ভারতবর্ষের সূচী

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

পৌষ—১৩৬৫

লেখ-সূচী

১। কবি পরিণতি (প্রবন্ধ)
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ১
২। অন্ধকারের পিপাসা (কবিতা)
সুনীল বসু ৬
৩। জীবনে বৈচিত্র চাই (কবিতা)
পুলক আঢ্য ৬
৪। শুভদৃষ্টি (গল্প)—সতীন্দ্র ভৌমিক ৭
৫। পুণ্যভূমি তারকেশ্বর (প্রবন্ধ)
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১০
৬। শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খলা (প্রবন্ধ)—শ্যামলী ১৩

চিত্র-সূচী

১। বারাসুলার বাজার, ২। পাটনার শহীদ স্মারক মূর্তি, ৩। শ্রমের জয়যাত্রা, ৪। জোসেফ বেকার অঙ্কিত নিগ্রোযুবার (আমেরিকার) শেকারদের উপাসনা-নৃত্যের চিত্র, ৫। জগদীশচন্দ্রের হস্তলিপি, ৬। শ্রীনবগোপাল দাশ, ৭। "জন্মান্তর" চিত্রের একটি দৃশ্যে পাহাড়ী সান্যাল ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ৮। কুমারী অপরাধা গুহঠাকুরতা।

লেখ-সূচী

৭। জন(তা)সাধারণ (প্রবন্ধ)
শঙ্কর গুপ্ত ... ১৪

৮। কমলমণি (বিষবৃক্ষ—বঙ্কিমচন্দ্র) (কবিতা)
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৬

৯। ভুল (গল্প)—শ্রীসুধীরঞ্জন গুহ ... ১৭

১০। সখারাম গণেশ দেউস্কর (আলোচনা)
শ্রীসজীবকুমার বসু ... ২১

১১। উপলব্ধি (কবিতা)
বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

১২। মানবতার সাগর-সঙ্গমে সুইডেনে আর নোবিয়েতে (ভ্রমণ কাহিনী)
শচীন সেনগুপ্ত ... ২৪

১৩। সে মেয়েটি (কবিতা)
শ্রীসন্তু দাশগুপ্ত ২৭

১৪। কলহনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ২৮

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র

মিলন

বিশেষ চিত্র

একলা চলরে ও নির্মীয়মান মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি

শ্রীরামপুরের এস.চক্রবর্ত্তীর
ডেপ্সাল গোল্ডেন XX নস্য
লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-৭

— শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত —
নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে
দাম—২৸০

যামিনীকান্ত সেন প্রণীত
আর্ট ও আহিতাগ্নি
সম্পাদনা : শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
জীবনের সুস্থ সমগ্রতা হ'তেই সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি—আর সুন্দরের অন্বেষণে মানুষের সাধনার ফল হ'লো শিল্প।
এই গ্রন্থে পাবেন—
কাব্য—চিত্রকলা—ভাস্কর্য ইত্যাদির ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব আর তারই সঙ্গে সেগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাব-বিশ্লেষণ। সুন্দর—সুরঞ্জিত—বহুমূল্যবান চিত্রশোভিত সুসজ্জিত সংস্করণ। দাম১২৲
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

ঢোল এণ্ড কোম্পানীর
• দাদ ও কাউরের
• নিম্ন মলম
• কিউটাটোন
বরানগর কলিকাতা

লেখ-সূচী

১৫। কী চাই (প্রবন্ধ)
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

১৬। সর্বোদয় ছাত্র অধ্যাপক শিবির (প্রবন্ধ)
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩৪

১৭। ক্লান্ত সুর (গল্প)—অমলেন্দু মিত্র ৩৭

১৮। ঐতিহাসিক (কবিতা)—গৌরীশঙ্কর দে ৪৪

১৯। সংগীত ॥ কথা, সুর ও স্বরলিপি ॥
বসন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীতরত্ন

২০। জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী
মাখনলাল রায়চৌধুরী

২১। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

২২। এ ডে'জ প্রেজার (অনুবাদ গল্প)
শ্রীতনয় বাগচী ৫৪

২৩। নাম ও প্রেম (অনুবাদ-কবিতা)
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ৫৬

২৪। জীবন সন্ধ্যায় তুমি (অনুবাদ-কবিতা)
রূপকানন বসু ৫৬

২৫। তোমরা কি লক্ষ্য করেছ ? (কিশোর জগৎ)
উপানন্দ ... ৫৭

২৬। পাখী ও কবি (কবিতা—কিশোর জগৎ)
বৈভব ...

২৭। ভাতকের গল্প (কিশোর জগৎ)
রবীন দেব ...

২৮। হেমন্ত ভোর (কবিতা—কিশোর জগৎ)
শ্রীমধুর দাশগুপ্ত

২৯। উৎসবের পরে (কিশোর জগৎ)
শ্রীআশাবরী দেবী

৩০। পতিব্রাতিনী সতী (কিশোর জগৎ)
শ্রীআর্যকুমার পালিত

৩১। বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য (প্রবন্ধ)
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ৬৫

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আস্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ্

জ্যোতিষসম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্ণব, রাজজ্যোতিষ

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

এম-আর-এ-এস্ (লণ্ডন), নিখিল ভারত কলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীর বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও গ্রহের অশুভ এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ঘটনার প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে অল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭৸৵০, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৸৵০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৸৵০. (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য)। **সরস্বতী কবচ**—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৸৵০, বৃহৎ—৩৸৵০। **মোহিনী (বশীকরণ) কবচ**—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরসঙ্গীও মিত্র হয় ১১৸০, বৃহৎ—৩৪৸৵০, মহাশক্তিশালী ৩০৭৸৵০ **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্ম্মোন্নতি, উপরিস্থ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৮৸৵০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৸৵০, মহাশক্তিশালী—১৮৩৸৵০ (আমাদের এই কবচ ধারণে জাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)। **নৃসিংহ কবচ**—সর্বপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিরোগ আরোগ্য, বংশরক্ষা, ভূত, প্রেত, পিশাচ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা ৭৸৵০, বৃহৎ—১৩৸৵০, মহাশক্তিশালী—৩৩৸৵০। (ভিঃ পিঃ করা হয় না।)

জ্যোতিষসম্রাট মহোদয় প্রণীত "অশ্ম মাস রহস্য"—কোন্ মাসে জন্ম হইলে কিরূপ ভাগ্য, আয়, বিবাহ, কর্ম, বন্ধু, মনের গতি, স্বভাব ইত্যাদি বিষয় ভাবে উল্লেখ আছে। ৸০। **বিবাহ রহস্য ২৲ ধনার বচন ২৲ জ্যোতিষ শিক্ষা ৩৷৷০**

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ও পণ্ডিতজীর নিজবাটী ৫০।২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (জবেদপথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট), কলিকাতা—১৩।
সাক্ষাতের সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ফোন ২৪—৩০৫৮। ব্রাঞ্চ ১০৪, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৪৪—৩৮৫৪।
সময় প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা। ফেক্টরী ব্রাঞ্চ অফিস—৩৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩৭

লেখ-সূচী

[illegible] (প্রবন্ধ)
[illegible]
[illegible] (উপন্যাস)
[illegible] ৭৩
কবিতা)
[illegible] ৭৭
[illegible] দর্শনে ডাক্তার শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
[illegible] রায়চৌধুরী ৭৮
[illegible] (প্রবন্ধ)
[illegible] ৮০
৩৭। উপন্যাস (উপন্যাস)—বনফুল ৮৩
৩৮। গ্রহ-রত্ন (জ্যোতিষ)—উপাধ্যায় ৮৯
৩৯। মহামতি ভারত (প্রবন্ধ)
[illegible] ৯৭
৪০ সংসার (কবিতা)—নিশীথ মিত্র ৯৯
৪১। আদালত অবমাননার দায়ে
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
[illegible] ১০০
৪২। নীলাচলে মহাপ্রভু (কবিতা)
শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী
৪৩। শিশু মন (মেয়েদের কথা)
সুপ্রিয়া ঠাকুর
৪৪। রান্নাঘর—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী
৪৫। মনে পড়ে (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ সান্যাল
৪৬। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র
৪৭। শ্মশানের স্বরূপ (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত
৪৮। লালমাটি (উপন্যাস)
ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
৪৯। সাময়িকী
৫০। পট ও পীঠ—শ্রীশ'
৫১। খেলা-ধূলা—
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ১২৬
৫২। সাহিত্য সংবাদ ... ১২৮

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত
— জ্যোতিষ গ্রন্থরাজি —

বিবাহে জ্যোতিষ

বিবাহই গার্হস্থ্য জীবনের মূল ভিত্তি। এই বিবাহ যদি সফল ও সার্থক না হয়—তবে সমাজের মূল ভিত্তিতে আঘাত লাগে।

বিবাহের ব্যাপারে আমাদের দেশে যেভাবে জ্যোতিষের সাহায্য নেওয়া হয় এবং যৌটক-বিচার করা হয়, তাতে অনেক সময় উল্টো ফলই ফলে থাকে। জ্যোতিষীর সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজেই যাতে যৌটক-বিচার করা সম্ভব হয়—এই গ্রন্থখানি সেই ভাবেই লেখা।

এতে মিল, মিল-বিচারের তত্ত্ব, প্রজাপতির নির্বন্ধ এবং বিরুদ্ধ মিলের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে। দাম—দুই টাকা

— অন্যান্য গ্রন্থ —

হাতের রেখা ২৲ সরল জ্যোতিষ ৪৲
হাত-দেখা ৪৲ কোষ্ঠী-দেখা ৫৲
ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র ৪৲
রাশিফল ২৲ মাসফল ২৲ লগ্নফল ২৲

শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

ছাত্র-সংসদি—সরকারি অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিণত বয়সের লেখনী-নিঃসৃত

নব-পরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য
ছাত্র সংস্করণ ২'০০, গ্রন্থাগার সংস্করণ ২'৫০ ন. প.

সুবিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের অনন্যসাধারণ সাহিত্য আলোচনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

অভিনব পঞ্চম সংস্করণ ৮'০০

প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
পরিবেশক : জেনারেল বুকষ্টল,
এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

যশস্বী সাহিত্যিকদের
সর্বোত্তম গল্প-সঙ্কলন

শ্রেষ্ঠ গল্প

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আজ গ্রহীতৃবর্গের আকার ধারণ করেছে এবং এরপরও কি বিজ্ঞাপনবহুল রসজ্ঞ পাঠকের সমক্ষের মূল্যায়নের দরবারে এ অভিযুক্ত অভিযোগই খণ্ড হয়েছে মাত্র। যে বস্তু হয়ে থাকে নি; রসোত্তীর্ণ বটে।

বাংলা সাহিত্যের যে শাখাটি করেছে তা হচ্ছে ছোট গল্প। অতিশয়োক্তি বোধ হয় এই? অন্যত্রও, তাঁরই সমালোচকের অভিনন্দন যার জুটেছে তাতে

শ্রেষ্ঠ গল্প

বনফুল	মনোজ বসু
সুবোধ ঘোষ	বুদ্ধদেব বসু
মানিক	বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর	বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রভাতকুমার	মুখোপাধ্যায়
উপেন্দ্রনাথ	গঙ্গোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ	মুখোপাধ্যায়
অচিন্ত্যকুমার	সেনগুপ্ত
শরদিন্দু	বন্দ্যোপাধ্যায়
নারায়ণ	গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিটি : ৫'০০

এই অভাবনীয় সম্পাদন

আহরণের উদ্দেশ্যেই 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সঙ্কলনের আয়োজন। যশস্বী সাহিত্যিকদের সর্বোত্তম গল্প সঙ্কলিত হয়েছে আমাদের প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ গল্প' পর্যায়ে। গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রত্যেক লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই সঙ্কলন গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য। বর্তমান শতাব্দীর স্বনামধন্য কর্তৃক সম্পাদিত এই সঙ্কলন গ্রন্থগুলি বাংলা গল্প সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে সাহায্য করবে। প্রত্যেক লেখকের প্রতিচ্ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা, চুম্বক পরিচিতি ও মনোরম প্রচ্ছদপট সঙ্কলন গ্রন্থগুলিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

• কয়েকটি গল্প-গ্রন্থ •

কাঠ-খড়-কেরোসিন : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : ২'০০ ॥ **হারানো সুর :** তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩'০০ ॥ **নরবাঁধ :** মনোজ বসু : ২'০০ ॥ **অপরিচিতা :** সতীনাথ ভাদুড়ী : ৩'০০ ॥ **অনুগামিনী :** বনফুল : ৩'০০ ॥ **মানস সিদ্ধিল :** বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : ৩'০০ ॥ **গল্প-সংগ্রহ :** প্রবোধকুমার সান্যাল : ৪'০০ ॥ **মধুরেণ :** দক্ষিণারঞ্জন বসু : ২'০০ ॥ **অন্তরতমা :** বারীন্দ্রনাথ দাশ : ২'৭৫ ॥ **পিয়াপসন্দ :** রমাপদ চৌধুরী : ২'৫০ ॥ **রাগে আর অনুরাগে :** সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ঃ কলিকাতা—বারো

—সর্বজন-চিত্ত-বিমোহন-কথাশিল্পী—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

॥ উকিলের ডায়েরি ॥

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা

সহরের ফৌজদারী কোর্ট—শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'জাতীর রঙ্গমঞ্চ' মানব চরিত্র-অধ্যয়নে প্রেসিডেন্সি কলেজ!' সেই ফৌজদারী কোর্টে চল্লিশ বৎসরকাল কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রমোহন ওকালতি-পেশার যে তিক্ত-মধুর-কটু-কষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেই সব মামলা-মকর্দ্দমার অপরূপ কাহিনী নাটক-উপন্যাসের অপরূপ টেকনিকে তিনি এ-ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেকালের কলকাতার বর্দ্ধিষ্ণু-ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিচিত্র রসের কাহিনী-মামুলি-চালের মুখোশ খসে বাবুদের সত্তা-কারের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে ডায়েরির পাতায় পাতায়।

কবি, সাহিত্যিক, জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্নি থেকে দোকানী-পশারী, চোর-বাটপাড়, সতী-অসতী নারী সকলকেই বাস্তবরূপে লেখক ডায়েরির ছায়ামুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিয়েছেন।

এ ডায়েরিতে আছে—বড় ঘরের বড় কথা, ক্ষয়িষ্ণু বোনেদী ঘরের পতনের কাহিনী—সহরের নিশাচর প্রমোদ-বিলাসীদের নৈশ লীলারঙ্গ, তাতে কত রঙের ঝিকিমিকি! উকিল-এটর্নির পালিশ-করা সৌজন্যের অন্তরালে উসকুনির কূট-কৌশলে বোনেদী ঘরের উচ্ছেদ।

সব কাহিনীতে পাবেন পর্যায়ক্রমে সমাজ-ইতিহাসের বিচিত্র উপাদান।

এম, এল, দে এণ্ড কোং ঃ ১৩।১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কল্পিত জীবনীয় রসায়ন। ইহা মৃতকল্পকে জীবন, ব্যাধিতকে স্বাস্থ্য, দুর্ব্বলকে বলদান করে এবং ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনাভরা মনমরা হতাশ জীবনে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দের ধারা উৎসারিত করে। ইহা সেবনে পাচকাগ্নি ও জীর্ণ শক্তি বাড়ে, যকৃৎ স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করে, অম্ল ও অরুচি দূর হয়, দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগান্তে এবং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে ইহা মন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। কঠিন রোগে ক্ষীণনাড়ী মুমূর্ষুর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া নিস্পন্দ হওয়ার উপক্রমে ইহা নূতন জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক নাড়ীর গতি আনিয়া দেয়।

পাইণ্ট—৪৲ টাকা, কোয়ার্ট—৭৷৷০ টাকা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয় ডাকা লিঃ।

হেড অফিস : ৫২।১, নিউমন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—ভারত ও পাকিস্থানে সর্ব্বত্র।

মালিকগণ—অধ্যক্ষ মথুরামোহন, লালমোহন ও শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখার্জ্জী চক্রবর্ত্তী

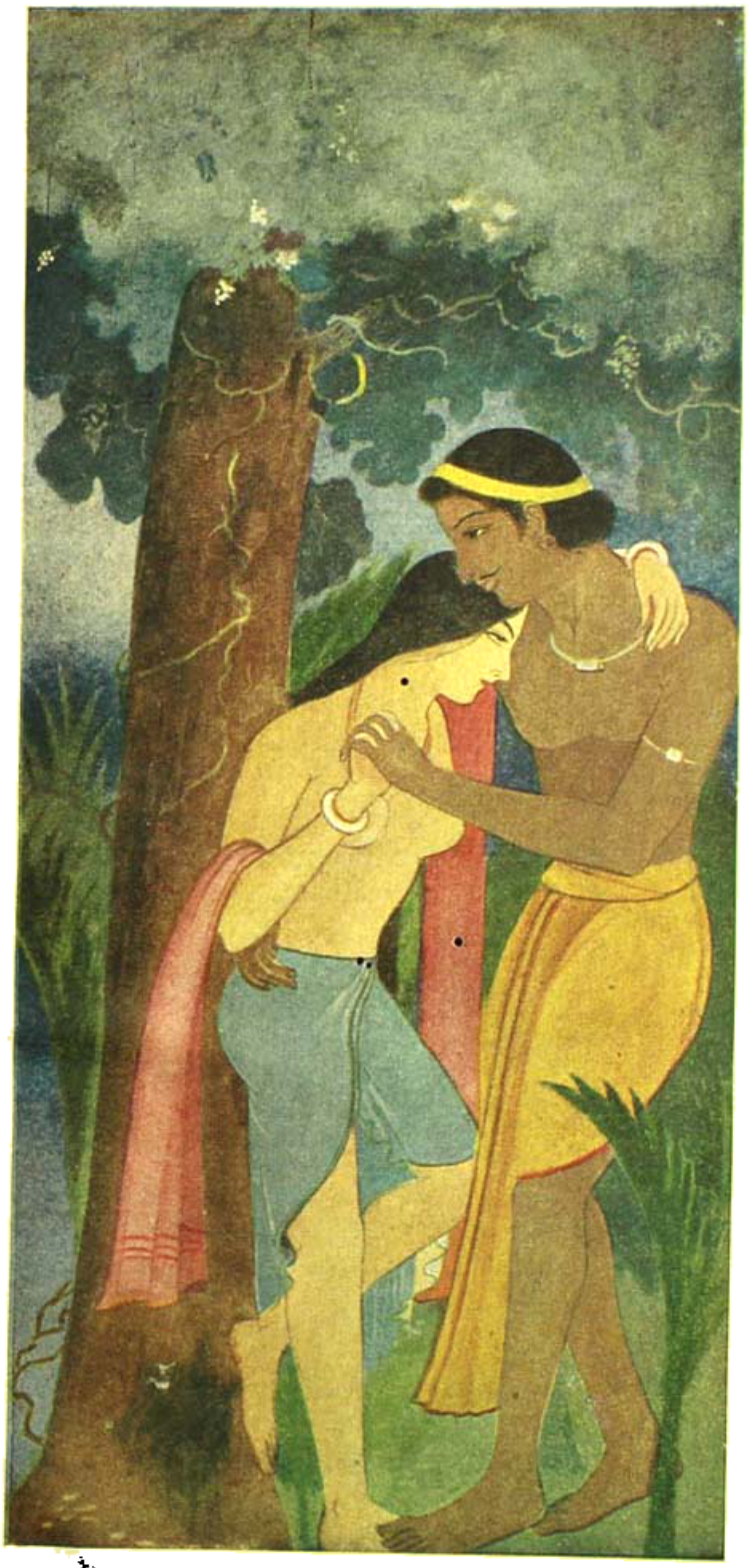

শিল্পী : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ নায়া এম-এ মিলন ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মননসাহিত্যে সর্বাগ্রগণ্য

কুলায় ও কালপুরুষ । সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রূপদী ভাব-ভাষার সামুজ্য সমেত এই প্রবন্ধাবলী বাংলা মননসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাগ্রগণ্য। গ্রন্থাকারে সবই প্রায় এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। সুধীন্দ্রনাথ দুরূহ রচনার অগ্রবর্তী হলেও অর্থকরী আধুনিক বাংলা গদ্যের ইতিহাস তাঁকে নিয়ে গৌরব করে। এবং স্বকীয় রচনার ভিন্ন চারিত্র সত্ত্বেও এই সব রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সর্বদা স্মরণীয় যে 'গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিস্ট।···তাঁর লক্ষ্য লেখার দিকে পাঠকের দিকে নয়।···ওর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না, কিন্তু একটা জায়গায় মেলে, সে ওঁর পথ-চলতি মন নিয়ে।' বাংলা ছন্দ, ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড, ক্রয়েড এবং অনার্য সভ্যতা প্রভৃতি বহু বিস্তৃত বিষয় ছাড়াও এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাঁচটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। দাম ৪·৫০

উপন্যাসের মতো জীবন

শরৎচন্দ্রিকা । নন্দদুলাল চক্রবর্তী

এই উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং শরৎচন্দ্র। শুরু সেই দেবানন্দপুরে, যেখানে কিশোরী ধীরুর তিনি মাস্টারমশাই, প্যারী-পণ্ডিতের ছাত্র, লাঠিয়াল নয়নচাঁদের ভক্ত। তারপর ভাগলপুরে, যেখানে প্রথম পরিচয় রাজেন্দ্র মজুমদার বা রাজুর সঙ্গে, একত্রে দুঃসাহসী জীবনের আস্বাদ। সেই তখন থেকে—জীবনের নানা কক্ষপথে, সাহিত্যের পথে জয়যাত্রায়, কখনো প্রেমে কখনো উপেক্ষায়, কখনো মিলনে কখনো বিচ্ছেদে, কখনো ক্লেশে কখনো বিলাসে—এই অসামান্য নায়কের জীবনসন্ধান। আত্মজীবনের তথ্য রহস্যে আবৃত রেখেছেন শরৎচন্দ্র। বলেছেন—'আমার যা-কিছু বলবার তার সবই আছে আমার বইয়ে। এত বেশি আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা আর কারো লেখায় পাবে না। আমার বই থেকে যদি কেউ আমার জীবনের সব কথা উদ্ধার করতে না-পারে, সে আমার জীবনের কথা লিখতে পারবে না।' শরৎচন্দ্রের এই নির্দেশ সযত্নে পালন করেছেন লেখক নন্দদুলাল চক্রবর্তী। দীর্ঘ দিনের সন্ধানে বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, গবেষণা করেছেন, তারপর রসান দিয়ে পরিবেশন করেছেন 'শরৎচন্দ্রিকা'। দাম ৪·৫০

নতুন সংস্করণ

দুই বাড়ি । বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লীগ্রামে পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ-বাড়ির ছেলে নিধিরাম মোক্তারী পাশ করে মহকুমায় প্রথম যেবার প্র্যাকটিস করতে যায় সেইবারই বহু বছর পর পাশের বাড়িতে জজসাহেব লালবিহারীবাবু ছুটিতে এলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। নিধিরামের ইনি পিতৃবন্ধু। তাঁরই কিশোরী মেয়ে মঞ্জু দরিদ্র মোক্তার নিধিরামের জীবনে অভাবিত ভাবে ভালো-বাসার যে মর্মর জাগালো, কৈশোরের আলোয় ভরা সেই ভীরু ভালোবাসার কাহিনী এই 'দুই বাড়ি'। দাম ২·৫০

নতুন সংস্করণ

টুনটুনির বই । উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছোট্ট টুনটুনি, কূটবুদ্ধি শেয়াল, কুচক্রী কাক, গোঁয়ার বাঘ, বোকা বামুন, নয়তো নেহাত পাকাবুড়ি। এই সব পশুপাখি, সাধারণ মানুষকে নিয়ে রূপকথার মধ্যে যে লৌকিকচরিত্রটি ফুটে ওঠে তার দৃষ্টান্ত টুনটুনির বইয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। অপরূপ কৌতুকে ভরা-পরিমিত সরল ভাষায় এই রচনাগুলির তুলনা পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যে বিরল। গল্পের অন্তর্গত আশ্চর্য ছবিগুলি স্বয়ং লেখকের আঁকা। দাম ২·২৫

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
ঢালিগঞ্জে : ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

সিগনেট বুকশপ

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

রূপসী না সজীব বোমা? ২৲
লণ্ডনে শত্রুচর ২৲
মরণের রণ-ভেরী ২৲
কুহকিনীর ফাঁদ ২৲
প্রচ্ছন্ন আততায়ী ২৲
চীনের ড্রাগন ৩৲

উপন্যাস:
কাননী মুখোপাধ্যায়

প্রাণ ও পাষাণ ওরা কাজ করে
দাম—৫৲

নর-বিগ্রহ ৩॥০
জ্যোতির্ময় ৫৲
জীবন রুদ্র ৩॥০
কালরুদ্র ৪৲
মহারুদ্র ৪৲
সন্ধ্যারাগ ৪॥০
মেঘ মেদুর ৩॥০
চিতাবহ্নিমান ৪৲

উপন্যাস:
পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দাম—৫৲

মরা নদী ৫৲
সাহিত্যিক ২॥০
রবেন রায়
মর্ত্তের-মৃত্তিকা ৩॥০
আরক্তিম ৪৲
জাগ্রত জীবন ২৲
মুখর-মুকুর ৪৲
সরলা বসু রায়
পথ ও পাথেয় ২৲
অশোক গুহ
এক রাত্রির কাব্য ২৲

দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি
৯৯এ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ
লাইন ও হাফটোনের কাজে

ভারতবর্ষ হাফটোন ওয়ার্কস্
৪৬ বৎসরের নির্ভরযোগ্য
সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান।
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে মূল্য-তালিকা
পাঠান হয়।

ওপাদ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মনোমত
সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হলে
আরতির
"রাণী রাসমণি"
শাড়ী ও ধুতি কিনুন
কাপড়কে সবদিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে তা হ'লে, দয়া করে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।
আরতি কটন মিলস্ লিঃ
দাশনগর, হাওড়া।

পৌষ—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

কবি পরিণতি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কবির আরম্ভ যেমন কৌতূহলের জিনিস, কবির পরিণামও তেমনি কৌতূহলের—পরিণামই হয়ত বেশী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। আরম্ভের আশা ভরসা, গুণধর্ম্ম পরিণামে কি রকমে সমর্থিত উপচিত পরিপূরিত হয়েছে, কিম্বা পরিবর্ত্তিত এমন কি পর্য্যুদস্ত হয়েছে, সে ইতিহাসের রহস্য জিজ্ঞাসুচিত্ত আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন—এ বিষয়ে আমরাও আজ কিছু দেখতে প্রয়াস করব।

সেক্সপিয়রের দিয়েই আরম্ভ করি—তাঁর উদাহরণ যেন সকল কবিপ্রাণের প্রতিকৃতি, তিনি যেন কবিকুলেরই প্রতিভূ। যাঁর আরম্ভ Venus and Adonis, আর The Rape of Lucrece দিয়ে তাঁর পরিণতি Winters Tale, Tempest এ গিয়ে। সেক্সপিয়রকে যদি যমুনা হিসাবে গ্রহণ করি, তবে কবির জীবনকে, হয়ত মানব-জীবন মাত্রকেই, মোটের উপর তিনটী পর্য্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথমে জোয়ারের আরম্ভ—যৌবনের ক্রমোদ্যির উল্লাস উৎসাহ উদ্দীপনা, প্রচুর হাসি-কান্না: তারপর জোয়ারের শেষে, মধ্য বয়সে, প্রৌঢ়ত্বের সূচনায় একটা প্রতিক্রিয়া, জীবনের সঙ্গে গাঢ়তর ও কঠোরতর পরিচয়ের ফলে একটা বিপর্য্যয়ের ব্যর্থতার, বিষাদের কাল্পণ্যের অনুভূতি—সেক্সপিয়রের দ্বিতীয় যুগ, যাকে বলা

হয় তাঁর ঔদারের মহাট্রাজেডির যুগ। তারপর শেষে জড়ের অন্তে একটা শান্তি ও সামঞ্জস্য, প্রসন্নতা ও ক্ষমার পরিবেশ। প্রথম যুগে যৌবনরাগে রঙীন সেক্সপিয়র এই যেমন বলেছেন—

If music be the food of love, play on.
Give me excess of it, that, surfeiting,
The appetite may sicken and so die.
That strain again! It had a dying falb;
O, it come O'er my ear like the sweet sound
That breathes upon a bank of violets,···
(Twelfth night I···I)

দ্বিতীয় যুগের ঘন-ঘোর শুরু পাঢ় রুদ্রতার সঙ্কটের সংগ্রামের লীলা:—

Howl, howl, howl, howl! O. you are
men.of stones!.
Had I your tongues and eyes, I'd use
them so
That heaven's vault should crack···
(King Lear V. 3.)

পরিশেষে একটা উপশমের, প্রশান্তির, প্রসন্নতার, প্রণতির, ক্ষমা ও শান্তির আবহাওয়া—

But this rough magic
I here abjure; and when I have requir'd
Some heavenly music—which even now
I do—
To work mine end upon their senses that
This airy charm is for, I'il break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'll drown my bo k. (Tempest V···I)

আর একজন কবির কথা বলি—William Blake-এর দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। তবে ব্লেক দেখিয়েছেন দুটি পর্যায়ের দুটি জীবনের অবস্থান্তর বা রূপান্তর। প্রথম জীবনে হল—যাকে তিনি বলেছেন Songs of Innocence—তাঁর কবি চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়েছে সরলতার শুচিতার অনভিজ্ঞতার মধুচক্রে—এ যেন শৈশবের স্বচ্ছ স্বপ্নালু যন্ত্রণা। কিন্তু বয়সের সঙ্গে তোরের স্নিগ্ধতা পেলবতা শুভ্রতা মিলে যায়—আসে ক্রমে পরিণত বয়সের খররৌদ্র; হয় স্বপ্নভঙ্গ, আসে কঠোর বাস্তবের, ঘাত-প্রতিঘাতের, কর্কশের, অসুন্দরের সঙ্গে পরিচয়। আদি মানব-মানবী নন্দনে যেমন ছিলেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পূর্বে, আর যেমন হয়েছিলেন সেই ফল আস্বাদনের পরে। এই দ্বিতীয়পর্বের আত্মপ্রকাশকে কবি নাম দিয়েছেন Songs of Experience। শুরুর একটা Song of Innocence

The moon like a flower
In heaven's high bower,
With silent delight
Sits and Smiles on the night

কিম্বা এই আর একটি

When the voices of children are heard
on the green
And laughing is heard on the hill,
My heart is at rest within my breast
And everything else is still.

এবার শুরুর বিপরীত বা বিষাদী রাগ, একটা Song of Experince. সেই পরিচিত বিঘাত—

Tiger! Tiger! burnig bright
In the forest of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy symmetrig?

অথবা—

The Rhine was red with human blood,
The Danube rolled a purple tide
On the Euphrates Satan stood
And ever Asia stretched his pride.

কিন্তু দ্বিতীয় ব্লেক প্রথম ব্লেকের বিপরীত নয়, পরিণত পরিপক্ক রূপ যায়, তা রূপের আন্তিকা প্রৌঢ়তার মধ্যও রুক্ষতার মধ্যেই অনুভূত হয়ে চলেছে—

I know thee. I have found thee, and I will
not let thee go;
Thou art the image of God who dwells in
darkness of Africa,

And thou art fall'n to give me life in
regions of dark death

কিন্তু বৈপরীত্য, একটা বিরুদ্ধতাই, দেখা দিয়েছে আধুনিক আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের এর মধ্যে।

বিষয়টি খুবই আলোচিত হয়েছে, বলা হয়েছে পর্যায়ক্রমে যে প্রথম যুগের ইয়েট্‌সই আসল ইয়েট্‌স, শেষের ইয়েট্‌স ইয়েট্‌সের প্রেতমূর্তি। হয়ত এটি অত্যুক্তি। কিন্তু বৈপরীত্য ও বৈপরীত্য যে বিশেষ প্রকট, তাতে সন্দেহ নাই। স্বপ্নের কল্পলোকের আতুর অনুচরের মুগ্ধদর্শী বিষাদী কবি, মধুছন্দ মধুরাক তাঁর—

In all poor foolish things that live a day
Eternal Beauty wandering on her way

কিংবা—

The wrong of unshapely things is a wrong
too great to be told
A hunger to build them anew, and sit on a
green knoll apart,
With the earth and the sky and the water
remade, like a Casket of gold
For my dream of Your image, that blossoms,
a rose in the deeps of my heart.

এই যে কল্পলোক, নন্দন কানন, আতুর চেতনার নিভৃত চিত্তের স্বর্গরাজ্য; কবির ভাষায় তাই হ'ল Innisfree The Isle of Innisfree—কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের পরে, প্রায় বার্দ্ধক্যের কি একটা বিপর্যয় ঘটে গেল তাঁর চেতনায়—একটা ঝড় এসে, কোন রুদ্র হস্ত এসে সে সব উড়িয়ে নিল, মুছে দিল। কবি হয়ে উঠলেন মাটির মানুষ, বাস্তবের অধিবাসী। তাঁর কণ্ঠ থেকে কি একটা যাদু উবে গেল, কবি নয় তিনি হয়ে, পড়লেন বক্তা শুধু। এখন তাঁর বলতে লজ্জা হল না—

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age;
They were not such a plague when
I was Young,
What else have I to spur me into song?

সত্যই ত Songs of Innocence আর তাঁর কণ্ঠে নাই, কিন্তু এসেছে সেখানে Songs of experience এবং যন্ত্রটা অকবির ভঙ্গিতে নানা সহজ গলায় বলতে চেয়েছেন তাও। অকবি বা অকবি-কণ্ঠ তিনি হতে পারেননি। এখনও তিনি সত্যকে সুন্দরকে চান, কিন্তু কল্পনার মানস অঞ্জনার কুলকুলি নয়, চান সত্য—হোক না তা কঠোর সত্য, সুন্দরকেই চান—হোক না তা নিরাভরণ শ্লেষী-ব্যঙ্গের রূঢ় অনুশাসন—বলছেন ত—

Grant me an old man's frenzy,
Myself must I remake
Till I am Timon and Lear.
Or that William Blake
Who beat upon the wall
Till Truth obeyed his call ..

তিনি এখন চান A old man's eagle mind তাঁর দেশের নাম এখন আর Innisfree নয়, তা হ'ল Byzantium—ফলতঃ আমি মনে করি যতই বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য থাক ইয়েট্‌সের এই দুটি পর্যায়ে, একটি আর একটির খণ্ডন নয়, পরিপূরক—একই ভিনিষের দুটি পীঠ, অথবা সুমেরু-কুমেরু।

আর একজন কবি কিন্তু সত্য সত্যই কবি-প্রেরণা, কবি-চিত্তই হারিয়েছেন তাঁর উত্তর জীবনে। আমরা জানি মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ শেষ বয়সে লিখে গিয়েছেন পদ্যাকারে গদ্য—কাব্য নয়, কথামালা। কবি-চিত্তের এই ক্রম-অবনতি বা অস্তগমন তাঁর শেষ সৈটায় চরমে পৌঁচেছিল একজন ফরাসী কবির মধ্যে—আর্থার রঁাবো (Arthur Rimbaud) অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয় (মাত্র ৩৭ বৎসর, যদিও কীট্‌স আরো অল্প বয়সে মারা যান—তবে কীট্‌সের কবিপ্রতিভা শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল)। কিন্তু তাঁর কাব্য-জীবন শেষ হয় কুড়ি বৎসর বয়সেই, তারপরে সরস্বতীর সেবা আর করেন নাই—যাপন করেছেন তবঘুরের দীনহীন জীবন। সে যা হোক, আমাদের বিষয় হোল কবির কাব্য-পরিণতি কথা, কাব্য-বহির্ভূত জীবনের কথা নয়।

প্রশ্নটি এখন আমরা আমাদের রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তুলতে চাই। পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ আর উত্তর রবীন্দ্রনাথ বলে কিছু আছে কি? থাকলে কি ধরণের পার্থক্য তা?

প্রথমত একটা জিনিষ দেখান হয়ে থাকে—ভাষার দিক দিয়ে। উত্তর রবীন্দ্রনাথের ভাষা হয়েছে যথাসম্ভব সহজ, সরল, নিরলঙ্কার, সাজসজ্জাহীন—যথাসম্ভব মুখের ভাষা সকলের ভাষা—পণ্ডিতের আলমারিকের পোষাকী ভাষা নয়, তা হল দৈনন্দিনের আটপৌরে চলন-বলন। ভাবের দিক দিয়েও বলা হয়েছে পূর্ব্ব-রবীন্দ্রনাথ হলেন যৌবন রসোচ্ছল, পার্থিব সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যের পূজারী, মাটির সন্তান—তিনি মাটির রসে মশগুল—স্বর্গে, ওপারে তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে মেহ টেনেছেন এই মাটির চোখেরই রঙরাগ। উত্তর রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়েছেন একটা ত্যাগের তপস্যার কঠিন-কঠোর না হলেও, একটা আত্মস্থ স্থৈর্য্যের সমাহিতির, বিরতির আবহাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের দুই পর্ব্বে একটা বিভিন্নতা থাকলেও, বৈপরীত্য কিন্তু কিছু নাই। এখানে উত্তরপদ পূর্ব্বপদের সহজ স্বাভাবিক ক্রমিক পরিণতি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ হলেন মুখ্যত মূলত মিলনের, সমন্বয়ের, সামঞ্জস্যের কবি। তাঁর চিত্ত, তাঁর অনুভব, তাঁর দৃষ্টি সকল রকম দ্বন্দ্ব বা বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই মিলনের সূত্র আবিষ্কার করে চলেছে। আপাতভের, নৈরাশ্যের, আত্মপ্রতিবাদের বা প্রত্যাখ্যানের বা বিমুখতার পর্ব্ব এসে জীবনের ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত ঘটায় নাই। জীবনের মধ্যে এলেন তিনি, জীবনকে গ্রহণ করলেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে, তার গুণগান গৌরব কীর্ত্তন করলেন, তবে তার নিভৃত অলক্ষ্য উৎসের সংযুক্ত রেখেই, সর্ব্বদা সেই ও-পারের অপারের ভাবনাকেও ইহের-এসবের মধ্যে অন্তঃসারী ফল্গুধারা হিসাবে নিহিত রেখে। তবে কালের ক্রম-পরিণাম ধারায় এই অন্তঃপ্রবাহের সুরই প্রকট হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, কিন্তু পুরাতন পূর্ব্বতনকে প্রত্যাখ্যান করে নয়। জীবনের অন্তে পৌঁছলেন যখন সহজ স্বাভাবিক গতিছন্দে, যেসব বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সাগ্রহে পরিচয় নিয়েছিলেন, তাদের থেকে সরে চলে যাবার পালা এল, তখন দুঃখ, ক্ষোভ বা অনুযোগ বা বিরোধীভাব কিছু নাই। পরিবর্ত্তন যদি হয়ে থাকে তবে হয়েছে কতকটা এই ধরণের—আদি জীবনে যে ভাবটা ছিল সরু, শেষ জীবনে তা মোটা হয়েছে—আর যে তার ছিল মোটা, তা শেষে হয়েছে সরু—মুখ্য যা ছিল তা হয়েছে গৌণ, গৌণ যা ছিল তা হয়েছে মুখ্য। বয়সের ফলে কণ্ঠে পরিবর্ত্তন এসেছে, কিন্তু স্বর বদলালেও সুর বেশী কিছু বদলায় নাই। পরিবর্ত্তন হল পরিণতি ও পরিপক্কতা। যা ছিল উজ্জ্বল তা হয়েছে গাঢ়, যা ছিল ভাবাবেশ তা হয়েছে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, যা ছিল অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ তা হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক—তরা ভাদরের পরে এ যেন, কালিদাসীয় উপমায়, তনুগাত্রযষ্টি শারদশ্রী। কবি-চিত্তের এই ক্রমধারা অনুসরণ করি যদি প্রথম পর্ব্বে, প্রভাত সঙ্গীত—

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রাঙ্গধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব যে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল, তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

তারপর দ্বিতীয় পর্ব্ব, ভাবোচ্ছ্বাস যখন গাঢ় হয়েছে, তারল্যের পরিবর্ত্তে এসেছে নিবিড়তা, কণ্ঠে উদাত্ত গাম্ভীর্য্য, ভাবে গভীরতা—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদি রক্তে আঁকা তব চরণ শোনিমা—
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার। (উর্ব্বশী)

তৃতীয় পর্ব্ব, যাকে বলা যায় কবিচিত্তের পরিপূর্ণতা, পূর্ণাহ্নতা, রবি-পরিক্রমার মধ্যাহ্ন-স্থিতি যেন—স্থিতির সঙ্গে গতির, গাঢ়তার সঙ্গে নমনীয়তার, দৃষ্টির সঙ্গে অনুভূতির সাযুজ্য মিলন হয়েছে—কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখা প্রেরণা সাম্যতা লাভ করেছে—

হে হংসবলাকা
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে শুব্ধতার ডানা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অযুত পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা— (বলাকা)

অথবা,

খোল খোল হে আকাশ, শুভ্র তব নীল যবনিকা—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলি বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার তীব্র দীপশিখা!
দিগন্তের কোন পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা—
(পূরবী)

তারপর চতুর্থ পর্বে—সব শেষের গান—কণ্ঠ প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন অনুদাত্ত কোমল হয়ে চলেছে পরমনিবৃত্তির মধ্যে মিলিয়ে যাবার পথে যেন—পরমনিবৃত্তি কিন্তু যার মধ্যে, আমি ইতিপূর্বে বলেছি যেমন, সকল বৃত্তিই আশ্রয় নিয়েছে সংহত সংবৃত হয়ে, স্বরূপের সার্থকতার মধ্যে—

পথ রেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
দূর দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে—
শুধু আমি দিনান্তের পান্থশালা দ্বারে,
শেষ তীর্থ-মন্দিরের চূড়া!
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ-জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহুদূর।

কবি-পরিণামের আর একধারা আছে—সেটি এখানে উল্লেখ করতে পারি মাত্র। কবিত্বের ক্রমগতি যেখানে অর্ধ-অবগমন বা অস্ত-গমন নয়, নিম্নাভিমুখী গতি নয়, সমতলবর্তী গতিও নয়—যা হল উর্দ্ধায়ন অর্থাৎ কবি আর শুধু কবি নন, হয়ে উঠেছেন ঋষি, মানুষী বাক ছাড়িয়ে কণ্ঠ উচ্চারণ করেছেন দৈবী বাক—কারণ তার চেতনাও চিত্ত হয়ে উঠেছে অনুরূপ—উদাহরণ শ্রীঅরবিন্দ। মানুষী কবিকণ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে আদিপর্বে বলেছে—

Are we more than Summer flowers ?
Shall a longer date be ours ;
Rose and Spring-time, Youth and we
By the everlasting Sea ?

এ সার্বজনিক সমস্যার উত্তর দিয়া কবিকণ্ঠ—

In the ending of time, in the sinking of space
What shall Survive ?
Hearts once alive,
Beauty and Charm of a face ?
Nay, these Shall be safe in the breast
: of the One
Man defied
World-Spirits wide
Nothing ends, all but began

প্রথম যৌবনের ভাবন ও ভাষণ প্রতিফলিত এই যে কথায় তিনি শেষ করলেন তাঁর "উর্বশী"—

.....So pressing back
The longed-for sacred face, lingering
he kissed.
Then love in his Sweet heavens
was Satisfied.
But for below through silent mighty Space
The green and Stremous earth
abandoned rolled

উর্বশী-পুরুরবার মিলন হ'ল, প্রেমের সার্থকতা হ'ল—কিন্তু এই মর পৃথিবীতে নয়, আর এক উর্দ্ধতর লোকে—বেচারী পৃথিবী পড়ে রইল যে তিমিরে সে তিমিরে। একটা নিবিড় মানুষী কারুণ্য, পার্থিব সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা যে অর্দ্ধস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়ে ফেটে পড়ছে। কিন্তু মানুষী কামনার দীর্ঘরজনী শেষ হবে, শেষ হ'ল একদিন—পৃথিবী আর অসহায়ভাবে পরিত্যক্ত রইলনা। "সাবিত্রীর" ঋষি-কবি দিব্যবার্তা আনলেন, বার্তা শুধু নয়, দিব্য-সিদ্ধি এনে ধরলেন মানুষের পৃথিবীর কাছে, "সাবিত্রী"র আরম্ভে এই অমর বাণী দিয়ে—

It was the hour before the gods awake···

সময় হয়েছে, দেবতারা জাগছে,—উর্দ্ধলোক থেকে, তাদের নিজেদের স্বর্গ থেকে দেবতারা নেমে আসছে এই ভূতলে মানুষী রূপধারণ করে, এই মর্ত্যলোকের মানুষ ও উর্দ্ধের চেতনায় পূর্ণ হয়ে দেবতার রূপ ধারণ করেছে—নবসৃষ্টির এই ত নব জাতি—রূপান্তরিত প্রকৃতি এসেছে যাদের কল্যাণে—

The Sun-eyed children of a marvellous dawn,
The great creators with wide brows of Calm,
The massive barrier-breakers of the world
...
The architects of immortality

Their tread one day shall change the Suffering earth
And justify the light on Nature's face.

অন্ধকারের পিপাসা

সুনীল বসু

এই অন্ধকারের গভীরে আমি ডুবে আছি
যেমন অরণ্যে, জলে ডোবে হিপোপটেমাস্,
রাত্রির বুকের ছায়া, তারার রূপালি মাছি
আঁকে চিত্রপট,—আমি যেন অন্ধকারে ক্লান্ত ঘাস।

অন্ধকার : আমায় আবদ্ধ করো তোমার দুয়ারে
রাত্রির প্রচণ্ড ছায়া নিঃস্বে যাওক,
আমার বিস্তীর্ণ অস্থিরন্ধ্র বুক
ধূলায় লুণ্ঠিত হোক, নিক আশ্রয়ে তোমারে।

দিবস জঞ্জাল, বেকারের বীভৎস হাহাকার
নৈরাশ্য-সমস্যা দুঃস্থ। আর
তুমি রাত্রির শরীর গাঢ় অন্ধকার,—
কারুজোছনায় রূপার ফেনার
সমুদ্রের জলে তুমি জলকন্যা আমার!

অন্ধকার তুমি স্নিগ্ধ-জল,—
জলপ্রবাহের আশ্চর্য সংগীত তোমার শরীরে;
তোমার প্রাচীন গহ্বরে আমাকে
সমাবৃত করো ধীরে ধীরে।

জীবনে বৈচিত্র্য চাই

পুলক আঢ্য

জীবনে বৈচিত্র্য চাই—উদ্দাম-আবেগ অনুভূতি,
প্রত্যহের প্রয়োজন ভুলে যেতে কিছুক্ষণ তাই—
যান্ত্রিক জীবনটাকে আলস্যের আমেজে ভিজিয়ে
আনন্দ রসের খোঁজে—ছুটি ইতি উতি।

চলার ছন্দেতে চাই—কিছু কম্, খানিকটা ছেদ,
রুটির কঠিন হতে চায় মন কিছুটা বিরতি।
জীবনের মুক্তি চাই—জীবিকার অক্টোপাশ হতে,
কিছুটা সময় চাই—একান্ত নিজের কোরে পেতে।

তাই তো চলার ছন্দে মাঝে মাঝে ছই ছন্নছাড়া,
লোকে কয়—'উচ্ছৃঙ্খল, সমাজের যোগ্য নও তুমি'
বোঝেনা আদিমরক্ত নাচে আজো শিরায় শিরায়
অরণ্যের আবাহন মর্মন্তিত প্রতি রোমকূপে।

জীবনে বৈচিত্র্য চাই—আনন্দের অমৃতপরশ,
কিছুটা সময় চাই—বেহিসাবী বিচিত্র যৌবন।

শুভদৃষ্টি

সতীন্দ্র ভৌমিক

ওপাশে রুমা, এ পাশে আমি—মাঝখানে শ্বেতপাথরের টেবিল। বয় এইমাত্র চপ্ দিয়ে গেল, প্লেটটা এখনো গুণছে।

রুমা তার এলোমেলো চুলসমেত মাথাটি এগিয়ে দিল টেবিলটার এক পাশে।

রুমা এবার মাথা তুললো। ওর কোমল মুখে নেমে এসেছে সারাদিনের ক্লান্তি। চোখের মণিতে দুর্জয় অভিমানের চিহ্ন। শ্রান্তস্বরে বলল রুমা, 'বেশ লাগছে সমীরদা!'

প্রগলভতার লোভ সংবরণ করতে না পেরে বললাম, 'কে, চপ না আমি?'

রুমা স্মিত হেসে বলল, 'খুব ক্লান্তি লাগছে!'

চা খেতে খেতে রুমা বলে, দেখুন, পুরুষমানুষ বড় স্বার্থপর হয়। এরা আপদে নিষ্ঠুর, কিন্তু বলে কর্তব্যপরায়ণ।

সে এমন স্নিগ্ধস্বরে কথাগুলো বলছিল যে প্রতিবাদ করাটাও নিতান্ত রূঢ়তা বলে মনে হলো। চায়ের কাপে আর একবার অধরস্পর্শ করে ও জের টেনে চলে, এই দেখুন না, রবিদাকে কত করেই না লিখলাম, কিন্তু তার এক কথা; 'এখন বিয়ে করবার সময় হবে না!'—এদিকে দিদি তো ভেবে ভেবে একসা—কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'মেয়েরা বড়ো সন্দিহান!'

'পুরুষদের কটুকথা বলবার শোধ তুলছেন বোধ হয়?'—রুমা হেসে ফেলে। 'তারপর আমিই মৎলব বাৎলে দিই! এ ভাবে হবে না দিদি, তার করে দাও, আমরা মদনপুর যাচ্ছি—অমুক তারিখ বিয়ে, রবিদা বর না হলেও আটকাবে না! বাস্ দিদির মনে প্ল্যানটি ধরল। তাই তো উড়ে এলাম, আর আপনাকেও না-হোক ঘণ্টা চারেক ওয়েটিং রুমে বসিয়ে কষ্ট দিলাম!'—দম নেবার জন্য রুমা এবার থামল।

আমি বললাম, শেষ পর্যন্ত বর রবি রায়ই হবেন তো?

'আহা যেন জানেন না?'—রুমা কটাক্ষ হানলো।

হেসে বললাম, 'ব্রেভো' মুন্নদি তবে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন বলো। এতদিন তো বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, বরই কনেকে বিয়ে করবে, এখন দেখছি কনেও বরকে বিয়ে করে!

'যান, আপনি বড্ড ঠাট্টা করেন।'—রুমা উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে। 'কই চলুন, এখানে বসে থাকলেই চলবে নাকি, ওদিকে তো দিদি একা একা বসে হাঁপিয়ে উঠছে!—রুমা পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

মুন্নদি শিলালহ স্টেশনে বসে আছেন। তাঁর জন্য কাগজে জড়িয়ে একটি চপ নেই।

গাড়ি ছাড়বার সময় মুন্নদি বললেন, চল না মদনপুর?

চোখ কপালে তুলে বললাম, 'জানতে পারলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে, তা জানো?

মুন্নদি হেসে উঠলেন। বললেন, 'আহা যাট, বিয়েতে কিন্তু যেয়ো—তুমিই তো কনে-কর্তা!'

'আলবৎ!'

গাড়ি ছেড়ে দিল। যেন্ ট্রেনের মতো রুমা রুমাল নেড়ে বিদায় জানালো।

মদনপুর মুন্নদির শ্বশুরেটের বাড়ি। সেখানেই বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। বিয়ের পর মুন্নদি চলে যাবেন রবি রায়ের সঙ্গে মাইথন, আর রুমা ফিরে যাবে কাকিমার কাছে।

সমীরের মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা।

তুফানগঞ্জ যাবে। হঠাৎ নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। অদূরে তিনটি শৈলশিখরের গলাগলি করে ধরে থাকা দৃশ্যটি বেশ লাগছিল সমীরের। স্টেশনটির নাম বুঝি ওই থেকেই হয়েছে, 'তিন পাহাড়!' ধীরে ধীরে সমীর এগিয়ে

হলে পাহাড়ের দিকে। সমীর দৃষ্ট প্রসারিত, পাহাড়টিও ততই কাছে সরে আসছে—তবুও তার কাছে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ সোনালি টোপর পরে টপ করে ঢুকে গেল হিমঘরের বাসরঘরে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। হঠাৎ সমীরের মনে পড়ল, 'তাইতো উঠব কোথায়?' এমন সময় দেখতে পেল পাহাড়কে পিছনে ফেলে দুটি মেয়ে কথা বলতে বলতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সমীর দাঁড়িয়ে পড়ে পথের উপরেই। মেয়েদুটি হঠাৎ চমকে ওঠে যেন—তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সমীরই কথা বলে ওঠে এবার, 'শুনুন।' কথা থেমে যায় তাদের। পথের বুকে পড়ে থাকা একটি মাঝারি গোছের গুড়িতে চোট লাগে বড়ো মেয়েটির। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বলছেন?'

'হোটেল আছে এ অঞ্চলে'—দোৎসুক মুখে তাকায় তাদের দিকে।

তারপর থেকেই ওদের সঙ্গে তার দুরত্ব। হোটেলে আর উঠতে হয়নি সমীরকে—সোজা ঝুনুদির কাকির বাড়িতেই উঠেছিল। সমীরের আজও আশ্চর্য লাগে, কেমন করে সব ঘটনা ঘটে। কে কোথায় গিয়ে ভেরা ফেলে!

রুমা আর ঝুনুদি দুই বোন। সংসারে তাদের নিজের বলতে ওই কাকিমা আর এক দূর সম্পর্কের মামি। বাবা-মা'র মৃত্যুর পর তাঁরা দুজন দুই বোনকে ভাগাভাগি করে নেন। দু-জনকে একসঙ্গে মানুষ করবার সামর্থ্য কারোরই নেই। ঝুনুদি গতবার বি-এ ফেল করেছেন—আর পড়েন নি। মামীর স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন, আর রুমা এবার আই-এ দিয়েছে।

মামির এক সম্পর্কের ভাই রবি—রবি রায়, তাঁরই সঙ্গে বিয়ে হবে ঝুনুদির আগামী এপ্রিলে মার্চ।

আজ সেই এপ্রিলে মার্চ। বিয়ে হয়ে গেল ঝুনুদির। না আমি যেতে পারিনি। গার্ডিয়ানের চোখ-রাঙানির উত্তাপে আমার সবুজ মনের আশা পুড়ে শাদা হয়ে গেছে। তখন আমি সবেমাত্র থার্ড ইয়ারের ছাত্র। বাড়ি থেকে বলল, 'তোমার আবার মেয়েবন্ধু কিসের?' ওই এক প্রশ্নেই আমি সুবোধ বালক বনে যাই। সত্যিকথা বললে হয়তো সেদিনও এয়ারপোর্টে যেতে পারতাম না। রোজের মতো খাতা-বই নিয়ে বেরিয়েছি—সবাই জানে কলেজেই যাচ্ছি। সেদিন যে কলেজ আমার ধমধম এয়ারপোর্ট সে কথা—কেবা জানতি না মশায়! আমার বয়েসটা তখন এমন কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে সময় কোনো অনাত্মীয় তরুণীকে এয়ারপোর্টে রিসেপ্‌শন জানানো দুষ্কর। এ বয়েসে কোনো মেয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা বিনয়সূচক কথা বলা শাস্ত্রের নিষেধ। চিঠি-পত্র আসত বন্ধুর ঠিকানায়। সমবয়সী বন্ধু হলেও তার শতগুন মাপ। কারণ সে চাকুরে। কাজেই বিয়েতে আর যেতে পারিনি—এমন কি কোনো উপহারও পাঠানো হয়নি।

একুশবছরের ছাত্র অভিভাবকের কাছে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক, আর মেয়ে হচ্ছে দেশলাই। কাজেই এ অগ্নি-কাণ্ড আমার অভিভাবকগণ ঘটতে দেননি।

একুশবছর গতবছর ফেলে এসেছি, এখন আমি বাইশ বছরের যুবক। নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। পূর্ণ সাবালকত্ব না পেলেও এখন সাবালকের প্যানেলে আমার নাম উঠেছে। রুমার সঙ্গে তাই মাঝে মাঝে চিঠিপত্র বিনিময় হচ্ছে। ওই লিখেছে, ঝুনুদির নাকি সেদিন আমি না যাওয়ায় চোখে জলই এসে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে দু-বছর কেটে গেল। ঝুনুদি প্রথম প্রথম চিঠিপত্র লিখলেও শেষপর্যন্ত তার ঘের টানতে পারেনি। রুমার কাছে নিয়মিতই খবর পাই। সে এখন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। বি-এ পড়বার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ পাচ্ছে না—তাই কচিমনকে ধমকে ধমকে আধপাকা করবার কাজে লেগে গেছে। এমনি একদিন তার চিঠি পেলাম, 'স্টেশনে থাকবেন, যাচ্ছি!' নাটকীয় ঘটনা ঘটবে নাকি আবার? মনে মনে একটু শঙ্কিতই হয়ে পড়লাম।

শেষ পর্যন্ত নাটক আর ঘটেনি। একটি শুধু মিলনাত্মক গল্প জমে উঠতে চাইছিল, এমন সময় রুমা তার ছেদ টেনে দিলে। কাকিমার এক আত্মীয় যুবক—গগন নাকি নাম—সে নাকি সরাসরি রুমার দাবি পেশ করে বসেছে! তাই কাকিমা রুমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়।

সেখানে স্থির হয়ে গেল রুমা। হোস্টেলেই থাকবে।

ধীরে ধীরে রুমার অধিপত্য আমাদের বাড়িতে স্বীকৃত হয়ে গেল। সময় অসময়ে যাতায়াত, এ পুজোয় সে পার্বণে নিমন্ত্রণ তার বাঁধা।

আমাকে শুনিয়ে মাকে প্রণাম করে রুমা বলে, 'এখন থেকে মা শুধু আপনার মা-ই নন সমীরদা, আমারও মা!' মা সস্নেহে রুমাকে কাছে টেনে নেন।

একদিন কথায় কথায় বলছিলাম, 'ঝুনুদিটা কী। একদম ভুলেই গেলেন।'

রুমা হেসে বলল, 'তাতে কী হয়েছে, আমি তো আপনাকে ভুলছি নে!'

সেদিন কথাটা শুনে ভালোই লেগেছিল বোধ হয়।

রুমার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে। দু-জনে একদিন চাইনীজ আর্ট এক্সিবিশনে গেছি। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ট্যাক্সিতে ফিরছি। রুমা হঠাৎ কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'এখন আমি কী করব সমীরদা।' আমি হেসে বললাম, 'সিভিল গ্রাজুয়েশনটা এবার নিয়ে নাও না!'

রুমার ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি খেলে গেলেও মন তাতে সায় দিতে পারে নি। আশ্চর্যের বিষয়, এর পর রুমা আর একটি কথাও বলে নি। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে একমনে। হঠাৎ দেখতে পেলাম তার চোখের পল্লবে দূর্বাদলের উপর শিশির বিন্দুর মতো জল জমেছে। বিমূঢ় হয়ে ভাবছি, এ আবার কী হলো।

'কী হলো রুমা!'

রুমা কথা শেষ হতেই সজল চোখে তাকালো আমার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হলো, আমি রুমাকে ভালোবাসি!

গাড়ি থামলে রুমা মুখবুজে নেমে গেল। সারা রাস্তায় সে একটি কথাও বলে নি। আমিও গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম মোহাবিষ্ট মনে। দু-এক পা গিয়েই রুমা ঘুরে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেললাম সেই দিকে। রুমা উঁচু হয়ে প্রণাম করল আমাকে। তারপর হেসে বলল, 'চলি সমীরদা!' হাসির বলকে ও নিজের রুদ্ধ কণ্ঠও চাপা দিতে পারে নি। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এ আবার কী।

দিন সাতেক পর হোস্টেলে গিয়ে শুনতে পেলাম, রুমা চলে গেছে হোস্টেল ছেড়ে। চমকে উঠলাম শুনে, কোথায় গেল রুমা?

এই ঘটনার পর দু-একদিন পর ঝুনুদির চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'রুমা আমার কাছে এসেছে!' সঙ্গে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, 'তোমাকে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি সমীর, ম্যাট্রিক পাশ করবার পরই আমার আগেই রুমার বিয়ে হয়ে যায় এবং ছ-মাস পরই ওর স্বামী মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। সেই থেকে ও আমাদের কাছেই থাকে।'

মাথাটা আমার ঝিমঝিম করে উঠল। নিজেকে কী বলে সান্ত্বনা দেব ভেবে পেলাম না। এখন বুঝলাম, ঝুনুদি কেন পুনশ্চ দিয়ে এ কথাটা লিখলেন, আর রুমাই বা কেন সেদিন কেঁদেছিল হঠাৎ। সেই চাপা পড়া প্রসঙ্গ আজ যে এমন নির্মমভাবে আমার জীবনে এসে উদ্ঘাটিত হবে—তা কি কোনোদিন ভেবেছিলাম?

ছ-বছর কেটে গেছে তারপর। আজ আমার বিয়ে। হঠাৎ রুমার কোমলস্মৃতি মনে পড়ে বুকটা কেমন করে উঠল। রুমার, এমন কি ঝুনুদির ঠিকানাও জানা নেই যে চিঠি লিখে অতীতের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের বিস্মরণের সেতু গাঁথবো।

শানাই বাজছে বেহাগরাগিনীতে। আমি ছাদনা-তলার নক্সা আঁকা পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছি—এমন সময় কন্যা এলেন মালা-হাতে। সাতপাক ঘুরিয়ে যখন কন্যাকে দাঁড় করানো হলো শুভদৃষ্টি এবং মালা-বদলের জন্যে—ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি পড়ল একটি মেয়ের উপর। মেয়েটি এককোণের ইঁদারার সানবাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে। কাপড় তার গাঢ়কোঁচর করে পরা। হাতে কপিকলের দড়ি। জল তুলছে বোধ হয়। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সেই দিকে—হঠাৎ রুমার উজ্জ্বল চোখদুটি মিলে গেল আমার দৃষ্টিকোণের সঙ্গে।

বন্ধুরা বলল, 'ওকি রে, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছিস? লক্ষ্য কিসের, রাজকন্যার মুখ দেখ!'

দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি আমার ভাবীবধূ মালা-হাতে অবনতনেত্রে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

শুভদৃষ্টির পর রুমাকে আর দেখতে পাই নি!

পুণ্যভূমি তারকেশ্বর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায় জন্মাবধি পুণ্যভূমি তারকেশ্বরের সহিত পরিচিত। অতি শৈশবে তারকেশ্বর তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম—তবে তাহা মনে নাই। আমার প্রতিবেশিনী বিনোদিনী দাসী এক কুসুমকুমারী-কন্যা (বালবিধবা) আমাকে শৈশব হইতে লালন পালন করিয়াছিলেন—তিনি প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সন্ন্যাস করিতেন—মাসের প্রথম দিকে একদিন তারকেশ্বরে যাইয়া "উত্তরীয়" (পলাশ ফোলানো মালার মত সুতার গোছা) লইয়া আসিতেন; সারা মাস একাহার করিয়া ভোজন করিতেন ও চৈত্র-সংক্রান্তির সময় তারকেশ্বর যাইয়া পূজা দিয়া আসিতেন। তাঁহার সহিতই প্রথম বার তারকনাথকে দর্শন করিতে যাই। ১৯১২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন—মৃত্যুর দিন সকালে তাঁহাকে তীর্থ করি ও প্রায় ১টার সময় অন্তর্ধান করবার তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তখনও যেন বৃদ্ধত্বাদের গঙ্গাতীরস্থ করা রীতি ছিল—অন্তর্ধানিত করা হইত। সারা কেশেই সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্রাহ্মকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিলাত-ফেরত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছিলেন। তিনিও তাঁহার 'পরিতোষ্যাবিধি গঙ্গে' গানে লিখিয়াছেন—

পরিহরি তব সুখ দুঃখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে,
বহিয় শ্রবণে সদা তব জয়কলরব
বহিয় দৃষ্টি মম নয়নে,
বহিয় শান্তি সদা শঙ্কিত প্রাণে
বহিয় অমৃত মম অঙ্গে
ম. ভাগীরথী, জাহ্নবী, সুরধুনি
কল-কল্লোলিনী গঙ্গে।

এই ত অন্তর্ধানির কথা। রামপ্রসাদের গানেও আছে "অর্দ্ধ অঙ্গ থাকবে ঘরে, অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাতীরে।" রামপ্রসাদ সেকালের কবি, এ কালের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও একই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমরা সেকেন্ড ১৯১০ সালে মাতামহীকে (আমার একমাত্র মাতুলের অকাল মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তিনি আমাদের গৃহে বাস করিয়াছিলেন) এবং ১৯১৮ সালে পিতামহীকেও মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে তীর্থ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

বিনোদিনীর সহিত কোন সালে তারকেশ্বর যাই, তাহা মনে নাই। তাহার পর কৈশোরে বন্ধুদের সহিত একবার পদব্রজে তারকেশ্বর গিয়াছিলাম। রেলের সকল লোক (রেলপথ হওয়ার পূর্বে ও পরে বহু বৎসর পর্যন্ত) আমার বাসস্থান আমড়াগাড়া হইতে নৌকাযোগে বৈদ্যবাটী যাইয়া নিমাই-তীর্থের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া ও মাটির পাত্রে গঙ্গাজল লইয়া পদব্রজে তারকেশ্বর যাইতেন। পথ তখন বর্তমানের মত মসৃণ হয় নাই—ইট, কাঁকর, পাথর বিছা ছোটখাটো অসমতল পথে চলিতে চলিতে পা ক্ষতবিক্ষত হইত—কিন্তু মানুষ পুণ্যক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রাহ্য করিত না। বলশালী ব্যক্তিরা যাঁকে করিয়া জল বহিয়া লইয়া যাইত। বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে জলপূর্ণ কলসী লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। শুধু কি তাই—যাবার নিকট প্রার্থনা আমাদের যে সকল-কাম হইত, সে বৈদ্যবাটী হইতে যাবার মন্দির পর্যন্ত দীর্ঘ পথ বত্রী খাটিত—অর্থাৎ জিহ্বা শয়ন করিয়া পথ মাপিতে মাপিতে যাইত। এখনও বহু লোক দীর্ঘ বত্রী খাটে—অনেকে দুধপুকুরে স্নান করিয়া যাবার মন্দির অবধি অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বত্রী খাটে।

তাহার পর সারা জীবনে কতবার তারকেশ্বরে গিয়াছি, তাহার হিসাব নাই। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় যে দিন বেলা ১টায় মোটরে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ১২টায় কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়ের ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছি ও পরের দিন সকালে সে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তখন বৈনিকবসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতাম ও প্রধানতম সংবাদ-সংগ্রাহক ছিলাম। বসুমতীর মালিক স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন নিজস্ব মোটরগাড়ী কিনিয়াছেন ও তাহা আমরা সকল কাজেই ব্যবহার করিয়াছি।

আমার মাতুলালয় তারকেশ্বরের নিকটস্থ হরিপাল গ্রামে। মাতুল-পুত্র কলিকাতাবাসী—কাজেই সে স্থানের সহিত আর সম্পর্ক নাই। শৈশবকালে মাতামহীর মুখে এলোকেশীর মামলার গল্প শুনিয়াছি ও নূতন রেলপথ খোলায় লোকের আনন্দের গল্প শুনিয়াছি। সাধারণ মানুষ তখন গান গাহিয়াছিল—

"যে পিসি ভাত চড়িয়ে
কলকাতাটা আসি বেড়িয়ে।"

অর্থাৎ বহু পথ পদব্রজে হাঁটিয়া যে কলিকাতায় যাইতে হইত, রেল খোলায় বাড়ীর ভাতটা চড়িয়া গাড়ী চড়িয়া কলিকাতা ঘুরিয়া আসা সম্ভব হইল—টাও কি কম আনন্দের কথা।

তারকেশ্বরে বর্ণা দেওয়ার গল্প বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি। আমার মাতামহের দ্বিতীয় ভ্রাতা (মাতামহ তৃতীয় ছিলেন) দুরারোগ্য রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন—তাঁহার রোগমুক্তির জন্য তারকেশ্বরে বর্ণা দিয়া কোন ফল হয় নাই। ১৯০০ সালে আমার অগ্রজও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে আমার মাতৃস্বরূপা বাল-বিধবা সহোদরা তারকেশ্বরে যাইয়া বর্ণা দিয়াছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নাই—৯ মাস ভুগিয়া দাদা অকালে পরলোকগমন করেন।

সেদিন বর্তমান যোগেশ মহারাজের কাছেও শুনিলাম, বৎসরে

প্রায় ৩ হাজার নরনারী দর্শন দিতে আসে—তন্মধ্যে অনেক সফল-কাম হয়—অনেকে ফলাফল না জানাইয়াই চলিয়া যায়—অনেকে তাহাদের বিফলতার কথাও জানাইয়া যায়। তারকেশ্বর মঠ হইতে বর্তমানে স্বামী নাথানন্দ কোবিদ ও অধ্যাপক ডাক্তার অমরেশ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'পুণ্যভূমি' নামক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে—তাহাতে দর্শন দেওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মোহান্ত মাধব গিরির সময় এলোকেশীর মামলা হইয়াছিল—সে ইতিহাসের কথা। মাধব গিরির পর পূর্ণ গিরি ও তৎপরে সতীশ গিরি মোহান্ত হন। সতীশ গিরির সময় তারকেশ্বরের অনাচার চরমে উঠে—সে জন্য ১৩২১।২০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। সে আন্দোলনে বহু মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা, ধরপাকড়, কারাদণ্ড প্রভৃতি হইয়াছে। সে সত্যাগ্রহে নিগ্রহ বা কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন এমন বহুলোক এখনও সারা বাংলাদেশে জীবিত আছেন। স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ নামক দুইজন সন্ন্যাসী সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিতেন। সতীশ গিরির লোক বৃদ্ধ সচ্চিদানন্দকে একদিন এত অধিক প্রহার করিয়াছিল যে তিনি কয়েকঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন ও লোক মনে করিয়াছিল, তাঁহার আর জ্ঞান হইবে না। সেদিন তারকেশ্বরে যাইয়া বহু সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সত্যাগ্রহের পর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার নেতৃত্বে মামলা চলে। সতীশ গিরি মৃত হইয়া হাজত বাস করে ও হাজতেই তাহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্বে মঠের বহু সম্পত্তি সে বেনামা করিয়াছিল এবং প্রচুর ধনরত্ন বিহারে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। সতীশ গিরিও তাহার চেলা প্রভাত গিরি উহারই বিহারধানী ছিল। বহু বৎসর মামলার পর হাইকোর্ট হইতে তারকেশ্বর মঠ পরিচালন সমিতি ও মোহান্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর (তিনি সরকার প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন) পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পুণ্যপাদ দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহোদয়কে তাঁহার কাঁকোয়িত আশ্রম হইতে আনিয়া মোহান্তপদে বৃত করা হয় ও প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে তিনি তারকেশ্বরে আগমন করেন। তৎপূর্বে তারকেশ্বর মঠ ও ষ্টেট-রিসিভারের অধীন ছিল। রিসিভারের সময়ে পূর্বাবস্থার বিলোপ হইলেও পুরাতন কর্মচারীবৃন্দ থাকায় যাত্রী সাধারণের সুখ সুবিধা অধিক বর্দ্ধিত হয় নাই। জগন্নাথ আশ্রম মহারাজের সময়ে যাত্রীগণের অভাব অভিযোগ বহুল পরিমাণে দূর করা হয় এবং মঠের স্থাপিত উচ্চ বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়। মোহান্তের প্রাসাদে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—এখন সেখানে ৫০টি ছাত্র থাকিয়া শিক্ষা ও অন্নাদি লাভ করিয়া থাকে। ৪।৬ জন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তাহাদের শিক্ষাদান করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট মন্দ—কাজেই মঠ পরিচালন ব্যাপারে মোহান্তের সহিত কমিটীর মতভেদ উপস্থিত হইল। বহু চেষ্টার পরও সে মতভেদ দূর করা সম্ভব হইল না—পরিচালন ব্যবস্থা লইয়া বহু মামলার সৃষ্টি হইল। শান্তিপ্রিয় ও সাধনারত শ্রীশ্রীজগন্নাথ আশ্রম সে সকল গণ্ডগোলে যোগ না করিয়া তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য শ্রীশ্রীহৃষীকেশ আশ্রমকে মোহান্তের কার্য্যভার প্রদান করিয়া নিজ-আশ্রমে চলিয়া গেলেন। গত ৮ বৎসর কাল হৃষীকেশ আশ্রমই মঠ ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

জগন্নাথ আশ্রম মহারাজের সময় বহুবার মঠে যাইয়া রাত্রিবাস করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সাধারণ যাত্রীদের সহিত মেলা-মেশা করিয়া শুনিয়াছি—এখন আর কাহারও নিকট অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় হয় না। যে সকল যাত্রী দর্শন দিতে আসে, তাহাদের ও তাহাদের সঙ্গীদের উপযুক্তভাবে মেথাশুনার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে বিনামূল্যে ভোগ (লুচি, মিষ্টান্ন ও পায়েস) সকল যাত্রীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা আছে। দরজায় অর্থ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় না। দেওয়ার যিনি যাহা দেন—তাহাই গ্রহণ করা হয়। মোহান্ত প্রত্যহ একবার কিছুক্ষণের জন্য মন্দিরে পূজা করিয়া গদীতে বসিয়া সকল বিষয় দেখাশুনা করিয়া থাকেন। বর্তমান মোহান্ত হৃষীকেশ আশ্রম অতি অল্প বয়সেই গুরুর আশ্রমে গমন করেন ও তথায় থাকিয়া শিক্ষাদি লাভ করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার তেজোদীপ্ত শরীর দেখিলেই বুঝা যায়, যে তিনি তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মঠে সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে; অতিথি অভ্যাগত ও সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রত্যহ অন্ন দান করা হয়। মোহান্তের বাড়ী রাজপ্রাসাদ তুল্য। নিম্নতলের ঘরগুলি অফিস, ছাত্রাবাস, চতুষ্পাঠী, অধ্যাপকদের ও কর্মীদের বাসস্থান প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতলে অধিকাংশ হলঘর ফাঁকা পড়িয়া থাকে। একটি বড় হলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবতাদি পাঠ হইয়া থাকে। মোহান্ত মহারাজ একটি ঘরে বাস করেন ও একটি হলে বসিয়া দর্শনার্থীদের দর্শনদান করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ জগন্নাথ আশ্রমের নিকট শুনিয়াছিলাম, তাঁহার বাসের জন্য স্বতন্ত্র একটী কুটীর নির্মাণ করিয়া দিলে তিনি তথায় বাস করিবেন ও বর্তমান অট্টালিকায় কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। শুনিলাম, অর্থাভাবে সে ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। অর্থব্যয় লইয়া এখনও মোহান্তের সহিত কমিটীর দ্বন্দ্ব লাগিয়া আছে—কমিটীর সদস্যগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি—কেন যে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না, তাহা বুঝি না। প্রাক্তন মোহান্ত ত্যাগী ও বিবেকী ব্যক্তি ছিলেন—বর্তমান মোহান্ত ত বয়সে নবীন, কর্ম করিবার জন্য আগ্রহশীল ও জনকল্যাণব্রতী। মীমাংসার অসুবিধা কি, জানা যায় না।

তারকেশ্বরে যাত্রী সমাগম যত অধিক, সে পরিমাণে যাত্রীদিগের বসবাস বা সুখ সুবিধা বিধানের ব্যবস্থা নাই। পাণ্ডাদের অত্যাচার হয় ত নাই, কিন্তু সুবিধা পাইলেই যে অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের কাছে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করা হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। ইলেকট্রীক কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সর্বত্র আলোর ব্যবস্থা হয় নাই। শুনিলাম, অর্থের অভাবে

মোহান্তের বাসস্থানে এখনও বিজলী বাতি আসে নাই। প্রাচীনকালের যাত্রীনিবাস বা চটিগুলি যেমন আছে—নূতন ধরণের যাত্রী-নিবাস নির্ম্মিত হয় নাই।

বহুপূর্ব্বে একবার ডিসেম্বরে তারকেশ্বরে গিয়াছিলাম। তাহার পর কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণে একবার শ্রাবণ মেলা দেখিতে তারকেশ্বর গিয়াছিলাম—তখন পূজাপাদ কবিবর অক্ষয় মোহান্ত এবং প্রফুল্লবাবু ষ্টেটের ম্যানেজার; যদিও সে সময় কয়েক লক্ষ যাত্রী সমাগম হয়, তথাপি ষ্টেট কর্ত্তৃপক্ষ তথা মোহান্ত তাহাদের জল ও আলো সরবরাহ, পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থা, সঙ্কল্প মত সুখাদ্য পরিবেশন, রোগে চিকিৎসা, পূজাদানের সুযোগ দান প্রভৃতিতে বিশেষ অবহিত ছিলেন। এত অধিক লোকের জন্য যে অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়, তাহা কখনই—একেবারে ত্রুটিশূন্য হইতে পারে না। আমরা মন্দির বা সম্পত্তির আয় ব্যয় সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করি নাই। তথাপি একথা অবশ্যই বলিব যে, যেখানে প্রত্যহ শত শত ও বিশেষ উৎসবে বা মেলায় লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমাগম হয়, সেখানে জল, আলো ও খাদ্যের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিশেষ উৎসবে বা মেলায় স্বাস্থ্যসেবকদল লইয়া আগত নরনারীদের সুখসুবিধাবিধান ব্যবস্থা প্রভৃতি অতি কঠিন কার্য্য। তখন মোহান্ত মহারাজকে এ সকল বিষয়ে অবহিত হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। মন্দির ও মোহান্তের প্রাসাদে সংস্কার সংস্কার হয়ত করে, কাহারা, কি ভাবে বিক্রয় করিয়াছিল জানি না, এবার উহা সংস্কার সাধন ও নূতন করিয়া পথ, ঘাট, ড্রেন, পুকুর, স্যানিটারী পায়খানা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা অতি বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্যই সে কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। কমিটির সভ্যগণ বোধ হয় কেন এ সকল বিষয়ে অবহিত হন নাই জানি না। মোহান্ত হইতেছেন ও ধর্ম্মগুরু—যেখানে রক্ষা, পূজার্চনা, সাধনা, অধ্যাত্ম-অধ্যাপনা যেমন তাঁহার নিত্যকর্ম্ম, তেমনই দুর্গত নরনারায়ণের সেবা ও তাঁহার কর্ত্তব্য। সাধারণ, দরিদ্র, অশিক্ষিত, ধর্ম্মভীরু যাত্রীরা যাহাতে কোনরূপ ভাবে কষ্ট না পায়, যাহাতে তাহারা অনায়াসে বাবার পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মোহান্তের নিযুক্ত কর্ম্মীদের সর্ব্বদা অবহিত থাকিতে হইবে এবং মোহান্ত মহারাজকে নিজেও সে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানে কিছু সময় দান করিতে হইবে।

অত্যাচার অনাচারের দিন শেষ হইয়াছে—তাই বলিয়া কাহারও নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন হওয়া চলিবে না। সেবা ধর্ম্মই এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সেই সেবা দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় আমরা যেন বিরত না হই।

তারকেশ্বর প্রাচীন তীর্থ—তাহার ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। কিম্বদন্তীর উপর যে ইতিহাস প্রথিত, তাহার আলোচনায় কোন লাভ নাই। তবে তীর্থ-মাহাত্ম্য আজও অটুট আছে। শত শত বৎসর ধরিয়া মাঠ, পাঁঠিত, পরগাপাতের দল তারকেশ্বরে পূজা দিয়া, মানত করিয়া, বলী দিয়া, বলী খাটিয়া অভীষ্টলাভ করিয়া আসিতেছে ও আসিবে, এই কার্য্য স্মরণাতীত কালের, ইহার মধ্যে কোন ছেদ নাই—মাঝে মিরি বা সতীশ সিরির ধারণ অনাচারের সময়ও ভক্তগণ তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রা বন্ধ করে নাই—শত বিপদ মাথায় লইয়া লোক বাবার চরণে শরণ লইতে গিয়াছে; আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমানের অভ্যাবশ্যকগুলির, ইহকালসর্ব্বস্ব লোকেরাও সেই পথ ত্যাগ করে নাই, করিবে না, করিতে পারে না। তাই আজও তারকেশ্বরে যাইলে আমরা যাত্রীর ভিড় দেখি, মন্দির চত্বরে বহুলোককে বলী দিতে দেখি, মন্দির প্রাঙ্গণে বহুলোককে বলী খাটিতে দেখি। এইসব মূক জনগণের উপযুক্ত সুখসুবিধার ব্যবস্থা যুগধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যবস্থাও যেন দুর্গোপযোগী হয়—তাহা গ্রহণ করিয়া গ্রহীতাও যেন নিজেকে ধন্য মনে করে।

তারকেশ্বর তীর্থ কলিকাতার অতি নিকটে—বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক রেলের ব্যবস্থা হইয়াছে। তীর্থস্থান ফাঁকা মাঠের উপর—জনবহুল স্থান নহে। মন্দির কর্ত্তৃপক্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হইলে তথায় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক কলেজ, কৃষি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অতি সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে। মন্দির-মঠ হইতেই চির-দিন এদেশে শিক্ষা বিস্তার করা হইয়াছে—তারকেশ্বর মঠ সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হউক—বাবা তারকনাথের আশীর্ব্বাদ সকলকে কর্ম্ম প্রেরণা অবশ্যই দান করিবে; মতী মোহান্ত মহারাজের মতের প্রভাবে তারকেশ্বর হইতে সকল অত্যাচার অনাচার যেন বিতাড়িত হয়, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খলা

শ্যামলী

মানুষ সারা-জীবনই শিক্ষালাভ করে, তবুও যখন সে স্কুলে কলেজে প্রবেশ করে অধ্যয়নরত থাকে তখনই তাকে প্রকৃত শিক্ষার্থী বলা হয়। সেই হিসাবে আমিও দীর্ঘকাল শিক্ষার্থিনী ছিলাম, কিন্তু এখন যেমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ বর্ষণ হয়ে থাকে, আমার শিক্ষাকালে তেমন উপদেশ বর্ষণ দেখিনি। আর সব চেয়ে মজার কথা এই যে, প্রত্যেক উপদেষ্টাই ধরে নেন যে শিক্ষার্থীরাই উপদিষ্ট হবার পাত্র, শিক্ষার্থীরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ। মনে হয়, ভেবে দেখা হয়না শিক্ষার্থীদের উপর এই দোষারোপ কতদূর ন্যায়সঙ্গত।

এই তো সেদিন ছাত্রদের উপস্থিতিতে জনৈক বয়স্ক শিক্ষক এক বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে সমবয়সে অপর শিক্ষককে লণ্ডভণ্ড করতে অপমানিত করলেন। দিল্লীতে এক বিদ্যালয়ের দরজায় ছুটির পর বাজার পানের ছাত্রের সামনে দুইটি শিক্ষক কথাকাটাকাটি করে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন! তাঁরা পরস্পরের গলাটিপে শ্বাসরোধ করতে উদ্যত হলে ছাত্রদল তাঁদের টেনে ছিঁচড়ে এই ঘৃণ্যযুদ্ধ থামায়। পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের এইরূপ ব্যবহার লজ্জাজনক নয় কি? এঁরা ভবিষ্যতে ছাত্রদের কাছে কতটা সম্মান পেতে আশা করেন?

মান-করা ডাক্তাররা বলেন, ধূমপান ফুসফুসের অনিষ্ট করে। পান-তামাকও বাকি দাঁত নষ্ট করে। ভারতীয় মাতা-পিতা চিরকালই ছেলে-মেয়েদের ধূমপান ও তাম্বুল সেবন করতে বারণ করে আসছেন; কারণ তাঁরা মনে করেন—ধূমপানে শ্বাস ক্রিয়া ব্যাহত হয়, পান দাঁত নষ্ট করে এবং সুপারী চর্বণে তোতলামি জন্মায়। তথাপি বড় বড় সহরেও অনেক শিক্ষক পান চিবুতে চিবুতে ক্লাসে আসেন, অনেকে আবার ছাত্রদের দিয়েই নিজেদের পান সিগারেট কেনান। যে কোন শিশুই মাতা-পিতাকে অপর বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা সম্মান করে, সুতরাং যে শিক্ষক যত পান তামাক প্রভৃতির প্রতি অনুরাগী, পিতৃমাতৃভক্ত ছাত্রদের চক্ষে তিনি ততই কম সম্মানীয় হয়ে পড়েন। কিন্তু স্বভাবতঃ অধিকতর অনুকরণপ্রিয় বলে অনেক ছাত্র শিক্ষকদের নকলও করে; তখন তারা শিক্ষকদের সামনেই পান চিবুতে বা ধূমপান করতে ইতস্ততঃ করে না। ছাত্রের এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী কে?

ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আজকাল যত্ন নিয়ে পড়ান? আলো যেদিন এক বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় দশমিকের একটি অঙ্ক কোন পরীক্ষার্থীই করতে পারেনি। অনেক ছাত্র এই প্রথম গণিতে ১০০।১০০ পেল না। তার পিতা এই অসাফল্যের কারণ জানতে চাইলে পুত্রের উত্তর হল, এই নিয়মের অঙ্ক ক্লাসে শেখান হয়নি। পিতা গণিতের শিক্ষকের নিকট নালিশ আনলেন। শিক্ষকমশায় বললেন, "শেখান হয়নি, তবে হবে।" প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে তার কারণ "সিলেবাসে" নিয়মটি দেখাবার আদেশ হয়েছে। স্কুল পরিদর্শকগণ স্কুল পরিদর্শনে এসে নাকি দেখবেন—প্রশ্নপত্রে এই নিয়মের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে কিনা। মনে হয় প্রশ্নপত্র দেখে স্কুল-পরিদর্শক ধরে নেবেন "সিলেবাস" অনুসরণ করে পড়ান চলছে। পরিদর্শক সন্তুষ্ট হলেন, শিক্ষককে উপরওয়ালার নিকট জবাবদিহি করতে হল না। কিন্তু না শিখিয়ে প্রশ্ন করার জন্য শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের মনোভাব কিরূপ হল? "পাবলিক" পরীক্ষা-গুলিতেও "পেপার-সেটার" ও পরীক্ষা-পর্ষদের ভুল-ত্রান্তির জন্য "সিলেবাসের" বাইরে থেকে প্রশ্ন তো হামেশাই আসে এবং তার ফলে পরীক্ষার হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার জন্য পরীক্ষার্থীদের দায়ী করা অন্যায় নয় কি? শিক্ষক বা পরীক্ষকদের ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে এরূপ অদ্ভুত ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে দিল?

আর এক শিক্ষক-সম্প্রদায় আছেন যাঁরা ইচ্ছা করে সাপ্তাহিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষাগুলিতে ছাত্রদের কম নম্বর দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলতে চান—কম নম্বর পেলে ছাত্র-ছাত্রী অধিকতর মনোযোগ সহকারে পাঠাভ্যাস করবে ও ভবিষ্যতে ভাল 'মার্ক' পাবে। কিন্তু কম নম্বর পেতে পেতে ছাত্র-ছাত্রীর মন ধসে যায় না? ধসে যাওয়া মন সহজে ওঠে? উৎসাহ বাতিরেকে কাজে রুচি আসে কি? এই সহজ সত্য কি শিক্ষকদের অজ্ঞাত?

আমি সেই শিক্ষকদের ব্যবহার আরও গর্হিত বলে মনে করি, যাঁরা—ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফেল করা ছাত্রদের বলেন "প্রাইভেট টিউটর" বাতীত তাদের পাশ করার সম্ভাবনা নেই। এ যেন হাতে ধরে "প্রাইভেট টুইশন" চাওয়া। সত্যি, অনেক শিক্ষক ক্লাসের পড়ান অবহেলা করে ঘুরে ঘুরে "প্রাইভেট টুইশন" করবার জন্য শক্তি বজায় রাখতে চান। এইরূপ শিক্ষকের শিক্ষণের উপর কতদূর ছাত্র আস্থা রাখতে পারে? বলা বাহুল্য এঁরা ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে পারেন না।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অনুকরণীয়। পিতা কলকাতার স্কুল হতে সাত মাইল দূরে সরকারী কোয়ার্টার পেলেও নবম শ্রেণীর ছাত্রী অপর্ণা নূতন বাড়ীর পাশে নূতন স্কুলে ভর্তি হতে চাইল না। সাত মাইল পথ "পাবলিক" বাসেই যাওয়া আসা করে পুরাণ স্কুলেই রইল। অপর্ণাকে বলাতে, "আমাদের ছেড়ে গেলে না কেন? আমাদের স্কুলের না আছে বিরাট বাড়ী, না আছে খেলার মাঠ। এই স্কুলে ভালবাসার মত কি পেলে?" ইতস্ততঃ না করে অপর্ণা উত্তর দিলে "আমি যে আপনাদের ভালবাসি।"

এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের কী বলবার আছে? তাঁরা চুপ করেন—তাঁদের মত শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মী অপেক্ষা তাঁরা কম পারিশ্রমিক পান, অনেকের বেতন নাকি এত কম যে দু'বেলা অন্ন সংস্থানই দুঃসাধ্য, ক্লাসে

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমবেশি ; সুতরাং তাঁরা কিরূপে নিশ্চিন্তমনে নিশ্চিন্ত চিত্তে শিক্ষাদান করবেন? এই অসন্তোষের জন্য সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার চেয়ে শিক্ষকগোষ্ঠী ধর্মঘটের হুমকি দেন, অনেকে ধর্মঘটও করেন। এই ভাবে শিক্ষকগণও দেশের শিক্ষার ব্যবস্থাকে ভাঙাচোরা দুর্দশার ভগ্ন-স্তূপের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছেন।

অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অভিযোগগুলি অমূলক নয়। অনেক স্কুলে শিক্ষকগণ মাসের পর মাস বেতন পান না। কারণ? হয় স্কুল কমিটি, সাহায্যকারী সরকার, মিউনিসিপ্যাল কমিটি বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট মাসিক ব্যয় খরচের হিসাব দিতে পারেন না, অথবা সাহায্যকারীদের কে কি হারে সাহায্য দেবেন অনেক ক্ষেত্রে তাই স্থির হয়ে ওঠে না। অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের কম পারিশ্রমিকে নিয়ে পুরো বেতন পাবার স্বীকৃতি লিখিয়ে নেওয়া হয়। বাকি টাকা কোথায় যায়? স্কুল-কমিটিগুলিই জানেন। কিন্তু এইরূপ দোষারোপের ফল কার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়? ছাত্র-ছাত্রীদেরই। আবার শিক্ষকদের এই দোষারোপের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়তে দেখে শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ও ছোট পাকায় এবং কারণে অকারণে নিজেদের অভিযোগ পাড়া করে। এরূপ অভিযোগ করা ভুল হতে পারে, তবে এই ভুল পথ ছাত্রেরা অনুসরণ করে শিক্ষকদের অনুকরণ করেই।

এখানেই এই প্রবন্ধের সমাপ্তির রেখা টানতে পারছি না। শিক্ষার্থীদের বিপথে পরিচালনার কথা যখন উঠলই, দেখা যাক্ কি ভাবে বা কাদের দ্বারা এরা কতখানি বিপথে পরিচালিত হয়। বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে—রাজনীতি নিয়ে যাঁদের খেলা তাঁরাই এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। আজকের কথা নয়, সুদূর উনিশশো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দেও কলকাতার ঘাটে ঘাটে ডেমোক্রেটিক ম্যাসিক লাঠন সমস্তিয়াহারে রাজনীতিকগণের ভাষণ। তাঁরা বোঝাতে চাইতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কোনও মূল্য নেই। পর্দায় দেখাতেন মোটা মোটা বইএর চাপে পড়ে ছাত্রের ঘুমে অবস্থা। এই বক্তৃতাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তখন যারা স্কুল কলেজ ছেড়েছিল আর স্বাধীনতা লাভের পর তারা বেশি লাভবান হয়েছে, না যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আঁকড়ে ছিল তারা বেশী লাভ করছে? এর উত্তর অনাবশ্যক।

কে যে বর—একথা বারবার স্মরণ করিয়ে কি কাজকে ভাল করা যায়? তাহলে ঘিরে যারে যারে শিক্ষার্থীদের অশিষ্ট আচরণ দূর করতে বললে কতটুকু সুফল পাওয়া যাবে? এতে বরং ছাত্রদের অধিকতর উত্তাক্ত করে উঠবে বলেই মনে হয়। ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে হলে শিক্ষকদের সাথে বোঝাপড়া করে সুফলদায়ী মীমাংসায় আসাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কারণ শিক্ষকই ছাত্র তৈরী করেন। জাতি গঠন তাঁরই হাতে। নিজেদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সজাগ থেকে রাজনীতিকদেরও বর্তমান শিক্ষার্থীদের ঘাঁটান উচিত নয়, কারণ আজকের শিক্ষার্থী কাল শিক্ষক বা রাজনীতিক হবে।

সব শেষে মাতাপিতাদেরও কিছু বলতে চাই। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁদেরও বড় রকমের দায়িত্ব রয়েছে। ছেলে-মেয়ের সমাজে তাঁরা যেন কখনও কোন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রশংসা বা নিন্দা না করেন, রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধেও যেন অযথা সমালোচনা না করেন। ছেলে-মেয়ের দোষ ত্রুটির প্রতি মাতাপিতা যে উদাসীন থাকবেন না তাতো বলাই বাহুল্য।

জন (তা) সাধারণ

শঙ্কর গুপ্ত

ফরাসী রিপোর্টারকে একবার একটি প্রশ্ন করেছিলাম—উত্তরে তিনি মৃদু হেসেছিলেন। সে সময় ফ্রেঞ্চিকে কলকাতায় পৌর-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছিল। কাগজে এক জনতার ছবি প্রকাশিত হয়। নিচে লেখা ছিল ফ্রেঞ্চিকের সম্বর্ধনায় উল্লসিত জনতা। তারই দু একদিনের মধ্যে সংবাদপত্রে জ্যোতিপ্রসাদের শোকযাত্রার পরে চিত্রদয় প্রকাশিত হয়। ছবির নিচে লেখা জ্যোতিপ্রসাদের মহাপ্রয়াণে শোক-জনতার একাংশ। আমার প্রশ্নটি ছিল জনতার ছবি সংক্রান্ত—ফ্রেঞ্চিকের সম্বর্ধনা এবং জ্যোতিপ্রসাদের শোকযাত্রা উভয় চিত্রেই জনতার রূপ আমার একই রকমের বোধ হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—একই ছবি কি বিভিন্ন ক্যাপশনে আপনারা ছেপে থাকেন? উত্তরের পরিবর্তে তাঁর মৃদু হাসি লক্ষ্য করে তাঁকে সে বিষয় ঘাঁটাঘাঁটি করিনি, তবু ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা আরো বলবতী হল সাম্প্রতিক ট্রাম ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের স্থান লক্ষ্য করে।

ধর্মঘটের সঙ্গে ধর্মের কতটা সম্বন্ধ তা ধারণা করার মত বুদ্ধি আমার ঘটে নেই। কিন্তু সাধারণের পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে আমার যে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে তাতে পরিবহনের অভাব ঘটলে সকলের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত কষ্টে পড়ি। বিষয় কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, গত ট্রাম ধর্মঘটের সময় কখন এ পক্ষ, কখনও বা পক্ষ তাঁদের নিজেদের মীমাংসা চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনমত জনসাধারণের উল্লেখ করছেন। রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও সাধারণ জনসাধারণ যে অংশ গ্রহণ করে তা একান্ত পরোক্ষ এবং নিতান্ত গৌণ

যা আমার বিশ্বাস করেছেন তাঁরা তা করার চেষ্টাই করে যান। সে সময় জনসাধারণের চিন্তার উদ্রেক বিস্ময় ঘটে না। যখন থেকে মাথার সময় আসে তখন জনসাধারণের মুণ্ড ভোগার প্রয়োজন দেখা দেয়। হাতের পাঁচের মত জনসাধারণ কথাটিকে ব্যবহার করা হয় মাত্র। জনসাধারণের সঙ্গে গড্ডালিকার নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ্য করে রোবহয় দ্বিজেন্দ্রলাল 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ' স্মরণ করাতে চেয়েছিলেন। যার খুশী মেষপালক হতে চাইলে জনসাধারণের পক্ষে কোন প্রতিবাদের উপায় না থাকার কারণ—জনসাধারণ কোন প্রতিষ্ঠান নয়। ভিড় আছে, জনতা আছে, কিন্তু তা জনসাধারণ নয়।

জনসাধারণের মুখপাত্র নেই। আমার পেটোদা হলে আমি দুকথা বলতাম, আপনার অবশ্য হল আপনি দুকথা বললেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি জনসাধারণের উত্তর দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে জনসাধারণ আমাকে বলত, তুমি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর; আপনাকে বলত, আপনি গঙ্গার ধারে মাথায় একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগান গিয়ে। জনসাধারণের যদি উপায় থাকত—জনসাধারণ যদি একটা দলের মত বা একটা ইউনিয়নের মত বা একটা সেনাবাহিনীর মত বস্তু হত—তাহলে সে তার কথা বলতে পারত। কিন্তু পাঁচদিনের পর দশদিন, বিশদিনের পর চল্লিশ দিন কেটে গেলেও জনসাধারণ কিছু করতে পারে নি—শুধু হেঁটেছে, বাসে ঝুলোঝুলি করেছে, খেয়েছে, ভিজেছে আর কষ্ট পেতে পেরেছে। খবরের কাগজে কখন ছাব্বিশদিনের মাথায়, কখন সাইত্রিশ দিনের মাথায়—কখন মালিক পক্ষকে, কখন ধর্মঘট পক্ষকে এক একবার জনসাধারণ জনসাধারণ—করতে দেখেছে। আমি এবং বাকী ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশ নিরানব্বই জন ট্রামযাত্রী ফ্লোরকরম দেওয়া রোগীর জান কেরার সময় ঘুমাগড় ধ্বনি কানে আসার মত মাঝে মাঝে আমাদের সাধারণ্যোচ্চারিত হতে শুনেছি। কিন্তু বলতে পাইনি—না বাপু—আমরা কিছু বলিনি, তোমরা নিজেরা যা হয় কর, আমাদের জড়িও না। আমাদের সুখের বোলকলা শুরু হয়েছে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, পাবলিক মেমরি ইজ ভেরি শর্ট। জনসাধারণের থাকা দেখা করার ক্ষমতা অসীম। তারা কিছু মনে রাখে না; শুধু গড্ডালিকা—অর্থাৎ ভেড়ার ঘণ্টোর নয় ইংরেজী প্রবাদ অনুসারে জনসাধারণ পাথায় পোষ্টমুক্তও বটে—তাদের মাথায় কিছু থাকে না। আমাদের পিতামহরা সুরেন্দ্রনাথকে জাতীয়তার জনক বলেও জুতোর মালা ছুঁড়েছিলেন, আমাদের পিতৃস্থানীয়রা চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধু বলেও গালিগালাজ করেছিলেন, আমরা গান্ধীকে মহাত্মা বলেও শেষটায় হত্যাই করে ফেলেছি। পাবলিক মেমরি যে শর্ট এক হিসেবে তাতে কোন ভুল নেই; এখুনি পায়ের ধুলো নেওয়া, তখুনি মাথায় পা দিয়ে যাওয়া থেকে সেটা প্রমাণ হয়। কিন্তু সেই ভরসায় যে সকলেই আমাদের হাতে তামাক খেয়ে যাবে এ কেমন কথা!

এ নিবন্ধের অবতারণার কারণ আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণ বলে মনে করি এবং জনতার সঙ্গে জনসাধারণের কোথাও একটা পার্থক্য আছে এমন একটা বিশ্বাস রয়েছে। সেটা ধরে নিয়েছি যে বাচার করে বেরার পথে ভোর ধরা পড়েছে সোনারায় খলিটা অন্যের জিম্মায় রেখে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে উক্ত তথাকথিত চোরকে বিনা প্রমাণে দুটো ঘুসি এবং তিনটে থাপ্পড় মারার—আমার মত বিবেকী অনেকেই আছেন। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়লে যাওয়া এবং বিবেকে বর্জন যাঁরা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করেন না, তাঁরাই আসলে জনসাধারণ; বাকী সবটা জনতা। এই জনতাকে রোবহয় ইংরেজীতে পাবলিক বলে। এদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। একবার যার যার মুখ ভুলতে পারা বিভিন্নদিক ভুলে যাবমুখী হবে—কাকে মারতে হবে না জেনেই। জয় সম্রাট শাজাহানের জয় বলার পর একটা বক্তৃতার মে মতের পরিবর্তন ঘটিয়ে 'জয় সম্রাট আলমগীরের জয়' বলান যেতে পারে। সাধু-ই আর একটা বক্তৃতা দিতে পারলে 'উভয়েই নিপাত যাক' শ্লোগানও তোলান যেতে পারে। এই পাবলিক ওপিনিয়নকে রাজনৈতিক, নাইলার পাবলিক বয় ওপিনিয়ন বলতে ভরসা পাই—আর সে কারণে শ্রদ্ধা করে না।

জনতার মধ্যে যাবমুখী ঝুঁকটি লক্ষ্য করে স্বার্থান্বেষীরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার বাসনায় জনসাধারণের দুর্গা তোলেন। স্বার্থান্বেষীদের প্রতি আমাদের নিবেদন—যাদের লেলিয়ে দেওয়া হলে তাদের আমরা মানুষের বলে জানি, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নেই। আমরা শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিক। কেউ পা মাড়িয়ে দিলে তার মুখে ঘুসি না মেরে পাশ সরিয়ে নিতে (পারলে নিজেরটা সরিয়ে নিতে) আমরা অভ্যস্ত। শান্ত, শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন, রুচিবান, ভদ্র নাগরিকের মোটামুটি সহ্যশক্তি ভালই। তবু সে সহ্যের সীমা আছে। জনসাধারণের কাঁধে বন্দুক রেখে আমার অভ্যাস একবার করলে তা কাটান শক্ত। তবে বরাবর তা করলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা ঘটে।

সুতরাং জনসাধারণ-টাধারণ জানি না, একজন ধাত্রী হিসাবে বিয়াল্লিশ দিন ধরে ট্রাম, অর্থাৎ সাধারণের পরিবহন, ধর্মঘট হওয়ায় আমরা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলাম এবং তা আমাদের স্বৈরচারিতা ঘটিয়েছিল। টাটা কোম্পানীতে ধর্মঘট হয়েছিল; তাতে পরোক্ষভাবে জাতির কতটা ক্ষতি হয়েছিল জানা নেই, তবে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের কোন দুর্ভোগ হয়নি। কিন্তু ট্রাম ধর্মঘটে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ ছাড়াও দৈনিক দশলক্ষ-যাত্রী সাধারণের সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। ধর্মঘট বাধা জানাবার একটা চরম পন্থা। ভারতের সংবিধানে যাকি স্বাধীনতা স্বীকৃত। আইনজ্ঞ নই, তবুও মনে হয় তার অর্থ পরের কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার। অর্থাৎ কাউকে বুকে বসালে কেউ বাধা দেবে না, নিজের বাড়ি ওপড়ালেও কেউ পুলিশ ডাকবে না, তবে পরের বুকে বসে বাড়ি ওপড়ানোর বাসনা যদি কারো চাপে তাহলে রাষ্ট্র সেখানে সম্মতি দিতে অসম্মত হবে। আমি শ্রমিক পক্ষের লোক অথবা মালিক পক্ষের জামাই নই, উভয় পক্ষকেই আমার প্রশ্ন—কোন কারণেই দৈনিক দশলক্ষ আরোহীর কষ্টকে নিয়ে দীর্ঘ

বিয়াল্লিশটা দিন হয়ে গেলেই, তা সে হয় খেলেধেলাই হোক, অধিকার কারো আছে কি না এবং তা মাত্রাজ্ঞানবিশিষ্ট কি না। সংবিধানের আইনে পটু কেউ যদি আমাদের বুঝিয়ে দেন এই ধরণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোক্তাদের কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়—তবে আমাদের প্রাণটা বাঁচে কাজেই বড় উপকার হয়। আর যদি জানা যায় যে কোন প্রতিকার নেই তাহলে বাড়ি রাখি। যায় না আসন্ন হয়ে আমার বুকে বসে পরমানন্দে দাড়ি ওপড়াতে পারবেন।

আমাদের পাড়ার চৌমাথার মাঝে মাঝে একজন পাগল। আমার দিকে সন্দিগ্ধ হয়ে তাকাবার প্রয়োজন নেই। ট্রাফিক পুলিশ নয়ে। ঐ মোড়ে যানবাহন স্বাভাবিক লাল নীল বাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গাড়ী-গুলো যখন লাল আলো দেখে থামে, সে তখন খানিকটা সঙ্কেত দেখায়—আবার যখন নীল আলো জ্বললে চলতে সুরু করে তখন সে গাড়ীগুলোকে চলে যাবার সঙ্কেত দেয়। কোন সময় বা একটা প্রকাণ্ড লরওয়ালা ষোড়শ বার হুইসেল ছাড়লেই পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে দেয়। তার ভাবটা দেখে, কেমন ঠেলে দিলাম বলে চলতে আরম্ভ করল। যখন কোন ঘটনাই হয় না তখন কয়েকজন রাজনীতিক সেখানে ছুটে পড়েন এবং খুব হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব দেখান। তাঁদের সত্যিকারে কোন ঘটনা করাবার ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ, থাকলেও নেতার ক্ষমতার যে অভাব আছে তার সাক্ষ্যস্বরূপ—বিয়াল্লিশ দিন। ঐ সব গোঁড়জনদের দেখলে আমার ঐ চৌমাথার পাগলটার কথা মনে পড়ে (আমি নিরুপায়)।

গ্রাণ্ড হোটেলের তলায় পায়ের-পরা বিশ্বী চিত্রাভিনেত্রীকে দেখে দিয়ে ওঠার জন্যে যারা নিজের নিজের ছুটো আঙুল পুরে তৈরী থাকে এবং যাদের ভিড়ে যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন অপরাধে পুলিশ তৈরী থাকে তাদের কথা জানি না ; ছাঁপোষা শুদ্ধ গৃহস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট নাগরিকদের কথা বলতে পারি—যখনি নেতারা হুমকী ছাড়েন 'জন-সাধারণ এর জবাব দেবে' এই নাগরিক সাধারণ তখন হয় ত কোন যানের হাউস হতে আপনাকে ঢাকার নিচে চলে যাওয়া থেকে জান বাঁচাচ্ছেন—জবাব দেবার অবস্থা নেই, উপায় নেই, ইচ্ছে নেই। তা যদি থাকত তবে তাঁরা তৃতীয় দিনেই ট্রাম চলতে বাধা করতে পারতেন—এক-চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কষ্টভোগ করতেন না।

খানিক বাক্‌স্বাধীনতার চর্চা করার জন্যে এসব কথা বলছি না। কে জানে হয়ত কাল থেকে বিদ্যুৎ বা পরশু থেকে পানীয় জল সরবরাহ ক্ষেত্রেও দু চার মাস ধরে ধর্মঘট চলতে পারে। তখন আমাদের যারা গেলে চলবে না, কারণ সহানুভূতি বজায় রাখতে হবে। একজন নাগরিক হিসেবে এই সব দিনের পর দিন চলা কারণে অসন্তুষ্ট কিন্তু কার্যে-ক্রেশধারী ধর্মঘট সম্পর্কে আমাদের কি মনে হয় তাই জানালাম। যাঁরাই ধর্মঘট করেন তাঁদেরই মনে মনে একটা স্বকল্পিত মধুর ধারণা আছে যে তাঁদের ওপর জনসাধারণের সহানুভূতি বুঝি অফুরন্ত। সে ধারণা ভুল। যখন প্রত্যহ কোন না কোন শোভাযাত্রা রাজভবনের কাছে পথ-রোধ করে থাকে তখন রোজই এসপ্লানেড পর্যন্ত হেঁটে এসে বিপর্যস্ত যানবাহন ব্যবস্থার মধ্যে কোন রকমে নায়াবিদ্যের ক্লান্তির পর (মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হলে টিফিনে জলখাবারে জলই বেশী, খাবার কম) সাধারণ মানুষ যখন বাড়ী ফিরতে চান তখন কি করে প্রত্যাশা করা যায় যে তাঁদের সহানুভূতির ভাণ্ডার অক্ষয় থাকুক। যে দলেরই হোক যত গুরুতর কারণই থাক, বিনা কোন জনসাধারণ অকারণ দুর্ভোগ সইবে। শোভাযাত্রাকারীদের অসন্তোষের মূলে জনসাধারণের ত কোন অপরাধ নেই। যাঁদের গাড়ী আছে তাঁদের অসুবিধা হয় না, কষ্ট হয় আমাদেরই —যারা ট্রামে বাসে যাতায়াত করি। আমাদের জন্যে ত কারো সহানুভূতি হয় না। কারো ত মনে হয় না দিনের পর দিন এমন করলে বুক জনসাধারণের ওপর ভুলুম করা হয়। কর্তব্য কি কেবল এক তরফা। আমরাই কি নির্বীর্য এবং উপায়হীন বলে চোর ঘাড়ে ধরা পড়ে গেলাম যে নিয়মিত ভাবে আমাদেরই কাছে সহানুভূতির মাশুল আদায় করা হবে।

জনসাধারণের কথা না বলে, জনসাধারণের কথা ভাবলে তারা যথার্থ উপকৃত হবে।

কমলমণি (বিষবৃক্ষ – বঙ্কিমচন্দ্র)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্বেলিত সুধা-সিন্ধু নারী রত্নসার
রূপে রসে টল টল—ওগো চতুরিকা
তোমার তুলনা কোথা ? দুঃখের সংসার
স্পর্শে তব হয়ে ওঠে কুসুম মালিকা !
গৃহিণী সচিব সখা প্রেয়সী কল্যাণী
সোহাগের পক্ষ দানে রাখি পতিধনে
পুত্র দুলালেরে লয়ে লক্ষ্মী স্বরূপিণী
খেলেছ সংসার খেলা প্রীতি স্নিগ্ধ মনে।
সংসারেতে দুঃখ কোথা ? কোথা হানা হানি ?
কোথায় বিরহ বিষ ? কোথা হাহাকার ?
তোমার হাসির ঘায়ে অরি সুকল্যানি
পালায় কলহ দুঃখ বেদনার ভার।
দেখনি দুখের মুখ তুমি ভাগ্যবতী
নিজ সুখে সুখী সবে করিয়াছ সতি।

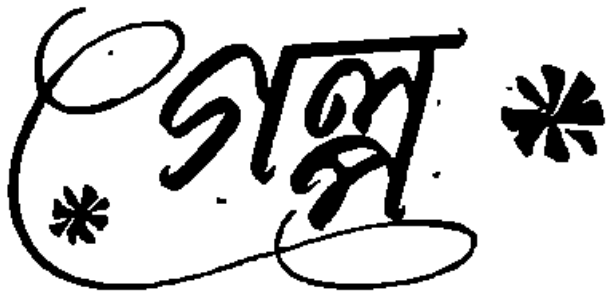

ভুল

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

ঘরে পা দিতে যাচ্ছে এমন সময়ই চিন্ময়ের কানে ভেসে এলো অমিয়বাবুর গলা, তোর জন্যেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা! খেতে পারছি না, পরতে পারছিনা, ছেলেমেয়েগুলো সব অমানুষ হ'য়ে যাচ্ছে……

কান্নার ছোঁয়া রুমার উত্তরে। স্বরেও লজ্জা—এ-কথা তুমি আর বোল না বাবা।

বো-ল-না বাবা! বিকৃত স্বর অমিয়বাবুর। পরেই বন গম্ভীর—একশ'বার বলব। মুখে কালি দিয়েছিস তুই। বলব না আবার।

রুমার মনের কান্না বের হ'ল ঢেউ হ'য়ে—রোজ বলে' তিলে তিলে মারো কেন তবে? বিষ এনে দাও এক-দিনেই শেষ হ'য়ে যাই…

চিন্ময়ের যাওয়া হ'ল না আর। ফিরতে হ'ল। মনময় তখন শুধু প্রশ্নের ঝড়: কি করে রুমা কালি দিয়েছে অমিয়বাবুর মুখে! রুমা কি তবে তার সব কথা তার কাছে বলেনি? ফাঁকি দিয়েছে তাকে!!

চিন্ময়ের সে-চিন্তাই এনে দিল জিজ্ঞাসা। বলল রুমাকে, একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার ওপর তোমার বাবার গলা শুনলাম, তোর জন্যেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা! খেতে পারছি না, পরতে পারছি না…তোমার উত্তরটাও শুনলাম। কি ব্যাপার রুমু?

ছায়া পড়ল রুমার কর্ণা মুখে। দরজার দিকে একবার চোখ ফেলে জানাল, বলব চিন্ময়—সব কথাই তোমার কাছে বলব। কিন্তু আজ নয়।

কেন?

পরিবেশ দরকার।

কয়েক দিন পরে। চিন্ময় গড়ের মাঠে গিয়েছে রুমাকে নিয়ে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কতো লোক। তা'হলেও নিরালা।

তোমার জীবনের সব কথাই নাকি আমার কাছে বলা হ'য়েছে তবে এ-আবার কি কথা রুমা? জিজ্ঞেস্ করল চিন্ময়।

রুমা যন হ'য়ে বলল। সুরু করল, শহরে গ্রামে ছিল আমাদের। ছেলেমেয়ে মিলে একটী সমিতি করেছিলাম। অরুণ ছিল আমাদের নেতা। পাশের গ্রামে একবার কলেরা লাগল। সেখানে রোগীকে সেবা করবার জন্যে নিয়ে গেল আমাকে…বলেই থামল রুমা।

এমন জায়গায় থামলে! তারপর?

তারপর! কথা কাঁপছে রুমার—তোমাকে ছুঁয়ে বলছি চিন্ময়! কোন অপরাধ আমার নেই; কোন দোষও আমি করিনি। উল্টে অরুণকে সেদিন আমার মুখে যা এসেছিল তাই বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা তো কেউ জানল না! সকলে জানল…

মিথ্যেটাই সত্য বলে জানল?

তাইতো হয়। মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা বড় সুখ-রোচক: আরো গ্রাম-দেশে।

তাতে তোমাদের এ-পরিণতি হ'ল কেন?

বাবার একখানা দোকান ছিল হাটখোলায়। বাবা কান পাততে পারত না বাইরে, পা ফেলতে পারত না পথে। কাজেই দোকানখানা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মরলাম আমরাও। তবুও মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা। নিষ্ঠুর সমালোচকদের কথার ছুরি থামল না। শেষে নিরুপায় হ'য়ে একদিন রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সঙ্গে নিয়ে এলাম দারিদ্র্য—তা' তো তুমি দেখছই।

কিন্তু এতোদিন এ-কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?

ভয়ে!

কিসের ভয়?

হারানোর ভয়। ভেবেছিলাম, তুমিও হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না। সত্যি বলো! চিন্ময়ের হাতখানি নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে রুমা আবার অনুরোধ করল, বিশ্বাস করলে আমাকে?

সত্য না বলে' কিছু মিথ্যে বানিয়ে বললেও অবিশ্বাস করত না চিন্ময়। তবুও তার বলতে ইচ্ছা হ'ল। কোন ঘটনাকে গোপন রাখলেই সত্যের গন্ধ থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু রুমা ব্যথা পাবে মনে করে সে-কথা বলল না চিন্ময়। বলল, তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলবে এটা আমি ভাবতেই পারি না রুমু।

একেই তো মায়ামাখা চোখ রুমার—তাকালেই নেশা লাগে। চিন্ময়ের উত্তর শুনে সে-চোখ উঠল হেসে—যেন সুরেখা কটার। ভারী সুন্দর লাগল দেখতে; বিকেলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন মিশে গেল তার কাছে।

তারপরেই আবার পট পরিবর্তন। হঠাৎ মুখখানা ম্লান হয়ে গেল রুমার।

পশ্চিমের আকাশে তখন আবীর ছড়ান। রুমার দুখের ঐ কালিমার ছোঁয়ার যেন সন্ধ্যা নেমে এলো একটু আগেই। চোখের পলকে আলো জ্বলে উঠল ক্যাজুরিণা এভেনিউ আর রেড রোডে। রুমাও হঠাৎ বলে উঠল, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না চিন্ময়। মেয়ের অপবাদকে কি করে যে তার বাবা রোজ রোজ এমন করে মনে করিয়ে দিতে পারে···তাই ভাবছি···

কি ভেবেছ?

সংসারের এই দারিদ্র্য! কবে যে দু'বেলা পেট ভরে··

আর বোল না রুমু, সবই তো আমি দেখ্‌ছি, জানি।

কথা থামাল রুমা, কিন্তু চোখের জল থামাতে পারল না। কয়েক ফোঁটা গরম জল গড়িয়ে পড়ল চিন্ময়ের হাতে।

বলবে না তো কি ভেবেছ?

থাক্, মন্দ ভাবনা।

তারপরে কেটে গেছে কয়েক মাস। একদিন দুপুর গড়িয়ে গেছে বিকেলের কোলে। রাস্তায় চলতি পায়ে হঠাৎ ডালহৌসির এক কোণে দাঁড়িয়ে পড়ল চিন্ময়। দেখল, বেশ জোর পায়ে রাস্তার জনতার মাঝে মিশে যাচ্ছে রুমা। ভালো করে তাকাল চিন্ময়—অবশ্য ওকে দু'বার দেখতে লাগে না।

চিন্ময়ের পা চলল আরো তাড়াতাড়ি। গিয়ে ধরল রুমাকে। জিজ্ঞেস্ করল, এ ভর-দুপুরে তুমি আপিস পাড়ায়!

মুখখানা রাঙা হ'য়ে গেল রুমার। এই তো···এই··· আটকে গেল কথাটা।

পরিষ্কার করে বলো না?

সে অনেক কথা।

সংক্ষেপে বলো।

তা'তে বিকৃত হবে।

চলো তবে কোথাও বসি।

তাই করল ওরা।

তর্ সইছিল না চিন্ময়ের। বলে উঠল, এবার সুরু করো।

জড়তা দূর হয়েছে রুমার—তোমায় দেখি খুব উৎসাহ।

নিশ্চয়ই—কাবোরও কার্য্য হয়তো।

হাঁ। সাহিত্যিক হ'লে গল্প, উপন্যাস লিখতে পারতে। যাক্—বাদলের একটা চাকরী ঠিক করেছি।

অফিসারের সঙ্গে তোমার জানা-চেনা ছিল নাকি?

না।

এম্‌নি চোপ ফেলে ভাইয়ের চাকরী যোগাড় করে দিলে তুমি! কি ক'রে হ'ল?

প্রথম সংসারের অভাবের কথা বলে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম। তারপরে চাকরীর কথাটা তুলি।

মানে অনেক দিন গিয়ে গিয়ে জমিটা প্রস্তুত করতে হ'য়েছিল তো?

একটু রাগ হ'ল রুমার—যা খুশী বলো।

চিন্ময়েরও তখন রাগ—আশ্চর্য! আঘাত বলাটা হল অন্যায়। তারপরেই গম্ভীর হয়ে বলল—না খেয়ে মরতে পারো না?

আমি পারি।

তবে?

তিনদিন আগে থেকে বাড়ীতে রান্না হয়নি। ছোট

ভাই-বোনেরা ক্ষুধায় ছটফট করছে। কাঁদল তারা। ধমক খেলাম। ধমক খেয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে উঠল আবার। চোখের সামনে এ-দৃশ্য দেখে নিজেও কেঁদেছিলাম। তার ওপরে বাবার গাল-মন্দ—সে-ই কথা! আমার জন্যেই সব—আমিই দায়ী। শুনে পাগল হ'য়ে উঠলাম। সেদিনের সে-রাতটা যে কি গেছে আমার। ঘুম এলো না, এলো চিন্তা। একদিকে দাঁড়াল ন্যায় নীতি, আরেক দিকে তীব্রতম দারিদ্র্য। বিরাট মানসিক দ্বন্দ্ব চলল সারা রাত।

কখন সিদ্ধান্তে পৌঁছলে।

সকালে। ভয়ে বাবার কাছে না গিয়ে ভাই-বোনেরা সব ছুটে এলো আমার কাছে—কাঁদল, দিদি! দিদি!! আর পারি না···মরলাম! তখন ওদের বাঁচানই বড় হ'য়ে উঠল আমার কাছে। তক্ষুণি! আদর্শ, ন্যায়, নীতি, সমাজের মাপকাঠি সব ভেসে গেল ওদের চোখের জলে।

জীবনে একবার কলঙ্ক মেখেছ তবুও ভয় বলে তোমার কিছু নেই?

শিউরে উঠল রুমা, যথেষ্ট আছে চিন্ময়।

কাজে তো নির্ভীকতার পরিচয় দিলে।

ম্লান হাসি হাসল রুমা। বিশ্বাস করো চিন্ময়। মিঃ সরকারের বয়েস ভাঁটীতে।

তা' তো আর তুমি প্রথমজেনে যাওনি? থাক্ তারপর?

মুচকি হেসে জানাল রুমা, কিন্তু মনটা রঙীণ।

কি করে বুঝলে?

যে-মন দিয়ে মেয়েরা পুরুষকে বোঝে।

অতি সূক্ষ্ম কথা।

বেশী সূক্ষ্ম নয়—সাদা চোখেও চোখ দেখে বোঝা যায়। মুখে একটু একটু হাসি! কথাও অনেক বলতে চান।

কেন চাইবে না। ওদের বাড়ী আছে, গাড়ী আছে; কথাও অনেক থাকতে দোষ কি। তা'ছাড়া যা বলেছে তা' নিশ্চয়ই ফলে-ফুলে মধুবর্ষী—কেমন? শোনা যাক্।

না শুনলেই নয়?

বলতেই বা আপত্তি কেন?

বলে, আমার কি রাজত্ব আছে নাকি? কোথা থেকে সাহায্য করব?

উত্তরে কি বলো তুমি?

ভুলিয়ে বেলুন করি। বলি, এতো বড় একজন অফিসার···

তাতেই ঔদার্যের বহর! তার পকেটের টাকা তোমার হাতে আসে?

একটু অভিনয়ও করি। কিছু বলি—আর কিছু হাসি দিয়ে আড়াল করে রাখি।

কিন্তু তোমার অভিনয় দেখে যদি আর কেউ কাঁদে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জানাল রুমা, আমিও তা' মনে ক'রে ব্যথা পাই।

মিথ্যে কথা। যদি ব্যথাই পেতে তবে একদিনও যেতে পারতে না ওখানে।

কিন্তু আমার যে অন্য হিসেব।

কি হিসেব?

তোমার পবিত্র ভালবাসা পেয়েছি বলেই এমন অভিনয় করতে পেরেছি আমি।

কিন্তু মানুষের মন! এবারে আর চিন্ময় বিশ্বাস করতে পারল না রুমাকে। প্রেমপূর্ণ একটা মনের মূল্য দিতে পারল না সে, ঘৃণা হ'ল রুমার ওপর। ভাবল, লুকিয়ে লুকিয়ে মিঃ সরকারের কাছে অনেকদিন গিয়েছে রুমা। যেতে যেতে মাঝখানের সুরুত্ব গিয়েছে কমে। তা' না হ'লে কি পেয়ে প্রতিদানে এতোদাম মেয়? সাময়িক সাহায্য থেকে একটা স্থায়ী সাহায্য!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হ'ল চিন্ময়ের—তা'র জীবনে রুমা কি? কেন? কতোটুকু?—নিজেই উত্তর পেল করুণ নীরবে। পাঁজরের হাড়গুলো খট্ খট্ ক'রে উঠল একসঙ্গে! ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল মন—রুমু! মন দেখল না—মন দিল না!—শুধু ফেলে দিয়ে গেল বেদনার কালীদহে! অভিনয় করে গেল জীবন-খেলায়! এতো-টুকু লাগে না ওর।

রুমার মনেও এখন তার অভিনেত্রী জীবন নিয়ে প্রশ্নের ঝড়! জিজ্ঞেস্ করে নিজেকে, উত্তর করে নিজেই। একবার মানসিক কোন্ প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলে উঠল, সত্যি অন্যায়! ভাবতে ভাবতে মিঃ সরকারের কাছ থেকে সেদিন পর্যন্ত যতো টাকা এনেছিল সে-অঙ্কটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বেশ মোটা সেটা! তার-পরে আবার ভাইয়ের চাকরী—আরেকটা সান্যাল!

আরেকটা ভাবনার বুদ্‌বুদ্ ভেসে উঠল রুমার মনে—সে তবে প্রতারক?—মিঃ সরকারের রঙীণ মনের সুযোগ নিয়ে—নিয়েছে দানের পর দান।—প্রতিদানে?—না তো!—একদিন পান-পাত্র সামনে নিয়ে মানুষ যেমন তৃষ্ণাভরা চোখে তাকায়, তেমন চোখে তাকিয়েছিল মিঃ সরকার। তার মাথায় রেখেছিল হাত। আরেকদিন হাতখানি রেখেছিল পিঠে। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না আর। মুখের দিকে তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল কথাটা।

চিন্তার স্রোত ঘুরল রুমার।—মিঃ সরকারের না-বলা কথাটা সে নিজেই বের করতে পারত। ঠিক পারত। মিঃ সরকারের চোখের ভেতর দিয়ে যে রঙীণ মনটা তখন উঁকি দিয়েছিল তাতে একটু দখিন্ বাতাসের ছোঁয়া দিলেই সে-কথা বেরিয়ে আসত বন্যার স্রোতের মতো। কিন্তু তা' সে করেনি। সে হ'য়ে রয়েছিল নিষিদ্ধ পানীয়; শরীরকে ছেড়ে না দিয়ে রয়েছিল শক্ত হ'য়ে।

রুমা এখন একা। নীরব ঘর। নিঃশব্দে নিজের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছাল সে। ঘুনিয়া মুছে গেল তার চোখ থেকে। শুধু চিন্তা নিয়ে সে, আর রইল মিঃ সরকার। স্মৃতির বন্যায় ভেসে ভেসে মিঃ সরকার যেন কাছে এসে দাঁড়াল রুমার। মনের চোখে দেখে চম্‌কে উঠল সে, মিঃ সরকার! এতোগুলো টাকা দিয়ে প্রতিদানে কিছু পায়নি বলে তা' কি সবই আজ আদায় করতে এসেছে? কিন্তু কোথা থেকে দেবে সে? তাড়াতাড়ি চোখ বুজল রুমা।

চোখ যখন খুলল মিঃ সরকার তখন ওখানে নেই। একি তবে স্বপ্ন? মনে করল রুমা। তা তা হ'ক। টাকা পরিশোধ করে দেবে সে। কিন্তু—কিন্তু কম টাকা তো আনেনি! যথেষ্ট! কি করে পরিশোধ করবে তা? একমাত্র ভাইয়ের চাকরী। যা দুর্মূল্যের বাজার, ভাইয়ের টাকায় সংসারের দৈনিক অভাবের সঙ্গেই যুদ্ধ চলে না। তা হ'লে? এ ঋণ পরিশোধ না হ'লে কতোদিন এ-গোপন ঋণের বোঝা, যা' টাকার অঙ্কের চেয়েও অনেক-গুণ বেশী ওজন—তা বয়ে চলবে? আর তো পারছে না সে! তার বিবেক ক্লান্ত।

ধীরে ধীরে আবার মনের গহন-গভীরে নাবল রুমা। ধরল মনের নাড়ী। অনুভব করল, মিঃ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন অভিনয়ে তা খেয়ে খেয়ে জেগে উঠেছে এক নূতন মন! সে-মন যেন মিঃ সরকারের অঙ্গে কে বেদনা-ভরা; তার ব্যর্থ আশার অঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ। সেই বেদনা আর সহানুভূতির একটা কাঁটা রুমার বিবেকের কোমলতম জায়গায় খোঁচ কাটতে লাগল বার বার।

আরেকটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল রুমার—মানুষের বয়েস বাইরে; তার আশা আর তার মনের কোন বয়েস নেই। তাইতো ওখানে গেলে তাকে দেখেই মিঃ সরকারের চোখ দিয়ে বের হয় কতো আশার কথা, নীরবে জানায় কতো তৃষ্ণা। পরে, প্রত্যেক দিনই তার বিদায় বেলায় কেমন হতাশ ভাবে তাকিয়ে থাকে সে। দপ্ করে আলো নিভে যাওয়া মুখখানি—সে মুখখানি পাণ্ডুর, ম্লান!

আচ্ছা! আবার ভাবনার পথ ঘোরে রুমার। সেই ম্লান মুখখানিতে কি পরিতৃপ্তির হাসি ফোটান যায় না? একদিনও কি বিদায় বেলায় মিঃ সরকারের মুখে দেখতে পাবে না এক ঝলক হাসি? পূর্ণিমার জোছনার মতো ফুটফুটে স্বচ্ছ হাসি? পারে না-কি তাকে প্রার্থনা করতে ···অন্ততঃ একটা দিনের জন্যে···কৃতজ্ঞতা! কলুষিত কৃতজ্ঞতা!

মাসের শেষ দিক। হাত টানাটানির দিন। দারিদ্র্য আভরণ নয়, অভিশাপ। অভিশপ্তা রুমা আবার বেরুল হাত পাততে।

কিন্তু আগের রুমার সঙ্গে সেদিনের রুমার পার্থক্য অনেক—যেমন শীত আর বসন্তে। পোষাকের বাহার নেই, রয়েছে যথেষ্ট বিন্যাস। কানে দিয়েছে ঝুঁটঝুক্কা। পাৎলা ঠোঁট দু'খানিতে মুচকি হাসির মতোই গলায় ছোট্ট একটু চেনের হাসি। নিজেও হাসি ভরা, গানে ভরা। পায়ে নেই জড়তা, গতি সাবলীল। কণ্ঠের অশ্রুত গান আর পায়ের অদেখা নূপুরের নীরব ঝঙ্কার ঐকতানে তাকে করেছে ছন্দময়ী। মনোবীণার তারে তারে কতো সুর, কতো রাগ কতো রাগিণী।

রুমাকে দেখেই মিঃ সরকার বলে উঠল, অনেকদিন পরে যে! এতোদিন আসোনি কেন?

প্রয়োজনের চরম মুহূর্তেই বিরক্ত করতে আসি।

তাহ'লে স্বার্থপর ?

ঠিকানা তো জানাই আছে, নিজের স্বার্থের জন্যে পৌঁছ করলেই পারতেন। তা'ছাড়া মনে মনে ডাকলেও হয়তো প্রতিধ্বনি জাগত আমার মনে, বলেই স্বপ্নভরা চোখে রুমা তাকিয়ে রইল মিঃ সরকারের দিকে।

মিঃ সরকারও রুমার দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্মিত আর অবাক চোখে।

চোখের সে ছোঁয়ায় ভেতরে ভেতরে রুমা কাঁপছে। আঁখি-পল্লবে তারই ঢেউ। বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, অনুদিন দেখি কথার ফুলঝুরি ! আজ এমন নীরব কেন ?

একটা জরুরী কাজ করছি।

রোজই তো শুনি অনেক কাজ, জরুরী কাজ ! শেষ পর্যন্ত দেখি অনেক কথাই বলেন।

না-হে না ! আমার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তোমাকে টাকা দিয়ে বিদায় করে দি' সেটা একান্তই অন্তরশূন্য শুষ্ক দানের মতো বলে মনে হয়। তাই—থাক্ ! আজ সত্যি অনেক কাজ। দেখ কতো ফাইল রুমা হ'য়ে আছে পাহাড়ের মতো। এগুলো পরিষ্কার না করলে আমিই চাপা পড়ে মরব।

উপচারে মনের অঞ্জলি উন্মুখ। অভিমানে রাঙা হ'য়ে রুমা বলল, বেশ আমি তবে যাচ্ছি—বলেই প্রণাম করতে গেল মিঃ সরকারকে।

মিঃ সরকার তাড়াতাড়ি চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে এখন। বাধা দিতে গিয়ে হাত দুখানি ধরল রুমার। রুমা বৈদ্যুতিক হয়ে উঠল তাতেই : মনের মুকুল হল কুসুমিত। চোখে ফুটে উঠল বিলোল দৃষ্টি। মিঃ সরকারের বুকের কাছে এসে মুখ লুকাল সে-প্রশস্তে ; যেন পারছিল না আর।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে উঠল মিঃ সরকারও—একি রুমা ! একি তুমি !! আমি তো তোমাকে···তোমাকে যে আমি ছোট বোনের মতোই মনে করেছি—আদর করে হাত দিয়েছি মাথায়, স্নেহে হাত বুলিয়েছি পিঠে···

একটা মুহূর্ত ! সে মুহূর্তেই কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল রুমার ওপর দিয়ে। তাতেই ঝড়ে-পড়া মানুষ রুমা। চুলগুলো এলোমেলো, অবিন্যস্ত কাপড়। মিঃ সরকারের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেল সে অফিসের বেয়ারাটা পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল রুমার দিকে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু

পাঠকেরা জানেন কিনা জানি না যে, 'সখারাম গণেশ দেউস্কর'—এই নামের মধ্যে তাঁর নিজের নাম, পিতৃনাম ও বংশ-পরিচয় নিহিত। তাঁর নাম সখারাম, পিতার নাম গণেশ এবং বংশের নাম দেউস্কর। সখারাম জাতিতে ছিলেন মহারাষ্ট্রী। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলায় ছত্রপতি শিবাজীর আলবান নামক দুর্গের নিকটবর্তী দেউল গ্রামে তাঁর পূর্ব পুরুষের বাড়ী ছিল। সখারাম মহারাষ্ট্রের এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের কৃতী সন্তান ছিলেন। ১৮৬৯ সালে ১৭ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়।

মহারাষ্ট্রী হয়েও তিনি বাংলাদেশের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি গ্রহণ করে বাঙালী জাতির সহিত একাত্ম হয়ে যান। বাস্তবিকই একজন মারাঠি যুবক যে ভাবে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় সারাজীবন চেষ্টা ও সৃষ্টি করে গেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। এক দিকে যেমন সাহিত্য সাধক, আবার অপর দিকে নির্ভীক সাংবাদিক ও দেশ-প্রেমিক ছিলেন। তাঁর 'দেশের কথা' পুস্তকখানি সেই সাক্ষ্য বহন করছে। ব্যক্তিগত জীবন তাঁর বিশেষ সুখের ছিল না, পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান এবং আর্থিক বৈন্য তাঁর লেগেই ছিল। কিন্তু কোন দুঃখ বা দৈন্য তাঁর উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে পরাভূত করতে পারে নি। ছোট বেলায় পিতার নিকট হতে তিনি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতেন এবং যথারীতি শিক্ষার জন্য সখারামকে বেন পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। কিছুকাল বেনপাঠের পর তাঁকে বেওয়ার উচ্চ-ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করা হয়।

তখন মাইকেলের চরিতকার যোগেন্দ্রনাথ বসু এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কাজেই তাঁর সান্নিধ্যে এসে সখারাম বাংলা শেখেন এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন। এইখান থেকে তাঁর বিকাশ সুরু হয়। তিনি যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে থেকে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মালোচনা

প্রভৃতিতে যোগ দিতেন এবং ক্রমশ তাঁর লেখার দিকে ঝোঁক গেল। তিনি কয়েকটী মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এমন কি তখনকার দিনে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশ হতে দেখে অনেকের তাঁর উপর নজর পড়ল—কারণ তখন 'সাহিত্য' পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের সাহিত্যিক বলা হত; কাজেই এই ভাবে সখারাম সাহিত্য আসরে নিজস্থানে সমাবৃত হতে লাগলেন। দেওঘরে থাকাকালীন তিনি আর এক বিরাট পুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষায় ও প্রেরণায় সখারামের মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল—তিনি হলেন ৺ঈ রাজনারায়ণ বসু। এ বিষয়ে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সখারাম সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন :—

"তিনি অবসর পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসু মহাশয় পরম ধার্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিসী লোক ছিলেন। সখারাম যখন যেখানে যাইতেন সেখানে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। সেই মজলিসে সখারামের সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়।"

(আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৮)

আর্থিক অভাব থাকায় সখারাম অল্প বয়সে জীবিকার জন্য ১৮৮৩ সালে দেওঘরের স্কুলে ১০৲ টাকা মাইনেতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং অবসর সময় পড়াশুনা ও সাহিত্য চর্চ্চা করতেন। তখন-কার 'হিতবাদী' কাগজে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। দেওঘরের শাসক তখন ছিলেন—মিঃ হার্ড, ইনি আবার স্কুল-কমিটির সভাপতি ছিলেন। মিঃ হার্ড সখারামকে খুব ভাল চোখে দেখতেন না। কারণ তাঁর বাংলা রচনার মধ্য দিয়ে যে স্বাধেশিকতা ও স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে মিঃ হার্ড ভাবলেন—সখারাম একেই জাতিতে মারাঠী, তার উপর বাংলাভাষার অধিকারী। একে (হয়ত রাজনৈতিক কারণে) এখনই বসে করা দরকার। তাই তিনি সখারামকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেন, এমন কি তাঁর পক্ষে দেওঘরে বাস করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

"যোগীন্দ্রবাবু ও সখারাম দুই জনেই বাংলা লেখক 'অপরাধ' ছিল। তাই দুই জনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া চাকরি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।"

দেওঘরের স্কুল পরিবেশ ত্যাগ করে সখারাম কলকাতার বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলেন। তিনি সোজা 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সহিত দেখা করলেন, সমস্ত শুনে সম্পাদক মহাশয় বিপন্ন সখারামকে তাঁর পত্রিকায় প্রুফ-রীডারের চাকরী দিলেন ৩০৲ টাকা বেতনে। তাপর ক্রমশ নিজের প্রতিভার গুণে সখারাম কালীপ্রসন্নের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। ১৯০৭ সালে কালীপ্রসন্ন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য জাপানে গেলে 'হিতবাদী'র সমস্ত পরিচালনার ভার সখারামের উপর ছেড়ে দিয়ে যান। জাপান থেকে ফিরে আসার পথে কালীপ্রসন্ন ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন সখারাম পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন ৫০৲ টাকা বেতনে।

কিন্তু চার পাঁচ মাস পরে রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের বিষয় নিয়ে সখারামের সহিত কাগজের মালিকদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে তিনি 'হিতবাদী'-সম্পাদক পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ব্রিটিশ কংগ্রেসে তিলকের সমর্থকেরা যে বক্তব্য আরম্ভ করেছিলেন, সেই কারণে হিতবাদীর মালিক তিলকের বিরুদ্ধে লিখবার জন্য সখারামকে নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু তিলক ছিলেন সখারামের গুরু : তাঁর বিরুদ্ধে তিনি স্বাধেশিকতার অধিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন—সেই গুরুকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লেখনী ধারণ—এ কথা চিন্তা করতেও তাঁর সমস্ত অন্তর ব্যথায় বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তাই তিনি নিজের দারিদ্র্যের কথা, পরিবারের কথা ভুলে গিয়ে এককথায় চাকরি ছেড়ে দিলেন। বললেন —'যদি ভিক্ষা করতে হয় সেও ভাল তবু এ কাজ করব না।'

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি সখারাম ইতিহাস চর্চ্চা করতেন এবং ক্রমশ তিনি ইতিহাসে জ্ঞান অর্জ্জন করলেন। সারা জীবন ইতিহাস নিয়েই পড়াশুনা করতেন। কিছুদিন বেকার থাকার পর সখারাম জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু নিশ্চিন্ত জীবন যাপন তাঁর ভাগ্যে নেই, তাই তাঁকে বারবার জীবন-যুদ্ধ করতে হয়েছে তবু মধ্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে তিনি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চাকরী ছেড়ে দিলেন। এ বিষয়েও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন :—

"সরকার হইতে তাঁহার নামেক মাসের উপায় "বেণের কথা" ও "তিলকের মোকদ্দমা" পুস্তকের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় পরিষদে'র শিক্ষিত কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ভাব বুঝিয়া সখারাম অধ্যাপক-পদ ত্যাগ করিলেন।"

সখারাম প্রকৃতিগতকর্ম্মী ছিলেন। জীবনে যে কয়দিন জীবিত ছিলেন তার মধ্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি নিম্নলিখিত বইগুলি রচনা করেন। (১) 'এটা কোন যুগ' (২) মহা-মতি রাণাডে' (৩) 'তাঁতীর রাজত্বকাল' (৪) 'বাজীরাও' (৫) 'আনন্দ বাঈ' (৬) 'শিবাজীর মহত্ব' (৭) 'বেণের কথা' (৮) কৃষকের সর্ব্বনাশ' (৯) 'শিবাজীর দীক্ষা' (১০) 'শিবাজী' (১১) 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত (১২) 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ' ? ইত্যাদি। ইহা ছাড়া তিনি 'সাহিত্য', 'প্রতিভা', 'বেঙ্গলী', 'ভারতী', 'বঙ্গবাসী', 'সাহিত্য-সংহিতা', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখেন, যার এখনও অনেক লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়নি। তাঁর রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'বেণের কথা', এই গ্রন্থে তিনি লেখেন :—

"ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটিশ শাসনে ইংরেজের প্রবর্ত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথানতম ফুসল। এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা দেশের রীতির অনুকরণে পরি-চালিত করিতে না পারিলে, ফুসল আশার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আশু ফুসল লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, অন্তত প্রজাসাধারণের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে।

আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকেই এই আন্দোলনের সংবাদ পর্যন্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতান্বিত স্বার্থান্বেষী রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যার অল্পতা অনুভব করিয়া প্রতীকারে উদ্যত প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয়না, আমাদিগের অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।...”

জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে একদিন সদারাম কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলেন এবং কিছুদিন পরে তার কর্মময় জীবনের অবসান হল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সদারামের একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গুণকীর্তন করতে গিয়ে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা সদারামের চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করেছে। তিনি বলেছিলেন :—

“পণ্ডিত সদারাম গণেশ দেউস্কর আর ইহজগতে নাই। ইনি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদপত্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সদারামবাবু কর্মী ছিলেন—ইনি কর্ম করিতেন, কিন্তু কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাঙ্গালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা সেই ক্ষতিতে মর্মাহত হইয়াছি।”...

“সাহিত্যসেবীর চিরন্তন অভিশাপ দারিদ্র্য দেউস্করের চিরজীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সেই দারিদ্র্যের যাতনা ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শত শত অপরাহ্ণে পরিবার প্রভাতে তিনি যখন স্থির করিয়া পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন। ভগবান্ কর্মক্লান্ত, পথশ্রান্ত পথিকের কর্মফলন স্থির করিয়া করুণার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাঁহাকে শান্তিদান করুন।”

(‘বসুমতী’ হইতে ১৩১৯ সালের মাঘ-সংখ্যা ‘সাহিত্যে’ উদ্ধৃত)

উপলব্ধি

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

তোমাকে অনেক দিতে চেয়ে আমি কিছুই দিইনি,
অথবা যে, যা দিয়েছি কিছু দীর্ঘ নয়।
যদিও সমস্ত গান, শব্দে এ-হৃদয়
আলোড়িত, তবু মনে হয়
অপর্যাপ্ত কী-যে দিতে অবশেষে দিইনি কিছুই!

কতটুকু দিতে পারি?—
পরিব্যাপ্ত হৃদয়ের কতখানি সুর
মেলে মেলে দিতে পারি?—এ নয় রোদ্দুর।
সামান্যই পুঁজি এ-যে, তবু যেন দেবার প্রয়াসে
ঢেউয়ের মতই অনায়াসে
একটি সার্থক ইচ্ছা ভাসে।

হয়ত সামান্য এই ভাষা—
তবুও জড়িয়ে থাকে হৃদয়ের রঙিন পিপাসা।
একটি কম্পিত ভালবাসা।
যদিও একটি গান আনে এ-হৃদয়
—তবুও কখনো তুচ্ছ নয়:
জ্যোৎস্নারও আছে পরিচয়।

তোমাকে দেবার মত অবশিষ্ট কিছু নেই আর
—শূন্য হাত, মুঠি মেলিলাম।
তবু জেনো, যা দিয়েছি তারো আছে দাম:
স্খলিত শিশিরকণা মৃত্তিকার 'পরে
মেলে দিতে নীলকান্তি অলক্ষিতে সেও কাজ করে।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সিন্ধুপ্রদেশের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম —ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, মোহেঞ্জোদড়োর আর হরপ্পার (বর্তমানের লরকানি আর মন্টগোমারি জেলার) পাঁচ হাজার বছর আগেকার মানব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তিন হাজার বছর আগে আর্যরা এই অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করে ভারতীয় আর্য-সভ্যতার ভিত্ রচনা করেন। খৃষ্ট জন্মের ২০০-৬০০ বছর আগে পারসিক কুরুশ আর দারায়ুস এই অঞ্চলেই তাঁদের রাজ্যের বিস্তার করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে আলেকজান্ডারও এই অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন, যার মূল উৎপাটন করে ফেলেন অশোকের পিতামহ মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত। কুষাণের অভিযান থেকে শুরু করে (খ্রীঃ পূঃ ২০০) ভাস্কো-দি-গামার কালিকটে অবতরণকাল (১৪৯৮) পর্যন্ত দু'হাজার বছর ধরে অগণ্য তাপাযেষী, পরধনলোভী, সাম্রাজ্য-বিলাসী দুর্দম্য যন্ত্র, সম্রাটোপাধিক বিভিন্নজাতি, তাঁদের ধর্ম ও রাজ্যলোলুপতার, শাসনের, নির্মমতার এবং বীরত্বেরও নানা পরিচয় রেখে গেছেন এই অঞ্চলে। আর এই অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে সারা ভারতের ভাগ্য যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমন ভারতের ধনও বার বার বগলে নিয়েছেন। তাঁদের অনেকে ফিরে গেছেন তাঁদের দেশে। অনেকে অবশ্য এই দেশকেই তাঁদের স্বদেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেকে চেষ্টা-বিজেতার সম্বন্ধ ঘুচে ফেলে দিয়ে একেবারে মিশে গিয়েছেন এই জাতির মানুষের সঙ্গে।

চোখের জানালায় বুকে পড়ে আমি আমার সারা-মনকে দৃষ্টির মাঝে সংহত করে দেখবার চেষ্টা করলাম—আট-নয় হাজার ফিট নীচেকার মাটিতে তাঁদের পদচিহ্নের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। বৃথাই চেষ্টা : সব ঘুরে গেছে, মুছে গেছে,—যেমন রক্তধারায়, তেমন কালের আবর্তে। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় রয়েছে সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, জয়ের অপরাজেয় ভারতীয় জাতি-সত্তার পরকে আপন করে নেবার প্রসারগুণে।

দেখতে পেলাম সিন্ধু নদ অতিক্রম করে চলেছি। বিশাল নদীগর্ভে এখন জল না আছে, তার চেয়ে বালির পরিমাণ বেশি। কিন্তু আমার মনে হোলো ওই জল কুড়ি শতাব্দীকাল কত বিভিন্ন জাতির, কত বিভিন্ন জয়ের, কত সাধারণ সৈনিকের, কত সামরিক হস্তী-অশ্বের রক্তে, আর কত সর্বহারা নর-নারীর অশ্রুধারায় রক্তবারই না স্ফীত হয়েছে, ফেনিল হয়েছে! আলেকজান্ডার কোন খামখাটায় নৌ-সেতু রচনা করে এই সিন্ধু অতিক্রম করেছিলেন, পৌরবরাজ পুরু পরাজিত হয়েও যবের বলের পরিচয় দিয়ে ভগ্নহৃদয় দিয়ে গেছেন কত মাইল উত্তরে বা দক্ষিণে, তা কিছুই অনুমান করবার উপায় নেই। কিন্তু এ-কথা বুঝতে পারলাম যে, আলেকজান্ডার যখন সদ্য নদে তরণী ভাসিয়ে ভারত জয় করে-ছিলেন, তখন নদের যে জায়গাটা আকাশ পথে এই মাত্র অতিক্রম করে এলাম আমরা, সেই জায়গাটার অনেক নীচ দিয়ে জল-পথে তিনিও চলে গিয়েছিলেন আজ থেকে দু'হাজার দু'শ তিয়াত্তর বছর আগে। ভারত ছেড়ে পারস্যের বাবিলনে তিনি যেই রওনা করেছিলেন। তিন বছর আগে সেই বাবিলনের উপর দিয়ে ও একবার উড়ে গিয়েছিলাম। বাবিলনের যে-রূপ, আর যে-যৌবন আর সৌষ্ঠব আলেকজান্ডারকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, আমার চোখে বাবিলন তার কোন পরিচয়ই যেমন রক্ষা করে না—তেমনি যে-সম্পদের সংবাদ পেয়ে দু'হাজার বছর ধরে বিদেশীরা বার বার ভারতের উত্তর-পশ্চিম দুয়ারে নির্মম আঘাত হেনেছে, তাও আজ চোখে পড়ে না। অথচ ইতিহাসে পাওয়া যায় এক-একজন লুণ্ঠনকারী কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, মণি-মুক্তা চীরক ভারে ভারে লুটে নিয়ে গিয়েছেন। ভারতকে কখনো সাময়িকভাবে, কখনো শতাব্দীর পর শতাব্দী পরবশতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু প্রতিরোধ সে করেছিল। সকল সময়ে দুর্বলতাই প্রকাশ করে নি, বিধ্বংসাত্মকতারই পরিচয় দেয়নি—বীরত্বেরও পরিচয় দিয়েছে, লুণ্ঠনকারীদের বিতাড়িতও করেছে অনেক-বার। এত দীর্ঘকালীন প্রতিরোধের ধারাবাহিক বীরত্বময় বিবরণ, ইতিহাসে খুব বেশি পাওয়া যায় না। ওই যুগের ভারত-ইতিহাসে কেবল আলেকজান্ডার-মহম্মদ-বিন-কাসিম-সুলতান মানুষের, মহম্মদ ঘুরীরই বিবরণ পাওয়া যায়না—পুরু, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও আছেন, হিন্দুশাহী জয়পাল, আনন্দপাল, দ্বিতীয় ভীমপাল, পৃথ্বিরাজ চৌহান প্রভৃতির অমিতবিক্রমেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তৈমুরলঙ্গ, বাবর, নাদিরশা মুসলিম-রাজ শক্তিকে বিপর্যস্ত করেন। চিন্তার আর শেষ নেই।

—'দাদা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

—'না ভাই, ভারতের ইতিহাস ধ্যান করছিলাম।'

—'কিন্তু ভারত আমরা পেছনে ফেলে এলাম যে।'

—'কাবুল অতিক্রম না করে, তা স্বীকার করি কি করে? কাবুল, কান্দাহার হিন্দু ও মুসলিম ভারতেরই চৌহদ্দিতে ছিল।'

—'সে ত কোন অতীতকালের কথা।'

—'সেই অতীতকালের কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম, ভাই।'

—'কিন্তু পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখুন, গাছ-পালা কিছুই নেই।'

—'ও-গুলো পাহাড় কি নর-কঙ্কাল, তাই আমি ভাবছি।'

—'নর-কঙ্কাল বলছেন কি!'

'তৈমুর দিল্লীর যত নাগরিক হত্যা করেছিলেন, তাদের শিরস্ত্রাণ যখন এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল, তখন তা দেখতে পাহাড়ের

হতো হয়েছিল। আর দুইহাজার বছর ধরে যত নর-কঙ্কাল জড়ো হয়েছে এই অঞ্চলে, তাতে কতগুলো পাহাড় হতে পারে ভাব ত।'

—'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা, বাবা।'

—নেপোলিয়ান যখন রিয়াজানে যান হয়েছিলেন, তখন তিনি যত সৈন্য নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তার একশতাংশের একশতাংশমাত্র প্যারীতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। হতদের সবাই যে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তা নয়; রোগে, অনশনে, ক্লান্তিতেও বহুসংখ্যক প্রাণ দিয়েছিল। তবুও ত ইউরোপে তখনো সুনির্দিষ্ট পথ ছিল। কিন্তু এই পাহাড়ী-পথ দিয়ে চেঙ্গিজের বহুর ধরে বিভিন্নদেশের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করতে যত সৈন্য যাওয়া-আসা করেছে, তাদের কতগুলোকে এই পথেই প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে রোগে, শ্রান্তিতে, অনাহারে, তা কল্পনায় আনতে পার? আর জেনে রাখ, এই অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই প্রাণঘাতী যুদ্ধ হয়েছিল; সূচাগ্র মেদিনী কেউ বিনাযুদ্ধে ছেড়েও দেয়নি, কেড়েও নিতে পারেনি। মানুষ যদি পাথরে গড়া হোতো, তাহলে বিগতদের আর ঘুমন্তের কঙ্কালে এখন কত পাহাড় তৈরি হোতো বলত।'

—'সত্যি কি বর্বরতারই যুগ ছিল!'

—'না, না, বর্বর যুগে তা হয়নি। গ্রীক-সভ্যতা, রোমান-সভ্যতা, ব্যাবিলনিয়ান, সুমেরিয়ান, খৃষ্টীয়, ইসলামিক সভ্যতার উত্থানের সময়েই ও-সব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিংশ শতকের সভ্যতার দিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত সামরিক আর বেসামরিক নর-নারী-শিশু নিহত হয়েছে, মৃত্যু যুথেপতিত হয়েছে, তার আগেকার সমস্তযুগে ইউরোপের নানা যুদ্ধেও তার বেশি লোক নিহত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুইকোটী বিশ লক্ষ সামরিক ও অসামরিক লোক মারা গিয়েছে। নেপোলিয়ান মাত্র ছয়লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইউরোপ বিজয়ে যান হয়েছিলেন, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর জাতিসমূহ যে সৈন্য-সমাবেশ করেছিল (mobilised into the army) তার সংখ্যা এগারো কোটী! বিজ্ঞানীরা বলছেন—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, রকেট-বোমা ব্যবহৃত হয়, তা হলে মানব-সভ্যতা সমগ্রভাবে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কার সঙ্গত কারণ রয়েছে। সভ্যতার পরিধি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যুদ্ধের বীভৎসতা আর হতাহতের সংখ্যাও ততই উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এমনকি আজও যারা ভূমিষ্ঠ হয়নি, তাদেরও জীবনে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে!'

—'আমরা অসহায়ের মতোই এই ধ্বংসের বিশ্বব্যাপী আয়োজন দেখছি।'

—'আমাদের আজকার অসহায়তা আমাদের দুর্ভাগ্যেরই কথা মনে নেই। কিন্তু সভ্যতার প্রলয় আবার দিকে দিকে আশার আলোও জেলে তুলেছে। তাই ত ঠিক এই মুহূর্তেই পৃথিবীর দশদিক থেকে ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে, শত-শত নর-নারী আমরা ডিস্‌আর্মামেন্ট চাও ধ্বংস কালনাল কো-অপারেশনের দাবী কণ্ঠে নিয়ে স্টকহোলম-কংগ্রেসে মিলিত হতে চলেছি।'

প্লেন কাবুলের কাছাকাছি চলে এসেছে। নীচে তাকিয়ে কাবুল উপত্যকাটি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

কাবুলীওয়ালাটি বলে—'মাইগুলো বেশ বাসুছি, তেমন ঝামেলা হলেছে।'

সত্যিই দেখবার মতো। ফসল কেটে মাঠে মেলে রেখেছে সারির পর সারি। প্লেন থেকে দেখে মনে হয়, সোনার চামর যেন বৃত্তা করছে।

—'আমারো ক্ষেতে এমনই ফসল ফলেছে।' কাবুলীওয়ালা বলে—সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াচ্ছে, মাঝে-মাঝে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে তার ছোট গ্রামখানি কোথায়!

ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে সমগ্র কাবুল শহরটি কখনো উপর থেকে, কখনো তির্যকভাবে দেখাতে দেখাতে আরিয়ানার পুষ্পক-রথ সাড়ে তিনঘণ্টার যাত্রা শেষ করে কাবুল এয়ার-পোর্টের মাটি স্পর্শ করল। শহরটি উপর থেকে খুবই সুন্দর দেখালো। চারিদিকেই পাহাড়। তারই মাঝ দিয়ে কাবুল নদী বয়ে গেছে। ধূম্র পাহাড়ের রেখাবলী, উপরে নীল আকাশ, আর নীচে শস্যক্ষেতের আর আঙুর-আনার গাছের প্রাচুর্য শোভা।

বাবর শা' ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে কাবুল জয় করেছিলেন। কিন্তু কাবুলের ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁর বিজিগীষাকে পরিতৃপ্ত রাখতে পারল না। তাঁর ধমনীতে পিতৃকুল থেকে এসেছিল তৈমুরের রক্ত, আর মাতৃকুল থেকে এসেছিল চেঙ্গিজ খাঁর রক্ত। ওঁরা দুজনাই ছিলেন এশিয়ার ত্রাস। বাবর এসেছিলেন ফারঘানা থেকে। তা ছিল তুর্কস্তানে। তৈমুরের রাজধানী ছিল সমরকন্দে। তাও ওই তুর্কস্তানে। আজকাল ওই দুইটি জায়গাই সোবিয়েৎ সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের অংশ রিপাবলিক অব উজবেকিস্তানের অন্তর্গত। বাবর কাবুলের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর নেই। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতেই তিনি দেহ-রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহ সমাহিত করা হয় কাবুলে, তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে।

কাবুলে আমাদের অগ্রগামী কয়েকজন ডেলিগেট বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। প্রথমার্ধের অধিকাংশ তার আগের দিন মোবিয়েতে রওনা হয়ে গেছেন। আমাদের দলটিকেও দুভাগে বিভক্ত করা হোলো। ঠিক হলো একদল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই টাসকেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে; আর একটি দল পরের দিন রওনা হবে। আমি কাবুলে থাকতে রাজী হলাম না। আমি তখন হিন্দুকুশ অতিক্রম করবার খিল উপভোগ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, কাবুলের সন্তা ফল খাবার লোভ আমার জন্মে হোল না।

কাবুলে আমাদের দলে যাঁরা নতুন করে ভিড়লেন, তাঁদের মধ্যে দেওয়ান চমনলাল সুপরিচিত ব্যক্তি। স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বাধীনতার পরে কিছুকাল ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে কাজ করেন। এখন তিনি কংগ্রেস দলের নির্বাচিত এম-পি। অমায়িক লোক তিনি, যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি সদালাপী। বন্ধুতাও জমলো ভালো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, ডাক্তার হেমেন চমনলাল।

তিনি ছিলেন বিদেশিনী, বিয়ে করে হয়েছেন ভারতীয়া। তিনি যেন ছিলা পৌরাণিকী—যেমন সুন্দরী, তেমনই আভিজাত্য মণ্ডিতা।

দ্বিতীয়া মহিলাটি ছিলেন ষোড়া মিস্ত্রী। তিনি তরুণী, সুন্দরী, এবং বিদুষী। তিনি একজন সমাজ-সেবিকা। হাসপাতালগুলোতে বিকলাঙ্গ নর-নারী শিশুদেরকে আশ্রয় দেবার এবং তাদেরকে কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য 'আরাম-ঘর' নামক একটি আশ্রম আছে। পরিচালনার দায়িত্ব ইণ্ডিয়ান ননকমেডস অব সোসাল ওয়ার্ক (অক্ষুণ্ণ) গ্রহণ করেছেন। ষোড়া মিস্ত্রী তার চেয়ারম্যান। বেশ বলতে-কইতে ও লিখতে পারেন। স্টকহোলমে ভারতীয় ডেলিগেশনের মেম্বার ছিলেন চাচেরী হেডের সেক্রেটারীর কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করেন।

কাবুল বড়ই ছিমছাম সৌম্য, এয়ারপোর্টটি কিন্তু আদৌ আরাম-প্রদ নয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই তাপসা-গরমে হাঁপিয়ে উঠলাম। তার ওপর চারের তৃষ্ণায় ছাতক। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী অজিত পাল বলেন—'চা খাবেন, চা এতক্ষণ বলেননি কেন?'

গোপাল হালদার জিমুচ্ছিলেন। চা পাবার সম্ভাবনা আছে শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন।

—'সত্যি বলছ অজিত, চা পাওয়া যাবে?' করুণকণ্ঠে গোপাল জানতে চাইলেন।

—'পাওয়া যাবে মানে! এটা কি এয়ারপোর্ট নয়? বন্ধুর মতো রেস্তোরাঁ রয়েছে। চলুন, আমার সঙ্গে।'

গোপাল আর আমি এগুতেই মিনিটখানেক আমাদের সঙ্গ ছিলেন উষা, শোভা, আর আমার 'লিটল সিস্টার' ছয় আনা। ব্যারাক বাড়ীর মতো একটা বাড়ীর লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে, ঝোলানোর সন্ধান পেলাম। রেস্তোরাঁটি পরিচ্ছন্ন নয়, আসবাবপত্রও জীর্ণ। কাউন্টারে বিরাজ করছেন একটি হিন্দুস্থানী আফগান-নারী। তাঁর মাথার চুল কাঁচা-পাকা এবং রুক্ষ। ওপরের পাটিতে দুটি দাঁত নেই। তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে অনর্গল কী যেন বকে যাচ্ছেন তিনি।

কয়েকখানি আসন দখল করে বসলাম আমরা। কিন্তু আমরা যা চাই, তা যোগাবে কাকে? কাউন্টারের মহিলা তো আমাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি ফেলছেন না। তিনি তাঁর বহু-বেচারাদেরকে সাজে ঝাড় করিয়ে চায় দেচ্ছে, চোখ বুলিয়ে, অনর্গল বকেই যাচ্ছেন।

অনেকক্ষণ তাঁকে দেখে-বেখে আমি গোপাল হালদারকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এই রকম নারী আর কোথায় দেখেছেন, বলুন তো?'

—'চা না পেলে নয় অথবা নারী কোন-কিছুই আমার মনে রেখা-পাত করেনা।' তিনি বলেন।

—'ছিকেন্সের মডেলে এই ধরণের নারীর বিবরণ পাওয়া যায়। 'এ টেল্ অব টু সিটিজ' উপন্যাসের মাদাম দেফার্জের মদের দোকান মনে পড়ে তো? অবশ্য তিনি আদৌ অপ্রয়োজনে কথা কইতেন না, বিনা বাক্যব্যয়ে বুনেই যেতেন। তাঁর বুনি তাঁর হিসাব কাজ করত।'

গোপাল বলেন—'ডিকেন্স আমেরিকার সিনেটরদের পড়িছি, কি থাকগাবিস্তানে এসেছিলেন শুনিনি।'

—'নারীর অবহেলা ভাবের এই রূপটি দেখে-দেখেই দেখতে পাওয়া যায়। তা দেখবার জন্য আমেরিকাতেও যেতে হয়না, আফগানিস্তানেও আসতে হয় না।'

অজিত পাল ট্রেড-ইউনিয়নের তরুণ কর্মী। তাই বহু-বেচারাদের চিত্র হয় করে চা আর কেকের ব্যবস্থা করে দেন, ভারতীয় কায়দাকে আফগানীতেও এক্সচেঞ্জ করে নিল।

খেওয়ান চমনলাল সদল এগিয়ে এলেন এবং কাছেই একটি টেবিলে তাঁরা সকলে বসলেন। তাঁর দলে দুটি আফগান তরুণ ছিলেন। ইউরোপীয়ান পোষাক-পরিহিত এই তরুণ দুটিকে প্রথম দৃষ্টিপাতে ইউরোপীয়ান বলেই ভুল হয়। চমৎকার ইংরিজি বলেন। চমনলাল হয়ত ওঁদের কাছে পিতৃবন্ধু। আফগান তরুণ দুটি বেশ মন দিয়ে তাঁর সব কথা গভীর মনে শুনছেন, এবং বিনীতভাবে জবাব দিচ্ছেন। কানে এলো চমনলাল নির্দেশ দিচ্ছেন—দিল্লীতে তাঁর নাম করে তার করে ক'কুড়ি আম আনিয়ে কাবুলে কাকে কাকে তাঁর প্রীতি-উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিতে হবে। একটি আফগান তরুণ প্রতি নির্দেশই বিনম্রভাবে গ্রহণ করছিলেন।

আমার ইচ্ছে করছিল তরুণদুটিকে ডেকে কাছে বসিয়ে আজকার আফগান তরুণ-তরুণীদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। কিন্তু খাবার এলো বেশ তৈরি, এখুনি উঠতে হবে। আমাদের মধ্যে যাঁরা কাবুলে রাত কাটাবেন, তাঁরা শহরে চলে গেছেন। আরিয়ানা তাঁদের থাকবার জন্য কাবুল-হোটেল ঠিক করে রেখেছিলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা সবাই সোবিয়েৎ প্লেনে উঠলাম, এই শ্রেণীর প্লেনগুলো আকারে ডাকোটারই সমান। কিন্তু পরিচ্ছন্নতায়, সাজ-সজ্জায়, মনোমোহন। সোবিয়েৎ সরকার এই প্লেনেরই একখানি ভারতের প্রাইম মিনিষ্টারকে প্রীতি-উপহার দিয়েছেন। আমরা সকলে আসন গ্রহণ করতে না করতেই চলন্তিম আকাশে উড়ল। আসনের পাশে প্লেনের বডির গা বিয়ে রবারের নল চলে গেছে দেখতে পেলাম। আর দেখলাম দুটি করে রবারের থলি আর মুখোস প্রতি পংক্তির আসনের মাথার ওপরকার শূন্য স্থানে ঝোলানো রয়েছে। মুখোস গুলি অক্সিজেন-মাস্ক, হিন্দুকুশ পর্বত-শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করবার সময় গুলি নাকে-মুখে পরতে হবে।

হিন্দুকুশ একটিমাত্র পাহাড় নয়, একটি রেঞ্জ—পাহাড়ের পর পাহাড়, তারও পর পাহাড়, প্রায় তিনশ মাইল স্থান জুড়ে। ওর সাধারণ উচ্চতা বারো হাজার থেকে আঠারো হাজার ফুট; মাঝিলিয়ের দিগন্ত থেকে চিনগুল চূড়া। কিন্তু তার চেয়েও উঁচু অনেক চূড়া আছে। তার কোন-কোনটা পঁচিশ হাজার ফুটও উঁচু। চলন্তিম প্লেনগুলো উঁচু শিখরগুলির উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে না। তাই উঁচু শিখরগুলিকে এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে চলে। আর উঁচু দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এবং অবিরত গতি পরিবর্তন করতে করতে উড়ে যায় বলে

আরোহীদের শ্বাস কষ্ট হতে পারে। সেই জন্যই অক্সিজেন-মাস্কের ব্যবস্থা।

হিমালয় রেঞ্জের কাছাকাছি যেতেই এয়ার-হস্টেস আর ইউথ প্রত্যেক আরোহীর মুখে মাস্ক পরিয়ে দিলেন। মুহূর্তেই হাসি-গল্প বন্ধ হয়ে গেল। প্লেনের ভিতরে থম-থম স্তব্ধতা। কখন কী হয়, তাই উৎকণ্ঠা সকলকেই হতবাক্ করে দিল। অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়-গুলো অনেক নীচুতে রেখে, উচ্চতর শৃঙ্গগুলিকে এড়িয়ে এড়িয়ে টুপুশিন প্রশান্ত গতিতে উড়ে চলেছে, নাচুনি নেই, কাঁপুনি নেই। যে পাহাড়গুলো এতক্ষণ মাথে থাকবার গরজ নিয়ে নীল আকাশে শূন্যের চূড়া খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল, তারাও যেন মর্যাদার আসনের মানুষের অপরিসীম শক্তির পরিচয় পেয়ে মূক ও মৌন হয়েছে। শুধু উচ্চতম শৃঙ্গগুলি যেন তাচ্ছিল্যভরে মানুষের এই সিদ্ধিকে না-বালকের প্রকৃতি-জয়ের খেলার অতিরিক্ত কোন মূল্যই দিচ্ছে না। তাদের গায়ে বরফ জমে রয়েছে। ধূসরের-সূত্রের সে বিস্তারী বিস্ময়কর কিন্তু চিত্তহারী নয়, কেননা সূর্যের আলো তাদের উদ্ভাসিত করেনি; কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ তাতে নেই। মনে হয় পাহাড়ের রাজ্যের রাজ্যে কেউ যেন চুপ মারিয়ে রেখেছে।

অক্সিজেন-মাস্ক পরে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। ওটা না পরলে কী অসুবিধে হয়, তাই দেখবার বড় ইচ্ছে হোলো। মাস্কটা খুলে ফেলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেলাম না। মিনিট পনেক যেতে না যেতেই কঠিন হস্টের ছুটে কাছে এসে ইংরেজীতে বল্লেন —ও কী করেছেন।

—হাঁপানিতে কখনো ভুগিনি। তাই শ্বাসকষ্ট ব্যাপারটি কী, একটু পরখ করে দেখছি।'

—'না, না, ওতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।' মাস্কটা আমার মাথার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিতে দিতে তিনি বল্লেন—'আপনারা এখন সোভিয়েত সীমানার কাছে এসে পড়েছেন। এখন থেকে আপনাদেরকে নিরাপদ ব্যবস্থার দায়িত্ব আমাদের।'

—'কিন্তু মুখে এই মাস্ক বেঁধে দিয়েই কি সব-বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পার? ওই ত আর একটু হলেই বাঁদিকের ওই উচ্চতর পাহাড়টা প্লেনের বাঁ দিকের পাখাটা ভেঙে দিত। ওই ডান দিকের পাহাড়টা সোজা এদিকে আসছে। হাড়-গোড় ভেঙে মরার চেয়ে নিজের হাত আটকে মরা কি ভালো নয়, মাস্টর?'

মাস্টর কোন জবাব দিলেন না। মাস্কটি বেঁধে দিয়ে ছুটে চলেন ঘন-ঘন যন্ত্রের পর্দা দেখে। জনকয়েক নর এবং নারী স্টিয়ারিং হুইলে পড়েছেন: স্টাইটে নব ফ্লাইটে। তাঁদের মাঝে খোলা ঘরে রাষ্ট্রপতি ছিলেন। টুপা খুব সাবধানী করে তাদের সেবা করছিলেন; কিন্তু পরে পাখীর পায় হবার সময় তিনিও কাৎ হলেন। টুপুশিন মানুষের কাছে পরাজয় সহজভাবে স্বীকার করবেন না বলেই জনকয়েককে কিছুটা শিক্ষা দিয়ে ফেরাই দিলেন।

কিন্তু প্রকৃতি কি সত্যই পরাজিত? আমরা প্রায়শই বলে থাকি মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে। প্রকৃতি যেন আমাদের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী; যেন আমরা তার সন্তান নই; যেন সে যুগ যুগ ধরে আমাদের ব্যবহারের জন্য, আমাদের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে বসে নেই! আসলে আমরা প্রকৃতির মান পাবার যোগ্য হচ্ছি, জয়-পরাজয়ের কোন কথাই নেই। প্রকৃতি যদি বিরোধিতা করতে চাইত, তাহলে তার বুকের স্নেহ (স্নেহ একটা স্নেহ-পদার্থ) জমুরের উষ্ণতা দিয়ে বাষ্প করে দিত,—পেট্রোলে তৈরি হোত না; এখনই এমন ঘন-ঘুরপাক সৃষ্টি করত যে, এই টুপুশিন মুহূর্তে পথভ্রান্ত হয়ে পাহাড়ে আঘাত খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আজ যেমন মানুষে-মানুষে সহযোগিতা বড় কথা হয়ে উঠছে, তেমনই বড় কথা হয়ে উঠছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহযোগ। জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ক্রমশই অবান্তর হয়ে যাবে।

তৈমুর, বাবর, আরো অনেক-কিছুরও এই হিন্দুকুশ পার হয়েই ভারত-জয়ে যাত্রা করেছিলেন। আমাদেরকে তারা পরাজিতও করে-ছিলেন, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারেন নি। তিন বছর আগে ওই তৈমুর-বাবরের দেশেরই রাশ্মি কমিটির সভাপতি এক প্রভাতে আমাকে হাত ধরে এরোপ্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে বলেছিলেন— এত আগে-ভাগে প্লেনে উঠে বসেছিলে কেন? যতক্ষণ তোমরা আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণই আমাদের বন্ধুত্বের মধুর স্বাদ আমরা পাব। তা থেকে কেন বঞ্চিত করেছিলে? (ক্রমশঃ)

সে মেয়েটি

শ্রীমঞ্জুর দাশগুপ্ত

একদিন এই পথে সে মেয়েটি গিয়েছিল চলে
বেনারসী শাড়ী পরে অঘ্রাণের শিশির সকালে—
কাঁসাই-এর নীল জলে উঠেছিল ঝিলমিল ঢেউ—
ঝিরিঝিরি বাতাসেরা নেচেছিল তারি তালে তালে।

তারপর সময়ের পেণ্ডুলাম চলেছে নিয়ত
কতদিন হেঁটে গেছে এ ধূসর পৃথিবীর বুকে,—
হাজার নতুন প্রাণ উড়িয়েছে নতুন পতাকা—
খেলেছে হাজার খেলা কভু সুখে কখনও বা দুখে।

সকলেই ভুলে গেছে—কেউ তারে রাখে নাই মনে,
শুধু সে কাঁসাই আর আমি কাঁদি তাইই স্মরণে।

বারামুলা

পথে বার বারোনো। একটা বাসের ঘরে কি যেন দেখেছে। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। আর ইতিহাস পড়া চলছে। পুরানো পেলে ঘোরাপথ আসে, ভেরোনাগে গেলে চকলতা, তীর্থে গেলে ধর্মবোধ। এও তো তীর্থ। পথের ধারে ফলক। কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় ১৯৪৭এর ২৭শে অক্টোবর শিখ বীরদের যুদ্ধ-জিৎ মূর্তি। এদের পুরোধা ব্রিগেডিয়ার রাজিৎ রায়; বাঙালী নন, শিখ অফিসার। ঘাটিনীর সঙ্গে তিনিও এখানে আমন্ত্রণ করেন। রণজিৎরায় বাঙালী নন, কিন্তু বারামুলা শত্রুমুক্ত করার জন্য চরম নেতৃত্ব করেছে বাঙালী; বেসামরিক ভক্ত, বিদেশে শিক্ষা, ভারতে কর্মস্থান, বাঙালী ব্রিগেডিয়ার এল্. পি. সেন।

আর মনে পড়লো মহাপ্রাণ মকবুল শেরওয়ানীর কথা। ব্রিগেডিয়ার ওসমান পুরো আত্মদান করে অমর হয়ে গেছেন। তার নাম অনেকে জানে। কিন্তু মকবুল শেরওয়ানীর রক্তে পূত বারামুলা। একদিন সীমান্তের আবদুল গফ্ফার খান, বম্বের মহম্মদ আলি জিন্না আর মকবুল শেরওয়ানী একই প্রতিষ্ঠানে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করেছে। কিন্তু জিন্না দেখলেন মুসলমান রাজত্বের অবসর। সাহায্য পেলেন ইংরাজ কূটনীতিজ্ঞের। যে ভেদাভেদ ছিল না ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সে ভেদাভেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ভারতকে দু'টুকরো করলো। এই জিন্না বারোডাই নৌকোর আরিচ্ ও প্রিন্স ছিল; কংগ্রেসে ছিল প্রতিষ্ঠা। আবদুল কাসুম কংগ্রেসের বিশ্বস্ত অনুচর। ১৯৪২এর সেই ব্যাপক ধরপাকড়ের সময়ে ইংরাজ কূটনীতি তাঁর কানে কি মন্ত্র ফুঁকলো কে জানে! সেতারা তখন আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী। আবদুল কাসুম একেবারে ইংরেজভক্ত কংগ্রেসত্যাগী, জিন্নার পার্শ্বর হয়ে বেশকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। মকবুল শেরওয়ানী মুসলমান হয়েও অন্য ধাতের। শ্রীনগরে জিন্নাকে প্রকাশ্য সভায় ছেড়ে বল্লেন,—কাশ্মীরে শুধু কাশ্মীরীই আছে। হিন্দু বা মোগল, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান - ও সবাই কাশ্মীরী। আর কেউ নয়। সেই মকবুল আছে বারামুলায়। তাকে খোঁজ করা চাই। সপ্রাণ, সমালোচী, সম্মানিত মকবুলকে পথে রেখে কোড়া মারা রক্তে পূত বারামুলা। বারামুলায় ধ্বংস হয়েছে প্রেসেটেশন কনভেন্টের গীর্জা, হাসপাতাল। নিরীহ নারী আর মুমূর্ষু বৃদ্ধ ইংরাজ প্রাণ দিয়েছে হানাদারদের হাতে। ঝড়ের মতো একটি তারার মতো সেই হত্যার মধ্যে একটিমাত্র নাম মনে পড়ে ভেরেনিসিন্—বাইবার ভেরেনিসিন। কিছু বলেনি সে, কিছু করেনি। নির্ভীক দেহীর মতো বীরবে হাঁটিয়ে, বুকে এক লাখি খেয়ে—মোহার পবিত্রতা রক্ষা করবো প্রভু আর কি দিয়ে, কি শক্তি আমার? আমার রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, নীরব প্রার্থনা দিয়ে। ভেরেনিসিনের বুকে গুলি লেগেছিলো। সেই রোমাঞ্চ রক্তাক্ত হয়েছিল তরুণীর আক্রমণে। সেই বারামুলা। গল্প চলছে।

বসে চলেছি। কথায় কথায় এসে গেল ওসমানের কথা। এক দিকে ওসমান, অন্যদিকে এব্রাহিম খাঁ। এব্রাহিম খাঁ পুরুষের লোক। পুরুষ মানুষ যথাযথভাবে প্রতিপালিত, শিক্ষিত। তার যথাযথভাবে ব্যারিষ্টার হয়ে বসে রয়েছে। সেই ঘিয়ে পাকা হোলো পুরুষ। হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেতা হবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। লাগবেনা কেন? জিন্না আর আবদুল কাসুমের আদর্শ তো তার চোখের ওপর! কিন্তু ইতিহাস পাঠকের মন এই ঘটনায় কাবু হবে না; বেলাভূমির ইতিহাসে এমনি ঘটনার কালীমা হয়ে যা। যেমন আছে এব্রাহিম, তেমনি আছে ওসমান। যেমন আছে মীরজাফর, তেমনি আছে মোহনলাল। ওসমান পাঠানের নয়। উত্তরপ্রদেশের, আজমগড়ের। কাশ্মীরে লেখাপড়া। কাশ্মীর শিক্ষাদীক্ষায় বরাবর একটা ঘরোয়া ভাব থেকে এসেছে। সাম্প্রদায়িকতা এই পোড়াদেশের সবচে কম। ছাত্রেরা খুব মিলেমিশে পড়াশুনা করে। সেকালের আলিগড়ের ঠিক বিপরীত আবহাওয়া। ওসমান গ্রাজুয়েট থেকে পাশ করে নৌশেরার কাছে স্থানগড়ের প্যারাব্রিগেডের অধিনায়ক। প্রথমটায় একটা ধাক্কা খান ওসমান, স্থানগড়ে হেরে যান। বাস্—আর দেখে কে? দিনরাত সমান খেটে দিনবিরতে দল গড়ে তুলে আক্রমণ চালিয়ে পর পর হানাদারদের ঘাটের পর ঘাট ঘিরে কোট, নৌশেরা ছেড়ে দিলেন। তারপর সেখানে তুমুল যুদ্ধ। দিনরাত ব্যাপী যুদ্ধ। নৌশেরা থেকে স্থানগড়। চলেছে বিজয় অভিযান। তখন বিপুল জয়ধ্বনি, বিপুল হর্ষ। এই হর্ষের মধ্যে ওসমান অতর্কিতে প্রাণ হারালো শত্রুর ঘোমায়। সেদিন যুদ্ধ থামে নি। যুদ্ধরত থাকেনি। কিন্তু ওসমানের জন্য প্রতিটি চোখে জল। সেই অমর দেহ ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরাট শোভাযাত্রার ছবি আজও চোখে ভাসে। ওসমান। ব্রিগেডিয়ার ওসমান। বারামুলায় এলে বারামুলার বিশ্বস্ত অঞ্চল দেখলে কে না মনে করবে ওসমানকে, রণজিৎ রায়কে, মকবুল শেরওয়ানীকে।

হিন্দু-মোগলের ঐক্য, অনৈক্য নিয়ে অনেক মতামত অনেক অভিজ্ঞ বাক্তি বলে গেছেন। কিন্তু সব কথার ওপর যে মানবতা-বাদ বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন সেই কথাই শেষ পর্যন্ত জয়ের মালা নেয়। মানুষ যদি মূলতঃ মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার করে, বাকী

সব হয়ে যায় যাক। দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, অত্যাচারের বিপক্ষে সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সাড়া দেওয়া মনুষ্যত্বের এক ধরণের বিকাশ। দেশ তোমার বা আমার নয়; সবার। যখন দেশের প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে হয় তখন সব ভুলে আঘাত হানতে পারলেই সে মহাবীর; জয় পরাজয় আরও পরের কথা। মানুষ মানুষকে রাজনৈতিক কারণে, অর্থনৈতিক কারণে, স্বার্থে, দ্বেষে, হিংসা করছে; করেছে। কিন্তু যেই শুনি দেশের হয়ে কেউ আত্মদান করেছে, অমনি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, তখন জাতি, বর্ণ, সংজ্ঞা সবকিছুর বিশেষ ভুলে যাই। লক্ষ্য করে দেখেছি মোগল বিদেশী ওসমানের কথা ভাবতে গিয়ে খুশী হয়, গর্বিত বোধ করে। রাজনীতির ঊর্ধ্বে এই যে স্বতঃসুলভ মানবচেতনা, একে আশ্রয় করেই নতুন সমাজ গড়তে হবে আমাদের।

উলার থেকে বারামুলার পথ। মাঝে সোপোর পড়ে। ঝিলম বাঁ ধারে। সহরের উপকণ্ঠ দিয়ে বাস চলেছে। সহর একটু নীচে নদীর তীরে। পথ পাহাড়ের উপর দিয়ে। বারামুলায় পৌঁছে দেখি, বিকেল তখন চারটে।

বারামুলার কথা আগে বলেছি। বরাহমূল প্রাচীন সহর, বহু প্রাচীন। ভারতবর্ষে কুশানরা আসে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। কনিষ্ক (৭৮—১২৩) এখানে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা করেন বসুমিত্র বসে। তার বর্ণনা হুয়েনসাংয়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়। হুয়েনসাং আসেন কনিষ্কের বহুপরে। প্রায় ৫০০ বৎসর পরে। কনিষ্কের পরে হবিষ্ক বরাহমূলের কাছে নগরী নির্মাণ করেন হুষ্কপুর। বরাহমূল থেকে কিছু দূরে হুষ্কর গ্রামে এখনও লোক বাস করে। হুষ্কর আর বর্তমান বারামুলার মধ্যে বরাহমূলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিল ভারত বিখ্যাত বিষ্ণুর বরাহ অবতারের বিরাট মূর্তি।

মহাবরাহঃ গুপ্তকে কাঞ্চনঃ কবন্ধঃ ঘবৎ
পাতালে তিমিরঃ হতঃ বহুস্থিত রবিপ্রভাঃ।

এ মূর্তির বিশদ বিবরণও হুয়েনসাং দিয়ে গেছেন। আরও দিয়ে গেছেন বরাহমূলের বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্যের বিবরণ। এখানকার বৌদ্ধ বিহারে তিনি বাস করে যান। তখন বৌদ্ধদের কতো সম্মান, কতো সম্মান বিষ্ণুকল্পের। কাশ্মীর-রাজ স্বয়ং তাঁর না ও শাইকে পাঠিয়ে দেন বিদেশী পণ্ডিতকে রাজঅতিথিরূপে জ্ঞাপন করতে। বরাহ মূর্তি ছিল বিরাট এবং লোহার তৈরী। মন্দিরের ছাদে গাঁথা চুম্বক। সেই চুম্বকের আকর্ষণে মূর্তি আকাশে বিরাজিত হয়ে দুলতো। লোকে চমৎকৃত হোতো দেখে। নিকষের মত শিক্ষিত এই মন্দির চূর্ণ করেন।...

বারামুলার বাজার

ভাবছি এই সব কথা। হঠাৎ এক শিখ-শিক্ষক ডেকে বলেন "সাবেব এখানকার গুরুদ্বারায়? মস্ত গুরুদ্বারা; প্রসিদ্ধ।"

যাবো কেন? তীর্থস্থান যে। সে মন্দির বেশদূর আজও আছে তা শিব মন্দির। শিবের লিঙ্গমূর্তির গায়ে মানুষের আকারে মুখ উৎকীর্ণ করা। আরও ঘুরে গেলে গুপ্ত দেখা যাবে। হুষ্কর-গ্রামের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে।

আরও এগিয়ে গেলে গিরিবর্ত্ম, যার মধ্য দিয়ে ঝিলাম চলেছে কৃষ্ণ গঙ্গার দিকে মুখ করে। ডান দিকে কাজিনাগ পাহাড়ের সার; বাঁদিকে শ্বেতপর্বত। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে ঝিলাম চলেছে। ঝিলামের পাশে পাশে মোটর পথ। বারামুলা, উরি, পুঁছ—প্রাচীন পর্ণোৎস—এ পথের তুলনা নেই, এতো সুন্দর, এতো রমণীয়। মাত্র এই পথে মোটর চড়ে আসার বিলাসেই বহু পশ্চিমী পর্যটকরা কাশ্মীরে বেড়াতে আসতো। পথের মাঝে মাঝে মোটর আসতো, কত লোক নৌকায়।

যেন একটা সাজার বারান্দায়। বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কখন যাত্রাদলটা একটা থেমে গিয়েছে। আমি শুধু পথটার দিকেই চেয়ে রইলাম। আপনোষ করে সর্দারজী বললেন—এই পথ দিয়েছে বাবি, রাওলপিণ্ডি। সেদিন আর নেই। কি পথই ছিল। এখন হানাবারা-দের এলাকা হয়ে গিয়েছে। পথের পানে চাই আর ভাবি—মা চলেও পারতো নিশ্চিন্ত ধারা—নিশ্চিন্ত পথ। যেতে যেতে মৈত্রী হোতো, আলাপে মিলে মিশে থাকা যেতো। কে থাকতে দেয় না? পথের ধারে এই যে মরু ছেয়ে লোকরা, এই যে ডিম ছেয়ে বুড়োটা একি নিষেধ করেছে, করতে চায়...? বেইজ্জত হতে দিল না। বাঁ ধার ধরে নেমে যেতেই সারি সারি ভাঙা বাড়ী আর মরদিন আর ওরতারা দেখলাম। সমস্ত যেন মড় মড় করে ভেঙে পড়েছে কেউ।—হানাবারেরা এলো বাবু, টীরের মতো এলো, হৈ হৈ করতে করতে; মশাল নিয়ে, বন্দুক নিয়ে, হাত গোলা নিয়ে। বেইজ্জত করলো মেয়ে, ধুলমলান মেয়ে; মুসলমান প্রাণ, হিন্দুদের দোকানপাট—কেউ বাদ গেল না।

ভাল লাগছে না লোকটার কথা। কোথায় যেন একটা মারাত্মক অসত্য উপলব্ধি করি। কোথায় যেন মানুষের কাছে মানুষ বারংবার বঞ্চনা করে যাচ্ছে, আর তার জন্য শোধ করতে হচ্ছে নিরীহ প্রাণীর রক্তপাতে। দুইদের কয়েকটী লোক একটা ভগ্ন, অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাধারায় প্রবাহিত করছে বিশুষ্ক শান্তির পথ। শোকে, বঞ্চনায়, যাতনাধারীতে বিস্রাব হচ্ছে অপরে এবং হানাহানি করে মারা হচ্ছে। কেন শান্তি-পিয়াসী-সহস্র অশান্তির উৎসমুখের এই কয়েকটা মানবকে রহিত করতে পারেনা?

কিন্তু বারান্দা আমায় আনন্দ দিলো না। অত্যন্ত ব্যথা নিয়ে ফিরে এলাম চিনারবাগে। এসে ভাবতে লাগলাম—ক্ষীরভবানীর কথা। ডায়েরীতে লিখলাম—মন ফুলের মতো। বাইরের আলো বাতাস লেগে ফুটে ওঠে। তখন মন ওঠে পুঁইতে ভরে। প্রসন্ন চাহনিতে জগতকে লাগে সুন্দর। আবার ঐ বাতাস করেই ঝুলো আসে। তখন ফুল যায় ঝরোয় ভরে। কিন্তু যদি সেই ফুল ফিই বেবতার পায়ে তখন তা হয়ে ওঠে নির্মাল্য; গ্লানিহীন। ঝুলো যায় ঘুচে। মন আবার সার্থকতায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছা করে পূর্ণমিদং।

আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েই ছিলাম। হঠাৎ কান্নার শব্দে জেগে উঠি। উঠতে যেতেই বেদু টেনে শোলো। কিন্তু যখন বলান 'এখুনি ফিরবো' তখন বোধহয় সকলেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু কান্না আমি ঠিকই শুনেছি। সবদিক খুঁজলাম—কোথাও কেউ নেই। চিনারের তলায় কাশ্মে অফিসের কাছে রিমটি মেয়ে ফিলে মিবি গল্প জুড়েছে। পূর্ণিমার রাত্রি। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারধার যেমন স্পষ্ট, গাছের তলায় ছায়া তেমনি নিবিড়।

কানে সেই কান্না।

রাস্তার ধেঁয়া ভাংখাটার পিছে যেখি একপাশা কাঠের ওপর বসে কান্না আর তার পাশে কন্যাটাইটা—লম্বা চেহারার লোক এ দুয়া। কান্না তাকে ধাক্কা দিয়েছে। সে হুমড়ি খেয়ে একটা খালি টিনের ওপর পড়ে পুরুপর্ণ শব্দ তুলেছে। কাপড় নাহলে কান্না উঠতে যাবে। দ্বিতীয় কন্যাটাইর দল এসে তাকে হাত ধরে টেনে বোটের মধ্যে নিয়ে গেল।

কিন্তু দুয়া ওঠেনি। এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে আমি তাকে তুলতে গেলাম। বেখলাম মনের বেগায় তার ওঠবার ক্ষমতা নেই। টীনের শব্দে চিনার তলার ছেলেমেয়েরাও ছুটেছে। আমি তাদের মধ্যে দুটী শিক্ষক যুবককে বললাম—তাকে হাসপাতাল বোটে নিয়ে যেতে।

আমার কাজ শেষ হয়নি। কে কাঁদছে। কান্না কাঁদেনি। বেশ করুণ কান্না। চারদের আলোয় চলতে লাগলাম। সাঁকো পার হলাম। বাঁধের বেড়ালের পার ধরে ধরে পোলো-গ্রাউণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। হাঁ, দুজন পাঁচিলের নীচে বসে কথা বলছে। দুজনেই মেয়ে। কথাবার্তা কানে আসছে। চুপি চুপি কথা শুনতে চাইনি। কিন্তু প্রথম কিথাটা কানে আসতেই আর পারিনি বাজীটুকু না শুনে। একই সঙ্গে প্রায় শুনের চিনতেও পারলাম যেন।

চিনারবাগে প্রথমদিন বোট ঠিক করে দেবার সময়ে শোভা আর মীনাক্ষী বলে যে মেয়ে দুটীকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলাম তারাই।

"না শোভা আমায় ভুল বুঝিস না..." কাঁদছে মীনাক্ষী—"ভালবাসি তোকে, এতো ভালবাসি যে বাবা মার নিষেধ সত্ত্বেও আমি চলে এসেছি শুধু তোর জন্যে—"

"আর তার টাকা আমায় ফিরে দিতে হবেছে। তুই ফিস্ বি। তোকে আমি বোধ দিই না; তোরে বোধ নয়; বোধ আমার ভাগোর। বার-বার সবস্ব প্রাণ দিয়ে একের পর এক এক একজনকে বাঁধতে চেয়েছি। কেবল হেরে গেছি। ভালবাসতে পারি, খুব পারি। কিন্তু তোরা অকৃতজ্ঞ; ভালবাসার পরেও কিছু চাস্। আমি যে তা তোদের দিতে পারি না।"

মীনাক্ষী জড়িয়ে ধরেছে শোভাকে—"শোভা, আমি ক্ষমা চাইছি শোভা। আর অমৃত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবো না শোভা..."

"কেন বলবি না? আমার নাম তোবারার জন্য? অমৃত বন্ধুর সঙ্গে ভাব করিয়ে কে দিল? আমিই। তোর মন যাতে ভাল থাকে সেজন্য। কিন্তু অমৃতবন্ধু তোর আপনার না হলে আমার শাসালো কেন? আমি আমার কপালকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি আমার শরীরকে। আমার মনের মতো সবল দেহ নিয়ে কেন আমি জন্মাইনি। এই সোজা সোজা হাত পা, এই সরু বুক, শক্ত চোয়াল, তোর ভালো লাগবে কেন? আমি বিধাতার অভিশাপ রে মীনা, আমি অভিশাপ।"

মীনাক্ষী ডুকরে কেঁদে জড়িয়ে ধরে শোভাকে—সরে আসি। ধীরে ধীরে বাঁধ ধরে নেমে যাই চিনার বাগে।

বিছানায় গা বিয়েছি, বিহারীলাল আর গুপ্তা বলে উঠলো "ব্যাপার কি?"

"পূর্ণিমার রাত। চাঁদে পেয়েছে সকলকে। শিকার চলছে। কেউ বাদ কেউ হরিণ। এ চিনার বাগ। এর মাটীতে শিকারের লোভ।"

ক্রমশঃ

STUDENT'S COMMON-ROOM

কী চাই ?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কী চাই ? তাই কি ছাই স্পষ্ট জানি ? আর চাই মান, যখন দেখি মানীর মর্যাদায় স্পর্শে বাড়ে মান। আমার কখনও করি মানীর হিংসা, যখন সে অগ্রাহ্য করে আমার ব্যক্তিত্বকে তার মাঝে দেখে ক্ষুদ্রত্ব। যশ চায় জীব। তারও প্রাণ ক্ষণিক—যদি সে যশের মূলে থাকে সংসারের তুচ্ছ সাফল্যের ক্ষণিক প্রভা। নিরাময়তা, দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান, শ্রদ্ধা, স্নেহ চায় মানুষ। কিন্তু তাদের মাঝে বিরাজ করে জটিলতা। তাদের রূপও বহু। অথচ অন্তরাত্মা চায় অনেক কিছু নিজের বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে।

জগতে মানুষ থাকতে পারেনা একাকী। তার জীবনে চাই সে সহযোগ ভিন্ন জীবনের। পৃথিবী তার ধৈরী-পূরী। নীরবে চক্ষু মেলে মানুষ দেখে উদ্ভূত আর সমূল এ বিশ্ব। সে তার অভিব্যক্তির আবিষ্কৃত হতে সজ্ঞ রেখেছে, নিজের রক্ষায় তাগিদে।

আত্ম-কেন্দ্রিক যত চক্রের মাঝে তার বাসা। এ প্রয়োজন যেমন অনিবার্য্য, তেমনি স্বার্থ-বিরোধী। যে কর্ম্মে নিজের সুখ তাতে যদি বহুর বা সঙ্ঘের দুখের হয় বিঘ্ন, মানুষকে করতে হয় সঙ্কোচ, আপনার তৃপ্তির বাসনাকে। মাত্র তাই নয়। যে কার্য্য তার পক্ষে ধার্য্য হয়েছে অন্যায় অপরাধ, সে যাথার দৃষ্টিতে কাঁদতে দেখে বিচারের বাণীকে শক্তের অপরাধে। অথচ চল্ল জীবন ব্যতীত গত্যন্তর নাই বুদ্ধি-সহায় জীবের।

এই সব কথা ভেবে প্রত্যেক জনসঙ্ঘের প্রথম নেতা সংবিধান করে নীতি, জীবের স্বেচ্ছাচারকে সীমাবদ্ধ করতে জন-কল্যাণের মানদে। কখনও জন-কল্যাণের অনুহাতে। ভিন্ন সমাজের সঙ্ঘ-পতি যদি পায় কর্তৃত্ব সমাজের উপর ; অতিবড় দুষ্ট হ'লেও সে চাবে নিজের আদর্শ মতে গড়তে বিধি-বিধান। সর্ব্বকল্যাণের আদর্শ জগতের ইতিহাসে মেলেনি। তাই বিধি-বিধানের মাঝে দেখা যায় বিজেতা-দলের প্রাধান্যের প্রক্ষেপ। ভারতবাসী দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অবমানের দীনতায় হ'ত ক্ষুব্ধ।

প্রাচ্যে বিশেষ ভারতবর্ষে ধর্ম্মকে প্রধান স্থান দিয়েছিলেন সঙ্ঘ-নেতারা। তাঁদের আদর্শ ধর্ম্ম ছিল—পরকালের সুখের কামনা এ জীবনের কর্ম্মে। বহু স্তোত্র-মুখর ছিল ভারতবর্ষ। আজিকার সন্দেহের দিনেও তারাও নির্বাসিত হয় নি সমাজ থেকে। অন্ততঃ বিধি আছে, এবং তাদের বিষয় নির্ভীক গবেষণা করলে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নিষ্ঠা-কর্ম্মের মাধ্যমে মানুষ যাতে চরম জ্ঞান লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে করেছিলেন আর্য্য-ঋষিরা। ধ্যান-গম্ভীর ভূমার নিভৃত নিস্তব্ধতায় ধ্যানমগ্ন হ'য়ে ব্রহ্ম-সাধুজ্য লাভের শিক্ষার সূক্ষ্মরূপ ছিল গুরু-মুখ-নিঃসৃত। যোগের বিধান অল্পের জন্য। কিন্তু আর্য্য-ঋষিরা এ কথা মেনে নিয়েছিলেন যে জীবনের অন্তরাত্মার আদি-বাণী—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তো মোহ নয়। তাঁরা জানতেন পৃথিবীর কাজের মাঝেই মনে জাগবে বৈরাগ্যের সুর—সাধকের জানবার প্রয়োজনে।

আমি যখন আমাদের ও বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিধিকে স্তোত্রমালা অনুধাবন করি তখনই মনে হয় যে ঋষি ও ঋষিরা পূর্ব্বরূপে মেনে নিয়েছিলেন আমাদের আদিম সংস্কারগুলিকে। তাঁরা জানতেন পৃথিবীর মঙ্গলের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হবে—জ্ঞান এবং কল্যাণ-মুখ বাসনা। তারাই আনবে চরম জ্ঞান এবং বৈরাগ্য।

সংসারের প্রয়োজনকে তো দূরে ফেলিবার উপায় নাই তাকে বুঝে তার সমুত্থান না হ'লে। সে চায় সমুখ সমর। বিশ্ব-বিধাতা নিশ্চয় চান তার পরাজয়। কিন্তু মায়া-রূপে যখন সংসার হ'য়েছে খাড়া, সেখা আদর্শ জীবন যাপন করলে তবে মুক্তি। তাই আয়োজন—সুখ, স্ফূর্তি, পূজাপাঠ, কল্যাণকর বিধি নিষেধ। ধন, যশ, বিদ্যে, প্রাণান্তের তুমুলে মানুষকে সে কর্ম্ম ভূমি হতে দেখায় তার ছন্দ এবং বিচরণ।

তাই সুখের মাঝে দেখি—কোথাও স্পষ্ট মাহিমা—দেহি, দেহি। আবার কোথাও দেখি সুখের ফলশ্রুতিতে স্পষ্ট করে বিশ্রুতি পারিত্রোদিকের।

সেই ফলের কথা জানলেও মনে হয় ঋষি ও কবিরা লক্ষ্য করেছিলেন জীবের আদিম প্রয়োজন। আমি খোটাকতক মাত্র দৃষ্টান্ত দেব দেখাব।

মন্ত্রে স্তবস্তুতিতে কেন বৈদিক সাহিত্য হতে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধ-গ্রন্থে দেখি—পিতামাতা গুরুজনের সেবা ও কর্তৃত্ব স্বীকার। পিতৃদেবো ভব এ কথার প্রতিধ্বনি সর্ব্বত্র। ভরতকে সান্ত্বনা দেবার সময় শ্রীরামচন্দ্র বলেন নাই, যিনে পিতা তাঁকে বনবাসী ক'রে অন্যায় করেছেন। বলেন—

আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন মহামতে।
নিধনং তু পিতুঃ শ্রুত্বা পিতৃর্বৃত্তমনুষ্ঠ।

হে নর শ্রেষ্ঠ পুণ্যশ্লোক পিতার পুণ্যচরিত্র অনুসরণ ক'রে তুমিও নিজের স্বভাবধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

পতিব্রতা নারী কৌশিক নামক শাস্ত্রজ্ঞ মুনিকে বুঝিয়েছিলেন যে পতিশুশ্রূষা হতে মহান ধর্ম্ম নাই নারীর পক্ষে। মহাভারতের সুখে সুখে এমন কথার মাঝে সংসার ধর্ম্মের আদর্শ স্থিত। বলাবাহুল্য এমন শিক্ষার ফল বহুমুখী।

প্রত্যূষে উঠে সুর পাঠ করবে, সারাদিন সকল কর্ম্ম ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে করবে, কর্ম্মফল অর্পণ করবে শ্রীকৃষ্ণকে বা তাঁর যত দেবতার এ শিক্ষা গৃহীর। সে সব শ্লোক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে কোন জিনিষকে দূর করবার সঙ্কেত তাদের মাঝে বিদ্যমান। আমি বলছি না

লোভ—যদিও বহু স্তব বিশেষ কামনার বিধানে নানা শ্লোকের আশ্রয় নিয়ে লিপিবদ্ধ।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।

ভয় নাই যাদের তাঁরি। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞের ভাষা শব্দ মুখর। বলবান গিরি লঙ্ঘন করে। তোমার নিশ্চয় সাধ গিরি লঙ্ঘনের উপযোগী দৃঢ় সবল কমনীয় দেহের। কোনো চিন্তা নাই। এবার যাঁর কৃপায় বধনা কর সেই শক্তি ও আনন্দের আধার। তিনি পরমানন্দ মাধব। বল আসে দেহে ও মনে—তখন জানতে ইচ্ছা হয় কে সে বলের ধারা যাঁর কৃপা এত মধুর। এ চিন্তায় বাচাল মুখর বা পাহাড় চড়বার তুচ্ছ ভাবনা উবে যাবে—মানুষের জ্ঞান-প্রধান জিজ্ঞাসু মন ধীরে ধীরে লাভ করবে জ্ঞান তাঁর যিনি—পরমানন্দ মাধব।

তখন জ্ঞান ফুটবে অর্থের সেই স্তরের—যাতে সরস্বতী দেবীকে বলা হয়েছে—নিঃশেষজাড্যাপহা। তিনি মনের জড়তাকে অপহরণ ক'রে নিঃশেষ করে দেন। জ্ঞান মানুষের স্বভাব। মোহ তাকে ঢেকে রাখে। বিদ্যা মুছিয়ে নিঃশেষ করে।

এমনি প্রার্থনা আমার করি—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।

আপদ যাবে চুকে নাবে। এ আপদ যে যেমন বোঝে নিজের বুদ্ধির স্তরে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি সকল আপদই জীবের স্ফূর্তির বিরোধী। কিন্তু তমোনাশের কবিতা মাদুরার অর্থ নয় কি জ্ঞানের উন্মোচন ও উদ্বোধন?

মাত্র সাধারণ আপদ, বিপদ, ব্যাধি প্রভৃতির উল্লিখিত উপলক্ষ রূপে নির্দ্ধারিত হলো সকল শ্লোক। নিত্যকর্ম এবং স্মরণ—জীবনের উৎকৃষ্ট পথে অগ্রসর হবার দুটি বিশেষ উপায়ের সার ছত্রগুলি হল এই নিত্য প্রভাতের আবৃত্তি চ'তে—

প্রাতরুত্থায় সায়ংতং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।

হে জগতের জননি, প্রাতঃকালে উঠে শোবার সময় অবধি এবং সায়াহ্ন হ'তে আবার প্রভাতে ওঠা অবধি যা কিছু করব যা, সবই তোমার পূজা। এ হ'তে মহান প্রতিজ্ঞা কী হ'তে পারে। নিজের বা পরের অপকার করবার সময় নিশ্চয় মনে আসবে যে এতো তাঁর পূজা নয়। আমার পক্ষে মুক্তির আলম্বন। তখন তাঁর সেবা, তাঁর সখ্য, তাঁর প্রতি মৈত্রী এবং করুণা সমৃদ্ধ হবে।

আর একটি প্রভাতের শ্লোকের কথা বলি। নবগ্রহস্তোত্র। সে স্তোত্রপাঠের ফল সম্বন্ধে স্পষ্ট বলা হয়েছে—ব্যাস বলেছেন এই স্তোত্র যে প্রণত এবং শুচি হয়ে পাঠ করবে তার হবে—

ঐশ্বর্য্যমতুলম্—ঐশ্বর্য্য মানে পার্থিব ধনসৌলত তেমনি মন ও চরিত্রের উৎকর্ষতার লক্ষণ। কিন্তু পরের কথাগুলি হতে প্রথম অর্থই মনে হয়। যাহোক, তারপর হয়—

আরোগ্য—অবশ্য কাম্য। এবং একথা স্মরণ করে মানুষ বরঞ্চ হবে দেহের প্রতি। তারপর—

পুষ্টিবর্দ্ধন—কাম্য। তথা—

মরমানীপ্রিয়ত্ব। এ ইপ্সিত চরিত্রগঠনে সর্ব্বত্র। অথেচা সকল স্তুতের—ভারত-কৃষ্টির সার।

কিন্তু যখন শ্লোকের অর্থ বুঝি তখন দেখি তার মাঝে আত্মোন্নতির যথেষ্ট উপায় আছে—যদিও প্রার্থনার দেবতা ভবপ্রায়। দুর্গা সর্ব্বপাপোঘ্ন। শত্রু—শত্রোর্মুকুটকুণ্ডল। ইত্যাদি।

সকল স্তব স্তোত্রে ধীরভাবে বোঝা যায় কোন্ কর্ম্মকে শুভ বলেছেন শাস্ত্রকার এবং যত দেবতার স্তবে কোন্ উপাধি উল্লিখিত। সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোকের—কী চাই?—প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু ফলশ্রুতি অতি সাধারণ লোককে কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত করবার প্রথা। শ্লোক বিচার করলে তার অন্তর্নিহিত শব্দগুলি হৃদয়ঙ্গম হবে। প্রথমে হয়তো সাংসারিক সুবিধার জন্য প্রবৃত্ত করে মানুষকে কিন্তু ক্রমশঃ মূর্ত হয় দেব-বিভূতি স্তবের শব্দ বিচার করলে।

একটি উদাহরণ দিই। অতি উদার শ্লোক। বিপদার তত্ত্বে আপদ্ধার করে এ শ্লোক। এর প্রতিছত্রের শেষে অতি কল্যাণকর শরণের কথা—

নরত্বে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।

দুর্গার বিভূতি বলা হয়েছে—তিনি সাধুকল্পা জগন্মাপিকা বিশ্বরূপা, জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দ, জগচ্চিত্রমানন্দরূপা, মহাযোগিনী জ্ঞানরূপা ইত্যাদি ইত্যাদি। অতি গভীর তত্ত্ব-মূলক এ-সব শব্দ। শেষে বলা হয়েছে তিনি শরণ্যা এবং দেবী প্রভৃতি। ব্যাধিতঃ পীড়িতানাম্ দেবী দ্বারা রোগে পীড়িত এবং

নৃপতি-গৃহ-গতানাং মজ্জন্তিস্থানিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রপীদ।

নৃপতির অত্যাচার ছিল সেদিন যেমন ছিল বন্যার উৎপীড়ন। লোককে এই স্তব আবৃত্তি করতে বলা হ'ল, সে সব অত্যাচার স্মরণ করিয়ে দিয়ে। কিন্তু একবার বুঝলে তখন মানুষ নিশ্চয় জানতো আনন্দময় বিশ্বসম্রাটের কথা এবং ষড় ঋ-ভাব, অন্নদাত্রী, অন্নিষ্ঠা প্রভৃতি স্বরূপের দেবী—শ্রীশ্রীদুর্গামাতার কথা। তুলে আরও পরিণতি যেতে।

অথচ এইসব শ্লোক হ'তে কয়েকটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়—সংসারের মানুষ প্রয়োজন উপেক্ষা করে, তাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে, বিক্ষিপ্ত মনে ভগবান বা ভগবতীর বিভূতি ধ্যানে আত্মোন্নতি সম্ভবপর নয়। যদি চক্ষু মুদলে—রাজার পোষাণ, বা বন্যার পয়োমুখি বিস্তার করে অথবা অসুস্থতা অসহ্য হয় উৎপীড়ক মানুষ পারেনা আত্মজ্ঞান হ'তে শুভ যাত্রা পথে।

অবশ্য সংস্কৃত-সাহিত্যে স্তবস্তুতি অসংখ্য। আমি দু-একটি আরও উল্লেখ করব। মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম এক অপূর্ব্ব স্তোত্র।

একশো আট নামে সকল তথা আছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে। কিন্তু এ পাঠের ফল কি ?

অনুপত্নীবহুঃখঘ্ন, পরমাপুর্বর্দ্ধনম্। অপুত্রের পুত্র লাভ হয়। অগতির গতি হয়। দরিদ্রের প্রচুর ধন হয়। অথচ শেষে—অন্তে কৃষ্ণস্মরণং ভবতাপত্রয়াপহম্—ভবের দুঃখে সবাই দুঃখী। শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে পরমানন্দ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বালকৃত কৃষ্ণস্তোত্র শুনি—

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ
মন্ত্রিতো ন ভবেৎ তস্য তস্যঃ জল্পনি জল্পনি—

যদি তার অবশ্য বাহিরের অগ্নি এবং অনুতাপ যদি।

শত্রুগ্রস্তে চ দাবাগ্নৌ বিপত্তৌ প্রাণসংকটে
স্তোত্রমেতৎ পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ
ইহলোকে হরে ভক্তিমন্তে দাস্যং লভেদ্ ধ্রুবম্।

শত্রুর ত্রাস, দাবাগ্নি, বিপদ, প্রাণসংকট সবই লোপ পায় কৃষ্ণস্তোত্র পাঠ করলে। ইহলোকে হরিভক্তি হয়, অন্তে তাঁর দাস্য লাভ হয়। এতে বাক্যকে দেওয়া হল উচ্চস্থান।

শিব শ্মশানবাসী বৈরাগী, যোগেশ্বর। যোগের সময় দীপশিখা যেমন বায়ুহীন স্থলে স্থির হ'য়ে জ্বলে, শিবলিঙ্গ তার প্রতীক। শিবলিঙ্গ ইঙ্গিত মহাদেবের যোগাবস্থায় একাগ্রতায়। কাজেই ধারণা সাধারণ যে, শিবের পূজা সংসারীর নয়। যোগী হ'তে গেলে প্রথম আবশ্যক বৈরাগ্য। কিন্তু মহাপুরুষের লিখিত স্তবে পাই দেবাধিদেব যোগেশ্বরের পূজা গৃহীরও কর্তব্য। ফলশ্রুতি এ সত্যের প্রমাণ।

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথ নাথং সদানন্দভাজম্
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে।

এক অপূর্ব্ব মনোরম শ্লোক। আমার জননীদেবী এ শ্লোক তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করতেন এবং নিজের পুত্রবধূকে শিখিয়েছিলেন। ফল কী এ স্তোত্র পাঠে ? যে ভক্তিভাবে এ স্তোত্র প্রত্যহ পাঠ করে সুধীরা তার ভাষানুরক্ত তেমন ভক্ত—

ন পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং
জগজ্জন্ম সদ্যাশ্চ মোক্ষং প্রযাতি।

পুত্র, ধন, ধান্য, মিত্র, কলত্র সকল লাভ করে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। অথচ শিব, শঙ্কর, শম্ভু, ঈশান স্বয়ং—শ্মশানে বসন্তং মনোজং যমস্যঃ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে হিমালয়কৃত শিবস্তোত্র পাঠের ফল বিশাল।

স্তোত্রমেতন্মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যাং যঃ পঠেন্নর
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো ভয়েভ্যশ্চ ভবার্ণবে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং মাসমেকং পঠেদ যদি।

একমাস পুত্রলাভের যাদুমাত্র পাঠ করলে কিন্তু ভক্তি বাড়বে, পুত্রলাভের বাসনা হবে ম্লান। যে যা' হ'ক আরও শুনি—

ভার্য্যাহীনো লভেদ্ ভার্য্যাং সুশীলাং সুমনোহরাম্
চিরকালগতং বন্ধুং লভতে সহসা ধ্রুবম্।
রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্ রাজ্যং শঙ্করস্য প্রসাদতঃ
কারাগারে শ্মশানে চ শত্রুগ্রস্তেঽতি সঙ্কটে।
গভীরেঽতিজলাকীর্ণে ভয়পোতে বিষাদনে
রণমধ্যে মহাঘোরে হিংস্রজন্তু সমন্বিতে
সর্ব্বতো মুচ্যতে প্রাণী শঙ্করস্য প্রসাদতঃ।

নিশ্চয়ই গৃহীর শিবপূজা বাঞ্ছনীয়। গৃহী কেন নাবিক যোদ্ধা প্রভৃতির পক্ষে শঙ্কর পূজা—মাত্র বৈরাগীর তিনি দেবতা নন।

এব স্তুতি-সাহিত্য আলোচনা করলে স্পষ্ট ধারণা হয় যে পূজা-আর্চাঋষিরা মাত্র পরপার-চাওয়া লোক ছিলেন না বাস্তবকে ঘৃণা করে। সংসার ছিল একটা আশ্রম। তার মাঝে বন্যজন্তু, ব্যাধির ভয়, মানুষ এবং প্রাকৃতিক শত্রুর ভয় বিদ্যমান ছিল সদাই। রাজভয়ও সেদিন ছিল আজও যেমন সকল সমাজে বিদ্যমান—সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি সঙ্ঘে। কারণ পরের বলে পরের উপর কর্তৃত্ব করবার কু-অভিপ্রায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। সংসার করতে গেলে—সুশীলা, মনোরমা, মনোবৃত্ত্যানুসারিণী ভার্য্যা চাই। সুযোগ্য পুত্র আবশ্যক, মিত্র চাই অভীষ্ট। কিন্তু এসব চাই কেন ?

এই চাওয়া স্তুতি নির্দেশ করেছে। চাই মোক্ষ, চাই পরপারে সুখ। কি বিভূতিকে সদা মনে রাখলে তবে স্পষ্ট দৃষ্টি হবে জীবের, সেজন্য প্যাওয়া যায় স্তবে। তাই বুঝতে হবে যে সাংসারিক যে সুবিধা, যে চাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় স্তোত্রে, মাত্র তার প্রতি চিত্ত সমাবেশ করলে হবে না। সমষ্টি বুঝলে প্রতি স্তোত্র হ'তে উপদেশ পাওয়া যাবে যে নিরাময়, নির্ভয়ের পুণ্যধাম হয়ে পবিত্র সংসারে ভক্তির সাথে বাস করলে প্রতি প্রভাতে প্রত্যহ সায়াহ্নে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে বিভূতি। তখন মানুষ আপনাকে পুণ্যপথে পরিচালিত করবে। তারই স্থলে বুঝবে—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী না ভৃত্যো ন ভর্তা
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

কিন্তু যোগী-শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্যকে বাস্তবকে মেনে বলতে হয়েছে—

কৃপাকী কুনঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

যে ঘোর এড়াবার জন্য শরণ আবশ্যক তিনি সেগুলির বর্ণনা দিয়েছেন।

বিষাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি

গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি।
অপারে মহিতো মহাতোষপুতো
মহাকীল কীনাশ লগ্না ভাতাবক্তৃ:।
বিপত্তৌ প্রবিষ্ট: প্রনষ্ট: সদাহং
গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি।

এ শ্লোক শঙ্করাচার্য বিরচিত। আমার মনে হয়—যোগী যিনি খুঁজিতেছিলেন—মায়ামরমিথমলিন: ছিন্ন। কিন্তু সে চরম অবস্থা ধ্যানযোগের দ্বারা পাবার পূর্বে—হতে হবে মুক্তিমান-পরশপাত।

পরমহংসদেবের জীবনেও তাই দেখি। তিনি মহাযোগী—কিন্তু সংসারী কী চায়, তা বুঝে বলেছিলেন—শরণ লও, ব্যাকুল হও।

অলমতি, পুরা পাঠ, ভোক্তা, স্তব সমস্ত পর্যালোচনা করলে রূপ পাওয়া যাবে—কী চাই—এ স্পষ্ট প্রশ্নের। শেষ কথা—শরণ।

সর্বোদয় ছাত্র অধ্যাপক শিবির

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

"আমি চিত্ত বিপ্লব ঘটাতে চাই, পশু-বিপ্লব ঘটাতে চাই। কবিরা বলেছেন, যুবকদের হৃদি নব ছন্দের সৃষ্টিতে। তাইতো আমি আপনাদের জন্য এই নবছন্দ রচনার সৃষ্টি করিতেছি।"—কথাগুলি বলেছেন বিনোবাজী। কিন্তু এই যুবকদের কোন বয়সীমা নেই। মনের সজীবতায় যারা তরুণ, নৈরাশ্যের অন্ধকারে যারা ভেঙ্গে পড়ে না, তারাই যুগে যুগে নতুন সমাজ গড়বার অগ্রণী হয়। প্রচলিত ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যারা অজানাকে জানতে চায় তারা বয়সে যুবক হলেও তরুণ নয়। তরুণ তারাই যারা স্বপ্ন দেখে। নিজেদের জীবনকে ভবিষ্যতের স্বপ্নের রঙে যারা রঙীন করে তোলে তারাই তরুণ।

"স্বপ্ন আমার জোনাকি-
দীপ্ত প্রাণের কণিকা
শুধু আঁধার নিশীথে
ছড়িয়ে আলোর কণিকা।"

স্বাধীনোত্তর ভারতে নতুন জীবনে গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু তাকে রূপ দেবার সময় তিনি পাননি। এগিয়ে এলেন তাঁরই পথ ধরে তাঁর উত্তর সাধক বিনোবা ভাবে। শুধু আঁধার নিশীথে স্বপ্নের উদ্ভাসে ঢেকে দিলেন সমস্ত দেশকে। সে স্বপ্ন হল সর্বোদয়।

কিন্তু কী এই সর্বোদয়? বাংলাদেশের শিক্ষিত জনকে তার সঙ্গে পরিচয় করাবার উদ্দেশ্যে গত পাঁচ বছর ধরে ছাত্র অধ্যাপক শিবিরের আয়োজন হয়ে আসছে। সর্বোদয় প্রকাশন সমিতির উদ্যোগে গত শিবির অনুষ্ঠিত হল গত ৩রা থেকে ১লা নভেম্বর বলরামপুরের অতুল আশ্রম ক্ষেত্রে।

বলরামপুর বজবজ ষ্টেশন থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার বিদ্যালয় তো আছেই, তা ছাড়াও আশ্রমের উদ্যোগে অন্ধ সেবাশ্রম, গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার প্রভৃতি পল্লীশিল্পের অনুষ্ঠানও আছে। এখানে কস্তুরবা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রেও স্থান মহিলা গ্রাম সেবার দীক্ষা নিচ্ছেন।

৭ই নভেম্বর হাওড়া ষ্টেশন থেকে সকালের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র সাহা, অধ্যাপক সুদিনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীমনকুমার সেন, সার্ভিস সিভিল ইণ্টার আপনাদের দু জন জাপানী মহিলাকর্মী এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যুবকরা। হাওড়া ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। যৌবনের উচ্ছ্বাস, অবিশ্রান্ত সংগীত-লহরীর উপর তরঙ্গিত হতে হতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম বেলা বারটা নাগাদ। ষ্টেশনে সর্বসেবাসংঘের যুব নেতা, সুলেখক শ্রীশৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বলরামপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যুবকদের এবং ছাত্রীদের জীপে উঠিয়ে দিয়ে আর সংঘের জিনিসপত্র-গুলিকে গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে আমরা পদব্রজেই যাত্রা করলাম। ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রাঙ্গামাটির পথ—তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলল প্রায় একশত জনের এক বিরাট দল। উপরে স্বচ্ছ আকাশ, আর পাশে হিল্লোলিত শ্যামলিমা—দলের মধ্য থেকে কে যেন গেয়ে উঠল, 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।' সত্যই তো, চকিত হয়ে উঠল সকলে—আর সেই সুরের রেশ ধরেই পৌঁছে গেলাম আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে। পথে পড়ল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কেন্দ্রটি। ১৯৫১ সালে বাংলা দেশ পরিক্রমার সময় বিনোবাজী এখানে দুদিন অবস্থান করেছিলেন।

এই নবীন তালিম কেন্দ্র থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অতুল আশ্রমের দ্বিতীয় কেন্দ্রটি অবস্থিত। সেখানেই শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছে। চার দিকে ওল খেঁটুনীর মধ্যে ছোট একটি খাপ যেমন বলা কওয়া নেই হঠাৎ মাথা উঁচিয়ে দেখে থাকে, তেমনি বিস্তৃত ধানক্ষেতের মধ্যখানে এই আশ্রমটি দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির হৃদকে একটুও ক্ষুণ্ণ না করেই। সেখানে পৌঁছতেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির মহাধ্যক্ষ শ্রীহিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং অন্যান্য আশ্রমিক বন্ধুরা এগিয়ে এলেন সকলকে অভ্যর্থনা করতে।

আহার ও বিশ্রাম শেষে সেইদিন বেলা সাড়ে তিনটের সময়

আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের উদ্বোধন হল। তুলার বেতা এবং উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী শিবিরের উদ্বোধন করলেন। প্রারম্ভে শিবির আহ্বানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বললাম। তারপর অতন্ত্র আশ্রমের নায়ক ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু অতন্ত্র আশ্রমের পরিচয় দিলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে অতন্ত্র আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র ছিল কুমিল্লাতে। খাদি উৎপাদন তখনকার দিনে প্রধান কর্ম থাকলেও এই আশ্রমকেই কেন্দ্র করে একদল ত্যাগী কর্মীর সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা আজ সকলেই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। নতুন ভারত গঠনের দায়িত্ব এসেছে সমগ্র দেশবাসীর উপর। দেশ কল্যাণের দায়িত্ব তো কেবল সরকার বা কয়েকটি দলের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সেকাজ সকলেরই। খাদির কাজকে কেন্দ্র করে অতন্ত্র আশ্রমও আজ নতুন দেশ গঠনের কাজে ব্রতী হয়েছে।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সর্বোদয়ের কর্মধারা সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করলেন। তাঁর প্রত্যেকটি কথায় বুদ্ধিদীপ্ত মুক্তমনের পরিচয় পেয়ে সকলের মন আশায়-আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠল। তিনি বললেন, আজকের যুগ অণুবোমার যুগ। কিন্তু এতো ভয়ের নয়, এ-যে ভয় ভাঙারই যুগ। যদি কেবল একটি রাষ্ট্রের হাতে অণুবোমার মত মারণাস্ত্র থাকত তবে তা মানুষের ভয়ের কারণ হত—কিন্তু এই অস্ত্র তো আজ কয়েকটি রাষ্ট্রের অধিগত হয়েছে। ফলে কেউ আর যুদ্ধ করতে ভরসা পায় না। এ তো আমার কথা। মানুষ যতই বুঝতে যে, যুদ্ধের উপর তার ভরসা নেই—ততই তার মন যুদ্ধ থেকে সরে যাবে। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাহিত্যের অনুশীলন প্রভৃতি সব কিছুই আজ সর্বমানব কল্যাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বোদয়ের লক্ষ্যও তাই। ভারতবর্ষে সর্বোদয়ের নাম নিয়েই একাজ হচ্ছে—কিন্তু সর্বোদয়ের নাম না নিয়েও এবং ভিন্ন ভাবে হলেও একই লক্ষ্যের অভিমুখে পৃথিবীর সমস্ত দেশের চিন্তাশীল মানুষ এগিয়ে চলেছেন।

প্রথম বৈঠক শেষ হবার কিছু পরেই আশ্রমবাসীদের সঙ্গে শিবিরার্থীরা একত্র হলেন মুক্ত প্রাঙ্গণে। পশ্চিম আকাশকে লাল করে দিয়ে সূর্য ঠাকুর তখন কোথায় সুখ-ভাগ্যের গান শোনাতে চলে গিয়েছেন। আশ্রমের সন্ধ্যা। প্রার্থনার সময় এটা। উপনিষদ ও গীতার অংশ বিশেষের বাংলার পদ্যানুবাদ আবৃত্তি হল। তারপর রবীন্দ্র সংগীত। সমাপ্ত হল প্রার্থনা। শিবিরার্থীরা ছড়িয়ে পড়লেন নানান দিকে ছোট ছোট দলে। এখন কোন কাজ নেই। আপন আপন খুশীর রঙে ছোট ছোট দল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে একেবারেই ভিন্ন শিবিরের এই বৈচিত্র্য জীবন। কিন্তু তা স্বতন্ত্রাড়া নয়। যেন ছন্দে গাঁথা কবিতা। ভোর সাড়ে চারটায় শয্যা ত্যাগ আর সাড়ে নয়টায় শয্যাগ্রহণ—এরই মধ্যে নানান কাজের তড়াকড়ি। প্রার্থনা দিয়ে শুরু আর নিবেদন অর্থাৎ মৃত্যু, গীতাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা বিরতি।

পরদিন। প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পর মেঠো পথটা পায়ের নিচেই। মাটির ঢিপি কেটে সমান করতে হবে, আর সেই মাটি সরিয়ে ফেলে আসতে হবে কিছু দূরের একটি নির্জন ক্ষেতে। কোদাল কোদাল হাতে সকলে গিয়ে জমা হলেন ঢিপির কাছে। কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে একটু দেরী হয়ে গেল। কোদাল হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন—সকলেরই দৃষ্টি একদিকে একজনের উপর নিবদ্ধ। তিনি শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী। খালি পা, ধোতি কাপড়কে আরও ছোট করে আঁট করে পরা। মাথায় এক ঝুড়ি ভর্তি মাটি—সকলের আগে এসেছেন, সকলের আগে কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। এক এক করে ভারতবর্ষের তেরটি রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীদের ছবি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নত হল তাঁর পায়ের কাছে।

শপথগ্রহণ প্রাতরাশ ও প্রার্থনার পর আলোচনা বৈঠক শুরু হল। আলোচনার সূত্রপাত করলেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। সংস্কৃতির সজ্ঞিপ্তের উপর একটি মনোজ্ঞ ভাষণে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার উপর নতুন আলোকপাত করলেন তিনি। সাহিত্যিকের সামনে যদি কোন আদর্শ না থাকে, কোন আশা-বাণীর আলোকবর্তিকা না থাকে—শুধু শিল্পের জন্য শিল্পসৃষ্টি বা শিল্পীর নিছক আত্মতৃপ্তিই যদি সাহিত্য রচনার একমাত্র প্রেরণা হয় তবে সাহিত্য সাধনা কেমন করে একাকী হয়ে যায়—তার কথাই সুন্দর করে বললেন তিনি। একটি একটি করে তিনি বাংলা সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন—আর তারই সঙ্গে বেপরোয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের সাহিত্য সৃষ্টি। উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিলেন। তার পরে গ্রামস্বাবলম্বন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করলেন অধ্যাপক সুধির কুমার ভট্টাচার্য। বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে গ্রামস্বাবলম্বনের অনিবার্যতা স্বীকার করেও তিনি কুটির-শিল্প ও যন্ত্রশিল্পের ব্যবধান এবং স্বাবলম্বনের ইউনিট সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এই আলোচনার ক্রম অনুসরণ করে শ্রীসুধীরচন্দ্র সাহা এবং শ্রীশৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম-স্বাবলম্বনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

বেলা সাড়ে এগারটায় ভোজন, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম, আবার আড়াইটেয় বৈঠক। কিন্তু বিশ্রামের জন্য অবসর থাকলেও অবকাশ কোথায়! সর্বসেবা সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার ইতোমধ্যে এসে গিয়েছেন। শিবিরের মূল আকর্ষণ এবং হোতা তিনি। শিবিরে সমাগত সকলেই তাঁর কথা শুনবেন বলে আগ্রহান্বিত। আড়াইটের অনেক আগেই এক একজন আলোচককে কেন্দ্র করে ছোট ছোট দলে বৈঠক শুরু হয়ে গেল।

শিবির উপলক্ষে আশ্রমিকরা একটি ছোট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক, গ্রামীণ পরিবেশে শিক্ষার স্থান—প্রদর্শনীটি মূলত এইসব বিষয়েরই তথ্যমূলক আলোকচিত্রে ভরা ছিল। শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার এটির উদ্বোধন করার পর শিবিরের বৈজ্ঞানিক বৈঠক শুরু হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক ভাবে ধীরেনবাবু কোন ভাষণ

দিলেন না। সর্বোদয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন আহ্বান করলেন, আর একটি একটি করে সেগুলির উত্তর দিলেন। সর্বোদয় কি বিজ্ঞান-বিরোধী, ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সর্বোদয়ের প্রভেদ কোথায়, হিংসা মুক্তির পথ কী, পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ কোন্ পথে হতে পারে, প্রতিভার স্ফুরণ কিসে হতে পারে—এই রকম নানান বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হল—আর তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাঁর কথার মধ্যে বিজ্ঞানের দৃঢ়তা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং কর্মযজ্ঞের আন্তরিকতা সকলের মনকেই স্পর্শ করল—সকলের হৃদয়কেই আলোড়িত করল। তার পরে গান্ধী শান্তক নিধির প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ ধোণ্ডে লিখিত সমাজের কাছে সর্বোদয়ের কী আশা রয়েছে তার কথা বললেন।

শিবিরার্থীরা নিজেরাও যাতে আলোচনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরদিন সকালের বৈঠকে। 'শিক্ষা ও সমাজ' এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাগত অধ্যাপক ও ছাত্ররা শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। পরিশেষে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়-চৌধুরী সর্বোদয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে একটি বক্তৃতাপূর্ণ ভাষণ দিলেন। আজকের দিনে শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা, কাজ—আর তা সমাজের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবেই যুক্ত—গ্রামবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে এই সমাজ-মূলক শিক্ষার যে সম্ভাবনা রয়েছে সেই কথাই তিনি বললেন। আলোচনা চক্রের পরে ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু কুটীর শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কুটীর শিল্পের প্রয়োজন কেন, সেকথা তো বললেনই—উপরন্তু ছাত্রদের মধ্যে আজ যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন যে, এর জন্য আমাদের মত কুক্ষেত্র বলই দায়ী। স্বাধীনতা লাভের পর তাগে আর সংগ্রামের পাসপোর্ট নিয়ে কুক্ষেত্র যদি সকলেই ক্ষমতা লাভের দিকে না যেতেন—ক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে তাঁরা যদি দেশগঠনের কাজে অগ্রসর হতেন, তবে ছাত্র-যুবকদের সামনে একটি আদর্শ তুলে ধরতে পারতেন। যৌবনকাল স্বভাবতই প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা। তাকে গঠনমূলক কাজে—যে কাজে এতটুকার আছে—তাতে নিয়ে যেতে না পারলে—হয়-তো ধ্বংসাত্মক কাজে নিযুক্ত হবে নয়ত অনিয়ন্ত্রিত যৌবনের উচ্ছ্বাসে নিজেদের জীবনকেই বিশৃঙ্খল করে দেবে।

বিকালে আলোচনার কোন কর্মসূচী ছিল না। অতএব আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি আমরা ঘুরে দেখলাম। নই তারিখ আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটি জনসভার আয়োজন হয়েছিল। তাতে ধীরেনবাবু ডাঃ কালিদাস নাগ বক্তৃতা করলেন। সান্ধ্য প্রার্থনার পর শিবির বেতায়া ডাঃ মাথের সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এনেছেন তার কথা বললেন। তিনি বললেন, ভৌতিক বিষয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলি যতই বড় হোক না কেন—সেখানেও আজ আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দেখা দিয়েছে। তাই অন্যান্য দেশের চিন্তাশীল লোকেরা আজ বিশ্বধ্বংসের কথা চিন্তা করছেন।

অতি উৎসাহী কেউ যোষণা ঘড়ি ভুল দেখেছে। অন্ধকার তখন একটুও চিহ্নিত হয়নি। ঘুম ভাঙানী গান নয়—নির্মমভাবে বেজে উঠল অন্যান্য দিনের ঘণ্টা। উঠে পড়লাম আমরা। না ভুলই হয়েছে—সাড়ে চারটের এখনও একঘণ্টা বাকি। শুয়ে পড়লাম আবার—ঘুম আসবে কি! আনন্দ কোলাহল শুরু হয়ে গিয়েছে—কোথাও গানের ছলা—আর পাশেই কর্মযজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আজ শিবিরের শেষ দিন। কী পেলাম, কী নিয়ে যাচ্ছি তার পরিমান করার সময় এখন নয়। মধুর পরিবেশই এখন সমস্ত মনকে ঘেরে আছে। প্রাতঃ-কালীনঅধিবেশন বসল। উড়িষ্যার শ্রীমনোমোহন চৌধুরী এসে গিয়েছেন। বয়সে তিনি তরুণ কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রবীন। ওঁকেই আহ্বান করলাম। তত্ত্বের কথা নয়, প্রাণের কথাই বললেন তিনি। সর্বোদয় কেবল ত্যাগ করার মন্ত্র নেয়? সংসারের দিকে চেয়ে দেখুন তো একবার। ছেলের পরীক্ষা শুরু হতে হবে, কিন্তু মায়ের কাপড়টাও ছিঁড়ে গিয়েছে, নতুন একটার যে বিশেষ প্রয়োজন। একই সঙ্গে ছুটো হবে তার সংস্থান নেই। থাক কাপড় এখন, ছেলের পরীক্ষার শুল্কই দিয়ে দিলেন মা আগে। এতি ত্যাগ, না এ প্রাণের পরিচয়। সর্বোদয় যারা প্রাণে জীবনের সোনার কাঠি ছোঁয়াতে চায়।

এই সর্বোদয়ের, এই প্রাণের, এই স্বপ্নের কথাই শোনাতে হবে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে—যাঁরা মনে মনে তরুণ, যাঁরা জড় নন। তাই শিবিরের শেষ অধিবেশনে ঘোষণা করা হল পশ্চিমবঙ্গে সর্বোদয় যুব সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার কথা। অধ্যাপক সুবিনকুমার ভট্টাচার্য এবং শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়ক হলেন: শিবিরের সমাপ্তি ভাষণে শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান করে বললেন যে, তাঁরা যেন সর্বোদয় ভাবধারা বুঝতে চেষ্টা করেন। নিজেদের যৌশক্তিকে নতুন নতুন বিচারধারায় ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট করুন, আর সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন ক্ষেত্রেও শান্তিপথের অনুসরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন।

এবার বিদায় নেবার পালা। কিন্তু এ যে কঠিন কাজ। চারদিনের নিবিড় পরিচয়ে 'যাই' বলা যায় না। তাই আশ্রমিক আর শিবিরাগত সকলের মন এস-এস-এসর সুরে ভরে গেল। বেরিয়ে পড়লাম আমরা সেই রাঙাপাটির পথে। ছিপলী কলীপালার উঁচু রঙটা তখন সূর্য্যালোকে ঝলমল করছে।

ক্লান্ত সুর

অমলেন্দু মিত্র

ছেলেদের নিয়ে একটা ড্রামা হবার কথা! আমি আর বিজনবাবু ডিরেক্শান্ দিচ্ছি। সেদিন রিহার্সেল দিতে দিতে হঠাৎ একটা জায়গায় খট্‌কা বেধে গেল। আমি একরকম দিলাম—বিজনবাবুর পছন্দ হোল না। বিজনবাবু এক রকম 'এক্সপ্রেশান' দিলেন, আমার পছন্দ হোল না। অথচ, দু'জনেই বুঝছি, মনের মত 'এক্সপ্রেশান' আসছে না কিছুতেই। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ছেলেদের বিদায় করে দিলাম বিরক্ত হয়ে। বিজনবাবু বললেন, "এ জায়গাটা ঠিকমত 'এক্সপ্রেশান' দিতে পারেন, একমাত্র যতীনদা!"

"যতীনদা!" বিস্মিত হয়ে বললাম; অমন হাবাগোবা নিরীহ চেহারা—উনি 'এক্সপ্রেশান' দেবেন?"

বিজনবাবু হাসলেন; "তুমি নতুন এসেছো তাই জানো না, যতীনদার কী পার্টসই ছিল। ছিল কেন আছে! অথচ উনি সব ছেড়ে দিয়েছেন! প্রতিজ্ঞা করেছেন, জীবনে আর রিসাইটেশান্ বা ড্রামার ডিরেক্শানে থাকবেন না!"

"কেন বলুন তো?"

"সে এক কাহিনী—উপন্যাসই বলতে পারো! তবে সে কথা তোমার শোনবার ধৈর্য এখন হয়ত থাকবে না। বেলা তো শেষ হ'ল, ছেলেদের পিছনে খাটতে খাটতে!"

"থাক্ আপনার বেলা, দুর্যোগের ঘন রাত্রি নেমে আসুক, তবু শুনব যতীনদার কাহিনী। চলুন রেষ্টুরেণ্টে। যত কাপ চা খেতে পারবেন, খাওয়াবো। গল্প আমার শোনা চাই-ই।"

বিজনদা সম্মত হলেন। দু'জনে এসে ঢুকলাম রেষ্টুরেণ্টে। তারপর একটা কর্ণার বেছে নিয়ে বসা গেল আরামে। বললাম, "বৌদিকে তো বাপের বাড়ী ঠেলেছেন—বাড়ী ফিরবার তাড়া নেই, সুতরাং ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে গল্প বলবেন কিন্তু!"

বিজনদা হাসলেন, "তুমি তো বেশ হে ছোকরা! গল্পে যদি রোমান্স না থাকে।"

টেবিল চাপড়ে বললাম; "রোমান্স থাকতে বাধ্য। জীবনকে অস্বীকার করে মানুষে, রোমান্সের ছোঁয়া ঝড় হাতে ভেঙে গেলে—নৈলে এমন কোন ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়, যার দ্বারা মানুষে অমন প্রতিজ্ঞা করে বসতে পারে।"

"বটে! তুমি ভুলে যাচ্ছ নন্দ, যতীনদা একজন মাষ্টার এবং ছেলেদের স্কুলের ভিতর কোন রোমান্সই ঘটতে পারে না। এ একেবারে ড্রাই ঘটনা।"

জবাব দিলাম; "বিজনদা! আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে না আশা করি। রোগের সংক্রমণ বলে বস্তুটা জানেন? "ক্যারিয়ার" সংক্রমণ নিয়ে আসে, নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের পাতায় দেখেছেন। তেমনি ছেলেদের মধ্যে কতজন যে রোমান্সের ক্যারিয়ার হয়ে আছে, তা একদিন আপনাকে শোনাবো। তুচ্ছ একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছি কথাটি। কলেজে পড়ার সময় একদিন এক উৎসব মেলায় হাজির ছিলাম বন্ধুর সঙ্গে। সে রকম অমানুষিক ভীড় সচরাচর দেখা যায় না। গরমে পচে মরে যাচ্ছি—হাঁক ধরে গেছে। অথচ রসিক বন্ধু অবলীলায় রোমান্স খুঁজে বের করে পুলকিত হল। বললে, "দেখ ভাই নন্দ, দেখ কত লোক! বল দেখি, কত যুগলের মধুস্মৃতি বহন করছে এরা?" বন্ধুর রসজ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আশা করি বিজনদা আপনি বুদ্ধিমান লোক, আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন।"

সামনের ডিসের খাবার এক হাতে তুলে নিয়ে অন্য হাতে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন বিজনদা; "সাবাস ছোকরা, অনেক জ্ঞান অর্জন করেছো। তাহলে তোমাকে গল্প বলা যেতে পারে। হ্যাঁ যতীনবাবুর রোমান্স ভরের কাহিনীই তোমাকে শোনাবো—"

…"যতীনদার আজকের চেহারা দেখে ওঁর সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু সত্যিই উনি একজন বড় এক্টর ছিলেন। স্কুল কলেজ জীবনে ড্রামা বা সোসিয়েলে নাম কিনেছিলেন খুবই। ইচ্ছাও ছিল অভিনয় লাইনে চলে যাবেন। অথচ প্রাণবন্ত অভিনয় বড় বড় অভিনেতা ছাড়া এ্যাবেচারদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। সিরিয়স চরিত্রে বা ভিলেনের চরিত্রে, ওঁর অভিনয় মনে দাগ রাখার মত। একবার দেখলে জীবনে ভোলা যেত না। অজস্র লোকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন, পেয়েছেন কত মানপত্র, মেডেল। তুমি জানো নয়, যারা এ সমস্ত সোসিয়েলের ব্যাপারে থাকে, তারা ক্রমেই পপুলার হয়ে ওঠে। যতীনদাও তাই হয়েছিলেন। কলেজ-বন্ধুরা 'যতীন' বলতে পাগল। মেয়েরা যতীনদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা বলবার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য মনে করত। যতীনদা আবার ছিলেন ওদিকে বড় দুর্বল! কেন জানিনে, আজও এ বয়সে কোন মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে যতীনবাবু কথা বলতে পারেন না। অথচ মেয়েদের প্রসঙ্গে তাঁর যেমন রুচি, তা বোধ হয় ষ্টাফের মধ্যে কারও নেই…।"

মনে পড়ল, যতীনবাবু স্ত্রী প্রসঙ্গে নানা রকম কুৎসিত আলোচনা স্বচ্ছন্দে করে থাকেন। মেয়েদের ছবি, পত্র-পত্রিকায় দেখলে অনিমিষে চেয়ে চেয়ে দেখেন, তারপর অশ্রাব্য মন্তব্য প্রকাশ করে হাসির তুফান ছুটিয়ে দেন।

বিজনবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন; "এইটিই কাল হ'ল যতীনদার! অবশ্য কলেজ ইউনিভারসিটির লাইফে মেয়েদের সাহচর্যে এসে স্বাভাবিক মেজে বসে কেউই থাকে না। অল্প-বিস্তর প্রেমে পড়ার চেষ্টা সবাই করে। খোসা-মুদি করে, চা খাওয়ায়, সুযোগমত রেষ্টুরেণ্টে টেনে নিয়ে গিয়ে: সিনেমা থিয়েটারে সঙ্গিনী করতে পারলে তো কথাই নেই। যতীনদার মত উঁচু ধরের অভিনেতা সে কারও আত্মদানকে বরণ করে নেবেন, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।"

"দেখুন"…মিনমিনে গলা শুনে যতীনদা সেদিন ফিরে দাঁড়ালেন একটা মিটিং-এর পর। একটি মেয়ে, তাঁরই ক্লাসের, ভারী শান্ত, মিষ্টি স্বভাবের। সুমিতা, নিতান্ত অসহায়ভাবে হাত কচলাচ্ছে। অথচ কিছু বলতে পারছে না। যতীনদা, সুমিতাকে দেখেছেন অনেকদিন ধরে। আলাপ করবার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। অথচও এমন একটি অপরিচয়ের ব্যূহ দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রেখেছে যে কাছে ভিড়বার উপায় ছিল না। কোন-দিন ভুল করেও যতীনদাকে অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে আসেনি। একেবারে মা-টাইপের মেয়ে। বিবাহপূর্ব-প্রেমে হাবুডুবু খাবার জাত ও নয়। তাই যতীনদা, নিজের নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস নিয়ে নিজেই ঘেমে মরেছেন। অথচ এই মেয়েটিই তাঁকে আজ কি বলতে চায়? আশ্চর্য নয় কি? যতীনদা একটু থতমত খেয়ে-ছিলেন প্রথমটায়, তারপর তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন: "কিছু বলছিলেন?"

সুমিতা বলল, "একটু পৌঁছে দিন না বাড়ীতে। একলা যেতে পারব না গলিপথে।"

এত ছেলে থাকতে তাঁকে কেন বেছে নিল সুমিতা, তা বুঝতে না পারলেও যতীনদা আর দেরী করলেন না। সুমিতার সঙ্গে হাঁটতে সুরু করলেন। তখন স্ত্রীলোকের উপর অস্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল না যতীনদার। তরুণ বয়স তো! দুর্বার মন। তাই চট করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আচ্ছা এত ছেলে থাকতে হঠাৎ আমার উপর এত আস্থা হ'ল কি করে আপনার?"

সুমিতা পিছন ফিরে দেখে নিলে একবার। পথটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। বিশেষ কেউ নেই। সে হেসে উঠল মধুরভাবে খিল খিল করে; "কেন জানেন? ক্লাসের সবাই আপনার সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু আমার কেমন যেন লজ্জা লাগে। অথচ আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহ কি আমার কম!"

যতীনদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বলে কি মেয়েটা। নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ আচার আচরণ দেখে ঘুণাক্ষরেও কোনদিন টের পায়নি সে ওর অন্তরের নিভৃতে যতীনদার সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। কিছু একটা জবাব দেবার আগে সুমিতা আবার হেসে উঠল; "অথচ দেখুন, ভীড়ের মধ্যে আপনার মত প্রতিভার সঙ্গে আলাপ করব ভাবতে পর্যন্ত পারিনে!"

যতীনদা এতক্ষণে লাগসই কথা একটা খুঁজে পেয়েছেন। বলে উঠলেন; "অনেক মেয়েই আলাপ করেছে গায়ে পড়ে, তাদের কারও প্রতি আগ্রহ নেই আমার। আপনি

আলাপ করেন না, আগ্রহের ভাব দেখিয়ে যান নির্বিকারে আর ততই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে—যেভাবে হোক আলাপ করতেই হবে। প্রাণ যার সে-ও স্বীকার। আজ সে দুর্ভাবনার অবসান হোল—আপনার দয়া আছে।"

সুমিতা লজ্জিত হল না এতটুকুও। বললে, "এ আপনার মুখেই মানায়;.. ষ্টেজের লোক তো!"

যতীনদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন; "বিশ্বাস করুন সুমিতা দেবী, আমি অভিনয় করছিনা—আপনার বন্ধুত্ব আমার একান্ত কাম্য!"

"তবে 'আপনি-আজ্ঞে' ত্যাগ করুন!"

"আপনাকেও ত্যাগ করতে হবে।"

"আপত্তি নেই" সুমিতা আর একবার হাসি ছিটিয়ে বললে; "এত মেয়ের সঙ্গে মিশেছো, কারও সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারো নি বুঝি?"

মিতভাষী ধীর, শান্ত মেয়ে সুমিতার প্রগল্‌ভতা দেখে যতীনদা বিস্মিত হলেন খুবই, তবু উত্তর বেরুলো ঠিক ঠিক। বললেন, "যদি পড়ি তাহলে তুমিই হবে আমার প্রথমা।"

সুমিতা এতটুকু বিচলিত হল না। যেন জানতই এ-কথা যতীনদা বলবেন। সহজ কণ্ঠে জবাব দিলে, "জানো তো আমরা ব্রাহ্মণ। খুব কি সুবিধা হবে?"

ষ্টেজ-স্ত্রী যতীনদার জবাব দিতে বেগ পেতে হল না। বললেন, "ভালবাসা জাতি মেনে চলে না। তোমার জন্য প্রয়োজন হলে আজীবন তপস্যা করব।"

"ও!"...অপাঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ভঙ্গিমা করল সুমিতা, "আচ্ছা এইবার এখান থেকে তোমাকে অভদ্রের মত বিদায় দিচ্ছি—আমার বাড়ীতে বাবা-মা সবাই ভীষণ গোঁড়া—কি ভেবে বসবেন বলা যায় না। কিছু মনে কোর না যেন, তাহলে ভারী দুঃখ পাবো!"

গ্যাসের আলোয় নজরে পড়ল যতীনদার, সুমিতা ওর রুমালখানা মুখের উপর বুলিয়ে নিচ্ছে। নিমেষে দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যায় যতীনদার মাথায়! সুমিতা রুমালখানা নামিয়ে নিতেই যতীনদা, আচমকা সেটা ছিনিয়ে নিলেন; "বেশ, প্রথম আলাপের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ,এটা জোর করেই নিচ্ছি."

সুমিতা ব্যাকুল হয়ে উঠল, "ছিঃ...ছিঃ...ছিঃ, কি করো! ওটা ভারী নোংরা হয়ে আছে! দাও, তোমাকে কাল ভাল রুমাল দেবো।"

যতীনদা তখন সেটা পকেটস্থ করে ফেলেছেন, "দিতে চাও দিও, আপত্তি করব না; কিন্তু এটা কিছুতেই ফেরত পাবে না, বুঝলে?"

হাসতে হাসতে যতীনদা ভারী উল্লসিত হয়ে হোষ্টেলে ফিরে এলেন। সুমিতাও তার মনের গভীরে সুতীব্র আনন্দের ঢেউ নিয়ে বাড়ী ফিরল সেদিন।

সামান্য অপরিচয়ের বাধাটুকু ছিল মাত্র। তারপর বুঝতেই পারছ নন্তু,ওরা দুজন ভেসে গেল মনের আবেগে। জানাজানি হতে বাকী রইল না। সবাই টের পেল। সুমিতার বাপ-মা কড়া হাতে রাশ টানলেন। কিন্তু যখন রাশ টানা হয়েছে তার অনেক আগেই যতীনদা কড়া হাতে চাবুক কষিয়েছেন। সুমিতার গর্ভে তাঁর সন্তান তিলে তিলে বিকশিত হয়ে উঠছে। তবু কোন ফল হ'ল না। অসামাজিক বিয়ের চেয়ে বোধ হয় মেয়ের এই দশাই, বেশী কাম্য বলে মনে করেছিলেন ওর অভিভাবকেরা! তাঁরা খুঁজে পেতে যে ভাবে হোক, একজন উদার সমাজ-হিতৈষীকে ধরে এনে সুমিতার সঙ্গে মহাসমারোহে বিয়ে দিয়ে দিলেন। উদার যুবক সমস্ত জেনে শুনেই সুমিতাকে বিয়ে করে নিয়ে গেল। যতীনদা বহু মেলোড্রামা ঘটিয়েছেন, কিন্তু জীবনের প্রকৃত রঙ্গমঞ্চের আলো আর রঙের জৌলুষে ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসকে দর্শকরা বরদাস্ত করে; কিন্তু আসল জীবনের কঠিনতম নিষ্ঠুর সত্যকে কেউ সহ্য করতে রাজী নয়। সুতরাং অবহেলিত, অবজ্ঞাত জীবন-নাটক যখন মঞ্চ বিফল বলে প্রমাণিত হল, যতীনদা পালালেন কোল-কাতা থেকে। নিজকে নির্বাসিত করলেন কাপুরুষের মত, জনসমাজ ও রঙ্গপট থেকে।"

..."ছেলেরা কয়দিন তাঁর খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করলে, তারপর সেই পুরানো দুনিয়া সেই পুরানো গতানুগতিক চালেই বইতে লাগল। কে কার খোঁজ রাখে? যে যায়, তার জন্য বসে থাকা মিছে। একটি তারকা খসে পড়ে তো নতুন তারকার জন্ম হয় আবার। যতীনদা, যে মনে মনে অভিমান করেন নি তা নয়! ভেবেছিলেন, তাঁর অভাবে কলেজ বুঝি অচল হয়ে গেছে। বন্ধু, বান্ধব, বান্ধবীরা সবাই বুঝি ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কিন্তু যখন টের পেলেন, কেউ তাঁর জন্য মাথা ঘামায় না, কলেজে সোসিয়েল, থিয়েটার কিছুই আটকে নেই তাঁর জন্যে, মন

ভেঙ্গে গেল যতীনদার। ফিরলেন না কোলকাতা। ভাবলেন পড়াশুনো ছেড়ে দেবেন।"

..."বছর দুই বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন, দেশে বিদেশে। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, কেউ কোথাও তো ছিল না তাঁর—সুতরাং ধরে বেঁধে রাখবে কে? কে-ই বা পরিচালনা করবে। যাই হোক, কোলকাতা থেকে অনেক দূরে, এক মফঃস্বলে এসে যতীনদা হাজির হলেন মাসীর বাড়ী। মাসীও একা পড়ে গেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে স্বামী সব মারা গেছেন। যতীনদাকে তিনি ফিরতে দিলেন না। ঘিয়ের ডাল, পুকুরের মাছের মাথা, আর প্রত্যহের দুধ ঘি খাইয়ে শরীর এবং মন দুটোকেই চাঙ্গা করে তুললেন, কিছুদিনের মধ্যেই। যতীনদা এতদিনে টের পেলেন, সংসারটা পাগলামির জায়গা নয়। সন্ন্যাসী যদি নিতান্তই না হওয়া যায়, তাহলে মনুষ্য সমাজে, ভদ্রভাবে বাস করতে গেলে, অন্ততপক্ষে একটা ডিগ্রী এবং ছোট হলেও কোন রকম চাকরী চাই। চোখ মেলে নজরে পড়ল, সবাই তাই করছে। একটা মেয়ের জন্যে সংসার ত্যাগ করার মত মূর্খামি আর কিসে আছে!"

..."নিছক উন্মাদনা বা 'ইনস্যানিটির' মধ্যে মিছিমিছি দুটো বছর জলে গেল যতীনদার। মন থেকে সব কিছু ঝেড়ে মুছে ফেলে ঐ অঞ্চলেরই কাছাকাছি একটা কলেজে আবার গিয়ে ভর্তি হলেন।

গরমের ছুটির আগে কলেজে সোসিয়েল হবে। সেই পুরানো আনন্দ আর স্ফূর্তি নিয়ে হৈ হৈ করে ভীড় জমালেন যতীনদা। মনের গ্লানিটুকু কোন সময় শরতের মেঘের মত হালকা হয়ে দিগন্তের বাইরে চলে গেল, তা টেরই পেল না। পুরোদমে ড্রামার রিহার্সেল চলতে লাগল।"...

বিজনদার চা ফুরিয়ে গেছে দেখলাম। সুতরাং ফের আনিয়ে নিলাম এককাপ। বিজনদা ভারী খুশি হয়ে বললেন, "আমার ষ্টকে এমনি গল্প অনেক আছে, শুনবে প্রত্যেক দিন?"

"শুনব! আলবৎ শুনব। এখন আপনি দয়া করে যতীনদার কাহিনীটি শেষ করুন"—কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দিলাম।

বিজনদা একটি সিগারেট ধরিয়ে বার কতক টান দিয়ে বললেন, "জানো নন্দ, কোন ছেলে যখন একবার প্রেমে পড়ে, তখন ভাবে আমার মত প্রেমিক পৃথিবীতে আর নেই। যাকে চেয়েছি, তাকে যদি না পাই, জীবন রাখব না। দুষ্কর তপস্যায় কাটিয়ে দেবো, বিরহের হোমানল জ্বেলে। অথচ সেই মূর্খ-ই দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়ে আবার নিঃসংশয়ে ভেবে বসে; "অহো! আমার মত প্রেমিক দুনিয়ায় আছে কে?" যতীনদারও ঠিক তাই হল। বাপ-মা নেই, সংসারের বন্ধন নেই—বেপরোয়া জমাট সোসিয়েলের হোতা যতীনদা, কি আর একলা থাকতে পারেন! প্রেমিকা এবার বাড়ী বয়ে হাজির হলেন। কলেজে অবশ্য পড়েছে কিছুকাল। আই-এ পাশ। যতীনদার পাড়ারই মেয়ে। মাসীর কাছে আসত রান্না শিখতে। মাসী নাকি রকমারী রান্না জানেন। সেগুলো শিখতে পারলে পাত্রের বাজারে তৃপ্তির দাম বেড়ে যাবে অনেকখানি। বুঝতেই পারছ, যতীনদা ওর রান্না খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। জানো ব্রাদার, বাঙ্গালীর ছেলেরা বড় দুর্বল। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলেই প্রেমে পড়ে, আর প্রেমে পড়লেই বিয়ে করতে চায়। সে বিয়ে যদি না হয়, তাতে নাকি জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় তাদের।"

আমি বাধা দিলাম, "শুধু ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেন যে বিজনদা! মেয়েরা কি একেবারে নির্দোষ! তারা প্রশ্রয় না দিলে সাধ্য কি, ছেলেরা কাছে এগোয়!"

"সে কথাও বলছি ভায়া, ব্যস্ত হয়ো না—আমাদের মেয়ের মত ন্যাকা মেয়ে পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তারা অনাত্মীয় ছেলের সঙ্গে আলাপ করবার সময়, দেহ ও মন সম্পর্কে এত সচেতন হয়ে ওঠে যে ওদের প্রেমে না পড়লে কাল্পনিক বেদনাবোধে বুক যেন ভেঙ্গে যায়। এই জন্যই বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের আলাপ করাটা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত আইন করে।"

"অতি সুন্দর প্রস্তাব বিজনদা! আপনি যখন ল' মিনিষ্টার হবেন, তখন অবশ্যই এই আইন চালু করবেন দেশে, এখন যতীনদার কাহিনীটি চলুক"—

..."আই-এ পাশ তৃপ্তি রায়ও যতীনদার স্বজাতি ছিল না দুর্ভাগ্যক্রমে, তবুও স্বগোত্রীয় করে নেবার জন্য যতীনদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।"

এ ব্যাপারে মহীয়সী মাসীর পূর্ণ সমর্থন ছিল। মা-মরা যতীনদার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ আই-এ পাশ তৃপ্তি রায়ের জবরাবেগে ইন্ধন জুগিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না মেয়েটি যতীনদার জন্য পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু তারা পাগল হলেও বাইরের লোকের মাথা ঠিকই ছিল। স্থূল মস্তিষ্ক এবং চক্ষুকর্ণের সাহায্যে তারা ব্যাপারটির সরল নির্গলিতার্থ বের করে রটাতে লাগিল বাইরে। তৃপ্তি রায়ের অভিভাবককুল মেয়ের রাশ টেনে ধরলেন। কিন্তু বাইরের রাশ টানবার চেষ্টা করলেও মনের রাশ টানা গেল না। একজনকে ধরল ইনস্যানিটি, অপরকে হিষ্টিরিয়া। যতীনদা বললেন, তৃপ্তি রায়কে না পেলে আত্মঘাতী হবেন। তৃপ্তি রায় বললে, কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরবেই, যদি তার ইচ্ছায় বাধা পড়ে।

দু'জনকে অবোধ শিশু ভেবে মাসী যে খেলার আসর পাততে চেয়েছিলেন, তা এ ভাবে ভেঙ্গে যাবে জানলে, কবে বিদায় করতেন তৃপ্তিকে। বেচারী মাসী নিরুপায় হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। যতীনদা কলেজ যাননা। প্রত্যেকদিন এক একটা উপসর্গ দেখা দেয়। কোনদিন সকাল থেকে অজ্ঞান, কোন দিন পাচবার আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, কোন দিন না খাওয়া, না স্নান অবস্থায় নগ্নগাত্রে, নগ্নপদে পথে পথে পরিক্রমা। তৃপ্তি রায়ও পাল্লা দিয়ে জীবন রঙ্গমঞ্চে যতীনদার বিপরীত চরিত্রে উপযুক্ত পার্ট করে যেতে লাগল। এ সমস্তর বিশদ বিবরণ শুনে কোন লাভ নেই নন্তু—পদাবলী সাহিত্যেই সব পাবে—তবে পার্থক্য এইটুকু যে পদাবলীর নায়িকার লৌকিক বিবাহের প্রয়োজন হয়নি—চায়ওনি কেউ। এরা বিবাহের মাধ্যমে চেয়েছিল দু'জনকে। শেষটায় অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুত পুহিয়ে যতীনদা তৃপ্তি রায়কে পেয়েছিলেন। এতবড় ঘটনাটার পর ওদের হংস বল, মাসীর আশ্রয়ে আর থাকা চলে না। লোক-লজ্জা বলে বস্তু আছে একটা। প্রেটোনিক লভের মহিমা লোকে বোঝে না, উল্টে বেহায়ার মত অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাসে। চটপট বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে যতীনদা সস্ত্রীক পালিয়ে গেলেন। পরীক্ষার ফল বেরুনোর পর এই চাকরী নিয়ে স্বস্তি পেলেন খানিকটা।...

...নন্তু, তুমি আধুনিক উপন্যাস—গল্প প্রচুর পড়েছো, সনেমাও দেখেছো নিশ্চয়ই। অনেক নাটকীয় পরিস্থিতি জীবনে ঘটে যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বাস্তবে অসম্ভব—অনেকটা সেই রকম ঘটনাই ঘটল যতীনদার জীবনে। নৈলে এ গল্প তোমাকে বলতে বসব কেন আজ!...

...মাস্টারী নিয়ে তো যতীনদা মনের সুখে ঘর সংসার করতে লাগলেন। সুমিতা বলে কোন মেয়ের সঙ্গে কোন দিন তাঁর আলাপ হয়েছিল, বা তাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলো তা স্বপ্নের মত অবাস্তব হয়ে এসেছে। তৃপ্তিকে স্ত্রীরূপে পেয়েই তিনি চূড়ান্তরূপে পরিতৃপ্ত। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ছেলেদের এই-ই হয়ে থাকে। ভাববার সময় কোথায় বল? সকালে টিউশানী, সন্ধ্যায় টিউশানী, দুপুরে স্কুল। অবশিষ্ট সময়টুকু শ্রীমতী তৃপ্তির কলগুঞ্জন শুনেই কেটে যায়। সুমিতার ঠাঁই কোথায় সে আসরে?

যদি বা তার সম্ভাবনা ছিল, কয়েক বছরের মধ্যে তার পাঁচটি ছেলে-পিলে জন্মিয়ে যতীনদাকে ঘোর সংসারী করে তুললে। অবশ্য ড্রামার রিহার্সেল বা রিসাইটেশানে তাঁর উৎসাহ তেমনিই ছিল। তুচ্ছ কোন উপলক্ষ ঘটলেই যতীনদা নিজে থেকে ছেলে বাছাই করে রিহার্সেল দিতে উঠে পড়ে লাগতেন। বলতেন, ড্রামাই তাঁর জীবন!"...

...বছরের প্রথমে সেবার নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে একদিন যতীনদা টীচার্স রুমে অবসরের ঘণ্টায় বসে আছেন। সহসা একটি ছেলে এসে দাঁড়াল সামনে। ওকে আগে কখনও দেখেননি যতীনদা। কিন্তু দেখেই চমকে উঠলেন। কিশোর বয়সের যতীনদা যেন নিজেকেই দেখছেন। কিছু বলবার আগে যতীনদার হাতে ছেলেটি একটি চিঠি দিল। ব্যগ্র হয়ে খুলে দেখলেন, মাত্র দুটি লাইন লেখা—আপনি আছেন বলেই রথীনকে ভর্তি করলুম! নজরে রাখবেন—ইতি সুমিতা।

নিঃসঙ্গের মত যতীনদার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মন কেঁপে উঠেছিল থর থর করে। সেই সুমিতা! বিদ্যুৎ-চমকের মত পশ্চাৎপট উদ্ভাসিত হয়ে ছায়া মিছিল পার হতে থাকে সব ঘটনার। সেই প্রথম দিনের আলাপ—তারপর বন্ধুত্ব কি ভাবে একটু একটু করে বেড়ে চলল...শেষ সেই দুর্যোগের দিন!...রথীন?...ওর অস্তিত্বের মধ্যে নিজে বেঁচে উঠতে চেয়েছিলো!

রথীন তার পায়ের ধুলো নিলে মাথায়। যতীনদার

ইচ্ছা করছিল, বুকে জড়িয়ে ধরেন ছেলেটিকে। কিন্তু স্বভাবতই তিনি একটু সংযত হয়েছেন আজকাল। তাই মনের আবেগ বা উচ্ছ্বাস কিছুই প্রকাশ করলেন না। মাথায় একটু হাত ছুঁইয়ে বললেন, 'যখন যা দরকার হবে, আমাকে বোল, বুঝলে ?'

ছেলেটিকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন যেন। একটু একলা থাকতে চান যতীনদা। সুমিতা এসেছে। আবার এসেছে সে এত কাছে যে একদিন নাগাল থেকে ফস্‌কে গিয়েছিল। নিজেকে মনে মনে শাসাতে লাগলেন, সেই বুড়ো বয়সে যেন কলেজে পড়ছেন। নিত্য-নতুন ভাবে সুমিতার সঙ্গে মিলনের ছল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ভাল লাগার বিচিত্রতর উপায় বের করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন। আর সুমিতা ? যতীনদাকে খুশি করবার জন্যই দিনের দিন, সাজ পোষাকে বদলে এসেছে। কলেজ পালিয়ে সিনেমা নয় পার্ক !···ছায়া ছবির প্রবাহ ধারায় মনের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল ! তৃপ্তির বাহু বন্ধনে বাঁধা পড়ে কী একটা অসার ভাব-বিলাসে মগ্ন হয়ে রইলেন এতদিন, তার জন্য ধিক্কার জাগতে লাগল বারবার। সুমিতাকে চারিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে আর বিয়েই করবেন না। কিন্তু সবই করতে চল !···সুমিতার কাছে দেখানোর মত মুখ তাঁর আর নেই।···

···জানো নন্দ, যতীনদা যে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়লেন তার কোন মীমাংসা নেই ; সমাধান নেই সে সমস্যার। সুমিতার সঙ্গে দেখাও হল। কিন্তু মন খুলে কথা বলবার উপায় নেই। সুমিতা সাবধানী হয়ে গেছে। স্বামী মারা যাবার পর চেহারায় বেশে বাসে বয়সের সম্ভব ভৈল টেনে এনে নিজেকে বুড়িয়ে দিতে চেয়েছে। যতীনদা নিজে যে একজন ইস্কুল শিক্ষক, সে-কথা ভুলে গিয়ে ওদিকটায় ইঙ্গিত করবার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু সুমিতা আদপে তো দেয়নি বরং কঠোর নিষেধ জারী করে দিয়েছে ; 'রঙীনকে মানুষ করে তোল যতীনদা— তাহলেই বুঝব তোমার প্রকৃত টান আছে। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নয় ! দেখা করার চেষ্টাও চলবে না।"

যতীনদা বহু মেহনত করে নিজেকে সামলেছেন আবার। যে তাঁর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, তাকে কেরান যায়না। এর উপর ছেলে বড় হয়েছে। তার সামনে উদ্ধত যৌবন আপনা-আপনিই মাথা নীচু করে।"

···নিষেধের তর্জনী সঙ্কেতে সুমিতার সঙ্গে লৌকিক দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু অন্তরের অলৌকিক রসের উৎস মুখ বন্ধ হল না। যত আবেগ, যত উচ্ছ্বাস, যত কোমলতা সবই আবর্তিত হতে লাগল রঙীনকে কেন্দ্র করে।

বেচারী তৃপ্তিও হয়ত স্বামীর পরিবর্তন লক্ষ্য করে আঁচ পেয়েছিল ব্যাপারটার। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করবার জন্য মানুষকে তাকেও নামতে হল ! যতীনদা টের পাননি, 'ইনটেলেকচুয়ালি' শ্রীমতী তৃপ্তি তাঁর মন থেকে সুমিতাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আগেই বলেছি তোমাকে নন্দ, যতীনদা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। সময় সময় তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন না, সুমিতাকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন কিনা ? তৃপ্তির মত এত গভীরভাবে মনকে নাড়া দিতে সুমিতা কোনদিন পেরেছিল কিনা ?

যখন বাড়ীতে থাকেন, ততক্ষণ সুস্থ থাকেন বেশ। তৃপ্তিকে নিয়ে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু স্কুলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে একটা প্রবাহ বেগ বয়। কেমন অশান্ত দীর্ঘশ্বাসে ফেনিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। রঙীনের ক্লাসে গিয়ে ওর পানে তাকিয়ে তাকিয়ে পলক পড়ে না—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওকে পড়া জিজ্ঞাসা করেন, চলচুতোয় কাছে ডাকেন পিঠ চাপড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। মনটা আবার ছলছল করে ওঠে। কিশোরী সুমিতা আর যতীনদার বাসনা-কামনার মূর্ত রূপ। আজ-কালের স্রোতে সেসব ধুয়ে মুছে গেছে !

স্কুলে সহজ হতে পারেন না। শান্তি পান না। থেকে থেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, এই বুঝি বা রঙীন নিয়ে এল এক টুকরা কাগজ সুমিতার কাছ থেকে। কিন্তু নিষ্ঠুরা সুমিতা এটুকু প্রশ্রয় দিয়ে ছেলের কাছে নিজেকে ছোট করতে রাজী নয়। বারবার মনের আশা ব্যর্থ হয়েছে। যতীনদা স্ত্রীর মধ্যে সুমিতার স্মৃতি জড়িয়ে মনকে শান্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু সে ক্ষণিক। জীবনের প্রথম নারীর স্পর্শ কত অত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায় না।···

···পরমের বন্ধের আগে আবার স্কুলে সোদিয়েল

আসছে। নাটক হবে না, হবে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। ছাত্র নির্বাচন করেছেন যতীনদা। সহসা অপ্রত্যাশিত-ভাবে রথীন নিয়ে এল লিপি ?

"যতীনদা! নাটকের ভক্ত ছিলুম। রথীনকে উপযুক্ত শিক্ষা করে তোল। তুমি চেষ্টা করলে ও ফার্স্ট হতে পারে। এই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।"

যতীনদার মাথায় উন্মাদনা ভর করল নিমেষে। রথীনকে ফার্স্ট করাতে হবে রিসাইটেশনে। সুমিতা খুশি হবে। ওর খুশি-মুখ স্মরণ করে যতীনদার দেহে মনে শিহরণ খেলতে লাগল।

অনেক বেছে বিরাট একটা গদ্য কবিতা নির্বাচন করলেন রথীনের জন্য। কাজটা উপযুক্ত হয়নি। কারণ যে ছেলের আবৃত্তি সম্পর্কে কোন কানই নাই, তাকে অতবড় কবিতা শেখানো চলে না। তার উপর রথীন একেবারে গবেট। আমরা সবাই বললুম, "আপনি করছেন কি যতীনদা! ও একেবারে অকাট! তার চেয়ে আমাদের হরেন মুখুজ্জেকে দিন, অল্প চেষ্টাতেই মাত করে দেবে।" কিন্তু যতীনদার ভিতরে ভিতরে এতকাণ্ড তা কি জানতাম! উনি জবাব দিলেন; "তোমরা কিছু জানো না, এরমধ্যে দারুণ সম্ভাবনা আছে—স্কুলের কোন ছাত্রেরই তা নেই। তোমরা ওদের নিয়ে দেখো। আমি রথীনকে এটা শেখাবোই!"

তারপর বুঝলে তারা, রথীনকে নিয়ে সে কি অমানুষিক পরিশ্রম। কোন নারীর প্রেরণা না থাকলে যে মহৎ কাজ হয় না, আন্তরিক প্রচেষ্টায় কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না, সেবার প্রমাণিত হল। রাতদিন যতীনদা রথীনকে তালিম দিতে লাগলেন। হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গী করে—স্বরের ওঠানামা, পরিবর্তন···ইত্যাদি, কত যে কসরৎ যতীনদা ছুটির পর প্রত্যহ রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত, আলো জেলে সুরু করে দিলেন—দেখে আমরা সবাই 'থ' বনে গেলাম। যতীনদারও অভিনয়-প্রতিভা বা নৈপুণ্য দেখে আমরা মুগ্ধ। ওঁর ভিতরে এত যে আবেগ ছিল, এত দক্ষতা ছিল কে জানত! ঐ রিহার্সেল দেখতেই আমরা খেয়েদেয়ে এসে আবার জুটে পড়তাম।

যা হোক, রথীনকে তো একরকম তৈরী করলেন যতীনদা। তার উপযুক্ত প্রমপটিং না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। যতীনদা যদি উইংসের পাশে থেকে প্রম-পটিং করেন, রথীন বিদ্যালয়ের সেরা রিসাইটার বলে নাম কিনবে। সেরা রিসাইটারকে এবার ইন্টার স্কুল রিসাই-টেশনে পাঠানোর কথা আছে।···

···নেমন্তন্ন পত্রের সঙ্গে যতীনদা সাহস করে লিখে পাঠিয়েছিলেন সুমিতাকে; তোমাকে খুশি করবার জন্য কি অসাধ্য সাধন করেছি এসে নিশ্চয়ই দেখে যাবে, আশা করি।

অনেক ভরসা ছিল যতীনদার, সুমিতা সম্মতি জানিয়ে লিখে পাঠাবে। কিন্তু লিখিত জবাব এল না। এল মুখের জবাব রথীনের মারফৎ; "মা আসতে পারবেন না বলেছেন।

যতীনদা মনে মনে আহত হলেন একটু। কিন্তু দমলেন না। আসর সোদিহেলকে সার্থক করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এবার শ্রীমতী তৃপ্তির স্নায়ুযুদ্ধের শেষ রজনী। ঘটনাটি তুমি কল্পনা করে নাও নগ্ন, আমি লেখক বা চিত্রকর নই যে হুবহু বর্ণনা করব—সাধারণভাবে একটা পাটাতন তার একটা পাশে খানিকটা আড়াল করা হয়েছে—সেখানে বসে সহজেই প্রমপটিং করা চলে।

পরপর কয়েকটি একঘেয়ে আবৃত্তি হয়ে গেল। যতীনদা কোনটাই তালিম দেননি এবার। সুতরাং ভাল হয়নি। যতীনদা আশায় আছেন। পাকা ওস্তাদের মত শেষ মার দেবার জন্য।

আর মিনিট দুই পর রথীনের পালা। যতীনদা উইংসের আড়ালে ঠিকমত জায়গাটিতে এসে বসেই চমকে উঠলেন দারুণ। ঠিক বরাবরি দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে শ্রোতা-দের একটা পাশে। সেখানে প্রায় গলাগলি হয়ে বসে আছে তৃপ্তি আর সুমিতা। একেবারে গা ঘেঁষে সখীর মত। সুমিতাকে আজ আশ্চর্য সুন্দরী লাগছে। কে বলবে ও রথীনের মত অতবড় ছেলের মা। গলকা সাজসজ্জাতেই এত মানিয়েছে যে যতীনদার মাথার ভিতর সব গোলমাল হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখলেন, তৃপ্তি দারুণ একটা কঠিন ভঙ্গী নিয়ে চেয়ে আছে তাঁর মুখের পানে। আর ভাববার অবকাশ মেলে না। রথীন

এসে দাঁড়িয়েছে পাটাতনে। কিন্তু তৃপ্তি কি দেখছে অমন করে রঙীনের মুখপানে—তারপর যতীনদার মুখে? ও কি মিল খুঁজে পেয়েছে দু'জনের মুখে? নৈলে অত আগুন কেন তৃপ্তির চোখে? ঘৃণা আর তিক্ততায় কি তামাটে হয়ে উঠেছে ওর মুখ? কিন্তু সুমিতার প্রণয় সুন্দর লাজিপাভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছে রঙীনকে একবার, আর যতীনদাকে পরমুহূর্তে। যতীনদা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। রঙীন সুরু করে দিয়েছে পাট···, কি যেন বললে ও?···না, থেমে গেছে রঙীন! যতীনদা ধড়ফড় করে একটা লাইন বলে উঠলেন। রঙীন ঘাড় ফিরিয়ে মাথা নাড়ে। ভুল হয়েছে।

তবে কোনখানটা? যতীনদা বলে উঠলেন; "আবার গোড়া থেকে ধর!" রঙীন গোড়া থেকে সুরু করলে। যতীনদা দুটো লাইন পর পর বলে মুখ তুললেন···! না, তৃপ্তি আর সুমিতা!···কি ভেবেছে ওরা? কে আসতে বলেছিল ওদের এখানে? ছিঃ···ছিঃ···!

না: রঙীন আবার থেমে গেছে।

বল···বল না···, যতীনদা ফের একটা অবান্তর লাইন আউড়ে গেলেন। রঙীন ঘাড় নাড়লে পাশ ফিরে। সে ততক্ষণে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এর আগে কোনদিন অভ্যাস ছিল না জনতার সামনে দাঁড়ানোর। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল···কলরব বাড়ছে। মাষ্টারমশাইরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু গোলমালটা যে কোথায়, যতীনদা ঠিক ঠিক ধরতে পারছেন না। তৃপ্তি আর সুমিতা! রঙীন আর সুমিতা! সামনে তাকালেন বিহ্বলভাবে। আবার চমকে উঠলেন। তৃপ্তির মুখে একটি আশ্চর্য হাসির আবেশ। কিন্তু সুমিতা? তৃপ্তির ঘৃণা বিদ্বেষ তার মুখে গিয়ে জমা হয়েছে। ওর দুটো চোখ থেকে ছুরির মত শানিত দৃষ্টি-বাণ ছুটে আসছে যতীনদার মুখের উপর।

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে দেখলেন, পিছন থেকে একজন শিক্ষক বলছেন রঙীনকে, "চলে এসো, চলে এসো না!"

রঙীন পালিয়ে বাঁচল। সভাস্থলে বিদ্রূপের ধ্বনি উঠল। ছাত্ররা চীৎকার করতে লাগল। যতীনদা মাথায় হাত রেখে বসে রইলেন। সভা ভেঙ্গে গেল। আমরা সবাই দৌড়ে এলাম, "কি হয়েছে। যতীনদার কি হোল?"

যতীনদা তখন উত্তেজনায় দাঙ্গা হাঙ্গামার মুখে। জল পাখা করে সুস্থ করলাম। প্রকৃতস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই শেষ! কোনদিন আর আবৃত্তি অভিনয়ে আমি নেই।"

বিজনদা চুপ করলেন। আমি বললাম, "তারপর? সুমিতাই বা কোথায়? রঙীনেরই বা হল কি?"

বিজনদা উঠে দাঁড়ালেন লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে, "সে কথা শুনে কাজ নেই ভায়া! সুমিতা রঙীনকে নিয়ে চলে গেছে! যতীনদাও সেই থেকে আর অভিনয় লাইনে নেই। জীবনের যা শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তা নিছক এক নারীর মোহে পড়ে দুর্বল সেন্টিমেন্টের বশে ত্যাগ করেছেন।" কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বিজনদা মন্তব্য করলেন, "তাই বলি ভায়া, মেয়েদের সম্পর্কে একটু সাবধানে চলো। দরকার হলে বিয়ে করবে, তবু প্রেম নয় কভু!"···

ঐতিহাসিক

গৌরীশঙ্কর দে

মনে পড়ে আরো একবার
থিরথির কাঁপা অন্ধকার,
চকচকে জিলের রূপে রেশমমহল একাকার।

মৃদু আলো গবাক্ষের পাশে
শাহজাদী আসে,

দেখে তাকে রাজপথে থেমে যেতে পারে মুসাফির।

শিরীষ ফুলের মতো ওড়নাটি আতরে মদির।

সহসা আরক্ত শিখা বিদেহী বহ্নির লালসায়
জ্বলে যায় রূপসীর অস্পষ্ট শরীর।

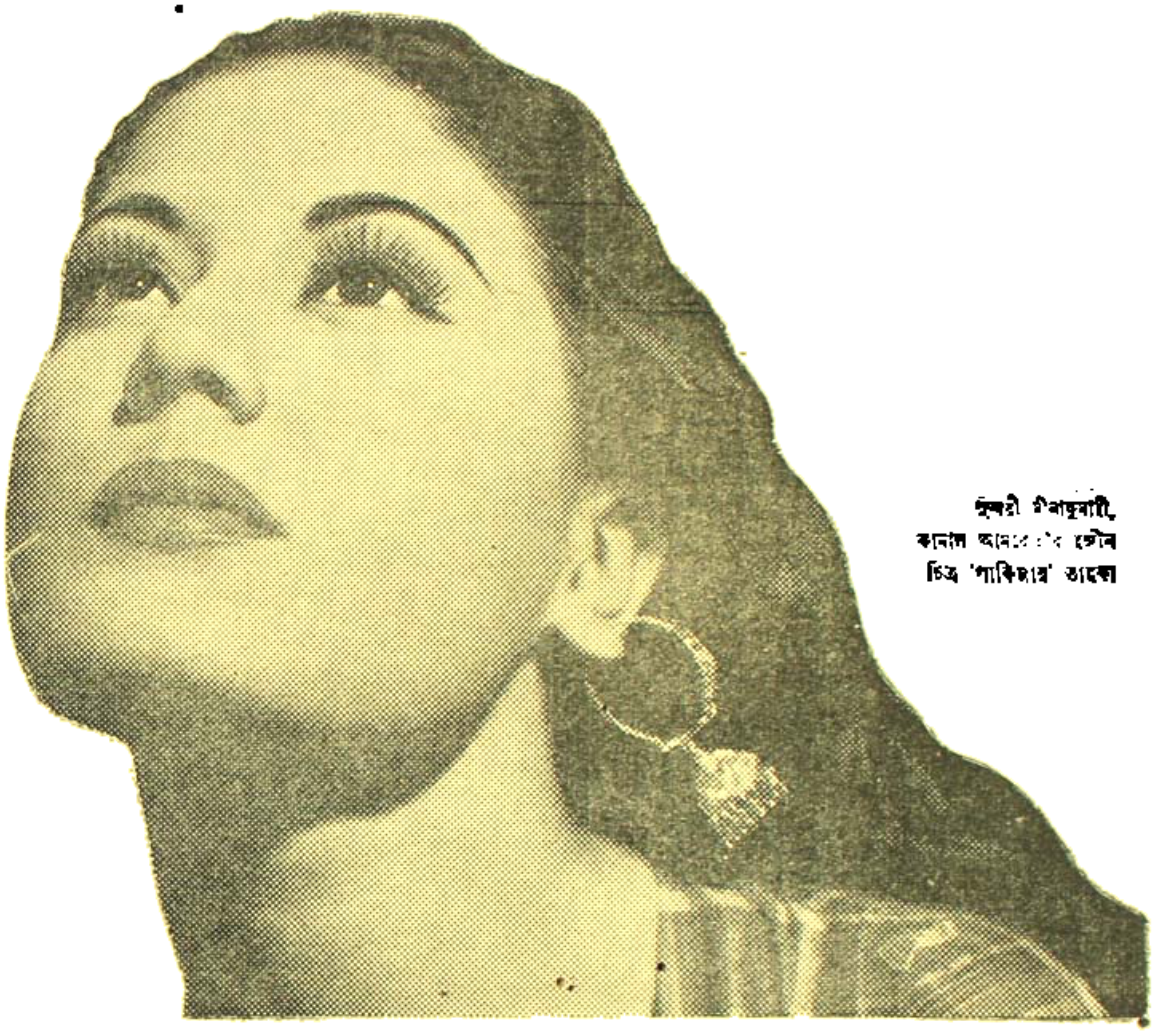

সুন্দরী মীনাকুমারী,
কমাল আমরোহীর সৌধ
চিত্র 'পাকিজার' তারকা

আপনার সৌন্দর্য্য

চিত্রতারকাদের লাবণ্যের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে !

সুন্দরী মীনাকুমারী কি বলেন শুনুন: "লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করার দরুণই আমার ত্বক এত কোমল আর সুন্দর থাকে।"

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্যরক্ষায় লাক্স টয়লেট সাবানের স্থান সর্বাগ্রে। বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান একবার ব্যবহার করলে আপনিও সর্বদা এই সাবানটিই ব্যবহার করতে চাইবেন কারণ তাতে ত্বক হবে সুন্দর, ততই মোলায়েম, আর তাতে পাবে সজীবতা।

LUX
TOILET SOAP

বিশুদ্ধ শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে প্রস্তুত।

LTS. 592-K52 BG

গীত

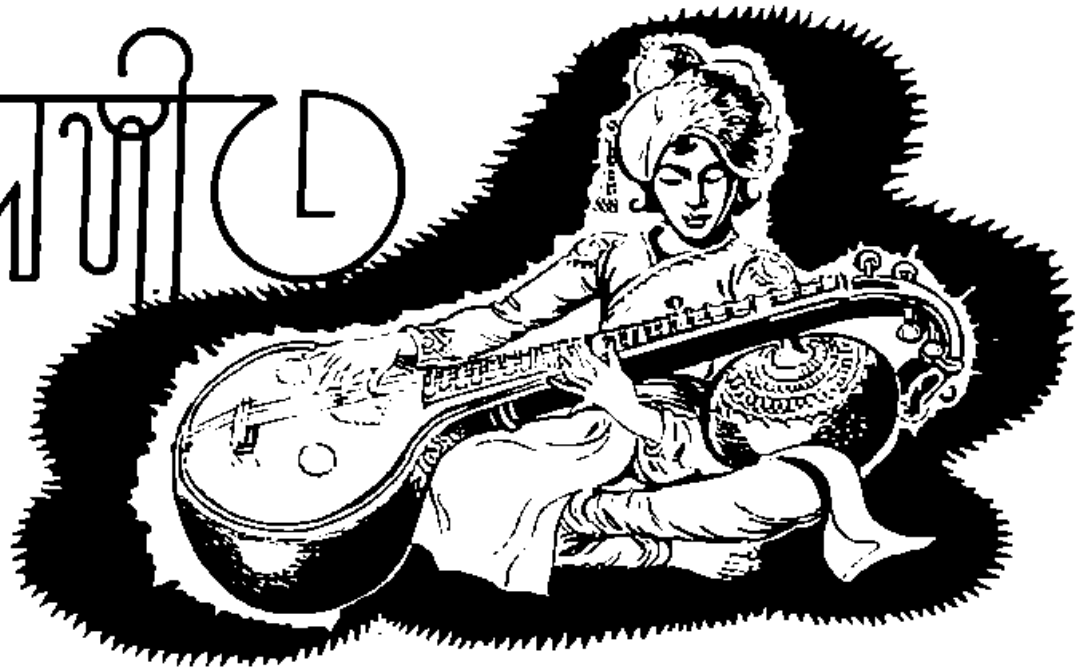

রাগপ্রধান—দাদরা

ঝির ঝির ঝির ঝরণাধারা
ঝিকিমিকি তারা,
বনের ধারে মনের ময়ূর
হেসেই হল সারা।

চমকে ওটি পাখী,
ডালে ডালে কাঁপন লাগে
পাতায় পাতায় রাগ
খুসীতে হয় হারা।

কথা, সুর, স্বরলিপি ঃ—বসন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীতরত্ন

মা | ঋ পা | ঋ পা | ধপা | সপা | ধপা | মমা | ৷ ৷ ৷
ঝর ঝির ঝর ঝর ঝা রা ০ ঝিকি | মিকি ০ তা রা ০ ০ ০ ০

মা | ধ পা | গা মা | রে সা | সসা | রে নি | সসা | ৷ ৷ ৷
ব নের ধা রে ০ মনে র ম যূ র হেসে ই হ ল ০ সা রা ০ ০ ০

পপা | নি নি | সসা | ৷ ৷ ৷
চ ম কে ও টি ০ পা খী ০ ০ ০ ০

সসগা | রে রে | সসা | সনি | ধধনি | ধপধা | পমা | ৷ ৷ ৷
ডা লে ০ ডা লে ০ কাঁ প ন লা গে ০ পা তা য় পা তা য় রা গী ০ ০ ০ ০

সমা | গপা | ক্ষপা | ৷ মা | ৷
খু সী ০ তে হ য় হা রা ০ ০ ০ ০

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি এক ভীষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি আমার বুদ্ধিমতী এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা গুলসনের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। গুলসন আমার হাতে বাদশাহের একখানি নকল পাঞ্জা খুঁজে দিল। আমি গুলসনের ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। এই পাঞ্জা নিয়ে আমি কুমার রামসিংহের দুর্গে প্রবেশ করব—মারাঠা বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই পাঞ্জা অত্যন্ত প্রাণবন্ত। আমাদের সঙ্গে বন্দীকে গোপন হত্যার ফারমান।

গভীর রাত্রি, ঘন অন্ধকার; আকাশে বিদ্যুৎ ঘনমেঘকে আরও স্পষ্টতর করে তুলেছে। আমি আর গুলসন-ঘনকৃষ্ণ বোরখা পরিধান করে নিরাভরণ শিবিকায় আরোহণ করলাম। সঙ্গে একটি তৃতীয় বোরখা এবং সেই নকল পাঞ্জা ও ফারমান। আমরা কুমার রামসিংহের দুর্গের পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হলাম। নিশ্চয়ই আমি স্থির বিশ্বাস ছিলাম না—এই নৈশ অভিযানের দারিদ্র, গুরুত্ব এবং পরিণতি আমি চিন্তা করিনি। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল-যদি আমাদের এই মুঘলবংশের রাজ-অতিথি অক্ষত না হন, তবে আমি তাকে এই তৃতীয় বোরখাটি উপহার দিব, আর এই পাঞ্জার সাহায্যে তাঁকে মুক্ত করব; মৃত্যুর পরওয়ানা দিয়ে মৃত্যু থেকে তাঁকে রক্ষা করব। এর দ্বিতীয় করলে বলব, বাদশাহ আলমগীরের আদেশে গভীর অন্ধকারে বন্দীকে অন্য দুর্গে স্থানান্তরিত করবার আদেশ নিয়ে এসেছি। সেখানে তাঁকে হত্যা করা হবে। বাদশাহ আলমগীরের এইরূপ গোপন কার্যকলাপ অপ্রত্যাশিত নয়, অসম্ভাব্য ও নয়।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। দূরে প্রাসাদরক্ষী চৌকার দিয়ে জানিয়ে দিল-রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। আমরা শিবিকা থেকে অবতরণ করে দুর্গের বহির্দেশে অপেক্ষা করলাম। সমস্ত পুরী নিস্তব্ধ; আমি আমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছিলাম। আমার কখন যে সময় অতিবাহিত হল, জানিনা প্রহরী আমার উচ্চ কণ্ঠে জানিয়ে দিল দুই ঘড়ি অতিবাহিত। বুঝতে পারলাম-প্রহরী প্রায় সকলেই নিদ্রিত, আমরা ধীরপদে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হলাম। আমরা দুজনে দ্বাররক্ষীকে পাঞ্জা দেখালাম, প্রহরী জানাল বন্দী অসুস্থ। সম্মুখ তোরণের পশ্চিম পার্শ্বে রক্ষীশালা—তার পশ্চিমে অলিন্দ—অলিন্দের শেষ প্রান্তে মারাঠা বন্দীর ক্ষুদ্র শয়ন কক্ষ। সম্মুখে অস্পষ্ট আলো। গুলসন দেখবার প্রহরীকে বাদশার আলমগীরের আদেশ জানিয়ে দিল। বন্দীকে এই মুহূর্তে দুর্গ থেকে অপসারণ করতে হবে এবং রাত্রিশেষের পূর্বেই তাঁকে হত্যা করতে হবে। বাদশা গোপনে তার কর্তব্যের শেষ হবে।

প্রহরী বন্দীকে জাগ্রত করতে অগ্রসর হল; আমরা মৃদু আলোকে দেখলাম, বন্দী যেন ধ্যানমগ্ন যোগাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একটি প্রদীপ এবং একখানি গ্রন্থ। বন্দী যেন আর অপেক্ষা করছিলেন-তাঁর আননে অপূর্ব দিব্য প্রশান্তি। প্রহরীর পদশব্দে তিনি আসন ত্যাগ করে পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে অগ্রসর হলেন। গুলসন প্রহরীকে ইঙ্গিত করল—প্রহরী দূরে সরে গেল। গুলসন অতি বিনম্র স্বরে বন্দীর নিকট নিবেদন করল, "বাদশাজাদী জেবুন্নিসা।" শিবাজী স্তম্ভিত। শিবাজী একপদ পশ্চাতে সরে গেলেন। গুলসন আবার নিবেদন করল, বাদশাহ আলমগীরের কন্যা জেবুন্নিসা। "বাদশাজাদী এসেছেন আপনাকে জীবিত দেখতে এবং জীবন্ত আপনাকে কারা-মুক্ত করতে। বাদশাহ আলমগীর আপনাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি বাদশাজাদী পালন করবেন। আপনি বিশ্বাস করুন, বাদশা আলমগীরের কন্যা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই রাত্রির অন্ধকারে বাদশাহজাদী গোপনে বাদশাহের পাঞ্জা আপনার জন্য একটি বোরখা এবং একখানি শিবিকা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন। আর মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, প্রাসাদের প্রহরী নিদ্রামগ্ন। এই গভীর রাত্রে কেহ সন্ধান পাবে না। আপনার মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে বাদ-শাহজাদী তাঁর পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে, মোগলবংশের কলঙ্ক ক্ষালন করবেন।"

মারাঠা বীর শিবাজী নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ। প্রদীপের মৃদু আলোকে বুঝতে পারলাম, তাঁর ওষ্ঠাধর কম্পিত হচ্ছিল। তিনি অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে বললেন, "বাদশাজাদী! আমার সশ্রদ্ধ সেলাম গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কুমার রামসিংহের নিকট প্রেরিত আপনার লিপি আমি দেখেছিলাম। আমি জানি, মুঘলবংশের গৌরব রক্ষা করবার জন্য আপনি কত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনি জীবন বিপন্ন তুচ্ছ ক'রে এই রাত্রির অন্ধকারে একটিমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে এই প্রাসাদে এসেছেন। বাদশাজাদী! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমার পলায়নের সংবাদ কাল প্রভাতে বাদশাহের অগোচর থাকবে না। তিনি যদি জানেন, আপনি আমার মুক্তির ব্যাপারে জড়িত আছেন, এই নিয়ে আপনার কলঙ্ক হবে। সেই কলঙ্ককালিমা আপনার ললাটে চিরকাল লিপ্ত থাকবে। আমারও দুরাশা নষ্ট হবে। আমার জানবে যে একজন নারীর অকালের অন্তরালে মারাঠা বীর শিবাজী মুঘল দুর্গ ত্যাগ ক'রেছেন। আমি অনুরোধ করছি-আপনি এই মুহূর্তে এই গৃহ ত্যাগ করুন। আপনার শুভেচ্ছার জন্য আমি আবার আপনাকে আমার সেলাম জানাচ্ছি।"

আমি স্তম্ভিত হলাম। অতি মৃদু অঙ্গুলী সঞ্চালনে আমার

অবগুণ্ঠন মোচন করলাম, মনের ভাষায় আমি তাঁকে বললাম—"মারাঠা বীর কি জানেন না যে তাঁর জীবন কত বিপন্ন। বাদশাহে আলমগীরের শিবিরে একবার যে প্রবেশ ক'রেছে তার পক্ষে জীবন্ত প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। এই মারাঠা বীরের প্রাণের বিনিময়ে শঙ্কা নাই?" আমার অবগুণ্ঠনমুক্ত আননের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে তিনি বলেন, "বাদশাজাদী! আমি আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। আমায় ক্ষমা করুন। আমি হিন্দু। পরনারীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করি। আপনি যদি আমার কল্যাণ কামনা করেন তবে আমার কল্যাণের জন্য এই মুহূর্তে এইস্থান ত্যাগ করুন। আমার মুক্তির উপায় আমি স্থির করেছি, গুরু আমার সহায়।"

আমি মারাঠা বীরের ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে শিহরে উঠলাম। ভয়ৌবনী বাদশাহের শতপ্রকার কৌশলের সঙ্গে মারাঠা বীর কি পরিচিত নন? নিভীক, আত্মবিশ্বাসী মারাঠাবীরকে আমি রক্ষা করব।

অতি দ্রুতপদে গুলসন এবং আমি রত্নপুর-প্রাসাদ পরিত্যাগ করলাম। হোসেনের প্রধান প্রহরীকে গুলসন জানিয়ে দিলো-বন্দী অত্যন্ত অসুস্থ। সুতরাং তাঁকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়।

সে কাহিনী গুলসন জানে, আমি জানি, আর জানে সর্বজ্ঞেয়কর্তা অন্তর্যামী।

তৃতীয় স্তবক

আজ ও বাদশাহ বেগমের কোন পত্র আমার নিকট আসেনি। প্রতিদিন তাঁর পত্রের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করছি। প্রত্যেক মুহূর্তে খণ্ড খণ্ড সংবাদ দূরের সাক্ষিণাত্য থেকে ভেসে আসছে। বাদশাহ আলমগীর পুত্র-বধের জন্য বদ্ধ-পরিকর। শাহজাদা আকবর কি আমার রাজপুতদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন? বাদশাহের সেনাপতি শিহাবুদ্দিন খান? শাহজাদা মোয়াজ্জম সম্রাট পুত্র চতুর্দিক থেকে শাহজাদা আকবরকে অবরোধ করবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত সৈন্য-সামন্তের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সম্রাট একটী সিপাহিকেও—প্রহরীর বেশীও ফেরত পাবেন না। সম্রাট স্বয়ং আজমীর থেকে পুত্রবধ যজ্ঞের আয়োজন করছেন। বাদশাহ বেগম, তুমি তো একবার পিতার সঙ্গে পুত্রের, ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার আত্মঘাতী সংগ্রামের স্থূলিঙ্গ নির্বাপিত করবার চেষ্টা করেছিলে। আজ কি তুমি মুঘল সাম্রাজ্যের এই আত্মঘাতী সংগ্রামের পুনরাবৃত্তি নিরোধ করবার জন্য বিন্দুমাত্র কর্তব্য সম্পাদন করবে না? বাদশাহ বেগম, শাহজাহানের সন্তানদের মধ্যে একজন তুমিই—বাদশাহ আলমগীরের অসন্তোষ, ভ্রূকুটি জিঘাংসা অতিক্রম করে, তাঁকে উপদেশ দিতে পারো। আজ বাদশাহ আলমগীর নিরস্ত্র, রক্ষীহীন তোমার কক্ষে প্রবেশ করতে সাহস করেন। তোমার সঙ্গে তিনি প্রহরের পর প্রহর রাজনীতি পরিবারের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তুমি দেখেছ তোমার চক্ষুর সম্মুখে তোমার প্রিয়ভ্রাতা মারা, কাফের অপবাদে, মোল্লার বিচারে নিহত হয়েছেন। শুজা পরাজিত হয়ে সুদূর আরাকানের নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। সরল বিশ্বাসী মুরাদ বক্সকে সুরাপানে অচেতন করে নিহত নিরস্ত্র বন্দী করা হয়েছিল, গোয়ালিয়র দুর্গে আলী নকীর পুত্র অভিযোগ করল—"আমার পিতাকে বিনা অপরাধে গুপ্ত-ঘাতের সুধারায় মুরাদ বক্স হত্যা করেছেন; বাদশাহ আলমগীরের নিকট আমি বিচারপ্রার্থী।" এই হত্যার অপরাধে মুরাদ করিমদীর সম্মুখে বক্সের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল; এবং তাঁর বিরুদ্ধে করিমদীকে প্রদান করা হল—উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে যেন আর কেহ নিজকে মুরাদ বক্স বলে নিজেকে প্রচার করতে না পারে। কারণ এই করিমদী হবে মুরাদ বক্সের হত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

বাদশাহ বেগম! তোমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও তুমি ভ্রাতৃহত্যার নিবারণ করতে পারনি। তবু তোমার শুভবুদ্ধির পরামর্শ নিয়ে তুমি মুঘল রাজপরিবারকে নূতন করে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছ—নূতন প্রীতির বন্ধ পড়ে তুলেছ। স্বর্গীয় দূতের মত তোমার আশীর্বাদ মুঘল রাজপরিবারকে নূতন জীবন দান করেছে। তোমারই পরামর্শে বাদশাহ আলমগীর নূতন করে মুঘল রাজপরিবারের সন্তানদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। সম্রাট শাহজাহান চেয়েছিলেন, দারা শিকোর পুত্র সুলেমান শিকোর সঙ্গে আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসার বিবাহ দিয়ে সিংহাসনের জন্য প্রতিরোধ করবেন। বাদশাহ বেগম তুমি তো জান আওরঙ্গজেবের কূটবুদ্ধির প্রভাবে পারস্যের বাদশাজাদা ফারুকের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব করে সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছিলেন। তুমি কিন্তু তাতে নিরাশ হওনি—তুমি দারার কন্যা জাহানজেব বানুকে আপনার স্নেহাঞ্চলের অন্তরালে আশ্রয় দিয়েছ এবং শাহজাদা আকবরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলে। সুলেমান শিকোর কন্যা সলিমাবানুকে শাহজাদা আকবরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

বাদশাহ বেগম, আমার কি মনে হয় জান? মুঘল রাজপরিবারের উপর বিধাতার একদিকে আশীর্বাদ, অন্যদিকে অভিশাপ। এই আশীর্বাদের জন্যই তৈমুরবংশে জন্মেছিলেন বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারাশিকো আর তুমি। বিধাতার আশীর্বাদে পানিপথের যুদ্ধে মাত্র দুইটী কামানের সাহায্যে বাবর হিন্দুস্থান বিজয় করেছিলেন।

হিন্দুস্থান বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে আশৈশব সুরাপানের অভ্যাস আল্লার নামে বাবর একদিনেই পরিত্যাগ করেছিলেন। পর মুহূর্তে জেগে উঠল পানপাত্রের স্তবমন্ত্র পথ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তিনশত সহচর পান-পাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ফেল। ধর্মের নামে যুদ্ধ—হয় হিন্দুস্থান, নয় মৃত্যু।

ক্রমশঃ

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৭৮ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমের যোগেশের পর রবীন্দ্রনাথ "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" রচনা করেন। ১৮৮১ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।...বাংলা চল্‌তি ভাষার সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

এই সময় থেকে বাংলা গদ্যে একটি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার দেখা গেল। প্যারীচাঁদ নিজে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথোপকথনের ভাষায় অন্যজনের কথোপকথন হলে সাধুভাষা-ঘেঁষানো কথ্যভাষা ব্যবহার করতেন —খাঁটি কথ্যভাষা ব্যবহার করতেন না, তা আগেই দেখা গেছে। লেখকের বর্ণনা ও মন্তব্যের ভাষায় তিনি শুধু সাধুভাষাই ব্যবহার করতেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বরাবর ঐ রীতি রক্ষা করে চলেছিলেন এবং তাঁর বইএর চরিত্রগুলির কথোপকথনের ভাষায় প্রথমদিকে কেবল সাধুভাষা ব্যবহার করলেও পরে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেন। কিন্তু আরো পরের সাধুভাষার ঔপন্যাসিকেরা মন্তব্য প্রকাশ ও বর্ণনা প্রদানের ভাষায় নিজেরা গম্ভীর-ভাবে সাধুতা বজায় রাখলেও চরিত্রগুলির মুখে কথোপকথনের জন্যে খাঁটি চল্‌তি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। ভাবটা এই রকম যে, তাঁরা সাধুভাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁদের তৈরি চরিত্রগুলো যদি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষের মতো স্বাধীনভাবে ঘরোয়া ভাষায় কথা বলে, তাহলে তাঁরা তাদের স্বাধীনতায় হাত দিতে চান না। তাঁদের রচনায় দেখা যায়, লেখক সাধুভাষী—কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কথ্যভাষাই বেশি পছন্দ করে। এই অসঙ্গতি যুক্তিবিহীন; পাঠক যদি উচ্চ সমাজের মার্জিতরুচি নায়ক-নায়িকার মুখে চল্‌তি ভাষা বরদাস্ত করতে পারে, তাহলে সে লেখকের বর্ণনাও সেই ভাষায় রচিত হলে আপত্তি করবে কেন? ঐ বিসদৃশ ভাষাবৈষম্যের একটি কারণ হচ্ছে পূর্ববর্তী বিশুদ্ধ সাধুভাষার দৃঢ়মূল কিন্তু অনাবশ্যক অভ্যাসের জের; অন্য কারণ, সমকালীন নাটকের সংলাপের প্রভাব। নাটকে স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যে সংলাপে যেমন যথাসম্ভব স্বাভাবিক কথ্যভাষা ব্যবহার করা হত, উপন্যাস প্রভৃতি অন্য গদ্য রচনাতেও তেমনি স্বাভাবিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কথোপকথনে ক্রমাগত চল্‌তি ভাষার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিছুদিন পরে এই অবস্থার অবসান হল; সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও ও সর্বনামের পরিবর্তন সাধন করে কিন্তু তৎসম শব্দের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রেখে শিষ্টজনসম্মত এক চল্‌তি ভাষায় দৈনন্দিনের গদ্যরচনা লেখা আরম্ভ হল। এ-ভাষাও ঠিক মুখের ভাষা নয়; কারণ, লেখার সময় যথা হয়ে বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করলেও মুখের ভাষায় বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষও খুব বেশি তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেন না। আরো পরে সাধু-ভাষার সংস্কৃতঘেঁষা অব্যয় ও নানা উপসর্গ তুলে দিয়ে খাঁটি ঘরোয়া বাগ্‌ভঙ্গি ও বুলির ব্যবহার চালু করা হল। অন্যদিকে, সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর মুখের ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহারও বাড়তে লাগল। অবশেষে, বেশ কিছু তৎসম শব্দসহ কথ্যরীতির বাগ্‌ভঙ্গিযুক্ত এক "সাহিত্যিক" চল্‌তি ভাষাকে ভদ্রসমাজশিক্ষিত মুখের ভাষারূপে মেনে নিতে কলিকাতার প্রাধান্যশালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর কারো আপত্তি থাকল না। লেখকগোষ্ঠীও নিজেদের ভাষার আভিজাত্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে রচিত গল্প-উপন্যাসে চরিত্রগুলির কথোপকথনের মতোই সংলাপযোগ্য বর্ণনা ও নিজেদের মন্তব্যসমষ্টিও চল্‌তি ভাষায় লেখা সুরু করলেন। গদ্যভাষার এই ক্রম-বিবর্তন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বেশ একটা লক্ষ্য করার বিষয়।

তাহলে, প্রথম উদ্ভবের পর থেকে আজ পর্যন্ত গদ্যভাষার পরিণতির স্তরবিন্যাস আলোচনা করলে, এইরকম একটা শ্রেণীপর্যায় অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়:—

বাংলা গদ্যভাষার দুটি শাখা; সাধুভাষা ও চল্‌তি-ভাষা; এদের প্রথমটির ধারাপ্রবাহ ক্রমশ দ্বিতীয়টির বর্ধমান প্রভাবের অন্তর্লীন হচ্ছে। সাধুভাষার রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে এই স্তরপরম্পরা চোখে পড়ে:—

প্রথম স্তর: অবিমিশ্র বিদ্যাসাগরি ভাষা; কথ্যভাষার লেশমাত্র নেই—কথাবার্তা বিশুদ্ধ সাধুভাষায় রচিত; কচিৎ গ্রাম্য ভাষার অসঙ্গত প্রয়োগের অপূর্বর প্রক্ষেপ।

দ্বিতীয় স্তর: সুবিমিশ্র বিদ্যাসাগরি ভাষা; আগুন্ত সমগ্র রচনা

সাধুভাষায়, কিন্তু তার ভিত্তি মৌখিক ভাষা এবং কথোপকথনে কথ্য-রীতির ঈষৎ স্পর্শ দেখা যায়।

তৃতীয় স্তর : প্যারীচাঁদ-বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ; কথোপকথনে সাধু-চলিত মিশ্রভাষা, আর সব কিছু সাধুভাষায় লেখা।

চতুর্থ স্তর : রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-পরশুরামের ভাষা ; কথোপ-কথন বিশুদ্ধ চলতি ভাষায়, অন্য সব কিছু পূর্ববৎ সাধুভাষায়।

এর পরের স্তরে এসে সাধুভাষা চলতিভাষার মধ্যে আত্মবিলোপ করতে বাধ্য হয়েছে। এই চতুর্থ স্তরের ভাষা ব্যবহার করতে অন্যান্য অনেক প্রবীণ লেখককে পরিণত বয়সে সাম্প্রতিক কালে আদ্যোপান্ত চলতি ভাষায় কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনা করতে দেখা যাচ্ছে। তা থেকে একদিকে যেমন কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, আর একদিকে তেমনি আলোচ্য বিষয়ের বক্তব্য প্রতিপন্ন হয়ে যায়। প্রমথনাথ বিশি, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি সুলেখক তো বটেই, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো সাধুভাষায় পোঁড়া সমর্থকরাও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে চলতি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রমথনাথ বিশি মহাশয়ের উপন্যাসসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, কি ভাবে তাঁর রচনাতেও চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কথ্য-ভাষার মধ্যে নির্বাপমুক্তি লাভ করেছে। তাঁর "কেরি সাহেবের মুন্সি" কথ্যভাষার বিজয়সাক্ষ্য ঘোষণা করে।

আবার, চলতি ভাষার বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, প্যারী-চাঁদের রচনার শুরু থেকে এই ভাষা অল্পদিনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই পর্যায়গুলি মোটামুটি এই :—

প্রথম পর্যায় : টেকচাঁদ ঠাকুরের ব্যবহৃত ভাষা : কথোপকথনে ঢাকা ভাঙা কথ্যভাষার প্রয়োগ।

দ্বিতীয় পর্যায় : হুতোমি ভাষা : ঈষৎ অমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন-লঘু ভাষা উচ্চভাব বিকাশের অনুপযুক্ত।

তৃতীয় পর্যায় : রবীন্দ্রনাথের ভাষা ; সবরকম রচনার উপযোগী কথ্যভাষার সন্ধান লাভ।

চতুর্থ পর্যায় : প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ; তাঁর অনুগামী ও শিষ্যদের রচনার ক্ষিপ্র, লঘু, তীক্ষ্ণ অথচ গুরু ভার বহনে সমর্থ চলতি ভাষা।

বঙ্কিমচন্দ্র-বর্জিত দুটি আলাদা গদ্যভাষা বয়স পথে বিকশিত হয়েছে, এ ব্যাপারটা বুঝতে হবে।

ভূদেবের বিদ্যালঙ্কার তাঁর রচনার মাঝখানে দীন ব্যক্তির বা অবর স্তরের মুখের ভাষার ছিন্ন সামান্য গ্রাম্য চলতি ভাষাকেও আসন দেন নি। তাঁর লেখা আলাপনের ভাষা গুরুগম্ভীর সংস্কৃতপ্রধান সাধুভাষা। বিদ্যাসাগর ঐ ভাষাকে মার্জিত করলেন, কিন্তু রচনাবলী সাধুগদ্যেই লেখা হতে লাগল। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত প্যারীচাঁদের প্রভাবে চলতি ভাষার মর্যাদা স্বীকার করে কেবল কথাবার্তার ভাষায় সাধুভাষার সঙ্গে "অপর ভাষা" কিছু পরিমাণে মেশালেন। এই স্তরের ভাষায় বহু গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাস এইভাবেই লেখা হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ও পরশুরাম—তিন মহারথী চতুর্থ স্তরের সাধুভাষায় গদ্য রচনা আরম্ভ করলেন—যাতে আর সব সাধুভাষায় লিখে মুখের আলাপাদি কথ্য ভাষায় লিখিত হল। এই ধারা আজও বর্তমান এবং বাংলা গদ্যের জগতে এই স্তর আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এই ধরণের সাধুভাষাতেই লিখিত। ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে এই স্তর অতিক্রম করেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ৩৯ বছর সময় তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল প্রবন্ধ থেকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে চলতি ভাষার পাড়িতে তেপে যেতে।

ওদিকে চলতি ভাষায় লেখার যে প্রয়াস ১৮৪৫ সালে প্যারীচাঁদের দ্বারা সুরু হয়েছিল, তা সাত বছরের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে খাঁটি কথ্যভাষায় পরিণত হলেও এই দ্রুত গতিকে অগ্র-গতি বলতে হবে, প্রগতি বলা চলবে না। কারণ, হুতোম প্যাঁচার হাতে কথ্যভাষা খুব নিম্ন স্তরে এসে পড়েছিল যাতে বহৎ সাহিত্য গড়া যায় না। নাটকে অবশ্য মধুসূদন ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু সব রকমের গদ্য রচনার উপযোগী চলিত ভাষার সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ। চতুর্থ পর্যায়ে বীরবলের চেষ্টায় এই ভাষা এখন সেই উৎকর্ষ অর্জন করেছে সাধুভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরি ভাষা যা করেছিল। কিন্তু সাধুভাষায় যেমন বঙ্কিম-চন্দ্রের মতো কুশলী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল, এই চলতি ভাষায় এখনও তেমন স্রষ্টা দেখা যায় নি।

লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, সাধুভাষা বিবর্তনের পথে স্বাভাবিক ভাবেই চলতি ভাষার মধ্যে আত্মবিলোপ করছে। যাঁরা এখনও চতুর্থ স্তরের সাধুভাষায় গল্প-উপন্যাস রচনা করেন, তাঁরা চতুর্থ পর্যায়ের কথ্য-ভাষার শিল্পীদের তুলনায় অশুদ্ধ ভাষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। এইজন্যে সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করেও অসঙ্কোচে বলা যায় যে, ভাষার ব্যাপারে তারাশঙ্করের তুলনায় বুদ্ধদেব বহু অনেক বেশি প্রগতি-সম্পন্ন লেখক।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সর্বাংশে না হলেও অনেক পরিমাণে বিদগ্ধ জনের মুখের ভাষা। কথা বলতে বলতে বীরবলি সমাসমুগ্রাস রচনা করা সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। তবু, "তার ইয়ারি কথা"-র ভাষা "ভাগীরথী-উপকূল"-এর শিক্ষিত জনের মুখের ভাষাই বটে। আরো পরে বুদ্ধদেব বসুও ঠিক ঐ ভাষাতেই তাঁর উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" থেকে "প্রগতি-সংহার" পর্যন্ত গদ্যভাষা কম-বেশি তৈরী করা ভাষা হলেও কথ্যভাষাই তার ভিত্তি বটে। রীতি বা style এর প্রভেদ যতই থাক না কেন, দিলীপকুমারের উপন্যাসের ঈষৎ তৎসমবহুল ভাষা, "যাযাবর"-এর মধ্যচলার ভাষা আর সৈয়দ মুজতবা আলির সংস্কৃত ও আলি-মেশানো ভাষা—সবই মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ভাষা শিল্পের বয়স-বিচারের দিক থেকে এঁরা সকলেই বীরবলের ভাবশিষ্য—এমন অপরিচিত বীক্ষিত লেখক প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে গেছেন। চলতি ভাষার লেখকবর্গ তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবেন।

STUDENTS COMMON-RO

বর্তমানে সাধুভাষা হিসেবে একমাত্র চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা রয়ে গেছে। জীবন্ত না থাকলেও, মৃত-প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেও, একালে অস্তিত্ব বজায় রাখা নিরর্থক। অনেকেক লেখক এরকম জোর করেই আজও অন্তত লেখ্য ভাষা বা standard writing languageরূপে একে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। আর একটু বিবর্তিত হলেই পরের ধাপে এ-ভাষা অনিবার্যভাবে চলতি ভাষার পরিণত হওয়ার কথা। এর প্রস্তরীভূত অবস্থার একমাত্র সার্থকতা হবে বৈশাদৃশ্য স্পষ্টীকৃত করে প্রগতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। এই সত্য উপলব্ধির পর সাধুভাষার শক্তিশালী লেখকেরা যত তাড়াতাড়ি ঐ স্তর অতিক্রম করে আসতে পারেন, ততই বাংলা সাহিত্য ও তাঁদের পক্ষে মঙ্গল। কমিলের দ্বারা বিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। দুঃখ এই যে, ঐ পুরাতন ধারায় এখনও গদ্য রচনা করার জন্যে কোন কোন শক্তিমান্ চিন্তাশীলের চিন্তাশক্তি অকেজো ও অপটু বিকাশবাহনের দ্বারা ব্যাহত হয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছে। চতুর্থ স্তরের সাধুভাষার আর কোন ভাষাতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই, কেবল গত যুগের তুলনায় বর্তমান কালের ভাষাগঠ প্রগতির পরিমাণ নিজ অস্তিত্বের দ্বারা অহরহ নির্দেশ করা ছাড়া।

"য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র"—চলতি ভাষায় লিখে নবযুগের পত্তন করে দিলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তখন ঐ ভাষায় আর তাঁর প্রধান গদ্যরচনা-কার্য পরিচালিত করেন নি। তখন সাহিত্যের আসরে বঙ্কিমচন্দ্র-মার্জিত কথ্যভাষামিশ্রিত সাধুভাষার প্রবল প্রতাপ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দীর্ঘকাল ঐ ভাষায় প্রধান প্রধান গদ্য রচনাগুলি নিষ্পন্ন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবে ধীরে ধীরে গদ্য রচনাগুলির বিভিন্ন স্তরে কথ্য-ভাষার প্রভাব বাড়িয়ে দিলেন, এখন তাই দেখা যাক। দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম পর্যন্ত ১৮৬৫-৮৭ সালের মধ্যে বিশ বছরে লেখা চোদ্দখানি উপন্যাসে বিভিন্ন স্তরিত্বের জন্যে কথোপকথনের ভাষায় কিভাবে মিশ্রভাষার ব্যবহার করা হয়েছে, তার দৃষ্টান্তগুলি আলোচ্য। প্রথমে দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে আশমানীর মুখের ভাষার উপর নজর পড়ে :—

"বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।...আমি খাদীঠাকুরকে বলে দেব, ঘরের ভিতরে কে ও? ও মাগী যে জেতে চাঁড়াল। খাদি যে তিনি! উঠে আমার দ্বার খুলে দাও।...সে কি! না খাও তো আমার মাথা খাও। এ যে পেট আর ভরে না। অলক্ষুণে। তুমি হাত ধোবে? আমি তোমাকে ঐ এঁটো আমার খাওয়াব। সে কি। হাত ধোও যে? ভাত খাও না।...খাও না খাও, একবার পাতের কাছে বোসো।...সূত্রের উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?...তুমি আমায় কেমন ভালোবাসো, আজ বুঝিয়া পড়িয়া তবে আমি যাব। তুমি আমার কথায় এই রাত্রে বাইতে পারো?...তবে যে মিন্সে, আমার এঁটো নাকি খাবি নে?...আমরা তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাব।"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ১৮৭৩ সালে দেখা যায়। দেবেন্দ্রের মুখের ভাষা :—

"আমি তোমারই আশায় এসেছিলাম"

কমল বলছে :—

"তোমার পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্যামী যদি [illegible]

আর তার স্বামী বলছেন :—

"হে হ'কে! তুমি পেটে ধর পঞ্চাশেক, মাথায় ধর আঠেক! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে।"

অন্যত্র দেবেন্দ্র বলছে :—

"যাবা! কোন্ গাছ থেকে? তুমি কাদের পেত্নী গা? পারলেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় সূচি-পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব—আজ একটু কেবল ত্রাতি পেয়ে যাও। তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি,—কোথাও দেখেছি হে।"

এ রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে আছে। সম্ভবত এই ভঙ্গির অনুকরণেই পরে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে সাধু ভাষার আর সব অংশ লিখে খাঁটি কথ্যভাষার সম্পূর্ণ কথোপকথন লিখতেন। ১৯০১ সালে "চোখের বালি" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সহসা সম্পূর্ণ সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উনিশ শতকেই গদ্য রচনায় চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা ব্যবহার করলেও "ঘরে-বাইরে" রচনার পূর্ববর্তী অনেক বছরে তিনি আবার একেবারে দ্বিতীয় স্তরে বিদ্যাসাগরি ভাষার রূপে ফিরে গিয়ে খাঁটি সাধুভাষার সমস্ত গদ্যরচনা লিখতে আরম্ভ করেন। সম্ভবত তিনি বেরেছিলেন যে খানিকটা সাধু ও খানিকটা চলতি ভাষার লেখা অর্থহীন; হয় সবটাই সাধুভাষার লেখা ভালো, নয় পুরো চলতি ভাষার লেখা উচিত। সেইজন্যে বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি বছর তিনি সাধুভাষার বিদ্যা-সাগর-ঘটিত স্তরে, যদিও নিজের রীতিতে, গদ্যরচনাগুলি নিষ্পন্ন করেন। তারপর ১৯১৪ সাল থেকে তিনি একেবারে মার্জিত চলিত ভাষার গদ্যে অর্থাৎ তাঁর নিজেরই ১৮৭৮ সালে প্রবর্তিত তৃতীয় পর্যায়ের চলতি ভাষায় উপনীত হন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিবর্তনের এই বিচিত্র গতি সরস কৌতূহলের বিষয়। তিনি ১৮৮১ সালে "বৌ ঠাকুরাণির হাট"-এ বঙ্কিমি গদ্যভাষা বা কথ্যমিশ্র সাধুভাষা, যদিও কম পরিমাণে, ব্যবহার করেছেন। এটি তৃতীয় স্তরের সাধুভাষা। আবার ১৮৯১ সালে চতুর্থস্তরের গদ্যভাষা ব্যবহার করার পর ১৯০১ সাল থেকে তাঁকে "চোখের বালি"-তে দ্বিতীয় স্তরের গদ্য ব্যবহার করতে দেখা গেল। ১৯১৪ সালে তিনি ১৮৭৮ সালের ভাষায় ফিরে গেলেন। এরপর আর তিনি পশ্চাদ্গতি অবলম্বন করেননি একটিমাত্র গল্পে ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার ইতিহাস সমালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি বারম্বার রচনার রীতি ও ভাষার রূপ পরিবর্তন করেছেন। এই চকল সাহিত্যপ্রয়াসের মনস্তাত্ত্বিক কারণ দুর্বোধ্য নয়। সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে কোন্‌টির সাফল্যলাভ অনিবার্য, সে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল; তা ছাড়া, তাঁর অসামান্য বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন পন্থায় আত্মবিকাশের পথে চরিতার্থতার সন্ধান করেছে। সাধু ও চলিত, দু ভাষাতেই যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, দুটিতেই রচিতা

আত্মপ্রকাশ করতে পারেন বটে, কিন্তু দুই প্রকাশের ধারা এবং তার রূপ ও রস স্বতন্ত্র। ১৮৭৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছর সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো মনস্বী পুরুষেরও অন্তর চারবার গদ্যভাষার রূপ বদল করতে দেখা যায়। যে পর্যন্ত তিনি কথ্যভাষার কণ্ঠেই বিভাষাকে অর্পণ করেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর কাল তিনি অনায়াসে বাধাহীনভাবে চলতি ভাষায় সমস্ত গদ্যরচনা প্রণয়ন করেছেন। এমন-কি, সেইদিকে তাঁর কবিতা রচনাতেও কথ্য ভঙ্গিমা প্রভাব ছড়িয়ে গেছে। সে-সম্বন্ধে বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় কিছু আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনা প্রসঙ্গে তাঁর অনুকৃত অনুরূপ রবীন্দ্রকাব্যের একটি দৃষ্টান্ত আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এইসব প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, আচার্য সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি মনীষীরা প্রমথ চলতি ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে ঠিক পথেই এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে এখনও যে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে, তা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনেরই অনুরূপ; যবনিকা তার অবসান হবে।

কতকগুলি দৃষ্টান্ত আলোচনা করে রবীন্দ্রগদ্যভাষার বিবর্তন ব্যাখ্যা করা যাক। ১৮৭৮ সালে তাঁর রচিত চলতি ভাষা ছিল এই রকম :—

"মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত—এ আর এক মতের ভয়ে ছাতা নেই। আষাঢ়ের ঘোর যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ্ টিপ্ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই হচ্ছে নিতান্ত পরদরকারে চলার তো চলছেই। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো গুন্ডভাবে হাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাচের জানলার উপর টিপ্‌টিপ্ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আষাঢ়ের বেলা শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল; এখনো আকাশ সমভাবে, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় যেন আদিতে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে ধারণ করবার একটা অবসন্ন মূর্তি।"

এই ভাষার ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, অব্যয় চলতি ভাষার; কিন্তু লিখিত তৎসম শব্দের যথেষ্ট ব্যবহারও এতে আছে। মুখের ভাষায় কেউ "জমি নিতান্ত পরদরকার" বললে সাধারণ লোকে হেসে ওঠে। কিন্তু লিখিত গদ্যরীতি বিষয়ে জ্ঞান তাতে সঙ্কুচিত হবেন না। তিনি ঘরোয়া আলাপেও কিছু বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি সাধারণ কথোপকথনেও শুধু যে সাধিয়ে গুছিয়ে বলতেন, তাই নয়, একটু "সাহিত্যিক" ধরণের ভাষাই ব্যবহার করতেন। শিক্ষিত অধ্যাপক-বৃন্দও, বিশেষত সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হলে, মুখের ভাষাতেও কিছু বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন যা সাধারণ লোকে করে না। কেবল তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে মনের গভীর গোপন কথাও নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনকেও বলা যায় না।

১৮৮১ সালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার অনুসরণ করেন। তিনি কথোপকথনে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় অনেক কম কথ্যভাষা ব্যবহার ক'রে "বৌঠাকুরাণির হাট" রচনা করেন। "চোখের বালি," "নৌকাডুবি" প্রভৃতি পুরোপুরি সাধুভাষায় রচিত। "বৌঠাকুরাণির হাট"-এ এক জায়গায় তাঁর বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত ভাষার দৃষ্টান্তের মতোই :—

"তুমি আমার শুশুরা, আমি তোমার জগন্নাথ ;...তবু মিনসে, শুশুরা যে জগন্নাথের বোন ;...আমি যে চাষা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ধি শ্রিহরমে।"

১৮৯৪ সালে "অতিথি" গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?" প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলর অধিক হইবে না। মতিবাবু উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।" ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নবীপাঁয়ে নামিয়ে দিতে পারো?" বাবু সম্প্রতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি।"

কেবল রীতির ঝোঁকেই সাধুভাষায় লিখেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুভাষা থেকে স্বতন্ত্র ধরণের ভাষা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর খাঁটি সাধুভাষার চরম উৎকর্ষের একটু নমুনা ১৮৯৪ সালেরই আর এক রচনা থেকে দেওয়া হল :—

"আজনার আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে—অধিকির জন্য সেই উজ্জ্বল ইরাবির দ্বারা আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে হাত দাঁকাইয়া তাহার সমস্ত বিপুল চক্ষু তারকার সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া সরল সুন্দর বিস্ময়ের একটি অস্ফুট ভাষার আভাস-মাত্র দিয়া লঘু চলিত বৃত্তে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে ক্রত-বেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা, বাসনা ও বিস্ময়ের, হাস্য, কটাক্ষ ও যুবজ্যোতির ঘূর্ণিত বৃষ্টি করিয়া দিয়া মর্মরেই মিলাইয়া গেল। শিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিল; আমি লজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেদনুদের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিত দেহে মুক্তির ক্ষেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই আভাসের মধ্যে, সেই আরাবলী গিরিমুক্তের সমস্ত বিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর, অনেক চুম্বন, অনেক কোমল করস্পর্শ নিস্তব্ধ অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কাহার কাছে অনেক কতগুলন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিঃশ্বাস আসিয়া পড়িত এবং আমার কপোলে একটি মৃদু সৌরভ প্রবণার সুকোমল গুড়না বারবার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার বাহুবন্ধনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুখভার নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত। সংস্কৃত সাহিত্যে যত যত ব্যবহৃত বহু সৌন্দর্যদ্যোতক বর্ণনা ও বিশেষ বিশেষ বাক্যাংশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৯১৪-পূর্ববর্তী রচনায় প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তো সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সৌন্দর্য ও ধ্বনিঝঙ্কারে নিতান্ত মুগ্ধ ছিলেন। এবং বঙ্কিম-যুগের সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি গদ্য লেখকদের রচনায় তদ্ভব শব্দের বেশি ও তৎসম শব্দের কম ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রতাপচন্দ্রের "বঙ্গাধিপ পরাজয়" উপন্যাসের এক এক জায়গায় চলতি ভাষার প্রয়োগ প্রায় আধুনিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে "চোখের বালি" উপন্যাসে কথোপকথনেও এই রকম বিশুদ্ধ সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন :—

বিহারী খাট হইতে উঠিল—অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপমান করিয়ো না—তোমার অক্ষমতা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ইহারই মধ্যে অধিকার ন্যায্য হইয়া গেছে? আজ তোমার নূতন নামকরণ করা যাক—বিনোদ-বিহারী।"

"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবার ভাষার ধারা পরিবর্তন করে সর্বত্র কথ্যভাষার সাহায্য গ্রহণ করলেন। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, বৌ ঠাকুরানির হাট, অতিথি, চোখের বালি ও ঘরে-বাইরে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে তাঁর গদ্যভাষার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি বেশ ধরা যায়।

১৯১৬ সালে প্রকাশিত "নিষ্কৃতিকৌটা" উপন্যাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৫১) চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন :—

হাইকোর্ট বন্ধ হইবার পরদিন অন্তঃপুরমধ্যে বিজয় বৈকালিক চা-পান করিতে বসিয়াছিল। তাহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, শুনলাম নাকি তুমি পশ্চিম বেড়াতে যাচ্ছ?"

"হাঁ বৌদিদি।"

"কোথা কোথা যাবে?"

বিজয় চা-পান শেষ করিয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া, পকেট হইতে সিগারেট-কেসটি বাহির করিতে করিতে বলিল—"প্রথমে যাব পয়া। বুদ্ধগয়ায় দুই একদিন থেকে সেখান থেকে যাব এলাহাবাদ।"

প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) যথাযথই কথোপকথনে কথ্যভাষা আর বর্ণনায় সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন। শরৎচন্দ্র চলতি ভাষায় অল্প গল্পরচনা সম্পন্ন করলেও তাঁর উপন্যাসে বরাবর ঐ চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা প্রয়োগ করেছেন। এমনও যে-সব খ্যাতনামা সাহিত্যিক সব রকমের রচনায় না হলেও উপন্যাসে ও গল্পে ঐ রকমের সাধুভাষার আশ্রয় মাঝে মাঝে নিয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাধিক জনপ্রিয়।

১৮৯৯ সালের "বঙ্গাধিপ পরাজয়" উপন্যাসের এক জায়গায় দেখা যায় :—

"বেলা প্রায় চারিদণ্ড আছে। মাঘ মাস, মাঠের জল শুকিয়েছে। কিন্তু জাঙ্গালের উত্তর খালের গভীরতা বশত ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি যেতে পারে, এমন জল আছে। জাঙ্গালের পশ্চিমের দাম শুষ্ক ও জনশূন্য। একে শীতকাল, তাতে আবার অপরাহ্ণ; দিবাকর প্রায় হয়ে যেন যোগায় মাখিতে ডিঙ্গি হুকুমে চৌকিদারের মতো আরোপ বুলিয়ে চুপচাপ।"

এই ধরণের সহজ চলতি ভাষা। এ সময় সমসাময়িক কালের প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আগত কথ্যভাষার মিশ্রণ-প্রবণতার প্রভাব। উপন্যাসটি ঘোটের উপর সাধুভাষায় লেখা। "বঙ্গাধিপ-পরাজয়" বা তারকনাথ গাঙ্গুলির "স্বর্ণলতা" (১৮৭৪) ধরণের রচনার গদ্যভাষার নতুন কোন ধারার উদ্ভব ঘটেনি। বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেই সিরিজ গ্রন্থের গুরুত্ব বিচার করা উচিত। সে হিসেবে যেমন "আলালের ঘরের দুলাল"-এর গুরুত্ব অসামান্য—কিন্তু "কুলমণি ও করুণার বিবরণ" একেবারে গুরুত্বহীন, তেমনি প্রতাপচন্দ্র, তারকনাথ প্রভৃতি সকলেই প্রথম গদ্যপ্রবর্তক বিভিন্ন পূর্বসূরীদের প্রবর্তিত গদ্যভাষার দ্বারা প্রভাবিত হলে একরকম উপেক্ষণীয়। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) বঙ্কিম-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। তাঁর রচনারীতি বঙ্কিমের মতো বর্ণাঢ্য বা চিত্রশোভিত ছিল না। কিন্তু গদ্যে সরল ভঙ্গির জন্যে তাঁর ভাষাও বেশ উপভোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯) "পালামৌ" গ্রন্থে খাঁটি রচনাসাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন এবং এরচেয়ে ভালো Belles Lettres বা রম্য রচনা বাংলা সাহিত্যে কমই রচিত হয়েছে। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের রচনা বিবর্তনের পারম্পর্য রক্ষা করে যুগপ্রভাব নির্ণয়ে সহায়ক হলেও স্বতন্ত্রভাবে সকলের রীতি আলোচনা করা অনাবশ্যক। প্রধান ধারাগুলির গতিপথ অনুসরণ করাই এই নিবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র তাঁদের গদ্যরচনায় ভাষার রূপায়ণে ও ঐশ্বর্যদানে অপেক্ষা সরলতা ও ভাবমূর্তি অনুশীলনের চেষ্টা বেশি করে করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে সব বিস্ময়কর সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তেমন কিছু শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের ভাষায় আঁকা যেত না। শরৎচন্দ্রের "আঁধারের রূপ" বা সাইক্লোন বর্ণনা প্রশংসনীয় হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রী-র রূপ বর্ণনা, জেব-উন্নিসার চিত্তবিক্ষোভবিবৃতি বা রবীন্দ্রনাথের "দুরাশা", "ক্ষুধিত পাষাণ" প্রভৃতি গল্পের ভাষার চিত্রসৌন্দর্য শরৎচন্দ্রের রচনায় অপ্রাপ্য। কিন্তু সংক্ষেপে বোঝাবার ক্ষমতা, সাধুতা ফুটিয়ে তোলা—বিশেষ করে হৃদয়ের গভীরতম স্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলির পূর্ণায়ত প্রস্ফুটনে শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত। "রত্নদীপ" উপন্যাসে প্রভাতকুমার আর "শ্রীকান্ত" উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সরলতা অনাড়ম্বর বর্ণনা দিয়ে একরকম ভাষার তুলিতেই সূক্ষ্মতম অনুভূতিরাশির সূক্ষ্মতম কম্পন পর্যন্ত রেখাঙ্কিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত হলেও তাঁদের গদ্যভাষায় এমন কোন অভিনব প্রবর্তনা নেই যার আলোচনা বাংলা গদ্যের বিবর্তনসহজে বোঝার জন্যে অপরিহার্য।

এ ডে'জ প্লেজার

শ্রীতন্ময় বাগচী

চারিদিকের শান্ত নিস্তব্ধ এক সন্ধ্যা।

ঝোপে ঝাপে ঢাকা এক সাগর তীরে বসে আছে তরুণ-তরুণী। পিঠের কাছের একটা মোটা পাথর তাদের আড়াল করে রেখেছে। তার ওপর ঝড় জলের আঘাত সহ্য করেও একটা শুকনো পাতা আছে। সেটি হয়েছে আসন। সামনের এ্যাশ্‌বীচের ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে দিয়েও তারা দেখতে পাচ্ছে শান্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ রূপ। তারি ছোট ছোট ঢেউ এসে লাগছে তীরের নুড়ির গায়ে।

সহরের কোলাহলের বহু দূরে এই বাসগাটি। পাড় ঘরে বেড়াতে বেড়াতে তারা এটি আবিষ্কার করেছে। তরুণী নীরব, তরুণ কিন্তু মুখর।

এই শান্ত নির্জনের মাঝে গড়ে তুলব বাড়ি। বন্ধুকের মত সাদা হবে তার রং। খড়ের চালের ওপর আইভি লতা গজিয়ে উঠবে।

'জানলাগুলো থাকবে খুব পুরানো। তার শার্সি হবে এতটুকু কিন্তু রং থাকবে সবুজ। দরজার ওপর দেওয়ালের গায়ে ঝুলবে বনের সবচেয়ে বড় হরিণের মাথা। বছরের পর বছর চড়াই আর শালিখ এসে বাসা বাঁধবে গোয়াল-ঘরের চালে কিংবা ঘুলঘুলিতে।'

'এখানে ক্ষেত খামার কোথায় যে পাখিগুলো বেঁচে থাকবে?'

'ক্ষেত খামার না থাক্ তবু ওদের থাকতেই হবে। আমি দেখব রোজ সন্ধ্যায় ওরা বাড়ি ফিরে আসবে, আর তাদের বাচ্চারা কেমন আনন্দে কিচির-মিচির সুরু করে দেবে!'

'শালিখ আর চড়াই না হয় থাকবে, কিন্তু তা বলে ওদের বাচ্চাগুলো নয়। ওরা বড় জ্বালায়। তার চেয়ে একটা বেশ বড় সবুজ রং-এর টিয়া পাখি থাকবে। আমরা কফি খেতে ঢুকলেই সে সাদর সম্ভাষণ জানাবে!'

'টিয়া পাখির সাথে একটা বাচ্চাকেও থাকতে হবে।'

'বেশ। তবে বাচ্চা কিন্তু খুব ছোট্ট হওয়া চাই।'

'হ্যাঁ দেখ—ঠিক এতটুকু…'

'খাবার ঘরের দরজার রং হবে সবুজ, আর সেগুলো খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হবে। দরজার ওপর-তাকে থাকবে নানা রকমের অদ্ভুত সব বাসন। চেয়ারগুলোরও রং হবে সবুজ। আর তার গায়ে থাকবে লাল ফুল আঁকা। এ ছাড়া ঘরের এক কোণে একটা সবুজ টেবিলের ওপর তামার চায়ের সরঞ্জাম থাকবে।'

'আর দেওয়াল-ঘড়ি?'

'হ্যাঁ তাও থাকবে। দেয়ালে ঝুলবে আদাম-ইভের পতনের ছবি, আর লোহিত সাগরে ফ্যারাও-এর ডুবে-মরা ছবি।'

'কিন্তু বৈঠকখানা?'

'বৈঠকখানার থাকবে শুধু তিনটে জানলা—যাতে করে গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাবে।'

'তাহলে যে সারাক্ষণ রৌদ্র ঢুকবে!'

'জানলাগুলো খোলা থাকবে ভেবেছ? না…না… সুগন্ধ লতার ঝাড়ে ঢেকে যাবে জানলা। তাহলে রৌদ্রের দোড়া ঢুকতে পারবে না। কতক ফালি টুকরো এসে পড়বে শুধু। ঘরের মাঝখানে থাকবে ডিমের মত মেহগিনির টেবিল, তার পাগুলো হবে নখের মত। নীচু নীচু গদিতে মোড়া চেয়ার আর এক কোণে পিয়ানো। জানলার নীচেই থাকবে রাঙা টবের ওপর পাম গাছের চারা।'

'আমার সেলাই-এর টেবিল কোথায় থাকবে ?'

'সেটা থাকবে জানলার ঠিক নীচে। পুরোনো গীর্জার জানলার মত সেটা শিসের শার্সিতে আঁটা। তাতে গাঢ়ো লাল নীল আর হলদে রং-এর থাকবে সাধু সন্ন্যাসীর ছবি। তাকের ওপর উঠবে কার্ণ-আর আইভি লতা। বড় বড় টবে থাকবে হলদে আর সাদা শালুক। আর কাঁচের গ্লাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে সোনালি মাছ। তুমি নিজে হাতে তাদের খাবার দেবে। আরো চাই ক'একটা বরফের মত সাদা, সমুদ্রের মত নীল আর ঝরা ফুলের মত ক'একটা পাখরা। বারান্দার সিঁড়িতে তুমি যখন শুভ্র পোশাক, নীলাভ জুতো মোজা, আর গলায় রক্ত-প্রবালের মালা পরে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন তারা তোমার মাথার ওপর ঘুরে বেড়াবে। তোমার গায়ে বসবে, মাথায় চড়বে, আবার হাত থেকে ধান খেয়ে যাবে···'

তরুণী আরো একটু সরে এলো তরুণের কাছে।

'আমার পড়বার ঘর ?'

'তোমার ঘর হবে পূবদিকে। জানলার সামনে নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে প্রকাণ্ড এক বাদাম গাছ। গাছের নীচে থাকবে সবচেয়ে রুচি সবচেয়ে কোমল ঘাসের ওপর বেতের চেয়ার টেবিল আর ঝুলবে দোলনা। দু' ফুট লম্বা একটা দূরবীণও বাদ যাবে না। সেটার কাজ হবে জাহাজের যাতায়াত লক্ষ্য করা।'

'আসবাব পত্র ?'

'সেগুলো তোমার যখন হবে, তখন ঠিক করবে তুমি।'

'না···না তোমাকেই বলতে হবে।'

'সাদার মাঝে সোনালী রেখা আর তার ওপর ফিকে নীল জমিতে ফুল তোলা রেশমের গদি। চামড়ার মত কাগজ-চাকা দেওয়ালে থাকবে সোনালী আভা আর পর্দার কাপড় ও রং হবে চেয়ারের মতই। ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা থাকবে লম্বা টেবিল। মাথাটা বেঁকানো আর ধারে ধারে সোনার জল লাগানো। তার ওপর কাঁচের ফুল-দানিতে ঝুলবে তিনকোনা কাঁচ।'

'সব তো হোল, কিন্তু উনুনের কি ব্যবস্থা হবে শুনি ?'

'উনুন কি হবে ? বসন্ত আর গরমকালে বাড়ি-ঘর বেশ গরম থাকবে আর শরৎ-শীতে তো কোপেনহেগেনে থাকব গিয়ে।'

'বাকি রইল তোমার পড়ার ঘর আর বেডরুমটা।'

'আমার পড়ার ঘরও হবে ঐ পূবদিকেরই কোণে। জানলা দিয়ে দেখা যাবে ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে শুধু বন জংগল আর পাহাড়। বিদায়ী সূর্যের শেষ আলোয় উদ্ভাসিত কত করুণ ছবি। জানলা হবে মোটে একটা—তার ওপর ঝুলবে মোটা ভারি পর্দা। কাপড়-চোপড়ের বদলে থাকবে শুধু বাঘ সিংহের ছাল চামড়া। আসবাব হবে শক্ত ওক্ কাঠের—যাতে একটা গুরু গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। ছবিগুলো হবে সেকেলের বীর পুরুষদের মত। দেওয়ালে ঝুলবে অস্ত্রশস্ত্র; আর একটা গোপন দরজা। বই-এর পিছন দিকে একটা মরচেধরা পেরেকে লেগে থাকবে গোপন কলা-কৌশল !'

অজানা আশংকায় অহেতুক শিউরে ওঠে তরুণী !

'সেই গোপন দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া হবে শুনি ?'

'অ···নে···ক অ···নে···ক নীচের অন্ধকার সুড়ঙ্গে। যেখানে একশ' বছর আগে এক বাড়ির মালিককে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। না···তা নয়। দরজা দিয়ে যাওয়া যাবে গোল ঘরটিতে—যেখানে তুমি পালংকে শুয়ে থাকো। মাথার কাছের মার্বেলের টেবিলের ওপর মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলো-আঁধারের মাঝে তুমি যেন কি দেখছ আর ভাবছ। বই পড়ছিলে কিন্তু এখন সেটা সাদা ধপধপে চাদরের ওপর অনাবৃতভাবে পড়ে আছে। গলার নীচে দু'হাত রেখে শুয়ে আছে;—কালো নরম চুলগুলো মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় দু' চোখে স্বপ্নাতুর ভাব যেন কিসের প্রতীক্ষায় আছে ! যেন কোন গোপন ইংগিত শুনছ ! হঠাৎ শুনতে পেলে গুপ্ত দরজা খোলার একটু আওয়াজ। তোমার ঠোঁটের ওপর খেলে গেল এক টুকরো ছোট্ট শান্ত হাসি ! নড়লে না —সেই ভাবেই শুয়ে রইলে। চোরের মত পায়ের খুট্ খুট্ অস্পষ্ট শব্দ যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। টেবিলের ওপর বইটা ছুঁড়ে ফেলে দু'চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শুলে। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। তারপর একটা মুখ

নিঃশব্দে নেমে এলো তোমার মুখের ওপর! আনন্দের অস্ফুট একটু শব্দ করে তুমি তার গলাটি জড়িয়ে ধরলে···'

চারিদিকের সুবাসিত গন্ধ-বন্যার মাঝে এমনিভাবে তরুণ-তরুণীর কল্পনা ডানা মেলে দিয়েছে। সমুদ্র তটে এসে আছড়ে পড়ছে ছোট্ট ছোট্ট শান্ত ঢেউ। চারদিকে ধীরে ধীরে নামছে অন্ধকারের স্বচ্ছ আবরণ। তাদের দৃষ্টি চলে গেছে বন-কোপের ঘন সবুজ মাথা ছেদ করে সুদূরের আকাশের গায়ে। ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড থালার মত সূর্য ডুবে গেল মেঘের কোলে। টুপটাপ করে পড়তে সুরু হোল শিশিরের ফোঁটা! তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'চল এবার ওঠা যাক্। মা বোধ হয় চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।'

ক্লান্ত শূন্য মনে বন জংগল পার হয়ে তারা এগিয়ে চলল ষ্টেশনের দিকে।

'এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করছে না'—হঠাৎ থেমে পড়ে তরুণী বলে উঠল।

শংকার চিহ্ন ফুটে উঠল তরুণের চোখে-মুখে।

'তোমার তো কিছুই অজানা নেই···'

'না···না···ঠিক আছে। সত্যি কি অবুঝের মত কথাই না বললাম!'

ষ্টেশনে এসে পড়ে দু'জনে। টিকিট ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে তরুণ একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

তরুণীর চোখে এড়াল না তরুণের ইতস্ততঃ ভাব। সাগ্রহে বলে ওঠে—'হ্যাঁ থার্ড ক্লাসই কাটো। এ সময় ট্রেণে তেমন ভীড় থাকে না। তাছাড়া আজ অনেক খরচ হয়ে গেছে সে খেয়াল আছে?'

---

* গুস্তাব ফ্লবেড্ অবলম্বনে।

নাম ও প্রেম

(Spenser-এর একটি সনেটের অনুবাদ)

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

লিখ্‌লাম নাম তার একদিন বালুকা-বেলায়
পরক্ষণে ঢেউ এসে মুছে নিল চোখের নিমেষে;
আবার লিখেছি নাম, অমনি তোয়ার ধারা এসে
আমার বহের লেখা ধুয়ে দিল এক লহমায়।
'বৃথা আশা, বললে সে, 'বৃথা এ-চেষ্টার ইতিহাস',
অমর করার সাধ ক্ষণস্থায়ী যা' এই ধরায়;
আমি নিজে ভালোবাসি এই অবক্ষয় যে হেথায়,
মুছুক এমনি ক'রে আমার এ-নামের আশ্বাস।'

'তা' তো নয়'—আমি বলি—'তুচ্ছ যা' মিলাক ধূলি' পরে,
তুমি র'বে চিরদিন এ-ধরায় যশের অমৃতে;
আমার কবিতা দেবে অমরতা তোমায় আদরে,
তোমার মধুর নাম লিখে' দেব স্বর্গ-সরণিতে!
মরণ আসবে যবে ধরণীরে পরাজয় দিতে,
আমাদের প্রেম শুধু বেঁচে র'বে অমর অক্ষরে।'

জীবন সন্ধ্যায় তুমি

(W. B. Yeats অবলম্বনে)

শ্রীপঞ্চানন বসু

জীবন সন্ধ্যায় তুমি পক্ককেশে ঘুমচোখে ব'সে,
তন্দ্রায় জড়িত শ্লোকে এ-কবিতা পড়বে সাদরে,
কোমল দৃষ্টির মায়া, ধরা দেবে স্বপ্নের গোচরে,
পুষ্পিত একদা চোখে এবং যে গভীরতা খ'সে;

অনেকে বেসেছে ভালো তোমারি-সে মুহূর্ত উজ্জ্বল,
লাবণ্য অথবা প্রেমে—অকৃত্রিম কিম্বা ছলনার,
কিন্তু সে বেসেছে ভালো পরিব্রাজ আত্মাকে তোমার,
এবং তোমার দুঃখ বিচলিত মুখের সম্বল;

আপন গণ্ডীর বৃত্তে সবিষাদে চিন্তানত শিরে
তুলবে গুঞ্জনে শেষে—সেই প্রেম ধীরপদে তার
কেমনে লঙ্ঘন ক'রে মস্তকের উত্তুঙ্গ পাহাড়
লুকাল নীরবে মুখ এক ঝাঁক তারকার ভীড়ে।

তোমরা কি লক্ষ্য করেছ ?

উপানন্দ

ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট। তাকে দেখা যায় না। সে আসে যেন হঠাৎ মেঘ-ভাঙা রৌদ্রের মত। জীবনের বীজ যেমন ভাবে বুনে যাবে তোমরা, তেমন ভাবে ফলবে ফসল। সেই ভবিষ্যৎই আসবে তোমাদের পরীক্ষার দিন, সেদিন পড়বে মনে কোন্ ক্ষেতে ভুলে-যাওয়া কোন্ বছর রৌদ্র আলো আর বৃষ্টি ধারার বীজ বুনেছিলে তোমরা। ফসল যদি ভালো না ফলাতে পারো, তা হোলে তোমের ফলে কাটিয়ে দিতে হবে জীবনের সুদীর্ঘ দিনগুলি,অনাদরে, অবহেলায়, দারিদ্রো আর অর্দ্ধাশনে—কত কষ্টই না পেতে হবে ! কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকবে না যাতে করে রীতিমত অর্থোপার্জ্জন করে দুঃখকষ্টের লাঘব করতে পারো। প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত চলেছে অবিরাম গতিতে—তার চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটায়—টিক্ টিক্—টিক্ টিক্। আজ যে কাজটা ভালো করে করা হোলো না, যে পড়াটা ভালো করে তৈরী করা গেল না, যে আঁকটা ভালো করে কষে উত্তর মেলানো হোলো না, সেই গুলো পড়ে ভুলে-যাওয়ার অন্ধকারে, ফলে আর তার দিকে ভালো করে দৃষ্টি দেবার আসবে না অবসর। এমি করে পেছনে-ফেলে-রেখে-যাওয়া কাজগুলো আর পাওয়া যাবে না খুঁজে। সময়ের মূল্য ও শিক্ষার আবশ্যকতা যারা উপলব্ধি করতে পারে না ছাত্র জীবনে, তারাই উত্তর-কালে পায় অশেষ দুর্গতি সমাজ সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে। এগুলো পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে জীবনের বীজ বুনে যাও উর্ব্বর করে জ্ঞানের ক্ষেত্র।

তোমরা কি লক্ষ্য করেছ টুকরো টুকরো পড়ে থাকে তোমাদের মন নানাদিকে, তাই পড়বার সময়ে কথা বলতে থাকো আর সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করো আষোল তাষোল। যা কিছু বলবার বা জিজ্ঞাসা করবার থাকে, তাও মন থেকে যায় হারিয়ে—যা পড়ো, তাও আলোচনা করবার জন্যে ইচ্ছুক হওনা, তাই পড়ার মত পড়া হয় না। তোমাদের অলস কল্পনার রঙীন ফানুসগুলো উড়িয়ে দিয়ে, মানুষ হবার পথের দিকে চেয়ে দেখো না। টুকরো টুকরো মন নানা দিক থেকে গুটিয়ে এনে বইয়ের পাতায় পাতায় টেনে রেখে যাও, যেন লেখাপড়া সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। বই পড়া খুবই দরকার, গ্রন্থের মত পরম বান্ধব, পবিত্র সহচর কোথায় পাবে ?

সাগর পারের ছেলে মেয়েরাই শুধু নয়,আজকের দিনে অন্যান্যরাও খুব অধ্যবসায় করে—তারা আজ তোমাদের ওপর টেক্কা দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে কিন্তু তোমাদের মন উড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে—তোমরা ছুটছ খেলার মাঠে, সিনেমা হলে, তাদের আড্ডায় আর পাড়া বেড়াতে, পরীক্ষার কিছু আগে অবশ্য উৎসাহ নিয়ে পড়তে বসো, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কিনা তার অনিশ্চয়তার ঘূর্ণী হাওয়ার শেষ পর্য্যন্ত থাক পেতে থাকো—এমিভাবে আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করেছ তোমরা অধিকাংশ বাঙালী ছাত্র ছাত্রী। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হটে আসছে আজ বাঙালী, এই শোকাবহ, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা একবারও ভেবে দেখো—গুরু-শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে পর্য্যন্ত তোমরা অশ্রদ্ধা করো, তাঁরা পড়াতে এলে হয় আষোল তাষোল গল্প করো, নয় আজ আর পড়বো না বলে বিদায় করে দাও—এমি করে নিজেরা নিজেদের ফাঁকি দিয়ে চলেছ, জাতিকে দিয়ে চলেছ' অবনতির পথে, অভিভাবক ও পরিবারবর্গকে দিচ্ছ মর্ম্মান্তিক বেদনা।

পাঠ কঠিন হোলে ভয় পাবে কেন ? বরং যত কঠিন হবে, ততই তাতে বেশী মনোযোগ দেবে—শুদ্ধরূপে মুখস্থ করবার চেষ্টা করবে। আজ তোমাদের উচ্চারণ দোষ ঘটায় এমন এক শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি করছে—যা হয়ে উঠছে হাস্যোদ্দীপক ও গ্লানিকর, তাই তোমাদের মুখে শুনি—'ডিস্ট্রার্ক্টের' বলবে 'ডিগার্ক্ট', 'আকস' শুনি 'আস্কের' বলবে—এ্যাকের বলবে শুনি এ্যাক, ব'ড়োর বলবে শুনি 'বরো'। ঠিক মত উচ্চারণ না হোলে কথা বুঝবার আকাশ কোথায় ? 'সঙ্গে' শব্দটী ভুলে গেছ—'সাথে' বলো, যা একমাত্র কবিতাতেই প্রচলিত—এটী গভীর অনুতাপের বিষয়। যে কথাই এর পরিবর্তে বলতে সিখেছ সে

'বক্তা দেবেন। সে ডাকবে, না বা'লে তোমরা বলো—'সে ডাকে' এই সব ত্রুটিকুটু লক্ষ করেও তোমরা খুশি। অসংখ্য বানান ভুল দেখা যায় তোমাদের লেখায়, তার কারণ তোমরা অমনযস্ক। পূর্ণ নোট বই বা গুরু-শিক্ষকের প্রচলন ছিল না। যে সময়ে যেই উনবিংশ শতাব্দীতে আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা হয়েছিল—স্বাধিকারলিপ্ত ঘুমে ঘুমে ভরেছিলেন বাঙালীর যেই মনীষীরা যত্ন জননীর প্রাণস্পন্দনের সন্ধানরা—আর আজ?

তোমরা কি ছেলে বেলায় তোমাদের উপরি বা অবসরের ওপর খেলার ও আজির উপরি বা অবসরের সম্বন্ধে আবদ্ধ? তাই বলি, তোমরা পরিবর্তনশীল ও অবাধগামী হয়ে বাঙালার ঐতিহ্য-হারানো দীর্ঘ প্রাক্তনের ছিন্ন পতাকাগুলিকে তুলে নিয়ে ভূমণ্ডলের ওপর বাঙালীর গৌরব পতাকা তুলে ধরবার জন্যে ঐকান্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও—স্বাস্থ্যের সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভীতিকে পরাজিত করে, সমস্ত বাধা বিঘ্ন ছিন্নোদ্যত করে তোমরা স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ, আচার্য-প্রাণ রবীন্দ্রনাথ, আচার্যপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য জগদীশ চন্দ্রের মত জিজ্ঞাসের জীবন গঠন করে তাগাবিড়ম্বিতা বঙ্গ-জননীকে রাজ-রাজেশ্বরী করে তোলো। এমন তোমাদের কাছে বড় বড় মনীষীদের কথা বলছি—শোনো।

গ্রন্থ পাঠ সম্পর্কে লোপেনবাবু বলেছেন, যে কোন প্রয়োজনীয় উপযোগী বই পেলেই, অবিলম্বে দু'বার পড়া করে নেওয়া উচিত—দু'বার অন্তত না পড়লে কোন বই সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি হয় না। প্রথমবার পড়বার সময় হয়তো উপন্যাস অধিকতা থাকে, গল্পাংশে অযথা কৌতূহল কম্বার মেজাজের অভাব ঘটে, একত্রে বইয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধলাভ হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়বার পাঠের পর-সে আড়ষ্টতা আর থাকে না, গ্রন্থের পরিচয় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। চার্লস ল্যাম্ব বলেছেন, প্রত্যেক ভালো বই অন্তত তিনবার পড়ে নিলে তবে ঠিক মত পড়া হয়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ যতবার পড়া যায়, ততবারই পড়তে ইচ্ছা হয়—যে সব গ্রন্থ স্থায়িক মহাসম্পদে করেছে, তারা আমাদের কাছে চির নূতন।

কোল্‌রিজের অনেকগুলি প্রিয় গ্রন্থ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম 'পিল্‌গ্রিমস্‌ প্রোগ্রেস'—এই বইখানি তিনি বহুবারই পোড়েছেন—কখন মার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে তর্কশাস্ত্রকের মত, কখন ভক্তির প্রগাঢ়তায় ভাগবতের মত, কখন বা কবির চক্ষু নিয়ে রামায়ণের মত—প্রত্যেকবারই নব-নব ভাবের সমাবেশন করে তিনি আনন্দে বিভোর হয়েছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল শোনের ছোমার পড়েছেন নিশ্চ ত্রিশবার। মিলের মতই একাধিকবার পড়েছেন অসমাপ্তের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি।

'হ্যাম্লেট ত্রিলজি' বইখানি পঞ্চাশবার পড়েছেন ব্রাণবির ডাঃ আর্ণল্ড। মাঝে মাঝে একখানি বই পড়াটাই বড় কথা নয়, পড়ার মত পড়াই হচ্ছে আসল কথা। লরেন্স হ্যাট বলেন, এডিন্বরার 'মেটা-ফিজিক্স' চল্লিশবার পড়েও আরিস্তোত্ত ও লিসেটাস বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারেন নি, তবু তাঁরা বারে বারে পড়েছেন, শেষে বুঝতে পেরে বইখানি মুড়ে রেখেছিলেন।

'রাসিনা' বইখানি সতেরো বার এবং প্রুটার্ক বেশ কিছু বার পড়েছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। জেন অষ্টেনের প্রত্যেক উপন্যাসই খুশি ছিল স্যর ওয়াল্টার স্কটের। প্রত্যেক বছরে একবার করে তিনি স্কটের সব উপন্যাস পড়তেন। আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা বঙ্কিম, শরৎ ও রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী বারে বারে পড়ে থাকেন, অনেকের মুখস্থও হয়ে গেছে।

কয়েক বছর আগেকার কথা—'দি টাইমস্‌' পত্রিকায় একটি সাহিত্য পরিষদের পরিচয় দেওয়া ছিল। এই পরিষদের সভ্য হোতে গেলে, থাকবার 'এসেন্স' বইখানি পঠিশ বার পড়ে নিয়ে মুখস্থ সভ্য হওয়া যাবে না। কার্লাইলের ভক্ত মেজাজেও আলেকজাণ্ডার স্কট কার্লাইলকে বলেছিলেন যে, 'স্লেক হেরলিটনস' বইখানি তিনি চার বার পড়েছেন,—সেখে আছে তাঁর মনে এই বইয়ের প্রত্যেকটী কথা। প্যাটারের 'ষ্টাডিজ ইন্‌ দি হিষ্ট্রি অব দি রেনেসাঁস' বইখানি অক্সফোর্ডের ঘরে ঘরে সোনার বই। এই বইখানি না নিয়ে তিনি কোথাও বেড়াতে যেতেন না।

একবার ওয়াল্ট হুইটম্যানের সম্বন্ধকালিত লিভস অব গ্রাস' কবিতার বইখানি নিয়েছিলেন হোর্স ম্যাডক্স ব্রাউন, এ্যানি সিলক্রাইষ্টকে। এই বই পেয়ে শ্রীমতী সিলক্রাইষ্ট আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন এই বই পাবার পর তাঁর আছে আর কোন বই পড়বার মত মনে হিরেছিল হয় নি। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—'এটী আমাকে একেবারে মুগ্ধ করেছে, যারে যারে পরমবিস্ময়ে আর আনন্দে পাঠ করি—'

চৌসরের 'ঘড' প্রথম প্রকাশিত হোলে মার্ক বেক ছিল রাত্রিদিন সব সময়েই তাঁর কাছে মতের এক কপি রাখতেন। কৈশোরোত্তর বিদ্যে মার্ক প্যাটিসন একবার পড়েছেন শিলবার্ট হোয়াইটের 'আলর্স হিষ্ট্রি অব সেলবোর্ন' যে বইয়ের প্রত্যেক পৃষ্ঠাটী তাঁর মুখস্থ ছিল, আর শিবরের আন্তরিক পড়ে পড়ে তাঁর এমনই অবস্থা হয়েছিল যে প্রত্যেকটী অনুচ্ছেদ তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন।

প্রেস্রাফিক প্রারিসন বলেছেন—'বজাতীয় স্বনামধন্য কবিদের গ্রন্থ শুধু পড়া নয়, বারে বারে এমন ভাবে পড়া দরকার যাতে তাঁদের প্রাণের সুর, তাঁদের মন মেজাজ, তাঁদের ভাব-অনুভাব আমাদের অন্তরে, আমাদের প্রকৃতিতে মিশে যায়—যে পৃথিবী তাঁরা আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সেই পৃথিবীতে যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, ততদিন তাঁদের অনুধ্যান করবো আর পরিপুষ্টিলাভ করবো তাঁদের মানসিক ভোজ্য গ্রহণ করে—'

কী অসাধারণ কবিস্বীকৃতি আর কাব্যানুরাগ! এইসব মনীষীর মর্মের মর্মর বাণী যেন তোমাদের মনে মন্ত্রের মিতে ওঠে যাতে তোমরাও এঁদের মত গ্রন্থপাঠ করে জ্ঞানী হোতে পারো। আজকের দিনের পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের মত জ্ঞান-তপস্বী, তাই এঁরা কোন কাজে ফাঁকি দেন না—একনিষ্ঠ সাধনার মত থাকেন যে কাজই করুন না কেন। আজ তাই পাশ্চাত্য জগতের

ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে উচ্চ মনের প্রভাবান দীপ্তিমান মানুষ। দুঃখ এই, পাশ্চাত্য জাতির ভালো দিকটা আমরা গ্রহণ করলাম না, অনুকরণ করলাম তার খারাপ দিকটা, তাই এগিয়ে পড়ল। নিজের জন্মভূমির ওপর যদি এসে থাকে তোমাদের সহজাত ভালোবাসা, হৃদয়-মন ও দেহের পরিপূর্ণ শক্তির সাহায্যে জন্মভূমিকে গড়ে তোলবার থাকে অদম্য স্পৃহা, তাহলে তোমরা তোমাদের ছাত্রজীবনকে সুষমাময় করে তোলো, বাঙালীর হৃত গৌরব ও সম্পদকে উদ্ধার করেছেনে আমাদের আজকের দিনের কলঙ্ক দূর করো। তোমাদের আপনা থেকে মনে জেগে উঠুক জিজ্ঞাসা—'আমরা আজ কোথায়?' আমাদের বিষণ্ণ গোধূলিতে ভর দেবে তোমাদের নবীন যুগের উষা—ভাবী বাঙলার গৌরব। আশা করে আছি তোমরা একদিন বাঙালীর লুপ্ত রক্ষা করবে। দুঃখের বিষয় পাঠ করেও আজকের দিনে কেউ প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে উঠতে পারছে না। পরধর্ম-গ্রাহী বিদ্যার্জন করে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে নিজেকে আবদ্ধ রাখছে। সাধারণ স্নাতকোত্তর স্তরের মধ্যেও বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না, স্বতন্ত্র ভাবে চিন্তা করে বিচার বোধশক্তি প্রকাশ করবার ক্ষমতা যা ছিল বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, আজ তা অবলুপ্ত প্রায়—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আজকের দিনের বাঙালী ছেলেমেয়েরাই কেবল পিছিয়ে পড়ছে, এটা গভীর অনুতাপের কথা। তোমরা এগিয়ে চলো।

অর্ধশিক্ষিত লোকের মতই নাস্তিক শিক্ষিত লোকের চালচলন কথাবার্তা আর ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায়। যেমন কুসংস্কার, চিত্তের মলিনতা, মিথ্যা ভাষণ, ঘুষাঘুষি, মানসিক দৈন্য ও কুসংস্কার সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে, সেই সবই এদের মধ্যে অবস্থিত—ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে মানুষকে হায়রান করে, মানসিকজ্ঞানহীনতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে তারা যখনেরই অকল্যাণ করে থাকে, শুধু নিজেদের নয়।

বর্তমানের তমসাচ্ছন্ন সন্ধ্যার রাজপথে দূরে রয়েছে তোমাদের বৈশাখিন সকালগুলো—মানা প্রলোভন তোমাদের চারিদিকে ভ্রাম্যমান; এরই ভেতর তোমাদের খুঁজে নিতে হবে কোথায় অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দীপশিখা রয়েছে। তথাকথিত সাধারণ স্নাতকোত্তর ছেলেমেয়েদের মত তোমরা যেন কুপ্রবৃত্তি, কুবুদ্ধি ও কুসঙ্গের চাপে পড়ে নিজেদের আত্মবিলোপ সাধন করো না—ভবিষ্যৎ জীবনকে যেন করোনা কলুষ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা বিষয়ক নানা মূল্যবান গ্রন্থ পড়ে জ্ঞান আহরণ করবার চেষ্টা করো—আর তা কাজে প্রয়োগ করে দেশের মুখোজ্জ্বল হবার জন্যে প্রস্তুত হও—কেবলমাত্র উত্তেজক চটুলতার গ্রন্থ পড়ে আর সিনেমা দেখে অমূল্য সময় অপচয় করো না, এই আমার অনুরোধ তোমাদের কাছে।

পাখী ও কবি

'বৈভব'

ওগো পাখী গাও গান
　　কাহার তরে?
কে শোনে ও গান তব
　　মোহন করে?
বনানীর মনপ্রাণ
করে কেন আনচান
শুনিয়া তোমার গান
　　পাখার পরে
তুমি পাখী গান গাও
　　কাহার তরে?

কেন তুমি গান গাও
　　কেন একেলা
কিছু কি লাগেনা ভালো
　　পৃথিবী-খেলা?
তুমি বুঝি বাসো ভালো
উষার অরুণ আলো
তারি তরে গান ঢালো
　　প্রভাত বেলা?
পৃথিবী কি শুধু ওগো
　　মায়ার খেলা?

নই আমি নই কেউ
　　ওগো ও কবি!
আমার প্রভাত গান
　　আপনি রবি।
কাহারেও চাহি নাই
যেখানেতে সীমা নাই
সেখানেতে উড়ে যাই
　　কেহনা সবি।
নই আমি নই কারো
　　ওগো ও কবি!

তোমার পৃথিবী আর
　　বনানী মেলি
সুনীল আকাশ বুকে
　　একেলা খেলি।
অসীমের গান গাই
অসীমের প্রাণ পাই
যেথি তার সীমা নাই
　　মনে মেলি,
সুনীল আকাশ বুকে
　　একেলা খেলি।

যখন বাতাস ঠেলি
　　উপরে উঠি
মনে হয় পৃথিবী সে
　　মিলাছে দুটি;
অজানা কি হিল্লোলে
আমার সকল দোলে
দেখা অসীমের কোলে
　　দুটি যে ফুটি,

পৃথিবী যে আজ মোরে
নিয়াছে তুই!
যেখানেতে নিরজনে
কাটাই ছায়ালো
সঙ্গী যে নিছে যাচে
পরাণ-আলো:
প্রাণ মোর থেমে যায়
প্রাণ করে হাহ হাহ
চারিধার চোখে ভায়
কি যোর কালো!
সেখানে একেলা আমি
নিলাম ভালো।

পৃথিবী ডাকিয়াকয়
'আয় রে নামি
আমার এ কলরোল
নিয়াছে থামি।'
দূরের কুয়াশার
করুনা পাখা-তার
বহিতে পারি না আর
ফিরিনু আমি
পৃথিবী ডাকিল হায়—
—আয় রে নামি!

যাই যাই ছুটে যাই
আকাশ বুকে
জাগে নাকো ভালো মোর
স্নেহ ও সুখে
আকাশ ডাকিছে ওই,
'কই পাখী, কই কই—
মোর বুকে প্রাণ তুই
যাস্ কি দুখে?'
যাই যাই ছুটে যাই
আকাশ বুকে!

জাতকের গল্প

রথীন দেব

জাতকের গল্প শোনার আগে, 'জাতক' কি?—এই সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা রাখা ভালো। ভগবান বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব-জীবনের বিভিন্ন কাহিনী নিয়েই 'জাতক' এর সৃষ্টি।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫২৯ বছর আগে কপিলাবাস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহ গয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের আগে ইনি মানুষ, পশু-পাখী, প্রাণী ইত্যাদি বহুরূপে অনেকবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন 'জাতি-স্মর'। পূর্ব পূর্ব জন্মের অনেক কথাই যাদের পরজন্মে মনে থাকে, তাদেরই বলে 'জাতিস্মর'।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর পূর্ব জন্মের যে সকল কাহিনী শিষ্যদের কাছে গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন, সে সব কাহিনীই 'জাতক' নামে অভিহিত হয়।

জাতকের কাহিনীগুলো পাঠ করলে তোমরা জীবনের অনেক উচ্চ আদর্শ লাভ করবে। আজকে তোমাদের কাছে জাতকের একটি গল্প বলছি, শোন:

হিন্দুর প্রধান তীর্থক্ষেত্র কাশীর নাম তোমরা সবাই শুনে থাকবে আশা করি। এই কাশীরই রাজধানী বারাণসীতে অনেক কাল আগে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। এই রাজার রাজত্বকালে কাশীর কোন এক গভীর বনে বোধিসত্ত্ব এক বাবুই পাখীর গর্ভে পাখী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই বনে অসংখ্য বাবুই পাখীর বাস ছিল। এরা পরম নিশ্চিন্তে আনন্দের ভেতর দিয়েই দিন অতিবাহিত করছিলো, হঠাৎ একদিন এক বিপদ এসে দেখা দেয়! কোন এক নিষ্ঠুর ব্যাধ একদিন কৌশলে ফাঁদ পেতে অনেকগুলো বাবুই পাখী ধরে নিয়ে যায় এবং ওদের বিক্রী করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। লোভী ব্যাধ এরপর রোজ এসে অনেক বাবুই পাখা ধরে নিয়ে যেতে থাকে। বাবুই পাখীরূপে বোধিসত্ত্ব তাঁর বংশের আসন্ন ধ্বংসের কথা চিন্তা করে প্রথমে একটু অভিভূত হয়ে পড়েন; পরে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে ব্যাধরূপ শাসনের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার এক সুন্দর উপায় আবিষ্কার করলেন। তিনি এক সময় বনের সকল বাবুই পাখীকে জমায়েত করে বললেন,—"ভাইসব, দুষ্ট ব্যাধ আমাদের বংশ ধ্বংস করতে উদ্যত। এ বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি এক বুদ্ধি করেছি, যার ফলে ঐ পাপিষ্ঠ ব্যাধ আর আমাদের ধরতে সক্ষম হবে না।" এই বলে বাবুই পাখীরূপী বোধিসত্ত্ব একটু থামলেন, তারপর একটু চিন্তা করে নিয়ে ফের বলতে আরম্ভ করলেন, "দেখো, এবার থেকে ব্যাধ যখনি আমাদের উপর জাল নিক্ষেপ

করবে অমনি সাথে সাথেই আমরা জালের ফাঁকে ফাঁকে মাথা রেখে জাল খুলে তুলবো ; তারপর নিকটবর্তী কোন কাঁটা-ঝোপে জালটি নিক্ষেপ করে সে যার ছিদ্র পথে পালিয়ে যাব। ফলে এই হবে, দুষ্ট ব্যাধ আমাদের ধরতে পারবে না ; কাঁটা বন থেকে জাল খুলে নিতে ব্যাধের খুবই পরিশ্রম হবে।

পরদিন ব্যাধ যখন পূর্বদিনের নিক্ষিপ্ত জাল গুটাতে এলো সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল কে বা কারা জালটিকে একটা গভীর কাঁটা বনে নিক্ষেপ করেছে, আর একটি বাবুই পাখীও জালের ভেতর আবদ্ধ নেই।

পর পর কয়েকদিন এ ভাবেই চলছে দেখে ব্যাধের বউ নিরাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর সে কি করবে ; কি ভাবে সংসার চালাবে ঠিক করতে না পেরে ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

বউকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে ব্যাধ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। সে ওর বউকে বললে, "দেখো, তুমি হতাশ হয়ো না। বাবুই পাখীরা নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমানের পরামর্শে একতা মেনে চলছে। তুমি একটুও ভেবো না, ওদের ঐ ঐক্য একদিন ভাঙবেই। তারপর আমি আগের মতোই অনেক অনেক বাবুই-পাখী ধরতে পারবো। এখন আমি শুধু গোপনে গোপনে খোঁজ রাখি ওদের ভেতরে ঝগড়া বাঁধে কখন।"

ব্যাধ পরদিন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবুই-পাখীদের চলা-ফেরা লক্ষ্য করতে থাকে।

এ ভাবে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর ব্যাধের আশা সফল হলো। সেদিন এক বাবুই-পাখী মাটিতে নামবার সময় অজানিতে অপর একটা বাবুই পাখীর ঘাড়ের ওপর চেপে বসে। ফলে এই হলো, দুজনের ভেতর ভীষণ ঝগড়া বেঁধে গেল। ক্রমে ক্রমে এই সামান্য ঝগড়াই দানা বেঁধে বনের অন্যান্য বাবুই-পাখীদের ভেতরও ছড়িয়ে পড়ল।

বাবুই-পাখীরূপী বোধিসত্ত্ব অনেক চেষ্টা করেও ওদের ওই বিবাদের নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হলেন না। তিনি তখন বুঝতে পারলেন এই বিবাদ, এই অনৈক্যের ফলেই একদিন এই বাবুই গোষ্ঠী ধ্বংস হবে। ঐ ভেবেই তিনি তাঁর নিজ পরিজন পরিবারবর্গসহ উক্ত বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র এক নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করলেন।

অচিরেই দুষ্ট ব্যাধ অনৈক্যের সুযোগে বনের অবশিষ্ট বাবুই পাখীগুলোকে জালে আবদ্ধ করে ধরে নিয়ে গেল। বাবুই পাখীরূপী জ্ঞানী বোধিসত্ত্বের বাণী এ ভাবেই মর্মান্তিক সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমার 'কিশোর জগৎ'এর কিশোর-কিশোরী ভাই-বোনেরা, উপরে যে জাতকের গল্প তোমাদের কাছে বলা হলো, ঐ গল্প থেকে তোমরা কি শিক্ষা পেলে বলতো ? একতা ? হ্যাঁ, এই জাতকের গল্পে আমরা স্পষ্টই দেখছি, যতক্ষণ আমাদের ভেতর একতা থাকে, ততক্ষণ জগতের কোন শত্রুই আমাদের চুলমাত্র ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু নিজেদের ভেতর অনৈক্যের ফলেই আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাবুই পাখীদের মতো বিপদগ্রস্ত হতে পারি।

হেমন্ত ভোর

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পাণ্ডুর চাঁদ হিজলের বনে ধীরে
ডুবে গেলে পরে শতেক পাখির ঝাঁক
শিশিরের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আসে ছুটে
পার হয়ে দূর অভয় নদীর বাঁক।
ধানে ভরা ক্ষেত রোদের উত্তরীয়
পরে নিয়ে দেহে সেজেছে পরীর মত—
রামধনু রঙ প্রজাপতি মেয়ে এক
গাঁদার বুকে মধু লজ্জায় নত।
এলায়িত-কেশ-দেহাতী মেয়েরা সবে
চঞ্চল পায়ে ঝুড়ি মাথে কাজে যায়,
তাদের গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে
শীত শীত হাওয়া সুড় সুড়ি দিয়ে যায়।
হেমন্ত ভোরে দোলা লাগে সারা প্রাণে
মন উড়ে যায় আকাশে নীলের টানে॥

উৎসবের পরে

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

সামনের বড়ো রাস্তাটা শেষ হলেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা যায়—সেটাই অরুণাদের বাড়ী। ওপর তলার কোণের দিককার ঘরে অরুণা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অঙ্ক কষছে। একটুপরেই অরুণা তাকিয়ে দেখে পড়িটা বইএর র‍্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে টিকটিক করে লাড়ে তিনটের ঘর পার হয়ে যাচ্ছে। অরুণা খুব ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র তুলে ফেললো। সেদিন কলম ঠিক জায়গায় রেখে অঙ্কটা মেঝের থেকে তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ভেতরকার টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলো কে কোথায় আছে?

দুপুর গড়িয়ে গেছে—একটু পরেই আবার কাজকর্ম আরম্ভ হবে সংসারের—তাই এই পূর্বমুহূর্তের বিশ্রামের আরামটুকু সকলেই চুপচাপ উপভোগ করছে—সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ—নীচের চক-মেলানো উঠোনে কেউ নেই। ঘোরগুলি সব বন্ধ—কেবল কোন ঘর হতে হঠাৎ ওর ছোট বোন বসন্তর উৎসাহপূর্ণ গলার স্বর ও হাসি শোনা গেলো! অরুণা আবার সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলো। সিঁড়ী দিয়ে টপাটপ নামতে নামতেই ও চেঁচামেচি শুরু করলো—"ও ঠাকুর, ঠাকুর। কখন উঠলে তুমি? বিকেল হয়ে গেলো যে—ও করো—শিগগির ওঠো—!" ঠাকুর বেচারী নীচের ঘোরানো দালানের লাল মেঝের ঠাণ্ডায়ই পেতে মস্ত মধ্যাহ্নের নিশ্চিন্ত সুখ ছিলো—হঠাৎ ডেকে আবার দুঃখ কষ্টময় পৃথিবীর উদয় আর রান্না-পরিবেশনের চিন্তায় দিয়ে এলো—তাড়া ভাঙা গলায় উত্তর দিলো—"এই যে যাই গো দিদিমণি!" অরুণা ততোক্ষণে আবার ওপরে উঠে গেছে মায়ের সন্ধানে। মা পুবের বার করা ঘরে মেঝেতে ওপর হতে সারা-দিন রোদ খাওয়া গরম পোশাকগুলি দিকে দিকে তুলিয়ে শুকিয়ে রাখছিলেন। অরুণা মার কাছে দৌড়ে গিয়ে বললো—"মাগো! আমি রতনীদের বাড়ী কি পোরে যাবো বলো না? ঠিক পাঁচটায় পৌঁছানো চাই বড়ু বোলেছে। সাড়ে পাঁচটায় ওদের নাটক শুরু—আমায় গান গাইতে হবে।"

"কি নাটক হবে রে? আজকাল আবার ছুটিদিনে সব এত ঘটা মেয়েদের···আর পারি মা!" মা ওর দিকে একবার চেয়ে আবার কাজে মন দিলেন।

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা হবে—কি মুস্কিল বলোনা—কি পরবো? ভূত হয়ে যাই তাহলে···?" অরুণা রাগ করে ফিরে চললো। মা একটু হেসে এবার কিছু তাঁর কন্যা পোশাক নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "রুনু! এতো বড়ো ধিঙ্গি এখনও নিজের পোশাক নিজে ঠিক কোরতে শিখলি না? আর তো এই কাপড়ের বোঝা তুলতে হবে···তুই যা মা বাপু বৌদির কাছে!" অরুণা মুখমনে এবার বৌদির ঘরের দিকে চললো। দক্ষিণের বারান্দাটা পার হয়ে। বৌদির ঘরের পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখলো—খাটের ওপর শুয়ে বেশ ভালো ঘুম দিচ্ছেন বৌদি। অরুণা রেগেই ছিলো—আরও রেগে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে একটি ঠেলা দিয়ে বললো, "বৌদি, ও বৌদিভাই! ওঠো না—একুণি যে বাবা এসে যাবে অফিস হতে!" বৌদি আওয়াজ ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে একটু লজ্জিতভাবে হেসে বললেন—"কি ভাই রুনা?—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝি?···সত্যি ভাই কাল রাত্তির জেগে তোমার দাদার পুজোআয়টা শেষ করলুম কিনা? তাই ঘুম—" "আচ্ছা বাপু তা' বুঝতে পারছি যে তুমি রোজই রাতে দাদার একটা কোরে পুজোআয়-বোসা শেষ করো। বলেই দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ো—" অরুণা রাগা ভিরে হেসে উঠলো, "এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী আজ যে রতুর "বার্থডে সেলিব্রেশন"—আমায় গেটে গাইতে হবে—দাদা কাপড় ঠিক কোরে দাও না দিদিভাই—খুব ভালো কোরে সাজিয়ে দেবে কিন্তু—নয়তো অত লোক জেগে কি বলবে কোরবে—একটু তাড়াতাড়ি ভদ্রদিদি এতো ঘটা···হলোই বা একমাত্র মেয়ে—না বৌদি?" "তাঁরে বড়লোক বেশি হয়ে গেলে মানুষে ঐসব করে—তা তুই এতোক্ষণ পা হাত মুখ ধুয়ে আসতে পারিসনি রুনু—দাদা তাড়াতাড়ি খেয়ে এসে বৌদিকে জাগাতে বলেছেন···! দুজনেই ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা-ভাঙে এবার একসঙ্গে হেসে ফেললো।

বৌদি অরুণাকে নিজের সব বাক্স পরনা আর শাড়ী পছিয়ে, লম্বা বেণীতে জরী ফুলকো ঝুলিয়ে রাজকন্যার মতো করে সাজিয়ে দিলেন। অরুণা বড়ো আয়নায় নিজেকে দেখে ভারী খুশী হয়ে বৌদির ঘর হতে বেরিয়ে আসতে আসতেই বাবা দাদা অফিস হতে ফিরলেন। অরুণা চেঁচিয়ে বলো, "দাদার, গাড়ীতে আমি যাবো—!" ওখুনি ঢং ঢং করে বসবার ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো আর অরুণা মহাব্যস্ত হয়ে সেখান হতেই—"মা গো! আমি রতুদের বাড়ী চললাম—এই যে রতুকে দেবার জন্য শাড়ীর প্যাকেটটা নিয়েছি!" বলেই দুড়দুড় করে নীচে নেমে মোটরে উঠে ড্রাইভারকে রতনীদের বাড়ী যেতে বললো। গাড়ী স্টার্ট দেবে এমন সময় বরুণা দেজেগুজে ছুটতে ছুটতে এসে উঠলো গাড়ীতে। "তুই কেন আসছিস আবার?" বলে অরুণা ছোটবোনকে তাড়া দিতে গিয়ে দেখে মা নিচে থেকে এসেছেন। গম্ভীর মুখে বললেন, "তুমি বার্থডের মতো উৎসবের আনন্দে একাই আত্মহারা হতে চাও? ছোট বোনটিকে ফেলে কেউ যায়?"

মোটর এসে রতনীদের বিরাট আলো-ঝলমলে বাড়ীর হাতায় ঢুকলো। সুন্দরী রতনী অপরূপ সেজে নিজে দাঁড়িয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করছিলো। অরুণা তাকে হাসিমুখে বললে, "রতু, তুই সত্যি আজ ঠিক গল্পের রাজকন্যার মতো হয়ে গেছিস।" "যাঃ তোকে যে কতো সুন্দর দেখাচ্ছে তা নিস না—!" রতনী খুব খুশী হয়ে বললো। দুই বন্ধুতে গল্প হতে হতে হঠাৎ রতনী গেটের দিকে তাকে বললো "ঐ যে

তাই মিস মাইকেলেন—একটু দাঁড়ান প্লীজ!" বলে তাড়াতাড়ি ওরা চলে গেলো। অরুণা চেয়ে দেখলো একটি ইংরাজ মেয়ে ঠিক অরুণাদের গাড়ীর মত সবুজ মোটর হ'তে নেমে আসতে রত্নত্রী তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসবার ঘরে চললো। হঠাৎ মনে পড়লো রুপা কই? এ গাড়ী তার অচেনা—অরুণাকে ছেড়ে সে ভীতু মেয়ে একা কোথায় গেলো? তবে সে গাড়ী হতে নামেনি? রত্নত্রী আসতে অরুণা বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করলে। খোঁজ নিয়ে লোক এসে বললে অরুণাদের গাড়ীর ড্রাইভার অনেকে বারণ বহুক্ষণ নেমে গেছে ফিরিয়ে নিয়ে! অরুণা অস্থির হয়ে রত্নত্রীকে বললো "বুলুকে না খুঁজে পেলে খান খাইতেই যে পারবো না রত্নু!" ঠিক এই সময় নাটক শুরু হওয়ার ঘণ্টা বেজে ওঠায় অরুণাকে আর কোনো কথা না বলে ছেড়ে উঠে গানের ঘরে বসতে হলো। সারাক্ষণ অরুণার চোখ দুটি সমুদ্রের বিরাট ভীড়ের মধ্যে ঘুরতে লাগলো—গলা যেন ওর বুঁজে আসতে লাগলো। কোথাও কিন্তু বুলুর বড়ো বড়ো চোখ, কোঁকড়া চুলে ঘেরা মুখখানি দেখা গেলো না। গানের ঘরে একটি নতুন মেয়েকে দেখলো অরুণা—মধুর সুরের গান তার—ওতোধার অরুণার তাল কাটছিলো খুব, সে তাড়াতাড়ি নিজের সুরে তা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছিলো। গায়িকা সাধারণ তার রেশমুখা, কিন্তু কি মিষ্টি কোমল মুখখানি হাসি আর মায়া-মাখানো।

নাটক রাত্তিরালির মধ্যে শেষ হতেই—ওদিকে খাবার আয়োজন তৈরী। রত্নত্রীকে উপহার দিয়ে অরুণা ও আর সকলে একে একে প্রোগ্রামের মতো শুভ ইচ্ছা জানাতে লাগলো। দেখতে দেখতে বিরাট টেবলটি বিচিত্র উপহার ঐশ্বর্যের রাশিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। রত্নত্রী গর্বোজ্জ্বল হাসিভরা মুখে মধুর কথায় সকলের খাবার আয়োজনের তত্ত্বাবধান করছিলো; গানের ঘরের সেই নতুন মেয়েটি—সুপর্ণার ইঙ্গিতে অরুণার সঙ্গে যেন আলাপ করে নেবে—দুজনেই উৎসুক দৃষ্টিতে বন্ধুর সন্ধান করছিলো। সকলের শেষে সুপর্ণাও সলজ্জ মুখে একগাদি শুভ দুইর মালা জড়ানো, সুন্দর একটি হাতে বাঁধানো খাতা দিয়ে তার শুভ ইচ্ছা জানালো। রত্নত্রীর মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠলো আর তার ধনী বন্ধুরা কাড়াকাড়ি করে খাতাটির বাঁধন খুলে পাতা উল্টে দেখতে লাগলো। পাতায় পাতায় সুপর্ণার নিজের আঁকা অপূর্ব সুন্দর রং রেখা সব ছবি ও সঙ্গে সঙ্গে মুক্তা অক্ষরে লেখা কয়েকটি কবিতা! একটা চাপা বিদ্রূপের ভঙ্গী রত্নত্রী ও তার ধনী বন্ধুদের মধ্যে খেলে বেড়াতে লাগলো। অরুণা মর্মাহত হলো রত্নত্রীর সুপর্ণার সঙ্গে এই ব্যবহারে। ও সুপর্ণাকে বললো, "ভাই তুমি কোথায় থাকো? তুমি এদের বাড়ী এলে কেন? আমার বড় খারাপ লাগছে—" "ধ্যা ভুল করেছি ভাই এখন বুঝলুম—তোমায় যখন বন্ধুরূপে পেলুম, এবার আর রত্নার কাছে আসবো না।"

এর পরেকার ঘটনা অরুণার সমস্ত মন ভরে দুঃখে আকুল করে তুললো। বরুণাকে কোথাও পাওয়া গেলো না। কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো অবস্থায় অরুণা বাড়ী পৌঁছালো। সে রাত্রে যে তাদের বাড়ীতে কি ভাবে কাটলো! হৈ চৈ পুলিশে খবর দেয়া, আর বাড়ীতে কান্নার রোল!

গভীর রাত্রি···অন্ধকার ঘর। ঠেলে ফেলে অরুণার তন্দ্রা ছেড়ে গেলো। বুলু যেন ওকে ডাকছে ঘরে ঢুকেছিলো—"বুলু" বলে জড়িয়ে ধরতে যেতেই বুলু কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো! অরুণা উঠে বসলো চোখের জল মুছে। জিরো পাওয়ার আলোয় মার মুখ দেখে ওর যেন বুকটা ছেড়ে গেলো। ঘুমের মধ্যে মার চোখে জলের রেখা···আহা-নামিতে মন ভরে উঠলো অরুণার···তারই চোখে ছোট বোনটি হারিয়ে গেলো। নিজের আনন্দে, হাসি গল্পে বন্ধুর সঙ্গে আলাপে এমন মত হয়েছিলো অরুণা যে বেচারী বুলু অচেনা জায়গায় কোথায় রইলো—মনেও পড়লো না!

মন ঠিক করে অরুণা আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলো। মোর ভেঙ্গিয়ে বাড়ীর হাতা পার হয়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াতে বড়ো ভয় ভয় করতে লাগলো অরুণার।—মা! ভয় করলে চলবে না—তার খোঁজেই বুলু হারিয়েছে—তাকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে! গেট খুলে অন্ধকার নির্জন পথে অরুণা এগিয়ে চললো। প্রতি পদক্ষেপে নিজেই নিজের পা ফেলার শব্দে, নিঃশ্বাস ফেলার শব্দে ও চমকে উঠতে লাগলো ভয়ে! রাস্তার মোড়টায় পৌঁছতেই দেখলো কে যেন বিরে একটা আবছায়া লাদা মতন কি একটা আগে আগে এগুচ্ছে···ও বাবা! সেটা আবার ওকেই লক্ষ্য করে আসছে যে। অরুণা একটা গোঙানীর মতো শব্দ করে, ভয়ে পাগল হয়ে দৌড়ে লাদাটাকে পাশ হতে যেতেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দুজনেই গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলো রাস্তার পাশের ঢালু একটা সেবড়ো মাঠের মধ্যে।

ভোরের আলো খুব সামান্য আভাষ দিচ্ছে—অরুণার ভয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা ঠাণ্ডা বাতাসে যেন কেটে এলো। সারা গা, হাতপা ছড়ে গেছে অল্প মাটি-কাঁকরে। চোখটা অল্প মেলে অবাক হয়ে দেখলো পাশেই একটা ছোট মতন কে পড়ে আছে—সেও হঠাৎ "উঁ বাবা গো!" বলে উঠে বসলো···ভোরের প্রথম আলোর মাঠের মাঝে এ কি স্বপ্ন না সত্য? "বুলু!" অরুণা প্রায় কেঁদে ফেললো আনন্দে। "দিদিভাই" লাফিয়ে এসে বরুণা তার কোলে বসে বললো, "ও দিদি, আমি আমাদের বাড়ী খুঁজছিলুম—আমি আমাদের বাড়ী খুঁজছিলুম।"

বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটলে বরুণা সব বললো—অরুণা যে ওকে সঙ্গে না নিয়েই কি কোথাও ঠিক করে না বসিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবে—তা প্রথমটা বরুণা বুঝতে পারে নি। দিদি চলে যাবার পর কিছুক্ষণ একা গাড়ীতে বসে থাকবার পর বরুণা গাড়ী হ'তে নেমে ভীড়ের মধ্যে যেতেই তার যেন কেমন সব গোলমাল লাগলো। দিদিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে লজ্জা ও ভয়ে ফিরে এসে আবার গাড়ীতে উঠে বসে দেখে ড্রাইভারটা নেই। ও পেছনের সীটে বসে থাকতে থাকতে তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছিলো—হঠাৎ গাড়ী চলার ঝাঁকুনী পেয়ে চেয়ে দেখে একজন অচেনা সেমসাহেব মোটর চালিয়ে যাচ্ছেন। বরুণার কান্নাকাটিতে তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন। বরুণা বা তিনি কেউ কারও কথা বুঝতে পারল না। তাঁদের বাড়ীতে পৌঁছে তিনি ও তাঁর মা মা বরুণাকে অনেক আদর যত্ন করলেন কিন্তু বরুণার ওসব কিছুই

ভালো লাগিতেছে না। পরদিন সকালে উহাদের বাড়ীতে একটী বাঙ্গালী মেয়ে বেড়াইতে আসে রুক্মার কাছে সব শুনে উহাদের বলে রুক্মাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের বাড়ী নিয়ে এলো—রুক্মার সঙ্গে নাকি তার আলাপ হয়েছে—তবে বাড়ী চেনে না—বাড়ী খুঁজে রুক্মাকে পৌঁছে দেবেন তার বাবা! রুক্মা অস্থির হয়ে তাদের বাড়ী হতে আজ বেরিয়ে পড়েছিলো বাড়ী যাবার জন্য!

এদিকে ভোর হয়ে গেছে—ওই মেয়েকে খোঁজার জন্য চারিদিক হতেই অরুণা রুক্মার বাবা ও সুপর্ণার বাবা এসে পৌঁছলেন ওদের কাছে! তারপর আর কি! এবার রুক্মার চরিত্রে ওদের বাড়ীতেও এক বিরাট আনন্দোৎসব হলো। তবে নাটক যা খুশী হক মিলন হলো। সুপর্ণা অরুণা রুক্মা অনেক অনাথ শিশুদের খাবার ও পোষাক দিলো। সুপর্ণা ওদের বাড়ীতেই একজন এখন। তার ছবি আঁকা রান্না খাওয়ার আর করিয়ে দেবার পরম প্রিয় অংশভাগী অরুণা রুক্মাই এখন!

পতিঘাতিনী সতী

শ্রীআর্য্যকুমার পালিত

রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে দিয়াছিলেন। কোনও সতী প্রজানুরঞ্জনের জন্য স্বামীকে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন এমন কথা তোমরা কোথাও শুনিয়াছ? এমন রাণী তোমাদের দেশে ছিলেন। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র আড়াই শত বৎসর আগে। তোমাদের দেশের ইতিহাস নাই তাই তোমরা তাঁহার কথা জান না। অন্য দেশের হইলে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত হইত। পতিকে হত্যা করিয়া কে কোথায় সতী হয়? এমন দৃষ্টান্ত তোমাদের দেশে রহিয়াছে। ইহা তোমাদের কম গৌরবের বিষয় নয়।

মেদিনীপুরের চেতো-বরদার তালুকদার—বাঙ্গলার শেষ বিদ্রোহী বীর শোভা সিংহের কন্যা ছিলেন চন্দ্রপ্রভা। বর্দ্ধমান রাজকন্যা রুক্মকুমারীর ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহের মৃত্যু হইলে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ চেতো-বরদা হইতে চন্দ্রপ্রভাকে বরণ করিয়া আনেন। ইঁহার সঙ্গে তিনি লালবাঈ নাম্নী আর এক মুসলমান রমণীকেও আনেন। রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে পাটরাণী করেন। রঘুনাথ সিংহ খুব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। লালবাঈ খুব ভালো গান গাইতে পারিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার অনুরাগিণী হন। লালবাঈএর জন্য বিষ্ণুপুরে তিনি এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বাঁধ কাটাইয়া দেন। লালবাঈএর নাম অনুসারে ঐ বাঁধের নাম নাকি লাল-বাঁধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরে এখনও ঐ বাঁধ রহিয়াছে।

রঘুনাথ সিংহ অধিকাংশ সময়ই লালবাঈএর প্রাসাদে কাটাইতে লাগিলেন। তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথ সিংহের ভ্রাতা গোপাল সিংহের সাহায্যে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে রঘুনাথ সিংহের ঔরসে লালবাঈএর এক সন্তান জন্মিল। সন্তান প্রায় ছয় মাসের হইল। লালবাঈ হিন্দুর ছেলের ন্যায় সেই ছেলের অন্নপ্রাশন করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাও সম্মত হইলেন।

সমস্ত আয়োজন হইল। হিন্দু মুসলমান যত প্রজা একত্র ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। হিন্দু প্রজাগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া চন্দ্রপ্রভার নিকট উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রপ্রভা সকলকে আশ্বাস দিলেন।

ভোজনের সময় হইল। রঘুনাথ সিংহ সকলকে ভোজন করাইবেনই। হিন্দুদের জাতি যায়। চন্দ্রপ্রভা গোপাল সিংহকে দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রঘুনাথ চন্দ্রপ্রভার নিকট আসিলেন। চন্দ্রপ্রভা গোপাল সিংহকে বলিলেন—"হত্যা কর।" গোপাল সিংহ রঘুনাথকে হত্যা করিলেন।

দলমাদল কামান দাগিয়া লালবাঈএর প্রাসাদ উড়াইয়া দেওয়া হইল। লালবাঈ সন্তানকে লইয়া প্রাসাদের মধ্যেই ছিলেন। কথিত আছে—প্রাসাদের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে লালবাঈএর কয়েক টুক্‌রা মাংস মাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল!

তারপর! চন্দ্রপ্রভা কি করিলেন! তিনি স্বামীর শ্মশানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার চারিদিকে তুঁষের স্তূপ সাজাইতে বলিলেন—তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে বলিলেন!! পতিহত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চন্দ্রপ্রভা তুঁষের আগুনে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন!

তখন হইতে চন্দ্রপ্রভার নাম, "পতিঘাতিনী সতী" হইল। তিনি যে স্থানে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন সেই স্থানের নাম হইল—"পতিঘাতিনী সতী ঘাট।"

এখনও বিষ্ণুপুরবাসী বিষ্ণুপুরের কোনও বিশেষ স্থানকে "পতিঘাতিনী সতী ঘাট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সৎ ও অসৎ

শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার ব্যবহারিক সত্তা আছে, তাহাও বলিয়াছেন। ব্যবহারিক সত্তা —আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট যে সত্তা প্রকাশিত হয় সেই সত্তা। তাহা সাদুৎপাদিক, তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে, তাহা আমাদের জীবনযাত্রার জন্য কাজে লাগে, কিন্তু তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই। তাহা নিত্য নহে। পারমার্থিক সত্তা কেবল ব্রহ্মের আছে। ব্রহ্মে কোনও পরিবর্তন নাই। তাহা নিত্য, স্থির, অচঞ্চল। পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে এই ভেদ দর্শনের আদিম যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। উপনিষদে অসৎ শব্দ কোন কোনও স্থলে অপ্রকাশিত অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে! "সৎ" এই অসতের প্রকাশিত অবস্থা। কিন্তু পরে 'সৎ' শব্দ যাহা নিত্য, যাহার পরিবর্তন নাই, তাহা বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নিত্য বস্তুর সন্ধান গ্রীক দর্শনেও বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। মিলেসিয়ান দার্শনিকদিগের 'উপাদান' (matter) এম্‌পিওক্লিসের মৌলিক দ্রব্য, আনেক্সগোরাথের "Homoiomeriac", পাইথাগোরাথের সংখ্যা, ডেমক্রিটাসের পরমাণু (atoms) এবং প্লেটোর Ideas সকলই সতের সন্ধান হইতে উদ্ভূত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের দর্শনে "সার" (Essence) বা স্বরূপ এবং অস্তিত্বের ভেদের অনুসন্ধান চলিয়াছিল। ক্যাণ্ট "সৎ"কে স্বর্গত বস্তু (Thing in itself) বা nonmenon নাম এবং অজ্ঞাত nonmenon এর উপরিভাগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নশ্বর ঘটনাদিগকে phenmenon (সমুৎপাদ) নাম দিয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানে তড়িৎই একমাত্র সৎ বস্তু বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান কালে দর্শনে Being (সত্তা) ও Existenceএর মধ্যেও ভেদ নির্দ্দেশ করা হয়। যাহা দেশ-কালে প্রকাশিত হয়, তাহাই (Existence); যাহা দেশ-কালে প্রকাশিত হয়না, কিন্তু যাহার অপ্রকাশিত সত্তা আছে, তাহাই Being। Being নির্গুণ অর্থাৎ অন্য কিছু হইতে তাহাকে বিশিষ্ট করিবার কোনও গুণ তাহাতে নাই। Existence গুণ-বিশিষ্ট সত্তা! Being সত্তা মাত্র, কেবল সত্তা। শঙ্কর দেশ ও কালে অপ্রকাশিত, কার্য্য কারণের নিয়মের অতীত ব্রহ্মকেই 'সৎ' বলিয়াছেন। তদতিরিক্ত যাহা, যাহা দেশ, কাল, কারণ ও কার্য্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ ও আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত, তাহা অসৎ। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ও নিষ্কল। তিনি জগৎ রূপে প্রকাশিত হন, এ কথা শঙ্কর বলেন নাই। বহুধা বিভক্ত জগৎ তাহাতে অধ্যস্ত হয়, অর্থাৎ জগতের ভ্রান্তি হয়, এই কথা বলিয়াছেন। পারমেনিডিস্ সর্ব্বব্যাপী সত্তাকে একমাত্র সত্য বলিয়াছিলেন। তাহার মতে সত্তার নানা বিশিষ্ট রূপের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বন্দ্ব। সৎএর বিশেষ বিশেষ রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, 'সৎ' বুদ্ধিগ্রাহ্য। বুদ্ধির জ্ঞান সত্য, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান মিথ্যা, শঙ্কর বুদ্ধির জ্ঞানকেও সত্য বলেন নাই। তাঁহার মতে দেশ, কালও কারণ দ্বারা বদ্ধ কিছুই সত্য হইতে পারে না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সর্ব্ব বস্তু দেশ-কাল ও কারণে বদ্ধ রূপে প্রকাশিত হয়।

যাহা অসৎ তাহার প্রতীতি হয়, কিন্তু এই প্রতীতি মিথ্যা। অসতের অস্তিত্বই নাই। এই মিথ্যা প্রতীতির উৎপাদনের হেতু অবিদ্যা। মানুষের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় এমন ভাবে গঠিত যে তাহা দ্বারা সকল বস্তুই দেশ-কালও কারণে বদ্ধরূপে প্রতীত হয়, এক অখণ্ড বস্তু খণ্ড খণ্ড রূপে আবির্ভূত হয়। এই খণ্ড খণ্ডরূপে এক বস্তুর আবির্ভাব ভাণ মাত্র, তাহার বাস্তবতা নাই। তাহা ভাণ (appearance), সৎ (Reality) নহে। শঙ্কর বলেন—ঘট প্রভৃতি ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্ন (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণযুক্ত) সকল বস্তুই অসৎবৎ, তাহাদের বিনাশ আছে, তাহারা অসৎ। যাহাই দেশে অবস্থিত, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাজ্য। তাহা উৎপন্ন কার্য্য, সৎ নহে। সতের উৎপত্তি নাই।

তাহা অবিভাজ্য, তাহা দেশে বিস্তৃত নহে। দেশের বিভুত্ব আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ নহে। যাহা দেশে সীমাবদ্ধ, কালেও তাহা সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিক জগতে কাল সত্য হইলেও তাহার বাহিরে কালের অস্তিত্ব নাই। কালে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তাহা সৎ নহে।

শঙ্কর কার্য্যকারণ তত্ত্বের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্কর কারণ হইতে কার্য্যের ভেদই স্বীকার করেন না। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যদি ভেদ না থাকে, কার্য্য ও কারণ যদি একই হয়, তাহা হইলে কার্য্যরূপে পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব নাই, তাহা ভাণ মাত্র। আছে শুধু সৎ, এক, অদ্বিতীয় অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণ সত্তারূপ অনন্ত ব্রহ্ম। সসীমত্ব অভাববাচক। তাই সকল সসীম বস্তুই যেন সসীমত্ব অতিক্রম করিতে চায়। এই আপনাকে অতিক্রমণ চেষ্টার ফলই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তনের ফলেই প্রত্যেক সসীম বস্তু নশ্বর। এই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গঠন প্রকৃতির ফলে। বাস্তবিক পরিবর্ত্তন নাই।

সাম্বৃতিক জগৎ—ভাবের জগৎ—নামরূপবিশিষ্ট বস্তুনিচয়ের জগৎ, যে জগৎ দেশ, কাল ও কার্য্য কারণের জগৎ। তাহার নিম্নে যে অপরিবর্ত্তনীয় দেশ-কাল কারণাতীত বস্তু নিশ্চল স্বরূপে বর্ত্তমান, তাহাই সৎ, তাহা ব্রহ্ম।

শঙ্কর দর্শনে কর্ম্মনীতি

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই জীবনের লক্ষ্য। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ লাভ হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধি যাবতীয় দুঃখের মূল। যত দিন জীব দেহকেই আত্মা বলিয়া গণ্য করে, ততদিন সে পাপ ও দুঃখে মগ্ন থাকে। কিন্তু যখন সে বিশ্বের আত্মার সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন মনে করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার যাবতীয় দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয়। আত্ম-সাক্ষাৎকারের সহায় যে সকল কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম, যে সকল কর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক, তাহা অধর্ম্ম বা অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য সত্য কি, মিথ্যা কি—তাহার জ্ঞান আবশ্যক। জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। এই জ্ঞান হইলে সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতির উদ্ভব হয়। তাহার ফলে শান্তি অধিগত হয়। জগতের প্রতি—সর্ব্ব জীবের প্রতি প্রীতি—হইতে সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য আত্ম-ত্যাগের ইচ্ছা উদ্ভূত হয়। আপনার সুখের জন্য চেষ্টার বিরতি হয়। স্বার্থপরতাই সর্ব্ব অমঙ্গলের মূল। সর্ব্বজীবে মৈত্রী ও করুণা, ক্ষুদ্র পারিবারিক স্বার্থ অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ মঙ্গলের নিদান।

গীতা শাস্ত্র-বিধানকেই কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রমাণ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করিয়া কামনার বশে কর্ম্ম করে, গীতার মতে সে সিদ্ধি (পুরুষার্থ অর্জ্জনে যোগ্যতা) প্রাপ্ত হয় না এবং ইহলোকে সুখও সে লাভ করে না, পরমাগতির তো কথাই নাই। শঙ্করের মতও তাহাই। তাঁহার মতে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম পাপ! স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। কিন্তু বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ফলে অভ্যুদয় লাভ হইলেও মোক্ষলাভ হয়না। তাহাদ্বারা লোকে স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রমের ক্ষমতা লাভ করে। ভক্তি জ্ঞানের জন্য এবং ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে মুক্তির সাধন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম জ্ঞানের সহায়ক। যাহার মন বিশুদ্ধ, যিনি কামনাধীন এবং যিনি ইহজন্মে ও পূর্ব্বজন্মে কৃতকর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার মনেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের ইচ্ছা উদিত হয়।

শঙ্কর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমে অবস্থান শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ও স্মৃতির বচন দ্বারা তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন। (শ-ভ ৩।৪।২৯) কিন্তু অনাশ্রমী ও দরিদ্রগণ জপ-উপবাস, দেবদেবা প্রভৃতি দ্বারাও যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহাও বলিয়াছেন। (৩.৪।৩৮)। অনাশ্রমী যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাহারা তাহাদের জন্মান্তর সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারের বলেই বিদ্যালাভ করে। শূদ্রগণও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ, তাহা শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন।

চতুরাশ্রমের মধ্যে পারিব্রজ্য বা সন্ন্যাস আশ্রমকেই শঙ্কর শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, কারণ সন্ন্যাস পরমাত্মবিজ্ঞানের বা

সেই 'সদ্য স্নানের' অনুভূতিটি সারাদিন ধরে বজায় রাখার জন্যে...

হিমালয়

বোকে ট্যালকাম পাউডার

ব্যবহার করতে এত আরাম! কিনতেও খরচ কত কম।

পরমার্থপ্রাপ্তির হেতু। অন্য তিন আশ্রমী পুণ্যলোকভাগী। কিন্তু "ব্রহ্মসংস্থ" পরিব্রাজক মোক্ষভাগী। "ব্রহ্মসংস্থ" শব্দের অর্থ ব্রহ্মে সর্ব্ব ব্যাপারের পরিসমাপ্তি। অনন্যব্যাপার বা অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওয়াই ব্রহ্মসংস্থ হওয়া। সেরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা অন্য তিন আশ্রমে অসম্ভব। অন্যান্য আশ্রমী আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপভাগী হন। কিন্তু পরিব্রাজকের কর্ম্ম ত্যাগে প্রত্যবায় হয় না। শম-দমাদি দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতা পোষণ করা প্রব্রজ্যাশ্রমের কার্য্য, যজ্ঞাদি করা অন্যান্য আশ্রমীর কার্য্য। যজ্ঞাদি ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসীর অধর্ম্ম হয় না। তাহাতে বরং আশ্রম-বিহিত কর্ত্তব্যই করা হয়। প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ মাত্র মোক্ষ-ভাগী হইলে জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। এ আপত্তি হইতে পারে না, কেননা পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের অসাধারণ উপায়। (শ-ভাং ৩।৪।২০) অন্য আশ্রমীকে মুক্তি লাভের পূর্ব্বে সন্ন্যাসী হইতে হইবে।

ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর বৃহৎ আরণ্যকের এই শ্লোকের উদ্ধার করিয়াছেন ; "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যাং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ। অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ।" সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্যও পাণ্ডিত্য লব্ধ হইলে মুনি হইবেন। মৌন ও অমৌন নিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। মুনি শব্দের অর্থ নিরন্তর মননশীল। বাল্য শব্দের অর্থ বালভাব বা সারল্য (শুভবুদ্ধি)। অধ্যয়নজাত ব্রহ্মবুদ্ধির নাম পণ্ডা। পণ্ডা বিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর নিম্নের স্মৃতি বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ন সন্ধ্যং ন চ সন্ধ্যং নক্ষত্রং ন বহুক্ষ্রম্ ।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদকশ্চিৎ 'স ব্রাহ্মণঃ' ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান অজ্ঞাত চরিতং চরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ বদং চরেৎ ॥ (৩।৪।৩০)

তিনি আপনার কুলীনত্ব, অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য, অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি গূঢ় ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া (লোকের) অজ্ঞাত আচরণ করেন, এবং অন্ধ, জড় ও মূকের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

গৃহী সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন—গৃহী কেবল স্বীয় আশ্রম বিহিত কর্ম্ম করেন না, অন্য আশ্রম বিহিত অহিংসা সংযমাদির অনুসন্ধানও করেন। (৩।৪।৪৮)

শঙ্কর সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে জাতি বৈষম্যের স্থান দান করেন নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিধান দেন নাই।

ব্রহ্ম-জ্ঞানীর করণীয় কোনও কর্ম্ম নাই। গীতার ৪।২০ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন "নিজের প্রয়োজনের অভাবহেতু লোক সংগ্রহের জন্য অথবা জীবন রক্ষার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কোনও কর্ম্ম করেন না।" তাঁহার কর্ম্ম কোনও কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে কৃত হয়না। সাংসারিক কর্ম্ম সংসারী জীবের জন্যই বিহিত। যিনি সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। গীতার ৪।২১ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর "কিল্বিষ" শব্দের ব্যাখ্যায় ধর্ম্ম-কর্ম্মকেও কিল্বিষ (পাপ) বলিয়াছেন। কেননা ("ধর্ম্মেঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপত্বাৎ কিল্বিষমেব বন্ধায়াদকত্বাৎ) বন্ধের জনক বলিয়া ও মোক্ষকামীর অনিষ্ট-রূপ বলিয়া ধর্ম্ম ও কিল্বিষ। কর্ম্ম কামনার ফল বলিয়া বন্ধের জনক। কিন্তু তাহা যখন নিষ্কামভাবে কৃত হয়, তখন তাহা হইতে বন্ধ হয় না। "কেবল শারীর কর্ম্ম" অর্থাৎ শরীররক্ষা মাত্র যাহার প্রয়োজন, তাহা দ্বারাও বন্ধ হয়না। কোনও পাপ বা পুণ্য নিষ্কাম কর্ম্মীকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কোনওরূপ কর্ম্মের বিধি শঙ্কর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার নিজের জীবনের অধিকাংশ জীবের মঙ্গলের জন্যই ব্যয়িত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞানান্ধ-লোকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের চেষ্টায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আপনার মুক্তিতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই। অজ্ঞানকেই তিনি জীবের প্রধান শত্রু মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন সেই অজ্ঞান-দূরীকরণে ব্যয় করিয়াছিলেন।

কোনও কোনও সমালোচকের মতে শঙ্করের মতে স্বপ্ন ও অজ্ঞানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। জাগতিক সকল বস্তুই যদি মায়িক হয়, কোনও ভেদই যদি জগতে না থাকে, তাহা হইলে পাপ ও পুণ্যের ভেদও মিথ্যা। এই সমালোচনার কোনও গুরুত্ব নাই। শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের নিকট এই জগৎ ব্যবহারিকভাবে সত্য

এবং মুক্তি লাভের প্রধান উপায় যদিও ব্রহ্মজ্ঞান, তথাপি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া অনেক কর্ম্ম করণীয় ও অনেক কর্ম্ম বর্জ্জনীয় ইহা শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। সত্য, অহিংসা, শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ; মিথ্যা, স্বার্থপরতা, হিংসা প্রভৃতি অসৎ কর্ম্ম। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি পাপ ও পুণ্যের ভেদকে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যা বলিবেন না এবং নিজেও কখনও পাপ কর্ম্ম করিবেন না। কেন না দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই পাপে প্রবৃত্তি হয়। যাহার দেহে আত্ম-বুদ্ধি নাই, পাপ কর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না।

শ্রুতিতে অনুজ্ঞা ও পরিহার আছে, অর্থাৎ কোনও কোনও কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোনও কোনও কর্ম্ম পরিহর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, জীব ও ব্রহ্মে যদি ভেদ না থাকে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই সকল অনুজ্ঞা ও পরিহার অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তর শঙ্কর নিজেই যাহা দিয়াছেন তাহা এই (শ-ভা ২।৩।৫৮) ; আত্মা এক হইলেও জীবের দেহ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুজ্ঞা ও পরিহার সার্থক হয়। যতদিন সম্যক দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিন ঐ ভ্রম নিবারিত হয়না। ততদিন অবিদ্যাজনিত নানা ভেদ বর্ত্তমান থাকে। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহার ত্যাজ্য ও অত্যাজ্যবুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহার নিয়োজ্যতা (অর্থাৎ এই কর্ম্ম কর, ইহা করিও না) অসম্ভব। আত্মার অতিরিক্ত হেয় ও উপাদেয় যে দেখে না, বিধি-নিষেধ তাহাকে কিসে নিয়োগ করিবে ? একাত্মদর্শী নিয়োজ্য নহেন। জ্ঞানীর নিয়োগ না থাকিলেও তাঁহার যথেচ্ছাচার সম্ভবপর নহে। কেন না তাহার অভিমান (যাহা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক) নাই। যেমন অগ্নি এক হইলেও অশুচি জ্ঞানে শ্মশানের অগ্নি ত্যাজ্য, শুচিজ্ঞানে অন্য অগ্নি গ্রাহ্য, সূর্য্যালোক এক হইলেও অশুচি দেশস্থ সূর্য্যালোক পরিহার্য্য, শুচি দেশের সূর্য্যালোক গ্রহণযোগ্য, সমস্তই মৃত্তিকার বিকার হইলেও হীরকাদি আদরণীয়, মৃতদেহাদি বর্জ্জনীয়, তেমনি আত্মা এক হইলেও দেহাদি উপাধি সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুজ্ঞা ও পরিহার সার্থক হয়।

জগৎ মায়িক হইলেও, শঙ্কর তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে বলিয়াছেন, তাহাকে আকাশে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় একেবারে অস্তিত্বহীন বলেন নাই। অনিত্য হইলেও, যতদিন অবিদ্যা দূরীভূত না হয়, ততদিন জীবের নিকট জগতের অস্তিত্ব আছে। অবিদ্যার নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভবের জন্য কতকগুলি কর্ম্ম করণীয়, কতকগুলি ত্যাজ্য। সুতরাং শঙ্করের মতের সহিত নৈতিক বিধি ও নিষেধ সংগত হয়না, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

"অহং ব্রহ্মস্মি" ইহার অর্থ ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মী জীবের "মুখ্য সামানাধিকরণ্য" নহে, অর্থাৎ অহংকার-সমন্বিত জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ইহা নহে। ইহা "বাধসামানাধিকরণ্য" বোধক, অর্থাৎ অবিদ্যার অপগমে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব-বোধক।

শঙ্কর চিত্ত-শুদ্ধিকে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির অর্থ রজঃ ও তমোগুণের অভিভব ও সত্ত্বগুণের প্রভাব। নিঃস্বার্থ কর্ম্ম ও সাধন ব্যতীত সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্য অসম্ভব। যাহার নিকট "অহং" ও 'মম' অর্থহীন, তিনিই আত্মাকে জানিয়াছেন। কাম বিনষ্ট না হইলে অবিদ্যার ধ্বংস এবং আত্ম-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। অবিদ্যাকে কেবল অস্বীকার করিলেই অবিদ্যার ধ্বংস হয় না। শুধু শ্রবণ (উপদেশ শ্রবণ) দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান অনুভবের বিষয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। ইহা ব্রহ্মের সহিত একত্বের অনুভব। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত এই অনুভব হইতে পারে না। সুনীতি বর্জন করিয়া দৈহিক সুখের পশ্চাতে ধাবমান ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না।

শঙ্কর মতে ব্রহ্মজ্ঞানী পাপপুণ্যের অতীত। পাপ-পুণ্যের ভেদ মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের পক্ষে সত্য, কিন্তু তাহা পারমার্থিক সত্য নহে। যতদিন জীব আপনাকে তাহার বহির্জগৎ হইতে পৃথক মনে করে, প্রত্যেক আপনাকে "আমি" অন্যান্য আমি হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, ততদিনই ন্যায়ান্যায় ও পাপ পুণ্যের ভেদ সত্য। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যখন সকল ভেদ বিদূরিত হয়, তখন কাহার প্রতি কে অন্যায়াচরণ করিবে, কাহার অনিষ্ট করিয়া কে পাপভাগী হইবে ? জীব ক্রমে ক্রমে "আমিত্বে"র—স্বার্থের—বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই মুক্তি যখন সম্পূর্ণ হয়, যখন আত্মপর-ভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন সুনীতি দুর্নীতির ভেদও লুপ্ত হয়। "আমিত্বের" সংকীর্ণ গণ্ডী ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিয়া

জীবকে বিশ্বের সার্বিক আত্মার সহিত একীভূত করাই সুনীতির লক্ষ্য। জীব যখন এই আমিত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার সমসীত্ব বিলুপ্ত হয়। ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের ভেদ সসীম জীবের পক্ষেই সত্য, কিন্তু জীব যখন সসীমত্ব অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত এক হইয়া যায়, তখন সে ভেদও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সুনীতির ভেদ সেই জন্যই শঙ্করের মতে আপেক্ষিক, অনপেক্ষ নহে। সুনীতির লক্ষ্য জীবকে অসীমত্বে উত্তীর্ণ করা। সেই লক্ষ্য অধিগত হইলে তাহার প্রয়োজন লুপ্ত হয়। অনেকে সমাজের মঙ্গলকেই সুনীতির লক্ষ্য বলেন। কিন্তু সমাজই তো একমাত্র সত্য বস্তু নহে। সমাজের উপরে ঈশ্বরের সহিতও মানবের সম্বন্ধ আছে। সমাজ-সেবা দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ যখন পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হয়। তখন সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের ভেদেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

শঙ্করের কঠোর বৈরাগ্যবাদ অনেকের অপ্রীতিকর। ঈশ্বর মানুষের ভোগের জন্য যে সকল ভোগ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদের সম্পূর্ণ বর্জনের কোনও হেতু অনেকে দেখিতে পান না। শঙ্করের বৈরাগ্যবাদ তাঁহার তাত্ত্বিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের সকলই অস্থায়ী—কিছুরই চিরস্থায়ী মূল্য নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভোগের প্রতি আসক্তি, যাহা পরম পুরুষার্থ লাভের প্রতিবন্ধক, তাহার বর্জনের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তিই টিকিতে পারে না। ভোগের সহিত সন্ধি করিয়া। ভোগাসক্তি অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় না। তাই শঙ্করের মতে পরমপুরুষার্থ সর্বস্ব-ত্যাগ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জাগতিক অবস্থার উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা নিরর্থক। সামাজিক জীবনের মূল্যও শঙ্করের মতে নাই—ইহা কেহ কেহ বলেন। শঙ্কর নাস্তিক জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি চাহেন, জাগতিক অবস্থার উন্নতি তাঁহার লক্ষ্য নহে। কিন্তু তিনি জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। রাজতন্ত্র ভালো কি প্রজাতন্ত্র ভালো, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, এ সকল রাজনৈতিক ও আর্থিক মতের আলোচনা না করিলেও, শঙ্কর সকল মানবের মঙ্গলই চাহিয়াছেন। কোন্ পথে সকলে পরমার্থলাভ করিতে পারে, তাহার নির্দেশ করিয়াছেন, প্রত্যেকের আমিত্বের প্রসারের উপদেশ দিয়া—স্বার্থপরতার সংকোচ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কামনাবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনা শান্ত না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তিনি নিত্য নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি ও তাহার পূরণের ব্যবস্থা না করিয়া ভোগ-বাসনাকে সংযত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং মানবের দুঃখ মুক্তির উপায় সর্বত্র প্রচারের জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও তাহার সাংসারিক কর্তব্যে অবহেলা করিতে বলেন নাই, কাহাকেও ঈশ্বরে ভক্তি না করিতে শিক্ষা দেন নাই। কাহাকেও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিতে উপদেশ দেন নাই। বরং বিধি-নিষেধ পালন মুক্তির দ্বার বলিয়াছেন। বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়, তখনই শাস্ত্রের মতে তাহা অর্থহীন হয়, তাহার পূর্বে নহে। জগৎ যে ঊর্ধ্বমূল, ঈশ্বরে তাহার মূল নিহিত, একথা শঙ্কর বারংবার বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সামুৎপাদিক জগৎকে অতিক্রম করিয়াই যেমন সত্যে পৌঁছিতে হয়, তাহা বর্জন করিয়া নহে তেমনি নৈতিক বিধি-নিষেধ পালন করিয়াই মুক্তি অধিগত হয়, বর্জন করিয়া নহে।

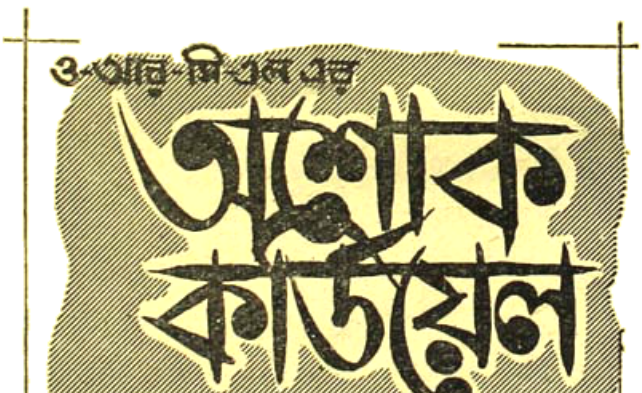

আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়

বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। লোকসঙ্গীতের এই বৈচিত্র্য বৃহত্তর বঙ্গের মধ্যকক্ষাবের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রবন্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই শ্রেণীর কতকগুলি আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত লইয়া আলোচনা করা হইল। অবশ্য টুসু, ভাদু, চটকা, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি শ্রেণীর গানও এক একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই গানগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নাই।

চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নাবিকবৃত্তির খ্যাতি আছে। দূর দূর সাগরে এখানকার নৌজীবিগণ মাসের পর মাস পাড়ি দিয়া বেড়ায়, আর কর্ণফুলী নদীর তীরে কোন নির্জন বটছায়ায়, আম্রকানন পার্শ্বস্থ অঞ্চলে কোন স্বর্ণাঙ্গে ধারে বসিয়া তাহাদের বধূরা অশ্রু বিসর্জন করে—

ও ভাই, চাঁদ মুখে মধুর হাসি
যেখানা যাবাইলি সাম্পানের মাঝি।
যাহার মাঝি যারপে সাম্পানরে।
ন যানে উজান ভাটি।
কুতুব দিয়ার পাছিম ধারে সাম্পানমসার ঘর।
লাল ঘন্টা তুলি দিয়ে সাম্পানর উপর।
রঙ্গা বন্ধু গেল ছাড়িয়ে সখা দিলে মোর মাপে লাগোই
এমন ছলের কালে কার সোধামী ঘর ত নাই?

হাওড়া জেলার মেয়েলী গানের মধ্যে শ্লেষ বাঙ্গ জড়িত আছে। রসিকতা করিবার জন্যই বিয়ের গানটী রচিত। এগুলির মধ্যে সমাজচেতনাও প্রকাশ পাইয়াছে—

তাম্বিপি মা, হাতির উপর কেন এত আড়ি।
মানুষে খেলে টেরটা পেতে, তোমার খেতে ছ'ত হরিণবাড়ি।
হুরকি ছুটে লাগা হতে, তোমার ঘুঘুট খেত পড়াপড়ি।
পুলিসের বিচারে পেথে দ'পতো তোমার প্রাণ ঘুরী।
লিখী মামা টেরটা পেতেন ছুটতে হ'ত উকিল বাড়ি।

হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলে ছেলেদীদের মধ্যে 'জালের বারপে' নামক একশ্রেণীর গানের প্রচলন আছে। এই গানগুলিও পেশাধারী গানেরই অঙ্গীভূত—

জালের মাথায় জাল বড়িয়ে আমার মাথায় রে ডালি।
ওরে কেমনে খেলিব মানুষে ঐ না গুরুদের বাড়ীরে।
(নদীর এই ছিল)
ছি খেনে চল আনতে গেলাম রে উজান নদীর ঘাটে।
ওরে সেইখেনে পুড়িল কপাল রে ওই-না হলকা জালের সাথেরে।
সাত ভাইয়ের বুন আছিরে পদমা সুন্দরী,
ওরে ছোটভাই বৌদি ছিলো খালিরে খালিয়ে ভাতারি রে।
নদীর এই ছিল।

জেলেনীদের ন্যায় গোয়ালিনীদের মধ্যেও বিশেষ শ্রেণীর গানের চলন আছে। বাংলার অঞ্চলের গোয়ালিনীদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের নাবিক সুরের গানের ন্যায় একশ্রেণীর সুরের গান প্রচলিত, যেমন—

'ভিক্ষা মাগি নিল মাতা তোমার বাসরে
খোড়া দুধ মাও মতো খেয়ে যাব ঘরে।'
দই-দুধ নাই মালিক বলি গো তোমারে
আছে একটি বাঁজা গাই খাও না দুইরে।
কেমনি সতীনকে কথীর দেখিব তোমারে।
বাঁজা গায়ের দুধ আর পাইব দুইরে।

ত্রিপুরা জেলার গোয়ালা গানের মধ্যে মাতৃহৃদয়ের স্নেহমমতা ফুটিয়া পড়িয়াছে। ঘরে শিশুর জন্য বন্দিনী মাতার কণ্ঠে আকুল রোদন ধ্বনিত হইয়াছে—

না পাওয়াইলাম ছাওয়ালে দুধ,
না দেখিলাম তার চন্দ্রমুখ,
না কহিলাম স্নেহবচনের কথা রে।
যখন শিশু ঘুমের ঘরে কাঁদিবে মা-মা ব'লে
সেবতার প্রাণে নিশ্চয় বাজিবে রে।
সঙ্গের সাথিরা ভাই, কইও তার ঠাঁই
দুধের শিশু রাখিতে যতনে রে।

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গেই ছেলেলী গানের বৈচিত্র্য অধিক। পশ্চিমবঙ্গের কীর্তনের সুর অন্ত গানকে তাসাইয়া দিয়াছে।

পল্লীবধূদের মার্জিত বিদ্যা বুদ্ধি বেশী না থাকিলেও তাহাদের পরিগ্রহণ ক্ষমতা (adaptability) অসীম। বড়া পাঁচালীর ঢঙ্গে তাহারা নিজেদের মনোমত করিয়া পড়িয়া লয়—

থাকো বিটি থাকো বিটি বিলগুড়ি পারা।
আগুন যদে দিমু তোমার কাঁইচা ধান কাটা।
কাঁচা ধান চুটুর চুটুর, চাপা ধানের খই,
লয়া লয়া সবরী কলা গোয়ালে-আরা দই।

কন্যার বিবাহগমন উপলক্ষে চট্টগ্রাম অঞ্চলে একশ্রেণীর ছড়াগান প্রচলিত আছে। এগুলি নারীরা সমবেত কণ্ঠে গায়—

দয়াল বড় মিঞার বি
রোসকালা বাজোইয়া যায় সৈ যায়ই পাড়া দিই।

বারই পাড়ার ম'াইলা পোয়া খিয়াই উ-অলা চাব
ভোরকালার ধনক ছইনউন চমকি আরাড় পাব ॥

ষোড়শ শেষার মুসলমান কৃষক বালিকাদের গান আলাদা। নীলের গানের সঙ্গে মায়ের মিল থাকিলেও বিষয়ের কোনই সামঞ্জস্য নাই। সাধারণতঃ পৌষ মাঘ মাসেই নীল গান গাওয়া হয়, মাঘমণ্ডলের গানের মতই এগুলিও রৌদ্রের আবাহনী চড়া—

গুলুরে ঢেকেছে মাথা সোনার মুকুট পরা
আগুন পানির পড়া মানুষ জোয়েতে,
আঁটোরনে মানুষ করা ;
আজ্ঞা চেহারা খরলি তুই, না বেটী না কি বেটা,
মর্ত্যে যা আসমানের বাপ চেনা বড় লেটা ॥

উত্তরবঙ্গের নারীদের মধ্যে প্রচলিত ধামালী গানের মধ্যে মৈমনসিং গীতিকার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইতেছে—

রাধা—লজ্জা নাইরে নিল ইচ্ছা কানাই, লজ্জা নাইরে তর
গলাত কলসী বান্ধিয়া যমুনাত, ডুইব্যা মর ॥

কৃষ্ণ—কোথায় পাবো কলসী রাধে, কোথায় পাবো দড়ি
তুমি হও যমুনা রাধে, আমি ডুইবা মরি ॥

বহুরূপী গানার আছে—

লজ্জা নাইরে নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর ॥
কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহিন পাড় আমি ডুব্যা মরি ॥

চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের কৃষাণী বালিকাদের কণ্ঠে খেঁটুর গান আর একটি ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন কৃষাণী মুনিষ-ঘরের বালিকারা বন বাঁধিয়া চা পান ও উঠোনের মধ্যে দিয়া খেঁটুর গান গাহিয়া থাকে। একদল গান গাহিয়া অনুরোধ জানাইল—

—বেল তো ভাই, বল না সই, লখিন্দর এই
তোমার কেমন ভাই।
বিদিশাড়ী ভাউরে তোমার হোক না লখিন্দর যেমন ॥

অপর দল চাপান দিল—

বলিলো, বাঁশ গাছেতে কলছে কাঁঠাল
ও তার বড় বড় কোয়া।

খেঁটুর দল জবাব দিল—ধীরা ভাই রয়—এই ফাগুন মাসে,
কাঁঠাল ফলে বুঝি বাঁশের গাছে!

অপর দল আবার প্রশ্ন করিল—

বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল ও তার বড় বড় কোয়া।
মুড়ির সনে খেতে গেলেই ভাল, নয় তো সব ভোঁয়া।
কাঁচায় না যায় ছোলে কালে, পাকায় না যায় খুলে,
স্বর্গ যাতে পৌঁছে যায় ও সে খেলে পারে মলে ॥

সবাই এক সঙ্গে—ও দিদি খেলে পারে মলে? খেঁটুর দল এবার নিজেরাই সমস্যার সমাধান করিল—

ওগো দিদি, ও দিদির সই—এর ভাবানিটা হচ্ছে এই—
খেয়ো গো শুয়ে খেয়ো সই—না খেয়ো তো করবে হৈ চৈ ॥

মেয়েলী গানের মধ্যে এই শ্রেণীর মৈথুনের কথা লিয়া নাটকীয় বৈচিত্র্য সঞ্চারের চেষ্টা হয়। ঢাকা অঞ্চলের একটি গানের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান, আদর-আবদারের সুন্দর ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

স্ত্রী—লাল নীল চটর বাঁইন্যা
হাটে যাওরে সোনার নাইয়া।
লাল বাদাম উড়াইয়া, ঝিলাম কিন্তু কইয়া—
আমার লাইগ্যা আনে আনি মেঘ ডমুর শাড়ী ;
নইলে কিন্তু আড়ি—

স্বামী—থাকো থাকো সোনার কইন্যা
পাছের দিকে চাইয়া,
গেলাম তোমার কইয়া—
তোমার লাইগা নেই-না শাড়ী আসমু আমি লইয়া ॥

বহু মেয়েলী গানই মেয়েদের জবানীতে পুরুষদের কণ্ঠেই গতি হয়। এই গানগুলির অধিকাংশই প্রেমের কমনীয় সুকুমার দিকটিরই পরিচয় প্রকাশ করে। বহু কর্ম সঙ্গীতের মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন আছে। নিম্নের গাড়োয়ানী গানটিতে গাড়োয়ানকে ঘরে ফিরিবার অনুরোধ করা হইয়াছে গাড়োয়ানী গান নিশ্চয় স্ত্রীলোকদের গাহিবার কথা নয়।

উজান উজান করে গাড়ীয়াল উজালে বাঘের ভয়।

গাড়ী রইয়া গাড়ীয়াল বাড়ি ফিরিয়া যায়,
ভাতও না খাইয়া গাড়ীয়াল ঘুমে না ভয় পান,
চালের বাতা রইয়া কন্যা ঝুরিছে কাঞ্চন ॥

দক্ষিণ বঙ্গের ব্রহ্মপুত্র তীরাঞ্চলের সকল পল্লীতে এককালে বরিপুজা নামে একটি বিশেষ শ্রেণীর মেয়েলী গান শোনা যাইত। বরিপুজা কার্তিক পূজারই রূপ ভেদ।

পল্লীবঙ্গের নিম্নশ্রেণীর কন্যা বধূদের নানাপ্রকার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনেই এই সকল গান রচিত ; ইহাও এক শ্রেণীর কর্ম সঙ্গীত—

সখিরে—ওরে ও বাবুই রে
তুই মোর পাক না ধান খাইলি।
এক বাবুই কালীয়া, এক বাবুই ধলিয়া
এক বাবুইর কপালে তেলক।
হাতে লৈয়া ধনু তীর কোথায় বৌ সাজিল রে—
একলা খুন্তের বৌ দাত ক্ষেত রাখে রে—
(ধুয়া—তুইসোর পাকনা ধান খাইলি) ॥
শাশুড়ী আর বৌ মেল বাদুড় মারিতে রে
(অনুকের) মার তার গণ্ডায় শিকারে রে?
(অনুকের) ঘট যায় গণ্ডায় বাঁধিতে রে
(ধুয়া—তুই মোর পাকনা ধান খাইলি ॥

দেবী মনসা, লক্ষ্মী মাতার ন্যায় ষষ্ঠীদেবী ও নারীগণের নিত্য আরাধ্যা। বাঙলাদেশে সর্বত্রই ষষ্ঠী ব্রতের চলন আছে। উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলে 'ষাইটোর' গান একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। খোলার সঙ্গে কলা বউ-এর শুভবিবাহ ও তাহার সন্তান কামনায় এরো স্ত্রীরা ফুলের পুল সাজাইয়া গান গায়—

আগাহাটের বামনা রে, পাছা হাটের বামনা।
কলাতি পুজেছে—ও বামনা ঠাকুর রে।
কি করিবেন আগ্ বল হাটের কলারে।
তোর মাথা হইয়াছে পাকিয়া শণ
কোমর হইয়াছে ধনুক বাণ
এখন কি তোমাকক পারে ছাওয়ালে বাপ রে ॥

—তেইশ—

—ডেকেছিলে কেন ?

ঘরে বিকেলের নীলাভ ছায়া পড়েছে। বাইরে রোদ ছিল, কিন্তু তার পথ জুড়ে রয়েছে সামনের কানা দেওয়ালটা। ক্যালেণ্ডারের রঙিন ছবিটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। পূরবী বসে আছে চুপ করে। চোখের দৃষ্টি টেবিলের উপর—একখানা খাতার শাদা পাতা খোলা সেখানে।

—ডেকেছ কেন ? কী হয়েছে ?—আবার মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল সত্যজিৎ।

সমস্যাটা বাড়ীর নয়। পা দিতেই কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কোনো বিশেষ কিছু হলে তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারত সত্যজিৎ। অতএব ব্যাপারটা পূরবীরই ব্যক্তিগত।

এইবার টেবিলের ড্রয়ারটা টানল পূরবী। বের করে আনল একখানা চিঠি। বললে, পড়ুন।

খামের উপরে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম। বাংলা দেশেরই একটি মফঃস্বল শহরের ঠিকানা।

—কী ব্যাপার ? সন্ন্যাসিনী হতে যাচ্ছ নাকি ?

নীলাভ বিকেলের আলোয় বিষণ্ণ হাসি হাসল পূরবী।

—পড়েই দেখুন।

টাইপ করা ছোট একটি চিঠি, একটা ব্যাকরণ ভুল আছে তাতে। আর তার বক্তব্য হল : তোমার দরখাস্ত আমরা পেয়েছি। তুমি স্বচ্ছন্দেই ওখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এখানে এসে ভর্তি হতে পারো। আমরা তোমাকে থাকা খাওয়া ছাড়াও পঞ্চাশ টাকা স্টাইপেণ্ড দেব। আমাদের সর্ত যদি তুমি মেনে চলতে রাজী থাকো, তা হলে তোমার অভিভাবকের চিঠি নিয়ে পত্রপাঠ আমাদের জানাও। চিঠির নিচে সেক্রেটারির দস্তখত।

চোখ তুলে সত্যজিৎ বললে, এর মানে ?

—ওদের ওখানে একটা দরখাস্ত করেছিলুম।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কারণটা কী ? কলকাতা ছেড়ে পালাতে চাও কেন ?

—আমার আর ভাল লাগছে না।

মুহূর্তে সারা মন কালো হয়ে উঠল সত্যজিতের। পূরবী চলে যেতে চায়। কেন চায় ? সত্যজিৎ তাকে ভালোবেসেছে বলে ? তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে—সেই ভয়ে ? সংকোচেই হোক, আর সত্যজিতের ব্যক্তিত্বের জন্যেই হোক—মুখ ফুটে বলতে পারেনি : তোমাকে আমি চাই না—তুমি দস্যুর মতো আমাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা কোরো না, তাই এইভাবে আত্মরক্ষা করবার পথ খুঁজছে ?

অথচ, সত্যজিৎ ভেবেছিল, পূরবী খুশি হয়েছে ; মনে করেছিল, সে যে তাকে চেয়েছে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য পূরবীর কল্পনাতেও ছিল না। সমস্ত জিনিসটাই নিজের দিক থেকে সে বিচার করেছিল, পূরবীর যে একটা আলাদা মন আছে, সত্যজিতের খেয়াল ছাড়া তারও যে একটা আলাদা সত্তা আছে—এই কথাটাই সে ভাবতে পারেনি। আমি ক্লান্ত, অতএব তোমার কাছে এসেছি ; বনশ্রীকে নিয়ে পুরোনো নাটক আর জমবে না। অতএব এ-বার তোমাকেই নতুন নায়িকা নির্বাচন করা যাক। কিন্তু তার খেলায় পূরবী তৎক্ষণাৎ খেলনা হয়ে সাড়া দেবে

—নিজের সম্পর্কে এতখানি শ্রদ্ধা না থাকলেই তার ভালো হত।

পকেট থেকে চুরুট বের করে তার গোড়াটা হিংস্রভাবে দাঁতে চেপে ধরল সত্যজিৎ। বললে, অনার্স পড়ায় ওখানে?

—জানিনা। না থাকলে ছেড়ে দিতে হবে।

—ওঃ! চুরুটে দেশলাই ধরিয়ে সত্যজিৎ জিজ্ঞেস করল: কিন্তু সর্তের কথা আছে চিঠিতে। সেগুলো কী?

—ওঁদের নার্সারি স্কুলে পড়াতে হবে। সকালে তিন ঘণ্টা করে পড়াতে হবে। খাওয়া নিরিমিষ। থিয়েটার সিনেমা দেখা চলবে না, বাইরে মেলামেশা চলবে না—ওঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিতে হবে—

—অর্থাৎ পুরোদস্তুর 'নানারী'? তার পরের স্টেজটা কী? ওখানকার দেবিকা? সৈরিকপরা ভৈরবী?

পূরবীর ম্লান মুখ পাণ্ডুর হল।

—অনেকে তাও করেন। কেউ কেউ চলেও এসেছেন।

—আর তুমি?

সত্যজিৎ স্থির দৃষ্টি মেলে ধরল পূরবীর মুখের উপর: তুমি কী করতে চাও?

—এখনো কিছু ভাবছি না। পরে ভাবব।

—কাকা-কাকিমার আপত্তি হবে না?

ওঁদের টাকার দরকার। গোটা ত্রিশেক করে পাঠাতে পারব।

মিনিট দুই ঘরটা স্তব্ধতায় ডুবে রইল। বিকেলের নীল ছায়া আরো গভীর হয়ে সমুদ্র নীল রঙ ধরল। পাশের ঘরে অন্য ভাড়াটেরা দেওয়ালে বোধ হয় পেরেক পুঁতছে—তারই একটা চাপা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল তালে তালে।

—তা হলে আমাকে ডাকলে কেন? সব তো ঠিকই করে ফেলেছ দেখছি।

এইবারে কথা বলবার সময় এসেছিল পূরবীর। বলতে চেয়েছিল, তোমার জন্যেই তো আমি পালাতে চাইছি। কলেজে তোমার আমার সম্পর্কের কথা আর গোপন নেই—মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জনটা এখন সরব হয়ে উঠেছে। সেদিনও ক্লাসে ইতিহাসের প্রফেসার কে-কে-এল কী একটা কথায় 'মাই ইয়াং ফ্রেণ্ড প্রফেসার মুখার্জি' বলে যে বাঁকা দৃষ্টি পূরবীর মুখের উপর ফেলেছিলেন, সে-কথা সে ভুলতে পারেনি—আরো ভুলতে পারেনি, পাশের মেয়েটির রুমাল চাপা দেওয়া মুখ রুদ্ধ হাসিতে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

পূরবী বলতে চেয়েছিল, আমাকে যদি নিতেই চাও—তা হলে তোমার দাবীটাকে পাকা করে নাও। এমনভাবে—সকলের সামনে, চারিদিকের নিষ্ঠুর কৌতুকের কাছে আর মেলে রেখো না। আর যদি এখনো তোমার সময় না হয়ে থাকে—তা হলে কিছুদিনের জন্যে আমিই দূরে সরে যাই। শুধু কি নিজের লজ্জাতেই আমি সরে যেতে চাইছি? ওদের মন লঘু—ওদের রুচি ইতর। ওরা কী করে বুঝবে তোমাকে, কী করে জানবে তুমি কত বড়—কী করে ওরা দেখবে তোমার সম্রাটের মহিমা! সে মন, সে দৃষ্টি ওদের নেই। তাই ওরা তোমাকে লঘু করতে চায়, অশ্রদ্ধার মন্তব্য করে। সে আমি সইতে পারব না। নিজের লজ্জার চাইতেও তোমার অপমান আমার বুকে অনেক বেশি করে বাজে। তাই আমি সেই অপমান থেকে তোমাকে আড়াল করতে চাই। জানি, তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার মতো বেদনা আমার আর নেই, সারাদিনে একটি বারও তোমাকে আমি দেখতে পাব না সে-কথা আমি ভাবতেই পারি না। কত দুঃখে তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছি—সে-কথা তুমি বোঝো, ক্ষমা করো আমাকে। আর যদি পারো, এখনই তোমার কাছে আমায় তুলে নাও—আমি তো অপেক্ষাই করে আছি।

কিন্তু এ-সব কথা রাত জেগে ভাবা যায়; সামনের কানা দেওয়ালটার উপর নিশীথ রাত্রের কালো ছায়া ভাসতে থাকলে, রেডিয়োর শেষ প্রোগ্রামে রবীন্দ্র সঙ্গীতের করুণ মূর্ছনায় ঘর ভরে গেলে যখন বুকের মধ্যেও বাজতে থাকে:

"পথিক আমি এসেছিলেম
তোমার বকুল তলে,
পথ আমারে ডাক দিয়েছে
এখন যাব চলে—"

চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

প্রত্যেকদিন এরাস্মিক পারফিউমড্
কোকোনাট হেয়ার অয়েল ব্যবহার করলে আপনার
চুল ঘন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এরাস্মিক একটি
বিশুদ্ধ নারিকেল তেল যা চুল ভাল রাখে এবং
চুলের শোভা বাড়িয়ে তোলে। আজকেই এক
বোতল কিনে পরখ করুন—আপনার মনোমত
গোলাপ বা চামেলির সুগন্ধযুক্ত তেল পাবেন।

এরাস্মিক

পারফিউমড্ কোকোনাট
হেয়ার অয়েল

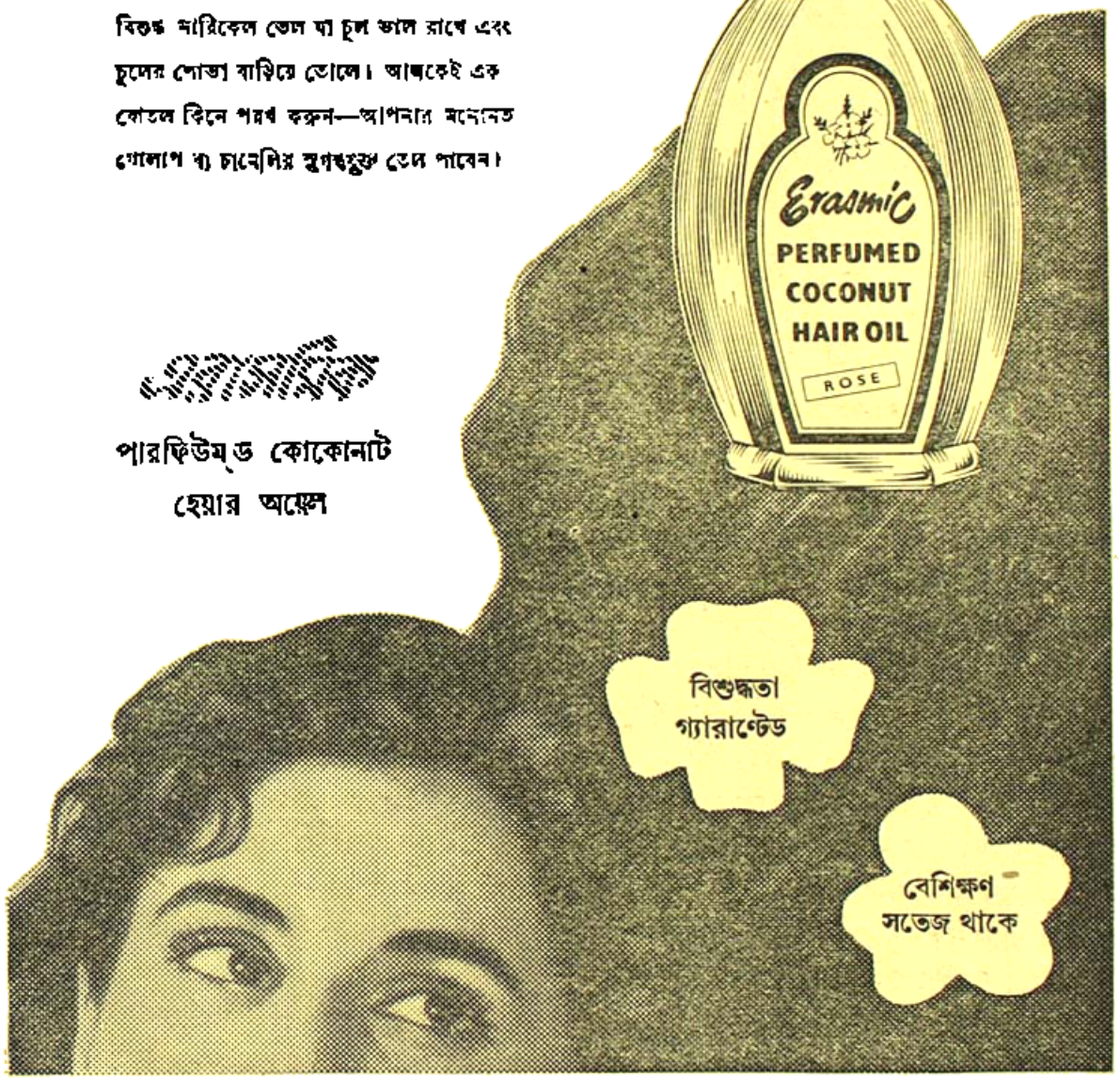

এরাস্মিক কোং লিঃ পক্ষে এস পদ্ম বিশ্বাস কর্তৃক ইণ্ডিয়ান ফার্মাকিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কলিকাতা-৩৭ হইতে প্রকাশিত।

সেই সময় সব কথা সাজিয়ে বলতে পারে পূরবী। কিংবা অন্যমনস্ক হয়ে চশমা খুলে রেখে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথার ভিতর একটা তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেলে তখন নিজের একটা কথাও সে আড়াল রাখতে পারে না। কিন্তু এখন? এই বিকেলে? সত্যজিতের মুখোমুখি? না—না।

পূরবী জবাব দিল না।

সত্যজিৎ চুরুটে টান দিলে—আগুন নিবে গেছে। নিজের মনেও কোথাও কী একটা নিভে গেছে তার। কথা বলবার উৎসাহ হচ্ছে না। তবু আস্তে আস্তে বললে, এতে বিপদের কী আছে? ইচ্ছে হয়—যাও।

পূরবীর বুকের মধ্যে ঘা লাগল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে এল শরীর। সত্যজিৎ ভুল বুঝেছে? নাকি এমনিই নিষ্ঠুর হয় পুরুষেরা?

—আপনার আপত্তি নেই?

—আমি কেন আপত্তি করব?—অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল সত্যজিৎ।

পূরবীর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। তুমিই তো দূরে সরিয়ে দিচ্ছ আমাকে। তোমার জন্যেই তো আমি নির্বাসনের পথ খুঁজে নিয়েছি। না—নিজের জন্য নয়। তোমাকে নিয়ে লজ্জা আমার যতই বড় হোক—তাতেও আমার সুখ আছে। কিন্তু ওরা তোমাকে ছোট করতে চাইছে। ওদের হীনতার পঙ্ক ছিটিয়ে দিতে চাইছে তোমার গায়ে। সেইটেই আমি সইতে পারি না। তুমি একবার জোর ক'রে বলো—'যেতে দেব না'—একবার হাত বাড়িয়ে বলো: 'এসো আমার সঙ্গে।' তা হলে—তা হলে—

গলার শিরায় এসে থর থর করে কাঁপতে লাগল কথাগুলো। কিন্তু মুখ ফুটে একটা শব্দও বেরুল না।

মাথা নিচু করে প্রায় নিঃশব্দ গলায় পূরবী বললে, তা হলে যেতেই বলছেন?

—এখানে যদি ভালো না লাগে, যাবে বই কি। আর টাকারও তো দরকার।

—হ্যাঁ টাকার খুব দরকার।—পূরবীর মুখে হাসির রেখা দিল। সে হাসিটা দেখতে পেলোনা সত্যজিৎ—পেলে চমকে উঠত।

আচ্ছা, আসি তবে—

সত্যজিৎ আর একটা কথাও বলল না—ফিরেও তাকালো না পূরবীর দিকে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেয়ালের দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল পূরবী—সারা শরীর কান্নায় টলমল করে উঠল।

ভেবেছিল, হেসে উঠবে সত্যজিৎ। সেদিনের মতো তার হাত টেনে নেবে মুঠোর ভিতর। বলবে, এইজন্যে তোমার এত ভয়? এরই জন্যে তুমি পালাতে চাও? আমি? আমি আছি। তাকাও আমার দিকে। তোমার সব ভাবনা—সব লজ্জা আমি তুলে নিলাম!

কিন্তু সত্যজিৎ বুঝল না। বুঝতে চেষ্টাও করল না। পুরুষ এই রকমই। এই ওদের নিয়ম।

টেবিলের উপর মাথা গুঁজে কাঁদবার সময়টুকুও পূরবী পেলো না। মা এসে পড়েছেন।

—সতু কোথায়? চা খেয়ে গেল না?

—কাজ আছে, চলে গেলেন—

ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল পূরবী। মা-র কাছে কান্না লুকোবার মতো এ বাড়ীতে কোথাও জায়গা নেই—এক স্নানের ঘরটা ছাড়া।

পথে বেরিয়ে এল সত্যজিৎ। আকাশে কনে-দেখা আলো। আত্মগ্লানিতে জ্বলতে লাগল মন। ঠিকই হয়েছে—তার পাওনাই পেয়েছে সে। নিজের প্রয়োজনে পূরবীকে সে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ভালোবাসাটা ছিল এক তরফা, সবটাই ছিল নিজের স্বার্থে জড়ানো। তার পুরো জবাবটাই পেয়েছে।

বীথি সামনে থাকলে হেসে উঠত।

—অনুগ্রহের দিন চলে গেছে ছোড়দা। অনুগ্রহ কথাটাই মানুষকে অপমান করা। শ্রদ্ধা করতে জানো না, দয়া করতে গিয়েছিলে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরছে—সেটা ভুলো না।

ঠিক। কিন্তু সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কোথাও কোনো অবলম্বন নেই। মাঝিহীন নৌকোর মতো মন ক্লান্ত বিকেলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। আপাতত তার কোনো কাজ নেই—কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তার চোখের সামনে কোনো কিছুর কোনো অর্থ নেই।

রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চিনে বাদাম চিবুনো যেতে পারে ; সামনের উঁচু প্রাচীরটা জুড়ে সিনেমার পোষ্টার পড়েছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে সেগুলো। নইলে বাড়ী ফিরে গিয়ে শোনা যেতে পারে ইন্দ্রজিতের বীভৎস চিৎকার—ভিলোঁর কবিতা—

ভিলোঁ! He was a Bohemian! উদ্দাম বেপরোয়া জীবন। লাইফ অ্যাণ্ড ওয়াইন। অ্যাণ্ড লাইফ?

পাশে একটা গাড়ী এসে থামল। একদা ছাত্র আন্দোলনকারী, অধুনা সরকারী চাকুরে পরিতোষ।

—হ্যালো অধ্যাপক!

—হ্যালো!

—কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথাও না।

—আই স্ট্রলিং?

—হুঁ।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বললে, ছবি দেখতে যাবি? মেরিলিন মুনরোর? যদি অবশ্য অধ্যাপকের নীতিতে না বাধে—

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সত্যজিৎ। তারপর পরিতোষের খুলে দেওয়া গাড়ীর দরজায় পা বাড়িয়ে বললে, চল্—

ক্রমশঃ

অষ্টাপদী

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

মনে রাখিবার মতো কি দিয়াছি? তাই লজ্জা পাই।
বলিতে পারিনা তাই মোর দান তুল না, তুল না।
আমার এ তুচ্ছ দান পাবে কি তোমার মনে ঠাঁই?
তুমি যদি এর সাথে কর অন্য দানের তুলনা?

শুনেছি প্রেমের দান ভুলেনাক প্রেমিকের মন,
যত তুচ্ছ হোক তাহা সে কভু তা যায় না পাশরি।
অশোক কিংশুক চম্পা আলোকিত করে উপবন,
তবু কেন মধুপের প্রীতি লভে তৃণের মঞ্জরী?

(২)

আমার বলিবার যা কিছু আছে, তার
সকলি বলি সোজা ভাষাতে।'
রচি না প্রহেলিকা রচি না কুহেলিকা
গহন বানাবার আশাতে।
রসিক মনে তব জোগেনা পাবে নব,
করুণা কর যদি কবিরে।
আমার লঘু কথা লভিবে গহনতা
গাহন কর যদি গভীরে।

(৩)

ক্ষুধার তাড়নে শ্যেন পাখী ধরে কপোতে নখের চাপে
যার মমতায় চঞ্চু তার কাঁপে।
তবু তারে তার বধিতেই হয়, রক্ত যখন করে
নয়নে তাহার অশ্রুর ধারা ক্ষরে।
ক্ষুধার জ্বালায় মানুষও তেমনি করে যেই পাপাচার
ধৌত তা হয় অশ্রু সলিলে তার?
হয় কি চিত্রগুপ্তের খাতে পৃথক করি তা জমা?
শ্যেনের মতন মানুষ পায় কি ক্ষমা?

(৪)

মনের আকাশে বিরাজ করিছে শাশ্বত ছায়াপথ,
এই পথ বাহি নামে প্রতি নিশি দেবতার মায়ারথ।
এই পথ দিয়া কবিকল্পনা ধায় অনন্তধামে,
এই পথ দিয়া বাণী-বীণা হতে অমৃতের ধারা নামে।

এই ছায়াপথে দেবতানরের মধুর মিলন ঘটে,
সে মিলনবাণী তারায় তারায় রটে গগনের পটে।
সে মিলনবাণী ধ্বনিত বিশ্বে কাব্যে, কথায়, গানে।
এই সুগোপন স্বপনবারতা কবিরাই শুধু জানে।

নূতন দিক দর্শনে ভাস্কর শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী

রাধিকা রায়চৌধুরী

প্রবীণ ভাস্কর ইটুক বিষয়ক রায়চৌধুরী শিল্প দেবীপ্রসাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন :—

The heroic sized statues of Sir Surendranath Banerjee and Sir Ashutosh Mukerjee in the Curzon Park and Esplanade of Calcutta Proclaim the vigour and firm execution of the Artist. My great joy in his successful career and attainments in the plastic art in particular, could only be expressed by the ancient verse :—বর্ধন বিষয়িষ্কের মাত্রাণ্ড পরাজয়ন The Victory lies in seeking defeat at the hands of his pupil or son.

I conclude with the prayer that the contributions of his mature manhood may reveal still higher possibilities or creative excellence as he goes a head with flying colours and the vigorous steps of a conquering hero in the realms of Art. (Choudhury and his Arts).

বিগত ২৮ বছরের কর্মক্ষেত্র মাত্রাজকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিম ভারতের প্রায় সর্বত্র দেবীপ্রসাদের প্রতিভার অমর স্বাক্ষর বর্তমানে রহিয়াছে।

উত্তর ভারতের প্রথম অভিযাত্রায় পাটনার সহীদ স্মারকের বিরাটত্ব, ও সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠতায় অতীতের বহু বৈদেশিক শিল্পীর কাজকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

পাটনার সহীদ স্মারকের মূর্তিগুলি প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চ বাঁধান মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাতজন স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভাক সৈনিক, পতাকা হস্তে লক্ষ্য স্থল সরকারী সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সরকারী সৈন্যের গুলিতে আহত সাথীকে ডিঙ্গিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখ পানে চলিয়াছে। প্রতিটি বেশ সৈনিকের চোখে মুখে দুনিবার পথের দৃঢ়তা। উপরে মুক্ত আকাশ—পায়ের তলে কঠিন পাষাণ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বেদনা ও গৌরবে বহু বিচিত্র ঘটনা যাহা চোখে দেখিয়াছিলাম, চলমান জীবনের অগ্রগতির পথে ক্রমশঃ সেই স্মৃতি বিলীন হইয়া ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহারই একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ভাস্কর দেবীপ্রসাদ যে জীবন্ত মূর্তিগুলি তৈরী করিয়াছেন, তাহা দর্শক-মনকে বিগতদিনের উত্থানপতনময় ঘটনার সম্মুখীন করিয়া, মর্মান্তিক বেদনা ও বিজয় গৌরবের অংশীদার করিয়া তুলে। ইতিহাসের এত বড় চাকুষ্যকর রূপায়ণ, চোখে না দেখিলে অনুমান করা সম্ভবপর নয়।

পাটনার সহীদ স্মারকের আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি

। পাটনার সহীদ স্মারকমূর্তি ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সাতজন বিভিন্ন সৈনিক—সরকারী সৈন্যের গুলিতে আহত সঙ্গীদের লক্ষ্যস্থলে অগ্রসরমান

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন "বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই ভাবোদ্দীপক ভাস্কর্য শিল্পের উদ্ভাবক ও রচয়িতা বলিয়া তাহাকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি। যাহারা এ শিল্পকার্য দেখিবেন তাহারাই সহীদ তরুণদের সাহস ও আত্মত্যাগের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন। শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অতি নিপুণ ভাবে এই মূর্তিগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া তাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।" সহীদ স্মারকের প্রতিষ্ঠার পর নূতন দিল্লীতে National Art gallery'র সম্মুখে যে মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রথম অভিযাত্রা'। এই compositionটী ১৯৫৬ ইংরেজীতে নূতন দিল্লীর All India contemporary sculptural exhibition ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ

STUDENTS
COMMON ROOM

॥ একটা চলন্তে ॥

কলিকাতার চৌরঙ্গী রোড্ ও পার্ক ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর এই বিরাট মূর্তিটির সম্প্রতি আবরণ উন্মোচন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু। মূর্তির পাদদেশে উপবিষ্ট ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে।

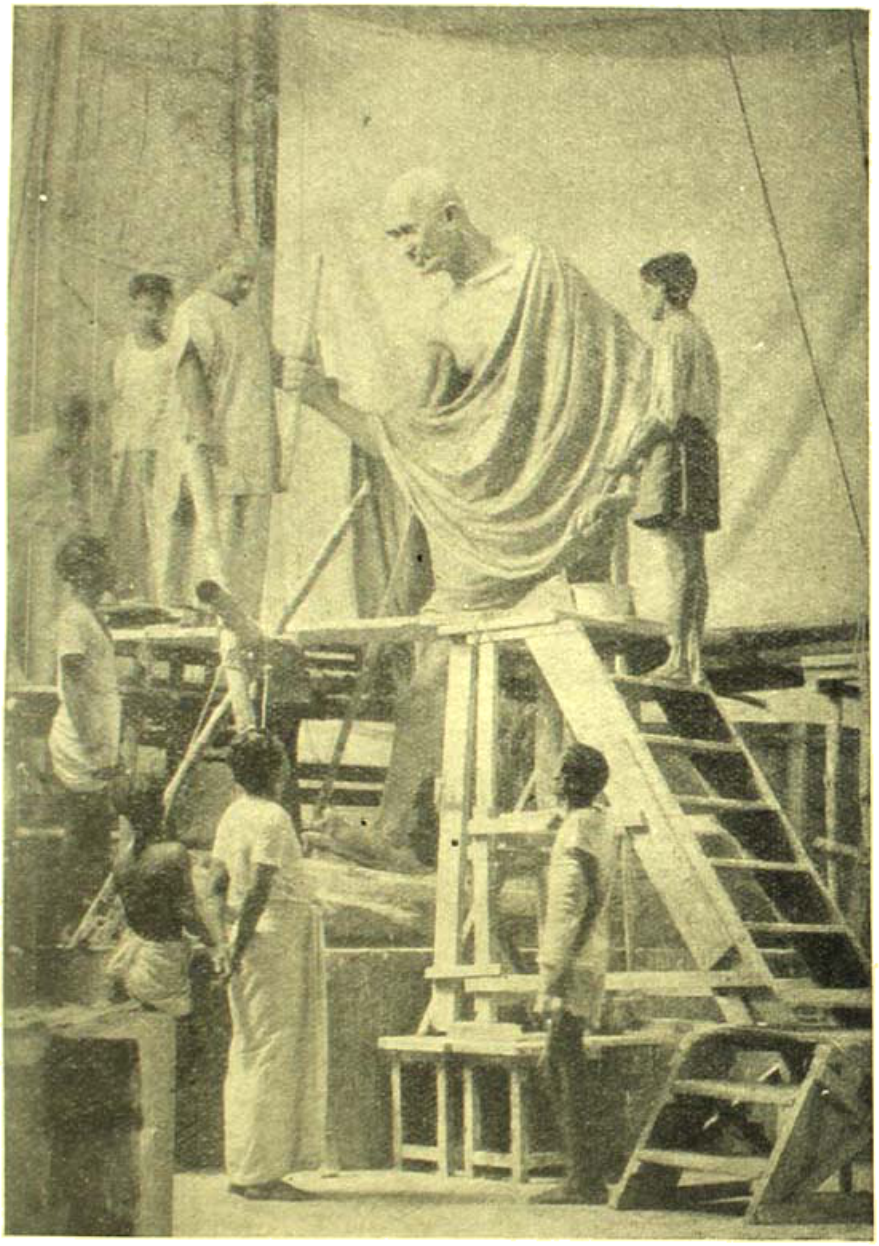

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে নির্মীয়মান মহাত্মা গান্ধীর বিরাটকায় মূর্তি।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মর্যাদা লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছিল। National Art gallery'র কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে দিয়ে life size bronze statue তৈরী করিয়ে তাঁহার মর্যাদার তাহা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উক্ত মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমের জয়যাত্রা'-ভারতীয় সাধারণ দরিদ্র শ্রমজীবীদের মূর্তপ্রতীক।

দেবীপ্রসাদের সৃষ্টির প্রখরতা ও অনুভূতির গভীরতা, কর্মমুখর মানুষগুলিকে যেন এক প্রাণ প্রান্ত হইতে মঞ্চলোকে লইয়া আসিয়াছেন এবং সাধনার সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাদের গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রতিদিন যে শক্তি আমাদের চোখে পড়লেও মনে পড়ে না, তাহাদের গুণগ্রাহী পরিচয় শিল্পী আমাদের দিয়াছেন।

। শ্রমের জয়যাত্রা ।

চারজন শ্রমিকের তীব্র দারিদ্র্যের শুষ্ক রূপ এবং সম্মিলিত উদ্যমে অপরাজেয় কর্মশক্তির পরিবেশ—এই দুই উপেক্ষিত সত্যের গভীর প্রকাশে সুপরিস্ফুট বিরাট রোঞ্জ মূর্তিগুলি উচ্চ মঞ্চের উপর হইতে, বিপুলভাবে দর্শক মনকে আকর্ষণ করে। বিস্ময়, সহানুভূতি ও জীবন-জিজ্ঞাসার মনকে আলোড়িত করে তোলে। গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে হয় আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা। এইরূপ বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং তার সার্থক রূপায়ণে, ললিত কলা একাডেমীর সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অপেক্ষা, জীবন দরদী শিল্পী আমাদের নিকট একান্ত হইয়া উঠেন। শ্রমের জয়যাত্রা ভারতীয় ভাস্কর্যে এক নূতন দিক দর্শন।

ভাস্কর দেবীপ্রসাদ স্থূলীকৃত কাদার তালে যে সজীবের অস্তিত্বদান করেন, তার মৃত্তিকাবে বেঁচে থাকার গভীর দায়িত্ববোধে অনেকের মত তিনি সচেতন। তাই তিনি আপনার সৃষ্টির সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রথম থেকেই তৎপর থাকেন। তিনি আজ পর্যন্ত যত অভিকায় মূর্তি তৈরী করেছেন, সমস্তই বিদেশ থেকে bronze casting করে আনা হয়েছে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার পর তিনি স্বদেশেই bronze casting এর সুব্যবস্থা করতে কৃত সংকল্প হন। বহু অর্থ ব্যয় করে, সামান্য একটী কারিগরকে নিয়ে নিজ তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছেন একটী কর্মকেন্দ্র। সেখান থেকে সর্বপ্রথম তৈরী হয়েছে, পাটনার সচীব সরকের সাতটী মূর্তি তারপর 'শ্রমের জয়যাত্রার' চারটী মূর্তি।

মাদ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে, তিনি সপরিবারে বাংলায় চলে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু আট বছর বয়সেও

দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র

শ্রীহারাধন দত্ত

বাংলাদেশে কৃষ্ণনগর ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর ও কৃষ্ণচন্দ্রের উপর অনেকগুলি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলই বোধ হয় এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থ। কারণ অন্নদামঙ্গল কেবল কাব্য নয়—কাব্যে ইতিহাস। রঘুনন্দন মিত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা প্রসঙ্গে এই দেওয়ান রঘুনন্দনের উল্লেখ আছে। দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে কিছু কিছু উল্লেখ আছে বটে—কিন্তু কোথাও বিস্তৃত আলোচনা নেই। আমি যে রঘুনন্দন মিত্র সম্বন্ধে বলছি—যদে রাজা প্রতাপচন্দ্র তিনি কৃষ্ণচন্দ্র সরকারের দেওয়ান। কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক দুইজন রঘুনন্দন মিত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। দুইজনেই দেওয়ান উপাধিধারী, দুই জনেই কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভায় পরিচিত ছিলেন। এ জন্যই দুই রঘুনন্দনকে অভিন্নরূপে বর্ণনা করে ইতিপূর্বে কোন কোন গ্রন্থকার ভুল করেছেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা গ্রন্থ, 'ভারতপথিক ভারতচন্দ্র' প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ডক্টর মন্মথমোহন গোস্বামী। বলা বাহুল্য ভারতচন্দ্রের উপর এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সত্যই বলেছেন···"অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন গোস্বামীর রাজসভাকবি ভারতচন্দ্র, কবি সমাজে, বঙ্গসাহিত্য সমাজে, এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতি সমাজে বহু বৎসর ধরিয়া একখানি প্রামাণিক, সুআদর্শ ও অনুকরণীয় পুস্তকরূপে বিরাজ করিবে।" এই গ্রন্থের, "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজসভা" শীর্ষক আলোচনায় দেওয়ান রঘুনন্দনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। রঘুনন্দনের ঐ পরিচয় প্রমাণপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়েছে। তবু ইহা ঐ গ্রন্থের ত্রুটি হিসাবে আমি উল্লেখ করছি না। বরং ঐরূপ বিরাট কার্যের ঐরূপ ত্রুটিকে বিবেচনার মধ্যে না আনাই উচিত। তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ দেওয়ান সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এখানে ঐ বিষয়েই কিছু উল্লেখ করছি।

ডক্টর গোস্বামী মহাশয় গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"রঘুনন্দন মিত্র কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। ইনি নবাবের নিকট হইতে 'মুস্তৌফী' উপাধি প্রাপ্ত হন। হুগলীর সাত ক্রোশ উত্তরে শ্রীপুর ইহার বাস ছিল। এই মুস্তৌফী উপাধিযুক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ানের বাস হুগলীর শ্রীপুরেও ছিল না। প্রথমতঃ এই মুস্তৌফী দেওয়ান রঘুনন্দনের কিছু পরিচয় দিয়েছি।

দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র-মুস্তৌফী উলার রামেশ্বর মিত্র-মুস্তৌফীর পুত্র ছিলেন। রামেশ্বর নবাব সরকারে কাজ করতেন। তিনিই প্রথম 'মুস্তৌফী' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই নদীয়া জেলায় উলার গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেন। রামেশ্বরের ১০টি পুত্রের মধ্যে রঘুনন্দন, অনন্তরাম, মুকুন্দরাম ও শিবরাম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘুনন্দন ছিলেন রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামেশ্বর উলায় (বীরনগরের) মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রঘুনন্দন একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। রঘুনন্দন তাঁর পিতার সঙ্গে ঢাকার রাজ সরকারে কাজ করতেন। রামেশ্বরের মৃত্যু হয় ১৭০০ শকাব্দের কিছু আগে। রঘুনন্দন পরম কার্যে পারদর্শী ছিলেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে রঘুনন্দন পরমা মায়া তাঁর বাসগৃহসংলগ্ন পুষ্প সমৃদ্ধির স্থান অপসৃত হয় এবং ১৭০০ শকাব্দে (১৭০৭ খৃঃ ১১১৪ সালে) তিনিশ্রী পুত্রাদিসহ উলা ত্যাগ করেন এবং হুগলী জেলায় শ্রীপুর গ্রামে গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে বাগবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব রায়ের নিকট ৭৫ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি গ্রহণ করে উলার বাটীর অনুকরণে তথায় গড়বেষ্টিত বাটী, দীঘিকা, চণ্ডীমণ্ডপ ও দেবালয়াদি নির্মাণ করেন। রঘুনন্দনের উলা ত্যাগের একটি কারণ এই যে উলা হইতে গঙ্গা বহু দূরে সরিয়া যায়। এই গঙ্গা-বিরহিত স্থানে ধার্মিক রঘুনন্দন বাস করা অকর্তব্য বিবেচনা করেন। ইতিপূর্বে উলার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা যে প্রবাহিত হইত তার প্রমাণ আছে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে' এবং উলা নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গা-ভক্তি তরঙ্গিণীতে (১২৮৪)। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে এই রঘুনন্দন মুস্তৌফীর সদ্ভাব ছিল। এই রঘুনন্দন একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং এই জন্যই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সন ১১৩৭ সালের ১৩ই ভাদ্র তারিখে একখানি দান পত্র দ্বারা রঘুনন্দনকে গঙ্গার পূর্বতীরে পলাশী মেহেরপুর, কলিকাতা ও ঘাবেলী সহরে বাসিন্দা করিবার জন্য ৩০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। রঘুনন্দন বৃদ্ধবয়সে সন ১১৩৭ সালে পুত্র রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। রঘুনন্দনের বিস্তৃত বংশ আজও শ্রীপুরে বর্তমান আছে। উলা ও শ্রীপুরের মুস্তৌফী বংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নাথ মিত্র মুস্তৌফী লিখিত "উলা বা বীরনগর পরিচয়" গ্রন্থে প্রচুর তথ্য ও উপাদান আছে।

রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফীর একটী সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখিত আছে। এ ছাড়া The modern history of Indian chiefs, Rajas and Zamindars. Part II গ্রন্থে মুস্তৌফী বংশের বিবরণ আছে। ডক্টর গোস্বামী মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে প্রামাণ্য সমর্থন হিসাবে "কাল পেঁচার মন্বন্তর" হতে যে অংশটি তুলিকায় ব্যবহার করেছেন তা উলা ও পরে শ্রীপুর মিত্র মুস্তৌফীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু এই রঘুনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন না, একথা আগেই বলা হয়েছে।

নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের যিনি দেওয়ান ছিলেন তাঁর নামও রঘুনন্দন মিত্র। এই রঘুনন্দনের মুস্তৌফী উপাধি ছিল না। এই রঘুনন্দনের জীবন কাহিনী সুবিস্তৃত কোথাও নাই। সুরেননাথ মিত্র মুস্তৌফী[১] তাঁর উনা বা বীরনগর ও 'মুস্তৌফী বংশ পরিচয়' উভয় গ্রন্থেই রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উভয় গ্রন্থের পাদটীকায় বলেছেন—"কোন কোন লোকের ধারণা আছে যে উনার রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী ও নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান বিখ্যাত রঘুনন্দন মিত্র একই ব্যক্তি। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান বিখ্যাত রঘুনন্দন মিত্র বর্দ্ধমান জেলার চাঙ্গুলগ্রাম নিবাসী ছিলেন। রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফীর বংশেরই এক ব্যক্তি এই কথা বলেছেন। এখানেই কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে সকল সংশয় কাটিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করছি।

শিবনিবাস[২] নদীয়ার ইতিহাসে সুপরিচিত। ইহা একদা কৃষ্ণচন্দ্রের সাময়িক রাজধানীও ছিল। শিবনিবাস সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে আজিও একটি ছড়া শোনা যায়। তাহা এই—

শিবনিবাসী, তুলাকাশী, তাহে নদী কয়ন,
কোথা হতে এলে তুমি রাজের রঘুনন্দন।

এই—রাজের রঘুনন্দনই কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান। ইনি নানাবিধ কল্যাণকর জনহিতকর কাজের জন্য নদীয়ার বিস্তৃত জনপদে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত "দেওয়ান বেড়"গ্রামও শিবনিবাসের সন্নিহিত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পরিত্রাতা দেওয়ান রঘুনন্দনকে এই গ্রামটি পুরস্কার স্বরূপ দান করেছিলেন। এই "দেওয়ানবেড়"গ্রামেই আজিও রঘুনন্দনের বংশধরেরা বাস করছেন। সুরেননাথ মিত্র মুস্তৌফী অন্য একটি প্রবন্ধে এই রঘুনন্দন সম্পর্কে বলেছেন—"রঘুনন্দন মিত্র জেলা বর্দ্ধমানের ডাঁইহাটের নিকট চাঙ্গুল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রঘুনন্দনের দেওয়ানবেড় এখন একগ্রামে জনপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার বংশে এখন নাম করিবার মত আছেন পাবনার সাবজজ শ্রীযুক্ত রোহিনী-মিত্র বি, এল মহাশয়। ইনি দেওয়ান রঘুনন্দনের প্রপৌত্র। শ্রীযুক্ত রোহিনীবাবুর জ্যেষ্ঠতাত কলিকাতে ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর প্রথমপক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

এই গ্রন্থে এই রঘুনন্দনের সামান্য উল্লেখ আছে দেখা যায় রঘুনন্দন প্রণীত গ্রন্থ 'তীর্থমঙ্গল'। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কবি বিজয়রাম সেন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবি বিজয়রাম সেনের বাস ছিল শিবনিবাসের নিকটবর্ত্তী ভাজনঘাট গ্রামে—কাব্য মধ্যেই এর উল্লেখ আছে—

শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট যায়
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে[৩] কহে সেন বিজয়রাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'তীর্থমঙ্গলে'র ১৯৪ পৃষ্ঠায়—রঘুনন্দন মিত্রের নামটি ছন্দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

ছয়দণ্ড বেলা হইল কাটোয়া নগরে
বাহুবলি মাঝিগণ চলিল সত্বরে
ডাহিনে রহিল বায়ববানার বাথে মাটিয়ারী
রঘুনন্দন মিত্রের শিব তথায় সারি সারি
যাবন শিব মিত্র করেছেন স্থাপন
তাহা প্রণমিয়া সবে করিল গমন
ডাহিন ভাগে ডাইহাট, বুড়ারাণীর ঘাট
মাণিকচন্দ্রের ঘাট তথা, অতিবড় ঠাট। (তীর্থমঙ্গল)

গ্রন্থ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথবসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ২১৯নং পাদটীকায় এই রঘুনন্দন মিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন—"রঘুনন্দন মিত্র দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভব। ইনি দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রনামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামা সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে যুদ্ধ-কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য নজরাণা স্বরূপ বারলক্ষ টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। দেওয়ান রঘুনন্দনের কর্ম্মকুশলতায় নজরাণার টাকা প্রদত্ত হইলে মহারাজ মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু রঘুনন্দন অনেকের বিদ্বেষ ভাজন হইয়া, শেষে দেওয়ান মাণিকচাঁদের কোপে পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী 'দেওয়ানবেড়' নামক গ্রামে রঘুনন্দনের বংশধরেরা এখনো বাস করিতেছেন।"[৪] মাটিয়ারীতে রঘুনন্দন মিত্র প্রতিষ্ঠিত যে যাবন শিবমন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে—তাহা ঐতিহাসিক সত্য। শুনেছি ঐ যাবন শিবমন্দির এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না—পরলোকে বিলুপ্তি হয়েছে। মাটিয়ারীর ঐ যাবন শিবমন্দির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Dr. K. K. Dutta লিখেছেন—"Matiari, a big village situated just opposite Dainhat, famous for the images of Ramasita Raghunandan Mitra, the Dewan of Maharaja Krisn Chandra of Nadia founded here twelve Sivo images"[৫]। পূর্ব্বোক্ত 'তীর্থমঙ্গল' ঐ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কেহ কেহ তাহাও উল্লেখ করেছেন। তীর্থমঙ্গল-সম্পাদক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাই, ইহাতে সে সময়কার বাঙালীর সমাজচিত্র, দেশের অবস্থা, লোকের মনের অবস্থা এবং ইংরাজাধিকারের সর্ব্বপ্রথম অবস্থার চিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এই তীর্থমঙ্গল কেবল তীর্থযাত্রীর পক্ষে নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের একটি উপাদেয় অধ্যায় বলিয়া সর্ব্বজনসমাদৃত হইবে।" এই তীর্থমঙ্গল সম্পর্কে Dr. K. K. Dutta ও লিখেছেন—

(১) সুরেননাথ মিত্র মুস্তৌফী উনার মুস্তৌফী বংশের সন্তান।

(২) শিবনিবাস—(ভারতবর্ষ—চৈত্র—১৩৩৩)

(৩) এই কৃষ্ণচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নহেন ইনি ভূকৈলাস রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ।

(৪) 'তীর্থমঙ্গল' (গৌড়ীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত) পাদটীকা।

(৫) Studies in the History of Bengal Subas, P-393.

"It is a Contemporary work on travels of much historical value—The description being accurate are of much importance for a student of history"[৬] দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী বর্দ্ধমানের মাটিয়ারীতে আনন্দ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বি এবং তিনি দেওয়ান ফেডের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বঙ্গী কৃষ্ণচন্দ্রকে রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী বন্দীভূত করেছিলেন কিনা এ ইতিহাসও নেই।

নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র সম্বন্ধে বর্তমানে শ্রীকালীকিঙ্কর দে বি-এল, মহাশয় কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। রঘুনন্দন কেমন করে শিবনিবাসের পাশ দিয়ে চূর্ণীর প্রবাহ এনেছিলেন—এতৎসম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। তিনি একস্থলে এই রঘুনন্দন সম্পর্কে লিখেছেন—"রঘুনন্দন ছিলেন বিশ্বামিত্র গোত্রের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সন্তান। মহাবিত্ত সংসারে তাঁহার জন্ম। পূর্ব্বনিবাস কোত্রসরে—পরে বর্দ্ধমান জেলার হাইহাটের নিকটে চাকুলী গ্রামে। অল্প বয়সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজ্যারোহণের পরেই টাকার তাগিদে ১২ লক্ষ নজরাণার দায়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অবরোধ করিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী রঘুনন্দনের একমাত্র উদ্যোগে তিনি কারামুক্ত হন। তদবধি তিনি নদীয়া রাজার দেওয়ান, শুধু দেওয়ান নয়—সর্ব্বাধিকারী ক্ষমতাযুক্ত দেওয়ান। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় নদীয়া রাজার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাস হইতে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হইল। রাজপরিবার ও ধনৈশ্বর্য্য রক্ষার জন্য নিরুপদ্রবে রঘুনন্দনেরই পরিকল্পনায় বিশাল নগরী শিবনিবাসের পত্তন হইল। অষ্ট্রোলিকাসমূহ তদানীন্তন ইউরোপীয় প্রাসাদাদি হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না তাহা বিশপ হেবার সাহেব বলিয়া গিয়াছেন। ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই শিবনিবাসেই অহিরোত্র যাজ্ঞের যজ্ঞ সমাহিত হইল এবং এই শিবনিবাস নগরীর পার্শ্বদেশে ভাগীরথের মতই তিনি বহতা নদী আনিয়াছিলেন।"[৭] এইগুলি ছাড়া দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায়ের "শিবায়ন বংশাবলী চরিত" (সংবৎ ১৯০২) জয়নারায়ণ ঘোষালের "কাশীখণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে পরিচয় আছে। কিন্তু সেখানে রঘুনন্দনের পূর্ব্ব জীবনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

নদীয়ার দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র বিচক্ষণ কর্ম্মকুশল ও সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। আর রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী ছিলেন ধার্ম্মিক ও সাধক। রঘুনন্দনের জন্ম হয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফীর জন্ম হয় অভিজাত মুস্তৌফী বংশে। নদীয়া রাজের দেওয়ান রঘুনন্দনের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম' (১৮১১) ও "শিবায়ন বংশাবলী চরিত" গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে। মুস্তৌফী রঘুনন্দন মিত্রের মৃত্যু ঘটে বৃদ্ধবয়সে অতি সাধারণ ভাবে। কিন্তু দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের মৃত্যুকাহিনী অতি করুণ। শিবায়ন বংশাবলী চরিত গ্রন্থের ৫৮-১০৮ পৃষ্ঠায় এই রঘুনন্দনের মৃত্যুকাহিনীর এক করুণ চিত্র অঙ্কিত আছে। উনার রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে উলা ত্যাগ করে হুগলী জেলার শ্রীপুর গ্রামে বাস করেন, ১৭৩০ খ্রীঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হতে মহারাণ ভূমি দান এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৮ বৎসর বয়সে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম দুই বৎসর ১৭২৮-১৭৩০ উলা-ত্যাগী শ্রীপুর নিবাসী রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফীর নদীয়ার দেওয়ান হইবার সুযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। এতদ্ভিন্ন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী ও দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র উভয়ের সম্বন্ধেই বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছি। উভয় রঘুনন্দনের মধ্যে এই বিভিন্নতা হতেই বোঝা যায় যে শ্রীপুরের রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন না।

---

(৬) Alivardy & His times—P-285 86

(৭) দুই পতাকী পূর্ব্বে নদী পরিবহনে কৃতিত্ব—বসুমতী (কার্ত্তিক—১৩৪১)

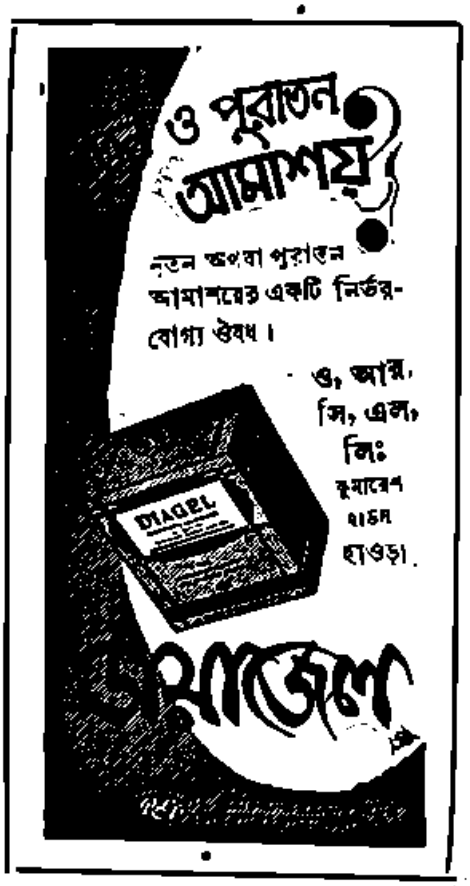

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৃহস্পতি ওরফে বিকুবাবু আহারাদির পর নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসিয়া ইভিপ্টের বইটিই পড়িতেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী লোক তিনি, স্বল্পাহারীও। অনেকরকম রান্না হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বেশী কিছু খান নাই। দুই আঙুলে করিয়া তুলিয়া তুলিয়া সব জিনিসই একটু আধটু চাখিয়াছিলেন। চাখিতে চাখিতেই তাঁহার পেট ভরিয়া গিয়াছে। ভাত যৎসামান্য খাইয়াছেন, ডালই একটু বেশী প্রিয় তাঁহার, প্রায় আধ বাটিটাক্ চুমুক দিয়া খাইয়াছেন সেটা। আপেল স্টাফিংটাও তাঁহার মন্দ লাগে নাই। চম্পার রান্নার হাত আছে। চম্পার গান-বাজনাও খুব ভালো লাগিয়াছে তাঁহার। কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করেন নাই। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে মনে উপভোগ করিয়াছেন তাহা। বাবা যে ইহাতে আনন্দ পাইয়াছেন ইহাতেই বেশী খুশী তিনি। কিন্তু এ খুশীভাবটাও তিনি চাপিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ করেন নাই, সাধারণত করেন না। এক-দুই-তিনকে কি গল্প বলিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা খুকুর পুত্র খুকুকে যে যাদুকরের গল্পটা বলিয়াছিলেন সেই গল্পটাই তিনি উহাদের শুনাইবেন। সম্ভবত উহাদের ভালো লাগিবে। যাদুকর দেশি হাঁসের মুণ্ড কাটিয়া তাহা আবার জুড়িয়া দিয়াছিল।...সহসা অন্য একটা কথা মনে হওয়াতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহাদের বাড়ির কাছে একটা পীর-পাহাড় আছে। তাহার তলায় কোন ঐতিহাসিক রহস্য আত্মগোপন করিয়া নাই তো! হারাপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো তো ওইরূপ পাহাড়ের মতোই ছিল। স্বর্গীয় রাখাল বাঁড়ুয্যে কল্পনার জোরে সেই সব পাহাড়ের তলায় অতীতের ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাহাড়টা খুঁড়াইয়া দেখিলে ক্ষতি কি। তাহা কি সম্ভব? গভর্ণমেণ্টকে বলিলে শুনিবে কি? শুনিবে না, পীরপাহাড়কে খুঁড়িতে সাহসই করিবে না। হিন্দু-মুসলমান বাধাই বাধিয়া যাইবে হয় তো। মনে পড়িল নকুলদা যখন এক স্টোন-কণ্ট্রাক্টারের মাড়োয়ারির নিকট চাকুরি করিতেন তখন এই পাহাড়ের তলায় না কি কয়েক ঘড়া মোহর পাইয়াছিলেন। কাহাকেও সেকথা বলেন নাই অবশ্য, খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু ওই পাহাড়-খোঁড়ার পর হইতেই তাঁহার অবস্থা ফিরিয়া যায়।...বৃহস্পতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাহাড় খুঁড়িবার সময় দু'একটা পাথরে কি যেন লেখাও ছিল, কারুকার্য্যও ছিল। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। বাবার জন্য যে দুশ্চিন্তা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, সে দুশ্চিন্তার বেগ আগেই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের খেয়ালে নিজের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যে কয়েকখানা বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

উষা নিজের ঘরে বিছানায় বসিয়া সদানন্দের পা টিপিয়া দিতেছিল। আহারাদির পর সদানন্দের দিবা-নিদ্রা দেওয়ার অভ্যাস আছে। নিদ্রার পূর্ব্বে পা-টেপানোটাও তাঁহার একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে। পূর্ব্বে চাকর দিয়া টিপাইতেন, কিন্তু এখন উষা নিজেই টিপিয়া

দেয়। চাকরদের হাতের ছোঁয়াচে চর্ম-রোগ হইতে পারে এই ধারণা যেদিন হইতে তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে সেদিন হইতে সে সদানন্দের পায়ে কোনও চাকরকে হাত দিতে দেয় না। এমন কি তাঁহার কাপড় চোপড়ও নিজেই কাচিয়া দেয়। প্রায় প্রকাশ্যভাবেই সে সদানন্দের সেবা করিতেছিল, ঘরের কপাটটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বামীর পদ-সেবা করিতেছে তাহাতে লজ্জার কি আছে। সন্ধ্যাটারই বরং লজ্জা-সরম নাই, দুপুরে স্বামীকে লইয়া ঘরে খিল দিয়াছে। ঊষা পান চিবাইতেছিল, ঠোঁট দুটি লাল, মাথার চুল আলুলায়িত, একটা সুন্দর কেশ-তৈলের সৌরভে ঘরের বাতাস আমোদিত, চোখের দৃষ্টি আনন্দে সোহাগে টলমল করিতেছে। পা টিপিতে টিপিতে সে স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতেছিল। ইদানীং কিছুদিন হইতে সে স্বামীর সহিত যে আলাপই করুক না কেন, তাহাতে ভর্ৎসনার সুর ফুটিয়া ওঠে।

"তুমি এসে থেকে তো বাবার কাছে একবারও বসলে না। বাইরে বাইরে খালি বাজে গল্প করে' বেড়াচ্ছ। কাছে বসলে বাবা কত খুশী হ'ন। কি যে মুখ-চোরা স্বভাব তোমার—"

"কেষ্ট-দা'ও তো যান নি"

"কেষ্ট-দার কথা ছেড়ে দাও। বুনো লোক। জানোয়ারদের সঙ্গই ওর ভালো লাগে"

"রঙ্গনাথ গিয়েছিল কি—"

"গিয়েছিল একবার সকালের দিকে, তুমি তখন চান করছিলে। গিয়ে বসে' বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, এদিকে বেশ দেকাপা-দুরস্ত আছে তো। দাদার জামাইটিও বেশ হয়েছে। ঘুরছে ফিরছে বাবার কাছে গিয়ে বসছে। তুমিই খালি এড়িয়ে চলছ—"

"গুরুজনদের সামনে গিয়ে কেমন যেন স্বস্তি পাই না। কি গল্প করব ওঁর সঙ্গে—"

"যে কোনও বিষয়ে গল্প করতে পার! বাবার সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে গল্প করা যায়। সোমনাথ তার ওপরওলা কি এক সাহেবের সম্বন্ধে গল্প করছিল। রঙ্গনাথ গাছপালা নিয়ে কি সব বকছিল, কে একজন বুড়ো মুসলমান এসেছিল সে তো সমস্তক্ষণ আখ আর গুড়ের গল্পই করলে। বাবা সবার সঙ্গেই বেশ মায় দিয়ে দিয়ে গল্প করলেন—"

"আমি বাবার সঙ্গে কি নিয়ে গল্প করব তাতো মাথাতেই আসছে না"

"বই টই নিয়ে বলো না কিছু। বাবা এককালে খুব বই পড়তেন। বাংলা ভাষার যত বই বেরুত সব বাবা কিনতেন, কি প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল আমাদের। এ গ্রামের সব বাঙালী আমাদের বাড়ী থেকে বই নিয়ে পড়ত। সেই জন্যেই সব হারিয়ে গেছে। যে বই নিয়ে যায় সে তো আর ফিরিয়ে দেয় না, সে পাট নেই কারও—"

সদানন্দের ঘুম আসিতেছিল।

জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, সন্ধ্যের পর বসব গিয়ে—"

"আর দেখ, এক-দুই-তিনকে তুমি একটু শাসন কোরো। বড্ড বেড়েছে ওরা—"

"আচ্ছা"

"আর দেখ, আমাদের চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে কাটিহারে পাঠিয়ে দিই, কি বল, কিছু তরকারি, ফল, চা কফি হরলিক্স্ কোকো এইসব কিনে আনুক। কুমার বেচারা একা আর কত সামলাবে। দাদা অবশ্য এসেই ওকে কিছু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরও তো কর্তব্য আছে—"

"বেশ—"

সদানন্দের নাকটা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

ঊষা তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া তাহার পর মৃদু হাসিল। দ্বিতীয়বার নাক ডাকিতে সে ধীরে ধীরে তাহার গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ঊষা দিবা-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, কে যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে দিনে ঘুমাইলে আরও মোটা হইয়া যাইবে।

এক-দুই-তিনকে লইয়া স্বাতী পেয়ারা গাছগুলির তলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। গাছ-পাকা পেয়ারার উপর তাহার খুব লোভ। কুমার—স্বাতী-সোমনাথের জন্য একটি আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছিল দক্ষিণ দিকের মাঠে। সোমনাথ আহারান্তে সেই তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়াছিল। সে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়াছিল স্বাতীও আসিবে। আসিলে তাহাকে বিলাতী মাসিক পত্রিকার

প্রকাশিত একটি ছবি দেখাইবে সে। পত্রিকাটি সে স্টেশন স্টলে কিনিয়াছিল কিন্তু ট্রেনের ভীড়ে স্বাতীকে দেখাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও যখন স্বাতী আসিল না তখন সোমনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অবশেষে পেয়ারা গাছগুলির নীচে আসিয়া পড়িল।

"এ কি, এতো খাওয়ার পর আবার পেয়ারা খাবে না কি"

স্বাতী আসল কথাটি চাপিয়া গেল। ইহাই তাহার স্বভাব।

"দাদুর জন্যে খুঁজছি। দাদু পেয়ারা খুব ভালোবাসেন তো—"

দুই বলিয়া উঠিল—"একটু আগে যে পেয়ারাটা পেলাম সেটা তো আমরাই বেলাম ভাগ করে'। দাদুর জন্যে রাখলে না তো—"

"ও পেয়ারা কি দাদুকে দেওয়া যায়। পাকেই নি—"

এক বলিল, "না জামাইবাবু, সুন্দর ছিল পেয়ারাটা—"

"চুপ কর ফাজিল কোথাকার"—ধমকাইয়া উঠিল স্বাতী। তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া মুচকি হাসিয়া সোমনাথকে বলিল—"ওই অনেক উঁচুতে চমৎকার পেয়ারা রয়েছে। পেড়ে দেবে ?"

প্রায় মগডালের কাছাকাছি একটা বড় পাকা পেয়ারা ছিল। সোমনাথ মালকোঁচা মারিয়া গাছে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তরুণী স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না।

কিরণও খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়াই কৃষ্ণকান্তকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারও উদ্দেশ্য ছিল স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া কিছু নীতি-উপদেশ দেওয়া! কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে সে ধরিতেই পারিল না! কৃষ্ণকান্ত আহার শেষ করিয়াই নিজের বন্দুকটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোথা গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। বন্দুকের খালি বাক্সটার দিকে চাহিয়া কিরণ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি লিখিল পুত্র ঘণ্টুকে।

"বাবা ঘণ্টু, তোমার দাদু অনেকটা ভালো আছেন। বিপদটা আপাতত কেটে গেছে মনে হচ্ছে। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। বাড়ি এখন জমজমাট। উষা তার তিন ছেলে নিয়ে এসেছে। দাদার ছেলে-মেয়েরা এসেছে সবাই, গগনের বউও এসেছে। দাদা-বউদি তো এসেছেনই। সন্ধ্যা-রঞ্জনাও এসেছে। সোমনাথ-স্বাতীও। সেজদাও সপরিবারে আসছেন, খবর এসেছে আজ। এ সময় তুমি না থাকাতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যেমন করে' পার ছুটি নিয়ে চলে' এস। সবাই নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে, আমার ছেলেটিই আমার কাছে নেই, একি ভালো লাগে কখনও ? তুমি আমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটির দরখাস্ত কোরো, যদি ইতিমধ্যে না করে' থাকো। দরখাস্তে লিখে দিও না হয়—মায়ের খুব অসুখ করেছে—"

এই একটি কথাই সে নানা সুরে লিখিতে লাগিল।

পার্ব্বতী পুরন্দরীকে লইয়া পড়িয়াছিল।

"নিয়ে আসি না একটু তেল। তুমি আপত্তি করছ কেন"

"না এখন তেল মাখাতে হবে না আমার পায়ে। বিছানার চাদরটা তেলে মাখামাখি হয়ে যাবে, আজই বার করেছি ওটা"

"হলেই বা, আরও তো চাদর আছে—"

"তুই গড়িয়ে নে না একটু, আমাকে নিয়ে পড়লি কেন—"

"ঘোরাঘুরি তোমার কম হচ্ছে না। হাঁটুর ব্যথাটি যদি বাড়ে তখন আমাকেই তুগতে হবে যে। আমি উনুনে তেলের বাটিটা চড়িয়ে এসেছি, নিয়ে আসি"

পার্ব্বতী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পুরন্দরী অর্দ্ধ-স্ফুট-কণ্ঠে বলিলেন, "আলিয়ে খেলে মেয়েটা—"

বৃহস্পতি কোণের দিকে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, দিক না একটু তেল মালিশ করে'। ঠিকই তো বলছে ও, হাঁটুর ব্যথাটা বাড়লে মুশকিল হবে—

পুরন্দরী বাদ-প্রতিবাদ পছন্দ করেন না, অপ্রসন্নমুখে পাশ ফিরিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

টেলিগ্রাম করিবার জন্য দিগম্বর সহিত সন্ধ্যাও পোস্টাফিসে গিয়াছিল। উষা ঠিক খবরটি জানিত না। সন্ধ্যা রঙ্গনাথের সহিত নিজের ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল এইটুকুই উষা দেখিয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই যে সন্ধ্যা অন্য দরজাটি দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা উষা দেখে নাই। সন্ধ্যার দিনের বেলা ঘুম আসে না। দিনের বেলা সে পড়া-শোনা করে। কিন্তু রঙ্গনাথের দিনের বেলা না ঘুমাইলে চলে না। তাহার আর একটি বদ-অভ্যাস আছে। সন্ধ্যা পাশে না শুইলে তাহার ঘুমই আসে না। রঙ্গনাথ ঘুমাইয়া পড়িতেই সন্ধ্যা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইল—দিগম্বর কোথা যেন যাইতেছে।

"কোথা যাচ্ছিস এ সময়ে—"

"পোস্টাফিসে টেলিগ্রাফ করতে। দাদা বললে পাক-প্রণালী চাই দু'তিন রকম। আমার এক বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে' দি, সে খুঁজে কিনে পাঠিয়ে দেবে—"

"পাক-প্রণালী? কি হবে?"

"দাদা বলছে বাহুকে নতুন নতুন তরকারি রান্না করে' খাওয়াবে রোজ।"

"আইডিয়াটা চমৎকার, না?"

কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া দিগম্বর সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিল। সন্ধ্যা দেখিল তাহার চোখের দৃষ্টি দাদার নূতন আইডিয়ার কিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ খুব ভালো লাগিয়া গেল দিগম্বরকে। নূতন আলোকে তাহাকে যেন দেখিতে পাইল।

"চল আমিও তোর সঙ্গে যাই, গ্রামের ভিতর যাইনি অনেক দিন। সেই ছেলেবেলায় যেতুম"

"চল"

পোস্টাফিসের কাছাকাছি আসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "তুই টেলিগ্রাম কর, ততক্ষণ আমি কালী সিংয়ের বাড়িটা ঘুরে আসি। ওরা কেউ আছে কিনা কে জানে—"

পোস্টাফিসের পিছনেই কালী সিংয়ের বাড়ি। কালী সিং এককালে এখানকার থানার হাবিলদার ছিল। আদি বাড়ি তাহার মুঙ্গের জেলায়। এইখানেই পুলিসের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করে। সেই সময় সূর্য্যসুন্দর চেষ্টা করিয়া তাহাকে স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে উচ্চ-শ্রেণীর সিপাহীর পদে বহাল করাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদারই তাহাকে গ্রামের মধ্যে কিছু জমি দান করেন। সেই জমির উপর কালী সিং বাড়ি করিয়াছিলেন। সেই হইতেই কালী সিংয়ের সহিত সূর্য্যসুন্দর পরিবারের হৃদ্যতা। কালী সিংয়ের বউ প্রায়ই নানা রকম খাবার করে প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যসুন্দরের ছেলে-মেয়েদের জন্য লইয়া যাইত। চিঁড়া বা মুড়ির মোয়া, ঠেকুয়া, খাবুনি, বাসনের সন্দেশ, তাল-মাড়া প্রভৃতি একদিন উষা ও সন্ধ্যার হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কালী সিংয়েরও দুটি মেয়ে ছিল, বুধিয়া আর সীতিয়া। উষা আর সন্ধ্যার খেলার সঙ্গী ছিল তাহারা। কালী সিং বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। কালী সিংয়ের স্ত্রী বাঁচিয়া আছে এখনও।

সন্ধ্যা তাহার কাছে গিয়াই উপস্থিত হইল।

"চাচী চিনতে পার আমাকে—"

চাচী উঠানে নামিয়া আসিল এবং মুখ তুলিয়া কপালে বাঁ হাতটা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা দেখিল চাচীর চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। চাচীর শিরাবহুল জরা-কুঞ্চিত কপালের চামড়াটা আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। চাচী সন্ধ্যাকে চিনিতে পারিল না।

"চিনতে পারলে না তো, আমি সন্ধ্যা"—

চাচী বাঙালীদের সঙ্গে আধা-বাঙলা আধা-হিন্দীতে কথা বলে।

"আরে সন্ধ্যা-মাই। আমি শুনেছি তোরা এসেছিস। যেতে পারি নি, আঁখে আর ভালো সুঝে না। সীতিয়াকে রোজ যেতে বলি, সে-ও পারে না, তার কোমরে দরদ—

"সীতিয়া আছে না কি এখানে—"

"আছে। শুয়ে আছে ঘরে। এ সীতিয়া—দেখি দেখি কে আয়ল বা—"

সীতিয়া বাহির হইয়া আসিল কোমরে হাত দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মুখে এক মুখ হাসি। সীতিয়াকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল সন্ধ্যা। এ কি চেহারা সীতিয়ার। এত মোটা হইয়াছে। সীতিয়া কথা বলিল পরিষ্কার বাংলাতে।

"কাকাবাবুর অসুখ করেছে, তোরা এসেছিস, সব

আমি জানি, কিন্তু কি করব, চলতে পারছি না কোমরে এত ব্যথা"

"কি হয়েছে কোমরে"

"বাত"

"এত অল্প বয়সে বাত! ডাক্তার দেখিয়েছিস?"

"দেখিয়েছি। হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু একটা মালিসের ওষুধও দিয়েছেন। লাগাচ্ছি তো, কিন্তু কমছে না"

"তুই গগনকে দেখা। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"গগন কে"

"দাদার বড় ছেলে। সে ডাক্তার হয়েছে যে, শুনিস নি?"

এই সংবাদে কাশী সিংয়ের স্ত্রীর মিশি মাখানো দাঁত-গুলি আনন্দে বাহির হইয়া পড়িল।

"খোকাবাবু ডাক্টর বন্ গৈসন! শিউজি বাঁচিয়ে রাখুন তাকে।"

পাঁচ ছয় বৎসরের একটি উলঙ্গ বালক লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিল। তাহার প্রকাণ্ড টিকি, নাক-বোঝাই সর্দ্দি। গায়ে একটা নীল সোয়েটার রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাকী সমস্তটা উলঙ্গ। কোমরে একটা লাল ঘুনসি, তাহাতে ছোট্ট একটা বুটিয়া ঝুলিতেছে।

"শিউধতন, গোড় লাগ। মৌসি—"

"তোর ছেলে?"

সীতিয়া হাসি মুখে ঘাড় নাড়িল।

"বড় দুষ্টু, দিন রাত রাস্তায় খেলছে"

শিউধতন কোন রকমে প্রণামটা সারিয়া আবার লাফাইতে লাফাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

"আয় ঘরে বসবি আয়—"

সন্ধ্যা অনুভব করিল, সীতিয়া আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরই ঢুকিল। গিয়া দেখিল সেখানেও একটি তিন চার মাসের ছেলে নিজের হাতের মুঠা দুইটি দেখিয়া দেখিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান শিশু। তাহার গায়ে ফুলদার রঙীণ রেজাই ঢাকা, মাথায় লাল টুপি। ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া রেজাইটা লাথি মারিয়া সরাইয়া দিবে। চোখের কাজল সারা মুখে মাখিয়াছে। সন্ধ্যা নিজে যদিও নিঃসন্তান, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। তাহার মনে হইল সীতিয়াকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করা তাহার কর্ত্তব্য। সে বিছানার একধারে বাগাইয়া বসিল। চাচীও কয়েকটি লাড়ু লইয়া প্রবেশ করিল।

"খা—"

লাড়ুগুলি দিয়াই চলিয়া গেল চাচী। বারান্দায় গিয়া 'বরশী' হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। চাচী তামাক খায়।

ছেলেবেলায় লাড়ু পাইলে সন্ধ্যা উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন ততটা হইল না। সে কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেল চাচী যে পাত্রটিতে লাড়ু আনিয়াছিল সেই পাত্রটি দেখিয়া। প্লেটের মতো, কিন্তু কাচের বা চীনেমাটির নয়, বেতের। তাহাতে নানা রকম রং ও রহিয়াছে, চমৎকার দেখিতে। গৃহ-শিল্প সম্বন্ধেও অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। অনেক ভাবিয়াছেও।

সীতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কোথা থেকে কিনেছিস্। বেশ"

"ভিখ্‌নার বউ তৈরি করে' বিক্রী করে"

"কোথা থাকে সে"

"কাজি গাঁয়ে। তুই নিবি? এইটেই নিয়ে যা না"

"দে—"

বাল্যসঙ্গিনীর নিকট হইতে এই সামান্য উপহার পাইয়া সন্ধ্যা সহসা যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

"আমি কিন্তু ভিখ্‌নার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই"

"আচ্ছা, খবর পাঠিয়ে দেব তাকে"

সন্ধ্যা নিমেষের মধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল কি করিবে। ভিখনার বউ বেতের বাসন তৈয়ারি করিতেছে, এই অবস্থার তাহার একটি ফোটো তুলিবে সে। বাসন-গুলির ফোটো তুলিবে, দৃষদতীতে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখিবে। তাহার পর সে নিজের গলা হইতে সোনার সরু হারটা খুলিয়া সীতিয়ার ছেলের গলায় পরাইয়া দিল।

"ওকি করলি"

"দিলুম তোর ছেলেকে। তোর বড় ছেলেকে একটা

কুল পাণ্টও করিয়ে দেব আমি। রমজানিয়া এলে মাপ নিয়ে যাবে—

সীতিয়া হাসিয়া বলিল, "রমজানিয়া অনেকদিন হ'ল মারা গেছে। তার ছেলে গোহর এখন দর্জির কাজ করে—"

"রমজানিয়া মারা গেছে? বেশ, গোহরকেই পাঠাব তাহলে—। বুদিয়ার খবর কি"

"বুদিয়া শ্বশুর বাড়িতে আছে"

"ভাল আছে বেশ?"

"খুব ভালো নেই। তার স্বামীটা বড় মারখুণ্টা। তোর ছেলেমেয়ে কি"

"আমার এখনও হয় নি ভাই"

"কেন?"

"এমনি"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। সমাজের নানারকম কাজকর্ম করারও ইচ্ছে আছে। কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে থাকলে ওসব হ'ত না"

"তা বটে। আমার মাত্র দুটো ছেলে, তাতেই পাগল করে' দিয়েছে আমাকে। কিন্তু ছেলে হওয়া বন্ধ করেছিস কি করে'। কোন ওষুধ খেয়েছিস?"

"না"

সন্ধ্যা জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধেও প্রচুর পড়াশোনা করিয়াছে। স্থির করিল এ বিষয়েও পরে সে সীতিয়ার সহিত আলোচনা করিবে।

"লাড়ু খাচ্ছিস না যে—"

"অনেক বেলায় খেয়েছি। সঙ্গে নিয়ে যাই, পরে খাব—"

বারান্দায় চাচীর হুঁকার শব্দ শোনা গেল।

ক্রমশঃ

গ্রহ জগৎ

প্রণয়, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন

উপাধ্যায়

সপ্তম ভাব

জন্ম কুণ্ডলীর লগ্ন বা তনু ভাব থেকে সপ্তম গৃহটী বিবাহ, পতি ও পত্নী ভাবের নির্দ্দেশ করে—স্ত্রীলোকের পক্ষে জন্মকুণ্ডলীতে লগ্ন ও রাশি থেকে সপ্তম স্থানটী উক্তভাব-গুলির নির্দ্দেশক। বিবাহের সম্ভাবনাকে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন ও প্রতিহত করে রবি চন্দ্রের অশুভ প্রেক্ষা বা দৃষ্টি। স্ত্রীর বিষয়ে বিচার করতে হোলে পুরুষের কোষ্ঠীতে লগ্ন, শুক্র ও চন্দ্র থেকে সপ্তম রাশির অবস্থা ও গ্রহসমাবেশে বলাবল লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয়। স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে শুধু লগ্ন ও রাশি থেকে সপ্তম স্থানটী সবটুকু নয়, রবি ও মঙ্গল থেকে সপ্তম স্থান ও বিচার করা দরকার।

সপ্তম স্থানে রবির অবস্থান সম্পূর্ণ ভালো বলা যায় না, তার কারণ দেহ ভালোবাসা বৃদ্ধিকারক, সৌভাগ্যপ্রদ এবং উচ্চাভিলাষী পতি বা পত্নীদায়ক হোলেও, গ্রহটী দাম্পত্য-ঐক্য দেয় না—দম্পতীর মধ্যে মতানৈক্য থেকে আসে মনোমালিন্য ও প্রণয়ভঙ্গ। সপ্তমে চন্দ্র সুখের বিবাহ ঘটালেও সামাজিকতার ক্ষেত্রে অদাক্ষণ্য ও স্বজনকুটুম্ব বিরোধ আনে। এখানে মঙ্গলের অবস্থিতি মোটেই সুখকর নয়। স্নেহ প্রীতি ব্যাপারে স্ত্রী বা পুরুষের ব্যগ্রতা ও গাঢ় ভাবপ্রবণতা থাকলেও অতিরিক্ত প্রভুত্ব-প্রিয়তার জন্য বিষময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়—গ্রহটী মিলন ঘটিয়ে দেয় এমন একটী নারী বা পুরুষের সঙ্গে—যার ভেতর আছে অসমসাহসিকতা, নির্ভীকতা ও উগ্রস্বভাব।

সপ্তম স্থানে বুধ পতি বা পত্নী সম্পর্কে অশুভপ্রদ বলা যায় না। অত্যন্ত চটপটে বুদ্ধিমান্ পতি বা বুদ্ধিমতী পত্নী-লাভ, কথাবার্ত্তায় থাকে তার ক্ষিপ্রগতি আর সময়ে সময়ে দেখা যায় তার স্পষ্টবাদিতা। সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি নারীকে সৌভাগ্যবতী করে আর উত্তম স্বামীলাভ হয়—এই গ্রহের সপ্তম ভাবে অবস্থিতি খুব সুখকর বিবাহ ও মিলন ঘটায়, উদারও মহৎ স্বামী বা পত্নীর আনুকূল্যে দাম্পত্যজীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। অবশ্য গ্রহের রাশিভঙ্গ অনুসারে প্রতিকূলগতি হোলে শুভ ফলের হ্রাস হয়ে থাকে।

সপ্তমে শুক্র প্রণয় ও কাম বৃদ্ধিকারক, এর আনুকূল্যে সৌভাগ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও দম্পতীর মধ্যে মনের সুন্দর মিলও সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ পায়। সপ্তমে শনি বিবাহিত জীবনে বিশ্বস্ততা আনে বটে, কিন্তু কোন মাধুর্য্য সৃষ্টি করে না—উদাসী বা উদাসিনী স্বামী বা স্ত্রী নিয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়। তা ছাড়া বিবাহে বিলম্ব বা বাধা আনে, আর সৌভাগ্য বৃদ্ধিও হয় না আশানুরূপভাবে। সপ্তমে রাহু বা কেতুর অবস্থান অশুভ। কেননা এরা বিবাহের ব্যাপারে দাম্পত্যজীবনে বহু গণ্ডগোলও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। স্ত্রী বা স্বামী প্রচণ্ড স্বভাববিশিষ্ট ও অব্যবস্থিতচিত্ত হয়। স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে এই গ্রহ মানসিক বিকৃতি, সাময়িক উন্মাদনা, অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বার্থপরতা, তীব্র কলহ ও মনোমালিন্য এবং অবশেষে বিচ্ছেদ এনে দেয়—স্ত্রী বা স্বামীর স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতা কেবলমাত্র দাম্পত্য জীবনকেই বিষময় করে না, সন্তান ও পরিবারবর্গও উৎ-পীড়িত হয়। রাহু কিম্বা কেতু সপ্তম স্থানে থাকলে দুঃখ-জনক শোকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, আর দাম্পত্যজীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

দাম্পত্য সুখের হানি হয় যদি সপ্তমাধিপতি ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে অবস্থান করে আর দ্বিতীয় স্থানে অশুভ গ্রহের

দৃষ্টি পড়ে। দুইটী পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী সপ্তম স্থান হোলে পাপযোগের ফলে দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত করুণ ও দুঃখময় হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকের কোষ্টীতে অষ্টম স্থানটী এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাপগ্রহ, বিশেষতঃ মঙ্গল থাকলে নারীর বৈধব্য ঘটে, আর শনি থাকলে বিবাহিত জীবনে কোন মাধুর্য্য থাকে না। সপ্তম স্থানে শনি ও চন্দ্র একত্র থাকলে স্ত্রীলোকের একাধিক বিবাহ হয়ে থাকে। যদি কর্কট বা বিষভাব রাশি সপ্তম স্থান হোলে এবং সেখানে শুক্র কোন পাপ গ্রহের সঙ্গে সহাবস্থান করলে একাধিক বিবাহ সূচিত হয়। শুক্র মঙ্গলের দ্বারা সপ্তম স্থানে পীড়িত হওয়া অশুভব্যঞ্জক। এরূপ যোগে বিশৃঙ্খল অবস্থা ও কলহ বিবাদ বা লজ্জা হাঙ্গামায় দাম্পত্যজীবন নষ্ট হয়ে যায়, ফলে দম্পতীর মধ্যে শান্তি সুখ তিরোহিত হয়, অবশেষে স্বামী স্ত্রীর ভিতর সুদীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

চির-কৌমার্য্যযোগ দেখা যায় জন্মকুণ্ডলীর ভিতর পঞ্চম ও সপ্তমাধিপতির অশুভ দৃষ্টির বিনিময়ে। স্ত্রীলোকের সংসর্গে এসে অর্থহানি ঘটে যদি সপ্তম স্থানে রবি ও রাহু একত্র থাকে। পুরুষের কোষ্টীতে চতুর্থ সপ্তম ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকা অশুভপ্রদ, কেননা এরূপ যোগে স্ত্রীও সন্তানলাভ জীবনে সম্ভবপর হয় না। শুভ সংযোগে যদি লগ্নাধিপতি সপ্তম স্থানে অবস্থান করে, তাহোলে স্বামী বা স্ত্রী উচ্চবংশোদ্ভূত হয়। লগ্নে বা সপ্তম স্থানে চন্দ্র আর নবাংশে সিংহ লগ্ন হোলে স্ত্রীর চরিত্র ভালো হয় না, এই দ্রষ্টা স্ত্রীর মধ্যে লাম্পট্যদোষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

লগ্নাধিপতি ও সপ্তমাধিপতি একত্র থাকলে, সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হোলে বা দৃষ্টি-বিনিময় করলে অল্প বয়সে বিবাহ হয়, তা ছাড়া অনুরূপ ফল ঘটতে দেখা যায়—লগ্নে, দ্বিতীয়ে বা সপ্তম স্থানে শুভ গ্রহ থাকলে। সপ্তম স্থানে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহের দশায় অথবা সপ্তমাধিপতির বা সপ্তম-দশা গ্রহের দশায় কিম্বা চন্দ্র ও শুক্রের দশায় বিবাহ হয়। বিবাহের সম্পর্কে গণনা করবার সময় শুধু এদের দশা অন্তর্দশা দেখলেই হবে না, তৃতীয় ও একাদশ স্থানের অবস্থাও লক্ষ্য করতে হবে : কেননা বিবাহের কারণ,যোগা-যোগ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে তৃতীয় স্থান থেকে—আর বিবাহের পরিণতি বা পরবর্ত্তী অবস্থা অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করতে হবে একাদশ স্থান থেকে। কেবলমাত্র যৌটক বিচার করে বিবাহের মতামত দেওয়া উচিত নয়।

দম্পতীর যৌন সম্বন্ধ কিরূপ হবে সেটা শুধু যোনিকূট বিচার করলে চলবে না, উভয়ের মঙ্গল ও শুক্রের অবস্থা ও অবস্থান দেখতে হবে—একজনের মঙ্গলের সঙ্গে অপরের শুক্রের কি রকম যোগ আছে তাও দেখা আবশ্যক! নারী-পুরুষের পরস্পরের শুক্র-মঙ্গলের কোন সম্বন্ধ বা যোগাযোগ না দেখা গেলে উভয়ের চন্দ্র-মঙ্গলের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার। নারী পুরুষের ভিতর একজনের শুক্রের সঙ্গে অপরের মঙ্গলের শুভাশুভ সংযোগ বা সম্বন্ধের উপর তাদের যৌন আকর্ষণ নির্ভরশীল। শুভ হোলে যৌন সংসর্গ প্রীতিকর হয়ে দাম্পত্যজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে, অন্যথায় বিবাহিত জীবনের পরিণতি দুঃখময় ও করুণ ঘটনাবহুল হয়ে থাকে—মিলনের পরি-বর্ত্তে বিচ্ছেদের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

বিবাহ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে লগ্ন, লগ্নাধিপতি, শুক্র ও মঙ্গলের বলাবল ও অবস্থিতি এবং রবি ও চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি-সম্বন্ধ প্রভৃতি বিচার করে মতামত প্রকাশ করা আবশ্যক। শুক্র প্রণয়, আসঙ্গলিপ্সা ও পরিণয়-কারক গ্রহ। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা এই গ্রহটীর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, জন্ম-কুণ্ডলীর এক একটি রাশিতে এর অবস্থানুসারে যে সব ফলের তারতম্য লক্ষ্য করেছেন, তা নিম্নে দেওয়া গেল। তাঁরা বলেন মেষ রাশিতে শুক্রের অবস্থিতি অশুভপ্রদ—যৌন উত্তেজনার আতিশয্য দোষ, উচ্ছ্বাস ও আবেগ এবং প্রেমে পড়বার জন্যে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়। বৃষ রাশিতে শুক্রের অবস্থিতি অশুভ নয়—একনিষ্ঠ প্রেম ও প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আনুগত্য-স্বীকৃতি এই শুক্রের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য। মিথুনে শুক্র ব্যভিচার-প্রদাতা —একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে একই সময়ে প্রণয়াসক্তি নানা দুঃখকষ্ট, বিপর্য্যয়, বাধাবিপত্তি ও চিত্ত বিভ্রম সৃষ্টি করে। কর্কটে শুক্র থাকলে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার কেননা হৃদয়ের ভালোবাসা অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থিতিশীল না হোলে, দাম্পত্য জীবন নৈরাশ্যপূর্ণ ও সংঘাতময় হবে। সিংহে শুক্র শুভপ্রদ—দম্পতীর মধ্যে সংযম ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়,তা ছাড়া সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়, সামাজিক

সুযোগ প্রাপ্তি ঘটে। কন্যার শুক্র স্বৈরাচার আনে, শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ বন্ধনে স্পৃহা থাকে না, হোলেও আবার বিবাহ হয়, স্বেচ্ছাতান্ত্রিক জীবন অবলম্বন ও মুক্ত প্রেম প্রত্যক্ষ করা যায়। কোনরূপে বিবাহ হোলেও স্বামী বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হয় আর ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য ঘটে। তুলায় শুক্র শুভ—সুদৃঢ় প্রণয়, বিবাহে সাফল্য, মধুর দাম্পত্য-জীবন, পারস্পরিক প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে গভীর আবেগ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। বৃশ্চিকে শুক্র থাকলে প্রণয়ক্ষেত্রে অপরের সঙ্গে মেলামেশায় মানুষকে সতর্ক করে না, বরং প্রণয়ে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয় সামান্য কথাতেই। ধনুস্থ শুক্র প্রণয়ের ক্ষেত্রে কিছু অদ্ভুত অবাঞ্ছনীয় ঘটনা-প্রবাহ এনে দেয় যার ফলে সুখী হওয়া যায় না, তবে সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে সৌভাগ্যলাভ, কর্ম্মোন্নতি ও নানাবিধ পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা প্রভৃতি ঘটে থাকে, তাতে দম্পতীর মধ্যে একটীকে নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থায় অরণ্যে রোদন করতে হয়।

মকরে শুক্র অদ্ভুতভাবে নারীপুরুষকে আকর্ষণ করে ও আসঙ্গলিপ্সার দিকে মোহজাল বিস্তার করে—আর চিত্ত বিভ্রম আনে। প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা বিষয়ে দেখা যায় অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ। কুম্ভে শুক্র প্লেটনিক ধরণের ভালো-বাসা সৃষ্টি করে, প্রণয় মিলনে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ও তজ্জনিত দারুণ অবসাদ আনে, মনে ধিক্কার জন্মে, বিবাহেও বিলম্ব ঘটে। বিবাহ হোলেও সে বিবাহ সুখের হয় না।

যৌন আকর্ষণও সম্মিলনে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যদান করে মীনে শুক্র, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় একনিষ্ঠ ভালোবাসার মাধ্যমে।

তনু বা লগ্নের ভাবের নবাংশ বা দ্বাদশাংশের অধিপতি শুক্রগ্রহ হোলে আর তা'তে অন্যগ্রহের যোগ থাকলে বিবাহে বিলম্ব ঘটে না। লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দ্বাদশে মঙ্গল থাকলে স্ত্রীলোকের স্বামী বিয়োগ আর পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হয়। ষষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু ও অষ্টমে শনি অশুভপ্রদ—স্ত্রী বিয়োগ আনেই। মেষেদের পক্ষেও অশুভ ফল দাতা। কোষ্ঠীতে লগ্ন, ষষ্ঠ বা দ্বিতীয়াধিপতি পাপগ্রহ যুক্ত হয়ে সপ্তমে অথবা পাপযুক্ত শনি সপ্তমাধিপতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবস্থান করলে জাতক পরস্ত্রীরত হয়।

সপ্তম ও দ্বিতীয়াধিপতির সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশায় কিম্বা পত্নীকারক গ্রহ চন্দ্র ও শুক্রের দশায় অথবা লগ্নপতি ও সপ্তমপতির দশায় বা এদের মধ্যে অন্ততম কোনগ্রহের দশায় বিবাহ ঘটে। ষষ্ঠস্থানে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু এবং অষ্টমে শনি অবস্থান করলে কিছুতেই স্ত্রী বেঁচে থাকে না। এর সঙ্গে যদি জাতকের কোষ্ঠীতে শুক্র, চন্দ্র ও সপ্তমপতির অবস্থান ভালো হয় অর্থাৎ তারা যদি বলবান হয়, তা হোলে বহু বিবাহ হবে, আর বারে বারে স্ত্রীবিয়োগ ঘটবে। ঐ মঙ্গল, রাহু বা শনির দশান্ত-র্দ্দশাতে প্রায়ই মৃত্যুযোগ পড়বে। ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানস্থ পাপ-গ্রহই পত্নীনাশ ও পত্নী সম্বন্ধীয় অশুভ ঘটনার স্রষ্টা।

সপ্তম স্থানে দুর্ব্বল চন্দ্র পাপগ্রহ সংযুক্ত হোলে চরিত্র-হানি ঘটে। একাধিক নারীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধ ঘটে সপ্তম স্থানে শুক্র ও বুধ একত্র থাকলে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হয় যদি পঞ্চমাধিপতি সপ্তমে, সপ্তমাধিপতি পাপগ্রহ সংযুক্ত আর শুক্র দুর্ব্বল হয়।

স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে দেখতে হয় লগ্ন, রবি ও মঙ্গলের সপ্তম রাশিতে পাপগ্রহ বা শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি। রবি ও শনি, অথবা রবি ও মঙ্গলের অশুভ প্রেক্ষা দাম্পত্য-জীবনকে বিষময় করে তোলে—রবি বা মঙ্গলের সঙ্গে রাহুর যোগ বা দৃষ্টি দাম্পত্য সুখ হানিকারক। সপ্তমে পাপগ্রহ দাম্পত্যজীবনকে কখন সুখী করে না। বহু কষ্ট, ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি এসে মানুষকে পীড়া দেয়। অষ্টমে পাপগ্রহ যৌন-সাহচর্য্যের পক্ষে প্রতিকূল ও অশান্তি-দায়ক।

সপ্তমাধিপতির দশা বা অন্তর্দ্দশায় তার সঙ্গে অন্য গ্রহের দশা বা অন্তর্দ্দশা (বিশেষতঃ তনু, ধন, পঞ্চম, নবম, দশম বা একাদশাধিপতির দশা বা অন্তর্দ্দশা) একত্র হোলে সাধারণতঃ বিবাহ হয়ে থাকে—শুভগ্রহ হোলে নিশ্চয়ই বিবাহ হয়—কোন বাধা বিঘ্ন ঘটে না। চন্দ্র বা শুক্র যে সময়ে পঞ্চম বা সপ্তম গৃহের ওপর দিয়ে যায়, সে সময়ে বিবাহ যোগ পড়ে।

পঞ্চমে পাপগ্রহ নারীপুরুষের চারিত্রিক অধঃপতন আনে কাম রিপুর তাড়নায়, এজন্যে বিবাহ দেওয়ার পূর্ব্বে পঞ্চম স্থানটী বিচার করে দেখা দরকার। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়তৃষ্ণা ও যৌনোদ্দীপনা প্রবল হয়ে ওঠে যদি কোন নারী

ও পুরুষের মধ্যে একজনের মঙ্গল অপরের শুক্রস্থানে অবস্থান করে।

নারীর আকৃতি, প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিচার হয় তার রাশি ও লগ্ন থেকে। তার পারিবারিক সুখ ও স্বামীর স্বভাব বিচার করতে হয় সপ্তম স্থান থেকে। যে স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে শুক্র ও মঙ্গল কোন রাশিতে নবাংশ ক্ষেত্র-বিনিময় করে, সে অসতী। শুক্র, রবি ও চন্দ্র সপ্তমস্থানে একত্র থাকা অশুভ, এরূপ যোগে স্বামীর সম্বন্ধিক্রমে জাতিকা পরপুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত ও ব্যভিচারিণী হয়। যে নারীর সপ্তম স্থানে কোন নীচস্থ গ্রহ শুভ গ্রহের দৃষ্ট হয়ে অবস্থান করে, সে নারী স্বামীর উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা হয়। সপ্তম স্থানে রবি থাকলে স্ত্রীলোক স্বামী-পরিত্যক্তা হয়। লগ্নে রবি অথবা মঙ্গল কোন জাতিকার পক্ষে শুভ নয়, কেন না সে দারিদ্র্যপীড়িতা হয়। লগ্নে রবি, শনি ও মঙ্গলের একত্র অবস্থিতি জাতিকাকে অসতী, অসুখী, ক্রূর ও কলহপ্রিয় করে। রবি অথবা মঙ্গল, শুক্র ও রাহু লগ্নে থাকলে জাতিকা একাধিক ব্যক্তির সহিত প্রণয়াসক্তা হয়।

শনি দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট মঙ্গল সপ্তমে থাকলে স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হয়। কেন্দ্রে শুভগ্রহ এবং মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনুর প্রথমার্দ্ধ বা কুম্ভ রাশি পতিস্থান হোলে,জাতিকার স্বামী ধনৈশ্বর্য্যশালী ও সম্ভ্রান্ত—আর জাতিকাও উত্তম প্রকৃতি-বিশিষ্টা, বিদ্বানী ও সুখী হয়। বৃহস্পতি বলী হয়ে রাশি থেকে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশমে থাকলে আর চন্দ্রের শুভ প্রেক্ষাবর্ত্তী হোলে, জাতিকা রাণী বা বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়। যে নারীর জন্মকুণ্ডলীতে বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি ও বুধ বলী হয় আর সমরাশিতে হয় লগ্ন, সে নারী বিখ্যাত, সুপ্রতিষ্ঠিতা, বিশিষ্ট বিদুষী, ধর্ম্ম-প্রাণা ও ঈশ্বরানুরাগিনী হয়।

যখন কোন নারী বা পুরুষের লগ্নাধিপতি সংক্রমণে অপরের লগ্নে আসে, তখনই তাদের দুজনের মধ্যে ভালো-বাসা ও বন্ধুত্ব নিবিড়ভাবে ঘটে।

মোটামুটিভাবে প্রণয়, বিবাহ, পতি বা জায়াভাব ও দাম্পত্য জীবনের বিচারপদ্ধতি এবং তার সঙ্গে গ্রহ-যোগাযোগ, দৃষ্টি ও অবস্থান হেতু বিভিন্ন ফলাফল বলা গেল। গ্রহগণের পূর্ণ দৃষ্টিই কোষ্ঠী বিচারে গ্রাহ্য হয়ে থাকে—পাদ, অর্দ্ধ, ত্রিপাদ দৃষ্টির ফল উল্লেখযোগ্য হয় না। দ্রষ্টা গ্রহ শুভ কিম্বা অশুভ কিনা এবং কোন্ ভাবের অধিপতি হয়ে গ্রহটী কোন্ ভাবকে পূর্ণ দৃষ্টি করছে, তার অবস্থিতি কোথায়?—স্বক্ষেত্রে, মূল ত্রিকোণে, শত্রু অথবা মিত্র গৃহে কিনা, এসব বিচার করে তবে ফলাফল বলা দরকার। তাছাড়া ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, নবাংশ, স্ফুট, ভাব প্রভৃতিও বিচার আবশ্যক। মতুবা সঠিক-ভাবে কিছুই বলা যাবেনা। শত্রুক্ষেত্রস্থ গ্রহ ভাবফলের হানি আর মিত্রক্ষেত্রস্থ গ্রহ ভাবফলের বৃদ্ধি করে। বর্গ বলে বলী গ্রহ শক্তিসম্পন্ন। স্বক্ষেত্রে মূল ত্রিকোণে তুঙ্গ-স্থানে যে গ্রহ যে ভাবে থাকে, সেই ভাবের সে বৃদ্ধিকারক হয়। পাপগ্রহ যে ভাবে থাকে বা বৃদ্ধি করে, সেই ভাবের হানি হয়, তবে স্বক্ষেত্রে ভাবফলের বিশেষ অনিষ্ট করেনা। শুভ বা অশুভ গ্রহ উচ্চস্থ হোলে শুভফলদাতা, নীচস্থ হোলে অশুভদায়ক। গ্রহ যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই সে দুর্ব্বল। পনরো অংশের মধ্যে দুইটী মিত্র-গ্রহ মিলিত হোলে পরস্পর শুভফলদাতা হয়—শত্রু মিত্র গ্রহের দৃষ্টিতেও এইভাবে ফলের হানি ও উৎকর্ষ ঘটে।

* * *

পৌষ মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ

এই মাসে মেষরাশিগত জাতকের পক্ষে শুভাশুভ মিশ্রিত ফল। শুভাপেক্ষা অশুভ ফলাধিক্য দেখা যায়। বহুকার্য্যে বাধা, শারীরিক কষ্ট, ভ্রমণে ক্লান্তি, অন্যায় দোষা-রোপ, প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা লাঞ্ছনা ভোগ এবং মানসিক কষ্টভোগ। অশ্বিনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিরই বেশী পরিমাণে অশুভ ফলভোগ করতে হবে।

দেহভাব ভালো যাবে না,—যাঁদের ব্লাডপ্রেসার বা রক্তের চাপ বৃদ্ধিজনিত পীড়া আছে তাঁদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। রক্ত ও পিত্তের দোষজনিত অসুস্থতা যাঁদের আছে তাঁদের ব্যাধি হবার সম্ভাবনা। জীবনীশক্তি এ মাসে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল। সন্তানাদির শরীর ভালো যাবেনা। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি, স্বজনবর্গের সঙ্গে মনো-

মালিন্য প্রভৃতি থেকে দুঃখ পেতে হবে। তাছাড়া আত্মীয় বা নিকট বন্ধুহানির জন্য কিছু মানসিক আঘাতের সম্ভাবনা। প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। আয় বৃদ্ধি হোলেও তদনুপাতে ব্যয়াধিক্যের জন্যে আশানুরূপ সঞ্চয় হবেনা। ব্যয়কুণ্ঠতার দিকে দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও খরচের খাতায় বেশী অঙ্কপাত হবে। কোনপ্রকার লগ্না বা কাটকার ব্যাপারে গেলে অর্থনৈতিক অবস্থা আদৌ সুবিধাজনক হবেনা।

বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু শুভ, অনাদায়ী বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি বিষয়ে শুভ। জমিজমা বৃদ্ধি, আসবাব-পত্র ক্রয় যোগ। চাকুরির ক্ষেত্রে মিশ্রফল, ভালো মন্দ, খ্যাতি অখ্যাতি, উন্নতিতে বাধা—উপরওয়ালার সঙ্গে কাজকর্ম ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা দরকার, কারণ সামান্য দোষ ত্রুটি থেকে কর্ম্মোন্নতির পথে বাধা আসতে পারে। ব্যবসা ও প্রোফেসানে কিছু উন্নতি ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সামাজিক আনন্দ উপভোগ, আমন্ত্রণ লাভ, রোমান্টিক আকর্ষণ বা আবেষ্টনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দতা, প্রণয়ে সাফল্য ও যোগাযোগ, ভ্রমণ প্রভৃতি দেখা যায়। মাসের শেষের দিকে সাংঘাতিক ধরণের প্রণয়াকর্ষণের সম্ভাবনা। বর্ষে রাহু আনন্দ ও সুখদাতা।

বৃষ

রবি, মঙ্গল এবং শনি দুঃস্থানগত হোলেও যোগের জন্য ক্ষতি করতে পারবেনা। পারিবারিক অশান্তি, সাংসারিক ব্যয়সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ত্রীর সহিত মতদ্বৈধ, অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য হোতে পারে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্ক না হোলে। উদরঘটিত পীড়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি বেশী হবে (High blood pressure) এজন্যে পথ্য বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নেওয়া দরকার। আর্থিক অবস্থা (বিশেষতঃ নগদ টাকা) আশানুরূপ নয়। ব্যয় বৃদ্ধি। ভূসংক্রান্ত বিষয়ে কোন শুভ সম্ভাবনা নেই—ভৃত্য, ভাড়াটিয়া, প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে ব্যবহার ভালো পাওয়া যাবেনা। চাকুরীর ক্ষেত্রে সুবিধা বা উন্নতির যোগ দেখা যায়না। ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ—ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনপ্রকার বাধা বিপত্তি ঘটবে না, অর্থাগম হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথম ও শেষ সপ্তাহ ভালো, মধ্যে দুইটি সপ্তাহ নানাপ্রকার উদ্বেগ, আশাভঙ্গ, অশান্তি ও প্রণয়ে বিপত্তি ঘটতে পারে—কলহ বিবাদ ঘটলে তা গুরুতর হোয়ে উঠতে পারে। পঞ্চমে রাহু অর্থহানি, সন্তান পীড়া ও ভয়ের সৃষ্টি করবে।

মিথুন

স্ত্রীর সহিত কলহ, মামলা মোকদ্দমা, অপবাদ ও কর্ম্মে বাধা। বয়স্ক সন্তানদের সহিত ব্যবহারে সতর্কতা ও বিশেষ বিবেচনা অবলম্বন আবশ্যক। শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটবে। নগদ টাকার অভাব হবেনা, কিন্তু মাসের শেষেও কিছু থাকবেনা। প্রথম দশদিন বেশ ভালো বলা যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু লাভেরও যোগ আছে, কিন্তু স্পেকুলেশনের ব্যাপারে লাভ হবে না। ভূম্যধিকারীদের পক্ষে ভালো সময়, লাভ হবে, বাড়ী ভাড়ার বিষয়ে শুভ-যোগ। মাসের শেষের দিকে ভূ-সম্পত্তিলাভ বা ক্রয় করার সম্ভব। কৃষি কাজে যারা লিপ্ত, তারাও অনেক সুবিধা পাবে। মামলা মোকর্দ্দমায় সুবিধা হবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হবে—শত্রু দমন, প্রতিযোগীর পরাজয়, সহকর্ম্মীদের সন্তোষ লাভ এবং উপরওয়ালার সুনজর আশা করা যায়। মেজাজ গরম করলে এসব শুভ ফল ঘটবে না, বরং ক্ষতি হবে। এই রাশির মেয়েদের পক্ষে নানা-প্রকার অসুবিধা ভোগ ঘটবে; এজন্যে সর্ব্বপ্রকার কাজে সংযম, ধৈর্য্য ও সংরক্ষণশীলতা আবশ্যক। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সময়ে সতর্ক হওয়া দরকার—পার্টিতে না যাওয়াই ভালো, পুরুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশার ফল খারাপ হোতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

কর্কট

এ মাসে কর্কট রাশির ব্যক্তিদের ফলাফল মিশ্র—অর্থাৎ জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতি শারীরিক ও মানসিক সুখ ও দুঃখ—দুইই হবে। এদিক দিয়ে অশ্লেষানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরাই বিশেষ বোধ করবেন—পুনর্ব্বসু ও পুষ্যজাত ব্যক্তিদের তুলনায় কিছু কম অনুভূত হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে সন্তানাদির স্বাস্থ্যহানি ও পতনাদি দুর্ঘটনার আশঙ্কা, নিজের ব্যাধি না হোলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা

বোধ হবে, এজন্য কষ্টভোগ। মাসের শেষার্দ্ধ নিজের ও পরিবারবর্গের পক্ষে শুভ। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্য ও মতভেদের জন্যে কিছুটা অশান্তি-ভোগ। প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আর্থিক লাভ ও ক্ষতি হবে। প্রতারণা ও চুরি—এ দুটির জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। পথে পকেট-মারের দৃষ্টি পড়বে। বাড়তি খরচ হবার যোগ আছে। এ মাসে স্পেকুলেশন না করাই ভালো, কেন না অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক ঘটনার জন্যে বাজার পর অনিশ্চিত। ভূম্যধিকারীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তবে প্রজা, ভাড়াটিয়া, প্রতিনিধি, অংশীদার প্রভৃতির সঙ্গে কিছু কিছু বাদ বিসম্বাদ ও মন কষাকষি হবে। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসের প্রথম দিকটা ভালো নয়, উপরওয়ালার অসন্তোষ দেখা দিতে পারে কিন্তু চুপ চাপ করে এড়িয়ে গেলে পরিণতি ভালো হবে না, সাহসী হয়ে এগিয়ে যেতে হবে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে তবে অসন্তোষের উপশম হবে। উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা-প্রতিযোগী মেয়েরা এ মাসে সুযোগ পাবেন না, ফলে নৈরাশ্যের কারণ ঘটবে—মেলামেলার পরিণতি মানসিক কষ্টভোগ এসে দাঁড়াবে।

সিংহ

সিংহ রাশির দ্বিতীয়ে রাহু অর্থ হানি, কলহ এবং মন কষাকষির কারণ ঘটাবে; বৃহস্পতি সৃষ্টি করবে বাধা ও শারীরিক অসুস্থতা, স্ত্রীর পক্ষে অশুভ—বিপদতার সম্ভাবনা। নবমে মঙ্গল ব্যয়কারক হবে, পঞ্চমে শনি ও বুধ দুঃখদাতা বিশেষতঃ সন্তান সম্পর্কে, তাছাড়া ক্ষতিকর হবে নানাপ্রকার পরিকল্পনাও, যথা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা সব চেয়ে বেশী কষ্ট পাবে, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ঘটবে, কিছুটা ভোগ করবে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা। শারীরিক অবস্থা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে, যাদের রক্তঘটিত পীড়া বা রক্তপাত উপসর্গ-জনিত ব্যাধি আছে, তাদের সতর্ক হওয়া দরকার। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে, তা থেকে ও রক্ত ক্ষয় হবে। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ভাব ঘটবে না। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ। এ মাসে সকল কাজই গতানুগতিকভাবে করে যাওয়াই ভালো। আর্থিক সুবিধা হবে না, বরং পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হোতে হবে। টাকাকড়ি কোন কাজে লাগালে অপব্যয় হবে। বাড়ী-ভাড়া সংক্রান্ত কাজে সুবিধা সুযোগ আছে—ভূসম্পত্তির ব্যাপারে অর্থ নিয়োগ না করাই ভালো। চাকুরীজীবীর পক্ষে এ মাসটী ভালো নয়, মাসের শেষার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা—নিজের কাজ ছাড়াও অতি-রিক্ত কাজ বা বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হবে কর্ম্মদক্ষতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে; পেশাদারী কর্ম্ম ও ব্যবসায়ে মোটামুটিভাবে মাসটী অতি-ক্রান্ত হবে। যে সব নারী গৃহস্থালীর কাজ নিয়ে আছেন তাঁদের পক্ষে মাসটী শুভ—কিন্তু যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সামাজিক মেলামেশা করে থাকেন, ক্লাবে পার্টিতে যোগ দান করতে অভ্যস্ত, তাঁরা দুঃখ বা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে সময় অতিবাহিত করবেন।

কন্যা

পীড়া ও ভয়। ভ্রমণে ক্লান্তি। মাসের প্রথম দিকে সাফল্য, সুখ, উত্তম বন্ধুত্বলাভ, সৌভাগ্য সুখ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সুসংবাদপ্রাপ্তি প্রভৃতি দেখা যায়; শেষের দিকে অশুভ বার্ত্তা, শত্রুবৃদ্ধি, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, স্বজন-বিরোধ। দুর্ঘটনার ভয় আছে, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বা হাসপাতালের ব্যবস্থা না করলে গুরুতর অবস্থা ঘটতে পারে। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ। পরে স্বজনবর্গের সঙ্গে মতভেদ। আর্থিক অবস্থা সন্তোষ-জনক ও আশাপ্রদ। ব্যয়ের দিকে সংযত না হোলে মাসের শেষের দিকে টান ধরবে। এ মাসে বিলাসব্যসনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত নয়। স্পেকুলেসনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারীদের পক্ষে সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নৈরাশ্য-জনক পরিস্থিতি। বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি বিষয়ে আশাপ্রদ কিছু হবে না। মামলা মোকর্দ্দমা এড়িয়ে চলাই ভালো, অন্যথা মাসের শেষে পরিস্থিতি জটিল হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধ চাকুরীজীবীদের পক্ষে কিছু শুভ। পদমর্য্যাদা-লাভ, শত্রু জয়, উপরওয়ালার প্রীতি প্রভৃতিযোগ আছে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটি শুভ। মেয়েদের পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধটী বিশেষ ভালো। যে সব নারী চাকুরীজীবী তাদের পক্ষে এ মাসটী ভালো যাবে।

তুলা

এ মাসে তুলা রাশির ব্যক্তিদের পক্ষে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির কারণ দেখা যায়। মাসের প্রথমার্দ্ধে ভ্রমণ-জনিত ক্লান্তি, ব্যর্থ চেষ্টা, উদ্বিগ্নতা, কার্য্যে বাধা ও অপবাদের আশঙ্কা—শেষার্দ্ধে শত্রু দমন, উত্তম সঙ্গীলাভ, অর্থাগম ও বিলাস ব্যসনের উত্তম দ্রব্যাদিলাভ। অম্ল, পাকাশয় প্রদাহ, অজীর্ণদোষ প্রভৃতি ঘটতে পারে। স্থায়ী চক্ষুরোগে যাঁরা ভুগ্‌ছেন তাঁদের পক্ষে কিছুটা ভালো হবে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। স্পেকুলেসনে কিছু সাফল্য। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে এ মাসটী আশাপ্রদ নয়—টাকাকড়ি ও উৎপন্ন দ্রব্য ঠিক মত পাওয়া যাবে না। রাজনৈতিক চক্রীদের আন্দোলন, সরকারী নীতি-ভেদকারীদের চক্রান্ত প্রভৃতি এর কারণ হয়ে উঠবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের কাজ বেশ জোরে চল্‌বে। চাকুরীজীবীদের পক্ষে এ মাসটি শুভ বলা যায় না, ক্রমাগত উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। মেয়েদের পক্ষে এটি কষ্টের মাস। প্রণয়ের দিকে অনুরাগ প্রকাশ করলে ব্যর্থতার সম্ভাবনা। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে স্নেহ প্রীতি ব্যাপারে বেশী ঘনিষ্ঠতা না করাই মঙ্গলজনক।

বৃশ্চিক

বৃহস্পতি ব্যয়স্থ হোলেও নিরপেক্ষ থাকবে। শুক্র ও মঙ্গল শুভদাতা হবে। রবি, বুধ, শনি বিশেষ অশুভদায়ক হবে না। স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ, সৌভাগ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উত্তম বিদ্যার্জ্জন, পরীক্ষায় সাফল্য, উপহারপ্রাপ্তি, শত্রুক্ষয় প্রভৃতি সূচিত হয়। শত্রুরা বাধা দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের চেষ্টা ফলবতী হবে না—স্বজনবর্গ ও স্বার্থগৃধ্নু ব্যক্তিরা নানাভাবে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে কিন্তু কেহই সুবিধা করতে পারবেনা। যাদের রক্তচাপের আধিক্য তারা সতর্ক হবে, পারিবারিক শান্তি থাকবে। যে সব ঘটনা বাদ-বিসম্বাদপূর্ণ হয়ে দুঃখ-জনক পরিস্থিতি এনেছে সেগুলির নিষ্পত্তি হ'বে। কোন আত্মীয়-স্বজন বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। আশানুরূপ আয় হোলেও শেষ পর্য্যন্ত ব্যয়াধিক্যের জন্য অসুবিধাভোগ। কোন প্রকার স্পেকুলেশন করলে ভীষণ ক্ষতি হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্য হওয়া সত্ত্বেও হস্তগত হবার সময়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোতে পারে। ভূম্যধিকারীর পক্ষে এ মাসটী শুভাশুভ মিশ্রিত। যে সব মামলা-মোকদ্দমা মুলতুবী আছে, সেগুলির বিচার হয়ে যাবে আর জয়লাভ হবে। বহু গোলমালের নিষ্পত্তি ও মিটমাট হয়ে যাবে। পদোন্নতিযোগ আছে—বেকার ব্যক্তিরা কর্ম্মলাভ করবে। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ সম্ভাবনা—উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এলে লাভ হবে। আয় ও লাভ আশাপ্রদ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন যোগ আছে। অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে এ মাসে বিবাহের কথাবার্ত্তা বা যোগাযোগ হবে। রোমান্সের ব্যাপার ঘনীভূত হয়ে আসবে তাদের কাছে যারা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। যে সব নারী শিল্পী, গায়িকা, কবি বা সাহিত্যিকা, তারা নানাপ্রকার সুযোগ, সুবিধা ও সুনাম পাবে।

ধনু

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ধনুরাশির পক্ষে কিছু শুভ। অপর দুটি নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা অনেক অসুবিধা, অশান্তি ও অসোয়াস্তি ভোগ করবে। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয়, উদ্বেগ ও মর্য্যাদা হানির আশঙ্কা, তাছাড়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করলে তার সাফল্য বিলম্বে আস্‌বে। সামান্য রকম শারীরিক অসুস্থতা ঘটবে। যাদের ব্লাড-প্রেসার বেশী, তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কোন সন্তানের পীড়ার জন্য মানসিক উদ্বিগ্নতা। দুর্ঘটনার যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা ভালোমন্দ মিশ্রিত। স্পেকুলেশনে ক্ষতি হবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে শুভ হবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ভাড়া বিলি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ। জমি বা বাড়ী ক্রয় হোতে পারে। চাকুরির ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা নানা সুযোগ পাবে, তাদের অর্থাগমও ভালোই হবে। মেয়েদের পক্ষে স্পষ্ট উক্তি বা উত্তেজক মন্তব্য প্রকাশ করা ক্ষতিকর, এ বিষয়ে সতর্ক হোতে হবে। আমোদ প্রমোদে, ভোজে বা আহার বিহারে কিম্বা অপরিচিত স্থানে অবস্থান সম্পর্কে নিজেদের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক—এই সব স্থানে ভিন্ন পুরুষের সংস্পর্শে আসা বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক উদারতা প্রকাশ করা

আদৌ শুভজনক হবে না। প্রণয়ঘটিত রাগে বিপত্তি। চাকুরী-জীবী মেয়েদের পক্ষে আত্মসচেতন হওয়া আবশ্যক।

মকর

কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, কর্মে সাফল্যও লাভ ঘটবে। মধ্যে কিছু দুঃখকষ্ট ভোগ। অপবাদ ও লাঞ্ছনার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। গুহ্য প্রদেশ ছোতে রক্তস্রাব, সন্তানদের পীড়া, হজমের গোলমাল, পারিবারিক অশান্তি, অকারণ উদ্বেগ, মানসিক পীড়া প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। রোজগারের কয়েকটি পথ বিস্তৃত হবে। এমাসে স্পেকুলেশন না করাই বাঞ্ছনীয়, কেননা ক্ষতি হোতে পারে। ভূমাধিকারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে এ মাসটী সাধারণভাবে যাবে। লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহারে নিজের অনুদারতা ও কঠকাহিতার জন্যে দুঃখ ও অবসাদ এনে দেবে। চাকুরীজীবীরাও বিশৃঙ্খলতার জন্যে কষ্ট পাবে। নগদ কারবারও টাকা লেনদেন সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন দরকার। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটামুটি ভালো। নারীদের পক্ষে এ মাসটী ভালো নয়—গার্হস্থ্যজীবন থেকে সুরু করে সামাজিক জীবন পর্য্যন্ত প্রতিটি স্তরে বাধা বিপত্তি, কলহ ও অশান্তি ভোগ আছে। কোনপ্রকার কলহ বিবাদ বা ঝঞ্ঝাটে গেলেই বিপন্নতার ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা। কথায় কান দিলেও কথা না বলাই ভালো।

কুম্ভ

কর্মে সাফল্য লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি, মর্য্যাদা ও সম্মান, সুখসুখ, সন্তানদের ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সুনাম, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি যোগ আছে। সামান্য কলহ বিবাদ আর বুঝাপড়ার ভুল ঘটতে পারে। বন্ধুদের সম্প্রীতি ও সাহচর্য্য থেকে কর্মসিদ্ধি বা কর্মযোগাযোগ। পারিবারিক শান্তি। ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। জনপ্রিয়তা লাভ। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ভূমাধিকারী, বাড়ীওয়ালা, সম্পত্তিশালী ব্যক্তি প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ আয় বৃদ্ধি। ক্রয় বিক্রয়ে লাভ। বন্ধকী কারবারেও শুভযোগ। বেকার ব্যক্তির কর্ম প্রাপ্তি। পদোন্নতি হবে। যারা ফৌজদারী সোপর্দ্দ তাদেরও দণ্ডের লাঘব হবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে এ মাসটী খুব ভালো। মেয়েদের পক্ষেও সাংসারিক, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে বহু সুযোগ, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যোগাযোগ ঘটবে।

মীন

পীড়া, ভয়, উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি। রেবতী নক্ষত্রে জাত ব্যক্তির পক্ষে অশুভ খুব কমই হবে। বায়ু ও পিত্ত প্রকোপ জন্য কষ্টভোগ। ভ্রমণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা সুখ হবে না। আসবাবপত্র বা বিলাস ব্যসনের দ্রব্যাদি ক্রয়। আয়ও ব্যয় উভয় দিকেই বৃদ্ধি পাবে। প্রতারণার জন্য ক্ষতি—অর্থোপার্জ্জন বেশী হোলেও লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে অকারণ অত্যধিক ব্যয় না ঘটে। স্পেকুলেশন একেবারেই বর্জ্জনীয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কা করা যায়। ভূমাধিকারী বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে মোটামুটি ভালোই যাবে কিন্তু ভাড়াটিয়া, পাশের জমির মালিক, এজেন্ট বা দালালের সঙ্গে কলহ বিবাদ ঘটতে পারে। নিজের স্বত্বাধিকার নিয়ে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারার সময়ে গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে বিবেচনা না করে অবিলম্বে আদালতের আশ্রয় লওয়া অনুচিত। চাকুরীর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে, পার্টিতে যোগদানে, কোর্টশিপ প্রভৃতি বিষয়ে মেয়েদের পক্ষে অসাফল্য।

* * *

ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মকর রাশিতে যখন আটটী গ্রহের সমাবেশ হবে তখন পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। সারা পৃথিবী ব্যাপী রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্তের ভেতর তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভেরী বেজে উঠ্‌তে পারে। ভারতবর্ষের রাশি মকর, এই রাশিতে আটটী গ্রহের অবস্থিতি হেতু ভারতের বিপন্নতা গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করবে এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ অশুভ ঘটনার সমাবেশ হবে। উক্ত বর্ষটী ভারতবর্ষের পক্ষে আদৌ শুভ হবে না। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দূরীভূত হবে না। এই বৎসরের পর সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হবে, তৎপূর্ব্বে নয়।

* * * *

এ মাসে শনি ও মঙ্গল ভারতের পক্ষে অশুভ হওয়ায় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে, ব্যবসা বাণিজ্যে, শিক্ষা ব্যবস্থার ও শিক্ষা বিভাগের নানাস্তরে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। গুপ্ত অপরাধ বৃদ্ধি, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, ব্যয় বৃদ্ধি, হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভেতর বিশৃঙ্খলতা, জনসাধারণের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সর্ব্বত্র দুর্নীতির বৃদ্ধি ও প্রাধান্য দেখা যাবে। শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ও শিশু মৃত্যু বৃদ্ধি পাবে। পাকিস্তানের পক্ষে রবি, মঙ্গল ও শনি অশুভ হওয়ায় আইন আদালত, রাজস্ব, ধর্ম্ম ও সাধারণ কর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভালো বলা যায়না। মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে, আর সাধারণের ভেতর নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটবে। নারী সমাজের পক্ষেও মাসটী শুভ হবে না। কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপারে পাকিস্তানের পক্ষে কোনপ্রকার নিষ্পত্তির চেষ্টা দেখা যাবেনা।

নৃত্যময় ভারত

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের খেলায় প্রমত্ত পরমপুরুষ। তাঁর নৃত্যের তালে তালে সৃষ্ট হচ্ছে কোটি সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের জগত, মানুষ-পশু-পাখী, দৃষ্ট-অদৃষ্ট কত কিছু। তাঁর নৃত্যের তালে বিকশিত হচ্ছে মায়াময় বিশ্বের সৌন্দর্য রাশি। ধ্বংসের করাল ছায়া নেমে আসছে, মৃত্যু আসছে, তাঁরি নৃত্যের গতিচ্ছন্দে। মহাকালের হৃদ্‌স্পন্দন-ধ্বনিতে অনুরণিত তাঁর নৃত্যতাল।

নেচে চলেছে বিশ্বজগত। সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন নৃত্য চলেছে গ্রহ-উপ-গ্রহের। অগণিত তারার মালিকা নেচে চলেছে কাল থেকে কালান্তরে। এনৃত্যের বিরাম নেই, নৃত্যতালের শেষ নেই।

মানুষের হৃদয় জন্ম থেকে নেচে চলেছে। তারও বিরাম নেই। আছে জীবনের শেষে মৃত্যুতে। তাই ছোট শিশু চলতে শেখার আগেই নাচতে শেখে, কিছু বলতে শেখার আগেই তার অন্তরের উল্লাসকে প্রকাশ করতে শেখে নেচে।

আদিম মানুষও তেমনি ভাষা-সৃষ্টি করে ভাব-বিনিময় করতে শেখার আগেই নাচতে শিখেছিল। যেমন করে আকাশের মেঘ দেখে ময়ূর নাচে, মাতৃস্তন্যপানের আনন্দে নেচে বেড়ায় গো-বৎস আর হরিণ-শিশুরা। আদিম মানুষ নেচেছে—তার প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে আকৃষ্ট করার জন্যে নেচেছে—প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যে নেচেছে, বিরহে নেচেছে, মিলনে নেচেছে, জীবনের উপচীয়মান শক্তির তাড়নায় নেচেছে, তার বীর্যকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে নেচেছে, প্রাণী-শিকারের আনন্দে নেচেছে, যুদ্ধ-জয়ের আনন্দে নেচেছে। সে ভয়ে নেচেছে, প্রাকৃতিক শক্তির অঘোষতা দেখে নেচেছে, অজানা অশান্ত শক্তিকে প্রসন্ন করার আকুতি নিয়ে নেচেছে—প্রার্থনা জানাতে নেচেছে—দেবতার লীলা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নেচেছে। সর্বোপরি সে আত্মপ্রকাশের তাড়নায় নেচেছে।

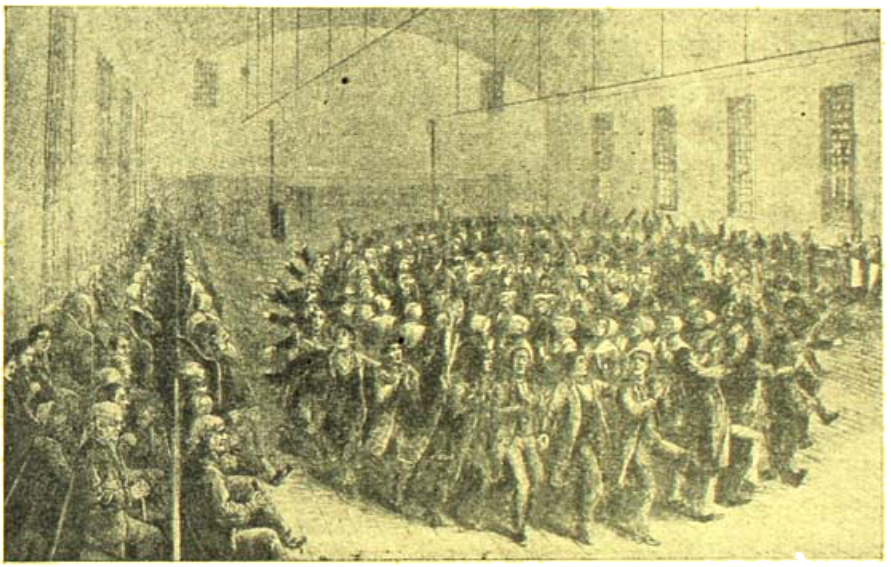

জোসেফ্ বেকার অঙ্কিত নিগ্রোদের (আমেরিকার) শেকারের উপাসনা-নৃত্যের চিত্র। কীর্তনের চং-এ বৃত্তাকারে ও হস্ত উত্তোলন করে নৃত্যের ভঙ্গিমা লক্ষণীয়। 'লেদলিস্ পত্রিকার মার্চমিটে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।

মানব-সভ্যতার আদি লীলাভূমি ভারত। সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞতার অন্ধকার-গহ্বরে, ভারত জ্বালিয়েছে প্রদীপ্ত জ্ঞানের আলো। ভারতের তপোবনে উদ্‌গ্রীব হয়েছে সামগান, আচরিত হয়েছে যজ্ঞানুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলেছে, সুন্দর করে তুলেছে নৃত্য।

দেবতার পূজায় মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে ভাবপ্রকাশের জন্যে প্রাচীন ভারতীয়দের মনোভাব যেমন ভাষায় ব্যক্ত হয়ে ছন্দোবদ্ধ হয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে, তাঁদের আত্মপ্রকাশের দেহভঙ্গিও জন্ম দিয়েছে সুষ্ঠু নৃত্যকলার। যে-কলার শিক্ষাও শিক্ষণ হয়েছে মহাভারতের যুগে কেন—তার অনেক আগেই। কোন সুপ্রাচীনকালে মহর্ষি ভরত নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন তা কেউ বলতে পারেন না। ভারতের মানুষ নাট্যকে (নৃত্যকলা) পেয়েছে ব্রহ্মার কাছ থেকে অন্যান্য বেদের মত—কোন সুদূর অতীতে—অনাদি কালের কোন অজানা মুহূর্তে।(১) নারদের সঙ্গীত-মকরন্দ কখন রচিত হয়েছে তাও কেউ ঠিক বলতে পারেন না। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নৃত্যশাস্ত্র 'শিল্পা-লিক্রম' রচিত হয়। তারপরে নন্দীকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' রচিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তখন নৃত্যশাস্ত্র রচনার কথা কল্পনাও কেউ করতে পারেনি।

ভারতের দেব-দেবী নৃত্য-পরায়ণ, অপ্সর-অপ্সরী নৃত্য-চঞ্চল। অবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের রাস-নৃত্য-লীলা বর্ণনায় ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত মধুর। প্রাচীন ভারতীয় রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরে মন্দিরে, আরাধনায় নৃত্যের প্রয়োগে অতি প্রাচীনকালেই ভারতীয় নৃত্য একটা উচ্চাঙ্গের শিল্পকলায় রূপায়িত হয়। এক থেকে দশগণনার বিদ্যা যেমন সারা জগৎ শিখেছে ভারতের কাছ থেকে, তেমনি নৃত্য-কলাও শিখেছে ভারতের কাছ থেকেই(২)। নৃত্যক্রিয়া সকল দেশের মানুষেরই স্বাভাবিক কর্ম—কিন্তু সে যেন পাখীর নৃত্য, মৃগশিশুর নৃত্য। নৃত্য-শিল্প তারা পেয়েছে ভারতের কাছ থেকে। প্রশ্ন আসবে, তার প্রমাণ? ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে লাক্ষণিক প্রমাণ অনেক আছে। একটু লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারা যাবে।

বৌদ্ধ যুগে সারা এশিয়ায় ভারতের ধর্ম, সভ্যতা, সঙ্গীত, সাহিত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সঙ্গে ভারতের নৃত্য-কলাও বিস্তার লাভ করেছিল। জাপানীও জাভানী নৃত্য-কলায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বিশেষ করে গ্রীসে এ শিল্প বৌদ্ধযুগের আগেই গিয়ে পৌঁছেছিল—ব্যবসায়ী ও আক্রমণকারীদের সঙ্গে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এদেশের নৃত্য রূপান্তর লাভ করেছে। বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন দেশের মানুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্নতাই রয়েছে এই রূপান্তরের মূলে। তবু এই বিকাশ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও সূক্ষ্ম সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বহুদর্শী ও অন্তর্দর্শীদের চোখে তা ধরা পড়ে।(৩)

কোথায় কোথায় ভারতের নৃত্য নবরূপ লাভ করেছে। নূতনরূপে সে আবার ভারতে ফিরে এসেছে। এদেও আবার পরিবর্তিত হয়েছে। মোগল পাঠানদের সঙ্গে যে-নাচ এসেছে এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রমাণ করা যেতে পারে, আধুনিক কালের যে ঝোঁয়ার ডাণ্ড—তারও মূলে রয়েছে ভারতীয় নৃত্য। কোন ভারতীয় সেখানে এ নৃত্য প্রচার করে এলেন? প্রশ্ন আসতে পারে বিদ্রূপবাণের তীক্ষ্ণতা নিয়ে। আপাত-দৃষ্টিতে কোনও ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এ যোগসূত্র অনুভব-গম্য হতে পারে।

ইংরেজেরা ভারত অধিকার করার অনেক আগেই

---

(১) আমেরিকার নৃত্য-সম্রাজ্ঞী লা মেরী এ-কথা অনুভব করতে পেরেছেন।

"Its birth is beyond the portals of time and it is ageless." (The Gesture Language of Hindu Dance : La Meri)

(২) লা মেরীর মতেও একথা প্রযোজ্য।

"It is probable that all forms of dance arts are outgrowths of it." (La Meri).

(৩) মনীষী Beryl De Zocte ও এ যোগসূত্র লক্ষ্য করেছেন।

"Yet I believe that far away as it seems in some respects and obviously embodying a very different physical as well as spiritual tradition, the classical dance of India is closely related to the classical tradition of the west, as to every other dance tradition in the world, all of which necessarily vary in the richness of their dance vocabulary according to the capacity for expression in the body of the dancer. (The Other Mind : Beryl De Zocte. P 12)

ইউরোপীয় ধর্মযাজকেরা এদেশে আসতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয় দস্যুও বণিকদের সঙ্গে সঙ্গেই। এদেশকে সে ধর্মযাজকেরা শুধু ধর্মশিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, আর এই ধর্মের দেশ ভারত থেকে কিছু নিয়ে যান নি—একথা গর্ব করে কেউ বলতে পারবে না।

ইউরোপীয়রা যখন এদেশের ধর্মপ্রচার ও ধনলুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন চৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম সারা ভারতকে কীর্তন-নর্তনে মাতিয়ে তুলেছে। সে কীর্তন-নর্তনের কি দুর্দম আকর্ষণী শক্তি ছিল তার প্রমাণ গৌড়ের কাজী—যিনি হিন্দুধর্মের ঘোরতর বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের কীর্তন-নর্তনে যোগ দিয়েছিলেন। যখন হরিদাস সেই কীর্তন-নর্তনে আকৃষ্ট হয়ে পরম-বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হন। হরিনামানন্দে যখন মেতে উঠেছিল সারাভারত তখন ইউরোপীয় ধর্মযাজকেরা এসে তার দ্বারা প্রভাবিত হননি, একথা কেউ জোর করে বলতে পারেন না। বরং অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ইংলাণ্ডে ১৭৪৭ ইংরেজিতে শেকিং কুয়েকার্স সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। কীর্তন-নর্তনকে তাঁরা ভগবদুপাসনার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁদের কীর্তন-নর্তনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা চৈতন্যোত্তর যুগের ভারতীয়দের নৃত্য থেকে মোটেই পৃথক্ নয়।—"In England, the early shaker had danced the same way: Singing, Shouting or Walking the floor, under the influence of spiritual signs showing each other about—or swiftly passing or repassing each other like clouds agitated by a mighty wind," ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেষ্টার থেকে মাদার এন, লি, আমেরিকার নিউ লেবাননে গিয়ে শেকার সম্প্রদায় গঠন করেন—কীর্তন নৃত্যের মাধ্যমে উপাসনা প্রবর্তন করেন। দলে দলে পুরুষ-নারী তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দিতে লাগল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মাদার এন, লির মৃত্যুর পর ফাদার জেমস্ সুইটটেকার গুরু হন। তিনিও ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহ-রক্ষা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী গুরু ফাদার জোসেফ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কীর্তন-নৃত্যের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বিধান করেন। তাতেই আমেরিকান ক্যোয়ার অর্ডার শাফল্ নৃত্যের সৃষ্টি হয়। আজকালকার ক্যোয়ার ডান্স তারই উত্তরাধিকারী। ইহা থেকে স্পষ্ট অনুভব হবে, কিভাবে ভারতীয় বৈষ্ণবদের কীর্তননৃত্য আমেরিকান ক্যোয়ার ডান্সের জন্ম দিয়েছে। নিবেকুলার (আমেরিকার) শেকারদের উপাসনা নৃত্যের (জোসেফ বেকার অংকিত) যে ছবি লেসলি'স পপুলার মান্থলি'তে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে ভারতীয় কীর্তন-নৃত্যের মাধ্যমেই সেই সুদূরদেশের পুরুষ-নারী ভগবানের নিকট আত্ম-নিবেদন করতে শিখেছিল। সে-কীর্তন-নৃত্যই ধীরে ধীরে আধুনিক কালের 'ক্যোয়ার অর্ডার ডান্সে' রূপান্তরিত হয়েছে। এমনিভাবেই সারা পৃথিবীর মানুষকে নৃত্যকলায় দীক্ষা দিয়েছে ভারত। একথা অস্বীকার করা—জেনেশুনেও সত্যকে অগ্রাহ্য করার নামান্তর।

সংসার

নিশীথ মিত্র

বোলপাড়া লেনে ওরা দু'টি থাকে
একখানা খিজিধর মোংরা স্যাঁতসেঁতে,
চুণবালি নেই প্রায় রুগ্ন এককালি
দৃষ্টির দেয়াল ; তবুও পথের বাঁকে
এ-দৃষ্টির অলস খেয়াল নক্ষত্রের অবাক রঙেতে
মনে হয় বিচিত্র বর্ণালী !
ছোট্ট এই বারান্দার ধারে সে থাকে একেলা ব'সে,
কখনো সে বাঁধে চুল সারাদেহে ঢালে ভালে
বেদুর ব্যথায়—প্রণব এলো না তবু অফিসের তন্দ্রা ঠেলে ?

সুদূর আকাশে ব্যর্থ নক্ষত্রেরা খ'সে
বিদ্যুৎ ছড়ায় যেন দিগন্তের ছন্নছাড়া পালে ;
জানি, জানি, ওই ঘন শান্তি পাবে বাড়ীতে প্রণব এলে।

তারপর খিজি ঘর ধুনোর ধোঁয়ায়
ভ'রে ওঠে স্বপ্নে অর্ঘ্যে ব্যাকুল সন্ধ্যায়।

আদালত অবমাননার দায়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম. এ

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এই মে। ক'লকাতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। দলে দলে লোক চলেছে রাজধানীর রাজপথ দিয়ে। সকলের চোখে-মুখে অধীর উৎকণ্ঠার ছাপ আর কণ্ঠে অস্ফুট গুঞ্জন। জনস্রোত শেষ হোল কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের (High Court) প্রাঙ্গণে এসে। বিভিন্ন স্রোতধারার সমাবেশে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল জনসমুদ্রের—আদালত কক্ষে কোথাও আর তিলধারণের স্থান নাই। আজ সুরেন্দ্রনাথের আদালত অবমাননার মামলার রায় বেরুবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারতের জন-তন্ত্রের আত্মার ও শক্তির প্রতীক। তাঁর প্রতি বিদেশী শাসকের ন্যায়ের বিধান কি হয়, তাই জানবার জন্য অসীম আগ্রহে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে অপেক্ষমান উদ্বেলিত জনতা। প্রায় একশতাব্দী আগে এই সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শাসকের ন্যায়ের বিধান—জাস্টিসাই, জোচ্ছুরী, নিধন ও প্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করে নিছক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যই নির্মোহ নন্দকুমারকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসককুলের নির্লজ্জ ন্যায়ধর্মই আবার সমুদ্যত হয়েছে নব্যভারতের সুরেন্দ্রনাথের উপরে বিদেশী বিচারপতির নির্বিবেক অবিবেচনা প্রসূত কার্যের নির্ভীক সমালোচনার জন্য।

সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ,—"বেঙ্গলী" সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য। বেথবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা সুধনমোহন দাশ সম্পাদিত 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় কিছুদিন আগে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল যে, একটি মামলার বিচারের সময়ে বিচারপতি নরিসের আদেশে মামলায় সনাক্ত করবার জন্য হিন্দুর পবিত্র পরমারাধ্য 'শালগ্রাম শিলা'কে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল। পবিত্র শালগ্রাম শিলার অবমাননায় সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল তারই অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে "বেঙ্গলীর" সম্পাদকীয় স্তম্ভে। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের" সংবাদটির উপর ভিত্তি করে ২৩ এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ তারিখের 'বেঙ্গলীতে' নরিসের অবিবেচনা-প্রসূত কার্যের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন সুরেন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গতঃ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এতদিন নব্যভারতের বাণী যাই প্রতিধ্বনি করে আসছিল। নরিসের এই অবিবেচনা-প্রসূত কার্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার সেই অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ল আসামের থেকে সংরক্ষণশীল বহলেও। জনমনের ধর্মাধারোধে লাগলো আঘাত। আর যায় কোথায়? রুজু হয়ে গেল সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা। দেশের চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল? সুরেন্দ্রনাথের বিচার দেখবার ও শোনবার জন্য এই যে আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

অবশেষে রায় বেরুল। স্যার রিচার্ড গার্থের নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বিচারক মণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। দু মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হোল। প্রসঙ্গতঃ এই পাঁচ জন বিচারপতির মধ্যে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন অন্যতম। তিনি অন্য চারজন বিচারকের সাথে একমত হতে পারেন নি; কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে নিজের দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন যে, এই ক্ষেত্রেই শুধু অর্থদণ্ডই যথেষ্ট—কারাদণ্ড অনভিপ্রেত। স্যার রমেশচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত অন্য চারজন বিচারকের মনঃপূত হয় নি। উদ্ধত কালো নেটিভকে তারা সহজে ছেড়ে দিতে স্বীকৃত নয়।

জনসাধারণের উত্তেজনা এখন আর মৃদু গুঞ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডাদেশ ঘোষণার সাথে সাথে আদালতে সমবেত জনতার চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়ল প্রতিবাদের প্রবল হুঙ্কারে। মুহূর্তের মধ্যে মুখে মুখে মহানগরীর সর্বত্র এই সংবাদ তড়িৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল। ক'লকাতার জনতা এর আগে আর কখনও বোধহয় এত উত্তেজিত বা বিচলিত হয়ে ওঠেনি। সমস্তের বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো বৃদ্ধ ও যুবসমাজ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উত্তরকালে যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত বিচারপতি হয়েছিলেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেছিলেন বাংলার সেই পুরুষ-ব্যাঘ্র স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তিনিও আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন রায় শুনবার পরীক্ষার আগ্রহে। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের সংবাদে অন্যান্য বিচলিত যুবে তিনিও সতীর্থদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে। ছাত্র ও যুবশক্তির বিক্ষোভ অবিলম্বেই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল। আজকের দিনের মতই সে দিনেও শাসনীর কাচ ভেঙ্গে, পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে সেই বিক্ষোভ অভিব্যক্তি লাভ করল। এতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। সর্বদেশে সর্বকালেই এই রকমই ঘটে থাকে। কোন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন—যার ভিতরে কখনো কখনো উচ্ছৃঙ্খলতাও দেখা দেয়—তা সর্বদেশেই সর্বকালে ছিল এবং পরেও থাকবে। যে সব ঔপনিবেশিক নীতিব্যাখ্যাকারের মত একে 'এ পোড়া দেশের পাপ' অথবা 'বর্তমান যুগের অভিশাপ' বলে আখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, তাঁরা ঐতিহাসিক সত্যকেই অস্বীকার করেন। বিক্ষুব্ধ জনগণের প্রতিবাদের এই বহ্নি প্রকাশে স্বভাবতঃই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল বিদেশী সরকার, তাই অন্যান্য অতিক্ষুব্ধ কর্মীদের মত সুরেন্দ্রনাথকে খোলাখুলিভাবে পুলিশের গাড়ীতে জেলে পাঠাতে সেদিনের সেই ধুরন্ধর শাসক গোষ্ঠীরও সাহস হয়নি। অতি সন্তর্পণে বিচারপতিদের প্রবেশ ও

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এই আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

L. 273-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রচারিত।

বিক্ষুব্ধের পথ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে পালিয়ে যায় আলিপুর জেলে—দুই দুখান বেয়নি করে দুইজনকে কাঁকি দিয়ে তার শিকার নিয়ে পালিয়ে যায় ডিটেকটিভ দলের নিয়ে। সেদিন তার ব্যবহার দেখিয়ে হয় সেইদিনই তার প্রতিবাদে সমগ্র মহানগরীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় তাঁর যুগের সর্বপ্রথম ভারতবাসী—যিনি জনসাধারণের হয়ে কারাবরণ করেন। "ইংলিশম্যান" পত্রিকার সম্পাদক ষ্টার্ট মাইটও সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। একটা কথা আছে যে, অকস্মাৎ থেকেই কখনও কখনও কলাপের উদয় হয়। সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ আপামী দিনের জন্য সুফলই প্রসব করেছিল। এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা পূর্বের থেকেও বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছিল, তার বীজ বপন হোল ১৮৮৩ খৃঃ এই যে। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব প্রতিবাদ সভায় এত বেশী জনসমাগম হয়েছিল যে বোধহয় বক্তৃতা দূরে সেই বিপুল জনতার স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হয়ে পড়ল। সুতরাং খোলা ময়দানে সভার আয়োজন করা ছাড়া উপায় রইল না। সেই থেকেই খোলা ময়দানে জনসভার সূত্রপাত হোল। এই উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্য পরিলক্ষিত হল। শুধু শিক্ষিত শ্রেণীই নয়, সাধারণ লোকেরাও প্রতিবাদ সভায় দলে দলে যোগদান করল। মাত্র কলকাতা সহরেই এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার প্রতিটি জিলায়, প্রতিটি সহরে এই প্রতিবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, এই প্রতিবাদের ঝড় বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকেও আলোড়িত করে তুলেছিল।

লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, এলাহাবাদ, পুণা প্রভৃতি সহরেও সুরেন্দ্রনাথের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথের ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল—প্রাদেশিকতা বিসর্জিত এক জাতীয়তাবাদ গঠনে।

এই ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথ সাংবাদিক জীবন গ্রহণে এক নূতন প্রেরণা লাভ করলেন। তাঁর "বেঙ্গলী" পত্রিকার জনপ্রিয়তাও অসম্ভব বেড়ে গেল এবং অল্পকালের মধ্যেই ভারতের সেই সময়কার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে পরিগণিত হ'ল।

কৃষ্ণনগরের তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি জাতীয় তহবিল গঠনে উদ্যোগী হলেন সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণকে উপলক্ষ করে। প্রায় ২০,০০০ হাজার টাকার মত সংগৃহীত হল। সেই টাকা উত্তরকালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে অর্পণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে সেই টাকাটার যথেষ্ট কাজ দিয়েছিল। এমনি করে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ভিতর দিয়ে সূচিত হয়েছিল ভবিষ্যতের সংগঠিত সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিশালী এক নতুন আন্দোলন।

নীলাচলে মহাপ্রভু

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

নির্মল আকাশে হাসে শরতের চাঁদ,
সুমন্দ পবনে হিল্লোলিত হয় পেলব বন পল্লবদল,
কুসুমমালতীমুকুলের গন্ধে বিহ্বল বৃন্দাবনে
বেজে উঠে মনকাড়া মুরলী,
ব্রজ-যুবতীর মন-যমুনায় জাগে জোয়ার।

শীতের আকাশেও উঠে পূর্ণিমা শশী
মাঘী পূর্ণিমা-নিশীথেও বেজে উঠে বাঁশি
'কৃষ্ণ-বর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়'
বিষ্ণু-প্রিয়ানাথকে বাহির করে পথে,
মাঘের রাতের চন্দ্রাহান চাঁদ হাসে আকাশে।

ঘরে ঘরে নবদ্বীপের দীপ যায় নিবে,
অমাবস্যার নিরন্ধ্র অন্ধকার
পূর্ণ চাঁদের মুখে পরিয়া দেয় অঙ্ক মেঘের মুখোস,
গৌড়-বঙ্গ ভরে যায় করুণ হাহাকারে।
খোল-করতালে বেজে উঠে
অন্তর্গূঢ় ঘন ব্যথায় গুরু গুরু গম্ভীর ধ্বনি।

নবদ্বীপের ধরণী ধূলায় পড়ে কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া,
সমুদ্রতোজ্জ্বলরসের লীলা চলে নীলাদ্রির কোলে
ধূলার পরে ঘাস ফুলের চোখে ঝরে শিশির বিন্দু;
উজ্জ্বল তারা অনুজ্জ্বল করে সুদূর নীলকাশে।

মেয়েদের কথা

শিশু মন

সুপ্রিয়া ঠাকুর

প্রত্যেক শিশুই নিজস্ব কতকগুলি সৎ ও অসদ্‌গুণের উপাদান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শৈশব এবং কৈশোরে শিশুর পরিবেশ ও পিতামাতার পরিচালনার তারতম্য অনুসারে কোথাও সদ্‌গুণগুলি নষ্ট হয়ে অসদ্‌গুণগুলি প্রাধান্য লাভ করে, আবার কোথাও বা সঙ্কুচিত হতে হতে অসদ্‌গুণগুলির মৃত্যু হয় এবং সদ্‌গুলি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। অসদ্‌গুণগুলি প্রাধান্য লাভ করলে মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি যে সমস্ত বদ্ অভ্যাস ছেলেদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলির সম্বন্ধেই এবার আমরা আলোচনা করব।

ছেলেরা মিথ্যা কথা বলে কেন?—

দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, শিশু যখন মিথ্যা কথা বলে তখন পিতামাতার কর্তব্য শিশুর ত্রুটি দেখার চেয়ে নিজেদের ত্রুটির প্রতি বেশী সচেতন হওয়া—নিজেদেরই এর জন্যে দায়ী করা।

এ কথা তো আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, কোন ছেলেই মিথ্যাবাদী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং সত্য বলাই তাদের স্বভাব। যেমনটি দেখে, যেমনটি শোনে বা যেমনটি ঘটে হুবহু তারই একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করে তারা; কারণ তাদের অভিজ্ঞতা যেমন কম কল্পনা-শক্তিরও তেমনই অভাব। তাই কোন কিছুকেই নিজের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে, ততই বুঝতে পারে যে সব সময় সত্য কথা বলার বিপদ আছে অনেক।

ছেলেরা সাধারণতঃ দুটি কারণে মিথ্যা কথা বলে, একটি হচ্ছে আত্মরক্ষা এবং অন্যটি আত্মগৌরব। অতএব বুঝতে পারছেন বোধ হয়—এর উৎপত্তি ভয় থেকে না হয় গর্ব বা অহংকার থেকে। আত্মগৌরব প্রচারের জন্য শিশু যখন মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখন বুঝতে হবে যে তার মধ্যে আত্মদীনতার ভাব কাজ করছে। অর্থাৎ মনের ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার শক্তি তার নাই, অথচ কাজে কর্মে আর পাঁচজনের চেয়ে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে ক্রমাগত উৎসাহিত করছে। এই সব ক্ষেত্রে আপনার কি ধরণের ব্যবহার আপনার সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর হবে তাই বলার চেষ্টা করছি:

১। সহানুভূতিশীল বন্ধু হবেন—

কোন রকম শাসনের ধার দিয়েও যাবেন না, এমন কি অভিভাবকের সুরও যেন আপনার কথাবার্তার মধ্যে না থাকে। বরং প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এই মিথ্যে বলার পিছনে তার মনে যে গভীর দুঃখ এবং লজ্জা আছে তা আপনি অনুভব করতে পারেন এবং এই অবস্থায় অনেকেই এমনই মিথ্যে বলে থাকে। তার অক্ষমতার জন্যে আপনারও যে দুঃখের সীমা নাই, এটুকুও প্রকাশ করতে ভুলবেন না। তারপর বোঝাবেন যে মিথ্যেটা একবার ধরা পড়ে গেলে, কোনদিনই আর—কেউ বিশ্বাস করবে না, তখন সত্য বললেও লোকে মনে করবে, যে মিথ্যাই হয়ত বলছে। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে আজ মিথ্যা বলছে তার সবটুকুই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

২। সম্ভবমত তাকে সাহায্য করুন—

অন্যের সঙ্গে তুলনায় নিজের অক্ষমতার কথা বুঝতে পারে বলেই শক্তি অর্জন করার ইচ্ছাও এই ধরণের ছেলেদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অপারগ হলে বিকৃত উপায় অবলম্বন করে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। অতএব এই সময় তাকে যদি পড়াশুনার উন্নতিতে এবং খেলাধূলার

নিপুণতা লাভে সাহায্য ও উৎসাহ দান করেন তবে সুফল হতে পারে। আরও একটা দিক লক্ষ্য রাখবেন, সেটা হল তার স্বাধীনতা। হ্যাঁ, যে দিকটায় তার স্বাভাবিক উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন সেই দিকটাতে বেশী করে ঝোঁক দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে একটা মানুষ সবদিকেই সমানভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

আত্মরক্ষার জন্য যে সব ছেলেরা মিথ্যা কথা বলে তাদের পিতামাতা যে "তাড়নে বহবে গুণা" পক্ষপাতী, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের দোষের জন্যও কঠোর শাসন করে থাকেন। আপনার ছেলেমেয়েদের বেলাতেও যদি এমনই ঘটে থাকে কিংবা আপনার ব্যক্তিত্ব যদি তাদের ভয়ের কারণ হয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে তা দূর করার চেষ্টা করুন। কারণ এই ভয় বস্তুটি তাদের জীবনে কোন কল্যাণ তো আনতে পারবেই না, বরং মিথ্যা কথা বলতে আরও তাদের কুশলী করে তুলবে। আপনাকে ঠকাবার নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করতে সাহায্য করবে।

এই রকম অবস্থায় কি কি উপায় অবলম্বন করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে তারই আলোচনা করছি :

১। রাগ সংযত করবেন—

ছেলেমেয়ে মিথ্যে বললে রাগ না হয়ে পারে না। খুব সত্যি কথা, তবুও তারই মঙ্গলের জন্যে সংযত হবেন। কারণ রাগ হলেই স্বভাবিক নিয়মে তাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে আপনার হবেই। তার চেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তার মিথ্যে বলার কারণটা অনুসন্ধান করবেন।

২। মিথ্যা বলার সুযোগ দেবেন না—

আপনি হয়ত বলবেন যে সেটাও কি আপনার হাতে? নিশ্চয়ই, ধরুন আপনি কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। এসে দেখলেন যে আপনার সখের ফুল-দানিটি ভেঙে চুরমার হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় আপনার সব ছেলে মেয়েদের ডেকে নিয়মিত একটা আদালত বসিয়ে যদি প্রকৃত দোষীকে ধরার চেষ্টা করেন তাহলে অতি-বড় সাহসী ছেলেও সত্যি বলবে না। ধরুন, যদি সে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে। কি তখন করবেন আপনি? মার-ধর করবেন? তাহলে তারপর থেকে আপনার কাছে আর সে কখনই সত্যি কথা বলতে চাইবে না। যদি সত্যি কথা বলার জন্যে ক্ষমা করেন, তবে সে অন্যায় কাজ করতেও আর ভয় পাবে না। কারণ, সে জানে যে আপনার কাছে এসে স্বীকার করলে, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন। তার চেয়ে তাদের এই কথাটাই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে আপনি দুঃখ পেয়েছেন খুবই। কিন্তু এই ধরণের অন্যায়টা যে করেছে তার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন আরও অনেক বেশী।

৩। ছেলেদের সামনে মিথ্যা বলবেন না—

মা এবং বাবার সঙ্গেই শিশুর প্রথম ঘনিষ্ঠতার সূত্র-পাত। তাঁদের আচার আচরণ দেখেই সে অভ্যাস গঠন করতে সুরু করে। অতএব ছেলেদের সামনে এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহারে আপনাকে সব সময়ের জন্য সত্যবাদী হতেই হবে। না হলে ছেলেদের মনে এমন ধারণা হতে পারে যে সব সময় সত্যি কথা বলার দরকার হয় না।

৪। মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না—

অনেক সময় ছেলেদের একটা অন্যায় আবদার ভোলাতে গিয়ে আমরা তার চেয়ে ভাল কিছু দেওয়া বা তার মনের মত কোথাও নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আমরা আর প্রায়ই পালন করি না। এমনটা করা মোটেই উচিত নয়। কারণ, এতে ছেলেদের মিথ্যা বলার উৎসাহই দেওয়া হয়। তাই এমন প্রতিশ্রুতি তাঁদের দেবেন না যা পালন করতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এতে আপনার ওপর ছেলেদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আপনার কোন সদুপদেশই পালন করতে চাইবে না। কারণ, তাদের চোখে আপনি অনেকখানি ছোট হয়ে গেছেন তখন।

৫। শাস্তির ভয় দেখাবেন না—

ছেলে মেয়েকে আগে থেকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে কোন অন্যায় নিবারণ করার চেষ্টা করবেন না। কারণ, ছেলেদের স্বাভাবিক ঝোঁক হচ্ছে, আপনি যা করতে বারণ করবেন, তাই করা। যদি একান্ত মনে কারণ যে ভয়

দেখান দরকার। তাহলে সেই অপরাধ করার জন্যে তাকে শাস্তি দিতেই হবে।

৬। বাহিরের আচার আচরণের নির্দ্দেশ দেবেন না—

ইস্কুলে বা অন্য কোথাও যাবার সময় সাধারণতঃ আমরা ছেলেমেয়েদের "এটা করো, ওটা করো, অমুকটা করো না" ইত্যাদি নির্দ্দেশ দিয়ে পাঠাই। এমন করবেন না। কারণ, ফিরে এলেই আপনি আপনার নির্দ্দেশগুলি পালিত হয়েছে কিনা জানতে চাইবেন। ছেলেরা আগে থেকেই ধরে নিয়েছে যে আপনার এই নির্দ্দেশগুলি যদি পালন না করে তবে আপনার কাছে বকুনি খেতে হবে। তাই তারা আপনাকে ভুলেও সত্য কথা বলবে না। তাদের পছন্দ মত আপনার নির্দ্দেশগুলি পালন করবে। বাকি-গুলি করবে না। ধরুন বাড়ী এলে আপনি হয়ত তাকে আর কিছু জিজ্ঞেসই করলেন না। তবুও সে মিথ্যে বলার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আপনার সামনে এসেছিল, মনে রাখবেন।

৭। সন্দেহ করবেন না—

সন্দেহ করে কোন সময়েই ছেলে-মেয়েদের বিরক্ত করবেন না। অনেক মাকে এমন কথা ছেলেদের বলতে শুনবেন—"তোমরা কি কর না কর—আমি সব বুঝতে পারি।" "তোমরা কোন অন্যায় করলে তোমাদের মুখ দেখলে আমি ধরতে পারি।" "আমার কাছে লুকিয়ে রাখা সহজ নয়" ইত্যাদি। কখনও এমন কথা বলবেন না। কারণ, সত্যিই তো তাদের সব অন্যায় বুঝতে পারা বা জানতে পারা সম্ভব নয়। মার থেকে অকারণে দোষারোপ করার জন্যে বিরক্ত তো হবেই তারা, আপনার ওপর শ্রদ্ধাও তাদের কমতে থাকবে, তখন আপনার সামনে মিথ্যে বলতেও তারা আর ভয় পাবে না।

৮। বাস্তব উপমা দ্বারা কুফলগুলি বোঝাবে—

অলীক কাহিনীর চেয়ে দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যা বলার যে কুফলগুলি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় সেইগুলি ছেলে মেয়েদের দেখিয়ে দেবেন। এতে প্রত্যক্ষ ভাবে তারা বুঝতে পারবে এবং নিজেরাই সাবধান হওয়ার চেষ্টা করবে।

মোচার ঝালিঝুরা

উপকরণ :—মোচা, আলু, আদা, লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা, গরম মসলা, ঘি, তেল, নুন, অল্প মিষ্টি ও কিছু ব্যঞ্জন।

প্রথমে মোচাগুলি কেটে নিন, মোচা খুব ছোট ছোট কুচি করবেন না। মোচার খোলা ছাড়িয়ে ফুলের মধ্যে যে একটা শক্ত কাঠি থাকে তাহা ফেলে দেবেন। তারপর ২।৩ কুচি ক'রে কেটে রাখুন। মোচাগুলি ঐ ভাবে কেটে যেদিন রাঁধবেন তার আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখবেন।

পরদিন রাঁধবার আগে বেশ ভাল ক'রে ধুয়ে নেবেন এবং ডেকচিতে ক'রে সিদ্ধ করতে দেবেন। এদিকে আলু-গুলি চার টুক্‌রো ক'রে কেটে রাখবেন। তারপর মোচাগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে জল ঝরিয়ে নিয়ে তাতে আদা-লঙ্কা-হলুদ-বাটা, নুন, অল্প কিছু মিষ্টি ও ব্যঞ্জন দিয়ে বেশ ক'রে চট্‌কিয়ে মাখুন। ব্যঞ্জন ও মসলা পরিমাণ মত দেবেন। তারপর ছোট ছোট বড়ার আকারে ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। এবার আলুগুলি বেশ ভাল ক'রে কসে নিন। কস্‌-বার সময় লঙ্কা, তেজপাতা ও জিরে ফড়ন দেবেন। এই সময় অল্প দই—অভাবে সামান্য তেঁতুল অল্প একটু জলে গুলে সেই জলটুকু ছেঁকে নিয়েও দিতে পারেন। আদা-লঙ্কা-জিরে-হলুদবাটা দিয়ে বেশ ভাল ক'রে কস্‌বেন। কসা হয়ে গেলে পরিমাণ মত জল ঢেলে দিন, ফুটে উঠলে মোচার বড়াগুলি দিয়ে দেবেন। অল্প রস থাকতে থাকতে ঘি ও গরম মসলা দিয়ে নামিয়ে নেবেন। ইহা আমি নিজে অনেকবার করেছি এবং খেতে খুব সুন্দর লাগে।

পোড়ের বড়া

খোড়গুলি প্রথমে চাকা চাকা ক'রে কেটে একটু নুন মাখিয়ে রাখুন। খোড়ের বড়া করতে হলে রাঁধবার আগের দিন সন্ধ্যায় কিছু মটর ডাল ভিজিয়ে রাখবেন। পরদিন সকালে রাঁধবার আগে ভিজে ডালগুলি ভাল ক'রে বেটে নিবেন। মটর ডালের বাসন হলেও চলবে, কিন্তু মটর ডাল বেটে নিলেই খান ভাল হয়। এবার ঐ ডাল-বাটায় নুন, লঙ্কা ও অল্প মিষ্টি দিয়ে ভাল ক'রে ফেটিয়ে নিন। তারপর খোড়ের চাকাগুলিতে বেশ পুরু ক'রে মাখিয়ে ঐ কাঁচা বড়াগুলির উপর অল্প ক'রে গোটা পোস্তদানা ও জিরে ছড়িয়ে দিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন। মনে রাখবেন, এই বড়া ঠাণ্ডা অপেক্ষা গরম গরম খেতেই ভাল লাগে বেশী।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী

(বাগবাজার, চন্দননগর)

আল্পনা—

—ইন্দিরা বিশ্বাস

মনে পড়ে ?

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মনে পড়ে তরু, তব ছায়াতলে
একটি বালক করিত খেলা—
সকাল বেলা ?
তখন তরুণ তপন-কিরণ
মনে হ'ত যেন তরল হিরণ,
তব সাথে সাথে বসি' বাঁকে বাঁকে
হাজার পাখীর কুজনমেলা।
আছে কিগো নদী, তব বালুকায়
আজিও তাহার চরণ-রেখা,
স্মৃতিটি লেখা ?
তব জলতলে আজো কি তাহার
বিম্বিত রুচিমুখ বারবার ?
ঐ উচ্ছল কলগীতি তারি
রুচি কণ্ঠের কাছে কি শেখা ?

ওগো বনভূমি, একটি বালক—
তার কথা তব পড়ে কি মনে
অঞ্জনে ?
তব মর্মরে, শ্যামসুষমায়,
লতাপুষ্পের ললিত মায়ায়,—
আজিও কি তারে খুঁজিছ বৃথাই
ব্যাকুল অলির গুঞ্জরণে ?
পল্লী-জননী, তুলেছ কি তার
মুগ্ধ আঁখির দৃষ্টিখানি ?
নাহি সে জানি।
তোমার কুটীরে, চাটমাঠঘাটে
আজ তার দিন নাহি আর কাটে ;—
সে তব দুলালে সংসার মাগো,
টানায় নিঠুর কারার ঘানি !

ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য **রেক্সোনা**

ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।

রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

Rexona
BLENDED WITH CADYL

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড এর পক্ষে লাভক কর্তৃক

B.P. 146-BG BO

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

Presidency College
Calcutta.

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু—

সৌভাগ্যক্রমে আপনার একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। তাহার পর আপনার সব বই আনিয়া পড়িয়াছি। অতি-মানুষ কদাপি দেখা যায়। আপনি সাধারণ জীবনের কথাই লিখিয়াছেন, যাহা দ্বারা জাতীয় জীবন রচিত হইতেছে। তাহাতে যে কি মহত্ব আছে ও কি মহত্ব সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, অথচ তাহা আমাদের হৃদয়ের পরিচালনে তাহা সম্ভবিত হয়। কারণ এই সর্ব্ব-ব্যাপী দুঃখ হইতে কে পরিত্রাণ পাইয়াছে সে কথা স্মরণ থাকিলে কে অন্যের বোঝা বাড়াইতে চায়? যে দুঃখ কাহারও জীবন ভাঙিয়া দেয় সেই দুঃখই আবার অন্যকে দুঃখের অতীত করিয়া দেয়। সফলতা যে কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়। আপনার পথ-নির্দ্দেশ পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না, যে দেখিয়া সুখী হইলাম যে—যে-পথটা বড় তাহা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই। আমি

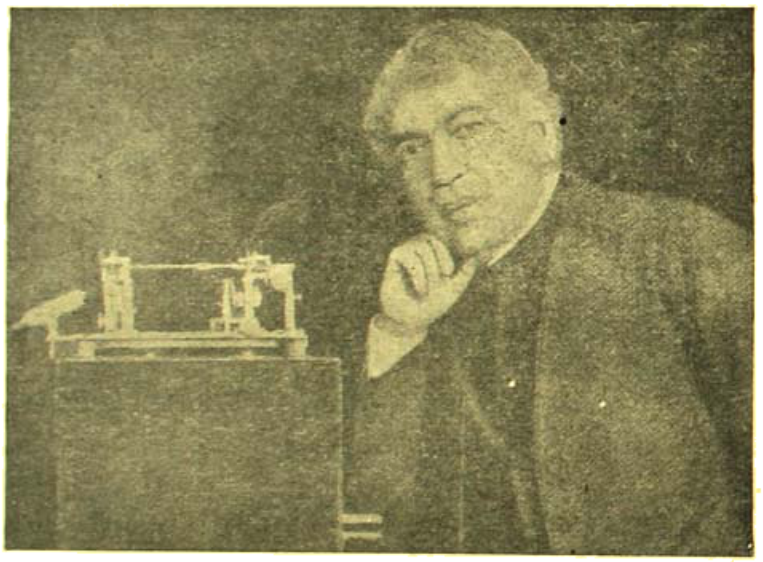

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

সাহিত্য পরিষদ সংস্রবে দুই একটা বিষয়ে যেরূপ আশান্বিত হইয়াছি অন্য বিষয়ে সেইরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অনেক বিষয়েই আমাদের প্রযত্ন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্যও অনেক নিরাশার কারণ উদ্ভূত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহার একটী এই যে—ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইলে বহিঃদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। আর একটী এই যে—বহু প্রয়াসে পূর্ব্বে যাহা সাধিত হইয়াছিল সফলতা আসিলে পরে এগুলি অল্প আয়াসেই সম্পন্ন করিতে চাহি। যদি সফলতা আসিয়া থাকে তবে তাহাও দেবতার করুণা, আমাদের তাহাতে কি বলিবার আছে? কেবল বলিবার কথা এই যে, যে করুণা আমাদের অনুপযুক্ত জীবনে প্রসারিত হইয়াছে সেই দান যেন আমাদের জীবনকে আরও পূর্ণতর করিতে পারে। যে মহত্বের কথা বলিয়াছি তাহা তখনই শক্তিমান হইবে যখন লেখকের জীবন লেখা হইতে মহত্তর হয়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

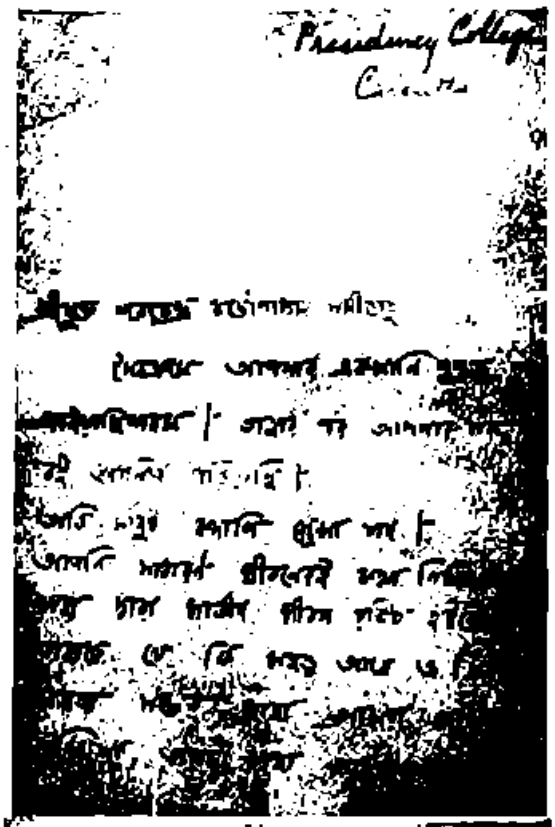

Presidency College
Calcutta

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

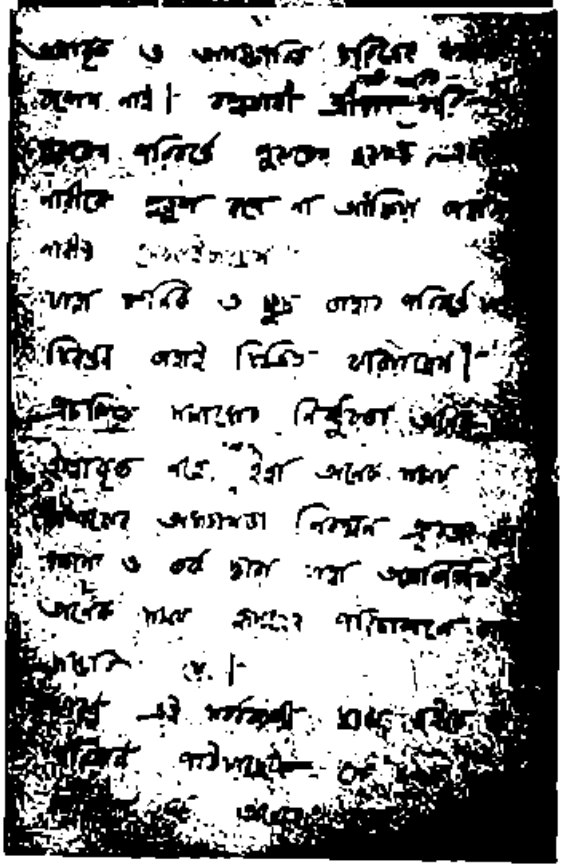

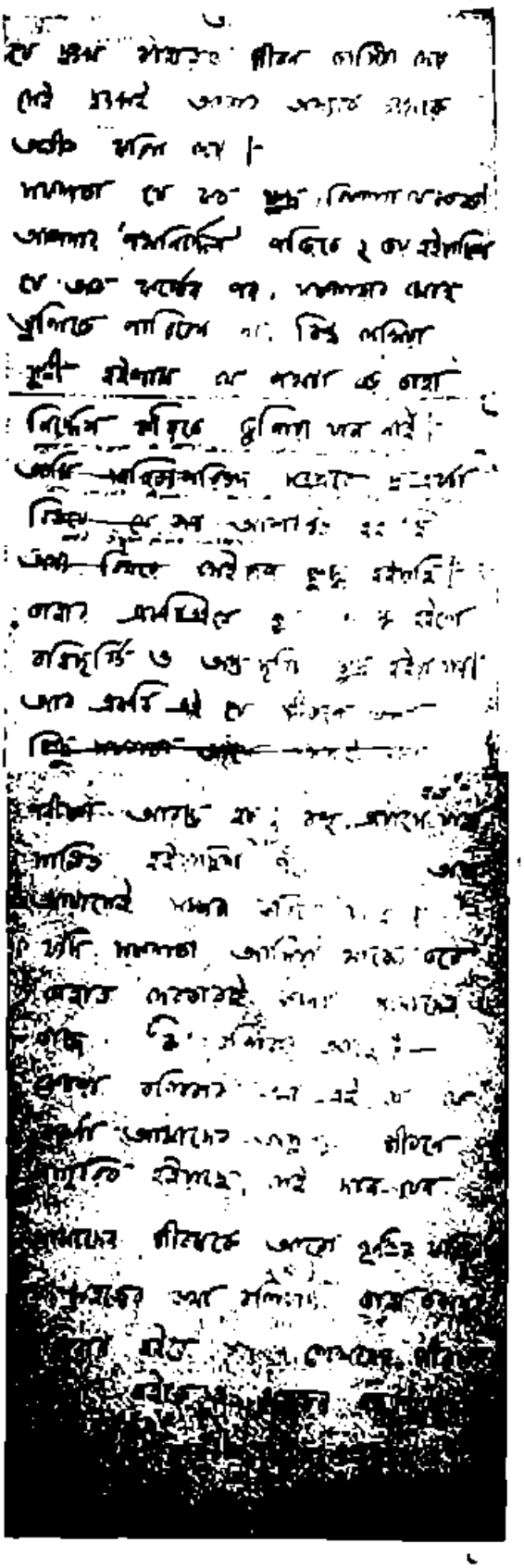

[পত্রখানিতে কোন তারিখ নাই, অপরাহ্নের কথা লিখিয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহা লিখিত। এই সঙ্গে পত্রখানির ছবিও প্রকাশিত হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসবের সময় আমরা তাঁহার এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে পারিয়া ধন্য হইলাম। যাঁহাদের কাছে আচার্য্যদের লিখিত এই রকম পত্রাদি আছে তাঁহারা দয়া করিয়া যদি সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।]

শ্মশানের স্বরূপ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কে বলে শ্মশানে ছাই হ'য়ে যাবে
এই স্নেহ-মাখা আঁতুড়-ঘর ?
রূপ তো পোড়ে না—রূপ তো মরে না—
লভে সে শুধুই রূপান্তর।
শ্মশান-অনলে আতর কেন ?
শোণিতে রক্ত হয়েছে আঁখি ;
নব-আগুকের জীবনোল্লাস
রোদন-বোধনে শুনিছো নাকি !

(২)

এই দেহাধারে জীবন যখনই
আপনারে আর রাখিতে নারে,
ভগ্নভাণ্ড শ্মশানে সঁপিয়া
ছলকিয়া ওঠে নোতুন ভাঁড়ে ;—
জীবন-রসের সরস সুধায়
অপরূপ রূপ কী সুন্দর !
রূপ তো পোড়ে না—রূপ তো মরে না—
প্রেমে শুধু পায় রূপান্তর।

(৩)

বাহ্যাচারে আর অনাচারে তুমি
চিতায় পুড়িলে চোখেরও মণি ;
দেখিলে না হায় এ মহা-পৃথিবী
রূপের—প্রেমের—রসেরই খনি ;
মরকতে-মোড়া আকাশ-তলায়
শ্মশানে শিবের জ্বলিছে ধূনি ;
সতী-শবাহত কাপালিক শিবও
উমারে লভিয়া হয়েছে মুনি।

(৪)

লওভণ্ড ভাও দেখিয়া
ওও সাধক, মরিছো ডরে ;
অবাক্ কাণ্ড দেখেও দেখো না ?—
সড়া-ই চলেছে অবক্ষরে।
জীবন কেবলই এগিয়ে চলেছে
শ্মশান-ভস্মে করিয়া ভর ;
পুড়িয়া পুড়িয়া খাদও খাঁটি হয় ;—
রূপও প্রেমে পায় রূপান্তর।

(৫)

মরা-কান্নার সময় কোথায় ?—
খণ্ড খণ্ড সতীর দেহে
উমাই আবার অপরূপ রূপে
শিবের হৃদয় জিনিবে স্নেহে।
দিব্য নয়নে রূপ দেখে লও—
বিশ্ব-রূপের রূপান্তর ;
শ্মশানই সূতিকা—সূতিকা শ্মশান ;—
কে বলে শ্মশান ভয়ঙ্কর ?

শিবেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

অতসীর যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। পুণ্যস্নান মহাযোগে চঞ্চল মহানগরীর স্নায়ু-কেন্দ্রে শ্রান্তির অবসাদ নেমে এসেছে। অমৃতলোভী পিপীলিকার দল পুণ্যকণা মুখে নিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আবার আপন আপন বিবরে প্রবেশ করেছে। দিগন্তের তীর্থযাত্রীরা গিয়ে ভিড় জমিয়েছে রেল স্টেশনের চত্বরে মুসাফিরখানায় আর ফুটপাতে। কোলাহল থেমে গিয়েছে। মানুষের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আর পেট্রোলের ধোঁয়ায় জমাট-বাঁধা ঝাঁজালো বাষ্প ধীরে ধীরে গলে' পড়ে হিমসিক্ত বাতাসের স্পর্শে।

সংজ্ঞা হয়তো ফিরেছিল অনেক আগেই। অনেক আগে অতসী একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখেছিল যে, তাঁবুর ভিতর একখানা বড় বেঞ্চিতে সে শুয়ে আছে। অবস্থাটা ভেবে নেবার মত মনের সক্রিয়তা ছিল না তার। হাত পা নড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না দেহে। অস্থিমজ্জা যেন পাথরে চোট খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। চোখ ফেরাতে কপালের শিরাগুলো ঝন্‌ঝন্ করে। মনে হয়, বুঝি ছিঁড়ে পড়বে।

চারিদিকে অচেনা লোকজন। ভদ্রলোকের ছেলে সব। তাঁবুর ভিতরে বাইরে ব্যস্ত হয়ে কারা সব ঘোরা-ফেরা করে!···দীনু!···দীনু নাই তো ওদের ভিতর?

মগজের ভিতর কিলবিল করে উঠেছিল অসংখ্য স্নায়ু-কীট। কেমন একটা ভয়, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ওর সর্বাঙ্গ আবার থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। বুঝে উঠতে পারে নি, ভেবে উঠতে পারেনি—কেমন করে কোথায় এসে পড়েছে সে।

ওর মুখপানে চেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটী সুন্দরী ভদ্রমহিলা। বয়েস হলেও ছাপ পড়েনি চোখে-মুখে। পরণে বাদামি রঙের রেশমি শাড়ি। আঁচলটা পিঠের ওপর ছড়ানো। মিষ্টি একটু হেসে বলেছিলেন: ভয় কি! এখুনি সেরে উঠবে।

ভয়!···ভয়। হাঁ, সত্যি ভয়। কেমন একটা অজানা ভয়ে আবার অসাড় হয়ে গিয়েছিল অতসীর সারা দেহ। চোখদুটো বন্ধ করেছিল। তারপর জানে না সে কেমন করে তাঁবু থেকে এসে পড়েছে এই ঝক্‌ঝকে ঘরে নরম বিছানার ওপর। দামী আসবাবে সাজানো বড়লোকের বৈঠকখানা। একপাশে একটা কৌচের ওপর শুয়ে আছে সে!

গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ে পথ হারিয়ে অতসী ছিটকে পড়েছিল। ভিক্ষিরীদের দলে দীনুকে খুঁজতে গিয়ে বৃন্দাবনের রঙ্গ বিক্রি করা তার হয় নি। জন-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান তৃণের মত শীর্ণ দেহটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছিল সে-জ্ঞান তার ছিল না। চেরিটির ও সবুজ-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের অনুগ্রহে সংজ্ঞাহীন দেহটা আশ্রয় পেয়েছিল ময়দানের তাঁবুতে। সংজ্ঞা যখন ফিরেছিল তখন পাশ ফিরবার শক্তিটুকুও ছিল না দেহে। মানুষের পাষাণ চাপে হাড়-গোড় আর পেশিগুলো যেন পেঁতো হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নিতে পাঁজরার হাড় ক'খানা টনটন করে।

পরণের কাপড়খানা কখন খুলে পড়েছে, অতসী বুঝতেও পারে নি। বুঝলো তখন যখন মনে হলো কে ওর খালি গায়ে হাত বুলাচ্ছে। অস্বস্তি হলেও প্রতিবাদ করতে পারে না। নিদারুণ অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন। কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও যেন লোপ পেয়েছিল। মগজের ভিতর বার-

বার শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি প্রশ্ন : কেন বাঁচলো ? আবার কেন বেঁচে উঠলো সে ?

দরজা জানালা বন্ধ। গরম কলে তোয়ালে ভিজিয়ে জোরে-জোরে গা-টা মুছিয়ে দিয়ে মিসেস চৌধুরী হেসে বললেন : অনেকখানি আরাম পাবে এবার।

একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখে, অতসী চোখদুটো আবার বন্ধ করে। কি বলবে ভেবে পায় না। মনটা নিবন্ত প্রদীপের মত মিটমিট ক'রে ঝিমিয়ে আসে।··· ইনিই ! হাঁ, এঁকেই সে দেখেছিল তাঁবুতে।

চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে মিসেস চৌধুরী চাদরের ভিতর দিয়ে আবার হাত বুলোতে লাগলেন ওর গায়ে। অতসীর দম বন্ধ হয়ে আসে। অসহ্য শিহরণে বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। সারা দেহ যেন কাঠ হয়ে আসে সংকোচের আড়ষ্টতায়। জিবটা শুকিয়ে আসে।

কি নাম তোমার ?

অতসী উত্তর দিতে পারে না। ঠোঁটদুটো কাঁপে। অনেককষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে : অ-ত-সী।

অতসী !···বাঃ ! বেশ সুন্দর নাম তো তোমার ! হলদে রঙের ছোটছোট ফুল। বনে জঙ্গলে ফুটে থাকে। তার চেয়েও সুন্দর তোমার চোখদুটো।···পেরণের ঝোপে চান করতে এসেছিলে বুঝি ?

না : একটা দীর্ঘশ্বাসে অতসীর গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে। আবার চোখদুটো বন্ধ ক'রে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

তবে ?

মিসেস চৌধুরীর মনে ভিড় করে অজস্র প্রশ্ন। কিন্তু অতসীর বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে নিরুদ্ধ উত্তর-গুলো।···পুণ্যি ! পুণ্যি করতে সে আসে নি। আর জন্মে যত পাপ করেছিল, সব কাঁড়ি হয়ে জমে আছে ওর কপালে। সে পাপ জলে ধুয়ে মুছবে না।

জোর ক'রে অতসী চোখদুটো খুলে তাকাবার চেষ্টা করে। পরিচিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে আর একবার দেখে নেয়।···না, নেই। আর কেউ তো নেই ঘরে। দু পাশের দরজা বন্ধ।···তবে ?

বিস্ময় কাটে না। বিহ্বল দৃষ্টিতে অতসী চেয়ে থাকে। কিন্তু মুখে কথা সরে না। হৃৎপিণ্ডটা অস্বাভাবিক দ্রুত চলে উঠেছে। ঠিক ভয় নয়। কেমন একটা অজ্ঞাত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে ওর নারীত্বের সুকোমল পর্দাগুলো।···মেয়েমানুষ ! এতক্ষণ এই একলা ঘরে ওর দেহটাকে নিয়ে যে অমন করে চটকাচ্ছিল, সে পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ !···ছি ! ছি !···অতসী ভাবতে পারে না।

পদ্ম মাঝে মাঝে পুরুষের মত তাকিয়ে থাকতো ওর দিকে। পদ্মাকাটা ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো যেন ইস-পিস করতো কাপড়াবার জন্যে। খেপা শেয়ালের মত তার চোখের চাউনি দেখে অতসীর গা-টা কেমন শিরশির করে উঠতো।

সঙ্গে যারা ছিল তাদের বুঝি খুঁজে পাওনি ?

কেউ ছিল না সঙ্গে : কম্পিতকণ্ঠে অতসী উত্তর দেয়।

একলা গিয়েছিলে ওই ভিড়ের মাঝখানে ?

হাঁ : অতসী চোখদুটো বন্ধ করে। কি বলবে, ভেবে পায় না। একটু থেমে, ইতস্তত করে বলে : আমাকে যদি একখানা ছেঁড়া কাপড় দিতেন, বাসায় ফিরে যেতাম। আমি পারবো এখন হেঁটে যেতে।

চাদরখানা পিঠের দিকে টেনে নিয়ে অতসী বিব্রত-ভাবে উঠে বসবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। পরণে কাপড় নাই। লজ্জায় জড়সড় হয়ে অতসী মুখখানা ঢাকে।

টেবিলের ওপর থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নতুন এক-খানা শাড়ি, একটা পেটিকোট আর ব্লাউস অতসীর হাতের কাছে দিয়ে মিসেস চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ওর মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বললেন : পরো। এত লজ্জা কিসের ? ঘরে তো পুরুষ মানুষ নেই কেউ।

লজ্জা কিসের ?···পুরুষ মানুষ নাই বলে ওর লজ্জা থাকবেনা ! অতসীর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে। ওর চেনা পৃথিবীটা যেন তালগোল পাকিয়ে চোখের দূরে সরে যায়। ভাবতে পারে না কেমন করে কোথা থেকে কোথায় ছিটকে এসেছে সে !···কে এই ভদ্রমহিলা ?

এত কেন?···জামা!···না, না। জামা আমার লাগবে না।

চোখদুটো রগড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অতসী উঠে বসে। শরীরটা মাতালের মত টলটল করে।

মিসেস চৌধুরী তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন দরজাটা টেনে দিয়ে।

অতসী চায় নি কিছু খেতে। কিন্তু মিসেস চৌধুরী তাকে জোর করে খাওয়ালেন দুখানা টোস্ট, আর এক-বাটী গরম দুধ।

নিতান্ত নিষ্ক্রিয় কাঠ-সোলার পাখীর মত অতসী আত্ম-সমর্পণ করে। কিন্তু ওর সারা অন্তর ভেঙে পড়তে চায় আর্তনাদে: না—না। এসব কেন? এসব তো ওদের জন্যে নয়। ও যে পথভিকিরীর মেয়ে। দুবেলা পেটের দুমুঠো ভাত আর পরণের একখানা ছেঁড়া কাপড়ও জোটে না ওর।

কথাগুলো মুখে আসে, কিন্তু বলতে পারে না অতসী। ঠোঁটের কাছে এসে আটকে যায়। চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

মিসেস চৌধুরী এতক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অতসীর মুখপানে: এত মিষ্টি চেহারা! তবুও যেন কি নেই ওর। হয় কোনদিন পায় নি কিছু, না-হয় পেয়ে হারিয়েছে সব।

হঠাৎ অতসীর চোখে জল দেখে কেমন হকচকিয়ে গেলেন মিসেস চৌধুরী: কষ্ট হচ্ছে তোমার?

না।

তবে?

অতসী উত্তর দেয় না। উত্তর ওর যোগায় না আর। দৃষ্টিটা মাটির দিকে নামিয়ে চোখের জল সামলে নেয়। ইচ্ছা করে, সব কথা খুলে বলে ওর আশ্রয়দাত্রীকে। কিন্তু পারে না। ভয়ে বুকের ভিতরটা জড়সড় হয়ে যায়। ···যখনই শুনবেন ও বস্তিতে থাকে, ঘেন্নায় নাকটা কুঁচকে যাবে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে যাবেন ঘর থেকে।

জোর ক'রে একটু হাসি টেনে এনে মিসেস চৌধুরী বলেন: মুখে না বললে কি হয়! কষ্ট যে তোমার হচ্ছে তা বেশ বুঝি।···সারা রাত ধ'রে বাড়ীর লোকেরা খুঁজে বেড়িয়েছে; এখনো হয়তো তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে সহরময়। তাঁরা তো জানেন না তুমি কোথায় এসে পড়েছ।···ড্রাইভারকে বলছি, গাড়ী নিয়ে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসুক।

এবার আর অতসী পারে না নিজেকে ধরে রাখতে। আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ওর অবসন্ন কণ্ঠস্বরের পর্দাগুলো ভেঙে: না—না। ড্রাইভার লাগবে না। কোনকিছু লাগবে না আমার। আমি পায়ে হেঁটেই যাবো।··· কোথায় পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাকে! খোলার বস্তিতে থাকি আমরা। আমরা নই, শুধু আমি—আমি একলা। ছিল—সবই ছিল। কিন্তু আজ আর নাই কিছু। জন্ম আমার ভিকিরীর ঘরে হয়নি। অন্ধ বাপের হাত ধরে আমিই প্রথম হলাম পথভিকিরী। বাবা রেহাই পেলেন, কিন্তু আমার মরণ হলো না।···কেন বাঁচালেন আপনারা?

মনে হলো অতসী বুঝি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। কৌচের হাতলটা ধ'রে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। আকস্মিক উদ্গত রক্তপ্রবাহে শরীরটা তালপাতার মত কাঁপে।

হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে কল্পনা চৌধুরীর উন্মুখ অনুভূতি-গুলো ক্ষণকের জন্যে পিছিয়ে দাঁড়ায়। ভিকিরী! ভিকিরীর মেয়ে! খাপরা-খোলার নোংরা বস্তির কোন অন্ধকার ঘরে থাকে। হয়তো কদর্য ঘৃণ্য জীবন যাপন করে।···অল্প বয়েস। অমন মিষ্টি চেহারা! নাক-মুখ-চোখ—

ভাবতে শরীরটা কেমন শিউরে ওঠে। তবুও যেন মন থেকে সরাতে পারেন না অতসীকে।···হোক গরীব। গরীব বই তো নয়। জন্ম ওর নিশ্চয়ই হয়েছিল ভদ্র-লোকের ঘরে। মুখে চোখে আজও সেই লাবণ্য মাখানো আছে। অভাবে অযত্নে পেশিগুলো শীর্ণ হলেও, ওর যৌবন যায়নি এখনও। দুদিন স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেলে আবার ফুটে উঠবে রূপ।···রোগ! রোগ ওর নেই কিছু। ওর দেহের প্রতিটি রক্তকণা তন্ন তন্ন করে উদ্বিগ্ন করেছেন মিসেস চৌধুরী। উনি পারেননি লোভ সামলাতে।··· অল্প-বয়সী মেয়েদের ওপর ওঁর লোভ পুরুষের চেয়ে কম নয়।

একটু ইতস্তত করে মিসেস চৌধুরী বললেন : থাকবে তুমি এখানে ?···কোনো অসুবিধে হবে না।

না।···না—না। মাপ করুন : মাথাটা ঝাঁকিয়ে অতসী সিধে হয়ে উঠে বসে। হাত দুটো জোড় ক'রে বলে : দয়া করে আমার জন্যে আপনারা যা করেছেন, তাই অনেক।···আমি গরীব। পথের কাঙাল, আপনার ঋণ শোধ করতে পারবো না কোনদিন।

মিসেস চৌধুরী নীরব হয়ে গেলেন। কেমন একটা অস্বস্তিতে মনটা ভরে উঠলো : গরীব—পথভিখিরী। লোকের দরজায় দরজায় হাত পেতে বেড়ায়। কিন্তু এখানে ও পারেনা থাকতে!

হাত দুটো কপালে ছুঁইয়ে অতসী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পা ফেলতে শরীরটা টলটল করে। বেঞ্চটায় বসে পড়ে দেহের ভারে হয়ে পড়ে। মনের বেগে শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় নামে।

মিসেস চৌধুরীর অমন তীব্র সচেতন মনও মুহূর্তের জন্যে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন সোফার হাতলে পিঠ দিয়ে। পরাজয়ের গ্লানিতে মনটা রী-রী করে ওঠে।···এতটুকু পরাজয় সইবার মত প্রস্তুতিও ওঁর জীবনে ছিল না কোনদিন।

অন্যমনস্কতা কাটলো বিভোরের সাড়া পেয়ে।

সার্ভিস ক্যাম্পের ভলান্টিয়ারদের নিয়ে হঠাৎ বিভোর সেন এসে উপস্থিত হলো প্রাতরাশের উদ্দেশ্যে।

লীলা মঞ্চো থেকে চিঠি দিয়েছে শেফালির কাছে। ওরা ভালোই আছে।···শুনেছো?

না : কল্পনা উঠে দাঁড়ালেন নিতান্ত বহুপুত্রদির মত।

ক্রমশঃ

গান্ধীজির আদর্শে দেশ গঠন—

কলিকাতা চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি ১৩ ফিট উচ্চ গ্রেনাইটপাথরের বেদীর উপর মহাত্মা গান্ধীর একটি ১১ ফিট উচ্চ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে—তাহা খ্যাতনামা ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্মাণ করিয়াছেন। ৩০শে নভেম্বর অপরাহ্নে ৫ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে শ্রীজহরলাল নেহরু সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ও বলেন—গান্ধীজির জীবনের আদর্শ ও বাণী অনুসরণের দ্বারা ভীতি ও সংশয়মুক্ত হইয়া শৃঙ্খলা-বোধ ও ঐক্য সাধনের মাধ্যমে দেশকে সমাজবাদের পথে পরিচালনার উদ্যোগী হওয়া আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ-মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঐ সভায় ঘোষণা করেন যে নীঘ্রই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি মূর্তি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর শ্রীনেহরু ১০ মিনিট কাল তথায় থাকিয়া মূর্তিটি দর্শন করেন। মূর্তিটিতে লেখা আছে—"মৃত্যুর মর্মে জীবন আছে, অসত্যের অন্তরে সত্য আছে, তমসার গর্ভে আলোক আছে, তাই বুঝিয়াছি—ঈশ্বরই জীবন, ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই প্রেম।" কলিকাতায় ঐ মূর্তি বাঙ্গালী তথা কলিকাতাবাসী সকলকে সর্বদা গান্ধীজির জীবন ও আদর্শের কথা মনে করাইয়া দিবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা—

গত ১লা ডিসেম্বর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশত-বার্ষিক উৎসবের দ্বিতীয় দিনে প্রধান-বক্তারূপে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বক্তৃতায় সকল বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানের ছাত্রকে বাংলা ভাষায় তাঁহাদের গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত হইতে জগদীশচন্দ্র বসুর বাংলা ভাষায় লেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, আজও বহু বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণার ফল মাতৃভাষায় প্রকাশ না করিয়া ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা দীর্ঘ দিনের সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, গণিত, প্রাণী বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অতি অল্পসংখ্যক প্রবন্ধই সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলায় কিছু কিছু পুস্তক রচিত হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আদৌ আগ্রহশীল নহেন। আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়টি উল্লেখ করিয়া বাংলা দেশের ও মাতৃভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রকাশ করিলেন, সে জন্য তিনি দেশবাসী সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই সত্য কথা প্রকাশ করায় আমরাও তাঁহাকে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কলিকাতায় শ্রীনেহরু—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ৩০শে নভেম্বর এক দিনের জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম শত-বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতায় আসিয়া ৫টি অনুষ্ঠানে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। গান্ধী মূর্তির উন্মোচনে ১ ঘণ্টা, জগদীশ বসু উৎসবে ৩৫ মিনিট, আন্তর্জাতিক ছাত্রসমিতির সভায় ২০ মিনিট, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-সেবা সমিতির অনুষ্ঠানে ১৫ মিনিট এবং সমাজ কল্যাণ ও ব্যবসা পরিচালন পরিষদে ১০ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ধাপি গ্রামোদ্যোগ ভবনে তিনি ১৫ মিনিট ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও বহু লোকের সহিত তিনি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীনেহরু এই বয়সে যেরূপ কাজ করেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রাজভবনে সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর নূতন সভাপতি শ্রীঅতুল্যচন্দ্র ঘোষ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ললিতা বসুর সহিতও তাঁহার আলাপ আলোচনা হইয়াছে। নেতাজীর কন্যা অনিতাকে ১৯৬০ সালে ভারতে আনয়ন সম্পর্কে শ্রীমতী ললিতা শ্রীনেহরুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১১ বৎসর

কাল শ্রীনেহরু প্রায় প্রত্যহই এইরূপ কর্মবহুল জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বসুবিজ্ঞান মন্দিরে গত ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। গত প্রায় ১০০ বৎসরের এ দেশে বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতির ইতিহাস তথায় দেখানো হইয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও গবেষণার সামগ্রীগুলিও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১০।১২ দিন প্রদর্শনী খোলা ছিল এবং হাজার হাজার ছাত্র তাহা দেখিয়া শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিয়াছে।

পাকিস্তান সমস্যা—

গত ৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তিই চঞ্চল হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্তানের সহিত ভারত যুদ্ধ করিতে চাহে না বটে, কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের ফলে এখন যুদ্ধের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না—সে জন্য ভারতকে যুদ্ধের প্রস্তুতি করিতে হইতেছে। ছিট-মহল আদান-প্রদান প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্রীনেহরু এত অধিক উদারতা প্রদর্শন করেন যে, সে জন্য একদল দেশবাসী তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হন। এ কথা সত্য যে, পাকিস্তান হানাদারেরা এ পর্য্যন্ত এত অধিকবার ভারত আক্রমণ করিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে বহু পূর্বেই ভারত সেই কারণে পাকিস্তান আক্রমণ করিতে পারিত। সে আক্রমণের ফল কি হইত, সে কথা আমরা আলোচনা করিব না—তবে আক্রমণ যে অন্যায় হইত না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পাকিস্তানে দারুণ অভাব, সে তুলনায় ভারতে প্রাচুর্য্য আছে। সেজন্য সীমান্তবাসী পাকিস্তানীরা প্রায়ই ভারত-সীমান্তে প্রবেশ করিয়া গরু, ছাগল, মাঠের ধান, গাছের ফল, এমন কি ধনরত্ন প্রভৃতিও লুঠ করিয়া লইয়া যায়। পাকিস্তান সরকার এ সকল কার্য্যের প্রতীকারে আদৌ অবহিত হয় না। স্বাধীনতা লাভের পর ১১ বৎসর অতীত হইলেও পাকিস্তানে আজ পর্য্যন্ত কোন স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। ফলে এইরূপ অনাচার বন্ধ করার শক্তিও তাহাদের নাই। এতদিন পর্য্যন্ত শ্রীনেহরু একথা বিচার করিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কতকগুলি ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে পাকিস্তানের বর্ত্তমান শাসকগণ হানাদারদের এ সকল কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহ দান করিতেছেন—সেজন্য সীমান্তের অনাচার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর সেখানে যেভাবে হিন্দুদের নির্য্যাতন করা হইতেছে, তাহা মনে করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। গত ৪ঠা ডিসেম্বর খবর আসিয়াছে যে বরিশালে দুইশতাধিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে খ্যাত-নামা এডভোকেট ৭০ বৎসর বয়স্ক শ্রীঅবনীনাথ ঘোষ, রামচন্দ্রপুরনিবাসী জমীদার শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ, কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রাণকুমার সেন প্রভৃতি আছেন। ২০০ জন সকলে হিন্দু নহেন—তন্মধ্যে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন। তথায় আদেশ হইয়াছে যে, যে কেহ বর্ত্তমান শাসকদের কার্য্যের নিন্দা করিবে, তাহাকেই নিরাপত্তা আইনেধরিয়া আটক রাখা হইবে। এই সকল ঘটনা ছাড়াও পূর্বপাকিস্তান সীমান্তে বহু স্থানে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে ও বহুস্থানে ভারত-এলাকার বহু গ্রাম পাকিস্তানী সৈন্যরা বলপূর্বক দখল করিয়া আছে। সৈন্যদলের দ্বারা ফসল বা বনের গাছ চুরি নিত্য ঘটনা। এই সকল সংবাদ পাইয়া শ্রীনেহরু চিন্তিত হইয়াছেন; ওদিকে আমেরিকা পাকিস্তানকে গত কয় বৎসর ধরিয়া প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়াছে। এখন ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে ও আমেরিকা পাকিস্তানের সাহায্যে অগ্রসর হয়, তবে তাহা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠীর সহিত এখনও সোভিয়েট-চীন গোষ্ঠীর কোন আপোষ হয় নাই—হবে বলিয়া আশাও দেখা যায় না। এ সময়ে শ্রীনেহরুর কাজের জন্য তাঁহাকে গালি না দিয়া প্রত্যেক দেশবাসীকে এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায়ের কথা চিন্তা করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক দেশবাসীকে যেমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিব, তেমনই যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা

চিন্তা করিয়া শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চেষ্টিত হইতে অনুরোধ করিব।

দণ্ডকারণ্য ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে এত অধিক সংখ্যায় পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের বসবাসের ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আর সম্ভবপর নহে। যে কেহ কলিকাতা ও সহরতলীতে ভ্রমণ করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শুধু সহরতলী নহে, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ও কতকগুলি স্থানে উদ্বাস্তুর ভিড় এত অধিক যে সে সকল লোককে অন্য স্থানে প্রেরণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার উদ্যোগে ও চেষ্টায় মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র তিনটি রাজ্যের সংযোগস্থলে তিনটি রাজ্য হইতে কিছু কিছু অংশ লইয়া একটি 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা' প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে চাষের জমী বেশ ভাল ও পরিমাণে বেশী,ঐ অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম, স্থানটি নদীবহুল, বর্ষায় ভাল বৃষ্টি হয়, বহু স্থান জঙ্গলে পূর্ণ এবং তথায় বহু প্রকারের খনিজ পদার্থ আছে। তথায় আপাততঃ ২০ লক্ষ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুকে লইয়া গিয়া পুনর্বাসন প্রদান করা হইবে। ধনী, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ তথায় যাইলে নূতন নূতন ব্যবসার সুযোগ ও সন্ধান পাইবেন। কৃষক, মৎস্যজীবী, কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, ধোপা, নাপিত, ছোট ছোট ব্যবসাদার প্রভৃতির কর্ম-সংস্থানের সুযোগ তথায় খুবই বেশী। সরকার আপাততঃ ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদিগকে সরকারী ব্যয়ে তথায় লইয়া যাইবেন এবং সরকারী ব্যয় ও ব্যবস্থায় তাহাদের পুনর্বাসনের সুযোগ করিয়া দিবেন। যদি সৌভাগ্যক্রমে তথায় বহু বাঙ্গালী গমন করে, তবে ক্রমে ঐ অঞ্চল নব বাংলায় পরিণত হইবে। বাঙ্গালী যদি তথায় না যায়, তাহা হইলে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি যাইয়া ঐ স্থান ক্রমে দখল করিয়া লইবে। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে লোক সংখ্যা অধিক বলিয়া সে সকল রাজ্যের পরিচালকগণও অন্য রাজ্যে অধিবাসী প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীরা ত তথায় যাইবার জন্য উৎসুক। বাংলা দেশে শুধু উদ্বাস্তুদের বাসস্থান ও কর্ম সংস্থান সমস্যা হয় নাই—পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসীদেরও সে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এ অবস্থায় প্রত্যেকের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালী চিরকাল বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, সিংহল, ব্রহ্ম, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পরিবার আজও সুখে বাস করিতেছে। কাজেই দণ্ডকারণ্যে যাইতে বাঙ্গালীর ভীত হওয়ার কারণ নাই। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা কমাইয়া ফেলা ছাড়া এখানে সুখে ও শান্তিতে বাস করার অন্য উপায় নাই। এই ভাবে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে ও ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কাজেই আমরা মনে করি, শ্রীখান্না দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা করিয়া বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ উপকার করিয়াছেন ও প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই সুযোগ গ্রহণ করা বা অপরকে গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করা একান্ত কর্তব্য।

সর্বোদয় আলোচনা—

গত ৯ই ডিসেম্বর উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী ও বর্তমান ভূদান নেতা শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী কলিকাতায় আসিয়া ভূদান যজ্ঞ কার্য্যালয়ে কলিকাতার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া দুই ঘণ্টাকাল সর্বোদয় আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বৈঠকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র লাহা, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, সমরেন্দ্র বসুঠাকুর প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও সর্বোদয় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। নবকৃষ্ণবাবু তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয় সহকারে এই আন্দোলনে বাংলার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদিগের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করিয়া সর্বোদয়ের আদর্শ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান—তিনি আচার্য্য শ্রীবিনোবা ভাবেজিকে বলিয়াছেন—বিনোবাজী যেন কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিয়া কলিকাতাবাসী চিন্তাশীল ব্যক্তি-

দিগের নিকট সহযোগের কথা স্থাপন করেন ও তাঁহাদের বিচারের দ্বারা ঐ আন্দোলনের সার্থকতা প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে তাঁহাদের ভ্রমণের ফলও তিনি সভায় ব্যক্ত করেন। নরকৃষ্ণবাবুর মত সুধী, প্রাজ্ঞ ও ধীবুদ্ধি সবোদয় নেতার এই প্রচার কার্য্য অবশ্যই সুফল দান করিবে।

সেবা কার্য্যে আগ্রহের অভাব—

শ্রীজহরলাল নেহরু ৩০শে নভেম্বর দমদম বিমান ক্ষেত্র হইতে যাইয়া সকাল ঠিক সাড়ে ১০টার সময় কলিকাতা ১৩৬.২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একস্-রে ক্লিনিক উদ্বোধন করিয়াছিলেন—তিনি তথায় বলেন—ভারতে সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া তুলিতে জনসাধারণ আজকাল আর বেশী উদ্যোগী হইতেছে না—সে জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানাদি জনসাধারণের উদ্যোগে অধিকতর সংখ্যায় গঠিত হইতে দেখিলে আমি সুখী হইব। মিনার সিনেমা গৃহে ঐ অনুষ্ঠান হয়। সভায় ২০১৪৫৭ টাকার একখানি চেক ঐ কাজের জন্য শ্রীনেহরুকে দেওয়া হইলে তিনি তাহা সমিতির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের হাতে দেন। সভায় সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীঅশোককুমার সেনও বক্তৃতা করেন। ঐ ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ফলে বহুলোকের ক্ষয়রোগ প্রথমেই ধরা পড়িবে ও তাহারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভের সুযোগ পাইবেন। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-সেবা সমিতি পশ্চিমবঙ্গে বহু জনকল্যাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

নেতাজী সুভাষের ভারতাগমন—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ললিতা বসু ভিয়েনা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে জানাইয়াছেন—নেতাজীর কন্যা শ্রীমতী অনিতা ১৯৬০ সালে পরীক্ষা দিবার পর স্থায়ীভাবে এ-দেশে বাস করিবার জন্য ভারতে চলিয়া আসিবেন। গত ২৬শে নভেম্বর অনিতার জন্মদিন গিয়াছে—ঐ দিন অনিতা ১৭ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। অনিতা নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিয়া মনে করে এবং ভারতীয় পোষাক ও ভারতীয় আচার ব্যবহার তাহাকে আকৃষ্ট করে। সে স্কুলে পরীক্ষায় প্রত্যেকটি বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। শ্রীজহরলাল নেহরুও অনিতাকে ভারতে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমতী ললিতা ৩ বার কাল ভিয়েনায় অনিতা ও তাহার মাতার সহিত বাস করিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার স্কুল ফাইনাল এ দেশের বি-এ পরীক্ষার সমান। অনিতা এদেশে আসিয়া আইন পড়িবে ও সমাজসেবার কাজ করিবে। ললিতা সমবায় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ও সমবায় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবেন। এদেশ হইতে ললিতা সমবায়-প্রথায় প্রস্তুত শাড়ী বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

উন্নতির সুযোগের দ্বার উন্মোচন—

৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীজহরলাল নেহরু কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে সমাজ কল্যাণ ও ব্যবসা পরিচালন পরিষদের নূতন ব্লকের ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় বলেন—"উন্নতি করিবার সুযোগের দ্বার অবাধে সকলের জন্য খুলিয়া দিতে হইবে—তবেই আমরা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আবিষ্কার করিতে পারিব।" পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি—এ সংবাদ জানিয়া শ্রীনেহরু বলেন—"আমি যখনই কলিকাতায় আসি, তখনই ডাক্তার রায়ের নব নব কীর্তির সহিত আমার পরিচয় ঘটে। প্রতিষ্ঠার পর গত ১৬ বৎসরে ঐ পরিষদ হইতে ১০১৬ জন সেবার অভিলাষে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—তন্মধ্যে ২৫৪ জন কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ পাইয়াছেন—৫৮৪ জন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ঐ উপলক্ষে পরিষদের একজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅতুল বসু অঙ্কিত ডাক্তার বিধানচন্দ্রের এক বিরাট তৈলচিত্র পরিষদকে উপহার দেন—তাহা শ্রীনেহরু পরিষদের পক্ষ হইতে সানন্দে গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে নবতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দান করিয়া সমৃদ্ধ করিবে।

নূতন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি—

গত ২৫শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সভায় সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী

শ্রীপাদবেন্দ্রনাথ পাল্লা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নূতন সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ সহ-সভাপতি ও শ্রীবিজয় সিং নাহার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীনির্মলেন্দু দে, শ্রীমতী আভা মাইতি ও শ্রীবীরেশচন্দ্র সেন সম্পাদক মনোনীত হন। শ্রীলাবণ্যপ্রভা দত্ত ও ডাক্তার জীবনরতন ধর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীঅবনি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর প্রভৃতিকে লইয়া মোট ৩০ জন কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হইয়াছেন। বাদবেন্দ্র-বাবু সর্বজন শ্রদ্ধেয়—তাঁহার সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দুর্নীতিমুক্ত হইলে সকলেই আনন্দিত হইবেন, দেশে কংগ্রেসের প্রতিপত্তিও বর্দ্ধিত হইবে।

কলিকাতায় চুরির হিড়িক—

সম্প্রতি কলিকাতা-সিমলা অঞ্চলে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর চুরি বাড়িয়াছে। চোর রাত্রিতে বড় রাস্তার ধারে দোকানসমূহের তালাগুলি খুলিয়া লইয়া যায়—স্থানীয় থানায় খবর জানাইলেও কোন প্রতিকার হয় না। আমরা এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি। একই দোকানে বার:বার চুরির ফলে লোক ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। কলিকাতায় রাত্রিকালে পুলিস পাহারার কোন ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান বৎসরে ধান্য উৎপাদন—

নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র ভারতে এবার যেরূপ পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, পূর্বে তাহা হয় নাই। এ বৎসরের উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন। পূর্ব ২ বৎসরে যথাক্রমে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ও ২ কোটি ৮২ লক্ষ টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে ধান্য কম উৎপন্ন হইলেও ভারতে ধান চাষের জমীর পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে আশাতীত ফসল ফলিয়াছে। জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলও প্রচুর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা আশার কথা হইলেও আমরা যেন আগামী বৎসরে খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই—কারণ খাদ্য দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমাদের খাদ্যের পরিমাণ আমরা কমাইতে বাধ্য হইয়াছি—তাহার ফলে শরীরের পুষ্টি কমিয়া যাইতেছে ও শরীরের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে। আমাদিগকে এখনও বিদেশ হইতে বহু পরিমাণ গম আমদানী করিতে হয়—কারণ চালের পরিবর্ত্তে, অভাবে পড়িয়া, আমরা অধিক গম ব্যবহার করি। কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার অধিক খাদ্য উৎপাদনে অবহিত হইয়াছেন; আশা করি দেশবাসী জনসাধারণও এ কার্য্যে আগ্রহান্বিত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে বিমুখ থাকিবেন না।

শ্রীনবগোপাল দাস—

খ্যাতনামা লেখক ও অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত শ্রীনবগোপাল দাস সম্প্রতি আই-সি-এস চাকরী—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের সেক্রেটারী ও হাওড়া ইম্প্রুভমেণ্ট

শ্রীনবগোপাল দাস

ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে ভারতীয় কর্ম সংস্থান সমিতির ডিরেকটার-জেনারেলের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি দুর্নীতি দমনের জন্য কলিকাতা পুলিস হাসপাতাল, শিবপুর বাগান প্রভৃতির ষড়যন্ত্র ধরিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বহু উপন্যাস ও অর্থ-নীতি পুস্তক লিখিয়াও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

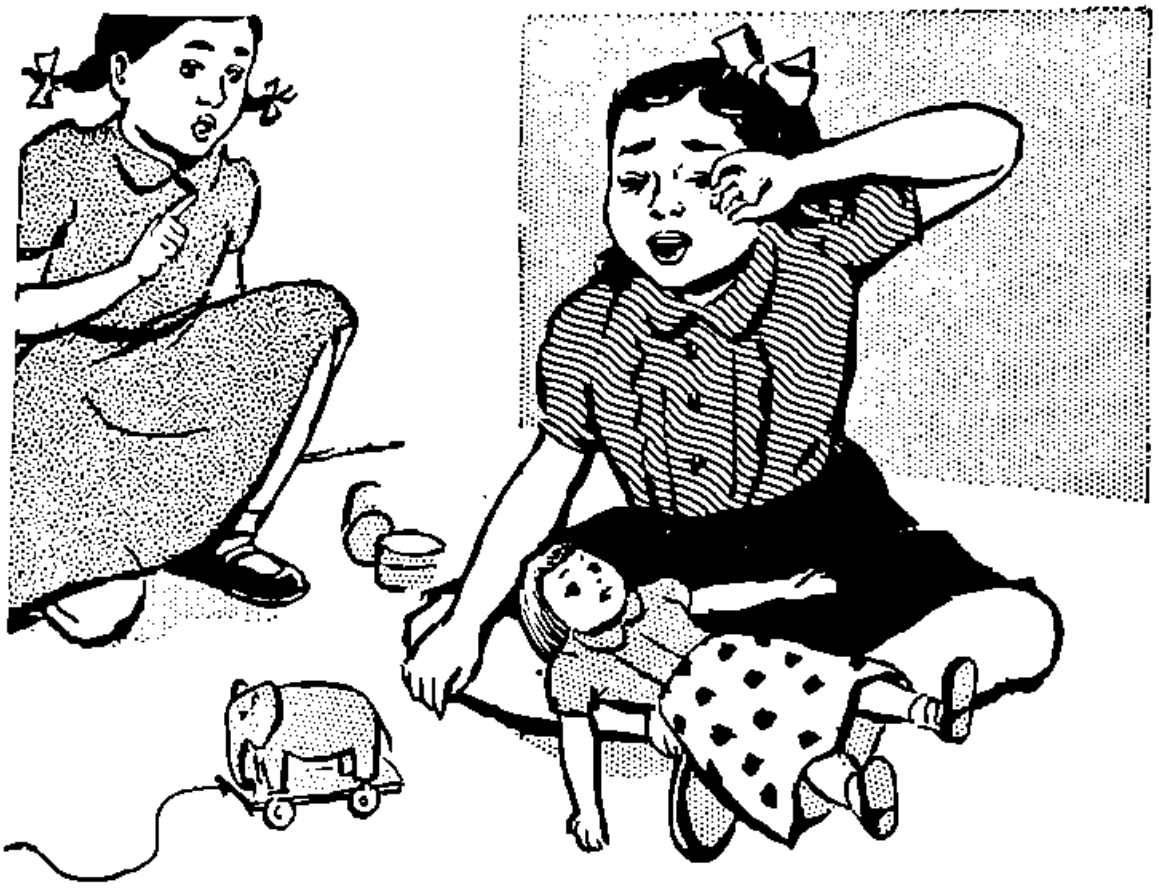

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

M52 0C

মুন্নি কোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির মুখে আলতার মেখানো গালে মশলার গাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে মশলা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এক্কোবে, এক্কোবে' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলাম। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা বিন্নুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, বিন্নুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "জলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বৌদি, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির জলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পাঞ্জাবী, শার্ট, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টি জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

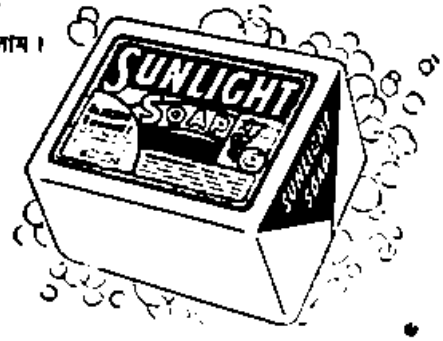

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগে। এর ফেণা হাতকে মধুর ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

ই. ২৪৪৩-৪৪৫ BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, এক এক প্রডাক্ট

পাটি ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ মর্ম্মবাণী ॥

নববিবাহিতা অরুণার বিস্মিত চোখের সামনে ঘটে যায় ঘটনাগুলা। বিয়ের পরদিন অরুণা যখন শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছাল, স্বামী তার গাড়ী থেকে নেমে সোজা চলে গেল নিজের ঘরে, তার মার শত ডাককে উপেক্ষা করে—বন্ধ হল তার ঘরের দরজা সশব্দে। বাড়ীর লোক সব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল, ডাক্তার এল। অরুণাকে তার ননদ বসিয়ে রেখে গেল একটা ঘরে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে যেতে লাগল অরুণা এই সব অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল ননদ—বোঝাল অরুণাকে ব্যাপার কিছু গুরুতর নয়, পরে সব বুঝিয়ে বলবে, এখন বিশ্রাম করুক। কিন্তু অরুণার মন তাতে বোঝে না। রাত্রে যখন সবাই ঘুমে অচেতন অরুণা শয্যা ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে স্বামীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা ভেজান ছিল—অরুণা ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। প্রথমেই ধোঁয়া আর একটা গন্ধে তার বুঝি মাথা ঘুরে যায়,—ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অদ্ভুত মূর্তি, অদ্ভুত চিত্র, অদ্ভুত শবাধার, আর তার মাঝে তার স্বামী বরুণ অদ্ভুত বেশে বিড় বিড় করে বকে চলেছে। স্তম্ভিত অরুণা পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে যায় স্বামীর অজান্তে। তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অতীত মিশরের মূর্তি, চিত্র প্রভৃতির এক অদ্ভুত সমাবেশ। স্বামী তার তখন প্রার্থনায় রত মিশরের পুরাণ দেবতা অদ্ভুত দর্শন আমন দেবের সামনে। আস্তে আস্তে ভীতবিহ্বল অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পায়ের ধাক্কায় কি একটা উল্টে পড়ে শব্দ হয়ে ওঠে। বরুণ চকিতে উঠে দাঁড়ায়, দ্রুত পায়ে অরুণার কাছে এসে বলে,—তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আইসিস, এতদিনে তুমি এসেছ।···তারপর বকে চলে বরুণ, চোখে তার উন্মাদের সুস্পষ্ট লক্ষণ! অরুণাকে বলে,—আইসিস তোমার প্রাণহীন দেহকে মমি করে রেখে দেব যাতে কেউ না তোমাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। বিস্মিত অরুণা এবার বিচলিত হয়ে ওঠে। চকিতে সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু বরুণও ছুটে আসে চিৎকার করে—যেওনা আইসিস বলে তাকে ডাকে। বাড়ীর লোক সব উঠে পড়ে, বরুণকে ধরে রাখে, আর ত্রস্ত অরুণা নিজের ঘরে গিয়ে পড়ে। ক্রমশঃ সব কিছুই বোঝা যায়। ইতিহাসের কৃতী ছাত্র বরুণ মিশরের পুরাণ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে করতে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ক্রমশ তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে উন্মাদের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বিয়ে হলে সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রীর সান্নিধ্যে হয়ত এই বিকার কেটে যাবে মনে করেই তার বিবাহ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ফল তাতে ভাল কিছুই হল না, উল্টে নববিবাহিতা স্ত্রী অরুণাকে সে মনে করল অতীত মিশরের বিস্মৃত ইতিহাসের এক রাজকুমারী বলে।—এই সব তথ্য জেনে আশাহত অরুণা আর এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে থাকতে রাজী হল না,—সে বাপ মার কাছে ফিরে যেতে চাইল; কিন্তু পিতা, মাতা, ননদ প্রভৃতির অনুরোধে থেকে গেল শ্বশুর গৃহে, আর নিজের ভাগ্যের প্রতি, স্বজনগণের প্রতি প্রতিশোধ নেবার এক অজানা আকাঙ্ক্ষাতেই বোধ হয় স্বামীর পাগলামীর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে নিজেও পাগল হবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে স্বামীর পরিচর্য্যায় নব-নিযুক্ত এক নার্সের উপদেশে তার মোহ ভঙ্গ হল,—স্বামী গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মুক্তির সন্ধানে, আর ঐ নার্সের সহায়তায় নার্সিং শিখে রুগীদের পরিচর্য্যায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। পরে স্বামী বরুণের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের খবর যখন তার কাছে পৌঁছাল তখন শত চেষ্টাতেও সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না,—রাঁচীর হাসপাতালে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হল।

এই হল 'মর্ম্মবাণী' ছবিটির গল্পাংশ। শ্রীমনোজ

ভট্টাচার্য্য লিখিত চিত্রটির গল্পাংশ বেশ সবল ও গতিশীল, আর মনকে ধরে রাখবার মতন উত্তেজনা, উদ্বেগ প্রভৃতির প্রাবল্য থাকায় গল্পটিও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। সাধারণ সামাজিক চিত্রের চেয়ে গল্পটি ভিন্ন ধরণের হওয়ায় ঔৎসুক্যও জাগায় মনে। তাছাড়া আজকের সমাজের একটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই চিত্রের মাধ্যমে। স্বামীর কোনও বিকারের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত কিনা সে প্রশ্ন এই চিত্রে পাওয়া যায়।

অভিনয় প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। নার্সের ভূমিকায় মঞ্জু দের সাবলীল অভিনয় মনে রাখবার মতন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, রাজলক্ষ্মী, অনুপকুমার প্রভৃতির অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী হয়েছে। নায়ক বরুণের ভূমিকায় অশোককুমারের অভিনয় আশানুরূপ না হলেও খুব খারাপ হয়নি। চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, বহির্দৃশ্য প্রভৃতির দিক দিয়ে চিত্রটি প্রশংসার দাবী করতে পারে, আর শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ও বিশেষ করে আবহ

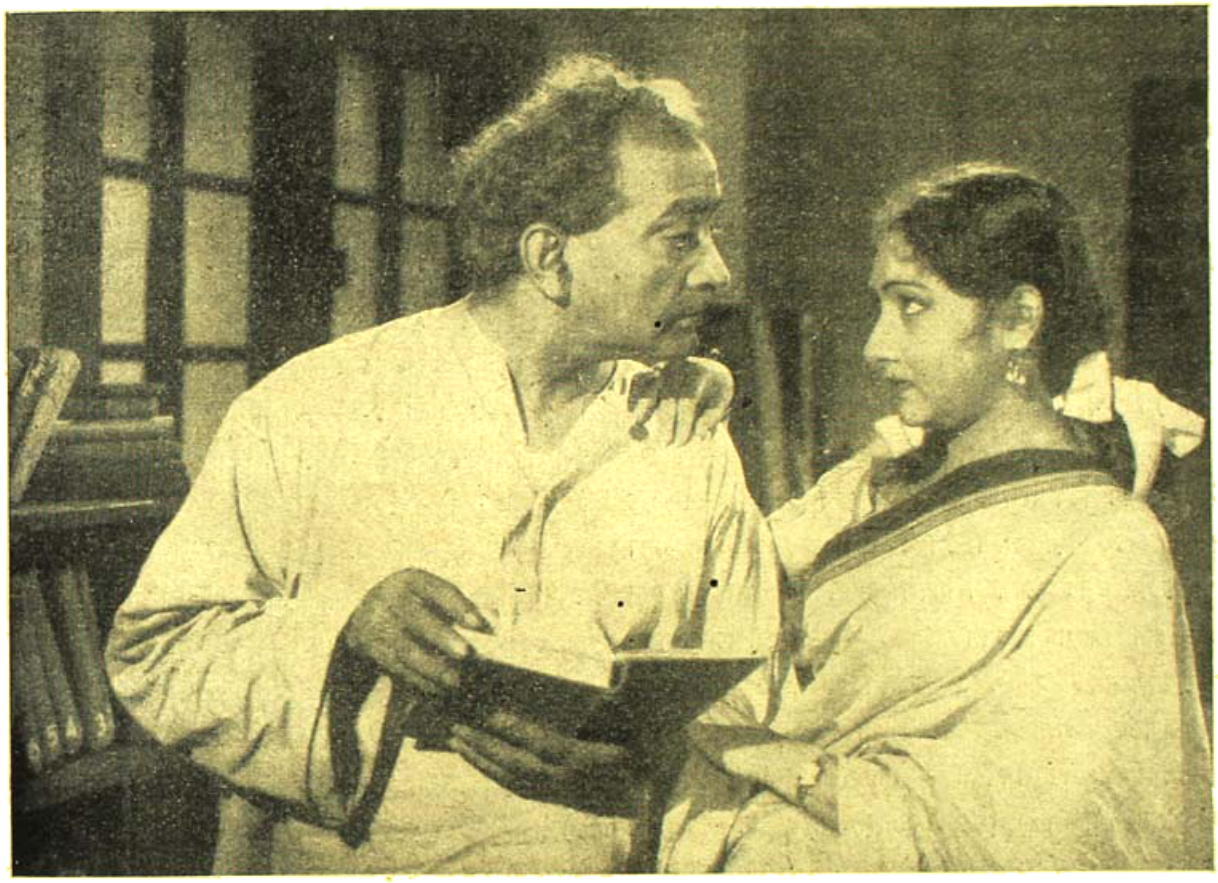

নবীনা চিত্র পরিবেশিত "অনুরাগ" চিত্রের একটি নাটকীয় মুহূর্তে পাহাড়ী সান্যাল ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়ের দিক থেকে সব চরিত্রগুলিই যে সু-অভিনীত হয়েছে একথা বলা চলে। বিশেষ করে অরুণার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় বেশ উচ্চস্তরের হয়েছে। বরুণের ভগ্নীর ভূমিকায় নবাগতা সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় দেখে মনে হয় তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বরুণের পিতার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও মাতার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর সঙ্গীতে তবলার বোলে বরুণের ঘরের রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করার অপূর্ব্ব দক্ষতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শ্রীসুশীল মজুমদারের কৃতিত্বও কম নয়। তাঁর পরিচালনাগুণেই চিত্রটি এরূপ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তাঁকে এবং প্রযোজক শ্রীমজিত নাগকে এরূপ চিত্র নির্ম্মাণের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

তবে "মর্ম্মবাণী" চিত্রটি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে একথা বলা ঠিক হবে না। এর ত্রুটি বিচ্যুতিও আছে অনেক। প্রথম আরম্ভটাই মনকে চিত্রের ওপর কিছুটা বিরূপ করে তোলে। নায়িকা অরুণার বিয়ের রাতের ঘটনা দিয়েই ছবিটির আরম্ভ। কিন্তু কেমন যেন সাধারণ সাধারণ কথা-বার্ত্তা, চলাফেরা—যেন ষ্টেজ এ্যাক্টিং হচ্ছে। তার ওপর অরুণার বান্ধবীদের ন্যাকামিভরা কথাবার্ত্তা, হৈ-হল্লোড় ও অকারণ অতিরিক্ত হাসাহাসির দাপটে প্রথম দিকটায় মনে হয় আর একটি অতি সাধারণ ছ্যাবলামীভরা ছবির সূত্রপাত হচ্ছে। পরে অবশ্য সে ভাবটা কেটে যায় অরুণার শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পর থেকে। বোধ হয় হাসিকান্নার কন্ট্রাষ্ট দেখাতে গিয়ে এইটি ঘটেছে; কিন্তু এখানে এই কন্ট্রাষ্ট ছবির প্রধান ভাবকে ব্যাহত করেছে। অরুণার বান্ধবীদের হাল্কা কথাবার্ত্তাগুলা বাদ দিলেই ভাল হত, আর ছবিটির আরম্ভও অন্যভাবে করা চলত। যেমন—অরুণা বিয়ের পরদিন শ্বশুর বাড়ীতে আসছে স্বামীর সঙ্গে মোটরে করে। (সেই সঙ্গে কাটিং ইত্যাদিও চলমান মোটরের সঙ্গে দেখান চলে)। গাড়ী এসে শক্তিগড়ে অরুণার শ্বশুর বাড়ীতে দাঁড়াল এবং ঘটনাগুলা ঘটে যেতে লাগল। তারপর স্তম্ভিত অরুণা যখন বসে বসে ভাবছে তখন ফ্ল্যাস্ ব্যাক্ করে গত রাত্রের বিয়ে বাড়ীর ঘটনাগুলা দেখান চলত। ছবির প্রথম আরম্ভটার ওপর এমনই পরিচালকরা বিশেষ মনোযোগ দেন, না—এটা ঠিক নয়। প্রথম আরম্ভটা ইম্প্রেসিভ্ হলে দর্শক-মনকে অনেকটা ভয় করে ফেলে। আরম্ভের মৌলিকতা পরিচালকের প্রগতিশীল মনের পরিচয়ও বহন করে,—এ বিষয়ে পরিচালকদের সজাগ থাকা উচিত। ছবিটি এমনিতেই অতিরিক্ত সিরিয়াস্‌নেস্ ও সাস্‌পেন্স ভারাক্রান্ত হয়েছেন সারাক্ষণ দর্শকমনকে চেপে রাখে। তার ওপর মাঝে মাঝে অযথা সাস্‌পেন্সের সৃষ্টি করাও উচিত হয়নি। যেমন, অরুণা যখন বরুণের ব্রেন্ অপারেশনের খবর পেয়ে ট্যাক্সি করে কলিকাতা থেকে শক্তিগড়ে যাচ্ছে তখন রাস্তায় গাড়ী বিকল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখিয়ে অহেতুক সাস্‌পেন্সের সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ অরুণার যাওয়া না যাওয়ার ওপর বিকৃত মস্তিষ্ক বরুণের জীবন নির্ভর করছিল না। বরুণের জীবন রক্ষা পাওয়া বা আরোগ্য হওয়া নির্ভর করছিল অস্ত্রোপচারের সাফল্য-অসাফল্যের ওপরই। দ্রুতগামী ট্যাক্সির আওয়াজও অতিরিক্ত হয়ে কর্ণপীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। মোটরের ইঞ্জিনের আওয়াজ ওরকম অস্বাভাবিক করা উচিত হয় নি। এ সব ছাড়া ছবিটির মূল উদ্দেশ্যটিও খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। একটি পারিবারিক সমস্যা—বিকৃত মস্তিষ্ক স্বামীকে ছেড়ে আসা উচিত কি স্বামীর কাছে থাকা উচিত—এই সমস্যার প্রতি একটা ইঙ্গিত আছে বটে কিন্তু সমাধানটি খুব স্পষ্ট নয়। অরুণার স্বামীর কাছে থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভর করছিল না বরুণের আরোগ্য হওয়া—সেটা নির্ভর করছিল সুচিকিৎসার ওপর, আর এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বরুণের মার অন্ধ মাতৃ-স্নেহ—যে স্নেহ সন্তানকে পাগল বলে, বিকৃত মস্তিষ্ক বলে বোঝবার সাধারণ জ্ঞানটুকুও হরণ করে রেখেছিল, আর তাই উন্মাদ আশ্রমের দক্ষ চিকিৎসার সুযোগ লাভ করা তার হয়ে উঠছিল না। শেষে যখন বাধ্য হয়ে বরুণকে সেখানে পাঠাতে হল ও সর্ব্বশেষে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হল তখনই সে আরোগ্য লাভ করল। তার স্ত্রীর তার কাছে থাকা না থাকার ওপর তার আরোগ্য হওয়া নির্ভর করে নি। বরঞ্চ অরুণা থেকে তার স্বামীর পাগলামীকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল আর নিজেও পাগল হতে যাচ্ছিল। তার চলে আসাটাই উচিত হয়েছে, আর ফিরে যাওয়াটাও মধুর হয়েছে। এরকম ঘটনাবহুল চিত্রে ঘটনাই হয় প্রধান, তাই তার অন্তর্নিহিত পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি না করাই ভাল। যাই হোক—অভিনয়, পরিচালনা, আবহ সঙ্গীত, চিত্র গ্রহণ, ঘটনাবাহুল্য প্রভৃতি সব দিক দিয়েই এই চিত্রটি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে,—আমরা চিত্রটির শিল্পী গোষ্ঠীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* *

প্রবন্ধাখবর ঃ

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রাজ্য সভায় জানিয়েছেন যে কাঁচা ফিল্ম আমদানী কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে চলচ্চিত্র শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক নয়; কারণ যে পরিমাণ ফিল্ম আমদানী করা হচ্ছে তা সিনেমা শিল্পের চাহিদা মেটাবার পক্ষে

পর্য্যাপ্ত বলেই তিনি মনে করেন। তা ছাড়া চলতি লাইসেন্সিং সময়ে সরকার ১১২ কোটি ফিট্ ফিল্ম আমদানীর ব্যবস্থা করেছেন। সিনেমা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব মত প্রায় ৯০ থেকে ৯৪ কোটি ফিট্ ফিল্ম লাগে। বাণিজ্য ও শিল্প উপ-মন্ত্রী শ্রীসতীশচন্দ্র জানিয়েছেন যে মাদ্রাজকে এখন শতকরা ত্রিশভাগ ফিল্ম দেওয়া হচ্ছে এবং বোম্বাই ও কলিকাতা যথাক্রমে পঞ্চাশ ও এগার ভাগ করে পাচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতে কাঁচা ফিল্ম তৈরীর একটি কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলছে।

• • •

ভারত-জাপান মিলিত প্রচেষ্টায় একটি চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ হবে বলে জানা গেছে। জাপানের মোশান্ পিক্চার এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ সিরো কিদো মাদ্রাজের এ, ভি, এম্, ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী শ্রী এ, ভি, মৈয়াপ্পানের সহযোগিতায় দক্ষিণ ভারতে একটি চিত্র নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেছেন। দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই, রামেশ্বরম, ব্যাঙ্গালোর, মাইশোর প্রভৃতি স্থানে এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।

• • • •

রিচার্ড ম্যাসন-এর বিখ্যাত গল্প "The Wind Cannot Read" অবলম্বনে যে ব্রিটিশ চিত্রটি ভারতে তোলা হবে তাতে আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লাল কেল্লা, এক মহারাজার বিশাল প্রাসাদ, জয়পুরের বহু পুরাতন ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখান হবে। Dirk Bogarde ও Yoko Tani এই চিত্রে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

• • • •

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিচারক" গল্পটি প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চিত্ররূপ লাভ করছে। উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকায় আছেন। এই চিত্রের একটি নতুনত্ব হচ্ছে জলের তলের চিত্রগ্রহণ, আর এতে দেখা যাবে বিগত দিনের বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্লকুমার বোষকে। পরিচালক মুখোপাধ্যায় মাদ্রাজ গেছেন জলতলের চিত্রগ্রহণের জন্য। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ।

পরিচালক সুশীল মজুমদার "আর্ট এণ্ড কালচার পিক্‌চার্স"-এর নতুন চিত্র "অগ্নিসম্ভবা"-র কাজে ব্যস্ত আছেন। ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

হিতেন বোস প্রভাকৃসন্সের প্রথম চিত্র "দেবর্ষি নারদের সংসার"-এর চিত্রগ্রহণ চলছে। চিত্রটির গল্পাংশ লিখেছেন "নবরত্ন" এবং পরিচালনা করছেন "পঞ্চভূত"। ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, নৃপতি, নবদ্বীপ প্রভৃতিকে এতে দেখা যাবে।

শঙ্করের পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প "কত অজানারে"-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন 'মিত্রা প্রডাকৃসন্স'। পরিচালনা করবেন শুধিক ঘটক এবং সঙ্গীত রচনার ভার নিয়েছেন সলিল চৌধুরী।

• • • •

হাওড়ার "বঙ্গবাসী" সিনেমার বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবে বহু সিনেমা শিল্পী ও গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল। সিনেমার ম্যানেজিং-ডিরেক্টার শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতারা অভ্যাগতজনকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন।

• • • •

লিটল্ থিয়েটার দল তাঁদের তৃতীয় নাটক-উৎসব সুসম্পন্ন করেছেন। এঁদের অভিনীত নাটকের মধ্যে বাংলা ভাষায় অভিনীত সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' ও 'ওথেলো' এবং 'নীচের মহল' ও উৎপল দত্ত রচিত 'ছায়ানট' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। আমরা "লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ্"-কে তাঁদের অভিনয় প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২২৭ (আর কানহাই ৬৬, স্মিথ ৬২ ; সুভাষ গুপ্তে ৬৬ রাণে ৪ উইকেট)

ও ৩২৩ (সোবার্স নট আউট ১৪১, স্মিথ ৪৮, বুচার নট আউট ৬৪)

ভারতবর্ষ : ১৫২ (উমরীগড় ৫১, রামচাঁদ ৪৮ ; গিলক্রাইষ্ট ৩৯ রাণে ৪, হল ৩৫ রাণে ৩ উইকেট)

ও ২৮৯ (৫ উইকেটে। পঙ্কজ রায় ৯০, রামচাঁদ নট আউট ৬৭)

খেলা হয় ২৮, ২৯, ৩০শে নভেম্বর, ২, ৩রা ডিসেম্বর।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। দশ বছর আগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় এবং পঞ্চম টেষ্ট খেলা বোম্বাইয়ের এই ব্রাবোর্ন ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এবং দুটি টেষ্ট খেলাই ড্র যায়। বেশ কিছুদিন বোম্বাই সম্বন্ধে একটা প্রবাদ চালু চলছিল, এখানে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় না।

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলার হিসাব মিলে দেখা যায়, ১৯৩৩ সালে জার্ডিনের অধিনায়কত্বে ইংলণ্ড দল ৯ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ; ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষ ১০ উইকেটে পাকিস্থানকে পরাজিত করে এবং ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষ নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত।

এ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে ৬টি টেষ্ট খেলা হয়েছে ; ৩টি খেলা ড্র গেছে, ৩টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক গোলাম আমেদ অসুস্থতার দরুণ প্রথম টেষ্ট খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। পলি উমরীগড় ভারতীয়দল পরিচালনা করেন। টসে জিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা করে। দলের মাত্র ২ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম উইকেট পড়ে যায় ; হাণ্ট গোল্লা ক'রে আউট হ'ন। লাঞ্চের সময় সময় দেখা গেল ৩টে উইকেট পড়ে ৭১ রাণ উঠেছে। চা-পানের বিরতির সময় ৪টে উইকেট পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১৫৪ রাণ দাঁড়ায়। ২২৭ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। কানহাই এবং কোলী স্মিথের যথাক্রমে ৬৬ ও ৬২ রাণের দরুণই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল শোচনীয় অবস্থা থেকে এ মাত্রা রক্ষা পেয়ে যায়।

২য় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫২ রাণে শেষ হয়। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৭৫ রাণে অগ্রগামী হয়। ভারতীয় দলের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পেস বোলার গিলক্রাইষ্ট এবং হল। দলের কোন রাণ হবার আগেই নরী কন্‌ট্রাক্টার আউট হন। ভারতবর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত যদি না কোলীস্মিথ তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে রামচাঁদের ক্যাচটা হাতছাড়া না করতেন। রামচাঁদের রাণ তখন ছিল মাত্র ৩। ভারতীয় দলের মোট ১৫২ রাণের মধ্যে উমরীগড় এবং রামচাঁদের ৫ম উইকেটের জুটিতে ভারতবর্ষের ৮০ রাণ ওঠে। এঁরা দুজন দলের পতনের মুখে অতি ধৈর্য্যের সঙ্গে খেলেছিলেন।

৩য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ২য় ইনিংসের খেলায় ৪ উইকেট হারিয়ে ২৭৩ রাণ করে। সোবার্স ৯৫ রাণ এবং বুচার ৪১ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। এই দিনের খেলায় সুভাষ গুপ্তের বলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কানহাই আউট হ'লে সুভাষ গুপ্তে টেষ্ট খেলায় ১০০ শত উইকেট লাভ করার গৌরব লাভ করেন। এই শত উইকেট পেতে তাঁকে ২২টি টেষ্ট ম্যাচ খেলতে হয়েছে এবং এই ২২টি টেষ্ট খেলায় তিনি মোট উইকেট পেয়েছেন ১০২টি।

সুভাষ গুপ্তে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলেন—ইংলণ্ডের বিপক্ষে (ক'লকাতায় ৩য় টেষ্ট ১৯৫১ সালের ৩১ ডিসেম্বর)।

৩য় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

৩২৮ রাণে এগিয়ে আছে, হাতে জমা ৬টা উইকেট। খেলা শেষ হ'তে পুরো দু'দিন বাকী।

৪র্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দল ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড ক'রে দেয়—রাণ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৩২৩।

ভারতবর্ষ ২ উইকেট হারিয়ে ২য় ইনিংসের খেলায় ১১৭ রাণ করে। রায় ৭৪ রাণ এবং মঞ্জরেকার ১৭ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

৫ম দিন খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দল ভারতীয় দলকে আউট করতে না পারায় প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারতীয় দলের রাণ দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ২৮৯। পঙ্কজ রায় দলের সর্ব্বোচ্চ ৯০ রাণ করেন। রামচাঁদ ৬৭ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

২য় টেষ্ট, কানপুর ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭ই ডিসেম্বর।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২২২ (আলেকজাণ্ডার ৭০ ; সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৯ উইকেট)।

ও **৪৪৩** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোবার্স ১৯৮, সলোমন ৮৬, বুচার ৬৯)

ভারতবর্ষ ঃ ২২২ (উমরীগড় ৭১, রায় ৪৬ ; হল ৫০ রানে ৬ উইকেট)

ও **২৪০** (পি রায় ৪৫, কনট্রাক্টর ৫০ ; হল ৭৬ রানে ৪ এবং টেলর ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

কানপুরে ম্যাটিং উইকেটে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

১মদিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ২২২ রানে শেষ হয়। কোন উইকেট না পড়ে ভারতবর্ষের ২৪ রান ওঠে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসে সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৯টি উইকেট পান। তিনি ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম বোলার হিসাবে টেষ্ট ক্রিকেট খেলার এক ইনিংসে ৯টি উইকেট পেলেন। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় এক ইনিংসে ৯টি উইকেট পাওয়া এক দুর্লভ সম্মান। এ পর্য্যন্ত মাত্র এই ৬ জন খেলোয়াড় টেষ্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে ৯টি উইকেট পেয়েছেন :

(১) হিউ টেফিল্ড (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১৩১ রানে ৯টি উইকেট : (২) জিম লেকার (ইংলণ্ড) ৫৩ রানে ১০টি উইকেট ; (৩) জি এ লোম্যান (ইংলণ্ড) ২৮ রানে ৯ উইকেট ; (৪) এস এফ বার্ণেস (ইংলণ্ড) ১০৩ রানে ৯টি উইকেট ; (৫) এ, এ, মেইলী (অষ্ট্রেলিয়া) ১২১ রানে ৯ উইকেট ; (৬) সুভাষ গুপ্তে (ভারতবর্ষ) ১০২ রানে ৯টি উইকেট।

২য় দিনে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে গিয়ে রান দাঁড়ায় ২০৯।

৩য় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২২২ রানে শেষ হয়। ৩য় দিনে ৪৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের বাকি ৫টা উইকেটে মাত্র ১৩ রান ওঠে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হল ৫০ রানে ৬টা উইকেট পান। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পড়ে ২৬১ রান ওঠে। সোবার্স ১৩৬ রান করে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৭ উইকেটে ৪৪৩ রান উঠলে পর তারা ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে।

ভারতবর্ষের কোন উইকেট না পড়ে ৭৬ রান ওঠে। ফলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ৩৬৮ রান প্রয়োজন হয়, হাতে সময় ৩৩০ মিনিট।

৫ম দিনে অর্থাৎ খেলার শেষদিনে চা-পানের ঠিক ১২ মিনিট পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪০ রানে শেষ হয়ে যায়। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে জয়ী হয়।

সাঁতারু অনুরাধা গুহঠাকুরতা ঃ

কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সন্তরণ

কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা

প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোকে দূরত্বপথ ১ মিঃ ৩৬.৩ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নতুন ভারতীয় এবং রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সাহিত্য সংবাদ

বাঘের লুকোচুরি : ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় শুধু সুলেখক ও নিভীক শিকারীহিসাবে নহেন, সাহিত্যিকরূপেও শিকারকেন্দ্রকে অবিকার করিয়া লইয়াছেন। শিকারকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মনে যে আশা-নিরাশা, যে উৎসাহ-অবসাদ, বিশেষতঃ কৌতূহল ও কৌতুকরসের যে একটা সেমান আদান-প্রদানের সৃষ্টি হয়, সেই মানবিক ভাবের আদান-প্রদানের উপরেই তাঁহার অপ্রতিহত সাহিত্যিক শিকার-নক প্রতিষ্ঠিত। এই হাস্য-পরিহাসপূর্ণ, মানবিক আবেগে লক্ষিত আবেষ্টনীর মধ্যে যে আসিয়া পড়ে, শুধু বাঘ মহাশয় নহেন, সেই বাঘি মহাশয়ও তাঁহার লক্ষ্যভেদের বস্তু। "টমি", "বড়দা", "মানের বহরে বাঘের" সংবাদদাতা জহলাল, কলির ভীম ভৌমেকী, বক্স, বড়দাদী, হস্তীনাসুর অবলম্বনে যোদ্ধুলামান, ব্যাঘ্রভীত রাহুপ্রবর, নিরোহ পাইড বেঁটে নির্দোষ, বৈকব বাবু, যা হতাশ বাবু, সকলে মিলিয়া এমন একটি উপভোগ্য বহলিপ গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে বাঘ শিকারটা গৌণ পর্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। পাঠকের মনোযোগ বাঘা-বুলেট ও বন্দুকের বুলেটের মধ্যে যেন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। আমাদের রঙ্গমঞ্চের মেলোড্রামার যেমন নাটকের উপসংহার অপেক্ষা উহার আয়োজন পর্ব আরও চিত্তাকর্ষক, এই শিকার-কাহিনীতেও তাহাই। মানবিক মেলোড্রামার নাটক ও আরণ্য মেলোড্রামার নাটক ব্যাঘের উপসংহার এক মুহূর্তের সংঘাতের মধ্যেই নিঃশেষ—আকস্মিক পতন ও মৃত্যু উভয়েরই সমাটিনিধি। ট্রাজেডির নায়কের মত বাঘ মরিবে, তাহা আমরা পূর্ব হইতেই জানি—সুতরাং এই পূর্ব-নির্ধারিত এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভিভূত হই না। কিন্তু এই অপরিহার্য পরিণামের ছোড়-ছোড়টাই আমাদের মনে বিশেষভাবে রসোদ্দীপক। তা ছাড়া এই বইখানিতে বাঘের জীবন-তত্ত্বের অনেক-খানি রহস্য আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। বাঘ-মহারাজের খেয়াল-খেয়াল তাঁহার অভ্যাস-আচরণ, বিভিন্ন পরিবেশে তাঁহার বিচরণ পদ্ধতির পার্থক্য, মানব সমাজের সহিত তাঁহার ভানক-ভগিনীপতি সম্বন্ধ (কে কোন অংশ অভিনয় করে তাহা পাঠকই অনুমান করিবেন) ভূমিষ্ঠ হওয়ার রক্ত-সম্পর্ক, এ সবই ইঙ্গিতের ঝলকে, বাচন-ভঙ্গীর তুলিহাতে উপভোগ্যভাবে ফুটিয়াছে। মোট কথা, বইখানিতে 'ব্যাঘো-ঢাকা' নামে এক নূতন ভৌগোলিক ভূখণ্ড আবিষ্কারের খবর পাওয়া যায়। জানিনা এই ব্যাঘ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষমতা কাহার হাতে ন্যস্ত আছে; আমার হাতে থাকিলে আমি নিশ্চয়ই লেখককেই ঐ সম্মানে-বিপদে মাথামাথি সঙ্গে নিয়োগের রাজটিকা পরাইতাম। আমরা ইহার সম্বন্ধে একেবারে অব্যবসায়ী—এক বইয়ের জঙ্গল ছাড়া আর কোন জঙ্গল খাটি না। সুতরাং তাঁহার শিকার-অভিযানে এক মানস-সঙ্গী হওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। সময় সময় দুঃখ অপেক্ষা ভোগের স্বাদই স্বাদুতর। আমি সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে তিনি এইরূপ শিকার-অভিজ্ঞতায় সরস বর্ণনা লিখিয়া আমাদের রসনাকে এইরূপ পরোক্ষ স্বাদুতায় পরিতৃপ্ত করিবেন।

[প্রকাশক :—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। মূল্য—দুই টাকা]

শ্রীহরিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন : শ্রীতারাপদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের নবজাগৃতির পিতা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যত অধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। লেখক পণ্ডিত-ব্যক্তি—বহু গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার ফলে রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে ধারণা হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় ঠিকই লিখিয়াছেন—"রামমোহনের প্রতি লেখকের আন্তরিক দরদ গ্রন্থ-খানিকে সরস করিয়াছে। বাংলাদেশের এই বীর রাজার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও তেজস্বিতায় নিকট সে যুগের গর্বিত শাসকশ্রেণিকেও মাথা নত করিতে হইত।" বইখানির ভাষা সাবলীল—গল্পের মত। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ করা যায় না।

[প্রাপ্তিস্থান—গ্রীডার্স কর্ণার, ৪ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ মূল্য—একটাকা ১৪ নয়া পয়সা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাতটী তারা : শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত

আলোচ্য গ্রন্থে সাতটি ছোট গল্প আছে, তার মধ্যে ছয়টি সংহতি সচিত্র ভারত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারভাবে গল্প বলার ভঙ্গিমা লক্ষ্য করা গেল। সাতটী গল্পের মধ্যে বাপ্পুটি বিশেষভাবে মনে রেখাপাত করেছে, তাছাড়া বিদায়ের গল্পের অমিত ও এলার অবৈধ প্রেমের মর্মান্তিক পরিণতি, পাগল বৌদির জীবনকাহিনী উপভোগ্য হয়েছে। অন্যান্য গল্পগুলি মন্দ নয়। গল্পগুলি পড়ে গ্রন্থকারের আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করা গেল।

[প্রকাশক—সংহতি প্রকাশনী, ২০৩২ বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬]

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মনের মানুষ : শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক সৌম্যেন্দ্রমোহন তাঁর এ উপন্যাসে দুই জোড়া দম্পতির জীবনের দুঃখ-কষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে কাহিনীর ইন্দ্র-জাল রচনা করেছেন। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের শ্রীতিপ্রেম ভালোবাসা গড়ে উঠতে পারে না। অসীম আত্মত্যাগের দ্বারা যে কবিকার মত স্ত্রীরা অশান্তির ধূ ধূ বালুচরে ও শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন লেখকের শক্তিশালী কলম তা প্রত্যক্ষ করেছে। এ উপন্যাসের আদর অবশ্যম্ভাবী।

[প্রকাশক—অক্ষর লাইব্রেরী। ৩বং পরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—দুই টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

মাঘ—১৩৬৫

লেখ-সূচী

১। সাহিত্য মীমাংসার আনন্দবর্ধন (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য ১২৯
২। ডুইরেংপার মেলা (গল্প)
প্রশান্ত চৌধুরী ১৩২
৩। চির বিচ্ছেদের পরে (কবিতা)
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ১৩৭
৪। কলহনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ১৩৮
৫। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১৪২

চিত্র-সূচী

১। শ্যামলাল পরাক বক্তৃতা দিচ্ছেন, ২। ফটোগ্রাফদের বাজার, ৩। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির জলসা, ৪। বন্দী গোলাম মহম্মদ, ৫। কাশ্মীরের বাজনা, ৬। নবনীতা দেব, ৭। কার্টুন, ৮। গেস্টাকলারে রঞ্জিত "নৌকাবিলাস" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুবল ও বৃন্দার ভূমিকায় অরুণকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ৯। শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। মীরা ও তাঁর রাশিয়ার বন্ধু নীনা।

লেখ-সূচী

৬। শেষ রক্ষা (নাটিকা)
শ্রীগোপী ভট্টাচার্য
৭। আমাদের যুগ ও আলঙ্কের যুগ (প্রবন্ধ)
শ্রীঅবনীনাথ রায় ... ১৫৩
৮। আকাশ পথে (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ১৫৫
৯। পূজারিণী (কবিতা)
শ্রীলাবণ্য পালিত ১৫৭
১০। সহানুভূতি (গল্প)
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৫৮
১১। মানবতার সাগর-সঙ্গমে সুইডেনে আর সোবিয়েতে (ভ্রমণ কাহিনী)
শচীন সেনগুপ্ত ... ১৬০
১২। ধর্মে স্বাতন্ত্র্য ও ভারতের (প্রবন্ধ)
শ্রীনলাটবরবর্মা ১৬৫

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র
ওজন
বিশেষ চিত্র
ঝরা পাতা ও সিক্ত কেশা

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

ছাত্র-সংসদি—লব্ধকীর্তি অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিণত বয়সের লেখনী-নিঃসৃত

নব-পরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য
ছাত্র সংস্করণ ২·০০, গ্রন্থাগার সংস্করণ ২·৫০ ন. প.

•

সুবিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের অনন্যসাধারণ সাহিত্য আলোচনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

অভিনব পঞ্চম সংস্করণ ৮·০০

প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
পরিবেশক : জেনারেল বুকষ্টল
এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

একবার কানে কানে বল ভালবাসি

এই গানের সুরজালে প্রতিটি দর্শক বিমোহিত।

উচ্ছ্বসিত এর কাহিনী বিন্যাসে ও অভিনয়ে।

প্রতিটি দর্শক ও সমালোচক বলেছেন :

অপূর্ব—পরিচ্ছন্ন

•
•
•
•

অরুণকুমার · নির্মল কুমার
জন্মান্তর
শ্রী · প্রাচী · ইন্দিরা

•

লেখ-সূচী

১৩। বৈমেদিকী—শ্রীঅতুল দত্ত ১৬৭
১৪। ক্রিস্‌টোফারসন্ (অনুবাদ-সাহিত্য)
শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭০
১৫। অলৌকিক (কবিতা)
শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় ১৮২
১৬। কি ভাবে স্মৃতিশক্তি লাভ করা যায় (কিশোর জগৎ)
উপানন্দ ১৮৪
১৭। গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প (কিশোর জগৎ)
বীরু চট্টোপাধ্যায় ... ১৮৮
১৮। ঘাস (কবিতা—কিশোর জগৎ)
শ্রীসুধীরকুমার রায় ১৯১
১৯। অচেনা মুখ (গল্প—কিশোর জগৎ)
প্রশান্ত মৈত্র ... ১৯১
২০। ভয় দেখানোর গল্প (গল্প—কিশোর জগৎ)
অশোক মুখোপাধ্যায় ১৯২
২১। কথা-সংগীত—
কথা ও সুর ॥ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য
স্বরলিপি ॥ কল্যাণী দেবী
২২। বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য (প্রবন্ধ)
শ্রীতারকচন্দ্র রায়
২৩। মা (গল্প)
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৪। বিভূতিভূষণের কথাশিল্প (আলোচনা)
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২০৩
২৫। হোতোনা দিগ্‌ভ্রান্ত (কবিতা)
সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ... ২১০

সদ্য প্রকাশিত

॥ ভিক্তর হুগোর অমর উপন্যাস ॥

লে মিজেরাবল

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ কর্তৃক সারানুবাদ

অন্যায় নীতিকথা, অন্যায় ধর্মগ্রন্থ মানুষকে যে মহত্বে প্রলোভিত করতে না পারে, এই উপন্যাসখানি তা সাধন করবার ধারণা রাখে ব'লেই তার এই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি। দাম ৩০০

॥ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ॥

শৃঙ্খলিতা

শৃঙ্খলিতা গোরার মুঘলযোদ্ধে ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে যে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম ও রোমাঞ্চ লুকায়িত ছিল, লেখকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তা এই উপন্যাসে জলন্ত হয়ে উঠেছে। দাম ৩৫০

এই লেখকের

দুটি সরস নাটক

আমমধুর ও প্রজাপতি

সমাজ জীবনের পটভূমিকায় রচিত, অনাবিল হাস্য-কৌতুকে ভরা এই নাটিকা দু'খানি যুগপৎ অভিনয় ও পাঠের উপযোগী। দাম ২০০

এ মাসেই বেরুবে

॥ এমিল জোলার বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস ॥

থেরেসা

অখিলচন্দ্র ঘোষাল অনূদিত

এই উপন্যাসে আছে মানুষের মৌলিক রিপুগুলির সঙ্গে বাইরের জগতের দুর্ধর্ষ সংঘাতের ভয়ঙ্করতা ও নাটকীয়তা। ফরাসী উপন্যাস-সাহিত্যে এমন চিত্ত-চাঞ্চল্যকর কাহিনী খুব কমই আছে। দাম ৪০০

এই লেখকের

মহাভারতের গল্প

সুসংবদ্ধ গল্পের মাধ্যমে মহাভারতের মূল আখ্যায়িকার বর্ণনায় অভিনবত্ব লেখকের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বহু চিত্র শোভিত। দাম ৪০০

॥ বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥

প্রেমের গল্প

খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের লেখা প্রেমের গল্পের এরূপ বিরাট সংকলন এই প্রথম। লেখকদের চিত্রসহ জীবনী। দাম ৭০০

বীডার্স কর্নার ৪৪ ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

লেখ-সূচী

২৬। উদয় অস্ত (উপন্যাস)—বনফুল ২১১
২৭। 'সোনার তরী' আধ্যাত্মিকতা (প্রবন্ধ)
শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ২১৬
২৮। ভেবউদ্দিনার আত্মকাহিনী (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)
ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী ... ২১৭
২৯। রজনীর তীরে মধু তরীর বেদনা (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ২১৯
৩০। ছিন্নবাধা (উপন্যাস)—সমরেশ বসু ... ২২০
৩১। ছেলেরা চুরি করে কেন (মেয়েদের কথা)
সুপ্রিয়া ঠাকুর ... ২২৪
৩২। রান্নাঘর—(মেয়েদের কথা)—আভারাণী দেবী ২২৭
৩৩। শ্রাদ্ধ বাড়ী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ২২৭
৩৪। বিদ্যালয়—পাঠাগার ও পুস্তক (প্রবন্ধ)
শ্রীনমিতা সেনগুপ্তা ... ২৩০
৩৫। আজ আমি চিনেছি আমায় (কবিতা)
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত
৩৬। লীলাভূমি (উপন্যাস)
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২৩৪
৩৭। সাময়িকী ২৩৮
৩৮। পট ও পীঠ—শ্রী'শ'— ২৪২
৩৯। 'তাঁরি নূপুর শুনি সখি মন্দিরে'
কুমারেশ ভট্টাচার্য ২৪৪
৪০। কোন মায়িকাকে (কবিতা)
দিব্যেন্দু পালিত ২৪৭
৪১। গ্রহ-জগৎ (জ্যোতিষ)—উপাধ্যায় ২৪৮
৪২। খেলা-ধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ২৫৩
৪৩। সাহিত্য সংবাদ ২৫৪
৪৪। নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী ২৫৬

লেখ-সূচী

—সর্বজন-চিত্ত-বিমোহন-কথাশিল্পী—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

॥ উকিলের ডায়েরি ॥

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা

সহরের ফৌজদারী কোর্ট—শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' মানব চরিত্র-অধ্যয়নে প্রেসিডেন্সি কলেজ!' সেই ফৌজদারী কোর্টে চল্লিশ বৎসরকাল কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রমোহন ওকালতি-পেশায় যে তিক্ত-মধুর-কটু-কথায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেই সব মামলা-মকর্দ্দমার অজস্র কাহিনী নাটক-উপন্যাসের অপরূপ টেকনিকে তিনি এ-ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেকালের কলকাতার বর্দ্ধিষ্ণু-ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিচিত্র রসের কাহিনী-মামুলি-চালের মুখোশ খসে বাবুদের সত্য-কারের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে ডায়েরির পাতায় পাতায়।

কবি, সাহিত্যিক, জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্নি থেকে দোকানী-পশারী, চোর-বাটপাড়, সতী-অসতী নারী সকলকেই বাস্তবরূপে লেখক ডায়েরির ছায়ামুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিয়েছেন।

এ ডায়েরিতে আছে—বড় ঘরের বড় কথা, ক্ষয়িষ্ণু বোনেদী ঘরের পতনের কাহিনী—সহরের নিশাচর প্রমোদ-বিলাসীদের নৈশ লীলারঙ্গ, তাতে কত রঙের বিকিমিকি! উকিল-এটর্নির পালিশ-করা সৌজন্যের অন্তরালে উস্‌কুনির কূট-কৌশলে বোনেদী ঘরের উচ্ছেদ।

সব কাহিনীতে পাবেন পর্য্যায়ক্রমে সমাজ-ইতিহাসের বিচিত্র উপাদান।

এম, এল, দে এণ্ড কোং ঃ ১৩।১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২

কাশ্মীর প্রিন্সেস

• সদ্য প্রকাশিত •

এ, এস, কাওলিক

মিথ্যে সত্য ঘটনা নয়, নির্মম রূঢ় সত্য—এরই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কাশ্মীর প্রিন্সেস-এর অবিস্মরণীয় উপজীব্য। উপন্যাসের কুশিলবে ও বিশ্বসুন্দরীর চারুহাস কাশ্মীর প্রিন্সেস শুধু উত্তেজনাপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক নয়, অতীব সুখপাঠ্যও বটে। ৫·০০

• নতুন বই •

নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ : মনোজ বসু : ৫·০০ ॥

ব্যঙ্গ কবিতা : বনফুল : ৬·৫০ ॥

চারুদা উত্তীন : বারীন্দ্রনাথ দাশ : ৪·৫০ ॥

স্বপ্নভূমগা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩·০০ ॥

বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা : নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত : ৩·০০ ॥

• কিছু রম্যকচনা ও ভ্রমণ কাহিনী •

পঞ্চতন্ত্র : সৈয়দ মুজতবা আলী : ৩·৫০ ॥ হরেকরকমবা : নীলকণ্ঠ : ২·৫০ ॥ দুয়ার হতে অদূরে : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : ৩·৫০ ॥ ইয়োরোপা : দেবেশ দাশ : ৩·৫ ॥ সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী : সতীনাথ ভাদুড়ী : ৩·৫০ ॥ ফতেনগরের লড়াই : বিক্রমাদিত্য : ৩·০০ ॥ অমৃতকুম্ভের সন্ধানে : কালকূট : ৪·৫০ ॥ পথে পথে : পরিমল গোস্বামী : ৩·০০ ॥ বইয়ের বদলে : রঞ্জন : ২·৫০ ॥ আড্ডা : গোপাল হালদার : ২·০০ ॥ লাক্ষা যাত্রা : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় : ২·৫০ ॥

• কিছু উপন্যাস •

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচারক : ২·৫০ ॥

সপ্তপদী : ২·০০ ॥

ভরাডুবি

তামসী : ৫·০০ ॥

লৌহকপাট ১ম খণ্ড : ৩·৫০ ২য় খণ্ড : ৩·৫০ ৩য় খণ্ড : ৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শিলাবিলিপি : ৫·৫০

অসিধারা : ৩·৫০

সতীনাথ ভাদুড়ী

জাগরী : ৪·০০ ॥

অচিন রাগিণী : ৩·৫০ ॥

• নতুন সংস্করণ •

দেবতাত্মা হিমালয় | প্রবোধকুমার সান্যাল

বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি দেবতাত্মা হিমালয়-এর নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড : ৮·৫০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : ১০·০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—বারো

দুইখানি অনবদ্য উপন্যাস

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

ইস্পাতের স্বাক্ষর

দাম দশ টাকা

বারীন্দ্রনাথ দাশের

বিশাখার জন্মদিন

দাম দু টাকা পঞ্চাশ ন. প.

• অন্যান্য উপন্যাস •

সমরেশ বসু

উত্তরঙ্গ ৩·৫০

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

অতীত স্বপন ৫·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল

দুরাশার ডাক ১·৫০

রণজিৎকুমার সেন

নিশিলগ্ন ৪·৫০

প্রবোধ সরকার

অদৃশ্য মানুষ ৩·৫০

বন পাপিয়া ২·০০

ছন্নছাড়া ২·০০

অপরাজিতা দেবী

বিজয়ী ৪·৫০

বাঙলার মাটি ৬·০০

আশু চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি ৪·৫০

ধীরেন্দ্রলাল ধর

ঢেউ ২·৫০

শচীন্দ্রকুমার মিত্র

কঠিন মায়া ২·৫০

• গল্প-সঞ্চয়ন •

সমরেশ বসু

অকাল বৃষ্টি ২·৫০

মন্বন্তরের একদিন ২·৫০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রথচক্র ২·৫০

সুশীল জানা

ঘরের ঠিকানা ২·৭৫

প্রমথনাথ বিশী

নীরস গল্প-সঞ্চয়ন ৩·৫০

শচীন্দ্রকুমার মিত্র

গল্প-সঞ্চয়ন ৩·৫০

প্রমথনাথ ঘোষ

গল্প-সঞ্চয়ন ৩·৫০

সুশীল রায়

গল্প-সঞ্চয়ন ৩·৫০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গল্প-সঞ্চয়ন ৩·৫০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

গল্প-সঞ্চয়ন ৩·৫০

• অনুবাদ-সাহিত্য •

ম্যাক্সিম্ গর্কি রচিত বিশ্বসাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ

জীবন-প্রভাত ৫·০০ ॥ লেনিনের সাথে ১·৫০ ॥ তাদেরই তিনজন ৬·০০ ॥

টলস্টয়ের স্মৃতি ২·০০ ॥ ভাওন ৬·০০ ॥

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কল্পিত জীবনীয় রসায়ন। ইহা মৃতকল্পকে জীবন, ব্যাধিতকে স্বাস্থ্য, দুর্ব্বলকে বলদান করে এবং ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনাভরা মনমরা হতাশ জীবনে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দের ধারা উৎসারিত করে। ইহা সেবনে পাচকাগ্নি ও জীর্ণ শক্তি বাড়ে, যকৃৎ স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করে, অম্ল ও অরুচি দূর হয়, দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগান্তে এবং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে ইহা মন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। কঠিন রোগে ক্ষীণনাড়ী মুমূর্ষুর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া নিস্পন্দ হওয়ার উপক্রমে ইহা নূতন জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক নাড়ীর গতি আনিয়া দেয়।

পাইণ্ট—৪৲ টাকা, কোয়ার্ট—৭৷৷০ টাকা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয় ডাকা লিঃ।

হেড অফিস: ৫২।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—ভারত ও পাকিস্থানে সর্বত্র।

মালিকগণ—অধ্যক্ষ মথুরামোহন, লালমোহন ও শচীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জী চক্রবর্ত্তী

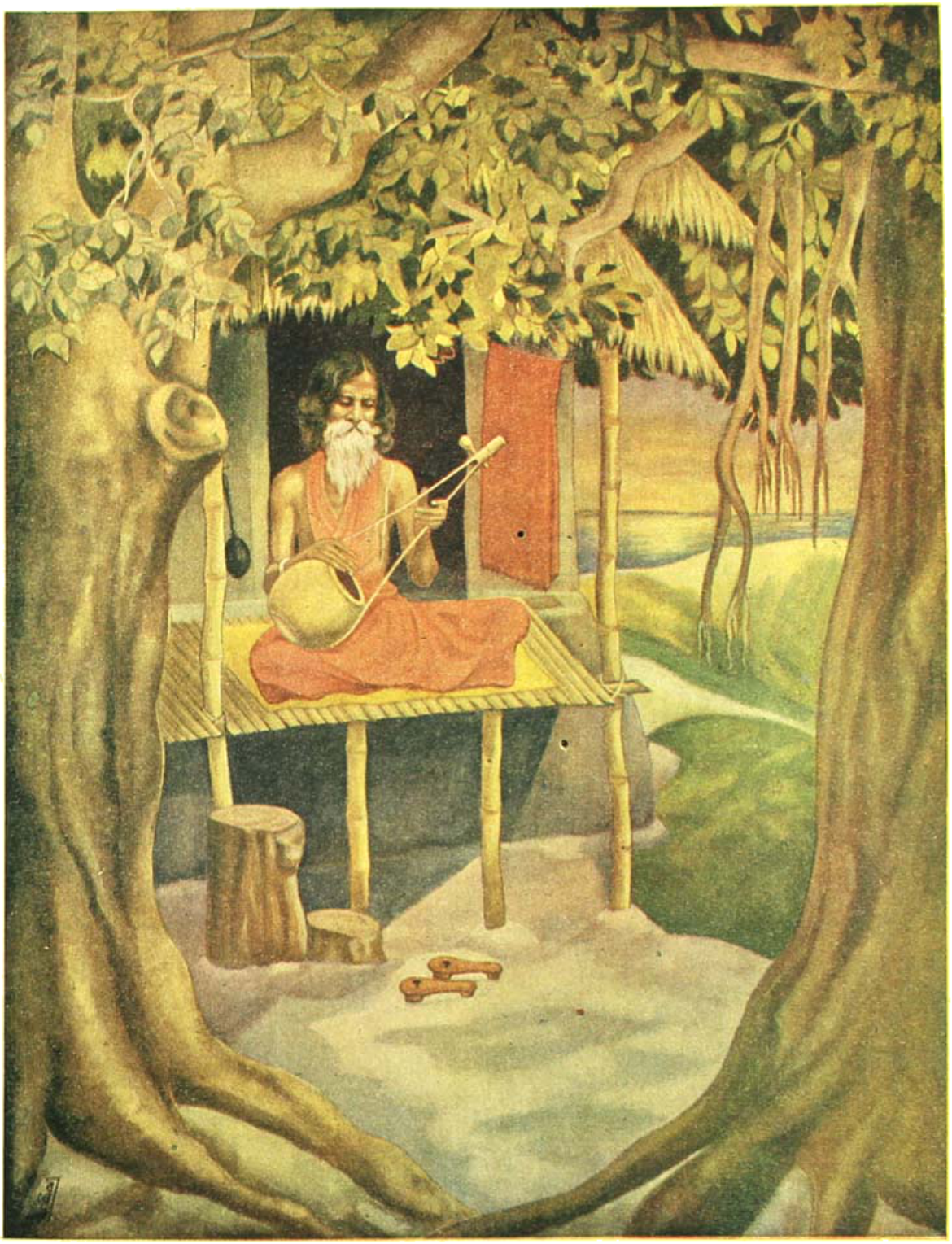

শিল্পী : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভজন ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উপন্যাসের মতো জীবন

শরৎচন্দ্রিকা । নন্দদুলাল চক্রবর্তী

এই উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং শরৎচন্দ্র। শুরু সেই দেবানন্দপুরে, যেখানে কিশোরী বীরুর তিনি স্যাঙাৎ, প্যারী-পণ্ডিতের ছাত্র, লাঠিয়াল নয়নচাঁদের ভক্ত। তারপর ভাগলপুরে, যেখানে প্রথম পরিচয় রাজেন্দ্র মজুমদার বা রাজুর সঙ্গে, একত্রে দুঃসাহসী জীবনের আস্বাদ। সেই তখন থেকে—জীবনের নানা কক্ষপথে, সাহিত্যের পথে জয়যাত্রায়, কখনো প্রেমে কখনো উপেক্ষায়, কখনো মিলনে কখনো বিচ্ছেদে, কখনো ক্লেশে কখনো বিলাসে—এই অসাধারণ নায়কের জীবনসন্ধান। আত্মজীবনের তথ্য রহস্যে আবৃত রেখেছেন শরৎচন্দ্র। বলেছেন—'আমার যা-কিছু বলবার তার সবই আছে আমার বইয়ে। এত বেশি আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা আর কারো লেখায় পাবে না। আমার বই থেকে যদি কেউ আমার জীবনের সব কথা উদ্ধার করতে না-পারে, সে আমার জীবনের কথা লিখতে পারবে না।' শরৎচন্দ্রের এই নির্দেশ সযত্নে পালন করেছেন লেখক নন্দদুলাল চক্রবর্তী। দীর্ঘ দিনের সন্ধানে বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, গবেষণা করেছেন, তারপর রসান দিয়ে পরিবেশন করেছেন 'শরৎচন্দ্রিকা'। দাম ৪·৫০

মজলিসী গল্প

শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প । গোপালচন্দ্র রায়

উৎকৃষ্ট মজলিসী মেজাজে শরৎচন্দ্র গল্প বলছেন—প্রেমের গল্প, সতীর গল্প, অসতীর গল্প, হাসির গল্প, কান্নার গল্প, ভূতের গল্প। সযত্নে সংগ্রহ করেছেন গোপালচন্দ্র রায়। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়, যিনি অল্পে সন্তুষ্ট কখনোই ছিলেন না, তাঁর অভিমত শুনুন—'গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম। শুধু গল্প নয়, গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গিতেও।···শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহার অনুপ্রেরণা আরেক ধরনের, তাহাতে ভাবের সংক্রামতা আরো অব্যর্থ।' দাম ২·৫০

নতুন সংস্করণ

জোনাকি । লীলা মজুমদার

নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ি ফিরছিলেন ব্রজসুন্দর। ফিরবার পথে এক পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে তার ছোট্ট খুকিটিকে ব্রজসুন্দরের কোলে গছিয়ে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে মনের মধ্যে সদ্য ট্রামে দেখতে পাওয়া একটি আশ্চর্য মেয়ের স্মৃতি, এবং ভাগ্যক্রমে মেয়েটির 'মন্দিরা' নাম লেখা মনিব্যাগটি এখন তাঁর বুক পকেটে। এই ব্যাগের সূত্র ধরে কী না হতে পারে, ভাবছিলেন ব্রজসুন্দর। কিন্তু এই পরিত্যক্ত শিশুটিকে নিয়েই বা তিনি কি করেন? পাকা হাতে লেখা মিষ্টি একটি প্রেমের গল্প, যার অধিকাংশ চরিত্রই মেয়েচরিত্র। সমাজের যে-অংশে শিক্ষিত এবং মোটামুটি বিত্তবান সম্প্রদায়ের বাস, সেই অংশের নারীচরিত্রকে সকৌতুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লেখিকা পর্যবেক্ষণ করেছেন। মেয়েদের চোখ দিয়ে মেয়েদের না-দেখলে এমন অন্তরঙ্গ চরিত্রচিত্রণ এবং ঘটনার বিন্যাস সম্ভব হত না। দাম ২·২৫

বিজ্ঞানের সংস্করণ

চাঁদের পাহাড় । বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর ছেলে শংকর, দেশান্তরের হাতছানি পেয়ে পাড়ি দিল সুদূর পূর্ব-আফ্রিকায়। ডিয়েগো আলভারেজ নামে দুর্ধর্ষ এক পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষীর সঙ্গে হঠাৎ সেখানে তার দেখা। তার সঙ্গ ধরে মহাদুর্গম রিখটারসভেল্ড-পর্বতে অজ্ঞাত এক হীরের খনির সন্ধানে চলে গেল। এক অতিকায় এবং অতিক্রূর দানবরক্ষ সেই হীরের খনি আগলিয়ে থাকত। পর্যটকেরা যার নাম দিয়েছেন চাঁদের পাহাড় সেই রিখটারসভেল্ড-পর্বতে গিয়ে জীবনমৃত্যু নিয়ে শংকরকে যে রোমাঞ্চকর ছিনিমিনি খেলতে হল তার বিবরণ যে-কোনো বয়সের কল্পনাকে উত্তেজিত করবে। সচিত্র। দাম ৩·২৪

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
বালিগঞ্জে : ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

সিগনেট বুকশপ

উপন্যাস :
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস :
পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাণও পাষাণ ওরা কাজ করে

ক্রাউন—৫৲
নর-বিগ্রহ ৩॥০
জ্যোতির্ময় ৫৲
জীবন রুদ্র ৩॥০
কালরুদ্র ৪৲
মহারুদ্র ৪৲
সন্ধ্যারাগ ৪॥০
মেঘ মেদুর ৩॥০
চিতাবহ্নিমান ৪৲

ক্রাউন—৫৲
মরা নদী ৫৲
সাহিত্যিক ২॥০
রুবেন রায়
মর্ত্তের-মৃত্তিকা ৩॥০
আরক্তিম ৪৲
জাগ্রত জীবন ২৲
মুখর-মুকুর ৪৲
সরলা বসু রায়
পথ ও পাথেয় ২৲
অশোক গুহ
এক রাত্রির কাব্য ২৲

কেতকী সাহিত্য সমিতি
২৯৫ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ভক্তি-বিরহ
মিলন নিয়েই কীর্ত্তনের গীতি-বিচিত্রা!
প্রোডাকসন সিণ্ডিকেটের
নৌকা বিলাস
॥ গেভাকলারে রঞ্জিত দৃশ্যাবলীসহ ॥
রূপবাণী. অরুণা. ভারতীতে চলছে

মনোমত
সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হলে
আরতির
"রাণী রাসমণি"
শাড়ী ও ধুতি কিনুন
কাপড়কে সবদিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে তা হ'লে, দয়া করে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।
আরতি কটন মিলস্ লিঃ
কাশিমনগর, হাওড়া।

মাঘ—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-মীমাংসায় আনন্দবর্ধন

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সেকালের সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যতত্ত্বের নানা সমস্যার সমাধানে যে অপূর্ব প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা একালে পরম বিস্ময়ের বস্তু। ভরত ভামহ দণ্ডী উদ্ভট বামন রুদ্রট—এঁরা সকলেই ছিলেন সাহিত্যিক তত্ত্ববিচারে এক একটি শিক্‌পাল। এঁদের পর ধ্বনিপ্রস্থানের মহানায়ক আনন্দবর্ধনের অভ্যুদয়কাল। কাব্যরসিকদের পক্ষে সে এক অসামান্য সৌভাগ্যসময়।

আনন্দবর্ধন ছিলেন একাধারে কাব্যতত্ত্ববিচারক, কবি ও দার্শনিক। তাঁর লেখা 'ধ্বন্যালোক' এবং 'দেবীশতক' দুখানি বই ছাপা হয়ে গেছে। ধ্বন্যালোকে তাঁর রচিত আরও দুখানি বইএর নাম পাওয়া যায়—প্রাকৃত কাব্য 'বিষমবাণলীলা' আর সংস্কৃত কাব্য 'অর্জুনচরিত'। এ ছাড়া, আনন্দবর্ধন 'তত্ত্বালোক' নামে একখানি অদ্বৈত-নিবন্ধ লিখেছিলেন এবং বৌদ্ধ ন্যায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ধর্মোত্তরকৃত 'প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা'র টীকা রচনা করে-ছিলেন। এই অসাধারণ মনীষীর জীবনকথা এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় নবম শতকে কাশ্মীর দেশে অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গোণ উপাধ্যায়।

ধ্বন্যালোকের মধ্য দিয়েই আনন্দবর্ধনের গৌরবদ্যুতির

পরম প্রকাশ। একশ বারটি ধ্বনিকারিকার 'বৃত্তি' অর্থাৎ ব্যাখ্যানরূপে তিনি 'ধ্বন্যালোক' বা 'সহৃদয়ালোক' রচনা করেন। গ্রন্থের চারটি পরিচ্ছেদের নাম 'উদ্দ্যোত'। 'আলোকে'র 'উদ্দ্যোত'গুলোর সাহিত্যপথের অলি-গলি উদ্ভাসিত করে আনন্দবর্ধন সেযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিচারক বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। সাহিত্যের আসরে ধ্বনিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে আনন্দবর্ধন কার না আনন্দ বর্ধন করেছিলেন?—

ধ্বনিনাতিগভীরেণ কাব্যতত্ত্বনিবেশিনা।
আনন্দবর্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবর্ধনঃ॥

ধ্বন্যালোকের মুখ্য বক্তব্য এই যে, শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কবি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তার শব্দার্থের বহিরঙ্গে প্রাণসত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। কবিনির্মিতির আসল রূপটি ধরা পড়ে অন্তর্নিগূঢ় আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায়। উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনায় শব্দ ও অর্থ উভয়েই নিজেদের অন্তরালে রেখে আর একটি ব্যঙ্গ অর্থের প্রতীতি জন্মায়। ব্যঞ্জিত বা প্রতীয়মান অর্থ ই ধ্বনি। এটিই কাব্যের আত্মা বা সারবস্তু।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥

ধ্বনির ভেদপ্রভেদ অনেক, ধ্বননের প্রকারও নানারূপ। সাধারণত উৎকৃষ্ট সাহিত্যসন্দর্ভের বিভিন্ন অংশে বা বিভিন্ন কবিতায় পৃথক পৃথক্ অর্থ ধ্বনিত হতে দেখা যায়। কিন্তু কবিকৌশলের এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, যেখানে সমগ্র রচনাটিই অখণ্ডরূপে কোন একটি বিশিষ্ট ধ্বন্যর্থ বহন করে।

আনন্দবর্ধন যেসব ধ্বনির উদাহরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি এই—

ব্রূহি ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোঽস্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥

'হে ধার্মিক, তুমি নির্ভয়ে ব্রূহি কর, গোদাবরীতটের লতাগহনবাসী এক দুর্দম সিংহ আজ সেই কুকুরটিকে নিহত করেছে।'

কবিতাটি শোনামাত্র মনে হয় যে, ধার্মিককে যথেচ্ছ বিচরণে অভয়দানই যেন এর উদ্দেশ্য। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—ভীতি উৎপাদনই ছিল শ্লোকটির গূঢ় অভিপ্রায়। এতে কবি কৌশলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুকুরটি নিহত হলেও তার নিহন্তা 'দৃপ্তসিংহ' সেখানেই বাস করছে। প্রকৃতপক্ষে, যাতে গোদাবরী-লতাকুঞ্জের নির্জনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, যাতে সেখানে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আকস্মিক প্রবেশে গোপন মিলন ব্যাহত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই কবিতাটির সৃষ্টি। এটি হল বিচ্ছিন্ন খণ্ডধ্বনির দৃষ্টান্ত।

ধ্বন্যালোকে সামগ্রিক ধ্বনির দৃষ্টান্ত হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারত। আনন্দবর্ধনের মতে মহাভারতকার ভারত-কাহিনীর নিগূঢ় ব্যঞ্জনার মাধ্যমে এই তত্ত্বই বোঝাতে চেয়েছেন যে, পাণ্ডবাদিচরিতের মত সমস্ত সংসারবৃত্তই বিয়োগান্ত এবং অসার আড়ম্বর।

অঙ্গরূপো ব্যঙ্গ্যত্বেন বিবক্ষিতো যদত্র মহাভারতে পাণ্ডবাদিচরিতং যৎ কীর্ত্যতে তৎ সমস্ত অবসানবিরসম্ অবিদ্যাপ্রপঞ্চস্বরূপঞ্চ।

মহাকবিদের কাব্য-নাটকে সামগ্রিক ধ্বনির আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী মনীষীরা কালিদাসের শকুন্তলা নাটকেও একটা প্রতীয়মান ধ্বন্যর্থ আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে নাটকের প্রথম অংশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার স্বচ্ছন্দ মিলন ও অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে অসংযমের অমঙ্গল, আর নাটকের দ্বিতীয় অংশে সন্তাপ-শুদ্ধ বিরহোত্তর মিলনে ধ্বনিত হচ্ছে দাম্পত্য প্রণয়ের প্রসন্ন পরিণতি। শকুন্তলা নাটক সামগ্রিক ধ্বনির উদাহরণ।

আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের প্রবর্তক নন। ধ্বন্যালোকের মূল কারিকাগুলিও অনেকের মতে কোন এক পূর্বসূরির রচনা। অতি প্রাচীন যুগ থেকে ধ্বনিবাদ সম্পর্কে নানা-জনের মনে যে সব সংশয় দেখা দিয়েছিল, তা নিরসনের জন্য কারিকাকার লেখনী ধারণ করেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে বলেছেন—

কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈঃ সমাম্নাতপূর্ব-
স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।
কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্॥

'যে ধ্বনিকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করে গেছেন, একদল লোক তার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। কেউ বলেন—অলঙ্কারের মধ্যেই ধ্বনি অন্তর্ভূত হয়ে আছে; অপরে সিদ্ধান্ত করেন যে, ধ্বনি এমন এক অস্পষ্ট বস্তু, যা বাক্য দিয়ে বোঝান যায় না। তাই আমি সহৃদয় জনের প্রীতির জন্য ধ্বনির স্বরূপ বর্ণনা করছি।

দেখা যাচ্ছে, আনন্দবর্ধনের বহু পূর্বে ধ্বনিবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ মতবাদ গড়ে উঠেছিল।

আনন্দবর্ধন বলেছেন যে, যে কাব্য রসভাবাদি তাৎপর্যরহিত, যার ব্যঙ্গার্থ প্রকাশের শক্তি নেই, যা কেবল শব্দ ও অর্থের বাহ্য বৈচিত্র্য সম্বল করে রচিত হয়, তেমন কাব্যের মূল্য ছবির চেয়ে বেশী নয়। তা উত্তম কাব্যের মর্যাদা পায় না।—

রসভাবাদিতাৎপর্যরহিতং ব্যঙ্গার্থপ্রকাশনশক্তিশূন্যং চ কাব্যং কেবলবাচ্যবাচকবৈচিত্র্যমাত্রাশ্রয়েণোপনিবন্ধমাত্রেণাপ্রথ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম্। ন তদুত্থং কাব্যম্।

অবশ্য শব্দ ও অর্থ এই দুটি বস্তুই যে সাহিত্যশরীরের মূল কাঠামো, সে বিষয়ে বিসংবাদ নেই। কিন্তু রস, অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি ও ধ্বনি—এগুলির মধ্যে কোন্‌টি কবিকর্মকে সাহিত্যের শ্লাঘ্য পদবীতে পৌঁছে দেয়, তা নিয়েই মতভেদ। ধ্বনিবাদীরা রস ও বক্রোক্তির উপাদেয়তা অগ্রাহ্য করেন না। ধ্বনি যে রসের আনুকূল্যেই সহৃদয়হৃদয়কে আহ্লাদিত করে, সে কথা আনন্দবর্ধনও স্বীকার করেন। বক্রোক্তি যে ধ্বনি-কবিতার সাহচর্যে মনোহর হয়ে ওঠে, তাও তিনি মানেন। কিন্তু আনন্দবর্ধনের বিচারে অলঙ্কার ও রচনারীতি এ দুটি কাব্যসৌন্দর্যের পক্ষে নিতান্তই বহিরঙ্গ—রত্নাভরণ ও প্রসাধন বস্তুর মত বাহ্যশোভার পরিপোষক মাত্র। এরা রসিক হৃদয়ে আনন্দ জন্মাতে পারেনা। উচ্চকোটির কাব্যনির্মাণে এদের ভূমিকা একান্ত গৌণ। অবশ্য একথা সত্য যে, উজ্জ্বল রত্নকুণ্ডল, রক্তিম কুঙ্কুমবিন্দু এবং মনোহর বর্ণকরাগ যেমন কমনীয় রমণীমুখের শ্রী বৃদ্ধি করে, রীতির বিশুদ্ধি এবং অলঙ্কারের সমৃদ্ধিও তেমন কাব্যের মাধুর্য বাড়ায়। কিন্তু মুখের আসল সৌন্দর্য থাকে লাবণ্যে, কাব্যের প্রকৃত জীবন পাওয়া যায় ধ্বনিতে। আভরণ বা প্রসাধনের অভাবে যেমন লাবণ্যময় মুখ শ্রীহীন হয়না, অলঙ্কার বা রীতির দৈন্যেও তেমন ধ্বনিময় কাব্য সৌন্দর্যহীন হয় না।

আনন্দবর্ধন ছিলেন একজন পরিনিষ্ঠিত সাহিত্যসমীক্ষক। তিনি সমকালীন সাহিত্যিক সমাজের চতুর্দিকে একটা অবসাদ লক্ষ্য করেছিলেন। হয়ত তাঁর সময়ে কাব্যপদ্ধতির গতি বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতায় নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আনন্দবর্ধন তাই কবিকুলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে,

'কাব্যজগতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কবি হচ্ছেন স্বাধীন সৃষ্টিকর্তা। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, বিশ্বসংসারকে তেমন রূপ দিতে পারেন'।

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে॥

এই পুরাণ উক্তি তুলেই আনন্দবর্ধন ক্ষান্ত হয়নি। তিনি কবিপ্রতিভার সীমাহীন শক্তির উল্লেখে আরও বলেছেন—

'এমন কোন বস্তুই নেই, যাকে রসতৎপর কবি আপন ইচ্ছামত রসের রসায়নে পরম রমণীয় করে তুলতে পারেন না'।

নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্যবতঃ
কবেস্তাদিচ্ছয়া তদভিঘতরসাঙ্গতাং নাধত্তে।
তথোপনিবধ্যমানং বা চারুত্বাতিশয়ং ন পুষ্ণাতি।

এ ধরণের সূক্ষ্ম সমীক্ষণে এবং সত্য বিদগ্ধ বচনে আনন্দবর্ধন অসাধারণ।*

* কলিকাতা আকাশবাণী হইতে প্রচারিত।

তুইরেংপার মেলা

প্রশান্ত চৌধুরী

তুইরেংপা ঠাকুরের পুজো।

মাদল আর সিঙা থরথর করে কাঁপিয়ে তুলেছে বাতাসকে।

কাঁপলে সবই সুন্দর হয়। সুন্দর হয় বাতাসে-কাঁপা গাছের পাতা, নদীর জল, ধানের শিষ। সুন্দর হয় নাচনে-কাঁপা মেয়েদের আঁচল, খোঁপার ফুল, চুলের গোছা। মাদলে-কাঁপা বাতাসটাও তাই আজ সুন্দর না হয়ে যায় কোথায়?

ছোট ছোট পাহাড়। শেষ নেই তার। একটার শেষ হবার আগেই আরেকটার সুরু। আর, তার ফাঁকে ফাঁকে জল-চিক্ চিক্ মাটি। মস্ত একটা কুমীর যেন ডুব দিয়ে চান সেরে শুয়ে আছে রোদে পিঠ পেতে। সে কুমীরের কে জানে কোথায় মুখের দাঁত, কোথায় বা ল্যাজের ডগা। কুমীরটা বুঝি মাঝে মাঝে নাড়া দেয় পিঠ। তখন ওদের অনেক কষ্টে গড়ে তোলা ঘর দোর সংসার কেমন টুপটাপ করে ভেঙে পড়ে। ওরা কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই আবার কোমর বেঁধে লেগে যায় ঘর বাঁধার কাজে—ঐ দুষ্টু কুমীরের পিঠেই।

দুষ্টু নয় গো, দুষ্টু নয়;—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কুমীর, সোনা কুমীর, ভাল কুমীর। তোমার পিঠ চুলকোলে তুমি পিঠ নাড়া দাও না? দেয় না তোমার সোরু? তোমার মোষ? তোমার পুষি বেড়ালটা? তাই বলে কি দুষ্টু ওরা? কুমীরই বা দুষ্টু হবে কেন? দুষ্টু হলে ত খালি খালি নাড়া দিত ওর পিঠ। তারপর ডুব দিত জলের মধ্যে। যে-জলের তলায় বসে আছে পাতালের রাজা বাসুকী। আর তখন সেই বাসুকী টপ্ টপ্ করে গিলে ফেলত সকলকে।

দুষ্টু নয় বলেই ত তা' ও' করেনি। দুষ্টু হলে কি ওর পিঠে ফলতো অত বাঁশ? অত বেত? অত কচু? অত কলাগাছ? অত ধান?

তুমি যাবে ওদের কাছে? থাকবে ওদের মাঝে? তাহলে টিলার মাথায় উঁচু জমির ওপর হাত পাঁচেক উঁচু করে বাঁধো বাঁশের মাচা বেশ শক্ত মজবুত করে। তারপর সেই মাচার ওপর গড়ে তোল তোমার ঘর। চালে বিছোও তলতা বাঁশ, আর গাছের পাতা! মাচার নিচে মাটির ওপর থাকুক তোমার মুরগী আর শুওরের পাল, ওপরে থাক তুমি তোমার মা-বাপ ভাই-বোন ছেলে-মেয়ে ভাইপো-ভাইঝি নিয়ে।

টুকরো করে কাটো কলাগাছের খোড়, কুচি কুচি কর নরম-নরম বেতের ডগা—একটু মরিচ মিশিয়ে রাঁধো তরকারী, খাও তারপর ভাতের সঙ্গে পেট পুরে। অভাব কি তোমার?

তারপর, খেয়েদেয়ে মোটা বাঁশের চোঙার মধ্যে সরু বাঁশের আরেকটা চোঙা গুঁজে তার মাথায় বসিয়ে দাও কল্কে। ঠ্যাঙ ছড়িয়ে টানো তামুক ভুকভুক করে।

সন্ধের পর যখন চাঁদ দেবতা হেসে উঠবে তোমার বাঁশবাগানের মাথার ওপর, তখন তোমার উঠোনে বসানো মদ-ভর্তি মস্ত মাটির গামলার চারিদিকে বাড়ির সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসে বাঁশের নল দিয়ে টানো মদ। টানতে টানতে পেট যখন ভরে যাবে, মাথার মধ্যে ঘুম-ঘুম সুড়সুড়ি উঠবে, তখন ঘরে উঠে দাও কষে ঘুম। পরদিন সকালে উঠে লেগে পড় সংসারের কাজে।

এমনি করে একদিন তুমি বুড়ো হবে। আর কাজ করতে পারবে না। চোখে দেখবে আবছা, কানে শুনবে কাপসা। চলবে কেঁপে কেঁপে, খাবে ফোকলা দাঁতে, বসবে হাঁটুর মধ্যে নড়বড়ে মাথা গুঁজড়ে। তামাক

টানতে টানতে বিষম খাবে। দেখতে-দেখতে—দেখতে পাবে না আর, শুনতে-শুনতে শুনতে পাবেনা। দেখবে না, শুনবে না, নড়বে না, কাঁদবে না, হাসবে না ;—তুমি মরে যাবে।

তুমি মরে যাবে। তখন ওরা আগুনে জল ফুটিয়ে সেই জলে নাওয়াবে তোমার দেহটাকে, সাজাবে ফুল দিয়ে, বুকের ওপর রাখবে পান-সুপুরি। তারপর পাড়া-পড়শী সবাই মদ খাবে আর নাচবে। শুধু তোমাকে আনন্দ দেবার জন্যেই।

তারপর নিয়ে যাবে তোমার দেহটাকে ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর। চাপাবে আগুনে। আগুনের আঁচে পুড়ে ছাই হয়ে হাল্কা ফুরফুরে হয়ে যাবে তোমার দেহ। উড়বে বাতাসে। ওরা তখন ফিরে যাবে। রেখে যাবে মদ, রেখে যাবে মুরগী। শুধু তোমার জন্যেই। সেই মদ-মুরগী খেতে তোমার ইচ্ছে হবে না মোটেই। তাই মদের পাত্র উল্টে যাবে, মুরগীরা চলে যাবে বনের মধ্যে। আর তুমি? সেই অনেক হালকা তুমি তখন অদৃশ্য চিল কিংবা ঘুঘুর পিঠে চড়ে চলে যাবে সেই স্বর্গে, যেখানে থাকেন তুইহুংপা, শিবরাই, তুইরেংপা নামক দয়ালু সর্বশক্তিমান দেবতারা।

তুইরেংপা পুজোর মেলা। বাজনা-বাদ্যি উঠেছে বেজে। যার সঙ্গে যার দেখা হচ্ছে, হেঁট হয় বলছে চুবাই, অর্থাৎ নমস্কার। খুশিতে টলমল করছে সবার মন।

যে বারেইন্ অর্থাৎ বারোয়ারীতলা এতদিন জঙ্গলের মাঝখানে অনাদরে ঢাকা পড়েছিল ঝরাপাতায়, আজ ওরা তাকে সাজ-সুদরো করে নিয়ে সাজিয়েছে ফুল দিয়ে, রঙীণ কাপড় দিয়ে, নিশেন দিয়ে। বারেইন্-এর এখানে-ওখানে খোঁটায় বাঁধা আছে শুওর, চম্পুইয়ের মধ্যে চাপা আছে মোরগ। তুইরেংপার কাছে ওদের সমচ্ছরের মানৎ। গুণতিতে হবে ওগুলো দেড়শোরও বেশি। তুইরেংপা আজ সব খাবেন। বছরে একদিন খান কিনা উনি, তাই কিধেটা একটু বেশি হবে বৈকি।

তুইরেংপার খাওয়া হলে সেই প্রসাদী মাংস খাবে ওরা সকলে। তারপর সারারাত নাচবে, গাইবে, মদ খাবে।

ঐ খুশি-ঝলমল বারেইন-এর মধ্যেই দেখা হল দুজনের। ষোল বছরের মেয়ের সঙ্গে আঠারো বছরের হৃষ্টপুষ্ট এক জোয়ান ছেলের। বারেইন-এর নাচের ভিড় থেকে সরে গিয়ে দুজনে বসল এসে জল-ঝিরঝিরে একটা রোগা নদীর ধারে।

: নাম কি তোমার?—শুধালো ছেলেটি।

মাথা নিচু করে মেয়েটি বললে: সেঙা।—তোমার?

: লাবুই।

চুপচাপ কিছুক্ষণ। শুধু বাঁশ ছেঁড়া আর জলে পা নাড়া খানিক।

তারপর,—

: কোথায় ঘর? কার মেয়ে?

: 'গালিমে'র।

: গালিমের? মানে মোড়লের?

: হ্যাঁ।—তুমি?

: ভিন্ গ্রামের। এসেছি তোমাদের পূজা দেখতে। দেশ ছিল শুনেছি আমার মেঘলা নদীর তীরে। বাপ এসেছিল এখানকার হাটে তুলসীকাঠের মালা আর লাল-তামার ঘটি বেচতে। এসেছিলুম সেই বাপের সঙ্গে ছোট্ট-বেলায়। মা ছিল না কি না। তোমাদের এই পাহাড়ী দেশের হাটে মালা বেচতে এসে বাপও মরে গেল পেটের রোগে। ঐ তিনবাঁকা পাহাড়ের পরে যে গ্রাম, সেই গ্রামের 'গাবুর' আমায় তুলে নিয়ে গেল ঘরে। সেই আমার ধর্মবাপ।

: জল খাটছো নাকি কোথাও?—শুধোয় সেঙা।

: না তো।—বলে লাবুই: তোমাদের ঘরে এসেছে নাকি জল?

ঘাড় নাড়ে সেঙা মুখ নামিয়ে। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে ওর মুখ। এখনো জল আসেনি ওদের ঘরে।

'জল খাটা' কাকে বলে জান না বুঝি? ওদের জোয়ান ছেলেরা যায় কুমারী মেয়েদের বাপের বাড়ি। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁকে—'জল খাটতে এসেছি গো।'—মানে, আইবুড়ো ছেলে আমি এসেছি তোমাদের মেয়েটিকে বিয়ে কোরে ঘর বাঁধতে। পছন্দ হয় কি না ভাখো। জোয়ান ছেলের হাঁক শুনে তখন বেরিয়ে আসে মেয়ের

বাপ-ঠাকুর্দা-কাকা-জ্যাঠা, ডাক-চোকরে উঁকি মারে মেয়ের মা-খুড়িরা, উঁকি মারে মেয়ে নিজেও। মেয়ের বাপ-দাদা শুধোয়, নাম কি? বাস কোথায়? বাপ কে বটে গো? শুনে-টুনে যদি পছন্দসই লাগে, তখন এগিয়ে দেয় ডাকুক। বলে, হুসুম রাজি। খাটতে পার জন।

তখন থেকে সেই জোয়ান ছেলে জনমজুরের কাজ করতে থাকে মেয়ের বাপের কাছে, পুরো পাঁচটি বছর ধরে। পাঁচ বছর পুরোলেই জন হয়ে যায় জামাই। মেয়ের বাপ তখন মেয়ে-জামাই আত্মীয়-স্বজন আর মদ নিয়ে যায় জামাই বাড়ি। দু-পরিবারের সবাই মিলে বসায় মদের উৎসব, চালায় নাচ-গান।

তুইরেংপা পুজোর পরদিন সকালে গালিমের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল লাবুই। ডাক দিল বুক চিতিয়ে: জন খাটতে এসেছি গো।

গালিম ছিল না ঘরে। পুরুষেরা কেউই নয়। বারেইন-এই পড়ে আছে তখনো মদের নেশায় চুর হয়ে। ডাক শুনে তাই উঁকি মারে শুধু সেওার মা। বলে: কে বট গো তুমি?

: লাবুই গো। ভিন্‌গাঁয়ের গাবুরের ধম্মছেলে। জমি আছে, জমা আছে। রাজি থাক ত বল, নৈলে ফিরে যাই, তাড়া আছে।

একটা ন্যাংটো ছেলে বেরিয়ে এসে বাড়িয়ে দেয় বাঁশের চোঙার হুঁকো। সেওার মা বলে: সেওার কাছে কাল রাতে শুনেছি তোমার বেত্তান্ত। তামুক খাও, পুরুষরা আসুক, তখন হবে পাকা কথা।

লাবুই বলে: দাও কাও! পাকাই যদি হল না কথা—ত তামুক টানি কোন্ সুবাদে গো? নিয়ম-কম্ম কি সব ভাসিয়ে দিয়েছ নাকি? থাক্ তবে গো, নাও ফিরিয়ে তোমাদের হুঁকো, আমি না হয় চলি।

: যেও না বাছা। হুঁকোর আগুন না নিবিয়ে টানো দিকি বসে বসে; রান্না চাপাই তোমার জন্যে।

চলে গেল সেওার মা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লাবুইয়ের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে সেওাও অনুসরণ করল তার মাকে। লাবুই পরমানন্দে তামুক টানতে টানতে একসময় হেঁকে বলল: যাচ্ছি গো আমি একবার। ধম্মবাপকে জানিয়ে আসছি কথাটা। নইলে ভাববে বুঝি সাপে কেটে নীল হয়ে পড়ে আছি কোন্ অজগর-বিজগর বনের মধ্যে।

কিন্তু হল না আর ফিরে আসা। ঘরে ফিরে অবাক হয়ে শুনলে, ধম্মবাপ তার বছর তিনেক আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছে বাড়ি, যে বাড়িতে জন খাটবে লাবুই। তারপর পাঁচবছর পরে সাত গাঁমলা মদের সঙ্গে নিয়ে আসবে ঘরে নতুন বৌ। নাম তার সেওা নয়, সিস্‌মি।

আর সেওা?

অনেক বেলায় তার বাপ গালিম ফিরে এল টলতে টলতে, সঙ্গে নিয়ে এক যেন বাঁথারির মতন মানুষ। জানালে—মানুষটা এ-অঞ্চলের সেরা ওঝা (অর্থাৎ ওঝা) বাপুর, তারই যোগ্য ব্যাটা হাপুর। এসেছে, সেওার জন্যে পাঁচবছরের জন খাটতে।

পরের বছর তুইরেংপার মেলায় আবার দেখা ওদের। আবার সেই রোগা নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসা।

লাবুই বললে: পারি না রে আর। সিস্‌মির আদি-খ্যেতায় ছাকার আসে। ডাক পেলেই গায়ে এসে ঢলে পড়ে। রাতের বেলায় সবাই ঘুমোলে টেনে তুলে বলে চাঁদের আলোয় বসবি চল্ না ঐ টিলার ওপর।

সেওা বললে: ঐ বাঁথারি যেন লোকটাকে নিয়ে আমারও হয়েছে জ্বালা। তামুকের কল্‌কে নেবার ছল করে কেবল আমার গা ছোঁবার চেষ্টা ওর। মদের আসরে ঠিক আমার পাশে এসে বসবার তাল। ওর কুতুরে চোখের পরতে পরতে শুধু লালসা আর লালসা।

লাবুই বললে: তুইরেংপার কাছে মানৎ করেছি একজোড়া মুরগী; যেন সিস্‌মিকে ঘুঘুর পিঠে চড়িয়ে সগ্‌গে টেনে নেন উনি শিগ্‌গিরই।

সেওা বললে: আমিও মানৎ করেছি খয়েরি শুওর, যদি ও হাপুরকে সগ্‌গে তুলে নেন তুইরেংপা।

: কিন্তু তুইরেংপা, তুইরুংপা, শিবরাই কোন ঠাকুরই যদি কানে না তোলেন আমাদের কথা?

: তাহলে চার বছর পরে ঐ হাপুরটাকে নিয়েই ঘরতে হবে সারা জীবন। ভাবলেও কান্না আসে। ওটার কোন গুণ নেই রে। সেদিন আগাছার জঙ্গলে আগুন

লাগিয়ে সবাই যখন 'ঝুমের গান' গাইছিলুম দল বেঁধে, ওর গলাটা এমন বেসুরো বলছিল যে, সকলকার ভুরু কুঁচকেছে।

: আর আমার ঐ সিস্‌মি! সেদিন শিবরাই পূজোর নাচের সময় এমন বেতালা নাচলে যে, কুমীরের মতন দাঁত থাকলে মেয়েরা সবাই সেদিন ওকে চিবিয়েই খেয়ে ফেলত।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে সেঙা বললে: না চেহারার ছোলুব, না গুণপনা একরত্তি—এমন মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার চেয়ে সাপে কেটে নীল হয়ে বনের মধ্যে পচে যাওয়াও ভাল।

লাবুই বললে: আমার কি অবস্থা জানিস? রাত-দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়ত তোর স্বপ্ন দেখছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। দেখি ঐ খাঁদানাকী উট্‌কপালী চিরুণদাঁতী কুচ্ছিৎ সিস্‌মিটা আমার পা টিপে দিচ্ছে। পা টেনে নিলে বলে,—'আহা আমার জন্যেই ত জন খেটে তোর গা-গতরের ব্যথা, পা দে, ঘুমো তুই—আমার কষ্ট নেই কোন।'

সেঙা ঠোঁট উল্টে বলে: ন্যাকা!

লাবুই বলে: শিবরাই ঠাকুরের এ কিন্তু বড় অন্যায় নিয়ম-রীতি সেঙা! বাপের কথা অমান্য করলেই কি না পাঠিয়ে দেবেন পাতালের রাক্কস-খোক্কসদের মুখে! কেন রে বাপু? বাপেদের কি আর বুদ্ধিসুদ্ধির ভ্রম হতে নেই?

সেঙা বলে: ও বিধানের কি কোন নড়চড় নেই রে?

হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে লাবুই: না! আমাদের গ্রামের বুড়ো অচাই-এর মুখে শুনেছি ত বেদ-পুরাণের কথা।—ঐ যে সেই সকালে, যখন সুজ্জি-চাঁদে ঝগড়া হয়নি, এক সঙ্গে এক আকাশে পাশাপাশি উঠত যখন ওরা দিনমানে, আর রাত্তিরে থাকত ঘুটঘুটি আঁধারে—সেই যুগে ছিল এক পাজী ছেলে, সুদাই। বাপের কথার অমান্য করেছিল সে একদিন। সঙ্গে সঙ্গে শিবরাই ঠাকুর প্রকাণ্ড এক অজগরের রূপ ধরে দিলেন তার মাথায় এক ছোবল।

সেঙা শিউরে উঠে বললে: মরে গেল তক্ষুণি?

লাবুই বললে: দূর, তাহলে আর পাপের শাস্তি হল কী? যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল সুদাই। মরে না, শুধু কাৎরায়। তখন দৈববাণী হল, 'সুদাই, ছুটে গিয়ে পড় আগে তোর বাপের পায়ে, তবে যাবে যাতনা।' সেই শুনে ছুটতে ছুটতে সেই না গিয়ে বাপের পা ছোঁয়া, অমনি কোথা থেকে সুদাইয়ের মাথার ওপর এসে পড়ল কালো কুচকুচে এক বিষপাথর। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার যাতনা একেবারে শীতল!

হতাশ হয়ে সেঙা বললে: তাহলে আমাদের কি আর কোন উপায়ই নেই?

লাবুই বললে: সারা বছরটা ধরে ত শুধু সেই কথাটাই ভেবে চলেছি।

পরদিন সকালে তুইরেংপার বাসি পূজো শেষ করে যে যার গ্রামে ঘরে ফিরে যাবার আগে সবাই এসে ভিড় জমালে সেঙার বাবা গালিমের বাড়ির উঠোনে।

ব্যাপার কি? না, সেঙাকে অপদেবতায় পেয়েছে।

সেঙা হাসছে কাঁদছে দাঁত কিড়মিড় করছে। সেঙা বাপের শাসন মানছে না, বুকের বসন রাখছে না, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা উঠোন বন-শুওরের পারা। সেঙা এমন ভাষায় কথা বলছে, যার মানে বোঝা যাচ্ছে না একতিল, শুধু তার খোনা গলার আওয়াজ শুনে শিউরে উঠছে সবাই!

সেঙার-মা জড়িয়ে ধরলে তার হবু-জামাইয়ের হাত। বললে: ও বাছা, তুই ত এ-অঞ্চলের সেরা অচাইয়ের পুত, সে আমার মেয়ের দেহ থেকে ঐ পেত্নীটাকে খেদিয়ে।

বলবার আগেই তৈরী হয়ে এসেছে হাপুর। সারা গায়ে তার তেল মাখা, পরণের কাপড় গুটিয়ে তোলা। সরু সরু পা। উরুৎ যেন বেতের গোড়া; তেমনি লিক্‌লিকে আর বাঁকা। গলায় ঝুলছে মালা; তাতে বাঘের নখ, গণ্ডারের খড়্গ, গোসাপের ল্যাজ, বাদুড়ের ঠ্যাং, আরো কি কি যেন বাঁধা। তুইরেংপার বেদির ধুলো মুঠি ভরে তুলে এনেছে ও'।

সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তার মন্ত্র-তন্ত্র, তার ভূত ঝাড়ার বিদ্যের কারচুপি। কথা নেই কারুর মুখে। চোখের তারা পাথর-নিথর।

সেই রোগা-রোগা পা তুলে তুলে কেমন ডিং মেরে মেরে বেড় দিতে লাগল হাপুর সেঙাকে। না, না, সেঙাকে নয়; সেঙার ভেতরকার সেই পেত্নীটাকে।

পেত্নীটা চুপচাপ।

মুখোমুখি দাঁড়াল হাপুর।

পেত্নীর মুখে কথাটি নেই।

হাপুর এইবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে তুইরেংপা তুইহুংপা শিবরাই নামক সব বড় ঘরের ঠাকুরদের। ডাক দিলে ছোটঘরের বনদেবতা রিংরেপা, জলের ঠাকুর গাংরেপা, আর ভূতের ঠাকুর বরাইপালুকে। সবাইকে ডাক দিয়ে সাতবার কান মুলে, এগারো বার আঙুল মটকে, তিনবার হাতের মুঠিতে ফু দিয়ে ছুঁড়ে দিলে ধুলো সেঙার দেহের ওপর।

সব বৃথা!

হাহা করে হেসে উঠে সেঙা একটা জ্যান্ত মুরগীর ঘাড় মটকে কাঁচা রক্তে মুখ দিলে!

শিউরে উঠল সবাই! কেঁদে উঠল কচির দল। লাজে ঘেন্নায় দুঃখে হাপুর ভিড়ের মাঝে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াল।

এল এবার হাপুরের বাপ বাপুর, অচাইয়ের সেরা অচাই, ওঝার সেরা ওঝা।

কিন্তু তারও ঐ এক হাল। সেঙা হাসে হা-হা। সকলে করে হায় হায়। বাপুর যাকে ভাল করতে পারলে না, তাকে বাঁচায় কার ক্ষমতা এ বিশ্ব-সংসারে?

এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল লাবুই। বললে: বাপ ছিল আমার মেঘনানদীর পারের মানুষ। সে যখন মোলো, চার বছরেরটি আমি। বাপের ফেলে-যাওয়া তুলসীর মালা নিয়ে খেলা করছি আর কাঁদছি, এমন সময় উদয় হলেন এক দেবী। সোনাবরণ তার রঙ, চাঁপা ফুলের বাস তার অঙ্গে। বললেন, বাপ গেল বলে কাঁদিসনি লাবুই। আমি মেঘনা ঠাকরুণ। তোর কানে দিচ্ছি ভূত তাড়াবার মন্তর। কিন্তু একটিবার মাত্তর কাজে লাগবে এ মন্তর, তার পরেই তুই ভুলে যাবি সব।

শুনে ছুটে এল সেঙার মা, ছুটে এল গালিম। জড়িয়ে ধরল লাবুইয়ের হাত।

: বাঁচা বাছা, বাঁচিয়ে দে আমার মেয়েটাকে।

দাঁড়াল লাবুই টান্ হয়ে। বললে: কিন্তু এতবড় দামী মন্তরটা যেমন জন্মের মতন খরচ করব, তেমনি বেঁচে উঠলে সেঙা হবে আমার জিনিষ। তোদের কারুর থাকবে না তার ওপর কোন জোর, কোন মালিকানা।

কথা কয় না সেঙার মা। জবাব দিতে পারে না গালিম।

পাঁচজনে কিন্তু ঘাড় নেড়ে বলে: বটেই ত। যে-সেঙা ছিল ওর বাপের মায়ের, সে-সেঙাকে ত পেত্নীতে খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে কখন্। এখন যদি আবার ঐ দেহে নতুন জীবন দেয় লাবুই ত সে-সেঙা ত লাবুইয়েরই বটে গো। এর আর ভাবনার কি আছে?

শেষ অবধি রাজি হল গালিম। বললে: তাই হবে। তবু বাঁচা ওকে।

আশ্চর্য!

ধুলোও নিলে না মুঠিতে, তেলও মাখলে না গায়ে, ডিং মেরে মেরে ঘুংলেও না লাবুই। চিৎকার করে শুধু হাঁক দিলে তিনবার: মেঘনা, মেঘনা, মেঘনা। তারপর মুরগীর ডানা ঝাপটের মতন ফরফর করে বলে গেল এক নিঃশ্বাসে এমন সব কথা, যার মানে বোঝার সাধ্যি ছিল না কারুর। বোঝা গেল শুধু শেষের কথাগুলো: আমি মেঘনার ছেলে লাবুই। যে আছিস ভালয় ভালয় চলে যা সেঙার দেহ ছেড়ে, নইলে ছুঁড়তে হবে নাগবাণ।

সঙ্গে সঙ্গে ধোঁজবাজী! সেঙা বুকের বসন গুছিয়ে নিয়ে লজ্জায় দৌড় দিলে ঘরের মধ্যে।

চিৎকার করে উঠল সবাই: জয় মেঘনার জয়!

রাতের আঁধার। নদীর ধারে এসে বসেছে ওরা দুজনে।

সেঙা বললে: বাব্বা! বুদ্ধিটা খুব দিয়েছিলি বটে তুই লাবুই। কিন্তু চেঁচাতে আর লাফাতে দম বেরিয়ে গিয়েছিল। আর ঐ মুরগীর কাঁচা রক্তে ঠোঁট ছুঁইয়ে অবধি এখনও গুলোচ্ছে যেন গা!

: হুঁ।—লাবুই বললে: আমার ধন্ম-বাপ গুধোলো আমায়, ঐ মেয়েটাকে নিয়ে করবি কি তুই লাবুই? বললুম, বিয়ে করি যদি? বাপ বললে, আমার আপত্তি নেই। স্বয়ং মেঘনা যখন ও মেয়েকে তোর হাতে তুলে দিয়েছেন, আমরা বারণ করবার কে?

সেঙা বললে: আমরা যা চেয়েছিনু তাই হল শেষ অবধি। আর বাধা রইল না কোন দিকে। কি বল্ লাবুই?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু জানিস লাবুই?—জলে পা নাচাতে নাচাতে বললে সেঙা: আমি যখন ভূতে-পাওয়ার ঢং করে হাসছিলুম, কাঁদছিলুম, দেখছিলুম আড় চোখে চেয়ে—ঐ হাপুরটার চোখে জল আর জল।

: আর আমি যখন ভূত ছাড়াবার ঢং করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম, সিস্‌মি আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলছিল, যাসনি লাবুই, যাসনি'। তখন ওর দুগাল বেয়ে জল গড়াচ্ছিল রে।

সেঙা বললে: জানিস লাবুই, আমি কতদিন দেখেছি, ঐ হাপুরটা রোজ রাতে জেগে বসে থাকত আমার শিয়রের কাছে। যাতে আমায় মশায় না কাটে, সাপে না দংশায়।

লাবুই বললে: একবার পা ভেঙেছিল আমার। দশ দিন লেগেছিল শীতল হতে। তা' জানিস সেঙা, সিস্‌মিটা সেই দশদিন দাঁতে কাটেনি রে এক কণা কিছু।

সেঙা বললে: জানিস লাবুই, তুই যখন সকালে উঠোনে দাঁড়িয়ে বললি, 'বাঁচাবার পর সেঙা আমার হবে' —তখন সে কথা মেনে নিতে আমার বাপ-মায়ের দেরি হল। কিন্তু ঐ হাপুর, আমি নিজের কানে শুনেছি রে, দৌড়ে এসে আমার বাপকে বললে, 'তা হোক্, তা হোক্, ও' নাই বা হল তোমার, নাই বা হল আমার, ও' প্রাণে বাঁচুক।'

লাবুই বললে: তোর ঐ হাপুর এসেছিল রে দুপুরে আমার কাছে। আড়ালে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললে—'সেঙা তামুক খেতে খেতে কাশে; ওকে তামুক খেতে দিও না গো।'

সেঙা বললে: তোমার ঐ সিস্‌মিও এসেছিল গো আজ ওর-দুপুরে লুকিয়ে আমার ঘরে। তোর নাম করে বললে—'মানুষটা মদ খেতে খেতে কাৎরায় পেটের যাতনায়;—দিওনা গো ওকে বেশি মদ খেতে।'

অনেক রাত।

মাচার নিচে একটা দুষ্টু শুওর শুধু ঘোৎ ঘোৎ করছে তখনো। বাকি সব নিথর নিঝুম। আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে এসে দাঁড়াল লাবুই।

চমকে উঠল গালিম: এখনই নিয়ে যাবি সেঙাকে?

লাবুই ফিসফিসিয়ে বললে: না। কোন দিনই না। ও' ত আমার জিনিষ। ওকে আমি আবার ফিরিয়ে দিলুম তোর হাতে। চললুম। বলে দিস তোর মেয়েকে। ঘুমোচ্ছে ও'। জাগাতে চাই না এত রাতে।

পরের দিন ভোরে উঠে শুনল সেঙা খবরটা। শুনে চমকে উঠল একবার। তারপর এগিয়ে গেল ঘরের অন্ধকার কোণে, যেখানে বসে হাপুর কাঁদছিল তখনো মাথা গুঁজে।

হাপুরের হাড়-জিরজিরে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সেঙা বললে: চ', খাসনি কাল সারাদিনে কিছু। খেয়ে নিবি চ' দুটো।

ওদিকে তখন কালো কুচ্ছিৎ সিস্‌মির হাত ধরে তিনটে পাহাড় পেরিয়ে নিজেদের গাঁয়ে ঢুকছে লাবুই।

চির বিচ্ছেদের পরে

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

মনে হয় কিছুক্ষণ—এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে
সে আমারি কাছে ছিল! দাঁড়াই নদীর ঘাটে যেয়ে
একান্তে নীরবে একা—মনের বিষণ্ণ পথ বেয়ে
মুছে'-যাওয়া অতীতের কথাগুলি একে একে জাগে।
সে-কথাই বারবার মনে করা বড় ভালো লাগে,
অশোক ফুলের মতো হাসি তার দেখি যেন চেয়ে;
কোকিলের সুর নিয়ে জেগে-ওঠা যৌবনের মেয়ে
রূপ ধ'রে দেহে তার দাঁড়ায় সে নয়নের আগে।

আর শুনি কণ্ঠস্বর! অদেখার বাধাদান ভেঙে
প্রাণের দুয়ারে এসে মনের মিনতি রেখে যায়;
বুকখানি অগোচরে ওঠে নিতি বেদনায় রেঙে,
রাতের স্বপন নিয়ে তারে যেন কি কথা জানায়!
দাঁড়াই নদীর ঘাটে—নদীটিরে ডেকে
বলি একা—
'নদি, তোর এই সুর তারি কি কণ্ঠের
কাছে শেখা?'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালে চিনারবাগেই এক সভা হোলো। কাশ্মীর রাজ্যের অস্থতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রেমনাথ পণ্ডিত আমাদের ক্যাম্পে আসবে দিতে এলেন। সমস্ত ছেলে মেয়েরা হাজির হয়েছে; শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা। বক্তৃতা শোনা গেল। তারপর অবকাশ। বিকেলে নিমন্ত্রণ আছে চাঁদের ডলদার

ছায়লাল পণ্ডিত বক্তৃতা দিচ্ছেন

হয়ী গোপাল মহাশয়ের বাড়ী। সেখানে গান বাজনার ব্যবস্থাও আছে।

আগেই নিমন্ত্রণটা আমার পক্ষে ছিল সময়। কান্তা যথারীতি রান্নাঘরের তদারক করতে ছুটল শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে। মোটা কন্ট্রাকটর বসে বসে সব তদারক করে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করি, পিঠের ওপর ঘিয়াট এক চড়।

সঙ্গে সঙ্গে তার খাঁদের ওপর দুহাত দিয়ে পিছন থেকে হাতখানা ধরে তাঁদের ওপর দিয়ে টেনে পতিরামকে পিঠে এক কাঁকানি দিতেই ও চিৎকার করে উঠলো:—"হতভাগা বাঙ্গালী মেয়ে খেয়ে।"

নামিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললো "বড়তমীজ, বেয়াদব! আমাদের খেয়ে মোদের দুধ খেয়ে তাকৎ বেড়েছে না? বাংলায় বেড়-পোড়া গরুর দুধ খেলে পেটে এ তাকৎ? আনো পঙ্কুলা যদিন্ বাংলার গরু আর আমাদের ছাগল।"

আমি বলি "আর বাংলার ছাগল এখানকার ম্যাটন! যে পরিমাণ দেহের বৃদ্ধিতা বাড়ছে তোমাদের মোষের দুধে আর ঘনে, সন্দেহ হয় বুদ্ধিতা বুদ্ধিতে তোমাদের চেয়েও মোটা হয়ে যাবো।"

পঙ্কুলা বলে—"যাঃ মি দ্যি ঝগড়া চলে তো আপনাদের!"

পতিরাম বলে, "জান না? আরে ওকে যে আমি ভালবাসি। কাশ্মীরে এসেছি। এতো মুহব্বতের আগো। পুরি হালুয়া খাও আর ভালবাসো।"

পঙ্কুলা জিভ কেটে গাল লাল করে বলে—"আই সাব্, চারধারে ছাত্রছাত্রী, এসব কি বলছেন? শুনতে পাবে যে।"

"আ খেলে যা। যে শুনবে শুনুক না। ভালবাসা কি খারাপ জিনিষ নাকি? আমি এই পাজী বাঙ্গালীকে ভালবাসি, ঐ রসুইকরটাকে ভালবাসি, তোমাকে, পঙ্কুলাকে ভালবাসি। তাও সে এতটুকু নয়। এতোখানি এতোখানি ভালবাসি।" বলে দুহাতের পাকা চওড়া এক করে দেখালো।

বিকেলে সকলেই দাওগোজ করে গেলাম মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর বাগানে। চিনারবাগেই বক্সী গোলাম মহম্মদের বাড়ী। সুসজ্জিত একখানি বাংলোর আতিথ্যও আছে, আতিথ্য নেই। বক্সী সাহেব প্রতিদিন বাগানে একটা সময়ে বেড়ানটা করেন। সাধারণ লোক যে কোনও নালিশ নিয়ে, আজি নিয়ে এইসময় কালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে। সেই সাধারণের—বেশার—বাগানটা পেরিয়ে ভিতরের বাগান-খানায় ঢুকতেই চোখে পড়লো ম্যাগনোলিয়া গাছের সার।

বক্সী সাহেবের গঠন ও মুখশ্রী খাঁটী পাঠান রক্তের আভাস জানায়। শক্ত সুঠাম চেহারা। মনোবলও শক্ত। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বহু ফোটো নিলে ছেলেরা। এক সময়ে এতোগুলি ক্যামেরা ওঁর সামনে কোনও

সভায় কেউ ঘুমোয় না। যেন ঘটো-ৎকচের বাসর। খাবার আয়োজন সুস্পষ্ট ও প্রচুর। চারদিক কাঁপিয়ে গান শোনার তাগা। সেই বাংলার বৈষ্ণবী সুরে হাফায় গান, লালে ঘেঁষের গান। একখানা রোমাঞ্চকর গান শুনলাম, সেখানা গালীবের।

সাবাস তোরে মিইপিয়ালা
শেষ হয়ে তুইসুখতে মিলি
অশেষ রসের পাত্র সে-কি
মৈলে তারে চাইতো কে
সাবাস তোরে মজপালা
ঘুইরে দিলি দুয়ারধারে
মরজিমে যা পাপ করেছি
মৈলে বোঝা হইতো কে
সাবাস আঁখি রক্ত আঁখি
ঘুমে আসিস বেলায় ঘোরে
নয়ন মেলে দেখিবাহা
দেখতে তাহা চাইতো কে
দেখা বলেই আজলেলে তো
পেয়ালা তোর ঠোঁটের পরে
আমি তো কই ভেঙ্গে ভেঙ্গেও
বলতে নারি "চাই ঠোকে।"

দ্বিতীয় গানখানা যেন আগুন ঝরানো গান :—

ছুটে আসি দুরন্ত বন্যায়
শান্তির সমতলে তূর্ণ।
যৌবন শক্তি সে কতদিন ?
আসি একদিন হবে চূর্ণ !
স্বর্গীয় উৎসের অঙ্কে
স্ফীত মোর যাত্রা সে বন্ধুর ;
জীবন সে ডাক দেয় বারবার,
ডাক দেয় হাতছানি সিন্ধুর।

কংগ্রেস ভবনের বাজার

স্বাধীনতার বাড়ির বাসনা

ছুটে যাই উন্মাদ, দুরন্ত
কিছু নাই বাধা কোথো বন্ধ,
পথ মোর রক্তেতে পিচ্ছিল,
গতি মোর দুরাশার অন্ত।
হাসি হাসি চন্দ্রালু মুষ্টি,
ছুটে যাই নব পথ সৃষ্টি,
বিশ্রাম নাই মোর, চাইনা ;
অফুরন্ত সন্ধানী দৃষ্টি।
এখনও এখনও আছে যৌবন,
আছে রোষ, আছে ক্ষোভ গর্জন ;
মর্মে আছে উৎকণ্ঠা
শুনিতে সবার দুঃখ ক্রন্দন।
আজ সে সভার বক্ষে

নিশ্চিত আছে কত শক্তি
দেখা নব দুকার মাঝে।
লভিব, পাইব নব দুক্তি।
বিশাল বিপুল সেই গর্জন
বুকে তার পর্বতের শপথ
শোনে মোর বক্ষের স্পন্দন
হারি মানি নত এ আবেগে।
বন্ধু আমি যে মহাধন
ছিঁড়ে নিয়ে নাহি যে অধরা
বুকে শুধু আশা মোর বন্ধু
সাগরের বুকে মোর সব শেষ।

বক্সি গোলাম মহম্মদ

এটা কোরাসে গাইলো। প্রথমে একজন পুরুষ, তারপর পুরুষ আর মেয়ে মিলে। বীজী গোলাম হাসান বেগ, আধুনিক কাশ্মীরের কবি, তাঁর নিজের বেওয়া সুর। কবিকে প্রণতি জানালাম।

কাশ্মীরের নব পর্যায়ে যে সব কবি এসেছেন তাদের কাব্য আলোচনা করার অবসর পরে পাবো। কিন্তু এই কাব্য আলোচনার সূত্রপাত হোলো এই সন্ধ্যার সভায়। গোলাম হাসান বেগের কাব্য শোনার পর এই আধুনিক কবিদের রচনার প্রতি একটা লোভ জন্মালো। এখানেই ভাব হোলো আমাদেরই দলের পারশী—আরবীয় প্রফেসর রফিকের সঙ্গে। কথা রইলো পাহালগ্রামে তাঁর সঙ্গে এই আলোচনা করবো। ভদ্রলোক আমল কাশ্মীরী জানেন। তাই কাশ্মীরী কাব্য এঁর কাছে জানার সৌভাগ্য পরে হয়েছিল।

বীণা নয়, অদ্ভুত এক যন্ত্র দেখলাম কাশ্মীরে, বাজনাও শুনলাম। নাম সন্তুর। ছোকা কাঠের বাক্সের মতো। আকারে যেন ট্রাপিজিয়ম। তার ওপর দশ সরিবিষ্ট তার, ওপরে নীচে চাবী দিয়ে বাঁধা। প্রথমটা পুরো লম্বা, পরেরটা তার চেয়ে ছোটো শেষটা একেবারে ছোটো, এমনি একসার। ঠিক তার উল্টো ভাবে সাজানো আবার ছোট থেকে বড় তার। বাঁয়ের ওপরের সারের বড় তার, তো নীচের সারের ছোটো তার। ডান হাতের ওপরের সারের ছোটো তার, তো নীচের সারের বড় তার। এই বাদ্য কলমের মতো কাঠি। সাধারণো দুহাতে দুটো কাঠি দিয়ে বাজায়। কাঠিটায় ডগা অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বাঁকা। খুব কাছে থেকে বাজলেও বেশ স্পষ্ট, রণন আর মূর্চ্ছনা আছে। ঝঙ্কার নেই। কিন্তু নরম ভাবালু গানের সঙ্গেও যেমন, জোরালো অগ্নিস্রাবী গানের সঙ্গেও তেমন, সমান জোরে চলে।

আমাদের ছেলে মেয়েরাও গানে গাইলো, আবৃত্তি করলো। জলসা জমলো খুব। মেয়েরা বলে বসলো, "আমরা মন্ত্রী সাহেবের বাড়ী এলাম, তাঁর বাড়ীর লোকের সঙ্গে ভাব করবো।"

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ভিতরে ঢুকে গেলো। অমন অমায়িক আর সরল লোক কি করে রাজনীতি করেন আমার ভাবতে কষ্ট হোলো।

পরশু পাহালগাম যাবো। আজ সন্ধ্যায় কেবল জোরা। আমি কেন জানিনা সব দল থেকে আলাদা হয়ে গেছি। বেণু, অমিত, অশ-ভীবন, মনোরমা সকলে দল বেঁধে গেছে প্রথম চিনারবাগে, সন্ধ্যায় বেড়াবার মতো সাজপোষাক আনতে। আমায় বলে গেছে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমার উচিত ছিল অপেক্ষা করা। কিন্তু অজ্ঞাতে কখন পা চালাতে সুরু করেছে। চলতে চলতে কোথায় চলে গেছে কোনও খবর রাখেনি। প্রতিপথের সন্ধ্যা। প্রথম দিকটা অন্ধকার। একটা জায়গায় দেখলাম অনেক বাড়ী ঘর জোর পুড়ে গেছে। কবে হয়তো আগুন লেগেছিল। আমি বিলমের বাঁধ কতদূর—কোথায় বেঁটে গেছি জানিনা। এক সময় মনে হোলো পথ ভুলেছি। পথে আলো নেই। বিরাট বিরাট চিনারে ঢাকা পথ। তাতে পথ আরও নিবিড়, আরও অন্ধকার। বহুক্ষণ হাঁটার পর পথঘাট যখন বেশ নির্জন বোধ হতে লাগলো তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করে পথ জেনে নিলাম। খানিকটা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ শুনলাম পাশে কে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে আমায় বলছে। চমকে বললাম—"তুমি?"

"পথে তো আর চেঁচাতে পারি না। অনেক দূর থেকে দেখেছি। তারপর ছুটতে ছুটতে আসছি আপনাকে ধরবে বলে।"

"একা নাকি? একা কেন? আর কেউ নেই সঙ্গে?"

"ছিল।"

"কোথায় গেল?"

"কাটিয়ে পালিয়ে এলাম।"

শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন? কে ছিল?"

"কে ছিল বলবোনা ; আপনি অনুমান করে নেবেন। আমি মোহের আবার অপেক্ষা করছিলাম। তিনি পাশ কিনতে দুটোপেতর দোকানে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম আপনি একা একা আপন মনে চলেছেন। তাড়াতাড়ি দুই লেম্বে এই অন্ধকার পথটায় ঢুকে পড়লাম। অন্যায় করেছি ? রাগ করলেন ?"

"রাগ করিনি, কিন্তু অন্যায় করেছো।" কঠোর হলো।

"কি অন্যায় করলাম ?" চমকে জিজ্ঞাসা করে।

"যেখানেই গোপন, সেখানেই প্রতারণা, সেখানেই পাপ। সত্য স্বয়ং প্রকাশ। প্রকাশ্যে যাকে আনতে লজ্জা পাও তা পাপ।" বিরক্তি চাপতে পারিনি।

"কিন্তু আমি জানতাম আমি আপনার কাছে এলেই পাপ থেকে দূরে থাকবো।" মিষ্টি গলা। নরমই নয়, ভিজেও।

"আর তা হয় না। আমার কাছে এলে শাস্তি পেতে পারো, শাড়ী তো পাবে না, দুল তো পাবে না, তাল রংয়ের কাপড়টা কাচ করা তুতো তো পাবে না।" ইচ্ছে করে শক্ত করে কয়েক ঝিরিয়ে বলি।

ও যেন চমকে যায়। একটু থেমে বলে—"আপনি আমার সম্বন্ধে আর কি জানেন বলুন।"

আমি তো গুপ্তচর নই ; পুলিশও নই। তবু অনেক কিছুই জানি। শুধু জানিনা—এতো জেনে শুনেও, এতো ভাল হয়েও তুমি আত্মবিক্রয় করছো কেন ?"

"আত্মবিক্রয় ?" ধরা পড়ার মতো আঁতকে বলে উঠলো।

"হ্যাঁ। মাত্র রাতে কাচের গ্লাসে বসে কাঁদতে কার ভাল লাগে। মত পুরুষকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে অন্যপুরুষের কাছে আদর চাওয়াই বা কার ভাল লাগে ?"

"আর কি জানেন আপনি ?" রুদ্ধস্বরে বলে কান্না।

"আর ? আর জানি যে তুমি ফিরে যাবার পথ খুঁজে হয়ে উঠেছো কিন্তু পাহারাদার ঘুরে না আসা পর্যন্ত যেতে পারছোনা—কারণ সঙ্গে আছে।"

"চাইছিলাম যেতে, আর যাবো না।"

"কেন ?"

"কষ্ট হলে আপনার কাছে আসবো।"

"না। আসবে না। আমি অত্যন্ত দুর্বল যে ভীরু। মন নামের বোঝা আছে ; অমন নামে শুধু আছে। মানুষের ছায়া আছে, শক্তি নেই। দুটি মানুষ আছে ; দুজন আমি। আমার আমোদ-প্রমোদ করার সামর্থ্যও নেই সাহসও নেই।"

"তবে আমায় অমন করে দৃষ্টি দিয়ে ডেকেছ কেন ?"

"খাঁচায় পোষা চড়িং আর বাস একই দৃষ্টি দিয়ে দেখি, সত্তার আর

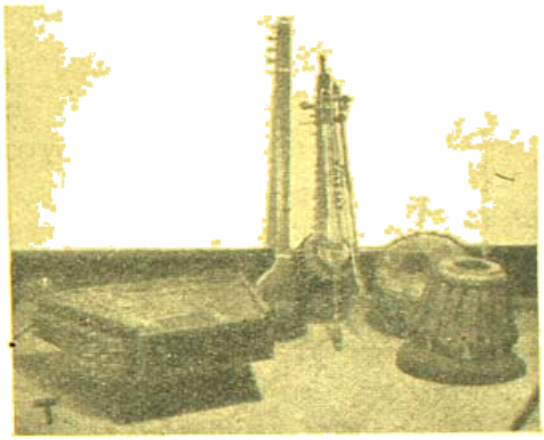

কাম্পুচিয়ার মন্দির

মাপ একই দৃষ্টি দিয়ে দেখি ; সে দৃষ্টি কি জানো ? করুণা। কত স্বাধীন থাকতে চাইতো এরা ! মানুষের দেহের দুটো মাপের জোড়াতে আজ এরা বন্দী। একে তুমি ভুল দৃষ্টি বলো"

বড় রাস্তায় পড়ে কখন হঠাৎ মোড় ফিরে হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে চলে গেল। দুজনার আমায় মুক্তি দিয়ে গেল ; কিন্তু কি সত্যই দিয়ে গেল ?

বেশ, যদি রাতে ভয় করে তবেই ফোন করে থাকে, অমিত যদি ফোনে বলে থাকে আমার মন কেমন করছে বৌদির জন্য, অন্যায় করেনি।

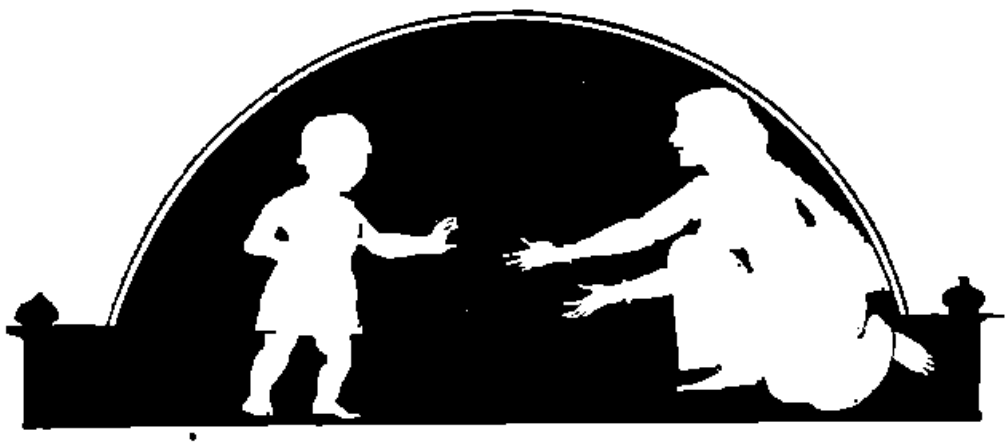

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাধুভাষার পাশাপাশি চলতি ভাষার রূপও ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। অক্ষিতে এমন অবস্থা বেশী দেরী হয়নি যখন "যাইতে যাইতে পড়িয়া গিয়া আমিয়াছিল বলিয়া হোসেন করিয়াছিলাম"—ধরণের সাধুভাষার অনধিকারী ক্রিয়াপদের ব্যবহারটুকুও বহু আধুনিক শিক্ষিত মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করতে লাগল। সাধুভাষার ঐ রক্ষণশীলতাটি পরম শত্রুর দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের হয়ে। বাইকে বিদ্রিপ করে, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল সকলেই বহুবচনের অনুকরণে ও অনুসরণে কথ্যভাষা ব্যবহার করে গিয়েছেন। "এই সাহিত্যিক চলতি ভাষার ক্রিয়ার রূপের সংখ্যা ছিল প্রচুর; কিন্তু করিলাম, করিয়া এ দুয়ের বদলে করলাম, করলেম, করলুম, করে—তাহার, আমিদের প্রভৃতির স্থানে তার, আমাদের—বাহিরে, নিকটে বাদ দিয়ে যাইবে, করে—এই সব মৌখিক ভাষার ব্যবহৃত পদ গৃহীত হল। রাজধানী বলে কলকাতা ও তার চার পাশের এলাকার ভাষা সহজ স্বীকৃত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্তির প্রয়োগ সাহিত্যিক কথ্যভাষায় কমে গেল। বিশুদ্ধ কথ্যভাষা লেখার ইচ্ছায় কেউ কেউ ছিলাম, চলাম, দিলে, বিকাল শব্দগুলির পরিবর্তন করে ছেলেবেলা, ওপরে, বেলে, বিকেল রূপে লিখতে আরম্ভ করলেন। চলিত পরবর্তী অঞ্চল বা পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার প্রভাবে, ধ্বনিগত —অ ও—ই ক্রমশ—এ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হল অনেক ক্ষেত্রে। এই নতুন "কলকেতিয়া" চলতি ভাষায় বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী লেখক উচ্চ চিন্তাসূত্র সার্থকভাবে লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন। ১৯০০ সালে বিবেকানন্দ "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধে লিখলেন :—

"চলতি ভাষায় কি আর লিখনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য, গবেষণা মনে মনে কর? তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন, বিজ্ঞান চিন্তা কর, মনজনে বিচার কর—সে-ভাষা কি দর্শন, বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচ জনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাষ, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। এ ভাষায় যেমন জোর যেমন অর্থের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে কেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন দাক্, ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আমার যে কে সেই এক চোটে পাথর কেটে যেন, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতর গদাই লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।

"যদি বল, "ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে যত-মারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব?" প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কলকেতার ভাষা। পূর্ব পশ্চিম যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই মিশিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব পশ্চিমে ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে। বুদ্ধিমান অমনই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। গ্রাম্য ঈষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে।"

বিবেকানন্দ নিজে তাঁর বাংলা গদ্য রচনায় ঐ প্রবন্ধে সমর্থিত আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্যে তিনি প্রথম শক্তিশালী চলতি ভাষার প্রবর্তন বাংলা গদ্য সাহিত্যে যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর পূর্ববর্তী ভাষায় "বহুবিধ কুটুম্বকম্" নীতিই গৃহীত হয়েছিল। প্যারীচাঁদ-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও সময়কার হুলেই প্রচুর আদি শব্দ যথার্থভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর জন্যে তাঁর ভাষার শক্তি ও শ্রীর সঙ্গে গতি ও অর্থবহতা খুব বেড়ে গেছে। এখানে একটু নমুনা দেওয়া হল। আরো বেশি উদাহরণ পাওয়া যাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক এবং ভাববার কথা এই তিনটিতে।

"লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের ভারি ধুম। বড় মসজেদ ইমামবারার জাঁক-জমক রোশ্‌নির বাহার দেখে কে? বেনুধার লোকের সমাগম। এ

দর্শকমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই হত রাজপুত তামাসা দেখতে এসিয়ে। ঠাকুর সাহেবদের, যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে, বিদ্যাবুদ্ধি ও শুরেচ। সে-মোসলমানি সভ্যতা, কায়দাকেতার বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লম্বাচি জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আদাকাবাচোগা পাগড়ানো, তাজ-মোড়ানো রসবোল্লা পছন্দপসন্দ, চঙ্গ, অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেব-দের স্পর্শ করতে আদৌ পারে নি। কাজেই ঠাকুরমা দরদ, স্নিগ্ধ, সর্বদা ধীকার স্বরে জমায়েত কড়াজান আর বেয়াল্লা মজবুত দিল্।"

এই গদ্যরচনায় ফার্সির প্রয়োগ লক্ষ্য করার বিষয়। ইদানীং সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ফার্সি শব্দাবলীর এই ব্যবহার সুলভ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে, স্বনামধন্য মুসলমান গদ্যলেখক মির মশর্‌রফ্ হোসেন মরহুম ১৮৮৯ সালে "রত্নবতী" আর ১৮৯৬ সালে "বিষাদসিন্ধু" নামে যে দুটি বই লিখেছিলেন তাদের কোনটিই স্বাভীয়ি উল্লিখিত রচনার মতো ফার্সিবহুল বাংলায় লেখা নয়। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে যোগেন আগুন পরিমুক্ত। এক শ্রেণীর মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার উপর উর্দু তথা ফার্সির বাড়াবাড়ি রকমের প্রয়োগ করতে চাইলেও সে-প্রচেষ্টা কার্যকরী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেকালের মুসলিম লেখক-দের শুভবুদ্ধি একালেও অক্ষিত দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী এতদূর সফল হয়েছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতেও খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার ভিত্তিতে গঠিত কলকাতার কথাভাষাই শোনা যাচ্ছে। সেখানে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজ কিছু ফার্সিমেশালো যে বাংলাভাষা ব্যবহার করছে, তা কলকেতিয়া কথাভাষা। ভবিষ্যতে অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে দুই বঙ্গ যে একত্র থাকবে, তার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট।

১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরী সবুজ ভাষায় প্রথম সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের আগে ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি" প্রকাশ করেন। এর ভাষাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায় না। কেবল এর ভাষা থেকে এটা প্রমাণ করা যায় যে, সাহিত্যে যে চলিত ভাষা ব্যবহার করা হবে, তাতে অথচ পরিমাণে তৎসম শব্দ, সাহিত্যিক কলাকাজ ও প্রয়োগ কৌশল অবাধে স্থান লাভ করতে পারবে। রবীন্দ্র-নাথ ঐ বই এ লিখেছেন :—

"মানুষের মতো এত বড় একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে, তার একটা মহৎ নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল ; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার মতন জীবাত্মার এত বেশী পীড়া নিতান্ত অকারণ অসঙ্গত এবং অধৈর্যজনক বলে বোধ হয়। কিন্তু আপাতিক বিষয়ের প্রতি দোষারোপ করে কোন সুখ নেই, কারণ সে-নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু বাধা যায় না এবং জগৎরচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।"

১৯১৪ সালের আগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি বহু গদ্যলেখক নানা রচনার দ্বারা বাংলা গদ্যের পরিমাণ যেমন বাড়িয়ে গেছেন, নানা স্তরের সাধুভাষাও তেমনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৮-১৯১৪ সময়ের মধ্যেই একদিকে সাধুভাষায় পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যে কথোপকথন বাদে অবশিষ্ট অংশ রচনা এবং অন্যদিকে চলতি ভাষায় প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, নাটক সর্বাংশে আর সাধুভাষায় লেখা কথাসাহিত্যের কেবল কথোপ-কথন-অংশ রচনা চলতে থাকে। এই সময়ে কথাভাষার প্রসার ও প্রভাব সাধুভাষার উপর বিস্তৃত হয় এবং সাধুভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র ক্রমশ সং-কুচিত হয়ে আসতে থাকে। ১৯১৪ সাল থেকে সাহিত্যের সকল অঙ্গে তো বটেই, জীবন ও রচনার অন্য সব ক্ষেত্রেও কথাভাষা ক্রমাগত প্রাধান্য বাড়িয়েই চলেছে।

১৯১৪ সালের আগে রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষার গদ্যের ধারাটির যথোচিত চর্চা ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। ১৯১৬ সালে "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে তিনি তাঁর গদ্যে চলতি ভাষার আশ্রয় পাকাপাকিভাবে নিলেন। অসাধারণ প্রতিভার শক্তিতে তিনি চলতি ভাষার গদ্য রচনার কাজে প্রমথ চৌধুরী এবং অন্য সবাইকে চোখের নিমেষে ছাড়িয়ে গেলেন। "সবুজপত্র"—প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ চৌধুরীর রচনার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার রচনাবলী সাহিত্যগুণে অনেক বেশি উন্নত।

ঘরে-বাইরে লেখার আগেও রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষায় অনেক লেখাই লিখেছিলেন। কিন্তু এই উপন্যাসে তাঁর ভাষার রীতি একেবারে বদলে গেছে। তার অনুরূপ ভাষায় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ কখা বলতে পারত না। তবু তাকে কথাভাষাই বলতে হবে। পরে এর উদাহরণ দেওয়া হল :—

"মা গো! আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণ-রাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাত্রের দিকে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোয় সঞ্চয় কি এক কণাও রাখ্‌ল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে সেই যে উদয়গিরির ধ্যান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?"

এর দুবছর পরে রবীন্দ্রনাথ "চতুরঙ্গ" (১৯১৬) গল্পে আবার ১৮৯৯ সালের মতো চতুর্থ স্তরের সাধুভাষায় ফিরে যান। তারপর তিনি কথাভাষাতেই তাঁর গদ্যের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। তা দেখা গেল "শেষের কবিতা" উপন্যাসে। এর ভাষায় পণ্ডিত বুদ্ধির যে বিদ্যুজ্জ্যোতি দেখা গেল, আজ পর্যন্ত চলতি ভাষার সাহিত্যে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন বিবর্তন লিপিবদ্ধ হয়নি :

"অমিত বলে, ক্যাপানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও বনেছে, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা বনেছে, বণের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ক্যাপান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে খানিয়ে মিশিয়েছেন ; বঙ্কিমি ক্যাপান নবিনচন্দ্রের লেখা "মনোমোহনের মোহনবাগানে" ; নবিনচন্দ্র তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে।...অক্সফোর্ডের বি. এ.-র মুখে এসব

কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেন না, আমার বিশ্বাস, আমার লেখার ঠাঁইল আছে—সেই জন্যেই আমার সকল বইএরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা "ন পুনরাবর্তন্তে।"

এর মধ্যে ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত সব শব্দই অবাধে অসংকোচে আশ্রয় পেয়েছে। এই হল শুদ্ধ বেঙ্গলি ভাষা—যাতে প্রয়োজন হলে ভাব প্রকাশের সরলে যে কোন বিদেশি শব্দকে আহ্বান করা যায়। অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য না হলে তৎসম, তদ্ভবসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শ্রেণীবিশেষে যে কোন শব্দই এই কথ্যভাষার ঘরবারে আসন সংগ্রহ করতে পারে। "শেষের কবিতা" (১৯২৯) উপন্যাসের প্রায় কুড়বছর পরে লিখিত দিলীপকুমার প্রণীত "তারঙ্গ রোধিবে কে?" (১৯৩৮) উপন্যাসের ভাষার নেখা যায় :—

"হয়েছে কি, বলতে ও, এখানে তাকে কানের কাছে এত বেশি মাতলা দিতে হল যে, শ্রুতির দেউড়ি পেরিয়ে অন্তরের অন্দরমহলে পৌঁছতে পৌঁছতে সে প্রায় বেউলে। কিন্তু চিত্তাকাশে ক্ষুব্ধ বিদ্যুদ্ভাবের রাগে মেঘমল্লের তান মেরে কে?...তথাস্তু! পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তোমরা কুলের খাতেই ঘুর্‌ণা দিয়ে রসিক নাম কিনে খুশ্‌মেজাজে বাহাল তবিয়তে কুরুক্ষনি করো। আমরা চাই জীবনের সিম্ফনি—তাতে শুধু সুরেরই নয়—সুরের বিষয়ে মিলে স্বরসঙ্গতি—হার্মনি। যাতে সবাই অতি সহজেই বলতে পারে, তাতেই মরতী বিনষ্টিঃ। আমরা চাইব সুপরিচিত সুরে নাগরদোলা বর্ণার ঝুমুরুমু ধ্বনি না; ছুটির অ্যাডিয়ামান হাইকেলাস ধারালো শুভ্রাহ্নের ভিড়িয়ে পৌঁছতে; যেখানে অনন্তে ছায়াদেশহীন নির্মেঘ গগনচুম্বী তুষারমৌলি।"

এই অংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ভাষা বাংলা মৌখিক ভাষা হলেও এর বহনদায়িত্ব এত বেশি যে, এতে সার্সি, ইংরেজি, সংস্কৃত বাক্যাবলী, শব্দনিচয় ও পদাংশ, তৎসম ও দেশজ শব্দসমষ্টির সঙ্গে অনায়াসে একত্র ঠাঁই পায়। এই চলতি ভাষার প্রধানতম যোগ্যতা এই যে, এর বর্ণবাস, ক্রিয়াপদ, অব্যয় ও দুএকটি প্রয়োগ-রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে এতে যে কোন ধরণের শব্দ অনায়াসে নেওয়া যায়। একই অর্থদ্যোতক তৎসম ও তদ্ভব শব্দ দুটির মধ্যে যে কোনটিকে অথবা দুইটিকেই যথাক্রমে নেওয়া চলে, কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং এর বিস্তারযোগ্যতা প্রায় সীমাহীন।

নাটকের সংলাপে এই কথ্যভাষার ভারবহনক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় সবচেয়ে ভালোভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়। তাঁর ভাষার চেয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণযুক্ত সংলাপের ভাষা বাংলা সাধ্যসাহিত্যে কেউ আজ পর্যন্ত রচনা করতে পারেননি। এই ভাষার প্রচুরতর তৎসম শব্দ চলতি ভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেছে। তাঁর নাটকে নাট্যকারের বিবৃতি অবশ্য সাধুভাষাতেই লেখা।

"স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন-তেমন ভালবাসা নয়। যে ভালবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, যে ভালবাসা বিয়ের চিন্তা ভুলে যায়—আর তার যেমতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, যে ভালবাসা প্রত্যূষসূর্যরশ্মির মতো যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণবর্ণ করে দেয়, জাহ্নবীজলের বারিরাশির মতো যার উপর পড়ে তাকেই পবিত্র করে দেয়, দেবতার বরের মতো যার উপর পড়ে তাকেই ভাগ্যবান্ করে—এ সেই ভালবাসা...চেয়ে দেখ, ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী, ঘুরে ঐ যমুনা বালুকাময়। চেয়ে দেখ, ঐ পর্বতস্রোতস্বতী যেন রৌদ্রে কাঁপ্‌ছে।"

বহুতপস্যুক্ত এই চলতি ভাষাকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবার জন্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৮৭—১৯৪৬) যখন ১৯১৪ সালে "সবুজপত্র" প্রকাশ করলেন, তখন ঐ পত্রিকার সব রচনাই যদিও খাঁটি চলিত ভাষায় লেখা ছিল না, তবু কথ্যভাষায় লিখিত যে পরিমাণ রচনাবলী এতে প্রকাশিত হয়েছিল, তার জন্যেই বহু প্রাচীনপন্থী সমালোচক এই পত্রিকার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। অনেকদিন পরেও যোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৪২)-এর মতো নাম-করা সমালোচকও এই অভিমত প্রকাশ করেন :—

"একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাষার একটা রীতিবৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—সবুজপত্র তাহার বাহন হইয়াছিল; শুধু বাহন নয়, ভাষার সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়া রীতিমতো আন্দোলন সুরু করিয়াছিল।...বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে "সংস্কৃত" ও "পণ্ডিতি" ইত্যাকার গালি বর্ষিত হইতে লাগিল; ইহাদের প্রধান আপত্তিই যেন এই যে, ভাষার ভিতরেও ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকিবে কেন?...সাধুভাষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন নিতান্তই আক্রোশমূলক বলিয়া মনে হয়। যুক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের একটা অকারণ বিরাগ ছাড়া ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ মোহিতলাল খেয়াল রাখেন নি। একমাত্র বিবেকানন্দের বক্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মোহিতলালের আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। তা ছাড়া, সাধুভাষাপন্থীদের মনে চলতি ভাষা ও তার সমর্থকদের সম্বন্ধে যতরাগ যে বিরাগ দেখা গেছে, চলতি ভাষার পন্থীদের মনে সে-রকম কিছু কখনও দেখা যায় নি। মোহিতলালের মতো আরো অনেকের তীব্র আপত্তি প্রবল বাতাসে তুলোর মতো উড়িয়ে দিয়ে চলতি ভাষা পোড়া ও রঙ্গশীল পত্রিকাগুলিতেও স্থান সংগ্রহ করে নিল। সাধুভাষার লেখকদের মধ্যে ক্রমশ কথ্যভাষায় লেখার প্রবণতা দেখা গেল। পরম কৌতুকের বিষয় এই যে, স্বয়ং মোহিতলাল মৃত্যুর কিছুকাল আগে প্রচারিত এক বেতার-বক্তৃতায় চলতি ভাষার ব্যবহার করেন। এ থেকে বোঝা গেল, এ যৌবনমন্ত্র তরঙ্গ রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

চলতি ভাষার সূক্ষ্মরূপ রচনাশক্তি যে কত বেশি, তার নিদর্শন দেওয়া যাক "চার ইয়ারি কথা" থেকে; যাঁরা শুধু বাকচাতুর্য নয়, বাক্‌সৌন্দর্যও রচনা করতে জানতেন; তার প্রমাণ ১৯১৪ সালের এই ভাষণের সুসংযমিত বর্ণনায় পাই :—

"মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর কখনও দেখি নি। সে-আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়—বিদ্যুতের। সে-আলো জ্যোৎস্নাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলছে, চন্দ্রালোকের বুকের

ভিতর যেন তাড়িত সঞ্চারিত হল। দিবের সুপ্ত শরীর যেন এক মুহূর্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এ-জড়জগৎ সেই মুহূর্তে প্রাণময়, মনোময় হয়ে উঠেছিল।...আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে মুখ ফেরালুম। যেন, কিছুক্ষণ আগে যে-চোখ হীরার মতো ঝলমল, এখন তা নীলার মতো সুকোমল হয়ে গেছে; একটি গভীর বিষাদের ছন্দে তা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে; এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনও দেখিনি। সে-চাহনিতে আমার হৃদয়-মন একেবারে গলে উথলে উঠল। আমি আস্তে তার একখানি জ্যোৎস্নাধারা হাত আমার হাতের কোলে টেনে নিলুম; সে-হাতের স্পর্শে আমার সকল শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, সকল মনের মধ্য দিয়ে একটি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি চোখ বুজে আমার অন্তরে এই নব-উন্মেষিত প্রাণের বেদনা অনুভব করতে লাগলুম।"

দেখা গেছে যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সঙ্গীতময়। এই মনোরম সঙ্গীতধর্ম যৌথিক ভাষার গদ্যেও যে শোনা যায়, তার সহস্র প্রমাণ আছে। আধুনিক বাংলা গদ্যে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫২) বিরচিত শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধাবলী থেকে:—

"বর্ষায় মেঘ নীল পাহাড়ের রং ধ'রে এল, শরতের মেঘ সাদা ঐরাবতের যাদুকা পালকের সাজে সেজে দেখা দিলে, কচি পাতা নতুন গুড়না উড়িয়ে এল বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়ে এল জলের উপর দিয়ে, কিন্তু এদের এই অপরূপ সাজ দেখবে যে সেই মানুষ এল নিরাভরণ, নিরাবরণ।"

এই তুলনা সাধুভাষায় দিয়েও। এর পর যদি কেউ বলেন, চলতি ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না, তাহলে বুঝতে হবে, এখানে রুচির তারতম্যই সত্যের স্বীকৃতি দানে প্রতিবন্ধক, অন্য কোন কারণ নয়।

বাঙালি মুসলমানের লেখা চলতি ভাষাতেও যে কি পরিমাণ তৎসম শব্দ থাকতে পারে, তার একটু নজির দেখলে বোঝা যাবে যে, চলতি ভাষাতেও সাধুভাষার প্রকৃত সম্পদ্ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের অফুরন্ত ঐশ্বর্য অনায়াসে আহরণ করে নিতে পারে। সাধুভাষার সার নির্যাস এইভাবে আত্মস্থ করা কথ্যভাষার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছেন:—

"তাই মনে হয়, যিনি বঙ্গ ভাষের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্ব রস বিলে দিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় নামহারার অভূতপূর্ব শান্তি এসে যেত। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী ধীচার আলস্য লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্যবিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে, কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি—লোকসমাজকে সম্পূর্ণ পুনরুক্ত করতে নিষেধন করতে পারেননি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে-বেদনা প্রকাশ করেছেন লোকে আতুর না হয়ে, স্বার্থান্ধ এবং পাপ্ত রূপে সমাহৃত হয়ে।"

এই রচনা বিষয়ানুগ চলিত ভাষার সংস্কৃত শব্দগ্রহিতা ও শব্দ-গ্রহণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

১৯১৭ সালে প্রকাশিত "বীরবলের হালখাতা"-র "কথার কথা" প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী তাঁর অভিমত এইভাবে ব্যক্ত করেন:—

"আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষার আর মুখের ভাষার মূলে কোন প্রভেদ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একটির সাহায্যে, অপরটির অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত—কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।...যে কথাটা নিতান্ত বলিলে নয়, সেটি যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পারো। কিন্তু তার বেশি কিছু, যার কিম্বা চুরি করে এনো না।"

এই প্রবন্ধটি ১৯১৭ সালে প্রথম লেখা হয়। এতে স্বামীজির কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, ভাষা যত বেশি লোকের বোধগম্য হবে, ততই ভালো। সেইজন্যে লৌকিক ও যৌথিক ভাষার প্রভেদ স্বীকার করেও তিনি কথ্যভাষার অনুকূলে রায় দিয়ে গেছেন। বিবেকানন্দ ও বীরবলও এক মতের সমর্থক। তবে একটা ব্যাপার বোধহয় চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্য করেননি। ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, এ কথা লাখ কথার এক কথা বটে, কিন্তু ভাষা আবার কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে যায়, এ কথারও নড়চড় নেই। এ বিষয়ে পরিশিষ্ট অংশে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

কথ্যভাষায় লেখা সুরু করা মাত্রই যে বাঙালি গদ্যলেখকেরা উপযুক্ত অনুপাতজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই চলতি ভাষার লেখা চতুর্থশ্রেণির সাধুভাষার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বয়ং বীরবলও ভুল করেছেন; খাঁটি চলতি ভাষায় "মহিলে" অচল; তবুও তিনি ঐ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ "শেষের কবিতা" উপন্যাসে "যাবনা"-র মত প্রচলিত উচ্চারণদ্যোতক বানানও ব্যবহার করেছেন কেবল যৌথিক ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রচনার খাতিরে। বাংলা গদ্যভাষার এই পর্যায় এখনও অনেক তাড়াগড়া চলছে। তারপর এখন একটা মাত্রাজ্ঞান গড়ে তোলা যাবে যার জোরে কোন কালো লেখকের লেখা আর শুধু যে একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থেকে বিচ্যুত হবে না তাই নয়, ঠিক কোন্ অনুপাতে কোন্ জাতের শব্দ আর তার প্রয়োগকৌশল গ্রহণ করতে হবে, সে-সম্বন্ধেও লেখকদের একটা সহজবোধ দেখা যাবে।

সমাপ্ত

শেষ রক্ষা

শ্রীগোপী ভট্টাচার্য

(সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। বনমালির আপ্যায়নপাত্রের ধুলা পরিষ্কার করিতেছে। কলিংবেল বাজিয়া উঠিল। বনমালী দরজা খুলিতে ভূধরবাবু প্রবেশ করিলেন।)

ভূধর। তোমার নামটা কি যেন বললে—

বনমালী। আজ্ঞে, বনমালী। পদবী হোল গে' মালাকার।

ভূধর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বনমালী মালাকার। খাসা নাম বটে তোমার। কিন্তু, তা যেন হোল বনমালী, এখন আমি কি করি বলতো।

বনমালী। আজ্ঞে, আপনার প্রয়োজনটা যদি খুব জরুরী হয়। তাহলে নয় অপেক্ষা করেই যান।

ভূধর। কিন্তু, তুমি যে আবার বলছ, গাঙ্গুলী মশাই কখন ফিরবেন তা বলে যান নি।

বনমালী। আজ্ঞে, সেটা ঠিক। এখুনি ফিরতে পারেন। আবার দু'ঘণ্টা নাও ফিরতে পারেন। তা আপনার কি আসবার কথা ছিল?

ভূধর। আজ সকালেই ফোনে কথা হয়েছে। ছ'টায় আসতে বলেছেন। (হাতঘড়ি দেখিয়া) অবশ্য ছ'টা এখনো বাজেনি। বাকি আছে দু' তিন মিনিট।

বনমালী। তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন। বাবু ঠিক ছ'টায় এসে যাবেন। একটুও এদিক সেদিক হবে না।

ভূধরবাবু সোফায় বসিলেন। বনমালী পাখা খুলিয়া দিল। নেপথ্যে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। বনমালী ছুটে বাহিরে গেল। রাজীব গাঙ্গুলী ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পরিধানে সাহেবী-পোষাক। বয়স ষাট হইলেও বেশ স্মার্ট চেহারা।

রাজীব। আপনি···

ভূধর। ভূধর ভট্টাচার্য। সকালে আমিই ফোন করেছিলাম।

রাজীব। নমস্কার—

ভূধর। নমস্কার। আপনাকে দেখছি ছুটির দিনেও কাজে বেরোতে হয়।

রাজীব। সবই ছিল মশাই। ছুটিও ছিল, কাজের মর্যাদাও ছিল। যাদা চামড়ার আমলে ও দুটোর খুবই মূল্য ওরা দিত। এখন সব বিদেশী মালিক। বন্ধুর পায়ে খাটিয়ে নেয়।

ভূধর। তা যা বলেছেন। অযোগ্য সরকার হলে যা হয়।

রাজীব। সরকারকে দোষ দেওয়াই আমাদের কাজ। সরকার তো আমাকে আপনাকে নিয়েই। আসলে গলদ আমাদেরই। ন্যায়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলতা, ভদ্রতা—এসব কি আর গভর্ণমেণ্ট শিখিয়ে দিতে পারে! নিজেদেরকে শিখতে হবে। তা যদ্দিন না হোচ্ছে, তদ্দিন আমাদের উন্নতির কোন আশাই নেই। যাক্ এসব। এখন বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

ভূধর। আপনি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরলেন। একটু নয় ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করে আসুন। আমি অপেক্ষা করি।

রাজীব। না ভূধরবাবু, তার দরকার হবে না। আমি কাজ ভালোবাসি। জীবনে দুটো জিনিস আমার কাছে বড়। কাজ আর সময়। বিশ্রাম তো আছেই। চির বিশ্রাম···

ভূধর। এসব কি বলছেন। আপনি যে রকম সময় ধরে চলেন, তাতে আপনার জীবন খুব দীর্ঘ হবে—সন্দেহ নেই।

রাজীব। ও অভিশাপ আর দেবেন না মশাই। যেদ্দিন বাঁচার মত পাপ আর নেই। এখন বাকি কর্তব্য শেষ করতে পারলেই আমার ছুটি।

ভূধর। তার জন্য এত ভাবছেন কেন গাঙ্গুলীমশাই?

রাজীব। আপনি তো আমার সব জানেননা ভূধর-বাবু। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে আমি। কি প্রচণ্ড অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের ফলে আজ যাহোক একটু দাঁড়াবার মত ঠাঁই করেছি। স্ত্রী গেছেন সে প্রায় দশ বছর হোল। এক মেয়ে আর এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে গত বছর দিয়েছি। ছেলেকেও মানুষ করেছি।

এখন তার বিয়ে দিলেই সব কর্তব্য শেষ হয়। চাকরীও আর বছরখানেক আছে। তারপর বিশ্রাম···হয়ত চির-বিশ্রাম নিতে হবে আমাকে।

ভূধর। সত্যি, আপনাকে দেখে অনেক শেখবার আছে। কাজ আর সময়ের দাম দিতে পারলে মানুষ যে উন্নত হোতে পারে, তার জলন্ত সাক্ষ্য আপনি।

রাজীব। তাহলে, আপনার সাথে আলোচনাটা শেষ করা যাক। ফোনে আপনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমার মনে আছে। সঞ্জয় আমার একমাত্র ছেলে। কদিন হোল জার্মানী থেকে ফিরেছে ডক্টরেট নিয়ে। আপাততঃ কিছুদিন প্রফেসরি করবে ঠিক করেছে।

ভূধর। আমার মেয়েটিকে যদি দয়া করে নেন, তাহলে কৃতার্থ হব আমি। আমারও ওই একমাত্র মেয়ে।

রাজীব। মেয়ে আমি এতদিনে অনেক দেখলাম ভূধরবাবু। আরো অনেকে ধরাধরি করেছেন মেয়ে দেখবার জন্য। কিন্তু একজনকেও আমার মনে ধরছে না। বরং এখনকার মেয়েদের চেহারা দেখে আমার তো আশংকা হোচ্ছে, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের এঁরাই যদি জননী হন, তাহলে জাতির স্বাস্থ্য বলতে বোধহয় কিছু থাকবে না।

ভূধর। আমার মেয়েকে যদি আপনি একটিবার দেখেন, আশা করি আপনার অপছন্দ হবে না। তবে ফটোও এনেছি। দেখবেন কি?

ললিতের প্রবেশ। ছিপ্‌ছিপে চেহারার সৌখীন যুবক।

রাজীব। এসো ললিত।

ললিত। মামাবাবু, আমি এলাম আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। জানেন তো বাবাকে? কি রকম ব্যস্ত-বাগীশ মানুষ? কিন্তু একি! আপনি তো এখনো অফিসের্ পেসেই রয়েছেন। এদিকে সাতটা বাজে।

রাজীব। কীর্তন তো সেই আটটায়। তা এত আগে গিয়ে করব কি। (ভূধরবাবুকে) ললিত, আমার ভাগ্নে। আজ ওদের বাড়ীতে আসছেন এক নাম-করা কীর্তনীয়া। সারারাত শোনাবেন। আমারও নিমন্ত্রণ।

ললিত। আরে স্যার যে! এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। মামাবাবুর সাথে আপনার পরিচয় আছে তাতো জানতাম না।

রাজীব। কি রকম! এঁকে তুমি চেনো নাকি ললিত?

ললিত। বাঃ! ছটিশে যে এঁর কাছে আমি পড়েছি।

ভূধর। তোমায় অনেকদিন পরে দেখে খুব আনন্দ হোল ললিত। জানেন গাঙ্গুলীমশাই, ললিত আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। এখন কি করছ বাবা তুমি?

ললিত। আসছে বার আই, এ, এস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি।

ভূধর। বেশ! বেশ! আশীর্বাদ করি সফল হও। তাহলে আজ আর আপনার সময় নষ্ট করব না গাঙ্গুলী-মশাই। বরং কাল ছ'টার সময় একবার আসবো। মনে রাখবেন একটু আমাকে। চলি বাবা ললিত। আসি গাঙ্গুলীমশাই।

নমস্কার বিনিময় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ভূধরবাবু। ললিত ভূধরবাবুর পায়ের ধুলা লইল।

ভূধর। তুমি তো আমার বাড়ীতে আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছ ললিত। বাড়ীতে প্রায়ই বলে তোমার কথা। পারোতো কাল সকালে একবার বেড়িয়ে যেওনা।

ললিত। নিশ্চয়ই যাবো। চলুন স্যার, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভূধরবাবু ও ললিতের প্রস্থান

রাজীব গাঙ্গুলী চেয়ারে বসিয়া ছাই তুলিতে লাগিলেন। টেলিফোন বাজিল। রাজীব গাঙ্গুলী রিসিভার তুলিয়া কথা বলিতে লাগিলেন—শুধু শেষ কথাটা শোনা গেল।

রাজীব। একটা জায়গায় কথাবার্তা চলছে। সেখানে একটা কিছু ফাইনাল্ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে কোন হোপ্ আমি দিতে পারলাম না মিঃ মুখার্জী। আশা করি আপনি দুঃখিত হবেন না। ধন্যবাদ।

রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন। ললিত আসিল।

রাজীব। শোন ললিত, তুমি এসে দেখছি ভালোই করেছ। ভূধরবাবু এসেছিলেন তাঁর মেয়ের সাথে সঞ্জয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তুমি তো জানো, এতদিন মেয়ে দেখে দেখে আমি কিরকম টায়ার্ড হয়ে গেছি?

তাই আগের থেকে ডেফিনিট্ না হোয়ে মেয়ে আর দেখব না ঠিক করেছি। কথায় বুঝলাম, তোমার ও বাড়ীতে যাতায়াত আছে। ভূধরবাবুর মেয়েটি কেমন?

ললিত। চমৎকার! আইডিয়াল! ওরকম মেয়ে সাথে একটা হয় কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভূধরবাবুর মত হাসিখুসিমিলী কোলকাতা শহরে খুব কমই দেখেছি।

রাজীব। তুমি যে দেখছি তোমার প্রফেসরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যাই হোক, তোমার ওপিনিয়নের ওপর আমার ঢের আছে। তুমি যখন সার্টিফাই করছ তখন ভূধরবাবুর প্রোপোজালটা এক্সেপ্ট করব ভাবছি। ভদ্রলোককে আমার খুবই ভালো লেগেছে।

ললিত। আমি শুধু ওঁর ছাত্র নই। ছেলের মত।

রাজীব পাতুলী খস্ খস্ করিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন তাহার পর খামে ভরিয়া ললিতের হাতে দিলেন।

রাজীব। তুমি এই চিঠিখানা ভূধরবাবুকে দেবে। আমার মন স্থির করে ফেলেছি। সঞ্জয়ের বিয়ে আমি এখানেই দোব। পরশু মঙ্গলবার পূর্ণিমা। ভূধরবাবুকে বলবে, তিনি যেন ওদিন ছেলে-আশীর্বাদের জন্ত তৈরী হয়ে আসেন।

ললিত। কিন্তু মামাবাবু, ফাইনাল্ করার আগে মেয়েটিকে একবার নিজের চোখে দেখবেন না?

রাজীব। তার আর আবশ্যক নেই। তুমি সার্টিফাই করছ এতেই আমার দেখা হোয়ে গেছে।

ললিত। কিন্তু সঞ্জয়দা? তার একটা মতামত?

রাজীব। কি বললে ললিত? হোতে পারে এটা বিংশশতাব্দীর মাঝামাঝি। ছেলে কন্টিনেন্ট্ ফেরত, উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু তার চরিত্র আমি তেমনভাবে গড়িনি যাতে করে আমার মতের ওপর তার কোন অমত থাকতে পারে।

ললিত। কিন্তু তাহলে সঞ্জয়দার যদি কোন···

রাজীব। আমাকে আবার এখুনি তোমাদের বাড়ীতে যাবার জন্তে তৈরী হোতে হবে। আমি যখন নিজের হাতে পাকা কথা লিখেছি, তখন জানবে সঞ্জয়ের বিয়ে এখানেই হবে। তার মতামতে আমার কিছু এসে যাবে না।

রাজীব পাতুলী বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। ললিত চিঠিখানি হাতে লইয়া পায়চারী করিতে লাগিল। সঞ্জয়ের প্রবেশ। ধুতি, পাঞ্জাবী পরিহিত সুদর্শন যুবক। মুখে হাসির রাশ।

সঞ্জয়। হ্যালো! ললিত যে! কখন এলি?

ললিত। অনেকক্ষণ। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে?

সঞ্জয়। ইউনিভার্সিটিতে একটু কাজ ছিল। বাবাকে নিতে এসেছিস্ বুঝি?

ললিত। হ্যাঁ। তুমিও চলো না?

সঞ্জয়। আজ নয় ভাই, আরেকদিন যাবো। তাছাড়া কেত্তন শোনার বয়স আমার এখনো হয়নি। তোর হাতে কার চিঠি রে ললিত?

ললিত। চিঠি নয়, ফাঁসির পরোয়ানা।

সঞ্জয়। কার?

ললিত। তোমার।

সঞ্জয়। কি রকম? অপরাধী জানিল না বিচার হইয়া গেল···

ললিত। সময়ে সবই জানতে পারবে। আমি কিছুই বলবনা।

সঞ্জয়। ললিত! কি রোক্ করছিস্? সত্যি বলনা, ব্যাপারখানা কি?

ললিত। বললাম তো। চোরের মন বোচকার দিকে। তুমি যা ভেবেছো তা তুমি করতে পাবে না। ব্যস্! আর কিছু জানতে চেওনা।

সঞ্জয়। ললিত! প্রীজ্! আমি টু টায়ার্ড! আমাকে আর সাস্‌পেন্সের মধ্যে রাখিস নে। বল আমাকে ভাই। আমার সম্বন্ধে কিছু ব্যাপার কি? আই মীন্ এনিথিং রিগার্ডিং মাই ম্যারেজ্?

ললিত। তুমিও কি আজকাল মামাবাবুর মত জ্যোতিষচর্চা করছ নাকি? মানুষের মনের কথা বেশ ধরতে শিখেছ দেখছি। বেশ, তবে শোন! তোমার বিয়ের কথা একেবারে পাকা হয়ে গেছে। সুতরাং বী রেডি।

সঞ্জয়। কি বলছিস্ যা তা! বিয়ে করব আমি, আর আমিই তার কিছু জানিনা। যদিও আমার এখনো

বিশ্বাস হচ্ছেনা। কিন্তু যদি তোর কথাই সত্যি হয়, তাহলে বলব এ অত্যন্ত অন্যায়। আমাকে যদি বাবা একটা পুতুল ভেবে থাকেন তাহলে তিনি ভুল করেছেন। আই মুভ্ প্রোটেষ্ট্। আই ষাষ্ট্…

রাজীব গাঙ্গুলী প্রবেশ করিলেন। পরিধানে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী কাঁধে পাট করা চাদর। পিছনে বনমালীর হাতে ঘড়ি।

রাজীব। চল ললিত। আমি রেডি। ওরে বনমালী, দেখ বাবা গাড়ী বার করেছে কিনা।

বনমালী। আজ্ঞে বাবু, গাড়ী অনেক আগেই বেরিয়েছে।

রাজীব। সঞ্জয় কি এইমাত্র ফিরছ?

সঞ্জয়। (অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে) হাঁা বাবা। কালই প্রেসিডেন্সীতে জয়েন্ করতে বলছে।

রাজীব। খুব আনন্দের কথা। আচ্ছা, ডিটেলস্ রাত্তে শুনবো। তোমাকে এখন টায়ার্ড দেখাচ্ছে। যাও রেষ্ট্ নাওগে। (সঞ্জয়ের কাঁধে হাত রাখিয়া) হাঁা, একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি। পরশু মঙ্গলবার তোমাকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। বাড়ীতেই থেকো। সঞ্জয়। (অসহায়ভাবে) বাবা! তুমি কি একেবারে ফাইনাল্ মানে সেটল্…

রাজীব। (দৃঢ়ভাবে) বার্লিন থেকে ডক্টরেট নিয়ে এসেছ বলে ভুলে যাচ্ছো কেন—তুমি রাজীব গাঙ্গুলীর ছেলে! ডোণ্ট্ বী সিলি মাই বয়। চল ললিত।

যাইবার মুখে ললিত সঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ করিল। ইহা রাজীব গাঙ্গুলী দেখিতে পাইলেন না। রাজীব গাঙ্গুলীর সহিত ললিত ও বনমালী প্রস্থান করিল। মোটরের শব্দ শোনা গেল। সঞ্জয় সোফায় বসিল। বনমালী আসিয়া দরজা বন্ধ করিল ও ভিতরে চলিয়া গেল। সঞ্জয় ঘরের আলো নিভাইল।

মঞ্চ অন্ধকার। অল্প পরেই কলিং বেল বাজিল। বনমালী আসিয়া আলো জ্বালিল। দেখা গেল সঞ্জয় টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। বনমালী দরজা খুলিতে শুভ্রা প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ২০। অত্যন্ত সুশ্রী আর স্মার্ট মেয়ে। এখন তাহাকে খুবই চঞ্চল দেখা গেল।

শুভ্রা। বনমালী, তোমার দাদাবাবু…

বনমালী ইসারায় দেখাইয়া দিল। শুভ্রা সঞ্জয়ের নিকট অগ্রসর হইল। বনমালী মুচ্‌কি হাসিল। দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শুভ্রা। (সঞ্জয়ের মাথায় হাত দিল) সঞ্জয়! সঞ্জয়!

সঞ্জয় ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় তাহার উপর দিয়া ঝড় বহিতেছে। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত শুভ্রাকে দেখিতে লাগিল।

শুভ্রা। আমাকে আসতে বলেছিলে, দেখ আমি এসেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না জানো তো? কি হয়েছে সঞ্জয়? কথা বলছো না যে? শরীর খারাপ?

সঞ্জয় আগের মতই চাহিয়া রহিল। শুভ্রা তাহার মাথা বুকের কাছে টানিল।

শুভ্রা। ওগো! চুপ করে থেকো না! কথা বল?

সঞ্জয় আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল

সঞ্জয়। বিদ্রোহ… বিদ্রোহ…

শুভ্রা। কিসের বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে?

সঞ্জয়। প্রেমকে যারা স্বীকার করে না, মূল্য দেয় না, আমাদের বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধে। সেই সব বিগত শতাব্দীর অভিভাবকসুলভ মনোবৃত্তিধারী গার্জেনদের বিরুদ্ধে।

শুভ্রা। তোমাকে কেমন এ্যাব্‌নর্মাল্ মনে হোচ্ছে। এমন অস্থির হোতে তোমায় তো কখনো দেখিনি। আমাকে সব খুলে বল সঞ্জয়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সঞ্জয়। প্রবল প্রতাপান্বিত পিতৃদেব একটু আগেই আমার ওপর হুকুম জারী করেছেন…পরশু আমার আশীর্বাদ। এ বিষয়ে আমার যে কিছু মতামত থাকতে পারে সেটা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেও আনেন নি।

শুভ্রা। ও—এই ব্যাপার? এ তো সুসংবাদ। কোই, তোমার আশীর্বাদে আমাকে আসতে বললে না তুমি?

সঞ্জয়। এটা রসিকতার সময় নয় শুভ্রা। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলে আমাদের বেঁচে থাকা মিথ্যে…এটা তুমিও জানো, আমিও জানি।

শুভ্রা। কিন্তু, এর জন্যে এত বিচলিত কেন তুমি?

সঞ্জয়। হবো না? আমাদের জীবনে এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হোতে পারে?

শুভ্রা। স্বীকার করি। কিন্তু তোমার বাবাকে তুমি আগের থেকেই এত ইন্‌ফ্লিডারেট ধরে নিচ্ছ কেন?

সঞ্জয়। আমার বাবাকে তুমি জানো না। পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে তাঁর কথার দাম অনেক বেশী।

শুভ্রা। তাঁকে বলেছিলে আমাদের কথা?

সঞ্জয়। তাঁর সামনে কিছু বলার মত স্পর্ধা আমার নেই। আমাকে তুমি সাহস দাও···শক্তি দাও শুভ্রা।

শুভ্রা। একটা কথা বলব?

সঞ্জয়। একটা কেন অনেক বল···

শুভ্রা। দুঃখ পাবে না?

সঞ্জয়। তেমন কিছু বলবে না, তা আমি জানি।

শুভ্রা। তাহলেও আমাকে বলতে হবে। মনে আছে তোমার? বার্লিন যাবার আগে আমায় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে? ফিরে এসেই আমাকে বিয়ে করবে? আমার মনে হয় তুমি শুধু প্রতিশ্রুতি ভেঙে যাবার ভয়েই এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছ। বল? তাই নয় কি?

সঞ্জয়। আমি আর একজনকে বিয়ে করলে তুমি কি এটুকু বিচলিত হবে না?

শুভ্রা তাহাকে ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া প্রতিবাদ জানাইল। সঞ্জয় শুভ্রার দুই বাহু কাঁধে টানিয়া নিল।

সঞ্জয়। তুমি কি আমায় সুবোধ বালকের মত আমার বাবার হুকুম মেনে নিতে বল? শুভ্রা···শু···

শুভ্রা সঞ্জয়ের বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিল, তাহার পর নিজেকে সংযত করিল।

শুভ্রা। তোমার বিপদটাই আজ বড় করে দেখছো। এদিকে আমারও যে বিপদ। আজই শুনলাম কোথায় নাকি আমার বিয়ের কথাবার্তা এক রকম ঠিক হোয়ে গেছে।

সঞ্জয়। অভিভাবকদের খেয়াল-খুসির হাত থেকে আমাদের বাঁচতেই হবে।

শুভ্রা। সব কিছুর জন্যেই আমি তৈরী করেছি নিজেকে।

সঞ্জয়। শোন শুভ্রা, পরশু আবার আশীর্বাদ। সে-দিনই আমরা আশীর্বাদ নেব বাবার কাছ থেকে। এসো আমার সঙ্গে। ভেতরে বসে একটা প্ল্যান্ ঠিক করে নি। বাবার ফিরতে এখন অনেক দেরী আছে।

সঞ্জয় ও শুভ্রার অন্দরে প্রস্থান

মুহূর্তক পরেই বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। কলিংবেল বাজিল। বনমালী হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

বনমালী। সর্বনাশ! বাবু! হে মা কালী! এখন কি করি।

হঠাৎ তাহার মাথায় কি বুদ্ধি আসিল। দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। রাজীব গাঙ্গুলীর প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকিয়া সোফায় বসিলেন ও পাইপে অগ্নি সংযোগ করিলেন। বনমালীর দ্রুত প্রবেশ।

বনমালী। বাবু! বাবু! গারেজ ঘর থেকে ভীষণ ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বোধ হয় আগুন লেগেছে। শীগগির আসুন বাবু!

রাজীব। আগুন! গ্যারেজ ঘরে! তাইতো ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি বটে! সঞ্জয়···সঞ্জয় কোথায়?

বনমালী। দাদাবাবু ঘুমোচ্ছেন। শরীর খারাপ, তাই আর ডাকিনি।

রাজীব। এতক্ষণ তবে কি করছিলি হতভাগা! ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করতে পারিসনি! (টেলিফোনের নিকট যাইতেই)

বনমালী। বাবু, তেমন কিছু নয়। আমরাই নিভিয়ে দিতে পারবো। আপনি শুধু একবার দেখবেন আসুন বাবু।

রাজীব। চল্ হতভাগা···

(বনমালী ও রাজীব গাঙ্গুলী বাহির হইয়া গেলেন। মুহূর্তপরেই বনমালী দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিল এবং ভিতরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বনমালীর পিছন পিছন শুভ্রা ও সঞ্জয় প্রবেশ করিল।)

বনমালী। শীগ্‌গির চলে আসুন দিদিমণি। বাবু দেখলে আর রক্ষে রাখবেন না। অনেক বুদ্ধি করে বাবুকে সরিয়েছি।

শুভ্রা। স্বয়ং বনমালী আমাদের সহায়। আর ভাবনা কিসের!

বনমালী। (চকিত হইয়া) আর দাঁড়াবেন না দিদি-মণি। বাবু এখনি এসে যাবেন।

নেপথ্যে রাজীব গাঙ্গুলীর গলা শোনা গেল—"বনমালী! বনমালী! ওই বাবু এসে পড়লেন বলে। দোহাই দাদাবাবু। তোমার পায়ে পড়ি বাবুকে। তুমি বুঝোও গে যাও। আহুন বিবিমণি……

সঞ্জয়। পরশু আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি একটুও দেরী কোর না।

শুভ্রা সম্মতি জানাইল ও বনমালীর সহিত দ্রুত প্রস্থান করিল। রাজীব গাঙ্গুলী চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে প্রবেশ করিলেন। পিছনে বনমালী।

রাজীব। হতভাগা! গ্যারেজ ঘরে বিচুলি রাখতে কে বলেছিল শুনি। জানোয়ার কোথাকার! যা আরো দু' বাল্‌তি জল ঢেলে দিগে যা—আর শোন, ডাঃ সেনগুপ্তকে আমি ফোনে বলে দিচ্ছি। তুই এখুনি গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়—

বনমালী। দাদাবাবুর অসুখ ভালো হয়ে গেছে বাবু। একটু আগেই দাদাবাবু বললেন—সব অসুখ সেরে গেছে—

রাজীব। এর মধ্যে আবার দাদাবাবুর অসুখও ভালো হোয়ে গেল? যা খেতে দিতে বল্। সঞ্জয়—সঞ্জয়—

রাজীব গাঙ্গুলী ও বনমালীর প্রস্থান

কিছুক্ষণ সব অন্ধকার। তাহার পর আলো জ্বলিল। বনমালী প্রবেশ করিয়া আসবাবপত্রের ধূলা পরিষ্কার করিতে লাগিল। হঠাৎ ডেট ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া।

বনমালী। আ আমার পোড়াকপাল। সন্ধ্যে হোতে চলল এখনো তারিখটা পালটাইনি?

ডেট ক্যালেণ্ডারের তারিখ পালটাইল। বেজা গেল "Tuesday 12 Sept." কলিং বেল বাজিল। বনমালী দরজা খুলিতেই ভূধরবাবু ও অবিনাশবাবু প্রবেশ করিলেন।

ভূধর। এই যে বনমালী মালাকর। গাঙ্গুলীমশাই কোই?

বনমালী। আজ্ঞে আপনারা বসুন। বাবু ভেতরে আছেন।

ভূধর। এসো অবিনাশদা—

ভূধরবাবু ও অবিনাশবাবু বসিতেই ললিত প্রবেশ করিল।

ললিত। স্যার, আপনারা কি এইমাত্র এলেন? মামাবাবুকে দেখছি না যে?

ভূধর। আমরা মিনিটখানেক হল এসেছি। তোমার মামাবাবু ভেতরে। সময়ের মানুষ তো। ঠিক সময় অবশ্য এখনো হইনি। তাহলেও বাবা ললিত, তুমি একবার ভেতরে গিয়ে গাঙ্গুলীমশাইকে জানিয়ে এসো।

ললিত। এখুনি মামাবাবুকে খবর দিয়ে আসছি স্যার।

ললিত অন্দরে প্রস্থান করিল।

অল্পপরেই রাজীব গাঙ্গুলী ও ললিতের প্রবেশ। নমস্কার বিনিময়ের পর।

রাজীব। (অবিনাশবাবুর দিকে চাহিয়া) আপনার সঙ্গে তো পরিচয়…

ভূধর। শ্রীঅবিনাশ ঘোষাল। আমার বড় সম্বন্ধী। রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্। এখন মধুপুরের বাড়ীতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

অবিনাশ। আপনার সাথে পরিচিত হোয়ে খুব আনন্দ পেলাম মিঃ গাঙ্গুলী। কাজকর্ম মিটে গেলে একবার আসুন না আমার মধুপুরের বাড়ীতে। দেখবেন কেমন গোলাপ ফুলের চাষ করেছি সেখানে।

ভূধর। হ্যাঁ, বলতেই ভুলে গেছি। অবিনাশদা এখন হাতে কলমে ফুল-চাষা হয়েছেন।

একথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বনমালী ভিতরে গিয়া ট্রেতে চার সরবতের লইয়া আসিল। ললিত তা তাহাদের পরিবেশন করিল।

রাজীব। ও ললিত! এ কাজটা বনমালীই করে দিচ্ছে। তুমি বরং একবার ভেতরে গিয়ে সঞ্জয়কে ডেকে নিয়ে এসো। আর দশমিনিট পরেই আশীর্বাদ আরম্ভ করতে হবে।

ললিত ভিতরে গেল ও অল্পক্ষণ পরেই চিন্তিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ললিত। মামাবাবু! সঞ্জয়দা ভেতরে নেই। কোথাও নেই।

রাজীব। কি বলছ ললিত! সে জানে আজ তার আশীর্বাদ। না না—দেখো ভালো করে ভেতরেই আছে, সে—সঞ্জয়—সঞ্জয়—ওরে বনমালী তুই একবার দেখে আয়—

বনমালীর তৎক্ষণে চা ছাকা হইয়া গিয়াছে। সে ভিতরে গেল। ললিত ঘরের এক কোণে নিলিপ্তের মত বসিয়া ম্যাগাজিন দেখিতে লাগিল। বনমালী প্রবেশ করিল। সে কাঁপো কাঁপো স্বরে বলিল—

বনমালী। দাদাবাবু নেই—

রাজীব। নেই কিরে! গেলো কোথায় সে। এখানে আর কোথায় সে যায় জানিস তুই?

ললিত। না মামাবাবু, সঞ্জয়দা বেড়াতে গেলে এক আমাদের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও যায়না। আমি তো বাড়ী থেকে এই মাত্র আসছি। সঞ্জয়দা সেখানে যায়নি।

রাজীব। তাহলে গেলো কোথায় সে? ভদ্রলোকেরা এসেছেন—আজ তার আশীর্বাদ। সে কি আমাকে বেকুফ বানাতে চায়? পাঁচজনের কাছে অপদস্থ করতে চায়?

ভূধর। আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন গাঙ্গুলী-মশাই? হয়তো আশেপাশে কোথাও গেছে। এখুনি এসে যাবে।

রাজীব। বার্লিন য়ুনিভার্সিটির ডক্টরেট। একটা রেস্পন্সিবিলিটি জ্ঞান থাকা উচিত। এদিকে সময় যে হয়ে এলো। ওরে বনমালী, ধানদুর্বার রেকাবীটা নিয়ে আয়।

বনমালীর প্রস্থান

ভূধর। হ্যাঁ, আমরা বরং ততক্ষণ আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখি। সঞ্জয় বাবাজী ফিরলেই কাজ সুরু করা যাবে।

ভূধরবাবু পকেট হইতে একটি মখমল বাক্স বাহির করিলেন ও তাহা খুলিয়া রাজীব গাঙ্গুলীকে দেখাইলেন।

রাজীব। এ যে হীরের বোতাম। এসবের কি দরকার ছিল।

অবিনাশ। বাবাজী যে হীরের টুকরো। তাকে হীরের বোতাম না দিলে বেমানান হবে যে মিঃ গাঙ্গুলী।

বনমালী ধান দুর্বার রেকাবী আনিল। ঠিক সেই সময় শুভ্রা ও সঞ্জয় প্রবেশ করিল।

রাজীব। এসো সঞ্জয়। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। যাই, কোয়ার্টার টু সিক্স্। নিন আরম্ভ করুন ভূধরবাবু।

ভূধরবাবু স্থির হইয়া শুভ্রার দিকে চাহিয়া আছেন। শুভ্রাও তাই। ললিত ও বনমালী অতিকষ্টে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। সঞ্জয়ের বেপরোয়া ভাব।

সঞ্জয়। হ্যাঁ, আশীর্বাদই আমরা নিতে এসেছি। একটু আগেই আমাদের বিবাহ রেজিষ্ট্রী হোয়ে গেছে। এসো শুভ্রা, আর আমাদের ভয়টা কিসের!

রাজীব। (ফাটিয়া পড়িলেন) ইডিয়ট্ রাস্কেল্··· এই শিক্ষা তুমি নিয়ে এসেছ বার্লিন থেকে? আমাকে তুমি অপদস্থ করতে চাও? কোথাকার কোন লোফারের মেয়েকে ধরে এনে আমার সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা করছে না? তোমার পছন্দটাই বড়···আমার প্রেষ্টিজটা কিছু নয়? গেট্ আউট্! গেট্ আউট্! আমার ছেলে নেই—আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই। তবে জেনে যাও আমার কথার দাম আমি ঠিকই দেবো। আজ তোমার বদলে আমি ললিতের আশীর্বাদ করব। এসো ললিত। নিন ভূধরবাবু, আশীর্বাদ করুন ললিতকে। বনমালী, ওদের ঘাড় ধরে বার করে দে—

ললিত। মামাবাবু! এই শুভ্রা, ভূধরবাবুর একমাত্র মেয়ে। আপনি যে মেয়ের সাথে সঞ্জয়দার বিয়ের ঠিক করেছেন এ সেই শুভ্রা।

ভূধর। (বিস্মিত ও আনন্দিত স্বরে) শুভ্রা···মা আমার···আমি যে তোর বিয়ে এখানেই ঠিক করেছিলাম···

শুভ্রার মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া গেল। ভূধরবাবু শুভ্রাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

অবিনাশ। "এ যে ছেড়ে দিয়ে হেড়ে ধরা" বড় মজার ব্যাপার···

অবিনাশবাবু হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন। রাজীব গাঙ্গুলী কি করিবেন ঠিক পাইতেছিলেন না। সঞ্জয় মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে

রাজীব। আর যেতে হবে না। লেখাপড়া শিখে একটা বাঁদর তৈরী হোয়েছেন। বলতে হয়তো আমাকে। এমন করে আমাকে বেকুফ না করলে হোত না?

সঞ্জয়। (কাঁদো কাঁদো স্বরে) আমি কি আগে জানতাম। (রাজীব গাঙ্গুলীর পায়ে ধরিয়া) আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর বাবা।

রাজীব গাঙ্গুলী সঞ্জয়কে উঠাইয়া দাঁড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর একদিকে সঞ্জয় ও আর একদিকে শুভ্রাকে ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

রাজীব। ভিক্টরী! ভিক্টরী! মাই ভিক্টরী!! বিংশ শতাব্দীর অলোকপ্রাপ্ত জীব! ভেবেছ আমাদের ওপর টেক্কা দেবে? সাধ্য কি তোমাদের! (হাসিয়া) ভূধর-বাবু, অবিনাশবাবু, আশীর্বাদ করুন শুভ্রা মা আর সঞ্জয়কে। প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করুন। এমন বৌমার জন্যেই আমি খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছি। ওরে ললিত, ওরে বনমালী—শাঁখ বাজা, জোরে জোরে শাঁখ বাজা—

(আনন্দ কোলাহলের মধ্যে পর্দা নামিল।)

আমাদের যুগ ও আজকের যুগ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন যে তিনি যদি কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করতেন তবে কি ব্যাপার হত :—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
হেথা হতেম যদি বসু নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি পেয়ে রাজার হাতে নিতাম ছেড়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কাননবেরা বাড়ি।
হেথায় তটে চাঁপার তলে সন্ধ্যা বসত সন্ধ্যা হলে
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে বিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
যৌবনতরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে॥

কালিদাস কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। সম্প্রতি কালিদাস-সংবৎ না হলে কালিদাসকে আমরা ভুলেই গেছি বলা যায়। আন্দাজ মত কালিদাস আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেকার লোক। সুতরাং তখনকার জীবনযাত্রার সঙ্গে এখনকারের যে তফাৎ থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে এখনকার কালে জন্মগ্রহণ করেও অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেও আমরা অপরাধের সঙ্গে একেবারে তফাৎ হয়ে গেছি। জীবন-যাত্রাও হয়ত হইনি, কেননা এখনো সেই ধনটার সময় আপিস যাওয়া, মফস্বলের উপর আসক্তি, হাতে কাজ না থাকলে চায়ের দোকানে আড্ডা জমানো এবং ঘুষে রাজা উজীর মারা প্রভৃতি আগের মতই আছে যেমন আমাদের সময় ছিল। কিন্তু আইডিয়ার রাজ্যে আমরা একেবারে বদলে গেছি অর্থাৎ আমাদের চিন্তাধারা এবং এখনকার যুগের চিন্তাধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে আলাদা। কেমন করে সেই কথাই বলছি। আর বৈদন্দিন জীবনযাত্রার কাঠামো ঠিক রেখে চিন্তাধারা বদলানো যে বেশি মারাত্মক সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

আমাদের সময়ে জীবনের আদর্শ ছিল—অন্তত আমরা যা আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলাম সে হচ্ছে—মানুষকে ভালবাসা, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা, শিক্ষকদের ভক্তি করা (আমাদের সময় শিক্ষিকা ছিলেন না বলেই হয়), দেশকে ভালবাসা, ধর্মকে ভালবাসা। এই আদর্শে যে সকলে পৌঁছতে পেরেছিলাম তা নয়, কিন্তু সেই পথে অগ্রসর হতে কোন বাধা ছিল না। এখন এগুলিকে আর আদর্শ বলে গ্রাহ্য করা হয় না। মুখে না বলেও ব্যবহারে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারও অপ্রতুলতা—মানুষের মন নাকি সংস্কারমুক্ত হবে—মানুষের মন কাচের টেবিলের মত ঝকঝক করবে (tabula rasa)—কারণ মনে সংস্কার থাকলে তার অগ্রগতির পথে বাধা হয়। ভূতের ভয় যেমন একটা সংস্কার, ছোট বেলা থেকে গল্প শুনে শুনে আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি; বাপ মাকে ভক্তি করা উচিত তাই। লোকের মুখে শুনে শুনে শিখেছি। গান্ধীর মহিমা কীর্তন শুনে শুনে শিখেছি। যারা এই কথা বলেছেন শুনে কোন কোন ছেলেকে এই যুক্তি প্রয়োগ করতে শুনেছি: কেন, বাবা কি ভুল করতে পারেন না। বাঃ, নিশ্চয়ই পারেন—কোন মানুষই ত পারফেক্ট (perfect) নয়। কিন্তু আমাদের আদর্শে বলতো যে বাবার ভুল ধরার হক ছেলের নেই! আর কেউ নিশ্চয়ই বলবে—তাঁরা শুরুজনেরা হয়ত বলবেন (যদি বেঁচে থাকেন) কিন্তু আমি নয়। বাবার বেলায় আমি বিচারকের আসন নেব না। তিনি আমার বাবা, তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন, এই পরিচয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি সেটা মানুষে এবং নির্বিবাদে মেনে মনে, তাঁর আদেশ পালনে ফলে, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। এই মনোভাব ছিল বলেই আমাদের সময় বাবা, কাকা, জ্যাঠা, মা—যে কেউ পাত্রী নির্বাচন করে এলে আমাদের বিয়ে করতে বাধতো না। কখনো মনে হত না যে পাত্রী কেমন হওয়া চাই আমার সে মনের কথা ত বাবা জানেন না, বাবা ভুল করে বসবেন। ভুল হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা করেও ছেন, কিন্তু আমার তাতে কিছু আসে যায় নি, আমার শাস্তি পুরু হয় নি, কারণ আমি মনে করেছি যে ভুল ত আমারও হতে পারতো, আমিও ত যে না নয় তাকে তাই বলে ভাবতে পারতাম।

আগে শাস্ত্রের উল্লেখ করেছি। বর্তমান যুগের যুবকদের মনের উপর আমাদের শাস্ত্র কোন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয় না। রামায়ণ আমাদের দেশের একখানি মহাকাব্য। এই মহাকাব্য বিভিন্ন বিভিন্ন-ভাবে কাহিনী আদর পেয়েছে। বহু যুগের উপর দিয়ে এর প্রভাবকাল বিস্তৃত, কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষের কাছে এর মধ্যে যে আদর্শ অনুসৃত হয়েছে তার মূল্য কমে গেছে। যে সীতাকে অগ্নি যুদ্ধ বিগ্রহের পর উদ্ধার করা হল, তাকে পুনরায় অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করার কল্পনা বা আদর্শ-প্রসূত সীতাকে ত্যাগ করা—এখনকার লোকের পক্ষে অবান্তর বলে গণ্য। রামচন্দ্র প্রজাদের এই অনুরোধে রাজী হওয়ায় কেউ কেউ বলেন যে, তিনি যথেষ্ট পরিমাণে পত্নী-বৎসল ছিলেন না, কেউ বলেন তিনি কাপুরুষ। বনবাস ফৈকেয়ীর নিকট নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যে রামচন্দ্রকে বনবাস নিলেন, তার মধ্যে অনেকে তাঁর পত্নী-প্রেমের অভাব বাড়াবাড়ি দেখেন। মোটকথা রামায়ণের যুগে এই সব আদর্শের যে মূল্য ছিল এবং আদর্শকে সত্য বলে মনে হতে যে মূল্য এখনো থাকার কথা, সেসব আজ আমাদের কাছে মূল্য নেই। এর অর্থ হল এই যে, হয় রামায়ণের আদর্শ সত্য নয়, তাই হওয়া সম্ভব কি, নয় ত আমরা পথ হারিয়েছি।

আদর্শ নিয়ে মূল্যের তারতম্য হওয়ার কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাব্যে এবং হিন্দু শাস্ত্রে যে বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সে হল—সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। সত্যই হল একমাত্র বস্তু যাকে সর্বক্ষেত্রে ধরে থাকতে হবে। সত্যই ভগবান। উপরে রামচন্দ্রের বা ধর্মরাজের যে উদাহরণ দেওয়া হল তার থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁরা সত্যের হাতে বন্দী। সত্যকে প্রাধান্য দিতে হবে—তার কাছে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন সব তুচ্ছ। এই আদর্শ ই সমাজের তারতম্য স্বীকার করে এসেছে—অন্য কোন শর্ট-কাট (short cut) নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য দেশে এবং সমাজে এই সত্য অস্বীকৃত হয়ে গেল। মানুষ যেন হঠাৎ পথের শেষে এসে গেল। জীবনে কোন আদর্শের বালাই নেই, যেন তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি করাই মানুষের অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়াল। End যদি সার্থক হয় তবে মানুষ যাহা ছিল কি means দিয়ে এই end এ উপনীত হওয়া গেছে—সেটা খতিয়ে দেখাই নয়। বহু মানুষের হত্যার দ্বারা অর্জিত যে অর্থ তার মালিকের স্থান আজ সর্বোচ্চে। সমাজ-জীবনে অর্থ ই আজ সম্মানের মাপ-কাঠি, সত্যনিষ্ঠা নয়। এই পঙ্কিল নীতি বা দুর্নীতি আজ পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-জীবন তথা রাষ্ট্র-জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এর প্রভাবের নাম cold-war—এরই প্রতিষেধকল্পে লম্বা লম্বা প্যাক্ট (pact) এবং nuclear weapons তৈরীর প্রতিযোগিতা। তারা শান্তি হারিয়েছে। তারা সত্যের বদলে শর্টকাটের সুগম পথ বেছে নিয়েছে।

সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশের ঐ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দেশেও এসে পৌঁছালো। আমাদের জীবন এবং চিন্তাধারাকে অনুরঞ্জিত এবং আবিষ্ট করলো। আপাতদৃষ্টিতে এর আবেদন আছে, যেমন সব সহজ জিনিষেরই থাকে। কঠিনকে পারলে সকলেই এড়াতে চায়। এখন এই যুগই চলেছে। এরি মধ্যে কিছু লোক পুরাতন সংস্কারকে অর্থাৎ সত্যকে আশ্রয় করে আছেন। তারা পুরাতনপন্থী বলে চিহ্নিত, হয়ত ঘৃণ্যও। কিন্তু একদিন স্রোত ফিরবে, সত্য জয়-লাভ করবে—এই আশা তাঁরা পোষণ করেন।

একটা উদাহরণ দিই। আমাদের বাল্যকালে এবং ছাত্রজীবনে খেলোয়াড়দের এত প্রচার (publicity) ছিল না। 'আশুতোষ পুরস্কার—খাঁকে পূজা করতে হবে, যাঁরা পুরুষলক্ষ্মী, এ বিধান-শাস্ত্রে আছে; কিন্তু সেই পুরুষলক্ষ্মী সর্বদা রাস্তার ঘাটে, ট্রামে বাসে, পার্কে লেকে বেলুনের মত ঘুরে বেড়াবেন, এই রীতি ছিল না। আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য এই ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়েছে এই যুক্তি স্বীকার করি। কিন্তু এই প্রবর্তনায় আমাদের পারিবারিক সুখ এবং শান্তি কেড়েছে কিংবা বাড়িয়েছে, এটা গভীর চিন্তার বিষয়। আমাদের বাল্যকালে এবং ছাত্র-জীবনে যেসব মহানগরে এক শ্রেণীর মেয়েরা অভিনয় করতেন। তাঁদের অভিনয়কুশলতা দেখে দর্শকেরা প্রশংসা করতো, কিন্তু সমাজে তাঁদের কোন সম্মান ছিল না। রামায়ণের পর এল চলচ্চিত্রের যুগ। প্রথম প্রথম মহানগরের অভিনেত্রীরাই চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যায়ে যেসব গৃহস্থের কন্যারাও ঐ অভিনয়ে যোগ দিলেন। এর ফল ফলতে বিলম্ব হল না। চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী গৃহস্থের কন্যারাও সমাজে সম্মান পেলেন। আগে আমাদের সময়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকতো দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীর ছবি—সকালে উঠে সেই ছবির দিকে তাকিয়ে গৃহস্থ প্রণাম করতেন। তার পর তাঁদের জায়গায় দেখা গেল বুদ্ধ, মহাবীর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের ছবি এবং মূর্তি। এখন তাঁরা সরে গেছেন—সেই স্থান অধিকার করেছে সিনেমার অভিনেত্রী এবং তারকাদের দল। শুনতে পাই কলেজের হস্টেলে এবং বোর্ডিং-এ ছাত্রদের শিয়রে উপরের উপর রাখা থাকে সিনেমা তারকার ছবি—সন্ধ্যাত্যাগ করেই যাতে নজরে পড়ে তাদের মুখ, অবশ্য প্রণাম করেন কিনা জানি না। সিনেমার চটুল গান সকলের মুখে মুখে—যেমন কোন্ খেলোয়াড় ভাল খেলেন তাই নিয়ে তাঁর ভক্তদের মধ্যে তর্কাতর্কি এবং শেষ পর্যায় হাতাহাতি হয়, তেমনি কোন্ অভিনেত্রী ভাল অভিনয় করেন বা করেছেন তাই নিয়েও খায় বিলক্ষণ এবং মহাভারত অশুদ্ধ হবার ভয় নেই। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড বা ইডেন গার্ডেনে ফুটবল খেলার মাঠে মামলে বেশি টিকিট বিক্রি হয়। কোথাও কোথাও সাহিত্য সভায় সিনেমা তারকার সভানেত্রী কিংবা প্রধান-অতিথিও করা হচ্ছে। এই সব উদাহরণ দেওয়ার অর্থ এই যে, আমাদের কালে যাদের সমাজ-জীবনে কোন সম্মান ছিল না, এখন তাঁরা শুধু সম্মান নয়, উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী হচ্ছেন। এর ফলে যদি আমাদের মেয়ে এবং বধূরা চলচ্চিত্রে অভিনেত্রীর পেশা গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন, তবে যুক্তির দিক দিয়ে আপত্তি করার কিছু থাকে না। কিন্তু আপত্তির কারণ এই যে

শুধু অর্থের লোভ ও এই পেশা গ্রহণ করবার উত্তেজক কারণ নয়—তার চেয়েও বেশি কারণ রয়েছে—ঐ ধরণের লালসার জীবন-যাত্রা গ্রহণ করবার আহ্বান—সহরের প্রাচীর-গাত্রে এবং সিনেমা-কাগজের পাতায় পাতায় নিজেদের ছবি দেখবার এবং দর্শকবৃন্দ সেই ছবির দিকে সভৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাই কল্পনা করবার উগ্র প্রলোভন। প্রমাণ দিয়ে এর সত্যতা দেখানো সম্ভব হবে না, কিন্তু যুক্তান্বেষী মাত্রেই এর যথার্থ মনে মনে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাশ্চাত্য দেশের উদাহরণ আমাদের দেশে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের দেশে দেহের পবিত্রতা অত্যন্ত গৌণ বস্তু। পাঁচবার সাতবার বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা, কুমারী মেয়েদের সন্তানসম্ভূতি—সে দেশের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তা নিয়ে সে দেশে কারো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে দেহ অত্যন্ত পবিত্র সম্পদ। দ্রাত ষ্টুয়ার্ট ফেলে-ছিলেন বলে শান্তনুর মৎস্যগন্ধাকে বিয়ে করতে হয়েছিল, এ ঘটনা একমাত্র আমাদের দেশেই ঘটতে পারে।

আমরা এখন যথেষ্ট পরিমাণে মডার্ণ হতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তাল রাখতে পারছি না। এখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বোধ হয়—কিন্তু তাকে মডার্ণ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এখন পিছিয়ে পড়েছেন—তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নবীন কবিরা—নবতর কবিতা লিখছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁদের রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারছি না। জাষ্টেনেপোর Quink কালি এখনো আমাদের শ্রেষ্ঠ মনে হয়, সুলেখা কালিকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারি না—ওস্তাদটিন এখনো শ্রেষ্ঠ মনে হয়, 'পাদ্রেন'কে শ্রেষ্ঠ বলতে পারি না—এ সবই আমাদের মনের দুর্বিনয়ের পরিচয়, সন্দেহ নেই।

অন্যায় আমার করবো না—সেটা শোভনও নয়, সুন্দরও নয়। করলেও সেটা রক্ষিত হবে না। পাশ্চাত্য দেশের সবই খারাপ এ রকম অভিসন্ধি আমার মনে নেই। কেবল সেই দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখতে বলি। সে দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে আছে একটা প্রতিযোগিতার ভাব—তার থেকে আসতে পারে একটা আলা এবং এগিয়ে যাওয়ার একটা নেশা। স্বস্তি এবং শান্তি কখনই আসতে না। বন্দুকের পর কামান, কামানের পর বোমারু, বোমারুর পর আটম বোমা, তারপর হাইড্রোজেন বোমা। এই মোকমোড়ের কি কোন শেষ আছে? মানুষ কি শুধুই ছুটবে?

আমাদের আদর্শে আছে এই স্থিতি—কারণ সত্য স্থির। আমাদের আদর্শে আছে এই সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ। মানুষ জন্মাবে মরবে, পৃথিবীতে এক রাজত্ব যাবে, আর এক রাজত্ব আসবে, পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবে—কিন্তু তবু একটা সত্য স্থির থাকবে। চন্দ্র সূর্য উঠবে, ঋতুর পরিবর্তন হবে, যাদুতে মানুষ নিঃশ্বাস নেবে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করবে, মানুষ ভালবাসবে, বিয়োগে দুঃখ পাবে, মিলনে আনন্দ পাবে—এই নীতি চিরদিন অম্লান থাকবে। ভারতবর্ষের সাধনা এই চিরন্তন নীতিকে নিয়ে। Verity of veritios, all is verity.

আকাশ পথে

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (লণ্ডন)

রোম থেকে বিদায় নেবার পালা ঘনিয়ে এল। মনটা যেন ভারি ভারি লাগছিল। কোথায় যেন এক অস্পষ্ট বেদনা লুকিয়ে আছে। নীলোজ্জ্বল আকাশের কোলে তারা ফুটে উঠল। সেদিনের মেদুর সন্ধ্যা এক অনির্বচনীয় রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল আমার কাছে। পাশ্চাত্য আমাকে যে এত নিবিড় করে বেঁধেছিল তা আগে বুঝতে পারিনি।

রোম থেকে ফিরীগামী ট্রেন ছাড়বে নিশীথ রাত্রে। এক আনন্দ বেদনার লগ্নিক্ষণ—একদিকে কতদিন পরে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলবার আশা, অন্যদিকে কত প্রবাসী মনের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা।

যন্ত্রচালিতের মত কখন আমার সিটটিতে এসে বসেছি। তখনও ট্রেন ছাড়বার আধঘণ্টা দেরী। পাশের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল এক অপরূপ দৃশ্য। রোমের হৃৎস্পন্দন তখন থেমে গেছে। অজ্ঞাত সৈনিকের মত বিদায় নিতে হবে। চোখে ভেসে উঠল কত হারাধরি, কত নদী প্রান্তর, কত মীল শ্যামল।

আমার বন্ধুরা এসেছিল আমাকে বিদায় দেবার জন্যে। দেখি সবাই মিয়মাণ……ভাবলুম এত মায়ার মানুষ কেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এবার ট্রেন সুরু করল তার গর্জন, তারপর একে একে ডানা মেলেছিল।

অনেকক্ষণ আকাশে উড়ে চলেছি খেয়াল নেই। কারণ তখন মনের আকাশে মেঘের ভিড়।

হঠাৎ চমক ভাঙল নারী-কণ্ঠ শুনে। "আপনি কোথায় যাবেন।" আমি তখন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। কি উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত তখন চারটে। দুরাতের তারাটি টিপ টিপ করে জ্বলছিল আশা দীপের মত। নীচে আঁধারের প্রাঙ্গন। রাত্রির অবগুণ্ঠনে বিশ্বের এত রূপ সব যেন রহস্যাবৃত। একে একে অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিনের আলো উঁকি দিল। সোনার আলো লুটিয়ে পড়ল—পল্লী প্রান্তরে। মনে হ'ল কত সুন্দর এই পৃথিবী, মনে হল "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে," এই বাণী কত সত্য কত গভীর।

সকালের ব্রেকফাষ্ট এসে গেল ছোট টেবিলটির ওপর। আমার পাশেই এক বৃদ্ধ সৌম্যকান্তি মুসলমান ভদ্রলোক। একটু হেসে বল্লেন —দিল্লী যাবেন বুঝি? একটু ঘাড় নেড়ে পালটা প্রশ্ন করলাম—। হাসেন আমাবাস। কত দেশের কত যাত্রী—সবাই উড়ে চলেছি মহাশূন্যে —নীড়হারা পাখীর মত।

বাইরে আলো তখন চলে গেছে। মেঘের মধ্য দিয়ে পথ করে চলেছে আমাদের পুষ্পকরথ। পৃথিবীকে আর দেখা যায় না।

শুনলাম কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের প্লেন বিমান ঘাঁটিতে নামবে।

সেই পাশের ভদ্রলোকটির বোধ হয় এবার নামবার পালা। প্লেন নামতে সুরু করেছে। ক্রমশঃ স্পষ্টরূপ নিয়ে ফুটল—পথ দিয়ি নদী।

মাটীর পরশ পেলাম—অনুভব করলাম ধরিত্রীর কঠিন আলিঙ্গন, বিমান ঘাঁটিতে দেখি মানুষের ভিড়। সবাই যেন আপন আপন প্রিয়-জনকে খুঁজছে। সেই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানাল যেন কিছু লোক। বুঝলাম ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্ট নাগরিক হবেন। তাঁর পরিচয় জানা হয়নি, তেবে মনে অনুতাপ হ'ল। এয়ারপোর্টে নেমে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি—উষর প্রান্তর। চারিদিক ধূ ধূ করছে। মাঝে মাঝে তুষারের। সকাল থেকেই গরম হাওয়া বইতে সুরু করেছে। মনে হল, এখান থেকে যা পালাতি না তাঁতি। যাক সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আবার প্লেনে। এবার নাকি অনেক দূরের পাল্লা—একেবারে বীরুট।

প্লেন উঠল হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে। যেন চারিদিকে বিভ্রহন্তের সিংহনি। মাঝে মাঝে দু একটা পাখী উড়ে চলেছে। শ্যামল পৃথিবী তখনও করছে—প্রখর রৌদ্রে। হঠাৎ গোলমালে প্লেনের ভেতরে দৃষ্টি পড়ল। Get ready—Hurry up, The Engine fails.

আমি তখনও অন্ধ জগতে। তাড়াতাড়ি Ready হ'তে বলে ব্যাপার কিছুই হ'তে হয়। চারিদিকে হৈ হুল্লোড়—কেউ বা বীশুর নাম ক'রছে, কেউ বা দুর্গানাম জ'পছে। প্লেনটি হুহু বাসে নামতে সুরু ক'রেছে। দেখা ক'রলাম এবার মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিন্তু মাটী কোথায়? একটা ধোঁয়াটে রাজ্যে আমাদের প্লেন মিলিয়ে গেছে, কিছুই দেখা যায় না—শুনলাম সেটা নাকি Persian Gulf।

বীভৎস সুন্দর তার রূপ—জলের যেন কোন গতি নেই, চারিদিকে যেন একটা ধোঁয়াটে আবহাওয়া। আমাদের প্লেনখানি তখন যেন মাটির স্পর্শ পেতে চাইছিল। কিন্তু একটু নীচেই সেই গতিহীন জলধি। তার বুকে যদি প্লেনটি ধরা দেয়। সকলেই দেখি—অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে। সব কোলাহল থেমে গেছে। আমিও ভাবছিলাম এতদিনের সংস্কার দিয়ে গেরা জীবনের মূল্যবান মুহূর্তেই বিমানের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। এর জন্যেই বুক দুরু দুরু—এত দ্বিধা সংশয়। হঠাৎ দেখতে পেলাম খেজুর গাছের মত গাছের সারি। তবে কি সেই জায়গা সমুদ্র পেরিয়ে মাটির বুকে এসেছি। বিমান একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন নামল কোথায় কে জানে? কোথায় কে ছিটকে গেল কে ধরে রাখে। সবে যখন একটু সম্বিৎ ফিরল তখন দেখি আমি বীরুটের একটি হাসপাতালে। পাশে দেখি ছোট একটি ফুটফুটে শিশু কাঁদছে। সবাই বলল—শিশুটির মাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকদিন বাদে তারতে ফিরছিল স্বামীর কাছে। স্বামী নাকি কোন বিরাট কোম্পানীর ম্যানেজার। তাতেমুখ, ভদ্রলোকের কি অবস্থাই না হবে যখন এসব গিয়ে পৌঁছবে তার কানে। কতদিনের আকুল প্রতীক্ষা। মানুষ সত্যই কত অসহায়। আমাদের যাদের সামান্য আঘাত লেগেছিল তাদের Special Planeএর ব্যবস্থা হল।

বীরুটের মরুস্থানে নজা নামল। হঠাৎ ঘর অন্ধ···রৌদ্রঝলমল দিন আঁধার হ'য়ে এল। এখানে দিন ও রাত্রির মধ্যে সীমারেখা যেন খুবই অস্পষ্ট। দূরে খেজুর গাছের আশায় তখনও ক্ষীণ আশার মত একফালি রোদ্দুর লেগেছিল। পিঙ্গল আকাশে জলজলে তারা ফুটল। এরা জানল, ইউরোপের রাতের আকাশ কি এত উদার এত উজ্জ্বল। তারায় তারায় আকাশ যেন ভরে গেছে। আর সেই তারার আলোয় দূরাগত মরুপথখানি যেন স্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছিল। ভোরেই Special Plane ছাড়বার কথা। রাত্রির প্রায় প্রহর গুণছিলাম। আমার পাশের সিটের ছেলেটি হঠাৎ কেঁদে উঠল। বোধহয় কি স্বপ্ন দেখেছে। ভাবলাম হয়ত তার মাকেই স্বপ্নে দেখেছে। পরে জানলাম সে স্বপ্ন সত্যি হ'য়েছে। তার মাকে পাওয়া গেছে—কিন্তুদূরে। একটি কোপের আড়ালে। কিন্তু তখন তার প্রাণ নেই।

শেষ রাত্রেই উঠে প'ড়লাম। ভাবলাম কি অবস্থা দেখা যাক। দেখি সবাই প্লেনে ওঠে পড়েছে। আমিও বসে পড়লাম একপ্রান্তে। অনেক অচেনা মুখ। বোধহয় স্থানীয় লোক দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করা হ'য়েছে। প্লেন ছাড়ল যখন তখনও রাত্রির অবগুণ্ঠনে পৃথিবী ঢাকা। উড়ে চলল নিঃসীম শূন্যে। আকাশের তারাগুলি তখনও নাড়ি দিয়ে জ্বলছে আর নিভছে। আবার পৃথিবীর বুকে দুই একটি বিন্দিত আলোক রশ্মি আসছে। মহাশূন্য থেকে রাত্রে বিদায় নেবে মাটি ও আকাশ সম্পর্কে।

শুনলাম এবার একেবারে করাচি।

মনে কি উন্মাদনা জাগল। কতদিন পরে ভারতের মাটি ছুঁতে পারব।

করাচীর কাছাকাছি গ্রামগুলি যেন আমায় হাতছানি দিচ্ছিল। যেন কত আত্মীয়তার বন্ধন। আমার পাশে যে ভদ্রলোক ব'সেছিলেন তাঁর নামবার পালা। সঙ্গে একটি ঘোমটা-পরা ভদ্রমহিলা। করাচীতেই বাস নিয়েছেন। এককালে তিনি নাকি ক'লকাতায় ছিলেন। আমার সঙ্গে অল্প আলাপে বুঝেছিলাম যে ভদ্রলোক নিঃসন্তান। তাই শিশু দেখলেই তাঁর প্রাণ আনচান করে। তাই বোধহয় সেই রিক্ত শিশুটিকে দেখে ভদ্রলোকের কতই না আকুলি বিকুলি। তাঁর আয়ত দুটি চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল। সে চোখদুটি আমও ভুলতে পারিনি। আর ভুলতে পারিনি কতদেশের কত মানুষের কলরোল ও জনতার কোলাহল।

করাচীতে পৌঁছনমাত্রই মনটা কেঁপে উঠল। তারপর এই ত ভারতের সীমান্ত। পরিচিত উর্দুমিশ্রিত ভাষা কানে যাওয়া মাত্রেই আত্মীয়তা-বোধ আরও নিবিড় হ'ল। তখন বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। চারিদিকে রৌদ্রের সামনে যেন সারা ভুবন তার রূপ লাবণ্য মেলে ধরেছে। করাচীর পথঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন. বিমান ঘাঁটি শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। করাচী থেকে যখন বিমান ছাড়ল তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যদিনের সূর্য। কত জনপদ পেরিয়ে এলাম। ধূসর নীলাম্বর দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। তারই তীরে সে ছায়াঘন কুঞ্জ তা দেখলে কবির কথা মনে পড়ে যায়…"তমালতালী বনরাজি নীলা।" মনে হয় ভারতের মাটির কি মায়া। একটা মোহাবেশ যেন জড়িয়ে ধরে।

এবার যাত্রাশেষের পালা। যখন বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছলাম তখন পূর্ব পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। বেদনায় একপাশের আঙিনায় রক্তকরবীর লাজনম্রতা। আর তারই ছায়া দুলছে ধরণীর প্রণয়কে। অপূর্ব এই দৃশ্য।

পালম বিমান ঘাঁটি থেকে শহরের পথে চোখ পড়ল আরও কত কি। পথের ধূলা ওড়াতে ওড়াতে চলেছে গোরুর গাড়ি। ক্লান্ত বক ফিরেছে তার কুলায়ভিমুখে গোধূলির রক্তিম মুহূর্তে।

আর আমিও চলেছি আমার নীড়টির দিকে কোন নিবিড় আকর্ষণে এতবড় বিশ্ব ছেড়ে। তাই কানে বাজল কবির সেই স্মৃতিরা বাণী।

যেথা হয় নাই নয়ন মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বি…

STUDENTS' I.P.G.A. COMMON-ROOM

পূজারিণী

শ্রীলাবণ্য পালিত

তোমারেই পূজা করিবার দাও অধিকার
তোমারি এ কাননের ছায়
প্রাণ চায়
তোমারি শেফালি ফুলে রচি উপহার
গাঁথি মালা আমি বার বার।
আজি এ কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়ায়ে একা
দ্বিধা-ভরে রহি চাহি, ডাকিছে কেকা…।
কচি কিশলয়গুলি জাগিছে ধীরে ;
এ নত শিরে
ফিরাও না নিরাশার অকূল আঁধারে…।
ফিরাও না, ডালিখানি পাঁচ ফুলে ভরা—
বসন্তের সৌরভের স্পর্শটুকু ধরা ;
দিনে দিনে পলে পলে শূন্য মন আমার…
যতটুকু পূর্ণ করে, সেটুকু তাহার
আনিয়াছি, দাও অধিকার
তোমারেই পূজা করিবার
তিথি নাই, রীতি নাই…, জানি নাই কিছু…,
অন্তরের ভাষা আছে, মন তারি পিছু
ছুটে যায়, জানে তাই মরমের ভাষা,
প্রথম পূজার দীপ আমার এ আশা…।
তোমারেই পূজা করিবার দাও অধিকার,
নিভৃতে একেলা বসি এই গান
গাহি বার বার…।
সুরখানি রচিয়াছি কখনো উদাসী…,
কখনো করুণ রসে, বেদনার বাঁশী ;
মত্ত বসন্ত বায়ে চঞ্চল হিয়ায়…
চপলতা ছিল সুরে গোধূলি ছায়ায়…;
মাধবী রাতের কতো মিনতি জড়ানো…
সুরখানি আলো বাজে ;
খোঁপায় জড়ানো
রাঙা ফুল মালা সবে রচিলাম গান……
তোমায় শোনাবো তাই : হাসি অভিমান…
রাগ, অনুরাগ, আনি আমি পূজারিণী,
আমার যা কিছু আছে সব লয়ে দিই উপহার—,
শুধু তুমি আমারেই পূজা করিবার—
দেবে অধিকার…।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

(চার)

কাবুল থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় তাসকেন্ট পৌঁছলাম। তাসকেন্ট সোবিয়েত রিপাবলিক অব উজবেকিস্তান। ইয়ুরের সাধারণতন্ত্র আর যাবার ব্যবস্থা এখন এই রিপাবলিকের আওতায়। তাসকেন্টে নামবার আগে পথে লেনিগ্রাদে বিরতির নামক একটি বাড়ায়। সেখানে আমাদের লাঞ্চ খাবার ব্যবস্থা ছিল। নিরামিষ লাঞ্চ। এখানে যে খাবার পেলাম সমগ্র সোবিয়েতে বিভাই তাই পেতে হয়, অতিরিক্ত থাকে আমিষ। পাঁপর ও কালো রুটি, মাখন, চীজ, সসা-টমেটোর স্যালাড, টেবিলে থাকবেই থাকবে। তিরমিজে তাই ছিল। অমৃতসরে পেট ভরে খেয়েছিলাম বলেই এখানকার নিরামিষ লাঞ্চ খেয়ে তেমন খুশি হলাম না। সাধারণত আমিষের ছোঁয়াচ্‌টুক না থাকলে খেয়ে তৃপ্তি পাই না।

লাঞ্চ শেষ হবার পর ওই এয়ারপোর্টে যে কয়েক ছেলে-মেয়েরা ছিল, তারা কিছু গান-বাজনার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করল। পাঁটার বাজিয়ে অজিত বসু আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে বললাম—এই যে, তুমি একজন ওস্তাদ বাজিয়ে। তোমাদের কিছুটা আনন্দ নিশ্চিতই ইনি দিতে পারবেন। অজিত বসু হাত ধুয়েই বসে ছিলেন। তবুও নারী-সুলভ কুণ্ঠিত লজ্জা কণ্ঠে আর অঙ্গ-সঞ্চালনে প্রকাশ করে তিনি বলেন—কী বিপদে ফেলেন, শচীনদা। পর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সবাই জানেন পাঁটার তুমি আর শোনা হোল না। আমি বললাম—অজিত পাঁটার আনতে যেতেন, ততক্ষণ তোমরা একটা ফল্গু-গান শুনিয়ে দাও। আমার বলা উচিত ছিল একখানা উজবেকী গান শুনিয়ে দাও। কিন্তু আমি তা বলাম না। আমার অভিজ্ঞতা ছিল যে, উজবেক তরুণ-তরুণীরা নিজেদের রূপ থেকে স্বতন্ত্র কল্পনা করতে চায় না। দুটি ছেলে-মেয়ে একটি দ্বৈত-সঙ্গীত গেয়ে শোনালে। এর মাঝেই অজিত বসু তার পাঁটার নিয়ে হোস্টেলের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। গান শেষ করেই ছাত্রীরা তাঁকে বলে—আমাদের গান তুমি শুনলে, এখন তোমার বাজনা আমাদের শোনাও। অজিত বসু আর একবার কণ্ঠে আর চোখে (অপাঙ্গে বলাব না) লজ্জা ভরিয়ে বলেন—কী বিপদে ফেলেন বলুন ত, শচীনদা। আমি বললাম—এ রকম বিপদ বার বার তুমি বরণ করে নেবে, আমি জানি। এখন তবুও এঁরা অপেক্ষা করছেন। [এদের কাছ অনুরোধেরও অপেক্ষায় তুমি থাকবে না। তখন তোমার মুখ-রক্ষার জন্য আমাকেই তোমার গায়ে পড়ে বার বার এমনই বিপদের মাঝে ঠেলে দিতে হবে।

আমি যতক্ষণ কথা বলছিলাম, অজিত ততক্ষণ সুর বাঁধছিলেন। আমার কথা শেষ হতে না হতেই অজিত পাঁটারে তারে সুর তোলালেন। তিনি ভালো বাজিয়ে। রুশী-শ্রোতাদের তিনি খুশী করলেন। তাঁরা পরপর ফরমাস করে চললেন। সমগ্র রুশে সঙ্গীতের প্রতি যে আকর্ষণ দেখেছি, তাতে বিস্মিত হয়েছি। যেখানেই যাবো—গান অথবা বাজনা শুনতে হবে, শোনাতে হবে; বিশেষ করে ছোটদের নিমন্ত্রণে। খাওয়া আর গান শোনা, আর মাঝে মাঝে বলশেভ ভাষণ ব্যতীত রুশী যাত্রার যেন ব্যতিক্রম করা যায় না। চীন দেশেও তাই দেখে এসেছি। আমাদের এযাত্রার ডেলিগেশনে গায়েন বাজেন যেশি ছিলেন না। শোভা চক্রবর্তীকে ছোটদের টেবিলে অথবা কোন সভাতে কখনো গান গাওয়াতে পারতাম না। অজিত বসু একাই এবার আমাদের মান রক্ষা করে এসেছেন। অবশ্য এবারকার এই ডেলিগেশনটি সাংস্কৃতিক ডেলিগেশন নয়। আগের বারেরটিও তা ছিল না। কিন্তু সে ডেলিগেশনে গায়েন-বাজেন অনেক ছিলেন। সেবার ভূপেন হাজারিকা একাই একশ গায়েনের কাজ করেছেন। তাঁকে রুশী তরুণ-তরুণীদের চক্রব্যূহ থেকে বার করে আনতে আমাকে কখনো-কখনো নির্মম হতে হোত। সেবার ডেলিগেশনের নায়ক ছিলাম আমি।

আমাদের দ্বিতীয় বসু ও সেবার বেশ অমিয়ে নিয়েছিলেন। হাজারিকাকে এবং তাঁকে একবার প্রাহায় (চেকোশ্লোভাকিয়ায়) আর একবার তাসকেন্টে টেলিভাইজড্‌ করা হয়। দ্বিতীয় দফাকে সেবারকার একটা গল্প বলি। যদিও তিন বছর আগেকার কথা, তবুও স্মৃতিতে গোলাপী রঙ ধরিয়ে রেখেছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

হেলসিঙ্কি পৌঁছবার পরের দিনই আমাদের কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী রমেশচন্দ্র আমাকে জানালেন যে, লাঞ্চের পর আমাকে হেলসিঙ্কি থেকে আশী মাইল দূরে একটি শহরে যেতে হবে বোটারে। সেখানে একটি পাব্লি একজিবিশনের উদ্বোধন হবে। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে আমাকে আর বোম্বাইয়ের একজন মুসলমান চিত্রকরকে। শহরের নামটি তিনি বলতে পারলেন না। ফিনল্যাণ্ডের মতো সুন্দর দেশ, যার প্রতিটি বৃক্ষবান অংশই এক একখানি ছবি মনে হয়, স্বভাবতই ভ্রমণের স্পৃহা জাগিয়ে দেয়। সেই দেশের বুকের উপর দিয়ে আরাম-প্রদ বোটারে আশী মাইল যাবার এবং ফিরে আশী মাইল আসবার প্রস্তাব কি প্রত্যাখ্যান করা যায়। তখুনি রাজী হলাম। রমেশ বললেন, লাঞ্চের পরই ইণ্ডিয়ান্‌ এম্বাসির গাড়ী নিয়ে আসবে।

লাঞ্চ খেয়ে বাইরে পা দিতেই একটি সুন্দরী ফিনিশ তরুণী এগিয়ে এসে বললেন—আপনিই ত মিঃ সেনগুপ্ত?

আমি জবাব দিলাম—হাঁ। কে চিনিয়ে দিলে?

—এই কাগজ। তিনি একখানি দৈনিক কাগজ আমার সামনে খুলে

বললেন। কী লেখা আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না, দেখলাম আমার ছবি ছাপা হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এরা কী লিখেছে।

—আপনি হঠাৎ যাচ্ছেন সেই খবর দিয়েছে, আর পরিচয় দিয়েছে আপনি কোলকাতার একজন প্যাতনামা নাট্যকার এবং স্থানলাভ ড্রামা একাডেমির কাউন্সিলার। চলুন গাড়ীতে বসে বসেই কথা হবে। আমাদের একটু দেরী হয়ে গেছে।

—কিন্তু আমার সঙ্গে আর কার যেন যাবার কথা ছিল!

—মিঃ হলেনীয়। কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আপনি একাই চলুন। আশী মাইল পথ যেতে সময়ও ত কিছু লাগবে।

ঠিক সেই সময়ে ফিতীশ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই আমার মনে হোলো একটি গাইয়ে সঙ্গে নিলে ত বেশ হয়!

আমি বললাম—ফিতীশ, বেড়াতে যাবে?

মুরগা ইন্টারপ্রিটারের দিকে চকিতে চেয়ে নিয়ে সে বলে—আপনি হুকুম করলেই যাই, দাদা।

—আমার আমন্ত্রণই আদেশ, গাড়ীতে উঠে পড়।

ফিতীশ দাদার আদেশ পালন করে দাদাকে ধন্য করল।

গাড়ী ছুটে চলে—মনে হতে লাগল যেন অন্নপূর্ণার মাঝ দিয়ে উড়ে চলেছে। ড্রাইভারকে একটু আস্তে চালাতে অনুরোধ করলাম। সে জানালে মোটে ত পঞ্চাশ মাইল স্পীড দিয়েছি। ইন্টারপ্রিটার তার বক্তব্য তর্জমা করে শুনিয়ে হেসে বলেন—ও খুব ভালো গাড়ী চালায়। আর পেশাদারী ড্রাইভার ও নয়। ইন্টারপ্রিটারটির নাম কাইয়া ফিনে-হোলা; ইংরেজি ভাষায় বেশ দখল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—আমাদের গন্তব্য স্থল হচ্ছে তুরকু। ফিনল্যাণ্ড যখন সুইডেনের অধীনে ছিল, তখন এই শহরটিই ছিল রাজধানী। এখনো সুইডেনের সঙ্গে এই শহরের যোগ রয়েছে। এর বন্দর থেকে রোজ একখানা খেয়া-জাহাজ যাওয়া-আসা করে।

তুরকু শহরে ঠিক সময়টিতেই পৌঁছলাম। শান্তি একজিবিশনে ঢুকতেই একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। তার সঙ্গে কোথায় কবে আলাপ হয়েছে স্মরণ হোল না। তাঁর ইন্টারপ্রিটার স্মরণ করিয়ে দিলেন ভদ্রলোকটি হাঙ্গেরীর সাংস্কৃতিক মন্ত্রী, পিকিংয়ে তিন বছর আগেকার সামান্য পরিচয়টুকু বড় কথা নয়, ব্যক্তিগত পরিচয়টাও বড় কথা নয়, বড় কথা হোলো ভারত-হাঙ্গেরীর পরিচয়। ভারতের বাইরে প্রত্যেক ভারতীয়ই ভারত, আর প্রতি দেশের প্রতিটি অধিবাসীই তাঁর দেশ। তাই এই রকম আকস্মিক পুনর্মিলনের আনন্দের কারণ ব্যক্তিগত মিলন নয়, জাতিগত মিলন। হাঙ্গেরীর সেই সাংস্কৃতিক মন্ত্রীটি অভিনন্দন জানাবার জন্য সে-কথা বলেও ফেলেন। তিনি বলেন—বিশ্বশান্তির প্রাটফর্মে ভারত আর হাঙ্গেরীর সৌহার্দ্যমূলক মিলন খুবই আশার কথা। আমাদের যেন কখনো বিচ্ছেদ না হয়।

আমি বললাম—এ বিষয়ে আমাদের মনোভাব কখনই ঘটবেনা।

শান্তি-এক্জিবিশনের উদ্বোধন শেষ হবার পর আমাদের শহর দেখাবার ব্যবস্থা হোলো। আমরা দর্শনীয় সব কিছু দেখে-দেখে ডুকে ফিরে উপস্থিত হলে বলেন, শহরের একটি অপেরা হাউসে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমাকে সেই সভায় কিছু বলতে হবে।

আমি সাগ্রহ অঙ্গীকার করলাম।

তারা কারণ জানতে চাইলে।

আমি বললাম—আমি বিদেশী। তোমাদের দেশের রাজনীতিক সভায় উপস্থিত থাকবার অধিকারই আমার নেই; কিছু বলা ত একেবারে অসম্ভব।

তারা বলে—সভাটা রাজনীতি আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে ডাকা হয়নি। ডাকা হয়েছে একই রাজনীতিক মতবাদের চারটি দলের মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে। তোমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি এই কারণে যে, তোমরা ভারতবাসীরা মিলনের মন্ত্র জান।

আমি চমকে উঠলাম। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—তাই নাকি।

—আমরা ত তাই জানি।

তাঁরা যা জেনেছে, তা যে ভুল, তাই বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তা বলতে বাধল। যারা আমাকে তুরকুতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা বলেন—আপনি যান, স্যর। নইলে ওরা ভাববে আমরাই যেতে দিলামনা।

আবার চমকে উঠলাম। তারতে এই রকম কথা শুনতেই ত অভ্যস্ত। রাজনীতিক মতবাদ ভঙ্গ করলে বোধ করি সব দেশের মানুষই একরকম হয়ে যায়। আমি ওদের সঙ্গে যেতে রাজী হলাম। আমাদের বুস হোইয়া আমাদের অপেরা হাউসের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নতুন হোষ্টদের বলেন—আপনাদের কাজ হয়ে গেলে আমাদের ফোন করবেন। আমরা এসে ওঁকে নিয়ে যাব। তাঁরা অপেরা-হাউসে ঢুকলেন না।

অপেরা হাউসে ঢুকতেই প্রেক্ষাগারের তিন-তলার সমস্ত দর্শক, প্রায় তিন-চার হাজার, উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা করল। অভিভূত হলেও এ-কথা ভুলিনা যে, এই অভ্যর্থনাও অভিনন্দন এই অল্পাতনামা ভারত-সন্তানকে উপলক্ষ করে নতুন ভারতকেই জানানো হচ্ছে।

আমরা যখন ঢুকি তখন বক্তৃতা চলছিল। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতেই আমাকে আহ্বান করা হলো, কিছু বলতে। আমি মিনিট দশেক বললাম, ভাইয়া ফিনিশ ভাষায় তা তর্জমা করে শোনাতে লাগলেন। আমার বক্তব্য শেষ করার মুখে আমি জানালাম যে আমার সঙ্গী দ্বিতীয় ভারতীয়টি বক্তৃতা করবেন না, গান শোনাবেন। ঘোষণা মাত্রই তুমুল হর্ষধ্বনি। নিজে নেমে এসে আমি ফিতীশকে মঞ্চে তুলে দিলাম।

কাইয়া বলেন—ওঁর গানের মর্মটা তাড়াতাড়ি আমাকে বলে দাও, স্রোতুদের বলে দি।

—কি গাইবে, চাঁদ জানিনা আমি।

ছাইরা তাই জানতে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন কিউীনের পাশে। কিউীনের পেটে কু-বুদ্ধি জমে উঠেছিল। হেলসিঙ্কি ছাড়বার পরই মোটরে বসেই সে একটি গান রচনা করে ফেলেছিল। আমাকে একবার শুনিয়েছিলও। পড়ে আমি বলেছিলাম—এটা ত গানও হয়নি, কবিতাও হয়নি। কিউীন এতটুকু ঘাবড়ায়নি তাতে, মনে-মনে গানটিকে সুরেও বেঁধে ফেলেছে। গানটা ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রশস্তি। হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই' রচিত গানটি আমি চীনে নিয়ে গিয়েছিলাম। মেয়রও বিমান সেইটিকে এমনই চমৎকার করে নিয়ে এসেছিলেন যে, আমরা ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হলেই চীন তরুণ-তরুণীরা 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই' বলে সম্বর্ধনা করে। কিউীন বোধ করি তেমনই একটি উচ্ছ্বাস নিয়ে গানটি রচনা করেছিলেন এবং গেয়েছিলেনও আবেগ ভেলে। গানটি শেষ হতেই করতালিধ্বনি হোলো। আমার মনে হোলো, তা যেন কেবল সৌজন্য-সূচক। তাই আমি কিউীনকে একটি ইংরাজি গানের অনুরোধ করলাম। খুব ফিনল্যাণ্ডে গাইবার মতটি সুর আছে, যেমটি সাগর-দোলা। কিউীনের ভালিাগি মুহূর্তেই শ্রোতাদের চিত্ত স্পর্শ করল। গান শেষ হতেই যে করতালিধ্বনি হোলো, তাতে মনে হোলো অপেরা-গৃহের ছাদ বুঝি বা ভেঙে পড়ে। এবার গান গাইবার খাতি মেনে কিউীনের ছিলনা। গাওয়া যাই হোক, সুরের আবেদন যাবে কোথায়? কিউীন আন্তি চান, কিন্তু শ্রোতৃদের দাবী আর একবার, আর একবার! সে এক অনুপম অভিজ্ঞতা। কিউীনকে চারবার ওই একটি গানই গাইতে হলো। কবিন-গান গাওয়া কিউীন ফিন-ল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে উঠল।

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের সুর আপনাদের রসানুভূতিকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে সুখে আপনাদের কাছ থেকে বালকের মহাবিদায়ের প্রেরণা পেলাম। এই রাতের অভিজ্ঞতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা বহন করে নিয়ে যাব আমরা। কিন্তু রাত এখন প্রায়টে। আমাদের আজি রাইল পথ অতিক্রম করে ফিরে যেতে হবে হেলসিঙ্কি শহরে। তাই বেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে আপনা-দের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাদের কল্যাণ হোক্, সুটুই শান্তির অধিকারী হোন আপনারা।

শ্রোতাদের যত বৃদ্ধা ছিলেন, নীচের তলায়, তাদের অধিকাংশ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়ালেন ফিরে আসবার পথের দুই-ধিকে, প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। অনেকের চোখে, দেখলাম, অশ্রু-সজল।

বিশেষ করে এই বৃদ্ধারাই কেন এমন করে আমাদের বিদায় দিলেন, তার কারণ বুঝতে বেশি-কিছু ভাবতে হোলনা। এঁদের প্রত্যেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রিয়জনদের হারিয়েছেন। তাই বিশ্বশান্তির জন্য যাঁরা বিশ্বময় আন্দোলন করে ফিরছেন, ওঁদের সঙ্গেই আপন-জন করে নিতে পেরেছেন। তাইতালি সুরও তাঁদের হৃদয়ের-দুয়ার খুলে দিয়ে অবলম্বন আবেগকে টেনে বার করেছিল।

অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম ওরই কিছুদিন পরে উত্তর-নিয়ার রাজধানী, নীপার নদের তীরে অবস্থিত, কিয়েভ শহরে। কিয়েভের যে হোটেলে আমরা ছিলাম, সেই হোটেলেই আমাদের একটা ব্যাঙোয়েট দেওয়া হয় বিদায় বেলায় রাতে। সব শেষে আমি হোটেলের কর্মীদের এক যায়গায় ডেকে নিয়ে আমাদের ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য বলাম —দেশ থেকে বহুদূরে এসে আমরা তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিছি। আমরা তোমাদের ভাষা বুঝিনি, তোমরা বোঝনা আমাদের ভাষা। কিন্তু তোমরা সেবা দিয়ে সেবা দিয়ে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি টেনে নিয়েছ, আর সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করে দিয়েছ আমাদের প্রতি তোমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে। আমাদের গায়ের রঙ, মুখের ভাষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমাদের এক করে দিয়েছে। একদিন আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা পরবাসী, আমরা হোটেলে রয়েছি···

এই পর্যন্ত বলতেই চাপা-কান্নার দমক গলে আমি থেমে গেলাম, চেয়ে দেখলাম তিন-চারটি নারী-কর্মী এপ্রণে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপে ফুঁপে কাঁদছে।

দুভাষী ইন্টারপ্রিটারকে বললাম—হোলো কি তোমার? অন্যায় কথা কিছু বলাম কি?

কি ঘটেছে জেনে নিয়ে তোমার বলে—ওরা কাঁদছে, যুদ্ধে নিহত ওদের স্বামী-পুত্রদের স্মরণ করে। অমনি স্নেহভরে তোমাও কথা কইত। ওরা কাদছে বিশ্বশান্তির বাণী নিয়ে সেই তোমরা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ আজ। কতেকটা বছর আগে কেন একথা ভাবলে না? তা যদি ভাবতে, তাহলে হয়ত ওদের স্বামী-পুত্রকে হারাতে হোতনা।

আমি আর বক্তৃতা দিয়ে শুরু করতে পারলামনা। সজল চোখে নীরবে সকলের করমর্দন করে অপেক্ষমান মোটরে গিয়ে উঠলাম—উত্তর-নিয়ার কালচারাল মিনিষ্টার এসে পাশে বসলেন। তাঁর সঙ্গেও প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলাম না, মন এমনই ভারি হয়েছিল।

তিরমিজ এয়ার পোর্টের গানবাজনার কথা বলতে বলতে মন তিন-বছর আগেকার শান্তি-সম্মেলনের দিনগুলিতে চলে গিয়েছিল। তিন বছর পরেও মেদলার মানুষের চিত্তের কোন পরিবর্তন হয়নি। দুয়ের মাঝে ফরের মাঝে মানবপ্রীতির পরিচয়টুকু প্রকাশ পেলেই মানুষ সব অমিল সমূলে সরিয়ে দিয়ে মিলনের জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেয়। তিরমিজে গান-বাজনা উপলক্ষ করে পারস্পরিক প্রীতির যে সূচনা হোলো, অতীত দিনগুলি থেকে যে আদৌ বিচ্ছিন্ন হইনি তাই যেন আমাকে বুঝিয়ে দিল। দেড়ঘণ্টাকাল তিরমিজে কাটিয়ে আমরা আবার প্লেনে উঠলাম, আর দেড়ঘণ্টা উড়ে গিয়ে নামলাম তাসকেন্টের সুবৃহৎ এয়ার-পোর্টে।

মাটিতে পা-দিয়েই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কিছুকাল আমি দাঁড়িয়ে

রইলাম? এই কি তাসকেন্টের সেই এয়ার-পোর্ট, না তিন বছর আগে দেখে গিয়েছিলাম? একতলা সেই মাঝিবৃহৎ বাড়িটি কোথায়? কোথায় সেই তাকাকুজ? কোথায় সেই মিতিরবর্ণসমন্বিত ফুলের কেয়ারী?

একটি ত্রিতল প্রাসাদতুল্য বাড়ীর সামে আমাদের নামিয়ে দিল কেন? মস্কৌ এসে পড়লাম নাকি!

তিনবছরে তাসকেন্ট এয়ার পোর্টের পরিবর্তন হয়েছে। এখন ছোট-প্লেনের যুগ শুরু হয়েছে, বিমান-বহরের ক্যাপাসিটি ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই পরিবর্তন, মাত্র তিনটি বছরে। চারি দিকে চেয়ে দেখলাম। অপেক্ষমান প্লেনগুলি গণনা করে শেষ করতে পারলামনা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মার্বেল-পাথরে তৈরি সুপ্রশস্ত সোপান বেয়ে দ্বিতলের বিশ্রামগৃহে গিয়ে দলবদ্ধ বোসলাম।

এবার আমরা উজবেক রিপাবলিকের অতিথি নই, মস্কৌ শান্তি-কমিটির অতিথি। তাই তাসকেন্টে অভ্যর্থনার তেমন আড়ম্বর ছিলনা, যেমনটি ছিল আগের বারে। সেবার ডেলিগেশন-নায়কের গাড়ীর সামে চলত পাইলট কার, ডেলিগেশনের বাসস্থান করা হয়েছিল সুসজ্জিত বেরা একটি ভিলায়। এবার থাকতে হয়েছিল সুবৃহৎ এক হোটেলে।

তাসকেন্টে পৌঁছলেই তৈমুর বাদশার কথা মনে পড়ে যায়। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতের সদ্য স্থাপিত বন্ধুত্ব তৈমুরের বার বার দিল্লী লুণ্ঠনের এবং অমানুষিক হত্যার বীভৎসতার ভিতর দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাবরের বংশধররা ভারতবর্ষকেই তাঁদের নিজেদের দেশ করে নিয়ে তাঁদের পিতৃ-পিতামহ-মাতামহদের দেশ থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ভারতকে তাঁদের স্বদেশ করে নেবার প্রয়াসে তাঁরা যা করলেন, তা প্রাক-মুঘল আমলের ভারতীয়দের যেমন বেদনার কারণ হয়েছিল, তেমন নানা সাংস্কৃতিক অবদান দিয়ে সমৃদ্ধও করে তুলেছিল। আকবর ও দারার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ যে নতুন রূপ পরিগ্রহ করল, যে সাংস্কৃতিক চেতনা সে লাভ করল, তা প্রাক-মুঘল আমলের ভারতের রূপ থেকে বহুলাংশে পৃথক হয়েও ভারতীয় রূপ বলেই স্বীকৃতি পেল, যেমন ভারতীয়দের কাছে, তেমন বিদেশীদেরও কাছে। আজকার দিনে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও, সেই রূপ ভারতীয় নেশনের ও ন্যাশনালিজম-এর বাস্তব রূপ নিয়ে রয়েছে। আজ কিন্তু তৈমুরের বীভৎসতার স্মৃতি আমাদের চিত্তকে বেদনাক্লিষ্ট করে না। তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দে গিয়েও প্রবৃত্তির জন্যও ক্ষুব্ধ হইনি। শুধু তৈমুরের সমাধির পাশে বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এই কথাই ভেবেছি—অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়েও যে মানুষটির দেহাবশেষ এই সমাধিতে ধূলো হয়ে রয়েছে, সে-মানুষটির চিত্তে কোথাও কি মানবতার কিছুই ছিল না?

সমরকন্দের একটি বিখ্যাত মসজিদ দেখবার সময় সেখানকার গাইড একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পটি এই:

তৈমুরের প্রিয়তমা মহিষী এবং পাটরাণি ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী একটি তরুণী। সেই তরুণী রাণীর একবার খেয়াল হোলো তাঁর স্বামী যখন দিগ্বিজয়ে আবার যাবে হবেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে, তাঁর অন্তরের-শক্তির মূর্তে যা রয়েছে, তারই নিদর্শন রূপে এমন একটি মসজিদ তৈরি করবেন, যার সমতুল মসজিদ আর কোন দেশে নেই। রাণী কিন্তু সম্রাট-স্বামীর কাছে তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করলেন না। তৈমুর যখন দিগ্বিজয়ে বার হলেন রাণী তখন ঘোষণা করলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থপতি অনুপম একটি মসজিদ করে দিতে পারবেন, পারিশ্রমিক ছাড়াও তিনি প্রচুর পুরস্কার পাবেন। সর্বাগ্রে শিল্পীদের মসজিদের নক্সা পাঠাতে হবে। দেশ-বিদেশ থেকে শিল্পীরা নক্সা পাঠালেন। মাত্র একটি নক্সা রাণীর পছন্দ হলো। রাণী সেই শিল্পীকে আহ্বান করলেন। শিল্পীটি তরুণ, কন্দর্পকান্তি। পর্দার আড়াল থেকে রাণী তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—এই তরুণ বয়সে এমন শিল্প-নৈপুণ্য কেবল করে অর্জন করল অজ্ঞাতনামা এই স্থপতি! উজীরকে রাণীর নির্দেশ দেওয়াই ছিল। রাণীর সামেই উজীর শিল্পীকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—আগে আর কোথায় তুমি মসজিদ তৈরি করেছ?

—কোথাও না।

—আর কোন নক্সা তোমার করা আছে?

—যে নক্সা আমি পেশ করেছি, তাই আমার প্রথম ও শেষ নক্সা।

—সম্রাট ফিরে আসবার পূর্বে তুমি মসজিদ তৈরি সম্পূর্ণ করে দিতে পারবে?

—কাল ফিরে এসে পারব না, পরশুও না, এক বছরের মধ্যে ফিরে এলেও পারব না। অন্তত দেড় বছর সময় আমার লাগবে।

—না পারলে তোমার গর্দানা যাবে, তা জান ত?

—জানি।

—দেড় বছরের সময় তুমি পাবে।

তরুণ শিল্পী মসজিদ নির্মাণের বাহির গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী রাণী ঘোষণা করলেন শিল্পীকে সাহায্য করবার জন্য দশ সহস্র শিল্পী ও ষ্টাফ নিয়োগ করা হোক, দেশে দেশে চিঠির, ঘোড়ার, গাধার গাড়ীর বহর পাঠিয়ে মাল-মশলা আনবার ব্যবস্থা করা হোক। শিল্পীর প্রয়োজন পূর্ণ করতে কোন ত্রুটি ঘটলে উজীরের গর্দানা যাবে।

তাই কোন বিষয়ে কোন ত্রুটিই আর রইল না, দিনে দিনে দিবা-রাত্র কাজের ফলে মসজিদ রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। রোজকার যখন সূর্য্য পাটে বসতেন, তখন পাদী-পরিবৃতা হয়ে রাণী দেখতে যেতেন মসজিদের কাজ কতটা এগিয়েছে। রাণী চেয়ে থাকতেন মসজিদের নানা কাজের দিকে, আর শিল্পী চেয়ে থাকতেন অস্তগামী সূর্য্যের লালিমায় চন্দ্রাতপিত বুখারার অন্তঃপুরচারী ইরাণী রাণীর মিথুন মুখখানির নিরুপম গড়নের দিকে।

সহসা একদিন দুপুরবেলাই অন্তঃপুরে পরপর তাঁর তিনজন চাটুরী প্রবেশ করলেন, সর্বাঙ্গে অকারণ পুলক-শিহরণ অনুভব করে রাণী ও

শিল্পী একটু চুপ করে থেকে আবার দৃঢ় নিশ্চয়ের সঙ্গে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। রাণী ধীরে ধীরে মাথা নীচু করলেন। শিল্পী সন্তর্পণে তাঁর কণ্ঠলগ্ন বাহুর বেষ্টন মুক্ত করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর রাণীর দক্ষিণ হাত ধরে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন। রাণী নীরবে তাঁর অনুসরণ করলেন। শিল্পী সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাণী চলে যেতেই শিল্পী চারদিকে তাকালেন। সহস্র সহস্র মজুর কারিকর এসে জড়ো হয়েছে। সারারাত কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, চারিদিকে চলছে কলকোলাহল, দুটী যাবে বলে পড়বে, তারই ও ঘর্ঘরানি হচ্ছে। সমস্ত মিলিয়ে চারদিকে একটা অসম্ভব-রকমের মজুরের।

তারপর তাকালেন শিল্পী সেই কর্মচঞ্চলতার কোন অর্থই আর খুঁজে পেলেন না। কী হবে তিনটি কাজের মধ্যে মসজিদ্ সম্পূর্ণ করে? কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আর ত রাণী বিরহ-বাহিনীর মতিষ্কপে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন না, আর ত তাঁরবেন না তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য এক মুহূর্ত শিল্পী নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলেছে! শিল্পী স্থির করলেন মসজিদ নির্মাণের কাজ তিনি বিলম্বিত করবেন; যত বেশি দিন সম্ভব, যত বেশি নিজেই হাতকে দৈনিক একটিবার করে দেখবার অবসরটুকু পাবেন। সব অপূর্ণ হলে ক্ষতি কী? হোকই বা। তাঁদের প্রেম না ফোটে পাওয়া যাবে বেদনা যাবে, শিল্পী কতটুকু লাভবান হবেন। মসজিদ নির্মাণের কাজ মন্থর হতে লাগল।

রাণী যা একদা করে একদিন শিল্পীকে জানালেন যে এভাবে কাজ চালে বেশিদিন তিনি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে পারবেন না। শিল্পী নিবেদন করলেন—তবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শেষ করে দিতে পারেন যদি তাঁকে দ্বিগুণ মজুর দেওয়া হয়।

রাণী জানতে চাইলেন তাঁর প্রার্থনা কি?

শিল্পী অনুরোধ করলেন—পাথরের স্তরে স্তরে অক্ষরের পাঠন।

নির্দেশ দেওয়ার পরিদিনে রাণীর সম্বর্ধনার মেতে উঠল, হতভাগ্য শিল্পী কেমন করে ভুলতে পারল তিনি ভুবিশ্বরী হৈমন্তুরের প্রিয়তমা, শ্রেষ্ঠতমা মহিষী—রাণী প্রত্যহীনের অনুরোধ করলেন না, শিল্পীকে বিশ্বাস করলেন না, তার সীমাহীন শাস্তির কথা ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে চোখ তাঁরই দিকে তুলে রইলেন, ধীরে ধীরে আঁধার নেমে এলো, দুটি প্রদীপ্ত চোখ আর দুটি প্রদীপ্ত চোখে মেশে শুরু হয়ে রইল।

প্রহরীরা সহচরী দুই পাশে দিয়ে রাণীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। রাণী অস্ফুট স্বরে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সহচরী রাণীকে নিয়ে দূরে সরে গেল। রাণী চোখে চোখে রেখেছিলেন তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একবার চারদিক চেয়ে দেখলেন। তারপর স্থির পদক্ষেপে শিল্পীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করে তোমাকে আমি ধন্য করব, নিজেও হবো ধন্য। শেষ কয়েকটি কথা আর তিনি শেষ করবার অবসর পেলেননা। দুঃখের তপ্ত দুটি অধরে অধরে পরশ। তারপরই রাণী মুখখা টেনে নিয়ে বললেন—নির্দিষ্ট সময়েই মসজিদ যেন সম্পূর্ণ হয়।

তাই হোলো। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মসজিদের সকল কার্য সুসম্পন্ন হয়ে গেল। রাণী শেষ পরিদর্শন করে শিল্পীকে সাধুবাদ জানাবার জন্য তাঁর সন্ধান করলেন, সন্ধান কেউ দিতে পারল না। রাণী সক্রোধ নয়নে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

হৈমন্তুর ফিরে এলেন। তাঁর প্রিয়তমা, শ্রেষ্ঠতমা মহিষী মসজিদটি সমারোহ সহকারে স্বামীকে নিবেদন করলেন—প্রণামের সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।

হৈমন্তুর জানতে চাইলেন—এত অল্প সময়ে এমন বৃহৎ মসজিদ এমন মহিমামণ্ডিত হলো কেমন করে? হৈমন্তুরের প্রশ্নের উত্তরে হৈমন্তুরের পাশে দাঁড়িয়ে হৈমন্তুরের প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠতমা মহিষী অকম্পিত কণ্ঠে বললেন—তার জন্য তাকে কী মূল্য দিতে একেবারে নিঃস্ব হতে হয়েছে।

হৈমন্তুর সব শুনলেন, ঘাতককে ডাকলেন না, নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন না, ইরাণী ছোরাও আগ থেকে টেনে বার করলেন না, অদ্ভুত শান্তে শুধু আজ্ঞা করলেন—সেই অকৃত্রিম অনুপম শিল্পীকে আমি একবার দেখতে চাই।

শিল্পীকে কোথাও পাওয়া গেলনা। তার শাকরের এক কিশোরকে ডেকে আনা হলো।

শান্তস্বরে হৈমন্তুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার গুরু কোথায় বালক?

ভয়ে আড়ষ্ট কিশোর।

—নির্ভয়ে বল, অভয় দিলেন হৈমন্তুর।

কিশোর এইবার কথা কইল। সে বলল—রাণী যেদিন সন্ধ্যায় আমার গুরুর কাছে সম্ভোগ প্রকাশ করে যান, সে সন্ধ্যায় আমি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম, আমার গুরু ধীরে ধীরে সবচেয়ে উঁচু মিনারটীর শিখরে দাঁড়িয়ে নীলিমায় বাহু মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম, গুরু আমার সহসায় নীলিমায় মিলিয়ে গেলেন।

শুনে হৈমন্তুর স্তব্ধ, স্তব্ধ পাত্র-মিত্র সব। পদ্মের অন্তরালে প্রস্তর মূর্তির মতো চপস্থিষ্ঠা রাণীর দুগাল বয়ে ঝরছে অশ্রুধারা। সে গালে আর লেশমাত্র লালিমা নেই।

ক্রমশঃ

ধর্ম্মে অভয়ত্ব ও ভয়বাদ

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

বিশ্বের যত বিশ্বমানবের ঈশ্বর ধারণাও বহু বিচিত্র। এই বিচিত্রতার একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য রহিয়াছে। সেইজন্যই ইহা এতখানি স্বাভাবিক। ধর্ম্মে সমন্বয় প্রচেষ্টা বহু কতকটা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। স্রষ্টার কামনা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও আবির্ভাব। ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন—এক আমি বহু হইব, একোঽহম্ বহু স্যাম প্রজায়েয়। সেই পরম ইচ্ছা হইতেই বিচিত্রতা বহুলতা।

মানব জাতির ঈশ্বর ধারণায় ও ধর্ম বিশ্বাসেও এই বিশেষত্ব সর্ব্বত্রোভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বহু ব্যক্তি মনে করে ভগবানের অস্তিত্ব নাই। প্রমাণ নাই বলিয়া অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি আপনা আপনি হইয়াছে। ইহার কোনও কর্ত্তা নাই। গীতার ভাষায়—অপরীক্ষ্যং প্রভুং। কতক কতক লোক আবার সংশয়বাদী agnostic। অরণ্যবাসী বন্য মানব যাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহাদিগের স্রষ্টা ও পাতার ধারণা—সভ্য মানবের ঐশ্বরিক ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কোনও কোনও বন্যজাতি মনে করে—কোনও বিশেষ প্রকার জীবজন্তু, ভূত বা প্রেতই তাহাদের স্রষ্টা। পাশ্চাত্য অভিধানে ইহারা টটেম উপাসক। কোনও কোনও বন্য জাতির দেবতার নাম বোঝাবুঝি। বৃক্ষ উপাসনা করে এমন সম্প্রদায়েরও অভাব নাই। পৃথিবীতে লিঙ্গ-পূজক জাতিরও বিদ্যমানতা রহিয়াছে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ইহাদের নাম দিয়াছেন—ফ্যালিক-ওয়ারশিপার্স। আবার বহু জাতি নর পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোনও বিশেষ মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া, বিশ্বকর্ত্তা বলিয়া আরাধনা করেন। তাঁহাদিগের অভিমত—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। এই মতবাদ অবতারবাদ হইতে পৃথক। জগতের বহু মনুষ্য নবীবাদী। নবীর ইংরেজী অভিধা প্রফেট। সামাসন জাতি, প্রাচীন হিব্রু সম্প্রদায় এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে নবী পন্থারই সমধিক সমাদর। স্বর্গে বা বেহেস্তে একজন ঈশ্বর থাকিলেও প্রফেটই ভগবানের প্রকৃত প্রতিনিধি, উপনিষদিক ভাষায় ধারণা। তাঁহার নবীত্ব বিশ্বাস করিলেই ঈশ্বরের কৃপালাভ সম্ভব হয়। প্রফেটে অবিশ্বাসীর অনন্ত নরক। খৃষ্টান জাতির অভিমত ইনি মনুষ্য পুত্র হইলেও Son of God, আবার ঈশ্বর পুত্র হইলেও ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। ইনিই প্রকৃত ঈশ্বর True God এবং একং ঈশ্বর—Only God.

আস্তিকের মধ্যে অনেকেই আবার নাস্তার বিশ্বাসী। অনেকে নিরাকার ভজনা করেন। এই নিরাকারত্বেও আবার অভিনবত্ব আছে। বৈদিক নিরাকারত্ব অবাঙ্মনসো গোচরম্। মন, বুদ্ধি, বাক্য দিয়া ইহার উপাসনা করা যায় না। অস্তি এই উপলব্ধি দ্বারা তাঁহাকে ব্রহ্ম করা যায় মাত্র। শ্রুতি বলেন—যাঁহাকে আকারহীন মনে করিতেছ, তিনিই সৎ তৎ সৎ। এই সদ্বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন কর। উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্মবাদ। কিন্তু বৈদিক নিরাকারত্ব আকারহীনত্বেই পর্য্যবসিত নহে। শ্রুতি ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বরূপের অপচয় ঘটাইতে চাহেন নাই। তাই বেদ বিজ্ঞান বলিয়াছেন—তিনি সর্ব্বম্। তিনি মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব একমাত্র বেদান্তেই উদ্ঘোষিত হইয়াছে। মহতোমহীয়ানের সহিত যুগপৎ অণোরণীয়ান্ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া শ্রুতি ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকারত্বের সমাহার ও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। কেবল মাত্র নিরাকার বলিলে ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে শ্রুতি একান্ত সাবধান। তাই, তাঁহাকে একবার বলা হইয়াছে সৎ এবং তদ্মুহূর্ত্তেই বলা হইয়াছে অসৎ। গীতা পাতঞ্জল এই সিদ্ধান্তের সমর্থক।

কেবলমাত্র আকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, টটেম ও ভূত প্রেতের উপাসনা ইহাই নহে, তিনি বা তাঁহারা যে ভাবেই ঈশ্বর আরাধনা করুন, ঈশ্বর যে পাপীর দণ্ড বিধান করেন এবং পুণ্যবানকে স্বর্গ সুখ প্রদান করেন, অধিকাংশ আস্তিক্যবাদেই এইরূপ অভিমত পোষিত হইয়া থাকে। ভগবান পাপের শাস্তা, অতএব মহত্তর—উচ্চতর বস্তু মহত্তর। এই মতই—অধিকাংশ আস্তিক্যবাদের দ্বারা স্বীকৃত। ঘুরেফিরে ভবিষ্যৎপুরুষের অস্তিত্ব হইতেই আস্তিক্যবোধেরও ধর্ম্মভাবের উন্মেষ। এই সিদ্ধান্তটি একান্তভাবে অবহেলার যোগ্য নহে। মানুষ তাহার সত্তাকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অসহায় ভাবিয়া এক সর্ব্বশক্তিমান পরম অস্তিত্বের আশ্রয় চাহিয়াছিল। আর্ত্ত উপাসকও চতুর্ব্বিধ ভজনাকারীর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু মানুষের ঈশ্বর ধারণার অপূর্ণতা হইতে এই পরম আশ্রয়—সর্ব্বাশ্রয় হইয়াও হইলেন পরম নিরাশ্রয়। চরম ভয়ঙ্কর, ভয়ের ও ভয়। পার্থিব আতঙ্ক হইতে উদ্ধারের কোনও পন্থা হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের কোপ হইতে নিষ্কৃতির উপায় মাত্র নাই। তিনি নাকি ন্যায়দণ্ডে বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করেন। ইহা সায়াসেনীয় হিব্রু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত। এই জাতীয় ঈশ্বরের স্বর্গ ও নরক ইহার মধ্যবর্ত্তী কোনও পথ নাই। প্রার্থনিতও নাই। কর্ম্মফল নাই। তিনি আমো দুরুদং সর্ব্ব ভূতানাং নহেন। এই বিশ্বস্রষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না—এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম। (কঠ, শ্রুতি) ইনি কখনই আশুতোষ শিব নহেন।

অধিকাংশ আস্তিক্য মতের ভগবান কেবল ভয়ের পাত্র। মর্ত্যের মানুষ তাঁহার ভয়ঙ্করতায় অনুক্ষণ সন্ত্রস্ত। কি জানি, কোন পাপে মানুষ কখন নরকস্থ হইবে। তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রার্থনা পরায়ণ—অহরহ অর্ঘ হস্তে ধ্যানমগ্ন। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়—

যাহা কিছু উত্তম তাহাই উপাস্যের দিকে ইঙ্গিত দুই বিধান হইতে। এমন কি ইহার জন্য আপনার দেহ এবং আপনার হইতে প্রিয়তম পুত্র পরিজনকে বলি দিতেও কুণ্ঠিত নহে। ভগবানকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মানুষকে কত কি যে কৃচ্ছ্র সাধনা করিতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈনের সাধনার নৈরাত্মিক বহু পুষ্ট ও বহুমুখীন এই উগ্র তপশ্চর্যার ইতিবৃত্ত কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া রহিয়াছে।

এই কারণে তপস্যার উদ্দেশ্য ভগবানের কৃপা লাভ, পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান। কারণ, তিনি কঠিন কারণ—তিনি রুদ্র। ভয়ের মধ্যে তাঁহাকে বিশেষিত করা হয়। তাহা তাঁহার অনুগ্রহ লাভের কৌশল মাত্র। ভয় করিবার জন্যই, সৃষ্টি স্থিতি করিবার জন্যই তিনি তাঁহার কালদণ্ড উদ্যত করিয়া রহিয়াছেন। ঐশ্বরিক বিধানের বিন্দু বিসর্গ পাছে হইলেই তিনি দুর্বাসার মত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহার যজ্ঞভাগ না পাইলে দক্ষযজ্ঞ ভণ্ডুল করিয়া দেন।

বিশ্বসৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পর বেদ-বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত। শ্রুতি উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—অখিল ভূত আনন্দ হইতে জাত হইয়াছে, তাহারা উৎপত্তির পর ঐ আনন্দের দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়কালে ঐ আনন্দেই বিলীন হয়। শুধু জন্ম ও জীবন নহে। মৃত্যু পরাস্ত আনন্দের পরিব্যাপ্তি। ছান্দোগ্য শ্রুতি মৃত্যুর নাম দিয়াছেন—জীবন-যজ্ঞের অবভৃথ স্নান। জীবিতাবস্থায় স্নান করিয়া মানুষ যেমন ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করে, উৎক্রান্তির তদ্রূপ, ইহা পরম পরিতৃপ্তির অবস্থা। এই কথাটাই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

এই প্রত্যক্ষ জগতের আর কোনও ধর্মশাস্ত্রে, ধর্মমতে ও তত্ত্বচিন্তায় ইহা উচ্চারিত হয় নাই। আনন্দ ব্রহ্ম এই ধর্মমত ও ধর্ম বিধান, ইহা একমাত্র শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এইরূপ—এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—তিনি জগতের নাভি।—নাভো জগানাং। ঋগ্বেদের—মানুষকে ব্রহ্মস্বরূপ যাজ্ঞ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে—বলিয়াছেন :—অহং ভুবং বসুনাচেকিতানা তা ব্রহ্মণিয়ে পবমে ন ইন্দ্র যা ই—আমি রুদ্র বসু ধারণ করিয়া ব্রহ্মদ্বেষীদের দমন করি।

পরম ব্রহ্মই যে রুদ্রের একটা বিভাব (aspect) বেদ-বিজ্ঞান ইহা অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। পঞ্চম একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনযোগে শ্রীভগবানের লোক-মহেশ্বর রূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই লোকমহৎকাঠামোরূপে বেদিকা কণ্ঠ শ্রুতির সেই বহুশ্রুতঃ মহত্তর কথা মনে পড়ে। সেই :—

তমসস্তাদ্বিজানতি তমসস্পরি সূর্যঃ।
তমসিদ্ধ বাহুক মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

জগতের অপরাপর ধর্মমতে ঈশ্বরের স্বরূপটা কতটা বেদের প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে বেদ-বিজ্ঞানে তেমন নহে। বেদ-বিজ্ঞানে ব্রহ্ম আনন্দ, অমৃত, রসস্বরূপ। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসে তাঁহাকে পরম পরমাণু—এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে। বৈদিক ভারতেরই আধ্যাত্মিক সম্পদ—আনন্দ ব্রহ্ম। এই তাপদগ্ধ বিজ্ঞান জগতের আর কোনও ধর্মমতে আছে বলিয়া জানা যায় না। ঈশ্বর উদ্ধারকর্তা—সেটিয়ার। পুণ্য কার্যের প্রতিদান সুকৃতকারীকে তিনি স্বর্গ সম্পদের অধিকারী করেন। কিন্তু আনন্দ স্বরূপ নহেন। তাঁহার উপাসকগণ তাঁহাকে রসো বৈ সঃ বলিয়া রসময় পূজা করেন না। এই জীবনাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে না—আকাশে যদি আনন্দ না থাকিতেন, তবে কেই বা জীবন ধারণ করিতে চাহিত—রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ—প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।

বেদ বিজ্ঞানে ব্রহ্মকে—প্রচলিত ভাষায় ঈশ্বরকে তাও বলা হইয়াছে। ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। শ্রুতি কণ্ঠে এইরূপ প্রার্থনাও উচ্চারিত হইয়াছে—রুদ্র যত্তে দক্ষিণ মুখম্ তেন মাং পাহি নিত্যম্। ব্রহ্ম রুদ্র। তিনি ভয়েরও ভয়। ভীষণ অপেক্ষাও ভীষণতম। সেই রাজাধিরাজ উদ্যত বজ্র মহত্তম। তাঁহারই প্রশাসনে সূর্য চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যে ব্রহ্ম পরিচয় দিয়েছেন তাহা প্রজ্ঞান ও কবিত্বের অপূর্ব অভিব্যক্তি। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি অজর অমৃত। ভগবান উদ্ধারকর্তা, সর্বতোভাবে তাঁহার অনুগত হইতে মানুষকে মুক্ত করেন, কিন্তু ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ আনন্দ—আনন্দং ব্রহ্ম—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন—এই আনন্দ ব্রহ্মকে জানিলে কোনও কিছুতে ভয় থাকে না, এই তত্ত্বের উল্লেখ হয় নাই। কেবল শ্রুতিই এই কথা বলিয়াছেন—জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত—আনন্দেরই নিচয়ন। জীবনান্তেই প্রকৃত সত্তা হইতেছে অজর—অমৃত। কৌষীতক প্রদর্শন গঙ্গায়ে বলিতেছেন—স এষ প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃত। পাপ নাই পরন্তু অনন্ত অমৃত হইতেই জীবনত্বের আবির্ভাব। জীবের আত্মা অন্তর্যামী পুরুষকে উপনিষৎ বলিতেছেন—ইনি অমৃত—এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃত :—এই তোমার আত্মা অমৃত।

উপনিষদ্ মহত্তম বলিয়াই বেদ-বিজ্ঞান তাঁহার সিদ্ধান্তে ইতিশেষ করেন নাই, পরন্তু এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন—ব্রহ্মই ভূমা—তিনিই পরম সুখ। সুখের পরাকাষ্ঠা তিনি। আর এই যে ভূমা, তাহা হইতে জীব অভিন্ন—তৎ ত্বমসি। উপনিষদে ইহাকে নানাভাবে আনন্দ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বলিয়াছেন ইনি রাস স্বরূপ। বলিয়াছেন—এতস্য বা অক্ষরস্য। এতস্য অমৃতস্য।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

মার্কিণ নির্ব্বাচন—

গত নভেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই নির্ব্বাচনে শাসন বিভাগীয় দল অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রিপাবলিক্যান্ দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সেনেটে (উচ্চ পরিষদ) ও প্রতিনিধি-পরিষদে রিপাবলিক্যান্ দলের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিমোক্রেটিক দলের সামান্য সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ ছিল ৯৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত সেনেটে মাত্র দুই জন এবং ৪৩৩ জন সদস্যের প্রতিনিধি পরিষদে ৩৫ জন। এই নির্ব্বাচনের ফলে উভয় পরিষদেই ডিমোক্রেটিক দলের সদস্য-সংখ্যা রিপাবলিক্যান্দের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে ৩৪টি রাষ্ট্রের গভর্ণরও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে রিপাবলিক্যান্ গভর্ণর অপেক্ষা ডিমোক্রেটিক গভর্ণরেরা সংখ্যায় ১০ জন বেশী ছিলেন। এই নির্ব্বাচনে সে পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে চৌদ্দ জন। নিউ ইয়র্কের গভর্ণর পদে নেলসন রকফেলারের নির্ব্বাচন রিপাবলিক্যান্ দলের একটি উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য। এতদিন একরূপ স্থির ছিল—আগামী ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে রিপাবলিক্যান্ দলের প্রার্থী হইবেন বর্ত্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সন। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইবে—রিপাবলিক্যান্ দলের প্রার্থী হইবার অধিকতর যোগ্য কে—নিক্সন, না রকফেলার? মার্কিণ সংবিধানের সর্ব্বশেষ সংশোধন অনুসারে এক ব্যক্তি দুইবারের বেশী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। কাজেই, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের যোগ্য বলিলেও তিনি আর তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট প্রধান। চার বৎসর অন্তর সর্ব্বজনীন ভোটে পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্ট সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তৃপক্ষ। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থাপক বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্। শাসন বিভাগের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেন্টের (অন্য সকলেই প্রেসিডেন্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্র) এবং ব্যবস্থাপক বিভাগের দুইটি পরিষদের নির্ব্বাচন হয় স্বতন্ত্রভাবে; দুইটি বিভাগের কাজও চলে পৃথক এবং স্বাধীনভাবে। প্রেসিডেন্ট তাঁহার কাজের জন্য আইন সভা দুইটির নিকট দায়ী নহেন; সুতরাং, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রিপাব-লিক্যান্ পার্টি ব্যবস্থা পরিষদ দুইটিতে সংখ্যা-পরিষ্ঠতা হারাইলে তাঁহার পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না।

আমেরিকার রিপাবলিক্যান্ দল ও ডিমোক্রেটিক দলে মূলগত প্রভেদ নাই। ইহাদের মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। উভয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিপোষক,—ধনী পুঁজিপতির আধিক্য দুই দলেই। তবে, ইহাদের মধ্যে ডিমোক্রেটিক দল প্রগতিশীল বলিয়া পরিচিত; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই দলের সভ্য ছিলেন। অবশ্য, চরম প্রতিক্রিয়াশীল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও এই দলের। নিউ-ইয়র্কের গভর্ণর ফরাসও ডিমোক্রাট্। যাহা হউক, এই দলের সমর্থকদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের সংখ্যা বেশী; অবশিষ্ট-প্রধান উত্তরাঞ্চলে ডিমোক্রাটদের সংখ্যাধিক্য। সম্প্রতি এই দলের মধ্যে একটি র‍্যাডিক্যাল শাখার উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিণ নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে লণ্ডনের 'নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের' নিম্ন-লিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"Now they (die-hard Republicans) have been defeated by Democrats who belong to the more liberal wing of the party..... these elections mean a genuine shift to the left. It is not simply a case, as it has so often been in American politics, Democrats beating Republicans with whom they agree on all essential issues.

সুদানে সামরিক একনায়কত্ব—

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সুদানে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবুবক্‌র বেগের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সামরিক "ক্যুপ" হইয়াছে, সামরিক একনায়কের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা এখনও অস্পষ্ট। সুদানের সর্ব্বশেষ প্রধানমন্ত্রী আবদুল খলিল্ পাশ্চাত্যের অনুগত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলকে উচ্ছেদ করিয়া মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনই সামরিক ক্যুপের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রথমে মনে করা হয়। কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত করিয়া জেনারেল আবুবক্‌র মিশরের সমর্থক সুদানী সংবাদপত্রগুলিকে এই অভিযোগে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা "বৈদেশিক চুক্তিবাদের সহিত সংযোগ" স্থাপন করিয়াছিল। জেনারেল আবুবক্‌র মার্কিণ সাহায্য লইতে সম্মত হইয়াছেন। এই সাহায্য দানের ব্যাপার সম্পর্কে গত ১৯শে নভেম্বর খার্টুমের এক সংবাদে বলা হয়—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সুদানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে চাহিয়াছিল এবং প্রধানমন্ত্রী আবদুল খলিল্ আগ্রহের সহিত সে সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু খার্টুমের সর্ব্বসম্মত অভিমত এই যে, মার্কিণ সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা উচিত; পার্লামেণ্টে এই সাহায্যের অনুকূলে যাহাতে ভোট হয়, তদুদ্দেশ্যে মার্কিণ দূতাবাস এক দিনে বহু

হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। এই মার্কিণ সাহায্য আক্ষরিক গ্রহণ করিয়াছেন। আমার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি লোকান্তরে চীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। সুদানের দান ইক অনুষ্ঠানকে বিপুল অভিনন্দনই জানাইয়াছে। সম্প্রতি আসোয়ান বাঁধের প্রথমাংশের কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট হইতে মিশরের ৪০ কোটী রুবল ঋণ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আসোয়ান বাঁধের সহিত মিশর ও সুদান—উভয়ের স্বার্থ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, সামরিক এক-নায়কের অধীনে সুদানের সহিত মিশরের সম্পর্ক কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সুদানের তুলা বিক্রয়ের জন্য বাজার বজায় প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাহার নিকট হইতে অধিক সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য একটি সোভিয়েট মিশনের সুদানে আসিবার কথা ছিল। নিরপেক্ষ নীতিতে অবিচলিত থাকিয়া সুদান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সুসম্পর্ক রাখিতে পারে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুদানের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে লণ্ডন টাইম্‌স্ বলেন—They (the main difficulties facing the Sudan) are the failure to find a market for cotton and consequent foreign exchange crisis, the south's bankering after self-government, and, above all, relations with Egypt. (Times 18-11-58)

বার্লিন্ সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব—

নভেম্বর মাসের প্রথমে মঃ ক্রুশ্চেভ্, বন্ধোর পোলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মঃ গোমুল্‌কার সম্বর্ধনা-সভায় বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব বার্লিনের কর্তৃত্ব পূর্ব জার্মানীর উপর ছাড়িয়া দিবে। বার্লিন্ সম্পর্কে এই নূতন নীতির ভিত্তিতে রচিত একটি প্রস্তাব বৃটেন্, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিকট নভেম্বর মাসের শেষভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রস্তাবের একটি অনুলিপি রাষ্ট্র-সঙ্ঘেও প্রেরিত হইয়াছে। এই নূতন সোভিয়েট প্রস্তাবের প্রধান কথা—যে তিনটি পাশ্চাত্য শক্তি (বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স) বর্তমানে পশ্চিম বার্লিন্ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা সেখান হইতে অপসরণ করুক, পশ্চিম বার্লিন নিরস্ত্রীকৃত স্বাধীন উন্মুক্ত নগরীতে পরিণত হউক, পশ্চিম বার্লিনের এই মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত। এই মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্র-সঙ্ঘ অংশ গ্রহণ করাতেও সোভিয়েট ইউনিয়নের আপত্তি নাই। এই প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিম বার্লিন হইতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অপসরণের জন্য সোভিয়েট প্রস্তাবে ছয় মাস সময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ছয় মাস বর্তমান ব্যবস্থাই প্রবর্তিত থাকিবে; অর্থাৎ জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের (পূর্ব জার্মানীর) মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পশ্চিম জার্মানীর সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে তখন পূর্ব-জার্মানীর মধ্য দিয়া পশ্চিম বার্লিনের সহিত সংযোগসূত্রগুলি নিয়ন্ত্রণের ভার ঐ অঞ্চলের গভর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত হইবে।

জার্মানী ও বার্লিন্ বিভক্ত হইবার এবং উহাদের উপর বিজয়ী চতুঃশক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সাম্প্রতিক ইতিহাস এইরূপ। সোভিয়েট সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণেই জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। রাজধানী বার্লিন তাহারাই অধিকার করিয়াছিল। জার্মানীকে পরাজিত করিবার প্রধান কৃতিত্ব সোভিয়েট সেনাবাহিনীর প্রাপ্য হইলেও ইহাকে মিত্রশক্তির সম্মিলিত বিজয় বলিয়া গণ্য করা হয় এবং পরাজিত জার্মানীর উপর চারিটি বিজয়ী শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার স্বাভাবিক অধিকারেই রাজধানী বার্লিন সহ পূর্বাঞ্চল অধিকার করে। পশ্চিম অঞ্চলে অবশিষ্ট তিনটি শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সোভিয়েট কর্তৃত্বাধীন পূর্বাঞ্চল জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক্ নামে কমুনিষ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম জার্মানী সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক জোট "ন্যাটোর" অন্তর্ভুক্ত হইবার পর পূর্ব জার্মানী পাশ্চাত্য সামরিক প্রতিষ্ঠান ওয়ারস্ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—জার্মানীর ঐতিহাসিক রাজধানী পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত, পশ্চিমাঞ্চল হইতে যাইতে হইলে কমুনিষ্ট প্রভুত্বাধীন জার্মান-গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। যুদ্ধের পর স্থির হইয়াছিল যে, সোভিয়েট প্রভাবাধীন পূর্ব-জার্মানীতে বার্লিনের অবস্থিতি হইলেও এখানে চারিটি বিজয়ী শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। তদনুসারে পূর্ব বার্লিনে সোভিয়েট ইউনিয়নের এবং বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চলে অন্য তিনটি শক্তির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। পূর্ব জার্মানীর মধ্য দিয়া পশ্চিম বার্লিনের সহিত সংযোগ রক্ষার অধিকার পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে দেওয়া হইয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম বার্লিন সংক্রান্ত এই প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সমস্যায় পড়িয়াছেন। পশ্চিম বার্লিন যদি তাঁহারা ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে ছয় মাস পরে পূর্ব জার্মান গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে পশ্চিম বার্লিনের সহিত তাহারা সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন না। অথচ, পূর্ব জার্মান গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন। এই অবস্থায় পূর্ব জার্মান গভর্ণমেণ্টের অনুমতির তোয়াক্কা না রাখিয়া জোর করিয়া পশ্চিম বার্লিনে যাওয়া ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর থাকিবে না। এদিকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, জোর করিয়া পূর্ব জার্মানীর মধ্য দিয়া পথ করিতে চেষ্টা করিলে উহাকে ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়াই ধরা হইবে; যেহেতু পূর্ব জার্মানী ওয়ারস্ সামরিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত, সে জন্য তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ ঐ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়াই গণ্য করা হইবে। অতএব, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যদি সোভিয়েট প্রস্তাবের ভিত্তিতে পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তুত হইতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ছয় মাস পরে যুদ্ধ বাধাইবার ঝুঁকি লইয়া উহার সহিত তাহাদিগকে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। অথবা কমুনিষ্ট কূটনীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া পূর্ব

জার্মান গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাহার নিকট হইতে সংযোগ রক্ষার অনুমতি লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জার্মানীর দুই অংশে এখন দুইটি বিরুদ্ধ সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত। এখন কম্যুনিষ্ট একেকার মধ্যে পশ্চিম বার্লিন কার্য্যতঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গের অগ্রগামী পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটীরূপে কাজ করিতেছে। সুতরাং, বার্লিনের এই অংশকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কবলমুক্ত করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব লণ্ডনে উত্থাপিত হয় নাই এবং এই প্রস্তাব উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। আর তাহার প্রস্তাবে খুবই সংযমের এবং দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। পশ্চিম বার্লিনকে বৈদেশিক কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে দিবার কথা বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরে তাহার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সহায়তা গ্রহণ করিতে দিবার সম্মতি সোভিয়েট প্রস্তাবের নৈতিক গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রস্তাবের এই নৈতিক গুরুত্বের প্রভাব রোধ করা সহজ হইবে না। বস্তুতঃ, পশ্চিমী শক্তিবর্গ সোভিয়েট প্রস্তাবের কোনও সঙ্গত উত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা শুধু বলিতেছেন যে, বার্লিনের প্রশ্ন বিভক্ত-জার্মানীর পুনর্মিলন সংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত জড়িত; জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইলে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত বার্লিনের পূর্ব্ব জার্মানীর রাজধানী হইবে—তাহার পূর্ব্বে বার্লিন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা কোনও যুক্তি নহে। জার্মানীর দুই অংশ আপাততঃ মিলিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে বার্লিন সম্পর্কেও কোনওরূপ মীমাংসার চেষ্টায় সম্মত না হওয়াটা অন্যায় জিদ্ মাত্র। পশ্চিমী শক্তিবর্গ স্বাধীন নির্ব্বাচনের দ্বারা জার্মানীর দুই অংশের মিলন চাহিতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন জানাইয়াছে যে, পশ্চিম জার্মানী যদি কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক জোট—ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সমগ্র জার্মানীকে ঐ জোটের মধ্যে লইতে সে দিবে না। এখন সোভিয়েট রুশিয়ার নীতি—জার্মানীর দুই অংশের গভর্ণমেণ্ট নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া কনফেডারেশনের দ্বারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করুক, বাহিরের কোনও শক্তিরই হাতে নাক গলাইবার প্রয়োজন নাই। অথচ, পশ্চিম-জার্মান গভর্ণমেণ্ট ও তাহাদের পশ্চিমী মুরুব্বিরা পূর্ব্ব-জার্মান গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতেই প্রস্তুত নন। দুই পক্ষের এই নীতির মধ্যে কোনও আপোষের সূত্র নাই। সুতরাং, জার্মানীর মিলন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসাও সুদূরপরাহত।

ফরাসী নির্ব্বাচন—

গত সেপ্টেম্বর মাসে জেনারেল ডু গলের রচিত সংবিধান ফ্রান্সে গণভোটে গৃহীত হইয়াছিল। এই সংবিধান অনুসারে গত নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে ডু গলের সমর্থক দক্ষিণ-পন্থীরা বিপুলভাবে জয়লাভ করিয়াছে। জাতীয় পরিষদে খাস ফ্রান্সের মোট ৫৩৫টি আসনের মধ্যে ১৮৭টি আসন অধিকার করিয়াছে ডু গল্ পন্থী ইউ-এন্-আর দল, ১৫৩টি আসন রক্ষণশীল দলের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ক্যাথলিক এম্-আর-পি অধিকার করিয়াছে ৫৭টি আসন। এই নির্ব্বাচনে বামপন্থী দলগুলির দারুণ শক্তি ক্ষয় হইয়াছে। সোস্যালিষ্ট, র‍্যাডিক্যাল ও কম্যুনিষ্টদের অধিকৃত মোট আসন সংখ্যা এক শতেরও কম। প্রদত্ত ভোট-পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, ইউ-এন্-আর শতকরা ২৬ ভাগ ভোট পাইয়াছে, রক্ষণশীল দল পাইয়াছে ২১ ভাগ, ক্যাথলিক দল শতকরা ৮ ভাগ, সোস্যালিষ্ট দল শতকরা ১৭ ভাগ এবং কম্যুনিষ্ট দল শতকরা ২১ ভাগ ভোট পাইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, দক্ষিণপন্থী তিনটি দলই তাহাদের অধিকৃত আসন সংখ্যার তুলনায় ভোট পাইয়াছে খুবই কম। ইহাদের মধ্যে ক্যাথলিক দল শতকরা মাত্র ৮ ভাগ ভোট পাইয়া ৫৭টি আসন অধিকার করিয়াছে, আর কম্যুনিষ্টরা শতকরা ২১ ভাগ ভোট পাইয়া আসন লাভ করিয়াছে মাত্র ১০টি। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ—নূতন সংবিধানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার বিলুপ্তি দ্বিতীয় কারণ—নির্ব্বাচনকালে বামপন্থী সোস্যালিষ্টদের কর্তৃক দক্ষিণপন্থী-দের সুকৌশলী পক্ষ সমর্থন।

গত মে মাসে ক্ষমতা লাভের সময় জেনারেল ডু গল্ ঘোষণা করিয়া-ছিলেন যে, তিনি বলগত রাজনীতির ঊর্দ্ধে থাকিবেন। তাঁহার এই উক্তি আন্তরিক হউক, আর না-ই হউক, সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে তাঁহার জনপ্রিয়তাকে আশ্রয় করিয়া ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি ক্ষমতালাভ করিল। যে সামরিক ক্যাবিনেট দল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিকরা গত মে মাসে দেশের ন্যায়সঙ্গত গভর্ণমেণ্টকে অমান্য করিয়াছিল, প্যারিসে হস্তীবাহিনী নামাইয়া দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের হুমকী দিয়াছিল, তাঁহারা এবং তাহাদের সমর্থকরাই প্রবল হইয়া উঠিল। শোনা যায়, ডু গলের ইচ্ছা ছিল—তিনি দক্ষিণপন্থী সোস্যালিষ্ট পি মালকে প্রধান মন্ত্রী করিবেন। কিন্তু দলের দল এই নির্ব্বাচনে নগণ্য প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সুশতেলের ইউ-এন্-আর আজ ফরাসী জাতীয় পরিষদে বৃহত্তম দল। প্রধান মন্ত্রিত্বে সঙ্গত দাবী তাঁহারই। গত মে মাসে আল্‌জেরিয়ার বিদ্রোহের পশ্চাতে যেসকল যে প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসীরা ছিল, সুশতেলকে তাহাদের মুখপাত্র বলা যাইতে পারে। আল্‌-জেরিয়ায় গভর্ণর থাকিবার সময় সুশতেল সেখানকার ফরাসী অধিবাসী-দের বড় প্রিয় ছিলেন। সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে আল্‌জেরিয়ার জন্য নির্দ্ধারিত ৭টি আসন যে দলের সেই ক্যাবিনেটপন্থীরাই অধিকার করিয়াছে। নির্ব্বাচিত আরবরা যাহা যাহা বলের খাঁ, ফরাসীরা আসু প্রতিক্রিয়াপন্থী। গত ২১শে ডিসেম্বর ডু গল্ আনুষ্ঠানিকভাবে সাত বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নূতন সংবিধানে রাষ্ট্রপতি প্রধান হইলেও জাতীয় পরিষদে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য স্বভাবতঃ তাঁহার নীতিকে প্রভাবিত করিবে। সে প্রভাব কতদূর পড়ায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ক্রিসটোফারসন্

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[লেখক ব্রাণ্ট গিসিং (George Robert Gissing) পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েকফিল্ড শহরের নিকটবর্তী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ম্যানচেষ্টারের ওয়েসলিয়ান কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক বিবাহের ফলে তাঁর শিক্ষাজীবন এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রথমে তিনি লণ্ডনে এবং পরে আমেরিকা যান। দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন, অধিকাংশ রচনাতেই এর ছাপ ফুটে উঠেছে। দেশান্তরে কিছুদিন তিনি অধ্যাপনার কাজও করেন এবং পরে লণ্ডনে ফিরে আসেন। এরপর সাহিত্যজগতের এক চুক্তির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং এই অবস্থাকেই তিনি বরণ করে নেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ "Workers in the Dawn" ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এইটিতেও জীবনের কিছুটা ছাপ আছে এবং এখানকার অভিজ্ঞতা ও জীবনধারার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর By the Ionian Sea গ্রন্থে। তাঁর প্রসিদ্ধ হচ্ছে "Unclassed" "The Nether world" "Demos" "New Grub Street" "Born in Exile" "The odd women" "The Emancipated" প্রভৃতি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর সেরা প্রসিদ্ধ গল্প "Christopherson"-এর অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো। যে মনুষ্যত্বে মানুষের থাকে আকর্ষণ—তাকে অন্তর দিয়ে যে ভালবাসে, সে ভালবাসা নিষ্কামতা, আত্মীয়বজন প্রভৃতিকে ভালবাসার চেয়ে কম নয় এবং সে তিনি চারবার মুহূর্তে খণ্ডে তার জটিল অন্তর্বেদন—এই ভাবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই গল্প এবং লেখকের সুনিপুণ তুলিকায় অতি সুন্দর ও অনবদ্য ভাবে গল্পটি ফুটে উঠেছে।]

বিশ বছর পূর্বের এক কাহিনী। সময়টা ছিল মে মাসের এক সন্ধ্যা। সেদিন সমস্ত দিন ধরে সূর্য্যদেব তাঁর রশ্মি বিতরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই যে, আমার এই লিপিবদ্ধ গল্পটির জন্য অনেকদিন পূর্বের সেই দিনটির রশ্মি ও তাপের স্মৃতি আমি হারিয়ে ফেলি নাই। সেদিন আমার জানালার সম্মুখের আকাশে যে খণ্ড খণ্ড সাদা সাদা মেঘ আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের আমি যেন এখনও তেমনই দেখতে পাচ্ছি—অথবা সেবার লণ্ডন নগরীর মধ্যে আমার নীরব কর্মসাধনা বসন্তকালের লঘু কুঁড়েমির প্রভাবে যেরূপ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল—তা যেন আমি এখনও অনুভব করছি সমস্ত অন্তর দিয়ে।

সূর্য্যদেবের পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ার সময়েই কেবলমাত্র আমি ঘর হতে বেরোতাম। সেদিনকার বাতাসে ছিল এক অভূতপূর্ব্ব মাদকতা। সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে প্রশস্ত আকাশের নীচে সহরের অসংখ্য আলোকরাজি হতে পীতাভ দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। নিষ্ক্রিয়ভাবে একটু বিশ্রাম উপভোগ করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না বলে আধ ঘণ্টা ধরে এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং কিছুক্ষণ পর গ্রেস পোর্টল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তন হয়ে যেখানে মেলবোর্ণ রোড হয়েছে সেখানে এসে হাজির হলাম। সেখানে ট্রিনিটী চার্চ্চের কাছে আমার পরিচিত একটি পুরোনো বইয়ের দোকান ছিল। দোকানের গ্যাসের আলোতে উজ্জ্বল বইয়ের তাকগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলাম। আমি বইয়ের পাতা একের পর এক উলটিয়ে যেতে লাগলাম এবং প্রায়শঃ যা ঘটে থাকে তাই-ই ঘটল। অর্থাৎ পকেট হাতড়িয়ে দেখতে লাগলাম টাকাকড়ি কি রকম আছে। একটা বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে গেল এবং বইটীর দাম দিবার জন্য দোকানদারের দিকে অগ্রসর হলাম।

দোকানে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় আমার এক আবছা ধারণা হয়েছিল যে—কোন লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে বই দেখছে। বইটি কিনে দোকান হতে বেরোবার সময়

দেখি, সেই লোকটি এক অদ্ভুত আগ্রহের সঙ্গে ও ঈষৎ হাসিমুখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হলো সে যেন কিছু বলতে চায়। আমি কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। লোকটীও সেদিকেই আসতে লাগল। গীর্জার ঠিক সামনে, সে তাড়াতাড়ি আমার পাশে এসে বলল, "দেখুন, আমায় অন্য কিছু মনে করবেন না। আমি শুধু আপনাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি যে বইটা এখন কিনলেন ওটার প্রথম সাদা পাতায় কার নাম লেখা আছে—সেটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা।" তার এই ভীতি ও শ্রদ্ধাজড়িত কণ্ঠস্বরে আমার প্রথমে মনে হলো যে লোকটী বোধ হয় ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু লোকটীকে সাধারণ ভিক্ষুকের মত মনে হোল না। বয়স তার আন্দাজ ষাট বছর। মাথায় তার লম্বা লম্বা চুল, আর আধপাকা ওবড়ো-খেবড়ো দাড়ি, আর রক্তহীন ফ্যাকাশে শুকনো মুখের মাঝ হতে চেয়ে আছে তাঁর অশ্রুপূর্ণ দুটী চোখ। লোকটীর অপরিষ্কার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে অভাবে-পড়া কোনও ভদ্রলোক বলে মনে হয়। তাঁর কথার ভঙ্গীতেই বোঝা যায় পূর্ব্বে তিনি কোন উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা বুদ্ধির দীপ্তি ছিল এবং কণ্ঠস্বরে মেশানো ছিল এমন এক হতাশা-পূর্ণ বেদনাজড়িত ভাব, যে তাঁর সঙ্গে বন্ধুভাবে পরিচয় না করে পারা গেল না। বইয়ের প্রথম সাদা পাতায় লেখা নামটা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই। সুতরাং গ্যাসের আলোতে পাতাটা খুলে ধরতেই দেখলাম অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট হাতের লেখায় লেখা রয়েছে এই ক'টি কথা—"ডব্লিউ, আর, ক্রিস্‌টোফারসন্‌, ১৮৪৯।"

ভদ্রলোক ইতস্তত করে ধীরে ধীরে বললেন—"ওটা আমারই নাম।"

—"তাই নাকি? বইটা তাহলে পূর্ব্বে আপনারই ছিল?"

—"হ্যাঁ। বইটা একসময় আমারই ছিল।" এই বলে ছোট ছেলের মত কাঁপানো গলায় হেসে উঠলেন এবং দাড়িতে হাত বুলিয়ে এক্সপভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন যে তাঁর কথায় কোন সংশয় জাগতে পারেনা।

—"আপনি কি কখনও ক্রিস্‌টোফারসন্‌ লাইব্রেরী বিক্রয় হওয়ার কথা শোনেন নাই? হয়ত তখন আপনি খুব ছোট ছিলেন। সেটা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কথা। আমি তো বইয়ের দোকানে আমার নাম লেখা বই প্রায়ই দেখেছি। আপনি আসবার ঠিক পূর্ব্বে এ বইটাতে আমার নামটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তাই আপনি যখন বইটীর দিকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকিয়েছিলেন তখন বইটী আপনি কিনছেন কিনা লক্ষ্য করতে বড়ই আগ্রহ হলো। আমার এই অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা করবেন। বইকে ভালবাসলে· ···তাই নয় কি?" তাঁর অসমাপ্ত প্রশ্ন তাঁর দৃষ্টি দ্বারা শেষ হলো। আমি যখন তাঁকে বললাম যে তাঁর সমস্ত কথাই আমি বুঝেছি এবং তাঁর সঙ্গে আমি একমত—তখন ছোট ছেলের মত তিনি হেসে উঠলেন।

কৌতূহলভরে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি বড় লাইব্রেরী আছে?"

—"আজ্ঞে না। মাত্র কয়েক শ' বই আছে। আর যার বাড়ী ঘর নেই তার পক্ষে ঐ প্রচুর।"

সরলভাবে হেসে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "আমার লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা ছিল ২৩,৭১৮ খানা।"

আমার ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বেড়ে চলল। সোজাসুজি আর কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহসী না হয়ে আমি জানতে চাইলাম তিনি বর্ত্তমানে লণ্ডন সহরেই বাস করছেন কি না।

"—যদি দয়া করে আপনি পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করতে পারেন তাহলে আমার বাড়ীটা—মানে—," আবার সেই হাসি।

"মানে, যে বাড়ীটা আমার ছিল সেটা আপনাকে দেখাতে পারি।"

ইচ্ছাভরেই তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। তিনি আমাকে সামান্য দূরে রিজেণ্ট পার্কের নিকটস্থ রাস্তায় নিয়ে গেলেন এবং অবশেষে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত উচ্চভূমির উপর অবস্থিত একটী বাড়ীর সামনে গিয়ে থামলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "এই বাড়ীটাতেই আমি পূর্বে বাস করতাম। দরজার পাশে ঐ ডানদিকে যে জানালাটা দেখা যাচ্ছে ওখানেই আমার লাইব্রেরী ছিল।"

কথাটা বলার সময় তাঁর মুখ হতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। আমি ধীরে ধীরে বললাম—

—"আপনার অদৃষ্ট।"

—"এ দুর্ভাগ্য নিজের দোষেই হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর টাকাই আমার ছিল। কিন্তু ইচ্ছা হলো আরও টাকা উপার্জ্জন করবার। ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমার কখনও ছিলনা। তাতেও আরম্ভ করলাম ব্যবসা। ফলে শীঘ্র এল দুঃসময়।"

উভয়ে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে গীর্জ্জার কাছে ফিরে এলাম। বিদায়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ক্রিস্‌টোফারসন স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমার আর কোন বই পূর্ব্বে কিনেছেন কিনা জানতে আগ্রহ হচ্ছে।"

উত্তরে বললাম, তাঁর নাম এর পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না। তারপর হঠাৎ খেয়ালের বশে বলে ফেললাম, আমার এ বইটা নিতে তাঁর ইচ্ছা আছে কিনা—তা হলে আমি অত্যন্ত খুসীর সঙ্গেই এটা তাঁকে দিতে পারি। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, আমি লক্ষ্য করলাম। তিনি প্রথমে বিধাভরে মৃদুভাবে আপত্তি করলেন, তারপর খুব আনন্দিত হয়ে আমার নিকট হতে বইখানি গ্রহণ করলেন। তারপর একটু লজ্জাভরে বললেন, "আমার এখনও গোটাকয়েক বই আছে। কিন্তু বাড়াবার ক্ষমতা আমার এখন আর নেই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

পরস্পর করমর্দ্দন করে বিদায় নিলাম।

তখন লণ্ডন সহরের ক্যামডেন টাউনে আমি বাস করছিলাম। এই ঘটনার প্রায় দিন পনের পর একদিন বিকেলবেলায় ঘণ্টা দু'য়ের জন্য আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে হাই ষ্ট্রীটের একটা বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। একজন লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ক্রিস্‌টোফারসন্। পুরানো বন্ধুর মত পরস্পর নমস্কার বিনিময় হলো। দিনের স্বচ্ছ আলোয় তাঁকে আরও দীন, ক্লিষ্ট এবং অপরিষ্কার মনে হতে লাগল।

—"এর মধ্যে কয়েকবার আপনাকে আমি দেখেছি। কিন্তু আমি, বলি বলি করেও কথা বলতে পারিনি। আমি এখন খুব কাছেই থাকি।"

কিছু চিন্তা না করেই আমি বলে ফেললাম, "আমিও আপনাকে দেখেছি। তা, আপনি কি এখন একলাই আছেন?"

—একলা? না, না, আমার পত্নীও এখানে আছেন।

তাঁর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা বেদনার ভাব অনুভব করলাম। মাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি কেমন অধীরভাবে পাপা নাড়ছিলেন।

উভয়েই বইয়ের দোকানের গল্প সুরু করলাম। দেখলাম ক্রিস্‌টোফারসন্ শুধু উচ্চবংশজাত নন, তিনি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান।

তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে (তিনি এসব ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী) আমি জানতে চাইলাম যে লেখার কোন চর্চ্চা তিনি করেন কি না? কিন্তু জানলাম যে লেখার চর্চা তিনি কোনদিনই করেননি এবং নিজেকে গ্রন্থ-কীট মাত্র মনে করেন। তারপর একটু ম্লান হাসি হেসে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিন পরেই ঘটনাচক্রে আবার দেখা হয়ে গেল। আমার বাসার নিকটে রাস্তার মোড়ে একেবারে সামনা-সামনি দেখা। তাঁর চেহারার পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম! তিনি যেন আরও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং গভীর বিষণ্ণতার ছাপ তাঁর সারা মুখে ছড়ানো। করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াতেই আমি তাঁর হাত স্পর্শ করেই বুঝলাম, যে তাঁর হাতের ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। এমন কি দুজনের দেখা হওয়াতে আনন্দের একটী ক্ষীণরেখা তাঁর মুখে দেখা গেল। আমার কৌতূহলী দৃষ্টির উত্তরে তিনি বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি, লণ্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

—"চিরকালের জন্য?"

—"তাই তো মনে হচ্ছে। তবে" খানিকটা দম নিয়ে তিনি বললেন, "এতে আমি খুবই আনন্দিত। আমার স্ত্রীর শরীর বর্ত্তমানে ভাল যাচ্ছে না। বাইরের মুক্ত হাওয়া তার এখন দরকার। চলে যেতে হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত—সত্যসত্যই খুব আনন্দিত হয়েছি।" তাঁর কথার ভঙ্গীতেই বোঝা গেল যে অত্যন্ত জোর করে তাঁকে কথাগুলো বলতে হচ্ছে। তাঁর দৃষ্টি ছিল উদাসীন এবং হাত কাঁপছিল থর থর করে। আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম কোথায় তিনি যাবেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি বলে

উঠলেন—"আমি এখন থাকি ঐ ওখানে। আপনি অনুগ্রহ করে বইগুলো একবার দেখবেন কি ?"

বলাবাহুল্য তাঁর আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা পরিষ্কার রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর সামনে হাজির হলাম। বাড়ীর একতলার অধিকাংশ জানালায় বাড়ীভাড়ার বিজ্ঞাপন টাঙানো ছিল। দরজার সামনে হাজির হলে আমার বন্ধু আমাকে আহ্বান করে বড় মুস্কিলে পড়েছেন এরূপ ভাব দেখিয়ে ত্রাস্তভাবে বলতে সুরু করলেন, "বাস্তবিকই আপনাকে দেখাবার বিন্দুমাত্র যোগ্য নয় এখানটা। আর বইগুলো যে পর পর সাজিয়ে রাখবো এরূপ স্থান পর্য্যন্ত এখানে একেবারে নেই।" আমি তাঁর অনুযোগ উড়িয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে ক্রিস্‌টোফারসন্‌ দোতলার সিঁড়ির দরজার সামনে নিয়ে গেলেন আমাকে এবং দরজাটা দিলেন খুলে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঘরটা ছোট, সাংসারিক ব্যবহারের পক্ষে মোটামুটি চলনসই। দেখেই বোঝা গেল এটা শুধু দিনের বেলাতেই ব্যবহার করা হয়। ঘরটার তিনভাগের একভাগ শুধু বইয়ে ভর্ত্তি। সামনে সারি সারি বই রাখার ফলে ঘরের মেঝে থেকে ছাদ-পর্য্যন্ত দুদিকের দেওয়াল সম্পূর্ণভাবে ঢেকে গেছে। জিনিষপত্রের মধ্যে রয়েছে শুধু একটা গোলাকার টেবিল, আর খানদুয়েক চেয়ার। এতেই ঘরের সমস্ত জায়গা ভর্ত্তি হয়ে আছে। বন্ধ জানালার উপর বাইরের সূর্য্যরশ্মি এসে পড়াতে ঘরের ভিতরটা অসম্ভব রকমের উত্তপ্ত। বাঁধানো বই ও কাগজপত্রের গন্ধে জীবনে কখনও এরূপ অস্বস্তি বোধ করি নাই। আমি বলে উঠলাম, "আপনি বলেছিলেন আপনার কেবলমাত্র খানকয়েক বই আছে। কিন্তু আমার মত বই আছে আপনার অন্ততঃপক্ষে তার পাঁচগুণ আছে। ক্রিস্‌টোফারসন্‌ একটু আবেগের সঙ্গে চাপা গলায় বললেন, "কতগুলো বই ঠিক আছে—আমার মনে নেই। দেখতেই তো পাচ্ছেন, এগুলোকে ঠিকমত সাজাতে পর্য্যন্ত পারিনি। আমার আরও গোটাকয়েক বই ঐ ঘরে আছে।" সিঁড়ি দিয়ে আমাকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলে একটা শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। এ ঘরটা অত ভর্ত্তি নয় বটে। কিন্তু এ বাড়ীটারও একদিকের দেওয়াল বইয়ের আড়ালে সম্পূর্ণ ভাবে লুকিয়ে আছে। চারদিকে বইএর গন্ধ এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে আমার চিন্তা করতেও অসহ্য বোধ হলো যে এই নোংরা ঘরটা প্রত্যহ দু'জন লোক শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে।

বসবার ঘরে পুনরায় ফিরে এলাম। ক্রিস্‌টোফারসন্‌ সেই বইয়ের বিরাট স্তূপ হতে দু' একখানি বই বের করে আমায় দেখাতে লাগলেন। কখনও ত্রাস্তভাবে, কখনও দুঃখকষ্টে অভিভূত হয়ে, কখনও হেসে এবং কখনও ম্লান-মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্রিস্‌টোফারসন্‌ তাঁর জীবনেতিহাস বর্ণনা করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি এই ঘরটাতে দীর্ঘ আট বছর ধরে বসবাস করছেন! তাঁর বিবাহ হয় দুবার। তাঁর একমাত্র সন্তান, প্রথম পক্ষের পত্নীর গর্ভজাত কন্যা, ছোট বেলাতেই মারা যায়। তারপর (মধুর হাসির সঙ্গে যেন কোনও গোপন কথা বলছেন এরূপভাবে) যাকে বিবাহ করলেন তিনি ছিলেন তাঁর কন্যার গৃহ-শিক্ষয়িত্রী। আমি অত্যন্ত মন দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছিলাম এবং আশা করছিলাম এই বিস্ময়কর সংসারের আরও বহু খবর জানতে পারব। আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "গ্রামে গিয়ে আপনি যে বাড়ীতে থাকবেন তাতে সম্ভবতঃ বই রাখবার জন্য অনেক তাক বসানো যাবে।"

তাঁর মুখের আকৃতির পরিবর্ত্তন হলো। অত্যন্ত ম্লান দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। আমি আবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেইসময় ঘরের ভিতরে কোন শব্দে আমার মন আকৃষ্ট হলো। সিঁড়িতে শব্দ হলো ভারী পায়ের এবং মনে হোল শুনতে পেলাম কোন পরিচিত কণ্ঠ।

ক্রিস্‌টোফারসন্‌ মনোযোগী হয়ে বলে উঠলেন, "এই যে যিনি আসছেন তিনি বইগুলো সরিয়ে ফেলতে আমাকে সাহায্য করবেন। আসুন, মিষ্টার পম্‌ফ্রেট, ভিতরে আসুন।" দরজাটা খুলে কঠিন-প্রকৃতির একটা লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর তামাভ রংয়ের চুল, নীল চোখ, উঁচু চোয়াল দেখে মনে হয় লোকটার শিক্ষা বেশী না হলেও শক্তিশালী মানুষ বটে। তাঁর কণ্ঠস্বর যে পরিচিত মনে হয়েছিল তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অনেকদিন পরে পরে যদিও সাক্ষাৎ হয়

তবুও আমার ও পমফ্রেটের মধ্যে আছে অনেকদিনের আলাপ।

পমফ্রেট উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন—"এই যে, আপনিও ক্রিস্‌টোফারসনের পরিচিত, তা তো আমার জানা ছিল না।"

আমি উত্তর দিলাম, "আপনিও ক্রিস্‌টোফারসন্‌কে জানেন দেখে আমিও কম বিস্মিত হই নি।"

গ্রন্থ-ভক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে আমাদের দেখছিলেন। অবশেষে সদ্য-আগত ভদ্রলোকটীর সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন এবং ভদ্রলোকটী একটু কঠিন কিন্তু ভদ্রভাবে প্রতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। পমফ্রেটের কথা-বার্ত্তায় ইয়র্কশায়ারের টান ছিল এবং তাঁর হাবভাবেও স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি প্রকৃত ইয়র্কশায়ার অঞ্চলের লোক। তিনি বলতে এসেছিলেন যে ক্রিস্‌টোফারসনের লাইব্রেরীর সমস্ত বই সংস্কারকী করে বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন কবে পাঠানো হবে সেই দিনটা ঠিক করা প্রয়োজন।

ক্রিস্‌টোফারসন্‌ বললেন, "তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই। মিষ্টার পমফ্রেট, আপনি আমার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করছেন দেখে আমি আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ! শীঘ্র দিনটা স্থির করে নোব।"

মাথা নেড়ে পমফ্রেট বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমাদের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হলো। দুজনেই এক সঙ্গে এখান হতে বেরিয়ে এলাম। বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ায় এতক্ষণ থাকার পর রাস্তার মুক্ত বাতাস খোলা মাঠের সুমধুর বাতাসের মত মনে হলো। আমার সহ-যাত্রীর অবস্থাও তেমনি। দেখলাম তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুক চওড়া করে আনন্দে হাওয়া খেতে লাগলেন।

"এমন মধুর দিনে ইলফ্‌লি মুরে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা জাগে।"

কিন্তু ইলফ্‌লি মুর নিকটে না থাকায় দুজনে রিজেণ্ট পার্ক হতে বেড়িয়ে আসাই ঠিক করলাম। পমফ্রেটকে কাজের জন্য এ পথ দিয়েই যেতে হবে, আর আমার পক্ষে ক্রিস্‌টোফারসন্‌ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার সুবিধা হবে। বুঝলাম এই গ্রন্থ-প্রিয় ভদ্রলোকের বাড়ীওয়ালী পমফ্রেটের পিসিমা। ক্রিস্‌টোফারসনের জীবনের সুদিন ও দুর্দ্দিনের ঘটনা সব সত্য। দুর্দ্দশার চরম সীমায় তিনি বর্ত্তমানে এসে পৌঁচেছেন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় তাঁকে কেরাণীর কাজ বা ঐ জাতীয় কোন কিছু করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয়েছে। তার পাঁচ বছর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

পমফ্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি মিসেস ক্রিসটোফারসনকে চেনেন?"

—"না। তবে জানতে বড়ই আগ্রহ। কেন?"

—"কারণ তিনি এমন একজন মহিলা যাঁর ঘটনা শুনতে আপনার ভালই লাগবে। আমার মতে তিনি আদর্শ মহিলা। আর ক্রিস্‌টোফারসনও যে প্রকৃত ভদ্রলোক সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। তা না হলে ওর মাথাটা না ঠুকে আমি ছাড়তাম না। খুব ঘনিষ্ঠভাবেই ওদের সঙ্গে আমার মেলামেশা আছে। ওদের সঙ্গে এক বাড়ীতে আমি কাটিয়েছি গোটা কয়েক বছর। মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসনকে স্ত্রী-রত্ন বলা চলে। আর তাঁর এত দুঃখকষ্ট তাঁর স্বামী যে কিরূপে সহ্য করেন বুঝতে পারি না। এরূপ স্ত্রীকে একটু সুখের মধ্যে রাখতে যদি দস্যুবৃত্তিও করতে হতো তাতেও আমি কুণ্ঠিত হতাম না।"

—"মিসেস ক্রিস্‌টোফারসনকে তাহলে পরিশ্রম করে আহার্য্য সংস্থান করতে হয়?"

—"সে তো বটেই। শুধু নিজের জন্য নয়, স্বামীর জন্যও। কাজও আবার শিক্ষয়িত্রীর কাজ নয়। টটেনহাম কোর্ট রোডে একটা দোকানে কাজ করেন। সপ্তাহে ত্রিশ শিলিংয়ের চাকুরীকেই ওরা ভাল কাজ বলে মনে করেন। ঐ তো যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন, ও থেকেই আবার ক্রিস্‌টোফারসনের বই কেনা চাই-ই।"

—"বিবাহের পর ক্রিস্‌টোফারসন্‌ কোনও কাজ-কর্ম্ম করেন নি?"

—"প্রথম কয়েক বছর কিছু করেছিলেন শুনেছি। তারপর এক শক্ত অসুখে পড়ায় সে সব বন্ধ হয়ে গেল। সেই হতে বাড়ীতেই বসে আছেন। এখন কাজ শুধু বইয়ের দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়িয়ে পুরাণো বইয়ের গন্ধ শোঁকা। মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসনও এতে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করেন না। আপনি চোখে না দেখলে ধারণা করতে পারবেন না তিনি কি প্রকৃতির মহিলা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি এমন ঘটনা ঘটলো যে ওঁদের লণ্ডন ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে ?"

—"সেই কথাই তো আরম্ভ করতে যাচ্ছিলাম। আমি যতদূর জানি, মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসনের বহু গোলগাল চেহারাওয়ালা স্বার্থসর্বস্ব ধনী আত্মীয়-স্বজন আছেন, কিন্তু তাদের কেউ-ই তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন নি। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন—সহরের জনৈক টাকার কুমীরের বিধবা পত্নী মিসেস্‌ কিটিং। নরফোকে এই মহিলার বাড়ী আছে। তিনি নিজে কখনও যান নি সেখানে। তবে ওঁর এক ছেলে সেখানে প্রায় মাছ-টাছ ধরতে ও শিকার করতে যায়। মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসন্‌ আমার পিসিমাকে বলেছেন যে মিসেস্‌ কিটিং নাকি সেই বাড়ীটা বিনা ভাড়াতেই এঁদের বসবাস করতে দেবেন। এমন কি সেখানে খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা যাতে হয় তার বন্দোবস্তও করে দেবেন। প্রকৃত পক্ষে মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসনকে বাড়ীটা ভাড়ারকের দায়িত্ব নিতে হবে—যাতে কেউ সেখানে বেড়াতে গেলে বেশ সাজানো গোছানো ও পরিষ্কারভাবে পায়।"

—"আমার তো মনে হয় ক্রিসটোফারসন্‌ এখান থেকে কোথাও যেতে চান না।"

—"তার কারণ কি জানেন ? বইয়ের দোকান ছাড়া বেঁচে থাকার কল্পনাও তিনি করতে পারেন না। কিন্তু পত্নীর অবস্থা চিন্তা করে অবশেষে সম্মত হয়েছেন। এটাও খুব দ্রুতভাবে হয়নি। এ রকম ভাবে ও মহিলার আয়ু বেশীদিন টিকতো না। আমার পিসিমা বলেন যে উনি কখন পড়ে যাবেন তার কোনও স্থিরতা নেই।

প্রকৃতপক্ষে প্রায় ওকে দেখে আমার ভীতি জাগে। এ কথা উনি কোনদিনও মানবেন না—নিজের শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি দেখানো ওঁর অভ্যাস নয়। গ্রামের মহিলা বলে প্রায়শঃই গ্রামের কথা বলেন। তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারা যায়, এই কয়েক বছরে তাঁকে কত সহ্য করতে হয়েছে। মিসেস্‌ কিটিংএর আহ্বান পাবার ঠিক পরে—প্রায় সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে আমি একবার তাঁকে দেখি। দেখে তো চেনাই যায় না। কারও চেহারার পরিবর্ত্তন জীবনে এতটা ঘটতে পারে, তা আপনি কখনও দেখেন নি। তাঁর মুখখানা যেন এক সপ্তদশী মেয়ের মত বোধ হলো। আর তাঁর হাসি—সে হাসি শোনামাত্রই বুঝতে পারতেন।"

প্রশ্ন করলাম, "তাঁর স্বামী অপেক্ষা তিনি কি অনেক কম বয়সের ?"

—"অন্ততঃপক্ষে কুড়ি বছরের পার্থক্য। এখন ওঁর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।"

একটু ভেবে বললাম, "ওঁদের বিবাহিত জীবনে অশান্তি প্রবেশ করতে পারেনি। কি বলেন ?"

—"অশান্তি ? আমি হলফ করে বলতে পারি কোন রূঢ় বাক্য বিনিময় ওঁদের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত হয়নি। জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যাপারটা ক্রিস্‌টোফারসন একবার স্বীকার করলেই আর কোন কথা নেই। এ পৃথিবীতে ওদের চাওয়ার আর কিছু থাকবে না। বইয়ের ভিতর ডুবে যাবেন আবার।"

আমি মাঝ পথে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি বলতে চান যে ঐ সমস্ত বই-ই তাঁর পত্নীর সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং উপার্জ্জনের অর্থ দিয়েই কেনা হয়েছে ?"

—"না, তা নয়। ওঁর পুরাণো লাইব্রেরীর বহু বই উনি রেখে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া চাকুরী-কালীন অনেক বই কিনেছিলেন। একদিন বলেছিলেন আমাকে যে, টাকা বাঁচিয়ে বই কেনার জন্য অনেক সময় দৈনিক ছ' পেনিতে ওঁকে চালাতে হয়েছে। এ রকম হুজুকে-পাওয়া ভদ্রলোক কি দেখেছেন কখনও। এ সব পাগলামিরি বাদ দিলে ওঁকে ভদ্রলোকই বলা যেতে পারে। ওঁর স্বভাব এত মধুর যে না ভালবেসে পারবেন না। এখান হ'তে ওঁরা চলে গেলে আমারও খুব ফ্লেশ বোধ হবে।"

ক্রিস্‌টোফারসনের বিদায়ের কাহিনী ছাড়া আমার আর অন্য কিছু শোনার ঔৎসুক্য ছিল না। কাহিনীটি শোনবার পর থেকে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীন জীবিকানির্ব্বাহের সংগ্রাম হতে ভদ্রমহিলা পাবেন চিরমুক্তি এবং এই প্রখর গ্রীষ্মে তাঁর প্রিয় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করবেন, এ কথা চিন্তা করতেও আমি আনন্দ বোধ করলাম। আর ক্রিস্‌টোফারসনের প্রতিও হলো একটু ঈর্ষা। কারণ এখন থেকে ভাবনা-চিন্তাহীন অবস্থায় তাঁর দিন অতিবাহিত হবে। নিরুপদ্রবে তিনি বইয়ের স্তূপের ভিতর নিজেকে

সমর্পণ করবেন। পুরানো বইয়ের দোকানগুলি হতে বিদায় নেওয়াতে তাঁর বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না মনে হয়। তাঁর সঙ্গে দু' একদিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করে আসব বলে আমি নিজে কথা দিলাম। রবিবারেই যাওয়া স্থির হলো, কেননা সেদিন তাঁর পত্নীর সঙ্গেও সাক্ষাৎকার ঘটতে পারে।

রবিবার বিকেলবেলায় তাঁর বাড়ীর দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমন সময় পমফ্রেট এসে উপস্থিত। কেমন একটা উগ্র ভাব তাঁর চেহারায়। আর বিশ্রীভাবে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর উপস্থিতিটাও অত্যন্ত আকস্মিক। আমি আমার বাড়ীর ঠিকানাটা তাঁকে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ধারণাও করতে পারি নাই যে তিনি আমার বাড়ীতে পদার্পণ করবেন। তাঁর কটু প্রকৃতির সঙ্গে মিশ্রিত একটা অহঙ্কারের ভাব থাকায় করেও সঙ্গে এত মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। কতকটা ক্রুদ্ধভাবেই তিনি বলে উঠলেন, "এ রকম ঘটনা পূর্ব্বে শুনেছেন কখনও? সব ভুয়োবাজী। ওঁরা এখান হতে যাবেন—না, আর তার মূলে আছে ঐ বইগুলো।"

ক্রোধে থর থর করে তিনি তাঁর পিসিমার বাড়ীর সমস্ত সংবাদ জানালেন। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে ক্রিস্‌টোফারসনেরা তাঁদের নিকটতম আত্মীয়া এবং ভবিষ্যৎ রক্ষা-কর্ত্রী মিসেস্ কিটিংয়ের তাঁদের বাড়ীতে হঠাৎ উপস্থিতিতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলেন। এই মহিলা তাঁদের বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পদার্পণ করেন নাই। সেইজন্য ধারণা করা হলো ক্রিস্‌টোফারসনদের সেখানে যাওয়া সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছেন। মিসেস্ কিটিং যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলেন তখন তাঁর জোরালো কণ্ঠের কৃপায় কথোপকথনের শেষ অংশটা বাড়ীওয়ালী শুনতে পেয়েছিলেন।

—"অসম্ভব। এ কখনও হতে পারে না। এ আমি চিন্তা করতেই পারি না। তোমরা কি মনে করেছ যে আমার বাড়ীতে তোমরা ঐ সব অপরিষ্কার বই-টই ভর্ত্তি করে রাখবে? ঘোর স্বাস্থ্য-বিরোধী এ সব। এর চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার আমি জীবনে কখনও শুনি নি।" এই কথা বলে মিসেস্ কিটিং গাড়ীতে ওঠে চলে গেলেন। তারপর কোন কারণবশতঃ বাড়ীওয়ালী উপরে উঠে দেখে, তাঁদের ঘরে বিরাজ করছে অখণ্ড নিঃস্তব্ধতা! দরজার কড়া নেড়ে কোন কাজের ছলে ঘরে ঢুকে দেখে অত্যন্ত ম্লান মুখে বসে আছে স্বামী আর স্ত্রী। তখনই তাঁরা সমস্ত কথা খুলে বললেন। মিসেস্ ক্রিস্‌টোফারসন্ এক-খানি পত্রে মিসেস্ কিটিংকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর স্বামীর অনেকগুলি বই আছে, "সেগুলি নরফোকের বাড়ীতে নিয়ে যেতে তার কোন আপত্তি আছে কিনা। তাতেই মিসেস্ কিটিং লাইব্রেরীটি দেখতে দৌড়ে আসেন এবং চলে যাবার সময় ঐরূপ মন্তব্য করে যান। এখন হয় তাঁদের বইগুলি পরিত্যাগ করতে হবে, আর না হয় আত্মীয়ার সাহায্যের আশা ছাড়তে হবে। আমি বলে উঠলাম, "ক্রিস্‌টোফারসন্ কি তাহলে বইয়ের আশা ছাড়তে সম্মত হলেন না?"

—"আমার মনে হয় তাঁর স্বামীর পক্ষে এটা খুব কঠিন হবে। যাই হোক, তাঁরা বাড়ী না ছেড়ে বইগুলো নিয়ে থাকাই স্থির করেছেন। সমস্ত পরিকল্পনার এখানেই পরিসমাপ্তি। অনেকদিনের মধ্যে কোন ঘটনায় এতটা বিরক্ত হই নি।"

আমি তখন চিন্তার জাল বুনছিলাম। ক্রিসটোফার-সনের মনের গতিবিধি হৃদয়ঙ্গম করতে আমার কষ্ট হলো না। মিসেস্ কিটিংকে না জানালেও আমার বুঝতে দেরী হলো না যে তাঁর সাহায্যের গুরুভার বোঝার মত ক্রিস্‌টোফারসনদের আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। মিসেস্ ক্রিসটোফারসন্ কি প্রকৃতপক্ষে অসুখী? যে সমস্ত মহিলা নিজের সুখ-সাধ জলাঞ্জলি দিয়ে সন্তুষ্ট, তিনি কি তাঁদের মধ্যে একজন নন? বরঞ্চ অমার্জ্জিত জীবন তিনি অতি-বাহিত করবেন, তবুও স্বামীর কোনও অসুবিধা তিনি হতে দিবেন না। আমার এই কথা শুনে পমফ্রেট ক্রুদ্ধ হলেন এবং মিসেস্ কিটিং ও ক্রিসটোফারসনের প্রতি যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগলেন। তাঁর মতে এরূপ ব্যাপার ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। অবশেষে আমাকেও তাঁর কথায় সম্মতি দিতে হলো।

দিন দুই তিন পরে অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশত ক্রিসটো-ফারসনদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম। সেই বাড়ীটার উল্টোদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

করতেই সেই বৃদ্ধ বই-পাগলা ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। দেখে মনে হলো উদ্দেশ্যহীনভাবে কিম্বা মানসিক দুশ্চিন্তায় তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই ডাকলেন এবং বাড়ীর দরজার কড়া নাড়ার আগেই তিনি নীচে নেমে এলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার সঙ্গে আমি রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আসতে পারি কি?"

মানসিক দুশ্চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর সমস্ত চোখে মুখে ছড়ানো। বিনা বাক্যব্যয়ে, নিস্তব্ধ ভাবে খানিকটা পথ আমরা অতিক্রম করলাম।

আমি প্রশ্ন করলাম, "লণ্ডন ছেড়ে চলে যাওয়া বিষয়ে আপনি মত পরিবর্ত্তন করেছেন?"

—"সমস্তই আপনি পমফ্রেটের কাছ হতে শুনেছেন দেখছি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমরা অন্ততপক্ষে এখনকার মত দিনকয়েক এখানেই যেমন আছি তেমনি থাকবো।"

এর পূর্ব্বে কোনও লোককে এরূপ অপদস্থ বোধ করতে দেখি নাই। তিনি মাথা নীচের দিকে করে কুঁজোভাবে এমন পথ চলছিলেন যে তাকে হাঁটা বলা যেতে পারে না। শরীরটাকে তিনি যেন কোনমতে টেনে নিয়ে চলেছেন। কোনও ঘৃণ্য কাজ করার পর দোষী ব্যক্তি যেমনভাবে হাঁটে, এও সেইরূপ।

তিনি আবার আরম্ভ করলেন তাঁর কথা, "সত্যি বলতে কি, বইগুলো নিয়েই বেশ গোলমাল বেধেছে," কথাটা বলে অত্যন্ত কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছে, আমি লক্ষ্য করলাম।

"আমার অবস্থা বেশ ভাল নয়, তা আপনি বুঝতেই পারছেন।"

—বলেই তিনি হেসে উঠলেন। "ব্যাপারটা প্রকৃত-পক্ষেও এই। মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসনের একজন আত্মীয়া কতকগুলি সর্ত্তে একখানা বাড়ী দিতে চেয়েছিলেন তাঁর গ্রামে। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল—লাইব্রেরীটাই বেশ মুস্কিলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সাংঘাতিক রকমের বাধা। আমরা বর্ত্তমানে দুজনাতে এখানেই থাকবো, স্থির করে ফেলেছি!"

একটু কৌতূহলভরে আমি জানতে চাইলাম, মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসনের গ্রামে যেতে কোন আগ্রহ ছিল কি না।

—কিন্তু প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারলাম আমি গুরুতর ভুল করে ফেলেছি। কারণ, কথাটা আমার বন্ধুর হৃদয়ের অত্যন্ত কোমল স্থানে ঘা দিয়েছে। তিনি যেন আমার ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এরূপভাবে অত্যন্ত করুণ ও বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন—"গ্রামে বসবাস করতে পারলে তাঁর পক্ষে খুব সুখকর হতো।"

আমি বলে উঠলাম, "বইগুলোর কোন বন্দোবস্ত আপনি কি করতে পারেন না? বইগুলোর জন্য অন্য একটা বাড়ীর কয়েকখানা ঘর যদি ভাড়া নেন?"

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলাম তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বুঝলাম, তাঁর হাতে এক কানাকড়িও নেই।

—"এ নিয়ে আর চিন্তা করছি না। এ ব্যাপারের আমরা নিষ্পত্তি করে ফেলেছি।"

এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা আর উচিত নয়। সুতরাং সেদিন বিদায় নিলাম রাস্তার মোড়ে।

এর পর সপ্তাহখানেকের ভিতরেই পমফ্রেটের কাছ হতে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে লেখা ছিল, "যেমন মনে করেছিলাম, তেমনই হয়েছে। মিসেস ক্রিস্‌টোফার-সন্‌ গুরুতরভাবে পীড়িত।" চিঠিতে আর অন্য কথা ছিল না। আমি চিঠির ব্যাপার নিয়েই চিন্তা করতে লাগলাম। কথাগুলো আমার মন ও অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করলো। সেদিন অপরাহ্নে পুনরায় চললাম সেই বাড়ীর দিকে।

সেই বাড়ীর সম্মুখের জানালায় কাউকেও দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর স্থির করলাম, বাড়ীতে গিয়ে পমফ্রেটের পিসীমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবো। পমফ্রেটের পিসীমাই এসে দরজা খুলে দিলেন।

এর আগে কখনও এঁকে দেখি নাই। যখন আমার নাম তাঁকে বললাম এবং জানালাম—মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফার-সনের সংবাদ জানতে উৎসুক হয়ে এখানে এসেছি—তখন বসবার ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এবং গোপনভাবে সমস্ত কথা বললেন। এই মহিলার স্বভাব ইয়র্কশায়ারের রমণীদের মত, লণ্ডনের নারীদের মত বিন্দু-মাত্রও নয়।

—"দিন দুই পূর্ব্বে মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসন্‌ অত্যন্ত

পীড়িত হয়ে পড়েন। প্রায়ই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন, আর রাত্রিতে অনিদ্রার রোগীর ন্যায় কাতরাতেন। অবশেষে ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসেই ওঁকে বইয়ে ভর্ত্তি নোংরা শোবার ঘর হতে সরিয়ে অন্য ঘরে রাখার ব্যবস্থা করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ একটা ঘর তখন আসবাবহীন অবস্থায় ছিল। দিবারাত্রি তিনি সেইখানেই থাকেন, আর এখন এত কৃশ হয়ে পড়েছেন যে কথা বলতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। স্বামীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে শুধু মাঝে মাঝে হাসেন। বিছানার ধারে তাঁর স্বামী সর্ব্বক্ষণ বসে থাকেন। তাঁকেও শীঘ্র শয্যা নিতে হবে। তাঁরও চেহারা হয়েছে ভূতের মত এবং ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় এক বদ্ধ উন্মাদ।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ অসুস্থতার কারণ কি?"

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে জানালেন—কারণ অনুসন্ধান করা মোটেই কঠিন নয়।

প্রশ্ন করে ফেললাম, আপনার কি মনে হয় হতাশা ও অবসাদের ফলেই এরূপ হয়েছে?

—"মনে হয় তাই। বহুদিন হতেই অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার উপর এরকম একটা ঘা তাঁকে একেবারে শয্যাগত করে দিলে।"

বললাম, "আমি আর আপনার ভাই-পোর মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে। পম্‌ফ্রেটের মতে ক্রিস্‌টোফারসন্ বুঝতে পারেননি—তাঁর পত্নী তাঁর জন্য কতখানি আত্মত্যাগ করেছেন।"

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, আমারও তাই মনে হয়। তবে এখন ক্রিস্‌টোফারসন্ এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। কেননা এখন পত্নীর কথা ছাড়া—

এমন সময় দরজার কড়া নেড়ে উঠলো। কে যেন খুব কম্পিত স্বরে বাড়ীওয়ালীকে শীঘ্র করে উপরে যেতে বললো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

ক্রিস্‌টোফারসন্ আমাকে চিনতে পেরে অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ওঁর অবস্থা খুব সঙ্কটজনক মনে হচ্ছে। দয়া করে শীঘ্র একবার উপরে চলুন।

আমার সঙ্গে আর বাক্যবিনিময় না করে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে উপরে চলে গেলেন। আমি চলে আসতে পারলাম না। দশমিনিট ধরে সেই ঘরের মধ্যে আমি অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম, আর কান পেতে প্রতিটি শব্দ শোনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে পুনরায় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম এবং বাড়ীওয়ালী আবার আমার নিকট ফিরে এলেন।

তিনি বলে উঠলেন, "ওটা কিছু নয়। নীরবভাবে একলা থাকলে উনি এরকম ঘুমিয়ে পড়েন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিছানার পাশে বসে ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞাসা করবেন—কেমন লাগছে—আর ওঁকে বিরক্ত করবেন। আমি বুড়োটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁর বসবার ঘরে পাঠিয়েছি। আপনি ওঁর ঘরে গিয়ে একটু কথাবার্ত্তা বলে এদিক থেকে উদাসীন করে রাখলে বড় ভাল হয়।"

সঙ্গে সঙ্গে আমিও উপরের বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। গিয়ে দেখি ক্রিস্‌টোফারসন্ একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। দেখলেই মনে হয়—দুঃখকষ্ট ও হতাশার প্রতিচ্ছবি। আমি অগ্রসর হতেই টলতে টলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতি-কুণ্ঠিত ও লজ্জাকরে তিনি আমার হাত ধরলেন। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারলেন না। তাঁর মধ্যে উদ্দীপনা জাগানোর জন্য আমি কয়েকটী কথা বলতে চেষ্টা করলাম। তাতে কিন্তু উল্টো ফলই হলো।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, "এ সব কথা আমায় বলবেন না। যে যাই বলুন না কেন, আমি বুঝতে পারছি উনি কিছুতেই বাঁচবেন না—আর বাঁচবেন না।"

—"যে ডাক্তারকে আপনি দেখাচ্ছেন তিনি খুব নাম-করা তো?"

—"ভাল বলেই তো শুনেছি। কিন্তু তাতে আর কি হবে? অনেক বিলম্বেই ডাকা হয়েছে—কিছুই করবার আর নেই এখন।"

তিনি পুনরায় চেয়ারে বসতেই আমিও তার পাশে বসে পড়লাম। দু'এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকার পর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ক্রিস্‌টোফারসন্ লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মাথা বিকৃত হয়েছে মনে করে আমি তার পিছনে পিছনে সিঁড়ি

পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে আসছেন। বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, পোষ্টাপিস হতে পিছন এসেছিল। একখানা পত্রের আশায় আমি আছি।

আলাপ-আলোচনা আর বেশীক্ষণ চালানো যাবেনা ভেবে আমি বিদায় নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ক্রিস্টোফারসন্ আমাকে কিন্তু ছাড়লেন না।

দোষী কুকুর শাস্তি পাবার সময় যেরূপভাবে তাকায়, অনেকটা তেমনিভাবে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—আপনাকে আমি সত্যি কথা বলছি, আমার যা ক্ষমতা করেছি। যখন আমার পত্নী পীড়িত হয়ে পড়লেন—কিম্বা আমি যখন বুঝতে পারলাম— হতাশা আমার পত্নীর পক্ষে কি সাংঘাতিক ক্ষতিকরই না হয়েছে, তখনি আমি মিসেস্ কিটিংএর বাড়ীতে বলতে গেলাম যে সমস্ত বই-ই আমি বিক্রয় করে দেব। মিসেস্ কিটিং তখন সহরে ছিলেন না। আমার মূর্খতা জানিয়ে আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে বলে করুণা ভিক্ষা করে পত্র লিখলাম। সে পত্রের উত্তর আসার সময় অনেকদিন পার হয়ে গেছে, এখনও কোন জবাব আসেনি।

তাঁর হাতে ডাকপিয়নের কাছ হতে সদ্য-পাওয়া একটা বইয়ের দোকানের তালিকা রয়েছে দেখলাম। মেসিনের মত উপরের ঢাকনাটা ছিঁড়ে প্রথম পাতাটা দেখতে লাগলেন। পরমুহূর্তেই কিন্তু বিবেকের দংশন-ব্যথায় অস্থির হয়ে হাত হতে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ঘরের রাশীকৃত বইয়ের মধ্যে পা রাখবার যে সামান্য জায়গা ছিল তিনি সেখানেই অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন এবং বললেন, অমন সুযোগ চলে গেল। উনি অবশ্য লণ্ডনেই না হয় থাকবেন বলেছিলেন। কিসে আমি পরিতৃপ্ত হবো সেটাও উনি জানতেন। কিন্তু আমি কি নির্মম, কত হীন যে সামান্য সুখের জন্য ওঁকে বহু দুঃখ দিয়েছি। অস্থিরভাবে তিনি হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। কতটা আত্মত্যাগ তাঁকে করতে হয়েছে আমি বুঝতে পারিনি। গ্রামে বসবাস করবার কথায় তাঁর অন্তরের যে স্ফূর্তি চোখে মুখে উদ্ভাসিত হতো তা আমি লক্ষ্য করিনি। অশেষ দুঃখযন্ত্রণা তিনি সহ্য করেছেন। তা বুঝেও আত্মসুখসর্বস্ব কাপুরুষের মত আমি তার প্রতিবিধান করিনি—তিলে তিলে তাঁকে আমি মেরেছি। আমি বললাম, "নৈত্র মিসেস্ কিটিংএর নিকট হতে পত্রের জবাব আপনি পেয়ে যাবেন। আর সে জবাবটা যে খুবই আনন্দদায়ক হবে তাতে আমার—" "বহু দেরী হয়ে গেছে। আমিই ওঁকে মেরে ফেললাম। সেই ভদ্রমহিলার কাছ হতে চিঠি পাবার আশা মিথ্যে। তিনি অকর্মণ্য ধনীদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ-ই নন। তাঁর দাম্ভিকতায় আমরা যখন একবার আঘাত করেছি, তখন তাঁর কাছ হতে ক্ষমার প্রত্যাশা করা বৃথা।"

মুহূর্তের জন্য বসে পড়ে আবার মানসিক বেদনায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

..."আমার পত্নী এখন মৃত্যুপথযাত্রী—আর ঐ বই-গুলিই তাঁর মৃত্যুর কারণ" এই কথা বলে হাত নেড়ে তিনি বইগুলির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন। "তাঁর প্রাণের পরিবর্তে আমি এইগুলোকে রেখেছি। উঃ! উঃ!"

এই কথা বলার সময় তিনি খানকয়েক বই হাতে তুলে নিলেন, আর কি করতে যাচ্ছেন বুঝবার আগেই সেগুলি জানালা দিয়ে গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন। আরও কতকগুলি বইয়ের ঐ একই অবস্থা হলো, আর সেগুলি রাস্তাতে পড়ার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। তারপর আমি তাঁর হাত ধরে স্থির হতে অনুরোধ করলাম।

—"উচ্ছন্নে যাক ওসব। ওগুলোকে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে উঠে। ওইগুলোই আমার স্ত্রীকে মেরেছে!"

কথাগুলো বলবার সময় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। অবশেষে অশ্রুধারা নেমে এল তাঁর দুচোখ হতে। এখন তাঁকে শান্ত করতে আমাকে বেশী বেগ পেতে হলো না। অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর কথা বলতে লাগলেন অবিরাম অশ্রু-বর্ষণ করতে করতে।

—"আপনি যদি বুঝতে পারতেন যে আমার পত্নী আমার জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হলো তখন আমি কপর্দকশূন্য, আর আমার বয়স তাঁর থেকে বিশ বছর বেশী। ভাবনা

চিন্তা আর একটানা পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই তাঁকে দিতে পারিনি। সমস্তই আপনি জানতে পারবেন—তাঁরই উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে আমি বেঁচে আছি। তা থেকে কতদূর ও লজ্জাকর ব্যাপার এই যে—তাঁরই উপার্জ্জন, অথচ তাঁকে না খাইয়ে শুকিয়ে রেখে তিলে তিলে মেরে ফেলে সেই অর্থে কিনে গেছি বই। কি দুর্বুদ্ধি। কি ঘৃণা ও লজ্জাকর ব্যাপার। বই কিনে খাওয়ার নেশা আমাকে মদ খাওয়া কিম্বা জুয়াখেলার নেশার মত পেয়ে বসেছিল। আমি বহুবার প্রত্যহ এর জন্য লজ্জিত হয়েছি ও পণ করেছি যে ও নেশা পরিত্যাগ করবো—কিন্তু সে আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এজন্য উনি আমাকে কখনও দোষ দেননি—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত কিম্বা তিরস্কার পর্য্যন্ত করেননি। কুঁড়েমি করে আমি কেবল সময় অতিবাহিত করেছি। দোকানে কাজ করার পাটুনি থেকে ওঁকে উদ্ধার করার কোনও চেষ্টা পর্য্যন্ত করিনি। একটা দোকানে যে উনি কাজ করতেন, তা কি আপনি জানেন? এত জ্ঞান, এত প্রখরবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ওঁকে এইরূপ ঘৃণ্য জীবন যাপন করতে হতো। ভিন্না করে দেখুন, কত সহস্রবার আমি বই হাতে করে সেই দোকানের সামনে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছি। উনি ঐ দোকানের মধ্যে পড়ে আছেন, আর আমি অনায়াসে নির্লজ্জিতভাবে সেই দোকানের সামনে দিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারতাম। উঃ! উঃ!"

দরজায় কেউ কড়া নাড়ছিল। দরজা খুলে দেখি, বাড়ীওয়ালী আশ্চর্য্যজনকভাবে তাকিয়ে আছেন কতকগুলি বই হাতে নিয়ে।

আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম, ঠিক আছে। মেঝের উপর ওগুলো নামিয়ে রাখুন। ভিতরে আনবেন না। একটা বিপর্য্যয় মাত্র।

আমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্রিস্‌টোফারসন্। যে কথা তিনি মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেন না, সেই প্রশ্নই ওঁর দৃষ্টির মধ্যে ছিল। বললাম, এমন কিছু হয় নাই, আর ধীরে ধীরে তাঁকে সংক্ষেপ করলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমি চলে আসার আগে ডাক্তার এসেছিলেন এবং খানিকটা উন্নতির সংবাদ দেলাম। রোগীর অনেকটা ঘুম হয়েছিল এবং আবার ঘুম আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ক্রিস্‌টোফারসন্ আমাকে আরেকবার খুব শীঘ্র খবর নিতে অনুরোধ করলেন। তাঁর জন্য মাথা ঘামার এতগুলি আমি ছাড়া আর কেউ-ই নাকি তাঁর ছিল না। পরের দিনই আবার আসব, প্রতিশ্রুতি দিলাম। পরের দিন অপরাহ্নে আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম। ক্রিস্‌টোফারসন্ আমারই জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা গেল খুলে। তাঁকে প্রফুল্লমুখে সম্ভাষণ করতে এগিয়ে আসতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাকে তিনি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন

—"সে পত্রের উত্তর এসেছে। আমরা বাড়ীটা পাচ্ছি।"

—"মিসেস্ ক্রিস্‌টোফারসনের অবস্থা এখন কেমন?"

—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অনেক সুস্থ বোধ করছেন। গতকাল আপনি যখন চলে গেলেন তখন থেকে সুরু করে আজ সকাল পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছেন। প্রথম ডাকে পত্রটা পেয়ে গেছি।" তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে চললেন, "ওঁকে বলেছি, তবে সমস্তটা খুলে বলিনি। উনি মনে করেছেন বইগুলোও সেখানে আমি নিয়ে যেতে পারব। ওঁর স্ফূর্ত্তির হাসিটা যদি দেখতেন। কিন্তু উনি বোঝবার পূর্ব্বেই সমস্ত বিক্রী হয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা হবে। উনি যখন জানবেন আমি বইগুলোকে একটুও মায়া করি না—"

ক্রিস্‌টোফারসন্ বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চলাফেরার মধ্যে লক্ষ্য করলাম আত্মত্যাগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আমোদ ও অহঙ্কার তিনি অনুভব করছেন। একজন পুস্তক-ব্যবসায়ীকে ইতিমধ্যেই চিঠি লেখা হয়ে গেছে। সমস্ত লাইব্রেরীটাই তাঁকে বিক্রী করা হবে।

"গোটাকতক বইও কি নিজের জন্য রাখবেন না?" আমি প্রশ্ন করলাম। অবশ্য গোটাকয়েক বই তাঁকে রাখতে হবে। তাতে কেউ-ই অনুযোগ করবেন না। এ ছাড়া তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করাও কষ্টকর। প্রথমে খুব জোরেই বললেন, একখানা বইও তিনি রাখবেন না, জীবনে বইয়ের চেহারা তিনি আর দেখতে চান না। আমি তখন জানতে চাইলাম, মিসেস ক্রিস্‌টোফারসনের জন্য কি কোন বইয়ের

প্রয়োজন নেই? মাঝে মাঝে বইয়ের সঙ্গে থাকলে তিনি আনন্দিত হবেন না? কথাটা শুনে তিনি একটু গম্ভীর-ভাবে চিন্তা করলেন। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম, অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে নরকোকে এক বাক্স-বোঝাই বইও পাঠানো হবে। আর এতে মিসেস কিটিংএরও অভিযোগ করার কোন কারণ নেই। তাঁর অনুমতি পূর্ব্বেই নিয়ে রাখতে বললাম।

সেইরকমই হলো। রুটুভাবে সমস্ত বই বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হলো। সারি সারি সাজানো বইগুলি বস্তায় ভর্ত্তি করে নীচে আনা হলো। তারপর সেগুলি গাড়ীতে করে এমন ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যে পীড়িতা পত্নী এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে। এই সমস্ত কথা বলার সময় ক্রিস্‌টোফারসন এমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন যে সেরূপ হাসি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। মনে হলো—ঘরের যে অংশটা এতদিন বইয়ে পূর্ণ ছিল তিনি আর সেদিকে তাকাতে পারছেন না। আর কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে মাথা আনত করে তিনি যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়ছেন। তবে পত্নীর রোগ-মুক্তিলাভে তিনি খুব আহ্লাদিত হয়েছেন তাতে বিন্দু-মাত্র সংশয় নেই। এই দুর্ঘটনার ধাক্কায় তাঁকে আরও বেশী বৃদ্ধ মনে হলো। স্মৃতির কথা বলার সময় তার চোখ হতে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল, আর বয়স হওয়ার দুর্ব্বলতায় মাথাটা কাঁপতে লাগল ঈষৎ।

লণ্ডন হতে বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে আমি মিসেস্‌ ক্রিস্‌টোফারসনকে একবার দেখেছিলাম। অতিশয় রুগ্ন ও বিবর্ণ এবং সুন্দর চেহারা বলতে যা মনে হয় সেরূপ চেহারাও তাঁর কোনদিন ছিল না। তবে মানুষের হৃদয়ের রূপ যদি ফোটে ওঠে মুখমণ্ডলে, তাহলে মিসেস্‌ ক্রিস্‌টো-ফারসনের মুখশ্রীতে অন্তরের মাধুর্য্য ও স্নেহের ভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। খুব আমুদে স্বভাবের না হলেও তিনি বিষণ্ণ স্বভাবের ছিলেন না। আর পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করে তাঁর চোখের ভাষা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সে ভাষা যেন তাঁর মনোবাঞ্ছা-পূরণকারী সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় পর-মেশ্বরের প্রতি নিবেদন করছিল অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি।

অলৌকিক

শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়

বছর পনের আগেকার ঘটনা, মনে হয় যেন সে দিনের কথা।

মেজ মেয়ে অনিমার হল অসুখ, বাস তখন তার বয়স চুয়াল্লিশ, সংসারে অভাব অনটন থাকলে সামান্য অসুখ বিসুখে যেমন হয়—খাই খাই বেড়িয়ে বেড়ায়, জ্বর এলে কাঁথা গায়ে দেয়, অবহেলা আর অযোগোযোগিতার ফলে দেখা দিল সর্দ্দি, কেসে, হ'ল সে শয্যাশায়ী, বুকে একটু ব্যথার ভাব, কেসে ওঠে ন, ডাকা হ'ল ডাক্তার।

ডাক্তার ডাক্তারখানা, পল্লীগ্রামের বন্ধু, মরম দিয়ে আপন জনের মত করে দেখেন রোগীদের ; দাবী করে পয়সা কিছু চান না, যা' দেওয়া যায় তাই নেন, পাশ-করা ডাক্তার তিনি না হলেও রোগী তাঁর যাতে সারে। দরিদ্র পল্লীবাসীরা ভক্তি করে তাঁকে, পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাঁর হাতে রোগীর সম্পূর্ণ ভার সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় গ্রামের লোকেরা।

গাঁয়ে বা আশেপাশে নেই পাশ-করা ডাক্তার, প্রয়োজন হ'লে মাগুরিয়া বা হাতুড়ে থেকে ডাকতে হয়—তাঁদের ডাকা মানে প্রাণান্তকর খরচার ঝুঁকি নেওয়া—কোথায় পাবে এত পয়সা গরীব পল্লীবাসীরা? সেই কারণেই বিশেষ সঙ্কটে না পড়লে ডাকে না তাঁদের।

প্রত্যহ সকালের ট্রেণে নিয়মিত ভাবে এসে নামেন আশুডাক্তার বালুর ষ্টেশনে, পায়ে হেঁটে এগা সেরী ঘুরে বেড়ান ব্যাগ হাতে করে—শুধান সবার কুশল, সন্ধ্যায় ফিরে যান বাড়ী।

ডাকলাম পথ থেকে ডাক্তারবাবুকে। রোগী দেখে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন তিনি চলে। যাবার সময় বলে গেলেন—ভয় নেই, সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু অভয় দেওয়া সত্ত্বেও রোগ কিন্তু সারবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, ক্রমেই যেন জটিলতর হ'তে লাগল অসুখের অবস্থা।

দিন সাতেক পরে আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, অনির অসুখ বেড়ে চলেছে, ভাল ডাক্তার যেমনতর ব্যবস্থা কর, এ চিকিৎসা আমার মনঃপুত হচ্ছে না। ইনি হয়ত রোগ ধরতে পারেন নি।

ডাক্তারবাবু এলে তাঁকে বললাম সে কথা, রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, সে রকম বুঝলে আমিই সেকথা বলতাম।

প্রবীণ ডাক্তার যখন দিয়ে ভরসা দিলেন তখন তাঁর অবাধ্য হয়ে বড় ডাক্তার কাকেও আনার মত পরিবর্ত্তন করলাম, বাবাকেও বললাম সে কথা, সম্মত হলেন না তিনি।

আরও দিন তিনেক পরে রবিবারের দিন বাবা পুনরায় আমাকে বললেন, মেয়েটা অচিকিৎসায় মারা যাবে, আজ দেখলাম তার অবস্থা খুব খারাপ।

হঁ্যাৎ করে উঠল আমার বুকের মধ্যে বাবার কথা শুনে, অনুতাপ হল, বাবা আগে থেকেই বলছেন একথা, ভাল মন্দ কিছু ঘটলে আমার ঘাড়েই ঘটবে—দেখলাম বাড়ীর সবাই আমার উপর দোষারোপ করতে আরম্ভ করেছে। সকলের সকলরকম কথাই বিনা প্রতিবাদে সইতে হ'ল আমাকে।

মেয়েটা সেইদিনই মারা যাবে—সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল পাড়াময়, দলে দলে গুভাকাঙ্খিনী প্রতিবেশিনীরা মেয়ের বিছানার পাশে ভীড় জমিয়ে চোখের জল ফেলে সমবেদনা জানিয়ে গেলেন, নির্ব্বাক বিস্ময়ে রোগ-যন্ত্রণাকাতর শিশু কন্যা সকলের মুখের পানে চেয়ে দেখল, হয়ত বুঝতে পারল কারণটা।

কেহ কেহ কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করতেও ছাড়লেন না, বললেন—মেয়ে কিনা!

সত্যিই কি খরচের দায়িত্বের ভয়ে আত্ম-প্রবঞ্চনা করলাম আমি? হাহাকার করে উঠল মন—এ আমি করলাম কি? তাকে এভাবে হত্যা করবার কি অধিকার আছে আমার? ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হ'লে হয়ত সে নিরাময় হত। অন্ততঃ আফশোষ করবার কিছু থাকত না, কারও সামনে না—নির্জ্জনে বসে ফেললাম চোখের জল। আবেগ-আকুল চিত্ত প্রার্থনা জানালাম শ্রীভগবানের পাদপদ্মে—তার আরোগ্য কামনা করে।

প্রতীক্ষায় থাকলাম ডাক্তারবাবুর, বিকালে তিনি পুনরায় এলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বসলাম রোগীর পাশে।

পরীক্ষান্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল দেখলাম ডাক্তারবাবুর মুখভাব, আশঙ্কার ছায়া যেন ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। বাইরে আমাকে একান্তে ডেকে তিনি বললেন, আমি ঠিক বুঝতে না পেরে মেয়েটাকে মেরে ফেলেছি, রোগ নির্ণয়নে ত্রুটির কথা স্বীকার করলেন তিনি। বাবা যে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন সে কথাও শেষ মুহূর্ত্ত বললেন অকপটে।

রাত্রি সাড়ে আটটায় তাঁর ফিরবার গাড়ী, ষ্টেশনের কাছে আমাদের বাড়ী। গাড়ী আসার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি উঠে গেলেন।

যাবার সময় আমাকে গোপনে বলে গেলেন, তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যাপার চুকিয়ে নিতে। হয়ত আর বেশীক্ষণ টিকবে না রোগী।

তিনি চলে গেলে খেতে বসলাম—খেতে পারলাম না। বাড়ীর অন্যান্যেরা কেউ খেল—কেউ খেল না।

নটা নাগাদ প্রকাশ পেতে লাগল মৃত্যুর লক্ষণ, আরম্ভ হ'ল শ্বাস কষ্ট। আমার সেজ ভাই ভূপেন (বর্ত্তমানে বারাসত কোর্টের উকিল) কর্পূরের মৌতা নাকের কাছে ধরে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিকতার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

সহ্য করতে পারলাম না সে বৃদ্ধ। সর্ব্বদা মনে হতে লাগল এ মৃত্যু না—হত্যা, এর জন্য দায়ী আমি, তাকে মৃত্যু শয্যায় ফেলে রেখে একলা একলা করে আমার দোকানের পথে পা বাড়ালাম, বাজারে দোকান—বসত বাড়ী থেকে অল্প দূরে। বাবার সময় মাকে বলে গেলাম, চোখের সামনে এ বৃদ্ধ সহ্য করতে পারছিনে। সে রকম কিছু হলে যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়।

দোকানে এসে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লাম গদীর উপর। আশুন মাস—গায়ে দিলাম একখানা পাতলা চাদর, গরম লাগতে লাগল, সেখানা সরিয়ে রেখে চোখ বুজলাম, ঘুম এলনা, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করছি বাড়ীর কারোও পদশব্দের। টং টং করে দেওয়াল ঘড়িটায় বাজল এগারটা। তবে কি বেঁচে গেল অনিমা! ডাকি গণধরকে—বেঁচে উঠুক সে—কেউ যেন ডাকতে না আসে আমাকে, ক্রমে আধ ঘণ্টার আওয়াজসহ বেজে চলল বারটা, একটা, দুটো।

তন্দ্রায় জড়িয়ে এলো দু'চোখ—দুটো বাজার পর। স্বপ্নে দেখলাম, স্পষ্ট নয়, এলোমেলো নয়—মনে হয় যেন এখনও চোখের সামনে জল্ জল্ করছে।

—অলৌকিক জ্যোতিসম্পন্ন গৌরবর্ণ সুন্দর সুঠাম বপু দেহ, খালি গা এক ব্রাহ্মণ, গলায় ঝুলছে পৈতার গোছা, পায়ে খড়ম, পরিধানে পট্টবস্ত্র—আমার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন, তাড়াতাড়ি যেন উঠে নিতে গেলাম পায়ের ধুলো, বাধা দিয়ে আমার মাথার হাত রেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রাহ্মণ—এত ভাবছিস কেন?

জড়িত স্বরে উত্তর দিলাম, মেয়েটা যে মারা গেল। গম্ভীর সুধাস্নিগ্ধ বদন মণ্ডলে লক্ষ্য করলাম অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আতিশয্য, বললেন তিনি, মেয়ে তোর মরবে না।

অপার আগ্রহভরে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাঁর মুখের সামনে, কথা বলতে পারলাম না।

হেসে বললেন তিনি, ঘরদোর চুকতে অযথাস্থলে শুধু দিয়ে বসে আছে বকিয়া। তোর মেয়ে ভাইকে খালি পায়ে—

কথা তাঁর শেষ না হতেই ঘরদোর খাকা, ভেঙ্গে গেল ঘুম, ডাকলেন বাবা, তারিণী দরজা খোল।

দেওয়াল ঘড়িটায় বাজল তিনটে।

বাবা বললেন—বাড়ী চল, অনিমা মারা গিয়েছে।

জানা কথা যে মারা যাবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে আমার তন্দ্রাহীন অবস্থায় তার মৃত্যু সংবাদের প্রতীক্ষায়, তবু বিশ্বাস করতে পারি না। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ যে বলে গেলেন, মেয়ে আমার মরবে না।

দোকানের দরজা বন্ধ করে বাবার পিছন পিছন পা বাড়ালাম বাড়ীর পথে। পথে আসতে ভাবতে এলাম—স্বপ্ন যদি সত্য হত!

বাড়ীতে পা দিতেই দেখি, সকলে কয়ে আছড়া পিছড়ি, কান্নাকাটি। তুপেন সকলকে দিচ্ছে সান্ত্বনা, দেখলাম সে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমাকে দেখেই বললে, আসুন দাদা, অনিকে তুলসী তলায় নিয়ে যেতে হবে।

মাথার তলা তার কথা। কর্ত্তব্য নিষ্ঠুর। নশ্বরীর মর তার মনোভাব। আমার মেয়েদের সে ভালবাসে খুব।

হারিকেনের আলোটা মুখের উপর ধরে দেখলাম মৃত কন্যার মুখখানা, একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে, কুণ্ঠিতভাবে ডাকলাম মেজভাই ষষ্ঠীকে, বললাম তাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত, অনুরোধ করলাম ধরণার মাথার জন্য।

বিরক্তি ভরে সে আমাকে বললে, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।

বাবা আগ্রহ ভরে শুনতে চাইলেন আমার বক্তব্য। বললাম সব। তিনিও ষষ্ঠীকে বললেন—ধরণার মাথার জন্য।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সে ফিরে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে, দেখে মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে পথে জল পেয়েছে কিনা।

কোন ক্রমে "না" বলে হাতের মুঠো খুলে আমার স্ত্রীর হাতে একটু ধুলো দিয়ে সে বললে, খাইয়ে দাও।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত সে, তখন তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে কন্যাকে কি করে ধুলো খাওয়ান যায় সে চেষ্টাই করতে লাগল সকলে।

যেহ যার প্রাণ নেই সে খাবে কি করে!

কোন ক্রমে তার জিহ্বায় বলে দেওয়া হল মাটিটুকু। আশা-নিরাশায় উদ্বেলিত হ'তে লাগল সকলের মন।

এইভাবে অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কি বিবেচনা করে তুপেন ঘড়ি নিয়ে বসল তার শিয়রে।

কি আশ্চর্য্য! মিনিট পাঁচেকের মধ্যে নড়ে উঠল তার চোখের পাতা—গিললে একটা ঢোক।

আরও এগার মিনিট পাঁচেক গত হ'লে খেতে চাইল জল। আমার ফুঁয়ার কথা—দেওয়া হ'ল গরম দুধ। ঘুমিয়ে পড়ল সে খাবার পরে।

ক্লান্ত শ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত বাড়ীর সকলে যে যেখানে পারল এলিয়ে দিল শরীর। আমি বৈঠকখানায় আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন সকলে। কখন সকাল হয়েছে, রোদ উঠেছে, টের পাইনি কেউই।

সকাল সাড়ে ছটায় গাড়ীতে এসে বাড়ীর চারিধারে ঘুরে বেড়িয়েছেন আশু ডাক্তার, কাউকেও ডাকাডাকি করতে সাহস পাননি। তাঁর ধারণা কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে এসে আমরা হয়ত অধিক রাত্রে শুয়েছি।

আমাদের তখনকার বাড়ী মানে—ফাঁকা জায়গায় তিন কুঠুরীযুক্ত একখানা কোঠাবাড়ী। চারিদিক ফাঁকা, কোন বেড়াবেড়ি আবরণ বালাই শূন্য। সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করছেন তিনি—আকুল আগ্রহ নিয়ে জানবার জন্য যে—মেয়েটি মারা গেল কখন।

অবশেষে বাইরের ঘরে আমার বিছানার পাশে বন্ধ জানালায় টোকা দিতেই খুলে গেল জানালা, দেখতে পেলেন তিনি আমাকে; মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, তারিণী, ও তারিণী!

সাড়া দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। চোখ মুছতে মুছতে খুললাম দরজা—চকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, কখন মারা গেল মেয়েটা।

মারা ত যায়নি ডাক্তারবাবু—উত্তর দিলাম।

সেকি? যেন আকাশ থেকে পড়েন তিনি। কোথায় সে? দেখে আসি। আমুন উৎকণ্ঠা ভরান স্বর প্রশ্ন।

উত্তরে রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে দেখি, অনিমা বিছানায় উঠে বসে তার আশেপাশে খাবার-দাবার যারা কিছু ছিল সব শেষ করে একটা মোটা বেলনা চাদরের চেষ্টা করছে।

ডাক্তারবাবুকে দেখে বললে, ভাত খাব।

হাত দেখলেন ডাক্তারবাবু, বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন ভাল করে।

স্তম্ভিত তিনি। বললেন—একি! অসুখ হয়েছিল বলেও ত মনে হয়না। জানতে চাইলেন তিনি—কি করে কি হল।

সবিস্ময়ে বললাম তাঁকে অলৌকিক দৈবফলের কাহিনী।

হেসে বললে—সত্যিই ফকির বলেছিল অমঙ্গলের। ঝড় ঝড় রুক্ষ চুল রাশি, গায়ে তেলচিটে কাঁথার সঙ্গে ছেঁড়া চট জড়ানো, জবাফুলের মত লাল চোখ দুটো যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলছে। মেয়েটাকে দেখেই ফকির হাত কড়মড় করে বিরক্তিপূর্ণ ঝাঁঝালো সুরে বললে তাকে, চাকর রেখেছিস যে মায়ারাত বসে থাকব এখানে?

ভয় পেয়েছিল মেয়েটা প্রথমে—কিন্তু পরে ফকির তাকে ডেকে সামনে থেকে একমুঠো ফুলা নিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেছিল, যা, এগুলি দিয়ে যাইয়ে দিবি।

ফুলা মুঠোয় মধ্যে নিয়ে ছুট দিয়েছিল সে বাড়ীর দিকে, ফকিরের নিকট থেকে হাত কুড়ি আসতে হতেই এসে সে একবার মাত্র কৌতূহলবশে পিছন ফিরে তাকিয়েছিল কিন্তু ফকিরকে আর দেখতে পায়নি।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য যেটুকু জানি—সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম ফকিরের কাহিনী।

কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার যখন মাটিয়ারী গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছিলেন সেই সময় পারস্য হইতে একজন পরিব্রাজক ফকির (অনেকে বলেন তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, আমি যাঁকে দেখেছি তিনিও ব্রাহ্মণ) নানা দেশ পর্যটন করিয়া এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া কলাপে মুগ্ধ হইয়া ভবানন্দ মজুমদার পীর সাহেবকে এখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ জানান। ফকিরসাহেব এই গ্রামে—যেখানে পীর সাহেবের দরগা সেইখানে—আস্তানা স্থাপন করিয়া থাকিয়া যান।

এই ফকিরের নাম পীর সালেক-উল-গউস। চলতি নাম পীর সাহেব। মৃত্যুর পর তাঁহার আস্তানা স্থলে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। সমাধি স্থলে রাজবংশের সমাধি মন্দির, চত্বর এবং গৃহাদি নির্মিত হয়। এই সমাধি বেদী পীর সাহেবের দরগা নামে খ্যাত।

মোগল বিভাগের পূর্বে বংশানুক্রমে কাজিবংশীয় মুসলমানগণ সেবায়েত (খিদমতগার) নিযুক্ত থাকিয়া দরগার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছিলেন। অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের বহুস্থান হইতে মনস্কামনা পূরণ, দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, নিঃসন্তানের সন্তান লাভ প্রভৃতি আশায় ভক্ত এখানে প্রত্যহ দলে দলে লোক ভীড় জমাইতে লাগিল। কিছুদিন অন্তর অন্তর মেলার প্রচলন হইল।

পীর সাহেবের দরগায় মানত বা ভক্তের পৌষ উপলক্ষে তদ্ব্যতীত আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠানী মেলা প্রসিদ্ধ ও খ্যাত।

যতদিন মোগল বিভাগ হয়নি, আমাদের ইউনিয়ন মাটিয়ারী-রামপুরকে বেষ্টন করিয়া বিভক্তির ছাপ পড়েনি, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি-কলহ, আপোষ-বিরোধের মধ্যে বাস করিতেছিল ততদিন এই রীতি প্রচলিত ছিল।

১৯৪৭ সালে মোগল বিভাগের ফলে পীর সাহেবের দরগার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইল অন্যরূপে।

মুসলমান সেবাইতগণ মাটিয়ার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন পাকিস্তানে। তাঁহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি বিনিময় সূত্রে দখল করিলেন পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুগণ।

বড়ই পরিতাপের বিষয় তৎসহ তাঁহারা পীর সাহেবের দরগা এবং পীরোত্তর সম্পত্তির আয়ও নিজেদের মধ্যে বন্টন ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। অব্যাহত গতিতে এই প্রথা অদ্যাপি চলিতেছে।

এই দরগার ঐতিহ্যকল্পে জনপ্রিয় দরকার অদ্যাপি সৃষ্টি হয় নাই। ফলে দিনের পর দিন জনগণশ্রদ্ধা আকৃষ্ট পীর সালেক-উল-গউস-দরগা ক্রমাবনতির পথে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পীঠস্থানে অবস্থিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ এই দরগা বর্তমান তথা বাংলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গৌরব। ঐতিহাসিক কীর্তি রক্ষণশীল সরকারের দৃষ্টি হইতে রক্ষিত পীর সাহেবের দরগা ধ্বংসের পথে, তাহাকে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সরকারী সাহায্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

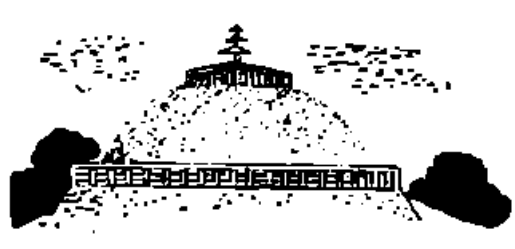

কি ভাবে স্মৃতিশক্তিলাভ করা যায়

উপানন্দ

স্মৃতিশক্তি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, এই শক্তির আনুকূল্যে সৌভাগ্যবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া যায়। স্মৃতি বিভ্রম যে সর্ব্বনাশের মূল, তা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথে বহুবার প্রত্যক্ষ করা গেছে। রামচন্দ্রের স্মৃতি ভ্রংশ ঘোর না ঘটলে রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে করুণ ঘটনার সমাবেশ হোতে পারতো না—এরূপ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটতে পারে—যার পশ্চাতে রয়েছে শোচনীয় বিভ্রান্তি।

প্রত্যেকটী দিন জীবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত আমাদের মনে নানাঘটনার ছেতর দিয়ে কিছু কিছু রেখাপাত করে যায়, সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কের ছেতর স্থান করে নেয়—সংরক্ষণ করা থাকলে মধুর স্মৃতিগুলি মনে আনন্দ দান করে, স্মৃতি কথা বলেও আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু যে সব অসৎ কাজ করা যায়, সেগুলি স্মরণ পথে উদিত হয়ে পীড়া-দায়ক হয়ে ওঠে—নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখতে হয়।

যে মানুষ নরহত্যা করে কোন রকমে আইনের ফাঁক পেয়ে আদালতের বিচারে মুক্ত হোলো,সে মানুষ সারাজীবন কষ্ট পেলো—তবও ভগবান ছেতরে—আর শেষের দিনে সে কাতর হয়ে উঠলো ভগবানের বিচারে দুঃসহ শাস্তি পাবার জন্যে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইব স্মৃতির দংশনে জর্জ্জরিত হয়ে শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন। পূর্ব্বগোলার্দ্ধ আবিষ্কারক কলম্বসকে বাধ্যদেবনার ইতিহাস বুকে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি চিত্রণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। যে ব্যক্তিটি উচ্চ-পদস্থ হয়ে নির্য্যাতিত করছে নীচুতলার লোককে, সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময়ে সে শিউরে উঠবে ভয়ে স্মৃতির সহস্র কশাঘাতে। জালি-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ার একদিনও মনে শান্তি পান নি—কত বিনিদ্র রজনী তাঁর কেটে গেছে স্মরণের পথে বিভীষিকা দেখে দেখে।

যার কোন কথা স্মরণ হয় না পরে পরে সে ভুল করে, আর আবোল তাবোল বলতে থাকে। ফলে সে নিজে কষ্ট পায়, অন্যকেও কষ্ট দেয়। স্মৃতিশক্তি অর্জ্জন করার দিকে তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পরিশ্রম বলেই এই শক্তির প্রাধান্য ঘটে থাকে। ভবিষ্যতে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যাদের কাম্য, উত্তম বিদ্যালাভ করে যারা কীর্ত্তি, ধন,সুখসাচ্ছন্দ্যের ও সম্মানের অধিকারী হোতে ইচ্ছুক, তারা স্মৃতিশক্তি লাভ করবার জন্যে অবশ্য চেষ্টা করে—তারাই ভবিষ্যতে হয় বেশ-ধারণ।

নিয়মিতভাবে মানসিক শ্রম, পুনরাবৃত্তি, গভীর মনন ও অনুশীলন ছিন্ন কোন কথা মনে রাখা সম্ভব নয়। যে মানুষ ছেলেবেলা থেকে মানসিক শ্রমে অভ্যস্ত, সেই সুচারুরূপে স্মৃতিশক্তি অর্জ্জন করতে পারে। মানসিক পরিশ্রম আর অধ্যবসায় অবলম্বন করে তোমরা শক্ত সমর্থ করে তোলো জীবনের ক্ষেত্রকে—যাতে করে ফসল তুলে এনে সঞ্চয় করে রাখতে পারো স্মৃতির ভাণ্ডারে। যারা স্মৃতির ভাণ্ডার পড়ে তুলতে পারে না, কেমন করে তারা জ্ঞানের ফসল রাখবে তুলে, আর কেমন করেই বা প্রয়োজন মত বের করে এনে পরে কথাগুলিকে কাজে লাগাবে? সময় মত কথা মনে না পড়লে পুঁথিগত বিদ্যালাভ করেও বিরাট ব্যর্থতার মাঝে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

জীবনে এমন একটি সময়ের প্রোত আসে যা অবলম্বন করে মানুষ সৌভাগ্যবান হোতে পারে—কিন্তু সে স্রোত উপেক্ষা করলে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না, ফলে জীবনের অবশিষ্টাংশে কর্ণধারহীন তরীর মত আবদ্ধ হয়ে থাকে—প্রত্যেক দিনটা চলে যায় কষ্টে, সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার হয় না। আজকে পাঠাভ্যাস করে যে ছেলে আগামী কাল ভুলে যায় তার পঠিত বস্তু, আজ যে অঙ্ক শিখে কাল পারে না করতে—সে কেমন করে মানুষ হবে! পরীক্ষা দিতে দিতে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবার সময়ে যদি কোন কথা মনে না আসে, তাহোলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আশা থাকে না। শিক্ষা লাভের সকল উদ্দেশ্য, সকল

প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যায়। যে সব ছেলে মেয়ে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, তারা যে খুব জ্ঞানী এরূপ ধারণা করো না, শুধু স্মৃতির প্রাখর্যই তাদের সাফল্য গৌরবের প্রধান কারণ এই কথাটি জেনে রেখো।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম একদা বাংলার আকাশে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজ তিনি এমন অবস্থায় এসেছেন যে নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছেন। স্মৃতি তাঁকে সকল রকমে ত্যাগ করেছে, তাই জীবদ্দশায় তাঁর আত্মবিলোপ ঘটেছে,—জ্ঞান বুদ্ধিও তাঁকে বর্জন করে তাঁর শোচনীয় পরিণতি এনে দিয়েছে। তোমরা যদি সব কিছু ভুলে যাও তাহলে তোমাদের জীবন-পথের পাথেয় অর্জন করা হবে না—মূর্খতার আবেষ্টনে পাবে অন্তর কষ্ট, আর সে মূর্খতা থেকে পাবে না কোন দিন মুক্তি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক পণ্ডিত রুশোর মতন বলেছেন—'প্রাথমিক ও প্রধান মৌলিক শক্তি হচ্ছে স্মৃতি—এটী ভিন্ন কোন বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা অসম্ভব।' যেখানে স্মৃতির অভাব, সেখানে বিদ্যার স্থান নেই। ভগ্নস্তূপের দিনে আমরা যেমন অসহায় ছিলাম তেমনি তাদেই জীবনব্যাপী অসহায় অবস্থায় থাকতে হবে—যদি না বিদ্যালাভ হয় আর সেদে আহৃত হবে পঙ্গুর স্বরে।

স্মৃতিশক্তির সহায়তায় আমাদের কর্মদক্ষতা বিস্তৃতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিকরা এই সত্য প্রতিপাদন করেছেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা বা আমরা লাভ করি, তা সঞ্চিত থাকে আমাদের স্নায়ুর মণিকোঠায়। কেমন করে মনে রাখতে হয়, সেইটি প্রকৃত সমস্যা নয়—সমস্যা হচ্ছে আমরা কেন ভুলে যাই। ব্যাপকভাবে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সম্মোহনের (Hypnosis) সাহায্যে সেই সব কথা মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায়, যারা মনে থেকে-হারিয়ে গেছে। সম্মোহন প্রয়োগ করে খুব ছোটবেলার কথাও মুখ থেকে বের করা যায়। এদের স্মৃতি প্রায়ই স্বপ্নের ভেতর ধরা পড়ে—চিহ্নিত হয়। পূর্বজন্মের বহু স্মৃতিও আমাদের স্বপ্নে সময়ে সময়ে দেখা যায়, অথচ আমরা বুঝে উঠতে পারিনে এই সব স্মৃতির পোড়ার কথা।

সকল বস্তুরই কালধর্ম আছে, তাই যে বস্তুর পূর্বে পাওয়া গেছে তার কথা বলতে পারা যায় না পরবর্তীকালে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে যা শেখা যায়, তা আর পরবর্তীকালে বর্তমান থাকে না। জীবন পথে জানা যায় যে, সীমাহীনভাবে জীবনটাকে মাজিয়ে ঘুষিয়ে নেবার, ক্ষমতা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আছে। কিন্তু জীবনে যে সব ঘটনা এসেছে সবচেয়ে শোচনীয় পরিণতি আর চরম দুর্গতি, সেগুলিকে অতিক্রম করা যায়না।

যে সব ঘটনা বা কাহিনী আমাদের স্পর্শ করেছে, সেগুলি থেকে আমরা অনেক কিছু ভালোরূপ সমাকৃতাবে উপলব্ধি করেছি, হৃদয় করেছি আর লাভবানও হয়েছি। ওরা আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয় স্বপ্নের স্তরে স্তরে। পাপ বা মন্দ কাজ যা করে ফেলি, তার জন্যে অনুতাপ, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা আসে! নীরবে নিভৃতে সকরুণ দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিগত আবহাওয়ার মধ্যে। ঔরঙ্গজীব তাঁর পুত্র শাহআলমকে যে সব পত্র লিখেছিলেন, তোমরা যদি সেইসব ঐতিহাসিক পত্রপাঠ করো—তাহলে বুঝতে পারবে কি করুণ অবস্থার ভেতর তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি স্মৃতি-তাড়নায় করে আতঙ্কের ভেতর নিজেকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন—প্রতি মুহূর্তে তিনি দেখেছেন তাদের আক্রমণাত্মক রূপ রূপ—যাদের জীবনের অবসান ঘটিয়ে তিনি দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন।

যখন বলা যায়···'ভুলতে পারিনে, এত যদি হতাশ, তখন বুঝতে হবে স্মৃতির ওপর আমরা আপনা থেকেই চাবুক হানছি। 'ভুলতে পারিনে' কথার অর্থই হচ্ছে আত্মবিচার—নিজেকেই নিজে কষা করতে পারা যাচ্ছেনা। বৈশোয়োরের দিনগুলির সঙ্গে এখনার নিবিড় যোগাযোগ নেই, আছে হেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া দিন গুলির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ যাকে জীবনে বেশীদিন পাননি—যে কয়-দিন পেয়েছিলেন তাঁর বউদিদি কাদম্বরী দেবীকে, তাও তাঁর সুদীর্ঘ-জীবনের মধ্যে অল্পদিনই বলা যায়। কবিগুরুর স্মৃতি গুহায় এঁদের কথাই বেদনার তুলির লিখন হয়ে রয়েছে। বাল্যস্মৃতি মধুর, আবার কলুষও বটে। মুমূর্ষু মায়ের শয্যার কাছে ছেলের না পৌঁছুতে পারার ব্যথা বা ব্যর্থতার মাঝে অথবা বাবাকে সময় মত সেবা শুশ্রূষা করতে না পারার জন্যে মেয়ের মনোকষ্টের মধ্যে স্মৃতি কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে গভীরভাবে—এদের ভুলতে পারা যায় না।

বহু বছর পরে হঠাৎ যখন স্মৃতির আঘাতে গভীর রাত্রে বিছানায় জেগে উঠি—আর মনে হয় নিজেকে গলা টিপে মেরে ফেলি, তখন বুঝতে হবে কোথায় যেন আমাদের গলদ রয়ে গেছে, কোথায় যেন আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত পেয়েছে। এই সব মানসিক আঘাত বা স্মৃতি-বিকারই তো 'কমপ্লেক্স' বীজাণু বাহক। যে ব্যক্তিটী উচ্চ মর্য্যাদা ও ক্ষমতা পেয়ে মানুষকে করেছে অবহেলা, ভুলে গেছে ভদ্রতা ও সৌজন্য—আর প্রাত্যহিক অজস্র লোকের প্রার্থনার হয়ে উঠেছে অহংমন্য, সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে তার মৃত্যুর প্রাক্‌কালে যখন সে বারে বারে শিউরে উঠেছে, চেঁচিয়ে উঠেছে, ভয়ে কেঁপে উঠেছে যারা জীবনের সকল কাজের সাক্ষীস্বামীর রূপে সহস্র স্মৃতির নিদারুণ কষাঘাতে। মানুষ নিজের দোষ কোনদিনই দেখেনা, তাই প্রবাদ সলিলে ডুবে মরে।

শিশু ভুল করলে, সে ধমকানি খেয়ে স্বীকার করে, ভুলের জন্যে শাস্তিও পায়—পেয়ে আবার তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়, নতুনভাবে কাজ সুরু করে—তার মনে কোন রেখাপাত হয়না। সে যেমনতর মত পবিত্র ও সুন্দর। কিন্তু যে বয়স্ক ব্যক্তি অতীতের মাঝে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজেই নিজের শাস্তিদাতা হ'য়ে দাঁড়ায়েছে, তার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে বিরল—সে অনুসন্ধান করতে জানে, সে প্রার্থনা করতে শিখে।

স্মরণ করবার ক্ষমতা না থাকলে, স্মৃতি রোমন্থন করা যায়না। স্মরণ করার শক্তির সঙ্গে স্মৃতির পার্থক্য আছে। স্মৃতিশক্তি সুদৃঢ় করবার জন্যে মনস্তত্ত্ব অনেকেরই অবলম্বন হয়েছে। চিত্তের একাগ্রতা,

পুনরাবৃত্তি, ও সাহচর্য বা সংযোজনার ওপর স্মৃতির নির্ভরশীলতা রয়েছে। মন যার ঘুরে বেড়ায়, তার কিছুই মনে থাকেনা। যে অন্যমনস্ক, তার বিপদ পদে পদে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—বারো বছর ফুলের মত মনটাকে নির্মল করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে, তোমরা অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও মেধাবী হোতে পারবে। যে কোন গ্রন্থের যে কোন পৃষ্ঠা ও বিষয় বস্তু তোমাদের মনে থাকবে। তাই বলি, এখন থেকে পবিত্র মন নিয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করো। যে সব তত্ত্ব বা তথ্য তোমরা শিখতে চাও বা জানতে চাও, সেগুলি যদি মনের মধ্যে সংযোগ সূত্রে গেঁথে রাখো—যেখা বা জানার সঙ্গে সঙ্গে, তাহোলে সেগুলি তোমরা সহজে বিস্মৃত হবেনা। সুকৌশলে এগুলি আয়ত্ত করবে কেননা ঘটনাগুলি নিজেরাই নিজের ভাষাপন্ন।

নিজেদের কাছে ডায়েরি রাখবে আর ডায়েরির পাতায় কিছু কিছু লিখবে যাতে স্মৃতিশক্তি সুযোগমতো বৃদ্ধি পায়। টনিকতা স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে—পারিবারিক কলহ বা অশান্তিও এ সম্পর্কে ক্ষতিকর। প্রাত্যহিক খাঁটি পদার্থের সঙ্গে মেশে থাকে তা'তে স্মরণ শক্তি লাভ হয়। সর্ব্বদা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত অবস্থায় রেখোনা, তাহোলে স্মরণশক্তি লোপ পাবে।

স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়ায় দরুণ নিরাশ হবার কোন কারণ দেখি না। কেন স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাচ্ছে বা কোন কথা মনে পড়ছে না, সে সম্বন্ধে তোমরা অনুসন্ধান করবে। তারপর সচেষ্ট হবে যেগুলি সংশোধন করে নিতে যাতে স্মরণশক্তি হ্রাস না পায়। স্মৃতিশক্তি লাভ করতে গেলে চিত্ত সংযম ও কল্পনার সাহায্যে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করে, পুরাতন কথা বা পড়া যাবে বারে পুনরাবৃত্তি করবে, তা'তে স্মৃতি সজাগ হয়ে উঠবে। তোমাদের মানসিকতাকে গতিময় না করে স্থিরভাবে রাখলে কোনদিনই স্মৃতিপথ প্রশস্ত হবে না। তোমরা দেহ ও মন পবিত্র করে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে, অন্তরে কোন প্রকার উদ্বেগ, বৈরাগ্য ও মলিনতা রাখবে না, তাহোলে স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই উত্তমরূপে লাভ করতে পারবে। আশাকরি কিশোর বয়স থেকেই স্মরণশক্তি লাভ করবার জন্যে সচেষ্ট হবে— ফুলের মত নির্মল হয়ে আর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করে।

জেনে রেখো :

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব হলেও আসলে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এই আধুনিক শতাব্দী সুরু হয়েছে। তোমরা বোধ হয় জানো, ইতিহাসে সাধারণতঃ বিখ্যাত ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত সময় থেকে এক একটি যুগের সূচনা হয়, আর সেই সব ঘটনা অভিনবত্বের ও বহুমুখ প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে মানব সভ্যতার প্রগতিকে নবনব পথে পরিচালিত করে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরুঢ়া হলেও ইংলণ্ডে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হবার সময় থেকেই ভিক্টোরিয় যুগ বলা হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর থেকে ইতিহাসের পাতা উল্টে গেল, পূর্ব্ব যুগের সঙ্গে রইলো যা আর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও সংযোগ, ফলে পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিকতার ক্ষেত্রে এলো একটা পরিবর্ত্তন, আচার ও আচরণে লক্ষ্য করা গেল ভিন্নতা—সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে প্রবাহিত হোলো নতুন দিনের ভাবস্রোত। তাই বিশ্বের ইতিহাসে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব বলে চিহ্নিত হয়েছে।

* * *

অপরের দোষ ত্রুটি দেখবে ক্ষমার চক্ষে, কিন্তু নিজের সামান্যতম ত্রুটিকেও দেখবে বিচারকের চক্ষে।

* * *

ভালোবাসার লোকের সংখ্যা কম, ভালোবাসা পাবার প্রত্যাশা করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশী।

* * *

ভালো করার জন্যে আমরা মানুষকে ভালোবাসিনে, ভালোবাসি তাকে এই জন্যে যে তার ভালো করেছি।

* * *

একজন রাজনীতিজ্ঞ পরবর্ত্তী নির্বাচনের জন্যে, চিন্তিত, কিন্তু উচ্চস্তরের রাজনীতি-বিশারদ যেখানের পরবর্ত্তী কালের মানুষদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন।

* * *

মহৎ হোলে কোন কাজই ক্ষুদ্র বলে মনে হয় না। জনসাধারণের কল্যাণ করবার দিকে লক্ষ্য রাখাই তোমাদের সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

* * *

পাঠের দ্বারা পূর্ণ মানুষ হওয়া যায়, মনের দ্বারা প্রভার তত্ত্বদর্শী হওয়া যায়, আর আলোচনার দ্বারা মানুষের ভেতর থেকে মলিনতা দূর করা যায়।

* * * *

অষ্ট্রেলিয়ার সুদূরতম মরুভূমি পেরিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুদীর্ঘ রেলপথ সোজাভাবে চলে গেছে। নদী এমন কি একটি গাছও পর্য্যন্ত একে উপকাতে হয়নি। সরল রেখার ওপর দিয়ে পথ ৩২৮ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

* * *

মিথ্যাবাদীর জীবন অন্ধকারময়। বন্ধুত্ব ঘোরের মত। তোমাদের দুর্দিনে তার কাছ থেকে কোনরূপেই বিচ্ছিন্ন হোতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের দুর্দিনে তাকে আর খুঁজে পাবে না।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

(জাম্পার পর্ব্ব)

বীরু চট্টোপাধ্যায়

গুড়ের মাঠে ধানের চাষ হচ্ছে দেখলেও এতটা বিস্মিত হতাম না, যা হলাম গাঙ্গুলী মশায়ের মুণ্ডিত মস্তক দর্শনে। তাঁর লীলায়িত গোঁফও সাবাড় হয়ে গেছে।

গজেন্দ্র গমনে তিনি হাতে একটা থলে নিয়ে বোধ করি দোকানে যাচ্ছিলেন—আমরা সবাই আঁতকে উঠে কোরাসে জিগ্যেস করলাম—একি ব্যাপার গাঙ্গুলী মশাই ?

ছিটদারী গাম্ভীর্য্যে তিনি জানালেন, সে অনেক কাহিনী। পরে বলবো। এখন আর সময় নেই—তোদের দিদিমার উনুন বয়ে যাচ্ছে।

তিনি দোকানের পথে অদৃশ্য হলেন।

আমরা ভাবতে লাগলাম।

মাথা বা গোঁফ কামানো সংসারে এমন কিছু পরমাশ্চর্য্য ঘটনা নয়, কিন্তু গাঙ্গুলী-মশায় সম্বন্ধে প্রায় তাই-ই বলা চলে। কেননা তাঁর পক্ক-কুঞ্চিত কেশদাম, সযত্নে লালিত গুম্ফ যারা এতকাল দেখেছে এবং ঐ দুটি জিনিসের পরিচর্য্যা সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তারা সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদয় হবে ভাবতে পারে, কিন্তু তাঁর মুণ্ডিতরূপ যে সম্ভব একথা তাদের কাছে অকল্পনীয়।

গাঙ্গুলী-দিদিমার মুখে শুনেছি যে গাঙ্গুলী-মশাইর জীবনে আবাল্য একটিমাত্র সখের প্রবাহই বয়ে আসছে, সেটা হল চুলের বিলাসিতা। পরে যৌবনোদ্গমে গোঁফের। এককালে তিনি বাবরি রেখেছিলেন (তখনকার যুগের যাত্রা থিয়েটারী অভিনেতাদের ঢংএ), তারপর যুগ পালটে গেল। বাবরি ছেঁটে হল ব্যাকব্রাস।

চুল আগে ছিল সাদাসিদে। সখ হল কোঁকড়ানো করতে। হাত ও চিরুণীর সাহায্যে যখন পুরোপুরি কার্লিং করা গেল না তখন তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিখ্যাত টীনে সেলুন থেকে একবারে ছ'মাস অন্তর কার্লিং করিয়ে আনতেন।

কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, হেকিমী যত রকমের চুলের উন্নতির তৈল ও ওষুধ আছে যথারীতি তা-ই তিনি ব্যবহার করতেন।

একবারে স্নানের পর চুল আঁচড়াতে তাঁর পাক্কা বিয়াল্লিশ মিনিট সময় লাগতো। আজকাল সময় কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মিনিট পনের কুড়ি। একবার আঁচড়াচ্ছেন আবার এলোমেলো করছেন—এই ভাবে পৌনঃপুনিক বার দশেক করেও কিছুতেই তাঁর পছন্দ হয় না। এই অতৃপ্তিই নাকি চুলোন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা সদ্‌গুণ।

একদা সর্ব্ব সময়ের জন্য পকেটে চিরুণী ও ছোট একটি আরশী থাকতো। রাস্তার ঘাটে, ভাড়ে ভাড়ে, বা দুরন্ত বাতাসে যদি এতটুকু চুল স্থানচ্যুত হত তক্ষুণি তিনি স্থান কাল পাত্র উপেক্ষা করে চিরুণী বের করতেন—আঁচড়াতেন, পরে আরশীতে মুখ দেখে তবেই নিশ্চিন্ত।

জামা কাপড় জুতো, খাওয়া দাওয়া, যাত্রা থিয়েটার কোন কিছুতেই তাঁর উৎসাহ ছিল না—একমাত্র চুল ছাড়া।

পড়তেন চুল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন, কিনতেন চুলোপকারী শত প্রকার জিনিস, ভাবতেন চুলের কথা, স্বপ্ন দেখতেন, তাও চুল। মোটমাট এক কথায় চুল-অন্ত প্রাণ ছিলেন গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায়।

গাঙ্গুলী-দিদিমা বলতে গিয়ে হেসে বাঁচেন না।

সেই চুল মাত্র একবার কামাতে হয়েছিল। পিতার মৃত্যুতে। মা শৈশবেই গেছলেন। শোকে গাঙ্গুলী মশায় পাগলের মত হয়ে গেলেন। তিন চারদিন পর্য্যন্ত অন্নজল মুখে দেওয়ানো গেল না তাঁর। কেঁদে ককিয়ে পাড়া মাৎ করলেন, ওরে আমার কী সর্ব্বনাশ হলরে ! ইত্যাদি।

পাড়ার লোক বিরক্ত হয়ে উঠলো। এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়। পরিণত বয়সে বাবা দেহরক্ষা করেছেন—আর তুমিও কচি খোকা নও। বাড়ী-ঘর, জমি জমা, কোম্পানীর কাগজ হাজার ত্রিশ টাকার, ভাল ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। বোনেদের সুপাত্রে বিবাহ, সবই তিনি দিয়ে গেছেন। এমন কিছু জ্ঞান হারাবার মত সর্ব্বনাশ হয়নি। অমর না হলে মানুষ এ বয়সে লোকান্তরিত হয়ই !

কিন্তু সমস্ত শোকটাই যে একমাত্র চুলের জন্যে হয়েছিল চুল কামাতে হবে বলে, সর্ব্বনাশ যে পিতার বিরহে নয়, চুলের বিরহে, সে কথা অবশ্য পরে প্রকাশ পেয়েছিল।

গাঙ্গুলী মশায় গোপনে দুশো টাকা ঘুষ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক পণ্ডিত বামুনকে 'মূলা ধরে দিয়ে' মাথা না কামিয়েও-চলে-গোছের শাস্ত্রোক্ত (?) এক বিধি আবিষ্কার করে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা বেফাঁস হয়ে গিয়ে পিসিমার চ্যাচামেচিতে সে-ই সাধের চুলকে কামাতে হয়েছিল।

তারপর পাকা ছটি মাস তিনি বাড়ীর বার হননি। চুলহীন অবস্থায় রাস্তায় বেরনো নাকি শালীনতা-বিরোধী —এই ছিল তাঁর তখনকার মতবাদ।

চুল দাড়ি গোঁফ নিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষাই না তিনি চালিয়েছেন—আগু মুখুজ্জের মত গোঁফ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, সফল হন নি। মাইকেলী ধরণে জুলফী-কান-দাড়ি রাখতে গিয়ে মুখটাকে কিম্ভূতকিমাকার করে তুলেছেন। শেষটায় খুতনির কাছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখতে গিয়ে—লোকের কাছে 'ছাগল দেড়ে' নাম নিতে হয়েছিল।

গোঁফটাকে শেষ পর্যন্ত বণিক সুলভ পাকানো টাইপের রেখেছিলেন—উভয় প্রান্ত সূচাগ্র। চুল আর গোঁফ, গোঁফ আর চুল এ নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলেন যে যথা সময়ে বিবাহ পর্যন্ত করতে পারেন নি।

শেষে পিসিমার বিদ্রোহে একদিন আমাদের গাঙ্গুলী-দিদিমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে বাড়া ফিরলেন। দিদিমার বয়েস ছিল কম, মন ছিল সরল। প্রথমবার মুখের দিকে চেয়ে গোঁফ দেখে নাকি হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, ও মাগো আমায় কি করে গো। শেষে দারোগানের সঙ্গে বিয়ে দিলে গো।

গাঙ্গুলী মশায়ের 'প্রাণ যায় তবু গোঁফ কামানো অসম্ভব' গোছের অটল প্রতিজ্ঞা দিদিমার কান্নায় কিছু নমনীয় হল। সূচাগ্র মুখ কাটা হল—উপরিভাগ ছাটা হল। ঠোঁটের মাঝখানটিতে একটি প্রজাপতির মত শোভা পেতে লাগলো! ঘাটারফ্লাই বা হিটলারী ধরণে।

এ হেন বিখ্যাত ও মূল্যবান চুল এবং গোঁফ-সর্বস্ব গাঙ্গুলী মশায়ের আজ এ সর্বহারা অবস্থা দেখে আমাদের বিস্মিত হওয়া কিছু অন্যায় কি? কী এমন অবস্থা বিপর্যয় হতে পারে যার জন্যে···তবে কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন? উহুঁ দিদিমা তাহলে আস্ত রাখবেন না। নাঃ কোন কিছুই ভেবে কূল কিনারা করতে পারলাম না।

সমস্ত দিন আর গাঙ্গুলী মশায়ের পাত্তা পেলাম না। পড়া-শোনায় মন বসাতে পারছি না। রহস্য-গল্পের কৌতূহল নিয়ে অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাল কাটাচ্ছিলাম। সন্ধ্যের মুখে গড়গড়া টানতে টানতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। আঃ বাঁচলাম।

তিনি বলে গেলেন কারণ কি। শুনে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পেলাম না। যথাযথ লিপিবদ্ধ করছি।

গাঙ্গুলী-দিদিমা ছিলেন চারুকলা পারদর্শিনী। মানে তাঁদের বিবাহের চল্লিশ বছর ধরে তিনি যুগে যুগে এক একটা শিল্প শিখেছেন ও তার অজস্র উদাহরণে বাড়ী-ঘর ছেয়ে ফেলেছেন। যেমন ঝিনুকের তাজমহল, মাছের আঁশ রাঙিয়ে ফুলের ঝুঁড়ি, কার্পেটে বুনা বিলিতি বুলবুলের তলায় সালঙ্কারে লেখা 'ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখবে মায়ের হাসি।" বালিশের অড়ে রেশমী সুতোয় 'সুখে থাক' লেখা—ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর কিছুকাল চুপ চাপ ছিলেন সংসারের নানা ঝামেলায়, বাত-ব্যাধি ইত্যাদির তাড়নায়। ইদানিং দশ পনের বছর যাবে তাঁর খেয়াল হয়েছে উলের কাজ করবার। দিদিমার অধ্যবসায় প্রচণ্ড। গাঙ্গুলী মশায়কে দিয়ে 'উল-বোনা-শিক্ষা' সম্বন্ধীয় বই ও আধমনটাক উল কিনিয়ে কয়েকদিন ধরে কাঁটা নাড়াচাড়া করেই তা আয়ত্ত করে ফেললেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হল।

দিদিমার বাসনা প্রথম কাজটি নিবেদন করবেন গাঙ্গুলীমশাইকে। শুভদিনে একটি জাম্পার তৈরী শুরু করলেন। অদ্ভুত ধৈর্য্য, দেড়মাস নাওয়া খাওয়া রান্না ও সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম বাদ দিয়ে বোনা শেষ করলেন। কিন্তু আফশোস্—কোথায় যেন ঘর গুণতে সামান্য ভুল হয়েছিল···'ভি' গলার শেষাংশ অর্থাৎ ত্রিকোণের নিরকোণ এতবড় হয়ে গেল যে গাঙ্গুলীমশায়ের নত বিরাট বপুরও, বুক ছাড়িয়ে, পেট ছাড়িয়ে, এমন কি নাভি প্রদেশকেও ছাড়িয়ে গেল। আর গায়ে যেন আলখাল্লা চাপানো হয়েছে, এমন ঢিলে হয়ে গেল। দোষ নেই দিদিমার···প্রথম প্রচেষ্টা···ডিজাইনটা বড় চমৎকার···'আয়রণোলা প্যাটার্ণ'। গাঙ্গুলীমশাই মুখে খুব পছন্দ হয়েছে দেখালেন। বললেন, থাকগে বড় গলাটাকে নয় একটু সেলাই করে নিলেই হবে।

—কেপেছ! গাঙ্গুলী দিদিমা নাকি মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, একবার ভুল হয়েছে বলে ভেবেছ আর ভুল আমি হতে দিচ্ছি। তাছাড়া জাম্পার আরেকটুকু টাইট হওয়া দরকার।

গাঙ্গুলীমশায় হাঁ না কিছু বলবার সাহস পেলেন না।

আবার খুলে ফেলে বোনা শুরু হল। পুনরায় নাওয়া খাওয়া ও অন্যান্য কাজকর্ম বাদ দিয়ে সারা শীতকালটি কাটিয়ে বসন্তের মাঝামাঝি শেষ করলেন বোনা।

জাম্পার সম্বন্ধে গাঙ্গুলীমশায় কোনকালেই তেমন উৎসাহ দেখাননি। কেন না ভয় ছিল, পরতে ও খুলতে তাঁর সাধের চুল এলোমেলো হয়ে যাবে।

দিদিমা অভয় দিলেন, সে ভয় করছ কেন? চুল আঁচড়াবে।

—তাতো বুঝলাম, নিমরাজী হলেন গাঙ্গুলীমশায়। দিদিমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার মত সাহস জীবনে কোন দিনই তিনি পাননি।

রোববার সকাল।

দিনও ভাল (দিদিমা পঞ্জিকা মতে চলেন), নব বস্ত্র পরিধানের উত্তম সময়। এবার সাইজটি বেশ ছোট হয়েছে, গলাও বেশ টাইট ফিটিং। দিদিমার সাহায্যে প্রায় ধস্তাধস্তি করে, সাধের চুলকে চরম বিপর্যস্ত করে গাঙ্গুলীমশাই যখন সেটি গায়ে ঢোকালেন তখনই নাকি তার নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে।

দিদিমা মিষ্টি হেসে জানালেন, নতুন নতুন উলের জিনিস, টাইট থাকা ভাল। একটুকু নড়াচড়া, দুদিনের ব্যবহার, তার পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

বুকে প্রচণ্ড চাপ, পেটে ভীম বন্ধন ও বগলে একটা অকথ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন গাঙ্গুলীমশাই।

—তুমি বোধকরি ভুল করে, কাতরস্বরে, প্রায় অস্ফুটে জানালেন গড়গড়া গাঙ্গুলীমশাই, কয়েক ঘর চওড়ায় কম নিয়েছ।

—না গো না, দিদিমা ফোগলা দাঁতে বিগলিত হাসি হাসলেন, দুদিন পরে ব'লো কি রকম ফার্স্ট ক্লেশ ফিট হয়েছে।

দুদিনের দরকার হলনা—দুঘণ্টার মধ্যে গাঙ্গুলীমশায়ের অবস্থা হল সঙ্গীন।

সেই নিয়মটা জানিস তো তোরা, বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছিস্ নিশ্চয়ই, গড়গড়া গাঙ্গুলী আমাদের বললেন, হিট এক্সপ্যাণ্ডস্ কোল্ড কণ্ট্রাক্টস্, উষ্ণতা প্রসারিত করে ও ঠাণ্ডা সঙ্কুচিত করে। রোদ্দুর যত চড়তে লাগলো জাম্পার তত টাইট। সকালবেলা দেহ ছিল শীতে শীর্ণ—বেলা বাড়তে রোদ্দুরে দেহ ফুলে গেল। সাধারণভাবে মানুষ এ সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন বুঝতে পারে না কিন্তু জাম্পার আমায় তা ভালভাবেই বুঝিয়ে ছাড়লে। অসহ্য চাপ অনুভব করতে লাগলাম বুকে, পেটে, বগলে।

শেষ অবধি খোলবার জন্যে তৈরী হলাম। কিন্তু হায় তোদের দিদিমা ও আমার যুগ্ম চেষ্টা বিফল হল। হাত তুলতেই পারিনা। হাত উপর দিকে তুলতেই বুকে লাগে। ফাঁসীর আসামীর গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলবার পরে যে অবস্থা হয় ঠিক তাই হল আমার। ভয় খেয়ে গেলাম। শিকার-টিকারে আমার সাহস দেখেছিস তো! পরোয়াই করি না কিছুকে। সেই আমিও ভয়ানক ভড়কে গেলাম। বেশীক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে হয়ত···তোদের দিদিমার বিজলী-খেলা আঁখিতেও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো আমার এখন-তখন অবস্থা দেখে। দেখে। টানাটানি হ্যাঁচড়া-হেঁচড়ি সবই নিষ্ফল হল।

আর্তচীৎকার করে উঠলাম—ডাকো শিগ্‌গির পাশের চৌধুরী বাড়ীর দরোয়ান হরনন্দন সিংকে।

বিহ্বলভাবে তোদের দিদিমা ডেকে নিয়ে এলো, দরোয়ান, উড়ে ঠাকুর, আর ছাপরাজিলার চাকর দুটোকে।

তারপর যতক্ষণ জ্ঞান ছিল এইটুকুই মনে আছে যে, পাঠার দেহ থেকে যেভাবে ছাল ছাড়িয়ে নেয় অবিকল সেই পদ্ধতিতে তিন হিন্দুস্থানী পালোয়ান ও এক উড়ে ঠাকুরে মিলে জাম্পারকে আমার দেহচ্যুত করলো··· আর মনে নেই···জ্ঞান ফিরে না পাওয়াই আমার ভাল ছিল। সর্বাঙ্গে লোমনাশকের কাজ করে গেছে ঐ জাম্পার! গোঁফের আর্ধেক···দুই ভুরুর, কানের পাশের এক খাবলা চুল উপড়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে জাম্পার···

গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায় থেমে গিয়ে ক্ষত গড়গড়ায় ভজনখানেক টান দিলেন।

তারপর লম্বা পাউণ্ড হাওয়া বুকের ভেতর নিয়ে দীর্ঘ-প্রশ্বাসে বললেন, তার পরের অবস্থা তো তোরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছিস। দ্বিতীয়বার আমার পিতৃশোক হল।

—

মাঘ

শ্রীসুধীরকুমার রায়

পোষ আজ গিয়ে থাকে থাক্,
আশাভরা মনোহরা
খুশিরালি সোনাঝরা
ওটিসুটি ওই আসে মাঘ।

মাঘু যেন মধুভরা চাক,
নেই তাড়া লেখাপড়া
শুধু খেলা মাতোয়ারা
নেই কারও চোখ রাঙা রাগ।

বই-খাতা তোলা আজ থাক,
কাঁচা-পাকা টোপাকুল
দোলে গাছে দুল দুল
শিখী যেন নাচে মেলি পাখ।

বাণীমার পুজো আগে থাক্,
রাঙা পায়ে দিয়ে ফুল
হরদম পাড়ো ফুল
চুপিসাড়ে বুঝে-সুঝে তাগ।

কুয়াশার মুখ ঢেকে মাঘ
কয় যেন কত-কথা
ওঁটি ফুল নাড়ে মাথা
পোষ আজ গিয়ে থাকে থাক্।

অচেনা মুখ

প্রশান্ত মৈত্র

অনেক অনেক দূরের পাহাড় ঘেরা এক দেশের কোন এক গ্রামে এক কৃষক আর তার বৌ বেশ সুখে বাস করতো। সে গ্রামের লোকেরা জীবনে কোনদিন আয়না কি জিনিষ দেখে নি। তারা তাই জানত না তাদের নিজেদের মুখ কেমন দেখতে। সে দেশের রাণী গাড়ী করে সে গ্রামের মধ্যে দিয়ে একদিন যাচ্ছিল। সে তার আয়নাটা ভুল করে ঘাসের মধ্যে ফেলে রেখে চলে এল।

একদিন খুব সকালে সেই কৃষকটা মাঠে যেতে যেতে ঘাসের মধ্যে চক্‌চকে কী যেন একটা লক্ষ্য করলো। অমনি সে হাতে তুলে নিল রাণীর সেই আয়না। সে কোনদিনও এ রকম জিনিষ দেখে নি। আয়নার দিকে তাকিয়েই তার গোল চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল ভয়ে, বিস্ময়ে। "একি? এটা যে আমার মৃত বাবার ছবি! নিশ্চয়ই বাবার আত্মা আমার সাথে বাস করছে। তা' ছাড়া হতেই পারে না। শুধু তাকে এ ছবিতে একটু জোয়ান দেখাচ্ছে।"

কৃষক বাড়ীতে ফিরে চলল। রাস্তার মধ্যে ভাবতে লাগলো, "কিন্তু বৌ যদি এ আত্মা দেখতে পায় তা' হলে ভীষণ ভয় পাবে। অন্য কোথাও এটাকে লুকিয়ে রাখব—যা'তে সে দেখতে না পায়।"

একটা খড়ের-গাদার মধ্যে সেটাকে সে লুকিয়ে রাখল। প্রত্যেক দিন সকালে—বিকালে খড়ের গাদার কাছে এসে বাবার আত্মাকে একবার করে দেখে যেত। তার বৌ তাকে প্রতিদিন সেখানে যেতে লক্ষ্য করে। মনে মনে সে ভাবল, "প্রতিদিন কেন যায়? নিশ্চয়ই সেখানে কিছু লুকিয়ে রেখেছে।" তাই একদিন কৃষকের বৌ গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করে আয়নাটা পেল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা অচেনা মেয়ের মুখ দেখতে পেল। বৌটা বলে উঠলো, "ও বুঝেছি, সে আবার একটা নূতন বিয়ে করেছে! থাকল সব। আমি রান্না-বান্না করতে পারব না, ঘর দোর পরিষ্কার করব না। ওর জন্যে কিচ্ছু করব না। নোতুন বৌ এসে যেন সব করে।" এ সব ভেবে ভেবে শেষ পর্য্যন্ত রাগে দুঃখে বিছানায় শুয়ে কান্না শুরু করলো।

বিকেল বেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে কৃষক দেখে ঘর নোংরা। খাবার তৈরী নেই। তখন বৌকে জিজ্ঞাসা করলো, "রান্না হয়নি কেন! শরীর ভাল নেই?"

"আমি তোমার জন্য রান্না করিনি। কোন দিন করবও না। তোমার নোতুন বৌ এসে যেন সব করে।"

"তার মানে!"

"মানে আবার কি? যা বললাম তা' সব কিছুই জান। তোমার নোতুন বৌয়ের ছবি দেখেছি। খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলে।"

"আমি তো কিছুই বুঝলাম না।"

"বেশ ভাল। বুঝতে যখন পারলে না আমি বাপের বাড়ী চল্লাম। তোমার কুৎসিত নোতুন বৌ আসুক।"

"ও বুঝেছি! ওটা কোন বৌয়ের ছবি নয় গো, আমার বাবার আত্মা। রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তুমি ভয় পাবে বলে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখেছি।"

"বললেই হল। আমি বুঝি আর মেয়েমানুষের মুখ চিনি না? অত বোকা নই।"

এ ভাবে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। ঠিক সেই সময়ে গ্রামের পুরোহিত রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গোলমাল

শুনে ঘরে ঢুকল। "শোন বাছা, মিছামিছি কেন ঝগড়া কর?" পুরোহিত বলল।

কৃষ্ণকের বৌ বলে, "সে আবার একটা নোতুন বিয়ে করেছে। আমি তার ছবি দেখেছি।"

কৃষ্ণকও বলে, "না, না আমার কাছে কোন বৌয়ের ছবি নাই। ওটা আমার বাবার আত্মা।"

সব বুঝে শুনে পুরোহিত বলল, "দেখি আমাকে ছবিটা দেখাও তো!" আয়নাটা হাতে নিয়ে ভালভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। অবশেষে বলল, "তোমরা শান্তিতে থাক। আর ঝগড়ার মধ্যে যেয়োনা। এটা একটা পুরোহিতের ছবি। কি করে যে ভূল করতে পার জানি না বাপু।"

এই সব বলে-কয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ করে পুরোহিত বিদায় নিল। যাবার সময় আয়নাটা নিয়ে গেল মন্দিরে রেখে দিতে।

(একটি বিদেশী গল্পের অনুকরণে—লেখক)

ভয় দেখানোর গল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

তখন আমি স্কুলে পড়ি। থাকি হোষ্টেলে। সবশুদ্ধ অনেক ছেলে একসঙ্গে ছিল সেখানে। তাই বেশ হৈচৈ করে কাটত দিনগুলো।

আমাদের সঙ্গে আরি হার্শ্বাথ ছেলে ছিল কজন। পারা হোষ্টেলটা তারা মাতিয়ে রাখত সব সময়। এক এক সময় বেরোত এক একটা মজা। যেমন কিছুদিন ভোরে উঠে দেখা যেত সকলের দশারির ঘড়ি কাটা। ক'দিন ঘুমের সময় থাকে তাকে ধরে চুল কেটে, গোঁফ লাগিয়ে সাজানো হত সং। কিছুদিন আবার একজনের আয়না অন্যজনের টেবিলে, একজনের জুতো অন্যজনের খাটের নিচে—এমনি জিনিসপত্র অদলবদল করে এক হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দেওয়া হত।

একসময় হোষ্টেলে আর এক রোগের উপদ্রব হয়েছিল—রাত্রিতে ভয় দেখানো। যারা একটু ভীতু ধরণের, তাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকত না। ঘুমোন পায়ে অথবা মুখে হাত, মেঝে ভূত দেখে, কিংবা স্প্রিং দিয়ে নকল সাপ তৈরী করে ভয়ের সৃষ্টি করা হত।

তাপস ছিল ভীষণ একরোখা। দেখতে খুব নাদুসনুদুস আর হাবা-গোবা। তাই সে হয়েছিল ভয়-দেখানো-ছেলেদের বাঁধা খদ্দের।

বেশ কয়েকবার ভয় পাবার পর তাপস মনে মনে খুশি হচ্ছিল, সে এবার শোধ নেবে। ভয়-দেখানো-রোগের পাণ্ডা ছিল শ্যামল। তাপস তাকেই শিকার ঠিক করে বসল।

তখন শীতকাল। বন্ধুরা জানালা খুলে সবাই ঘুমোয়। এক এক ঘরে চারজন ক'রে ছেলে। শ্যামল থাকে জানালার ধারের সিটটাতে। সাহসী বিবেচনা করে আগে থাকতেই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ঐ সিটটা দিয়েছেন ওকে।

সেদিনটা অমাবস্যার রাত। ঘুরঘুটি অন্ধকার। তাপস চুপিচুপি শ্যামলের ঘরে ঢুকল। ভয় দেখাতে এসেছে, অথচ তারই বুক ভয়ে টিপটিপ করছে।

ঘরে চারজনের নাক ডাকার শব্দ। পা টিপে টিপে শ্যামলের কাছে এগিয়ে গেল তাপস। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল ওর খাটের তলায়। তারপর উবু হয়ে চট করে পায়ের ওপর মাথা রেখে পিঠ দিয়ে ওপর দিকে ঠেলতে আরম্ভ করল খাটশুদ্ধ শ্যামলকে।

খাট বারকয়েক নড়ে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল শ্যামলের। সন্ত্রাসে অবস্থায় চট করে কিছু বুঝে উঠতে পারল না সে। ঘরে নিচু-আলো অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ। এ অবস্থায় খাট মাঝে মাঝে নাচিয়ে উঠছে অকারণ—এতে আঁৎকে ওঠারই কথা। সাহসী হলেও আচমকা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। মুখ দিয়ে তার আঁ-আঁ ধরণের এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগল।

এদিকে শ্যামলের গলার ঐ কিম্ভূত শব্দ শুনে তাপসের অবস্থা গেছে কাহিল হয়ে, তার দ্বারা যে সত্যি সত্যি ভয় পেতে পারে, কাউকে ভয় দেখানোর দুরোধ ভাবও আছে—এ বিশ্বাস তাপসের আদপেই ছিল না। তাই সে ভাবল, ভয় পাবার মত অদ্ভুত কিছু নিশ্চয় ঘরে আবির্ভূত হয়েছে, যার জন্যে শ্যামলের মত সাহসী ছেলেও এতটা ভয় পেয়ে গেছে। এতক্ষণ অবধি কোনমতে সাহসে বুক বেঁধে সে অন্ধকারে বসেছিল। কিন্তু এবারে অন্ধকার তার সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে চেপে বসল তার ওপর। উপরন্তু শ্যামলের গলার ঐ আমুনাসিক আওয়াজ যেন অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তুলল।

পিঠের ওপর থেকে খাটটা ধপ করে ফেলে দিয়ে এক বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল সে। তারপর ভয় পেলে সে যা করে, তার সবগুলো শুরু করে দিল একসঙ্গে। চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক অদ্ভুত কাণ্ড জুড়ে দিল সে। ঘরের আর তিনজন জেগে উঠেছে। অন্য ঘরের ছেলেরাও এসে হাজির হল ছুটোছুটি করে। তারপর আলো জ্বালতেই সকলে দেখতে পেল এক মর্মান্তিক দৃশ্য। খাটের ওপর শুয়ে একজন আঁ-আঁ করছে চোখ বুঁজে, আরেকজন খাটের তলায় শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছে বিষ্টিরিয়া রোগীর মত।

জলটল দিয়ে সুস্থ করে তোলা হল দুজনকে। তারপর তাপসের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে আমরা তো আর হেসে বাঁচিনে। অনেকরকম ভয় পাওয়ার কথা লোকে শুনেছে, কিন্তু ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেই ভয় পেয়ে যাওয়া—এমনটি বোধহয় কেউ কোনদিন শোনেনি।

STUDENTS
P. G.
COMMON ROOM

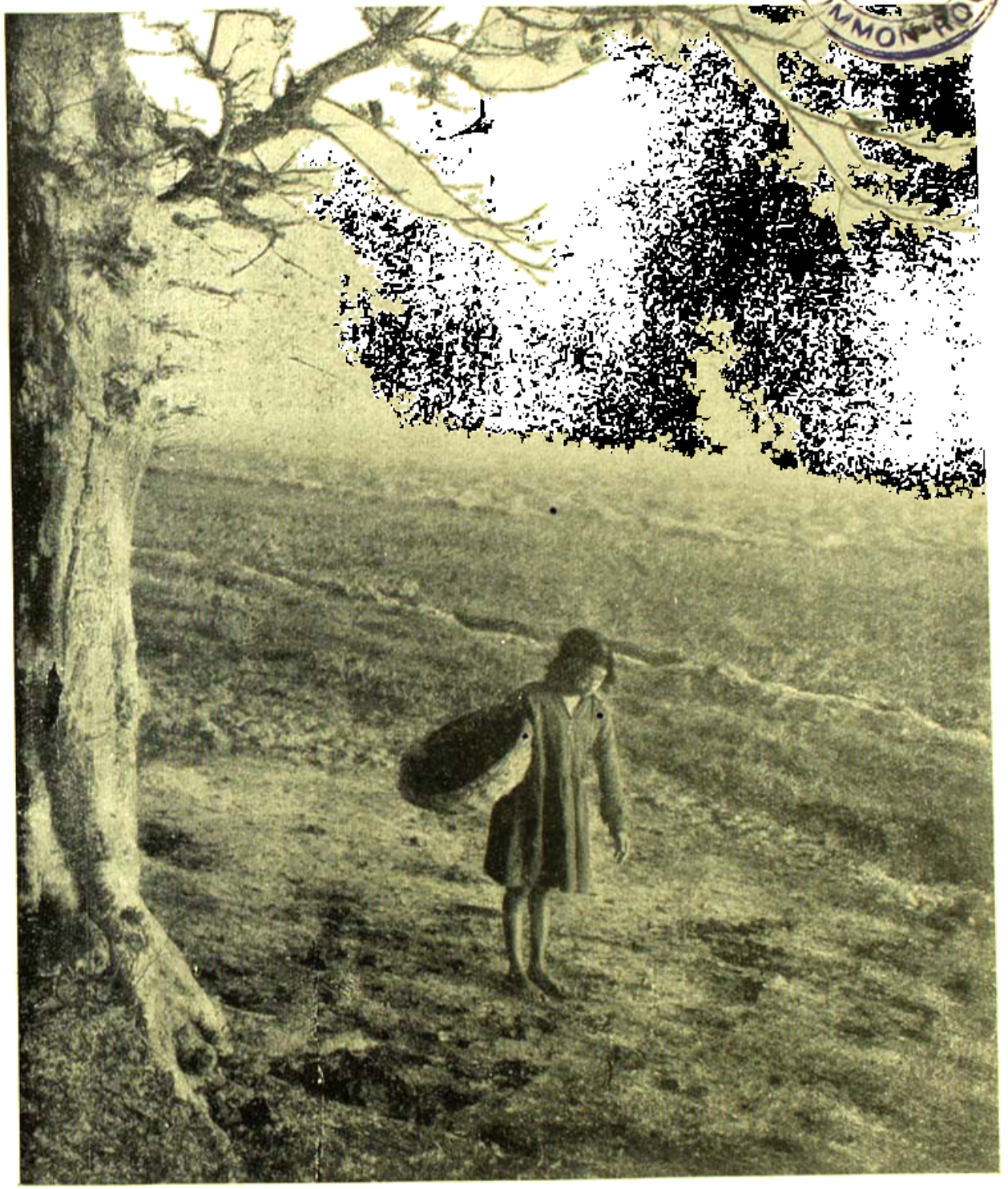

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ঝরা পাতা ফটো : রাখাল দাস

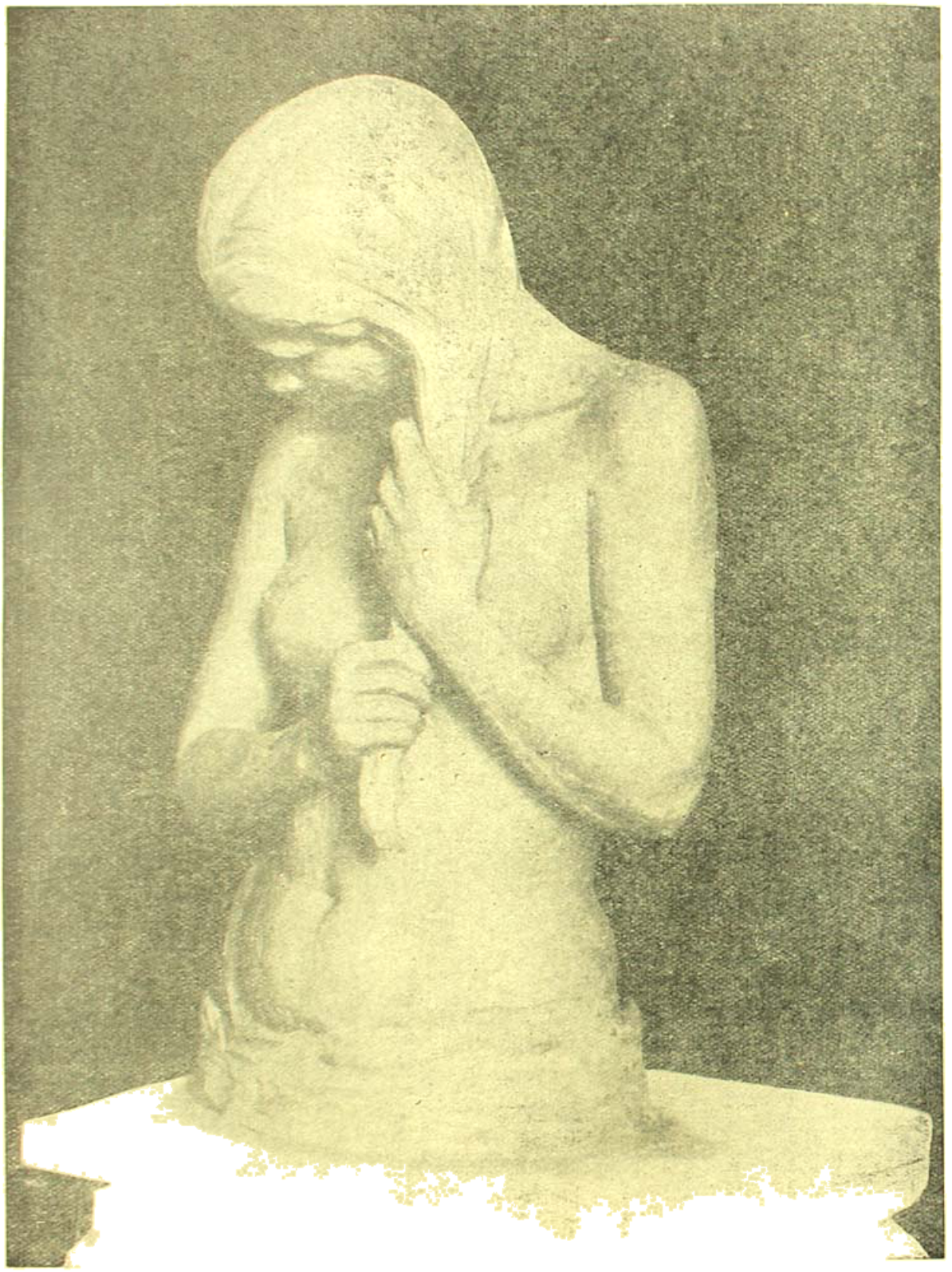

ভারতের শিল্পকীর্তি ওলার্ডন্‌

সিক্ত কেশা

ফটো : রামানন্দ ঘোষ

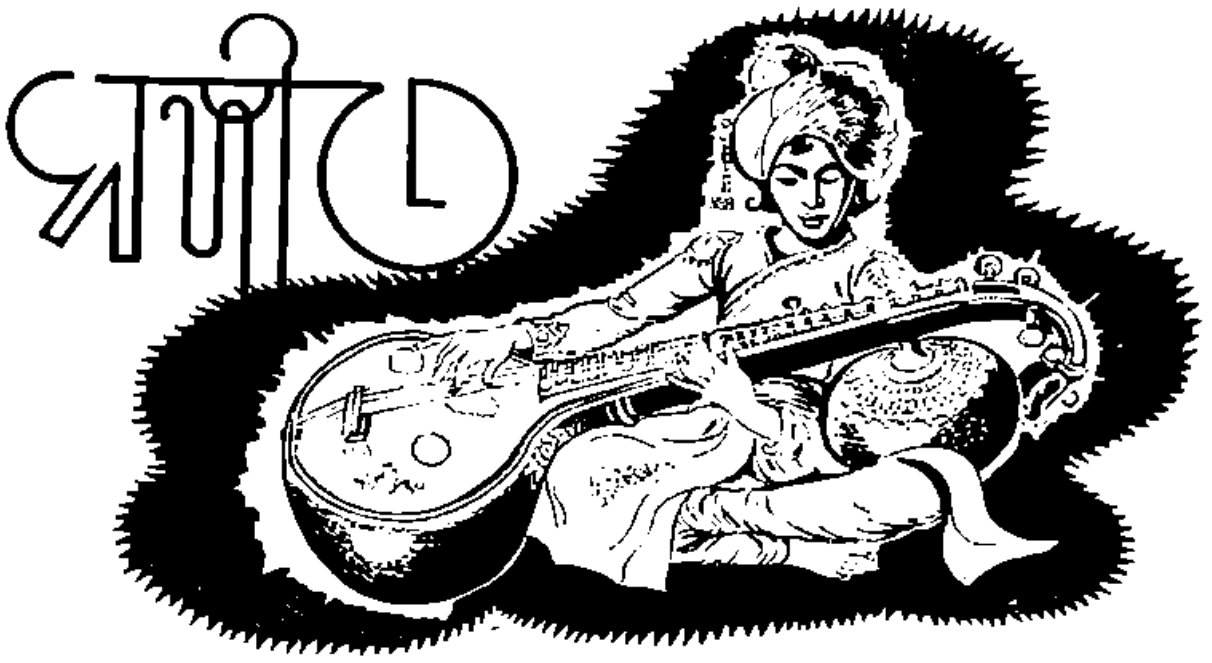

কথা-সঙ্গীত (তাল-দাদরা)

(১) সে দিন তুমি আসবে প্রিয়,
আসবে আমি জানি
সেই আশাতে থাকবে আমার
জীর্ণ হৃদয় খানি

(২) আসবে তুমি সঙ্গোপনে,
আমার হৃদয় সিংহাসনে।
শুনাবে গো শুভ্র-হরণ,
ছাপ-হরণ বাণী

(৩) যার তোমায় ছিল অনেক,
তাদেরই তোমার বাঞ্ছিত!
যার কিছু নাই, তাদেরই শুধু—
তোমারে পূর্ণ দক্ষিত?

(৪) কি দিয়ে হায়! পূজবো তোমায়,
সেই ভেবে মোর দিন কেটে যায়।
হৃদয় খানি রইল শুধু—
নিও হে তুলে তুমি

কথা ও সুর—ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য স্বরলিপি—কল্যাণী দেবী (বন্দে)

(১)

স	পধনো	নো	ধ	নো	নো	নোধ	নোর্স	ধ
সে	দি		ন্	তু	মি	আ	স্	ব্

ম	প	ধ	নো	র্স	র্স	ধ	নো
আ	স্	বে	আ	মি	০	জা	নি

ধ	নো	ধ	প	স	স	মগ	মপ	স	গ
সে	ই	আ	শা	তে	০	থা	ক	বে	আ

স র গ স প প গ স স - - -
ছী ০ র্ ঙ্গ দ য় যা নি ০ ০ ০ ০

(২)

| ম ম প | ধ ন ন | ধ নর্স র্স | ন ধ ধ |
আ স্ বে তু মি ০ স ঙ্গে গো প নে ০
কি ০ দি য়ে ছা য় পূ র্ণ্ বো ছো যা য়

প ধন র্স ন র্স র্স নর্স র র্স ন ধ ধ
আ মা য় ঙ্গ দ য় সি ইং ছা স সে ০
সে ই ভে বে মো র দি ন্ কে টে যা য়

| ধ র্সর্রর্গ্ঁ র্গ্ঁ | র্র র্স র্স | ন র্স ন | ধ প প |
শু না ০ বে গো ০ শ ং কা ছ র ন
ঙ্গ ঙ্গ য় যা নি ০ র ই লো শু ধু ০

ম প ধ নো র্স র্স ধ নো নো
দুঃ ০ খ হ র ন বা শী ০
নি ও ভে বু কে ০ টা নি ০

(৩)

| স স ম | গ ম ম | গম প স | গ র র |
সা য়া ০ ছো মা য় দি ০ ল অ নে ক

স স প প প ম মপ দানো নো দা প প
তা রা ই ছো মা রি বা ০ ন্ ছি ন্

গ প স গ র র স রস রজ্ঞ র স স
যা য় কি ছু মা ই তা রে ই শু ধু ০

স প প প প ম মপ দানো নো দা প প
কো য় বে তু মি ই ব ০ ন্ চি ন্ ০

(৪)

দ্বিতীয় সুরে গেয়ে

কোমল গা = জ্ঞ। কোমল ধা = দা
কোমল নি = নো। উদারা—স্, মুদারা—স, তারা—স্।

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

মোক্ষ

মুক্তি বা মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। জীবাত্মার স্বরূপ আনন্দ। অবিদ্যাজাত দেহাত্মবোধের ফল দুঃখ। তাহাই বন্ধ। মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও স্বীয়স্বরূপ আনন্দের অভিব্যক্তিই বন্ধ হইতে মুক্তি বা মোক্ষ। আনন্দ জীবের স্বরূপগত হইলেও অজ্ঞান আবরণে আবৃত থাকার ফলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যখন অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তখন আনন্দ প্রকাশিত হয় এবং দুঃখের বিনাশ হয়।

বৈশেষিক মতে মুক্তিতে আত্মার বিশেষ গুণের আত্যন্তিক বিনাশ হয় এবং অন্য কোনও বিশেষ গুণও তাহাতে আবির্ভূত হয় না। ন্যায়দর্শন মতে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই মুক্তি। মুক্তির অবস্থায় বৈশেষিক ও ন্যায় মতে আত্মার চৈতন্য থাকে না। তাহা শিলার মত জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ন্যায় মতে আত্মা স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, মনের সহিত সংযোগের ফলে আত্মায় চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মুক্তিতে মনের সহিত সংযোগের নাশ হয়, চৈতন্যও তিরোহিত হয়। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—অপবর্গে অনেক সুখ বিলুপ্ত হয়, চৈতন্য পর্য্যন্ত থাকে না। এই জন্য তাহা ভয়াবহ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা ভয়াবহ নহে, বরং শান্তিনিকেতন। তখন যাবতীয় কার্য্যের উপরম এবং অনেক দুঃখ ও ভয়ঙ্কর পাপ লুপ্ত হয়। যাহাতে সর্ব্বদুঃখের উচ্ছেদ হয় এবং দুঃখের সংবিদ থাকে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা অরুচিকর হইতে পারে না। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতেও মুক্তিতে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থা শুদ্ধ চিত্তের অবস্থা, আনন্দময় অবস্থা নহে। বেদান্ত মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। তাহা পরম আনন্দের অবস্থা। সুষুপ্তাবস্থা কিরূপ অবস্থা তাহা আমাদের ধারণার অতীত। জগতে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হয়, এবং অবিদ্যার আবরণবশতঃ যদি তাহা হইতে অসংখ্য ভ্রান্ত জ্ঞান-বিশিষ্ট সসীম জীবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার অপসরণে জীবের সসীম ভ্রান্তিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, এবং পূর্ণ জ্ঞানও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—যিনি অবিদ্যার বিনাশের পূর্ব্বেও ভ্রান্ত জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ জীবে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি, মুক্তিতে তাহার বিনাশ হয় এই মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম জীবের মুক্তির পূর্ব্বেও আনন্দস্বরূপ, পরেও আনন্দস্বরূপ। মুক্তিতে অবিদ্যা-নাশের ফলে নূতন আনন্দানুভূতি কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে।

শঙ্কর বলেন আত্মা অশরীর। তাহার জ্ঞানশক্তিমান্ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন নাই। আত্মা শুদ্ধ (শুদ্ধ) অসঙ্গ। সুতরাং মোক্ষ নামক অশরীরত্ব নিত্য, ইহা ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল নহে। শরীরাভিমানরহিত মোক্ষ পরিণামী নিত্য নহে। (যেমন সাংখ্যের তিন গুণ)। মোক্ষ পারমার্থিক কূটস্থ নিত্য, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব। (শ-ভা ১।১।৫)। অহাতে কালভেদ নাই। মোক্ষ নামক অশরীরত্বই ব্রহ্ম। মোক্ষের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান। অজ্ঞানের নিবৃত্তি তত্ত্ব-জ্ঞানের ফল। তত্ত্ব-জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-বিজ্ঞান সম্পদরূপও নহে, অধ্যাসস্বরূপও নহে। সম্পদ উপাসনার অর্থ কোনও অপকৃষ্ট বস্তুকে কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্ন মনে করিয়া, এবং ধ্যানকালে অপকৃষ্ট বস্তুকে অবিদ্যমানপ্রায় করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুকে প্রধানভাবে চিন্তা করা। ইহাকে প্রতীকোপাসনাও বলে। অধ্যাস উপাসনাও প্রতীকোপাসনা। কিন্তু তাহাতে অবলম্বন বস্তুটির প্রাধান্য থাকে। যেমন মনকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা। এতাদৃশ উপাসনা পুরুষ-ব্যাপার তন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মোক্ষ-সাধক ব্রহ্ম-জ্ঞান তাহা নহে। ইহা বস্তুতন্ত্র—যে বস্তুর জ্ঞান, তাহার অধীন অর্থাৎ সেইরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার কোনও সম্বন্ধ নাই। মোক্ষও ক্রিয়াসাধ্য

নহে। মোক্ষ উৎপাদ্য বা প্রাপ্য নহে। আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্ম সকলের দ্বারা নিত্যপ্রাপ্ত। মোক্ষ নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। মোক্ষ আত্মার ধর্ম্ম হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; উপাসনা দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা আত্মা ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে পারে না। ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা লভ্য। এই জ্ঞান পুরুষের মানসিক ব্যাপারের অধীন নহে। জ্ঞানকে "করিতে", "না করিতে", অথবা "অন্য প্রকার করিতে" পারা যায় না, কেননা তাহা বস্তুতন্ত্র, বিধির অধীন অথবা পুরুষের অধীন নহে।

উপাধিমুক্ত আত্মা মোক্ষে শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তাহাতে নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় না। যাহা কেবল আত্মভাব, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী তাহাতে আবির্ভূত হন। (শ-ভা ৪।৪।১) পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, বিগলিত-বন্ধন হইয়া শরীর ও শরীর ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হন মাত্র, নূতন কিছু হন না। স্বরূপ নিষ্পন্ন হইয়া (মুক্ত হইয়া) আত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক অবস্থান করেন, অথবা তাঁহার সহিত একীভূত হন? শঙ্কর বলেন মুক্ত পুরুষ পৃথক অবস্থান করেন না। (অবিভক্ত এব পরেণ আত্মনা মুক্তঃ অবতিষ্ঠতে—শ-ভা ৪।৪।৪)। "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি"। যেমন নির্ম্মল জলে নির্ম্মল জল মিশাইলে এক হইয়া যায়, জ্ঞানীর আত্মাও তেমনি শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিভক্ত হইয়া যায়। কোন কোনও শ্রুতিতে ভেদের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা ঔপচারিক। "ভেদ নির্দ্দেশস্তু অভেদেঽপি উপচর্য্যতে। (শ-ভা ৪।৪।৪) মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। জৈমিনির মতে মুক্তের স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা নিষ্পাপ, সত্য-সংকল্প প্রভৃতি বিশেষণান্বিত। তাহা সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ। "তিনি সেইকালে মুক্ত আত্মায় পরিক্রমণ করেন, ক্রীড়া করেন, ভোগ করেন", ইত্যাদিও তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। এ সকল মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য। শঙ্কর বলেন—ঔডুলোমির মতে যদিও ব্রহ্মে এই সকল বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহারা "শব্দ বিকল্পজ" অর্থাৎ শব্দ ব্যবহারমূলক মিথ্যা প্রত্যয় (যেমন রাহুর শির)। রাহুর মস্তক ভিন্ন অন্য অঙ্গ নাই, রাহুর মস্তকই রাহু। রাহুর মস্তক শুনিয়া মনে হয়, মস্তক বুঝি রাহু হইতে ভিন্ন। সেইরূপ ব্রহ্মে পাপাদি নাই, এই মাত্র উপরিউক্ত বিশেষণ সকলের অর্থ। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, মোক্ষকালে জীব চৈতন্য মাত্রে অভিনিষ্পন্ন হয়। কেননা এই আত্মা অন্তর্বাহ্য রহিত, একরস, পূর্ণ চৈতন্যঘন। সত্য কামত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্টের ন্যায় উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল উপাধি-সম্পর্কের অধীন, স্বরূপের অন্তর্গত নহে। চৈতন্য মাত্রই স্বরূপ, আর সকল উপাধি সংসর্গে অধ্যস্ত। "তিনি ক্রীড়া করেন, রমমান থাকেন" প্রভৃতি দুঃখাভাব বুঝাইতে ও স্তুতি অর্থে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত ক্রীড়া অন্য পদার্থ সাপেক্ষ, আত্মার তাহা নাই। মোক্ষ "নিরন্তাশেষ প্রপঞ্চ, প্রসন্ন (অত্যন্ত নির্ম্মল, উপাধি কালুষ্যহীন) ও অব্যপদেশ্য।" (অথর্ব্বশীর্ষ)। ইহাই ঔডুলোমীর মত। কিন্তু বাদরায়ণ বলেন আত্মা পারমার্থিক রূপে নির্ব্বিশেষ ও অখণ্ড চিৎ মাত্র হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে তাহার ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয়না।

উপনিষদে আছে মুক্ত পুরুষের সংকল্প মাত্র তাহার পিতৃগণ তাহার সমীপে উপস্থিত হন। শঙ্কর বলেন—ইহার জন্য মুক্ত পুরুষের সংকল্পই যথেষ্ট, অন্য নিমিত্তের প্রয়োজন হয় না। মুক্ত পুরুষ কাহারও অধীন নহেন (অনন্তাধিপতি)। সংকল্প শব্দের প্রয়োগে জানা যায় মুক্ত পুরুষের মন থাকে, কেন না মনই সংকল্পের সাধন। বাদরি মুনির মতে মন থাকিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। (শ-ভা ৪।৪।১০) জৈমিনির মতে মনের সহিত শরীরও ইন্দ্রিয় থাকে। বাদরায়ণের মতে মুক্ত পুরুষের কখনও শরীর থাকে, কখনও বা থাকে না। মুক্ত পুরুষ ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে আবিষ্ট হইতে পারেন। (এক প্রদীপ হইতে যেমন অনেক প্রদীপ হয়, সেইরূপ।) কিন্তু মুক্তি হইলে মুক্ত যখন চিৎমাত্র ও দ্বৈতরহিত হন, তখন ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? শঙ্কর বলেন—উপনিষদে মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা আছে বটে। কিন্তু তাহা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নহে। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য ঈশ্বর সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের হইয়া থাকে। কিন্তু পরমেশ্বরের যে নির্গুণ নির্ব্বিকার রূপ আছে, সগুণ উপাসক তাহা প্রাপ্ত হন না। যাহারা দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মার লোক) গমন

করেন, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না (পুনর্জন্ম হয়না), নির্গুণ ব্রহ্মবাদীদিগের তো কথাই নাই।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে প্রতীত হয়, যে ঈশ্বরোপাসকগণ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন না। তাহারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেও, তাহাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী—যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "ইদং মহাভূতং অনন্তমপারং বিজ্ঞান ঘন এব। এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি। ন প্রেত্য-সংজ্ঞা অস্তি"। এই মহাভূত (মহান্ আত্মা) অনন্ত অপার (অসীম) এবং বিজ্ঞানঘন। এই সকল হইতে (দেহ হইতে) উত্থিত হইয়া, (দেহ ও দেহ সম্বন্ধ বর্জন করিয়া) (এই মহাভূত) তাহাদের পরে (সহিত ?) বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহ হইতে যাইবার পরে সংজ্ঞা থাকে না। দেহ-ত্যাগের পরে সংজ্ঞা থাকে না শুনিয়া মৈত্রেয়ী কহিলেন—ভগবান আমাকে মোহের মধ্যে ফেলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "আমি মোহজনক কিছু বলি নাই, আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদহীন।" আত্মাকে বিজ্ঞানঘন, অবিনাশী ও অনুচ্ছিত্তি ধর্মী বলিয়াও যাজ্ঞবল্ক্য তাহার বিনাশ হয় বলিয়াছেন এবং দেহ-ত্যাগের পরে তাহার সংজ্ঞা থাকে না বলিয়াছেন। ইহার অর্থ মুক্তিতে আত্মার বিশেষ জ্ঞান থাকে না। (শ-ভা ১।৪।২২) তাহার আমিত্বের লোপ হয় এবং তাহা ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকদিগের মুক্তি। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ ঈশ্বরে মিশিয়া যান না। তাহাদের ভেদ থাকে। বিশেষ জ্ঞানহীন আত্মার ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাওয়াকে যাজ্ঞবল্ক্য বিনাশই বলিয়াছেন। (বিনশ্যতি) যদিও ব্রহ্মের মধ্যে তাহা অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। তরল মেঘাবৃত আকাশের নিম্নে সূর্য্য অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু মেঘের উপরে স্বীয় পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করেন, মেঘাপসরণের ফলে তাহার কোনও পরিবর্ত্তনই হয় না। সেইরূপ অবিদ্যাবরণে আচ্ছাদিত ব্রহ্ম অবিদ্যার উপরি সদাই পূর্ণ গৌরবে বর্ত্তমান থাকেন। অবিদ্যাবরণ বিদূরিত হইবার পূর্বেও তিনি যাহা ছিলেন পরেও তাহাই থাকেন, কেবল নিম্নভাগে অবিদ্যাজনিত বিশেষ জ্ঞান বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মে নূতন কিছুই ঘটে না, কিছুই তাহাতে প্রবেশ করে না। অবিদ্যাবরণমুক্ত ব্রহ্মই মোক্ষ—তাহাকে প্রাপ্তব্য বলা যায় না, তিনি নিত্যপ্রাপ্ত। বিশেষ জ্ঞানের উপরে তাহার সাক্ষীরূপে তিনি নিত্য বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি সর্বদাই "প্রাপ্ত"। কিন্তু জীবের বিশেষ জ্ঞানে সেই প্রাপ্তি-জ্ঞান নাই। বিশেষ জ্ঞানের যখন অভাব হয়, তখন তাহা জানিবার কেহই থাকে না।

ভ্রান্তি-অপগমে রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় মুক্তিতে সংসারের জ্ঞান তিরোহিত হয়, শঙ্কর বহু স্থানে একথা বলিয়াছেন। এই সকল উক্তি দ্বারা তিনি সংসারকে ঐকান্তিক মিথ্যা বলেন নাই। জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তিনি তাহার এক প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে স্বপ্ন, জাগরিত ও সুষুপ্তি অবস্থাকে মিথ্যা বলা হয় নাই। জাগরিত অবস্থা "বহিঃ-প্রজ্ঞ" অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থা বলিয়া যদি সুষুপ্তিকে "একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়" অবস্থা বলিয়াছেন। "একীভূত" অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার পৃথক পৃথক রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময় অবস্থায় একীভূত। প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া এই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় আত্মা সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও ভূতদিগের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। চতুর্থ অবস্থা "প্রপঞ্চোপশম" অবস্থা—যে অবস্থায় সকল প্রপঞ্চ উপশান্ত হয়। প্রপঞ্চোপশমে প্রপঞ্চের নাশ হয় না, প্রপঞ্চ ব্রহ্মে বিলীন হয়। তখন এক "আত্মামাত্র প্রত্যয়সার" রূপে আত্মা থাকেন। তুরীয় অচেতন অবস্থা নহে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—সত্যের বিভিন্ন রূপ দেখিবার জন্য আমাদের বিভিন্ন শক্তি (faculties) আছে। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের ফলে বিশ্বের রূপেরও ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন হয়। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মই জগতের পারমার্থিক সত্য, তখন মায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় এবং ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। মুক্ত পুরুষের উপরে মায়ার আবরণ-শক্তির প্রভাব থাকে না। যখন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব হয়, তখন নামরূপের সহিত আমাদের বন্ধন ছিন্ন হয় এবং তাহাদের কোনও আকর্ষণ থাকে না। যতদিন ইন্দ্রিয়গণ

থাকে ও বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতে থাকে, ততদিন তাহারা থাকে। মরীচিকার স্বরূপজ্ঞানের পরেও মরীচিকার প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা প্রতারিত হইবার ভয় থাকে না। সেইরূপ জগতের মায়িকরূপ যখন মায়িক বলিয়া প্রতীত হয়, তখন তাহা দ্বারা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জগতের প্রপঞ্চ রূপ ব্রহ্মে বিলীন হউক অথবা ব্রহ্মের ভাণ বলিয়া প্রতীত হউক। জগৎ আত্যন্তিক মিথ্যা নহে।*

শঙ্কর বলিয়াছেন "যে অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতং অ-পারমার্থিকং দ্বৈতং জগৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব-রাগ-দ্বেষাদি-ক্লেশ-কলুষিতং অনেকানর্থ যোনি, তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতং অপহত-পাপ্মাত্মাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপদ্যতে। সর্পাদিবিলয়নেন এব রজ্জ্বাদীন্।" তত্ত্ববিদ্যা অবিদ্যাজাত রূপের বিলয় করিয়া শুদ্ধরূপের প্রাপ্তি করায়, যেমন রজ্জু-তত্ত্বজ্ঞান-কল্পিত সর্পের বিলয় করিয়া অকল্পিত রজ্জুরূপ প্রতীতি করায় (শ-ভা ১।৩।১৯)। আরও বলিয়াছেন "এক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থো নিত্য বিজ্ঞানধাতুঃ অবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবৎ অনেকধা বিভাব্যতে। যস্মাৎ বিজ্ঞানধাতুঃ অস্তি ইতি এক পরমেশ্বর কূটস্থ, নিত্য বিজ্ঞানধাতু (চিৎ-এক রস) তিনি মায়াবীর মত অবিদ্যা মায়া দ্বারা নানা আকারে প্রকাশিত হইতেছেন। তিনি ভিন্ন বিজ্ঞান ধাতু অন্য কিছু নাই।" "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবে কূটস্থ নিত্যে একস্মিন্ অদ্বয়ে অরূপে পরমাত্মনি তদ্বিপরীতঃ দ্বৈতং রূপং যোগিত্বেন তদনন্তরং পরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্ব-প্রতিপাদন-পর-বাক্যৈঃ ন্যায়োপেতৈঃ দ্বৈতবান-প্রতিষেধৈশ্চ অপনেতুমিতি পরমাত্মনো জীবাৎ অন্যত্ব দ্রঢ়য়তি, জীবস্য তু ন পরস্মাৎ অন্যত্ব প্রতিপিপাদয়িষতি।" ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে পরমাত্মা এক। অনন্ত আকাশে যেমন মালিন্যাদি কল্পিত হয়, তেমনি পরমাত্মার আশ্রিত অজ্ঞান প্রভাবে তাহাতে জীবত্ব ও প্রপঞ্চ কল্পিত হইতেছে। দ্বৈতনিষেধক 'অদ্বৈত'-প্রতিপাদকযুক্তি সহকৃত শ্রুতি বাক্যের দ্বারা তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি পরমাত্মা হইতে জীবের প্রতীয়মান অন্যত্ব দৃঢ় করিয়া পরে পরমাত্মা হইতে জীবের যে প্রকৃত অন্যত্ব নাই তাহা প্রতিপাদন করিবেন। (শ-ভা ১।৩।১৯)।

শঙ্করের উপরোক্ত উক্তি এবং ঐ প্রকার অন্যান্য উক্তি হইতে মনে হয় যে চিদ্রূপ বিজ্ঞান-ধাতু একমাত্র। কিন্তু অবিদ্যাকর্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রে পরস্পর সংবদ্ধ এক প্রকার বিজ্ঞান-প্রবাহের উদ্ভব হয়। কাহার বিজ্ঞান, জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ নাই, কেননা পরমাত্মারূপ অনন্ত সমুদ্রের বক্ষে এই সকল বিজ্ঞান-বুদ্বুদ উঠিলেও এবং পরমাত্মা তাহাদের সাক্ষী হইলেও, তাহারা নির্লিপ্ত পরমাত্মার বিজ্ঞান নহে। প্রত্যেক কেন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রবাহের সঙ্গে "আমি" জ্ঞান যুক্ত থাকে, কিন্তু এই "আমিত্বের" যেমন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞান-বুদ্বুদদিগেরও তেমনি পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে এই সকল বুদ্বুদের সঙ্গে "আমি"-জ্ঞানেরও বিনাশ হয়। ইহাই মোক্ষ। "আমি"-জ্ঞানযুক্ত বিজ্ঞান-বুদ্বুদপুঞ্জের সাক্ষী পরমাত্মা পূর্বে যাহা ছিলেন 'আমি'র বিনাশের পরে তাহাই থাকেন। তাহাতে কোনও পরিণাম হয় না। আমিত্ব-যুক্ত বিজ্ঞান-প্রবাহ নানাছন্দে নানারূপে আবির্ভূত হয়, তিরোহিত হয়, দুঃখকষ্ট ভোগ করে। যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি হয়, আমিত্বযুক্ত বিজ্ঞান-প্রবাহেরও নিবৃত্তি হয়। এই নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কেহ প্রাপ্ত হয়না। তাহা ব্রহ্মে নিত্য বর্তমান, তাহাই ব্রহ্ম। যখন মোক্ষ হয়, তখন তাহা ভোগ করিবার জন্য আমিত্বযুক্ত জীব থাকে না। কিন্তু এই জীব—এই আমিত্বযুক্ত বিজ্ঞান-শ্রেণী ঐকান্তিক মিথ্যা নহে। জড় জগতের অস্তিত্বের মত তাহার ব্যবহারিক (সুতরাং নশ্বর) অস্তিত্ব আছে। "জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহার অর্থ জীবের মধ্যে যিনি সাক্ষীরূপে বর্তমান, তিনিই ব্রহ্ম—জীব-সাক্ষী। তিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। জীবের নশ্বর অংশ ব্রহ্ম নহে।

* ডঃ রাধাকৃষ্ণন, Indian Philosophy vol II P. 639.

মা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিছু দিন আগে বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ব্র্যাকেটে ফার্ষ্ট হয়েছিল একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। দুজনেরই নাম, চেহারা ও জন্ম পরিচয় যুগান্তরে প্রথম পাতায় ছাপান ছিল। ছেলেটীর নাম বীরেন, পিতা গোপেন মুখার্জ্জী, বাড়ী উত্তর কলিকাতায় নিবেদিতা লেনে; আর মেয়েটীর নাম রমা, পিতা গোলক ব্যানার্জ্জী, বাড়ী দক্ষিণ-কলিকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। সম্পাদক মন্তব্যে লিখেছিলেন যে ছেলেটি ও মেয়েটি প্রতিভায় একই, ব্র্যাকেটে সমান, শৈশবে দুইবেরই আঘাতও তারা পেয়েছিল ঠিক একই নির্ম্মমভাবে। এক বৎসর বয়স যখন, ছেলেটী তার মাকে, আর মেয়েটী তার বাপকে হারিয়েছিল। রমা ও বীরেনের মধ্যে পরিচয় পূর্ব্বে ছিল না কিন্তু—পরে জানা গেল যে যুগান্তরে ঐ সংবাদ প্রকাশিত হবার পরই উভয়েই পরস্পরে আলাপের জন্ত ব্যস্ত হয়েছিল; কিন্তু মেয়েটীর বাড়ীতে গিয়ে আলাপ করা বীরেনের পক্ষে সঙ্গত হবে না ভেবেই এম-এ ক্লাসে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে তাদের মধ্যে কোনও আলাপ পরিচয় হয়নি।

রমা যখন ব্র্যাবোর্ণ কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে সে দেখলে যে একটী প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা রোজ বিকেল বেলায় গেটের পাশে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এই আশায় যে ছাত্রীরা তাকে একটি করে পয়সা দেবে। ১০।১৫ দিন সে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে রোজ তাকে দুই আনা তিন আনা করে দিতো। এতেও রমার সন্তুষ্টি না হওয়ায় সে মাকে একদিন বল্লে—"মা যদি তুমি অনুমতি করো সংসারে গৃহস্থালি কাজে তোমাকে সাহায্য করার জন্ত ঐ মহিলাটিকে বাড়ীতে নিয়ে আসি।" রমাই তাঁর একমাত্র সন্তান। সংসারে আর কেহ আপনার জন নাই, তাই রমাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। স্বামী যে টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন, রমার শিক্ষা ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্তে তিনি তাহা খরচ করতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বাড়ীতে দারবান, ঝি, রাঁধুনী-ব্রাহ্মণী সবই ছিল, আর কোনও লোকের প্রয়োজন ছিল না—তথাপি রমার আবদার রাখবার জন্তই মা রমাকে বল্লেন, "তুমি যদি সুখী হও, মহিলাটির খোঁজ খবর নিয়ে তাকে বাড়ীতে আনতে পারো।" তার পর দিনই বিকেলবেলায় রমার প্রস্তাবে মহিলাটি খুব খুসী হয়ে তাকে বুকে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে এবং রমার সঙ্গে সেইদিনই তাদের বাড়ীতে এসে রমার মাকে বল্লে যে তার নাম সুবর্ণা, জাতিতে ব্রাহ্মণ, মুখুয্যে। তার স্বামী পাঞ্জাবে চাকরী করতেন। ১৯৪৭ সালে হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামায় সে সব হারিয়ে ভাসতে ভাসতে কলিকাতায় ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। তার কথা শুনে রমার মাও বড়ই ব্যথিত হলেন এবং তাকে বল্লেন—"তুমি এ বাড়ীতে আমার ছোট বোনের মত থাকবে এবং দিদির সংসার তোমার নিজের মনে করে যা তুমি পার তা করবে, আর রমার সুখ-সুবিধার কোনও ত্রুটি না হয় তার উপর সর্ব্বদাই নজর রাখবে।" রমার মার কথায় সুবর্ণা অতিশয় সন্তুষ্ট হলো। সেদিন হতেই সুবর্ণা মনে প্রাণে চেষ্টা করতে লাগলো—কিসে রমার মাকে সে সুখী করতে পারে। রমার পড়ার ঘরটি গুছিয়ে রাখা, সকালে বিকেলে তার খাবার দেওয়া, মায়ের বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, তাঁর খাবার সময়ে পাখা নিয়ে বাতাস দেওয়া—যাতে কোনও পোকা বা মাছি সেখানে না আসে। রমার মায়ের রুচি ও পছন্দ অনুসারে সুবর্ণা সকল কাজ করতো, ফলে ২।১ মাসের মধ্যেই রমার মা তাকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না। সুবর্ণা মাঝে মাঝে কালীঘাটে আদিগঙ্গায় স্নান করতে ও মায়ের পূজা দিতে যেতো, একটু দেরী হলেই রমার মা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন—কখন সুবর্ণা ফিরবে। এইভাবে প্রায় দু বৎসর সুবর্ণার সময় ভালভাবেই কেটেছিল। কিন্তু

যেদিন বীরেনের ও রমার পাশের খবর দুপাতার কাগজে বাহির হলো যেদিন সুবর্ণার দুয়ারে যেন কি এক বিপ্লব উপস্থিত হলো। সে সর্ব্বদাই যেন কি ভাবে এবং যখনই সুযোগ পায় সেই যুগান্তর কাগজখানি রমার টেবিল থেকে নিয়ে, সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখের পলক পড়ে না। রমার মা একদিন দেখেছিলেন যে সুবর্ণা যুগান্তরের সেই ছবিকে চুম্বন দিচ্ছে। রমার মা ভাবলেন যে সুবর্ণা রমাকে কত না ভালবাসে।

কয়েক মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনের উৎসব হওয়ার কথা রমা তার মাকে জানালো। তিনি নিজের চোখে এই উৎসবে মেয়ের সম্মান পাওয়া দেখবেন বলে রেজিষ্ট্রারকে লিখে তাঁর নিজের জন্য একখানি প্রবেশপত্র আনিয়েছিলেন। রমাকে নিজ হাতে সাজিয়ে গাউন, হুড ও ক্যাপ সব পরিয়ে দিলেন। রমাদের বাড়ীর ওপাশখানি বাড়ীর পরেই পালিত বিল্ডিংয়ের প্রাঙ্গণে এই উৎসবের এক বিরাট প্যাণ্ডাল তৈরী হয়েছে। রমা ও তার মা হেঁটেই যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ যখন বীরেন ও রমাকে ডিগ্রোমা দিয়ে দুইটি সোনার মেডেল দুজনকে পরিয়ে দিলেন, সভাস্থিত সকল নরনারী করতালি দিয়ে বীরেন ও রমাকে অভিনন্দিত করলেন। গৌরবে ও আনন্দে রমার মার হৃদয় স্ফাপ্লুত হলো, অশ্রুতে গণ্ডদেশ প্লাবিত হলো। তার দুঃখ বোধহয় এইজন্য যে আনন্দ ও গৌরবের তিনি তাঁর প্রধান অংশের তিনি ইহজগতে নেই। অধিবেশন হতেই বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে রমা তার মায়ের কাছে এসে বীরেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলে। রমার মার চোখ তখনও অশ্রুতে ভরা। রমার মা ক্ষণবিলম্ব না করেই বীরেনকে ডান হাতে আর রমাকে বাম হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন এবং দুজনকেই চুম্বন করে অভিনন্দিত করলেন।

রমার মায়ের স্নেহপূর্ণ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত হবে না ভেবেই বীরেন তাঁদের সঙ্গেই রমাদের বাড়ীতে এসেছিল। বোধহয় রমার মায়ের পূর্ব্ব থেকে বলা ছিল, তাই বীরেন পৌঁছিবামাত্রই উপরের বারান্দায় রমার ও বীরেনের জন্য সুবর্ণা দুই কাপ চা এবং নানাবিধ খাবার জিনিষ এনে দিলে। রমার মা বল্লেন—"অনেকদিন থেকে তোমাকে দেখব বলে রমাকে বলেছি। তুমি বোধহয় আমাতে লজ্জাবোধ করেছ। যাহোক অনেকদিন পরে আজ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। আমি শুনলাম, তুমি এম-এ পড়তে পড়তে আই-এ-এস পরীক্ষা দেবে, তুমি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমার বাবার জীবন মহিমান্বিত কর।" রমার মা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে সুবর্ণা এক দৃষ্টিতে বীরেনের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনই তিনি ইসারা করে তাকে পাশের একটি ঘরে ডেকে নিয়ে বল্লেন যে খাবার সময় নবাগত অতিথির কাছে দাঁড়িয়ে থেকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকা আদৌ উচিত হয়নি। সুবর্ণা লজ্জিত হয়ে একটীমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমার মাকে বলেছিল, তিনি যেন তাকে মাপ করেন—ভবিষ্যতে তিনি এমন কাজ আর করবেন না। বীরেন রমার মাকে প্রণাম করে বাড়ী চলে গেল।

কিছুদিন পরে ক্লাস শেষ হলে পথে কথাপ্রসঙ্গে বীরেন রমাকে বল্লে—"তোমার মা বড়ই ভাল। আমার বাবাও আমাকে খুব স্নেহ করেন, মা চলে যাওয়া অবধি প্রায় কুড়ি বৎসর নিজে বসে থেকে আমাকে খাওয়ান, কলেজ থেকে ফিরে আসতে একটু দেরী হলে বাবা আমার জন্য পথে দাঁড়িয়ে থাকেন, রাত্রিতে এখনও পাশে শুইয়ে একখানি হাত আমার গায়ের উপর না রাখলে তাঁর ঘুমই আসে না। বাবা সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন যে মায়ের অভাব যেন আমি বুঝতে না পারি। এত যত্ন সত্বেও আমার মনে হয় যেন আমার জীবনটা ফাঁকা। রমা জান, আমি ভাবি যে 'মা' বলে ডাকতে না পায়, তার মত হতভাগ্য জগতে আর কেউ নেই। সূর্য্যের আলো অন্ধকে অথবা কোকিলের মিষ্ট কুহুস্বর বধিরকে যেমন কোন আনন্দ দিতে পারে না তেমনি বাবার আদর ও স্নেহ আমার কাছে যেন বিফল মনে হয়। রমা তোমার জীবন আমার জীবনের মতো শূন্য ও নীরস মনে হয়? রমা বীরেনের মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনে কোন জবাব দেয় নাই, কিন্তু বাড়ী এসে বীরেনের ভাষায় তার ব্যথার কাহিনী মাকে জানিয়েছিল। রমার মা তখনই কেঁদে ফেললেন; রমা তাতে বিস্মিত হয়নি; কিন্তু সুবর্ণা যখন ঐ কথা শুনে তার ঘরে দরজা বন্ধ করে উপুড় হয়ে কান্না সুরু করলে—শুধু রমা নয়—রমার মা পর্য্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগলেন—সুবর্ণার মাথার কি গোলমাল আছে? কিছুক্ষণ পরেই

সুবর্ণা সংযত হয়ে সংসারের করণীয় কাজ আরম্ভ করে দেওয়ায় রমার মা ভাবলেন যে নারীমাত্রই কম বেশী স্নেহ-প্রবণা হয়ে থাকে।

রমা ও বীরেনকে অবলম্বন করে তাদের পরিবার দুটি ক্রমশঃই ঘনিষ্ট হতে লাগল। রমার মা বীরেনকে বীরু বলে ডাকতেন, রমাও তাকে বীরুদা বলে ডাকত। পারস্পরিক সুখ সম্পদে কিম্বা আপদ বিপদে পরিবার দুটি কখনও নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকত না। বীরেনের আই-এ-এস পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই পাসের সংবাদের জন্ত বীরেনের বাবা গোপেনবাবু যেমন ব্যস্ত ছিলেন, রমার মাও সেজন্তে কম উৎকণ্ঠিত ছিলেন না। যেদিন সংবাদ এল যে বীরেন আই-এ-এস পরীক্ষায় সেকেণ্ড এবং ছয়জন বাঙ্গালীর মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছে, দুই পরিবারেরই হর্ষের আর সীমা রহিল না। রমার মা মনে করলেন যেন তাঁর নিজের ছেলেই আই-এ-এস হয়েছে, তাই তিনি তার পরদিনই রমার ও বীরুর তিন চারজন বন্ধু, বীরুর বাবা গোপেনবাবু এবং বীরুকে সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণ করলেন। গোপেনবাবু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কারও বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণে যেতেন না, কিন্তু রমার মায়ের অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। সেদিন সকালে উঠে অবধি সুবর্ণা এমনভাবে কাজ করছে, বাড়ীঘর এমনভাবে সাজাচ্ছে যাতে সেদিনকার উৎসবে কোন খুঁত না থাকে। কিন্তু যত বেলা যাচ্ছে সুবর্ণা যেন বেশী চঞ্চল ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। সন্ধ্যার মধ্যে সে তার সব কাজই করেছে, কিন্তু বীরু ও গোপেনবাবু এসেছেন জেনেই সুবর্ণা রমাকে জানাল যে তার বুকে এমনি ব্যথা ধরেছে যে সে আর দাঁড়াতে পারছে না, কোন উত্তর পাবার আগেই সুবর্ণা তার ছোট ঘরটীর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। রমার মা একথা শুনে কোন হৈ চৈ করেন নি, তবে তিনি সুবর্ণার উপর একটু বিরক্ত হলেন। খাওয়ার পর যখন সকলেই চলে গেলেন, রমার মা সুবর্ণার ঘরের নিকট গিয়ে সুবর্ণাকে বল্লেন যে তিনি ডাক্তার আনতে লোক পাঠাচ্ছেন। সুবর্ণা ঘরের ভিতর হতেই উত্তর দিলেন যে ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নেই, সে শীঘ্রই সুস্থ হবে। তার পরদিন সকালে উঠেই তার কর্ত্তব্য কাজগুলি যখন সুরু করে দিয়েছে—রমার মা দেখলেন যে সুবর্ণার মুখখানি শুকিয়ে গেছে এবং তখনও যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তার কষ্ট হচ্ছে। রমার মা প্রশ্ন করামাত্রই সুবর্ণা বললে যে মাঝে মাঝে তার এরূপ হয়ে থাকে, দু'তিনদিনের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

একদিন সুবর্ণা রমার মায়ের কাছে কথাপ্রসঙ্গে শুনলে যে গোপেনবাবু রমার সঙ্গে বীরেনের বিবাহের প্রস্তাব করেছেন এবং তিনি সে প্রস্তাবে মত দিয়েছেন; বীরেন ইহাতে আপত্তি করিয়াছে। যদি বীরেনের মত হয় তাহলে এম-এ পরীক্ষার পর তাদের বিবাহ হবে। ইহার চার পাঁচদিন পরে রমার মা দেখলেন—সুবর্ণা বাড়ীতে নাই। রমার মা চিন্তিত হয়ে রমাকে বললেন, যে গঙ্গাস্নান হতে ফিরবার পথে সুবর্ণা বোধহয় মোটর চাপা পড়েছে এজন্ত থানায় একটা খবর দেওয়া দরকার। রমা থানায় পাঠাবার জন্ত চিঠি লিখতে গিয়ে দেখলে যে তার খাতায় একটী পাতায় সুবর্ণার লেখা একটী পত্র। চিঠিখানি নিয়ে রমা তার মাকে শুনালে—

"মা রমা, আমার মত হতভাগিনী বোধহয় জগতে আর নাই, তুমি ও তোমার মা উভয়েই আমাকে ক্ষমা করো। আমি এমনই অধম যে তোমাদের আদর-যত্নের প্রতিদানে কিছুই করতে পারলাম না। তোমাদের কাছে আত্ম-পরিচয় দিবার সময়ে সত্যের গোপন করিয়াছিলাম এজন্তও আমি তোমাদের নিকট অপরাধী। তোমাদিগকে কোন কথা না বলিয়া জীবনের নূতন পথে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলাম। তুমি যেমনি তরুণ ও কোমল তেমনি মধুর ও সুন্দর। আমার পূতিগন্ধময় জীবনের অতীত ইতিহাস তোমাকে জানাইব না—শুধু এইটুকুই বলিলাম যে বীরেন আমার গর্ভজাত পুত্র। মা বলে আমাকে ডাকিতে পারে নাই বলিয়া সে সমস্ত জগৎ ফাঁকা দেখে, একথা তোমার নিকট সে বলিয়াছিল। ভগবানের নিকট কিছুই চাহিবার আমার সাহস নাই। সে কারণ তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে যদি সুযোগ আসে তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরেন যেন আমাকে একবার মা বলিয়া ডাকে।"

ইতি সুবর্ণা

রমার চিঠি পড়া শেষ হলে সে সব রহস্ত বুঝতে না পারলেও তার মার বুঝতে কিছুই বাকী থাকল না। রমার

যা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে চিঠিখানি রমার হাত থেকে নিজে নিয়ে তাহা সাবধানে নিজের বাক্সে রেখে দিলেন। রমাকে তিনি বললেন—"তুমি এ জন্য দুঃখিত হয়ো না। অসৎ সংসর্গ দূরে যাওয়াই গৃহের মঙ্গল।" রমা কিন্তু মার নির্মম বিচারে সন্তুষ্ট হয়নি, কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। রমার মা আরও ভাবতে লাগলেন যে যার মা কুলটা ও পতিতা তার ছেলের যতই প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা থাকুক না কেন, তার সঙ্গে রমার বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

দুই এক সপ্তাহের মধ্যে সুবর্ণার ঐ চিঠির বিষয় কথা-প্রসঙ্গে বীরেনের কানে উঠিল। লজ্জা ও ঘৃণায় অভিভূত হয়ে সে বুঝিতে পারিল কেন তার পিতা কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশিতেন না; কি গভীর গ্লানির মধ্যে কেবল তাকেই মানুষ করার জন্য তিনি সারাটি জীবন কাটিয়ে এসেছেন। সে তাহার বাবাকে তখন কিছুই বলিল না—পাছে তিনি পুত্রের নিকট তার মায়ের ঘৃণাময় জীবনের জন্য লজ্জা বোধ করেন। সে শুধু এই কথা তাঁহাকে বলিল—যেন তিনি তার বিয়ের জন্য আর অগ্রসর না হন; তাহার কারণ রমাই সমস্ত খুলিয়া বলিবে। সেই দিনই বীরেন রমাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিল রমা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই চিঠির নকল দরোয়ান দিয়ে বীরদার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল;—

"প্রিয় রমা,

তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের জন্য তোমার মা ও আমার বাবা প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে মত দিই নাই। যাকে তুমি দাদা বলে ডেকেছ, যে তোমাকে ছোট বোনের মত স্নেহ করে এসেছে, তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হতেই পারে না। আইনের কোন বাধা না থাকলেও আমার তো বিবেক ও বিচারবুদ্ধি আছে। মানুষ যদি বিবেক অনুসারে কাজ না করে তবে বন জঙ্গলের পশু ও মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকবে কিসে? আমার ইচ্ছা যে তোমার মা তোমার বিয়ে আমার বন্ধু শচীনের সঙ্গে দেন। সেও আই-এ-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে নিশ্চয়ই তুমি সুখী হবে।

আমি স্থির করেছি যে আমি এখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিব এবং স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজ-সেবা করবো—যাতে বাংলা দেশে আদর্শ জননী ও আদর্শ পুত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। মায়ের যে রক্তে আমার এই দেহের সৃষ্টি হয়েছে সমাজের কল্যাণের জন্য ও মাতৃত্বের গৌরব রক্ষার জন্য আমার সেই দেহ-মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। ব্রহ্মচর্য্য সাধনই আমার মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি বরণ করিয়া লইলাম।

মায়ের ইচ্ছা ছিল যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া এবং তাঁকে 'মা' বলিয়া একবার ডাকা। কিন্তু তাহা আর সম্ভব হল না। ইহাতে তাঁর বা আমার কোনও শান্তি হতো না। 'মা' বলে ডাকলে আকাশে তার প্রতিধ্বনি শোনা যেত, কিন্তু মা ডাকে যে অমৃতধারা মাতৃহৃদয় হইতে আপনা-আপনি বিচ্ছুরিত হয় সে ধারা মায়ের পাপের তাপে ও অনুশোচনার জ্বালায় নিশ্চয়ই শুকিয়ে গিয়েছে। যদি কখনও তাঁর দেখা পাও মাকে এই চিঠির মর্ম্ম জানিয়ে দিও। তুমি আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ নিও এবং তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিও।"

ইতি বীরদা

সেই দিন সন্ধ্যায় বাবাকে প্রণাম করে চিরদিনের জন্য বাড়ী ছেড়ে বীরেন আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিল। তার অনুরোধ অনুসারে গোপেনবাবু তাঁর বাড়ীখানি উইল করে রমাকে দিলেন এবং মিশনের হিন্দু ধর্ম্ম ও কৃষ্টি অনুসারে যে হিন্দু নারী শিক্ষা মন্দির হয়েছে তাঁর অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তি সেই শিক্ষা মন্দিরে দান করিলেন। বীরেন সন্ন্যাস নেওয়ার এক মাসের মধ্যেই গোপেনবাবু দেহত্যাগ করলেন।

সুবর্ণা সংবাদপত্রে পড়েছিল যে বীরেন তাঁর মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। এ কথা জানবার পর সুবর্ণা মরে নাই, কিন্তু তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

অতি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক শূদ্রক বিরচিত 'মৃচ্ছকটিকে'র নান্দীতে দেবাদিদেব মহাদেবের দুইখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমখানিতে মহাদেব একা, বিশ্বসৃষ্টি, সর্প-বিভূষিত ; অন্যটিতে হরগৌরীর যুগল মূর্তি, বিদ্যুল্লেখার ন্যায় গৌরীর গৌর তনুলতা মহাদেবের শ্যামকণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। নাট্যকার নাটকখানিতে বিপত্ত-বৈভব নায়ক চারুদত্তের ভাগ্য-পরিবর্তন দেখাইতে চাহিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত চারুদত্ত বিভব এবং প্রেয়সী বসন্তসেনা—দুই-ই লাভ করিয়াছে। রিক্ততা হইতে স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, শূন্য-সংসার হইতে আনন্দময় পূর্ণ সংসারের দিকে নাটকখানির গতি, তাই নান্দীতাগে দেবাদিদেব মহাদেবের দুই বিপরীত রূপ-চিত্রণ।

ভারতবাসীর চিরন্তন জীবন-স্বপ্ন এই সু-প্রাচীন নাটকের নান্দীতে বিধৃত হইয়াছে। কোলাহলে নয়, সংঘর্ষে নয়, নিষ্কণ্টক সহজ সুন্দর জীবনাচরণের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের চিরকালের। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এইজন্যই অন্তর্মুখী হইত না। এই স্বপ্ন ভারতবাসীর এখনও আছে, তবে ইংরেজ আসিবার পর ইংরেজি সাহিত্যের ট্রাজেডির গৌরব নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রভাবিত করিয়াছে ভারতীয় সাহিত্যিকদের। সাহিত্যে জীবন রূপায়িত হয়, জীবনের সমালোচনাই সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় সাহিত্যবোধে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। পৃথিবীতে সুখও আছে, দুঃখও আছে, জীবনের আনন্দ-বিলাস এবং কঠিন বাস্তবের আঘাত-সংঘাতে জীবনের ব্যথা-বিপর্যয়—দুই-ই সংসারে সত্য। আধুনিককালে মানুষের জীবনযাত্রা বিরল-অবসর এবং বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এযুগের সাহিত্যিক ট্রাজেডিকে অস্বীকার করেন না। তবু আজও ভারতীয় সাহিত্যিকের মানসলোক যখন নির্বাধ অনুভূতিতে মুখর হইয়া উঠে, তখন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা জন-মনের স্বর্ণস্বপ্নরূপ কবি-মানসে প্রতিফলিত হয়। এ অবস্থায় সংবেদনশীল ভাবপ্রবণ লেখক শান্তরসের শিল্পী না হইয়া পারেন না। এই লেখকদের মধ্যে আমার যাঁহারা জীবন দুঃখের আপাত-কঠোর সমস্যা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদাসীন (সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়া আজ বড় সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব নয়) এবং যাঁহাদের মন বৃহৎ জীবন-দর্পণে আলোকিত, তাঁহাদের সৃষ্টি স্বভাবতই দুঃখের দাবী ছাড়াইয়া সিদ্ধরসের গৌরবে চির-কালের সম্পদ হইয়া উঠে। সমকালীন সাহিত্যিকদের সহিত ইহাতো তাঁহাদের তফাৎটা বিল থাকে না, দুঃখের তথাকথিত অনন্ত প্রসঙ্গগুলি তাঁহাদের লেখায় অগ্রাধিকার পায় না বলিয়া হয়তো দুঃখোদ্দীপনায় উত্তেজিত একশ্রেণীর পাঠকের কাছে সে লেখা বিস্বাদ বোধ হইতে পারে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রসিক-হৃদয়ে তাঁহাদের আবেদন অনস্বীকার্য। কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীর লেখক। যে যুগে তিনি বাংলা-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সভাই স্মরণীয় যুগ। তিনি কিন্তু বিরলপ্রজ ছিলেন। সাহিত্যিক-চিত্ত-বৈকল্যকারী সমসাময়িক ভাবসমূহের উত্তেজনা হইতে সাবধানে দূরত্বরক্ষা তিনি আপনাকে বহুলাংশে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। পরে আলোচনা করিয়া দেখানো হইবে বুদ্ধদেব বসু তাঁহার বিপরীত-প্রান্তীয় লেখক, কিন্তু বিভূতিভূষণের মানস-স্থৈর্য অভিনন্দিত করিয়া বুদ্ধদেব বসুও বলিয়াছেন—"This extremely fortunate mental composition (we may call it composure) has enabled Bibhutibhusan to steer clear of the triple temptation of Bengali literature : Patriotism (in those debased forms where it becomes either jingoism or provincialism), reformist zeal (leading to journalistic tantrums) and pathology (Popularly known as psychology). [An Acre of Green Grass (1948). P. 89].

অনুকার শাস্ত্রের মতে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের সংযোগে শমভাব শান্তরসে পরিণত হয়। শমভাব একটি স্থায়ীভাব এবং ইহার অর্থ বিষয়ের প্রতি অনুরাগহীন মনের আত্মায় বিশ্রাম সুখ ভোগ। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন :—"সকল রসের উপর শান্তরসের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় কবির কবিধর্ম। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ কঠোর নিয়তি, বাসনা-কামনার স্বর্গ-নরকব্যাপী আলোড়ন, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নীতি ট্রাজেডির অনুপ্রেরণা ভারতীয় কবিকল্পনাকে বিপথ-গামী করিতে পারে নাই" (আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—২২)। ঠিক আক্ষরিকভাবে এই অর্থে না হইলেও মোটামুটি জটিল সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাত্রা ভারতবাসীর কাম্য নয় বলিয়া এবং নিষ্কলুষ সরল-সুন্দর জীবনের জন্য ভারতবাসীর মন সাধারণভাবে উন্মুখ বলিয়া ভারতীয় জীবনে শান্তরসের একপ্রকার প্রাধান্য রহিয়াছে বলা চলে। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভাবুক বেশ বাংলা এবং সবচেয়ে সরল মন বাঙ্গালীর,—এরূপ বহুপ্রচলিত। সেই অর্থে বাঙ্গালীর মনে শান্ত-ভাবের আবেদন স্বাভাবিক। যুগে যুগে বাঙ্গালী-মানসের রূপকার বাঙ্গালী লেখকের রচনায়ও তাই শান্তভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। বিভূতি-ভূষণও এই পথের পথিক। প্রথম মহাযুদ্ধের আলোড়নে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছিল। তাঁহার সম-সাময়িক কোন কোন সাহিত্যিক শান্তভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া-ছিলেন। বিভূতিভূষণ কিন্তু প্রশান্ত স্থৈর্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার বিষয় মূল্যায়ন-রীতিতে যে পরিবর্তন তিনি কল্যাণকর মনে করিয়াছেন,

তাহা তিনি সাদরে স্থান দিয়াছেন তাঁহার সাহিত্যে; কিন্তু 'যাহা প্রচলিত বা পুরাতন তাহাই অস্বীকার করিতে হইবে',—এইরূপ নৈরাজ্যবাদী মনোভাবে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। তিনি যাহাকে অস্বীকার করিয়া যেমন দুরীহভাবে আবিষ্ট হন নাই, তেমনি আমার কালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধা পড়েন নাই। মহান সাহিত্যিকের ইহাই লক্ষণ। বিভূতিভূষণের স্বজন-বৈশিষ্ট্য পরে আলোচিত হইবে, উপস্থিত একথা বলিলেই চলিবে যে, ভাববাদী শিল্পমর্ম তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির হইলেও জীবনের রবি তিনিও আঁকিয়াছেন, মানুষ লইয়া তাঁহারও কারবার। তবে তাঁহার জগৎ শুধুমাত্র রুক্ষ ধূসর নয়, তাঁহার চরিত্র শুধুমাত্র জটিল মনস্তত্ত্বের রেখাচিত্র নয়। মানুষকে ফুটাইবার চেষ্টায় তাঁহার একান্ত দৃষ্টি ছিল মানবতার মর্মসন্ধানের দিকে, মানুষের আত্মার স্বরূপ-উদ্ঘাটনের দিকে, ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের শাশ্বত সম্পর্ক নির্ধারণের দিকে।১ এ হিসাবে তাঁহাকে টলষ্টয়, রোমা রোলাঁ বা কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য বলা যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের জীবন দর্শন বা ভাবসৃষ্টি সম্পর্কে যে সব আলোচনা করা হইতেছে তাহাতে প্রধানতঃ পথের-পাঁচালী—অপরাজিত—আরণ্যক শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের রচনাই সমুখে রাখা হইতেছে। লেখককে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিরিখেই বিচার করা উচিত। মানুষের মহত্ত্ব যেমন তাহার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তের আত্মপ্রকাশেই স্ফুরিত হয়, দৈনন্দিন সাধারণ জীবনে নয়, লেখকেরও তেমনি সব লেখা সমান-মানের না হইলেও যেগুলি তাঁহার সত্যকার উচ্চশ্রেণীর রচনা, সেইগুলি দিয়াই তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে। এ সম্পর্কে সমরসেট মমের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :—প্রত্যেক লেখকের তাঁহার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টির দ্বারা বিবেচিত হইবার অধিকার আছে।২

বঙ্কিমচন্দ্র গল্প লেখক ছিলেন, কিন্তু রচনা তাঁহার কাব্য-বিভূতি

---

১ 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'চীনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের ও যে কথা বলিয়াছেন তাহা এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—"ভারতবর্ষ সমাজকে সকলের সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। নিজেকে পরিধিবিশিষ্ট অন্য চেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যবিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল। নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগবান করিবে, বন্ধী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে মুখপাত্রি সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আলোক আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে অন্তরের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল।—রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ—৫১৪-৫১৫।

২ "Every author has right to be Judged by his best."

—Somerset Maughm,—Ten Novels and their Authors (1951), P. 107.

মণ্ডিত। কবির-মনস্ক গদ্য রচনা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব বলা চলে। শুধু ভাষার দিক হইতে নয়, ভাবের দিক হইতেও বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথে এই কবি-ধর্ম বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়। বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যেও এই কবি-চেতনার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। গল্প-উপন্যাসে কাব্য-প্রবণতা সাধারণতঃ বর্ণনার-অবসরেই দেখা যায়, বিভূতিভূষণের কবি-মন কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধিস্থানীয় রচনার সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। কথাসাহিত্যের প্রচলিত রচনারীতির দিক হইতে বিভূতিভূষণের রচনা সর্বাংশসুন্দর নয়। বিষয়বস্তুর বাস্তবতা, ঘটনার সম্বিবদ্ধতা, চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি, বৈচিত্র্য এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ইহার উপর প্রতিফলিত, কাহিনীর অসঙ্গতি ও নাটকীয়তা,—এই সবই কথাসাহিত্যের, বিশেষ করিয়া উপন্যাসের, প্রধান বিচার্য-বিষয়। পৃথকভাবে দেখিলে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য এই সকল দিক হইতে অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু তবু সমগ্রভাবে বিভূতিভূষণের সৃষ্টি যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাঁহার কবিসুলভ ভাব-দৃষ্টি তাহার বহুলাংশে কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। কবি-চেতনা বিভূতিভূষণের শিল্পরীতি ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই, বরং পূর্বোল্লিখিত ত্রুটিসমূহের জন্য যে ক্ষতি প্রায় অনিবার্য ছিল, তাহা পূর্ণাংশে না হইলেও আংশিকভাবে প্রতিরোধ করিয়াছে। বিভূতিভূষণের বিপুল জনপ্রিয়তার মূল হইল তাঁহার স্নিগ্ধ শিল্পকলা। এই শিল্পকলা বলিতে বিষয়-বস্তু, ভাব এবং আঙ্গিক,—সবই বুঝায়। বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য তাঁহার অসাধারণ মানবপ্রেম, নিকষিত সহজ জীবন ধর্মের প্রতি অনুরাগ, প্রকৃতির সহিত একাত্মতার মত সুগভীর প্রকৃতি প্রীতি, প্রকৃতিকে জীবন্তরূপে, বলিতে গেলে চরিত্ররূপে, রচনার স্থানে স্থানে এবং সর্বোপরি জীবনের মূল সূত্রের বা আত্মার অনুসন্ধান। তাঁহার কথাসাহিত্যের এই উপাদান পটভূমিকায় কাব্যিক রচনাশৈলী চমৎকার মানাইয়া গিয়াছে। এ হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পথের পাঁচালী আরণ্যকের পাশে—কবি-চেতনা অপেক্ষাকৃত লঘুচিত্ত করিয়া মোটামুটি উপন্যাসের বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের উপর লেখা 'বিপিনের সংসার', 'অথৈজল' 'দুইবাড়ী' অনেক দুর্বল রচনা বলিয়াই মনে হয়। এমন কি 'অনুবর্তন' বা 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র মত যে বস্তুধর্মী উপন্যাসে বিভূতিভূষণ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেগুলিও পথের পাঁচালী বা আরণ্যকের পাশে দাঁড়াইতে পারে না।

অবশ্য কবির সব জায়গায় যে বিভূতিভূষণের সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করিয়াছে এমনও নয়। কথাসাহিত্যে জীবন রূপায়িত হয় বলিয়া বাস্তবের সেখানে বিরহ ও অপরিহার্য মূল্য আছে। বিভূতিভূষণের কবি-চেতনা কোন কোন স্থানে বাস্তবতা এমনভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, যাহা সত্যই আধুনিক উপন্যাসে গৌরবসূচক বিবেচিত হইতে পারে না। কল্পনাপ্রবণ রোমান্স এবং ভাববর্মী উপন্যাস এক জিনিস নয়। কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া কল্পনার অবাধ অবাধে ছুটাইয়া দিয়া বিভূতিভূষণ মাঝে মাঝে রচনাকে রোমান্সের পর্যায়ে তুলিয়াছেন। কোন কোন জায়গায় এমনও হইয়াছে যে, যাহা অবিশ্বাস্য, এমন কি যুগধর্মে যাহা অসহিষ্ণু, সেইরূপ পরিস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি আপন অনুভূতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় এরূপ করিতে পারেন, কিন্তু কথা-সাহিত্যে করেন নাই। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে' পার্থিব অঞ্চলে অনাসক্তি স্থাপিত হওয়ার প্রশ্নটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক। পৃথিবীর ইতিহাসে আকস্মিক জনসমাগমের ও কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানকল্পে জনবিরল এলাকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা বারবার হইয়াছে। জন্মভূমির প্রতি মমতা মানুষের স্বাভাবিক, তবু স্বদেশে যাহাদের অন্ন জুটে না, দেশান্তরে ঘর বাঁধিয়া তাহারা চিরকালই অন্নসংস্থানের চেষ্টা করে। এই রীতি শুধু অর্থনীতির দিক হইতে নয়, পৃথিবীতে শান্তি-রক্ষার এবং মানব সভ্যতা বিকাশের দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ। অতীত জীবন, শিক্ষাদীক্ষা বা মানসিক প্রস্তুতি অনুযায়ীই এই সমাধানের ফলে যা জীবনযাত্রা গড়িয়া উঠে। তাহাদের দেশত্যাগে যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাঁধিয়া লওয়া যায়, তাহাদের জীবনযাপন-প্রণালীর কিছু বিরুদ্ধ বা ক্ষুণ্ন হওয়া কালের কথা নয়। কবি নিরক্ষুশ, কিন্তু ঔপন্যাসিক প্রাণের আবেগে সুন্দরের জন্য সত্যের কণ্ঠরোধ করিতে পারেন না। বিভূতি-ভূষণ এইখানে কিন্তু তাহাই করিয়াছেন বলা চলে। অবাধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলে বস্তির পর বস্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। পতিত জনশূন্য ভূমিভাগে বহুসংখ্যক মানুষের আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাড়া যে উৎপাদিকা শক্তি এ অঞ্চলে অবাধমুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ব্যবহারে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ কিন্তু গাছ কাটিয়া মানুষের এ বসবাসে তীব্র বেদনাবোধ করিয়াছেন। বিরক্তি তাঁহার এরূপ পর্যায়ে উঠিয়াছে যে, শান্তভাষাভাষী বিভূতিভূষণ লাহক সত্যচরণের জবানীতে এই অরণ্য-বিলোপের যন্ত্র-বিভূতি কল্পনা করিয়া আতঙ্কে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন। 'লবলুটিয়া' অঞ্চলে বস্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, লবলুটিয়া হইতে বহুদূরে ঘন্‌ঘরি শৈলমালার অন্তর্গত চকমকিটোলা অঞ্চল তখনও শাল সৌন্দর্যময়ী। এখানেই থাকে সত্যচরণের মানসী পার্বত্য কন্যা ভানুমতী। সত্যচরণ ভাবিতেছে—এই এলাকায়ও যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে :—

"তামার কারখানার চিমনি, ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলি বস্তি, মহুল জলের ড্রেন, এক্সিন-ঘাড়া কলার ছাইয়ের স্তূপ···খোকান ঘর, চায়ের খোকান, সস্তা সিনেমার 'জোয়ারী হাওয়া' 'শেষ শয়নের' 'প্রণয়ের ছেয়' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্বাহ্নে আসন দখল করুন)—দেশী মদের খোকান, ময়রীর খোকান।

রোগির কাথেসি (সমাগত দরিদ্র রোগিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়)। আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ হিন্দু হোটেল।

কলের বাঁশিতে তিনটার সিটি বাজিল।

ভানুমতি বুড়ি মাথায় করিয়া এক্সিনের-ছাড়া কলা বাজারে বিক্রী করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই—চার পয়সা বুড়ি।···"

—এই হইল কাব্যিক ভাষাভিব্যক্তির উদাহরণ। কোন কোন সময় কাব্যিক ভাষার জন্য বিভূতিভূষণের বিষয়বস্তু অস্পষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার ডায়েরীগুলিতে এই অস্পষ্টতার অনেক নিদর্শন আছে। উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'পথের পাঁচালী' খুবই উচ্চাঙ্গের রচনা, ইহাতে বিষয়বস্তুর সহিত ভাষার চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে। শুধু এখানের লেখকের কাব্যপ্রবণ প্রকাশভঙ্গি কয়েকস্থানে বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার পরিবর্তে অস্পষ্ট করিয়াছে। তাহাড়া অনেক জায়গায় চরিত্রকে খামাইয়া দিয়া তিনি বর্ণনা-বিশ্লেষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।* এইরূপ আত্মপ্রকাশ ঘটিলে ভাষার কারুকার্য স্বাভাবিক এবং তাহার ফলেও বর্ণনী পরম্পরায় চরিত্র বা ঘটনা পাঠকমনে স্থান লইয়া যাইতে পারে। 'পথের পাঁচালী' হইতে উদ্ধৃত নিম্নের দৃষ্টান্ত দুইটিতে কথাটা পরিষ্কার হইবে :—

প্রথমটিতে গ্রামের পাঠশালার প্রতিলিখনের পর বালক অপুর মনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অপু কল্পনাপ্রবণ, প্রতিলিখন শুনিতে শুনিতে সে তাহার মনকে তাসাইয়া দেয় আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া দূর হইতে আরও দূরে। তাহার বিস্ময়ন কল্পনা করে বড় হইয়া সে প্রতিলিখনে শোনা অজানা দেশটিকে দেখিতে যাইবে। এ পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার পরই লেখকের মনস্তত্ত্ব বর্ণনাভারে পাঠকের দৃষ্টি হইতে অপুর মনের শুধু পক্ষদুটি যেন কুয়াশায় হারাইয়া যায় :—"কিন্তু সে যেখানী, কউকিচ ঠট, বিচিত্রপুলিনা সোনাবতী, সে ঝাউবন জনস্থান, নীল মেঘমালার দেশ সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, মানচিত্রে যদিও কোনো দেশে ছিল না। বালিকী বা অবভূতির তাহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখী-ডাকা গ্রামে সন্ধ্যায় এক মুক্তমতি গ্রাম্য বালকের অপরিপক্ক শিশু কল্পনার খেলে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশব মনেই সে কল্পজগতের প্রত্যেক-পর্বত তাহার সতত সকরুণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল!"

কবিত্বের আধিক্যে এইরূপ রচনার সরল প্রসাদ গুণখানির আর একটি দৃষ্টান্ত প্রথমখণ্ডে কিশোরী দুর্গার সঙ্গে নীরেনের দেখা হওয়ার মুহূর্ত। নীরেন জমীদারের চাবু হইতে ফিরিতেছিল, আম-বাগানের পথে হঠাৎ তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল দুর্গার। ইতিপূর্বে গুরুমুখে চমৎকার আনার বলিয়া গোকুলের স্ত্রী ইহাদের বিবাহের কথা তুলিয়া-ছিলেন এবং তদবধি দুর্গা সেই স্বপ্নই দেখিতেছে। নীরেন কথাটায়

---

* এই কবিত্ব-ভাষার লেখক যখন হইয়া যখন কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—"কাব্যে কবির নিজের মুক্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে, তাই কাব্যে কবির ভিতরকার তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা প্রায়ই সৌন্দর্যের হানি করে না। কিন্তু নাটক অথবা উপন্যাসে যখন কবি বা লেখক অন্যের মুখে আপনার কথা বলেন, তখন ভিতরকার তত্ত্বপ্রকাশ করিতে গেলে মানুষগুলার তত্ত্বের চাপে ছোট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, বিশুদ্ধির আতিশয্যে তাহাদের বিকাশের প্রতিরোধ হইতে পারে।—বর্তমান বাংলা সাহিত্য, পৃঃ—১৫৮

উপর তেমন শুরুত্ব হয়তো দেয় নাই, কিন্তু এখন এই দিক বনশ্রীর রূপবতী কিশোরীকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সহজ বর্ণনালোকে এই অনুপম দৃশ্যটি যখন ঝলমল করিতেছিল, তখন লেখকের অনুকূল কাব্যিক বর্ণনা ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরিবর্তে ঘুলাই করিয়াছে :—"দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনো ভাল করিয়া দেখে নাই, চোখ বুজিয়া অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই তাই অমুখ মধ্যে। যেন পল্লীগ্রামের নিভৃত দূর-বকুল-বীথির প্রশান্ত শ্যামস্নিগ্ধতা তাহার চোখদুটির মধ্যে অন্তর্লুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনও হয় নাই, রাত্রি শেষের অমল অন্ধকার এখনও জড়াইয়া। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে,—কত শুভ্র আশির আহ্বান, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জন্মোৎসব—ভালবাসা জানানোর মুখরতা।"

যাহা হউক, এইরূপ বিক্ষিপ্ত দুর্বল অংশের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের শিল্পরীতিতে চিত্রের বাহন গদ্য এবং অনুভূতির বাহন পদ্যের সার্থক সমন্বয় দেখা যায়। এইরূপ সমন্বয় দেখা যাইত মহাকাব্যে। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে বলিয়াছেন জ্ঞানের কথা প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথা সকার করিতে হয়। বিভূতিভূষণ মূলতঃ ভাবধর্মী সাহিত্যিক, তাঁহার লেখায় জ্ঞানের কথা যতই থাক, ভাবের কথা তাহার চেয়ে বেশি। জীবনবোধ তাঁহার প্রধান হইলেও তাঁহার সৃষ্টিধর্মী। প্রধানতঃ সাধারণ মানুষের সরল জীবনের কাহিনী তিনি রূপায়িত করেন বলিয়া তাঁহার লেখার আবেদন সর্বশ্রেণীর পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।[৪] সহজ কথা সরল করিয়া বলাই কঠিন, জটিল কথা বলা মোটেই কঠিন নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'খাপছাড়া' কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ কবিতাটিতে ঐরূপ সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ যে লোককবি হইয়াছেন তাহার একটা বড় কারণ—পাঠক তাঁহার সৃষ্টির সহিত অপরিচয়ের দূরত্ব অনুভব করে না।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য মূলত হৃদয়প্রধান, বুদ্ধি-প্রধান নয়। বাংলা সাহিত্যে আমরা যাহাদের কল্লোলপন্থী বলি, তাহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বুদ্ধির উজ্জ্বলতা। হৃদয়ধর্মী ভাবধারী লেখক বিভূতিভূষণ ইহাদের প্রায় সমসাময়িক হইয়াও বিপরীতপ্রান্তে অবস্থান করিতেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর রোম্যান্টিক দৃষ্টির দিক হইতে কবি জীবনানন্দ ইহার সহিত বিভূতিভূষণের সাদৃশ্য লক্ষণীয়, কিন্তু জীবনানন্দের বুদ্ধি-প্রাধান্য বিভূতিভূষণে নাই। বিভূতিভূষণ সহজধর্মী লেখক, তাঁহার অন্তরে যে সুর বাজিয়াছে, স্বভাবতঃই তাহা তাঁহার লেখায় প্রকাশিত হইয়াছে। জগৎ সংসার হইতেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার বিষয়বস্তু, কিন্তু তাঁহার অন্তরের মাধুর্য-সিঞ্চিত হইয়া সেই বিষয়বস্তু একটা বিশেষ কমনীয়তা পাইয়াছে। রূপরসও রস, আমরূপকে স্বরূপে ফুটাইবার মধ্যেও লেখকের বুদ্ধিযোগ অনস্বীকার্য। বিভূতিভূষণে কিন্তু এই 'রস' স্বরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার সাহিত্যে বস্তুগতভাবে তাহার আছে, কিন্তু তাহার উপরও যেন লেখকের শান্ত ভাবদৃষ্টির পেলব প্রলেপ পড়িয়াছে।[৫] হিংস্র জটিলতা ফুটাইবার ক্ষেত্রেও তাই, পরশুরামের গোলোক চাটুয্যে, বেণী ঘোষাল বিভূতিভূষণে অনুপস্থিত। তাঁহার আরণ্যকে প্রকৃতির ভয়াল কঠোর রূপ-চিত্রণের যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু বিভূতিভূষণ তাঁহার মনোধর্মের তাগিদেই যেন আরণ্যকের সুবিশাল পটভূমি ফুটাইবার সাধনা করিয়াছেন। এইখানেই প্রকৃতি-শিল্পী টমাস হার্ডি বা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সহিত বিভূতিভূষণের পার্থক্য। হার্ডি 'রিটার্ন অফ দি নেটিভ' গ্রন্থে 'এগডন হিথ' প্রান্তরটি যেভাবে আঁকিয়াছেন, বিভূতিভূষণের প্রান্তর-অরণ্য সেরূপ রুক্ষ বা মানুষের প্রতিকূল-শক্তির স্মারক নয়। আগেই বলা হইয়াছে, অন্তরধর্মের দিক হইতে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। রবীন্দ্রনাথও ভয়াল ভয়ঙ্করকে কুণ্ঠাহীনভাবে ফুটাইতে পারেন নাই। শান্তভাবের দিকে তাঁহারও প্রবণতা লক্ষণীয়।[৬]

আবেগ-প্রবণ বা উচ্ছ্বাসবহুল যে সব সাহিত্যিকের রচনারীতি, তাঁহাদের নরনারীর প্রেমবর্ণনায় আপেক্ষিক সুবিধা আছে। বাংলা কথাসাহিত্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল যে প্রেম চিত্রণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বর্ণাঢ্য ভাষা বা প্রকাশভঙ্গিই তাহার সবচেয়ে বড়দিক। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে কাব্যগত আবেদন গভীর হইলেও নরনারীর প্রেমের বর্ণনায় তিনি কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লেখায় প্রকৃতি অনুপমভাবে ফুটিয়াছে, বাৎসল্যরস ফুটিয়াছে চমৎকার, মানবতার আবেদনও ইহাতে অপরিমেয়, কিন্তু নরনারীর দৈহিক আকর্ষণগত প্রেমের রূপায়ণে

৪ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সহরে 'পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপ প্রদর্শিত হইতেছিল। বিখ্যাত চিত্র সমালোচক আর্নার উইনস্টেন ছবি দেখিয়া কাহিনী-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"The picture has a story so universal and simple that it is no story at all. This is what it is to live in an Indian village."

(Hindusthan Standard—3.11. 1958)

৫ তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গোরার সমস্ত উদ্দামতা শেষ পর্যন্ত আনন্দময়ীর পদতলে নিঃশেষিত হইয়াছে, নদীর আঙ্কে হইয়া গিয়াছে নিশ্চিহ্নলেখার প্রশান্ত প্রতিরোধে, 'চার অধ্যায়ের' অগ্নিগর্ভ অতীনের কণ্ঠলগ্না এলার অশ্রুজলে নিভিয়া গিয়াছে।

৬ ব্যালেরিনা আর যাহিত্যে মুমূর্ষু আন্দিপাড়া কৃষ্ণনগর গ্রামের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ নিজের লাইন ড্রইং যেভাবে লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ভয়াল ভয়ঙ্করকে বর্ণনার চরম রূপ মনে করা যাইতে পারে :—"সেই বনমধ্যস্থলে ভয়া গ্রামখানির ওপর যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর করাল কালো ডানার ছায়ায় সারা গ্রাম অন্ধকার।"

—অভিযাত্রিক, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ—৭

চিত্রতারকার মত লাবণ্য —

কত সহজেই আপনার হতে পারে !

চিত্রতারকা সুমিত্রা দেবীর মত অপূর্ব লাবণ্য আপনারও হতে পারে— যদি আপনি লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন ! "লাক্সের সরের মত সুগন্ধ ফেণা ত্বকের পক্ষে এত ভাল" সুমিত্রা দেবী বলেন, "এই আমার লাবণ্যকে মোলায়েম এবং সুন্দর রাখে।"

সুন্দরী সুমিত্রা দেবীর কথা শুনুন। আপনার লাবণ্যের জন্যে নিয়মিত লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ, শুভ্র **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

ইহার সাফল্য খুবই সীমাবদ্ধ। চিত্র রসের রসিক তিনি, ঘটনা জীবনালেখ্যে অনুপ্রবেশের প্রয়োজন যেন তিনি অনুভব করেন নাই। সহজ জীবনধর্মের ছন্দশিল্পী বিভূতিভূষণের হাতে অসমাপিকে অপর্ণা-অনুর অর্থাৎ ইন্দ্রাণীতে তিনু-তরঙ্গীর মাস্পতা প্রেমচিত্র হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, কিন্তু বিবাহ-নিরপেক্ষ নরনারীর দুর্বার ভালবাসা তাঁহার হাতে খোলে নাই। এই অসামাজিক প্রেমের যে অপোরমতা, সর্বস্ব বাজি ধরিয়া চরিত্র পথে অগ্রসর হইবার যে আকুতি, ইহার ঘনিষ্ঠতা এবং জানাইবার যে ক্ষমতা, বিভূতিভূষণের রচনায় তাহার পরিচয় কদাচিৎ মেলে। ঠিক পরিচ্ছন্নতাবোধ বা সামাজিক রীতি-বোধের জন্য ইহা হয় নাই। সামাজিক বিধি-নিষেধ নয়, এখন ভাল-বাসার ছবি বিভূতিভূষণ অনেকই আঁকিয়াছেন, তবে সবক্ষেত্রেই লেখকের বাস্তব দৃষ্টি বা আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক হইলেও ছবিগুলি কেমন যেন অতাধিক পরিচ্ছন্ন পারিপাট্য পাইয়াছে। বিভূতিভূষণের সাধারণ রচনায় ইহার স্নিগ্ধ মানবলোকের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে, ঘটনা প্রেমের বর্ণনার উপরও তাহার প্রভাব পড়িয়া বর্ণনাংশগুলি একটু অবাস্তব বা কিঞ্চিৎ হইয়া গিয়াছে। 'বিপিনের সংসারে'র বীণা-ঘটনের নিষিদ্ধ প্রেম এই শ্রেণীর। এই প্রসঙ্গে অনু-লীলার ভালবাসার কথা বলা যায়। এই প্রেম যে ঘনীভূত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রথম দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অনু ও লীলার ভালবাসা শহরে-পাঁচালী-অসমাপিকের সম্পদ। অনুর জীবনে অপর্ণার স্থান খুবই বড়, কারণ অপর্ণা অনুর সহমর্মিণী, শুধু সহধর্মিণী নয়। তাহাদের দুজনের মানস-গঠন একই ধরণের,—প্রণাঢ় অথচ আবেগে লীলায়িত। কিন্তু অনু ও লীলা ঐকান্তিক ধরিয়া পরস্পরকে গভীরভাবে ভাল-বাসিয়াছে। তবু বালক অনুর বালিকা লীলার জন্য আগ্রহের একটা আবেগ পাঠক উপলব্ধি করিতে পারে, এইরূপ ছবির উৎকর্ষারিত, লীলেনের সহিত তাহার বিবাহের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া বালিকা তাহার পুলকচঞ্চল মনোভাবের বর্ণনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। এই সাদা মনের প্রেম-তরীর মানস-চাঞ্চল্য বিভূতিভূষণের স্বাভাবিক আবেগ-স্নিগ্ধ বর্ণনা-মাধুর্যে ভালই ফুটিয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীতে 'অসমাপিকে' অনু-লীলার কাহিনীর মধ্যে তরুণ তরুণীর সর্বগ্রাসী প্রেমের কোন রসোজ্জ্বল চিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। এই প্রসঙ্গে 'প্রেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে' জানাইয়া লিখিয়া অনুর প্রতি-বেশিনী যে মেয়েটি তাহার সঙ্গে প্রেমের নাটকের সম্ভাবনাময় যবনিকা উত্তোলন করিয়াছিল, সূচনাতেই সমস্ত ব্যাপারটা বাস্তবের বোধগ্য করিয়া লেখক সেই সম্ভাবনাটা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে লীলার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অনু ও লীলার ভালবাসার কোন বড় রকমের সংঘাত বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় নাই। অথচ এই ভালবাসার আবেগমুখর ছবি ফুটাইবার প্রচুর সুযোগ ছিল। কার্যক্ষেত্রে লীলার প্রেম যেন সতীশ অনুর প্রতি করুণা এবং অনুর ঘনীভূত লীলাকে ভালবাসা যেন অপন মনের নিভৃতে সম্ভাবনাহীন একটুকরো তীব্র কামনাকে সযত্নে লালন করা,—ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লীলার মৃত্যুর ঠিক আগে অনু ও লীলার পরস্পরের প্রতি প্রেম-স্বীকৃতির মধ্যে লেখকের বাস্তব-সংযম এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের "মালাদান" গল্পে অনাথা জাতিকুলহীনা মালী কুড়ানীর মৃত্যুশয্যায় স্বপ্নের ঘন ঘনায়মানা তাহার মনায় মালাদান। ডাক্তার ঘটনের সামাজিক মর্যাদা সমতা-সচেতন রাসিয়াই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুপথযাত্রীর গলায় মালাদানের তথা মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটাইবার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।[১]

বিভূতিভূষণের অসামাজিক প্রেমচিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে মনে হয়,সম্ভবতঃ ইহাদের দুই রূপাঙ্গনে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের তেমন ভরসা ছিল না। এইরূপ অসামাজিক প্রেমের যে সাধারণ কয়খানি চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন,পূর্বাপর যা ঘনিষ্ঠ না হইলেও সেগুলিতে একটু সূক্ষ্ম সৃষ্টি করাই যেন তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি জীবনকে বাস্তব দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিকতাকে তিনি অবশ্য প্রশ্ন করেন নাই। 'কেদার রাজা'র সিদ্ধিনের পরিণাম শোচনীয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধিন লম্পট, প্রেমিক হইলে এই অবশ্য মৃত্যুদণ্ড লেখক তাহাকে দিতেন না।

প্রকৃতপক্ষে সত্যকার ভালবাসার ক্ষেত্রে অসামাজিক প্রেমও লেখকের সহানুভূতি-ধন্য হইয়াছে. বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'অথৈ জলে' জাতের কবি বড়, মানিক সোনামুখী গ্রামের এক বিধবাকে লইয়া পালায়, প্রেমিক বড়কে লেখক বিকৃত করেন নাই। বিপিনের সংসারে সতীন-বীণার প্রেম পরিণতি লাভ করে নাই সত্য, তবে বালবিধবা দুঃখিনী বীণা যে লেখকের সহানুভূতি পাইয়াছে, তাহা গ্রন্থপাঠেই বুঝা যায়। 'ইছামতী'তে এই স্নিগ্ধ সহানুভূতির পূর্ণ পূর্ণই উদয়। তিনু নদীর ঘাটে পদ্মপুকুরে আসন্না গ্রামের বধূ নিস্তারিণী-কে হাতে নাতে ধরিয়া ধমক দিলে নিস্তারিণী সতীনাক্ষীর কাছে ধরা পড়িয়াও বলে,—"তুমি দিদি স্বামী পেয়ে শিবির মত। আমন শিবির মত স্বামী আমরা পেলি আমরাও অমন কথা বলতাম। আহা—তিনি যে ওখানায় !...ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কোমরে ব্যথা ধরবার মত হয়েছে। এত করেও মন পাবার যো নেই কারো। কেন আমি থাকবো অমন খসম বাড়ি ? বলে যাও তো দিদি !"

—এবং ইহার পরই আছে :—"সুন্দরী নিস্তারিণীর মুখ রাঙা হয়ে

---

১ বিভূতিভূষণ প্রকৃতপক্ষে এইভাবেই কয়েক স্থানে অসামাজিক প্রেমের এবং সমাজের দুই বিপরীত কোটির মিলনাকাঙ্ক্ষী নরনারীর কঠিন জীবন-প্রশ্নের মধু-পরিণতি আঁকিয়াছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহার 'কিন্নরদল' গ্রন্থের 'অপি-ডাক্তার' গল্পে গোপালদের মেয়ে প্রেমলতার সহিত ডাক্তারের প্রেম-কাহিনী ধরা যাক। এই অসামাজিক প্রেম জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পরিণতির পূর্বেই প্রেমলতাকে টাইফয়েড মারিয়া ফেলিয়া লেখক সকল সমস্যার অবসান ঘটাইয়াছেন। এইরূপ প্রেমের স্বাভাবিক পরিণাম তীব্র বেদনাদায়ক, সেই দুঃখের মধ্যে তাঁহার গবেষণা-শীল মন বোধ হয় ঢুকিতে চায় নাই।

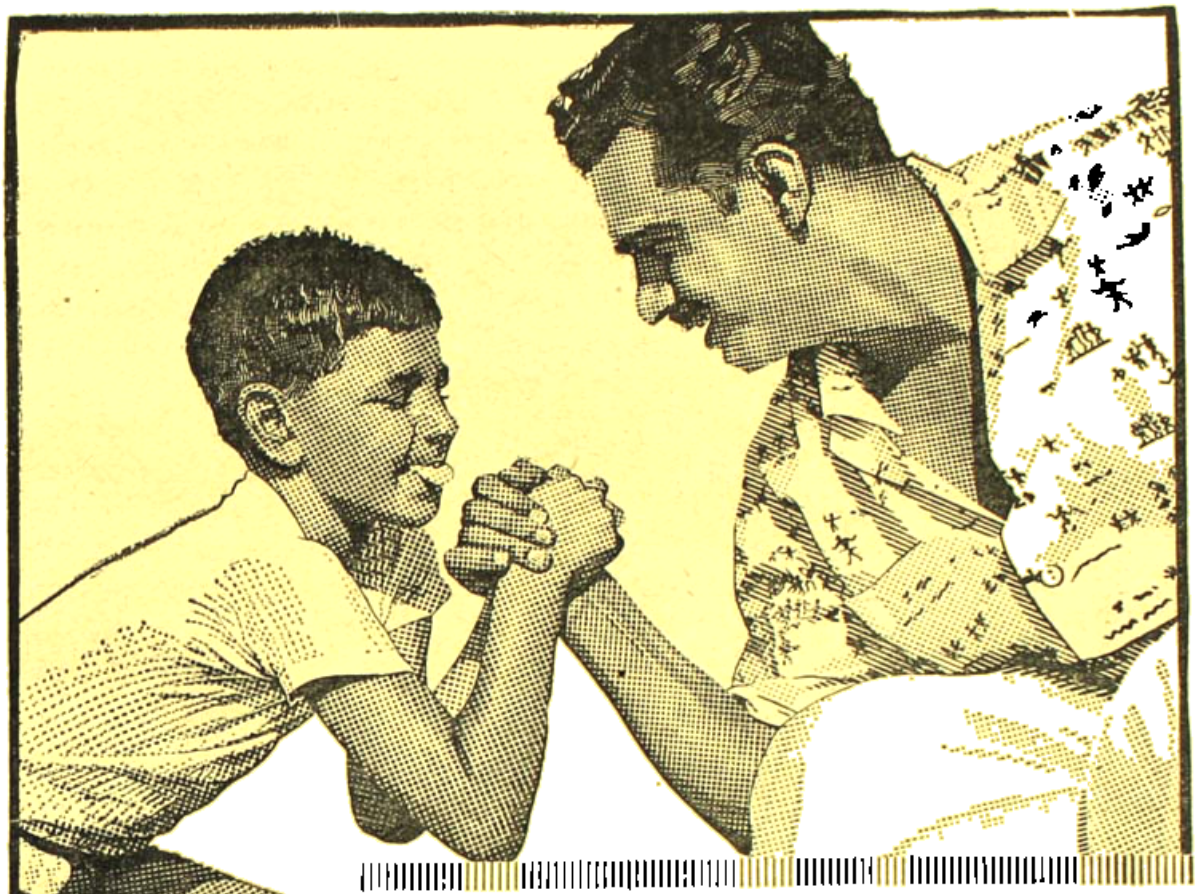

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** দিয়ে স্নান করেন

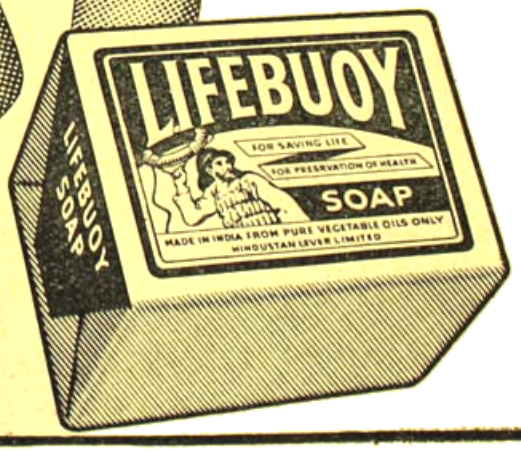

খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে এরিয়া।

L. 276-X52 BG

উঠেছে। মুখে একটি অদ্ভুত গর্ব ও যৌবনের দীপ্তি, নিবিড় কেশপাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে নাগা সিঁড়ি ঘুড়ে। বড় মায়া হোল এই অসহায়ানী বধূটির ওপর ঠিলুর।"

বিভূতিভূষণের কবি-চেতনা ও শান্তভাবাশ্রয়ী মনোধর্মের নিরিখে এইরূপ প্রেমচিত্রের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বোধ হয় 'জল ও কুয়া' গল্পগ্রন্থের 'অন্তরঙ্গের নিমন্ত্রণ' গল্পটি। এই গল্পে হীরেনের সঙ্গে ভালবাসা হইয়াছিল তাহার পিসিমার গ্রামের চঞ্চলা মেয়ে কুমুর। তাহাদের বিবাহ হইল না —ভুলে মিলিল না বলিয়া। হীরেন মনের দুঃখে আসানসুর চলিয়া গেল। তারপর কাটিয়া গেল বহুবৎসর। ইহার মধ্যে হীরেন এবং কুমু দুজনেরই বিবাহ হইয়া গেল। জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পর হীরেন একদিন পিসিমাকে দুদণ্ডের নিমেত্ত কাছে লইয়া যাইতে আসিল পিসিমাদের গ্রামে। কুমুর বিবাহ হইয়াছিল গরীব ঘরে, স্বামী লইয়া যাইতে পারে না, কুমু তাহার ছোট ছেলেটিকে লইয়া মার কাছে কায়ক্লেশে দিন কাটায়। হীরেনের সহিত দেখা হইল কুমুর। পরদিন অন্নকণের নিমন্ত্রণ খাইতে হীরেন কুমুদের বাড়ী আসিল। কুমু যত্ন করিয়া হীরেনকে খাওয়াল, কতুর শাক, নারকোল কুমড়ো—হীরেনের প্রিয় খাদ্যগুলি কুমু রান্না করিয়া রাখিয়াছে। খাওয়ার সময় তাহারা অসঙ্কোচে স্বীকার করিল পরস্পরকে তাহারা আগের মতই ভালবাসে। বহিস্থ গৃহসজ্জাকে বড়লোকী উপহার দিয়া হীরেন তাহার অপমান করিল না। পিসিমাকে লইয়া শান্তভাবেই সে নৌকায় উঠিল, কুমু দাঁড়াইয়া রহিল ঘাটে। কুমু তাকাইয়া রহিল, নৌকা ভাসিয়া চলিল দূর হইতে দূরে। আসন্ন উষার এই বিচ্ছেদ লগ্নের কবিত্বময় বর্ণন :—"দূ'পাড়ে নদীর নির্জন। দুপুরের রৌদ্র আর বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরণের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। কচুরিপানার বেগুনি-ফুল-চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-তুলসীর ডাঙার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকো। ঢেউয়ের চলার ঘায়ায় চারুক চরছে। বন্যার জলে বিলয় আগের ক্ষেতের আখপাছগুলো স্রোতের বেগে থরথর করে কাঁপছে।"

বলা বাহুল্য, অসামাজিক প্রেমের সম্পর্কের বিভূতিভূষণের এই সহজ সুন্দর দৃষ্টি তাঁহার মানবতাধর্মী মনোধর্মের পরিচয়ই উজ্জ্বল। মানুষকে স্বরূপে উপলব্ধির প্রয়াস এক মহৎ সাধনা, বিভূতিভূষণ সেই সাধনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রচলিত রীতিনীতির নিরিখে অধিকাংশ ঘটনা প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মানুষের প্রতি সব সময় সুবিচার করা সম্ভব নয়। মানুষকে স্বরূপভাবে ভালবাসিতেন বলিয়াই বিভূতিভূষণ চেষ্টা করিতেন দুর্বল বা রীতিভ্রষ্ট মানুষকে তাহার দিক হইতে বুঝিতে এবং এইরূপ মানুষের মধ্যে মহৎ গুণ থাকিলে সে গুণ ফুটাইতে তাঁহার কোন সঙ্কোচ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণ মানসিক ক্ষুধা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সামাজিক সংস্কারের চাপে ক্লিষ্ট মানুষকে সত্যার্থের দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার পাশ পাশেই থাকিয়া গিয়াছে, পুরোর মিথ্যা গৌরব পায় নাই; তবে পাপের মধ্যে যদি কোন সত্যকার মহৎ বৃত্তির সন্ধান মিলে, তাহার বিকাশে ও প্রকাশে তিনি সহায়তা করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার কথাসাহিত্যে পাই যেন (ইছামতী) কমলা (কেদার রাজা), পারা (অথৈ জল), বিনোদিনী (মুখোশ ও মুখশ্রী গ্রন্থের 'অন্তর্জলি' গল্প), গোলাপী (নবাগত গ্রন্থের 'কামতাসার কৃষ্ণলাল' গল্প), কুসুম ('জ্যোতিরিঙ্গণ' গ্রন্থে 'হিংসের কড়ুই' গল্প) বা গিরিবালার ('আচার্য কৃপালনি কলোনী' গ্রন্থের গিরিবালা গল্প) মত যেহোপমাবিনী পতিতা স্ত্রীলোকেরাও সর্বাংশে ঘৃণিতা হইয়া ফুটে নাই, আপন বৈশিষ্ট্যের হিসাবে কোন না কোন দিক হইতে লেখকের অন্তরিক্ত সহানুভূতি তাহারা লাভ করিয়াছে।

ক্রমশঃ

হোতোনা দিগ্‌ভ্রান্ত

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

পথ চলতে হঠাৎ তার স্খলপদ্ম মন,
হারিয়ে যাবে মেঘের ভিড়ে, হায়রে সে কি জানত ?
বৃষ্টি-ভেজা ছায়ার নেশা—জানল উষ্ণ
হৃদয় বেয়ে নামল এক নিবিড় অন্তলীন।

যখন সব শ্রান্ত চোখে ঘুমের বুঝি বেন,
নামল এক মধুমাতাল মৌমাছির নেশা,
তখন সব ভুলেও মন কাজল-কালো কেশে,
জ্যোৎস্না এসে ভেড়াল তার আলোর শাম্পানও।

পথ চলতে হঠাৎ তার আনত আঁখি পথে,
হারিয়ে যাবে হায়রে যদি অনেক আগে জানত,
তাহ'লে আর নামত না ক' অন্ধকারে-ঘেরা
তৃষ্ণা, আর মেঘের ভিড়ে হোতোনা দিগ্‌ভ্রান্ত।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মিস অনুপমা বসুও নিজের কর্তব্য সমাপনান্তে নদীর ধারে গিয়া একটি বিস্তৃত পাথরের উপর বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৈনন্দিন কর্তব্য চম্পার মাকে চম্পার রিপোর্ট প্রত্যহ পাঠানো। ইউরিন কেমন, ব্লাড-প্রেসার কত, খাওয়ায় রুচি আছে কিনা, ভিটামিনগুলি প্রত্যহ খাইতেছে কিনা, এসব খবর প্রত্যহ না পাইলে চম্পার মা অনর্থ করিবেন, হয়তো চলিয়া আসিবেন। তাই এগুলি সে সযত্নে প্রত্যহ পাঠাইতেছে। গঙ্গার জল-স্রোতের দিকে চাহিয়া তাহার বাবুলের কথা মনে পড়িতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া বাবুলের চঞ্চল স্বভাবের কথাই মনে হইতেছিল তাহার। সে এখন কেমন আছে, কে জানে। ভালই আছে সন্দেহ নাই, না থাকিলে খবর পাইত। তাহার বাবা নিশ্চয়ই খবর দিতেন।

তাহারই ছেলে বাবুল। কিন্তু যেহেতু বাবুলের বাবার সহিত তাহার সামাজিক আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই তাই প্রকাশ্যভাবে সে নিজের মাতৃত্ব ঘোষণা করিতে পারে না। অনুপমার বাবা শঙ্করপ্রসাদ নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক। মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ে থাকিত। সে লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছিল, কিন্তু সে ডিগ্রির সহিত একটি প্রণয়ীও জুটাইয়া আনিল। সুপর্ণ সিংহ নামটাই অনুপমার চিত্তকে প্রথমে আকর্ষণ করে। একটি নামের মধ্যে পক্ষীরাজ এবং পশুরাজের এমন সমন্বয় দুর্লভ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহার। লোকটির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল জাগিল। প্রথমে দেখা হইয়াছিল কলেজেরই কমন রুমে। তখন বয়সটাই এমন যে সব কিছুই ভালো লাগে। দোকানে-টাঙানো ছিট হইতে শুরু করিয়া বিশেষ ধরণের পশু-পাখী লতা-ফুল লতা-পাতা সব কিছুই মনকে মুগ্ধ করে। এক বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে কলেজে আসিয়াছিলেন সিংহ মহাশয়। আলাপ করিয়া অনুপমা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিলাতী ডিগ্রি আছে। সমাজেরই সেবা করেন। নামটিও চমৎকার। কথাসময়ে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পিতা শঙ্করপ্রসাদ এসব কিছুই জানিতেন না। বাবুল যখন পেটে আসিল তখন অনু তাঁহাকে সব কথা জানাইতে বাধ্য হইল, কারণ নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সুপর্ণ উড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে খবর পাওয়া গিয়াছিল তিনি নাকি একটি ধনী-কন্যার পাণি-পীড়ন করিতে উৎসুক হইয়া তাহারই পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধনী-কন্যাটি পিতার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাহাকে গাঁথিতে পারিলে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন (অর্থাৎ সমাজ-সেবা) সফল হইবে। কারণ সমাজ-সেবা করিতে হইলে প্রচুর টাকা চাই। অনুপমা তাহাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়াও জবাব পায় নাই, কলেজের দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। কারণ সুপর্ণ সেই মেয়েটির পিছু পিছু কখনও দার্জিলিং, কখনও মসৌরি, কখনও রামগড়, কখনও বা কালিম্পঙে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। ইদানীং ঠিকানাও পায় নাই।

শঙ্করপ্রসাদ অনুকে ভর্ৎসনা করেন নাই, বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়া কোনও নাটকীয় কাণ্ডও করেন নাই।

তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। সব জেনে শুনে যে লাইফ তুমি গ্রহণ করেছ, তার ভার তোমাকে বইতে হবে। সামাজিক লাঞ্ছনা আজকাল আর হয় না, তবে লোক-লজ্জা বলে' একটা জিনিস আছে এখনও। আমি যতদূর সাধ্য তোমাকে তার থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব।" অনুপমার মাথায় সিঁদুর পরাইয়া তিনি তাহাকে ব্যাঙ্গালোরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার হাসপাতালেই বাবুলের জন্ম হয়। বাবুল একটু বড় হইবার পর সে তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া ব্যাঙ্গালোর হাসপাতালেই নার্সের কাজ শেখে। তাহার পর সেখান হইতে মাদ্রাজে যায়। মাদ্রাজের এক মিশনরি সাহেবের সাহায্যে সে বিলাত পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। নার্সিং এবং ছেলে-প্রসব-করানো বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করিয়াছে। ভালই রোজকার হয়। বাবাকে কোন কোন মাসে দুইশত টাকা পর্যন্ত পাঠাইতে পারে। অক্ষয়-প্রসাদ সমস্ত টাকা বাবুলের নামে ব্যাঙ্কে জমা করেন।··· নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুর মনে হইল, এখনও সে সুপর্ণ সিংহকে ভালবাসে। আগেও একথা মনে হইয়াছে। আবার হইল।

সূর্য্যসুন্দর নিমীলিত-নয়নে শুইয়া আবার সেই দিবা-স্বপ্নটি দেখিতেছিলেন। নির্জ্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া দিগন্ত-বিস্তারী পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে তিনি একা যাত্রী। তিনি যেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলিয়াছেন। কেন চলিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম আকাশ বর্ণ-বিচিত্র। সেই বর্ণ-বিচিত্র ভেদ করিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। অনিবার্য্য অশ্রান্ত গতিতে আসিতেছে। কিন্তু কে, ওকে—

"কে, ওকে—"

তদ্রার ঘোরে সূর্য্যসুন্দর কথা কহিয়া উঠিলেন।

"বাবা কিছু বলছেন?"

ঊর্ম্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল।

সূর্য্যসুন্দরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া প্রথমে মেটের মশারাটা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর ঊর্ম্মিলার মুখটা। বুঝিতে পারিলেন, তিনি পথ চলিতেছেন না, বিছানাতেই শুইয়া আছেন। তাঁহার পুরাতন খাটের উপরই শুইয়া আছেন, তাঁহার পুরাতন শয়ন-গৃহে। মনে পড়িল এ রকম স্বপ্ন আর একবার দেখিয়াছিলেন।

"বাবা, কিছু বলছেন?"

"না। কুমার কোথা"

"তিনি বাগানে গেছেন, পাখীর মাংস রান্না করছেন সেখানে"

"ও"

সূর্য্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন।

একটু পরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিলেন চন্দ্র-সুন্দর। ঊর্ম্মিলাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সন্ধের পর এইখানে বসে' গীতা পড়ব। তুমি মা মেঝেটা গঙ্গাজল দিয়ে একটু নিকিয়ে দিও, কেমন? মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুনের রান্না এইখানটায় বসে' খেয়েছ তো তোমরা, তার উপর বসে গীতা পড়াটা কি ঠিক হবে—"

ঠিক হইবে কি না এ প্রশ্নের উত্তর ঊর্ম্মিলা দিল না।

কেবল বলিল, "আমি গঙ্গাজল দিয়ে এখুনি ধুয়ে দিচ্ছি মেঝেটা"

১৩

কুমারের বাগানের ঘরটিতে মাংস চড়াইয়াছিল।

ঘরের বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ঘোর শীতও। নানা সুরে নানারকম নৈশ কীট পতঙ্গ চীৎকার করিতেছে, একটা পেচকের কর্কশ কণ্ঠও শুনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। ঘরের ভিতরে কয়লার উনুনের উপর প্রকাণ্ড মাংসের ডেকচিতে মাংস ফুটিতেছে, মশলাভাজার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। ল্যাংড়া চাকরটা ঘরের এককোণে আপাদমস্তক চাকা দিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা বস্তা বুঝি কোণে ঠেসানো আছে। ইহারা মশারীতে অভ্যস্ত নহে, আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়া মশা হইতে আত্ম-রক্ষা করে, দম বন্ধ হয় না। মশা বেশি নাইও, কারণ কুমার চতুর্দ্দিকে ফ্লিট্ ছিটাইয়াছিল। কুমারের পায়ের কাছে ছুঁচ্‌কি সামনের পাবার উপর মুখটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মাঝে মাঝে কুমারের মুখের দিকে চাহিতেছিল, মাঝে মাঝে কান খাড়া করিতেছিল, কিন্তু কোন শব্দ করিতেছিল না। ল্যাং-ল্যাং ঘুমাইতেছিল।

ঘরের একধারে পেট্রোম্যাক্স জ্বলিতেছে. কুমার তাহার কাছেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া বাবার স্মৃতিকথা'য় মন দিয়াছে। তাহার পাশেই রহিয়াছে একটি গুলি-ভরা বন্দুক। গোটাদুই বড় বড় ব্যাঙ্ আসিয়া জুটিয়াছে, লাফাইয়া লাফাইয়া পোকা ধরিয়া খাইতেছে। অনেক দূরে কোথায় যেন মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। থানার বর্ত্তমান দারোগা সাহেব মাঝে-মাঝে কারণে-অকারণে বন্দুক-আওয়াজ করেন। তিনি বলেন—ঘরে আলো আসিয়া রাখিলে এবং মাঝে মাঝে বন্দুক আওয়াজ করিবে। যাহার বন্দুক নাই সে শাঁখ বাজাইতে পারে, যাহার শাঁখ নাই সে গলা-খাঁকারি দিক। তাই কুমারের মনে হইল দারোগা সাহেবই বোধহয় বন্দুক আওয়াজ করিতেছেন। কুমারের এসব দিকে কিন্তু ততটা মন ছিল না, সে নিবিষ্ট চিত্তে বাবার বাল্যজীবন কাহিনী পড়িতেছিল।

"যথা সময়ে আমি দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেলাম। ভরতির দিন দিদিমার আদেশে বাড়ির অ্যান্ত ঝি চাল ডাল তরিতরকারি ফল-মূল দিয়া সাজাইয়া একটি সিধা দীনু পণ্ডিতকে দিয়া আসিয়াছিল। সিধার সহিত একখানি নয়ন-পাড় ধুতি এবং একটি লাল গামছাও ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে দীনু পণ্ডিত খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দিদিমা মাঝে মাঝে দীনু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতেন। এই সব কারণেই সম্ভবত দীনু পণ্ডিত আমার উপর একটু প্রসন্ন ছিলেন। পাঠশালার প্রথম দিন গিয়াই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলাম। গিয়া দেখি নবীন চৌদ্দ-পোয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই বিস্তৃত হাতের উপর দুইখানি ইট। চৌদ্দ-পোয়া শাস্তিতে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হইত, দুই পায়ের মাঝখানে চৌদ্দ-পোয়া অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত ব্যবধান থাকিত। নবীনের অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিদিমার কৌশলে আমি দীনু পণ্ডিতের কোপ-কবল হইতে কিছুটা রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য খুব নিরীহ ছেলে ছিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বালাইবার মতো ইন্ধন আমার ছিল না। সে ইন্ধন ছিল মন্মথর। বদমায়েসিতে তাহার জোড়া আমি হইতে পারি নাই, যদিও তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব খুব হইয়াছিল। মন্মথ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায়ই শাস্তি পাইত। প্রায়ই তাহাকে 'ঘুঘু-ঘোড়া' হইয়া বসিতে হইত। মন্মথও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। সুযোগ পাইলেই অন্ধকারে পণ্ডিত মহাশয়ের বাগায় ঢিল ফেলিত। গোলক পণ্ডিতের নিকট আমি কিছু শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম। শিশুবোধক, ধারাপাত শেষ হইয়াছিল। হাতের লেখাও অনেকটা মক্সো করিয়াছিলাম। কিন্তু দীনু পণ্ডিত ঘোড়া হইতে আবার নব শুরু করিলেন। দিদিমাকে গিয়া বলিলেন—'মা, ভাগ্যে আপনার নাতিটিকে এখানে এনেছিলেন। ওই অজ পাড়াগাঁয়ে গোলক পণ্ডিতের কাছে থাকলে হয়েছিল আর কি। ও তো একটি গুবাকাণ্ড হয়েছে।' দিদিমা বুদ্ধিমতী ছিলেন, গোলক পণ্ডিতের কাছে আমি কতটা বিদ্যার্জ্জন করিয়াছি তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি দীনু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ করিলেন না। বলিলেন, "এখন তোমার কাছে এনে দিয়েছি বাবা—তুমিই ওর ভার নাও, ওকে মানুষ করে তোল।" দীনু পণ্ডিত সাহ্লাদে বলিলেন "নিশ্চয়, নিশ্চয়, করব বই কি। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করাই তো আমার কাজ। ওই যে রামবাবুর ছেলে ঘোঁতা, যেমন বোকা তেমনি পাজি ছিল। কারো গাছে ফল থাকবার যো ছিল না ওর জ্বালায়। আম জাম পেয়ারা কুল প্রত্যেকটি গাছ মুড়িয়ে খেত ছোকরা, আর বাকী সময়টা ছিপ নিয়ে বসে থাকত গঙ্গার ধারে। রামবাবু ওরে একদিন ধরে' এনে আমার হাতে সমর্পণ করে' দিলেন। ওকে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিট্ করেছিলাম। এখন রেলের টালি ক্লার্ক হয়েছে জানেন বোধ হয়।" দিদিমা বলিলেন, "হাঁ, তোমার নাম ডাক তো খুব। সুধির ভারটিও তুমি নাও বাবা। ওর মায়ের ওই একমাত্র ভরসা। বাপ তো থেকেও নেই—"

দিদিমার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া আসিয়াছিল। দীনু পণ্ডিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমার ভার তিনি বহন করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপে তিনি তো আমাকে শাসন করিতেনই—অবশ্য খুব একটা মারধোর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে

না—আমার হাতের লেখা অঙ্ক এবং ভাষা জ্ঞানও যাহাতে অনিন্দনীয় হয় সে বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পাঠশালাতেই আমি ধারাপাত, শুভঙ্করী এবং লোহারামের ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।

এতদিন পরে আমার সেই পাঠশালার জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া দুই তিনটি বন্ধুর কথাই কেবল মনে পড়িতেছে। মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী এবং দিবাকরের কথা। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রত্যেকেই আমার পরবর্ত্তী জীবনকেও কম প্রভাবিত করে নাই। মন্মথ ছিল বেশ মিশুক এবং সরল। চমৎকার গান গাহিতে পারিত। অভিনয়েও দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে যে সব যাত্রা হইত মন্মথ ছিল সে সবের উৎসাহী দর্শক। মামার এবং দিদিমার কড়া শাসনে আমার ভাগ্যে প্রায়ই যাত্রা দেখা ঘটিয়া উঠিত না। আমি যাত্রা-দেখার আনন্দটা উপভোগ করিতাম মন্মথর সহায়তায়। সে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যাত্রার গান বক্তৃতা আমাদের শুনাইত। তাহার গানের গলা অসাধারণ ছিল, যেমন চড়া, তেমনি মিষ্ট। বক্তৃতাও খুব ভালো করিত। তাহার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ি যাইতাম। মন্মথর মা শুভঙ্করী দেবী সত্যই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। বৈকালে যেদিন তাঁহার বাড়িতে না যাইতাম তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, চাকর পাঠাইতেন আমার খবর লইবার জন্য। চাকরের সঙ্গে আবার আমাকে যাইতে হইত। গিয়া দেখিতাম আমার জন্য খাবার ঢাকা-দেওয়া রহিয়াছে। সেটি সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইয়া, তাহার পর চাকর সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। দিদিমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। ইহার সূত্রপাত হয় আমরা সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পরেই। কথায় কথায় একদিন বাহির হইয়া পড়ে তাঁহার বাপের বাড়ি একই গ্রামে। আমার মা যে স্বামী-পরিত্যক্তা ভাগ্যহীনা এবং আমি যে পিতৃহীন অনাথেরই মতো—একথা প্রায়ই আলোচনা করিতেন তাঁহারা। সম্ভবত এই সব কারণে এবং দিদিমার ইঙ্গিতে তিনি আমার বৈকালিক আহারের ব্যবস্থাটা করিয়াছিলেন। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ-রকমের ছিল। সকালে ব্যবস্থা ছিল মুড়ি কিম্বা বাসী রুটি এবং পাতলা গুড়। পাঠশালায় যাইবার সময় ভাত, কলাইয়ের ডাল এবং বাসী অম্বল ছাড়া আর কিছু থাকিত না। মাঝে মাঝে আলু ভাতে থাকিত। পাঠশালা যাইবার সময় তরকারি বা মাছ খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া ঠাণ্ডা তরকারি, (কচিৎ কোনদিন মাছ) দিয়া ঠাণ্ডা ডাল-ভাতই ছিল বরাদ্দ। আমি মন্মথর বাড়ি হইতে প্রত্যহই কিছু ভালোমন্দ খাবার খাইয়া আসিতাম; কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন সন্দেশ, কোনদিন দুধের সর বা চাঁচি, যেদিন লুচি পরোটা থাকিত সেদিন তো হাতে স্বর্গ পাইতাম। মন্মথর বাড়ি হইতে ফিরিয়া মামার বাড়ির বরাদ্দ ডাল-ভাত-তরকারি এবং দিদিমার প্রসাদ খাইতাম। খাইবার খুব যে একটা ইচ্ছা থাকিত তাহা নয়, কিন্তু দিদিমার জেদে খাইতে হইত, মামীমা পাছে কিছু মনে করেন এ ভয়ও ছিল। সংসারে মামীমার আধিপত্য ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, মা ক্রমশ যেন নিজেকে সংসার হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন। তিনি যে বাড়িতে আছেন তাহা বোঝাই যাইত না। কখন খাইতেন, কখন শুইতেন, কিছুই টের পাইতাম না। কখনও তাঁহাকে বসিয়া গল্প করিতে দেখি নাই। সর্ব্বদাই নীরবে কাজ করিতেন। কাজই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা রান্না-করা সবই তিনি একা করিতেন। ক্ষ্যান্ত ঝি কেবল মাছ কুটিয়া দিত। রান্না আবার দুইরকম ছিল। দিদিমার জন্য শুদ্ধাচারে আলোচালের ভাত রান্না করিতে হইত। আলাদা একটা রান্নাবরই ছিল তাঁহার জন্য। দিদিমা তাঁহার পাত হইতে আমার জন্য প্রত্যহ কিছু আলো-চালের ভাত, মুগের ডাল এবং দুধ রাখিয়া দিতেন। মা সংসারে সব কাজই, এত নীরবে এমন প্রচ্ছন্নভাবে করিতেন যে, তাঁহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না। তাঁহাকে কখনও ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সর্ব্বদা একটি লাল পেড়ে আধময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন, মাথায় সিঁদুর পরিতেন বটে, কিন্তু কেশের প্রসাধন করিতে কখনও দেখি নাই। অনেক চুল ছিল তাঁহার, সেগুলি তাঁহার মাথার উপর স্তূপ হইয়া থাকিত। দিদিমা মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া দেখিতেন এবং চুলে জট পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন শুনিতে

পাইতাম।...এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটাতে মা যেন আরও লজ্জিত, আরও ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। একদিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম—আমার একটি ভাই হইয়াছে। অবাক হইয়া গেলাম। হঠাৎ ভাই আসিল কোথা হইতে? গোয়ালের পাশে যে ঘরটিতে গরুর খড় রাখা হইত সেখান হইতে খড় বাহির করিয়া কখন যে সেটা আঁতুড়-ঘরে পরিণত হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

উঁকি দিয়া দেখিলাম সেই ঘরে মা একখানি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া ছেঁড়া কম্বল ঢাকা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন। পাশেই ছেঁড়া-মেকড়াই-ঢাকা একটি ছুটফুটে শিশু। সে-ও ঘুমাইতেছে। ক্যান্ত ঝির ধমক খাইয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিলাম। একটি মোটা কালো মেয়ে একটি ভাঙা লোহার কড়াই করিয়া কিছু গনগনে কয়লার আগুন লইয়া প্রবেশ করিল। শুনিলাম সেই ধাত্রী, জাতে ডোম। সেই ছেলে প্রসব করাইয়াছে, সেই এখন মায়ের সহিত এই ঘরে থাকিবে, আমরা কেহ এ ঘরে ঢুকিতে পাইব না।

দিদিমার কাছে গেলাম। তিনিও সেই কথাই বলিলেন। চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, "ভাইকে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ, দূর থেকে দেখেছি। খুব সুন্দর। ধপধপ করছে রং, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—"

"হবেই তো। ও যে চাঁদ"—দিদিমা বলিলেন।

"চাঁদ?"

"তুই খুশি, তোর ভাই চাঁদ হবে না? খুব সুন্দর হয়েছে?"

"খুব। চাঁদের চেয়েও ভালো"

"পোড়াকপাল আমার, এই সময়ই চোখের দৃষ্টিটা গেল। ওর মুখ আর দেখতে পাব না"

ইহার পর দিদিমা চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি নীরবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে দিদিমা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। মা-ই প্রত্যহ দিদিমার চুল আঁচড়াইয়া পিছনে ছোট্ট একটি খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। মা আঁতুড়ে ঢোকার পর মামীমা একদিন চিরুণী লইয়া দিদিমার চুল আঁচড়াইতে বসিলেন। দুই একবার চিরুণী চালাইবার পরই দিদিমা থামাইয়া দিলেন তাঁহাকে।

"সর, তোকে আর চুল আঁচড়াতে হবে না। তুই ঠিক পারচিস না। আমি আর চুল রাখবই না। বিশুকে খবর পাঠা, আমার চুলগুলো ছোট ছোট করে' ছেঁটে দিক। এ আপদ আর রাখা কেন—"

পরদিন বিশু নাপিত আসিয়া দিদিমার মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো করিয়া দিয়া গেল। দেখিতে অদ্ভুত হইল দিদিমাকে। ইহার দিন কয়েক পরে ঠাণ্ডা লাগিয়া দিদিমার একটু অসুখ হইল। প্রবীণ ডাক্তার সুরথবাবু দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়ার জন্যই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তিনি মাথায় গরম টুপি, গায়ে গরম জামা এবং পায়ে মোজা পরিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহার পর দিদিমার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। শঙ্কর দরজি তাঁহার জন্য যে জামা করিয়া আনিল তাহা মেয়েদের জামা নয়, ঢিলা-হাতা কোটের মতো পাঞ্জাবী, চায়না কোট তাহার নাম। দিদিমার রং খুব ধপধপে ফরসা ছিল, নাকটি ছিল টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো। তিনি যখন টোপরের মতো কালো মখমলের টুপি ও গরম পাঞ্জাবী পরিয়া বিছানায় বসিয়া থাকিতেন মনে হইত কোনও বৃদ্ধ ইহুদী বুঝি বসিয়া আছে। দিদিমা বলিয়া তাঁহাকে চেনাই যাইত না। মামা খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি দুইবেলা, সকালে-সন্ধ্যায়, দিদিমাকে আসিয়া প্রণাম তো করিতেনই, দূরে কোন 'কলে' যাইবার আগেও প্রণাম করিয়া যাইতেন। মায়ের এই নূতন বেশ তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তিনি মায়ের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে সরু-পাড়-দেওয়া বেগুনী-রঙের একটি চমৎকার বালাপোষও আনাইয়া দিয়াছিলেন। বালাপোষটি গায়ে দিলে দিদিমাকে আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহার মুখভাব ক্রমশ শিশুর মুখের মতো হইয়া আসিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইত যেন একটি শিশু কোনও মন্ত্রবলে হঠাৎ বড় হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে...'

কুমার তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল এবং কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল বাবার দিদিমা সত্যই কেমন দেখিতেছিলেন।

ক্রমশঃ

'সোনার তরী'র আধ্যাত্মিকতা

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

বর্তমান যুগে একটা বিশেষ ভাবপ্রবণতা দেখা দিয়াছে। এই ভাব-প্রবণতা—সব কিছুকেই মাটির বা রক্ত মাংসের পানে রূপে ধাবিত। রবীন্দ্র-কাব্য এই ধারার হাত থেকে নিস্তার পায় নাই। মনে হয় 'কমুনিজম্'ই ইহার মূল। বিশেষ শ্রেণীর লেখক ও অধ্যাপক শিক্ষা দিতেছেন—"রবীন্দ্রনাথ মাটির গান গাহিয়াছেন। কোথাও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নাই। আধ্যাত্মিকতা একটা ধোঁয়াটে কথা।"

ইহা স্বীকার করা অসম্ভব। 'অধ্যাত্ম' শব্দের যথার্থ অর্থবোধের অভাবই তাঁহাদের প্রকৃত অর্থ হইতে দূরে স্থাপন করিয়াছে। কোন আদর্শ দেহে বা স্থূলে সীমাবদ্ধ নহে। আদর্শ দেহাতীত। যাহা দেহাতীত তাহাই মাটির বা রক্ত মাংসের অতীত। মাংসাতীত হইলেও আত্মাতীত নহে। এই আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যাহা ঘটে তাহাই আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতা কাল্পনিকতার লীলা বিলাস নহে। কল্পনা ও কাল্পনিকতার যে পার্থক্য তাহা সুবিদিত। রবীন্দ্র-প্রতিভায় কল্পনা আছে, কাল্পনিকতা নাই। কল্পনা ও রক্ত মাংস এক নহে।

'সোনার তরী'তে কল্পনার প্রমাণ পাই—

আজ কোন কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে
রুদ্ধদ্বার প্রমোদিত, এসো তুমি প্রিয়ে,
আজিকে সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনাতীতা।

—মানসসুন্দরী।

কল্পনা ছিন্ন কাব্য সম্ভব নহে। শুধু বাস্তব দিয়ে কবিতা হয় না। রক্ত মাংসের গান গাহিতে ও বাস্তবকে ত্যাগ করিয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। তাহা হইলে রক্ত মাংসের গান ও কল্পনার অবকাশ আছে।

কল্পনার বর্তমানতা প্রমাণে আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা বিশেষ অসুবিধা হইবে না। তাঁহার কাব্য সমুদ্রের অমূল্যরতন যে আধ্যাত্মিকতা—তাহা "গীতাঞ্জলি"র নোবেল-পুরস্কার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এখানে 'সোনার তরী'র আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

বেদান্তে সাধনার পথকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—

"সর্বথা তত্ত্বতঃ মমকারঃ, ত্যক্তুমশক্যত্বেৎ সর্বথা কর্তব্যঃ মমকারঃ।"

'আমি' 'আমার' এই দেহ-কেন্দ্রিক বুদ্ধি বর্জনপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত। যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে "সব আমি ও সব আমার চিন্তা করা কর্তব্য।" ইহার অপর নাম বড়-আমির সহিত ছোট-আমির যোগ। এই আত্মার যোগ না হইলে কোন সৃষ্টিই সম্ভব নয়।

'সোনার তরী'র 'রবীন্দ্রনাথ' সব আমির সাধক'। সোনার তরীতে নিজের আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিত হইয়াছেন সেখানে তিনি বিশ্বাসঘাতী। সোনার তরীর 'ছোট আমি' আর কিছু নেয়া—বড়-আমির রক্ত মাংস। জনৈক লেখক লিখেছেন—"মহাকাল দেহী আমিটিকে নেন না, কিন্তু আমার কর্ম কৃতিত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে ভাবময়-আমি, আমার কর্মকে মর্যাদা দিয়ে প্রকাশান্তরে সেই ভাবময় আমি সত্তাটিকে, কবির ভাষায়, বড় আমিটিকে, তরীতে নেন বসিয়ে।"

কেবলমাত্র বিশ্বাসই নাম নাই—কারণও আলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "বৈষ্ণব সন্ধ্যাস" রাখালের গানের মধ্যে পেয়েছেন অন্তরের সন্ধান—বড় আমির সন্ধান।

"কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা
কত অমূলক আশা, অন্তহীন কামনা,
অনন্ত বিষাদ! দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
মেলিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে।"

বর্ষা যাপনের অনুভূতির ধারা-স্রোত হইয়া চলিয়াছেন ধারার উৎপত্তির সন্ধানে অর্থাৎ পরমপুরুষের সন্ধানে। পরমপুরুষ কখন তাঁহার ছোট-আমিকে সোনার রূপান্তরিত করিয়া বিরাজে তাহা তিনি স্বয়ংই জানিতে পারেন নাই। ছোট-আমি ব্যবহারিক মূল্য ও সৌন্দর্যকে অধিকতর বর্দ্ধিত করেছে। তথাপি তাঁহার শান্তি নাই। তখন তিনি অনুভব করেছেন প্রেমই সকলের মূল। প্রেমই বিশ্বের প্রথম কথা এবং প্রেমই বিশ্বের শেষ কথা। এইখানেই কাব্যের, বিজ্ঞানের, সাধনার আরম্ভ। কাব্যের কথা—"শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।" প্রথমেই হৃদয়ের প্রেমের উৎপত্তি, নতুবা সহানুভূতি প্রকৃতির অস্তিত্ব কোথায়! যদি নিজের বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে বেদনার উৎপত্তিই হইতে পারে না। পরিণামে কাব্য বা রসের উৎপত্তি অসম্ভব।

প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এখন জানী না হইয়া ভক্তে রূপান্তরিত হইলেন। বৈষ্ণব কবিতায় তাঁহারই পরিচয় মিলে। এখানে সব 'তুমি'র খেলা। তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

হেরি কার মরমে,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?

ভক্ত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ভানুসিংহের পদাবলি, গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে লেখা আছে। তাঁহার অন্তরের অমাহত—ধ্বনি তাঁহার 'পূরস্কার' কবিতায় শুনিতে পাই—

যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি,
তারারে দিয়েছে ধ্রুবর তরী।
জানেনা আপনা, জানেনা ধরণী,
সংসার ভোলাহেন।

এই ধ্বনি যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকর্ষণ করিতেছে। কেহ তাহিতেছে সংসার, কেহ প্রাণ, কেহ বা মুক্তিধাম। রবীন্দ্রনাথ আজ বিমোহিত সেই অমরের রবে।

আলোচনার কোথাও আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা তাহা সুধী-সমাজের বিচার্য। বর্তমান যুগ ঐহিকতার মুখে প্রণতিত হইতে বসিয়াছে। সেই ঐহিকতাই প্রকৃত অর্থ সন্ধানের কষিতে দেয় না। রবীন্দ্র প্রতিভার দুইয়ের সমন্বয়ে সার্থকতা ও আধ্যাত্মিকতা ঘটিয়াছে, রবীন্দ্র প্রতিভা হইতে আধ্যাত্মিকতা বর্জন করিলে প্রতিভাকে পঙ্গু করা হইবে। অপর পক্ষে যদি কেহ মনে করেন যে, আত্মবাদকে ত্যাগ করিলে তাহা হইলে তিনিও একদেশদর্শী পদবাচ্য হইবেন। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর মূল কথা 'ক্ষেত আমি'র সহিত 'ফড় আমি'র, দেহের সহিত দেহাতীতের, মনের সহিত প্রাণের, সীমার সহিত অসীমের, নিকটের সহিত দূরের সংযোগ স্থাপন।

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অদ্ভুত এই মুঘলবংশ। এই বংশের রক্তধারায় চাঘতাই তুর্ক, খর্পাত মোঙ্গল, ভয়মীয় পারসিক, নবনীর ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। এদের জন্মের ভাষা তুর্কী, ধর্ম্মের ভাষা আরবী, রাজভাষা ফারসী, মাতৃ-দুগ্ধের ভাষা হিন্দুস্থানী। ভারতের মুঘলদের মাতৃকুলে বিখ্যাত বীর যোদ্ধা কারাকোয়ানের চেঙ্গিজের রক্ত, পিতৃকুলে সমরখন্দের চাঘতাই বীর তাইমুরের রক্ত। তৈমুর গর্ব অনুভব করতেন, তিনি মোগলকুলের জামাতৃবংশে। সেইজন্যই তিনি নিজেকে আমীর তৈমুর গুরগণ (জামাতা) বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। চেঙ্গিজের তরবারির ছিল আকণ্ঠ রক্ত পিপাসা—লাট লক্ষ শত্রুর রক্তে তিনি তাঁহার তরবারির পিপাসা নিবারণ করেছিলেন—অথচ এই চেঙ্গিজ খান বিভিন্ন ধর্ম্মের সত্য ও তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্য একদিন পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মগুরুদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। একযোগে ব্যাপী সম্মেলনের আলোচনা অনুধাবন করে চেঙ্গিজ বলেছিলেন—সমস্ত ধর্ম্মেরই অন্তরালে ন্যূনাধিক সত্য নিহিত আছে। যে কোন ধর্ম্মের মধ্যদিয়েই ইষ্ট লাভ করা যায়। প্রতিদিন গভীর রাত্রে সপরিবারে তিনি মুক্ত আকাশতলে নতজানু হয়ে নক্ষত্র রাজিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন।

এই মুঘলবংশের পূর্ব্বপুরুষ সমরখন্দের বিতাড়িত ও পলাতক অধিপতি চাঘতাই বীর তাঘাবাই সমরখন্দের বনভূমিতে সামান্যমাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় লাভের জন্য অনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণ করছিলেন। তখন দ্বিপ্রহরের মধ্যাহ্নে অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি আপন মহিমা বিস্তার করছিল। তাঘাবাই জন-মনুষ্যবিরল বনাঞ্চলে বহু ঘুমন্ত একটি শব্দ শুনে চকিত হয়ে উঠলেন। এমন শব্দ এই নির্জ্জনে অশ্রুতপূর্ব্ব। সে যেন ছিল একজন যোদ্ধা। তাঁর মাতা নমাজের-পবিত্র আল্লাহু—আল্লাহু আকবর। তাঘাবাইয়ের কর্ণে এই শব্দ ও সুর অত্যন্ত নূতন, অথচ অতি মধুর বলে মনে হল। তাঘাবাই এই শব্দ অনুসরণ করে উপুক্ত তরবারী হস্তে শব্দের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করলেন। একই শব্দ—একবার, দুইবার, তিনবার। দূর থেকে তাঘাবাই দেখলেন, দীর্ঘদেহ আজানুলম্বিত পরিচ্ছদে লোহিত, শিরে হরিৎবর্ণ শিরস্ত্রাণ, অথচ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এই বনভূমিতে অস্ত্রহীন অশ্বহীন পদচারী মানবের দর্শন অশ্রুতপূর্ব্ব। সেই দীর্ঘদেহ পুরুষ অস্তায়মান সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁহার দুই হস্ত একবার দুই কর্ণে, অন্যবার দুই জানুতে রেখে সেবার নতজানু হয়ে আনুমি প্রণত হল। আবার—একবার, দুইবার, তিনবার। সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি সুললিত কণ্ঠে সেই মহান বাণী আল্লাহু আকবর। ততক্ষণে বিস্মিত, চকিত, মুগ্ধ তাঘাবাই সেই দীর্ঘদেহ মানুষটির পশ্চাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁহার ছায়া আগন্তুকের দেহ অতিক্রম করে গেল—কিন্তু আগন্তুকের ভ্রূক্ষেপ নাই—সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করে কৃতাঞ্জলিপুটে পশ্চিম আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত শান্তস্বরে আমার মোর্য প্রার্থনা করছিলেন। তাঘাবাই আগন্তুকের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?" আগন্তুক নির্ভয়ে উত্তর দিল—"আমি মুসলিম। আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করছিলাম।"

"আল্লা কি তোমার প্রার্থনা শোনেন?"—প্রশ্নের সুরে তাঘাবাই জিজ্ঞাসা করলেন।

"নিশ্চয়ই শোনেন।"

"আমার হয়ে প্রার্থনা কর—আমি আমার পিতৃরাজ্য হতে বিতাড়িত, পলায়িত, নিরাশ্রয়। আমি এই গভীর বনবনে আশ্রয় লাভের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছি। আমার স্বতরাজ্য আমি উদ্ধার করব। তুমি আমার

জন্য প্রার্থনা কর। তোমার আত্মা যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তবে আমি তোমার আত্মাকে স্বীকার করব—তোমার ধর্ম গ্রহণ করব।"

সম্রাট সেলিম আপনার আত্মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—তারপরের যুদ্ধে তাঁহারই জয়লাভ করলেন। তিনিই প্রথম চাঘতাই তুর্ক—যিনি 'ইসলাম ধর্ম গ্রহণ' করেছিলেন। মোগল আইন্‌বাব এবং আকবর মোগল সমরখণ্ডে চাঘতাই বংশ প্রতিষ্ঠিত হল। এই তারাগাইবেরই পুত্র বিখ্যাত খঞ্জরীব হৈবুব।

একবা আর্সি-আদিয়ানি বাদশাহ আকবর শিকার অন্বেষণে অযোধ্যাঞ্চলে যাইবার পথে দেখেন, অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করবেন সম্বৎসা হরিণী। শিকারের উন্মাদনায় বাদশাহ আকবর তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন—অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিক থেকে একটি আহ্বান শুনলেন—আকবর! আকবর স্তম্ভিত হলেন—এই গভীর অরণ্যে তাঁর নিক্ষেপের অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে কে তাঁকে বাধা দিল? পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আকবর দেখলেন—চতুর্দিকে বিরাট শূন্যতা, জনমানবের কোন চিহ্ন নাই। এই অবসরে হরিণী বহুদূর পথ অতিক্রম করে গেল। আবার আকবর দ্রুততর বেগে হরিণীর নিকটে উপস্থিত হলেন। আবার স্মৃতিকে তা সংযোজন করলেন—তাঁর নিক্ষেপের মুহূর্তে আবার সেই অশরীরী আহ্বান অতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। আকবর অবধারণা সংযত করে তৃতীয় নিক্ষেপ করলেন, সেই বিরাট মহাপুরুষ—কার এই আহ্বান? হরিণী ইচ্ছা করলেই শিকারীর দৃষ্টিপথ হতে বহুদূর অতিক্রম করতে পারত—কিন্তু হরিণ শিশুর মায়াতে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছিল। ইতোমধ্যে আবার আকবর হরিণীর নিকটে উপস্থিত হলেন—যৌবনকাল, অসংযত উদ্যম—শিকারের উন্মাদনা, অব্যর্থ লক্ষ্য, হরিণীকে বধ করতেই হবে। আবার শর নিক্ষেপের জন্য উদ্যত হলেন—পশ্চাদ্দেশ থেকে আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—"আকবর, তুমি কি এইজন্য জন্মগ্রহণ করেছ?" ইতোমধ্যে আকবরের নিক্ষিপ্ত শর হরিণী-মাতাকে আবদ্ধ বিদ্ধ করল। হরিণী মাতার করুণ দৃষ্টি আকবরের দিকে নিবদ্ধ ছিল। হরিণ শিশু সুপরিচিতা মাতার গাত্র স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রইল। আকবর অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে হরিণীর দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ণে অনবরত ধ্বনিত হচ্ছিল সেই ধ্বনি—"আকবর! তুমি কি এইজন্যই জন্মগ্রহণ করেছ?"

সেই মুহূর্ত হতে সম্রাট আকবরের মনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল। দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধানে হিন্দুস্থানে এক নূতন তথাগত বুদ্ধের অভির্ভাব হল, শাহানশাহ আকবর রাজকীয় শিকার নিষিদ্ধ করে দিলেন। রাজকীয় রন্ধনশালার জন্য পশুবধও প্রায় নিষিদ্ধ হয়েছিল। সমস্ত রাজ্যে পবিত্র নামাজের দিন পশু হত্যা নিষিদ্ধ হল। তিনি একদিন দুঃখ করেছিলেন—"কেন মানুষ আহারের জন্য জীব হত্যা করে? আমার যদি এত বিরাট দেহ হত যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমার মাংসে তৃপ্ত হত আমি আল্লাকে ধন্যবাদ দিতাম।" এই মহাপুরুষ সমস্ত ভারতবর্ষকে এক মহান আদর্শে উদ্বোধিত করে, এক বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে স্বপ্ন সাহজাদা দ্বারা সিকো সফল করতে পারতেন—কিন্তু দুর্ভাগা হিন্দুস্থান—তোমার রাজো সে বিরাট পুরুষের স্বপ্ন সফল হল না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন জয়পুর মিত্রির পুণ্যশ্লোক মহারাজ সেলিম চিশতীর আশীর্বাদপুত সন্তান—যোধপুর রাজকন্যা ধর্মপ্রাণা যোধবাইয়ের পুত্র। সেলিম চিশতীর পবিত্র খানকার পবিত্র ধূলিতে শাহেনশাহ সেলিম প্রথম ধরণীর ধূলি স্পর্শ করেছিলেন। আকবর সেলিম চিশতীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁহার সন্তানের নামকরণ করেছিলেন "সেলিম।" এই সেলিম সর্বধর্ম সমন্বয়ী ইবাৎখানার পুণ্য আবেষ্টনীর মধ্যেই শৈশবের শিক্ষালাভ করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ আবদুর রহিম খানখানান ছিলেন তাঁহার বাল্যের শিক্ষাগুরু। খানখানান ছিলেন জন্মে তুর্কী, সংস্কারে সম্পূর্ণ ভারতীয়, তিনি তপধানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে বলেছিলেন—আমি তোমার শরণাগত। এই জগৎ উদ্ধারের জন্য তোমার শরণ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।*

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, জীব জন্তুর প্রতি দয়া—সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রবাদরূপে প্রচলিত ছিল। রাজ্যের দীনতম প্রজা ও বিচার প্রার্থনা করে যেন প্রত্যাখ্যাত না হয় এজন্য পিতামহ ফিরুজ-শকালী তাহার রাজপ্রাসাদে এক বৃহৎ ঘণ্টা সংযোজিত করেছিলেন। মুঘল পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের ন্যায়নিষ্ঠা। যে কোন প্রজা দিন রাত্রি যে কোন মুহূর্তে ঘণ্টাধ্বনি করে বাদশাহের নিকট বিচার প্রার্থনা করতে পারত। আমি শুনেছিলাম একদিন বাদশাহ জাহাঙ্গীর মৃগয়ায় নির্গত হয়েছিলেন—একটি নিলের ধারে একটি হরিণী জলপান করতে এসেছিল—নির্ভয়, নিঃশঙ্ক; পার্শ্বে ছিল এক রজক।—নিলের জলে বস্ত্র ধুচ্ছিল। হরিণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত শর দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হল। সেই রাজমোহরাঙ্কিত শর নিরপরাধ রজকের বক্ষ বিদ্ধ করল। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই দুঃসংবাদ জানতেন না। পরদিন প্রভাতে রজকিনী শরবিদ্ধ রজককে রাজপুরীর সম্মুখে নিয়ে এসেছিল—ঘণ্টাধ্বনি করে, বাদশাহের নিকট বিচার প্রার্থনা করল। অভিযোগ এক নিষ্ঠুর ব্যাধ শরের আঘাতে তার স্বামী হত্যা করেছে। সে বাদশাহের নিকট বিচার প্রার্থনা করল। সম্রাট আদেশ করলেন মৃত রজকের দেহ থেকে শর বিচ্ছিন্ন করা হউক। শর পরীক্ষা করে বাদশাহ নিঃসন্দেহ হলেন বিগতদিনের হরিণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত শর এই রজককে নিহত করেছে। বাদশাহ স্তম্ভিত হয়ে উঠলেন। তারপর বিচার করলেন—"রজকিনী, আমি বিচার করছি যে অপরাধী তোমাকে স্বামীহীনা করেছে, তার শাস্তি স্বরূপ তুমি তার পত্নীকে স্বামীহীনা করে সে দুঃখের ক্ষতিপূরণ করবে। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান রজকিনীকে লক্ষ মুদ্রা দান করে স্বামীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এই ন্যায় বিচারের ফলে মুঘল রাজবংশের উপর আল্লাহর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল।

একদিন একজন সর্বত্যাগী ফকীর সম্রাট শাহজাহানকে আশীর্বাদ

* পতি শরণাগত রামচন্দ্র কী তবদাতার ন নাকী।
ও রহিমন জগৎ উদ্ধারকারী আর না কছু উপায়।

করে একটি আপেল প্রসাদ দান করেছিলেন—সেই আপেলের অনুরূপ বর্ণ গন্ধ রূপ কোন আপেলের মধ্যে কেউ কখনও দেখে নাই। ফকির বলেছিলেন—"শাহজাদা, তুমি প্রতিদিন নামাজের পূর্বে এই আপেল স্পর্শ করবে—এই স্পর্শে তোমার অঙ্গুলি অপূর্ব গন্ধ পূর্ণ হয়ে যাবে। এ আপেল বিষাক্তার আরোগ্যকারী। এ আপেল যেদিন তুমি হারিয়ে ফেলবে, সেদিন হবে তোমার জীবনের চরম দুঃখের দিন।" বাস্তবিকই বাদশাহ শাহজাহান ভ্রাতৃবিরোধের পূর্ব মুহূর্তে বহু অনুসন্ধান করেও আপেলের সন্ধান পান নাই।

অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাসী এই বাদশাহ আলমগীরের তিনি বক্ষের যুদ্ধের দিনে সূর্যোদয় থেকে অবিশ্রাম সৈন্য চালনা করে চলেছেন। মুহূর্ত-মাত্র বিশ্রাম নাই—অগণিত শত্রু সৈন্য চুর্ণ সৈন্যকে বেষ্টন করে অগ্রসর হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের জীবন পণ্ডপ্রায়। তাঁর আত্মরক্ষের পশ্চিম আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেদনের সুরা অপরাহ্ণ। সন্ধ্যার নমাজের সময় উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে নতজানু হয়ে নমাজ সম্পন্ন করলেন। তাঁহার এই নিষ্ঠা ও অটল ধর্মবিশ্বাস দেখে শত্রু সৈন্য অভিভূত ও বিমূঢ় হয়ে গেল। অল্পের মধ্যেই বাদীর যুদ্ধ প্রচণ্ড বিক্রমে অস্ত্রের মুখ পরিবর্তন করে—যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করলেন।

সেদিনের আত্মরক্ষের আর আজকের বাদশাহ আলমগীর। পার্থক্য আকাশ পাতাল।

ক্রমশঃ

রজনীর তীরে মম তরীর বেদনা

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নাহি আর এক-হয়ে-থাকা অবকাশ, ফুল-ফোটাবার আশা
মুছে গেছে অশ্রুজলে—তবু কেন সম্ভোগের অতৃপ্ত তিয়াষা
সাগর সঙ্গম তরে তটিনীর মত!
সুদূর্ণ সৈকতে তব উপনিবেশের আয়োজন করে বৃথা
তরুণ যাত্রীর দল। মৃত হয়ে গেছে কত জীবন-সবিতা
কত প্রাণ হোলো শেষে উপল-আহত!

মায়া-মুকুরের বুকে আজো তব প্রতিচ্ছায়া যেন মরীচিকা,
তৃষাতুর প্রেমিকেরে দেয় ব্যথা, মত্ত করে তব রূপশিখা—
অনঙ্গেরে—জাগে চিত্তে উদগ্রচেতনা।
তুমি যেন চোরাবালি, তবু তব পানে ছুটে যায় মনপ্রাণ!
মর্মের মর্মর বাণী রহিল গোপনে তব, গাহিবে কি গান?
রজনীর তীরে মম তরীর বেদনা।

বিদায়ের দিনে কবে করেছিলে মিলালাস মিলনের দিন
প্রথম প্রেমের লাগি! সিঁদুরের ছোঁয়া লেগে কল্পনা-রঙীণ
হোলো ছিন্নমেঘ, চাঁদ উঠিবার আগে!
প্রণয়-সংযোগ যাদু তোমার আমার ছিল যেখানে একদা,
সেথা আজ দিক্‌ভ্রান্ত কামনার বলাকারা কহে কত কথা,
মোর সাধ হয় রাণু! শোনাতে তোমাকে।
তোমার মনের সেই হারানো সুরের সনে মোর পরিচয়
পুরানো স্মৃতির পথে, সেথা এসে বিদর্পায় এনেছে বিস্ময়
মধ্য এশিয়ার মরু-বালু গর্ভসম।
নীড় হোতে নীড়ে চকিত নিবিড়ে যারা মৃদুমধু আলাপন
করে পায় মুহূর্ত-মথন সুধা প্রখর তাদের প্রলোভন
কেন মনোহরণের ক্ষণে তিক্ততম!

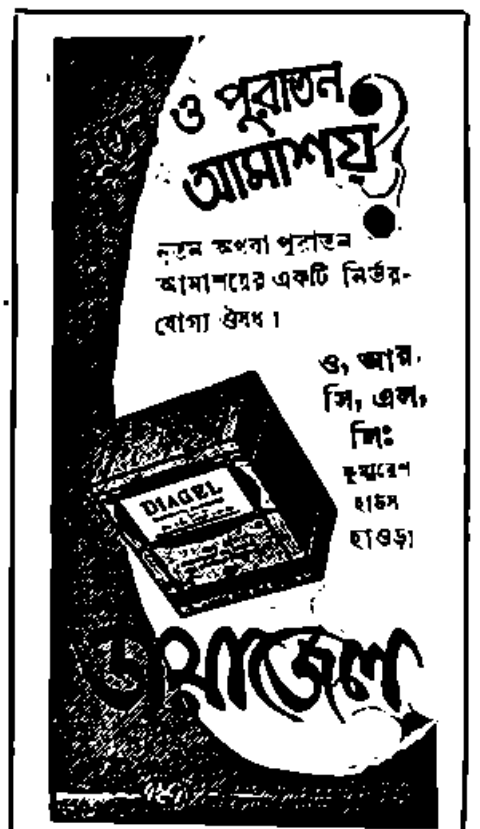

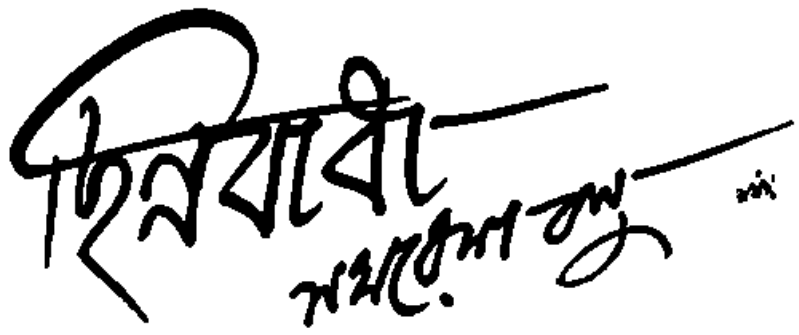

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিমির ঘুম আসে না।

হ্যারিকেনের আলো যতই আড়াল করুক অভয়, যতই অন্ধকার ক'রে দিক নিমির দিকে, তার ঘুম আসে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বই বন্ধ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত জেগে থাকে সে। নিঃশব্দে নয়, সশব্দেই জেগে থাকে। কথা নয়, কথার চেয়েও তীব্র কতগুলি শব্দ আছে। চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী সেই শব্দগুলি আশ্চর্যরকম কার্যকরী।

থেকে থেকে নিমি হঠাৎ এক একটা দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে ওঠে। যার মধ্যে অনেক না-বলা বিদ্রূপ ও বিরক্তি ওঠে ফুটে। কখনো কখনো তার সহসা ককানি শুনে মনে হয়, কি কষ্ট যেন হচ্ছে নিমির। সে যেন কাঁদছে, ছটফট করছে।

আবার কখনো কখনো নিঃশব্দে অভয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ভেবে ভেবে যেন কূল-কিনারা পায় না।

কূল-কিনারা পায় না ব'লেই, তার নিজের দিকে নৈতিক সমর্থনের অভাব হ'য়ে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অভয়ের ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধবেরা। যারা প্রায়ই এ বাড়িতে যাতায়াত করে। অনাথ মিস্ত্রি তাদের মধ্যে একজন। যাকে সবলে ভালবাসে, ভক্তিও করে।

সেই অনাথ অভয়ের নামে অজ্ঞান। অভয়ের ভাল বাখানে পঞ্চমুখ। মন্দ বাখানে রা' নেই।

কিন্তু অনাথদের সঙ্গে নিমিদের মিল কোথায়। অনাথের নামের সঙ্গে ভয় মিশিয়ে আছে। জেল খাটতে, গুলী খেতে যার ভয় নেই, সে অনাথ। যার চার পাশে, অদৃশ্য, ওৎপাতা বাঘের মত পুলিশ ত্রাস বিরাজ করছে, সে হল অভয়ের গুরু। যে অনাথ ওই এক কাজে বউ ছেলে মেয়ে সব হারিয়েছে। যে-মানুষ আগে কোন বাধা রাখে নি, পিছনে রাখেনি কোন টান।

সুবালার কল্পিত কুহকী মায়ায় যত সর্বনাশের ভয় নিমির, অনাথের সঙ্গে ঘোরাফেরা তার চেয়ে কোন অংশে কম ভয় নয় তার।

ভালবাসার কী বিড়ম্বনা নিমির। ভয় তাকে কখনো ছেড়ে যায় না। অকূল ভাবনায় তার ছোট মনটিতে যে কত উদ্বেগ ভ'রে ওঠে, সংসারে সে কথাটা কেউ জানে না। জানতে চায় না। নিমিরও যে বড় দিশেহারা লাগে নিজেকে, চোখ মেলে সেটুকু দেখবার সময় নেই কারুর। চোখও নেই।

এসব কথা ভেবে, নিমিরও যে কান্না উথ্‌লে ওঠে, তা কেউ শুনতে পায় না।

অভয়ও টের পায়, নিমি ঘুমোয়নি। মিথ্যে নয়, নিমির নানান রকম শব্দগুলি তার মনোযোগের ব্যাঘাত করে। মিথ্যে নয়, বইগুলির সঙ্গে অনাথ খুড়োর চাক্ষুষ যোগাযোগ আছে।

কিন্তু প্রথমে প্রথমে নিমি যেমন ক'রে অভয়ের মনকে কুলুপকাটি এঁটে, যখন খুশি খোলা-বন্ধ করতে পারত, আজ আর তা পারে না। নতুন নতুন বিস্ময়ের দরজা তার চোখের সামনে খুলে দেবার যাদুটা শিখিয়ে দিয়েছে অনাথ। সেই বিচিত্রের মাঝে, নিমির ঢোকবার কোন দরজা নেই।

অভয়ের চেয়ে অনাথ কিছু বেশী পণ্ডিত নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ,

'কারিগরী শিক্ষা' ছাড়াও, 'মজুরি ও পুঁজি' নামে বইয়ের কপালে মাথা কোটে অভয়। বইটি তাকে অনাথই দিয়েছে। বানান ক'রে ক'রে, অভয় যেটুকু উদ্ধার করে, 'বাক্য' হিসেবে সেটুকু পড়ার মত হয়। কিন্তু মানে বুঝতে গিয়ে গুরু শিষ্যের প্রায় একই দশা। সহজ হিসেবের এত যে গরমিল, কে জানত। টিপসই দিয়ে 'হুণ্ডা' নেবার বেলায়, কোনদিন মনে হয় না। এই মুজুরির সঙ্গে, সমুদ্রের মত অতল রহস্যময় পুঁজির কোন যোগসাজস আছে, তার সঙ্গে আছে আরো ভারী ভারী কথা। 'উৎপাদন' 'পণ্য' 'ক্রয় ও বিক্রয়' 'সমাজ ব্যবস্থা' 'ধন বণ্টন' ইত্যাদি। কথাগুলি বানান ক'রে প'ড়ে, অভয়ের নিজেরই মনে হয়, বাঁদরের মুঠিতে যেন কেউ মুক্তো ভ'রে দিয়েছে। আড়ষ্ট জিহ্বার কোলে, কতগুলি অর্থহীন শব্দ। প্রলাপের মত।

তবু, কুয়াশা ঢাকা দিগন্তের মত কী একটি অস্পষ্ট আলোকের রেখা যেন চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে অভয়ের চোখের সামনে। তার কোন স্পষ্ট মূর্তি নেই। তার দীপ্ত হাসি ও প্রখর তাপ ফুটে ওঠে না মেঘ-চাপা দিকচক্রবালে। রক্তাক্ত সুগোল অবয়ব নিয়ে তার রথ হয় তো দেখা যায় না।

কিন্তু সে আছে। অনেক কুয়াশা ও মেঘের আড়ালে সে যেমন আছেই আছে, তেমনি অর্থহীন অস্পষ্ট কঠিন কথাগুলির মধ্যেও অনাবিষ্কৃত মানে যেন ঠাহর করা যায়। শুধু বোঝা যায় না।

অভয়ের তাই সব কিছুতেই বড় বিস্ময়। গান গেয়ে সে যেমন বলে, এক থেকে ডাইনে গেলে, শত সহস্র অযুতে কোটিতে তুমি যেতে পার। কিন্তু বাঁয়ে? একেকে কোটিতে নিয়ে যাওয়া যায়। বাঁয়ে যে অসীম ও অনন্ত বিন্দু, তার হদিস কোথায়?

তখন মনে হয়, সবই ওর জটিল ও কঠিন।

অনাথ বলে, অত কথার খোলস না হয় না ভাঙতে পারলুম। জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখ না কেন? ওই প্যাচানো পাকানো কুটুটে কথাগুলোনের মানে জলের মতন সহজ হয়ে রয়েছে সবখানে।

কেমন?

জীবনটা। অবিচার আর অনাচারের ছড়াছড়ি। ঘরে যাও, ঘরে, পথে যাও, পথে; সবখানে। খাওয়া পরা বাস, যেদিকে চোখ দেবে, বড় বড় সব কথার মানে একেবারে সাফ।

অভয়ের তখন মনে হয়, তাও তো বটে!

তবে? এই অবিচার আর অনাচারটাকে জগত জুড়ে চালাবার জন্যে অনেক বড় বড় মাথা খাটানো হয়েছে। সেই মাথা খাটানো— চালাকীটা, আর একজন মাথা খাটিয়ে বইয়ে লিখেছে। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও, মন দিয়ে বোঝা যায়। চোখ মেলে দেখা যায়।

তবু বইয়ের বুকে মাথা কুটে মরে অভয়। যদিও বই তার কাছে পাথরের সামিল। কী যেন আছে, কী যেন নিঃশব্দে বলছে সেই পাথর। সেইটুকু সেই কথাগুলি শুনতে চায় সে। কিন্তু সেখানে সমাজের কথা আছে। সমাজের কথা জানতে গেলে, ইতিহাস আসে। ইতিহাস জানতে গিয়ে। একটা কঠিন দুর্বোধ্য মস্ত গল্পের মত মনে হয়। আশ্চর্য অদ্ভুত গল্প। অভয়ের সামনে নানান পোষাক-পরিচ্ছদ পরা, নানান ধরণের মানুষের মূর্তি ভেসে ওঠে। বিচিত্র সব কল্পনায় পেয়ে বসে তাকে। সে যেন ইতিহাসকে দেখতে পায়। কিন্তু তাকে বুঝতে পারে না।

তবু মনের একটি জায়গা কখনো ভরতে চায় না। হেসে গেয়ে হেঁকে ডেকে যে জীবনটা তার টলমল করত, বেগে বইত, তেমন আর হয় না। কোন্ একটা ঘূর্ণী ধাঁ-ধাঁয় যেন সে আটকে গেছে। সেখানে শুধু নিমির কঠিন মুখ ও বিদ্রূপ চাইনি।

মানুষের অনেক সাধ। নিজেকে ছাড়িয়ে যাবারও তার বড় সাধ। বুঝি সাধনাও। কিন্তু যাওয়া যায় না যেন।

মাঝে মাঝে ছোটোখাটো কারণে, এই আড়ষ্ট জটিলতা কেটে যায়।

ইতিমধ্যে পাড়ার যাত্রার দল যাত্রা করেছে। অভয় বিবেক সেজে গান করেছে। বিশু ছাড়া সুখ্যাতি করেছে সবাই। রতন ঠাকুর, যাত্রা গানের 'কেলাবের' মাস্টার। সে বলেছে, 'এতদিনে একটা খাঁটি বিবেক পাওয়া গেছে দলে। একা এই বিবেক দিয়ে, এখন কলকাতা ঘুরে আসা যায়।'

যাত্রার আসর শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গানের পালা

শেষ হয় নি। এ বাড়ি ও বাড়ি, পাড়ায়, চায়ের দোকানে কারখানায় আরো অনেকবার গাইতে হয়েছে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে বিবেকের গান।

বাজারের মাছের কারবারী গান শুনে মেডেল দিয়েছে। রূপোর জল লাগানো লোহা নয়, এক ভরি ওজনের খাঁটি রূপোর মেডেল। লাল সিল্কের ফিতের বাঁধা, নিজে ঝুলিয়ে দিয়েছে বুকে।

বাগীপাড়ারই বারোয়ারী তলায় যাত্রা হয়েছে। নিমি গিয়েছিল। পাড়ার মেয়েরা কেউ বাকী ছিল না। নিমি দেখেছিল, সুবালাও এসেছে।

মাছের কারবারী শরৎদাস যখন মেডেল দেয়, তখন নিমির দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে নি। তার দুই চোখে যেন খুশির বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল কেউ। আশে পাশের মেয়েদের চাউনির জ্বালায়, মুখখানিকে গম্ভীর করে, মাথা নীচু করে রেখেছিল।

কিন্তু মেয়েদের আসরের মধ্যে, খিলখিল হাসি ও নির্লজ্জ হাততালি শুনে, চমকে দেখেছিল নিমি, সুবালা। সুবালার পাশে বসে, গিরিবালা সিগারেট টানছিল। সে বলেছিল, এই ছুঁড়ি, হাত তালি দিচ্ছিস কেন লো মুখ-পুড়ি? মুখপোড়া মিনসেরা যে সব এদিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সুবালা বলেছিল, থাকুগে। লোকটা মাইরি ভবর গায় গিরিদিদি।

এই পর্যন্তই এসেছিল নিমির কানে। তারপরেই চোখাচোখি হয়েছিল গিরিবালার সঙ্গে। চোখাচোখি না হ'লে, গিরিবালা যে-কথাটি বলত, সেটা তার মুখেই ছায়া পড়ে গিয়েছিল। গিরিবালা বলতে চেয়েছিল সুবালাকে, ভবর গানের গাইয়ে তো তোর ঘরের গাইয়ে।

তাতেও বোধহয় আপত্তি ছিল না নিমির। সে দেখ-ছিল, সুবালার অপলক চোখের আর পলক পড়ছে না অভয়ের ওপর থেকে। যতই দেখছিল, ততই নিমির মুখের সব আলোটুকু আসরের বিজলী আলোও ধরে রাখতে পারেনি। খুশির দীপ্তি নিভে গিয়েছিল একটু একটু করে। একটু একটু করে, স্বামীর জন্যে সব অহঙ্কার উবে গিয়েছিল।

দলের মধ্যে কিন্তু ডেকে কথা বলেনি। ঘরে নিমি মুখ ফুটে বলেনি কিছু আগে। অভয়ই জিজ্ঞেস করেছে। হেসে, অনেক আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, বিবেকের গান কেমন লাগল?

নিমি জবাব দিয়েছে, 'যার ভাল লেগেছে, সে তো আসরে দাঁড়িয়েই হাততালি মেরেছে। শুনতে পাওনি?'

—না তো।

—তবে তোমার কপাল মন্দ। রাত পোহালে যেও তার কাছে। বুকের কাছে দাঁড়িয়ে, শুনিয়ে দেখেখনি।

এর বেশী আর বলতে হয়নি। বুঝতে বাকীও থাকে নি অভয়ের।

তবু, কয়েকটা দিন যেন তার জীবনের বন্ধ দরজা খুলে গিয়েছিল। সেই ঝোঁকের মাথাতেই অনাথ খুড়ো ধরে বসল তাকে। ধরল এমন বে-কায়দায়, একেবারে সভার মধ্যখানে। কারখানার মজুরদের সভা। হাজার হাজার লোক। তার ওপরে লোক এসেছেন কলকাতা থেকে বক্তৃতা দেবার জন্যে। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে, হাততালি দিয়ে তাঁদের সম্মান জানায়।

অনাথ খুড়োরও সেখানে খুব মান। ঘরের চোঙাটার কাছে দাঁড়িয়ে, অনাথ খুড়ো বেমালুম চেঁচিয়ে বলে দিল, আমাদের রিপেয়ারিং ডিপার্টের কবিয়াল অভয়চরণ আজ গান গাইবেন। নিজের তৈরী গান।

অভয় থ। রিপেয়ারিংএর মিস্ত্রিরা হাত তালি দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। জনাকয়েক, প্রায় পাঁজাকোলা ক'রে তুলে দিয়ে গেল তাকে যন্ত্রটার সামনে।

অতবড় বক্তার মত মানুষটা অভয়। যন্ত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, সে বুঝি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে। এ কি করলে খুড়ো?

অনাথ বলল, ঠিক করেছি। পাঁচার মত দিন রাত্তির থম্ ধরে বসে থাকলেই হবে? লোকে তোমাকে আমার সাকরেদ বলে। ওসবে আমার লোভ নেই। তোমাকে বক্তিমে দিতে হবে না, কিন্তু তোমার মধ্যে যাদ যা আছে, তা' ছাড়তে হবে। নে, আরম্ভ কর।

অভয় আবার বলল অসহায় ভাবে, কি আরম্ভ করব অনাথখুড়ো, ব'লে দাও।

অনাথ বলল, তা' আমি কি জানি।

কলকাতা থেকে যারা এসেছেন, তাদের একজন বললেন, আপনি যা পারেন, তাই গেয়ে দিন একখানা।

কিন্তু সভার চীৎকার থামছে না।

অভয় গিয়ে দাঁড়াল সকলের সামনে। মাইকের স্পীকার প'ড়ে আছে তার বুকের কাছে। সে আসর বোঝে, বাসর বোঝে, কিন্তু এ রকম সভায় সে কোন দিন দাঁড়ায়নি। এ রকম সভায় যে-সব গান হ'য়ে থাকে, তাও সে জানে না।

অভয় যেন পাথর হ'য়ে রইল। চীৎকার বাড়তে লাগল। ইতিমধ্যে একজন এসে, মাইকের স্পীকারটা তুলে দিয়ে গেল তার মুখের সামনে।

অনাথ বলল, ধর, ধরে ক্যাল্ পুড়ো।

অভয় শব্দ ভুলে অবাক হ'য়ে গেল। মাঠের চারদিকে তার গলা। সহসা তার নজরে প'ড়ে গেল হরি মিস্ত্রিকে। তার হাতের কাজের গুরু। চেঁচিয়ে বলল, ক গাইব?

শুনে সবাই হেসে মরে গেল।

হরি চেঁচিয়ে বলল, সেই সেইটা, 'গত মহলা গানা···

অভয় চোখ বুজে চীৎকার ক'রে উঠল, আমি গান গাইতে পারি না। আমাকে মাফ করেন সকলে।

কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই নীরব। পর মুহূর্ত্তেই হাসি ও চীৎকারের একটা ধুম প'ড়ে গেল।

অনাথের চোখে কোনদিন তার প্রতি রাগ বা বিরক্তি দেখে নি অভয়। আজ চোখাচোখি করবার সাহস পর্য্যন্ত হ'ল না তার। সে শুধু দেখল, তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, অনাথ চীৎকার ক'রে বলছে, বন্ধুগণ, আমরা আমাদের সভা শুরু করছি। জলালউদ্দীন তার আগে আপনাদের একখানি গান গেয়ে শোনাবে।

অভয় লজ্জায় ও অপমানে তাড়াতাড়ি নেমে এল মঞ্চ থেকে। তারপরে, ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল, কেউ ফিরেও দেখল না।

ক্রমশঃ

মেয়েদের কথা

ছেলেরা চুরি করে কেন ?

সুপ্রিয়া ঠাকুর

মিথ্যা বলা এবং চুরি করা—ছেলেদের এ দুটি বদ-অভ্যাসের সম্বন্ধ, অত্যন্ত নিকট। অর্থাৎ একটা থেকে অন্যটার উৎপত্তি খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে, যে ছেলে চুরি করার পটু হতে চলেছে তাকে নিতান্ত প্রয়োজন বোধেই মিথ্যার সাহায্য নিতে হয়েছে। আবার যে মিথ্যায় পটু, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চুরির প্রতি একটা আকর্ষণ তার আসবেই। কারণ, অপরাধ করে রেহাই পাবার উপায় তার হাতের মুঠোয়। তাই একটার প্রতিরোধ করতে হলে অন্যটার কথা ভুললে চলবে না।

১। ছেলেদের হাত থেকে কোন জিনিষ জোর করে কেড়ে নেবেন না।

ধরুন, আপনি সেলাই করতে বসেছেন, সামনে আপনার বছর দেড়েকের ছেলে খেলা করছিল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হল আপনার কাঁচিটা টেনে নিলে। অথবা তার বাবার ঘড়িটা হাতের কাছে পেয়ে নিয়ে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে যেন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না, বরং তার বদলে অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে দেবেন, যাতে করে বুঝতে সে না পারে যে কাঁচিটা নেবার জন্যেই আপনি এই কৌশল বিস্তার করেছেন। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে, সে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, কারণ আপনার গায়ের জোর বেশী। কিন্তু অন্য সময় যখন আপনি ঘরে না থাকবেন তখন ঐ জিনিষটিই কিংবা অন্য কোন জিনিষ আপনাকে লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ তার ধারণাই হয়ে যাবে যে আপনাকে জানিয়ে বা দেখিয়ে কোন কিছু নেওয়া সম্ভব নয়।

২। তাদের নিজস্ব বস্তুতে আপনার অধিকার নাই, মনে রাখবেন।

অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমরা তাদের খেলনা বা সখের জিনিষগুলি নিয়ে নিই। এতে তারা শাস্তি পায় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার উপায়ও শিখে যায়, অর্থাৎ কোন কারণে কখনও যদি সে আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হয় তখন এমনি করেই আপনার প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ লুকিয়ে রাখবে বা নষ্ট করে ফেলবে। আর আপনাকে জব্দ করার জন্যে যে কৌশল সে অবলম্বন করলে, দুদিন পরে অন্যের কোন একটি জিনিষ তার পছন্দমত হলে সে সেটিকে ওই একই কৌশলে নিয়ে নেবে।

আপনার আত্মীয়ের কোন ছেলে হয়ত আপনার বাড়ীতে এসেছে। তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে আপনার ছেলের কিছু খেলনা তার অনুপস্থিতিতে বা তার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে ছেলেটিকে দিলেন। এমনও কিন্তু করবেন না কখনও! তাকে দিয়েই দেওয়াবার চেষ্টা করবেন। কারণ, এতেও ছেলেদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়।

৩। নিজের জিনিসের যত্ন করতে শিক্ষা দিন।

ছেলেদের নিজের জিনিষের প্রতি যত্ন নেওয়ার শিক্ষা দিতে হলে নিচের নিয়মগুলি পালন করুন :

(ক) যতদিন ছেলেরা সাবধানতা অবলম্বন করতে না পারবে ততদিন কোন বই বা খেলনা তার হাতে দিয়ে সেখান থেকে চলে আসবেন না।

(খ) ভাঙ্গা খেলনা বা ছেঁড়া বই তাদের হাতে দেবেন না। অর্থাৎ ভেঙ্গে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে হয় সেগুলি মেরামত করে দিতে হবে, না হয় ফেলে দিতে হবে।

(গ) খেলা হয়ে গেলে খেলনাগুলি বা বইটি যথা-স্থানে গুছিয়ে রাখতে শেখাবেন।

নিজের জিনিষের প্রতি যত্নবান হলে অন্যের জিনিষের পরেও শ্রদ্ধাশীল হবে এবং অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে।

৪। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস ব্যবহার করতে দেবেন না।

অধিকাংশ মা বাবাই ছেলেদের কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষ সম্বন্ধে মাথা ঘামান না। কারণ, তাঁরা অত তলিয়ে দেখেন না যে এতে তাঁর ছেলের মনে অন্যের জিনিষের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যেতে পারে। তাই ছোটবেলা থেকেই তাদের শিক্ষা দেবেন যে কুড়িয়ে পাওয়া পয়সা ভিখিরিকে দিয়ে দিতে হয়, অন্য জিনিস পেলে তার মালিকের সন্ধান করে তাকে ফেরৎ দিতে হয়। মালিকের সন্ধান না পেলে জিনিসটি অন্য জায়গায় তুলে রাখতে বলবেন। তারপর বুঝিয়ে বলবেন যে সে যদি আর ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে, অন্য দিন তার কোন জিনিস কেউ কুড়িয়ে পেলে সেও তাকে ফেরৎ দেবে না।

৫। ছেলেদের জিনিস-পত্র মাঝে মাঝে পরীক্ষা করবেন।

আপনার ছেলে-মেয়েদের খাতা, পেন্সিল, খেলনা ইত্যাদি যা আছে আপনি তা মোটামুটি সবই প্রায় চেনেন। তার মধ্যে এমন কোন জিনিস যদি দেখেন যা আপনার ছেলের নয় বলে মনে হচ্ছে, তবে সেটির সম্বন্ধে ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু ছেলের সামনেই তার জিনিস-পত্র যেন পরীক্ষা করতে লেগে যাবেন না বা তাকে বুঝতে পর্যন্ত দেবেন না যে তার অনুপস্থিতিতে তার জিনিস-পত্র আপনি উল্টে পাল্টে দেখেছেন।

৬। ন্যায়সঙ্গত চাহিদাগুলি সাধ্যমত পূরণ করবেন।

বিশেষ করে উৎসবে বা কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে যা যা দরকার সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যেমন ধরুন, কালীপুজোর বাজী, বিশ্বকর্মার দিনে ঘুড়ি সুতো বা বন্ধুদের নিয়ে কোন পিকনিক্ পার্টির চাঁদা ইত্যাদির জন্যে কৃপণতা করবেন না। কোন সৎকাজ বা স্কুলে পরীক্ষার ভাল ফল করার জন্যে পুরস্কার দেবেন, তা যত সামান্যই হোক। এই সবের মধ্যে দিয়ে ছেলেদের সৎকাজের অনুপ্রেরণা বাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই অসৎ-কাজের দিকে লক্ষ্য থাকে না।

৭। টাকা পয়সার ব্যাপারে বিশেষ করে সাবধান থাকবেন।

টাকা পয়সার ওপর মানুষের যত আকর্ষণ, এত বোধ হয় আর কোন কিছুর ওপরেই নাই। কারণ, এই ছোট ছোট বস্তুগুলির বিনিময়ে মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক খানিই লাভ করতে পারে। এমন কি অবোধ শিশুরা পর্যন্ত এই মোহিনী শক্তির প্রভাব থেকেই রেহাই পায় না। তাই ছেলে-মেয়েদের মনে টাকা-পয়সার ওপর আসক্তি অত্যধিকভাবে না জন্মাতে পারে তার জন্যে আপনার নিজের কতকগুলি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) টাকা পয়সা তাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে রাখবেন না।

সাধারণত আমরা যা করে থাকি, বাজার বা দোকান থেকে ফেরৎ খুচরো টাকা বা আনি, দুয়ানিগুলো বিছানার কোণে বা টেবিলের ওপর রেখে দিই। সকালে তাড়া-তাড়ির সময় কে এখন তুলতে যায়! ঘরে তো অন্য কেউ নাই। আপনারই ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। আজ তারা চুরি করবে না সত্যি কথা। হয়ত হাতে করে নিয়ে খেলা করবে একটু। কিন্তু এই খেলার মধ্যে দিয়েই তার মনে কিছু কেনার সখ আসবে। যেমন তার বাবা, মা বা অন্যেরা কিনে থাকেন। সবটাই খেলার ছলে কিন্তু। তারপর যখনই সে বুঝতে পারবে যে এর বিনিময়ে তার প্রার্থিত বস্তু প্রায় সবই পাওয়া যায়, তখনই সে যখন তখন আপনার কাছে পয়সা চাইবে। সব সময় আপনি দেবেন না নিশ্চয়ই। আর দেওয়া উচিত নয়! অতএব তখন তার অন্য পথ বেছে নেওয়ার কথা খুব স্বাভাবিক-ভাবেই মনে পড়বে।

(খ) ছোলাবার জন্যে ছেলেদের হাতে পয়সা দেবেন না।

আপনি হয়ত বাইরে কোথাও যাচ্ছেন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। ছেলেও বায়না ধরেছে আপনার

সঙ্গে যাবে। তখন অন্য উপায় আর না দেখে তার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে ভুলিয়ে যান। এমনটা করবেন না। এতেও ছেলেদের পয়সার ওপর লোভ বেড়ে যায়। তখন আপনার কাছ থেকে সব সময়েই এমনিভাবে পয়সা পাবার আশা করে।

(গ) ছেলেদের দিয়ে কোন জিনিস কেনাবেন না।

ফিরিওয়ালা ডেকেছেন ওপর থেকে। দর-দস্তুরি ওপর থেকেই করলেন, তারপর ছেলের হাতে পয়সা দিয়ে জিনিসটা আনতে পাঠালেন। কে আর নীচে যায়। নীচে নিজেই যাবেন। ছেলেকে নীচে পাঠিয়ে তার আরও নীচে নামার পথ তৈরী করে দেবেন না।

(ঘ) তাদের সামনে কারও পকেট থেকে কিছু নেবেন না।

অনেক সময় দরকার হলে, টাকা পয়সা বা দরকারী কোন কাগজ তাদের বাবার পকেট থেকে আমরা নিয়ে থাকি। আপনার দেখাদেখি তারাও নিতে শিখবে। প্রথম প্রথম তারা হয়ত বুঝতেই পারবে না যে এটা তাদের পক্ষে অন্যায়। আর বুঝলেই বা কি এসে যায়। তার থেকে বরং ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেবেন যে কারও পকেট থেকে কিছু নিতে নাই।

(ঙ) তাদের কাছ থেকে পাই পয়সার হিসাব নেবেন।

ছেলে একটু বড় হয়ে গেলে তাকে দোকানে বা বাজারে পাঠাতেই হবে। কারণ, আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরে এ ছাড়া উপায় থাকে না। হিসাব নেবেন বটে, কিন্তু সে যেন এমন কথা মনে না করতে পারে যে আপনি তাকে সন্দেহ করেছেন। তা হলে তার ফল হবে বিপরীত। তাকে যখন টাকা পয়সা দেবেন গুণে নিতে বলবেন।

(চ) অহেতুক সন্দেহ করবেন না।

অধিকাংশ মায়েরই কম বেশী এ দোষ আছে দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁরে, অমুক বাড়ীর চাকর বা অমুক বাবু দু টাকা সের চিংড়ি মাছ নিয়ে এল, আর তোর বেলাতেই আড়াই টাকা?

এই ধরণের কথা ছেলেদের কখনও বলবেন না। এতে আপনার ছেলের মনে বিরক্তি আসবে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেও অন্ততঃ তার পরের দিন কিছু না কিছু পয়সা আপনার বাজারের টাকা থেকে সে চুরি করবে।

(ছ) ছেলেদের হাতখরচা সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

(জ) বিলাসিতার প্রশ্রয় একেবারে দেবেন না।

শেষে এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলব। 'ধরুন, জানতে পারলেন যে আপনার ছেলের চুরি করার অভ্যাস হয়ে গেছে। এতদিন বুঝতে পারেন নি। এখন জানতে পেরে কি করবেন? আঁৎকে উঠে তাকে রাগের মাথায় মারধর বা বকা-ঝকা যেন কখনও করবেন না। তার ফল আরও খারাপ দাঁড়াবে। তার চেয়ে তাকে প্রথমেই এর পরিণতিটা দেখবার চেষ্টা করবেন। তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন তার এই বদ্ অভ্যাসের কথা জানতে পারবে তখন তার নিজের অবস্থাই বা কি হবে—আপনাদেরও লজ্জার সীমা থাকবে না ইত্যাদি। তারপর তার প্রকৃতি এবং স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে তার সখের ব্যাপারে খুব বেশী করে উৎসাহিত করবেন। যেমন, আপনার ছেলে হয়ত ছবি আঁকতে ভালবাসে। তখন তাকে ভাল কাগজ পেন্সিল, রং তুলি ইত্যাদি কিনে দেবেন এবং তার আঁকার ব্যাপারে আপনিও যে খুব উৎসাহী এমন ভাব দেখাবেন। অর্থাৎ তার মন যে দিকে যেতে চায় সেই দিকেই বেশী করে নিয়ে যেতে পারলে কিছুদিন পর তার এই বদ্ অভ্যাস আর থাকবে না। কারণ, ছেলেরা চুরি করার জন্যে চুরি করে না—এই কথাটা সব সময় মনে রাখবেন। অন্যান্য খেলার মত—প্রথম প্রথম এটাও তাদের একটা খেলার মতই থাকে।

সামি কাবাব

উপকরণ—আধসের কিমা, এক ছটাক ছোলার ডাল, আদা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, কিছু ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, দুই তিনটি বড়এলাচ, দারচিনি ও একটি ডিম।

এই সামি কাবাব তৈরী করতে হলে আগে কিমা আর ছোলার ডাল সিদ্ধ করতে হবে। বেশী জল দেবেন না। ডাল যেন বেশী না গলে যায়। সেদ্ধর সময়ে পিঁয়াজ আদা একটু বড় কোরে কেটে, বড়এলাচ ছড়িয়ে, দারচিনি, পরিমাণ মত নুন সব ওতে দিয়ে দিন। হাঁ। শুক্‌নো লঙ্কাও চার পাঁচটা আস্ত ঐ সঙ্গে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে সব একসঙ্গে মিহিন কোরে বেটে নিন। এবার ঐ পুদিনা-পাতা ধনেপাতা আর কিছু পিঁয়াজ আদা কুচি কুচি করে কাটুন যত সরু কাটতে পারেন, এর মধ্যে একটু টক দিন। আমচুর বা লেবুর রস যা হয়। ঐ ডিমটি এবার ভেঙ্গে ঐ পেস জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে চপের মত কোরে গড়ুন। গোল কোরে গড়বেন। ভেতরে ঐ কুঁচনো জিনিষ পুরের মত কোরে দেবেন। ঐ কুঁচনো জিনিষের মধ্যে কিছু কাঁচা লঙ্কাও কুঁচিয়ে নেবেন। এবার তাওয়ায় অল্প ঘি দিয়ে ঐগুলি লাল কোরে ভেজে নিন। চপের চেয়ে কম খরচে চপের চেয়ে সুস্বাদু জিনিষ হবে। যাঁরা রন্ধন খান তাঁরা সেদ্ধর সময়ে রন্ধন দিতে পারেন।

—আভারাণী দেবী

শ্রাদ্ধ বাড়ী

শ্রীকালিদাস রায়

প্রকাণ্ড ম্যারাপ-তলে শ্রাদ্ধ-বাড়ী সুসজ্জিত সভা,
পর্দায় ঝালরে দুলে কিবা শোভা বাহবা বাহবা।
রাস্তায় দাঁড়ায়ে গেছে শত শত গাড়ী
আসিয়াছে শত শত পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী।
সিগারেট চুরুটের ধূমে আমোদিত সভাস্থান
চলিতেছে তার মাঝে কীর্তনের গান।
কেহ তা শোনে না কান দিয়া।
আড়চোখে দেখে কীর্তনিয়া
জমা হলো কত টাকা থালার উপর।
চলিছে ভোটের গল্প সভাস্থলে কোর্টের খবর।
ছাউনীর অন্য পাশে জনদশ উড়িয়া ব্রাহ্মণ
পান মুখে, ঘামে ভিজে হাতা নাড়ি করিছে রন্ধন।

সভাটির এক পাশে সাজানো যোড়শ,
খাট-শয্যা বস্ত্র-ফল সন্দেশ তৈজস।
আসিছে মিষ্টান্ন দধি কত ভারে ভারে।
পুরুত তাগিদ দেয় হোথা বারে বারে।
চলিতেছে সমারোহে মহা মহোৎসব,
বাজে খোল, হট্টগোল, অট্টহাস্য,
চলে কলরব।
সর্ব আভরণমুক্ত খানপরা গৃহিণী কেবল
এক কোণে কেলে আঁখিজল,
উচ্চ কণ্ঠে ডাকে ছেলে। মা কোথায়
হুঁশ নেই তার
কে করিবে শ্রাদ্ধের যোগাড়?

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

"দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন "আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

S 261A-X52 BG

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা।"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত

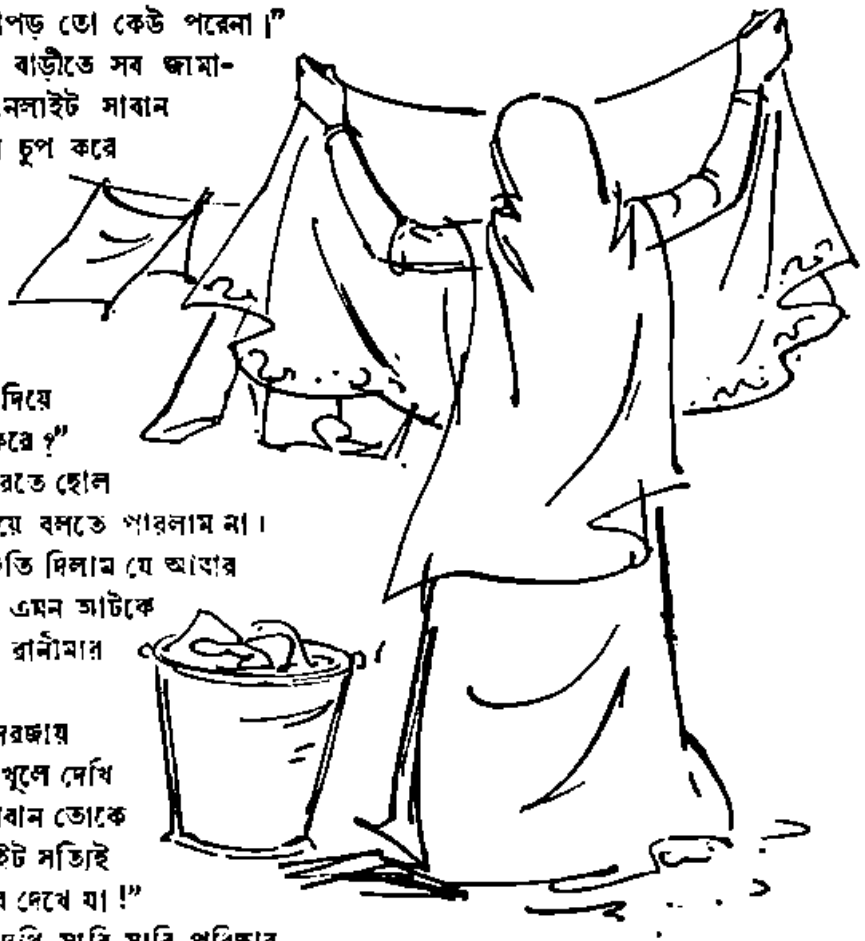

ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে নম্বর।

S. 1618-X51 BG

বিদ্যালয়-পাঠাগার ও পুস্তক

শ্রীনমিতা সেনগুপ্তা

ডাক্তার রঙ্গনাথন বলেন, শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য নহে, বহির্জগতের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন এবং এই শিক্ষাকে আরও করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন বিদ্যালয়-পাঠাগারের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা।

বিদ্যালয়-পাঠাগারের কাজ যেমন বহুমুখী ইহার প্রয়োজনও তেমনি বহুল। পাঠাগারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Gretchen Knief schsenk বলিয়াছেন "Three B's in library service—books, brains and building." সুতরাং পুস্তকের প্রয়োজনীয়তাই যে সর্বাধিক একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। একটা উত্তম পাঠাগার পুস্তক, পাঠক এবং কর্মী এই তিনটির মিলিত এবং অখণ্ড সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে পুস্তকই যে প্রধান এবং মূলবস্তু, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বহুমূল্য আসবাবপত্রের দ্বারা পাঠাগারকে যতই সুসজ্জিত করা হোক না কেন, তাহার কোন মূল্যই থাকে না যদি সেই পাঠাগারে উপযুক্ত পুস্তক না থাকে এবং সেই পুস্তকের উপযুক্ত ব্যবহার না হয়।

পুস্তকের সংখ্যা নিরূপণ এবং গুণাগুণ বিচার করিয়া পুস্তক নির্বাচন করাও বিদ্যালয়-পাঠাগারের আর একটী প্রধান লক্ষ্য বস্তু। একমাত্র ইহার উপরই নির্ভর করে পাঠাগারের সার্থকতা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে নানাবিধ পুস্তকের মাধ্যমেই বহির্বিশ্বের সহিত মানসিক সংযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু ইহা একটী লক্ষণীয় বিষয় যে, আমাদের বালক-বালিকাদের মধ্যে ১০ ভাগ বালক বালিকাই তাহাদের পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া অন্য কোনরূপ পুস্তক পাঠ করে না। বিদ্যালয়ে পাঠাগারের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। জ্ঞানপিপাসু বালকবালিকাগণ বিদ্যালয়-পাঠাগারের উপযুক্ত সুযোগের অভাবে দুইয়ের জনসাধারণ ও ব্যক্তিগত পাঠাগারগুলির, অল্পসংখ্যক পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সেই তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হয়।

বহির্ভূত ক্ষেত্রবিশেষে নিয়মিত পাঠক এবং সাময়িক পাঠকের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন, তথাপি মোটামুটিভাবে ইহা বলা চলে যে, অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয় পাঠাগার হইতে পুস্তক সংগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। অথচ এইরূপ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয় যে বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলি তাহাদের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয় না এবং একমাত্র এই কারণেই ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহের নিমিত্ত বিদ্যালয় পাঠাগারের বহির্ভূত জনসাধারণ কিংবা ব্যক্তিগত পাঠাগারগুলির শরণ লইতে ও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়। এই সকল ছাত্রছাত্রীদিগের পুস্তক সংগ্রহের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ছুটাছুটির হাত হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তুর উপর লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে উহাদের চাহিদা মিটাইতে পারা যায় এইরূপ পুস্তক বিদ্যালয়-পাঠাগারে সযত্নে রক্ষিত রাখা। এই লক্ষ্যে সহজপ্রাপ্য ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করাও বিশেষ প্রয়োজন।

পুস্তকের সংখ্যা ও গুণাগুণ নিরূপণ করা বিদ্যালয় পাঠাগারের একটী অপরিহার্য্য বিষয়। সাধারণতঃ দেখা যায় বিদ্যালয় পাঠাগারসমূহে অতি আবশ্যক বিষয়, যেমন—ভাষা, ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির সংখ্যাই বিশেষ করিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়, কিন্তু সেই তুলনায় মনোবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয় না। অথচ এই সকল পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা যে কিছুমাত্র কম নহে ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই সকল পুস্তক ক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। একটী বিদ্যালয় পাঠাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের কি পরিমাণ সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে তাহা ঠিক করা খুবই কঠিন, তথাপি প্রত্যেক বিদ্যালয় পাঠাগারের কর্তব্য মোটামুটি তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার মাথা পিছু অন্ততঃপক্ষে একটী করিয়া পুস্তক রাখা। এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রথাগারিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। L. R. Mccolvin বলেন, একটি সাধারণ পাঠাগারের প্রথম অবস্থায় পুস্তকের তাকগুলি পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে, তদুপরি পাঠাগারের আশে পাশের লোক সংখ্যা অনুসারে মাথা পিছু ১·৫ খণ্ড করিয়া পুস্তক রাখা সমীচীন। ইহার পরে নিয়মিত পাঠকের হার অনুসারে পুস্তকের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ রঙ্গনাথনের মতে মাথা পিছু ২৪ খানা পুস্তক রাখা সমীচীন। যে কোন বিদ্যালয় পাঠাগারে প্রায় ২০০ শত ছাত্রছাত্রীর অনুকূলে অন্ততঃ পক্ষে ১০০০ হইতে ১৭০০ পর্য্যন্ত পুস্তক তালিকাভুক্ত রাখা কর্তব্য এবং প্রতি বৎসর কমপক্ষে আরো ১০০ নূতন পুস্তক এই তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। Ireno Wells এর মতে একটী বিদ্যালয় পাঠাগারে নিম্নলিখিত রূপ পুস্তক রাখা প্রয়োজন।

তালিকাভুক্ত ২০০ জনের জন্য ১৭০০ পুস্তক হইতে ২০০০ খণ্ড।

" ৪০০ " " ৩৪০০ " " ৪০০০ "

" ১,০০০ " " ৪০০০ " " ৭০০০ "

কিন্তু ভারতের নানাবিধ বাধাবিঘ্নের বিশেষতঃ আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আমরা এই বিষয়ে অতিরিক্ত বড় ধারণার বশবর্ত্তী হইতে পারি না। কাজেই এখানে একটী বিদ্যালয় পাঠাগারকে সুপরিচালিত করিতে হইলে এবং দ্রুতগতিতে উন্নত করিতে হইলে আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তবর্তীকালীন সময়ে প্রতি ছাত্রছাত্রী পিছু পাঁচ হইতে সাতটি পুস্তক বিদ্যালয় পাঠাগারে রাখা সমীচীন মনে

করি অথবা যে পরিমাণ পুস্তক বর্তমানে আছে তাহার বেড় গুণ বৃদ্ধি করিলেও বর্তমান অবস্থায় চলিতে পারে। অবশ্য শুধু বিদ্যালয়ের পক্ষে এত পুস্তক সংগ্রহ করা আর্থিক অসুবিধার জন্য সম্ভব নহে। কাজেই সরকার ও স্থানীয় জনগণের এই বিষয়ে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ হিসাবে পুস্তক নির্বাচন করিবার কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই। সেই সকল বিদ্যালয় পাঠাগারগুলির পুস্তক ক্রয় করিবার সময় ছাত্রছাত্রীদিগের একজন প্রতিনিধি অথবা স্বতন্ত্রভাবে ছাত্রছাত্রীর মতামত নিয়া পুস্তক নির্বাচন করা উচিত। এই সকল ছাত্রছাত্রীগণের পুস্তক মনোনীত করিবার সুবিধার নিমিত্ত বিদ্যালয়-পাঠাগারে এক-একটী করিয়া "পুস্তক নির্দেশিকা" রাখা যাইতে পারে। অথবা একটী বাক্স রাখা চলিতে পারে যেখানে তাহারা তাহাদের নির্বাচিত পুস্তকের নাম লিখিয়া তাহা সেই বাক্সে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যালয় পাঠাগারগুলি যদি সর্বৈ-তাভাবে ছাত্রছাত্রীর দাবী কিংবা নির্বাচিত পুস্তকের উপর পাঠাগারের চাহিদা ঠিক করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভুল করা হইবে। তাহাদের অহেতুক দাবীকে সংযত করিয়া অপর বিষয়সমূহের এমন সকল পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে যাহা বিদ্যালয়ের তরফ হইতে ছাত্রছাত্রীর পাঠ করা অতি অবশ্যই কর্তব্য। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করাই বিদ্যালয়-পাঠাগারের উদ্দেশ্য নহে। গ্রন্থাগারের এমন সমস্ত পুস্তক নির্বাচন এবং ক্রয় করা উচিত যে সমস্ত পুস্তক পাঠে ছাত্রছাত্রীগণ অধিকতর আগ্রহান্বিত হইবে এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত অধিকতর পুস্তক সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট থাকিবে। পুস্তকের সংখ্যা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি করা এমন কিছুই নহে, যদি তাহার গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা থাকে।

বিদ্যালয় পাঠাগারের প্রত্যেকটি পুস্তক এরূপভাবে সংগ্রহ করা কর্তব্য যাহা বালক-বালিকাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, উপকারিতা এবং জ্ঞান অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে অধিক প্রয়োজন সেইখানেই যেখানে বিদ্যালয় পাঠাগার কেবলমাত্র তাক-সজ্জিত করিবার নিমিত্ত পুস্তক ক্রয় করে না। অতএব একটী বিদ্যালয়-পাঠাগারের প্রকৃত পুস্তক নির্বাচন গ্রন্থাগারিকের সুবিবেচনার পরিচায়ক।

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলি ভারতীয় কৃষি, কলা, অতীত ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলির পুস্তক রাখা সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করে না। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের দেশের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া অতীত এবং বর্তমান সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সুযোগ দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। সুতরাং এই সকল বিষয়ক উত্তম পুস্তক সংগ্রহ করা প্রত্যেক বিদ্যালয়-পাঠাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পাঠাগারে Reference পুস্তকও বহুল পরিমাণে রাখা কর্তব্য। ঐ সকল পুস্তক এরূপভাবে ক্রয় করা উচিত যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ পরবর্তীকালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে।

সময় মত পুস্তক প্রাপ্তির বিষয়ে দৃষ্টি রাখা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্তব্য। পুস্তক সময়োপযোগী না হইলে ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ভাল অপেক্ষা মন্দ কমই প্রমাণ করে বেশী, ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া পাঠাগারে দরকারী পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করা বিদ্যালয়-পাঠাগারের একটী মুখ্য কর্তব্য। ঘোটের উপর যে সকল পুস্তক পাঠে ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনীয় আগ্রহ মিটিতে পারে এবং তাহাদের পাঠাগার সম্বন্ধে আকর্ষণ আনিতে পারে সেইরূপ উপযুক্ত পুস্তকই বিদ্যালয়-পাঠাগারে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

অনেক স্থলে দেখা যায় বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলিতে অব্যবহার্য এবং অপ্রয়োজনীয় বহুসংখ্যক পুস্তক কেবলমাত্র পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য রাখা হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোনও আইনজীবী ব্যক্তি হয়তো আইন সংক্রান্ত তাঁহার যাবতীয় পুস্তক সমূহ তিনি দান পত্র করিয়া কোন বিদ্যালয় পাঠাগারকে দিয়া গিয়াছেন। আবার কখনো দেখা যায় হয়তো কোন পাঠ্য পুস্তকের একটা মোটা সংখ্যা পাঠাগারের কোন একটী বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া রাখিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে বহু পুরাতন এবং মোটেই সময়োপযোগী নহে। উপরন্তু এই গুলি ছাত্রছাত্রীদেরও কোন কাজেই আসে না। আবার কোথাও দেখা যায় অনাবশ্যক ও অব্যবহৃত পুস্তকসমূহ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এই সকল ধূলি-ধূসরিত পুস্তকগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে কখনও ইহাদের স্পর্শও করা হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় এই সকল পুস্তক তালিকাভুক্ত করিবার পূর্বেই সতর্ক বিবেচনার প্রয়োজন। এই ব্যাপারে কেবলমাত্র সেই সকল পুস্তকই গ্রহণযোগ্য, যে সকল পুস্তক হইতে প্রকৃত উপকার পাওয়া যাইবে। যে সকল বিদ্যালয়ে এই ধরণের অব্যবহৃত পুস্তক কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় অতি সত্বর সেই বিদ্যালয় পাঠাগারে উহাদের স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। অবাঞ্ছিত এবং অপ্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ বিদ্যালয়-পাঠাগারে অতি অবশ্যই বর্জনীয়। ইহা যদি কেহ দানও করে তথাপি গ্রহণ করা উচিত নহে। স্থান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠাগারগুলিতে এই পুস্তকগুলি দান করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া উচিত। কারণ যে কোন বিদ্যালয়-পাঠাগারে এই প্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত পুস্তক মৃতদেহেরই মত ভার স্বরূপ। একজন সুদক্ষ গ্রন্থাগারিকের পুস্তক-বিক্রেতার লাভের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কোন প্রকার দুর্বলতার বশবর্তী না হইয়া, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান করা উচিত। এখানে একটী মাত্র প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে সকল অবাঞ্ছিত পুস্তকসমূহ পাঠাগারে বিদ্যমান আছে তাহাদের সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে? এই সকল পুস্তক মধ্যে মধ্যে বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ৪০ জনের মধ্যে ১৬ জন গ্রন্থাগারিকের মতে এই সকল পুস্তক সরবরাহ করা মোটেই উচিত নহে। ২৭ জনের মতে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের নিমিত্ত উহা রাখা আবশ্যক।

মোটামুটি একথা বলা যায়, পুরাতন পাঠ্যপুস্তক, বয়স্কদের উপন্যাস এবং অপরাপর অনাবশ্যক জিনিষপত্র বিদ্যালয় পাঠাগারের মঙ্গলের নিমিত্ত ত্যাগ করা প্রয়োজন।

উপরোক্তরূপে ইহা বলা হইল, একটী বিদ্যালয়-পাঠাগারের সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার বিভিন্ন ব্যবস্থাদির এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া স্থাপন করা উচিত এবং পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিলে তাহাতে সুফল লাভ হইবে। একটী সহরে যে কয়টি পাঠাগার আছে প্রত্যেক পাঠাগারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে এমন একটী বৃহৎ বিদ্যালয়-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তাহার মাধ্যমে প্রত্যেক পাঠাগার নিজেদের প্রয়োজন মত পুস্তকসংগ্রহ ও বিনিময় করিতে সক্ষম হইবে। পাশ্চাত্য দেশে বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলির সহর কেন্দ্র আফিস হইতে গ্রামের পাঠাগারগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ান্তর মটর-গাড়ি যায়া প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ ও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ভারতেও এই দিকে লক্ষ্য রাখিলে শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটিবে তাহা নিঃসন্দেহে আশা করা যায়।

আজ আমি চিনেছি আমায়

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

আজ আমি চিনেছি আমায়
লভেছি আশিস তব
কাণায় কাণায়—
আজ আমি চিনেছি আমায়।

রবি শশী তারকার রূপ
নাহি আজ করে বিমোহিত
রূপের ছটায়—
আমি আজ চিনেছি আমায়।

অনন্ত আকাশ আজ
শান্ত হ'য়ে আছে
আমা—মাঝে।
অনন্তের পেয়েছি সন্ধান।
আমা হ'তে অনন্তের
হয়েছে উদ্ভব,
আমার মাঝারে পুনঃ
লয় হ'য়ে যায়।
আমা ছাড়া নাহি আর কিছু
এই জগত সভায়।
আমি আজ চিনেছি আমায়।

যাহারে চিনেছি আজ
ছিল মোর হৃদয় গুহায়।
আমি আজ চিনেছি আমায়।

যাহারে চিনেছি আজ
রহিয়াছে সবে মিশে
নিজ মহিমায়।
আমি আজ চিনেছি আমায়।

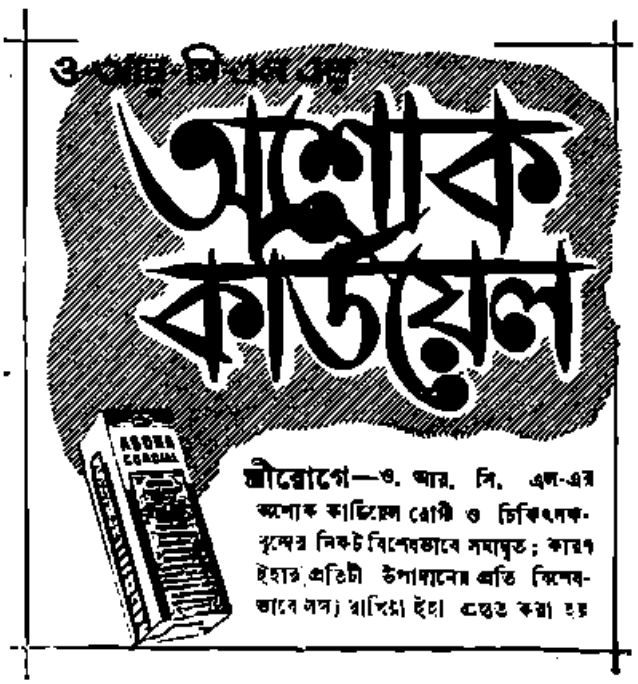

॥ বাণী-বন্দনা ॥

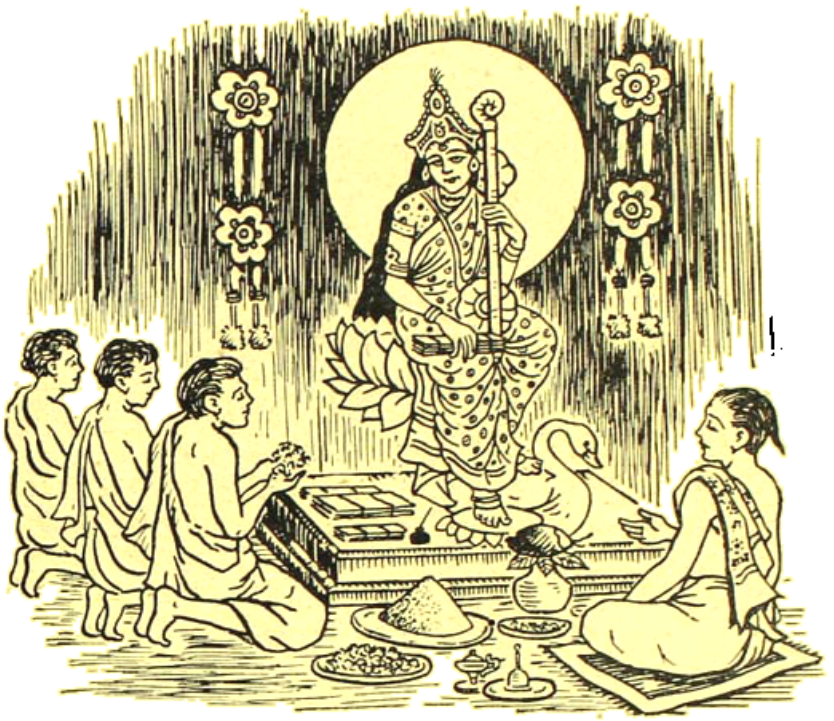

সেকালে

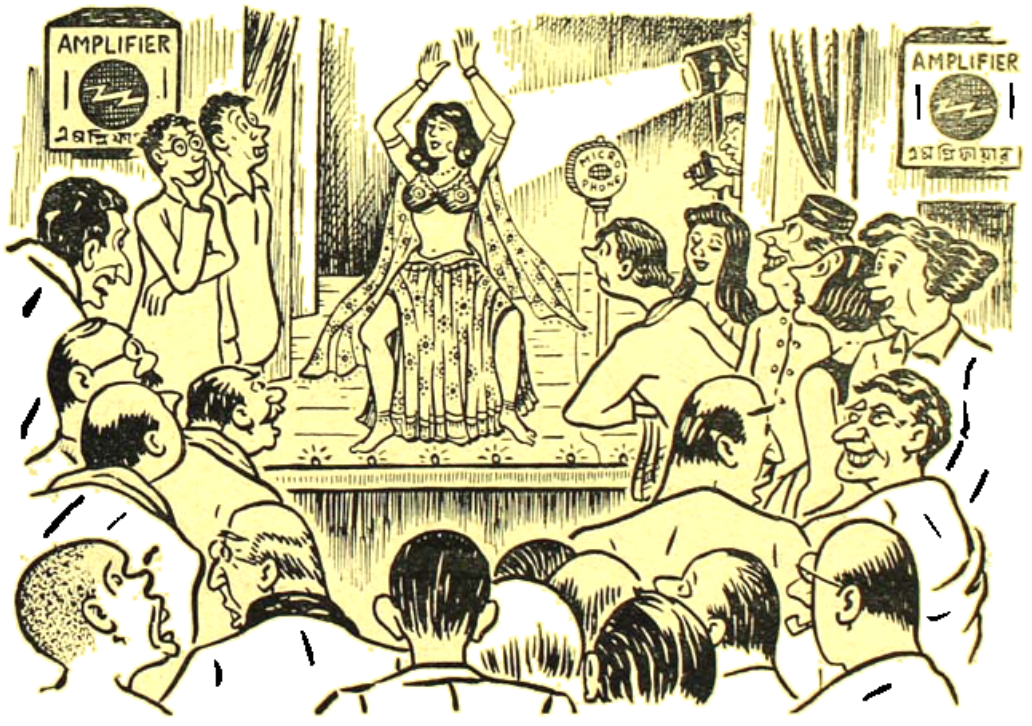

একালে

শিল্পী :—শ্রীপৃথ্বী সেনগুপ্ত

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

পয়সা নিবারণ পেয়েছে কিছু। ধূলিমুষ্টি বিলিয়ে কড়ি-মুষ্টি কুড়িয়েছে ঘর্মাক্ত নরনারীর হাটে। কিন্তু তার খেসারতও কম দিতে হয়নি। পাহাড়-ভাঙা শ্রান্তি নিয়ে সারাটা রাত, সারা সকাল পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে অতসীর সন্ধানে। মনটা অশুভাশঙ্কায় ভরে উঠেছে। ওর বউনি কারবারে ওভারি নৌকার গুণ টানতে অতসী কোথায় তলিয়ে গেল ভাটার টানে! অতসী তো নিজে থেকে এগিয়ে আসেনি। নিবারণই জোর করে তাকে টেনে এনেছিল নিজের স্বার্থে।…পয়সা!…পয়সা নিবারণ চেয়েছিল সত্যি। পয়সা না হলে আর একটি দিনও বাঁচবার সংস্থান ছিল না তার। কিন্তু তাই বলে তো অতসীর বিনিময়ে সে-পয়সা চায়নি নিবারণ।

নন্দাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল নিবারণ, মনের মতন করে নতুন ঘর বাঁধবে বলে। নন্দা পালিয়েছে তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে। কিন্তু নিবারণ আজও পারেনি বস্তির এই অন্ধকার এঁদো ঘরখানা ছেড়ে পালাতে। কেন পারেনি, সে কথা অন্যে না জানলেও নিবারণ জানে। অতসীর হয়তো এতটুকুও অসুবিধা হয়নি পাপ কাটিয়ে চলতে। কিন্তু নিবারণ একমুহূর্তের জন্যেও পারেনি মনটাকে আড়ালে সরিয়ে নিতে। পলাতক মন অজানা আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে ওই অসহায় মেয়েটার মুখপানে চেয়ে।

অদ্ভুত! ওর ওই নিঃসম্বল নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভেবে নিবারণের মন বারবার ভিজে উঠেছে। কিন্তু অতসী নিজে একটি মুহূর্তের জন্যেও ভাবে না সে কথা। হয় ভাবে না, কিংবা ভাববার মত বুদ্ধি তার নেই।… বুদ্ধিই নেই। উঠতি বয়েসে ভাগ্যের বিপাকে প'ড়ে হয়তো হতভম্ব হয়েছে। না হয়, কষ্ট ওর হাড়ে-হাড়ে দাঁত বসিয়ে মনটাকে ভোঁতা ক'রে দিয়েছে। বুদ্ধি আছে, কিন্তু অনুভূতি নেই।

তাই কি?

না-না।—নিবারণের সে ভুল বারবার ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসেছে। অতসীর মনের নাগাল সে পায়নি। যতদিন বিছানায় পড়ে ছিল, নিবারণের দেওয়া ওষুধ-পথ্য খেতে কোন আপত্তি সে করেনি। মনে আপত্তি থাকলেও মুখ ফুটে বলেনি কোন কথা। কিন্তু ধীরে ধীরে শরীর যত সুস্থ হয়ে উঠেছে, মিনতি তত বেড়েছে। হাত জোড় ক'রে অনুনয় করেছে নিবারণের কাছে: ওসব কি হবে নিবারণবাবু?…ডিকিরীর আবার ওষুধ!

নিবারণ ইতস্তত করেছে। ক্ষণকাল নীরব থেকে, একদাগ ওষুধ ঢেলে অতসীর মুখের সামনে তুলে ধরে বলেছে: আর আনবো না। এবারের মত খেয়ে নাও।… ভুগে কি লাভ বলো?

লাভ!…বাসি ফুলের মত মরা একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছে অতসীর পাণ্ডুর ঠোঁটের কোণে। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিবারণের মুখপানে চেয়ে থেকে বলেছে: গরীবকে বাঁচানো পাপ।

পাপ!

তাছাড়া আর কি নিবারণবাবু? খুন অথম করলে যে পাপ হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী পাপ হয় গরীবদুঃখীকে বাঁচিয়ে তুললে। মরে' তারা খালাস পায়।

নিবারণ আর কোন কথা বলেনি। ইচ্ছা থাকলেও জবাব আসেনি মুখে। ওষুধ খাইয়ে শিশিটা কুলঙ্গীতে তুলে রেখে, নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে দরজাটা টেনে দিয়ে।

মনটা নৈরাশ্যে ভরে উঠেছে। নিবারণ বুঝেছে যে অতসী নন্দা নয়। ঘরে বাইরে নিয়ত যাদের সঙ্গে চলেছে ওর পরিচয়, তারা যেন আলাদা রক্তমাংসে তৈরী। অতসীর সঙ্গে তাদের কোথাও এতটুকু মিল নেই। তবুও মাঝে মাঝে মনের কোণে স্বপ্নের জলতরঙ্গ বেজে ওঠে। পদ্ম যখন চটুল পরিহাসে অতসীকে বিব্রত ক'রে তোলে, নিবারণের চোখ দুটো চালকা নেশায় আমেজে বন্ধ হয়ে আসে।

অতসী যে কেমন করে এতখানি পথ পায়ে হেঁটে ফিরলো তা নিজেও বুঝতে পারেনি। একটা ঘূর্ণা বাতাসের ঝাপটায় ওর অসাড় হাত-পাগুলো যেন ছেঁড়া পাতার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার উড়ে এসে পড়লো বস্তির সরু গলিটার মুখে।

লোকগুলো বিকৃতিগন্ধে বেরিয়েছে পেটের দায়ে। কোন সাড়াশব্দ নাই। পুঁটি তলপেটে ব'সে কাঠের আরসিখানা বাঁ-হাতে ধ'রে ডান হাতে রসকলি আঁকছে খাঁদা নাকটার ডগায়। ওপাশে দরজার সামনে তোলা উনুনটার ভাত চড়িয়ে পদ্ম রৌদ্রে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল।

হঠাৎ অতসীকে দেখে বীভৎস উল্লাসে পদ্ম চেঁচিয়ে উঠলো: কি লো, শেষমেষ তা হলে ফিরলি?…রাত কাটালি কোন চুলোয়?

অতসী কোন উত্তর দিলে না। শ্রান্ত পা' দুটোকে সামলে নিয়ে এগিয়ে চললো নিজের ঘরের দিকে।

নিবারণের ঘরখানা তালাবন্ধ। নিঃশব্দে চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে অতসী তার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই তড়বড় করে পদ্ম এসে দাঁড়ালো ওর পাশে। ততক্ষণে পুঁটি গয়লানিও উঠে এসেছে ওর পিছু পিছু।

ওমা, এযে নতুন কাপড়-চোপড় লো! রথ দেখতে গিয়ে কলা বেচে এলি বুঝি?

অতসী কোন উত্তর দিলেনা। তালুতে জিব ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে পদ্ম বললে; তা ভালো। চৌকস কপাল করে এসেছিলি। কিন্তু ইদিকে মিনসে যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে কাল রাত থেকে। সহরময় খুঁজে মরছে।

অতসী জানে। এই ক'মাসে নিবারণকে চিনতে তার বাকী নাই। বস্তির আর পাঁচজনের মত সে নয়।…খুঁজে বেড়াবে। সত্যি খুঁজে বেড়াবে সহরময়। নিবারণের অতগুলো পয়সার জিনিস অতসী ভিড়ের ভিতর কোথায় হারিয়ে এসেছে, তা নিজেও জানে না। নিবারণের উপকার করতে পারেনি কোনদিন। কিন্তু আজ লোকসান করে এসেছে তার অনেক টাকার মাল।

কিলো, কি ভাবছিস অমন ক'রে?…ছেকলটা খোল। ঘরে ঢুকতে মন সরছে না বুঝি?

না: উত্তর দেবে না ভেবেও না দিয়ে পারে না অতসী। পদ্মর কথায় ওর আপাদমস্তক যেন ঘেন্নায় রী রী করে ওঠে।

অতসী-ঘরে ঢুকলো।

পুঁটির গায়ে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে পদ্ম শানকি-ভাঙা অওয়াজে এক ঝলক হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললে: বয়েস থাকতে অমন রূপ-ধান্ধা করার কোন মানে হয়?…ভালো শিকার জুটিয়েছিল; রাতারাতি ডোল পাল্টে দিয়েছে।…অমন দামী কাপড়-চোপড়! মন লাগিয়ে থাকলে, সোনাদানাও উঠতো গায়ে।

পুঁটি হাসে। কিন্তু পদ্মর কথায় ফোড়ন কাটতে পারে না। একটু থেমে, নরম সুরে দরদ মিশিয়ে বলে: একদিনে চেহারাটা যে কালি-ঝুল হয়েছে লো! পথ হারিয়েছিলি বুঝি?

হাঁ।…ছেঁড়া মাদুরখানা টেনে নিয়ে অতসী মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ওদের কথার কান দেবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে চাপা কান্নায়। কিন্তু কাঁদতে অতসী পারে না। ওই গয়লাকাটা পদ্ম আর রসকলি-কাটা পুঁটি গয়লানির সামনে চোখের জল ফেলতে তার মন আজ বিদ্রোহ করে ওঠে।

পদ্ম হঠাৎ থেমে যায়। অতসীর রকম-সকম দেখে কথা বাড়াতে যেন সাহস হয় না আর। অতসী যতক্ষণ ফেরেনি, নিবারণ যতবার ঘুরে এসেছে তার ঘরে, পদ্ম ততবার চাপা গলায় টিটকারি দিয়ে উঁকি মেরেছে দরজায়। অথচ অতসী ফেরেনি দেখে সে নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছিল। মনে মনে হাজার বার মুণ্ডপাত করেছে নিবারণের। কাটা কাটা কথার বিঁধুনিতে তাকে কম বিব্রত করেনি।…আর অতসী যখন সত্যি ফিরে এলো, পদ্মর মনটা যেন বিষিয়ে উঠলো চোখের নিমেষে।

অতসী !

কি ভেবে পদ্ম বসে পড়লো অতসীর পাশে। অতসী বাধা দিলে না। যেমনকার তেমনি নিষ্টীব হয়ে পড়ে রইল মুখ গুঁজে।

এমন নিবাক পদ্ম হয়না সহসা। ওর উত্তাল নদ প্রকৃতি যেন হঠাৎ বিষহরির ছোঁয়ায় মাথা নীচু করে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পুঁটি চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে।

অনেকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে পদ্ম ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলো: ভারি সুন্দর মানিয়েছে অতসীকে। নারে পুঁটি ?

তা মানাবে না ? গেরোর ফেরে না-হয় খাপরা-খোলার বস্তিতে এসে ঠাঁই নিয়েছে। জাতের ঘরের মেয়ে তো বটে।

তাই। সত্যি তাই। এমন মিষ্টি চেহারা ! যোগ থাকতে ভালো মানুষের হাতে পড়লে, রূপ ওর ঝলমলিয়ে উঠতো।

আবার পদ্ম নীরব হয়ে গেল। অতসী কোন কথা বলে না। এমন কি, তার শরীরের স্পন্দনটা পর্যন্ত যেন অনুভব করা যায় না বাইরে থেকে। বুকের ভিতর যে ঝড় উঠেছিল, সে ঝড় থেমে গিয়ে ওর সারা সত্তা যেন নিথর হয়ে এসেছিল নিদারুণ অবসাদে। তিতীক্ষায় স্থির হয়ে এসেছিল ওর নারীসুলভ প্রতিঘাতস্পৃহা। ওদের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার মত সক্রিয়তাও যেন ছিল না মনের।

পদ্ম উসখুস করছিল। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে নিয়ে বললে: পুঁটি, যা না। উনুনে ভাত ফুটছে। হেঁসেলে কুকুর না ঢোকে !

একটু ইতস্তত ক'রে পুঁটি সরে গেল দরজা থেকে।

পদ্ম তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিলে। এসে আবার বসলো অতসীর মাদুরখানায়—একেবারে গা-ঘেঁসে। অতসীর পিঠের ওপর হাতখানা ছড়িয়ে দিয়ে বললে: কি লো, কথা কইছিস না যে ! গোসা হলো নাকি ?···না, মন ঘুরছে কারো লেগে ?

অতসী কোন উত্তর দিলে না। শরীরটা ওর শিরশির করে উঠলো দারুণ বিতৃষ্ণায়।···এই পদ্মাকাটি ছাড়বে না ওর হাড়মাস না চিবিয়ে। কপালে কাল-নাগিনীর মতন এসে ছুটেছে হতচ্ছাড়ি ঠোঁটকাটি।

আস্তে আস্তে পদ্ম কুঁকে পড়লো অতসীর ঘাড়ের ওপর। কাণের কাছে মুখখানা নিয়ে চুমকাড়ি কেটে বললে: নিবারণের কারবারের পয়সা ভাঙিস নি তো ?

অতসী চমকে উঠলো। হঠাৎ যেন ওর বিচার বুদ্ধি ফিরে এলো পদ্মর কথা শুনে।···নিবারণবাবুর পয়সা ! সত্যি তো নিবারণবাবু অনেক টাকার জিনিস দিয়েছিল ওকে গঙ্গার ঘাটে বিক্রি করতে ! যাত্রীর ভিড়ে সেই থলে-ভরা জিনিস-পত্র ও হারিয়ে এসেছে।···কি ভাববে নিবারণবাবু ? ওর পরণে এই দামী নতুন শাড়ি আর সায়া-ব্লাউজ দেখে হয়তো নিবারণবাবুও ভাববে এই কথা। যা পদ্ম ভেবেছে, পুঁটিও ভাবছে মনে মনে।···ছি-ছি !

অতসী ধড়ফড় করে উঠে বসলো। পদ্মর হাত দুখানা দু'হাতে চেপে ধরে বললে: না পদ্মদিদি, নিবারণবাবুর পয়সা আমি ভাঙিনি। না ব'লে কেন নেবো পরের জিনিস !···হারিয়েছি। পথেই হারিয়ে এসেছি জিনিস-পত্তর সব। বিক্রি করতে পারিনি। লোকের চাপে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম।

তারপর ?

তারপর কি ঘটেছে, কিছুই জানি না। যারা দয়া করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারাই দিয়েছে সব। পরণের কাপড়খানাও ছিল না।

মিনসেরা ভালো বলতে হবে।

পুরুষ নয়। মেয়েছেলে।···বড় লোকের বাড়ীর গিন্নী।

ওঃ !···এক টুকরো অবিশ্বাসের হাসি খিলিক দিয়ে গেল পদ্মর চোখে মুখে।

অতসী হকচকিয়ে গেল। কি বলবে, ভেবে পায় না। পদ্মর হাত দুখানার আকুতির সঙ্গে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে: বিশ্বাস করো, পদ্মদিদি। তারা বড়লোক—মস্ত বড়লোক !

তাই বুঝি গেরণ-দান দিয়েছে ?

হাঁ।···না-না, গেরণ-দান নয়। ভেবেছিল, ভদ্দর ঘরের মেয়ে আমি। যোগে চান্ করতে এসে সঙ্গ হারিয়েছি। ভিকিরী, তা জানতো না। জানলে, এমন

দামী জামা-কাপড় দেয় কখনো ?···রাখতে চেয়েছিল বাড়ীতে।

রয়ে গেলি না কেন ?···পেটের দায়ে সাত ঘুঘোরে হাত পেতে বেড়াতে বুঝি ভালো লাগে তোর ?

ভালো লাগে না, তা জানি···তবু অমন করে বাঁদি হয়ে থাকতে পারবোনা কারো বাড়ীতে।···অত বড় লোক। দয়া-মায়া সবই আছে। কিন্তু থাকা চলে না তার কাছে। তুমি জানো না, পদ্মদিদি।

জানবার আর কি আছে ?···ভিকিরীর আবার বাছ-বিচার !

পদ্ম ঝাঁজিয়ে ওঠে।

অতসী ক্ষণকাল নীরব থেকে, ইতস্তত ক'রে বলে : জানো না, তাই রাগ করছো। মেয়েমানুষ হলে কি হয়। যতক্ষণ একলা ঘরে ছিলাম, আস্ত রাখে নি। বেটা-ছেলেকেও হার মানায়।

ওমা ! সে কি লো ?···সে কি !

তাই। লজ্জায় অতসী মুখখানা নীচু করে।

পদ্ম যেন হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে উঠলো। অতসীর হাত দুখানা ধ'রে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে : নেকি, জানো না তুমি কিছু ! বেশ করেছে, বেশ করেছে তোকে নাকাল ক'রে। বাগে পেলে কে-ই বা ছাড়ে বল ?

অতসী হকচকিয়ে গেল পদ্মর কথা শুনে। নিমেষে ওর চোখ দুটো যেন ঝক ঝক ক'রে উঠলো। সেই চাউনি অতসী আগেও অনেকবার দেখেছে পদ্মর চোখে। কিন্তু এমন ক'রে সে মাতাল হয়ে ওঠেনি কোন দিন।

অতসী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পদ্ম নেকড়ে বাঘের মত থাবা মেরে ঝাঁকড়ে ধরে। গয়নাকাটির গায়ে যেন অসুরের মতন জোর। প্রাণপণ চেষ্টাতেও অতসী পারে না নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে।

ছাড়ো, ছাড়ো পদ্ম দিদি।

পদ্ম বাধা মানে না। খিল খিল করে হেসে ওঠে বীভৎস উল্লাসে।

অতসীর হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে অজ্ঞাত আশঙ্কায়।

হঠাৎ দরজায় শিকল নাড়ার শব্দ হলো। নিবারণবাবু ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়।

পদ্ম উঠে দাঁড়ালো শিকার ছাড়া হিংস্র জানোয়ারের মত।

অতসী তখন প্রায় বিবস্ত্র। উঠে দরজার খিলটা খুলে দেবার শক্তিটুকুও যেন লোপ পেয়েছে তার। রাগে দুঃখে ক্ষোভে বুকের ভিতরটা থর-থর ক'রে কাঁপে। সর্বাঙ্গ ভিজে উঠেছে ঘামে।···গয়নাকাটি !···গয়নাকাটি নতুন শাড়ির আঁচলটাকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে ! লাগলা কুকুরের মত চিবিয়ে কেটেছে গোটা আঁচলটা। অতসী উঠে বসবার আগেই খিল খুলে পদ্ম হুল্‌কে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।　　ক্রমশঃ

অগ্নি

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপন বলি' জানি তোমায়, অগ্নি, তুমি মোদের পিতা ;
অগ্নি, তুমি ভ্রাতা মোদের, তুমিই চিরকালের মিতা।
শুভ্রবরণ সূর্য্যে যেমন আরাধনা সবাই করে ;
তেমনি তব মূর্ত্তি বিশাল অর্চ্চি আমি শ্রদ্ধাভরে।
(ঋগ্বেদ ১০।৭।৩)

সংগ্রামেতে হয় যেন মোর তেজের নব অভ্যুদয় ;
তোমায় করি' প্রজ্বলিত দেহ মোদের পুষ্ট হয়।
চারিটি দিক নত হ'য়ে আমার যেন বশ্য হয় ;
তোমায় পেয়ে অগ্নি, যেন করতে পারি শত্রু জয়।
(ঋগ্বেদ ১০।১২৮।১)

বিধান সভায় সাহস প্রদর্শন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া নেহরু-নুন চুক্তির সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের একটি অংশ পাকিস্তানকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছিট মহল বদল উপলক্ষে উহা করা হইয়াছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ও বিধান পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ঐ অংশে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত বহু উদ্বাস্তু বাস করে ও তাহাদের বসবাসের জন্য সরকার তথায় বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। এখন উহা পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে যাইলে শুধু ঐ স্থানের অধিবাসীরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—সরকারের বহু অর্থ ক্ষতি হইবে। কাজেই শ্রীনেহরুর এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সদস্যগণ যে সাহস দেখাইয়াছেন সে জন্য সকলেই তাঁহাদের অভিনন্দিত করিবেন।

কলেজ-শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি—

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-শিক্ষকগণের বেতন বর্দ্ধিত হারে দিবার জন্য ইতিপূর্বে ৭৭টি কলেজের অধ্যাপকগণকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্ট-কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের দেয় টাকা দিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার বাকী ৭টি কলেজ ও মফঃস্বলের বাকী ৪টি কলেজের জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালের দেয় ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন—কমিশনও ঐ পরিমাণ টাকা সত্বর দান করিবেন। বর্দ্ধিত বেতনের অর্ধেক পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অর্দ্ধেক কমিশন দিতেছেন। কলিকাতার কলেজগুলির ছাত্র সংখ্যা আগামী ৫ বৎসরে কমাইয়া প্রতি কলেজে ১৫ শতের অনধিক ছাত্র রাখার নির্দ্দেশ এই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। কলেজ-শিক্ষা ব্যাপারে ব্যবসাদারী বন্ধ করিয়া ছাত্রদের প্রকৃত ও উপযুক্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থার জন্যই সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্ট-কমিশন গঠিত হইয়াছে ও কেন্দ্রীয় সরকার ঐ কমিশন মারফত প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। আশা হয়, ইহার ফলে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর ফলদায়ক হইবে।

দুর্গাপুর অঞ্চলের উন্নতি—

পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুরে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে। তথায় দামোদরের বাঁধ হওয়ার পর প্রচুর ইলেকট্রিক শক্তি উৎপন্ন হওয়ায় কলকারখানা স্থাপনের সুযোগ হইয়াছে। সে জন্য ঐ অঞ্চলে বহু ফাটকাদার ব্যবসায়ী যাইয়া জমী ক্রয় বিক্রয় ও গৃহনির্মাণ দ্বারা সাধারণকে ও সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছিল। সে কারণে গত ৩০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় "দুর্গাপুর উন্নতি আইন" পাশ হইয়াছে। অতঃপর তথায় জমীর মূল্য ও গৃহ নির্মাণ ব্যবস্থা এই আইনে নিয়ন্ত্রিত হইবে। সে ব্যবস্থার জন্য সরকার একটি কমিটী গঠন করিয়া কমিটীর উপর সকল কার্য্যের ভার প্রদান করিবেন। নূতন সহর সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গঠিত হইলে তাহা যেমন দেখিতে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হইবে, তেমনই জমী ও বাড়ী বিক্রেতারা ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

লেডী ওয়াডিয়ার দান—

পরলোকগত খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী সার কুসরো ওয়াডিয়ার শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী ম্যাডালিন গত আগষ্ট মাসে বিলাতে মারা গিয়াছেন। তিনি তাঁহার উইলে ভারতস্থ ও বিলাতস্থ সকল সম্পত্তি পুনা (ভারত) ওয়াডিয়া কলেজের ইলেকট্রিকাল টেকনোলজিকাল ইনিষ্টিটিউটে দান করিয়া গিয়াছেন। লেডী ওয়াডিয়ার বিলাতস্থ সম্পত্তির মূল্য ১১৭০২৯ পাউণ্ড। ভারতে ও আমেরিকায় তাঁহার যে সম্পত্তি আছে তাহার মূল্য এখনও জানা যায় নাই। লেডী ওয়াডিয়া কিছু অর্থ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কেও দান করিয়া গিয়াছেন।

ভারতকে ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের দান—

গত ৩০শে ডিসেম্বর আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেসন ভারতকে ৪ দফায় নিম্ন লিখিত অর্থদান করিয়াছেন। (১) আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ডলার। (২) বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার (৩) ভারতের ৬টি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৯৪ হাজার ৭ শত ডলার (৪) ভারতে শাসন-ব্যবস্থা শিক্ষার সরকারী কলেজে ৬০ হাজার ডলার। এই সকল দানে ভারতের অবস্থা অবশ্যই উন্নত হইবে।

আমতায় জল নিকাশ পরিকল্পনা—

পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে ডিসেম্বর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার নিজ হাতে মাটি কাটিয়া আমতা জল নিকাশ পরিকল্পনার কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন। ২৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে কেতুয়া বিল প্রভৃতি নীচু স্থানের জল নিকাশের ব্যবস্থা হইলে ২১ হাজার একর চাষের জমী উন্নত হইবে ও ফলে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার মণ অতিরিক্ত ধান ফলিবে। গঙ্গা হইতে কেতুয়া বিল পর্য্যন্ত সাড়ে ১০ মাইল পুরাতন খাল চওড়া ও গভীর করা হইবে। নবীনবাবুর খাল, কমলাচক খাল ও কুমারচক খালও চওড়া এবং গভীর হইবে। ৮টি পায়ে চলার পুল, ৪টি গাড়ী চলাচলের পুল ও ৪৯টি স্লুইস গেট নির্মিত হইয়া ৪৮ বর্গ মাইল এলাকার উন্নতি করা হইবে। সত্বর কাজ শেষ হইলে ঐ অঞ্চলের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

কলিকাতা যাদুঘরের বিস্তার—

গত ২৮শে ডিসেম্বর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন কলিকাতায় যাদুঘরের বিস্তারের জন্য যাদুঘরের নিকট এক নূতন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ৬ তালা বাড়ী নির্মিত হইলে বহু নূতন ও পুরাতন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। নূতন বাড়ীতে কখনও আগুন লাগিবে না—তাহার একতলায় ৫ শত শ্রোতা বসিবার উপযুক্ত সভা-গৃহ থাকিবে। তাহা ছাড়া গবেষণাগার ও গবেষক ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত স্থানের তথায় ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতায় ঐ নূতন গৃহ নির্মাণের ফলে কলিকাতাবাসী ছাত্র-ছাত্রীগণ অধিক উপকৃত হইবেন।

কুমারী নবনীতা দেব—

কবিদম্পতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর একমাত্র সন্তান কুমারী নবনীতা দেব ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্যে' স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে 'তুলনামূলক বিশ্ব-সাহিত্যে'র পঠন থাকিলেও এসিয়ায় জাপানে ছাড়া আর কোথাও এ বিষয়ের আলোচনা ছিল না। নূতন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার অধ্যয়ন প্রবর্তিত হইলে ১৯৫৬ সালে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে নবনীতা কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজি অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়া

কুমারী নবনীতা দেব

যাদবপুরে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে স্বর্ণপদক ছাড়াও ১৯৫৮ সালের এম-এ পরীক্ষায় সকল বিষয়ের ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া একটী অতিরিক্ত স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। নবনীতা বহুবার বিতর্ক সভা, সন্তরণ প্রতিযোগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীতে সম্মান ও স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৫৯ সালের মধ্য-ভাগে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকা যাইবেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতায় চৈতন্য গবেষণা ভবন—

গত ২৮শে ডিসেম্বর দক্ষিণ কলিকাতায় রাসবিহারী এভেনিউতে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে অনুশীলনের জন্য শ্রীচৈতন্য গবেষণা ভবন ও গৌড়ীয় মঠের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত ভবন বিভিন্ন ধর্মীয় মত বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল হইবে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন তথায় বলিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেম ও সত্যের বাণীকে অবলম্বন করিয়া এক নূতন বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইহা অনিবার্য্য। যিনি প্রকৃত ভক্ত তাঁহার নিকট ধর্মীয় ভেদাভেদ নিরর্থক। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীকে-সি দাশগুপ্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং স্বামী ভক্তি বিলাস তীর্থ মহারাজ ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বৈষ্ণব দর্শন গবেষণার কেন্দ্র বর্ত্তমান যুগের মানুষকে অবশ্যই শান্তির পথ দেখাইবে।

নবদ্বীপে শ্রীঅরবিন্দ মন্দির—

নবদ্বীপ (নদীয়া) বঙ্গবাণীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী ১২ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীমা'র নিকট হইতে শ্রীঅরবিন্দের ভস্ম লইয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় আসিবেন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ২৯ ঘোড়ায় চালিত স্বর্ণ রথে তাহা মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ ষ্ট্রীট ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইয়া ৫২বি ইণ্ডিয়ান মীরার ষ্ট্রীটে রাখা হইবে। তাহা স্পেশাল ট্রেণে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর হইয়া নবদ্বীপে ২১শে ফেব্রুয়ারী পৌঁছিবে ও ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবদ্বীপ বঙ্গবাণীতে নির্মিত মন্দিরে স্বর্ণাধারে রক্ষা করা হইবে। কলিকাতায় ২ দিন ঐ ভস্মাধার সকলের দেখার জন্য রাখা হইবে। বঙ্গবাণীর সভাপতি মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মন্দির নির্মাণ ও উৎসবাদির ব্যয়ের জন্য সর্বসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীভূপতি মজুমদারকে সম্বর্দ্ধনা—

গত ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ভারত সভা হলে খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মী ও বর্ত্তমানে মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের ৬৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তাঁহাকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সভায় প্রথমে ডেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন এবং পরে খ্যাতনামা বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ঐ উপলক্ষে প্রকাশিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' পুস্তকে ভূপতিবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা সভায় পঠিত হয় এবং কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমবেত দেশবাসীর পক্ষ হইতে ভূপতিবাবুর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাল্য, অভিনন্দন পত্র, উপহারাদি প্রদান করা হয়। তাঁহাকে একটি রৌপ্যনির্মিত রিভলভার উপহার দিয়া বাঙ্গালী তরুণগণের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রশস্ততর করার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। গত ৫০ বৎসর কালের অধিক দিন ধরিয়া ভূপতিবাবু যেভাবে দুঃখবরণ করিয়া নানাক্ষেত্রে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা স্মরণ করা ও সেজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য—সেজন্য এই উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে আমরা অভিনন্দিত করি।

সমরেশ বসু সম্বর্দ্ধনা।—

গত ৪ঠা জানুয়ারী রবিবার বিকালে ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির নিকটস্থ মাদরাল গ্রামে স্থানীয় সারস্বত পাঠাগারের কর্মিদের উদ্যোগে মাদরালস্থ শান্তিধাম নামক মনোরম গৃহে খ্যাতনামা তরুণ কথাশিল্পী নৈহাটিবাসী শ্রীমান সমরেশ বসুকে কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁহার সাফল্যলাভের জন্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মাদরালবাসীদের পক্ষ হইতে শ্রীকালিদাস ঘোষাল ও শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সমরেশবাবুকে এক সুলিখিত অভিনন্দন পত্র, একটি সুন্দর কৃত্রিম ফুলের তোড়া উপহার দেন। ফুলের তোড়াটি স্থানীয় এক মালাকর শোলা দ্বারা সুনিপুণভাবে তৈয়ার করিয়া দেন ও তাহার সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ হন। অনুষ্ঠানে ২৪ পরগণা জেলা ইতিহাস সংকলন সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য ও জেলা সাংবাদিক সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সমরেশবাবুকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সমরেশবাবু তাঁহার সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাষণ দান করার পর সভাপতি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারা এবং বিশেষ করিয়া সমরেশের লিখিত 'গঙ্গা' প্রভৃতি পুস্তকের বিবরণ দান

করিয়া তাঁহার রচনা-শৈলি ও অন্যান্য গুণের বর্ণনা করেন। কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মাদরাদ নিবাসী শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের উদ্যোগে ঐ সুরম্য শান্তিধাম ও বিরাট বিলের ধারে বুদ্ধমন্দির ও শিবমন্দির নির্মিত হইয়াছে। ভাটপাড়া-নৈহাটি অঞ্চলের বহুসংখ্যক ও জেলার নানাস্থান হইতে সমাগত সুধীবৃন্দ ঐ মনোরম গৃহাদি দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। সকলে তরুণ সাহিত্যিক সমরেশের সম্বর্দ্ধনার জন্য স্থানীয় কর্মীদের প্রশংসা করেন।

বিভূতি-তীর্থ—

গত ২৮ শে ডিসেম্বর রবিবার ২৪পরগণা জেলা ইতিহাস সংকলন সমিতির ও জেলা সাংবাদিক সংঘের সদস্যগণ বনগ্রামে যাইয়া স্বর্গত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি বারাকপুর গ্রামে তাঁহার বাসগৃহ এবং গোপালনগরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় নির্মিত পাঠাগারভবন দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। বারাকপুর ও গোপালনগর উভয় স্থানেই স্থানীয় কর্মীরা সমাগত সুধীবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীরণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইতিহাস সমিতির শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক সংঘের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কবি শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাণাঘাটের শ্রীননং চৌধুরী প্রমুখ একদল উভয় স্থানে গমন করেন এবং উভয় স্থানের সভাতেই উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বারাকপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিভূতি-তীর্থ নামকরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পথের পাঁচালী, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রভৃতিতে অঙ্কিত চরিত্র ও চিত্রগুলি ঐ সকল স্থানে আজিও বর্ত্তমান। বিভূতিভূষণের খ্যাতি আজ ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে—কাজেই বারাকপুরস্থ তাঁহার বাসগৃহ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া তথায় বিভূতিবাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা স্বাধীন সরকার ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য। বনগ্রামবাসী শ্রীসুবোধকুমার সাহার ঐকান্তিকতা ও চেষ্টার ফলে সে দিন সকলের ঐ সকল স্থান দর্শনের সকল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

পাটি ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ জন্মান্তর ॥

জন্ম ও মৃত্যু আর আত্মার অবিনশ্বরত্ব—এই নিয়ে আছে গবেষণা, আছে মতভেদ, আছে প্রমাণ ও অপ্রমাণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত; কিন্তু হিন্দু ধর্মমতে জন্মান্তর সম্ভবই শুধু নয়, নিশ্চিতও বটে। তবে মৃত্যুহীন অবিনশ্বর আত্মা জন্মে জন্মে দেহধারণ করলেও দেহধারীর কিন্তু মনে থাকে না পূর্বজন্মের কথা, অবশ্য যদি সে জাতিস্মর না হয়।

'বর্ণচিত্র' পরিবেশিত বরুণ পিকচার্সের "জন্মান্তর" ছবিটি এই জন্মান্তরকে উপজীব্য করেই রচিত হয়েছে। এক প্রেমে আঘাতপ্রাপ্ত তরুণীর বিয়ের রাতে আত্মাহুতি দান ও কুড়ি বৎসর পরে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত সেই প্রেমিকের সম্মুখে সেই মৃত তরুণীর হুবহু একই চেহারায় উপস্থিত হওয়া এই জন্মান্তরবাদকেই সমর্থন করে, তবে সে জাতিস্মর না হওয়ায় তার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে না। কুড়ি বছর আগের এক ঘটনা,—উদীয়মান চিত্র-শিল্পী আশীষ তরুণী কবরীর সঙ্গে পরিচিত হয় একটি চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে, আর এই পরিচিতিই পরিণত হয় সুগভীর প্রণয়ে। কিন্তু সে প্রণয়ের পরিণতি সুখের না হয়ে, হয় অতীব দুঃখের। বিবাহে সামাজিক ও পারিবারিক বাধার জন্য কবির (কবরীর ডাক নাম) বিবাহ আশীষের সঙ্গে দিতে তার অভিভাবকেরা রাজী হয় না। উপরন্তু অন্যের সঙ্গে কবির বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আশাভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কবি বিয়ের রাতে আত্মহত্যা করে তার তরুণ জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দেয়। আবার কুড়ি বছর পরে এই যবনিকা উত্তোলিত হয়—প্রৌঢ় আশীষের ঘরে আশীষেরই আঁকা কবির চিত্রাবলীর সঙ্গে তরুণী মিনতির হুবহু সাদৃশ্য শুধু মিনতিকেই বিস্মিত করে না আশীষ ও তার বৃদ্ধ ভৃত্য নিধুকেও অবাক করে দেয়। নিধু আশীষকে বলে কবিদিদিই আবার ফিরে এসেছে। আশীষ ভাবে। মিনতিকে জানায় কবির সব কথা। মিনতি অস্থির হয়ে ওঠে, কিন্তু পূর্বজন্মের কথা কিছুই মনে পড়ে না। তারপর আশীষের হয় মৃত্যু, আর গল্পেরও শেষ। এই হল সংক্ষেপে "জন্মান্তর"-এর কাহিনী।

কাহিনীর দিক থেকে নতুনত্ব আছে। অভিনয়ে কবি ও মিনতির ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় দক্ষতার অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন, আর নিধু চাকরের ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় মনে রাখবার মতন হয়েছে। এঁরা ছাড়া পাহাড়ী সান্যাল, অনুপ গাঙ্গুলী, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায় প্রভৃতির অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী হয়েছে। আশীষের ভূমিকায় নির্মলকুমারের অভিনয় কিছুটা দুর্বল হলেও তাঁর প্রৌঢ় বেলাকার অভিনয় ভাল হয়েছে। পরিচালনা উচ্চস্তরের না হলেও মোটামুটি ভাল হয়েছে—বিশেষ করে ছ্যাবলামি বা হাল্কা রসিকতা প্রভৃতি বর্জন করে নবাগত পরিচালক তাঁর সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

তবে গুণাগুণের চিত্রটিকে বিচার করলে এর কতকগুলি বিশেষ ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমতঃ চিত্রটির গতি বড়ই শ্লথ। তার ওপর গান আছে তিনটি—মিনতির একটি আর কবরীর দুটি। এর মধ্যে আবার কবরীর একটি গানকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার শোনান হয়েছে। ঐ একটি গানকে রেখে অন্য দু'টি গান বাদ দিলেইভাল হত। তাহলে ছবিটির গতিও এত ঝিমিয়ে পড়ত না। তাছাড়া আশীষের ঘরে কবির পেন্টিংগুলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুবার দেখান হয়েছে। যে কোনও জিনিষই অনেকবার করে দেখালে তা বিরক্তিকর হয়ে পড়ে। এর ওপর কবির গান ও কয়েকটি দৃশ্য পুনঃ পুনঃ ফ্ল্যাশ্‌ব্যাক্ করে দেখানোও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। আর সর্বোপরি ছবির যেটি প্রধান অঙ্গ সেই রহস্যময় পরিবেশটিই ফুটে ওঠেনি। এই মিষ্টিক্ ভাবটিই হওয়া উচিত ছিল ছবির প্রধান অবলম্বন—এই ভাবটির ওপরই গল্পের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রধান ভাবটিই পরিচালক সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি; আর সেটা হয় নি আশীষ ও কবির পুরান কথাকে—তাদের ভাব, ভালবাসা, বিচ্ছেদকে একটানা দেখাতে গিয়ে তাতে সেটাই হয়ে পড়েছে ছবির প্রধান বিষয়। তাই, একটি ছেলে ও মেয়ের প্রেম ও তার বিষাদময় পরিণতি—সেই একঘেয়ে সাধারণ গল্পেরই একটি একটি নতুন সংস্করণ ছাড়া আর কিছু হয় নি। সর্বোপরি ছবির শেষটিই ঠিকমত হয়নি। যখন ট্র্যাজেডির মধ্যেই ছবিটির শেষ করা হল তখন আশীষের মৃত্যুর পর মিনতিকে জীবিতা রেখে কি উদ্দেশ্য সাধিত হল? আশীষের সঙ্গে মিনতির মৃত্যু ঘটালে তবু একটা উদ্দেশ্য আছে বোঝা যেত যে পরপারে বা পরজন্মে হয়ত তারা মিলিত হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর কবির চেহারা নিয়ে মিনতি কি করবে? কবিই যদি মিনতিরূপে আবার জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে তার এ জন্মের ফলটা কি

চল ? সে কি অপেক্ষা করে থাকবে কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরে যুবক দেহে আশীষ আবার জন্মে তার সামনে এসে দাঁড়াবে বলে ?

এই সূত্রে এভা গার্ডনার ও জেম্‌স মেসন্ অভিনীত "প্যাণ্ডোরা এণ্ড দি ফ্লাইং ডাচ্‌ম্যান্" নামক একটি নামকরা বিদেশী চিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। এই চিত্রে বহু যুগ আগে নায়ক কর্তৃক বিনাদোষে হত নায়িকা প্যাণ্ডোরা ভগবান কর্তৃক শাস্তিভোগরত মৃত্যুহীন নায়কের সামনে, সেই বহুকাল আগে মৃত নায়িকার হুবহু চেহারা নিয়ে বহু-যুগের ওপার হতে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর নায়ক কর্তৃক অঙ্কিত সেই মধ্যযুগীয় নায়িকার প্রতিকৃতি তারই চেহারার হুবহু নকল দেখে আধুনিকা প্যাণ্ডোরাও বিস্মিত হয়েছিল—কারণ সেও আতিশয্য ছিল না। পরে সে যখন সব বুঝতে পারল তখন নায়কের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নায়ক ডাচ্‌-ম্যান্‌কে ভগবানের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিল। গল্পের এই যে শেষ—এর মধ্যে একটা যুক্তি আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা সঙ্গতি আছে, আর এই রকমই হওয়া উচিত। একটা খাপছাড়া সঙ্গতিবিহীন শেষের কোনও অর্থ হয় না। গল্পের শেষটুকুর দিকে লেখক ও পরিচালকরা বিশেষ নজর দেন না দেখা যাচ্ছে ; কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত ছবির শেষ দৃশ্যটিই দর্শকমনে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে, শেষের সুরটুকুই অনুরণিত হতে থাকে দর্শক মনে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবার সময়।

যাই হোক, অভিনয়ের দিক দিয়ে ও কিছুটা নতুনত্বের জন্য "জন্মান্তর" চিত্রটি যে দর্শনীয় হয়েছে তা অবশ্য স্বীকার্য্য।

পরিচালনায় ঃ

পরিচালনায় দেবকী বসু, প্রযোজনায় অমর মল্লিক ও সঙ্গীত পরিচালনায় রাইচাঁদ বড়াল—এই তিন গুণীর সমন্বয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "সাগর সঙ্গমে" গল্পটি চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন ভারতী দেবী।

পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় "মৃত্যুর মর্ত্যে আগমন" চিত্রটি প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন। প্রধান ভূমিকায় আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দী।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের লেখা ভক্তিমূলক চিত্র "নদের নিমাই"-এর কাজ এগিয়ে চলেছে। চিত্রটিতে প্রায় তিরিশটির ওপর গান গীত হয়েছে।

"অদৃশ্য ইঙ্গিত" চিত্রের পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় আকস্মিক মৃটিং-এর জন্য জামসেদপুর অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসীমকুমার, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি।

বিদেশী খবর ঃ

ব্রিটিশ অভিনেতা Alec Guinnessকে ও মার্কিণ অভিনেত্রী Elizabeth Taylorকে যথাক্রমে "The Bridge on the River Kwai" ও "Cat on a Hot Tin Roof" চিত্রে অপূর্ব অভিনয় করার জন্য নিউ ইয়র্ক-এর রেডিও, টেলিভিশন্ ও সংবাদপত্রের ফিল্ম সমালোচকগণ গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে ভোট দিয়েছেন।

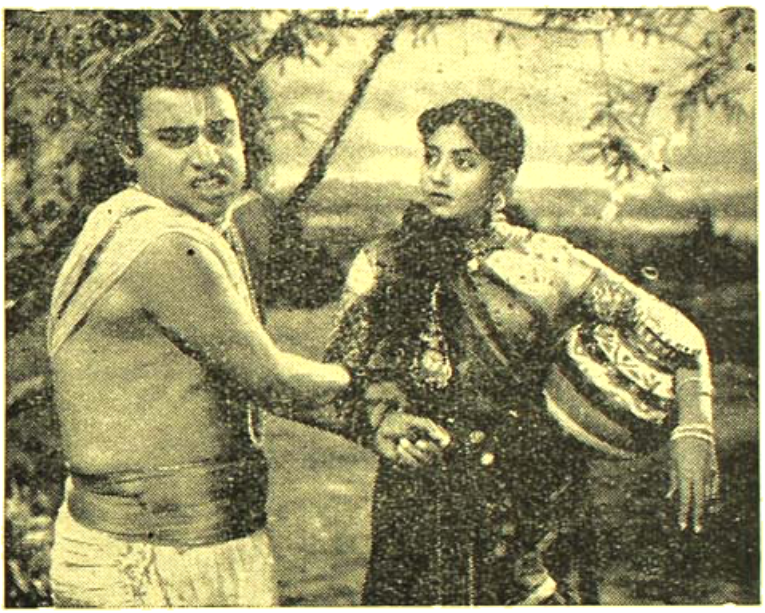

মেঘাকাশে রচিত "নৌকাবিলাস" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুবল ও বৃষার ভূমিকায় অনুপকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

Elizabeth Taylor অভিনেতা Glenn Ford-এর সঙ্গেও সিনেমা মালিক ও ম্যানেজারদের ভোটে বক্স অফিসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণরূপে প্রথম স্থান পেয়েছেন। তাঁদের পরে আছেন—(৩) Jerry Lewis, (৪) Marlon Brando, (৫) Rock Hudson, (৬) William Holden, (৭) Brigitte Bardot, (৮) Yul Brynner, (৯) James Stewert এবং (১০) Frank Sinatra.

Alec Guinnessও তার হাজার সিনেমার ভোটে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ বক্স অফিস্ আকর্ষণ বলে অভিহিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে Sir Alec Guinnessকে এই নতুন বছরে নাইট্‌হুড্ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

শিল্পীর কথা

'তাঁরি নূপুর শুনি সখি মন্দিরে'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

বিশ বছর আগের কথা। বালীগঞ্জ রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে কসবা নিবাসী সংগীতজ্ঞ শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে বসে গানের আসর। সে আসরে সমবেত হয় তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী। তারা আন্তরিকভাবে শিক্ষা করে উচ্চাংগ সংগীত। শৈলেনবাবু বিখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীউমাদেব চট্টোপাধ্যায়ের অতি প্রিয় ও সুযোগ্য ছাত্র। তিনি যখন ছাত্র-ছাত্রীদের তালিম দেন তখন তাঁর কোলে এসে চুপচাপ বসে থাকে ফুটফুটে

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দর তাঁর আদুরে ছোট্ট মেয়েটী। পাঁচ-ছ' বছরের এই অতি শান্ত মেয়েটি ডান হাতের একটি আঙুল মুখে দিয়ে কখনও বা দাঁতে চেপে একমনে শোনে গান। সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনী তার পূর্বজন্মার্জিত সাধনাকে কি সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে চায়? সুরের অপূর্ব ঝংকার ও মূর্চ্ছনা এই ছোট্ট বালিকাটীর হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠে জাগাতে চেষ্টা করে কি তার সুপ্ত প্রতিভাকে?

ইং ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবনৃত্যে আর হের চিটলারের দাপটে সমগ্র বিশ্ব যেন প্রকম্পিত—সন্ত্রস্ত। এ মহাযুদ্ধের প্রবল ঢেউ থেকে বাঙলাদেশও বাদ প'ড়ল না। এই বিরাট কোলকাতা শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই বোমার ভয়ে আতংকিত হ'য়ে দলে দলে কোলকাতা ত্যাগ ক'রলেন—প্রাণের মায়ায়। শৈলেনবাবু কিন্তু এখানেই থেকে গেলেন। সকাল-সন্ধ্যায় গান-বাজনায় মুখরিত তাঁর বৈঠকখানাটি কিন্তু নীরব—নিথর। বাদ্যযন্ত্রগুলোও যেন মনের দুঃখে নেহাৎ মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে আছে ঘরের কোণে।

কারণ, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীই তাদের অভিভাবকদের সংগে কোলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। শৈলেনবাবুর মন তখন খুবই খারাপ। একা একা ব'সে গান গাইতে তাঁর আর ভাল লাগে না। এমনি সময় একদিন তাঁর স্ত্রী ব'ললেন—'অফিস থেকে ফিরে এসে চুপ ক'রে ব'সে না থেকে নিজের মেয়েটাকে তো একটু গান শেখাতে পারো।' কথাটা ঠিক বটে! তারপর থেকেই সেই আট বছরের মেয়েটির সংগীত শিক্ষা শুরু হোল তার পিতার কাছে। কিন্তু সেদিন কি তার পিতা-মাতা কল্পনা ক'রতে পেরেছিলেন যে তাঁদের এই ছোট্ট মেয়েটিই একদিন সারা ভারতের মধ্যে হ'য়ে উঠবে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীত-শিল্পী? তাঁরা কি সেদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে এই মেয়েটিই ভবিষ্যতে একদিন ভারত পেরিয়ে সুদূর রাশিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভিকিয়ার গিয়ে সংগীত-শিল্পী হিসেবে লাভ ক'রবে নাম, যশ ও সম্মান; আর সংগে সংগে বৃদ্ধি ক'রবে বাঙলার তথা ভারতের মর্যাদা ও গৌরব? কিন্তু পূর্বজন্মার্জিত সাধনা ও সুকৃতির ফলে আর ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হ'য়েছে। সেদিনকার সেই বালিকাটি আর কেউ নয়, ইনি হ'চ্ছেন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠা সংগীত-শিল্পী বাঙলা ও বাঙালীর মুখোজ্জ্বলকারিণী শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়)।

মীরার জ্যেঠামশাই শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন সুলেখক ও নামকরা চিত্র-শিল্পী। পিতার নিকট সংগীত শিক্ষা শুরু হবার পর থেকেই মীরার সংগীত-প্রতিভা শতদলের মত হয় বিকসিত। ন' বছর বয়সেই তিনি বিলম্বিত একতালে বা ঝুমরায় খেয়াল গান অতি সহজে ও অল্প সময়ে আয়ত্ত করেন। তাঁর পিতার এবং তাঁর অন্যান্য ছাত্রীর পক্ষে যে গান সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রতে প্রায় একমাস সময় লেগে যেত, মীরা কিন্তু সে গানটি একদিনেই শিখে নিতেন। প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাই-ই সোনা হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে মীরা কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে খেয়াল গান গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে করেন বিস্মিত ও চমৎকৃত, নিজে লাভ করেন বিপুল উৎসাহ ও

আনন্দ। ঐ সালেই তিনি নিখিলবংগ সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে খেয়াল, ঠুংরী ও তারণা নোটেশনে ১ম স্থান অধিকার ক'রে পুরস্কার লাভ করেন পাঁচটী রৌপ্যপদক।

ইং ১৯৪৩ সাল বাংলা ১৩৫০ সন—বাঙলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আবার বুঝি দেখা দিল সারা বাঙলায়। সুদূর পল্লী থেকে দলে দলে বুভুক্ষু নর-নারী-শিশু এসে হাজির হ'ল এই কোলকাতা শহরে—এক মুষ্টি খাদ্যের আশায়। সেই দুদিনে বালিকা মীরার হৃদয়ও কেঁদে উঠল—চঞ্চল কোল বুভুক্ষু নরনারীর আর্ত চীৎকারে। কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে গান গেয়ে যে অর্থ তিনি পেতেন সেই অর্থ এবং নিজেদের পল্লী থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে তিনি সাধ্যমত সাহায্য ক'রেছেন বহু নরনারী ও শিশুকে। এগার বছরের একটি মেয়ের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। ১৯৪৪ সালে ১২ বছর বয়সে তিনি সম্মানের সংগে লাভ করেন 'গীতশ্রী' উপাধি।

১৯৪৫ সাল—জানুয়ারী মাস। কোলকাতায় পূরবী সিনেমা হলে শুরু হ'য়েছে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের অধিবেশন। ভারত-বিখ্যাত প্রায় সমস্ত ওস্তাদই এসেছেন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ ক'রতে। তেরো বৎসরের বালিকা মীরা সেই অনুষ্ঠানে খেয়াল ও ঠুংরী গান গেয়ে সবাইকে বিস্মিত করেন। ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদরা মুক্তকণ্ঠে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রীঋণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় মুক্তকণ্ঠে সেদিন বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বালিকা সমগ্র ভারতে একজন প্রথম শ্রেণীর সংগীতশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাঁদের সেদিনকার সেই বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ঐ বৎসরেই আগষ্ট মাসে কোলকাতার রঙমহল থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত নিখিলবংগ সংগীত সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সংগীত-প্রেমিক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অমর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রতে। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি ভূপেন্দ্র-বাবুর অমর আত্মার উদ্দেশে তাঁর পিতার রচিত নিম্নোক্ত গানটী গেয়ে সবাইকে আনন্দ দান করেন।

'বাঙলার তুমি, বাঙালীর তুমি, তুমি যে মোদের প্রাণ।
তোমারে স্মরিতে আজি এ তিথিতে গাহি তব জয়গান॥'

ঐ একই বৎসরে নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি মিউজিক কনফারেন্সে এবং ডিসেম্বর মাসে গয়ায় অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কংগ্রেসে যোগদান ক'রে মীরা পরিচয় দেন অসামান্য সংগীত-প্রতিভার—লাভ করেন বিপুল সম্মান ও গৌরব। সারাভারতের কাছে তিনি প্রমাণ করেন যে বাঙালী মেয়েরাও সংগীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। এই সম্মেলনে ভারত-বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী গোলাম আলি খাঁ সাহেব, কেশরীবাঈ প্রভৃতি এই বালিকাকে জানান তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৯৪৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী কোলকাতার শ্রী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে যোগদান ক'রে মীরা মালকোশ রাগে খেয়াল গান করেন। তাঁর সুমিষ্ট-কণ্ঠে রাগের বিস্তার ও উন্নত তান শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

১৯৪৮ সালের মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহে পরাধীন ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তদীয় পত্নী লেডী মাউন্টব্যাটেন আসেন কোলকাতায়। কোলকাতার তদানীন্তন শেরিফ মিঃ ডি, এন সেন মহামান্য অতিথিযুগলকে কোলকাতার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ৯ই মার্চ তারিখে ক্যালকাটা ক্লাবে অভিনন্দন জানান। এ উপলক্ষ্যে সভায় সংগীত পরিবেশন করেন মীরা চট্টোপাধ্যায়। এই অপূর্ব সুললিত ভজন গানখানি মহাত্মা গান্ধীর রচিত, শ্রীশৈলেন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সুর সংযোজিত এবং মীরার মধুরকণ্ঠে পরিবেশিত হ'য়ে সভাইকে, বিশেষ ক'রে লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেনকে আকৃষ্ট করে ও আনন্দ দান করে। তাঁরা উভয়েই মীরার ও তাঁর পিতার সহিত করমর্দন ক'রে গানখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। গানখানা নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

উঠ জাগো মুসাফির ভোর ভঈ
অব্ রহেনা কাহা সোবত হুয়,
যো জাগতো হয় সো পাও ত হয়
যো সোয়ত হয় সো খোয়ত হয়।
যো কাল করনা হয় ওব আজ করলে
যো আজ করনা হয় ওব অব করলে
টুট্ নিদ্‌সে আঁখিয়া খোল যারা—
ঔর অপ্‌নে প্রভু পর্ ধ্যান লাগালে॥

এভাবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মীরার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার কাছেই শিক্ষা করেন খেয়াল-ঠুংরী ও অন্যান্য গান। ১৯৫১ সালের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মীরা ভারত ও পাকিস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা ক'রছেন খেয়াল ও ঠুংরীর জটিল ও সূক্ষ্ম কলাকৌশল। ভারতীয় সংগীত সুরের বহিঃপ্রকাশ নয়—এ ধ্যানের বস্তু। এর যেন শেষ নেই—সমুদ্রের মতই এ যেন অসীম।

'কেরে বাদল মেঘে গগন ছাইল', 'আঁধার ছাইল নীলাকাশ', 'গগনে গরজে মেঘ নিবীড় তিমিরে ঘেরা', 'তাঁরি নূপুর শুনি সখি মন্দিরে', প্রভৃতি বহু বাঙলা খেয়াল ও রাগ প্রধান গান মীরার সুমিষ্ট-কণ্ঠে বেতার ও

রেকর্ডের মাধ্যমে পরিবেশিত হ'য়ে জনসাধারণকে দিয়েছে গভীর আনন্দ ও পরম তৃপ্তি।

১৯৫৩ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় বেতার অনুষ্ঠানে মহিলা শিল্পী হিসেবে বাঙলা থেকে সর্বপ্রথম দিল্লীতে আমন্ত্রিত হন মীরা। এর পরও আজ পর্যন্ত তিনি আরও তিনবার আমন্ত্রিত হয়েছেন দিল্লী থেকে।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বম্বে শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে যোগদান করেন মীরা। সেখানে খেয়াল ও ঠুংরী গানে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি লাভ করেন স্বর্ণপদক। ১৯৫৬ সালে পুনরায় এই বম্বে শহরে কয়েকজন নির্বাচিত বিশিষ্ট শিল্পীর মধ্যে তিনি বম্বে গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সুবর্ণপদক 'প্লেট এ্যাওয়ার্ড' হিসেবে লাভ করেন। তারপর এল ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস। মীরার জীবনেতিহাসের এক স্মরণীয়, বরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ভারত রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলে নির্বাচিত হ'য়ে তিনি রওনা হ'লেন রাশিয়ায়—পরিচালিকা মিসেস্ চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে।

মীরার সারা অংগে খেলে গেল পুলক শিহরণ, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মনে লাগলো আনন্দের দোলা, বাঙালী অনুভব ক'রল পরম গৌরব।

মস্কো শহরে এসে পৌঁছলেন ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল। সেখানে পৌঁছাবার সাথে সাথেই তাঁরা লাভ ক'রলেন বিরাট জনতার বিপুল অভিনন্দন। তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব ক'রলেন তাঁদের প্রতি মস্কোবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহের পরশ। ৩০শে আগষ্ট বলশোই থিয়েটার হলে শুরু হ'ল ভারতীয় সংগীত পরিবেশন ও নৃত্য প্রদর্শন। হাজার হাজার উৎসুক শ্রোতা ও দর্শকের স্থান তো একটা থিয়েটার হলে হ'তে পারে না। তাই টেলিভিশনের সাহায্যে সবাই সুযোগ পেল ভারতীয় শিল্পীদের দেখবার এবং তাঁদের গান শুনবার। মীরা সেখানে প্রথমে গাইলেন রবীন্দ্র সংগীত—'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', ও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।' পরে রাধাকৃষ্ণের বর্ণনাসহ একটা ঠুংরী গান। এ ছিন্ন আরও অন্যান্য গান গেয়ে তিনি শ্রোতাদের দেন গভীর আনন্দ আর তাঁদের কাছ থেকে লাভ করেন বিপুল অভিনন্দন ও সম্মান। সমস্ত গানগুলো সংগে সংগে রাশিয়ান-ভাষায় অনূদিত হবার ফলে শ্রোতাদের বুঝতে কোন কষ্ট হয়নি। প্রথমদিনের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর মীরা যখন 'হল' থেকে বাইরে এলেন তখন নীনা নামে সুন্দরী একটি রাশিয়ান মেয়ে ভীড় ঠেলে মীরাকে এসে জড়িয়ে ধ'রে ভালোবেসে সাদর চুম্বন। সে টেলিভিশনে মীরাকে দেখে ও তাঁর গান শুনে এতদূর আকৃষ্ট হ'য়েছে যে মীরাকে সে বন্ধুত্বে বরণ ক'রে নিতে চায়। তার অমায়িক ব্যবহারে ও কথাবার্তায় মীরার মনে হ'ল, এই নীনা যেন তাঁর কতদিনের চেনা—যেন কত ঘনিষ্ঠতা, কত আলাপ-পরিচয় এর সংগে পূর্ব থেকে। আজ পর্যন্তও নীনা প্রতিমাসে মীরাকে চিঠি লিখে বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রেখেছে। মস্কো রেডিও থেকেও মীরার গান পরিবেশিত হয়েছে, রেকর্ড করাও হ'য়েছে তাঁর গানের। এক অভূতপূর্ব আনন্দের মাঝে রাশিয়ায় মীরার দিনগুলো কেটে গেল। বহু উপঢৌকন লাভ ক'রে, যশের মুকুট প'রে মীরা যখন মস্কো ত্যাগ ক'রলেন তখন তাঁর স্বল্পদিনের পরিচিতা বান্ধবীরা বিশেষ

মীরা ও তাঁর রাশিয়ার বন্ধু নীনা

ক'রে নীনা কাঁদতে লাগল। চোখের জলের ভেতর দিয়ে ভারতীয় দল বিদায় নিলেন। তাঁরা মস্কো থেকে এলেন পোলাণ্ড। সেখানে মীরা পোলিশ গান শিখে নিয়ে সেই গানও তাঁদের শোনালেন। তারপর তাঁরা আসেন চেকোশ্লোভিয়ায়। এখানেও ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল লাভ করেন বিপুল সম্মান। এখানে মীরা পরিবেশন করেন একটি ভক্তিমূলক সংগীত—'সকলি তোমারি ইচ্ছা, মা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'।...এখানকার একজন চেক অধিবাসী সুন্দর বাঙলা জানেন। তিনি মীরার সংগে বাঙলা ভাষায় আলাপ করেন। মীরা আরও বিস্মিত হ'লেন তখনই যখন সেই ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট রাজলক্ষ্মীর চরিত্র সম্বন্ধে

আলোচনা ক'রতে চাইলেন। শরৎ-সাহিত্য সে ভদ্রলোক কি ভাবে প'ড়েছেন, ভাবতেও আনন্দ লাগে না কি? এ ভাবে বিদেশে সর্বত্র সম্মান ও সুনাম লাভ ক'রে ভারতীয় দল ফিরে এলেন দিল্লী—ভারতের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য বিদেশে প্রচার ক'রে।

১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙলার সর্বজনপ্রিয় সংগীত-শিল্পী শ্রীপ্রমথনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগে মীরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

মীরার ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী লক্ষ্মী বসু বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে সমগ্র ভারতের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করে এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট থেকে সুবর্ণ পদক ও টাকার তোড়া পুরস্কারস্বরূপ লাভ ক'রে বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করে।

মীরার মায়ের ইচ্ছা আজ পূর্ণ, বাবার আন্তরিক চেষ্টার সংগে সংগীত-শিক্ষাদান আজ সার্থক। কিন্তু মীরার সংগীত-সাধনা আজও চলেছে অব্যাহতভাবে। কেননা, এ সাধনার বুঝি শেষ নেই!

মীরার বয়স এখন ২৬ বৎসর। আমরা আন্তরিক-ভাবে ভগবানের কাছে কামনা করি তাঁর শারীরিক সুস্থতা, সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন।

কোন নায়িকাকে

দিব্যেন্দু পালিত

আরো একবার তুমি এসো—
অস্থরীর আঁচল উড়িয়ে,
উচ্ছলার দহন ছুড়িয়ে,
গভীর হৃদয়ে ভালবেসো।

ললাটের প্রিয়তম টিপ,
গুঁড়ো গুঁড়ো সিঁদুর ছড়ানো,
যে-কথাটি মনে মনে জানো,
তার মুখে জেলে দিও দীপ।

বাতাসে এখনো কতো ভাষা,
আকাশের বুকে কতো রঙ,
তার কিছু নিয়েই বরং—
স্বভাবের সম্মিলিত আশা।

সকালের শিশু-রোদ বলে,
বৃদ্ধের মতন এক নারী—
তুমি সেই পুণ্যতোয়া বারি
ঢেলে দিও সময়ের পলে।

ধ্যান-ময় শান্তি কতো আছে
অধরের রক্তিম আভায়—
অপূর্ণ পিপাসা কিছু চায়
সুমদির ভঙ্গিমার কাছে।

অপলক প্রতীক্ষার স্নায়ু
তোমাতেই হয়েছে বিলীন;
কামনার রৌদ্র-রাঙা দিন—
আর তুমি তার পরমায়ু।

শ্যাম-স্নিগ্ধ চোখের ছায়ায়
বনানীর অপার নীলিমা;
সাগর খুঁজেছে তার সীমা
হৃদয়ের গহন মায়ায়।

শঙ্খিনীর মতো ভালবেসো—
যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়;
ছবি তার আঁকুক সময়—
আরো একবার তুমি এসো।

গ্রহ জগৎ

বিদ্যাভাব

উপাধ্যায়

লগ্ন থেকে চতুর্থ স্থান, এর অধিপতি এবং বিদ্যাকারক গ্রহ বৃহস্পতির বলাবল ও অবস্থিতি অনুসারে জাতক বা জাতিকার বিদ্যাভাব নির্ণয় করতে হয়। পঞ্চম স্থান থেকে বিচার হয় মানুষের বুদ্ধি সম্পর্কে। কেউ কেউ তৃতীয় স্থানকে বিদ্যা বিচার সময়ে লক্ষ্য করে থাকেন। এঁরা বলেন, পার্থিব জগতে মনের অবস্থা বা গতি ও প্রকৃতি কিম্বা মানসিক প্রবণতার কারকতা তৃতীয় স্থানেই নিহিত রয়েছে। মানুষের উচ্চ চিন্তাধারা সম্পর্কে জানা যায় নবম স্থান থেকে। কিন্তু হিন্দু-জ্যোতিষীরা চতুর্থ স্থানকেই বিদ্যার প্রকৃত স্থান বলেছেন। অবশ্য মানুষের মানসিক-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য কতটুকু, তা তৃতীয় স্থান বিচার করে যেমন ধরতে পারা যায়, অনুরূপ ভাবে বুঝতে পারা যায় চতুর্থ স্থান থেকে জাতক বা জাতিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবে কিনা বা ডিগ্রি-উপাধি পেয়ে শিক্ষিত বলে জন সমাজে সমাদৃত হবে কিনা—চতুর্থ স্থান থেকে বিদ্যা, পঞ্চম স্থান থেকে বুদ্ধি, আর দশম স্থান থেকে বিদ্যাজনিত বশ চিন্তা করতে হয়। বিদ্যাবিষয়ক ফল ভালো হোলেই যে জাতক বা জাতিকা বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী হবে বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারবে এরূপ কথা বলা যায় না। আমরা পাশ ফেল প্রভৃতি দশম স্থান থেকে বিচার করে সাফল্য লাভ করেছি। খুব বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী মেধাবী ছেলেমেয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারেনা—অনুকূল আবেষ্টনী, অধ্যবসায়, মনঃ-সংযোগ ও প্রশ্নোত্তর করবার কৌশল জানার অভাবে, আর একথাও সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রিধারী হোলেই যে সে জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নত হবে, এরূপ নিশ্চয়তা দেখা যায় না। চাকরীর ক্ষেত্রে অবশ্য ডিগ্রিটা পাসপোর্ট বলা যায়। বহু স্নাতকোত্তর ছেলে-মেয়েকে দেখা গেছে বিদ্যাবুদ্ধিতে নিকৃষ্ট এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকলে বিদ্যায় বাধা প্রদান করে —আর আশানুরূপ বিদ্যার্জ্জন হয় না, বিদ্যাভঙ্গযোগ ঘটে। এই স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকলে উত্তম বিদ্যা ও কর্ম্মলাভ অবশ্যই হয়ে থাকে। দশম স্থানে পাপগ্রহ, নীচস্থ, দুর্ব্বল বা পরাজিত গ্রহ থাকলে আর দশমাধিপতি দুঃস্থান-গত ও পাপদৃষ্ট হোলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। দশম স্থানে কোন গ্রহ না থাকলে দশমাধিপতি কার নবাংশে আছে, সেই নবাংশপতির অবস্থান ভেদে পাশ-ফেলের বিচার করতে হয়। যার বুধ ও বৃহস্পতি উত্তম, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে উন্নতি লাভ করবে। চতুর্থ বা দশম স্থানে বৃহস্পতি থাকলে আইন-বিদ্যায় উন্নত ও পারদর্শী হওয়া যায়। দ্বিতীয়াধিপতি শুভভাবে থাকলে বাক্‌শক্তি লাভ হয়—উৎকৃষ্ট বক্তা ও অধ্যাপক হওয়া যায়। বুধ কেন্দ্রে কোণে অথবা দ্বিতীয়ে শুক্র থাকলে জ্যোতির্ব্বিদ হওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী হোতে হোলে দ্বিতীয় স্থানে মঙ্গল আর কেন্দ্রে বা কোণে বুধ থাকা দরকার। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাগ্মিতা, কবিত্ব শক্তি প্রভৃতি কারক বুধ গ্রহ। বুধ শুভ হোলে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক হওয়া যায়। অস্ত্রাদি চিকিৎসা বিষয়ের জ্ঞান মঙ্গলের অবস্থান দ্বারা নির্ণয় করতে হয়, শনি দ্বারা তান্ত্রিক ব্যাপারের জ্ঞান নির্ণয়।

রবি বা মঙ্গল দ্বিতীয়াধিপতি হয়ে শুক্র বা বৃহস্পতির সঙ্গে একত্র থাকলে ন্যায়দর্শন বা মনোবিজ্ঞানে উৎকর্ষ

লাভ হয়। বৃহস্পতি ও শুক্র বুধের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হয়ে কেন্দ্রে কোণে অবস্থান করলে দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ ও মানসিকক্ষেত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি অর্জন করা যায়। শুক্র ও বৃহস্পতি বলবান হয়ে কেন্দ্র কোণে থাকলে বিশেষ বিদগ্ধতা লাভ হয়। উৎকৃষ্ট বিদ্যার্জ্জন করে পণ্ডিতসমাজে ব্যাস-তুল্য হোতে গেলে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতির প্রভাব-মুক্ত হয়ে চতুর্থাধিপতি ও বৃহস্পতির শুভভাবে থাকা দরকার।

তৃতীয় ও নবমস্থান আর এদের অধিপতির বলাবল ও অবস্থান ভেদে বিচার করতে হয়, জাতক বা জাতিকা সাহিত্যকলা, শিল্প বা বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে কোনটির দিকে তার ঝোঁক—আর কোন্ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করলে জীবনে কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। চতুর্থ স্থানে বৃহস্পতি বা রাহু বলী হোলে ডিগ্রী লাভে কোন বাধা বিপত্তি ঘটে না। বৃহস্পতি বা বুধ বিদ্যাধিপতি হয়ে শত্রু গৃহে থাকলে কুবিদ্যা হবে—আর কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা উচ্চগৃহে থাকলে উত্তম বিদ্যালাভ ঘটে।

ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রপরতা বৃহস্পতির আনুকূল্যে সম্ভব হয়।

ভিষক, জ্যোতিষ, কাব্যশিল্প, লেখাবৃত্তির কারক বুধ। শুক্রের আনুকূল্যে কাব্যকর্ত্তা ও প্রাকৃত গ্রন্থতৎপর হওয়া যায়—প্রাকৃত গ্রন্থ বলতে নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বুঝা যায়। চতুর্থপতি ও পঞ্চমপতি একত্র কেন্দ্র বা কোণে সহাবস্থান করলে জাতক বিদ্বান হয়। শঙ্করাচার্য্যের লগ্নে বিদ্যাকারক গ্রহ বৃহস্পতি তুঙ্গস্থ ছিল—এজন্যে তিনি বেদান্তজ্ঞ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়স্থানে মঙ্গলগ্রহ থাকায় তিনি গণিতজ্ঞ হয়েছিলেন। বুধ ও শুক্র আইনবিদ্যার কারক। উদিত বুধ একাদশ স্থানে এবং শুক্র দশম স্থানে থাকলে আইনশাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায়, উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক হোতে গেলে চন্দ্র বলবান হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধিকারকগ্রহ বলবান অথবা বুদ্ধি-ভাবাধিপতি অর্থাৎ পঞ্চম ভাবাধিপতি শুভগ্রহ দৃষ্ট হয়ে কিম্বা বুদ্ধি স্থানে খুব থাকলে জাতক বা জাতিকা অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। বিদ্যা বিষয়ে বিচার করতে হোলে চতুর্থ ও পঞ্চমাধিপতির বলাবল, অবস্থান ও শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় বিধেয়; তা ছাড়া ভাবাধিপতি শুভগ্রহ শুভবর্গগত, শুভদৃষ্ট, শোচ্যাদি বর্গ ও স্বগৃহাদি বর্গগত কিনা তাও লক্ষ্য করা উচিত। চন্দ্র মনের কারক, আর চতুর্থস্থান থেকে মানসিক গুণাগুণ বিচার করা হয়। যদি চতুর্থাধিপতি বলবান হয় তবেই জাতক বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হৃদয় হোতে পারে, চন্দ্র দুর্ব্বল হোলে মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। হীনবল ও নীচস্থ চন্দ্র যার রাশিচক্রে দেখা যায়, সে ব্যক্তি প্রায়ই অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়, তার পক্ষে লেখাপড়া ভালো হয়না, তবে গ্রহ-যোগও দৃষ্টি দ্বারা ফলাফলের তারতম্য হোতে পারে।

বুধ বুদ্ধির কারক, এজন্যে বুধ চন্দ্রের সঙ্গে থাকলে বা চন্দ্র বুধ দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে জাতক বুদ্ধিমান্ও বালকের ন্যায় সরলচিত্ত হয়ে থাকে। চন্দ্র মনের কারক হওয়ায় স্মৃতিশক্তিরও কারক। এজন্যে চন্দ্র বলশালী হয়ে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ ভিন্ন অন্যভাবগত হোলে জাতক বা জাতিকা স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হয়। চন্দ্র ও বুধ একত্র যুক্ত থাকলে জাতক অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। চন্দ্র থেকে কেন্দ্র কোণগত বুধও শুভফলপ্রদ। বৃহস্পতি প্রজ্ঞা-কারক এজন্য চন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে প্রজ্ঞাবান হওয়া যায়।

বিদ্যাভাব নিজের অধিপতি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতির দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হোলে অতীব শুভজনক হয়। কিন্তু ভাবাধিপতি দুঃস্থানে অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাবে থাকলে, শত্রুগ্রহগত বা দুর্ব্বল হোলে শুভফলের আশা নেই, কিন্তু স্বক্ষেত্রে মূল ত্রিকোণে বা তুঙ্গে থাকলে শুভফলদাতা হয়। ভাবাধিপতি তুঙ্গী, মূল ত্রিকোণস্থ, বা স্বগৃহী হয়ে শুভগ্রহ-যুক্ত বা দৃষ্ট হয়ে কেন্দ্রে বা কোণে থাকলে বিদ্যাভাবের অতীব শুভফল হয়ে থাকে।

চতুর্থ স্থানে তুঙ্গস্থ চন্দ্রের সঙ্গে শনি থাকলে আর এদের ওপর বৃহস্পতি পূর্ণদৃষ্টি করলে অল্পবয়সেই জাতক পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হয়ে গ্রন্থকার হয়। জাতকের লগ্ন ধনু হোলে আর লগ্নাধিপতি শনির সঙ্গে লগ্নে অবস্থান করলে, সে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী অর্থাৎ উকিল, ব্যারিষ্টার, শেষ পর্য্যন্ত আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে—সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচারক পর্য্যন্ত হয়।

চতুর্থ স্থানে চতুর্থাধিপতি ও তুঙ্গস্থ বৃহস্পতি একত্র থাকলে উচ্চ আইন শিক্ষালাভ হয়ে থাকে। লগ্নাধি-

পতি ও চতুর্থাধিপতি একাদশে আর রবির সঙ্গে দ্বিতীয়াধিপতি দ্বাদশে থাকলে বিদ্যাশিক্ষা সঙ্কীর্ণভাবে ঘটে থাকে। চতুর্থাধিপতি ও শুক্র কেন্দ্রগত হোলে আর বুধ বলবান হোলে জাতক বিদ্যাবিনয়াদি গুণসম্পন্ন হয়। চতুর্থাধিপতি বৃহস্পতি ও বুধ তৃতীয় স্থানে বা দ্বাদশে থাকলে অথবা নীচ শত্রু গৃহগত হোলে বিদ্যাদি বিষয়ে নিকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

মাঘ মাসের ব্যক্তিগত লগ্ন ও রাশির ফলাফল

মেষ লগ্ন—কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভ্রমণ—পুত্র-সন্তান লাভ—নানা পরিকল্পনার সাফল্য লাভ—দুর্ঘটনার সম্ভাবনা—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ—অসন্তোষ ও বিপন্নতার আশঙ্কা—অর্থক্ষতি, সাময়িক শারীরিক কষ্ট—স্ত্রীর আর্থিক বিষয়ে কিছু বিশৃঙ্খলতা—চৌর্য্যভয়—স্বজন বিরোধ বা উপরওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্য—ব্যয় বৃদ্ধি—স্ত্রী বা মাতার পীড়া। নানাভাবে অর্থ অপব্যয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ ফল দেখা যায় না। পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ ফল লাভ।

বৃষ লগ্ন—অর্থ ও বন্ধু লাভ—পীড়া—উচ্চ স্থান হোতে পতনের আশঙ্কা—কর্মে সাফল্য লাভ—অপবাদ ভয়—দুশ্চিন্তা—আংশিক ভাবে কিঞ্চিৎ ক্ষতির সম্ভাবনা। পরীক্ষায় সাফল্য। বিদ্যার্জন মন্দ নয়। প্রণয়ে সাফল্য লাভ। পারিবারিক কলহ—পিতামাতার সহিত মনোমালিন্য, হৃদ্যস্ত বিচ্ছেদ।

মিথুন লগ্ন—শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ও অস্বচ্ছন্দতা—আশাভঙ্গ—মনস্তাপ—উদ্বেগ—চৌর্য্যভয়—স্বজন বিরোধ। অতিরিক্ত ব্যয়, স্ত্রী বা মাতার অসুখজনিত দুশ্চিন্তা। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি, প্রণয় ভঙ্গ। বিপন্নতার আশঙ্কা। শত্রু বৃদ্ধি। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য হবে না, অকৃতকার্য্য হবার আশঙ্কা।

কর্কট লগ্ন—অপ্রত্যাশিতভাবে ভয়, মানসিক আঘাত। স্বাস্থ্যহানি। ভ্রমণ। গবেষণা বা আবিষ্কার কার্য্যে সাফল্য। পিতৃপীড়া। সন্তান লাভ। কর্ম স্থানে পরিবর্তন সম্ভাবনা। কলহ-বিবাদ। বিদ্যার্জন, পরীক্ষায় শুভফল। প্রণয় বৃদ্ধি—স্ত্রী বা পুরুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা—অবৈধ প্রণয়ের যোগাযোগ ঘটতে পারে।

সিংহ লগ্ন—শত্রুহানি। আকস্মিক ভয়। বিপন্নতার সম্ভাবনা। কলহ ও মনোমালিন্য। সঞ্চিত অর্থ থেকে ক্ষতি। ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তানের পীড়া, অর্থকৃচ্ছ্রতা—ঋণ। স্ত্রীলোকের সহিত অসদ্ভাব, স্নেহাপ্রকোপ, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বা চাঞ্চল্য, কতকগুলি অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর ঘটনা। বিদ্যার্জন। পরীক্ষায় সাফল্য। গৃহসুখের অভাব।

কন্যা লগ্ন—শারীরিক অসুস্থতা ও ভয়। ব্যয় বৃদ্ধি। শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদের ভয়। প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধনার ইচ্ছা। সাহিত্যচর্চা, গ্রন্থ রচনা ও অধ্যাত্ম সাধনার দিকে আগ্রহ। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। কর্মে বাধাপ্রাপ্তি। পুত্র লাভ। পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ বলা যায় না। স্মৃতিশক্তির হ্রাস হেতু বিদ্যার্জনে কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ। স্ত্রীর সহিত অসদ্ভাব। প্রণয়ভঙ্গ যোগ। ভালবাসার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক বা পুরুষের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ। শরীরে আঘাত প্রাপ্তি।

তুলা লগ্ন—স্ত্রীর বিপন্নতা। ক্লান্তি ও বিবাদ। পুরস্কার লাভ। অর্থ লাভের যোগ। ব্যবসায়ে লাভ। সৌভাগ্য সুখ। শুভ কর্মানুষ্ঠান। বিদ্যাভ্যাস মধ্যম। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ বলা যায় না। ব্যয়বৃদ্ধি। উদ্বেগ ও আতঙ্ক। প্রণয় বৃদ্ধি। নারী বা পুরুষের সাহচর্য্যসুখ।

বৃশ্চিক লগ্ন—ভ্রমণ। আমোদ-প্রমোদে অপব্যয়। দুঃখভোগ ও দুর্ঘটনা। অর্থলাভ। স্ত্রীলোকের সহিত কলহ। সন্তানের পীড়া। পরীক্ষায় উন্নতি। বিদ্যালাভ। অবৈধ প্রণয়ের যোগাযোগ। দাম্পত্য কলহ। পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা।

ধনু লগ্ন—আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। দুশ্চিন্তা। অর্থলাভ। শারীরিক অসুস্থতা—দুর্ঘটনার ভয়। উদ্বেগ। সন্তানাদির পীড়া। গৃহ বিবাদ। আয় বৃদ্ধি। শত্রু ভয়। ব্যবসায়ে লাভ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। নূতন কর্ম যোগাযোগ।

বিবাহাদির যোগাযোগ বা প্রণয় লাভ। পরীক্ষায় বৈরাশ্ত-জনক পরিস্থিতি, লেখাপড়ায় মনঃসংযোগের অভাব। স্ত্রী-লোক কর্তৃক প্রতারণা।

মকর লগ্ন—স্থান পরিবর্তন। বিবাহের সম্ভাবনা, বিবাহিত ব্যক্তির সন্তান-সম্ভাবনা—ভূম্যাদি ক্রয় বা গৃহ-নির্মাণ যোগ। বাহন যোগ। অর্থপ্রাপ্তি—প্রণয় লাভ। সন্তানের পীড়া। পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। বিদ্যাভাব মধ্যম।

কুম্ভ লগ্ন—ব্যয় বৃদ্ধি। অপবাদ। অর্থক্ষতি। মাসের মধ্যভাগে লাভ। স্ত্রীর পীড়া বা বিপন্নতা। হঠাৎ বিবাহের যোগাযোগ। প্রতিদ্বন্দ্বীর কুচক্রান্ত। বিবয়-সম্পত্তির গোলযোগ। প্রণয়ের প্রবণতা। স্বজন বিয়োগ। মাতার অনিষ্ট সম্ভাবনা। পরীক্ষার ফল ভালো নয়।

মীন লগ্ন—স্বাস্থ্য ও ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু কষ্ট ভোগ। চিত্তচঞ্চলতা ও মতভেদের দরুণ অশান্তি। আকস্মিক ভয় ও উদ্বেগ। দূর দেশ থেকে দুঃসংবাদপ্রাপ্তি। ধনভাব শুভ। সহোদরগণের সহিত কলহ বিবাদ। মাতৃপীড়া। বিদ্যার্জন কিন্তু পরীক্ষার ফল মধ্যম। স্ত্রীর সহিত মনো-মালিন্য। আয় বৃদ্ধি। অর্থলাভ। সম্মান বৃদ্ধি। পদোন্নতি। পিতার বিশেষ পীড়াদি কষ্ট।

***

মেষ রাশি—আশা আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার সিদ্ধিলাভ। পতন বা আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অপব্যয়। কিঞ্চিৎ কষ্ট। কর্মে কিঞ্চিৎ বাধা। ভ্রমণে ক্লান্তি। রোগ বা গুরুতর পীড়া। কলহ বিবাদ ও তজ্জনিত লাঞ্ছনা-ভোগ। স্ত্রী পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ। ব্যয়াধিক্য এমন কি ঋণ সম্ভাবনা।

বৃষ—নৈরাশ্ত। বিচ্ছেদ। বিপদের আশঙ্কা। নূতন বন্ধু লাভ। ধন লাভ। সন্তানের পীড়া। পিত্ত-প্রকোপ। চক্ষুপীড়াদি। স্ত্রীর সহিত কলহ। পুত্র-লাভ। পরাক্রম বৃদ্ধি। স্ত্রী বা পুরুষের সঙ্গলাভজনিত আনন্দ। বুদ্ধির প্রাখর্য্য। যানবাহন বা সম্পত্তিলাভের সুযোগ। বিলাস ব্যসন বৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধি।

মিথুন—মর্মান্তিক মানসিক কষ্ট। অর্থ লাভ। সাময়িক পীড়া বা স্বাস্থ্যহানি। দুঃখ ভোগ। কলহ। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ও স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হেতু স্থানা-ন্তরে গমনেরও সম্ভাবনা। স্ত্রী বা পুরুষের সহিত প্রণয়। উদ্বেগ।

কর্কট—ভ্রমণ ও স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীর সহিত কলহ। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। কর্মে যোগাযোগ। সৌভাগ্য লাভ। জনপ্রিয়তা, যশোলাভ। শত্রু হানি। স্ত্রীলোকের সাহচর্য বা সংসর্গ লাভ। প্রণয়াসক্তি।

সিংহ—স্বজন বিরোধ। কলহ। সঞ্চিত অর্থহ্রাস। ব্যয়বৃদ্ধি। জ্ঞাতিবর্গের দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ার যোগ। বিমর্ষভাব। আশাভঙ্গ। শত্রুদের পরাজয়। বিপদের আশঙ্কা। সম্মানহানি। রক্তপাত।

কন্যা—আকস্মিক ভীতি। সন্তানাদির সুখ-স্বচ্ছন্দতা স্থান পরিবর্তন। কর্মে বাধা। পরিবার বৃদ্ধি। স্বজনবর্গের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। মাতৃ পীড়া। বন্ধুবিচ্ছেদ। দুশ্চিন্তা। প্রত্যেক কার্যে সন্দিগ্ধতা প্রকাশ। পীর সহিত অনভাব।

তুলা—অর্থলাভ। পৌনঃপুনিকভাবে শত্রুদের দ্বারা আক্রমণ। পাওনাদারদের তাগাদার জন্য মানসিক বিশৃঙ্খলতা। ঋণ-সম্ভাবনা। উদ্বেগ ও ভয়।

বৃশ্চিক—ভ্রমণ ও ভয়। অপমান কিন্তু কর্মে সাফল্য ও ধনপ্রাপ্তি। শারীরিক সৌন্দর্যহানি। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। দুর্বলতা। পরানুগ্রহে অর্থলাভ। ব্যয়ের জন্যে সঞ্চয়ের অভাব। পরাক্রমবৃদ্ধি। গুরুজনবর্গের আনুকূল্য লাভ। উপরওয়ালার প্রীতি। স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা। শত্রু হানি। উচ্চস্থান হতে পতনের আশঙ্কা।

ধনু—শরীরে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশের আশঙ্কা। অগ্নিভয়। ভ্রমণ। শারীরিক ক্লান্তি, অনিদ্রা ও অকারণ ভয় ও দুশ্চিন্তা। দুষ্টলোকের চক্রান্তে বা প্ররোচনায় অসৎ পরামর্শপ্রাপ্তি হেতু অর্থক্ষতি ও বুদ্ধি ভ্রংশ। মাতৃপীড়া বা মাতার স্বাস্থ্যহানি। দুঃখভোগ।

মকর—সম্মান হানি। অকারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থায় ভ্রমণ। নানা বাধা ও কর্মে গোলযোগ। শারীরিকও মানসিক কষ্ট। অর্থ লাভ। অজীর্ণ, শরীরে রক্তপাত। শত্রুবৃদ্ধি। নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা—নানাভাবে প্রলুব্ধ হওয়ার দরুণ। কলহ বিবাদ। আয়বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহ। দুঃখভোগ।

কুম্ভ—সাফল্য লাভে বিঘ্ন, ধনলাভ ও সম্মানহানি, কলহ-বিবাদ, স্বাস্থ্যোন্নতি, বস্তুলাভ। স্ত্রীর বিপন্নতা। স্থান ত্যাগ। শত্রুহানি।

মীন—উত্তম ভোগ বিলাস, রোগ ও ভয়, অর্থ ক্ষতি,

পরমর্যাদালাভের আশঙ্কা, স্ত্রীর সাহচর্য্য লাভ ও প্রণয়, বন্ধুপ্রীতি ও সাহায্য প্রাপ্তি।

* * * *

পৌষমাসের প্রারম্ভ থেকে মাঘের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে যে সব ব্যক্তির জন্ম, তাদের মধ্যে অনেকেরই পক্ষে ইংরাজী ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দটী আশাপ্রদ। সাংসারিক ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা উদ্ভব হয়েছিল বা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির জন্য মানসিক অস্বচ্ছন্দতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলি আর থাকবে না—ক্রমশঃ উন্নতির সূচনা ঘটবে। সূর্য্যোদয়ের সময় যাদের জন্ম, তারা স্বজন-বিয়োগের জন্যে শোকাচ্ছন্ন হোলেও তাদের সম্পত্তিলাভ ঘটবে চরমপত্রের বলে বা মৃত্যুকালে নির্দ্দেশের আনুকূল্যে। নূতন বন্ধুত্বসূত্রে আনন্দলাভ, অবিবাহিত বা অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্ভাবনা ও রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হবে। বৎসরের মধ্যভাগে সৌভাগ্য বৃদ্ধি, ভ্রমণ যোগ, শেষভাগে কর্ম্মোন্নতি ও নানা কর্ম্মে, ব্যবসায়ে বা প্রোফেসনে সাফল্য।

মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে জাত ব্যক্তির পক্ষে ১৯৪৮সালের অনিশ্চিত পর্য্যায়ভুক্ত অবস্থা বা ঘটনাগুলির জের চলতে থাকবে গোটা ১৯৪৯ সাল ধরে। চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে এঁদের অনেককে মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হোতে হবে আর শত্রু বৃদ্ধিও ঘটবে দারুণভাবে। সূর্য্যোদয়কালে যাদের জন্ম তারা বিগত ইংরাজী বর্ষাপেক্ষা এই বর্ষে ব্যবসায়ে অধিকতর সাফল্য ও অর্থ লাভ করবে। মধ্যাহ্নকালে জাতকদের পক্ষে ব্যবসায়ের ওপর বিশেষ নজর নেওয়া দরকার হবে, স্টীল নার্ভিক কাজ ছাড়া কোনপ্রকার স্পেকুলেশন করলেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে বর্ষের প্রথমে ও মধ্যভাগে। সূর্য্যাস্তের সময় জাতকেরা সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সৌভাগ্যবান হবে, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করে কার্য্যাদি সম্পাদন করবার চেষ্টা করলে রোগশয্যায় শায়িত হবার আশঙ্কা আছে। মধ্য রাত্রে জন্ম যাদের, তারা যদি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলে তাদের চাকুরির স্থানে, আর অপরের সহিত ব্যবহারে কৌশল প্রয়োগ ও কর্ম্মে মনোনিবেশ না করে, খুঁটিনাটি কাজটা পর্য্যন্ত না দেখে, তা হোলে তাদের ভাগ্যে উপরওয়ালার সঙ্গে কলহ বিবাদের দরুণ যথেষ্ট অশান্তি ভোগ হবে, পদোন্নতির পক্ষেও বাধা সৃষ্টি হবে—কোন কোন ক্ষেত্রে বেকার অবস্থায় থাকতেও দেখা যাবে।

***

ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলবে, তাঁকে পদচ্যুত করার চেষ্টা হবে এমন কি আততায়ীর হস্তে জীবন বিপন্নও হোতে পারে। ফ্রান্সের জাতীয়তার অভ্যুদয় হবে, যাতে করে সে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে পেতে পারে জেনারেল দ্য গলের অধিনায়কতায়। ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট প্রতিপত্তি হ্রাস পাবে, ক্যাপিষ্ট শাসনই প্রত্যক্ষভাব পরিলক্ষিত হবে। কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পোন্নতি ঘটবে ফ্রান্সে। আন্তর্জ্জাতিকতার ক্ষেত্রে মার্কিণের সম্মান ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবে, বেকার সমস্যার উদ্ভব হবে আর নানাভাবে তাকে গোলযোগের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনাও আছে। মার্কিণ জনসাধারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে—ব্যয় সঙ্কোচের জন্যে আমেরিকার বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। আইসেনহাওয়ারের পক্ষে এ বৎসরটি শুভ নয়। ডিফেন বেকারের সংরক্ষণশীল দলের প্রভাব কানাডায় অক্ষুণ্ণ থাকবে, আমেরিকার সঙ্গে কানাডার সম্প্রীতি থাকবে না। কানাডার আভ্যন্তরিক উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যপ্রসার ও আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হবে। ইংলণ্ডে আকস্মিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও টাকার বাজারে বেশ ওঠানামা চলবে, রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের সুচতুর কৌশল প্রয়োগের ফলে ইংলণ্ডের বিশেষ অর্থক্ষতির সম্ভাবনা আছে। চীন ও জাপানের শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সূচিত হয়। আমেরিকার নিকট এই বৎসর কমিউনিষ্ট চীন সমাদৃত হবে। ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত জনবরেণ্য ব্যক্তির পরলোকগমন ঘটবে। আরবের উপর মিসরের প্রভাব বিস্তৃত হবে। সৌদি-আরবে প্রায়ই সংঘর্ষ ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোতে পারে। আয়ার-অলষ্টার সীমান্তে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। বৃটেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চুক্তিভঙ্গ হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হোতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ চরমে উঠবে—গ্রেট ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে। কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রকার মীমাংসা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আশা নেই। জাপানের জনৈক বয়োবৃদ্ধ নেতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে। চীনকে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে বিশেষভাবে চাপ দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারও আভ্যন্তরীণ সংগঠন হবে। সন ১৩৬৪ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাস ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে অবসাদ ও বিরক্তিকর, বিশেষতঃ পাকিস্তানে এই দুইমাসে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাবে। ইংরাজী ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে নাগাদের বিদ্রোহও উপদ্রব হেতু ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কলিকাতায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সম্ভাবনা আছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বাংলা রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় আসামকে ১৮৭ রানে পরাজিত ক'রে ৮ পয়েন্ট লাভ করেছে।

বাংলা : ১৬৪ ও ১৫১ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

আসাম : ৬৮ ও ৬০

বাংলার বোলার পি চ্যাটার্জি আসাম দলের ২য় ইনিংসে ৩টি উইকেট নিয়ে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় ১০০তম উইকেট লাভের গৌরব লাভ করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ঃ

পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব ৬৯ পয়েন্ট এবং মহিলা বিভাগে মহীশূর ৪০ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ফলাফল :

পুরুষ বিভাগ : ১ম পাঞ্জাব ৬৯ পয়েন্ট ; ২য় মাদ্রাজ ২৪, ৩য় রাজস্থান ১৩, ৪র্থ দিল্লী ১২, ৫ম মহীশূর ১১, ৬ষ্ঠ পুণা ১০, বিক্রম ১০, ৭ম জব্বলপুর ৮, ৮ম বোম্বাই ৭, ৯ম কর্ণাটক ৫, ১০ম এলাহাবাদ ৩, গুজরাট ৩ পয়েন্ট।

মহিলা বিভাগ : ১ম মহীশূর ৪০, ২য় পুণা ১৭, ৩য় জব্বলপুর ১৬, ৪র্থ পাঞ্জাব ১১, বোম্বাই ১১, ৫ম বিক্রম ২, ৬ষ্ঠ নাগপুর ১, মাদ্রাজ ১, কর্ণাটক ১ পয়েন্ট।

ডেভিস কাপ ঃ

১৯১৮ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকা ৩-২ খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। চারটি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলস মোট এই পাঁচটি খেলার মধ্যে আমেরিকা দুটি সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেলায় জয়ী হয় এবং বাকি দুটি সিঙ্গলসে অষ্ট্রেলিয়ার জয় হয়। গত ১২ বছর ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে আসছে ; এই পনের বছরে অষ্ট্রেলিয়া ৮ বার এবং আমেরিকা ৭বার ডেভিস কাপ জয়লাভ করেছে। আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার কাছে শেষ হেরেছিল ১৯১৫ সালে। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত একাদিক্রমে তিন বছর অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ পেয়েছে।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৬১৪ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; আর কানহাই ২২৬, বি বুচার ১০৩, জি সোবার্স ১০৬ নট আউট)।

ভারতবর্ষ : ১২ উমরীগড় ৬৩ নট আউট। গিলক্রিস্ট ১৮ রানে ৩, হল ৩১ রানে ৩ এবং রামাধীন ২৭ রানে ২ উইকেট।) ও ১৫৪ (মঞ্জরেকার ৫৩ নট আউট। গিলক্রিস্ট ৫১ রানে ৬, হল ৫১ রানে ৩ উইকেট)

ক'লকাতার রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। ফলে বর্তমান টেষ্ট সিরিজে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। অনুষ্ঠিত তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ও ৩য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়েছে এবং ২য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। পাঁচ দিনের টেষ্ট খেলা চতুর্থ দিনে ১২টা বাজতে ২০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ বনাম

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলা নানা দিক থেকে অপূর্ব্ব হয়ে থাকবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের রোহান কানহাই ১ম ইনিংসে ২১৬ রান করেন। তাঁর ড্রাইভ, কাট এবং লেগ ষ্ট্রোক দেখে দর্শক সাধারণ পরম তৃপ্তি পায়।

এই ২১৬ রান ক'রতে তাঁর ৪০০ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারী করেন ৪২টি। ইডেন উদ্যানের উইকেটে কোন দলেরই খেলোয়াড় ইতিপূর্ব্বে টেষ্ট খেলায় দ্বিশত রান করতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় এ পর্য্যন্ত ৭টি ডবল সেঞ্চুরী হয়েছে এবং কানহাইয়ের ২১৬ রানই সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই ৭টি ডবল সেঞ্চুরীর মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলেরই করেছেন তিনজন খেলোয়াড়—কানহাই (২১৬), ওরেল (২০৭) এবং উইকস (২০৭); এবং বাকি ৫টি করেছেন—ব্র্যাডম্যান (২০১), হার্ডষ্টাফ (২০৫ নট আউট), হ্যামণ্ড (২১৭) এবং সাটক্লিফ (২৩০ নট আউট)।

টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসে ৬০০ রান হয়েছে চারবার। এই ৪ বারের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই করেছে তিনবার।

আলোচ্য তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে সমান নৈপুণ্য দেখিয়েছে; অপর দিকে ভারতীয় দল ক্রিকেট খেলার এই তিনটি বিভাগে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জয়ী হয়ে ব্যাটিং আরম্ভ করে এবং ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৫৯ রান করে। কানহাই ২০৩ এবং বুগার ৮৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ২য় দিনে চা-পানের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৬১৪ (৫ উইকেটে) রানের মাথায় ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তিনজন খেলোয়াড়—কানহাই (২১৬), বুগার (১০৩) এবং সোবার্স (১০৬ নট আউট) সেঞ্চুরী করেন। ৯০ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের ২টো উইকেট পড়ে ২৯ রান ওঠে।

৩য় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১২৪ রানে শেষ হয়। ৪৯০ রান পেছনে পড়ে ভারতবর্ষ 'ফলো-অন' করে। নির্দ্ধারিত সময় দেখা গেল ৫টা উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ৬৯ রান উঠেছে। ৪র্থ দিন ১২টা বাজতে ২০ মিনিটে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১২৪ রানে শেষ হয়ে যায়। গিলক্রিষ্টের বোলিং ভারতবর্ষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর বলে ২য় ইনিংসে ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে। সুভাষ গুপ্তই তাঁর 'hat-trick' ঠেকিয়ে দেন।

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২৫৯ (মে ১১৩; ডেভিডসন ৬৪ রানে ৬ উইকেট, মেকিফ ৬৯ রানে ৩ উইঃ) ও ৮৭ (মেকিফ ৩৮ রানে ৬, ডেভিডসন ৪১ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩০৮ (হার্ভে ১৬৭; বেথাম ৫৭ রানে ৭ এবং লোডার ৯৭ রানে ৩ উইকেট) ও ৪২ (২ উইকেট)

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে।

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২১৯ (মে ৪২; বেনড ৮৩ রানে ৫ উইকেট। ও ২৮৭ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কাউড্রি ১০০ নট আউট, মে ৯২। বেনড ৯৪ রানে ৪ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৫৭ (ও' নীল ৭৭, ডেভিডসন ৭১ ম্যাকে ৫৭, ক্যাভেল ৫৪। লেকার ১০৭ রানে ৫ এবং লক ১৩০ রানে ৩ উইকেট) ও ৫৪ (২ উইকেটে)

সিডনিতে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৩য় টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

ক্রিকেট খেলায় বিশ্বরেকর্ড ঃ

পাকিস্তানের টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ করাচী বনাম ভাওয়ালপুরের খেলায় করাচীর পক্ষে ৪৯৯ রান ক'রে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ডন্ ব্র্যাডম্যানের—৪৩৪ নট আউট রান। এই ৪৯৯ রান তুলতে হানিফ মহম্মদের ১০ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট সময় লেগেছিল।

জাতীয় বাস্কেটবল ঃ

পুরুষ বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল ফাইনালে মহীশূরকে ৬৪—৫৯ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বাংলা ফাইনালে মহীশূরকে ৩৯—২৯ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

বালকদের বিভাগে বোম্বাই ফাইনালে পাঞ্জাবকে ৭২—৫৮ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

সাহিত্য সংবাদ

অরুন্ধতী (কবিতা-পুস্তক) : অংশুপতি দাশগুপ্ত

২০টি কবিতা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। নাম হইতে কবিতার বিষয় বস্তু বুঝা যাইবে—যথা (১) দারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, রাত্রে (২) শিবানীপুর গ্রাম (৩) সেক্সপীয়র (৪) ৩০শে জানুয়ারী (৫) আষাঢ়ের এই সহর ইত্যাদি। ৩০শে জানুয়ারী সনেট—কবি লিখিয়াছেন—

> সে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি নিয়ে আসে প্রলয়ান্বিশিখা,
> বিশ্বস্থে আসন হল ঘুণাক্ষের কৃষ্ণ যবনিকা।

শিবানীপুর গ্রামে—

> আকাশেতে সন্ধ্যা নামে, রাত্রি নামে আলোর ভিখারী,
> বক্ষতলে উঠে আসে বুকে নিয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা
> অন্ধকার পানে চাঁর হানে কালপুরুষ শিকারী
> সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে বধূটির ভীরু ভালোবাসা।

এই ভাবের বর্ণনা সকল কবিতায় বর্তমান। কবির কাব্য-সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই।

[প্রকাশক—তুলি-কলম, ৩৭এ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২ দাম—দেড় টাকা।]

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সেরা রূপকথা : বীরু চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত ন'ন—ছেলেমেয়েদের উপযোগী বহু রচনায় এঁর কৃতিত্ব দেখা গিয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে জাপানী, জার্মানী, ফরাসী, আমেরিকা, ইংরেজী, গ্রীক তুরস্ক, হাঙ্গেরিয়া, ভারত, গ্রীক ও সুইডেনের যাবোটী বিভিন্ন ধরণের রূপকথা সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলি খুব উপভোগ্য, বলবার ভঙ্গীও শিল্পসম্মত, তাছাড়া প্রত্যেক গল্পে সুন্দর পরিবেশ লক্ষ্য করা গেল। ছেলেমেয়েদের কাছে রূপ কথাই সব চেয়ে ভালো লাগে, তারা এই বইগুলি পড়ে খুব খুশী হবে। গ্রন্থখানি প্রশংসনীয়। আমরা পড়ে আনন্দ পেয়েছি। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—পারিজা ব্রাদার্স, ৮১বং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ; দাম—একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।]

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ : স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

আলোচ্য গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত—শ্রীগুরু, ইষ্ট ও সাধন। রাম-কৃষ্ণ শরণম্ শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থের সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে। শ্লোকগুলি সংস্কৃত ভাষায় নামাঙ্কনে রচিত হয়েছে, আর সেগুলি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে দেওয়া আছে। বাংলা কবিতাগুলিও মনোরম। যাঁরা অধ্যাত্ম পথের যাত্রী তাঁদের মানসিক পুষ্টির পক্ষে গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবধারা উপযোগী হোতে পারে। আমরা পড়ে আনন্দ পেয়েছি।

[প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য—আড়াই টাকা।]

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে (একাঙ্কিকা) :
নির্বোধ (নাটক) : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

দুইখানা নাটক একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমখানা 'নাকি ডনটেও ভরির কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে, আর দ্বিতীয়খানা মাকি আক্তর হোসেন অনুসরণে রচিত হয়েছে। অনুসরণের চেয়ে যোগেশের অনুবাদ আরো ভালো হ'ত। যাই হোক লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

[প্রকাশক—বসুর পুস্তকালয়, ৭২ সুপ্রেন্স বসু এভিনিউ, কলিকাতা —৩। মূল্য—মাত্র তিন টাকা]

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক : নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ

ভারতে প্রাচীনকাল থেকে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে তা বিস্ময়কর না হলেও একেবারে সামান্য নয়। এ অগ্রগতির পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের জীবন-কাহিনীও এতে রয়েছে। দেশের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এ পুস্তক অত্যন্ত উপযোগী। পড়লে বড়রাও অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

[প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা—১২। মূল্য —দুই টাকা আট আনা।]

ঠাকুর হরিদাসের জীবন কথা : শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত

ভক্ত হরিদাসের অমর জীবন বৈষ্ণব সাহিত্যে ও গানে বিশেষ শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তের রচনায় অতি মনোহর রূপ লাভ করেছে। বাঙলার ভক্তমাত্রেই এর রস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হবেন, উদ্বুদ্ধ হবেন, উপকৃত হবেন।

[প্রকাশ—নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত। ১০০ নং বলা রোড, কলিকাতা —১৩। মূল্য—তিন টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যবনিকা" (২য় সং)—২৲
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কর্ণার্জুন"
(২৪শ সং)—২·৫০
বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" (২৯শ সং)—২·৫০
ডাঃ শ্রীযামিনীলাল রায়চৌধুরী প্রণীত "ডায়মণ্ডহারবার আত্মকাহিনী"
(৪র্থ সং)—৩·৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অরক্ষণীয়া" (২৩শ সং)—১·২৫,
"বিরাজ-বৌ" (২৮শ সং)—২৲, "পল্লীসমাজ" (৪র্থ সং—১৫শ সং)—
২৲, "বামুনের মেয়ে" (১১শ সং)—২৲
ভরুণ লেখক সংঘ প্রকাশিত বনফুলকুমার সেনের "শ্রেষ্ঠ গল্প"—৫৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ছুটির কবল"—২৲,
"শেষ পরাজয়"—২৲ এবং পরলোক-তত্ত্ব "পরলোকের বিচিত্র কাহিনী"
—২·২৫
শ্রীমন্দ্রেন্দ্র দেব প্রণীত শিশুপাঠ্য "জল-ডুবুরীদের কাহিনী"—২·৫০,
"বকমারি গল্প"—২·৫০
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষশর্মা প্রণীত "উপনিষদ্‌ব্রহ্মতত্ত্ব" ১ম খণ্ড (৩য় সং)—
৮৲, ২য় খণ্ড (৩য় সং)—৮৲
নীরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অমৃত-সংগ্রাম"
(নূতন সং)—২·২৫
মিলোজ্যাভ জিলাস্ প্রণীত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ "নতুন শ্রেণী"—১·৫০

নতুন রেকর্ড

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 76071—"তোমার দৃষ্টি ভাসালো সৃষ্টি" দুখানা আধুনিক গান যুগ্মকণ্ঠে গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ক্ষমা দেবী। দুষ্কোচুরি কথাচিত্রের গান—'মাটীর বিচারিণী দরিণী' গানখানা গেয়েছেন কিশোরকুমার ও ক্ষমা দেবী।

N 76075—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের দুখানা গান 'দূরের তুমি আজ' ও 'ওগো সুন্দর জানো নাকি' গেয়েছেন গীতা দত্ত।

N 76076—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের আর দুখানা গান 'ভাবছে ভাবছে ভাব' ও 'সবাই কুহু সুটাকর' গেয়েছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মন্নাডে ডে।

N 76077—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের আর দুখানা মনোরম গান 'দূরের তুমি আজ' ও 'ঝনক ঝনক কনক কাকণ বাজে' দুখিষ্ট কণ্ঠে গেয়েছেন শ্রীমতী গীতা দত্ত।

N 76078—'পুরীর মন্দির' বাণীচিত্রের দুখানা গান গেয়েছেন নচীনাথ মুখোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

GE 30106—মুক্তি প্রতীক্ষিত বাণীচিত্র 'অকতীর্থ হিংলাজ' ছবির দুখানা গান 'তোমার সুবনে জাগে' ও 'পথের ক্লান্তি ভুলে' দুখিষ্ট কণ্ঠে গেয়েছেন নবাগত শিল্পী হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

GE 30107—'অকতীর্থ হিংলাজ' কথাচিত্রের আর দুখানা গানও গেয়েছেন হেমন্তকুমার। গান দুটি হোল—'হে চন্দ্রচূড়' ও 'সর্বত্র বুদ্ধিজীবন'।

GE 30109—'যৌতুক' কথাচিত্রের দুখানা আধুনিক গান—'মনের কথাটি ওগো' ও 'এই যে পথের এই রেখা' দুখিষ্ট কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন হেমন্তকুমার।

GE 30110—'যৌতুক' কথাচিত্রের দুখানা গান 'আহা রঙ মহলে দুলে দুলে' ও 'এই মন বিহঙ্গ'—ভরল ঢালা কণ্ঠে গেয়েছেন যথাক্রমে গীতা দত্ত ও লতা মুংগেশকর।

GE 30111—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের আরও দুখানা গান—'নীড় ছোট ক্ষতি নেই' ও 'দূর ডোবার পালা'—গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতা দত্ত।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৬৫

লেখ-সূচী

১। কবি চিত্তরঞ্জন দাশ (প্রবন্ধ)
তপোবিজয় ঘোষ ২৫৭
২। ধ্বনি (গল্প)—অমিয় চৌধুরী ২৬৪
৩। পাখা (কবিতা)—রত্নেশ্বর হাজরা ২৭১
৪। শক্তিসাধন বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)
শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় ২৭২
৫। বিপদী (কবিতা)—বেতাল ভট্ট ২৭৫
৬। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২৭৬

চিত্র-সূচী

১। অনন্তনাগে কপটেশ্বরের ঘরণা, ২। অনন্তনাগের বাজার, ৩। অচ্ছাবল উদ্যান, ৪। রাধা নৃত্যে—রুথ্ সেণ্ট ডেনিস্, ৫। রাই-উন্মাদিনী নৃত্যে—রুথ্ সেণ্ট ডেনিস্, ৬। প্রাচ্যব্যালের অনুসরণে—ডেনিস্ ও টেডশন্, ৭। আদিবাসী নৃত্যে—টেডশন্, ৮। উদয়শংকর, ৯। প্রাচ্য নর্তকীরূপে—লা—মেরী, ৯। 'নর্মদা চিত্র' পরিবেশিত "জল জঙ্গল" চিত্রের একটি দৃশ্যে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমকুমার।

লেখ-সূচী

৭। রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনধর্মিতা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

স্বরাজের পথে অগ্রসর দেশ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ২৮৪

৯। কবি শশাংকমোহন সেন (আলোচনা)
হরিহর শেঠ ২৮৮

১০। প্রেমময়ী হিমালয় (কবিতা)
শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ২৯০

তিন (গল্প)—সংকর্ষণ রায় ২৯১

মরমীয়া সাধনা (প্রবন্ধ)
ডক্টর শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য ২৯৫

১৩। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতি (আলোচনা)
শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ২৯৮

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র

কাশ্মীর লেক

বিশেষ চিত্র

দেখছ কি ! ও বিগত বৈভব

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী

অনুরূপা দেবীর

—অমর সাহিত্য-সাধনা—

মন্ত্রশক্তি ৪-৫০ পোষ্যপুত্র ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ হারানো খাতা ৩৲

পথের সাথী ৩৲ বাগ্‌দত্তা ৫৲ পূর্বাপর ৪৲

—সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে—

নূতন রূপসজ্জায় পুনর্মুদ্রিত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস

রামগড় ৪-৫০

যে মহিমময়ী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্ত বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

লেখ-সূচী

১৪। উদয় অস্ত (উপন্যাস)—বনফুল ৩০২
১৫। বিরহে (কবিতা)
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০৬
১৬। জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)
ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী ৩০৭
১৭। সাধন সংগীত (স্বরলিপি)
কথা ঃ নিশিকান্ত : সুর ও স্বরলিপি ॥
তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১০
১৮। ভরত (কবিতা)
শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৩১২
১৯। ন্যূনতম বেতন সম্বন্ধীয় আইন (আলোচনা)
শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু ৩১৩
২০। চৌপদী (কবিতা)
শ্রীকালিদাস রায় ৩১৪
২১। কলহনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য
২২। বিশল্যকরণী (গল্প)
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩। মানবতার সাগর-সঙ্গমে সুইডেনে আর সোবিয়েতে (ভ্রমণ কাহিনী)
শচীন সেনগুপ্ত ৩২৪
২৪। অভিজ্ঞতার কথা (কিশোর জগৎ)
উপানন্দ
২৫। ছবির ঘোড়া (জাপানী উপকথা)
গোপাল দাস ৩৩১
২৬। আজকে প্রাতে (কবিতা—কিশোর জগৎ)
রমেশ মজুমদার ৩৩৩

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আস্ট্রিক ও জ্যোতির্বিদ্

জ্যোতিষসম্রাট ঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস্ (লণ্ডন). নিখিল ভারত গণিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীর বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেশিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও গ্রহের অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে অল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭৲০, শক্তিশালী বৃহৎ—২৩৲০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৲০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। সরস্বতী কবচ—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ২৲০, বৃহৎ—৩৲০। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী পুরুষ বশীভূত এবং চিরসঙ্গও মিত্র হয় ১১৲০, বৃহৎ—৩৫৲০, মহাশক্তিশালী ৩০৭৲০ বগলামুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯৲০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৫৲০, মহাশক্তিশালী—১৮৯৲০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)। নৃসিংহ কবচ—সর্বপ্রকার দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য, ভূতপ্রেত, ভূত, প্রেত, পিশাচ হইতে রক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র ৭৲০, বৃহৎ—১৩৲০, মহাশক্তিশালী—৬৩৲০। (ভি: পি: করা হয় না।)

জ্যোতিষসম্রাট মহোদয় প্রণীত "জন্ম মাস রহস্য"—কোন্ মাসে জন্ম হইলে কিরূপ ভাগ্য, স্বাস্থ্য, বিবাহ, কর্ম, বন্ধু, মরণ গতি, স্বভাব চরিত্র প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। মূ০। বিবাহ রহস্য ২৲ ধনার বচন ২৲ জ্যোতিষ শিক্ষা ৩৷৷০

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী
(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ও পণ্ডিতজীর নিজবাটী ৫০।২, বর্ষতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (হেরিসন রোড ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট), কলিকাতা—১৩।
সাক্ষাতের সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ফোন ২৪—৪০৬৭। ব্রাঞ্চ ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত বিলাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৮৭।
সময় প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা। সেণ্ট্রাল ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, বর্ষতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩।

লেখ-সূচী

২৭। পুরানো দিনের স্মৃতি (স্মৃতিকথা—কিশোর জগৎ)
শ্রীহরিপদ ওঝা ৩৩৩

২৮। মলয়কুমার (কবিতা—কিশোর জগৎ)
শান্তশীল দাশ ৩৩৬

২৯। বিভূতিভূষণের কথাশিল্প (আলোচনা)
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৯

৩০। দেশ-বিদেশে ভারতীয় নৃত্য (প্রবন্ধ)
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ৩৪৫

৩১। এখানে রাত্রি আসে (কবিতা)
শৈলজানন্দ রায় ৩৪৮

৩২। সপ্তম সুর (অনুবাদ—গল্প)
শ্রীকানু রায় ৩৪৯

৩৩। সাময়িকী ৩৫৪

৩৪। ছিন্নবাধা (উপন্যাস)—
সমরেশ বসু ৩৫৯

৩৫। পি. ই. এন. ক্লাবের রজত জয়ন্তী উৎসব ও লেখক সম্মেলন
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৩৬৫

৩৬। বৈদেশিকী—
শ্রীঅতুল বসু ৩৭০

৩৭। ভস্ম পুতুল (উপন্যাস)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭২

৩৮। গ্রহ-জগৎ (জ্যোতিষ)—
উপাধ্যায় ৩৭৫

৩৯। পট ও পীঠ—শ্রীন'— ৩৭৯

৪০। খেলা-ধূলা—
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৩৮২

৪১। সাহিত্য সংবাদ ৩৮৪

—প্রকাশের অপেক্ষায়—

॥ নীলকণ্ঠ ॥
* অদ্য ও প্রত্যহ *

॥ বিক্রমাদিত্য ॥
● যুদ্ধের ইয়োরোপ ●

নতুন | কাশ্মীর প্রিন্সেস ঃ | নতুন

—॥ এ. এম. ফারনিক : ৪'০০ ॥—

নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ : মনোজ বসু : ৫'০০ ॥ ব্যঙ্গ কবিতা : বনফুল : ৬'৫০ ॥ চায়না টাউন : বারীন্দ্রনাথ দাশ : ৪'৫০ ॥ মৃগতৃষ্ণা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩'০০ ॥ আধুনিক ইয়োরোপ : দেবজ্যোতি বর্মণ : ৩'২৫ ॥ তামসী : জরাসন্ধ : ৫'০০ ॥ বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা : নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত : ৩'০০ ॥ কয়লা কুঠির দেশ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : ৩'৫০ ॥ চলাচল : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : ৬'৫০ ॥ প্রদক্ষিণ : সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : ৪'০০ ॥ সুখ-দুঃখের ঢেউ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র : ৪'৫০ ॥ ঝড় ও বিহঙ্গ : তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : ৩'৫০ ॥

—॥ কিছু উপন্যাস ॥—

বিভাস্বক : ২'৫০
রাইকমল : ২'০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জীয়ন্ত : ৪'০০
পুতুলনাচের ইতিকথা : ৫'০০

কদম্ব : ২'৫০
নীলাঙ্গুরীয় : ৪'৫০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ী
জাগরী : ৪'০০
অচিন রাগিণী : ৩'৫০

বিষের ধোঁয়া : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪'০০ ॥ হাসুবানু : প্রবোধকুমার সান্যাল : ৭'৫০ ॥ বৈতালিক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ৩'৫০ ॥ গঙ্গা : সমরেশ বসু : ৫'৫০ ॥ অবিশ্বাস্য : সৈয়দ মুজতবা আলী : ৩'০০ ॥ অন্তরতমা : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : ২'৫০ ॥ বল্মীক : নারায়ণ সান্যাল : ৪'০০ ॥ পূর্বপার্বতী : প্রফুল্ল রায় : ৮'৫০ ॥ পৌষ ফাগুনের পালা : সোমেন্দ্রনাথ রায় : ৩'০০ ॥ জননী : গুণময় মান্না : ২'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা—বারো

=সৌখীন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চপ্রশংসিত নাটকসমূহ=

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিপ্রদাস ১-৫০ রাজলক্ষ্মী ২, গৃহদাহ ২,

রামের সুমতি ১-৫০, নিষ্কৃতি ১-৫০, দেবদাস ২৲, বিজয়া ২৲, ষোড়শী ১-৫০, রমা ২৲, পথের দাবী ২৲, কাশীনাথ ২৲, বিন্দুর ছেলে ১-৫০, বিরাজ-বৌ ২৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জনা ২-৫০, সিরাজদ্দৌলা ২৲, প্রফুল্ল ২-৫০, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ২৲, বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

রমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ২-৫০

বিধূভূষণ বসু প্রণীত

দুই বিঘা জমি ১৲

অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

মন্ত্রশক্তি ২৲

মহানিশা ২-৫০

অমৃতলাল বসু প্রণীত

ব্যাপিকা বিদায় ০-৭৫

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০

কর্ণার্জ্জুন ২-৫০, ফুল্লরা ২৲, পুষ্পাদিত্য ১৲, শকুন্তলা ১৲, শুভদৃষ্টি ১৲, সুদামা ১-২৫, অপ্সরা ০-৩১

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

রাতকাণা ০-৬২

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

মিটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গেবর্গা ২-৫০, পথের শেষে ২-৫০, দেবলাদেবী ২-৫০, ললিতাদিত্য ২৲

মনোমোহন রায় প্রণীত

বিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

মানময়ী গার্লস্ স্কুল ১-৫০,

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

আলিবাবা ১৲, মন্ত্র-সারায়ণ ২-৫০

প্রতাপ-আদিত্য ২-৫০

আলমগীর ২-৫০, রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫, ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

রাণাপ্রতাপ ২-৫০, মেবারপতন ২৲, সাজাহান ২-৫০, দুর্গাদাস ২-৫০, পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲, সোরাব-রুস্তম ১-২৫, পুনর্জ্জন্ম ০-৬২, চন্দ্রগুপ্ত ২-৫০, বিরহ ০-৫০, সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০ ভীষ্ম ২-৫০, সুরজাহান ২-৫০

বটকৃষ্ণ রায় প্রণীত

পাকচক্র ০-৫০, পঞ্চমাঙ্ক ০-৫০, পাল্টা-পাল্টি ০-৩১

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲, হর-পার্ব্বতী ১-২৫, সিরাজদ্দৌলা ২৲, সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫, কালো টাকা ২৲, ভারতবর্ষ ১-২৫

কানাই বসু

গৃহপ্রবেশ ২৲

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ২৲, কাশীর রাণী ২৲

অন্নদাস বক্সী প্রণীত

ভোলা মাষ্টার ২-৫০, খুনী ১-৫০, ভাঙ মিস্ কুমুদ ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মরা হাতী লাখ টাকা ১৲, অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲, চাঁদসদাগর ২৲, রাজনটী ০-৭৫, খনা ২৲, জীবনটাই নাটক ২·৫০, কারাগার, মৃত্তিকার ডাক ও মহুয়া (একত্রে) ৩৲

মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲

ধর্ম্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর প্রেম, আজব দেশ (একত্রে) ৪৲

ছোটদের একাঙ্কিকা ২৲

একাঙ্কিকা ১৲, নবএকাঙ্ক ৩৲

অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত

আয়েসা ০-৫০, পাষাণে প্রেম ০-৫০, রংরাজ ০-২৫, আসল ও নকল ০-৩১, হিন্দা হাফেজ ০-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বন্ধু ১-৭৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ২৲, পথিক ২-২৫

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজ ১-২৫

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

শনিচক্র ২৲

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

মন-প্যাখি ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভুল ২৲ টৈকবাৎ ০-২৫

প্রভাময়ী মিত্র প্রণীত

দেউল ২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কল্পিত জীবনীয় রসায়ন। ইহা মৃতকল্পকে জীবন, ব্যাধিতকে স্বাস্থ্য, দুর্ব্বলকে বলদান করে এবং ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনাতুরা মনমরা হতাশ জীবনে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দের ধারা উৎসারিত করে। ইহা সেবনে পাচকাগ্নি ও জীর্ণ শক্তি বাড়ে, যকৃৎ স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করে, অম্ল ও অরুচি দূর হয়, দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগান্তে এবং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে ইহা মন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। কঠিন রোগে ক্ষীণনাড়ী মুমূর্ষুর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া নিস্পন্দ হওয়ার উপক্রমে ইহা নূতন জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক নাড়ীর গতি আনিয়া দেয়।

পাইণ্ট—৪৲ টাকা, কোয়ার্ট—৭৷৷০ টাকা

অধ্যক্ষ মধুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয় লিঃ।

হেড অফিস: ৫২/১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—ভারত ও পাকিস্থানে সর্ব্বত্র।

মালিকগণ—অধ্যক্ষ মধুরমোহন, লালমোহন ও শ্রীসুশীলমোহন মুখার্জ্জী চক্রবর্ত্তী

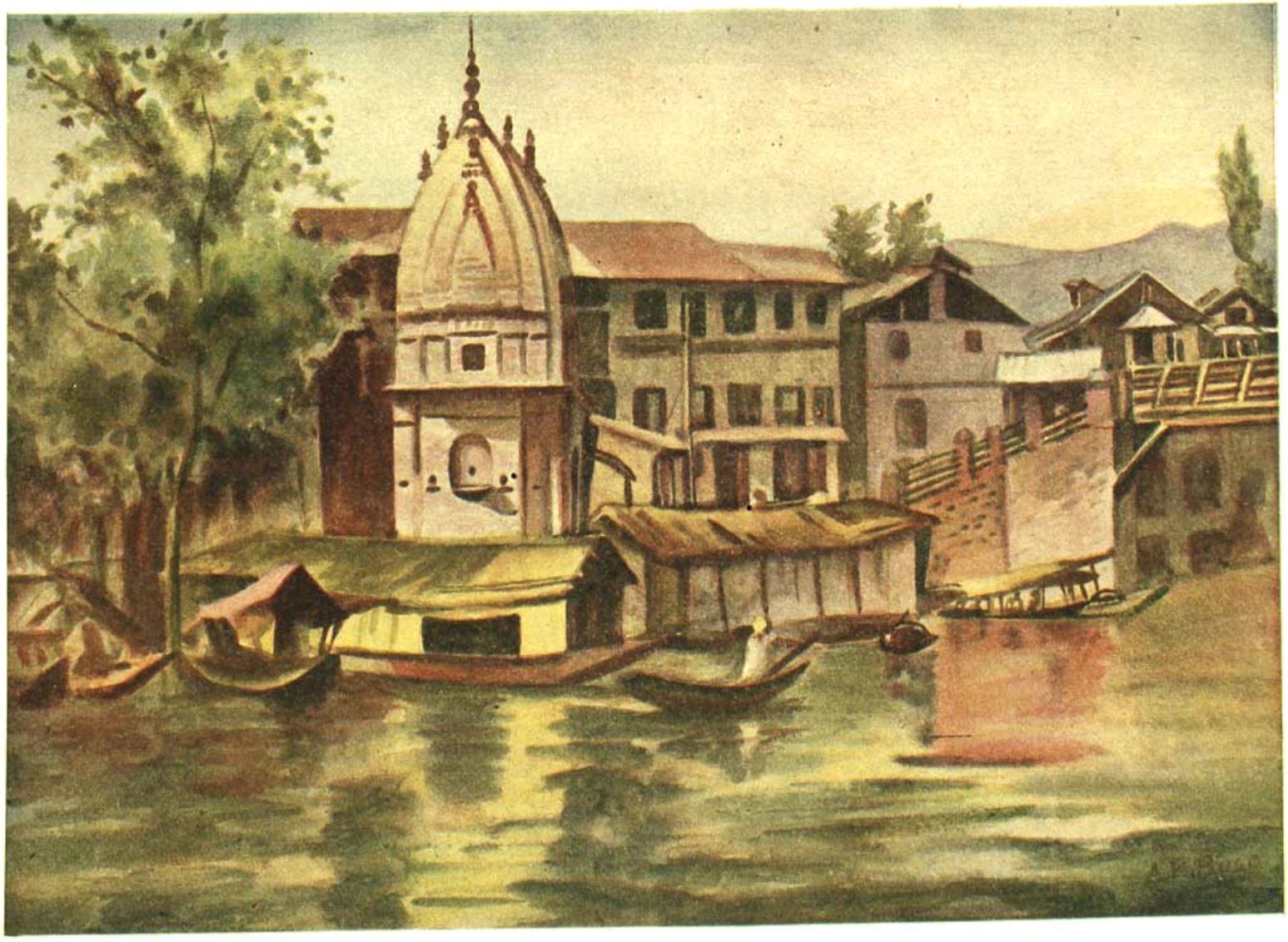

শিল্পী : শ্রীঅসিত বহু

কাশ্মীর লেক

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সচিত্র চারখণ্ডে সম্পূর্ণ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। অচিন্ত্যকুমার

প্রথম খণ্ড। 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে মর্ত্তধামে লীলা করতে এসেছিলেন। ভগবানের সেই নরলীলা বর্ণনা করতে পারি আমার সে ক্ষমতা নেই। আমার তত্ত্ব নেই, তন্ত্রমন্ত্র কিছু নেই, আছে কিঞ্চিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে।···দিয়াশলাই জেলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এ-বই শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পূজা, দীপ-জ্বালানো আরতি।'—অচিন্ত্যকুমার। দাম ৫৲

দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের নতুন পর্যায়। শতদল উন্মোচনের নবতম অধ্যায়। এ অধ্যায়ে রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকপতিদের কাহিনী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রথম মুখীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত, প্রথম সন্ন্যাসীভক্ত লাটুমহারাজ। তারপর ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি নরেন্দ্রনাথের আখ্যান। ইতিহাস, কাব্য ও উপন্যাসের নৈবেদ্যে ভক্তি পবিত্র অর্চনা। দাম ৫৲

তৃতীয় খণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের নবতম পরিচ্ছেদ। জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানাজনের আনাগোনা। গিরিশ ঘোষ, দেবেন মজুমদার, অধর সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দুর্গাচরণ নাগ, মাস্টারমশাই, প্রতাপ হাজরা, বলরাম বোস, কেদার চাটুয্যে, অশ্বিনী দত্ত। নারাণ-ছোট-নরেন নিত্যগোপাল-মনোমোহন। গোপালের-মা-লক্ষ্মীবিনোদিনী-ভুবনমোহিনী। আরো অনেকে। ভাবের রূপৈশ্বর্যে, বাক্যের প্রসাধনে সুন্দর ঈশ্বর-প্রসঙ্গ। দাম ৫৲

চতুর্থ খণ্ড। গ্রন্থের এই শেষখণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হবার কাহিনী। নরেনকে সর্বস্বদানের কাহিনী। তিরোধানের কাহিনী। বর্তমান যুগের তিন বৃহৎ সমস্যার সমুখীন হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম, তর্কমুখর সংশয়, যার প্রতিনিধি নরেন। দ্বিতীয়, দুরপনেয় পাপ, যার প্রতিনিধি গিরিশ। তৃতীয়, প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান, যার প্রতিনিধি মহেন্দ্রলাল সরকার। জয়ী হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই সংগ্রামত্রয়ের ইতিহাস। দাম ৫৲

'আমাকে রসে বশে রাখিস মা'

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ। অচিন্ত্যকুমার

শ্রীরামকৃষ্ণচরিতে যত রসাত্মক বাক্য ও গল্প আছে তা সযত্নে সংকলন করেছেন অচিন্ত্যকুমার 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে, সরসভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আলোচনা করেছেন মুগ্ধ হয়ে। প্রমাণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। যিনি দেখেন জানেন প্রকাশ করেন তিনিই কবি। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, আশ্চর্য সরস ভাষায় বলেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবের দিক থেকে যত গভীর, বাক্যের দিক থেকে তেমনি সুন্দর। দাম ৫৲

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি। অচিন্ত্যকুমার

'ও কি যে-সে? ও আমার শক্তি,' বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ও সরস্বতী, বিদ্যাদায়িনী।' পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেই পুণ্যজীবনের সমস্ত উপাদান একত্রিত করে ভক্তিসুষমামণ্ডিত ভাষায় সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। কী ছিল এই 'সাতিশয় লজ্জাশীলা বাঙালী হিন্দু কুলবধূটির মধ্যে?···আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে···এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে, রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।···' (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। সচিত্র। দাম ৪৲

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
বালিগঞ্জে : ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

সিগনেট বুকশপ

—নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—

দুর্গাচরণ রায়ের

দেবগণের মর্ত্যে আগমন

আপনি ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হইলে এ গ্রন্থখানি আপনার অপরিহার্য সঙ্গী—
আর ইহা গৃহে বসিয়া পাঠ করিলে ভারত-ভ্রমণের আনন্দ পাইবেন।
ভারতের সমুদয় দ্রষ্টব্য স্থানের পূর্ণ বিবরণ—ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রসঙ্গের পূর্ণ পরিচয়—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবন-কথা—এই গ্রন্থের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।
আর দেবগণের কৌতুকালাপ উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিরাট গ্রন্থ।
প্রতি গৃহে রাখার মত বই।
দাম : আট টাকা

নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত

মধুস্মৃতি

"মধু-স্মৃতি" মহাকবি মাইকেলের সর্বোত্তম জীবনবেদ
—তাঁহার কবিকীর্তির অমর ভাষ্য।

বাঙ্গালীর প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপাদানে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।
মাইকেলের প্রথম পুস্তক "Captive Ladie" ও
"Visions of the Past" বর্তমানে ইহার
অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহার আকর্ষণ আরও
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র
ইহার অন্যতম আকর্ষণ।

দাম—দশ টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা৬

বাংলা কথাসাহিত্যে নূতনের আবির্ভাব

সুধাংশুকুমার গুপ্তের

দিব্যদৃষ্টি

"দেশ" বলেন ঃ

আলোচ্য পুস্তকখানি কয়েকটি ভৌতিক গল্পের সংকলন। ভৌতিক ব্যাপারে যাঁহারা বিশ্বাসী, গ্রন্থখানি তাঁহাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং উপাদেয়। লেখকের রচনা-শৈলীর মাধ্যমে প্রত্যেকটি গল্প একান্ত বাস্তব এবং রসপুষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে গোয়েন্দা পুলিশের আবির্ভাব অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ডিটেকটিভ গল্প নহে। ভৌতিক গল্প সৃষ্টি করিবার অপূর্ব কৌশল লেখকের করায়ত্ত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এরূপ আরও চমকপ্রদ ভৌতিক গল্প আমরা লেখকের নিকট আশা করি। ছাপা বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদপট নয়নাভিরাম।

দাম—২·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা৬

ভারতবর্ষ

ফাল্গুন—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কবি চিত্তরঞ্জন দাশ

তপোবিজয় ঘোষ

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ যাঁর সম্পর্কে এই উক্তি করেছিলেন বাঙ্গালী-মানসের পুনর্জাগরণের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বের কথাও আজ এক শ্রদ্ধের ঐতিহ্যের বিষয়। সর্বস্বত্যাগী এই মুক্ত পুরুষের মহান্ আত্মা সূর্য-শক্তির মত চিরভাস্বর। প্রত্যহের চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও আরও একটি মনোরম পরিচয় আছে। কালের ব্যবধানে তাঁর সেই সৃজনধর্মী শিল্পী-সত্তা আজ বিস্মৃত প্রায়। অথচ চিত্তরঞ্জনের সেই কবি-ব্যক্তিত্ব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলা কাব্যসাহিত্যের আসরে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী।

রাজনৈতিক জীবন সুরু করবার আগে তিনি ছিলেন মূলতঃ কবি। এই কাব্য সাধনা তাঁর আষালোর সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বাইরের কোন প্রভাব বা পরিণত বয়সের কোন বিশেষ মুহূর্তের হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়। জন্ম মাত্রে নব শিশু যেমন সুতীব্র চীৎকারে আপন

প্রাণ স্পন্দনকে চেতনা করে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে চিত্ত-মানসও তেমনি ছন্দোবদ্ধে মুক্তি দিয়েছে আপন অনুভূতিকে। উত্তর জীবনে এই কাব্যই তাঁকে অমৃতের অন্বেষণে পথ দেখিয়েছে। আলো হয়ে ফুল হয়ে অসীম মমতায় তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের কথা ভাবিয়েছে এবং মানুষকে ভালবাসিয়েছে।

১৮৯৬ সাল থেকে ১৯১২ এই সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর কালের নিরবচ্ছিন্ন কাব্য সাধনায় চিত্ত-কবি-মানসের ফসল তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এরও আগে অপরিণত কিশোর বয়স থেকেই নিয়মিত কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা সুরু করেছিলেন তিনি। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীনও এই সাধনার বিরাম ছিল না। কবি-কন্যা লিখেছেন, "বাবার অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাস কবিতাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকাশ প্রথমে মূর্ত হয়েছিল তাঁর অপরিণত বয়সে রচিত পদ সমূহে।" (১) কিশোর-কবির এই প্রথম আবেগকে স্পষ্ট করার জন্য কবির একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ভক্তি পুষ্প দিয়ে মাগো! গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ নিব তুলে—ওই চরণে তোমার
ব্যথা মোর পূরি যত বহে হৃদি বহে যত
আশা কত হয় হত, বহে হৃদে নীর ধার।

* * *

তুমি যদি আলো করে থাক মা হৃদয় 'পর
দুঃখ মোর সুখ হবে দূরে যাবে অন্ধকার।

ভক্তি-বিনম্র প্রসন্ন-নির্ভরতায় কবির এই প্রাথমিক মাতৃ-বন্দনা লক্ষ্য করবার মত। কিশোর-কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-প্রবণতা তাঁর ভবিষ্যৎ কবি-শক্তি সম্পর্কেও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। দেশমাতৃকা সম্পর্কে কবির অনুভূতি এখানে স্পষ্ট রূপ নয়। অস্পষ্ট এবং ঈশ্বরানুরক্তির প্রচ্ছায়ায় কুহেলিকাচ্ছন্ন। এ যেন ভোর হবার ঠিক আগের মুহূর্ত! প্রত্যুষকালের আলো অন্ধকারের লীলা-রহস্যে কবি-চিত্তের ভাবাবেগ আন্দোলিত। প্রেম অথবা সৌন্দর্যানুভূতির রহস্যময় ব্যাকুলতা এখনও স্পর্শ করেনি অন্তর। ধ্যান দেয়নি, গান জাগায়নি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিত্য আবর্তে মুখরিত হয়ে উঠেনি হৃদয়ের কামনা-বাসনা। দুর্বল ছন্দে, সাধারণ প্রকাশ ভঙ্গির সাহায্যে কবি কেবল-মাত্র আত্মপ্রকাশ করছেন কাব্যালোকে।

তবু এই অস্ফুট মানবিকতার মধ্যেও কবি যেন অনুভব করছেন আগামী জীবনকে। মহত্তর-বৃহত্তর সেই জীবন সম্পর্কে কবি-চিত্তে দেখা দিয়েছে ব্যাকুলতা, তাকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন কিশোর কবি। জীবন-সংগ্রামের দুঃখ বৈতরে নির্ভয়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য অসঙ্কোচ সাহস সঞ্চয় করেছেন :

সাহসে করিয়া ভর
আনিয়া হৃদয়ে বল
দাও তরী ভাসাইয়া।
যদি বা গরজে ঘন
উঠে ঝড় করে রণ
দেয় তরী ডুবাইয়া—
কি ভয় কি ভয় তোর
ওরে হৃদয় আমার
উঠিবি রে সাঁতারিয়া!

উপরোক্ত দুটি পদই কবির কিশোর বয়সের রচনা। কিন্তু চিত্ত-কবি-মানসের স্বরূপ এখানে আশ্চর্যজনকভাবে উদ্ঘাটিত। কোমলতা এবং কাঠিন্য, মাতৃ-বন্দনায় অটল নির্ভরতা, বিশ্বস্ত আত্ম-সমর্পণ এবং সংগ্রাম-মুখর জীবন-সমুদ্রে স্নাধিত ব্যক্তিসত্তার বীর্য-নির্ঘোষ—এই পদ দুটিতে যেন তারই অস্ফুট পদধ্বনি।

কবি চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। কিশোর বয়সের রচনাগুলি তখন অপ্রকাশিত ছিল, সম্প্রতি কবি-কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী সেগুলোকে 'কবি-চিত্ত' গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। 'মালঞ্চ' কবির প্রথম গ্রন্থ। চিত্তরঞ্জনের যৌবনকালের ফসল। কবি-জীবনে যৌবন-ঋতু ফুল ফুটায়, ফল দেয় না। পত্রপুষ্পের ঘন-নিবদ্ধ সমুদ্রতায়, আকাশ-মাটির বহিরঙ্গ সৌন্দর্য তন্ময়তায় এবং প্রেম ও প্রিয়ার অবগুণ্ঠিত লীলাময়তায় কবি-চিত্তের উচ্ছ্বসিত আবেগের তরল আতিশয্য থরো থরো রোমাঞ্চে নিয়ত কম্পমান। প্রকাশের ব্যগ্রতা সামুদ্রিক তরঙ্গ-বিস্তারের মত এখানে কেবল ফুলে ফুলে উঠে।

স্থির অচঞ্চল হতে জানে না। কৈশোরের অপরিণত প্রেমোদ্যচ্ছায়ার প্রেক্ষাপটে এমনি বর্ণালী রূপ নিয়েই শক্তিধর যৌবনের আবির্ভাব ঘটে। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জগতে কবির অস্থির পাদচারণা সুরু হয়। গীতি-কবিতার ছন্দোস্পন্দে মুক্ত ঝরণার মত কবি নিঃশেষে প্রকাশ করতে চান নিজের আকুলতাকে। আর কবির এই গীতি-ধর্মী ভাবাবেগকে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে যিনি নিয়ন্ত্রিত প্রেরণান্বিত করেন তিনি নিত্যকালের চিরপ্রেমময়ী সৌন্দর্য-লক্ষ্মী। মালঞ্চে এই প্রেম এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ। চিত্ত-কবি মানস এখানে তাই সহজ ভাবে প্রেমময়ীকে আহ্বান জানিয়েছে। 'নির্বাসিত জীবনের জলন্ত যাতনার মধ্যেও লাভ করেছে তার মায়াময় শুভ স্পর্শ :

তোমার ও শুভদৃষ্টি থাকুক জীবনে,
ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রাণী !
প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের,
উঠুক ফুটিয়া তব প্রেম পুষ্প হাসি
সুন্দর মঙ্গল রূপে ! (উপহার)

যৌবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ সৌন্দর্যময়ী এই প্রেমকে কখনও তিনি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিচার করতে বসেছেন (দ্রঃ 'তোমার প্রেম'), কখনও বা নব জাগৃতির উদার স্পর্শে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন বহির্বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যলোকে :

আমার এ প্রেম তুমি রেখ না বাঁধিয়া
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুসুমের ;
সমস্ত গগন-ভরা পবন লাগিয়া
সমস্ত ধরণী পাক প্রেম পরমের।
• • • •
আজি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন,
পড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প-কারাগারে ;
আবর লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন,
ভেসেছে তরণী আজি মুক্ত পারাবারে।
(জাগরণ)

যৌবনের প্রেম ও সৌন্দর্য তন্ময়তার মধ্যে একটা বিরহাতুর বেদনার সুর থাকে। এ বেদনা যেন সর্বগ্রাসী। মনে হয়, কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে, অভাববোধের কাঁটা তীক্ষ্ণ হয়ে মনকে পীড়িত করে তুলছে : যা পাওয়ার ছিল তার অনেকখানিই বুঝি থেকে গেছে না-পাওয়ার রহস্য-বরণে। অথচ যৌবন জীবনের সবটুকু সুধাকেই নিঃশেষে চাখ পান করতে। যৌবনের ধর্মই তাই। তরুণ গরুড়ের মত কি এক মহৎ ক্ষুধার আবেগে দিগন্ত সীমায় তার পক্ষ সঞ্চালন। আকাশের সবটুকু নীলিমাকে পক্ষপুটে ধারণ করার এক উগ্র পিপাসা। এ-পিপাসার নিবৃত্তি নেই। যৌবনে কবি-চিত্তের বেদনাও তাই অন্তহীন।

চিত্ত-কবি-মানসের এই বেদনার সুরটুকু তাঁর কাব্য-গ্রন্থগুলিকে এক সজল মধুর আত্মায়মানতায় মনোরম করে তুলেছে। মালঞ্চের তৃষ্ণাতুর কবি-মানস কখনও আকুল-ভাবে এই অপ্রাপ্তির বহ্নি-মালাকে উপভোগ করেছে :

আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা।
(—'তৃষা', মালঞ্চ)

কখনও মোনালিসার চিত্র-দর্শনে কবি-চিত্তে জেগেছে জিজ্ঞাসা :

দিবা-দগ্ধ রাত্রিহীন জীবনে আবার
প্রেম মায়া উপবন নহে সম্ভবিবার।
কি ভুল আনিবে তবে কি নব ছলনা ?
আজ মোনা ! ('মোনা' মালঞ্চ)

প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কবি-মানসের স্বতঃস্ফূর্ত বিহার সব সময় সংযত থাকে নি, এ কথা অনস্বীকার্য। ছন্দ ও ভাষার লালিত্য কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে সুষ্ঠু রূপ দিতে পারে নি। কবি-চিত্তের আবেগ-তরলতা মালঞ্চের ও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি যে সংহত-চিত্তে সংযত বাক্য বিন্যাসে কাব্য রচনায় একেবারে অপারগ ছিলেন না, তার প্রমাণ কবির সনেট রচনা। প্রেম ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাস উদ্বেলতার সফেন সমুদ্রে এখানেই কবি-শক্তি আবিষ্কার করেছে তটভূমির কাঠিন্য।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের উদ্দেশে লিখিত চিত্ত-কবির সনেটটি পাঠ করলে একটি আদর্শ সংযত কবি-মানসের

পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের গাঢ় বন্ধনে, শব্দ প্রয়োগের একনিষ্ঠ কবি-কুশলতায়, অষ্টক এবং ষটক বন্ধের লীলা-মাধুর্যে সনেটটি প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। এর প্রথম আট চরণে দেবেন্দ্রনাথের 'সুখ-ভরা শান্তি-ভরা স্বপ্ন-ভরা' কাব্য-সৃষ্টির প্রতি চিত্ত-কবির বিমুগ্ধ অনুরাগের প্রকাশ। ষটকে সেই চিরন্তন কবি-প্রিয়ার উদ্দেশে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি :

আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অঙ্গ পানে রাঙা মুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙিয়া।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট
আমার আগ্রহভরা ভিখারী সনেট।

('কবি ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি' মালঞ্চ)

মালঞ্চের পর কবির আরো চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় : মালা (১৯০২) সাগর সঙ্গীত (১৯১৩) অন্তর্যামী (১৯১৪) এবং কিশোর কিশোরী। কিশোর কিশোরীর কবিতাগুলি চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয় ও পরে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। মালঞ্চ থেকে কিশোর কিশোরী—কবির কাব্য সাধনার এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে বিশ্লেষণ করলে কবি-চিত্তের একটি সুস্পষ্ট ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ক্রমবিকাশমান কবি প্রতিভা প্রেম ও সৌন্দর্যের বহিরঙ্গ লীলা বিলাসের স্তরগুলো অতিক্রম করে কেমন সহজ ভাবে আধ্যাত্মিকতার নিবিড় উপলব্ধিতে সমাহিত হয়েছে তার স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থে। বস্তুত কবি-মানসের এই বিবর্তন কবি ধর্মেরই অনুকূল। শক্তিমান কবি মাত্রই চলার পথে বারংবার তাঁর রূপ ও রঙের পরিবর্তন করেন। মনের স্বাভাবিক অগ্রগামিতাকে রুদ্ধ করে রাখলে চলমান কবি-প্রাণের অপমৃত্যু অনিবার্য। ঋতু বদলের মত রীতি বদল করাও তাই কবি-ধর্ম। চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। মনের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই ভাবেই প্রকাশ করেছেন নিজের অনুভূতিকে। মালঞ্চের কবি এবং কিশোর কিশোরীর কবির মধ্যে তাই একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। তবে এ প্রসঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে কবি-চিত্তের এই ক্রম-পরিণতির ইতিহাস কোথাও তাঁর স্বধর্ম-চ্যুতির কারণ ঘটায় নি। এ পরিণাম একান্তই স্বাভাবিক, কবি-হৃদয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং ঈশ্বর ও লৌকিক জগৎ সম্পর্কে তাঁর ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছ মোহমুক্ত উপলব্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। তাই মালঞ্চ-রচয়িতার সঙ্গে অন্তর্যামী বা কিশোর-কিশোরী স্রষ্টার মনোভঙ্গির যে পার্থক্য, তা যত-খানি প্রকাশগত, অন্তরঙ্গ বিচারে ঠিক ততখানি চরিত্রগত নয় বলে আমাদের ধারণা। জটিলতার পরিবর্তে সহজ সরলভাবে কবি-মানসের এই রূপান্তরটুকু সাধিত হয়েছে। বক্রগতি বা বিচিত্রগতি নয়, একটি সরল রেখার অনায়াস ঊর্ধ্বগতিই কবি-চিত্তের এই ক্রম-বিকশিত ভাবধারার প্রকৃত অভিধা।

চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থে ইতস্তত: শিথিলতা লক্ষিত হয়েছে। রূপ-কর্মের ক্ষেত্রে কবি-মানস তখন পর্যন্ত ছিল দুর্বল এবং আবেগ তরল। রোমান্টিক কবি-চেতনা এখানে কোন শাশ্বত রস-বস্তুর সন্ধান লাভ করেনি। তাই প্রেম ও সৌন্দর্যের বহিরঙ্গ লীলা বিলাসে কবি-চিত্ত নিয়ত অস্থির, অতি-কল্পনার ভাবাবেগে স্পন্দিত। মালঞ্চ পরবর্তী কাব্যে কবির এই লঘু-পক্ষতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে একনিষ্ঠ ভাবুকতার স্তরে ক্রমশঃ উন্নীত হয়েছে। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মালা' থেকেই এর সূচনা লক্ষ্য করা যায়। মালঞ্চের উচ্ছল জীবনাবেগ এখানে এক অখণ্ড নীরবতার মধ্যে ধ্যানস্থ হওয়ার জন্য ব্যাকুল। যৌবনের সর্বগ্রাসী অস্থিরতা যৌবন-মধ্যাহ্নে প্রেমের শীতল স্পর্শে 'আপনার গান' রচনা করতে চায়। ডুব দিতে চায় অন্তর-রহস্যের চির-মৌন রসসমুদ্রে। কবি-চিত্তের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য-পিপাসা অন্তর্লীন লীলাময়তার শান্ত নিবিড় সাযুজ্য চায়। কবির তাই নূতন উপলব্ধি :

আমার হৃদয় ছিল সব গীতহারা
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী
সুখ পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অমৃতের ধারা
করিছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী।

('প্রেম' মালা)

কিন্তু এই প্রেম আর আর আত্মকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বমুখীন।

বিশ্বমাঝে তার বেজে উঠে গান। স্বার্থপরের মত সম্পূর্ণ একার করে তাকে আর পাওয়ার উপায় নেই; তাই এই প্রেমোপলব্ধির সকল সুকৃতি একনিষ্ঠ ভক্তের মত দেবতার চরণে সমর্পণ করার অভীপ্সা জানাতে হয়:

তবে এস নামি মোরা দেবতা চরণে
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে মরণে। (ঐ)

মানুষী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এখানে আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গীতে দেবতার চরণে সমর্পিত: প্রেম এবং ভক্তির প্রগাঢ় সমন্বয়। চিত্ত-কবি-মানসের ক্রম-পরিণতির সূত্র সন্ধানের পক্ষে কবিতাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মালঞ্চের ভোগ-তৃষ্ণা তার সকল চঞ্চলতা অস্থিরতাকে পরিহার করে কেমন অনায়াস গতিতে শুদ্ধ সত্য উপলব্ধির গভীরতায় ভাবনিষ্ঠ হয়ে উঠছে এ কবিতাটির ছন্দোস্পন্দে তার প্রমাণ বিধৃত। এই অনির্বচনীয় প্রেম-সঙ্গীতকে সুরে ছন্দে ভরে তুলবার জন্য কবি-চিত্তে প্রয়োজন ধ্যান-মৌন প্রশান্তির। পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন অখণ্ড নীরবতার। কবির কণ্ঠে তাই প্রার্থনার সুর:

পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত। হে সম্পূর্ণ। নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে।
('নীরবতা,' মালা)

কিন্তু এমন পরিপূর্ণ প্রশান্তি, আত্ম-নিবেদনের জন্য এমন শব্দহীন মহান সঙ্গীতের পটভূমিকা, সে কোথায়? অনন্তের পুণ্যস্পর্শ যেখানে চিরপ্রবহমান, সফেন তরঙ্গের মন্দ্রোচ্চারণে সীমাহীন সমুদ্র যেখানে ধ্যান-গম্ভীর বিমুগ্ধ ভক্তের মত আপন অন্তরের সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত করে—সেই সাগর-তীরে কি? 'মালা'র পর তাই বোধ হয় চিত্ত-কবি 'সাগর সঙ্গীত' রচনা করলেন!

সাগর-সঙ্গীত দিগন্তবিহারী সাগরের উদ্দেশে কবির ভাবুক-চিত্তের মুগ্ধ বিস্ময়াঞ্জলি। এই কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্র-নাথের সোনার তরীর (২) অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও, চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এখানেই। কবি কন্যা লিখেছেন: "সীমাহীন সমুদ্রের রূপের প্রতি বাবার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তাই বার বার তিনি ছুটে গিয়েছেন সাগরের আহ্বানে—আদিঅন্তহীন বিশাল জলধির সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশের যে মিলন, সে মিলনে সাগরের উচ্ছল নৃত্য তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল—তাই আদি-অন্তহীন বিশাল নীলাম্বুধ বিভিন্নরূপের তরঙ্গ ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে সেই অসীম রূপকেই তিনি সাগর সঙ্গীতের ছন্দে বেঁধে রাখলেন।"

কিন্তু ছন্দের এই বন্ধন চিত্ত-কবির হৃদয়ের সকল বন্ধনকে নিঃশেষে মুক্তি দিল অরূপ সুন্দর বিশ্ব জগতে। স্থিতপ্রজ্ঞ কবি-সত্তা অসীম ঔদার্যের সঙ্গে এই প্রথম অনুভব করল বিশ্ব-জীবনের চলমান ধারার সঙ্গে তার নিজস্ব প্রাণ-শক্তির ঘনিবিড় একাত্মতা। সাগরের সাথে কবি-হৃদয় বাঁধা পড়ল জন্মান্তরের আত্মীয়তায়:

কবে দেখেছিনু তোমা, হাত ধরেছিনু—
চেয়েছিনু চোখে? কোন কালে কোন দেশে
সেদিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান? চেয়েছিলে হেসে?
সেদিন কি ছিল প্রাণ এত ভরপুর—
গভীর আবেগ ভরা এত অশ্রু জলে?

গভীর আত্মীয়তার মন্ত্রে সাগর সাধনা সমাপ্ত করে কবি এবার 'অন্তর্যামী'র সাধনা সুরু করলেন। কবির অস্থির আত্ম-বিশ্লেষণ প্রশান্ত আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে এবার পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হল ভক্তের আত্ম নিবেদনে। বৈষ্ণব-আরাধ্য লীলাময় বিশ্বদেবতার চরণতলে সমস্ত বাণী সাধনার সুকৃতিকে উৎসর্গ করলেন কবি। বৈষ্ণব-ভাবুকতার চির রহস্যময় প্রেম-জীবনে কবি-চিত্তের নবতম জন্মলাভ ঘটল। অঙ্গধারী মানুষী প্রেম এবার অনঙ্গরূপে কাম-গন্ধহীন দেব-মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল কবির লেখনীতে! মালঞ্চের কবি 'কিশোর-কিশোরী'তে পদার্পণ করে এই দেহাতীত প্রেম ও সৌন্দর্যকেই করে নিলেন:

জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,

এমন মধুর করে
এমন পরাণ ভরে। • • •
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার।
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার।

(কিশোর-কিশোরী)

এ যেন সেই বৃন্দাবনের চির-কিশোর-কিশোরীর হৃদয়-মথন-জাত দিব্যভাবপূর্ণ প্রেমপ্রীতি! যেন রাধাভাবে ভাবিত বৈষ্ণব মহাজনের অন্তরের অকৃত্রিম উল্লাস। প্রেম ও ঈশ্বরানুভূতির এক আশ্চর্য রস-সম্মিলন। চিন্ত-কবির বাণী আরাধনার পরমেশ সিদ্ধি লাভ!

কিন্তু কবির এই রূপান্তর পারম্পর্যবিহীন কোন একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। যে সহজ সরল গতিতে কবি-মানসের রূপান্তর ঘটেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি তারই অনিবার্য ফল। কবির পূর্ব জীবনেই এর বীজ নিহিত আছে। পরিণত কাব্য সাধনায় তাই অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়ে আকাঙ্ক্ষিত ফলদান করেছে মাত্র। কবির কিশোর বয়সে রচিত পদগুলির বিশ্লেষণ করলে এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাবে। কবির আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গিটি সেখানে অনুপস্থিত নয়। 'মালঞ্চে' প্রেম ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি কয়েকটি ঈশ্বর সম্পর্কিত কবিতা আছে। কৈশোরের অপরিণত রচনায় বিশ্ব-নিয়ন্তার প্রতি কবির একটা সহজ বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু যৌবনের অস্থিরতা সে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলেছে—

তবে সেই ভাল, জীবনের
ভেঙেছে আবাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস
তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন।

('আমার ঈশ্বর,' মালঞ্চ)

কিন্তু এখানেও, একটু লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়, কবির অভিমানী রূপ যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততখানি মোটেই প্রবল নয় কবির 'ঈশ্বর-বিদ্রোহী' চেতনা। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি তাঁর আপাতঃ অবিশ্বাস মূলতঃ তার ঈশ্বরানুরাগেরই পরিচয়বাহী। যৌবনে সমস্ত কিছুকেই ছুঁয়ে দেখবার, অদৃশ্যকে দৃশ্য এবং অলক্ষ্যকে লক্ষ্যগোচর করবার একটা প্রবল স্পৃহা দেখা যায়। মানুষের সামর্থ্য সেখানে সহজে পৌঁছায় না—যৌবনে তার প্রতিই জাগে বিরূপতা, তাকে আক্রমণ করে ধূলিসাৎ করবার প্রবল বাসনা। অথচ এ সমস্ত কিছুরই মূলে নিঃশব্দে সংগোপনে কাজ করে যায় একটা সুতীব্র আকর্ষণ। এই আকর্ষণই পরিণত বয়সে রূপান্তরিত হয় মুগ্ধ বিস্ময়ের আত্ম-নিবেদনে। মালঞ্চের পর 'মালা'য় এসে যখন কবি একই ঈশ্বর সম্পর্কে বলেন :

নিখিলের প্রাণ তুমি। তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার
জাগরণে কর্মভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি
ওগো সর্বপ্রাণময়। তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার।

('প্রার্থনা' মালা)

তখন সন্দেহ থাকে না মালঞ্চের অভিমানী কবি-হৃদয় মালায় এসে মুগ্ধ আত্মনিবেদনের প্রশান্তিতে শান্ত সমাহিত হওয়ার সাধনা সুরু করেছে এবং এই প্রস্তুতি অজ্ঞাত আকর্ষণের তাড়নায় মালঞ্চের আপাতঃ সন্দেহ অবিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নিজস্ব পথ তৈরী করে নিয়েছে। তা না হলে মালঞ্চ-পরবর্তী কাব্যগ্রন্থেই কবি-হৃদয়ের এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেবার পক্ষে যথেষ্ট কালোচিত বাধা দেখা দেয়।

'মালা' কাব্যগ্রন্থে কবি-মানসের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে 'সাগর-সঙ্গীত' শেষ করে 'অন্তর্যামী'র সাধক কবি তাকেই পুনরায় নবরূপে আবাহন করেছেন 'কিশোর কিশোরী'র মায়াময় জগতে। পার্থক্য এই কিশোর-কিশোরীতে দেহাতীত প্রেমের বন্দনা গান লৌকিক জগৎকে প্রায় অস্বীকার করেছে। প্রেমিকা এবং ঈশ্বর এক দেহে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। তার পৃথকীকরণ আর সম্ভব নয়। মালঞ্চ-মালার না পাওয়ার বেদনা এখানে সকল মিলনের উল্লাসে স্পন্দিত। 'অন্তর্যামী'র ধূসর বৈরাগ্য প্রেমের স্পর্শে আবার রঙীণ, মধুরতম হয়ে উঠেছে। মালঞ্চে যদি অভিমান, মালায় আত্ম-বিশ্লেষণ, আর সাগর-সঙ্গীতে নির্জন-সাধনা এবং অন্তর্যামীতে সাধন-

শেষের বৈরাগ্য প্রশান্তি, তবেই কিশোর-কিশোরীতে আত্মনিবেদন ও সর্বশেষ উপলব্ধি—প্রেমোপলব্ধি।

তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?
কে বলে রে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে ?
কার পদরজ :
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে ? হে মিলিত ! হে মধু মিলন !
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি ! ধন্য এ জীবন।

(কিশোর-কিশোরী)

কিশোর-কিশোরী কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এরপর চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক জীবনের সুরু। কবি চিত্তরঞ্জনের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনরূপে আবির্ভাব। কবি-জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবনে চিত্তরঞ্জনের এই ভিন্নতর পদচারণার সূত্র সন্ধান করতে গেলে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন। মনে হয়, কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় তাঁর অন্তরের অতৃপ্ত বেদনার কোন দিনই অবসান হয়নি। পরম ও চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কবি-চিত্তের ব্যাকুলতা শেষ পর্যন্ত অসফলই থেকে গেছে। দেশ ও দেশমাতৃকার আরাধনার মধ্য দিয়ে তিনি তাই নূতন করে তাঁর জীবন দেবতাকে খুঁজে নিতে প্রয়াসী হয়েছেন।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা তাঁর কবি-প্রতিভাকে ম্লান করে দিয়েছে। আধুনিক পাঠক-সাধারণও তার কথা বড় একটা মনে রাখেনি। এর একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে চিত্তরঞ্জনের কাব্য কোন নূতনত্বের দাবী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়নি। এক হিসেবে তা গতানুগতিকতারই অনুবর্তন। চিত্তরঞ্জনের কাব্যের ভাষা সরল আবেগধর্মী। তাতে উচ্ছ্বাস আছে, সংযত উত্তাপ নেই। কোমলতার পাশাপাশি নেই দৃঢ়-সংবদ্ধ ভাষা ও ছন্দের কাঠিন্য। কঠোর কোমলের উত্থান পতনে ছন্দের যে লীলামাধুর্য—চিত্র-কাব্যে সে সৌন্দর্য অনুপস্থিত। চিত্র সৃষ্টিতে অথবা উপমা অলঙ্কারাদি ব্যবহারেও তিনি কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হয়ে প্রাচীন সংস্কারকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে যুগোপযোগী জীবন-জিজ্ঞাসা নেই, মননধর্মী তীক্ষ্ণতা নেই, হেমচন্দ্র-রঙ্গলালের জলন্ত দেশপ্রেমও অস্বীকৃত। ছন্দরীতি বিষয়ে তিনি সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাস-যুক্ত প্রবহমান পয়ারেরই অনুসরণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সমকালীন খ্যাতিমান লেখকদের প্রভাব থেকে তাঁর কবি-চেতনা মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু কবির কাব্য দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-গুরু বিহারীলালের নিরুদ্ধ সৌন্দর্য-লোকের ভাবালু রোমান্টিকতা চিত্তকাব্যে যেন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিশে আছে। এদিক দিয়ে তিনিও বিহারীলালের ধারার একজন শক্তিমান অনুকারী মাত্র। ঘরের প্রেমকে বিশ্বাভিসারী করার যে কৃতিত্ব চিত্তরঞ্জন দেখিয়েছেন—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যাবলীতে তার স্পর্শ আমরা আগেই পেয়েছি। বাংলা গীতি-কবিতার প্রবহমানতায় চিত্তরঞ্জন কিছুটা দার্শনিকতার রং ছড়িয়েছেন, এটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। মৌলিক না হলেও এই কবি-ক্ষমতাটুকুকে স্বীকার করে নেওয়া যায়। তবে কোনো কবির কাব্য কালজয়ী হওয়ার পক্ষে কোনো একটা বিশেষ গুণ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়।

---

(১) ইন্দুপর্ণা দেবী সম্পাদিত 'কবি চিত্ত' দ্রঃ

(২) সোনার তরীর প্রকাশ কাল ১২৯৮ ফাল্গুন—১৩০০ অগ্রহায়ণ।

ধ্বস

অমিয় চৌধুরী

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল কালীপদর।

কয়েকদিন থেকেই এক ফোঁটা ঘুম আসেনি তার চোখে। কিংবা এলেও তা টিকে থাকতে পারেনি। টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো জেলে খট্‌খট্ খটাখট্ খটাখট করে মাকু টেনে টেনে এপাশ ওপাশ করেছে। চারখানা গামছা আর দুখানা ধুতি তৈরী করে ফেলেছে এই ক'দিনে। ব্রহ্মদৈত্যের মেলায় ওগুলো বিক্রি করবে। এক দিনের মেলা। কিন্তু ঐ একদিনেই যা বিক্রি হয় তাতে দরিদ্র চাষীগুলোর অনেক দিনের আহার জোটে। তাছাড়া তেমন নামকরা না হলেও মেলাটা খুব জাঁকজমকের। ও তল্লাটে এই একটি-মাত্রই মেলা বসে। বছরে একবার। বছরে একবার করে আসে পাশের গ্রাম থেকে ছেলে বুড়ো সবাই এসে মেলে এই মাঠটায়। সহর থেকে দোকান পাটও আসে। চানাচুর, ভেলেভাজার দোকান। দু একটী মিষ্টির দোকান। তা ছাড়াও সহরের ফুটপাতে জিনিষ ছড়িয়ে যে সব সাড়ে-ছ-আনা-ওয়ালারা বসে থাকে তারাও এই একটী দিনের জন্যে মেলায় না এসে পারে না। আর হতভাগা-হতভাগীর দল। ওরা আসে বাবা ব্রহ্মদৈত্যের কাছে নিজেদের মনস্কামনা জানাতে। কারো ছেলে চাই, কারো ছেলের অসুখ সেরে যাক্, কারুর স্বামীর শরীর এবং মন সুস্থ হয়ে উঠুক। কালীপদর জীবনেও এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। বিয়ের এক বছর পরে একটা বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু গত বছরে মাঘের দরাজ অর্থাৎ বসন্তের হলিয়াতে কালীপদর বাচ্চাটা রেহাই পায় নি। বাবা ব্রহ্মদৈত্যের থানে বটগাছটার কোটরে মানত করে একটা ইঁটও তুলে রেখেছিল কালীপদ। কিন্তু কে জানে বাবার কি ইচ্ছে, বাচ্চাটা বাঁচলো না। অকালে গলে গলে পচে পচে মরলো। বাচ্চাটার সেই বীভৎস চেহারা খানা মনে করলে এখনো দুহাতে মুখ ঢাকে কালীপদ। তবু তাকে বুক বাঁধতে হয়। দুদিনের জন্যে অচল হয়ে পড়া সংসারটাকে আবার মজবুত করে তুলতে হয়েছে। মজবুত করে তুলে আবার তাঁতের মাকু ধরতে হয়েছে।

কিন্তু এবারকার মেলাটা ভালভাবে জমবে কি না, কে জানে। ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে উঠে বসলো কালীপদ। সন্ধ্যের অন্ধকার আর আকাশের বুকে কালো মেঘ একসঙ্গেই জমতে শুরু করে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে হিংস্র বাতাসের দাপাদাপি। সেই মেঘগুলো এখন গলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বাতাসের দাপাদাপিটা আরও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে। এপাশ ওপাশ ভীত চোখে চাইলো কালীপদ। ওরই পাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে আকালী। মাঝ রাতের এত প্রচণ্ড শব্দেও ওর ঘুম ভাঙেনি। একবার মাত্র সামান্য একটু নড়ে উঠেছিল। তার পর আবার ঘুম। ও বেচারাকে দেখলে সত্যিই আজকাল বড্ড মায়া লাগে কালীপদর। ছেলেটা মারা যাবার পর থেকেই ও কেমন ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছে দিন দিন। আগেকার সেই নিটোল শরীরটা ভাঙছে আস্তে আস্তে। আগে গাল দুটো একটু পুরন্ত, নাকটা একটু খাঁদা-খাঁদা দেখাতো। আর আজকাল সারা মুখের মধ্যে নাকটাই সার হয়ে উঠেছে। একটু ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। ক'দিন থেকে ও বেচারারও একটু স্বস্তি নেই। তাছাড়া কাল সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে কেমন একটা গুমোট ভাব অস্থির করে তুলেছিল সবাইকে। সম্ভবতঃ এই বৃষ্টিটারই পূর্বাভাষ। ঐ ন্যাপসা গরমেও খানিকটা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছিল। আজ তাই সন্ধ্যে হতে না হতে দুটো পান্তা ভাত গিলে বিছানা নিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে। খেয়ে উঠে অন্যদিন দুচারটে গল্প করে কালীপদর সঙ্গে। আজ তাও করেনি।

বিছানা ছেড়ে একবার উঠে দাঁড়ালো কালীপদ।

কালীপদর মনে হল সে মরে গেছে একেবারে। ভয়ের এতগুলো সময়ের আগে কোনও দিন ঘটেছে কিনা তা জানা নেই ওর। ঘরের চৌকীটা দুলছে বেতালে। চালার বাতাগুলো মচ্‌মচ্‌ করছে দুরন্ত বাতাসের চোটে। দেয়ালের মধ্যে চৌকাটা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কালীপদর মনে হচ্ছে, এইবার এই মুহূর্তে বুঝি সমস্ত ঘরটাই ওদের ওপর ধ্বসে পড়বে। মা বলে আর ডাকবার সময় পাবে না। আবার ভয়ে কুঁকড়ে গেল কালীপদর মনটা। কেমন একটা নিরুপায় আতঙ্ক নিয়ে বাইরের অবস্থাটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো।

পুকুর পারের দিকে চেয়ে বুক কেঁপে উঠলো ওর। ঈশান কোণের জমাট বাধা কালো ছায়াটা দ্রুতবেগে ছুটে এসে সমস্ত আকাশটা ঢেকে ফেলেছে। অসম্ভব কালো আর ভয়ানক রাত্রি। অসুর রাক্ষসের মাতলামিতে যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেছে। এতদিন পর্য্যন্ত রোদে জলে যে গাছগুলো মাথা খাড়া করে ছিল, ওগুলোও যেন শুয়ে শুয়ে পড়বার জন্যে ছটফট্‌ করছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেন একটা ব্রহ্মদৈত্যের রক্তাক্ত রোষবহ্নির শিখা। লাখ লাখ দামামা বেজে উঠেছে আকাশে। ওরা সমস্ত পৃথিবীটাকে ভেঙে চুরে গুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ঝড়ের শব্দ আর তারই সঙ্গে বিদ্যুতের জ্বালা-ধরানো চমক। কালীপদর সারা ইন্দ্রিয় জুড়ে যেন বিরাট একটা ভীতির শিহর ছড়িয়ে পড়লো। এখানে ওখানে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ার শব্দ আসছে। এ গাছে ওগাছে ডাল ভেঙে ভেঙে পড়ছে হাওয়ার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। কাছেই কোথায় দুপ্‌ দুপ্‌ করে শব্দ হল একবার। কালিপদর মনে হল, পিছনদিককার পাটীলটা বুঝি ভেঙে পড়লো হঠাৎ। এইবার বোধ হয় এ ঘরটাও যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানার কাছে সরে এলো। ঘুমন্ত আকালীর গায়ে ঠেলা দিয়ে ডেকে বললো, আকালি। এই আকালি!

শঙ্কিত ডাকে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো আকালী। ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠলো, কি হল গো? কি হলো?

কালীপদ বলে, উঠে বস্‌! স্যাখ্‌ ক্যানে কি কাণ্ড আরম্ভ হইছে বাইরে!

চোখ মুছে এদিক ওদিক ভাল করে চাইলো কালীপদ। যেন চোখ থেকে ঘুটঘুটি অন্ধকারটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলো। আকালীও। বাইরের ঝড়ঝড়ে হাওয়ায় কাঁপছে ঘরটা। চালের এক কোণের ফুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। মেঝের খানিকটা ভিজে গিয়ে কাদা হয়ে গেছে। আকালী শিউরে উঠলো, হেই মা গো! ই কি কাণ্ড! এই আষাঢ়ের (শ্রাবণের) দিনে এত সিষ্টি কুথা থিকে এলো!

কালীপদ আর একবার বাইরের অবস্থাটা আন্দাজ করে বললো, এই স্যাখ্‌ ক্যানে ভগমানের কাণ্ডকারখানাটো। টুকটি বিবেচনা থাউক উয়োর! কাল বাবার থানে পুজো হবে, বলি দান হবে, তা পরে মেলে মেলা বসবে,আর এই অসুমুয়ে কি আরম্ভ করলে স্যাখ্‌ দিখিনি!

ইসব বাবা বম্মদত্যির খেলা বুঝলে গো! আকালী কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে দক্ষিণ দিক করে প্রণাম করে। বলে, হেই বাবা বম্মদত্যি, তুমি রক্ষে করো বাবা! ই গেরামের তুমিই তো বাবা রাজা। তুমার দয়া না হলে যে কিছুই হবে না। হেই বাবা, তুমাকে বাগাতা করছি বাবা, আমরা গরীব দুক, আমাদের দিকে একবার ভেলে দেখো। আমাদের ঘর ভেঙে গেলে কুথাকে যাবো বাবা! টুকটি রসো বাবা! নইলে যে কাল তুমার পুজো হবে না গো! সব মাটি হইন্‌ যাবে!

আকালীর সঙ্গে কালিপদও প্রণাম করে। মনে মনে তারই ভয় বেশী। কারণ আগেকার মত আর রোজগার পাতি নেই। সহর বাজারে কল বসে আর বিদুঁই থেকে কাপড় আমদানী হওয়ায় ওদের বাজার মন্দা পড়ে গেছে একেবারে। হাতের তৈরী জিনিষ চড়া দাম দিয়ে কিনতে নারাজ বাবুরা। আর কালিপদ বা এ পাড়ার অন্যান্য সব তাঁতিরাও তো ঐ কলের কাপড়ের সমান সস্তা দামে জিনিষ দিতে পারবে না। মহাজনেরাও আজকাল আর দাদন দিতে চায় না। যদি বা দিতে চায় তাতে টাকের দামে মনদা বিকিয়ে যাবার মত অবস্থা। কালে ভদ্রে মাঝে মাঝে সহরের ব্যাঙ্ক থেকে সুতি নিয়ে আসে কালিপদ। গামছা তৈরী করে বিক্রী করে দিয়ে আসে ছ'মাইল দূরের সহরে। তাও নিতান্ত সস্তায়। পুরো পোষায় না তার। চারটে গামছা বিক্রী করে খুব জোর দুটাকা। কি তারও কম কিছু লাভ থাকে। তবু তাঁতের

কাপড় তৈরীতে কালীপদর বিলক্ষণ একটা সুনাম আছে। সেই সুনামের জোরেই বনেদী বড়লোক-গুলো মাঝে মাঝে সহর থেকে তলব দিয়ে পাঠায় কালীপদকে। সৌখীন কাপড় তৈরী করে দেবার জন্যে। ঐ সময়েই যা দু একটা দাঁও মারতে সুবিধে হয় তার। ও দাঁও সে ছাড়ে না। তবু সে আর ক'টাকা। ওতে তো আকালীর দু জোড়া রূপোর চুড়িও হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় যদি শেষ সম্বল ঘরটাও ধ্বসে যায়, তবে সে ঘর আর জন্মেও তুলতে পারবে না কালিপদ। সেইজন্যে ও-ও আকালীর কথায় সায় দেয়। বলে, হেই বাবা, তুমিই তো আমাদের মা-বাপ! তুমার এই রাগ কেনে! তুমি তুমার রাগটো সামলিন্ লাও বাবা! তুমি রক্ষে করো!

বাবা ব্রহ্মদৈত্যের চরণে ওদেরকে রক্ষে করবার ইচ্ছে নেই মোটেই। বৃষ্টিটা আরও চেপে আসে। মাঝরাতের চাঁদ ডোবা অন্ধকারটা আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। রাতের কালো বিপর্যস্ত গ্রামখানা আরও কাঁপতে থাকে। ও পাশের আম বাগানের শন্‌শনে সঙ্গে আর দুটী আত্মার কম্পমান অস্তিত্বে বুঝি ভয়ঙ্কর একটা শিহরিত স্তব্ধ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ওরা দুজনে দুজনের কাছে সরে আসে আতঙ্কিত চোখে।

চালাটার একটা কোণে খড় উড়ে গেছে। খড় উড়ে গিয়ে ফাঁক হয়ে যাওয়ার ফলে বৃষ্টির ধারাপাত আরও বেশী করে আরম্ভ হয়ে গেছে। কাঁথা বিছানা সব তাড়াতাড়ি গুটিয়ে যা দিককার বাক্সটার ওপর তুলে রাখে কালীপদ। সারা ঘর কাদা হয়ে গেছে। কাঁচ-কাঁচে চৌকিটাকে সরিয়ে নিয়ে আসে বৃষ্টির ছাট বাঁচিয়ে। সেদিকে একটু ছাউনী আছে।

এই ঘর থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে কালীপদ—পাশের পাঁচিলটা জলে ভেসে যাওয়ার মত অবস্থা। তাঁতের কাঠ আর দড়িগুলো ভিজে গেছে। পা-রাখা গর্তটা জলে ডুবে গেছে। অথচ কোনও উপায়ও নেই ওগুলো বাঁচাবার। এ ঘরে যেটুকু জায়গা তাতে ওদের দুজনেরই একটু মাথা বাঁচাবার জায়গা হচ্ছে না। কালীপদর মনে হল, ওর সংসারটা বুঝি এই বেহিসেবী জলের তোড়ে ভেসে যাবে এই মুহূর্তে। তাই যাক্। সেই সঙ্গে ওরা দুজনেও ভেসে যাক্।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে আকালীর মেজাজ বিগড়ে গেছিল। এবার ও গজর গজর করে ওঠে, লাও, এবারে সামলাও! তখন ভুরে ভুরে কান কামুড়ে বলে দিলম, ওগো আর কিছু না হোক্ যেকে, ঘরের চালাটো ছয়রে লাও। না তখুন আমার কথাটো শুনতে লাগলো, তখন বলা হল, যে আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি বুঝি! লাও বুঝলে তো কে বেশী বোঝে, হুঁ:! তুমাকে কি আর বোল্‌বো!

বিছানাগুলো আরও ওপাশে ঠেলে দিয়ে বলে কালী-পদ, তা আমি কি তখুন জানি সি এই আড়ের দিনে অমন বে-আক্কেলে বিষ্টি নামবে!

: ক্যানে ই কি নতুন দেখছো নাকি? গেল বারের আগে বারে দেখো লাই থো, এমনি পারা আড়ের দিনে বিষ্টি নেমে গোটা স্থাপটোকে ভাসিন্ দিলে। ই বারে বুধার উরোর চেয়েও বেশী বান লাগবে নদীতে!

হঠাৎ একটা ভিজে ঝাপটায় দুজনে পিছিয়ে যায়। উঃ! বৃষ্টি কি আর থামবে না নাকি! সারা ঘরে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে ওরা। ভাগ্যে এই চৌকিটা ছিল, নইলে ঠায় এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত ওদের। কালীপদ বলে, বকুর বকুর করে বকিস্ না তো বাপু! এ্যাকে তো এই শালা বিষ্টির জ্বালায় মরছি, তার উপরে তু যদি কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করিস্ তো নদীতে ডুবে মরবো গা যেকে। যা হবার তা হইন্ গেইছে! ঘর ছ'ন হয় লাই, যখুন তখুন তো আর কুছু উপায় লাই থো! আপুন টুকচি লেগে দে তো, ঘরের জলগুলান লালা কেটে বার করে দি। জলটো টুকচি থেমেছে লাগছে!

দেয়ালের মাটী নরমই হয়ে গেছে। কালীপদ জলের ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এল একটু। ঘরের একটা কোণে একটু মাটী খুঁড়ে জল যাওয়ার পথ করে দিল। আকালীকে বললো, তু জল ওলান্ হেঁচালে হেঁচালে দে তো, আমি ইদিকে থাবুলে থাবুলে পার করে দি। নইলে বেশীক্ষণ জল দাঁড়িন্ থাকলে ঘরটা শুদ্ধ পড়ে যাবে একেবারে।

তখনও আকালীর গজর গজর থামেনি। মনে মনে সে একেবারে অজগরের মত ফুঁসছিল। তবু মুখে কিছু

বললো না। ছেঁড়া কাঁথাখানা গা থেকে নামিয়ে রাখলো কোণ-ঘেঁষা রং-চটা টিনের বাক্সটার ওপর। বলা যায় না—কাজ করতে করতে ওটা জলে পড়ে যেতে পারে। জলে পড়ে কাদামাখা হয়ে গেলে ওটার আর কোনও জাত থাকবে না। সুতরাং ওটা গায়ে নিয়ে কাজ করা ঠিক হবে না। আঁচলটাকে জড়িয়ে আঁট সাঁট করে বেঁধে নেয় আকালী। তার পরে হাতে করে সরু ফোঁকড়টা দিয়ে জল পার করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর জলটা একটু কমের দিকে আসে। হাওয়াটাও যেন একটু দম নেয়। দেয়ালের গা গড়িয়ে আর ফাঁকা চালা দিয়ে জল পড়া কমে খানিকটা। কিন্তু তখনো ওরা সমানে জল বের করতে থাকে। দু-এক সময় আর একটা ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ওদের। জল হিঁচতে হিঁচতে আকালী বলে, হ্যা গো, বাইরের গ'ল (গোয়াল) ঘরটো ঠিক আছে তো ?

কালীপদ উত্তর দিল, হ, হ, উ ঘরটো তো ভালই আছে। উটোর জন্যে ভয় নাই, টিনের চালা আছে। ত্যাবে একবার যেঞে দেখে এলে হত গরুগুলান্ ভিজে গেইছে নাকি !

আকালী শশব্যস্তে বলে, না, না, তুমার আখুন যেঞে কাজ নাই। আগে জোড়-জলটা থামুক, তা' পরে না হয় যেয়ো।

আকালীর ভয় দেখে হাসে কালীপদ। ফোঁকর দিয়ে জল ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারেই আকালীর মুখটা দেখতে চেষ্টা করে। ঠিক দেখা যায় না। শুধু আন্দাজ করে বুঝতে পারে অদ্ভুত মমতায় চিক্‌চিক্ করছে দুটো চোখ। ভারি ভাল লাগে কালীপদর। বলে, না রে, এই দুর্যোগে কি মানুষ ঘর থেকে বেরোয়। আমাকে কি উদোম পাগল পেইছিস্ ?

আবার চুপ করে যায় ওরা দুজনে। সারা রাত বিশ্রাম নেই ওদের। অমনি করে জল পরিষ্কার করে ঘরের মেঝে থেকে। কালীপদ মনে মনে বড্ড অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। বড্ড ভুল করে ফেলেছে ও। মাসখানেক আগে লাঙুলের গোয়ালারা খড় বিক্রী করতে এসেছিল। কুড়ি টাকা কাহন। কালীপদ অবশ্য তিন তাড়া কিনে রেখেছিল। কিন্তু আরও কিছু কিনে রাখলে ভাল করত ও। অন্ততঃ এক কাহন যদি কিনে রাখত, তাহলে অযথা এমনি নষ্টও হয়ে যেত না খরটা। আর তাঁতটাও তো কাজের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হয়। ছি, ছি, কালীপদটা নেচাতই বেয়াকুব। তখন আকালীর কথা না শুনে বেবাক্ ভুল করে ফেলেছে। শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও। হ্যাঁ অন্যায় বৈকী ! নইলে মাঘরাত্রে আকালীকে আবার এমনি করে বেগার খাটতে হয় ! না তাকেই এমনি করে খালি গায়ে শীতের জ্বালায় কাঁপতে হয় !

ততক্ষণে জলটা একেবারে থেমে গেছে। খালি এ-গাছ ও-গাছের পাতা থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছিল টুপ-টাপ। কালীপদ একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো বাইরের অবস্থাটা। আলকাতরার মত অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যায় না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারলো, এখনো গ্রাম্য পথের জল নিষ্কাশিত হয়ে যায়নি। আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ছোট ছোট গাছগুলো সর্বনাশা ঝড়ের দাপট সহ্য করতে না পেরে একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেছে। দূরে কোত্থেকে একটা শব্দ আসছিল। খুব সম্ভব ক্ষেতের জলরাশি আল-কাটা পথ দিয়ে গিয়ে বাঁধা পুকুরে পড়ছিল।

কালীপদর মনে হল, আর বেশী রাত নেই। আর একটু পরেই আলো ফুটে উঠবে। নিকষ-কালো অন্ধকারটা একটু একটু করে তরল হয়ে আসছে। আকাশের পূবদিকের খানিকটা অংশ মেঘমুক্ত হয়ে উঠেছে। দু একটা তারাও জ্বলে উঠবার জন্যে কাঁপছে অল্প অল্প। ঠাণ্ডা হাওয়ার হাড়ে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে কালীপদর। কালীপদ আকালীর দিকে তাকালো একবার। একটানা এতক্ষণ কাজ করার পর হাঁপাচ্ছে বেচারী। মাথাটা ঢুলে ঢুলে পড়ছে বুকের ওপর। আর তার নিজের শরীরটাই কি কিছু কম ক্লান্ত। গোটা শরীরটায় যেন কে আলপিন ফুটাচ্ছে অবিরাম। তারই যন্ত্রণায় গিটে গিটে নিঃসাড় হিম-শীতলতা।

নিঃসাড় হিম-শীতলতা নিয়েই রাত্রিটাও কাটলো ওদের। ভোরের পাখী দুটো একটা করে ডাকতে সুরু করলো। কালীপদ ঠায় দাঁড়িয়েছিল বাখারির জানালাটার কাছে। সেখান থেকেই শুনতে পেল ব্রহ্মদৈত্যের থানে

ডাক ছেড়ে উঠেছে। সকালবেলার আগে পুজো হবে তারপর মেলা বসবে।

আকালীর দিকে তাইলো মুখ ফিরিয়ে। ছেঁড়া কাঁথাটা মুড়ে ঐ অল্প পরিসর চৌকিটুকুর ওপর বুক হাঁটু এক করে শুয়ে পড়েছে বেচারা, সারা রাত্রি ধরে বেফালতু খাটুনির ধকলে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অল্প অল্প কাতরাচ্ছে আকালী। কালীপদ ডাকলো, অকালী!

ঘুমের ঘোরে চমকে উঠলো আকালীর মুখটা। সাড়া দিল, উঁ।

বাবার থানে যাবি না?

সাড়া পাওয়া গেল না আকালীর। কাছে সরে এসে ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে গিয়েই হঠাৎ চিক্‌চিক করে উঠলো কালীপদর চোখ দুটো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো আকালীর মুখ। একটি আশা। কেমন একটা আনন্দের শিহর ছড়িয়ে গেল কালীপদর সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য! কথাটা একেবারে ভুলে বসেছিল সে। তাহলে কি অমন সারা-রাত ধারার আকালীকে! হিঃ ভারি চুক গেছে। না থাক্, আকালীকে জাগিয়ে লাভ নেই। একটি নতুন ফুর্তি নিয়ে আকালীর অজান্তরে চলচাত করে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছে পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে, সে কথা মাত্র কদিন আগেই জেনেছে কালীপদ। ভারি ভাল লাগলো। ঠিক এই জন্যেই বুঝি অত তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে উঠেছিল আকালী। এই জন্যে এখনও ঘুমের মধ্যেও হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। ভাল করে লেপটা টেনে দিল কালীপদ আকালীর গায়ে।

তারপর বেরিয়ে এলো। আজ উপোস করবে কালীপদ। বাবা ব্রহ্মদৈত্যের থানে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়ে খাবে না। শুনতে পাচ্ছে কালীপদ, একদল লোক হৈহল্লোড় করছে বুড়ো বটতলাটার কাছে। গত রাত্রের আচমকা বৃষ্টির জন্য লোক অবশ্য কিছু কম হয়েছে। কিন্তু পুজো আটকায়নি। ভাবনা হয়েছিল কালীপদর, এই অকাল বৃষ্টির অত্যুক্তিতে বুঝি বা পুজোটাই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তা হল না দেখে মনে মনে আশ্বস্ত হল। যাহোক, ওর কাপড় ক'টা তা হলে বিক্রি করা যাবে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো একবার। মেলা বসবে সেই বিকেলের দিকে। লোকজন এখন যা এসেছে তা কেবল পুজো দেখবার জন্যে। আর যাবত শুধবার জন্যে।

গোয়াল ঘর থেকে গরুগুলো বের করে ডাঙ্গায়ে বেঁধে দিয়ে এবং ঘরের আরও কাজকর্ম শেষ করার পর মনে করে কাচা কাপড় পরে ব্রহ্মদৈত্যের থানে এসে যখন পৌঁছুলো বেলা তখন অনেকটা হয়েছে। তবে রোদের তেমন তেজ নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এখনো খানিকটা গোমড়া করে রেখেছে আকাশের মুখটাকে। পথে-ঘাটে প্যাচপ্যাচে কাদা।

ব্রহ্মদৈত্যের থানে তখন যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠেছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা জায়গাটা ছেয়ে গেছে। যেন এক-টুকরো মেঘ সব কিছুকে আড়াল করে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বড্ড বেশী। গাঁয়ের মাতব্বররা বসে বসে হুঁকো টানছে। আর গল্প করছে। ব্রহ্মদৈত্যের থানে প্রণাম করে এসে ওদের মধ্যেই বসে পড়লো কালীপদও। ওদের কথাবার্তা যে গতরাত্রের সর্বনাশা বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে তা বুঝতে কষ্ট হল না কালীপদর।

বলাই ভট্‌চাজ্ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছে, তোমাকে কি বলবো ভায়া, বৃষ্টি নয় এটা নিতান্তই পিতৃদেব ব্রহ্মদৈত্যের অভিশাপ। নইলে অত মজবুত করে ঘর তৈরী করলাম, আর এক বৃষ্টিতেই সমস্ত ঘরটা পড়ে যায় অমন করে! গরীব বামুন, চাল-কলা ছাড়া তো আর কিছু রোজগার নেই। কি করে যে ঘরটা তুলবো তার ঠিক নেই। তবু ভালো, সে ঘর চাপা পড়ে আমার ছেলে দুটো মরেনি।

নিতাই মোড়ল বলছে, আমারও সেই অবস্থা ভাই! টিনের চালাটা উড়ে গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে পুকুরের জলে! গরুগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজেছে সারা রাত। আর যে ঘরটা আধখানা তোলা হয়েছিল, সেটাও ভেঙে গেছে! কি যে করি ভেবে পাচ্ছিনা!

: তোমাদের তো ঐ গেল! আর আমার যে সর্বস্ব গেল! একটি মাত্র গাই—ওর দুধ বিক্রী করে কোনও রকমে পেটের ভাত জোগাড় করছিলাম, বিধাতা তাতেও বাদ সাধলেন! 'খ্যান' করে কালই গরুটাকে ঘরে বেঁধে রেখেছিলাম, আর কালই ঐ কাণ্ড ঘটলো—দেয়াল চাপা পড়ে মারা গেল! কচি বাচ্চা—ওটাও বাঁচবে না

আর—বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মোহন গোয়ালা। অসহায়ভাবে মাথা নাড়তে লাগলো।

ঠ্যাং-খোড়া নটু বললো, কেঁদো না ভায়া হে, কাঁদবার কিছু নেই। বাবা বক্ষদত্যির ইচ্ছে ছিল এমনি, তা আর খণ্ডাবে কে বলো! দেশে অনাচার এসেছে, নৈলে এমনি অসময়ে এমন ধারা জল নামে! তুমি দুঃখ করছো এইটুকুর জন্যে, আর ভেবে দেখ তো এই বৃষ্টিতে আরও কত লোকের কত সর্বনাশ হয়েছে! কত সংসারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! এ তো আর শুধু তোমার আমার পাপ নয়, সারা দেশের পাপ!

ওদের সবারই দিকে তাকিয়ে মুষড়ে পড়লো কালীপদর মন। সবারই মুখে ঐ মেঘের কিছু কিছু টুকরো ছড়িয়ে পড়ে ম্লান করে দিয়েছে মুখগুলোকে। অন্য বছর ব্রহ্মদৈত্যের পুজোর দিনে যে শরীরগুলো উচ্ছল উৎসাহে ব্যস্ত হয়ে উঠতো, এ বছরও সেই শরীরগুলোই এসেছে। কিন্তু সে উৎসাহ নেই। তেমন প্রাণোচ্ছলতা নেই। কেমন যেন মনমরা। নেহাৎই পুজো না করলে নয়, তাই করা। এ একরকম দায়-সারা গোছের ব্যাপার। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে ভাঙা-জীবনের আর্তনাদ। এখানে ও গাছটা পড়ে গেছে। ওখানে ঐ পুকুরের ধরল নেমেছে। এই মাঠের আল ভেঙে গেছে। ঐ মাঠটার ফসলগুলো জলে ডুবে গেছে। আর তারই সঙ্গে এতগুলো মুখও ভারী হয়ে এসেছে চিন্তায়। এত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করবার মত সংগতি এদের নেই—কালীপদ তা জানে।

আর জানে বলেই নিজের দিক থেকেও একবার হিসেব করে দেখলো কালীপদ। যাক্ এত সব ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে কালীপদ। ওর ঘরটাই কি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো যদি না সে সমস্ত রাত্রি জেগে জল বের করে দিত! ভাগ্যে তখন বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল! সকাল বেলায় উঠে ভাঙা ঘরটাও একবার দেখে এসেছে কালীপদ। বিশেষ কিছু নষ্ট হয়নি। ভাঙাটা জলের ছাঁটে একটু ভিজে গেছে। আর পা-রাখা জায়গাটাতে খানিকটা জল দাঁড়িয়ে গেছিল। ও জল কালীপদ তোবড়ানো বালতিটার করে আস্তে আস্তে বের করে ফেলে দিয়েছে বাইরে। গরুগুলোও অক্ষত শরীরেই আছে। তবু ওদের কথা শুনে মনটা দমে গেল কালীপদর। আজ বাবা ব্রহ্মদৈত্যের পুজোর দিনে এমনি একটা অমঙ্গল যেন সমস্ত আনন্দকে মুহূর্তে বিষিয়ে দিল। নিজের দিক থেকে নয়। ওদের দিক থেকে ভেবে মনে হল, বাবার পুজোটা এবার ভাল করেই করা উচিত। নইলে ঐ জাগ্রত দেবতার কোপ দৃষ্টি সমস্ত গ্রামকে ছারখার করে দেবে।

অথচ ভয়ে কিছু বলতেও পারলো না কালীপদ। ও কথা বলতে গেলেই হয়ত খিঁচিয়ে উঠবে ওরা, তুমি তো বলেই খালাস হে! তোমার যদি আমাদের মত এই হাল হত, তাহলে বুঝতে কত ধানে কত চাল হয়! আমাদের খালা ঘর-দুয়োর ভেসে গিয়ে কোথায় দাঁড়াই তার ঠিক নেই, আবার পুজোর ধুমধাম! রাখো, রাখো, ও সব ভণ্ডামি! ও সব ভণ্ডামি আমাদের দেখা আছে বহুত। শালার দুনিয়ায় আগে নিজের প্রাণ, তারপর অন্য কিছু।

আস্তে আস্তে মেঘের থমথমে ভাবটা কেটে গেল কিছুক্ষণ পর। চড়া রোদ উঠলো আকাশ ভাতিয়ে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। গত রাত্রের রাক্ষুসে বৃষ্টির দাপটে এলো-মেলো হয়ে যাওয়া ঘরদোর সামলে নিয়ে গাঁয়ের ঝি-বহুড়িরা এসে জুটেছে। কালীপদ হুঁকোয় টান দিয়ে মোড়লদের সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করতে করতে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এতক্ষণ পর যেন পুজো-পুজো মনে হচ্ছে। জমে উঠেছে জায়গাটা বেশ।

কেষ্ট মোড়ল বললো, বুঝলি কেলে, বাবা বক্ষদত্যির এমনি মহিমে যে আপনা আপনি লোক ছুটে আসে—

আরও গোটা দুই টান দিয়ে হুঁকোটা মোড়লের দিকে এগিয়ে দিল কালীপদ। মোক্ষ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, হুঁ—তা তো ব্যাটেই।

জায়গাটা যখন হট্টগোলে গমগম করছে, ঠিক তখনি হঠাৎ ওদিক থেকে হেঁকে উঠলো বেরেজো অর্থাৎ ব্রজঠাকুর —এই যে পেসাদ লাও—এদিকে এসো—এদিকে এসো সবাই—

পেসাদ!—উঠে দাঁড়ালো কালীপদ। বাবা ব্রহ্ম-দৈত্যের প্রসাদ খেলে সব পাপ কেটে যায়। ঐ এক

কণা প্রসাদ পাবার জন্যে বসে আছে কালীপদ সেই সকাল থেকে। ঐ এক কণা প্রসাদ মুখে দেবে! তার পর জলগ্রহণ করবে। তাছাড়া মনে মনে দেবতার কাছে একটা মানতও করে রেখেছে কালীপদ। একটি টিল নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে ব্রহ্মদৈত্য তলার বুড়ো নাযান-নামা বটগাছটার কোটরে তুলে রেখেছে। হেই বাবা! আকালী আমার বড়া দুখ্যা! একটো ছেলের জন্যে মাথামোড় খুঁড়ছে! উকে একটো ছেলে দাও বাবা! ঘি পেরানীটো উর প্যাটে জন্ম লিইছে, উ যেন বেঁচে থাকে বাবা!

অন্যান্য বছর কালীপদ আকালীকে সঙ্গে নিয়েই পুজো দেখতে আসতো। এ বছর তা পারেনি। কাল সারা রাত ধরে অবিরাম খাটনির পর আর 'উরো'র 'দেচি'টোর সাড় নেই। একেবারে 'লতার পারা' নেতিয়ে প'ড়েছে। চোখের কোলগুলো তলিয়ে গেছে। মুখ চোখেও নিঃসীম কাতরতা। বটতলার ওপাশে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে গেল কালীপদ। হাত পেতে প্রসাদ নিল। তারপর আবার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো। মনে মনে আবার প্রণাম করলো কালীপদ। প্রসাদটুকু মাথায় ঠেকালো।

পথে যেতে যেতে অনেক কথা মনে হল কালীপদর। কবে কোন্‌কালের এক ব্রহ্মচারীর স্মৃতি নিয়ে বসে আসছে এই মেলা। বড় জাগ্রত এই ব্রহ্মচারীর অদৃশ্য আত্মা। সমস্ত গ্রামটাকে বিপদে রক্ষা করেছে। দুর্ভিক্ষ মহা-মারীর হাত থেকে রক্ষে করে আসছে। এ গাঁয়ে কেউ কোনওদিন ডাকাত কি চোর আসতে দেখেনি! কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে কেউ এই গ্রামে আসতে গেছে, সে ঐ ব্রহ্মদৈত্যের বটগাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতের অস্ত্র খসে গেছে। ভয়ানক আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। অথচ সংশয় এই যে, গত কাল এমন বৃষ্টি নামলো যেন এতগুলো লোকের জীবনের ভিতটাকে একেবারে কেঁপিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কেন এমন হল? মনে মনে প্রশ্ন করলো কালীপদ নিজেকেই। এমন তো কোনও বার হয় না! তবে গতবার পুজোর ঘট উল্টে গেছিল। ঠিক তারই প্রতিফল কি এ বৎসর পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে! মোড়লদের আড্ডায় বসে বসে অনেক ক্ষতির খবর শুনতে পেল কালীপদ। নিজের মনে ব্যথাও পেল কম না। সব থেকে ব্যথা পেল—নোটন বুড়ীর মৃত্যুর খবর পেয়ে। বয়েস অবশ্য নোটন বুড়ীর কম হয়নি। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তবু গত বৎসর পর্যন্তও এই পুজোয় এসেছে। মোড়লদের সঙ্গে ঠাকুমার মত রসিকতা করেছে। সত্যিই বুড়ীটা ভালবাসতো সবাইকে খুবই। নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। সেই মাতৃত্বের সবটুকু তাই ঢেলে দিতে পেরেছিল গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাইকে। আর কালীপদকেই কি কম ভালবাসতো বুড়ী! গতবার ব্রহ্মদৈত্যের মেলায় এক ঠোঙা বাতাসা নিয়ে পুজো দিয়ে সেই 'পেসাদ' নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছিল আকালীকে। বলেছিল, এই প্রেসাদটো মুখে দে তো! দেখবি ঠিক তুর বেটা হবে একটো।—ঠিক হবে! সেই নোটন বুড়ী গত সন্ধ্যে পর্যন্ত মরণ করেছে পাড়া মাতিয়ে। মাঝ রাতে জল নামলো। আর সেই জলে গোটা গুটি ঘরটাই ওর ওপর ধ্বসে পড়লো।

কালীপদর মনে হল, এ সব গাঁয়ের লোকদের অবিশ্বাসের ফল। বিশেষ করে চাংড়া ক'টা ছোঁড়া জুটেছে। দূরের সহর গাঁয়ে কলেজে না কোথা পড়ে! ওরাই সব দুটো 'ইজিরি' শিখে একবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ওরা নাকি বিশ্বাস করে না ঠাকুর-দেবতার কথা। আরে বাবা, তোরা তো কালকের ছেলে। তোরা ও সবের কি জানবি। এইবারে দেখলি তো অবিশ্বাসের ফল। হাতে নাতে প্রমাণ পেয়ে গেলি! নইলে সেবার এত বড় একটা বানে গোটা দেশটা ভেসে গেল, তাতেও এই গাঁয়ের কোনও ক্ষতি হল না, আর কালকের এক বৃষ্টিতেই এত বিপর্যয়! তবু ভালো, কালীপদর এখনো বিশ্বাস যায়নি। ও জানে, ওকে রক্ষে করেছে ঐ দেবতাই। ঐ ব্রহ্মদৈত্যকে সে জলের মধ্যেও সারা রাত ডেকেছে। তাই না ওর কোনও ক্ষতি হয়নি। এত লোকের এত ক্ষতি হল, অথচ ওর কোনও ক্ষতিই হয়নি। এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা? আর এ সৌভাগ্য তার কিছুতেই হত না—যদি না তার বাবা ব্রহ্মদৈত্যের ওপর অটল বিশ্বাস থাকতো! মনে মনে আবার প্রণাম করলো কালীপদ।

ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কালীপদ। সমস্ত পাড়াটা নির্জন বলে মনে হচ্ছে। পাড়ার সবাই বাবার থানে পূজো দেখতে গেছে—ঘরে ঘরে দরজায় শিকল তোলা।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলো কালীপদ, আকালী—আকালী—

কোনও সাড়া পেল না কালীপদ। আচ্ছা থাকোক্ ঘুমোতে পারে আকালীটা। এতখানি বেলা হল এখনো বিছানার শুয়ে থাকতে ভালও লাগে! আবার হাঁকলো কালীপদ—আকালী—আকালী রইছিস্ ঘরে?

তবু কোনও সাড়া মিললো না। বিরক্ত হয়ে উঠলো কালীপদ। চীৎকার করে ডেকে উঠলো, বলি কানের মাথা কি খেইছিস্ নাকি হারামজাদি! এত্ত করে ডাকছি, সা দিছিস্ না ক্যানে?

এর পরেও যখন কোনও উত্তর এলো না, তখন বিস্মিত হয়ে গেল কালীপদ। তবে কি আকালী অসুখ শরীরেই পূজো দেখতে চলে গেছে পাড়ার বৌগুলোর সঙ্গে? আচ্ছা মেয়ে তো! পোয়াতি শরীর নিয়ে ভিড়ে কোথায় ঠেলা লেগে পড়ে যাবে, সে আক্কেলটুকুও জন্মেনি নাকি এই বয়েসেও? ক্রোধে বিরক্তিতে ভরে উঠলো কালীপদর মন। আবার ওকে যেতে হবে বাবার থানে। আকালীকে নিয়ে আসতে হবে। এত ঝামেলা লাগিয়ে দিতে পারে বউটা!

হাতের প্রসাদটুকুর দিকে তাকালো কালীপদ। এগুলো কি খেয়ে ফেলবে নাকি? নাঃ থাক্। বলা যায় না ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে হাত থেকে প্রসাদ নেবার মত সুযোগ নাও আসতে পারে আকালীর! হাজার হলেও মেয়ে মানুষ তো! তাতে আবার গাঁয়ের বৌ! তার থেকে বরং প্রসাদগুলো ঘরের ভেতরে লক্ষীর কাঁপিতে তুলে রেখে দেওয়া যাক আপাততঃ। আকালী ফিরে এলে আকালী আর ও এক সঙ্গে খাবে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই হঠাৎ চমকে গেল কালীপদ।

চমকে দু পা পিছিয়ে গেল। ওকি! ঘরের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে আকালী। নিরাবরণ দেহ। সারা মেঝেটা চাপ চাপ থকথকে রক্তে ভেসে গেছে!

মুহূর্তে আঁৎকে উঠলো কালীপদ। চেতনার বুকে অজস্র সাপের ছোবলে ছটফট করে উঠলো। নিঃসাড় বেদনায় চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো কালীপদর আকালীর দিকে চেয়ে। অচেতন আকালীর পায়ের দিক ঘেঁষে একটা আকারহীন রক্তের ডেলা একটা বীভৎস আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে যেন সমস্ত জায়গাটায়!

কেঁপে উঠলো কালীপদ। প্রসাদগুলো হাত থেকে খসে পড়লো। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠলো আর একবার। আর একবার বৃষ্টি নামবে। মেঘ জমছে আকাশের ঈশান কোণে।

পাখী

রত্নেশ্বর হাজরা

উদার আকাশ ছেড়ে কুটিল মাটির কাছাকাছি
ভালো আছি।
ভালো থাকি—
এখানের ডাকাডাকি
হাজার প্রাণের কানে যায়,
আকাশ উদার শুধু ফাঁকা-ফাঁকা একা নির্জন
গম্ভীর বিস্ময়!
এখানে সকাল হয় বুঝি:
মাঠে আর ঘাসে ঘাসে পুঁজি
ফড়িঙের নীল ডানা, প্রজাপতি, দানা-ভরা ধান,
সেখানে আছার নেই নীল প্রান্তর
পাখার ঝাপট-লাগা শব্দহীন ইথারে তুফান।

এ-মাটির অভিশাপ ভালো
আকাশের আশিসের চেয়ে
পৃথিবীর ঘাসদেরা ভালো
লাখো লাখো দেবতার চেয়ে।
এ-মাটির বুকে ভরা হৃদয়ের অজস্র সঞ্চয়।

শক্তিসাধন-বিজ্ঞান

শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষীয় পঞ্চ-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তি, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রধান। ইহাদের উপাসনাপদ্ধতি তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত। সাধনার অঙ্গগুলি যথা—অন্তর্পূজা, বহির্পূজা, প্রতিষ্ঠা, প্রতীক, শাল-গ্রামশিলা, নিজ ইষ্টাদির পূজা, উপচারমণ্ডল, যন্ত্র, মন্ত্র, জপ, ধ্যান, ভূতশুদ্ধি, মুদ্রা, ন্যাস, ধ্যান প্রভৃতিও সাধারণতঃ একই প্রকারের। উপাসনার মূল-নীতি এক হইলেও উপাস্য দেবতা এবং বাহ্য উপাসনা প্রণালীর মধ্যে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত মতভেদে কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পঞ্চরাত্র আগমে বৈষ্ণবগণের মূল, শিবশক্তি আগমে তাহাই উক্তাকার।

আত্মাশক্তি এবং শক্তির বিভিন্ন রূপই শক্তি-সাধকের ইষ্টদেবতা। আত্মাশক্তি—একাত্মক চিদাকৃতিঃ, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপা। শক্তি-সাধনা অদ্বৈতেরই সাধনা। তন্ত্রশাস্ত্রও অদ্বৈতেরই সাধন-শাস্ত্র। কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তি লাভের প্রথম ধাপ। বিজ্ঞানভৈরব—শক্তি-জ্ঞানং বিনা যেবি নির্বাণং নৈব জায়তে—অর্থাৎ শক্তিজ্ঞান বিনা নির্বাণ মুক্তি লাভ হয় না।

কালিকাই আদি মহাবিদ্যা এবং ইঁহার উপাসক অগ্রণী বলিয়া কথিত। অন্য সব মূর্ত্তি ব্রহ্মরূপিণী কালিকা দেবীর মূর্ত্তিভেদ। অসুর গুম্ভকে দেবী বলিয়াছিলেন—তুমতে এক আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে আছে। যে দুষ্ট অষ্টমাতৃকা আমারই অভিন্না বিভূতি, আমারই শরীরে বিলীন হইতেছে। চামর তন্ত্রে বলা হয়—

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী নারসিংহ্যৈন্দ্রি চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, ও চামুণ্ডা—ইঁহারাই অষ্ট-মাতৃকা।

দিব্য এবং বীর ভাবের জ্ঞানী সাধক কালীকুলের এবং কর্মী-সাধক শ্রীকুলের অনুগামী। কালী, তারা, রক্তকালী, ভুবনী, মেদিনী, ত্রিপুটা, বগিতা, একজটা বা বিদ্যা ও দুর্গা—কালীকুলের অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরী, ত্রৈপুরী, ছিন্না, বগলা, কমলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, সম্প্রদায়-বিদ্যা, মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলের অন্তর্ভুক্ত। আদ্যামূর্ত্তি কালিকা শুদ্ধসত্ত্বরূপা প্রধানা, নির্বিকারা—নির্গুণ-ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রকাশিকা এবং সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী। তারা সত্ত্বগুণাত্মিকা, তত্ত্ববিদ্যাপ্রদায়িনী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা—রজোগুণপ্রধানা সত্ত্বগুণাত্মিকা—স্বর্গ এবং গৌণ মুক্তি প্রদান করেন। ধূমাবতী, কমলা, বগলা ও মাতঙ্গী—তমঃপ্রধানা—ষট্কর্ম সাধনের জন্য ইঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। শারদা-তিলক গ্রন্থে ষট্কর্মের লক্ষণ—

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি সংসক্তি ষট্কর্মাণি মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ শান্তিকরণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ—এইগুলি পণ্ডিতগণ ষট্কর্ম নামে অভিহিত করেন। যে কর্ম দ্বারা রোগ, গ্রহকৃতি দারুণাদি কার্য ও গ্রহাদি দোষ নিবারিত হয় তাহা শান্তিকর্ম। দশজন লোককে বশীভূত করার নাম বশীকরণ। যে কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তি দোষ বা কার্য-কারিকা শক্তি নষ্ট করা যায় তাহার নাম স্তম্ভন। স্নেহসূত্রে আবদ্ধ প্রণয়ীগণের স্নেহবিচ্ছেদ ঘটান রূপ কর্মের নাম বিদ্বেষণ। যে কার্যের দ্বারা স্বদেশ হইতে লোককে বিতাড়িত করা হয় তাহার নাম উচ্চাটন এবং যে কার্য দ্বারা প্রাণীগণের প্রাণ-হরণ করা হয় তাহার নাম মারণ।

শক্তিধর্ম অর্থে যে বৈষয়িক অদ্বৈতবাদই বুঝায় তাহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গন্ধর্ব তন্ত্রের উক্তি—

গুরুম্ বন্দ্যা বিধানেন সোঽহম্ ইতি পুরোদয়ঃ।
ঐক্যং সম্ভাবয়েৎ ধীমান জীবস্য ব্রহ্মণোঽপি চ॥

অর্থাৎ যথাবিধি গুরুপ্রণাম ও সোঽহম্ চিন্তা করণান্তর ধীমান সাধক জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ধ্যান করিবেন। আত্মার সহিত দেবতার ঐক্য ভাবনার নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে সর্বত্রই দেখা যায়। দেহ দেবালয় এবং জীব সদাশিব। অজ্ঞানরূপ নির্মাল্য ত্যাগ করিয়া সাধক সোঽহম্ ভাবনায় পূজা করিবেন।

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদ্ অজ্ঞান নির্মাল্যং সোঽহম্ ভাবেন পূজয়েৎ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ড শক্তি-উপাসনায় মিশ্রিত। কর্ম বা ধর্মানুষ্ঠান রীতিই জ্ঞানকাণ্ডের প্রকাশ, ইহার পরিসমাপ্তিও জ্ঞানে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নহে। এইরূপ ধর্মানুষ্ঠান রীতি পশুভাবের মধ্যেও জ্ঞান সঞ্চার করে, সেজন্য কুলজ্ঞানী চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সামাজিক জীবন বা সংস্কারের সহিত তান্ত্রিক সাধকের সম্বন্ধ নাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জাতি বিভাগ স্বীকৃত, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক গুণেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সিদ্ধির উপায়ের নাম সাধনা, যাহার ধাতুগত অর্থ চেষ্টা। কিন্তু কিসের জন্য সাধনা তাহা নির্ভর করে সাধ্য বিষয়ের উপর। সাধনা কেবলমাত্র উপাসনা বা ধর্মানুষ্ঠান নহে। ইষ্টদেবতা দ্বারা ও সামর্থ্য লাভের জন্য সাধনা করেন। বশীকরণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন প্রভৃতি শক্তি-লাভের জন্য কেহ কেহ সাধনা করেন। কেহ বা অতিমর্ত্য হইবার

অন্ত সাধনা করেন। যেকোন অভি-সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহার নাম সিদ্ধি। কিন্তু সাধনা অর্থে প্রধানতঃ মুক্তার উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান, তদ্বারা স্বর্গ, সৌধ-মুক্তি বা নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। নির্বাণ-মুক্তি সাধনার চরম লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, প্রার্থনা, সংস্কার, তপঃ,স্বাধ্যায়, যাগ প্রভৃতি এইরূপ সাধনার অন্তর্গত। সাধারণতঃ সিদ্ধিলাভের জন্য যোগাভ্যাস ও সাধনার অঙ্গ। সাধারণতঃ উপাস্য-উপাসক জ্ঞানে যে উপাসনা করা হয় তাহাই সাধনা। ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও ভাব-শুদ্ধি হয় এবং সাধক জ্ঞানযোগ বা লয়যোগ বা পরাভক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

নির্বাণমুক্তি বা মোক্ষই মুক্ত আত্মার স্বরূপ—পরমাত্মা। সাধক অবিদ্যাসংযুক্ত জীবাত্মা। আত্মার সূক্ষ্ম এবং স্থূল বাহন রূপে অবিদ্যার প্রকাশ হয়। মানুষ বলিলে বুঝায়—মন ও দেহ বা অন্তঃকরণ ও স্থূল শরীরসংযুক্ত আত্মা। আত্মা, বুদ্ধি ও মনস্—এই ত্রিরূপে আত্মা মানুষের শাশ্বত অধিনায়ক রূপ এবং কাম-মনস্, কামদেহ, পিণ্ডদেহ ও অণ্ডদেহ—এ চারিটী মানুষের নশ্বর ভোগায়তন রূপ। কাম-মনস্ সহ তিনটী দেহ চিৎ-শক্তির মায়াকল্পী প্রকাশ বা উপহিত অংশ। চিৎ-শক্তির প্রকাশ বা চৈতন্যের প্রভায় প্রকৃতপক্ষে জড়-শক্তির মাতৃ, মান ও মেয় রূপ সঙ্কোচ। চৈতন্য এইরূপে সঙ্কুচিত হইয়া নশ্বর আত্মা রূপে নিজেকে অন্য নশ্বর আত্মা হইতে পৃথক জ্ঞান করে। বিশুদ্ধ চৈতন্যের বহুরূপে আত্ম-প্রকাশের নামই মায়া। জগতের প্রত্যেক পদার্থই চিৎ-শক্তি বা মহামায়ার অঙ্কে অবস্থিত। জগৎ বলিলে বুঝায় শক্তিযুক্ত সত্তা। 'জগৎ আছে'—এরূপ প্রতীতে অথবা জগৎবিশিষ্ট সত্তাজ্ঞান হইতে জগৎরূপ বিশেষণ দূর করিলে থাকে মাত্র সত্তা, যাহার প্রতীতি হয় না। আমার জগৎ-সত্তার প্রতীতি না হইলে আত্ম-সত্তা বা 'আমি আছি' এরূপ জ্ঞানও থাকে না। সত্তা সর্বদাই শক্তির-অঙ্কে অবস্থিত। শক্তি অংশটী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহার সাধারণ সংজ্ঞা—নাম ও রূপ। শ্রুতি বলেন—

অস্তিভাতি প্রিয়ম্ রূপম্ নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ম ব্রহ্মরূপম্ জগৎ রূপা তথেতরে দ্বয়ম্।

অর্থাৎ অস্তিভাতি প্রিয়ম্ বা সচ্চিদানন্দ রূপই ব্রহ্মরূপ এবং নাম ও রূপই ইহার জগৎ-রূপ। প্রথম তিনটী সত্তা, অপর দুইটী সংজ্ঞা। সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অপ্রত্যক্ষ বলা যায় না।

শক্তি ও সত্তা অভিন্ন। শক্তিও শক্তিমান অভেদ। কিন্তু এই শক্তিটী জড় নহে—ইনি চিন্ময়ী-মহামায়া, যাঁহার অন্তর্হিত সত্তায় জীব ও জগৎ। এই শক্তি বা মায়া মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে। ইহা সত্য। ব্রহ্মের আবরক নহে, প্রকাশক। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশই শক্তি বা মায়া। মহামায়া যা যখন ব্রহ্মের স্পন্দন উপলব্ধি করিয়া স্থির হন তখন তিনি নিষ্কল, নির্গুণ, নির্বিকল্প ব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হন, কিন্তু তখন তিনি বাক্য-মনের অতীত। মহামায়ার স্পন্দাত্মক নিত্য চৈতন্যই জীব। মহামায়াই জীব-জগৎ রূপে নিত্য প্রকাশিত।

সাধনা অর্থে মুখ্যার শক্তিপতি অর্থাৎ দেবীর কৃপালাভ। দেবীর কৃপালাভ হইলে সাধক স্বার্থবোধ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জনে কৃতসঙ্কল্প হয়। এইরূপ পরিবর্তনই সাধনার লক্ষ্য। তত্ত্বী-তত্ত্বে শক্তিপাত অর্থে মুখ্যার মহামায়ার অনুভাব। মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছা বা কৃপা উপলব্ধি হইলে জীব মধুমতীর অধিপতি লাভ করিতে পারে। রবিতনয় মহাতপা সাবর্ণি মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছায় মধুমতীর অধিপতি হইয়াছিলেন। অনুভাব অর্থে পশ্চাৎ তত্ত্বচৈতি—যাহা পরে আবাকারে ফুটিয়া উঠে। চৈতন্যরূপিণী শক্তিস্বরূপা মহামায়া দুর্বিজ্ঞেয়। কিন্তু তিনি আবাকারে প্রতিনিয়ত প্রকটিতা। অন্তরে প্রতিক্ষণে যে ভাবরাজি উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, উহা মহামায়ার অনুভাব। তাঁহার অঙ্কেই সঞ্চার এবং তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। অব্যক্তাবস্থা হইতে যখন বাক্যাবস্থায় আবির্ভূতা হন তখন ভাবাকারে প্রকটিতা হইয়া থাকেন। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থূল। ভাবমাত্রই গ্রাহ্য, ঘন হইলে তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অনুভাবরূপিণী মহামায়া প্রতি জীবে ভাবরূপে নিত্য বিরাজিতা হইলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারিনা। ইহা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি তাঁহার অনুকূল ইচ্ছা বা কৃপাও উপলব্ধি করিয়াছেন। যাহা ভাব বা কল্পনা বলিয়া আমরা সাধারণতঃ উপেক্ষা করি তাহা যে মহামায়ার অনুভাব, শক্তির বাক্যাবস্থা—তাহা বুঝিতে পারিলে সাধনার পথ সুগম হয়।

কামক্রোধাদি বৃত্তি, রূপরসাদি বিষয়, ঘটপটাদিপ্রাণি রূপ—এ সবই মহামায়ার অনুভব। যে সব ইন্দ্রিয়বৃত্তি একত্বের অভিমুখী সেগুলি দেবতা এবং যেগুলি বিষয়ে আসক্ত করিয়া ভেদ সৃষ্টি করে সেগুলি অসুর বলা হয়। গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দৈবাসুরসম্পদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়, দেবাসুর সংগ্রাম জীবমাত্রেরই দেহে চিরকাল চলিতেছে। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিষয় অপহরণে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। এই ভেদ-দ্বেষক ভাব সর্বজনবিদিত। পুরাণে পাওয়া যায় যখন মহিষ নামক অসুর, অসুরগণের রাজা এবং পুরন্দর দেবরাজগণের রাজা ছিলেন তখন দেবাসুর সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। রজোগুণের প্রতীক মহিষাসুর। কাম এবং ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত দেহস্থ বলা হয়— ক্রোধক মহিষং মত্বা অর্থাৎ ক্রোধকে মহিষরূপে কল্পনা করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান দিবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যানে যে তিনটী চরিত্রের কথা পাওয়া যায় তাহা এই ত্রিগুণেরই বিশ্লেষণ। প্রথম চরিত্রে মধু ও কৈটভ দুইটী অসুর—মধু অর্থে আসব ও কৈটভ অর্থে বসার অর্থাৎ বসার আসবরূপ অসুর-দ্বয় সত্ত্বগুণের বহির্বিকাশরূপী সংস্কারদ্বয়। দ্বিতীয়চরিত্রে মহিষাসুর। বল, বীর্য, অভিমান, কামনা প্রভৃতি আসুরিক সম্পদের অধিপতি মহিষ রজোগুণের বহির্বিকাশরূপী সংস্কার। তৃতীয় চরিত্রে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুর। ইহারাই তমোগুণের বহির্বিকাশরূপী আধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপ সংস্কারদ্বয়। রজোগুণের অন্তর্মুখী বিকাশসমূহের অধিপতি পুরুষদ্বয়।

ইনি দেহরূপ পুরকে বিদারণ করিয়া দেহাত্মবোধের বিনাশ সাধন করিয়া, পরমাত্ম সত্তার স্থিতিই করিবার জন্য সর্বদা প্রয়াস করেন। অতএব, সত্ত্বগুণ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দৈবসম্পদের অধিপতিই পুরন্দর।

সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল, রজোগুণ ক্রিয়াশীল এবং তমোগুণ স্থিতিশীল। ইহাকে বলা হয়—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ। আমি আমাকে জানি না, কিন্তু জানিবার জন্য যে চেষ্টা তাহাই প্রবৃত্তি, চেষ্টার ফলে একটু একটু আমাকে জানা তাহাই প্রকাশ এবং আমি বলিয়া ঐ ক্ষুদ্র জানাটিকে ধরিয়া রাখার নামই মোহ। গুণত্রয় নিয়ত পরিবর্তনশীল ও পরিণামী। ব্রহ্ম হইতে শুরু পরন্তু সমস্তই এই ত্রিগুণের সংযোগ, বিয়োগ ও মিশ্রণ ব্যতীত আর কিছু নহে।

গুণত্রয়ের দুইটী দিক আছে। একদিকে সৃষ্টি স্থিতি লয়, জীব জগৎ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিবে, অপরদিকে অখণ্ড প্রকাশ, বৈরাগ্য ও নিরোধ যে অপবর্গ—মুক্তি।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

অর্থাৎ তুমি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিস্বরূপিণী। সনাতনী ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপা ও গুণময়ী। তুমি নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার। শক্তি যে তোমার স্বরূপ তাহা এই জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতিক্ষণে তোমার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই ত্রিশক্তি একই শক্তির ত্রিবিধ লক্ষণ মাত্র। শক্তির স্বরূপটী অব্যক্ত হইলেও এই ত্রিবিধ লক্ষণ দ্বারা তাঁহার সত্তা উপলব্ধিযোগ্য হয়। অব্যক্ত শক্তি যেরূপে ব্যক্তভাবাপন্ন হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া দেবতাগণ স্তুতি বাক্যে বলিলেন—তুমি গুণাশ্রয়া আবার গুণময়ী। গুণত্রয় যখন তোমার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় তখন তুমিই গুণময়ী হইয়া নারায়ণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও।

জীবন গতিশক্তি বিশিষ্ট, ইহার লক্ষ্য অগ্রসর হওয়া। দেবাসুর-সংগ্রাম নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া অসুরবিনাশকারিণী মহামায়া মাকে দর্শন করা ও তাঁহার পূজা করাই উদ্দেশ্য।

তাঁহার ভগবান বলিলেন—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। ফল জল পুষ্প ধূপাদির দ্বারা ভক্তি সহকারে আরাধনা করাই পূজার অঙ্গ। কিন্তু কেহ কেহ বাহ্যপূজাবর্জ্জিতা—এই উক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মকাণ্ড একেবারে ত্যাগ করিয়া মাত্র ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎকার করিতে চেষ্টা করেন। দেহাত্মবোধ, আহার নিদ্রা প্রভৃতি যতদিন থাকবে, বাহ্য পূজাও থাকবেই। বাহ্য উপকরণ পুষ্প ধূপাদি ত্যাগ করিলেই বাহ্য পূজা ত্যাগ হয় না। শ্রুতি বলেন—উপাস্য একজন আর উপাসক একজন—এইরূপ ভেদজ্ঞানে যাঁহারা পূজা করেন তাঁহারা দেবতাদের নিকট পশু। ভেদজ্ঞানের সহিত যে পূজা তাহাই বাহ্যপূজা। বাহ্য বলিয়া কিছু নাই, সবই অন্তর—এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর বাহ্য পূজা থাকে না। অন্তর বাহির রূপ ভেদজ্ঞান দূর করার জন্যই সাধনা। যতদিন এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হয় ততদিন দেবতার সহিত পরিচয় হয় না—সুতরাং পূজা কাহার হইবে—দেবে পরিচয়ো নাস্তি যদ পূজা কথং ভবেৎ। আমার দেবতার সহিত পরিচয় হইলে তখন পূজার আকাঙ্ক্ষা থাকে না—জ্ঞাতে পরিচয়ে দেবে পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি। পূজাপূজক ভেদজ্ঞানে যে পূজা হয় তাহা অজ্ঞানের অন্ধ পূজা। কিন্তু আমার হৃদয়ে যিনি প্রাণ, যিনি আমি তাঁহাকে পূজা করিতেছি—এইরূপ বোধে যে পূজা করা হয় তাহা কখন ব্যর্থ হয় না। অন্তরে ভেদজ্ঞান লইয়া পূজা আরম্ভ করিলে ভেদজ্ঞান ক্রমশঃ বিলীন হয়। গীতায় উক্ত হয়—

যেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।

যতদিন মূর্ত্তি আত্মভাবস্থ না হয় অর্থাৎ যা অনুকম্পাপূর্বক সাধকের আত্মারূপে প্রকাশিত না হন, ততদিন অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। সকল মূর্ত্তিতেই, প্রতিমা এবং প্রতীকে, আত্মভাবস্থ করিয়া দর্শন করিতে হয়। ইষ্ট মূর্ত্তিতে আত্মভাবস্থ হইলে অন্য মূর্ত্তিতে ইহা সহজে সাধ্য হয়। মূর্ত্তি বা প্রতীক সৃষ্টি স্থিতি ও লয় শক্তির ঘনীভূত বিকাশ ও চৈতন্য সত্তার কেন্দ্র এবং আত্মপ্রতিবিম্ব স্বরূপ—এইরূপ কল্পনা করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কল্পনা সত্য এবং প্রাণময় হইলে পূজা সিদ্ধ এবং অভিষ্ট ফলপ্রদ হয় না।

রাজা সুরথ রাজ্যাপহরণ জন্য এবং সমাধি বৈশ্য বিষয়াসক্তিবশতঃ অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে জগদ্ধাত্রীর মৃন্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আরাধনা করেন। এইরূপে তিন বৎসর জগদ্ধাত্রীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন ও বরলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীশ্রীচণ্ডীর তৃতীয় মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

সমর্পণার্থমাত্মনঃ নদীপুলিনমাস্থিতঃ।
ন চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাকল্পতন্ত্রাভ্যাং পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।
এবং সমারাধয়তো স্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।

জগদ্ধাত্রীর দর্শন লাভের জন্য রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি উভয়েই লোকালয় ত্যাগ করিয়া নদীপুলিনে অবস্থানপূর্বক নিয়মিতভাবে দেবীসূক্ত জপ, মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠনপূর্বক পুষ্পধূপাদির দ্বারা পূজা, হোম, অনাহারে কিম্বা সংযতাহারে সমাহিতভাবে অবস্থান এবং তৎপরিবর্ত্তে নিজ উপহার প্রদান ইত্যাদি নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়া তিন বৎসরকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। স্বয়ম্ভুবমনুর শাসন আধ্যাত্মিক অর্থ প্রাণ। উপনিষদে প্রাণকে আত্মিরস বা অন্নের রস বলা

হয়। বলবিক্রমের দ্বারা সঞ্চারিত না হইলে কোন উপহারই আত্মচরণে অর্পিত হয় না। পূজার পদ্ধতি সম্বন্ধে এই চারিটী শ্লোকে যাহা বলা হইল তাহা পূজানুষ্ঠানকালে সর্বদা স্মরণ রাখা প্রত্যেক ভক্ত এবং পূজকেরই কর্তব্য।

ভারতবর্ষে বহুস্থানে এবং বাংলাদেশে বিশেষভাবে শরৎকালে জগন্মাতার পূজা বহু আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বামন অবতারে ভগবতী-বাক্যে তাহার ফলশ্রুতি এইরূপ—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ।
সর্ববাধা বিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

শরৎকালে আমার যে বার্ষিকী মহাপূজার অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতে ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করিয়া, মনুষ্য আমার প্রসাদে সকল বাধা হইতে মুক্ত এবং ধনধান্যসুতান্বিত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কিন্তু উক্ত বরলব্ধিত ফললাভ ক্বচিৎ কখন দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ ভক্তির সহিত যথাযথভাবে পূজার অনুষ্ঠান হয়না এবং দেবীবাক্যে সংশয় থাকে। সংশয় এবং অবিশ্বাস থাকিলে কোন পূজাই আশানুরূপ ফলপ্রদায়ক হয় না।

ত্রিপদী

বেতাল ভট্ট

(১)

দশ-চক্রে ভগবান ভূত হয়, প্রবাদই প্রমাণ,
দশ-চক্র মাঝে পড়ি হয়ে উঠে ভূতও ভগবান।

(২)

বংশীধরের সন্তানেরা কেবল ধনের অংশহর,
গানগুলি তার যেমো আসল বংশধর।

(৩)

রমণীর 'বাহুপাশে' বন্দী হওয়া আনন্দময় বটে
'হাতে' তার বন্দী হলে বিড়ম্বনা ঘটে।

(৪)

ধমকাতে বা গালি দিতে যে ভাষাটি মুখে যোগায়,
সেই ভাষারই রাষ্ট্রভাষা হওয়াই উচিত—
দ্বিধা কি তায়?

(৫)

এ যুগের বহু পিতা সন্তান না চায়,
ইলিশের ডিম হ'লে স্বাদ কমে যায়।

(৬)

দিদিমা খোকারে কোলে আদরে নাচায়
মা তারে না চায় না চায়, ধোয়া
শাড়ীটা বাঁচায়।

(৭)

ধনঞ্জয় হয় বটে কোন কোন বই,
তাই ব'লে মৃত্যুঞ্জয় হয় তারা কই?

(৮)

দুঃখ নাই অগ্নিদাহে, লৌহের পীড়নে
তোলন কুচের সঙ্গে সহিব কেমনে? (অনুবাদ)
(স্বর্ণের আক্ষেপ)

(৯)

টেবিলের খানা আর হেঁসেলে পায়স,
দুই-ই লুটিতেছে নয়া শিক্ষিত বায়স।

(১০)

গোষ্ঠী ক্রমে যাচ্ছে বেড়ে কোষ্ঠীতে নেই অন্ন।
লক্ষ্মী মায়ের মাঠ হল বন, ষষ্ঠী মায়ের জন্য।

(১১)

উচ্চৈঃশ্রবা পৃষ্ঠে হেরি বনের বানরে,
পায় না বানর ছাড়া বাপা কে অন্তরে?

(১২)

নাথপতি হয় যদি, যে মাগিত ভিখ,
কেমনে সে রাখে বল মাথা তার ঠিক।

(১৩)

ভেবেছিনু বুঝি তুমি মধুকর, তা নয় দেখি যে ভীমরুল
বল ছুটাতেই পার ফুলে ফুলে, ফুটাতেও নারো শিল-ফুল।

(১৪)

বুড়োরা তল্পী তোল,
তরুণ তখতাসনে তোদের ঠাঁই যে পিঁজরা-পোল।

(১৫)

আগে বেঁধে পোষো, নহিলে করিতে হইবেই অনুতাপ,
ওরা ভাণ্ডারে ইঁদুর আসিবে, ইঁদুর ধরিতে সাপ।

(১৬)

পান্তা ভাতে পেয়াজই চাই কি হবে ছাই ঘৃতে,
পেন্তা বাঁটা চলবে নাক সস্তা ঝুলুরিতে।

(১৭)

দুশমনেরও দুর্দশাতে পারি না তাই হাসতে,
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, কে যেন কয় আস্তে।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯১৪ সালের শরৎকালে কবিগুরুর পক্ষ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবর্তনা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে তার ছেদ সাধুভাষার পরিণতির দিকে। প্রমথবাবুর ভাষায় যে কোন জটিল বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর, তা যেন ভালো করে দেখিয়েছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর বিদ্যাপতি কাব্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে। জটিল অলঙ্কারশাস্ত্র অতি-উপভোগ্য ভঙ্গিতে উপাদেয় ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে এই বইএ। রবীন্দ্রনাথের বিষয়টির আর একটি দৃষ্টান্ত—যাতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ডাঁটা-চচ্চড়িও কথ্যভাষার সরস মশলা সহযোগে সুস্বাদু মানসভোজে পরিণত হয়েছে।

সাহিত্যে প্রথম স্থান লাভের পর মাত্র একশো বছরের মধ্যেই চলতি ভাষার পক্ষ সাধুভাষের মূল সুরেগুলি আয়ত্ত করতে পেরেছে। কোন জটিল বিষয় বোঝাতে হলে তখনও শব্দের সাহায্য নেবার সামর্থ্য তার এমন ভাবে হয়েছে যে, ভাষার বিন্যাসজটিল আড়ম্বর সৃষ্টি না করে মূল কাঠামো ঠেলে তোলা যেতেই তা করা যাচ্ছে ; অন্যদিকে, কিপ্রতা বজায় রাখতেও হাতোয়ারি উপমা এসে পড়ার ভয় আর নেই। সরসতার জন্যে সহজাত প্রবাদবাক্য, বাগ্‌ধারার মুখের ভাষা আর যত বাগ্‌ধারা, সবই এই ভাষায় পাংক্তেয়ত্বে আসন পেতে বসে যাচ্ছে। জাত-বেজাতের কোন বাছবিচার উঠছে না। চলতি ভাষার তাই সারল্যও আছে ভারল্যও আছে ; গাম্ভীর্যও আছে, মাধুর্যও আছে ; বিষাদের অশ্রুটা ও স্মিত হাসির চুমকি এখানে অনায়াসে পাশাপাশি বিরাজিত।

বাংলা গদ্য ১৯১৭ সালের পরেই যেন তার প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। একদিকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রায় বেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস আগুন এই কথ্যভাষায় লেখা চলছে, আবার জটিলতর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাও এর দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। আগে উৎকৃষ্টতম সাধুভাষার প্রাবন্ধিকের নিজেরও যত চপল, চটুল ও চঞ্চল ভাব কি করে বিকশিত করা যায়, তা লেখকদের এক মহা ভাবনার বিষয় ছিল। কিন্তু গত একশো বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এখন আর সে-ভাবনা নেই। যে কোন বিষয়ের উপযোগী শব্দের উপাদানের অফুরন্ত সিলেক্ট ডিশ যাঁরা তুলছি ভাষার কাঠামোর ফেলে এখন যে কোন রচনা সম্পন্ন করা যায়, যাতে যাতে ভিন্ন ভাষের উপাদানের আবির্ভাবেও ভাষা ঘরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। বিদ্যাসাগরের ভাষায় হঠাৎ "স্নেহেবান্ কলহবান্ আপনার জমিন্ খারাজ" ধরণের পক্ষ এসে পড়লে তাদের ভাতিনাস্ বা রসভঙ্গের ভয় ছিল। কিন্তু এখন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্ট, বিমলকুমার রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষাল, অন্নদাশঙ্কর রায় বা মৌলানা খাজি খানের সঙ্গে রচনায় বাংলা ভাষার পক্ষ-ভাণ্ডারের সব কটা ভাতের উপাদান পরম উদারতার পাশাপাশি বাস করতে পারে রমণীয় সুবধার সহযাত্রী হয়ে। এই কথ্যভাষার অপরিসীম সম্ভাবনা এখন যাযাবর, রঞ্জন, শুকসারী, কালপেঁচা প্রভৃতি লেখকদের হাতে টুকরো টুকরো ভাবে রূপ নিচ্ছে। এজন্য শক্তি-শালী পক্ষলেখক প্রয়োজন যিনি একটি অখণ্ড সৃষ্টিতে কথ্যভাষার সমস্ত ভেদ সম্ভাবনাকে একযোগে ফলিয়ে তুলতে পারবেন। তার জন্যে এমন এক সাহিত্যপ্রতিভার আবির্ভাব দরকার, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো নিজের রচনাবলীর সাহায্যে নব-গঠিত কথ্যভাষার সমস্ত অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য ঐশ্বর্য শুকনো শুকনো সুসজ্জিত করে ফুটিয়ে তুলবেন, করে করে সাহিত্যে মেলবেন এর অন্তর্লীন মাধুর্যসম্ভার নিজ রচনার নৈবেদ্যপাত্রে, এর সুসজ্জিতরঙ্গ ছড়িয়ে দেবেন দিগ্‌বিদিগন্তে আসন রচনার পুষ্পপাত্রের পরিবেশনায়, যাতে দূর বিদেশের সাহিত্যরসিকও উন্মুখ হয়ে উঠবেন বাংলা গদ্যে কথ্যভাষার উৎকর্ষের আস্বাদ পেতে।

প্রমথ চৌধুরী এই মহান্ পরিণতির পথ সুগম করে দেবেন ফরাসি রাগতন্ত্রি গদ্যের মতো সহজ করে বাংলা গদ্যে ছড়িয়ে দিয়ে :—

"রাজাজ্ঞা সর্বদা শিরোধার্য হলেও সর্বদা পালন করা সম্ভব নয়। রাজার আদেশে ঘুম বন্ধ করা সহজ, খোলা কঠিন।"

কিন্তু,

"কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও বঙ্গসরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকারভুক্ত হবেন না এবং মাশুরিকেও দায়ধি করবেন না।"

এই ধরণের বুদ্ধি-প্রধান রাগতন্ত্রির সঙ্গে তুলনীয় সেই প্রসিদ্ধ Montaigne (মঁতেঞ —১৫৩৩-১৫৯২)-এর রচনারীতির প্রভাব প্রমথ বাবুর উপর খুব বেশি। মঁতেঞ, তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে যে মন্তব্য

করেছেন তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তা নীরদচন্দ্র মহাশয়ের রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও বটে। সেইজন্যে সংক্ষেপে তা একটু তুলে দেওয়া হচ্ছে। মঁতেঞ্ ও প্রমথ চৌধুরী দুজনেই রীতিসর্বস্ব লেখক। ঐ রীতি তাঁদের নিজের নিজের ব্যক্তিত্বও নির্দেশ করে। চলতি ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক যিনি হতে চান, তাঁর কেবল রীতিসর্বস্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এই কারণেই প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিশালী স্রষ্টা হতে পারেন নি। তাঁর লেখা বৈদগ্ধে সমুজ্জ্বল, কিন্তু গভীরতাবিহীন; রসিয়ে রসিয়ে উপভোগের বস্তু তাঁর রচনা, কিন্তু উপভোগের পর ঠিক পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তার কারণ, প্রমথবাবু নিজেকে নানাভাবে ভোগ করেছেন নিজের রচনারীতির মধ্যদিয়ে; নিজেকে উপভোগ করে কখনও পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব নয়; চৌধুরী মহাশয় কখনও পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেন নি; তাঁর সেই অতৃপ্তিজাত রচনারীতি পাঠকের মনেও একটা অভাববোধ জাগিয়ে তোলে। মঁতেঞ্ যেন মন খুলে বলেছেন:—

"C'est moi que je peins···Je suis moi-meme la matiere de mon livre···C'est ici purement l'essai de mes facultes naturolles et nullement des acquises···Ce sont ici mes fantaisies par lesquelles je ne tache point a donner a connaitre les choses, mais moi···Le monde regarde toujours vis-a-vis; moi, je renverse ma vue au dedans, je la plante, je l'amuse la. Chacun regarde devant soi; moi, je regarde dedans moi. Je n'ai affaire qu'a moi. Je me considere sans cesse, je me controle, je me goute···Moi, je me roule en moi-meme."

অর্থাৎ, "আমি নিজেকেই রূপায়িত করি···আমি নিজেই আমার রচনার বিষয়বস্তু···এ হল পরিপূর্ণভাবে আমার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের উপস্থাপনা, আমার পাণ্ডিত্যের নয়···এইসব রচনারীতির দ্বারা আমি কেবল নিজেকে দিতে চাই, কিন্তু দেখাতে চাই না···দুনিয়া সর্বদা সম্মুখে চায়; আমি আমার দৃষ্টি ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দিই: আমি তাকে লালন করি, আমি তাকে ভোগ করি সেখানেই। প্রত্যেকে চায় বাইরের দিকে। আর আমি চাই আত্মাভিমুখ হতে! আমি কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে চাই। বিরামহীনভাবে আমি নিজেকে যাচাই করি, নিয়ন্ত্রণ করি, আস্বাদন করি···আমি নিজের মধ্যে গড়াগড়ি খাই।"

প্রমথ চৌধুরীও তাঁর মতোই রীতির মাধ্যমে শুধু নিজেকে, নিজের মানস সত্তাটিকে নানিয়ে গুছিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকাশ করেছেন। সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থগর্ভ বাক্যবন্ধনে উজ্জ্বেই বিশেষ পটু। কথা দানিয়ে বলতে, ভঙ্গির বৈচিত্র্যে এক বস্তুকেই বারবার অভিনব করে তুলতে দুজনেই সিদ্ধহস্ত। মঁতেঞ্, যেমন বলেছেন যে, তিনি তাঁর রচনার মধ্যে কেবল নিজেকে রূপায়িত করেন, নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, অন্যিরাম আপনাকে পরখ করেন, সামলান, চাখেন, নীরদবাবুও তেমনি তাঁর রচনায় বুদ্ধির লকড়ি খেলা খেলিয়ে খেলিয়ে নিজের বিশিষ্ট মানসটি নানাভাবে প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অনুসারী আধুনিক বাঙালি গল্পলেখকেরাও মোটামুটি এই আত্মানুভূতি ও আত্মবিলসনের পন্থা অনুসরণ করেছেন। কয়িইনিষ্ট লেখকগুলি ছাড়া প্রায় সব বুদ্ধিজীবী কথাসাহিত্যিক গল্পলেখকেরা তথাকথিত রম্য-রচনা বা Belles Lettres শ্রেণীর রচনায় মনোযোগ পুরুষের বিদ্যুচ্চমকপ্রদ বিদ্যুতিবিলাস বা মানসিক তরঙ্গায়িতলীলার চাতুর্য দেখিয়ে থাকেন। এর ফল কেবল বুদ্ধির ঘাসা উপলব্ধি। এই শ্রেণীর রচনার বুদ্ধির ফলে বাংলা গদ্য রচনাবলী বুদ্ধির জড়তা থেকে মুক্তিলাভ করেছে।

প্রমথ চৌধুরি আমাদের যে পরিণতির সমুখীন করে গেছেন, এখন প্রয়োজন তাকেই পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা গদ্যে ফরাসী গদ্যের যে উৎকর্ষ সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, তাকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করা, যাতে বাংলা গদ্য ফরাসি গদ্যের মতোই বাঙ্ময় ও বুদ্ধি-প্রধান হয়ে উঠে আধুনিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়নে সমর্থ হয়। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯১—১৯৪১) সার্থকভাবে এবং শিবরাম চক্রবর্তী বিভিন্ন সমুভাবে প্রমথবাবুর বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গি অনেকটা আয়ত্ত করেছেন দেখা যায়। কথার লকড়ি খেলায় তাঁরা বেশ খানিকটা সাফল্য লাভ করেছিলেন যথাক্রমে হৃদয়ের পত্র ও ধন্যো বনাম পণ্ডিতেরি রচনায়। অবশ্যপক্ষে অপেক্ষাকৃত ধীর ভঙ্গিটি আয়ত্ত করে খুব গভীর চিন্তাও সহজ মৌখিক ভাষায় ফোটাতে পেরেছেন। আরও তরুণদের রম্যরচনা যে প্রমথবাবুর অনুসরণে তাঁর প্রবর্তনায় উৎসাহিত হয়ে আত্ম-আস্বাদনের প্রয়াস, তা সকলেরই চোখে পড়ে।

এই প্রয়াস পূর্ণ সার্থকতা লাভ করলে মানসভূমিতে বুদ্ধির ফসল আরো বেশি করে ফলবে এবং বাংলা গদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধতর হবে। ফরাসি ও অন্যান্য বৈদেশিক গদ্যভাষার প্রভাব যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে বাংলাগদ্যকে কথ্যভাষার প্রবাহীতে প্রবাহিত হতেই হবে। অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করে বাংলা গদ্যভাষাও তাহলে আধুনিক ইংরাজি ফরাসি গদ্যভাষাগুলির মতো বন্ধনমুক্ত ও ভারমুক্ত হতে পারবে।

ভাষাকে ইচ্ছামতো ঘোরাতে ফেরাতে হলে কেবল মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদই যথেষ্ট নয় বটে। কথাভাষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকেও নজর রাখতে হবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, শুধু চলতি ভাষার ক্রিয়াপদই যথেষ্ট নয় বটে, কিন্তু সেটাও অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদ একমাত্র লক্ষণ নয় বটে, কিন্তু অন্যতম এবং একটি প্রধান লক্ষণ, সে কথা চলতি ভাষার ক্ষেত্রে সর্বদা স্মরণীয়। যে ভাষা মুখের ভাষা, একমাত্র তাই চলতি ভাষা। কারণ, একমাত্র মৌখিক ভাষাই লোকের মুখে মুখে চলে নিত্য পরিবর্তনশীল, সজীব ভাষা। অন্যান্য অবয়ব সমান সমান হলে এরই সৃষ্টিশীলতা সবচেয়ে বেশি, একথা আগে প্রমাণিত হয়েছে। অপর পক্ষে, লাখ

ভাষা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা, হরপ্রসাদের মতো তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ, দুষ্টান্ত অমিয়াক্ষর। পাণিনি-সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা সংস্কৃতের মতোই প্রথমে তার আবির্ভাব সাহিত্যে, প্রাধান্যের দিনে মুখের কথায় না হলেও সবরকম লেখার কাজে তার অধিষ্ঠান বিস্তৃত, পরে মাত্র সাহিত্যে ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে তখন তার মৃত্যু অনিবার্য। কোন প্রতিভাশালী কথাসাহিত্যিকও এই পরিণতি ঠেকাতে পারেন না। সেইজন্যে পরশুরামের মতো অসাধারণ প্রতিভার রস-স্রষ্টাও কজ্জলী ও কচ্চলিকার ভাষার রূপান্তর সাধন করে পরবর্তী কালে সাধু ক্রিয়াপদযুক্ত তথাকথিত "চলতি ভাষা," যা আসলে মিশ্র-ভাষা তা, পরিত্যাগ করে মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদযুক্ত খাঁটি কথা-ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি যদি আবার "এই বস্তুটি দেখিয়া হাস, ইহা চট্টাৎ বাহির হয়" গোছের ভাষা প্রয়োগ করেন, তাহলে বিশেষ বিবেচনার কাজ হবে না।

বঙ্কিমের সঙ্গে সঙ্গে রীতিপ্রধান যে যুগের সুরু হয়েছিল, প্রমথ চৌধুরীর শিল্পী-সত্তার পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত মহাত্ম বহুজন পরের মতো পূর্ণ প্রস্ফুটিত হল। রীতির চরম বিকাশ দেখা গেল বীরবলের গদ্যভাষায়। শব্দ চয়নের হিসাবনিকাশ সৌষ্ঠব হতে হতে কৃচ্ছ্রতায় পর্যবসিত হল। আর সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষার তর্কযুদ্ধ জমবার এই ছকেই যে, কথাভাষা কেবল যে সাধু-ভাষার সমান মর্যাদায় অন্যতর Standard Writing Language বা আদর্শ লেখা ভাষা হয়ে উঠেছে তা নয়, সেই তিন্নাইল বাঙালি লেখকের কাছে এটিই একমাত্র আদর্শ লেখা ভাষাও হয়ে উঠেছে। এখন কেবল চলতি ভাষার ক্ষেত্রেই রীতি বা style-এর পার্থক্য বিচার করে চলতি ভাষায় বিভিন্ন লেখকদের গুণগত তারতম্য নির্ণয় করা যাবে। লেখকের ব্যক্তিনির্দেশক যে রীতি, তা লেখক সাধু-ভাষায় লিখলেও আত্মপ্রকাশ করে, কথাভাষায় লিখলেও রোপম থাকে না এমন-কি রূপান্তরিত হয়না। তবে, কোন্ ভাষায় কোন লেখক শক্তির সঙ্গে তার রীতি বিকশিত করতে পারবে, তা একান্ত ব্যক্তিগত বিবেচনার বিষয়। দুটি ভাষাতেই তার ব্যক্তির ফুটে উঠবে ঠিক, কিন্তু সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কিনা, তা লেখকবিশেষের উপর নির্ভর করে। তবে, ব্যক্তিব্যঞ্জক রীতি যে উভয়ত্র থাকবে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। উদাহরণত, প্রমথনাথ বিশির কথা ধরা যাক। ভাষার পার্থক্যেও যে রীতি বজায় থাকতে পারে, তাঁর রচনাবলী তার প্রমাণ। তাঁর মোড়ার দিকের উপন্যাসে ও অন্যান্য রচনায় সাধুভাষার আধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু প্র-না-বি-র বিশিষ্ট গুরুত্ব তাদের মধ্যে যেভাবে পাঠকবর্গের কাছে প্রকটিত, ঠিক সেইভাবেই তাঁর সফলতা আমরা আবিষ্কার করেছি সাম্প্রতিক কালের কথা-ভাষায় রচিত "কেরি সাহেবের মুন্সি" উপন্যাসে। পরশুরামের ক্ষেত্রেও ভাষার বদলে রীতির পরিবর্তন ঘটেনি। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। প্র-না-বি ও পরশুরাম বা রাজশেখর বসু মহাশয়ের ক্ষেত্রে সাধুভাষায় রীতির যে বিকাশ দেখা গেছে, চলতি ভাষায় সে-বিকাশ কিছুমাত্র কম মহিমায় পরিস্ফুট হয়নি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষেত্রে সাধন করেই বলা যায় যে, তাঁর সাধুভাষার রচনা-বলীর চেয়ে চলতি ভাষার রচনাবলীতে সাম্প্রতিক কালে রীতির উন্নততর বিকাশ দেখা গেছে।

বিষয় অনুসারে সাধু বা চলতি ভাষার লেখা উচিত, এ ধারণা হতে সাধু সাধনে সমর্থন করা যেত, যখন কথাভাষায় প্রকাশসামর্থ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞজনের সংশয়ের অবকাশ ছিল। কিন্তু আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, যে কোন বিষয় কথাভাষায় সাধুভাষার চেয়ে ভালো-ভাবে প্রকাশ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আনন্দবাজার পত্রিকার কমলাকান্তের আসর-এর কথা ধরা যাক। প্রমথনাথ বিশি এতে সাধারণত সাধুভাষায়, কদাচিৎ চলতি-ভাষায় যে সব মন্তব্য প্রকাশ করেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সব রচনাগুলিই চলতি ভাষায় লিখিত হলে বক্তব্যের কোন হানি হত না। সাধু ও কথ্য-ভাষার প্রকাশভঙ্গি রূপরসসমেত পৃথক্ বটে, কিন্তু প্র-না-বি-র রীতিবাহুল্য উভয় ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রেখে প্রস্ফুটিত করা যায়। তার কারণ, লেখকের ব্যক্তির দুই ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকে। সাধু বা চলতি যে ভাষাই হোক না কেন, বিকাশ-বাহনের তারতম্যে রীতির তুরঙ্গমীয় রূপান্তর অসম্ভব। তাহলে কথ্যভাষায় লেখার সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা ঐ বাহনের ক্ষিপ্রগতির জন্যে। বিবেকানন্দ-বর্ণিত সাধুভাষার পদাইলস্করি চাল আমাদের ছাড়তেই হবে।

বৈষম্য না হয়েও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব জয়যুক্ত হয়েই; বাংলা গদ্যে রামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রবাহিনী আর স্বামীজির বাংলা রচনার কথাভাষাই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করবে। সাহিত্যে অধ্যাত্মভাব ব্যক্ত করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ, বৃহত্তম রূপকের সাধনা। সেই সাধনায় মহেন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সিদ্ধিলাভের পর কথাভাষার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আর কোন তর্ক উঠতে পারে না। কথামৃতের ভাষাই সর্বজন-বোধগম্য ভাষা; কারণ, সব বাঙালিই সে-ভাষা বোঝে। সুতরাং অন্য সাহিত্যাঙ্গের কথা যদি দিলেও কথামৃতের রামকৃষ্ণ-কথিত অংশের ভাষা যে সুবোধ্যতার দিক থেকে আদর্শস্থানীয়, তাতে কোন সংশয় নেই। ঐ সহজবোধ্যতার সঙ্গে অন্যান্য গুণ সংযুক্ত হলে কথাভাষার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যাবে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য গুণ আহরণ করা কথাভাষার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তনের ধারায় এখন থেকে বিচার্য বিষয় হবে, গদ্যভাষার সম্ভাব্য পরিণতি কোন্ দিকে। সমাজে অর্থ-নৈতিক কারণে শ্রেণী সংঘাতের ফলে নতুন শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তৃত হবে। তখন প্রাধান্যশালী নতুন শ্রেণীসমাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই শ্রেণীর মুখের ভাষার উপর কথাভাষার গদ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আধুনিক কালে পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই গদ্য ভাষা জাতির প্রাধান্যশালী শ্রেণীর মুখের ভাষা অনুসারে পরিচালিত হয়। বাংলা গদ্যভাষার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে না।

বাংলা গদ্য-ভাষার ভবিষ্যৎ পথ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট অংশে আলোচনা করা যাবে।

ইতিমধ্যে আমরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি যে, চাপিয়ে-দেওয়া কাদি আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় সংস্কৃত প্রভাব সম্পূর্ণ মুক্ত করে বর্তমানে চলতি ভাষার প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব হয়েছে; এর মধ্যে মুসলিম বা ইংরেজ রাজশক্তির কোন প্রভাব নেই, কিংবা এটা একটা বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেওয়া ব্যাপারও নয়। বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্বাভাবিক ভাবেই কথাভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই কারণে লেখকবর্গ পথ খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত মৌখিক ভাষার শরণাপন্ন হয়েছেন। এটাও কথাভাষার শ্রেষ্ঠত্বের একটা প্রমাণ। রামকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-বীরবলের মধ্যে দিয়ে এসে আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কেও চলতি ভাষার গদ্যকার করতে দেখি। বাংলা ভাষার ভিত্তিও বঙ্গভূমির অধিবাসীদের মৌখিক ভাষার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, বাংলা গদ্যের মূল ধারাটি কথাভাষার প্রাধান্য স্থাপনের দিকে অগ্রসর।

পরিশিষ্ট

বাংলা গদ্যের বর্তমান প্রবণতা কোন্ দিকে, তা বুঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে—বাংলা গদ্যসাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার রীতি-নীতি আলোচনা করা। কোন্ সাহিত্যিকের রচনায় কোন্ সাহিত্যধর্ম অভিব্যক্ত, কোন্ গুণ সেখানে প্রকাশ লাভ করেছে, তার গবেষণা বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আলোচনার বিষয় অন্য; আমরা গদ্যসাহিত্যের ভাষার তথাকথিত সাধু ও কথাভাষার রীতিগুলির তারতম্য ও প্রভাবের পার্থক্য আর পরিমাণ নিরূপণ করে বাংলা গদ্য বিবর্তিত হয়ে কোন্ প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কোন্ পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা নির্ণয় করব।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ; বাস্তবে যা ঘটছে, কেবল তারই গুরুত্ব স্বীকার্য। আমাদের ভালো-লাগা না-লাগার কথাও অবান্তর। আমরা চাই বা না চাই, যা ঘটছে তাকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। সুতরাং বাংলা গদ্যের প্রবণতা ভাষার দিক থেকে সাধু বা কথা, যেদিকে দেখা যাবে, সেদিক, বিশেষ কারো পছন্দ হোক বা না হোক, সত্যিই যে বাংলা গদ্যের গতিপথের নির্দেশক, তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। যথাযথ রাগদ্বেষবিবর্জিত মনে বাস্তব তথ্যসমূহ সংগ্রহের পর আমাদের সিদ্ধান্ত গঠনীয়।

প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যের মূল ধারাই হচ্ছে চলতি ভাষার দিকে প্রবণতা। কোন আধুনিক ভাষাই মুখের ভাষার উপর নির্ভর না করে থাকতে পারে না। আমরা সহজেই আধুনিকতম চিন্তাগুলি প্রকাশ করতে পারি। চিন্তার ভাষা যা, লেখার ভাষাও তাই হওয়া উচিত। এই জন্যেই আধুনিক ইউরোপীয় মনের জটিল ভাবুকতার প্রকাশ হয়েছে তথাকথিত দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতায়; এলিয়ট, পাউণ্ড, এলুয়ার, রিল্‌কে প্রভৃতির রচনায়। আধুনিক যুগের চিন্তাধারা প্রকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম যে গদ্য, তাকেও হতে হবে অনাড়ম্বর, লঘু ও সরল। বর্তমান সময়-সংক্ষেপ ও গতি-প্রিয়তার যুগে ইঙ্গিতে মিনিয়ে নিজের চিন্তাকে একটা কৃত্রিম বক্রতঙ্গিময় বিন্যাসপদ, সর্বনাম ও অব্যয়কণ্টকিত ভাষায় প্রকাশ করা কর্মব্যস্ত লেখকের পক্ষে সুখের ব্যাপার নয়। বিশেষ করে যখন চলতি ভাষায় লিখলে মনের চিন্তা সহজেই কলমের ডগায় আসে, তখন খামকা একটা সাধু ভাষার আশ্রয় নেবার কোন দরকার নেই। সারগর্ভ, সংক্ষিপ্ত থাকাসত্ত্ব, সুবুদ্ধিপ্রসারী বাক্যমার অঙ্গেও চলতি ভাষাই প্রশস্ত; কারণ, যথেচ্ছ তৎসম শব্দ এতে মিশিয়ে নেওয়া যায়, আর তৎসম শব্দে মনের মধ্যে অনেকখানি ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের জানা আছে। অবশ্যই চলতি ভাষায় লিখতে-পারা শিক্ষা ও সাধনা সাপেক্ষ। বিভিন্ন পাত্র উপাদানের কণ্ঠ বিন্যাসের দরকারও আছে। তাহলেও এই ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে এক ভাব-প্রণালীর দ্বারা সংযুক্ত। এই ভাষায় মনোভাব লিপিবদ্ধ করা সহজতম।

সাধুভাষার পৌঢ়া সমর্থকদের জন্যে চলতি ভাষার উপযোগিতা এখনও ব্যাখ্যা করার দরকার আছে। মোহিতলাল লিখছেন, "লিখিবে সাধুভাষায়, ভঙ্গিমা করিবে বাংলা বুলির এবং তাহারই মাঝিয়ে উচ্চারণ বাঁকাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টক্ টক্ শব্দ করিবে, এ-অনাচারে ভাষা পীড়িত হয়, তাহার ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হয়।" ধ্বনি-ধর্ম সম্বন্ধে মোহিতলালের অনুভূতি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। কারণ, ভাষা প্রথমত মুখে জন্মগ্রহণ করে; তার সব ধ্বনিই প্রথমে মুখে উচ্চারিত হয়ে রূপ লাভ করে; সুতরাং, ধ্বনির বিশুদ্ধ রূপের নিরিখ তার কোন লেখা রূপ নয়, তাহার তার উচ্চারিত ও শ্রুত রূপ; ভাষা চোখে দেখার জিনিস নয়, মুখে-বলা ও কানে-শোনার জিনিস; ভাষার লিখিত রূপ পরের কথা। কাজেই যদি ভাষায় কোন ধ্বনি সুপ্রচলিত থাকে এবং সেটাই তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ হয়, তাহলে তার কৃত্রিম রূপ ব্যবহারেই ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হয়, ভাষার প্রকৃত উৎস থেকে আসা রূপটি লেখায় ব্যবহার করলে তার ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হবে কেন? এর চেয়ে অযৌক্তিক মনোভাব আর কিছু হতে পারে না।

মূল সংস্কৃতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহার মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগেই আমরা ত্যাগ করেছি। মুখের কথায় এখন "করোমি," "করোতি" না বলে "করি," "করে" বলা হয়, "তে" না বলে "তারা" বলা হয়; সুতরাং লেখায় সমস্ত অকারণে জটিলিহিত প্রভাবযুক্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগীয় "করিয়া," "খাইয়া," "খাইতেছি," "পড়িতেছি," ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করে সংক্ষিপ্ত চলতি শব্দগুলো ব্যবহার করা এবং "তারা" শব্দের মাঝখানে অনর্থক একটা-"আ-" ধ্বনি ব্যবহার না-করা বেশি যুক্তিসঙ্গত।

মোহিতলাল প্রভৃতি প্রাচীনপন্থীরা অভ্যাসের দাসত্ববশে ভুলে যান যে, যে কোন ভাষাই সেই ভাষাভাষী লোকের মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। কে না জানে যে, ভাষা প্রথমত মুখের, তার পরে লেখার?

অথচ মোহিতলাল তা মানতে চান নি। মুখের ভাষাই পরে নানা রচনাকে লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়ে লেখ্য-ভাষা গড়ে তোলে। ভাষা গড়তে হবে মুখের কথার উপর ভিত্তি করে; কৃত্রিমভাবে কোন নির্দিষ্ট ভাষা মানুষ পোষাকের মতো কৃত্রিম বহিরাবরণমাত্র নয়। তা ইচ্ছামতো খোলা-পরা যায় না। কিন্তু ভাষা পরিহাস করে অন্য ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করা যেমন কষ্টসাধ্য, মাতৃভাষার কৃত্রিম কোন রূপে লেখা হওয়াও না হলেও বেশ একটু পীড়াদায়ক। সুতরাং লিখবার সময় ভাষাকে যথাসম্ভব তার মৌখিক রূপের উপর স্থাপিত না করে একটা অস্বাভাবিক বক্রতা দেবার দরকার কিছু নেই। যে বক্রিমা চারু এবং সাহিত্য সৌন্দর্যের আকর, তাকে অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু চলতি ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম ও অব্যয় পদগুলিকে সংস্কৃত ভাষার হালকা অনুকরণে বাঁকিয়ে চুরিয়ে না লিখলে ভাষার ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হবে, এ কথা অর্থহীন। ভাষার ধ্বনি-ধর্ম তো সেই ভাষার লৈখিক রূপে আবদ্ধ নয়, বরং সেই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের বাচনভঙ্গি ও ভাষার মৌখিক রূপের উপর ধ্বনিধর্মই একান্তভাবে নির্ভরশীল। অতএব, ভাষার ধ্বনিধর্ম মুখের ভাষার বক্তব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর তার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে। ধ্বনি দ্বিরীকৃত হয় রসনায়, লেখনীর দ্বারা নয়। রসনা ধ্বনিরূপ গঠন করলে অনেক পরে লেখনী তার চিত্র অঙ্কন করে যায়, এই মাত্র। সেই চিত্ররূপ চিরদিন আঁকড়ে ধরে রাখার বস্তু নয়; সময় হলেই তাকে বাদুঘরে পাঠাতে হয়। অন্যথা ভাষার বাতু নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

বাঙালি যদি তার মুখের কথার ক্রিয়াপদের উচ্চারণকালে করছি, বলছি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা টকটক্ শব্দ করেও, তবে সেটা তার ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনি-ধর্মবশত; "-ইতেছি" প্রত্যয়যোগে যদি সে করিতেছি, বলিতেছি বলে, তাহলে টকটক্ শব্দ না হলেও এক অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা এখন আড়ষ্টতা দেখা দেয়। সেই অসঙ্গত বক্রতা যখন মুখের কথায় চিহ্ন-অনাবৃত থেকেছে তখন লেখায় তার সমাবেশ করা কি জন্যে? মোহিতলালের গদ্য রচনাবলীর ভাষার আড়ষ্টতা ঐ দোষ থেকেই উদ্ভূত। তাঁর প্রতিভা, উগ্র চিন্তাগুলির উপযুক্ত ভাষা তিনি কখনও খুঁজে পান নি। সেই জন্য তাঁর রচনার ভাষা চিন্তার অগ্রগমনের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে থেকে বিরক্ত সমালোচকের ব্যঙ্গবাণীর মুখে নিরুপায় হাসি ফুটিয়েছে। বাহিরে আমাদিগকে, তোমাদিগের— ইত্যাদি পদ যে খুব প্রতিমধুর আর যাইরে, আমাদের, তোমাদের— ইত্যাদির ধ্বনি প্রতিকটু, এসব বলার মতো ধ্বনিমাধুর্য বিচারের মাপ-কাঠি কারো কাছে নেই।

যে সুললিত ধ্বনিমাধুর্য এক শ্রেণীর সংস্কৃত শব্দের বিশেষ গুণ, তাকে সাধ্যে আয়োজন করতে চলতি ভাষায় কোন বাধা নেই। এমন অবস্থায় কতকগুলি প্রাচীন পদগঠনরীতি সমাদৃত হওয়া বিস্ময়কর। তথাকথিত সাধুভাষার সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি পদগুলি আসলে মৌখিক রূপের ভিত্তিতে অবস্থিত, অথচ বিকৃতভাবে গঠিত রূপ মাত্র। শব্দের মূল সংগৃহীত হয়ে মৌখিক ভাষা থেকেই, অথচ লেখার সময় সেই শব্দে সংস্কৃতের ভঙ্গি আনতে কতকগুলো অদ্ভুত বিকৃতি সংযুক্ত করে বলা হবে যে, শব্দটি এর পর সংস্কৃতের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হল— এই মনোভাব কষ্টোদ্ভবভাবে বিস্ময়কর। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতপ্রবর আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু কথ্যভাষার প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন, মনস্বী সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞের এ ব্যাপারে কোন অক্ষমতা নেই। সকল সংস্কৃতজ্ঞবিশেষের কাছে আসল জিনিসের মূল্য-বোধ আশা করা যায় না।

ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি প্রত্যেক সাহিত্য গৌরবমণ্ডিত আধুনিক ভাষার ক্রিয়াপদ প্রকৃতির মৌখিক ও লৈখিক রূপ এক রকম—অবশ্য ভদ্র সমাজে। ঐ সব ভাষার লেখকেরা তাঁদের রচনায় সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি পদ গঠনের সময় মুখভাষার আশ্রয় ছেড়ে যে সব ভাষা থেকে তাঁদের ভাষার জন্ম, সেই সব ভাষার অনুকরণে বিকৃতকিমাকার কিছু গড়বার চেষ্টা করেন না। সুপরিচিত বাংলা গদ্যভাষাও ঐ সব আধুনিক ভাষার অনুরূপ হয়ে উঠছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের গদ্যভাষা সেই পরিণতিতে উপস্থিত হবেছে, যে পরিণতি তার মূল ধারাটি অব্যাহতভাবে নির্দেশ করছে।

১৪০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত চারশো বছর সময়ের বাংলা গদ্যের ক্রমপরিণতি নিয়ে আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, গদ্যভাষা মূলত সহজ কথাভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুগে যুগে ফার্সি, সংস্কৃত ও অন্য ধরণের প্রভাব এর উপর প্রসারিত হলেও এবং তার জন্যে মাঝে মাঝে একে বিকৃতিত হতে হলেও শেষ পর্যন্ত এই ভাষা সব আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে আত্মস্থ হয়ে তার নিজেরই প্রত্যেক আপন্নক প্রত্যেককে যথাযথ আসন নিতে; কিন্তু সে কারো কাছে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে দেবে না। তাই ১৮১০ সালের পরে দেখতে দেখতে এই ভাষার গড়ে উঠল এমন বিস্ময়জনক প্রাঞ্জলতা ও ক্ষমতাশালিতা যা দেখা যায়, অথচ অতি সুকুমার ভাব বিকাশেও কোন অসুবিধা হয় না। নিঃসংশয়ে মৌখিক ভাষাভিত্তিক গদ্যভাষাই বাংলা গদ্যের মূলধারা নির্দেশ করছে।

এই ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলোর সংখ্যা খুব কম নয়। তারা যে চলতি ভাষার ক্রিয়াপদগুলোর সঙ্গে মিশ খায়নি, এমন কথা বলা যায় না। এই ভাষা যে মুখের ভাষা এবং রুচিবান্ বিদগ্ধ ভদ্রলোক যে এই ভাষায় বিকৃতি দিয়ে থাকেন আর অন্যমনস্ক বহুলে গদ্যরূপ করে থাকেন, সে-সত্য অস্বীকার করা যায় না। চলতি ভাষার ক্রিয়াপদের উচ্চারণই স্বাভাবিক উচ্চারণ; শত শত বছর ধরে বিকৃতি হয়ে মুখের ভাষায় ক্রিয়াপদের ঐ রূপ দাঁড়িয়ে গেছে। সাধুভাষায় তাকে বাঁকিয়ে এক অদ্ভুত রূপ দেওয়া হয়। অথচ মোহিতলাল বলেছেন, "উচ্চারণ বাঁকাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টকটক্ শব্দ করিব" ইত্যাদি, যেন মূলত উচ্চারণটা বাংলা ভাষার প্রথমে সাধুভাষার মতো ছিল—আর এখন তাকে বদলে কথ্যভাষার উচ্চারণে পরিণত করা হয়েছে। উচ্চারণের প্রাথমিকতা প্রাচীন বা মধ্যযুগের

ভাষার যা ছিল, তার নয় কিম্বা লেখা ভাষারও নয়; তা কেবল বর্তমান কালের মুখের ভাষার—অবশ্য শিষ্ট সমাজের। অতএব, উচ্চারণ যা, তাকে বাঁকিয়েছেন সাধুভাষাপন্থীরা, যাঁরা শিক্ষিত সমাজের উচ্চারণ অনুযায়ী কথ্যভাষার গদ্য রচনা করেন, তাঁরা নন। "করছেন"—এই পদটিই লোকের মুখে উচ্চারিত হয়, "করিতেছেন" তার বিকৃত লেখারূপ মাত্র।

সুতরাং আধুনিক বাংলা গদ্যের দুর্গতি সাধিত হয়েছে, এই অভিযোগ আমরা মানতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কোন প্রতিভাবান্ লেখক যদি কথ্যভাষায় লেখনী চালনা করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত ভাষার চেয়ে বেশি ভালো ভাষা নির্মাণ করতে পারবেন। এখনও পর্যন্ত যদি কথ্যভাষায় লেখা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের তৈরি রচনার চেয়ে ভালো কিছু গড়ে উঠে না থাকে, তার কারণ যোগ্য প্রতিভার অভাব, কথ্যভাষার কোন ত্রুটি নয়। মনে রাখা দরকার যে, বঙ্কিমোত্তর সাধু গদ্যভাষাতেও তাঁর চেয়ে ভালো লেখক আজও জন্মায়নি। বরং বঙ্কিমচন্দ্র কথ্য ভাষার সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতেন, মোহিতলালের মতো বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা তা জানেন না, কিম্বা দেখেও রাখেন না। বিদেশী-নবীশের বক্তব্য পড়ার পর তাঁদের চৈতন্য সঞ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। মোটকথা বিশুদ্ধবাদীদের অভিমত বিদ্বেষপ্রসূত ও উপযুক্ত অধ্যয়নের অভাবনির্দেশক। জনসাধারণ যে এই সব নির্বোধ ও একদেশদর্শী মন্তব্যে বিভ্রান্ত হয়নি, তা আনন্দের বিষয়।

১৯১৬ সালের পরবর্তী যুগে পণ্ডিতি রীতি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সাধুভাষায় যে শব্দসম্পদ্ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে পণ্ডিতেরা একদা হাহাকার করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে যে, সে-শব্দসম্পদ্ অবিকৃত-ভাবে অধিকতর মানুষের সঙ্গে ব্যবহার আছে। কথ্যভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় সাহিত্যের ভাষা গ্রাম্য তো হয়ই না, বরং শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষা আগের চেয়ে বেশি সাহিত্যধর্মী হয়ে উঠেছে কথ্যভাষায় লিখিত সাহিত্যের প্রসাদে। মধুসূদন-পাত্রীটাদ বিতর্কে মধুসূদন যে বলেছিলেন, একদিন শিক্ষিত লোকে তাঁর নাটকের সংলাপের ভাষায় অনুরূপ ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করবে, তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনধর্মিতা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রবীন্দ্রকাব্যকে কাহার সহিত তুলনা করিব? বোধ হয় একমাত্র কল্পতরুর সহিত মানবীয় শিল্পসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা এই অপূর্ব কাব্যকলা তুলনীয়! ইহা সকল রুচির পাঠকেরই রস-পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারে। এই বিশাল কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পাইতে পারে —"Here is God's plenty" তথাপি এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত যৌবনের কবি; চিরতারুণ্য তাঁহার স্বভাবধর্ম। এই যৌবনধর্মিতা তাঁহার মানস-ভঙ্গিকেই শুধু অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করিয়া তোলে নাই, কাব্যকলাসৃষ্টিকেও একপ্রকার মসৃণতা ও পেলবতায় প্রসাধিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে হয়, এ যেন অতি-মানুষের দুষ্টান্তস্থল এবং অতি-লালিত্যের আধার। সঙ্গীত-স্বপ্ন, আবেগ-বিভ্রম, চারুতা-কোমলতার অভিনব সমাবেশে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় নিপুণ কবি এরূপ এক কাব্যলোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা গন্ধর্বলোকের মতই চিত্তাকর্ষক, নয়নাভিরাম। কুঞ্চনশুন্যযুবচিত, শুভ্রাঙ্গন এই শাশ্বত যৌবনের রাজ্যে মরজগতের ত্রিতাপজ্বালার কোনো প্রতাপ নাই। এখানে পদার্পণ করিবামাত্র কবির সুরে সুর মিলাইয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।"

৩৬

রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনধর্মিতা এই সুষমাময় বিচিত্র অপরালোক হইতে চির-নির্বাসিত। সৌন্দর্যের অমর প্রহরী চূর্ণীসঙ্কেতে তাহাকে শাসন করিয়া বলিতেছে—"হে জরা, হে জরুর, ছিঃ। মানুষের নশ্বর শরীরেই তোমার অধিগতা,—তাহার মর্মলোকে তোমার প্রবেশ নিষেধ।"

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়োর
সবার আমি এক-বয়সী জেনো।

আমাদের এই অবসাদজর্জরীকৃত হতভাগ্য দেশে রবীন্দ্রনাথের মত এক চিরতরুণের আবির্ভাব ও তাঁহার "যৌবন-বেদনা-রসে উজ্জ্বল" কাব্যগ্রন্থাবলীর শ্রবণ "অমৃতের তপোভঙ্গদূতের" আগমনের মতই একটি আকস্মিক ও বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার যৌবনবিলসিত কাব্যসৃষ্টি আমাদের শুষ্ক, আনন্দহীন জীবনকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। দুঃখ-বেদনা, জরামৃত্যু সত্ত্বেও সংসারের সুধাপাত্র যে নিঃশেষিত হইবার নয় এ কথা যৌবনধর্মী রবীন্দ্রকাব্যই আমাদিগকে শিখাইয়াছে। ইহার প্রতিটি ছত্রে দৃপ্ত তারুণ্যের অনন্ত, অক্ষয় বাঙ্ময়।

চিরসুন্দর তুই যে চিরজীবি,
জীর্ণজরা করিয়ে বিদে
প্রাণ অমৃতরস ছড়িয়ে যেমায় দিবি।—

রবীন্দ্রকাব্যের এই অমৃত-লোক আমাদের এই গ্লানিময় দৈনন্দিন জীবনের সঙ্কীর্ণ-গণ্ডী হইতে কোন্ এক সুদূর স্নিগ্ধ, আলোকোজ্জ্বল জগতে লইয়া যায়। এক হিসাবে বলিতে গেলে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যই যেন এক উচ্ছ্বসিত ছন্দায়িত যৌবনবন্দনাগীতি।

যৌবন স্বভাবে সুন্দর সুচারু। তাই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের কবি। চিরসুন্দরের সন্ধানে ব্যস্ত, কৃতার্থ কবি জীবনের সর্ববিধ কুশ্রীতা ও কদর্যতাকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন,—"All things uncomely, all things worn-out and old." তাঁহার জীবনের চতুর্দিকেই সৌন্দর্যের এক অলৌকিক সৃষ্টিরহস্য পরিমণ্ডল; তাঁহার ইন্দ্রনিন্দিত ভাষা—সুন্দর সুকোমল; তাঁহার অনুপম কবিকর্ম শুধু "বিলাসকলানুকুতূহলম্" নয়—চিরসুন্দরের বেদীমূলে হৃদ্যোদ্ধৃত মানবীয় ভক্তি-অর্ঘ্য। রবীন্দ্রকাব্য কেবলমাত্র অলস পলকাঙ্কনি নয়, কেবল মাত্র মনোহর কবিকল্পনার কপলীলায়িত ইন্দ্রধনুচ্ছটা নয়,—পূজা। সে পূজা সেই চিরসুন্দরের—যাহাকে কবি "ওগো সুন্দর, মরি মরি" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন, যাহাকে কবির ধ্যানমুগ্ধ তৃষ্ণার নেত্র জলে স্থলে, অন্তরে অনিলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; যাহার ললিত করস্পর্শে—

মানস-উরস-তলে বাণীর সঙ্গীতশতদল
মেলে ওঠে ফুলে।

এই চিরসুন্দরকে কবি তাঁহার পার্থিব জীবনে নব নব রূপে,—গন্ধে বর্ণে গানে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সেই Spirit of Beauty যাহাকে শেলী "That Light whose smile kindles the universe" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুন্দরের শ্রেষ্ঠ পূজারী বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে বাস্তব জগতের কদর্যতা, অসম্পূর্ণতা, কাড়াকাড়ি, হানাহানি নাই, আছে শুধু বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপ—"বকুল নিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন"। সৌন্দর্যের এই অতিলৌকিক এই অতি-মাধুরী অনুভব করিবার নিকট "শুধু হয়ে থোর হ'ল বিস্তার বিস্তার" বলিয়া মনে হইয়াছে; উপনত অপেক্ষা গো-ভাগাড়ই যাহাদের নিকট অধিকতর স্পৃহণীয়, তাহাদের রুচির বালাই লইয়া মরিতে হয়!

রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনধর্মিতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ ইহার গীতি-প্রবণতা ও গতিচঞ্চলতা। মনে হয়, সঙ্গীতপ্রবণ কবিমানস সুরের পাখা মেলিয়া অব্যক্তের, অনির্বচনীয়ের উদ্দেশে উধাও হইয়া চলিয়াছে,—"দেখা নয়, দেখা নয়, শুধু কোনোখানে।" যৌবনের চোখে মায়া-কাজল—"যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে-মায়া শরৎ বসুন্ধরে সুধাশুভ্রকালের মেঘপুঞ্জে।" এই যৌবন-মায়াকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিতে পারে—একমাত্র সঙ্গীত; ভাষার বাধা নাই তাহাকে রূপায়িত করিয়া তোলে। যৌবনের অপরূপী স্বপ্ন-কামনা, অস্ফুট হৃদয়াবেগের উপযুক্ত বাহন—সুর।

নাসুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কহে,
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তারারে।

তাই যৌবনধর্মী রবীন্দ্রকাব্য সঙ্গীতের সগোত্র; কথা ও সুর এখানে "বাগর্থাবিব" বিরাজ করিতেছে।

স্থানুর ন্যায় শুষ্ক অচপল হইয়া থাকা যৌবনের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই রবীন্দ্রকাব্যলোকে স্থিতি বলিয়া কোনো কিছুই নাই—আছে উদ্দাম উধাও গতি, বাধাহীন বন্ধনহীন চলার মুক্তি। পর্বত এখানে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হইতে চাহে এবং তরুশ্রেণী পক্ষীর মত পাখা মেলিয়া উড়িবার জন্য ব্যাকুল। যৌবনের পক্ষে অচলায়তনের অন্ধকারায় বন্ধ হইয়া থাকাটাই মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। মৃত্যু চিরস্থির, তুহিনশীতল; তাহাতে নাই জীবনের স্পন্দন, যৌবনের বহ্নিতাপ। তাই জীবন-প্রেমিক যৌবনধর্মী কবির কল্পলোকের একমাত্র মূলমন্ত্র—চরৈবেতি চরৈবেতি। জগতের মর্মমূলেও আছে এই প্রচণ্ড উদ্যম অধীর গতিবেগ; 'গম্' ধাতু হইতেই 'জগৎ' শব্দটির উদ্ভব। রবীন্দ্রকাব্যসৃষ্টির অন্তর্লীন সুন্দর সূক্ষ্ম ক্রমাভিব্যক্তির ধারাটি অনুসরণ করিলে দেখা যায় তাহারও মূলে এই গতি। এই গতিশীলতাই শিল্পীর স্বভাবধর্ম। শিল্পীর নিরাসক্ত নক্ষত্রকৌতূহলদীপ্ত চিত্ত এ সংসারে কোনো কিছুকেই "ছেড়ে নাহি দিব" বলিয়া অনন্তকাল আঁকড়াইয়া রাখিতে পারে না—পারিলে তাহার স্বধর্মচ্যুতি ঘটিতে বাধ্য। এক হাটে বোঝা লইয়া অন্য হাটে শূন্য করিয়া দেওয়াই শিল্পীর জীবনের মূলমন্ত্র। শিল্পীশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের চিরপ্রগতিশীল হৃদয় কোনো পথের বাঁকে আসিয়া পাদচেকং ন গচ্ছামি বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। সর্বপ্রকার বন্ধনমোচনের ঐকান্তিক আকুলতা, সংস্কার ও জড়ত্বের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা এবং সর্বোপরি এক অনন্যসাধারণ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথকে চিরতারুণ্যের অক্লান্ত পরাক্রমাধীশ করিয়া তুলিয়াছে।

যাহারা রবীন্দ্রকাব্যের মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই তাহাদের নিকট ইহার যৌবনধর্মিতা একটা বেদনাক্ষীণ কোমল ভাববিলাসমাত্র। তাহাদের বিশ্বাস লতাসুলভ পেলবতাই যৌবনধর্ম। এরূপ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহা বলাই বাহুল্য। কোমলের সহিত কঠোরের সংমিশ্রণ যে আদৌ অসম্ভব নয় তাহা সর্বজনবিদিত। যৌবন শুধু কুসুমকোমল নয়—বজ্রাদপি কঠোরও বটে। রবীন্দ্রকাব্যে যৌবনের রসাবেশ একটা নারীসুলভ নমনীয়তা অথবা ক্ষুণ্ণ ভাবপ্রবণতা হইতে সঞ্চিত নয়, ইহার উৎস আরো গভীরে। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—উপনিষদের এই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী কবির জীবনকে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা ঊর্বশীর মত আনন্দের সুধাপাত্র লইয়া হৃদয়ের অতলসিন্ধু হইতে অমরমৃত্যুময় সংসারে আবির্ভূত হইয়াছে।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আরাম ও বিলাসের সুনিশ্চিত কুসুমাস্তৃত পথেই যৌবনের সঞ্চরণ নয়—দুঃখদহনৈর তাহার নিত্যসহচর; ভোগ ও বিপদের শিয়রে বসিয়াও সে অকুতোভয়। "এক হাতে তার কৃপাণ আছে, আরেক হাতে হার"—ইহাই তাহার স্বরূপ। দুর্জয়ের জয়মালা তাহার কণ্ঠতটে, উল্লাস উদ্যমের উতরোল বৃত্যে তাহার বক্ষ স্পন্দিত।

বাধার প্রলাপে মোর গোলাপে জাগে বাস,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি।

যৌবনের বুকে অমন্ত অমিবাণ আশা। তাই যৌবনমদমত্ত দুর্মদ আশাবাদী কবি মৃত্যুকবলিত মর্ত্য সংসারে থাকিয়াও মানবজীবনের সেই অবার্থ জয়ের পরিণতিকে চালেঞ্জ করিয়াছেন—

তোর বাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে
করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে সত্য আমি—এ বিশ্বাস প্রাণে নিয়ে, দেখ,
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরসুন্দর এক।

হৃদয়-কুহর হইতে উদ্গারিত এই অমন্ত অগ্নিগর্ভ বাণী কি শুধু একটা Poem? ইহার উত্তর—জগতের অন্তর্নিহিত অথচ অপরাজীত এক সর্বব্যাপী আনন্দময় সত্তার অস্তিত্বে ধ্রুব অচপল বিশ্বাস। এই আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি কবির হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে সঙ্গীতের বন্যায় তুলিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্য সঙ্গীতলক্ষণাক্রান্ত এবং সেখানে গীতি সেইখানেই গতি।

যৌবনধর্মী বলিয়াই রবীন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার রোমান্টিক ভাববিহ্বলতা ও স্বপ্নালুতা। রঙীন রোমান্টিক কাঁচের ভিতর দিয়া এই ধূল প্রাত্যহিক জীবনকে দেখাই যৌবনধর্ম এবং এইরূপে দেখিলে বস্তুজগতে কুশ্রীতা, কদর্যতা কিছুই নাই; সবই সুন্দর, সুঠাম, সুবলয়িত—মধুর মধুর মধুর। এখানে এই উঠিতে পারে—জগৎ ও জীবন কি সত্যই এত সুন্দর, এত লোভনীয়? —"The world is more full of weeping than you can understand!" জগৎ ও জীবন যতই কুশ্রী, কদর্য হোক্, যৌবন তাহাকে "আপন মনের মাধুরী" মাখাইয়া সুন্দর করিয়া তোলে। রবীন্দ্রকাব্যজগৎ এই আপন হৃদয়ের মাধুর্যে অতিলিপ্তিত এক অপূর্ব আনন্দলোক।

রবীন্দ্রকাব্যের সুদূর সুবিশাল আশাবাদও তাহার যৌবনমূর্ছিতা হইতে উদ্ভূত। যৌবনের মেঘে মনোরথ অবাধগতি এবং অল্প বেদিতে পারে বলিয়াই মানুষ এমনও জীবনকে নিতান্ত দুর্বিষহ মনে করে না। যৌবনের নিকট "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter." যাহা কিছু দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য তৎপ্রতি তাহার অনুরাগ। এ যেন

The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

কবিগুরুর অনুপ্রেত আশাবাদ বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত। দুঃখ-দুর্দৈব, ব্যাধি-বিঘ্নের সম্মুখে ইহা মাথা নত করে না, এমন কি মৃত্যুর মধ্যেও অমৃত, অক্ষয়ের অন্তরালে ধ্রুবের অস্তিত্বকে অহরহ উপলব্ধি করে। কবির কণ্ঠে অনন্ত আশার বাণী। তাই তিনি আশাতৃষ্ণিতে যাহা ব্যর্থ তাহারো মধ্যে সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছেন…

যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে,
যে-নদী মরুপথে হারালে ধারা,
আমি হে জানি তাও হয়নি হারা।

কবির বিশ্বাস যৌবনের মধ্যেই জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যৌবনের মধুর স্বপ্নঘড়িমা ও রসাবেশ কবিকে চিরকালের জন্য "ভাবের ললিত ক্রোড়ে" নিলীন করিয়া রাখিতে পারে নাই—দুঃখদৈন্যজর্জরিত সংসারের বিশাল কর্মক্ষেত্রের আহ্বানেও তাঁহাকে সাড়া দিতে হইয়াছে। দুর্বল অসতর্ক-মুহূর্তে তরল ভাববিহ্বলতার নিকট আত্মসমর্পণ করিবামাত্র কবিচিত্ত ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; "অশ্রুজলে চিরস্নান" এই জগতের করুণ ক্রন্দনকে কবি কোনোদিনই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রকাব্যালোক চিরযৌবনের লীলাভূমি, কিন্তু তাই বলিয়া সেই আনন্দময় জগতে কেবলমাত্র সত্যপুষ্প, চন্দ্র-চকোর ও মাধবী-মাধিমীর ব্যাকুল বিরহ নাই। সেখানে কঠোর কঠোর আহ্বান যৌবনের রঙীন মোহঘোরকে পুড়াইয়া ভাব ছিন্ন ছিন্ন করিয়া দেয়; দুঃখদেবতার রথচক্রধ্বনি ও মৃত্যুর কলগর্জনও সেখানে ধ্বনিত হয়!

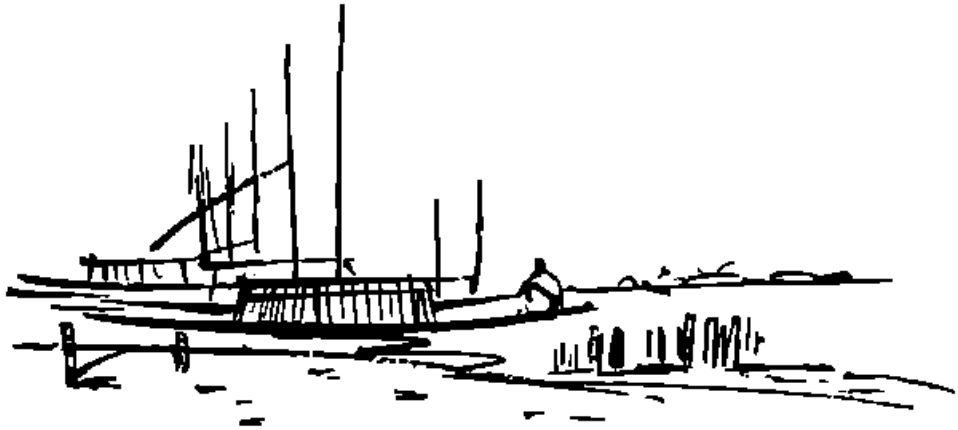

স্বরাজের পথে অছি দেশ

অধ্যাপক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পৃথিবীর নানাদিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের কলোনীগুলি ছড়াইয়া আছে। এই সকল দেশের শাসন ও শোষণ ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে এবং এজন্য অপর কোন শক্তির নিকট উহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। তবে শাসককে নিজ স্বার্থেই শাসিতের প্রতি কিছুটা ভালোরূপ ব্যবহার করিতে হয়। তাহাদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি কিছুটা নজর দিতে হয়। শাসকজাতির নিজ স্বার্থই সেখানে বড় এবং প্রত্যক্ষ, শাসিতের স্বার্থ গৌণ। শাসকেরা মুখে যাহাই বলুক না কেন, তাহাদের নিজ স্বার্থেই পরাধীন উপনিবেশগুলি শাসিত হয়। এজন্যই আজও শাসন ও শাসিতের সংঘাত পৃথিবীর নানাদেশের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিতেছে, সেই সকল অঞ্চলে চলিতেছে শাসক-নীতির নির্লজ্জ অত্যাচার এবং দেশগুলিরও স্বাধীনতালাভের জন্য আমরণ সংগ্রাম।

কিন্তু এই সকল পরাধীন দেশের বাহিরে আরও কতগুলি স্বাধীন দেশ আছে যেখানে শাসক জাতি অতিরিক্তরূপে দেশ শাসন করে—পরাধীন দেশের নিজের স্বার্থেই এই সকল দেশ শাসিত হয়। এই সকল অধিদেশকে স্বরাজের পথে লইয়া যাওয়াই শাসকের উদ্দেশ্য এবং প্রতিবৎসর শাসককে তাহার শাসিত দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট বিবরণ দাখিল করিতে হয়। রাষ্ট্রসংঘের অছি-পরিষদের একটী ক্ষুদ্র চরখণ্ডবিটি প্রতি বৎসর এই সকল দেশের লোকদের অবস্থার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করে এবং অধিবাসিগণের নিজেদের মুখ হইতে তাহাদের অভাব অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্খার কথা শুনিয়া রিপোর্ট দেয়। এই সকল দেশের যে কোন অধিবাসী লিখিতভাবে নিজের, দেশের বা দেশবাসীর কোন অভাব অভিযোগের বিষয় রাষ্ট্রসংঘের গোচরে আনিতে পারে। এরূপ ব্যক্তিগত অধিকার অনেক স্বাধীনদেশের নাগরিকদেরও নাই। প্রত্যেকটী অভাব-অভিযোগের পত্র রাষ্ট্রসংঘ আলোচনা করে ও মতামত দেয়। আবেদনকারী নিজে রাষ্ট্রসংঘের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তব্য বলিতে পারে, রাষ্ট্রসংঘ আগ্রহের সহিত বক্তব্য শুনিয়া থাকে এবং ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পরে যুদ্ধে-পরাজিত জাতিসমূহের শাসিত কতগুলি উপনিবেশ যুদ্ধে জয়ী জাতিসমূহের হস্তগত হয়—ঐ সকল দেশ পূর্বে লীগ-অব-নেশনের ম্যাণ্ডেট (অনুমতি) বলে ঐ সকল জাতি শাসন করিতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) পৃথিবীর ইতিহাস আরও ওলট-পালট হইয়া যায়। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধজয়ী জাতিগণ বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিয়া এই সকল ম্যাণ্ডেট-ভুক্ত দেশসমূহের ভাগ্যির গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে। অবশ্য লীগ অব নেশনের পরিসমাপ্তির পর রাষ্ট্রসংঘ চরু প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী হিসাবেই এই নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু প্রায় সকল জাতি রাষ্ট্রসংঘের এই দায়িত্বগ্রহণের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় নাই। এজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম-আফ্রিকা (প্রাক্তন জার্মাণ উপনিবেশ) আজও অছি এলাকাভুক্ত হয় নাই। অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল এসেম্বলির অধিকাংশ সদস্যই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এই মত স্বীকার করে নাই।

পৃথিবীতে উপনিবেশ-রক্ষণাধীন (Protectorate) বা অপর যে যে কোন নামেই হউক বহু পরাধীন দেশ আছে। শাসক দেশগুলি এই সকল পরাধীন দেশের পঞ্চাশটী দেশকে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ঘোষণার অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে। ইহার বাহিরের পরাধীন দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণার আওতায় পড়িবে কিনা বিতর্কের বিষয়। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণার আওতায় পড়িলেই যে রাষ্ট্রসংঘের এই সকল দেশ সম্পর্কে দায়িত্ব খুব বেশী তাহা নহে—তবে লীগ-অব-নেশনের আমলে এই সকল দেশের সহিত বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের যে সম্পর্ক ছিল, আজ রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পরাধীন দেশসমূহের সম্পর্ক বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কিন্তু দশটী অছিদেশ এবং উহার দুই কোটী অধিবাসী সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্ব খুবই পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ। রাষ্ট্রসংঘের সনদের আদর্শ অনুযায়ী এই সকল অছিদেশের পরিচালন ও শাসন ব্যাপারে রীতিমত খুঁটানুপুঙ্খ পরিদর্শনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে একটী পরাধীন উপনিবেশ বা রক্ষণাধীন দেশের সঙ্গে একটী পরাধীন অছিদেশের কি তফাৎ। বাহির হইতে খুব বড় রকমের পার্থক্য দেখা যায় না ইহা খুবই সত্য। ইটালীর অধীন সোমালীল্যাণ্ড এবং টাঙ্গানিকা এই দুইটী অছিদেশ পূর্ব-আফ্রিকার বৃটিশ কলোনী কেনিয়ার খুব নিকট, আফ্রিকার মধ্যবর্তী বেলজিয়ান কঙ্গোর পাশেই অছিদেশ রুয়ান্ডা উরুন্ডী; আরও তিনটী অছিদেশ—দুইটী কেমারুন, ফরাসী শাসিত টোগোল্যাণ্ডের পাশেই ফরাসী এবং বৃটিশ রক্ষণাধীন (Protectorate) দেশসমূহ। একই শাসন-অধীন একটী অছিদেশ, অপরটী কলোনীমাত্র—কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট এবং মৌলিক। শাসকদেশ নিজের নিজ অধিকার বলে উপনিবেশ বা কলোনী শাসন করে, কিন্তু উহা যখন একটী অছিদেশ শাসন করে—এই শাসনের অধিকার সে পায় রাষ্ট্রসংঘের চুক্তি হইতে। চুক্তির সর্ত এই যে শাসিত অধিবাসীগণকে শাসক একটি উন্নত আদর্শে পৌঁছাইয়া দিবে। এই সকল অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত-শাসনে স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অবস্থানুযায়ী এই আদর্শে পৌঁছিতে অল্প বা বেশী সময় লাগিতে পারে।

অছিদেশসমূহের সংখ্যা দশটী মাত্র। গত দুইটী বিশ্বযুদ্ধে যে সকল অঞ্চল একেবারে নিরাজ্য বা 'শিশুরাষ্ট্রহীন' হইয়াছে তাহারাই অছি-দেশে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক অছিদেশ সম্বন্ধেই পৃথক পৃথক চুক্তি হয় এবং পালকদেশ চুক্তি মতে রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী সমস্ত অধিকার পায় এবং শাসন প্রবর্তন করে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা (প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশ) লীগ-অব-নেশন্সের মাণ্ডেট-ভুক্ত দেশ হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে ইহাকে অছিদেশ বলিয়া স্বীকার করে নাই।

রাষ্ট্রসংঘের অধীন অছি এলাকাগুলি :—

অছি দেশ	পালক দেশ	জনসংখ্যা	দেশের পরিমাণ (বর্গ মাইল)
(১) ক্যামারুন্স	যুক্তরাজ্য	১৪,০০,০০০	৩৪,০৮১
(২) ট্যাঙ্গানিকা	যুক্তরাজ্য	৮২,০৪,৪০০	৩,৫২,৬৮৮
(৩) ক্যামারুন্স	ফ্রান্স	৩১,০০,০০০	১,৮৮,৭৪৭
(৪) টোগোল্যাণ্ড	ফ্রান্স	১০,৭০,০০০	২১,২৩৬
(৫) রুয়ান্ডা-উরুণ্ডি	বেলজিয়ম	৪২,৭০,২০৫	২০,৮১৩
(৬) সোমালীল্যাণ্ড	ইটালী	১২,৬৩,৫৪৮	১,৪৪,০০০
(৭) পশ্চিম স্যামোয়া	নিউজিল্যাণ্ড	৮৬০০০	১,১০৩
(৮) নাউরু	অষ্ট্রেলিয়া	৩,২৪৪	৮২
(৯) নিউগিনি	অষ্ট্রেলিয়া	১১,০০,২৪০	৯৩,০০০
(১০) প্যাসিফিক দ্বীপসমূহ	যুক্তরাষ্ট্র	৬৪,২৮০	৬৮৭

রাষ্ট্রসংঘের তিনটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান—অছিদেশগুলি রীতিমত পরিচালিত হইতেছে কিনা এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে। অছি দেশসমূহের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল অ্যাসেম্বলি—এই প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেক সদস্য দেশের প্রতিনিধি রহিয়াছে। কিন্তু অছিএলাকার প্যাসিফিকদ্বীপসমূহ (যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন) সামরিক গুরুত্বের জন্য সাধারণ পরিষদের অধীন নহে, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সিকিউরিটী কাউন্সিল ইহার তত্ত্বাবধায়ক। রাষ্ট্রসংঘের সনদের বিধান অনুযায়ী অছি-পরিষদ বা ট্রাষ্টীশিপ কাউন্সিল সাধারণ এবং নিরাপত্তা পরিষদকে এই সকল দেশের প্রতি অছির কর্তব্যপালনে সহায়তা করে।

অছি-দেশসমূহ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণ পরিষদে উহা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে পাস হওয়া দরকার। যে সকল রাষ্ট্র অছি-দেশ পরিচালনা করে তাহারা অছি-পরিষদের সভ্য। চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার অধীনে কোন অছি-দেশ নাই, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে ইহারা অছি-পরিষদের স্থায়ী সভ্য। ইহা ব্যতীত সাধারণ পরিষদ প্রতি তিন বৎসরের জন্য অছি-পরিষদে অপর পাঁচজন সভ্য নির্বাচিত করিয়া থাকে। ১৯৪৪ সালের পূর্বে ইটালী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য না হইয়াও অছি-পরিষদের সভ্য ছিল। কিন্তু ইহার কোন ভোট দিবার অধিকার ছিল না। ১৯৪৪ সালে ইটালী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ইহা এখন অছি-পরিষদের 'পূর্ণ' সদস্য হইয়াছে। ইটালী একটী পরামর্শ সভার সাহায্যে সোমালীল্যাণ্ড শাসন করে—এই সভার সভ্য ইথিওপিয়া, কলম্বিয়া এবং ফিলিপিন দেশের প্রতিনিধি।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে অছি-পরিষদ নিম্নলিখিত ১৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত ছিল :

পালক সভ্য :—অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী, নিউজিল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

অ-পালক সভ্য : চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, (এবং নির্বাচিত) মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, হাইতি, ভারত ও সিরিয়া।

প্রতি বৎসর অছি-দেশের পালককে সাধারণ পরিষদে (সামরিক গুরুত্ব অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে) রাষ্ট্রসংঘের অছিসিরির মূলনীতি ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বার্ষিক বিবরণী পেশ করিতে হয়। কোন্ কোন বিষয়ে বিবরণী দিতে হইবে অছি-পরিষদই তাহা নির্ধারণ করে। অছি-পরিষদে সমালোচনা এবং প্রশ্নের আর শেষ নাই—এই সকলের জবাবে শান্তিত জাতির মুখকোপের অনেক সময় দেশের রাজনৈতিক ধন, হাঁড়িকুড়ির আমদানী রপ্তানী, দেশের বহির্বিবাহের কারণ, জলের সরবরাহের কলের সংখ্যা প্রভৃতি বহু খবর পাওয়া যায়।

পালক অবশ্য বিবরণীতে নিজেদের সন্তোষজনক এবং সদুদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে সমাধানের উপায় নির্দেশ করে। এই মতের সহিত পালিতের মতের মিল হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। তাহারাও নিজেদের মত যাহাতে প্রচার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও আছে।

এজন্যই সেই সকল দেশ পরিদর্শনের প্রথা আসে। তাহাদের নিকট হইতে যে সকল আবেদন পাওয়া যায় তাহারও পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের দরকার হয়; অছি-দেশের যে কোন পুরুষ, নারী বা শিশু তাহাদের আশা, আকাঙ্খা, অভিযোগ এবং দাবীর বিষয় সরাসরি রাষ্ট্রসংঘকে জানাইতে পারে—কাহারও মারফৎ আবেদন পাঠাইতে হয় না। প্রতিবৎসর অছি-দেশের ভিতরের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাহিরের হাজার হাজার লোক, ব্যক্তিগতভাবে, দল বাঁধিয়া বা ছোট বড় সমিতির মাধ্যমে এই অধিকারের সুবিধা গ্রহণ করিতেছে।

অদ্ভুত রকমের চিঠিপত্র পাওয়া যায়—হয়ত টোগোল্যাণ্ডের একটা ছেলে লিখিল—কবে তাহার গ্রামে রেল লাইন যাইবে। আরেকজন কেহ জানিতে চাহিল—কবে তাহার দেশ স্বাধীনতা পাইবে। একজন ক্যামারুন-জয়ী যন্ত্র একখানি কাঠের পায়ের জন্য আবেদন করিল। পশ্চিম স্যামোয়াবাসী স্বায়ত্বশাসনের জন্য দরখাস্ত করিল। এক প্রশান্ত-সাগরীয় দ্বীপের নারীরা জানাইল—তাহাদের পুরুষগণ যাহাতে বড় মদ অল্প পরিমাণে খায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মেগোটিপিও হইতে পাথর গাড়ীর চালকেরা বেশী টেক্স দিতে হয় বলিয়া প্রতিবাদ জানাইল। এই সকল আবেদন কেবল চিঠি লেখা, আর ডাকে পাঠান নহে—ইহা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশী। আবেদনকারী নিজে রাষ্ট্র-

সংঘের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা বিবেচনা করিয়াছে কিনা তাহা জানা যায় নাই। আবেদনের বক্তৃতা সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হয় এবং তাহাতে কিছু অতিরিক্ত থাকিলে নিষ্পত্তি করা হয়। ১৯২৬ সনের শেষের দিকে আফ্রিকায় ছয়টী অভি-দেশের প্রায় ছুড়িজন প্রতিনিধি অভি-পরিষদ এবং সাধারণ-পরিষদে অনেকবার উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েকজন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে এবং কেহ কেহ দেশের কথিত জাতীয় অধিকারের কথা বলিতে আসিয়াছিল।

অবশ্য স্বীকার করিলেই সবকিছু পাওয়া যায় ইহা না হইলেও স্বীকার করা এবং উহার বিবেচনার মধ্যে যে অধিকার সূচিত হয় তাহার গুরুত্ব খুবই। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে—তাহাও কম কথা নহে। এই কারণেই প্রতি বৎসর পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত হইতে হাজার হাজার আবেদন-নিবেদন রাষ্ট্রসংঘের দরবারে প্রেরিত হয়।

আর এক উপায়ে অভি-পরিষদ আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্পাদনা করে। এই সকল অভি-দেশে পর্যবেক্ষক বা পরিদর্শক হয়ে পাঠান হয়—তাহাদের বলা হয় অভি-পরিষদের "চক্ষু এবং কর্ণ"। ইহারা অভি-দেশে যাইয়া যাহা কিছুর তদন্ত করে। শাসকর্তাদের এই তদন্তে আপত্তি করে না। লীগ-অব-নেশন্সের সহিত এইখানে রাষ্ট্রসংঘের ম্যাণ্ডেটের দেশ ও অভিদেশের পার্থক্য।

১৯২১ সন হইতে এরূপ তদন্তের কাজ চলিতেছে। অভিপরিষদের নিয়ম এক এক এলাকায় ৩টী অভিদেশ একবৎসরে পরিদর্শন করে। প্রতি তিন বৎসরে এইভাবে প্রত্যেক অভিদেশ একবার পরিদর্শন হয়। সাধারণতঃ পরিদর্শক মিশনে চারিজন সভ্য থাকে—দুইজন পঞ্চক দেশের এবং দুইজন অ-পঞ্চক দেশের প্রতিনিধি। ১৯২৬ সনে, বেলজিয়ম, ডাচ এবং ইংলণ্ডের প্রতিনিধি উগাণ্ডায়াতে মিটউইর হইতে পশ্চিমে রওনা হইয়া মহাসাগর অভিমুখে কঙ্গো প্রশান্ত-সাগরীয় বীপমধ্যে অবতরণ করে এবং স্থল ও যানপাত্রাদি পরিদর্শন করে, আর স্থানীয় লোকদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করে। সেখান হইতে পরে তাঙ্গানিকাতে যেয়া, যায় মিটউইর রাস্তায় ষ্টেপ-গাড়ীতে—স্থানীয় শাসনকর্তা, চাকুরে এবং মিশনারীর সহিত তাহাদের আলাপ-আলোচনা হয়; আমোদার সর্দার ও নেতারা তাহাদের অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপর তাহাদের চোখে পড়ে বাটক বীপের মূল্যবান কফিক্ষেট কোরাল ঈষির বিরাট অরণ্য। বহু বৈচিত্র্যময় এই অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা করতে করতে মিশনের সভ্যরা ফিরিয়া যায় মিটউইর্কের হেডকোয়ার্টারে।

ইহার পূর্ব বৎসর মিশন গিয়াছিল পশ্চিম আফ্রিকায়। কাজ প্রায় একরকম। কিন্তু সেখানকার লোকেরা বেশী সজাগ, লেখাপড়ায় একটু অগ্রসর এবং রাজনৈতিক চেতনাও বেশী। মিশনের পদে পদে তাহাদের সহিত কথা বলিতে হইয়াছে, তাহাদের বহু বক্তৃতা মুদ্রিতরূপ এবং স্মারক পুস্তিকে হইয়াছে। আর গ্রহণ করিতে হইয়াছে বহু আবেদন-নিবেদন পত্র।

অভি দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে টেঙ্গানিকা—লোকসংখ্যা আট লক্ষের উপর—সর্বাপেক্ষা ছোট নাউরু—লোকসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশী। কামারুণ-টগোতে চল্লিশ লক্ষের বেশী লোক দুই ও বন্দুক পার্শ্বতা দেশে ঠাসাঠাসি করিয়া বাস করে। ইটালীয় সোমালী-ল্যাণ্ডে পনরলাখ যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর অধিবাসী সমস্ত তীরবর্তী উষর দেশে ছাগপুত্র লইয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মিটউইর লক্ষ লক্ষ লোক মাত্র কিছু দিন পূর্বে মহা-সমরকালের আওতায় আসিয়াছে।

প্রতিদিনই এই সকল দেশের চেহারা বদলাইতেছে। বিভিন্ন অভি-দেশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কয়লী ক্যামারুনে আধুনিক কারখানা ও সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মাত্র কিছুদূর ভিতরে কয়েক শত মাইল গেলে, সাহারা মরুভূমির পাশে, দেখা যায় ক্যাথলেতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গভীর অরণ্য! সেখানে দেখা যায় রৌদ্রে শুকান ইটের বাড়ীর সহর, পাগড়ী-পরা সর্দার, রঙীণ পোষাকের অন্তরোহী, নিদ্রা ও বাজারের বাজ—মনে হয় যেন ইহা এক মধ্যযুগীয় মুসলীম রাজ্য। রুয়ান্ডা-উরুণ্ডিতে পাহাড়ে ধান্য কাটিয়া কত যত্নের ফসল চাষ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের কোরোল ঢেউ—আর মনোরম নারিকেল গাছের শ্রেণী এবং মিটজিল্যাণ্ডের অন্যান্যে পার্বত্য যাযাবরীর মাথায় তুষার লাঞ্ছন—এই পরস্পর বহু ব্যবধানে অবস্থিত অভিদেশগুলির বিভিন্ন রূপ কতই না আগ্রহের সঞ্চার করে।

দেশে দেশে বিভিন্নতা ত বটেই, দেশের মধ্যেও মানুষের চেহারা বিভিন্ন। টেঙ্গানিকার যেথা যায় বাসাই জাতির লোক পশু চরাইতেছে, আরবীয় ছেলে স্কুলে যাইতেছে, আর যেথা যায় ইউরোপীয় সিসল তন্তুর কুঠীয়াল বা প্লাণ্টার। ক্যামারুণে যেথা যায় একদিকে ফরাসী বাইবিং বা খনির ইঞ্জিনিয়ার, অপর দিকে উষ্ট্র ভূমিতে পশু পালন করিতেছে ফুলানী জাতের লোক। মিটজিলির পর্বতে পাথরের কুঠায় লইয়া আরও কুদ্র শিকারী ঘুরিয়া বেড়ায় পশুর সন্ধানে। ক্ষুদ্র নাউরু দ্বীপে দেখা যায় চীনা প্রমিক কস্ফেট খুড়িতেছে, আর প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপে চোখে পড়ে সাইপেনা চর্মশিল্পীর বা নৌকা নির্মাতা। মাঝে মাঝে দেখা যায় পাদরি মেয়ের—এমনকী রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞগণ ছোট ছোট দলে কর্মব্যস্ত। ইউরোপীয় কার্পাস বা চাষী, কুঠীয়াল, খনির মালিক এবং ব্যবসায়ীও দেখা যায়—খুব অল্প সংখ্যায়—টেঙ্গানিকা, ক্রেকক্যামারুণ বা মিটজিলি অঞ্চলে। বড় বড় সহরে বহু জাতের মানুষের মধ্যে দেখা যায়—ব্যবহারজীবী, ডাক্তার, ব্যবসাদার, ফিরিওয়ালা এবং আরও কতকি।

যখন আমরা সংখ্যাধিক্যের কথা বলি, আমরা গ্রামাঞ্চলের লোকের কথাই মনে রাখি। পল্লী-অঞ্চলের লোকেরা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। অপরের সহিত তুলনা করিলে ইহাদের জীবনযাত্রার মান খুবই ছোট এবং তাহাদের জীবনের পরিবেশ সমতলই নিরক্ষরেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিদেশের লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী, যার করে সে নিজের এক বা একাধিক স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা লইয়া পরিবার জঙ্গল কিম্বা কৃষ্ণাঞ্চলিত সমতল ভূমিতে। সে পালন করে কয়েকটা ছাগল বা

অনেকগুলি গরু মহিষ। ঝড়ে জলে তিতিয়া বা রৌদ্রে পুড়িয়া যে খাদ্য উৎপাদন করে তাহা খাইয়া-পরিয়া জীবন যাপন করে। সে আর তাহার পরিবারের লোকেরা সাধারণতঃ খাদ্য উৎপাদন করে নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য—অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে সাধারণতঃ তাহা বিক্রয় করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কেনে।

তাহার জগত ক্ষুদ্র জগত। তাহার জগতের সীমা অনেক সময় গ্রামের সীমার শেষ বা কাছাকাছি শহরের সীমা পর্যন্ত, বড় জোর হাটের জাতের লোকেরা যতদূর পর্যন্ত বাস করে সেই পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু সে মাঝে মাঝে বহির্জগতের খবর পায়, বিশেষতঃ যখন শাসক-জাতির কর্মচারীকে দেখে। লেখাপড়া প্রায় কেহই জানে না, যাহারা মিশনারী স্কুলে পড়িয়াছে হয়ত কিছু কিছু সাধারণ জ্ঞান। ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ কিছু লেখা-পড়া শিখিতেছে।

অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রথম আনুগত্য জাতির সর্দার বা চীফের প্রতি। এই সকল সর্দারের উপরে অবশ্য জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার বা চীফ আছে। ইহার উপরেও এক ইউরোপীয় শক্তি আছে ইহাও হয়ত তাহার জানা। তাহার জাতের কিংবদন্তী, বিশ্বাস, আচার ব্যবহার, সূত্র বা কুসংস্কার, পূর্বপুরুষের ধর্ম যদিও কিছুটা কিম্বা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে কিন্তু লোপ পায় নাই এবং এই সকলই তাহার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু আদিম লোক যে একেবারে আদিম আছে তাহা নহে। আজ শাসকের ক্ষমতার অপব্যবহার, অসহন মৃত্যু এবং মহামারীর ভয় কমিয়াছে। পুরাতন সংস্কার আর পূর্বের মত নাই। বাহিরের জগত আজ আনিয়াছে নূতন জ্ঞানের আলো। নূতনের শক্তি তরুণদলে প্রাণ লইয়া উঠিতেছে। আজ সে বেশী খাদ্য, ভাল খাদ্য ফলাইতে শিখিয়াছে। এমন সব ফসল সে ফলায়, যাহা দেশের বাহিরের বাজারে বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়। আজ তাহার দেশে রাস্তা-ঘাট তৈরী হইতেছে, সে পথে পণ্যের দ্রব্য আমদানি রপ্তানী হয়। স্কুল, ডাক্তারখানা, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র—তাহার দেশের ভিতরে নানা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

অবশ্য এই সকল উন্নতি খুব সহজে হয় নাই। পূর্ব-আফ্রিকায় লোকের অকর্মণ্য গরুর সংখ্যা কমাইতে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ বহু গরুর মালিকানা ছিল সেবেশে বহু সম্মানের। পশ্চিম আফ্রিকার লোকেরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাইতে চাহে নাই—কারণ মাঠে কাজ-করা ছেলে অপেক্ষা স্কুলে-পড়া ছেলের মূল্য যে বেশী একথা তাহাকে বুঝান খুবই শক্ত।

সকল আধুনিক উন্নতিতেই যে তাহাদের মঙ্গল হইয়াছে তাহা নহে। ইউরোপীয় খনির কাজে মজুরীর লোভে লম্বা সফরের জন্য মজুরী তাহাদের ক্ষতি করিয়াছে। আত্মাপূর্ণ গ্রাম ছাড়িয়া তাহাকে অস্বাস্থ্যকর বস্তীতে বাস করিতে হইতেছে। স্কুল, ডাক্তারখানা খুব বেশী হইয়াছে কি? যাহারা অল্প লেখাপড়া শেখে অল্প দিনেই তাহা ভুলিয়া যায়। আবার সে বিষয়ও।

রাষ্ট্রসংঘ তথা উহার সাধারণ পরিষদ এবং অছি-পরিষদ সকল সময়ই অছি-দেশসমূহের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। অছি-দেশের অধিবাসিগণের বাসনা যাহাতে বাড়ে, কৃষ্টি উন্নত হয়, উৎপাদন এবং খাদ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, সমবায় যাহাতে সমভাবে প্রচারিত হয়, রাস্তা, স্কুল এবং আরোগ্যশালা যাহাতে নির্মিত হয়, শিক্ষক-শিক্ষণ ও ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধি—প্রভৃতি বিষয়ে সকল সময়ই রাষ্ট্রসংঘ সজাগ। শাসকদেশসমূহকে এই সকল বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্য। বহির্জগতের সহিত সম্পর্কে আসিয়া এই সকল দেশের লোকের মানসিক চেতনা হইয়াছে—শিক্ষা ইহাদিগকে আধুনিক গণতন্ত্রের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে। শিক্ষাই গণতন্ত্রের সাধক, বাধক এবং পরিশোধক। কিন্তু শিক্ষা সকলে এক সঙ্গে পায় না। সহরে খনিঞ্চলে এবং যেসকল স্থানে গবর্নমেন্টের আপিস সেই সকল স্থানের লোকেরা বহির্জগতের সহিত বেশী সম্পর্কে আসে এবং প্রথমে শিক্ষিত হয়। একটা ছোট শিক্ষিতের দল এইরূপে গড়িয়া উঠে এবং ইহারাই দেশের প্রতিপত্তি ও প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার করে। শিক্ষিতের মধ্যেই কেহ কেহ বিদেশে যাইয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। এই উচ্চশিক্ষিতেরাই হয় দেশের নেতা। পুরাতন আচার ব্যবহার, জাতির বংশগত প্রভুত্বের এবং 'বিদেশী' শাসকের অধিকার হয় বিরুদ্ধ-যুক্তির সম্মুখীন। ক্রমেই নূতন চিন্তাধারা দেশের লোকের মনকে প্রবেশ করে। শাসক বলে প্রতিনিধির স্থান, ভোটাধিকার, রাজনৈতিক দল গঠন, দেশের শাসননীতি এবং আইন প্রণয়নে কর্তৃত্ব, স্বায়ত্বশাসন কিম্বা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার—প্রকৃতি নানা রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। কোন কোন অছি দেশ এই সকল বিষয়ে বেশ কিছু অগ্রসর হইয়াছে, আবার কোথাও সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই ক্রমবিকাশমান মনের সভ্যতা। শাসকগণকে এই আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত থাকিয়া দেশকে অগ্রগতিতে সহায়তা করিতে হয়। প্রতিনিধিগণকে সকল কাজে সংযোগিতার জন্য আহ্বান করিতে হয়। কি শাসন কার্যে, কি বিচার কার্যে—জেলা পর্ষদ, গ্রামপঞ্চায়েৎ গঠনে নির্বাচনের প্রবর্তন করিতে হয়। কারণ এই সকল অছি-দেশের আদর্শ পূর্ণস্বরাজ লাভ এবং জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন। শাসক জাতি-সমূহের তথা রাষ্ট্রসংঘের কর্তব্য এই আদর্শে যথাসম্ভব অল্প সময়ে পৌঁছিতে সহায়তা করা।

গত ৬ই মার্চ ১৯৫৭ ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড (পশ্চিম আফ্রিকা ট্রাষ্ট টেরিটরি) গোল্ডকোষ্টের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীন 'ঘানা' রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। আর দশ বৎসর পূর্বে টোগোল্যাণ্ড অছি-দেশ মুক্ত হয় এবং এই স্বল্পকালের মধ্যেই ইহার স্বাধীনতা লাভ অছি-দেশসমূহের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচনা করে। আর একটা দেশ সোমালীল্যাণ্ড—১৯৬০ সনে স্বাধীনতা লাভ করিবে স্থির হইয়া আছে। যাহাতে এই দেশ আর্থিক ও অন্যান্য দিক হইতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহার আয়োজন চলিয়াছে।

গোল্ডকোষ্ট স্বাধীনতা পাইবে স্থির হইয়া গেল, কিন্তু পার্শ্ববর্তী অছি

টোগোল্যাণ্ড অঞ্চলের বিস্তার ১৩,০০০ বর্গমাইল পর্যন্ত, তাহার কি গতি হইবে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ইহাই একটা সমস্যা। ১৯৪৪ সালের কথা। একটি বিশেষজ্ঞ সেক্রেটারিয়েট সমস্যার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য পাঠান হইল। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সমস্যাটী বিচার করিলেন এবং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নিম্নের প্রস্তাব পেশ করিলেন। সাধারণ পরিষদ স্থির করিল যে বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডের লোকেরা নিজেরাই স্বল্প ভোটে দ্বারা স্থির করিবে যে তাহারা গোল্ডকোষ্টের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা চায় কিনা—কিম্বা তাহারা আরও কিছুদিন অভিভাবকত্বে থাকিবে। রাষ্ট্রসংঘের পরিচালনাধীনে ১৯৫৬ সালের ৯ই যে ভোটে গণভোট লওয়া হইল—তাহার ফলে ৯৩,৪৯৯ এই মিলন ও স্বাধীনতা লাভের স্বপক্ষে এবং ৩৭,৫২২ এই মিলনের বিপক্ষে। সাধারণ পরিষদ উহার এলাকাধীন অঞ্চলে স্থির করিল যে—সেখানে গোল্ডকোষ্ট স্বাধীনতা পাইবে সেই দিনই ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড ঐ দেশের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবে এবং ঐ দেশের আলাদা এবং উল্লেখ্য কিছু হওয়ার উহা আর অস্তিত্ব থাকিবে না।

পৃথিবীর জনমত চায় শান্তি—বিশ্বশান্তি। এই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদেশের স্বাধীনতা লাভ প্রয়োজন। ইহা রাষ্ট্রসংঘ স্বীকার পাইয়াছে। কিন্তু সকলেই সমান অগ্রসর নহে। খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অভাব বহুদেশে আরও পূর্ণ মাত্রায়। এই সকলের সমাধান না করিলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্থহীন, বিশ্বশান্তি ত দূরের কথা। তাই রাষ্ট্রসংঘ ও ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ অবিরাম গতিতে যাহাতে পাক সমস্যার সমাধান, আর্থিক উন্নয়, শিক্ষার এবং শিল্প ও কৃষির প্রসার, বিশ্বমানবের মিলন ও সহযোগিতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে।

কবি শশাঙ্কমোহন সেন

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

বঙ্গভারতীর মন্দির প্রাঙ্গণে যারা এই শিশু পরাকেই 'বঙ্গসাহিত্যের একজন সুরাজাজ্ঞ অথচ অকৃতী সেবক' বলে সমাহিতচিত্তে মাথা নত করে দান গেয়েছিলেন। তাঁর দানের সুরে ও ভাব-মহিমায় মুগ্ধ বঙ্গবাসী সেই অখ্যাত অথচ অকৃত্রিম সাহিত্য সাধককে অভিনন্দিত করেছিলেন, বিনম্র সরলে একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আপনার ভাষা ও ভাবকলা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য'। কিন্তু বঙ্গবাণীর এই শক্তিমান কবি শশাঙ্কমোহনের ভাগ্যকুঞ্জে সাহিত্যরস-পিপাসু মধুকরের গুঞ্জন অদ্যাবধি রুদ্ধ হয়ে রেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যে মানুষ নিজেরই পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে—যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, তারা তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো; তারই থেকে জ্বলে ভাবীকালের পথের মশাল, আর ভাবীকালের মুখের প্রদীপ।' সমালোচক শশাঙ্কমোহন কবি-মাহাত্ম্য নির্দেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রত্যেক প্রকৃত কবি নিজের কোন বিশেষ মায়াত্মা ও অননুকরণীয় বিশেষত্ব গুণেই—কবি-সাধকের ব্যক্তিত্বটুকুই সর্বদা এবং সর্বত্র, সর্বপ্রধান কথা। উহাই ভাষাটীর সাহিত্যের, মৌলিকতার চিরন্তন আধারের নিদান।' শশাঙ্কমোহনের রচনায় তাঁর নিজের পরিচয়, অননুকরণীয় বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়। গভীর সৌন্দর্যানুভূতি, মৌলিকতা, উচ্চ ভাবাদর্শ, ভাষার সৌষ্ঠব, কল্পনাশক্তির উদ্দামতা ও অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি শশাঙ্কমোহনের রচনায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তবু তিনি আজো যথার্থ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেননি, অবিচ্ছিত ভাবী-কালের সুবিচার তিনি পাবেন কিনা, কে জানে? শশাঙ্কমোহন নিজেই বলে গেছেন, 'সাহিত্যের চরম বিচার প্রণালী নির্মম ও নিরপেক্ষ পদার্থ। অনন্ত কালপ্রবাহের স্রোতোমুখে সর্বপ্রথমে আত্মত্বের উপর নির্ভরে দাঁড়াইতে না পারিলে এইরূপ বিচার লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়না।' কিন্তু শশাঙ্কমোহন নিজে সেই যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কমোহন স্বভাব-কবি ও ভাবুক। সিন্ধু জননীও শৈলশিখরই তাঁকে ভাবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল। তিনি রচনা করেছিলেন—"সিন্ধু-তটের কর্ম প্রণোদনা ও জ্ঞান প্রেম সৌন্দর্যের আদর্শে সমুজ্জ্বল কাব্য 'সিন্ধুসঙ্গীত', শৈলতটের প্রেম স্বাধীনতা ও ধ্যানগত নাট্যকাব্য 'সাবিত্রী', অতুলনীয় ভাবসম্পদ-সমৃদ্ধ প্রেমগাথা 'স্বর্গে ও মর্ত্যে', নব্য শিবসুন্দরের অনুভূতিমূলক নানা ভাবসঞ্চোয়ন গীতিকাব্য 'ব্যোম সঙ্গীত', ভারতের অধ্যাত্মলোকে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিভিন্ন আদর্শমূলক 'সাধনার দ্বন্দ্ব ও তার পরাজয়ের কাহিনী 'বিশ্বামিত্র', 'দক্ষিকেতা', 'তপতী' ও বহু অপ্রকাশিত গদ্য কাব্য। তাঁর অভিনব প্রেমগাথা 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সাহায্যে আমরা এই 'অকৃতী সেবক'র কাব্য কৃতিত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

আর্য কবিশিষ্ট শশাঙ্কমোহনের সর্বোত্তম সৃষ্টি "স্বর্গে ও মর্ত্যে"। জনৈক সমালোচকের মতে এই হলো "finest loveatory ever written"। এই কাব্যের অনবদ্য শিল্প মাধুর্য, সসীমের সঙ্গে অসীমের সমন্বয়-সাধন নৈপুণ্য ও প্রেমাশ্রুধারাপুষ্ট বিরহমিলন বিস্ময়-

কয়! এই একটিমাত্র কাব্যে কবির সমগ্র কবিপ্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কাব্যরসপিপাসু পাঠক-পাঠিকা 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' বর্ণিত প্রেমসুধা পান করে তৃপ্তি লাভ করবেন। আরতীর সত্যতা ও কৃষ্টির মর্মমূলনিহিত অবতারবাদ এই কাব্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রাগিকারায় উজ্জ্বল সমারোহে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গীতার আদর্শ ও অধ্যাত্মবাদ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। একদিকে যৌবনের প্রাণপ্রবাহ, অপরদিকে দেবাদিদেব মহাযোগের ধ্যানগম্ভীর ভাবমূর্তি—মহামানবতার প্রতীক। দার্শনিক কবি মঙ্গলের পদচিহ্ন অঙ্কন করেছেন এই কাব্যে। পৌরাণিক আত্মাকে আধুনিক ভারতীর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন তিনি। এ যেন রবীন্দ্রনাথের দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়কে দেবতা' করবার গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্ন।

এই ধরণীতে বসে স্বর্গসুধা লাভ করা কি সম্ভব? প্রিয় বিরহ বিধুর মর্ত্যের আকুল আহ্বানে স্বর্গ কি সুলভ ও সহজলভ্য হবেনা?

এই আধ্যাত্মিক জবাব মেলে কবির এই কাব্যে।

কাব্যের নায়িকা সুকুমার বয়স থেকেই অন্তরে অন্তরে অনন্তের পথের সন্ধানী। সে—

'শুকতারা সিন্ধুনীরে আকাশের মুখপানে
রেখাঙ্কিতা একাকিনী, স্থির বিরহিনী যথা।
বালার নাহিক তপন, করিয়াছে অন্তর্ধান
সে রূপের অভিলাষে বিশ্ব বিমোহন।'

মহাসমুদ্র সঙ্গমাভিলাষিণী চঞ্চলগামিনী প্রবাহিনী দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে, তার এই আত্মবিস্মৃতির উদাস উল্লাসের তরঙ্গ প্রবাহ কি রোধ করা যায়?

'স্বর্গে ও মর্ত্যে'র প্রথম সর্গে প্রেমের বেদনবিধুরতা, দ্বিতীয় সর্গে সন্ধানী চিত্তের আকুল জিজ্ঞাসা:

'কে আছে এ বিশ্ব মাঝে
হৃদয় খুঁজিছে যারে, ডাকিতেছে উতরায়!'

তৃতীয় সর্গে নায়িকার মনভুলানো সম্মোহন মূর্তি ও সুন্দরের ছায়া বর্ণনা। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নায়িকা বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীভূতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার অন্তরে অসীমের ক্রন্দন, আনন্দের আকুতি। এই হলো 'Dark night of the Soul', দুঃখের এই অমানিশা শেষে অমৃতের সন্ধান পেয়ে ভক্ত ধন্য হয়। সুন্দরের সুমধুর বাঁশরির ডাকে এগিয়ে চলেছে বালা। তার—

'আকুলে উড়িছে বেশ, মুখে নাহি বাক্য লেশ
আকুল পিপাসা ক্ষুধা দু'নয়নে ভাসে।'

দূর বনপথে সে দেখল এক ভয়ংকর অনন্ত রূপ:

'বালার অনন্ত ঘুম, চৌদিকে অনন্ত জল
কোথায় লুকায় ধরি, যায় কার কাছে?
বালার একটি মালা, চৌদিকে অনন্ত জ্বালা
চৌদিকে সহস্র বায় পশিয়া আসে।

অনন্তের মাঝে পড়ে বালা ছটফট করে
যেন রেণু কণা যদি স্থান নাহি পায়।'

চতুর্থ সর্গে সত্য ও ছায়া রূপ, পঞ্চম সর্গে সংশয় ও প্রত্যয়ের দ্বন্দ্বাবর্ত।

ছায়া ও কায়ার মিলন রূপে—

"ঊর্ধ্ব হতে অতীন্দ্রিয় বাঁশরীর সাড়া
অনন্ত অদ্বৈত শান্ত আসে অনুক্ষণ।"

সপ্তম সর্গে মধুমোহন প্রেমডোরে বাঁধা পড়লেন, নায়িকার তপস্যা সিদ্ধির গৌরবে ধন্য হলো।

বৈষ্ণব ও বৈদেশিকের সন্ধিক্ষণে বৃন্দাবনবাসিনী বালা নবযৌবনোদ্ভাসা তো শ্রীরাধিকার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তারই সঙ্গে সঙ্গে গোপ-বালকেরও আত্মদর্শন ঘটেছিল। পরম ভক্ত বৈষ্ণবের মতো কবি সেই মিলনমুগ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে মধুমোহনের স্তুতিগান করেছিলেন:

'হে অনঙ্গ হে অচ্যুত, হে শিব সুন্দর
হে নিত্য হৃদয়রাজা প্রভু লোকেশ্বর
পড়িয়াছে ধরা।'

সপ্তম সর্গে কবির কবিত্বশক্তির চরমোৎকর্ষ। এখানে, বৈষ্ণব কবি-সুলভ সহজিয়া সুর নেই, আছে নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনজনিত অফুরন্ত শাশ্বত পুলকাবেশ। বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ অভিসার বিরহ মিলন মানুষের সঙ্গে দেবতার নিবিড় পরিচয় করিয়ে দেয়। শশাঙ্কমোহনের এই 'প্রিয়াৎ প্রিয়তর' মধুমোহন পুরুষোত্তম মূর্তি, জ্ঞান ও ধ্যানলোকে সমাসীন। তিনি মোক্ষদায়ী। যুগে যুগে কবি ও ভাবুকেরা এই জীবন-দেবতারই আরাধনা করে গেছেন।

"তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরমং নিধানম্,
সনাতনত্বং পুরুষো মতো মে।"

শশাঙ্কমোহনের কথায়:

অনাবৃত সত্য সন্নিধানে
অগ্নির বিধানে, সেই জ্যোতির বিধানে
সীমা অসীমায় লীন, বারিবিন্দু বিলীন সাগরে।
অনন্ত পরমা শান্তি বিশ্ব সিন্ধুময়
শান্ত শিব অদ্বৈতের স্বয়ম্ভু অক্ষয়।

শান্ত শিব অদ্বৈতের বৈজয়ন্তী সুরই এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য।

বিরহের অমানিশায় বিরহিণীর অনন্ত বেদনা-বিহ্বল, রসসম্ভার নৃত্য। যমুনা উজান বহে না, বিহগকুল স্তব্ধ, সমগ্র প্রকৃতি নীরব ব্যথাতুর।

এই বিরহের চিত্র বৈষ্ণব-কবির বর্ণনার সমকক্ষ না হলেও তা'তে যে কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, কাব্য-রসিকের কাছে তা' সহজেই ধরা পড়ে।

প্রেমিকের মিলন-চিত্রে প্রেমিক সম্পূর্ণহীন, একাকিনী, প্রেমিকের পত্রাঘাতে সে যে তার সমস্ত নিবেদন করে দেয়িনী সেকেছে :

"আজি মিলনদল
আজি আমি নহি আর সবার সকল
আজি আমি একা—আজি আমি অকূল অতল।"

এ যেন সাধকের চরম আত্মোপলব্ধি, আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের ব্রাহ্ম-মুহূর্তের সাংকেত-গোধূলি। সম্পূর্ণ মিলন ও মিলনজনিত আনন্দ না হলে কি মিলনের পরমানন্দ উপভোগ করা যায়?

এরপর কবির জিজ্ঞাসা :

"কি পাইনু এতক্ষণ
পাইলে কি চির নব প্রাণের প্রবাহে
এ হৃদয় পাখা দুটি সাধনা আমার?

ওরই মধ্যে কবিচিত্তে 'অনন্ত মরণলোকের সেই শেষের মৃতি চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

শশাঙ্কমোহন ছিলেন সর্বতোভাবে মানুষের কবি। মানবকল্যাণের জন্যেই তিনি সাধনা করেছিলেন বঙ্গবাণীর মন্দিরে। মানবের জয়-গান করে গেছেন তিনি। মানুষকে বরীয়ান মানুষ সর্বত্রই—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সার্থক কবিরা মানুষেরই বন্দনা গান করে যান। "তুমিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দ গানে"—বলেছিলেন রবীন্দ্র-নাথ। মানুষকে দেবতা করবার স্বপ্নবিভোর ব্যাসবাল্মীকির মতো শশাঙ্কমোহনও ভারতের প্রাচীন আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে বঙ্গসাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কাব্য সাহিত্যে তাঁর অবদান 'অকূল' লেখকের নিছক প্রয়াস নয়, সার্থক শিল্পীর রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। তাঁর কাব্যে যে Currency ও supremacy' রয়েছে ভাবীকাল তা' আবিষ্কার করবেই।

প্রেমাত্মা হিমালয়

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

অত্যাচার, অবিচার, দৈন্য কিংবা বঞ্চনার,
অনন্ত বৈচিত্র্যময় শুরুতম বিরহের
ব্যথায় গুরুন রত,
বেদনার আর্ত কলরব
মানুষের মনে ছিল যুগে যুগে
সুপ্তিতে, স্বপ্নে জাগরণে
অবচেতনার তলে, প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশের রূপে
এক সঙ্গে এল কি সকলে তারা
মহাসিন্ধু-তরঙ্গ-নির্ঘোষে—নীলাচলে
গম্ভীরায় জনহীন গোপন মন্দিরে
উচ্ছ্বসিত লবণাক্ত অশ্রুর প্লাবনে?
এক সঙ্গে মিল দেখা বিরহিণী শ্রীরাধিকা
চিরন্তন দুঃখার্ত লাঞ্ছিত জনতা—
আকাশের শুকতারা আর
স্রোতোজলে ভেসে যাওয়া ধরণীর ফুলদল।
মানুষে মানুষে প্রীতি, প্রভুভৃত্যে হৃদয় বন্ধন,
সখার পরম সখ্য, জননীর বাৎসল্য নির্ঝর
যৌবন প্রমোদবনে প্রেমিক ও প্রেমিকার
মনোমহোৎসব—
সব ভালোবাসা বাঁধে বাসা
এক অতি অপরূপ মানুষের চোখের বন্যায়
বাঁধ ভাঙা সে জলপ্লাবন
দেখা দেয় তরঙ্গিত গঙ্গাকূলে নিরালা
কুটীর প্রান্তে
সৃষ্টি করে সুকঠিন হিমস্তূপ
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণের স্পন্দনে প্রেম-আত্মা হিমালয়।

গল্প

তিন

সঙ্কর্ষণ রায়

নানা রঙে রঙিণ দিন ও রাত। কঠিন মাটি যেন পায়েই ঠেকে না—একটানা পুষ্পাতীর্থ অস্তিত্ব। বীথিকার সান্নিধ্যে উদ্‌ঘাটিত হ'তে থাকে রূপককে কেন্দ্র ক'রে বিচিত্র জীবনের পরম বিস্ময়। তাতে রঙ ও রসের অদ্ভুতপূর্ব আয়োজন—যা সে কল্পনাও করেনি কখনো।

একক আত্মকেন্দ্রিক অস্তিত্ব যাপনের সুকঠিন সঙ্কল্প থেকে নেমে এসেছে সে কোন মোহিনী মায়ার কুহকে। না উঠে এসেছে জীবন যৌবনের চরম সার্থকতায়।

শুকনো মরা নদীতে যেন বান ডাকে—সুপ্ত নারীত্বের উদ্বোধনে আবিষ্কার করে সে অনাস্বাদিত রূপের উৎস।

কিন্তু রূপক তার নতুন জীবনের সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিল না। সে বুঝতে পারছিল, কুণ্ঠা ও সংশয় অতিক্রম করা তার পক্ষে সহজ নয়। এ যেন তার চরম পরাজয়। মিলনের মাধুর্যবোধের পরিবর্তে বিপুল গ্লানি। রাতের পর রাত তার পুনরাবৃত্তি।

বিয়ের পর মাসখানেকও কাটে না—রূপক যেন ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। তার মনে হয় যেন সে তার আত্মবিকাশের ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বের অসীমাংসিত পথের পাঠোদ্ধারে যাকে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চেয়েছিল, সে তাকে ভুলিয়েছে রঙিণ কুহকের মায়ায়—লোপ করেছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালাবার সাধনাকে। এ কুয়াশার চেয়ে যে আঁধার ভাল।

বীথিকা একদিন বললে, কী হয়েছে তোমার বল তো? হঠাৎ ও রকম মনমরা হ'য়ে গেলে কেন?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে রূপক বললে, ভাবছিলাম কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি।

বীথিকা বললে, নেমে এসেছি মানে! উঠে এসেছি বলো।

কোথায় উঠেছি। এতগুলো বছরের প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হওয়াকে কী উঠে আসা বল?

হ্যাঁ বলি। বাঁধাধরা প্রত্যয়ের ছক থেকে মুক্ত হ'য়ে বৃহত্তর জীবনে উঠেই এসেছ—নেমে আসনি।

রূপক কিছু বলল না। চুপ ক'রে থেকে ভাবে তার সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত সত্তার মধ্যে কোথায় পূর্ণতর জীবনের বিকাশের প্রতিশ্রুতি?

বীথিকা বললে, চুপ ক'রে রইলে যে!

রূপক বললে, মনে পড়ে বীথি, দুজনের মধ্যে একজনকে খুঁজতে চেয়েছিলাম আমরা?

দু'হাত দিয়ে রূপকের গলা জড়িয়ে ধ'রে বীথিকা বললে, খুঁজে কী পাই নি? পারি নি কী দু'জনে এক হ'তে—খণ্ড খণ্ড জীবনবোধের সমন্বয় করতে!

রূপক বললে, বুদ্ধি দিয়ে পারছি কই!

রূপকের বুকে মাথা রেখে বীথিকা বললে, হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির পরাজয়কে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে।

রূপক কাতরকণ্ঠে বললে, পারছি নে বীথি।

বীথিকা চমকে উঠে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় রূপকের মুখের পানে। বলে, পারছ না! এরি মধ্যে অসহ্য লাগছে আমাকে।

রূপক ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বলে, তোমাকে নয় বীথি, নিজেকে। তোমার ভালবাসায় যার সৃষ্টি—তাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারছি নে সহজ মনে।

আমার ভালবাসাকে স্বীকার করতেও তোমার কুণ্ঠা?

চিরকাল এ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে বিচরণ ক'রে এসেছি। বাস্তব জীবনের স্বাদ তো কখনো পাইনি। তোমার ভালবাসা আমাকে মাটিতে নামিয়ে এনে উদ্‌ঘাটিত করেছে আমার তুচ্ছতা—ধূলিসাৎ করেছে আমার এত বছরের অভ্রভেদী অহঙ্কার!

রূপকের ব্যথিত অসহায় মুখখানার দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে থাকে বীথিকা। হঠাৎ এক ঝলক হাসি তার পাতলা রক্তাভ ঠোঁট দুটিতে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। রূপকের মুখখানা নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে সে বললে, কিন্তু আমার ভালবাসা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে তো আমি পারব না। মাটিতে যদি নেমেই থাক—সেই ভাল। মাটিতেই ঘর বাঁধবার সাধ আমার—আকাশে নয়।

রূপক বললে, কিন্তু কথা ছিল আমাদের দু'জনের অস্তিত্বকে এ্যাবস্ট্রাক্শনের মধ্যে তুলে ধরব—যেখানে আকাশ মাটির তফাৎ নেই, যেখানে অস্তিত্ব এসে মিশেছে শূন্যতার মধ্যে।

বীথিকা হেসে বললে, ম্যাথমেটিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্শনের মধ্যে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের কল্পনা করতুম—যখন হয়তো জীবনের ঊর্ধ্বে জীবনাতীতের স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি প্রতিদিনের অস্তিত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াবার উপায় নেই—দার্শনিক বা সংখ্যাতত্ত্বের খেলায় দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না।

কিন্তু—

আর তর্ক নয়। এখন শোবে চল। রাত অনেক হয়েছে।

রিসার্চে আর তেমন মন দিতে পারে না রূপক। বস্তু-জগৎ এতদিন তার কাছে ছিল বাস্তবতাবর্জিত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পৃথিবী ছিল কতগুলো প্রতীকের সমষ্টি। চোখ মেলে চেয়ে কখনো দেখে নি—শুধু অঙ্ক কষে গেছে। সংখ্যাতত্ত্বের পথেই ছড়ান ছিল তার প্রতিদিনের ভাবনা।

আজ কী এতদিনের স্বীকৃতি না পাওয়া বস্তুজগৎ তার ওপর শোধ নিচ্ছে? বীথিকা বুঝি নিমিত্তমাত্র।

দশ বছরের গবেষণার সূত্রগুলি সবই যেন ছিঁড়ে গেছে—গাণিতিক বুদ্ধিও যেন ভোঁতা হ'য়ে যায়। বস্তুর অতীত যে প্রতাকগুলোর মধ্যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিচরণ করেছে তাদের যেন অর্থহীন প্রহেলিকার মত মনে হয়।

টেবিলের ওপর ছড়ান কাগজপত্রের ওপর চেপে ব'সে আছে বোবা শূন্যতা। সংখ্যাতত্ত্বের পরিচিত ধূর্ণিলাগুলোও যেন অসহযোগ করছে।

সেদিন সিক্সথ ইয়ারের ক্লাস নিয়ে নিজের ঘরে এসে ব'সে "নাম্বারের" সদ্য প্রকাশিত সংখ্যাটি নাড়াচাড়া করছিল রূপক। হঠাৎ তাপস বসুর লেখা একটি প্রবন্ধ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবন্ধটি সংখ্যার সংজ্ঞা নিয়ে লেখা।

রূপকের এত বছরের গবেষণার সূত্র ধ'রে ফেলেছে তাপস। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিট্যুটের তাপস বসু। সাক্ষাতে চিনবার অবকাশ হয়নি তার—কিন্তু বীথিকা তাকে চেনে। মনের মধ্যে আচমকা ধাক্কা খেল রূপক। প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে সে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। ধাপে ধাপে তারই পথে এগিয়ে চলেছে তাপস—হয়তো শিগ্‌গিরই তাকে ছাড়িয়ে যাবে।

প্রবন্ধটি বার বার পড়ে রূপক। তার নীল চোখ দুটিতে ঈর্ষার জ্বালা—দুঃসহ দাহ মনের মধ্যেও। মনের শিথিল প্রতিশ্রুতিগুলি জড়ো করে সে।

বাড়িতে এসে দেখল—গা ধুয়ে বীথিকা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ব'সে সাজগোজ করছে। রূপককে দেখে সে বললে, এত দেরি হ'ল যে! ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাবার কথা ছিল না।

রূপক বীথিকার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, আর বেড়ানো নয়। বীথি—আমাদের কাজ আবার শুরু করতে হ'বে।

মুখে পাউডারের পাফ বোলাতে বোলাতে বীথিকা বললে, কী আবার কাজ!

আমাদের রিসার্চের কথা বলছিলাম।

রিসার্চ! তোমাকে সামলানোর রিসার্চে আমার হাড় জালা জালা হ'য়ে গেল—এর ওপর আবার কী রিসার্চ করব গো!

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপক বললে, সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণার সমস্ত জীবনটাকে উৎসর্গ করবে বলেছিলে একদিন—সেটা যে উঁচু স্তরের মনোবিলাস ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকেও তুমি নামিয়ে এনেছ—সেদিক থেকে অসাধারণ ক্ষমতা তোমার তা' অবশ্য স্বীকার করতে হ'বে।

আর্ত কণ্ঠে বীথিকা বললে, ও কী বলছ তুমি!

সোফার ওপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুম হ'য়ে বসে থাকে রূপক। দু'জনের মাঝখানে অস্বস্তিকর নীরবতা থম থম করে।

দিন কয়েক বাদে রূপক বীথিকাকে বললে, ডক্টর নিয়োগী জিজ্ঞেস করছিলেন রিসার্চ স্কলারশিপটা তুমি ছেড়ে দেবে কিনা!

বীথিকা গম্ভীর মুখে বললে, তুমি কী জবাব দিলে?

আমি আবার কী জবাব দেব। জবাব তো তুমি দেবে!

আমি কী জবাব দেব তা তো তুমি জানোই।

জানি হয়তো। কিন্তু লিখিতভাবে তোমাকে জানিয়ে দিতে হ'বে যে তুমি স্কলারশিপ ছেড়ে দিচ্ছ।

চিঠি লেখার প্যাডটি টেনে নিয়ে বীথিকা বললে, এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি।

বীথিকার লেখা শেষ হ'লে রূপক বললে, তাপস বসু তোমার ঐ স্কলারশিপটা নিতে চায়। আমার সঙ্গে দেখা করেছিল আজ।

বীথিকা চমকে উঠে বলে, তাপস!

বীথিকার মুখের ওপর বক্র দৃষ্টিপাত ক'রে রূপক বললে, হ্যাঁ, তাপস। তার কাছে শুনলুম ওর সঙ্গে একলা তুমি নিয়মিত ক্যালকুলাস কষতে। তোমার বুদ্ধির ওপর অসাধারণ শ্রদ্ধা ওর। সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে মৌলিক গবেষণা করবার ক্ষমতা যে তোমার আছে তা'ও সে আমাকে বলেছে। তোমাকে ও যতটা চিনেছিল তার শতকরা এক ভাগও আমি চিনতে পারি নি ব'লে মনে হ'ল—যদিও প্রায় ছ'মাস তুমি আমার সঙ্গে কাজ করেছ।

চোখ নামিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল বীথিকা—কিছু বলতে পারল না। তার মনের গভীরে আলোড়িত আবেগ-গুলি মুখের ওপর গাম্ভীর্যের আবরণ টেনে চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে সে।

বীথিকার পদত্যাগ পত্রটি ভাঁজ ক'রে পোর্টফোলিও ব্যাগে রেখে দিয়ে রূপক বললে, তাপসকে আমি কথা দিয়েছি যে ওকে আমার রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্ট ক'রে নেব। ডক্টর নিয়োগীরও তাতে আপত্তি নেই।

বীথিকা হঠাৎ ব'লে ফেলে, স্কলারশিপ আমি ছাড়ব না—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেল।

রূপকের দু'চোখে কৌতুক উপচে ওঠে—সে বললে, কিন্তু তাপস কাল থেকে তার কাজ শুরু করবে। দরখাস্ত সে আমাকে দিয়ে দিয়েছে—তোমার রেজিগ্‌নেশন লেটারের সঙ্গে জুড়ে তা' আজই আমি ডক্টর নিয়োগীর কাছে পেশ করব।

দু'চোখে দুঃসহ জ্বালা ছিটিয়ে বীথিকা বললে, আমার স্কলারশিপ আমি ছাড়ব না—ফিরিয়ে দাও আমার চিঠিটা।

বীথিকার কথায় কর্ণপাত না ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রূপক। মনে জমাট কান্নার গুরুভার নিয়ে ব'সে রইল বীথিকা।

যে রঙিন স্বপ্নে এতদিন মগ্ন ছিল বীথিকা, তার মোহ মিলিয়ে গিয়ে অন্তবিহীন অন্ধকার শুধু অবশিষ্ট রইল তার চোখের সামনে। বিপুল শূন্যতাবোধের কেন্দ্রে অসহায়ের মত ব'সে রইল সে।

ওদিকে রূপক নির্বিকার। তাপসের সাহায্যে পুরো-পুরি কাজে মন দিয়েছে সে। বীথিকার দিকে নজর দেবার সময় নেই তার। প্রতি দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নগণ্য একটি অভ্যাসের মত তাকে স্বীকার ক'রে নেয় মাত্র।

বীথিকাও চুপচাপ। তার অভিমানাহত অবমাননিত হৃদয়ের ভার কোথায় নামাবে সে ভেবে পায় না।

একদিন তাপসকে নিয়ে বাড়িতে এল রূপক। তার সেই পূর্বপরিচিত তাপস নয়—অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব, অনেক বেশি প্রত্যয় জমাটবাঁধা আত্মভোলা মুখখানি। দেখে বুকের ভেতরটাতে মোচড় দিয়ে ওঠে।

মামুলি কুশল বিনিময় ছাড়া আর কোন কথাবার্তা হয়না তার তাপসের সঙ্গে। তাপস যে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায় তা' সে বুঝতে পারে।

বসবার ঘরে রূপক ও তাপসের জোর বিতর্ক চলে। রূপকের generalisation গুলোকে স্বীকৃতি দিতে পারছিল না তাপস। তাপস বলছিল, যথেষ্ট উপকরণ নেই যাদের সমন্বয়ে সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হওয়া চলে। খণ্ডখণ্ডভাবে বিশ্লেষণ না ক'রে অখণ্ড সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া চলবে না।

পাশের ঘরে ব'সে তাদের তর্ক শুনছিল বীথিকা। যে পথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে একদিন সে পথ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তা' সে বুঝতে পারছিল। সংখ্যা-তত্ত্বের যে সব সমস্যার সমাধানে সে একদা সক্রিয় অংশ নিয়েছে তাদের স্বরূপ নির্ণয়ের অধিকার সে আজ

হারিয়েছে। রূপক বা তাপস তাদের আলোচনায় অংশ নিতে, তাকে আর ডাকে না।

বীথিকা মনে মনে জ্বলতে থাকে নিজের ওপরই মর্মান্তিক আক্রোশে।

দিন কয়েক বাদে সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ তাপস রূপকের বাড়িতে এসে রূপকের খোঁজ করে— রূপক তখন বাড়িতে ছিল না।

চোখ নামিয়ে বীথিকা বললে, তিনি তো একটা মিটিংএ গেছেন বরানগরে।

তাপস বললে,মিটিং ! কই আমাকে তো কিছু বলেননি !

মুচকি হেসে বীথিকা বললে, হয়তো ভুলে গেছেন। বা ভুলো মন। বাড়িতে এসে হঠাৎ ওঁর মনে পড়ে গেল মিটিংএর কথা। পড়ি কি মরি ক'রে ছুটলেন।

ও। তা হ'লে আমি যাই।

একটু বসবে না। উনি না থাকলেও আমি তো রয়েছি। আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথাবার্তা বললে তোমাদের সংখ্যাতত্ত্ব অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না।

তাপসের মুখে চাপা হাসি খিলিক দিয়ে ওঠে—সে বললে ; অশুচি সংখ্যাতত্ত্বের স্পর্শ বাঁচিয়ে তোমার শুচিতা বজায় রাখছো, তা' তো আমার অজানা নয় বীথি—অমন কথা কেন আর বলছ ?

আরক্ত মুখে বীথিকা বললে, সংখ্যাতত্ত্বের বাইরেও একটা জগৎ আছে—যেখানে মানুষ তার ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে বাস করে।

ম্লান হেসে তাপস বললে, একথা তোমাকে একদিন ব'লেছিলুম বীথি—তুমি তা' কানেও তোলোনি।

তাপসের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বীথিকা চমকে উঠে তাপসের মুখের দিকে তাকায়। অনিমেষ চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলে, ভেতরে বসবে এস।

বীথিকা চা ঢালতে ঢালতে তাপসকে বলছিল, অমন খণ্ড খণ্ড ক'রে চুলচেরা বিচার করবার দরকার কী তাপস ? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর সব কিছু রিলেটিভ হ'লেও সংখ্যা যে এ্যাবসোলিউট তা' মানো নিশ্চয়ই ?

তাপস অবাক হ'য়ে বললে, এ সব নিয়ে এখনো ভাবো নাকি তুমি !

সলজ্জ হেসে বীথিকা বললে, পুরোনো অভ্যেস—ছাড়তে পারিনে।

বীথিকা যা' বলেছে তা' নিয়ে মনে মনে খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে তাপস বললে, সোজাসুজি জেনারেলাইজেশন করতে গেলে তা' ফিলজফি হ'য়ে পড়ে—ম্যাথ্‌মেটিক্স নয়।

বীথিকা বললে, কিন্তু ম্যাথ্‌মেটিক্সও তো জেনারেলাইজেশন। এ্যাবস্ট্রাকশনও বলতে পার। এ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্য দিয়ে বিচার করলে শূন্য আর একের মধ্যে কোন তফাৎই নেই। অঙ্ক কষে সহজেই প্রমাণ করা যায়। অথচ সত্যিই তো শূন্য একের সমান নয়।

তাপস চুপ ক'রে থাকে। তার চোখ দুটি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠে বীথিকার মুখে কী যেন ব্যগ্রভাবে অন্বেষণ করে।

বীথিকা চোখ নামিয়ে বললে, অবশ্য এসব নিয়ে কিছু বলা আমার সাজে না। ও সবের চর্চা তো অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

তাপস ব্যগ্র স্বরে বললে, ছাড়ো নি বীথি—ছাড়তে পার না। কেনই বা ছাড়বে ? কিন্তু নিজেকে ওরকম লুকিয়ে রাখার দরকার কী। এস না য়ুনিভার্সিটিতে।

শাড়ির আঁচলের কোনটি ধ'রে পাকাতে পাকাতে বীথিকা বললে, আমার য়ুনিভার্সিটি আমার ঘরের চারটি দেয়ালের মাঝখানে। তোমাদের য়ুনিভার্সিটিতে যেতে আমি চাইনে।

কিছুক্ষণ বাদে তাপস উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলি।

বীথিকা বললে, আবার আসবে তো ?

তাপস মাঝে মাঝে আসে—প্রায়ই রূপকের অনুপস্থিতিতে। রূপক বাড়িতে থাকলে বীথিকার নাগাল পায় না। বীথিকা তখন তাকে এড়িয়ে চলে সযত্নে। গৃহকর্মে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা প্রকাশ করে। রূপক তাদের কথাবার্তায় যোগ দিতে ডাকলে কাজের অজুহাত দেখায়। অথচ রূপক না থাকলে তাপসের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে—তাপসের রিসার্চের সমস্যাগুলির সম্বন্ধে জানতে চায়।

রূপক য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরে একদিন দেখল, দুইং রুমে তাপস ও বীথিকা পাশাপাশি ব'সে তন্ময় হ'য়ে অঙ্ক কষছে। রূপক স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়াল। রিসার্চে চাপা

পড়া তার দুরন্তটি হঠাৎ যেন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—প্রতিদিনের অভ্যস্ত অস্তিত্বের বাইরে নতুন ক'রে দেখল সে বীথিকাকে তাপসের মুগ্ধ দৃষ্টির আলোয়। তার নীল চোখ দুটি জ্বলতে থাকে।

রূপককে দেখে তাপস উঠে দাঁড়িয়ে বললে, নমস্কার স্যার। মিসেস মিত্রের কাছ থেকে কতগুলো প্রবলেম বুঝে নিচ্ছিলুম।

কাষ্ঠ হাসি হেসে রূপক বললে, তা' বেশ। কিন্তু প্রবলেমগুলো সম্বন্ধে আমাকে তো কিছু বলো নি।

বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু মিসেস মিত্রের কাছে সহজ সমাধানের আভাস পেয়েছি। অঙ্কের মাথা ওঁর খুব পরিষ্কার।

রূপক কিছু বলল না।

মাসখানেক বাদে রূপক বীথিকাকে বললে, তাপস জার্মানি যাচ্ছে। বন্ য়ুনিভার্সিটিতে পোস্ট-ডক্টরেট ফেলোশিপ পেয়েছে।

বীথিকা টেবিল রুথে ফুল তুলছিল—তার দু'চখরা হাতটি কেঁপে উঠে। সে বললে, এখানকার রিসার্চ ওর শেষ হ'য়ে গেল?

না, হয়নি। ওখানে গিয়ে না হয় করবে। স্কলারশিপটা জোগাড় ক'রে দিয়ে আমিই ওকে পাঠাচ্ছি।

বীথিকার সেলাই করা বন্ধ হ'য়ে যায়। সেলাইয়ের সরঞ্জাম টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে বসে থাকে সে।

রূপক তার পাশে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলে, নিখেকে ক্রমশঃ আমার কাছ থেকে গুটিয়ে নিচ্ছ কেন বীথি? কী অপরাধ করেছি আমি তোমার কাছে?

মুখ তুলে তাকায় বীথিকা—উদ্গত অশ্রু দমন ক'রে বললে, গুটিয়ে তো আমি নিই নি।

বীথিকাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে কম্পিত স্বরে রূপক বললে, কিন্তু আমাদের দু'জনের মাঝখানে তৃতীয় কেউ এসে কেন দাঁড়াবে? কেন?

রূপকের বুকে মাথা রাখল বীথিকা—কিছু বলল না।

মরমীয়া সাধনা

ডক্টর শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য

ধর্ম ও নীতির বিশ্বকোষে মরমীয়া সাধনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:—relationship and potential union of the human soul with Ultimate Reality, and to use the term 'mystical experience' for direct intercourse with God। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড় সম্বন্ধ ও অন্তরঙ্গ মিলন মরমীয়াবাদের মূলকথা—কোথাও প্রেমের পথে, কোথাও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির সহায়। উভয় ক্ষেত্রেই এই সাধনা কুয়াসাঘুসর রহস্যময়তার মণ্ডিত।

মরমীয়া-সাধনার উৎস-সন্ধানে ঐতিহাসিকগণ পৌঁছে গেছেন আদিম যুগে। সেকালের মানুষ জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে নানা যাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, মাঠের শস্য, বৃক্ষে প্রাণ কল্পনা করে তাদের দৈবীকরণ হত। এদের জয় ও লাভ করার জন্যে প্রাণময়ী প্রকৃতি-পত্নাদির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত মানুষ। তার মেয়ে 'ভর' হত, দৈব নির্দেশ প্রচারিত হত, দেবতার সঙ্গে অঙ্গের ভরে ইন্দ্রিয়পুরণের চেষ্টা চলত। শস্য অথবা তার প্রতীকের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনায় তারা নতুন শস্য ও তার প্রতীকের (পশু বা মানব) মাংস আহার করত, রক্তে স্নান করত, শস্যবিচ্ছিন্ন চর্ম পরিধান করত। দেবতা ও মানবে অঙ্গের মিলনে মানুষ হত দৈবীচিহ্নসম্পন্ন। এই সব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শস্য-শিশু-পশুর সমৃদ্ধি। সেই সঙ্গে উৎসব হত, আসর বসত নাচ গান কথার। চাষের মাঠে, নারীরাই-প্রধানতঃ এই উৎসবে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করত; পরে পুরুষেরা সে ভার নিল। অনেক ক্ষেত্রে, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধায় ও সংস্কারের প্রতি বিশ্বাসে পুরুষ নারীর রূপসজ্জায় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত—যেমন, বঙ্গিন ভারতের 'কুকনইকুট্' নৃত্যাভিনয়। এইভাবে ইষ্টসহ অঙ্গের সাধনা ও নারীরূপে ভজনার রীতি—যা প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে তাহাই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল আধ্যাত্মিক মিষ্টিকতায়—কোথাও হৃদয়ভাব তার সহায়, কোথাও দেহ সাধনা তার মাধ্যম।

মধ্যযুগের ইউরোপে প্লেটোর মতবাদ, এপিকিউরিয়ান ও স্টোইক্ দর্শনের পাশে দেখা দিল মতিমার্গের (২০৪-২৭০ খ্রীঃ) নিও-প্লেতোনিক

দার্শনিকতা। প্লেটোর all knowledge re collection—স্মরণে ভিত্তি করে বিশ্বে হল ব্রহ্মাত্মবাদ ও আত্মার অমিমরতার ভাবনা। এর সাহায্যে নব্য প্লেটোনিকরা গড়ে তুললেন মরমীয়া সাধনার প্রাথমিক রূপটি—'flight of the alone to the alone'—'একার সাথে মিলুক একা।' পোরফিরি ও আয়াম্ব্লিকাস একে আরও মিষ্টিক করে তুললেন। দেবতা দেবদূত শয়তান, যাদুবিদ্যা সন্ধান বিদ্যাভ্যাস, রূপক ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদির অনুপ্রবেশে সাধনা জটিলতর হয়ে উঠল। সেন্ট্ অগস্টাইন এই মিষ্টিক আরাধনাকে নিয়ে এলেন খৃষ্টধর্মে : তার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রচারিত হল। ব্যাপকতা দান করলেন সেন্ট পল। অতিপ্রাকৃত আনন্দলোকের স্বপ্ন-দর্শন ও রসাস্বাদন এবং পরম সত্তার নিবিড়তর উপলব্ধির এক রাহস্যিক ধারা গড়ে উঠল মরমীয়া সাধনা নামে ও রূপে।

কিন্তু মরমীয়া তত্ত্ব ও সাধনা কোন এক বিশেষ দেশকালের ধর্মমত নয় : তা সর্বজনীন, সকল দেশের সকল মানুষের। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য আপাত—মূলে সমতা। ইহুদী ধর্মে, 'জোহার' বইতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের প্রেমের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়েছে। ওল্ড্ টেস্টামেন্টের সলমন্ অফ্ সলমন্ এই ভাবনার ভাষারূপ প্রতিফলিত হয়েছে—Let Him kiss me with the kisses of His mouth ; for Thy love is Better than wine :···By night on my bed I sought Him whom my soul loveth :···I sought Him but found Him not।

মধ্যপ্রাচ্যে মরমীয়া সাধনার আত্মপ্রকাশ সূফী ধর্মে। কোরাণে এর উল্লিখিত এবং হজরৎ মহম্মদের ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সঙ্গে এর যোগ আছে বলে অনেকে মনে করেন। গ্রীক্ দর্শনের অনুশীলনের ফলে নিও-প্লেটোনিক মতবাদ থেকে ইসলামী মিষ্টিকতা শক্তি সংগ্রহ করে। সিরীয়, পৃষ্টান, ইথো-ইরানীয় বিশেষত বৌদ্ধ প্রভাবও এতে লক্ষণীয়। আবু সুলেমান, অল্ হল্লাজ, ইব্ন্ আরাবি, অল্ ইসারো, রাবেয়া প্রভৃতি সাধক সাধিকার মাধ্যমে সূফী ধর্ম ক্রমে বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান অল্ বহালির। সূফী মতবাদ সন্ধান থেকে মরমীয়া, তা থেকে তত্ত্ব, শেষে বিশ্বপ্রেমতাবাদে উপনীত হয়। এতে বিধান-বিরোধিতা প্রেমসাধনা, অন্তরঙ্গতা, নির্বাণলাভ, ঈশ্বরের মানবীয়, জীবের পুরুষর ইত্যাদি ভাব মুখ্য স্থান লাভ করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ইব্ন্ অল্ ফারীদ্, সানী, হাফিজ, রুমী প্রভৃতি সাধকের মরমীয়া-বাদী রচনা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। ক্রমে, দার্শনিকতা ও মত-উপদলের ভীড়ে সূফী ধর্ম বিচিত্র জটিল হয়ে ওঠে।

ইষ্ট দেবতার সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ মরমীয়া সাধনার মূল কথা। তার জন্যে প্রয়োজন আত্মার বিশুদ্ধিকরণ ও ভাগবত-মিলন-লাভের ব্যাকুলতা। এই দৃষ্টিতে, উপনিষদের 'সোঽহম্'-বাদ এর সঙ্গে অভিন্ন। ব্যাপকতর অর্থে : সকল মতপথেরই শেষকথা ঈশ্বরে-জীবে ভেদহীন একাত্মতা। যেন সাধনার জ্ঞানপথে সাধক পশুত্ব-ত্যাগে পশুপতিত্ব লাভ করেন ; যেন সাধনার মাধ্যমে তান্ত্রিক সাধকের শক্তি-সাযুজ্য ঘটে (বৌদ্ধ ও চীনাচারী তত্ত্ব-সাধনারও এই ভেদরাহিত্য) ; বৈষ্ণব ভক্ত প্রেমসাধনার সময়ে মিলিত হন নিখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণের সঙ্গে। পথ হয়ত আলাদা, পথিক হয়ত বিভিন্ন, কিন্তু পথের শেষের মিলন—বিন্দুটি সেই এক।

তাতে ইসলাম অনুপ্রবেশের পর থেকে সূফী ধর্ম এ দেশীয় ধর্ম-সাধনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মরমীয় সাধনাকে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করে তোলে। কবীর-তুকারাম চৈতন্যদেবের সাধনার তার অভিপ্রকাশ, সমকালীন ও পরকালীন ধর্মে ও সাহিত্যে তার ব্যাপ্তি। কালক্রমে, তারতীয় মরমীবাদের বিস্তৃততর রূপান্তরিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন মত—পথের ধর্ম-ভাবো তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

শ্যাজিজম বলেছেন : Mysticism is, in truth, a temper rather than a doctrine, an atmosphere rather than a system of Philosophy ; এবং আল্ডাস হিল বলেছেন : Mysticism is a vision, an individual quest, a psychological experience : উক্তি দুটির মধ্যে মিষ্টিক সাধনার মর্মকথা ও মৌল স্বরূপ পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে। দেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও মরমীয়া সাধকদের উপলব্ধি ও চলার পথ প্রায়—অভিন্ন। আঞ্চলিক সীমান্ত সত্ত্বেও তা বিশ্বজনীন এবং সকল ক্ষেত্রেই এই উপাসনা কোন বিহিত শাস্ত্র বা সুসংগঠন ধার্মিকতার মুখাপেক্ষী নয়। কোন বিশিষ্ট মত পথ বা বাদ নয়। সর্বত্রগামী মরমীয়া সাধনা একান্তই মরমী—ব্যক্তিগত এষণা, তত্ত্বাতীত বোধিদৃষ্টি, আত্মার আত্মসাক্ষাৎকার সাধকের হৃদয়ভাব নির্ভর : 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে'। তার কাছে, Ideal is the only Real : এবং এই আইডিয়াল ভগবান। ইনিই আত্মার উৎস ও অবস্থান, এঁর জন্যেই আত্মার অন্তর্দৃষ্টি—মোক্ষণ ও লীলাবিলাস, তত্ত্বাবভাবিত হয়ে তাঁরই উপলব্ধি—God only। তত্ত্বদর্শিক সাধক সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখেন একটি চিত্র, সব অনৈক্যের মধ্যে পরম ঐক্যকে, বিরতম সেই ঐক্যকে।

মরমীয়া সাধনার একদিকে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা ও বিচিত্রতা ; অন্যদিকে প্রেমাকৃতির মধুরতা ও সুন্দরতা। উক্তি মরমীয়া সাধকের কাছে প্রেম জীবনের মূল ও ইষ্টের সঙ্গে মিলনের একমাত্র সেতু। পরমাত্মার জন্যে জীবাত্মার ব্যাকুল কামনা অভিসারের পথে এগিয়ে নেয় আত্মাকে, অসীমের হয় সসীম হৃদয়-সংবাদ, ভাগবত প্রেমের আলোর পথ চিনে চিনে ভক্ত যেখানে উপনীত হয়, সেখানে—God and I are one। এই উপাসনা মরমীয়া মনে এর প্রকাশ মরমী, হৃদয়বেদ্য। এর ভাষা মুখর নয় : রূপকে প্রতীকে alchemic language। এখানে, বৈষ্ণবীয় প্রেমাকৃতে মানবিক প্রেমের চিত্র অংকিত হয় ; ঈশ্বর ও ভক্তের সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর—উভয় ঘরবসু, বিবাহ এখানে মিলনের প্রতীক। এ ছাড়াও সোনা রূপা লোহা পারা নৌকা জল আলো আগুন অন্ধকার ইত্যাদি শব্দকে বিশুদ্ধ অর্থবোধক প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়। বস্তুর রাসায়নিক রূপান্তরের ইঙ্গিত দ্বারা

৮ কনের বৃত্তিসমূহের তাদাত্ম্যকে বোঝান হয়। বিশ্বজগতের যা কিছু সবই মরমীয়া সাধকের কাছে অসীমের প্রতীক। ব্লেকের ভাষায় :

To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

মরমীয়া সাধনা ব্যবহারিক বিজ্ঞান-সম্মত। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানবাত্মা কেবলই ধরবার। চলে, লড়াই করে; বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেবলই 'হয়ে—ওঠে'। তাই এর চলার পথ বাঁধানো রাজপথ নয়। ব্যক্তিগত আকুতিতে মাঠঘাট উজিয়ে-যাওয়া সকলেরই সেই এক কথা : কেবলই চলা, কেবলই সরা। সমগ্র মরমীয়া সাধনাই যেন বর্ণসুষমা অভিসারের পদাবলী—পঞ্চপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত!

প্রথম প্রদীপ : 'আত্মার জাগরণ'। সংসারসুখে আবদ্ধ মন হঠাৎ শুনতে পায় অজানার ডাক, নতুন এক অনুভবের স্ফূর্তি, নবতর এক চেতনার পদসঞ্চরণ। অহংবোধ গৃহসুখ ছাড়তে চায়না, জলেওঠা আগুন মনকে বার করে আনতে চায় দৈব-চেতনার অভিমুখে। ভাগবত-প্রীতির এই দ্বিধা-গতিই 'পূর্বরাগ'। দ্বিতীয় দীপ : 'চিত্তের শুদ্ধি'। পূর্বরাগান্বিত চিত্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে পথ করে এগিয়ে চলে অজ্ঞাত সম্মুখে। হৃদয়ই দৈবী-প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে দিতে থাকে যাবতীয় হীনতা-দীনতা-কলুষ-গ্লানিকে। অহং দুর্বলতর, আত্মা শুদ্ধতর, সংসার-চেতনা শিথিলতর হতে থাকে। ভক্ত তখন সেন্ট্ খেরেসার মত বলে : Let me Suffer or die। এরই নাম 'অভিসার'। মরমীয়া সাধকচিত্তের উদ্বর্তনের তৃতীয় সোপান : 'চিত্তের উজ্জীবন'। অভিসার-অন্তে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। অহংবোধে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়, আত্মবোধও বিশ্ববোধে এনে দেয় ভেদজ্ঞানরাহিত্য। ভাগবত প্রেমের দীপ্ত আলোকে হৃদয় তখন পরিপ্লাবিত। একদিকে আত্মার স্থিতি-ধ্যান-তন্ময়তা-সাত্ত্বিকভাব, অন্যদিকে সমস্ত দেহমনকে একাগ্র করে তুলে পরম আনন্দ-প্রেমামৃতের কাছে আত্মসমর্পণ। সেখানে, সেন্ট্ জনের ভাষায় : all ceased and I was not। ভক্ত-ভগবানের এই সান্নিধ্যকে বলা হয়েছে 'মিলন'। চতুর্থ পর্যায়ে : 'আত্মার মৃত্যু'। মিলন স্থায়ী হয়না; ভগবান দেখা দেননা। কারণ ভক্ত হৃদয়ের অহংকার, চিত্তের আবিলতা এখনও নিঃশেষিত নয়। তাই আঘাত দানের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর সরে যান নিকট-সুদূরে। একাকিত্বের অসহ্যতা, শূন্যতার অন্তর্জ্বালা ও বেদনার আগুনে ক্রম-রূপান্তর হতে থাকে আত্মার। তার শেষতম কালিমাটুকু নিশ্চিহ্ন, সামান্যতম আসক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। মুক্ত আত্মা নিজেকে পরিপূর্ণরূপে চিনতে পারে, ৯ উপলব্ধি করে নিজের ক্ষুদ্রতা ও ঈশ্বরের বিরাটত্ব। সেন্ট্ ক্যাথারিনের মতো সে অনুভব করে, by me is god। ঈশ্বর বিচ্ছেদে কাতর হৃদয় আরও নিবিড় ও আপন করে পেতে চায় তাঁকে। সংসার প্রীতির অপসরণে চিত্তে যে শূন্যতা জাগে, তা পরিপূর্ণভাবে অধিকার করে ভাগবত-প্রীতি। অহরহ সখার অভাববোধজনিত এই যে আকুল আর্তি, এই-ই 'বিরহ'। পঞ্চম বা শেষ বিন্দুতে : 'আত্মার অতন্ত্র-মিলন'। পার্থিব চেতনাবিলুপ্ত ভক্ত হৃদয়ে এখন কেবল দৈবীচেতনার নিঃসীম আলো। আত্মা তখন পরম বিশুদ্ধ, সর্বকলুষমুক্ত, সুপ্রতিষ্ঠা পদ্ম। পরম প্রিয়তম এসে ধীরে ধীরে বসেন সেই শুভ্র শতদলে আসন করে। জীবাত্মা-পরমাত্মার হয় বিবাহ, অর্থাৎ পুনর্মিলন ও পূর্ণমিলন; সানন্দ চিত্ত উপলব্ধি করে : god in me—ঈশ্বরই প্রেম, প্রেমই ঈশ্বর—'সোঽহম্' বা 'সাহম্'। মরমীয়া ভাষায়, সংসারপ্রীত আত্মা থাকে লোহার মত কঠিন—কালো; ঈশ্বর রতির আগুনে পুড়ে তার সব কালো উধাও হয়; সে হয় সাদা অর্থাৎ শুদ্ধ; তারপর লাল হয়ে ওঠে ভাগবত-প্রেমে দীপ্ত হয়ে; শেষে মহাভাবের আবেগে গলে গিয়ে মিলিত হয় ইষ্টের সঙ্গে। আত্মার সঙ্গে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, সাধুজ্য হয়, এক আর একে মিলে হয় এক—সমুদ্রের লবণে বৈরী পুতুল সমুদ্রেই মিশে যায়, আমার ঘটে 'আত্মমিলন'।

মিস্টিকের এই অভিসারও মিলনানন্দের অভিজ্ঞতা চরাচরাতীত বোধাতীত প্রজ্ঞাপাতীত, অনুভবেরও দুরন্বয়ন্য প্রত্যক্ষময়। সাধকের এই তুরীয় আস্বাদ উচ্চারণাতীত। বৈষ্ণব সাধকের অন্তিম প্রেমানুভূতিও বেদান্তের প্রকাশ-অগম্য, যদিও তাঁর সাধনা মূলত মরমীয়া নয়। তার ভিত্তি ঘুলে আছে একটি বিশিষ্ট দর্শনতত্ত্ব, প্রকাশতাত্ত্বিকার রহস্যের অভাব, লীলা রাধাকৃষ্ণের : (গাহস্থ্যে) জীব-ঈশ্বরের নয়। ভক্ত লীলাশুক সখী, গোপিপ্রেম তাঁর সর্বসাধ্য সার। তথাপি বৈষ্ণবী রতি মরমীয়া অনুরাগানুগা। রাধার কৃষ্ণপ্রীতি মরমীয়ার ঈশ্বরপ্রেমের সমান্তরাল মিস্টিক উপাসনার পঞ্চাঙ্গ (পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন) বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বেরও সুস্বরূপ। যাঁরা রাধাকে জীবাত্মার প্রতীক মনে করেন, যাঁদের আরাধনা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত—তাঁদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ মরমীয়ার মতই অতি-প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত। ভক্তের কাছে ইষ্ট প্রেমময়, ভক্তরাধা, মূলরাধা কৃষ্ণরতি, সাধন প্রেম—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে', পথশেষের অনুভূতি : 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর! চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর'। মিস্টিকের কণ্ঠে : He is not only with us, but also within us। ভাষা তখন সাংকেতিকতার হাত ধরে চলে। মিস্টিসিজ্‌ম্ বৈষ্ণব ধর্মে আরোপিত নয়, অন্তর্নিহিত : বৈষ্ণব সাধনা মরমীয়া না হয়েও মরমী।

মেটাফিজিক্‌স্ আত্মাবহুধা ভাবনা হলেও মিস্টিসিজ্‌ম্ তার মৌল ক্ষেত্র নয়। মেটাফিজিক্‌স্ জানতে চায় কার্যকারণের আদিকে : absolute Knowledge তার সাধ্য; মিস্টিসিজ্‌ম্ পেতে চায় কার্যকারণের অন্তকে : Union with Union তার সাধন। প্রথমটির লক্ষ্য জ্ঞানের উপলব্ধি, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য পরমের অনুভূতি। তাই কাব্যকলার ক্ষেত্রে জন ডান ও ক্রাশিস টমসন মরমোত্র কবি নন। একজন জিজ্ঞাসু, অপরজন মুমুক্ষু। কিন্তু অনুভবের অতলান্ত গভীরে মেটাফিজিক্যাল কবিও মিস্টিক হয়ে ওঠেন। প্রকৃতি দেহ-নারী-প্রেম সম্পর্কে তত্ত্বজিজ্ঞাসা উপনীত হয় তত্ত্বরূপে—যেখানে আত্মার অন্তরঙ্গতম মাধুরীতত্ত্ব। ডান্ ট্রাহের্ণে, ব্রুটি, টৌজিসন্, শেলী,

কীটস, শেলি, ব্লেক,-এর বহু কবিতা এই পর্যায়ে উল্লেখ্য। বিহারী-লালের কবিতাও। এই দৃষ্টি-আলোকে ওমর্ড্‌স্ ও অর্ধ. উপলব্ধি করেন :

Gently did my Soul
Put off her veil, and Self transmuted, Stood
Naked, as in the presence of her god.
Prelude

মিষ্টিকতার রহস্যময় পরিবেশ ও আবেশ তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্নিহিত প্রেমারতির স্থানে সেখানে দেহ-আরতির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ। বিচিত্র মন্ত্র ও কৃত্যের (ritual) মাধ্যমে উপাসক আরাধনা করেন আরাধ্য দেবতার ; মন্ত্র ও তন্ত্রবলে দেবতা আবির্ভূত হন, আশ্রয় করেন আরাধকের দেহ ও মনকে। উভয়ের একাত্মতার মাধ্যমে সাধক অলৌকিক শক্তি ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র। মন্ত্রপূত শুদ্ধি স্নান ইত্যাদি করার আবশ্যিক। শুধু প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্য দেশেও তান্ত্রিক মিষ্টিক সাধনা প্রসার লাভ করে। 'সাধনমালায়' এই কৃত্যমূলক বহুমুখী সাধনার সরলতর রীতিপদ্ধতি বিধিবদ্ধ ; ক্রমেই তা জটিলতর হয়ে ওঠে পুরাণ যেঁটে তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে। রহস্যময় তান্ত্রিকের মন্ত্র শাস্ত্রীয়—মন্ত্রশাস্ত্রে নানা অনুষ্ঠানে-ক্রিয়াকলাপে।

কিন্তু দেহের অভিসিঞ্চনেই মিষ্টিকতার যথার্থ বিকাশ। প্রেম-ভক্তির আকুলতা তান্ত্রিক চিন্তকেও ভাবীভূত আবেশময় করে তোলে। খ্রীষ্টানে—খ্রীষ্টিয়ে অনেক সুকঠোরতার তান্ত্রিকের উপলব্ধি হয় ভক্তি—শক্তি মিশ্রিত। তখনই শক্তি পরাবলীর শক্তিমৎ প্রেমের সাত্ত্বীতিক প্রকাশ ; স্নান ও আচার আচরণ, নখী ও সম্প্রদায়ে ভেদহীনতা। বৈষ্ণব ভক্তের মত শক্তি তান্ত্রিকও হন কবি। প্রেমিক কবির আত্মোপলব্ধির একাশ ব্যাকুলতার সৌন্দর্যে : যেখানে ঘুচে গিয়ে এক হওয়া—তুমি দিয়ে তুমি অনুভব। সেখানে, ব্লেকের মত : Naked I wait Thy love's uplifted stroke।

সাহিত্যশিল্পের বিচারে, রোমান্টিকতা নিবিড়তম হয়ে অধ্যাত্মরাগে পরাবর্তন করলে মিষ্টিকতার আবির্ভাব হয়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মরমী আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ মাঝে মাঝে সীমান্ত অতিক্রম করে মিষ্টিক অলীকতায় বিহার করেছে। পদ্মাবীপাধিষ্ঠা পথ ঘেঁষে তিনি উপনীত হয়েছেন সহ-পেয়েছির দেশে, অবগাহন করেছেন নিবিড় অতলে, অনুভব করেছেন চিত্তের মধীম পূর্ণতা :

এক রজনীর বরষণে শুধু কেমন করে,
আমার মনের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।

সেই হৃদয়-সরোবরে :

একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঝলমল ;

তখন কবির অন্তরতম প্রদেশে সমাহিত সৌন্দর্য-উপলব্ধি :

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
মূলীর মাঝখানে :
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে পূর্ণপানে।

আর সেই স্বর্ণকমলের ওপরে সোনালী-পাখা এক নাম-না-জানা সোনার পাখার মধুর বিহার।

মিষ্টিক সাধনকলায় রোমান্টিক শিল্পকলা : যেন ইন্‌প্রেসনিস্টিক ছবির চারপাশে কারুকরা সোনা-ফ্রেম।

বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতি

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

বাঙ্গালীর স্বদেশ প্রীতির পরিচয় বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছে। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে স্বদেশ-প্রীতির মন্ত্র আহরণ করিয়া ভূদেব প্রথম বাঙ্গালীকে শোনাইলেন,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এত অল্প কথার মধ্যে এমন প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেমের অভিব্যক্তি আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

ইহার সহিত তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। এ মহাকার্য্য তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না, পরজাতি-বিদ্বেষ ও পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবেনা। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে আসন এবং খ্রীষ্টের ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে।"

এই সাত্ত্বিক উদারভাবে পরিপূর্ণ স্বদেশপ্রীতির কথা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম প্রচারিত করিলেন। এই স্বদেশ-প্রেম বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রেম, ইহাতে জাতি-বৈরতার চিহ্নমাত্র নাই।

কিন্তু স্বদেশপ্রীতির প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। দেশ জননীর দুর্দশায় তিনি কাতর হইয়া ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি কবিতায় লিখিলেন,—

—"জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি
স্বর্গরূপ তুল্যহীন হয়ে ?
তোমার কৃপায় যত সকলেই জ্ঞান হত
মিছে কেন মর তার ভয়ে ?
পূর্ব্বকার যোগ্যতার কিছুমাত্র নাহি আর

অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্ব রীতি নীতি
অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি
প্রতি ঘর প্রতিপথ হত।

ইহাই বাঙলা সাহিত্যে দেশপ্রীতির আদি বাঙলা গান। দেশপ্রীতি দেশবাসীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে। ইহাও গুপ্ত কবি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেশবাসীকে শোনাইলেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

ইহাতেও বিদেশী বিদ্বেষ নাই। এই কয় ছত্রে গুপ্তকবি তাঁহার গভীর দেশানুরাগের প্রেরণায় বাঙালীকে তাহার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। দেশের লোক যখন মমতাহীন হইয়া দেশীয় রীতিনীতি ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল তখন তিনি এই অনুকরণপ্রিয় জাতিকে আঘাত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন।

মায়ের উপর সন্তানের যে ভালবাসা গুপ্তকবি দেশের প্রতি দেশবাসীর সেই ভালবাসার অভাব দেখিয়া লিখিয়াছেন,—

"জানলা কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে?"

ইহা তাঁহার মর্ম্মবেদনার এক চরম অভিব্যক্তি। "থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে" বাঙালী জাতি সম্বন্ধে এই মর্ম্মান্তিক কথাকে আরও মর্ম্মান্তিক করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্র, রবীন্দ্র, রজনীকান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত অনেকেই শুনাইয়াছেন। কিন্তু আজ হইতে একশত বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর গুপ্তের মুখে গুপ্তকবি ভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে বাঙালী একথা শোনে নাই। স্বদেশবাসীর শোচনীয় অধঃপতনে কবিবর এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে তাহাকে তিনি 'মানুষ' না বলিয়া 'জীব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'জীব' কিরূপে মানুষ হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশও তিনি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থ অত্যন্ত অনুরাগী। মনুষ্য তাহাকেই বলি, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"

গুপ্তকবির ভাবধারা যে এখনও পর্য্যন্ত পারম্পর্য্যের পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না; বরং আরও স্পষ্ট ভাবে বলা যায় এই ভাবধারার তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক।

ঈশ্বরগুপ্তের পর মাইকেল মধুসূদনের রচনায় স্বদেশপ্রীতির পরিচয় ফুটিয়া উঠে। ইয়োরোপ যাত্রাকালে তিনি জন্মভূমির উদ্দেশে লিখিয়াছেন,—

"রেখ মা দাসেরে মনে,
এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করোনাগো তব মনঃ কোকনদে!
প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হ'তে নাহি দেখ তারে
উজলিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি মরণে
মক্ষিকাও পদে না গো পড়িলে অমৃতহ্রদে।

ইহা ছাড়া মাইকেলের মেঘনাথবধ কাব্যের ৪র্থ সর্গের বিভিন্ন স্থানে স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণে নাই। তাঁহার রচিত মেঘনাদ দ্বিতীয়বারে বলিতেছে—

"—সাধে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়; পর, পর সদা।"

ইহার পর দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ নাটক বাঙালীর প্রাণে জাতিপ্রেমের বন্যা আনাইয়া তুলিল। নীলকরপীড়িত কৃষকদের হাহাকার সমস্ত বাঙালীর হৃদয়ে সহানুভূতির একাত্মতা আনিল। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—

"নীলদর্পণ কি করিয়াছে?...
বাঙালীর মূর্চ্ছাগত মনকে মনুষ্যত্বের স্নেহে উত্তীপ্ত করিয়া আশ্বস্থিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙালী দেশের জন্য কাঁদিতেছে, 'ভারত', ভারত বলিয়া একটু হাত পা নাড়িতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের পূর্ব্বে এ অবস্থায় কতটুকু অস্তিত্ব ছিল?"

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমসাময়িক কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বীরবাহুকাব্যে স্বদেশ বন্দনা করিলেন। বীরবাহুকাব্যে দেশভক্তির উজ্জ্বল প্রকাশনা বাঙালী পাঠককে বহু বৎসর যাবৎ মাতাইয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন হেমচন্দ্র দেশবাসীকে দেশানুরাগে অনুপ্রাণিত করিতে আরও বহু কবিতা রচনা করিলেন। কংগ্রেস সৃষ্টির প্রায় ষোলো বৎসর পূর্ব্বে তিনি 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। 'ভারত বিলাপ' কবিতার এই সুর বাঙালীর মনে প্রাণে দেশপ্রেমের এক নতুন সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে। ইহার পর কংগ্রেস অনুষ্ঠানে কবিবর হেমচন্দ্র আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার 'রাখিবন্ধন' কবিতায় এই উপলক্ষে লিখিলেন,—

—"কি আনন্দ আজ ভারত ভুবনে
ভারত জননী হাসিল!

*

যোগনিদ্রা ভেঙে ভেবে জননীর
কেন ডেকে আজ তোমাকে শরীর,
কার না নয়ন তিতি রে ?
সপ্তম বংসর পোষাদের ছাল,
ভারতের মুখে এত যে কালি,
আজি তার ফল ফলেছে।
জীবন সার্থক আজিরে আমার
এ রাখি বন্ধন ভারত মাতার
দেখিনু নয়নে দেখিনুরে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ
পুরাবার তরে চলিল।"

কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন উপলক্ষে কবি উদার ভাবে ভারতবাসীকে আহ্বান জানাইয়া লিখিলেন,—

এসনো কে আর অবসর প্রাণ
ত্বরা, ত্বরা—শোন ভারত সন্তান,
মহারবে আজি কি অমর গান,
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়।
অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি নাদ
এস সবে গাহি জননীর গুণ
জীবনে না হবে মরণের ভয়,
অসার সংসার ভাবনা হরি—
মহামন্ত্র মাতৃকোষে বিমোচন
মাতৃপূজা কোটি কোটি দেবার্চনে
ইন্দ্র-পদ লোকে কি আছে হেনমন
বাঞ্ছিত নরের বল না আর।

কংগ্রেস অধিবেশন হইবার পূর্বে রাজনারায়ণ বসু "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের" ইচ্ছা লইয়া একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ইহার ফলে সর্বপ্রথম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গানটি গীত হয়,—

"মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত ! তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি ?
চন্দ্রকিরণ কান্তি বিরথিতে
ভাসিতাম আনন্দে।
আজি এ মলিন মুখ কেমন নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে, সহিতে না পারি।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ পরে এই গান তাঁহার রচিত "ভারত-মাতা" নামে কুত্রনাটকে সন্নিবেশিত করেন।

এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই সঙ্গীত গীত হয়—

"মিলে সবে ভারত সন্তান
এক তান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশো-গান।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।" ইত্যাদি

এই সঙ্গীত সমগ্র দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণে দেশোদ্ধারণার এক অপূর্ব সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গলার প্রতি গ্রামের ঘাটে ঘাটে সর্বত্র এই সঙ্গীত গীত হইত। ইহার প্রভাব সমগ্র দেশকে যেন এক নবচেতনায় উদ্বোধিত করিল।

বাঙ্গলা ভাষায় রচিত এই প্রথম জাতীয় সঙ্গীতকে অভিনন্দিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিলেন,—"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী তট বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। এই গীত ত্রিংশতি কোটি ভারতবাসীর সুদয়-যন্ত্রে বাজিতে থাকুক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আশা সার্থক হইয়াছিল। জাতীয় মহাসমিতিতেও (কংগ্রেস) এই সঙ্গীত গীত হয়। এমন আশা-উদ্দীপনাপূর্ণ ভারতের জয়গান বাঙ্গালী ইহার পূর্বে আর শোনে নাই।

এই জাতীয়তার প্রভাব বেগ বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত গভীর ভাবেই আঘাত করিয়াছিল। তাই তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্র জাতীয়তার মন্ত্র গানে মুখরিত হইয়াছে।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করিলেন। এই বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর জাতীয়তার এক নবযুগের উদ্বোধন করিল। এই বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালী বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মধ্য দিয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রতি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার সঙ্গীত রচনা করিলেন, সাহিত্যরচনা করিলেন। বাঙ্গলাদেশে জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমে এই ভাবে দেশপ্রীতির বীজ রোপণ করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি লিখিলেন,—

—"ঈশ্বরী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায় ? যে মনুষ্য জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে সে মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিতে না পারে সে জাতি জাতি মধ্যে হতভাগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার নানাস্থলে এই দুঃখ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যাহাতে দেশের দুঃখ মোচন করিতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। সেকালে বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যাবাদী, ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—

সেদিন সেকালের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিলেন শুধু বঙ্কিমচন্দ্র। অগ্নিগর্ভ ভাষায় তিনি বলিলেন—"যে বলে—বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল,

চিরকাল ভীরু, ক্লীবতার, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। তাহার কথা মিথ্যা।"

শুধু এই কথা লিখিলেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন না। মেকলের সেই মিথ্যা ভাষণকে বাঙ্গালীর স্মৃতি হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তিনি তাঁহার রচিত সীতারাম, আনন্দমঠ ও দেবী-চৌধুরাণীতে বাঙ্গালীর বীরত্বের ছবি অত্যন্ত নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিলেন।

কমলাকান্তরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া লিখিলেন,—

—"আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা। ওই আমার মা। কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি। সহসা আশার আলোকে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্‌মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল সেই তরঙ্গ সঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণপ্রতিমা, এই সপ্তকোটি শাণময়ী প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা! হাঁ এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নখচিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।...

কমলাকান্তের এই উক্তির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ জননীর দুঃখ দুর্দশার পরাণ মর্মবেদনা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বন্দেমাতরম সঙ্গীত বাঙ্গালীকে স্বদেশ সেবায় অনুপ্রাণিত করিল।

ইহার পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অমৃতলাল, অতুল সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ বাঙ্গলার জনপ্রিয় কবিরা যে সব গান ও কবিতা রচনা করিলেন তাহাতে শুধু যে আমাদের স্বাজাত্য ও স্বদেশপ্রীতিকে বর্দ্ধিত করিল তাহা নয়, সেই সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুল সম্পদ সঞ্চিত হইল।

এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে সাহিত্য রচিত হইল তাহাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার প্রেরণা জোগাইল। বাঙ্গালী দেশকে বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন,—

"ওই অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে
সময় তরঙ্গে নিকটে, এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

কান্তকবি রজনীকান্ত বাঙ্গালীকে বিদেশী বর্জ্জন করিয়া দেশী বস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য লিখিলেন,—

—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া বাঙ্গলার যুবক বাঙ্গলার পথে ঘাটে গাহিতে লাগিল,—

"সব সংসারে করিলাম পণ—
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে, তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন, না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।"

এই ভাবে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে স্বদেশী মন্ত্রের মত স্বদেশী সাহিত্য বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। বাঙ্গলা থেকে এই ভাবধারা সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত হইল। জাতি যেন শতাব্দীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল।

সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন, সাহিত্য মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছায়া। স্বদেশী সাহিত্যের এই মহাজীবনের প্রতিচ্ছায়া আমাদের মানব জীবনে অনন্ত অক্ষয় প্রতিভাত হইল। সাহিত্যই জাতির প্রাণ, আর এই সাহিত্যই জাতীয় যুদ্ধে আমাদের জয়মাল্যে ভূষিত করিল।

আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরা, যেন কখনও ভুলিয়া না যাই আমাদের সাহিত্যই আমাদের মুক্তি সাধন করিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হঠাৎ ল্যাং-ল্যাং ভেউ-ভেউ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। চুঁচকিও তাহার অনুসরণ করিল। কুমার খাতা বন্ধ করিয়া দ্বারের দিকে চাহিল একবার, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। ডেস্কটির ড্রয়ারটা খুলিয়া একবার দেখিল মাংসের ঝোল কতটা আছে। ঝোল তখনও ছিল। তাহার সাহায্যে একটুকরা মাংস বাহির করিয়া সে তখন একটা বাটিতে রাখিল, তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়া সেটাকে ঠাণ্ডা করিল, তাহার পর আঙুল দিয়া টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল মাংস সিদ্ধ হইয়াছে কি না। একটু বাকী আছে,মনে হইল জলটা মরিতে মরিতে হইয়া যাইবে।

"কুমারবাবু না কি। এখানে কি হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ল্যাংলা এবং চুঁচকি। দুইজনেরই মুখে অপ্রস্তুত ভাব। জামাইবাবুকে তাহারা চিনিতে পারে নাই—তাড়া করিয়া গিয়াছিল এজন্য দুইজনেই যেন খুব লজ্জিত। সেই ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই হোক বা একজন আর একজনকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্যই হোক তাহারা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় পা কান কামড়া কামড়ি করিয়া বপ্রক্রীড়ায় মাতিয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্তের পোষাক অদ্ভুত। ব্রিচেস্-পরা সাহেবী পোষাক, হাতে বন্দুক মাথায় টর্ক-বাঁধা। চক্ষু কর্ণ রোগের বিশেষজ্ঞেরা মাথায় যেমন টর্চ বাঁধেন অনেকটা তেমনি।

"কোথায় গিয়েছিলেন, দিদি খুঁজছিলেন আপনাকে"

"তোমার দিদি সারাজীবনই খুঁজছেন আমাকে। কখনও পাচ্ছেন, কখনও হারাচ্ছেন"

"এ বেশে কোথা গিয়েছিলেন!"

"—প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম—"

"প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ"

"আজ সকালে হাঁসপাতালে দেখলাম একটি মানব-শিশুকে শেয়ালে খেয়েছে। শৃগালের স্পর্দ্ধা বরদাস্ত করা যায় না। গোটা কুড়ি শৃগাল সংহার করেছি"

"কোথায়—"

"পাশের বাগানটায়! ওই বেতের জঙ্গলটার পাশে—"

"অতগুলো শেয়াল একসঙ্গে পেলেন কি করে—"

টোপ ফেলেছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে' মাথায় এই আলোটা জেলে দিলুম। শেয়ালরা কৌতূহলী জীব, অস্থানে এমন জোর আলো দেখে দেখতে এল ব্যাপারটা কি। গুটিগুটি রেঞ্জের মধ্যেই এসে পড়ল, তারপর আর ফিরে গেল না"

"কুড়িটা মেরেছেন?"

কুড়িটা। তোমার কোনও জমিতে যদি সারের দরকার থাকে, ওগুলো পুঁতে দিতে পার সেখানে। শেয়ালের মাংস খাওয়া যায় না, বিশ্রী গন্ধ ওদের মাংসে, কুকুর-কুকুর গন্ধ। নিগ্রোরা বোধহয় খায়—

একটা কেরোসিন বাক্সের উপর পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলিতেছিল, সেটা মাটিতে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণকান্ত তাহার উপর উপবেশন করিলেন।

"আপনি এই ক্যাম্পচেয়ারটায় আরাম করে' বসুন না"

"না, রাজাকে অকারণে সিংহাসনচ্যুত করা আমার স্বভাব নয়। ভগবানের আদেশে আমি কেবল দুষ্কৃতদের শাসন করি—"

কুমার পুনরায় মাংসের দিকে মন দিয়াছিল। ঢাকনাটা তুলিয়া দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "গন্ধটা তেমন ভালো ছাড়ছে না"

"বুনো হাঁস ?"

"হাঁ।"

"কি কি হাঁস"

"টিল,নোচার্ড,লালসর,স্পুনবিল,পীরও আছে একটা—"

"কতটা মাংস আছে—"

"তা সের পাঁচ ছয় হবে"

"ভাল সরষের তেল আছে এখানে ?"

"আছে—"

"তাহলে এক কাজ কর। পোয়া দেড়েক সরষের তেল চড়িয়ে দাও একটা কড়াতে। কড়া এনেছ ?"

"হাঁ, ওই যে—"

"পেঁয়াজ রসুন আদা ?"

"তা-ও আছে—"

"তাহলে গোটা তিনেক রসুন, পাঁচ-ছটা পেঁয়াজ আর ছটাক খানেক আদা কুঁচিয়ে তেলে ভেজে সবসুদ্ধ ঢেলে দাও ওটার ভিতরে। খানিকটা কাঁচা তেলও দাও তার উপর। পাখীর মাংস সরষের তেলেই রান্ধ। তোমার দিদির কাছে শিখেছি এটা"

"জলটা মরুক আগে। ওরে ল্যাংড়া—"

"ছি"

কোণের বস্তাটা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

কড়াটা পরিষ্কার কর। আর তিনটে রসুন, দু'টা পেঁয়াজ, আর খানিকটা আদা কোট্"

কৃষ্ণকান্ত মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাঃ বেশ চমৎকার কামুফ্লেজ করে' ছিল তো ল্যাংড়া"

ল্যাংড়া উঠিয়া আসিয়া আদেশ প্রতিপালনে মন দিল। ল্যাং ল্যাং এবং কুঁচকি তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতে লাগিল। ল্যাংড়া তাহাদের পরম বন্ধু, একটু আগেই পাখীর মাংস খাওয়াইয়াছে"

কুমার বলিল, "আপনার শিকারের গল্প অনেকদিন শুনিনি জামাইবাবু—"

"আজ দুপুরে তো বলছিলাম রামপ্রসাদ, যোগেন আর প্রিয়গোপালদের—"

"এখন বলুন না একটা, শুনি। মাংসের জলটা মরুক ততক্ষণ—"

কৃষ্ণকান্ত ঊর্দ্ধমুখ হইয়া খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না এখন"

"আচ্ছা আপনার ভাইঝির শ্বশুর কালীবাবুকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল বলুন তো। আবছা আবছা শুনেছিলাম"

"প্রতিশোধ নিয়েছিলাম"

"কি রকম—"

"মালতী আমার এক দূরসম্পর্কের দাদার মেয়ে। দুমকায় যখন ছিলাম তখন মেয়েটা খুব ন্যাওটো ছিল আমার। বীরেন-দা দুমকায় থাকতেন তখন। কিছুদিন পরে আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। কাউকে কিছু জিগ্যেস না করে' বীরেনদা চুপ্ করে' মালতীর বিয়ে দিয়ে বসলেন ওই কালীবাবুর ইম্‌বেসিল (inbicile) ছেলেটার সঙ্গে। মূর্খ, থলথলে মোটা, দুটি গাল যেন দু'টি বাস্ রুটি। সম্বলের মধ্যে আছে শহরে গলির শেষ প্রান্তে এক জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। বিয়ের সময় আমি যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে সম্ভবত ভালই হয়েছে। চুলটি ভাঙল বছরখানেক পরে। মালতীর চিঠি পেলাম। লিখেছে তার উপর যে ধরণের অত্যাচার চলছে তা সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে সে। নিজের বাবাকে চিঠি লিখে সে কোনও প্রতিকার পায় নি, তাই আমাকে লিখেছে। আমিও যদি এর কোনও প্রতিকার না করি তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। টেলিগ্রাম করে' ছুটি নিলুম, তারপর গেলুম তার কাছে। কালীবাবু লোকটিকে সেই প্রথম দেখলাম। ভালুক আর বাঁদরের ক্রসব্রিনেশন। বেঁটে, রোগা, মুখময় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গোঁফদাড়ি, কুৎসিৎ দর্শন লোকটা। চোখে নীল চশমা। বাঁ হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি সর্ব্বদা চলাচল করছে গোঁফ-দাড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মতো। আমি গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। চুপ করে' রইল, তারপর দাড়ির জঙ্গলে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে বললে, আপনাকে তো চিনি না। বীরেনবাবুর কোনও চিঠিও পাইনি। এ অবস্থায় ঘরের বউকে আপনার সামনে

বার করি কি করে'। বললাম, আপনি মালতীকে গিয়ে বলুন যে তোমার ছেইকাকা এসেছে। অনেক কচলাকচলি করে' তবে মালতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনলাম বুড়োর স্ত্রী নেই। একটি মাত্র শোবার ঘর। সেই ঘরে বুড়ো ছেলের সঙ্গে এক খাটে শোয়, মালতীকে শুতে হয় ঘরের বারান্দায়। সমস্ত রাত শীতে ঠকঠক করে' কাঁপে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, বাড়িতে ঝি নেই, চাকর নেই, তার উপর রাত্রে ঘুমও নেই—বোঝ অবস্থাটা। কালীবাবুকে বললাম, আপনি এই বৈঠকখানার একধারে শুলেই তো পারেন। মেয়েটার শীতে ভারী কষ্ট হচ্ছে যে। দাড়িতে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে কালীবাবু বললেন, "আমার গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপনি ওপর-পড়া হ'য়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? হুঁ "—আবার খানিকক্ষণ থেমে—"আপনি দূরসম্পর্কের কাকা, জোয়ান বয়স। আমার বউমাটিও সুন্দরী, যুবতী। আপনার সহানুভূতি হবারই কথা। হুঁ "—এই বলে' আবার দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল। আমি দেখলাম এক্ষেত্রে সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বাঁকাতে হবে। মালতীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললাম—"তোর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ, রাত্তির আড়াইটের ট্রেণে তোকে নিয়ে যাব। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম ডায়গাটা। দেখলাম ওদের বাড়ির ঠিক পাশেই একটা সেকেলে শুকনো ইঁদারা আছে। বেশ প্রকাণ্ড ইঁদারা। তারপর থানায় গেলাম। সেখানে ভাগ্যক্রমে দেখা হ'য়ে গেল পুরাতন বন্ধু সুরপৎ সিংয়ের সঙ্গে। একসঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গে শিকারও করেছি অনেকবার। সে তখন ওখানকার দারোগা। খুব সুবিধে হয়ে গেল। তারপর বাজারে গেলাম। বেশ মজবুত দেখে কিছু দড়ি আর একটা মুখোস কিনে নিয়ে এলাম, লুকিয়ে রেখে দিলুম সেগুলো ব্যাগের মধ্যে। সব ঠিক করে' আবার থানায় গেলাম। সুরপৎ সিংকে আমার প্ল্যানটি খুলে বললাম অকপটে। সে হাসল একটু। তারপর বলল, "ঠিক আছে। তবে দেখো, ধরে' বার না যেন!" বললাম, "না, ধরবে না"। রাত বারোটা নাগাদ মুখোশ পরে' ওদের শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় মারলাম লাথি, তারপর দিলুম একটা ধাক্কা। কপাট মজবুত ছিল না তেমন, ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকে বাপ ব্যাটা দু'জনেরই মুখ কস্‌কসিয়ে বেঁধে ফেললাম তাদেরই কাপড় দিয়ে, তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে দুজনকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সেই শুকনো ইঁদারাটার ভিতর নামিয়ে দিলুম!"

কুমার স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল, "বলেন কি! চীৎকার করলে না তারা"

"তারস্বরে। তাদের সঙ্গে আমিও চেঁচাতে লাগলুম। কিন্তু লোকজন উঠতে উঠতে আমি তাদের ইঁদারায় নাবিয়ে মুখোসটা ফেলে দিয়েছি ইঁদারার মধ্যেই। পাশেই ছিল তো ইঁদারাটা—"

"ইঁদারায় নাবাতে গেলেন কেন"

"বাইরে শীতে কি রকম কষ্ট হয় তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে' নিয়ে গিয়েছিলাম বাপ ব্যাটাকে—"

"তারপর?"

"আমার হাল্লা শুনে বেরিয়ে এল দু'একজন। তাদের বললাম, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, ডাকাতগুলো হয়তো আছে এখনও আশে পাশে। এই শুনে ঘরে ঢুকে পড়ল সবাই। তারপর মালতীকে নিয়ে আমি নিজেই থানায় গেলাম। সেখানে অফিসিয়ালি রিপোর্ট করলাম—আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু রাত্রে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাইঝির স্বামী আর শ্বশুরকে একটা ডাকাত টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। কোথা নিয়ে গেছে জানি না, আপনারা সেটা খোঁজ করুন। আমাকে কালই কাজে জয়েন করতে হবে, তাই এই ট্রেণেই আমি আমার ভাইঝিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যখন কেস হবে, তখন এসে সাক্ষী দেব। ঠিকানা দিয়ে কেটে পড়লাম আড়াইটের ট্রেণে"

"কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত?"

"কেস হ'ল। গিয়ে সাক্ষীও দিলাম। ডাকাত ধরা না পড়াতে কেস ধামা চাপা পড়ে গেল"

"আর মালতী?"

"মালতী আর ফিরে যায় নি। তাকে স্কুলে ভরতি ক'রে দিয়েছিলাম। এখন সে এম-এ, পাস করে প্রফেসারি করছে"

"কালীবাবু কিছু করেন নি?"

"যথেষ্ট করেছিলেন। মকোর্দ্দমা পর্য্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন নি আর মালতীকে। আমারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেন নি, সুরপৎ আমার স্বপক্ষে ছিল তো। তুমি মাংসটা দেখ এইবার, জলটা মরে গেছে মনে হচ্ছে—"

কুমার উঠিয়া গেল এবং মাংসটা নাড়িয়া দেখিল।

"তাগো আপনি বললেন, জল একদম শুকিয়ে গেছে, আর একটু হ'লে ধরে যেত—"

"এইবার তৈলাক্ত কর। বেশ খানিকটা তেলে পেঁয়াজ রসুন আর আদাটা ভাজ"

পেঁয়াজ রসুন আর আদা কোটা হইয়া গিয়াছিল, কুমার সেগুলি ভাজিয়া মাংসে ঢালিয়া দিল। ল্যাং ল্যাং এবং ছুঁচকি এতক্ষণ কানখাড়া করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই বাহিরে কুকুরে কুকুরে ঝগড়া বাধিয়া তুমুল কোলাহল উঠিল একটা। একাধিক রুষ্ট কুকুরের চীৎকারে অন্ধকার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুমার বলিল, "তাকিয়াটা এসেছে বোধহয়"

"তাকিয়া? সে আবার কে?"

"বোসবাবুর কুকুর। বোসবাবু পুষেছিলেন ওটাকে। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে গেছেন, ওটাকে আর নিয়ে যান নি। ও আমাদের বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কিছুতে আমোল দিচ্ছে না ওকে—"

সহসা একটা কুকুর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কুমার দ্বারপ্রান্তে উঠিয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল—"ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভেতরে আয়, ভেতরে আয়—"

দেশী কুকুরেরা সহজে কথা শোনে না। অনেক ডাকা-ডাকির পর তবে ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভিতরে আসিল। যখন আসিল তখনও তাহারা রাগে গরগর করিতেছে। ঘাড়ের লোম খাড়া, ল্যাজও খাড়া। বিজয়ীর মতো তাহারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ঝগড়াটে হিংসুকে কোথাকার। ব'স এখানে—"

কুমার তাহাদের হাত দিয়া ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া দিল।

"বসে' থাক চুপ করে"

তাহারা বসিবার পর কুমার ডাকিল—'তাকিয়া, তাকিয়া আয়, তাকিয়া—"

কুণ্ঠিত মুখে সসঙ্কোচে পাঁশুটে রঙের একটি বেঁটে মোটা কুকুর আনত নয়নে, আনত পুচ্ছে দ্বারপ্রান্তে আসিল।

"আয়, আয়, ভেতরে আয়—"

তাকিয়া ভিতরে আসিতে সাহস করিল না, সসঙ্কোচে দ্বারপ্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"ওর নামটি বেশ লাগসই হয়েছে। কে রেখেছে"

"আমি। আমিই ওকে প্রথমে পুষেছিলাম, কিন্তু বোসবাবু চাইলেন বলে' তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন ওকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। তাকিয়া, তাকিয়া আ, আ"

তাকিয়া সভয়ে ল্যাজ নাড়িয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঘরের কোণ হইতে ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি দুইজনেই আবার গরগর করিয়া উঠিল।

"চোপ্। চুপ করে বসে' থাক তোরা। হিংসুকে কোথাকার"

কুমারের ধমক খাইয়া আবার নীরব হইল তাহারা।

এমন সময় বাহির হইতে মাতীর গলা শোনা গেল।

"ছোটকাকা, ছোটকাকা—আলো দেখাও"

ল্যাংড়া পেট্রোম্যাক্স্ লইয়া বাহির হইল। ক্ষণপরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাতী আসিয়া হাজির, তাহার পিছনে স্মিতমুখী সন্ধ্যা।

"মাঝ রাস্তায় ছোট পিসির টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল। শিগ্‌গির চল, চিত্রা এসে গেছে—"

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি বড় পিসিকে যত বলছি আপনি এখানেই আছেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কেবল ভাবছে, ভেবেই যাচ্ছে, চলুন"

কৃষ্ণকান্ত সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সাহেব কোথা"

"আপনাকে খুঁজছেন"

"আমাকে! কেন"

"গাছের সম্বন্ধে কি যেন জিগ্যেস করবেন। বাগান করবার শখ হয়েছে—"

"কিন্তু আমি তো জঙ্গলের খবর রাখি"

"হয়তো ফলের গাছই বাগানে লাগাবেন। চলুন"

কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?"

"এখনও হয় নি। তবে দিদিমা তাঁর জন্যে অন্তঃপুরে তরকারি-টরকারি আলাদা করে রেঁধেছেন। ছানার পায়েস হয়েছে তাঁর জন্যে। চমৎকার হয়েছে পায়েসটা—"

"তুই পায়েসও খেয়েছিস না কি"

স্বাতী নিজেই পায়েস চাহিয়া খাইয়াছিল, কিন্তু বলিল, "দিদি জোর করে' খাওয়ালে—কি করব বল। বললে—চেখে দেখ্ কিন্তু দিলে একটি বাটি। হ্যাঁ, দিদি বললে কলাপাতা কাটানো হয়েছে? যদি না হ'য়ে থাকে শাল-পাতা নিয়ে যেতে। জামাইরা শুধু থালায় খাবে, আমরা পাতায়—"

"ন্যাংড়া কলাপাতা কেটেছিস তো"

"ও হাঁ—"

"সব নিয়ে চল তাহলে। আগে মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে চল"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

স্বাতী কুমারকে চুপি চুপি বলিল, "জানো ছোটকাকা, বাবা বড় disappointed হয়েছেন। তিনি ভেবে-ছিলেন—চিত্রা আসবার আগে টেলিগ্রাম করবে আর তিনি ষটা করে' স্টেশনে আনতে যাবেন। কিন্তু ওরা খবর না দিয়ে হট্ করে' এসে পড়েছে। কি করবে, টেলিগ্রাম করবার সময়ই পায়নি, সুব্রত লাস্ট মোমেণ্টে ছুটির খবর পেলে—"

"ও, তাই বুঝি—"

হঠাৎ স্বাতী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছোটকাকা, ও-দুটো কি, শেয়াল নাকি!"

সত্যই দুইটি শৃগাল একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের দেখিতেছিল।

"এ দুটোর ভবলীলাও শেষ করে' দেব না কি"—কৃষ্ণকান্ত প্রশ্ন করিলেন।

"অনেক তো মেরেছেন আজ। ছেড়ে দিন এ দুটোকে"

শৃগাল দুটিও সরিয়া পড়িল।

"অনেক শেয়াল মেরেছেন বুঝি? কোথা?"—স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"পাশের বাগানটায় স্তূপ করা আছে"

"চলুন না দেখি—"

"না, এখন নয়। কাল সকালে দেখো"

সন্ধ্যার মৃদুকণ্ঠের গম্ভীর আদেশকে কেহ অমান্য করিতে পারিল না। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

বিরহে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তোমারে ছাড়িয়া যেন তোমারে আবার
পেয়েছি নূতন করে। সে রূপ তোমার
মনে হয় কোন দিন দেখি নাই আগে,
তাই ত নূতন কবি মনে তোমা লাগে।
আগে তব দেখেছিনু নীরব আকুতি
বুক ভরা শান্ত প্রেম, তীব্র অনুভূতি,
সলাজ সোহাগ ভরা অমথিত বাণী,
মুকুলিত ভীরু প্রেমে মুগ্ধ হিয়াখানি।
পত্রে তুমি আজিকে মুখর; প্রবাসেতে আজ
লিখি তব কহে কত কথা; নাহি করে লাজ
দুরন্তার আড়ালেতে রহি; খুলিয়া হৃদয়
মোর কাছে আজি ধরা দেছ অসংশয়।

তোমারে ছাড়িয়া আজি—আজি বহু দূরে
পেতেছি তোমার বাণী অপরূপ সুরে।

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাদশার বেগম, আজকে নূতন পরিবারে তোমার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সুখে দুঃখে, আনন্দে উৎসবে, ঈর্ষায়ে, বিপদারে—তুমি বন্দীর দেবদূতের মতন নূতন রাজ-পরিবারকে রক্ষা করবার জন্ত চেষ্টা করেছ। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব মুহূর্তে আগ্রার দরিদ্রতে মুরাদ এবং আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হয়ে আত্মঘাতী সংগ্রাম নিবারণের চেষ্টা করেছ। যে কোন মুহূর্তে অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ বিরাট অগ্নিবারে পরিণত হতে পারত,অথচ তুমি ছিলে নির্ভীক। শিবির থেকে শিবিরান্তরে গিয়ে, শান্তির চেষ্টা করেছ। যুবরাজ আজাদের তিরস্কার করে তোমা অগ্রিমীর কর্তব্য সম্পূর্ণ করেছ। সম্রাট শাহজাহান যেদিন আগ্রার দুর্গে বন্দী হলেন, তুমি সেদিন বাদশাহ আলমগীরের সমস্ত অর্থ, সম্মান এবং বিলাসের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে, কারাজীবন বরণ করেছিলে। শাহজাহানের দুর্বার আট বৎসর ব্যাপী কারাজীবনের দুঃখ, অপমান, যন্ত্রণা সাত্ত্বনের জন্ত তোমার সেই অমলন প্রয়াস তোমাকে গৌরবান্বিত করেছে, মুঘল রাজ পরিবারকে এক অপূর্ব মহিমান্বিত করে তুলেছে। একদিন ছিল, যখন সম্রাটের মোহরাঙ্কিত পাঞ্জা তোমার হাত শোভিত করত। তোমার ইঙ্গিতেই ছিল মুঘল সম্রাটের সর্বস্বের আবেগ। তোমার অঙ্গুলি সঞ্চালনেই বিপুল সাম্রাজ্য পরিচালিত হত। দুর্কী-স্থান, তোরাণ, ইরাণ, জগতের রাজপ্রতিনিধিগণ তোমার অনুগ্রহ লাভের জন্ত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস রাজপুরীর অঙ্গনে অপেক্ষা করত, অথচ শাহজাহানের রাজ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনের এবং ক্ষমতার কি আশ্চর্য পরিবর্তন! তুমি আজ সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তবু তুমি শাহজাদী, মুঘল রাজরক্ত তোমার জীবনকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তুলছে, তার সাক্ষী আমি।

বন্দী শাহজাহানের পার্শ্বচারিণীরূপে তুমি দেখেছ—এক পক্ষকাল ধরে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদকে সুরাপানে অচেতন করেছিলেন, অথচ এই আওরঙ্গজেব আত্মবিশ্বাসের প্রাক্কালে মুরাদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—মুরাদ! দিল্লীর সিংহাসন তোমার। তুমিই দিল্লীর সিংহাসনের একমাত্র যোগ্য অধিকারী, মুঘল বংশের একমাত্র যোগ্যতম সন্তান। তারা ধিক্কারী হিন্দুস্থানেই। গুরু বিলাসী, ইসলামে বিশ্বিত সঙ্গীতসেবী। আমি আজার কথায়, তুমি আমার ধর্মপুত্র ভ্রাতাদের নিরাপত্তার ভার নেবে। আমি আজার নামে তোমার স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তোমাকে আমি বাদশাহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত আমার সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি এবং অর্থ নিয়োজিত করব। আমার অঙ্গীকারের নিদর্শনরূপ তোমাকে এই শপথের সঙ্গে এক মুদ্রা প্রেরণ করছি। তোমাকে দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে আমি যাত্রা করব।

সরল বিশ্বাসী মুরাদ সেই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল। পূর্ণ ছয়টি পক্ষকাল ধরে আওরঙ্গজেব মুরাদকে তাঁবুর শিবিরে আমন্ত্রণ করলেন। মুরাদের বিজয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্ত বিরাট ভোজের আয়োজন হল। সঙ্গীত, সুরা এবং নর্তকীরও ব্যবস্থা হল। অবশ্য এই তিন বস্তুই ইসলামে নিষিদ্ধ। এই উৎসবই মুরাদের জীবনের শেষ উৎসব। পরদিন সমস্ত আগ্রাবাসী চকিত, ভীত, স্তম্ভিত হল—আওরঙ্গজেবের শিবিরে মুরাদ বন্দী। মুরাদবক্ষ এই দলিবদ্ধ দুর্গের অতিথি হলেন, তার পর গোয়ালিয়রের দুর্গে তিন পক্ষকাল পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর উপাধি ধারণ করে বাদশাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। পিতা শাহজাহান আগ্রার প্রাসাদে তখনও জীবিত। শাহজাদা সুলতান সুলতান পিতার আদেশে পিতার শিবিরকে বন্দী করে সৈন্যদের পরিবর্তনশীল করে বাদশাহ আলমগীরের আদেশের অপেক্ষা করছিল। পরবৎসর আওরঙ্গজেব সদর সমারোহে দিল্লীর দুর্গে প্রবেশ করলেন। দিল্লীতে দিল্লীশ্বরের তাঁহার সিংহাসনারোহণ উৎসব অনুষ্ঠান হবে। পাঁচ পক্ষকাল ব্যাপী উৎসব—সে যে কি বিরাট উৎসব, তাহা কল্পনা করা যায় না। মানুষ কি অদ্ভুতরূপ! কি বর্বরতা! উৎসবের উল্লাসে দুরাকাঙ্ক্ষীর বিলাস ভোজনের আনন্দ সমস্ত বিদ্রোহীদের ভুলে। বাদশাহ আলমগীর তখনও জানতেন যে আগ্রার হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গ শাহজাহানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—শাহজাহান যদি একবার দুর্গদ্বারে এসে প্রজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন, সমস্ত প্রজা বাদশাহ আলমগীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠত। সে অসন্তোষের পরিণতি বাদশাহ আলমগীরের পক্ষে শুভ হবে না; সুতরাং উৎসবের স্থান আগ্রা থেকে দিল্লীতেই স্থানান্তরিত করা হল। শাহজাহানের দীর্ঘ বাস, দীর্ঘ প্রতিবাস আগ্রা দুর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।

শাহজাহান দুঃখ করে মমতাজকে বলেছিলেন—"মমতাজ! তুমি কি আমার জন্ত পৃথিবীর সমস্ত অভিশাপ কুড়িয়ে এনেছিলে?" আগ্রার প্রাসাদের পূর্ব অলিন্দে বসে সূর্যাস্তের রক্ত রশ্মি তাজমহলের মর্মরকে প্রতিমুহূর্তে নব নব রূপ দান করত। শাহজাহান তখন সেই রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করতেন। তাজমহলের রূপ পরিবর্তন শাহজাহানের জীবনের ঘটনা পরিবর্তনেরই প্রতিচ্ছবি।

এই উৎসবের জন্তই শাহজাদা সুলতান সুলতান আওরঙ্গজেবের শিবির পরিত্যাগ করে গুজরাত পথ অবলম্বন করলেন। তাঁর পরিবার লাহোরে ও তাঁহার পুত্র শিপার সিংহই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন বলে

বাদশাহ আলমগীরের হস্তে সমর্পণ করল। উঃ! কি বিশ্বাসঘাতক এই ফিরঙ্গ জাত! একদিন যা যারা শিকো এই ফিরঙ্গ জাতের প্রাণ-রক্ষা করেছিলেন—তার জীবন রক্ষা করেছিলেন? এই উৎসবের মধ্যেই যারা শিকোর বিচার আরম্ভ হয়েছিল—অপরাধ অদ্রোহ—অপরাধ তাহার অনুচিতে 'প্রভু' শব্দ জোড়িত অনুচরী খোজা ভৃত্য—দুইজনে তারা করেছে। খোজার বিচারে তারা শিকোর প্রাণদণ্ড হল। তাহার ছিন্নমুণ্ড পিতা শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। শাহজাহানের পক্ষে ভবিষ্যতে তাহার পক্ষ সমর্থন করে রাজ্যের প্রত্যাবর্তনে উত্তেজিত করার সুযোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাদশাহ আলমগীর বহুমূল্য সুলতানকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করবার অনুমতি দিলেন। প্রয়োজনে বাদশাহ আলমগীরের পক্ষে মূল্যবান সুলতানকে বলিস্বরূপ দুর্গে অবরুদ্ধ করা হল।

মমুর সিংহাসন! অপূর্ব তোমার মহিমা! কি মোহময়ী তোমার প্রভা! তোমার উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত মুঘল পরিবার আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। বাদশাহ আলমগীর তোমারই প্রলোভনে পিতাকে কারারুদ্ধ করিলেন—জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ সুলতানকেও অবরুদ্ধ করলেন।

সুলেমান শিকো! তুমি তো ছিলে ময়ূর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। তোমাকেও রাজরক্তের অভিশাপে ময়ূর সিংহাসনের সম্মুখে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। দুরার বক্ষ! তুমি থাকে কেন অবশিষ্ট রাখবে? বাদশাহ আলমগীর অনুগ্রহ করে তোমার ছিন্নমুণ্ড পিতাকে উপহার দেন নি। সে কি পিতার প্রতি করুণা? তোমার ছিন্নমুণ্ড আলী নকীকে তোমার ছিন্নমুণ্ড বধ্যভূমিকে বিদ্ধ করে এক পক্ষ কাল জনতার কৌতূহল বর্দ্ধন করেছিল।

নিরাপদ উত্তাপে পুষ্পরসের মতন শাহজাহানের রাজত্বের একটির পর একটি নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বাদশাহ শাহজাহান নিষ্ফল আক্রোশে কখনও তর্জন, কখনও অনুরোধ, কখনও অভিশাপ দিয়ে এবং কখনও আল্লার নিকট প্রার্থনা করে তাঁহার দুর্বহ দিনগুলি অতিবাহিত করছিলেন। বাদশাহ আলমগীর আগ্রার দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে এক নূতন সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিলেন। দুর্গদ্বারে তীরন্দাজ সশস্ত্র রাজপুত প্রহরী। নগরের সর্বত্র গুপ্তচর। শাহজাহানের পুরাতন কৃতা ও কর্মচারী সকলকেই দুর্গ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। একমাত্র অবশিষ্ট রাজপরিবারের পুরনারী এবং খোজা ভৃত্য তাঁহার সহচর ও আজ্ঞাবাহী। সম্রাট পক্ষাঘাতে পঙ্গু। যষ্টির উপর নির্ভর করে কারক্লেশে ঘরে প্রকোষ্ঠে অলিন্দ পর্যন্ত পদচারণ করেন। অলিন্দে বসে কখনও তাজমহলের দিকে করুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন; কখনও অশ্রু বিসর্জন করেন, কখনও অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। কখনো বা তাঁহার প্রিয় বীণা বাজিয়ে সঙ্গীতের মধ্যে অতীতের স্মৃতি বিলুপ্ত করেন। সপ্তাহে একটিদিন মাত্র বাদশাহ আলমগীরের আদেশে রাজনর্তকীগের সমবেত হয়ে চিত্তবিনোদন করেন।

আগ্রার দুর্গে মুহম্মদ সুলতান দিনে দুইবার শাহজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বাদশাহ আলমগীরের লিখিত অনুমতি ব্যতীত শাহজাহানের সঙ্গে অন্য কোন মানুষের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল। অনুমতি-সাপেক্ষ সাক্ষাৎ ও আলাপের প্রতিটি শব্দ বাদশাহ আলমগীরের নিকট বর্ণিত হত। শাহজাহানের কক্ষের মসীপাত্র ও লেখনী আলমগীরের আদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল। একজন বিশ্বস্ত খোজা ভৃত্যকে শাহজাহানের লেখক নিযুক্ত করা হল। সেই খোজাভৃত্যই ছিল শাহজাহানের একমাত্র লিপিকার। স্বহস্তলিখিত কোন লিপি প্রেরণ শাহজাহানের পক্ষে অনুমত ছিল।

শাহজাদা যারা আগ্রা দুর্গ পরিত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদের ব্যবহৃত সাতাশ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের হীরা জহরৎ মণিমুক্তা শাহজাহানের অন্তঃপুরে এক গুপ্তকক্ষে আবদ্ধ রেখেছিলেন। শাহজাহানের নিকট বাদশাহ আলমগীর পরাজিত ভ্রাতার উত্তরাধিকারের দাবীতে সেই হীরা জহরৎ দাবী করলেন। শাহজাহান সেই নিষ্করুণ দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শাহজাহানের পক্ষে মৃত ভ্রাতার স্ত্রী কন্যাদের এই শেষ সম্পদ—হত্যাকারীর হস্তে সমর্পণ করা যে কি মর্মান্তিক তা একমাত্র আল্লাই জানেন। শেষ পর্যন্ত শাহজাহান অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সেই হীরা জহরৎ বাদশাহ আলমগীরের হস্তে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিনের কর্মকারিণী তুমি জোবদা।

পাষাণ বেগম! বাদশাহ আলমগীরের লোভ ছিল সীমাহীন। মাত্রার পরীক্ষায় হীরা জহরৎ লাভেও বাদশাহ আলমগীরের লোভ তৃপ্ত হয়নি। তাঁহার সর্বাধিক লোভাতুর দৃষ্টি ছিল পিতার শতমুক্তাখচিত জপমালার প্রতি—সেই মালার প্রত্যেকটি মুক্তা ছিল একই বর্ণ, একই আকার এবং একই পরিমাপ মূল্য চারিলক্ষ আসরফি। আরও ছিল শাহজাহানের অনাধিকার পরিহিত একটি বৃহৎ হীরক খণ্ড। সেই হীরকখণ্ডের শাহজাহান প্রতিদিন মুকুরের মত তাঁহার প্রতিফলিত মুখমণ্ডল অবলোকন করতেন। বাদশাহ আলমগীর শাহজাহানের নিকট লিখলেন, এই মুক্তার মালা এবং হীরকখণ্ড সংসার-ত্যাগী অপেক্ষা সম্রাটের অঙ্গেই অধিকতর শোভা পায়। এই উক্তির উক্তি অত্যন্ত সরল, সহজ এবং স্পষ্ট। শাহজাহান নির্বোধ ছিলেন না; অত্যন্ত দুঃখ এবং ক্ষোভের সঙ্গে তাঁহার অনুচর বাদশাহ আলমগীরের নিকট প্রেরণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই লিখলেন—আমি আমার এই জপমালা নিয়েই নমাজের সময় আল্লার নাম উচ্চারণ করি। আমি এই জপমালা বাদশাহকে দেব, কিন্তু তার পূর্বে আমি মুক্তাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করব। তারপর আর বাদশাহ আলমগীরের মুক্তামালার প্রতি কোন লোভ প্রদর্শন করেন নাই। কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

সিংহাসনচ্যুত শাহজাহানের অপমান এইখানেই শেষ হয়নি। সম্রাট শাহজাহানের ব্যবহৃত রাজ পরিচ্ছদ, শয্যা সামগ্রী, ভোজন পাত্র মণিমুক্তা অন্তঃপুরিকাদের অলঙ্কার—খেওয়ানী আম এবং খেওয়ানী খাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু দ্রব্য—সমস্তই অতি সাবধানে এবং অত্যন্ত সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মণিমুক্তা এবং মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণপাত্র আওরঙ্গজেবের পাস গোলকগানাতে তাঁহার বিশ্বস্ত খোজা ভৃত্য মুক্তাগুলির তত্ত্বাবধানে অর্পণাবদ্ধ এবং মোহরাঙ্কিত করে রাখা হয়ে-

ছিল। তারপর প্রয়োজন অনুসারে তিনজন কর্মচারীর সম্মুখে সেই অর্গল উন্মুক্ত করে প্রত্যেকটি জিনিষ পরীক্ষা করা হত এবং প্রত্যেক কর্মচারীর বিভিন্ন মোহরাঙ্কিত করে অর্গলবদ্ধ করা হত। প্রথমেই বৃদ্ধ সম্রাটের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় মণিমুক্তা অবলোকন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে সেই অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। আমার মনে পড়েছে একদিনের ঘটনা—বৃদ্ধ সম্রাট তাঁহার খোজা ভৃত্যের নিকট এক জোড়া পাদুকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন—সেই খোজা ভৃত্য আগ্রার বাজার থেকে অতি সাধারণ চর্ম-পাদুকা শাহজাহানের নিকট প্রেরণ করেছিল। সে পাদুকার মূল্য আট টাকা নয়, চার টাকা নয়, দু'টাকা মাত্র। খোজা ভৃত্য শাহজাহানের পদপ্রান্তে পাদুকা ন্যস্ত করে অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত করল। শাহজাহান কুর্তার স্পর্দ্ধায় বিস্মিত হলেন। যে শাহজাহান প্রতি সপ্তাহে তিনবার মণিমুক্তাখচিত মকমলের অথবা শতক চর্মের কিংবা পশমীনার পাদুকা পরিবর্তন করতেন তাঁহার পদান্তরে কি না অতি সামান্য কঠিন চর্মপাদুকা! শাহজাহানের সেই গ্লানি ভৃত্য তার বন্ধুদের নিকট গল্পচ্ছলে প্রকাশ করে ব্যাখ্যান করেছিল। যেন সেই ভৃত্যই শাহজাহানকে পরাজিত করেছে। এ কাহিনী আগ্রার প্রাসাদে প্রবাদ হয়ে পড়েছিল।

আর একদিনের ঘটনা তোমার মনে আছে পাদশাহ বেগম! শাহজাহানের নিঃসঙ্গ কারাজীবনের সঙ্গী ছিল তাঁর বীণা। একদিন বীণার তার ছিঁড়ে গিয়েছিল—শাহজাহান খোজা ভৃত্যকে বীণা সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলেন, অবিলম্বে যেন বীণা সংস্কার করা হয়। একদিন, দুইদিন, তিনদিন সেই বীণা শাহজাহানের নিকট ফিরে আসে নাই। প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শাহজাহান দুর্গের উন্মুক্ত অলিন্দে তাজমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বীণা বাজিয়ে তাঁহার অন্তরের ব্যথা তাজবিবিকে শোনাতেন। চতুর্থ দিনে তিনি উত্তাক্ত হয়ে খোজা ভৃত্যকে অবিলম্বে বীণায় আনয়নের জন্য আদেশ করলেন। বাদশাহ বেগম! মনে পড়ে—খোজা ভৃত্য কি উত্তর দিয়েছিল? পাদশাহ বেগম! অনেক দুঃখে তোমার নিকট পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব করছি, তুমি ভিন্ন আর কে বেদনার অংশ নেবে?

পাদশাহ বেগম, এই দুঃখের জন্য দুঃখ করে লাভ কি? তুমি তো জান আওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অবরোধ করে প্রথমেই দুর্গে জল চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শাহজাহান ছিলেন পান-বিলাসী, প্রতিদিন যমুনা নদীর পথে নৌকাযোগে কাশ্মীর থেকে ফুল, ফল, বরফ শাহজাহানের জন্য দিল্লীতে আসত। জলের অভাবে শাহজাহানের জীবন অতীষ্ট হয়ে উঠল। এদিকে শাহজাহানের ব্যবহৃত সমস্ত পানপাত্র অর্গলাবদ্ধ। সম্রাট শাহজাহান পৌত্র মহম্মদ সুলতানের নিকট পানীয় জল এবং পানপাত্রের অনুরোধ জানালেন। পিতার অনুমতি ভিন্ন কোন ক্রমেই শাহজাহানের নিকট প্রেরণ করা নিষিদ্ধ—আওরঙ্গজেব আদেশ এই ছিল। মহম্মদ সুলতান পিতার নিকট শাহজাহানের জন্য পানপাত্র এবং পানীয় প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। অনুগ্রহ করে আওরঙ্গজেব জলদানের আদেশ করলেন। কিন্তু যে পানপাত্র মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণপাত্র নয়, মণিমুক্তাখচিত পাদুকা। তুমি তো জান, পাদশাহ বেগম! শাহজাহান বলেছিলেন—বিধর্মী জামের দ্বিতীয় পুত্র পিতার আত্মাকে অসম্মান করে, শ্রাদ্ধ করে আত্মাকে তৃপ্ত করে। কিন্তু আমার ধার্মিক পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁর জীবিত পিতাকে অশ্রদ্ধা করে জলপূর্ণ পাদুকা দান করেছে।

জীবনের শেষদিনে এত দুঃখের মধ্যেও শাহজাহান তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুত হননি। আল্লার প্রতি বিশ্বাস হারান নি। সম্পূর্ণভাবে তিনি ভাগ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কনৌজের মোল্লা সৈয়দ মহম্মদ কনৌজী শেষ জীবনে শাহজাহানের সঙ্গে পবিত্র কোরাণ আলোচনা করে তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছেন। রসুল আল্লার জীবন আলোচনা করেছেন—মোল্লাদের সঙ্গে একত্র নামাজ পড়েছেন। ঈদ, মহরম প্রভৃতি ইসলামের পুণ্য দিবসে শাহজাহান ভিক্ষুক, উলেমা, ফকীরদের দান করতেন। বাদশাহ আলমগীর শাহজাহানের বিশ্ব হস্তে দান করবার অধিকার বন্ধ করে দিলেন, কারণ দানের সুযোগে শাহজাহান হয়ত তাঁর বন্ধুকে জনমত সৃষ্টি করে পারেন। সুতরাং আওরঙ্গজেব তাঁর দান নিষেধ করে দিলেন।

তুমিই ছিলে পাদশাহ বেগম, সম্রাট শাহজাহানের সেই দুর্বিসহ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী—একাধারে মাতা ও কন্যা। তোমার মধ্যে রয়েছে আমাদের মাতামহী জগৎ গোঁসাইনির ধর্মপ্রাণতা, মাতা মমতাজ বেগমের কোমলতা। কারাগারে শাহজাহান দেখেছেন মায়ার স্নিগ্ধ মুখ—শুনেছেন শুশ্রূষার পরামর্শ, নির্দ্ধারণ—শুশ্রূষা পত্নী কন্যার তিরোধান, মুরাদের স্নিগ্ধ মৃত সর্ব্বাঙ্গন গজকে প্রতিবাদীর হস্তে সমর্পণ করা হয়েছিল, আমার শুনেছেন গোয়ালিয়র দুর্গে সুলেমান শিকোর তিলে তিলে মৃত্যু। তুমিই তো পাদশাহ বেগম; একহাতে সম্রাটের অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছ, আর এক হাতে নিজের অশ্রুমোচন করেছ। তোমার অশ্রুজল মুঘল রাজপরিবারের বহু পাপ প্রক্ষালন করে দিয়েছে। আমি আমার পিতার শেষ জীবনের সেবা করব মনে কত কল্পনা করেছিলাম, কত আশা করেছিলাম, তোমার আদর্শে জীবন অনুপ্রাণিত করেছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, আমি সেই সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছি। আমার পিতা আমাকে বুঝতে পারলেন না; তোমার পিতার অভিশাপের দিনে আমার পিতার আমাকে অত্যন্ত প্রয়োজন, তাঁর সেই দূরদৃষ্টি নেই। আত্মরক্ষার জন্যও তাঁর আত্মবর্জন নেই।

তোমার পিতা তোমার সেবায়, তোমার সান্নিধ্যে মৃত্যুর মুহূর্তে অপূর্ব্ব আত্মনিবেদন করার মতন শক্তি লাভ করেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সজ্ঞানে পবিত্র কোরাণ পাঠ শুনেছিলেন, তাঁর পার্শ্বে তাজবিবির সপত্নী অক্রুর-তা আকবরাবাদী বহল, ফতেপুরী বহল, কন্যা সুরয়হন্নার বাসু, পৌত্রী জাহানজেবকে সান্ত্বনা বাণী দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন। জীবনে তাঁর যে আল্লার বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিলনা, মরণের পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি দরিদ্র ও ফকীরদের মধ্যে বিতরণ করবার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং তোমার উপরই সেই ভার অর্পণ করা হয়েছিল।

ক্রমশঃ

সাধন সঙ্গীত

রাগপ্রধান—ত্রিতাল

"শিব সুন্দর পরম-পথে,
নিলে তব পন্থাতে ;
এই অভিসারে রাখি' তব সাথে
সাথী হ'লে মোর সাথে।
নিলে তব পন্থাতে "

সকল আঘাতে, সব প্রলোভনে
চলিয়া চলেছি আমার চরণে,
শত্রু বিকল, প্রিয় পরিজনে
রুখাই আমারে সাধে !
নিলে তব পন্থাতে "

দেব-দানবের প্রলয় ঘনারে
রুধিতে পারে না ঘোরে,
বিঘ্ন-বিপদ-বারণ বন্ধু,
তুমি আছ অন্তরে।

তোমারে স্মরণ করিয়া সদাই
আমার সাধন সরণীতে যাই,
তোমার পাবক-পরশন পাই
আমার দিবস-রাতে
নিলে তব পন্থাতে ॥

কথা ঃ নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী)　　সুর ও স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

০　　১　　২　　৩　　৪
পা মা ॥ { পা- র্সা না র্সা | -া ণপা মা রা | সণা -রা সা -া | -া -া -া -া ‖
শি ব সু ন্ দ র ০ প র ম পা০ ন্ থ ০ ০ ০ ০ ০

| না -সা রা মা | রা -মা পা -ণা | পা -না মা -র্সা | -া -া পা মা } ‖
নি ০ লে ত ব প ন্ থা ০ তে ০ ০ ০ "শি ব"

I পা -া ধা পা | পা -পা পা পা | পা ধা ধা -মা | পা -া -া -া I
এ ই অ ন্ত ধা ন্ ন্ রা খি ত ব পা ০ নে ০ ০

I পা র্রা -া র্সা | -র্রা র্রা র্সর্গা -র্গর্র্ | র্সনা ধ্নপা র্সা -া | -া -া -া -া I
সা খী ০ হ ০ লে মো০ ন্ সা০ ০ ধে ০ ০ ০ ০ ০

I ন্ -সা রা মা | রা -মা পা -পা | পা -না না -র্সা | -া -া পা মা II
নি ০ লে ত ব ০ প ন্ থা ০ তে ০ ০ ০ "শি ব"

II মা পা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সনা ধ্নপা | র্সা -া -া -া I
স ক ল আ ঘা ত, স ব প্র লো ভ০ ০ নে ০ ০ ০

I মা পা পা পা | না র্সা র্রা র্সা | র্রা র্মা র্রর্মা -র্রা | র্সা -া -া -া I
দ লি য়া চ লে ছি আ মা র চ র০ ০ ণে ০ ০ ০

I র্রা -র্পা র্পর্মা র্মা | র্রা র্রা র্সা র্রা | র্সনা র্সা পা -পা | পা -া -া -া I
শ ০ ক্র বি ম- ল প্রি য় প০ রি জ ০ নে ০ ০ ০

I রা মা পা মা | পা -র্সা র্সণা ণা | -পা পা -া -া | -া -া -া -া I
বৃ থা ই আ মা ০ রে সা ০ ধে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ন্ -সা রা মা | রা -মা পা -পা | পা -না না -র্সা | -া -া পা মা II
নি ০ লে ত ব ০ প ন্ থা ০ তে ০ ০ ০ "শি ব"

১ +
II রা পা -া মা | মধা -ধপা মা রা | র্রা মা রা সা | ৩ রা সা ন্ সা I
দে ব ০ দা ন০ ০ বে রা প্র ল য় ঙ্ক না য়ে ক ধি

I প্ -া -া প্ | ন্ -া ন্ ন্ | সা -া -া -া | -া -া -া -া I
তে ০ ০ পা বে ০ না মো রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I প্ -না সা ন্ | সা রা মা -রা | মা -পা ণা -ধা | ণা -া পা -া I
বি ০ শ্ব বি প দ রা ০ র ০ ণ ০ ব ন্ ধু ০

I -া পা র্রা র্সা | র্রা -া -া -া | -া র্সা -না ধ্নপা | র্সা -া -া -া I
০ ভূ মি আ ছ ০ ০ ০ ০ অ ন্ ত রে ০ ০ ০

মা পা সা সা	সা -া সা সা	সা -র্া সনা -ধনা	সা -া -া -া
তো মা রে ম	র ণ ক রি	যা • স• ০	ধা ০ ০ ই
মা পা ণা পা	না সা র্া সা	র্া -মা র্মা -র্া	সা -া -া -া
আ মা র সা	ধ ন স র	ণী • তে• ০	ধা ০ ০ ই
র্া পা পা ঁমা	র্া র্া সা র্া	না -সা ণা -পা	পা -া -া -া
তো মা র পা	ধ ক প র	শ • ন ০	পা ০ ০ ই
রা মা পা না	পা সা র্ণা -পা	পা া -া -া	-া -া -া -া
আ মা র ছি	ব স রা ০	তে ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
না -সা রা মা	রা -মা পা -ণা	পা -না না -সা	-া -া পা মা ॥ ॥
নি • লে ত	ব • প ন্	ণা • তে ০	০ ০ "শি ব"

ভরত

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কহিলেন শ্রীভরত : হে রামজননি !
আরাধনবাস-কথা আমি নাহি জানি।
রাজ্যতৃষ্ণা নাহি মাতঃ ! নাহি অন্য আশ—
শুধু জানি তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস।
মোর অভিলাষে এই নির্বাসন
পিতৃহত্যা পাপ তবে কলঙ্ক স্পর্শন।
তার লাগি' অভিশাপ : যার প্রেরণায়
অযুতের ভাগ্যদণ্ডী ম্লান বেদনায়
কটক উদাস সেবা—ছিন্ন বস্ত্রধারী।
বৃদ্ধি তার হ'ক ভিক্ষা ! নারীবধকারী
যে পাপে নিমগ্ন হয় হ'ক সেই পাপ।
যার লাগি' অযোধ্যার এই দুঃখ তাপ—
রবির উদয় আর গমন সময়
শয্যাশ্রিত মানবের যত পাপ হয়
হ'ক সেই অপরাধ ! লভি' উপকার
যে জন তাহার ঋণ না করে স্বীকার ;
অপরের দেবতায় রহে যার দ্বেষ
নাহি করে দূর সেবা অপরের ক্লেশ
বারি দান নাহি করে যে তৃষ্ণার্ত-নরে
পিতা ও মাতার সেবা সেবা নাহি করে—
এই সব পাপ মোরে করে যেন গ্রাস
আমার লাগিয়া যদি এই বনবাস।
রামের অযোধ্যা আর অযোধ্যার রাম—
সেই রাম পদে আমি জানাই প্রণাম।

ন্যূনতম বেতন সম্বন্ধীয় আইন

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু এম-এ, ডি-এস্-ই

শ্রমিকের কল্যাণে—

শ্রমিকদের বাদ দিয়ে সমাজের টিকে থাকা আজকাল সম্ভবপর নয়। তাই দুনিয়ার পোষাক যোগানোর মূলে যে মজুর রয়েছে—সে কথা সমাজ স্বীকার করেছে। সমাজের আটানো জোরালো করতে হোলে—মজুরদের আগে একটা সুযোগ দেয়ার দরকার। এই জন্যই তাদের ভাত-কাপড়ের দিকে, তাদের কল্যাণের দিকে পড়েছে আমাদের নজর। দেহে ও মনে সবল ও কর্মঠ মজুর তৈরী করার ভার দায়ী-সমাজের। এ ব্যাপারে শুধু—যাঁরা মজুর খাটান তাঁদেরই নয়; রাষ্ট্রও এব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে সরকার শ্রমিকদের আর্থ বজায় রাখার জন্য ও তাদের কল্যাণের জন্য কতকগুলো আইনগত ব্যবস্থা করেছেন। নজীর হিসাবে আমরা দেখাতে পারি—১৯০৮ সালের কারখানা (ফ্যাক্টরী) আইন, ১৯৪৭ সালের খনি মজুরদের ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড আইন, ১৯৪৭ সালের বিরোধ মীমাংসার আইন প্রভৃতি। এ ছাড়াও, আমাদের প্রাদেশিক সরকার ট্রাইবুনাল বসিয়ে কারখানার মালিক ও শ্রমিক এই উভয়পক্ষের চাঁদায় প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, উপযুক্ত গ্রাচুইটি প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারখানা আইনে-প্রাপ্য বেতনসহ ন্যূনতম ছুটী ছাড়াও—অসুখকালীন ছুটী ও নানা পূজা-পার্বণের ছুটীর ব্যবস্থা হয়েছে।

ন্যূনতম বেতন আইন—শ্রমিকদের কল্যাণমূলক আইনের একটি। আজ আমরা এই আইনের বিষয় আলোচনা করবো। এদেশের যাদের চুপসানো আছে—তাদের আয়ব্যয়-কাল হ'তে এই চেষ্টা যে—কি ক'রে সবচেয়ে কম পয়সায় মজুর খাটিয়ে কাজ হাসিল করবে। আর মজুরেরা তাদের আর্থিক টানাটানির ফলে—অনেক সময় যে কোন মজুরী—তা যত কমই হোক না কেন—নিতে বাধ্য হয়। একদল মজুর বাধ্য হয়ে পায়ে ঠেলে যে কাজ উদ্ধার করলে—সে তার উপযুক্ত পয়সা পেলো কিনা মালিকের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। মালিকদের এই চিরন্তন শোষণ-প্রবৃত্তির হাত হ'তে, শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য জগতের অধিকাংশ দেশই মজুরদের নিয়তম বেতনের হার বেঁধে দিয়েছেন। যে সমস্ত শিল্পে মজুরদের গায়ের রক্ত জল ক'রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটতে হয়, আর যে সব জায়গায় শ্রমিকেরা সঙ্ঘ-বদ্ধ নয়—সেইসব ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে ন্যূনতম মজুরীর আইন দরকার। ইংলণ্ড সর্বপ্রথমের আগে ১৯০৯ সালে নিয়তম বেতনের আইন পাশ করে। আমেরিকায় ১৯১২ সালে এই আইন কার্য্যকরী হয়। ১৯১৫ সালে ফ্রান্সে এই রকমের আইন তৈরী হয়। জগতের অন্যদেশের অনুপাতে ন্যূনতম বেতন আইন ভারতবর্ষের মতো গরীব দেশে অনেক আগেই পাশ হওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ন্যূনতম মজুরীর একটা আইন (Minimum wages Act, 1948) পাশ করেছেন। কতকগুলি শিল্পে নির্দিষ্ট হারের নীচে বেতন দিয়ে মজুর খাটানো বন্ধ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। যদি কোন মালিক সরকারের বেঁধে দেওয়া মজুরী ছাড়িয়ে—কম বেতনে মজুর খাটান, তাহ'লে তাঁর কাজ বে-আইনী বলে গণ্য হবে; আর আইন-অমান্যকারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে। দণ্ড—৬ মাস জেল বা ৫ শত টাকা জরিমানা হতে পারে। এই আইন—যাতে মজুর ঠকেলা পেতে পারে, খাজনেওয়া কালকাটানোর জন্য উপযুক্ত বেতন পায়—তার ব্যবস্থা করেছে।

ন্যূনতম বেতন আইনের জোরে আমাদের সরকার মালিক ও শ্রমিকের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে, কমিটি তৈরী ক'রে, আইনে উল্লিখিত ১২টী শিল্পে ও কৃষিমজুরদের ন্যূনতম বেতন বেঁধে দিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর মধ্যেই তেল কলের শ্রমিকদের ও চামড়ার কাজের মজুরদের ন্যূনতম বেতন উপদেষ্টা কমিটি বসিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। এইসব শিল্পের জন্য কমিটি একজন জজের সভাপতিত্বে মালিক ও মজুরদের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী হয়েছিল। হাওড়া ও কলিকাতার তেলকলের নিপুণ মজুরদের মাসিক ন্যূনতম মজুরী স্থির হয়েছে—৭৮৲ টাকা। একজন অনিপুণ মজুরের জন্য ৫০৲ টাকা। এইভাবে মহুয়ার কলের, চাল-কলের মজুরদের ন্যূনতম বেতন ধার্য্য হচ্ছে। গত ১৯৫০ সালে সরকার সাহারাপুর চা বাগানের শ্রমিক-দের ন্যূনতম বেতন বেঁধে দেবার জন্য শ্রমিক ও মালিকদের নিয়ে যে কমিটি বসিয়েছিলেন, সে কমিটি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করেছেন। রিপোর্টটী এখন সরকার চূড়ান্তভাবে মেনে নেবার আগে বিবেচনা করছেন।

এ ছাড়া, ন্যূনতম বেতন আইন মাফিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশমতো শ্রম-মহাধ্যক্ষ মহাশয় (লেবার কমিশনার সাহেব) সম্প্রতিভাবে চারটী শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বেতন ধার্য্য ক'রে দিয়েছেন। এই সমস্ত ব্যবসায়ে মজুরদের আয়ব্যয়, চলতি বেতন ইত্যাদির খুঁটিনাটী ভাবে অনুসন্ধান করার পর ন্যূনতম মজুরী স্থির করা হচ্ছে। মোটরবাস ও ট্যাক্সীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে নানা শ্রেণীর ড্রাইভারদের জন্য ৯০৲ টাকা হ'তে ১১০৲ টাকা ন্যূনতম বেতন স্থির হয়েছে। অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে কন্‌ডাকটরদের মাহিনা ৭০৲ টাকা হ'তে ৭৮৲ টাকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিড়ি শিল্পের কারিগর-দের ন্যূনতম দিনমজুরী ও হাজার বিড়িপিছু মজুরীর হার স্থির হয়েছে। এ ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারী, কেমারেণ্ডের কর্ম্মচারী, রাস্তা-ঘাট তৈরীর কাজে কুলীমজুরদের ও রাজমিস্ত্রী এবং তাদের যোগাড়েদের ন্যূনতম মজুরী ধার্য্য হবে। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে সরকারের বিজ্ঞপ্তি বার হবে।

ন্যূনতম বেতন আইনের বলে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সালের শুরুতে মজুরদের বিভিন্ন মজুরী বেঁধে দেন। এই উদ্দেশ্যে পাড়াগাঁয়ের মজুরদের অবস্থার তদন্ত, তাদের পারিবারিক অবস্থা, দিনমজুরী, দিনের খাবার খরচ, অভাব অনটন সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। এই আইন কার্যকরী হলে পাড়াগাঁয়ের মজুরদের দুর্দশা কিছুটা কমবে ও তাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে। পাড়াগাঁয়ের অনেক জায়গায় যে সামান্য মজুরীতে বা কোনও মজুরী না দিয়ে বেগার খাটানোর বেওয়াজ আছে—সেটাও চিরকালের মতো বন্ধ হবে।

পরিশেষে আর একটী কথা না বললে ন্যূনতম মজুরীর সব কথা বলা হবে না। যে সমস্ত শিল্প ন্যূনতম মজুরীর আইনের আওতায় আসে না—সেই সমস্ত শিল্পের মজুরদের ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাইবুনাল গঠনের করেছেন। লোহার কারখানাগুলোয় আগে ২২৲ টাকা হতে ৩০৲ টাকা মজুরী দিতেন। মাগ্গীভাতা সমেত গড়ে মোট ৪০৲ টাকা পেত একজন মজুর। লোহার কারখানার ট্রাইবুনালের রায়ে সবচেয়ে কম বেতনভোগী অনিপুণ মজুরের মাসিক বেতন মাগ্গীভাতা সমেত ৪৫৲ টাকা ও আধা-নিপুণ মজুরের বেতন ৬০৲ টাকা স্থির হয়েছে। কাপড়ের কলে ন্যূনতম বেতন শতকরা ২৫৲ টাকা বাড়িয়ে ৫০৲ টাকা ও চটকলে সবচেয়ে কমবেতনের পরিমাণ ৯৬৲০ আনা হতে ৫৮।০ টাকা ধার্য্য হয়েছে।

ন্যূনতম বেতন আইন ঠিকমতো চালু হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য সরকার ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেছেন। ইন্সপেক্টররা এই আইনের আওতার কারখানা মালিকদের বেতনসম্বন্ধীয় খাতাপত্র তলব করতে পারবেন ও আইন-মতো মজুরী যদি না দেওয়া হয় দেখেন—তা হলে মালিকদের দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্ত করতে পারবেন।

আইনের দ্বারা শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন বেঁধে দেবার যে শুভ হিড়িকটা দেখা দিয়েছে—তার ফলে শ্রমিকদের জীবনের মান ও জীবনযাত্রার ধারা উন্নত হবে—এই আমরা আশা করি। তাদের উপরই আমাদের ভালমন্দ করতে নির্ভর; তাই আজ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পর—তাদের কথাটাই আমাদের বড় ক'রে মনে পড়ে।

চৌপদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

কতজনই লিখিতেছে গদ্য পদ্যে করিয়া নাটক।
দেখিব তুলে নয় এই দেখে, দুর্মতি পাঠক।
ছাপিবার যন্ত্র আছে যত বহু ছাপা হয় তাই
পড়া তো সহজ নয়, পড়িবার কোন হেতু নাই।

(২)

বসন্ত শেষ প্রীতও শেষ চলিছে এখন বর্ষা,
ধাপ্পা যদি আষাঢ়ে তে, আকাশও নয় সরল।
ডাকলে কোকিল মারো তারে পাও যদি তার দেখা
রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন মিষ্টি যেন কেকা।

(৩)

শোনো ভগবান এইবার তোমা আসন ছইবে ত্যজিতে,
আইন করিয়া আর কাহারেও দেবনা তোমারে ভজিতে।
গণতন্ত্রের শেষকাল এটা, চলিবে না আর চালাকি,
আমাদেরি ভোটে বাঁচন মরণ,শুনিছ ? হইলে কালা কি ?

(৪)

এ জীবনে ভোগসুখ যত,
উটের খেজুর পাতা চিবানোর মত।
তালু তাতে ছিঁড়ে যায় ঠোঁট তাতে চিরে যায়
রাবুরাশি পায় পায় গুড়ায় সতত।

(৫)

মসলা এমন কি আছে আর প্রেমের সম,
যাতে দেবে তাই হবে যে মিষ্টতম।
নিম ছেঁচকি হয় যে মিঠে প্রিয়ার হাতে,
আনন্দে খাই বিনা দুনে চেঁড়স ভাতে।

(৬)

বন্দী ছিলি এত কাল মুক্তি পেলি
পেয়ে খোদা সম্মুখে শত্রু।
না চেয়ে ডাইনে বাঁয়ে চলে গেলি
ওপথের শেষ যে নরক।

(৭)

যোগীদের সাধনার ধ্যানলব্ধ স্বাধীন এ দেশ,
হবে কি উন্মাদগ্রস্ত রোগীদের আশ্রম বিশেষ ?
ত্যাগীদের রক্তোরক্তে লব্ধমুক্তি আমার বাঙ্গালা
হায় রে হবে কি শুধু ভোগীদের রঙ্গনাট্যশালা ?

(৮)

লেখাটি তোমার ফাঁপা ফুটবলসম
অন্তরে তাত প্রবেশ করে না মোটে,
ধাক্কা মারিয়া মাথার খুলিতে মম
ফিরিয়া আবার তোমার পানেই ছোটে।

(৯)

'প্রডিগ্যাল সন' কোথা ছিল এতকাল
ফিরে এসে হ'ল, বাবা, আদুরে দুলাল।
একেবারে ভুলে গেলে তারে হায়, যেবা
চিরদিন পদতলে করিতেছে সেবা!

(১০)

খোকার এবং খোকার ভরা দেশটা
নরক তাদের ভুলানো খুব শক্ত।
লেখায় আঁকায় তারই কর চেষ্টা,
মিলবে বহু টাকা এবং ভক্ত।

পহাল গাঁয়ের পথে

(২৮)

ভক্তদের সঙ্গে সেই তবে পথে দেখা হয়েছিল। আর তারা নিমন্ত্রণ করে গেছে হাউস-বোটে। যাব খেতে পাবো।

বাঙালী মাত্রেরই লজ্জার নেই। অসিতও নিমন্ত্রণ পেয়েছে তার এক অফেন্দরের হোটেলে। সকালবেলা হাজির পাণ্ডা কোটেশ্বর। "অমরনাথের ইচ্ছা থাকলে আপনারা অমরনাথ যেতে পারেন। কাল তো পাহালগাম যাচ্ছেন আপনারা। আমার বাড়ী ঘর্তও। সেখানে বাস দাঁড়াবে। খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। ভাত, ডাল, সব্জী, আর কিছু নয়। না-না—আপত্তি নয়। আমরা এ গাওয়াই। আমাদের নিয়ম। আমার অনুরোধ, আপনি না বলতে পারবেন না।" অসিত নিমন্ত্রণ নিয়ে নিলো। কোটেশ্বরজী চলে গেলেন।

সেই কথাই হচ্ছিল ভক্তদের হাউসবোটে। ঝিলমের বাঁধের পাশে হাউসবোট। ও'রা ঝিলমে ছটফট করছিলেন। আমরা আসতেই যেন বাঁচা ছেড়ে বাঁচলেন। ভক্ত-গৃহিণীর দু'চোখ-ভরা তিরস্কার—"এতো বেলা; খিদে পায় না?"

"পায় বৈকি! ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করার ধর্ম আছে।"

"যাক না ভাই। আর দশ মিনিট পরে এলে দেখতেন কেমন আড়িয়ে নিতাম।"

"সেও তো পাওয়া হোতো! গলা ধাক্কা খাওয়া।"

খাওয়াদের চমৎকার। বিরিয়ানী পোলাও, মাংস আর মাছের ফ্রাই।

ঠেসে খেয়ে গল্পগুজব করতে লাগলাম। গুপেনবাবু তাঁর ছবির গল্প করতে লাগলেন। বেণু আর ভক্ত-গৃহিণী গল্প জুড়েছে একান্তে। হঠাৎ ভক্ত-গৃহিণী বলে উঠলেন—"সত্যি নাকি? আপনারা অমরনাথ যাচ্ছেন?"

"সত্যি কিনা জানি না; ব্যবস্থা করছি। যাবার চেষ্টা খুব করবো।"

"তবে তুমি একা ফিরী ফিরে যাও। আমি এঁদের সঙ্গে যাব অমরনাথ।"

"তুমি যাবে, অমরনাথ কেন, গোয়ার গেলেও আমার হকু কি তোমায় নিষেধ করি। আমার মং নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্রের মতো; তোমার মং 'তড়িত লতা জনু'; তোমার নিষেধে নিরস্ত রাখার সাহস কই আমার। বুকে রাখতে পারি, দেখে তো রাখতে পারিনা।"

"কেবল কাব্যলক্ষ্মীই জানো। সোজা কথা বলোনা বাপু—যেতে দেবেনা।"

নীচের ঠোঁটটা একটু বেরিয়ে এলো। গাল দুটো একটু ভারী হয়ে এলো, তবল চিবুক স্পষ্ট হোলো। অভিমানের সুস্পষ্ট ছবি।

হেসে বললেন বন্ধু,—"একা ফিরী ফিরলেই দিদি আবার বিয়ে দিয়ে দেবেন। জানো তো দিদি বললেই আমি বিয়ে করি। ও আমার অভ্যেস।"

গুপেন বলে,—"দেবেছে!"

"কোরো, কোরো, বিয়ে করো। তার মধ্যে অমরনাথ আমি ঘুরে আসবো।" আমার দিকে চেয়ে বলেন, "কি আমার নিয়ে যাবেন না?"

'শাস্ত্রাৎ তৃতীয়ঃ—শাস্ত্রে নিষেধ। 'নিষ্প্রয়োজন কথাস্তেরো বন্ধুত্বাং শ্রীতি হেতবঃ'—এসব ব্রহ্মস্তোত্রের মতো পশে। তবে যদি বন্ধু বলাবও যান্—"

"অনুরোধ। ছুটে আমার অনুরোধ; কিন্তু চাকরিতে আমার টান্। অনুরোধ পোষায় আসল টান্। ছুটির দুপয়সা লবঙ্গ মতো বেশার চন্দ্র আমার মতো টান, তার চেয়ে বেশটা আমার অফিসে সেপ্টেম্বরের বেশ মশটায় আমার মুখপানে চেয়ে। তার মন ভাঙলে জোড়া লাগবে না, কিন্তিৎ অর্থেরও মন কোমা লাগে।"

"এখো তপনবাবু কোরোনা বন্ধুর! তোমার টাকা আমি চাইনা;" লাল হয়ে বেঁটেখর বলেন।

"তবে তোমার? বিয়ে আছে। সাতকলকার চাই বিয়ে দিই। ওকের মেয়ে এ। বিলেত বছর ছেড়ে ফোর্ড মাস্টারমশাই ডাকিয়ে বিয়ে ছেড়েছে।"

"কে না চেনার মেয়ে আমার লক্ষ্মী। কি এমন গরজ করেছি তুমি?"

গুপেন বলে "এমন কি; নিয়ে বেরিয়েছিলাম সাতপো। এখানি থেকে টেলিগ্রাম করিয়ে এনেছি নিজেরো। এখন বেলাটি আবার অসুখে দু'চারেক দেরি বাড়ী ফেরা যাবেনা।"

"বোলোনা, বোলোনা গুপেন; বন্ধুর খানেকের সঙ্কল্প নিয়েছে ঘুলাব হোলো লয়। শুনছি আর কিছু যেন টাপ্‌ড়ার আইকে যাচ্ছে।"

হাসতে হাসতে ভক্ত-গৃহিণী আমায় শুনিয়ে বললেন—"যেমনের তো বেরসিক বিয়ে করে আমার সব খেল।"

"যা বলেছো!" বলে ভক্ত দাদাই হাঁপ ছাড়লেন।

কিন্তু পরদিন যখন পাহাল গ্রামের বাস ছাড়লো তখনও আমরা এই মধুর দম্পতীর গল্প করেছি। আমরা যাচ্ছি শুনে ওদের উৎসাহের কথা বার বার মনে হচ্ছে।

রয়ছা নিজেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিলো। আমরা এখন ঘাটদিনের জন্য পাহাড়-বাস বাঁধছি। রয়ছার চিন্তা আমরা অমরনাথ যাওয়া মনস্থ করেছি। ওর মতে ও বিষয়ে এখন রাখা ঢাকা গলানোই শ্রেয়। আমাদের কর্তিনের শ্রীনগরবাস শেষ হোলো; বাক্স বিছানা বেঁধে ঘাটটার সময় বাসে চড়লাম। কিন্তু ডিনির রয়ছার কাছে রেখে গেলাম। বোঝার আরো কিছু রেখে গেলাম এই সরাইয়ের বিশ্বস্ত রক্ষীর কাছে।

পহলগাঁয়ের পথে আমরা কয়েকটা জায়গা দেখতে দেখতে যাবো। অনন্তনাগ, মুত্তনাগ, অম্বাবল, মার্তণ্ড।

অনন্তনাগ কাশ্মীরের একটি প্রধান জিলা। এখানে বেশীর ভাগ লোকই নানারকম শিল্পের তৈরী করে। গালার কাজ আর কাঠের কাজই প্রধান। অনন্তনাগে এখনও বিষ্ণুমন্দির আছে। তার পাশে প্রস্রবণ। এ প্রস্রবণের জল সমস্ত রোগ দূর করে বলে খ্যাতি। তখন সকাল সাতটা হবে। মোড়ের মাথায় বাস থামলো। শ্রীনগর থেকে এসেছি ৫২ মাইল। খানিকটা রাস্তার পেছিয়ে অনন্তনাগ মন্দিরে

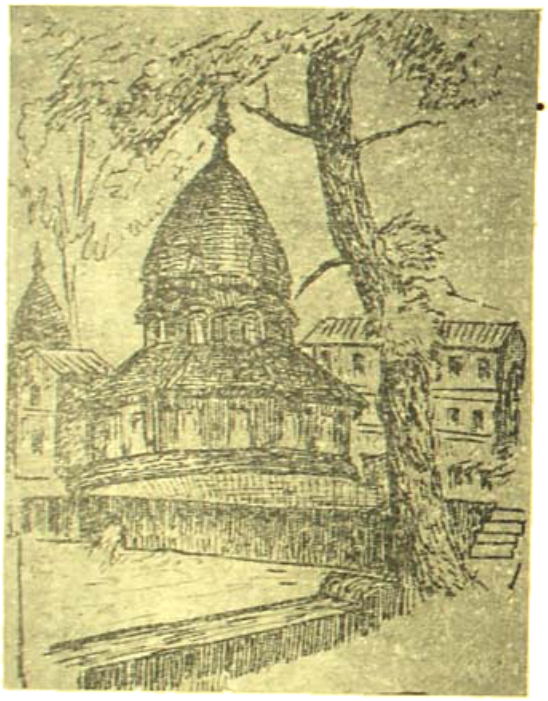

অনন্তনাগে কপটেশ্বরের মন্দির

গেলাম। এখন বলে কোটের। প্রাচীন কপটেশ্বর মন্দির এইখানে ছিল। প্রস্রবণের জল একটা বাঁধানো পুকুরে পড়ছে। পুকুর ভর্তি রাঙের মাছ। একেবারে তলার মাছগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পাপ-দূরন কপটেশ্বরের মহিমা ভারতবিখ্যাত ছিল। কাশ্মীরের রাজা পরমাত্ত। মাসের জোড়রাজের সমসাময়িক। বন্ধুতা হয় উভয় রাজার। ফলে পরমাত্ত কপটেশ্বরের জলধারে জল কাঁচের বোতলে ভরে জোড়রাজকে পাঠাতেন মুখ ধোবেন বলে। জোড়রাজ জলের মহিমা অনুধাবন করে কাশ্মীর রাজকে পাঠাতেন সোনার পিত্ত। এই সুবর্ণের বিনিময়ে পরমাত্ত একটী খোলকুণ্ড নির্মাণ করেন। সেই কুণ্ডটী মন্দিরের বাম দিকে। আমরা গিয়ে সেখান থেকে জল খেলাম। অম্বাবল—কিছুদূরের পথ। সেই পথের ওপর কপটেশ্বর, কোটের।

কোটেরের স্বর্গা সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। একটী কাহিনী আছে যে, স্বর্গার জলের তলায় একখণ্ড পাথর আছে। তাতে উৎকীর্ণ আছে লিপি। এ লিপিতে সন্ধান লেখা আছে ভূগর্ভস্থিত বিরাট রত্ন-ভাণ্ডারের। জলের ধারা যেঘিয়ে যদিও লোকে এখনও সেই কাহিনী বলে থাকে, এটা সত্য যে সে পাথর আজও কেউ সাহস করে বার করতে পারেনি। যদি পারতো অনন্তনাগের অনন্ত দারিদ্র্য থাকতো না।

লোকালয়ে ঢোকামাত্র চোখে পড়ে। সেখানে গেলে এ দারিদ্র্য ঢোকা যায় না। বুঝতে গেলে শহরের আরও ভিতরে গলির মধ্যে যেতে হয়। যেতে হয় যেখানে ঘড়ি ঘিরে চাকা টেনে চলেছে মুসলমান বালক। সেই চাকার গায়ে শুকনো পপলার বা দেবদারুর ডাল রেখে নানা রকম যন্ত্র দিয়ে কাটা চলেছে। গোল গোল ঘুলঘুলী, বাতিদান, খাটের পায়া, লম্বা ইলেকট্রিক ট্রাণ্ড তৈরী হচ্ছে। শ্রীনগরে যে ঘুলঘুলীর জোড়া তিনটাকা, বাজারে তা দু'টাকা, এইসব গলিতে তা একটাকা দামে বিক্রী হয়। ওদের দারিদ্র্যের মূলধনে স্ফীত হয় বণিক। আমি যদি এদের একটা কো-অপারেটিভ্ সিস্ত থাকতো, যদি এরা একজোট হয়ে ভাল করে নিজেরাই বাজারে চালু করতে পারতো, যুগ যুগ ব্যাপী এই দুঃসহ দারিদ্র্য এদের সইতে হোতনা।

অনন্তনাগের বাজার

অনন্তনাগের বাজারে চা খেতে খেতে মনে পড়ে—কাশ্মীরের এই স্বল্প দিনের ঐতিহাসিক আর অর্থনৈতিক পরিচয়। অনন্তনাগের

কাঠের কাজ, ইসলামাবাদের শাল। কাশ্মীর বলতেই তো কাশ্মীরী শালের কথা মনে পড়ে। কাশ্মীর "স্যাকারওয়ার্ক" অর্থাৎ কাঠের ওপর রঙীন পালার ছং-বাহারী কাজেও ওস্তাদ। দিনগরের বাজারে এই কাজের নমুনা পকেট-অনুযায়ী নানা রকমের পাওয়া যায়। সৌখীন ভ্রমণবিলাসীরা কাশ্মীরের স্মৃতি হিসেবে ছোটো বড়ো নানা উপঢৌকন কিনে আনেন। তেমনি আনেন কাঠের, বিশেষ করে আখরোট কাঠের, নানা নক্সা-বাহারী জিনিষ, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি। কিন্তু কাশ্মীর বলতে আসলে কাশ্মীরী শাল। ইসলামাবাদে এর প্রধান কেন্দ্র। এখন কারিগররা সকলেই কাশ্মীরী। চিরকাল তা ছিল না। কাশ্মীরের শাল এলো বাবর বাদশার সময়ে। বাবর তো শিল্পকর্মের মহা সমঝদার ছিলেন। ইরাণের কারিগরদের কাশ্মীরে এনে তিনিই এ কাজের প্রবর্তন করেন। নক্সার ডিজাইনটা তাই আজও পারসিক পদ্ধতি মেনে চলেছে। যাকে আমরা বলি কল্কা—এই কল্কার বাহারেরও একটা আকস্মিক অনুপ্রাস যোগ আছে। তখনকার দিনে বাদশারা উষ্ণীষের ওপর একটি মণিমুক্তার কারুকার্য ব্যবহার করতেন, নাম জিগা। জিগার চারপাশে মণিমুক্তার কারুকার্য; আর তারই মাঝখানে একগুচ্ছ দামী পালক ঝলমল করতো। আজিআলী এক কারিগর একবার একটা জিগার কল্কা করলো নানা রঙের রেশমী আর পশমী সুতোর শালের ওপর। দেখতে অবিকল তদ্রূপ জিগা। বাবর দেখে মহাখুশী। সেই শালের জিগাই তিনি উষ্ণীষে বাঁধলেন। ব্যস; সেইটাই চলন হয়ে গেল, আর সেই থেকে আলোয়ানে, রুমালে, পাঁড়ীতে, আঙরাখায়, চোগার ঐ জিগার প্রচলন। রণজীৎ সিংহের এক সেনাপতি জেনারেল ভেন্তুরা বস এগারো ফুটের একটা জিগায় একটা স্কার্ফ তৈরী করে, তার নাম 'শাল্ ডিজাইন' দিয়ে ফ্রান্সের অভিজাত মহলে প্রচার করলেন। এই সঙ্গে ইয়োরোপে শালের প্রচলনের কথাও মনে পড়ে যায়। এখানেও নেপোলিয়ন একদিকে, অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়। মিশর জয় করার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নেপোলিয়নই প্রথম কাশ্মীরী একখানা শাল সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের জন্য নিয়ে যান। এই ইয়োরোপে প্রথম শালের ঐতিহাসিক আবির্ভাব। কিন্তু ইয়োরোপীয় শালীন সমাজে এর প্রচলন করেন রাজা রামমোহন রায়; তাঁর চোগার ওপর শাল জড়িয়ে রসিকজনের চোখে শালের নেশা লাগিয়ে দিয়ে। আমি এক বিশিষ্ট শালব্যবসায়ীর কাছে শুনেছি যে আজও কাশ্মীর বাঙালীর কাছে ফুটন্ত। "শালের নিত্যমিত পরিবার বাঙালী। বাঙালীর শুধুই কাশ্মীরী শাল পৌঁছালো ইয়োরোপের বরবারে, সেখানকার অভিজাত মহলে। বাঙালীর উষ্ণতে শাল একটা অবশ্য দেয় সামগ্রী। শালের সমঝদার বাঙালী। আর ইয়োরোপে ফ্রান্স। ফ্রান্সে জার্মানীতে যুদ্ধ বাধলেই কাশ্মীরীরা চায় ফ্রান্সের জিত। নৈলে ফ্রান্সে শাল কেনার তাগিদ যাবে কমে।"

শালের পশম জোগাড় করতে হয় তিব্বত থেকে, তিব্বতী-শাল এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে। এই উভয় পশমের শালই প্রসিদ্ধ দুর।

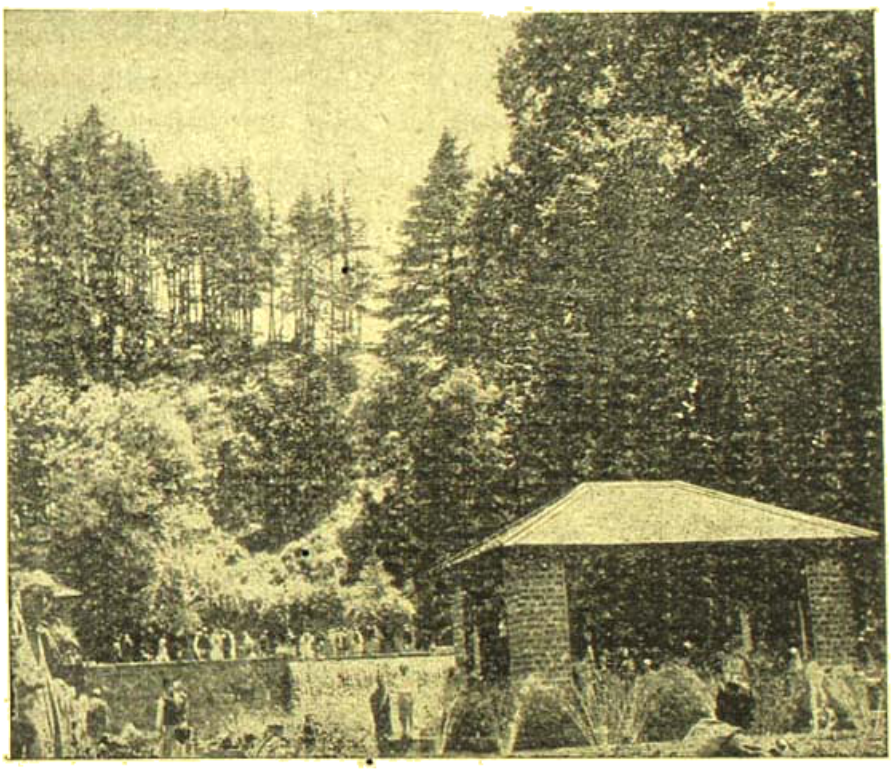

অঙ্কারল উদ্যান

কারিগরদের অবস্থা দুরবস্থা। তারা কিছুদিন আগেও দৈনিক ৪'পয়সা থেকে ৮'আনা মজুরী পেতো। এখন অনেক ভালো। সরকার খুব সাহায্য করেন। ওদের একখানা ভাল শাল করতে একবছরের বেশী খাটতে হয়।

মীর্জা গুলাম বেগ কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতা। 'অরীক্' ছদ্মনামে তিনি কাব্য লেখেন। বর্তমান কাশ্মীর সরকার তাঁতীদের আর কারিগরদের উন্নতির প্রতি কতো সজাগ—অরিকের এই কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়:—

অঙ্গে তোমার আজরাখা বোনা যোয়াখা কাশ্মীরীনা !
খোঁজ করেছো কি, দেখেছো কি চেয়ে, কোনো ক্ষত আছে কিনা ?

মোরোগো নন্দী-কূলের পাশটি ঘিরে
তখন আছে কি ? বক্ষ আজে কি মেয়ে ?
আছে কি পরম স্নেহ ?
আবেগেই যেন ছোটো হয়ে তার মুখিয়ে পড়েছে হাতে ;
দুটী ঘুরে চলে পলাশের ফুলো ঘিরে বিরক্ত করছে।
আলো তার পাবে কিনা
উদ্ভট মন যেন কাস্তরাজ মোরোগো কাস্তীরীলা।
প্রতীক্ষা যে তার ফেন নয় ওটা, বক্ষ ঘিরে তা ভরা,
পদ্মের টানে, তারি আলো ঘিরে পাবেতে নন্দী করা
মোরোগো নন্দী কূলের পাশটি ঘিরে
তার হৃদয়ের বেদনায় ক্ষত বক্ষ ঘিরেছে ঘিরে
যদি তাহার জীবনে আলো কিনা
যেন আজোরা মোরোগো কাস্তীরীলা।
কুমারী মেয়ের বিবাহ করো এই নন্দীর পার
তখ হয়ে শুধু পাক করে ; তবু কি পাওয়া যায় !
তারা অতিথির লাল ঘোলো ঠাঁই, হৃদয় যেনো ঘিরে
সবো হৃদয়ের বক্তাক্ত ক্ষত বক্ষ ঘিরেছে ঘিরে।
তুমি যেন কল্পনা।
যে যৌবন মুলো পরেছে মোরোগো কাস্তীরীলা।

ওরা ওরা পরে কার্পেট। কার্পেটের ডিজাইন আগে কাগজে এঁকে নিয়ে চুকোয়। তারপর ওরা একটী চক্ষ আস্তিক নিয়ে বেশ খেটে। সেইজন্যে কেউ কাজ শিখতে চাইলে তাকে অন্তত দুবছর শিক্ষানবিশী করতে হয়। এমনিতে মুখে চলে। অন্যথা,

"ডিজাইনকার তারা যেন বাঘ—হেরিয়ের পাঁচের চিহ্ন ; চোখ সবুজ এবং ; ছাড়ো ; সবশুদ্ধ সাতিশ কালো।" কার্পেটখানা যে অবধি হোলো না হওয়া পর্যন্ত কেউ জানে পারেনা ডিজাইনটা হবে কি।

একথা যখন প্রথমে পড়লো এই সঙ্গে কাস্তীরশিল্পের অন্যতম ঐতিহ্যের কথা মনে করে নেওয়া যাক। শাল, কার্পেট, গালার কাজ ছাড়া কাস্তীরে গালার কাজ। এত ভয়াট কথাটা নন্দী কাজ। কিন্তু স্থানীয়দের কাছে প্রিয় কাজ 'পেইপার মেশী'—অর্থাৎ কাগজের মণ্ডের কাজ। এই মণ্ডকে নানান আকারে ভয়াট করে তার ওপর রং দিয়ে অতিসুন্দর নক্সীর কাজ করে এরা। দাম অবশ্য মজবুত জিনিষ। সুদৃশ্য ও আপেক্ষিকভাবে কম মূল্যের। এরা বলে 'কলমদানী'র কাজ। কারণ সেইদার মেশী কাজে কলমদানীই প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া বাদী রঙীন পাথর কাটাই, কাপা-চাদরের কাজ, সাদোজার গড়ন, নৌকার কাজ থেকে কাঠের আসবাবের কাজ পর্যন্ত এবং বর্তমানে উৎসাহিত কাস্তীরহাত সিল্কের কাজ কাস্তীরী জীবনের মজ্জায় মিশে গিয়ে জীবিকার একটা মস্ত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব পর্যায়ে পাঁচশালা বন্দোবস্তে সরকার এই সব কুটীর শিল্পের ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামাবাদ, পাম্পরসরাজ, অনন্তনাগ, শ্রীনগর—এইসব জায়গাতেই কুটীর শিল্পের প্রকৃত পীঠস্থান। কাস্তীর জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে গেলে এসব জায়গায় যাওয়া অনিবার্য।

অদ্ভুত এক কাহিনী শুনলাম ডোঙ্গরের জল সম্বন্ধে। কাহিনীটা লায়া অনন্তনাগে প্রচলিত একটা ছড়াকে আশ্রয় করে। ছড়াটা এই—

মুৎসকুণ্ড রাজস ইইসিরন্দি কাণ।
তিম অতি শালবন্থ ? কুঠোরওয়ান্।

যে এক রাজা ছিল মুৎসকুণ্ড—মুচকুন্দ হবে হয়তো। তার সমস্ত রাজকীয় চিহ্নের ও অঙ্গের অলঙ্কার ছিল দুটী কাণ। কাণ দুটী ঘোড়ের কাণের মতো। রাজার মাথায় ঘোড়ের কাণ নিশ্চয় রাজার মন্ত্রিত্বকে বিশেষ মর্যাদা দিতনা। বুঝতে বেশ পেতে হয়না যে রাজার ছোটো পরম অবস্থি। অন্যান্যের কাণ দুটী সহজেই প্রকৃষ্ট উপায়ে ছোটো করলো। আচার্যদের মতে কাটলেও খুব হয়তো আর রাজার কাণ কাটতে পারেননা ; পারলেও রাজার কাণ-কর্তনকারীর প্রাণসংশয় বিশেষ বিপজ্জনক ব্যাপার ছোটো। তখন রাজা এক উপায় বার করার আদেশ দিলেন। রাজার জন্য ঠিক ছাতের মতো মাথায়—দুপাশে এসদিন ওলে মুচকুন্দ অর্থাৎ কলে যাবেন এক দূর। দূর দিয়ে ঢাকেই ঘোড়ের কাণ থেকে যাবেন্দ্রী যোগ নেমে পেয়ে। কাণেই মুচকুন্দের কর্ণবৃদ্ধি ঘোড়ের কাণ উপ-শমের কাহিনী অনন্তনাগের ছেলে বুড়ো জানে।

ক্রমশঃ

বিশল্যকরণী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিং ভেঙে বাছুরের দলে অনেকেই ঢুকে থাকেন, প্রাক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত চিঁহি চিঁহি ও করেন, কিন্তু মহিম মামার যৌবন অক্ষয় অব্যয় অনির্বাণ। বাবার সঙ্গে সমানে আড্ডা দিয়েছেন—ভগৎদা বলতে অজ্ঞান, এখন আমাদের সঙ্গেই ওঠেন বসেন। মাথার চুলে আর এক যৌবনলক্ষ্মী শুভ্র মল্লিকার মালা পরিয়ে দিলে কি হয়, মনের সবুজপত্র আজও পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। মোটকথা মামা আজও কচি ও কাঁচা, শুধুকড়ি নয় কোমল।

সেদিন থেকের মিস্রড্‌ আড্ডায় পা দিয়েছি কি না দিয়েছি, গেটের কাছ থেকেই শুনতে পেলুম মামার দিল-খোলা-প্রাণ উচ্ছল হাসোচ্ছ্বাস যেন নাগর সঙ্গীত করছে—গল্প আর কি বলবো রে ভাই—নবনীদা ঠিকই বলেছে বুঝি—পুষ্পমালা নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল, নাহি বর্ণ অঙ্গদকুণ্ডল—তোদের সঙ্গে কি আর পারা দিতে পারি, না জেনা আছে কথায়—আমাদের দৌড় ঐ পর্যন্ত।

নবনী আমাদের বন্ধু আর ওঁর দূরসম্পর্কের ভাগনে। সেই সূত্রেই উনি আমাদের 'কমন' মামা। আর বয়সের কমবেশ থাকলে কি হয়—সম্বন্ধটা হয়ে গেছে সচিব সখা প্রিয় বান্ধবের। নবনী বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার—বাপ যা রেখে গেছে তা অধস্তন তিনপুরুষকে গোল্লায় দেবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু হৃদহৃদের দোষে ওর স্বাস্থ্যটা গেছে ভেঙে, তাই বিয়েও করেনি, কোন মাথাব্যথাও নেই। দীঘার প্রায় কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে একটা চমৎকার বাংলো বানিয়ে রেখেছে, সুবিধে পেলেই যায় আসে। বছরের বেশীভাগই সেখানে কাটায়—সে আবার ওখানকার এক খোকা হাকিমও বটে অর্থাৎ অনাহারী।

মামা বললেন—এর আগে নবনী কতোবার বলেছে, যাইনি, এখন আপশোষ হচ্ছে—কী চমৎকার জায়গা—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা পেরিয়ে হরঘটাভ্রষ্ট দেবী যেখানে আর থাকতে না পেরে রাই-উন্মাদিনীর মত সাগর জলে ঝাঁপ দিয়েছেন তারও আরও দক্ষিণে—সেখানে ওপরে নীল, নীচে নীল, সামনে নীল—দেখে দেখে আশ মেটেনা, নয়ন ন তিরপিত ভেল—

নবনী কবি মানুষ—ফোড়ন কাটলে—

আবেশ লাগে মনে, নীলে নীলে নীলাঞ্জনার অকাল জাগরণে, আকাশপ্রদীপ জেলে দেখে অরুন্ধতীর দল—

মামা বললেন—থাক—আর কবিতায় কাজ নেই—তবে থাদপূরণটা করে দিই—মত্ত মাতাল সাগরতল মথিছে উতল—কিন্তু জীবনে সমুদ্রমন্থন ত রোজই হচ্ছে, বাসুকির লেজ ধরে কতো টানাটানি—উঠছে সেই একই গরল—নীলকণ্ঠের আজ আর শক্তি নেই তাকে কণ্ঠে ধরবার—

কিন্তু গজমোতি হার গলায় নয়-কন্যা নয়-মাতার একটি আধুনিকা সংস্করণ উঠবেন ত—তিনিই মোহিনী হয়ে অমৃত বণ্টন করে দেবেন—

তা যা বলেছিস—কথাটা কি জানিস্‌—সব তীরথ্‌ মে তীরথ সাঁচা হ্যায়—মানুষই সেই সত্য তীর্থ—শুধু ইয়া ঘটকা পরদা খোল দেখা—অন্তরের পরদাটা সরিয়ে দিয়ে দেখতে হয়—তাই দেখে এলুম রে ভাই—

সে কী মামা—

আমরা ত শুনলুম যে নবনী তোমাকে ভজিয়েছিল যে ওখানে যা মুর্গী পাওয়া যায় আর ওর বার্বুচি তোফা কাটলেট বানায় আর ওষুধ হিসেবে শরীর ভাল রাখার জন্য দুএক ভোজ তেপালো জলীয়েরও বন্দোবস্ত আছে—নেপোলিয়নের নিনের খাঁটি আঙুর—পুরপুরু ব্রাণ্ডি-গুচ্ছ—আর তুমি নাকি মামীর ভয়ে বলিদানের পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে কালীঘাটের কালী, চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীকে ডেকে মানত করে-

ছিলে নিবিড়ে একা যেন সমুদ্রতীরে একমাস কাটিয়ে আসতে পারো—

তোদের নিয়ে আর পারিনা—ওরে ভ্রমর ভাই, কোন্ কাজের তাগিদ নাই, গল্প যদি শুনবে বল তার খবর কইয়া যাই, সাঁঝের বেলা দুটলো ফুল তার খবর কইয়া যাই।

পৌঁছলুম ত সমুদ্রের ধারে—খাই দাই বেড়াই—একদিন হলো কি কথায় কথায় এগিয়ে চলে গেছি অনেকদূর, ক্যাকটাস ক্যাসুরীনার ছায়া পেয়ে বালীয়াড়ীর পাহাড়ের উপর দিয়ে—দেখছি ধীরে ধীরে আলো নিভে আসছে, অন্ধকারের কালোয় নিজেকে নিবিড় করে নিকষকৃষ্ণার সাগরে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন জ্যোতিষাং জ্যোতি। জলে এসেছে জোয়ার, বাতাসে দিয়েছে দোলা, আকাশের তারারা মিটমিট করে হাসছে। উদাসীন সমুদ্রও নিভৃত নূতোর রসাভাসে জাগছে—তারই একটা ঘর্মাক্তিক আকুতি ছড়িয়ে পড়ছে বালির বেলাভূমিতে। দেখি দূরে বসে আছে একটি ছেলে আর মেয়ে—তাদের কণ্ঠে এসেছে গান, সুরের লহরীতে ছেয়ে গেছে আকাশ-বাতাস—ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে। হঠাৎ দেখি ছেঁড়া প্যাণ্টালুন-পরা উস্কোখুস্কো-চুল বিস্ফারিত চোখ নিয়ে এক প্রৌঢ় কোথা থেকে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—দয়া করেন! stop that song you idiots, গান থামাও মূর্খরা, সবচেয়ে বড়ো গান গাওয়া হচ্ছে, শুনতে পাও না। বজ্রকঠিন আদেশের মত শোনালো সেই বাণী। থতোমতো খেয়ে গেলো তারা—আর বাপের বয়সী আমিও। নবনী আমার গা টিপে সাবধান করে দিলে, কথা না বলে এগুলো, দেখি সমুদ্রের সেই বালিয়াড়ীর ধারে কণিষ্কসার পাশে দাঁড়িয়ে আক্রোশে গর্জরাচ্ছে যেন একটি শঙ্খচূড় মহাসর্প।

নিভৃতে নিরালায় বসে আলাপ করছেন ওঁরা—ইডিয়টরা জানে না যে নূতন সূত্র তৈরী হচ্ছে আমার বিজ্ঞানশালায় যা বিঁধবে ওদের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। ডাক্তার সমাদ্দারের একটি ডোজে প্রেমচন্দ্র উধাও হবেন জগত থেকে—এমন ট্রানকুইলাইজার বের করেছি যে সব উত্তেজনা প্রশান্ত হয়ে যাবে চিরকালের মত, সব উন্মত্ততা শান্ত হবে একটি ইনজেকসনে—রক্তে বইবে না জোয়ার, ধমনীতে আসবে না উচ্ছ্বাস, মনে জাগবেনা আবেগ—কিগো কবির দল, ওগো স্বপনচারিণীরা, তোমাদের দিন উঠলো, নতুন করে গড়বো আমি মানুষকে, সৃষ্টির হৈবিক নিয়ম পর্যন্ত দেবো পাল্টিয়ে, হাক্সলি যা কল্পনা করেনি, আইনস্টাইন যা ভাবেনি।

হো হো করে একটা উন্মত্ত হাসির ঝড় বয়ে গেলো সমুদ্র বৈকতে। লেখকের দল—কি হবে তোমাদের কল্পনা করতে পারো—প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, কামনা নেই, উত্তেজনা নেই—কি নিয়ে কাব্য লিখবে, গল্প ফোটাবে, উপন্যাস রচনা করবে—আর ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হবে না—পদ্মদিঘীর ঘাটে গো, বনে সিঁড়ির পাটে গো, সুন্দরী এক কণ্ঠে ভাবছেন কার জন্যে।

নবনী কিছু বললে না—শুধু ইঙ্গিত করলে এগিয়ে যেতে—আরো কিছু দূর গিয়ে বললে—মস্ত বড় পণ্ডিত লোক—মিঃ সমাদ্দার—তবে মাথার দোষ আছে—ওঁর কথা পরে বলবো—ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং কোথায় জানি না—ঐ যে গাঁ দেখছো, ওরই পিছনে আছে এক মন্দির, সেইখানেই আস্তানা।

আমরা এগিয়ে চললুম—সামনেই সেই মন্দির, এমন কিছু নয়—শুধু একটা ঘর—তারি চাতালে সমুদ্রের দিকে মুখ করে আধোজাগ্রত চন্দ্রের মত বসেছিল একটি পরিপূর্ণা কালো মেয়ে—ছেঁড়া কাপড়, দেহ মলিন, কিন্তু মালিন্য ভেদ করে চোখের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখে কী বিদ্যুৎময় আবেশ। নবনী বললে—আমি যখন প্রথম এখানে আসি—তার কিছুদিন পরে একদিন পুলিশ এক আসামীকে ধরে নিয়ে এলো আমার কাছে, স্টেটমেণ্ট লেখাবার জন্য—রক্তাক্ত উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন এই নিরালা সাগর তীরে—ক্যাকেটোরিয়ায় থাকতেন—আর সমুদ্রের ধারে মাইলের পর মাইল ঘুরতেন—কী যেন খুঁজতেন, বলতেন বিশল্যকরণী খুঁজছি, এমন ওষুধ যে মেয়ে-মানুষ পুরুষ দেখলে চঞ্চল হবে না, আর পুরুষ মেয়ে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। শান্ত করে দিতে হবে এ বৃত্তিটাকে। বৈজ্ঞানিক লোক, নাম ডাক, বিস্তারবত্তার পরিচয় আছে—জন্ম থেকেই মিশনরীদের দাক্ষিণ্যে মানুষ, বিলাতে গিছলেন তাদেরই সাহায্যে। প্রণয়রসসিক্ত হয়ে ঐ দেশেই একটি আতাম্রকুন্তলার পাণিপীড়ন করেন—তার পরের ইতিহাস অলিখিত—হয়তো একটি নিরুদ্ধ পরিচ্ছেদ

আছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেলো বিজ্ঞান ছেড়ে প্রজ্ঞানে নিয়ে যেতেছেন, মন্দির ও মূর্তি নিয়ে গবেষণা করছেন, বিশেষ করে উল্লোক্ত স্ত্রী মূর্তি নিয়ে আর গান্ধলতাপাতার মাঝে ওষুধ খুঁজছেন—প্রেম নামক শলাকে উৎপাটিত করবেন, পঞ্চশরের শর যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো যে এখানকার মন্দিরের বিগ্রহকে কলুষিত করেছেন তিনি—কালীর পায়ের নীচের শিবকে ভেঙে ফেলে দিয়ে নিজে সেইখানে শুয়েছিলেন—সকালে লোকে দেখতে পেয়ে উন্মাদ ভেবে প্রহার দিয়েছে। নবনী আরো বললে যে, আমি পরিচয় পেয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম, নিজের বাড়ীতে এনে চা জলযোগ করিয়ে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ব্যাপার কী বলুন ত? উত্তর দিলেন তিনি—অনু কে বোঝো—হাইফেন-বার্গম্রডিজারের নাম ত করো—এম্-এস্-সি না—বললাম হ্যাঁ—তবে ঐ অনুগুলোর ভেতর যে শক্তি আছে সেগুলো পাষাণ হয়ে জমে যাচ্ছে ঐ কালো পাষাণীর মধ্যে, তার খবর রাখো—কিসস্ আর কিউসস্ মুখে বললে হয় না। ভেঙে চুরমার করে ছড়িয়ে দিতে হবে ঐ চূর্ণ অনুকে—তবেই ত শক্তির খেলা দেখতে পাবে, সবাই হবে শক্তিধর, বীর্যবান্। শিবটা পারলেনা, নামেই শুধু মহাকাল—মহাদেবচন্দ্র যে মরে ভূত হয়ে গেছেন সে খেয়াল কারো নেই—গাঁজার দম দিয়ে ভোঁ হয়ে পায়ের তলায় ঘুমুচ্ছেন ভূতনাথ—নন্ কওাকটার বনে গেছেন—তাই এ ব্যাটাকে সরিয়ে নিজের বুকের উপর ঐ নাচের তালের ধুকধুকি শুনছিলাম, কী অন্যায় করেছি বাবা—

মুখে তখনও তীব্র সুরার গন্ধ—মনে হলো নির্জলা নির্ভেজাল খাঁটি তালরস মহিষাই এই প্রেমরস সীমার একটি সমীম দিক্। বুঝলাম পাণ্ডিত্যের চাপে আর নানা রকমের কারণে অকারণে মাথার স্ক্রু গোলমাল হয়েছে। আমার এক মনস্বীকল্প বন্ধু ছিলেন, সাইকোএনালিষ্ট—তাঁকে চিঠি লিখলাম—তিনি এলেন, দেখলেন, বললেন—ফ্যামিলির ইতিহাস নাও, আর মনের গোপন সুড়ঙ্গের, কোন বিস্তার আর সুন্দরের যাতায়াত ছিল—বিলেতে কিছু ঘটেছিল নিশ্চয়ই—কিছুদিন দেখে-শুনে যাওয়াই বাতলালেন—ভদ্রলোকের বিয়ে দিয়ে দাও একটি কালো মেয়ের সঙ্গে—খবরদার সরুতাঙ্গী গৌরী হলে চলবে না, চিকণদেহা শ্যামাঙ্গিনীও নয়—একটি মেদাঙ্গী আদুলাহিত-কুন্তলা কপালকুণ্ডলাকে ধরো এই নবকুমারের জন্য—মাস্ত, মাথা আমার কি ঘটকালীর ব্যবসায়ে—অনেক কষ্টে যোগাড় করে পাঠিয়ে দিলাম রাঁচিতে। এক সপ্তাহের মধ্যে খবর এলো—একী কাকে পাঠিয়েছো—এ রকম একটা সুন্দর, মনীষাসম্পন্ন, কৃষ্টিবিচারে অভ্যস্ত, বিদ্বান বুদ্ধিমান বিনয়ী নম্র ভদ্রব্যক্তি সচরাচর দেখাই যায় না। আরো পনেরো-দিন পরে ছেড়ে দিলে তারা। কলকাতায় গিয়ে পুনরায় অধ্যয়নব্রতী হলেন তিনি। ভুলেই গেছি কথাগুলো, মাস আষ্টেক বাদে আবার এক গোলযোগ—হাঙ্গামাহুজ্জুত—এবারে ব্যাপার আরো সঙ্গীণ—মন্দিরে ঢুকেছেন উনি, সঙ্গে একটি মেয়ে—ঐ যে চত্বরে বসে সেটি। মহিম মামা বললেন—আমি চমকে উঠলাম নবনীর কথায়—বলিস কিরে, অতো বড় বিদ্বান জ্ঞানী লোক।

নবনী বলে চললো—জানো মামা—মেয়েটা কিছু কুলবতী নয়, তবে যৌবনবতী চটকবতী বটে, বাগদীদের না দুলেদের, না চাঁড়ালের ঘরের তা জানিনা, তবে শুনলুম যা, তাতে প্রকৃতিতে উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধনবাধন মানে না, একেবারে হাটবাজারের, সম্ভ্রমসৌরভ কিছু নেই, লাজ ভয় ঘৃণাও নয়, কিন্তু যেন একটি চকল বিদ্যুৎশিখা। শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেলো। তার সাথে কি রকম করে যে ছুটেছেন তা জানিনা, সারারাত হৈচৈ করেছেন, কখনো কস্মিন্ কালেও নেচেছেন, বোতল গড়াগড়ি গিয়েছে, বলেছেন—পাষাণীকে পিসে চুরমার করে দেবো, চেঁচিয়ে-ছেন—তুমি দেবদাসী, আমি দেবীদাস, দুজনে মিলে শিব বাটাকে তাড়িয়ে দেবো—ডিস্মিস্—তারপর, কাণ্ড কি, নিজের বুকের উপর দাঁড় করিয়েছেন ঐ কালো-বরণী নগ্না নগণ্যাকে, দিয়েছেন তার হাতে দেবীর খপড়, বার করিয়েছেন জিভ্, নিজের বুকে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে লাগিয়েছেন তার জিভে। সকালবেলা গাঁয়ের লোক, পুরুত নাপিত ছেলেমালা এসে দেখে—একী কাণ্ড—সবাই অবাক্, দুজনেই বাহ্যজ্ঞানহীন, লোকজন এসেছে, ভোরের আলো ঢুকেছে, হুঁসই নেই। হৈহল্লা করতে মেয়েটাই আগুপাছু ভেবে দৌড়ে পালালো। উনি মার খেয়ে ঢুলুঢুলু চোখে বললেন—কি বাবা, ভোলা মহেশ্বরের পার্ট প্লে করছিলাম—সহ্য হোলনা—দিলে ত

সোনার চাঁদ মোতাতটিকে ভেঙে—জানো ধরেছি বেটির কাদো, অণু আর পরমাণুর ঘড়িটাকে নিয়েছি কেড়ে—অষ্টভৈরবীরা খুঁজে পাবেনা—পৃথিবীর দম বন্ধ করে দেবো—সময়ের চলা শুরু—কী মজা তারপরে চোবাবো ঐ ঠাকরুণকে সমুদ্রের জলে।

আবার পাঠানো হলো রাঁচিতে, আবার তারা ফেরত পাঠালে—শুধু ফেরত পাঠালে নয়—যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন তিনি দর্শনবিজ্ঞান, মহাজাগতিক বিকীরণ, শক্তির লীলা নিয়ে এমনি এক দিগগজী প্রবন্ধ ফাঁদলেন, যার নাম দিলেন—কাল আর কালী—যে তার কপিগুলি পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা লিখলেন—যিনি এই উঁচুদরের প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তাঁকে সাধারণভাবে পাগল বলবো কি করে। ছেড়ে দিলেন ওঁরা—তারপরে কোন পাত্তাই নেই প্রায় বছর দুই। মেয়েটা কিন্তু—নাম তার মাতঙ্গী সেইদিন থেকেই কেমন যেন বদলাতে সুরু করলো—এতদিনের প্রগলভতা যেন আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে—সে যেন স্ফটিকের এক নতুন স্পর্শে জেগে উঠছে। রঙ-রস, জাতি বাসনা, ঘরের কাজ সব ছেড়ে দিলে—কাজ নিলে ঐ মন্দিরে—সকাল সন্ধ্যে ঐ মন্দিরের চত্বর নিজের মাথার চুল দিয়ে পরিপাটী করে মুছে নেয়, বলে—কত-কালের কতলোকের পায়ের ধুলোর স্পর্শ লেগে এখানে—আমরা পাপিষ্ঠে যদি কিছু পুণ্য হয়—ওর মা কাঁদে—মাকু আমার রোজগেরে মেয়ে, তাকে কিনা কোথাকার কে এক বুড়ো গুণ্ডা গুণ করে দিয়ে গেলো গা। আরো শুনলুম তার মাকে বহু অর্থ দিয়ে রাজী করিয়েছিলেন ভদ্রলোক ওর সঙ্গে মন্দিরে যেতে ঐ একটি দিনই। আগে কোন ঘনিষ্ঠতা ছিলনা, পরেও নয়।

আজ কিছুদিন হলো আবার এসেছেন ভদ্রলোক—এবারে আর এক রূপ, অবস্থা আরো খারাপ, পেণ্টুলান্ আরো ছেঁড়া—কোথায় থাকেন, কি করেন, কিছুরই ঠিক নেই, মাকুর কাছে ঘেঁসেননা,' ওকে দেখলে—দূর দূর করেন, বলেন—তুই ভণ্ড, তুই মেকী, দোয়াতের কালি গায়ে ঢেলে কালী সেজেছিস, তোর আসল রং কালো নয়, হাড়ে হাড়ে কালি যখন নেই তখন হাড়কালি মাস-কালি করবি কি করে, বেরো। লাঠি নিয়ে তাড়া করেন, মাকু কাঁদে। বললাম নবনীকে—দেখ্ দেখি, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়—কেথিড্রাল অব্‌কোর্ড ঘুরে আসা ভদ্র-লোকের অবস্থা দেখ—

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো—তারপর যে কটা দিন ওখানে ছিলাম দেখেছি ওঁকে—সমুদ্রের ধারে বসে আছেন—শুদ্ধ সমাহিত মানুষ, অন্য জগতের লোক—সিন্ধুর মতই গভীর আর বন্দনীয়—মনে হলো বলি—

> উগ্র তুমি বাহির হতে, ব্যগ্র তুমি অর্ধনিশি
> অন্তরেতে শান্ত তুমি, আত্মরতি মৌনী ঋষি

কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলেন—গান শুনছি। কেউ কথা কইলে চটে যান, গান গাইলে আরো, চেঁচিয়ে বলেন—যেখানে সবচেয়ে বড় গান গাওয়া হচ্ছে, তোমরা সেখানে কচিনষ্টি করছো। আর দেখছি ঐ কালো, নিকষ কালো, কষ্টিপাথরে কোঁদা মানুষকে—খাচ্ছে দাচ্ছে, কাজ করছে, কিন্তু দৃষ্টি রয়েছে ঐ পাগলের দিকে, ঐ অসহায় মানুষটার দিকে—কতো মার খেয়েছে ওঁর হাতে, কতো তাড়া, কতো গালাগাল, তবু নড়েনি—ধরে বেঁধে খাইয়েছে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে শুইয়েছে, সেবা করেছে, যত্ন করেছে, পাড়ার লোকের টিটকারী শুনেছে, মা মাসীর হাহুতাশ। ভদ্রলোকের এমন অবস্থা যে যিধে পেলে বা কিছু দরকার হলে বলতে পারেননা, কখনো বলেন—দে, দে ভিক্ষে দে, যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি, এক অক্ষর মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি। আবার কখনো বলেন আমার দেবতা ক্ষুধিত পাষাণ, আমার রাধাবল্লভকে রাধাবল্লভী দিয়ে সাধতে হয়না, তিনি সর্বভুক—সকলের কাছে হাত পাতেন, চেটে-পুটে খান—নিতেও আছেন, লীলাতেও আছেন—তাঁর দাঁড়িপাল্লায় কিছু কম পড়লে চলেনা। তাঁর কাছে কোন চাওয়াই মন্দ নয়, তাঁর কাছে কোন পাওয়াই খারাপ নয়—শুধু দিতে আর নিতে জানতে হয়—সেই টেকনিক্-টাই হলো সাধনা।

মাকুকে ডেকে ধমকে বলতেন—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে অপরূপ বসে আছেন তিনিই বসে আছেন তোর ঐ দেহের প্রতিটি কোষে, তোর মনের প্রতিটি তন্ত্রীতে ইন্দ্রিয়ে, কামনায়, মিলিয়ে দেনা দুটোকে তাহলে দুইও ত রাধা হয়ে যাবি, যাকে চাইবি তাকে পাবি, বুঝলি, মিটে

যাবে শুধু আলো নয়, সব খেলা—পাগলী কিছু বুঝতে পারলি না—যা, যা, বেরো—

আমি থাকতেই এর প্রধান অঙ্কের সমাপ্তি দেখে এলাম, হয়তো নাট্যের অবসান নয়, বললেন মামা—পাড়া-গাঁয়ের নিশুতি রাত—প্রায় এগারোটা—তারা-জ্বালা আকাশে আলোর হাট বসেছে, সমুদ্রের হাওয়া আসছে হুহু করে—খাওয়া-দাওয়ার পর নবনী আর আমি তর্ক করছি জোর। নবনী বলছিল, আচ্ছা, মামা, তোমার কি মনে হয়, প্রথম যৌবনে মি: সমাদ্দার এপিলেপ্টিক বা এপিষ্ট ছিলেন—এ সব তারই প্রতিক্রিয়া, তিনি ত কিছুই মানেন না। আমি জবাব দিয়েছিলাম—নবনী, শঙ্খচক্রধারী কোন বরাভয় মূর্ত্তি, অসিখর্পরধারিণী কোন চামুণ্ডা, বাঁশী হাতে কোন মনোমোহন পারে তাঁর চেতনাকে রাঙিয়ে পাল্টা হয়তো করেনি কিন্তু তাঁর অবচেতনে বিরাটের যে একটা বিশাল রূপ ফুটেছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই—তার সঙ্গে হয়তো কড়ায়ক্রান্তিতে মিলিয়ে নিতে পারা যাবে না শিশুকোলে কোনো ম্যাডোনাকে, ক্রুশবিদ্ধ কোন মহা-পুরুষকে, নৃত্যরত কোন নটরাজকে বা ধ্যান নিমগ্ন কোন তথাগতকে, কিন্তু নিজের মতো করে সত্যকে তিনি পেয়েছেন। নবনী উত্তর দিলে—সত্য কি মিথ্যা বুঝবো কি করে—তুমি যাকে বলছো লীলা, আমি বলবো শক্তির অন্ধ আলোড়ন—বড় জোর তার মধ্যে একটা ছন্দ, একটা সুষমা, একটা হার্মনি আছে—ব্যস্ এ পর্য্যন্ত।

তর্কটা আরো জোরে করলো বলে জবাব দিতে যাচ্ছি, নবনী বললে—মামা, মূলতুবী রইলো—দেখছো না কারা আসছে—

দেখি হারিকেন হাতে এক বুড়ী (পরে শুনলাম মাতুর মা) আর একটি লোক এসে দাঁড়ালো—প্রণাম করে খবর দিলে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক অত্যন্ত অসুস্থ। নবনী ওঁর খোঁজ-খবর করতো, অলক্ষ্যে টাকাকড়ি যোগাতো—হাজার হোক অতবড় একটা পণ্ডিত মানুষ—তাই মাতু বলেছে খবর দিতে। সমাদ্দার সাহেব পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে আমি আর নবনী বেড়িয়ে পড়লাম। নিশীথ রাত্রের অন্ধকারে মহাপ্রকৃতি আমাদের যেন হাত ধরে নিয়ে চলেছেন—দূরে মহাসিন্ধুর গর্জ্জন—আকাশে নক্ষত্রের অভিসার—অরুন্ধতীরা বাসর সাজাচ্ছে—বর এলো বলে—

মন্দিরের চত্বরে উঠে দেখি মাতু যেন গণেশ জননী। ভদ্রলোকের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে জল দিচ্ছে। শ্বাস জোরে জোরে পড়ছে, বুঝলাম বাঁধন ছেঁড়ার সাধন আরম্ভ হয়েছে—গলায় তারই ঘড়ঘড়।

মাতুর চোখে অবিশ্রান্ত ধারা।

খানিক পরে আশ্চর্য্য—রোগীর জ্ঞান যেন কিছুটা ফিরলো, নেভবার আগে প্রদীপের মত—কাঁ যেন দেখছেন—হাঁ করে চেয়ে রইলেন মাতুর দিকে—সে চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত রুক্ষতা নেই, চাঞ্চল্য নেই—শ্যামসমারোহে এক অপরূপ কোমলতা নেমেছে—এক পেলব মৃদুলতা—এক সব পাওয়ার তৃপ্তি। সে চোখের দৃষ্টি আর উপোসী চোখের দৃষ্টি নয়—সে দেখছে প্রিয়াকে, জায়াকে, মেয়েকে, মাকে, এক অক্ষরে।

হঠাৎ মাথাটা চলে পড়লো।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো মাতু।

মামী কখন এসে আসরে বসেছেন দেখিনি, দেখি তিনিও চোখ মুছচেন।

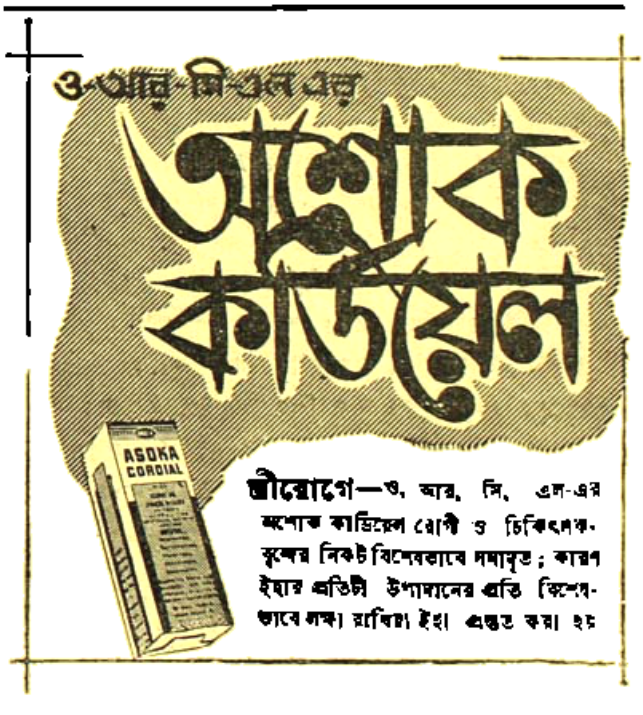

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

—পাঁচ—

হৈমন্তের কাহিনী বলতে বলতে সামারকন্দের কথায় এসে পড়েছি। এবার সামারকন্দ যাইনি, গিয়েছিলাম তিন বছর আগে। সেবার মস্কো থেকে তাসকেন্টে গিয়েছিলাম ফ্লাই ফ্লাই প্লেনে উড়ে। দূরত্ব দুহাজার মাইল, সময় লেগেছিল চারটি দিন। এখন মস্কো-তাসকেন্ট রেড প্লেনে লাগে তিন ঘণ্টার পথ হয়েছে। ওই সময়টা, শুনলাম, আরো কমানো যায়।

সেবার তাসকেন্টে পৌঁছে স্নান প্রভৃতি সেরে ফ্রেশ হয়ে বৃষ্টি-ভাঙার পরে গেষ্ট-হাউসের বহুবর্ণাঢ্য ফুল-বাগানটিতে বসে বিশ্রাম করছিলাম যখন, তখন আমাদের সোবিয়েত পক্ষের অভিভাবিকা মাদাম কুলাপোলোভা উজবেক শান্তি কমিটির সভাপতিকে নিয়ে কাছে এসে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—উজবেকিস্তানের কী কী দেখতে চাও?

দেখবার মতো কী কী আছে জানিনা। তবুও বললাম—সামারকন্দ আর বুখারা। ওই দুটি নাম মনে হয় ঘরিয়ে রেখেছিল অনেকদিন ধরে। তখন তাসকেন্টের নামও জানতাম না।

শান্তি কমিটির সভাপতি বলেন—বুখারা দেখানো এখন সম্ভবপর নয়। কিন্তু সামারকন্দ যাওয়া সম্ভব। তবে তার জন্য এরোপ্লেনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনখানা এরোপ্লেনের ব্যবস্থা এখন সাতিশয় করে দিতে পারবেন কিনা, তাও ভাববার কথা।

আমি বললাম—আমরা ট্রেনে যাব।

—না, না, তাঁরা কোনোমতে অতিথি হবার কষ্ট স্বীকার করেন, তাঁদের আমরা রেল-ভ্রমণের কষ্ট দিতে চাইনা।

আধাপ-আলোচনার পর ঠিক হোলো, তাসকেন্টে আমরা চারদিন থাকব। ওই সময়ের মধ্যে, এরোপ্লেন পেলে, একদিন সামারকন্দ ঘুরে আসব।

এরোপ্লেনের ব্যবস্থা হোলো। চৌদ্দটি জন ভারতীয় ডেলিগেটের যাওয়া-আসার জন্য তিনখানা এরোপ্লেনের ব্যবস্থা হলো। একদিন খুব ভোরে ডেলিগেশনকে তিনটি দলে ভাগ করে আমরা তিনখানা প্লেনে সামারকন্দ যাত্রা করলাম। দু'ঘণ্টার আমাদের প্লেনখানা সামারকন্দে আমাদের নামিয়ে দিলে। আমরা এয়ার-পোর্টের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম, আর দুখানা প্লেনের জন্য। সামারকন্দের মুখ্যরাও বড় বড় ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সেই গোলাপী রঙ, সেই কালো কালো চোখ, টানা টানা ভুরু। কিন্তু বাগদাদ কোথায়, ওড়না কোথায়, কোথায় কুঠার আবগুণ্ঠন। সকলেরই সর্ট স্কার্ট, সিল্কের ব্লাউজ, ছিমছোলা ছোট চুলও অনেকের মাথে অবশ্য নিশ্চলভ। শুনলাম সবাই রুশী ভাষায় কথা বলতে পারেন; উজবেকীর সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকেই রুশী শিখতে হয়।

মাদাম একটি মহিলাকে আমার সাথে এসে বলেন—আজ সারাদিন তুমি এঁরই অতিথি। ইনি ডাক্তার।

—কবে থেকে আমি একজন রুগী?

—রোগ যদি কিছু থাকে ডাক্তারের কাছে তা গোপন রেখনা। সামারকন্দে আসবার আকাঙ্ক্ষা আর সবার চেয়ে তোমারই ছিল বেশি। একটু হেসে মাদাম অন্যত্র চলে গেলেন।

যে ডাক্তারের হাতে তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন, তিনি ইংরিজি জানেন না। রোগ ব্যক্ত করি কোন ভাষায়? দো-ভাষিণী নিচ্ছা পাশেই ছিলেন, মস্কো থেকে সঙ্গে এসেছিলেন, ইংরেজী ভাষার শিক্ষিকা তিনি; তরুণী।

তিনি বলেন—বল লীডার, রোগের কথা খুলে বল। আমি তর্জমা করে ডাক্তারকে বুঝিয়ে দোব। ডাক্তার রুশী জানেন, আমিও উজবেকী ভাষার কথা বলতে পারি।

আমি বলাম—নারীর সাথাবে নারীর কাছে যে-পুরুষ রোগ ব্যক্ত করতে চায়, দু'নৌকোয় সাথে পড়ে তাকে হাবু-ডুবু খেতে হয়। বুড়ো হবার পর থেকে তত বোকা আমি আর নেই। আমি দেশে ফিরেই চিকিৎসা করাবো। আমার রোগের কথা থাক। সামারকন্দের রুশী-দের কথাই শুনি।

ডাক্তার শোনাতে লাগলেন রোগ, অপমৃত্যু, খুনই ছিল; দারিদ্র্যও ছিল দুরপনেয়। আর যে সবই অতীতের বিষয় হয়েছে, তা নয়। তবে ওগুলির মূলোৎপাটনের প্রচণ্ড প্রয়াস চলছে। তারপর ডাক্তার সংখ্যা আবৃত্তি করে তাঁর অতিথিকে জানাতে লাগলেন—কটা হাসপাতাল, কতগুলি ক্লিনিক, ক্রেশ, প্রসূতি-সদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সংক্রামক ব্যাধির সঙ্গে কেমন করে সংগ্রাম করা হচ্ছে, কেমন করে দিনে দিনে সুস্থ সবল শিক্ষার্থীর দল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যা স্মরণ রাখবার বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় বার বার পেয়েছি ইউরোপ ডেমোক্রেসীগুলিতে। এত মুখস্থও রাখতে পারে ওরা।

মাদাম আবার এগিয়ে এলেন একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে। তিনি বলেন—এই ছেলেটি আর্থ্রালিষ্ট হবার চেষ্টা করছে। তোমার কাছে কিছু জানতে চায়। উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে আমার পাশে বসালাম। যুবকটি বড় লাজুক। যা জানতে এসেছিল, তা যেন সে ভুলেই গেল। আমার বাঁ হাতের পাতাটা তার হাতের মুঠোর ভিতর চেপে ধরে সে চুপ করে বসে রইল। অগত্যা আমিই প্রশ্ন করতে লাগলাম। জানলাম কোন স্কুল কলেজে সে আর্থ্রালিষ্ট শিখছেনা, নিজে-নিজেই চেষ্টা করছে আর্থ্রালিষ্ট হবার।

আমি বলাম—তবে ত আমার সঙ্গে তোমার মিল হয়েছে, বন্ধু। আমিও ও-বিদ্যে কোন স্কুল কলেজে পড়ে আয়ত্ত করিনি। তবুও এক

কালে আমার দেশে একজন মাসকাবার সাংবাদিক হয়েছিলাম। রোজ দু'বেলা খেতে পাও ত?

মুখটি বাঁকা মেড়ে জানালো, তা পাই।

—আমি তাও পেতাম না।

মামাম বলেন—তা যে বল তুমি।

—বড়াই করবার জন্য বলছি না, মামাম। তোমাদের বিপ্লবের আগে তোমাদের দেশেও অনেক আর্টিস্টকে, ইন্টেলেকচুয়ালকে, না খেয়ে দিন কাটাতে হোতো। সে-কথা তুমি জান।

—সে দুর্দিন কেটে গেছে, মামাম দৃঢ়কণ্ঠে বলেন।

—হয়ত গেছে। আমাদেরও তাই আশা করছি। কিন্তু মানুষের দিন কাটে, সে-দিন যে আবার ঘুরেও আসে, ইতিহাসে তারও প্রচুর নজীর রয়েছে।

মামাম বলেন—তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—কোন নিয়মে চালু হবার ফলে যে-সুবিধা হয়, সেই নিয়মের প্রাচীন হতে হতে নতুন নতুন সমস্যা এসে রাজায় আবার অরাজক সৃষ্টি করে। আবার আসে দুর্দিন।

সেই রেনকোটটা এসে ল্যাণ্ড করল। মামাম বলেন—ওরা এসে পড়েছে। আমি ওদের নিয়ে আসি। সমরকন্দের ঠকঠকিয়া ফুলের তোড়া নিয়ে মামামের অনুসরণ করলেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ডেলিগেশনের প্রতিটি ডেলিগেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন লীডার তাঁদের উপেক্ষা করেন কিনা। সামারকন্দের তরুণ আর্টিস্টটি আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বিদায় নিলেন।

মহিলা ডাক্তারটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম—তারপর ডাক্তার, হৃদ্রীর রোগ ধরতে পারলে?

সেহন থেকে নিচু করেন—ইট ইজ টু লেট. লীডারে। তুমি সুযোগ হারালে। এখুনি ভিড় জমে উঠবে।

সত্যই ভিড় জমে উঠল। মামাম বলেন—আর সময় নষ্ট কোরনা, বাসে গিয়ে ওঠ।

সারি বেঁধে চারখানা বাস দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার আমাকে নিয়ে তার প্রথম থামিতে উঠলেন, মামামও সব ব্যবস্থা করে এসে আমাদের বাসেই উঠলেন এবং হেসে বলেন—এখন আমার মাধ্যমেই তোমাকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—আমাদের চোখ কথা কইবে মামাম, কণ্ঠে ভাষা থাকবে না।

মামাম তর্জমা করে আমার উক্তিটি ডাক্তারকে শুনিয়ে দিলেন। ডাক্তার বলেন—আমাকে দেখতেও আসেননি, এসেছেন সামারকন্দ দেখতে।

সামারকন্দ মুটো অংশে বিভক্ত। প্রাচীন সামারকন্দের কোনই পরিবর্তন করা হয়নি। তাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে নতুন সামারকন্দ গড়ে তোলা হচ্ছে আধুনিক শহরের অনুকরণে। আমার কৌতূহল প্রাচীন সামারকন্দ সম্বন্ধে। নতুন শহর ত অনেক দেখলাম।

প্রাচীন সামারকন্দের বাড়ীগুলি মাটি দিয়ে গড়া—প্রায় উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ ছাড়াবার পর পশ্চিম দিকে যাবার সময় রেল-পথের দুধারে যেমন বাড়ী দেখা যায় তেমন। পথগুলোও তাই।

আমাদের প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হোলো ওখানকার একটি মান-মন্দিরে। মাটির তলায় সেটি ঢাকা পড়েছিল, খুঁড়ে বার করা হচ্ছে। গাইড বলেন—আলু বেগির সেটি তৈরি করেছিলেন ভারতবর্ষের জয়পুর মান-মন্দিরের ধাঁচে। উক্তিটি শুনেই গর্ব হোলো। ওকে জয়সিংহের বলব, না আত্মাকিমার বলব, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন—ও গর্বের মূলে রয়েছে ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। তৈমুর যোর যার যা মার দিয়েছিলেন, তার শোধ নিতে পারিনি। তাই জয়পুরের মডেলে মন্দিরটি তৈরি হয়েছে শুনে মন খুশি করি উৎফুল্ল হলো এই ভেবে যে, বিলিতও বিদ্যা হতে পারে।

মান-মন্দিরটি দেখবার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হোলো তৈমুরের আত্মীয়-পরিজন যেখানে বাস করতেন, সেই অঞ্চলে। সব বাড়ীগুলিই পালি পড়ে আছে, খুবই জীর্ণ। কিন্তু সমস্ত পরিবেশের এমন একটি রূপ আছে, যা দেখে আরব্যরজনী আর পারস্য রজনীর গল্পগুলি থেকে থেকে মনমুড়ে হচ্ছিল, আর দুই মাঝে মাঝে প্রত্যাশা করছিল ওই সব গল্পের নায়ক-নায়িকাদের অকস্মাৎ আবির্ভাব। কিন্তু তা ঘটল না। সঙ্কীর্ণ পথের দুপাশে দাঁড়িয়েছিল মলিন-বাস-পরিহিত পঙ্গপাল নর-নারী, আর নগ্ন-প্রায় শিশুকুল। আমরা সেলাম আলেকুম জানাই হেসে হেসে তাঁরা আলেকুম সেলাম বলে আমাদের প্রত্যাভিবাদন জানাতে লাগলেন। আমি মাঝে মাঝে এক-একজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম—আপনি কি মুসলমান? কেউ হাঁ বা না বলেন না। কিন্তু আমরা এসেছি বলে সকলেই যেন খুশি হয়েছেন। আমরা যেন ওঁদের পূর্ব-পরিচিত আপন জন।

সামারকন্দে আজও উল্লেখযোগ্য কোন ইমারতই পড়ে ওঠেনি, কেবল কলেকটির কার্ব কতগুলি পড়ে উঠেছে। তাসকেন্টের মতো সামারকন্দ এখনো সমৃদ্ধ হয়নি। মসজিদ আর সমাধি অনেক দেখলাম, তৈমুরের আর তাঁর পৌত্রের সমাধিও দেখলাম। কিন্তু প্রাসাদ বলে তৈমুরের কিছু ছিল কিনা তার কোন নিদর্শন পেলামনা।

একটি মক্তব দেখাতে নিয়ে যাওয়া হোলো। সেখানেও সুনির্মিত কারুকার্যখচিত একটি সুন্দর মসজিদ। তাই দিয়ে চারদিকে ছাত্রাবাস। ফটকের দু'পাশে দুটি উচ্চ স্তম্ভ ছেলে পড়েছে। সে দুটিকে ছেড়ে না ফেলে কেমন করে আবার সোজা করা যায়, ইঞ্জিনিয়াররা সেই চেষ্টা করছেন। আমরা দেখতে পেলাম মোটা-মোটা তার দিয়ে সে-গুলো টানা দেওয়া হয়েছে। আমাদের বলা হোলো স্তম্ভগুলো আগেকার চেয়ে অনেক বেশী সোজা হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল, প্রায় বড় কম হয়নি। ডাক্তার বলেন—আর ঘোরাঘুরি না। এইবার লাঞ্চে চল।

—কোথায়? তৈমুরের প্রাসাদে?

—না, কলেকটির কার্বে। তার কর্মিরা তাদের ভারতীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে রেখেছে।

আর বিশ মিনিট বাসে চলে কলেকটির কার্বে ঢুকে পড়লাম।

যার থেকে মেয়েই মেহমান ভাকাভুকুরের মাঝে কার্পেট বিছানো রয়েছে। তার ওপর মোটা মোটা তাকিয়া, চারিদিকে ঘুমন্ত রক্ষ-বাহার। পা বাড়ালাম কার্পেটের দিকে। কাপ্তের নায়ক বলেন—একেবারে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নেবেন। চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে নেবেন।

সাবান তোয়ালে নিয়ে কার্পের কয়েকজন সেবক-সেবিকা জলের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখানে যেতেই তাঁরা সাবান হাতে তুলে দিলেন, জল ঢেলে দিলেন; বর্ষিয়সী একটি মহিলা কন্ধী তোয়ালে দিয়ে আমার মুখও মুছিয়ে দিলেন।

সকলের হাত মুখ ধোয়া হলে সকলকে টেবিলে নিয়ে যাওয়া হোলো। খাবার আয়োজন দেখে চমকে উঠলাম। শুপাকার আঙুর, আপেল, কলা, কেক, মাখন, পাউরুটি, রকমারি মাংসের তৈরি খাবার, আর নানা রঙের মদ। আসনে বসতেই কার্পের নায়ক একখানা লম্বামতন ছুরি হাতে তুলে নিলেন, আটার লুচি পরিবার চাকির মতো গোল আর নিখুঁত। ছুরি বসাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কাপ্তের নায়ক হাতের চাপ দিয়ে ভেঙে দিলেন। খেয়ে দেখলাম বেশ স্বাদ। কিন্তু বেশি খেতে ভরসা হোল না, পেটে গিয়ে যদি পাথর হয়ে ওঠে!

খাওয়া, বাক্-বাক্ আলাপন, গান, আলাপন, এক সঙ্গেই চলতে লাগল। ওরই মাঝে ফোন নেওয়া হোলো কার্পের দু'টিনটি নানা স্থানে। বরফের পর বরফ সকল রকম পশুর উৎপাদনবৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্পের নায়ক বলেন—এবার আশা করছি উৎপাদনে আগেকার সকল রেকর্ড অতিক্রম করব।

বেড়ে ওঠা ঘরে খাওয়া চল।

টেবিল ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে কার্পেটের উপর গা এলিয়ে দিলাম একটা বড় তাকিয়া টেনে নিয়ে। একটু আলস্যে ভরা দুমিয়েও পড়েছিলাম। ঘন-ঘন ঘণ্টার আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠে বসলাম। কার্পের কোথাও আগুন লেগেছে নাকি? রুশী মেয়েটি হিন্দি বললে—চল, টেবিলে চল।

—আবার টেবিলে! ডানকেকে দিয়ে আজ রাতেও কিছু খাব না। বলে আবার শুয়ে পড়লাম।

মিনা বলে—বিরিয়ানি পোলাউ তৈরি হয়েছে।

—হোকগে! চোখ না খুলেই বললাম।

মিনার কোন জবাব পেলাম না। একটু পরেই কপালে কোমল হাতের পরশ। চেয়ে দেখি ডাক্তার। আমি বললাম—খেয়ে আমার অসুখ করেনি ডাক্তার, শুধু পেটটা এত বোঝাই হয়েছে যে, উঠতে পারছি না। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিডাও এসেছিল। সে বলে—উঠতে তোমাকে হবেই, নীচায়। টেবিলে বিরিয়ানি পোলাউ, আর শিক-কাবাব মার্ত করা হচ্ছে।

তারপর গলা নীচু করে বল—বিরিয়ানি প্রত্যাখ্যান করলে এখানকার মেয়েরা নিজেদের অপমানিত মনে করেন।

নিরুপায়। আবার টেবিলের কাছে গেলাম। কার্পের নায়ক আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি হাত ধরে আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। সামনের ডিসে বিরিয়ানি ধোঁয়া ছড়াচ্ছে, গরম গরম শিক-কাবাব পরিবেশন করা হচ্ছে। কিছুকাল ডিসের দিকে চেয়ে রইলাম, তারপর টেবিলের আর সবাইকার দিকে চেয়ে দেখলাম। সকলেই হাত আর মুখ সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েদের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য এক চামচ বিরিয়ানি আমিও মুখে তুলে নিলাম। কার্পের নায়ক এক খণ্ড শিক-কাবাব মুখের সামনে তুলে ধরলেন। তাও মুখে পুরে নিয়ে চিবোতে লাগলাম। পিছন থেকে লিডা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে—এইবার তোমার কিছু বলা উচিত।

এক চামচ বিরিয়ানি তুলে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তারস্বরে আমি বললাম—কেতাবে পড়েছি আর্যরা মাঝে মাঝে গো-বৎস খেতেন। কিন্তু বিরিয়ানি পোলাউ আর শিক-কাবাব খেতেন কিনা, সে বিবরণ আমি কোন কেতাবে পড়িনি। আমরা এখন গো-বৎস খাইনা, কিন্তু সুযোগ পেলেই শিক-কাবাব আর বিরিয়ানি পোলাউ খাই, আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি এই দেশের সেই ঐতিহাসিক-বিস্মৃত মহান পুরুষদেরকে—যাঁরা এই পরম লোভনীয় খাদ্য দুটি এই দেশ থেকে আমাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন (করতালি)। আজ যাঁরা পরম প্রীতিভরে তাঁদের ভাষীর ওই সম্পদ দুটি অকৃপণ হাতে আমাদের পরিবেশন করে আমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করলেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আর প্রার্থনা করি পৃথিবীতে এমন দিন অচিরে আসুক, যখন পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ নিত্য দু'বেলা এই সুখাদ্য পান খেয়ে ছাই এবং পুষ্ট হতে পারে।

তুমুল করতালি ধ্বনি। কার্পের নায়ক দুই হাতে আমার ডান হাতের পাতা ধরে ঝাঁকানি লাগালেন। আমি বললাম—চল ত তোমাদের কার্পের ওই ঘন সবুজ ঘাসগুলো দেখে আসি।

—ও আর কি দেখবে! ওটা ত টমেটো ক্ষেত।

—টমেটো আমি বড্ড ভালবাসি।

টেবিলে থেকে ঘুরে সরে যেতে তবে আমার খানা স্বাভাবিক হোলো।

মাথায় তাড়া দিলেন, এখানে আর দেরী করলে টানকেন্ট পৌঁছুতে অনেক রাত হয়ে যাবে। একে একে বাসে গিয়ে উঠলাম। রাস্তায় এখন খুব ভীড় জমেছে। তাদের বেশির ভাগ নর-নারী এই প্রথম ভারতবাসী দেখছে। তাদের মুখে-চোখে কেবলই কৌতূহলের পরিচয় পেলাম না, আত্মীয়তার প্রসন্নতাও দেখলাম। আর তাই আমার চিত্ত স্পর্শ করল।

একটা জায়গায় ভীড় এত ঘন হয়েছিল যে, ড্রাইভার বাস থামিয়ে দিল। ঠিক সেই সময়টিতে রাস্তা থেকে কে যেন আমার হাতে এক-খানা বই গুঁজে দিল। আমি ভাবলাম অটোগ্রাফ চায় বুঝি। কলম বার করে লিখতে উদ্যত হলাম।

মাথায় বলেন—বইখানা উপহার পেলে।

—কে দিলে?

—সকাল বেলায় এয়ার-পোর্টে যে আর্মেনিয়ান মেয়েটির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, সে।

—কোথায় যে?

—ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল বেপলাম।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাদাম আমার হাত চেপে ধরে বলেন—কোথায় যাও?

—যেসি ছেলেটিকে খুঁজে বার করতে পারি কি না। ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ পেলাম না যে!

—সে ধন্যবাদ চায়না, তার চিরদিন তুমি তাকে মনে রাখ।

বাস চলতে শুরু করল। আমি ছেলেটির কথা ভাবতে লাগলাম। তার বেপলুদা বেপে বুঝেছিলাম তার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তবুও আমি তার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম বলেই সে মনে করল—আমাকে একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার। বইখানা কেনবার জন্য তাকে কতবার যোগাড় করতে হয়েছে হয়ত বেশ কষ্ট করে, হয়ত ধার করেই কিনেছে। বই কিনে সারাদিন আমাদের পিছু-পিছু ঘুরেছে, হয়ত কিছু না খেয়েই। আমার কাছে পৌঁছবার সুযোগ হয়ত এর আগে সে পায়নি। বাস অকস্মাৎ থেমে যেতে সেই সুযোগ যে-মুহূর্তেই পেল, সে মুহূর্তটুকুর সদ্ব্যবহার সে করল, বইখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই উধাও হয়ে গেল। একে কী বলা যায় ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। বইখানা লেনিনের জীবনী, রুশীতে লেখা। তা আমি পড়তে পারবনা কোনদিনই। কিন্তু বইখানা আমার লেখার ডেস্কের ওপর রেখে দিয়েছি। তার ওপর দৃষ্টি পড়লেই সামারকন্দের তরুণ আর্মেনিয়ানের মুখখানি আমার চিত্তপটে ফুটে ওঠে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে বেশি তিনঘণ্টা বসেই ওড়বার অপেক্ষায় আছে। মাদাম তাড়া দিলেন—আর দেরী নয়। ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন—দারুণ দিন কী কষ্টই না তোমাকে দিলাম।

—কিন্তু যে আনন্দ দিয়ে গেলে, আমার মনেই তা জমা রইল। কাউকে তার ভাগ দিতে হবেনা।

রাতের অন্ধকার নেমে আসবার পর আমরা তাসকেন্টে ফিরে এলাম। সমস্ত শহরটিই যেন একটি প্রমোদ-উদ্যান। সুপ্রশস্ত পথের দুই পাশে গাছের সারি, তার পরেই ফুটপাথ, ফুটপাথের পর ফুলের বাগিচা, তারপর বাড়ী ঘর, কোনটা ছোট, কোনটা বড়; কোনটার টালির ছাদ কোনটা ঢেউ-তোলা উঁচু, সর্ব্ব ব্যাপারে আধুনিক। অতীতে শুনেছি এই তাসকেন্টের ওপর দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা বাণিজ্য-পথ চীন-ইউরোপকে সংযুক্ত করেছিল। চীনারা তাকে সিল্ক-রুট বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের রেশম ব্যবসায়ের পথ ছিল ওটা। ভারত এবং পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে এই তাসকেন্টের যে সংযোগ ছিল, তার বিবরণ এবং প্রমাণ ও রয়েছে। আজও আকাশ-পথে পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের সংযোগস্থল হয়েছে তাসকেন্টের বিরাট এয়ার-পোর্ট।

আজকার তাসকেন্ট, অর্থাৎ উজবেকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুলা উৎপাদন করে; হাইড্রো-ইলেকট্রিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এর স্থান দ্বিতীয়। একাও টেক্সটাইল মিল রয়েছে এই তাসকেন্টে। শিক্ষার প্রসারে, সাংস্কৃতিক চেতনায়, তাসকেন্টে সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির মাঝে আগেকার সারিতে স্থান করে নিয়েছে। এখানকার ছেলে-মেয়েরা তুলনায় অন্যান্য রিপাবলিকগুলির ছেলে-মেয়েদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় দ্বিভাষী আর উর্দু, পড়ে, বলেও অনেক ভালো।

প্রথম দিন সকালে আমাদের ইন্টার ট্রেইনিং কলেজে নিয়ে যাওয়া হোলো। প্রায় দু'হাজার ছাত্র-ছাত্রী সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। আমাদের নিয়ে বসানো হোলো একটি প্রকাণ্ড হল-ঘরে। টেবিল ভর্তি খাদ্য ও পানীয়; বিরিয়ানি পোলাও বা মদ নয়, মকমারি ফল, আর কোল্ড-ড্রিঙ্ক। শিক্ষক-শিক্ষিকাও অনেক ছিলেন। আমাদের দলেও আট-দশজন অধ্যাপক আর শিক্ষক ছিলেন। আমি একে-একে তাঁদের সকলের পরিচয় দিলাম। শুরু হোলো শিক্ষা-সংক্রান্ত সংবাদের আদান-প্রদান, উভয় দেশের শিক্ষা বিষয়ক নানা আলোচনা।

আমি নীরবে বসে সামনের প্লেট থেকে এক-এক কালি ফলমূল তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিতে লাগলাম। সেগুলো চিবোতে হয়না, মুখের তাপেই গলে যায়। ওঁদের পক্ষ থেকে বলা হোলো শহরের শিক্ষার সকল সমস্যা ওঁরা যেমন সমাধান করতে পারছেন, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা-সমস্যা তেমন সমাধান করতে পারছেন না। তবে এই স্কুল অব পেডাগগির দ্বারা সংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আশা করা যায় যে, সুশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব অল্পদিনেই দূর হবে। সব চেয়ে আশার কথা, ওঁরা বলেন, মেয়েরা দলে দলে এগিয়ে আসছেন শিক্ষা-প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করবার আগ্রহ নিয়ে। তারপর শুরু হোলো সংখ্যা শোনাবার পালা। সব শেষে ওঁরা বলেন যে, উজবেকিস্তানে এখন আর নিরক্ষরতা নেই।

আমাদের পক্ষ অনুরূপ মন্তব্য করতে না পেরে কুণ্ঠিত বদিও হলেন, তবুও জোর-গলায় বুঝিয়ে দিলেন শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতিও বিস্ময়কর হয়েছে স্বাধীনতার পরে। এই আলোচনায় আমি আদৌ যোগ দিইনি। তার কারণ শুধুমাত্র লিটারেসি যে একটা জাতিকে এগিয়ে নেয়, আমি তা বিশ্বাস করিনা। নিরক্ষরতা যে দূর হতে বাধ্য, এ-কথাও আমি মানিনা। শিক্ষিত মূর্খের সংখ্যা কোন দেশেই নগণ্য নয়। তবুও আমি বেশ মনোযোগ দিয়েই চলতি-আলোচনা শুনছিলাম এই আশা নিয়ে যে, শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নতুন কিছু হয়ত শুনব, যা পুরাণো পৃথিবীর মানুষদের বলতে শুনিনা। ঘণ্টা দেড়েক আলোচনা চল। তারপর স্কুলের অধ্যক্ষ আমাকে বলেন—তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা, অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকারা, অডিটোরিয়ামে অপেক্ষা করছেন আমার ভাষণ শোনবার আগ্রহ নিয়ে।

আমি বললাম—একজন অধ্যাপককে পাঠাচ্ছি। আমি সামান্য একজন নাট্যকার মাত্র।

তিনি বলেন—তাঁরা টেলিভিশন-মারফতেই ভাষণ শুনতে চান।

মঞ্চে থেকে আগত তরুণ মেজবান মিশাকে বক্তৃতা তর্জ্জমা করে শোনাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিট খানেক করতালি। অধ্যক্ষ আমাকে শ্রোতৃদের কাছে ইনট্রোডিউস করে দিলেন। মিশাকে পাশে টেনে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম। যা বললাম, তার মোদ্দা কথা এই যে, আমি শিক্ষিত নই, তাই শিক্ষকও নই। আর শিক্ষিকাও যে নই, তা আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন। আমি নাট্যকার। আমার কাজ হচ্ছে অভিনয়োপযোগী এমন সব বাক্যরচনা করা, যা অভিনেতৃদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়ে শ্রোতৃদের মনের দুয়ার খুলে দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্তধারার মতো বাইরে বার করে এনে তাদের প্রত্যেককে, প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে, এবং নাট্যকারকেও, অন্যরূপ একটা আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারে মুহূর্তের জন্য। সেই ক্ষণকালের অনুভূতিই নাটক। নাটক বইয়ের পাতায় থাকে না। তেমনই জানও থাকেনা বইয়ের পাতায়—থাকে মানুষের মনে-মনে। মনের দ্বারে আঘাত হেনে সেই জ্ঞানকে বাইরে এনে সর্ব্বরূপীন করাই হচ্ছে শিক্ষা। প্যাটার্ণ দুই এডুকেশন নয়, ট্রেনিং। জ্ঞানকে সর্ব্বরূপীন করবার সহায়তা বই-ও করতে পারে, গানও পারে, নাচও পারে, নাটকও পারে, কাব্যবৃত্তিও পারে। স্কুল আর স্কুল-মাষ্টারি, লিটারেসি আর কারিকুলামই শিক্ষার শেষ কথা নয়। শেষ কথা হচ্ছে মানুষকে, সকল মানুষকে, সমাজের একটিমাত্র শ্রেণীকে নয়, সমগ্র মানুষকে, পতঙ্গদের মতো ছুটিয়ে তোলা। একে যদি আপনারা আদর্শ করে নিয়ে থাকেন, তা'হলে শুধু আপনাদেরই

আহ্বান জানাবেন না, সমস্ত জগতের হিত করবেন। আপনাদের মহৎ মার্থক হোক।

প্রচণ্ড করতালি ধ্বনি। তারই মাঝে মিসেস বসু—তোমার বক্তৃতা উদ্বোধন করতেও inspiring হয়ে উঠবে, লীলার।

—তুমিও ওকে কোনো মিশন, মানবীয় মতো আমিও ফ্লাটোরি চাই।

—না, লীলার না, আমি যা অনুভব করি, তাই বলাম।

—থাক ইট দিলা, বলে আমি অন্যাকের সঙ্গে মিলিত হলাম: তিনিও খুব খুশী।

আমাদের দলের দুইজন অধ্যাপক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে উদ্বোধন বক্তৃতা করতে আহ্বান জানালেন। বেশ বলেন তাঁরা।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিদায় নিয়ে সকলে আমার বাসে উঠলাম। মিনিট পনরোর পথ—ঘন বিশিষ্ট অঞ্চল। সুন্দর একটি নতুন বাড়ী। মিসিয়ার স্বয়ং এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। অত্যন্ত রসিক তিনি, যৌবন অতিক্রম করেননি; ইংরিজি বলেন।

তিনি ফিরে গেলেন একটি বড় ঘরে। সেখানে একটা বড় টেবিলের এক পাশে বহু লোক বসে আছেন। আমরা ঢুকতেই তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। মিসিয়ার বলেন—আমরা এখন বন্ধুর মতো ঘরোয়া ধরনে কথা-আলোচনা করব। সকলে বসবার পর উদ্যোক্তারা প্রশ্ন জানালেন তাঁরা কতগুলি বিষয় জানতে চান।

আমি বলাম—জানাতে পারলে খুবই খুশী হব আমরা।

তাঁরা জানতে চাইলেন জাভাতে কত তুলা উৎপন্ন হয়, তুলোর আঁশগুলো কেমন, বছরের কোন সময়ে ফসল লাগানো হয়, কখন ফসল তোলা হয়, কতগুলো টেকসটাইল মিল জাভাতে আছে।

আমাদের সঙ্গে কয়েকজন ফোটাই আর মধ্যপ্রদেশের ডেলিগেট ছিলেন। তাঁরা-আমাদের সঙ্গে তাঁদের কিছুটা তোল ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের খবরও কিছু-কিছু তাঁরা রাখতেন। জবাব তাঁরাই দিলেন। কিন্তু সংখ্যা আঁটে প্রশ্নকারীদের শুদ্ধ রাখতে পারলেন না। আমি বলাম—এটি ফার্মার্স ডেলিগেশন নয়। কাজেই কৃষি-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তি আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমাদের কাছে দু'তিন কপি ইণ্ডিয়া ইয়ার-বুক আছে। আপনারা যদি উলটান বরুপ এক কপি গ্রহণ করেন, তাহি থেকে ও' বিষয়ে তথ্য ও সংখ্যা আপনারা জানতে পারবেন। আলোচনা মিসিয়ার বলেন—এই মিনিটিতে এসে এই সব আলোচনা করতে হবে আপনারা চিন্তা করেন নি। কিন্তু ও-সব আমাদের আলোচনার অঙ্গ।

আলোচনা-আলোচনার শেষে মিসিয়ার আমাদের বাসে তুলে দিয়ে বলেন—কাল আপনাদের নতুন একটা ড্রামাহল দেখাবো।

—সেজন্যে বিব্রত হবেন না, আমি বলাম।

—কেন?

—আমাদের দেশের ড্রামাহলের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, তাঁর বদনীতে এই দেশেরই আমাদের বন্ধু ছিল। সামান্যক্ষণের জন্যেও দেখে এসেছি, আর গল্পটাও শুনে এসেছি।

লাঞ্চের টেবিলে মিসিয়ার বলেন—খাবার পর দু'ঘণ্টা ছুটী। তারপর আমরা নগর দেখতে বেরুবো, তারপর ডিনার, এখানে উলটেকি আমার সেকেণ্ড ডিনারের ওখানে নাটকের অভিনয়।

সন্ধ্যা হতে না হতেই একটা বড় পার্কে গিয়ে ঢুকলাম। তারই এক অংশে ওপন্ এয়ার থিয়েটার। মঞ্চ আর দর্শকাসন প্রকৃতির ওপর আচ্ছাদন আছে, কিন্তু দর্শকদের বসবার ব্যবস্থা অনাবৃত। বেশ মনে হোলো দাড়-আটশ আসন আছে।

নির্দিষ্ট সময়ে অভিনয় শুরু হোলো। খানিকটা দেখেই বলাম—চমৎকার

আমার আমারই পাশে বসে অভিনয় দেখছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী চমৎকার?

—ওখেলোর অভিনয়।

—ইটালিয়ান প্রাইম মিনিস্টার যে।

—আমাদের দেশে বিদেশ থেকে মাঝে-মাঝে ছোট বড় দল শেকস্‌পীয়রের অভিনয় করতে যান। তেমন দু'চারটি দলের অভিনীত ওথেলো নাটক আমি দেখেছি। কিন্তু কোন দলে এমন অভিনয়-কুশলী ওথেলো দেখিনি।

—ব্রিটেন থেকে আমাদের দেশে এসে যাঁরা ও'র অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাও খুব সুখ্যাতি করে গেছেন।

—করবারই কথা, আমি বলাম।

—ডেসডিমোনা, ইনিই? আমায় জিজ্ঞাসা করলেন।

—জানো, বেশ ভালো।

আমার তখন কথা কইতে ইচ্ছে করছে না। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, আমি মুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখছি। একটা অঙ্ক শেষ হবার মুখে ডেসডিমোনা যখন একটিই দিতে যাবেন, তখন হঠাৎ মঞ্চে পড়লেন। আমি আর্তের মতো হায়, হায়, করে উঠলাম।

আমার বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোলো?

—ক্ল্যাক্‌চার মা হোলেও গুরুতর স্প্রেন।

—কার?

—ডেসডিমোনার পায়ের।

—তুমি কি করে জানলে?

—জানিনি, বুঝিছি। নইলে ওরকম জোরে ও মঞ্চে পড়তো না। আমি যে অনেক দেখেছি।

অঙ্ক শেষে সেই যে পর্দা পড়েছিল, তা আর ওঠে না। দশ মিনিট বিশ মিনিট, পর্দা তবুও পড়ে রইলো। দর্শকরা আমাদের দেশের দর্শকদের মতোই হাত-তালি দিতে লাগলো, সিটি মারতে লাগলো। অবশেষে এক ব্যক্তি পর্দার সামে এসে বলেন—ডেসডিমোনার পায়ে গুরুতর চোট লেগেছে। তিনি দাঁড়াতে পারবেন না। অন্যদিন হলে অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া চোতো। কিন্তু আজ ভারতীয় অতিথিরা রয়েছেন। তাই আজ আমাদের পরিচালক বলং, বহুদিন পরে, সাজের অঙ্ক থেকে ডেসডিমোনার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন। হাত-তালির সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ রব উঠল, উল্লাসের।

আমায় বললেন—তোমাদের ভাগ্য ভালো খুব বড় একজন অভিনেত্রীর অভিনয় দেখবার সুযোগ পেলে। পরিচালিকাই আগে ডেসডিমোনার ভূমিকা অভিনয় করতেন। তখন বাস্তব জীবনে ওই ওথেলো ফ্রিমেসন্স-সেক্রেটারি স্ত্রী ছিলেন তিনি। তারপর মিউচুয়াল কনসেন্টে ও'দের সেপারেশন হয়। সেই থেকে স্ত্রী আর অভিনয় করেননা, পরিচালনার কাজ করেন। আজ তোমরাই আমায় ওঁদের একসঙ্গে অভিনয় করতে বাধ্য করালে। তুমি আট্যাকার, তুমি হয়ত দু'খানি নাটক দেখতে পাবে একটি অভিনয়ে।

—কিন্তু ওথেলো যদি সত্যি-সত্যিই ডেসডিমোনার গলা টিপে ধরে?

—ওঁদের পরস্পরের ব্যক্তিগত প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু শিল্পগত শ্রদ্ধা দিন দিন প্রগাঢ় হচ্ছে।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্যই বটে।

আশ্চর্য অভিনয়ও দেখলাম। পরিচালিকার বয়স একটু বেশি, ডেসডিমোনার তুলনায়, কিন্তু অভিনয়ের কী অসাধারণ শক্তি, আর শিল্প সৈকতে দুজনার কী প্রগাঢ় understanding! শেষ একটা লোকাতীত অভিনয় দেখলাম সেই রাতে, তাজমহলের সেই পার্কে, যেন আকাশের নিবিড়-নীল চন্দ্রাতপ তলে।

ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস দেখছ কি ? ফটো : সুধাংশু চক্রবর্তী

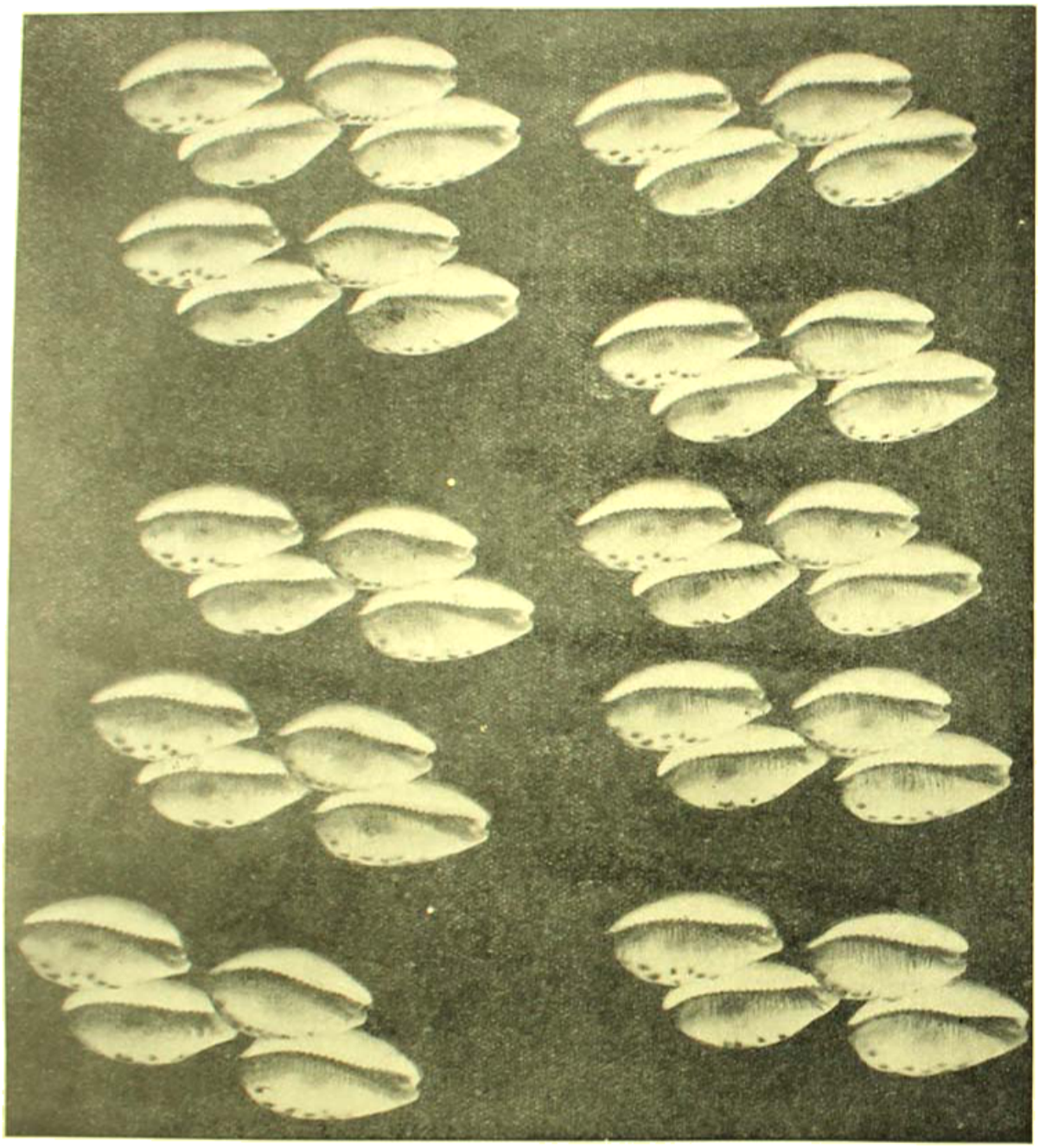

আচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ বিপাক্ষ বৈভব ফটো : অমল সেনগুপ্ত

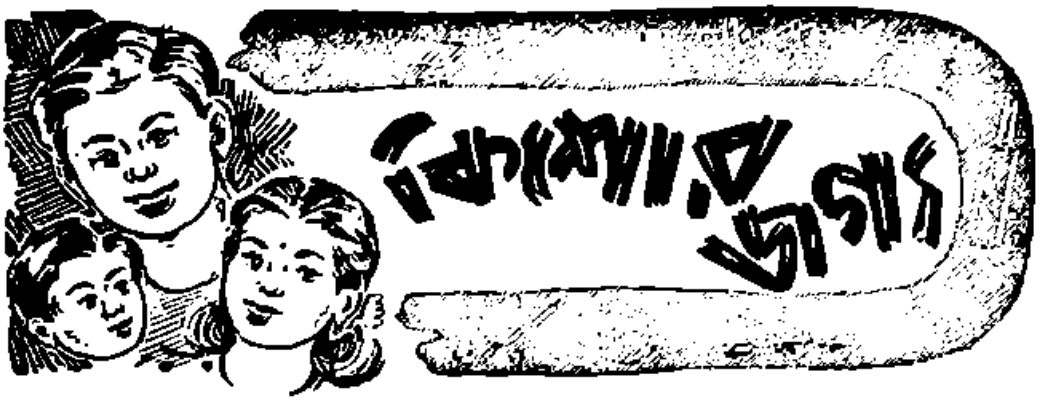

অভিজ্ঞতার কথা

উপানন্দ

অভিজ্ঞতাই জান। এবারে তোমাদের কাছে এবার অভিজ্ঞতার কথা বলছি।...

একটি ঘোড়াকে জোর করে মেরে মেরে টেনে হিচড়ে জলে নামাতে পারা যায় বটে,কিন্তু জল খাওয়াতে পারা যায় না। সে তার আপনার খেয়ালেই থাকবে। কেউ জোর করে কি কাউকে কিছু করাতে পারে? ভালবাসা নম্র ব্যবহার ও মিষ্ট কথার দ্বারা অনেক কাজ করানো যেতে পারে যে কোন মানুষকে দিয়ে, আর সে হাসি মুখেই তা করবে, বিরক্ত হবে না। অলস লোকেই হতভাগ্য হয়ে থাকে—ছেলেবেলা থেকে তোমরা যদি অলস হও, তাহলে পরিণামে বহু কষ্ট তোগ করতে হবে। যেসব লোক সর্বদাই বলে যে, এ জগতে আপনার বলতে তার কেউ নেই, তারা নিজেই নিজেকে বন্ধুহীন করে থাকে, তাতে অপরের দোষ নেই। নিজের ব্যবহারে আপনার পর, পর আপনার হয়। অন্যায়ভাবে প্রতিফল হচ্ছে শাস্তি, সংসারে তারও আবশ্যক আছে। যে প্রকৃত মানুষ, সে নতশিরে ছষ্টচিত্তেই শাস্তি গ্রহণ করে থাকে। যতজনই তোমরা অর্জন করো না কেন, যতক্ষণ সে জ্ঞান তোমাদের পারিপার্শ্বিক জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ সে জ্ঞানের কোন মূল্যই নেই। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন আর জীবনের উৎকর্ষ সাধন করাই সমস্ত জ্ঞানার্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু জ্ঞানার্জন সত্ত্বেও যদি মনুষ্যত্বের প্রকাশ না হয়, তা হোলে বরং মূর্খ হয়ে থাকা ভালো। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে যে অভ্রান্ত মনে করে, তার অধঃপতন নিশ্চয়ই ঘটে। ভুল বুঝেও কেন বলার রাখবার উদ্দেশ্যে তা প্রয়োগ করা চরিত্রের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। শারীরিক বা মানসিক হোক, আহারের পর তখনি পেটে কোন রকম পরিশ্রম করা উচিত নয়। অধ্যাপক পার্কার একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেছেন, ডাক্তারের ঔষধ অপেক্ষা প্রকৃতির ওপর বেশী নির্ভর করলে, মৃত্যু-সংখ্যা অনেক-খানি হ্রাস পেতে পারে। অধ্যাপক ব্রাকি বলেন, যে সব কাজ বাঁড়িয়ে কিংবা চলাফেরা করে সম্পন্ন করা যেতে পারে, তা কখনও বসে করা উচিত নয়। শরীরকে যতক্ষণ চালনার ওপর রাখাই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একটি প্রধান উপায়। তোমরা কখন কাউকে প্রহারিত করো না—এর পরিণতি হচ্ছে অধঃপতন। যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে প্রয়াসী হও, তাহোলে কখন সুযোগের অপেক্ষা করে বসে থাকবে না—সুযোগও করে নিতে হয়—আর এইরকমেই সুযোগ ও সিদ্ধিলাভ করতে হয়। প্রকৃত বন্ধু দিতে চায়, কখন নিতে চায় না। ধৈর্য নেতাজ সুখের প্রধান উপকরণ। টাকা আর সময় এই দুটীই মানুষের সমান মূল্যবান। যে লোক সময়ের অপব্যয়ী, সে টাকারও অপব্যয়ী। অন্যায় ঘুচাতে হোলে, আঘাত সহ্য করতে হবে, নিষ্ঠুরতা ছোড়তে হবে। পাশী ধরা পড়ে ফাঁসে না দিয়ে, আর মানুষ ধরা পড়ে কথা কয়ে। তোমরা সব বিষয় করতে পারো কিন্তু তোমাদেরশ্রিত হাসবড়া লোককে কখন সন্তুষ্ট করতে পারবে, এটা যেন কখন মনের কোণে ঠাঁই দিয়ে বিষাদ করো না। এইসব মানসিক রোগের কাছ থেকে সমস্ত নিরীহ ভদ্রলোক দূরে থাকতে চায়—কেন জানো? অপমানিত হোতে পার এই ভয়ে।

প্রতিদিন রাত্রি বারটা থেকে তোর পাঁচটা পর্যন্ত যদি ঘুমিয়ে হয়, তা হোলে শরীর মন দুয়ের পক্ষেই মঙ্গল। সেকালে ধর্ম ও পাপ-পুণ্যে যে একটা ভয় আর আস্থা ছিল, সেইটেই এখন এদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, আর লোকে স্বেচ্ছাচারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাই আজ দেশের দুর্গতি বেড়ে চলেছে। চার্লস্টি স্পেনসার বলেছেন—জীবনে সাফল্যের সিদ্ধিলাভ করতে হোলে ভালো জীব অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান শরীরের আবশ্যক। যেখানে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অভাব, সেখানে আলস্য ও অকর্মণ্যতারোগে পরিশক্তিত হয়। যে কাজ স্বীকার করবে, তা সুসম্পন্ন করবে। আত্মসুখ জীবন কেবল কাজের দ্বারাই অমরত্ব লাভ করে। প্রকৃত বীর সর্বদাই অমায়িক।

সবাই নেপোলিয়ন যে কেবলমাত্র বীরই ছিলেন, তা নয়, সবার সঙ্গে তাঁর চলনসইরকম পরিচয় পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন যখন অল্পবয়সেই একজন গোলন্দাজ সৈন্যের অফিসাররূপে কাজ করছিলেন, তখন জনৈক অস্ট্রিয়ান সেনানায়ক অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে কথাপ্রসঙ্গে একদিন তাঁকে বলেছিলেন—আমার বেতনভোগী কেবল সৌন্দর্যের জন্যেই যুদ্ধ করে—কিন্তু ফরাসীরা টাকার জন্যে যুদ্ধ করে মাত্র—এই কথায় নেপোলিয়নের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরিয়ে এলো। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'ঠিক, ঠিক, যাদের যা অভাব, তার জন্যে তারা যুদ্ধ করবে বৈকি, ব্রাণ্ডের তো আর সৌন্দর্যের অভাব নেই—' এই কথা শুনে অস্ট্রিয়ান সেনানায়ক নির্বাক হয়ে রইলেন।

নাম কিনবার জন্যে কাজ করার চেয়ে লোকের বিশ্বাসী হয়ে থাকাই ভালো। মনের অন্ধকারের চেয়ে গাঢ় অন্ধকার আর কোথাও নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ভীরু ধর্ম নয়, ভীরু সেবাই পরম ধর্ম" যারসম্বন্ধে ভীরু মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কেননা ভয়ে তখন তার কেশাকর্ষণ করে টানে। যখন সে ভয়মুখে পতিত হয়, তখন কয়েকের জন্য চৈতন্য হোলেও আর ফিরবার আশা থাকে না। অন্যায়ের প্রকৃত প্রতিরোধ হচ্ছে ভালোবাসা। শত্রুকে ভালোবাসা দিয়ে যে জিত করে নিতে পারে, সেই হচ্ছে প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত বীর। নিজের সুখের জন্যে অপরকে প্রতারণা করা মহাপাপ।

স্যার ওয়াল্টার স্কট্‌ খুব লোক চরিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, —'ছেলেবেলায় অ্যালিফান্ট কাজের সময় কাজই করবে, খেলার সময় কেবল খেলবে, এই উপদেশই ঠিক। ছেলেবেলা থেকে এই উপদেশ অনুসরণ করে জীবনে কৃতিত্বলাভ করতে পেরেছি—' শৈশবের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি দূর করাই প্রত্যেক পরোপকারিতাপ্রিয় ব্যক্তির লক্ষ্য।

অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজের পরিচয় না ঘটলে জীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। খাদ্য, চরিত্র ও আত্মসম্মানের ভিত্তি পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত স্থান অধিকার করা যায় না। সঙ্গী নির্বাচনে গুরুজনদের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। মানুষ যাতে ভগবানের দিকে উঠে আসতে পারে, সেইজন্যে ভগবান মানুষের রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে আসেন। লক্ষ্যহীন জীবন স্রোতে চালিত তৃণের মত। আদর্শ ভিন্ন জীবনে সুখ ও উন্নতি অসম্ভব। কর্তব্য-জ্ঞানের সঙ্গে সংবাহন বা চরিত্রবল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে বিষয়ের চিন্তা করা যায়, সেই বিষয়েরই স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে। যার যা প্রাপ্য, তাকে তা-ই দেওয়াই হচ্ছে ন্যায়পরতা। ন্যায়পরতাই সমাজ রক্ষার মূল। কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার গ্লানি করা বা তার কলঙ্ক রটনা করাকে পরনিন্দা বলে। পরনিন্দা মহাপাপ। পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি স্বার্থপর, নীচাশয় ও কাপুরুষ। বিজ্ঞান দিন দিন অনেক অভিনব তত্ত্ব আমাদের জ্ঞান-গোচর করছে—সেই সব তত্ত্ব না জানলে অনেক সময়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

একটিমাত্র দীপ থেকে যেমন হাজার দীপ জ্বেলে অন্ধকার স্থানের অন্ধকার দূর করা যায়, তেমনি একটিমাত্র সাধু ব্যক্তির সংস্রবে এসে তাঁর সুবিমল চরিত্রের স্পর্শ দ্বারা চারার ব্যক্তির চরিত্র নির্মল হোতে পারে। যেমন ঘুম ভিন্ন থেকেই দিয়ে নিদ্রিত সিংহের ঘুম প্রাণ বিসর্জন করে না, তেমনি নিষ্কলুষ পুরুষ সংসারে কোন কাজই করে উঠতে পারে না। মনের বিশ্বাসমত কাজ করাকে সরলতা বলে। যার ভেতরে সরলতা আছে, তার পক্ষে ভগবানের কৃপালাভ খুব সহজ। গুরুর চরণের সরলতা গুণের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছিলেন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরা কখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন না। প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক; মহাত্মা শিবিরাজ একটি সামান্য কপোতের প্রাণরক্ষার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যে হাসিমুখে নিজের দেহ-মাংস দান করেছিলেন।

অতীতই বর্তমানকে গড়ে তোলে। জীবনের প্রত্যেক স্তরে রয়েছে অতীতের গোপন ক্রিয়ার পরিচয়—যার অনুভব করা যায় তার মৌন শাসন ও নিবিড় স্নেহ। যাদের অতীত অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে, তাদের বর্তমানের উন্নতির দ্বারও রুদ্ধ। জনসমাজের শ্রদ্ধা প্রীতিলাভ করতে হোলে, মহৎকর্ম করা আবশ্যক। সংসার-সাগরে চলেছে সুখ তরঙ্গ খেলা, তার মাঝে জেগে চলেছে মানুষের হাহাকার জ্বালা। মহত্ত্ব-হীনতা ব্যতীত জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়া যায় না।

লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্যে যার মন নেই, আছে কেবল মতলব, তার ছাত্রের দিনগুলি নিশ্চয়ই আসবে—সেদিন অনুতাপ করেও কোন ফল হবে না। বাক্তিগত চিন্তা-স্রোতের স্বাধীনপ্রবাহ অব্যাহত ভাবে যেখানে চলতে থাকে, সেখানেই সামাজিক ঐক্য, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় ও শিথিল হয়ে দুর্ভাবনা আনতে পারে। যে কাজ করে, ভুল করার সম্ভাবনা তার চিরদিনই থাকে, তা বলে কাজ না করে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। মানুষের মনে যা ধরে থাকে, কাজে তাই ফুট হয়ে বেরিয়ে আসে। জগতে কিছুই চিরকালের মত হয়ে যায় না; অর্থাৎ কোন কিছুরই সমাপ্তি রেখা দেখা যায় না। সোজা কথাকে সোজা করে বলতে চেষ্টা করা উচিত, কেননা বাক্যের বুহত্তের করে যেটুকু পাওয়া যায়, তা আর সব সময়ে সারগর্ভ হয়ে ওঠে না, ভাব-বৈগুণ্য লক্ষ্য করে ভ্রূকুঞ্চিত করতে হয়। কথায় শুধু কথা বাড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে তার মূল্যও চড়ে যায়, ফলে দু'পক্ষে চড়া সুরে কড়া কথা বলতে সুরু করলে কলহ বিবাদ, শেষ পর্যন্ত বিবাদ ঘটে। এক্ষেত্রে নম্রভাবে কথা বলাই শোভন, তাতে মান ছাড়া ক্ষতি হয় না। তোমরা এইসব অভিজ্ঞতার কথা ভেবে দেখে অনুসরণ করবার চেষ্টা করো, তাতে ফল ভালোই হবে।

ছবির ঘোড়া

(জাপানী উপকথা)

গোপাল দাস

অনেকদিন আগেকার কথা। জাপানে বাস করতেন এক বিখ্যাত চিত্রকর। লতা-পাতা-ফুল আর পশু-পাখী-মানুষের ছবি আঁকতেন তিনি। যা কিছুর ছবি আঁকতেন তাই হয়ে উঠত একেবারে জীবন্ত সত্যিকারের জিনিস। তিনি ছিলেন জাপানের সেরা আঁকিয়ে। তাঁর তুলির রঙে ছিল যাদু।

তাঁর ঘরের দরজা ছিল কাগজ দিয়ে তৈরী। সেই কাগজের ওপর চিত্রকর আঁকলেন একটা ঘোড়ার ছবি। ঘরের ভেতর দিয়ে দরজার গায়ে রইল ছবিটা।

ঘোড়ার ছবিটা হয়েছিল একেবারে নিখুঁত। যে দেখত সেই প্রশংসা করত। হঠাৎ দেখলে মনে হ'ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সত্যিকারের ঘোড়া। বহু লোক আসত এই অদ্ভুত ঘোড়াটাকে দেখতে। তারা বলাবলি করত, আঁকা হলেও এটি একটি সত্যিকারের ঘোড়া। আসল ঘোড়া থেকে তফাৎ নেই কিছু।

একদিন পাশের গাঁ থেকে ঘোড়াটাকে দেখতে এল এক বুড়ী। বেশ একটা জোয়ান ঘোড়ার ছবি দেখে ভারী খুশী হল সে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বুড়ী দেখল এক অবাক কাণ্ড। বার বার একটা মাছি উড়ে এসে বসছিল ঘোড়াটার পিঠের ওপর। বুড়ীর চোখের সামনেই ঘোড়াটা লেজ নেড়ে তাড়াল মাছিটাকে।

—এযে দেখছি একেবারে জল-জ্যান্ত ঘোড়া, মনে মনে বললে বুড়ী। এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মতো। যেন কেউ সহজে বুঝতে না পারে।

একদিন ঘোড়াটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটি ছোট ছেলে—ওমা, ওমা ঘোড়াটা কি রকম পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে!

ঘোড়াটাকে পিটপিট করে তাকাতে দেখেছে আরও অনেকে। কান নাড়াতেও দেখেছে কেউ কেউ।

ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শোনে সকলের কথা। বলে না কিছুই। অনেক দিন ধরেই এক ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল টগবগ্ করে ছুটে যায় রাস্তা দিয়ে।

একদিন নিশ্চয়ই বাইরে বেরুবে সে। তবে হ্যাঁ, ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে তাকে। মাত্র দুটোদিন। তারপরই আসবে পূর্ণিমার রাত্রি। ধবধবে জোছনায় ডুবে যাবে পথঘাট। তখন পথ দিয়ে চলতে কিছুই অসুবিধে হবে না তার।

দুই

আকাশে ভাসছে পূর্ণিমার চাঁদ। যেন ঝকঝক করছে একখানা রূপোর থালা। জোছনার ঠাণ্ডা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। লোকজনের সাড়া মিলছে না কোথাও। বেশ রাত হয়েছে তখন। চিত্রকরও পড়েছে ঘুমিয়ে। ঘোড়াটি দেখলে এই তার সুযোগ।

দরজার গা থেকে আস্তে আস্তে উঠে এল ছবির ঘোড়া। তার শরীরটা তো পুরু নয় মোটেই। কাগজের মতোই পাতলা তার দেহ। জানলার সরু ফাঁক দিয়ে কাত হয়ে সে অনায়াসে চলে এল বাইরে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল একবার। না: কেউই দেখছে না তাকে। উঠোন পার হয়ে সে বেরিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়। মাথাটা উঁচু করে লেজ তুলে কদম্ কদম্ শুরু করল চলতে।

চওড়া রাস্তাটা বরাবর চলে গেছে অনেক দূর। কিছু দূর গিয়েই সে ছুটতে আরম্ভ করলে টগবগ টগবগ। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ল এক জায়গায়। সামনেই সে দেখতে পেল একটা গাজরের ক্ষেত।

ক্ষেতে নেমে পড়ে শুরু করলে গাজর খেতে। অনেক দিন হল তার কোন খাওয়া জোটেনি। তার ওপর এমন তাজা পুষ্ট গাজর। মনের আনন্দেই খেয়ে চলেছে সে। হঠাৎ কে যেন উঠল চেঁচিয়ে। মাথা তুলে দেখে লাঠি হাতে এক বুড়ী আসছে তাড়া করে। বেগতিক বুঝে সেও দিলে ভোঁ দৌড়।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে পৌঁছল চিত্রকরের বাড়ী। গাজর খেয়ে একটু ফুলে উঠেছে তার পেটটা। কোন

রকমে জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। তারপর ঠিক আগের মতোই দরজার কাগজের সঙ্গে রইল লেপ্টে।

গাজর-চোরকে ঠিক চিনতে পারলো বুড়ী। এ হচ্ছে সেই চিত্রকরের বাড়ীর ঘোড়া। একেই সে দেখেছিল লেজ নেড়ে মাছি তাড়াতে।

সকাল হতেই বুড়ী দৌড়ে এল চিত্রকরের কাছে। তার ঘোড়ার নামে করল নালিশ, কাল রাতে আমার গাজর খেয়ে নষ্ট করেছে আপনার ঘোড়া!

—আপনি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন, বললেন চিত্রকর। অন্য কারুর ঘোড়া হবে সেটা। দেখুন না দরজার গায়ে কি রকম সেঁটে রয়েছে আমার ঘোড়া। বাইরে যাওয়া দূরে থাক, ও নড়া-চড়া পর্যন্ত করতে পারে না একটু।

—বাজে কথা কেন বলছেন মিছিমিছি? ঝাঁজের সঙ্গে বললে বুড়ী। আপনার ঘোড়াকে লেজ নেড়ে মাছি তাড়াতে তো সেদিন দেখে গেলুম নিজের চোখে! আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার কখনও গাজর খেতে গেলে একেবারে বেঁধে আটকে রাখব আপনার ঘোড়া। বলেই বুড়ী হন্ হন্ করে চলে গেল সেখান থেকে।

তিন

পরের দিন রাতেও তেমনি আকাশ ভর্তি জোছনা। ছবির ঘোড়ার ইচ্ছে হল আজও বেরিয়ে পড়ে বাইরে। বুড়ীর শাসানি মনে পড়তেই চুপ হয়ে যায়। কিন্তু গাজরের কথাও ভুলতে পারে না সে। গাজর খেয়ে খুবই লোভ হয়েছে তার। ভাবলে খুব চুপি চুপি গিয়ে খেয়ে আসবে কয়েকটা গাজর। বুড়ী টের পাবে না মোটেই।

সেদিনকার মতোই জানলা দিয়ে গ'লে বেরিয়ে এল ছবির ঘোড়া। তারপর চেনাপথ ধ'রে হাজির হল এসে গাজরের ক্ষেতে। যেমনি সে একটা গাজরে মুখ দিয়েছে অমনি 'ধর ধর' করতে করতে ছুটে এল বুড়ী আর তার এক ছোকরা চাকর। দুজনেরই হাতে বাঁশের লম্বা লাঠি।

চিত্রকরের ঘোড়াও ভয় পেয়ে লাগাল চোঁ চোঁ দৌড়। বুড়ী আর চাকর নাগাল পেল না তার। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে পৌঁছুল চিত্রকরের বাড়ী। তাড়াতাড়ি জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। মুখে ছিল তার একটা গাজর। তাড়াহুড়োতে সেটাকে ফেলে দিতে ও গেল ভুলে। গাজরটা কিন্তু আটকে গেল জানলার ফাঁকে—সেটা ছিঁড়ে পড়ে রইল বাইরে।

চটপট সে গিয়ে ঢুকল ছবির ভেতর। মুখে যে গাজরের এক টুকরো সবুজ পাতা আটকে রইল সেদিকেও খেয়াল নেই তার।

চার

পরদিন খুব ভোরেই বুড়ী এল চিত্রকরের বাড়ী। সঙ্গে তার অনেক লোক। চিত্রকরের ঘরের সামনেই একটা গাজর পড়ে থাকতে দেখল বুড়ী।

বাড়ীতে লোকজনের হৈ চৈ। চিত্রকরের গেল ঘুম ভেঙে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—কোথায় আপনার ঘোড়া। চেঁচিয়ে বললে বুড়ী। আমরা দেখব তাকে। কাল রাতেও সে আমার গাজর খেয়ে এসেছে পালিয়ে। আপনার ঘরের দোর গোড়ায় পাওয়া গেছে এটা। গাজরটা তুলে দেখাল বুড়ী।

হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে ঢুকল চিত্রকরের ঘরের ভেতর। নেহাত ভাল মানুষের মতোই চুপটি করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ছবির ঘোড়া।

— দেখুন, দেখুন এখনও ও'র মুখে লেগে রয়েছে এক টুকরো গাজরের পাতা। বুড়ীর চোখেই সেটা ধরা পড়ল সকলের আগে।

সবাই অবাক হয়ে দেখল—সত্যিই ছবির গায়ে লেগে রয়েছে গাজরের এক টুকরো সবুজ পাতা।

সেই ছোট ছেলেটিও ছিল ভীড়ের মধ্যে। হাত নেড়ে বললে চিত্রকরকে—সত্যিই ভয়ানক দুষ্টু আপনার এই ঘোড়াটা। সেদিন কি রকম পিটপিট করে তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

সকলেই কিছু না কিছু বললে ঘোড়াটার নামে। গোলমালে সব শোনা গেল না।

চিত্রকর বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন দোষ করেছে তার ঘোড়া। তা নইলে এত লোক কেন নালিশ করবে ও'র নামে। বুড়ীকেই বললেন তিনি, আচ্ছা, আপনিই বলুন ওকে নিয়ে এখন কি করতে পারি আমি।

—কেন ওকে ছেড়ে রেখেছেন আপনি? উত্তর

করলে বুড়ী! একটা খোঁটার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখুন না কেন ওকে!

—ঠিক বলেছেন আপনি, বলেই চিত্রকর নিয়ে এলেন রঙ আর তুলি। ছবিটির এক জায়গায় প্রথমে একটা খোঁটা আঁকলেন। তারপর দড়ি এঁকে তার সঙ্গে বেঁধে দিলেন ঘোড়াটাকে।

এরপর আর কোনও দিন চিত্রকরের ঘোড়াটাকে বাইরে বেরুতে দেখেনি কেউ।

আজকে প্রাতে

রমেশ মজুমদার

পুব্ গগনে নীল ছড়ালো দিল্ ভরালো,
হিম বাতাসে কাঁপন আসে নিদ্ হারালো,
ঐ কুয়াশা বাঁধ্ছে বাসা,
খিল্‌খিলিয়ে তাদের হাসা ;
ঐ ডালিয়া লক্ষ গাছে,
হাস্‌ছে আরো ডাক্‌ছে কাছে,
মনের বনে আজকে প্রাতে রঙ্ ধরালো,
দেখ্‌রে ভোরা কুঞ্জে কেগো রূপ ছড়ালো।

পুরাণো দিনের স্মৃতি

শ্রীহরিপদ গুহ

আজ তোমাদের কাছে অনেকদিনের একটা স্মৃতি বলছি। আমার বয়স তখন প্রায় তোমাদেরই মতো। আমি তখন বিক্রমপুরে থাকি।

ভাদ্রমাস, ভরা বর্ষা। চারদিক জলে থই থই করছে। এমন কি এ'বাড়ী থেকে ও' বাড়ীতে যেতে হলেও নৌকো ছাড়া গতি নেই। তোমরা, যারা সহরে থাকো, পূর্ব্বঙ্গের বর্ষাকাল সম্বন্ধে হয়তো কল্পনাই করতে পারবে না। প্রত্যেক গৃহস্থেরই একখানা করে নৌকো থাকে। নৌকো না থাকলে তাদের চলে না। হাট, বাজার, স্কুল, পোষ্টঅফিসে যেতে নৌকো ছাড়া গতি নেই।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। আমি আমার ছোট্ট বয়পানিতে ব'সে রবীন্দ্রনাথের দোনার তরী আবৃত্তি করছিলুম—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা,
কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরসা।

* * *

একখানি ছোট ক্ষেত—আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।

ঠিক এমনি সময় কানাই, যতীশ, ভবতোষ, অমিয় ও শিবু ঘরে ঢুকে সমস্বরে চীৎকার করে বলল—একা কেন হে! এই তো আমরা এসেছি! সকলে খুব হেসে উঠ্‌লুম। হাসি থামলে কানাই বলল—অনেক কথা আছে, নৌকোয় আয়। মাউটা গায়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে নৌকোয় গিয়ে বসলুম। তারা নৌকো ভাসিয়ে দিলে। পাঁচখানা বৈঠার টানে নৌকাখানি তীরবেগে ছুটে চল্‌ল।

গ্রামের প্রান্তভাগে শ্মশান। চারদিক জলে ডুবে গেছে, শুধু খানিকটা স্থান দ্বীপের মত মাথা উঁচু করে আছে। এখান থেকে লোকালয় অনেক দূরে। তারা নৌকোখানি এখানে এনে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধল। বর্ষাকালে এখানটাই ছিল আমাদের আড্ডা। এমন নির্জ্জন স্থানে সকলেই প্রাণ খুলে গল্প করতে পারতুম। গুপ্ত পরামর্শ ও গুপ্ত আলোচনা এখানে বসেই করা হতো। তাইতো আমার বুঝতে দেরী হলো না যে, আজ কোন গোপন পরামর্শ হবে।

কানাই আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—আজ যে 'নষ্টচন্দ্র' সে হুঁস আছে?

আমি বল্‌লুম—ষোটেই না, কে আর পাঁজি দেখতে বসে বল। তবে তারা আছে, খবর তোমরা নেবেই।

কানাই বল্‌ল—তা' হ'লে শোনো, আজ প্রস্তুত থেকো, রাত্রে তোমায় নিয়ে আসব। এদিককার যোগাড় আমরা সব করে রেখেছি। তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে নানাপ্রকারে পরামর্শ চলতে লাগল।

অমিয় বল্‌ল—চণ্ডীবোসের গাছে অনেক পেয়ারা হয়েছে, তারক সাহার বাড়ীতে নারকেল গাছে বড় বড় ডাব হয়েছে।

ভবতোষ বল্‌ল—হারাণ মণ্ডলের বাড়ী মোটা মোটা আম্ আছে। যতীশ বল্‌ল—বিষ্টু সমদ্দারের বাড়ীর চাউনি কলায় পাক ধরেছে। আর কোথায় কি উপাদেয় দ্রব্য আছে তার খবর নিয়ে কানাই একটা 'চার্ট' প্রস্তুত করে ফেল্‌ল। কোন্ বাড়ীতে কে কখন সজাগ থাকে, কোথা দিয়ে নৌকো ভিড়াতে হবে, কে কে কোন্ গাছে উঠ্‌বে, তাও তখনই স্থির হয়ে গেল।

তখন দিনমণি পাটে বসেছে। সমস্ত আকাশে ও গাছের মাথায় তার স্বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। কানাই ধীরে ধীরে নৌকো ভাসিয়ে দিল। ভবতোষ স্ফূর্ত্তিভরে গেয়ে উঠ্‌ল—

সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা,
ওগো, হরষে মেঘে হলো, মাঝি বেলা।'

আর সকলে হৈহৈ বাধিয়ে হাসি দিতে দিতে নৌকা ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে বেয়ে চলল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি রাত্রের খাবার খেয়ে তৈরী হয়ে রইলুম। বাড়ীতে যেন কেউ কোন সন্দেহ করতে না পারে তাই ছোট্ট বোনকে পড়া আরম্ভ করে দিলুম। পাড়াপাঁর এরিমধ্যেই সকলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। রাত আটটার সময়ই কোন কোন বাড়ীতে গভীর রাত্রি বলে মনে হয়। অবশ্য কোন কোন বাড়ীতে যখন হরি সংকীর্তন হয়, তখন এর ব্যতিক্রমও হয়।

সহসা আমার ঘরের দরজায় ঘোটা দুই টোকা পড়ল। আমি ঝড়ি সমেত নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলুম। কানাই নৌকো ভাসিয়ে দিল।

নৌকায় সাতজন লোক আছে। আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। খানেকের কাটারি, দু'খানা রামদা, ক'গাছা মোটা মোটা বাঁশের লাঠি ও কিছু শক্ত দড়ি। চুরি বিদ্যায় এই প্রথম হাতে-খড়ি। কানাইরা এ' বিষয়ে খুবই দক্ষ। প্রতি বছরই নবান্নের সময় তারা বৈল-অভিযানে বেরিয়ে থাকে। তাদের সাহসও খুব বেশী। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেও আমার বুকের ভেতরটায় কিন্তু দুরু দুরু করে উঠেছিল। আমরা সকলেই হাফপেণ্ট পরে এসেছিলুম। ভাল করে পড়ছে তুলে পেড়ি, বিকাশ বেলা-কানাই অনেকগুলো ঘুনো-কয়লা সংগ্রহ করে রেখেছিল। সেগুলো দেখতে অনেকটা কয়লেরই মতো কিন্তু নীরেট। মনে হয় যেন কাঠের বল। আমরা সকলে মেতুনি ছুঁড়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর চালে ফেলতে লাগলুম। বাড়ীগুলির অধিকাংশেরই টিনের চাল, কাজেই দুমদাম করে শব্দ হতে লাগল। অনেকে নানাপ্রকার গালাগালও ঝোপা ঝোপা বাঁশ নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু ভয়ে কেউ ঘরের বার হলো না।

আমরা বেগে নৌকো ভাসিয়ে চললুম। দুমদুম গালি-গালাজ শ্রবণেও আমাদের প্রাণে কত আনন্দ! বিগুণ উৎসাহে আবার অন্য বাড়ীতে ঘোটা ছুঁড়তে লাগলুম। প্রাচীনদের মুখে শুনেছি যে, সেদিন নাকি পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরির অপরাধে পাপ তো হয়ই না, অধিকন্তু পুণ্যের ঝোলা নাকি বেড়ে যায়। বিনা খরচায় পুণ্য-সঞ্চয়ের এতবড় সুযোগ কিছুতেই ছাড়া যায় না—তাই এই বৈল-অভিযান। আর লোকের গালাগালিতে নাকি পরমায়ু বাড়ে। সেদিক দিয়েও মনে বেশ একটু সান্ত্বনা পেয়েছিলুম।

কানাই বলল—আর একটু গভীর রাত না হলে কোন সুবিধা হবে না, এরমধ্যে অনেকে সজাগ হয়েছে, চল, শ্মশানে গিয়ে বসা যাক্।

ভবতোষ আপত্তি করে বলল—না, আমি চুপ করে বসে থাকতে রাজী নই। চল, গাবকতক আক্ নিয়ে আসি, তারপর যতক্ষণ খুসী বসে থাকো, আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

এ' প্রস্তাব কেউ অবহেলা করতে পারল না। তীর বেগে নৌকা ধারাণ মণ্ডলের বাড়ীর ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। ভবতোষ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, কাটারি হাতে নিয়ে টপ করে নেমে পড়ল; অমিয় তাকে অনুসরণ করল। এক হাতে আকের পাতাগুলি ধরে অপর হাতে কেমন কিপ্রগতিতে ভবতোষ ইক্ষু বংশ খণ্ডে কর্তন তা দেখলে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। অমিয় তাড়াতাড়ি আকের খণ্ডগুলি নৌকায় এনে তুলল, আমরা নৌকো ভাসিয়ে দিলুম। শ্মশানে গিয়ে এসে সকলে ভবতোষকে খুব বাহবা দিলুম। তারপর প্রত্যেকে এক এক খণ্ড ইক্ষু খণ্ড নিয়ে তার সদ্ব্যবহারে লেগে গেলুম। পূর্বে আমরা পয়সা খরচ করে অনেক আক্ খেয়েছি, কিন্তু সত্যি তার রস এত মধুর লাগেনি। 'না জানি কতেক মধু এই আকে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।'

ঘণ্টাখানেক পর আবার প্রস্তুত হওয়া গেল। এবার কালাইয়ের পালা। আয়োজনের বড় কিছু আশা ভরসা সবই তার উপর। কারণ, সে সর্ব বিষয়েই অগ্রণী এবং সুদক্ষ। আমাদের দলে তার মত ডাকসাইটে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না।

আমাদের নৌকাখানি ধীরে ধীরে তারক সা'র বাগানের পেছনে লাগানো হোল। কানাই, বিমু আর আমি ঝড়ি ও কাটারি নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটা ঝিঁ ঝিঁ অনবরত একঘেয়ে ডেকে চলেছে। একটা আম গাছের কাছে এসে কানাই হঠাৎ চমকে দাঁড়াল, আমরা একটা খস্ খস শব্দ শুনতে পেলুম। কানাই চাপা কণ্ঠে বলল—একটু দাঁড়া, আগে ওটা চলে যাক্!

আমি বললুম—কি?

সে অস্বস্তির কণ্ঠে বলল—জাত সাপ।

আতঙ্কে আমার বুকের ভেতর দুরুদুরু কম্প আরম্ভ হলো। একটু পরে কানাই বলল—আয়, আর ভয় নেই, বেটা চলে গেছে। তারপর সে নারকেল গাছের দিকে অগ্রসর হল। আমি ও বিমু তাকে অনুসরণ করলুম। তখনও আমার বুকের কাঁপুনিটা কমেনি।

ঝড়ি ও কাটারিখানা নিয়ে কানাই সড় সড় করে গাছে উঠে পড়ল। একটু পরেই ঠক্ ঠক্ করে কয়েকটা শব্দ হলো, তার পরেই নারকেলের একটা কাঁদি নীচে নেমে এলো। বিমু তাড়াতাড়ি ঝড়ির বাঁধন খুলে কাঁদিটা তুলে নিলে, কানাই ঝড়িটা টেনে নিল। একটু পরেই আবার আর এক কাঁদি নেমে এলো, আমি সেটা খুলে নিলুম। এ'ভাবে সে গাছের সবগুলি নারিকেল শেষ করে কানাই নেমে এসে আর একটা গাছে উঠল।

সেই সময় চৌকিদার পাহারায় বেরিয়েছিল। পুকুরের ঘাটখানে এসে সে 'জাগো, জাগো, বলে কয়েকবার চীৎকার করল। তার সেই ত্রাসবিজড়িত কণ্ঠস্বরে অনেক গৃহস্থেরই নিদ্রাভঙ্গ হলো। কাজেই আমরা যেন একটু অসুবিধায় পড়লুম।

কানাই মাহোড়বান্দা; বলল—এই গাছটা শেষ না করে যাবুম না।

কাটারি দিয়ে কয়েকটা ঘা দিতেই কে একজন বলে উঠল—বাবা, বাবা চোর এসেছে। পর মুহূর্তেই কর্কশ কণ্ঠে কে চীৎকার করে উঠল—কে রে ওখানে?

শিবু ছুটে গিয়ে চুপি চুপি তাদের ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে মোটা গলায় বলল—চোমার বাপ।

কানাই এবার একটা বড় কাঁদি কেটেছিল; ঝুলিয়ে নেবার সময় মাঝ-পথে হঠাৎ—দড়িটা ছিঁড়ে যাওয়ায় নারকেলগুলো সব পড়ে গেল একটা ভয়ানক শব্দ হলো। ঘরের মধ্যে বন্ধ লোকটি তখন 'চোর, চোর' বলে চেঁচাতে লাগল এবং আলো নিয়ে বাইরে আসবার জন্ম বৃথা চেষ্টা করতে লাগল।

ততক্ষণে আমরা নারকেলগুলো সব নৌকায় তুলে ফেলেছি। কানাই নৌকোর উঠে কয়েকটা পোটা দকোয়ে তার ঘরের চালে নিক্ষেপ করল। লোকটা অশ্লীল ভাষায় আমাদের উদ্দেশে গালি দিতে লাগল।

আমরা বেগে নৌকো চালিয়ে দিলুম এবং শ্মশানে পৌঁছে মনের সঙ্গে ডাব খেতে সুরু করে দিলুম।

কানাই বলল—ওহে, ছোবড়াগুলো ফেলো না, বেটার ঘরের সামনে সব রেখে দিতে হবে: ভবতোষ বললে—নিশ্চয়। বেটা শয়তান, চাইলে একটা ডাব দেয়নি, এবার বুঝুক ঠেলা। দেখতে দেখতে অত-গুলো ডাব যে কেমন করে শেষ হয়ে গেল, ভাবলে সত্যি আশ্চর্য্য লাগে।

যতীশকে বলা হলো—ওহে, তুমি এবার চাটির কলার ছড়াটা নিয়ে এসো। গাছ পাকা কলা খাওয়ার লোভ সামলানো যায় না। শিবু বলল—অগ্নিকে দিয়ে শশাগুলোও আনতে হবে, কিছু বাদ দিলে চলবে না।

আবার বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় তারক সা'র বাড়ীতে ছোবড়া গুলো ফেলে দিয়ে গেলুম।

বিনু সমাদ্দার লোকটা কৃপণ। তার কাছে কেউ কিছু চেয়ে কোন দিনও পায়নি। বেটাকে এবার খুব জব্দ করা যাবে।

যতীশ ধীরে ধীরে নেমে কলার কাঁদিটা কেটে নিয়ে এলো। কাটবার সময় যে সামান্য একটু শব্দ হলো, তা শুনেই বিনু সমাদ্দার ঘর থেকে চীৎকার করে উঠল—কে রে? সঙ্গে সঙ্গে কপাট খোলার শব্দ হলো।

আমরা তাড়াতাড়ি নৌকো ভাসিয়ে দিলুম। ভবতোষ তার ঘরের চালে কয়েকটা পোটা নিক্ষেপ করল।

আমরা চণ্ডীঘোষের ঘাটে এসে নৌকো লাগালুম। অগ্নি গিয়ে এক কুড়ি শশা নিয়ে এলো। আমরা আবার সেই শ্মশানে ফিরে এলুম।

সকলে এক একটা কলা নিয়ে কামড় দিতে লাগলুম। তারপরই মুখ বিকৃত করে সেগুলো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। কলা মোটেই পাক ধরেনি, তখনো কস রয়েছে। যতীশ সকলের কাছ থেকেই মুখ বিচুনী খেয়ে আম্তা আম্তা করতে লাগল। বেচারার আর দোষ কি?

যাক্ গে হোক্, শশা খেয়ে মুখটা আবার বদ্‌লে নেওয়ার জন্ম সকলে এক একটা শশা তুলে নিলুম।

সহসা কানাই বলে উঠল—ঐগুলি বৈঠা নয়, ওই বেগ সমাদ্দার এইদিকে আসছে।

চেয়ে দেখলুম—তিন চারজন লোক নিয়ে সমাদ্দার এদিকেই বেগে নৌকো চালিয়ে আসছে। হাতের শশা ফেলে রেখে আমরা প্রাণপণে বৈঠা বাইতে লাগলুম। কানাই মাঝে মাঝে বলতে লাগল—ভয় নেই, জোরসে টান?

সহসা কানে এলো—মর বেটারা! আর ফিরতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিকট হাসি!

এতক্ষণ আমরা শুধু নৌকোই বেয়েছি, কোথায়, কোনদিকে যে চলেছি, কিছুই ভাবিনি, এবার ভাববার অবসর পেলুম। কোথা জলের সীমা? চারদিক ধূ ধূ করছিল। জল, শুধু জল। উন্মাদিনী পদ্মা তাণ্ডব নৃত্যে নেচে চলেছে। তীব্র জল-কল্লোলের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ কানে তালা লাগাচ্ছিল।

কানাই বলে উঠল—আর ভয় নেই, বেটারা ফিরে যাচ্ছে।

ভয়লাই বা কি যে আছে, আমরা কিন্তু তা বুঝে উঠতে পারলুম না। বড় নৌকা নিয়েও লোকে এ সময়ে পদ্মায় আসতে সাহস করে না, আর আমাদের তো একখানা ছোট ডিঙ্গি! বড় বড় ঢেউ এসে সজোরে নৌকোর আছড়ে পড়তে লাগলো। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল—বুঝি আর রক্ষা নেই!

কানাই অকম্পিত কণ্ঠে বলল—তোমা বেশ নড়াচড়া করিস্ নি, স্থির হয়ে বসে থাক। আমি একাই চালাচ্ছি। তারপর ভবতোষকে লক্ষ্য করে বললে—তুই বাটি ভরে আস্তে আস্তে নৌকোর জল ফেলে দে। ভয়ে সকলের মুখই একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল; আমার তো মনে হচ্ছিল—ভবলেলা বুঝি আজই শেষ হয়ে যায়; চুক্তির শাস্তি বুঝি হাতে হাতেই ফলে!

কানাই বলল—হয়েছে কি? অত ভয় কিসের? এ'রকম করলে, নৌকো এখনই ডুবিয়ে দেব। তার কথার উত্তর দিতে কারো সাহস হলো না, মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলুম।

স্রোতের টানে আমাদের নৌকোখানি তীরবেগে ছুটে চলেছিল। কানাই হাল ধরেছিল, নৌকো সোজা ওপারের দিকে চালাতে লাগল। আমি একটু আপত্তি করে বললুম—ওপারে যাচ্ছ কেন?

সে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল—দরকার আছে।

আবার সব চুপচাপ।

জলতরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আমরা কয়টি প্রাণী নীরবে বসেছিলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নৌকো এসে চড়ায় পৌঁছল। একটা গাছের গুঁড়িতে নৌকো বেঁধে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠল। তারপর "তোরা একটু বোস ভাই, আমি এখনই আসছি।" বলে ধীরে ধীরে চলে গেল। সে অদৃশ্য হলে, অগ্নি বললে—কি ভয়ানক লোক! ওর জন্ম আমাদের প্রাণ যেতে বসেছিল। আগে জানলে কে ওর সঙ্গে আসে? নমস্কার, জীবনে আর কখনো নয়!

তখন বুকের কাঁপুনিটা অনেক কমে গিয়েছিল। ভবতোষ আমার তা' বাড়িয়ে দিলে, বললে—কী অসীম সাহস এই কানাইএর। এই

চুরট ফুরোয় আস্তাল, ও কি না সরীন এক্ষা চলে গেল। আমাদের ভাইকে সঙ্গে নেওয়ও বল্লে না!

* * *

প্রায় মিনিট পনের পরে কানাই ফিরে এসে শুষ্ক মুখে বল্লে—তোরা একবারটি আয় ভাই, বড় বিপদ। তার খুব বড়ই করুণ!

কোনপ্রকার প্রশ্ন না করে আমরা ধীরে ধীরে নৌকো থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করলুম। কিছুদূর যাবার পর দু'খানি ছোট খড়ের ঘর দেখা গেল। কানাই আগে আগে একখানি ঘরে প্রবেশ করল। এক পাশে মিটমিট করে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। সেই ক্ষীণালোকে দেখলুম—একজন যুবতী চুপ করে মাটিতে বসে আছে; তার মুখখানি একেবারে পাংশু হয়ে গেছে। বেদনাতুর চক্ষু দুটি জলভরে ছল্ ছল্ করছে! সামনে একজন লোক লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, তার আপাদমস্তক একটা স্থির বসন দ্বারা আবৃত।

কানাই বল্লে—আর দেরি করিস্ নি, ধর ভাই, এর সদ্গতি করে দি! তারপর নিজেই সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তির মাথার দিকটা দু' হাতে উঁচু করে তুলে ধরল। আমরা সকলে তাকে সাহায্য করলুম, ধরাধরি করে তাকে বাইরে নিয়ে এলুম। সেই রমণীও আমাদের সঙ্গে বাইরে এলো। নৌকোর কাছে এসে কানাই বল্লে—নামা, ঠিক করেনি। তারপর সেই শব দেহের বস্ত্র উদ্ঘাটন করে, সমস্ত কাপড় চোপড়ে ভাল করে বাঁধলে। আমাদের সঙ্গে দুটো বড় মাটির কলসী এনেছিল, তাদের সেই দুটিতে বালি ভরতে লাগল।

কন্যাকুমারীর কোথায় দেখে আমার মনে হলো—একে যেন আগে কোথা দেখেছি! আমি একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলুম। কানাই তা' লক্ষ্য করে বল্লে—কি দেখছিস অত করে? চিন্তে পারছিস্ না? আমাদের পানু ঠাকুর।

তখন অতীতের অনেক কথাই মানস-পটে জেগে উঠল। পানু ঠাকুরের সংসারে আপন বল্তে কেউ ছিল না। পল্লীকেই সে আপন বলে মনে করত। কি পরোপকারীই না ছিল সে! লোকের উপকার করতে গিয়ে তাকে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনাই না সইতে হয়েছে! তার আজ এই পরিণতি! হা ঈশ্বর!

পানু ঠাকুরের দেহ নৌকোয় তুলে, নৌকো ভাসিয়ে দেওয়া হলো। রমণী আর্তনাদ করে একটা বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে।

এতক্ষণ এই রমণীকে ভাল করে দেখবার অবসর পাই নি। এবার কিন্তু তাকে চিন্তে পারলুম। সে ছায়া দিদি!

অদূরে 'ঝুপ' করে একটা শব্দ হলো। একটু পরেই নৌকো ফিরে সকলে তীরে ফিরে এলো।

আমরা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। ছায়াদিদি সহসা আর্তনাদ করে বল্তে লাগল—আমার কি উপায় হবে? আমি কোথা যাবো!

কানাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে—তোমার কোন ভাবনা নেই দিদি! আমি তোমার ভার নেব। আজকের রাতটা কষ্ট করে কাটিয়ে যাও; কাল এসে তোমার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

ছায়াদিদি আর কিছু বল্তে পারল না। কাতর ভাবে দীন-নেত্রে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার সেই ব্যথা ভরা করুণ দৃষ্টি আজো চোখের সামনে ভেসে উঠে মনটাকে বেদনাতুর করে তোলে।

আমরা যখন বাড়ী ফিরলুম তখন ভোর হতে দেরী। সমস্ত রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কানাই তার কথা রেখে ছিল। ভাল ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল।...

তারপর কত বছর কেটে গেছে। আজও ছায়াদিদির সেই ব্যথা-ভরা দৃষ্টি ভুলতে পারি নি। প্রতি বছর 'নষ্টচন্দ্র' তিথিতে তার স্মৃতি বুকের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠে মনটাকে ব্যথাতুর করে তোলে।

মলয়কুমার

শান্তশীল দাশ

এ পাড়ার সেরা ছেলে মলয়কুমার—
বলি শোন একে একে কতগুণ তার!
ভোরবেলা মুখ ধুয়ে সবাই যখন
পড়ার ঘরেতে যায়, মলয় তখন
ছিপ হাতে ছুটে যায় পুকুর পাড়ে;
সব কিছু ভুলে গিয়ে একেবারে
চুপ করে বসে থাকে ছিপটি ধরে;
সকাল বেলাটা যায় এমনি করে।

দশটা যখন বাজে, ছেলের দলে
ইস্কুলে যায় চলে বই বগলে;
ছিপখানি রেখে দিয়ে পুকুর ঘাটে
মলয় তখন জলে সাঁতার কাটে।
বার দুই তিন করে এপার ওপার;
বাড়ী গিয়ে কিল খায় গোটা দুচ্চার
মার কাছে; তবু হুঁস হয় না মোটে,
পরদিন ঠিক মত আবার ছোটে।

ডাংগুলি, ফুটবল, লাটাই-ঘুঁড়ি—
ওস্তাদ সব তাতে, নেইকো জুড়ি
তার মত এ পাড়ায়, মিলবে না আর,
সকলেই তার কাছে মেনে নেয় হার।

সন্ধ্যাবেলায় তার বদলায় রূপ,
হৈ চৈ গোলমাল একেবারে চুপ;
লক্ষ্মী ছেলের মত বই সাজিয়ে,
বসে থাকে বই পাশে মুখ নামিয়ে।
মা এসে অবাক হয়ে গালে দিয়ে হাত
দেখেন, শ্রীমান ঘুমে একেবারে কাত।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের জীবাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত জীবাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত জীবাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

L. 273-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই ৪২৮ এস্তত।

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব : দ্রষ্টা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আগেই বলা হইয়াছে, বিভূতিভূষণ রোমান্টিক চেতনাসম্পন্ন লেখক ; তীব্র সৌন্দর্যবোধ ও দুঃসাহসী কল্পনা-প্রবণতার জন্য তাঁহাকে এক হিসাবে রোমান্সধর্মী লেখকও বলা যাইতে পারে। তাঁহার চিন্তায় ও ভেবারীতিতে তাত্ত্বিক বৃঢ়তার বা নিবেদনাত্মক নীতিনিষ্ঠার অভাব ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই শ্রেণীর লেখক বলিতে বাস্তব-সমস্যায় অব্যাহতি-দুঃখ পলায়নের যে মনোবৃত্তির কথা সাধারণত আমাদের কল্পনায় জাগে, বিভূতিভূষণের মনোভাব সেরূপ ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি কবিসুলভ এবং সেদিক রোমান্টিক হইলেও আসলে তিনি জগৎ ও জীবনের খাঁটি শিল্পী ছিলেন। বিষয়বস্তুর সহিত কতখানি গভীর পরিচয় লইয়া তিনি লিখিতে বসেন, তাহা তাঁহার সৃষ্টির রেখা, উর্ণনাভের বা উৎকর্ষের মত ডায়েরীর নিখুঁতে গল্প-উপন্যাসগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে।[৩৮] একথা সত্য যে সমকালীন বহু জটিল সমস্যাই তিনি স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু এ হিসাবে তাঁহার কোনরূপ সংস্কারও ছিল না। যুগ-সমস্যা সম্পর্কে বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্করের মত সচেতন শিল্পী নন। তবে তাঁহার আবেগ-প্রবণ মানসলোকে এইরূপ কোন সমস্যা প্রতিফলিত হইলে তাহার রূপায়ণে তিনি দ্বিধা করেন নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, বিভূতি-ভূষণের লেখায় যে সব দুঃসমস্যা স্থান পাইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট মনো-ধর্মের উচ্চতরার উর্দ্ধে সেগুলি কখনোই উঠিতে পারে নাই, সমস্যারূপে সেগুলি কেমন যেন নিষ্প্রভ হইয়াই ফুটিয়াছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবনের সহজ গতি এবং প্রকৃতির রূপাভিরতাই বড় কথা, যুগসমস্যার দৃষ্টি বলিষ্ঠ প্রকাশ তাঁহার সাহিত্যে খুবই কম। কবি-ভাবাপন্ন কথা-সাহিত্যিকের এই দুর্বলতা অস্বাভাবিক নয়। বিভূতিভূষণের ভাবগুরু রবীন্দ্রনাথেও এইরূপ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস-খানি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিলে দেখা যায়, রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসে কাহিনীর গৌরব আছে, রচনা-বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্য আছে, নাটকীয়তাও কিছু আছে, কিন্তু তথাপি রসিক পাঠকের কাছে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের কাব্যময় বা আত্মিকের মূল্য অবশ্যই তত্টা নয়, ইহার কাব্যিক সুষমামণ্ডিত অথবা হৃদয়গত আবেদনের আবেদন তাঁহার কাছে যতখানি।[৩৯]

এই কবিসুলভ ভাবপ্রবণতা ছিল বলিয়াই বিভূতিভূষণের মন বস্তু-তান্ত্রিক জীবনের নিছক প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মনস্বী প্রকৃতির স্পর্শ-গভীর এবং ভাষা ও কল্পনার অপরূপ সমন্বয়ে সার্থক বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য নূতন ধরণের সৃষ্টি হিসাবে বিবেচিত হইবার স্পর্ধা রাখে। বিশেষ করিয়া প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে মানুষের জীবনে আবিষ্কারের বা সমপ্রকাশে রচনার স্থান দিয়াছেন তাহা সত্যই অভূতপূর্ব। বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতির রূপ জীবন্ত, এই জীবন্ত সত্তা আমার কষ্টকল্পিত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত।[৩৯ক] বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী অতি মনোজ্ঞভাবে বলিয়াছেন :—"রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত সার্থক উপন্যাস বাংলাদেশে লিখিত হইয়াছে, বিভূতিবাবুর রচনা ঠিক সে পর্যায়ভুক্ত নহে। কারণ এখন একটি নূতন উপাদান তাঁহার রচনায় আছে, যাহা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের সার্থক উপন্যাসে ছিল না। সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অনাবিষ্কৃত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন সূত্র, আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও। প্রকৃতিকে জীবনের

---

৩৮ কথা-সাহিত্যিকের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক জন ক্যারথারসের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় :—'He is first an observer, then a recorder. He must be not only in the world, but of it ; for how else should he gain the sympathy and understanding without which all his art is vain.

John Carruthers—Schherazade—P. 32

৩৯ প্রকৃতপক্ষে বাংলা কথা-সাহিত্যে কাব্যধর্মের অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মনে হয় বাঙালী মনের আবেগ-প্রবণতা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। আধুনিককালেও রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম পর্ব), বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটলো কমল', প্রেমেন্দ্রকুমার সাহিত্যের 'আকাশ-পাতাল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' (১ম পর্ব), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি প্রখ্যাত বাংলা উপন্যাসে অল্পভাব যাই থাক, কাব্যভাব একটি বড় দিক।

৩৯ক প্রকৃতি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে কিরূপ জীবন্ত এবং মানুষের সহিত কিভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা নিম্নের উদ্ধৃত অংশ হইতেই অনেকটা বুঝা যাইবে :—

'দেশের পাঁচালী'তে মায়ের মৃত্যুর-পরদিন অপু পৌঁছাইল গ্রামে। গ্রামের প্রবেশ পথে কোদলা নদীর তীরে যাত্রা হইয়াছে। এখানে আছে—"মা নাই ! মা নাই !...বৈকালের কি রূপটা ! নির্জন, বিরাগা কোনও দিকে কেহ নাই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিষাদী যাহা রোদ-ভরা আকাশটা। অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

উপাদানরূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, সে নূতন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের চাঁদ হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনার নূতনত্ব, দেশ ও কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে আধুনিক, প্রাচীন-নবীন সংঘর্ষ বা সার্বজনীন অসন্তোষের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। প্রাচীন সাহিত্যের অঙ্গে নূতন সাহিত্যের এইখানেই প্রত্যেক।[৩১১]

বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রেমিক শিল্পী, তাঁহার পল্লীপ্রীতি আধুনিক, তাহাতে ছদ্মবেশ বা ক্যাশনের স্পর্শ ছিল না। পড়িলেই বুঝা যায় তাঁহার গল্প-উপন্যাস হৃদয়োৎসারিত নিছক সাহিত্য। তিনি গ্রামকে এবং গ্রাম-প্রকৃতিকে কতখানি ভালবাসিতেন, তাঁহার ডায়েরীগুলিই তাহার সাক্ষ্য দিবে। 'উৎকর্ণ'তে তিনি বলিয়াছেন :—"বাংলাদেশের রূপকাহিনী লুকান আছে এই সব নিভৃত পল্লীগ্রামের আম-কাঁঠাল-বাঁশ বনের আড়ালে। যিনি লেখক হবেন, তিনি লেখনী ধারণ করবেন, বাংলার কথা শোনবার জন্য তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই শান্ত উদ্বেগহীন, তুচ্ছ অনাড়ম্বর, অথচ গ্রাম-জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে পবে, ভালবাসতে হবে।[৩১২] তাঁহার অপর ডায়েরী 'স্মৃতির-রেখা'য় আছে :—"গভীর রাত্রি পর্যন্ত বড়বাসার ছাদে শুয়ে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে—আমার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐ রকম রীমঝীমের পর্দাফেলা অন্ধকারের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রামা নদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহময়ী দুপুরের মধ্যেই হয়—"[৩১৩]

শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণের সাহিত্যে পল্লীচিত্র এবং পল্লীচরিত্র যেভাবে ফুটিয়াছে, তাহার তুলনামূলক বিচার করিলেই পল্লীপ্রকৃতি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মনোভাবের সম্যক পরিচয় মিলিবে। প্রকৃত-পক্ষে এ হিসাবে দুজনের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বর্তমান। শরৎ সাহিত্যে পল্লীগ্রামের সামাজিক সমস্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে, পল্লী-প্রকৃতির জীবন্ত রূপ খুবই কম চোখে পড়ে। বিপরীতভাবে বিভূতি-ভূষণের সাহিত্যে পল্লীপ্রকৃতি শুধু বর্ণনার উচ্ছল নয়, তাহার গতির সঙ্গ আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের সমস্যার যে আলোচনা তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে, তাহা মূল রসের হিসাবে অনেকক্ষেত্রেই গৌণ এবং অল্প-আবেদনশীল। পল্লীর মানুষ তাঁহার সাহিত্যে প্রশান্ত প্রকৃতির আয়ত্ত স্বরূপ, তেমনি সহজ, সরল, শান্ত। তাহাদের মধ্যে আধিক স্বচ্ছলতা নাই, শিক্ষার দীপ্তি নাই, কিন্তু সেই জন্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মত অন্তঃপতনের বেদনায় তাহাদের চিত্র করুণ হইয়া উঠিয়াছে কথাচিৎ। আসল কথা, প্রাণময়ী ও সাবণ্যময়ী প্রকৃতির কাছে যে মানুষ আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে বিভূতিভূষণ বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক যুগ-সমস্যার নিরিখে দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার হীনতা ফুটাইয়া তাহাদের তথা দেশের পুনর্গঠনের আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস পান নাই। এইজন্যই বলা হয়, বিভূতিভূষণের পল্লীসাহিত্য "নদী-তটের সাহিত্য" কিন্তু শরৎচন্দ্রের পল্লীসাহিত্য "চণ্ডীমণ্ডপের সাহিত্য"। বিভূতিভূষণের লেখায় পল্লীর যা গ্রামবাসীর কোন নিন্দা পড়িলে পাঠকের মনে হইবে ইহা যেন প্রিয়জনের অন্তরস্থিত বৈরূপ্যে বেদনা বা অভিমানের প্রকাশ, হীনতার ছদ্ম বিরূপ সমালোচনা নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও জীবনের অভি-জ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়াছে, কল্পনার উপর নহে। মানুষকে তিনি স্বরূপে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কবি-সুলভ ভাবদৃষ্টি এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি অবাধমুক্ত মন, পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যে যে মানুষ বাঁচিবার সুযোগ পায়, নাগরিক-জটিলতা-বন্ধুর চেতনা হইতে যা যেসাদৃশ্যের আবেগে তাহাদের আপাত-বাস্তবধর্মী বিচার না করিয়া পল্লীপ্রকৃতিতে লালিত তাহাদের আপন মনোধর্মের নিরিখে তিনি তাহাদিগকে সহজভাবে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। আধুনিক লেখকেরা দাঁড়িওয়ালার ছবি আঁকিবার সময় এই দৃষ্টিকোণ হইতেই, লেখনী চালনা করেন, কিন্তু পল্লীর মানুষের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সান্নিধ্যের মহিমা তাঁহারা প্রায়ই ভুলিয়া বসেন।

আসলে বিভূতিভূষণ অবিশ্বাসী লেখক। বিশ্বাসপ্রবণতা তাঁহার অন্তর্ধর্ম। বক্তব্যের পটভূমে তিনি যখন প্রবেশ করেন, তখনও তাঁহার প্রকাশভঙ্গী ইতিবাচক বা সমর্থক, নেতিবাচক বা নঞর্থক নয়। মানুষের আত্ম-ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং কেবলমাত্র অনুভূতি-লেশ এক পরমাশক্তির বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে নিভানিতে লীলা চলিতেছে। ইহা প্রাচীন সাহিত্যের নিছক নিয়তি নয়, মানুষের প্রতি-কূলগামী অপ্রতিরোধ্য শক্তি নয়, অনুকূল প্রকৃতির মধ্যেই তাহার স্বরূপ লক্ষণীয় :—বিভূতিভূষণ ইহা দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করিতেন। এই নবমী কবিচেতনার তিনি রবীন্দ্রনাথের কৃতী উত্তরাধিকারী।

বিভূতিভূষণের মানস গঠনই তাঁহার রচনার মূলপ্রেরণা সন্দেহ নাই। প্রকৃতির কোলে তাঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হইবার ফলে তাঁহার মন প্রশান্ত উদারতায় ভরিয়া গিয়াছিল। কল্পনা ইন্দ্রাণীর শুধু তাঁহার শুধর বীণার সুরসংযোগ করে নাই, গতির আবেগও জোগাইয়াছে। তখন পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীতচারী কাব্যমুখী ভাবলোকের প্রভাব পড়িয়াছিল তাঁহার উপর; এই সময় পিতার সহিত নূতন নূতন স্থানে যাইবার সুযোগ হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টি দূরপ্রসারী হয়। বিভূতিভূষণ অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন, দেশী-বিদেশী বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকের সৃষ্টির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও উইলি এই দুজনের তিনি অনুরাগী ছিলেন, টমাস হার্ডি সিনেক্ষেহে তাঁহার প্রকৃতি-মুখী মনোভাবকে সম্প্রসারিত করেন। বিভূতিভূষণ টলস্টয়ের ভক্ত ছিলেন, ভাবিত হইয়াছিলেন তাঁহার ভাবে।[৩১৪] রোমা রলাঁর অমর সৃষ্টি 'জাঁ ক্রিস্তফ'র দ্বারা

---

৩১১ বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প, (১ম সংস্করণ), ভূমিকা, পৃঃ-৵৹-।৹

৩১২ উৎকর্ণ (১ম সংস্করণ), পৃঃ-৬৩-৬৪

৩১৩ স্মৃতির রেখা (১৩৬২), পৃঃ ৩২-৩৩

তাঁহার পথের পাঁচালী কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন।৩১৪ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টিকে প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ও হীনতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া সচ্চিদানন্দের দিকে প্রসারিত হইবার প্রেরণা দিয়াছিলেন; তাঁহার অন্তরালে নিত্য প্রবহমান শাশ্বত-সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।৩১৫

মহৎ উপন্যাসের প্রতিটি যে সংজ্ঞা আছে, তাহাতে বহুচরিত্র, বিরাট পটভূমিকা, প্রচুর আড়ম্বর, লেখকের ভূয়োদর্শনের পরিচয়, ইত্যাদি অপরিহার্য। আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন দূরত্ব অতীতে, পরিবর্তিত কালের নিরিখে—এখন সেইসব সংজ্ঞার কিছু কিছু পরিবর্তন,পরিবর্তন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন স্বাভাবিক। আগে ছোট গল্পকেই মহৎ বলা হইত, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রোমান্স আর নভেল এক ছিল। বর্তমানে ভল্টেয়ের কাল পর্যন্ত এই সংজ্ঞা কত বদলাইয়াছে! এখন আর তাই এপিকের বা মহাকাব্যের ছকে ফেলিয়া মহৎ উপন্যাস খোঁজা চলেনা। অবশ্য এখনও কোন মহৎ উপন্যাসে উপরোক্ত গুণাবলী থাকিলে ভাল হয়, না থাকিলে পুনর্নির্দিষ্ট মূল্যায়নের হিসাবে উপন্যাসটিকে বিরল গৌরবে বিচার করিতে হইবে। এখনে মহৎ উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ বলিতে হইবে ইহার পিছনে লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং উপন্যাসটিতে জগৎ ও জীবনের নিবিড়ে সেই জীবনদৃষ্টির প্রকাশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, লেখকের সংবেদনশীল বা সহানুভূতিশীল মনোভাব, বিশ্লেষকে নিবিশেষ করিয়া তোলা, ব্যাপক পটভূমিকা হইলেও মহান আদর্শবোধ এবং ব্যক্তিগতকে বিশ্বজনীন করা ইহার মূল কথা। সংক্ষেপে বলা যায়, যে উপন্যাসের বক্তব্য বর্তমান-কেন্দ্রিক হইয়া ব্যক্তির সীমার মধ্যেই থাকিয়া যায়, তাহা ভাল উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু মহৎ উপন্যাস নয়। মহৎ উপন্যাসের লেখক অতীত বা ভবিষ্যতের হাতড়াইয়া মরিবেন না, চিরন্তনের আলোকে আলোকিত তাঁহার মন বহুবিচিত্র সমস্যার চাপে ছিন্ন হইয়াও হতাশ হইবেনা, তাঁহার মধ্যে থাকিবে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাসবোধ। আঘাত সংঘাতের আবর্ত-আলোড়নের ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শ আত্মার গৌরবে পরম মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই নব মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে তাই ছোট গল্পের চেয়ে সামান্য বড় আর্পের হেমিংওয়ের উপন্যাস 'ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সি' অথবা গ্রেহাম গ্রীনের বৃহৎ উপন্যাস 'দি হিডেন ফেইথ'-দুখানিই মহৎ উপন্যাস। রুশ-লেখক টলষ্টয় ডষ্টয়েভস্কি এই শ্রেণীর উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁহারা উভয়েই বহু অভিজ্ঞতা, বহুল ব্যক্তিজীবনের যথাযথ নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বৃহৎকে খুঁজিবার সাধনা করিয়াছেন।৩১৭ ডষ্টয়েভস্কির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'কে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিলে দেখা যায় এই মহৎ উপন্যাসখানি আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণ কারামাজোভ ও তাঁহার পুত্রদের অথবা পতিতা নারী সংক্রান্ত কাহিনী হইলেও আসলে এই ক্রুদ্ধ-আবর্তিত, ঘনীভূত কাহিনীটি ভগবান থাকিয়া যদি কেহ থাকেন, তাঁহাকেই খোঁজার কাহিনী।৩১৮

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে এতবড় কথা বলা না গেলেও একথা ঠিক যে তাঁহার প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী-অপরাজিতে বর্ণিত ব্যক্তিজীবন

---

৩১৪ The Concise Oxford Dictionary of English Literature (1939)।—এ গ্রন্থানুযায়ী মানবপ্রেমিক ঔপন্যাসিকের সম্পর্কে বলা হইয়াছে :—The union of a great moral conviction and realistic details, and an immense imaginative vision, combine to make him one of the great European writers.

৩১৫ "জীবনের যেন যেন মনীভূত না হয়। আমাদের দেশে আমাদের চারটীর জীবনে তার আশঙ্কা খুব বেশী। পেট্রার্ক সম্বন্ধে যেমন উক্ত হয়েছে—'It is a noble florentine profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life.....' আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়?"—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—উর্মিমুখর পৃঃ-৭৪

৩১৬ "কিন্তু বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যে ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী? সেই হচ্ছে শিবম্। এই-যে মঙ্গল এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্বতত্ত্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, দুই দুঃখ, ভালোমন্দ। বাটির মধ্যে যেটি ছিল এক, সেই নানাত্ব, সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে যখন সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে 'অবয়ুদ্ধং বহুনুদ্ধতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ পাত্রের মধ্যে তার গর্ভবাস।

—রবীন্দ্রনাথ—আত্মপরিচয় (১৯৪৭), পৃঃ—৬৮

৩১৭ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আগে উল্লিখিত হইয়াছে, ডষ্টয়েভস্কি সম্পর্কে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে চমৎকারভাবে বলিয়াছেন —"Dostoevsky খ্রীষ্টকে রুশ-কৃষকের অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া পাশ্চাত্য জগতের হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়াছেন।"—বর্তমান বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ—১৩৪

৩১৮ "The Brothers Karamazov remains a stupendous book. It has a theme of profound significance. Many critics have said that this was the quest of God ; I, for my part, should have said that it was the problem of evil.

Somerset Maughm—Ten Novels and their Authors (1951), P. 260

অবলম্বনে পাঠক-মনকে বৃহৎ বিশ্ব জীবনবোধের মুখোমুখী লইয়া যাইবার আবেগ আছে, ঘরের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মনকলোকের আনন্দ-সভায় যোগ দিবার আমন্ত্রণ আছে। সেই অর্থেই ইহাতে আছে মহৎ উপন্যাসের বীজ। তাঁহার আরণ্যক এবং ইছামতীতেও এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে। এমন এইরূপ আলোকের প্রতিষ্ঠা বিস্ময়কর ন্যূনতায়। এই সৃষ্টি-কৃতিত্বে বিভূতিভূষণ অদ্বিতীয় হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একমাত্র 'আনন্দমঠে'ই ইহা কিছুটা আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাস এ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই এ বৈশিষ্ট্য নাই। বিস্ময়ের কথা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও এই সম্ভাবনা কম, শুধু 'গোরা'য় ইহার কিছুটা স্পর্শ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা উপন্যাসিকদের মধ্যে 'প্রাগৈতিহাসিক', 'বিসর্পিল'-রচয়িতা তারাশঙ্করই অনেকটা এই গৌরবের অধিকারী।

* * * * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশো, ভিয়ারো, ভলটেয়ার প্রমুখ মনীষীরা উচ্চকণ্ঠে মানবতার মহিমা ঘোষণা করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপের প্রচলিত প্রাচীনপন্থী সমাজ জীবনে সুস্পষ্ট ভাঙন দেখা দেয়। বিপ্লবের মূলমন্ত্র 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্বপ্ন এই কাহিনে রূপায়িত করিয়া নূতন জীবনানুভূতির বীজ। ফরাসী বিপ্লবের সুপ্রভায় স্নাতক হইয়া ইংলণ্ডে আবির্ভূত হইলেন লেক-কবিকুল এবং এই কবিদল, বিশেষ করিয়া ইহাদের মধ্যমণি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ সীমাহারা প্রকৃতিকে জীবন্ত সত্তা হিসাবে সাহিত্যে স্থান দিলেন। এইভাবে মানবতাবোধ এবং প্রকৃতি-মহিমা-সমুজ্জ্বল এই সমন্বয়ের সাহিত্য সমস্যুগের সৃষ্টি করিল। এই সাহিত্যের প্রভাব পর্বত-সমুদ্র পার হইয়া যেন যেন সঞ্চারিত হইয়াছে এবং আমাদের বাংলাসাহিত্যের কুঞ্জেও ঝঙ্কৃত হইয়াছে ইহার সুর। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া সেই সুরের যে প্রভাব আধুনিক কালে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা অধিকাংশে লেখকই অল্প বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এক হিসাবে কল্লোলপন্থী হইলেও এই ভাবধর্মের প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন।০১৯ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই সাহিত্য-চিন্তার ছাপ রহিয়াছে। তবু কঠিন বাস্তবকে স্বীকার করিয়া তাহারই পটভূমিকায় বিশাল উদার মানবতাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া বিভূতিভূষণ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আরণ্যকের আদিমতা ও রহস্যময়তা মুগচারী বন্যানুভূতির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার রচনায় একটি রোমান্টিক আবেদনের স্পর্শ আনিয়াছে। সমাজ-নিরপেক্ষ মনুষ্যধর্ম অর্থাৎ ওয়াইল্ডের মত কলাকৈবল্যবাদী তিনি নন, তি এইচ লরেন্সের মত সমাজ বা মনুষ্যচরিত্র উভয় নিরপেক্ষ আত্মচিন্তাসর্বস্ব প্রষ্টাও নন, রুশো হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বভাব-সায়লাপন্থীদের যে ধারাটি বহু সমস্যাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সাহিত্যিক রূপকলার মায়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও আপন গৌরবে গৌরীশৃঙ্গের মহিমায়, বিভূতিভূষণ তাহারই অন্যতম ধারক। জীবনধর্মের দিক হইতে চার্লস ডিকেন্সের সহিত বিভূতিভূষণের তুলনা করা যায়। কিন্তু এই আদর্শ-সংগ্রামে ডিকেন্স যেরূপ সমকালের যে আনুকূল্য পাইয়াছিলেন, বিভূতিভূষণ তাহা পান নাই।

ডিকেন্সের মন গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংলণ্ডের উদারনৈতিক পরিবেশ-প্রভাবের যুগে (Age of growing liberalism) ; বিভূতিভূষণের অবস্থা কিন্তু ঠিক বিপরীত। বিভূতিভূষণের মন প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মত শাসন কর্তৃপক্ষের পৈশাচিক পাড়ন, জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতাজনিত হতাশা, যুদ্ধোত্তর সামাজিক বিশৃঙ্খলা, প্রভৃত অর্থনৈতিক মন্দা এবং অনন্ত নিরাশার পরিস্থিতি হইতে মুক্তিকামী আবাল্যচারী বিদ্রোহী তাহাদের মর্মমূলের মধ্যে সংগঠিত হইয়াছিল। এই পরিবেশে তাঁহার পক্ষে বেপরোয়া জোরদার অথবা হতাশ অন্তর্মুখী—দুইটি হওয়া সম্ভব ছিল। বিভূতিভূষণ কিন্তু এই প্রতিকূল পরিবেশে বিস্ময়কর মনোবল দেখাইয়াছেন। তিনি নিজে যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং যে কথা বা যে সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহার অন্তর উন্মন হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রায় একই সঙ্গে যোগাযোগ এবং শেষের কবিতা রচনার কিছু পিছু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আপন কবি-ভাবনা এবং যুগপ্রভাবের যে সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বিভূতিভূষণের রচনাশক্তি সেরূপই হউক, তাঁহার চিন্তায় যাহো এইরূপ কোন দ্বিধার অবতারণা হয় নাই। চার্লস ডিকেন্স সম্বন্ধে মহীনী জি কে চেস্টারটন বলিয়াছেন, ডিকেন্স তাঁহার বিষয় পন্থায় কুসংস্কার বিরোধী, উদার মানবতাবাদী এবং ধর্ম-বিশ্বাসী ছিলেন ; ০২০ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা পাঠে বুঝা যাইবে এই

০১৯ প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের কবি, তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলিতে গেলে 'কর্মের আর ধর্মের কবি'। তবু বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা নিজের পত্রাংশ হইতে তাঁহার প্রকৃতি-মহিমার খানিক মিলিবে :—"...একদিন যৌবনে পৃথিবীর মানবসভায় আমার আসন ছিল—অন্ধকার রাতে ঘরের ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশের পানে চাইলে মনে হত, সমস্ত যেমন যেন মনুষ্যলোকের অভিনন্দন গান করছে—অপরূপ তার ভাষা। বুঝতে পারতুম আমার বেদের মধ্যে অমনি অপূর্ব মহত্ত অনাদি অনন্ত আকাশের ভাষায় সাড়া দিচ্ছে।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ (১ম সংস্করণ), পৃঃ—২১

০২০ "And it is right to say that when more sophisticated Victorians set up fads like fences, and established new forms of narrowness, that flow of popular feeling that was a single man, burst through them and swept on. He was a radical, but he would not be a Manchester Radical, to please

বৈশিষ্ট্যগুলি বিভূতিভূষণের মধ্যেও ছিল। সমসাময়িক পাঠকের চাহিদা মত তাঁহাকে পাইয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। বিভূতিভূষণের অমর সৃষ্টি পথের পাঁচালী পাঠে মুগ্ধ হইয়া রোমিলাদেবী মজুমদার ইঁহাকে 'দেবতার দীনপতি' বলিয়াছেন।[৩১] অতিরিক্তকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলযুগের অন্যতম প্রধান লেখক। বিভূতিভূষণের অকৃত্রিম প্রশস্তি করিয়া অতিরিক্তকুমার বলিয়াছেন :—"বিভূতিবাবু এসে বিভূতিভূষণের সঙ্গে পরিচিত হই। তখন তাঁহার পথের পাঁচালী ছাপা হচ্ছে—মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আসতেন পরিচয়ে।" সবসময়ই আসতেন মনে হত যেন অন্য জগতের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। সে জগতে প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব—যেন অনেক শান্তি অনেক আনন্দ সেখানে। যারা-যাদেরা বিপুল বিস্তৃত অরণ্যে যে তাপস বাস করছে, তাকেই যেন আসন বিছিয়ে ডেকে—এক আত্মভোলা বন্যতার সংস্পর্শে তিনিও যেন সমাহিত, প্রসন্ন, শান্ত। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য আত্মসংযোগ রেখেছেন বলে তাঁর ব্যক্তি ও যৌবন সর্বদাই সমান স্বচ্ছতা, সমান প্রশান্তি। তাঁর মন যেন অনন্তভাবে স্থির ও আবিষ্ট। মনের এই সুস্থবর্ষ বা বৈরাগ্যশক্তি অন্যজনকে স্পর্শ করবেই। যে মানবশ্রীতির উৎস থেকে এই প্রজ্ঞা, এই আনন্দ, তাইতো পরম পুরুষার্থ। এই শ্রীতিরসে অবস্থিতিই তো সাহিত্য। এই সাহিত্য যা সৃষ্টি-তেই বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠা। স্বভাবস্বচ্ছন্দবরণ নিশ্চিন্ত নিষ্পৃহ বিভূতিভূষণ।

এই বিভূতিভূষণের আওতায় এসে "পরিবারের চিঠি" তার সুর বদল করলে। অর্থাৎ সে শ্রুতি বদলে। এর আগে পরশু সে একটানা সুরে নিজাই করে এসেছে,...'[৩২]

নিজের প্রকৃতির ভাবে ভাবুক বিভূতিভূষণ সমাজ ও মানুষের খুঁটিনাটি চিত্রণে। মনস্তত্ত্ব এবং উদ্দেশ্যমূলক, সাহিত্য লক্ষ্যের এই দুই তত্ত্বকথা পরিহাস করিয়া বলিতে গেলে তিনি মধ্য পথে চলিয়াছেন। ইহাতে যা বিষয়বস্তুগত সামাজিক পরিচিতি তিনি আশা রাখিয়াছেন, অথচ মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসিয়াছেন এবং সুন্দরকে তিনি বরণ করিয়াছেন। পরমমূল্যবোধ সম্বলে রাখিয়া, কলাপদ্ধতি-প্রাধান্যে উজ্জ্বল বিভূতিভূষণ সত্যনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কুয়াশাদর্শন-সমৃদ্ধ তাঁহার দৃষ্টি। জগৎকে যে প্রকৃতির অবাধ উদারতা ধরের পণ্ডী তারিয়া মনকে বিশাল বিশ্বে ছড়াইয়া দেয়, তাহাই বিভূতিভূষণের একান্ত আশ্রয়। প্রকৃতি জটিল নয়, সরল; জটিল জীবনযাপন বিভূতিভূষণের পথ নয়, তিনি সহজ-পথের পথিক। তাঁহার সমকালীন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তুলনা করিলেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইবে। মানিকবাবুর মত জীবনের জটিলতার মূল অনুসন্ধানে মনঃশক্তি বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা তিনি করেন নাই, বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত অল্প। জীবনের একটা চলমানতা তিনিও ফুটাইয়াছেন সত্য, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিকদের সংঘাত-আলোড়িত চিত্তের দ্রুত-গতির সহিত তাহা তুলনীয় নয়। বিভূতিভূষণের মতি ধীর, চিত্ত রসসিক্ত, আপন সৃষ্টির বিশ্লেষণ অপেক্ষা আস্বাদনেই যেন তাঁহার অনুরাগ বেশি। তাঁহার ভালবাসিয়া যাহা তাঁহার সাহিত্যের সামগ্রী করিয়াছেন, তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া পাঠককে ধীরে সুস্থে উপভোগ করিবার সুযোগ দেওয়াই তাঁহার শিল্পরীতি। এইজন্য তাঁহার সাহিত্যে অনুশীলন মহৎভাবে যাহাই থাকুক, বহিরঙ্গ জীবনালেখ্যের যা প্রকৃতি-রূপের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

'কুলত্যাগি' উপন্যাস উপলক্ষ করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার প্রফুল্লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিয়াছিলেন :—"আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে। ওর মধ্যে কোন বহুদেশি মিথ্যার ছায়া নেই।...আপনি কোনরকম ঐতিহাসিক বা উপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরন্তনময় ইতিহাস তাই আপনি লেখবেন।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই পত্র যখন লেখা হয় রবীন্দ্রনাথ সেই সময় গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি রচনা করিতেছেন। ছোট ছোট ঢাকা-পাওয়ার কাহিনী, সাধারণ মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার ছবি, প্রকৃতির প্রশান্ত স্বাস্থ্য এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ঐকাবোধ—এ সবই ছিল গল্পকার রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এরূপ প্রশংসা লাভ 'কুলত্যাগি'র মত গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সৌভাগ্য, মনে হয় কবিগুরু 'কুলত্যাগি'তে আপন হৃদয়ের সুর প্রতিধ্বনিত দেখিয়াছিলেন বলিয়াই আবেগ-বিহ্বল হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে যে সব নির্দেশ দিয়াছেন বা শ্রীশচন্দ্রের যে গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি বিভূতিভূষণের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শ্রীশচন্দ্রের ও বিভূতিভূষণের প্রতিবেশ এক নয় এবং যুগের পরিবর্তনে রুচির শিল্পকলায় কিছুটা পরিবর্তন অনিবার্য বলিয়া একই দৃষ্টিকোণ হইতে দুইজনকে দেখাও

Mr. Gradgrind. He was a humanitarian, but he would not be a platform pacifist to please Mr. Honeythunder. He was vaguely averse to ritual religion, but he would not abolish christmas to please Mr. Scoorge. He was ignorant of religious history, and yet his religion was historic. For he was the people, that is heard so rarely in England; and if it had been heard there often, it would not have suffered its feasts to be destroyed.

G. K. Chesterton—Charles Dickens—The Great Victorians (Pelican Ed. 1937) Vol.-I.-P. 176.

৩১। সাহিত্যবিচার, পৃঃ—২০১

৩২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ (১ম সংস্করণ), পৃঃ—৩২৪-২৫

চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

প্রত্যেকদিন এরাস্মিক পারফিউমড্ কোকোনাট হেয়ার অয়েল ব্যবহার করলে আপনার চুল ঘন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এরাস্মিক একটি বিশুদ্ধ নারিকেল তেল যা চুল ভাল রাখে এবং চুলের শোভা বাড়িয়ে তোলে। আজকেই এক বোতল কিনে পরখ করুন—আপনার মনোমত গোলাপ বা চামেলির সুগন্ধযুক্ত তেল পাবেন।

এরাস্মিক

পারফিউমড্ কোকোনাট
হেয়ার অয়েল

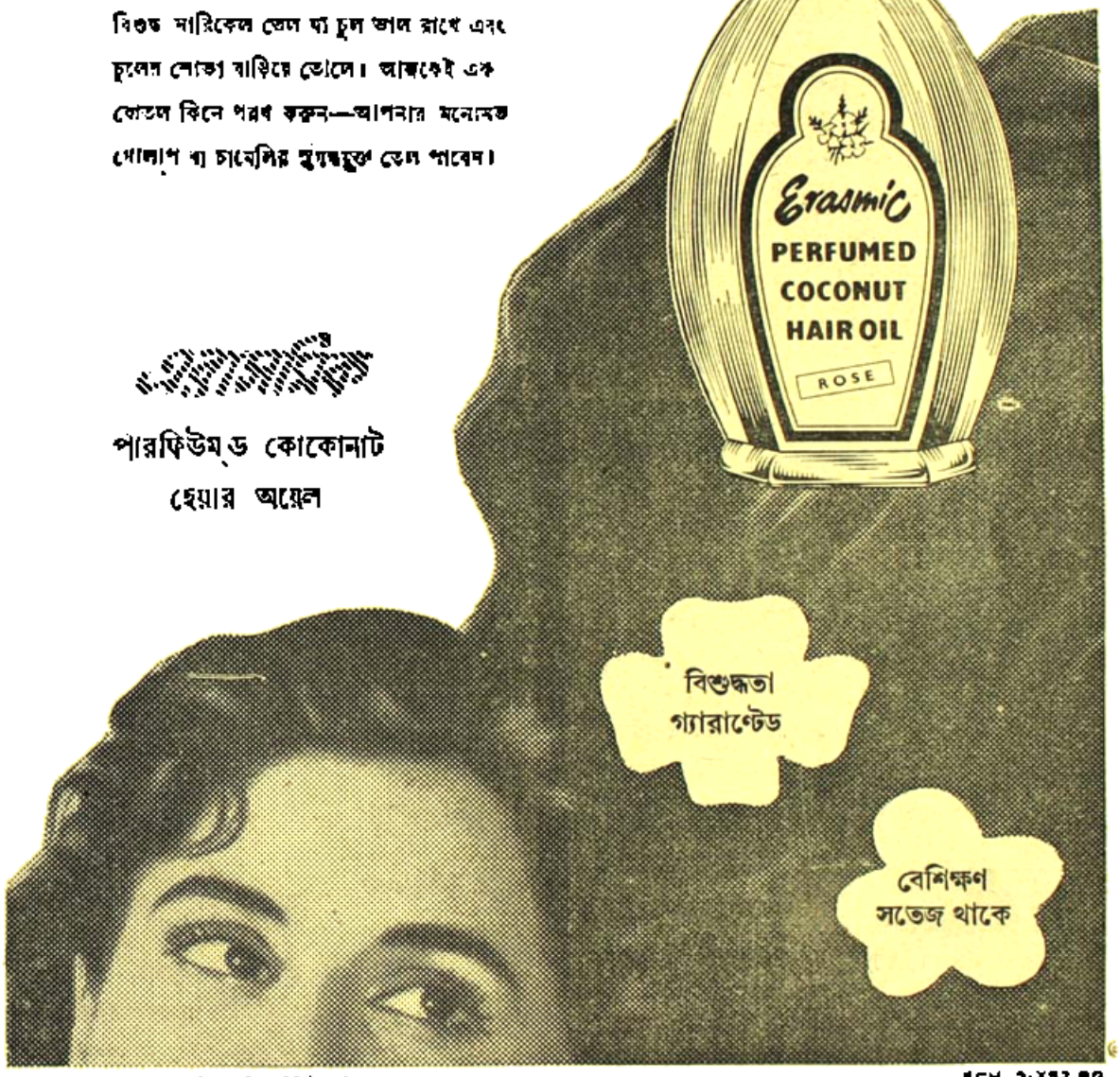

বিশুদ্ধতা
গ্যারাণ্টেড

বেশিক্ষণ
সতেজ থাকে

এরাস্মিক হেয়ার টনিক এর সঙ্গে ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার পাবেন।

BCH. 3-X52 BG

ঠিক হইবে না। তবে সংক্ষেপে একটা বলা যায় যে, বিভূতিভূষণের রচনার যে বিশেষত্ব অভিনবত্বটুকু, তাহার আবেদন নিঃসন্দেহে সমকালীন বিদগ্ধপাঠকের সাহিত্যের পাঠকের রুচির উপরও অবশ্যই কিছুটা নির্ভরশীল। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণের স্থান কোথায় তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে নির্ধারণের চেষ্টা হইবে, তখন বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাক-বিভূতিভূষণ পর্ব এবং বিভূতিভূষণের সমকালীন রুচি বিচার করিয়া পাঠকের বিভূতিভূষণ-প্রীতির কারণ বা হইবার বলন নির্ণয়ন করা যাইবে। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত উপরোক্ত পত্রে "ঐতিহাসিক বা উপদেশিক বিড়ম্বনা" কথাটি ব্যবহার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বাংলাসাহিত্যের কোন কোন সৃষ্টি-প্রয়াসকে কটাক্ষ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিভূতিভূষণের যুগে এইরূপ কটাক্ষযোগ্য কোন সাহিত্য-প্রয়াস হইয়াছিল কি না; তাহাও আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব।

আধুনিককালে কথাসাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টি বা চরিত্র বিশ্লেষণের উপর যে জোর পড়িয়াছে, তাহার মূলে আছে বাহিরের সংঘর্ষে চঞ্চল ব্যক্তিমনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার স্বীকৃতি। যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষ নূতন নূতন ভাব-ভাবনা পুঁজায় করিয়া লয়। এই স্বীকৃতির প্রকাশ অবশ্য উপন্যাস সৃষ্টি হইবার আগে সাহিত্যে তেমন দেখা যায় নাই। উপন্যাসের প্রশস্ত পটভূমিতে এই স্বীকৃতি সার্থক আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কথাসাহিত্য সর্বজন-প্রিয় ও সকলের অধিগম্য সাহিত্যবিভাগ, চিন্তারাজ্যে পরিবর্তনের ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ ইহাতে পড়া স্বাভাবিক। সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গৌরব বাড়িয়াছে এবং যে যাহা চিন্তা করে, এখন তাহা প্রকাশ করার বাধা নাই। তাই কথা-সাহিত্যিক বর্তমানে মানুষের জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠা গল্প-উপন্যাসে আপন অনুভবের চারিত্র অনুযায়ী নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইতেছেন। গল্পের আয়তন সীমাবদ্ধ, এই পরীক্ষার চাপ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই পড়িতেছে অধিক পরিমাণে। উপন্যাসে জীবনের মূল্যায়নে তাই ঘটিতেছে রূপান্তর, শিল্পকলার দিকেও পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। এক্ষেত্রে কবিতা বা নাটকের তুলনায় উপন্যাস-গ্রন্থের শিল্পকলার এ রূপান্তর যে কত বেশী, তাহা সামান্য অনুধাবনেই বুঝা যায়। কবিতা এখন ছন্দেই পোশাক হইয়া পড়িতেছে, তাই তাহাতে বৈচিত্র্য কম।[৩২৩] নাটকে বিষয়বস্তুকে বৈচিত্র্য থাকিলেও চরিত্রের বহিরঙ্গ প্রকাশ-প্রয়াসের সীমাবদ্ধতা নাটককে তত্টা বৈচিত্র্যময়ী হইতে দেয় না। জীবনের মূল্যবোধ সম্প্রসারিত বা পরিবর্তিত হইবার ফলে উপন্যাসে এমন বৈচিত্র্য আনিবার সুযোগ আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙালী সাহিত্যিকের এ সুযোগ প্রচুর, কারণ যুদ্ধে, ছর্ভিক্ষে, দেশবিভাগে, রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের বিপুল আয়োজনে বাঙালীর জীবনে এখন আলোড়ন আসিয়াছে। এই আলোড়নের সুযোগ বিভূতিভূষণ তত্টা পান নাই, অন্ততঃ তিনি যখন লিখিতে আরম্ভ করেন তখন পান নাই। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রোমান্টিক-ভাবাপন্ন লেখক ছিলেন বলিয়া কবি-চেতনার জন্য আপন ভাব-ভাবনার বর্ণাঢ্য বহিঃ-প্রকাশের একটা তাগিদ তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন।[৩২৪] বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আসিলেন, তখন কেমন একটা অস্থির আবহাওয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছিল এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা লইয়াও সেই হতাশার ধুম্রজাল দূর করিতে পারেন নাই। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা, কালাজ্বর মেকার সমস্যা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমকালীন ব্যর্থতাই এই হতাশা-বোধের কারণ। এই সময় বিভূতি-ভূষণ উদার অভিযানী ভাব-দৃষ্টির বিপুল আশ্বাস লইয়া আবির্ভূত হইলেন। জীবনের উদার প্রগতি এবং আশাবাদের আলোকে নিরাশ-বাস পাঠকহৃদয় আলোকিত ও আশ্বস্ত করিবার সাধনায় তিনি অভ্রান্তভাবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার রচনার আঙ্গিক ত্রুটিমুক্ত নয়, তাঁহার বৈদগ্ধ্য বা অলৌকিকে বিশ্বাস এযুগে বিচারসহ কিনা সন্দেহ; তথাপি তাঁহার সাহিত্যের মূলরস পাঠকমন এমনভাবে জয় করিল যে, এই লোককান্ত লেখকের ত্রুটি-দুর্বলতা পাঠকের যেন নজরই পড়িল না।

ক্রমশঃ

---

৩২৩ আধুনিক কালের কবিতা-ব্যক্তিত্বের চাইতে উপন্যাস-ব্যক্তিত্বকে চিনে নেওয়া সহজ। কারণ এ যুগের 'ইমেজিস্‌ম্' এবং প্রতীকতার অনুরাগে সাম্প্রতিক কবিতার অন্তর্ভুক্ত বহিরাংগনে এমন একটা সাধারণ ধর্মিতা এসেছে যে তা থেকে স্বভাবতই কোন কবির একান্ততা খুঁজে নেওয়া কঠিন হয়—যদি না সেই কবি কোন বিশিষ্ট মার্গনিকতায় উদ্ভাসিত থাকেন।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১ম সংস্করণ), পৃঃ—১

৩২৪ তত্ত্ব চিন্তা ও যুক্তি প্রণালীর মধ্য দিয়া যেমন একটি সুসংবদ্ধ গভীর ব্যক্তিসত্তা আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, কবির কাব্যের মধ্য দিয়াও তেমনি একটি গভীর উপলব্ধি, চিত্তের একটি অনির্বাচ্য রস-নির্ঝরিণী, তাহার সেই অলৌকিক রূপকে মূর্ত কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—সাহিত্য পরিচয় (১ম সংস্করণ), পৃঃ ১২১

নৃত্যময় জগৎ

STUDENTS COMMON ROOM

দেশ-বিদেশে ভারতীয় নৃত্য

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

১৯০৬ সাল। অ্যামেরিকা তখনও রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেনি। রুথ্ ডেনিস্ নামে এক তরুণী অ্যামেরিকান দর্শকদের অবাক করেছিলেন তাঁর রাধা-নৃত্যের মোহন ভঙ্গিতে। তাঁর এ-নাচের জন্যে খ্যাত হলেন। এরপরে তিনি শুধু 'রাধা' নয়, 'কাল-নগিনী' 'ধূপশিখা' এই কয়টি ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে চমৎকৃত করলেন সারা মহাদেশটাকে। তারপর বেরুলেন ইউরোপ বিজয়ে। লণ্ডন, প্যারিস ও সারা জার্মানি তাঁর

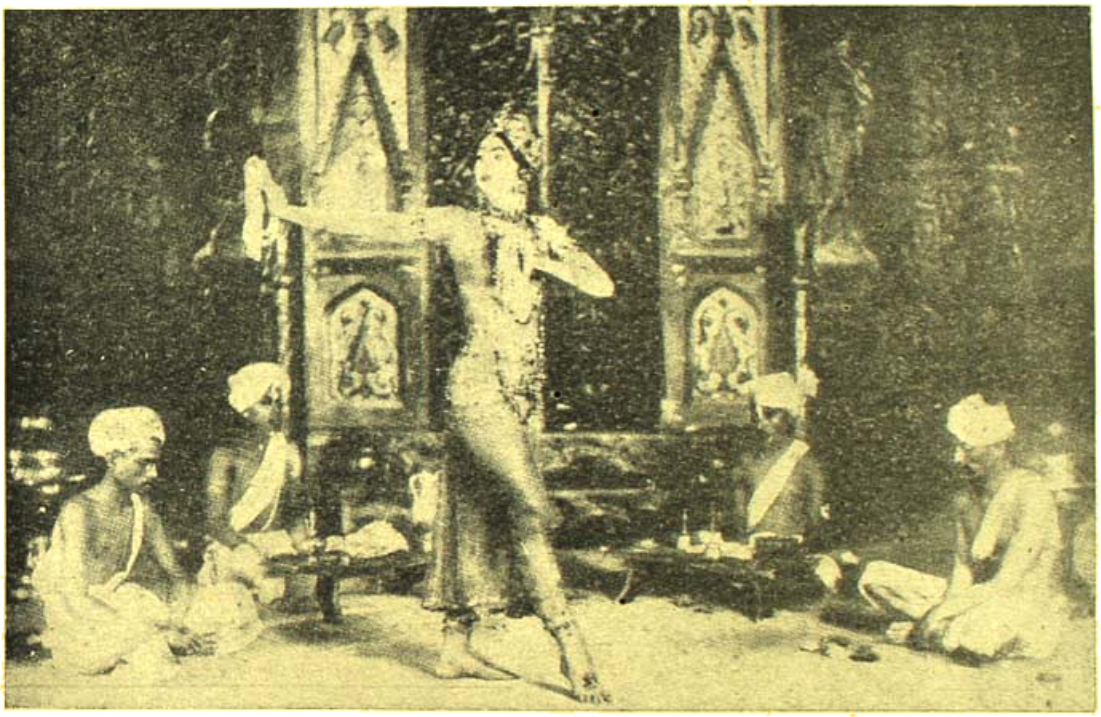

রাধা নৃত্য—রুথ্ সেণ্ট ডেনিস

সেখানকার দর্শকেরা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। একদল লোক নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, কিন্তু বেশীর ভাগ দর্শক তাঁর নৃত্যমহিমায় মুগ্ধ হলেন। ডেভিড্ বেলাস্কো তাঁকে সেণ্ট বলে অভিনন্দিত করলেন। সেই থেকে রুথ্ ডেনিস্ সারা অ্যামেরিকায় রুথ্ সেণ্ট ডেনিস নামে বন্দনা-গানে মুখরিত হয়ে উঠল। দেবী 'রাধা' রূপে তিনি পূজা পেলেন। সার্থক হল তাঁর ইউরোপ অভিযান।

কিন্তু এ-নাচ তিনি শিখলেন কোথায়? অ্যামে-রিকার প্রচলিত নৃত্য-ছাড়া তো কিছুই তিনি দেখেননি! ভারতে আসেননি হিন্দু-নৃত্য দেখতে কিংবা শিখতে।

একবার শুধু কোনহ-দ্বীপে একটা সাধারণ হিন্দু-নৃত্য দেখেছিলেন। তখন থেকেই হিন্দু-নৃত্যের মহিমা তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রাচ্য নৃত্য সম্বন্ধে পড়াশোনা করলেন। তাঁর অন্তরের গভীরে শিল্পী নব অনুপ্রেরণায় জেগে উঠল। আমেরিকাবাসী দেখতে পেল শ্রীরাধার ভুবন-ভোলানো রূপ। এ নৃত্য

রাই-উন্মাদিনী নৃত্যে—রুথ সেণ্ট ডেনিস্

প্রেরণার উৎসও সেণ্ট ডেনিস্ নিজেই আবিষ্কার করেছেন। যে আনন্দে মাতৃক্রোড়ে শিশু নাচে, মেষশাবক লাফায় তা আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দলোকেরই পরিচয়। সে আনন্দ-ব্রহ্মের সংগে যোগ যাঁর যত নিবিড় নৃত্যের প্রেরণাও তাঁর অন্তরে তত গভীর।১

১৯১৮ সালে তাঁর নৃত্যে মুগ্ধ এক তরুণ তাঁর দলে যোগ দিলেন। তাঁর নাম টেড্‌শন্। তরুণটিকে তাঁর

প্রাচ্য ব্যালের অনুসরণে—রুথ সেণ্ট ডেনিস্ ও টেড্‌শন

এত ভাল লাগলো যে তিনি তাকে বিয়ে করে ফেললেন। দুজনে মিলে একটা নাচের স্কুল স্থাপন করলেন—'ডেনিশন বিদ্যালয়' নামে। আমেরিকার নৃত্যে ডেনিশন যুগের সূচনা হল। রুথ সেইণ্ট ডেনিস ও টেড্‌শন্ সতের বৎসর

১। "Obviously I did not have any idea. I only had the deep cosmic impulse to move freely and rhythmically, which I believe is an inborn impulse carried over on the physical plane from the mere joy of youthful exuberence, as animals gambol in the spring. And from lambs gamboling in the spring, let us move to Himalayan heights where according to my understanding of Hindu Philosophy, the Gods dance, because Brahma Himself is sheer bliss and so all young things coming straight from God are happy, they cry because they can't yet reveal their joy but they begin bouncing on mother's knee, and from there they indicate all their life that they came from a realm of light and joy and rhythm.: Ruth St. Denis

একত্রে নৃত্য করেছেন। হিন্দুনৃত্যের ভঙ্গিতে তাঁরা আরও কত নাচের সৃষ্টি করেছেন। মার্থা গ্রেহাম, ডোরিস হাম্ফ্রে

আদিবাসী নৃত্য—চেউন্

প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত নর্তকী ডেনিশান বিদ্যালয়েরই ছাত্রী।

আর একজন নর্তকী ভারতীয় নৃত্যকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হচ্ছেন রাশিয়ান শিল্পী ইউরোপের সর্বজনপ্রিয়া নর্তকী এনা পাভলোভা। তিনি যখন ভারতে আসেন তখন ইলোরার গুহামূর্তি ও অজন্তার চিত্রাবলী তাঁকে আকৃষ্ট করে নূতন শিল্প-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি তাঁর সে-শিল্প প্রেরণাকে মূর্ত করে তুলেন ভারতীয় নৃত্যে যুগস্রষ্টা শিল্পী উদয়শংকরের সাহায্যে। ভারতের নৃত্যে নবযুগের সূচনা করেন উদয়শংকর। তাঁদের দুজনের কাছে সমগ্র পৃথিবী পেল হিন্দু ব্যালের অনাস্বাদিত অপূর্বরসের আস্বাদন। ১৯২৩ সালে তাঁরা সারা আমেরিকাকে মাতিয়ে তুলেন হিন্দু নৃত্যে।

উদয়শংকর

তার দেড়বছর পরে উদয়শংকর এনা পাভলোভার দল ছেড়ে দিয়ে নিজের দল গঠন করেন। বস্তুতঃ পক্ষে উদয়শংকরই দিলেন সারা জগতকে প্রকৃত হিন্দুনৃত্যের প্রথম আস্বাদন ১৯৩১ সালে যখন তাঁর নৃত্য-সঙ্গিনী ফরাসী নর্তকী সিম্‌কীকে নিয়ে বিশ্বজয়ে বাহির হলেন।

আমেরিকান তরুণী লা-মেরি (রাসেল মেরিওয়েদার হিউজেস্) নৃত্য শিক্ষা করতে এলেন ভারতে। সাত বৎসর ধরে এদেশের নৃত্য তিনি শিক্ষা করলেন। লাহোরে ও দিল্লীতে তিনি কথক-নৃত্য শিক্ষা করলেন, আর দাক্ষিণাত্যে ভরতনাট্যম্। বর্মী, জাপানী, আরবীয় ও স্পেনীয় নৃত্যে তিনি দক্ষতা লাভ করেন। কিন্তু হিন্দু-নৃত্যের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯৪০ সালে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে হিন্দুনৃত্য শিক্ষাদানের জন্য নিউইয়র্কে নাচের স্কুল খোলেন। হিন্দু-নৃত্য

সম্বন্ধে রচনা করেছেন মূল্যবান গ্রন্থ—The Gesture Language of Hindu Dance"। হিন্দু-নৃত্যে দীক্ষা

প্রাচ্য নর্তকীরূপে—লা-মেরী

দিচ্ছেন শতশত অ্যামেরিকান তরুণ তরুণীকে। শুধু তাই নয়, হিন্দুনৃত্যের মুদ্রা ও অঙ্গিকের সাহায্যে তিনি অনেক অভারতীয় নৃত্যেরও রচনা করেছেন। নৃত্যরূপ দিয়েছেন কোন কোন খৃষ্টীয় ও ইহুদি সঙ্গীতের। ১৯৪৫ সালে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন নিউইয়র্কে। তাঁর নৃত্য দেখে অ্যামেরিকান দর্শকেরা হিন্দু-নৃত্যের সৌন্দর্য নূতন করে অনুভব করতে শিখল।২

ভারতীয় নর্তক রামগোপাল, মৃণালিনী, শিবরাম, প্রিয়গোপাল, রাগিণী প্রভৃতি ইউরোপ ও অ্যামেরিকার হিন্দু-নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিখ্যাত নর্তকী রাগিণীর কৃষ্ণ-নৃত্য, অপ্সরী-নৃত্য ও বীর-নৃত্যে সমগ্র অ্যামেরিকা মুগ্ধ হয়েছিল।

২। "To see the Hindu dance is to experience an awakening to the existing beauty which has been hidden from us by our haste."

এই প্রবন্ধের চিত্রাবলী Mr. Walter Terry রচিত ও Harper & Brothers, Publishers, New York কর্তৃক প্রকাশিত The Dance in America নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

এখানে রাত্রি আসে

শৈলজানন্দ রায়

এখানে রাত্রি আসে শিওলের ডালের ফাঁকে
স্তাওড়ার ঝোঁপে ঝোঁপে ঝিঁঝিঁর ডাকে
এখানে রাত্রি আসে ঝিলিমিলি নদীর মতন
আঁধারের রূপ দেখে অভিসারী বাউলের মন।
এখানে রাত্রি আসে নীড় ফেরা পাখীদের গানে
হাসি মুখ তারা বৌ-বসে আকাশ সোপানে,
এখানে রাত্রি আসে ঘাস বনে আলপথ ধরে
সুস্থ নিদ্রায় রত কিষাণের স্বপ্ন বাসরে।

এখানে রাত্রি আসে রাখালিয়া বাঁশীর সুরে
গোধূলি ছায়া ম্লান সোনালী ধান ক্ষেত জুড়ে
এখানে রাত্রি আসে ধান শীষে মধুপের নাচে
ফড়িং নৃত্য তালে তমসার পরশ যাচে।
এখানে রাত্রি আসে বেদানিয়া মেয়েটির চোখে
আঁধার ঘর কোণে দীপজ্বলা সন্ধ্যা আলোকে,
এখানে রাত্রি আসে অভিসারে লাল মাটি পথে
যখন চলেছে মেয়ে প্রিয় মুখ দরশন পেতে।

সপ্তম সুর

শ্রীকানু রায়

[খ্যাতনামা ইংরেজী লেখক Robert Barr-এর লেখা An Alpine Divorce অবলম্বনে। যদিও তিনি স্কটল্যাণ্ডবাসী তাহলেও তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে স্কটল্যাণ্ডের বাইরে। কানাডায় লেখাপড়া শিখেছেন, কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন। Detroit Free Press পত্রিকায় তিনি Luke sharp ছদ্মনামে নিয়ে লিখতেন। এই নামেই তিনি সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত। ১৮৮১ সালে তিনি ইংলণ্ডে চলে আসেন। এখানে এসে জেরোম কে জেরোম প্রভৃতি খ্যাতনামাদের সাথে মিলিত হয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা আছে। ফ্রেঞ্চ আর উপন্যাসই তিনি ঐ সময়ে রচনা করেছেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সাল যথাক্রমে ১৮৫০ ও ১৯১২ খৃঃ]

এক একটা লোক থাকে যাদের জীবনে মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই। তাদের সব কিছুই চরম, সব কিছুই চূড়ান্ত। জীবনের পথে চলতে গেলে প্রত্যেকটা মানুষকেই কোন না কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, যার সংগে হয়তো তার মতের কোন সংগতি নেই—মিল নেই। সে সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটা আপোষ রফা, অন্ততঃপক্ষে মধ্যবর্তী মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য পথে চলাই বিধেয়। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদের সুর সব সময়েই সপ্তমে বাঁধা থাকে। যেমন মিষ্টার জন বডম্যান। অবশ্য তাঁর এই মেজাজও খুব বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করতনা—যদি না তিনি এমন এক মেয়েকে বিয়ে করতেন—যার মেজাজ, দুঃখের বিষয় ঠিক তাঁরই মতন।

সত্যি সত্যি বিয়ের ব্যাপারে দৈবই প্রবল। এই পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী—তার মধ্যে কজনেরই বা সুযোগ ঘটে খুব বেশী লোকের সাথে পরিচিত হবার? আর যদিই বা কোন পুরুষ তার পছন্দ মত মেয়ে খুঁজে পেল, স্ত্রী হিসাবে তারা সব সময়ে মনের মত হয় না। মেয়েদের বেলাও অবশ্য এই কথা প্রযোজ্য। প্রথমে মতান্তর তারপরে মনান্তর। শেষটায় সমস্ত দাম্পত্য-জীবনটাই বড় বিরক্তিকর, বড় দার্শিক হয়ে দাঁড়ায়।

বডম্যান দম্পতিরও ঠিক তাই ঘটেছিল। আর তার ফলে বিবাহিত জীবনের রঙীণ স্বপ্নাবেশটা আস্তে আস্তে কেটে যাবার পর তাঁরা একে অন্যের প্রতি ক্রমশঃ বিরক্ত হতে লাগলেন। সেই বিরক্তিটাই ধীরে ধীরে রূপ নেল ঘৃণায়, তীব্র তীক্ষ্ণ নির্মম ঘৃণায়। স্নেহ নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই। মনের সুর গেছে কেটে, একত্র থাকার প্রয়োজনটা মিথ্যে হয়ে এসেছে তাই তাঁরা একটি কামনাই করলেন। বিচ্ছেদ। হ্যাঁ, বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইংলণ্ডের আইনগুলি বড় অসুবিধাজনক। শুধু মতের বা মনের অমিল হলেই চলবে না। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজনকে হতে হবে নিষ্ঠুর, নির্মম অপরাধী, আর অত্যাচারী। একমাত্র তখনই আইন বিচ্ছেদকে সমর্থন জানাবে। দুঃখের বিষয়, অতি বড় ধূর্ত চোখেও কেউ কোনদিন মিসেস বডম্যানের নিষ্পাপ জীবনে এতটুকু কলংকের ছাপ দেখতে পায়নি। আর মিষ্টার বডম্যানও সামাজিক ভাবে বড় ভাল মানুষ। যে কোন সৎ নাগরিকের চেয়েও সৎ এবং সভ্য। যদি মিষ্টার বডম্যান দরিদ্র হতেন তাহলে হয়ত অর্থের অভাবের জন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু তা'ও হবার নয়। কোন দিকেই কোন পথ খুঁজে পেলেন না তিনি। অথচ প্রতিনিয়ত এই অশান্তি এটাও অসহনীয়। এই ভাবে ভাবতে ভাবতে কখন যে খুন করবার কথা মনে

এল তা' বডম্যান নিজেও জানে না। খুনই যোগ্যতম একমাত্র পথ। বোকা নন তিনি। সাধারণভাবে খুন করলে চলবে না। এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে মনে হবে···অন্ততঃ লোকে যাতে ভাবতে পারে সেটা দুর্ঘটনা। এমন কি হয়না? হৈহামেশা দুর্ঘটনায় পড়ে কত লোকের স্ত্রী মারা গেছে। খবরের কাগজে এই জাতীয় কত ঘটনাই তো পড়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও যদি ঐ রকম কোন একটা দুর্ঘটনায় মারা যান তবে লোকের সন্দেহ করবার কী আছে।

হঠাৎ একদিন তিনি স্থির করলেন সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবেন। মিসেস বডম্যানও নির্বিবাদে বাক্স গুছোলেন, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে আনালেন, বিছানা বাঁধলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর উপস্থিতি বডম্যানকে বড় বিরক্ত করে তোলে। কিন্তু স্বামীর প্রতি তিনি নিজেও কম বিরক্ত নয়। স্বামীর প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা ছাড়া তাঁর আর কিছু নেই। বড় তীব্র, বড় তীক্ষ্ণ তাঁর নিজস্ব এই ঘৃণা। তাঁর মেজাজের সুরও কোনদিন সপ্তম থেকে পঞ্চমে নামলো না। অথচ স্বামীর সাথে তিনি অনায়াসে সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণের সংগী চলেন।

জন বডম্যান তাঁর পরিচিত একটা হোটেলে এসে উঠলেন। এই হোটেল থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা নির্জন স্থানের কথা তাঁর মনে পড়ল। একদিন খুব ভোরবেলা একা একা বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই স্থানটাতে চলে গেলেন। বড় নির্জন এই অঞ্চলটা। আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। চারপাশে প্রচুর গাছপালা, একটা পাহাড়ের আড়ালে দূরের হোটেলটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। উপত্যকার উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথটা এগোতে এগোতে এখানে এসে একটা বড় পাথরখণ্ডের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তারপর—তারপরই অন্ধকার অতলস্পর্শী একটা খাদ। খাড়া পাহাড়ের ঢালদেশটার দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। মাইল খানেক কি তার চেয়েও বেশী গভীরে নেমে গিয়েছে। শুধু ক্ষণিকের দৃষ্টিতেই যেন বুকের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। এটাই উপযুক্ত স্থান, মনে মনে বললেন জন বডম্যান। কালকে ভোরবেলাতেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা ব্রেকফাস্টের পর বডম্যান তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি একটু বেড়াতে বেরুব। তুমি যাবে?

যাব, ঘাড় নাড়লেন মিসেস বডম্যান।

বেশ। তাহলে ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে নাও।

তাই হবে। ন'টার আগেই আমি তৈরী হতে পারব।

পথে তাঁরা একটা কথাও বললেন না। সারাটা পথ বডম্যান শুধু পরিকল্পনাটার কথা ভাবতে ভাবতে চললেন। সেই বড় পাথরখণ্ডটার উপরে দু'জনে বসবেন, গল্প করবেন। তারপর গল্প করতে করতে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। কিন্তু পড়বার সময় সে যদি জড়িয়ে ধরে, কিংবা শার্টের কলারটাও চেপে ধরতে পারে তাহলে তো তাঁকেও—ভাবতেও কেমন ভয় লাগে। মাইলখানেক খাড়া খাদ। তলায় চাপ চাপ অন্ধকার। কাজটা যদি নির্বিবাদে সারতে পারেন তাহলে বেশ হয়। যদি চিৎকার করে ওঠে কোন লাভ হবে না। কিন্তু অক্ষম আর্তনাদের শব্দ বারবার পাহাড়ের গায়ে নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরবে। সাহায্য করবার জন্য কেউ ছুটে আসবে না। হায়রে মূর্খ নারী, কিছু জানে না, কিছু বুঝতেও পারেনি!

পাথরটার খুব কাছাকাছি এসে হঠাৎ মিসেস বডম্যান থমকে দাঁড়ালেন। একটু যেন কেঁপেও উঠলেন।

কি হয়েছে? বডম্যান জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

জন! কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন মিসেস বডম্যান। আজ অনেকদিন পরে তিনি স্বামীর ক্রিশ্চিয়ান নাম ধরে ডাকলেন, আচ্ছা জন—তোমার কি মনে হয়না তুমি যদি গোড়া থেকেই আমার প্রতি একটু সদয় হতে তাহলে হয়ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়াত না?

বডম্যান স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই জবাব দেন, এখন আর এসব কথার কোন মানে হয়না।

একদিন হয়ত আমি এর জন্য দুঃখিত হব। আর তুমি?

মনে হয়না।

ও, তাই নাকি? আস্তে আস্তে মিসেস বডম্যান তাঁর আসল মেজাজে ফিরে গেলেন, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছিলাম। মনে রেখো।

জন বডম্যান একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই স্ত্রীর দিকে তাকান। তারপর শুষ্কভাবেই বলেন, তার মানে? তুমি আমাকে সুযোগ দিচ্ছিলে? আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি না। মানুষ যাকে ঘৃণা করে তার কাছ থেকে কিছু নেয় না। আমার মনের কথা সবই তোমাকে খুলে বলছি। একদিন আমরা এক পবিত্র আনন্দময় বন্ধনের মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি—তুমিই তাকে স্থায়ী হতে দিলে না।

ঠিকই বলেছ তুমি, পাথুরে জমির উপরে চোখ রেখে মিসেস বডম্যান উচ্চারণ করলেন···হ্যাঁ এমন একদিন ছিল যখন আমাদের মনের সুর আলাদা হয়নি।

পাথরটার একেবারে ধারে এসে অস্থির পদবিক্ষেপে হাঁটতে লাগলেন তিনি, আর বারবার—যেন নিজের মনেই কথা বলছেন এমনি ভাবে ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ করেন। তাঁকে যেন কেমন খাপছাড়া কেমন অস্বাভাবিক লাগে। হাত দুটো বারবার মুঠো করছেন আবার খুলছেন, কী এক অস্থির উদ্দামতা তাঁকে বুঝি পেয়ে বসেছে। জন বডম্যানের কেমন যেন ভয় লেগে গেল। তিনি বলেন,অমন করে পায়চারী করছ কেন? এস, আমার পাশে এসে স্থির হয়ে বস। তোমাকে বুনো জানোয়ারের মত মনে হচ্ছে।

কি বললে, জানোয়ার? মিসেস বডম্যান অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন, হ্যাঁ আমি জানোয়ার। আমি বুনো। একটু আগে তুমি বলেছ তুমি আমাকে ঘৃণা কর। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কেননা আমি জানি তুমি মূর্খ, বর্বর। তুমি জানো না আমি তোমাকে তার চেয়ে বেশী ঘৃণা করি। তুমি হয়ত শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাই ভাবছ, আমি নিশ্চিত জানি—এর চেয়ে কোন মারাত্মক চিন্তা তোমার মনে স্থান পাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি! খুন—হ্যাঁ খুনের কথাই আমি ভাবছি।

জন বডম্যান ভয় পেয়ে পাথরটাকে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর মনের গোপন অপরাধের ছবিটা বড় করুণ হয়ে ভাসছে।

আমি সবাইকে বলেছি—মিসেস বডম্যান আবার সুরু করেন, তুমি আমাকে খুন করবার মতলবেই স্যাইজার-ল্যাণ্ডে নিয়ে এসেছ।

আশ্চর্য। জন বডম্যান প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, এমন একটা মিথ্যে কথা কী করে তুমি বলতে পারলে?

কেন বলেছি জান? তোমাকে ঘৃণা করি বলে। তোমার উপর প্রতিশোধ নেব বলে। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময়েও আমি ম্যানেজারকে সব কথা বলে এসেছি। তিনি আমাকে তোমার সাথে আসতে নিষেধও করেছিলেন। কিন্তু আর কয়েক মুহূর্ত পরেই হোটেল থেকে দু'জন লোক এখানে উপস্থিত হবে। তাদের বোলো, মিসেস বডম্যান হাঁপাতে থাকেন, তাদের বোলো যে দুর্ঘটনায় তোমার স্ত্রী মারা গেছে।

এই কথা বলে তিনি স্কার্ফটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নেন। তারপর—

ও কি করছ? চিৎকার করে ওঠেন বডম্যান।

কিন্তু তার আগে—অনেক আগেই মিসেস বডম্যান সেই খাদের অতলস্পর্শী অন্ধকারে ঝাঁপ দিলেন। ক্ষণিকের মধ্যে তলিয়ে গেলেন, হারিয়ে গেলেন তাঁর স্বামীর চোখ থেকে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, বেদনায় বোবা হয়ে গিয়েছেন জন বডম্যান। সেই অতলান্ত অন্ধকার থেকে চোখের দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে পেছনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন সত্য মিথ্যা সবই এখন নিরর্থক।

কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিনয়ঃ কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়ঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলোছো কি মুড়িসুদ্ধ ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমলঃ ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। খাঁচ খাঁচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক তফাতে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমলঃ মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদাঃ হ্যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে)ঃ কি! কি!!

বিনয়ঃ বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর

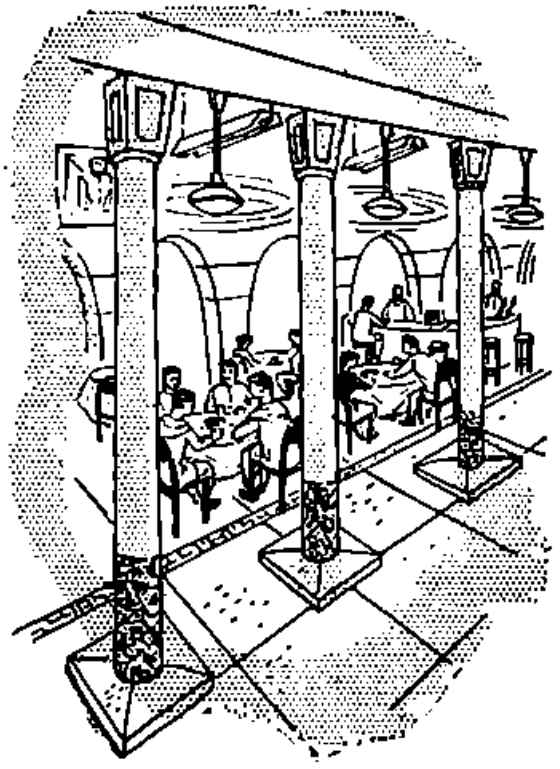

বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদাঃ সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

এ ধোঁয়া কালি সিগারেটের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে।

ভুতোদা: কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সব ছেলে একটু নাছটা ফোটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।

বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। ফেঁসায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি যে ছাড়েন।

বিনয়: কি ব্যাপার?

ভুতোদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলে! হোত আমাদের মধুপুর মুনী চেম্বাকাঠ নিয়ে পেটাতো।

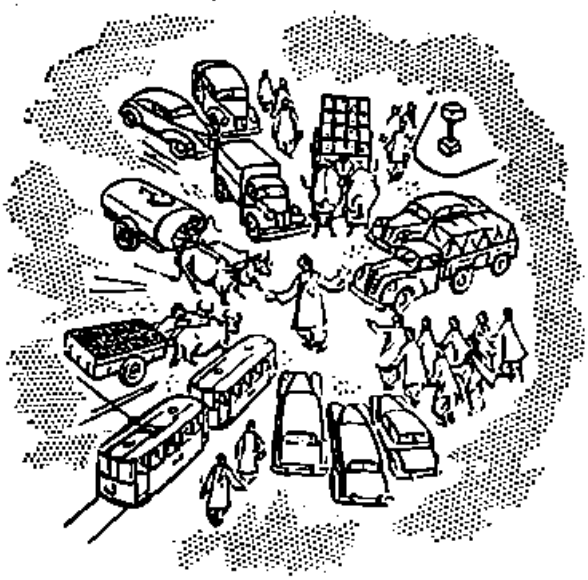

বিমল: ঝুনই না কি করলে?

ভুতোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী সেই 'ডালডার' টিনে হাতাটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় সীলকরা টিনে। খোলা মাজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায়?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা?

ভুতোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা। মধুপুরে বিশিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' তো আমরা কিনে থাকি।" ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে। বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না খাবেন কিন্তু। কেনেন যত খোলা কিনিস যাতে ধুলোময়লা আর নাছি বসে" বলে গটগট করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি) বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন ফেঁসায় জব্দ করছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা।

বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা কি ডায়েট—হাঃ হাঃ

ভুতোদা: হাসির কি হোল?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই? বিনয়: ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ! বাজারকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস? বিমল: আপনি এই রেষ্টুরেণ্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাস করুন। বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হাঁ, ওরা ঠিকই বলছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র সীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: সীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা নিরুপায় হয়ে গেল।

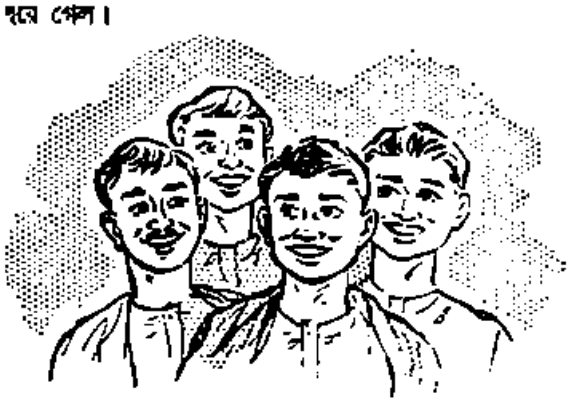

DL. 466B-X62 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

পুস্তক ব্যবসায় ও বিক্রয় কর—

ত ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় যখন সমস্ত অর্থাভাবে বিপন্ন হয়, সে সময়ে অন্যান্য বহু জিনিষের চিত পুস্তকের উপর বিক্রয় কর ধার্য্য করা হয়। সে সময়ে দেশের অবস্থা সাধারণ ছিল না : যুদ্ধ পরিচালনা কার্য্যে সরকারের অর্থের প্রয়োজন ছিল—কাজেই সে সময় ঐ বিক্রয় করের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইলেও সে প্রতিবাদ সফল হয় নাই। তাহার পর পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দিবার জন্য ১৯৪২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এক আইন করেন। সে আইনে একটা ফাঁকী থাকিয়া যায়—যে সকল রাজ্যে তখন বিক্রয় কর প্রচলিত ছিল, সে সকল রাজ্যে পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দেওয়ার স্বাধীনতা রাজ্য-সরকারগুলিকেই দেওয়া হইয়াছিল। উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে পুস্তক বা পত্রিকার উপর বিক্রয়কর নাই। পশ্চিমবঙ্গে বহু আন্দোলন সত্ত্বেও পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। শুধু ধর্ম পুস্তক ও প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তকের উপর আংশিক-ভাবে বিক্রয়-কর রহিত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় কর্তৃপক্ষ ধর্ম-পুস্তক বলিতে শুধু রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধরিয়াছেন। তাহা ছাড়া যে সকল পুস্তকে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা থাকে, সেগুলির উপর বিক্রয় কর দিতে হয়। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক বলিতেও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তকগুলিই শুধু ধরা হয়। বহু নূতন ধরণের প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তক প্রকাশিত হইলেও আমরা এখনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়াইয়া নিজদের শিক্ষাকার্য্য করিয়া থাকি। দুঃখের কথা, ঐ সকল পুস্তক বর্তমানে সরকারী অনুমোদন লাভ না করায় বইগুলি ক্রয়ের সময় তাহার উপর বিক্রয় কর দিতে হয়। সাময়িকপত্রগুলি দেশের জনগণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারে যে বিরাট কাজ করে, সে কথা সকলে মুখে স্বীকার করিলেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-সচিব সেগুলির উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা বলেন, পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দিলে তাঁহাদের আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে। এ বিষয়ে এক বৎসর পূর্বে ১৯৭৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ঐ বৎসর ২১শে জুন পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সমিতিও ঐ বিষয়ে পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক নিবেদন প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় গত ১৩ই জানুয়ারী পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সমিতির এক উপ-সমিতি আবার এ বিষয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহা সকলের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সমিতি এ বিষয়ে সরকারকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলে সরকারের আয় না কমিয়া বরং বাড়িয়া যাইবে। প্রকাশকদিগকে কাগজ কিনিবার সময় কোন বিক্রয় কর দিতে হয় না। সরকার যদি কাগজের কল-গুলি হইতে কাগজ বিক্রয়ের সময় বিক্রয়কর গ্রহণের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পুস্তকের উপর বিক্রয় করের বাবদ ১০ লক্ষ টাকার স্থলে তাঁহারা ২২ লক্ষ টাকা পাইতে পারেন। এ ব্যবস্থা হইলে কাগজের বাজারে বর্তমানে যে কাটকাবাজি ও দুর্নীতি চলিতেছে, তাহাও আংশিকভাবে কমিয়া যাইবে। বর্তমানে মুদ্রিত পুস্তক ও সাময়িক-পত্রাদির উপর বিক্রয় কর লওয়া হয়। কিন্তু সরকারের এ কথা অজ্ঞাত নয় যে, যে পরিমাণ পুস্তক ও সাময়িকপত্র ছাপা হয়, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—সেগুলি সম্বন্ধে সরকার কোন কর পান না। এ অবস্থায় কাগজের কলে উৎপন্ন কাগজের উপর

বিক্রয় কর ধার্য্য করা হইলে কেহই কর হইতে রেহাই পাইবেন না।

এ বিষয়ে আরও একটি বিবেচনার যোগ্য বিষয় আছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে পুস্তকাদির উপর বিক্রয় কর না থাকায় সে সকল রাজ্যে পুস্তকের ব্যবসা যে পরিমাণে সমৃদ্ধতর হইতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে পুস্তকাদির ব্যবসা সেই পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে। যে কোন ক্রেতা কলিকাতার দোকানে বই না কিনিয়া পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের যে কোন দোকান হইতে বই কিনিলে বিক্রয়কর বাবদ শতকরা ৭ টাকা প্রদান হইতে রেহাই পাইয়া থাকেন।

আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা, বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিক্রয় করের জন্য কলিকাতার বাজারে পুস্তক ও সাময়িকপত্র ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক ব্যবসায়ী কারবার বন্ধ করিয়া দিতেছেন—ফলে বহু লোক বেকার হইয়া যাইবে। যখন মিলজাত কাগজের উপর বিক্রয় কর দিতে পুস্তক-ব্যবসায়ীদের আপত্তি নাই—তখন পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ কেন যে ঐ বিক্রয় কর না ধরিয়া পুস্তাদির উপর বিক্রয় কর গ্রহণের ব্যবস্থা করেন, তাহা বুঝা যায় না। উহা করিলে সরকারের আয় কমিয়া না গিয়া বরং দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মত দরিদ্র দেশে জ্ঞান-বিস্তারের উপর এই প্রত্যক্ষ কর শুধু অন্যায় নহে, দৃষ্টিকটুও বটে। ভারতের প্রায় সকল রাজ্যে পুস্তকাদির উপর বিক্রয় কর যখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন আমাদের বিশ্বাস, বিষয়টি সম্যকভাবে অনুধাবন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষও ঐ কর সত্বর তুলিয়া দিবার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

চাউলের সঙ্কট—

যদিও বার বার কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করিতেছেন যে এবার ভারতবর্ষে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে ফলে ১৯৫৯ সালে ভারতের কোথাও খাদ্যাভাব হইবে না, কিন্তু আমরা প্রত্যহ সকালে লোক মুখে জানিতে পারি যে কোথাও ন্যায্য মূল্যে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে—ফলে অধিকাংশ লোক হয় ন্যায্য মূল্যে অথাদ্য চাউল কিনিতে বাধ্য হয়, না হয় কালোবাজারে ২০ টাকার চাউল ২৮ টাকা মণ দিয়া কিনিয়া দুর্ভিক্ষ করে। ধনী ব্যবসায়ীরা চাউল কিনিয়া জমাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু খুচরা দোকানে পর্য্যাপ্ত চাল দিলে সে চাল কালোবাজারে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক নহে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সাধারণ লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল কিনিবার অর্থ নাই। নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিষই মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা ঠিক সময় মত ক্রয় করিতে পারে না—এ অবস্থায় চাউলের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিলে লোককে আর চালের জন্য চোরাবাজারে ছুটাছুটি করিতে হয় না। ন্যায্যমূল্যে চাউল বিক্রয়ের দোকানের সংখ্যাও প্রয়োজনানুসারে অধিক নহে—তাহার ফলে সাধারণ মানুষকে চাউল কিনিতে অনেক সময় ঘুরে যাইতে হয়। সপ্তাহের মধ্যে যে দিন সে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, সে দিন সে দোকানে যাইয়া দেখে—দোকানে চাউল নাই। এ অবস্থার জন্য দায়ী কে, আমরা জানি না। অনেক সময় ২ দিন ঘুরিয়া ক্রেতা শেষ পর্য্যন্ত অখাদ্য চাউল কিনিতে বাধ্য হয়। প্রতিদিনের সকালে সংবাদপত্র খুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, কোন না কোন অঞ্চলে চাউলের অভাবে লোক কষ্ট পাইতেছে। ফলে কালোবাজারে ২৮।৩০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে বাধ্য হইয়া থাকে। চাউল ও আটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ—তাহার ব্যবস্থা না করিলে গৃহস্থ গৃহে বাস করিতে পারে না—কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই চাউল ও আটার সংস্থান করাই মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। মাথা পিছু সপ্তাহে দেড় সের চাল ও এক সের আটাতে কোন সাধারণ বাঙ্গালীর কুলায় না—সে অবস্থাপন্ন হইলে কালো-বাজারে যায়, নচেৎ অন্তরূপ সুলভ অখাদ্য খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে। আমরা জানি, শীতকালে তরিতরকারী সুলভ বলিয়া বহু দরিদ্র পরিবার ভাত কম খাইয়া অধিক তরকারী খাইয়া দিন যাপন করে। ২।১ মাসের মধ্যে যখন তরকারীর দাম বাড়িবে, তখন তাহাদের না খাইয়া থাকিতে হইবে। সে জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চাউলের উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। একদিকে কাটকাবাজী ব্যবসায়ী, অন্য দিকে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী—এই উভয় পক্ষের

অন্যায়ভাবে দেশদ্রোহী আর কতদিন বন্ধ করিবে? সহরের নানা স্থান অগ্নিকাণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বেরুবাড়ী সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯৫৮ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের একাংশ নেহরু-নুন চুক্তিতে ছিটমহল বদলের সময় অন্যায় ভাবে ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হয়। ঐ স্থানে পাকিস্তান হইতে আগত বহু সহস্র উদ্বাস্তু পুনর্বসতি লাভ করিয়াছিল। সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সকল দলের সদস্যগণ একযোগে নেহরু-নুন চুক্তির ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া ঐ অঞ্চলের হস্তান্তর বন্ধ করিতে শ্রীনেহরুলাল নেহরুকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ঐ অঞ্চল হস্তান্তরের সময় শ্রীনেহরু পশ্চিমবঙ্গের কাহারও সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন কলিকাতায় আসিয়া এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত কথা বলিয়া গিয়াছেন—তিনি নাকি বলিয়াছেন যে এখন ঐ অঞ্চল হস্তান্তর বন্ধ করা শ্রীনেহরুর পক্ষে অসম্ভব—তাহা করিতে গেলে উঁহার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিবে। ঐ সংবাদ পাইয়া ঐ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়াছেন ও দলে দলে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানের সন্ধান করিতেছেন—যাহাদের অন্য স্থানে যাইয়া বসবাসের সুবিধা আছে, তাহারা অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। দেশ বিভাগের ১১ বৎসর পরে এই ভাবে ছিটমহল বদলের ব্যবস্থা হওয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যবস্থার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল নেতা একমত, সে ব্যবস্থায় শ্রীনেহরুলাল নেহরুর আপত্তি হইবে কেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। শুনা যায় এ বিষয় লইয়া শ্রীনেহরুর সহিত ডাক্তার রায়ের মত-ভেদের জন্যই ডাক্তার রায় নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে যান নাই। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের-সভাপতি-প্রস্তাব বিষয়েও কেন নীরব, তাহার কারণ সম্বন্ধে লোক বেরুবাড়ী সমস্যার কথাই আলোচনা করিতেছে। ডাক্তার রায় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব—তবে আমাদের বিশ্বাস, ডাক্তার রায় যদি এ বিষয়ে একটু কঠোর মনোভাব লইয়া সমস্যার সমাধানে শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে তখনই পশ্চিমবঙ্গের সম্মিলিত মনোভাব উপেক্ষা করা শ্রীনেহরুর পক্ষে সম্ভব হইবে না।

দণ্ডকারণ্য—

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে স্থান সংকুলান না হওয়ায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র রাজ্যের সংযোগ স্থলে এক প্রকাণ্ড জমীতে খুব কম লোক বাস করে। সে স্থানের স্বাস্থ্য ভাল, স্থানটি নদীবহুল ও উর্বর, তথায় যেমন বহু অরণ্যজাত সম্পদ আছে, তেমনই বহু মূল্যবান খাতব পদার্থ আছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে একটু দূরবর্তী হইলেও তথায় সহজে ২০ লক্ষ বাঙ্গালী যাইয়া বাস ও জীবিকার উপায় লাভ করিবে। পশ্চিমবঙ্গের একদল বামপন্থী নেতা বাঙ্গালী বাস্তুহারাকে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছে। যদি বাঙ্গালী তথায় না যায়, তবে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ হইতে বহু লোক আসিয়া ঐ স্থানে বাস করিবে—তাহার ফলে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে পশ্চিম বাংলায় থাকিয়া বাসের জমী, চাষের জমী ও জীবিকার উপায়ের অভাবে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিয়া মৃত্যুপথের যাত্রী হইতে হইবে। এ কথা সর্বত্র প্রচারের ফলেও বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা কেন দণ্ডকারণ্যে যাইতে ভয় পাইতেছেন তাহা বুঝা যায় না। সুখের কথা গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ৯২টী পরিবারের ২১০ জন উদ্বাস্তু রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ) যাত্রা করিয়াছেন—সেখান হইতে মোটরে ১৩০ মাইল যাইয়া তাঁহারা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রথম ঘাটি করাসগাঁও সহরে পৌঁছিবেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় হইতে দণ্ড-কারণ্য পরিকল্পনা এবং পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নামে একখানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে কয়েকটি মানচিত্র দিয়া ঐ অঞ্চলের সকল তথ্য ও সংবাদ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে যে স্থানে পুনর্বাসন পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার আয়তন ৩০০৫২ বর্গ মাইল—উহা মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা ও উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডি জেলায়

অবস্থিত। আসল দণ্ডকারণ্যের আয়তন ৮০ হাজার বর্গ মাইল, উহার কিছু অংশ উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও অন্ধ্র ও বোম্বাই রাজ্যে পড়িয়াছে। যাঁহারা ঐ অঞ্চল দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের জলবায়ু বাঙ্গলা দেশের মত। তথায় অতি সহজে জল পাওয়া যায়, ফলে চাষের জন্য সেচ এবং শিল্পের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা খুব সহজ হইবে। সেখানকার খনিজ সম্পদ আহরণ করিয়া তথায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। কাজেই খনিজ পদার্থ ব্যবহারের ফলে শত শত বৎসর লোক জীবিকার উপায় পাইবে। সে জন্য আমরা প্রথমাবধি বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে—শুধু উদ্বাস্তু কেন, অপেক্ষাকৃত ধনী, শিক্ষিত, তরুণ বাঙ্গালীদিগকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছি। তথায় যাইলে লোক সহজে অর্থার্জনের উপায় পাইবে। বাঙ্গালী না যাইলে অন্য রাষ্ট্রের উৎসাহী কর্মীরা যাইয়া সে স্থান দখল করিবে—ফলে বাঙ্গালী জাতিকে এই সংকীর্ণ জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিয়া ক্রমে মৃত্যুপথ যাত্রী হইতে হইবে। সে জন্য এখনও আমরা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে দলে দলে যাইয়া দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় ও পুনর্বাসন লাভ করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

দিল্লীতে কবিশেখর

শ্রীকালিদাস রায়—

দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র উদ্যোগে বার্ষিক কবি-সম্মিলন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া এ বৎসর কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় গত ২৩শে জানুয়ারী তথায় যান ও ২৪শে তারিখে কবি-সম্মিলনে যোগদান করিয়া স্বরচিত 'স্বপ্নভূত' কবিতা পাঠ করেন। ১৩টি ভাষার ১৪ জন কবি (হিন্দীর ২ জন) ঐ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ দিন রাত্রিতে হিন্দী অনুবাদসহ কবিতাটি কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতেও প্রচারিত হইয়াছিল। ২৪শে সন্ধ্যায় দিল্লীর বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগী অধিবাসীরা কবি শ্রীবিভূতি-ভূষণ বাগচীর বাসগৃহে কবিশেখরকে এক প্রীতি সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গত বৎসর বাংলা দেশ হইতে কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। খ্যাতিমান ও প্রবীণ বাঙ্গালী কবিগণের এই ভাবে সম্মানদানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার

নূতন সম্পাদক—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন—আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলা-কান্ত ভট্টাচার্য্য কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়ার পর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে শ্রীঅশোককুমার সরকার কার্য্য-ভারগ্রহণ করিয়াছেন। অশোককুমার সাপ্তাহিক দেশ-পত্রেরও সম্পাদক।

গান্ধীজীর অর্থনীতিক ব্যবস্থা—

গত ৩১শে জানুয়ারী মাদুরাই সহরে কেরল, মাদ্রাজ, মহীশূর ও অন্ধ্রের কলেজ অধ্যাপকগণের এক আলোচনা চক্রে গান্ধী স্মারকনিধির সেক্রেটারী শ্রীজি-রামচন্দ্রন বলিয়াছেন—গান্ধীজি যে অর্থনীতিক ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুধু আদর্শবাদী ব্যবস্থা নহে, খুব বাস্তব ব্যবস্থা। তিনি বলেন—গান্ধীজি কখনও যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না—তিনি শুধু এই সর্ত নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, যন্ত্র যেন মানুষকে শোষণের উপায় না হয়। অর্থনীতিক উন্নয়ন যেন নৈতিক উন্নয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। গান্ধীজি যে অর্থনীতির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজির শিক্ষানীতি যেমন দেশ ক্রমে গ্রহণ করিতেছে, অর্থনীতিও সেইভাবে ভারত-বাসী যাহাতে বুঝে ও গ্রহণ করে, ভারত সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা দেশের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের অন্য উপায় নাই।

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি—

শ্রীজহরলাল নেহরুর একমাত্র সন্তান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২রা ফেব্রুয়ারী দিল্লীর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয় কর্তৃক কংগ্রেসের নূতন সভাপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐ পদে নির্বাচিত হইলেন, ৮ই ফেব্রুয়ারী বর্তমান সভাপতি শ্রীইউ-এন-ডেবরের নিকট হইতে কর্মভার গ্রহণ করিবেন ও কংগ্রেসের গঠন তন্ত্রের নির্দেশ মত নিজে ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিবেন। তাঁহার পূর্বে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা—৩ জন মহিলা কংগ্রেস সভাপতি হইয়াছিলেন—ইন্দিরা গান্ধী চতুর্থ মহিলা সভাপতি। তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর।

ডাক্তার তারকনাথ দাস—

খ্যাতনামা রাজনীতিক ও আমেরিকায় ভারতীয় আদর্শের প্রচারক ডাক্তার তারকনাথ দাস সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২৪পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়ার নিকট মাঝিপাড়া গ্রামে ১৮৮৪ সালে তাঁহার জন্ম হয় ও কলিকাতা আর্য্য মিশন ইনিষ্টিটিউসন, স্কটীশচার্চ কলেজ ও টাঙ্গাইল কলেজে পড়ার পর তিনি সন্ন্যাসী হইয়া কিছুকাল ভারত ভ্রমণ করেন। রামদয়াল মজুমদার, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত পরিচয়ের ফলে তাঁহাদের প্রভাবে তারকনাথ প্রভাবিত হইয়া ১৯০৭ সালে তিনি জাপানে যান ও একবৎসর পরে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় যাইয়া সানফ্রান্সিসকোতে বাস আরম্ভ করেন। সাংবাদিকের কাজ গ্রহণ করিয়া তিনি তথায় ১৯১০ সালে বি-এ ও ১৯১১ সালে এম-এ পাশ করেন। ১৯১৩ সালে আমেরিকার নাগরিক হইয়া ১৯২৪ সালে এক মার্কিণ মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৪—৩১ সালে উভয়ে ইউরোপে বাস করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি আমেরিকায় ফিরিয়া যান ও ১৯৩৮ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য দানের জন্য ১৯৫১ সালে ১৫ লক্ষ ডলার দান করিয়া এক 'দাস ফাউণ্ডেসান' প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৭ বৎসর পরে ১৯৫২ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্য ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অসাধারণ কর্মী ও সাহসী মানুষ তারকনাথ দাস বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে আজীবন যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

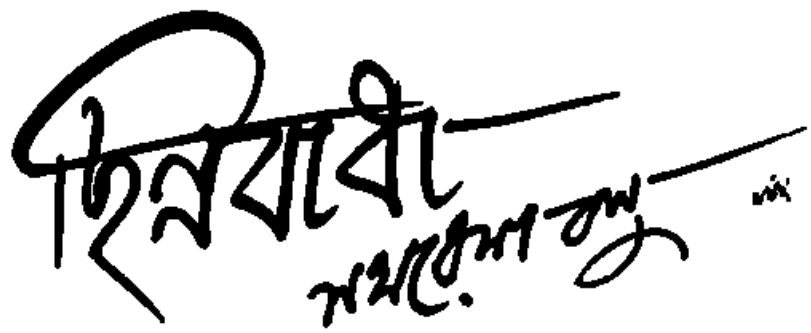

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অভয় মনে করেছিল, তার অসহায় দুরবস্থা বুঝে, অনাথ খুড়ো আবার তার সঙ্গে হেসে কথা বলবে। ডেকে নেবে কাছে। পিঠে চাপড় মেরে হাসবে হা হা ক'রে।

কিন্তু তা হ'ল না। কারখানায় গিয়ে অভয় যখন দাঁড়াল অনাথের কাছে, সে প্রথমে ফিরে তাকায় নি। তারপরে বলেছে, যা, নিজের কাজে লেগে যা।

অভয় বলেছে, অন্যায় হ'য়ে গেছে খুড়ো।

অনাথ ধমক দিয়েছে, থাক্, আর খুড়ো খুড়ো করতে হবে না। খুড়ো ডাকলে তার মান রাখতে হয়।

অভয় বলেছে বোকা বোকা করুণ মুখে, তা' আমি কি তোমার মান রাখি না?

অনাথ মুখ ভেংচে বলেছে, রাখ বৈ কি। একশ গণ্ডা লোকের সামনে খুড়োকে মিথ্যুক ক'রে দিয়েছিস্, বলেছিস্, গান গাইতে পারি না। মান রেখেছিস্ বৈ কি। ওসব বর্দ্ধমানি ন্যাকামো করিস্ না, যা কাজে যা।

অভয় বর্দ্ধমানের ছেলে। অনাথের ভাষায় সেই জন্য অভয়ের ন্যাকামো বর্দ্ধমানি ন্যাকামো হয়েছে।

অভয় বলেছে মুখ চুণ ক'রে, তা কি করব বল। লাজ-লজ্জা ভয় ব'লে জিনিষ তো থাকে। আমি যে-ওপায় হ'য়ে বলে ফেলে দিয়েছি।

অনাথ খিচিয়ে উঠেছে, তবে আর কি, আমার মাথা কিনেছিস্। কেন, এত লাজ লজ্জা ভয় কিসের? শরীলটা তো এ্যাত্তখানি। কাছা নেই পাছায়।

অনাথ খুড়োর খোঁচা বড় তীক্ষ্ণ। জ্বালাটা লেগেছে অভয়ের। বলেছে, এ্যাট্টা আনান টানান দেহা নেই। বেমক্কা খাড়া ক'রে দিলে অতগুলান লোকের সামনে। তা' কি করব আমি?

এর পরে অনাথের আক্রমণ আর একটু কড়া হ'য়ে উঠেছে। বলেছে, হুঁ, মস্ত গাইয়ে তুমি। দশ দিন আগে তোমাকে পত্তর দিয়ে নেমন্তন্ন করতে লাগবে, আপনি হাঁজে ক'রে নিয়ে আসতে হবে, তবে না! যা ভাগ এখন।

আর কথা বলতে পারেনি অভয়। গানের খোঁটা বড় খোঁটা। অভয়ের মানে লেগে গিয়েছে। কষ্টও হয়েছে প্রাণে। তা' ব'লে এত কথা, এমন কথা বলবে খুড়ো? বড় বড় ঠ্যাং ফেলে সে নিজের ডিপার্টে চলে এসেছে। কারুর সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও বলেনি।

দু'একজন ঠাট্টা ইয়ারকি করতে গিয়ে, অভয়ের গরম মেজাজ দেখে, আর মুখ খারাপ শুনে অবাক হ'য়ে গিয়েছে। মেজাজ গরমটা অবিশ্যি বা মানতে পেরেছিল সবাই, অভয়ের মুখ খারাপ করা শুনে সবাই খ। আর মজাও পেয়েছে, তার মুখ খারাপ শোনার জন্যেও উস্কে দিয়েছে অনেকে।

শেষে মনের কথাটা বলেছে অভয় হরি মিস্তিরির কাছে।

হরি মিস্তিরি ফোগলা দাঁতে, গোঁফ ফুলিয়ে হেসেই বাঁচে না। বলেছে, অনাথ রাগ করেছে তোমার 'পরে, তাতে আবার তুমি মন খারাপ করেছ?

অভয়—বড় যে কিটিরে কিটিয়ে বলেছে সে।

অনাথের রাগ নেয়নি অভয়।

হরি মিস্তিরি যেন চারী মজা পেয়েছে। বলেছে, আরে ধু-র! অনাথের রাগ, তাও আবার তোমার 'পরে। ওটা রাগ নয়-রে খুড়ো, রাগ নয়। তোর ওপরে অভিমান হয়েছে।

—অভিমান ক'রে, অমন অপমান করলে ?

—হ্যাঁরে। তোকে যে বড় ভালবাসে গো। অনাথের সত্যিকারের রাগ কি ওরকম নাকি ? আরে বাবা !

ও সত্যি সত্যি রাগ করলে, মিলের ম্যানেজার ওপর-শিবের সাহেব পর্যন্ত পেরমাদ গোণে না ? সে তো আর যেমন তেমন রাগ নয়। মহাদেবের মতন ?

—মহাদেবের মতন ?

—হাঁ। গেল বেচল্লিশ সালে সেই রাগ দেখেছিলুম আমরা। অনাথের এক সাকরেদ, ব্যাচাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল মিলের দারোয়ানেরা। তখন কলকাতাও খুব গুলীগোলা চলছিল। অনাথ কারখানার বাইরে খাড়া হ'য়ে আমাদের ডাক দিলে। বললে, সব বেইরে এস। আমরা সব বেইরে এলুম। এসে দেখলুম, অনাথ নয়, আগুনের শিস্। সেই আগুন আমাদের গায়েও লাগল। অনাথ বললে, 'দারোয়ানেরা লেবার অফিসারের চর। শলা-পরামর্শ ওখেনেই হয়েছে। লেবার অফিসারটাকে আমরা ছারখার ক'রে ফেলব। মেরে ফেলব অফিসারটাকে। আর দারোয়ানদের কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে দেব গঙ্গায়।'

—তাই হ'ল ?

—হুকুনি। আমরাও রেগে গেছলুম। অনাথের কথা শোনামাত্র লেবার অফিসটাকে একেবারে ভেঙে ফেললুম আমরা। কিন্তু লেবার অফিসার পালিয়ে গেছল আগেই। মার খেয়ে মরেছিল শুধু শুধু বাবুরা। দরোয়ানরা সারা তল্লাটে ছিল না। অনাথ আমাদের বললে,'সায়েবদের কুটি ঘিরে ফেল !' ঘিরে ফেললুম। মেমসায়েবরা চেঁচা-মেচি চীৎকার ছুড়ে দিলে। অনাথ বললে, 'কুটি তল্লাশী ক'রে ছাখ, দরোয়ানরা কোথায় আছে।' আমরা তল্লাশী করলুম। পেলুম না কাউকে। ম্যানেজার সায়েব থরথর্ ক'রে কাঁপছিল। ভয়ে পাতলুন খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হল। অনাথ বললে ম্যানেজারকে, 'দরোয়ানদের বার ক'রে দাও, নইলে তোমার কারখানা তুলে ফেলে দেব গঙ্গার জলে।' ম্যানেজারের মুখ চুপ। তবু অনাথের কাছে এসে বললে, 'অনাথ আমি ইংরাজের বাচ্চা, কুট কথা কভি বোলে না। দরোয়ানের খবর আমার জানা নেই।' তা' অনাথ কুটির ওই চকচকে মেঝেয় থুথু থুথু ফেলে বললে, 'থুথু দিই তোমার মত ইংরাজের বাচ্চাকে।' অনাথের মত আমরাও রেগে গেছলুম। আমরাও থুথু ফেলেছিলুম। অনাথ বললে, 'ঝুটার কারবারী আমার খড়াই দেখাচ্ছিস। কোন কথা শুনব না। ব্যাটার খুনীদের চাই।' তখন একে একে সব সায়েবরা এল। এসে বললে, ইমান সে বলছি, আমরা জানি না। দরোয়ানরা ভাগ্ গয়া। কথা দিচ্ছি, সমস্ত দরোয়ানের নোকরি খতম। তাদের আমরা আর ত্রিসীমানায় আসতে দেব না।' আমরা ব্যাচার মড়া নিয়ে মিছিল বার করলুম। ও জায়গায় সমস্ত কারখানায় হরতাল হ'য়ে গেল। আর যত কারখানা ছিল, সব কারখানার দরোয়ানেরা একেবারে মুলুক। কিছুদিন দরোয়ান ব'লে কেউ ছিল না। কিন্তু মাসখানেক বাদেই, সেই পেরথম পুলিশ চুরি ক'রে নে' গেল অনাথকে।

—চুরি ক'রে ?

—হাঁ, চুরি ক'রে রাত দুটোয় চুপি চুপি এসে নে গেছল। নইলে যে হল্লা হ'য়ে যেত, ধরে নিয়ে যেতে পারত না। তা' অনাথকে ধরে নে' গেল ; আমরা ভয় পেয়ে গেলুম। আমরা চুপসে গেলুম, ঠিক শেয়ালের মতন। পুলিশ যেন আমাদের সাহসটাও চুরি ক'রে নে গেল। বাংলা দেশের তাবৎ চটকল আমাদের মিলকে বলে, 'লড়িয়ে মিল।' কেন ? না লড়াই আমরা শুরু করি আগে। এই তোমার শক্ত র‍্যাশান বল, যাগ্‌গিভাতা বল, আর ছুটি বল, আমরা আগে রব তুলেছি। আমরা রব তুলেছি কার কথায় ? অনাথ। অনাথের কথায়। অবিশ্যি অনাথেরও গুরু আছে। সে সব গুরুরা সব লেখাপড়া জানা মস্ত মিগ্‌গজ। তারাও খুব জেল খাটে। কিন্তু সত্যিকারের দুঃখী হল অনাথ। নিজের জন্যে সে কিছুটি রাখে নি। আমরাও সেইমান। অনাথ দু' দুবার জেল খেটেছে। আমরা তার বউ বাচ্চাকে খাওয়াতে পারি নি। রোগে ডাক্তার দেখাতে পারি নি। সব ম'রে গেছে। শুধু তাই ? তার গুরু ঠাকুরা, সেই সব দিগ্‌গজ-দের সঙ্গে মতান্তর হ'য়ে গেল অনাথের। তাঁরা বললেন, 'সাতচল্লিশ সালে আমরা স্বাধীনতা পাইনিকো।' অনাথ বললে, 'হ্যাঁ পেয়েছি। গরমেণ্টটা আমাদেরই গরমেণ্ট।' হুঁ, কথার ওপরে কথা ? অনাথকে দিলে দল থেকে

তাড়িয়ে। আর ব'লে দিলে, অনাথ লোক খারাপ, দালাল। সেই যে শত্রু খেল, আজো তার ঘা শুকোল না। বউ ছেলে-মেয়ে ঘর, সব গেছে। এখন একেবারে ফাঁকা। তবে, দলের লোকেরা আবার ডেকে নে গেছে অনাথকে। বলেছে, 'তোমার কথাও সত্যি অনাথ। গরমেণ্টটা এ দেশের স্বাধীন গরমেণ্ট।' তখন অনাথ বললে, 'হাঁ, স্বাধীন গরমেণ্ট, কিন্তু বড়লোকের গরমেণ্ট।' কেন বললে? না, 'দেশের দিকে তাকিয়ে ছাখ।' অনাথের ওই এক কথা। যা বলবে, দেশের দিকে তাকিয়ে বল।

বলতে বলতে হরি মিত্তিরির বুড়ো চোখ দুটি আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে। আপন মনে বলেছে, 'কিন্তু আর তেমন ক'রে কথা বলে না অনাথ। জানিনেকো, আবার কবে ও রেগে উঠবে। ও তো পাগল।

ব'লে ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

অভয়ের অর্থহীন অপচ বিস্মিত চোখের সামনে ভেসেছে অনাথের মুখখানি। বলেছে, আবার কোনোদিন রাগবে?

হরি বলেছে, তা জানিনেকো। দু'বার তিনবার রেগেছে অনাথ। তা' সব জিনিষের তো এ্যাটটা সময় আছে। আবার যখন সময় আসবে, তখন রাগবে। কিন্তু তখন হয়তো আমি আর সম্সারে থাকব নাকো।

অভয়ের মনটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছে। বলেছে, কেন? থাকবে না কেন?

হরি ফোগলা দাঁতে হেসে বলেছে, জন্মালে মরতে হবে না? কিন্তু অনাথের কাছে যে কথাগুলোন শুনেছি, মরবার কালে সেই কথা মনে হবে। আর ওর মুখখানিও মনে পড়বে।

—কোন্ কথা খুড়ো?

হরি মিত্তিরির বুড়ো মুখের লোলরেখা টান টান হ'য়ে উঠেছে। চোখ দুটি উঠেছে চিকচিকিয়ে। বলেছে ফিস্-ফিস্ ক'রে, ওই যে, সেই কথা গো। সব সময় যা বলে পাগলাটা, আমরা একদিন ভালভাবে মানুষের মত বাঁচব। সকলে সমান হ'য়ে যাবে সম্সারে।

বহুবার শোনা কথাটা হরি মিত্তিরির চোখে ও কপালের প্রায় শতাব্দীর সঞ্চিত রেখায় এখনো বিস্ময় জাগায়। বলে, কি আশ্চর্য্য কথা অনাথ বললে যে অবিশ্বেস করতে পারিনেকো। আর কদ্দিন বা বাঁচব। ছেলে নাতীরা রইল, তারা দেখবে। মাথার ওপরে ভগমান তো রয়েছেন। একদিন নিশ্চয় অনাথের কথাটা ফলবে।

এক কথায় কত কথা উঠে গিয়েছে। রাগারাগির কথা ভুলেই গিয়েছে অভয়। অনাথেরই গুরুগিরিতে শেখা জীবনতত্ত্বের কথাগুলি যেন নতুন গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিল তার সামনে। নতুন ক'রে যেন পরিচয় পাওয়া গেল অনাথ খুড়োর।

কিন্তু তবু অভয় থেকে যেতে পারল না অনাথের কাছে। রাগ ক'রে বা মান ক'রে নয়। অনাথ যদি নিজের থেকে ডেকে না নেয় কাছে—তবে অভয় যায় কেমন ক'রে?

তিন দিন পরে, বাজারের মহাজন শরৎদাস এসে ধরল অভয়কে। সঙ্গে সুরীনের ওকালতি। অভয়কে বাজারে গাইতে হবে।

যে কোন বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা পড়লে, বাজারে বারোয়ারী গান বাজনা কিছু না কিছু হয়ই। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোয় সবচেয়ে বেশী গানবাজনার আসর বসে। কয়েকদিন ধরে যাত্রা, কবিগান, কীর্তন চলে। কয়েক বছর ধ'রে, অনেক টাকা খরচ ক'রে, কলকাতার রেকর্ড-রেডিওর গাইয়েদেরও আনা হ'চ্ছে। সেইটাই রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে আজকাল।

অভয় রাজী হল না প্রথমে। মন ভাল নেই। কে শুনবে তার গান? অনাথ খুড়ো তো আসবে না। মুখ ফুটে সেকথা বলল না অভয়!

সুরীন কাকুতি মিনতি করল। শৈলবালাও পীড়াপীড়ি করল জামাইকে। একলা শরৎদাস নয়। বাজারের আরো আরো মহাজনরা এসে ধরল। তারা কোনো কথা শুনবে না। জামাই কবিয়ালের কেরামতিটা তারা একবার দেখতে চায়।

ভামিনী খুড়িও পুকুরঘাট থেকে চেঁচিয়ে দিব্যি দিলে অভয়কে। না গাইলে খুড়ি বড় দুঃখ পাবে। শৈলবালার বাড়িতে সে আসবে না, তাই ঘাট থেকেই বলতে হ'ল তাকে।

নিমি তো মুখ ফুটে কখনো কিছু বলবে না। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বোঝবার উপায় নেই।

কিন্তু শুধু যে অভয়ের মনটাই খারাপ তা নয়। ভয়ও তো আছে। কতটুকু সে জানে। কোন্ সাহসে দাঁড়াতে আসবে? প্রথমবারের অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। এই দুয়ে দেখে সে রকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু প্রতিপক্ষ বহুরূপী, অভিজ্ঞ ঘাগী লোচন ঘোষ। নামে ডাকে যার গগন ফাটে। কলকাতার রেডিওতে লোচন কবি গান করে। আলাপ পরিচয় আছে অভয়ের সঙ্গে। প্রথম পরিচয় পেয়ে, অভয় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল লোচন ঘোষকে! শুধু নয়, চেহারায়ও পায়ে হাত দেবার মত মানুষ। ছোটখাটো মানুষটি, মুখখানি এই বুড়ো বয়সেও ছেলেমানুষের মত। আর সাজতে পারে ভাল। লুটনো কোঁচা, শাদা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবী, ঘাড় অবধি বড় বড় চুল। যদিও মাঝখানে এখন টাক প'ড়ে গিয়েছে। আর চোখ দুটিতে সবসময়েই হাসি। একটু অস্বস্তি হয় হাসি দেখে। যেন সবটাই ঠাট্টা, সবটাই ফেক। দুটি দুটি মুক্তাখানা আছে নিজের। বসতবাটি আছে ভাল। আর কায়স্থ সমাজে সম্মানও আছে। কবিগান ছাড়াও, আর একটি গুণ, ভাল পাখোয়াজ বাজাতে পারে।

এ অঞ্চলে লোচন ঘোষের জমাটি-প্রতিপক্ষ মুরারিদের বাড়িওয়ালী রাজুবালা দাসী। আগে আগে রাজু লোচনের লড়াই যেমন উপভোগ করেছে লোকে, তেমনি আবার দুজনের পারিষদ নিয়েও কম কথা হয়নি। আসরে দুজনে ঘোর শত্রু। অন্দরে গলাগলি। সেইটিই লোকের ভাল লাগত।

রাজু-লোচন আলাদা আলাদা কবিয়ালের সঙ্গে গাইলে, সে আসর জমত না। এ অঞ্চলের লোকেরা উঠে চলে যেত। বলত, এ আসর মরা। প্রাণ নেই।

জোয়ার আসে। ভাঁটা যায়। একদিন জোয়ার এসেছিল। এখন ভাঁটা যাচ্ছে। সেদিনকার যৌবন আর নেই। কালের পা' দাগ ফেলেছে তাতে। শুধু গায়ক গায়িকার নয়। সেই সব শ্রোতাদের যৌবন গতায়ু। রাজু এখন গান ছেড়ে দিয়েছে। লোচনও সচরাচর গায়না। মাসে দু'মাসে রেডিওতে কবি গায়। পাখোয়াজ বাজাবার আমন্ত্রণ পায় কখনো কখনো।

সেই লোচন ঘোষের সঙ্গে গান করা কি চাট্টিখানি কথা?

কিন্তু বাতাসের আগে খবর গেল কারখানায়। হরি মিস্তিরিরা সবাই উৎসাহ দিলে। শুধু অনাথ কিছু বললে না। কিন্তু এতগুলি লোকের কথা ঠেলাই বা যায় কেমন ক'রে?

সুরীনকে বলল অভয়, ঘোষ মশায়ের সঙ্গে গাইতে আমার সাহসে কুলোয় না খুড়ো।

সুরীন গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, মন্দ হলেও তোমার মান যাবে না বাবা। ঘোষ অনেক বড়। এখানে হারলে তোমার লজ্জার কিছু নেই। কেউ তোমাকে ছুয়ো দেবে না।

আসর বসল।

পাড়াগাঁ নয়। মফস্বল শহরের বাজার। বিজলী-বাতিতে ঝলমলিয়ে উঠল আসর। বাজারের আসরে ভদ্রলোকদের আগমন কমই হয়। দোকানী ফড়ে পাইকের মহাজনদের ভিড়। আর মালীপাড়ার গেরস্থ, আধাগেরস্থ, দেহপোজীবিনীরা দল বেঁধে আসবেই। বারোবাসর-পাড়ার মেয়েমানুষদের শহরের অন্য আসরে যাবার সুযোগ নেই, যেতেও চায় না কেউ। বাজারের আসরটা তাদের নিজেদের হ'য়ে গিয়েছে। বরং তারা না থাকলে বাজারের আসর জমে না।

তবে ভদ্রপাড়ার মেয়েমানুষেরাই শুধু আসে না। পুরুষেরা কামাই দেয় না।

লোচনের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে অভয়ের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কোনরকমে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সে লোচনকে।

লোচন চুপি চুপি বলল অভয়কে, মনে জোর আছে তা হ'লে বল?

অভয় চমকে উঠে বলল, এঁজে কেন?

লোচন বলল, মনে বল না থাকে তো চুপচাপ বসে থাকতে গো। নমস্কার করতে আসতে কি?

অভয় বলল, এঁকে আপনি গুরুজন, গুণী।

লোচন তেমনি নিঃশব্দে হাসল মিটিমিটি। মনটা ঘমে যেতে লাগল অভয়ের।

অভয় মার্কিন কাপড়ের পাঞ্জাবী পরেছে। মিলের ধোরা ধুতি পরেছে কোঁচা দিয়ে। কিন্তু মিলের ধুতি কখনো তার পায়ের পাতা ছাড়িয়ে নীচে নামে না। কারণ কুলোয় না। গলায় একখানি চাদর জড়িয়েছে। একটু বেশী নীল হ'য়ে গেছে চাদরখানি। বাড়িতে কাচা নীল দেওয়া হয়েছে, তাই।

লোচনের লুটনো কোঁচা আর আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবীর কাছে ওসব চোখেই পড়ে না। তার ওপরে সোনার বোতামের চকচকানি।

মেয়েদের বসবার জায়গায়, রাজুবালা দলকের আগে বসেছে। চির-সধবার বেশ রাজুদের। বৈধব্য তাদের কপালে লেখা নেই। শালপাড় শাড়ির ওপরে, মুগার পাতলা চাদর জড়িয়ে, কপালে সিঁদুর প'রে বেশ ঘরোয়ানা হ'য়ে এসেছে।

লোচন ঘোষ-গিন্নে যখন তার কাছে দাঁড়াল, বয়স্কদের সকলের চোখ গিয়ে পড়ল সেদিকে। স্বপ্ন নেমে এল সকলের চোখে। আর একবার তারা তাদের হারানো যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে।

লোচন বলল, ভাখো দিখিনি কি কাণ্ড। এই বুড়ো বয়সেও রেহাই পেলুম না।

রাজু তার চির-প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি, বয়সের গাঢ় ছায়া-ভরা চোখ দুটি দিয়ে তাকিয়ে হাসল। বলল, ভালই তো। তোমার যে বড় সৌভাগ্য ঘোষ মশায়।

লোচন বলল, আর কি সেদিন আছে রাজু? ছোকরার কাছে হেরে গিয়ে আমার মাথা হেঁট হবে।

রাজু অবিশ্বাসের হাসি হাসল দাঁতহীন ঠোঁটে। অপাঙ্গে তাকিয়ে, চিরকালের সেই স্নেহ মুখ ঝামটা না দিয়ে পারল না, যাও, আর আদিখ্যেতা ক'রোনা বাপু।

অর্থাৎ লোচনের পরাজয় যে কোনোকালেই সম্ভব নয়, তা' জানে রাজু। কারণ, ঘোষের কপালে সে দুর্ভোগ কোনোদিন ঘটেনি।

রাজু আবার বলল, ছোঁড়াটার গলা ভাল। এদিকে লড়বে কেমন, বলতে পারি নে।

কোনদিন তো আসরে নামে নি।

কথাটা যেন কেমন? সান্ত্বনা দিচ্ছে লোচন ঘোষকে, লোচন তাকাল রাজুর বুড়ি চোখের দিকে।

লোচনের চাউনির অর্থ বুঝে রাজু বলল, আহা! অমন তাকিয়ে আছ কেন!

অভয়ও এল রাজুর সামনে। অভয়কে দেখে, রাজু-বালার দু' চোখে ঈর্ষা ফুটে উঠল। ভাঙ্গ-পড়া ঠোঁটে দেখা দিল বিদ্রূপ।

অভয় বলল, আশীর্বাদ কর গো মাসী।

রাজু বলল, তাই করছি। ঘোষের কাছে হারলেও তোমার সেটা জয় হবে, মনে রেখ।

যেন অভয়ের পরাজয় চায় রাজু। লোচনের সঙ্গে লড়াই যে আজ তার সঙ্গে লড়াইয়েরই সামিল।

অভয় বলল, সেই মানটাই যেন থাকে।

মেয়েদের আসরে সুবালা ছিল একদিকে। তাদের বারোয়াসরপাড়ার দলের সঙ্গে। মালীপাড়ার গেরস্থ দলের সঙ্গে, নিমি আর একদিকে।

সুবালা ডেকে বলল অভয়কে, এই, এই যে গো?

সুবালার দিকে চোখ তুলতে গিয়ে, অভয় অনুভব করল তার সর্বাঙ্গে নিমির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিঁধেছে।

সুবালা বলল, লড়াই যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি। সেই সাতকেলে রামায়ণ আর মহাভারত শোনাবে দুজনে। ঘেন্না ধ'রে গেছে শুনে শুনে। একটু ভাল পদ বানিও। শুনে যেন ভাল লাগে।

কথাটা লোচনের কানে যেতে সে একটু অবাক হ'য়ে তাকাল সুবালার দিকে। অভয় জবাব দিল, সাতকাল গেলে আর এককাল থাকবে। তারপরেই বল হরি হরি।

সবাই হেসে উঠল।

অভয় ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল নিমিদের সামনে। না, নিমির মুখে রাগের ছাপ পড়েনি।

তবে খুব খুশি-খুশিও নয়। বিভুর বউ বলল, হারলে পাড়ায় ঢুকতে দেব না কিন্তু।

তারপরেই ঢাকে কাঠি পড়ল। কাঁসি তাল দিল, কাঁই নাঁই কাঁই নাঁই।

শরৎদাস এসে ফুলের মালা পরিয়ে দিল আগে লোচনকে। পরে অভয়কে।

আসর বেশ জমে উঠেছে।

লোচন দেবদেবীর, পরে গুরুর বন্দনা করল। তারপর হাত জোড় ক'রে, সকলের দিকে তাকিয়ে গাইল লোচন,

অনেক দিন পরে
বাজারের ভিতরে
গাইতে এলুম কবি গান
(বন্ধুরা মাপ করিবেন)

হেসে উঠে গাইল

সঙ্গে গাইবে অভয়
তিনি দিয়েছেন অভয়
রাখিবে লোচনেরো মান
(বন্ধুরা মাপ করিবেন)

হাতজোড়ে আরও খানিকটা ভনিতা করে, আসর জমিয়ে নিল লোচন। অভয় মাথা নীচু করে, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে।

লোচন হঠাৎ একবার কোমর নাড়াল, আর শুরু করল একটা ছোরে। তালও ওস্তাদ। হাত দিয়ে তোলকের বাঁ দিকে এমন ডলা দিয়েছে, প্রায় লোচনেরই গলার স্বরের মত একটা আওয়াজ করে উঠল।

লোচন গাইল।

ভাই সাতকেলে নয় চিরকেলে
রামায়ণ আর মহাভারত গেলে
এখনো বুকে ধরে রাখি।
(বন্ধুরা মাপ করিবেন)

শ্রোতারা হু হু করে হেসে উঠল। তাকে চিমটি কাটল গিরিবালা। —মর মুখপুড়ি, আর বলতে বাকি ?

নিমিও হাসল ঠোঁট উল্টে। অভয়ও চাপল ঘাড় দুলিয়ে।

লোচন গেয়ে চলেছে,

আমাদের বাপ ঠাকুরের পরিচয়
রামায়ণ মহাভারতে কয়
আদি ইতিহাসের কোথাও নাই বাড়ী।
(বন্ধুরা মাপ করবেন)

পুরাণ ছাড়া নতুন নাই
জবাব দিও হে অভয় ভাই
কোন্ ভগবতী স্বামী থাকতে চির বিধবা।
(ধুয়া)

দিতি ও অদিতি কথা
বিনতার কহ বার্তা
কি যাতনায় চিতা জেলে মরেন দেবী অম্বা।
(ধুয়া)

লোচনের প্রশ্নাবলীতে সবাই বিস্ময়ে ও কৌতূহলে চোখ বড় বড় ক'রে উঠল। সকলেরই চোখ গিয়ে পড়ছে বারে বারে অভয়ের ওপর !

অভয় নত মস্তক। পাথরের মত শুব্ধ।

লোচন একে একে পনরটি প্রশ্নের পর, শেষ প্রশ্ন করল,

অসুরো ঠাকুরো গুরু
কার কাছে হলেন চুরো
কাহার যৌবন বীজ ধারণ করিলেন।
(ক্রমশঃ)

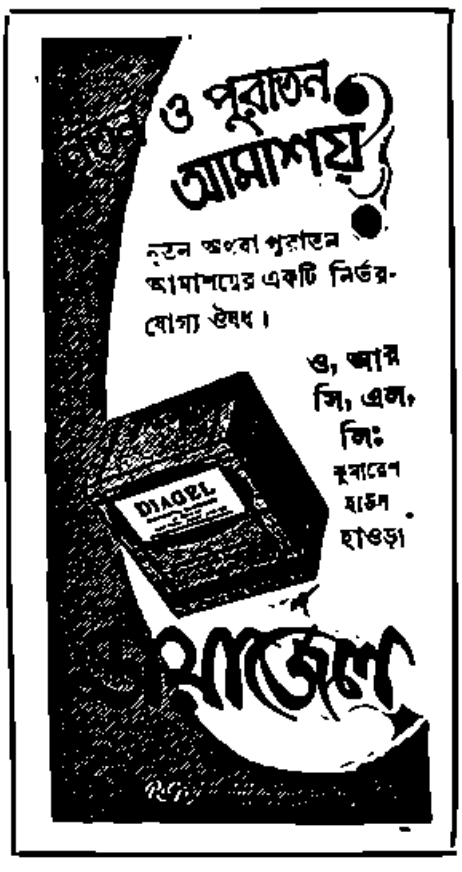

পি. ঈ. এন. ক্লাবের রজতজয়ন্তী উৎসব ও লেখক সম্মেলন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পি, ই, এন ক্লাব বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রখ্যাত কবি, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পীদের নিয়ে সংগঠিত। পৃথিবীর বহু পরমাশ্চর্য লেখকলেখিকা এই সংস্থার সভ্যভুক্ত। পি, ই, এন সংক্ষেপিত শব্দত্রয়ী—এর নামকরণের ছেতর দু'ভাবে এরূপ সুন্দর পদ যোজনা হয়েছে যার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্য-গোষ্ঠী প্রবেশাধিকার পেয়েছেন—যেমন Poets (কবি) Editors (সম্পাদক) Novelists (ঔপন্যাসিক)। কবি, সম্পাদক ও ঔপন্যাসিককে নিয়ে সংক্ষেপিত শব্দ পড়ে উঠলো পি, ই, এন। আবার Playwrights (নাট্যকার) Essayist (প্রাবন্ধিক) আর Novelists (ঔপন্যাসিক) নিয়েও পি, ই, এন এর ঐ একই রূপ।

এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মিসেস ডলস গল্ট গঠিত করেন। এর বিশ্বিলভারহকেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সংগঠিত্রী। এর পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ভুবনেশ্বরে এবার রজতজয়ন্তী উৎসব সমারোহে হোলো। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, পরবর্ত্তী সভানেত্রী হয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু। বর্ত্তমানে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং অন্যতম সহ সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য মহামণ্ডলরূপে পি, ই, এন ক্লাব পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে—আর ভাবজগতের ভিতর চরম দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না; এর সঙ্গে আঁতাঁত অর্থাৎ মৈত্রীবদ্ধ হয়েছেন ইউনেস্কো, বিশ্বের সর্ব্বদেশের সাহিত্য একাডেমি এবং রাষ্ট্রকর্ণধারগণ। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রিক সঙ্কীর্ণ নীতি, ভেদাভেদ, প্রাদেশিকতা, জাতি বর্ণ ধর্ম্ম ও ভাষাগত বৈষম্য দূর করে সমস্ত প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আত্মীয়তা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার মাধ্যমে বিরাট কৃষ্টিগত পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া—আর বিশ্বশান্তি প্রেম মৈত্রী মানবতা ও সর্ব্বপ্রকার মানব কল্যাণের আদর্শকে বৃহত্তর করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রচনা করা, যাতে করে হিংসা-কণ্টকিত পৃথিবী শান্তি সমাজের হয়ে তার মহামন্থনের হারানো সুর আবার ফিরে পেতে পারে।

পৃথিবীর যে কোন পি, ই, এন শাখাকেন্দ্রের সভ্য শুধু বেশ বিদেশে সমাদৃত হবার সুযোগ পান না, সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও পেয়ে থাকেন অন্য দেশে অবস্থানকালে, ভ্রমণ, পরিদর্শন, গবেষণা ও আলাপআলোচনা সম্পর্কে স্থানীয় পি, ই, এন ক্লাবের চর্চ্চাকেন্দ্রের সভ্যগণ বাক্তিগত—তাছাড়া পি, ই, এন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত বিদেশী বন্ধুকে—আর একান্ত আপন জনরূপে নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে এই বন্ধুকে আতিথেয়তা দেখাতেও কার্পণ্য করেন না, ফলে, যে কোন দেশের কবি, কথাশিল্পী, সম্পাদক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকের পক্ষে অন্যদেশের স্বগোত্রীয়দের সংস্পর্শে এসে চিন্তা মনন ও জ্ঞান রাজ্যের নব নব উপলব্ধির দ্বারোদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে মনের ভূগোলের অনাবিষ্কৃত প্রদেশগুলির সন্ধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এইটিই হোলো পি, ই, এন ক্লাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিশ্বিল ভারত পি, ই, এন ক্লাব কেন্দ্রের উদ্যোগে ইতিপূর্ব্বে বিশ্বিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হ'য়েছিল জয়পুর (১৯৫৪) বারাণসী (১৯৫৭) আরামালাইনার (১৯৫৪) এবং বরোদায় (১৯৫৭)—এবার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হোলো ভুবনেশ্বর। এখানে ভারতবর্ষীয় পঞ্চদোলী ভাষায় পি, ই, এন সভ্যভুক্ত প্রতিনিধিবর্গ এবং সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান থেকে এর সভ্যও প্রতিনিধিগণ সাগর পেরিয়ে এসেছিলেন, আর এসেছিলেন তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারবর্গ প্রতিনিধির অধিকার গ্রহণ করে—প্রতিনিধি শিবিরে সকলেই ছিলেন রাজ-অতিথির সমাদর ও মর্য্যাদা নিয়ে। উড়িষ্যার রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পি, ই, এন ক্লাবের অভ্যর্থনা সমাদর, আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক প্রতিনিধির ব্যাজ রৌপ্য নির্ম্মিত, আর উড়িষ্যা শিল্প শ্রীমণ্ডিত তাদের কারুকার্য্যে সুন্দর ও সুশোভন হয়ে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিল।

উড়িষ্যার নব রাজধানী ভুবনেশ্বর ভারতের অন্যতম পুণ্যতীর্থ ও ঐতিহাসিকক্ষেত্র। আজ এখানে উড়িষ্যার নব জাগরণ। এই রাজ্যের তরুণ প্রাণে জেগে উঠেছে অনেক কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, অনেক কিছু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এখানকার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-সম্প্রদায়ের ছাত্রাবাসের ভার গ্রহণ করে অকাতরভাবে যেরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ম্মতৎপরতা, কর্ত্তব্যবোধ ও বাহির জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তাতে তাদের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—একদা ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে আসুবে তাদের পরম মাহেন্দ্র লগ্ন। ভুবনেশ্বরে আজ গড়ে উঠ্‌ছে নব নব সৌধশ্রেণী বিশাল বিশ্বভক্ষেত্রের ওপর—আর গড়ে উঠ্‌ছে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলায় তার বিশিষ্ট আসন রাখ্‌বার জন্যে—কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মাটিতে বাংলার তরুণের মন তৈরী হয়ে এসেছে সুদীর্ঘকাল ধরে, সে মাটি আজ যেন বদলে গেছে—বাঙালী ছাত্র-সম্প্রদায় যারা সকলক্ষেত্রে ছিল পুরোভাগে—আজ যেন হটে আস্‌ছে, এইটি হয়ে উঠ্‌ছে আমাদের কাছে মর্ম্মান্তিক বেদনা।

উড়িষ্যার পশ্চাতে আছে বিরাট ঐতিহ্য, আছে তার সৌন্দর্যময়

পটভূমিকা। প্রাচীন কলিঙ্গের বেশীর ভাগ অংশ আর প্রাচীন উৎকলের কিছু অংশ একত্রিত হয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান উড়িষ্যা। তাম্রপর্ণী থেকে শুরু করে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ছিল কলিঙ্গ আর পূর্বদিকে বাংলার মহীপতনী পর্যন্ত উৎকলের সীমা বিস্তার করে, ও গোদাবরীর পশ্চিম দিকে এবং কলিঙ্গের উত্তর পশ্চিম অংশ পর্যন্ত সীমা রেখা টেনে উৎকল আপনাকে প্রকাশ করেছে। উৎকল আর কলিঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমগোত্রীয়—কেননা উভয় দেশের রাজবংশ ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত।

মহাভারতে কলিঙ্গ দেশকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল পর্যন্ত ত্রয়োবিংশতি ক্ষত্রিয় রাজা প্রায় এক হাজার বৎসরের ওপর এখানে রাজ্যশাসন করেছিলেন। শুধু কলিঙ্গ নয়, ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয় শাখা-প্রশাখা নির্মূল করে দেবেন মহাপদ্ম নন্দ। পরবর্তী সময়ে কলিঙ্গ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র বিন্দুসার কলিঙ্গ জয় করতে সাহসী হননি, অশোকই কলিঙ্গ জয় করেন। উড়িষ্যার ধৌলি ও জৌগড় গিরি প্রবেশে অশোকের লিপি খোদিত আছে। সার্বভৌম সম্রাট খারাবেলের অধীনে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হয়ে ওঠে—খণ্ডগিরিতে তাঁর লিপি খোদিত। প্রাকৃত, পৈশাচী ও শৌরসেনী প্রাকৃতের সমন্বয়-সংযোগস্থল এখানেই লক্ষ্য করা যায় ত্রিবেণী সঙ্গমের মত।

খ্রীষ্টীয় তেরোর সময় থেকে সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যা ভাষার কোন নিদর্শন নেই। প্রায় অষ্টম শতাব্দীতে সিদ্ধগণ তাঁদের গান রচনা করতে আরম্ভ করেন। সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধগণের মধ্যে দুই পাদ, ভাসু পাদ, শবরপাদ পাদ্ধিপাদ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় লুই, কাহ্নু, শবরপাদ প্রভৃতি সিদ্ধগণের সঙ্গীতে। ঐ সব গান ও আধুনিক উড়িয়া রচনা পাশাপাশি রেখে পড়লে দেখা যাবে এরই মধ্যে আছে অনেকখানি মিল। নরসিংহ দেবের (১২৪৯ খৃঃ) প্রথম খোদিত লিপির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় কি ভাবে উড়িয়া ভাষা আধুনিক রূপ নেবার দিকে দ্রুততর এগিয়ে চলেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সরল মহাভারত, চণ্ডীপুরাণ ও বিদগ্ধ রামায়ণ লিখেছেন সরল দাস। এঁর আবির্ভাবের একশো বছর আগে এসেছিলেন বিখ্যাত লেখক বৎস দাস। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত অদ্ভুত গদ্য সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় হস্ত সুধানিধির মধ্যে।

বলরাম, জগন্নাথ, অনন্ত ও অচ্যুত এই কয়জন ঈশ্বরের কৃপাসিদ্ধ মহাসাধকের প্রত্যেকেই এক লক্ষ কবিতা রচনা করেছিলেন। তুলসী দাসের রামায়ণ রচনার বছরই বৎসর পূর্বে বলরাম দাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এটা বাল্মিকী রামায়ণের মূল অনুবাদ নয়—অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব এর মধ্যে আছে। ঐ পাঁচজন মহাসাধক ও শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেবের গুরু হোলেও পরম গুরুরূপে স্থান পেয়েছিলেন বলরাম দাস। উড়িষ্যার ধর্ম ও সাহিত্য জগতে জগন্নাথদাস (১৪৯০ খৃষ্টাব্দ) বিরাট জ্যোতিষ্ক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে 'অতিবাড়ী' (সর্বোত্তম পুরুষ) বলে অভিহিত করেছেন। জগন্নাথ দাসই বৈষ্ণব অতিবাড়ী সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁর ভাগবত সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ নয়। উড়িষ্যা ভাগবত সংস্কৃত ভাগবত অপেক্ষা উত্তম। আজও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে এই ভাগবত পাঠ হয়ে থাকে।

ষোল, বৃত্ত ও বৈষম্যিক ছন্দ আর তথাগুলিকে অবলম্বন করে অনেকে ধর্ম বিষয়ক, প্রেমভক্তি, ব্রহ্মগীতা, মালিকা প্রভৃতি রচনা করে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বেদুমর ভাগবত, মালিকা (ত্রিবিক্রমী) বাদর (ধর্মোপদেশ) সধার (গল্প) এবং কতকগুলি অতীন্দ্রিয়মূলক কবিতা রচনা করে গেছেন অনন্তদাস।

অচ্যুতানন্দ দাস মহাযোগী ছিলেন। তাঁকে অনেকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলেছেন। তিনি যে সব গ্রন্থ লিখে গেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শূন্য সংহিতা, অনাকার সংহিতা, গুরুভক্তি গীতা আর গরুড় টীকা। উপরোক্ত ঈশ্বরের কৃপাসিদ্ধ পাঁচজন সাধকের রচনাবলী উড়িষ্যার ধর্ম সাহিত্য, ভাষা এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়রূপে পরিগণিত হয়েছে। বিপ্রনারায়ণ দাসের হরিবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার বহু প্রাচীন কবি সহজ সুন্দর ভাষায় মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এবং তৎপরবর্তীকালে কবিরা আলঙ্কারিক ও অপ্রাকৃতিক ভাব প্রয়োগপদ্ধতিতে কবিতা রচনা করতে শুরু করলেন। অর্জুন দাসের রামবিভা, ধামোদর দাসের রসকল্লা চৌতিসা, শিশু শঙ্করের উষাবিলাস, লক্ষ্মণ মহান্তির উন্নিসা ছন্দা, কপিলেশ্বর দাসের কপটকেলি, হরিহর দাসের চন্দ্রাবতী বিলাস, কৃষ্ণাবন দাসের রসবারিধি, রামচন্দ্র পট্টনায়কের হারাবতী প্রভৃতি পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর উড়িয়া সাহিত্যে অমূল্যরত্নরূপে সমাদৃত হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে নায়ক-নায়িকা সৃষ্টি করে রামচন্দ্র পট্টনায়ক হারাবতী রচনা করেছেন, এখানে এর বৈশিষ্ট্য আছে।

যে সব কবির কবিতায় আলঙ্কারিকতা ও অপ্রাকৃতিকতার লিখনশৈলী ফুটে উঠেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যশস্ত শুক্ল, দীনকৃষ্ণদাস, লোকনাথ বিদ্যাধর, ত্রিবিক্রম ভঞ্জ প্রভৃতি। এঁরা পুরুষও প্রকৃতির ভালোবাসা সংক্রান্ত বিষয়ে কবিতা লিখেছেন উচ্চাঙ্গের রসসৌষ্ঠব ফুটিয়ে। উড়িয়া সাহিত্যে কবিসম্রাট রূপে স্থান পেয়েছেন উপেন্দ্র ভঞ্জ। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম আর তিরোভাব ১৭২০ খৃষ্টাব্দে। এঁর মধ্যে অপূর্ব কবিপ্রতিভা অভিব্যক্ত হয়েছে। এঁর পরবর্তীকালে বহু খ্যাতনামা কবি জন্মগ্রহণ করেছেন যেমন ঘনশ্যাম, দাশরথি দাস, কৃপাসিন্ধু পট্টনায়ক, রঘুনাথ ভঞ্জ, সদানন্দ কবিসূর্য, চন্দ্রপাণি পট্টনায়ক, বিশ্বনাথ খুন্টিয়া, বিশ্বম্ভর দাস, যদুমণি মহাপাত্র, কবিসূর্য বলদেব রথ প্রভৃতি। উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় গানে আর গীতিকবিতায়। উড়িয়া কবিদের চৌতিসা অনবদ্য, এই সব চৌতিসা গদ্য সদৃশ উড়িষ্যার আজও পাওয়া হয়ে থাকে। চৌপদী সঙ্গীতের প্রাচুর্যও লক্ষ্য করা যায়। গীতিকার হিসাবে কপিলেন্দ্র দেব, বলভদ্র, উপেন্দ্র ভঞ্জ, সালবেগ, বনমালি পট্টনায়ক, বিশ্বনাথ খুন্টিয়া, কবিসূর্য বলদেব রথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্রজবুলি ভাষায় যে সব উড়িয়া বৈষ্ণব কবি পদ রচনা করে গেছেন তন্মধ্যে ধামোদর দাস, চণ্ডকবি, রাধাবী দাসী, রায় রামানন্দ এবং যদুপতি প্রধান।

উড়িষ্যার বিদগ্ধ সমাজ পণ্ডেও সর্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা বিষয়ক বহুর ওপর নানা সূত্র রচনা করে গেছেন। বর্তমান উড়িষ্যা সাহিত্যের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় জাগরণের সময় থেকে। উড়িষ্যার সাহিত্যাকাশে তিনটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে এসেছিলেন রাধানাথ রায়, ফকিরমোহন সেনাপতি, এবং মধুসূদন রাও। গদ্যসাহিত্যে আর কথাশিল্পে ফকিরমোহন বিশেষ স্থান অধিকার করে

আসেন। গল্পসাহিত্য প্রবর্তকরূপে তিনি সর্বজনসমাদৃত। উড়িষ্যা সাহিত্যের অন্যান্য যুগের সর্বোত্তম কবি হিসাবে রাধানাথ স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। অতীন্দ্রিয় লোকের বার্তা বহন করে এনে মধুসূদন ভক্তিমূলক কবিতা ও গান রচনা করে গেছেন। গোপবন্ধু দাস, নীলকণ্ঠ দাস, গোপালকৃষ্ণ মিশ্র, পদ্মচরণ পট্টনায়ক প্রভৃতির দান উড়িষ্যা সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। এই সাহিত্যের সমন্বয়ের দ্রষ্টা হলেন সমৃদ্ধ সাহিত্য সমিতি। দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এঁরা করেছেন উচ্চ সাধনা। ফুলমণিমাতা, বায়ানন্দ মানসিংহ, পদ্মচরণ রায়, অনন্ত পট্টনায়ক, কান্তুচরণ মহান্তি, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, বৈষ্ণব পট্টনায়ক, রাধামোহন গদনায়ক, বিশ্বনাথ মহাপাত্র, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী প্রভৃতি বর্তমান উড়িষ্যা কাব্য সাহিত্যের নক্ষত্রমণ্ডলী। এঁদের কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও সমালোচনা যথেষ্ট স্থান অধিকার করেছে। রামশঙ্কর রায়, ত্রিপাঠীচরণ পট্টনায়ক, অখিলীকুমার ঘোষ, ভক্তিপোর পট্টনায়ক, অদ্বৈতচরণ মহান্তি, মনোরঞ্জন দাস প্রভৃতি উড়িষ্যার নাট্য সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সাহিত্যাকাশের অন্যতম উজ্জ্বলজ্যোতিষ্ক অন্নদাশঙ্কর রায়।

এলো ইংরাজী নববর্ষ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। একে স্বাগত জানিয়ে মহাসমারোহে শুরু হোলো পি, ই, এম ক্লাবের ভারতবর্ষ কেন্দ্রের রজত জয়ন্তী উৎসব ও পঞ্চদশাধিক বিশ্বিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশন উড়িষ্যার মহারাজধানী পুণ্যতীর্থ ভুবনেশ্বরের পাদপীঠে। উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী সুসাহিত্যিক ও কবি ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাবের অধিনায়কত্বায় উড়িষ্যা পি, ই, এম ক্লাবের শাখা-সঙ্ঘ ও রাজ্যসরকারের উদ্যোগে অধিবেশন ও উৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১লা জানুয়ারী থেকে ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত। এর সঙ্গে প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল—শুধু যে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি শিল্পকলার নিদর্শনীগুলি বিভিন্ন বিপণিতে সুসজ্জিত হয়েছিল তা নয়, বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্র সম্বলিত চিত্রপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার ভেতর থেকে উড়িষ্যার সভ্যতাও সংস্কৃতির অগ্রগমনের পথের সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। যদিও ইতিহাসের বহু জীর্ণ পুঁথির পাতা উড়ে গেছে মানুষের দৈবদুর্বিপাকের প্রবল ঝটিকায় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে।

ভারতবর্ষের পনেরোটী ভাষার প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেছিলেন 'বর্তমান ভারতের উপন্যাস' এবং 'বর্তমান ভারতের সাহিত্য আর তার দাবী' শীর্ষক আলোচনা সভায়। 'লেখকরূপে আমার অভিজ্ঞতা' শীর্ষক বক্তৃতায় অনেকেই মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। বক্তৃতাগুলি ইংরাজীতে প্রদত্ত হয়েছিল। তাছাড়া ভুবনেশ্বরে রাজ অতিথিশালায় কবি সম্মেলনে পনেরোটী ভাষার কবিরা নিজ নিজ ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কবি, তাঁর স্বরচিত কবিতা-আবৃত্তি চিত্তগ্রাহী হয়েছিল। খৃষ্টীয়ানন্দাগু প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের সমাবেশ হয়েছিল ভুবনেশ্বর অধিবেশনে। এঁরাও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বাণী বাহক বিশ্বসাহিত্য-সংস্থার প্রতিনিধিকেও দেখা গিয়েছিল। এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন পনেরোটী দেশের সাহিত্যিকদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন কংগ্রেস বা সংস্থা। এঁদের প্রধান কার্যালয় প্যারিসে। পি, ই, এমের বিশ্বিল ভারত কেন্দ্রের কার্য নির্বাহক সমিতির বর্তমান সভাপতি ডাঃ এস্ রাধাকৃষ্ণণ এবং অন্যতম সহসভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু। ভুবনেশ্বরের প্রদর্শনী ও সম্মেলনের উদ্বোধক হয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি। তিন দিন ধরেই চলেছে অধিবেশন হয়েছে, তারপর ছিল ভুবনেশ্বরের রাজঅতিথিশালায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ, কটকে রাজভবনে নাট্যাভিনয়ও নৈশভোজ। উড়িষ্যা সরকারের আনুকূল্যে কোনারক, ভুবনেশ্বর, পুরী, কটক ও চিল্কাহ্রদ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করে প্রতিনিধিরা আনন্দলাভ করেছিলেন। রাজ্যসরকার প্রতিনিধিদের সর্বপ্রকার সুবিধার সুষ্ঠু সুব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের রাষ্ট্রপরিবহন, ও মোটরকারগুলির আনুকূল্যে নানাবিধ দেশবরেণ্য সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হচ্ছে কোনারকের সূর্যমন্দির। ভুবনেশ্বর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত বঙ্গোপসাগরীর দক্ষিণ পূর্ব কোণে। তৃতীয় নরসিংহদেবের রাজত্বে বারো বছরের রাজস্ব ব্যয় করা হয়েছিল এই মন্দির নির্মাণ করতে, বারো বছর ধরে দুইশত স্থপতি শিল্পী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সাত হাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভূমর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এর ভেতর থেকে অতীতের অজ্ঞাত ইতিহাসও আবিষ্কৃত হয়েছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে আছে অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন—এই নিদর্শনগুলিকে চারভাগে ভাগকরা যেতে পারে (১) সামাজিক (২) ধর্মসংক্রান্ত (৩) আলঙ্কারিক আর (৪) প্রচলিত (Conventional)—উড়িষ্যা আর্টের সর্বোত্তম পরিণতি লাভ হয়েছে কোনারক মন্দিরে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে মাত্রার দুর্দমনীয় আক্রমণের ফলে উড়িষ্যা থেকে গৌরবময় স্থাপত্য শিল্পের তিরোধান ঘটে। তারপর উড়িষ্যার নিজস্ব সত্তাও হারিয়ে যায় পরভূতিকায় মত।

পুরীর সমুদ্র উপকূলে উদ্বিগ্নালায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও ঝড়োহাওয়ার, বালুবেলার বিস্তৃত বালুকাকীর্ণ প্রান্তর, নারকেলের ঝোপঝাড় আর পশ্চিমে উপবিভাগের অধিকাংশে শৈলমালা, চল্লিশ মাইল লম্বা চিল্কা হ্রদ আর হিংস্র বাঘের সমুদ্র ঘন অরণ্যরাজি উড়িষ্যার জীবনীশক্তিকে সুদৃঢ় করেছে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যাধারার নিত্য অবগাহন করে বর্ণপ্রাণ হয়ে উঠেছে উড়িষ্যা জীবনে। তাই প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাওয়া যায় দেবতার মন্দির—আর শোনা যায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও গুরু গুরুম। পুরীঘাট পর্বতমালা এখানে অনুচ্চ নয়—এই পর্বতমালার পাশে ছেয়ে ছেয়ে মানুষ আস্তানা হয়ে ওঠে, সমুদ্র আর তার তরঙ্গহিল্লোল ও অবিশ্রান্ত গর্জন মানুষের অন্তরে কত আন অনুভূতিই না জাগিয়ে তোলে! পুরী বন্দরের সমুদ্রে হোটেলে আমাদের বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল, চিল্কাহ্রদের ধারে ডাক বাংলোয় মধ্যাহ্ন ভোজন আর প্রত্যাবর্তনের পথে খুর্দারোড আমাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে অপরাহ্নিক চা-পানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভুবনেশ্বর হোটেলে উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব এবং কটক রাজভবনে রাজ্যপাল হিসাবে আমাদের আপ্যায়ন করেছিলেন। ভুবনেশ্বরে শৈলভোজে আমাদের সঙ্গে ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল ও রাধাকৃষ্ণণ। কোনারক পরিভ্রমণেও এঁরা ছিলেন আমাদের সাথী। আমরা পেয়েছিলাম আমাদের পথ নির্দেশক হিসাবে উড়িষ্যা সরকারের টুরিষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত বনবিহারী রথকে। এঁকে মনে হোলো ইতিহাসের বিশ্বকোষ। এঁর বন্ধুত্ব, সাহচর্য, ভালোবাসা, সঙ্গ আমাদের অবিস্মরণীয়।

সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্র বিশ্বে আজ আমাদের উদ্যোগ করতে হবে মহা মৈত্রীশক্তিকে—যে শক্তি নিহিত আছে শস্যের ক্ষেত্রে, আমার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের আধার গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে—সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে হবে মানুষের মন আর রাজনৈতিক কূটচালের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে মানুষের মনের শাসন ভার! তবেই সার্থক হবে বর্ষে বর্ষে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন, তবেই অনাগত পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে সাহিত্যসাধকেরা। 'আয় আয়ুষে পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি কোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট নিহু ওকে শান্ত করার আন্তরিক চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন জল পুতুলটির মুখে আলতার মেখানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কেঁদে কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এক্কোর, এক্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিহু—আহা বেচারা—তবে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিহুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিহু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা বিনুকে শাড়ি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, বিনুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ওদের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বৌদি, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছে? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারণ আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, সার্ট, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টি জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই; সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

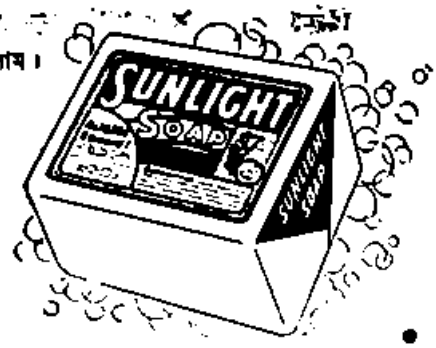

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বই প্রোডাক্ট

S. 2888-X52 BG

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও কমুনিজম্—এই দুইয়ের বিরোধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সঙ্কট, তাহার তীব্রতা বর্তমানে কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। তবে, এই অবস্থাটা সাময়িক, না ইহার কোনও স্থায়ী মূল্য আছে, তাহা এখনও পাইতে বিলম্ব হইবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই পরিবর্তন সাধনে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ মিকোয়ানের আমেরিকা সফর অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে।

মিঃ মিকোয়ানের মার্কিণ সফর—

জানুয়ারী মাসের প্রথমে সোভিয়েট কমিসার সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ মিকোয়ান আমেরিকায় গমন করেন এবং এক পক্ষ কাল সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। ইহা তাঁহার বেসরকারী সফর; সোজাসুজি মার্কিণ সরকারের সহিত ও মার্কিণ জনসাধারণের সহিত আলাপ-আলোচনা করাই তাঁহার এই সফরের উদ্দেশ্য। মিঃ মিকোয়ান্ সরকারী স্তর অপেক্ষা বেসরকারী স্তরে আলোচনার উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন। আমেরিকায় তাঁহার আলোচনাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার সময় তিনি প্রধানতঃ বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব এবং জার্মানী সম্পর্কে শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব লইয়াই আলোচনা করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক স্তরে আলোচনাকালে সোভিয়েট-মার্কিণ বাণিজ্যের প্রস্তাব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বেসরকারী স্তরে মেলা-মেশা ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে মার্কিণ জনসাধারণের ভুল ধারণা অনেকখানি দূর করিতে সমর্থ হন; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব অনেকটা নষ্ট হয়। অর্থনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েট-মার্কিণ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও মিঃ মিকোয়ান্ বেসরকারী মহলে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'নিউইয়র্ক টাইম্‌সের' যে প্রতিনিধিটি মিঃ মিকোয়ানের মার্কিণ সফরের সময় তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়াছিলেন, তিনি বলেন, "সহকারী সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী সর্বত্র গভীর রেখাপাত করিয়াছেন; শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী-শ্রেণী তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন—সরকারী মহলের নীতিতে এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী মহলের মনোভাবে পার্থক্য রহিয়াছে, এই কথাই তাঁহাকে বোঝান হইয়াছে।"

জার্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তির প্রস্তাব—

মিঃ মিকোয়ান্ আমেরিকায় সফর করিবার সময়ই সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে জার্মানী সম্পর্কে সন্ধি-চুক্তির সরাসরি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবে দুই মাসের মধ্যে প্রাগে অথবা ওয়ারশতে শান্তি-চুক্তির জন্য বৈঠক আহ্বান করিতে বলা হইয়াছে এবং উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জার্মানীর "সমরবাদ" ও "প্রতিশোধ বৃত্তির" অবসান ঘটানই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। প্রস্তাবের প্রধান কথা হইল দুই জার্মানীর (পশ্চিম জার্মান্ গভর্নমেন্ট ও পূর্ব জার্মান্ গভর্নমেন্ট) স্বীকৃতি; এক পক্ষে সহযোগী শক্তিবৃন্দ এবং অন্য পক্ষে দুইটি জার্মান্ গভর্নমেন্টের মধ্যে এই চুক্তি হইবে। চুক্তির সর্ত—চুক্তিবদ্ধ কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে জার্মানী সামরিক জোট গঠন করিতে পারিবে না; পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী যথাক্রমে ওয়ারশ চুক্তি ও অতলান্তিক চুক্তি হইতে মুক্তি পাইবে; ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে জার্মানীর যে সীমান্ত ছিল, উহাই তাহার সীমান্ত হইবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ মিকোয়ান্ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন; স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, পূর্ব-জার্মানীর জনসাধারণ তাহাদের গভর্নমেন্টকে সমর্থন করে। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, জার্মানী সম্পর্কে শান্তি আলোচনা সুষ্ঠুভাবে শুরু করিবার জন্য সোভিয়েট কমিসার এল্‌ব নদীর দুই পাশে পাঁচ শত মাইল পর্যন্ত দুই পক্ষের সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা সমর্থন করে।

বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক—

গত জানুয়ারী মাসে করাচীতে বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা। গত বৎসর ইরাকে সামরিক বিপ্লব বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থাকে দারুণ আঘাত করিয়াছিল; এই বিপ্লবের ফলে বাগদাদ্ চুক্তির একমাত্র আরব শুম্ভ ধসিয়া পড়ে। বাগদাদ্ চুক্তির এই ভাঙ্গা ঘর মেরামত করাই ছিল করাচীতে অনুষ্ঠিত চুক্তি-কাউন্সিলের সাম্প্রতিক বৈঠকের উদ্দেশ্য। এই অধিবেশনের পূর্বে ইরাকের কতকগুলি সংবাদপত্রে ইরাকের বর্তমান শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশ প্রকাশ পায়। কোনও কোনও সংবাদপত্র ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং ইরাকের বৈদেশিক মন্ত্রণ ও কার্যক অধিকার করিয়া লইতে বলেন। ইরাকী মন্ত্রিসভাও (আইম মন্ত্রী) ইরাকের বিরুদ্ধে পরম গরম বক্তৃতা হইতে থাকে। সীমান্ত অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ছোটখাটো হাঙ্গামা ঘটে। পাকিস্তানে ভারত-বিরোধী প্রচারের মাত্রা এই সময় খুবই চড়ে; আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও প্রবল প্রচার আরম্ভ হয়। সিরিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত বহুকাল হইতে নানাবিধ অলীক অভিযোগ করিয়া আসিতেছিল, এই সময় ঐ অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়। বাগদাদ্ চুক্তির সদস্যরাষ্ট্রগুলি হইতে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে এত বাপা-

যাপি করিবার বিশেষ কারণ ছিল। আমেরিকা ইরানের প্রত্যেকের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সামরিক চুক্তি করিতে চাহিতেছে। করাচীতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার কথা ছিল। পাকিস্থান, ইরাণ ও তুরস্ক তাহাদের সমগ্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে। শুধু কম্যুনিষ্টদের আক্রমণই নহে—যে কোন রকম আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার দায়িত্ব তাহারা আমেরিকার ঘাড়ে চাপাইতে চাহিতেছে। এই দাবীর সমর্থন যোগাইবার জন্যই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তাহাদের আশা—এই দাবী গ্রহণে আমেরিকাকে সম্মত করাইতে পারিলে প্রতিবেশীরা ভয়ে চটপট হইবে। কিন্তু আমেরিকা ততদূর অগ্রসর হইতে চাহে নাই। করাচী সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধিদল হেডলাইন্স শোনায় যে, মার্কিন কংগ্রেসের নির্দেশ—শুধু কম্যুনিজম্ প্রতিরোধের জন্যই সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে। মার্কিন সামরিক বিভাগ সে নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই মতবিরোধের ফল আপাততঃ করাচীতে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হইতে পারে নাই।

বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থাকে সুসংহত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিবার যে আশা আমেরিকা পোষণ করিয়াছিল, তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ইরাক্ এই সংস্থার বাহিরে থাকায় সে আশা শীঘ্র পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহার পর ১৯৫৯ সাল হইতে মধ্যপ্রাচ্যে যে আইসেনহাওয়ার নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা হয়, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। কোনও আরব রাষ্ট্রকেই এই নীতির আওতায় রাখা সম্ভব হয় নাই। প্রথমে রাজনৈতিক সাহায্য, তাহার পর সামরিক সাহায্য এবং শেষ পর্যায়ে সামরিক চুক্তি সম্পাদন ছিল আইসেনহাওয়ার নীতির লক্ষ্য। সেই নীতি ব্যর্থ হওয়ায় এবং বাগদাদ্ চুক্তির ভিত্তি শিথিল হইয়া যাওয়াতেই তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্থানের সহিত আমেরিকা সামরিক চুক্তি করিতে আগ্রহী হইয়াছে। এই সব চুক্তির দ্বারা ঐ দেশগুলিকে পাকা সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত করা তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সে শত্রুতা করিতে চাহিতেছে না; তাহাদের ও আফগানিস্থানের সে চটাইতে চাহে না। সেই জন্যই কম্যুনিষ্ট আক্রমণ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারে আশ্বাস দিতে সে প্রস্তুত নয়।

আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যনীতি ও নাসের—

আরব রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে এতকাল আমেরিকা যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহার কতকটা সংশোধনে সে প্রয়াসী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রও (মিশর ও সিরিয়া) যেন আমেরিকার এই সংশোধিত নীতিতে প্রকারান্তরে সাড়া দিতেছে। ইতিপূর্বে আমেরিকা নানাভাবে মিশর ও সিরিয়াকে চাপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই নীতির ফলে মিশর ও সিরিয়া কম্যুনিষ্ট শিবিরের নিকটবর্তী হয়। সম্প্রতি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আসোয়ান্ বাঁধ নির্মাণে ৭০ কোটী রুবল্ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিতে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে রুশিয়ার জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় এখন আমেরিকা মিশরকে চাপ দিবার নীতি ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সদ্ভাব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। সম্প্রতি কুটনের সহিত মিশরের আর্থিক লেন-দেন সম্পর্কিত মীমাংসায় মধ্যস্থতা করিয়াছেন বিশ্ব-ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান্ ইউজেন্ ব্ল্যাক্। ইহা আমেরিকার ইঙ্গিতেই সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যুক্তিসঙ্গত। আর প্রেসিডেণ্ট নাসের গত ডিসেম্বর মাসে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেন। তাহার পরেই জানুয়ারী মাসে মিশর ও সিরিয়ায় কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ধর-পাকড় চলে। মিশরে চারশত পরিচিত কম্যুনিষ্টদের মধ্যে একশত কারারুদ্ধ হয়, সিরিয়ায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরও বেশী। আরব সাধারণতন্ত্রে এই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী তৎপরতা নিছক আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলত নহে। প্রেসিডেণ্ট নাসের হয়ত আমেরিকাকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্ক যাহাই হউক না কেন, কম্যুনিজমের প্রতি তাঁহার বিন্দু মাত্র সহানুভূতি নাই। অতএব, আমেরিকা যেন সংযুক্ত-আরব সাধারণতন্ত্রকে সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখে।

বেলজিয়ান্ কঙ্গোয় হাঙ্গামা—

গত জানুয়ারী মাসে বেলজিয়ান্ কঙ্গোর আফ্রিকানদের বিদ্রোহ এবং কিউবার ডিক্টেটারী শাসনের অবসান দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুদিন পূর্বে থানার রাজধানী আক্রার আফ্রিকাবাসী জনগণের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের কঙ্গোস্থান প্রতিনিধিগণ বেলজিয়ান্ কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলেতে আহূত এক সভায় বক্তৃতা দিবেন, স্থির ছিল।

কর্তৃপক্ষ এই সভার প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করা সত্ত্বেও গত ৩রা জানুয়ারী এই সভার আয়োজন হয়। সভায় পুলিশ বাহিনী জোর করিয়া এই সভা ভাঙ্গিতে গেলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ চলে। এই হাঙ্গামায় সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৭৯ জন; কিন্তু বেসরকারী হিসাবে অনেক বেশী। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে হ্যমারশিল্ড মন্তব্য করিয়াছেন—the explosion was an historical accident in the sense nobody planned it. এই হাঙ্গামার পর বেলজিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট কঙ্গোর শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই নূতন প্রস্তাব অনুসারে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন "অর্গান" সম্পর্কে নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হইয়াছে, বর্ণ-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে, নূতন শ্রমিক আইন প্রবর্তিত হইবে, শিক্ষা-ব্যবস্থারও কিছু প্রসার ঘটিবে।

কিউবায় ডিক্টেটারীর অবসান—

গত জানুয়ারী মাসে কিউবার সামরিক ডিক্টেটার জেনারেল ফুলগেন্সিও বাতিস্তা বিতাড়িত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে তিন বৎসর পূর্বে ডাঃ কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এতদিনে সে বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করিল। কিউবার এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রামাঞ্চলে ইহার উদ্ভব; সেখান হইতে ইহা রাজধানী হাভানা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। লাটিন আমেরিকায় সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন হয় সফলকামের সামরিক অভ্যুত্থানে। এই দিক হইতে কিউবার বিদ্রোহের সহিত লাটিন্ আমেরিকার অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের মূলগত পার্থক্য। যুদ্ধোত্তরকালে লাটিন্ আমেরিকায় ডিক্টেটারীর অবসান এক বিশেষ আন্তর্জাতিক ঘটনা। গত ১৯৫৫ সালে আর্জেন্টিনায় পেরণের পতন হইতে এই প্রগতিশীল ধারার আরম্ভ। কিউবার পর এখন শুধু পারাগুয়ে, নিকারাগুয়া ও ডোমিনিকান্ ডিক্টেটার অবশিষ্ট রহিল। ১০।২।৫৯

(পূর্বানুবৃত্তি)

—চব্বিশ—

সেদিন মেরিলিন মুনরোর ছবি দেখল সত্যজিৎ, রেস্তোরাঁয় খেলো পরিতোষের সঙ্গে, বাড়ী ফিরল রাত প্রায় এগারোটায়। খুব সহজ ভাবে নেওয়া যাক জীবনটাকে। আবার ফিরে যাওয়া যাক সেই দিনগুলোর ভেতর—যখন কোনো ভার ছিল না মনের মধ্যে—নিজেকে নিয়ে বিশেষ কোনো দায় ছিল না। সেদিন সকলের সঙ্গে স্রোতের মুখ দিয়ে চলা : ক্রিকেটের মাঠে, সিনেমায়, ইউনিভার্সিটিতে, পলিটিক্যাল তর্কে, ছাত্র শোভাযাত্রায়। আরো অসংখ্য মানুষের পাশাপাশি পা ফেলে আমিও চলেছি—এইটুকু বলেই, এর বেশি কিছু ভাববার দরকার ছিল না।

সাড়ে দশটার ট্রামে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সত্যজিৎ ভাবছিল, মানুষের বয়স বাড়ে কখন? যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যখন নিজেকে সরিয়ে নেয় এক পাশে। আমি—আমি। তখন পৃথিবীর স্রোতে ভেসে চলা নয়, তখন ভাবা : এই স্রোত কতখানি বয়ে আছে আমার দিকে, আমার প্রয়োজনে। তখন সেই দার্শনিকের ভাষায় : 'আমি আছি, তাই পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে।' সত্যজিতেরও বয়স বাড়ে এমনি করে। যত বাড়ে—মানুষ তত আত্ম-কেন্দ্রিক হয়।

সেই নিজের প্রয়োজনেই সত্যজিৎ মনে করেছিল, পুরবী তারই একটি কথার ওপর বিশ্বাস করে শপথের মতো প্রতীক্ষা করে থাকবে; বলেছিল এতদিন পরেও সেই গঙ্গার ধারের সন্ধ্যাগুলিকে ভুলতে পারেনি। কিন্তু পুরবী তার ঘোর ভাঙিয়ে দিয়েছে। 'আমিত্বের' উপর মস্ত একটা ঘা খেয়েছে সত্যজিৎ। তাকে বাদ দিয়েও মানুষের আলাদা আলাদা মন আছে—জীবনের আলাদা স্রোত আছে।

আবার ফিরে যাওয়া যায় সকলের ভিতর? সেই সুমিত্র—আবার সেই আস্তিন গুটিয়ে রাজনীতির আলোচনা? আবার সেই খেলার মাঠ—মোহনবাগান হোর করলে গ্যালারীর ওপরে সেই লাফানো, আনন্দে পায়ের চটি ছুড়ে ফেলে দেওয়া? পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে ঘুগ্‌নি আর তেলে ভাজা খাওয়া? বন্ধুর করুণ প্রেমের কাহিনী শুনতে শুনতে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেওয়া : আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন অত? লেগে থাক্—পেশেন্স্, পে-ড।

ফিরে যেতে পারে কি সত্যজিৎ? বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে আমিটা একটু একটু করে নিজের চারদিকে একটা শক্ত খোলা তৈরি করে দিয়েছে—সেটাকে ভেঙে ফেলা কি এতই সহজ আজকে?

কিন্তু সেই চেষ্টাই করতে হবে—নইলে তার মুক্তি নেই। মুখার্জি ভিলার বিষ তার রক্তে তিলে তিলে জমে উঠছে, তার নিজের ব্যক্তিত্বটা গুটিয়ে আসছে নৈরাজ্যের ভেতর—কিছুদিনের মধ্যেই সে সিনিক হয়ে উঠবে। অথচ এই ত্রিশঙ্কু পরিণতিটাকেই ঘৃণা করে সত্যজিৎ—ঘৃণা করে সব চাইতে বেশি।

বাড়ীতে যখন পৌঁছুল, তখন নীচেটা অন্ধকার। আস্তাবলে পা ঠুকছে ঘোড়াটা : বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে শিবশঙ্করকে নিয়ে অনেক রাতে সে কলকাতার ঘুমন্ত পথ দিয়ে কেশর দুলিয়ে ছুটে আসত, হয়তো এমনি রাতে সেই

স্মৃতি আলো। ওর পা-কে চঞ্চল করে তোলে। একবার উপরের দিকে চোখ তুলে তাকালো। হিংস্র উগ্র খানিকটা আলোয় অস্বাভাবিক ভাবে ঝকঝক করে জ্বলছে শিব-শঙ্করের কাচের জানলা। কী করছেন এত রাত্রে? অনুমান করতে পারে সত্যজিৎ। এক দৃষ্টিতে হয়তো তাকিয়ে আছেন ভেনাস্ আর অ্যাডোনিসের সেই কুৎসিত ছবিটার দিকে, ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও বসেছেন এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে—আস্তাবলের ঘোড়াটার মতো তাঁরও উদ্দাম দিনগুলিকে মনে পড়ছে।

মার্কারি ক্লকটায় এগারোটা বাজতে আরম্ভ হল। মুখার্জি ভিলায় কালপুরুষের কণ্ঠস্বর। কোনোদিন একটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় এই বাড়ীটা যখন বালির স্তূপের মতো এলিয়ে পড়বে (সেই দিনটার কথা প্রায়ই ভাবতে চেষ্টা করে সত্যজিৎ), তখনো সেই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে ঘড়িটা সমানে প্রহর ঘোষণা করতে থাকবে। ওর আর মুক্তি নেই।

বারান্দায় উঠে এল সত্যজিৎ। ম্লান আলোর দেওয়ালে অর্কিডের ছায়া—কতগুলো ভুতুড়ে আঙুলের মতো কাঁপছে। গ্রাক-পিলারের ওপর ঘুমন্ত পায়রার পাখা ঝাপ্টানি। প্রীতি বীথির ঘরে একটা ফিকে নীল বাতি জ্বলছে, শোবার আগে বোধ হয় রাত্রির প্রসাধন করছে প্রীতি, দরজার ফাঁকে মৃদু গানের গুঞ্জন: "তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস"—

মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়াল সত্যজিৎ।

"দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস"—

এ গান কা'র উদ্দেশে? রীতেন দি গ্রেটার?

ভাবতে ভালো লাগল না। রবীন্দ্রনাথের ওপর মমতা হয়। এই গান লিখবার সময় কা'র কথা ভেবেছিলেন তিনি? রীতেন?

ইন্দ্রজিতের ঘর অন্ধকার। বারান্দার সামনে বসে বসে ঘুমুচ্ছে রঘু—হয়তো সত্যজিতের জন্যই অপেক্ষা করছে। মনে হল এ বাড়ীর যত শ্রান্তি—যত অবসাদ সব যেন রঘুরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে।

পা টিপে টিপে সে আবার সিঁড়ি বাইতে লাগল। তেতলায়, নিজের ঘরে।

অন্ধকার। টেবিল, খাট, আয়না, আলনা, বইয়ের আল্মারি। অচেনা। শুরু। মৃত।

সত্যজিৎ দাঁড়ালো। এর মধ্যেই আবছা চোখে পড়ছে বড় আয়নাটা। তার মধ্যে আরো আবছা তার ছায়া। ধূসর, দুনিরীক্ষ্য। ব্যক্তি সত্যজিৎ নয়—তার আত্মার প্রতিবিম্ব।

"And after my death
I enter my dark airless tomb
From where"—
From where?

কবি উত্তর দিতে পারেন নি। হয়তো ইন্দ্রজিৎ জানে। আরো অন্ধকারে, আরো নীরন্ধ্র বিবাক্ততার অতলে। কিন্তু সত্যজিৎ কি সে-কথা বিশ্বাস করে? জীবনকে কি সে ও-ভাবে দেখতে চেয়েছে কোনোদিন?

সুইচে আঙুল রেখে। সেটাকে টেনে দেবার আগে আর একবার তমসাচ্ছন্ন আয়নাটায় নিজের আরো তামসী আত্মিক প্রতিবিম্ব দেখল সত্যজিৎ। আর মনে হল, পৃথ্বী অনেক দূরে চলে যাবে—হয়তো কালকেই।

পৃথিবীকে নিজের প্রয়োজনে চাওয়া নয়—নিজেকে পৃথিবীর প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিলে তবেই মুক্তি। কিন্তু তাই কি পারে ইন্দ্রজিৎ? এই মুখার্জি-ভিলার সমাধি-কক্ষে একবার পা দিলে সে বিশ্বাস টলে যেতে চায়।

খুট ক'রে আলো জ্বলে উঠল। টেবিলে ঢাকা দেওয়া খাবার। "Toothbrush hanging on the wall"—এলিয়টের কবিতা।

জীবন। রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি। মুখার্জি-ভিলার এই গণ্ডীর মাঝখানে থাকা—নিজের চারদিকে শামুকের মতো একটা শক্ত খোলা তৈরি করে যাওয়া। আর মধ্যে মধ্যে মনে হওয়া—পৃথ্বী অনেক দূরে চলে যাবে। হয়তো কালকেই।

তাই তিন দিন পরে একটুও চমকালো না সত্যজিৎ।

একটা বিশেষ রোল নাম্বারের ঘরে লাল কালির লেখা টান। পরুষ নিষ্করুণ অক্ষরে লেখা: টেক্‌ন ট্রান্স্‌ফার।

ক্লাসে মুখ তুলে কা'রো দিকে তাকালো না সত্যজিৎ। এমন কি বীথির রোল-নাম্বারে যখন একটা গ্রন্থি পড়ল, তখনও না। তারপর বই খুলে তাকালো সোজা সামনের

দেওয়ালের দিকে, পরিষ্কার গলায় পড়তে আরম্ভ করল : "In shakespearian tragedies, we always find a strange rote of"—

না—ক্লাসের দিকে চোখ সে নামাবে না। পূরবী চলে গেছে। তার ছাত্রীদের দৃষ্টির চাপা সমবেদনার চাইতে অপমান আর কিছুই নেই।

বাড়ী ফিরল তিনটের কাছাকাছি। বারান্দায় একটা ছোট হোল্ড-অল আর সুটকেস্। বীথি দাঁড়িয়ে।

—কিরে, কী ব্যাপার ?

—বাঃ, আমাদের সেই কন্‌ফারেন্স সাউথ-ইণ্ডিয়ায় ? টাকা নিলাম না তোমার কাছ থেকে ? দিন ছয়েক লাগবে ফিরে আসতে।

—বাবাকে বলেছিস ?

—বললে যেতে দেবেন নাকি ?—বীথি হাসল।

—জানতে তো পারবেন। তখন ?

—আমার সম্বন্ধে কোনো ইন্‌টারেস্ট নেই ছোড়দা। তাঁর কালো মেয়েকে তিনি কোনোদিন দেখতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে গান শোনবার জন্যে দিদির ডাক পড়বে —আমার নয়। অতএব নিশ্চিন্ত থাকো।

—কিন্তু কাজটা বোধ হয়—

—ভালো হচ্ছে না—না ?—সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল হাসিটা বীথির : যেন এ-বাড়ীর সবই ভালো চলছে। সবই ভেঙে যাচ্ছে ছোড়দা, এটা তুমি আমার চাইতে বেশি জানো। এখন আর আড়াল রেখে কী হবে ? অতএব লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার সঙ্গে চলো হাওড়া স্টেশনে। তুলে দিতে হবে মাদ্রাজ মেলে।

সব সমস্যার সমাধান এক মুহূর্তে করে দিলে বীথি।

মুহূর্তের জন্য সত্যজিতের দৃষ্টি ঘুরে গেল বীথির মুখের উপর দিয়ে। মুখাজি-ভিলার কাটলে সূর্যের আলোর একটা ঝলক। এই মেয়েটা এখানে প্রক্ষিপ্ত। এ বাড়ির আলো-বাতাস-বিহীন উজ্জ্বল গৌরবর্ণতার ভিতর কোথা থেকে এনেছে রৌদ্রের রঙ—অরণ্যের শ্যামশ্রী। শিবশঙ্কর সহজাত সংস্কারেই চিনে নিয়েছেন—ও এখানকার কেউ নয়, এখানে ওকে মানায় না।

বীথি আবার বললে, ভাবছ কি ? চলো। বড্ড ভীড় হবে গাড়িতে।

—দাঁড়া, চা খাই এক পেয়ালা।

—চা খাবে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে।

সত্যজিৎ হাসল : এদিকে তো এত বড় বড় কথা—একা স্টেশনে যাওয়ার সাহস নেই ?

—আছে। কিন্তু তোমাদের ভ্যানিটিকে একটু খুশি করতে চাই। অবলাত্বের সুবিধেটুকু ছাড়ব কেন ? দেখো গাড়িতে জায়গা না থাকলেও কোনো সহৃদয় পুরুষ আমাকে বসবার জায়গা করে দেবেন।

—তুই ডেঞ্জারাস মেয়ে। আচ্ছা—চল—

—বাবাকে ম্যানেজ করবার ভার কিন্তু তোমার।

—সে দেখা যাবে, চল্।

ট্রেনে বীথিকে তুলে দিতে অসুবিধে হল না। একটা দল ওদের ছিলই—একখানা থার্ডক্লাশ আগে থেকেই দখল করা ছিল ওদের।

আবার সন্ধ্যা। আবার নিজের ঘর।

টেবিলের উপরে একরাশ প্রুফ। বনশ্রী পাঠিয়েছে।

বিরক্তিকর। আজ সারাদিন মনের কাছে একা থাকতে চেয়েছিল সত্যজিৎ। নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে ভাবতে চেয়েছিল পূরবীর কথা। কিন্তু উপায় নেই। কেউ সময় দেবেনা তাকে—এক মুহূর্তেও না।

এমন সময় প্রীতি।

—কী চাই ?

—একটা খুব দরকারি কথা।

—বলো।—হতাশায় চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলে সত্যজিৎ : বলে যাও।

প্রীতির মুখ লাল টকটকে। উত্তেজনায় শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

—ছোড়দা—আমি—আমি—রীভেনকে বিয়ে করতে চাই।

দারুণভাবে চমকে উঠল সত্যজিৎ—চমকে উঠল প্রীতিও। ঝন্ ঝন্ করে একটা অস্বাভাবিক শব্দ বেজে উঠল সারা বাড়ীতে। আছড়ে আছড়ে পেয়ালা-পিরিচ ভাঙছে ইন্দ্রজিৎ।

আর আর্ত চিৎকার।

ইন্দ্রজিৎ তারস্বরে জিলোঁর কবিতার আবৃত্তি করছে।

ক্রমশঃ

গ্রহ জগৎ

ভাগ্যভাব

উপাধ্যায়

জাতকাভরণে উল্লিখিত আছে—'ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেয়ং বিদ্বাংস্তত্ত্বনা স্তথম্। আয়ুর্বিদ্যা যশোবিত্তং সর্ব্বভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতম্। বিদ্যার সর্ব্বং যশ-স্তৈর্থিদ্যাং ভাগ্যালয়ং কেবলমত্রবন্ধাৎ। আয়ুষ্ক মাতা চ পিতা চ বংশো ভাগ্যাধিতে নৈষ ভবিষ্যবস্তাঃ।' রাশিচক্র বিচারে দ্বাদশ ভাবের মধ্যে নবম বা ভাগ্যভাব সর্ব্বপ্রধান। একে ধর্ম্মভাবও বলা হয়। প্রথমে এই ভাব বিচার করে পরে অন্যান্য ভাব বিচার করা বিধেয়। আয়ু বিদ্যা যশ এবং ধন সমস্তই ভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। এজন্যে জ্যোতির্বিদ্‌গণ অন্যান্য ভবন ত্যাগ করে অগ্রে সঙ্গে ভাগ্যস্থানের বিচার করবেন, কেননা জীবন, মাতা, পিতা আর বংশ ভাগ্যবান ব্যক্তির দ্বারাই রক্ষা হয়।

নবম ভাবকে ভাগ্যভাব বলে। নবম ভাব ও বৃহস্পতি থেকে ভাগ্য প্রভাব, গুরুর অনুগ্রহ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, উচ্চপ্রয়োগ, তীর্থপর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য করা হয়। লগ্ন থেকে নবমস্থান ও চন্দ্র থেকে নবমস্থান এই দুইটীর ভেতর যেটী বলবান রাশি, সেটী থেকে ভাগ্যভাবের ফলাফল বিচার করতে হয়। ভাগ্যভাবে গুরু, তৃতীয় সন্তান, চতুর্থ ভ্রাতা বা ভগ্নী, নবম সন্তান, পৌত্র পৌত্রী, পুত্রের প্রথম পুত্র ও দৌহিত্র-পত্নী, শ্যালক বা শ্যালিকা, বিশেষতঃ স্ত্রীর কনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠা প্রভৃতি আত্মীয়গণের শুভাশুভ বিচার হয়ে থাকে। বিচারের সময়ে এই নবমস্থানটীকে লগ্ন মনে করে রাশিচক্রস্থ গ্রহসংস্থান দেখে উপরোক্ত আত্মীয়দের সম্পর্কে ফলাফল বলা হয়ে থাকে।

ভাগ্যভাব বলবান হোলে প্রাক্তন সুকৃতি বলে অন্যান্য ভাবেরও ফলাফল শুভ হয়। ভাগ্যস্থান দুর্ব্বল হোলে নানারকম যোগ থাকলেও জীবনে বাঞ্ছিত ফল লাভ ও সুখৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ঘটে না। নবমস্থানে বহু পাপগ্রহ থাকলে আর ভাগ্যাধিপতি বা লগ্নাধিপতি হীনবল হোলে ভাগ্যহানি ঘটে। ভাগ্যস্থানের অধিপতি ভাগ্যস্থানে থাকলে বা সেখানে তাঁর দৃষ্টি থাকলে অযত্নেই ভাগ্যলাভ হয়, আর যদি ভাগ্যস্থান নবমাধিপতি ভিন্ন অন্য কোন উচ্চগ্রহস্থ শুভ গ্রহের দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তা হোলে বিশেষে ভাগ্যলাভ হয়। পাপ ও ক্রূর গ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হোলে ভাগ্যোন্নতি বিশেষ হয় না, বহু দুঃখ কষ্ট জীবনে ভোগ করতে হয়।

নবম স্থানে সমস্ত গ্রহের যোগ বা সমস্ত গ্রহের দৃষ্টি থাকলে জাতক বিশেষ ধনী, সৌভাগ্যবান ও রাজতুল্য হয়। নবমে শুভগ্রহ দৃষ্টি বর্জ্জিত গ্রহ নীচস্থ, অস্তগত বা পক্ষবলরহিতরূপে অবস্থান করলে দুর্ভাগ্য হয়। ভাগ্যাধিপতি ও বৃহস্পতি শুভাধিক বর্গগত আর ভাগ্যস্থান শুভগ্রহ যুক্ত হোলে জাতক ভাগ্যবান হয়। ভাগ্যস্থ অন্যশুভগ্রহ তুঙ্গী বর্গস্থ বা মিত্রগৃহী হোলে ভাগ্য বল, ধন ও ধর্ম্মের উন্নতি ঘটে। ভাগ্যাধিপতি যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতিই ভাগ্যকর্ত্তা। এই ভাগ্যকর্ত্তা তুঙ্গী, স্বগৃহী, মিত্রগৃহী, বর্গবলে বলী হোলে ভাগ্যবৃদ্ধি হয়, কিন্তু নীচস্থ দুঃস্থান গত, শত্রুগৃহী, পাপগ্রহযুক্ত, পাপাধিক বর্গগত হোলে ভাগ্যহানি হয়।

কেন্দ্রস্থান গ্রহযুক্ত হোলে ভাগ্যভাব শুভ হয় না। ভাগ্যস্থ গ্রহ সুহৃদ্গৃহস্থ হোলে জাতক অতিশয় ভাগ্যবান ও ধনৈশ্বর্য্যশালী হয়। সর্ব্বগ্রহ দৃষ্ট বৃহস্পতি ভাগ্য স্থানে থাকলে জাতক মহাভাগ্যশালী ও রাজমন্ত্রী হয়। ভাগ্যে অবস্থিত শুভগ্রহ, দুর্ব্বল হোলেও জাতক ধার্ম্মিক হয়। বৃহস্পতি যদি ভাগ্যে থাকে, আর ভাগ্যের অধিপতি থাকে কেন্দ্রে—আর লগ্নপতি বলশালী হয়, তা হোলে জাতক বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান হয়। লগ্নাধিপতি ভাগ্যে, ভাগ্যাধিপতি লগ্নে আর সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি থাকলে জাতক অতিশয় ভাগ্যশালী হয়। ভাগ্যাধিপতির সঙ্গে মীনরাশির ২৭ অংশে শুক্র আর লগ্ন থেকে তৃতীয় স্থানে শনি থাকলে জাতক মহা ভাগ্যশালী হয়। বৃহস্পতি ও শুক্র শুভ রাশিতে থেকে ভাগ্যভাব বা সুখভাব গত হয় অথবা ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রে বলবান হোলে জাতক বহু গ্রামের অধিপতির ন্যায় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হয়। যাদের ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রে থাকলে বাল্যে আর উচ্চস্থ বা ত্রিকোণস্থ হোলে যৌবনে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করে। বৃহস্পতি, চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত তার অধিপতি বা লগ্নাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থান করলে যৌবনে সুখী হয়। কেন্দ্র ত্রিকোণ ভিন্ন অন্য স্থানে ভাগ্যাধিপতি স্বক্ষেত্রগত বা মিত্র গৃহগত হোলে জাতক শেষ বয়সে ভাগ্যবান হয়। চন্দ্র ও রবি নীচস্থ বা নীচ রাশিগত হয়ে নীচাভিমুখী হোলে সমস্ত ভাগ্যযোগ নষ্ট হয়। যার কোষ্ঠীতে রবি ও চন্দ্র দুর্ব্বল, তার ভাগ্যোদয়ে নানা বাধা বিপত্তি ঘটে। নবমাধিপতি শত্রুষষ্ঠগত হোলে আর নবম স্থানে পাপ ও শত্রু গ্রহের দৃষ্টি থাকে তা হোলে জাতক পরধর্ম্ম রত হয়। বৃহস্পতি ভাগ্যগত হোলে আর ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থান করলে বিশ বছর বয়সের পর ভাগ্যোদয় ঘটে। ভাগ্যাধিপতি ধনভাবগত হোলে আর ধনাধিপতি ভাগ্য স্থানে অবস্থান করলে ত্রিশ বর্ষের পর

জাতক যানবাহন সম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান হয়। বৃষ লগ্ন রাশির ১৫ অংশে আর ভাগ্যাধিপতি ভাগ্যস্থানে অবস্থান করলে ৫৪শ বৎসরের পর ভাগ্যোদয়। বিচার দ্বারা যে যে গ্রহ উন্নতি কারক বলে ঠিক করা হয়, সেই সেই গ্রহ নিজেই বয়সের পর ফল দিতে থাকে। রবি উন্নতিকারক হোলে বারিশ বছরের আগে উন্নতি হয় না। চন্দ্র চব্বিশ, মঙ্গল আটাশ, বুধ বত্রিশ, বৃহস্পতি ষোলো, শুক্র পঁচিশ ও শনি ছত্রিশ বর্ষ পরে স্ব স্ব ফল প্রদান করে। রাহু ৪২ বর্ষ থেকে নিজের ফল পূর্ণভাবে দিতে পারে। শনি ও মঙ্গল অশুভ হয়ে পরস্পর কেন্দ্রবর্ত্তী হোলে অত্যন্ত কষ্ট, নানাবিধ ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি প্রদান করে। ৩১ থেকে ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত কষ্ট পেতে হয়। কৃত্তিকা, রোহিণী, পুষ্যা ও পূর্ব্বফল্গুনী শুভ ভাগ্যগত হোলে বিশেষ ভাগ্যোদয়। নবম ভাগ্যাধিপতি ও নবমভাবকারক পাপযুক্ত, পাপদৃষ্ট অথবা পাপ নবাংশে হোলে পিতার দুঃখ হয়। নবমে শনি থাকলে যদি লগ্নাধিপতি ও চন্দ্র নীচ রাশিগত হয় তা হোলে জাতক ভিক্ষোপজীবী হয়। অষ্টমে মঙ্গল, নবম বা পঞ্চমে রবি ও দশমে চন্দ্র থাকলে মানুষ ভিক্ষুক হয়। কর্কট লগ্ন জাতকের রাশিচক্রে তুলায় শনি, বৃষে চন্দ্রস্থ এবং বৃহস্পতি মকরে থাকলে তার মহা সাধনায় সিদ্ধি ও অন্তে মুক্তিলাভ হয়। কেন্দ্রস্থ চন্দ্র বা শুক্র বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট হোলে মানিতা যোগ হয়। চন্দ্রের দ্বিতীয়ে ও দ্বাদশে কোন গ্রহ না থাকলে কেমদ্রুম যোগ হয়। এই যোগে জন্ম হোলে অত্যন্তরোগ, মানিতা, কুপুত্র, অসতী স্ত্রী, পাপাচার ও নানা দুঃখকষ্টে পড়ে মানুষ জীবনে কষ্ট পায়। ভাগ্যাধিপতি স্বস্থানে, কর্ম্মাধিপতি ভালো থাকলে উৎকৃষ্ট রাজযোগ হয়। এই যোগে জাত ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হয়। নবমে কেতু ও মঙ্গল, দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি, পঞ্চমে বুধ, সপ্তমে রবি ও লগ্নে শুক্র থাকলে জাতক অতীব ধনশালী হয়। লগ্নাধিপতি ভাগ্যাধিপতির সহিত একত্র হয়ে পঞ্চমাধিষ্ঠ হোলে সন্তানসূত্রে দ্বারা ধন ও ভাগ্যলাভ। দ্বিতীয়াধিপতি নবম স্থানে থাকলে উত্তরাধিকারসূত্রে ভাগ্যলাভ। নবমভাবপতি, ভাগ্যভাব কারক বৃহস্পতি ও শুক্র তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকলে জাতক দুর্ভাগ্যের হয় আর কেন্দ্র, ত্রিকোণ বা তার স্থানে থাকলে ভাগ্যবান হয়। নবম স্থান দুষ্টগ্রহ হোলে মানুষ ধার্ম্মিক হয় না। নবম পতি শুভগ্রহ ও শুভস্থান অর্থাৎ কেন্দ্রকোণগত হোলে ভাগ্যোন্নতি আর হয়, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান পাপ হোলে ভাগ্যোন্নতি চান্সি ঘটে থাকে। ভাগ্য স্থানে পাপগ্রহ, ভাগ্যাধিপতি পাপসংযুক্ত অথবা ক্রূর গ্রহের নবাংশে বা ষষ্ঠাংশে কিম্বা পাপগ্রহের নবাংশবর্ত্তী হোলে জাতক পাপকার্য্যে রত হয়। রবি বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র ইচ্ছাংশে অথবা মিত্র বা শুভগ্রহের নবাংশে অবস্থান করে এবং ভাগ্যাধিপতি প্রবল বলযুক্ত হয় তা হোলে জাতক ধর্ম্মাত্মা হয়। মাঘের ভাগ্যাধিপতি ও লগ্নাধিপতি তৃতীয় স্থানে বা ভাগ্য স্থানে কিম্বা বলবান চারে উচ্চ রাশিতে অবস্থান করে তারা জেষ্ঠ মানব হয়ে থাকে। দ্বিতীয়াধিপতি নবমে ও নবমাধিপতি জাতি কারক গ্রহে। সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকলে জাতক জাতি ভাগ্যলাভ করে। জন্ম লগ্নে লগ্ন, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানগত বলযুক্ত গ্রহের নবম স্থানে দৃষ্টি থাকলে জাতক গুণবান, ভোগবান ও ধর্ম্মবান হয় এবং যানবাহন সম্পত্তি ভোগ করে। রবি ও চন্দ্র রাজার কারক। রামচন্দ্রের কুণ্ডলীতে রবি ও চন্দ্র কেন্দ্রগত হয়ে বিশেষ বলশালী হয়েছে, এইজন্য তিনি প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন।

০০০

ফাল্গুন মাসের ব্যক্তিগত লগ্ন ও রাশির ফলাফল

মেষ

মোটামুটি ভাবে মাসটা ভালো যাবে। উচ্চপদস্থ বন্ধু প্রাপ্তি। লাভ। বিলাসব্যসনের উপকরণ প্রাপ্তি। সঙ্গলাভ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শেষভাগে ভ্রমণে কষ্টলাভ, সাময়িক ঝামেলা। কলহ বিবাদ। সন্তানের সম্ভাবনা বা আঘাত প্রাপ্তি। অকারণ মানসিক উদ্বেগ। বায়ু ও পিত্তপ্রকোপ। ভূম্যধিকারীর পক্ষে মূলতঃ কোন অবস্থার উন্নতি না হোলেও বাড়ী বা জমির ক্রয় বিক্রয়ে আধিক উন্নতি। মামলামোকর্দ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে অশুভ সময়, এরূপে আপোষনিষ্পত্তি করে নেওয়াই ভালো। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। ব্যবসায়ে ও প্রোফেসানে খুব ভালো ফল দেখা যাবে। জমীদার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে শুভ ফলগুলি সম্পূর্ণভাবে পাওয়ায় অন্তরায় ঘটবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের পক্ষে অপ্রত্যাশিত দৈবানুগ্রহকর পরিস্থিতি বা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ। অধ্যাত্মপথে যে সব ধর্ম্মপ্রাণা নারী সাধনা করছেন, তাঁরা ভগবৎ কৃপালাভ করবেন ও নানারকম ভাব ও দর্শনের মাধ্যমে সাধনায় অগ্রসর হবেন।

বৃষভ

ফাল্গুন মাসের শেষের দিক থেকে চৈত্রের গোড়া পর্য্যন্ত সময়টী ভালো, প্রথম দিকটা নানাপ্রকার অশান্তি, উপদ্রব, শত্রু বৃদ্ধি ভ্রান্তি-জনক ভ্রমণ ও আশাভঙ্গ, অর্থব্যয় প্রভৃতির ভয়ে কিছু কষ্টভোগ আছে। এমন কি মামলামোকর্দ্দমায় পরাজয় পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। শারীরিক দুর্ব্বলতা। শ্লেষ্মাপ্রকোপ। পারিবারিক শান্তি, মধ্যে স্বজন-বিরোধ। সন্তানের পীড়া। অর্থপ্রাপ্তি। সকল কাজে বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে কিছু কিছু সাফল্য। ফাটকায় ক্ষতি। প্রথমদিকে চাকুরি-জীবীর পক্ষে শুভ নয়, শেষের দিকে কিছু ভালো। ভূম্যধিকারী বা বাড়ীওয়ালার পক্ষে নানা অশান্তির কারণ ঘটবে। ব্যবসায়ী ও পেশা-জীবীর অবস্থার উন্নতি। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, মেয়েদের পক্ষে ভালো বলা যায় না। রোহিণীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির ভাগ্যে বেশী কষ্টভোগ।

মিথুন

মাসের শেষের দিকটা আগে ভালো যাবে না। স্ত্রীলোকের সহিত কলহ, মিথ্যা অপবাদ, সকল কাজে বাধা, অনবসর, চিত্তচাঞ্চল্য ও ও বিক্ষোভ, মনোমালিন্য, আর্থিক অসচ্ছলতা, ব্যয়াধিক্য, শুভ প্রভৃতি দেখা যায়। মাসের প্রথম দিকটায় অশুভ ফলাফলই হবে। রক্তের চাপাধিক্য, চক্ষুপীড়া, বক্তৃতাঘটিত দোষ, পিত্তপ্রকোপ। পারিবারিক অশান্তি। আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য। প্রথম দিকে আর্থিক অবস্থা উদ্বেগ জনক হবে না। মাসের শেষের দিকে বিশেষ আর্থিক ক্ষতি যোগ আছে। সম্পত্তিসংক্রান্ত গোলযোগ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও পেশা জীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। মাসের প্রথম দিকটা মেয়েদের পক্ষে বেশ ভালো বলা যায়। সকল দিকেই

এ মাসে মেষেরা ভালো ফলই পাবে, তবে কোনপ্রকার উচ্চ আশার বশবর্তী হয়ে নব প্রচেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করা চলবে না।

কর্কট

এ মাসটী ভালোই যাবে। মোটামুটি সব কাজেই সাফল্য। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ধনাগমে। বন্ধুমিলন। খ্যাতি প্রতিপত্তি। বিলাস-দ্রব্যাদি লাভ। গুরুজনবর্গের সহায়তা লাভ। সৌভাগ্য-সূচনা। পুনর্বসু ও অশ্লেষা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে শুভফলগুলি পূর্ণ-ভাবে আশা করা যায়। স্ত্রী-পুত্রের সামান্য পীড়াদি। মাসের প্রথম দিকে বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে সামান্য ঝগড়া হতে পারে। সাধারণভাবে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যাধিকারীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর উন্নতি ও উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ। বেকার ব্যক্তির কর্মপ্রাপ্তি। মেষের পক্ষে এ মাসটী নানা দিক দিয়েই শুভ হবে।

সিংহ

মোটামুটি শরীর ভালোই যাবে। কিছুটা সাফল্যলাভ। ভ্রাতৃবিরুদ্ধ ভ্রমণ। উদ্বেগ, অশান্তি, বন্ধু বিয়োগ, অযথাদেনা প্রভৃতি—শেষের দিকে জনপ্রিয়তা অর্জন। স্ত্রী ও সন্তানাদির স্বাস্থ্যহানি। প্রভাবের পীড়া। পারিবারিক কলহ। বিবাদের ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা। কোন প্রকার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ বর্জনীয়। কৃষি-জীবীর পক্ষে শস্য সঙ্কটের পথে বাধা। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালার নানা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হবে, মামলা-মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য অর্থব্যয় ও উদ্বেগ। মাসের প্রথম দিকে চাকুরিজীবীর পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হোলেও শেষের দিকটা আদৌ ভালো নয়। ব্যবসায়ী ও পেশা-জীবীরা এ মাসে কেনা বেচা করবে। এ মাসে মেষেদের পক্ষে স্থান পরিবর্ত্তন বা নূতন উদ্যম গ্রহণের সম্ভাবনা। মাসের শেষ দিকটাই বেশ ভালো, প্রথম দিকটা তত ভালো হবে না। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে সুসময়। মঘা ও পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে আশানুরূপ শুভ ফল হবে না।

কন্যা

মাসটী মোটেই ভালো নয়। নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ। রোগ প্রকোপ ও কঠিন পীড়া প্রভৃতি, ভ্রম, শোক ও বন্ধু বিচ্ছেদ। উদ্বেগ ও অশান্তি। আশাভঙ্গ মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানি, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। সর্ব্ব কার্য্যেই বাধা। অসম্মান ও অপযশ প্রাপ্তি। ভূমিসম্পর্কিত পীড়াভোগ। বিদ্রোহ, দ্বন্দ্ব কলহ। মাসের প্রথমে দুর্ঘটনা ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত। পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি, কলহাদি সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা ভালো যাবে না। কাটকা, জুয়াখেলা প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ভূম্যাধিকারীর বা বাড়ী-ওয়ালার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিযোগী হয়ে আদালতে মামলাভোগ, মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। চাকুরির ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দিকটা খারাপ যাবে, শেষের দিকটা কিছু ভালো। উপরওয়ালার সঙ্গে বিরোধ, তজ্জন্য বিরাগ ভাজন হওয়ার ফলে উন্নতির পথে বাধাপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর পক্ষে মোটামুটি যাবে। মাসের প্রথম দিকটা মেষেদের পক্ষে ভালো শেষের দিকটা ভালো যাবে না। হস্তানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে দুর্ভোগ কম হবে, উত্তর ফল্গুনী ও চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির বহু দুর্ভোগ আছে।

তুলা

মাসটী মিশ্রফলদাতা—ভালোমন্দ দুই ঘটবে। শত্রু বৃদ্ধি, বন্ধু বিচ্ছেদ, কর্ম্মে বিপত্তি ও বাধা, মানসিক চাঞ্চল্য, অসম্মান ও আশাভঙ্গ-যোগ আছে। আর আছে বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে কার্য্যে সাফল্য, পদোন্নতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শত্রুদমন আর বিলাস ব্যসনে কালাতিপাত। যে ভাবেই হোক্ বন্ধুপাতজনিত মানসিক দুর্ব্বলতা ও শরীরের অভ্যন্তরে পচনক্রিয়ার সম্ভাবনা। গৃহে কলহ-বিবাদ হোলেও শেষ পর্য্যন্ত পারিবারিক শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। নানা ভাবে অর্থাগম। হঠাৎ কোন পরিকল্পনার কার্য্যবিরোধ করে শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে শুভ। চাকুরীজীবীর পক্ষে সুসময়। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর সময় মন্দ যাবে না। ঘরে বাইরে মেষেরা কুমন্ত্রণা ও ঈর্ষ্যা সংযোগ রাখতে পারবে না, প্রণয়ে আনন্দ হোলেও বিচ্ছেদ ঘটবে। স্বাতী ও বিশাখা-নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অশুভ ফলগুলি পূর্ণভাবে ফলবে কিন্তু চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণ শুভ ফলগুলিই সম্পূর্ণভাবে লাভ করবে, অশুভ ফল পাবে না বললেই চলে।

বৃশ্চিক

মোটেই ভালো যাবে না। মাসের প্রথম দিকটা কোন মতে অতি-বাহিত হোলেও শেষে। দিকটা একেবারেই ভালো নয়। দুঃখ কষ্ট, স্বজনবর্গের শত্রুতা, ভ্রমণে নানা অঘটনার আশঙ্কা, অসম্মান ব্যয়, নানা কাজে বাধা বিঘ্ন প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। শেষার দিকে ভ্রমণে কিছু সুখলাভ, সুসংবাদ লাভ, শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বন্ধুদের সঙ্গে কলহ। আর্থিক ক্ষেত্রে বৈরাগ্যজনক পরিস্থিতি, অকারণ অর্থব্যয়, চিকিৎসায় বিব্রত ও ব্যয়। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ অনেকখানি বেরিয়ে আসবে। রেস, কাটকা, জুয়াখেলা চলবে না। বাড়ী ক্রয়ের লাভ কিন্তু জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলযোগ। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে দুর্ভোগ। চাকুরিজীবীর কোন লাভ হবে না। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর পক্ষে মাঝামাঝি সময়। মেষেদের পক্ষে মোটেই ভালো নয়—নানা বাধা বিপত্তি, কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা, পারিবারিক গোলযোগ প্রভৃতি দেখা যাবে। অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিছুটা ভালো গেলেও বিশাখা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণ খুব কষ্ট পাবে এই মাসে।

ধনু

মিশ্রফল। মাসের প্রথম ভাগটী শুভপ্রদ নয়, শেষ ভাগ অপেক্ষাকৃত শুভ। পেষার্দ্ধে কিছু সাফল্য লাভ, পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ প্রমোদ, ভ্রমণ, সুসংবাদ প্রভৃতি আশা করা যায়। বন্ধু বিচ্ছেদ, নানা কাজে বাধা, স্বাস্থ্যহানি, স্বজন বিরোধ, ক্ষতি মাসের প্রথমার্দ্ধে আশঙ্কা আছে। স্ত্রীর পীড়া ও চিন্তানিত উদ্বেগ। অর্থকৃচ্ছ্রতাযোগ মধ্যে মধ্যে ব্যয় বাহুল্যহেতু দেখা যাবে। এ জন্য ব্যয়সঙ্কোচের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন প্রকার নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ বা পরিকল্পনা করা অনুচিত। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতি ব্যক্তির পক্ষে এমাসটী ভালো যাবে না। চাকুরি জীবীদের পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধটী শুভ—কর্ম্মোন্নতি, পদোন্নতি প্রভৃতি ঘটতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অশুভ। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অনেকটা ভালো, মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া লাভ ব্যক্তির পক্ষে কম অশুভ।

মকর

মাসটী বিশেষ শুভ। সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির আশা করা যায়। সৌভাগ্য বৃদ্ধি, আয়োন্নতি, নানাপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সম্মান, পদার প্রতিপত্তি, শত্রুনাশ প্রভৃতি যোগ আছে। সুযোগসুবিধা ও অর্থলাভ। ভূম্যাধিকারী, বাড়ীওয়ালা শ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে মাসটী মোটামুটি যাবে। কর্ম্মক্ষেত্রে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি হোলেও চাকুরি জীবীর পদোন্নতি, কর্ম্মোন্নতি প্রভৃতি আশা করা যায়, উপর ওয়ালার কোন-বাধাই উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ।

কুম্ভ

শুভপ্রদ নয়। সর্ব্বকার্য্যেই বাধা ও বিপত্তি, ক্লান্তিকর, শ্রমণ, মধ্যে মধ্যে হানি, দুঃখ, স্বজন বিরোধ, বন্ধু বিচ্ছেদ, সম্পত্তি সংক্রান্ত গোলযোগ, স্থানান্তরে গমন, অপবাদ প্রভৃতি দেখা যায় কিন্তু বিলাসব্যসন, পরীক্ষায় সাফল্য বিদ্যার্জ্জন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঘটিবে। ঋণ অস্বীকার, পাকাশয় প্রদাহ, ঘরে বাহিরে বিবাদ ইত্যাদি রক্ষা করা যায়। আর্থিক অবস্থা বা ঋণ সম্পর্কে মোটামুটি ভালো, মাসের শেষার্দ্ধেই বেশী ভালো হবে। প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কৃষিজীবীর, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে মাসটী শুভ নয়, বাড়ীভাড়া ও ঋণ আদায়ে গোলযোগ ঘটিতে পারে। বেকার ব্যক্তির চাকুরী হোতে পারে বা কর্ম্মের যোগাযোগ হবে। চাকুরিজীবীর পদোন্নতি সম্পর্কে বাধা হওয়ার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের লাভ বৃদ্ধি সম্ভব উপার্জ্জন। মেষের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ অশুভ। ধনিষ্ঠাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষেই বেশী শুভ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অশুভ ফলগুলি বেশী ফলবে।

মীন

মাসটী শুভ যাবে; কর্ম্মে সাফল্য; সৌভাগ্যবৃদ্ধি; লাভ, সন্তান সুখ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য, বিদ্যায় উন্নতি প্রভৃতি মাসের প্রথমার্দ্ধে প্রথম, শেষার্দ্ধে কিছু পারিবারিক অশান্তি ও শত্রুবৃদ্ধি। স্বাস্থ্যোন্নতি পারিবারিক শান্তি, নানাভাবে অর্থাগম, বাড়ীওয়ালী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মোটামুটি ভালো। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ মাস। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিছু অশান্তি, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ শুভ বলা যায়।

***

মেষলগ্ন—

কর্ম্মে সাফল্য। অর্থব্যয়। লাভ। আয়বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে উন্নতি। শত্রুবৃদ্ধি। অকারণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। বিলাসব্যসন ও আমোদপ্রমোদ। পদোন্নতির আশঙ্কা। বিদ্যার্জ্জন। পরীক্ষায় সাফল্য। স্নেহা প্রকোপ।

বৃষলগ্ন—

মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। মনস্তাপ। দুর্ঘটনার ভয়। আর্থিক ক্ষতি আংশিকভাবে। স্বাস্থ্য লাভ। মাসের শেষার্দ্ধে সৌভাগ্য লাভ। বিদ্যায় বাধা। পরীক্ষায় মধ্যম ফল। আয়ব্যয় শুভ। সন্তানাদির পীড়া। অপবাদ। ভয়। পিত্তাধিক্য।

মিথুনলগ্ন—

পীড়া, মানসিক কষ্ট, মাতার অসুখ, বিপত্তি, শারীরিক অসচ্ছন্দতা, নানাপ্রকার অশান্তি ও দুঃখ, অর্থাগম, স্বজন বিরোধ ও বিদ্বেষ। বিদ্যাভ্যাস মধ্যম। পরীক্ষায় সাফল্য।

কর্কটলগ্ন—

বিবাদ ও নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা। লাভ। ভূম্যাদিক্রয়। দুশ্চিন্তাযোগ। কর্ম্মব্যাপ্তি। পুত্রসন্তান লাভ। পারিবারিক অসচ্ছন্দতা। সম্পত্তি লাভ। মানসিক উদ্বেগ। স্ত্রীর পীড়া। বিদ্যায় বাধা। পরীক্ষার ফল মধ্যম। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন। প্রণয়ে বিপত্তি।

সিংহলগ্ন—

শ্রম, শারীরিক কষ্ট, বায়ু প্রকোপ, অর্থ ক্ষতি, পারিবারিক অশান্তি, অহেতুক ব্যয় বৃদ্ধি,সন্তানের পীড়া এবং দুশ্চিন্তা, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, স্ত্রীর বিপত্তি। পরীক্ষার ফল শুভ, বিদ্যার্জ্জন আশানুরূপ। প্রণয়ানুরাগ।

কন্যালগ্ন—

উদ্বেগ ও ভয়, পারীরিক অসুস্থতা, বায়ু প্রকোপ, কর্ণে বাধা, ব্যয়, শত্রু ভয়, মাসের শেষার্দ্ধে কর্ম্মে সাফল্য, মাতার মোকর্দ্দমা, সাংসারিক ক্ষতি ও পারিবারিক অশান্তি। বিদ্যার্জ্জনে বাধা, পরীক্ষায় অসাফল্য, স্ত্রীর সহিত মতবিরোধ, স্ত্রীর চিত্ত চাঞ্চল্য, সন্তানাদির শুভ লাভ, প্রতিবেশীদের দুর্ব্যবহার জনিত কষ্ট।

তুলা লগ্ন—

পারিবারিক অমঙ্গল, ব্যয়, মনস্তাপ, অর্থাগম, পুরস্কারপ্রাপ্তি সৌভাগ্যবৃদ্ধি, পুত্রলাভ, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা অনায়াসের হেতু চিত্ত-বিক্ষোভ, দুর্ঘটনার ভয় বা পতনাশঙ্কা, স্বরভঙ্গ বা কণ্ঠনালীতে প্রদাহ, ঋণ বৃদ্ধি। পরীক্ষার ফল মোটামুটি মন্দ নয়, পড়াশুনায় অমনোযোগিতা, সন্তানাদির কষ্ট, স্ত্রীর সহিত প্রীতি, সুখ, ও বাহ্য ভ্রমণ।

বৃশ্চিকলগ্ন—

শ্রম, শ্লেষ্মা প্রকোপ, স্বরভঙ্গ দোষ, দুর্ঘটনার ভয়, চিত্তের উদ্বেগ, সন্তানহানি ও সহকর্ম্মীদের সহিত মতবিরোধ, মাসের শেষার্দ্ধে অর্থাগম বা আয় বৃদ্ধি, সৌভাগ্যযোগ, সন্তানের পীড়া। মাঙ্গলিক কর্ম্মে শ্রদ্ধা, স্ত্রীর পক্ষে অশুভ মাস, শারীরিক শ্রান্তি ও অবসাদ, সুখাদ্যাদ্য, প্রণয়াসক্তি বিদ্যা ও পরীক্ষায় শুভফল।

ধনু লগ্ন—

ধনাগম, শারীরিক ও মানসিক অসচ্ছন্দতা, আয়বৃদ্ধি, শত্রুর গুপ্তচক্রান্ত, সম্মান বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে অর্থাগম, মাসের প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা, প্রণয়ে সাফল্য, অধীনস্থ ব্যক্তিদের অপরাধের জন্য উদ্বেগ, মোকর্দ্দমায় জয়লাভ। বিদ্যাভ্যাস অশুভ। পরীক্ষায় মধ্যম ফল।

মকরলগ্ন—

পীড়া, বুকের যন্ত্রণা, বায়ু প্রকোপ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, চিকিৎসা বিভ্রাট হেতু জীবনের ভয়, অর্থ লাভ, পারিবারিক অসচ্ছন্দতা, সন্তানাদির দ্বারা মানসিক আঘাত, স্বজন বিরোধ, বিজ্ঞান শাস্ত্রার্জ্জনে সাফল্য। পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ। মধ্যে মধ্যে ব্যয়বৃদ্ধি।

কুম্ভলগ্ন—

স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা, সৌভাগ্যোদয়, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, অর্থাগম, ব্যয়বৃদ্ধি, শত্রুবৃদ্ধি, সন্তান সুখ, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যলাভ, ভূমিজাত দ্রব্য বিক্রয়াদিতে লাভ—মেষার্দ্ধে মনস্তাপ ও হঠাৎ দুঃসংবাদপ্রাপ্তি। বিদ্যার্জ্জনে নিকৃষ্ট ফল, পরীক্ষায় অসাফল্য, কামপ্রবণতা।

মীন লগ্ন—

পীড়া ও ভয়, ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও অর্থাগম, পারিবারিক কষ্ট, স্ত্রীর সহিত কলহ বিবাদ, এমন কি বিচ্ছেদ, কর্ম্মে বিপত্তি, মাসের শেষার্দ্ধে চিত্তসুখ, জমিজমার ব্যাপারে কিছু গণ্ডগোল, মামলা মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, পরীক্ষার ফল নিকৃষ্ট, বিদ্যার্জ্জনে মধ্যম। পুত্র কন্যাদির বিবাহ, স্থানান্তরে গমন। নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত কলহ বিবাদ।

পাট ও পাঠ

শ্রী'শ'—

॥ নীল আকাশের নীচে ॥

১৯৩০-এর কলিকাতা। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। চতুর্দ্দিকে চাপা বিদ্রোহের অগ্নি ধূমায়িত। পার্কে, পার্কে বিদেশী আইন অমান্য করে সভা আহ্বান ও বক্তৃতা, পুলিশের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও গ্রেপ্তার। ১৯৩০-এর কলিকাতার এই পটভূমিকার মধ্যে এক নিরীহ চীনা ফেরিওয়ালার সশঙ্ক পদক্ষেপ, আর এক স্বদেশী আন্দোলনকারী ব্যারিষ্টার পত্নীর জীবনের সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নীর সুমিষ্ট সম্পর্কে জড়িত হয়ে পড়ার ঘটনা প্রভৃতি নিয়েগড়ে উঠেছে হেমন্ত-বেলা প্রডাক্‌সন্সের "নীল আকাশের নীচে" চিত্রের কাহিনী। মহাদেবী বর্মা লিখিত এই কাহিনীতে যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। সুদূর চীন দেশের একচাষীর জমিদারের অত্যাচারে তার বোন নিখোঁজ হয়ে যাবার পর ভারতবর্ষের কলিকাতা শহরে এসে ফেরিওয়ালার বৃত্তি গ্রহণ করা এবং কয়েক বৎসর এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে বেড়ানর মধ্যে কংগ্রেস কর্ম্মী ব্যারিষ্টার পত্নীর সঙ্গে পরিচয় এবং শেষে তাঁরই স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্যে স্বদেশ গমন। চীন ও ভারত, এই দুই মহাদেশের মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে যে মৈত্রীর সম্পর্ক বিদ্যমান 'নীল আকাশের নীচে'র এই ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্যে তা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। চীন দেশীয় ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছেন এবং প্রায় প্রতিটি দেশেই 'চায়না টাউন' বা চীনা পাড়া নামে তাঁদের নিজস্ব এলাকা গড়ে তুলেছেন। কলিকাতাতেও বহু চীনা বংশ পরম্পরায় বাস করে আসছেন,—আর ভারতীয় জীবনের সঙ্গে, বাংলার ভাব ধারার সঙ্গে প্রায় একাত্মীভূত হয়ে মিশে গেছেন। এঁদেরই একটি চরিত্র নিয়ে, তাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকায় বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এবং চীন দেশের গ্রামে তার পূর্ব্ব ইতিহাস, যা বাংলার গ্রামেও কিছু নতুন নয়, এই নিয়ে যে সুন্দর গল্প গড়ে উঠেছে তা সু-পরিচালনা ও অনবদ্য অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সুদৃ চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

অভিনয়ের দিক দিয়েও চিত্রটি যে সার্থক হয়ে উঠেছে তা বলা চলে। বিশেষ করে শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চীনা ফেরিওয়ালার ভূমিকায় অভিনয় সত্যই অপূর্ব্ব হয়েছে। তাঁর রূপসজ্জা, ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা সব কিছুই চীনাম্যানের হুবহু অনুকরণ হয়েছে। ব্যারিষ্টার পত্নী বাসন্তীর ভূমিকায় শ্রীমতী মঞ্জু দের সাবলীল অভিনয়ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হয়েছে। শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান দু'টিও শ্রুতিমধুর ও সুগীত হয়ে চিত্রের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে।

দৃশ্যগ্রহণের দিক দিয়েও চিত্রটির ফটোগ্রাফী উল্লেখযোগ্য হয়েছে। চীন দেশের একটি গ্রামের চিত্র, নদীর চিত্র প্রভৃতি সম্পূর্ণ বাস্তবরূপী না হলেও, খারাপ হয়নি। চীনা পাড়ায় চীনাম্যান্‌দের নববর্ষ উৎসবের দৃশ্যটিও সুন্দরভাবে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে কলিকাতার রাস্তা ও পার্ক, রাতের গঙ্গা ও রাতের রাজপথ প্রভৃতির চিত্রগ্রহণ প্রশংসার যোগ্য হয়েছে।

তবে 'নীল আকাশের নীচে'র মধ্যে 'কাবুলিওয়ালার' ছায়া যেন দেখতে পাওয়া যায়। 'কাবুলিওয়ালা'-র কাবুলিওয়ালা কলিকাতায় এসেছিল কাবুল থেকে, আর এতে চীনা ফেরিওয়ালা এসেছে সুদূর চীন থেকে। কাবুলিওয়ালা রাস্তায়রাস্তায় ফেরি করতে করতে বাড়ীর দরজায় ভাব করল ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে, আর চীনা ফেরিওয়ালাও ফেরি করতে করতে বাড়ীতে এসে পরিচিত হল স্বদেশী আন্দোলনকারিণী বাসন্তীরায়ের সঙ্গে। কাবুলিওয়ালার জেল হয়েছিল, এখানে বাসন্তীর জেল হল। জেল থেকে বেরিয়ে কাবুলিওয়ালা তার মেয়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় শেষে দেশের দিকে রওনা হল, আর এখানে ব্যারিষ্টার পত্নী বাসন্তী জেল থেকে ফিরে আসার পর চীনা ফেরিওয়ালাও দেশের কথা ভেবে শেষে দেশের দিকে যাত্রা করল। অন্য ঘটনাগুলি অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলে আলোচনা

অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৩০ সালের কলিকাতা দেখাতে গিয়ে প্রথমেই আধুনিক কালের দুইচ্ছ স্কাই স্ক্র্যাপার অট্টালিকা চকিতে দেখা গেছে। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক পুলিশ ভ্যান্, রাস্তায় পথিকদের রাস্তা পার হবার প্যাসেস্-ট্রিয়ান্ ক্রসিং-এর শাদা দাগ, নিউ মার্কেটের একটি কাপড়ের দোকানের নিওন্ লাইট্ প্রভৃতি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় ছিল না। এই ত্রুটিগুলি এদেশীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে সামান্য হলেও, উপেক্ষণীয় নয়। একটু চোখ খুলে এডিট্ করলেই এই সব ছোটখাট কিন্তু মারাত্মক দোষগুলি চোখে পড়বে। আমাদের দেশের পরিচালকরা এই সব খুঁটিনাটির প্রতি বিশেষ নজর দেন না। কিন্তু ওদেশীয় পরিচালকরা যে সালের ঘটনা সেই সালটিকে সর্ব্ব বিষয়ে নিখুঁত করে দেখান, আর তার জন্য অংশই বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করে থাকেন। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র এখন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, এ সময় এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। ৩০ সালকে ৩০ই দেখাতে হবে সর্ব্ব বিষয়ে, ২৯-এর ছায়া যেন তাতে কোথাও না থাকে। তাছাড়া ছবির গতিও মাঝে মাঝে বড়ই মন্থর হয়ে পড়েছে। গল্পটি ছোট, আর ছবিটিকে ১১০০০ ফিটের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে—তাই গতিও দ্রুত হবার সুযোগ পাই নি। ছোট গল্পকে ছোট করে দেখানই ভাল, অহেতুক টেনে বড় করতে গেলে তার বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বেই। অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখাবার ইচ্ছা থাকলে বড় দেখে গল্প বেছে নেওয়াই উচিত। প্রযোজক-পরিচালকেরা এ বিষয়ে একটু অবহিত হবেন আশা করি।

তবে, এই কয়েকটি ত্রুটি ছাড়া চিত্রটি যে অভিনয়ের সৌন্দর্য্যে, বিষয়-বস্তুর নতুনত্বে, বহির্দৃশ্যের চমৎকারিত্বে ও পরিচালনার পারিপাট্যে একটি দ্রষ্টব্য চলচ্চিত্র হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

॥ হলিডে অন্ আইস্ ॥

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যায় ময়দানে নবনির্ম্মিত আইস্ ষ্টেডিয়ামে দশসহস্রের উপর দর্শকের উপস্থিতিতে আমেরিকার বিখ্যাত বরফের ওপর নৃত্যদলের নয়নাভিরাম তিন সপ্তাহ-ব্যাপী স্কেটিং নৃত্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। কয়েক বৎসর আগে এলিট্ সিনেমা হলে প্রদর্শিত স্যাভিনেভিয়ান্ আইস রিভিউ ছাড়া এরূপ বরফের ওপর স্কেটিং পায়ে নৃত্যের প্রদর্শনী কলিকাতায় বা ভারতে পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়নি। চৌরঙ্গী রোডের ধারে কৃত্রিমভাবে নির্ম্মিত ময়দানের একাংশ জুড়ে ৭০০০ বর্গফিটের যে কৃত্রিম জমান বরফ হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে ও তৎসংলগ্ন যে অস্থায়ী ষ্টেডিয়াম্ নির্ম্মিত হয়েছে তাও কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব বলা চলে। শুভ্র বরফের ওপর নানা বর্ণের আলোকসম্পাতে, সাজ পোষাকের চোখ ঝলসান বর্ণচ্ছটায়, সুমধুর সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্যের সুরঝঙ্কারে এই স্কেটিং নৃত্য চমৎকারই শুধু হয়নি—পরম উপভোগ্যও হয়েছে। আড়াই ঘণ্টাকাল ধরে বরফ হ্রদের ওপর স্কেটিং পায়ে নৃত্যপরা তরুণীদের ও সুদক্ষ স্কেটারদের সাবলীল ও দুরূহ নৃত্য ও কৌতুক অভিনেতাদের হাস্য-কৌতুক এবং সর্ব্বোপরি সমগ্র অনুষ্ঠানের বিরাটত্ব ও জৌলুস প্রভৃতির জন্য এই মার্কিণ প্রদর্শনীটিকে কলিকাতায় ও ভারতে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ অনুষ্ঠানরূপে অভিহিত করা চলে।

নৃত্যগুলির মধ্যে "পিটার প্যান্ ইন্ ষ্টোরিবুক ভিলেজ" নৃত্যের জন্য জানোয়ার ও রূপকথার কয়েকটি চরিত্র ছেলে বুড়ো সবাইকে আনন্দ দেবে, আর "ইষ্ট অফ্ সুয়েজ" নৃত্যটিতে নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের পীতবর্ণের প্রাচ্যদেশীয় পোষাকের চোখ ঝলসান বাহার ও কৃত্রিম ধূম্রজাল সৃষ্টি প্রভৃতি সত্যই নয়নমুগ্ধকর হয়েছে।

অন্যান্য নৃত্যগুলিও দুরূহ ফিগার-স্কেটিং-এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর বিশেষ করে কৌতুক অভিনেতাদের হাস্যকৌতুকগুলি সুন্দর অভিনয় ও অপূর্ব্ব স্কেটিংয়ের জন্য পরম উপভোগ্য হয়েছে। তার ওপর সু-পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এই নৃত্য উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে। তবে একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে না করে থাকা যায় না। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ত্রুটিতে বহু নিমন্ত্রিত অতিথিকে, বিশেষ করে মহিলাদের, প্রবেশদ্বারে ভিড়ের চাপ ও অন্যান্য অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। একটি বিরাট সু-পরিচালিত অনুষ্ঠানে এরকম ত্রুটি হওয়া অবাঞ্ছনীয়ই শুধু নয়, অশোভনও। আশা করি এখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা এ বিষয়ে অবহিত হবে, এরকম ত্রুটি যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে সে সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন।

যাই হোক, "হলিডে অন্ আইস্" অনুষ্ঠানটি যে এ বৎসরের কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও অবশ্য দ্রষ্টব্য প্রমোদ অনুষ্ঠান তা নিসন্দেহে বলা চলে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৫০০ (হোল্ট ৬৩, কানহাই ৯৯, বুচার ১৬১ ; মানকড় ৯৪ রানে ২ উইকেট) ও ১৬৮ (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হোল্ট ৮১ নট আউট ; গুপ্তে ৭৮ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ ঃ ২২২ (রায় ৬৯, কপাল সিং ৫৩। ফোরেস্ট ৯৮ রানে ৪ উইকেট) ও ১৫১ (বোরদে ৫৬ ; সিলভারউড ৩৬ রানে ৩, হল ৬৯ রানে ৩)

মাদ্রাজের কার্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২৫১ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' লাভ করে। চারটি টেষ্ট খেলায় পরাজয়ের ফলাফল ঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১ ;

১ম দিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২৮৩ রান ওঠে ৭ উইকেটে। ওলকট ৯৯ রান ক'রে রান আউট হ'ন। লাকের পর মানকড় সোবার্স এবং হিথের উইকেট পান। এ দুজনের একজন উইকেটে থাকলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের আরও রান উঠতো। ২য় দিনে ৫০০ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস শেষ হয়। বুচার সেঞ্চুরী করেন। ১ উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসে ২১ রান ওঠে। ভারতবর্ষ ৬৭৩ রান পিছিয়ে থাকে ; হাতে উইকেট থাকে ৯টা। ৩য় দিনে ২২২ রানে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ হয়। কপাল সিং ৫৩ রান ক'রে ভারতবর্ষের মুখ কিছুটা রক্ষা করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভারতবর্ষকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য না ক'রে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে ৮ রান করে। ৪র্থদিনের ২-৫১ মিনিটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ক্যাপটেন দলের ১৬৮ (২ উইকেটে) রানের মাথায় ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসে ৩টে উইকেট হারিয়ে ৪৮ রান করে।

৫ম দিনের ২-৩০ মিনিটে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৫১ রানে শেষ হয়। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২৯৫ রানে জয়ী হয়।

ভারতবর্ষ ঃ ৪১৫ (বোরদে ১০৯, কনট্রাক্টর ৯১, উমরীগড় ৭৬, অধিকারী ৬৩) ও ২৭৫ (রায় ৪৮, গাইকোয়াদ ৫২, বোরদে ৯৬, অধিকারী ৪০)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৬৪৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোলোমন ১০০ নট আউট, স্মিথ ১০০, হোল্ট ১২৩, হাণ্ট ৯২)

নিউ দিল্লীর ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ৫ম টেষ্ট খেলার নায়ক হলেন ভারতবর্ষের সি জি বোরদে। তাঁর ক্রীড়া চাতুর্য্যের জন্যই ভারতবর্ষ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। বোরদে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন ; ২য় ইনিংসে ৯৬ রান ক'রে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের উইকেট ভেঙ্গে ফেলেন, মাত্র ৪ রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী করা থেকে বঞ্চিত হ'ন। নতুবা টেষ্ট খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করতেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র বিজয় হাজারে এই কৃতিত্ব অর্জ্জন

করেছেন। (অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৪৭-৭৮ সালের টেষ্ট সিরিজে)

১ম দিন ৪ উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ২০৬ রান ওঠে। ৮ রানের জন্যে কমট্রাক্টার সেঞ্চুরী করা থেকে বঞ্চিত হ'ন।

২য় দিন ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৪১৭ রানে শেষ হয়। বোরদে ১০৯ রান করেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতীয় খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রথম সেঞ্চুরী। কোন উইকেট না পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৬৪ রান ওঠে।

৩য় দিনে ৪ উইকেট হারিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৪০৮ রান তুলে। ভারতবর্ষ ১ম ইনিংসের খেলায় ৪১৭ রান তুলে যে সুবিধা ক'রে নিয়েছিল তা ৩য় দিনের খেলায় দূর হয়ে যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের হোল্ট এবং কানহাই এই দিন তাঁদের টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ১,০০০ রান পূর্ণ করেন।

৪র্থ দিনে চা-পানের কিছু পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেটে ৬৪৪ রান তুলে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষে ক্রিকেট সফরে এসে এ পর্য্যন্ত কোন্ বৈদেশিক দলই এত রান তুলতে পারেনি। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ১ উইকেট পড়ে ৩১ রান ওঠে। ৫ম বা খেলার শেষ দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৭৫ রানে শেষ হলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৪র্থ টেষ্টে জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করায় তাদের কাছে ৫ম টেষ্ট খেলার ফলাফলের কোন গুরুত্বই ছিল না।

ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে উমরীগড় আহত থাকায় ব্যাট করতে পারেন নি। তাছাড়া ভারতবর্ষের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় আহত হওয়ায় তাঁদের স্বাভাবিক খেলা দেখাতে পারেননি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফর ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত সফরে ১৭টি ক্রিকেট খেলায় যোগদান ক'রে অপরাজেয় থাকে। খেলার ফলাফল : ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জয় ৯, খেলা ড্র ৮।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৪৮ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা ১৯৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯৪৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর এই শীল্ড ফাইনাল খেলাটি উভয় পক্ষে একটি ক'রে গোল হওয়ায় ড্র যায়। পুনরানুষ্ঠিত খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে ১৯৪৮ সালের আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়। এই নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ৬বার আই এফ এ শীল্ড জয়ী হল।

অষ্ট্রেলিয়া : ৪৭৬ (ম্যাকডোনাল্ড ১১০, বার্ক ৯৬, ও' নীল ৫৬ ; ট্রুম্যান ১০ রানে ৪ উইকেট) ও ৩৬ (কোন উইকেট না পড়ে)

ইংলণ্ড : ২৪০ (কাউড্রে ৮৭, বেনড ৯১ রানে ৫ উইকেট, রোকি ২৩ রানে ৩ উইকেট) ও ২৭০ (মে ৫৯, গ্রেভনি ৫৩ নট আউট। বেনড ৮২ রানে ৪ উইকেট)

এডলেডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৪র্থ টেষ্ট খেলায় ১০ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত ক'রে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' জয়ী হয়। আনুমানিক ৬ বছর পর অষ্ট্রেলিয়ার ঘরে 'এ্যাসেজ' ফিরে গেল। এই জয়লাভের ফলে চারটি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ায় অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৩ (১ম, ২য় ও ৪র্থ টেষ্ট) এবং ড্র ১ (৩য় টেষ্ট)।

টসে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ২০০ রান ওঠে ১ উইকেটে। ম্যাকডোনাল্ড ১১২ এবং হার্ভে ১১ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ২য় দিনে পূর্ব্ব দিনের ২০০ রানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার ২০৩ রান যোগ হয়—রান দাঁড়ায় ৪০৩, ৬ উইকেটে। ম্যাকডোনাল্ড ১৪২ রান ক'রে আহত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ৩য়দিন অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৭৬ রানে শেষ হয়। ম্যাকডোনাল্ড ১১০ রান করেন। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান করে। কাউড্রে এবং গ্রেভনী যথাক্রমে ৫৩ ও ১৬ রান ক'রে নটআউট থাকেন। ইংলণ্ডের প্রথম ছুটো উইকেট মাত্র ১১ রানের মধ্যে পড়ে যায়। কাউড্রে এবং গ্রেভনী ছুটি বেঁধে দলের পতন রোধ করেন।

৪র্থ দিনে চা পানের বিরতির কিছু পর ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ২৪০ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। কোন উইকেট না পড়ে ইংলণ্ডের ৪০ রান ওঠে।

৫ম দিনে ইংলণ্ডের ৫ উইকেট পড়ে ১৯৮ রান ওঠে, ফলে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রানের থেকেও ৩৮ রান পিছিয়ে থাকে।

৬ষ্ঠ দিনে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ২৭০ রানে শেষ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩১ রান তুলতে অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না পড়ে প্রয়োজনীয় রান উঠে যায়।

আগাখাঁন কাপ ঃ

১৯৪৯ সালের আগাখাঁন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে নর্দার্ণ রেলওয়ে ১—০ গোলে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলকে পরাজিত ক'রে আগাখাঁন গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে। নর্দার্ণ রেলওয়ে সম্প্রতি ইণ্টার রেলওয়ে হকি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে।

সাহিত্য সংবাদ

হাসির টেক্কা : ইন্দুপ্রকুমার মিত্র মহাশয় প্রণীত

প্রবীণ ভারতবর্ষের কিশোর জগতের অন্যতম লেখক, এঁর লেখার সঙ্গে আমাদের কিশোর বন্ধুদের পরিচয় ইতিপূর্বেই হয়েছে। এঁর প্রথম গ্রন্থ হাসির দুই ডজন শিশু সাহিত্য সমাদৃত। আলোচ্য গ্রন্থে বেশীর ভাগ চিত্রিত হাসির গল্প আছে,—সবগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। হাল্কা রসের অবতারণায় লেখকের বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েরা এ গ্রন্থে প্রচুর হাসির খোরাক পাবে। তাদেরই মনের মানুষকের খেলাঘর সাজিয়ে ইন্দু মিত্র মহাশয় সুন্দর সুন্দর চিত্রে, সরল ভাষায়, সাবলীল ছন্দে ও মধুর ব্যঞ্জনায়, যে 'হাসির টেক্কা' তাদের হাতে তুলে ধরেছেন, তা অনবদ্য ও উপভোগ্য হয়েছে। ছেলেমেয়েদের হাতে এই বই উপহার দেবার যোগ্য। বই খানি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—বাণীকানন সাহিত্য মন্দির, ২০।১।৫, বিডন রো, কলিকাতা—৬ ; মূল্য দেড় টাকা]

(১) ছোটদের রামকৃষ্ণ (২) পরমারাধ্য শ্রীমা : শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রামতনু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত দ্বিতীয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। লেখক দুর্গাদাস শিশু সাহিত্য রচনা করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন—বই দুখানি ছোটদের উপযোগী করিয়াই লিখিত। যুগ মানব শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীসারদা দেবীর জীবনী ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সে পাঠ করিলে তাঁহাদের মন নূতন-ভাবে গঠিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি, বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম বা নীতি শিক্ষার স্থান নাই—কাজেই অভিভাবকগণকে পুত্র-কন্যাদির জন্য এইরূপ পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহাদের সে অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লেখক গল্পচ্ছলে বহু শিক্ষা দিয়াছেন, ভাষাও স্বচ্ছ এবং সরল।

[মূল্য—(১) ১·২৫ নয়া পয়সা (২) ২·২৫ নয়া পয়সা। প্রাপ্তি স্থান—শ্রীগা প্রকাশনী—১৯ং রমেশ মিত্র রোড কলিকাতা—২৫]

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য | শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নতুন রেকর্ড

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82507—"আমার নেমেছে সুখে" ও "মল্লিকা বেহেছে যে"—দুখানা আধুনিক মনোজ্ঞানান গান পরিবেশিত হয়েছে শিল্পী উৎপলা সেনের মধুরকণ্ঠে।

N 82508—"খেলে ফোল ফোল না" ও "আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে" দুখানা মনোরম ছড়া সুরের অপূর্বপরশে যেন সজীব হয়ে উঠেছে আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সুমিষ্টকণ্ঠে।

N 82509—মোহাম্মদ রফির কণ্ঠের দুখানা গান—"ঐ দূর বিদেশ থেকে" ও "এ জীবনে যদি।"

N 82510—"আকাশের তারা আর মাটীর ফুলেরা" ও "একটি তারা চাকে আমায়" গান দুইটি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর কণ্ঠে।

কলম্বিয়া

GE 30112—সুরীয় রফির অভিনীত গান "আমার মোদন কথাটি" ও "মোর অন্তর আজ কেঁদে বলে"—গেয়েছেন অভিনেতা শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30113—মুখোপাধ্যায় বাণীচিত্রের দুখানা গান "ওরা ছোটের গানে" "হোকনা আকাশ মেঘলা" গেয়েছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

GE 30114—"তুমি তো জানো" ও "ওগো অরুণ" মুখোপাধ্যায় বাণীচিত্রের এই গান দুখানা যথাক্রমে দুইজন অভিনেতা শিল্পী হেমন্ত মুখার্জি ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30115—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ভরাট কণ্ঠে আর দুখানা গান—"আমার জীবনে নেই আলো" ও "ওগো অরুণ।"

GE 30116—শিকার বাণীচিত্রের "না জানি কোন ছলে" ও "সবমে ঝড়ানো আঁখি" এই দুখানা আধুনিক গান আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

চৈত্র—১৩৬৫

লেখ-সূচী

১। মানবতার পূজারী লক্ষ্মণ (প্রবন্ধ)
শ্রীমঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় ৩৮৫
২। গোধূলির রঙ্ (গল্প)
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ৩৯৪
৩। বাংলা গল্পের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩৯৮
৪। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনের এক অধ্যায় (প্রবন্ধ)
শ্রীভবাণীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ৪০২
৫। কী মেলে গীতা পাঠে (প্রবন্ধ)
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ৪০৫

চিত্র-সূচী

১। মেলায় মেয়েরা ভাত খাচ্ছে, ২। অস্থাবলের পথের ধারে, ৩। কুন্দর নাগ, ৪। কুন্দর নাগের আর একটি দৃশ্য, ৫। মাটনের সূর্য মন্দির, ৬। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, ৭। ভূপেন্দ্রনাথ দাশ, ৮। ও মহুয়া দোনা, ৯। 'অগ্নি-সম্ভবা' চিত্রের একটি দৃশ্য, ১০। জি. ই. সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিবেশনায় রঙমহল মঞ্চে "দুই পুরুষ" নাটকের একটি দৃশ্য, ১১। শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল, ১৩। ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী।

লেখ-সূচী

৬। পারমাণবিক শক্তি ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)
সমর ভট্ট ৪০৭
৭। সারাহ্ (গল্প)—হরেন ঘোষ ৪০৯
৮। অতিথি (কবিতা)
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৪১৩
৯। পরশুরামের কৃষ্ণমণ্ডল (প্রবন্ধ)
শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪১৪
১০। বহ্নি যৌবন (কবিতা)
শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ ৪১৬
১১। কলহনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)
ব্রহ্মমাধব ভট্টাচার্য ৪১৭
১২। শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চতুর্বিধ শিক্ষা (প্রবন্ধ)
শ্রীচারুপদ ভট্টাচার্য ৪২৩
বাড়ির কর্তা (অনুবাদ গল্প)
শ্রীকল্যাণকুমার ভট্টাচার্য ৪২৭
১৪। প্রেম (অনুবাদ কবিতা)
শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায় ৪২৯
১৫। জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)
ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী ... ৪৩০
১৬। আশা (কবিতা)—শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত ... ৪৩২
১৭। লীলাভূমি (উপন্যাস)
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৪৩৩
১৮। অভিজ্ঞান (কবিতা)—মণি পাল ... ৪৩৬
১৯। শ্রীঅরবিন্দ ও প্রেমধর্ম (প্রবন্ধ)
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩৭
২০। আসন (কবিতা)—শ্রীচিত্র শর্মা ৪৪২
২১। কবীর-তীর্থ—মগহর (প্রবন্ধ)
শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৪৩

লেখ-সূচী

২২। বিদ্যুৎ (কবিতা)—কৃতী সোম
২৩। ভল্লুকের কবলে (শিকার কাহিনী)
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
২৪। চিত্রোপম ভারত (কিশোর জগৎ)
উপানন্দ
২৫। স্টাইল (গল্প—কিশোর জগৎ)
নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার ... ৪৪২
২৬। চৈত্র আমন্ত্রণে (কবিতা—কিশোর জগৎ)
শ্রীসুবীরকুমার রায় ৪৪৪
২৭। তোমরা কি জানো (কিশোর জগৎ)
সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়
২৮। আগুন নেবানোর যন্ত্র (কিশোর জগৎ)
শ্রীসত্যগোপাল পাল
২৯। বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য (প্রবন্ধ)
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ৪৪৭
৩০। উদয় অস্ত (উপন্যাস)—বনফুল ৪৬৩
৩১। বিভূতিভূষণের কথাশিল্প (আলোচনা)
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৬৮
৩২। মধুমাসে তুমি এসেছ মাধবী
ঘুম কুসুম মেখে (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৪৭৩
৩৩। ঘুম নেই (কবিতা)—বীরেন্দ্র ... ৪৭৩
৩৪। প্রবাসী বাঙালী ভূপেন্দ্রনাথ (আলোচনা)
কুমার ভট্ট ... ৪৭৬
৩৫। আধুনিক নারী জীবন ও তার সমস্যা (মেয়েদের কথা)
শ্রীমতী অমুজবালা দেবী ... ৪৭৮
৩৬। টমাটোর আচার (রান্নাঘর)
শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী ... ৪৮৩
৩৭। বিচিত্র লীলা (কবিতা) শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য ৪৮৩
৩৮। ও মধুয়া সোনা (কবিতা) সতীন্দ্রনাথ লাহা ৪৮৪

লেখ-সূচী

৩৯।	ছিন্নবাধা (উপন্যাস)—সমরেশ বসু	৭৮১
৪০।	সংস্কৃত-জননী-স্তুতিঃ (কবিতা) ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৪৮৭
৪১।	বৈদেশিকী—শ্রীঅতুল দত্ত	৪৮৮
৪২।	পট ও পীঠ—শ্রী'শ'—	৪৯১
৪৩।	বিকল জনম, বিকল জীবন (জীবনী) কুমারেশ ভট্টাচার্য	৪৯৫
৪৪।	সাময়িকী	৪০০
৪৫।	ওঝা পুতুল (উপন্যাস) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০২
৪৬।	গ্রহ-জগৎ (জ্যোতিষ)—উপাধ্যায়	৫০৬
৪৭।	খেলা-ধুলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়	৫১০
৪৮।	সাহিত্য সংবাদ	৫১২

বহুবর্ণ চিত্র

বসন্ত বাহার

বিশেষ চিত্র

আকাশ পটে ও জল জঙ্গল

সম্প্রতি প্রকাশিত

প্রফুল্ল রায়ের

সিন্ধুপারের পাখি

॥ নয় টাকা ॥

নীলকণ্ঠের

অশ্ব ও প্রত্যহ

॥ পাঁচ টাকা ॥

* উপন্যাস *

বিচারক : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ২·৫০ ॥ **জীয়ন্ত** : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪·০০ ॥ **নীলাঙ্গুরীয়** :

বিক্রমাদিত্যের

যুদ্ধের ইয়োরোপ

॥ চার টাকা ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : ৪·৫০ ॥ **দ্বৈরথ** : বনফুল : ৩·০০ ॥ **জলজঙ্গল** : মনোজ বসু : ৪·০০ ॥ **অচিন রাগিনী** : সতীনাথ ভাদুড়ী : ৩·৫০ ॥ **তামসী** : অরাসঙ্ক : ৫·০০ ॥ **বনহংসী** : প্রবোধকুমার সান্যাল : ৪·৫০ ॥ **কয়লাকুঠির দেশ** : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : ৩·৫০ ॥ **গঙ্গা** : সমরেশ বসু ৫·৫০॥ **তিমির তীর্থ** : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ২·৫০॥ **চায়না টাউন** : বারীন্দ্রনাথ দাশ : ৪·৫০ ॥ **মৃগতৃষ্ণা** : সরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩·০০ ॥ **প্রদক্ষিণ** : সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪·০০ ॥ **খোলা চোখে** : মণীন্দ্র রায় : ২·০০ ॥ **ধুলোমাটি** : ননী ভৌমিক : ৬·০০ ॥

* আলোচনা-গ্রন্থ *

আধুনিক ইউরোপ : দেবজ্যোতি বর্মণ : ৩·২৫ ॥ **মার্কসবাদ** : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ২·০০ ॥ **এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব** : সাধনকুমার ভট্টাচার্য : ৬·৫০ ॥ **বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য** : প্রমথনাথ বিশী : ৩·৫০ ॥ **সনেটের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন** : জগদীশ ভট্টাচার্য : ৬·০০ ॥ **ভারতের চিত্রকলা** : অশোক মিত্র : ১৫·০০ ॥ **বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা** : নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত : ৩·০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

আপনার নিরাপদ নির্ভরতার প্রতীক

এই "জোড়া হাতের" প্রতীকই নিশ্চিত নিরাপত্তার নিদর্শন—কেন না, আপনার জীবন বীমার টাকা দেশের সর্বোচ্চ সংস্থা ভারত সরকারের হাতে সুরক্ষিত। এই প্রতীকের মধ্যে রয়েছে সেবার আশ্বাস, রয়েছে আপনার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি। বীমার মেয়াদ পূর্ণ হ'লে ১৯৫৬ সালের লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী অবিলম্বে আপনার প্রাপ্য আমরা নগদ টাকায় পরিশোধ ক'রে দেব, এ বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত থাকতে পারেন।

এই প্রতীকটি নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতির চিহ্ন।

লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

কেন্দ্রীয় অফিস : ওরিয়েন্টাল বিল্ডিংস্, ফোর্ট, বোম্বাই-১

Life Insurance Corporation of India

অন্যান্য অফিস : বোম্বাই ★ নিউ দিল্লী ★ কলিকাতা ★ মাদ্রাজ ★ কাণপুর

ডিভিশনাল এবং ব্র্যাঞ্চ অফিস ভারতের সর্বত্র

= নূতন বই =

দেবেশ দাশ ।। সেই চিরকাল
— সাড়ে তিন টাকা —

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।। সমুদ্র সফেন
— সাড়ে চার টাকা —

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ।। বহ্নিবন্যা
— সাড়ে আট টাকা —

বনফুল ।। রচনাসংগ্রহ
— সাত টাকা —

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ।। কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
[পুনর্লিখিত, পরিবর্ধিত সংস্করণ]
— সাড়ে পাঁচ টাকা—

।। অবধূত ।।

দুই তারা

★

- আড়াই টাকা -

প্রমথনাথ বিশীর আশ্চর্য উপন্যাস

কেরী সাহেবের মুন্সী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল।
—সাড়ে আট টাকা—

তারাশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

উত্তরায়ণ

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল।
—চার টাকা—

প্রবোধকুমার সান্যালের
বোলায়ারী
[দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ]
—সাড়ে ছ টাকা—

মণীন্দ্রনাথ দাসের
সরস বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ
বিচিত্র প্রসঙ্গ
—চার টাকা—

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
নূতন উপন্যাস
অপরূপা
—সাড়ে পাঁচ টাকা—

বিহারীলাল গোস্বামীর
অনূদিত
কুমার সম্ভব

রবীন্দ্রনাথ বলেন :—
"ছন্দ ও তাহার কারুনৈপুণ্যে পূর্ণ আপনার কুমারসম্ভবের অনুবাদে আমি হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। আপনি যে দুঃসাধ্য কাজে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা আমাদের কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া মনে করি না।"
—সাড়ে তিন টাকা—

অবধূতের
মরুতীর্থ হিংলাজ (ষোড়শ মুদ্রণ) ৫

বশীকরণ ৪৷৷০ বহুব্রীহি ৪৷৷০ উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কল্পিত জীবনীয় রসায়ন। ইহা মৃতকল্পকে জীবন, ব্যাধিতকে স্বাস্থ্য, দুর্ব্বলকে বলদান করে এবং ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনাভরা মনমরা হতাশ জীবনে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দের ধারা উৎসারিত করে। ইহা সেবনে পাচকাগ্নি ও জীর্ণ শক্তি বাড়ে, যকৃৎ স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করে, অম্ল ও অরুচি দূর হয়, দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগান্তে এবং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে ইহা মন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। কঠিন রোগে ক্ষীণনাড়ী মুমূর্ষুর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া নিস্পন্দ হওয়ার উপক্রমে ইহা নূতন জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক নাড়ীর গতি আনিয়া দেয়।

পাইণ্ট—৪৲ টাকা, কোয়ার্ট—৭৷৷০ টাকা

অধ্যক্ষ মধুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয় ডাকা লিঃ।

হেড অফিস: ৫২।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—ভারত ও পাকিস্থানে সর্ব্বত্র।

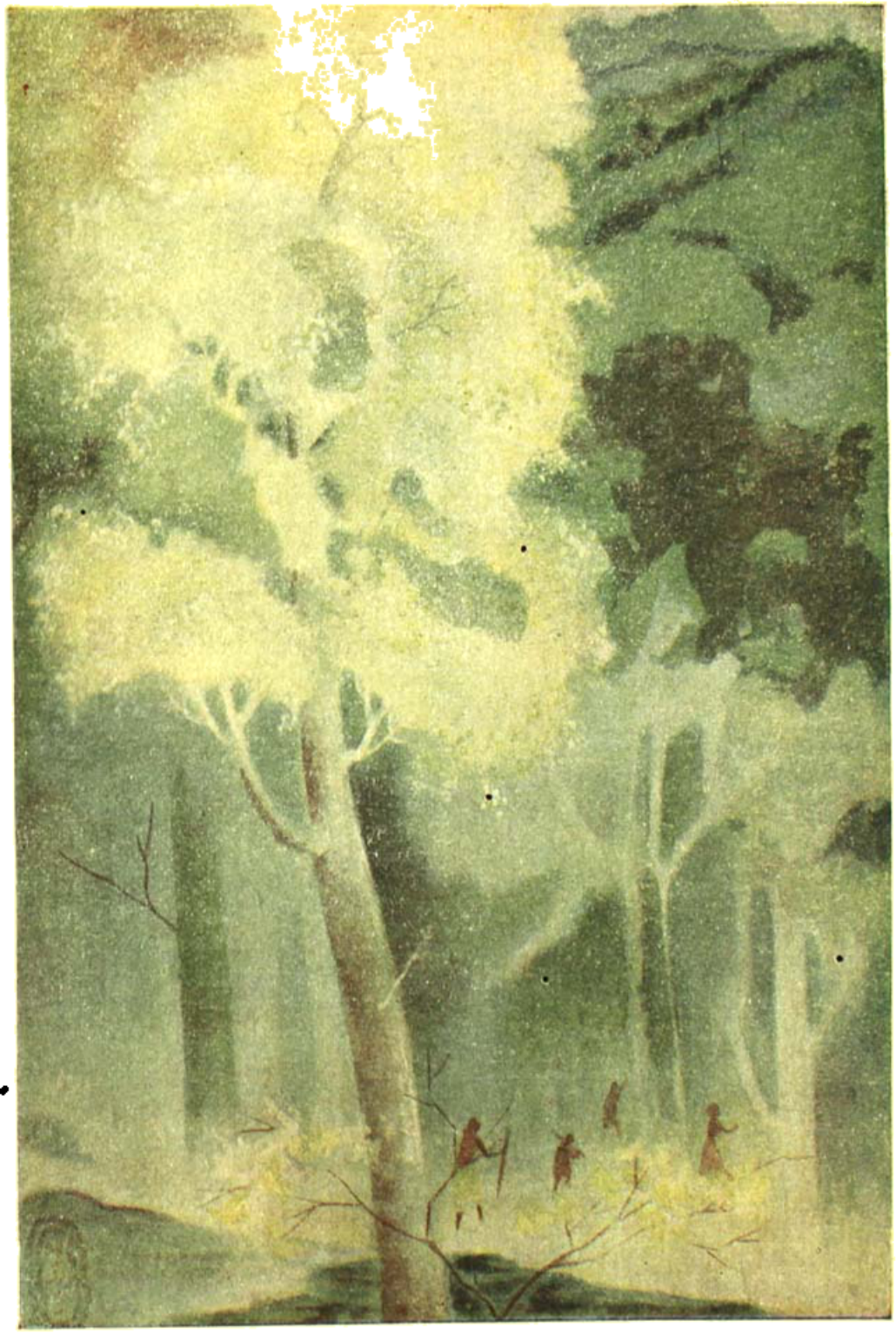

শিল্পী : শ্রীঅটীন্দ্রনাথ সাহা বসন্ত বাহার ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সচিত্র চারখণ্ডে সম্পূর্ণ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। অচিন্ত্যকুমার

'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে মর্তধামে লীলা করতে এসেছিলেন। ভগবানের সেই নরলীলা বর্ণনা করতে পারি আমার সে ক্ষমতা নেই। আমার তত্ত্ব নেই, তত্ত্বগন্ধ কিছু নেই, আছে কিঞ্চিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে।···দিয়াসালাই জেলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এ-বই শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পূজা, দীপ-জ্বালানো আরতি।'—অচিন্ত্যকুমার। দাম ৫৲

দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের নতুন পর্যায়। শতদল উন্মোচনের নবতম অধ্যায়। এ অধ্যায়ে রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর দিকপতিদের কাহিনী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রথম পুরীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত, প্রথম সন্ন্যাসীভক্ত লাটুমহারাজ। তারপর ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি নরেন্দ্রনাথের আখ্যান। ইতিহাস, কাব্য ও উপন্যাসের নৈবেদ্যে ভক্তি পবিত্র অর্চনা। দাম ৫৲

তৃতীয় খণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের নবতম পরিচ্ছেদ। জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানাজনের আনাগোনা। গিরিশ ঘোষ, দেবেন মজুমদার, অধর সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দুর্গাচরণ নাগ, মাস্টারমশাই, প্রতাপ হাজরা, বলরাম বোস, কেদার চাটুয্যে, অশ্বিনী দত্ত। নারাণ-ছোট-নরেন নিত্যগোপাল-মনোমোহন। গোপালের-মা-লক্ষ্মীবিনোদিনী-ভুবনমোহিনী। আরো অনেকে। ভাবের রূপৈশ্বর্যে, বাক্যের প্রসাধনে সুন্দর ঈশ্বর-প্রসঙ্গ। দাম ৫৲

চতুর্থ খণ্ড। গ্রন্থের এই শেষখণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হবার কাহিনী। নরেনকে সর্বস্বদানের কাহিনী। তিরোধানের কাহিনী। বর্তমান যুগের তিন বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম, তর্কমুখর সংশয়, যার প্রতিনিধি নরেন। দ্বিতীয়, দুরপনেয় পাপ, যার প্রতিনিধি গিরিশ। তৃতীয়, প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান, যার প্রতিনিধি মহেন্দ্রলাল সরকার। জয়ী হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই সংগ্রামজয়ের ইতিহাস। দাম ৫৲

'আমাকে হৃদে রাখিস মা'

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ। অচিন্ত্যকুমার

শ্রীরামকৃষ্ণচরিতে যত রসাত্মক বাক্য ও গল্প আছে তা সযত্নে সংকলন করেছেন অচিন্ত্যকুমার 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে, সরসভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আলোচনা করেছেন মুগ্ধ হয়ে। প্রমাণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। যিনি দেখেন জানেন প্রকাশ করেন তিনিই কবি। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, আশ্চর্য সরল ভাষায় বলেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবের দিক থেকে যত গভীর, বাক্যের দিক থেকে তেমনি সুন্দর। দাম ৪৲

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি। অচিন্ত্যকুমার

'ও কি যে-সে? ও আমার শক্তি,' বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ও সরস্বতী, বিদ্যাদায়িনী।' পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেই পুণ্যজীবনের সমস্ত উপাদান একত্রিত করে ভক্তিসুষমামণ্ডিত ভাষায় সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। কী ছিল এই 'সাতিশয় লজ্জাশীলা বাঙালী হিন্দু কুলবধূটির মধ্যে?···আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে···এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে, রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।···' (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। সচিত্র। দাম ৪৲

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
বালিগঞ্জে : ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

সিগনেট বুকশপ

—সর্বজন-চিত্ত-বিমোহন-কথাশিল্পী—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

॥ উকিলের ডায়েরি ॥

মূল্য—তিন টাকা

সহরের ফৌজদারী কোর্ট—শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' মানব চরিত্র-অধ্যয়নে প্রেসিডেন্সি কলেজ!' সেই ফৌজদারী কোর্টে চল্লিশ বৎসরকাল কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রমোহন ওকালতি-পেশার যে তিক্ত-মধুর-কটু-কষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেই সব মামলা-মকর্দ্দমার অদ্ভুত কাহিনী নাটক-উপন্যাসের অপরূপ টেকনিকে তিনি এ-ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেকালের কলকাতার বর্দ্ধিষ্ণু-ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিচিত্র রসের কাহিনী-মামুলি-চালের মুখোশ খসে বাবুদের সত্য-কারের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে ডায়েরির পাতায় পাতায়।

কবি, সাহিত্যিক, জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্নি থেকে দোকানী-পশারী, চোর-বাটপাড়, সতী-অসতী নারী সকলকেই বাস্তবরূপে লেখক ডায়েরির ছায়ামুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিয়েছেন।

এ ডায়েরিতে আছে—বড় ঘরের বড় কথা, ক্ষয়িষ্ণু বোনেদী ঘরের পতনের কাহিনী—সহরের নিশাচর প্রমোদ-বিলাসীদের নৈশ লীলারঙ্গ, তাতে কত রঙের ঝিকিমিকি! উকিল-এটর্নির পালিশ-করা সৌজন্যের অন্তরালে উদ্বৃত্তির কূট-কৌশলে বোনেদী ঘরের উচ্ছেদ।

সব কাহিনীতে পাবেন পর্য্যায়ক্রমে সমাজ-ইতিহাসের বিচিত্র উপাদান।

এম, এল, দে এণ্ড কোং ঃ ১৩।১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২

শাশ্বত যুবতী গীতা গেরুয়া ছাড়িয়া,
মোর কাছে স্বচ্ছ-শাড়ী লইল চাহিয়া।

গীতার যৌনভাষ্য

রচয়িতা

উজ্জ্বল মহাকাব্যপ্রণেতা

মহাকবি শ্রীগুণমণি দাস

পোঃ সাঁইথিয়া, বীরভূম।

অজয় চক্রবর্ত্তীর (ধুবড়ী, আসাম)

সর্ব্বজন প্রশংসিত বই ঃ—

মহাকবি (নাটক)	২·৫০
শিল্পীর মৃত্যু (গল্প)	২·৭৫
কায়া ও ছায়া (গল্প) ২য় সং	১·২৫

চৈত্র—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

মানবতার পূজারী লক্ষ্মণ

শ্রীমঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

'রামায়ণে'র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি বলিষ্ঠ, ঋজু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরম-অনুগত, উচ্ছ্বাসবিহীন, দৃঢ়চেতা ও অসাধারণ সংযমী মহাবীরের যে স্থির চিত্র আমাদের মনকে বিশেষভাবে অভিভূত করিয়া রাখে, সেই চিত্র শ্রীরামচন্দ্র, ভরত অথবা শত্রুঘ্নের নহে, তাহা সুবর্ণছবি লক্ষ্মণের।

এই নীরব, সংযত পুরুষটি মহাকাব্যে একরূপ উপেক্ষিত বলিলেই হয়। একমাত্র রামচন্দ্র ছাড়া তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপটি সকলের নিকট অজানা ছিল। সূর্য্যের প্রভায় যেমন নক্ষত্র দীপ্তি-হীন হইয়া থাকে, তেমনি শ্রীরামের দিব্যছটায় লক্ষ্মণ-চরিত্রের মহিমা সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া গিয়াছিল। এবং লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের সেবার মধ্য দিয়া নিজেকে এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে 'রামায়ণে' তাঁহার নিজস্ব সত্তা বলিয়া যে কিছু আছে তাহা জানা যায়না। কিন্তু সূর্য্য-প্রভায় নক্ষত্র যতই ঢাকিয়া থাকুক না কেন, অচঞ্চল স্থির ধ্রুব নক্ষত্রটি স্বতেজে ও স্ব-মহিমায় আপন কেন্দ্রে দীপ্তিমান থাকে। লক্ষ্মণ সেই অচঞ্চল ধ্রুবরূপী নক্ষত্র, যাহা কালের বক্ষে স্থির থাকিয়া পবিত্র আলোকছটায় এই ধরণীকে যুগে যুগে অভিষিক্ত করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া

লইয়া যাইবার জন্য চিত্রকূট পর্বতে জটাচীরধারী ভরতের বিলাপ কাতরোক্তি ও রোদনে আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। রামের পাদুকা গ্রহণ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের জন্য তাঁহার নগরের বহির্দেশে বাসের প্রতিজ্ঞা এবং ঐ পাদুকাকে সমস্ত রাজা-ব্যাপার নিবেদনপূর্ব্বক জটাচীরধারণ করিবার ও ফলমূল খাইয়া জীবনধারণের শপথের ছবি ভরতকে এক মহত্তর মর্য্যাদা দান করিয়াছে ইহা সত্য। তাঁহার নির্লোভতা, ত্যাগ, ভ্রাতৃপ্রেম ও বিনম্রতার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। 'রামায়ণে' তিনি এই একটিমাত্র কার্য্যের জন্য চিরকালের মত আদর্শ-স্থানীয় হইয়া রহিলেন। এই চিত্রই যুগেযুগে কাব্যরসে সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহাকে অপরূপ সুষমা দান করিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণের বীরত্ব, ধৈর্য্য, ত্যাগ, আনুগত্য, বুদ্ধিমত্তা, সেবা, প্রেম, ক্ষমা, নির্লোভতা ও কর্ত্তব্যনিরত অবস্থায় যে শত শত চিত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছে, তাহার তুলনাও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বালকাণ্ডে দেখি, বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট আসিয়াছেন—রাক্ষস বধ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে। রাজা এই কথা শুনিয়া শোকে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রাম যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির পাত্র, নয়নের মণি। রাম যে অল্পবয়স্ক কিশোর, যুদ্ধবিদ্যা এখনও সম্যকরূপে তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই—একথা জানাইয়া বার বার রামের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র অটল।

উপরন্তু বিশ্বামিত্র মুনির উদ্বেলিত ক্রোধের প্রাবল্য দেখিয়া বশিষ্ঠ মুনি তাড়াতাড়ি রামকে তাঁহার সঙ্গে বনে পাঠাইবার জন্য রাজাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তখন রাজা লক্ষ্মণকেও ডাকাইয়া পাঠাইলেন। লক্ষ্মণ আসিলেন। রাজা দশরথ ও জননী কৌশল্যা রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলাচরণ করিলেন। তাহার পর দশরথ রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্রের পিছনে রাম, রামের পিছনে লক্ষ্মণ চলিতে লাগিলেন।

দেখা যাইতেছে, সেই সময় সুমিত্রা অনুপস্থিত ছিলেন। আর তিনি উপস্থিত থাকিলেও কিশোর-পুত্রকে দুর্গম বনমধ্যে রাক্ষস নিধন করিতে যাইতে দেখিয়া যাত্রাকালীন মঙ্গলাচরণ বা তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ইত্যাদি ব্যাপারে নিবৃত্ত ছিলেন। মঙ্গলাচরণ যাহা কিছু রামকে কেন্দ্র করিয়া হইয়াছিল—লক্ষ্মণকে কেন্দ্র করিয়া নহে।

লক্ষ্মণ রামের চেয়েও ছোট। ভরতকে না ডাকাইয়া দশরথ রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দিলেন কেন—ইহা আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। রাম সর্ব্ব-বিদ্যায় বিশারদ। কিন্তু সেই রামকে দিতে তিনি অল্পবয়স্ক ও যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত হয় নাই বলিয়া বিশ্বামিত্র মুনির নিকট আপত্তি তুলিয়াছিলেন—অথচ রামের বনগমনে তিনি লক্ষ্মণকেও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন কেন?

দশরথ নীতিনিপুণ ছিলেন এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধেও তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তিনি অল্প-বয়স্ক রামের সহিত তাঁহার অপেক্ষা কনিষ্ঠ লক্ষ্মণকে সঙ্গে দিয়া যে বুদ্ধিহীনের ন্যায় কার্য্য করিবেন ইহাও বোধ হয় না। মনে হয়, আবেগপ্রবণ রামের সঙ্গে আবেগবিহীন লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া তিনি বুদ্ধিমত্তার কাজই করিয়াছেন। লক্ষ্মণের দৃঢ়চিত্ত ও সুখেদুঃখে অচঞ্চল ভাবটি তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয়।

ইহার পর অযোধ্যা-কাণ্ড।

শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেক-বার্ত্তায় সমগ্র অযোধ্যা-নগরী অপূর্ব্ব শোভাময় রূপ ধারণ করিল। রাজধানীতে তুমুল হর্ষের স্রোত বহিতে লাগিল। রামচন্দ্র সেই সুখ-সংবাদ জননীকে জানাইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কৌশল্যা সেই সময় রামের মঙ্গল কামনায় দেবগৃহে ছিলেন। সেখানে কৌশল্যা প্রাণারাম দ্বারা ধ্যান করিতেছিলেন এবং সীতা, সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। রাম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জননীকে শুভসংবাদ জানাইয়া হাস্যমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন—"লক্ষ্মণ, এক্ষণে তোমাকেও আমার সহিত রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। সুতরাং রাজাশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়া আছেন। ...বৎস তুমি ইচ্ছামত ভোগসুখ উপভোগ কর।"

রাজ্যলাভজনিত আনন্দে লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের

প্রগাঢ় প্রীতিসূচক এই ক'টি কথাই যেন সংযতবাক্ লক্ষ্মণের সম্যক উপযুক্ত। আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাই—দেবগৃহের সেই শান্ত, গাম্ভীর্যময় পরিবেশে রামের এই অনাবিল প্রীতিপ্রদর্শন ও উচ্ছ্বাসে লক্ষ্মণ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া নতমস্তকে নীরবে সেই প্রীতি ধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকজনিত আনন্দে অযোধ্যাবাসী অপেক্ষা লক্ষ্মণেরই অধিক আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কোন আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্মণ চরিত্রের কোথাও দেখিতে পাইনা। তাহার পরিবর্তে দেখি লক্ষ্মণ দেবগৃহে জননী কৌশল্যার শুশ্রূষায় রত।

অযোধ্যা নগরীর আনন্দ কোলাহল, রাজসভার উত্তেজনা, রাজপ্রাসাদের বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিশাল অযোধ্যা নগরীর উৎসব-মুখরতার মাঝে লক্ষ্মণের এই যে শান্ত, মৌন, স্থির, কর্তব্যনিরত, সেবাপরায়ণ চিত্রটি—ইহা অপূর্ব।

শান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে অটল থাকিয়া নিরাসক্তভাবে কর্ম করিয়া যাওয়া—ইহাই লক্ষ্মণের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ইহার পর রামের প্রতি কৈকেয়ীর নির্বাসনের আদেশে রাম জননীর নিকটে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। কৌশল্যা এই সংবাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ও চেতনা পাইয়া নানারূপ বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম জননীকে প্রবোধ দিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ আগাইয়া আসিয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"আর্যে, রঘু-প্রবীর রাম রাজ্যশ্রী ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিবেন ইহা সুসঙ্গত হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত, স্ত্রৈণ, সুতরাং স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় তিনি কিনা বলিবেন?" বলিয়া তিনি রামকে বলিলেন—"আর্য, এক্ষণে আপনার এই নির্বাসন সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণ করিয়া আপনার পার্শ্বরক্ষা করিব—তখন কাহারও সাধ্য নাই যে অভিষেকে বিঘ্ন সম্পাদন করিবে।"

"দেখুন, জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য—সুতরাং মহারাজ কোন বলে কোন যুক্তিতে তাহা কৈকেয়ীকে দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন? ... এক্ষণে আপনি ও আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। বৃদ্ধ হইয়াও বালক, কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত পিতাকে আমি এখনই বিনাশ করিব।"

লক্ষ্মণের এই উক্তি সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত নহে। অকারণে রামচন্দ্রের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন ধার্মিক পুত্রকে বনবাস দেওয়ার কল্পনা বালকের খেয়াল-খুশীর মতই হাস্যকর ও অগ্রাহ্য। কাজেকাজেই বৃদ্ধ পিতার বালকোচিত উক্তি যে সম্পূর্ণরূপে রাজধর্মের প্রতিকূল, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াই লক্ষ্মণ বৃদ্ধ পিতাকে বিনাশ করিয়া রাজধর্মের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন। ইহার মানে এমন নহে যে তিনি পিতার আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন না, অথবা পিতাকে তিনি ভালবাসিতেন না।

'রামায়ণে' মহর্ষি বাল্মীকি "কর্তব্য"কেই সবার উপরে স্থান দিয়াছেন দেখিতে পাই।

সে কর্তব্য লৌকিক কর্তব্য নহে, শাস্ত্রোক্ত অথবা বেদোক্ত কর্তব্য নহে, সে কর্তব্য মানবিক। যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যে সে কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত। মানুষ বুদ্ধি, যুক্তি, হৃদয়, প্রেম ও জীবন দিয়া যে কর্তব্য সংসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে তাহা লৌকিক বা শাস্ত্রোক্ত কর্তব্য নহে—তাহা অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক মহৎ—এই শিক্ষাটাই বোধ হয় রামায়ণের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তাই লক্ষ্মণ যখন কহিলেন—'পিতাকে বিনাশ করিব' তখন আমরা তাঁহাকে এই উক্তির জন্য দোষারোপ করিতে পারিনা। কেন না—মানবত্ব যেখানে লাঞ্ছিত ও পদদলিত, সেইখানেই প্রয়োজন হয় বীর্যের ও পৌরুষের। মানবতা যে দেবত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ—তাহা প্রমাণ করিলেন লক্ষ্মণ। কিন্তু রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উপরন্তু তাঁহার ধর্মতত্ত্ব দৈবের যুক্তিপূর্ণ সুমধুর ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন—"আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে তবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব? আপনি দৈবকে অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করিতে

পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতে চান? আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন যাহার প্রভাবে আপনার মত-স্থৈর্য উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই ধর্ম্মকেই দ্বেষ করি।" "• • • যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য্য সেই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের প্রশংসা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেননা। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈব-প্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।" এই ধরণের কঠোর উক্তির সময় লক্ষ্মণের চক্ষুদ্বয় বারবার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কোমলও কঠোরের সন্নিবেশে ইহা এক বিচিত্র চিত্র। রামের রাজ্যলাভজনিত আনন্দে যিনি ধীর স্থির, বনবাসজনিত দুঃখে তাঁহার এরূপ উক্তি, হৃদয়ের অর্গল খুলিয়া অকস্মাৎ যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

রামচন্দ্র সীতার সহিত বনবাসে যাওয়া স্থির করিলেন। তখন লক্ষ্মণ রামের চরণে পড়িয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন—"আর্য্য, মৃগযাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে যদি আপনার একাকীই যাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক আমিও আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক, কি অমরত্ব —কিছুই চাহিনা, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করিনা।"

তাঁহার এই সকাতর প্রার্থনায় প্রথমে রাম রাজী হন নাই, কিন্তু অবশেষে রাজী হইলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে চলিলেন। রাজা দশরথ ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের রোদন ও বিলাপ-ধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ মুখরিত হইয়া উঠিল। সমগ্র অযোধ্যা নগরী শোকে আকুল হইয়া পড়িল। রাজা হইতে অযোধ্যাবাসী সকলেরই মুখে কেবল রামের কথা।

রাজকুমার লক্ষ্মণও যে রামচন্দ্রের মত চীরধারণ করিয়া রাজ্যের চিরাভ্যস্ত ভোগ সুখ ত্যাগ করিয়া বনবাসে চলিলেন—সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিদায়ের সময় জননী সুমিত্রা লক্ষ্মণকে কহিলেন—"বৎস, যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আজ্ঞা দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। বৎস, জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। এক্ষণে রামকে পিতা, সীতাকে জননী এবং গহনবনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অগ্রে থাকিয়া পথ পরিষ্কার করেন। শিকার করিয়া আনেন, ফলমূল পাড়িয়া আনেন, নদী হইতে পানীয় জল তুলিয়া আনেন, অরণ্য মধ্যে সুন্দর পুষ্প দেখিলে জানকীর প্রীতি উৎপাদনার্থ তাহা তুলিয়া আনেন। রাম অযোধ্যা ছাড়িয়া আসিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন—লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। ভরতের আগমনে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির জন্য ঐ স্থান অপরিষ্কার হওয়ায় তাঁহারা চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীতে আসিলেন। পুষ্পিতকানন পঞ্চবটীর অতুলনীয় শোভা দর্শনে ঐ স্থানে বাস করিতে রামচন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ উৎকৃষ্ট গুল্মশোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন ও যথাবিধি বাস্তু-শান্তি করিয়া তিনি রামচন্দ্রকে কুটীর দেখাইতে আনিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। রাম লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কহিলেন—"বৎস, প্রীত হইলাম। তুমি অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিক স্বরূপ কেবল তোমায় আলিঙ্গন করিলাম, চিত্ত-পরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে।"

রামচন্দ্রের নিকট হইতে এই ধরণের কয়েকটি উক্তিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সমগ্র রামায়ণ মধ্যে লক্ষ্মণ এবং হনুমানই শুধু রামচন্দ্রের এই ধরণের প্রগাঢ় প্রেম ও প্রীতিপূর্ণবাক্য দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন। বাস্তবিক লক্ষ্মণ ও হনুমানই রামায়ণ মধ্যে এক রামের কৃপা ও প্রীতি ছাড়া আর কিছুই পান নাই।

বনবাসের চতুর্দ্দশবর্ষ পরে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা

হইয়া লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় লক্ষ্মণ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। শত্রুঘ্ন মধুর পুত্র লবণকে বধ করিয়া রামের নির্দ্দেশে মধুপুরীর রাজা হইলেন, বিভীষণ লঙ্কার অধিপতি হইলেন, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়া অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন—শুধু হনুমান ও লক্ষ্মণ বাকী রহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদের উভয়কেই আপনার হৃদয় মধ্যে ঠাঁই দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী করিয়া রাখিলেন।

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর লক্ষ্মণ রামের সেবা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর তিনি নিদ্রা যান নাই। রাম ও জানকীর যাবে রাত্রে তিনি ধনুর্ব্বাণ হস্তে পাহারা দিতেন।

সীতাহরণের ব্যাপারে লক্ষ্মণ যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সীতা যখন রামের অনুরূপ আর্ত্তরব শুনিয়া লক্ষ্মণকে বারবার রামের নিকট যাইতে বলিলেন, তখন লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন জনস্থানে যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে—তাহারাই উহাদের প্রতিশোধ লইবার জন্য মায়াবী মারীচকে পাঠাইয়াছে। কাজেই উহা রাক্ষসী মায়া, এই বুঝিয়া লক্ষ্মণ কিছুতেই সীতাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া যাইতে চাহিলেন না—কিন্তু লক্ষ্মণের এই নীরবতাকে ভুল বুঝিয়া সীতা নানা অপমানজনক বাক্যে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলেন। সীতার সেই হৃদয়-বিদারকউক্তি "তুই প্রচ্ছন্নরূপী ভরতের চর, জাতি শত্রু, কপট, ক্রূর, মিত্ররূপী শত্রু—আমার নিমিত্তই তুই একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস" ইত্যাদি অসম্মানকর বাক্যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যাইবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গেলেন—"তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। বনদেবতারা সাক্ষী, তুমি আমার প্রতি যারপর নাই কটূক্তি করিলে—মৃত্যু তোমার একান্তই সন্নিহিত হইয়াছে।"

সীতাহরণ হইল। রাম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা যুক্তিতর্কে অতি বিচক্ষণতার সহিত শোক, মোহ ও অবসাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর পম্পাতীরে সুগ্রীবের সহিত ইহাদের মিত্রতা হইল। রামের সাহায্যে সুগ্রীব রাজ্য পাইয়া ভোগসুখে মাতিয়া গেলেন।

সীতাকে অন্বেষণ করিবার যে প্রতিজ্ঞা সুগ্রীব করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হওয়ায় কিষ্কিন্ধায় যাইয়া সুগ্রীবকে ক্ষত্রনোচিত ভাষণ ইত্যাদিতে লক্ষ্মণের যথেষ্ট ন্যায়-নীতি ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মদবিহ্বল তারা যখন স্খলিত গমনে তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "রাজকুমার, তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল" তখন স্ত্রী-লোকের সান্নিধ্যে তিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া তটস্থ হইয়া অবনতমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এখানে তাঁহার লজ্জাশীলতা লক্ষণীয়। যে সুগ্রীবকে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভুলিয়া ভোগসুখে মত্ত থাকার জন্য তিনি—"বানর, তুমি স্বকার্য্য সাধনপূর্ব্বক রামের কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য্য, মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। ... সুগ্রীব, অঙ্গীকার পালন করিয়া তুমি বালীর অনুসরণ করিও না" ইত্যাদি বাক্যে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন—তিনিই আবার তারার নিকট হইতে—"না জানিয়া ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে, ... সুগ্রীব রামের প্রয়োজনে রাজ্য, ধন, ধান্য, পশু, রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন—" ইত্যাদি শুনিয়া বীত-ক্রোধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন।

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় গিয়াছিলেন রামের বার্ত্তা লইয়া, কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ দেখিয়া সুগ্রীব লক্ষ্মণের সম্মুখেই স্বর্ণ সিংহাসন হইতে উঠিয়া কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য ছিন্ন করিয়া কহিলেন—"রামের জন্যই আমি হৃতরাজ্য ও কীর্ত্তি পুনরায় অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছি। সেই দেব আমার যে উপকার করিয়াছেন উহার আংশিক প্রতি-শোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন। ... বীর, আমি তোমার কিঙ্কর, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে তাহা হইলে প্রণয় ও বিশ্বাস এই দুই কারণে ক্ষমা কর।" ইত্যাদি বিনয়সূচক বাক্যে লক্ষ্মণের প্রসন্নতা দেখা দিল এবং তিনিও যে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এজন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন—"রামচন্দ্র প্রিয়বিরহে শোকাকুল হইয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতেছিলেন, সেই দেখিয়াই

আমি তোমাকে এইরূপ কহিলাম—এজন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

ক্ষত্রিয়োচিত তেজের সহিত বৈকাথোচিত বিনয় ও নম্রতায় লক্ষ্মণ-চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এইবার আসিল যুদ্ধকাণ্ড।

সমগ্র রাক্ষসকুলের মধ্যে ইন্দ্রজিত ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর অবশেষে ইন্দ্রজিত বধ হইল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, ঋষিকুল সকলেই তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়া লক্ষ্মণ স্বয়ং অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। রক্তাক্ত-দেহে তিনি ক্ষতনিঃসৃত ব্যাথার জন্য বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে ভর করিয়া রামের নিকট যাইয়া প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র এই সংবাদে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া রণক্লান্ত রক্তাক্ত-দেহ লক্ষ্মণকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"ভাই লক্ষ্মণ, আজ বড় পরিতুষ্ট হইলাম। তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিত বিনষ্ট হইল, তখন জানিও আমরা জয়ী হইলাম।" এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই স্তুতিবাদে অতিশয় লজ্জা পাইলেন। তাঁর এই বীরোচিত কার্য্যে রামচন্দ্র যৎপরনাস্তি খুসী হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার উচ্ছ্বাস আর বাধা মানিতেছিল না। কিন্তু স্বল্পভাষী লক্ষ্মণ তাঁহার এই উচ্ছ্বাসকে এড়াইয়া আসিয়াছেন সেই সর্ব্বসমক্ষে রামচন্দ্রের এই স্নেহালিঙ্গন ও বীর-কার্য্যের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসাবাদে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া গেলেন। এই বীরোচিত কার্য্যের উপযুক্ত নায়ক হইতেছেন লক্ষ্মণ। রণক্ষেত্রের বীভৎস পরিবেশে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ লক্ষ্মণের নিকট হইতে এই লজ্জা ও কুণ্ঠা আমরা আশা করিতে পারি না। বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতবধের গৌরব ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তাঁহাতে নাই, নাই রণজয়ের উল্লাস, নাই গর্ব্ব স্ফীতি অবসাদের কোন ছায়া। পক্ষান্তর করিয়া তিনি যে নম্রতা ও বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন—তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। জয়ের গৌরবরূপ স্বর্ণকিরীট অপেক্ষা বহুমূল্য রত্নকিরীট তাঁহার শিরোভূষণ হইয়া দীপ্তি-মান হইতে লাগিল। এই বিনম্রতার বিপরীত রূপ পর-মুহূর্ত্তে দেখিতে পাই। অপর এক দৃশ্যে—

রাবণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া হতজ্ঞান লক্ষ্মণ রক্তাক্ত-দেহে রণভূমিতে পড়িয়া গেলেন। বানরেরা ঐ শক্তিশেল উহার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে ব্যর্থ হইল। ঐ শক্তিশেল লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিয়া মাটিতে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তখন রামচন্দ্র ঐ শক্তি-শেল লক্ষ্মণের বক্ষ হইতে তুলিয়া তাহা ভাঙিয়া হনুমানকে লক্ষ্মণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া রাবণ বধ করিবার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তীব্র শরাঘাতে রাবণ রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। তখন লক্ষ্মণকে মৃত-প্রায় দেখিয়া রামচন্দ্র নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। সুষেণের আদেশে হনুমান গন্ধমাদনের শৃঙ্গ তুলিয়া আনিলেন। বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চারি প্রকারের ঔষধে লক্ষ্মণ বিশল্য ও নীরোগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র তখনও শোকোচ্ছ্বাস কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণকে বসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন—"বৎস, আমি ভাগ্যবলেই তোমাকে পুন-র্জীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকী লাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন?"

রামের এইরূপ বাক্যেও কার্য্য শৈথিল্যের আভাসে লক্ষ্মণ সেই অবস্থাতেই অতিশয় দুঃখপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"আর্য্য, ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় আপনার এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি উচিত? প্রতিজ্ঞা পালন মহতেরই লক্ষণ, বীর আপনি কেন আমার জন্য নিরাশ হন? আমার ইচ্ছা যে আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রাবণকে বধ করুন। যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ধর্ম্ম হয়, যদি জানকী উদ্ধারে আপনার ঘত্ন থাকে, তবে শীঘ্রই আমার কথা রক্ষা করুন।"

লক্ষ্মণের এই উক্তিটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়—"বীর, আপনি কেন আমার জন্য নিরাশ হন?"

রামচন্দ্র যে আবেগজনিত আনন্দের অবস্থায় লক্ষ্মণকে স্নেহে, আদরে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহার বিপদে বালকের ন্যায় কাতর হইয়া পড়েন, রামচন্দ্রের এই একান্ত স্বাভাবিক স্নেহ-দৌর্ব্বল্যের প্রাবল্যে তিনি রামচন্দ্রকে কখনও না

তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছেন—কখনও বা নীরব থাকিয়া তাহা উপভোগ করিয়াছেন।

আরণ্যকাণ্ডে লক্ষ্মণের আরও একটি উক্তি লক্ষ্যণীয়।

কবন্ধবধূর হস্তে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই অবাক। লক্ষ্মণ সেই সময় রামকে কহিলেন—"বীর, দেখুন আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপচারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। বোধহয় আপনি অচিরাৎ জানকীকে পাইবেন। পরে সৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া একবার আমাকে স্মরণ করিবেন।"

লক্ষ্মণের এই হীন-দীন কাতরোক্তিতে সেদিন রামচন্দ্র তাঁহাকে বীরের প্রতি বীরের যথাযোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বীর, অকারণে ভীত হইও না, তোমার সদৃশ লোক বিপদে কদাচ ভীত হন না।"

সেদিন লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় আপনার জীবন দিয়া রামচন্দ্রকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার এই অর্ব্বাচীনতায় রামচন্দ্র শুধু মৃদু ভৎর্সনা দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা উভয়েই কবন্ধকে বধ করেন।

রাবণ-বধের পর বিজয়োল্লাস কিছু স্তিমিত হইলে সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া আসা হইল। কিন্তু রাবণের গৃহে বন্দিনী থাকায় রাম তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রত্যাখ্যান করিলেন। সীতা লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। রামচন্দ্রের এই প্রত্যাখ্যানও সীতার প্রতি নানা অশোভন উক্তির প্রতিবাদ তাঁহার অনুরাগী ও সুহৃদগণের মধ্যে কেহই করিতে সাহসী হইলেন না। একমাত্র লক্ষ্মণই রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

সীতার এই অপমান তিনি অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র যে কথা সীতাকে তখন বলিলেন—তাহা রাজধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়াই তিনি সহসা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহাদের সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রের উক্তিগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

রাম সীতাকে কহিলেন—"তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই সমুদ্রম উত্তীর্ণ হইলাম—ইহা তোমার জন্য নহে। • • • যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী কোন সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ তোমাকে দুই চক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিব।"

লক্ষ্মণ স্বয়ং রাজপুত্র হইয়া রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না···সে শুধু নিজেদের বংশমর্য্যাদার জন্য। তাহার পর রাম অগ্নি পরীক্ষান্তে সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করায় তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না।

পিতা দশরথ এই স্থানে কেবল লক্ষ্মণের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণকে তিনি কহিলেন—"রামকে তুমি নিতান্তরূপ বলিয়া জানিবে। বৎস, জানকীর সহিত ইহার সেবা করিয়া তোমার ধর্ম্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।"

সীতা, লক্ষ্মণ ও অগণিত লোক সমভিব্যাহারে রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে অযোধ্যা আবার রমণীয় শ্রীধারণ করিল। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে ডাকিয়া কহিলেন—"বৎস, মনু প্রভৃতি পূর্ব্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—এবং পূর্ব্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছেন, তুমিও সেই ভার গ্রহণ কর।"

রামচন্দ্রের বিনীত অনুরোধ ও নিয়োগ বাক্যে লক্ষ্মণ কিছুতেই রাজী হইলেন না। লক্ষ্মণ চরিত্রের এই নির্লোভতা ও ত্যাগে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না। রামচন্দ্রের অনুরোধ সত্ত্বেও কেন যে তিনি যৌবরাজ্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন, ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

লক্ষ্মণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখি কতকগুলি বিশেষ গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে—সেই বিশেষ গুণগুলির জন্য তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এক মহান পুরুষরূপে—যিনি সেবাধর্ম্মকেই একমাত্র আদর্শ ও মহান জানিয়া সকল প্রলোভন হেলায় জয় করিয়া আপন কর্ত্তব্যে দৃঢ়ভাবে অটল রহিলেন। অথচ কোথাও কোন আতিশয্য নাই, সেবা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া কোথাও তিনি শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত করেন নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার যে সেবাপরায়ণ চিত্রটিই আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা মানবতার ইতিহাসে অম্লান হইয়া রহিয়াছে।

এইবার আসিল উত্তরকাণ্ড।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে জানকীকে বনবাসে পাঠাইবার ভার লক্ষ্মণের উপরেই পড়িল। লক্ষ্মণের মুখ শুষ্ক, চক্ষু অশ্রুধারাক্রান্ত। রামচন্দ্রের নিদারুণ বাক্য তাঁহার কর্ণে গলিত সীসার ন্যায় তপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাম তাঁহাকে ডাকাইয়া কহিলেন—"তুমি জানকীর জন্য আমার কোন অনুরোধ করিও না।.....তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। আমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য আমায় কিছু বলিও না।" "তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্র-চালিত রথে করিয়া সীতাকে লইয়া পরিত্যাগ করিয়া আইস। যদি তোমরা আমার মতন্ত হও, তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" এই বলিয়া রাম বাষ্পাকুল-লোচনে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র বিশেষভাবেই জানিতেন যে লঙ্কায় সীতা পরিত্যাগের সময় লক্ষ্মণ বাধা না দিলেও বর্ত্তমানে তিনি বাধা দিতেন। সেইজন্য তিনি বাধা দিবার পূর্ব্বেই রামচন্দ্র তাঁহাকে নিদারুণ শপথ জালে জড়িত করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া রথে করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া জানকী তাঁহাকে কহিলেন—"তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া এইরূপ শোকাকুল হইয়াছ? সীতা তাঁহার নিদারুণ বিপদ জানিতেন না বলিয়াই লক্ষ্মণের চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিয়া ঐ কথা বলিলেন। লক্ষ্মণ অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। ঐ অশ্রু সীতার বনবাস-দুঃখে তো বটেই, পরন্তু সীতার প্রতি রামচন্দ্রের প্রেম স্মরণ করিয়া, এই অশ্রু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সীতার বিসর্জন-জনিত হৃদয়বিদীর্ণকারী দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে দেখিয়া, এই অশ্রু রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের নিদারুণ অভিমান-সঞ্জাতও বটে। সীতা-বিসর্জ্জনের মত এত বড় একটা ব্যাপারে রাম কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করেন নি—ভ্রাতাদের পূর্ব্বাহ্নে এ বিষয়েও কণামাত্র আভাস দেননি—লক্ষ্মণের অভিমান সেই কারণ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

তপোবনে আমরা জটাচীরধারী ভরতের আকুল ক্রন্দন দেখিয়াছি, সীতা-বিরহে রামের সেই শোকোচ্ছ্বাস বিরহের এক অমর চিত্ররূপে পরিণমিত হইয়াছে, কিন্তু নিস্তব্ধ তমসা-তীরে অশ্রু-আকুল লক্ষ্মণের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহার সহিত কাহারও তুলনা চলে না।

লক্ষ্মণ সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন—"দেবী, আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট। আর্য্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্য্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আমার আজ মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই লোক-গর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার সমুচিত নহে, তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না।"

লক্ষ্মণের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন ও দীনহীন ভাব দেখিয়া জানকী বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি কহিলেন—"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি সব কথা আমাকে বল।"

তখন লক্ষ্মণ জলধারাকুল লোচনে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইয়া অবশেষে কহিলেন—"তুমি আমার সমক্ষে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ কলঙ্ক ভয়ে তোমাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোনও দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা নহে, তুমি এরূপ বুঝিও না, এক্ষণে রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রম দর্শনে মনোরথ—এই দুই কারণে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। তুমি পাতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে অনশনে কালযাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।" এই বলিয়া তিনি সীতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিলেন।

তমসার তীরে এক রোরুদ্যমানা অসহায়া অন্তঃসত্ত্বা নারী, আর গঙ্গাবক্ষে অশ্রুসিক্ত শোকাকুল এক বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ—উভয়েই রাজধর্ম্মের নির্দ্দেশ নতশিরে গ্রহণ করিলেন।

একজন গভীর অরণ্যে রহিয়া গেলেন—আর একজন তমসার জলে সমস্ত দুর্ব্বলতা বিসর্জ্জন দিয়া ভাবলেশহীন-মুখে অচঞ্চল-হৃদয়ে রামচন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একদা বহুবর্ষ পূর্ব্বে রামচন্দ্রের বনগমন যাত্রায় ক্ষুব্ধ হইয়া যে লক্ষ্মণ রামকে 'দৈবের বশবর্ত্তী' হইয়াছেন বলিয়া নানা যুক্তিতর্কে দৈবকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া আপন পৌরুষকেই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন সেই লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের সহিত রথে ফিরিয়া আসিবার সময় হাস্যমুখে

কহিলেন—"আমার বোধহয় এই দুর্ঘটনা, ইহা দৈব-নিবন্ধন। দৈবকে অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। যিনি ক্রুদ্ধ হইলে দেব, গন্ধর্ব, অসুর এবং রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। হায়, অন্যায়বাদী পৌরবিগের জন্য এই অপকর্ম কার্য্য করিয়া তাঁহার কোন ধর্ম সাধিত হইবে জানিনা।"

অযোধ্যায় ফিরিয়া লক্ষ্মণ দেখিলেন, সীতা বিরহে রাম অনবরত রোদন করিতেছেন। লক্ষ্মণ নিজেকে সংযত করিয়া কহিলেন—"আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জাহ্নবী তীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শুদ্ধচারিণী জানকীকে পরিত্যাগ পূর্বক আপনার পাদমূলে আশ্রয় লইবার জন্য পুনরায় আসিলাম।"

এখানে লক্ষ্মণের "শুদ্ধচারিণী" কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি আরও কহিলেন—"আর্য্য, আপনি শোকাকুল হইবেন না, কালের গতিই এইরূপ। আপনার মত ধীমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। দেখুন, সমস্ত সঞ্চয় নাশে, উন্নতি পতনে, সংযোগ বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্য্যবসান হয়। অতএব স্ত্রী পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ধন-সম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অতিমাত্রায় আসক্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী।"

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের নিকট শুনিয়াছিলেন—রাম চিরদুঃখী হইবেন। তিনি প্রিয়-বিচ্ছেদ কষ্ট সহ্য করিবেন এবং বহুকালের জন্য জানকী, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে ত্যাগ করিবেন। কাজেই সীতা-বিরহে তাঁহাকে একান্ত শোকাকুল দেখিয়া লক্ষ্মণ রামকে অতি প্রচ্ছন্নভাবে জানাইলেন যে—"সংসারে সবই অনিত্য, অতএব শোক করা উচিত নহে। আপনি যে অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদ আবার থাকিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যবলে এই দুর্বল বুদ্ধি ত্যাগ করুন।"

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র প্রীতিভরে লক্ষ্মণকে কহিলেন—"বৎস, তোমার বাক্যে আমার দুঃখ, নিবৃত্তিও সন্তাপ দূর হইল। তুমি বুদ্ধিমান। তুমি আমার অনুকূল বন্ধু, বিশেষতঃ এই সময়ে এমন বন্ধু দুর্লভ।" রামচন্দ্র তাঁর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়ে তাঁহাকে বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দিয়া ধন্য করিলেন।

এ যাবৎ লক্ষ্মণ সেবকরূপেই রামচন্দ্রের স্নেহছায়াতলে নতশিরে সব আদেশ পালন করিয়া আসিলেও যেখানে অন্যায়, অধর্ম্ম ও অযৌক্তিকতা সেইখানেই তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত বিরুদ্ধ মত অবশেষে রামচন্দ্রের মতের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তা সত্ত্বেও দেখি, রামায়ণ মধ্যে একমাত্র তিনিই বাস্তব। জন্ম হৌসালো, দুঃখে বেদনায়, ক্ষাত্র তেজে, ন্যায়, ধৈর্য, ধর্ম্ম ও নীতির অকুণ্ঠ সমালোচনায়, রাজধর্ম্ম বিশ্লেষণে, আত্মবিশ্বাসে, স্নেহে, প্রেমে, ক্ষমা ও উদারতায়, অন্যায়ের প্রতিবাদে, পরিশ্রমের কঠোরতায় তিনিই একমাত্র মানবোচিত গুণে ভূষিত।

'রামায়ণে' রামচন্দ্রকে কেহই বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। তিনি সকলের নিকট হইতে অযাচিতভাবে স্নেহ ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান ও পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। একমাত্র লক্ষ্মণই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্র তাঁহাকে "বন্ধু" বলিয়া অভিহিত করিলেন।

রামচরিত্রের উজ্জ্বলতম অংশ লক্ষ্মণ। তাঁহাকে বাদ দিয়া রামচরিত্র অঙ্কন করা বৃথা। কিন্তু লক্ষ্মণ-চরিত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ। যদিও তাঁর গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের ছবি আমাদের নিকট অগোচরই রহিয়া গেল, কিন্তু তবুও বলিতে পারা যায়—সেখানেও তিনি আদর্শস্বামীরূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাম-সীতার সহিত আজ লক্ষ্মণের মূর্ত্তিরও পূজা হইয়া থাকে এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে একাসনেই তাঁর স্থান হইয়াছে। জানি না কোন প্রাচীন যুগে কাহারা তাঁহাদের পূত-চরিত কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের প্রিয়চরিত্রগুলির মূর্ত্তি করাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জানি না কোন বিস্মৃত যুগ হইতে তাঁহাদের চরিত্র-কথা নিয়মিত পাঠের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল, যাঁহারা এ কাজ করিয়া থাকুন—রামচন্দ্র ব্যতীত লক্ষ্মণকে যে তাঁহারা মানবতা'র শ্রেষ্ঠ পূজারী বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন এ বিষয়ে লক্ষ্মণের মূর্ত্তিপূজাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।*

* মহর্ষি বাল্মীকি রচিত "রামায়ণ" অবলম্বনে।

গোধূলির রঙ

সন্তোষকুমার অধিকারী

বেলা রায়ের বাবা অনীমকৃষ্ণ রায়—একটা নামকরা—কারখানার মালিক। কলকাতায় ও আশে-পাশে তাঁর খান তিনেক প্রাসাদতুল্য বাড়ী আছে। আর আছে গোটা চারেক মোটর। কিন্তু ঐশ্বর্যই বেলা রায়ের একমাত্র অহংকার নয়। বেলা রায় অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে এবং বিলেত যাবো যাবো করেও যেতে পারেছেনা, কারণ বেলার বাবা-মার ইচ্ছে বিয়ের পর সে স্বামীর সঙ্গে বিলেত যায়। মেয়ে-জামাইকে বিলেত পাঠাবার মত যথেষ্ট অর্থও তাঁরা আলাদা ক'রে রেখেছেন। কিন্তু শুধু এই জন্যেই যে বেলা খৃত্তিকাকে পায়ের তলায় রাখতে পেরেছে তা নয়। এমন কি তার অনিন্দ্য রূপের জন্যও নয়। বেলার গর্ব্ব তার বনেদী আভিজাত্য, তার কৃষ্টি, তার আচরণ, তার রুচি, তার দীপ্তি।

সাধারণ ঘরে এঁর যে কোন একটি গুণ থাকলেই মেয়েরা মাটিতে পা না দিয়েই হাঁটতে চায়। আর বেলার বয়েস সবেমাত্র একুশ ছুঁয়েছে। তার মনে এখন প্রথম আশা আর স্বপ্ন। জীবনকে এখন সে শুধু মধুর বলেই জেনেছে। কাজেই বেলা রায়ের পক্ষে অহংকার কিছুটা না থাকাই বরং আশ্চর্য। যদি সে পাঁচতলা বাড়ীর পাঁচতলার ছাদ থেকে মাটির দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে।

বেলা রায়ের একুশ বছরের যৌবন ফুটবো-ফুটবো ক'রে উন্মুখ হ'য়ে আছে। তার পাপড়ি শতদলের মধু গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মধুলোভী বহজন ছুটে এসেছে। কিন্তু আবার ফিরে গিয়েছে তারা। ছুটে এসেছিলো কলেজের সতীর্থ সত্যেন সেন, সে আজ ব্যারিষ্টারি পড়তে লণ্ডন চলে গিয়েছে। এসেছিলো চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার গুপ্তর একমাত্র পুত্র অনিমেষ। সে এখনও নিরাশ হয়নি একেবারে। আরও অনেক এসেছিলো। কিন্তু মনের দরজা খোলেনি বেলা রায়। এ দরজা শুধু একজনই খুলতে পারে। সে মনসিজ।

মনসিজের বাবা নাম-করা সিলোয়ার নন। কিম্বা তাঁর লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটও নেই। মনসিজের বাবা কলেজের শুধু অধ্যক্ষ। শুধু সেই কলেজে পড়ার দিনে যে কি ভাবে বেলা রায় মনসিজ নামক ছেলেটির কাছে মনটাকে হারিয়ে এলো সে কথা ভাবতে গেলেও আশ্চর্য্য লাগে।

এ কথা সকলেই জানে। শুধু এ বাড়ীর নয়—ও বাড়ীর লোকেও। বেলার বাবা আপত্তি করেন নি। কারণ টাকার অভাব তাঁর নেই। জামাইকে অর্থাভাব পেতে হবে না—বেলাই তাঁর একমাত্র মেয়ে। আর মনসিজ?

সেই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণটির মুখ ভর্ত্তি সারল্য। চোখে বুদ্ধির দৃঢ়তা। বেলা তাকে হৃদয় দিয়েছে। হ্যাঁ দিয়েছে বই কি। ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকহারা পথে ড্রাইভ করতে করতে পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুণীর চোখের দিকে চেয়ে একাধিকবার বলেছে মনসিজ—তোমাকে আমার ভালো লাগে···ভালো লাগে। তুমি কেমন করে এলে আমার কাছে?

দোতলার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ড্রেস্ করতে করতে ভাবছিলো বেলা। হালকা পাউডারের পাফ্ সযত্নে বোলাচ্ছিলো সে তার গালে আর গলায়। আয়নার উজ্জ্বল কাচে কানের গোল রিং দুটি চিক্‌চিক্ করছিলো। কোঁকড়া ফাঁপানো চুলগুলো বাতাসে একটু একটু উড়ছিলো। নিজের মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি শুধু হাসলো বেলা রায়। এখন সবে মাত্র সকাল আটটা। দীর্ঘ তিন বছর স্কুল আর লণ্ডনে কাটিয়ে কন্টিনেন্ট ঘুরে

অবশেষে ফিরে এলো মনসিজ। আজ এগারোটায় তার ট্রেন এসে লাগছে হাওড়া ষ্টেশনে। ফিরে আসছে, এসে পৌঁচচ্ছে মনসিজ।

লম্বা করিডোর বেয়ে একেবারে পশ্চিমের ছাদে পৌঁছলো বেলা। খোলা ছাদে সারি সারি টব ভর্তি গোলাপ। রজনীগন্ধা আর চন্দ্রমল্লিকা বেছে বেছে লম্বা ডাঁটার কটা গোলাপ কাঁচি দিয়ে সযত্নে কেটে নিলো সে। মনসিজ বড় ভালোবাসে গোলাপ। তাদের সহপাঠী সেই শ্যামলা মেয়ে নীলা দত্ত একবার কতকগুলো গোলাপ দিয়েছিল মনসিজকে। উঃ কী খুসীই না হয়েছিল মনসিজ। বাপ যার কাগজের আপিসের সাব-এডিটর—সেই মেয়ে কিনা তার গান শুনিয়ে আর ফুল দিয়ে ভুলিয়ে দেবে মনসিজের মনকে।

নিজের দিকে চেয়ে একটু গর্বিত হ'য়ে ওঠে বেলা রায়। সে যদি একটু কম রূপ পেতো—যদি তার মুখের রঙ আর একটু কম ফরসা হ'তো—কিম্বা আর একটু মোটা হ'য়ে যেত তার দেহ···কিম্বা যদি সে হালকা হ'য়ে যেত—বাচাল হ'ত ওই নীলা দত্তর মত ?

মৃদু হাসিতে ভ'রে উঠলো বেলার মুখ। ফুলগুলোকে দু'হাতে ধরে সে দক্ষিণের বারান্দায় এগিয়ে এলো—বাপি, আর একটু পরে আমি গাড়ীটা নিয়ে বেরোবো। আজ মনসিজ ফিরে আসছে।

—সত্যি ?

ইজি-চেয়ার থেকে ঘাড় কাত করে তাকালেন অসীমকৃষ্ণ রায়। তারপর আবার ডুবে গেলেন রাশিকৃত ফাইলের স্তূপে। বেলা হাল্কা একটু সুরের ঢেউ তুলে এগিয়ে গেল উত্তরের বারান্দায়—ছোড়দা, ষ্টেশন যাবি ? আজ মনসিজ আসছে।

—মনসিজ ? তা আজ তুই একাই যা। আমি বিকেলে ওকে কন্‌গ্রাচুলেট করবো।

বেলা লঘুপদে ফিরে এলো তার নিজের ঘরে। এখন সবে সাড়ে আটটা। বোম্বে মেল এসে পৌঁছবে এগারোটায়।

নীলা দত্ত হয়ত জানেনা যে মনসিজ আজ এসে পৌঁচচ্ছে। মনসিজ কি তাকেও চিঠি লেখে ? না, এত হালকা সে নয়। কিন্তু তবু কি অহংকার ওই কালো মেয়ে নীলা দত্তর। সে যেন তার দৈন্য তার অভাবকে পুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। সে যেন আপন গতির বাইরের পৃথিবীকে অবহেলায় তলিয়ে দেবে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সে বড় করুণাবোধ করছে নীলা দত্তর জন্যে।

সত্যি কথা বলতে কি, নীলাই ত আলাপ করিয়ে দিল মনসিজের সঙ্গে। তখন নীলা তার ঘনিষ্ঠ সখী ছিল। এক জন্ম-দিনের উৎসবে নীলা তার হ'য়ে নেমন্তন্ন ক'রে আনলো মনসিজকে। মনসিজ সেতার বাজায়। চমৎকার-তার হাত। তার বাজনা শুনতে শুনতে কতদিন দুঃখে গুমরে উঠেছে বেলা। হায়! কেন সে শেখেনি বাজাতে ?

নীলা তার কানে কানে বললো—এই মনসিজ। তোকে এতদিন নাম শুনিয়েছি। এবার চেহারা দেখালাম। দেখত—আমার 'মন্‌আমি' হবার যোগ্য কিনা ?

প্রথম দিনেই মুগ্ধ হলো বেলা। তারপর তার সঙ্গেই ব্যাডমিন্টন ক্লাবের পার্টনার হলো মনসিজ। তার ছুটির দিনের আউটিংএরও সঙ্গী হ'লো সে! তার মুগ্ধ মধুর চোখে চোখ রেখে অবশেষে একদিন বললো সে—তোমায় বড় ভালো লাগছে···বেলা।

আশ্চর্য্য! নীলা ঝগড়া করেনি। তার লাভারকে মুগ্ধ করেছে বেলা, কিন্তু নীলা কোন চাঞ্চল্য দেখায় নি মুখে। আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য দিয়ে সে অবজ্ঞা করেছে মনসিজ-বেলার গড়ে-ওঠা ঘনিষ্ঠতাকে। কিন্তু সত্যিই কি সে মনে মনে দুঃখ পায়নি কিছু ?

নীলার জন্যে—মনে ব্যথাবোধ করলো বেলা।

মনসিজ লিখছে—সোমবার সকাল এগারোটায়—বোম্বে মেলে হাওড়া পৌঁচচ্ছি। আশা করি ভালো আছ। আশা করি যেদিন তোমায় ছেড়ে এসেছিলাম ঠিক সেদিনের মত করেই পাবো।

তোমার মনসিজ

মনসিজ বড় চাপা। মনের ভাবকে সে প্রকাশ করে না কথায়। কিন্তু কথায় তার ব্যঞ্জনা আছে। আর বেলা অনুভব করতে পারে তার ভাবের ব্যঞ্জনাকে।

মনসিজ গ্লাসগো থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসছে ইন্ডি-নিয়ারিংয়ে। ইতিমধ্যে কলকাতার সমাজে হৈ চৈ পড়েছে

তাকে নিয়ে। বেলা জানে ঘরে ঘরে মেয়েদের আর মায়েদের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু বেলা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছে। সে জানে মনসিজ পাকাল মাছ নয়। তাকে হারাবার ভয় নেই। তাকে সে স্থির জেনে পেয়েছে। মনসিজ শুধু তার।

সন্ধ্যা নাগাদ ষ্টেশনে এসে পৌঁছলো বেলা। গাড়ীটাকে থামতে বলতে বলতে দুহাত ভর্তি ফুল নিয়ে হাওয়ায় যেন উড়তে উড়তে গাড়ী থেকে নামলো সে। সঙ্গে আর কেউ আসেনি। ভালোই হয়েছে। এতদিনের পর দেখার মধ্যে তৃতীয় কেউ না থাকাই ভালো। আকাশ রঙের ক্রিপ সিল্কের শাড়ীতে তাকে অপূর্ব্ব মানিয়েছে। মাথার চুলের গুচ্ছ বেণী বেঁধে ঘাড়ের দু'পাশ দিয়ে ঝুলিয়েছে। চোখে সোনার চশমা। হাতের কড়ে আঙুলে ঝুলছে টকটকে লাল রঙের একটা ভ্যানিটি ব্যাগ।

হাঁটতে হাঁটতে চশমার কাচের আড়াল থেকেই দেখলো বেলা—কাউণ্টার থেকে দু'জন ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। বেলা কুণ্ঠিত হয়না। মুগ্ধ অথবা ঈর্ষান্বিত চোখের দৃষ্টি সইতে সে অভ্যস্ত। দৃঢ় পদক্ষেপে এনকোয়ারির সামনে এসে সে প্রথমেই শুধোলো—গোখে মেল ?

—টাইট টাইম্।

একটা প্ল্যাটফরম্ টিকিট কিনে নিলো সে। তারপর অবশিষ্ট সময়টুকু কাটাতে হুইলারের বইয়ের ষ্টলের দিকে এগোলো।

সবেমাত্র একটা সিনেমা পত্রিকা নিয়ে তার প্রথম দুটি পাতা উল্টিয়েছে সে এমন সময় ঘাড়ের কাছে কার যেন নিঃশ্বাস পড়লো—আরে বেলা নাকি ?

মুখ ফিরিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ ক'রে প্রায় অসাড় হ'য়ে গেল বেলা। তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে তারই পুরোনো বন্ধু নীলা দত্ত। একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ী প'রে, সবুজ পপলিন্ ব্লাউজ গায়ে, খোলা চুলে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে নীলা। কিন্তু সে এখানে কি করতে এলো ?

নীলা সহাস্যে বললো—মনসিজ আসছে এই ট্রেনে। তুই নিশ্চয়ই খবর পেয়েই এসেছিস ?

শুকিয়ে ওঠা ঠোঁট দুটোকে আলগা করে ওল্টালো বেলা রায়।

—মনসিজ ? হ্যাঁ আসছে বটে আজই। আমার এক আত্মীয়ও আসছে। এলাহাবাদ থেকে।

—এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। মনসিজ খুসীই হ'বে তোকে দেখলে। অনেক সময় আছে এখনও। ভাবছিলুম একা একা কি করি ? ভালোই হ'লো তোকে পেয়ে। নীলা তার হাত ধ'রে টেনে আন্‌লো একটু ফাঁকা জায়গায়।

—তুই ত আজকাল আর খবরই রাখিস্ না আমাদের। ডুমুরের ফুল হ'য়ে গেছিস নিজে। ভাগ্যিস্ আজই তোর আত্মীয় আসছেন এলাহাবাদ থেকে।

নীলা শব্দ ক'রে হেসে উঠলো। আর বেলার হাতের ফুল দেখিয়ে বললো—ভারী সুন্দর গোলাপগুলো। মনসিজ পেলে খুসী হতো। ও আবার ছবি আঁকা ধ'রেছে। পাঠিয়েছে তোকে কিছু।

অপমানে লাল হ'য়ে গেল বেলার সুন্দর মুখটা। সে শুধু নিঃশব্দে বললো—ছবি আঁকে ? তাহলে হাতে আর কোন কাজ নেই বল ?

নীলা বললো—এক সপ্তাহের জন্যে ক্রান্স গিয়েছিলো। তার কতকগুলো ফোটো পাঠিয়েছে। কী সুন্দর ক্রান্সের নদী, বন, আর আকাশ ! তুই দেখেছিস ? সুইজারল্যাণ্ডে এক হোটেলে খেতে গিয়ে জল চেয়ে ও বিপদে ফেলে দিয়েছিলো সকলকে। ওয়েটার কিনা এক গ্লাস গরম জল এনে হাজির। কোল্ড ওয়াটার বলাতে ছোট্ট মেজার গ্লাসে ক'রে এক আউন্স জল। তাও অনেক দেরী ক'রে আন্‌তে পারলো।

নীলা হেসে গড়িয়ে পড়লো, আর সে হাসিতে রাশিকৃত ব্যঙ্গ আগুন হ'য়ে ছড়ালো বেলা রায়ের বুকে।

হঠাৎ একটা ঘণ্টার শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো বেলা। নীলার কথায় বাধা দিয়ে বললো—আমি যেখি একটু, ছোড়দা আসবে বলেছিলো।

নীলার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই হ'ন হ'ন ক'রে একদিকে এগিয়ে গেল বেলা। সে এখন পরিত্রাণ চায় নীলার হাত থেকে—তার কথা আর দৃষ্টি থেকে।

নীলার দৃষ্টি সত্যিই ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছিলো। ভীড়ের মধ্যে অসংযত হয়ে পড়েছিলো তার পদক্ষেপ। বোধে মেলের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফরমে একটা চাঞ্চল্য

আগলো। ভীড়ের ধাক্কায় কত এগোচ্ছিল বেলা! হঠাৎ কে এসে হাত ধরলো।

—কোথায় চলেছো? নীচে পড়বে যে?

হাত ধ'রে প্ল্যাটফরমের প্রায় কিনারা থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এলো যে, তার দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো বেলা—আঃ অনিমেষদা, বড্ড ভীড়। যা ধাক্কা দিচ্ছে লোকগুলো।

অনিমেষ ও'র দিকে চেয়ে বললো—তোমায় দেখে ত' আমি ছুটে এলাম। একা—কে আসছে?

—আসছে আমাদের এলাহাবাদের এক পিসী। ট্রেন এসে গেলো। তুমি এসো আমার সঙ্গে।

হু হু করে কাঁপতে কাঁপতে প্রকাণ্ড ট্রেনখানা এসে দাঁড়ালো যেন একটা ক্লান্ত দৈত্যের মত। আর তার জঠর থেকে ছিটকে পড়তে লাগলো লগেজ সমেত মানুষগুলো। শুধু একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা থেকে একটি মাত্র যুবক স্থির দৃষ্টিতে যেন খুঁজতে লাগলো কাউকে—খুব পরিচিত কোন লোককে!

—এই যে মনসিজ, তুমি নামোনি এখনও?

নীলা দত্তর ব্যস্ত ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে—উদাসীন-ভাবে উত্তর দিলো মনসিজ—কে নীলা? তুমি কি ক'রে জানলে যে আমি আসছি?

—বাঃ রে! তুমি চিঠি লেখোনা তোমার বোন বিনতাকে? বিনতাই ত বললো—তুমি ত আর আমাকে মনে ক'রে লিখবে না?

নীলার অভিমানভরা চোখের দিকে চেয়ে মনসিজ বললো—কিন্তু বিনতা ত···

—ওর যে অসুখ। না না, বেশী কিছু না। চলো যেতে যেতে বলবো।

কুলীর মাথায় সুটকেশ আর বেডিংটা তুলে দিয়ে মনসিজের পাশে এসে দাঁড়ালো নীলা। বললো—চলো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আবার থমকে দাঁড়ালো মনসিজ। হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তার মুখ। উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে বেলা! হেঁটে আসছে সে। হাত ধ'রে আছে অনিমেষের।

থমকে দাঁড়ালো বেলাও। হ্যাঁ মনসিজ নীলার হাত ধ'রেই চলেছে। কোন রকমে কাঁপা গলায় সে বললো—ভালো আছো?

—হ্যাঁ, তুমি ভালো আছো বেলা?

—ভালো আছি।

—কী অপূর্বই তোমাকে দেখাচ্ছে। আঃ কী সুন্দর ফুলগুলো। তুমি কি—দেরী করেছো আসতে? এত দেরী···

মনসিজের চোখ সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু না, আর ভুলবে না বেলা রায়। যে বিশ্বাস রাখতে জানে না, যে মিথ্যা বলতে পারে, যে প্রবঞ্চক···বেলা অনিমেষের হাত টেনে ধরে এগিয়ে গেল।

—আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছো? কে আসবে আর? তোমার সঙ্গে যে আমার কথা আছে বেলা। বেলা···

মনসিজ প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু ভীড়ের হট্টগোলে আর ইঞ্জিনের গর্জনে বেলার কানে মনসিজের ডাক পৌঁছলো না। সে ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে অনিমেষের হাতটাকে আঁকড়ে ধ'রে।

গেটের দিকে এগোতে এগোতে বললো নীলা দত্ত—কত চং-ই যে জানে বেলা রায়? কত ছেলেকে যোল খাওয়াচ্ছে তারও ঠিক নেই। আর অনিমেষ, কাল ছিলো পীযূষ, আবার কাল হবেন হয়ত···স্যাণ্ডাল্যাস।

মনসিজ মনের গোপন একটা জায়গায় যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত অনুভব করলো। নীলাকে থুকিয়ে সে রোধ করলো একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তারপর মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলো—এর জন্যেই কি এই তিন বছর ধ'রে শুধু তোমার কথাই শুধু ভেবে এলাম বেলা?

আচমকা অনিমেষকে থামিয়ে বললো বেলা—আমি যাচ্ছি। কাজ আছে খুব। বাবাকে এক্ষুণি গাড়ী দিতে হ'বে।

প্রায় ছুটতে ছুটতে গাড়ীতে ফিরে এলো সে। দরজা খুলে ভেতরে বসে পড়লো। ফুলগুলোকে আনলো গলিয়ে ছিটিয়ে দিলো রাস্তায়। তারপর চলন্ত গাড়ীর নরম কুশনে মুখ লুকিয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো একুশ বছরের মেয়ে বেলা রায়।

—হায় মনসিজ! এর জন্যেই কি এতকাল ধ'রে অপেক্ষা করলাম? তুমি রূপটাই দেখলে আমার। দেখলে না এই রক্তে মাংসে গড়া মনটাকে?

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত নবপ্রতিষ্ঠ প্রধান সাময়িক পত্রগুলিতে কেবল সাধুভাষা ব্যবহৃত হত। সবুজপত্র ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এসে দেখা যায় যে, এমন কোন সাময়িকপত্র পাওয়া দুষ্কর যাতে অল্পবিস্তর কথ্যভাষা ব্যবহার করা হয় না। "ভারতবর্ষ," "প্রবাসী," "শনিবারের চিঠি," "মাসিক বসুমতী," "বেণু," "আনন্দবাজার," "যুগান্তর" প্রভৃতি সব কটি মাসিক ও দৈনিক কাগজেই এখন চলতি ভাষায় লেখা গল্প রচনাবলী অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। পত্রিকাগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই চলতি ভাষার আধিপত্যও ক্রমশ বাড়ছে। প্রধান সম্পাদকীয়গুলি এখনো সাধুভাষায় লেখা হয়। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদগুলিও সাধুভাষায় পরিবেশিত হয়। কিন্তু নানা চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, সরস রচনা, ছোটখাট সংবাদ, সংবাদ-সাহিত্য—এ সবই খাঁটি চলতি ভাষায় লেখা হচ্ছে।

১৯২৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে দেখলে খুব কম লেখকই চলতি ভাষায় গল্পরচনা নিষ্পন্ন করেছেন। কিন্তু ১৯২৫ সালের পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চলতি ভাষা তথাকথিত সাধুভাষার সঙ্গে সমান সমান বলের লেখ্যভাষার মর্যাদা পেয়েছে। আধুনিক ও প্রগতিপন্থী লেখকমণ্ডলে সব রকমের গল্প রচনাই এখন কথ্যভাষায় সুসম্পন্ন হচ্ছে।

কোন কোন মহলে এখনো সাধুভাষার লেখার বিচিত্র প্রবণতা থাকলেও আর সাধুভাষায় রচনাবলী আজও বেশ প্রবলভাবে বর্তমান থাকলেও চলতি ভাষা যে আধুনিক প্রভাবশালী মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছে, সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করলে তা বোঝা কঠিন নয়। কথ্যভাষা দিন দিন প্রবলতর হয়ে ক্রমশ সার্বভৌম আধিপত্য লাভ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরো কতদিন সাধুভাষার অস্তিত্ব থাকবে, তা বলা সম্ভব নয়। মফস্বলে আর অল্পশিক্ষিত মহলে পুরাতন ঘুণের প্রভাব বেশি হওয়ায় আরো অনেকদিন সাধুভাষার অস্তিত্ব দেখা যেতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, অচিরে বাংলা গদ্যের মূল ধারারূপে একমাত্র চলতি ভাষার গদ্যই জন-স্বীকৃতি লাভ করবে। তার মানে এই নয় যে, সাধুভাষায় লেখা বিরাট ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে। সেই সাহিত্য আগের মতোই নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রধান প্রবণতা হবে কথ্যভাষার দিকে। নতুন যুগের সাহিত্য গড়ে উঠবে এই ভাষাতেই। এই চলতি বাংলা-বুলির স্বরূপ ও গতিবিধি নিরূপণ করতে পারলেই বাংলা গদ্যের পরবর্তী ক্রমবিকাশ অনুধাবন করা যাবে।

চলতি ভাষার প্রসারে বেতার-কেন্দ্রের দান অসামান্য। ১৯২৭ সাল থেকে বেতার-কেন্দ্রের মারফতে যতগুলি ঘোষণা, সংবাদ, সমালোচনা, সংবাদ-সমালোচনা, বক্তৃতা, সাহিত্যনিবন্ধ, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস পঠিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে, তার প্রায় সমস্তই কথ্যভাষায় লিখিত; সুতরাং এর জন্যেও কথ্যভাষার প্রসার যেমন বাড়ছে, তার সাহিত্যিক মর্যাদাও তেমনি স্বীকৃত হচ্ছে। নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠান বা "আকাশবাণী"-র যে কয়েকটি কেন্দ্র থেকে বাংলা ভাষায় কিছু অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়, সে-সব জায়গায় এবং পাকিস্থানের বেতার-কেন্দ্রগুলিতেও খাঁটি কথ্যভাষায় সব কাজ চালানো হয়। পাকিস্থানে কেবল দু-একটি আরবি-ফার্সি শব্দ বেশি ব্যবহার করা হয়। বেতার-প্রচারের সাহায্যে চলতি ভাষায় লেখার প্রবণতা আরো বাড়বে।

চলতি ভাষার প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ভাষা ক্রমশ খাঁটি মুখের ভাষা হয়ে উঠবার দিকে প্রধাবিত। তথাকথিত সাহিত্যিক কথ্যভাষার ভিত্তি লোকের মুখের ভাষায় স্থাপিত হলেও রবীন্দ্রনাথ—বীরবল—বিভূতিভূষণ—দিলীপকুমার—অন্নদাশংকর প্রভৃতির ব্যবহৃত ভাষা পুরোপুরি মুখের ভাষা নয়। তাঁদের ভাষায় এমন সব তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে—যা কেবল অসাধারণ শিক্ষিত জনের মুখের ভাষা বলে গণ্য হতে পারে। ভাবাভিব্যক্তির প্রয়োজনেই ঐ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে শিক্ষিত উচ্চ বাঙালি ঔপন্যাসিক শক্তিশালী লেখকের অনুকরণে নিজেদের মুখের ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বাড়াচ্ছেন, আর অন্যদিকে লেখকেরাও লেখার ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার কমিয়ে তদ্ভব আর দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভাষাকে একটু একটু করে ঘরোয়া ছাঁদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবে সাহিত্যিক কথ্যভাষা মুখের ভাষা, আর মুখের ভাষা গদ্যভাষা হয়ে

উঠবে পরস্পরের দিকে ধাবিত প্রবাহে। অন্যদিকে দেখা যাবে, সরকারি ও বেসরকারি মিলিত চেষ্টায় কলকেতিয়া শিষ্ট কথ্যভাষাই সরল বাংলা-ভাষী এলাকার একমাত্র আদর্শ কথ্যভাষা হয়ে উঠবে। সুতরাং ভবিষ্যতে লেখার কাজে যে কথ্যভাষা ব্যবহার করা হবে, সেই ভাষাই ভারত ও পাকিস্তানের বাংলাভাষী বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষিত জনের মুখের এক-মাত্র ভাষারূপেও প্রযুক্ত হবে। অতীতে এক এক বেলা বা পরগণাকে কেন্দ্র করে যে প্রাদেশিকতা গড়ে উঠেছিল, আজ ভৌগোলিক ব্যবধান সংকুচিত হওয়ায় সাহিত্য ও বেতার-যন্ত্রের প্রসারণে তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে। তার মানে এই যে, লেখ্য ও কথ্য, উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই বঙ্গদেশের অখণ্ডতা নিয়তিনির্দিষ্ট।

যখন যে সমাজ প্রভাবশালী, তখন সেই সমাজের লোকের মুখের ভাষাই দেশের সর্বত্র আদর্শ কথ্যভাষা বলে গৃহীত হয়ে, এটা স্বাভাবিক। ফ্রান্সে পারি-ভ্যার্সাই অঞ্চলের কথ্যভাষাই কি ভাষাগত সৌন্দর্য কি উচ্চারণ, দুদিক থেকেই ফ্রান্সের আদর্শ চলিত ভাষা বলে ধরা হয়। তার কারণ, সপ্তদশ শতকেই ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা জনসংঘ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-মান্ ফরাসি সম্প্রদায়রূপে গণ্য হয়েছিল। ফরাসি রাজদরবারও ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলাদেশেও একই কারণে প্রথমে নদীয়া পরে কলকাতা অঞ্চলের ভাষা আদর্শ কথ্য ও লেখ্যভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। ভবিষ্যতে লোকের মুখের ভাষা যেমন সাহিত্যিক হয়ে উঠবে, সাহিত্যের ভাষাও তেমনি পুরোপুরি বিদগ্ধ জনের মৌখিক ভাষার উপর স্থাপিত হবে। তার ফলে বাংলা গদ্যভাষা অনেকটা ফরাসি গদ্যভাষার মতো প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, সারগর্ভ, গাঢ়বন্ধ ও অব্যর্থ হয়ে উঠবে। বাঙালি শিক্ষিত জনও কতক অংশে বিদগ্ধ ফরাসি নাগরিক লাভ করবেন। চলতি ভাষায় লেখা সাহিত্য সহজেই লোকের মুখে মুখে ফিরবে এবং মুখের ভাষায় সাহিত্যগুণ অর্পণ করে ভাষার ধার বাড়িয়ে দেবে। ফরাসি বিদগ্ধ যেমন শানিয়ে-বলা বানানো কথার জন্যে বিখ্যাত, ফরাসি গদ্য যেমন বানিয়ে-বলা শানানো কথার জন্যে প্রসিদ্ধ, বাঙালি মার্জিতরুচি তেমনি সরস বাক্‌চাতুর্যের জন্যে, বাংলা গদ্য তেমনি সুভাষিত ও বাগ্‌-ধারাগত উৎকর্ষের জন্যে খ্যাতিমান্ হতে পারবে। অদূর ভবিষ্যতে এই সাহিত্যদীপ্তি ও বাক্‌সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

উনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষা ও গদ্য রচনার উপর রাষ্ট্রিক কারণে ফার্সি ভাষার প্রবল প্রভাব বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক বিবর্তনে সে-প্রভাব অপসারিত হয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠল। আজকের দিনে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের সংখ্যা যাই হোক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি। ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য আক্রমণ থেকে অনুপ্রাণন—দুইশতাব্দীর অধিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যতটা প্রভাব স্থাপন করেছিল, মাত্র দুই শতকেই পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যসমূহ তার চেয়ে ঢের বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক কথ্যভাষার গদ্যে ইংরেজি বাক্যরচনা পদ্ধতি, উদ্ধৃতি-চিহ্ন সহযোগে বাক্য সুরু করে মাঝপথে কর্তৃপদের স্থান নির্দেশ করে তারপর বাক্য ও উদ্ধৃতি-চিহ্ন শেষ করার পাশ্চাত্য প্রভাবগুলি-প্রবণতা বেশ দেখা যায়। অন্য ধরনের বাগ্‌ভঙ্গিও অনেক দেখা যায়। ইংরেজি কথাসাহিত্যের প্রভাবেই এমন হয়েছে। বাংলা বাক্যের গড়ন কোথাও কোথাও ইংরেজি ঢঙে বিন্যস্ত দেখা যায়। কথার মধ্যে খণ্ড প্রসঙ্গে বা Parenthesis-এর প্রয়োগ, ড্যাশ-চিহ্নের ব্যবহার, বাগ্‌ভঙ্গির বৈদেশিক বিন্যাস, বিদেশি ভাবকল্পনার আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োগ—সবই অল্পান্তভাবে এই পাশ্চাত্য প্রভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। উদ্ধৃতিযুক্ত বিশেষণগুলি বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের রচনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দু একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক :—

"এও যদি বুঝতাম," লেখক আবার বলতে লাগলেন, "যে, আমার ছবি শোনা লোকের হাতেই পড়েছে, তবু না-হয় কিছু সান্ত্বনা ছিল। যাদের বড় বড় বাড়ি, টাকার ছড়াছড়ি, এমন লোকের মধ্যে দু চারজন আর্ট পেট্রন তুমি পাবে—হাঁ, পেট্রন পাবে, কিন্তু প্রেমিক পাবে না।"

মাত্র এইটুকুর মধ্যেই "আর্ট পেট্রন.....পাবে না" অংশে লেখকের উপর ইংরেজি ভাষা ও রচনাপদ্ধতির প্রভাব লক্ষণীয়। "হাঁ, পেট্রন পাবে"—বাক্যের পরাংশ সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। অন্যত্র তিনি লিখেছেন :—

"কেন, ভাগ্যিস্ কেন?" চিত্রকর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালেন।

"দ্রুত বৃষ্টি", "সুবর্ণ সুযোগ," "আলোকসম্পাত," "এই উক্তির আলোকে"—এই সব প্রয়োগ ইংরেজির প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রভাব—আক্ষরিক অনুবাদ বললেও চলে। আরো কয়েক বছর পরে স্পষ্ট বোঝা যাবে, বাংলা ভাষা ও গদ্যে ঠিক কি পরিমাণ পাশ্চাত্য প্রভাব স্থায়ী হবে। স্বাধীনতা লাভের পরও ভাষা ও সাহিত্যে ইউরোপীয় ও মার্কিন প্রভাব আগমনের পথ রুদ্ধ হয়নি।

আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলির মধ্যে যেমন—টুথ ব্রাশ, টুথ পেস্ট, চেয়ার, টেবিল, ফাউন্টেন পেন, ট্রাম, বাস, গ্রামোফোন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের ভাষাতেও সেগুলি প্রবেশ লাভ করেছে। প্রধানত গদ্য ভাষার কথাসাহিত্য রচনায় এই সব শব্দের ব্যবহার দরকার হয়। পরিভাষা রচনা করে এগুলির বিদেশি নাম তাড়াবার চেষ্টা করা বৃথা। চলতি ভাষায় লিখিত গদ্যে যে কোন ভাষা থেকে নানান নতুন উদ্ভাবিত জিনিসের নাম বিনা খাপ্পা ফেরে যাবে। ইংরেজি ভাষার রাজনৈতিক কারণগত প্রভাব আজ চলে গেছে বলেছি। কিন্তু তার সাংস্কৃতিক প্রভাব কতদিন থাকবে বা কতদিনে লুপ্ত হবে, তা বলা সহজ নয়। রাজনৈতিক প্রভাব লুপ্ত হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পাশ্চাত্য প্রভাবের ধারস্থ থাকতে হবে। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রভাবও বাংলা সাহিত্যে থাকবেই। ঐ বৈদেশিক প্রভাব আপাতত কেবল ইংরেজি ভাষার মারফৎ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে সঞ্চারিত হবে। কাজেই শুধু সাংস্কৃতিক কারণেই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আরো বিদেশি শব্দ ঢুকবে, বাংলা সাহিত্যে অধিক বিদেশি ভাব ও চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হবে এবং স্বভাবতই গদ্যভাষাও খানিকটা পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে ঢালাই হবে।

কথাভাষা বৈদেশিক প্রভাব আত্মসাৎ করার ব্যাপারে সাধুভাষার চেয়ে বেশী উপযোগী। কাজেই সেদিক থেকেও কথাভাষার আদর বাড়বে।

রাজনৈতিক কারণে ও রাষ্ট্রিক প্রভাবে এর পর হয়ত হিন্দি ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষা তথা সভ্যতার উপর বেশী হতে পারে। তার পরিমাণ আন্দাজ করা যায় না। দীর্ঘকাল বাঙালি ও হিন্দুস্থানি সমগ্র ভারতে এক সরকারের অধীনে পাশাপাশি বাস করে আসছে; সাংস্কৃতিক বৈদ্যের ফলে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এক সময়ে মালাধর বসু, কৃত্তিবাস কবিরাজ প্রভৃতির মতো শক্তিশালী কবির রচনায় হিন্দি ভাষার সামান্য প্রভাব দেখা গেছে। কিন্তু প্রতিবেশী কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হবে, সেই সম্ভাবনা অনেক বেশি।

সমাজে সাম্যবাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার ফলে যদি কোন দিন কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি তথাকথিত বঞ্চিত ও সর্বহারা শ্রেণীর লোক রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে নেয়, সমাজের সব ক্ষেত্রেই তাদের সর্বময় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেও কথাভাষার খুব খারাপ কোন পরিবর্তন হবার ভয় নেই। অবশ্য পরিবর্তন একটা হবেই, কিন্তু সেটা ভালোর দিকে। আদর্শ কথ্যভাষা কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখেই আবদ্ধ না থেকে ক্রমশ সর্বশ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেও এই ধরণের একটা পরিবর্তন ঘটবে, দেশে সাম্যবাদপ্রচারের পরিণতি যাই হোক না কেন। আর তখন তাতে কথাভাষার প্রয়োগবৈচিত্র্য ও ভঙ্গিমাধুর্য দেখা যাবে। এ কথা মনে করা ভুল যে, তথাকথিত অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ইতরজনসুলভ কট্‌ক্তি-কণ্টকিত ভাষা মার্জিত চলতি ভাষাকে পঙ্কিল করে তুলবে। সামগ্রিকভাবে যাই ঘটুক না কেন, স্তরের সূক্ষ্ম কোনও ভাবনারাশি ফোটাতে গিয়ে সে-স্তরের উপযোগী ভাষা খোঁজার সময় সব শ্রেণীর লোককেই মার্জিতরুচির চলতি ভাষার আশ্রয় নিতেই হবে। তাতে অনেক তৎসম শব্দের দ্বারলাভ অনিবার্য। ব্যাপক জনশিক্ষা আর বয়স্ক সাক্ষরশিক্ষিতের জন্যে সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনার বহুল প্রয়াসের দ্বারাও কৃষক ও শ্রমিকদের মুখের ভাষার উন্নতি ও সংস্কার অনিবার্য। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে প্রোলেটারিএটদের মুখের ভাষাও আর এখনকার মতো চোয়াড়ে থাকবে না, বরং রাশিয়ার যেমন দেখা গেছে, বেশ মিহি আর বোলায়েম হয়ে আসবে। চিরন্তন মানবিক অনুভূতিগুলি সর্বজনের হৃদয়ে যদি নাও হয়, সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে সাড়া তুলবেই। তখন নিজেদের দরকারেই সেগুলিকে রূপ দিতে সমর্থ যে ভাষা, তার সন্ধান করতে হবে। সুতরাং আদর্শ কথ্যভাষার বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার কারণ নেই।

আচার্য বিনয়কুমার সরকারের মতে, বাংলা গদ্যে ফরাসি প্রাঞ্জলতা দেখা গেছে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায়। কিন্তু ঐ প্রাঞ্জলতা আরো ভালো করে কথ্য ভাষায় নিতান্ত দুরূহ বিষয়ের আলোচনাতেও ফুটিয়েছেন বিনয়কুমার নিজে, সুনীতিকুমার আর দিলীপকুমার। তাঁদের রচনাশৈলীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; অথচ নিজ নিজ রীতি ও ভঙ্গির মহিমায় প্রত্যেকেই চলতি ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও যাদু যেভাবে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তা অনুসরণীয়। প্রথমে বিনয়কুমারের ভাষার নমুনা দেখা যাক :—

"ওকাদের ফরাসি পণ্ডিত বের্গসঁ অরবিন্দের মাথায় ঢেলেছেন "জীবনের ধাক্কা" (লেঁ দে লা ভি)—এই ধাক্কাটা দুনিয়াকে ছিঁড়ে চিঁড়ে করে ঠেলে নিয়ে চলে। তাতেই হয় সৃষ্টি। প্রাণ, মানুষ, জগৎ, চিত্ত সবই এই ধাক্কার ঠেলায় নয়া নয়া মূর্তিতে বিকাশলাভ করতে থাকে। এই গেল বিবর্তন বা অভিব্যক্তির এক পশ্চিমা কোআয়া। অরবিন্দর দ্বিতীয় পশ্চিমা গুরু জার্মান পণ্ডিত হেগেল। এই কোআয়ার দাইতে গেলে সহজেই দেখা যায় দুনিয়ার ধন্দ—টক্কর, প্রতিযোগিতা, সংঘাত। এই দ্বন্দ্বমূলক দুনিয়ার বিভিন্ন গতিভঙ্গি অর্থাৎ ভাঙাগড়া, জীবন বিকাশের বা সংস্কৃতি বিকাশের বা চিত্তোন্নতির নানা স্তর, গড়ন বা রূপ মাত্র। অরবিন্দর "ভাগবত জীবন" দ্বন্দ্বনিষ্ঠ, টক্করনিষ্ঠ, লড়াইনিষ্ঠ। অরবিন্দ দর্শন শান্তি জানে না। এর ভেতরকার মন্ত্র হচ্ছে ওঁ অশান্তিঃ ওঁ অশান্তিঃ অশান্তিঃ! মানুষের ভাগবত জীবনকে অরবিন্দ গড়া করেছেন অশান্তির উপর—লড়াইএর উপর—বিপ্লবের উপর। ভাগবত জীবনকে পাকড়াও করতে হলে মানুষের চলতে হয় অশান্তি চাখ্‌তে চাখ্‌তে—টক্করের পর টক্কর চালিয়ে—দুনিয়াখানাকে জুতোতে জুতোতে। যে লোকটা বিপ্লবকে চিরসাথী করে না, সে লোকটা দেখে না কখনও ভাগবত জীবনের মুখ। নমো বিপ্লবায়—অথাতো বিপ্লব জিজ্ঞাসা—এই হল অরবিন্দ দর্শনের গৌরচন্দ্রিকা।"

এর চেয়ে সহজ সরল অথচ লাগসই ভাষায় আর কেউ শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন নি। বিনয়কুমারের ভাষা দেখে বোঝা যায়, তথাকথিত চোয়াড়ে ভাষাতেও জটিল দার্শনিক ও ধর্মবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা অতি সুন্দরভাবে করা যায়। সুতরাং কথ্যভাষার পরিণতি সম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করা নিরর্থক। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "বিনয় সরকারের লেখার ভিতরে যেটা আপাতত শুষ্কচঙালি বোধ বলে মনে হয়, সেটা তাঁর অক্ষমতার পরিচায়ক নয়, বরঞ্চ সেটা তাঁর প্রগতিশীল মনেরই পরিচায়ক।" বিনয়কুমার দেখিয়ে দিয়েছেন, চলতি ভাষার প্রায় গ্রাম্য ও ঈষৎ আটপৌরে রূপের দ্বারাও ফরাসি প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

সুনীতিকুমারের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নিবন্ধগুলি সবই কথ্যভাষায় লেখা; তিনি জলের মতো সহজে ভাষাসম্পর্কিত আলোচনার বক্তব্য বুঝিয়ে যেন। ইউরোপের এক অঞ্চলের ভাষাসমস্যা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :—

"ফ্লেমিংরা ডচ্‌ বা ওলন্দাজদেরই শাখা—এদের ভাষা ডচ্‌ ভাষারই এক প্রাদেশিক রূপ; সমস্ত ফ্লেমিং লোকে ডচ্‌ পড়ে বা শুনে বুঝতে পারে, আর ডচেরাও ফ্লেমিংদে বোঝে। ডচ্‌ আর ফ্লেমিংদের মধ্যে কেবল ধ্বনির পার্থক্য মাত্র দেখা যায়—ডচেরা প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান, আর

ক্লেমিংরা হচ্ছে রোমান কাথলিক। ধর্ম আলাদা বলে, ক্লেমিংরা তাদের সহোদরপ্রতীম ডচেদের সঙ্গে মিলে এক জাতি না হয়ে, রোমান কাথলিক কিন্তু ফরাসিভাষী ওয়ালুনদের সঙ্গে মিলে বেলজিয়ম রাষ্ট্র গঠন করেছে। বেলজিয়মের রাষ্ট্রীয় জীবনে আগে ফরাসি ভাষারই প্রভাব বেশি ছিল ; কিন্তু ক্লেমিংরা ক্রমে ক্রমে তাদের বিশিষ্ট ভাষা আর জাতীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ছে, তাই এখন দুটো ভাষাকে সব বিষয়ে সমান স্থান দিতে হচ্ছে। সরকারি ইস্তাহার দুই ভাষায় হয়, রাস্তার নাম দুই ভাষায় লেখা থাকে, রেলের টিকিটে ডাকটিকিটে টাকাপয়সায় মোটে সর্বত্র দুই ভাষার মর্যাদা রাখতে হয়। ক্লেমিং আর ফরাসিভাষী ওয়ালুন—এদের অনুপাত ছিল ১৯১০ সালের লোকগণনায় ৭৪ লাখ বেলজিয়ানদের মধ্যে ২৯ লাখ ফরাসি-বলিয়ে, ৪১ লাখ ক্লেমিশ-বলিয়ে, আর প্রায় ৯ লাখ ক্লেমিশ আর ফরাসি দুই-ই মায়া বলে, এমন লোক ; বাকি জর্মান বলে। এই অনুপাতটা এখন কি রকম দাঁড়িয়েছে তা জানি না, তবে অনুমান হয়, বিশেষ পার্থক্য হবে না, দুটো জাতই এখন নিজের নিজের ভাষা আর সংস্কৃতি রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। আমরা সভাসমিতিতে দুটো ভাষার ব্যবহার প্রায় সর্বত্র সমান সমান দেখেছি। মধ্য যুগের ইংরিজি আর এংলো-স্যাক্সন বা প্রাচীন ইংরিজি জানা থাকলে, একটু জর্মান জানা থাকলে, ডচ, বা ক্লেমিশের অনেকটা পড়ে বোঝা যায়, কিন্তু শুনে বোঝা যায় না। বেলজিয়মে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ওয়ালুনরা যাকে বলে ফরাসি, সেটা প্যারিসের শুদ্ধ ফরাসি নয়—সেটা হচ্ছে ফরাসির এক প্রাদেশিক উপভাষা। শিক্ষিত লোকেরা অবশ্য সর্বত্রই শুদ্ধ ফরাসি বলে।

সঙ্গীতশাস্ত্রের জটিল রূপকল্পের আলোচনায় কত রস ও চমক সৃষ্টি করা যায়, তা দিলীপকুমারের রচনার মাঝখানে দেখা গেছে। যাঁরা "গায়কী" পড়েছেন, তাঁরাই কথাভাষার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছেন। ঐ গ্রন্থে এক জায়গায় একটি বৈদেশিক গ্রন্থের পটভূমিকার বর্ণনায় তিনি ভাষার যে নৈপুণ্য ও শিল্পবিন্যাস রচনা করেছেন, তার তুলনা বাংলা ভাষায় বিরল। সাধুভাষায় দুরূহ ঐ বস্তুসম্ভারের বর্ণনা অসম্ভব। সামান্য একটু আভাস দেওয়া গেল :—

"পুরীর সঙ্গে মেশানো একটা হাওয়াইই সিটারের কান্নাজোড়া ছিড়ে কি যে একটা পথহারা আবেশের মহিমা জেগে ওঠে মনের চারাকুঞ্জে···কত কি ভাব যে ভিড় করে আসে···কত আবহারানো দিনে পাওয়া আমার তখনি মিলিয়ে-যাওয়া স্মৃতির দুরন্তি···কিন্তু সব মুক্তির হৃদয়ের কোথায় একটা গাঢ় অথচ স্বচ্ছ বেদনা। ঐ—সেই সিটারের ছিড়—কবে শুনেছিলাম একটি ভুলে-যাওয়া গানের সঙ্গে··· রক্তের মধ্যে সেই বেদনাটা যেন কের উথলে হয়ে ওঠে—বন্ধুরা যাওয়ার পিউরে-ওঠা নাড়া দুরন্তের মতন। বেদনাটা যেন মোড় ফিরল তার পর থেকে গাড়ির পথে···যেতে ওঠে একটা দূর গুরুমজুমি—কথায় সুরে মিলেমিশে। উথলে ওঠে একটি গান এক গাড়ির নির্ঘরের মতনই—ঊর্ধ্ব-উৎসারে। সুরও গুনগুনিয়ে আসে···মনে হয় যেন সাগরপারের সেই অর্ধবিস্মৃতা সুরে তাকে মেশে আমার ভোলা মনেও নিরন্তর ঝলকটি ছিল, আছে···উপরে আকাশের কৃষ্ণাম্বরীতে নানারঙা তারার চুমকি ঝলমলিয়ে উঠেছে···নিচে একটি দূরত্ব নয়নের অথবে সেই উজাড়-করা সুরেরা গান করতে চাইছে—অথচ সে উর্ধ্বাকাশের স্বচ্ছ কৃষ্ণাম্বরীটি ছুঁতে গেলেই যাচ্ছে মিলিয়ে···হারাতে অচিন্ প্রার্থনা আশাপূর্ণার কাছে ···এ-সুরকে এ-যেমি বলা যায় না পুরোপুরি, অথচ কত রাগের ছায়া-পরিমল যে এর পাপড়িতে পাপড়িতে ছড়ানো, মাখানো, জড়ানো, শুধু কথার নয়—ভাবে রঙে, বাজনায়। একে গানের কোন্ শ্রেণীতে ফেলব বলো ?"

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়গৌরব ও প্রাঞ্জলতার সার্থক সমন্বয় ঘটেছিলেন। আজকের কথাভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রকাশ করে যে, আধুনিক বাংলা গদ্যে ঐ দুটি জিনিসের সুসমঞ্জস মিলন ঘটেছে। দীর্ঘ চারশো বছরের অক্লান্ত সাধনায় বাংলাগদ্য এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গদ্যভাষাগুলির সমপর্যায়ে উঠে আসতে পেরেছে। বাংলা কথাসাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যের সুরে আরোহণ করুক বা না করুক, প্রকাশ-সামর্থ্যের দিক থেকে বাংলা গদ্যভাষা এখন বিশ্বসংসারের গদ্যের সেরা গদ্যভাষাগুলির অন্যতম। এত দীর্ঘ এই বর্ণমালাদের জন্যে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর চলিত ভাষা রচনা করে গেছেন, তাকেই অভিনন্দন জানাতে হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অনুগামী বীরবলের সংস্কারমুক্তিও প্রজ্ঞার সঙ্গে স্মরণীয়। আর যে সব উত্তরসাধক বাংলা গদ্যকে তার পরম বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের অন্যতম প্রধানে, তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে এই সামান্য নিবন্ধের পরিসমাপ্তি টানা যেতে পারে।

আমাদের ভাষাজগতে যাই হোক, গদ্যভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী লেখনীর অভাব নেই। প্রবীণ লেখকদের কথা বাদ দিলেও তরুণদের মধ্যেই যাঁরা যশস্বী ও জনপ্রিয়, তাঁদেরই সম্ভাবনা অপরিমেয়। সাহিত্যের সব রস তাঁদের রচনায় নব নব রীতি ও ভঙ্গিতে নিয়ত আত্ম-প্রকাশ করছে। কথাভাষার সার্থকতম বিকাশ অনতিবিলম্বে তাঁদের রচনায় জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দেবে, নির্ভয়ে সেই আশা করা যায়। তখনই সংস্কৃত ভাষার দুরূহতা দুহিতার প্রকৃত মহিমা বোঝা যাবে। সংস্কৃত গদ্যভাষার সঙ্গে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের পরিণতির তুলনা করলে তা বাংলা গদ্যের পক্ষে গৌরবের বিষয় হবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমাপ্ত

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনের এক অধ্যায়

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

১৮৪৮ সালের ১০ই নবেম্বর ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আমাদের জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ ঐ তারিখে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁর চিত্রময় জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে আমরা উপনীত হই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন রঙ্গপুরের খোঁড়া মনোজাবাদের সিভিলিয়ান ব্রাহ্মণ। আর পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদার-মনোভাবাপন্ন। কিন্তু লক্ষণীয়, এই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সংঘাতে কখনও তাঁদের পরিবারে এমন কোন আলোড়ন বা আবর্তের সৃষ্টি হয়নি যাতে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। অবশ্য এর জন্য অনেকখানি দায়ী হিন্দুধর্মের পরমত-সহিষ্ণুতা। প্রাচীনপন্থী ভাবধারার সঙ্গে উদার-পন্থী মতাবলম্বীর এক অপূর্ব সমন্বয়ের সমন্বয় হয়েছিল সেই পরিবারে—যে সময়কার মনোভাব উত্তরকালে সুরেন্দ্রনাথকে অনেক প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে আপোষ করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে অথবা সহায়তা করেছে। ভারতের জাতীয়তার জনক ও রাজনীতিক দীক্ষাগুরু সুরেন্দ্রনাথের উপরে তাঁর পারিবারিক প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল।

সাধারণ বাঙালী পরিবারের শিশুদের মতই সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-জীবন শুরু হয় পাঠশালায় প্রথমতঃ বাংলাপাঠসাধনে শিখবার জন্যই। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর। সেদিনের পাঁচবছরের শিশুর জীবনের একটি ছোট ঘটনা: পাঠশালার গুরুমশাই তাকে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে একদিন 'মেড়োমোখ' বলে ভর্ৎসনা করেন। বর্ণবিদ্বেষ-প্রসূত এই জাতীয় ভর্ৎসনায় শিশু সুরেন্দ্রনাথ এমনই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হলেন যে তিনি আর ঐ পাঠশালায় যেতে রাজী হলেন না। অভিভাবকদের অনেক সাধ্যসাধনা এবং পরিশেষে ভীতিপ্রদর্শন কোন কিছুতেই সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর অটল সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই আর ঐ পাঠশালায় গেলেন না। কোরেলা যেমন ভবিষ্যৎ মিলনের সংকেত বহন করে, তেমনি সেই মিনোর সেই শিশু সুরেন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের দৃঢ়চেতা, সংকল্পে অটুট, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগুরুর সম্ভাবনার ইঙ্গিতই বহন করেছিল। যাই হোক অবশেষে সংকল্পে অটল সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছার কাছেই হার মানতে হয়েছিল তাঁর অভিভাবকদের এবং বাংলা ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য তাঁকে একটি বাঙালী বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে দু'বছর অধ্যয়নের পর সুরেন্দ্রনাথকে ইংরাজী শিখবার জন্য পেরেন্টাল একাডেমিক ইনষ্টিটিউশান (Parental Academic Institution) নামক এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথের সন্তানদের ছাত্রজীবন এখান থেকেই সুরু হয়। সুরেন্দ্রনাথকে যখন এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছয় বছর। অথচ এই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ান (Anglo-Indian) ছেলেরাই পড়াশুনা করত এবং তারা ইংরাজীতেই কথাবার্তা বলত। এই পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথের অবস্থা সহজেই অনুমেয়—যদিও তাঁকে এই পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি অথচ তাড়াতাড়িই ইংরাজীতে কথাবার্তা বলে তাদের সমকক্ষ হতে পেরেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক এবং তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন যে—এই ইংরাজী কথাবার্তার ভিতরে তাঁর ব্যাকরণ শুদ্ধি যথেষ্ট থাকত না, কারণ তাঁর ইংরেজী জ্ঞান, ইংরেজী শুনে—ব্যাকরণকে আয়ত্ত না করেই। তিনি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন তখনও তাঁর ব্যাকরণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল লেনীর (Lennie's) ছোট ইংরেজী ব্যাকরণ পেতাবে। উত্তরকালে ইংরেজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী—যিনি শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই বা প্রাচ্যেই শুধু নয়—বিলাতে বা পাশ্চাত্য দেশেও তাঁর বাগ্মিতার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন—তাঁর ইংরেজী বিদ্যারম্ভ শুরু করেছিলেন এমনিভাবে।

সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি কখনও গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠাভ্যাস করেন নি—যদিও তিনি যেন আর্থিক স্বচ্ছল পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের উপর নির্ভরশীল হয়েই সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর পাঠ্যজীবনে অগ্রসর হতে হয়েছিল। ইংরেজী এবং ল্যাটিন প্রভৃতি কঠিন পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ শিক্ষা করবার জন্য অবশ্য যদি কখনও তিনি খুব অসুবিধা বোধ করতেন তখন তিনি তাঁর পিতার সাহায্য গ্রহণ করতেন এবং তাঁর পিতাও তখন সানন্দ চিত্তে তাঁর শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁকে পাঠ বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করতেন। এমনি করে ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর ভিতরে গড়ে উঠেছিল আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা—যারা সুরেন্দ্রনাথের উত্তর কালের রাজনীতিক জীবনে সাফল্য অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। শৈশবের এই আত্মনির্ভরশীলতা ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনে নূতন কর্মপথে বা কর্মপন্থা গ্রহণে তাঁকে শুধু সহায়তাই করেনি, তিনি এই স্বাবলম্বন-শিক্ষা থেকে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাও লাভ করেছিলেন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে" কবির এই বাণী তাঁর কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর বাল্যের এই স্বাবলম্বন শিক্ষা থেকেই। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভরতায় এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি চিকিৎসাবিদ্যায় যথেষ্ট সুনাম, প্রতিপত্তি ও অর্থ অর্জন করেছিলেন এবং তৎকালীন কলিকাতায় একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে বিবেচিত হতেন, তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করে-

ছিলেন শিক্ষকতা নিয়ে। তিনি প্রথম জীবনে ডেভিড, হেয়ারের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন, যদিও মনে মনে তাঁর চিকিৎসক হওয়ার খুবই বাসনা ছিল। কিন্তু অগ্রজের ইচ্ছা অন্তরে রেখেই তাঁকে জীবন সুরু করতে হয়েছিল শিক্ষকতা নিয়ে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় তাঁর অভিভাবকদের অনমতির জন্য। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষক-জীবনে এসেই তিনি সান্নিধ্য লাভ করলেন, উদারপুরুষ হেয়ার সাহেবের। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোবাসনা জানতে পেরে হেয়ার সাহেব তাঁকে তাঁর অভিপ্রেতিত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা করে দিলেন শিক্ষকতা চাকুরী বজায় রেখেই। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রত্যহই তাঁকে বিদ্যালয় হতে ছেয়ার করেক ঘণ্টা ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। এই সুযোগ ও সুবিধারও তিনি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি চিকিৎসা জগতে কলিকাতার অন্যতম প্রধান ডাক্তার বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হেয়ার সাহেবের সহায়তা ও দাক্ষিণ্যেই তাঁর অবদমিত মনোবাঞ্ছা সকল বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছিল। নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা-লাভের পথে অভিভাবকদের অনমতি প্রভৃতি নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলেই দুর্গাচরণবাবু তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রীঃ একটি উইল করে রেখে-ছিলেন; অবশ্যই তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠিয়ে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই উইল সুরেন্দ্রনাথের হাতে পড়লে তবে তিনি এই উইলের সারমর্ম জানতে পারেন। ছেলের শিক্ষাব্যবস্থায় যাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয় বা আর্থিক কোন কারণ যাতে ছেলের উচ্চশিক্ষার পথে কোন সময় কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে—তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিচার করেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার্থ কলেজে ভর্তি হন। কলেজেও তিনি ভাল ফলই দেখান এবং যথারীতি বি-এ পাশ করেন। স্কুল কলেজে তিনি বরাবরই ভাল ফল করতেন। তিনি পরীক্ষায় স্কলারশিপ অধিকার না করলেও বরাবরই তাঁর কাছা-কাছি থাকতেন এবং পুরস্কার-বিজয়ীদের অন্যতম থাকতেন। অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্যসাধনের নিষ্ঠার পুরস্কার মানুষের অবশ্যপ্রাপ্য। এই অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্য সাধনের নিষ্ঠাই সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনে জয়যুক্ত করেছিল। তাই দেখা যায় তাঁর শৈশবাবস্থায় যে সকল সহপাঠী বন্ধু-গণের কাছে সুরেন্দ্রনাথ জ্ঞানী হতে পারেন নি, ভবিষ্যতে তিনি তাদের পশ্চাতে ফেলে অগ্রগামী হতে পেরেছিলেন! বি-এ পরীক্ষা পাশ করে তিনি যখন কলেজ ত্যাগ করে যাবার উপক্রম করেছিলেন তখন তাঁদের কলেজের অধ্যক্ষ সেন্ট এণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জন্ সাইম (Mr. John Simo of the university of St. Andrew's) ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন সুরেন্দ্রনাথকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বিলাত পাঠিয়ে দেবার নিমিত্ত। বিদ্যোৎসাহ দুর্গাচরণবাবু পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যক্ষ সাইমের এই অনুরোধকে শিরোধার্য করে তখনই রাজী হলেন এই প্রস্তাবে এবং সুরেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠাবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে তাঁর ১৮৪৩ সালের উইলের স্বত্বকে অর্থাৎ পুত্রকে বিলাত পাঠিয়ে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করার স্বত্বকে বাস্তব রূপদান করতে উদ্যোগী হলেন। এমনি করে দুর্গাচরণবাবু সুরেন্দ্রনাথের মনে উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৬৯ সালের ৩রা মার্চ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অপর দুই বন্ধু মহেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ শরীর-পালন ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য রীতিমত ব্যায়ামানুশীলনও করতেন। সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী না হতে পারলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যই সকল সুখের এবং জীবনে সাফল্য লাভের মূল—এই অনস্বীকার্য সত্যকে উপলব্ধি করেই সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থা থেকেই ব্যায়ামানুশীলনে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং যাবজ্জীবনভরই তিনি এই অভ্যাস বজায় রেখে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সুস্থ ও আনন্দোজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। অবশ্য এই বিষয়েও অনেকগুলি কৃতিত্বের দাবী রাখেন সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর সন্তানদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একজন নিয়মিত ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত করে নিজের বাড়িতেই একটি আখড়া তৈয়ার করে দিয়েছিলেন। এমনি করে সন্তানদের মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব। উত্তরকালে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকেরই স্বাস্থ্যের প্রতি যথোচিত মন দেওয়া প্রয়োজন। কারণ দেশপ্রেমিকের জীবন জাতির কাছে এক মহা-মূল্য সম্পদবিশেষ। তাঁদের দীর্ঘজীবনের পথে সাথে তাঁদের বিচারবুদ্ধি ও পরিপক্কতা লাভ করে এবং তাঁদের বক্তৃতাও যথেষ্ট মূল্যবান হয়,..... .....অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের নেতৃবর্গ তাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন বলেই তাঁদের অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন—যার জন্য জাতিকে অনুশোচনা এবং শোক প্রকাশ করতে হয়েছে।" সুরেন্দ্রনাথ এই উক্তিগুলি করেছিলেন তদ্বন্ধু আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথের এই মূল্যবান উক্তি আধুনিক যুগের আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই—বিশেষ করে দেশ-প্রেমিকদের প্রণিধানযোগ্য। কারণ, বর্তমানে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা কোন কোন মহলে রয়েছে যে সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবা করতে গেলে বোধ হয় স্বাস্থ্যের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়—অথবা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে গেলে যথোচিত দেশ-সেবা বা সমাজ-সেবা করা সম্ভব নয়। উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য বা ভাল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাল্যবিবাহ রোধ করবার প্রয়োজনীয়তা ও সুরেন্দ্রনাথ অনুভব করতেন। যখনই সুরেন্দ্রনাথ সুযোগ বা সুবিধা পেতেন তখনি তিনি জনসমক্ষে বাল্যবিবাহবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করতেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ একবার সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় তাঁর স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথের বয়সী ভারতবাসীর মধ্যে সচরাচর এই রকম স্বাস্থ্যের অধিকারী ও কর্মক্ষম লোক খুব কমই দেখা যায়। তখন

এই আশা হয়তো কারণ বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর নিকট তাঁদের পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে বাল্যবিবাহ বন্ধ থাকাই এর অন্যতম প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছিলেন। তবুও আশ্চর্য লাগলেও এ কথা সত্যি যে সুরেন্দ্রনাথের পরিবারের সংরক্ষণশীল গোড়া মনোভাবের জন্যই তাঁদের পরিবারে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। তাঁরা খুব বড় কুলীনবংশ ছিলেন। তাই স্বভাবতঃই বিবাহ-যোগ্য বয়স্থাদের অনুরূপ কুলীনবংশ (যাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল) খুঁজে বার করতে শুধু বেশ পেতেই হত না, অনেক দেরীও হত। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ পরিণত যৌবনেই তাঁদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হত। অবশ্য কোন উদ্দেশ্যমূলক বা সমাজ সংস্কারের মনোভাব থেকে যে এটা হয়নি তা সুরেন্দ্রনাথ অকপটভাবে নিজেই স্বীকার করে গেছেন তাঁর আত্মচরিতে। বাল্যবিবাহের পরিবর্তে পরিণত-যৌবনে বিবাহের ফলই তাঁদের পরিবারের প্রায় সকলেই সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন বলেই সুরেন্দ্রনাথের সুস্থ প্রত্যয় জন্মেছিল এবং এমনি করে তাঁর মধ্যে একটা বাল্যবিবাহ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

সুরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন তথা ছাত্রজীবনের সমসাময়িক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের যা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ধারা আদৌ বেগবতী ছিল না বলেই চলে। রামগোপাল ঘোষের মত বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতা শুনতে পঞ্চাশ জনসভাগুলিতে বিশেষ জনসমাগম হত না এবং জনগণের চিত্তে সেই বক্তৃতার ফল বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়াও দেখা দিত না। সুরেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে অবশ্য সেই আন্দোলনের ধারায় শুধু বেগই সঞ্চারিত হয়নি, জনমুক্তিআন্দোলনে জনপ্রজাতন্ত্রবাদীকে সেই আন্দোলনের মূল স্রোতস্বিনী ধারায় অবগাহন করিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এক পুণ্যে প্রথিত করে-ছিলেন তাদের সকলকে—এক ভাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতায়। সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের ব্রাহ্মসমাজ তথা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনই বোধ হয় বাংলা তথা ভারতের সকল বক্তা ছিলেন—যিনি তাঁর বাগ্মিতার সম্মোহনী শক্তিতে শ্রোতাধারাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। তিনিই ভারতের সার্থক বক্তা তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ দলে দলে জনসভায় যোগদান করতে আরম্ভ করে। তাঁর সময় হতেই প্রকৃত জনসভায় লোক সমাগম বৃদ্ধি পেতে সুরু করে—তিনিই এই গৌরবের প্রথম দাবী করতে পারেন —কেশবচন্দ্র তাঁর বক্তৃতার অপূর্ব শক্তিতে অতি সহজেই যুবকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় গুরুগম্ভীর ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত থাকত এক অপূর্ব ভাবাবেগ ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। অসামান্য ছিল তাঁর বক্তৃতার উচ্চারণ ভঙ্গী। স্বভাবতঃই ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে গ্রাণ্ড-নেতার বক্তৃতার প্রতিটি অক্ষর অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন, মুগ্ধনয়নে লক্ষ্য করতেন তাঁর বক্তৃতার মৃদু বাচনভঙ্গী, গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করতেন তাঁর বক্তব্য বিষয় এবং ভাব। একথা বলে বোধ হয় একটুও অত্যুক্তি হবে না যে বাগ্মী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের জন্য অনেকখানি ঋণী কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার প্রভাব।

সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বিশেষ করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রভাব তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। বিদ্যা-সাগরের বিরাট ব্যক্তিত্ব, সংকল্পের দৃঢ়তা, উদার মহানুভবতা এবং সর্বোপরি অসহায় দীন-দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি সুরেন্দ্রনাথের অন্তরে যথেষ্ট লভ্য আকর্ষণ করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলে গেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের গোড়ায় রয়েছে আর্ত দুঃখীর প্রতি তাঁর সহানুভূতিপ্রবণ প্রাণ।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করায় সুরেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সেই খুব ক্ষুব্ধ হয়ে-ছিলেন। তাঁর জীবন স্মৃতিতে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমার তরুণ বয়সে আমি আক্ষেপ করে যে কথা বলেছিলাম—আজ জীবনের সায়াহ্নেও সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করে বলছি—কালে তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন সাফল্য অর্জন করবে।" এই উক্তি থেকেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা সুরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে কি গভীর রেখাপাত করেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে তৎকালীন আর একটি আন্দোলনের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাহীতালের খ্যাতি-মান ও শক্তিমান বক্তা সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করবার প্রথম পাঠও বোধহয় সেই আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনটী ছিল মাদকতা নিবারণী। অন্যতম ও বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকার তখন কলুটোলার একটী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যেকোন আন্দোলনে নেতৃত্বদানের প্রত্যেকটী গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। তিনি এগিয়ে এলেন মাদকতা নিবারণী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের জন্য। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তৎকালীন যুবক সমাজের ভিতরে অমিতাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্রতিভাবান অনেক যুবকও ঐ ভ্রান্ত পথে পা বাড়িয়েছিলেন। মদ্যপানকে তাঁরা পাশ্চাত্যশিক্ষা বা ইংরেজী শিক্ষার অঙ্গেরূপ আপাতদৃষ্টিতে মনে করতেন। মাদকতা নিবারণী আন্দোলন এই জাতীয় অনেক বিপথগামী অংশোন্মুখ প্রতিভাবান যুবককে মিশ্রিত সমাজের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সমাজসেবী কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মণিষীবর্গ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ইউনিটারিয়ান সিঙ্গার (Unitarian Church) আমেরিকা প্রবাসী পাদ্রী রেভারেণ্ড সি. এইচ. এ. ডল (Rev. C. H. A Dall) এই আন্দোলনের একজন সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের তাঁর তরুণমন স্বভাবতঃই সমাজহিতৈষণায় এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মাঝে মাঝে তিনি এই আন্দোলনের সমর্থনে জনসভায় বক্তৃতা করতেও সুরু করেন। এমনি করেই সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মীজীবনের প্রথম পাঠ সুরু হয়েছিল এই মাদকতা নিবারণী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

কী মেলে গীতা পাঠে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কঠোপনিষদ বলেন—আত্মাকে জানবে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে জানবে সারথি আর মনকে লাগাম। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব, জাগতিক বিষয়কে বিচরণ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলে জানেন।*

কুরুক্ষেত্রে রথের রথী অবশ্য অর্জুন আত্মা নয়, যদিও তাঁর অন্তরে অধিষ্ঠিত 'আত্মা ব' সবার মাঝে বিরাজিত। কিন্তু যেহ রথে মনের লাগাম ধরে বিরাজিত সকল বুদ্ধির কেন্দ্র জ্যোতির জ্যোতি নারায়ণী নারায়ণ। ইন্দ্রিয় অশ্বেরা বেগেছে অস্ত্রের ঝলক, আত্মীয় স্বজন, শুনেছে শঙ্খধ্বনি, স্পর্শ করেছে ধনুর্ব্বাণ, ঘ্রাণের আভাস পেয়েছে রণস্থলের শোণিতধারার। বুদ্ধি সারথি চান আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে আত্মার মোহ-জাল উদ্ঘাটন করতে। অর্জুনের আত্মাই যে প্রকৃত রথী—তার মেহটাও রথ। টানো টানো মনের লাগাম—বুদ্ধি সারথী শ্রীকৃষ্ণ বলেন লাগাম। বলেন—ইন্দ্রিয় ঘোঁড়াগুলাকে টানো টানো মনরূপ লাগাম টেনে। দৃষ্টি যাও অন্তরে, শোনো জ্ঞানের বাঁশী, ঘ্রাণে কর যুক্ত স্বর্গের মন্দার পারিজাত। তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন—প্রকৃত জ্ঞান। কি যে রূপ দেখালেন সারথি আপনার—বিশ্বরূপ বা সঙ্কীর্ণ বিশ্ব পথ হ'তে কোটি কোটি গুণ বিশাল, অনন্ত বিস্তৃত।

সে জ্ঞান অন্তর প্রবিষ্ট হলে আরতো বাকী থাকে না জানবার বোঝবার ভোগ করবার কোনো বিষয়। কিন্তু সবার পক্ষে কী সে বোঝা সম্ভব? এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে কোথা সে জ্ঞানের স্থান? এ তুচ্ছ নয়নের সাধ্য কী সে জ্যোতির তেজ উপলব্ধি করবার? অর্জুন স্বয়ং ভীত হয়ে চতুর্ভুজরূপ দেখতে চেয়েছিলেন—ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পথে বিচরণ করবার আনন্দ উপভোগ করবার প্রয়াসে।

মানুষের উন্নতির ক্রম আছে। মোহের পরদা ধীরে ধীরে ওঠে—আবার পড়ে আবার ওঠে। প্রদীপের আলো ধীরে ধীরে জ্বলে। কিন্তু প্রদীপকে একেবারে নিভিয়ে রাখলে, মায়ার আবরণ চাপা দিলে, সে তো আত্ম-প্রকাশ করে না। অবতার, মেশায়া, পয়গম্বর, মহাপুরুষ, ঋষি, মুনি সবাই বিচরণ করেন জ্ঞান। নিজ নিজ বুদ্ধির মাত্রা অনুসারে জ্ঞান আহরণ করে সদাচার। একই উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্নরূপে ফোটে তার বোঝবার ক্ষমতা অনুসারে। কিন্তু শোনা চাই। কান বন্ধ ক'রে লাভ তো নাই। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—গাহিতে গাহিতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাণে নামীর ঐশ্বর্য, মাধুর্য্য এবং প্রাচুর্য্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জ্ঞানের প্রদীপ। সে প্রদীপ বাড়িয়ে তোলে হৃদয়ের আঁধার ঘর। প্রকাশ করে তাঁর মূরতি যিনি অণু হতে অণু, মহান হ'তে মহত্তর। প্রাণ পূর্ণ হয় উদ্ভাসিত প্রেমে। তখন প্রেমানন্দময়ী ভক্তি দর্শন দান সচ্চিদানন্দের। কিন্তু সে প্রদীপ জ্বলে নেবে, আবার জ্বলে—ধীরে ধীরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে দীপশিখাকে উজ্জ্বল রাখবার জন্য ঢালতে হয় ভক্তি তৈল জ্ঞানের প্রদীপে। একদিনে—হয়তো এক জন্মে সম্ভব নয় গীতার তত্ত্ব-কানন হতে পারিজাত সংগ্রহ ক'রে ডালি পূর্ণ করা। তাই অভ্যাস চাই। বারম্বার পাঠ চাই। শোনা চাই সে গুরু শিষ্যের অপূর্ব্ব মনোহর আলোচনা দিনের পর দিন।

তাতে মেলে কী? ঋষি কি বলেছেন সে কথা গীতা আছাড়ো বুঝি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কী বলেছেন—গীতার সপ্তশতের মন-মাতানো ছন্দের বিষয়? কী মেলে কুরুক্ষেত্রে সংবাদ শুনলে?

তিনি প্রথমেই সাবধান করেছেন অর্জ্জুনকে গীতার কথা বলতে অনধিকারীকে। কারণ মানব-মনের অভিব্যক্তির ক্রম আছে। সত্য অনন্ত। কিন্তু মায়ার খেলা সৃষ্টি করেছে স্তর—বিভিন্নতা বুদ্ধির, রস-গ্রহণের। বুদ্ধি সারথি সকল রথের লাগাম টানতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয় ঘোঁড়ারা সংকীর্ণ স্থল, যান, রূপ ও রসের অভিমুখে ধাবিতে ছোটে। তাদের জগতটা ছোট। অভিজ্ঞতা এবং নৈরাত্ম ধীরে ফোটায় জ্ঞানের চক্ষু। সারথির চোখ ফোটে। কিন্তু সে সারথি আজ্ঞেতোলা মায়ার খেলায় তার পক্ষে তো সার সত্যের পথ বোধ হবে ভুলপথ।

তাই ভগবান বলেন—তপস্যাহীন ব্যক্তির নিকট বলা উচিত নয় গীতার বর্ণিত পরম কথা। যে ভক্তিহীন তার তো প্রাণ রুদ্ধ—সে অধিকারী নয় গীতার তত্ত্ব কথা শোনবার। যার শোনবার ইচ্ছা নাই কী ফল তার কাছে গীতা পাঠের? আবার এমন মানুষ আছে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগশূন্য। কী উদ্দেশ্য সাধিত হবে তেমন লোকের নিকট পরিবেশন করলে গীতার সত্য—যা জীবনের সার সত্য—অবিনশ্বর সনাতন পরম তত্ত্ব।*

কিন্তু যার সাধনা আছে, যে ভক্ত, যার নিজের আত্মার আছে শ্রীহরির মুখনিসৃত অমৃত পানের সে তো সুধা-পানের সুখ একলা ভোগ করতে পারে না। কারণ জীবনের শ্রেষ্ঠ আচরণ সাম্য; পরকে আপন জ্ঞান বিদ্বেষ-বিহীন প্রাণে। যখন সুধারস উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে কার সাধ্য

---

* আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।

* ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।১৮।৬৭

রোধে তার বেশ? তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন—এই পরম গুহ্যতত্ত্ব আমার ভক্তদের মধ্যে যে ব্যাখ্যা করে, সে তার পরম ভক্তির ফলে নিঃসন্দেহে আমাকেই পায়।*

ভক্ত ভেবে ভক্তকে। পবিত্রচিত্ত, কায়মনোবাক্যে, পরম কণ্ঠে জ্ঞানের কথা কওয়া—ভক্তির এক পথ। আমি জানি তাই জ্ঞানী, বাকী মূর্খ, এ হলো মূর্খতার পরম রূপ। সক্রেটিস যে শুনেছিলেন সেও তো দৈবীর এক রূপ। যেখানে শুনে বিভ্রম করেছিলেন সে জ্ঞান—তাই মানব সমাজ সমৃদ্ধ আজ সে জ্ঞানে। তবে একেবারে বোবা মনে মুক্ত ছড়ানো বৃথা। তাই ভগবান নির্দেশ দিলেন—ভক্তের সাথে আলোচনায় তার কাছে প্রকাশের। ব্যাখ্যা করতে হবে ভক্তের নিকট—অসূয়ার যে ত্রাস তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে। গীতা ব্যাখ্যা করতে হবে তাঁকে যিনি ভগবানকে করেছেন গুরু। তাই মনগড়া আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন গীতা—নাক ডাকাতে, নাক ডাকে।

শ্রীকৃষ্ণ পরম গুরুর ইচ্ছা যে গীতা প্রতিপাদিত সত্য মানব সমাজের হিতের জন্য ঠাঁই প্রচারিত হয়তে। প্রচারকে তিনি পুরস্কৃত করবার বিধান করেছেন। প্রচারে যা পাবে কী নেবে সে কথা তিনি বলেছেন সুস্পষ্টভাবে। বোঝা যায় তাঁর অভিপ্রায়—জগতের হিতের জন্য আবশ্যক গীতার বাণী প্রচার। তিনি বলেন—মানুষের মধ্যে, গীতা প্রচারকারীর মতো আমার এতখানি প্রিয় কর্মকারী লোক পৃথিবীতে কেহ নাই। আর তেমন ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমার অধিক প্রিয়ও কেহ থাকবে না।†

তার পর তিনি বলেন—যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্ম সম্বাদে আলোচনা সংবাদ অধ্যয়ন করবে—তার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হব—এই আমার মত।‡

অধ্যয়ন অর্থ মাত্র পাঠ নয়—মর্ম সংগ্রহ করা নিজের বুদ্ধির সামর্থ্য অনুসারে। মনে রাখলে জ্ঞানযজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জ্বালিয়ে না রাখলে অধ্যয়ন সফল হয় না। গীতা-প্রতিপাদিত পরম সত্য বোঝবার এবং ধারণা করবার সাধ্যমত প্রয়াসই যজ্ঞ। সে প্রয়াস ঐকান্তিক হলে জেগে ওঠে প্রাণ ভুটে ওঠে ভগবানের বিভূতি। সে অধ্যয়ন হতে হবে—মননা—এ নির্দেশ তাঁর নিজের। সেই নির্দেশের পটভূমিতে কলকাতি বুকনে মর্মের রাস্তা-পথে বিচরণ করবার আশঙ্কা থাকবে না। বলা বাহুল্য মাত্র জ্ঞান আহরণের জন্য গীতা অধ্যয়ন করলে শুভফল-লাভ হয় না। যে কেহ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, অসূয়ামুক্ত হয়ে, গীতাপাঠ মাত্র শ্রবণ করে, সে হয় পাপমুক্ত। পুণ্যাত্মা শুভলোক প্রাপ্ত হয়।¤

শ্রদ্ধাবান কে? শ্রদ্ধাবান হয়ে শুনলে শুভলোক প্রাপ্তি। শ্রদ্ধা—ভগবানে একনিষ্ঠ ভক্তি। সেই অবস্থায় মানুষকে তোলবার আয়োজনই গীতার উপদেশ। শ্রদ্ধা থাকলে গীতা পথ বেঁধিয়ে দেবে জ্ঞানের এবং কর্মের। ভক্তি ছড়িয়ে পড়বে সারা জীবনের সকল কর্মে। আর তো কিছু বাকী থাকবেনা! একনিষ্ঠ ভক্তিই তো যোগ। কিছু না ভেবে সকল ভাবনা একক্ষেত্র করলে নিবাত স্থলের দীপ শিখার মত আলোর আলো, জগতের আলো সমৃদ্ধ করবে ভরকে। অসূয়া থাকলে তো শ্রদ্ধা স্থান পায় না মনে। বিষাদে বিলীয় কৃষ্ণ তাকে বহু দূরে।

কৃষ্ণ বলেছেন অর্জুন শুনেছেন। যিনি বলেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি শুনেছেন প্রথম তিনি অর্জুন। কবে জন্মেছিলেন কৃষ্ণ, ছিলেন কিনা, কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, কোন বাদী বাদ করা—এ সব তর্কে কৃষ্ণ ছিলে না। আর এমন ছিন্ন মন নিয়ে সদ্‌গ্রন্থের, গীতা পাঠ করলে কোনো জ্ঞান লাভ হয় না। গীতা বা কোনো মহাজন-বাক্য শুনতে গেলে প্রথম চাই শ্রদ্ধা? তাই ভগবান সখাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন প্রথমেই। যার তপস্যা নাই, ভক্তি নাই, শোনবার ইচ্ছা নাই, তার কাছে গীতা পাঠের প্রয়োজন নাই।

গীতা পাঠের ফল স্বয়ং বিবৃত করেছেন ভগবান। তাঁর আলোচনার শেষে। শ্রদ্ধাবান হয়ে শুনেছিলেন অর্জুন, অসূয়া ছিল না তাঁর মনে। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।

হে অচ্যুত তোমার প্রসাদে অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে। আমি স্মৃতিলাভ করে নিঃসংশয় এবং স্থির হয়েছি। তোমার কথামত কাজ করব।

কী বলে গীতার বচন শুনলে স্পষ্ট বলেন অর্জুন। নষ্ট হয় মোহ, ফুটে ওঠে জ্ঞান। সংশয় লোপ পায়, শ্রোতা হয় স্থির।

আর বলেন তোমার বচনের নির্দেশে কাজ করব।

গীতার শিক্ষা প্রথমতঃ কাজের শিক্ষা—কর্ম পথের নির্দেশ। তাই গৃহস্থের কল্যাণকর শ্রীমুখের শুভবাণী।

গীতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করলে বোঝা যায় গীতার মর্ম।

---

* য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ। ১৮।৬৮

† ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি। ৬৯

‡ অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।

¤ শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্।

পারমাণবিক শক্তি ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ

COMMON-ROOM

সমর দত্ত

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারাপথে পেরিয়ে আজ আমরা এসে পৌঁছেছি বিজ্ঞানের যুগে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পরম বিস্ময়কর। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে মানুষ আজ বিস্মিত। কিন্তু পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের বীভৎস পরিণতি দেখে বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছে—বিজ্ঞানী কি তাঁর নব নব আবিষ্কারগুলি ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করবে—না সৃষ্টি ও মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে অতিমানব সভ্যতার এক নূতন অধ্যায় রচনা করবে! আজ পারমাণবিক শক্তি এরূপ সক্রিয় হয়ে উঠেছে যে এর আনুকূল্যে পৃথিবী এক নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড থেকে অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। মাত্র দুইটি পরমাণুবোমার আঘাতে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি অঞ্চল সম্পূর্ণ-ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। আজও আমরা প্রত্যক্ষ করছি—বিজ্ঞানের মারিণ্যে ক্ষমতাশিপ্সু বিভিন্ন শক্তির ধ্বংসলীলার আচরণ। হিংসোন্মত্ত পৃথিবী অদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রলয়ের পরিকীর্ণ ভস্মস্তূপে পরিণত হবে, না মানুষের লক্ষ্মী-মনঃপ্রকৃতির অন্তর্হীন রহস্যের অতল সাগর মন্থন করে নব নব তথ্য ও সত্যের মণিমুক্তা তুলে এনে মানব-মঙ্গলের পরমসম্পদ সৌধ রচনা করবে—এই কথাটাই আজ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

১৯৪৫ সালের আগষ্টমাসে উপরোক্ত দুইটি অঞ্চলের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করে পারস্পরিক হুমকী দিতে আরম্ভ করে। তৃতীয় রাষ্ট্র বৃটেন ও পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারক ব'লে নিজেকে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচয় দিয়েছে। ফ্রান্স ও কয়েকটি পশ্চিমী রাষ্ট্র এই মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত এবং এ সম্বন্ধে তারা অদূর ভবিষ্যতে সাফল্য লাভে আশান্বিত। উন্নততর অস্ত্র নির্মাণের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়াতে এবং বৃটেনে নানারূপ গবেষণামূলক কাজ চলেছে। আমেরিকা তার আপন রাজ্যের অন্তর্গত নানাধিক মরু অঞ্চলে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালাচ্ছে এবং কয়েকবার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে খ্রীষ্টমাস ও বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে ও পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সংক্রান্ত কাজ ও হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশন ঘোষণা করেছে যে গত ২৮শে জুন ১৯৫৮ রাত্রি ১টায় (ভারতীয় সময়) প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তা বর্তমান পর্যায়ের সপ্তম বিস্ফোরণ। বৃটেনও খ্রষ্টমাস দ্বীপপুঞ্জে এই মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সোভিয়েট ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে এই ভয়াল অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

মহাশূন্যে বিমান অথবা বেলুন থেকে নিক্ষেপ ক'রে এই বোমা পরীক্ষা করা হয়। কোন একটি বোমার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ ও চোখ ঝলসানো আলোর সৃষ্টি হয়। বহুদূরের মানুষেরও কানের পর্দা এই শব্দ তরঙ্গের আঘাতে ছিঁড়ে যায় এবং এই আলোর রশ্মি প্রায় ১০০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী বিকীরিত হয়। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণস্থলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তার তাপমাত্রা (Temperature) প্রায় ৮ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ সূর্যের অভ্যন্তরের সমান। যে স্থানে বিস্ফোরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেই স্থানের চতুর্দিকের মাটি কাঁপতে থাকে। তাহার পর আকৃতিবিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের ঘূর্ণায়িত মেঘ সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে।

এই মারণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। বিস্ফোরণের ফলে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ মুহূর্তের মধ্যে উপর দিকে ওঠে এবং বাতাসের সঙ্গে বহুদূরবর্তী অঞ্চলেও ছেয়ে যায়। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থগুলি পৃথিবীর বুকে নেমে এসে মিশ্রাক্ষর সর্বনাশের সৃষ্টি করে। বিস্ফোরণের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিদের মর্মন্তুদ অবস্থা কল্পনাতীত। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফল করেকজন মৎস্যজীবীর মর্মান্তিক জীবনাশের কথা জানা যায়। বিস্ফোরণ অঞ্চল থেকে বহুদূরে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত বীকর-গণ তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরক পদার্থের (Radio active Chemicals) সর্বগ্রাসী শক্তির কবল থেকে রেহাই পায় নি, বিস্ফোরণের অনতি-বিলম্বে তাদের সর্বশরীর শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে, মুহুর্মুহু বমি হতে থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাদের মাথার সব চুল উঠে যায়। ২৩ জনের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়। ১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে ফ্লু (' Flu) নামে পরিচিত যে এক অদ্ভুত ইনফ্লুয়েঞ্জার আবির্ভাব হয় তার কারণ এই পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। ভারত মহাসাগর ও কাশ্মীরের উলার ও ডাল হ্রদে যে লক্ষ লক্ষ টন মাছ নষ্ট হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই অপচয়ের জন্য দায়ী পারমাণবিক শক্তির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। মানবদেহে বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া নিম্নোক্ত ব্যাধির আকারে প্রতিফলিত হয় বলে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন :—

(১) Lukemia (দেহ মধ্যস্থিত রক্তকণিকাবিনাশক ব্যাধি)
(২) Epilation (মাথার চুল চিরতরে নষ্ট হওয়া)
(৩) Mutation (জড়শক্তি জীবতা)
(৪) Sterility (বন্ধ্যাত্ব)
(৫) Cancer (কর্কট রোগ)
(৬) Bone necrotis (দেহের অস্থির বিনাশ)
(৭) Cataracts (চক্ষুর ছানি)

ফরাসী পদার্থবিদ Frederick Juli Curie পরমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছেন :—

Radioactive elements in the atmosphere would cause outbreak of Cancer unless H-Bomb tests are halted.

হার্ভার্ডস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr James F Crow বলেছেন :—

People now exposed to fall out may be expected to produce two thousand million children and 80,000 of them, by crude estimate, will be born with some gross mental or physical defect of genetic origin.

মেডিসন ষ্টেট প্রাণ্ড আমেরিকার প্রখ্যাত রসায়নবেত্তা Dr. Linus Poling এর মত :—

The average age of one million people will be reduced to 5 to 10 years, two lacs of children of 20 generations will suffer from mental and health deformation, one ray of radiation in the human body will shorten their life about two weeks. Dr. Poling আরও বলেছেন—The British H-Bomb tests will cause the break of Lukemia and one thousand people will die and by comparatively small radiation. Cancer and Lukemia cases will notably increase.

যে তেজস্ক্রিয় শক্তি মারণাস্ত্ররূপে বিশ্বব্যাপী মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে, পরমাণুর বুকের মধ্যে লুকানো সেই অপরিমিত শক্তিকে গঠনমূলক কাজে অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্রে, কৃষিকার্যে এবং উচ্চতর মৌলিক গবেষণার প্রয়োগ ক'রে বিস্ময়কর কল্যাণে সাধন করা সম্ভব। যে বিভিন্ন উপায়ে এই অমিত পরমাণু শক্তিকে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা যেতে পারে এখন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

(১) মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ কয়লা থেকে মানুষ এই শক্তি সংগ্রহ ক'রে থাকে। যদি পারমাণবিক শক্তি থেকে এই চাহিদা মেটানো যায় তাহলে কয়লার খরচ অনেক বেঁচে যাবে। অবশ্য এখন সত্য যে আজ কয়লা ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহারে যা খরচ পড়ে, পরমাণু শক্তি ব্যবহারে খরচ তার চেয়ে অনেক বেশী পড়বে। কিন্তু এরকম চিরকাল থাকবে না। ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের খরচ যখন অনেক কমে যাবে তখন কয়লার খরচ বেড়ে যাবে অনেক। কয়লার সঞ্চয় নিঃশেষিত হবার আগেই পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার পুরু হয়েছে আশা করা যায়।

(২) পারমাণবিক চুল্লী (Atomic Reactor) থেকে প্রচুর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (Radioactive Isotopes) পাওয়া যায় এবং শিল্পক্ষেত্রে এগুলিকে প্রয়োগ করার প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দেছে। রেডিও ফসফরাস (ফসফরাসের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক) ও জিঙ্ক সালফাইড মিশ্রণের ফলে একটি ইন্ডিকেটর তৈরী হয় এবং এটা ঘড়ির কাঁটায় লাগলে খাকাকালীন অন্ধকারে আলোকিত অবস্থায় দেখা যায়। এই পদার্থগুলি হ'তে বিকীরিত রশ্মিকে বিভিন্ন ধাতব বস্তুর পুঁতে ফেলার জন্য অথবা ধাতবপাত্রে কতটা পুরু হ'লে তা স্থির করবার জন্য, কিংবা ধাতব পদার্থের ঘনত্ব শক্তির পরিমাপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। নানাপ্রকারের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যথা—কাগজ, প্লাস্টিক, রবার, টায়ার ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ অপচয় তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বাঁচাতে পারছে। খাদ্যদ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক অতিশয় কার্যকরী। সমস্থানিক থেকে নির্গত রশ্মি ঘাস, শাক-সব্জী ও অন্যান্য খাদ্যে নিহিত নানা প্রকার জীবাণু নাশে সমর্থ। নানাপ্রকার ঔষধ ও জৈবিক পদার্থ রক্ষণাবেক্ষণেও এই রশ্মি বিশেষ উপকারক।

(৩) পারমাণবিক চুল্লী হ'তে সংগৃহীত তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক বিভিন্নপ্রকারের চিকিৎসা জগতে এক অভিনব ইতিহাস রচনা করেছে। চিকিৎসকগণ তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং লাভ, ঔষধ ও পথ্যের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন। মানব দেহের অন্তর্গত থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ নির্ণয়ে এবং ওই রোগের চিকিৎসায় এই বস্তু বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। বস্তিগেস্ত অন্ত্রাঞ্চলে টিউমার-অস্ত্রোপচারে এর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চর্মরোগ, ক্যান্সার, সিফিলিস ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে এই মানুষকে চিন্তিত করেছে।

(৪) উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে এই পদার্থ বৈজ্ঞানিকগণকে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করেছে। গাছপালা সূর্যরশ্মি থেকে নিজ দেহে শক্তি সংগ্রহ করে, কার্বোহাইড্রেটস্, প্রোটিন ও চর্বি সংগ্রহ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে। রেডিওকার্বন ব্যবহার সহায়তায় বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদ জগতের এই বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

(৫) কৃষিক্ষেত্রেও রেডিও ফসফরাস প্রয়োগ করে সারের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা এবং কৃষিকর্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু শক্তির সাহায্যে ফল-মাকড়, পঙ্গপাল প্রভৃতির উপদ্রব থেকে শস্যক্ষেত্রকে নিরাপদ করাও সম্ভব।

সংখ্যাতীত যুগের মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি আধুনিক পারমাণবিক যুগে উত্থান-পতনের সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। পরমাণুর অভ্যন্তরে লুপ্ত অপরিমিত শক্তিকে যারা রাষ্ট্রিক কল্যাণে প্রয়োগ করে আমেরিকা, ইংলণ্ড, কানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। ভারতবর্ষও এ বিষয়ে একেবারে পিছিয়ে নেই। কিন্তু ভারত ব্যতীত অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই শক্তির সহায়তায় মারণাস্ত্র তৈরী করে সমগ্র বিশ্বমানব জীবনে এক অশুভ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। একটি সুন্দর সভ্যতা ও উন্নততর মানব সংস্কৃতির ভিত্তি রচনার প্রয়াস যুগপৎ মারণাস্ত্রের সর্বাত্মক ধ্বংসের বিরাট আয়োজন—এই দুইটি বিপরীত প্রবাহ দিনে দিনে দ্রুততর হচ্ছে। সাম্রাজ্যগঠন, উপনিবেশ স্থাপন, শিল্পে অনগ্রসর দেশে লাভজনক অর্থ বিনিয়োগের সঙ্কীর্ণ পথ পরিহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ আন্তর্জাতিক মানব কল্যাণে পরমাণু শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ব্যবস্থা করে বিশ্বব্যাপী প্রজন্মাধারণের ভবিষ্যৎ জীবন সুখী ও শান্তিময় করে তুলুক—জগতের যে কোন দেশের শান্তিকামী মানব-শ্রেণিকের এই অন্তরতম কামনা।

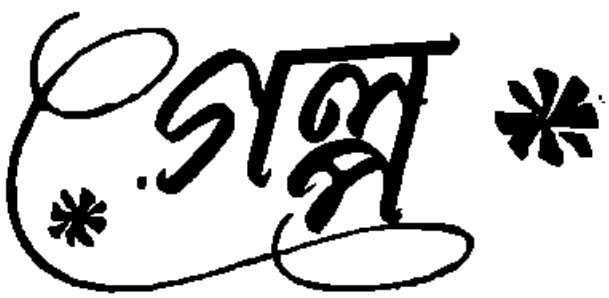

সান্ত্বনা

হরেন ঘোষ

দেয়ালঘড়িতে ঢং করে আওয়াজ হল একটা। সাড়ে পাঁচটা বাজলো। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন সদানন্দবাবু। সোজা তাকালেন ঘড়ির দিকে। তারপর পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে। এখনো হালকা একটা আবরণ, রোদের রাঙা আলো পড়েনি আকাশে-মাটিতে। বিছানা ছেড়ে নামতে যাবেন, সদ্য-ঘুম-ভাঙা সুজাতা দেবী কাপড়ে টান দিলেন।

—উঠছো যে! এত সকালে উঠে কি করবে? আর একটু শুয়ে থাকো।

—ও হ্যাঁ, একচিলিক বিষণ্ণ হাসি হাসলেন সদানন্দবাবু। তাইতো, এত সকালে উঠে কি করবো? আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু নতুন করে ঘুম এলোনা। এতদিনের অভ্যেস। ভারী বিশ্রী লাগে চুপচাপ করে শুয়ে থাকতে। তবু চোখ বুজে, একবার খুলে, এপাশ ওপাশ করে ঘড়িতে ছটা বাজতেই উঠে পড়লেন। সুজাতা দেবীও উঠলেন। দুজনে দুজনার দিকে তাকালেন। কেউ কোন কথা বললেন না। সদানন্দবাবু কলঘরে চলে গেলেন। সুজাতা দেবী গেলেন বাইরের দিকে। কি আসবে। দরজা খুলে দিতে হবে। আজ থেকে ওকে একটু দেরীতে আসতেই বলে দিয়েছেন। কি করবে সাতসকালে এসে?

কল খুলে অনেকক্ষণ ধরে মুখ হাত ধুলেন সদানন্দবাবু। ইচ্ছে করে এত দেরী করছেন, তবু কেন যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ততার ভাব কাটিয়ে উঠতে চাইছেন আপ্রাণ। তবু পারছেন না। ব্যস্ততা যেন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। ইচ্ছে করলেই তাড়ানো যায় না। তবু যথাসম্ভব দেরী করে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালেন, তারপর অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রতিবিম্বের দিকে। সত্যি এমনভাবে কতদিন দেখেননি নিজেকে। চুল সব সাদা হয়ে গেছে, ভাঁজ পড়েছে মুখে। শিথিল হয়ে এসেছে চামড়া।

বাইরে এলেন সদানন্দবাবু। খবরের কাগজ রেখে গেছে হকার। তুলে নিলেন তিনি। আজ পড়তে হবে। সবটা পড়ে ফেলবেন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিজ্ঞাপন, কর্মখালি, নিরুদ্দেশ, সিনেমার পাতা, খেলাধুলো, যা আছে সব পড়বেন তিনি। কাগজ তুলে নিলেন। চশমা বার করে চোখে দিলেন। অক্ষরে অক্ষরে পড়তে হবে আজ। অন্যদিন তো তাড়াহুড়োর মধ্যে হেডিং দেখারই সময় পান না। আজ কতদিন পর ছুটি পেলেন।

প্রচণ্ড অবকাশ, প্রচুর অবসর, সীমাহীন ছুটি। কোন কাজ নেই। সমস্ত দিন আর রাত, সব কটি মুহূর্ত হাতের মুঠোয়—তিনি যেমনভাবে ইচ্ছে খরচ করবেন। কোন বিধিনিষেধ, নিয়ম, শাসন বন্ধন নেই। তিনি আজ মুক্ত স্বাধীন, কারো অধীন নন। খবরের কাগজ সামনে খুলে রেখেই তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবনার সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলেন। অকস্মাৎ বুক তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো একটি। অপ্রতিভ হলেন সদানন্দবাবু। এদিক ওদিক চাইলেন। এবার কাগজটা মেলে ধরলেন চোখের ওপর।

একি, এত খবর থাকে কাগজে। কৈ তিনি তো খোঁজ রাখেন নি কিছু। সোনার দর কি রকম ওঠানামা করছে, সরকারী পরিকল্পনা কতদূর কাজে এগিয়েছে, কোথায় যুদ্ধ চলছে, কেমন ভাবে মন্ত্রীদের মধ্যে বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছে—সব খবর পড়লেন। তিনি এ যুগেরই মানুষ, অথচ তাঁর অজ্ঞাতে এতকাণ্ড হচ্ছে, আর তিনি খবরই রাখেন না কোন কিছুর। মনে মনে লজ্জিত হলেন সদানন্দবাবু। বহুদিনের অন্ধকার

অবনিকার অন্তরাল থেকে একটি স্মৃতি-রশ্মি ভেসে এলো মনশ্চক্ষে। এককালে খবরের কাগজের খবর নিয়ে সেকি উত্তেজনা আর মাতামাতি। কাগজ না পড়লে ঘুম আসতো না চোখে। তারপর যেন সত্যি সত্যি পরিণত হয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। মনে মনে ধিক্কার দিলেন নিজেকে। জগৎ ভুলে ছিলেন। নিজের একটা সীমাবদ্ধ জগৎ গড়ে তুলে নিজেকে তার মধ্যে আটকে রেখেছিলেন এতদিন। আজ আবার সীমা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে সবার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে মানিয়ে নিতে পারবেন কি?

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁর অজ্ঞাতে বেরিয়ে এলো।

চা খাবার নিয়ে সুজাতা দেবী এলেন। মুখখানা প্রসন্ন করতে চাইলেও, এক ঝলক দেখেই সদানন্দবাবু বুঝে নিলেন যে তারই মত না-নিদ রাত কেটেছে সুজাতা দেবীর। অথচ কেউ কোন কথা বলেন নি। চুপচাপ শুয়ে ছিলেন, কখনো সন্তর্পণে পাশ ফিরছিলেন, দীর্ঘশ্বাস চাপছিলেন। অবশেষে ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অথচ ঘুম ভেঙেছে ঠিক সেই সাড়ে পাঁচটায়। এতদিনকার অভ্যেস।

আবার চোখাচোখি হ'ল, কথা হ'ল না। খাবার, চা নামিয়ে রেখে মুখ ঘুরিয়ে ভেতরে চলে গেলেন সুজাতা দেবী। আজ তাঁরও যেন ছুটি। ব্যস্ততা নেই অন্য দিনের মত। কি মসলা বেটে দিত, তিনি দু'এক ভাগে রোজ, তরকারী রেঁধে একবাটি দুধের সঙ্গে সোনে নটার সময় ভাত বেড়ে দিতেন। তারপর পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসতেন।

আজ তিনি একের পর এক, চার পাঁচ ভাগে তরকারি কুটলেন ধীরে সুস্থে। তাড়াতাড়ি খাবার ব্যস্ততা নেই, এগারোটার পর একসঙ্গে খেলেই চলবে। মনে পড়লো তাঁর, প্রথম জীবনে একসঙ্গে খাবার জন্যে যেমন আকুল হয়ে উঠতেন সদানন্দবাবু। মাঝে মাঝে দেরী করে অফিস যেতেন, কখনো বা জোর করে সুজাতা দেবীর মুখে ভাত গুঁজে দিতেন।

আবার উদাস হয়ে পড়লেন সদানন্দবাবু। কাগজের একটা বর্ণও মাথায় ঢুকছে না। মনে হচ্ছে একদল পোকা কিলবিল করছে যেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো তাঁর, শিথিল হাতে পড়ে রইল ভাঁজ করা কাগজ। উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন। কি ভাবে দিন কাটাবেন, কি নিয়ে থাকবেন আজ থেকে? ঘাড় নীচু করে কাজ করতে করতে কুঁজো হয়ে গেছেন, শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, লেজার বুকের হিসেব ঠিক রাখতে চশমা নিতে হয়েছে। তিলতিল করে দেহকে খরচ করেছেন তিনি, মনকে পরিণত করেছেন যন্ত্রে। সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছরের অভ্যেস তাঁর ছাড়তে হবে একদিনে। এমনি সময় তাঁকে তাড়াহুড়ো করে নাকেমুখে গুঁজে ছুটতে হ'ত অফিসে। রবিবারেও ছুটি ছিল না তাঁর। অফিসের তাড়াতাড়া ফাইল বাড়ী নিয়ে আসতো চাপরাসী। সারাদিন কেটে যেত সেই কাজ শেষ করতে। ছুটি নিতে ইচ্ছে হয়নি কোনদিন। মনে হত সময় কাটবে না তাহলে। আজ কি হবে ছুটি নিয়ে, প্রয়োজন নেই যখন। খুব বেশী দিন কখনো ছুটি নিয়েছেন বলে মনে হ'ল না তাঁর। আর অদ্ভুত ঘটনা, জীবনে অসুখবিসুখও হয়নি তেমন বড় রকমের। একেবারে নিয়মবাঁধা ছকে ফেলা জীবন কেটে গেছে।

সেই সতের বছর বয়সে চাকরীতে ঢুকেছিলেন সদানন্দবাবু। কলেজে ঢুকেই কলেজ ছাড়তে হ'ল। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সংসারের ভার পড়লো তাঁর ওপর। মা, তিনটি অবিবাহিত বোন, দুই ভাই স্কুলে পড়ে। দেশ ছেড়ে চলে এলেন শহরে, চাকরী করতে। তারপর গেছে সেই কষ্টের দিনগুলো। আধপেটা খাওয়া, তাও জোটেনা ভালো করে। থাকতেন এক জায়গায়—খেতে যেতে হ'ত মাইলখানেক দূরের মেসে। কেমন করে নিজের খরচ কমিয়ে বাড়ীতে মাসে মাসে দু'টো টাকা বেশী দেওয়া যায়, এই চিন্তায় ভালো করে ঘুমুতে পারেননি কতোরাত্রি। টিউশনি নিলেন। তবু প্রতি চিঠিতে মার চাওয়ার শেষ নেই। ঘর সারাতে হবে, বর্ষায় জল পড়ে, বোনের শাড়ী নেই, ভাইদের স্কুলের মাইনে বাকি, বই কিনতে হবে। তবু মুষড়ে পড়েননি তিনি। পেছু হটেননি। দুঃখকষ্ট সয়ে ওদের সকলের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করেছেন। ভীরু তিনি কোনকালে নন, ভেঙে পড়েন না দুঃখকষ্টে। সামর্থ্য না থাক, মনোবলের অভাব নেই কোনকালে।

ভাই দুটো ম্যাট্রিক পাশ করলো। হাঁফ ছাড়লেন

সদানন্দবাবু। তবু এতদূর করতে পেরেছেন। এখনো কাঁধের বোঝা নামেনি। তিনটি বোন। ঘুম হ'ত না কতোরাত্রে। ভেবে ভেবে আকুল হলেন। তবু দাঁড়াতেই হবে। আত্মীয়-স্বজনরা সবাই দূরে গেছেন বাবার মৃত্যুর পর, জ্ঞাতি সরিকরা মামলা সুরু করেছেন সম্পত্তি ভাগা-ভাগি নিয়ে। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ী গেলেন। পরম ভাগ্য বলতে হবে। যোগাযোগ ঘটে গেল। এক বোনের বিয়ে দিলেন ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে। একটা বোঝা কমলো।

ইতিমধ্যে উঠতে বসতে মা ঘ্যানর ঘ্যানর সুরু করেছেন, এবার ঘরে বৌ আনতে হয়। কত করে বোঝালেন তিনি, এখন উপায় নেই কোন, যা আয়, এতেই চলে না, আবার পরের মেয়ে এনে কষ্ট দেব কেন? সময় তো আছেই। আগেই শ্যামানন্দ, প্রাণানন্দ মানুষ হোক। চোখের জল ফেলে মা বাধ্য হয়ে রাজী হলেন কিছুদিন অপেক্ষা করতে।

ভাইদের পড়াবার ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠলেন না সদানন্দবাবু। সামর্থ্যে কুলোলো না। ধরে করে দুজনেরই কাজ জুটিয়ে দিলেন। অল্পবয়সে তাদের কাঁধেও সংসারের জোয়াল পড়লো।

এবার কাঁধের বোঝা হালকা হ'ল কিছুটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন তিনজনের উপার্জ্জন। সংসারের শ্রী ফিরলো ক্রমশঃ, স্বচ্ছলতা এলো। অল্পদিনের মধ্যেই তিন ভাই ও বড় ভগ্নিপতি মিলে দু'বোনের বিয়ে দিলেন। হাসি ফুটলো মায়ের মুখে। ভগবান আবার মুখ তুলে চেয়েছেন!

মা এবার নাড়োড়বান্দা। আর কোন ওজর আপত্তি টিকলো না সদানন্দবাবুর। সেবারই পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে ছুটি বাড়াতে হ'ল। মা দেখেশুনে প্রায় ঠিক করে রেখেছিলেন, শুধু ওঁর মতের অপেক্ষা করছিলেন। সুজাতা দেবী বধূ রূপে এলেন তাদের সংসারে। সে আজ কতদিনের কথা!

দুফোঁটা চোখের জল এসে কখন তার গালের ওপর স্থির হয়েছিল বুঝতে পারেননি সদানন্দবাবু। ছায়াছবির মত অতীতের ছবি আসছে, যাচ্ছে। একের পর এক।

সুজাতা দেবীর পায়ের শব্দ পেয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন দ্রুত হাতে। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন—কি গো রান্না হ'ল? চিরদিনকার অভ্যেস, নটার আগেই পেটে টান ধ'রে। এত তাড়াতাড়ি খিদে পাবার কথা নয়।

—সর্বনাশ সেকি কথা। অবাক হলেন সুজাতা দেবী।—কখন হয়ে গেছে রান্না। আমি বসে আছি তোমার চান করবার অপেক্ষায়। কাগজ পড়া আর শেষই হয়না। সব মুখস্থ করে ফেলবে নাকি? ওঠো, এগারোটা বেজে গেছে যে।

রীতিমত চমকে উঠলেন সদানন্দবাবু। সে কি গো! এগারোটা এরি মধ্যে বেজে গেল? এত বেলা হয়েছে তা তুমি যে বড় ডাকোনি। দেখো দেখি, তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়ে গেছে। অভ্যেস তো! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সদানন্দবাবু।

—যাও, আমার খিদে পাবে কেন? চান করে নাও তাড়াতাড়ি। বেশী বেলায় খেলে পিত্তি পড়বে। সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে ভেতরে চলে গেলেন তিনি।

আবার আনমনা হয়ে পড়লেন সদানন্দবাবু। অন্যদিন এই সময় ঘাড় গুঁজে থাকেন কাগজের স্তূপে। মনে থাকে না ঘর বাড়ী, কোন কিছুর কথা, এমনকি সুজাতা দেবীর কথাও ভুলে যান। আজকের দিনটির সঙ্গে কত তফাৎ। নতুন, একেবারে অনভ্যস্ত জীবন। তবু আজ থেকে এই নতুন জীবনকে মেনে নিতে হবে, খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে নতুন করে নতুন অভ্যেস সুরু করতে হবে। চুপচাপ, কর্মহীন বসে থাকতে হবে। বাত ধরে না যায়! এভাবে কেমন করে দিন কাটাবেন? এভাবে থাকলে তো তিনি আরো বেশী বুড়ো হয়ে যাবেন অল্পদিনেই। এবার জোর করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। ভেতরে গেলেন।

—দাও তেলদাও—চান করে নিই। বড় দেরী হয়ে গেল।

—যাও, সব গুছিয়ে রেখেছি। দেরী কোরো না যেন।

দেখলেন সদানন্দবাবু, ইতিমধ্যেই স্নান করে নিয়েছেন সুজাতা দেবী। লালপেড়ে শাড়ী পরেছেন, চওড়া করে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছেন।

—আর শোনো, দুজনেরই ভাত বেড়ো। একসঙ্গে খেয়ে নিই।

একেই দেরী করে ফেলেছি। ব্যস্তভাবে কলঘরে চলে গেলেন তিনি।

দুপুর আর কাটতে চায় না। এত লম্বা দুপুর। এটা কাটানোই সবচেয়ে কষ্টকর। আর এই মস্ত দুপুরটা বহু করে কেটে যেত। দ্রুত হাত চলতো তার। পাঁচটা বেজে গেলেও তাস শেষ হ'তে চাইত না। দেরী হয়ে যেত বাড়ী ফিরতে। আগে শুধু তাস খেলার সখ ছিল, তাড়াতাড়ি ফেরবার তাড়া ছিল। বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন তাস খেলা। বাড়ী ফিরতে দেরী হ'ত, একা একা না খেয়ে বসে থাকতেন সুজাতা দেবী। মুখে বলতেন না কিছু, শুধু বুঝতেন সদানন্দবাবু, ওর কষ্ট হয়। তাস খেলা ছাড়লেন। আর ছিল থিয়েটারের নেশা। অনেকদিন পালন করেছেন। তারপর তাও ছেড়ে দিয়েছেন। মনে পড়ছে তিনি আনন্দ করছেন, স্ফূর্তি করছেন, ওদিকে সুজাতা দেবী একা একা তার পথ চেয়ে বসে আছেন। সেই থেকে সন্ধ্যের পর আর তিনি বাইরে থাকেন না।

কখনো বলতেন সুজাতা দেবী—তুমি পড় বইটা, আমি শুনি। কিন্তু সুজাতার বেশী পড়া হ'ত না। বই বন্ধ করে গল্প সুরু করতেন সদানন্দবাবু। তারপর রান্নাঘরে যাওয়া সারতে লাগতো। এবার ঘুমোবার পালা।

সামান্য কেরাণীর চাকরীতে ঢুকেছিলেন তিনি এই অফিসে, সেই কতদিন আগে। অফিস বলে করেননি কখনো। প্রয়োজন হয়নি। ধীরে ধীরে চাকরীতে উন্নতি করেছেন। কোম্পানীর অফিস। বড়সাহেব, ছোট-সাহেব তাঁর কাজে খুসী। নিজেরাই তাকে ধাপে ধাপে উঠিয়ে দিয়েছেন। আজ তিনি অবসর গ্রহণ করলেন একেবারে চীফ-ক্লার্কের কাজ থেকে। কত বড় দায়িত্ব ছিল তার কাঁধে। আজ থেকে তিনি ভারমুক্ত। সব বোঝা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন। ফাঁকা, সব ফাঁকা, চারিদিকে কেমন শূন্য মনে হচ্ছে।

তাঁর আমলেই অফিস সুরু। সেই প্রথম থেকে তিনি আছেন। কত সাহেব এসেছেন, গিয়েছেন—কিন্তু তিনি সেই এক এবং অদ্বিতীয়। কোম্পানীর বড়কর্তারা তার ওপর বরাবরই প্রসন্ন ছিলেন। শেষদিন পর্য্যন্ত। তার সঙ্গে অফিসের, অফিসারদের, একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছলো।

ছোট অফিস থেকে আজ এত বড় অফিস হয়ে উঠেছে। দু তিনটি জেলায় শাখা গড়ে উঠেছে। তিনি দেখলেন সব তার চোখের সামনে। শুধু একবার বললেই হয়ত আরো কিছুদিন কাজে থাকতে পারতেন তিনি। কিন্তু তা তিনি বলবেন কেন? কোনদিন অন্যায় অনুরোধ তিনি করেননি কাউকে।

দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই কোনদিন। চোখ বুজে শুয়ে থাকতে পারলেন না বেশীক্ষণ। অসহ্য লাগে। উঠে পড়লেন তিনি। সুজাতা দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। বারবার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে তাঁর। আবার ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছিলো তাদের। হেসে উঠেছিল সংসার। কিন্তু সইল না কপালে। অল্পদিনের ব্যবধানে মারা গেল ছেলেদুটি কলেরায়। শোকের ছায়া পড়লো সংসারে। কেমন হয়ে গেলেন সুজাতা দেবী। কাজ নিয়ে আরো ডুবে গেলেন সদানন্দবাবু।

অঙ্কের গুড়ি মিনতি রইল শুধু। তার দিকেও তাকাতে পারেন না আর। হয়ত, কোন ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে ওদের মত। বিশ্বাস নেই। কাঁদাতে আসে এরা। ওকে এড়িয়ে চলতে চান সদানন্দবাবু। কদিনের জন্যে মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর বিধাতা পরীক্ষা করছেন। কী নির্মম রসিকতা। হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তবু জোর করে মনকে সবল করতে চেষ্টা করেন তিনি। আর সুজাতা দেবী নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

না, মিনতি ফাঁকি দিলো না। কোলেপিঠে করে মানুষ করলেন সুজাতা দেবী। বড় হ'ল মিনতি। সামান্য লেখাপড়া শেখালেন। তারপর দেখেশুনে বিয়ে দিলেন তার। কেউ আর কাছে রইল না। সুজাতা দেবী আবার একা। বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, থাক পরের ঘরে, শুধু বেঁচে থাক, সুখে থাক। এ বাড়ীতে রাখতে ভয় হয় বেশীদিন। হঠাৎ যদি ফাঁকি দিয়ে চলে যায়? তাই অল্প বয়সে বিয়ে দিলেন ওর। মাঝে মাঝে আসে মিনতি। দুটফুটে দুটি ছেলে। অস্থির করে তোলে

বরবাড়ী। বেশ লাগে যে কদিন থাকে ওরা। মনে মনে হাসলেন সদানন্দবাবু, মা আমার একেবারে গিন্নি হয়ে উঠেছে। কেমন সংসার করছে দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে। আর বুদ্ধিও হয়েছে বেশ। একটা রামায়ণ, মহাভারত আর গীতা কিনে পাঠিয়েছে আমার পড়বার জন্যে। অবসর কাটাবার জন্যে।

কখন যে সুজাতা দেবী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারেননি সদানন্দবাবু। তাঁর কথায় চমকে উঠলেন। কান্নাভেজা গলা সুজাতা দেবীর।

—ওগো কখন তুমি উঠে এসেছ? তুমি এরকম করে মন খারাপ করে থাকলে আমি কিভাবে থাকবো?

জোর করে হাসলেন সদানন্দবাবু। অপ্রস্তুত ভাব কাটাতে চাইলেন।

—না, না—মন খারাপ করবো কেন? ঘুম এলো না কিনা। অভ্যেস নেই তো। চলো, চা করো খাই। একটু বেশী উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করলেন তিনি।

তবু তো কাটলো আজকের দিনটা। ভাবলেন সদানন্দবাবু, এমনি করেই কেটে যাবে। সব অভ্যেস হয়ে যাবে। তাছাড়া বিশ্রামের তো প্রয়োজন আছে জীবনে। এ দেহ তো যন্ত্রবিশেষ। আজ প্রথম, তাই হয়ত অসুবিধে হচ্ছে একটু বেশী।

আবার এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। ভাগ্যিস বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন আগে। নইলে আরো বিশ্রী লাগতো, সব পোটলাপুটলি দিয়ে কোম্পানীর বাড়ী ছেড়ে আসতে। তারচেয়ে চাকরী থাকতে থাকতে নিজের এই ছোট্ট-বাড়ীতে উঠে আসতে ভালোই লেগেছিল। হাজার হোক নিজের বাড়ীতে। এই বেশ, মনকে প্রবোধ দিলেন সদানন্দবাবু। ঠিক কেটে যাবে সময়। এতদিন কাজ করেছি, এবার বিশ্রাম প্রয়োজন। তাছাড়া নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে তো! তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে, আর নতুনদের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্রাচুয়িটির টাকা পেয়ে যাবেন কিছুদিনের মধ্যেই। তাদের দু'টি পেট চলে যাবে ঠিক। ছেলে না, মেয়ের বিয়েও বাকি নেই। তবে আর ভাবনা কিসের। বছরখানেকের পরে দুটি ঘর ভাড়া দেবেন। সেভাবেই তৈরী করিয়েছেন। তবে এখন নয়। কিছুদিন নিরিবিলিতে বিশ্রাম করা যাক। উদাস চোখে চেয়ে রইলেন সদানন্দ-বাবু সামনের দিকে। সূর্য্য অস্ত গেছে, এখন গোধূলির ধূসর ছায়া পড়েছে আকাশে-মাটিতে। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে পাখীরা দলবেঁধে কিচির-মিচির শব্দে বাতাস মাতিয়ে নীড়ে ফিরছে। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে, তার মায়াবী আঁচল বিছিয়ে দিতে।

অতিথি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শাস্ত্র বলে—ভালই বলে—
সর্ব্বদেবময় অতিথি,
অতিথ—রাখা পূর্ণিমা মোর—
বাসন্তী পঞ্চমী তিথি।
ভরে ভবন উৎসবে হে।
অবিশ্রান্ত আনন্দ যে।
তাদের হাসি ফোঁটার গোলাপ,
প্রতি কথায় নূতন গীতি।

২

রঙিয়ে যায় ভুবন, ভবন—
যায় চলে যায় উল্লাসেতে—
আলতা দুধের ঢেউ খেলে যায়
সাগর হাওয়ার পরশ এতে।

সকল দেশ ও সকল জাতি—
আত্মীয় ও তাদের জ্ঞাতি,
সারা পথই ফুলের বাগান—
বসন্ত যায় সঙ্গে নিতি।

৩

জানেনাক—ক্লান্তি, জরা—
হেমন্ত নাই তাদের ক্ষেতে।
অকুণ্ঠিত জীবন ধারা
তাদের প্রাণের সে উৎসেতে।
নয় অচেনা দেবতাদের,
দর্শনে হয় পুণ্য যে ঢের,
ধরার ধূলা হয় মধুময়—
সরস সে হয় উষর ক্ষিতি।

STUDENT
COPY
NOT FOR PUBLICATION

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি শ্রীবলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল নামক গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল্য বার টাকা।

প্রথমে সম্পাদক ১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহার পর এক পৃষ্ঠা গ্রন্থপঞ্জী, দুই পৃষ্ঠা কথাবস্তু ও আলোচনার সূচিপত্র এবং তাহার পর ১৮২ পৃষ্ঠা ব্যাপী কথাবস্তু ও আলোচনা। ৩ পৃষ্ঠা কৃষ্ণমঙ্গলের পুথীপত্রের পর ৫৯২ পৃষ্ঠা ব্যাপী মূল ও টীকা সহ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য—।

সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

মধ্যযুগে বাংলাদেশে কৃষ্ণ, শিব, চণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর—প্রধানতঃ এই কয়জন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য লেখা হইয়াছিল। এই সকল কাব্য লোকে ভক্তি করিয়া পাঠ করিত এবং গায়কেরা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে গান করিয়া এই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য লোক সমাজে প্রচার করিত। এইরূপে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়া যতগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল, কবি পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল তাহাদের অন্যতম। আমরা বিভিন্ন কবির প্রায় ২০ খানি কৃষ্ণমঙ্গলের পরিচয় অল্পাধিক জানা দিয়াছে—তাহার মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ খানি ইতি-পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলের তুলনায় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল নিকৃষ্ট নয়—বরং অধিকাংশগুলির চেয়ে ইহার কবির অনেক বেশী সরস ও প্রাণবন্ত।

দুইবার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ের প্রথম ভাগে (১৯১৪-২০১-১০৭ পৃষ্ঠা) এই রচনার খানিকটা অংশ ছাপিয়া-ছেন। দীনেশবাবুর অনুমানে পরশুরাম সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন—কিন্তু এই অনুমানের কারণ তিনি ব্যক্ত করেন নাই।

আমার দুই পুঁথি। একখানি আমার বহরমপুরের বাড়ীতে ছিল—এখানি সম্পূর্ণ। তাহার নকলের তারিখ ১২১৪ সাল। অপর পুথি-খানি আমার সংগৃহীত—ইহা শেষের দিকে ১৭০ পৃষ্ঠায় আসিয়া খণ্ডিত। দুই পুঁথিতেই লিপিকরেরা বানানের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছেন।

পরশুরাম সমগ্র ভাগবত পুরাণের, অথবা উহার কেবলমাত্র দশম স্কন্ধের ও অনুবাদ করেন নাই। গ্রন্থারম্ভে বন্দনার পর ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের শেষ দুই (১৭-১৯) অধ্যায় অবলম্বনে পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ও শুকদেবের ভাগবত কীর্তনের কথা বিবৃত করিয়া তিনি চতুর্থ স্কন্ধ (৮-১২ অধ্যায়) অনুসারে ধ্রুব চরিত্র, ষষ্ঠ স্কন্ধ (১।২ অধ্যায়) হইতে কান্যকুব্জের অজামিল নামক উচ্ছৃঙ্খল ব্রাহ্মণের বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ, সপ্তম স্কন্ধ (১০) অনুসারে প্রহ্লাদ চরিত্র, অষ্টম স্কন্ধ (২।৪) হইতে সমুদ্রমন্থনের সৃষ্টি ভাহিনী এবং নবম স্কন্ধ হইতে পাঁচটি বিভিন্ন উপাখ্যান প্রসঙ্গ—এই পাঁচটি স্কন্ধ হইতে পাঁচটি বিভিন্ন উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া দশম স্কন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। দশম স্কন্ধে ও কবি ভাগ-বতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। মোটামুটিভাবে ভাগবতকে উপজীব্য করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

দাশগুপ্ত মহাশয় টীকায় করিয়াছেন—"দুঃখের বিষয় পরশুরামের ব্যক্তিগত বিশেষ কোন পরিচয়ই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" তাঁহার লেখা বিচার করিয়া বলা হইয়াছে—পরশুরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির উপাধি ছিল চক্রবর্তী। তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না।

কৃষ্ণচরিত্রের প্রাথমিক রূপ দেখা যায় মহাভারতে; কিন্তু মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র আছে তাহা ক্ষত্রিয় বাসুদেব—কৃষ্ণের ইতিহাস ও সেই ইতিহাস প্রধানতঃ কুরু পাণ্ডবের ইতিহাসের সহিত ও বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র ভারত-যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট। কৃষ্ণের বাল্যচরিত্র সম্বন্ধে বিবরণ প্রথম রচিত হয় হরিবংশে; হরিবংশ ছাড়া ব্রহ্ম, মৎস্য, অগ্নি, বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণে কৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ আছে। পুরাণগুলির রচনা কাল খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগে হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে। প্রায় আট শতাব্দী ধরিয়া কৃষ্ণচরিত্র লেখা হইয়াছে। খৃষ্টজন্মের ১৮০ শতাব্দী পূর্বে মহাকবি ভাস কৃষ্ণের বাল্যজীবন লইয়া 'বালচরিত' নাটক লিখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ভাগবত পুরাণই কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে অতি উল্লেখযোগ্য রচনা। ভাগবত দক্ষিণ-ভারতে লিখিত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে বোধ হয় তাহা উত্তর-ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণ করিয়া লিখিত—তিনি ভাগবত দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মালাধর বসু ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

পরশুরামের এই কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পূতনা বধ, তৃণাবর্ত বধ, যমলার্জুনভঙ্গ, বৃন্দাবন যাত্রা, বৎস, বক ও অঘাসুর বধ, ধেনুক বধ, কালীয় দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, দোললীলা, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, কংসবধ, কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষা, রুক্মিণীহরণ, শ্যমন্তক মণিহরণ, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী হরণ, নরকাসুর বধ, পারিজাত হরণ, ঊষাহরণ প্রভৃতির পর—বৃষপর্বার উপাখ্যান, শিশুপাল বধ, শ্রীদাম উপাখ্যান, বৃকাসুর বধ, কৃষ্ণের লীলাবসান প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বলিনীবাবু 'কথাবস্তু ও আলোচনা'র মধ্যে সকল ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—

ষোললীলা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ভাগবতে ষোললীলা, রাসখণ্ড ও নৌকাখণ্ড নাই। পদকর্তাগণ এই সকল বিষয়ে পালা গান রচনা করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। পরশুরাম ব্যতীত ভাগবতের অন্য কোন অনুবাদক এ সকল বিষয় লেখেন নাই। পরশুরাম ষোললীলা সম্বন্ধে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী পালা গান লিখিয়া গিয়াছেন। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও গরুড় পুরাণে কৃষ্ণের ষোলো আনোহণের কথা আছে—তাহা লইয়াই পদকর্তারা পদ রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে ষোল উৎসব ছিল না। ক্রমে ইহার প্রবর্তন হয় ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বর্তমানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

রাসখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ভাগবতে নাই—বহু চণ্ডীদাসই ঐ দুই পালার লেখক। ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা রূপ গোস্বামী রাসকেলি-কৌমুদী নামক গ্রন্থে কৃষ্ণের রাসলীলার রূপ দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাসখণ্ড দেশের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে একদা নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিজ সন্ন্যাসের বাড়ীতে রাসলীলার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈত প্রভু কৃষ্ণ, চৈতন্যদেব রাধিকা ও নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ী সাজিয়াছিলেন।

বিরাট কাব্যখানির সকল ঘটনা লেখার স্থানও নাই, তাহা সম্ভবও নহে। পরশুরাম তাঁহার কৃষ্ণমঙ্গলের বহু উপাখ্যান বর্ণনায় মুখ্যতঃ ভাগবতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যুগোপাখ্যান, বলদেবের যমুনা-কর্ষণ, জরাসন্ধবধ, শিশুপালবধ, পাণ্ডবধ, শ্রীদাম উপাখ্যান, বৃকাসুর বধ ও ভৃগুমুনি কর্তৃক তিন দেবতার মধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য পরীক্ষা দিয়া কৃষ্ণমঙ্গল শেষ করা হইয়াছে। ভাগবতের দশমস্কন্ধের বহু উপাখ্যান বর্ণনা না করিয়া পরশুরাম মাত্র কেন ঐ কয়টি উপাখ্যানে কৃষ্ণমঙ্গলে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝা যায় না।

২।৩টি উপাখ্যান দিয়ে দেওয়া হইল।

নৃগরাজার উপাখ্যানের কথাবস্তু এই—একদা কোন এক ব্রাহ্মণের গাভী নৃগরাজের ইক্ষ্বাকুবংশের রাজার গোধনের মধ্যে বিশিয়া যায়। নৃপ না জানিয়া তাহা আর এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দেন। তারপর গাভীর প্রকৃত অধিকারীর সহিত ঐ ব্রাহ্মণের বিবাদ লাগিয়া যায়। নৃপরাজা তাঁদের উভয়ের যে কোন একজনকেই ঐ গাভীটির পরিবর্তে অপর একটি উৎকৃষ্ট গাভী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেহই রাজী হইলেন না। গাভীটি রাজারই রহিয়া গেল। ফলে, ধার্মিক ও দানশীল হইলেও ব্রহ্মস্ব-অপহরণের অপরাধে মৃত্যুর বিচারে নৃপরাজা একজনের জন্য একটি কৃকলাস হইয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। পরে দৈবক্রমে কৃষ্ণ ঐ কৃকলাসকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন এবং কৃষ্ণের নিকটে নিজের পরিচয় দিয়া ও কৃষ্ণকে স্তব করিয়া পাপক্ষয়ান্তে নৃপরাজা সকলের সমক্ষে বিমানে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ তখন ব্রহ্মকুমারগণকে, জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, ব্রহ্মস্ব অপহরণের বিষম ফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া উপদেশ দান করিলেন।

বলরামের যমুনাকর্ষণ উপাখ্যানটি ও কল্পনার এক আছা বিলাস। অনেকদিন পরে বলদেব গেলেন অশ্বের গোকুলে। একদিন গোপী-গণে পরিবৃত হইয়া তিনি গেলেন যমুনার এক উপবনে বিহার করিতে। সেখানে প্রচুর বারুণি মধু পান করিয়া মত্ত হইলেন ও গোপীদের সহিত জলক্রীড়া করিবার বাসনায় যমুনা নদীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যমুনা তুমি ত্বরা, শ্রোত পরিবর্তন করিয়া উজান বহিয়া যাও, আমি জলক্রীড়া করিব। যমুনা শুনিল না, দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলরাম লাঙ্গলাগ্র দিয়া পর্বতও বিদারণ করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে যমুনাকে টান দিলেন। ভীতা যমুনা মূর্তি ধারণ করিয়া আসিয়া বলদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, বলদেব তখন গোপীগণকে লইয়া যমুনায় জল বিহার করিলেন।

এই সকল উপাখ্যান ভাগবত-পাঠ, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে সে যুগে সর্বজনবিদিত ছিল। পরশুরাম সেগুলি তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের পাঠ ও আলোচনার ফলে ভাগবত-কথা ও প্রচারিত হইয়াছিল।

শিশুপালবধ কাহিনী সর্বজনপরিচিত। কৃষ্ণমঙ্গলে তাহারও স্থান পাইয়াছে। কাহিনী এইরূপ—

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমবেত সকল রাজারও অন্যান্য ব্যক্তিগণের অতে ও অনুরোধে যুধিষ্ঠির সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের এই সম্মান দেখিয়াও শিশুপালের সহ্য হইল না—তিনি আসন হইতে উঠিয়া সক্রোধে কৃষ্ণকে কটু কথা বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ চক্র দিয়া তাঁহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

শ্রীদাম উপাখ্যানে কি করিয়া শ্রীদাম নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী চিরদারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নীর অনুরোধে দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে ধন প্রার্থনা করিতে গেলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রচুরভাবে সমর্চনা করিলেও তিনি লজ্জায় কিছুই না চাহিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়া আশ্চর্যভাবে অপরিমিত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সাধ্বীর ধনলাভ, প্রাসাদ, উদ্যান, দাস, দাসী সমস্তই যে কৃষ্ণের করুণার দান, তাহা বুঝিতে ব্রাহ্মণের বিলম্ব হইল না।

একটি উপাখ্যানে ভৃগুমুনি কর্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবের মধ্যে প্রাধান্য পরীক্ষায় বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ ঘোষিত হইয়াছে। একদা সরস্বতীর তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিদের মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হইল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কোন্ দেব মহান্। ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনি প্রথমে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মাকে প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না। তাহাতে ব্রহ্মা বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পুত্রকে কোন শাস্তি দিলেন না। তারপর ভৃগু গেলেন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকটে এবং বিষ্ণুকে উদ্ধার্গগামী বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। ভৃগুর শিব আরও বহুবার শূল উদ্যত করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে গেলেন, পার্বতী ব্রহ্মহত্যার পাতকের ভয় দেখাইয়া স্বামীকে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর

কৃষ্ণ সেখানে বৈকুণ্ঠে। কৃষ্ণ সেখানে স্বর্ণে শয়ন করিয়াছিলেন, তৃণ দিয়া তাঁহার বুক পদাঘাত করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণ শয্যা হইতে উঠিয়া মস্তক দিয়া মুনিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি আসিয়াছেন আমি তাহা আগে জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কৃপাকরে এই আসনে বসুন। তীর্থ সমূহের জলে আপনার পদ পবিত্র, আপনি পাদোদক দিয়া আমাকে ও আমার অনুগত সকলকে ধন্য করুন। আপনার পাদপ্রহার চিহ্ন আমার বুকে বিভূতিরূপে বিরাজ করিবে। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ তৃণ সরস্বতীর তীরে গিয়া সিদ্ধ ঋষিদের সকল সমাচার করিলেন। শুনিয়া তাঁহারা সকলকে কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন।

ইহার পর পরশুরাম বলেন, এইভাবে নানা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বলরামের সহিত কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন। তখন নিজের বাহুবলে অসহনীয় বোধ হইলে, কৃষ্ণ পাপ-ছলে উদ্ধত ও দুর্বিনীত যাদবদের নিজেদের মধ্যে কলহ উৎপাদন করাইয়া তাহাদের ধ্বংস করিলেন। তারপর লীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণ ধীর ধ্যানে চলিয়া গেলেন।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই কৃষ্ণচরিত পাঠ করিলে সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারিবেন। এই ভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাস রক্ষিত আছে। ১২১২ সনে অর্থাৎ আজ হইতে ছয়শত বৎসর পূর্বে ইহা লিখিত —লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহার লেখার মধ্যে বহু ভুল ভ্রান্তি আছে—তবে তিনি 'মূর্খীজন সমিতির' লিখিয়া নিজেকে ছোট করেন নাই। তখন ও ছাপাখানা হয় নাই—কাজেই হাতে লিখিয়া নকল করার প্রথা ছিল—পরশুরাম যে সুবৃহৎ কাব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা এইভাবেই রক্ষা পাইয়াছে।

বহ্নি-যৌবন

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

হে চির অতৃপ্ত দাহ, দহনের হোম-হুতাশন,
আমার এ মনঃকুণ্ডে পেয়েছ কী হব্য-পরশন,
দুর্ব্বার হে অনন্ত পাবক ?
ক্ষমাহীন শাসনের অনুপম দণ্ড তাই তব
কী অঘোষ মর্ম্মবাণী রচিয়াছে নিত্য নব নব,
বুভুক্ষুর ক্ষুধা ধক্-ধক্—
আমি জ্বলি—বিশ্ব জ্বলে—দুনিবার বেদনার-তলে
বুকে নিয়ে' বহ্নির-পাহাড়
যুগ হ'তে যুগান্তর—অবিচ্ছেদ—পল হ'তে পলে
চৌদিকে ছড়ায়ে সেই দগ্ধতার দীর্ঘ হাহাকার !
হে বহ্নি, বাসর তব করে যেন রচিলে উল্লাসে
জগতের কোল হ'তে বিদ্যুৎচ্ছুরিত নীলাকাশে
আলোড়িয়া সে পরিমণ্ডল—
সে-দিনেও পাও নাই তব প্রিয়া স্বপনের রাখী,
বিদ্রোহ-বাসনা তাই হৃদিমূলে করে কানাকানি
বক্ষের-উত্তাপে অনর্গল—
অযুত অসংখ্য তাপ অন্তস্তাপে মিশে অগুণন্
কী আশ্চর্য্য জ্বালায় জ্বালায়,
নিষিক্ত নির্য্যাস যার আমাতেও জাগায় স্পন্দন,
রুদ্ররোষে শুধি যবে সেই রক্ত মন্থর-তৃষায় !

হে অনল, চিরোন্মাদ, নশ্বরের লীলাভূমি 'পরে
নির্ম্মম পদাঙ্ক তব রেখাঙ্কিত যবে থরে থরে
ভস্মের বিদ্রূপ তুলিকায়,
সর্ব্ব-শেষ অবসান, সুনিশ্চিত মুছিল-আশান,
এ-মর্ত্ত্যের যত জাল-জঞ্জালের উড্ডীন নিশান
মুহূর্ত্তের ইঙ্গিত-লীলায়,
তবুও সে-জিহ্বা তব গ্রাসিতে পারেনি কোনোদিন
কামনার কণ্টকের-বাগ,
যে-কাঁটা আগুনে পুড়ে' চিরন্তন হয় মৃত্যুহীন—
কার্ম্মুকে কুসুম-শর—দেহ-পর্ণে পীরিতির-দাগ !
আমার সর্ব্বাঙ্গে সেই সঘন নিঃশ্বাস তব নাচে,
নাচে কী শাণিত মসৃণ শিখা ; প্রাণের-কানাচে
বাজায় কী গুরু দুর্গানাদ—
আতপ উদ্গার ওঠে বক্ষ ঠেলি' উলঙ্গ আক্রোশে,
দিশাহারা চিত্ত মোর উল্কা ছুটে আবেগের-বশে,
খুঁজে কোন্ অনন্ত আহ্লাদ
যা' হ'তে বঞ্চিত তুমি ক্ষিপ্ত হে, আরক্ত অনল,
অভিপ্রস্ত তিক্ত রিক্ততায়,
আমি চাই সেই তাপ-সম্ভারের তীব্র হলাহল
উচ্ছৃঙ্খল ধমনীতে আত্মমতী সৃষ্টির আশায় !

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনন্তনাগে অতিকষ্টে একটা হোটেল পেয়ে গিয়ে চা, ডিম, রুটী খেয়ে নেওয়া গেল। অতিষ্ঠ হয়ে ব্যবস্থা করলে তাই। তারপরেই অতিথের দেওয়া পান। সুতরাং গাড়ী ছাড়লো যখন, তখন যেন নতুন হয়ে গেছি। এবার ৭ মাইল পরে গাড়ী এসে থামলো অচ্ছাবল। চমৎকার জায়গা। লোকে লোকারণ্য; বিরাট ভীড়। অচ্ছাবলে মেলা বসেছে। বাৎসরিক মেলা। মনে মনে ইচ্ছা ছিল এখানকার একটা মেলা দেখি। অন্য কোথাও কি হয় জানা নেই, তবে ভারতবর্ষে মেলা একটা প্রাতিষ্ঠানিক অনাবশ্য। বিরাট জনসমাজের একটা আড়াআড়ি টুকরো, যার ক্ষেত্রের থেকে ভাল করে চাইলে জীবন-নাট্যের অনেকখানি দেখা যায়।

মেলায় মেয়েরা ভাত খাচ্ছে

এখানে দেখলাম ঘোরখা-পরা মেয়ের দল কাতারে কাতারে, সঙ্গে পাহাড়ীয়া, গ্রাম্য, অন্যোন্যাদী মুসলমান শ্রমিক, চাষী, জোলার দল। মস্ত বড় বড় মাটীর জালায় ভাত। সামনে মাটীর সানকী বুড়ি বাইশ খানা করে রাখা। এক একজন যাচ্ছে এক আনা থেকে দু'আনা দিচ্ছে। একটা সানকীতে কিছু ভাত তুলে দিল, অন্য জালা থেকে মাখন তুলে নেওয়া ঘইয়ের ছাঁই দুধাতা দিয়ে এক খাবলা নুন মিশিয়ে দিল, আর দিল সানকী ভরে ঝোল। উবু হয়ে বসে শেষ দানা অবধি ভাত কটি খেয়ে করপায় জলে সানকী ধুয়ে সানকীটা রেখে দিল। এমনি শত শত নরনারী যুবা বৃদ্ধ বালক শিশু ঐ ভাত খাচ্ছে। ঐ ওদের মেলার খাদ্য। একটু বর্দ্ধিষ্ণু যারা তারা সঙ্গে করে খাবার এনেছে। গোল হয়ে বসে চিনারের ছায়ায় খাবার ভাগাভাগি করছে। মস্ত বড় বড় চষিতে সেঁকা রুটী, কয়েকটা পোড়া কাবাবের টুকরো, কিছু মূলো পাতর পেঁয়াজ, একটা আপুর খাঁটি মতো—এই নিয়ে বসে বসে খাচ্ছে ঘোরখার সামনের ঢাকা তুলে। মিটমিটে চোখে চাইছে। চোখে সুর্মা, ঠোঁট দুটো জরাদ পানে কালচে লাল। মাথায় তৈলাক্ত শীঁথির মাঝে কাশ্মীরী পাথর বা পলা বসানো রূপার ঝুমকো, কাণ দুটো চেন্-যুক্ত ঝুলের ভারে ছিঁড়ে পড়তে যেন। গলার ওপরটায় ঢাকা কাপড়ে ঢাকা বটেই—তার ওপর রাশি রাশি পাথর, পলা, বাঁধ আর রূপোর ভীড়। ওরা আজ মেয়ে এনেছে। পুরুষরা বেশীর ভাগই লম্বা আলখাল্লা ঢাকা, মাথায় খুলি ঢাকা টুপী, পরণে পাজামা। বেশীর ভাগই কখন বেচতে এনেছে। সেই নতুন ভেড়িয়া-কম্বলের এক ধরণের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে হেঁসে ভাজা তিলের বড়া, গুড় আর বেসনের বড়া, পোড়া মাংস, আর পকোড়া ভাজার গন্ধ। আর গন্ধ নোংরা কাপড়ের, ঘামের, আর মাথার তেলচিটে টুপীর। নানা গন্ধে মেশা সে গন্ধ—তাকে বলি

জাতের গরু, ঘোড়ার পাল। কাপড়ের কারবার চারা দোকানের সার; তাতে পুঁতি, মালা, আয়না, টিনের বাসন, চায়ামাটী আর কাঁচের চারবেল, তুলোভরা পুতুল, সিল্কের গহনা, গালার চুড়ি, রঙীন ফিতে—এই সব। খানা খানা কাশ্মীরী বিস্কুট; অর্থাৎ আটার তালের সঙ্গে গুড় আর তিল মেশানো, পরে সেঁকা। কাঠের মতো শক্ত। কাশ্মীরী চায়ের সঙ্গে খায়। নরম শুকনো পাতাচা চায়ের তে রাখা। তাই গুলে লিক্ষ করে দিয়ে যেই এক পয়লা নুন। নাম—ন্ত্ন। সেই নুন-চায়ে ডুবিয়ে খেই ঐ বিস্কুট। নরম করে খায়।

কাশ্মীরে নুন খাবার প্রচলন অত্যন্ত বেশী। কাশ্মীরী রান্না বলতে নয়তলে আমরা যা বুঝি তা মোগলাই রীতির একটা সংস্করণ। আসল কাশ্মীরের যা রান্না, অর্থাৎ যে রান্নায় মোগলাই পাকে ডুবায় মধ্যে,

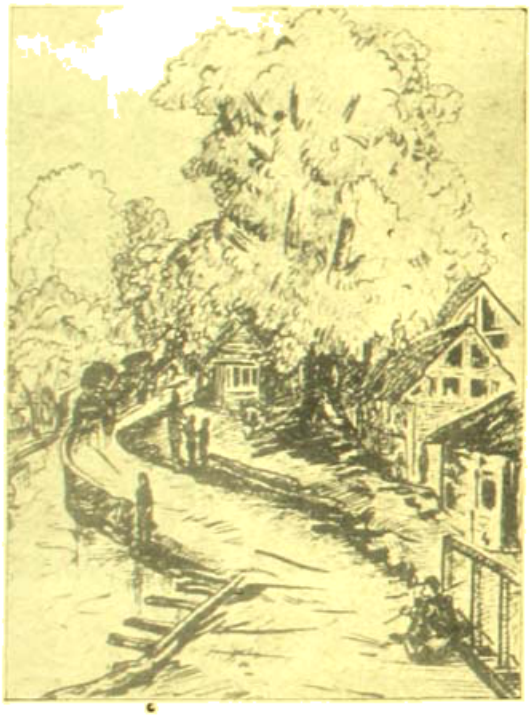

অন্তাবলের পথের ধারে

নদীর ধারে, ভেসে পড়াতে, কাঠুরেদের কুটীরে, চাষার গ্রামে—তার মোগলাই পাকটা যাবে নুনে আর চন্দ্রায়। একপাথা নুন আর লঙ্কা দিয়ে তবে রান্না হবে ভালোবাসে। কাশ্মীরে নুনের খাঁই অত্যন্ত বেশী। চিনি বড়লোকের পান্না। ওদের নুন। তিব্বতের পথেও দেখেছি নুনের খুব কদর। নুনের কদর কোথায় না নেই, তা নয়। আপেক্ষিক ভাবে নুনের ব্যবহার কাশ্মীরে অত্যধিক। পরে কাশ্মীরীদের রান্না, বাজারের ব্যবসায়ী হোটেলে নয়, বাড়ীতে স্নেহের রান্না, বড়লোক-দের বাড়ী নয়, দরিদ্রের বাড়ী, খেয়ে এর পরিচয় পেয়েছি। আর কাশ্মীরী-খানা আসল যা, সেটা পুরোমাত্রার মোগলাই রীতির সুসংস্কৃত সংস্করণ। তা অতুলনীয়।

ভীড় ঠেলে চলেছি অন্তাবলের বাগানে। বহুলোকের ভীড় নয়, নদীর পুল অন্ত এই অখিলের নগর স্থাপন করেন। অন্তাবল কাশ্মীরের সর্ববৃহৎ প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণের জল দিকে দিকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। অনন্ত নাগে এবং অন্তাবলে বাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রস্রবণের জল বইছে। সেই জলই বাড়ীর সব নোংরা ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে দিয়ে যে জল বইছে সেই জল সকলে পানীয় জলে ব্যবহার করে। অন্তাবলের প্রসিদ্ধ বাগিচা মুঘলবাগানের চৌরী। অনেকগুলা বাগান। শেষ হলাটা নেই। চমৎকার আঠের কালো পেট। এটা বেশী দিনের নয়। রাজা প্রতাপ সিংজী করিয়েছেন। ভিতরে প্রকাণ্ড হামাম—নাইবার ঘর, বারাদরী। এসব হামামে বাদশা জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে নিয়ে রাত্রি বিলাসে মত্ত ছিলেন। রাজার ঐশ্বর্য্যের সভা বসেছে চাঁদনী রাতে। বাইরে সেদিনও এই দরিদ্র জনতার ভাড় লাগতো, বলতো "বাদশা জাহাঙ্গীরের জয় হোক।" জনতার এই জয়ধ্বনি উপর থেকে নেমেছে, আসার নেমেছে, প্রাণ থেকে নেমেছে না, প্রাপ্তির আনন্দে। সেদিনকার মহাবলশালী রাজাও বুঝতে পেরেছি যে রাজত্ব না থাকলেই প্রজাদের কল্যাণ; রাজত্ব থাকাই প্রজাদের অকল্যাণ।

হঠাৎ দেখি সামনে দিয়ে ওরা মোষহয় তিনটী মেয়ে যাচ্ছে। বড়টি আঠারো, ছোটোটি বছর ছয়। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। কাপড় চোপড় নোংরা হলেও তুলে রাখা সজ্জা; আজ পরে এসেছে। রংয়ের খুশী মেজেছে মনে। গলা আর গা ভরতি পুঁথি-পাথর আঁটা গহনার স্তূপ। আমার ইচ্ছা হোলো এই হাসিভরা মুখখানার ছবি নিই। একজন বৃদ্ধকে বোঝালাম। সে তো কোনও মতে রাজি করালো মেয়েটাকে। ছবি তুলবো। অত ভীড়ের মধ্যেও ভয় পেয়ে গেলো মেয়েটা। হঠাৎ কেঁদে ফেললো। ছবি নেওয়া হোলোনা। অবশেষে বৃদ্ধকে বলি ওরা তিনজনে দাঁড়াক। বৃদ্ধ বলেন,—"না, তা হতে পারে না। ঐ বড় মেয়ের ছবি ও তোমার তুলতে দিয়েছে জানতে পেলে ওর অভিভাবকরা তো ওকে মারবেই, তোমার বন্দুকটিও (ক্যামেরা) আস্ত থাকবে না।"

আমি আর বৃদ্ধ চলতে লাগলাম। অমিত আর বেশী দাঁড়িয়ে গেছে। দল তো ভীড়ে কে কোথায় মিশেছে তার আর পাত্তা নেই। বাগানের ওপরতলা থেকে ভীড়টা এখন স্পষ্ট। ছোটো অমিত দেখেই। কে এক তরুণী গাছের তলায় খাড়ী মমতা মুখ পরিবৃত হয়ে সন্তানকে স্তন্য দিচ্ছে। অমিত দেখে শটটা; হঠাৎ মেয়েটী হেসে পিছন ফিরে বসলো। অমিত বলে,—"খেলে যা। এদিক নেই ওদিক আছে। মেয়েই এসব অসূর্য্যম্পশ্যাদের ছবি।" সেই ও চলে গেল। আমি তো গা-ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য ব্যস্ত। বৃদ্ধকে পেয়ে খুশী। "বলতো তুমি ছবি নিলে- ওরা রাগ করবে অথচ শুনতে পাই কাশ্মীরে মেয়ে খুব সস্তা।"

"সে তো কাবুলের পথে শুনবে কলকাতায় মেয়ের ছড়াছড়ি। কোন্ সহরে নেই। এরা হোলো কাশ্মীরের জান্, ইজ্জৎ। কাশ্মীরের গাঁয়ের মেয়ে এরা। এদের সোহবত্ আলাদা।"

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম। "দেখো দেখো ইজ্জৎএর মধ্যে দেখো।" একটি বোরখাবৃতা ললনা স্বামীর সঙ্গে চলেছেন। বিদেশী পর্য্যটক।

ভদ্রলোক উত্তম লজ্জায় সঙ্কুচিত। ভদ্রমহিলার লাজ তো দেখবার উপায় নেই। তবে বোরখার ঘায় দেখলে মনে হয় খোলব যখন এত পরিপাটি, ভেতরের ব্যাপার কোন না সমান ভালের হবে। ঠাওর করতে না পেরে একেবারে বাগানের কেয়ারী-বাঁধা জোয়ারের চৌবাচ্চায় ঝম্পাং। স্বামী নাম্বরা বোরখা সমেত ভেজা মালটী যখন উঠলেন তখন প্রশ্ন সিক্তবসনাসুন্দরীকে কি করে শুষ্কবসনাসুন্দরী করা যায়। খেলও। ভদ্রলোক অভিনব উপায় আবিষ্কার করলেন। নিজের পাজামাটা খুলে —ইত্যাদি। ওদিকে আর চোখ রাখিনি। খানিকক্ষণ পরে দেখি ভদ্রলোক আণ্ডারওয়ার আর সার্ট পরে চলেছেন। হাতে একটা ভিজে পুটুলী। বোরখার তলায় আচকান পরে শ্রীমতীকে কেমন দেখাচ্ছে জানিনা, বাইরে সেই ভিজে বোরখা কাকের ছানা হয়ে আছে। সুবিধামতো ভদ্রলোককে পাওয়াই বাৎলালাম,—"কোনও নির্জনে গিয়ে শুকিয়ে নিন, যা রোদ বাতাস শুকিয়ে যাবে।"

আষাঢ়ের বাদ যে ছেড়ে দেবে। কাতরভাবে বললেন ভদ্রলোক।

আমি বলি,—"আজ মেলায় দিন ছাড়বে না।"

বোরখার ভেতর থেকে কলকণ্ঠে জবাব এলো—"বুদ্ধি বিলেও দিতে নেই বুঝি?"

বোরখার দিকে চেয়ে তীতচকে ভদ্রলোক বলেন—"আমার আরও।"

কণ্ঠস্বর শুনে সন্দেহ হোলো:—বোরখার ভেতর সত্যিই কোনও পুরুষ নেই তো?

সুন্দরী কাশ্মীরের মেয়েরা। কিন্তু কাশ্মীরী মেয়ে এক ধরণের নয়। ডোগরা মেয়েরা আকারে খর্ব এবং স্থূল। মধ্যদেশ রহস্যময় নয়। চোখের দৃষ্টিতে অতটা উজলতা নেই। সেই উজলতা আর রমণীর তীক্ষ্ণতা আছে ডুম্বার হাঁজিদের মধ্যে, চাষা মেয়েদের মধ্যে, গ্রামের মুসলমান মেয়েদের মধ্যে। শ্রীনগরের মেয়েদের মধ্যে পর্যটকদের নয়ন-মন বিনোদিনীরা এই জাতীয় মেয়ে। কিন্তু সত্যকার সুন্দরী মেয়ে যাদের চোখ টানা টানা, ভাসা ভাসা, আঁখি পল্লব স্নিগ্ধ ও দীর্ঘ, কেশ সুকুঞ্চিত ও কুঞ্চিত, নাকের গঠন তীক্ষ্ণ ও সুডৌল, রোঁচা পাতলা, চিবুকে খাঁজ, গালে রক্তিমাভা লেগেই আছে, পাৎলা সুগঠিত মধ্যদেশ—সেই কান্তরুচি মেয়েদের পাওয়া যায় গুজরদের মধ্যে, পার্বত্য বনেচর গুজর। কিন্তু কি ডোগরা কি মুসলমান, কি গুজর মেয়েদের হাতে পা সুগঠিত নয়। করপল্লব ও চরণকমল দুটোই যেন বৃক্ষের পুষ্প পল্লবহীন কাণ্ড। রুক্ষ, কর্কশ, পুরুষালী। এরা ছাড়া কাশ্মীরে অন্য এক জাত মেয়ে আছে; তারা লদ্দাকী। তাদের টানটা তিব্বত চীনের নির্বাক্ষ বংশের প্রতি। খস্ প্রভৃতি উপজাতিদের কথা এখানে বললাম না।

খিদের পেট চুঁই চুঁই করছে। খুঁজে পেলাম বেণুকে, কিন্তু অসিত উধাও। পথে এক বৈষ্ণব ভোজনালয়ে সপিত্ত ভগবানদাসজী ডাল-রোটী গাচ্ছেন ও সাধা-সাধার গুণগান করছেন। "আপনার জিভের মতো সরল খাদ্য এখানে অচল। সুতরাং আসবেন কি?"

আমি বল্লাম "অচল চালাবার রুচি আমার সত্যিই নেই।"

একটা স্বর্ণার ধারে এসে বসে পড়লাম। বাস থেকে বেণু পাম্প এনে সাফিয়ে নিয়ে বসলো। কিন্তু এলো না অসিত শেষ অবধি। সাজানো খাবার গুটিয়ে নিয়ে আবার বাসে চড়া গেল। এবার কুকরনাগ। কুকরনাগ এমন কিছু নয়। পার্বত্য নিসর্গশ্রী। এখানে বাগান বাগিচার বালাই নেই। ডাক-বাংলো আছে। শিকার করা, মাছ ধরা, পিকনিক করার জায়গা। তাঁবু নিয়ে এসে দুচার দিন কাটাতে ভালই লাগে। চারিধারে ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে নানা ফুলের গাছ ঘরে আছে। বড় বড় পাথরের চিবির চারিধার দিয়ে উচ্ছল কলরবে জল পড়ছে। তার শব্দ বনভূমিকে প্রাণবন্ত চঞ্চল করে রেখেছে। এখানে দ্বিতীয়বার বেণু তার পোটলা খুলেছে।

"খেলোম এই অসিতকে নিয়ে।"

"কেন বেণুদি?"

"কেন? কেন আবার কি? পাওয়া যাওয়া নেই নাকি আজ?"

কুকরনাগ

পলার ঘর ভেজা ভেজা পকেট থেকে কাগজের প্যাকেট বার করে অসিত বলে "পান্, এনেছি, পান।"

"রাখো তোমার পান। ধন্যি ছেলে সব। না খেয়ে খেয়ে ভালোও লাগে।"

কিন্তু যখন অসিত পকেট থেকে আর একটা মোড়ক বার করলো তখন বেণু চুপ।

সে মোড়কে ছিল বেণুর প্রিয় খাবার—পিক কাবাক!

"এবার? খাস তো!"

"খাপ! কাজিল, দুষ্টু ছেলে; কেবল জোগাবে।"

এতটাই যে বেণু কি করে বলেছিল আজ ভাবি। খিদের কিনা করে। বেণুকে সবাক করে আমাদের অবাক করে দেয়।

বাস এবার যাচ্ছে মার্তণ্ড। বর্তমান নাম মাইন্। মার্তণ্ডের স্বামীর মন্দির। কত আনন্দ:—এখানে কোটেশ্বরীরা থাকবেন আমাদের আপ্যায়ন করতে। মার্তণ্ডের মন্দির, বরাহস্বামী মন্দির আর পরিহাস-

ছেলেবেলায়—কাশ্মীর রাজ্যের তিনটি প্রধান বিখ্যাত হিন্দু মন্দির। অমরনাথ মহাদেব, খীরভবানী এবং টীকে। কিন্তু মন্দির স্থাপত্য, মানুষের শিল্পবোধ—রুচির বিকাশের দিক থেকে এই সব মন্দিরের তুলনা ছিল না।

কাশ্মীরের স্থাপত্যে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধারাটিকে সাধারণভাবে হিন্দু ধারা বলা হয়েছে সত্য, কারণ হিন্দু প্রেরণা সম্ভূত এর বিকাশ। কেউ কেউ এ ধারাকে হিন্দু কুষাণ ধারার অগ্রগতির বলেছেন। কেউ বা বলেছেন গ্রীক। আমি এসব। কিন্তু বর্তমানে একটা দল ইসলামিক ধারা বলতে আরম্ভ করেছে। আমি স্থাপত্য বা প্রত্নতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ নই। তবে এই সব আলোচনার মধ্যে আমি ঐতিহাসিক সত্য

সুখরনাগের আর একটি দৃশ্য

পাই। পজিটিভ-চিহ্ন নিয়ে নাৎসীরা 'আর্য' 'আর্য' করে উন্মত্ত হয়েছিল। অথচ হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে পজিটিভ চিহ্ন পাওয়া একেবারেই যায়না একথা সত্য নয়। সত্য কোনটাই নয়। সত্য এর প্রচ্ছন্ন রাজনীতি। মানুষের মধ্যনিহিত সুপ্তকে জাগরিত করবার, মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করবার, ভেড়ালের ঝগড়া বাঁধিয়ে কিছু লাভ করবার বাঁদুরে বুদ্ধি।

আমি দেখেছি কাশ্মীরের প্রাক্ কুষাণ আর কুষাণোত্তর স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য রীতিতে পার্থক্য। কুষাণ যুগের মূর্তিরা মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি থেকে যে ছাঁচ নিয়ে এসেছিল তার খানিক বিকাশ যাইআর্টাইন স্থাপত্যে আছে। এ দুটোর যোগাযোগও হয়তো ছিল। এদের মিলন যেমন হয়েছিল—কাশ্মীর রাজ্যের তিনটি প্রধান বিখ্যাত হিন্দু মন্দির। অমরনাথ মহাদেব, খীরভবানী এবং টীকে। কিন্তু মন্দির স্থাপত্য, মানুষের শিল্পবোধ—রুচির বিকাশের দিক থেকে এই সব মন্দিরের তুলনা ছিল না।

কাশ্মীরের স্থাপত্যে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধারাটিকে সাধারণভাবে হিন্দু ধারা বলা হয়েছে সত্য, কারণ হিন্দু প্রেরণা সম্ভূত এর বিকাশ। কেউ কেউ এ ধারাকে হিন্দু কুষাণ ধারার অগ্রগতির বলেছেন। কেউ বা বলেছেন গ্রীক। আমি এসব। কিন্তু বর্তমানে একটা দল ইসলামিক ধারা বলতে আরম্ভ করেছে। আমি স্থাপত্য বা প্রত্নতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ নই। তবে এই সব আলোচনার মধ্যে আমি ঐতিহাসিক সত্য রীতি, ত্রিশোল সিংহদ্বার করার রীতি, থামের ওপরে নীচে কারুকার্য করার রীতি, দুদারি থামের মাঝে মধ্য প্রদক্ষিণ পথ করার কৌশল, সকলের ওপরে ছাদের কারুকার্যের খুঁটীনাটীর মধ্যে প্রবেশ করলে বিস্ময় বস্তুর নির্বাচনে ও উৎকীর্ণ করার প্রথা যতদূর সম্ভেহ নেই। তবু সম্ভেহ উৎপাদন করার লোকের অভাব নেই। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ মন্দিরের বেশীর ভাগই তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু মাত্তণ্ড মন্দির থেকেই এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এ মন্দিরের গঠন রীতির সঙ্গে, এর থামের সারি থেকে, এর খিলানের ধরণধারণ থেকে আশ্চার্য করা আশ্চর্য নয় যে গ্রীসীয় পদ্ধতির অনুসরণেই কাশ্মীরী রীতি চলেছিলো এবং কাশ্মীরের পক্ষে সে রীতির সংবাদ পাওয়া বড় একটা কঠিন সমস্যার ব্যাপার ছিল না। মার্তণ্ড স্বামীর মন্দির বা অবন্তীপুরের মন্দির গড়বার সময়ে কাবুলে গ্রীক-স্থাপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কাবুল থেকে ধারাটা কাশ্মীরে আসবে আশ্চর্য কি? আরও একটা কারণ গ্রীক-বাদীরা দেখিয়ে থাকেন। আরো কৌতূহলপ্রদ কারণ। ওঁরা বলেন "হিন্দু আরম্ভের মন্দির চেয়ে দেখা আছে! এতো সুন্দর, সরল, অনাড়ম্বর পদ্ধতি ওরা পাবে কোথা থেকে?" অর্থাৎ যেহেতু সুন্দর এবং সরল—সেই হেতু তা ভারতীয় নয়। যেহেতু ভারতীয় নয়, সেই হেতু গ্রীক্; কারণ সুন্দর এবং সরলের ধারক ও বাহক তো গ্রীসই, আর কেউ নয়! কী মত্ত! একবারও ভাবতে পারেন না যে কাশ্মীরেই স্বতন্ত্র একটা প্রথা জন্ম নিয়েছিলো। মধ্য-এশিয়ার যে মহিমময় আর্য সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছিল, যার ফলে মন্দির স্থাপত্যের ওপর প্রাধান্য ও সুবিস্তৃত প্রস্তর রচিত হোলো। সেই সংস্কৃতি কাশ্মীরীর মতো শিল্পপ্রাণ জাতির প্রাণে একটা নবভাবধারা, নব উন্মেষ আগ্রত করলো। অন্ধ আত্মগরিমায় এঁরা এই সরল পথ বেছে নিলেন না। ক্যানিংহামের মতো প্রসিদ্ধ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক যা মেরেছেন একটা কথা নিয়ে। কথাটা গ্রীসের এক ধরণের স্থাপত্যের নাম। নামটি 'আয়োনিক্ অর্ডার' একটা বিশিষ্ট ধরণের নামের সঙ্গে যখন 'আয়িও' বা আর্য কথাটা সংযুক্ত এবং সে পদ্ধতির সঙ্গে যখন কাশ্মীরী পদ্ধতির মিল আছে তখন এ কথা বলতে বাধা কি যে আসলে থাম ও খিলানের এই বিচিত্র সমাবেশের মূল আবিষ্কার কাশ্মীরেই;

তা থেকে কানুনের গ্রাকেরা নিয়ে গ্রীসে পাচার করলো এবং নাম দিলো আরিওষ্টাইল! এতে বাধা কি? বাধা এই যে গ্রীসকে ভারতের কাছে ছোটো করতে হয়। তার চেয়ে অনেক সোজা ভারতকে ছোটো করা। কিন্তু ইতিহাস নির্মম। উইলডুরাণ্ট গ্রীক স্থাপত্য-পদ্ধতির সমালোচনায় বলেছেন গ্রাকেরা স্থাপত্যের জন্য যে মাইলেসির সভ্যতার কাছে ঋণী সেই মাইলেসীয় সভ্যতা 'অরিয়েন্টাল' পদ্ধতির কাছে ঋণী। এমন এই 'অরিয়েন্টাল' বলতে গিয়েই বেসীর ভাণ্ড বুরোদীয় ঐতিহাসিক 'ইতিগল' সূত্র অবলম্বন করেছেন! ছোটো হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলেন; ফিরে এসে বর্ণনায় পরমহংস ভড়ালেন। ঐতিহাসিক শুধু বাকী রিলেন 'অরিয়েন্টাল' প্রভাব। যীশু খ্রীষ্টের জন্মে গেলেন, কিন্তুকাল ঐতিহাসিক শ্রীহরতা রক্ষা করা প্রয়োজন বুঝে কেবল বলেন—'অরিয়েন্টাল'। ব্যস্—আর যা খা নেই। গণিত বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসা সবই প্রথম গ্রীকদের (!); তবে মোদ্দা ফেরে পড়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন 'ওরিয়েন্টাল' প্রভাব। গ্রীক স্থাপত্য পদ্ধতির তাই। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে গ্রীসে স্থাপত্য পরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলো; তা বলে মার্তণ্ড মন্দিরের স্থাপত্যও গ্রীসের কাছে ঋণী এ কথা কেন? যা সত্য তা স্বীকার করতে বাধা কি? মার্তণ্ড মন্দিরের স্থাপত্য যে পদ্ধতির নিদর্শন,গ্রীসে সেই পদ্ধতিরই যৌবন। তাই নাম Arioslyle এবং মার্তণ্ড মন্দিরের অনেক আগে এ পদ্ধতি উদ্ভাবিত। ভারতে ভারতত, মিশ্রিত হতে হতে শেষ নিদর্শন মার্তণ্ড মন্দির রয়েছে। সেই প্রাচীন হতে প্রাচীনতর যুগে মাইলেসিয়া থেকে গ্রীসে এ পদ্ধতি গিয়ে যখন ক্রমশ উন্নত হতে থাকে, তখন এদেশে পাশন পৃথলায় অভাবে এই শিল্প ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু। কেন এ ক্ষয়? ইতিহাসের দায়ী। এ দায়ী পুরণ প্রয়োজন করতে হয়েছিল। পদ্ধতি যাই হোক, আশ্চর্য লাগে ভাবতে এ কারা করেছিল; কেন করেছিল। রাজার তাড়াহু, না মনের তাড়ায়? কেবলা প্রশ্ন এই যে শিল্পটা সৃজন করে কে? ঘাটালি না মন? সেই মনটা কোন রসে স্নিগ্ধ হয়ে কাজ করেছে। ঘোড়াকে জল অবধি নিয়ে যাবো, জল খাওয়াতে পারো? প্রতিকে পেয়ারে পয়দারে প্রণ করতে বাধ্য করতে পারো, কিন্তু আনন্দযোগ ব্যতিরেকে চিরকালের শিল্পরচনা করাতে পারো? দেবীপ্রসাদকে টাকা দিলেই যে রচনা করবেন, তা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হবে, যদি তাঁকে শ্রেষ্ঠ টাকা দেওয়া যায়? এটা দেবীপ্রসাদকে করলে তাড়া দেওয়া হবে। তাই মনে হয় যাঁরা এর মন্দিরের স্থাপত্য তাঁরা শুধু একটা ব্যাপার বাহক ছিলেন না; স্রষ্টারও অধিকারী ছিলেন। সে স্রষ্টা মানুষী ছিল, আর ছিল ভক্তি আর শ্রদ্ধা। এ শিল্প প্রশস্তিতার সভায় আজ মেকানো নয়। এ স্রষ্টার নিবেদন। এঁরা অবধূতস্বামী, রামস্বামী, বরাহস্বামীর কথা মনে মনে সঙ্কীর্তন করে পেয়েছেন তবে সেই রসকে রূপায়িত করতে পেরেছেন এই সাধনে।

মোহগুণ্ডিতাদ্ধ প্রাকারঃ প্রাসাদাদ্যর্থাধরঃ

মার্তণ্ডস্যাদ্ভুতঃ সাক্ষাদ্ভাতি ত্রাক্ষাকীর্তক পত্তনম্—

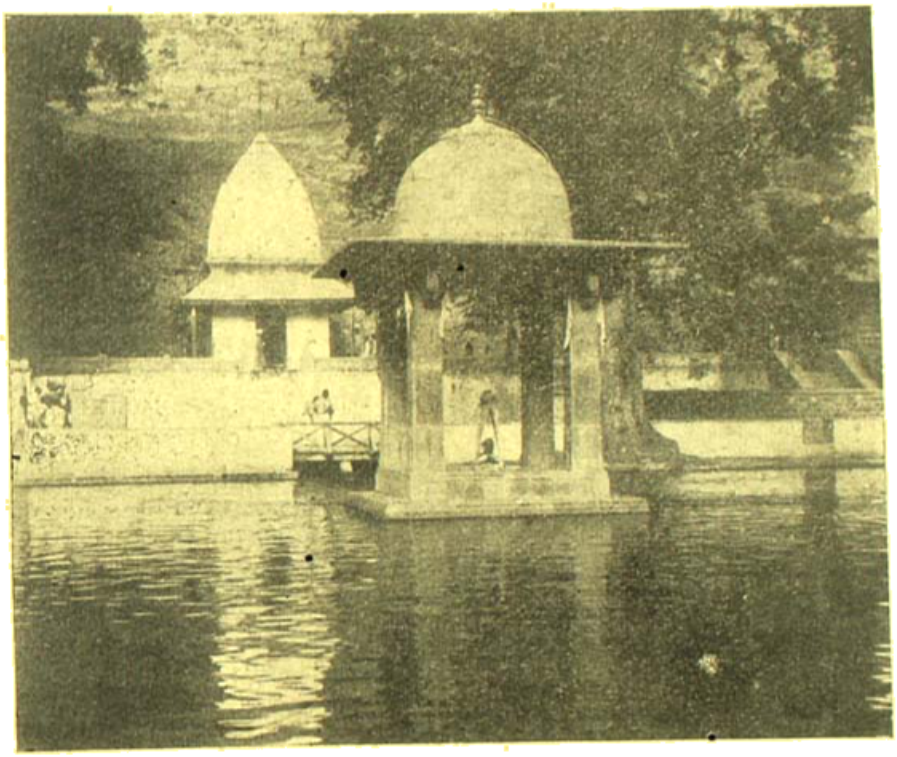

মার্তণ্ডের সূর্য মন্দির

সেই ত্রাক্ষাকীর্ত পত্তন দেখতে যাবো। মার্তণ্ড মন্দির। কিন্তু তার মার্তণ্ড মার্টন্ হয়ে গেছে। নাম সার্থক। কল্পনায় যা ছিল ভীষণ, প্রত্যক্ষে দেখি তা 'কোল্ডব্রেড্ মার্ডার'—নিবিবার চিত্তে হত্যা—।

মার্টন্ একটা খুব ছোটো নগর বলা যায় বা খুব বড় গ্রাম। এখানে কাঁসার বাসন আর সাধারণ কাজ প্রচুর। অনেক দোতলা তেতলা কাঠের কাজ করা বাড়ী। সবই পাণ্ডাদের। মেলার সময়ে যাত্রীদের থাকার জন্য এসব বাড়ী। বছরের বেশীর ভাগই খালি থাকে। কাজেই বড় বড় বাড়ী থাকতেও জায়গাটা ভুতে পাওয়া।

ভূত নেই এক জায়গায়। সেটা মন্দিরের সামনে চিনার তলায়। তা একশো বছর বয়স হবে চিনার গাছটার। বেড় হবে প্রায় বাইশ

খুই। তার উপায় নরক। মেয়েলোকের বাসিকঃ এবং, চিত্রগুপ্তের সহায়। বলে ভাকব। বিরাট বিরাট লালখাতা-মারা খাতায় পাহাড়। নিজে খাতে কায়েছে, চরিত্রদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। আর বাসের মেয়ে এসে ভীড় করে ক্রমাগতঃ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলছে। "কোন জিলা?" "কানাদু?" "নহি—নহি বোলিয়ে না।" "কুছ নেহি দেবা পড়ে গা—পিতাজীকা নাম ক্যা?" "কলরব, কলরব, কলরব। এর মধ্যে ছোটমানুষ কোটেশ্বর হাত তুলে চেঁচায়, "দাদা ম্যায় ইধর হুঁ।"

বিদেশে চেনা সুখ। কোটেশ্বরই আমার কতো চেনা।

সেই পাহাড় ঘুরে নিয়ে গেল মন্দিরের চাতালে। চাতালের চারধারে ঘুপরি ঘুপরি ঘর। যাত্রীরা থাকে। মাঝখানে জলাশয়ে ঘাট বেঁধে করছে। কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরে ছোটো মন্দির চুনকাম করা, এই সেদিনের বলে মনে হয়। মন্দিরের ভেতর শ্বেতপাথরে তৈরী সপ্তাশ্বরথ-রূঢ় সূর্যদেব। দেখে আশ্চর্য লাগলো!! মন্দির দেখে যখন তৃপ্তি হয়, তখন চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে; বিগ্রহ দেখলে একটা শান্ত সমাহিতের আভাস পাওয়া যায়। এর ব্যতিক্রম নেই। মসজিদে গেছি, আজমীর শরিফ, দিল্লী নিজামুদ্দীন আওলিয়ার দরগা—এরও প্রায়শঃ গেছি, চার্চ এবং বিভিন্নস্থানে গেছি—সর্বত্রই ভক্ত-ভগবানের ঐক্যের মাঝখানে এক শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ পেয়েছি। কিন্তু এ যেন উগ্র ব্যবসাবুদ্ধির বিরুদ্ধে এ যেন নবদ্বীপের পথে সাজানো মহাপ্রভুর জীবনের নানা লীলার মাঝখানে উপাস্যদেবের মূর্তি। এতোদিন ধরে লক্ষিতাবিতা যুক্তা-পীড়ের বিরাট কীর্তি, হনাহিতোর প্রতিষ্ঠিত যে মন্দির দেখবো বলে স্তবে এসেছি, সে মন্দির কোথায়?

কোটেশ্বরকে আমার দৃষ্টিতে কি দেখেছিলেন জানিনা। আমায় প্রশ্ন করলেন,—কি হয়েছে? প্রণাম করুন।

মাথা হেঁট করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম "সার্ত্ত মন্দির কোথায় হুজুর? সার্ত্তস্বামীর মন্দির?"

কোটেশ্বরজী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "এই তো।"

"এই নয়। এতো মাটনের ছোটো মন্দির। আমার সেই সার্ত্ত-স্বামীর মন্দির; সে কোথায়? সে তো মূর্তিপূজা নয়; সপ্তাশ্বরথবাহিত এ মূর্তি সার্ত্তমূর্তি নয়।"

কোটেশ্বরজী বললেন "কালীমূর্তি চান?"

"কালীমূর্তি? হাঁ এক কালী মন্দিরও ছিল, লক্ষিতাবিতা সেখানে পূজা পাঠাতেন। অবশ্যই সে মন্দিরে ঢুকার হুকুম পেয়েছেন। কিন্তু সে তো সার্ত্ত-মন্দির থেকে দূরে। সার্ত্ত মন্দির কোথায়?

বেদু ডাকছে। "চলে এসোনা। মন্দির দেখেই তর্ক আর কর। আমরা তো ঠিক ঠিক করে পেয়ার করলাম, পয়সা দিলাম, চলে এলাম। তোমার মতো বাই, কেবল কুলুজী খাঁচা। যৌদিকে হলো শুচিবাই, খুঁৎখুতে; তোমার মতো শুচিবাই দেখিনি আমি।

কোটেশ্বরের ছোটভাই, বুড়ো বাপ আর ছোট ছেলে, কোটেশ্বরই হবে। ওরা রাশি রাশি খাস এনেছে। ডাল, ভাত, ঘিয়ের সঙ্গে এক হুকুম শাকের ঝোল, ছানার ডালনা আর ক্ষীর। খাবার দেখে তো প্রণাম পড়লাম। খাবো কি করে? এই তো কুকরবাগে খেয়ে এলাম।

ওস্তাদ নেয়ে এই বেদু। খাবার ব্যাপারে বিবি মাথা গেলে। বলে,—"পাণ্ডাজী, এগুলো রেঁধে বুঝে নিয়ে যাই। রাতে খাওয়াটা জমবে। আপনি তো খাবেনই আর। বাসন নিয়ে আসবেন।"

পাণ্ডাজী খুব মনে রাজী হলেন।

বাসে চড়ার আগে কোটেশ্বরজী বললেন—"সময় আছে ঘণ্টা দুই? পাহাড়ের মাথায় একটা পুরানো ভাঙ্গা মন্দির আছে। যেতে পারতেন, সেই হচ্ছে আপনার চেনা মন্দির।"

"চেনা মন্দির? চিনা নয়, জানা। কিন্তু বাস তো থামবে না। আমি আবার আসবো। পাহাড়ের মাথায় মন্দির বললেন? একটা স্বর্গা আছে বড়? কালো পাথরের মন্দির?"

"হাঁ স্বর্গা আছে। বড়ো বড়ো পাথরের স্তূপ পড়ে আছে। পুরানো কালের দেবদেবিত মন্দির। মার্ত্তণ্ডের মন্দির এটাই।"

"কি হবে বলে? কবে ভেঙ্গে গেছে। সে কি আজ? এখন আর হিন্দু কেউ যায় না। সায়েবরা আর বাঙালীসাহেবের বাবুরা যায়। হিন্দুরা এই মন্দিরেই পূজা করে।"

কাশী বিশ্বনাথ, কৃষ্ণাবনের গোবিন্দজী, গোপীনাথজী, মদনমোহনজী, চিতোরের মীরার মন্দির—সবেরই আজ এই দশা। পুরাতন পরিত্যক্ত; নূতন নৌধে দেবতা প্রতিষ্ঠা। নূতন দেবতা কি হয়? দেবতা তো চিরকালের। পাথর ভেঙ্গেছে আলাউদ্দিন, সিকন্দর বুতশিকন, আউরঙ্গজেব; দেবতা কি ভাঙতে পেরেছে?

এবারে ছোলোনা। বাস ছেড়ে দিলো। এবার পহলগাম।

এবার উঠছি পাহাড়ের বলয়ে বলয়ে ঘুরপাক খেয়ে। শ্রীনগর-পাহালগাম মোটর পথ খুব প্রশস্ত পথ। অনবরত নানা মডেলের গাড়ী উঠছে নামছে। খানিক ওঠার পরই সাক্ষাৎ পেলাম লীদারের। পাহালগাম থেকে শেষনাগ পর্যন্ত ভূমি তাদের জীবনদান গাইছে এই কলনাদিনী নদী। লীদারের সৌন্দর্যের কথা আগে শুনেছিলাম। মোটর পথের পাশে পাশে লীদারের নালায় জল রেখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একধারে পাহাড় উঠে গেছে। দেওদার আর চীড়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে ছোটছেলের সন্ধ্যার ঘুমঘর মতো মিষ্টি ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম। মনে হয় সমস্ত পাখির আজব এই গ্রামগুলো।

মোটর আর থামছে না। চলছে। কনভয়টার বড় অংশ চলে গেছে। আমাদের অংশটার চারখানা গাড়ী উঠছে। বিকেল হয়ে এসেছে। লীদারের আসল অন্তর্বাহিকা নীচে গভস্তলে দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে পথ গেছে। কাশ্মীরী কুলীরা কাজ করছে কাজের ভুলে। মেরামতের কাজ। বাস চলেছে ঘুলোর বস্তা আকাশে উড়িয়ে। এবার লীদারের বক্ষরূপ চোখে পড়লো। গর্জনে, আস্ফোটে, আস্ফালনে লীদার যেন নিজের লেজ পাখিয়ে নিজে আছাড় খাচ্ছে। কুঁদিয়ে গর্জিয়ে বিত্ত করিয়ে কামদা বৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ। লীদার মিশে মিশছে ঝিলমে—সাঙ্গিপুরে। লীদার আর ঝিলম, এই দুটীই ঝিলম-বক্ষার যমুনা আর গোম। কয়েকটী যুবা এবং একটি মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। ছোটো ছোটো ঘোড়ার চক-চকে জীন। অপর দিক থেকে ওরা আসছে। পহলগামে ঘোড়ায় চড়ার প্রচলন খুব। ঘণ্টায় চার পাঁচ আনায় ঘোড়া পাওয়া যায়। খুব বেশী চড়া হলে সময়ে আট নয় আনা ওঠে। এদের ঘোড়ায় চড়া দেখে বুঝলাম শহরের কাছে এসে গেছি।

সমস্ত গা চুল মাথা ধুলায় ভরে গেছে। স্নানের জন্য ব্যস্ত হয়েছি। খুব বেশী ঠাণ্ডা নয়। এমন কি শিমলার মতোও নয়। বাজারের মধ্যে এসে বাসষ্ট্যাণ্ডে বাস দাঁড়াতেই প্রথম জিজ্ঞাসা—কোথায় থাকবো। জগজীবন ওস্তাদ। খবর আগেই সমস্ত আয়োজন বিচূর্ণ করে স্নানাভাব ঘটেছে। আমায় অবিলম্বে যেতে হবে অফিসে। কাউন্সিল বসেছে।

(ক্রমশঃ)

P G A
COMMON-ROOM

শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চতুর্বিধ শিক্ষা

শ্রীচারুপদ ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে প্রচলিত শারীরিক প্রাণিক আত্মরিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলির মধ্যে আমরা শারীরিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিয়াছি এবং বর্ত্তমানে অন্য তিনটি শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে সকল রকম শিক্ষার মধ্যে মানসিক শিক্ষাই সর্ব্বজন, পরিচিত, যদিও দুই একটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত এই শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং নানাবিধ দোষে পূর্ণ। শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ মানসিক শিক্ষার কথাই বুঝিয়া থাকি।

মনের প্রকৃত শিক্ষা যাহা মানুষকে উচ্চতর জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে তাহার প্রধান পাঁচটি ধারা লইয়া। সাধারণতঃ ইহারা ক্রম-পরম্পরায় আসিলেও, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহারা পূর্ব্বে কিম্বা পরে অথবা একত্রেও আসিতে পারে।

ঐ পাঁচটি ধারার বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে :—

১। একাগ্রতার শক্তি ও মন সংযোগের সামর্থ্য বৃদ্ধি।

২। প্রসার, ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য্যদায়ক বৃত্তিসমূহের অনুশীলন

৩। একটি মূলভাব বা উচ্চতর আদর্শ কিম্বা একটা পরম জ্যোতির্ময় লক্ষ্য যাহা আমাদের জীবনের দিশারী হইবার উপযুক্ত, এবং এইগুলিকে ঘেরিয়াই আমাদের সমস্ত চিন্তা সুসংবদ্ধ করা।

৪। চিন্তা নিরোধ, অবাঞ্ছিত চিন্তাবলী বর্জ্জন, যাহাতে আমরা যাহা চাই তাহা সুষ্ঠিকভাবে চাহিতে পারি।

৫। মানসিক নিস্তব্ধতা, পূর্ণ প্রশান্তি, সত্তার উর্দ্ধলোক হইতে আগত প্রেরণা ধারণের ক্রমবর্দ্ধমান ধারণ সামর্থ্য।

মনের ধর্ম্ম জ্ঞান-অর্জ্জন, কিন্তু জানা হইল মানসিক ক্রিয়ার একটি দিক মাত্র এবং ইহার আর একটি দিক হইল মনের নির্দ্ধারণ বৃত্তি, অধিক না হইলেও মনের এই দুইটি দিকই সমান প্রয়োজনীয়। বৃত্তি অর্থাৎ যে বৃত্তি রূপ দেয় এবং পরিমাণে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। বিশেষ মূল্যবান হইলেও মানসিক ক্রিয়ার এই দিকটি আমরা কদাচিৎ সম্যক্ অধ্যয়ন এবং অনুশীলন করিয়াছি। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা তাহাদের মনের বৃত্তির উপর সম্যক কর্তৃত্ব চায়, কেবলমাত্র তাহারাই রূপদ বৃত্তিতে পর্য্যবেক্ষণ এবং সু-নিয়মিত করিবার কথা ভাবিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় চেষ্টা করিলেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে অনন্ত বিপুল বাধা তাহাদের প্রচেষ্টার অন্তরায়। এইরূপ হইলেও এইরূপ স্থায়ী বৃত্তির সংযম এবং আত্মানুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে এবং এইগুলি ব্যতীত মনের উপর কর্তৃত্ব অসম্ভব। জ্ঞান অর্জ্জনের দিক হইতে দেখিলে সকল রকম চিন্তাই গ্রহণযোগ্য এবং এইগুলিকে সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য ; কারণ সমৃদ্ধতর এবং জটিলতর হওয়াই সমন্বয়ের ধর্ম্ম।

কর্ম্মের জন্য প্রয়োজন ইহার বিপরীত দিক—কিরূপভাবে কর্ম্মের রূপ দিতে হইবে তাহার উপর রাখিতে হইবে সম্যক দৃষ্টি। মানস সমন্বয়ের ভিত্তির মূল ধারাটির সঙ্গে মিলমিশ রাখিয়া চলিতে পারিবে সে সমস্তগুলি, কেবলমাত্র সেইগুলিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন ভাব মানস চেতনায় প্রবেশ করিবে তাহাকে তখনই, কেন্দ্রীয় ভাবটির সামনে আনিয়া ধরিতে হইবে এবং যে সকল ভাব ইতিমধ্যে সংগৃহীত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যদি তাহার প্রয়োজন হয় তবেই

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

এই ভাবনা সমন্বয়ের মধ্যে সে স্থান পাইবে এবং এইরূপ না হইলে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, যাহাতে কর্ম্মের উপর সে প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে। কর্ম্মের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব চাহিলে মনঃসংযম এই প্রক্রিয়া নিয়মিত ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে। এই অভ্যাসটি আয়ত্ত হইয়া গেলে কাজ কর্ম্মের মধ্যেও আমরা আমাদের চিন্তাবলীর উপর

কর্তৃত্ব রাখিতে পারিবে এবং আমাদের কাছের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় এমন চিন্তা স্থান পাইতে পারিবে না।

একাগ্রতা এবং মনঃসংযোগের সামর্থ্য নিয়ত অভ্যাস করিলে, বহিশ্চেতনার কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় চিন্তাবলী এবং পরিবেশে প্রয়োজনীয় চিন্তাবলী অধিক সচিত এবং ফলপ্রদ হইয়া উঠিবে। একাগ্রতাকে তীব্রতর করিতে পারিলে, কোন চিন্তাই থাকিবে না, এবং মনের উদ্ভাবন বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং এইরূপে পৌঁছান যায় একটি অখণ্ড নিস্তব্ধতায়। এই নিস্তব্ধতায় নিজেকে উন্নত মানব লোক সকলের দিকে খুলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং উহান হইতে যে সব অনুপ্রেরণা আসে, সেখান হইতে উহাদিগকে নিশ্চিন্ত করা যায়।

এতদূর না হইলেও নীরবতা এমনিতেই পরম উপকারী; যাহাদের মন কিছু পরিণত এবং সক্রিয় তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই মনকে বিশ্রাম দিতে জানে না। দিনের বেলায় মনের চিন্তা আমরা অনেকটা শাসনে রাখিতে পারি; কিন্তু রাত্রে শরীর নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে, জাগ্রত অবস্থার শাসনটির লেশ মাত্রও থাকে না এবং মন তখন অত্যধিক অনাসক্ত চিন্তায় মাতিয়া উঠে। ইহার পরিণামে হয় উত্তেজনা, ক্লান্তি এবং মানসিক চিন্তার ভার।

মনের আমাদের অন্যান্য অংশগুলির মত মনেরও বিশ্রাম চাই এবং মনকে বিশ্রাম দিবার উপায় জানা থাকিলে, মন কোন সময়েই বিশ্রাম পাইবে না। মনকে কি ভাবে বিশ্রাম দিতে হইবে তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন এবং মনের সব চেয়ে ভাল বিশ্রাম হইল নীরবতায়। অনেক ঘণ্টা-ব্যাপী নিষ্ফল অপেক্ষা কয়েক মিনিট নিষ্পন্ন নীরবতায় কাটাইলে, মন অনেক বেশী বিশ্রাম লইতে পারে।

উত্তেজনার মধ্যে চিন্তা বিশৃঙ্খল এবং অক্ষম হইয়া পড়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে আলো প্রকাশ হয় এবং মনেরও নূতন নূতন সামর্থ্যের সন্ধান খুলিয়া যায়।

প্রাণের শিক্ষা—

সকল রকম শিক্ষার মধ্যে প্রাণ সত্তার শিক্ষাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। একটি সম্পূর্ণ জ্ঞান ও পদ্ধতি ধরিয়া এই শিক্ষাটিকে খুব কমই অনুসরণ করা হইয়াছে। অথচ ইহার অজস্রগুলি কারণ আছে। প্রথমত এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত ভিন্ন এবং দ্বিতীয়তে আমরা অতীব দুরূহ। ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

প্রাণ আমাদের স্বভাবের বৈচারাচারী প্রভুত্বকামী অত্যাগ্রহী রাজা। প্রাণের মধ্যে আছে সামর্থ্য শক্তি উৎসাহ, কার্যকরী সক্রিয়তা এবং এই কারণে অনেকেই তাহাকে সমীহ করিয়া চলে এবং সর্বদা তাহাকে খুশী রাখিতে চেষ্টা করে। প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না এবং প্রাণের দাবি দাওয়ারও কোন সীমা থাকে না। প্রাণের আধিপত্যের পশ্চাতে দুইটি সু-প্রচলিত ধারণা দুর্বহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল মানব জীবনের লক্ষ্য সুখী হওয়া এবং অন্যটি এই যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট স্বভাব লইয়া। এই স্বভাবের পরিবর্তন অসম্ভব।

প্রথমটি একটি সত্যের সত্যের কথা বিকৃতি। কারণ সত্যটি হইল এই যে, সমস্তই রহিয়াছে আনন্দের উপর এবং সেই আনন্দ ব্যতীত জীবনের কোন অস্তিত্বই নাই।

সুখী হওয়া আমার জন্মগত অধিকার—এই মূঢ় প্রত্যয় হইতে কার্যকারণ সূত্রে এই ধারণা জন্মিয়া থাকে যে, যে কোন উপায়ে বাঁচিতে হইবে। অজ্ঞান আত্মার এবং আত্মপ্রসারী অহমিকার এই মনোভাব হইতে যত দুঃখ ও সংঘর্ষ, নিরাশা ও হতাশা এবং পরিণামে একটি বহুতী বিষণ্ণতার কারণ হইয়া থাকে। পৃথিবী আজ যে অবস্থায় পতিত তাহাতে ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য সুখ এবং সুবিধা নহে। ইহা হইল প্রত্যেকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সত্যময় চেতনার ঊর্ধ্ব-চিত্তের সন্ধিৎ জাগিয়ে তোলা।

দ্বিতীয়টির মূলে এই সত্য যে স্বভাবের আমূল রূপান্তর করিতে হইলে প্রয়োজন অবচেতনার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যাহা কিছু অবচেতনা হইতে আসিয়া থাকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ।

প্রাণিক শিক্ষার প্রধান দুইটি দিক :—দুইটীর প্রকৃতি এবং লক্ষ্য অনেক তফাৎ হইলেও, দুইটিই সমান মূল্যবান। প্রথম হইল ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ সাধন এবং ব্যবহার। দ্বিতীয় নিজের প্রকৃতি জানা এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করা ও তাহাদের রূপান্তর সাধন। ইহার পরের বিষয় হইল প্রাণের শিক্ষার দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ স্বভাব ও তাহার রূপান্তরের বিষয়।

সাধারণতঃ প্রাণের শিক্ষা তাহার তুষ্টি এবং তাহার উপর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রণালী প্রচলিত আছে তাহাদের মূল হইল নিগ্রহ, দমন, কৃচ্ছ্রতা এবং তপস্যা। এই পথগুলি সরল এবং আশু ফলদায়ী কিন্তু গভীর ভাবে দেখিতে গেলে এইগুলি নিম্নানুগত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষার অপেক্ষা কম স্থায়ী ও কম ফলদায়ক। অধিকন্তু এই উপায়ে প্রাণের সম্মতি, সাহায্য এবং সহযোগের সকল সম্ভাবনা দূরে চলিয়া যায়—অথচ সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্তির জন্য এই সহযোগের একান্ত প্রয়োজন। নিজের ভিতরে গতিধারা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং দেখিয়া চলা যে আমরা কি করিতেছি—ইহাই হইল অপরিহার্য আরম্ভ।

সমস্ত স্থির হইলে পরাজয়কে কখনও চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া না লইয়া ক্রমাগত লাগিয়া থাকাই এই বিষয়ে একমাত্র করণীয়। এইরূপ ক্রমোন্নত অনুশীলন দ্বারা মাংস পেশীর মতই ইচ্ছাশক্তির পুষ্টি এবং বৃদ্ধি সাধন করিতে হয়। চেষ্টার দ্বারাই সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে কঠিনতর ক্ষেত্রে আমরা নিজেকে নিযুক্ত করিতে শিখি।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে প্রথমেই প্রয়োজন নিজের স্বভাব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান এবং ইহার পর নিজের সকল বৃত্তির উপর কর্তৃত্ব। তাহাতে যে সমস্ত জিনিষগুলির রূপান্তর সাধন করিতে হইবে, সেই গুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আনিয়া ঐগুলির রূপান্তর সাধন করিতে হইবে।

আমাদের ভিতরে প্রাণ হইল বাসনা কামনার, উৎসাহ ও উগ্রতার

সক্রিয় শক্তি ও নিরাকার চৈতন্যের মতাবেশ ও বিস্ফোরক কেন্দ্র। প্রাণ সমস্ত কিছুই সকল করিতে এবং সৃষ্টি করিতে পারে। সকল কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে এবং সকল কিছুই ধ্বংস এবং নষ্ট করিতে পারে। মানব সত্তার এই অংশটিকে সুলিক্ষিত করা সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য।

শরীর ও প্রাণ :—প্রকৃতপক্ষে শরীরের কাজ আবেগ করা নয়। আবেগ মানিয়া চলাই শরীরের ধর্ম। শরীর স্বভাবতই নিজীব বিষয় সেবক। দুঃখের বিষয় এই যে শরীর মন এবং প্রাণের বিষয়ে সঠিকভাবে যাচবিচার করিতে পারে না। শরীর নিজের স্বাস্থ্যহানি করিয়াও মন এবং প্রাণের সেবা করিয়া যায়। প্রাণ তাহার আবেগ আতিশয্য এবং অপচয় দিয়া শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সুষমা অচিরে নষ্ট করিয়া অবসাদ ক্লান্তি এবং ব্যাধি আনিয়া দেয়। শরীরকে এই অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিতে গেলে একমাত্র চৈত্য পুরুষের সহিত নিত্য সংযোগ দ্বারা ইহা করা সম্ভব হয়। শরীরের সকল অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিবার আশ্চর্য শক্তি এবং সহ্য করিবার একটি আশ্চর্য শক্তি আছে। শরীরের এমন কাজ করিবার যোগ্যতা আছে যাহা আমাদের কল্পনাতীত। এই সমস্ত অযথা বৈরাচারী প্রভুত্বের পরিবর্তে আমাদের সত্তার কেন্দ্রীয় সত্তা যদি তাহাকে পরিচালনা করে তাহা হইলে শরীরের কাজ করিবার আশ্চর্যজনক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের পূর্ণতার লক্ষ্যস্থানে উঠিলে আমরা দেখিব যে আমরা চলিতেছি যে সত্যের সন্ধানে তাহার প্রধান চারিটি দিক :—যথা প্রেম, জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য। সত্যের এই চারিটি গুণই আমাদের জীবনে এক সঙ্গে প্রকাশ পাইবে। চৈত্য পুরুষ হইবে যথার্থ বিশুদ্ধ প্রেমের বাহন, মন অভ্রান্ত জ্ঞানের, প্রাণ প্রকাশ করিবে অপ্রতিহত শক্তি এবং তেজ, শরীর প্রকাশ করিবে এক আনন্দ সৌন্দর্য এবং সুসঙ্গতি।

অন্তরাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা :—যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্ম লাভ হয় এবং যে রকম শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অনুসারেই মানুষ তাহার আরাধ্য আদর্শ বা পরম তত্ত্বকে নানা নামের বসন পরায়। অভিজ্ঞতা সর্বত্রই এক—অবশ্য তাহা যদি হয় আন্তরিক। পার্থক্য আসে শুধু ব্যাখ্যা দ্বারা, নিয়ম প্রত্যয় এবং মানসিক শিক্ষা অনুযায়ী ব্যবহৃত প্রত্যেক ভাষার শব্দে এবং বাক্যে।

ব্যক্তির জন্ম রহস্য এই যে সকল সৃষ্টির আদি উৎস অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে একটি সূত্র ধরা দেয় ; এক অদ্বিতীয় এবং বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের সাহায্যে আপনাকে দেহ কাল ইত্যাদি সকলের মধ্যে নিক্ষেপ করিল, যাহা নিয়ম বা যাহা সত্তার মধ্যে নিজেকে গুপ্ত ঘনীভূত করিয়া ধরিল এবং এই রকম একটা রূপ সৃষ্টির ধারায় হইয়া উঠিল তাহার অন্তর, আত্মা বা চৈত্য পুরুষ।

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে সঙ্গোপনে একটি উর্ধ্বতর চেতনার সম্ভাবনা—যে চেতনা বর্তমান সমস্ত সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যায় একটী উচ্চতর পরিবেশের জীবনে, এবং এই চেতনাই চালনা করে সমস্ত বিশিষ্ট মানবের জীবন। ইহাই নির্দেশ করে মানব জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী এবং এই সবের প্রতি তাহার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াবলী। মানবের মানব চেতনা যাহা জানেনা বা করিতে পারে না, এই চেতনা তাহা জানে এবং করিয়া থাকে।

এই চৈত্যপুরুষের ভিতর দিয়াই মানুষ মানুষের সত্তা-মানুষকে, মানুষের বাহ্য অবস্থাবলীকে স্পর্শ করে। এই চৈত্য পুরুষ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কাজ করিয়া চলে অজানা অচেনা হইয়া পর্দার অন্তরাল হইতে। কেহ কেহ এই চৈত্য পুরুষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে এবং তাহার ক্রিয়াও করিতে পারে এবং ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র কয়েকজন তাহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করে এবং এই সমস্ত ব্যক্তির নিকটেই চৈত্য পুরুষ পূর্ণরূপ ধরা করে। এই কর্তৃত্ব লাভের জন্য চৈত্য সত্তার চেতনায় সচেতন হইয়া উঠিবার জন্য আন্তরিক শিক্ষার অনুশীলন প্রয়োজন। ইহার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন ব্যক্তিগত সংকল্প। অটল সংকল্প, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অকাট্য অধ্যবসায় লইয়া এই পথে অগ্রসর হইতে হয়।

এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে এমন একজনকে প্রয়োজন হয় যিনি অনুরূপ প্রচেষ্টার পূর্বেই সফলতা লাভ করিয়াছেন, যিনি এই পথ-গামী পথিককে সাহায্য করিতে পারেন, এবং পথের সন্ধান দিতে পারেন। ইহা হইলেও এমন সাধকও আছেন যাঁহারা একলা চলিতে চান। এইরূপ ব্যক্তিগণের জন্য দুই একটি সূত্র কার্যকরী হইতে পারে। প্রথমে নিজের ভিতরে অন্বেষণ করে সেই বস্তুর—যাহা দেহের জীবনের বাহ্য অবস্থার অধীন নয়, যে মন আমরা পাইয়াছি, যে ভাষায় আমরা কথা বলি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে (অর্থাৎ আচার ব্যবহার ইত্যাদি) চলে আমাদের জীবন এবং যে দেশ এবং যুগের সঙ্গে সংযুক্ত তাহা হইতে তাহার জন্ম নয়। নিজের সত্তার মধ্যে গভীর ভাবে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহাকে, যে মিটে পারে আমাদিগকে একটা বিশ্বব্যাপ্তি, একটা সীমাহীন প্রসারের অনুভূতি, একটা অন্তহীন স্বাধিনের উপলব্ধি। এইখানে আরম্ভ হয় সকল জীবের মধ্যে, সকল জিনিষের মধ্যে ঐক্য ধারণ, যে সমস্ত বাধার প্রাচীর মানুষকে পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে এইখানে তাহারা খসিয়া পড়ে। এই সময় অন্যের চিন্তা হয় আমার চিন্তা, অন্যের অনুভবে আমার অনুভূতি, অন্যের হৃদয় বৃত্তি আমার হৃদয় স্পন্দিত, সব কিছুর জীবনেই আমি জীবন্ত। যাহা কিছু ছিল অসার তাহাই হইয়া উঠে প্রাণবন্ত, পাষাণে জাগে স্পন্দন, গাছ পালা অনুভব করে, ইচ্ছা করে এবং মুখর পাখি, পশুরা কথা বলে অল্প বিস্তর যদিও অপরিণত অথচ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় কালহীন সীমাহীন এক অপরূপ চেতনা সমস্ত কিছুকেই প্রাণবন্ত করিয়া রাখে। অন্তরাত্মিক সিদ্ধির এইগুলি হইল একটি দিক মাত্র। ইহা ব্যতীত ইহার আরও অনেক দিক আছে। মন দিয়া আধ্যাত্মিক জিনিষের বিচার করা সম্ভব নয়। যোগ সাধনা সম্বন্ধে যাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারা সকলেই এই কথা বলিয়াছেন। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে সকল রকম মতামত সকল রকম মানসিক ক্রিয়া বর্জন

করা একেবারে অসম্ভবিহীন। এই পার্থে কখনও বিচ্ছিন্ন, উদ্ভূত বা সম্ভব হইতে নাই।

এই অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে ভিতরের একটা দুয়ার যাইবে খুলিয়া যাইবে এবং দেখিতে পাওয়া যাইবে নিজের প্রদীপ্ত জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে, যাহা আনিয়া দিবে অমৃতের নিশ্চয়তা এবং এই উপলব্ধি—যে অন্ধকার হইতে চিরদিন আসিয়াছি সে অন্ধকার নয়, সে আলোকের অন্তরালে। মানুষের মূল আকারেরই বিকাশ হয়। মানুষের মূল বস্তুগুলি জীবধর্ম, তাহাদের ফেলিয়া দিতে হয়। তথাপি এই মূল ভোগের সকল রকম দাসত্ব হইতে মুক্তি, সকল রকম ব্যক্তিগত আসক্তি হইতে মুক্তিই পরম সিদ্ধির। লক্ষ্যস্থল হইতে আরও অনেকখানি পথ অতিক্রম করিতে হইবে। সোপানের পর সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া অতিমানসের উদ্ভুক্ত দুয়ারে পৌঁছিতে হইবে এবং এই শেষের সোপানগুলির মানই আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

অধ্যাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে তফাৎ করা প্রয়োজন এই জন্য যে সময় সময় এই দুইটি একটি সাধারণ যোগ সাধনার নামে মিশাইয়া ফেলা হয়, যদিও দুইটির লক্ষ্য ভিন্ন। একটি পৃথিবীর উপর অমরত্ব সিদ্ধি, এবং অন্যটি পলাইয়া যাইতে চায়, সকল পার্থিব সৃষ্টি হইতে, এমন কি বিশ্ব তৃষ্ণাও ছাড়াইয়া পলাইয়া যাইতে চায়ে অবাক্তের মধ্যে।

অধ্যাত্মিক জীবন, অমর জীবন, অন্তরীন কাল, সীমাহীন দেশ, চিদ্-রূপান্তর পরিবর্তন, এই রূপময় বিশ্বের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন অতিপ্রবাহ। আধ্যাত্মিক চেতনা চাহে মনস্ত এবং শাশ্বতের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করা। অন্তর আত্মাকে জানিবার জন্য, অন্তর আত্মার জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজন বিশ্বের মধ্যে সকল অভিব্যক্তির বিলোপ। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য চাহে চাহে অন্তর্মুক্ত।

যে মুক্তি পৃথিবীর কোন পরিবর্তন আনে না, যে সমস্ত কারণে মনুষ্যে কষ্ট পায় তাহার কিছুমাত্র অপনোদন করে না, তাহা এমন ব্যক্তিকে তৃপ্তি দিবে কি করিয়া যাহারা অন্যকে না দিয়া কেবলমাত্র নিজেরই কাছে পঁহুছিতে যে মন তাহা বলিয়া ক্ষোভ করিতে চায় না, যাহারা অন্ধ হেসে যে আমাদের চতুর্দিকে পৃথিবী যত বিপুলভাবে যত দুঃখ বৈচিত্র্যই হোক না কেন তাহা হইয়া উঠিবে পৃথিবীর অন্তরালস্থিত মহিমার ঘোষণা ভূমি। তাহারা চাহে তাহাদের এই অন্তর্দর্শনের আবিষ্কার থেকে অন্যরাও যেন লাভবান হইতে পারে।

এই রূপময় জগতের ওপার হইতে আহ্বান করা যাইতে পারে এক নূতন শক্তিকে, এক অদ্ভুতপূর্ব চেতনা শক্তিকে—যাহা আসিয়া ঘটনার ধারা পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিবে এবং এক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবে।

দুঃখ কষ্ট সমস্যার ; অজ্ঞতা ও মৃত্যু সমস্যার যথার্থ সমাধান পার্থিব দুঃখ যন্ত্রণাবলীর বাহিরে। এক অবাক্তের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়াতে নয়, দুঃখ থেকে সম্পূর্ণভাবে পলায়নে নয়—ইহা যতদূর সম্ভব তাহা সম্পূর্ণ অলক। এই পলায়ন সমস্যাকে, সৃষ্টির একেবারে ফিরিয়া যাওয়া তাহার স্রষ্টার কাছে। ইহা হইল সৃষ্টিকে বিলোপ করিয়া দিয়াই তাহার সংস্কার।

প্রয়োজন একটা রূপান্তর—অর্থাৎ জড়ের পুনরুদ্ধার। তাহা আনিবে প্রকৃতির প্রগতির মধ্যে যে একটা ঊর্ধ্বগতি পূর্ণতার দিকে তাহারই যুক্তিযুক্ত পরিণতি দিয়াবে। তাহা আনিবে এক নূতন ধরণের জীব সৃষ্টির দ্বারা—যাহার সহিত মানুষের পার্থক্য হইবে, মানুষের এবং পশুর মধ্যে যতখানি, যাহা এই পৃথিবীর উপর প্রকাশ করিবে এক নূতন শক্তি, নূতন চেতনা এবং নূতন সামর্থ্য।

এইরূপে আরম্ভ হইবে একটি নূতন শিক্ষা, যাহার নাম হইবে অতিমানস শিক্ষা। ইহার সর্বপ্রথম প্রভাব কেবলমাত্র যে ব্যক্তি চেতনার উপর ক্রিয়া করিবে তাহা নহে, যে পদার্থ দিয়া সে তৈয়ারী—যে পার্থিব-পার্থিবীর মধ্যে তাহার জীবন তাহার উপরও ইহার ক্রিয়া হইবে।

অতিমানস শিক্ষা হইবে না শুধু মানুষী প্রকৃতির একটা রূপগতি। তাহার মূল বৃত্তিসমূহের বর্দ্ধিষ্ণু উন্নতি ; হইবে সমস্ত প্রকৃতিরই একটা রূপান্তর ; সত্তার আমূল পরিবর্তন। এই উদ্ভবন—অতিমানসের দিকে যাহার শেষ পরিণাম পৃথিবীর উপর শেষ জাতির আবির্ভাব।

(On education হইতে অনুবাদ)

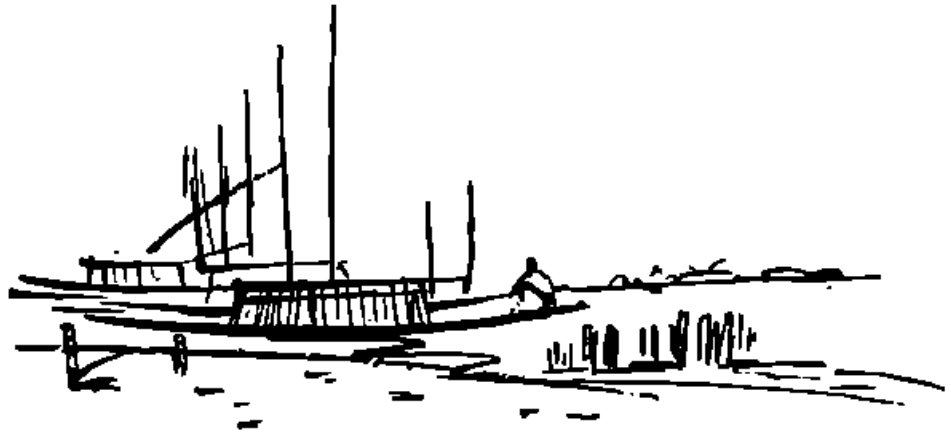

বাড়ীর কর্ত্তা

(Tchehov-এর "The Head of the family" গল্পের অনুবাদ)

শ্রীকল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য

সাধারণতঃ তাসখেলায় খুব বেশী রকমের হেরে যাওয়ার পর অথবা খুব মদ খেয়ে যখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আরম্ভ হ'ত, তখন স্টিপানিচ্‌ বিলিন অস্বাভাবিক রকম বিষণ্ণ মনে ঘুম থেকে উঠত। এলোমেলো চুলে তাকে তখন অত্যন্ত বিরক্ত মনে হ'ত। তা'র পাংশুমুখে এমন অসন্তোষের ছাপ লেগে থাকত যেন কোন কিছুতে সে খুব মনঃক্ষুণ্ণ অথবা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে জামা-কাপড় পরে সে ইচ্ছে করে ডিসির জলে * চুমুক দিয়ে ঘরের চারদিকে পায়চারী করতে আরম্ভ ক'রত।

আলখাল্লাটা নিজের চারপাশে জড়াতে জড়াতে এবং সশব্দে থুথু ফেলতে ফেলতে সে বিড়বিড় করে ব'কত —"আমি জানতে চাই কোন্ জানোয়ার এখানে এসে দরজা খুলে রেখে চলে যায়।"

—"নিয়ে যাও ঐ কাগজটা। ওটা এখানে পড়ে আছে কেন? কুড়িজন চাকর পুষছি, অথচ জায়গাটা ভাঁটিখানার চেয়েও বেশী নোংরা হয়ে রয়েছে। আঃ! কোন্ হতভাগা আবার ওখানে ঘণ্টা বাজাচ্ছে?"

—"ওখানে এ্যান্‌ফিসা, যে ধাই-মা আমাদের ফেডিয়াকে জগতে এনেছিল।"—ওর বৌ উত্তর দেয়।

—"এই সব হতভাগা আদর দেওয়ার লোকগুলো কি সারাদিন ঘুরে বেড়াবে?"

—"স্টিপানিচ্‌, ওকে এখন বার করে দেওয়া যায় না। তুমি নিজে ওকে চেয়েছিলে, এখন তুমিই ওকে বকছ।"

—"না, না আমি মোটেই বকছি না,আমি শুধু বলছি। তুমিও ত কোলের ওপর হাত রেখে ঝগড়া করার চেয়ে না খুঁজে কিছু কাজ করতে পার। আমার কথা হচ্ছে, মেয়েরা আমার বুদ্ধির বাইরে; সত্যি তাদের কিছুতেই বোঝা যায় না। কি ভাবে যে তারা সারাটা দিন কিছু না করে নষ্ট করে? পুরুষ মানুষকে ত ষাঁড়ের মত, জানোয়ারের মত কাজ করতে হয়—অথচ তার বৌ, যে তার জীবনের সহধর্ম্মিণী সে সুন্দর পুতুলের মত বসে থাকে এবং কিছু না করে শুধু সুযোগ খোঁজে সময় কাটানোর জন্য, স্বামীর সঙ্গে কি করে ঝগড়া করা যায়। ওগো, ইস্কুলের মেয়েদের মত চলা এখন ছাড়তে হবে। তুমি আর এখন ইস্কুলের মেয়ে নও—তুমি এখন তরুণী নারী। তুমি বৌ হয়েছ। ছেলের মা এখন। তুমি আর আগের মত নও। আহা! এই রূঢ় সত্যটা শুনতে মোটেই ভাল লাগছে না, না?"

—"মজার ব্যাপার এই যে তোমার পিত্তারে যখনই গোলমাল দেখা দেয় তখনই কেবল তোমার মুখ দিয়ে রূঢ় সত্য বেরোয়।"

—"তা ঠিক।"

"তুমি বাইরে কি অনেকক্ষণ ছিলে, না তাস খেলছিলে?"

—"যদি আমি করি তা'তে কার কি? এটা কি অন্য কারোর ব্যাপার?"

—"আমি কি কাউকে আমার কাজের হিসেব দিতে বাধ্য? আমি মনে করি, এতে যে টাকা আমি নষ্ট করি

* ফ্রান্সের অন্তর্গত ভিসির প্রস্রবণের জল অনেক রোগ সারাতে পারে বলে প্রসিদ্ধি আছে।

তা আমার নিজের। যা' আমি খরচ করি এবং যা এই বাড়ীতে খরচ হয় সব আমার—আমার। কানে যাচ্ছে কি আমার কথা ?"

এই এক ভাবে সব কিছু চ'লল।

কিন্তু খাওয়ার টেবিলে সব লোকের মাঝখানে ষ্টিপানিড্‌কে যে রকম কঠোর, যুক্তিবাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলে মনে হ'ল—সে রকম আর অন্য কোন সময়ে নয়। সেটা আরম্ভ হ'ল ঝোল পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে। এক চামচে ঝোল খেয়েই সে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে চামচে রেখে দিয়ে বলে উঠল—

—"দুত্তোর ছাই! আমাকে রেষ্টুরেণ্টেই খেতে হ'বে।"

তা'র বৌ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল, ঝোল কি ভাল হয়নি ?"

—"এই রকম রান্না-ঘর ধোওয়া জল কি খেলা যায় ? গন্ধ শুন এতে। ছেঁড়া স্থাকড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে এর থেকে —পেঁয়াজের গন্ধ না হয়ে ছারপোকার গন্ধ হয়েছে।"

ধাই-মাকে বলল, এ্যান্‌কিসা, এ খেতে গেলে সত্যি রাগ হয়ে যায়। সংসারের জন্য প্রত্যেক দিন আমার টাকা দেওয়ার শেষ নেই। নিজের সব কিছু ছেড়েছি—আর আমার খাওয়ার জন্য এদের কাছ থেকে এই পাচ্ছি।"

মিসেস্‌ট্রীটি আস্তে আস্তে সাহস করে ব'লল, "আজ ঝোলটা ত ভালই খেতে হয়েছে।" কটমট করে তাকিয়ে ফিলিন্ চেঁচিয়ে উঠল, "ও, তুমি তাই মনে কর নাকি ? অবশ্য সকলেরই নিজের নিজের রুচি আছে। এটা স্বীকার করতেই হবে ভ্যাসিলিভনা, যে আমাদের রুচি সম্পূর্ণ আলাদা—যেমন তুমি এই ছেলেটির ব্যবহারে খুব খুশী। (ফিলিন্ একটা বিশ্রী ভঙ্গী করে তার ছেলে কেডিয়াকে দেখাল)। তুমি একে নিয়ে খুব আনন্দে আছ, অথচ আমি—আমি একেবারে বিরক্ত—হ্যাঁ।"

সাত বছরের ছেলে কেডিয়া কাঁচুমাচু মুখে খাওয়া বন্ধ করে নিচের দিকে তাকাল। তা'র মুখটা আরও করুণ হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, তুমি সন্তুষ্ট আর আমি একেবারে বিরক্ত। আমাদের মধ্যে কে ঠিক তা আমি ব'লতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওর বাবা হিসাবে ওকে আমি তোমার থেকে ভাল রকম জানি। দেখ, কি রকম ভাবে ও বসে আছে। এই ভাবে কি কোন ভদ্র ছেলে-মেয়ে বসে ? ঠিক করে বস।"

কেডিয়া মুখ তুলে গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। তার মনে হচ্ছিল যে সে নিজে এবার আরও ভাল ভাবে বসেছে। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছিল।

"ঠিক করে চামচে ধরে খাও। দাঁড়াও পাজী ছেলে, তোমাকে দেখাচ্ছি। কাঁদতে পাবে না। সোজা তাকাও আমার দিকে। আহা! কান্না হচ্ছে আবার, তবে রে বদমাইস, কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।"

তা'র বৌ বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা, ও আগে খেয়ে নিক।"

"না, কিচ্ছু খাবে না। এই রকম শয়তান ছেলের কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।"

কেডিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেয়ার থেকে নেমে ঘরের কোণে গেল। সে তখনও বলে চলছিল, "ওতে কিছু হ'বে না। যদি তোমাকে কেউ মানুষ না করে, তাহ'লে আমি আরম্ভ ক'রব। তোমাকে দুষ্টু হ'তে দেব না। আর খাওয়ার সময় তুমি কাঁদতে পাবে না। বুঝেছ বুদ্ধু, তোমার কাজ তোমাকে করতে হবে। তোমার বাবাকে কাজ করতে হয় এবং তুমিও তা করবে। কুঁড়েমি করে কেউ খেতে পাবে না। তোমাকে মানুষ হতে হবে। হ্যাঁ—পুরো মানুষ।"

তা'র বৌ ফরাসী ভাষায় বলে উঠল,"ভগবানের দোহাই তুমি থামো। অন্ততঃ বাইরের লোকের সামনে আমাদের খুঁত ধরে বেড়িও না। ঐ বুড়ী সব কিছু শুনছে, আর ওর জন্য সারা সহরের লোক এখন তা শুনবে।"

ফিলিন্ রাশিয়ান ভাষায় ব'লল, "বাইরের লোককে আমি ভয় পাই না। আমি সত্যি কথাই বলছি। তুমি কেন মনে করছ যে আমি ঐ ছেলেটির ওপর সন্তুষ্ট হ'ব। তুমি কি জান—ও তোমার জন্য কত খরচ করাচ্ছে আমাকে। ওহে নোংরা ছেলে, তোমার জান আছে কি তোমার জন্য কত খরচ করতে হচ্ছে। তোমার ধারণা কি—যে আমি টাকা তৈরী করি ? না কিছু না করেই টাকা পাই ? চেঁচিও না, মুখ সামলাও বলছি। যা বলাই, তা কি কানে যাচ্ছে ? ওরে শয়তান, তুমি কি চাও চাবুক খেতে ?"

ফেডিয়া আরও জোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। তার মা টেবিল থেকে উঠে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল —"ওঃ অসহ্য! তুমি কখনও আমাদের শান্তিতে খেতে দেবে না। তোমার রুটি আমার গলায় আটকাচ্ছে।" চোখে রুমাল চেপে সে খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জোর জোরে হাসি ফুটিয়ে ঝিলিন্ বিড় বিড় ক'রে বলল, "এখন ইনি রাগ করেছেন। এঁর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। এই হয়ে থাকে এ্যান্‌ফিসা, আজকাল আর কেউ সত্যি কথা শুনতে চায় না।

ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে সবই যেন আমার দোষ।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল।

ঝিলিন্ চারিদিকে খাওয়ার থালাগুলোতে দেখল—কেউ কোন কিছু ছোঁয়নি। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে শিক্ষয়িত্রীর লজ্জিত ও অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। "ভ্যালিলেভ্‌না, তুমি খাচ্ছ না কেন? মনে হয় তুমি দুঃখ পেয়েছ। দেখছি সত্যি কথা বলা তুমি পছন্দ কর না। আমি মাপ চাইছি। এটা আমার স্বভাব। ওত হ'তে আমি কোনদিনই পারি না; সব সময় সোজা-সুজি সত্যি কথাই বলে থাকি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) দেখছি, আমার থাকাটাই কেউ পছন্দ করছে না। আমি থাকলে কেউ খেতে কিংবা কথা বলতে পারে না। বেশ, তোমার বললেই পারতে। আমি চলে যেতাম।"

ঝিলিন্ উঠে পড়ে গম্ভীর হয়ে দরজা পর্যন্ত গেল। ফেডিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ভয়ে কান্না থামিয়ে ফেলল। গম্ভীর মেজাজে ঘাড়টা পেছন দিকে হেলিয়ে ফেডিয়াকে বলল—"থাক তোমার ছুটি। তোমাকে মানুষ করার জন্য কখনও আর কিছু বলতে আসব না। সব কিছু ঘুচে ফেলছি। বাবা হয়ে তোমার কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা চাইছি—সত্যি তোমার ভালর জন্যই তোমার অভিভাবকদের বিরক্ত করতে গিয়েছিলাম। এই সঙ্গে শেষবারের মত তোমার ভবিষ্যতের সব কিছু দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি।

ফেডিয়া আরও জোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ঝিলিন্ দরজা খুলে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল। ঘুম থেকে ওঠার পর তার মনটা খচ্‌খচ্ করছিল। বৌ, ছেলে, এ্যান্‌ফিসা সকলের সামনে আসতেই তার লজ্জা করছিল। বিশেষ করে যখন খাওয়ার সময়কার ঘটনার কথা মনে পড়ল—তখন আরও খারাপ লাগছিল। কিন্তু তার আত্ম-মর্য্যাদাবোধ ছিল খুব বেশী। সব কথা খোলাখুলি বলার মত সাহস ছিল না বলে সে গোঙ্গ গোঙ্গ করতে লাগল।

পরের দিন সকালে উঠে তা'র মেজাজটা খুব শরীফ ছিল। মুখ ধোয়ার সময় সে আনন্দে শিস দিচ্ছিল। প্রাত-রাশের জন্য খাওয়ার ঘরে গিয়ে সে ফেডিয়াকে দেখতে পেল। বাবাকে দেখেই সে উঠে পড়ে অসহায়ের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

টেবিলে বসে ঝিলিন্ খুশী মনে বলে উঠল, বাঃ খোকা। কিছু বলবে আমাকে। শরীর ভাল আছে ত। আচ্ছা এদিকে এস ত সোনা, বাবাকে একটা চুমু খাও দিকি।

ভয়ে শুকনো মুখে ফেডিয়া বাবার কাছে গিয়ে কম্পিত ঠোঁটে তার চিবুক স্পর্শ করল, তারপর নিজের জায়গাটিতে গিয়ে কোন কথা না বলে বসে পড়ল।

প্রেম

[William Shakespeareএর XVIII সনেটের অনুবাদ]

শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায়

তব সাথে বসন্তের তুলনা কি করি?
আরও মনোরম তুমি, আরও অনুপম;
অশান্ত সমীরে কাঁপে (প্রিয়) মে-মাসের কুঁড়ি;
(আর) বসন্তের সাথে বাঁধা কালের নিয়ম।
কভু আতপের তেজ-হানে স্বর্গের নয়ন,
কভু তার কনককান্তি নিষ্প্রভ তিমিত।
বসন্তের নির্ম্মল স্বচ্ছতা কভু করেনা বরণ,
প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন গতি যবে হয় অবমিত;
কিন্তু তব অক্ষয় বসন্ত রহে চির অম্লান।
হারায়ে ফেলনা কভু তোমার মাধুর্য্য
তোমার গতিতে ফেলিতে পারেনা ছায়া মৃত্যু-সুমহান
স্বর্গীয় আনন্দধারা ব'য়ে আনে জীবনে ঐশ্বর্য্য;
যতদিন মানবের ব'হে শ্বাস জ্যোতি নয়নে,
তোমার অদম্যগতি জীবন স্পন্দন॥

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ স্তবক

পাদশার বেগম! মৃত্যুর পূর্বে শাহজাহান প্রায়ই যমুনার অপর তীরে তাজমহলের প্রতি অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কার প্রতীক্ষায় যেন আকুল হয়ে উঠতেন? অশ্রুধারা তাঁর দুই চোখ বেয়ে পড়ত। অস্তিমদিনে একবার হাত তরপদর স্পর্শন করে, আর একবার দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করে তাজমহলের দিকে তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন। পাদশাহ বেগম! তিনি তো বুঝেছিলেন, শাহজাহান চেয়েছিলেন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হউক।

শাহজাহান কল্পনা করেছিলেন, তাজবিবির সমাধির অপর পার্শ্বে যমুনার উঁচে পড়ে উঠবে তাঁর সমাধি; সে সমাধি হবে রক্তপ্রস্তর দিয়ে তৈরী। সেই রক্তপ্রস্তর হবে শক্তি সৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। অন্যদিকে তাজবিবির শুভ্রসৌধ ছিল যেন প্রস্তরনির্মিত—শুচি, সৌন্দর্য এবং শান্তির প্রতীক। এই দুই সমাধি মন্দিরের মিলন-সেতু হবে কৃষ্ণপ্রস্তর দিয়ে তৈরী। এই কৃষ্ণ প্রস্তর হবে মৃত্যুর প্রতীক। বাদশাহ আলমগীর সিংহাসনারোহণ করে রক্তপ্রস্তর দিয়ে সমাধিসৌধ নির্মাণ নিষেধ করে দিলেন। কারণ রাজধানীর মৃত্যুতে বিলাস শোভা পায় না।

হায়, পাদশার বেগম! তুমি আশঙ্কা করেছিলে—শাহজাহান জীবনে যে আড়ম্বর ও বিলাস উপভোগ করেছেন, মৃত্যুর দিনে যেন সেই আড়ম্বর ও বিলাস থেকে যেন তাঁকে বঞ্চিত না করা হয়। তাই তুমি শাহজাহানের পদাঙ্কানুসারে আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ে, তোমার ইচ্ছা ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান কর্মচারিগণ, আমীর ওমিরাহ সম্ভ্রান্ত, জ্ঞানী, গুণী উলেমা এবং আপামর প্রজাবর্গ পর পর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে; সর্বাগ্রে, সর্বশিরে তারা পবিত্রদেহের শোভাযাত্রার অনুগমন করবে—পথের দুই পার্শ্বে স্বর্ণমুদ্রা রক্ষিত এবং সকলের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কিন্তু তোমার সেই ইচ্ছা বাদশাহ আলমগীর পূর্ণ করতে দেন নি—রাত্রির অন্ধকারে দুর্গের পশ্চাদ্দেশের প্রাচীরের অতি সামান্য অংশ ভগ্ন করে বিনা আড়ম্বরে শব দেহ দুর্গের বহির্দেশে আনীত হল। সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকজন ঘোড়া কুচ্ছ। অতি সন্তর্পণে গভীর অন্ধকারে শবাধার তাজ মহলের বহির্ভাগে এসে প্রবেশ করল। পূর্বেই কাজী সমাধির আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই তাজবিবির সমাধির অপর পার্শ্বে শাহজাহানকে সমাধিস্থ করা হল। শাহজাদা সুলেমান বাদশাহ আলমগীরের প্রতিনিধিরূপে শবদেহের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন; তখন শব সমাধি প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

বুদ্ধিমান বাদশাহ আলমগীর আগ্রাবাসীর ধূমায়িত অসন্তোষকে বিরাট ভোজের দ্বারা দিয়ে শান্ত করেছিলেন। দরিদ্র প্রজা ভেবেছিল—বাদশাহ আলমগীর পিতার আত্মার কল্যাণে দান অর্থ বিতরণ করেছেন।

আমি চিন্তাই করে যাচ্ছিলাম—সমুদ্রের মত সীমাহীন আমার চিন্তার পরিধি—উন্মিমালার আবর্তের মত আমার চিন্তার স্রোত। তবে কি সবাই শাহজাদা আকবর পলাতক, নিরাশ্রয় মিরপাত? আজ তৈমুর বংশের দুর্বল—তাঁর পত্নী, কন্যা, পুত্র—তারা কি বাবর-শিকোহ পত্নীর মত শাহজাদা আকবরের দুর্বল হয়ে উঠবে?

আমি প্রতিদিনই বাদশা বেগমের পত্রের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি তৈমুর বংশের দুর্দিনে একমাত্র আশা? তবে কি তিনিও শাহজাদা আকবরকে পরিত্যাগ করেছেন? একদিন দলিলা বেগম শাহজাদা দলিল এবং বাদশাহ আকবরের মিলন সম্ভব করে মুঘল বংশকে রক্ষা করেছিলেন। বাদশাহ বেগম কি আর আলমগীরের সঙ্গে শাহজাদা ও আকবরের মিলনের চেষ্টা করবেন না? আমি নিরাশ হয়ে পড়লাম। পরক্ষণে একজন ঘোড়-সওয়ার দলিলগড় দুর্গদ্বারে এসে সিলমোহরাঙ্কিত চর্মপেটিকা রেখে গেল। সেখেই বুঝলাম সেই চর্মপেটিকা দুর্গের দায়োগার নিকট প্রেরণ করা হয়নি; —নিশ্চয় রাজবন্দিনীর কাছে বাদশাহের অনুমতি ভিন্ন পত্র কিংবা দ্রব্য আদান প্রদান নিষিদ্ধ। আমার কিন্তু কৌতূহল অতি সাধারণ একটি চৌপায়াধারে আমার সম্মুখে রেখে দিল। এই আমার জীবনে প্রথম চৌপায়ার ব্যবহারের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি চিরকালই স্বর্ণপাত্রে ব্যবহারে অভ্যস্ত। আজ যে আমি বন্দিনী; বাদশাহ আলমগীরের আদেশে বন্দিনীর পক্ষে রৌপ্যমূল্য, স্বর্ণপাত্রে ব্যবহার বিলাসমাত্র।

আমি কম্পিত হস্তে চর্মপেটিকা পরীক্ষা করে দেখলাম। পাদশাহ বেগমের মোহর পরীক্ষা করার দুঃসাহস কোন কর্মচারীরই ছিল না। আমার আদেশে তৎক্ষণাৎ মোহর-মুক্ত করে কয়েকখানি পত্র আমার হাতে তুলে দিল। প্রথম পত্রখানি ছিল পাদশাহ বেগমের স্বহস্ত-লিখিত।

জাহানারার পত্র :

"শাহজাদী জেব, তোমার আশঙ্কা উদ্বেগ নিরসন করবার মত আমি কোন সংবাদ পরিবেশন করতে পারছি না। পিতার অন্তর্ধানের সময়ে সিংহাসনের দ্বন্দ্বের সময়কার যে ঘটনা আমাকে মুহ্যমান করেছে। বহু ঘটনাই আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমার অনুরোধেই পিতা শাহজাহান পুত্র আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করেছিলেন, আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের অভিশাপ আজও আগ্রার প্রাসাদকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

বাদশাহ আলমগীর গুপ্তচরের নিকট থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন,

মাড়োয়ারের মুঘল সেনাপতি তাহওয়ার খানের রাজপুত রাণা রাজসিংহের সঙ্গে গোপনে সংবাদ আদান প্রদান করছেন। কয়েকদিন পূর্বে বাদশাহ আলমগীর হিন্দুর উপর জিজিয়া-কর পুনঃস্থাপন করেছিলেন। অপরাধ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীর প্রতি আচরণে সমস্ত রাজপুত জাতি বিক্ষুব্ধ, কিন্তু। উপরোক্ত কারণ তাহারা রাজপুত-জাতির সম্মানে মুখ্যাপন করেছে মুঘলের বিরুদ্ধে মেবারের রাণা রাজসিংহ মেতা মাড়োয়ারের রাঠোর-বীর দুর্গাদাস সহায়ক। প্রতিদিন বাদশাহের নিকট সংবাদ আসছিল—কোনদিন রণধ জোধপুর শিবির অধিকার করছে; কোনদিন সম্মুখ যুদ্ধে মুঘল সৈন্য পরাজিত। রাজপুত বীর যুদ্ধ করতে জানে, শাহজাদা আকবর প্রতিবারই পরাজিত হয়েছিল। মুঘল সৈন্য যুদ্ধ করছে বিদেশে অর্থের জন্য—ধর্ম, জাতি ও দেশের জন্য। যে রাজপুত যুদ্ধক্ষেত্রে মুঘল সৈন্যের কাছে প্রাণ দিয়েছিল; সেই রাজপুতের বিরোধিতা করা মুঘলের পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। এই পরাজয়ের অপমানে বাদশাহ আলমগীর শাহজাদা আকবরকে তীব্র ভৎর্সনা করেছিলেন। শাহজাদা আকবর অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজের অযোগ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বাদশাহের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন। বাদশাহ আলমগীর কিন্তু শান্ত হন নি। তুরিত পত্রে বাদশাহ আলমগীর শাহজাদা আকবরকে পদচ্যুত করে শাহজাদা আকবরকে চিতোরে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং আকবরকে মাড়ওয়ারে স্থানান্তরিত করলেন। ফোকে, অপরপক্ষে শাহজাদা আকবর বাদশাহের সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করে দিলেন—ফলে পিতাপুত্রের মধ্যে চিরকুটা বেড়েই চলেছিল। এ সংবাদ রাজপুতদের অগোচর ছিল না। সিংহাসনের জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে কলহ, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্ব—প্রতি মুঘল শিবিরেই একটা আশঙ্কা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাদশাহ আলমগীর ও শাহজাদা আকবরের মধ্যে মনোমালিন্য পত্র শিবিরেও অজ্ঞাত ছিল না। রাণা রাজসিংহ মুঘল সেনাপতি তাহওয়ার খানের মধ্যে গোপন পত্রালাপ প্রকাশ্য আলোচনা হয়ে উঠল; রাঠোর বীর দুর্গাদাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি শাহজাদা আকবর তাঁহার পিতার রাজপুতবংসী নীতি পরিত্যাগ করেন এবং মহামুভব সম্রাট আকবরের নীতি অনুসরণ করেন, তবে রাঠোর এবং শিশোদীয় বংশ সম্মিলিতভাবে তাঁকে সাহায্য করবে। শাহজাদা আকবর ছিলেন অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন এবং অদূরদর্শী। দিল্লীর মসনদ সিংহাসন শাহজাদা আকবরকে প্রলুব্ধ করেছিল। সেনাপতি তাহাওয়ার খান স্বপ্ন দেখলেন দিল্লীর তখ্ত-ই আকবরের পর্ব।

বাদশাহ আলমগীর তখন আজমীরে শিবির স্থাপন করেছেন—চলছে রাজধানী এবং মুঘল রাজদরবার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাতো। এলেছে। রাণা রাজসিংহ স্থির করলেন—শাহজাদা আকবরকে কেন্দ্র করে আজমীরে বাদশাহ আলমগীরের শিবির আক্রমণ করবেন। এই সংকটময় মুহূর্তে অকস্মাৎ মহারাণা রাজসিংহ ইহলোক ত্যাগ করলেন। সমস্ত রাজপুতানা শোক-ভারাক্রান্ত। মেবারের নূতন রাণা জয়সিংহের দূত রাও কেশরী সিং মুঘল সেনাপতি তাহওয়ার খানের পক্ষ—গোপন সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর করলেন। একপক্ষ কালের মধ্যে আজমীরে বাদশাহ আলমগীর শিবির আক্রান্ত হল।

শাহজাদী জেব, তুমি শুনের নিশ্চয়, চার জন মোঘা প্রকাশ্যে তাদের মোহরাঙ্কিত একখানি ফতোয়া জারি করেছিলেন যে বাদশাহ আলমগীর ইসলাম ধর্মের নির্দেশ করেছেন, সুতরাং তিনি দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করবার অযোগ্য। শাহজাদা আকবর স্বয়ং জনসাধারণের সম্মুখে সিংহাসনারোহণ উৎসব সমাপ্ত করলেন। ইতিপূর্বেই শাহজাদা যুবরাজ বাদশাহকে এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ সেই সতর্কবাণী বিশ্বাস করেন নাই। বরং শাহজাদা যুবরাজকে কলিঙ্গ রাজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচারের জন্য তিরস্কার করেছিলেন। তিনি শাহজাদা আকবরকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধের সুরে আদেশ করেছিলেন। শাহজাদা আকবর যে পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। আমি তোমার নিকট পিতা-পুত্রের পত্র—পত্রের উত্তর এবং প্রত্যুত্তরের অনুলিপি তোমার নিকট প্রেরণ করছি। তোমার অন্তরের স্নেহ, আমি হয়ত অনেকটা দূর হবে, আমি বড় ক্লান্ত।

বাদশাহ আলমগীরের বৈধ্য অপরিসীম, অভিজ্ঞতা প্রচুর—বিপদকালে বুদ্ধি অটি স্থির। তিনি শাহজাদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিবিরে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাহাওয়ার খানের পত্নী কন্যা তখন মুঘল শিবিরের পিতা ইনায়েৎ খানের আশ্রয়ে ছিল। বাদশাহ আলমগীর জানিয়ে দিলেন—তাহাওয়ার খান যদি আকবরের পক্ষ ত্যাগ না করে, তবে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের প্রকাশ্যে রাজপথে অপমান করা হবে। ভীত শঙ্কিত তাহওয়ার খান বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শিবিরে উপস্থিত হলেন। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ তাহওয়ার খানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তবু বাদশাহ নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তিনি রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এক সাংঘাতিক কৌশলের আবিষ্কার করলেন। শাহজাদা আকবরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ উৎপাদনের জন্য—তিনি অতি চতুর একখানি পত্র রচনা করলেন। সেই পত্রখানি শাহজাদা আকবরের উদ্দেশ্য লিখিত হয়েছিল। তিনি আকবরকে লিখেছিলেন—

আমার প্রাণাধিক পুত্র! তোমার বুদ্ধিকে আমি প্রশংসা করি। তুমি মিছিমিছি কুট করে রাজপুতদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছ। মূর্খ রাজপুত—বিশ্বাস করেছে যে তুমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেছ। আমি অত্যন্ত উল্লসিত যে রাজপুত যোদ্ধাগণ তোমার পশ্চাতে অগ্রসর হচ্ছে, তারা আমার শিবিরের অনতিদূরে উপস্থিত হলে সম্রাটের সৈন্য পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করবে। শাহজাদার সৈন্য সম্মুখ দিক হতে আক্রমণ করবে। আমাদের মিলিত সৈন্য রাজপুত সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করেন।

পূর্বের ব্যবস্থানুযায়ী বাদশাহ আলমগীরের পত্র নিয়ে গুপ্তচর রাজপুত শিবিরের সম্মুখে অতিক্রম করে চল। রাঠোর বীর দুর্গাদাসের শিবির রক্ষী সেই গুপ্তচরকে বন্দী করল। পুনঃ পুনঃ জাতি প্রধর্ম এবং দেশের উন্নতে গুপ্তচর স্বীকার করেছিল যে, শাহজাদা আকবরের শিবিরে বাদশাহের গোপন পত্র নিয়ে এসেছিল। গুপ্তচর পত্রখানি রাঠোর

বীর দুর্গাদাসের হস্তে অর্পণ করল। রাণার দুর্গাদাস পত্র পড়ে স্তম্ভিত। সহজেই তিনি বিশ্বাস করলেন যে, ষড়যন্ত্র-কুশল বাদশাহ আলমগীরের পুত্রের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র সম্ভব।

গভীর রাত্রি ; সমস্ত শিবির নিদ্রামগ্ন। শুধু বিমর্ষচিত্ত মনে মুক্ত-কৃপাণ, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে নির্ভীক রাঠোর বীর দুর্গাদাস শাহজাদা পত্রের গরল অর্থ এবং গুপ্ত অভিসন্ধি জানবার জন্য আকবরের শিবিরে স্বয়ং উপস্থিত হলেন। কিন্তু শিবির রক্ষী দুর্গাদাসের নিকট নিবেদন করল—বাদশাহজাদা নিদ্রামগ্ন ; রাত্রি প্রভাতের পূর্বে তাঁর শিবিরে অন্য মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। দুর্গাদাসের সন্দেহ ঘনীভূত হল। শাহজাদার এই নিদ্রা কপট নিদ্রা নয় ত ? শাহজাদা আকবরের সাক্ষাৎলাভে নিরাশ হয়ে দুর্গাদাস—যুবন সেনাপতি তাহওয়ার খানের শিবিরে উপস্থিত হলেন। তাহওয়ার খানও অনুপস্থিত। বাদশাহ আলমগীরের আক্রমণে রাত্রির প্রথম প্রহরে যুবন শিবির অভিমুখে গমন করেছেন।

আকবর নিদ্রামগ্ন ; —তাঁহার শিবিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেনাপতি তাহওয়ার খান অনুপস্থিত—সুতরাং রাজপুতের সন্দেহ বিষাদে পরিণত হল। সরল বিশ্বাসী—বীর দুর্গাদাসের পক্ষে বাদশাহ আলমগীরের পত্রের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ ছিল না। রাজপুত শিবির সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রের মায়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই রাজপুত অশ্বারোহী এবং পদাতিক আকবরের শিবির ত্যাগ করে গেল। পথে তারা আকবরের শিবিরের রসদ লুণ্ঠন করল এবং মাড়োয়ারের পথে অশ্বমুখ ফিরিয়ে দিল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রা ভেঙে আকবর চকিত হয়ে দেখলেন—শিবির অন্তরালে সে একা। প্রথমে আকবর বিশ্বাস করতে পারে নি, শেষ পর্যন্ত সত্য প্রভাতেই তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হল। দিল্লীর সিংহাসনের স্বপ্ন প্রভাতের আলোকে বিলীন হয়ে গেল। মাত্র তিনশত পঞ্চাশজন দেহরক্ষী এবং অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে নিয়ে আকবর রাজপুতানার পথে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

শাহজাদী জেব, তুমি নিরর্থক রাজপুতজাতির উপর অভিমান করেছ, তিরস্কার করেছ। বৃদ্ধির খেলায় বাদশাহ আলমগীরের জয় হয়েছে। আমি শুনেছি, পলায়নের পরে সমস্ত দিবস রাত্রি এবং তার পর-দিনও শাহজাদা আকবর আশ্রয়ের উদ্দেশে রাজপুতদেরই দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন—কারণ আকবর তখনও বাদশাহ আলমগীরের কৌশলের সংবাদ জানতেন না। রাজপুতদের সম্মুখে প্রায় একাকী, সহায়সম্বলহীন, রিক্ত কেশ, অবিন্যস্ত বেশ, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বাদশাজাদার উপস্থিতিতে রাঠোর বীর দুর্গাদাস সহজেই পরিস্থিতি অনুমান করে নিলেন ; এবার সত্যই দুর্গাদাস বাদশাহ আলমগীরের নিকট পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থী শাহজাদা আকবরকে ফিরাতে তিনি আশ্রয় প্রদান করতে পারলেন না—প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু আজ ত শাহজাদা আকবর মেবারের অতিথি। তোমার মনে পড়ে জেব, বীর রাজপুত বুন্দেলা শাহজাদা দারা শিকোহর জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন।

ক্রমশ

আশা

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

আমার এ কবিতা নয় ছন্দে-ভরা গান
নয় এ যে ভাবে ভরা ভাষার ঝংকার
সাধারণ মানুষের এ সরল কথা
এতে নাই কোনখানে গর্বের হুংকার।
আমি কবি তাই চাই এই পৃথিবীর
ছোটবড় সবাকার কান্না-হাসি সব
ধূসর ধূলির পরে যুগ যুগ ধরে
রেখে যেতে এইখানে স্মৃতিটুকু মম।
তুচ্ছ আমি—আর তুচ্ছ আমার লিখনী
নেই তাতে এতোটুকু রূপরস গন্ধ—
প্রেমের সে উচ্ছ্বাস কিংবা কামের লালসা
মনের জঘন্যতম লজ্জাকর দ্বন্দ্ব।
আমি আঁকিতে যাই বাস্তব পৃথ্বীর
দুঃখ ব্যথায় ভরা নিত্যকার রূপ
কাঁদে যে হৃদয় মোর তাদের লাগি
যাদের সমাধিস্থলে নাহি জ্বলে ধূপ।
হয়তো অজানা রব, কোন ক্ষতি নাই,
যদি আমি নাহি পাই যশ-অর্থ-মান
তবুও জানিব মনে—মানুষের লাগি
মানুষ "আমি"রে দেখা ক'রে গেছি দান।

গিরীন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুবিমল নিষ্কৃতি পেয়েছে। শুধু নিষ্কৃতি নয়, দেহ আর মনের কঠোর সংগ্রামে মন তার হয়েছে বিজয়ী। জীবনের খরস্রোতে যে চোরাবালির চরে সে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার সমাপ্তি ঘটেছে আচমকা একটা ভাঁটার টানে। রীণাকে সে দিয়েছে মুক্তি। নিজে ফেলেছে স্বস্তির নিঃশ্বাস। কিন্তু পিছুটানের বোঝা চাপিয়ে গিয়েছে জয়ন্তর ঘাড়ে। জয়ন্ত অস্বীকার করতে পারেনি। সে সুযোগও তাকে দেয় নি সুবিমল। মরবার আগে তার পৈতৃক সম্পত্তি আর সঞ্চিত অর্থের বিলি-ব্যবস্থা করে সুবিমল খোকার ভার দিয়ে গিয়েছে জয়ন্তর হাতে। জয়ন্ত জানে খোকাকে সে কেমন ক'রে মানুষ করতে চেয়েছিল। বড় হয়ে খোকা বিলেতের কোন কনভেন্টে থেকে লেখাপড়া শিখবে। দেশে আর ফিরবে না কখনো। ওর মায়ের জীবন পথে চেনা মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে খোকার চোখ যেন নিষ্প্রভ না হয়ে আসে কোনদিন। যৌবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রীণা যেন হঠাৎ কারো মুখপানে তাকিয়ে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে চেয়ে না থাকে। ভুল করেও যেন একফোঁটা চোখের জল ফেলে খোকার পথ সে ভিজিয়ে না দেয়। পিচ্ছিল হয়ে উঠবে খোকার পায়ের তলা।

জোয়ারদার-ভিলার নিঃসঙ্গ দিনগুলো মন্থর হয়ে আসে। জনাকীর্ণ সহরের কোলাহল থেকে জয়ন্ত দূরে সরে আসতে চেয়েছিল। চেয়েছিল নির্জন পরিবেশে জীবনটাকে মনের ছাঁচে ঢালাই করে নিতে। সুযোগও সে পেয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগের সবটুকু পরিধি যেন নাগ-পাশের মত তাকে জড়িয়ে ধরেছে সুবিমলের মৃত্যুর পর। প্রতিটি মুহূর্ত অসহ্য হয়ে ওঠে। অথচ সে বন্ধন থেকে জয়ন্ত আজ জোর ক'রে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না।

ওপরে থাকে জয়ন্ত একা। নীচে সেই পুরানো দারোয়ান, মালী আর চাকরটা। জয়ন্ত হাঁপিয়ে ওঠে।··· দায়িত্ব শেষ হয়েছে। যে কাজ নিয়ে সে এসেছিল, সে কাজ ফুরিয়েছে। তবে আর কেন এ বন্ধন!···অনুগ্রহ তো সে চায়নি।···মাথাটা হেঁট হয়ে আসে।

জোয়ারদার সাহেব দুদিন এসেছিলেন ওর খবর নিতে। সরকার মশায় নিয়মিত এসে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন হাত খরচের টাকা। ওর খাওয়া-থাকার স্বাচ্ছন্দ্য তেমনি বজায় আছে। নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি কোনদিকে। ঠিক আগের মতই মালী প্রতিদিন বদলে দিয়ে যায় ফুলদানির ফুলের গোছা। ঘড়ির কাঁটা ধরে চাকরটি যথারীতি এনে হাজির করে ওর চা-জলখাবার, দুবেলার ভাত-ডাল-রুটি।

তবুও জয়ন্তর ভালো লাগে না। একতিলও সইতে পারে না এই গুরুভার দিনগুলো। সুবিমলের মনের পর্দার সঙ্গে ওর জীবনের স্বরগ্রাম হয়তো মেলেনি কোনদিন, মিলতোও না। তবু সুবিমলকে ওর ভালো লেগেছিল। সুবিমলের বিশুদ্ধতা ওকে আকর্ষণ করেছিল। সেই মমতা রূপান্তরিত হয়েছিল বন্ধুত্বে। নিবিড় অনুভূতিতে জয়ন্তর মন ভরে উঠেছিল।···সুবিমল!···পর্যাপ্ত সমৃদ্ধির ভিতরেও যেন সুবিমল ছিল নিঃস্ব। মনটা ছিল তার উদার। কিন্তু যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতো ঐশ্বর্যপুরীর নির্জন প্রান্তরে। বেঁচে থাকবার মোহ ওর ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই, বাঁচাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে কয়েকমাস বেঁচে ছিল, জীবনের সুতোটা ধরে যেন শরীরটাকে নিয়ে সুবিমল ইয়ো-ইয়ো খেলতো: নিরালম্ব হাতলাটুর চাকাটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে কখনো সুতোর টানে বুকের কাছে গুটিয়ে

আনতো, তখনো বা কাঁকানি দিয়ে সরিয়ে দিত নাগালের বাইরে।

তরঙ্গ অনেকদিন বলেছে: কেন মিছেমিছি নিজেকে এমন অবহেলা করেন সুবিমলবাবু?

সুবিমল হয় উত্তর দেয়নি; চুপ করে চেয়ে থেকেছে তরঙ্গর মুখপানে। না-হয় মিষ্টি একটু হেসে বলেছে: যা সত্যি—তাকে এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে লাভ কি তরঙ্গবাবু? মরা আর বাঁচা একই পোস্ট কার্ডের দুটো পিঠ। ভিতরের দিকটা সামনে ধরলে হাতখানা এগিয়ে আসে বুকের কাছে: আর বাইরের দিকটা উল্টে ধরলে ডাক বাক্সের দিকে এগিয়ে যায়।

ইচ্ছা থাকলেও দ্বিতীয় কথা বলেনি তরঙ্গ। ক্ষণকাল নীরব থেকে, একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অস্পষ্ট স্বরে হয়তো নিজেকেই শুনিয়েছে—তাই। জীবনের প্রতিস্থানে জমার দিকটা হাওলাতে ভরে উঠেছে।

কি, চুপ করে গেলেন যে?···ভাবছেন বুঝি, রীণার কাছে আঘাত পেয়ে জীবনের পূঁজি আমার কমে গিয়েছে! ···তা নয়। মোটেই তা নয়, তরঙ্গবাবু। রীণা ছিল আমার জীবনে একটা লটারীর টিকিট।···নন্‌স্টার্টার হয়ে যেটুকু ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, সে ওই খোকা। না এলে যে লোকসান হতো, এসে লোকসান করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। মাঝখান থেকে খোকার ভবিষ্যতের পরিচিতিটা ঘোলা হয়ে রইল।

অনেকক্ষণ ধরে কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা দুজনের মাঝখানে এসে ডানা মেলে দাঁড়িয়েছিল। বার-বার তরঙ্গর মনে হয়েছে প্রসঙ্গটা না তুললেই ভালো হতো।

নিস্তব্ধ দুপুর।

নীচে সিঁড়ির পাশের চাতালটার মালী আর চাকরটা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। গেটের পাশে ঘুমটি ঘরের দরজার দারোয়ানটা টুলে বসে দুলছে। শিমুল গাছটার পরডালে বসে একটা কাক কলকল শব্দে আর একটা কাকের মুখে খাবার গুঁজে দিচ্ছে। এখন আর কাকের কণ্ঠস্বরে সেই কর্কশতা নাই। মমতায় ভিজে উঠেছে।···হয় প্রিয়া, না হয় জননী।

দিনে তরঙ্গর চোখে ঘুম আসে না। আলমারির বই-গুলো পাতি পাতি করে খুঁজে একখানা জীর্ণ বই টেনে নিয়ে এসে বসলো ডেক চেয়ারটায় গা ঢেলে।

অ্যান্ ইংলিশ ম্যান ইন্ সার্চ অব ইংল্যাণ্ড।

বইখানার নাম অনেকদিন আগে শুনিয়েছিল তরঙ্গ। কিন্তু হাতে পড়েনি কোনদিন।···মানুষের সভ্যতা কেমন করে বদলে যায়, কেমন করে ধাপে ধাপে ওঠে আর নামে বিরাট একটা জাতির জীবনধারা, তারই নিখুঁত চিত্র। বিশ বছরের ভিতর ইংরেজের সংস্কৃতি, সমাজ জীবনের আদর্শ, জাতীয় ভাবধারা নিঃশেষে প্লাবিত হয়ে গেল ফরাসী সভ্যতার স্রোতে।···ঠিক এমনি ক'রে—এমনি ক'রে অতল সাগরে তলিয়ে গেল এ দেশের ঐতিহ্য। শুধু বাঙলার নয়, সারা ভারতের। বিশ বছরও লাগলো না। দশ বছরের ভিতর এত বড় একটা বিরাট জাতির আত্মচেতনা নিঃশেষে লোপ পেয়ে গেল। না ফিরিঙ্গী, না বাঙালী, না ইংরেজ, না হিন্দুস্থানী! তালগোল পাকিয়ে গেল সব। যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড ভোগ ক'রে আজ যদি এ দেশের কোন মানুষ আবার ফিরে আসে তার জন্মভূমিতে, পথে ঘাটে দরবারে কোথাও সে খুঁজে পাবে না তার চেনা একটী মানুষকে। স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের ছবি মিলিয়ে নিতে গিয়ে মাথা তার গুলিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে চোখদুটো বন্ধ হয়ে আসে। কেমন একটা অস্বস্তিতে তোলপাড় করে ওর স্নায়ুকেন্দ্র। মনটা বিদ্রোহ করে উঠতে চায়।···কন্‌গ্রারভেটিভ ও নয়। নতুনকে মেনে নেবার শক্তি ওর আছে। ও চায় জীর্ণ সংস্কৃতিকে ভেঙে নতুন করে গড়ে নিতে। কিন্তু সে নতুন মানে তো জীবনের সমাধি নয়। আত্মচেতনার অবলুপ্তিও নয়।···ওরা প্রোগ্রেসিভ। দেহ ও মনের নীতির শৃঙ্খল ছেড়ে ছুটে যাওয়াকেই ওরা বলে প্রোগ্রেস।···সভ্যতা দুর্বলতা। চেষ্টিটি ততোধিক।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগেকার একটা কথা। মিলেন সুবেখা খাণ্ডেলওয়াল বলেছিলেন: স্পীড না থাকলে কি জীবন! লাইফ মানেই স্পীড। যন্ত্র জীবের স্পীড থাকে না। যাদের ছিঁড়ে যারা ছুটে চলে, তারাই জীবন্ত। বাকী সব জড়-পদার্থ। স্পীড থাকলেও, সে স্পীড চালু মেসিনের।

তার মানে ?

মানে সহজ। জীবনের স্পীড একই এক্সেলে ঘোরে না। দরকার হলে গতি বদলায়। হাতও বদলায়।

ঠিক।

হাঁ, তাই। স্টিয়ারিং হাত-ফের করে যখন গতিবেগ বাড়ে, তখন ক্লান্ত হাত থেকে নতুন হাতে স্টিয়ারিং তুলে দেওয়াই ভালো। তাতে যে শুধু স্পীড বাড়ে তাই নয়। এক্সিডেন্টের ভয়ও কমে।

কিন্তু জীবনের তো একটা ভার্চু থাকবে! ছুটে চলার স্পীডের চেয়ে পা-পিছলে পড়ার স্পীড অনেক বেশী।··· হয়তো সহজও অনেক।

কি বলতে চান, অরন্তবাবু?···জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুরেখা চেয়েছিল অরন্তর মুখপানে।

উত্তরে অরন্ত বলেনি কিছু। শুধু একটুখানি হেসেছিল। সে হাসিতে হয়তো স্নেহও ছিল না, সমর্থনও ছিল না।

তবুও বেশ একটু খটকা লেগেছিল সুরেখার মনে। ক্ষণকাল নীরব থেকে জোরের সঙ্গে বলেছিল: ভার্চু একটা কাল্পনিক দুর্বলতা। মনকে মেনে নেবার সাহস যাদের নেই, তারাই কাঁটালাগাম লাগিয়ে জীবনের রাশ টেনে রাখবার চেষ্টা করে। মনকে অস্বীকার করবার একটা কৌশল।···আত্মবঞ্চনার সান্ত্বনা!

আত্মবঞ্চনা!

তা ছাড়া আর কি! মনের লাগাম টেনে দেহকে নিপীড়িত করার বাহাদুরি থাকতে পারে, পৌরুষ নেই।··· আগুনের ধর্ম পোড়ানো। জল পেলে নিবে যাওয়াও তার প্রকৃতি। কিন্তু জলের মাহাত্ম্য বাড়িয়ে আগুনের শক্তিকে চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা ক'রে লাভ কি? আপনাদের ভার্চু মানে তো তাই।

হবে: অরন্ত হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসি ফোটে না।

সুরেখা একটু থেমে বলে: ভার্চু তো পান্না নয়, যে মনের অগোচরে দেহের খনিতে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়বে। ···মনকে বাদ দিলে দেহ তো একটা শব।

কথাটা ব'লে সুরেখা আর বসে নি। অরন্তর মুখপানে ভালো ক'রে চাইতেও হয়তো পারেনি আর।

এলোমেলো বাতাসে পাল-তোলা পান্সির মত দুপুরের নিঃসঙ্গ প্রহর যেন টলমল করে।

মিস্টার জায়ান্ট!

হঠাৎ অরন্তর চমক ভেঙেছিল শিপ্রার কণ্ঠস্বরে।··· কখন শিপ্রা ঝড়ো-পাতার মত উড়ে এসে পড়েছিল অরন্তর সামনে, অরন্ত তা বুঝতেও পারেনি।

আজও শ্মশান আগলে ব'সে আছেন, দেখছি!

শ্মশান?

তা ছাড়া আর কি!

সত্যিই তাই। সত্যি অরন্ত শ্মশান আগিয়ে বসে আছে এই জোয়ারদার-ভিলায়। সুবিমলের শুশ্রূষার জন্যে সে এসেছিল। সুবিমল বিদায় নিয়েছে কিন্তু সে আজও পারেনি সরে যেতে। সে কথা সে অরন্ত অনুভব করেনি, তা নয়। তবু পারেনি রাতারাতি সব স্মৃতি মুছে ফেলে অস্তিত্ব কাটিয়ে উঠতে।

প্রসঙ্গটা না বাড়িয়ে অরন্ত বলে: হঠাৎ আবার কি মনে ক'রে শুনি?

আত্ম-রক্ষার জন্যে: শিপ্রা হাসে।

আত্মরক্ষা?

হাঁ, তাই। পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছি নিজেকে নিয়ে বারবার ছিনিমিনি খেলে। পারেন না, পারেন না আমার হাত ধ'রে টেনে তুলতে?

শিপ্রার কণ্ঠে এমন আর্তনাদের সুর অরন্ত শোনেনি কোনদিন। বিস্ময়ে ভরে ওঠে। চোখ দুটো মেলে ধরে শিপ্রার মুখপানে: ব'সো।

গোল টিপয়টা টেনে নিয়ে শিপ্রা সামনা-সামনি বসে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। অরন্ত অনুধাবন করবার চেষ্টা করে। শিপ্রা প্রাণপণ যুদ্ধ করে নিজের সঙ্গে।

জানেন? লীনা বিভোর সেনের ছোট ভাই নজরের সঙ্গে মস্কো চলে গেছে।

জানি।

আর?

জানবার মত নেই কিছু।

ওর মা মিসেস্ মোতাহার চৌধুরী অলৌকিক খেলা খেলেছেন। খেলেছেন কেন, খেলছেন আজও।

পরেও খেলবেন। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?

মাথা ঘামাবার নেই?

না। তবে নিজের সম্পর্কে ওই ধরণের আশঙ্কা হয়ে থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র।

না—না—না। সে কথা বলছি না।

তবে?

বলছি মিসেস চৌধুরীর কথা।

মিসেস চৌধুরী নয়। মাদাম ককটেল।

মাদাম ককটেল!···অদ্ভুত নাম। সত্যি আপনার অরিজিনালিটী আছে জয়ন্তবাবু।···সব আছে। সব আছে আপনার। শুধু নেই অনুভূতি।···পুরুষ নন আপনি।

শিপ্রার চোখে-মুখে যেন দপদপ ক'রে জ্বলে ওঠে শিরলিকে আগুনের শিখা: পারেন না ওই বলিষ্ঠ দুখানা হাতে দুরন্ত মানুষকে টেনে তুলতে?

না।···জয়ন্ত কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। শিপ্রার মত মেয়ে যে কেমন করে হঠাৎ এমন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, সেকথা ও ভাবতে পারে না।

দু-হাতে চায়ের দুটো পেয়ালা নিয়ে চাকরটা ঘরে ঢুকলো।

তাড়াতাড়ি শিপ্রা বুকের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে সিধে হয়ে বসে। একটু থেমে, নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে: এখানকার কাজ তো শেষ হয়েছে। এখন একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে ফিরে চলুন না অযোধ্যায়।

চাকরি!···জয়ন্ত হাসে।

মুহূর্তে শিপ্রার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণের স্রোত বয়ে যায়। ওই এক চিল্‌কে হাসির ছোঁয়াচে ঝকঝক করে ওঠে জয়ন্তর চোখদুটো। এত কাছাকাছি মুখোমুখি বসে জয়ন্তকে শিপ্রা দেখেনি কোনদিন।···ওর মনে পড়ে যায় সুরেখার কথা। সুরেখাদি একদিন জয়ন্তর কথায় বলে—ছিল—চাঁচ-কাটা হীরে কিনতে মেলে বাজারে। কিন্তু মন-কাটা হীরে মেলে না।

ক্রমশঃ

অভিজ্ঞান

মণি পাল

সন্ধ্যারি গিয়েছে সরি' জানি তব
আকাশের সীমারেখা হ'তে
জানি তার হয়েছে সময়, নিয়েছে বিদায়
সাগরের নীলিমার স্রোতে।
ছায়াপথে ছায়াপাত কি এমন দোষ—
আলো যদি নেভে, মুছে যায় পথ;
হাসি-ভরা পৃথিবীতে কারে দেব দোষ
থেমে যদি যায় মোর জীবনের রথ?
বিষাদের মেঘ-মাখা চাঁদ দেয় উঁকি,
ভাঙা জোছনায় ভাসে ধরণীর তট,
আমি হেথা বসে আঁকি যত আলপনা
কালি দিয়ে কালো করি জীবনের পট!
সবই যার ক্ষতি তার হিসাব কি নেব
হেরে গেছি এই বাজী পাশাখেলাতে,
জোর ক'রে বাঁকা দিন ফুরাবে যে কবে
সকলের হাসি দেখে চাই হাসি লুকাতে।
তবু আজ আশা রাখি পরে কোনো দিন
হয়তো বা ভুল ক'রে ক্ষণিকের বিলাসে,
আনমনা ভেসে যাবে পুরাতন দিনে
আঁখিকোণ ছলছলি' স্মৃতিরাঙা সুবাসে।

PGA COMMON-ROOM

শ্রীঅরবিন্দ ও প্রেমধর্ম

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন যখন শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ বাংলার লীলা-ভূমি, মহাপ্রভুর সাধনক্ষেত্র নবদ্বীপে যাবার পথে কলকাতায় এসে পৌঁছলো, তখন আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু প্রশ্ন করে-ছিলেন—ওহে শ্রীঅরবিন্দও কি প্রেমপথ-পথিক নাকি? এই প্রচণ্ড প্রাণবন্ত বীর্যবান মহাপুরুষকেও তোমরা বৈষ্ণব করে খোল করতালে ঢুকিয়ে দিলে—হায়রে বাংলার মাটি, বাংলার জল। আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম—প্রেমপথ বলতে কি বোঝাতে চান তিনি—অনেক সময়েই আমরা কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে ভাবের ও ভাষার দরকষাকষি করি। আসলে সব সাধনার লক্ষ্যই এক। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—যে যে পথ দিয়েই আসুক—কবির ভাষায় সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে তোমার দুখানি নয়নে। সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ ভাব-বিহ্বল গদগদ মসৃণ পথ নয়—সে পথ অশঙ্কিনী প্রত্যাত্তির, অমেয় বীর্যের পথ। অব্যভিচারিণী-ভক্তি আর বিপুল বা বিরাট জ্ঞান একই স্তরের কথা—যা কিছু দুই, যা কিছু বিভক্ত, যা কিছু খণ্ড সে সবকেই একে মিলতে হবে। এই মিলন রহস্যই প্রেম ধর্ম—রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা—রাধার অর্থ হচ্ছে—সম্পূর্ণ হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, আরাধনা করা, আরাধিত হওয়া—অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বর। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী মহিমাই এই প্রেম রসসীমা। সেখানে স্বসুখ বাসনার লেশ নেই।

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ মান প্রণয়
রাগ অনুরাগ, ভাব মহাভাবময়

কিন্তু মহাভাব হলেই হলোনা—অধিরূঢ় মহাভাবকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তীরা বললেন—মাদন—মহাভাব স্বরূপেরং গুণৈরতি বরিয়সী—অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার—

একই চিচ্ছক্তি ধরে তিন রূপ,
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ মিলিয়ে যে মহাভাব তিনিই 'সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি'।

সাধারণ মানুষ কিন্তু জ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানী নয়, ভক্ত নয়, ভাবুক নয়, দরদী নয়, মরমী নয়—সে কাতর, সে ক্লিষ্ট, সে পিষ্ট। দুঃখে বেদনায়, অজ্ঞানতায় কামনায় সে জর্জর। কিন্তু এই যে তার কান্না সেটি হচ্ছে আসলে পূর্ণতমের জন্য কান্না। তার মনের গভীরে এই আকুতি—আমায় বলে দাও, আমায় জানিয়ে দাও, আমায় বুঝিয়ে দাও—কে তুমি, জগন্নাথ-স্বামী নয়ন-পথগামী ভবতুমে—কাকে আমি পুজো করবো, কোন শক্তির সঙ্গে আমি মিলবো, কোন ছন্দকে, কোন সৌষম্যকে আমি ধরবো, কোন পথ বাহ্য, কোন পথ গ্রাহ্য—

কোথায় আলো, কোথায় আলো
ভিতর বাহির কালোয় কালো

দিনের তপ্ত আলোয়, রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে, ঘর ছাড়ার শ্মশানে, সংসারের মোহমাদকতার মধ্যেও মানুষের এই প্রশ্ন। বৃহদারণ্যকের ঋষি ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্ব এই অমৃতের কথা বলেছেন। এই সর্বের গানই রাধাতত্ত্ব, রাসতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব। বিষ্ণু তিনিই যিনি (বিশ্) প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি (বিষ) বিস্তৃত হয়ে আছেন।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে

এর রূপ অনন্ত, ভাব অনন্ত, গুণ অনন্ত—এখানে এক ও অখণ্ড রস। কিন্তু সান্তের সীমায় খণ্ডবোধে, স্তর ও অধিকার ভেদে এই একই প্রকাশিত হন বহুরূপে—মল্লদের কাছে যিনি অশনি, স্ত্রীদের কাছে তিনিই মদনমোহন, নাগর নারায়ণ মূর্তিমান স্বয়, ভোজপতির কাছে তিনিই সাক্ষাৎ মৃত্যু, জ্ঞানীর কাছে তিনিই বিরাট, যোগীর কাছে

পরম তত্ত্ব। শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভাষায় এই যে উদ্বর্ত—এ হচ্ছে মনোময় রাজ্যে চৈতন্য স্বরূপে—মনোময় রাজ্যে স্তরের পর স্তর আছে—চেতনার পর্দায় একটির পর একটি যবনিকা সরে যাচ্ছে—ঊর্দ্ধের মানস, ভাস্বর মানস, অধিমানস, অতি মানস (Higher mind, Illumined mind, Over mind, Supermind.)। শুদ্ধমায়ার বন্ধন যখন খসে যায়, প্রকৃতির সর্ববাধা যখন বিনিমুক্ত হয়, ভাগবত সেবায় তৎপরত্ব আসে, তখনই যোগমায়ার আশ্রয়ে আমরা লীলারস-রসিক হই। প্রাকৃতিক জীবনের লীলায় প্রথম ছন্দই হচ্ছে মিলন অভীপ্সা। সেই অনাদ্যন্তবান একই নিজের ইচ্ছায় দুই হলেন, কারণ তিনিই বহু হবেন। মহাপ্রকৃতি এই আকর্ষণের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি লীলার ধারাবাহিকতাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নিয়ে যান্। এই শক্তি বিশ্বজয়া, এই শক্তি যোগমায়া। যোগমায়ার অর্থ হচ্ছে যিনি শুধু যুক্তই করছেন না, রূপনাম উপাধির মধ্যে মিত হয়েও প্রকাশিত করছেন নিজেকে। তাই রাসলীলায় চাই যোগমায়ার আশ্রয়। কারণ তখনও আবেগ রয়েছে, স্পন্দন রয়েছে, রাগ অনুরাগ, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, পূর্বরাগ, মান অভিমান নিয়ে প্রেম-বৈচিত্র্য চলেছে। বাঁশীর ডাক শুনে ছুটে আসছেন গোপীরা—কেউ রাঁধছিলেন, কেউ শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন—ওগো কল্য বামদৃশঃ মনোহরঃ।

বিসৃজ্য স্নেহ নিজচ দেহ এক নয়নে কাজরয়েহ
শিথিল নীবির বন্ধ···বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ

এই প্রেম বৈচিত্র্য অপরূপ, কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়—কারণ প্রেমসঙ্গতা থেকেই আসে অনন্য মমতা। অনন্য-মমতা থেকে আসে সর্বত্র সমতা—যথা যথা নেত্র পড়ে তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে। ক্রমশ বহির্মুখী রূপ অন্তর্মুখী অপরূপের সঙ্গে মিশে যায়—ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্য মেশে—বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ এক হয়—এই তো প্রেম সাধনার পরম ইঙ্গিত—এই তো আকর্ষণের প্রধান রীতি, একেই আচার্যরা বলেন কৃষ্ণতত্ত্ব।

শ্রীঅরবিন্দও এই কথাই বললেন তাঁর পূর্ণযোগে। এই যে বিশ্বব্যাপী শক্তি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবতরণ করছেন তিনিই উদ্দীপিত অধিরোহণও করছেন—আর দুইএর এই যে মিলন—এই যে Double ladder of consciousness—সে সবের পরিণতি ইহৈব এইখানে—শুধু এই লভিত্ব নহ তব সুন্দর হে সুন্দর নয়—আমিই সুন্দরে রূপান্তরিত—আমার অঙ্গ ও বঙ্গ হবেই, পরশ রাগে চিত্ত ও রঞ্জিত হবেই, মিলন সুধা প্রাণে সঞ্চিত ও হবেই—কিন্তু তার পরেও আছে আমার জন্ম-জন্মান্তর ঘটে গেছে—আমিই বদলেছি—কিংকরত্ব আর নেই, শংকরত্ব ঘটেছে—আমিই পরম শিব, সোঽহং, তত্ত্বমসি। এই যে তিলে তিলে নূতন হোয়—এ শুধু ভাবরাজ্যে নয়, দেহে মনে প্রাণে—সর্ব স্তরের রূপান্তরে। এই ও অচিন্ত্যভেদাভেদ। শ্রীঅরবিন্দ বললেন বৈদিক ঋষিরা, উপনিষদের যাজ্ঞিকরা এই সত্যের আভাস পেয়েছিলেন—তাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন—ত্রিধু সপ্তধু—Body, life and mind—জড় প্রাণ মনের স্তরে—তাই অপদস্ত সোধন দেবতার বরে নতুন হয়ে ফিরে আসতো—Young and radiant.

জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিনের সামঞ্জস্যের মধ্যেই যোগের পূর্ণ বিকাশ। তাই শ্রীঅরবিন্দ ভক্তি বা প্রেমকে কোনদিন নিষিদ্ধ করেন নি, শুধু সাবধান করে দিয়েছেন—অবিশুদ্ধ ভাব-তরঙ্গে গা ভাসিয়োনা—যাতে সাধনার মধ্যপথে মোহ না আসে, মাদকতা না নামে। আর ভাগবতী শক্তির ঐশ্বর্য ও মাধুর্য একেরই দুই পিঠ—যে সত্তা নিজেকে এই বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যষ্টির মধ্যে প্রতিটি অণুতে রেণুতে, তিনিই নিজেকে আস্বাদন করে গুটিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে কোটীতে—Return of the spirit to itself. এই ও মহারাস—আত্মস্থ পরম শিব সক্রিয় পুরুষোত্তম। সমাধিমগ্নও বটে—সমাধি ভঙ্গে লীলারতও বটে। তাই শ্রীঅরবিন্দের প্রেমরস সীমা হচ্ছে সমগ্র সত্তার Integration. প্রতি মুহূর্তে নবজন্মলাভ, নূতন হওয়া। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি—ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্ম-লাভ—আচার্য শঙ্করের এই উক্তি এখানে প্রযুজ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বললেন—শুধু তাই নয়, যদিও বিশুদ্ধঃ সর্ব-কর্মদাহ অর্থাৎ জ্ঞানীর সর্ব কর্মই দগ্ধ হয়, মিথ্যা জ্ঞানপ্রসূত অশরীরত্ব সশরীরত্ব ভাব থাকে না—তবু এই দিব্যলীলার বিলাস বা ক্রিড়া মায়া নয়, মোহ নয়, ভ্রান্তিভ্রম নয়। এই বিশুদ্ধীকৃত প্রেমের চরম সাধনা আমরা দেখি শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'তে—একে বলা যেতে পারে—

অন্তের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করে মানি।

এ প্রেমের ইতিহাস শুধু বৈশী নয়, রাগাত্মরাগা নয়—সচেতনাম্ রসতাম্ নয়—এ রস শৃঙ্গার থেকে শান্তমে চলে গেছে। শেষ অবস্থায় সাধক প্রাপ্তারাম, আপ্তকাম, সর্বকাম, সেখানে মনবাক চিত্ত নিরাপিত, স্থির অচঞ্চল, ব্রাহ্মী স্থিতিতে মগ্ন।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনলব্ধ উপলব্ধির শেষ কথা অপূর্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে 'সাবিত্রীতে।' রূপে রসে ঝঙ্কারে, ভাবে ভাষায়, শব্দ বিন্যাসে, আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিতে 'সাবিত্রী' এক অপরূপ কাব্য। ইংরাজীতে লেখা বলে এর রহস্য অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অনাবৃত নয়—তা ছাড়া গুরুগম্ভীর ভাব ও ভাষা আমাদের অনেকের কাছেই দুরূহ। তবু প্রেমতত্ত্বের যে এক অপূর্ব দিক্ কবি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ফুটেছে তাতে তাঁকে পরম-ভাগবত পরম-বৈষ্ণব বলতে কারুর বাধবে না। সাবিত্রী সত্যবানের প্রতীকে কবি শ্রীঅরবিন্দের কল্পনায় প্রেমের এক সর্বগ্রাসী সর্বময় রূপই ভেসে উঠেছে—সেখানে দেহ বা দেহাতীত এ প্রশ্ন অবান্তর। এক অনাদি আনন্দের অনন্ত হিল্লোলে জেগে উঠেছে দুই। একদিকে এই মাটির পৃথিবী—God hidden in the clay, আর এক দিকে অনন্ত যৌবন আকাশ—তার Everlasting yes—চির-প্রেমিকের হাঁ, আমি আছি অয়মহং ভোঃ এই বাণী। এই দুই মিলিয়েই আবিষ্ট হয়ে আছেন সেই পরম এক, যিনি দ্বৈতাদ্বৈত অর্ধনারীশ্বর, মন্দারমালা পরিশোভিত, কপালমালা পরিশোভিত। স্বর্গ ফিরে ফিরে চায় ধরণীর দিকে—যে ধরণী ক্লান্ত নয়, তপ্ত নয়, পূর্ণের পূর্ণাভিসিঞ্চনে মধুময়—আর পৃথিবী চেয়ে থাকে স্বর্গের দিকে, জরা-মৃত্যু বিনষ্টির অতীত যে লোক। প্রেমের পট্টবাস পরে তপস্বী মানুষ চলবে স্বর্গের দিকে দীপশিখা হাতে—আয়ে সেই আলো দেখে নামবেন মাটির পথে স্বর্গের দেবতা। কোন পাহাড়ের পায়ে কোন সাগরের ধারে কোন মানুষের বুকে দুয়ের হবে মিলন তারই অধীর প্রতীক্ষায় পৃথিবীর সব মানব-মানবী দাঁড়িয়ে। তারই বারতা দিলেন শ্রীঅরবিন্দ—

Inscribe the long romance of Thee and Me

অরবিন্দ প্রেমতত্ত্বের মূল কথাই হোল—All that thou art, shall to my hands belong—তুমি যাহা সবই আমি, আমার—

I will pour delight from thee as from a jar
I will whirl thee as my chariot through the ways
I will use thee as my sword, as my lyre.

তুমি আমার অমিয় সুধার পাত্র, আমার তরবার, আমার বীণা—তুমি হবে a channel for my timeless force—কালসীমা পেরিয়ে অচিন্ত্যিত যে শক্তি তারই ধারক ও বাহক সাবিত্রী আর সত্যবান a dual power of God in an ignorant world সেই "যেষা অপাতরং"—এই যুক্ত প্রেমময় জীবনে—

You shall reveal to them the hidden eternities

The truth of infinitides not yet revealed

তোমাদের সম্মিলিত জীবনে জানাবে সেই পরম সত্য, সেই চরম তত্ত্ব, সেই অপূর্ব গান, সেই অচিন্ত্যনীয়ের সুর—কারণ স্বর্গকে জন্ম নিতে হবে বারে বারে মাটির মায়ের কোলে। প্রেম হচ্ছে তারই দুয়ার।

My Earth is now play-field and thy Seat

আমার ভুবন হবে তোমার ভবন, তোমার লীলাক্ষেত্র, তোমার আসন্।

Her face She lifts to Him who is herself
Until the Spirit leaps into the Spirit's embrace

এই যে সত্তার সঙ্গে সত্তার মিলন—এ মিলন পরম রমণের, পরমা রমার, পুরুষ প্রকৃতির, শিব ও শিবানীর, সংসার ও ও প্রজার, অর্ধনারীশ্বরের। এখানে ছোট্ট আমি বিরাট আমিতে মিলিয়ে গেছে, ক্ষুদ্র অহং বৃহতের মহাসাগরে বিলীন।

I have escaped and the small self is dead,
I am immortal, alone, ineffable
I have gone out from the Universe I made
And have grown nameless and immeasurable.

এ আমি ছোট্ট সত্তা থেকে পালিয়ে আসা আমি, যে ক্ষুদ্র আমি মরে গেছে, যে আমি অমর, একক, পরিবর্তনহীন, যে আমি নিজের তৈয়ারী জগত থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে আমি নামহীন, সংখ্যা গণনার অতীত। কিন্তু তখনও তিনি তাঁকেই দেখছেন, তাঁর বাঁশী শুনছেন।

I have seen the beauty of immortal eyes
And heard the passion of the Lover's flute
And known a deathless ecstasy's Surprise
And sorrow in my heart for ever mute.
Nearer, nearer, now the music draws
Life shudders with a strange felicity,
All nature is a wide enamoured pause
Hoping her Lord to touch, to clasp, to be.

কবি বলছেন—

আমি যে দেখেছি সেই অমর আঁখির সুষমাকে
আমি যে শুনেছি সেই চির প্রেমিকের বাঁশরী
আমি যে জেনেছি মৃত্যুহীন উল্লাসের বিস্ময়।

কবির কাছে সেই অমৃত সঙ্গীত এগিয়ে যাচ্ছে। তার 'More Poems'ও ঠিক এই কথাই পড়ি।

কোন ছায়াঘন প্রত্যূষের আলোতে
বিস্মৃত সাগরের বাণীহীন প্রতীক্ষাতে
নির্জন প্রাঙ্গণে, মোর পরাণে
মৌনী বীণার যেখানে
তব পদধ্বনি শুনি আমি
চরিতার্থ, আসো তুমি
দীপশিখা সম
অনিল স্বপন মম
তুমি আসো, তুমি আসো,
আরো আরো নিকটে আরো

জীবন কাঁপছে থর থর অপূর্ব রসাভাসে, সমস্ত প্রকৃতি শুরু আবেগে ভাষাহীন মূক—পরমপতির স্পর্শে সে চাইছে, শুধু স্পর্শ নয়, গভীর আলিঙ্গন, শুধু আলিঙ্গন নয়, সে হতে চাইছে একাত্মীভূত, তাও নয়, শেষ পর্য্যন্ত "To be" অর্থাৎ রূপান্তরিত হতে—তিলে তিলে নূতন হোর।

For this one moment lived the ages past
The world now throbs fulfilled in me at last

সেই এক চরমক্ষণের গানই গাইলেন পরম বৈষ্ণব পরমশাক্ত মহারসিক কবি শ্রীঅরবিন্দ। তিনি মহাজনদের মতই গাইলেন—

To live, to love are signs of infinite things
Love is a divine power by which all can change.

বেঁচে থাকা মানেই ভালবাসা—ভালবাসা অনন্তের সন্ধান দেয়, যে দিব্যশক্তি রূপান্তর করতে পারে, সত্তাকে বদলে দিতে পারে।

An hour began, the matrix of new time, a new age, a new creation—সত্যিকার ভালবাসলেই জীবনের ধারা বদলে যায়, জীবনে নূতন সূর্য্যের উদয় হয়, নূতন যুগ আসে, নূতন সৃষ্টি, নূতন দৃষ্টি।

তাই সাবিত্রী হচ্ছেন—"A priestess of immaculate ecstasies—জীবন যজ্ঞে প্রতিটি আনন্দোচ্ছল ছন্দে যিনি আহুতি দেন। সাবিত্রীর জীবনই সত্যবানের পৃথিবী—তারই উপর তার ত্রিধা পদ রেখে তিনি বিচরণ করবেন। সাবিত্রীর তনু তারই আনন্দের অনুভূতির কেন্দ্র। কবি বলছেন—মহাকালের যাত্রাপথে একাকী সত্যবান দাঁড়িয়ে—নৃত্যুর বিধানের জোয়াল ঘাড়ে করেও তিনি অমরতার যাত্রী—তিনি যে সত্যবান অর্থাৎ সত্যে বিধৃত। সত্যবান gathered all Savitri into his clasp." লক্ষ্য করবার বিষয় যে কবি "all Savitri" বলছেন অর্থাৎ যে সাবিত্রী অখণ্ড—তার প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কার্য্য, প্রতিটি সংস্কার, তার দেহ-মন চিত্ত বাক্ সবই নিয়ে যে তিনি, যেখানে দ্বৈত নেই, অজ্ঞান নেই, সবই সীমাহীনের মহানে বিলীন "A soul merging into God. Her separate life was lost in his.

ভালবাসার শেষ কথা এই প্রেম-মগ্নতায়—তুমি নেই, আমি নেই, আধার তুমিও আছ, আমিও আছি—দুই মিলিয়ে এক অখণ্ড অনুভূতি। সাধনার প্রথম স্তর—মর্ত্য সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে যাত্রা (transcending the human formula)। দ্বিতীয় স্তর—ঊর্দ্ধারোহণ, জ্ঞানের যাত্রা। তৃতীয় স্তর—মহাশক্তির অবতরণ, চতুর্থ স্তর—সেই শক্তিকে প্রেমে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে সমস্ত সত্তাকে রূপান্তরিত করা।

সাবিত্রী হচ্ছেন সেই প্রেমরস সীমা, আর অবতরণের প্রতীক্।

One shall descend and break the iron law
নিয়মের অর্থাৎ (যমের) নিগড় যিনি ভাঙবেন। তাই নারদের মুখ দিয়ে তিনি গান শোনালেন।

He Sang to them of the lotus heart of love
With all its thousand luminous buds of truth

বিকশিত বিশ্ব-বাসনার মূলে যে শতদল পদ্ম সেই শোণিত প্রেমের মধ্য দিয়ে রূপ নেয় পরম সত্য। তারই সহস্র বিকাশের গান গাইলেন দেবর্ষি।

Which quivering sleeps veiled by apparent things যা আপাতদৃষ্ট সত্তার মধ্যে 'এষতি' কম্পমান হয়ে ঘুমিয়ে থাকে It trembles at each touch, it strives to wake প্রতি স্পর্শে সেই সত্তা চঞ্চল হয়ে ওঠে, জেগে উঠতে চায় এবং একদিন—

It shall hear a blissful voice
And in the garden of the spouse shall bloom
When she is seized by her discovered lord.

একদিন সে শুনবে সেই বাণী, সেই বাঁশী—যা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশবে। সেই চিররমণের উদ্যানেই তার হৃদয়ের ফুল ফুটবে এবং সেদিন সে শুধু পতিকে আবিষ্কার করবে, না, পরমপতিও তাকে গ্রহণ করবেন। কবির উপমা হলো—

Seized by her discovered Lord

একজন করবে আবিষ্কার, আর একজন করবে সজোরে গ্রহণ; মনে রাখতে হবে কবির অবচেতনায় এই মিলন, এই গ্রহণ, এই গ্রসন্ at one and every point of time—অর্থাৎ নিত্যরাস। এই অমর জ্ঞান যেখানে সম্ভব সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হয়—মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, মৃত্যু মানেই দ্বৈতকে স্বীকার। তাই সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী যমকে বললেন—I bow not to thee, O huge mask of Death মৃত্যুদেব আমি তোমাকে স্বীকার করি না। Mask কথা ব্যবহার করে কবি বলতে চাইলেন যে মৃত্যু একটা মুখোস—অনন্ত জীবনেরই আবরণ। সেই পরম কল্যাণতম রূপকে দেখতে গেলে বলতে হয়—খোলো খোলো দ্বার, তোলো তোমার যবনিকা—স্বর্গতোরণ সামনে।

মৃত্যু হাসে—বলে, কিসের শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন বিধানকে উল্টে দিতে চাও নারী—

সাবিত্রী বলে—My God is Love—আমার দেবতা প্রেম, I shall remake the Universe O! Death—নতুন করে এই বিশ্বকে আমি গড়ে তুলবো।

যমরাজ হেসে বলেন—বাতুল—সেই পরম মৈত্রিময় একের মধ্যে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, অমৃতত্ব নেই—তিনি চরম একাকী, আমি তারই প্রতীক।

সাবিত্রী জবাব দিলেন—প্রভু, তুমি ভুল করছো, সেই নেতির মধ্যেই আছে ইতি—Everlasting yes—জল স্থির থাকলেও জল, ঢেউয়ে দুলে ও জল।

I am, I love, I See, I act, I will

আমি আছি অহমহং ভো, আমি ভালবাসি, মহাভাবে প্রাণারাম হই, আমিই দ্রষ্টা পুরুষ, আমি কাজ করি, যন্ত্র শুধু নই, যন্ত্রীও, আমি ইচ্ছা করি—অহং মনুতে।

যমরাজ তখনও তর্ক করেন—You should know—বিজ্ঞানীয়াৎ, বিজ্ঞানী হতে হবে—বিরাট, বিপুল, বিশালের সম্যগের যে জ্ঞান—

সাবিত্রীর উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট—when I have loved for ever, I shall know—আমার জ্ঞান তখনি সম্পূর্ণ হবে যখন আমি ভালবাসবো চিরকালের জন্য। প্রেমই আমাকে জ্ঞানী করবে। আমার প্রেমের ঠাকুর এইখানেই, ইহৈব, কাদামাটির মাঝেই তিনি আছেন—আমার প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম—আমার সব—আমার পূর্ণ, আমার জীর্ণ, তাঁরই চরণ চিহ্ন সব জায়গায়—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, সর্বং খল্বিদং। তিনি আছেন এই মর্ত্যের ও মৃত্যুর আবরণের মধ্যেও—কামকামনা লোভ-লালসার মধ্যেও—ভাগবত-বীজ সর্বত্র সুপ্ত।

Our Earth starts from mud and ends in sky মাটিতে আরম্ভ সেই জীবনের, আকাশের পরমে তার শেষ—দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ—when unity is one, strife is lost.

হেরে গেলে তুমি প্রভু—

And all is known and all is clasped by Love
My Love eternal sits enthroned in God's calm
For Love must soar beyond the very heaven
It must change its human ways to ways divine.

প্রেমের শক্তিতে সবই জানা যায়, সবকেই ধরা যায়—প্রেম অনন্ত, শাশ্বতের মন্দিরে তার অধিষ্ঠান—কিন্তু এই প্রেম

মানুষী প্রেম নয়, একে দিব্য প্রেমে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।

—একে শুধু বদলে নিতে হবে—কক্ষেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার স্বরূপ করে নিতে হবে—কেন।

Not for my heart's sweet poignancy
Not for my happy body's bliss alone
I have claimed from thee, the living Satyaban
But for his work and mine, our sacred charge

আমার নিজের সুখের জন্য নয়, দেহের ভোগের জন্য নয়—ঊর্ধ্বচারিতায় আমাদের এই যুক্ত জীবন—

Our Love is the heavenly seal of the Supreme
For Love is the bright link twixt Earth and heaven
Love is the far Transcendent's angel here
Love is the man's lien on the Absolute.

প্রেমই হচ্ছে স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতু, দিব্যের বাহন, সেই এক ও অনাদির কাছে মানুষের ছাড়পত্র।

সাবিত্রী প্রেমের ঊর্ধ্বতম রাজ্যে উঠে যমরাজকে বলছেন—

I am a deputy of the aspiring world.

Release the Soul of the world called Satyavan ফিরিয়ে দাও সত্যবানকে—আমার প্রেম নিত্য, সত্য, অখণ্ড এ বাণী, অমোঘ বাণী। কালপুরুষকে হঠতেই হলো—

শ্রীঅরবিন্দ-প্রেমতত্ত্বের এই হলো মূল কথা। তার প্রজ্ঞা-ধ্যানে প্রেমের যে প্রত্যয় উদ্ভাসিত সে প্রত্যয় স্থির—তিনি অসংশয়িত চিত্তে বলেছেন—তুমি আছ, আমি আছি।

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস—

রবীন্দ্রনাথের মহুয়ায় দেখেছি কবি-প্রেমের একান্ত তপস্বিনী একাকিনীকে নিয়ে গেছেন এক অনন্তমের ঊর্ধ্বের রাজ্যে

যে মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে
অরূপো অরূপো আজি সাগরে সাগরে
জনশূন্য তুষার শিখরে
কোন মহাশ্বেতা কোন তপস্বিনী বিছালো অঞ্চল
শুভ্র অচঞ্চল
অনন্তের সংযোগিয়া কহিল সে ঊর্ধ্বে তুলি আঁখি
তুমিও একাকী

এও অপূর্ব উপলব্ধির রাজ্য—শ্রীঅরবিন্দ আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন—তুমিও একাকী নও, আমিও একাকী নয়, আমরা সব সময়েই মিলিত—সে মিলন অনন্ত, অসীম, রসঘন—তার মধ্যে মৃত্যুর অধিকার নেই, খণ্ডের বোধ নেই, নিয়তির নির্দেশ নেই। এই পূর্ণ পরিণামের কথাই সাবিত্রীর শেষকথা

আরো জাগি পরিপূর্ণতার স্তরে সর্ববাধাহীন।
সেই প্রেমের ওঠানামার মানুষ দেবতা, দেবতা মানুষ।

আসন

শ্রীচিত্র শর্ম্মা

মোর দীর্ঘ জীবনের ক্ষুদ্র তাঁত-শালে
চালায়েছি প্রতিপল মাকু তালে-তালে,

সুরে সুরে কান্না-হাসি,
পাওয়ার মিলার রাশি
বসায়ে গিয়াছি মোর বাসনার তালে।

বুনী-তোলা সুখ-দুখে,
চুমকির চিকন মুখে
স্নায়ু-সূতা কারুতায় বানেনি শাসন,
একা-একা অন্তরালে,
জীবনের তাঁত-শালে
আমার দেবতা লাগি বুনেছি আসন।

কবীর-তীর্থ—মগহর

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বর্ধিষ্ণু রেলওয়ে লক্ষ্ণৌ-গোরক্ষপুর সেকশনের মধ্যে ছোট একটি ষ্টেশন—নাম মগহর। গোরক্ষপুর হইতে মগহরের দূরত্ব মাত্র ষোল মাইল। উত্তর প্রদেশের বস্তী জেলার অন্তর্ভুক্ত এই মগহর গ্রাম ভক্ত-কবি কবীরের মহাপ্রয়াণ স্থান ও সমাধিভূমি। বস্তি শহর হইতে মগহরের দূরত্ব ২৭ মাইল। গোরক্ষপুর হইতে ফয়জাবাদগামী পাকা সড়কের পার্শ্বে এই গ্রাম অবস্থিত।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক কবীরের জন্ম হইতে মৃত্যু-ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন—কবীর কোন ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্র, মুসলমানের গৃহে পালিত; কেহ বলেন—তিনি মুসলমান জোলার ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। কবীর স্বয়ং নিজেকে কাশীর জোলা ও গুরু রামানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে নাথপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন তাঁহারাই জোলা বলিয়া পরিচিত হন। বাঙ্গলাদেশের তুন্তী বা তোশীরা নাথপন্থী, তাঁত-বোনা এই সম্প্রদায়ের জীবিকা। সমগ্র উত্তর ভারতে একসময়ে গুরু গোরক্ষনাথের নাথধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। গোরক্ষপুর নাথধর্মের অন্যতম কেন্দ্র, গোরক্ষপুর হইতে কাশী বহুদূরে নহে, সুতরাং জোলাদের পূর্ব পুরুষেরা নাথপন্থী ছিলেন এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যারা দুইক কাশীর পণ্ডিত বা যোগী-প্রভাবিত হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের পরিবেশের মধ্যে কোনধর্মের অন্তরসংস্কার কবীরের ধর্মমতকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই হিসাবে কবীরকে একজন বিদ্রোহী সাধক বলা যাইতে পারে। কবীরের উদার ও সার্বজনীন মতবাদ ভারতের নানাস্থানে যেমন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু ভক্তশিষ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তেমনি আজীবন বহু নির্যাতন ও প্রতিকূলতা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

আপন সাধনালব্ধ মতবাদ অত্যন্ত সহজবোধ্য লোকভাষায় প্রকাশ কবীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবীরের ধর্মমতাবলম্বীরা কবীরপন্থী নামে পরিচিত—উত্তর ভারতে কবীরপন্থীর সংখ্যা নগণ্য নহে। অবশ্য সহজবোধ্য, হেঁয়ালীপূর্ণ-ভগবদ্ভক্তি-স্নিগ্ধ দোঁহাবলীর রচয়িতা হিসাবেই কবীর অধিকতর জনপ্রিয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কবীর-সাহিত্যের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির সহিত কবীরের ভাবধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এই প্রভাব কবীর সাহিত্যের ধর্মমূলে অনুপ্রবেশের পরিণাম। গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর খৃষ্টীয় মিশনরীগণ খৃষ্টীয় ধর্মমতের নিকট রবীন্দ্রনাথকে বলী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার সহিত তাঁহার মানসিক যোগাযোগ প্রতিপন্ন করায় উৎফুল্ল ইউরোপীয় পাঠকদের গুরু কবি-গুরু কবীরের একশতটি কবিতা নিজে ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তক One hundred poems of Kabir নামে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশের পর ইউরোপে কবীরের নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও শিক্ষিত সমাজে কবীরের সমাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পূর্বে ভারত-সরকার কবীরের প্রতিকৃতি সম্বলিত ডাকটিকিটের প্রবর্তন করিয়া লোকমানসে কবীরের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত পঞ্চদশ শতকে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে এই প্রতিকৃতি গৃহীত হইয়াছিল।

কথিত আছে যে কবীরকে কেহ উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—তুমি কাশীতে প্রাণ রাখ, মোক্ষের আশা মুক্তির আশা কি? এই কথা শুনিয়া কবীর কাশী হইতে মগহরে চলিয়া আসেন এবং এইখানেই তাঁহার নরলীলার অবসান ঘটে। কবীর তাঁহার বিদ্রোহী মতবাদের জন্য কাশী হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন ইহাও শুনা যায়।

কবীরের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। কবীরের দেহান্তের পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার দেহের সদ্গতি লইয়া কলহ আরম্ভ করিল, শিষ্যেরা কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান। হিন্দু-শিষ্যেরা দেহ দাহ করিতে চাহিলেন, বলিলেন কবীর হিন্দু। মুসলমান শিষ্যেরা বলিলেন, গোর দিতে হইবে কবীর জোলা মুসলমান। শবের আচ্ছাদন উঠাইয়া দেখা গেল—দেহ নাই, কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে। মুসলমানেরা কতকগুলি ফুল লইয়া সমাধি দিলেন, হিন্দুরা কতক-গুলি ফুল লইয়া দাহ করিলেন। জীবিতকালে যাঁহার জীবন ফুলের মতই নির্মল ও সুরভিত ছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পুষ্পরাশিতে পরিণত হওয়ার কাহিনী সত্যই উপভোগ্য।

কবীরের দেহান্তকালের এই ঘটনা সর্বাংশে সত্য না হইতে পারে—তবে উহা যে নিছক কল্পিত কাহিনী নহে মগহরে আসিলে তাহার প্রমাণ মিলিবে। মগহর ষ্টেশন হইতে এবং মগহর গ্রামের জনবসতি হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে ধামি নাম্নী একটি স্রোতস্বিনীর তীরে পাশাপাশি দুইটি সৌধে কবীরের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। কবীরের সমাধির উপর মুসলমান শিল্পীরা একটি মকবরা বা সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন, ইহার স্থাপত্য মসজিদের অনুরূপ। উহার পাশেই হিন্দু শিল্পের দ্বারা স্থাপিত সমাধি মন্দির। কবীরজীর দেহাবশেষ কাশীতে লইয়া গিয়া দাহ করা হয় ও ভস্মাবশেষ এখানে প্রোথিত করা হয় বলিয়া কথিত আছে। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর দেহ দাহ করার প্রথা নাই, কবরস্থ করার বিপরীত প্রথা হিসাবে দাহপ্রসঙ্গ-কাহিনীতে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই পণ্ডিতদের অনুমান। যাহা হউক কবীরের দেহাবশেষের অর্ধাংশ ভস্ম-

হিসাবেই হউক বা পুণ্যরাশি হিসাবেই হউক এই স্থানে সমাধিত হয় ও তাহার উপর স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরে নিত্য আরতি পূজা প্রভৃতি নিয়ম সহিত সম্পন্ন হয়। মন্দিরটি প্রস্তর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত ও সুরক্ষিত। কাশীর কবীর-চৌরায় কবীরপন্থীদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত; এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই এই মন্দিরের সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। মুসলমানদের নির্মিত সৌধটি অধুনা শ্রীহীন ও উপেক্ষিত মনে হয়। এই সৌধটির চারিদিকে ও বেষ্টনী আছে। বেষ্টনীর মধ্যে বহু ফকিরের সমাধি রহিয়াছে। এক কোণে কবীর-পুত্র কামালের সমাধি আছে। মুসলমানদের জন্য সমাধি সৌধটি দিল্লীর বাদশাহের অন্যতম সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নাম কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে সুনির্মিত বা সংস্কৃত করা হয়। মগহর পরগণার একটি গ্রামের রাজস্ব হইতে এই সমাধির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। একটি ছোট পরিবারের উপর সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ ভার ন্যস্ত আছে।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মগহরে একটি বিরাট মেলা বসে। সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান ভক্ত-যাত্রীর সমাবেশে স্মৃতি সৌধ দুইটির চারিপাশ মুখরিত হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে মেলা উপলক্ষে সমবেত যাত্রীদের সুবিধার্থ এই স্থানে 'আমি' নদীর তীরে একটি মসজিদ ও একটি শিব-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। গোরখপুর-গোরখপুর রেলপথের ট্রেণ-যাত্রীরা ট্রেণ হইতেই পাশাপাশি অবস্থিত মন্দির ও মসজিদ দুইটি দর্শন করেন।

যাত্রি সাধারণের সুবিধার্থ মগহর ষ্টেশনটি পূর্বোত্তর রেলওয়ে কর্তৃক কিঞ্চিদূর্ধ্ব দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি পুনর্নির্মিত হইয়াছে। ভারতীয় স্থাপত্য কলাসম্মতভাবে নির্মিত ষ্টেশন ভবনটির উপর কবীর সমাধির উপর নির্মিত মন্দির ও মসজিদের অনুকরণে দুইটি গম্বুজ নির্মিত হইয়াছে। ষ্টেশন ভবনের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর ফলকের উপর কবীরের কয়েকটি সুনির্বাচিত দোঁহাবলীও খোদিত রাখা হইয়াছে। নবনির্মিত ষ্টেশন সকল শ্রেণীর যাত্রিদের বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যোদ্ধার জন্য আরামপ্রদ বিশ্রামালয়ের ব্যবস্থা সম্বলিত রাখা হইয়াছে। কবীরের সর্ব-ভারতীয় বিপুল জনপ্রিয়তার তুলনায় কবীরের অস্তিম আশ্রয় ভূমি মগহর এখনও সর্বভারতের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে মগহর এরূপ অনাদৃত থাকিবে না। অচিরেই ইহা একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হইবে।

। বিদ্যুৎ ।

কৃতী সোম

ওই বুঝি জেগে গেল কালির দোয়াত :
মেঘলা আকাশে
কালো রঙ মেখে দিলো মিশ্‌কালো হাত।

কালি নয়, রঙ নয়, চিন্তার পাহাড়
মনের আকাশে জমে, শুরু ভীর্ণ ঝাড়
অকস্মাৎ ভরে ওঠে,
কামনা-পাখিরা ছুটে
অস্থীন আবেগ ডানায়,
তারপর আকাশের ছবি বদলায়।
বিদ্যুৎ-আগুন
কখন ঝলকে উঠে, আমি বুঝি খুন!

আমার আকাশ চমকায়,
আমার দু'চোখ ঝলসায়,
আমাকে আহত করে যায়;
রাক্ষুসে পাখির মত খুঁটে খুঁটে খায়
আমার সবুজ কত সুখ
প্রজ্বলন্ত বিদ্যুতের মুখ।
সেতো নয় তিলোত্তমা—নিটোল নিখুঁত,
পৃথিবীর মেয়ে এক—মানবী বিদ্যুৎ।

চমৎকার—ঝলসায়—কাঁপে থরথর,
দেহের মেঘেরা করকর
পড়বে কি গলে গলে এ-দেহের তীরে?
বিহ্বল সীমানা ঘিরে ঘিরে?
বর্ষণের আগে কই হাতছানি নীল?
শিরায় শিরায় শুধু উগ্‌বগ্‌
রক্তের মিছিল।

চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

প্রত্যেকদিন এরাস্মিক পারফিউম্‌ড
কোকোনাট হেয়ার অয়েল ব্যবহার করলে আপনার
চুল ঘন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এরাস্মিক একটি
বিশুদ্ধ নারিকেল তেল যা চুল লাল রাখে এবং
চুলের গোড়া বাড়িয়ে তোলে। আজকেই এক
বোতল কিনে পরখ করুন—আপনার মনোমত
গোলাপ বা চামেলির সুগন্ধযুক্ত তেল পাবেন।

পারফিউম্‌ড কোকোনাট
হেয়ার অয়েল

এরাস্মিক কো. লি. পক্ষে এস. সুরা বিশ্বনাথ সিনহা কর্তৃক ৮৫, [illegible]

BCM. 3·752 BG

ভল্লুকের কবলে

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি যে যুগের কথা বলছি, তখন Coxwell Harrison Certus-Cordite .450০০ Repeating Rifle খুব জনপ্রিয় ছিল এবং ব্যবহাররীতি Rossএর মত সোজাসুজি টানতে হয়। এতে ৬০ গ্রেণ Cordite আর চারশ' গ্রেণের সওয়া তিন ইঞ্চি কার্ট্রিজ ব্যবহার হত—দেখতে যেন ছোটখাটো বোতলের মত। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না—এই রাইফেল আমিও কিছুদিন ব্যবহার করেছিলাম।

প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা। মাঝে মাঝে ছিটকে এধার ওধার শিকারে বেরিয়ে যাই। এবার রঙমঞ্চ কর্ণগড়—পটভূমিকা মেদিনীপুর, অন্ধ্র, গর্ভাঙ্গ, সম্বলপুরী উজ্জল মোটেই নয়, বরং কিছুটা ঘোলাটে বলা যেতে পারে।

জুন মাস—কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। এদিককার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, ধারাবর্ষণ চলেই শালগাছের জঙ্গলে ডিমটি করে পাতা গজিয়ে ওঠে। সেটা ক্রমেই এত ঘন হয় যে দূরে দৃষ্টি চলেনা—আর সেইজন্যেই জঙ্গলে ভালুকের সন্ধান পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমরা চারজন ভবঘুরে। সঙ্গী আরও আছে—দুজন সাঁওতাল আর দুটি কুকুর। জঙ্গল বিট্ করা হয়নি—আমরা পায়ে হেঁটেই ওধার ওধার ঘোরাফেরা করি।

প্রায় ঘণ্টা দুই ধোঁজাখুঁজির পর ভালুকের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। ঐ জঙ্গলে মাঝেমাঝেই উইয়ের ঢিবি আছে। ভালুক এসে প্রায়ই নখ দিয়ে ওই বল্মীকের গা চিরে ভুটোর মধ্যে নাক লাগিয়ে দেয়—আর নিঃশ্বাসের এক একটা লম্বা টানে পোকা বের করে এনে খায়।

খানিকটা অনুসন্ধানের পরেই ভালুকের অবস্থিতি টের পেয়ে গেলাম। কারণ তাদের কোনও একটা শব্দ শুনে বা গন্ধ পেয়ে সাঁওতালদের কুকুর দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে কোথায় যে পালিয়ে গেল—তার আর পাত্তা নেই। শিকারে এসে কুকুরের এই বিপরীত আচরণ দেখে স্তম্ভিত হ'লাম। এতদিন দেখেছি যে, তারাই জঙ্গলে ঢুকে শিকার তাড়িয়ে বের করে আনে। সেই আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এরা সমান তালে প্রয়োজনের রসদ যুগিয়ে এসেছে। মহাভারতের যুগে কুকুররূপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এবথা বাদ দিলেও, ঘরে ঘরে কুকুরের কী যত্ন, কী সেবা—দেখে মনে হয়, মানুষের চেয়ে তাদের চাহিদা এতটুকুও কম নয়—রাত্রে তারা পাহারা দেয়, বাজারের থলি বয়ে আনে; আমি আবার এমন একটা সাধারণ দেশী কুকুরের কথা জানি, যে থলির মধ্যে পয়সা আর জিনিষের ফর্দ্দ নিয়ে দোকান থেকে রাতিমত সওদা করে আনে—কোনও জিনিষ বাদ পড়লেই কেঁউ কেঁউ করে আর সেখান থেকে নড়তে চায়না। আজকাল তো কথাই নেই। মানুষের তৈরী নকল চাঁদে উঠে অনন্ত মহাশূন্যে পৃথিবী বেষ্টন করে পরিক্রমণ করেছে সর্ব্বপ্রথম সেই কুকুরই।

কুকুর-মাহাত্ম্য বাদ দিয়ে এবার শিকার-মাহাত্ম্যে আসা যাক।

আমরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলাম। ওদিকে চারজন—আর এদিকে আমি আর আমার পাশেই শাণিত-ভীরফলা নিয়ে একজন সাঁওতাল। ওরা গেল বাঁদিকে, আর আমরা গেলাম ডাইনে। ভাল্লুকপ্রবর ঠিক কোথায় এবং কী ভাবে আছেন—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা দুজন এগিয়ে যাই।

ওদিকে ভাল্লুকও জঙ্গলে মানুষের আগমন টের পেয়েছে, কারণ সব জন্তু-জানোয়ারই জঙ্গলে নূতন কিছুর আমদানী হলেই বুঝতে পারে। বনের জীব-জন্তুর সহজাত অনুভূতি এতই তীক্ষ্ণ যে জঙ্গলে কেউ ঢুকলেই তারা টের পেয়ে যায়। অরণ্যচারী যে কোনও পশু-পক্ষীরই এটা স্বভাবজাত ধর্ম।

অদূরে উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলীর আওয়াজ হতেই বোঝা গেল, একটি জানোয়ার যেন আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। চীৎকারেই বুঝলাম, ইনিও ভাল্লুক না হয়ে

যান না। লক্ষ্য করে দেখি, আমার কাছ থেকে প্রায় ২০ গজ দূর দিয়ে জানোয়ারটা ছুটে যায়—আমিও দৌড়ে কিছুটা এগিয়ে গেলাম, যাতে ভাল করে দেখতে পাই। যেমন দেখা অমনি আওয়াজ।

আশ্চর্য্য, সে পড়ল না—ফিরেও চাইল না, গতি-বেগেরও কোনও হ্রাস নেই—ছুটেই চলেছে! বেশ লক্ষ্য করে দেখলাম—সে যেন ডান দিকে ঘুরতে চায়। আমিও তখুনি ছুটে গিয়ে ডান দিকে দাঁড়ালাম এবং তার দেহের উপযুক্ত স্থান নজরে আসতেই আবার গুলী করি। ততক্ষণে ভাল্লুকটা ঘুরে আমার সামনা-সামনি এসে পড়েছে। আমার আর ভাল্লুকের ব্যবধান অত্যন্ত অল্প—প্রায় বিশ পঁচিশ ফুট হবে।

খুব তাড়াতাড়ি রাইফেলে আবার গুলী ভরতে যাই—কী সর্ব্বনাশ। ব্যবহৃত গুলীর খোলটা একেবারে নলের মধ্যে আটকে গিয়েছে—নড়াচড়ার নাম গন্ধ নেই। প্রাণ সংশয়াপন্ন—এই মুহূর্ত্তেই ভাল্লুকের স্নেহ-আলিঙ্গনে লৌহ-তীম চূর্ণ হয়ে যাবে। কী বীভৎস রূপ। তার লেলিহান জিহ্বার যেন মৃত্যুর আহ্বান! সুতীক্ষ্ণ দাঁতগুলো সূর্য্য-কিরণে ঝিক্‌মিক্ করে উঠল।

আমার স্থির লক্ষ্য ভাল্লুকের চোখের ওপর—সে যদি আর দু'পা এগিয়ে এসে আক্রমণ করে, তবে আমার হাতের রাইফেলটি ওর মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ বন্দুকটি তখন আমার উরুদেশে—স্কন্ধে নয়—আর বেল্ট নিয়ে টানাটানি করবারও সময় নেই। ইতিমধ্যে আমার কানে আরও দুটি গুলীর আওয়াজ এসে পৌছুলো—তার সঙ্গে দূরে আহত ভাল্লুকের চীৎকারও শুনতে পেলাম। কিন্তু তখন নিজেই মারা যাই—কাজেই সেদিকে লক্ষ্য করবার ফুরসৎ কোথায়?

এত কাছে এসেও ভাল্লুকটি আমার দিকে তাকিয়ে হাঃ হাঃ করতে থাকে। ভাবলাম, এই মুহূর্ত্তে দু-পায়ে ভর দিয়ে, দু-হাত উর্দ্ধে তুলে আমার উপর ঝাঁপ দেয় আর কি। আর মাত্র চার পাঁচ ফুটের ব্যবধান! আমার দৃষ্টি বিস্ফারিত, নিঃশ্বাস রুদ্ধ, বুকের স্পন্দন দ্রুততর, বুঝি আর রক্ষে নেই।

ভগবান্ যাকে বাঁচান, তাকে মারে কে?

হঠাৎ ভাল্লুকটা টাল খেয়ে বাঁদিকের থাবে গড়িয়ে পড়ল। গড়াতে গড়াতে নীচে কিছুদূর গিয়েই ভল্লুকটির ভবলীলা সাঙ্গ।

ওদিকে আমার দলীয় লোকের কলরব শুনতে পেলাম। কী সংবাদ? জানতে কৌতূহল হওয়াটা বিচিত্র নয়। প্রাণে রক্ষা পেলাম তাই, নইলে বিপরীত কিছু ঘটলেই সংবাদ নেওয়াটা এ জন্মের মত ফুরিয়ে যেত। সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, দুটো ভাল্লুক ছিল—একটা শুয়ে আর একটা বসে। বসা ভাল্লুকটাকে গুলী করতেই অপরটি কোথায় ছুটে পালিয়ে গেল।

বাধা দিয়ে বলি—

—সেটি আমার গুলীতে তখন হয়ে একটা খাদে টাল খেয়ে পড়েই অক্কা।

আমার বন্দুক বিভ্রাট ও প্রাণ বিপন্ন হওয়ার কথা তাদের সবাইকে খুলে বলতেই তারা সচীৎকারে আমাকে অভিনন্দন জানালে—

"Long live our Hero—কিন্তু—

—আবার কিন্তু কী?

—তুমি তো ভাই নিপাতনে সিদ্ধ—এদিকে কিন্তু চার-পাঁচটা গুলী খেয়েও আমাদের ভল্লুকটি যে 'ভাগল্‌বা'!

—এত গুলীবৃষ্টি সত্বেও? তাহলে নিশ্চয় ঠিক জায়গা মত লাগেনি।

জনৈক বন্ধু মুরুব্বীয়ানা চালে উপদেশ দেন।

—আরে, ওসব কথা এখন যেতে দাও—এই নাও আমার winchester Rifle—তুমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখনা, কী হয়! আমার জন্যে পরোয়া কোরোনা—রিভলবার ছাড়!

তিনি কটিবন্ধে রক্ষিত রিভলবার একহাতে দেখিয়ে অপর হাতে তাঁর রাইফেল আমার হাতে তুলে দিতেই পূর্ব্বতন সাঁওতাল সঙ্গীটিকে নিয়ে আমি আবার ছুটে চলি। তাঁরাও আমার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিছুদূর হৈ-চৈ করে এগিয়ে যেতেই অদূরে দেখলাম, সেই গুলী-খোর ভাল্লুকটি যেন মরণোন্মুখ অবস্থায় দুহাত বাড়িয়ে টলতে টলতে ধেয়ে আসে—তবুও দুইঞ্চি, আড়াই ইঞ্চি মোটা শালগাছগুলো মট্‌মট্ করে ভাঙবার শক্তি তখনও সে রাখে। ধার-করা রাইফেলটাই তখন কাজে লাগিয়ে দিলাম। বুকের সাদা জায়গায় আমার গুলী লাগতেই

সেই বিশালকায় ভালুকটি এবারকার মত তত্ত্বধারণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

অনুগামী বন্ধুদের বলি—

—এ শিকার আমার নয়—সর্ব্বপ্রথম যার গুলী ওর দেহ স্পর্শ করেছে—আইন অনুযায়ী এটি তারই প্রাপ্য।

আইন দেখালাম বটে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদও শুনলাম—

—সে আর কেমন করে হয়? আমরা সবাই চাঁদা করে চালিয়েছি—কার গুলী যে কালা-মাণিকের অঙ্গ স্পর্শ করেছে, কে জানে! অতএব লটারী করেই ওর মালী-কানা সাব্যস্ত করা হউক।

যুক্তিটি বন্ধুটির উর্ব্বরে যে মুনশিয়ানা ছিল, তার উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেলামনা।

এদিকে সাঁওতালের হাতে আমার নিজের বন্দুকটি চোখে পড়তেই, সেটি নিয়ে, একটা মজবুত সরু শালের ডাল দিয়ে উল্টো দিক থেকে নলের মধ্যে খোঁচা দিতেই সেই আটকে-থাওয়া গুলীর খোলটা বেরিয়ে এলো।

শিশুকালে পড়েছি—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়েছিল। হাড় বের হতেই বাঘ যেমন তার নিজস্ব রূপ ধারণ করেছিল, খালি কার্ট্রিজ বেরিয়ে আসতেই, আমার বন্দুকও তেমনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল।

উৎসাহী সাঁওতালেরা তখন ভালুকটিকে লোকজনের সাহায্যে বয়ে নিয়ে যায়—আমরাও পশ্চাতে শবানুগমন করি। প্রকাণ্ড রাজপথের ধারে, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা জায়গায় সেটাকে এনে ফেলতেই, আঙুল দেখিয়ে জনৈক মোড়লের গদ্‌গদ্ ভাব—

—চাইন্দা রে চাইন্দা—বাঁচাইলেন, সায়েবরা বাঁচাইলেন।

ভালুকটার কপালে অর্দ্ধচন্দ্রের মত বেশ পরিষ্কার একটা দাগ—মস্তকের অগ্রভাগ একেবারেই লোমশূন্য। জবা-কুসুম মাখলে টাকে চুল গজায় কিনা, সেটা কৌশল্যা-উপাসকরাই বলতে পারেন—কিন্তু আমাদের এই ভালুকটি জোড়ে যে জবাকুসুম মাখায় মাখতেন, তার সাক্ষাৎ বিবরণ দিলে গাঁয়ের সেই মোড়ল—রীতিমতো লোমহর্ষণ ব্যাপার হলেও লোক বর্ণনের মান্য সাক্ষী সে নিজেই। রোজ বিকেলে সেই ভালুকটি নাকি পুকুর পাড়ে এসে মানুষের মতই তার অঙ্গসজ্জা সুসম্পন্ন করতো—আর মাঝে মাঝেই সেই 'পাড়-বাঁধানো' পুকুরের আরশিতে নিজের অপরূপ মূর্ত্তি দেখে, বিরক্তি ও ঘেন্নায় যেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠতো—তার ফলে মেয়েরা কেউ 'গাগরী-ভরণে' ওপথে হাঁটতো না—এমন একটা জলজ্যান্ত যম-দূতের সামনে কেই বা যেতে চায়!

এই কথা শুনেই একজন শিকারী বলে উঠল—

—ভালুকের হাবভাবও অনেকটা মানুষের মতই। দু পায়ে হাঁটে—বাচ্চা কোলে নিয়ে আদর করে—আবার গারো পাহাড়ে একজাতের ভালুক আছে তাদের বৌ-মারা ভালুক বলে—বৌকে যেমন আদর করে, তেমনি কথায় কথায় 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিতেও ছাড়েনা। মানুষ অবশ্য এখন সেই আদিযুগ কাটিয়ে এসেছে।

অতঃপর পরীক্ষা কার্য্য। কয়েকটি গুলী লেগেছে—কোমরে পিঠে, তলপেটে, আর একটি সামনের হাতে—আর ভালুকের বক্ষে আমার বুলেট! মেপে দেখা গেল পাক্কা ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি।

আজকাল সমবায় পদ্ধতিতেই কাজ করার রীতি; কিন্তু সে যুগেও শিকারে সমবায় শক্তি নিয়ে আমরা যে এক বিশাল গুরুরাজকে ভূপতিত করেছিলাম—তার আনন্দও কোনো অংশে কম নয়।

এবার আমাদের সেই টেকো ভালুকটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তিনি একদিন কাদায় মাখা খুঁড়ে অঙ্গপ্রসাধন করতেন, এবার তিনি 'টান' হয়ে এসে তোরণদ্বারের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করবেন। জনৈক প্রবীণ মোড়লের হাতে দু'খানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে ভালুকটির চামড়া ছাড়িয়ে আমাদের ক্যাম্পে পাঠাবার নির্দ্দেশ দিলাম। সেই সঙ্গে এটাও বিশেষ করে তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিই, আমার স্বহস্ত-নিহত যে ভালুকটি যাদের গহ্বরে নিজের সমাধি রচনা করেছে, তারও ছাল ছাড়িয়ে যেন ঐ সঙ্গেই পাঠিয়ে দিতে ভুল না হয়।

শেষের পরও অবশেষ থাকে?

এবার সংক্ষিপ্ত সমাচার। আমরা চাঁদা করে যে ভালুকটি মেরেছিলাম, সেই চাইন্দার চামড়াটি পরদিন আমাদের আস্তানায় এসে পৌঁছুল। আমি স্বয়ং যে ভালুকটিকে নিধন করেছিলাম, সেটি এলো না। তার কারণ জানতে চেয়ে শুনলাম—সেই সাঁওতাল কোন এক সৌখীন বাবুর কাছে সেটা বিক্রী করে দিয়েছে—হেতু নাকি তাড়ি খাবার পয়সার অভাব। তাছাড়াও কর্জ্জ নিয়েছিল—সুদে আসলে পরিমাণটি বৃদ্ধি হওয়ায়, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সে নাকি ধার পরিশোধ করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

এই শুভসংবাদটি অবগত হয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হ'লাম।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ আকাশের পটে ফটো : দিলীপকুমার রায়

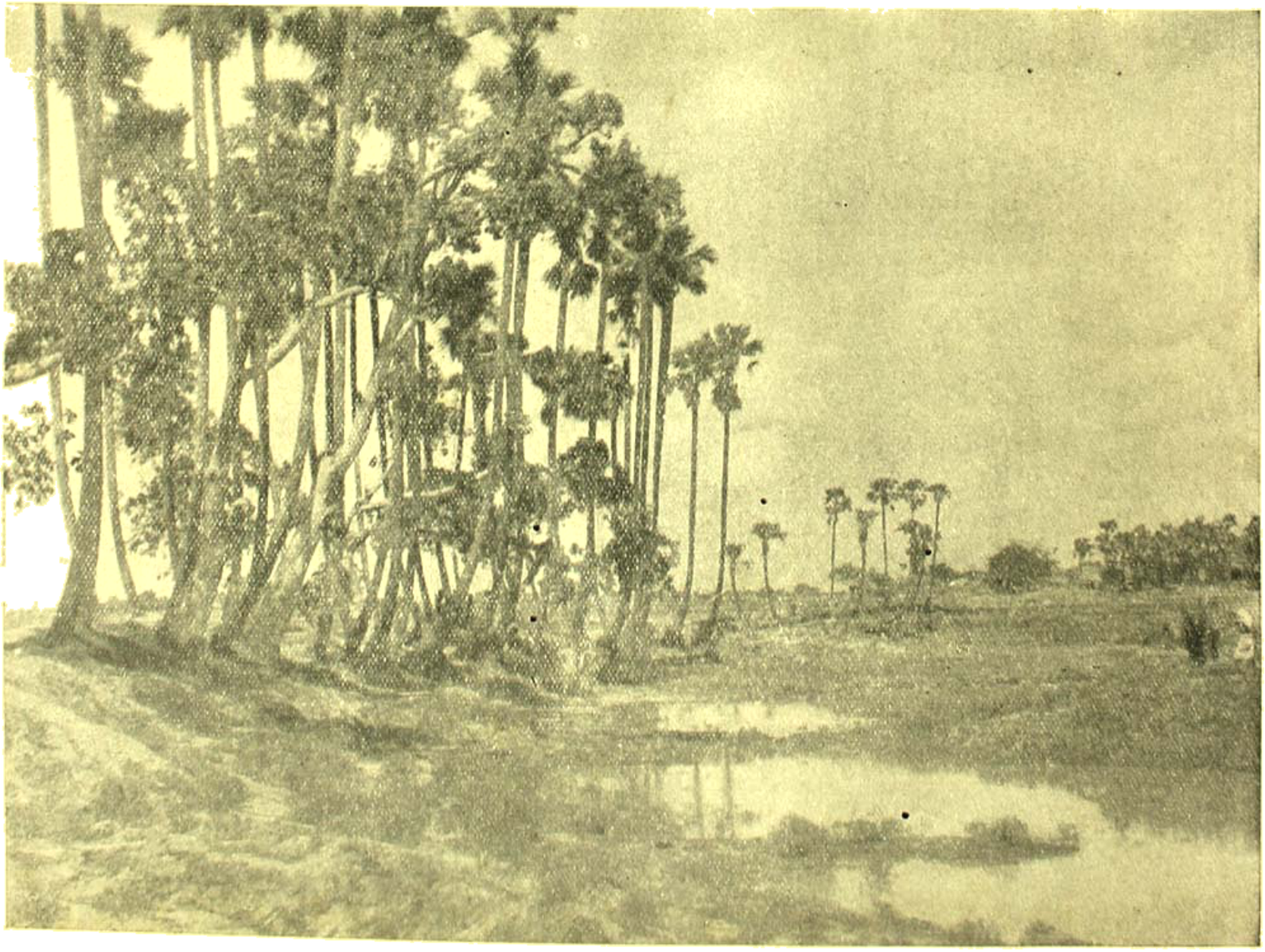

ভারতবর্ষ রিপিট প্রার্থনা

ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ

ফটো : রবি পণ্ডিত

চিত্রোপম ভারত

উপানন্দ

ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবর্ষকে উদ্দেশ করে গেয়েছেন—'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে—' কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই জন্মভূমির প্রশস্তি বন্দনা করে তাঁর অমর সঙ্গীত রেখে গেছেন—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের রাণী সেযে আমার জন্মভূমি'—ভারতের রাজধানী দিল্লী। এই দিল্লী অন্তত বহুলক্ষ বৎসর আগে কেমন করে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল এ সম্পর্কে ডক্টর ডি. এন ওয়াডিয়া গবেষণার সাহায্যে অনুমান করে বলেছেন বর্ত্তমান দিল্লীতে ভারতীয় ভৌগোলিকদের সাধারণ বার্ষিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে তিনি ছিলেন সভাপতি।

সভাপতির ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে আরাবল্লী পর্ব্বতমালার উত্তর শৈল-শিরায় যেখানে দিল্লী অবস্থিত, তার জন্ম হয়েছে এক শত কোটি বছর পূর্ব্বে। সেই সময়ে এইসব গিরিশ্রেণী জন্মলাভ করে। তারপর এলো বৃষ্টিধারার তীব্র স্বাভাবিক আক্রমণ ও আলোড়ন। ফলে উত্তর ভারতে অধিকাংশে স্থলও এমন কি দিল্লীর, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল আর বিশ হাজার ফুটের ওপর পাললিক পলি পুঞ্জীভূত হয়ে রইলো। ষাটকোটি বছর পূর্ব্বে সমুদ্র থেকে উত্থিত হোলো উত্তর ভারত ভূমি, আর সেই সময় থেকে দিল্লী ও কল্যাকুমারিকার মধ্যবর্ত্তী স্থলও সুদৃঢ় স্থলভুক্ত হয়ে রয়েছে। যে উত্তর-ভারতীয় সমুদ্র একদা দিল্লী অঞ্চল ও তার সন্নিহিত শৈলশিরা গ্রাস করেছিল, সেই সমুদ্র প্রায় দশকোটি বছর পূর্ব্বে হিমালয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। সিন্ধু গাঙ্গের উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে পরবর্ত্তীকালে। দিল্লী অঞ্চলের ভৌগোলিক ইতিহাসের সময়কাল যদি চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নেওয়া যায় তা হোলে যুধিষ্ঠিরপুরের প্রতিষ্ঠা সময় থেকে ধরে দিল্লীতে মানুষের বসতির সময় নির্ণীত হবে এক সেকেণ্ডের ষাটভাগের চার ভাগ—তাই ওয়াডিয়া তাঁর ভাষণে এই কথাই বলেছেন, তাহোলে বুঝে দেখ এই ভারতবর্ষ কত প্রাচীন, এখানে মানুষের বসতি ও সুরু হয়েছে সংখ্যাতীত বর্ষ আর এর সভ্যতা ও সংস্কৃতিও সবচেয়ে পুরাতন। বৈদিক সভ্যতার আবির্ভাবকাল এর তুষার-প্রবাহ যুগেরও পূর্ব্বে। এই 'ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' জন্মলাভ করে তোমাদের গর্ব্ব অনুভব করা উচিত।

পৃথিবীতে কোথাও ভারতবর্ষের মত বিচিত্র সৌন্দর্য্যপূর্ণ বৃক্ষময় দেশ নেই, এখানে বহুরূপ নিত্য খেলা করে। অতীতের তপোবনপ্রেরিত প্রত্নশিল্পীরা এর প্রাচীন স্মৃতিবোধ আর প্রাণাবেগকে এমনভাবে গঠন করে গেছেন যে, আমরা আজও তার নিদর্শনগুলি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতবাসীদের সামাজিক আচার-পদ্ধতি, পাল-পার্ব্বণ অনুষ্ঠান, পর্ব্বসমারোহ, ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা, যোগ, দর্শন ও শিল্পকলার অত্যাশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর ভিতরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে সমাবৃত—প্রাচীন ভারত গৌরবের উচ্চশিখরে উঠেছিল। বর্ত্তমানে বস্তু-বিজ্ঞানের যেসব নব নব আবিষ্কার দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি, এসব আবিষ্কৃত হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে, যন্ত্রসভ্যতা উঠেছিল চরমোন্নতির গৌরীশৃঙ্গে—যন্ত্রযুগের অধিপতা আজকের দিনের মত সেযুগেও হয়েছিল, তাই এর ধ্বংসের জন্যে ভগবান বারে বারে মানুষের রূপ ধরেছিলেন। পাশ্চাত্য জাতিরা সংকুচ শিক্ষালাভ করে আর এদেশের পুঁথিপত্র বিদেশের দেশে নিয়ে গিয়ে তরজমা করে পড়েছে আর বিশ্লেষণ করেছে। আজ যে জড়-বিজ্ঞানকে উপাসনা করা হচ্ছে, সেই বিজ্ঞানই অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হবে।

প্রাচীন ভারত বারে বারে এই বিজ্ঞানের দানবীয় লীলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে এর উচ্ছেদসাধন করেছে, আর প্রকৃতির শুভ্রপানে তার পুষ্ট হয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম-বহির্ভূত সর্ব্বপ্রকার কাজ বর্জ্জন করে গেছে, এই ভারত জড়বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় না দিয়ে ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের সন্ধান করে অদ্ভুতের সন্ধান করেছিল। পৃথিবীর ধ্বংস আসন্নপ্রায়, এর জন্য দায়ী হচ্ছেন পাশ্চাত্য জগৎ। আজ আমরা পাশ্চাত্যানুরাগির পদলেহী, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হোতে পারে!

যেখানে যত প্রকৃতির পূজারী, ইঞ্জিনিয়ারিং আর বিজ্ঞানবিদ—তাদের কাছে হাওড়ার মহাবণ্য, পার্বত্যবাসী, উপত্যকা ও অধিত্যকা, কৃষিক্ষেত্র, মরুভূমি, নদনদী ও প্রস্রবণধারা অপূর্ব বলেই মনে হবে। শিকারীদের কাছে জঙ্গলের জীবন্ত পশুপক্ষী বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এখানে আছে বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, হাতী, মহিষ, বাইসন প্রভৃতি নানা জন্তুর, সরীসৃপ আছে—বিভিন্ন প্রকারের সর্প, কুম্ভীর, কচ্ছপ প্রভৃতি—আর আছে ময়ূর, পাহিরাস প্রভৃতি বিদেশ থেকে আনা পাখী। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়। এই বেলুড়ের হিমালয়-শৈলারোহণে অনেক নামী পর্বতের অভিযাত্রীরা। পশ্চিমভারতের গুহার মন্দির নানাভাবে অভিনব। কেননা এখানে মুসলমান প্রমশিল্পীরা পাহাড়পর্বত খোদাই করে নব নব শিল্পসৌধ। প্রকাশ করেছেন, পাহাড় কেটে কেটে কতরকম না চিত্রবিচিত্র!

বোম্বাই বন্দরের পাশে এলিফেন্টার গুহাতে যে ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, তার তেতর শুধু শিল্পীর অসাধারণ কৃতিত্বের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায় না, পশ্চিম ভারতের হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পরিচিতিও প্রত্যক্ষীভূত হয়। কার্লি ও ভজার ভিতর যেসব গুহা আছে, সেগুলি বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন। এরকমের সুপরিচিত্র প্রাচীনতম, এখানে তার কিছু কিছু প্রমাণ পেয়েছে। কার্লাতে বাস্তুশিল্পের যে নিদর্শন রয়েছে, তা দুহাজার বছরের আগেকারো তেমন যায় না—সুদূর অতীতের শিল্পবিভাবকে বুকে নিয়ে আজও সে দাঁড়িয়ে আছে। শিল্প-প্রেমিক তীর্থযাত্রীদের কাছে অজন্তা, ইলোরা আর ঔরঙ্গাবাদের গুহা-গুলি পুণ্যবিস্ময়রূপে অবস্থিত। অতীতের এই মহান শিল্পসৌকর্য আজও যে কালজয়ী হয়ে রয়েছে, পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ বলেই আমরা জেনেছি। ভারতের নবতর অমূল্য সম্পদের কিছু কিছু পাওয়া গেছে এলোরায়—অরঙ্গা ও কৈলাসমন্দিরের প্রাচীরগাত্রের চিত্রলেখায়। গুহামন্দিরগুলির পাশে ঔরঙ্গাবাদের সন্নিহিত স্থানে ঐতিহাসিক স্মৃতি-সম্বলগুলি আমাদের চিত্ত অধিকার করে তোলে—বিবি-কা-মোকবারা ও দৌলতাবাদের দুর্গ অতুলনীয়।

ঔরঙ্গাবাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত চাঁদমিনার, মোগলকুঞ্জ দুর্গ, সালাবক্ষ বাদুঘর প্রভৃতি ভ্রাম্যমান মানুষের কাছে সমাদৃত হয়ে থাকে। বিজাপুরের গোলগম্বুজ এবং ইব্রাহিম রাজার আছে অপূর্ব শিল্পনিদর্শন। এ ছাড়া এতদঞ্চলে এসে মাণ্ডি, আইহোলি আর পট্টাডকল প্রভৃতি দর্শন করে যাওয়া উচিত কেননা মানুষের প্রাগৈতিক সময়ের ইতিহাসের পাতা এখানে ছড়ানো রয়েছে—চৌলুক্যের মন্দিরগুলি ও পট্টডকল্লের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে তাদের স্থাপত্যশিল্পের চরমোৎকর্ষ। বোম্বাইয়ের উত্তরে আমেদাবাদ, আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহররূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর আভরণ হয়ে রয়েছে মনোমুগ্ধকর সুন্দর মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের অলঙ্করণ। মাটেরান জায়গার বৈকল্পের মিলনতীর্থ মন্দির। অকৃত্রিম ধবলবর্ণ পাথরে গড়ে উঠেছে এর ভাস্কর্য শিল্পের মোহিনী-সৃষ্টি। বিচিত্র-বর্ণের মানুষ যেন যায় সেখানে। এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে—শ্বেতমর্মর গঠিত পালিতানা সহর, দুর্গ এবং পর্বত-বেষ্টিত হ্রদসহ, গান্ধীজীর জন্মভূমি পোরবন্দর সৌরাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করেছে। এশিয়ার একমাত্র সিংহের বাসভূমি গির-জঙ্গলে ভ্রমণ ত্রাসাধ্যের পক্ষে আনন্দ-প্রদ। প্রায় দুহাজার বছরের কীর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক-প্রসিদ্ধ মহাভারত—তার স্তরে স্তরে রয়েছে প্রাচীন দিনের স্মৃতিসৌধ। খ্রীষ্টপূর্ব ছয়শত বছরের পশ্চাতে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তার উজ্জয়িনী পৃষ্ঠাগুলি পড়ে আছে প্রাচীন অবন্তী উজ্জয়িনীতে—এই উজ্জয়িনী কালিদাসের আবা-নিকেতনী, এইখানেই ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। এখানেই ছিল বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা।

বিন্ধ্য বা বিন্ধ্যাচল উপত্যকাগুলি অতীত ভারতের হিন্দু ভাস্কর্যের মহিমা বক্ষে করে নিয়ে আজও বর্তমান। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর স্মৃতিজড়িত সাঁচী, এর বিরাট স্তূপ আর অধিত্যকার খোদিত তোরণ নিয়ে অবস্থিত, বৌদ্ধদের প্রচুর ভগ্নাবশেষ রয়েছে এখানে। ওয়ার্ধার কাছে গান্ধীজীর সেবাগ্রাম শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। রাজপুতনের প্রাচীন রাজভূমি রাজস্থান বিশেষভাবে দর্শনীয়। রাজাদের রাজিয়ে আছে সৌধমালা-শোভিত জয়পুর, এর কাছেই প্রাচীন রাজধানী অম্বর। উদয়পুরের কাছে অবস্থিত মনোরম হ্রদ, প্রাসাদ, আর উপত্যকা। মরু-প্রান্তরের শৈলসমাচ্ছন্ন প্রান্তে মরুদ্যানে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপূর্ব নগর যোধপুর। পঞ্জনদ ভূমে যাঁর শিকারের জন্যে পৃথিবীর নানাদেশের লোক আসে শিকানীরে। চিত্রশালা ও যাদুঘরের জন্য প্রসিদ্ধ আলোয়ার। এখানেও শিকারের প্রাণী বহু প্রকারের থাকায় শিকারীরা ছুটে আসে। তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আজমীর। ইতিহাসের ঘটনাবলিত আজমীর চারণো-বিদের অনেক কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সহরের সাত মাইল পশ্চিমে পবিত্র তীর্থ-হ্রদ পুষ্কর। অতীত ও বর্তমানের মধ্যবর্তি বিরাট কাল যুগ যুগই না সঞ্চিত করেছে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য—কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এর যাদু—কত সাম্রাজ্যেরই না রাজধানী ছিল দিল্লী। দিল্লী থেকে দক্ষিণে দুই মাইল দূরে যমুনা তীরে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের রাজভবনের ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়।

মোগল শাসনকর্তারাই আগ্রার দীর্ঘ মহিমামুকুট পরিয়ে গেছেন, সাজিয়ে গেছেন নবনব সৌধ স্থাপত্যশিল্পের অলঙ্কারে। আকবর আগ্রাকে সৃষ্টি করে গেছেন, শাজাহান এসে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য তাজ-মহলের সৃষ্টি করে গেছেন, এখানে—এই তাজমহল প্রেমের সমাধি তীর্থে পাষাণের মহাকাব্য। আগ্রা দুর্গ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আগ্রার মাইল মাইল দূরে আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রী পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এখানে সম্রাটের প্রাসাদ এখনও দর্শকগণের অন্তরে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতির স্মৃতি বহন করছে লক্ষ্ণৌ। আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়, এটি ভারতের সর্বাপেক্ষা নূতন সহর। শিখদের পবিত্র নগর অমৃতসরে সুবর্ণমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে স্বর্ণ সৌপোন্ন ওয়ের মীনার কারুকার্যগুলি মানুষের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। হিমালয়ের উপর

ও মধ্য ভাগে শৈল শিখরে গ্রীষ্মাবাসের উপযোগী বহু সুন্দর স্থান আছে। এইসব পার্ব্বত্য অঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লোক সমাগম হয়, তাছাড়া হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব—হিমালয়ের ভিতর এমন সব স্থানের অলৌকিক ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে যা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। হিমালয়ের পশ্চিম দিকে ডালহৌসী—এর শান্ত সৌম্য দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। ফুলু ও কাংরা উপত্যকা ছোটখাটো শিকারের উপযোগী, এখানে আছে বহু আপেলের বাগান। সিমলায় তিতিরপাখী শিকার ও ঘোড়ার ষ্টেটং, মায়াকান্দা থেকে ফুলুর দৃশ্য, ভিন্নতের পথে রামপুর ও চিনি চিত্রোপম করে রেখেছে। প্রাচ্য সুইজের জেলিস কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর—কাশ্মীর এশিয়ার স্বর্গভূমি। এখানে আছে সুন্দর নদী ও হ্রদ, কাশ্মীরের কামনগুলি বিচিত্র বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীরের গুলমার্গ, সোনামার্গ, পহলগাম, অমরনাথ তীর্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলমোরা ও রাণীখেত হিমালয় সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশ করছে, আর আলমোরার কাছে সিওরী তুষার-প্রবাহ আলোকচিত্রের পক্ষে অতীব সুন্দর। ইণ্ডো-নেপাল সীমান্তে লুম্বিনী। এখানে গৌতম বুদ্ধ বাস করেছিলেন ও ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। গয়ার দক্ষিণে ৯৯ মাইল দূরে বুদ্ধগয়া। এখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। কাশীর নিকটে সারনাথ। এখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান। বারাণসী ভারতের প্রাচীনতম পুণ্যতীর্থ ভূমি। এখানে আর্য্যসভ্যতা, সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধনার চরমোৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। উত্তর প্রদেশে কুশীনগর। এখানে বুদ্ধ নির্ব্বাণলাভ করেন।

হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে দার্জ্জিলিং। এখান থেকে দেখা যায় এভারেষ্ট। কালিম্পং কার্সিয়াং সিংং প্রভৃতি স্থানে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। আসামের শিবসাগর ও গৌহাটীতে রয়েছে আহম রাজাদের ধ্বংসাবশেষ। আসাম চা বাগানের জন্য বিখ্যাত, এখানে গহন অরণ্যে হস্তিযূথ ও একটি শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডার পাওয়া যায়। কামাখ্যা পাহাড় হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান। হরিদ্বারের একক্রোশ পূর্ব্বে চণ্ডীর পাহাড়ে থেকে গঙ্গার নীলধারা দেখতে পাওয়া যায়। জমনোত্রী, হরিদ্বার, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি হিমালয়ের মধ্যে পুণ্যতীর্থরূপে অবস্থিত। হরিদ্বারের তিনদিক ঘেরে আছে উপলকোণে মানসসরোবর। এখানে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ অবস্থান করেন।

কলিকাতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখান থেকে প্রায় একশত মাইলদূরে শান্তিনিকেতন। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাধনা করে গেছেন আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে গেছেন। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারক প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন রয়েছে মন্দিরগুলিতে। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সময় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে শতাধিক বিখ্যাত মন্দির একমাত্র ভুবনেশ্বরেই। মুক্তেশ্বরের মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অমূল্য রত্ন। পুরীর সমুদ্র, চিল্কাহ্রদ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দাক্ষিণাত্যের মেরুদণ্ডের মেরু। দক্ষিণাত্যের প্রত্যন্তদেশে বহু সুন্দর সুন্দর নদী, অরণ্য, হ্রদ, প্রস্রবণ, সমুদ্র উপকূল, তীর্থের প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের মূর্ত্তিই না মূর্ত্তিতে ভরেছে রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত। মহীশূরের চতুষ্পার্শ্বে উত্তম-পরিকল্পিত অলঙ্কারমণ্ডিত তীর্থভূমি, বৃহৎ প্রাচীন অরণ্যশ্রেণী, জলপ্রপাত ও হুর্গপদবি নয়নাবলম্বকর। একটি প্রস্তরখণ্ড কেটে বন্দী বাঁড় তৈরারী হয়েছে পর্ব্বতের ওপর, একে দেখতে পাওয়া যায় মহীশূর থেকে। সহরের ওপর বাঁড়ির আশ্চর্য্যরকম পরিষ্কৃত পরিলক্ষিত হয়। নির্ঝরের সুন্দর লীলা প্রকাশ পায়ে মহীশূরের বৃন্দাবন বাগানে, এই বাগানটী মনে হয় যেন আধুনিক পরীর রাজ্য। বাঙ্গালোরের লালবাগে রয়েছে একটা কুষ্মাণ্ডের ওপর বহু ছত্রাকা ও বিবেশাগত লতাগুল্ম আর উদ্ভিদ শ্রেণী। সারানা বেলগোলায় গোমতেশ্বর মূর্ত্তিটি একটী বিপুল প্রস্তর খণ্ড গড়ে উঠেছে সাতাশ হাত উঁচু করে। বিদুরের তোরা কেশবের মন্দির, ওয়েলবিদে হয়শালেশ্বর মন্দির মধ্যযুগের হয়শালদের অপূর্ব্ব স্থাপত্য নিদর্শন। মহাবলীপুরমের গুহামন্দির, প্রস্তরগোদিত মহাভারতের চিত্রাবলী, প্রাচীন রাতিনর প্রভৃতি সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর পল্লব-স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্য্যের গৌরবময় কীর্ত্তিমালাক্ষে সমৃদ্ধ উপকূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পল্লব, চোল ও বিজয়নগরের মহিমা বিস্তীর্ণ হয়েছে বহু মন্দিরশ্রেষ্ঠিত নগর কাঞ্চীপুরমে। এটী ব্রাহ্মণাত্যের কাশীধাম।

দক্ষিণভারতের অনেকখানি দক্ষিণে তিরুচি। এখানে উচ্চশৈলশৃঙ্গে মন্দির অবস্থিত, সমতলক্ষেত্র থেকে উঠেছে অনেকগুলধাপে। এখান থেকে তিনমাইল দূরে শ্রীরঙ্গম। এখানে অন্যতম সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাঞ্জোরে তুমাত্তরটী মন্দির আছে। চোলদেবের বৃহদীশ্বর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মন্দির রূপে এটি অভিহিত। তামিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মাদুরাই। এখানে মীনাক্ষীমন্দিরে বহুসঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যায় সে ধ্বনি অপূর্ব্ব।

নীলগিরিতে কোডাই ক্যানাল পার্ব্বত্য ষ্টেশন, রামেশ্বরমতীর্থ, টুটীকোরিণ, কুলুর অরে কোচীনপরির পার্শ্বত্য ধাতুপরিবর্ত্তন আসাম উল্লেখযোগ্য। মালাবার উপকূলে সতীর অরণ্য, এই অরণ্যে অনন্ত বন্যজন্তু আছে—পেরিয়ার হ্রদের চতুর্দ্দিকে অরণ্যভূমি চিত্তাকর্ষক। ত্রিবাঙ্কুরে চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর, কোবালামের সমুদ্র উপকূল ও সুচিত্রিত বিশেষভাবে দর্শনীয়। চোলরা সুযোগ ও সুবিধামত সারাবছর পরিভ্রমণ করে বেড়াবে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি, নৈসর্গিক বৈচিত্র্যাবলী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল আর তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের মত সুন্দর যেন পৃথিবীর কোথাও নাবে না।

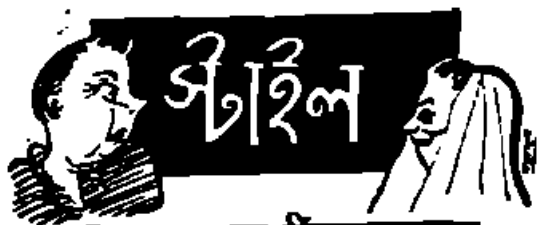

শীতকাল।

বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে।

হারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ক্যাবলার সঙ্গে তার মামাবাবু—হাবলার দেখা।

ক্যাবলাকে জলে ভিজে আসতে দেখে হাবলা প্রশ্ন করলে—কিরে ক্যাবলা এই শীতের দিনে জলে ভিজছিস্! চুড়িদার পাঞ্জাবী তো জলে ভিজে সারা গায়ে লেপ্টে বসেছে। তবু ছাতা মাথায় দিবিনে—ছাতা মাথায় দিলেই স্টাইল করে চলা হ'লনা—এই না?

অপ্রত্যাশিত ভাবে পথেই যে তার হাবলামামার সঙ্গে দেখা হবে—এ কথা সে একবারও ভাবতে পারেনি। অপ্রতিভ হয়ে বললে—বৃষ্টি নামবে এমন জোরে দেকি আর ঘর থেকে বেরুবার পূর্ব্বে জানতে পেরেছিলাম। জানলে ছাতা নিয়েই বেরুতাম।

উত্তর শুনে হাবলা জানালে—কৈফিয়ৎ তোদের তৈরী রয়েই থাকেই—তোরা কি বর্ত্তমান যুগে ছাতা নিয়ে বেরুবার ছেলেরে? কড়ো কাকের মত জলে ভিজবি, রোদে পুড়বি তবু ছাতা নিবিনে! আর আমি ছাতা তো ছাতা—প্লাষ্টিকের ওয়াটারপ্রুফ চাদরটাও ঘাড়ে ফেলে বেরিয়েছি। দরকার হয় সারা দেহটাকেও বৃষ্টির ছাট হ'তে ঢেকে ফেলতে পারব চাদরটা দিয়ে! নে—এই ছাতা নে। জলে না ভিজে সটান বাড়ী চলে যা। আমি একটু ঘুরে ফিরে যাবো।

কথাটা শুনেও ক্যাবলা কোন জবাবদিহি না করেই—পাঞ্জাবীর বোতামগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকে।

এমন নিরুত্তরও দুনোমুনো ভাব দেখে বিরক্তির সুরে হাবলা জানায়—যা, আর ছাতা নিতে হবে না। প্লাষ্টিকের এই চাদরটাই নে—ছাতা হবে—বেশ স্টাইল করে যাওয়া হবে—গা-মাথা ঢেকে। ট্রাম রাস্তা পার হয়ে বাড়ী পৌঁছতে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। একে ত ভাল পাতার সেপাই! তার উপর অতক্ষণ জলে ভিজলে নির্ঘাৎ ব্রনকাইটিস্ নিউমোনিয়া ধরে যাবে।

অনিচ্ছা থাকলেও ক্যাবলা আর আপত্তি জানাতে পারল না। কারণ হাবলা বড় রগচটা লোক। অগত্যাই সে মামার কাছ হতে প্লাষ্টিকের চাদরটাই টেনে নিলে এবং মামার সম্মুখেই মাথা থেকে ঘোমটা দেওয়ার মত কোমরের নীচ পর্য্যন্ত জড়িয়ে নিয়ে শ্যামবাজারের ট্রাম ধরতে পাশে দাঁড়ালো।

ট্রাম যা একটা এলো—ভীষণ ভিড়! তিল ধারণের জায়গা নেই!

ক্যাবলার চেহারাটা ঠিক মহিলাদের মত ক্ষীণ ও ছিপ-ছিপে। মুখে দাড়ির বালাই নেই, গোঁফটাও খুর দিয়ে কামানো। উপরন্তু প্লাষ্টিকের চাদরে ঘোমটা দিয়ে কোমর পর্য্যন্ত ঢেকে ফেলেছে। এমন 'মেকআপ' নিয়েছে গড়নে পিটলে তাকে কেউ মহিলা ছাড়া ভাবতেই পারবেনা!

ফুটবোর্ডে সলজ্জ ভাবে উঠতে দেখে পাশের এক ভদ্র-লোক বলে উঠল—দরুন মশায়—একটু পাশ দিন—মহিলার সিটটা ছাড়ুন।

একে মহিলা তার উপরে বাহিরে সমানে বৃষ্টি চলেছে—কার মনে না দয়া হয়। সসঙ্কোচে হুড়োহুড়ি করে সবাই ভিতরে যাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। মহিলাদের মাত্র একটি সিট বাকী পড়েছিল যা এতক্ষণ এক ভদ্র-মহিলার আত্মীয় পুরুষ অধিকার করে বসেছিলেন। মহিলার সম্মানার্থে তিনি সিটটি ছেড়ে দিয়ে পাশে উঠে দাঁড়ালেন।

ক্যাবলাই বা ছাড়বে কেন সম্মানে আগিয়ে দেওয়া সিটটি। সে আরও লজ্জাবতী নারীর মত ঘোমটাটি একটু টেনে বেশ আরাম করে বসে পড়ল।

ভিড়ের ভিতর কারুর সেদিকে নজর নেই। ট্রামটিও এদিকে হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও পরক্ষণই বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে সাথে চালু হয়।

বৃষ্টিটা তখন এদিকে আরও বেশ জোরসে চলেছে।

ছাবলা একটু পথ এগিয়েই বিরক্তি ভরে গজগজ করে না গিয়ে ভিজে ছাতা হাতে সেই ট্রামটিরই হাতল ধরে ফুট-বোর্ডে উঠে দাঁড়ালো।

ছাবলের ভিজে ছাতাটি হতে সমানে জল গড়িয়ে পড়ছে। শীতের ঠাণ্ডা জল দু'এক ফোঁটা গায়ে পড়তেই পাশের এক ভদ্রলোক ককিয়ে উঠে বললেন—বেশ তো ছঁস! এই বৃষ্টির দিনে ট্রামে-বাসে উঠেছেন। রিক্সা করে গেলেই ত পারতেন। ছাতা না নিয়ে কি কলকাতা সহরে পথ হাঁটা যায় না। ঝড়-বৃষ্টির দিনে আক্কেলটাও বলিহারি!

ফুটবোর্ডে অধিকক্ষণ এমন ভাবে দাঁড়ানো সমীচীন হবে না ভেবেই কটূক্তি কথাগুলো শুনেও পরক্ষণেই পাশ কাটিয়ে ছাবলা ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করলো।

ভিজে ছাতাটা আবার আর একজনের গায়ে ঠেকতেই তিনি ত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন একি! একি মশাই! গট-গটিয়ে ভিজে ছাতা নিয়ে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকছেন! ট্রামে না এসে—বাসে আসতে পারতেন না?

এ কথায় ফোড়ন দিয়ে আর একজন যাত্রী বলে উঠলেন—বাসেও তাই! ভিজে ছাতা নিয়ে কলকাতা সহরে পথ চলতে চান ত মোটর, ট্যাক্সি করে যাওয়া আসা করবেন। যান নেমে যান। আর ভিতরে নাক গলাতে চেষ্টা করবেন না। ভাল উপদেশই দিচ্ছি।

ছাবলার বড় রাগ হলো উত্তরের ঢং শুনে। সে নাকি সুরেই মন্তব্য করলে—আমার নয় মশাই! আমার নয়! যারা ট্রামে-বাসের ভিড় সহ্য করতে কাতর—তাদেরই ট্যাক্সি মোটরে যাতায়াত করতে অনুরোধ করি! বৃষ্টির দিনে ছাতা নিয়ে পথ চলবোনা ত ঝড়ো কাকের মত আপনাদের দেখা-দেখি আধুনিক স্টাইল করে জলে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে যাতায়াত করতে হবে।

বটে! বটে! বাবাজীর দম্ভ ত কম নয়। উনি ভিজে ছাতা গায়ের উপর চালাবেন আর যাত্রীরা চুপ করে সইবে! কই দেখি ছাতা! আমি টান মেরে ফেলে না দিই তো কি বলছি? বলেই লোকটি তার দিকে তেড়ে আসে আর কি?

তাতে ক্যাবলা এতক্ষণ মহিলার সিটে মহিলা সেজেই আরাম করে বসে মামাবাবুর ও যাত্রীদের কথা কাটা-কাটিই শুনছিল। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্টপেজে আসতেই ক্যাবলা মহিলার মত মিহি গলায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে—একটু গাড়ীটা থামাবেন।···একটু সরে দাঁড়ান না?

মহিলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে যেতেই অনেকেই সমস্বরে দরদ দেখিয়ে বলে উঠলেন—আরে মশাই! গাড়ীটা থামান! ভদ্রমহিলাকে নামতে দিন।

ঝগড়া যিনি করছিলেন ছাবলের সঙ্গে—তিনিও এই কণ্ঠস্বর শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে জানালেন—ভদ্রমহিলা নামুক তার পর দেখছি! কি চঙ! বলেই পথ ছেড়ে দিলেন ভদ্র-মহিলাকে।

বাড়ীর সন্নিকট স্টপেজ এসে গেছে দেখেই ছাবলাও চটপট এই সুযোগে নেমে পালাবার জন্য ক্রমশঃ দরজার মুখ ঘেঁসে সরে আসছিলো।

দেখতে দেখতে স্টপেজে এসে ট্রাম দাঁড়ালো। ফুট-বোর্ডের মুখে এসে ক্যাবলা মামাকে টেনে নিয়ে ঘোমটা খুলে পুরুষের স্বরে বললে—মামাবাবু, তাল চান তো নেমে পড়ুন! বলেই তারা ঝড়ের মত দুজনে নীচে নেমে পড়ল।

কন্ডাক্টার ক্যাবলাকে হঠাৎ মহিলা হতে পুরুষের বেশে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠল—মেয়েত নয়—পুরুষ! আচ্ছা ঠকিয়ে গেল আমাদের! চোখে ধূলি দিয়ে নেমে

গেল! মামা ভাগ্নে দুজনেই সমান চীজ! জোড়-মাণিক হয়েই বুঝি গাড়ীতে উঠেছিল।

কনডাকটারের মুখে কথাগুলো শুনে গাড়ীশুদ্ধ লোক বিস্ময়ের সুরে প্রকাশ করল—এঁ্যা-এঁ্যা! বটে! মেয়ে নয়—পুরুষ! বলেই চলন্ত ট্রাম থেকে সব মামা-ভাগ্নে দুজনকে দেখতে লাগল।

ট্রাম চলে গেল। ক্যাবলা বলল—দেখলে ত মামা, স্টাইল! স্টাইল কর! ছাতা না নিয়ে সাধে কি কলকাতা সহরে চলাফেরা করি! আর এই কাঁকা স্টাইল করেই গাড়ী হুর্ত্তি ভিড়ের ভিতরেই আমি আরাম করে বাড়ী ফিরে এলাম। তোমার তো ভিজে ছাতা নিয়েই প্রাণ যাবার যোগাড় হয়েছিল। আমি না থাকলে অদৃষ্টে তোমার কি যে ঘটতো তাই ভাবি! বুধনা বলেই রাতদিন আমাদের বল—স্টাইল! স্টাইল! স্টাইল কেন যে করি—বুঝলে তো এবার!

ক্যাবলা অনিচ্ছা সত্বেও চাপা গলায় উত্তর দিল—হুঁ!

চৈত্র আমন্ত্রণে

শ্রীসুধীরকুমার রায়

রৌদ্রকরা
পত্রঝরা
চৈত্র এলো আজ,
কাননরাজির
বন্ধ মুক্তি
ঘনায় নব সাজ।

কুঞ্জ গাঁয়ে
উঠলো ফুটি
টগর থালি হাসে,
মধুর আশে
মধুপ ঘোরে
তাহার পাশে পাশে।

বিহঙ্গেরা
আজকে কেন
বেজায় রকম সুখী,
হরষাজির
পাখার
কিশলয়ের উকি।

নতুন ভোরের
স্বপ্ন জাগে
সবার মনের কোণে,
নতুন বছর
আসছে যে আজ
চৈত্র আমন্ত্রণে।

তোমরা কি জানো

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

বৃক্ষারোহী মাছের কথা—

মাছেরা সাধারণতঃ জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, এ তোমরা নিশ্চয়ই জানো। যে জন্যে আমরা সংগীন অবস্থা বোঝাতে 'জলের বাঘ ডাঙায়' একথাটা খুব বেশীরকম ব্যবহার করি। মাছের কানকোর নীচে যে ঝিল্লীর মতো প্রত্যংগ গুলো রয়েছে, সেগুলোই তাদের শ্বাসযন্ত্রের কাজ করে। ঐ ঝিল্লীগুলো যতোক্ষণ ভিজে থাকে, ততোক্ষণ সে অক্সিজেন শ্বাস নিতে পারে! জলের মাছকে ডাঙায় এনে তুললে শারিরক্ষণের মধ্যে ঐ ঝিল্লীর মধ্যে সঞ্চিত জল বাইরের হাওয়া আর উত্তাপের চোটে শুকিয়ে যায়, আর এমনি তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট সুরু হয়।

কিন্তু তোমরা হয়তো অনেকে জানোনা যে, এমন মাছও আছে যে অনায়াসে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসতে পারে হেঁটে-চলে বেড়াতে পারে অক্লেশে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, সত্যি সত্যি সে গাছের ওঁড়ি বেয়ে বিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে। এরকম মাছ পাওয়া যায় ব্রহ্মদেশে, সিংহলে আর আমাদের দেশে। এ মাছের ইংরিজী নাম হোলো ক্লাইম্বিং পার্চ (Climbing Perch) অর্থাৎ বাংলায় 'বৃক্ষারোহী পার্চ মাছ' বলা যেতে পারে।

এরা কেন এমন হঠাৎ জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে শুনবে? মাঝে মাঝে এদের ভয় হয় যে, তারা যে পুকুরে বা নদীতে বাস করে, দারুণ অনাবৃষ্টির ফলে তার জল বুঝিবা একেবারে শুকিয়ে যাবে, তলাকার মাটি ফেটে শুকনো খটখট করবে। তখন তারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে আরো গভীর কোনো পুকুর বা নদীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এদের গায়ে বড় বড় কাঁটি বেওয়া পাখনা আছে, তারই সাহায্যে এরা ডাঙায় উঠে নতুন বাড়ির খোঁজে ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, এদের শরীরের মধ্যে এমন কি আশ্চর্য জিনিস আছে, যার সাহায্যে এরা জলের বাইরে এসেও বেঁচে থাকে? তার উত্তর হচ্ছে, এদের মাথার প্রত্যেক দিকে একটা করে বিশেষ থলি আছে, যার মধ্যে এরা দীর্ঘদিন ধরে খানিকটা জল সঞ্চিত রাখতে পারে। চলতি কথায় 'জলের ভাঁড়ার' বলতে পার তোমরা। এই সঞ্চিত জলই এদের কানকোর নীচের ঝিল্লীগুলোকে ভিজিয়ে রাখে, আর যতোক্ষণ না তারা বড় কোন পুকুরে পৌঁছোয়, ততোক্ষণ তাদের বাঁচতে সাহায্য করে।

তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলবে, এমনও তো হতে পারে যে, পার্চ মাছ খুঁজে খুঁজে মনের মতো কোন পুকুর বা নদী পাচ্ছে না, অথচ তাদের মাথার ভুলিকে-থাকা জলের থলিতে জল ফুরিয়ে এসেছে, তখন

তারা কি করবে? এই মাছেরা অত ভোলা নয় যে, জলের সন্ধান ফুরিয়ে আসতে দেখলেই তারা পদ্মফুল বা নদী খোঁজা শুরু ক'রে দেবে। যখন তাদের মাথার ওপরে আঁটা জলের থলিতে জলের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসে, তখন তারা গাছের যে-সব গর্তে অনেকক্ষণ বৃষ্টির জল জমে থাকে, সেরকম গর্তে ঢুকে পড়ে—আর যদি সে-জলও তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় তাহ'লে গাছের গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠতে থাকে।

গাছের ছালের সঙ্গে এরা কায়দা দিয়ে নিজেদের আটকে রাখে, আর কাঁটা-ওয়ালা পাখনার ভর করে গুঁড়ি বেয়ে উপরে চড়তে থাকে। তারা চলে খুব ধীরে ধীরে, কিন্তু অবশেষে যখন তারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়, তখন অফুরন্ত জলের সন্ধান পেয়ে যেন পায়ের নতুন প্রাণ ফিরে পায়।

তোমার মাথায় কত চুল?—

তোমার মাথায় কত চুল আছে, বলতে পারো? বলা খুব শক্ত। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা, একটা আনুমানিক হিসাব করে জেনেছেন যে এক-একজনের মাথায় ১০৯,০০০ থেকে ১৪০,০০০ পর্যন্ত চুল আছে। প্রতিটি চুল কতখানি মোটা জানো?—এক ইঞ্চির আড়াইশো ভাগ থেকে ছশো ভাগের মধ্যে। একটি মাত্র লম্বা চুল চার আউন্সের মতো ভার সইতে পারে, বিশেষজ্ঞেরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

হাজার হাজার বছর আগে চীনেরা আর জাপানীরা চুল দিয়ে লম্বা ঘড়ি বানাত। এরকম একটা চুল থেকে তৈরারী-করা ঘড়ি বিলেতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সাজানো আছে। এই ঘড়িটা বৈধে কয়েক হাজার ফুট, আর এর ওজন হবে প্রায় দু'টন।

কাঁচের বাটিতে গরম জল—

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, কাচের বাটিতে বা গ্লাসে গরম জল ঢাললে সাধারণতঃ সেটা ফেটে যায়। বাড়ীর নতুন চাকরটা কাচের গ্লাসে ফুটন্ত দুধ ঢেলে তোমার কাছে নিয়ে আসতে গিয়ে গ্লাসটা তো ফাটিয়ে ফেলেছই, উপরন্তু দুধটাও নষ্ট হল—তা' দেখে তোমরা কতো বিজ্ঞের মতো বলেছ—কি যে, কাচের গ্লাসে গরম জল বা দুধ ঢাললে, ফেটে যায় জানো না? তারপর এই নিয়ে অনেক বকাবকি করেছ। কিন্তু জানো কি কেন এরকম হয়।

প্রকৃতির একটা মস্ত বড় নিয়ম এর পিছনে কাজ করছে। তোমরা যখন বাবাদের মতো বড় হয়ে ফিজিক্স পড়বে, তখন দেখবে কোনো জিনিসকে গরম করলে সেটা বৃদ্ধি পায় বা সহজ ভাষায় বেড়ে যায়, ইংরিজীতে যাকে বলে expansion। অবশ্য এই বৃদ্ধির মাত্রাটা সব জিনিসের বেলায় সমান নয়; কোন কোন জিনিসের বেলায় খুব বেশী কোন কোনটার বেলায় মাঝামাঝি, আবার কোনটায় বেড়ে খুব কম।

যদি তুমি জলের বাটি বা গ্লাসের মধ্যে খুব গরম (ফুটন্ত) জল বা কল চালো তাহ'লে সেই বাটীর অথবা গ্লাসটার ভিতরের আগুন উত্তাপের স্পর্শে বেড়ে যেতে চায়। এই ব্যাপারটা এমন তাড়াতাড়ি হতে পারে যে, উত্তাপ সেই বাটি অথবা গ্লাসটার সম্পূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এইজন্য ভিতরের অংশ যখন বাড়বার চেষ্টা করে, তখন বাইরের অংশ মোটেই বাড়বার চেষ্টা করেনা (কারণ সেটা এখনো ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে—উত্তাপ এখনও বাইরের অংশে এসে পৌঁছতে পারেনি)। এর ফলে বাটি বা গ্লাস সহজেই ফেটে যায়।

আমরা কি সব শব্দ শুনতে পাই—

যে সব শব্দ আমরা শুনতে পাইনা, তার মধ্যে এক রকমের শব্দ হচ্ছে খুব আস্তে, যা আমাদের কান পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেনা, আর এক রকমের শব্দ হচ্ছে অস্বাভাবিক রকমের জোরে, যা আমাদের কানের পর্দায় এতো জোরে আঘাত করে যে অনুভূত হলেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না (মনে হয়, কিছুই যেন শুনতে পেলুম না)।

ছোট ছোট পোকামাকড়েরা আর সবরকমের জীবজন্তুরা সবই শুনতে পায়। ধর, একটা ছোট ইঁদুরছানা তার গর্তে বসে কিচমিচ করে ডাকছে,—এ ডাক আমরা শুনতে পাইনা কিন্তু বড় ইঁদুরেরা অনেকদূর থেকেও সে-শব্দ শুনতে পায়। যন্ত্রের সাহায্যে এতো উঁচু পর্দায় যে আমাদের শব্দ তা শুনে বুঝতে পারা বড় কষ্টকর। ছোট ছোট পোকামাকড়দের শোনবার জন্যে এমন সব যন্ত্র আছে যার দ্বারা তারা খুব মিহি আওয়াজও অনায়াসে শুনতে পায় আমরা যে-সব আওয়াজ শুনতে পাইনা।

জীবজন্তুদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। বিড়াল, কুকুর—এরা দেখবে সর্বদা কান খাড়া করে রাখে যাতে যে-কোন শব্দ আসে, অথবা জোরে, তাদের কানে অতি সহজেই পৌঁছয়। কানে শুনেই তারা বুঝতে পারে বিপদ আসছে কিনা অথবা শিকার হাতে পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

আগুন নেবানোর যন্ত্র

শ্রীসত্যগোপাল পাল

এই কলকাতা শহরের নানা জায়গায়ই চোখে পড়ে আগুন নেবানোর যন্ত্র। বড় বড় দোকানে, বিভিন্ন অফিসে অফিসে, বিশেষ করে সকল সিনেমা হলেরই কোণে কোণে ঝোলানো লাল রঙের মোচার মত আকৃতি বিশিষ্ট যে একটি বড় চোঙ চোখে পড়ে ওটাই হচ্ছে আগুন নেবানোর যন্ত্র। ইংরেজীতে একে বলা হয় 'ফায়ার এক্সটিংগুইশার'।

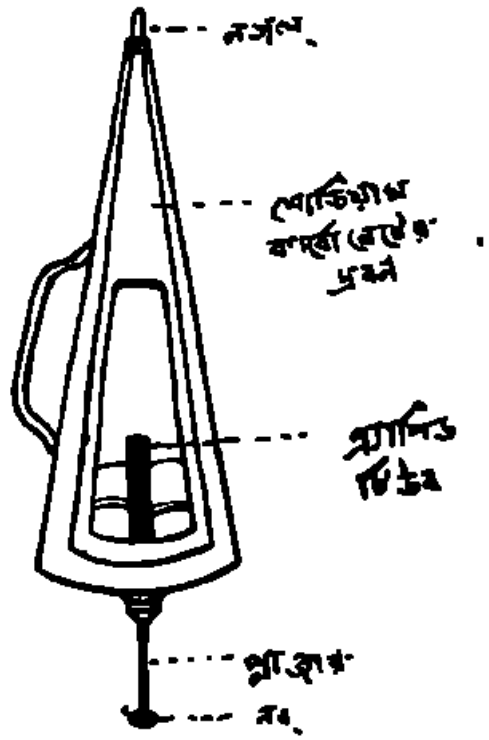

আগুন নেবানোর যন্ত্র

এটি মানুষের পরম বন্ধু। হঠাৎ আগুন লেগে গেলে মানুষের ধন-প্রাণ রক্ষার ওটাই হবে প্রধান অবলম্বন।

এই ধরনের উল্লেখিত প্রকৃতির কঠিন ধাতুনির্মিত একটি চোঙ যন্ত্র। অনেকের জিজ্ঞাসুই মনে হবে যে, ওটা আগুন নেবার ব'লে ভেতরটা জলে ভর্তি থাকে। তা কিন্তু মোটেই নয়। রাসায়নিক সংমিশ্রণের দ্বারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বা অংগার অম্লজান উৎপাদনই এটির এক-মাত্র কল-কৌশল। এই অংগার অম্লজান আগুন নেবানোর ব্যাপারে বিশেষ দরিয়া। এর সংস্পর্শে আসা মাত্রই আগুন নিবে যায়।

চোঙটির ভেতর সম্পূর্ণ ভর্তি থাকে সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে। আর তার মোটা অংশে অর্থাৎ তলার দিকটায় চোঙটির সংগে সংলগ্ন থাকে সালফিউরিক এসিড ভর্তি একটি কাচের ছোট্ট চোঙ। সেটির নাম এসিড ফিউজ। এ ছাড়া যন্ত্রটির ভেতরে কলকব্জার মত কোনো কারসাজি নেই। এর বাইরের অংশে এসিড ফিউজের ঠিক নীচে থাকে ধাতুনির্মিত একটি কঠিন বস্তু এর নাম প্লাঞ্জার। প্লাঞ্জারটির উপরে আছে বলের মত গোল ধাতু দিয়ে তৈরি একটি বস্তু। তার নাম নব (Knob)।

যন্ত্রটি ব্যবহার করবার সময় নবটিকে ধরিয়ে মেঝের অথবা দেয়ালের গায়ে খুব জোরে আঘাত করতে হয়। প্লাঞ্জারটা সংগে সংগে ঝড়বুড় করে ঢুকে পড়ে যন্ত্রটির ভেতরে। ফলে প্লাঞ্জারের ভীষণ আঘাতে সালফিউরিক এসিড ভর্তি কাচের ছোঙটি তক্ষুণি যায় ভেঙে চুরমার হয়ে। সংগে সংগে সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণের সংগে সালফিউরিক এসিডের সংমিশ্রণের ফলে বুদ্বুদের মধ্যে উৎপন্ন হোতে থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বা অংগার অম্লজান।

যন্ত্রের তলদেশের দিকে লম্বা অংশে একটি মুখ আছে। এইটির নাম নজল। যা-দেয়ে প্লাঞ্জারটা ভেতরে ঢুকে যাবার সংগে সংগে নজলটি খুলে যায়। আর সেই পথে বেরিয়ে আসতে থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের প্রবল প্রবাহ। যন্ত্রটির বাইরের অংশে তার গাত্র সংলগ্নভাবে চাবিটি আছে সেটা ধ'রে নজলটিকে ইচ্ছে মতো অগ্নিশিখার মুখোমুখি করে দিলেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের প্রবাহে আগুন নিবে যেতে থাকে।

যন্ত্রটি দিয়ে আগুন নেবানো গেলেও এর সামান্য শক্তি বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। সাধারণতঃ আগুন নেবানোর প্রাথমিক অবলম্বন হিসেবেই এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মনে করো, সবাই সিনেমা দেখছ এক মনে। হঠাৎ কোন কারণে হয়তো বাতি যাই জ্বলে আগুন জ্বলে উঠলো হলের ভেতরে। আগুন নেবানোর জন্যে অনেকেই চঞ্চল হ'য়ে কোম করে বেরিয়ে যাবেন হলঘরের অফিসে। কিন্তু দমকল বাহিনীর ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে তো বেশ খানিকটা সময়ের প্রয়োজন। তা ব'লে আগুন নিয়ে তো আর ঘরে থাকা চলবে না। কাজেই যতক্ষণ না দমকল বাহিনী এসে পৌঁছোয় ততক্ষণ, এই যন্ত্রটি আগুন নেবানোর একমাত্র উপায়। বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে নাগরিকদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য কোলকাতার রাজপথে ঘং ঘং করে ঘন্টা বাজিয়ে ভীষণ বেগে দমকল বাহিনীর ছুটোছুটি তো সকলেই দেখেছো আশা করি।

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শব্দ প্রমাণ

অদ্বৈতবাদে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্র শাব্দ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য প্রমাণের কথা তাহাতে বিশেষ ভাবে নাই। "ঋগ্বেদাদি এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত।" বেদ শব্দসমষ্টি। ব্রহ্ম হইতে স্বতঃ-নির্গত বলিয়া বেদ-প্রমাণ বাদরায়ণ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা নহে। তিনি শ্রুতিকেই প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতিকে অনুমান নাম দিয়াছেন (১।৩।২৮)। বেদ স্বপ্রকাশ। স্মৃতি যতক্ষণ বেদের অবিরোধী, ততক্ষণ প্রমাণ। শঙ্কর বলিয়াছেন (২।১।১১) "বেদকল বিষয়ের জ্ঞান শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে যুক্তি ও তর্কের উপর নির্ভর করা যায় না। মানুষের চিন্তা কোনও বন্ধন মানে না। যে যুক্তি শ্রুতিকে গ্রাহ্য করে না, ব্যক্তিগত মতের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার দৃঢ় ভিত্তি নাই। বহুকষ্টে এক পণ্ডিত কর্তৃক যে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত হয়, তাহা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি কর্তৃক তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তির যুক্তিও অন্য লোককর্তৃক খণ্ডিত হয়। বিভিন্ন মতের অস্তিত্ববশতঃ কেবল যুক্তিকে নিশ্চিত ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আবার কপিল, কনাদ বা অন্য কোনও সর্বজনমান্য পণ্ডিতের মতকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কেননা তাহাদের মত পরস্পরের বিরোধী।" এইভাবে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার জন্য শঙ্করের বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়াছেন—"কোনও যুক্তিরই দৃঢ়ভিত্তি নাই, একথা তুমি বলিতে পার না। কেননা যুক্তির কোন ভিত্তি নাই, ইহাও তো তুমি যুক্তিদ্বারাই প্রমাণ করিতে চাও। বিশেষতঃ কোনও যুক্তিরই যদি কোনও ভিত্তি না থাকে, তাহা হইবে জীবনযাপন যে অসম্ভব হয়"। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন "কোন কোনও বিষয়ে যুক্তির ভিত্তি আছে, ইহা সত্য। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে যুক্তির যে দৃঢ় ভিত্তি নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যুক্তি নির্ভর করে বিশ্বের যাহা কারণ, তাহার জ্ঞানের উপর। কিন্তু তাহা এতই দুর্গম, যে শ্রুতির সাহায্য ব্যতীত, তাহার চিন্তা করাও অসম্ভব। কেননা তাহার রূপ এবং প্রত্যক্ষ-যোগ্য কোনও গুণ নাই বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, এবং তাহার বিশেষ লিঙ্গ অথবা গুণ নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অনুমান অথবা অন্য কোনও প্রমাণের ব্যবহারও সম্ভবপর নহে।" শঙ্করের মতে সূর্য্যালোক যেমন নিজেই আলোকের প্রমাণ, স্বপ্রকাশ বেদও তেমনি নিজেই তাহার সত্যতার প্রমাণ, তাহার প্রামাণ্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু এই উপমাদ্বারা যাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহাদিগকে নিরস্ত করা অসম্ভব।

বেদ শব্দসমষ্টি। বেদান্তীর মতে বেদের অর্থ-ই নিত্য। কিন্তু বেদকল বাক্যে ও শব্দে বেদের অর্থ প্রকাশিত, তাহারা নিত্য নহে। কেননা তাহারা প্রতিকল্পে ঋষিদিগের রচিত। বেদকল বাক্য, শব্দ ও অক্ষর যোগে বেদ রচিত, তাহারা প্রতিকল্পে সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয় এবং প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। "সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি এবং প্রতিকল্পের শেষে সৃষ্টির ধ্বংস হইলেও পর পর সৃষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ আছে, তাহাদের মধ্যে নিয়তত্ব আছে।" (ডয়সেন), "বেদের মধ্যে বিশ্বের আদর্শ রূপ রক্ষিত আছে। এইরূপ অবিনাশী বলিয়া বেদকে নিত্য বলা হয়। পর পর সৃষ্ট জগতের আকৃতি নিয়ত বলিয়া কোনও কল্পে বেদের প্রামাণ্যের হ্রাস হয় না। অবশ্য বেদকল আকৃতির আদর্শে জগৎ এবং জাগতিক বস্তু গঠিত হয় (archetypal form) তাহারা মায়া-জাত, সুতরাং তাহারা পরমসত্তার ন্যায় নিত্য নহে। ধোধাকৃষ্ণ্ শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু শব্দ জগতের উপাদান-কারণ নহে। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। শঙ্করের মতে শব্দের অর্থ নিত্য। এই নিত্য অর্থ বহন করিবার শক্তিই শব্দের স্বরূপ। এই অর্থ যে সকল বস্তুতে প্রকাশিত হয়, তাহাদের সৃষ্টিকেই এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হয়। ঈশ্বরের বুদ্ধি ও ইচ্ছা স্বাধীন। প্রতিকল্পে ঈশ্বর এইসকল শব্দ স্মরণ করিয়া তদনুসারে নূতন সৃষ্টি করেন। যুগেযুগে এই সকল শব্দের অর্থকে বাস্তবরূপ দানই সৃষ্টি। বেদে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং স্বরূপ প্রকাশিত। এই অর্থেই বেদ নিত্য। তাঁহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু শ্রুতি কেবল ব্রহ্মবিষয়েই প্রমাণ। ভৌতিক বস্তু এবং তাহাদিগের গুণ আদি সম্বন্ধে (যাহারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) বিজ্ঞানের (Science) প্রামাণ্য শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রুতিবাক্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য অনুমান ও প্রত্যক্ষ এবং প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। (১।১।২)।

বেদ শব্দের মৌলিক অর্থ জ্ঞান (বিদ্ জ্ঞানে)। অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলেন সম্ভবতঃ আদিতে 'জ্ঞান' অর্থেই (Sophoa) বেদ শব্দ ব্যবহৃত হইত। জ্ঞানের (অর্থের)

সহিত শব্দের সম্বন্ধ নিত্য, অর্থপ্রকাশক শব্দ ব্যতীত কোনও জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। বেদ বুঝাইতে বহু স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অর্থেই ব্রহ্ম ও বেদ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে যে আদিতে "বেদ" শব্দের অর্থ ছিল "জ্ঞান," — ব্রাহ্মণ ও সংহিতা অর্থে পরে ঐ শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। শব্দেই ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক শব্দ এক একটি প্রত্যয়ের (Idea) বাহ্যরূপ। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহার এক একটি প্রত্যয়কে রূপ দিয়া তাহাকে বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই শব্দসকলই প্রাকৃতিক বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং প্রত্যেক শব্দই জ্ঞানময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। জীব জগতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিতে (Species) যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ, তেমনি প্রত্যেক শব্দে তাহার জ্ঞানের প্রকাশ। শঙ্কর বেদকে "দেব-তির্য্যক্ মনুষ্য-বর্ণাশ্রমাদি প্রবিভাগ-হেতু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১।১।৩)। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন "কোনও কিছু করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন কেহ কার্য্যারম্ভ করে, , তখন উক্তিত বস্তু প্রকাশক শব্দটি প্রথমে স্মরণ করে (১।৩।২৮)।" কিন্তু যখন কোনও শব্দেরই সৃষ্টি হয় নাই—তখন সে কি করিবে? সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দগণ প্রথমে স্রষ্টার মনে উদিত হইয়াছিল এবং এই শব্দগণের আবির্ভাবের পরে স্রষ্টা তদনুরূপ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে হয়। এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ শ্রুতিতে আছে। শ্রুতিতে আছে "ভূঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "ভুবঃ ও-"স্বঃ" উচ্চারণ করিয়া ভুব ও স্ব-লোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় প্রজাপতির চিন্তা বুঝাইতেই "বেদ শব্দ" ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অর্থে বেদ নিত্য—কেননা বেদ শব্দসমষ্টি এবং এই সকল শব্দ ঈশ্বরের চিন্তার নিত্য রূপ। বেদ (ব্রহ্ম, বাক্, শব্দ) নিত্য ও নিরপেক্ষ। যে সত্য প্রকাশের জন্য বেদান্তের এত প্রচেষ্টা তাহা "ব্রহ্ম" (= বাক্ = শব্দ) ও আত্মা—এই দুই শব্দ বহন করিতেছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। শব্দসমষ্টি বেদই তাহার প্রমাণ।

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন

শঙ্করের মতে বাহ্য জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; তাহার অস্তিত্ব ব্যবহারিক। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানবাদী নহেন। যাহা বাহ্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা বিজ্ঞানমাত্র, ইহা তাঁহার মত নহে। এই মতে বাহ্য জগৎ বস্তুবিহীন স্বপ্ন মাত্র। তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের এই মত শঙ্কর গ্রহণ করেন নাই। আমাদের উপলব্ধির বাহিরে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই। কোনও শুদ্ধ অথবা প্রাচীরকে কেহই জ্ঞানের এক রূপ বলিয়া অনুভব করে না—পরন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়রূপেই অনুভব করে। যাহারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারাও বলেন যে যাহা মনের মধ্যে অনুভূত হয়, তাহারা যেন বাহিরে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং বাহ্যবস্তু যে মনোবাহ্য বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা তাহারাও স্বীকার করেন। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিষয়ের ভিন্নতা বশতঃই জ্ঞানের ভিন্নতা হয়। আমরা বিষয়দিগকে প্রত্যক্ষ করি, কেবল যে তাহাদের চিন্তা করি, তাহা নহে। প্রতীতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ মানসিক ক্রিয়া হইতে সেই প্রতীতির বিষয়ের উদ্ভব হয় না। পরন্তু জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহার প্রকৃতিই ঐ মানসিক ক্রিয়ার কারণ। কোনও ব্যক্তি সংবিদের সমীপে উপস্থিতি হইলে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় না। যখন কোন কষ্টের অনুভব হয়, তখন সেই কষ্ট কেবল মনের একটা বিকার মাত্র নহে। অন্য বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের ন্যায় সেই কষ্টের অস্তিত্ব আছে। বস্তু স্বরূপে যাহা, সেই রূপেই তাহা অনুভূত হয়। যেরূপে তাহার অনুভূতি হয়, তাহাই তাহার স্বরূপ। শঙ্করের মতে সংবিদের মধ্যে কোনও আধেয় নাই, ইহা কেবল জ্ঞান মাত্র (awareness)। ইহার ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম নাই। ইহা বিশুদ্ধ রূপহীন স্বচ্ছতা মাত্র। জ্ঞানে যে বর্ণ, সৌন্দর্য্য, গতি ও উদ্বেগ দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই বিষয়ের, সংবিদের নহে। সংবিদের বিষয়সকল বিভিন্ন বলিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি, কল্পনা, পরিচিন্তন, বিচার, তর্ক, বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে আমরা ভেদ দেখিতে পাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সংবিদ্ কিছু দানও করে না, কিছু গ্রহণও করে না। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও বিষয় থাকে। সেই জন্য ব্রাডলের মতো শঙ্করও নিরপেক্ষ সত্য অথবা ভ্রান্তি স্বীকার করেন না। সত্য প্রত্যয়গণ আমাদের প্রয়োজন-সাধনে সাহায্য করে এবং আমাদের সত্যের ধারণার সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু ভ্রান্ত প্রত্যয় দ্বারা আমাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না, আমাদের সত্যের ধারণার সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যও থাকে না। যে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে ও আঘ্রাণ করে, সেও যেমন সত্য, তেমনি যাহাকে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, আঘ্রাণ করে, তাহাও তেমনি সত্য। প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"বিষয় আছে, অথচ তাহা জানিবার উপায় নাই, বলা, আর দৃশ্যবস্তু দৃষ্ট হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই বলা, সমান।" যেখানে কোনও জ্ঞান নাই, সেখানে জ্ঞানের বিষয়ও নাই। এক দিকে মন ও তাহার প্রকারগণ (Categories), অন্য দিকে প্রকারদিগের দ্বারা গঠিত জগৎ এক সঙ্গে বর্ত্তমান। বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর-সাপেক্ষ। একটি ছাড়িয়া অন্যের

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন-এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে এরিয়া।

L 280-X52 BG

অস্তিত্ব নাই। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদ ও বস্তুবাদ (mentalism and realism) উভয়ই অস্বীকার করিয়াছেন। উভয় মতই অভিজ্ঞতার বিরোধী। তিনি স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার পার্থক্য নির্দেশও করিয়াছেন। স্বপ্নাবস্থার উপলব্ধ বস্তু জাগরিত অবস্থায় বাধিত হয়, কিন্তু জাগরিত অবস্থার উপলব্ধ স্তম্ভাদি কোনও অবস্থাতেই বাধিত হয় না। (১।৩।২৯)

অধ্যাত্মবাদ

শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী নহেন, কিন্তু তিনি আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বাহ্য জগৎ অচেতন জড়রূপে প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা চৈতন্যেরই প্রকাশ। যাহাই জ্ঞানের বিষয়, তাহাতে বিষয়-চৈতন্যই প্রকাশিত। জ্ঞানের বিষয় জড় নহে, গতি নহে, শক্তিও নহে, তাহা মনের সজাতীয় পদার্থও (mind self) নহে। গতি, শক্তি এবং মন—সকলই প্রত্যয় মাত্র (concept)। সংবিদ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। কোনও ব্যক্তির সংবিদে যে বিষয় নাই, ঈশ্বরিক সংবিদে তাহা বর্তমান। ঈশ্বরের সংবিদে যাবতীয় বিশ্ব বস্তুমান। বিশ্বের জ্ঞান-সমন্বিত জীবগণও ঈশ্বরের সংবিদে বর্তমান। জগৎ যে স্থায়ী, তাহার কারণ ঈশ্বরের সংবিদে তাহা সর্বদা অনুভূত হইতেছে। সমগ্র জগৎ সেই অসীম আত্মা দ্বারা পূর্ণ। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই স্বরূপে আত্মিক—আত্মার ধর্ম। আত্মা বিষয়-ও-বিষয়ি সম্বন্ধের অতীত, আত্মাই সৎ বস্তু। আত্মার বাহিরে কিছুই নাই। ঈশ্বরের জ্ঞানে বর্তমান আছে বলিয়াই যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব। ঈশ্বরের জ্ঞানে যাহা নাই, তাহার অস্তিত্বই নাই।

সত্তা ও মিথ্যা

মীমাংসকবিদের মতে বেদের সকল অংশই (উপনিষদও) কর্মপ্রেরক, কর্মের উপদেশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র (১।১।৪) বলেন—ব্রহ্মই সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য। বেদান্ত-বাক্যসকলের তাৎপর্য-নির্ণয়-দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়। মীমাংসক বলেন ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু, তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে উপদেশ অনর্থক। বেদান্ত বলেন ব্রহ্ম ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য না হইলেও তাহাকে আত্মারূপে অবগত হইলে সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয়, এবং পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে মোক্ষরূপ ব্রহ্ম অধিগত হয়। কোন ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার ফল মোক্ষ অধিগত হয় না। আত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষের প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে বস্তুজ্ঞান, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তুতন্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কোনও কার্যের সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। শাস্ত্র ব্রহ্মকে ইদম্ বলিয়া প্রতিপাদন করেন না। ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা; তিনি জ্ঞানের বিষয় নহেন, ইহা প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান প্রভৃতি ভেদ অপসারণ করেন। শ্রুতি বলেন—"যস্য অমতং, তস্য মতং। মতং যস্য, ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্" ব্রহ্ম যাহার নিকট অবিদিত তাহার নিকট বিদিত, আর যাহার নিকট বিদিত বলিয়া বিবেচিত, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। কারণ সমস্ত জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত (ফলাব্যাপ্য রূপে তাহাদের জ্ঞানের বিষয় হন না)। আর অজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্ম হন বিজ্ঞাত। শ্রুতিতে ইহাও আছে—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে এবং বিজ্ঞাতার (বুদ্ধিবৃত্তির) বিজ্ঞাতাকে সাক্ষীকে জানিতে পারিবে না। ব্রহ্মকে বিধিমুখে প্রতিপাদন করা যায় না বলিয়া তিনি শব্দ জ্ঞানের অবিষয়। আবার নিষেধ মুখে তিনি নেতি, নেতি রূপে বিজ্ঞাত হন বলিয়া তিনি শাস্ত্র-প্রমাণগম্য তিনি তৎ-ত্বম্ অসি অহং ব্রহ্মস্মি, এই প্রকার বৃত্তির বিষয় হন—সুতরাং তিনি শব্দ জ্ঞানের অবিষয় নহেন।

যখন আমাদের ঘটজ্ঞান হয়, তখন আমাদের অন্তঃকরণ ঘটের আকার ধারণ করে। এই ঘটাকার বৃত্তিতে চিতের আভাস থাকে। অন্তঃকরণের এই বৃত্তি ঘটের অধিষ্ঠান। যে চৈতন্য তাহাতে বর্তমান তাহা অজ্ঞানরূপ আবরণকে নাশ করে। ঘটাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাস, তাহাকে প্রমাণ-চৈতন্য বা "ফল" বলে। এই প্রমাণ-চৈতন্যই ঘটকে প্রকাশিত করে (অজ্ঞানাবরণ নাশের পরে)। প্রমাতৃ চৈতন্য ও ঘটাধিষ্ঠানভূত বিষয় চৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ প্রমাণ চৈতন্য ঘটকে প্রকাশিত করে। ইহাই ঘটের ফলব্যাপ্যতা। প্রমাতৃ চৈতন্যও বিষয় চৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত ঘট প্রমাতৃ-চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়। ইহার ফলে প্রমাতা ঘটকে জানিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানের সময় "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া মনের ব্রহ্মাকারা অখণ্ড বৃত্তি হয়। ব্রহ্ম এই বৃত্তির ব্যাপ্য। এই বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কিন্তু অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু স্বয়ং অভিভূত হইয়া পড়ে ও ব্রহ্মমাত্রে পর্যবসিত হয়। ইহার কারণ এই অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার বৃত্তি কর্তৃক ব্রহ্মনিষ্ঠ অবিদ্যার নাশ হইলে, সেই অবিদ্যার কার্যভূত সমস্ত প্রপঞ্চ ও তাহার অন্তর্গত উপরি-উক্ত ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বিনষ্ট হয়। দর্পণ অপসারিত হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখ যেমন সত্য মুখে পর্যবসিত হয়, সেইরূপ উক্ত ফলরূপ চিদাভাসও ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্রে পর্যবসিত হয়, লবণের পুতুল লবণ সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস রূপ "ফল চৈতন্য" ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্ম বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাই ব্রহ্মের ফলাব্যাপ্যতা।

এইভাবে ফলব্যাপ্য নহেন বলিয়া ব্রহ্মকে শব্দ জ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে।*

ব্রহ্ম জ্ঞানই একমাত্র সত্যজ্ঞান। তাহা প্রকাশিত হইলে অন্য সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় অন্য জ্ঞান মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞানেরও এক প্রকার সত্যতা আছে। ইহা ব্যবহারিক জ্ঞান। লোক ব্যবহারে ইহা সত্য। লোক ব্যবহারের যতটুকু সত্যতা, এই জ্ঞানের সত্যতা তাহার অধিক নহে। ব্রহ্মজ্ঞান পারমার্থিক। তাহার সত্যতা অনপেক্ষ, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান যতক্ষণ অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণই সত্য। অবিদ্যার নাশ হইলে এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রপঞ্চের সহিত এই জ্ঞানও বিনষ্ট হয়। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান দূরীভূত হইলে যেমন বুঝিতে পারা যায় রজ্জুই সত্য, সর্প মিথ্যা, সর্প সেখানে কখনও ছিল না, তাহার যে জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে যখন অবিদ্যা ও প্রপঞ্চের নাশ হয়, তখন চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণের অস্তিত্ব থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত, যে প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান কখনই ছিল না। কিন্তু তখন অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়।

ব্যবহারিক জ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যতার প্রমাণ বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য, ব্যবহারে তাহার কার্য্যকারিতা এবং অন্যান্য ব্যবহারিক জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য। কোনও বস্তু সত্য কিনা তাহা নির্ভর করে সেই বস্তুর উপর, আমাদের ধারণার উপর নহে। কোনও গুল্মকে গুল্ম, অথবা মানুষ অথবা অন্য কিছু এইভাবে বর্ণনা করিলে তাহা সত্য হয় না। তাহা গুল্ম ইহাই সত্য। কেননা এই বর্ণনাই সেই বস্তুর স্বরূপের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত। সত্য ও মিথ্যা উভয়ই সংশ্লিষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য বস্তু ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এবং ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে সমর্থ কোনও শব্দই নাই। সুতরাং আমাদের কোনও বর্ণনাই সম্পূর্ণ সত্য নহে।

যে জ্ঞান অন্য জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, অন্য জ্ঞানের সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য (ব্যবহারিক)। কিন্তু বিশ্বের অতি সামান্য অংশই আমাদের পরিজ্ঞাত বলিয়া কোনও জ্ঞানকেই অবাধ বলিতে পারা যায় না, অন্য জ্ঞানলাভের ফলে যে জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সে জ্ঞান সত্য নহে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরিত হইলে তাহার বাধা হয়, সুতরাং স্বপ্ন সত্য নহে। আবার ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা জাগরিত ব্যবহারিক জ্ঞান বাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক কোনও জ্ঞান নাই। এই পরম জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না। ব্যবহারিক জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একত্ব অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। মনের গঠনের মধ্যে অবিদ্যার বীজ নিহিত।

জ্ঞান স্ব-প্রকাশ। অবিদ্যাকর্তৃক তাহার পূর্ণ প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানকালে চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্তুর রূপধারণ করে। ইহাই অন্তঃকরণের বৃত্তি। ইহার ফলে জ্ঞেয় বস্তু যখন প্রমাতৃ চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়, তখন সেই বস্তুর জ্ঞান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানেরও জ্ঞান হয়। বস্তুর জ্ঞান বস্তুর সহিত আপনাকে (জ্ঞানকে) প্রকাশিত করে। ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোনওরূপ জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। তখন জ্ঞান জ্ঞানরূপে পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে অন্তঃকরণে-প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রহ্মনিষ্ঠ অবিদ্যার নাশের ফলে তখন ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ বৃত্তির সহিত অবিদ্যাকৃত যাবতীয় প্রপঞ্চ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান অন্তঃকরণে হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া অনুমান করা যায়।

জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিতে আছে "কোনও বস্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহা প্রকাশ করে বলিয়াই তাহার জ্ঞান প্রামাণিক হয় না। অথবা তাহার বিপরীত রূপে প্রকাশ করিলে অপ্রামাণিক হয় না। কিন্তু যে জ্ঞান পরবর্ত্তীকালে অসত্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না, তাহা প্রামাণিক এবং যাহা পরিত্যক্ত হয় তাহা অপ্রামাণিক। এই প্রামাণ্য কেবল শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানেরই থাকিতে পারে। অন্য কোন জ্ঞানের এই প্রামাণ্য নাই।"

ব্যবহারিক জ্ঞান

শঙ্কর বলেন—আত্মার অনাত্মার অধ্যাস এবং অনাত্মার আত্মার অধ্যাস অবিদ্যা। এই আত্মা ও অনাত্মার ইতরেতর অধ্যাসকে হেতু করিয়া যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিধিনিষেধ ও মোক্ষপর সকল শাস্ত্রও এইরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমিও আমার এইরূপ অভিমান যাহার নাই, সে জ্ঞাতা হইতে পারে না। সুতরাং তাহার পক্ষে প্রমাণপ্রমেয়ের প্রযোজ্যতা নাই। দেহের সহিত প্রত্যক্ আত্মার ইতরেতর অধ্যাস ও ধর্ম্মের অধ্যাস না হইলে অসঙ্গ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হয় না। অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রমাণ ও শাস্ত্র সকল প্রবৃত্ত হয়। ব্যবহার কালে পশু প্রভৃতির সহিত বিদ্বান ব্যক্তির আবার কোনও প্রভেদ নাই। উদ্যতদণ্ড-হস্ত পুরুষকে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া পশুগণ পলায়ন করে এবং হরিত-তৃণ-হস্ত পুরুষকে দেখিয়া তাহার দিকে গমন করে। মানুষও উদ্যতখড়্গ পুরুষ দেখিয়া দূরে যায়, বিপরীতহস্ত মানুষের নিকট আগমন করে। বিবেকীই হউক অবিবেকীই হউক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার পশুগণের

---

* বেদান্তদর্শন। (উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত) (১৬৮—৯ পৃষ্ঠা)

সমানই হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় আমাদের মানসিক ক্রিয়া আমাদের স্বার্থ (interests) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং অন্তঃকরণ-কর্তৃক আমাদের চেতনা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে। আমাদের প্রয়োজনের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে পড়িয়া থাকে। ফলে সংবিদের ক্ষেত্র নিতান্তই সংকীর্ণ। সংবেদ অসংখ্য সম্বন্ধের জন্যই আমাদের সংবিদে প্রতিফলিত হয়। সকল সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কোনও বস্তুই সংবিদে প্রতিফলিত হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও সসীম বুদ্ধি দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বের অধিকাংশই আমাদের জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বের যেরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা যে বিশ্বের প্রকৃত রূপ তাহা বলিতে পারা যায় না। বিশ্বের যতটুকু আমরা জানিতে পারি, ততটুকু সম্বন্ধেই আমাদের জীবনের কারবার। সুতরাং পার্থিব জীবনের পক্ষে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে এবং তাহার মূল্যও আছে। এই জ্ঞানই ব্যবহারিক জ্ঞান। অধ্যাস বা অবিদ্যা এই জ্ঞানের ভিত্তি হইলেও এবং তাহা ত্রুটিপূর্ণ হইলেও, তাহা নিরর্থক ও মূল্যহীন নহে।

আমাদের সংবিদ বিষয়ী ও তাহার বিষয়ের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধই জানে। কিন্তু এই সম্বন্ধ অসাধারণ। অন্য কোনও সম্বন্ধের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। এই সম্বন্ধ সংযোগও নহে, সমবায় সম্বন্ধও নহে। সংবিদ ও তাহার বিষয় একত্র বর্তমান, এই পর্যন্ত বলা যায়, কিন্তু উভয়ের সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না।

চিন্তা বা মনন দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, সেই চিন্তা এই স্বরূপ জানিবার জন্য সদা-চেষ্টিত। চেতনই পরম সত্তা, তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্যই সমস্তের জ্ঞানের চেষ্টা। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সত্যেরই প্রকাশ, কিন্তু সব কালাতীত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কালিক বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়না। জ্ঞানের কোনও সাধনই সৎকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না। সৎকে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা তাহাতে বিশেষণের আরোপ করি। যাহার আরোপ করি তাহা সত্য নহে, তাহা সৎ হইতে ভিন্ন। যাহা সত্য নহে, তাহা সত্যে আরোপ করি বলিয়াই তাহা অধ্যাস—সৎ যাহা নহে, সত্যে তাহার আরোপ। আত্মা সৎ, তাহাতে আমরা ক্রিয়া, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের আরোপ করি। 'অতদ্বিন্ তদ্বুদ্ধিঃ—যাহা তাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানাই অধ্যাস। আমাদের যাবতীয় ব্যবহারিক জ্ঞান অধ্যস্তের জ্ঞান। সকলই আত্মায় অধ্যস্ত। আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই কিন্তু আত্মায় যাহা অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়, তাহা অন্নময় অন্ন, ভূমা। এই জগৎ প্রপঞ্চ, আত্মাতেই অধ্যস্ত। ইহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পের মত শুক্তিতে রজতের মত, জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মে অধ্যস্ত। ব্রহ্ম জ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে ইহার বিলোপ হয়। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহার জ্ঞান মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয়-বিষয়ী ভেদ নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান বিষয়-বিষয়ীর ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানব মনের গঠনই এইরূপ যে তাহা এক অখণ্ড বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড বিভক্ত করে, এবং অসঙ্গ আত্মাকে বিষয়ী-বিষয়-সম্বন্ধ যুক্তরূপে প্রকাশিত করে। এই মানব-মন ও তাহাতে প্রকাশিত যাবতীয় বিষয় সেই অখণ্ড অসঙ্গ আত্মাতে অধ্যস্ত। তাহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তাহারা প্রপঞ্চের অন্তর্গত, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রপঞ্চ-বিলয়ের সময় তাহারা বিলুপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষ অবিনাশী।

ব্যবহারিক জ্ঞানে যে জগৎ প্রকাশিত, তাহা প্রজ্ঞার নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ; তাহা কার্য্যকরণ-নিয়মের অধীন, দেশ ও কালে ব্যবস্থিত। কিন্তু এই জগতের তলদেশে যে অখণ্ড আত্মা বর্তমান, তাহা অবিকারী, তাহাতে কার্য্য-কারণ ভেদ নাই, তাহা দেশ ও কালের অতীত। ব্যাবহারিক প্রমাণ তাহাতে প্রযোজ্য নহে, ব্যাবহারিক প্রমাণ দ্বারা তাহাকে জানা যায় না। কিন্তু আমরা তাঁহার চিন্তা করি, চিন্তার অভ্যস্ত উপায়ে। সেই পরম সত্তাকে—যাহাতে আমাদের জ্ঞানের যাবতীয় বিষয় অধ্যস্ত, তাঁহাকে পুরুষরূপে এবং সমগ্র বিশ্ব সেই পুরুষের জ্ঞানের বিষয়রূপে চিন্তা করি। এই পুরুষই ঈশ্বর। ঈশ্বর জ্ঞাতা ও জগৎ জ্ঞেয়। তাঁহার ও জগতের মধ্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানও মানবীয় জ্ঞানের মতো আপেক্ষিক, জ্ঞাতা-ও-জ্ঞেয়-সম্বন্ধের অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিক। পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক।

(পূর্বানুবৃত্তি)

তাহারা বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল চন্দ্রসুন্দর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছেন। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ধূপকাটি জ্বলিতেছে। চন্দ্রসুন্দর পরিবেশটিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মেঝের একধারে রাধানাথ গোপও বসিয়া আছেন এবং মুগ্ধচিত্তে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। তিনি নিজের বাগান হইতে কয়েকটি বড় বড় গাঁদাফুলের মালা আনিয়াছিলেন, সেগুলি চন্দ্রসুন্দরের দুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। প্রিয়গোপাল এবং সুবাতালী তহশিলদারের ছোট ছেলে সফুদ্দিনও একধারে বসিয়া আছে। ইহারা সকলেই চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র। ঘরের আর একধারে একটু তফাতে বসিয়া আছে কিরণ, নিখিল-বাবুর স্ত্রী কাঞ্চনমালা, স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী যোগমায়া এবং মিস বোস। কিরণ এবং যোগমায়ার গলায় আঁচল, হাত দুইটি জোড়-করা। উষাও এখানে ছিল, কিন্তু চিত্রা আর সুব্রত আসাতে উঠিয়া গিয়াছে। ঊর্মিলা সূর্যাসুন্দরের মাথার শিয়রে চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। গগন পিছনের দরজাটা দিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল। আলাপ করিবার চেষ্টা করিল গীতাপাঠ আর কতক্ষণ চলিবে। কথা ছিল সন্ধ্যায় দাদুর ঘরে মজলিস বসিবে, চম্পা গান গাহিবে। কিন্তু ছোট-দাদুর গীতা-পাঠে সে সম্ভাবনা রহিত করিয়া দিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। সূর্যাসুন্দর চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে তাঁহার কানে যাইতেছিল, তিনি তাহার কিছু অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুদিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেই পথটা, সেই আদি-অন্ত-হীন নির্জন পথ, যে পথে তিনি একক যাত্রী, যে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু? মৃত্যু কি এভাবে আসে?

হঠাৎ বাহিরে খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল।

"ও কি?"

সূর্যাসুন্দর চোখ খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন।

রাধানাথ গোপ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন—কিষুণগঞ্জের রামবিলাস বাবাজীর কীর্তনীয়ার দল। তাদের খুব ইচ্ছে তারা আপনার দাতার একধারে বসে' নামকীর্তন করবে রোজ। রামবিলাস বলছিল আমি তো ডাক্তারবাবুর ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে নামগান শোনাই—

সূর্যাসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কাঞ্চনমালা, নিখিলবাবুর স্ত্রী, কিরণের কানে কানে কি যেন বলিলেন।

কিরণ বলিল, "কাকীমা বলছেন, একটু দূরে বসে' ওরা বাজাক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দাদুর কানের কাছে যেন গোলমাল না হয়"

"না, না, ওরা দূরে বসেই বাজাবে। ওই হাসপাতালের ঘাটের ওপারে ওদের ভাগগা করে' দিয়েছি। মাস্টার মশাইকে জিগ্যেস করে' তবে ওদের খবর দিয়ে-ছিলাম—"

চন্দ্রসুন্দর বলিলেন, "বাজাক না। ভগবানের নাম হবে, ভালই তো"

রাধানাথ গোপ তাহাদের বসাইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দর পুনরায় গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুরসুন্দরী প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না।

পুরসুন্দরী সূর্য্যসুন্দরের কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার জন্যে গরম লুচি ভেজে আনি দু'খানা?

"না। আমি আর রাত্রে কিছু খাব না। দিনে অনেক খাওয়া হয়েছে। রাত্রে না খাওয়াই ভালো"

গগন মাথার দিকের দরজার কাছে পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "ভোরের দিকে আমি না হয় চলিক্স্ করে' দেব এক কাপ্।"

"তুমি করে' দেবে?"

সূর্য্যসুন্দর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি খুব ভোরে উঠি যে। আপনার ঠিক পাশের ঘরেই তো আমি আছি। সমস্ত ব্যবস্থা করে' নিয়েছি ওখানে। স্টোভ, জলের কুঁজো, চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম, ওভালটিন, চলিক্স—"

গীতাপাঠে বাধা পড়ায় চন্দ্রসুন্দর মনে মনে চটিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি! পুরসুন্দরী তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রাত তো অনেক হ'ল। আপনার খাবার জায়গা করে' দি?"

"আমারও তেমন খিদে হয় নি মা"

"তবু যা পারেন খেয়ে নিন। গরম গরম ফুলকো লুচি আপনি বসলে ভেজে ভেজে দেব। আপনার খাওয়া হলে তবে এরা খেতে বসবে। কুমার মাংসের হাঁড়ি খোলবার আগেই আপনাকে খাইয়ে দিতে চাই"

কিরণ মন্তব্য করিল—"সে-ই ভালো। একে পাখীর মাংস তার কুমার রেঁধেছে, ঢাকা খুললে ও তো মাৎ করে' দেবে চারদিক। কাকাবাবু, আপনি খেয়েই নিন"

"আচ্ছা এই শ্লোকটা শেষ করে' উঠছি"

শ্লোকটা পড়িতেছিলেন কিন্তু তাহাতেও আবার বাধা উপস্থিত হইল। হাই-হিল-জুতা খটখট করিয়া চিত্রা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গেলেন। শুধু জুতা নয়, ওভার কোটও পরিয়াছে, হাতে দস্তানা, চোখে চশমা। সে সোজা গিয়া সূর্য্যসুন্দরের বিছানায় বসিল এবং দুই হাতে সূর্য্যসুন্দরের গাল দুটি ধরিয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করিল। প্রণাম করিল না। চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য!

পুরসুন্দরী চন্দ্রসুন্দরের দিকে আড় চোখে চাহিয়া চিত্রাকে বলিলেন, "জুতোটা খুলে আয় বাইরে, এখানে গীতা পড়া হচ্ছে যে। আগে প্রণাম কর, দাদুকে, ছোটদাদুকে—"

"ও"

অপ্রতিভমুখে চিত্রা বাহির হইয়া গেল এবং জুতা খুলিয়া আসিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। চিত্রার স্বামী সুব্রতও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, তাহার পরিধানে ছিল খাকি সুট। সে-ও পুরসুন্দরীর কথাগুলি শুনিয়া হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। চন্দ্রসুন্দর সুব্রতকে দেখেন নাই, কিন্তু সে যে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, তাহা শুনিয়াছিলেন।

বলিলেন, "তুমি দাদু কষ্ট করে' জুতো খুলছ কেন। এখানে আর কেউ কিছু মানছে না, সব জগন্নাথ ক্ষেত্র হ'য়ে গেছে। তাছাড়া গীতা পড়াও হয়ে গেছে। তুমি জুতো পরেই ভিতরে এস"

সুব্রত কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল মাত্র, তাহার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর সূর্য্যসুন্দরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, আপনি কেমন আছেন এখন"

"খুব ভালো আছি। তবে সময় হ'য়ে এল, তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এবার পারের খেয়ায় উঠিতে হবে"

পার্ব্বতী হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ধমকের সুরে পুরসুন্দরীকে বলিল, "মা, তুমিও এসে গল্পে মেতে গেছ! চিত্রা আয়, সুব্রত তুমিও এস, বাথরুমে গরম জল দিয়েছি। মা, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না এস, আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে, বেগুন ব্যাসন সব ঠিক করে' দিয়েছি"

গগনকে আবার দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"ওরে পার্ব্বতী, চিত্রা আর সুব্রতর জিনিস-পত্র ওই

হলদে তাঁবুটায় নিয়ে যেতে বললে ছোটকাকা। ওরা ওখানেই থাকবে, তুই গুছিয়ে দে সব—"

"বাবা বাবা, এক হাতে আমি আর ক'দিক সামলাই বল—"

বলিয়াই পার্ব্বতী অন্তর্দ্ধান করিল।

ইহার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন কবিরাজ মশায়। তিনি হঠাৎ মিলিটারি কায়দায় সুব্রতকে স্যালুট করিয়া বলিলেন—"জয় হিন্দ্"। তাহার পর আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছুদিন ফৌজে চাকরি করেছিলাম। ফৌজী আদব-কায়দা কিছু কিছু মনে আছে এখনও। তারপর সুপারিনটেণ্ড সাহেব কেমন আছ"

"ভাল। আপনি ?"

"আমি নেই, যা দেখছ তা অতীতের কঙ্কাল"

চিত্রার বিবাহের সময় কবিরাজ মশায় ছিলেন, তখন সুব্রতর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ হইয়াছিল।

পার্ব্বতীর উচ্চকণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল।

"চিত্রা, সুব্রত এস, তোমাদের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"যাও, যাও তোমরা যাও। ছোট বামুনদিদিকে আর চটিও না। সেই বুড়ীই বোধ হয় পুনর্জন্ম গ্রহণ করে' এসেছে আবার—"

"কার কথা বলছেন—"

"সেকালে আর এক বামুনদিদি ছিলেন এ বাড়ীতে, তার কথা তোমরা বোধহয় শোন নি। বিকাশবাবুর মনে আছে হয় তো।"

"সুব্রত, চিত্রা আ—"

আবার পার্ব্বতীর গলা শোনা গেল।

"যাও, যাও তোমরা যাও"

চিত্রা সুব্রত উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় কবরেজ মশাই"—কিরণ প্রশ্ন করিল।

"ভুস্‌কারে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। ওইখানেই আমি আমার আস্তানা করে' নিয়েছি"

এ অদ্ভুত খবরে সকলে হাসিয়া উঠিল। ভুস্‌কার মানে যে ঘরে গমের ভুসি জমা করা থাকে। প্রকাণ্ড উঁচু ঘর। জানালা দরজা কিছু নাই। একটি দেওয়ালের উপরে শুধু একটি ছোট জানলার মতো ফাঁক থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই ঘরে ভুসি ঢালা হয়। ভুসি বাহির করিবার সময়ে সিঁড়ির সাহায্যে সেই পথেই চাকরেরা ঢোকে। ঘরের ছাত হইতে মেজে পর্য্যন্ত ভুসি ঠাসা থাকে সেখানে। কেবল ওই জানালার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা খালি থাকে ভিতরে। সেখানে কবিরাজ মহাশয় শুইয়াছিলেন এ সংবাদ সত্যই অদ্ভুত।

কিরণ প্রশ্ন করিল, "ওখানে আপনি উঠলেন কি করে ?"

"মই দিয়ে। কুমারবাবুর লম্বা মই আছে যে একটা"

"আপনার গায়ে তো ভুসি-টুসি কিচ্ছু লাগে নি দেখছি"

"আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলাম। কম্বলটায় লেগেছে খুব। সেটা খুলে এসেছি"

সূর্য্যসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুস্‌কারে শোওয়া ওঁর অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেস"

কবিরাজ অকৃত্রিম আনন্দে খিক খিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"সেই কলাচুরির কথা মনে আছে আপনার ডাক্তারবাবু ?"

"আছে বই কি—"

উষা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে সবটা শোনে নাই। কিন্তু গল্পের গন্ধ পাইয়াছিল।

বলিল, "কোথায় কলা চুরি হ'ল—"

"এখন হয় নি। হয়েছিল অনেক দিন আগে। তোমাদের জন্মাবার আগে। সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে বড় মজার গল্প"

"বলুন না"

ছোট-খুকীর মতো আবদার করিয়া উষা বাবার বিছানার একধারে জাঁকিয়া বসিল।

কুমার পিছনের দ্বার দিয়া ঢুকিয়া কাকনমালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এখন যাবেন ? আমি মথুরার হাতে কাকাবাবুর জন্য খানিকটা রান্না-করা মাংস পাঠাচ্ছি। আপনি যদি যেতে চান মথুরার সঙ্গে যেতে পারেন"

"তাই যাই তাহলে। লণ্ঠন দিও একটা"

"হ্যাঁ লণ্ঠন দেব বই কি"

কাঞ্চনমালা বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দরও গীতা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এসব আলোচনা তাঁহার তত ভালো লাগিতেছিল না।

কবিরাজ মহাশয় একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন এবং শুরু করিলেন তাঁহার গল্প।

"এটা গল্প নয়। আমি যা বলি তা একটাও গল্প নয়, সত্য। আই অ্যাম এ হিস্‌টোরিয়ান্। ডাক্তারবাবুর বাড়ির চারিপাশে তখন বাগান ছিল। ফুল ফল শাক-সবজি কপি-আলু সব রকম হ'ত। ডাক্তারবাবু বিতরণ করতে কসুর করতেন না, তবু চুরি হ'ত। কাক-বাদুড়-গরু-ছাগলরা তো করতই, মানুষরাও করত। যখনকার কথা বলছি তখন ডাক্তারবাবুর ফল-চাষ করবার শখ খুব প্রবল। জিতুবাবু বলে' এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখন ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে থাকতেন এবং চাষ সম্বন্ধে নানা'রকম পরামর্শ দিয়ে ডাক্তারবাবুকে উৎসাহিত করতেন। আর আমরা বিনা পয়সায় নানা রকম তরিতরকারি ফলমূল খেয়ে বাহবা বাহবা করতুম। ফলা চাষের খুব ধুম চলেছে তখন, বাড়ির চারদিকে নানা রকম ফলা-গাছ লাগানো হয়েছে। সে যে কত রকমের ফলা, তা আর কি বলব তোমাদের। সব আমার মনেও নেই। চীনে ফলা, বর্দ্ধী ফলা, সিংগাপুরী ফলা, কাবুলী ফলা, মাদ্রাজী ফলা, নর্থম্যান ফলা, অম্লাম্বর ফলা—এই ক'টা নাম মনে পড়ছে। জিতুবাবু ঢাকা থেকে এক রকম ফলা গাছ আনালেন তার নাম 'শঙ্খরি' ফলা। তিনি এক ডজন শঙ্খরি ফলার গাছ লাগালেন, নানা রকম সার-টার দিয়ে। ডাক্তারবাবু রোজ সকালে উঠে রোগী দেখবার আগে ফলা গাছগুলিকে একবার দেখে আসেন। জিতুবাবু তো দু'বেলা অন্তর দেখছেন। ক্রমে ক্রমে গাছগুলি বাড়ল, তারপর দেখা গেল একটি গাছে ফলার ফুল হয়েছে। সেদিন কি আনন্দ সকলের। বাড়িতে নূতন ছেলে হয়েছে যেন। তারপর সেই মোচা ফলা ছাড়তে লাগল ক্রমশ। ক্রমশ কাঁদি হ'ল একটা। সবাই এসে বড় বড় করে' দেখে যেতে লাগল সেটাকে। তারপর যেদিন ফলার রং ধরল সেদিন তো হৈ হৈ পড়ে' গেল বাড়িতে। ছুটো দল হ'য়ে গেল। বিরুবাবুর মা বললেন—এখুনি ওটাকে গাছ থেকে কেটে ভাঁড়ার ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হোক, দু' একদিনেই পেকে যাবে। এ শুনে জিতুবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। তিনি বললেন—গাছে আরও দু' একদিন থাক,মাটির রসটা পুরো টেনে নিক, তারপর কাটা হবে। জিতুবাবু এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক, তাঁর কথা অমান্য করা গেল না। কাঁদি গাছেই রইল। তারপর দিন ডাক্তারবাবু কলে বেরুবার আগে সকাল সাতটার সময়ে দেখেছেন কাঁদি গাছে ঝুলছে, আরও দু'চারটে কলা পেকেছে। ন'টার সময় জিতুবাবু গিয়ে দেখলেন—সব সাফ, গাছে কাঁদি নেই, কে কেটে নিয়ে গেছে। হুলুস্থুল পড়ে' গেল। থানায় পর্য্যন্ত খবর দেওয়া হ'ল। দুপুর বেলা আমদাবাদ থেকে আমি এসে পৌঁছলাম এক বেতো ঘোড়ায় চড়ে'। তখন আমার ঘোড়া ছিল, তার ল্যাজে চুল ছিল না, বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু চলত ভালো। বিরুবাবুর মায়ের কাছে খবর পাঠালাম আমি এসেছি। তিনি তো অন্নপূর্ণা ছিলেন, খবর পাঠালেই অন্ন ফুটে বেত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। জিতুবাবু ভুরু কুঁচকে বসে' আছেন, চাকর-বাকরগুলো সবাই সন্ত্রস্ত, উদিৎ সিং তম্বী করে' বেড়াচ্ছে চারিদিকে। তারপর শুনলাম ব্যাপারটা। আমারও রাগ হ'ল খুব। এ শালা চণ্ডালের দেশ, ডাক্তারবাবু এদের এত দেন, এদের জন্যে এত করেন তবু ব্যাটারা চুরি করতে ছাড়ে না। ডাক্তার-বাবু তখনও কল থেকে ফেরেন নি, বিরুবাবুর মা আমাকে আগেই খাইয়ে দিলেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুঘুর বলে' মই আনিয়ে ভুসকারে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে নিরিবিলিতে বেশ চমৎকার ঘুম হয়। বিশেষত শীত-কালে। বরাবরই আমি ওখানে শুতাম। সেদিন ভুসকারে ঢুকে ভুসোগুলো সরিয়ে একটু জায়গা করতে গিয়ে দেখি ভুসোর মধ্যে কলার কাঁদিটা ঢোকানো রয়েছে। বুঝলাম চুরি করে' কেউ সরিয়ে রেখেছে এখানে। নিয়ে যেতে পারে নি। অন্ধকার হ'লে নিয়ে যাবে। ওখানে শোয়া আর নিরাপদ বলে' মনে হ'ল না। নেমে গিয়ে খবরটি চুপি চুপি উদিৎ সিংয়ের কানে তুলে দিলাম। সাপের ল্যাজে পা পড়লে যা হয় অনেকটা তেমনি হ'ল। উদিৎ সিং তড়াক করে' লাফিয়ে উঠে ছুলতে লাগল, যেন

আমাকেই ছোবলাবে। নাকের ছ্যাদা ফাঁক হয়ে গেল, ছোট ছোট নীল চোখ দুটো থেকে ছুটতে লাগল আগুন। দাঁতে দাঁত পিষে নীচু গলায় তর্জন করে' আমাকে বললে —কোই কোই বাত্ নেহি বোলিয়ে। ম্যয় শালেকো পাকড়েঙ্গে। তারপর কি করলে জান? সেই কলার কাঁদির পাশেই ভুসোর মধ্যে ডুবে বসে রইল। নাকের ছ্যাদা দুটি আর চোখ দুটি বেরিয়ে রইল শুধু। ঠিক সন্ধের পরই ধরা পড়ল চোরটা। ডাক্তারবাবু তাকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, খেতে পাচ্ছিল না—তাই বাগানের মালী করে' বাহাল করেছিলেন। সেই শালার এই ব্যবহার।

উদিৎ সিংহ তো তাকে ছুতিয়ে রক্তারক্তি করে' দিলে, তারপর থানা পুলিশ। নির্ঘাত জেল হ'য়ে যেত, ডাক্তার-বাবুই আবার বাঁচালেন তাকে। চাকরিও দিলেন আবার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঁচাতে পারেন নি। মাস ছয়েক পরে আর এক জায়গায় চুরি করে' ধরা পড়ল সে। তখন জেল হ'য়ে গেল···"

গগন বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, সে অনুভব করিল কবিরাজ মহাশয় যদি আর এক প্রস্থ গল্প আরম্ভ করেন তাহা হইলে বড়ই দেরি হইয়া যাইবে। সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চলুন আমরা সব বাইরে গিয়ে বসি। দাদুর সমস্ত দিন বড্ড strain গেছে, উনি এবার একটু ঘুমুন"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ভালো। চল বাইরেই যাই আমরা। আমি তো পুরোনো গুদাম ঘরের মতো। আমার মনের দরজা জানলা খুলে দিলে কত যে গল্পের আরশোলা, ইঁদুর, টিক্‌টিকে বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক আছে। রাত ভোর হয়ে যাবে।"

হাসিতে হাসিতে কবিরাজ মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশ

স্মরণাতীত কাল থেকেই 'নিম' এর অভ্যাশ্চর্য্য পচন-নিবারক ও প্রতিষেধক গুণাবলী ভারতবাসীর কাছে সুবিদিত। নিমের এই সব সহজাত গুণাবলীও বৈশিষ্ট্য নিম টুথ পেষ্ট-এ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকায় এর উপকারিতা অসাধারণ। তা ছাড়া আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞান-সম্মত দাঁত ও মাড়ির উৎকর্ষসাধক শ্রেষ্ঠ উপকরণ-গুলিও নিম টুথ পেষ্টে সংমিশ্রিত আছে, কাজেই অন্য কোন টুথ পেষ্টের সঙ্গে নিম টুথ পেষ্টের তুলনাই হয় না।

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

প্রকৃতি শ্রীতির সহিত মানবপ্রেমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।[২২] প্রকৃতিকে তিনি সত্য সত্যই ভালবাসেন, অবাধ-প্রসারিত প্রকৃতির সান্নিধ্যে তাঁহার মন হয় মুক্ত, সংকীর্ণ পরিবেশের সীমা ছাড়াইয়া তাঁহার দৃষ্টি লক্ষ্যপ্রসারিত হয়। এইভাবে মন যাঁহার বাড়িয়া যায়, স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিকতার দৈন্য তাঁহাকে আর গ্রাস করতে পারে না। নিজেকে লইয়া ব্যস্ততার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, তিনিই অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ভাবিতে বা কাজ করিতে পারেন। প্রকৃতি-প্রেমিক সাহিত্যিক এইজন্যই মানব-প্রেমিক হন। শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টমাস হার্ডি, রবীন্দ্রনাথ,—ইঁহারা প্রকৃতি ও মানুষকে একই সঙ্গে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহাদের রচনায় দুইই উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। বিভূতিভূষণও এই পথেই চলিয়াছেন। প্রকৃতি-প্রেম এবং মানবতাবোধ অঙ্গাঙ্গী হইয়া তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে।

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার জন্য যাহারা বোঝাটা থাকিলেও সম্মুখে আসিতে পারে না, বলিষ্ঠকণ্ঠে আপন ন্যায্য দাবী উপস্থাপিত করিতে পারে না, যাহারা বঞ্চিত, শোষিত অথবা অবহেলিত, সাধারণতঃ সাহিত্যিকের মানবতাবোধ তাহাদের রূপায়ণেই প্রতিফলিত হয়। স্যুট, আমুন, মাক্সিম গোর্কি, প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্রের মত লেখকের ইহাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমিক মানবতাবোধী সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ইহাতেই নয়, মানুষ মাত্রেই ভালবাসার পাত্র। মানুষের নিজস্ব সত্তাকে স্পর্শ করাতেই তাঁহাদের আনন্দ। যে মানুষ শ্রেণী-বিশেষে ভাবে যে কেহই হইতে পারে। যেমন শিকলে পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে সম্মুখে আনিতে তাঁহারা যেমন ব্যগ্র, যে মানুষ আপন মহৎ সম্ভাবনা প্রতিরুদ্ধ করিয়া আপাত-সুখ-তৃপ্তির মোহে শক্তির অপব্যবহার করে, তাহার সম্পর্কে যেমন তাঁহাদের বেদনাবোধ, সেইরূপ যে মানুষ একেবারেই উচ্চকোটির, তাহার ছবি আঁকিতেও তাঁহাদের কোনরূপ সংকোচ নাই। এইরূপ সাহিত্যিক বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়ই বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্ত সত্তা, একই পরমাশক্তি ইহাদের মূলে কাজ করিতেছে। সে অর্থে তাঁহাদের প্রকৃতিপ্রীতি মানব-প্রেমেরই দ্যোতক।

---

[২২] অবশ্য একথা বিশ্বভাবে না বলিলেও চলিবে যে, মানবপ্রেম প্রকৃতিপ্রেমের উপর নির্ভরশীল নয় এবং মানবপ্রেমিক হইতে হইলেই যে প্রকৃতিপ্রেমিক হইতে হইবে এমন নয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতিপ্রেমিক স্বভাবতই মানবপ্রেমিক হইয়া থাকেন।

মানুষমাত্রেই মহৎ, তাহার আবিলতা পারিপার্শ্বিক বা সাংগঠনিক ত্রুটি-জাত,—এই মহৎ বিশ্বাসে আলোচ্য সাহিত্যিকেরা উদ্বুদ্ধ।[২৩]

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে এইরূপ মানবপ্রীতির প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ভালবাসার স্বচ্ছমুকুরে মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই বিভূতিভূষণের রচনায় মানুষ স্বরূপে ফুটিয়াছে। তিনি কবি-স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন, তাহাদের সুযোগে তাঁহার মানবতাবোধের স্বতঃস্ফূর্তি দেখা যায়। অবশ্য বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম এত গভীর ও বিশাল যে, তাঁহার পক্ষে এরূপ আকাশচারী কল্পনাবিলাসী হওয়া, প্রকৃতির অন্তহীন রহস্যে ডুবিয়া গিয়া মার্মিক হওয়া, অথবা প্রকৃতির উদার ব্যাপ্তি-সংঘে বস্তুতান্ত্রিক রূপৎ অস্বীকার করিয়া ক্রমে অধ্যাত্মবাদী হইয়া উঠা বিচিত্র ছিল না, কিন্তু এই ত্রিবিধ প্রবাহের স্পর্শ তাঁহার গায়ে লাগিলেও তিনি মূলতঃ জগৎ ও জীবনের শিল্পী ছিলেন। প্রকৃতি তাঁহার মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা-উৎস এবং প্রাণস্বরূপ সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহার কথাসাহিত্যের পটভূমি মানুষের জীবন। তিনি যে মানুষকে আপন রচনায় স্থান দিয়াছেন, তাহাকে মৌল মূল্যেই রূপায়িত করিবার সাধনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—'নিজের সুখদুঃখের ধারাই হ'ক, আর অন্যের সুখ-দুঃখের ধারাই হ'ক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হ'ক, আর মনুষ্যচরিত্র গ'ড়ে হ'ক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। সাহিত্যে আর সমস্তই উপলক্ষ।'—এই হিসাবে, কিছুটা ভাববাদী হইলেও বিভূতিভূষণের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য।

বিভূতিভূষণ তাঁহার রচনায় যেসব মানুষকে স্থান দিয়াছেন, তাহারা শুধুমাত্র আমাদের পরিচিত মানুষের গতানুগতিক রূপ নয়, আপন ভাব-দৃষ্টির অনুকূলে তিনি তাহাদের আসল সত্তাকে আগন্তুক 'জীবন' র পট-ভূমিকায় ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।[২৪] এইরূপ মৌল- । ফুটাই-

---

[২৩] তুলনীয় :—

'His life was gentle, and the elements
So mix'd in him that Nature might stand up,
And say to all the world "This was a man!"

—Shakespeare, Julius Caesar, V. 5.

[২৪] সাধারণ মানুষের। বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে ভিড় করিয়াছে, কিন্তু লেখকের দরদী স্পর্শে তাহাদের অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হওয়ায় তাহারা এক বিশেষ অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। হোটেলের পাচক হাজারি (আমর্শ হিন্দু হোটেল), ঘাটুড়ে ডাক্তার বিপিন (বিপিনের সংসার), বিপত্নীক সরল গ্রাম্য কেদার (কেদারবাবু), যাত্রাদলের নট বহু (বহু হাজারা ও শিবিরের গল্প), সতীসাধ্বী হাড়ির

যায় প্রায়ে মনকুণ্ডের গহন অরণ্যে তাঁহার পথ হারাইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সেই জটিলতা এড়াইয়া নিজ আপন বিশ্বাসের আলোতে তিনি মানুষকে আবিষ্কার করিয়াছেন। বিভূতিভূষণের সাধনা বৈষ্ণবের সাধনা, অন্তরের প্রেম-মন্দাকিনীর স্পর্শে পবিত্রিত নিলাশ্রুতে স্নানসকার করিয়া তিনি পাঠকের হৃদয় তরঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্র তাঁহার ভাবদৃষ্টির অনুকূল হইলেও তিনি শিল্পকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, মোটামুটি আদর্শপ্রবণ, নীতিবাগীশ এবং ধার্মিক মানুষ হইলেও লেখার মধ্যে তিনি এই দিকগুলি হইতে খুবই কম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এ হিসাবেও তিনি রবীন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্য। সমকালীন শরৎচন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় বিভূতিভূষণ অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয়াম। বিশ্বস্থল ভূমে লিখিতে বসিয়া বন্ধুর-পথ-পরিক্রমায় তিনি আশ্চর্য সংযম দেখাইয়াছেন বলা চলে। সহজ প্রকাশের ভিতর দিয়া বিভূতিভূষণ যে রূপসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই হইয়া উঠিয়াছে আবেদনময়। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে বলা হয়, তাঁহার কবিপ্রতিভা চরমে উঠিত যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক অথবা উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া প্রকৃতি হইতে বিপুল অভিভাব (suggestion) সংগ্রহ করিতেন।৩২৮ কথাটি বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও খাটে। সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ নয়, অনুভবের ভাবধারায় স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিই তাঁহার মহিমাব্যঞ্জক। মনীষী অমায়-ওয়াইল্ড সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসাবে বলিয়াছেন সাহিত্য জীবন ভিত্তিক, কিন্তু ইহা জীবনের অনুলিপি নয়, সাহিত্যে উদ্দেশ্যের অনুকূলেই জীবন রূপ পায়।৩২৯ বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে দেখা যায়, তিনি আপন ভাবদৃষ্টির ধাঁচে জীবনকে চালিয়া লইয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি সেই সংগ্রহনে নির্দেশাত্মক আত্মপ্রকাশ করেন নাই।

কাহিনী, কাঠামো (Pattern), চরিত্র, সংঘাত, নাটকীয়তা, সংলাপ, আকৃতি (Form), রচনাশৈলী এবং লেখকের ভাবদৃষ্টি এইগুলিই মোটামুটি উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ।৩৩০ কেহ কেহ কাহিনীকেই উপন্যাসের মূলভিত্তি বলেন, ৩৩১ আবার কাহারও কাহারও মতে চরিত্রসৃষ্টিই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ দিক।৩৩২ মানুষের হৃদয়ের ছবি, তথা মানুষের স্বরূপপ্রকাশই উপন্যাসের প্রধান কাজ, একথাও কোন কোন মনীষী বলিয়া থাকেন।৩৩৩

বিভূতিভূষণের উপন্যাস বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার রচনা উপরোক্ত সকল লক্ষণের দিক হইতে সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করিয়া কাঠামো, সংঘাত, নাটকীয়তা—এই দিকগুলি হইতে তাঁহার লেখার বহু ত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের উপন্যাস যে উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টিরূপে অভিনন্দিত হয়, তাহার কারণ তাঁহার সরল গল্প, সরল চরিত্র, অনুপম সংলাপ এবং অপূর্ব ভাবদৃষ্টি। মানুষের হৃদয়ের সহজ সুন্দর রবি ফুটানোর ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্বের তুলনা কদাচিৎ মিলে। বিভূতিভূষণের আর এক বৈশিষ্ট্য হইল মানুষের বোধ ও চেতনাকে পৃথক খণ্ডে ভাগ করিয়া তিনি খণ্ডিত (compartmental) চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, মানুষের ব্যক্তির বা স্বরূপ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেন বলিয়া জীবনের প্রকৃত রূপের পূর্ণাঙ্গ চিত্র

হেমেন্দ্র (অসাধারণ গল্প), গায়পাগল মুরলীপ্রসাদ (মায়পাক), পতিব্রতা পোলাপী (কামতাসার কৃষ্ণকাল গল্প), ভক্তিমতী চারিত্রিক-দৃঢ়তাহীনা নারী সিরিবালা (সিরিবালা গল্প), সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও নিজের গ্রামের কুটিরে বাসে অভিলাষিণী কাশীবাসিনী বৃদ্ধা বিধবা ভ্রবময়ী (ভ্রবময়ীর কাশীবাস গল্প), বিরাট একটি বাড়ীর খণ্ডে মণ্ডল দরিদ্র ভদ্রলোক মামা (ভদ্রলোকমামার বাড়ী গল্প), মহত্তের অরণ্যে প্রণাম সাধু (কুপল পাহাড়ী গল্প), পবিত্র গভীর কর্মচারী কবি কুসুমদাস (কবি কুসুম দাসের গল্প),—ইহারা সবাই এই ধরণের চরিত্র। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এইরূপ চরিত্রই বেশি।

৩২৮ উইলফ্রেড হুইটেন সম্পাদিত 'The world's Library of Best Books' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩২৯ 'Literature always anticipates life. It does not copy it; but moulds it to its purpose.'

—Oscar wilde—the Decay of Lying.

৩৩০ ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও এই লক্ষণগুলির অধিকাংশ প্রযোজ্য, যদিও ছোট গল্প জীবনের খণ্ডাংশ লইয়া লেখা হয় এবং তাহাতে একটি ঘটনা বা একটি ভাব রূপায়িত হইয়া থাকে। তবে ছোট গল্পের গভীরতায় একটা অঙ্গুলি নির্দেশের তীক্ষ্ণতা থাকে, যাহা উপন্যাসের ব্যাপকতর পরিধিতে দেখা যায় না।

৩৩১ 'We shall all agree the fundamental aspect of the novel is its story-telling aspect'—E. M. Forster—Aspects of the Novel (1928) P. 40

৩৩২ 'The greatest novels are essentially character studies.'—Alfred H Upham—The Typical forms of English Literature (1927) P. 183.

৩৩৩ এই সকল তর্ক ও আলোচনা বাড়িয়া দিয়া একটি সহজ কথা স্মরণ করিলেই উপন্যাসের স্বরূপ ধরা পড়িবে। উপন্যাস মানুষের হৃদয়ের ছবি; মানুষের ধর্ম আছে, সমাজ আছে, রাষ্ট্রনীতি আছে, সচেতন ও অবচেতন আত্মা আছে। প্রত্যেকে যে কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মানুষের স্বরূপের অভিব্যক্তিই তাহার আদর্শ; কোন একটি বিশেষ লক্ষণকে সমগ্র ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সেই চিত্র জীবন্ত হইবে না।

৩৪ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—শরৎচন্দ্র (৭ম সংস্করণ), পৃঃ—১-২

আঁকিবার দিকেই তাহার প্রবণতা ছিল।[৩৪] মানুষের প্রতি প্রবল ভালবাসায় তাহার মন উদ্বেল বলিয়াই তিনি মানুষের প্রকৃত সত্তার এই পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে সমর্থ হইয়াছিলেন। আঙ্গিকের দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ না হইলেও বিভূতিভূষণের সৃষ্টির শিল্পকলা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাহা প্রচলিত সংজ্ঞার-অপেক্ষা রাখে না, বরং সাফল্যের নিরিখে নূতন সংজ্ঞা নির্দেশের-দাবী রাখে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, আঙ্গিকের ত্রুটি থাকিলেও মহান মানবতাবোধ বা হৃদয়বোধের আবেদনের দিক হইতে বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য সন্দেহাতীত। 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা, এই গ্রন্থবিচারেই কথাটার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। পথের পাঁচালীর গল্প প্রথমতঃ, ইহা লেখকের আত্মজীবনধর্মী মনের সৃষ্টি। ইহাতে নাটকীয়তা খুবই কম। তবু পথের পাঁচালী অসাধারণ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইয়াছেন।[৩৫] রবীন্দ্রোক্তে তারমান নৌকা হইতে তীরভূমির বিচিত্র সৌন্দর্য দর্শন যেমন নৌকারোহীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ, বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস পাঠে সেইরূপ তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে বুদ্ধির উদ্দলতাধীপ্ত 'দীপ্তিকাব্যে'র নয়, ভাবরসে চিত্ত বিগলনকারী 'প্রতিভাবো'র লক্ষণ বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। যে মানুষকে তিনি তাঁহার রচনার স্থান দিয়াছেন, তাহার ও সমাজের মাঝখানে কোন ফাঁক নাই; সে সমাজেরই অংশ এবং সমাজের দ্বারাই প্রভাবিত। আবার তাহার সহিত প্রকৃতির (যে প্রকৃতি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবন্ত, গল্প-উপন্যাসে উপস্থাপিত চরিত্রের মনোভাব গঠনের উপাদানমাত্র নয়) কোন বিরোধই নাই, সে প্রকৃতির সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। এই অ-সমমুখী দুই পথের মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়া বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্র অগ্রসর হইয়াছে। বাস্তবিক সমাজ ও প্রকৃতি এই দুই আপাতবিরোধী শক্তির মাঝে পড়িয়াও বিভূতিভূষণের চরিত্র যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে লেখকের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন—চমৎকারিত্ব রসের সারবস্তু। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সাধারণ কথা ও সাধারণ চরিত্র সহজ বর্ণনা বা রূপায়ণের ভিতর দিয়া এমন চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে যাহার আবেদন সর্বজনীন। শিল্পের সাধারণীকৃতি (universalisation) শিল্পের গৌরব এবং উন্নত শিল্পের লক্ষণ। বিভূতিভূষণের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রগুলিও আপন আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা, এগুলি পাঠকের রসিক চিত্তের আশ্রয় পাইয়া সাধারণীকৃত হইয়া যায়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার বলিয়াছিলেন :—"আমি চিরদিন কলকাতায় মানুষ। বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি এবং পল্লীজীবনের সঙ্গে এমন আমার পরিচয়ের দাবী করতে পারিনা। কিন্তু বেশ একটা মমতাবোধ করি তার জন্য—তাতে ভুল নেই। আর 'পথের পাঁচালী'র অপুর সঙ্গে অনুভব করি বাঙালী শিশুর অভিন্নতা।[৩৬]

বৃহৎ অর্থে না ধরিলে সাধারণ অর্থে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জীবনের ভাষ্যকার বলা চলেনা। বিশ্লেষণ কখনই তাঁহার বিশিষ্টতা নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবনের চিত্রকর, ছবি আঁকাই তাহার কাজ। এই চিত্রাঙ্কনে অবশ্য খুঁটিনাটির বর্ণনা তিনি করিয়াছেন। এইরূপ বিস্তারিত রূপায়ণের উদ্দেশ্য হইল—আপন বক্তব্য বা কথনকে যথাসম্ভব পরিস্ফুটন। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে মানুষের সহায়ক শক্তিরূপে প্রাণময়ী করিয়াছেন। এই জীবন্ত প্রকৃতির স্পর্শ বা অনুকূল প্রভাব এমন এক সরল পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে, যাহার আশ্রয় লাভ করিয়া পৃথিবীর জটিলতা-ক্লান্ত পাঠক শান্তি লাভ করে।[৩৭] মানুষকে তিনি

[৩৪] 'The novel is not merely fictional prose, it is the prose of mans life, the first art to take the whole man and give him expression.

—Ralph Fox—The Novel and the People.

[৩৫] রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী'কে স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছেন :—"পথের পাঁচালির আখ্যানভাগটা অত্যন্ত দেশি। কিন্তু কাজের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকী থাকে। যেখানে আজকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালি' সে বাংলার পাড়াগাঁয়ের কথা, সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। দেখায় শুধু এই যে নতুন জিনিস কাপনা হয়নি, মনে হয় খাঁটি, উচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তাদরের তাঙতোর সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখিনি। এই গল্পে গাছপালা, পথঘাট, মেয়েপুরুষ, সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টন থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল, অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।"

[৩৬] দ্রষ্টব্য :—গোপাল হালদার 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি' (১ম সংস্করণ), পৃঃ—১৯৩-১৯৭

[৩৭] মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা সর্বজনবিদিত। এই প্রাচুর্যভোগেও এখন সেখানে এক্যবদ্ধের ক্লান্তি দেখা যাইতেছে বলিয়া মনীষীরা মনে করিতেছেন। স্বাধী-দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়া অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানকার জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—"যাদের মন চকচকে গাড়ি ও বাড়ির ধারে ক্লান্ত, তারা অন্য একটি রাস্তা ধরেছেন। কুটির-নির্মাণ করবার জন্য জঙ্গলের কাঠ ব্যবহার করে তাতে রঙ বজায় রেখেছেন। রেড উড নামক একটি কাঠের ব্যবহার অনেক জায়গায় দেখলাম। আবার অনেকে মানুষের হাতে গড়া জিনিসের বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্রোহ ক'রে গাছপালা, মাটি, পাখা, ফুলফল প্রভৃতির প্রতি যেন একটি পূজার

তাহার স্বরূপের হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য, সৌন্দর্য ও মহৎ আনন্দের রসে অভিসিঞ্চিত তাঁহার সৃষ্টিতে জীবনের ঘটনাভার স্থান নাই বলিলেই চলে। যে ঘটনা সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতি মানুষের গহন মনের স্বপ্নঘাত—তাহাতো পরিহার তিনি করিয়াছেনই, সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ঘটনাতাও তিনি সাহস-পক্ষে এড়াইয়া গিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা একেবারে এড়ানো সম্ভব হয় নাই, সেক্ষেত্রেও আপন ভাবদৃষ্টির প্রলেপে তিনি তাহা মোলায়েম করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে এইরূপ সমস্যার ছবি এমন মানবিক আবেদনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে সমস্যার উদ্ভবস্থল সেখানে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত মূল্যবোধের পুনঃ নির্ধারণের হিসাবে অথবা কথাসাহিত্যে মানুষের হৃদয়ের বার্তা-পরিস্ফুটনের অগ্রাধিকার স্বীকৃতিতে পাশ্চাত্যাবাসীরা বিভূতিভূষণের হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপিত হইল। প্রথম দৃষ্টান্তটি অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা একটি গল্প এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা একটি গল্প। উভয় গল্পেই সহৃদয়তাবের শিল্পী বিভূতিভূষণের মনোধর্মের সন্ধান মিলিবে।[৩৮]

প্রথম দৃষ্টান্তটি হইল বিভূতিভূষণের অসাধারণ প্রেমের বিষয় নামক গল্প। গল্পটি অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা। ইহার প্রধান চরিত্র হাজু নামে একটি তরুণ। হাজু রামচরণ বোষ্টুমের মেয়ে। স্বামী-পরিত্যক্তা এই গ্রাম্য মেয়েটি পরীর বাপের ঘরে থাইতে পায় না এবং এর ওর দুয়ারে গিয়া লাঞ্ছনা সহ্য করে, পেটের জ্বালায় চুরি পর্যন্ত করিতে কখনও কখনও। অবশেষে হাজু একদিন মনস্থ শহরে গিয়া পতিতাবৃত্তি শুরু করে। এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মেয়েটিকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলে। হাজুর নিজের ঘর হয়, সে ঘরে তার জিনিষপত্র, সে চায়ের কাপ কিনিয়াছে, ঘটি কিনিয়াছে, চৌকী কিনিয়াছে। বক্তাকে গ্রাম সম্পর্কে হাজু আগে আঠামশায় বলিত, এই আঠামশায়ের নিকট হইতেই তবু কিছু সহানুভূতি মিলিত। হাজু তাঁহাকে ভক্তি করিত খুব। হঠাৎ সে একদিন আঠামশায়কে পথে দেখিতে পাইল, আবদার করিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল নিজের ঘরে। নিজের জিনিষপত্র সরলভাবে দেখাইতে দেখাইতে হাজুর মুখ আনন্দে গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই সময় বক্তা যে সব কথা বলেন, তাহাতে অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক নীতিবোধের প্রচলিত মূল্যের উপর এক সূক্ষ্ম প্রশ্নচিহ্ন ফুটিয়া উঠে। অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় ইহা বিভূতিভূষণের সহানুভূতিস্নিগ্ধ মনেরই প্রশ্নচিহ্ন। তিনি বলেন :—"কাল ও দিন ছিলাম্পি, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্তরঙ্গের সমস্যা বুঝিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার যাথাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সার্থকতা ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।[৩৯]

বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক সমস্যাভিত্তিক এই গল্পটিতে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন মূল্যায়নে প্রচলিত নীতিবোধের খোঁড়ামি পরিবর্তনের যে আবেদন আছে সে হিসাবে বিভূতিভূষণের আধুনিকত্বও ফুটিয়াছে। কিন্তু তবু এ গল্পে হৃদয়াবেগ বা মানবতা-বোধই বড় কথা, অর্থনৈতিক সমস্যা অথবা সামাজিক প্রশ্নে আধুনিকতা-বোধ গৌণ দিক।

অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বিভূতিভূষণের এই যে প্রচলিত নীতি-নিরপেক্ষ সহানুভূতিশীল মানবিক মনোভাব, ইহা তাহার রাজনৈতিক পটভূমিকার রচনাতেও দেখা যায়। অবশ্য, আগেই বলা হইয়াছে বিভূতিভূষণ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমস্যা প্রায়ই এড়াইয়া গিয়াছেন এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁহার লেখার সংখ্যা নগণ্য। এই সামান্য দু একটি রচনায়ও মানবতাবোধের রসসিঞ্চনে বা হৃদয়াবেগের স্পর্শে রাজনীতি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এদিক হইতে 'দুর্গাদাস ও যুধাজিৎ' গ্রন্থের 'যোড়াম' নামক গল্পটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। আলোচ্য 'যোড়াম' গল্পে আছে :—

'প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে সারা ভারতে যে গণ-জাগরণ হইয়াছিল, আদিবাসী মহিলা এলিসাবা কুই

ভাব (cult) গড়ে তুলেছেন। আবার অন্যান্য মরমী লোকেরা আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের সভ্যতার মধ্যে আরও অনাবিল প্রকৃতির সন্ধান করেছেন—যেখানে তাঁদের বাসনা মানুষ নিজের গড়া ঐশ্বর্যের ভারে চাপা পড়েনি।

(শ্রীনির্মলকুমার বসু—আমেরিকার চিঠি—বসুধারা, আশ্বিন, ১৩৬৮)

[৩৮] দুইটি গল্পেই বিভূতিভূষণের প্রিয় রচনারীতি অনুযায়ী 'আমি' চরিত্রটি বক্তারূপে বর্তমান। এই 'আমি' চরিত্রটি গল্প-সংশ্লিষ্ট, কিন্তু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়। বলা বাহুল্য এইভাবে নিজের জবানীতে দ্রষ্টাকে রাখার একটা সার্থকতা আছে, ইহাতে লেখকের ভাবদৃষ্টি সহজে ফুটিবার সুযোগ পায়।

[৩৯] তবে এই প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিকতার মোহে দুশ্চরিত্রতা সমর্থনের লোক বিভূতিভূষণ নন। মানুষের নৈতিক চরিত্রের মর্যাদা তিনি কিরূপ বুঝিতেন তাহা 'কেদার রাজা' উপন্যাসে বিপন্ন বালবিধবা নরেন্দ্রকুমারীকে রক্ষার অথবা 'অসাধারণ' গ্রন্থের 'অসাধারণ' গল্পে নিম্নশ্রেণীর সতীসাধ্বী বধূটির সংগ্রাম-চিত্রণে সবাক ফুটিয়াছে। 'বিধুবাহার' গ্রন্থের 'অভিশাপ' গল্পে দুশ্চরিত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর অপমৃত্যুতেও তাঁহার এই নীতি-বোধই প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঁচী অঞ্চলের যে আকাশের বেতুর করে। বিশনে বিদ্যালয়ের পূর্বে এলিশাবা ছিল এক গ্রামা মেয়ে অন্তা 'চম্পু' এবং সেই সোনালী কৈশোরের দিনে চম্পু ভালবাসিয়াছিল পরের বন্ধু বাঙালী এক সাহেবমহলবাবুকে। সাহেবমহলবাবুই চম্পুদের দুইয়ে অনুরা হইয়া কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং চম্পু সে সময় সেবাযত্ন করিয়া তাহাকে সারাইয়া তুলিয়াছিল। বিদায় লইবার সময় বাবুটি উপহারস্বরূপ তাহাকে আপন হাতঘড়িটি দিতে চায়, সরলা চম্পু কিন্তু ঘড়ির পরিবর্তে চাহিয়া লয় তাহার সিটিকরা ছ'আনা দামের মোহরটি। তারপর বহুদিন কাটিয়া যায়। এখন সাহেবমহলবাবু জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সেই চম্পু এখন মহীয়সী মেমসাহেব এলিশাবা বুই। বিলবায়ইয়ের ঘরে তাহার বিবাহের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন হয় এলিশাবা বুইয়ের এবং সেই সূত্রে পুনরায় দেখা হয় বাঙালীবাবুটির সহিত এলিশাবার। মহীয়সীর পুলকিত লাবণ্যে বর্তমান তুচ্ছ হইয়া যায়, আগুন-ঝরানো আগষ্ট বিপ্লবের মেহদী স্মৃতির বাদুরও স্পর্শে ফিরিয়া পায় বহুদিনের হেলিয়া-আসা আরবাক লালফুলের আলক্ত-মাখানো পাতু দিনগুলি। সে স্বীকার করে :—"সত্যি বলছি, এখন এসব কেলে চলে যেতে ইচ্ছে করে বলিয়া থাকে। আগষ্ট আন্দোলনের পরে ছেলে বসে শুধু বলি-বলি কথাই ভাবতাম।" যাবার সময় পুরানো দিনের চম্পু ফিল ফিল করে ছেলে বলে,—"কাল আসবে।" তারপর একটু থেমে আবার বলে,—"বোতাম নিয়ে আসবে। ভারাইনি।"

প্রকৃতি-প্রেমিক ও মানবতাবাদী বিভূতিভূষণের মনোধর্মের আর একটি প্রধান দিক হইল তাঁহার বলিষ্ঠ আশাবাদ। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কঠিন পথই তাঁহাকে ভাঙ্গিতে হইয়াছে, কিন্তু সেই বাধার মধ্য তাঁহার বন্দিয়া যায় নাই। তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিতে এই অপরাজিত মনের ছাপ স্পষ্ট। বিভূতিভূষণ যে যুগের লেখক, সে যুগে চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছিল ব্যর্থতা আর বৈরাগ্য। ব্যক্তি ও সমাজ—উভয় জীবনেই পঙ্গুতা দেখা দিয়াছিল। এই-সময় বাঙালী লেখকদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া তরুণ একদল লেখকের মধ্যে হয় হতাশার দীর্ঘশ্বাস, আর না হয় নিরন্ন জীবনের প্রতিক্রিয়ায় স্বপ্ন-সুখবাসের দিকে একটা বিপজ্জনক ঝোঁক দেখা যায়। আগেই উল্লিখিত হইয়াছে, কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই দুর্দিনে বেগবান সাহিত্যতরীর হাল দৃঢ়হস্তে ধরিতে পারেন নাই।[৪৪০] সে সময়কার অনেকগুলি তরুণ বাঙালী লেখক প্রচলিত নীতি বা রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া প্রকাশ্যেই এক ধাপের গৌরববোধ করিতে থাকেন। সত্যসুন্দরের প্রতীকস্বরূপ রবীন্দ্র সাহিত্য-রীতিও ইহাদের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।[৪৪১]

এই সময় বিভূতিভূষণের আবির্ভাব হইল। তাঁহার শুচি-স্নিগ্ধ সাহিত্যকৃতি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু বিদ্যুৎবিহ্নে বারিসিঞ্চনের কাজ করিল। সমকালীন অবস্থিকর পরিবেশে অসাধারণ ধৈর্য ও আশাবাদী মনোভাব লইয়া তিনি বাণী-সাধনা সুরু করিলেন।[৪৪২] জীবন যে অপরাজিত, জৈবের চাপে ধ্বংস হইতে পারে না, সত্য, শিব ও সুন্দর পার্থিব কলুষের স্পর্শে নিঃশেষিত হইবার নয়, একথা তিনি উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন। তাঁহার অনু অপরাজিত জীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিল। পথের পাঁচালী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস সাহিত্য রসিকদের আকর্ষণ করিয়া তুলিল। বাংলার সবুজ প্রকৃতি আর সরল মনের যে সরল রূপায়ণ তিনি করিলেন, তাহার মাধুর্যরসে অনভ্যস্ত পাঠক হৃদয়ও আপ্লুত হইল।

বিভূতিভূষণ কিরূপ আশাবাদী ছিলেন, তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত তাঁহার 'জন্ম ও মৃত্যু' গ্রন্থের 'ডাকগাড়ি' গল্পটি। গল্পটি এক হতাশ আত্মহত্যার মনের পরম আশ্বাসলাভের কাহিনী, কিন্তু এই আশ্বাস আসিয়াছে যিচিত্র সূত্র হইতে। 'সাধারণ বিষয়বস্তুর অসাধারণ গৌরবে 'ডাকগাড়ি' গল্পটি বিভূতিভূষণের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। গল্পটিতে আছে :—

"তরুণী রাধা বিধবা হইয়া শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। দিন কাটিয়া যায়, ইতিমধ্যে রাধার বাপের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ-হইয়া পড়ে। রাধা তাহার ভোলা ও শাশুড়ীর নিকট গচ্ছিত সোনার হারটি লইতে ছোট ভাইটিকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর-বাড়ি আসিল। রাধার এত কষ্ট করিয়া আসা কিন্তু বিফল হইল, শাশুড়ী নানা ঝগড়া করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ক্লিষ্ট ও হতাশ মন লইয়া রাধা ফিরিয়া যাইবার পথে রাণাঘাট ষ্টেশনে আসিল। তাহার কাছে মোট পয়সা ছিল বারোটি, ক্ষুধার্ত ভাইটিকে সে তাহা হইতে তিন পয়সা দিয়া একখানি পাউরুটি কিনিয়া দিল। চা খাইতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু চার পয়সা খরচের ভয়ে সে চা খাইতে পারিল না। ঠিক এই সময় রাণাঘাট ষ্টেশনে ঢুকিল বালিগিং রেল। ঝকঝকে গাড়ী, সাহেব, মেম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যাত্রীদল। হঠাৎ রাধার ক্লিষ্ট মন উদ্বেলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গেল। গল্পে এইখানে আছে :—"রাধা কি দেখিল, কি পাইল জানিনা কিন্তু ডাকগাড়ীখানা দুটি সুবেশ আরোহী দল ও সুসজ্জিত ঝকঝকে তকতকে প্রথম ও দ্বিতীয়

---

৪৪০ অবশ্য বাংলা সাহিত্যের যাহাতে মর্যাদা রক্ষা হয়, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নব্যপন্থীদের অভ্যুদ্রতা দীমিত করিবার আশায় ১৩৩৪ সালের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র তিনি বিচিত্রা-ভবনে তাহাদের সহিত মিলিত হন। কিন্তু কবিগুরুর এই চেষ্টায় সুফল বিশেষ ফলে নাই।

৪৪১ দ্রষ্টব্য—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ : (১৩৫৭), পৃঃ —১৪৭

৪৪২ 'বিভূতিভূষণ'—আশাবাদী ছিলেন,...দুচিরকাল অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁহার ছিল।

—সজনীকান্ত দাস—আত্মস্মৃতি (১৩৬১), পৃঃ—২৯০

শ্রেণীর কামরাগুলি লইয়া তাহার মনে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিল। সমস্ত দার্জিলিং যেন খানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা—কিংবা কোন প্রতিভাবান গায়কের মুখে শোনা সঙ্গীত। রাধার মনে হইল এই ভালো কাপড়-চোপড়-পরা সুন্দর চেহারার মেয়েপুরুষ বালক-বালিকাদের সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ'আনা পয়সা খরচ করিয়া রাণাঘাট ষ্টেশনে আসে। সে পৃথিবীতে এরা আছে, সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, সুচির (পাড়ের এক চালাঘরে সমবয়সী মেয়ে) হৃদয়হীনতা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর সিঁদুর ব্যবহার সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার ছ'ভরির হারছড়ার শোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়। কি চমৎকার! দেখিলে জীবন সার্থক হয় বটে, মন ভরিয়া ওঠে বটে! সংসারে এত সুখ, এত রূপ, এত আনন্দ আছে!

পূর্বেই বলিয়াছি, রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না—কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, যেন গাড়িখানা ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র রাধা দেখিল যে সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ে নতুন বল, চোখে নতুন ধরণের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়,—যে সংসারে অনাদৃতা, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, অসহায়হীনা এবং যার শেষ সম্বল ছ'ভরির হার ছড়াটা পর্যন্ত শাশুড়ী ঘুচাইয়া দিয়াছে।'

—অতঃপর নতুন মানুষ রাধা তাহাকে নিয়া এক পেয়ালা চা আনাইল নিজের জন্য।

ক্রমশঃ

মধুমাসে তুমি এসেছ মাধবী ঘুম-কুঙ্কুম মেখে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রাণসজনে প্রেমের কথাটী ভুলেছ কি এই রাতে?
স্বপ্ন-সবুজ যৌবন জাগে আবেগের সংজ্ঞায়;
নীল দিগন্তে উঠেছে কি চাঁদ নয় রজনী সাথে?
ছায়া বুঝি তার দুলে ওঠে গঙ্গায়।
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী ঘরে পুষ্পিত অঙ্গনে
তোমায় আমার নৈশ-মিলন বাচনিক বন্ধনে।

মধুমাসে তুমি এসেছ মাধবী ঘুম-কুঙ্কুম মেখে
মুখোমুখি বসে কহিবে কি কথা হৃদয়ের বিনিময়ে?
আলাপনে তব আলিপনা দেব রঙের পাত্র রেখে
পরাজয়ে নয়—শুধু ক্ষণ পরিচয়ে।
মুকুল ফোটানো জোছনার হাসি পড়েছে বিজন ঘরে,
ওষ্ঠ তোমার কেঁপে ওঠে কেন আমারে পরশ তরে?

যত রাত হোক্, ক্লেশ-মধুর মনের কথাটী বলো,
বাতায়ন হোতে এলো সমীরণ তোমারে শোনাতে গীতি।
ঘর যদি আজ, ভালো নাহি লাগে, বাহিরে এখন চলো,
হারানো দিনের রয়েছে সুবাসে স্মৃতি।
আলোর পাপড়ি বুকেতে তোমার হেরিতেছি অভিসারে,
নব বিভাবরী দিওনা পোহাতে ধরে রেখে দাও তারে।

ঘুম নেই

বীরভদ্র

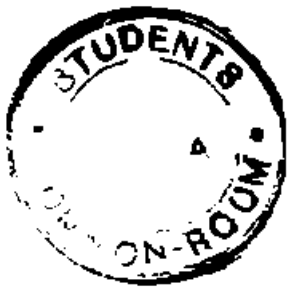

রাত্রি নিঝুম, ঘুম নেই চোখে
দূরে কুৎসিত গাঢ়তর অন্ধকারে
পেচকের একটানা কর্কশ চীৎকার।
আকাশে ওঠেনি চাঁদ—আলো নেই,
শুধু কালো মেঘ—আরও ভয়ার্ত রাত্রি।
এমনি কত বিনিদ্র রজনী অনায়াসে
কেটে যায়—
মেলে না অজস্র জিজ্ঞাসার কোন শুদ্ধ উত্তর।
অসহ্য চিন্তার নিবিড় আবেশে
আচ্ছন্ন সমস্ত মন, ক্লান্ত শরীর।
বাঁচবার অবলম্বন নেই কোন,
মুক্তিরও পথ রুদ্ধ—শুধু পলে পলে দাহ।
সারাদিন কর্ম্মের সাথে কঠোর সংগ্রাম,
রাত্রে নিদ্রাবিহীন জীবন,
তবুও তীব্র জ্বালায় জ্বলে যায় ক্ষুব্ধ জঠোর—
জোটে না সামান্য বস্ত্র—অনাবৃত দেহ।—
ক্রমে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে,
চিন্তার জাল বোনা আরও একটি
কালরাত্রি
নিঃশব্দে অলক্ষিতে পার হ'য়ে যায়!

লক্ষ্মী কমলা!

আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায়!

'এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না। কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া দরকার খাঁটি আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়

জামাকাপড়েরও ক্ষতি হয়না এবং হাতেরও কোন অনিষ্ট হয়না।" সে সানলাইট সাবান এনে আমায় দেখাল যে সানলাইটে কাচা জামাকাপড় কত পরিষ্কার হয়। সত্যি, একটু ঘষলেই ফেণা হয় কত। আমি যখন ওকে কাপড়কাচার জিনিষটা দিলাম, কমলা বলল—"না, পিসীমা, সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। শুধু একটু সাবান ঘষে দাও প্রচুর ফেণা হবে এবং জামাকাপড় বিনা আছাড়েই পরিষ্কার হবে।"

সত্যিই কাচার পরে কাপড়জামা এত সাদা আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে আমার যেন আর শুকোবার জন্যে তর সইছিল না; তখনই পরতে ইচ্ছে করছিল। কমলা সত্যিই চালাক মেয়ে! সে বলে যে সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় এত সাদা আর উজ্জ্বল হয় তার কারণ সানলাইটের প্রচুর ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।"

সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বাড়ীটা চালাতে হয়তো আমাকেই। সেইজন্যে ওকে আমি আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—"কিন্তু সানলাইটের দাম যে বড্ড বেশি।" কমলা একগাল হেসে বলল—"পিসী, ওটা তোমার মিথ্যে ভয়!" আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন কমলা বলল: "একটা সানলাইট সাবানে একগাদা কাপড় কাচা যায়। সানলাইট দিয়ে জামাকাপড় কাচলে সত্যিই খরচ বাঁচে!" সানলাইট সাবান সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ আমার খুব ভাল লাগে। সানলাইট দিয়ে কাচার পরে জামাকাপড়ের গন্ধটাই কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে আর এর ফেণা হাতকে রাখে কোমল ও মসৃণ।

কমলা বাড়ীতে আসার পরেই আমি প্রথম জানলাম যে পরিবারের সমস্ত জামাকাপড় যেমন আমার স্বামীর সার্ট, পায়জামা, তোয়ালে, ন্যাপকিন, বিছানার চাদর, পর্দা, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়—এক কথায় আমার ছোটবড় সব জামাকাপড় কাচার জন্যে সানলাইটের থেকে ভাল সাবান আর কিছুই নেই। এটি যে শুধু জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে তাই নয়; সানলাইটের একটি সাবানেই এক গাদা জামাকাপড় কাচা যায়। এতে পয়সাও বাঁচে আর পরিষ্কার জামাকাপড়ও পরা হয়।

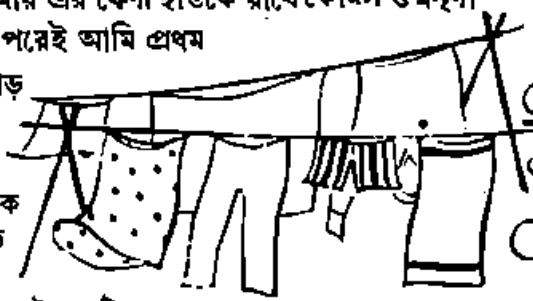

E 254 B-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

প্রবাসী বাঙালী ভূপেন্দ্রনাথ

কুমারভট্ট

দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট এই বাঙলাদেশ। বাঙালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে—আছে স্বাতন্ত্র্য। কর্মে-কাজে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে, বুদ্ধি ও প্রতিভায় বাঙালী পরিচয় দিয়েছে অসাধারণ মৌলিকতার—বিরাট প্রতিভার। তাই তার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল, মহিমান্বিত। শুধু বাঙলাদেশেই নয়, বাঙলার বাইরে অন্যান্যদেশে গিয়েও প্রবাসী বাঙালী বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে লাভ ক'রেছে প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও বিপুল গৌরব। যে সমস্ত বাঙালী বিদেশে গিয়ে বিদেশে সম্মান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন, বৃদ্ধি ক'রেছেন বাঙালীর সুনাম, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় অন্যতম।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর ছিল একটি ধনিষ্ঠ গ্রাম। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর উক্ত গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবিত কায়স্থ পরিবারে এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন ভূপেন্দ্রনাথ। তাঁর পিতৃদেব

ভূপেন্দ্রনাথ দাস

কৈলাসচন্দ্র দাস নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁর ছয়টি পুত্রের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিতীয়। ছাত্রজীবন থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ ক'রে তাঁকে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল পাঁর লক্ষ্যপথে। মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ভূপেন্দ্রনাথ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জুবিলী হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন মাসিক ১৫৲ টাকা জলপানি লাভ ক'রে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে লাভ করেন ২০৲ টাকা বৃত্তি। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি সসম্মানে বি-এ পাস করেন। তারপর তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলে। অল্পদিনের মধ্যেই আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সুখ্যাতি। ইতিমধ্যে তিনি বি-এল পরীক্ষা পাস করেন।

তারপর ভাগ্যান্বেষণে ভূপেন্দ্রনাথ বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে গেলেন সুদূর ব্রহ্মদেশে। প্রথমে রেঙ্গুনে এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসে নিযুক্ত হন কেরাণীর কাজে। তিতীক্ষু ও স্বাধীনচেতা ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন আজীবন, তাঁর প্রতিবাদ ক'রেছেন স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে। উক্ত অফিসের মাদ্রাজী সুপারিন্টেডেন্টের কোন অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে তিনি ইস্তাফা দেন কেরাণীর কাজে। এর পর তিনি যোগদান করেন মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে নিযুক্ত হ'লেন দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে। ওকালতি পাস ক'রে তিনি তখনও পর্যন্ত সে বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। শিক্ষাব্রতীর কাজেই ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ, আন্তরিক অনুরাগ। অধ্যাপনার মধ্যেই তিনি লাভ করিতেন বিমল আনন্দ। এখানে প্রায় সাত বছর ধরে শিক্ষকতা ক'রে তিনি লাভ করেন বিপুল যশ ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা। তাঁর কর্মী ছাত্রদের মধ্যে উত্তরকালে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে স্বাধীনব্রহ্মের প্রেসিডেন্ট উ, বা, উ এবং সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ উ, এ মং প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যেদিন মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলটি পরিণত হয় গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে। ভূপেনবাবুরই স্বাভাবিক দাবী ছিল প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হবার। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিলাত থেকে ম্যাট্রিক পাস করা মিঃ ই. সি ডাউন নামে এক সাহেবকে এনে দিলেন সেই পদ। তেজস্বী ভূপেন্দ্রনাথ সে অন্যায় মাথা পেতে মেনে নিলেন না, প্রতিবাদ ক'রলেন বিদেশী সরকারের অন্যায় কার্যের। তারপর এক কড়া চিঠি লিখে শিক্ষকের পদে দিলেন ইস্তাফা।

তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ যোগদান শুরু করেন ওকালতি। অল্পদিনের মধ্যে এ্যাডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে তিনি আশ্চর্যরূপ লাভ করেন ভাগ্যলক্ষ্মীর। আশাতীত আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সৎ-কার্যে, দুঃস্থ আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের সাহায্যকল্পে ব্যয়বৃদ্ধিও হ'ল তাঁর যথেষ্ট। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যোগদান করেন এলোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি স্থানীয় কালীবাড়ী, জগন্নাথবাড়ী, গৌরাঙ্গ আশ্রম প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন হস-পিটালের উন্নতিকল্পে বর্মী সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বেঙ্গল ক্লোসাল ক্লাবের তিনি শুধু অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন বিনা প্রতিযোগিতায়। তারপর আরও দুবার তিনি উক্তসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপকসভায় তিনি

[illegible] ভারতীয় দলের নেতার না থাকে তবে স্বয়ংবাসী পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে তিনি লাভ করেন বিশেষ সুনাম। বহু অধুনীন ও কার্যকর ভারতীয় প্রতিনিধিদের অবাধ অধিকারের প্রতিকারকল্পে তাঁর চেষ্টা ও দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সামাজিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যের পূজারী। তাঁর রচিত গল্প, প্রায় বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁর রচিত উপন্যাস 'আগুন' ও অন্যান্য পত্রিকায় পাঠক-পাঠিকাকে বেশ কিছু আনন্দ দানেন। সেদিন থেকে প্রকাশিত 'ভোরের বেলা' নামক কাগজের একটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার প্রথমে বিভাগের সম্পাদনা করতেন তিনি। বাংলা মাসিক পত্রিকের ব্যবসায়ের পথের সন্ধানটি ছিলেন তিনি প্রায় তিন বছরের আগে। একজন প্রাণ অভিনেতা হিসাবেও খ্যাতি ছিল তাঁর অসামান্য। বিভিন্ন অভিনয় ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে রঙ্গমঞ্চের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা সহজ বাঙালী সমাজের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলা তথা ভারতের আকাশে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এলে দুর্যোগের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবার বর্গ সহ অধিকারে তাঁর ছিল করুণার ভেতে আসবে বাধা হন। তিনি কাঁকিনাড়ায় এসে বাসীপাকে বাস করতে থাকেন। কয়েক বছর পরে উপেন্দ্রবাবু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন—চিকিৎসা করতে থাকেন ডাঃ অমল রায়চৌধুরী। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত এক মাসুষাটে কলম ও আসন কীর্তির অবসান হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশের বাঙ্গ সাহিত্যিকদের একটি গৌরবময় অধ্যায় শেষ হয় এবং তাঁর অভাব আমাদের সন্তানার্থে কোটি বছ থাকে অবিদিত। তাঁর অধীন দুটি ছেলে ভারতের ও ছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেই পুত্রের পারেনি তাদের অভিভাবক উপেন্দ্রনাথকে। তাইতো তাদের অন্তরে উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

মৃত্যুকালে উপেন্দ্রবাবুর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

আমরা কামনা করি তাঁর অমর আত্মার চিরশান্তি। তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর কীর্তিমান্ পরিবারটিকে যেন অক্ষুণ্ণ রাখে

মেয়েদের কথা

আধুনিক নারী জীবন ও তার সমস্যা

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মধ্যমণি নারী। গৃহে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তার জীবনের কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্ত্তব্যও আছে। সেই সব কর্ত্তব্যপালনের দায়িত্ব একমাত্র তারই ওপর ন্যস্ত। গার্হস্থ্যক্ষেত্রে পরিবারের মধ্য-বিন্দুটির স্থিতি-সাম্য সংরক্ষণের ভার সে-ই গ্রহণ করেছে। পুরুষের কার্য্যের পূর্ণতার সহায়ক হয়ে তার পৃথক সত্তা সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজ-সংসারকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীমণ্ডিত করে এসেছে। আজ সমাজের দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাংলার নারীর শ্রী, হ্রী আর মাধুর্য্য ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ, আনন্দ ও পরিপুষ্টির জন্যে যে নারী একদা আদর্শ গৃহিণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, সে নারীর সাম্প্রতিক বৃত্তি নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ পথে সঞ্চালিত হচ্ছে, তাই পারিবারিক জীবনে দ্রুতভাবে ঘনিয়ে আসছে অকল্যাণ ও অশান্তি; এর মারাত্মক প্রভাব সমগ্র সমাজ-জীবনকে আত্মহত্যার পথে পরিচালনা করবে কিনা, তা কে বলতে পারে? মেয়েদের মধ্যে আজ অধিকমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা দেখা দিয়েছে—আর এসেছে কুচিন্তা ও কুসংসর্গ।

আমরা যে সময়ে মানুষ হয়েছি আর সংসার পাতিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন করতে সুরু করেছি, সে সময়ের সমাজ-পদ্ধতি, জীবন-যাত্রা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্নরূপ ছিল। আমরা যারা সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জন্মেছি, স্বামীর সংসারটীকেই মনপ্রাণ দিয়ে অলঙ্করণের চেষ্টা করেছি, গৃহক্ষেত্রকে ব্রতপার্ব্বণ পূজা সদাচারের ভেতর নানাবিধ মাঙ্গলিকী ব্যবস্থা করে—সেদিনও যে সব মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানগুলি পেরিয়ে স্নাতকোত্তর হয়েছে তাদের ভেতর ঘর সংসার করবার মনোবৃত্তিটাই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের মধ্যে চাকরি করবার স্পৃহা ছিল খুব কম মেয়েরই—আদর্শ গৃহিণী ও জননী হবার জন্যে সকলেই ছিল সচেষ্ট; আর তাদের জন্যে চাকুরীর ক্ষেত্রও অবশ্য প্রশস্ত হয়নি। কাজেই সংগ্রহ নির্য্যাতন ভোগ করেও সেদিনের মেয়েরা ত্যাগ স্বীকার করে ঘর সংসার করেছে—স্বামীর লাঞ্ছনা, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ও সপত্নীর দুর্ব্ব্যবহার তাদের পক্ষে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। আইন ও সমাজের নাগপাশে আবদ্ধ নারী শুধু প্রতিকারহীন প্রতিবাদই করেছে, উৎক্ষিপ্ত চিত্ত বিদ্রোহের রূপ ধরেছে—সাপের মত ফোঁস করে উঠেছে, কিন্তু দংশন করেনি। শরৎচন্দ্রের লেখনী সেদিনের মেয়েদের ব্যথা-বেদনার ইতিহাসের দিকেই এগিয়ে চলেছিল।

আজ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ও জীবন-দর্শনে নানারূপান্তর এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বহু পরিবর্ত্তন নারীর সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও। নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন সার্থক হয়ে ওঠায় সমাজ জীবনে সমান অধিকার পেয়ে নারীর গতিবিধির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অপসারিত হয়ে গেছে, যুগের প্রবাহকে গতিরুদ্ধ করে সুদৃঢ় রূপে বাঁধ দেবার চেষ্টা করেছেন প্রাচীন পন্থী সমাজ নায়কেরা—কিন্তু তাঁদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ নারীর ঘরসংসারের রুদ্ধ বাতায়ন-পথগুলি উন্মুক্ত হয়েছে,—গৃহস্থালী শিক্ষা, পারিবারিক বৃত্তি শিক্ষা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাজের উপরতলার মেয়ে থেকে সুরু করে নীচের তলার মেয়ে পর্য্যন্ত পাচ্ছে। কিন্তু নারী প্রগতির প্রবহমান স্রোতোধারা কোন কোন দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে—আর কোন কোন দিকে হয়ে উঠেছে শীর্ণ। স্বামীর গৃহে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করার শিক্ষা যে নারীর মাতা, মাতামহী আর পিতামহী লাভ করে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, সেই নারী আজ রাষ্ট্রশাসন থেকে সুরু করে আইন প্রণয়ন পর্য্যন্ত করছে, ওকালতি ব্যারিষ্টারী করছে—বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে দূত হয়ে চলেছে, ইচ্ছামত বিবাহ ও

স্বামী ত্যাগ করছে, আর প্রজনন শক্তির বিলোপ সাধন করে দিয়ে সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়েছে, তা'তে তার মধ্যে পুরুষত্বই প্রকাশ পেতে বসেছে, নারীত্বের রূপ ফুটে উঠ্‌ছে না। নারীর সেই অঙ্গলাবণ্য, কমনীয়তা ও রূপের উজ্জ্বলতা আজ রূপান্তরিত হয়ে উঠ্‌ছে, চোখ মুখের চেহারা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন-সৌষ্ঠব প্রায় পুরুষের মতই হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এদেশের মেয়েরা টমিগান নিয়ে মোটরবাইকে চড়ে রণক্ষেত্রে ছুটবার মত মেজাজও তৈয়ারী করেছে, এরোপ্লেন পরিচালনাও করবে তারা। কোন কোন মেয়ে ট্রামে বাসে পকেট মারের বৃত্তিও গ্রহণ করেছে—অদৃষ্টের কি পরিহাস! মেয়ে-ডাকাতেরও অভাব হয় না! এই তো অতি-আধুনিক নারী জীবন!

ভারতীয় নারীর আদর্শ সেবায় ও তিতিক্ষায় অরুন্ধতী, অনুগমনে দময়ন্তী ও সাবিত্রী, কর্ম্মনৈপুণ্যে দ্রৌপদী এবং দুঃখদলনে সীতা। তার সিঁদুর কৌটায় পূর্ণ থাকে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, পদ্মিনী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীর সতীত্বের আদর্শ। ভারতের নারীত্ব ও সতীত্বের পাদপীঠে প্রতিযুগই প্রণাম করে এসেছে। ত্যাগে, প্রেমে, স্নেহমমতায় আর বাৎসল্যে অভিসিঞ্চিত করে ভারতীয় নারীরা চিরকালই নিজেদের জীবনকাব্যকে ভাগবতের ন্যায়ই পবিত্র করে রেখেছে। কিন্তু এসব আদর্শ, আচার ও আচরণের রূপান্তর হ'তে সুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে। আজ সিঁদুর কৌটার মর্য্যাদা নেই, সুতরাং প্রাচীনদিনের সতীত্বের আদর্শ সে কৌটায় কেমন করে স্থান পাবে? একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবন যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার সংঘাতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরজন্মের মত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘট্‌তে পারে। কিন্তু পূর্ব্বসময়ে এ বিচ্ছেদ হিন্দু পরিবারে হবার সম্ভাবনা ছিল না; তাই দায়ে ঠেকেই হোক, আর মানিয়ে গুছিয়ে নেবে—দাম্পত্যজীবন রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করা হোতো। যে সব মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতো, তারা যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্যে বেরিয়ে কুপথগামী হোতো একথা স্বীকার করা যায়না—সহ্য করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেই নির্য্যাতিতা নারী পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতো। আজ সমাজের অনুশাসন উদার হওয়ায় মেয়েরা নিজের ইচ্ছা মত পথ ধরে চল্‌বার সুযোগ পেয়েছে। 'ভ্রষ্টা' শব্দ অভিধান থেকে উঠে যাচ্ছে, আজ আর কেউ পতিতা নয়, তবে অধঃপতিতা হোতে পারে।

নারীর মন সুখ সম্ভোগ, আর কাম ও কামনার পথে পুরুষের মতই বৈচিত্র্যকামী, তা মনস্তত্ত্ববিদের নজরে অবশ্যই সহজে ধরা পড়ে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা এসব লক্ষ্য করেই নারীকে সংসারে মন দিতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, ধর্ম্মপালনের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যে নানা রকম পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আর নারীও সেই নির্দ্দেশ পালন করে এসেছে। তা না হোলে পদ্মিনীর জহর ব্রতানুষ্ঠানই বা কেমন করে সম্ভব হোতো, আর শত শত রাজপুত রমণীর পক্ষে আগুনে ঝাঁপিয়ে-পড়া সহজ হোতো?

আজকের দিনে মানুষের মন বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে—বিজ্ঞান ও বাস্তববাদ মানুষকে ঈশ্বরভীতির পথ থেকে টেনে এনে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে উত্তেজিত করছে, পক্ষী-মিথুনের নীড়ের মত আজ ওর সংসার রচিত হচ্ছে, কোন্ সময়ে ভেঙে পড়বে তার ঠিক নেই। ঘর ধারা বেঁধে দেবে তারাই ঘর বাঁধার বিরোধী, এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনের মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা নৈতিক স্খালনানি ঘটালেও আত্মতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ সুখ সম্ভোগের সহায়ক হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য দেশে যে সমস্যা তীব্র হোতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে, সেই সমস্যা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে এই দেশে। রোমান্টিকতার আতিশয্যের ফলে প্রেমেই আসছে অবসাদ, আর মানুষের যৌবন শক্তিও অকালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নারী পুরুষের পরস্পর লোলুপ দৃষ্টি সংক্রামক ব্যাধির মত আজ মারাত্মক হোতে বসেছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

আজ স্ত্রী-পুরুষ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যে সমানভাবে অধিকার পাওয়ার কর্ম্মক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর মানুষই জল-স্রোতের মত বেগে ধাবিত হচ্ছে। অধিকাংশ তরুণ-তরুণী বিবাহের পক্ষপাতী নয়, কেন না গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে এরা বিশেষ ইচ্ছুক নয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নানাপ্রকার রীতিপদ্ধতি এদের কাছে অজানা না থাকায়, কোনপ্রকার নিন্দা অপবাদের আঘাত পাবার অবকাশ এদের পক্ষে নেই। সহশিক্ষা ও সহকর্ম্ম লাভের

ফলে জীবনের ক্ষেত্র পূর্বের মত নেই। এখানে মানুষের অন্তর্নিহিত রূপ প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা প্রকৃতিকেই দলিত মথিত করে চলেছে। তাই যখন মেয়ে-পুরুষ অফিসের ছুটির পর রেস্তোঁরায়, কাফেতে বা সিনেমায় গিয়ে অশোভন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তখন সৃষ্টিকর্তাকেই দোষারোপ করে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে মেয়েরাই বেশী স্থান পাচ্ছে, প্রতিযোগিতায় পুরুষ হটে আসছে।

অবশ্য অন্তঃপুরচারিণীর মধ্যে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে স্খলন হয়নি, একথা বলি না—কিন্তু এরূপ স্খলন খুব সীমাবদ্ধ নারীর মধ্যে দেখা যেতো। বর্ত্তমানে সকল সীমা লঙ্ঘন করার অধিকারপ্রাপ্তির ফলে মানুষ যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। শহরে নাইটক্লাবের অভাব নেই, এখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের নারী পুরুষের ভিড় হয়ে থাকে। সেখানে পানাসক্তি শুধু তীব্রভাবে প্রকাশ পাওয়া, প্রচণ্ড পরকীয়-প্রবৃত্তি ও ব্যভিচারের চরম স্তর পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু এসব কথা অনেকেই জানে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এইসব দুনিবার উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনছে—পরিণতিই যে সমাজ-বিধ্বংসী তা সহজে অনুমেয়। যাদের অর্থ আছে, তারা কি ভাবে যে নারীকে প্রলুব্ধ করে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। আর কার্য্যোদ্ধারের জন্যে বিশিষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার মনোরঞ্জনের বাহন হয়ে বহু আধুনিকা নিন্দা গ্লানিকে তুচ্ছ মনে করে।

ধর্ম্মচর্চ্চার অনুষ্ঠানে নারীর ক্যামোফ্লেজিং-প্রবৃত্তি আজও সমাজের রন্ধ্রপথে ব্যভিচারের বিষবাষ্প সৃষ্টি করছে, কতনা তীর্থক্ষেত্রে, আশ্রমে, সঙ্ঘে বামা নিয়ে তথাকথিত বাবাদের চলেছে বামাচার, যার সম্বন্ধে জানবার পক্ষে কোন সুযোগই ঘটে না, কোন কথাই বাহির হবার পথ পায় না—কত নারীই না নিজের ঘরসংসার জলাঞ্জলি দিয়ে এই সব স্থানে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে! নারী-পুরুষের বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বর্ত্তমান যুগের মধ্যে বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে—যার সমাধান হওয়া কোন দিনই সহজসাধ্য হবে না। প্রত্যেক নারীপুরুষের ভেতর আছে যে চাপা প্রবৃত্তি, সেইটাই যখন উদগ্র হয়ে ওঠে তখন সে নারী বা পুরুষ কোন বাধা নিষেধকে গ্রাহ্য করে না, আর তার একাজের জন্যে উৎসাহ দেবার লোকেরও অভাব হয় না। যাকেও পথভ্রষ্ট করবার লোকের অভাব হয় না, কিন্তু পথ থেকে মোড় ফিরিয়ে এনে সুপথে চালনা করার লোকের অভাব হয়। আজ নারীপুরুষের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন সমাজের জন্মদান করছে চারিত্রিক অধঃপতনের আধারে। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, শিশু-মনস্তত্ত্ব, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সেবাশুশ্রূষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সঙ্গীত, নৃত্য, রন্ধন প্রভৃতি—এতদ্‌সত্ত্বেও আদর্শস্থানীয়া নারী ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। আধুনিক অর্থকরী বিদ্যা আমাদের দেশে যেভাবে প্রসারিত হয়েছে, তা'তে শিক্ষিত মেয়ে-পুরুষের মধ্যে রুটির জন্যে কিছুকাল ধরে কামড়াকামড়ি সুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে আদর্শস্থানীয়া জননী না হোলে জাতি কোন দিন বড় হোতে পারে না। জাতির কল্যাণের জন্যে এদেশের কয়জন প্রগতিবাদিনী মেয়ে চিন্তা করে থাকে? ভালোবাসার বিবাহ (অর্থাৎ যে বিবাহ মাতাপিতার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না, শুধু সিভিল ম্যারেজে রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষরের অপেক্ষা রাখে) কোনদিন দাম্পত্যজীবনকে সুখী করে না, কেননা পরস্পরের মধ্যে চারিত্রিক অবিশ্বাস গভীরভাবে শিকড়-বদ্ধ হয়—তার মূলোৎপাটন করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে জীবনের করুণ সমাপ্তি ঘটে। যেসব ক্ষেত্রে ভালোবাসার বিবাহ স্থিতিস্থাপক হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর মধ্যে একজন উদারচেতা সহস্র কটূক্তি নীরবে সহ্য করেছে দাম্পত্য জীবনকে স্থায়ী ও সুন্দর করতে।

অনেক সময়ে দায়িত্বজ্ঞানবিবর্জ্জিত তরুণ তার সহ-কর্ম্মিণীর প্রণয়ে আসক্ত হয়ে তার তরুণী সহধর্ম্মিণীর জীবনও বিড়ম্বিত করে তোলে, ইদানীং এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটতে দেখা যায়। স্বামীর সাক্ষাতে পরপুরুষের প্রতি আসক্তি প্রকাশও আজ যেন সভ্যতার রুচিকে বিকৃত করছে না। এইসব দেখে মনে হয়, জাতিকে যদি বীরপুরুষ, চিন্তাশীল নায়ক, বিশিষ্ট মনীষী, বরেণ্য বৈজ্ঞানিক, কবি ও সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে হয়, তা হোলে তার পক্ষে হয়তো তা আর সম্ভব হবে না—যদি আজকের দিনের মত স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যেসব ক্ষেত্রে পিতা বা স্বামী যোগাযোগ করেছেন অর্থলাভের জন্যে

ব্যভিচারের পথে, সেসব ক্ষেত্রে পরিণতিতে ভয়াবহরূপ ধারণ করে।

আজ স্ত্রী পুরুষ চলেছে জীবিকা উপার্জনের জন্যে কর্ম-ক্ষেত্রে সকাল ন'টা না বাজতেই, ফলে ঘরসংসার দেখবার মত তাদের অবকাশ আর থাকে না। মেয়েরা চলেছে অফিসে কাজ করতে, স্কুলকলেজে পড়াতে, কারখানায় কাজ করতে বা পার্টির কাজ করতে, কোন কোন মেয়ে হয়তো চলেছে ট্রামে বাসে পকেট মারতে—তাদের যাবার পথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদতে থাকে, ভুলিয়ে রেখে যাবার সময় কোথায়? ঠিক সময়ে চালিয়া দিতে হবে। তারা মেঝেতে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়, মা চলে যায় গটগট করে, 'ভুটানি কা ডিব্বা' (ভ্যানিটিব্যাগ) হাতে নিয়ে। তাদের ছোট ছোট সন্তানেরা কিভাবে ঘরে থাকতে পারে, এটাও একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বের মত একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায় সকলেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা অর্জন করেছে, ফ্রেচে মেয়েরা তাদের শিশুসন্তানদের রেখে কাজ করতে চলে যায়, ফেরার পথে তাদের নিয়ে বাড়ীতে বা বাসায় আসে। ওদেশে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ দেশের মত এত চোরের উপদ্রব নেই, আড়কাঠিও নেই। ছেলেমেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বেচে দেওয়ার জন্যে শিশু অপহরণ এদেশে যেমন চলছে, এরূপ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে নেই। ওদেশের পুলিস এদেশের পুলিসের মত নয়, তাই তারা ঘেসে ঘুমোয় না, তারা জাতির কল্যাণের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এদেশে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা ঘাঁটি গড়ে ওঠেনি, যেখানে ছেলেমেয়েকে জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজে যাওয়া যাবে। মধ্যবিত্ত সমাজের সকলেই যে ঝি চাকর রাখতে পারে এরূপ অবস্থা এদেশে নেই, আর ঝি চাকর থাকলেও তাদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যায় না। আগেকার দিনে যে সব ঝি চাকর দেখা গেছে, তারা বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত আর সৎ ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সততা, ভদ্রতা আর মায়াময়তা। আধুনিক ঝি চাকররা সদাচার ভুলে গেছেন—সাধ্যের গান শুনে লাল কাণ্ডা দেখে। তারা চেষ্টা করে মনিবের কাছ থেকে কতটা আদায় করে নেবে, আর সুযোগ সুবিধা মত মনিবের জিনিষপত্র, টাকাকড়ি বা সিন্দুকের চাবি আত্মসাৎ করবারও চেষ্টা করে।

দিনদুপুরে ঝি-চাকরের হাতে মনিবের পরিবারবর্গ খুন হ'য়েছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, তাই আধুনিক ঝি-চাকরের ওপর সর্ব্ববিষয়ে নির্ভরতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। গৃহিণী হয়তো অফিসের ছুটির পর বাড়ী এসে দেখলেন ছেলেমেয়েদের ভালো করে খাওয়া হয় নি, চা তো বা কারো গায়ের অলঙ্কার চুরি গেছে, অথবা হয়তো কোন ছেলেমেয়ে নিখোঁজ হয়েছে, কিম্বা ঘরের জিনিষপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী ফ্লাটের বহির্দ্বারের তালাচাবি দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে চলে গেলেন, এসে দেখলেন তালা ভেঙে জিনিষপত্র কে বা কারা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। তখন তাঁরা বিশ্রামের অবকাশ পান না, থানায় চলে যান ডায়েরী করতে—এই তো সমস্যা। তাছাড়া স্ত্রী হয়তো তাঁর অফিসের কোন বন্ধু সহকর্ম্মী বা উপর-ওয়ালার সঙ্গে ছুটির পর বেড়িয়ে বা সিনেমা দেখে আর কাজেতে নৈশ ভোজন ও স্বাস্থাপান করে ঘরে ফিরলেন রাত্রি এগারোটায়, তাঁর স্বামীকে সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বায়না, কান্নাকাটি ও জ্বালাতন অবলীলাক্রমে সহ্য করে রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়, আর ঘরদোর পরিষ্কার করতে হয়। এদিকে নৈশবিহারিণী ক্রমে ছেলেমেয়েদের প্রহার ও স্বামীর সঙ্গে কলহ করে আধুনিকত্ব প্রকাশ করলেন। সকলের পক্ষে হোটেল-জীবন যাপন সম্ভব নয়, আর হোটেলে থাকতে গেলেও সেইরকম বিত্ত উন্নত হোটেলে থাকতে হয়, সেরূপ বিত্ত-শালী না হোলে তা সম্ভব নয়। মেয়েদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অধিকার পাওয়ার ফলে আর তারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে কর্ম্মক্ষেত্রে জীবিকা উপার্জ্জনের অধিকার লাভ করার পর থেকে পারিবারিক জীবন অধিকতর বিড়ম্বিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কিনা ভেবে দেখবার সময় এসেছে! সবাই চাকুরি করতে গেলে ঘরই বা দেখবে কে? আর সন্তানপালনের দায়িত্বই বা নেবে কে? সন্তান পালনের নানা পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে বটে, কিন্তু শেষে এ শিক্ষা মূল্যহীন হয়েই থাকবে। এদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভ নষ্ট করাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোজী মেয়েরা যেভাবে এক একটি

পরিবারে আগুন জ্বালিয়ে দিতে বসেছে তাতে তারা ক্ষমারও অযোগ্য। অশিক্ষিত মেয়েরাও সাংঘাতিক।

বাহিরবিশ্বে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান দাবী, এর ওপর তার অধিক মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা আর দুর্দ্দশার চাপে সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের উপার্জ্জনের অংশ স্বামীর সংসারে দেওয়া বা পরার্থে নিয়োগ করার যে মনোবৃত্তি তা আর মেয়েদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আদালতে প্রায় দেড় হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তাই মনে হয় দেশের আজ বড় দুর্দ্দিন। সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে —যাদের মা বাপের বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। তারা যখন দুজনকে একত্র না দেখতে পায় দুকূলে কেঁদে ওঠে, শোকে ভেঙে ভেঙে অর্দ্ধমৃতপ্রায় হয়ে যায়। অনেককে অকালে জীবন হারাতেও দেখা গেছে। বাস্তবজীবনকে বিষাক্ত করে দিয়ে যারা মানুষের ঘর-সংসার ভেঙে দেবার চেষ্টা করে, তারা সেই বাল্মিকী-কথিত ব্যাধের মত, তাদের প্রতিষ্ঠা কোনদিন শাশ্বতী হয় না। ভগবানও কোনদিন সংসার-ভাঙার দলকে ক্ষমা করেন না। আজকের দিনে আমাদের সংসার ভাঙার দলই সবচেয়ে বেশী।

আজ আমরা এমন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যখন দাম্পত্যজীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করে আদালতের আশ্রয়ে স্বামীপুত্রপরিবারের সঙ্গে পৃথক হবার উদ্দেশ্যে ছেলেমানুষী করা শোভা পায় না। ভারতের নারীর আদর্শ ত্যাগে ও তিতীক্ষায়, সহিষ্ণুতা ও শান্তিস্থাপনায়— আজকের দিনে ক'জন বিবাহিতা তরুণী সে কথা ভাবে! বাঙালী মেয়ের সবচেয়ে বড় গর্ব্বের জিনিষ তার আদর্শ মাতৃত্ব, সতীত্ব ও পতিভক্তি! অন্যান্য দেশের মেয়েরা আমাদের বাঙালী পরিবারের আদর্শনিষ্ঠা দেখে প্রশংসা করেছে, আর নিজেরা অনুতপ্ত হয়েছে নিজেদের ভুলের জন্যে।

চারদিকের নারীপ্রগতি ও স্বৈরাচারের মধ্যে বাঙালী সমাজের পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা কত বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে, তা বোধ হয় আজ এখনও অনেকে উপলব্ধি করতে পারছেন না। পণপ্রথার কালো-বাজারীরূপও ধরা পড়ছে, এ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে জাতি দৃঢ়সঙ্কল্প নয়। জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে বোধ হয় এত বড় সঙ্কটকাল আর আসে নি। যাঁরা ঘরে থাকেন, অথচ কোন কাজ করেন না—তাঁদের অনেকেই সারাদিন সংসারধর্ম্ম ফেলে রেখে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সিনেমায় যাচ্ছেন, আর ট্রামে বাসে ভিড় ঠেলে গিয়ে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট সিটে বসে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। নারীর স্থিতিই সৌভাগ্য এনে দেয়। গৃহলক্ষ্মী যদি চঞ্চলা হয়ে কেবল ঘরের বাইরেই ছুটে ছুটে যায়, তাহোলে সে পরিবারে কোনদিন লক্ষ্মীর কৃপা হবে না—লক্ষ্মীছাড়া হবে সমস্ত পরিবারবর্গ। ছেলেমেয়েরাও কোনদিন মানুষ হবে না, মায়ের অসৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অধঃপতিত হবে একথা কয়জন নারী ভাবে?

বাঙলার শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের আদর্শ চরিত্র গঠন করে নিদারুণ সামাজিক ও পারিবারিক অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে জাতিকে ত্রাণ করতে পারে, এজন্যে দুর্ব্বার সঙ্কল্পে সহযোগিতা করুক প্রত্যেকটি বাঙালী মেয়ে—যাতে করে সর্ব্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, অশিষ্টতা ও অশান্তি প্রত্যেক পরিবারের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভারতীয় সভ্যতার মূল সূত্রটীকে অবলম্বন করে প্রত্যেক বাঙালী নারী মহৎ আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, এইটাই অন্তরের কামনা। চিত্রতারকার জীবন মেয়েদের কাছে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে—তা লক্ষ্য করে ঘৃণায় ও লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকতে হয়। তারকা-জাতীয় পুরুষ বা নারীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বিকৃতইচ্ছার সাইকোলজিক্যাল আলোচনা ছেলে-মেয়েদের সম্মুখে মেয়েরা যত করবে ততই তারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। সিনেমা-বাতিকগ্রস্ত মেয়েরাও পারিবারিক জীবনকে বিধ্বস্ত করে তুলছে। এদিকে তাদের সতর্ক হয়ে ওঠা উচিত, আর তাদের পক্ষে সত্য শিবসুন্দরের সাধনায় আত্মনিয়োগ করা খুবই দরকার। বাংলার আয়তন কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে, নারীসমাজও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করছে—কিন্তু বিবাহিত মহিলা সংখ্যার মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আদর্শ গৃহিণী, বধূ বা কন্যার সংখ্যা খুবই কমে যাচ্ছে, এজন্যেই দুঃখের সঙ্গে এত কথা বলতে হোলো।

টমাটোর আচার

উপকরণ—টমাটো /১ সের, গুড় /৮/ পোয়া, আদা /০ ছটাক, ভাজা কিস্‌মিস্ /০ ছটাক, পাঁচফোড়ন, লঙ্কা, এবং সামান্য তেল।

প্রথমে, গোটা টমাটোগুলি ধুয়ে নিয়ে চাকা চাকা করে কাটতে হবে। কাটবার সময় লক্ষ্য রাখবেন টমাটোর রস যেন মাটিতে না পড়ে। একটা থালা কিম্বা অন্য কিছুর উপর রেখে কাটবেন। তারপর আদাগুলি খুব সরু সরু করে কুচিয়ে নিন। কিস্‌মিস্‌গুলি বোঁটা ছাড়িয়ে ধুয়ে রাখুন। টমাটোগুলি কাটার পর আর যেন জল লাগাবেন না। এইবার উনুনে সিলভারের হাঁড়ি বা ডেকচি চড়িয়ে দু'-চামচ তেল দিয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে লঙ্কাগুলি দু'খানি করে তেলে ছেড়ে দিন। আর পাঁচফোড়নগুলি দিয়ে দিন। ফোড়নগুলি ভাজা ভাজা হয়ে এলে টমাটোগুলি ছেড়ে দিয়ে চামচ বা হাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন। টমাটোগুলি কুটবার সময় যে রস বেরিয়েছিল তাও এইসময় দিয়ে দিন। তারপর আদা-কুচি ও কিস্‌মিস্‌গুলি দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট পরে গুড় দেবেন। একটুও জল দেবেন না যেন। তারপর অল্প মাখা মাখা রস থাকতে থাকতে নামাবেন। ঠাণ্ডা হলে কাঁচের জারে ভরে রাখুন। এই চাটনি অনেকদিন থাকে। তবে মাঝে মাঝে রোদে দেবেন। রোদে দেবার সময় জারের ঢাকনি খুলে রেখে জারের মুখে একখানি কাঁচা পাপড় দিয়ে বেঁধে দেবেন। তা না হলে ঢাকনির ঘাম আচারে পড়লে আচার নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী

(চন্দননগর)

বিচিত্র লীলা

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

অন্ধকার বলে নেয় আলোকের পথ,
অশান্তির দেশে চলে শান্তির সে রথ।
কঠিন প্রস্তর ভেদি ছুটে আসে নদী,
অসহ্য উত্তাপ হতে জন্মিল জলধি।
দুঃখ মাঝে নিরন্তর সুখ করে বাস,
প্রসব বেদনা পরে মাতৃ-মুখে হাস।
আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের আলো,
কুসুমের বক্ষ বিঁধে মালা গাঁথে ভালো।
আঁধার সমুদ্র গর্ভে মুকুতা-রতন,
কঠিন তপস্যা শেষে ঈশ্বর দর্শন।
এমন বিচিত্র লীলা নাহি যায় বোঝা,
সুকঠিন সমস্যার সমাধান সোজা।
রত্নাকর বাল্মীকির হয় অগ্রদূত,
রচনা তোমার, হরি, সকলি অদ্ভুত!

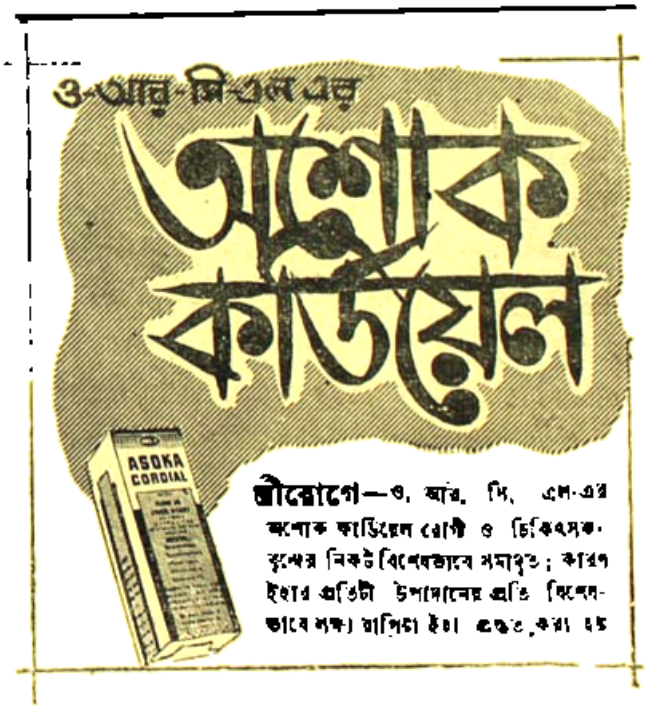

ও মনুয়া সোনা

সতীন্দ্রনাথ লাহা

ও মনুয়া সোনা
কলার কাঁদি মাথায় দিলাম
ফসল আমার সোনা।
না' দিয়েছি হাতে,
কুলিয়ে যাবে তাতে।
লাভের কড়ি সামলে রেখো
কাউকে বোলো না

ওগো মাথার মানিক!
ক্লান্ত হ'লে বট তলাতে
না হয় বোসো মানিক।
পাশে টিউব কল,
আঁজলে খেয়ো জল
একটা না হয় কলসী কিনো
নেয় পয়সা নিক॥

থাক গামছা গায়
সময় মত মুখটি মুছো
এগিয়ে বটের ছায়।
বিছিয়ে চটের থলি।
বসতে তোমায় বলি।
জিরিয়ে খানিক চিঁড়ে খেয়ো
খিদে যদি পায়॥

তুমি গেলেই হাটে
চরণ টিপে ভাবনাগুলো
আমার বুকে হাঁটে।
বলবে আমায় ভীতু
জানেন ঠাকুর ইস্তু।
তুমি ত আর বুঝবে না'ক
কি করে দিন কাটে॥

সদাই লাগে ত্রাস
কাজ ফেলে কি কোথাও গেলে
খেলতে পাশা তাস?
সখনই যাও দূরে,
মন কাঁদে বেসুরে।
সব কাজেতে যোগান দিতে
আমার অভিলাষ॥

দিলাম মাথার ঝিরে।
থাকতে আলো ফিরতে হবে
আসবে আঁধার ঘিরে।
কাল বোশেখী দিন
ভাবনা অন্ত হীন।
বড় বাহনে চিকুর হানে
বৈকালী মেঘ চিরে॥

পড়বে মনে ভুলে
দুপুর রোদে বট তলাতে
হয়ত যদি গুলে।
তোমার কোদাল আমার ঝারি,
ফসল ফলায় কি বাহারি।
যাও গো সোনা তাড়াতাড়ি
দিচ্ছি ফসল তুলে॥

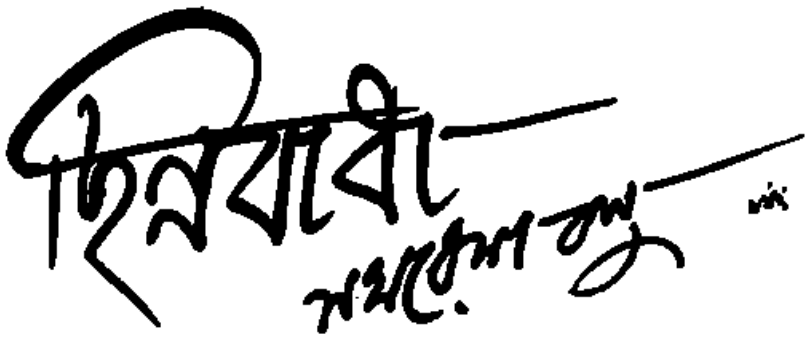

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লোচনের শেষ প্রশ্নে হরিধ্বনি দিয়ে উঠল সকলে। হরিধ্বনির সঙ্গে একটা খুশির আমেজও ছিল। ভাষায় না হ'লেও লোচনের ভঙ্গির মধ্যে ছিল একটি রহস্যময় মাদকতা। একটি বিশেষ ভঙ্গি। যা দেখে মনে হয়, এখনো আসল তুণে টান পড়ে নি। আসল তীর ছোঁড়া হয় নি। যে-তীর আসল রসের পাত্রকে বিদ্ধ করবে। যে-রস ছড়িয়ে পড়বে, আর রস ভরজর হ'য়ে সবাই হল্লা ক'রে উঠবে। পুরাণের জটিল কাহিনী পেড়ে আগে ধর্মের কথা হোক। লোচন ঘোষের আসল মূর্তি তারপরে দেখা যাবে।

বিদায় নেবার আগে, গানে গানে বলল লোচন, অভয় যেন সবিস্তারে সব কথার জবাব দেয়। সভার লোকজন যেন সব পরিষ্কার বুঝতে পারে।

ঢোলক বাজল ডুডুম ডুম্। আসর দেখলে বোঝা যায়, লোচনের পক্ষে লোক বেশী। আসর ভরে তারই মহিমা।

সুকীন বিড়ি খেতেও ভুলে গিয়েছে। লোচনের কাছে হারলেও হার নয় বটে অভয়ের। তবু সে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে নত-মাথা অভয়ের দিকে। ভামিনীর মন আরো খারাপ। অভয়ের তাব-সাব দেখে, আসর ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে তার।

সবচেয়ে বিচিত্র মিমির মনের অবস্থা। অভয় জিতুক, এই আশায় তার বুক ভরে উঠতে চায়। কিন্তু আর একটা মন বলছে, অভয় পরাজিত হোক, অহঙ্কার মরুক একটু। যেন সেই পরাজয় অভয়কে তার কাছেও নত ক'রে দেবে।

সুবালার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, তাদের বাড়িরই একটি মেয়ে। তোর গাইয়ে সে মুখ তোলে না দেখ সুবলি।

সুবালা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, আমার সাতকেলে ঘরের গাইয়ে। কিন্তু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সুবালার মন বিমর্ষ হ'য়ে উঠছিল। ভামিনীর মত তারও মনে হচ্ছিল, চলে যাওয়াই ভাল। কারণ, অভয়ের ভাবভঙ্গি দেখে তার রাগ হচ্ছিল।

আরো একজন অভয়ের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে বসেছিল। সে অনাথ। কারখানার সকলের সঙ্গেই বসেছে সে। কিন্তু কথা বলছে না একটিও।

অভয় দাঁড়াল। প্রকাণ্ড চেহারা। দেখলে মনে হয়, পাড়াগাঁয়ের চাষীমানুষ, ভদ্রলোক হবার আপ্রাণ চেষ্টায় সেজে এসে দাঁড়িয়েছে। গলার মালাখানিও মানুষ অনুপাতে ছোট হ'য়ে গিয়েছে। গলা খুলল অভয়। সুর ভাঁজল খানিকক্ষণ কানে হাত দিয়ে। তারপর, ক্রমে ক্রমের নাম না ক'রে, এক কথায় বন্দনা সারল অভয়। গাইল—

গুরু আমার সবাই
সকলের পায়ে পরণাম জানাই।
গুরু মানেই গুরুজন
ব'লে গেছেন মহাজন।
গুরুই হলেন ভগমান
গুরু হলেন আপন প্রাণ
গুরু আমার আপনারা সবাই
আপনাদের পায়ে পরণাম জানাই।

বলে, চারদিকে ঘুরে ফিরে নমস্কার করল অভয়।

লোচন ঘোষ বলল, বাঃ বেশ বাবা, বেশ!

চেঁচিয়ে বলল, কিন্তু বৌ-মা রয়েছেন যে আসরে, তোমার পরিবার?

আসরে হাসির ধুম প'ড়ে গেল। কিন্তু অভয়ও হাসছে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। চীৎকার ক'রে বলল, আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন। এবার দয়া ক'রে শোনেন।

তারপর হাত জোড় ক'রে, সুর দিয়ে বলল,

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গুরু শ্রীরাধিকা
কে না জানে ভাই।
শিবের আরাধ্যা দেবী মা চণ্ডিকা
কেন—জানেন না ঘোষ মশাই॥

আসরের এক কোন্ থেকে হরি মিত্তিরি লাফিয়ে উঠল, বাঃ, বেঁচে থাক ভাই।

লোচন ঘোষও চীৎকার ক'রে উঠল, সুন্দর, সুন্দর।

গুলতানি চলল খানিকক্ষণ। মহাজন পাশ মশায় হাত তুলে থামিয়ে দিল, আঃ, চুপ কর, গাইতে দাও।

রাঙ্গুবালা ভুরু কুঁচকে, বিনয় হেসে বলল, ছোঁড়ার গলার জোর আছে দেখছি।

নিধি তার বাঙ্কবীদের চিমটি কেটে বলল, কথা জানে কাঁড়ি কাঁড়ি।

রাঙ্গুবালা বলল তার সঙ্গিনীদের, লোচন ঘোষের জবাব শুনুক আগে। নিজে কথা বলুক, তারপরে বোঝা যাবে কেরামতি।

সেই কথাই ভেবেছে এতক্ষণ অভয়। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রেছে। চুপ ক'রে বসেছিল মাথাটি গুঁজে। এ যে গুরুমশায়ের কথা শোনা। একটি কথা ভুললে চলবে না। কান পেতে শুনতে হবে। মনে রাখতে হবে। জবাব দিতে হবে একটি একটি ক'রে।

অভয় প্রথমে সুরা তৈরী ক'রে নিল। বলল, তার বুদ্ধি অল্প। জ্ঞানের বড় অভাব। পুরাণ চিরকালের। সে কথা বলবার হক থাকু লোচন ঘোষ মশাইয়ের। সে হালের কথা বলবে। নতুনই কালে কালে পুরানো হয়। ছোঁড়ার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে—

একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে।
আপনার অঙ্গ
মহাকালের কত রঙ্গ
কান পেতে কালের কথা শোন আপন বুকে॥ (ধুয়া)
ও ভাই, হায় দিন চলে যায়
কান পেতে কালের কথা শোন আপন বুকে (ধুয়া)

ব'লে, সরাসরি লোচনের জবাবে চলে এল অভয়। গান গেয়ে গেয়েই বলল, শিব থাকতে গৌরী দেবী হ'লেন বিধবা। কেন? না, মা আমার খিদের জ্বালা সইতে না পেরে, স্বামীকেই খেয়ে বসলেন। মহাদেব বললেন, পার্বতী ঠাকরুণ, আমার খেয়ে যে তুমি বিধবা হ'য়ে গেলে? তখন দেবীর শোক আর ধরে না। দেবীর দুঃখ দেখে মহাদেব বললেন, বিধবার বেশেও তুমি দেবী থাকবে। নাম হ'ল তোমার ধুমাবতী। ওই নামেই তুমি পূজো পাবে জগতে।

জবাব দিয়ে অভয় মন্তব্য করল, পুরাণ বলেই রক্ষে। বিধবা হ'য়েও তিনি পূজো পান, মানুষ হলেই মাগী ডাইনী। শুধু কি তাই?

মাগো, তোমার খুদার জ্বালায় স্বামী খেলে
পুলিশ আসিবে পলে
পূজোর বদলে ফাঁসীর দড়ি, ঝুলিয়ে গলে॥

হাসির রোল পড়ল চারদিকে। বাহবা বাহবা উঠল আসরে। অভয় কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে নমস্কার করল নত হ'য়ে।

লোচন ঘোষও বাহ্‌বা দিল। কিন্তু তার চোখে যেন খিসের ছায়া। বিস্ময়ের ঘোরও আছে।

পুরাণের কাহিনী আষ্টেপৃষ্ঠে মুখস্থ করেছে অভয় গাঁয়ের গুরু নিতাই ভট্টাযের কাছে। কলিগানের ওইটি বোধহয় প্রাথমিক। রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও, যেখানে যে-কথা শুনবে, মনে ক'রে রাখবে। হিন্দু ধর্ম বল, মুসলমান ধর্ম বল, আর খ্রীষ্টানদের ঢঙ বল, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে রাখতে হবে। যত শোনা যায়, তত শেখা যায়। সংসারের কাউকে ছোট জ্ঞান ক'রো না। নিতাই ভট্টাযের সঙ্গে গাঁয়ে একবার লড়াই হয়েছিল মামুদের। মামুদ নাম-করা গাইয়ে। ভট্টায তাকে আসরে জিজ্ঞেস করেছিল, হিঁদু মেয়েরা সিঁদুর কেন পরে। সিঁদুরের উৎপত্তি কেন?

মামুদ জবাব দিয়েছিল অব্যর্থ। দিয়ে, ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করেছিল, মুসলমানদের নামাজের পাঁচ ওক্ত কি?

সবাই ঘাবড়ে গিয়েছিল ভট্টাচার্যের জন্য। কিন্তু ভট্টাচার্য আরো গম্ভীরের মানুষ। মামুদের সঙ্গে গাইবার আগে তৈরী হ'য়ে এসেছিল সে। অভয়ের গুরু ফাল্গুনা নয়।

একে একে লোচন ঘোষের সব কথার জবাব দিল অভয়। দেবমাতা অদিতি, অসুরমাতা দিতি, আর উচ্চৈঃশ্রবা ও গরুড়ের মাতা বিনতার জীবন ব্যাখ্যা করল। কাশীরাজের কন্যা অম্বাকে হরণ করেছিল ভীষ্ম, কিন্তু বিয়ে করেনি। তাই নিজে চিতা জ্বেলে মরেছিল সে। পরজন্মে ভীষ্মের শমন শিখণ্ডী হ'য়ে জন্ম নিয়েছিল। তারপরে বলল, মহাদেবের যৌবন-বীজ শুক্র। ব'লে, সকলের দিকে হাত জোড় ক'রে, হেসে হেসে দুলে দুলে বলল, কিন্তু মানুষ মহাদেবেরা একটু সাবধান থাকবেন। কারণ,

শুক্র এক চোগো, কা—না।
তানার পাপ পুণ্যে নাই মানা।
সংসারে করেন সিষ্টি অনাছিষ্টি
এক চোখে এক বগ্‌গা দিষ্টি
এক ছাড়া তার দোসরা নাই জানা।

আবার কলরোল উঠল হাসির। বাহ্‌বা দিল তারা, যারা কথার অন্তর্নিহিত মানে বুঝতে পেরেছে। মেয়েদের আসরে কথাবার্তা একটু কম শোনা গেল। অনেকে বুঝতে পারে নি।

অনাথ দেখল, হরি মিস্তিরির মুখে কথা পর্যন্ত নেই। অনাথ বলল, খুড়ো?

হরি যেন চমকে উঠল, অ্যাঁ?

অনাথ বলল, ব্যাপার কি?

হরি চোখ গোল ক'রে বলল, আমিও তো সেই কথাই বলছি। অভয়ের কথা বলছিস্ তো?

অনাথ বলল, হ্যাঁ। দেখে মনে হয়। তাদার মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু কি গাইছে একবার শুনেছ?

হরি বলল, শুনিনি? শুনেছি বলেই তো থ' মেরে গেছি। অবিশ্যি আমি জানতুম।

—জানতে?

—জানতুম না? সেই একদিন যখন আমাকে শোনালে, একের ডাইনে কোটি কোটি, বাঁয়ের বিন্দু তা হ'লে কত? বাঁয়ের বিন্দু থেকেই তো তুমি সব তুলে নিয়ে এসেছ—যাকে শূন্য বলা হয়। তখুনি বুঝেছি, ভেতরে মাল আছে।

অভয় ততক্ষণে লোচনের প্রতি তার প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ক্রমশঃ

STUDENTS' COMMUNITY GROUP

সংস্কৃত-জননী-স্তুতিঃ *

ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

সংস্কৃতজননী সৃষ্টি-সুখদায়িনী বিশ্বভাষাপ্রসবিনী।
বেদবেদান্ত—বিবিধ—সিদ্ধান্ত—সর্বযুগপ্রচারিণী ॥১
জগজ্জনধর্ম—দর্শনমর্ম—সমগ্রেহসংরক্ষিণী।
হিমস্তচীন—শ্যামশ্যাপান—মহাযানসুখসরণী ॥২
এসিয়ামেরিকা—ইয়োরোপাফ্রিকা—শিক্ষানিকেতনমণিঃ।
নিঃস্ব-ভারতবাসি—প্রজ্ঞা-প্রকাশি—তমোনাশি—
রত্নখনিঃ ॥৩
মহারাষ্ট্র—গুর্জর—মগধজ্যোতিষপুর—
কাশ্মীর-চোলভরণী।
ভারতখণ্ডাকাশ—বিভূষণ-ধ্রুবতারা—
সুসমঞ্জস-নিবেশনী ॥৪
যত্রাস্ত্রো বিমলো দীনো
যাচতে সংস্কৃতাম্বিকে।
আশিষস্তে দিবারাত্রং সদাবিশ্ব-হিতাত্মিকে ॥

---

* উজ্জয়িন্যাং কালিদাস সমারোহে পঠিতা। (২৩, ১১, ৫৮ খৃষ্টাব্দ)

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

জার্মান সমস্যা গত কিছুকাল আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; অন্য কোনও প্রশ্নই সাম্প্রতিক কালে বিশ্বমানীকে এত বেশী বিচলিত করে নাই। জার্মানী আন্তর্জাতিক সমর-সজ্জার একটি প্রধান কেন্দ্র। এই জার্মানী সংক্রান্ত প্রশ্ন কৃত্রিম উপায়ে চাপা রাখিয়া পশ্চিম জার্মানীকেসমর-সজ্জা চলিতেছে; উহাকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইয়াছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম বার্লিন সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এবং পরে জার্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তির খসড়া প্রস্তাব আনিয়া জার্মান সমস্যার কৃত্রিম আবরণ ছিন্ন করিয়াছে; এই প্রশ্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুনরাভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জার্মান সমস্যা—

আগামী মে মাসে পশ্চিম-বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাবের চরম দান হোয়া শুরু হইবে। তৎপূর্বে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ঐ সময় তাহার প্রভুত্বাধীন অঞ্চলের অংশ পূর্ব-জার্মানীর উপর অর্পণ করিয়া সৈন্য সরাইয়া লইবে। তখন পশ্চিম-বার্লিনের সহিত পাশ্চাত্য শক্তির যোগাযোগ রক্ষার জন্য হয় পূর্ব জার্মান গভর্নমেন্টকে স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সাহসের জোরে সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। যেহেতু সোভিয়েট প্রস্তাবে কোনও উগ্রতা নাই, সে জন্য পাশ্চাত্যের জনমত পশ্চিম বার্লিন লইয়া সঙ্কট সৃষ্টি করিবার বিরোধী। এই অবস্থায় সাহসের জোরে পশ্চিম বার্লিনের সহিত যোগাযোগরক্ষার কথা আপাততঃ বৃটেন ও আমেরিকা ভাবিতে পারিতেছে না। আবার পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ আডেনয়ার পূর্ব জার্মান গভর্নমেন্টকে কোনরূপ স্বীকৃতি দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে মিঃ ডালেস ইউরোপে সফর করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পরিবর্তনের এক পুরাতন নিয়ন্ত্রণ ছিল। মিঃ ম্যাকমিলান্ এই নূতন পরিস্থিতিতে সে নিয়ন্ত্রণ রক্ষার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। মস্কোর যাত্রা করার পূর্বে মিঃ ডালেসের সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। জার্মান প্রশ্ন সম্পর্কে অনমনীয়তার জন্য ডাঃ আডেনয়ারের নূতন মিত্র জুটিয়াছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ডি গল। পশ্চিম জার্মানীর সমর-শক্তি বৃদ্ধিতে বরাবরই প্রধান আপত্তি ছিল ফ্রান্সের। তাহার আপত্তিতেই পশ্চিম জার্মানীকে "ন্যাটোর" অন্তর্ভুক্ত করিতে বিলম্ব হয়। এই দিক হইতে দেখিলে জঙ্গী-নীতির পরিপোষক আডেনয়ারের সহিত ডি গলের মিলন সহজই মিত্রিত। কিন্তু সম্প্রতি এই দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে "সোনায় সোহাগা কোলাকুলি" হইয়া গিয়াছে। কয়েক মাস পূর্বেও ডি গল্ যখন পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে "সাধারণ বাজার" (কমন্ মার্কেট) নীতি ঘোষণা করেন, তখন আডেনয়ারের সমক্ষে সমস্যা উপস্থিত হয়—তিনি কী করিবেন। জার্মান শিল্পপতিরা ফরাসী প্রভুত্বাধীন এই অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় যোগ দিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আডেনয়ার সেই বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই ব্যবস্থার সহিত পশ্চিম জার্মানীকে যুক্ত করেন। ইহার বিনিময়ে পূর্ব জার্মানী সম্পর্কে তাঁহার নীতির প্রতি ফ্রান্সের সর্বাত্মক সমর্থনের আশ্বাস তিনি লাভ করেন। জেনারেল ডি গল্ দেখিলেন—আপাততঃ বৃটেনের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানীর সমর্থনে ফ্রান্সের শক্তি বাড়িবে। তাহার পর জার্মানী যদি স্থায়ীভাবে বিভক্ত থাকে, তাহা হইলেই ফ্রান্সের সুবিধা। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ফ্রান্সকে ইউরোপের একমাত্র মুখপাত্র করিয়া তুলিবার যে আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করেন, তাহা সফল হইবার প্রকৃত উপায় জার্মানীর স্থায়ী বিভাগ। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন—জার্মান সমস্যা ঝুলাইয়া রাখিয়া জার্মানীতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য মজুত রাখার প্রয়োজনীয়তা তাহারই বেশী; কারণ উত্তর-আফ্রিকায় ফরাসী সৈন্য নিযুক্ত রাখার আবশ্যকতা শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্য দিকে ফ্রান্সের সহিত অর্থ-নৈতিক সংযোগিতার সম্মত হইয়া ডাঃ আডেনয়ারের রাজনৈতিক সুবিধাই শুধু হয় নাই; অন্য দিক হইতেও পশ্চিম জার্মানীর উপকৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি আলসেসে ব্যালিষ্টিক অস্ত্র গবেষণার জন্য জার্মানী ও ফ্রান্সের একটি যুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ারী সম্ভব হইতে পারে। জার্মান ভূমিতে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ না করিবার জন্য পশ্চিম জার্মানী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু জার্মান ভূমির বাহিরে উহার তৈয়ারীতে কোনও আইনগত বাধা নাই।

মস্কোয় ম্যাকমিলান—

এই পরিস্থিতিতে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান্ ও তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সেলুইন লয়েড মস্কোয় যান। সেখানে দশ দিন অবস্থানের পর তাঁহারা ফিরে ফেরেন। তাহার পর, মিঃ ম্যাকমিলান্ এখন বন্ ও প্যারিস্ সফর করিতেছেন। মস্কোয় বৃটিশ রাষ্ট্রনায়করা বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জার্মান সমস্যা সম্পর্কে স্বভাবতঃ তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। এই বিষয়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

তাঁহারা অর্জন করিয়াছেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এখন পর্যন্ত বার্লিন্ ও জার্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাবের কোনও উত্তর দেন নাই; অবশ্য মোটা ভাবে এই প্রস্তাবের সমালোচনা হইয়াছে—বার্লিনের প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধিকারের কথাটা প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্বের সহিত বার বার বলা হইয়াছে। সাধারণভাবে জার্মান প্রশ্ন এবং অন্যান্য প্রশ্নের আলোচনার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাকমিলান এই প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সম্মত করাইয়াছেন। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী মিঃ ক্রুশ্চেভ মস্কোর এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পররাষ্ট্র-সচিব-বৈঠকে আলোচনার "গোলকধাঁধাঁয়" আর পড়িতে চাহেন না। এই গোলকধাঁধাঁ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন সম্পর্কে সর্ত দিয়াছেন যে, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠক বসিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈঠক শেষ করিতে হইবে; পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র সচিবকে এই বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দুই পক্ষের প্রতিনিধি-সংখ্যা সমান করিতে হইবে এবং বার্লিন ও জার্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব এই বৈঠকের আলোচ্য হইবে। পররাষ্ট্র সচিব বৈঠক সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সর্তাধীন সম্মতিকেই মিঃ ম্যাকমিলানের মস্কো সফরের সাফল্য মনে করা হইতেছে।

বার্লিন ও পশ্চিম জার্মানী—

বার্লিন ও জার্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন দাবী জানাইয়াছে। বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব সংক্ষেপে এইরূপ—বার্লিনে বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান হউক; উহাকে স্বাধীন মুক্ত নগরীতে পরিণত করা হউক; বৃহৎ চতুঃশক্তি উহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিবে; প্রয়োজন হইলে জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন জানাইয়াছে যে, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত কোনও মীমাংসা না হইলে ছয় মাস পরে সে তাহার প্রভুত্বাধীন বার্লিনের অংশ পূর্ব-জার্মানীর উপর অর্পণ করিয়া সৈন্য সরাইয়া আনিবে। অর্থাৎ, তখন পশ্চিমী শক্তিবর্গকে হয় পূর্ব-জার্মান গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের অনুমতিক্রমে পশ্চিম বার্লিনের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে, অথবা গায়ের জোরে পূর্ব জার্মানীর মধ্য দিয়া পথ করিতে হইবে। পূর্ব জার্মানীর বিরুদ্ধে গায়ের জোর প্রয়োগ করা হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে নিষ্ক্রিয় থাকিবে না, ইহা সে জানাইয়া দিয়াছে। জার্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব—জার্মানীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হইবে; জার্মান সমরবাদের অবসান ঘটাইয়া জার্মানীকে শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে; পোটস্‌ড্যাম্ চুক্তিতে নির্ধারিত জার্মানীর সীমান্ত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বার্লিন সংক্রান্ত প্রস্তাব ও জার্মানী সংক্রান্ত প্রস্তাব স্বতন্ত্রভাবে উত্থাপিত হইলেও ইহারা পরস্পরের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইলে ভৌগোলিক দিক হইতে বার্লিন পূর্ব-জার্মানীর প্রাণ্য হয়। অ-কমুনিষ্ট পশ্চিম বার্লিনের ইহাতে আপত্তি স্বাভাবিক। এই জন্যই সোভিয়েট প্রস্তাবে বার্লিনকে স্বাধীন মুক্ত নগরীতে পরিণত করিয়া উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। জার্মানীর সমরবাদের উচ্ছেদ সাধনের এবং উহার সীমান্ত নূতনভাবে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে পোটস্‌ড্যাম্ চুক্তিতেই স্থির হইয়াছিল; ইহা সোভিয়েট প্রস্তাবে উত্থাপিত নূতন প্রসঙ্গ নহে। জার্মানীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করিবার কথাটা অবশ্য নূতন। কিন্তু উহা গত চৌদ্দ বৎসরের ইতিহাসের সৃষ্ট বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি বাতীত আর কিছুই নয়। জার্মানী যে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা বাস্তব সত্য। ইহাকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। বিশেষতঃ, যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ প্রথমে পশ্চিম বার্লিনকে স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বাস্তব ব্যবস্থাকে স্বীকার না করা নিতান্তই অশোভন। জার্মান সমস্যাকে জীয়াইয়া রাখিয়া পশ্চিম জার্মানীকে অগ্রবর্তী আক্রমণ-ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহা হইলে সকল যুক্তিই অবশ্য নিষ্ফল। প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিতেছেন যে, জার্মানীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য এখন সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত। মার্কিন সেনেটার ম্যান্‌স্‌ফিল্ড সম্প্রতি বলিয়াছেন—পূর্ব জার্মানীর অস্তিত্ব "বাস্তব সত্য" এবং উহা ক্রমেই সংহত হইতেছে। বৃটিশ শ্রমিক-নেতা মিঃ ক্রসম্যান্ গত বৎসর জার্মানী পরিদর্শনের পর বলিয়াছিলেন "Whether we like it or not, Germany is now firmly partitioned.···To suggest that these two states could now be demolished and one central state constructed in their place by a freely elected constituent assembly seems to me quite absurd."

অর্থাৎ, আমরা পছন্দ করি, আর না-ই করি, জার্মানী এখন আইনতঃ ও কোরিয়ার মত বিভক্ত। এই দুইটি রাষ্ট্র স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারা গঠিত গণপরিষদের মাধ্যমে একটি এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠনের কথা কিছুতেই বলা চলে না বলিয়া আমি মনে করি। এই বাস্তব অবস্থা স্বীকার করিয়া জার্মানী ও বার্লিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানীর অভ্যন্তরে বার্লিনের নিজস্ব বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা টিকাইয়া রাখিতে হইলে ইহাকে স্বাধীন মুক্ত নগরীতে পরিণত করাই আবশ্যক।

পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তি—

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার সহিত তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই তিনটি রাষ্ট্রই ঘোষণা করিয়াছিল যে, শুধু কমুনিষ্ট আক্রমণই নয়—সর্বপ্রকার বহিরাক্রমণই দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তির আওতায়

আসিবে। তাহাদের এই আশঙ্কা মিটিয়াছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভাষায় "কম্যুনিষ্ট আক্রমণ" প্রতিরোধের কথা নাই—আছে বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি, স্বাধীনতা ও রাজ্যের অখণ্ডতারক্ষার আশ্বাস। প্রয়োজন হইলে সদ্য মার্কিণ সৈন্য প্রেরণ করা হইবে বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির মধ্যে পাক্-মার্কিণ দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তির সহিতই আমাদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। পাক্ কর্তৃপক্ষের আবদার বজায় থাকায় তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছেন। পাক্ পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জোর গলায় শুনাইয়াছেন যে, সব রকম আক্রমণের বিরুদ্ধেই পাকিস্থান এখন আমেরিকার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পেল। "স্বাধীনতা ও রাজ্যের অখণ্ডতা" রক্ষার জন্য মার্কিণ আশ্বাসেই পাকিস্থানের উল্লাস বেশী। ইহার কারণ "রাজ্যের অখণ্ডতার" প্রশ্নের সহিত কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কিত রহিয়াছে। আমেরিকার পক্ষ হইতে বিশেষভাবে মার্কিণ দূত মিঃ বাজার শুনাইয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এই চুক্তির নাই; কারণ যে আইসেনহাওয়ার নীতি অনুযায়ী এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ। মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিবের মুখপাত্র নিকল্ রোমাইট্ বলেন যে, এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি অন্য কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত; তবে বাগদাদ্ চুক্তি, সিয়াটো প্রভৃতি অনুসারে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্যান্য আক্রমণ প্রতিরোধেও আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিণ সংবাদের বক্তৃতা প্রচারিত হইবার পর পাক্-পররাষ্ট্র বিভাগ বলিয়াছেন যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির যে ব্যাখ্যাই করা হউক না কেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। এক্টু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়, চুক্তিকারীরা ইচ্ছা করিয়াই "কম্যুনিষ্ট আক্রমণের" কথাটা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া পাকিস্থানকে খুশী করা হইয়াছে। আশার চুক্তির যৌথিক ব্যাখ্যার দ্বারা ভারতকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। মিঃ ফোস্টার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রতিরোধমূলক বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোনও কৈফিয়ৎ নয়। প্রকাশ্য সামরিক চুক্তিতে উদ্দেশ্য সব সময়েই প্রতিরোধমূলক বলিয়া উল্লেখ করা হয়—পররাজ্য আক্রমণ করা হইবে বলিয়া ঢাক-ঢোল সহকারে প্রচারের দ্বারা কোনও আধুনিক রাষ্ট্র সামরিক চুক্তি করে না। মিঃ ফোস্টারের দ্বিধাগ্রস্থিত ও ব্যর্থবোধক উক্তি শুনিয়া স্বভাবতঃ মনে হয়, পাক্ মার্কিণ সামরিক চুক্তির প্রকাশিত বিবরণই হয়ত সব নয়—ইহার অন্তরালে গোপন আশ্বাস আছে। ইহা ছাড়া পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তি প্রতিরোধমূলক হউক, আর আক্রমণমূলকই হউক, ইহা পাকিস্থানের উদ্ধত্যকে যে কি পরিমাণ প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা ভারতীয় সীমান্তের অধিবাসীরা বুঝিতেছে ধন-প্রাণ দিয়া, তাহাদের মা-বোনের ইজ্জত দিয়া। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্থান ভারতীয় সীমান্তে মার্কিণ অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। ইহার পর, পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পাক্ উদ্ধত্য বৃদ্ধির আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান—

সাইপ্রাসবাসীর চার বৎসরব্যাপী দুঃখের অবসান হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাইপ্রাস্ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আর্ক বিশপ্ ম্যাকারিওস স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিদ্রোহী নেতা জিওর্গে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন।

সাইপ্রাস্ সমস্যা মূলতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফসল হইতে সাইপ্রাসবাসীর মুক্তির সমস্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সমস্যা আন্তর্জাতিক রূপে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীস স্বভাবতঃ সাইপ্রিয়ট্ গ্রীকদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহী। বিশেষতঃ, প্রথম দিকে মুক্তিকামী সাইপ্রিয়টরা গ্রীসের সহিত তাহাদের বৈপায়ন মাতৃভূমির সংযুক্তি দাবী করিয়াছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কূটকৌশলে গ্রীসের বিরুদ্ধে তুরস্ককে দাঁড় করায়। গত এই ফেব্রুয়ারী গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী মিঃ কারামানলিস্ এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডেরিস্ জুরিখে মিলিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন গ্রীক পররাষ্ট্র সচিব মিঃ স্পাদোলাস্ এবং তুর্কি পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জোরলু। দুইদিন আলোচনার পর তাঁহারা সাইপ্রাস্ সম্পর্কে মীমাংসায় উপনীত হন। এই মীমাংসা-পরিকল্পনায় সাইপ্রাসে একটি কাউন্সিল অব ষ্টেট গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইবেন। গ্রীক ও তুর্কি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনে কোনও সাইপ্রিয়টের আপত্তি থাকিলে সে ঐ কাউন্সিল অব ষ্টেটের নিকট আপীল করিতে পারিবে। একটি যুক্ত কম্যাণ্ডের দ্বারা সাইপ্রাস্ রাষ্ট্র গ্রীস ও তুরস্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। গ্রীস, সাইপ্রাস ও তুরস্ক পালাক্রমে এই কম্যাণ্ডের নেতৃত্ব করিবে। পরে, লণ্ডনে ব্যাপকতর আলোচনায় এই মূলনীতি ভিত্তিতে মুক্তিকামী সাইপ্রিয়টদের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মীমাংসা হইয়াছে। ১০।৩।৫৯

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ চলচ্চিত্র ও ভারত ॥

ভারতীয় পরিবেশে ও পটভূমিকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ঝোঁক অধুনা বিদেশী চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ, বর্ণাঢ্য দৃশ্যাবলী ও অপূর্ব এই যুগ-সন্ধিক্ষণে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের ক্ষেত্ররূপেও সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদীপের তলায় যেমন অন্ধকার, তেমনি ওদেশীয় চিত্র-নির্মাতাদের কাছে এদেশের আকর্ষণ যতই প্রবল হোক, আমাদের দেশীয় চিত্র-নির্মাতারা কিন্তু এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের বুকে নিহিত চিত্র নির্মাণের অপূর্ব উপাদানগুলির দিকে বদ্ধচক্ষু হয়ে রয়েছেন। এই ঐতিহ্যময় ও ঐশ্বর্যময় ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে, ধর্ম ও অনুশাসনকে, পুরাণ ও ইতিহাসকে, গল্প ও রূপকথাকে, সাহিত্য ও শিল্পকে, চিত্রের মাধ্যমে প্রাণময় ও বাঙ্ময়

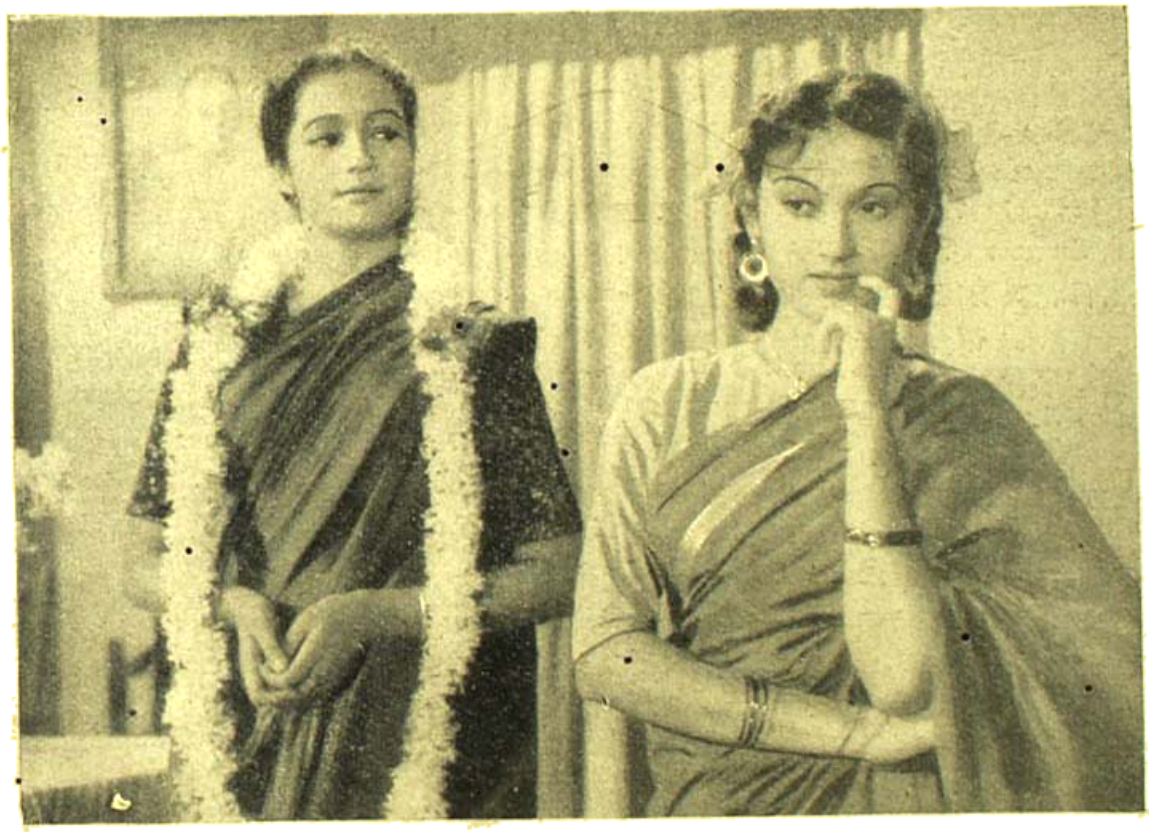

মুক্তি প্রতীক্ষিত "অগ্নিসম্ভব" চিত্রের একটি দৃশ্যে মধুমতী মুখোপাধ্যায় ও করবী মুখোপাধ্যায়কে এক বিশেষ ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে।

সৌধশ্রেণী প্রভৃতিই প্রযুক্ত করছে বিদেশীদের এই স্বপ্নময় ভারতের রহস্যময় পটভূমিকায় চিত্র নির্মাণে। তা ছাড়া পুরাতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, নবীন জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সাধক, যুদ্ধোত্তর এই স্বাধীন ভারত, শান্তি ও অশান্তির করে তুলে, বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশ করে, আবার এই পুরাতন ভারতকে নতুন করে আবিষ্কার করবার সুযোগ বিশ্ববাসীকে দেবার চেষ্টা, আমাদের দেশের চিত্র নির্মাতারা করছেন বলে মনে হয়না। এখনও ভারতীয় চিত্র, বিশেষ

করে হিন্দী চিত্র, হলিউডের হাল্কা ও অপরাধমূলক ছবির অন্ধ অনুকরণে এগিয়ে চলেছে; আর বাংলা ছবির সেই অনাদি-অনন্ত প্রেম ও বিরহ, হাসি আর কান্না, সেই চাওয়া আর পাওয়া—বড় জোর মনস্তত্ত্বের কিছু কচকচি বা ধনী-নির্ধনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। তবে আশার কথা অধুনা ভারতীয় চিত্রে বিশেষ করে বাংলা চিত্রে একটা পরিবর্তনের সুর যেন শোনা যাচ্ছে, নতুনের আগমন যেন সূচিত হচ্ছে। কয়েকটি ছবির মধ্যে দিয়ে পরিচালক-প্রযোজকদের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ও পাওয়া গেছে। এখন এই প্রচেষ্টাকে ফলবতী করতে হলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নতুন পথে এগিয়ে চলতে হবে পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে, তবেই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র বিষয়বস্তুর নতুনত্বে ও পারিপাট্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারী দেশরূপে বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

* * *

অধুনাতন যে সব বিদেশী চিত্র ভারতে নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে Stewart Granger ও Anthony Steel অভিনীত মার্কিন চিত্র "Harry Black and the Tiger" চিত্রটি বছরখানেক আগে দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে গৃহীত হয়েছিল। এর পর বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা Dirk Bogarde ও জাপানী অভিনেত্রী Yoko Tani অভিনীত "The Wind Cannot Read" নামক ইটিশ ছবিটিও ভারতে তোলা হয় এবং এই চিত্রটিতে দিল্লী, আগ্রা ও জয়পুরের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানের চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। চিত্রটি শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তি পাবে।

এ ছাড়া সোভিয়েট সরকারও ভারতীয় চিত্র নির্মাতাদের সহিত একযোগে কয়েকটি চিত্র নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে সোভিয়েট পরিচালক Kamil Yarmatov শীঘ্রই ভারতে আসবেন। ইতিমধ্যে Soviet Taskent Film Studio সোবের একটি ষ্টুডিওর সঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি ভারতীয় কবির কাব্যকে চিত্রে রূপায়িত করবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

ভারত ও পূর্ব জার্মানীর মধ্যেও চিত্র নির্মাণের ব্যবস্থা রয়েছে। "গৌতম, দি বুদ্ধ" খ্যাত ভারতীয় প্রযোজক শ্রীরাজবংশ খান্না পূর্ব জার্মানীর ডেফা ষ্টুডিওর সহযোগিতায় "মহাভারত", "রামায়ণ", "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" ও অযোধ্যার শেষ নবাব "ওয়াজেদ আলী শা"-র জীবনী —এই চারটি চিত্র নির্মাণ করবেন বলে জানা গেছে। প্রথম চিত্রটি ওয়াজেদ আলী শার জীবনী অবলম্বনে রচিত হবে।

পশ্চিম জার্মানীও ভারতীয় বিষয় নিয়ে চিত্র নির্মাণে পেছিয়ে নেই। জার্মান ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রযোজক Poul Zils ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে কয়েকটি চিত্র নির্মাণ করবেন বলে জানিয়েছেন। চিত্রগুলি জার্মান ভাষায় রচিত হবে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার চলচ্চিত্র বাজারে প্রদর্শিত হবে। তাঁর প্রথম চিত্র,—"5000 years of Indian Art"—প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার একটি প্রদর্শনীর জন্য তোলা হবে। এর পর তিনি "Mother Ganga" ও "The Chosen One" নামে ভারতীয় জীবন ও সভ্যতাকে ভিত্তি করে দুটি চিত্র নির্মাণ করবেন।

* * *

॥ ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ॥

বাংলার চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ৫৪ বৎসর বয়সকে পরিণত বয়স বলা চলে না—বিশেষ করে ধীরাজের মতন শিল্পীর ক্ষেত্রে, যাঁর কাছ থেকে চলচ্চিত্র-শিল্প ও বাংলার নাট্যামোদী, চলচ্চিত্র-অনুরাগী দর্শক সমাজ আরও অনেক কিছু আশা করছিল। তাই এই পরিণত প্রতিভার এই অপরিণত বয়সে প্রয়াণে বাংলার চলচ্চিত্র জগৎ আজ বিশেষ ব্যথিত। অদূর ভবিষ্যতে ধীরাজের শূন্য স্থান পূর্ণ হবার সম্ভাবনাও সন্দেহের অবকাশ রাখে।

১৯০৫ সালে ৬শোর বেলায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে বেলায় লেখাপড়ায় তিনি ভাল ছেলেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্মগত অভিনয় প্রতিভা তাঁকে আকর্ষণ করল অভিনয়ের প্রতি,—আর ১৯২৫ সালে ম্যাডান্ থিয়েটার্স-এর নির্বাক চিত্র "সতী লক্ষ্মী"তে তিনি যখন সর্ব্বপ্রথম দর্শক সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বোধ হয় কেউই ভাবে নি যে উত্তরকালে এই সুদর্শন তরুণ অভিনেতা

বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র-অভিনেতারূপে খ্যাতিলাভ করবে।

সেই নির্বাক যুগের "সতী লক্ষ্মী"র পর আর যে সব চিত্রে তিনি অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন তার মধ্যে 'কাল পরিণয়', 'নৌকাডুবি', 'গিরিবালা' ও 'মৃণালিনী' উল্লেখযোগ্য। তারপর এল সবাক চিত্রের যুগ, আর সে যুগের প্রথম পর্বেই ধীরাজ 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দক্ষযজ্ঞ', 'অন্নপূর্ণা', 'যমুনা পুলিনে', 'সমাধান', প্রভৃতি চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে সবাক চিত্র-জগতেও তাঁর স্থান পাকা করে নিলেন। প্রথম থেকেই ধীরাজ নায়কের চরিত্র অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখান; কিন্তু পরে মধ্যজীবনে এসে তিনি তাঁর অভিনয় কুশলতার আর একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন,—এই সময় থেকেই তিনি চৌকস চরিত্র-অভিনেতা রূপে, বিশেষ করে 'ভিলেন' চরিত্রে তাঁর অপূর্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে, অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেন। এই সময়ের চিত্রগুলির মধ্যে 'কঙ্কাল', 'কুহাশা', 'কালোছায়া', 'চীনের পুতুল', 'হানা-বাড়ী', 'নিয়তি', 'মরণের পরে', 'ডাকিনীর চর', প্রভৃতি চিত্র তাঁকে বাংলা চিত্রের শ্রেষ্ঠ 'ভিলেন' চরিত্রাভিনেতা রূপে পরিচিত করে। সাম্প্রতিক কালের দুটি চিত্র "ধূমকেতু" ও "লীলাকমল"-তে দর্শকরা আবার তাঁকে দেখতে পান। এর পর তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লেও "অপরাধ" নামক একটী অপরাধমূলক চিত্রে অভিনয় আরম্ভ করেন, কিন্তু মৃত্যু এসে তাঁর এই শেষ চরিত্র-চিত্রণে বাধা দিল,—নিজ গৃহেই রোগশয্যা থেকে উঠে তিনি ক্যামেরার সম্মুখে শেষ বারের মতন অভিনয় করেন, আর এর কয়েকদিন পরেই এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে যাত্রা করেন।

অভিনয় ছাড়া লেখক রূপেও ধীরাজ ভট্টাচার্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে গেছেন—তাঁর "নারান বাগান" উপন্যাস ও আত্মজীবনী মূলক লেখা "যখন পুলিশ ছিলাম" ও "যখন নায়ক ছিলাম" পুস্তকের মধ্য দিয়ে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেও ধীরাজ তাঁর অবদান রেখে গেছেন সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে; আর তরুণ বয়স থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর ধরে অসংখ্য চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে অভিনয় জগতে রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর—যা কোনও দিনই মুছে যাবে না।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

* * *

দেশে-বিদেশে ঃ

ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা I. S. Johar বিদেশী চিত্র "Harry Black and the Tiger"-এ সাফল্যময় অভিনয়ের পর বৃটেনের The Rank Organisation কর্তৃক তাঁদের আগামী চিত্র "North West Frontier"-এ অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চিত্রটির প্রধান ভূমিকাদ্বয়ে অভিনয় করবেন Lauren Bacall ও Kenneth More, আর এক পার্বত্য রেলপথের খালিকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন আই, এস, জোহর। ছবিটির চিত্র গ্রহণ করা হবে ভারতের জয়পুরে। স্পেন ও বৃটেনেও কিছু কিছু চিত্র গ্রহণ করা হবে। তবে চিত্রটির পরিণাম "The Pride of India" নামক একটি ট্রেণে ভ্রমণের ঘটনার থেকে রচিত বলে হয়ত ছবিটির নাম "North-West Frontier" না রেখে "The Pride of India" রাখা হতে পারে।

* * *

খ্যাতনামা ইতালীয়ান্ চিত্র-পরিচালক Roberto Rosselini ও ভারতীয় ডকুমেন্টারী চিত্র-প্রযোজক হরি দাশগুপ্তর ৩২ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী সোনালী দাশগুপ্তকে ঘিরে যে রহস্য-রোমান্স গড়ে উঠেছে ও যা ভারত তথা বিশ্বের—বিশেষ করে ইউরোপের চিত্র জগতে বিপুল আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, তার ওপর নতুন করে কিছুটা আলোকপাত হয়েছে। দু'বৎসর আগে রোসেলিনি যখন ভারত সরকারের পক্ষে চিত্র-পরিচালনার ব্যাপারে এদেশে নিযুক্ত ছিলেন তখনই তাঁর সঙ্গে সোনালীর সাক্ষাৎ হয়। তারপর হঠাৎ রোসেলিনি তাঁর কাজের মাঝখানেই এদেশ ছেড়ে চলে যান, আর সোনালীও গোপনে তাঁকে অনুসরণ করে প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে লোক চক্ষুর অন্তরালে এক বছরেরও ওপর বাস করছেন—তাঁর শিশু পুত্র হরি ও চোদ্দ মাস বয়স্কা কন্যা রাঞ্চাবেলাকে নিয়ে।

প্যারিসবাসীরা যদিও জানত সোনালী ওখানেই বাস করছে কিন্তু তার ঠিকানা কেউই বার করতে পারে নি। সম্প্রতি রোসেলিনি ও সোনালী সর্বপ্রথম একত্রে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না বিখ্যাতা ইতালীয়ান্ অভিনেত্রী আনা ম্যাগ্নানীর পূর্বতন স্বামী ও হলিউডের স্বনাম খ্যাতা অভিনেত্রী ইন্‌গ্রীড্ বার্গম্যানের বর্তমান স্বামী রোসেলিনি বলেছেন যে তিনি ও সোনালী তাঁদের বর্তমান বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার অপেক্ষায় রয়েছেন। ইতালীয়ান্ ও ভারতীয় আদালত কর্তৃক তাদের বর্তমান স্ত্রী ও স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হলেই তাঁরা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন বলে মনে হয়।

• • •

প্রবন্ধাপ্রবন্ধ ঃ

'আই এণ্ড কালচার পিক্‌চার্স' পরিবেশিত ও সুশীল মজুমদার পরিচালিত "অগ্নিসম্ভবা"-র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গিয়ে ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। শান্তি দাশগুপ্ত লিখিত একটি দরিদ্র কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মনোজ ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কালোবরণ এবং গান রচনা করেছেন রমেন চৌধুরী ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকায় আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, আশা দেবী প্রভৃতি।

• • •

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নতুন চিত্র "ক্ষণিকের অতিথি"র বহিদৃশ্যের চিত্র-গ্রহণের জন্য দলবলসহ পুরী অভিমুখে যাত্রা করেছেন। চিত্রটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন নির্মল কুমার ও রমা দেবী, আর সঙ্গীত রচনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

• • •

নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান 'সি, আর, এস্' তাঁদের প্রথম ছবি "তৃষ্ণা এলো চোখে"-র কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুরু করে দিয়েছেন। এক অভিনব রহস্য কাহিনীকে কেন্দ্র করে ছবিটির চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। অভিনয়াংশে আছেন কমল মিত্র, ভারতী দেবী, শোভা সেন, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালনা করছেন "সপ্তরথী" নামে একটি কলাকুশলী দল।

• • •

'চিত্রসাথী' নামে আর একটি নবগঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠান তাঁদের প্রথম ছবি "স্বর্ণ চাঁপার" কাজ প্রাথমিক ভাবে আরম্ভ করেছেন। এক অনাদৃতা নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে চিত্রটির কাহিনী লিখেছেন সুজিত নাগ। পরিচালনা করছেন অনিল মিত্র।

• • •

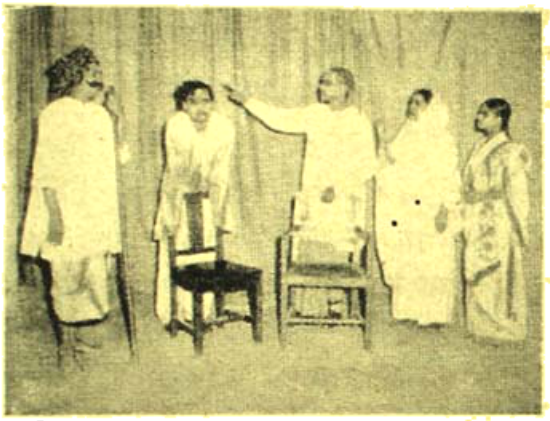

ি. ই. সি. রিক্রিয়েশন্ ক্লাবের পরিবেশনায় রঙমহল মঞ্চে "দুই পুরুষ" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তপন গুহ, গৌর গোস্বামী, মলয় মজুমদার, গীতা দে, ইরা চক্রবর্ত্তী ও কমলা ঝরিয়ার অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। উপরে অভিনয়ের একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

• • •

পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়ের নতুন চিত্র "এ জহর সে জহর নয়"-এর কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। ভূমিকায় আছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র ও চৌকস অভিনেতা জহর রায় প্রভৃতি।

• • •

বিদেশী প্রবন্ধ ঃ

Marylen Monroe, Diana Dores ও Brigitte Bardot-এর সমগোত্রীয়া আর একটি লাস্যময়ী চিত্র-তারকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তারকাটি হচ্ছে ফরাসী অভিনেত্রী Mylene Demongeot. ফরাসী

চিত্র "The Witches of Salem"-এ Mylene তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছেন, আর "Upstairs and Downstairs" নামের একটি ব্রিটিশ কমেডি-চিত্রে শীঘ্রই অবতীর্ণা হয়ে দর্শকমনোরঞ্জন করবেন।

• • •

বিশ বছরেরও আগে হলিউডে নির্মিত ও বোরিস্ কার্লফ্ অভিনীত "The Mummy" চিত্রটিকে ব্রিটেনে আবার নবরূপে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। Mummy-র ভূমিকাটিতে রূপদান করবেন Christopher Lee, যিনি ব্রিটিশ চিত্র "Dracula" ও "The Hound of the Baskervilles"-এ অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন।

• • •

স্বনামখ্যাত অভিনেতা Orson Welles, Herman Melville-এর উপন্যাস "Moby Dick"কে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্যরূপ দান করেছেন। নাটকটি শীঘ্রই ব্রডওয়েতে প্রদর্শিত হবে।

• • •

নিউ ইয়র্কের The Little Orchestra Society প্রায় দু'মাসের জন্য পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ভ্রমণ করবেন।

The Chicago Symphony Orchestra মস্কো থেকে আরম্ভ করে তিন মাস ধরে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ভ্রমণ করবেন।

ওয়াশিংটনের National Symphony Orchestra মধ্যে ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে দু'মাসের জন্য বহির্গত হবেন।

• • •

Los Angeles-এর The United Nations Association রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব-শান্তির আন্দোলনে সাহায্য করতে পারে এই রকম বিষয়বস্তু বিশিষ্ট এক অঙ্ক নাটকের একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ নাটকটি যাতে এই বৎসরের অক্টোবর মাসের রাষ্ট্রপুঞ্জ সপ্তাহের (United Nations Week) একটি বিশেষ অনুষ্ঠানরূপে প্রদর্শিত হতে পারে তার জন্য লস্ এঞ্জেলিসের American National Theatre and Academy এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে।

শিল্পীর কথা

'বিফল জনম, বিফল জীবন'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

বাঁকুড়াজেলার বিষ্ণুপুর শুধু স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-শিল্পেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নয়, সারা ভারতের মধ্যে সংগীত চর্চার এ একটা অন্যতম পীঠস্থান। এখানকার মল্লরাজগণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু বছর ধরে সমভাবে চ'লছে সংগীতানুশীলন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সংগীত চর্চার নেই কোন

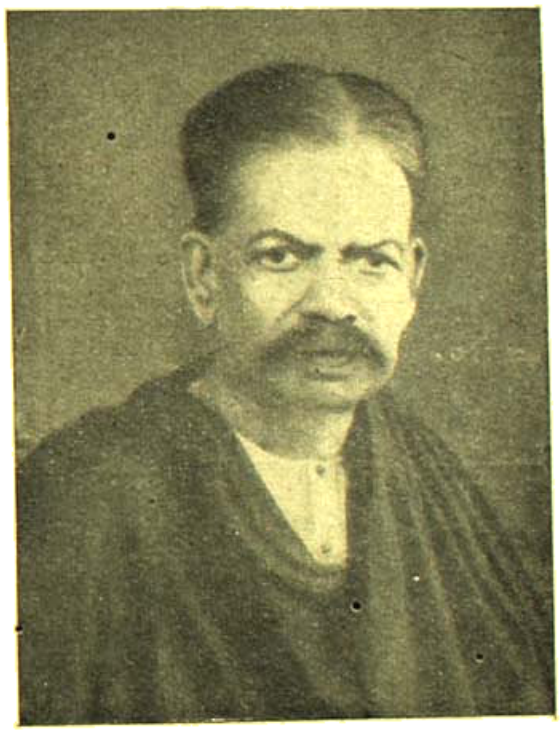

শ্রীযোগেশের বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাম—নেই বিচ্ছেদ। এখানকার সংগীতগুরু গদাধর চক্রবর্তী, অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, বদু ভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য সংগীতসাধক ছিলেন সংগীত-জগতের দিকপাল, শুধু বাঙলার নয়—এঁরা সমগ্র ভারতের গৌরব। এখানকার বন-মর্মরে,পাখীর-গানে, নদীর কলতানেও যেন ঝঙ্কৃত হয় সংগীতের এক অপূর্ব মধুর সুর।

আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগের কথা। সংগীত-কেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহকে সংগীত শিক্ষা দেবার জন্যে যখন রাজদরবারে যেতেন, তখন প্রায়ই সঙ্গে যেত তাঁর পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্রটী। এই বালকের মধুর কণ্ঠের অপূর্ব সুর-তাল-সমন্বিত গান শুনতেন মহারাজ অত্যন্ত আগ্রহভরে, মুগ্ধ হ'তেন এর সংগীত-প্রতিভায়। চিত্তরঞ্জন বিদ্যাতেও এই বালকের অপূর্ব প্রতিভা লক্ষ্য ক'রে মহারাজ তাঁকে কোলকাতায় পাঠাতে অভিলাষ করেন—চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্যে। কিন্তু তৎপূর্বে ইংরাজীভাষায় কিছু জ্ঞানলাভ করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা ক'রে তিনি অনন্তলালকে অনুরোধ করেন ছেলেটীকে তাঁর বিষ্ণুপুর ইংরাজী স্কুলে ভর্তি ক'রবার জন্যে। বালকটি যথারীতি স্কুলে যেতে আরম্ভ ক'রল, সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে সংগীতও শিক্ষা ক'রতে লাগল পিতৃদেবের কাছে। কিন্তু নাদ-ব্রহ্মের সাধনার দ্বারা যে বালক ভবিষ্যতে যশলাভ করবে তার মন কি আর ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় আকৃষ্ট থাকতে পারে? সেদিনকার সেই বালক আর কেউ নয়, ইনি হ'চ্ছেন ভারতের একনিষ্ঠ সংগীত-সাধক, সুর-ব্রহ্মের নিষ্ঠাবান পূজারী, বাঙলা তথা ভারতের গৌরব সর্বজনপ্রিয় সংগীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইনি বিষ্ণুপুরে ১২৮৪ সালের ২৪শে পৌষ বৃহস্পতি-বার জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব সংগীতে ছিল তাঁর সহজাত অধিকার ও অনুরাগ। তদুপরি বিখ্যাত সংগীত-সাধক পিতৃদেবের নিকট সংগীত শিক্ষা ক'রে অল্প বয়সেই সংগীতে তিনি লাভ করেন বিশেষ পারদর্শিতা। দশ বছর বয়সে গোপেশ্বর প্রথম এলেন কোলকাতায়। সংগীত-প্রিয় এক সাহেব তাঁর গান শুনে এত মুগ্ধ হন যে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী ভাড়া নিয়ে শুধু গোপেশ্বরের গান হবে এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে থাকেন। একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় সারা শহরে। দশ বছরের এক বালক সংগীতে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাবে এ সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। বহু লোকের সমাগম হ'ল। বালকের গান শুনে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা তাকে কোলে ক'রে অত্যন্ত প্রশংসা করেন তার গানের। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বালকের গানের সমালোচনা ক'রে ব'লেছিলেন, 'চক্ষু মুদ্রিত ক'রে শুনলে মনে হয় খুব বড় গায়কের গান হ'চ্ছে।' কোলকাতার জনসাধারণকে গানে সন্তুষ্ট ক'রে গোপেশ্বর ফিরে গেলেন বিষ্ণুপুরে। সেখানে গিয়ে পুনরায় একাদিক্রমে ১৩ বৎসর ধ'রে তিনি পিতার কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করেন। তারপর আবার তিনি আসেন কোলকাতায়। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ গুরুপ্রসাদ মিশ্র, দুলো গোপাল, শিবনারায়ণ মিশ্র প্রভৃতির নিকট থেকে বহু খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদ সংগীত সংগ্রহ করেন। স্বীয় অগ্রজ সংগীতবিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে ইনি শিক্ষা করেন শোরী-কৃত টপ্পা ও ঠুংরী। শুনলে অবাক হতে হয় যে ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি প্রায় পাঁচহাজার গান ইনি বিশেষ করে আয়ত্ত করেন। ইনি হিন্দী ও বাঙলা ভাষায় বহু ধ্রুপদ, খেয়াল ও বাংলা গান রচনা করেছেন। বর্ধমান-মহারাজার রাজসভায় গোপেশ্বর সংগীতাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন প্রায় ২৯ বৎসর ধ'রে এবং কোলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীত প্রতিষ্ঠান 'সংগীত সঙ্ঘের' অধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন যাবৎ। নিষ্ঠাবান সংগীত-সাধক গোপেশ্বর প্রকৃত সংগীতের প্রচার ও প্রসারকল্পে যেভাবে চেষ্টা ক'রেছেন এবং আজও এই বৃদ্ধ বয়সে যতটুকু ক'রছেন তার জন্য বাঙালী তথা ভারতবাসী মাত্রেই তাঁর কাছে ঋণী। ১৩১৬ সালে তাঁর রচিত "সংগীত চন্দ্রিকা" ১ম ভাগ ও ১৩২১ সালে উক্ত গ্রন্থের ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। সংগীতের এই দুই বৃহৎ পুস্তকে প্রমাণিত হয় সংগীত শাস্ত্রে গোপেশ্বরের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং তিনি লাভ করেন 'সংগীত-নায়ক' উপাধি। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোপেশ্বরকে "সুর-সরস্বতী" উপাধিতে ভূষিত করেন। গোপেশ্বর 'আনন্দ সংগীত পত্রিকা', 'সংগীত প্রকাশিকা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু গানের স্বরলিপি ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ তানমালা, গীতমালা, সংগীত লহরী, গীত প্রবেশিকা প্রভৃতি সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে আদৃত হ'য়েছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে গোপেশ্বরবাবু গিয়েছিলেন বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে। প্রথমদিন মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হবার সময় বিখ্যাত ওস্তাদ পরম উদারচিত্ত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব গোপেশ্বরবাবুকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে

এসে সশ্রদ্ধ নমস্কার ক'রে বলেন, আপনি আমার গ্রন্থ-গুরু। আপনার 'সংগীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থ আমার ধ্রুপদশিক্ষার পরম উপকার সাধন করেছে।

বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বেও আমাদের দেশের মেয়েদের উচ্চাঙ্গ সংগীত কেউ শেখাতেন না। কিন্তু গোপেশ্বর-বাবু কোলকাতায় এসে সে আবহাওয়ার পরিবর্তন ক'রেছেন। আজ বাঙলার ঘরে ঘরে বহু মেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধনায় রত।

বিষ্ণুপুরের অধিপতি দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মহাশয়ের আন্তরিক সাহায্যে ও তানসেন-বংশীয় সংগীতজ্ঞ বাহাদুর সেনের আপ্রাণ চেষ্টায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরে উচ্চাংগ সংগীতের প্রসার বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। সেই ভারতীয় বিশুদ্ধ উচ্চাংগ সংগীতের প্রভাব আজও সমগ্র ভারতে বাঙলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারতীয় বিশুদ্ধ সংগীতের ধারক ও বাহক বিষ্ণুপুর তাই আজও ভারতের অন্যতম সংগীত-তীর্থক্ষেত্র—সংগীত-শিক্ষা-মন্দির। বর্তমানযুগে সেই মন্দিরের একনিষ্ঠ সংগীত সাধক, প্রধান পুরোহিত সংগীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোপেশ্বরবাবুর এমন একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমন একটা সারল্য আছে যা শুনলে সত্যিই অবাক হ'তে হয়—শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'য়ে আসে অজ্ঞাতসারে। তাঁরই কথা প্রসংগে সেদিন তাঁর উপযুক্ত সংগীতজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় সত্যকিঙ্করবাবু ব'লছিলেন—যখন কলকাতায় বাস করেছিলেন গোপেশ্বরবাবু—মুক্তিরা ষ্ট্রীট অঞ্চলে, তখন একদিন ভবানীপুর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করলেন তার পরদিন তাঁদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গানের আসরে গান গাইবার জন্য। সম্মত হ'লেন গোপেশ্বরবাবু। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা পূর্ব থেকেই সংগীতাচার্য প্রস্তুত হয়ে আছেন যাবার জন্য। সত্যবাবুও নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর সংগে যাবেন। কিন্তু আশ্চর্য, সংগীত আসরের উদ্যোক্তাদের কথামত তো নির্দিষ্ট সময়ে মোটর এসে উপস্থিত হ'লনা নিয়ে যাবার জন্য। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে গোপেশ্বর-বাবু তাঁর ভাইপোকে ব'ললেন—আর মাত্র আধঘণ্টা বাকী আছে গান আরম্ভ হবার। কর্তৃপক্ষ বোধহয় বিশেষ কোন কারণে ব্যস্ত থাকায় গাড়ী পাঠাতে পার-ছেন না। চল আমরাই একটা ট্যাক্সী ডেকে চ'লে যাই। উপস্থিত শ্রোতারা সব অপেক্ষা ক'রে থাকবেন; এটা কি ভাল?' এই ব'লেই তিনি নিজে ট্যাক্সী ক'রে ভাইপোকে সাথে নিয়ে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হলেন ভবানীপুরে—গানের আসরে। বলা বাহুল্য কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পথে যান্ত্রিক গণ্ডগোলের জন্যে গাড়ী পৌঁছাতে দেরী হ'য়েছিল।

এই সামান্য একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে জনসাধারণ বুঝতে পারেন যে সংগীতাচার্য গোপেশ্বরবাবু কতখানি সরল, কত নিরহঙ্কার এবং কি পরিমাণে কর্তব্য ও সময়ানু-বর্তিতা মেনে চলেন।

আর একদিনের একটা ঘটনা। কোলকাতায় কোন বাড়ীতে 'বৌভাত' উপলক্ষে বাড়ীর ছেলেরা ঐ রাত্রে একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা ক'রেছে। নিমন্ত্রিত বহুলোক উপস্থিত হবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ ক'রবেন কিছু-ক্ষণ গোপেশ্বরবাবুর গান শুনে। নির্দিষ্ট সময়ে গোপেশ্বর-বাবু সত্যকিঙ্করবাবুকে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। গান আরম্ভ করলেন তিনি। কিন্তু এ কী? শ্রোতা যে বাড়ীর দু একজন মাত্র লোক। প্রায় সমস্ত লোকজন খাবার জন্যেই ব্যস্ত। গান শুনবার চেয়ে নিমন্ত্রণ খাবার দিকেই লক্ষ্য তাঁদের বেশী। সংগীতের তান থেকে আহারের বিবিধ উপাদানের আকর্ষণ যে তাঁদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। সাধক গোপেশ্বর কিন্তু গান গেয়ে চলেছেন একমনে। সত্যকিঙ্করবাবু বাধা দিয়ে ব'ললেন—কি হবে এখানে গান গেয়ে! সবাই নিমন্ত্রণ খাবার জন্যে ব্যস্ত।

মৃদু হেসে সাধক উত্তর দিলেন—কেউ নাইবা শুনুক, আমার তো সাধা হ'চ্ছে। বাসায় থাকলেও সাধতাম, এখানেও সাধছি।

সংগীতের প্রতি কি গভীর অনুরাগ! সুরব্রহ্মের এক-নিষ্ঠ পূজারী গোপেশ্বর সংগীতকে যে কিভাবে ভালবেসে-ছেন তা ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয়।

ইং ১৯৬০ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে সাধক আত্মনিয়োগ করেন তাঁর জন্মস্থান বিষ্ণুপুরের গৌরবময় সংগীত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারকল্পে। বিষ্ণুপুর 'রামশরণ সংগীত মহাবিদ্যালয়' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রণয়ন করেন ভারতীয়

সংগীতের ইতিহাস। তিনি নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ১৯৪৬ সালে তিনি দিল্লী বেতার রাত্রির অনুষ্ঠানে যে গান করেন সে অপূর্ব গান আজও দেশবাসীর কানে যেন অনুরণিত হচ্ছে। গোপেশ্বরবাবু দিল্লী সংগীত-নাটক আকাদমীর একজন সম্মানিত সভ্য। ১৯৫৫ সালে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সম্মানিত হন এবং ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষে এই সংগীত-সাধককে জানানো হয় সম্বর্ধনা। ১৯৫৬ সালে গোপেশ্বরবাবু শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সম্মানিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

বাঙলা ১৩৫৩ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কোলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে দেশ-পূজ্য এই সিদ্ধ সুর-সাধকের জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয় বিরাট সমারোহে। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পী, রাজা-মহারাজা, চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রভৃতি দেশ-বরেণ্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে গোপেশ্বরবাবুকে জ্ঞাপন করেন তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রদান করেন মানপত্র।

১৯৫২ সালে বেতার প্রতিষ্ঠান বাঙলার বিষ্ণুপুরের বৃহৎ কীর্তি স্মরণ করার উদ্দেশ্যে সেখানে অনুষ্ঠান করেন বেতার সংগীত সম্মেলন এবং সংগীত-নায়ক গোপেশ্বরের সংগীত দ্বারা উদ্বোধিত হয় উক্ত সম্মেলন। আজ পর্যন্ত ভারতের কোন প্রদেশ এরূপ সম্মানে সম্মানিত হয়নি।

গোপেশ্বরবাবুর বর্তমান বয়স ৮১ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও অন্ত নেই তাঁর উৎসাহের, বিচ্ছেদ নেই তাঁর সংগীত-সাধনার। এখনও তিনি মগ্ন সংগীত-গবেষণায়। এখনও তাঁর বিষ্ণুপুর-ভবনে দেশ-বিদেশ থেকে আসেন অনুচ্ছিত সংগীতানুরাগী ও সংগীত-শিল্পী এই সাধকের দর্শন ও উপদেশ লাভের জন্য।

বহু রাগের মধ্যে ভৈরব, ছায়ানট, দরবারী-কানাড়া, আড়ানা, আশাবরী প্রভৃতি রাগগুলি গোপেশ্বরবাবুর অতি প্রিয় এবং বহু বাঙলা গানের মধ্যে 'বিফল জনম ; বিফল জীবন', 'দ্বারে রাসবিহারে', প্রভৃতি গানগুলি তিনি প্রায়ই গেয়ে থাকেন।

সাধক গোপেশ্বর মনেপ্রাণে বুঝেছেন সুরব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম একই বস্তু। তাই বৃদ্ধবয়সেও এই আশুতোষ সাধক সুর-ব্রহ্মের সাধনায় একান্ত মগ্ন। আজ এই বয়সেও সংগীতকে যে তিনি কি পরিমাণে ভালবাসেন তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দুপুরবেলা। আসন পেতে ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে বৃদ্ধ সাধককে। তিনি খেতে বসবেন ঠিক এমনি সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন তাঁর বাড়ীতে দূর থেকে। সাধক ভুলে গেলেন নিজের আহারের কথা। সম্মানিত আগন্তুকদের যথোচিত অভ্যর্থনা ক'রতে, তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা ক'রতে তিনি ব্যস্ত। তাঁরা তখন কিছু খেয়ে-দেয়ে অনুরোধ ক'রলেন সাধককে—তাঁর গান শোনাতে। নিজের খাবারের কথা ভুলে গিয়ে বিপুল আগ্রহে তানপুরাটি নিয়ে তিনি আরম্ভ ক'রলেন গান গাইতে। শুধু সংগীত সাধক হিসাবে নয়, প্রকৃত মানুষ হিসাবেও গোপেশ্বরবাবুর স্থান অতি উচ্চে।

বর্তমান ভারতে গোপেশ্বরবাবু যে একজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী, একথা বলাই বাহুল্য। তদুপরি তিনি সংগীতভাণ্ডারের কুবের-সদৃশ।

আমরা কামনা করি, বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের গৌরব, সর্বজনবরেণ্য, সুরব্রহ্মের নিষ্ঠাবান পূজারী, সংগীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আরও সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর অপূর্ব সংগীত-সাধনার অভিজ্ঞতালব্ধ অমূল্য সংগীতের বস্তুসমূহ দেশবাসীকে বিতরণ ক'রতে থাকুন।

ভাব ও ভক্তিরসের মহাসঙ্গীতময় পুণ্যচিত্র

রূপজ্যোতির

* ঠাকুর হরিদাস *

শ্রেষ্ঠাংশে : সুমিত্রা দেবী, নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়,
তপতী, শোভা সেন, মলয়কুমার, মাঃ তিলক, মাঃ বিভু এবং আরো অনেকে

নেপথ্য কণ্ঠে : ধনঞ্জয় ভট্টাঃ, সন্ধ্যা, প্রতিমা, ছবি, গায়ত্রী, শচীন, তরুণ ও হেমন্তকুমার

বসুশ্রী * বীণা * সুরশ্রী • আলোছায়া * মৃণালিনী (দমদম) এবং সহরতলীর অন্যত্র

STUDENTS P G A WAITING-ROOM

সাময়িকী

মুর্শিদাবাদ সীমান্ত সমস্যা—

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার নিকটস্থ চর ও পদ্মা মধ্যস্থ জলাভূমির একটা বড় অংশ গত নেহরু-নুন চুক্তি অনুসারে ভারতরাষ্ট্র হইতে পূর্বপাকিস্তানকে দান করার ফলে ঐ অঞ্চলের ১৬ হাজার অধিবাসী আবার উদ্বাস্তু অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। নানাস্থানের মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবীর দল ঐ স্থানগুলিতে নূতন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া গত ১০।১২ বৎসর বাস করিতেছিল। তাহাদের পক্ষে এখন পাকিস্তানে বাস করা অসম্ভব হইবে বলিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে ঘরবাড়ী ও জমীজমা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। পাকিস্তানে তাহাদের উৎপন্ন মৎস্য বা শাকসব্জী কিনিবার লোক নাই। ভুল মানচিত্র দেখাইয়া নাকি শ্রীনেহেরুকে ঐ অঞ্চল পাকিস্তানকে দিতে বাধ্য করা হইয়াছে। প্রকাশ কোন সরকারী কর্মচারী ভারতরাষ্ট্রে থাকিয়াও পাকিস্তানকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ভারতরাষ্ট্রকে রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব হইবে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না।

সীমান্ত আক্রমণ সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে পূর্বপাকিস্তানের সৈন্যগণ ও সাধারণ মানুষগণ সর্বদা ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসীদের উপর গুলীবর্ষণ করিতেছে, প্রায়ই ভারত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, অনেক সময় ভারতরাষ্ট্রের জমী জবর দখল করিয়া বসিয়া থাকিতেছে—প্রতি-আক্রমণ করিলে তাহারা পলাইয়া যায়। এ বিষয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে লোকসভায় আলোচনা হইয়াছিল—তথায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু জানাইয়াছেন যে এ সকল বিষয়ে তিনি আপোষ রক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী আছেন। কিন্তু তাহার পরও বহু স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যগণ কর্তৃক গুলীবর্ষণ ও লুটতরাজের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কতদিন এই অবস্থা থাকিবে বলা যায় না। গত ১০ বৎসর ধরিয়া এইরূপ অত্যাচার চলা সত্ত্বেও ভারতরাষ্ট্রের কর্তারা ইহা বন্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এইরূপ গোলমাল লাগিয়াই আছে।

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল—

এ বৎসর 'ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিক' সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্রিমিনোলজিতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্রিমিনোলজিতে অন্য কেহ ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন নাই। ডক্টর ঘোষালের গবেষণার

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

বিষয় বস্তুটি সম্পূর্ণ নূতন এবং এই দিকটি পূর্বে কেহ আলোকপাত করেন নাই। এই গবেষণার জন্য তিনি বিদেশী যন্ত্রপাতির সহিত স্বনির্মিত কয়েকটি যন্ত্রপাতিরও সাহায্য গ্রহণ করেন।

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল একজন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক রূপে ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান ও অন্যান্য পুস্তক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনী রচনা করিয়াও পঞ্চাননবাবু বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইনি পোলাণ্ডের ওয়ারসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষালের ভ্রাতা। পঞ্চাননবাবু বর্তমান কলিকাতা পুলিসের একজন ডেপুটী

কমিশনার। সর্বসাধারণের নিকট ইনি একজন সৎ ও দক্ষ রাজপুরুষরূপে পরিচিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ঘোষাল বংশের দৌহিত্র সেই প্রাচীন ঘোষাল বংশেরই সুসন্তান ইনি। ইঁহার পিতামহ রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুর ছিলেন বঙ্কিম-বাবুর মাসতুতো ভাই এবং ইংরেজী শিক্ষায় তাঁহার প্রথম শিক্ষক। ইহা বঙ্কিমবাবুর জীবনী হইতেই জানা যায়। ডক্টর ঘোষাল মাদ্রাজের পুরাতন জমিদার বংশের সন্তান। ওখানকার বহু জনহিতকর কার্যের সহিত অতীত হইতে অদ্যাবধি ইঁহারা জড়িত। এদানীং ডাঃ ঘোষাল তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির বহু মূল্যবান অংশ প্রজাদের ও গ্রামবাসীদের সুখ সুবিধার জন্য দান করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক স্বয়ং এইরূপ কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া অন্যান্য দর্শকদের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ স্বার্থত্যাগী বিদ্যানুরাগী, জ্ঞানী পুলিসের সংখ্যা যতো অধিক হয় ততই মঙ্গল। আমরা ডক্টর ঘোষালের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

আজাদ স্মৃতি বক্তৃতা—

গত ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে আজাদ স্মৃতি বক্তৃতামালার ২টি বক্তৃতা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু 'বর্তমান ও ভবিষ্যত ভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শবাদীগণকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। পুঁজিবাদী বা সাম্য-বাদী দুনিয়ার সমালোচনা করা সহজ—উভয় ক্ষেত্রেই যেমন ত্রুটি রহিয়াছে, সেরূপ গুণাবলীও রহিয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও উভয়ের লক্ষ্য এক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা ব্যতীত ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন পথ নাই—কিন্তু অতীতকে যদি আমরা উপেক্ষা করি কিম্বা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে এই ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন মূল্য থাকিবে না। শ্রীনেহরুর এই দুইদিনের বক্তৃতা মৌখিক ছিল না—তিনি লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। মৌলনা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ও ইহা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। শ্রীনেহরু ইহাতে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়-চৌধুরী সম্প্রতি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া কাবুল রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসাবে ইরাণে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করিবেন। অতঃপর তিনি ইস্পাহান, শিরাজ, সঞ্জনী, বোর, কান্দাহার প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন। ডাঃ রায়চৌধুরী কিছুকাল মিশরের রয়াল ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্য সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়া

ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী

বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমরা ডক্টর রায়-চৌধুরীর দীর্ঘজীবন ও আরো উন্নতি কামনা করি।

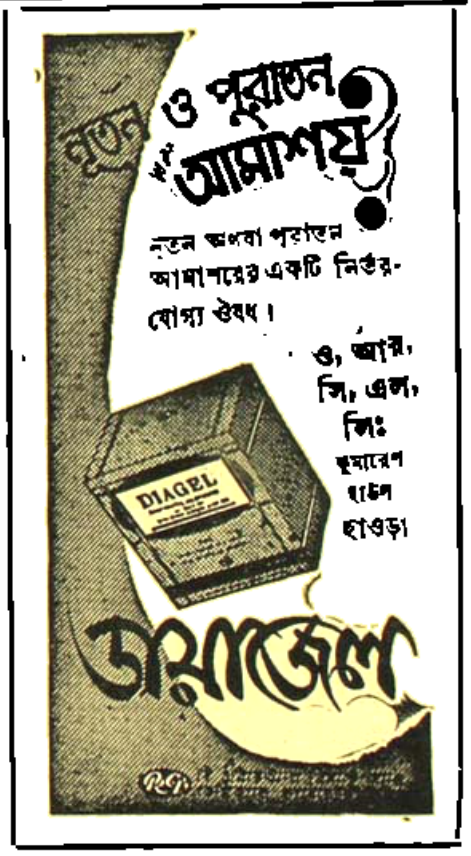

পঁচিশ

প্রায় দু মিনিট একটানা চিৎকার করল ইন্দ্রজিৎ। তারপর হঠাৎ থেমে গেল। উত্তেজনার একটা অন্ধ উন্মত্ত উচ্ছ্বাসকে বুকি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল সে। আর চিৎকারটা থামবার পর সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল অদ্ভুতভাবে। একটা পিন পড়ে গেলেও তার আওয়াজ পাওয়া যাবে এমনি স্তব্ধতা।

প্রীতির লাল টকটকে মুখখানা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ। সত্যজিতের সামনে ফেলে রাখা প্রুফটার ওপর লম্বালম্বি একটা মোটা আঁচড় পড়েছে—হাতের কলমটা চমকে চলে গেছে তার ওপর দিয়ে। সমস্ত বাড়ীতে এখনো চিৎকারটার নিঃশব্দ অনুরণন চলছে—মুখার্জি ভিলার ফাটলধরা মৃত্যু রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিউরে শিউরে উঠছে অভিশাপের মতো।

সত্যজিৎই সহজ হল আগে।

—রীতেনকে বিয়ে করতে চাস?

প্রীতি বসে পড়েছিল সামনের চেয়ারটায়। দু হাতে মুখ ঢেকে। লজ্জায় নয়—ভয়ে। ঘরের আলোটা কোথায় কোথায় একরাশ অর্থহীন বিকৃত ছায়া রচনা করেছে—হঠাৎ সত্যজিতের মনে হল একদল অশরীরী যেন এখানে ওখানে গুঁড়ি মেরে বসে আছে—কী যেন একটা ভয়ঙ্কর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

প্রীতি চোখ তুলল। রক্তাক্ত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

—তা ছাড়া আমার উপায় নেই ছোড়দা।

একটু সময় নিল সত্যজিৎ। সিগার কেস খুলে একটা চুরুট বের করল, ধরিয়ে নিল ধীরে সুস্থে।

—রীতেনকে তুই সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিস?

শাড়ীর আঁচল দিয়ে প্রীতি মুখটা মুছে নিল একবার।

—আমার মনে হয়, ভুল বুঝিনি।

—কিন্তু বাইরে থেকে যতটুকু ওকে দেখা যায়—

—সেটুকু ওর হেয়ালীপনা ছোড়দা। কিন্তু মনের দিক থেকে ও যে কী ছেলেমানুষ, কত অসহায় সে অসুখ আমি জানি।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। মুহূর্তের জন্য একটা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ভেসে গেল ভাবনার ওপর দিয়ে। পুরুষের ভালবাসা শুরু হয় নেশা দিয়ে—মেয়েদের ক্ষেত্রেও কি তাই? বাৎসল্য যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য পায়—মেয়েদের ভালোবাসা সেখানে উৎসারিত হয় তত সহজে। তাই রীতেনের সমস্ত পাগলামোর ওপরে বনশ্রীর এমন অবাধ প্রশ্রয়; তাই যেগুলো রীতেন সম্পর্কে মানুষকে বিরূপ করে তোলে—সেইগুলোই প্রীতিকে বেশী করে আকর্ষণ করেছে। রীতেনের চরিত্রের উদ্দামতাই প্রীতির মনে মোহটাকে তীব্র করে তুলেছে—এই খামখেয়ালী অসংলগ্ন দায়িত্বহীন লোকটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা পেয়ে বসেছে তাকে।

—কী ভাবছ ছোড়দা?

—ভাবছি তুই নিজের মতো করে ওকে দেখছিস—ঠিক ওকে দেখতে পাচ্ছিস না।

—সকলেই নিজের মতো করেই অন্যকে দেখে ছোড়দা। ঠিক অন্যকে কেউ কি কোনদিন দেখতে পায়?

সত্যজিৎ চকিত হল। এ-কথা বীথির মুখে মানাত—কিন্তু প্রীতির কাছ থেকে সে আশা করেনি। নিজের চোখ দিয়েই তো সবাই দেখে। সে-ও পূরবীকে অমনি করেই দেখতে চেয়েছিল। পূরবীর আলাদা মনটার কথা ভাবেও নি কোনদিন। তার দাম তাকে দিতে হয়েছে। আজ যদি প্রীতি ভুল করে—যদি দুঃখও পায়, তা হলেই বা সে বাধা দেবার কে? সে-ও তো রীতেনকে সত্যি করে দেখতে পাচ্ছেনা—তার মন, তার চিন্তা দিয়েই বিচার করছে।

আর কে বলতে পারে, আমি আর একজনকে সম্পূর্ণ করে চিনতে পেরেছি? সংসারে যারা সব চাইতে নিকট, সেই স্বামী-স্ত্রীই কি দশ বছর ঘর করবার পরে এমন দাবী করতে পারে যে তাদের পরস্পরের পরিচয় একেবারে সম্পূর্ণ করে জানা হয়ে গেছে, সেখানে কোনো

আড়াল আর নেই, কোনো বিস্ময় আর লুকিয়ে নেই কোথাও ?

দার্শনিক বলে, দর্শন হল এমন একখানা গ্রন্থ—যার প্রথম পাতা ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে—শেষ পাতা এখনো লেখাই হয়নি। মানুষও তো ঠিক তাই। ছেলেবেলায় কবে কোনখানে তার জীবনের পাণ্ডুলিপি লেখা শুরু হয়েছিল সে জানে না; তার চেতনার দিকটাতে পিঠ ফিরিয়ে বসে তারই আর এক সত্তা লিখে চলেছে এক গোপন উপন্যাস—মধ্যে মধ্যে কোড়ো হাওয়ায় এক-আধটা পাতা উড়ে এলে সেইটুকুর মধ্যেই সে পায় তার বিস্তৃত আত্মকাহিনীর সংবাদ; আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—"The sealed envelope goes to the fireplace!"

সেই নিভৃত নির্জন গ্রন্থটি পড়বার ক্ষীণ চেষ্টার নাম মনোবিজ্ঞান। একটা পেন্‌সিল টর্চ ধরে অন্ধকারে এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার পাঠোদ্ধারের মতো। কেউ কাউকে জানেনা। জানবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করেই বা কী লাভ ?

—কী করব ছোড়দা ?

—যা ভালো বোঝো তাই করো।—সত্যজিৎ মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল।

—কিন্তু বাবা।

সত্যজিৎ হাসল।

—এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করছিস ? বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতের ছেলেকে বিয়ে করবি—আর ভেবেছিস বাবা দু-হাত তুলে তোকে আশীর্বাদ করবেন ? তার ওপর—সত্যজিৎ একটু হাসল: কিছু মনে করিসনি, বাবা নিশ্চয় দু-চারবার রীতেনকে দেখে থাকবেন। আর সে ক্ষেত্রেও—

বিমর্ষমুখে প্রীতি বললে, ও বলেছে দাড়িটা ও কামিয়েই ফেলবে।

এবার সশব্দে হেসে উঠল সত্যজিৎ। এক ঝলক বসন্তের হাওয়ায় যেন অনেকক্ষণের একটা গুমোট কেটে গেল।

—এটা বুঝি তোর ফার্স্ট সাকসেস্ ? তা আরম্ভ হিসেবে নেহাৎ মন্দ নয়। এরপর যদি ওর গায়ের বিশ্রী শার্টটা আর ইয়াংকি ইংরেজি ছাড়াতে পারিস, তা হ'লে ভদ্র সমাজে একেবারে অচল হবে না।

প্রীতির পীড়িত মুখেও একটুকরো হাসি দেখা দিল।

—বলেছে, একটা মোটরকার কোম্পানিতে চাকরী পাওয়ার কথাও হচ্ছে।

—গুড্—ভেরি-গুড্।—সত্যজিৎ সশব্দে প্রীতির পিঠ চাপড়ে দিলে: তুই তো দেখছি এর মধ্যে রীতেনকে একেবারে মানুষ করে ফেলেছিস। নাঃ—এরপর বিয়েটা তোদের আর ঠেকানো গেল না।

—কিন্তু—

চুরুটটা নিবে গিয়েছিল। আর একবার সেটায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে সত্যজিৎ বললে, ও 'কিন্তুর' উত্তর দিতে পারব না। বিয়েটা এ বাড়ীতে হওয়ার আশা ছেড়ে দাও—ওটা সেরে এসো রেজিস্ট্রী অফিসে। এবং আর যাই করো, বিয়ের পরে জোড় বেঁধে বাবার কাছে অন্তত আশীর্বাদ চাইতে যেয়ো না। তার ফল কী হবে তুমি জানো।

প্রীতি হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

—বাবা আমার গান শুনতে বড় ভালোবাসেন ছোড়দা।

—সেই গান শোনাবার জন্যে নিজেকে তুমি বলি দিতে পারো না।

প্রীতি কেঁদে চলল। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না সত্যজিৎ। এ সমস্যার কোনো সমাধান তার জানা নেই।

—বাবা কি কিছুতেই একে মেনে নিতে পারেন না ছোড়দা ?

—না। শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে অন্তত সে ভুল করবার কারণ নেই।

—কিন্তু বাবা খুব কষ্ট পাবেন ছোড়দা। হয়তো—

হয়তো। তার অর্থ সত্যজিৎও ভালোই বোঝে। বীথি হলে শিবশঙ্কর বলতেন—'বেরিয়ে যাক বাড়ী থেকে, ও আমার কেউ নয়। আমি ওর আর মুখদর্শনও করব না কোনোদিন।' কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধে ও-কথা বলতে পারবেন তিনি ? হুইস্কির গ্লাস যখন বিস্বাদ হয়ে যাবে, নিজের শূন্যারিক অবসাদের ভেতর ভেদাস আর অ্যাভা-নিসের কুৎসিত ছবিটা নিজের কাছেই যখন আরো কুৎসিত হয়ে উঠবে, তখন প্রীতির কীর্তন তাঁর একমাত্র অবলম্বন, ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত চেতনার একটুখানি ছায়াচ্ছত্র। সে আশ্রয় সরে গেলে কোথায় দাঁড়াবেন তিনি—কী নিয়ে বেঁচে থাকবেন ?

—কেঁদে লাভ নেই প্রীতি। যা ঘটবে তাকে ঘটতে দেওয়াই ভালো। তুই তৈরি হয়ে নে। যদি দরকার পড়ে আমাকে জানাস—আমি সাধ্যমতো সাহায্য করব।

প্রীতি উঠে দাঁড়ালো। কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মুখার্জি ভিলায় এই-ই শেষ কান্না—সত্যজিৎ ভাবল। এই-ই মমতার শেষ উচ্ছ্বাস—হৃদয়ের শেষ ব্যাকুলতা। এ-সব দুর্বলতার সীমা পার হয়ে গেছে বীথি—নতুন সূর্যের আলো পড়েছে তার চোখে। ইন্দ্রজিৎ প্রতি মুহূর্তে এখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে অভিশাপ—কোনদিন নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে কিংবা যাকে হোক খুন করে সে সব কিছুর ওপর

ঘরনিকা টেনে দেবে। শিবশঙ্কর তাঁর ফাইনাল ষ্ট্রোকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আর ত্রিশঙ্কু সভাজিতের পক্ষে ঘরে বাইরে সবই সমান। কেবল এ-বাড়ীর অস্তিত্ব সত্ত্বে তিনটি জিনিসের পরিণামই সত্যজিৎ ভাবতে পারে না—এক রত্নু, দুই আস্তাবলের বুড়ো ওয়েলার ঘোড়া আর তিন নম্বর কালপুরুষের মতো ওই মার্কারি ক্লকটা।

প্রীতির কান্না এখনো দুকান ভরে বাজছে তার। মুখার্জি ভিলার মমতার শেষ উচ্ছ্বাস।

স্কুল থেকে প্রায় দু'টার সময় ফিরল বনশ্রী। চারটে পর্যন্ত স্কুলের খাটুনি—তারপর এক ঘণ্টা কাটল সেক্রেটারির সঙ্গে বকবক করে। এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে বোঝাতে হল আর একজন টীচার নইলে স্কুল কিছুতেই চালানো যাচ্ছে না। তিন মাসের জন্যে একটা টেম্পোরারি একজন লোকও দরকার—মিনতি তার মেটার্নিটি লিভ একটেণ্ড করতে চেয়েছে।

মিনতি সম্বন্ধে একটা কী মন্তব্য করতে গিয়েও সেক্রেটারি সামলে নিলেন। চকিতের জন্যে রাঙা হয়ে উঠেছিল বনশ্রীর মুখ। মিনতি অসহায় নিরুপায় জেনেও তার মনের ভিতরটা আলা করছিল। এত দারিদ্র্য—এই স্বাস্থ্য! আর বছর বছর না হওয়ার ব্যাপারে তার বিরাম নেই। কী খাওয়াবে তার ছেলেমেয়েদের—কেমন করে মানুষ করবে?

ক্রিমিন্যালিটি! শিওর ক্রিমিন্যালিটি!

বিষণ্ণ, বিরক্ত মন নিয়ে ক্লান্ত বনশ্রী এসে নিজের ঘরের ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। বাবা বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন যথানিয়মে। রীতেন এখনো বাড়ী থেকে বেরুতে পারে না—ঘরে বসে রেডিয়ো খুলে বিলিতী গান শুনছে। রক্ত-এন্-রোলের মতো খানিক দুঃশ্রাব্য গান ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাড়ীতে। বনশ্রী ভ্রূকুটি করল।

পাশের ছোট টেবিলের উপর চোখ পড়ল। একখানা চিঠি রয়েছে তার নামে। অচেনা হাতের লেখা এনভেলপ।

চিঠিটা ছিঁড়ে কয়েক লাইন পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনশ্রী বোবা হয়ে উঠে বসল। প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে কে যেন একটা ঘা বসিয়ে দিয়েছে তার হৃৎপিণ্ডের ওপর।

মিনতি মারা গেছে। একটি মৃত সন্তানকে জন্ম দিয়ে পরশু হাসপাতালে তার জীবনের দায় মিটিয়ে দিয়েছে। তাকে নিয়ে স্কুলের কোনো অসুবিধাই আর রইল না।

পাথর হয়ে রইল বনশ্রী—ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। মনে পড়ল সেদিনের কথা—যেদিন লজ্জা আর অপরাধের ভারে ম্লান হয়ে তার কাছে ছুটি চাইতে এসেছিল মিনতি। শীর্ণ রক্তহীন শরীর—বকের মতো শুকনো পা, অন্ধকার দুটো চোখের কোনে তার জল ছলছল করছিল। আর বনশ্রী রুক্ষ গলায় বলেছিল—

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরল বনশ্রী। সেদিনের সেই নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তার বুকটাকে পিষে দিতে লাগল। সে মা হয়নি—মা-র দুঃখ, মা-র বেদনা বোঝবার শক্তিও তার নেই। তবু আরো একটু সহানুভূতি নিয়ে সে মিনতিকে বোঝবার চেষ্টা করতে পারত—অত অফিসিয়াল, অতখানি কর্কশ না হলেও তার কোনো ক্ষতি ছিল না।

আর ছুটি চাইতে আসবে না মিনতি। তার মেটার্নিটি লিভ্ নিয়ে আর কোনো সমস্যা দেখা দেবে না স্কুলে।

চিঠি লিখে জানিয়েছে মিনতির স্বামী। বলতে গেলে স্ত্রীকে হত্যাই করেছে লোকটা। কিন্তু আইন তাকে ছুঁতে পারবে না—কোনো বিচারও হবেনা তার। বনশ্রী জানে, সাতদিন পরেই মিনতির যৎসামান্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার তাগিদ দিয়ে এই লোকটাই আবার আফিসিয়াল চিঠি লিখবে। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে আবার বিয়ে করবে স্বচ্ছন্দে, নির্বিকার চিত্তে। কলকাতার হোটেলে কোনোদিন হয়তো ফাউল কারীর মুর্গীতে টান পড়তে পারে—কিন্তু স্ত্রীর অভাব বাংলা দেশে অন্তত কখনো ঘটবে না।

বনশ্রী নিথর হয়ে বসে রইল। গলে পড়তে লাগল চোখের জল।

কতক্ষণ সে জানেনা। টেবিলের ওপর চা আর খাবার যে কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—তাও তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ হীরুর গলার আওয়াজে সে জেগে উঠল।

হীরু বললে, দিদিমণি, সত্যজিৎ বাবু দেখা করতে এসেছেন।

—ক্রমশঃ

বোকা চাকর-বুদ্ধিমতী গিন্নী

— মা আপনি যে 'ডালডা' চাইছেন তা আমি কেমন করে খুঁজে পাব ?

— ঠিক। নাম তো তুই পড়তে পারবিনা কিন্তু — 'ডালডার' টিনের ওপর থাকে খেজুর গাছের ছবি।

— ও এখন মনে পড়েছে ! আচ্ছা মা, বাটি করে আনব না বড় কিছু একটা নিয়ে যাব ?

— দূর সবজান্তা ! 'ডালডা' কখনও খোলা বিক্রী হয় না। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা টিনে।

— যাতে কেউ চুরী না করতে পারে ?

— হাঁ, তাছাড়া শীলকরা টিনে মাছি ময়লা বসতে পারেনা, ভেজালের ভয় থাকে না। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ারও ভয় নেই।

— ও সেই জন্যেই সব বাড়ীতে 'ডালডা' রেখা যায় !

— হাঁ, কিন্তু কত ওজনের টিন আনবি বল তো ?

— মোটা পাওয়া যায়।

— 'ডালডা' পাওয়া যায় ½, ১, ২, ৫ আর ১০ পাউণ্ডের টিনে। তুই একটা ৫ পাউণ্ডের টিন আনবি।

— ঠিক আছে মা ! আমি শীলকরা ডালডা আনব—যে একটা ৫ পাউণ্ডের মার্কা বনস্পতির টিন নিয়ে টিনের ওপর খেজুর গাছের

ছবি আছে—ঠিক তো ?

— হাঁ, হাঁ, এখন তাড়াতাড়ি কর !

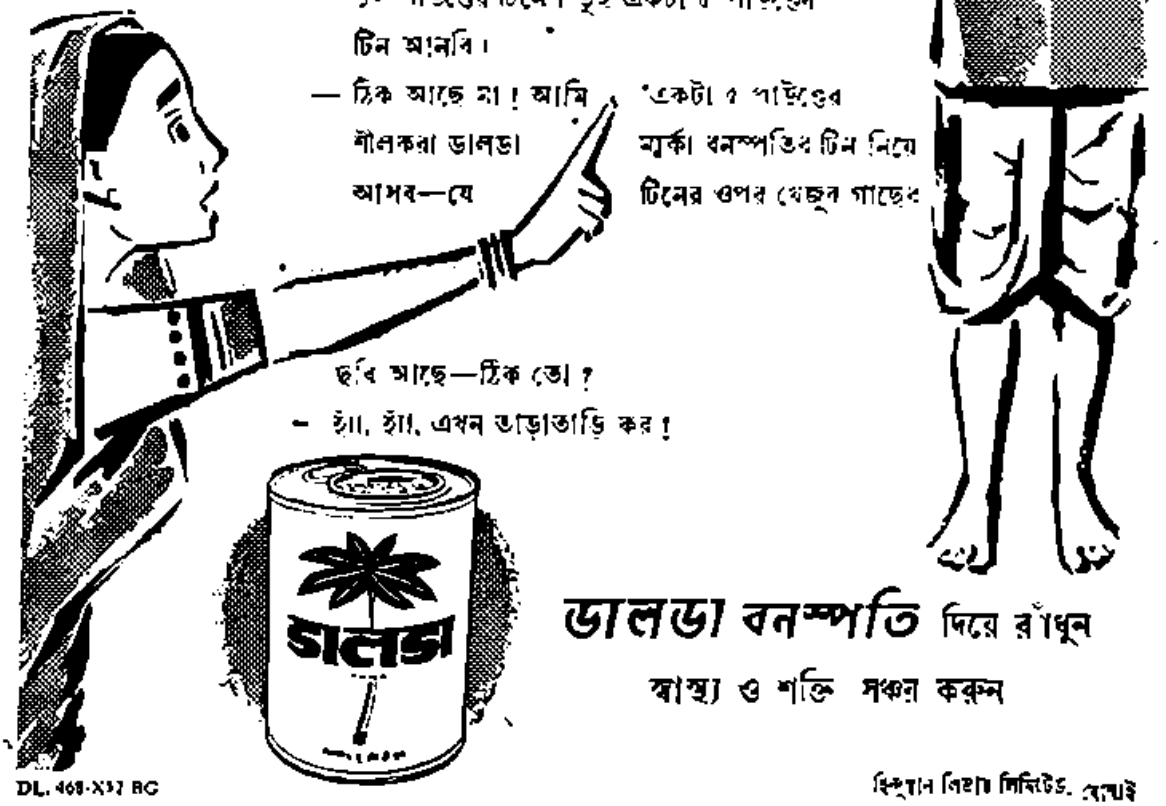

ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন

স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন

DL. 468-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

STUDENTS P.G.A. COMMON-ROOM

গ্রহ জগৎ

কর্ম্মভাব

উপাধ্যায়

কর্ম্মভাব রাশিচক্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে যে সব গ্রহ থাকে তারা বিশিষ্ট ফল দিয়ে থাকে। অন্যান্য ফল অপেক্ষা মানুষকে কর্ম্মফলই আগে ভোগ করতে হয়—'ইথাপি সংসার সমুদ্র মধ্যে তুফানে নয়ঃ কর্ম্মফলানি বৈ'। 'কর্ম্মস্থানে কোন গ্রহ না থাকলে বা তার দৃষ্টি না থাকলে মানুষ দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করে। এই কর্ম্মভাব যদি বলবান হয়ে থাকে তবে সহস্র চেষ্টা করলেও মানুষের প্রভুত্ব, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি হয় না। কেন্দ্রাধিপতি ত্রিকোণাধিপতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হোলে তবেই বিশেষ উন্নতি হয়ে থাকে। বলবান্ অধিপতি অর্থাৎ কর্ম্মাধিপতির সঙ্গে নবমাধিপতি অর্থাৎ ভাগ্যাধিপতি মূল্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হোলে জাতক বিদ্যান্ ও বিজ্ঞ হয়ে থাকে—আর হয়ে থাকে দেশের মধ্যে গণ্যমান্যের একজন। লগ্নাধিপতি ও বলবান্ধিপতি পরস্পর একপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হোলেও অনুরূপ উত্তম ফলভোগ হবে। গ্রহগণের ক্ষেত্র-বিনিময়ই মূল সম্বন্ধ। নবম (ভাগ্য) স্থানের অধিপতি আর দশম (কর্ম্ম) স্থানের অধিপতি শুধু মূলসম্বন্ধবিশিষ্ট হোলেই যে জাতক কীর্ত্তিশালী ও বলবান্ হবে তা নয়, এই অধিপতিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে থাকলেও প্রবল রাজযোগহেতু অনুরূপ কীর্ত্তিশালী ও বিখ্যাত হবে। ত্রিকোণপতির মধ্যে নবমাধিপতি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ধার্ম্মিক বলে মনে। এক্ষেত্রে যদি নবমাধিপতি ও দশমাধিপতি বলবান্ হয়ে পরস্পর সম্বন্ধ করে, তা হোলে উৎকৃষ্ট রাজযোগ হয়ে থাকে। যদি একই গ্রহ কেন্দ্র ও ত্রিকোণাধিপতি হয়, তা হোলে সেই গ্রহই বিশেষ উন্নতিকারক হয়ে জাতককে সাধারণের চেয়ে অসাধারণ ব্যক্তি করে তোলে কিন্তু যদি একই গ্রহ দশম ও একাদশাধিপতি হয়, তাহোলে জাতকের জন্যে রাজযোগের ফল লাভ হয়না। গ্রহগণ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে থেকে রাজযোগকারক হোলে, যে যোগ বিফল হয়ে যায়। গ্রহরা রাজযোগকারক হয়েও একাদশে থাকলে রাজযোগের অর্দ্ধেকটা ফল নষ্ট হয়ে থাকে। যদি রাহু ও কেতুর কোন গ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে ও শুভভাবস্থ অর্থাৎ কেন্দ্র ত্রিকোণ গত হয়, তা-হোলে এরা এদের দশা অন্তর্দশায় রাজযোগের ফল প্রদান করে। কর্ম্মস্থানস্থ গ্রহমাত্রই শুভ ফল দিয়ে থাকে। লগ্ন ও চন্দ্র এই দুইটীর মধ্যে যে বলবান হবে তা থেকে দশম ভাব নিয়ে বিচার করতে হয় জাতকের কর্ম্ম ও বৃত্তি। রবি, চন্দ্র ও লগ্ন এদের বলবাধিপতি যে গ্রহের নবাংশে থাকেন, সেই সেই নবাংশাধিপতি গ্রহের যে বৃত্তি, জাতক সেই বৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ও জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যদ্ গ্রহ বৃত্তিকারক হোলে সকলেই নিজ নিজ বলাবলানুসারে নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা অর্থ নিয়ে থাকে। মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নিরাশি। বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বীরাশি। মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ুরাশি। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলরাশি। অগ্নিরাশির যে কেউ জাতকের বলবান্ হোলে জাতকের কর্ম্মস্থান হবে কারখানা, আগুনের কাজ, লৌহ, যন্ত্রপাতি ও ইস্পাতের কারখানা, রাসায়ণ প্রভৃতি। ভূগর্ভস্থ খনি, কৃষি, বস্ত্র-ব্যবসা, বাণিজ্য, উদ্যান রচনার ক্ষেত্র প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্র যাদের বলবত্তায় হচ্ছে পৃথ্বীরাশি। বাগ্মিতা, সাংবাদিকতা, লেখন, বিমান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা আর যেসব কাজে যন্ত্রপাতিরাদির জ্ঞান দরকার সেইসব কাজই হবে তাদের, যাদের কর্ম্মভাব হয়েছে বায়ুরাশিতে। জলরাশি যাদের বলবত্তায়, তারা জাহাজের কাজ পাবে, হোটেল রেস্তোঁরা, মদ, মৎস্য প্রভৃতিও তাদের কর্ম্মসংশ্লিষ্ট হোতে পারে। বেশীরভাগ গ্রহ যদ্যপি বা বিষমভাবস্থিত রাশিতে থাকলে অথবা পৃথ্বীক্ষেত্রের নীচে থাকলে বা দুর্ব্বল হলে, পরের অধীনে চাকুরীর সুযোগ করে। পৃথ্বীক্ষেত্রের উপরে, দশম ও শুভদৃষ্টি গত হয়ে বেশীর ভাগ গ্রহ থাকলে, জাতক অপরকে কর্ম্মে নিযুক্ত করবে বা করবার অধিকার পাবে। বায়ুরাশিতে বেশীর ভাগ গ্রহ থাকলে, বুদ্ধিজীবী হওয়াই ভালো। যাদের দশম বা কর্ম্মভাব পৃথ্বীক্ষেত্রে অবস্থিত, তাদের পক্ষে ব্যবসা করাই উত্তম। বলবান রবি বৃত্তিকারক হোলে ঔষধ, কাষ্ঠ, সুবর্ণ, পারদ, ঘাস, খড় বা তৃণজাত দ্রব্য, হরীতকী প্রভৃতি ঔষধি পশু লোমজাত দ্রব্য, প্রভৃতি বস্ত্রের ব্যবসা জাতকের বৃত্তি নির্দ্দেশ করতে হবে। চন্দ্র বৃত্তিকারক হোলে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী, কৃষি, জল ও জলোৎপন্ন দ্রব্য, কুটীর জীবিকা ইত্যাদি—জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট স্থানে কর্ম্ম, যেমন জাহাজে কাজ নৌবাহিনী, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগে কাজ, ফেরিওয়ালা, যানবাহন-পরিচালকের কাজ, মোকামদার ও পুরস্থালীর দ্রব্যের কারবার হোতে পারে। রবি বৃত্তি নির্দ্দেশক হোলে, রাজকর্ম্মচারী, রাজনৈতিক বিভাগের কর্ম্মী, রাজা, মন্ত্রী বা রাজপরিষদ বা মন্ত্রী বিভাগে চাকরী, বিচারক, আইনব্যবসায়ী ও সরকারী কর্ম্মচারী হবার সম্ভাবনা। চন্দ্র বৃত্তিকারক হোলে উপসেবিকা (নার্স) ধাত্রী (মিড-ওয়াইফ) অলঙ্কার প্রস্তুত-কারক, জহুরী, ধাতুদ্রব্যাদি বিক্রেতা ও রাজকীয় কর্ম্মাদি সূচিত হয়। মঙ্গল বৃত্তিকারক হোলে অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ বা ক্রয় বিক্রয়, বৃত্তিকা খনন ও গঠন, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, অগ্নি সংযোগের কার্য্য ইত্যাদি কর্ম্মসম্ভাবনা। তাছাড়া সৈন্য বা সৈন্য বিভাগে কর্ম্ম, ভূতত্ত্ববিদের কাজ, মেকানিকের কাজ, জমিদারির কাজ, রাসায়নিক, আইন ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের কাজ, ইঞ্জিনিওয়ের দালালী ও কন্ট্রাক্টরের কাজও হোতে পারে। এরূপ গ্রহ সংস্থানে সার্জ্জেন ও বহু চিকিৎসক হওয়ার যোগ দেখা যায়। বুধ বৃত্তিকারক হোলে কবিতা ও উপন্যাস লেখা, গ্রন্থরচনা, সাহিত্যিকতা, শিল্পবৃত্তি, বিমান নির্ম্মাণ বা পরিচালনের কাজ, টীকা, ব্যাখ্যা, শাস্ত্রচর্চ্চা ও লেখার কাজ, কেরাণীবৃত্তি প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা। বৃহস্পতি বৃত্তিকারক হোলে পুরোহিতী, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি হোতে পারে। এ যোগে বড় ব্যবসায়ী, ব্যবস্থারজীবী, চিকিৎসক এবং গণ্য কেরাণী হবারও সম্ভাবনা আছে। শুক্র বৃত্তিকারক হোলে সিনেমা, থিয়েটার

ও সর্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও কীড়া কৌতুক ও যাদু প্রভৃতি দ্বারা অর্থোপার্জন। গান বাজনা, অভিনয়, নাটক রচনা প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারাও জীবিকা উপার্জন, তাছাড়া রৌপ্য ও লৌহাদির খনিজ আর খ্রীলোক থেকে ধনপ্রাপ্তি সূচিত করে শুক্রের ধনস্থানে অবস্থিতির ফলে। শনি বৃত্তিকারক হোলে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিলাভ হোতে পারে—গবেষণাপূর্ণ কাজ, অপরের অধীনে কাজ, মিলে কাজ, কম্পোজিটার, ভারবাহীর কুলি আর সাবুদার ও কেরিওয়ালার কাজের সম্ভাবনা দেখা যায়। তা ছাড়া যে সব কাজে ছাড়ছাড়া পরিশ্রম করতে হয় সেগুলিও লাভ হয়ে থাকে। চাষবাসেও সাফল্য লাভ। ধনাগম দ্রব্যাদি নিয়ে কর্ম হবার সম্ভাবনা। ছাদেশ ধনস্থানে থাকলে জ্যোতিষী, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আর সাধারণ ধরণের কাজে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। নেপচুন বৃত্তিকারক হোলে মদ্যের কাজ, নৌ-বাহিনীতে কাজ প্রভৃতি সূচিত হয়, ছাদেশের প্রভাবে অধ্যাত্ম সাধনায় সাফল্য লাভ করে আশ্রম বা সঙ্ঘ পরিচালক, ধর্মগুরু প্রভৃতি হবারও সম্ভাবনা থাকে। ধনস্থানে কোন গ্রহ না থাকলে ধনাধিপতি যে নবাংশে আছে তার অধিপতিকে নির্দেশক মনে করতে হবে। রবি নির্দেশক হোলে ঔষধ ব্যবসায়ী, রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা ও স্বর্ণকার হবার সম্ভাবনা। চন্দ্র ঐরূপ হোলে কৃষিকর্ম, জহুরী আর খ্রীলোকের অধীনে চাকুরি। মঙ্গল নির্দেশক হোলে সৈন্য বিভাগে কাজ, মেকানিক, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। বুধ ঐরূপ হোলে লেখক, প্রকাশক, সচিবত্ব ও ব্যাঙ্কার হওয়া যায়। বৃহস্পতি ঐরূপ নির্দেশক হোলে, এটর্ণী, উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, বিচারক প্রভৃতি হওয়া যায়। শুক্র নির্দেশক হোলে আর্টিষ্ট, সৌখীন পোষাক প্রস্তুতকারক হওয়া যায়। শনি নির্দেশক হোলে অতি নিম্ন পদ লাভ। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি বা শনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাহু কেন্দ্রের ভিতর থাকলে জাতক পুত্র, সম্মান, লক্ষ্মী ও আরোগ্য লাভ করে। ধনস্থানে থেকে বৃদ্ধি, আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, সম্মান প্রতিষ্ঠা, পার্থিব উন্নতি ও সাফল্য, বিদেশ ভ্রমণ, জীবিকা উপার্জনের উপায়, আত্মসম্মান, ধর্মজ্ঞান এবং পত্নীবর্গাদি বিচার হয়। মীনরাশি ধনস্থানে হোলে আর সেখানে বুধ বা মঙ্গল থাকলে জাতকের তীর্থস্নান ও মোক্ষলাভ হয়। এইভাবে বুধ বা মঙ্গলের সঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে জাতক মাতৃবা প্রতিষ্ঠান তৈরী করে, আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে জনকল্যাণকর কাজ করে। চন্দ্র এখানে থেকে বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট হোলে সদাচার ও সত্যবাদিতার জন্যে যশ হয়ে থাকে। ধনস্থে রবি পৈতৃক ধন সম্পত্তিদাতা, আর চন্দ্র হচ্ছে মাতার ধনসম্পত্তি দাতা। এখানে অবস্থিত মঙ্গল শুক্রের, বুধ বন্ধুর, বৃহস্পতি ভ্রাতৃবর্গের, শুক্র স্ত্রীলোকের আর শনি ভৃত্যের যোগাযোগে ধনসম্পত্তি দান করে। মোটামুটিভাবে বিচার করে দেখা গেছে রবি বা মঙ্গল ধনস্থে থাকলে জাতকের পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তর বৃত্তি ও পুরুষকার প্রয়োগের ফলে যথেষ্ট ধনোপার্জন হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা আর বিজ্ঞান যন্ত্রের তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশের দ্বারা জাতক জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবে যদি তার ধনস্থভাবে থাকে বুধ ও বৃহস্পতি। শুক্র ও চন্দ্র যোগে আইনজ্ঞ, মন্ত্রী, দেওয়ান, কাউন্সিলার, মেয়র, প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি হওয়া যায়। চন্দ্র উত্তম কর্মদাতা। কটন্‌ট্রাক্টর, বড় বড় শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ডিরেক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, কুলীদের পরিচালক প্রভৃতি হওয়া যায় ধনস্থে শনি থাকলে। অবশ্য এসব বিচার করতে গেলে দেখতে হবে গ্রহদের বলাবল আর দেখতে হবে বিদ্যাবুদ্ধির অধিপতিদ্বয়ের অবস্থা। যদি বিদ্যাবুদ্ধির অধিপতিরা দুর্বল হয়,ও লেখাপড়া না হয় তাহোলে সেব্যক্তি গ্রামের মোড়ল, কুলির সর্দার, চাপরাশিদের প্রধান, বা অফিসের দারোয়ানদের বলপতি হোতে পারে। এগ্রন্থে কোষ্ঠী বিচার করে ছেলেবেলা থেকে রাশিচক্রের বলাবল অনুসারে কর্মক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ও বৃত্তি নির্বাচনের ব্যবস্থা করানো দরকার। ঠিকমত পথ না ধরিয়ে দিলে বা বৃত্তি নির্বাচনে সম্বন্ধে অভিভাবকগণ অভিজ্ঞ জ্যোতিষীর মত কাজ করলে, ছেলেমেয়েদের জীবনে সাফল্য না হওয়ার কারণ তারা খুঁজে পাবেই। বহু বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়েরা নষ্ট হয়ে যায় তাদের পিতামাতার দোষে। এই সব ত্রুটি অনায়াসে হোতে পারে যদি তাঁরা বালক বালিকাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্যে বিদ্যালয়ে পাঠাবার পূর্বে তাদের কোষ্ঠীবিচার করে দেখে নেন কিভাবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে। যদি তাঁরা কোষ্ঠীতে দেখেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সাংঘাতিক পরিমাণে অশুভ সম্ভাবনা রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, তাহোলে তাঁদের কোষ্ঠীর দোষগুলি খণ্ডন করবার জন্যে সচেষ্ট হবেন, শাস্ত্রে এই সব দোষের প্রতিকারের ব্যবস্থাও করে দেওয়া আছে। নতুবা পরবর্তীকালে শত শত টাকা খরচ করেও ছেলেমেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব হবেনা। চতুর্থাধিপতি ও পঞ্চমাধিপতি, নবমাধি-পতি ও দশমাধিপতি কিম্বা লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতির অবস্থান সমাবেশ ভালো না হোলে জীবনে উন্নতি সম্ভব হয় না। বুধ ও বৃহস্পতি দ্বিতীয় ও একাদশ ঘরে অবস্থান করলে বহুটাকা রোজগার করা যায়। চতুর্থ বা একাদশ স্থানে মঙ্গলও বৃহস্পতির সমাবস্থানে বহু অমিলমা হয়। শত বাধা বিঘ্ন এলেও জাতক উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠবে, যদি রবি ও চন্দ্র কোষ্ঠীতে তুঙ্গস্থ থাকে। চতুর্থস্থানে শুক্র ও বৃহস্পতির সমাবস্থানে উত্তম বিদ্যা ও উপার্জন ঘটে। আশোক আগামী সংখ্যায় কৃষ্ণমাহাত্ম্য উক্ত বিভিন্ন গ্রহানুসারে কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব গ্রহের সমাবেশে যেরূপ বিভিন্ন ফল পাওয়া গেছে তা প্রকাশ করবেন। আশা করি তার দ্বারা কর্ম ও বৃত্তি সম্পর্কে অনেকে উপকৃত হবেন।

* * *

চৈত্রমাসের ব্যক্তিগত রাশিফল

মেষ

স্বাস্থ্য খারাপ যাবে না। মধ্যে মধ্যে পিত্তপ্রকোপ ও মাথাধরা। পারিবারিক অশান্তি। স্বজন বা বন্ধু বিয়োগ। ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনা। অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল বলা যায় না। ভূম্যধিকারীর পক্ষে কিছু অসুবিধা ভোগ বিশেষতঃ মাসের প্রথমে ভূমি বা বাড়ীভাড়া আদায় সম্পর্কে খরচ উপস্থিত হোতে পারে। ভাড়াটিয়ার সঙ্গে মামলামোকর্দ্দমা, আয়বৃদ্ধি, চাকুরিজীবীদের পক্ষে অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে বা কাজে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। শত্রু-বৃদ্ধি, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে সাময়িক ক্ষেত্রে বা গৃহস্থালী ব্যাপারে কিছু অসুবিধা ভোগ। প্রণয়ঘটিত যোগ। অশ্বিনীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভালো যাবে না। ভরণী নক্ষত্র জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে মোটামুটি ভালো। বিদ্যায়কিঞ্চিৎ বাধা।

বৃষ

বিশেষ ভালো সময়। কর্মে সাফল্য। সৌভাগ্যযোগ। বিদ্যায় উন্নতি লাভ। পরীক্ষায় কৃতকার্যতা। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পারি-বারিক স্বচ্ছলতা। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, তবে রোহিণী নক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে উচ্চস্থান থেকে পতন, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে না, বরং আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি। মাসের প্রথম দিকে অর্থের টানাটানির আশঙ্কা। রাজনৈতিক কারণে বা গভর্ণমেণ্টের কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনে ভূম্যধিকারীদের পক্ষে কিছু ক্ষতি ঘটবে।

চাকুরিজীবীদের পক্ষে অত্যন্ত শুভ, কর্মোন্নতি বা পদোন্নতি আশা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে এমাসটী শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। প্রবাসে সাফল্য, প্রবাসের ব্যাপারেও সিদ্ধিলাভ। অযাচিত লোকের সংস্পর্শে আসা বৃহস্পতির স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুচিত, অবৈধ লাভিবার যোগাযোগসহিত অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা আছে।

মিথুন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। স্ত্রী ও সন্তানের পীড়াযোগ। পিত্তপ্রকোপহেতু ব্যাধির আশঙ্কা। আত্মীয়স্বজনের সহিত মনোমালিন্য ও তজ্জনিত পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয় কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্র তা ঘটবে না। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু লাভ হোলেও ব্যয়বৃদ্ধির জন্য মানসিক উদ্বেগ। আশাভঙ্গযোগ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না। শস্য ক্ষতি। জমিজমা নিয়ে শত্রুতার সৃষ্টি। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থিগণ আশানুরূপ শুভ ফল লাভ করবে না। প্রবাসে সাফল্যলাভ। মৃগশিরানক্ষত্র জাত ব্যক্তির পক্ষেই বেশী অশুভ, অন্য ও পুনর্ব্বসুর পক্ষে তদনুপাতে কম।

কর্কট

শরীর ভালো যাবে না। ব্লাডপ্রেসার রোগীর পক্ষে সতর্ক হওয়া উচিত। পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান। ভ্রমণে অসুবিধা ও ক্লান্তি। শুভ শুভ কার্য্যারম্ভে মানসিক উৎপীড়ন ভোগ, ঈপ্সিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-পরাভবের। অর্থোপার্জ্জনের দিকে ব্যাঘাত। মানসিক দিয়ে কিছু অর্থনাশ মাসের মধ্যভাগে হোলেও ব্যয়াধিক্যহেতু মাসের শেষে অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ভোগ। ভোগবিলাসিতার জন্য ব্যয় ও ঋণ হোতে পারে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে কিছু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতা। টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারেও লোকসান। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শুভ, উপরওয়ালার সুনজরে পড়বার সম্ভাবনা। দেকার ব্যক্তির পক্ষে এইমাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে সাক্ষাৎ করা, পরীক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য। চাকুরিলাভের সুযোগ সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে শুভ মাস, এদের আয় বৃদ্ধি ও লাভ হবে। কর্কট রাশির স্ত্রীলোক সংসারের সকল দিকে সুবিধাসুযোগ পাবে, গার্হস্থালী ও প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, সেখেই আনন্দলাভ করবে। রোমান্টিক আবেষ্টনীও মধুর হয়ে উঠবে। পরীক্ষায় সাফল্য। পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির অপেক্ষা পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষা-জাত ব্যক্তিরই বেশী শুভ ফল হোয়া যায়।

সিংহ

এমাসটী উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র-জাত ব্যক্তির শুভফল মধ্যম। হস্তজাত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ।

উদর ও শুক্রপ্রদেশে পীড়া, জ্বর, আমাশয় ইত্যাদি সূচিত হয়। ব্লাডপ্রেসারের রোগীর সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্ত্রী পুত্রাদির পীড়া। পারিবারিক অবচ্ছন্নতা মাসের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়েই নানা রকমের ব্যক্তির সহিত কলহ, এজন্য অশান্তিভোগ ও চিত্তবিক্ষোভ। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ বৃদ্ধি। অর্থের দিক দিয়ে শুভই হবে। অনায়াসে টাকা পাবার যোগ। অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থলাভ। কোন প্রকার স্পেকুলেশন করলে ক্ষতি হবে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী ভালো নয়। ভ্রমণকারীদের পক্ষে কোন অসুবিধা ভোগ হবেনা। চাকুরি-জীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ হোলেও মাসের শেষের দিক শুভ নয়। যে সব স্ত্রীলোকের কোনপ্রকার প্রণয় সূত্রে আসবার সম্ভাবনা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি আশু হবে ও প্রণয় মিলন ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ের যোগাযোগ ঘটতে পারে। অবিবাহিতা মেয়ের বিবাহের সুযোগ আসবে এমন কি পাকাপাকি হয়ে যাবে। সাধারণী ব্যাপারে শুভ। স্বামী বিদেশে থাকলে এমাসে বাড়ী ফিরে আসবার সম্ভাবনা। মাসের শেষে কি চাকরের জন্য অসুবিধা ভোগ, পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে শুভ ফল।

কন্যা

এ রাশির পুরুষেরা নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করবে, স্ত্রীলোকের সুবিধা সুযোগও স্বাচ্ছন্দ্যভোগ করবে। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভাধিক্য। হস্তজাতগণ বিশেষ কষ্ট পাবে আর চিত্রানক্ষত্রজাত ব্যক্তিরা উত্তর ফল্গুনীর মতই শুভ ফল লাভ করবে। এমাসে প্রস্রাবের দোষ বা পীড়া, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত, উদর ঘটিত পীড়াদি যোগ আছে। শিকারিগণের পক্ষে খুব সাবধান হওয়া দরকার। পরিবারবর্গের সঙ্গে অসদ্ভাবসহিত অশান্তি ভোগ। অর্থ-নৈতিক অবস্থা ভালো, আয় হবে। আবিষ্কার ও গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জ্জন। মাসের শেষের দিকে বেশ ব্যয় হবে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী অশুভ, মামলা মোকর্দ্দমায় ব্যয় ও পরাজয়। চাকুরিজীবীরা অফিসে লাঞ্ছনা ভোগ করতে পারে। এজন্য উপরওয়ালার সঙ্গে বেশী কথা কাটাকাটি করা উচিত নয়, কাজের কৈফিয়ৎ দেবার সময়ে খুব সতর্কতা প্রয়োজন, এবং উপরওয়ালার কাছে যতটা কম যাওয়া যায় ততটাই ভালো। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করবে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, সামাজিক মর্য্যাদা লাভ, প্রণয়ীর অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আনন্দ ও উপভোগলাভ, সমাজ সেবায় সুনাম অর্জ্জন ও মানসিক সুখ। অবৈধ প্রণয়ে স্বার্থসিদ্ধিলাভ। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য হবে না।

তুলা

দুর্ঘটনায় রক্তপাতাদি ও অস্ত্রোপচার। শারীরিক দুর্বলতা। যদ্দ দিন ধরে যারা রোগে ভুগছে, তাদের পক্ষে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক অশান্তি। সামাজিক মর্য্যাদালাভ। আর্থিক সুযোগ আসবে তাদের স্বাগত। সাহিত্যসেবীর শুভ সুযোগ। গ্রন্থপ্রকাশকগণের পক্ষে শুভ। স্পেকুলেসনেও লাভ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালারা অনেক সুখ সুবিধা পাবে, তবে সময়ে সময়ে ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে মনোমালিন্য হবে। এমন কি মামলা হাঙ্গামাও হোতে পারে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উন্নতিযোগ, পদমর্য্যাদাবৃদ্ধি, উপরওয়ালার সুনজর প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের আয় ও লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সামাজিক সুখভোগ, যশ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। পরীক্ষার্থীগণের সাফল্য।

বৃশ্চিক

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অনেকটা শুভ। অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না, চক্ষুপীড়া, উদর পীড়া, ব্লাডপ্রেসার, পারিবারিক অশান্তি ভোগ। ব্যয়বৃদ্ধি, পাওনাদারের তাগাদা, মামলামোকর্দ্দমা, বন্ধুবিচ্ছেদ। গৃহ সুনিবেশ্রান্ত ব্যাপারে গোলযোগ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটী অশুভ। চাকুরিজীবীরা এমাসে নানা অসুবিধা ভোগ করতে পারে। গভর্ণমেণ্ট চাকুরিতে যাঁরা আছেন, তাঁদের সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীলোকগণ নানা অসুবিধা ভোগ করবে। পরীক্ষায় আশাভঙ্গ ভোগ।

ধনু

মাসটী বিশেষ শুভ। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরাই সব চেয়ে ভালো সময়। পূর্ব্বাষাঢ়া ও মূলানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ হোতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে,—সর্দ্দি ও অজীর্ণ রোগ অল্প পরিমাণে দেখা দেবে। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলতা। বিলাস-ব্যসন দ্রব্য ক্রয়। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সামান্য পরিমাণে অনুচর পরিচারকবর্গের সহিত কলহ হোতে পারে, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলে কোনপ্রকার গোলমালের সৃষ্টি হবে না। অর্থ লাভ, ব্যয়বাহুল্য। ভৃত্য বা কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় দ্রব্যাদি চুরি যাবার সম্ভাবনা ও তজ্জনিত ক্ষতি, সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এরূপ ঘটনা না ঘটবারই সম্ভাবনা।

বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী ভালোই যাবে। চাকুরিজীবীরা উন্নতির আশা করতে পারেন। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ হওয়ায় পদোন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে মাসের প্রথমে কিছু বাধা আসতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সম্প্রীতি এবং স্নেহ ভালোবাসা প্রাপ্তি। অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলতে থাকবে, বিবাহ হবার সুযোগও আসবে। পরীক্ষায় শুভফল।

অরুন্তুদ

মাসটী মিশ্রফল যাবে, মাসের শেষের দিকে কিছু কিছু অশুভ ঘটনা ঘটতে পারে। উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষেই শুভফলগুলি বিশেষ ভাবে ফলবে। শ্রবণানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিছু কিছু অশুভ সম্ভাবনা। শরীর মধ্যে মধ্যে খারাপ যাবে। অর্থ, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রক্তদুষ্টতা। সন্তানাদির সঙ্গে কলহ বিবাদ, তজ্জনিত মানসিক অশান্তি, চিন্তাকুলতা, সন্তানের পীড়াদি কষ্ট। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। চুরির ভয় আছে। বিষ চাকরের দ্বারা প্রতারণা।

ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে শুভ সুযোগ। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মধ্যম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অলঙ্কার লাভ, বিলাস ব্যসনের দ্রব্যাদি ক্রয়, বন্ধুভোজন, আমোদপ্রমোদ, গানবাজনা ও সভাসমিতিতে যোগদান ও আনন্দ উপভোগ। প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা লাভ। প্রণয়ের ক্ষেত্রে ও সাফল্যলাভ। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য ঘটবে না।

ক্ষুদ্র

ধনিষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে মাসটী উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং শতভিষানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। বুকে ব্যথা, অজীর্ণ, চক্ষুরোগ, হৃদ্‌রোগের প্রাবল্যতা। এজন্য সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক অশান্তি। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত বিরোধ? আর্থিক স্বচ্ছলতা ও লাভ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতির চাপে পড়ে ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে দুর্যোগ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ যাবে। কিছু কিছু মানসিক কষ্ট ও উদ্বেগ মাসের প্রথমে ঘটলেও শেষের দিকে বিশেষ ভালো হবে,—যারা অন্যায় পথে আছে, তাদের পদ থাকা হবে—চাকুরির ক্ষেত্রে পদার প্রতিপত্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর আয়বৃদ্ধি হবে না, ঐকভাবেই চলবে। লাভও বিশেষ হবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসটী শুভ, মাসের শেষে প্রণয়ের ব্যাপারে একটু সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য, অন্যথা বিশৃঙ্খলতা ও অপবাদ জনিত মানসিক কষ্টভোগ। সভার ও সামাজিকক্ষেত্রে এরাশিস্থ স্ত্রীলোকেরা সুখ লাভ করবে। পরীক্ষায় সাফল্য কৃতিত্ব অর্জ্জন।

মীন

পূর্ব্বভাদ্র ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে মাসটী খারাপ যাবে না কিন্তু উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা নানাপ্রকারে কষ্ট পাবে। জ্বরভাব, অজীর্ণ ও যকৃৎকোপ। পারিবারিকক্ষেত্রে নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি হবে। অতিরিক্ত ব্যয় হবে। উদ্বেগ ও চিন্তাধিক্য। অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো বলা যায়। নূতন পরিকল্পনা, গবেষণা ও আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হোলে সাফল্যলাভ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী ভালো নয়। নানাপ্রকার অসুবিধা ও মামলামোকর্দ্দমা। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ।

ব্যক্তিগত ফলপ্রকাশ

মেষলগ্ন—

কলহ বিবাদ। কিছু অর্থক্ষতি ও ব্যয়। মানসিক অশান্তি। অসন্তোষ ও বিপন্নতা। স্বাস্থ্যলাভ। আমোদপ্রমোদ। প্রণয়বৃদ্ধি। শত্রুবৃদ্ধি। কর্ম্মে বাধা ও অশান্তি। মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য। আয় বৃদ্ধি যোগ। বিদ্যায় বাধা পড়াশুনার ব্যাঘাত।

বৃষলগ্ন—

সম্মান, সাফল্য, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। শত্রুর উপদ্রব। পুত্রসন্তান লাভ। বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও উত্তম বিদ্যার্জ্জন। উত্তম প্রণয় লাভ। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। আয় সুখ।

মিথুনলগ্ন—

পীড়া। মানসিক অশান্তি। শারীরিক অসচ্ছলতা। দুঃখভোগ। বন্ধুর স্নেহ। আয়বৃদ্ধি ও লাভ। পদোন্নতির পথে বাধা। প্রণয়ভঙ্গ। বিদ্যায় কিছু উন্নতি।

কর্কটলগ্ন—

মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য। বিদ্যালাভে উত্তম। সন্তানলাভ। শত্রুনাশ। সম্পত্তিপ্রাপ্তিযোগ বা হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার। লোকাপবাদ হেতু মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য।

সিংহলগ্ন—

কর্ম্মে খ্যাতিলাভ। কর্ম্মোন্নতি। আয়বৃদ্ধি। স্বজনবিরোধ ও বন্ধু বিচ্ছেদ। অপবাদ। অবৈধ প্রণয়ের সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা। ব্যাধিভয়। মনস্তাপ। আকস্মিক ভয়। স্ত্রীর পীড়া বা জীবন সংশয়।

কন্যালগ্ন—

পীড়া ও ভয়। অর্থক্ষতি। নানা কর্ম্মে বাধা। মাতৃবিয়োগ। শোক প্রাপ্তি। ভ্রমণ। উত্তম আয়। অকারণ উদ্বেগ ও চিন্তাকুলতা। বিদ্যার্জ্জনে ক্ষতি। কর্ম্মপরিবর্ত্তন বা কর্ম্মস্থানে বদলি।

তুলা লগ্ন—

স্ত্রীর সহিত কলহ। সম্মান বা পুরস্কার লাভ। ধনযোগ। সৌভাগ্য লাভ। দুর্ঘটনার ভয়। সামান্য পীড়া। বিদ্যায় আশানুরূপ উন্নতি। কিঞ্চিৎ ব্যয়।

বৃশ্চিকলগ্ন—

ভ্রমণ। দুঃখকষ্ট। দুর্ঘটনার ভয়। শত্রু বৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু ব্যয়। কার্য্যে বাধাপ্রাপ্তির পর কিছু সাফল্য। স্ত্রীর দুর্ঘটনা বা পতনাশঙ্কা। সন্তানাদির পীড়া। বিদ্যা মধ্যম।

ধনু লগ্ন—

অর্থ ব্যয়। উত্তম আয়। পুত্র লাভ। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। সম্মান হানি। সৌভাগ্যোদয়। মাতার পীড়া। শত্রু বৃদ্ধি। অধীনস্থ লোকের বিশ্বাসঘাতকতা। প্রণয়ের যোগাযোগ। বিদ্যায় উন্নতি বিশেষতঃ সাহিত্যকলায় শিল্পবিদ্যায় সাফল্য।

মকরলগ্ন—

আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ মানসিকভাবে কষ্ট। অর্থক্ষতির যোগ্য ভয়। প্রাপ্য টাকা আদায়ে গোলযোগ। মানসিক অশান্তি। স্বজন বিরোধ। বিদ্যা শুভ।

কুম্ভলগ্ন—

আয় বৃদ্ধি। কর্ম্ম সাফল্য। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিজ্ঞান শাস্ত্র বিদ্যায় উন্নতি। মামলা মোকর্দ্দমায় জয় লাভ। সন্তান পীড়া। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। স্থান পরিবর্ত্তন। কর্ম্মক্ষেত্রে সুনাম।

মীন লগ্ন—

স্থান পরিবর্ত্তন। দুর্ঘটনার ভয়। অর্থনাশ ও আমোদপ্রমোদ। সৌভাগ্য। শারীরিক অসচ্ছলতা। প্রণয় বৃদ্ধি। কর্ম্মের প্রসারতা। বিদ্যায় বাধা। গুরুজন বিয়োগ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২০৫ (রিচার্ডসন ৬৮, মর্টিমোর ৪৪ নট আউট। বেনড ৪০ রানে ৪ উইকেট) ও ২১৪ (এডরীচ ৫৭, কাউড্রে ৪১। লিণ্ডওয়াল ৩৭ রানে ৩ উইকেট, গ্রেগরি ৪১ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৫১ (ম্যাকডোনাল্ড ১৩০, গ্রাউট ৭৪, বেনড ৬৩) ও ৭০ (১ উইকেটে। ম্যাকডোনাল্ড ৩২ নট আউট

মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৫ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। ফলে ১৯৫৮-৫৯ সালের ৫টি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ায় অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং খেলা ড্র ১। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়ার এই 'এ্যাসেজ' লাভের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনডের কৃতিত্ব এবং অবদান সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বলাতে কি ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই টেষ্ট-সিরিজটাই রিচি বেনডের টেষ্ট সিরিজ হিসাবে টেষ্ট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম টেষ্ট খেলার এক সপ্তাহ আগে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিসাবে রিচি বেনডের নাম প্রকাশিত হয়। সারা ক্রিকেট মহলে এই ঘোষণা কম বিস্ময় সৃষ্টি করে না। ৫ম টেষ্ট খেলায় বেনড টসে জয়ী হয়ে ইংলণ্ডকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। টসে জিতে ভাল উইকেটে বিপক্ষ দলকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দিয়ে সেই বিপক্ষ দলকে শেষ পর্য্যন্ত হারাতে পারা গেছে এমন দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজে খুব কমই আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অধিনায়ক জনি ডগলাস টেষ্ট খেলায় এইভাবের সিদ্ধান্ত নিয়ে জয়ী হয়েছিলেন ; তাঁর পর বহু অধিনায়কই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে এ চেষ্টা একেবারে জুয়া খেলার সামিল বলে মেনে নিতে হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনড আলোচ্য ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজের ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলায় সেই অসম্ভব কাজে সিদ্ধিলাভ ক'রে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন।

অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলার সর্ব্ব বিভাগে ইংলণ্ডের থেকে উন্নত খেলার পরিচয় দিয়েছে। ইংলণ্ডের টেষ্ট সিরিজে পরাজয়ের প্রধান কারণ ব্যাটিংয়ে অসাফল্য, বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যানরা ইনিংসের গোড়াপত্তন মোটেই সুদৃঢ় করতে পারেন নি।

৫ম টেষ্ট খেলা অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে আর একদিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্বখ্যাত ফাস্ট বোলার আর লিণ্ডওয়াল তাঁর টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের ২১৯টি উইকেট লাভ ক'রে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ক্ল্যারী গ্রিমেটের—২১৬টি। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড—ইংলণ্ডের এ্যালেক্স বেডসারের—২৩৬টি।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ক্রিকেট খেলা ৮৩ বছরের ঐতিহ্যে বিশ্বখ্যাত। এ পর্য্যন্ত ১৭৮টি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের থেকে ১২টি টেষ্ট খেলা বেশী জয়ী হয়েছে। দু'দেশের ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল—

	অষ্ট্রেলিয়ার জয়	ইংলণ্ডের জয়	ড্র	মোট খেলা
অষ্ট্রেলিয়াতে	৪৩	৩৮	৬	৯৭
ইংলণ্ডে	২১	২৪	৩৬	৮১
	৭৪	৬২	৪২	১৭৮

রঞ্জি ট্রফি :

বোম্বাই ২৯৪ (আমরোলীওয়ালা ১৩৯, দালভী ৪৮ ; দি চ্যাটার্জী ৭৬ রানে ৬ উইকেট) ও ৫৩৬ (আপ্তে ১৫৭, কেনী ১১১, ওয়াদেকার ৮৪)

বাংলা : ১৭৬ (পি রায় ৪৩ ; হারদীকার ২৪ রানে ৪, দেশাই ৫৮ রানে ৩ উইকেট) ও ২৩৪ (পি রায় ৯৪ সিলেটি ৫৮ ; দেশাই ৩৭ রানে ৪ উইকেট)

জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে বোম্বাই ৪২০ রাণে বাংলাকে পরাজিত করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তান :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ১৪৬ (ফজল মামুদ ৩৫ রানে ৪, নাসিমুল গনি ৩৫ রানে ৪ উইকেট) ও ২৪৫ (বুচার ৬১, সোলোমন ৬৬। ফজল মামুদ ৮৯ রানে ৩, সুলাউদ্দিন ১৮ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান : ৩০৪ (হানিফ মহম্মদ ১০৩, সৈয়দ আমেদ ৭৮। হল ৫৭ রানে ৩, গিবস ৯২ রানে ৩)ও ৮৮ (কোন উইকেট না পড়ে)

করাচিতে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ১০ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। খেলার ৪র্থ বা শেষ দিনে পাকিস্তান জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৮ রানের জন্যে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট খেলে কোন উইকেট না হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে দেয়। ফজল মামুদ তাঁর টেষ্ট ক্রিকেট জীবনের শততম উইকেট লাভ করেন। পাকিস্তানের পক্ষে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন।

বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেষ্ট খেলায় পাকিস্তানের পক্ষে ফলাফল : পাকিস্তানের জয় ৭, হার ৬, ড্র ১১।

পাকিস্তান : ১৪৫ (হল ২৮ রানে ৪, রামাধীন ৪৫ রানে ৩ উইকেট) ও ১৪৯ (হল ৪৯ রানে ৪, এ্যাটকিনসন ৪৯ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৭৬ (ফজল মামুদ ৩৭ রানে ৬ উইকেট) ও ১৭২ (ফজল মামুদ ৬৬ রানে ৬ এবং গোলেস ৪৮ রানে উইকেট)

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ৪১ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। খেলা শেষ হ'তে ২ দিন বাকি থাকতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। ফজল মামুদ ১২টা উইকেট পান ১০০ রান দিয়ে। এই জয়লাভের ফলে পাকিস্তান 'রাবার' লাভ করে। টেষ্ট সিরিজের তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে পাকিস্তান ২টিতে জয়ী হয়।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান :

ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত ২৪তম জাতীয় এ্যাথলেটিক্ চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে প্রথম তিনটি দলের পয়েন্ট—১ম সার্ভিসেস ১২০ পয়েন্ট, ২য় পাঞ্জাব ৪৪ পয়েন্ট এবং ৩য় মাদ্রাজ ১৮ পয়েন্ট।

মহিলা বিভাগের ফলাফল : ১ম বোম্বাই ৩০ পয়েন্ট। বালকদের বিভাগে ১ম পশ্চিম বাংলা ১৯ পয়েন্ট এবং বালিকাদের বিভাগে ১ম মহীশূর ৩২ পয়েন্ট। চার দিনের অনুষ্ঠানে মোট ২৪টি সর্বভারতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়।

সন্তোষ ট্রফি :

১৯৫৮ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। ১৫ বার সন্তোষ ট্রফির খেলার মধ্যে বাংলা ১২ বার ফাইনালে খেলে ৯ বার ট্রফি পায়। সূচনা থেকে (১৯৪১) বাংলা পর্যায়ক্রমে ১০ বার ফাইনালে উঠে ৭ বার সন্তোষ ট্রফি পায়। বাংলা মাত্র ৩ বার ফাইনালে উঠতে পারেনি।

আলোচ্য বছরের খেলায় সার্ভিসেস দল সেমি-ফাইনালে গত দু' বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হায়দ্রাবাদ দলকে ৪-২ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। সার্ভিসেস দলের পক্ষে লাহিড়ী 'hat-trick' করেন।

বাংলা বনাম বোম্বাইয়ের সেমি-ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন ১—১ গোলে ড্র যায়। ২য় দিনও খেলাটি ড্র যায়। উভয় দলই ২টি ক'রে গোল করে। বাংলা দল দু'বার অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করতে পারেনি। বোম্বাই শেষ মিনিটে গোল দিয়ে খেলাটি ড্র করে। ৩য় দিন বাংলা ২—১ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে।

সাহিত্য সংবাদ

একটি প্রণয় সুর : পাবলিশার্স—কবিতা পুস্তক

কবি পাবলিশার্স কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে ২৫টি ছোট কবিতা—সনেট আছে। প্রার্থনা কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

যাবার আগে, দুঃখ নাও, কোনো ক্ষতি নাই,
হায় সাথে যদি ঈশ্বর প্রণয়তা পাই।

অপর এক কবিতায়—

ছেড়ে দাও কক্ষ দ্বার, যে ছিল সুন্দর,
নির্জন আলোকে ঈশ্বর-চাঁদের অক্ষর।

আবার কবি বলিতেছেন—

আবার প্রতীক্ষা করি, তবে পাব ফিরে
সে সুখদেহ; তবে ধরা দেবে সে-সুন্দর
মুক্ত হাতে ছিনিয়ে নেব অজস্রতর।

এই কবির অন্তরের প্রার্থনা। তরুণ কবি নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সকল চিত্তরঞ্জন প্রণয় সকলের মনে সাড়া দিবে।

প্রকাশক : তুলি কলম, ৫৭-এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১৲

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গবিহঙ্গ : বাণী রায় প্রণীত

কবি জীবনানন্দ দাশই গ্রন্থকর্ত্রীর নিঃসঙ্গ-বিহঙ্গ। এঁর সঙ্গে জীবনানন্দের পরিচয়ের দিনগুলি সংখ্যায় অধিক ছিল না, কিন্তু গভীরতায় তাহা ও ঘনিষ্ঠ নীড় ছিল। ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনাও কাব্যের কিছু কিছু সমালোচনা উক্ত গ্রন্থে আছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকর্ত্রী আলোচনা করেছেন আরও অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীকে নিয়ে তাঁর 'অভিশপ্ত গন্ধর্ব' 'কীর্তিনাশা ফুলে' প্রভৃতি গ্রন্থে। স্বর্গত নাট্যশিল্পী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি-মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাস সান্যাল ও রবীন্দ্রজীবনের প্রেরণার উৎস কাদম্বরী দেবী নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। সাগরপারের কয়েকজন মনীষীর চরিত-কথা ও আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

গ্রন্থখানি প্রবন্ধ-সঙ্কলন। প্রাঞ্জলতার ও গ্রন্থকর্ত্রীর বিশ্বস্ততার পরিচয় প্রত্যক্ষ করা গেছে। যে ধরণে 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' লেখা হয়েছে, এ-ধরণে লেখা আমাদের সাহিত্যে এখনও তেমন প্রচলন হয়নি, সাগর-পারের সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রচুরভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভাল ও মন্দ উপাদান থেকে প্রকৃত ব্যক্তিসত্তার পরিচয় দেবার প্রচেষ্টাই এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থকর্ত্রী বলেছেন—'সাহিত্য বিচারে' আমি সাহিত্যিককে জড়িত করে প্রোফাইলের প্রথার নূতন আঙ্গিক বাংলায় আনবার চেষ্টা করেছি।' এঁর সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। গ্রন্থখানির মধ্যে কৌতূহলপ্রদ ঘটনার অবতারণা আছে, কাব্যও সাহিত্যের আলোচনা আছে; আর আছে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশেচ্ছা। এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি পড়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি, আমাদের বিদগ্ধ পাঠকপাঠিকারাও পড়ে খুব তৃপ্তিলাভ করবেন। মুদ্রণ প্রচ্ছদপট, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।

[প্রকাশক—মুখার্জী বুক হাউস, ৯বনং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য—তিন টাকা আট আনা]।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নতুন রেকর্ড

কয়েকখানা কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

GE 21917—মাধুরী বাণীচিত্রের দুখানা গান পঙ্কজ মল্লিকের সুরসৃষ্টিতে শোভাযাত্রা চৌধুরীর সুস্পষ্ট কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে। গান দুখানা—'আমাকে ভুলিয়ে ভুল মালতী বধূর' ও 'বন্ধু এলনা, কারফুতে হইল শয়ন।'

GE 21918—'ওগো গাইয়ে গান গাও' ও 'আগে জানলে আমি যাইতাম না'—গান দুখানা গেয়েছেন যথাক্রমে সুচিত্রা সেন ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

GE 21919—কুমারী নবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিতকণ্ঠে দুখানা মনোরম আধুনিক গান—'আমারে লেগে গান' ও 'ডাগর ডাগর নয়ন মেলে'।

GE 21920—'গোলাপের পাপড়ি ঝরা' ও 'বিষুক বিষুক 'বিষুক তুলে'—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের মধুকণ্ঠে দুখানা আধুনিকগান সুশ্রাব্য হয়েছে সুরসংযোজনা।

GE 21921—অভিনেত্রী শিল্পী পারুলদেবী ভট্টাচার্যের কণ্ঠে দুখানা রামপ্রসাদী গান—'মন তোমার এই ভ্রম গেল না' ও 'চাইনা মাগো যাতে হতে' সত্যিই মনে ভাবের উদ্রেক করে।

GE 21922—সঙ্গীতশিল্পী-শিল্পী পাঞ্চালী বসুর কণ্ঠে 'ঐ পাখী জানে' ও 'প্রথম মুকুল তুমি হয়োনা' দুখানা আধুনিক গান ভাবব্যঞ্জনায় ও সুরমাধুর্যে শ্রোতার মনকে দোলা দেয়।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৬৬

লেখ-সূচী

১। মাঘ কবির কাব্যকলা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য ৫১৩
২। লৌপদী (কবিতা)—বেতাল ভট্ট ৫১৭
৩। নতুন বাসর (গল্প)
রবীন্দ্রকমল কর ৫১৮
৪। রবীন্দ্রকাব্যে সসীম ও অসীম (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৫২১
৫। টেরাকোটা শিল্প ও বাঙালী (প্রবন্ধ)
শ্রীদুর্গাচরণ সরকার ৫২৩

চিত্র-সূচী

১। মন্দির দ্বারে, ২। ওয়ল্লার হোটেলে ছাত্র-ছাত্রীদল খাচ্ছে, ৩। পহলগাম মনকে ডুবিয়ে দেয়, প্রাজা হোটেল, ৪। পহলগামের—পাইন—পাহাড় তুষার, ৫। পহলগামের সাঁকো, ৬। শ্রীঋটিক চট্টোপাধ্যায়, ৭। বেলগড়িয়া গ্রামোৎসবে সম্মিলিত ব্যক্তিগণ, ৮। আর, ডি, বনশল প্রযোজিত 'শশীবাবুর সংসার' চিত্রের একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও জীবেন বসু। ৯। কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার।

লেখ-সূচী

৬। জাতীয় স্বল্প-সঞ্চয় পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)
আশা গংগোপাধ্যায়
৭। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান (প্রবন্ধ)
শ্রীসুরদেব রায় ৫২৬
৮। অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধ)
প্রিয়তোষ মৈত্রেয় ৫২৮
৯। সাবিত্রী (কবিতা)—বনবেণু ৫৩০
১০। পুরুষস্য চরিতম্ (গল্প)—দেবাচার্য ৫৩১
১১। কবি মুকুন্দরামের শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী ... ৫৩৭
১২। প্রণয়ী (কবিতা)—শ্রীবিমল রায় ৫৪৩
১৩। পিতম্ (কবিতা)—বন্দেআলি মিয়া ... ৫৪৩
১৪। দেবভূমি—বদরীনাথ (ভ্রমণ কাহিনী)
শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী ৫৫৪
১৫। গেলিনীর জীবন কথা (প্রবন্ধ)
সুনীলকুমার নাগ ৫৫৭

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র
দিনের শেষে
বিশেষ চিত্র
ঝড়ের সংকেত ও ঝড়ো হাওয়া

দিলীপকুমারের

অনামী—(২য় সংস্করণ) পূজার আগেই বাহির হইয়াছে। ইহাতে আছে :—

মণি-মঞ্জুষা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন ও হিন্দী কবিতা থেকে অনুবাদ।

কবিতাকুঞ্জ—দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন—বহু নূতন কবিতা।

গীতিগুঞ্জন—দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গানের সংকলন—বহু নূতন গান।

মীরার ভজন—ইন্দিরা দেবীর সুধাঞ্জলির প্রায় ১০০ কবিতার অনুবাদ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের প্রাক্‌কথন সহ।

পত্রাবলী—(বাংলায়)—রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের, সুভাষচন্দ্রের, মোহিতলালের, শ্রীগোপীনাথের ইত্যাদি।

পত্রাবলী—(ইংরাজীতে)—শ্রীঅরবিন্দের, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের, সার পল চিটকলের, জর্জ রাসেলের ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রাক্‌কথন সহ। মূল্য—৬·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সঙ্গীতাচার্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত ও কাহিনী

মূল্য—৩·৫০

সঙ্গীতাচার্য তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির স্পর্শ দিয়ে এই গ্রন্থখানাকে সঙ্গীতময় ও রসমধুর ক'রে তুলে সঙ্গীতানুরাগীদের ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান—২৫।ই, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার কলিকাতা-৪

কাশ্মীর যাচ্ছেন ?

খ্যাতিমান ভ্রমণ কাহিনী লেখক

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কাশ্মীর

পড়ুন। বহু চিত্র শোভিত। নূতন ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হল

মূল্য—৪·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১৬। সংগীত : কথা ॥ শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুর ও স্বরলিপি ॥ পঙ্কজকুমার মল্লিক ৫৪৯

১৭। আদি-কবি কৃত্তিবাস (কবিতা) শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৫৫১

১৮। বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য (প্রবন্ধ) শ্রীতারকচন্দ্র রায় ৫৫২

১৯। উদয় অস্ত (উপন্যাস)—বনফুল ৫৫৪

২০। ব্যাকুল (কবিতা) শ্রীদিলীপকুমার রায় ৫৫৭

২১। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদনের রস-চিত্র কল্পনা (প্রবন্ধ) শ্রীকিশোরীরঞ্জন দাশ ৫৫৮

২২। প্রতীক্ষা (কবিতা)—পুষ্প সান্যাল ৫৬০

২৩। ভাবপ্রবাহ (কিশোর জগৎ) উপানন্দ ৫৬১

২৪। উপনিষদের ভূমিকা (প্রবন্ধ—কিশোর জগৎ) চিত্রিতা দেবী ৫৬৩

২৫। বৈশাখী (কবিতা—কিশোর জগৎ) শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী

২৬। কাজল-প্রদীপ (গল্প—কিশোর জগৎ) শ্রীআশাবরী দেবী

২৭। তোমরা কি জানো (কিশোর জগৎ) সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

২৮। কলহনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী) ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

২৯। ভালোবাসা (কবিতা) বিবোন্দু পালিত

৩০। একটি প্রেমের ব্যাপার (অনুবাদ গল্প) শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় ... ৫৭৫

৩১। বৈদেশিকী—শ্রীঅতুল দত্ত ... ৫৭৮

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আস্ট্রিক ও জ্যোতির্বিদ্‌

জ্যোতিষসম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

এম্‌আর-এ-এস্‌ (লণ্ডন), নিখিল ভারত গণিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীস্থ বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ম্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অল্প পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে অল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (অব্যর্থ)। সাধারণ—৭৷৵০, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৷৵০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৷৵০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য)। **লক্ষ্মীসরস্বতী কবচ**—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ১৷৵০, বৃহৎ—৩৷৵০। **মোহিনী (বশীকরণ) কবচ**—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরসঙ্গত স্থির হয় ১১৷০, বৃহৎ—৩৪৷৵০, মহাশক্তিশালী ৩৮৷৵০ **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্ম্মোন্নতি, উপরিস্থ ব্যক্তিবর্গ সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯৷৵০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৷৵০, মহাশক্তিশালী—১৮৷০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)। **নৃসিংহ কবচ**—সর্বপ্রকার দুরারোগ্য রোগের আরোগ্য, বংশরক্ষা, ভূত, প্রেত, পিশাচ হইতে রক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র ৭৷০, বৃহৎ—১৩৷০, মহাশক্তিশালী—৩৩৷০। (ভিঃ পিঃ করা হয় না।)

জ্যোতিষসম্রাট মহোদয় প্রণীত "জন্ম মাস রহস্য"—কোন্ মাসে জন্ম হইলে কিরূপ ভাগ্য, স্বাস্থ্য, বিবাহ, কর্ম, বন্ধু, জন্মের গতি, স্বভাব ইত্যাদি বিষয় জানিতে পারিবেন। ৷৹। **বিবাহ রহস্য ২৲ খনার বচন ২৲ জ্যোতিষ শিক্ষা ৩৷০**

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ও পণ্ডিতজীর নিজবাটী ৫০।২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশপথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট), কলিকাতা—১৩।

সাক্ষাতের সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ফোন ২৪—৪০৬৫। ব্রাঞ্চ ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৬, ফোন ৫৫—৩৯৮৫।

সময় প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা। সেণ্ট্রাল ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩।

লেখ-সূচী

৩২। মানবতার সংগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে—
শচীন সেনগুপ্ত ... ৫৮১
৩৩। যুগ প্রয়োজনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু (কবিতা)
অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৫৮৮
৩৪। সাময়িকী ৫৯০
৩৫। লীলাভূমি (উপন্যাস)
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫৯৭
৩৬। মাতৃবাৎসল্যের রূপায়ণে কবিশেখর
অধ্যাপক গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ... ৬০২
৩৭। নারী শুধু গৃহিণীই নয় (মেয়েদের কথা)
সুপ্রিয়া ঠাকুর ... ৬০৮
৩৮। রাঙা আলুর পানতোয়া (মেয়েদের কথা—রান্নাঘর)
শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী ... ৬১১
৩৯। যৌবন ভাণ্ডার লাগি সাধনের খেলা (কবিতা)
'বৈভব' ... ৬১১

লেখ-সূচী

৪০। ডাক্তার (গল্প)—শ্রীসতীরঞ্জন রায়
৪১। জিজ্ঞাসা (কবিতা)
প্রভা দত্ত
৪২। পট ও পীঠ—শ্রী'খ'—
৪৩। 'গানের ছলে যে হার গাঁথি'
কুমারেশ ভট্টাচার্য
৪৪। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে
জীবনকৃষ্ণ দাস
৪৫। ফার্ট বয় (গল্প)
বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৪
৪৬। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী (প্রবন্ধ)
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬২৮
৪৭। গ্রহ-জগৎ (জ্যোতিষ)—উপাধ্যায় ৬৩০
৪৮। খেলা-ধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৬৩৭
৪৯। সাহিত্য সংবাদ ৬৩৯
৫০। নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী ... ৬৪০

সিন্ধু
প্রকৃত
পাত্রের
রায়
পাখি
[৯·০০]

অন্য
নীলকণ্ঠ ও
প্রত্যহ
[৫·০০]

বিক্রমাদিত্য
যুদ্ধের ইয়োরোপ
[৪·০০]

● উপন্যাস

বিচারক : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ২·৫০ ॥ বিপিনের সংসার : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪·০০ ॥ জাগরী : সতীনাথ ভাদুড়ী : ৪·০০ ॥ জলজঙ্গল : মনোজ বসু : ৫·০০ ॥ বিষের ধোঁয়া : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪·০০ ॥ তামসী : অন্নদাশঙ্কর : ৫·০০ ॥ শ্রীমতী কাকে : সমরেশ বসু : ৬·০০ ॥ মাধুর : শরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪·০০ ॥ প্রদক্ষিণ : সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : ৪·০০ ॥ দেহমন : নরেন্দ্রনাথ মিত্র : ৪·০০ ॥ নারী ও নগরী : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : ৪·৫০ ॥

✱ রম্যরচনা

পঞ্চতন্ত্র : সৈয়দ মুজতবা আলী : ৩·৫০ ॥ রাজোয়ারা : দেবেশ দাশ : ৩·৫০ ॥ লৌহকপাট : অন্নদাশঙ্কর : (১ম) : ৩·৫০, (২য়) ৫·০০, (৩য়) ৫·০০ ॥ আড্ডা : গোপাল হালদার : ২·০০ ॥ বইয়ের বদলে : রঞ্জন : ৩·০০ ॥ স্বর্গ যদি কোথাও থাকে : রূপদর্শী : ৩·০০ ॥ ডাক্তারের ডায়েরী : আনন্দকিশোর মুন্সী : ৩·০০ ॥

● ভ্রমণ-কাহিনী

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে : কালকূট : ৫·০০ ॥ দুয়ার হতে অদূরে : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : ৩·৫০ ॥ দেবতাত্মা হিমালয় : প্রবোধকুমার সান্যাল : (১ম) : ৮·৫০, (২য়) : ১০·০০ ॥ পথ চলি : মনোজ বসু : ৩·০০ ॥ বিদেশ বিভুঁই : দক্ষিণারঞ্জন বসু : ৬·০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা—১২

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

নিরুদ্দেশ

"জগৎ আগাইবে, জনম পিছাইবে, প্রাচুর্য আসিবে মনের দৈন্য লইয়া, সম্পদ আসিবে ঔদ্ধত্য লইয়া, অকল্যাণ আসিবে কল্যাণের বেশে, আমরা চলিয়াছি—চলিব"—পৃথিবীর তেপান্তরে নিরুদ্দিষ্ট পথে—পিছনে জমিয়া উঠিয়াছে অশ্রুসায়র। দাম—৪৲

দেহ ও দেহাতীত

কল্পনাচারী মানব-মন যুগে যুগে তার জীবনে রচনা ক'রেছে স্বপ্নের মায়াজাল। তাই তার পাওয়ার মাঝে আছে না-পাওয়ার বেদনা—না-পাওয়ার মাঝে আছে পাওয়ার আনন্দ। দেহ ও দেহাতীত-জীবনে ইহাই মানবের চিরন্তন জীবনেতিহাস। দুইটি নর-নারীর জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার পূর্ণ আলেখ্য।

দাম—৪৲

পেতনী

যুগে যুগে রক্তাক্ত বিপ্লবই পৃথিবীকে দিয়াছে অগ্রগতি। মহামানবগণের প্রেমের বাণী—ত্যাগের বাণী—মানুষের বধির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। আণবিক শক্তির দম্ভে মানুষ আপনার মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে পৃথিবীর দ্বারে।

১ম পর্ব—২·৫০ ২য় পর্ব—২৲০

কারটুন

তিনটি বোহিমিয়ান শিল্পীর বিচিত্র জীবন-কথা—হাসি ও অশ্রুর সমন্বয়ে অপরূপ। দাম—২·৫০

বিশ্ব মানব

যুগান্তর বলেন: তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই বৃহৎ উপন্যাসখানি বঙ্গ-সাহিত্যের এক নূতন সৃষ্টি। দাম—৪৲

শ্রেষ্ঠ গল্প

(অ-নির্বাচিত)

দাম—চার টাকা

পৃথ্বীশবাবুর দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও গভীর—জীবনের মর্মমূল হইতে সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করাই উহার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ আর দুঃখের তুচ্ছ ইতিকথাও তাঁহার অপূর্ব লেখনী স্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠে। জীবনের নশ্বর পটভূমিকায় অঙ্কিত ক্ষুদ্র মানুষের অতিক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার লিপিচাতুর্যে অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। একুশটি গল্পের সুবৃহৎ সংকলন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী

অনুরূপা দেবীর

—অমর সাহিত্যসাধনা—

মন্ত্রশক্তি ৪-৫০ পোষ্যপুত্র ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲

পরীবের মেয়ে ৪-৫০ হারানো খাতা ৩৲

পথের সাথী ৩৲ বাগ্‌দত্তা ৫৲ পূর্বাপর ৪৲

—সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে—

নূতন রূপসজ্জায় পুনর্মুদ্রিত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস

রামগড় ৪-৫০

যে মহিমময়ী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্ত বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কল্পিত জীবনীয় রসায়ন। ইহা মৃতকল্পকে জীবন, ব্যাধিতকে স্বাস্থ্য, দুর্ব্বলকে বলদান করে এবং ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনাভরা মনমরা হতাশ জীবনে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দের ধারা উৎসারিত করে। ইহা সেবনে পাচকাগ্নি ও জীর্ণ শক্তি বাড়ে, যকৃৎ স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করে, অম্ল ও অরুচি দূর হয়, দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগান্তে এবং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে ইহা মন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। কঠিন রোগে ক্ষীণনাড়ী মুমূর্ষুর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া নিষ্পন্দ হওয়ার উপক্রমে ইহা নূতন জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক নাড়ীর গতি আনিয়া দেয়।

পাইণ্ট—৪৲ টাকা, কোয়ার্ট—৭৷৷০ টাকা

অধ্যক্ষ মধুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয় ডাকা লিঃ।

হেড অফিস: ৫২।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—ভারত ও পাকিস্থানে সর্ব্বত্র।

শিল্পী : শ্রীনিবাসন্তর কুণ্ডু

দিনের শেষে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

CENTRAL REFERENCE LIBRARY ROOM

উপন্যাসের মত জীবন

শরৎচন্দ্রিকা । নন্দদুলাল চক্রবর্তী

আত্মজীবনের তথ্য রহস্যে আবৃত রেখেছেন শরৎচন্দ্র। বলেছেন—'আমার যা-কিছু বলবার তার সবই আছে আমার বইয়ে। এত বেশি আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা আর কারো লেখায় পাবে না। আমার বই থেকে যদি কেউ আমার জীবনের সব কথা উদ্ধার করতে না-পারে, সে আমার জীবনের কথা লিখতে পারবে না।' শরৎচন্দ্রের এই নির্দেশ সযত্নে পালন করেছেন লেখক নন্দদুলাল চক্রবর্তী। দীর্ঘ দিনের সন্ধানে বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, গবেষণা করেছেন, তারপর রসান দিয়ে পরিবেশন করেছেন 'শরৎচন্দ্রিকা'। দাম ৪·৫০

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন । রবি রায়

বাংলাভাষায় মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে এ ধরণের বই এই প্রথম। সব চেয়ে বড় গুণ এর আলোচনা-পদ্ধতি। মার্ক্সীয় দর্শন যে একদিনে রচিত হয়নি, তার পিছনে আছে পাশ্চাত্য দর্শনের আড়াই হাজার বছরের পটভূমি, তা দেখাবার জন্যে পাশ্চাত্যের প্রথম দার্শনিক থেলস্ থেকে হেগেল্ পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকের ধারাবাহিক পরিচয় গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে মার্ক্সীয় দর্শনের মর্ম গ্রহণ যেমন সহজ হবে তেমনি দর্শনে উৎসাহী ছাত্রদের বিশেষ কাজে আসবে। দাম ৫৲

কৈলাস-মানসের পথে । ডক্টর অতুলচন্দ্র লাহিড়ী

কৈলাস মানস-সরোবর—এই মহাতীর্থের ডাকে মন সাড়া দেয়নি এমন ভারতীয় বিরল। কিন্তু তাহলেও এই তীর্থ দর্শনের সংকল্প অনেকেরই মনে শুধু যে কল্পনাতেই থেকে যায় তার একটি প্রধান কারণ—এই পথপরিক্রমার উপযুক্ত তথ্যবিবরণীর অভাব। ডক্টর অতুলচন্দ্র লাহিড়ীর গ্রন্থ সেই অভাব দূর করবে। সাধারণ গৃহস্থের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা—সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এই ভ্রমণকাহিনীতে উন্মুখ যাত্রী পাবেন এমন অনেক তথ্য যাতে এই অজানা পথ তাঁর কাছে অনেকটা জানা হয়ে যাবে, অভিজ্ঞ পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হতে পারবেন। ২৪খানা আলোকচিত্র। সিগনেট বুকশপ পরিবেশিত। দাম ৩৲

নতুন সংস্করণ

আবোলতাবোল । সুকুমার রায়

বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নম্বরের বই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তালিকা করা যায়, সে তালিকা যেখানেই শেষ হোক, এর প্রথম স্থান অবধারিত। যুগে-যুগে যত ছেলেমেয়ে আসবে এ-দেশে, প্রত্যেককে তার আনন্দের অভিজ্ঞতা নিতে হবে এ-বই থেকে। এ শুধু একটা বই নয়, এ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। দাম ২·২৫, ২·৭৫

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
বালিগঞ্জে : ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

সিগনেট বুকশপ

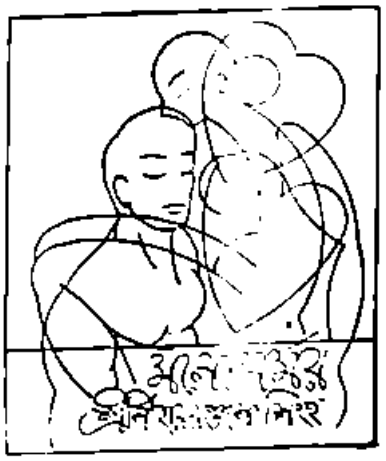

আধুনিক গল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ২৪টি গল্পে নরনারীর নিখুঁত মনস্তত্ত্ব। ২০৮ পৃষ্ঠার এই শ্রেষ্ঠ গল্প-সংগ্রহখানি প্রত্যেক পাঠকের মনে ও প্রতিটি পাঠাগারে নিঃসন্দেহেই স্থান পাইবার দাবী রাখে।

দাম—৩·৫০

ক্যালকাটা বুক হাউস

১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমারের

সুধাঞ্জলি

হিন্দীতে ১৮৬ মীরা ভজন—সচিত্র। দিলীপকুমার, ইন্দিরা দেবী ও ঠাকুরের ছবি, ইংরাজি অনুবাদ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের ভূমিকা-সহ। দাম—৩·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

অজয় চক্রবর্ত্তীর (ধুবড়ী, আসাম)

সর্ব্বজন প্রশংসিত বই ঃ—

মহাকবি (নাটক)	২·৫০
শিল্পীর মৃত্যু (গল্প)	২·৭৫
কায়া ও ছায়া (গল্প) ২য় সং	১·২৫

কোটিপতি নিরুদ্দেশ

গত ২।১।৫৯ তারিখে 'যুগান্তর—সব পেয়েছি আসরের' বার্ষিক উৎসবে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকবর্গ অভিনীত মন্মথ রায় রচিত দেড় ঘণ্টার একাঙ্ক হাসির প্রহসন 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ' এবং তৎসহ মন্মথ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ বড় তিনটি নাটিকা : 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজনটী' ও 'রূপকথা' একত্রে এক খণ্ডে, মূল্য তিন টাকা। প্রত্যেকটি নাটকেই একটিমাত্র দৃশ্যপট।

গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বৈশাখ—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মাঘ কবির কাব্যকলা

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ মাঘ-কবির শিশুপালবধের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলেছিলেন—

যাঁরা শব্দ ও অর্থের প্রয়োগসৌষ্ঠব উপভোগ করতে চান, যাঁরা গুণ ও অলঙ্কারের মর্মগ্রহণে আগ্রহশীল, যাঁরা সৎকাব্যের ধ্বনিপথে বিচরণ করতে অভিলাষী, যাঁরা উত্তাল ভাবতরঙ্গময় রসামৃতপ্রবাহে অবগাহনেচ্ছু, তাঁদের জন্যই আমি মাঘের 'সর্বংকষা' টীকা লিখছি।

যে শব্দার্থপরীক্ষণপ্রণয়িনো যে বা গুণালঙ্কৃতি-
শিক্ষাকৌতুকিনো বিহর্তুমনসো যে চ ধ্বনেরধ্বনি।
মুক্ত্যুদ্ভাবতরঙ্গিতে রসসুধাপূরে নিমজ্জন্তি যে
তেষামেব কৃতে করোমি বিবৃতিং মাঘস্য সর্বংষাম্।

এই কাব্যের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বীররস এর প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কবি তাঁর অপূর্ব বর্ণনার শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসেরই সহায়তা নিয়েছেন। ইন্দ্রপ্রস্থযাত্রা এর বর্ণনীয় বিষয়। শিশুপালনিধনে এর সমাপ্তি। ধন্য মাঘকবি! আর ধন্য আমরা যারা তাঁর সূক্তিরসের আস্বাদ গ্রহণ করছি।

নেতাস্মিন্ বহুনন্দঃ স ভগবান্ বীরঃ প্রধানো রসঃ
শৃঙ্গারোদ্ভিরলঙ্কৃতির্বিজয়তে পূর্ণা পুনর্বক্রতা।
ইত্যুদ্গ্রহণমাদ্যপার্থবিষয়ৈশ্চিত্তাবসাদঃ ফলং
ধন্যো মাঘকবির্যদঃ তু কৃতিনস্তৎসংক্রমসংসেবনাৎ॥

সংস্কৃত ভাষায় পাঁচখানি মহাকাব্য বিখ্যাত। শিশুপালবধ এই পঞ্চকাব্যের অন্যতম। বৃহত্ত্রয়ীর মধ্যেও এই গ্রন্থের নাম গণ্য করা হয়। চেদি দেশের দুর্বুদ্ধি রাজা শিশুপাল হঠকারিতার ফলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়েছিলেন—মহাভারতের সেই পরিচিত কাহিনী অবলম্বনে মাঘ সুদীর্ঘ বিংশতি সর্গে কাব্য প্রণয়ন করেছেন।

আখ্যানের কোন কোন অংশ তিনি বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবত থেকে গ্রহণ করেছেন। ঘটনার অঙ্গবিন্যাসে ভারবির কিরাতার্জুনীয় ছিল তাঁর আদর্শ।

এদেশের অপর অনেক কবির মত মাঘও আত্মপরিচয় সামান্যই দিয়েছেন। তাঁর পিতামহ সুপ্রভদেব ছিলেন বর্মল বা বর্মলাত নামে এক রাজার মন্ত্রী, আর পিতা ছিলেন দত্তক সর্বাশ্রয়। নানা কারণে অনুমান করা হয়—মাঘ খ্রীষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতকে বর্তমান ছিলেন।

শিশুপালবধের প্রসাধনে কবি অনেকস্থলে বাহুল্যের প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি দ্ব্যক্ষরে, ত্র্যক্ষরে, এমন কি, একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণের সাহায্যে কবিতা রচনা করেছেন; নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গীতে যমক-অনুপ্রাস প্রয়োগ করেছেন; চক্রবন্ধ, মুরজবন্ধ প্রভৃতি পদ্যবন্ধে শ্লোক সাজিয়েছেন। এতে তাঁর অদ্ভুত নির্মাণ-কৌশল প্রকাশ পেয়েছে, শব্দ-ভাণ্ডারের উপর অবাধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরূপ বিস্ময়কর শিল্প-নৈপুণ্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হলেও সর্বত্র কাব্যরসের পরিপোষক হয় নি। ভাষার আড়ম্বরে, ছন্দের গহনতায়, বর্ণনার আতিশয্যে অনেক স্থলে ভাবের প্রসার ব্যাহত হয়েছে। শব্দ আর অর্থ এই উভয়ের সামঞ্জস্যে, উভয়ের সহকারিতায় উত্তম সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। মাঘের দৃষ্টি ছিল শব্দের দিকে অধিক।

কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই মাঘই ঘোষণা করেছেন—উত্তম কবি শব্দ ও অর্থ উভয়েরই অপেক্ষা রাখেন।

'শব্দার্থৌ সৎকবিরিব দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে।'

মাঘের কাব্যে এমন স্থল মোটেই বিরল নয়, যেখানে কবি সব্যসাচীর মত শব্দের প্রযোজনায় আর অর্থের সংযোজনায় সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন; কারুশিল্পের মহাপ্রাণতের সঙ্গে চারুশিল্পের রসনিষ্যন্দের মিলন ঘটিয়েছেন, বাগ্বিন্যাসের ঘনঘটার অন্তরালে ভাবনির্ঝরের অমৃতধারা সঞ্চার করেছেন।

শিশুপালবধ সংস্কৃত বিদ্যার্থীর প্রিয় কাব্য। এমনও অনেকে বলেন—বিচিত্র পদবৈভবে সমৃদ্ধ মাঘের নয়টি মাত্র সর্গের সঙ্গে যার পরিচয় ঘটে, তার কোন শব্দ অজ্ঞাত থাকে না।

নবসর্গগতে মাঘে নবশব্দো ন বিদ্যতে।

কথা মিথ্যা নয়। মাঘের শব্দ-সম্ভার অফুরন্ত, প্রয়োগ-পটুত্ব অসাধারণ।

শব্দের পারিপাট্যে,ছন্দের বৈচিত্র্যে, অলঙ্কারের সৌষ্ঠবে বিমুগ্ধ হয়ে সেকালের সমালোচকরা মাঘের উপর পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কাব্যের প্রশংসায় অত্যুক্তি করেছেন। কেউ বলেছেন—কাব্যের পরা কাষ্ঠা মাঘ—'কাব্যেষু মাঘঃ'। কেউ বা বলেছেন—বিভিন্ন কবির যত বৈশিষ্ট্য সমস্তই এক মাঘে পাওয়া যায়। কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, দণ্ডীর পদলালিত্য—তিন গুণই মাঘে আছে।

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

অজ্ঞাতনামা গুণগ্রাহীদের এসকল উক্তিতে অতিরঞ্জন আছে, সে কথা সত্য। তা হলেও মাঘের কাব্যে উপমার মাধুর্য, অর্থের গাম্ভীর্য, লালিত্যের প্রাচুর্য অসাধারণ। রুচিভেদের বৈষম্য সত্ত্বেও মাঘের শিশুপালবধ ভাবের গভীরতায়, কল্পনার বিচিত্রতায়, ভাষার বহুরূপতায় প্রাচীন সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

কাব্যের প্রারম্ভে মহামুনি নারদ দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে বার্তা বহন করে আনলেন—উচ্ছৃঙ্খল শিশুপালের অত্যাচারে জনগণ উৎপীড়িত। ইন্দ্রের অনুরোধে তুমি এই দুর্বৃত্তকে বধ কর। দুষ্কৃতির ফলে স্বভাবতই দুর্জনদের বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন শিষ্টজনেরা তাদের দমন করেন।

তদেনমুল্লঙ্ঘিতশাসনং বিধের্বিধেহি কীনাশনিকেতনাতিথিম্।
ততস্তরাচারবিপক্তিমাপদো বিপাদনীয়া হি সতামদাধবঃ॥

নারদের এই নির্মর্যাদবাক্যে গগনাঙ্গনে ধূমকেতুর মত ক্রুদ্ধ কৃষ্ণের মুখমণ্ডলে প্রলয়-ভ্রুকুটি ফুটে উঠল। তিনি চির-বিদ্বেষী শিশুপালের উৎসাদনে স্বীকৃতি জানালেন।

ওমিত্যুক্তবতোঽথ শার্ঙ্গিণ ইতি ব্যাহৃত্য বাচং নভ-
স্তস্মিন্নুৎপতিতে পুরঃ সুরমুনাবিন্দোঃ শ্রিয়ং বিভ্রতি।
শত্রুগ্রামনিশং বিনাশপিশুনঃ ক্রুদ্ধস্য চৈদ্যং প্রতি
ব্যোম্নীব ভ্রুকুটিচ্ছলেন বদনে কেতুশ্চকারাস্পদম্॥

কিন্তু পূর্বে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পাণ্ডবযজ্ঞে আমন্ত্রণ এসেছে। চেদিরাজ্যে অভিযান করলে সে আমন্ত্রণ রক্ষিত হয় না। দ্বিধাকুল মুরারি গুরুজনদের মন্ত্রণা চাইলেন। মন্ত্রী উদ্ধব এবং অগ্রজ বলদেবকে ডেকে পাঠালেন।

বিনক্ষবাণেনাহৃতঃ পার্শ্বেনাথ দ্বিষদ্ভয়ম্।
অভিচৈদ্যং প্রতিষ্ঠাম্নুরাদীৎ কার্যধুরাকুলঃ॥
গুরুষ্বথায় গুরুণোরুভয়োরথ কার্যয়োঃ।
হরির্বিপ্রতিষেধং তমাচচক্ষে বিচক্ষণঃ॥

কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব উগ্রস্বভাব, তাঁর নীতিও অনুরূপ। স্বপক্ষের বৃদ্ধি আর বিপক্ষের বিনাশ ছাড়া তাঁর কিছুই কাম্য নেই।

আত্মোদয়ঃ পরজ্যানির্ঘৃণং নীতিরিতীয়তী।

তিনি বললেন, শত্রুর উৎপাটন ব্যতীত প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব, ধূলিজালকে কর্দমে পরিণত না করলে জল দাঁড়াতে পারে না।

বিপক্ষমখিলীকৃত্য প্রতিষ্ঠা খলু দুর্লভা।
অনীত্বা পঙ্কতাং ধূলিমুদকং নাবতিষ্ঠতে॥

বলদেব আরও বললেন—ওজস্বিতা সদ্গুণ বৃদ্ধি করে, মৃদুতা হীনত্বের হেতু হয়। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের অপরাধ সমান। অথচ রাহু সূর্যকে বহুদিনের ব্যবধানে আক্রমণ করে; কিন্তু চন্দ্রকে ঘন ঘন গ্রাস করে। চন্দ্রের মৃদুত্বই এর যথার্থ কারণ।

তুল্যেঽপরাধে সূর্যাদুর্ভাদুদ্যন্তঃ চিরেণ যৎ।
হিমাংশুমাশু গ্রসতে তন্মৃদিম্নঃস্ফুটং ফলম্॥

লোকে পরাক্রমকেই সম্মান দেয়। যে সিংহ নিষ্ঠুরভাবে মৃগদল ধ্বংস করে, সকলে তাকেই বলে মৃগাধিপ, কিন্তু যে চন্দ্র মৃগকে অঙ্কে ধারণ করে, তার নাম দেয় মৃগলাঞ্ছন।

অঙ্কাধিরোপিতমৃগশ্চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ।
কেসরী নিষ্ঠুরক্ষিপ্তমৃগযূথো মৃগাধিপঃ॥

যাঁর শক্তি আছে, তিনি বিধিনিষেধ গ্রাহ্য করেন না। উদ্দাম প্রতাপের কাছে শাস্ত্রনিয়ম কিছুই নয়। তেজ কখনও তিমিরের বশীভূত হয়ে একত্র অবস্থান করে না।

অনুদ্যুক্তং খলং সত্ত্বমুজ্ঝাস্ত্রনিয়ন্ত্রিতম্।
সামানাধিকরণ্যং হি তেজস্তিমিরয়োঃ কুতঃ॥

বলরামের মতে আমন্ত্রণ রক্ষা অপেক্ষা শত্রুবধ অধিক লাভ-জনক। পাণ্ডবেরা যজ্ঞ করুন, ইন্দ্র স্বর্গে আধিপত্য করুন, সূর্য তাপ বিকীরণ করুন, আমরাও আমাদের শত্রু নিপাত করি। সকলেই স্বার্থ চায়।

যজন্তাং পাণ্ডবঃ স্বর্গমবতিষ্ঠন্তপত্বিনঃ।
বয়ং হনাম দ্বিষতঃ সর্বঃ স্বার্থং সমীহতে॥

প্রবীণ মন্ত্রী উদ্ধব সব শুনলেন। তিনি কটাক্ষ করে বললেন, অজ্ঞেরা কর্ম করে অল্প, ব্যয় হয় অধিক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মহা ব্যাপারেও অকেল থাকেন।

আরভন্তেঽল্পমেবাজ্ঞাঃ কামং ব্যগ্রা ভবন্তি চ।
মহারম্ভা: কৃতধিয়স্তিষ্ঠন্তি চ নিরাকুলাঃ।

উদ্ধবের মতে রাজনীতিক কার্যে মৃদুত্ব উগ্রতা উভয়েরই স্থান আছে; প্রতীক্ষা প্রণয় উভয়ই আবশ্যক।

তেজঃ ক্ষমা বা নৈকান্তং কালজ্ঞস্য মহীপতেঃ।
নৈকযোনেঃ প্রসাদো বা রসভাববিদঃ কবেঃ॥
নালম্বতে দৈষ্টিকতাং ন নিষীদতি পৌরুষে।
শব্দার্থৌ সংকবিরিব স্বয়ং বিধানপেক্ষতে॥

সুতরাং অনুকূল মুহূর্তের প্রতীক্ষা কর্তব্য। উপযুক্ত কাল ভিন্ন শিশুপালের বিনাশ অসাধ্য।

সমরাবধিমপ্রাপ্য নাস্তারালং ভবানপি।

স্থিরবুদ্ধি উদ্ধবের যুক্তির ফলে যুদ্ধাভিযান স্থগিত রইল। শ্রীহরি সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করলেন।

অথেতরুঃ তিমিরেশলৌল্যো হরিহরিপ্রস্রবণ প্রতন্বে।
ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে প্রজাসমূহের মত, শম্ভুর জটাজুট থেকে বারিপ্রবাহের মত, স্বয়ম্ভুর মুখ থেকে শ্রুতিসম্ভতির মত মধুমতীর বিপুল বাহিনী পুরী থেকে নির্গত হল।

প্রভা ইবাম্ভোধরবিদ্যুতাভেঃ শম্ভোর্জটাজুটতটাদিবাপঃ।
মুখাদিবাপ শ্রুতয়ো বিধাতুঃ পুরাদ্রিরীর্ষুর্ধুতিরিঙ্গিতস্তঃ॥

পথে অভ্রাঙ্ক রৈবতক মহাকালের মত দণ্ডায়মান। গিরিগাত্রে জলহীন পাণ্ডুর মেঘমালা শিবদেহে শুভ্র উত্তরীয়ের শোভা ধারণ করেছে।

ক্বচিচ্ছিলাপাংবিপাণ্ডুরাণি দৌতোত্তরীয়প্রতিমচ্ছবীনি।
অনাদি বিস্রাণযুমাঙ্গসঙ্গবিভক্তভস্মানমিব স্মরারিম্।

সেখানে কমলদলে মধুকর বিচরণ করে, তরুবীথিকা তাপ হরণ করে, সুন্দরী সুলোচনা নির্ভয়ে বিহার করেন।

রাজীবরাজীবশলোলভৃঙ্গং নক্তম্বমুক্তং তরিভিস্তরুণাম্।
কান্তাঃ সলীলাস্তরুণাঃ সুরাণাং
রক্তোভিরক্তোভিতমুদ্বহন্তম্॥

পর্বতপৃষ্ঠে এক পার্শ্বে উদয়োন্মুখ সূর্য, অপর পার্শ্বে অস্তগামী চন্দ্র, যেন হস্তিগণ্ডস্থিত ঘণ্টাদ্বয়, ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত রশ্মিচ্ছটা যেন তার বন্ধনরজ্জু।

উদয়তি বিততোর্ধ্বরশ্মিরজ্জাবহিমরুচৌ
হিমধামি যাতি চাস্তম্॥
ক্ষিতি গিরিরয়ং বিলম্বিঘণ্টাদ্বয়পরিবারিত-
বারণেন্দ্রলীলাম্॥

নির্ঝরিণীরা শৈলশিখর ত্যাগ করে সাগর উদ্দেশে যাত্রা করেছে; ইতস্তত: বিহগকূজন ধ্বনিত হচ্ছে; যেন অপত্যবৎসল রৈবতক পতিগৃহগামিনী আত্মজাদের বিচ্ছেদে বিলাপ করছেন।

অপসরণপরিবর্তনোচিতাশ্চলিতাঃ পুরঃ পতিমুপেত্যমাত্মজাঃ।
অনুরোদিতীব করুণেন পক্ষিণাং বিরুতেন
বৎসলতয়ৈব নিম্নগাঃ॥

সুদূর যাত্রাপথে পর্যায়ক্রমে নানা ঋতু অতিক্রান্ত হতে লাগল। কত অবোধ্য, কত সন্ধ্যাপ্রভাত আবর্তিত হল।

সেখানে বিকচ কমলের গন্ধ বৃন্দদের ছাড়িয়ে তোলে, মকরন্দের সুবাস ছড়িয়ে স্নিগ্ধ সমীর ক্লান্তি দূর করে।

বিকচকমলগন্ধৈরুদ্ধরন্ বৃন্দমালাঃ সুরভিতমকরন্দং মন্দমাশাবাতি বাতঃ।
প্রমদমদনমাদ্যন্নৌবনোদ্দামরামা রমণরতসখেদস্বেদ-
বিচ্ছেদদক্ষঃ॥

দিনান্তে নিশানাথ শ্রীহীন হয়েছেন, রজনী বিদায় নিয়েছে, কুমুদিনী নিমীলিত হয়ে আছে, তারকারাও অস্তমিত। সঙ্গিনীদের হারিয়েই যেন চন্দ্র ম্লান হয়েছেন।

সপদি কুমুদিনীভিমীলিতং হা! ক্ষপাপি
ক্ষতমগমদপেতাস্তারকাস্তাঃ সমস্তাঃ।
ইতি দয়িতকলত্রশ্চিন্নরশ্মিস্মিন্দু-
র্বহতি কৃশমশেষং ত্রষ্টশোভং শুচেব॥

উষা রজনীর অচিরোৎপন্না আত্মজা। শিশু কন্যা যেমন ক্রন্দনের ধ্বনি তুলে জননীর পশ্চাৎ গমন করে, তেমনই উষা কাকলির রব তুলে রজনীর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

অরুণকমলরাজীমুদ্ধহন্তাগ্রপাদা
বহল মধুপমালাকজ্জলশ্লীষরাক্ষী।
অনুপততি বিরাবৈঃ পক্ষিণাং ব্যাহরন্তী
রজনিমচিরজাতা পূর্বসন্ধ্যা সুতেব॥

উদয়গিরি থেকে মৃদু কর বিস্তার করে তরুণ সূর্য গগনে উঠলেন। যেন প্রাঙ্গণ থেকে ক্রীড়ারত শিশু কোমল করাগ্র প্রসারিত করে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করল।

উদয়শিখরিমূর্ধপ্রাঙ্গণেষেব রিঙ্গন্
সকমলমুখহাসং বীক্ষিতঃ পদ্মিনীভিঃ।
বিততমৃদুকরাগ্রঃ শক্যরক্ষ্যো বয়োভিঃ
পরিণততি দিবোঽঙ্কে হেলয়া বালসূর্যঃ॥

স্বল্প সুপ্তির ক্ষণিক বিশ্রামের পর প্রত্যূষে বিগতক্লম রাষ্ট্রনায়ক প্রণয় মনে গুরুগম্ভীর রাষ্ট্রচিন্তায় নিরত হন, কবি কাব্যানুশীলন করেন।

ক্ষণপরিচিতবিবুধাঃ কল্পয়ন্তঃ প্রয়োগান্নুদবিষয়তি রাজ্যে
কাব্যবদ্ধুর্বিগাহে।
গহনবরবরাত্রপ্রাপ্তবুদ্ধিপ্রসাদাঃ কবয় ইব মহীপা-
শ্চিন্তয়ন্ত্যর্থজাতম্॥

দিবসের আগমনে বিশ্লিষ্ট তিমিরপুঞ্জ টেনে নিয়ে

যামিনী প্রস্থান করে, কমলাক্ষী বিলাসিনীরাও স্বস্ত কেশ-পাশ নিয়ে পথ অতিক্রম করে।

মুলিতনয়নতারাঃ ক্ষামবক্ত্রেন্দুবিম্বা রজনয় ইব নিদ্রাক্লান্ত-
নীলোৎপলাক্ষ্যঃ।
তিমিরমিব দধানাঃ ব্রংসিনঃ কেশপাশানবনিপতিগৃহেভ্যো
যান্ত্যদূরীরবধ্বঃ ॥

নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখাকালে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। যজ্ঞসভায় সমাগত সভ্যদের মধ্যে তিনিই লাভ করলেন শ্রেষ্ঠার্ঘ্য। সভাসীন শিশুপাল প্রতি-পক্ষের এ সম্মান সহ্য করতে পারলেন না; যুদ্ধোদ্যোগ ঘোষণা করলেন। বলোদ্ধত সৈন্যগণের সমরকোলাহল বেগবিক্ষুব্ধ নদীসমূহের গর্জনধ্বনির মত শোনাতে লাগল। অস্ত্রের ঝন-ঝনার মধ্যে মহারণ আরম্ভ হল।

আরাস্থীনামবিরতরয়ং রাজকানীকিনীনা-
মিথঃ সৈন্যৈঃ সমমলমূদিঃ শ্রীপতেরমিষ্টিঃ।
আসীদোঘৈর্মকর ইব মহদ্বারিধেরাপগানাং
দোলাযুদ্ধং কৃতগুরুতরধ্বানমোদ্ধতাভাজাম্ ॥

এই সংশয়িত সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ অনলবর্ষী চক্রধারে অরিদেহ নির্মস্তক করলেন।—

তেনাক্রোশত এব তস্য মুরজিত্সংকাললোলানল-
জ্বালাপল্লবিতেন মূর্ধ্ব বিকলং চক্রেণ চক্রে বপুঃ ॥১

১ আকা[illegible]হতে প্রচারিত।

STUDENTS' COMMON-ROOM P G A

চৌপদী

বেতাল ভট্ট

(১)

আমরা ঘুঁটে পুড়ছি বটে, সে ব্যথাটা সইবে।
তুমি গোবর হাসছ বটে ক'দিন হাসি রইবে?
গোবর পেটে আছে গোবর তাও তো ধরায় আসবে।
ঘুঁটে হয়ে পুড়বে তুমি, তখন তা যে হাসবে।

(২)

আশ্রিতে করিবে বড়, ভালো কথা, তাই করো,
দেখো যেন তোমারেও না যায় ছাড়িয়ে।
দেখো সে হইয়া উচ্চ তোমারে না গণে তুচ্ছ
যারে তুমি ঘুঁয়ে ঘুঁয়ে তুলেছ বাড়িয়ে।

(৩)

বাবুর পাদুকা জোড়া দামী ভেলভেট মোড়া
পায়ে থাকে প্রণতের তরে,
কড়া জুতা এক পাটি তোলা থাকে, সে জুতাটি
দুর্বলের ঘাড়ে পিঠে পড়ে।

(৪)

ভারতের মানচিত্র? তোমার নিজের দেশ
দেখছ কি ওখানে?
খুলে যেন ঠ্যাঙবাঁধা ছালতোলা ছাগশিশু
কশাইএর দোকানে।

(৫)

ভাত ছড়ালে হয় না কাকের অভাব
গর্বভরে বলত যত ছোট বড় নবাব।
আজকে তারা যাচ্ছে গড়াগড়ি
হাজার কাকে নৃত্য করে' তাদের 'পরে চড়ি।

(৬)

দুর্বোধ কবিতায় অনেক ঘামায়ে মাথা
পাঠক কষ্টেই পায় রস।
শতকরা নব্বই কৃতিত্ব পাঠকের
কবির পাওনা শুধু দশ।

(৭)

গ্রন্থের প্রচার,
সিংহ আর শৃগালের মিলিত শিকার।
তারপর ভাগ বাঁটোয়ারা?
তাদের অজ্ঞাত নয়, ঈশপ কি কথামালা
একদিন পড়িয়াছে যারা।

(৮)

শত শত যুগ হতে মিলি কবিবর্গ
ক্রামেরে প্রেমের নামে বানায়েছে স্বর্গ।
তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখি সব বইতে
সে প্রেমের নামে হয় সাতখুন সইতে।

(৯)

বাণীর মন্দিরে উঠে সঘনে বৃংহণ
হইল ডি-ফিলখানা তাঁহার প্রাঙ্গণ।
গণেশেরে কর বাণী তুমি লও ভার,
সামলাতে পশুবল চলিনু এবার।

(১০)

এরও হয়েছ তুমি ক্রম,
শিয়ালকাঁটার বন করে তোমা স্তব,
তৃণগণ তব মূলে ঢালিছে কুসুম,
দূরে রয়ে হাসিতেছে বনস্পতি সব।

নতুন বাসর

রবীন্দ্রকমল কর

গ্রামের কোল ঘেঁষে খালটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে গ্রামান্তরে। পারের ঘুনো ঘাস ছুঁয়ে এসে পড়েছে জলে —যেন কত পিপাসার্ত। এদিক সেদিক ভেসে যাচ্ছে দু'চারটে নৌকো। পাড়ের দপ্‌দপ্‌ শব্দ আর গাঙ-শালিকের কিচিরমিচির। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের শূন্যতাকে ভারে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে।

ঘটিও সারা বছরই এই খাল নৌকো চলাচলের উপযোগী থাকে, কিন্তু আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন তার দুই পার জলে ভেসে যায় তখনই নৌকো চলাচলের ছন্দ খুঁজে পায়। আত্মীয়-পরিজনের বাড়ীতে বেড়াবার ধুম পড়ে যায় গাঁয়ে। দিনের সারাক্ষণই খালের বুক বেয়ে চলে নৌকোর অন্তহীন শোভাযাত্রা। আচমকা মাঝি-মাল্লাদের গানে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুনীল দুটি চোখ, নিষ্পলক সুনীল আকাশে মেলে ধরে।

"উঃ, কতকাল বাপের বাড়ী যাইনি।" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন দত্তগিন্নী।

ঘোড়ন কাটে সুরজা। "দত্ত মশাইকে ছেড়ে থাকতে পারবেন তো?" এ গাঁয়েই ওর বাপের বাড়ী! তাই ওর মুখের বাঁধন একটু আলগা।

হেসে ওঠে সবাই। দত্তগিন্নী যেন একটু লজ্জা পান। তারপরই সামলে নিয়ে বলেন, "পরিমলকে ছেড়ে তোরই বুঝি থাকতে কষ্ট হচ্ছে?"

আবার হাসে সবাই। পরিমল সুরজার স্বামী। মাস কয়েক হল বিয়ে হয়েছে তাদের। কলকাতার কি একটা সওদাগরী অফিসে কাজ করে পরিমল।

বেগতিক দেখে পালিয়ে যায় সুরজা। দত্তগিন্নীর কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। সত্যিই তো পরিমলের জন্য মনটা কেমন করে। সেই যে বিয়ের পর গেল তারপর কৈ একবারও তো এল না। কী এমন কাজ পরিমলের! কাজ ফেলে কি একদিনের জন্যেও আসা যায় না!

একটু অবসর পেলেই সুরজা তার ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াবে। সেখান থেকে খালের জল স্পষ্ট দেখা যায়। জলে কাঁপতে কাঁপতে নৌকোগুলো যখন ভেসে যায় বেশ লাগে ওর দেখতে। এই জানলা দিয়েই ও প্রথম দেখেছিল পরিমলকে। বর আসছে—বর আসছে। একটা হলস্থুল পড়ে যায় চারদিকে। কি এক অদম্য কৌতূহল হয় সুরজার। সবার অলক্ষ্যে চুপিসাড়ে এসে তার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়ায়। বর দেখার জন্যে খালের পারে ভিড় জমে উঠেছে। এত ভিড়ে পরিমলকে কি করে দেখা যাবে। সুরজা ভাবে লোকগুলো কি বেহায়া, যেন বর দেখেনি কখনো! বর তো আমার, তোদের কি। তোরা কেন ভিড় করছিস। যা-না বাপু সরে। আমার চিরজীবনের সঙ্গীকে একবার দু'চোখ ভরে দেখি। নয়ন সার্থক করি।

এরই এক ফাঁকে সুরজা পরিমলকে দেখে নেয়। খুশীতে ভরে ওঠে তার মন। এই হবে তার স্বামী। তার চিরজীবনের সাথী। ইহকাল পরকালের দেবতা। এত সুখও লিখা ছিল তার কপালে! এইতো সেদিনের কথা। তবু মনে হয় কতকাল, কতযুগ, আগের।

কত নৌকোই না ভেসে চলেছে খালের জলে। কত নতুন মানুষই না এসেছে গাঁয়ে।

সুরজা প্রতিটি লোকের দিকে নজর রাখে। চেনা শোনা কাউকে দেখলেই ছুটে যায়। অনুযোগের সুরে বলে, "এতদিনে তা হলে মনে পড়ল বড়দি।"

নীলিমা তার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ী বেড়াতে আসে। বিয়ের পর গাঁয়ে তার এই প্রথম পদার্পণ।

সুরজা দেখতে পেয়েই ছুটে আসে। বলে, "বেশ মেয়ে যা হোক তুই নীলি'। গাঁয়ের কথা বুঝি একবারও মনে পড়ে না?"

"পড়বে না কেন ভাই। একা তো আর আসতে পারি না।"

"একা আসতে পারিস না—না দাদমণাইকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়?" ঠোঁটে ছোট্ট একটু হাসির ঢেউ তুলে সুরজা সকৌতুকে প্রশ্ন করে।

"আমার মোটেই হয় না," নীলিমা তার স্বামীর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে, "তবে ওর হয়। আমাকে ছেড়ে ও একদণ্ড থাকতে পারে না।"

নীলিমা হাসে। সুরজাও হাসে।

রুমাল দিয়ে বিজন তখন মুখ মুছচে। সুরজা জিজ্ঞেস করে, "আমায় চিনতে পারছেন?"

"তা আর পারছি না—বিয়ের রাতে আপনি আমায় যা জব্দ করেছিলেন—"।

বিজন চটপট জবাব দেয়।

নীলিমা বলে, "তোর কথা প্রায়ই বলে ও। তুই নাকি দেখতে পু-উব-সুন্দর···ভালো গান জানিস···তোর কাছে আমি কিছুই না—"

সশব্যস্ত হয়ে ওঠে বিজন। বলে, "দেখুন ও-সব একেবারে মিথ্যে কথা। একটুও বিশ্বাস করবেন না।"

সুরজা আর নীলিমা দু'জনেই সশব্দে হেসে ওঠে।

সেদিন সারারাত ঘুম হয় না সুরজার। কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় বিছানার এপাশ ওপাশ করে ও। নীলিমা কত সুখী। স্বামী তার কত আপনার। একদণ্ডও নাকি তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। আর পরিমল? সে তো তাকে ছেড়ে দিব্যি আছে। বিয়ের পরে তো ক'মাস কেটে গেল। ক'টা চিঠি দিয়েছে পরিমল তাকে। তবে কি পরিমল তাকে ভুলে গেল? যেমন করে দুষ্মন্ত ভুলে গিয়েছিলেন শকুন্তলার কথা? না—না, তা কেমন করে সম্ভব!

বিয়ের রাতে দেখা পরিমলের চেহারাটা সুরজার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কি সুন্দরই না দেখতে পরিমল। যেন ঠিক রাজপুত্তুর। কে জানে হয়তো বা তাকে রাজকন্যা ভেবে ভুল করে গলায় মালা দিয়ে গেছে। পরিমল, কি সুন্দর নাম। নীলিমা পরিমলকে দেখেনি। দেখলে বুঝতে পারত সে তার চেয়ে কত বেশী সৌভাগ্যবতী।

বাসর ঘর থেকে একে একে সবাই যখন বেরিয়ে গেল পরিমল তখন সুরজার একটা হাত চেপে ধরেছে। ভীষণ লজ্জা করছিল সুরজার। কে কোথা দিয়ে আবার দেখে ফেলে। পরিমলের ওসব বালাই নেই। সুরজার কানের কাছে মুখটা এনে বলেছিল, "আজ কী সুন্দর রাত, তাই না সুরু।"

পরিমলের মুষ্টি বন্ধন থেকে নিজের হাতটা মুক্ত করার একটা নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেছিল সুরজা, যদিও বেশ লাগছিল ওর বলিষ্ঠ স্পর্শটুকু।

"রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে—যতক্ষণ চিনি নাই তোরে," বলেই ছেড়ে দিয়েছিল পরিমল।

সুরজা শাড়ীর আঁচল দিয়ে নিজেকে আরও বেশী করে জড়িয়ে খাটের একপাশে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। কিন্তু তা হলেও কি পরিমলের হাত থেকে রেহাই আছে। সে ঠিক সুরজার পাশটিতে এসে বসেছে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, "দুষ্টু মেয়ে।" আর তারপরই আলোটা দিয়েছে নিভিয়ে।

পরিমল না জানি এখন কি করছে। সে কি বিনিদ্র শয্যায় সুরজার মতই ভাবছে! সুরজার কথাই ভাবছে।

আচ্ছা, মানুষের যদি পাখীর মত ডানা থাকত? তা হলে কিন্তু বেশ হত। তা হলে কাউকে না জানিয়ে অন্ধকার আকাশের বুকে সুরজা তার ছোট্ট ডানা দুটি মেলে টুকটুক করে উড়ে যেত কলকাতায়। পরিমলের মেসের ঘরখানাতে। কিন্তু পরক্ষণেই সুরজা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলল। না সে যাবে না। কেনই বা যাবে। তারই বা এমন কি গরজ শুনি। আসতে পারে না পরিমল?

পরদিন নীলিমা সুরজাদের বাড়ী বেড়াতে আসে। বলে, "তোর বরের খবর কি বল। কবে আসছেন শুনি?"

"কি জানি ভাই।" সুরজা নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয়।

"অত আর ন্যাকা সাজতে হবে না। বলবি না এই তো?"

কি বলতে পারে সুরজা। সে যে সত্যিই কিছু জানে না। সেই যে বিয়ের পর গিয়ে একবার একটা চিঠি দিয়েছে তারপর কি আর চিঠি দেবার কথা মনে হয়েছে পরিমলের।

দুপুরে রোজই একবার করে আসে নীলিমা। কত কথা বলে, সবই শ্বশুরবাড়ীর কথা। শাশুড়ী, দেবর, ননদের কথা। সবার চেয়ে বেশী বলে বিজনের কথা। বিজন কি খেতে ভালবাসে, নীলিমা কোন রঙের শাড়ী পরলে বিজন খুশী হয়। কেমন সুন্দর নাম দিয়েছে তার —বৌরাণী। কথা বলতে বলতে নীলিমা হাসে। হাসতে হাসতে কথা বলে। সুরজাও সঙ্গে সঙ্গে হাসে। আর নীলিমা চলে গেলেই তার হাসি মিলিয়ে যায়। দুই চোখ বেয়ে নামে শ্রাবণের ধারা। নীলিমার প্রতি একটা রুদ্ধ আক্রোশে তার অন্তর বিষিয়ে ওঠে। নীলিমা যেন ইচ্ছে করেই তার সুখের কথা বড় গলায় জাহির করে—শুধু সুরজার দুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে যে নীলিমা তার চেয়ে কত সুখী।

অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশ রাঙিয়ে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন করুণ দু'টি চোখ মেলে খালের দিকে চেয়ে থাকে সুরজা। বাইরের উদাস বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পায় সে। একসময় কখন তার চোখ দু'টি কানায় কানায় ভরে ওঠে জলে। সামনের দৃশ্যটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে নজরে পড়ে একটা নৌকো এসে ভিড়েছে পারে। কে আবার এল? সুরজা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

একটা রুগ্ন লোককে দু' তিনজন ধরাধরি করে নৌকো থেকে নামায়। ওদের কাঁধে ভর দিয়ে লোকটা সুরজাদের বাড়ীর দিকেই এগোতে থাকে। পিছনে মোট নিয়ে আসে মাঝি।

এ আবার কে? সুরজা ভাবতে বসে। কৈ এমন কারও কথা মনে তো পড়ছে না!

হঠাৎ চমকে ওঠে সুরজা। লোকটাকে চিনতে পেরেছে সে। খুব কাছাকাছি থেকে একদিন দেখেছিল তাকে। আজ চেনাই যায় না। এ কেমন করে সম্ভব। একদিন রাজপুত্রের মত ছিল যার চেহারা, আজ একি তার পরিণতি। কেন নিষ্ঠুর বিধাতা এমন করে তার স্বপ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে দিয়ে গেল। সে তো কারও কোন অনিষ্ট করে নি। তবে তার কপালে কেন এত লাঞ্ছনা। ওগো পাষাণ দেবতা, এ তোমার কেমন ধারা বিচার। সুরজা আর ভাবতে পারে না। তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। পড়তে পড়তে জানলার গরাদটা ধরে নিজেকে সামলে নেয় সে।

রাত অন্ধকার। আলোর ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। সুরজা ধীর পদক্ষেপে পরিমলের বিছানায় এসে বসে। এ ঘরই তার বাসর রাত্রির সাক্ষ্য বহন করে আছে। এ ঘরেই একদিন পরিমল দৃঢ় মুষ্টিতে তার আঙুলগুলো নিষ্পেষিত করে দিতে চেয়েছিল। আর আজ ও কত অসহায়। উঠে বসবারও ক্ষমতা নেই।

সুরজা আলতোভাবে পরিমলের কপালে একটা হাত রাখে। চোখ মেলে পরিমল শুধু একবার চায়। তারপর আবার চোখ নামিয়ে আনে। কোন কথা বলার শক্তিও আজ তার নেই।

পরদিন নীলিমা ও বিজন কলকাতায় রওয়ানা হয়ে যায়। যাবার আগে ওরা সুরজার সঙ্গে দেখা করে। ওর দুঃখে সহানুভূতি জানায়। ওর স্বামীর রোগমুক্তি কামনা করে।

জানলা দিয়ে উদাস দুটো চোখ মেলে চেয়ে থাকে সুরজা। খালের ধারে নৌকো বাঁধা। মালপত্র বোঝাই করা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নীলিমা কাদা থেকে শাড়ী বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলে চলেছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় খালের পার পিছল। নীলিমা পড়তে পড়তে বিজনকে ধরে সামলে নেয়। দু'জনে খিলখিল করে হেসে ওঠে। আর সেই হাসি যেন একটা চাবুকের মত সুরজার বুকের ওপর সপাং করে এসে পড়ে। সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে খাটায় ভেঙে পড়ে ও পরিমলের বুকে।

পরিমল প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর সুরজার অশ্রুসজল মুখখানা দুর্বল দুটি হাতে তুলে ধরে কম্পমান অধরে এঁকে দেয় নিঃশব্দ একটি চুম্বন। আর সুরজার মনে হয় যেন আজই তার বিয়ে হল পরিমলের সঙ্গে। যেন একটু আগেই পড়শীরা হৈ হল্লা করে বর-কনেকে বাসরে একলা রেখে পালিয়েছে।

আজ আর এতটুকুও লজ্জা করেনা সুরজার। পরিমলের বুকে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সে। নিজেই বুঝতে পারেনা ব্যথার অশ্রু কখন এক সময় আনন্দাশ্রুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রকাব্যে সসীম ও অসীম

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রবীন্দ্রকাব্যের মর্মমূলে উপনীত হইতে গেলে সাধারণ পাঠক অনেক সময় হীতিমত বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, 'সসীম', 'অসীম,' 'সান্ত,' 'অনন্ত' প্রভৃতি কবির অতিপ্রিয় ও বহু-ব্যবহৃত শব্দ তাহার মনে একটা কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া তোলে। অথচ এই শব্দগুলির অন্তরালে যে-তত্ত্বটুকু প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত, রবীন্দ্র-কাব্যে লক্ষ্যপ্রবেশ হইতে গেলে তাহাকে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিতেই হইবে। জানি, কাব্যরস আস্বাদনের জন্য তত্ত্বাবেষণ করিয়া মরা একটা বিড়ম্বনামাত্র; কাব্যের পক্ষে তত্ত্ব একটা By-Product তাহাও সর্বজনবিদিত। কিন্তু নারিকেলের শুষ্ক কঠিন বহিরাবরণ ভেদ না করিলে যেমন সুস্বাদু সুকোমল শাঁসটুকু পাইবার উপায় নাই; ঠিক সেই-রূপ নীরস তত্ত্বের কঠিনময় পথের মধ্য দিয়াই অনেক ক্ষেত্রে কবির মর্মস মর্মলোকে উপনীত হইতে হয়। ইহার সর্বোপাদান দৃষ্টান্ত—ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ। সসীম ও অসীমের তত্ত্বটুকু একটি অদৃশ্য সূত্রের ন্যায় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ বিধৃত করিয়া অসামান্যরূপে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইহাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিলে ভুল হইবে।

বলাবাহুল্য, যাহা সীমিত ও সুনির্দিষ্ট তাহাই সসীম এবং সুনিশ্চিত সীমারেখার বাহিরে এমন কোনো কিছু যাহাকে সীমার দ্বারা চিহ্নিত করা অসম্ভব তাহাই অসীম, অনন্ত। সসীমের, সান্তের উপমাস্থল—আমাদের ক্ষুদ্রসুখ-প্রাঙ্গণ, চতুর্দিকের সঙ্কীর্ণ পাষাণ-প্রাচীর তাহার সুনির্ধারিত গণ্ডী। সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের কুলীন্যমের বাহিরে যে-উদার মুক্তি, যে-অসীম উদার সীমাহীন অনির্দেশ্যতা তাহাই অসীমের স্বরূপ। অসীমের কোনো ভৌগোলিক অবস্থিতি নাই—নিঃসীমতাই তাহার স্বভাবধর্ম। দেশকালপাত্রের দ্বারা সে অসহায়ভাবে রুদ্ধ, শৃঙ্খলিত নয়। জ্যোৎস্নার সহিত অফুল মধ্যেধির যে-পার্থক্য, সসীম ও অসীমের মধ্যে ব্যবধানটুকুও ঠিক সেইরূপ।

ভূমাকে বলা হইয়াছে "অমোর্ভাবঃ" অর্থাৎ বহুর ভাব। যাহা অসীম তাহার মধ্যে এই ভূমার, এই বহুর ভাবের অভিব্যক্তি। এবং প্রকৃত সুখ ভূমার মধ্যেই নিহিত—নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। অসীমের মধ্যেই আত্মার প্রসারণ, সীমার মধ্যে তাহার সঙ্কোচন। অবশ্য অসীমের সীমারেখাশূন্য অন্তহীন অফুল বিস্তার সীমার মধ্যেও সঙ্কুচিতরূপে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। সান্ত ও অনন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত হইয়াও অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। তাইতো ফুল আপনাকে গন্ধের মধ্যে এবং গন্ধ আপনাকে ফুলের মধ্যে বিলীন করিবার জন্য ব্যাকুল। সীমাও সেইরূপ অসীমের এবং অসীম সীমার সফলতার জন্য উন্মুখ, সানন্দিত। মানুষ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব।' এই বিষয়ব্যাপারের ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল মধ্যে তাহার মত নগণ্য নগণ্য অসহায়ের স্থান কতটুকু। সৃষ্টির মধ্যে সে তো অণু হইতে অণীয়ান্ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তথাপি সেই "অপোরণীয়ানের" মধ্যেই "মহতো মহীয়ানের" জ্যোতির্ময় প্রকাশ—"তিমির বিদার তোমার অমুদয়!" তাইতো কবি ভগবানকে সীমার মধ্যে অসীম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এই সঙ্কীর্ণ সীমিত মানব-জীবনের বাহিরে যে-অসীম স্বাধীনতা, বাঞ্ছনা ও উদার মুক্তি বিরাজিত হইতেছে মানুষ তাহার আস্বাদ জানে না। সে জানে না বলিয়াই তাহার পুঞ্জীভূত দুঃখ ও নৈরাশ্য। ইহার কারণ, অসীমের মধ্যেই প্রকৃত আনন্দের উৎস,—সীমার মধ্যে নিরন্তর দুঃখ, নিরবচ্ছিন্ন গ্লানি। আমাদের এই জীবন যেন একখানি বেসুর বীণাযন্ত্র; তাহাকে অনন্তের সুরে—In tune with the infinite—বাঁধিয়া লওয়া চাই। সম্ভবত ইহাকেই মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন—"Hitch your wagon to a star." অসীম হইতে আমরা বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন বলিয়াই দুঃখকে এত দুঃসহ বলিয়া বোধ হয়, এবং মৃত্যু তাহার ভয়ের মূর্তি পরিগ্রহ করে:—

দুঃখ সে হয় দুঃখের রূপ,
মৃত্যু সে হয় মৃত্যুর কূপ···

জীবন সীমিত বলিয়াই সে সবল, চঞ্চল, অনায়ুষ্কালবলিত। অসীমের মধ্যে দুঃসমুদ্যবিক্ষোভ বলিয়া কিছুই নাই। অনন্তের মধ্যে বিযুক্ত প্রসারিত করিয়া দেখিলে এগুলি আমাদের চিত্তের শান্তিকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। ঋষির সেই আকুল প্রার্থনা—"মৃত্যোর্মামমৃতং গময়" সান্ত হইতে অনন্তে, সসীম হইতে অসীমে প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষাকেই অভিব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সান্ত ও অনন্ত যেন বন্ধন ও মুক্তি, মৃত্যু ও অমৃতের নামান্তর মাত্র। খাঁচার পাখী এবং বনের পাখার রূপকের মধ্য দিয়া কবি সীমা ও অসীমের-মধ্যে সুদূরস্থ ব্যবধান-পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। অনন্তের অগাধ বিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতির মধ্যেই "অসীমনিলীনাভিলাষী" বিহঙ্গের কলোল্লাস। সেখানে কুণ্ঠিত কুণ্ঠার স্থান নাই—আছে অপরিমেয় পুলক, স্বাধীনতার অমৃত-আস্বাদ। বিশ্বস্তনীন মরুভূমির বুকে অশ্বপৃষ্ঠবিহারী আরব-বেদুইনের উদ্দাম জীবনের প্রতি কবিচিত্তের দুর্নিবার আকর্ষণ অনন্তের প্রতি সান্তের আকর্ষণ বলিয়া মনে করিতে ভুল কি! শেলীর "The desire of the moth for the star" কি অসীমের জন্য সসীমের বুক-ভাঙা ক্রন্দন নয়?

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তির প্রতি একটি প্রবল ধিক্কার পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

লাভক্ষতি—টানাটানি, কতি শুদ্ধ ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ-সংশয়—
হায় না সহে না আর—জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
ভণ্ড ভণ্ড ভয়।

চিরসুন্দরের পূজারী, অমরতার মুগ্ধভক্তপ্রাণী কবির নিকট জীবনের এই বিকৃত অবস্থাদৃষ্টি নিতান্তই অসহনীয়। তাঁহার মানস-বিহঙ্গের বিরাম এই ভঙ্গুরলোকের বহুউর্দ্ধে যেখানে

আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-বিপ্রহরা নিবিড় হিমির-আঁকা।

ব্রাউনিঙের মতো রবীন্দ্রনাথও যেন বলিতে চাহেন—

What's time! leave Now for dogs and apes!
Man has for Ever.

অভিব্যক্তির "লাভক্ষতি-টানাটানি"র ফলে এই সংসার তুচ্ছ পঙ্ক-ভূতের স্তরে ক্রোক্ত, আদিম হইয়া উঠিয়াছে। সীমিত জীবনের দুঃসহ দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী, কবিচিত্তের ক্ষোভের অন্ত নাই। তাই কবির আকুল প্রার্থনা—

প্রেমসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্দ্ধলোকে যাও
পঙ্কভূত হতে।

বস্তুত যাহা সীমাহিত তাহাই স্বভাবত পরিমিত এবং যাহা অপরিমেয় তাহাই অনন্ত, অসীম। তুচ্ছের তলের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব,—মহাসমুদ্রের তল অগাধ, অপরিমেয়। সীমার মধ্যে চিরবন্দী বলিয়াই মানুষের জীবন এত অল্প। সেই অল্প পরিমাণ জীবন হইতে কিছুটা আগু ঘুরিয়া চাহিলেই সে হাহাকার করিয়া উঠে,—"অল্প লইয়া থাকি, তাই যাহা যায় তাহা যায়।" মানুষের দুঃখ বেদনা, অতৃপ্তি-অশান্তির কারণ ইহাই। সীমার মধ্যে সুখ কোথায়!—নাহি সুখমতি। অসীমের নিশ্চিন্তার ঈষানীন্ত ও অপরিমেয় উদারতার মধ্যে লাভক্ষতির হিসাব নাই। নদী পুলিনে লক্ষ কোটি প্রবাহ অবিশ্রাম স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু সেই চলোর্মিরাশিকে নদী কি মুহূর্তের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে পারে? জীবনকে যদি নদীরূপে কল্পনা করা যায়, তবে চিরচঞ্চল যৌবনস্রোতের বাধমান নদীপ্রবাহের সহিত তুলনীয়। ইহারা গতিশীল,—স্থিতিশীলতা ইহাদের স্বভাবধর্ম নয়।—"কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধন মান।" সীমার পটভূমিকা হইতে দেখিলে ইহাদের এই চলিষ্ণুতা, এই নশ্বরতা একটি মহতী বিনষ্টি বলিয়াই আমাদের প্রতীতি হইতে পারে,—কিন্তু সত্যই কি তাই? অনন্তের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বিষয়াশ্রী জন্ম ও মৃত্যুকে পর্যায়ক্রম নদীর বলিয়া মনে হয়। যে "প্রলয়ীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি" বিশ্বসংসারকে বিরন্তর দুঃখবেদনা, ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা ক্লিষ্ট, জর্জর করিয়া তুলিতেছে, কবির নিকট তাহাই মাতার মতো স্নেহময়ী,—"ধরেছে আমার কাছে জননীমূরতি।" প্রজ্ঞা-দৃষ্টিসম্পন্ন, অনুভূতিপ্রবণ কবি এই অমৃত অক্ষশক্তির খেয়ালখুশী ও অত্যাচারকে অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়াছেন। তাই ইহার দুঃসহ-তাকেও তাঁহার নিকট এক বিচিত্র লীলা বলিয়াই মনে হইয়াছে।

যে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতারূপে
এক ঘরাতল মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে!

পার্থিব জীবনের বহুকাঙ্ক্ষিত অমরতার প্রতি এই নিষ্করুণ উপেক্ষা অসীমের লীলা-বৈচিত্র্যের সহিত কবির পক্ষেই সম্ভব। নব নব সৃষ্টির নব নব জীবন যে-কবি চিত্তকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছে তাহার নিকট সসীম জাগতিক জীবনের অমরতা অন্ধকূপ ছাড়া আর কি! একটি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনচক্র অবিশ্রাম আবর্তিত হইতেছে বলিয়াই আমাদের এতো ভয়, এতো সংশয়। কবি সীমার মধ্যেও অসীমকে উপলব্ধি করিয়াছেন। যদি আমরা তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারিতাম—"একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়" তবে দুঃখ বেদনা আমাদের নিকটও সহনীয় হইয়া উঠিত।

রবীন্দ্রকাব্যের মূলে যে-দুর্মর আশাবাদ—তাহার মূলে দেখিতে পাই বিশ্বজীবনের সহিত কবির নিবিড় একাত্মতা। যাহা কিছু ব্যক্তিগত তাহাই সীমিত, সঙ্কীর্ণ; যাহা বিশ্বের তাহাই অসীম, অপরিমেয়। এক-হিসাবে বলিতে গেলে সসীম নাস্ত্যর্থবাচক এবং অসীম অস্ত্যর্থবাচক। একটি নাস্তি, অপরটি অস্তি। ব্যক্তির দিক্ হইতে দেখিতে যাহার অস্তিত্ব নাই, বিশ্বের বিশাল দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে তাহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয় নাই,—রূপান্তর হইয়াছে। মৃত্যুর অন্ধকারে যাহাকে হারাইয়া ফেলিলাম, আমার নিকট তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গেছে; কিন্তু সে তো বিশ্বজীবনে বিলীন হইয়া তাহার অংশীভূত হইয়া আছে। নয়নের সম্মুখে যাহাকে দেখি না, সেতো নয়নের 'মাঝখানেই' 'ঠাঁই' লইয়াছে। দৃষ্টির সম্মুখে যতক্ষণ সে ছিল, ততক্ষণ সে ছিল নিতান্ত সসীম, ব্যক্তিগত; দৃষ্টির বাহিরে রহিয়া সে হইয়াছে অনন্তের ধন। জীবনে সে ছিল অপূর্ণ,—মৃত্যু তাহাকে দিয়াছে পূর্ণতা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যুলোকের মতো এতো বড়ো একটা দুঃখবিধায়ক ব্যাপারও ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতা হারাইয়া সহনীয় ও মধুরীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রবাহে ব্যক্তি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। অনন্তের সহিত কবির নিবিড় একাত্মতার ফলেই তাঁহার শোক শ্লোকরূপে বিগলিত হইয়া পড়িলেও তাহার চতুর্দিকে একটি শান্তি ও স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। কবির সুদৃঢ় প্রতীতি, এই মহাবিশ্বে কিছুই হারায় না; অনন্তের ভাণ্ডারে তোমো ক্ষয় ক্ষতি নাই। মরুপথে যে-নদীর ধারা হারাইয়া গেছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, কবির অন্তর বিশ্বাস—তাহার বিলুপ্তি ঘটে নাই। এই বলিষ্ঠ দুর্মর আশাবাদ তোমো ক্ষণস্থায়ী Moodএর ব্যাপার নয়। অনন্তজীবন-বিশ্বাসী কবির পক্ষে সর্বতোভাবে ইহাই স্বাভাবিক।

PGA COMMON-ROOM

টেরাকোটা শিল্প ও বাঙালী

শ্রীদুর্গাচরণ সরকার

শিল্পের দেশ বাংলা দেশ। এর প্রতি মন্দিরে দালানে দেউলে ফুটে উঠেছে বাঙালীর শিল্প-প্রীতি। আলপনা, নক্সা, পটচিত্র আর মৃৎশিল্পে বাঙালী পটুয়ার কোমল হাতের স্পর্শ লেগে আছে। বিয়াট পুজোর দালানের দেওয়াল-চিত্র থেকে, মাটির ছোট হাঁড়িটির গায়ে পর্যন্ত, মন্দিরের সুবিশাল বিস্ময়কর ভাস্কর্য থেকে খেলার পুতুলটিরও অঙ্গে বাঙালীর সুনিপুণ রূপরেখা। ফ্লোরেন্স মিউজিয়মে সুহাসার বৎসর পূর্বের গাজনিড়িদের বিবাহাদি সামাজিক চিত্র মৃৎপাত্রে অঙ্কিত দেখা যায়। কুটীরের আলপনাতে যেমন, নাটমন্দিরের স্থাপত্যেতেও তেমনি বাঙালীর সৌন্দর্য সাধনা। শিল্প এখানে বাঙালীর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলার সামাজিক অনুষ্ঠানেও শিল্পের বিশিষ্ট স্থান। পিঁড়ে, আসন, খুলো, কাঁথা ও কলসী-ঘটে যে আলপনা ও মাঙ্গলিক নক্সা আঁকা হয় তা সত্যিই খুব উঁচু স্তরের।

এইসব লোক-শিল্প বাদ দিয়েও ভারতীয় শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে—বাঙালীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। বাঙালী স্থপতির প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মন্দির গাত্রে। বাংলার মন্দির সাধারণতঃ মৃৎনির্মিত। সেইজন্য জয়পুর, রাজপুতানা বা দাক্ষিণাত্যে যখন পাথরের উপর অপূর্ব ভাস্কর্য খোদিত হয় সেইসময় বাংলার স্থাপত্য শিল্প এক বিশেষ ধারায় অগ্রসর হ'ল। পাথর কুঁদে কুঁদে যে মূর্তি রচিত হচ্ছিল, তা আরও কমনীয় ও লীলায়িত হ'য়ে উঠলো বাঙালী শিল্পীর কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে—মাটির দেবদেব অঙ্গে। নরম কাদাকে শিল্পী রূপ দিল। শুরু হ'ল এক বিশেষ ঢংএ (Style) মূর্তি নির্মাণ। প্রাচীনকালের বাঙালী শিল্পীর গড়া মৃৎ-মন্দিরের কারুকার্য এখন আর দেখা যায় না। পুরোন যুগের প্রায় সব দেবালয়ই ধ্বংস হয়েছে—কালের গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে। তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ পাথরের অভাবে এগুলি মাটির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ফলে বাংলার জলীয় আবহাওয়া, লবণাক্ত জল, বন্যা-প্লাবন ও পরবর্তীকালে যবন-আক্রমণে এগুলি দ্রুত ধ্বংস হয়। তবুও যখন এখানে-ওখানে মাটির তলা থেকে খোদিত ফলক বা ইট বা'র হয়, তখন বোঝা যায় প্রাচীন বাংলার কারুশিল্প কতদূর উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

ছোট ছোট ইট বা মাটির ফলকে প্রথমেই দেবদেবীর মূর্তি আঁকা হয়; তারপর সেগুলি পুড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে তৈরী হয় মন্দির। ইটের ওপর এই যে মাটির কাজ—একেই বলে টেরাকোটা (Terracotta) শিল্প। টেরাকোটা-শিল্প বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব। শিল্পজগতের বৈশিষ্ট্য বাঙালীর টেরাকোটা। প্রাচীন মন্দির গাত্রে এখনও দেখা যায় সুপ্রচুর এই বিচিত্র শিল্পকলা। শিল্পীর আন্তরিকতা, সৌন্দর্যবোধ ও কলানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এই সব ইষ্টক-শিল্পে। দেব-দেবীর মূর্তি রচনায় যেমন তার হৃদয়ের নীরস ভক্তির সংযোগ ঘটেছে, তেমনি কারুকার্য রূপায়ণে তার অপূর্ব ও বিচিত্র শিল্পী-হৃদয়ের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

রাজসাহীজেলার পাহাড়পুরের বিহার ঐতিহাসিক মন্দিরটী যদিও রয়েছিল শুধু মাত্র ইঁট ও কাদায়। তবুও কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে পাথরের মন্দিরের মতই তা দাঁড়িয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। এখনও এর গায়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় অনন্যসাধারণ কারুকার্য। অপূর্ব টেরাকোটা মূর্তি। এর ভগ্নাবশিষ্ট মূর্তিগুলি আজও অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিংশশতাব্দীর মুক্তশিখিত চিত্র ছাড়াও বহু সামাজিক চিত্র শোভিত আছে। সাজন কাঁধে কৃষক, শিশু কোলে করে জল-আহরণ-রতা মাতা, ক্রীড়ারত বালিকা প্রভৃতি বাঙালীর ঘরোয়া ব্যাপারও স্থান পেয়েছে এতে। সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ইটের কঠিন গায়ে। সুধীর, সাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি বাঙালীর অতি পরিচিত জীবজন্তু এবং কিন্নর-কিন্নরী, গন্ধর্ব, দৈত্য, অসুর ও বহু কাল্পনিক জীব শিল্পী উৎকীর্ণ করেছেন। কাল্পনিক জীবগুলি যদিও অদ্ভুত, তবু তাদের নিজস্ব মূল্য আছে। শিল্পে কল্পনার এক বিশিষ্ট স্থান। শিল্প সব সময়ে বাস্তবের মুখাপেক্ষী নয়। শ্রেষ্ঠশিল্পী মাঝে মাঝে এই কঠোর বাস্তব রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে মনোহর স্বপ্নীয় কল্পলোকে বিচরণ করেন। বাঙালী স্থপতির কল্প-কথার অভিব্যক্তি এই মূর্তিগুলি।

পাহাড়পুর বিহারে শিল্পশৈলীর মাঝে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। প্রাচীন বহু মন্দির, বিহার ও স্তূপগাত্রে হিন্দু দেব-দেবীর পাশেই স্থান পেয়েছে জাতকের গল্প, বৌদ্ধশিল্প ও বৌদ্ধ দেবদেবীগণ। সেখানে উদারহৃদয় শিল্পী ধর্মের নামে কোন ভেদ সৃষ্টি করেননি। হিন্দুব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশ্রমণ পাশাপাশি থেকেও কোন দ্বেষ, হিংসা বা সংঘর্ষের সৃষ্টি করেননি। এ থেকে বেশ বুঝা যায় বাঙালী কতদূর উদারহৃদয়, ধর্মবিদ্বেষহীন এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে কতখানি মুক্ত ছিলেন—তা বোঝা যায়। জানা যায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পালযুগের সমৃদ্ধিময় বাংলার অবদান।

আর একটা কথা, ছোট ছোট ইটের উপর নির্মিত হলেও টেরা-কোটা মূর্তিগুলির কিছুমাত্র সৌন্দর্যহানি হয়নি। বরং মাটির কোমল অঙ্গ খুঁদে খুঁদে তৈরী হলে এগুলি আরও লাবণ্যময়। পাথরের মূর্তির থেকে এই পোড়ামাটির পুতুলগুলি কোন অংশেই হেয় নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঁট বা ফলকের ওপর এগুলি উৎকীর্ণ। কিন্তু সেই ক্ষুদ্রাবয়বের মাঝেই প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব অঙ্গ-সৌষ্ঠব—পুরুষের

পৌরুষ, সৈনিকের দৃঢ়তা, নারীর কমনীয়তা, শিশুর চাঞ্চল্য, নক্সার বৈচিত্র্য।

পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ-বহু প্রভৃতি চিত্রগুলির শিল্পসৌষম্য ও লালিত্য যেমনে অজন্তার শিল্পশৈলীর কথাই মনে পড়ে। সুতরাং

'আমাদেরি কোন সুদূর পটুয়া নীলাম্বিত তুলিকায়
আমাদের পট অজন্তা ক'রে রেখেছে অজন্তায়।'—

মনে করলে কোন অন্যায় হয় না ; বরং সেইটাই হয়ত ঠিক।

টেরাকোটা শিল্পে বেহেরেবীর মূর্তিতে অপূর্ব এক দেবভাব ফুটে উঠেছে। শিল্পী-হৃদয়ের সকল ভক্তি যেন ইঁটের ওপর মূর্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে ভাব-গম্ভীর দেবমূর্তি। আবার শিশুর ও গর্ভবতী মূর্তিতে সে বিচিত্র কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মানবলোক থেকে শিল্পী তার শিল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে নিয়েছেন।.....

কিন্তু বাঙালী ভাস্কর রাজপুতানা বা ভারতীয় শিল্পীর মত নিজের শিল্পপ্রতিভা দেহ-রচনাতেই সীমাবদ্ধ করেনি। নিজের জীবনকে শিল্পের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে। বাঙালী মনোভাবের সঙ্গে বাংলার শিল্পের তাই ঘনিষ্ঠ যোগ। টেরাকোটা শিল্পে তাই দেখা যায় কোথাও মেয়েরা নাচ করছে, কোথাও লাঙ্গল নিয়ে কৃষক চলেছে ক্ষেতে, কোথাও পীতবাসধারী পুরুষ, কোথাও বৃত্তাবরণা নারী, কোথাও বা যাদুবিদ্যারী। মহাস্থানগড়ের মন্দির গাত্রে এইরূপ বহু সামাজিক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

যোশোরের অন্তর্গত মুসলমানরাজার কয়েকটি প্রাচীন দেবালয় আছে। এগুলি আগাগোড়া টেরাকোটা কারুকার্য মণ্ডিত সুন্দর সুন্দর ইঁটের দ্বারা রচিত। ইঁটের ফলকের ওপর যে সকল নক্সা অঙ্কিত আছে সেগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি অপূর্ব কারুকার্যখচিত। মন্দির গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। ছোট ছোট ইঁটের ওপরেই কালী, শক্তিনিপীড়নরতা দুর্গা, ধ্যানমগ্ন শিব, নারায়ণ ও আরও বহু মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের প্রতি কোণে হাতী, ঘোড়া, সিংহ, রথ ও অর্ধারোহী উৎকীর্ণ করা বিরাট স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। সুসজ্জিত সিপাহী সৈন্য, অশ্বারোহী ও যুদ্ধরত রবি বাঙালীর অতীত-গৌরব স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাচীন যুগের এই সকল ছবি দেখলে তখন মনে পড়ে বাঙালী একদিনে স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এদিকে সেদিকে ; পালযুগে, সেন রাজত্বকালে, পশাসের সময়ে বাঙালীর গৌরব ব্যাপ্ত হয়েছিল সারা ভারতে আর ভারতের বাহিরে—জ্ঞান, কারুকার্য, চম্পা ও সুবর্ণ দ্বীপে। বাঙালী তখন ভীরু ছিল না।

পুরার দালানের বহু জায়গায় কয়েকটি সামাজিক ও লৌকিক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। একজায়গায় বিরাট ফলকে আছে : পাল্কী করে বিয়ের বর যাচ্ছে। বেহারার সঙ্গে যাচ্ছে একজন পাইক—আর তাদের সঙ্গে চলেছে একটা কুকুর—পায়ারা দিতে দিতে। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বহু ঘটনাই মৃৎশিল্পী রূপ দিয়েছে ইঁটের গায়।

বংশবাটীতে অনন্তদেবের মন্দির ও হংসেশ্বরী মন্দির গাত্রে ইষ্টক শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাই। বিরাট গাত্রে অসংখ্য ফলকগুলিতে কোথাও কৃষ্ণহস্তে সারি সারি রমণী, মাথায় বাসনওয়ালা নারী, বৃত্তাকার পুরুষ ও নারীমূর্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা, নারায়ণের অনন্তশয্যা, নৌকাবিহার প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। 'নৌকাবিহার' চিত্রটিতে প্রাচীনবাংলার সমুদ্র-জাহাজের অনেকটা নিদর্শন পাওয়া যায়। সিংহ-মুখাঙ্কিত বিরাট নৌকা বাঙালীর অতীতদিনের যুদ্ধজাহাজ ছিল। বিজয় সেনের বাংলা, 'সমুদ্রাক্রান্ত' 'নৌযাবনোত্তরান্' বঙ্গদেশের সমুদ্র-বিজয়ের বিরাট ইতিহাসের খণ্ডিত প্রকাশ এই টেরাকোটা মূর্তিগুলি। বাঙালীর গৌরবময় অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে এই মৃক নাটীর ক্ষুদ্র পুতুলগুলি।

বৃটিশ চন্দননগরে বুড়ো শিবতলার ওপর দেবালয় গাত্রে ফরাসীবাসী সিপাহী সৈন্য দেখে হঠাৎ আশ্চর্য হতে হয়। সেগুলি হুবহু ইংরেজ সিপাহীর অনুকরণে রচিত হয়েছে। বাংলায় প্রথম ইংরেজ পদার্পণের চিত্রটি কোন এক বাঙালী শিল্পী ইঁটের ওপর চিত্রিত করে রেখেছিল বোধহয়।

সুতরাং টেরাকোটা কারুকার্যখচিত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। বাঙালী-জীবনের বহুচিত্র খোদিত রয়েছে ইঁটের ক্ষীণ গাত্রে। বাঙালীর বিশিষ্ট শিল্পশৈলী নিয়ে ইঁটের পর ইঁট সাজান হয়েছে জীর্ণ দেবালয়ের গায়ে। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী চিত্রিত ইতিহাস টেরাকোটা শিল্প।

কিন্তু বাঙালীর নিজস্ব এই শিল্প সৃষ্টি, অনাবৃত, টেরাকোটা-শিল্পীরও আর সাক্ষাৎ মেলেনা। দিন দিন বর্ষার বৃষ্টিতে ক্রমাগত ঝরে ঝরে যাচ্ছে বাঙালী শিল্পীর শিল্পসাধনা। মাটির কারুকার্য ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে চলেছে—যা আর কিছুদিন পর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে বাঙালীর অতীত শিল্পের পরিচয়।

জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা

আশা গংগোপাধ্যায়

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যখন ছিটেফোঁটা বন্ধক দিয়েও কন্যার বিবাহের যৌতুক বা খরচের অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন না, যত-আয়-তত-ব্যয় যে সংসারে সেখানে আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হওয়াতে পরিবারের কর্তা—যিনি একমাত্র কর্ণধার—চতুর্দিকে রাশি রাশি ধনুর্ধরদের সরষে ফুল দেখছেন, —মরুভূমির অগ্নিবর্ষী বুকে হঠাৎ-আসা স্নিগ্ধ জলধারার মত গৃহিণী এলেন তাঁর অনেক দিনের ধীরে ধীরে সঞ্চয় করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে :—

এই নাও, হাজার টাকা, পঁচিশ টাকা ; এই নাও আমার অলংকার, আমার যা-কিছু সোনাদানা আছে। নিজের স্বামী সন্তানকে, নিজের আত্মীয় স্বজনকে যদি আপদ-বিপদে স্ত্রী ধন দিয়েই সাহায্য করতে না পারব—তাহলে বৃথাই সিঁথিতে এঁকেছি সিঁদুর—মণিবন্ধে বেঁধেছি লৌহবলয়। তোমাদের মাসিক আয়ে পরিবার পোষণের, আর আমাদের নেই ? আমরা কি পারি না সংসারের প্রতিদিনের খরচ বাঁচিয়ে কণিকা-মাত্র সঞ্চয় কোরে আমাদের সিঁদুর কৌটো ভরে রাখতে, পূর্ণ কোরে রাখতে আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপি ?

এই নারী ! সহস্রদর্শিনী—গৃহিণী-সচিব-সখী-প্রিয়-শিষ্যা। মহিলা-দের এই মনোবৃত্তিকে বেশী কোরে জাগিয়ে তুলতে—আর শুধু মহিলাদের জন্যই বা কেন—সমস্ত জাতির এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে কার্যকরী কোরে তোলবার জন্য দিকে দিকে আজ চলেছে সঞ্চয় অভিযান।

বহুদিনের পরাধীনতামুক্ত স্বাধীন দেশের সংগঠন কাজে—জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন কাজে সাহায্য করতে হবে দেশের প্রতিটি অধিবাসীকে—কি মহিলা—কি পুরুষ, কি ধনী—কি দরিদ্র।

এই বিষয়ে মহিলাদের সঞ্চয়-সংস্থা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত এক পক্ষকাল ধরে এক বিপুল অভিযানের আয়োজন কোরে-ছিলেন। সমস্ত সহরের পল্লীতে পল্লীতে সভার আয়োজন কোরে, সহর-তলীয় বিভিন্ন কেন্দ্রে বক্তৃতা দিয়ে, চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে, দৈনিক ও মাসিক সংবাদপত্র, সব রকমেই এর বহুপ্রচারের এক সুষ্ঠু প্রচেষ্টা করেছেন।

দেশ যতদিন পরাধীন ছিল, দেশের গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব ছিল শাসকের। 'ভারতের জনসাধারণের সুখ-সুবিধা কিভাবে হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করবার ভার নিয়েছিলেন—স্বয়ং বৃটিশ সম্রাট। দেশের লোকের সে বিষয়ে কিছু বলবার অধিকার ত ছিলই না, উপরন্তু যে-কোনরূপ স্বাধীন মতবাদকে সন্ত্রাসিপে দমন করা হত এবং স্বাধীনতা প্রয়াসীকে তুলিয়ে দেওয়া হত ফাঁসির মঞ্চে রাজদ্রোহের অপরাধে।

সেদিন গত হয়েছে—আজ আমাদের সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার রথ সূর্যকরোজ্জ্বল সড়ক দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতির দিগন্তাভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

দরকার নিজেদের দেশকে উন্নত করবার মহান্ দায়িত্ব—আর সেই দায়িত্ব হচ্ছে আমাদেরই জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। সুতরাং এক কথায় বলা যায় দেশের জনসাধারণই হাতে তুলে নিয়েছে দেশ-গঠনের পুরোপুরি দায়িত্ব।

তাই আজ জনগণকে দিতে হবে অর্থ—প্রচুর অর্থ—যা নাকি লাগবে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত কোরে তুলতে। দেশের অর্থ আসবে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে।

এক—বিদেশ হতে ঋণ গ্রহণ। দুই—জনসাধারণকে করভারে প্রপীড়িত কোরে, আর সর্বশেষ অথচ সর্বোৎকৃষ্ট উপায়—জনগণের নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ লগ্নী কোরে।

ঋণভারে জর্জরিত হয়ে কত ধনী, কত জমীদার, কত সাম্রাজ্য, কত দেশ একেবারে শেষ হয়ে গেছে। যে ঋণ শোধ দেওয়া যাবে না—সে ঋণ গ্রহণের দায়িত্ব বড় কম নয়।

দেশের উৎপাদনী বাড়িয়ে এবং তার দ্বারা দেশবাসীর অভাব মিটিয়ে উদ্বৃত্ত দিয়ে বিদেশের ঋণ পরিশোধ করা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া বিদেশের অর্থে শিল্পোৎপাদন হলে একটি বড় রকমের লভ্যাংশ চলে যাবে বিদেশের কোষাগারে—সুতরাং ঋণ গ্রহণ করা এরূপ পরিস্থিতিতে কোনক্রমেই উচিত নয়। এই প্রথম উপায়টি সব দিক দিয়েই নিতান্ত ক্ষতিকর। দ্বিতীয়—করধার্য করা। করভারে জর্জরিত দেশের উপর আর অধিক কর ধার্য করাও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। এতে একদিক দিয়ে দেশের ধনী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা একেবারেই হারাতে হবে।

সুতরাং দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ ই বিনিয়োগ করতে হবে এই সং-গঠনের কল্যাণ কার্যে।

জনসাধারণ এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ উপকৃত হবেন। ১২ বছর, ১০ বছর, ৭ বছর পরে সুদসমেত সেই সঞ্চিত অর্থ বর্ধিত হয়ে এক-কালীন দেশ একটি স্ফীত অংকের রূপে নিজেরই কাছে ফিরে আসবে।

জাতীয় সকল সংস্থায় সঞ্চিত অর্থ দিয়েই আবার জাতীয় সরকার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। যেমন।—

হাসপাতাল, মাতৃমংগল, শিশুসদন, বিদ্যালয়, জলসেচন ব্যবস্থা, শিল্প-মন্দির, কারখানা, কৃষিকল্যাণ সংস্থা প্রভৃতি গঠন কোরে দেশকে উন্নততর ও সুন্দরতর কোরে তুলবেন। এতে দেশের লোকের পক্ষেও সহ-যোগিতা পাওয়া যাবে।

একটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে যে—দরিদ্র দেশবাসীর সঞ্চয় করবার মত অর্থ কোথায় ?

কিন্তু চিরকাল মুষ্টিভিক্ষার চাল সঞ্চিত কোরে আবহমান কাল ধরে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে কত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কত অনাথ-আতুর।

লক্ষ্মীর কৌটার মতো সঞ্চিত অর্থ মাটীর বুকে নিহিত শুধু চতুরঙ্গল, সিন্দুক ভরা হীরা জহরতের অলঙ্কার—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই কিছু না কিছু এক সময়ে সঞ্চয় করেছে। সে টাকা সুদে বাড়ত না—বছরের পর বছর জমা থেকে যেত—কখনও অধিকারীর কাজে লাগত, কখনও লাগত না। আর দেশের কাজে ত আসতই না। এর দ্বারা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থই সিদ্ধ হত।

আজ একটি কোরে পয়সাও যদি স্বাধীন ভারতের কোটি কোটি লোকের অর্ধেক সংখ্যাও প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করে, তাহলে কত কোটি টাকা বছরে সরকার পেতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। আর সেই পয়সা জাতির সঞ্চয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখলে আমারই দুর্দিনে আমারই কাজে অনেক বেশী হয়ে ফিরে আসবে—সেটা কি আমাদের এক পরম লাভ নয়?

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান

শ্রীজয়দেব রায়

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কথা বলছিলাম। ইংরেজ রাজত্ব তখন চলছে পুরোদমে। রাজসেবাই সেদিন ছিল বাঙালীর ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ ব্রত, যাতে ইংরেজ প্রভুর অসন্তোষ বা রোষ উৎপাদন হয় এমন কিছু করা ছিল সেকালের রাজকর্মচারীদের পক্ষে অচিন্তনীয়।

সেকালে পরাধীন হতভাগা দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভাব-অভিযোগের একটি কথা বলবারও অধিকার ছিল না, এমন দিনে নিজে একজন রাজকবি হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন দেশবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণী, এমে দিয়েছিলেন জাতীয়তাবোধের নবচেতনার জাতির জীবন প্রবাহে।

দেশবাসীর প্রতি ছিল দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর সমবেদনা। তাঁর দেশপ্রেমের গানগুলি থেকেই সেদিন দেশবাসী নবচেতনা লাভ করেছিল, এগুলির কাজ আজও ফুরায় নি; চিরদিনই এগুলি দিতে থাকবে জাতীয় জীবনে নব উদ্দীপনা, নতুন প্রেরণা।

ইউরোপে কিছুকাল বাস ক'রে কবি তাঁর স্বদেশবাসীর সর্ববিষয়ে বেশ ও স্বদেশে তাঁর সহকবিদলের বিজাতীয় আচার আচরণ লক্ষ্য ক'রে ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছিলেন। পরদেশীদের অনুকরণে যারা জাতীয় বাতন্ত্র্য বর্জন করেছিল, কবি তাদের বিদ্রূপের কশায় ও ব্যঙ্গবাণে ক্ষত বিক্ষত করেছিলেন। পক্ষান্তরে দেশবাসীর ভুলত্রান্তি ও গুর্বাদিকেও তিনি নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছিলেন।

তাঁর এই ব্যঙ্গগীতগুলিও তাই আর এক রকমের দেশপ্রেমের গান। গুণ্ডামি, নকল সাহেবিয়ানা, রাজভক্তির আতিশয্যের আবহাওয়ায় তাঁর কবিজীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাঁর কবিজীবন ছিল সেই পাঁকের মধ্যে পাকাল মাছের মতো নিষ্পঙ্ক। তাই প্রত্যেকটি অনাচার, অপচার, কপটতা, হীনতার গ্লানি তাঁর লেখনীতে সরস সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে।

যে যুগে বিলাতী আচারই ছিল সামাজিক জীবনের কৌলীন্যের আদর্শ, সেযুগে নিজে বিলাতফেরতা হয়ে বিলাতী কদাচারকে ব্যঙ্গ করা যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচায়ক। এগুলি তাই তাঁর মূল স্বদেশীগানগুলির চেয়েও অধিকতর জাতীয়তার উদ্দীপক। যেমন,

আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই,
আমরা সাহেব হেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা দিয়েছি তুলি'
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা' আর
বুটের ডাকি 'কুলি'।
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিটার মাপে হাটি,
যদি সাহেব না বোলে বাবু কেহ বলে
মনে মনে তারি চটি।

শুধু তাই নয়, বিলাত থেকে ফিরে এসে 'হরিদাসরায়ের' যে দুর্দশা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ হেনেছেন। এ সকল গান শুদ্ধ মাত্র হাসির গান নয়, এগুলির মধ্যে স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র বক্তৃতা ক'রে আর তর্ক ক'রে জাতির মঙ্গল বা দেশোদ্ধার করা সম্ভব নয়, কবি তাই দেশবাসীকে আসল পথ দেখাতে চেয়েছেন—

তোমরা দেশোদ্ধারটা করতে চাও কি
ক'রে মুখে বড়াই?
তা' সে হবে কেন!
তোমরা ব্যঙ্গবাণে শুধু ক্ষত করতে চাও কি লড়াই?
তা সে হবে কেন!
তোমরা ইংরাজ গৌরব সুদ্ধ বলে চাও কি যে, সে
তোমাদের ও কয়পৃষ্ঠে দেশটা স'পে, শেষে
তন্নিতম্বা বেঁধে নিজেই চলে যাবে দেশে?
তা'-সে হবে কেন?
তোমরা হিন্দুধর্ম প্রচার ক'রেই, হতে-চাও যে খৃষ্ট।
তা সে হবে কেন?

এখন অবশ্য যুগের পরিবর্তন হয়েছে, ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, বিলেত থেকে ফিরে এসে আর কেউ বড় একটা সাহেবও বনে যায় না। কিন্তু সেকালের সাহেবীভাবাপন্ন বিলাত-ফেরতাদের সঙ্গে নিজের সমাজ ও পরিবারের বিরোধ ঘটত। এতে জাতির বলক্ষয় হ'ত বলেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাদের আক্রমণ করেছেন।

কেবল জাতীয়তামূলক স্বদেশী গানেই নয়, কবির রচনার সর্বত্রই স্বদেশপ্রীতি মুখ্য। তাঁর নাটকের প্রায় সবগুলিতে স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামই প্রধান অবলম্বন। রাজকর্মচারী দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বদেশপ্রেম প্রচারের জন্য বাধ্য হয়েই সেদিন প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মেবার পাহাড়কে উদ্দেশ করে তিনি যে গান রচনা করেছেন, তাতে সমগ্র ভারতবাসীর সংঘবদ্ধ শক্তিরই প্রশস্তি—

মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়
দুর্ভেদ্যি যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট মৈন্য দুঃখে তাহার খুঁজের সদা অটল স্থির।
জ্বলিল যেখানে সেই দাবাগ্নি, সে জলবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল, সে মহাআহবে যবনসৈন্য, ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়, উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চ শির—
তুচ্ছ করিয়া স্নেহস্পর্শ দীর্ঘ সপ্ত পতাব্দীর।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি অবশ্য বাংলাদেশকে কেন্দ্র ক'রেই প্রথমত উদ্ভাসিত হয়েছিল। তিনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মাতৃভূমিরই মহিমার গান গেয়েছেন—কখনও বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ করে, কখনও-বা ভারতভূমিকে উদ্দেশ করে। তাঁর মহিমা-কীর্তন বঙ্গভূমির উদ্দেশে—

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ।
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
(কোরাস)—কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।

জাতির জাগরণের জন্য তার ধর্মপ্রাণতার অপেক্ষা তার অতীত গৌরবগীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই তিনি অধিকতর প্রয়োজন মনে করতেন। তাই বঙ্গে ও ভূয়ে সেই গৌরবমানের কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তার ফল, তাঁর অধিকাংশ গান জাতিমূলক প্রশস্তি-বাচন না হয়ে, হয়ে উঠেছে উদ্দীপনাময় গৌরবব্যঞ্জক ও অনন্য সম্ভার—

হিমে শুভ্র তুষারকিরীট সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া অঙ্গ,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখনো মা তুমি ভাবণ দীপ্ত, তপ্ত মরুর উপর দৃপ্ত,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ভরিয়ে পড়িয়ে নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি। জননি! ভারতবর্ষ।"

দেশমাতার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আবেদন যে কোন গানে নেই, তা নয়। তবে এ শ্রেণীর গান উদ্দীপনাময় নয়, এর অন্তর্গত সুর আমাদের অন্তরকে বিমলিত ক'রে মাতৃমমতায় দ্রবীভূত। মনমাতায় স্নায়ুর অনল ছায়ায় মিয়ে যায়। যেমন,

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

কেবল মাতৃভূমিই নয়, মাতৃভাষার প্রতিও সভীর মমতা কবির গানে প্রকাশিত। এজীবনে তিনি অর্থ, মান কিছুই চান না, তিনি চান কেবল বীনা মাতৃভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় জীবনোৎসর্গ করতে। মাতৃ-ভাষার উদ্দেশে তিনি গেয়েছেন—

আজি গো তোমার চরণে জননি!
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান।
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত-পূতেক ভক্ত বীনের গান!
রবির রশ্মি মা তোমার লাগি' পরাণ ফুড়ায়ে পথে পথে বাগি।
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সহিতে করিয়া স্নান।
(কোরাস)—
জননি বঙ্গভাষা এজীবনে চাহিনা অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

তবে প্রধানত তাঁর গান সমুখ-সমরে-অগ্রগামী সাহসী সৈনিকের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারসাধনের জন্য চারণ কবির তন্ময়তার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।

ভারতের যে সকল বীর নিজেদের রক্ত দিয়ে শত্রুর আক্রমণ একদা প্রতিরোধ করেছিলেন, দেশবিদেশে ভারতের গৌরব পতাকা বহন ক'রে ফিরেছিলেন, তাঁদের বীর অবদান তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি-মা এই ধূলায় আসন, তার কিমা এই ছিন্ন বেশ?

প্রাচীনকালের চারণরা গ্রামে গ্রামে জাতির গৌরব ও মহিমার গুণগান ক'রে বেড়াত, এই চারণব্রত তাঁর গানে বাণী রূপ আরোপ করেছিল। তা ছাড়া, তাঁর গানের উদ্দীপনাময় সুর কবি বিদেশের সামরিক সঙ্গীত থেকেও সংগ্রহ করেছিলেন, এই সকল গানের উচ্চকণ্ঠে সমবেত কোরাসও ইংরেজি গান থেকে গৃহীত—

যাও যাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা।
রক্ষা করিতে দাঁড়িয়ে স্বর্গে শুন ঐ ডাকে ভারত মাতা।

কে হবে কবির প্রাণে মাতা, যখন বিশ্ব জননী তার ?
সাত সাত সকলে রণমাতে শুভ মনমন রণক্ষেত্রী মাঝে
শুভ সময়ে দিব জীবন ঢালি—হব মা ভারত, তব মা কালী।

অতীতের গৌরবগান, বর্তমানের দুঃখ গ্লানির গান গেয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিব্রতের শেষ হয় নি, তিনি জাতির ভবিষ্যতের দিকেও আশা-ক্ষেত্রে চেয়েছেন।

দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন কবি, অতীতের জন্য শোক না ক'রে দেশের লোককে আবার মানুষ হবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন করুণ কণ্ঠে—

কিসের শোক করিস ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
নিজেরে দেখ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি পক্ষ দোষ ?
তোদের এ যে নিজেরই রোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।
বিমল আলোয় তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান :
ভুলিয়ে যারে আপনার, পরকে নিয়ে আপন কর :
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ' ॥*

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

অনুন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

আজকের গোটা দুনিয়ার অর্থ নৈতিক চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মকে মোটামুটি-ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি উন্নত অর্থনীতির দেশের—তাহ'লে, পূর্ণ কর্ম সংস্থান অবস্থার সৃষ্টি এ রকম সাহায্যে সাময়িক অর্থ নৈতিক সংকট থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার চিন্তা ও ক্রিয়াকর্ম। অপরটি, অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলির—আর তা'হল, শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের জীবনমান ও আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা এবং পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের অবস্থা সৃষ্টি করার চিন্তা ও ক্রিয়া-কর্ম। আমরা যেহেতু দেশের অধিবাসী—তাই সেই দেশের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কর্মের বৈশিষ্ট্য আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অনুন্নত-অর্থনীতির অনেকগুলি দেশেই পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। সেইজন্যও বিশেষ ক'রে এই সব অর্থ-নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সাবধানী থাকা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্য গুলি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :

এই সব অর্থনীতির দেশের জন-সংখ্যার এক বিরাট অংশ গঠন করছে প্রায় ৭০ ভাগ কৃষি নির্ভরশীল। ফলে জীবন-মান অতি নিম্ন,আর তাই অন্য কোন প্রকার পণ্যের ব্যাপক বাজার গ'ড়ে ওঠে না—আর সেজন্য অন্য শিল্পও গ'ড়ে ওঠার পরিবেশ পায় না,—ফলে সাধারণভাবে মানুষের মাথা পিছু আয় খুবই অল্প এবং তাও ব্যাপকক্ষেত্রে পণ্যভিত্তিক,—মুদ্রাগত নয় (non-monetised)। মাথা পিছু অল্প-আয় যেহু সঞ্চয় নেই। বাজার নেই ব'লেও শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। এমন ক'রেই "দেশটা দরিদ্র" এ আখ্যাতেই দরিদ্রই থেকে যায়।

এই সব অর্থনীতিতে কৃষিই প্রধান উপজীবিকা—আর তাই বিপুল জনসংখ্যা জমিতেই ভীড় জমায়। ফলে এই অর্থ-নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ও অর্ধ বেকার (disguised ও under-employed) সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ যদি এই সংখ্যা থেকে কিছুসংখ্যক লোককে সরিয়ে অন্য কোন বৃত্তিতে নিয়োগ করা যায়, তাতেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমানই থাকে। ঐ লোকগুলির প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। যদি অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে কৃষি ছাড়া অন্য কোন জীবিকার ব্যাপক ব্যবস্থা করা যায় তবে এই হ্রাসবেকার জন-সংখ্যা নূতন নিয়োগের ও মূলধন গড়ে তোলার পক্ষে একটি বিরাট সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ যদি এই হ্রাস-বেকার জন-সংখ্যাকে কলকারখানায় এবং ভারী ও মূল শিল্পে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা যায়, তবে সুষ্ঠু কৃষি এলাকার অপচয়ের যে বাড়তি শ্রম-কালক্ষেপ করত, তা সকলের মাধ্যমে যা ভারী ও মূলশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ঐ বাড়তি উৎপাদন ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে মূলধন গড়ে ওঠে। মুদ্রাস্ফীতির শঙ্কাও অনেক হ্রাস পায়। কৃষি অর্থনীতির এই দিকটা অনেকদিন অবজ্ঞাতই ছিল।

আগেই বলেছি, এই সব দেশের মানুষের মাথা পিছু আয় অতি সামান্য এবং উৎপাদনও কোন রকমে জীবন-ধারণের পর্যায়ে সীমিত। এর ফলে, সঞ্চয় গড়ে ওঠে না ব'লে, ব্যাপক শিল্পায়নের সম্ভাবনা দেখা যায় না। আর ব্যাপক শিল্পায়নের অস্তিত্ব নেই বলে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই এবং সেইজন্য উপার্জনও কম। এমন করেই 'দেশটা দরিদ্র, কারণ তা দরিদ্র' এই Vicious circleটা সক্রিয় থাকে। আবার, কোনরকমে জীবন-রক্ষার পর্যায়ের বাড়তি উৎপাদন নেই বলে এবং তাই শিল্পায়ন সম্ভাবনা ঘটনা বলে এ সব দেশে মুদ্রাগত বাজার এবং Exchange Economiesর অবস্থা গ'ড়ে ওঠে না। অথচ শিল্প-সম্ভাবনাকে সার্থক ক'রে তোলার পক্ষে এই অবস্থা সৃষ্টি অপরিহার্য।

এই আলোচনা থেকে এই ধারণা আমরা সহজেই করতে পারি, এই সব দেশে যেহেতু মাথা পিছু স্বল্প আয়, সেই হেতু সঞ্চয় না' ঘটে তা নগণ্য। শুধু তাই নয়, যে সামান্য সঞ্চয়ও ঘটে, তাও জমিতেই নিয়োজিত হয়। ফলে শিল্প-বাণিজ্যে মূলধনের সরবরাহ ঘটে না।

উৎপাদন প্রধানতঃ কৃষি এলাকায় খাদ্য শস্য এবং প্রাথমিক কাঁচা-মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রোটিন খাদ্যের উৎপাদন তুলনায় অল্প।

এ সব দেশে মোট আয়ের প্রায় সবটাই খাদ্য শস্য এবং বাকী সামান্য অংশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেই ব্যয় হয়। ফলে শিল্প পণ্যের চাহিদা থাকে না বললেই চলে।

এই সব দেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য—খাদ্য-শস্য ও কাঁচামাল রপ্তানি। অবশ্য অর্থনীতির অবস্থা খুব শোচনীয় হ'তে পড়লে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় এমন দৃষ্টান্তও আছে।

এই সব কারণে মাথাপিছু বাণিজ্যের পরিমাণ সামান্য।

আরও একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, তব সরবরাহ এবং বাজারের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যেমন দুর্বল, তেমনি অসংগঠিত। সোনারূপো, হীরে, জহরত প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু বিপুল পরিমাণে অলঙ্কারের আকারে এবং বন্ধার স্থানে অকেজো অবস্থায় প'ড়ে থাকে—অথচ অর্থনৈতিক উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় না।

দেশের মানুষের এবং অর্থ-নৈতিক ক্রিয়া-কর্মের অবস্থা এমন শোচনীয় বলে তাদের বসবাসের অবস্থাও তদ্রূপ।

ভারতের যেকোনও জায়গায় গিয়ে ঘুরে আসুন, উপরে বর্ণিত সব লক্ষণই চোখে পড়বে।

পূর্বের আলোচনায় বলেছি, এই সব অর্থনীতিতে কৃষি-কর্মই প্রধান অর্থ-নৈতিক কর্ম। আর কৃষিকর্মে খুব সামান্যই মূলধন ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে কৃষি উৎপাদন-সংগঠন পরিচালিত বলে ঐ সামান্য মূলধন ও সুবিধাজনক ভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং ফলপ্রসূ হয় না। উৎপাদন-পদ্ধতি মান অত্যন্ত নিম্ন এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলি যেমন মান্ধাতার আমলের তেমনি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুর্বল।

অনুন্নত কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দেশগুলিতে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে স্বল্প বাজারের অভাব এবং অনুন্নত পথঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থা। তবে এটা দেখা যায়, কোন কোন অনুন্নত দেশে শুধুমাত্র বিদেশের বাজারের জন্য কৃষি উৎপাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের কৃষিউৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

আবার এই সব দেশে কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী সংকটও ঘুরের স্বল্প-মেয়াদী সংকটের সম্মুখীন হবার ক্ষমতাই থাকে না—আর তাই তারা তাদের সেই পুরানো পদ্ধতি জমি থেকে সর্বাধিক ফসল ফলাতে চেষ্টা করে—তার ফলেও জমির শক্তির অবনতি ঘটতে থাকে।

আবার উপার্জন ও সঞ্চয়ের তুলনায় কৃষকদের ঋণের পরিমাণ বিপুল—তারপর ঘরোয়া স্বল্পমূল্য উৎপাদন ব্যবস্থা—ফলে বাজারের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্য আসে না। তাই উৎপাদনটা বিরাজই subsistence level এ থেকে যায়।

অনুন্নত অর্থনীতির জনতত্ত্ব

(ক) এইসব অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে যেমন জন্মহার অত্যন্ত বেশী, তেমনি মৃত্যুহারও বেশী। জন্মহার হাজার প্রতি প্রায় ৪০। এই অবস্থার ফলে সাধারণতঃ শিশু মৃত্যুর ঘটনা যেমন মূলধন সঞ্চয় বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(খ) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং sanitation এর ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়।

পল্লী এলাকায় জনসংখ্যার ভীড় অত্যধিক।

শিক্ষা, কৃষি ও সংস্কৃতি

(ক) শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে এবং শিক্ষিতের শত করা হার খুবই কম।

(খ) শিল্প-শ্রমিকের ব্যাপক-ব্যবহার

(গ) অসংগঠিত এবং দুর্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণী

(ঘ) সামাজিক জীবনে স্ত্রীলোকদের মর্যাদার অভাব।

(ঙ) গতানুগতিক ও রুদ্ধ জীবনচর্চা।

এছাড়া রয়েছে অসংগঠিত এবং প্রয়োজনের তুলনায় অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থা। এর গুরুত্ব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে অত্যধিক।

উপরে যে সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশকে অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের দুটি সম্পর্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে। তা'হল, (ক) আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ পরিমাণও বাড়ে। (খ) আর, যত আয় বাড়ে তত বিনিয়োগ বাড়ে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে—আয় যত অল্প, ততই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় বাবদ খরচ অনুপাতে বাড়বে। আমরা বলেছি মাথা পিছু স্বল্প আয় অনুন্নত অর্থনীতির একটি অন্যতম লক্ষণ। আর এটা দেখা যায়, এই স্বল্প আয় উদ্ভিদিত অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রসূত। আবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই স্বল্প আয় উদ্ভূত। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যাক—

এই সব এলাকার কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্যের মূলে চাহিদা ও ভোগ ক্রিয়ার প্রভাব অন্যতম। যেহেতু এই সবদেশের লোকেদের আয় স্বল্প, সেইহেতু আয়ের বিরাট অংশ খাদ্যের খাতে ব্যয় হয়। আর সেইজন্য এই সব দেশে কৃষিপণ্যের চাহিদা অন্যতম চাহিদা। আবার এই সব দেশে মাথা পিছু মূলধন অত্যন্ত কম বলে মোট শ্রমের প্রায় সবটাই কৃষিতে খাটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাহায্যে এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তার জন্যেও দেশের অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন।

এ থেকে ধারণা করা যায়, যে সব দেশে শিল্পার্জনের এক বিরাট অংশ খাদ্য ও কোনরকমে বসবাসের বাবদেই ব্যয় হয় সে সব দেশে মাথা পিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের হার অত্যন্ত কম। মাথা পিছু স্বল্প আয়

—নির্ম্মিত-কাপাসের বিদেশ থেকে আমদানী করা অনুবিধাজনক পণ্যের সন্ধির চাহিদা স্বভাবতই সামান্য হয়ে থাকে। বরং অনেকক্ষেত্রে কৃষিজাত জোগানের আমদানীর প্রয়োজনই বোধ হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা চাহিদার দিক থেকে। জোগানের দিক যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে, প্রাথমিক পণ্য (কৃষিজাত) দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত সামান্যই থাকে এবং যন্ত্র-শিল্পের প্রসার এমন থাকে না যাতে উদ্বৃত্ত শিল্প-পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা যেতে পারে। এসব দেশে যখন রপ্তানীর প্রাধান্য ঘটে তখন সাধারণতঃ রবার, কোকো, এবং ইক্ষু প্রভৃতি ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য—রপ্তানী বাণিজ্যের এই সব পণ্যের প্রাধান্য থাকে বলেই ঐতিহাসিক মূলধনের বিরাট অংশ এই সব অনুন্নতদেশে এই সব single crop, plantationএর ক্ষেত্রে বেশী হয়ে থাকে। যদিও এই সব পণ্যের রপ্তানী গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি মাথা পিছু মোট রপ্তানীর হিসাব করলে তা খুব লক্ষণীয় হয়ে না।

এ সব দেশে শিল্প শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপকতা জোগের দিক দিয়ে বহু অংশে প্রভাবগ্রস্থ। প্রথমতঃ পরিবারের আয় এত অল্প থাকে যে সেই আয়ে সংসারের খরচ মেটানোই যায় না—তাতেই শিশুকেও জীবিকা উপায়ের কাজে নিযুক্ত হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা প্রভৃতির জন্যে যে খরচের প্রয়োজন তা এই সমস্যের অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক সংস্থিতিতে সংকুলান হয় না।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিচার করা চলে, যে সব দেশে মূলধনের বেশী যে সমস্যের শিল্পক্ষেত্রে আকর্ষণী হওয়ার কারণ পর্যাপ্ত লাভন-পালনের পরও থাকে—মূলধনের দেশের চেয়ে বেশী। কাজেই অনুন্নত অর্থনীতির দেশে—যেখানে পরিবর্ত্তনশীলদের সংখ্যা বেশী সেখানের অল্পবয়স্ক ছেলেদের উপার্জ্জনের কাজে লাগিয়ে এই ভার লাঘব করার চেষ্টা চলে।

আবার এই সব দেশে আয় অল্প ব'লে সঞ্চয় অল্প। আর তাই বিনিয়োগের পরিমাণ সামান্য। মূলধন স্বল্প বলেই শ্রোতশীল, এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পে মান্ধাতার আমলের অনুন্নত ধরণের মূলধন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণের ব্যবস্থাও অত্যন্ত প্রাচীন এবং তাও যথেষ্ট নয়। একথাও সত্যি এই সামান্য মূলধন যদি বিশিষ্টভাবে নিযুক্ত থাকে তবে সেই মূলধন উন্নত ধরণের যা সুফল-প্রসূ হবে না। তবে অবশ্য অনেক অনুন্নত অর্থনীতির দেশে দেখা যায়, কোন কোন বিশেষ বিশেষ শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট এবং খুব উন্নত ধরণের মূলধন ব্যবহৃত হয়ে থাকে—আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষেত্রে বহু এবং সুপ্রাচীন মান্ধাতার আমলের মূলধন নিয়োগ করা হয়। উন্নত ধরণের মূলধন—বিশেষ করে রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পে—যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন খাটে, সে সব ক্ষেত্রেই বেশী ব্যবহার দেখা যায়।

সাবিত্রী

বনবেণু

হলের আঁধারে, সাগর আঁধারে
স্বামীরে লইয়া কাছে,
সকল মরমে, সকল মরমে
কে ওই বসিয়া আছে!
প্রাণের দ্বারে যারা ফিরিছে সেথায়
নাহি তবু দৃক্‌পাত,
চোখে ঝরে জল, ভাবিয়া বিকল
কপালে রাখিয়া হাত।
ভাবে শুধু এই জীবনের খেলা,
শেষ হ'ল বুঝি ধীরে,
বুঝিয়াছে আজ মৃত্যু হারাবে
হয়েছে আঁধার ফিরে।
হারায় কন্যা, কত আছে ধন
তবু দেন বিদায়ক,
মৃত্যু ছুঁয়ে যবে হানে করাঘাত
বলে তোর নাহি বশ।

যমরাজ আসি, কহিল তখায়
যাও ফিরে যাও ঘরে,
জীবন যে তার ব'য়ে গেছে শেষ
দীর্ঘ বিরহ পরে।

লহে যায় দেখা, মৃত্যু দুয়ারে
অন্ধকারের মাঝে,
বন উজলি মৃত্যু হারিয়ে
দেখা প্রভাতে ও সাঁঝে।

কহে সাবিত্রী সাশ্রু নয়নে
এই ছিল মোর ভালো,
মৃত্যুর পরে দেখিব স্বামীরে
পাইবো নয়নে আলো।
সাধ নাই আর, বাঁচিতে আমার
জীবন করিব শেষ,
রহিবে না সুখ, রবে না পাশে
রবে না দুঃখ লেশ।
ওহরাজ জানে, বুঝেছি তোমার
স্বামী প্রতি অনুরাগ
সকল আশা ও সুখ সম্পদ,
তারি তরে কর ত্যাগ।

যাও ফিরে যাও, সুখ পানে চাও,
বিভাবরী বিভাবরে
সারা বিশ্বের স্নেহের পাত্র
জাগুক তোমার পরে।

নবীন আবেগে সজল নয়ন
তুলিয়া চাহিল ধীরে
ফোঁটা কয় জল পড়িল ধূলায়
নমিতে বিনত শিরে।

P.G.A. COMMON-ROOM

গল্প

পুরুষস্য চরিতম্

দেবাচার্য

—মন্দির দেখতে যাবেন না ?

সুলতা কর, সলিলার সমবয়সী, সিঁথিতে সিঁদুর, প্রশ্ন করে।

—যান আপনারা, আমি আর যাব না—বালিশ কোলে টুর্গেনিভের 'অন দি ইভ্' উপন্যাস পড়ছিল সলিলা সান্যাল, মুখ তুলে উত্তর দেয়।

—এইখানে বসেই স্বামীর আরাধনা করতে চান ? —সলিলার মুখে রক্তিমাভা দেখা দেয়, বলে—স্বামীর আরাধনা !

—মানে, জগন্নাথ স্বামীর আরাধনার কথা বলছি।

—ওঃ। সলিলা হাঁফ ছাড়ে।

—যাক, ভালই হল, ঘরটা পাহারা দেবেন। আমি আবার ভাবছিলাম, এতগুলো টাকা ঘরে রেখে যাবো—তালাচাবীর উপরেই কি নির্ভর করা যায় ? চোরের কাছে ডুপ্লিকেট চাবী থাকাতো বিচিত্র নয়।

—যান আপনি, আমি আছি। সলিলা বইএর পাতার দিকে চোখ ফেরায়।···

···স্কুলের ২২টি মেয়ে নিয়ে সলিলা সান্যাল আর সুলতা কর এসেছে পুরীতে। হোটেলের নীচের তলায় মেয়েরা, আর উপরের একটি কোণের ঘরে স্থান পেয়েছে শিক্ষয়িত্রী দুইজন। বৃষ্টির দিনে জন্ম, তাই ঠাকুরদা নাম দিয়েছিলেন, 'সলিলা'। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, নাক মুখ সুন্দর। রং ও কর্ণা বলা যায়, বাঙালী মেয়েরা যেমন দেখতে, তার চেয়ে খারাপ নয়। তবু দেবতা-প্রজাপতি কেন যে সলিলার উপর এত উদাসীন, তার কারণ সলিলা নিজেও সঠিকভাবে জানে না। এইটুকুই শুধু জানা আছে তার, শেয়ার মার্কেটে সর্বস্বান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাবার নিকট কোন পাত্রই পছন্দ হ'ত না। সর্বস্বান্ত হবার পর, পাত্রদের সাক্ষাৎ পেলেও, পাত্র-পিতাদের দাবী মেটানো সম্ভব ছিল না।···

তারপর, দেখতে দেখতে আট বছর কেটে গেল।

···পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেলটি, এখনও পুরীর সীজন ঠিক শুরু হয়নি বলে ভিড় কম। স্কুলের খরচে এবং ছাত্রীদের পয়সায় প্রায় বিনা ব্যয়েই কোনারক, ভুবনেশ্বর, পুরী দেখে ফেরা যাবে যখন, তখন সলিলা ছাত্রীদের একসকারসান পার্টির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুলতা করের সহকারিণী হিসাবে আসতে আপত্তি করেনি।

বাইরে বারান্দায় জুতোর মচ্‌মচানি শুনতে শুনতে সলিলার কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কে যেন আগন্তুক যাত্রী এল। পাশের ঘরে তালাচাবী খোলেন ম্যানেজার।

ম্যানেজার চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর—পছন্দ হয়েছে ?

হয়েছে, উত্তর শোনা যায়।

পছন্দ হবেই। সব ঘরই ভাল। চেয়ারে, বিছানায় যেখানেই বসুন না কেন, সমুদ্র দেখতে পাবেন। ব্রেকফাস্ট এখুনি পাঠিয়ে দেব ?

হ্যাঁ, দিন।···

প্রহরে প্রহরে কত লোকই তো আসে, আবার চলে যায়।' সলিলার ভ্রূক্ষেপ নেই। কী আশ্চর্য ! পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে আজ আর কৌতূহল অনুভব করে না সলিলা। তার নামের সঙ্গে মানসিক প্রকৃতির যোগ নেই কি ? সে যে সলিলা, অর্থাৎ ঢেউ, ঢিল ছুড়লে কয়েক নিমেষের জন্য বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়, আবার মিলিয়ে যায়। জলের চিহ্ন আঁকা যায় কি ?

সমুদ্রে স্নান ক'রতেও সলিলার উৎসাহ দেখা যায় নি। প্রথমদিনেই লবণ জলের যে আস্বাদ নাকে মুখে অনুভব করেছে সে !···

আর, তাছাড়া,

কলেজের ছেলেগুলো কি অসভ্য!

পথে দাঁড়িয়ে থাকে, সরমে না কিছুতেই। ভিড়ে কাপড়ে অন্ততঃ পুরুষের চোখের সামনে উঠে আসাও এক ফ্যাসাদ। তাছাড়া, সরম বালির উপর হেঁটে আসতে পায়ে যেন ফোস্কা পড়ে।···

বিকেল গড়িয়ে গেল।

হোটেল নির্জন। প্রায় সবাই বেরিয়েছে শহর দেখতে, মন্দিরের প্রসাদ কিনতে, অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে। সাবান তোয়ালে গুছিয়ে দরজা বন্ধ করে সলিলা। বাথ-রুমটা বেশ বড়, শাওয়ার-বাথের বন্দোবস্ত আছে, সকল পোশাক আশাকের ভার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্নান করায় যে এত আনন্দ, তা যেন আজই সলিলা প্রথম টের পেল। প্রকাণ্ড দেওয়াল আয়নায় দেহের প্রতিবিম্ব পড়ে··· তাকে কি দেখতে খারাপ?···সলিলা লজ্জা পায়।···

···ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, গৌরীকুণ্ড, তারপর কোনারক ঘুরে ছাত্রীদের নিয়ে রিসার্ভ বাসে এসেছে পুরীতে, কালই ফিরে যাবে সন্ধ্যার ট্রেনে।···একটা রাত্রি আর দিন শুধু বাকী।

···নীল রঙের শাড়ী পরে তাকে তো বেশ মানায়। ইশ, লোকগুলো কী! সেকালের রাজাদেরই বা কি রুচি! ছিঃ ছিঃ, ঐ সব মূর্তি গড়িয়ে রেখেছে মন্দিরের গায়ে। ভাবতেও সলিলার গা শিরশির করে ওঠে।

এই কি বিবাহিত জীবন?

সাধারণ সংসার? ভগবান—দেবতা—মানুষ···প্রভেদ কোথায়?

আমেরিকান মেমসাহেব গাইড নিয়ে কোণারকে এসেছিল—সলিলার সঙ্গে কোণারক-মিউজিয়ামে আলাপ Why this obscenity? কী উত্তর দেবে সলিলা? কয়েকটি কলেজের ছাত্র দূরে দাঁড়িয়ে উড়িয়া দরোয়ানের সঙ্গে হাসিঠাট্টা ক'রছে।

সলিলার মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। কোনমতে বুদ্ধি করে বলে—Cross the hurdle, you get into the sanctuary of god···

কিন্তু, মনে মনে সলিলার প্রশ্ন জাগে—সাধারণ লোকের সম্মুখে স্বামীস্ত্রীর রতিজীবন এমন নগ্নভাবে তুলে ধরার কি সার্থকতা?

সলিলা ন কৌচকায়। নির্জন বারান্দায় সোফাটা টেনে বসে। তখনও টুর্গেনিভের উপন্যাসটি শেষ ক'রতে পারেনি। ইলীনার মতো মেয়ে কি বাংলাদেশে নেই? কিন্তু, ইন্সারোভের মতো পুরুষ কোথায়?

বাঙালী পুরুষ—পুরুষই নয়। ছিল, এককালে হয়তো ছিল। সে বিবেকানন্দও নেই, সে অরবিন্দও নেই। নেতাজী···নেতাজী কি এখনও বেঁচে আছেন?···

ব্রেকারের শব্দ যেন আরও জোরে শোনা যায়। ঢেউ যেন আরও উঁচুতে উঠতে না পেরে ভেঙে পড়ে, ক্ষুব্ধ আক্রোশে।···বাতাস, বাতাস নেই। এমন গুমোট—না, না, এইবার বাতাস বইতে শুরু ক'রেছে।

খুট্ করে শব্দ, পাশের ঘরের দরজা খুলে যায়, কিন্তু সলিলার ধ্যানভঙ্গ হবার মতো শব্দ সরব নয়।

···অনিমেষ অবাক হয়ে দেখে, একটি যুবতী। এলো-চুল পিঠে ছড়িয়ে, সমুদ্রের দিকে মুখ।

দর্শনের প্রফেসর, একলা একলা দেশভ্রমণ ও দর্শন করাই তার নেশা। বাড়ীতে বাবা মা ভাই, দাদা, বোন, বৌদি—সবাই আছেন, তাছাড়া পিসীমা মাসীমার ভিড়ও সর্বদাই লেগে আছে। তাই, বেশী লোকের ভিড় এড়িয়ে নির্জনে, নিজেকে খুঁজে পাবার চেষ্টাতেই তার তৃপ্তি। মানসিক বিলাসও বলা যায়।

অপরিচিতা তরুণী। সেও বয়সে প্রবীণ নয়। তাছাড়া অবিবাহিত। আর, সর্বদাই স্ত্রীলোককে এড়িয়ে চলাই তার বহুদিনের অভ্যাস। অনিমেষের ইচ্ছে ছিল খোলা বারান্দায় একটি চেয়ার টেনে বসে। কিন্তু, বসতে গেলে পাশেই বসতে হয়। স্ত্রীলোকের পাশে বসবে? সম্পূর্ণ অপরিচিতা হয়ে? তার শালীনতাবোধে আটকায়।

মহিলাটির বয়স কত?

উনি কি বিবাহিতা?

কি জানি। ওঁর স্বামী বোধহয় শহরে গিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন। সলিলা মুখ ফিরিয়ে আছে, তাই সিঁথির উপর নজর যায়না।

অনিমেষ নিমেষের জন্য ইতস্তত: করে, কি যেন জানতে পারলে ঔৎসুক্য মিটতো—কিন্তু, থাক্—থাক্ ওসব কথা··· অল্ লেডীজ্ আর উইমেন—টমাস এ কেম্পিস্ কি বলেছেন?—কমেও, দেম্ টু গড্, বাট্ ডোণ্ট বি ইন্টিমেট

উইথ্ এনি। সকল স্ত্রীলোকদের জন্য ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, কিন্তু, দেখো, যেন কোন একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ো না।··

সমুদ্রের তীরে অগণিত নরনারীর ভিড়। জেলিয়ারা লম্বা দড়ি টেনে জাল গোটাচ্ছে। অনেকগুলো নৌকো কালো বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে, অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে জেলেরা, ব্রেকার্সের ওপারে। অনিমেষ অন্যমনস্কভাবে চারদিকে চোখ বোলায়। একটা সাইকেল-রিকশ আসছে। উঠবে কি? ঐ যাঃ, পার্স নিতে ভুলে গিয়েছে। ফিরে আসে অনিমেষ। সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। করিডর পার হয়ে দুটো ঘরের মাঝ দিয়ে বারান্দা। বারান্দা না ঘুরে তার ঘরে ফিরবার উপায় নেই। তাই, অনিবার্যভাবে আবার···সেই মহিলাটির—কবির ভাষায়, চাঁচর চিকুর··· ঘনকুন্তল···মেঘের মতো কালো চুলের ছবি চোখে পড়ে।

আচমকা জুতোর শব্দে সলিলা চোখ ফেরায়।

চার চোখ এক হয়।

উভয়পক্ষের দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহল। অনিমেষ মুখ ফেরাবার আগে মেয়েটির দৃষ্টি নত হয়ে আসে। কেউ কথা বলে না। কিন্তু, দু'জনের মনেই এক প্রশ্ন: কে ইনি, কোথায় যেন দেখেছি।

—শুনুন। কম্পিতকণ্ঠে সলিলা বলে।

—আমাকে কিছু ব'লছেন? অনিমেষ দরজায় চাবী ঘোরানো বন্ধ রেখে, প্রশ্নের উত্তর দেয়।

—অনিমেষদা! সলিলার কণ্ঠস্বরে এইবার দৃঢ় প্রত্যয়।

—সলিলা, তুমি!! এখানে??

ততক্ষণে সলিলা উঠে দাঁড়িয়েছে। চুলগুলোকে মাথার পিছনে কোন রকমে জড়িয়ে, সলিলা পূর্ণদৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকায়। অনিমেষও বিস্মিত দৃষ্টিতে সলিলার দিকে চেয়ে থাকে।

সলিলার পিছনে, অনিমেষের সুমুখে—অনন্ত নীল সমুদ্রের ফেনিল বিস্তার। তখনও সূর্যের আলো ছড়িয়ে ছিল আকাশে।···

—তারপর?

—তারপর, আর কিছুই নেই। মেয়েদের অন্যতমা অভিভাবিকা হয়ে এসেছি পুরীতে।

—ক'লকাতা মুখো ফিরবে কবে?

—কাল।

—আচ্ছা, তুমি তাহলে ব'সো এখানে। আমি একটু ঘুরে আসি। অনিমেষ ঘর খুলে পার্স নেয়, বেরিয়ে যাবার সময় আবার সলিলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সলিলার চোখের দৃষ্টিতে যে আহত অভিমান ছিল, তা অনিমেষ দেখতে পায়নি।

জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সলিলা সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরায়। একটু পরে, ক্লান্তি অনুভব করে, ঘরে গিয়ে খিল এঁটে শুয়ে পড়ে।

এমন দুর্বোধ্য পুরুষও আর সে দেখে নি।

এতদিন, এক যুগ পরে দেখা হ'ল, শুধু একতরফা প্রশ্নই করেই গেল। তার সম্বন্ধে জানবার কৌতূহলও তো সলিলার মনে জাগতে পারে। কিন্তু, সে কৌতূহল নিবৃত্তির কোন সুযোগই দিল না অনিমেষদা। অনিমেষদা ঠিক সেই রকমই আছে। কেমন যেন অদ্ভুত। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুর্বলতা নেই, এমন পুরুষ অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র, তাই বলে এত উদাসীন হলেই বা স্ত্রীলোকের চলে কি করে?···

মায়ের মামাবাড়ীর দেশের ছেলে অনিমেষদা। বেশ মনে আছে সেদিনকার ঘটনা। সলিলার তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়েস। নদীর ঘাটে গিয়েছে শিশুর কৌতূহলে, মাকে—কাউকে না জানিয়ে। বর্ষার নদীর জল ঠিক গেরুয়া রঙে রাঙা—স্রোতও প্রখর, অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা কেমন জলে ঝাঁপ দেয়, আমিও দি না কেন, এই রকম মনোভাব থেকেই বিপত্তির উৎপত্তি। ঘন লম্বা চুল জলে তখনও ভাসছিল, তাই সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল সলিলা। ক্লাশ টেনের ছাত্র অনিমেষ আসছিল বই বগলে, নদীর ধার ঘেঁষে।

উঃ, সে কি বকুনী!

মা, মাসী, দাদু, দিদিমার, আর পাড়ার লোকের। কিন্তু, অনিমেষদা কিছু বলেনি। দেখা হলেই বলতো, তোমার মধ্যে প্রাণ আছে, তোমাকে একদিন সাঁতার শিখিয়ে দেব।···

আরও, কত টুকরো স্মৃতি-চিত্র ভেসে ওঠে মনের পর্দায়, একের পর এক ছবি। ছবির যেন শেষ নেই।···

না, না, কারুর কাছেই সলিলার মনের গোপন কথা প্রকাশ হয়নি। নিজের কাছেও কি সব নিজের কথা প্রকাশ হয়?…

যা হতে পারতো, তা কেন হয় না? বাবা এত পাত্রের সন্ধান নিলেন, কিন্তু এমন সুপাত্র থাকতেও কেন সেদিকে বাবার নজর গেল না?…

তখন, কিই বা বয়েস তার, মুখ ফুটে কি করেই বা ব'লতো সলিলা?

তা ছাড়া সে যে সলিলা। বাঙ্গালী মেয়ে কি রাসিয়ার ইলীনার মতো হ'তে পারতো? কি জানি, হয়তো পারতো। হলে ক্ষতি হ'তো না। বাঙ্গালী ঘরের প্রত্যেক মেয়েই কি সলিলার মতো নয়? টিপ্‌টিপ্ করে ঝরেই চলেছে জল, ছিদ্র-ওয়ালার পুরনো কলের ফাঁক বেয়ে। কঠিন সিমেণ্ট, ক্ষয় নেই। আগেকার দিনের বেলেপাথর-গুলো কিন্তু ক'লতলায় ক্ষয়ে যেতো।

—চরকা ঘুরুন।…কি হ'ল আপনার!

আলো জ্বালে সলিলা।

—মা, মিষ্টি নেবেন? ভাল লেডিগেনি, সন্দেশ।

—আঃ জ্বালাতন, রাখো তোমার লেডিগেনি। না না, নেব না, যাও। ঘরে প্রবেশ করে সুলতা কর। হাতে জগন্নাথের প্রসাদ, কাঠের জগন্নাথ, মোষের শিঙের ধূপদানি. ইত্যাদি।

একগাল হাসি হেসে বলে—বেশ আপনি, কবি হওয়া উচিত ছিল। সেই শুয়ে আছেন বিছানায়, ওঠেন নি একবারও।…

—আমি আর রাত্রে খাব না। আপনি খেয়ে নিন।

—শরীর খারাপ হয়েছে?

—হ্যাঁ।

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে সলিলা মুখের উপর চাদর টেনে ঘুমের ভান করে।…সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, একে একে সব ঘরে আলো নিভে যায়, তখন সে উঠে আসে সন্তর্পণে। বাইরে শিকল টেনে বারান্দার সেই চেয়ারটা টেনে নেয়।

ঘর অন্ধকার, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে অনিমেষদা।

… উঃ, কি গুমোট! সমুদ্রের তীরে দোতালার উপরেও বাতাস নেই। পুরীতে এত মশা কেন? চারদিকেই তো বালি, পচা জল কোথায়? কে যেন নির্জন বীচের উপর দিয়ে তখনও পায়চারী করছে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে সলিলা, মাথা হেলে পড়ে কাঁধের উপর—টেরও পায়নি সে।…

পরদিন।

সকালে মেয়েরা সমুদ্রে স্নান করতে নামে। অবাক হয়ে দেখে, সলিলাদিও তাদের পিছন পিছন জলে নেমেছেন।

—কি, আজকে যে বড় এলেন? একটি মেয়ে প্রশ্ন করে।

স্রোতের উপর লক্ষ্য রেখে মাথা নীচু করে সলিলা। আঃ, লোনা জলেও স্নান মন্দ নয়, দেখছি। চোখ জ্বালা হয়।…

সেদিন অনেকক্ষণ সমুদ্রে স্নান করেছিল সলিলা। কিন্তু সব সময়ে তার লক্ষ্য ছিল একটি বিন্দুর উপর।… ঢেউএর দোলায় দোলায় তুলিয়ারা কেমন অভ্যস্ত কৌশলে আনাড়ীদের স্নান করাচ্ছে।…কিন্তু, অনিমেষদার কি এখনও আশ মেটে নি? কি দরকার, ব্রেকার্স ডিঙ্গিয়ে যাবার? হাঙর—হাঙর যদি—সন্তঃস্নাতার বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে।…ফিরে এসেছে…ওই, ওধারে, কোমর জলে দাঁড়িয়ে। ..উঠে আসছে—যাক্, এইবার আমি যাই।

—সলিলা, তুমি আবার জলে নেমেছ? মনে পড়ে ছেলেবেলাকার ঘটনা?…কৈ, কেউ তো ব'ললো না সে কথা? সলিলা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ততক্ষণে গরম বালির মধ্যে তার নরম পা দুটো গরম হয়ে ওঠে। ভিজে আঁচল নিংড়িয়ে, পথের উৎকণ্ঠা কমিয়ে, এগিয়ে চলে সলিলা।

তারপর?

—তারপর, তুমি এখন?…তাহ'লে, চললে?

পরম বিস্ময়ে ট্রেণের কামরা থেকে মুখ বের করে সলিলা। অনিমেষদা দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফরমে, তার জানালার পাশে—গম্ভীর মুখে।

কি বলবে সলিলা?

সেই দেখা হবার পর থেকে আর একবারও যিনি তার

খোঁজ নেওয়া আবশ্যক মনে করেন নি, তিনি যে স্টেশন পর্যন্ত আসবেন, সলিলা ভাবতেও পারেনি।

—তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও।

—আমার আবার ঠিকানা কি, স্কুলই আমার ঠিকানা।

—না না, সেখানে থাকো ?

—স্কুলেই তো থাকি। স্কুলের সঙ্গে হোস্টেল।

—ওঃ, অনিমেষ বলে—আচ্ছা, চলি। অনিমেষ হন্‌হন্ করে হেঁটে চলে প্ল্যাটফর্মের উপর। শেষবারের মতো সলিলা জানালার বাইরে দূরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায় মূর্তি। অবাক হবারই কথা।···

ট্রেণ চলতে শুরু করেছে। মেয়েরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সলিলাদির দিকে তাকিয়ে থাকে। সুলতা কর প্রশ্ন করে —ভদ্রলোকটি কে ? ভারী অদ্ভুত তো ! একী ! আপনি হাসছেন, না কাঁদছেন ?

সুলতা করের কাছে সব চেয়ে অদ্ভুত মনে হ'ল, যখন মাত্র তিন দিন যেতে না যেতেই, সলিলাকে ও প্ল্যাটফর্মের সেই ভদ্রলোককে পাশাপাশি হেঁটে, স্কুলের গেট পার হয়ে, এক ট্যাক্সীতে উঠতে দেখলো। তখনও কিন্তু মুখ টিপে হাসবার চেষ্টাও করে নি সুলতা। কিন্তু, পরদিন যখন অনিমেষের মা ও বৌদি দুজনেই এলেন স্কুলে এবং এলেন স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্ এবং তার সাহায্য প্রার্থনা ক'রলেন, তখন সুলতা শত চেষ্টা করেও নিজেকে গম্ভীর রাখতে পারেনি।

লক্ষ কথা না বলেই বিয়েটা হয়ে গেল। বাসর ঘরে পর পর অনেকগুলো গান গেয়েছিল সুলতা ও আর এক-জন শিক্ষয়িত্রী, মাধবী বোস। বরপক্ষের প্রতিনিধি ও বাসর ইত্যাদি ব্যবস্থার অন্যতমা প্রধান কর্মকর্ত্রী, অনিমেষের ছোট বোন, সংস্কৃত অনার্সের ছাত্রী অরুন্ধতী—একগাল হাসি হেসে সমবেত কজ্জলিতাক্ষীদের সামনে অনেক সংস্কৃত বচন আউড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বলে বসে—শাস্ত্রকারেরা চিরকাল উল্টো কথা লিখে আসছেন।

সুলতা কর স্কুলে ছাত্রীদের সংস্কৃত পড়ায়, প্রশ্ন করে—কি ব্যাপার ?

দাদার দিকে তাকিয়ে ভয়ের ভাব দেখিয়ে অরুন্ধতী বলে—দাদা, যদি অভয় দেয়, তো বলতে পারি।

অনিমেষ স্মিতহাস্যে অর্ধাবগুণ্ঠিতা সলিলার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—অভয় দিলাম।

ঠোঁট উল্টে অরুন্ধতী বলে :

পুরুষস্য চরিত্রম্ স্ত্রীণাং ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ ?

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ফুলের গন্ধে ছাদের ঘর এবং নন্দনকাননের মধ্যে প্রভেদ খুঁজে পায় না অনিমেষ, সালঙ্কারা সলিলার হাতের আঙুল নিজের আঙুলের মধ্যে নিয়ে অনিমেষ প্রশ্ন করে—কাঁপছো কেন, ভয় কি ?

—ভয়ের জন্য কাঁপছি না কি। তুমি যেন কেমন।

—কিসের জন্য কাঁপছো ?

—যাও, তোমার সঙ্গে কথা ব'লবো না।

—কেন, আমি কি দোষ ক'রলাম ?

সলিলা প্রশ্নের উত্তর দেয় না, কি যেন ভাবে, হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় খোলা ছাদে। অনিমেষও বেরিয়ে আসে। স্বল্পান্ধকারে পরিণীতার মুখ দুই হাতের মধ্যে নিয়ে সবিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে বলে—একী ! তুমি কাঁদছো ? তবে কি ভুল ক'রলাম ?

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সলিলা বলে—এ দয়ার প্রয়োজন ছিল না। চব্বিশ বছর যখন কেটে গিয়েছে, তখন বাকী জীবনটাও কাটতো।

—কি ব'লছো তুমি ! আমি কিছুই তো বুঝতে পারছি না। দয়া ক'রলাম কোথায় ? এ প্রশ্নই বা আসে কি করে ?

—কেন তবে তুমি বাবার প্রস্তাবে রাজী হওনি ?

—কে বলেছে ? নিশ্চয়, অরুন্ধতীর কাজ। দেখতো কি ছেলেমানুষী ! আমি বারণ করে দিলাম, তাও শুনলো না।

—আচ্ছা, সত্যি বাবা তোমাকে ডেকে প্রস্তাব ক'রেছিলেন ?

—আমাকে ডেকে নয়, আমার বাবার কাছে প্রস্তাব ক'রেছিলেন ? সে প্রস্তাবে বাবার সম্মতিও ছিল, সকলেরই ছিল। কিন্তু, আশ্চর্য, তুমি কি কিছুই জানতে না ?

—না, কোনদিনই বাবা এ কথা আমায় জানতে দেন নি।

—তা হবে, তোমার উপর তোমার বাবার টানের কথা শুনেছি। তোমার বিয়েতে কিছুই যৌতুক দিতে পারবেন না ভেবেই, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল, ভাবলেও ভুল হবে না।

—কিন্তু, তুমি কেন তখন বিয়েতে মত দিলে না? তখন তো বাবার হাতে টাকা ছিল।

—ছিল বৈ কি, তিনি আমাকে ঘরজামাই ক'রতে চেয়েছিলেন। বাবা মাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, সমস্ত সম্পত্তি আমার ও তোমার নামে অর্ধেক অংশ লিখে দিতে রাজী ছিলেন। তখনও তোমার মা বেঁচে। তোমার ভাই বা বোনও হতে পারতো। কিন্তু—

—কিন্তু?

—আমি রাজী হই নি।

—কেন?

—তা আমি তোমাকে ব'লবো না।

—ব'লতেই হবে। স্ত্রীলোকের কৌতূহলে এইবার সলিলা স্বামীর হাত ধরে। অবশেষে পীড়াপীড়িতে বিব্রত হয়ে অনিমেষ উত্তর দেয়—

কারণ, তখন তোমাকে আমি ভালবাসতাম না। হ'লো? এইবার আর কোন ব্যাখ্যা নয়।

—কিন্তু, কখন তুমি আমাকে ভালবাসতে শুরু ক'রলে, তা তো জানতে পারলাম না।

—জেনে দরকার নেই। অনিমেষ মিটিমিটি হাসে।

সলিলা তখন কাঁদছিল, না হাসছিল, তা বুঝবার উপায় ছিল না। আপন মনে, যেন আকাশকে সম্বোধন করে সে কথা ব'লছে, অনিমেষ আবার বলে—ভালবাসারও লয় আছে।

খোলা আকাশে তারার ভিড়। অনিমেষের মনে হয়, মাত্র তিনটি দূরে যে সোনাকীর আলো মিলছে, আবার জ্বলছে, তার তুলনা নেই।

অবশেষে সলিলা বলে—সবই ধরো মেনে নিলাম, কিন্তু—

—আবার কিন্তু।

—অতদিন পরে দেখা হ'ল, দু'চার কথা জিগ্যেস করেই তুমি কেন ওরকমভাবে পালিয়ে গেলে? তারপর, আর একটি কথাও নেই।

—অসঙ্কোচে মিথ্যে বলেনি। পুরুষের চরিত্রই হল, কাজ করা।

—আর মেয়েদের চরিত্র কি?

—কেঁদে ভাসানো। আর, দিনরাত—নাঃ, আর বলা ঠিক হবে না।

—কি এমন মহান কাজ ক'রছিলেন মহান পুরুষ, যে সামান্য একটি মেয়েকে কাঁদিয়ে যেতেও তার বিবেকে বাধলো না?

—পুরুষ মাত্রেই সমুদ্রের মতো মহান না হলেও, অন্তরের গর্জন কিন্তু ঐ সমুদ্রের গর্জনের মতোই জানবে, ধরে নিতে পারো। আমি সারারাত্রি সমুদ্রের তীরে পায়চারী করেছি।

—পায়চারী করেছ! সারারাত্রি। হেটেলে ফেরো নি?

—না।

—বল কি!

—বেশী তো বলি নি। আরও যদি জানতে চাও, তা'হলে তোমার চোখের অশ্রুকণিকা, আই মিন, হাইড্রোজেন পরমাণু পর্যন্ত শুকিয়ে যাবে।

—কিন্তু, কেন তুমি এরকম অদ্ভুতভাবে পায়চারী করে রাত কাটালে?

—পুরুষ মাত্রেই মাঝে মাঝে রাত্রে পায়চারী করে, ক'রতে বাধ্য হয়।

—বুঝলাম না।

—কিছুই বুঝতে পারলে না?

—না।

—নিজের কাছে প্রশ্ন ক'রেছিলাম। উত্তর পাইনি।

—কি প্রশ্ন করেছিলে?

—'তুমি' ছাড়া 'আমি' নামক পদার্থের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা।

—আবার হেঁয়ালী। সহজ করে, ব'লো।

—আর, কত সহজ করে ব'লবো। তুমি যে আমার জীবনের কত বড় বাধা, তা কি তুমি টের পাওনি, যেদিন তোমার চুল ধরে টেনে তুলেছিলাম—মনে নেই?···

এ উত্তরের পর আর কি কোন প্রশ্ন করা চলে? সেই কথাই ভাবছিল সলিলা। তারপর রাত্রি শেষ হয়ে গেল এবং সেই রাত্রির পরে আরও অনেক অনেক রাত্রি কেটে গিয়েছে, কিন্তু সলিলার ভাবনা শেষ হয়নি। কারণ, এখনও মাঝে মাঝে মাঝ-রাত্রে অনিমেষ ছাদের উপর পায়চারী করে'।

কবি মুক্তরামের শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

ধর্ম্মাবর্ষে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যে সে কখনও তাহার দেবতাকে সুদূর স্বর্গের রত্নসিংহাসনে বসাইয়া শান্তি পায় নাই। তাহাকে সে আপনার সুখ-দুঃখের ব্যথা বেদনার মাঝে আনিয়া আনন্দ পাইয়াছে। পূর্ণব্রহ্মসনাতন, মঙ্গলস্বরূপের মাঝে মূর্ত্ত হইয়াছেন; পূর্ণব্রহ্মময়ী জগজ্জননী, মেনকা-কন্যা উমাতে পরিণত হইয়াছেন। বাঙালীর কল্পনায় যেন উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী স্মৃতি শ্রুতি সব একাকার হইয়া তাহার মানস-লোককে অপূর্ব্ব-শ্যামল ঐশ্বর্য্য-উজ্জ্বল করিয়াছে। তাই শাস্ত্রে পুরাণে সে যে দেবতাকে পাইয়াছে তাহার পরিচিত বিশ্বাসের নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়া বিশ্বের অণু হইতে পরমাণু মহৎ হইতে মহীয়ান সকল ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যে পরিণত করিয়াছে।

বাংলার শাক্তধর্ম্মের সুপ্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত সত্য—'তন্ত্রা পৌড়ে প্রকীর্ত্তিতা' কিন্তু তন্ত্রের দুরবগাহ আচার আচরণ তান্ত্রিকের তন্ত্রপীঠে যতখানি মহিমময় ছিল তাহা পুথীর পৃষ্ঠাঙ্গনে ঐশ্বরিক মহিমার সৃষ্টি না করিয়া ততখানি বিভীষিকার সৃষ্টি করিত। তাই পুথীভক্ত তান্ত্রিকের আচার অনুষ্ঠানকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার মানস-পদ্মের অন্তস্তলে নবভাবে নিষিক্ত করিয়া লইয়াছিল আর এক নূতন ভাবকে। ইহা হইতেই জন্ম-লাভ করিয়াছিল লৌকিক শাক্ত সাহিত্যের। লৌকিক সাহিত্যের-ই পূর্ণ বিকাশ আগমনী ও বিজয়া গান। বৃক্ষের পূর্ণতম পরিণতি হয় ফুলে ও ফলে। বৃক্ষস্বরূপ বৃহিপাল লৌকিক শাক্ত সাহিত্যের-বৃক্ষ চণ্ডী-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলি। সেই বৃক্ষেরই ফুল আগমনী, বিজয়া সঙ্গীত এবং তাহার ফল মাতৃরূপে কন্যারূপে জগজ্জননীর প্রতি বাঙালীর সুনিবিড় আকুতি। তাই বাংলার বহু প্রতিভাধর কবি, মনীষী অনেকক্ষেত্রে উভয়ের সংমিশ্রণে শাক্ত কাব্যের এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তকবি মুক্তারাম সেনের শ্রীশ্রীদুর্গা-পুরাণ ও এমনি-ই একটী শাক্ত কাব্য। ইহাতে রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী, পুরাণ, ভাগবত এবং আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্নধারা একই স্রোতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কবি যেখানে যাহা সুন্দর পাইয়াছেন তাহাই তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়া নিজেকে এবং তাঁহার কাব্যের শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই মালিকা গ্রথন করিয়াছিলেন।

কবি মুক্তারামের উর্দ্ধতন নবম পুরুষ বিজ্ঞানন্দ সেন মহাশয় পুরোহিত সাদিত, ঘোপা, মালী প্রভৃতি সহ রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব তীরে ঘুঘুরদিয়া নামক এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদি থানার নিকটে ঘুঘুরদিয়া গ্রাম অবস্থিত। কবি মুক্তারামের পিতৃপুরুষগণের সহিত ঘুঘুরদিয়ার প্রতিপত্তিশালী ভক্ত-বংশের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবার ফলে নাগ বংশীয়েরা একটী নূতন স্থানে বসতি স্থাপন করেন আজও সেই স্থানটি নাগের গ্রাম নামে পরিচিত। কবি মুক্তারাম তাপসপুরের দেওয়ান সরকারের অধীনে সুবার-নবিশের কার্য্য করিতেন। দেওয়ান সাহেবগণ "একদিন মুক্তারামকে স্ত্রীজনোচিত অলঙ্কার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া তাঁহার রূপ লাবণ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে তিনি ক্ষোভে দুঃখে দেওয়ান বাড়ীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং সাগইর গ্রামে তাঁহার কুল পুরোহিতের বাড়ীতে উপস্থিত হন।" তিনি এইখানে থাকিয়া কাব্য পুরাণাদি পাঠ আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মন ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এই সময় তিনি অনেক শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করেন এবং পরে তিনি দুর্গাপুরাণ এবং পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ভক্তির সুকুমার বেদ মহাশয়ের অভিমতে তিনি একটী কালিকাপুরাণও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি আট মাস পরিশ্রমে এই দুর্গাপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন'—কিন্তু কোন সময়ে রচনা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই।

"শিবের আজ্ঞায় কৈলা অষ্টমাস ভন,
জীবন মঙ্গলে কত হৈল মন ভ্রম।"

তবে তাঁহার অধস্তন চতুর্থ এবং বেদ পুরুষ ধরেকানাথ নাগ মহাশয় ১২৯৩ সালের ভূমিকম্পে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কাজেই তিনি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যভাগে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। তাঁহার দুর্গাপুরাণের মধ্যে তাঁহার রচিত দেবী বিষয়ক অধিকাংশ সঙ্গীত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে মাঝী পূর্ব্ববঙ্গীয়, আরাকানী এবং সাধুভাষার সংমিশ্রণ অদ্ভুত-ভাবে হইয়াছে।

কবি মুক্তারাম গ্রন্থ সূচনায় 'নমো গণেশায়' শ্রীশ্রীদুর্গাচরণের স্তব। অথ শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ পাঁচালী লিখিতে শ্রীশ্রীগুরবেনমঃ' বলিয়া আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গার এবং রাগরাগিণীর বন্দনা সূচক সপ্তটি পংক্তি; শুদ্ধ বাংলায়ও নহে শুদ্ধ সংস্কৃত নহে, অথচ দুইয়ের মিলনে রচনা করিয়াছেন। তিনি দুর্গাপুরাণ রচনা করিয়া তাই আগে দুর্গার বন্দনা এবং এই পুরাণ পাঁচালী যে বিভিন্ন রাগরাগিণীতে গীত হইবে সেই সকল রাগরাগিণীর বন্দনা করিয়াছেন:—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা চন্দ্রকান্তকান্তি তথা।
পূজিতা শ্রীরাম রাজা বন্দে দেবী বরদুহা।
আদ্যে আদ্যে সনাতনী চতুর্ভুজ পাশও মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
শঙ্খচক্র শূল হস্তে বরে দেবী নমস্তুতে।
মল্লার মালবশ্চৈব শ্রীরাগ বসন্তমুখা,
হিন্দুল কর্ণাটশ্চৈব বন্দে ষড় রাগরাগিণী।

পুরাণের অন্নপূর্ণা রূপের পরিবর্তে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে পরিণামে শান্তি আসিল। দেবী পিতৃগৃহে যাইবেন বলিয়া নারদকে তাঁহার গমন সংবাদ দিতে পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন 'বসন্তের শুক্লপক্ষে সুখে আমার পূজা করিয়াছিল, আশ্বিনের শুক্লপক্ষে সাগরের পারে রামচন্দ্র আমার পূজা করিয়াছিলেন, আবার সেই শরৎ কাল আসিয়াছে আপনি গিয়া আমার পিতা মাতাকে বলিবেন যে আমি শারদ সপ্তমীতে পিতৃগৃহে যাইব, তিন রাত্রি তিন দিন থাকিয়া দশমী তিথিতে কৈলাসে ফিরিয়া আসিব। নারদ সেই বার্তা লইয়া হিমালয়ে চলিলেন।

এদিকে হিমালয়ে মাতা মেনকা ও পিতা নিদ্রা মধ্যে স্বপ্নে দেখিলেন—

ঈত মালসী

কাঁদিয়া বলে ভবানী, মা জননী ! একবার নাইওর আন মোরে।
পিতা হিমালয়, পাষাণ হৃদয়, মায়ে কি পাসরে ঝিয়েরে (গো মা)
মা তোমার চইত্রে, জন্মেছি সংসারে গো,
ষোল মাসি বিয়াভারে, (পাইলাম) পতি ঘরেঘরে,
পাগল ঝিনঘর, থাকে সে কৈলাসপুরে (গো মা) ॥
পাগল শঙ্করে, কুচনী নগরে গো, ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে,
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, শ্মশানে বেড়ায়, আমি থাকি অনাদুষ্ট ঘরে,
বৎসরান্তে পরে, মা জিজ্ঞাস মোরে গো, কেমনে ঝিন্নিয়ে মোরে,
ঝিনরাজের বাপ, শুন দিয়িরাণি, হইয়াছ কঠিন অন্তরে ॥

দেবী যেন কাঁদিয়া মাতাকে বলিতেছেন—'মাগো তুমি বড় নিষ্ঠুরা হইয়াছ, তুমি সারা বৎসরেও একবার আমার খোঁজ লও নাই, তবু তুমি ও আছ বাবাও আছেন পিতা না থাকিলে বাঙালী ঘরের কন্যারা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূর গৃহে যেমন আদর পান না, মাতা অসহায়—সেখানে মাতার অসহায়তা কন্যা অনুভব করে, কিন্তু যেখানে পিতা পূর্ণ-গৌরবে বর্তমান সেখানে মাতা কেন এমন, কন্যা যেন নিরুদ্ধ অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছেন। ইহা ত কৈলাস নহে বাঙালী ঘরাণির গৃহের নিত্যদিনের ঘটনাশ্রোত কবি উমা মেনকার জবানীতে বর্ণনা করিয়া তুলিয়াছেন! মাতা স্বপ্নে ইহা দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া ঘুমিতে গড়াগড়ি করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি বন্ধু সকলে তাঁহাকে শান্ত করিলে তিনি বলিলেন

দেখলেম মাকে, এই যে দুঃখে মরিগো
সুরঙ্গ খেপে, চাঁচর কেপে, চন্দ্রছটা তাহে হেরি,
... ...
আমি মনের বেদে (হে) বইয়াছি সাধি নাইওর আসিবের গৌরী
ছিল কাল নিশা, ভেল হে ঐ কইয়া গেল চকলা শঙ্করী।

মাতা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

শুকুল যে হও মোর প্রাণ রক্ষা চাও,
ধরিতে আনিয়া মোর গৌরীরে দেখাও।
যাবৎ মায়ের আমি না দেখিব ঘরে।
তাবৎরন্ধন আমি না দিব উদরে।

হিমালয় বাস্ত হইয়া কৈলাসে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া 'হিমালে মেনকায়' দুয়ে পরামর্শ হইল। কারণ তিনিই শিব বিবাহের ঘটক। তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া বলিলেন—

কোথায় ছিলে হে নারদমুনি। আমার দুর্গাহারা ক'রে
রাখলে হে, যেমন মণিহারাফণী।
বিয়ার কালে বলেছিলে হে, মায়েরে দেখাবে আনি,
কোলে ক'রে মাকে নিলে হে, আমায় করে অনাথিনী।
দেবের দেব মহাদেব হে, তাহে জামাই হেন গণি,
ভূত সঙ্গে মনরঙ্গে হে, ভুলায় কুচনী।

গোস্বামি রামানন্দ তাঁহার রচিত মালসী গীতে মেনকার কথা বলিয়াছেন, কবি মুকুন্দরাম হিমালয়ের কথা বলিতেছেন—

দেবেন্দ্রদেব মহাদেবে বরিয়া জামাই,
চণ্ডীকে বিবাহ দিয়া দেখার আশা নাই।
জাতিতে পর্বত আমি তিনি যে দেবতা,
বিনা আজ্ঞায় আনিবারে কি মোর যোগ্যতা।
ভাগ্যে ছিল পুত্রীভাবে পাইনু শিশুকালে
এখন না দেখি তাঁরে মনে অগ্নিজ্বলে।

হিমালয়ের কাতরতা দেখিয়া যেন মনে হয় তিনি নিজে কিরাত বা শবর জাতি—তিনি উচ্চতর আর্য সমাজে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, সেইজন্য সর্বথাই তিনি আপন গণ্ডীতে আপনি সঙ্কুচিত। দুর্গার যে রূপ দেখিতে পাই তাহা অধিকাংশ সময়ে কি কিরাত কন্যার মত নয়? হিমালয় যেন কিরাতরাজ!

দেবর্ষি মেনকাকে বলিলেন—'রাণি তোমার ভাগ্যের অবধি নাই। তুমি জগৎ ঈশ্বরীকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ, হাতে কোলে করিয়া তাঁহার মুখে শুন দিয়াছ। যাহার অন্ত ব্রহ্ম পায় নাই, তাহাকে তুমি ভুলিয়া আছ কেমন করিয়া? মহিষাসুর বধ করিয়া তিনি প্রসূতা হইয়া তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মহিষাসুর বধের পর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাকে খুবে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়াছেন। যেমনভাবে স্বর্গে তিনি ইন্দ্রকে পুন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি ভাবে সুরথের বসন্ত সপ্তমীতে পূজার রাজ্যপ্রাপ্তি এবং শারদ সপ্তমীর পূজায় রামচন্দ্রের সীতা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। রাণী তুমি ও তাঁহাদের-ই মত ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণসহ এই শারদ সপ্তমীতে তাঁহার পূজা কর, মৃত্যুমুখে শিবকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাও। তাহা হইলেই দেবী আসিবেন শঙ্কর ইহা জানেন—কারণ এই লইয়াই ত তাঁহাদের নিত্যদিন বিবাদ ঘটিতেছে। ষোলা ষোড়া কিছুই পাঠাইতে হইবে না কেবল—

যে যেন বিহিতে পূজা করিলা শ্রীরামে,
তুমিও করিবা সেবা সেই অনুক্রমে।
কেবল ভবানী হেন না করিয়া জ্ঞান
ব্রহ্মা বিষ্ণুআদির পূজা হইবে সন্ধান।
এতেকে পাঠালেন আমা জানাইতে বার্ত্তা,
দূত ডাকি আনি দেও শীঘ্র যাউক তথা।
নারদের মুখে শুনি এ সব কাহিনী;
হিমালয় মেনকা নাচে জয় জয় ধ্বনি।

কবি অতি সহজেই লোক প্রচলিত ধারণা এবং পুরাণ কাহিনীকে এক সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহার কাব্যকে ভক্তিরসধারা ও মধুরতার মিশ্ররসে উজ্জীবিত করিয়া প্রবীণ বাংলা সমাজের অন্তর-তৃষ্ণা নিবারণের উপায় স্বরূপে কাব্যের কাঠামো গঠন করিলেন।

শিখাকণ্ঠ শ্রুতিকণ্ঠ নামে দুইজন গন্ধর্ব অনুচর যাহারা দেবীকে 'কোলে কাঁখে' করিয়া বড় করিয়াছিল, হিমালয় তাহাদিগকেই স্বর্গের দেবতাগণকে নিমন্ত্রণের জন্য 'পানকপূর্ণ সহিতে' পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা নারদকে সঙ্গে করিয়া প্রথমে কৈলাসে গিয়া দেবীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। চণ্ডীর আজ্ঞায়, শিবের নিকটে গিয়া দেখিলেন' —বিষ খেয়ে মহাদেব হালি চলি পড়ে।' কতক্ষণ পরে শিব ত্রিনয়নে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন 'চণ্ডীর চক্ষের অন্ত নাই। দূত সাবধানে হিমালয়ের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি হিমালয়ের নিমন্ত্রণে সন্তুষ্ট হইয়া নন্দীকে বৈকুণ্ঠে গিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে নিমন্ত্রণের জন্য পাঠাইলেন—

আজ্ঞা কহিবা তুমি সকল সংবাদ,
হিমালয়ের নিবেদন দূত বিসম্বাদ।
একে একে দেবগণ জানাও যথোচিত,
বিলম্ব না'কর অম্বি, চলহ ত্বরিত।

এই ত বাঙালীর শিব, বাঙালীর আশুতোষ 'ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, ভাঙ খাইয়া ঢুলিয়া চলিয়া পড়েন, সেই ভাঙ ধুতুরার দেশে নাই—তাই তিনি বুঝিয়া পান না কেমন করিয়া সেই দেশে মানুষ থাকিতে পারে। তাই ত তিনি দেবীকে পাঠাইতে চাহেন না—উপরন্তু তাঁহারা নিমন্ত্রণ করেন না, পূর্বে সতী কাহিনীতে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাহার স্মৃতি আজও ভুলিতে পারেন না তাই গলায় তাঁহার হাড়ের মালা এখনও ঝুলিতেছে, 'বারাধন গেঁটে বান্ধিয়া' রাখিয়াছেন। সতীগতপ্রাণ বাঙালীর একান্ত সত্যচিত্র। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবায়নে যেখানে 'পার্থারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি' বলিয়া পত্নীহীন গৃহে বাঙালীর সংসারের অসহায় রূপ প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে মুক্তারাম আরও সুন্দর করিয়া বাঙালীর মনের নিগূঢ় চিন্তাচিত্রকে সুপ্রকাশ করিয়াছেন। আহ্বান না পাইয়া যেখানে দুর্গার অভিমান; আহ্বান পাইয়া সেখানে একেবারে এমন উন্মাদিত যে বৈকুণ্ঠের দেব সভাতেও দেবীর সহিত কলহের কথা সবই বলিয়া পাঠাইলেন। মনের ভাবটা যেন এরূপ—আমি কেউ কেটা নই—আহ্বান পাইয়া তবে রাণী হইয়াছি। এই না হইলে দেবাদিদেব আশুতোষ মহেশ্বর হইতেন কেমন করিয়া? দেবগণ হর পার্ব্বতীর কোন্দল শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, গ্রাম বৃদ্ধের ন্যায় পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—

ব্রহ্মা করি বাপ মারনাই ওর নিবে কি,
কেন বা জঞ্জাল বাড়াও তাতে যোগ কি?

দেবগণের প্রবোধ বাক্যে শিব অনুমতি দিলেন কিন্তু নিজে চণ্ডীর সহিত যাইবেন না তিনি দেবগণের সঙ্গেই যাইবেন। দেবী ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন। তখনও শিব তাঁহাকে ছাড়িতে রাজী নহেন তিনি বলেন—

গমন বিরোধি আমার
না হইও সর্ব্বথা।
তোমার ঘরের যতধন
রাখ লেখা করি,
শুধু হাতে আমি যাব
দুই পুত্র সঙ্গে করি।

নাইওর যাইবা বাপের ঘরে গো ভবানী।
ভাঙ ধুতুরা ইন্দ্রাসন, কে করিবে যতন
ডাকিলে নিকটে পাব কারে।
কার্ত্তিক গণেশ যাবে, আমার লেখা কে রহিবে,
লক্ষ্মী বিজয়া যাবে সঙ্গে, অন্ন নাই শূন্য ঘরে,
রাখি যাইবা একেশ্বরে, কুল মজাইবা উৎসবের রঙ্গে।

দেবী বলিলেন হর আজ্ঞা কর বাপের বাড়ী হইতে দূত আসিয়াছে আমি সেখানে যাইব। তোমার ঘরের সব কিছু রহিল—শুধু হাতে যাইব সঙ্গে থাকিবে দুই পুত্র কার্ত্তিক গণাই। বিশ্বাস না হয় তোমার ধন কড়ির হিসাব লিখিয়া রাখ। শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন সবই বুঝিলাম—কিন্তু কে আমাকে দেখিবে 'ডাকিলে নিকটে পাব কারে।' তুমিত আবার কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী বিজয়া সকলকে লইয়া যাইবে আমি কেমন করিয়া থাকিব? কে অন্ন দিবে? তুমি যাবে যাও কিন্তু 'উৎসবের রঙ্গে কুল মজাইও না'। আর এক কথা আমি ত যাহা পাই সবই বিলাইয়া দি, ঘরে ত কিছুই নাই শূন্য হাতে কি যাওয়া তোমার শোভা পায়? স্থিরচিত্ত বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের রূপ কবির লেখনীতে ধরা পড়িয়াছে। মানুষটি সঙ্কায় সংকোচে দ্বিধায় দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। দেবী উত্তর দিলেন—তার নাই সপ্তমীতে যাইব দশমী প্রত্যূষে ফিরিয়া আসিব কোনও মেয়ে কোথাও কি বাপের বাড়ী থাক নাই যে 'রাত্রদিন খোঁটায় দহিবে মোর হিয়া।'

যত মন্দ কহিলা মোরে তুলি বাপ মাও,
কহিতে লক্ষন আগে না করিলায় রাও।
বুঝিয়াছি যারে পেয়ে কর চপলতা,
আপনার ভল নহ কিসের দেবতা,

আজ ডুবুরা খেলে লজ্জা নাহি থাকে,
বহু পুণ্য হবে থাক তারে দেবলোকে।
যদি কিঞ্চিৎ জ্ঞান হয় বাপে চণ্ড টান,
শিক্ষিবারে চাও তারে লজ্জা নাহি মনে।
এ সকল দেখিয়া আমার লজ্জা করে,
তোমার সাক্ষাতে কেবা কথা কৈতে পারে।

দেবদেবীর কোন্দল দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু হাসিয়া বলিলেন—কন্যার পিতৃগৃহ গমন কাল আনন্দের সময় এমন কোন্দল করা উচিৎ নয়, বিশেষ করিয়া কথায় কথা বাড়ে কি জানি এমন কথা করিতে করিতে সেই পূর্ব্ব ঘটনার (সতী কাহিনীর) কথা মনে পড়িলে কি অনর্থপাত করিবেন কে জানে? দেবদেবের এই কথায় দেবী শিবকে প্রণাম করিয়া লজ্জা ছাড়িয়া প্রাঙ্গণের উত্তর দ্বারদেশে বিল্ববৃক্ষতলে দুই সখি সঙ্গে করিয়া বসিলেন। দেবী তাহাদের হাতে সেই বিল্ববৃক্ষের 'দুর্ব্বল শ্রীফল' দিয়া মাতা মেনকাকে দিয়া তাঁহার আগমন সংবাদ দিতে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি যে আসিবেন তাহার প্রতীক এই দুর্ব্বল শ্রীফল। যেদিন তিনি 'দুর্ব্বল শ্রীফল' পাঠাইলেন সেদিন পারণাও হই।

এদিকে হিমালয় মেনকা আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছেন গীরিরাজের পরি ভক্ত ভূত্য আসিয়াছে—মনোবেগ হইতে নানা দ্রব্যাদি করিতেছেন। কর্পূর, তাম্বুল, আতপ তণ্ডুল, নারিকেল, চিনি, নবনী, ক্ষীর, গুড়, কলা, মধু, ঘৃত, তিল যব, দুগ্ধ, মাস, মুগ, 'মেষ, মৈষ ছাগ কোটী কোটি' আনিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন। পান পাইয়া ঋষি, মুনি, দেবতা গন্ধর্ব্ব গোকর্ণ, যক্ষিকন্যা, পার্ব্বতীয়া নারী, জাতিকুটুম্ব, অপ্সরী, ভাট বর্ত্তকী, বহুরূপিয়া বাজিকর ঘন্টি, বাজ প্রভাপণ প্রভৃতি আসিবার ফলে 'একান্ত লোকের ঘরে রান্ধো নাই পাক চাই'। বিবাহের সময় যেখানে সৌরীর সময় ঘর হইয়াছিল সেখানে রত্নমন্দিরের দেওয়াল 'তরুণ কদলে বান্ধা চারিটি দেওয়ালী' নির্ম্মাণ করিলেন, উপরে চন্দোয়া টাঙাইয়া দিয়া চতুর্দ্দিক শুদ্ধ গঙ্গাজলে পরিষ্কার করিয়া 'রিদুল হরিতালে' আলিপনা দেওয়া-ইলেন। ষষ্ঠী সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আসিল। ধূপ ধূপের গন্ধে, শঙ্খঘণ্টার রাবে বিভাবরীর সাথে পরমসন্ধ্যা আনন্দমুখর হইয়া উঠিল। মেনকা, দেবী প্রেরিত 'দুর্ব্বলবেল' পুরোহিতের হাতে দিয়া বলিলেন—

এই সে ভবানী মোর আদুরীর প্রতি
ইহাকে স্থাপিয়া কার্য্য কর যত ইতি।

...

চণ্ডীর দুর্ব্বল বেলে রম্ভা কচু বিশালে
সঙ্গে দিল অলোক জয়ন্তী
ওরিহা বাড়িব নাহ, যাক আদি সমাধান
নবরত্না বুঝি লয় দেবা
সারি সারি সাজাইয়া, গন্ধপুষ্প জল দিয়া,
পূজিলেক নব-পত্রিকা॥

দেবীপ্রেরিত শ্রীফল দেবীর প্রতীক, তাই বিল্ববৃক্ষ বা বিল্ব অধিবাসে দেবীর আগমন সূচিত হয়।

সপ্তমী প্রভাতে হিমালয়পুরে যাত্রাতার অবধি নাই 'হিমেলতাল' যাহাকে যে কার্য্য দিয়াছেন সকলেই তাহা করিতেছেন। সকলে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে কখন দেবী আসিবেন।

এদিকে দেবী 'দুর্ব্বাশ্যেখী, হরিত্রা, পিঠালী, আমলকী, বিল্বতৈল' প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নানা তীর্থের জলে স্নান করিয়া অতি ঐশ্বিয় রতন পাড়ী পরিধান করিলেন। 'অতসী কুসুমবর্ণ অরুণ মিশ্রিত' আসনে বসিয়া কবরী বাঁধিলেন—

মণিমুক্তা তাহাতে লাগিছে ঝোলানি,
উর্দ্ধে কামটাস্থি ঘর রচিটে ঘোরে বেণী।

দুই পাশে কেশেতে কেঁচুরা (১) সারি সারি ১। ভিঙ্গাপাশ।
রচিয়া পাখরের কলি (২) মাণিকোর খুচি॥ ২। ফুলস

সীমন্তে কাম সিন্দুরের কোঁটা, সীমন্তের আগে তরুণ চন্দ্র তার আগে লম্বর, ভুরুতে অঞ্জন আর চোখে কাজলের রেখা, নাসায় বেসর প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে দেহ সজ্জিত হইলেন—

সেইরূপে দশদিক আলোকিত হৈল,
তুলনা দিবার নাহি এই রূপ রহিল।
শশধর যোগ্য নহে অম্বরে কলঙ্ক,
সেইরূপ দেখিয়া হরের যোগ অঙ্গ।

সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশকে বিচিত্র বসনে ভূষণে এবং দেবীর বাহন সিংহও বিচিত্র ভাবে সজ্জিত হইলেন। লক্ষ্মী সরস্বতী কিন্তু এই প্রসঙ্গে নাই। তারপর—

শিবের প্রণাম করি তাঁরা তিনজনে।
অধিলম্বে আরোহণ করিলা বিমানে॥

দেবী ক্ষেত্রপালকে বলিলেন—পশ্চিমে রথ সজ্জিত কর কারণ বৈকুণ্ঠে পূর্ব্বদ্বার নিরঞ্জনকে দেখিয়া পিতৃগৃহে যাইব। চন্দ্রমণ্ডল ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ বলিয়া রাখিয়া একস্থানে আসিয়া দেবী বলিলেন—

এখানে বিলম্ব কর কিঞ্চিৎ পলিকা।
নিরঞ্জন নির্ব্বাণে করিয়া আদি সেবা॥
রথ রাখি তথায় রহিলা সর্ব্বজন।
পদব্রজে হাটি দেবী করিলা গমন॥
সেইস্থান দেখি স্তবে করিলা স্তুতি।
তার ভেদ কই শুন হইয়া স্থির মতি॥
প্রকৃতির সেবায় পুরুষ হলেন বশ।
তার অর্থ লিখিলা এবে ভুবন চতুর্দ্দশ॥

সপ্ত পাতাল সপ্ত দ্বীপ স্বর্গ লোকে।
এ তিন ভুবন হৈল এক ডিম্ব হৈতে।

রূপ ভেদ নাই তাঁর লক্ষণ না পারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যাহাকে বিচারে।
পরমপুরুষ সে যে আদ্যা অবিনাশী।
অনন্তশয়ন তাঁর ক্ষীরোদ নিবাসী।
যত দেব পূজা কর তাতে আসি মিলে।
প্রলয় পৃথিবী হৈলে নৈরাকারে জলে।
ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিবা জ্ঞান আর অজ্ঞান।
পাপ পুণ্য তাঁর কাছে সকলি সমান।
মরিলে মরণ না যায় আছয়ে পরিনে।
আচম্বিতে নাদ হল শক্তি দরশনে।
তাঁর ইচ্ছা নাই সৃষ্টি রহিতে এই মতে।
সকল তাজিয়া চান এই ব্রহ্মে নিতে।
তপ অজপা তাজি একই কাহিনী।
একাক্ষরে এক নাম ব্রহ্ম উঠে ধ্বনি।

একেতে অনন্ত হয় অনন্তে চলে এক।
সেবকের তুলনা নাই ভজন করি দেখ।
অনাহতে সেই ধ্বনি উঠে সেই ব্রহ্মে
যাকে জপি মায়া ত্যাগ করিতে যোগীন্দ্রে
কঠোর তপস্যা কইলে যেবি তাঁর আজ্ঞা
উদ্দেশে তপস্যা করে যত দেবী দেবা
শব্দেতে আলম্ভ তার নিঃশব্দেতে সার।
কেবল শক্তির কাছে রাখিছেন সংসার।

কবি মুক্তারাম তাঁহার কাব্যটিকে কেবল মাত্র মার্কণ্ডের পুরাণ অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। কালানুগ লোকচেতনা অনুসারে যেখানে দাগ পাইয়াছেন সব কিছু দিয়াই তাঁহার কাব্যকে মর্ম্মগৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে সৃষ্টিপ্রকরণ লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না বা আদিদেব নিরঞ্জন সম্পর্কে আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু পুরুষপুরাণ হইতে যে ধারা চলিয়া আসিতেছে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলে এবং ধর্ম্মমঙ্গলে ও শিব-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনার স্থান করিলেন দেবীর পিতৃগৃহে যাত্রা পথে। [illegible] স্থানে আদিল দেবী পরমতিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

STUDENTS' COMMON-ROOM P.G.A.

প্রণয়ী

শ্রীবিমল রায়

একটি অরুণ ভোরে এসেছ বাহিরে
ঘুম ভেঙে, পদতলে লুণ্ঠিত অঞ্চল,
কেশাক্ত কুঞ্চিত বক্ষে অলস কুন্তল
মাখিয়া রাত্রির গ্লানি রহিয়াছে ঘিরে।
বিনিদ্র অঞ্জন মাখা আঁখির পালকে
অস্পষ্ট স্বপ্নের মায়া, চোখের সাগরে
ফেলিয়া ক্ষণিক ছায়া দূরে যায় সরে'
অজানার কোন পাখি আঁধার-আলোকে।
গোপনে দেখেছি তাহা, তুমি তো জাননা
তোমার বুকের ব্যথা আছে কোন খানে ?
যখন চেয়েছ ফিরে, সচকিতা, পাছে
আমি কিছু বুঝি তব ব্যথার বাঞ্ছনা
সলজ্জ ভ্রূকুটি হেনে গেলে দূরে, মানে
মদনের চোখ নাই—প্রণয়ীর আছে।

পিতম্

বন্দেআলী মিয়া

জীবনের মধুবৃন্তে ঘুম ভেঙে জাগে প্রজাপতি
গ্রহে গ্রহে জ্বলে দীপ—কলকণ্ঠে কাকলি কূজন,
তোমার উদয় তারা দেখেছো কি কংকাবতী
সেদিন প্রলয় বেলা—দুই চোখে অচেনা স্বপন।

সেদিন বাতাসে ছিল অচেনা মদির দাহ
আছিল অশেষ ব্যথা ক্ষুধাতুর জলধির বুকে,
সেদিন ভুবনে ছিল জীবনের অমৃত প্রবাহ
আছিল স্বপন সাধ—অজানার আরণ্যক দুখে।

আজিগো পুষ্পপাথে মেলিয়াছে মধুমতী পেখম
মেলেছে কমলদল জীবনের দক্ষিণ সায়রে,
তোমার সুরের ধ্বনি লোকে লোকে
জাগে গো পিতম।
আজিও অশ্রু তব দিকে দিকে নিরবধি ঝরে।

দেবভূমি—বদরীনাথ

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

দেবভূমি কেদারনাথে আমরা একরাত্রি যাপন করে পরদিন প্রাতে যাত্রা কেদারনাথকে দর্শন ও পূজা সমাপন করলাম। ২৩শে মে (১৯৫৭) বেলা অনুমান ১১টা'র সময় আমরা যাত্রা করলাম পৌরীকুণ্ড অভিমুখে। মনে হ'ল যেন কি অসীমের—মহীর আনন্দলোক ছেড়ে চলেছি। স্বল্পকালে উদিত হ'ল আর একটি দেবভূমির কথা,—যাবো বদরী বিশাল বা বদ্রীনারায়ণে যাব। মনের ক্ষণিক বিষাদ হ'ল তিরোহিত, আবার এক নূতন দেখবার কল্পনা জাগল মনোমধ্যে। নবীন উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে যাত্রা সুরু হ'ল।

সেভেনাইন বয়সের চাল্লা অতিক্রম করে এবার চললাম বিশাল পর্বত শ্রেণীর উৎরাই পথে। কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে ঘোড়ায় চাপলাম। সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছলাম পৌরীকুণ্ড চটিতে। তখন টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল—খুব শীত। কেদারনাথ ধামে স্নান করা সম্ভব হয়নি, তাই পৌরীকুণ্ডের উষ্ণকুণ্ডে স্নান করলাম। সেখানে এক চটীতে রাত্রিবাস করে পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা সুরু হ'ল বদরীনাথের পথে। মন্দাকিনী "কাচা" চটীতে আহার ও বিশ্রাম করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে পৌঁছলাম "নালা" চটীতে।

আমাদের গ্রামে ছিল যে নালার পথে উখীমঠ হ'য়ে আমরা চারধাম যাব, সেখান থেকে 'যাবে' যাব পিপলকোটি; কিন্তু নালায় পৌঁছে সেই পথ দুর্গম ও নির্জন এবং ভাল চটী নাই জেনে আমরা স্থির করলাম আবার রুদ্রপ্রয়াগ ফিরব। সেখান থেকে যাব মটর যোগে পিপলকোটি। নালা থেকে গুপ্তকাশী ১ মাইল পথ। আমরা ঠিক করলাম গুপ্তকাশীতে রাত্রিযাপন করব কিন্তু গুপ্তকাশীতে সন্ধ্যার সময় পৌঁছে দেখলাম সেখানে নো স্থানং তিল ধারণম্। কি করা যায়—এই শৈত্যপ্রধান স্থানে রাস্তায় শোয়া আর যাওয়া যায় না। এখানে এসে আমরা ঘোড়া ছিঁড়ে ফিরেছিলাম। স্থির করলাম ২ মাইল হেঁটে কুণ্ড চটীতে গিয়ে রাত্রি যাপন ও আহার করব। দুর্ভাগ্য এমনি সেই সময়টা বন্ধুর উৎরাই পথ অতিক্রম করে রাত্রি ৮টার সময় কুণ্ড চটীতে এসে দেখলাম সেখানে লোকে লোকারণ্য। বহু কষ্টে সামান্য একটু স্থান পেলাম—তার মধ্যে আমার ঢুকে আছে উত্তর প্রদেশের কৃষক শ্রেণী। তাদের ভাষা কাপড়ের দুর্গন্ধে গা বমি বমি করতে লাগল। কিন্তু উপায় কি? সকলেই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। কোথাও পাকের স্থান মিলল না—খাবারও মিলল না। ঘটিতে করে খাবার জল এনে পিপাসা নিবৃত্ত করা হল।

প্রত্যুষে উঠে যাত্রা করলাম—৮ মাইল অতিক্রম করে পৌঁছলাম গুপ্তকাশী চটিতে বেলা প্রায় ৯টায়। সেখানে একটি ভাল চটীতে স্নান করে খাবারের সমাপন করলাম। এই চটী মন্দাকিনীর সংগম স্থানে সমতল ভূমিতে—স্বচ্ছ স্নিগ্ধ মন্দাকিনীর পূত জলে স্নান করে পথ চলবার শ্রান্তি দূর হ'ল। অপরাহ্নে আবার যাত্রা করলাম অগস্ত্যমুনি ৫টী অভিমুখে। পৌনে পাঁচ মাইল রাস্তা—সমতল ভূমি। আশা ছিল অগস্ত্যমুনিতে পৌঁছে মটর "বাস" পাব—১১ মাইল মটর পথে পৌঁছব রুদ্রপ্রয়াগে সেইদিন বৈকালে; কিন্তু হায় সেখানে বেলা তিনটার সময় পৌঁছে দেখলাম অসংখ্য যাত্রীর দল মনে আছে ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রামের চারিদিকে। কি ব্যাপার? তিনদিন ধরে এক-খানি মাত্র গাড়ী চলছে—আর সেইদিন সেগামিও হয়েছে বিকল। অসংখ্য জনতা ঘিরে আছে মটর বাস ষ্টেশন অফিস। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথায় পেলাম না আশ্রয়। ভগবানের সৃষ্টি অসংখ্য তারকা খচিত বিশাল গগন তলে করলাম সেই রাত্রির সমাধা রচনা—উন্মুক্ত দুর্ব্বাক্ষেত্র হ'ল আমার স্থান। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু বেশ!

পর দিন প্রত্যুষে স্নান মিলল 'কালীকম্বলীর' ধর্মশালায়। স্নান আহার শেষ করে প্রতীক্ষা করছিলাম মটর-বাসের। ইতিমধ্যে এক কোলাহল উঠল, 'বাস এসেছে—বাস এসেছে'। পড়ল ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। এক ঘণ্টা পরে উঠলাম বাসে—বেলা ৪টায় পৌঁছলাম আবার রুদ্রপ্রয়াগে—সেই মন্দাকিনী ও অলকানন্দার উদ্দাম তরঙ্গধ্বনি। মনে প্রাণে স্বর্গীয় আনন্দধারার শিহরণ।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে রুদ্রনাথকে প্রণাম করে চললাম অলকানন্দার অপর তীরে যাব ব'লে। আশা, যদি 'বাস' পাই যাত্রা করব পিপলকোটি অভিমুখে। অলকানন্দার পুল পেরিয়ে বাসের অফিসের সম্মুখে অসংখ্য জনতা দেখে চমকে গেলাম। খবর নিয়ে জানলাম 'বাসের' অভাবে প্রায় দুই হাজার যাত্রী তিনচার দিন অবস্থান করছে এই ক্ষুদ্র স্থানে। যুক্তিং অন্বিষে মিলল না কোন কর্মচারী—মরুভূমি বক্ষে অনেক অনুসন্ধান করে একজন কর্মচারীকে পাকড়াও করলাম। তিনি যা বললেন তা'তে ৭ দিনের পূর্বে আমাদের পিপলকোটি যাবার 'বাস' পাওয়া দুষ্কর মনে হ'ল। যা'হোক আমাদের আটজনের নাম রেজেষ্টারী করলাম ২৲ টাকা দিন জমা দিয়ে মটর বাস্ অফিসের গাড়ীতে। তৃতীয়দিনে সৈন্য (গাড়োয়াল জিলার হেডকোয়ার্টার) থেকে পাঠাল অনেক মটর-বাস। আমরা প্রথম ট্রিপের মধ্যেই স্থান পেলাম। যাত্রা বদরীবিশালের নাম নিয়ে বাসে চাপলাম। রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে পিপলকোটি ৪৯ মাইল। ভাড়া প্রথমশ্রেণীতে ৩৷৵০। আমি আসন নিলাম ড্রাইভারের পাশে।

বাস চলল এবার অলকানন্দার দক্ষিণ কূল ধ'রে—একই রকম রাস্তা, পাহাড়-প্রেণীচারিদিকে, সাথে পুণ্যতোয়া, অলকানন্দা। চালক

একটু অসতর্ক হলে সলিল সমাধি সুনিশ্চিত। রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে কর্ণপ্রয়াগ ২০ মাইল। এই কর্ণপ্রয়াগে পর্বতশ্রেণীর নীচে সূর্যের তপস্যা করেছিলেন মহাবীর কর্ণ—তপস্যায় সিদ্ধ কর্ণ লাভ করলেন অভেদ্য কবচকুণ্ডল সূর্যদেবের কৃপায়। এখানে স্নান, তর্পণ ও উমাদেবীর মন্দির দর্শন করা বিধেয়। কর্ণপ্রয়াগ হতে চামোলী ২০ মাইল—নন্দপ্রয়াগ ১১ মাইল। নন্দপ্রয়াগ—নন্দা ও অলকার সঙ্গম স্থান, এখানে রাজা নন্দ ও যমাপতি মন্দির দর্শনীয়। নন্দপ্রয়াগ হতে পিপলকোটি ১৮ মাইল।

আমরা অপরাহ্ণে পৌঁছলাম পিপলকোটি। আমরা এখানে কোন চটিতে স্থান পেলাম না। ঘর ভাড়া করতে হল আশ্রয় মিলনের জন্য। ইহা একটি ছোট গঞ্জ—এখানে আছে হাটবাজার, দোকানপাট—ডাকঘর ও তারঘর। ডাকবাংলো ও ধর্মশালা যাত্রীর ভীড়ে ভর্তি। এই হলো বাস-রুটের শেষ ষ্টেশন। এখানে পাওয়া যায় অসংখ্য হরিণ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশু-চর্মাসন, চামর কম্বল ইত্যাদি। কিন্তু রাস্তার কোথাও এসব জন্তু জানোয়ারের দেখা মেলে না।

এখান থেকে বদ্রীনাথ ৩৯ মাইল। পিপলকোটিতে পাওয়া যায় ঘোড়া, ডাণ্ডী ও ঘোড়া। আমরা চললাম এখান থেকে পায়ে হেঁটে। সেইদিন (১লা জুন, ১৯৫৭) বৈকাল ৪ টার সময় আমরা যাত্রা করলাম বদরীনাথের পথে। ৪ মাইল চড়াই রাস্তা হেঁটে আমরা পৌঁছলাম সন্ধ্যায় গরুড়গঙ্গা চটিতে। একটি ভাল চটিতে স্থান পেলাম। এখানকার দৃশ্যটি মনোরম—দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রবাহিত হচ্ছে গঙ্গা। এখানে গরুড় গঙ্গায় স্নান ও মন্দির দর্শন করতে হয়; কিন্তু রাত্রিকালে বরফ জলে স্নান করতে সাহস হল না—স্পর্শ করে সন্ধ্যাবন্দনা করলাম। ফিরবার পথে স্নান করেছিলাম। গরুড়গঙ্গায় এক ডুবে একমুড়ী পাথর তুলে ঘরে রাখলে নাকি নাগ ভয় দূর হয়। বিছার কামড়ালে ইহা জলে ঘষে লাগালে আরাম হয় বলা।

প্রত্যূষে ওঠে আমরা চললাম জোশী মঠ (জ্যোতির্মঠ) অভিমুখে। বেলা ১১০ টায় আমরা পৌঁছলাম বড়কুলা চটিতে। এখানে এসে জানলাম অত্যধিক বরফ পড়ায় চলতি রাস্তা হয়েছে বন্ধ। চার দিনের মধ্যেও পরিষ্কার করতে পারে নি সেই রাস্তা—সেই কারণে বহু যাত্রী ফিরে গেছে বড়কুলী থেকে তিন দিন অপেক্ষা করে। আমার বড় ছেলে আমাদের এক সপ্তাহ পূর্বে এসে এইখান থেকে ফিরে গেছিল। আমরা সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হ'লাম। গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীরা জানাল যাত্রীরা যেতে পারে উচ্চ পাহাড়ের রাস্তায়—কিন্তু ৩ মাইল ঘুরে যেতে হ'বে আর রাস্তা খুব বন্ধুর—আর একটি রাস্তা আছে পাহাড়ের গায়ে—যেটি তৈরী হচ্ছে মটর চলাচলের জন্য। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ রাস্তার ওর আছে পাহাড় ধ্বসে পড়ার এবং পুল হ'বার স্থানগুলিতে পারাপার হ'তে আসতে উঠতে অসীম কষ্ট। আমরা দুর্গা বলে সেই রাস্তায় যাত্রা করলাম। সেই অরণ্যসংকুল রাস্তায় এসে কি যে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। ৩ মাইল পথ অতিক্রম করতে প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় লাগল। রাস্তা দুর্গম অথচ মনোহর। জোতির্মঠ ভগবান শঙ্করের স্থাপিত—চারি মঠের মধ্যে একটি। বেবভূমি হিমালয়ে ভগবান শঙ্করের দান অপরিসীম। জোশীমঠে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে তাকালে যে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় তা অতীব মনোহারিণী। অদূরে দেখা যায় হাতীপর্বত ঘোড়াপর্বতের শীর্ষ—প্রায় হাজার ফিট নিম্নে বিষ্ণুপ্রয়াগের সেতু। জোশীমঠে নৃসিংহ ভগবানের মন্দির, জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব, দেবীমন্দির ও বুড়ি কলের ধারা দর্শনীয়। ইঞ্চের কয়েক মাস বদরীনাথের পূজা হয় এখানকার মন্দিরে—এখানে শীত থাকে ৫১০ ডিগ্রী ফুট উচ্চ। যাত্রার হাসপাতাল ডাক ও তার অফিস যাত্রীর এখানে আছে দেখার ছাউনি। এখান থেকে নূতন সড়ক তৈরী হয়েছে লাসা অবধি—মটর রাস্তা। পিপলকোটি হতে জোশীমঠ পর্যন্ত মটর রাস্তা সমাপ্ত প্রায়। এই পর্যন্ত

মন্দির দ্বারে

যান আসলে তীর্থযাত্রীদের অশেষ কল্যাণ হবে। এখান থেকে বদরিকাশ্রম ২১ মাইল—ভয়ানক চড়াই উৎরাই রাস্তা, কিন্তু মনোরম দৃশ্য। কোথাও শ্লেটের পাহাড়—কোথাও শ্বেতপাথরের পাহাড়—মনে হয় যেন কোন নিপুণ শিল্পী তৈরী করেছে প্রাসাদ গাত্র হরেক রকম পাথরে। আমরা আহারান্তে যাত্রা করলাম এবং সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ভিজে পৌঁছলাম বলদৌড়া বলদেও চটিতে। সে ঘরে আশ্রয় পেলাম তার দ্বার ছুঁটো—হাত্তা বাধার দেবার উপায় ছিল না যাত্রীর ভীড়ে—সারারাত্রি বসে কাটালাম সামান্য খাবার খেয়ে।

পরদিন—প্রত্যূষে অলকানন্দার উপরে পুল পার হয়ে আমরা উঠলাম পশ্চিম পাড়ে, এবার সুরু হল চড়াই পথ। পাঁচ মাইল অতিক্রম করে ডানদিকে একটি পুলের গায়ে লেখা দেখলাম "Way to vally of gardens" অর্থাৎ নন্দন-কানন যাবার রাস্তা। আরো একমাইল হেঁটে আমরা পৌঁছলাম পাণ্ডুকেশ্বর। ইহা একটি বড়গ্রাম—আছে দোকানপাট, অনেক বাড়ীঘর—এখানে বাড়ী ভাড়া করে থাকতে হ'ল—একটি বড় ঘর, ভাড়া ১০৲। সম্মুখে পর্বতশিখরে বাস করতেন পাণ্ডুরাজা—প্রবাদ শাপগ্রস্ত নৃপবেশধারী রাজা

পাণ্ডু এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে এইস্থানের নাম পাণ্ডবেশ্বর। আমরা এখানে রাত্রিযাপন করলাম। পরদিন যোশীমঠস্থ মন্দিরে আরতি দর্শন করলাম। এখানে বেশ শীত।

প্রত্যূষে যাত্রা করলাম বদরীনারায়ণপুরীধাম পথে—১১৪ মাইল পথ। বড়ই দুর্গম চড়াই রাস্তা—মাঝে মাঝে বরফে রাস্তা গেছে ঢেকে, তাতে রাস্তা হয়েছে আরো পিচ্ছিল—কোন প্রকারে একটি প্রাণী যেতে পারে। মালবাহী খচ্চর যাচ্ছিল—তেড়ার পাল প্রভৃতিকে আদৌ অগ্রসর করতে হয় পারতে পারে। হনুমান চটী ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে রাস্তা বরফাচ্ছন্ন হওয়াতে নূতন রাস্তা তৈরী হয়েছিল পাহাড়ের গায়ে—পথ পিচ্ছিল। পা একটু বেসামাল হ'লে পড়তে হবে ৫০০০ ফুট নীচে বরফের স্তূপে। কতকটা পথ চলতে হল বরফের উপর দিয়ে। একস্থানে আমার পিছনে মালবাহী খচ্চর এসে পড়ায় আমি পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম, কিন্তু দুদিকের ঝোঁট ভারী থাকায় আমি পাহাড়ের গায়ে আরো ঢুঁকতে উঠতে দিয়া প্রায় যাচ্ছিলাম বরফ-গহ্বরে পড়ে, কিন্তু পিছন থেকে এক বাঙ্গালী বৃদ্ধা মহিলা আমার একখানি হাত ধরে ফেলাতে সেযাত্রা বেঁচে।

সেই দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে যখন চড়াই ভেঙ্গে উঠলাম এক উচ্চ পর্বতশিখরে—পশ্চিম উত্তর কোণে দেখতে পেলাম বাবা বদরীনাথের মন্দিরের ধ্বজা—এই উঁচু স্থানের নাম "চেকরুনদী"। এবার উৎরাই পথ নামলাম এক সমতলভূমিতে। সামনে দেখলাম একটি সেতু—তার অপর পারে বদরীনাথ ধাম। সামনে উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম অপূর্ব দৃশ্য—নারায়ণ পর্বত চূড়া, বরফাচ্ছন্ন গিরিরাজির এক অপূর্ব দৃশ্য! দূর হ'তে অত্যুচ্চস্বরে উচ্চারিত হ'ল—এই তো স্বর্গদ্বার! ঘড়িতে তোলা ঐতিহাসিক সেতু পেরিয়ে প্রবেশ করলাম বদরিকাশ্রম—বদরীনারায়ণ আশ্রম। উচ্চতা ১০,৪০০ ফিট। অমুপমেয় পর্বতশ্রেণীর ভঙ্গিম আভা পর্বতের বরফাচ্ছন্ন চূড়ায় প্রতিফলিত হয়ে তখন সৃষ্টি করেছিল এক অনবদ্য দৃশ্য! মুহূর্তে তিরোহিত হ'ল দুর্গম পার্বত্য পথের ক্লান্তি, দুঃখ কষ্ট, ক্ষুধা পিপাসা। সেই দৃশ্য অবলুপ্ত হ'লে দৃষ্টি পড়ল যাত্রা বদরীনাথ মন্দিরের চূড়ায় ও তপ্ত কোলাহল মুখরিত সমস্তের দিকে।

আমরা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্ট পাণ্ডার যাত্রীবাসে উঠে হাতমুখ ধুয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে গেলাম পোষ্টাফিসে আত্মীয়-স্বজনের চিঠির খোঁজে। তারপর চললাম মন্দির অভিমুখে।

বদরীনারায়ণ অত্যুচ্চ গিরিসঙ্কটের এক সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত—একটি ছোট খাট নগর বলা। অসংখ্য যাত্রী ও পাণ্ডার কোলাহল মুখরিত। এখানে পাবেন সব কিছু। শাকসব্জী ও আম। হিমালয়-তীর্থে এখানে পৌঁছে এসব বস্তু দেখতে পেলাম। বাঁধান রাস্তা, ডাকঘর, তারঘর, দোকান, বাসভবন, ধর্মশালা, ছত্র ও বিজলী আলো সব কিছু আছে এখানে।

একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত বদরী পঞ্চায়তন বা মন্দির। রাস্তা থেকে চলেছে বিরাট সোপান শ্রেণী সিংহদ্বার অবধি—তারপর মন্দিরের চারদিকে বাঁধান চত্বর—তার চারদিকে গুদামঘর—মন্দিরের আঙ্গিন—প্রশস্ত বিস্তীর্ণ স্থান। লাইন দেখে চলেছে যাত্রীর দল মন্দির মধ্যে বাবা বদরীনাথ বা বদরীনাথ পঞ্চায়তন দর্শনে। সেখানে দেখতে পাবেন চতুর্ভুজ নারায়ণ—সিংহাসনে উপবিষ্ট—পার্শ্বে লক্ষ্মী, উদ্ধব, নারদ, কুবের, গণেশ, গরুড়, নর ও নারায়ণ মূর্ত্তি। এই মন্দির পরিচালিত হয় গভর্ণমেণ্ট কমিটি কর্তৃক। মন্দিরের আয় নেহাৎ কম নয়—যাত্রীদের প্রণামী অর্থ ও অলঙ্কার যাতীত মন্দিরে বদরীনাথের সামনে ক্ষুদ্র চত্বরে বসতে হ'লে প্রণামী দিতে হ'বে ৫০৲ টাকা। বদ্রীনাথের একখানি মুকুট দেখালেন পুরোহিত—অসংখ্য মূল্যবান মণিমুক্তাজহরৎখচিত সোনার মুকুট—মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা।

এই মন্দির বা ঠাকুর কে তৈরী করেছে বা প্রতিষ্ঠা করেছে সঠিক কেহ বলতে পারেনা। তবে অতীব প্রাচীন। বৌদ্ধযুগে এই মন্দিরের মূর্ত্তি সকল নিক্ষিপ্ত হয়েছিল অলকানন্দার গর্ভে। ভগবান শঙ্কর হিমালয়ে তপস্যা শেষ করে শ্রীভগবানের আদেশে আসেন এই ভীষণ দুর্গম হিমালয় তীর্থে—তিনি অলকার গর্ভ থেকে উদ্ধার করেন এই সব মূর্ত্তি ও স্থাপন করেন তাঁদের আবার এই মন্দিরে। এখনকার পুরোহিত মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। বয়সে নবীন কিন্তু পাণ্ডিত্যে প্রবীণ। আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ও তাঁর মন্ত্র পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

মন্দিরে পূজা দিবার পূর্বে তীর্থযাত্রীরা স্নান তর্পণ করেন মন্দিরের নীচে অলকার তীরে তপ্তকুণ্ডে। ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি এই স্নানকুণ্ড! অলকার জল বরফ-সদৃশ—হাত দিলে যেন কেটে যায়—সেখানে স্নান করে কার সাধ্য! তাই শ্রীভগবান সৃষ্টি করেছেন পাহাড়ের গায়ে বেশ প্রশস্ত তপ্তকুণ্ড—জলের আবাদ পরম ভাল স্নান সেরে পূজা পার্বণ শেষ করলাম।

বদ্রীকে দর্শন করে গেলাম ব্রহ্মকপালে—পিণ্ডদান ক্ষেত্রে। অলকার ওপারে বেশ প্রশস্ত একখানি পাথরের চত্বর। মন্দির পার্শ্বে পাবেন পিণ্ড-দানের জল, কূপ বা ইত্যাদি। গঙ্গা থেকে ঘটিতে করে জল নিতে হবে—তারপর বসুন সেই ব্রহ্মকপালে। সারি সারি বসেছে তীর্থযাত্রী—এক এক লাইনে আছেন একজন পুরোহিত—তাঁর উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করে চলেছে পিতৃ মাতৃ পুরুষের পিণ্ডদানকারীরা।

প্রবাদ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব স্বর্গারোহণ কালে হিমালয়ে অবস্থিত নদীগুলি পার হবার জন্য তাঁর আপন শক্তি বলে পাঁচটি শীলাখণ্ড নদী গর্ভে স্থাপন করে তাঁর চার ভাইয়ের নদী পারাপার করেন—এই পাঁচটি শিলার নাম, দুর্যের শিলা, ঘারাইশিলা, মার্কেণ্ডেয় শিলা ও গরুড়-শিলা যথাক্রমে বদরী আদন অবস্থিত।

বাবা বদরীনাথের কথামৃত আমার পাণ্ডার মুখে যা শুনেছিলাম তার চুম্বক হলে আমি এই তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ শেষ করব। পুরাকালে স্বর্গের দেবতা ও মর্ত্যের মানব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন এক শক্তিশালী দুর্বৃত্ত দৈত্যের দাপটে। এই দৈত্য পেয়েছিলেন সহস্র কবচ কুণ্ডল যারা কেবা নোখকে আরাধনা করে—বর পেয়েছিলেন এই মর্মে—যে যতদিন থাকবে এই সহস্র কুণ্ডল দৈত্যের অঙ্গে, কারোর সাধ্য হবে না এই দৈত্যকে কাবু করতে। এহেন দৈত্য অন্ধ করল স্বর্গ, মর্ত্য ও

পাতাল। দেবতাগণ এলেন বিষ্ণুর নিকট—প্রার্থনা জানালেন দৈত্য বিনাশের। বিষ্ণু আশ্বাস দিলেন, যাচ্ছি! হঠাৎ একদিন লক্ষ্মী দেবী দেখলেন বৈকুণ্ঠ ধামে বিষ্ণু নাই—লক্ষ্মী হলেন চিন্তিত। তিনি স্বয়ং বেরুলেন বিষ্ণুর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে হিমালয় চূড়ায় এসে দেখলেন স্বয়ং বিষ্ণু সমাধিস্থ—উন্মুক্ত স্থানে। তিনি তখন বরফী বৃক্ষ হয়ে আচ্ছাদন দিলেন বিষ্ণুকে। কিছুদিন পরে এসে হাজির হল এক বিশালকায় ভীষণ মূর্ত্তি দৈত্য—মুখে রব 'রক্তং দেহি।' বিষ্ণুর সমাধি ভঙ্গ হল—তিনি বললেন—ঠিক ক্ষণকাল। তারপর বিষ্ণু সৃজন করলেন ধর্মকায় নর নারায়ণ। ভীষণ যুদ্ধ হল দৈত্যের সংগে নর নারায়ণের—একে একে নয় শত নিরানব্বইটি কবচ কুণ্ডল ছিন্ন হ'ল দৈত্য গাত্র হ'তে। তখন দৈত্য ভীত হয়ে ছুটল সূর্য্যদেবের নিকট—কবল তাঁর সাহায্য ভিক্ষা। সূর্য্যদেব জানালেন স্বয়ং বিষ্ণু যুদ্ধ করছেন তার সংগে, কোন দেবতার সাধ্য নাই তাকে বাঁচাবার, একমাত্র পন্থা প্রাণ বাঁচাবার জন্য পাতালে পলায়ন। দৈত্য অনন্যোপায় হয়ে সূর্য্যদেবকে অবশিষ্ট কুণ্ডলটি দিয়ে পাতালে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাল। দেবতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার যার যার স্থানে অধিষ্ঠিত হলেন।

এই অবশিষ্ট কবচকুণ্ডলটি সূর্য্যদেব পরে দান করেছিলেন ভক্ত পুত্র কর্ণকে।

চেলিনীর জীবন কথা

সুনীলকুমার নাগ

ইতালীর শিল্পী চেলিনীর (Benvenuto Cellini, 1500-1571.) আত্মজীবনী একখানা অসাধারণ বই। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা এই বইখানা যে শুধু পৃথিবীর প্রাচীনতম আত্মজীবনীর অন্যতম তা'ই নয়। সে সময়ের ইতালীর পোপ ও রাজপুরুষগণের সংগে কাছের থাকিয়ে চেলিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবার জন্য আত্মজীবনীতে সে সময়কার ইতালীর একটা নির্ভুল ইতিহাসও পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এ বই অনূদিত হ'য়েছে। জর্মন ভাষায় চেলিনীর আত্মজীবনী অনুবাদ করেন গ্যয়টে স্বয়ং।

চেলিনী ছিলেন একাধারে স্বর্ণশিল্পী, মনিকার ও ভাস্কর। শিল্পী হিসেবে চেলিনী সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় যে ইতালীর রেনেসাঁর মধ্যমণি মহান শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো অবধি তাঁর তৈরী একাধিক মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেছেন। ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে মাইকেল এঞ্জেলোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ফ্লোরেন্সের ভাস্করগণের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য চেলিনীই নির্বাচিত হ'য়েছিলেন।

চেলিনী মনে করতেন কোন না কোন দিকে জীবনে যাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁদের সকলেরই উচিত আত্মজীবনী রচনা করে যাওয়া। চেলিনী তাঁর আত্মজীবনী রচনার কাজে হাত দেন আটান্ন বছর বয়সে।

ভূমিষ্ঠ হবার পর সবাই ওঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—শিশুর নাম কি রাখা হবে।

চেলিনীর বাবার আশা ছিল একটি মেয়ে হবে, কিন্তু ছেলে হওয়াতেও যেহেতু তিনি কম খুশী হলেন না। প্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, তারপর হেসে বললেন—ভালই ছেলে হ'য়েছে, আমি ওকে স্বাগত জানাই (He is welcome)। আনুষ্ঠানিক ভাবে নাম রাখবার সময়ও তাই নাম হ'লো Benvenuto অর্থাৎ welcome.

পনেরো বছর বয়সে ফ্লোরেন্সের এক স্বর্ণকারের কাছে চেলিনী কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। তিন বছরের মধ্যে চেলিনীর নৈপুণ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং ফ্লোরেন্সের স্বর্ণকারেরা একবাক্যে স্বীকার করলো যে নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে চেলিনীর সমকক্ষ কোন যুবক নেই। সেই অতি-নৈপুণ্যের কথা ছড়িয়ে পড়বার পর দেখা গেল, যে স্বর্ণকারের কাছে চেলিনী এক সময় শিক্ষানবিশি করতেন তারাই এখন ঈর্ষায় জ্বলতে আরম্ভ করেছে। শেষ পর্য্যন্ত চেলিনীকে পালিয়ে যেতে হয় রোমে। রোমে প্রথমে এক স্বর্ণকারের কাছে চাকরী করতেন চেলিনী, তারপর গণ্যমান্য কয়েকজনের সহায়তায় নিজেই একটা দোকান খুললেন। রোমে এসে চেলিনী শীলমোহর, মেডেল, এনগ্রেভিং এবং এনামেল করার কাজ দেখবার জন্য ভেঁড় করতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এতটা সুযশ অর্জন ক'রে উঠলেন যে সে সময়ে রোমের সর্বাপেক্ষা নিপুণ-শিল্পী মাইকেলিওর সংগে রীতিমত পাল্লা দিতে লাগলেন, শিল্পকর্ম আরম্ভ করার জন্য নিজের এই অসাধারণ শক্তি দেখে চেলিনী নিজেই বলছেন: "The Author of Nature, had gifted me with a genius so happy that I could with the utmost ease learn anything to which I gave my mind."

রোমের ভীষণ রোগে চেলিনীও আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওঁর ছোট ভাই এবং বোন অধিক রোগে মারা যায় কিন্তু চেলিনী সেরে ওঠেন। উঠবার পর ওর চিকিৎসককে কয়েকটি রূপোর বাসন তৈরী করে উপহার দেন। ঐ চিকিৎসক ফেরারার ডিউক এবং আরো অনেককে ঐ বাসনগুলি দেখান। সবাই বললেন: এগুলি নিশ্চয়ই বহু প্রাচীন, গত দু'তিন হাজার বছরের মধ্যে এমন শিল্প-নৈপুণ্য কেউ দেখাতে পারে নি। তারপর যখন চেলিনী সত্য কথা প্রকাশ করলেন, সকলেই শুনে অবাক।

কয়েকবছর পরের ঘটনা। ১৪২৭ সালে ইটোরোপে তখন ভার্সেল্স ও ফ্লোরেন্সের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। অস্ত্রশস্ত্র রাখাও ভড়িয়ে পড়তে লাগলো এ যুদ্ধে। তখনরা রোমের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। রোমের কাছেই একটি বড় বাড়ীর জন্য লড়াইয়ের সময় চেলিনী তন পঞ্চাশেক লোক সংগ্রহ করে তখনদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের হাত থেকে বাড়ীটা রক্ষা করলেন। এখানে শত্রুপক্ষের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে পাঠকের মনে হয় যে চেলিনী নিশ্চয়ই একজন বড় যোদ্ধাও ছিলেন। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। কারণ যত ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করেন নি। চেলিনী যে কিছুটা মিথ্যে প্রকৃতির ছিলেন সে কথা অনেকেই বলে গেছেন। তিনি নিজেও আত্মজীবনীতে এরকম তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন পোপের (Pope Clement) চোখের সামনেই একজন স্প্যানীশ সামরিক অফিসারকে হত্যা করেন। এরপর কার্ডিনাল বারটিনোচির এক চাকরের নিকটআত্মীয় মিলানের এক অধিকার পাম্পেচ্চা চক্রান্তের ফলে রোমের টাঁকশাল থেকে চেলিনী পদচ্যুত হন। এই লোকটি চেলিনীর নামে অনেক মিথ্যে চাষা লিখেও প্রচার করতে লাগলো। যেমন একবার পোপের কাছে গিয়ে নালিশ করলো যে এক স্বর্ণকার চেলিনী খুন করেছে। পোপ রাগে জ্বলে উঠে রোমের ম্যাজিষ্ট্রেটকে হুকুম করলেন যে অবিলম্বে যেন চেলিনীকে ধরে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। চেলিনী রোম ছেড়ে নেপলসে পালিয়ে যাবার আয়োজন করলেন। ইতিমধ্যে পোপ তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত অনুচরকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন যে সেই স্বর্ণকার সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। এই পাম্পেওকে একদিন চেলিনী ঘোড়ার মাথাতে খুন করেন। আর একবার এক সৈনিক হুকুমে বিনা অপরাধে মারবার জন্য চেলিনী নিজের হাতে প্রতিশোধ নেন। একদিন রাতে হঠাৎ চোখে পড়ল যে লোকটি তাঁর বন্ধুর কাছে ঘাঁড়িয়ে। চেলিনী ছুটে গিয়ে নিজের ছোরাখানা এমন ভাবে ওর কাঁধের ওপর বসিয়ে দেন যে আর টেনে তুলতে পারেন না। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। চেলিনীর প্রকৃতিটাই ছিল অত্যন্ত উগ্র। এক এক সময় সামান্য কারণে উত্তেজিত হ'য়ে উঠতেন। আর কোন কথাই পুর ভেবে চিন্তে বলবার অভ্যাস ওঁর ছিল না। যে পোপের কাছে চেলিনী অশেষ ঋণী ছিলেন একবার তাঁর শিরশ্ছেদের সুনাজোচনা করে নিজেকে বিপন্ন করে তোলেন। কখনো কখনো হয়তো সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সাধারণ কথালাপের মধ্যে কাঁটালেও নিজের শিল্প "সাধনার উত্তরোত্তর উচ্চতর লাভের আকাঙ্খা অন্তরের লক্ষ থেকে কখনো মুহূর্তের জন্যও দূর হ'তে পারেনি। পোপ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য চেলিনী নিত্য নতুন জিনিস তৈরী করে প্রচুর অর্থ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি করলেন অল্পদিনের মধ্যে। চেলিনীর তৈরী অনেক মুদ্রার শিল্পসৌষ্ঠব প্রাচীন রোমের অনেক সম্রাটের মুদ্রার চাইতেও সুন্দর বলে অনেকেই বলে গেছেন।

সে সময়ের ইতালীতে গির্জ্জা ও রাজপুরুষদের মধ্যে প্রায় সব বিষয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো, চেলিনীর শিল্পনৈপুণ্যের জন্য প্রত্যেকেই চাইতেন চেলিনী তাঁর অধীনে কাজ করুক। চেলিনী অবশ্য বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন কাজের বন্ধ দিয়ে কাটিয়েছেন। ভেতরের পাশবিক প্রবৃত্তিটা মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দিয়ে উঠলেও নিজের প্রকৃত যে কাজ অর্থাৎ শিল্পকর্ম—সে কাজে তে চেলনী কখনো অবহেলা করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি যখন যা তৈরী করেছেন তার প্রায় প্রত্যেকটিই সে সময়কার ইতালীর শিল্পবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশংসা পেয়েছে। প্রায় সারা-জীবন ধরেই উচ্চতর প্রতিভার অধিকারী হবার জন্য চেলিনীকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হ'য়েছে। একবার পোপের এক দারুণ ছেলে পিয়ের লুইগী চেলিনীর ভাগ্য যেচে মাথায় তুলে নিয়ে অভিযোগ করলো যে সিনী থেকে প্রচুর সম্পত্তি চেলিনী অপহরণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চেলিনীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হ'লো যে অভিযোগটি একেবারে মিথ্যে, অকারণে এরকম নাজেহাল হবার জন্য চেলিনী আত্মহত্যার কথা ভাবছিলেন, এই সময় একদিন তিনি দিবাচোখে দেখলেন দন্ত পিটার স্বয়ং কুমারী মেরীর কাছে তাঁর জন্য করুণা ভিক্ষা চাইছেন। কথাটা পোপের কানে গেল, এ পোপটি ছিলেন একজন ঘোর নাস্তিক। পোপ চেলিনীকে পাগল ঠাওরালেন।

এই সময়ই ফেরারার কার্ডিনালের তদ্বিরের ফলে চেলিনী মুক্তি পেলেন এবং ফ্রান্সে চলে গেলেন। ফ্রান্সের রাজার হ'য়ে চেলিনী কতকগুলি মূর্ত্তি তৈরী করেন তার প্রাসাদ সাজাবার জন্য। যার প্রত্যেকটি সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু'টি মূর্ত্তিবিশিষ্ট একটি চমৎকার লিবরবানীও বানিয়েছিলেন চেলিনী ফ্রান্সের রাজার জন্য। শোনা যায় এ লিবরবানিটি এখনো ভিয়েনায় আছে।

ফ্রান্সের রাজার এক প্রিয় পাত্রী ছিল, ওঁর আশা ছিলো চেলিনী তার কোন না কোন মূর্ত্তি ওঁর মুখশ্রী অনুসারে করবেন। কিন্তু তিনি তা করবেন না বেখে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হ'তে থাকেন। রাজার প্রিয়তমা হ'য়েও এই মহিলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেলিনীকে ফ্রান্স ত্যাগ করতে হয়। ফ্রান্সের রাজার জন্য চেলিনী অনেক অবিস্মরণীয়শিল্প সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে জুপিটার এবং মঙ্গল গ্রহাধিপতি অতিকায় মূর্ত্তিটী বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

ক্লোরেন্স এসে চেলিনী ডিউক ক্যাসিমোর জন্য পারসেউসের একটা মূর্ত্তি তৈরী করেন ব্রোঞ্জ দিয়ে। তা ছাড়া কিছু কিছু মার্বেলের কাজও করেন।

ক্লোরেন্স নগরবাসীরা চেলিনীর শিল্প সৃষ্টি দেখে এমন মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে অনেক গুণগ্রাহী চেলিনীর নামে কবিতা পর্যন্ত রচনা করেছিল। চেলিনীর তৈরী নেপচুনের মার্বেল মূর্ত্তি দেখে স্বয়ং ডিউক ক্যাসিমো বিস্মিত হ'য়ে যান, ক্যাসিমোর ভাষেন স্বলে ওঠেন :

"By my life, I never could have conceived the tenth part of bonuty ns this !" ক্লোরেন্সের প্রখ্যাত ভাস্কর বাণ্ডিনেলোর সঙ্গে এই মার্বেল মূর্ত্তিটির মডেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাতে বাণ্ডিনেলো হেরে যান,চেলিনী বলেন যে হেরে যাবার জন্য তাঁর যে মনোকষ্ট হয় তার ফলে অল্পদিন পরেই বাণ্ডিনেলো মারা যান। ফ্রান্সের রাণী তাঁর স্বামী রাজা হেনরীর সমাধি মন্দির বানাবার জন্য চেলিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু ডিউক ক্যাসিমো ছাড়লেন না চেলিনীকে।

নেপচুনের মার্বেল-মূর্ত্তি বানাবার সময় একটি লোক বাবাজের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে চেলিনীর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। অল্পের জন্য চেলিনী বেঁচে যান। এই সময় সিসেরা নামী একটি মহিলা চেলিনীর সেবা শুশ্রূষা করেন। ১৫৩৫ খৃঃঅব্দে এঁকে চেলিনী বিয়ে করেন।

চেলিনী তাঁর আত্মজীবনীতে ১৫৬২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত নিজের জীবনের ঘটনাবলী লিপে যান, এর পরেও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন তিনি, তবে তখন তাঁর শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে। প্রায় বালক বয়স থেকে চেলিনীর যে দুরন্ত এবং কর্মময় জীবনের সুরু হয় তার শেষ হয় ১৫৭১ খৃঃ অব্দে চেলিনী ফ্লরেন্সিতে ঘুমে মারা যান।

P. G. A
COMMON-ROOM

গীত

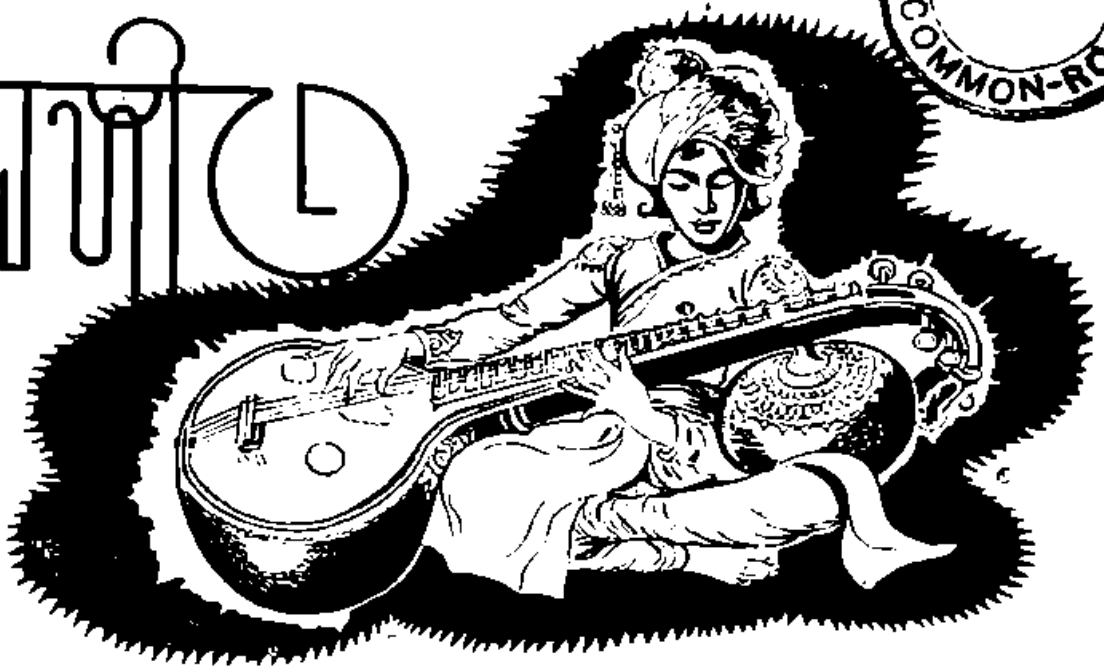

আমি যেন সেই গান ভুলে যাওয়া পাখি,
যে একা নীরব নীড়ে
হিম রজনীর অবসান গোণে মেলি অতন্দ্র আঁখি।
ছিল কত সুর, উচ্ছল কলতান,
ভালবাসা অভিমান,
তারা মেলে দূর-নীলিমার নীলে পাড়ি দেওয়া থাকি-থাকি।

ঝরি নিয়ে এলে দক্ষিণ হাওয়া ভাকি,
তুমি বন মরমরে,
ফুলগুলি ফুটে তার কার মুখে সূর্য-সোহাগ মাখি!
দয়া করো মোরে হানো পঞ্চম বান,
প্রেমে মেলে দাও প্রাণ,
সুধা সুরে ঢেলে কণ্ঠের মিলে হৃদয়ের গাওয়া বাকি।

কথা : শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি : পঙ্কজকুমার মল্লিক

- - স র জ্ঞ প | জ্ঞ প - - - - ॥ ধ র্স র্ধ প জ্ঞ স | জ্ঞ র - - - - | জ্ঞ - রজ্ঞ ম জ্ঞম রজ্ঞ |
০ ০ আ মি যে ন সে ই ০ ০ ০ ০ গা ন ভু লে যাওয়া, পা খী ০ ০ ০ ০

সসর্রসনসর্র | সর্রজ্ঞ - - - | পর্সনসর্রর্স | র্- - - - - | র্সরর্স ণ - প |
ছিল ০০ ০ কত যু ০ ০ ০ ০ ০ উ চ্ছ লকল তা ০ ০ ০ ০ ন তা ল বা দা ০ ০

ণ - ধনর্সন | স - - - - - | র্স ণধ ম্প - - | পধ পধ ণ - - | ণর্স র্স ণর্স ণর্সণধ |
০ ০ ০ ০ অভি মা ০ ০ ০ ০ ন ভা না মে লে ০ ০ যু ০ ০০ ০ ০ ২ নী লি মা র ০ ০ নী

প - - - - - | ম প প প পধ পধ | মপ ম - জ্ঞ - - | ম - - - রসর | স - সরজ্ঞপ |
লে ০ ০ ০ ০ ০ পা ড়ি দেওয়া থা ০ কি ০ থা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি যে ন

জ্ঞপ - - - - ||
সে ই ০ ০ ০ ০

নর্সধনপ পধ পধ | মপ ধ্বপ পধ০ পধ | মপম - জ্ঞ - ম | ম প প প দ ণ |
দু কি নি ০ যে ও লে ই ০ কি ণ চাও যা ০ ডা ০ কি ০ ০ ০ ০ শু নি ধ ন ময়

ম প - - - - | জ্ঞ জ্ঞ র জ্ঞ রস জ্ঞ | র স - - - - | স গ গ গ গ গ | গ ম ম - ম ম |
ম রে ০ ০ ০ ০ শু নি ধ ন ম ০ য় ম রে ০ ০ ০ ০ ফু ল গু লি ফু টে চা য় কা র মু খে

ম প প পদ প ণ | দ প - - - - ||
ত ই ব সো হাগ মা খি ০ ০ ০ ০

র্সর্স র্সর্রসনর্স | র্র - র্সর্র জ্ঞ - - | র্র র্স প - র্সন র্স | র্র - - - - - | র্স র্র র্স ণ র্স প |
হা কর ০ মো রে ০ ০০ ০ ০ ০ ছা নো প ণ চ ০ ম বা ০ ০ ০ ০ ন প্রে ০ মে ০ ০ ০

ণ - ধ ন র্স ন | র্স - - - - - ||
০ ০ জে লে দা ও প্রা ০ ০ ০ ০ ণ

সর্সন - ধ প - | গ - ম প ধ ণ | ণর্স র্স ণর্স ণ ধ | প - - - - - | ম প প প পধ পধ |
সু ধা ০ সু রে ০ ঢে ০ লে ০ ০ ০ ক ণ্ ঠে র ০ ০ মি লে ০ ০ ০ ০ ০ হৃ দ য়ে র গা ও যা ০

মপ ম - জ্ঞ - - | ম - - র সর | স - সর জ্ঞ প | জ্ঞ প - - - - ||
বা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি যে ন সে ই ০ ০ ০ ০

আদি-কবি কৃত্তিবাস

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হেথাকার মৃত্তিকায় স্বাদে গন্ধে রয়েছে ছড়ানো
মৃত্যুহীন জীবনের অমৃত-প্রবাহ অভিনব,
হে কবি, তোমার স্পর্শ হেথাকার বাতাসে জড়ানো,
আজি এ পবিত্র দিনে সেই স্পর্শ দেহে মনে লব।

সেই স্বাদে পরিতৃপ্ত, সেই গন্ধে পুলকিত প্রাণ
হে অতীত কথা কও, স্মৃতির দুয়ার দাও খুলি,
দোয়েল শ্যামার কণ্ঠে মুখরিত তব নাম গান
তব পাদস্পর্শে ধন্য, ধন্য এ পল্লীর পথধূলি।

সেই ধূলি শিরে রাখি,' কবি-জন্ম সার্থক আমার
বাঙলার আদি-কবি কৃত্তিবাস তোমারে প্রণাম,
আদি মহাকাব্যকার, ভক্তি-অর্ঘ্য আমা সবাকার
নিবেদি' চরণে তব—সফল পূজার মনস্কাম।

স্মৃতিপথে যাত্রা করি' চলে যাই দূরে বহুদূরে
পল্লীতে পল্লীতে আর অবলুপ্ত সহরে বন্দরে,
চণ্ডীমণ্ডপের তলে, অঙ্গনে অঙ্গনে অন্তঃপুরে
শুনি রামায়ণ পাঠ সন্ধ্যায় অথবা দ্বিপ্রহরে!

মাঠের কাজের শেষে ছুটে আসে কৃষক কৃষাণী—
শূদ্র আসে ভদ্র আসে, আসে মাঝি মাল্লা ও মজুর,
তন্ময় হইয়া শোনে অমৃত সমান সেই বাণী
বিচিত্র কাহিনী তব রামায়ণ অতি সুমধুর।

বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত সেই রাম নাম
আপদ-হরণকারী, সর্বসম্পদের দাতা তিনি,
নরনারায়ণ রাম, ভূয়ো ভূয়ো তাঁহারে প্রণাম
প্রচারি' মহিমা তাঁরই কবি-কীর্তি লইয়াছ জিনি।

অর্থী প্রার্থী চলে গেল সেদিন সে রাজসভা হ'তে
একান্তে ডাকিয়া রাজা কহিলেন—"কি প্রার্থনা তব,
ভূমি? অর্থ? স্বর্ণ কিছু? আমার এ মুক্ত সদাব্রতে
তোমার ঈপ্সিত বস্তু দান করি' আমি ধন্য হব।"

"আমি কবি, হে রাজন্, সম্পদের নাহি প্রলোভন,
তব কণ্ঠে পুষ্পমাল্য মোর কাছে সেই মূল্যবান,
রক্তহার চমৎকার রাজদেহে সুন্দর শোভন,
দেহ মোরে অনুমতি প্রভাতে করিয়া গঙ্গাস্নান

শুদ্ধাসনে বসে আমি রামায়ণ করিব রচনা,
তুমি শুধু তব রাজ্যে প্রচারিতে রামের মহিমা
আমার সহায় হও; আজীবন বাণীর অর্চনা
সফল করিতে দাও। ইতিহাসে তোমার গরিমা

যুগে যুগে লোকে লোকে আরতির দীপশিখা সম
উজলিবে মানবের অজ্ঞাত প্রচ্ছন্ন ইতিহাস
সুখে দুঃখে বেদনায় আশা নিরাশায় অনুপম
জীবযাত্রা অবশেষে সান্ত্বনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস।"

সিংহাসন হতে রাজা নেমে এল মৃত্তিকার 'পরে
দুবাহু বাড়ায়ে দিল শ্রদ্ধাভরে গাঢ় আলিঙ্গন,
কণ্ঠ হ'তে পুষ্পমালা খুলিয়া সেদিন তোমা তরে
পরাইল কণ্ঠে তব, কবি বলে' করি সম্ভাষণ।

রাজ-পুরস্কার নহে, লভেছিলে রাজ-উপহার,
চন্দন-তিলক ভালে, কবি, তব সেই জয়টিকা,
দেশে দেশে যত কবি তাদের সৃষ্টির অহঙ্কার
তব মহিমার দীপ্ত, যেন অনির্বাণ হোমশিখা

সেই হতে জ্বলিতেছে এই মৃত্তিকার অন্তস্তলে
হেথা হতে নিয়ে যাই সে শিখার পবিত্র উত্তাপ,
রেখে যাই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি এ পুণ্য বেদীতলে
নিয়ে যাই এই আত্মবিস্মৃত জাতির মনস্তাপ।

কালজয়ী-স্মৃতি তব, তবু আজ বহুবর্ষ পরে
মনে পড়ে, যে অমৃত বিলাইলে তৃষিত জনায়,
এ অন্ধতামস যুগে যদি পারিতাম দিতে ধরে'
সবার সম্মুখে তাহা দুর্লভ মানব-সাধনায়;

পুনর্জন্ম হত তব লোকচিত্তে এই ফুলিয়াতে
বাঙালীরও নব জন্ম দেখিতাম বিস্মিত নয়নে,
নর দেহে দেবতার আবির্ভাব নূতন প্রভাতে
জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পেতাম রামায়ণে।

তবু মনে হয় যেন লোকলোচনের অন্তরালে
প্রসন্ন প্রচ্ছায়ে কোনো নব জাতকের কণ্ঠস্বর
শুনিতেছি মাঝে মাঝে; দেহজ্যোতি দিকচক্রবালে
চমকি উঠিয়া যেন উত্তরিছে দুস্তর সাগর।

ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবে পঠিত—৩রা ফাল্গুন রবিবার ১৩৮৪।

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর-ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

দর্শনে শঙ্করের স্থান

শঙ্কর অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসরে তিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অন্য কেহ সেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই। উপনিষদের অদ্বৈত দর্শন তাঁহার ভাষ্যে পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষকে তাহার প্রাচীন ব্রহ্মবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছিল। তিনি যে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ অপেক্ষা তাহাদ্বারা লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা অধিকতর পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। মুক্তির জন্য তিনি কোনও বিশেষ দেবতার উপাসনার বিধি দান করেন নাই—বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, শক্তি, সকলেরই স্তব তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত অনেক দূষিত প্রথার তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি এবং সাধক ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের রক্ষণ ও প্রচারের জন্য তিনি ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন—দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্ম্মঠ এবং দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ। এই সকল মঠ এখনও বর্ত্তমান আছে।

শঙ্করের দর্শন সম্বন্ধে অধ্যাপক থিব বলেন যে "দর্শনের দিক হইতে শঙ্করের সমন্বিত মতই ভারতীয় সকল দার্শনিক মতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সাহসে, গভীরতায় এবং যুক্তির দৃঢ়তায় ভারতীয় অন্য কোনও দর্শনই শঙ্করের দর্শনের সহিত তুলনীয় নহে।" জগতের দর্শনেও শঙ্করের স্থান অতি উচ্চে।

শঙ্কর তাঁহার দর্শনে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন। তবু তাঁহার দর্শনকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মত বলিয়াছেন। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদের মায়াবাদ সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদ হইতে একান্ত ভিন্ন। শঙ্কর জগৎকে 'মায়া' বলিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা—ইহা সত্য। কিন্তু এখানে 'মিথ্যা' অর্থ অস্তিত্ব-হীন নহে, শশশৃঙ্গ অথবা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অলীক নহে। জগৎ-ভ্রম—শুক্তিতে রজত-ভ্রম এবং রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতোও নহে। শুক্তিতে রজত-জ্ঞান এবং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান ক্ষণ কাল-পরেই বাধিত হয়, কিন্তু জাগতিক বস্তুর জ্ঞান আমৃত্যু বাধিত হয় না। জগতের অনুভূতি আমাদের হয়, সে অনুভূতির এক ভিত্তিও আছে। সুতরাং জগৎ ঐকান্তিক মিথ্যা নহে। কিন্তু জগৎ নশ্বর, নিত্য-পরিণামী ও চঞ্চল, জগৎ সৎ নহে। জাগতিক বস্তু যাহাতে অধ্যস্ত হয়, সেই ব্রহ্মই সৎ, অধ্যস্ত জগৎ অসৎ। ব্রহ্ম noumenon, জাগতিক বস্তু তাহার phenomena। Noumenonএর উপরে phenomena দিগের আবির্ভাব হয় কেন, এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা জানি না। এই অজ্ঞাত শক্তিই 'মায়া'। এই শক্তিবশতঃই সমুদ্রে তরঙ্গের মত ব্রহ্ম noumenon—সমুদ্রে অনবরত জাগতিক বস্তুরূপ phenomena তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। ইহাই মায়া। এই মায়াবশে যে জগতের উদ্ভব ও বিলয় অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে, তাহার অন্তর্গত জীব মায়ার বশ হইয়াও মায়ার স্বরূপের আলোচনা করিতেছে। মায়া মিথ্যা নহে, মায়ার সৃষ্টিও অস্তিত্বহীন নহে।

ব্রহ্ম নির্গুণ। নির্গুণ কোনও বস্তুর অভিজ্ঞতা আমাদের নাই এবং এরূপ কোনও বস্তুর ধারণা ও বর্ণনা করাও অসম্ভব। তাই ব্রহ্মকে মনের অতীত বলা হইয়াছে। কিন্তু "গুণ" শব্দ দ্বারা এখানে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য 'গুণ'ই সূচিত হইয়াছে। এই জগৎ সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ গুণের বিকার। আমাদের পরিচিত যাবতীয় গুণই সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণের বিকার। ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ওতমোগুণের অতীত। জাগতিক কোনও গুণ ব্রহ্মে নাই। ব্রহ্মকে আমাদের পরিজ্ঞাত যাবতীয় গুণের অতীত বলিলেও শঙ্কর তাহাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম

একেবারে যে বাক্যও মনের অতীত, তাহা নহে। "সৎ" এবং চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। সৎ-ত্ব (অস্তিত্ব) কোনও গুণের বোধক না হইলেও চিৎ ও আনন্দকে গুণ না বলিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু এই চিৎ ও আনন্দ আমাদের পরিজ্ঞাত চিৎ ও আনন্দ নহে। ব্রহ্ম চিৎ-ত্ব-ও-আনন্দত্ব-গুণান্বিত নহেন—তিনি চিৎ ও আনন্দ। সৎ এবং চিৎ ও আনন্দ অভিন্ন। এই ব্যাখ্যা সংজ্ঞাজনক বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত, সুতরাং তাহার চিৎ-ত্ব ও আনন্দ-ত্ব আমাদের পরিজ্ঞাত চিৎ-ত্ব ও আনন্দ-ত্ব হইতে ভিন্ন। সুতরাং আমাদের পরিজ্ঞাত কোনও গুণ ব্রহ্মে নাই ইহা স্বীকার করিলেও, কোনও গুণই তাহাতে নাই ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে ব্রহ্মকে "বস্তু-শূন্য বিকল্প" (বস্তুত্বহীন কল্পনা মাত্র) বলিতে হয়। ব্রহ্মে মানবীয় গুণের আরোপ নিষিদ্ধ—কেননা তিনি আমাদের পরিজ্ঞাত যাবতীয় গুণের অতীত। কিন্তু তিনি আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত গুণেরও অতীত, ইহা নিতান্তই দুঃসাহসিক উক্তি। গুণের আরোপ করিলে ব্রহ্মের অসীমত্ব সংকুচিত হয়, ইহাও বলা যায়না, কেননা অসীম গুণের আরোপে অসীমত্ব সংকুচিত হইবার কারণ নাই। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন—কার্য্য তাহার কারণের নিকট যাহা প্রাপ্ত হয়, কারণে তাহার অস্তিত্ব নাই। ইহা বলিয়াও তিনি ব্যাপ্তি (Extension) ও চিন্তা (thought) এই দুই গুণ ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছিলেন। ইহারা অসীম বলিয়া এই দুই গুণের দ্বারা ঈশ্বরের অসীমত্বের সংকোচের আশঙ্কা তিনি করেন নাই। যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তখন ব্রহ্মের যে স্বরূপ তাহা অনুভূত হয়। ভাষায় তাহার বর্ণনা অসম্ভব হইলেও সেই অনুভূত স্বরূপই ব্রহ্মের গুণ। সেই স্বরূপের মধ্যে যদি অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত অনন্ত প্রেম ও অনন্ত ক্ষমা যে থাকিতে পারে না, তাহা বলা যায় না।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে কোনও স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। শঙ্কর দর্শনে ব্রহ্মই আদি, অন্ত ও মধ্য—ব্রহ্মই "সর্ব্বত্র গীয়তে।" শঙ্করের দর্শনে জগতের অস্তিত্ব যদি বাস্তবিক অস্বীকৃতও হইত, তাহা হইলেও নিত্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার হেতু তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা যাইত না। কিন্তু শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক (phenomenal) অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। শঙ্করের দর্শন অজ্ঞেয়বাদ নহে। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের নিকট ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। কিন্তু মানবীয় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ইহাই মুক্তি—ইহাই বেদান্তের লক্ষ্য। এই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যখন লব্ধ হয়, তখন যে বাধা দ্বারা মানবের জ্ঞান সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ, তাহা বিদূরিত হয়। তখন মানবজ্ঞান অসীমত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ভক্তিবাদীর নিকট এই পরিণাম বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি চিনি খাইতে চাহেন, চিনি হইতে চাহেন না। কিন্তু প্রেম চাহে প্রেমাস্পদের সহিত এক হইতে, ব্যবধান প্রেম সহ্য করিতে পারে না। শঙ্করের মুক্তিতে এই ব্যবধানের বিলোপ হয়, তাহার ফলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। যতদিন ভেদ থাকে, ততদিন তাহার সংকোচ-সাধনেই ভক্তের সমস্ত চেষ্টা ব্যয়িত হয়। চেষ্টার সম্পূর্ণ সফলতাই অভেদ। তাহাকে ভয় করিবার কারণ নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, ক্বচন তারঙ্গঃ সমুদ্রঃ॥

হে নাথ, ভেদ অপগত হইলেও আমি তোমারই থাকিব, তুমি আমার হইবে না। তরঙ্গ সমুদ্রেরই, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের হয় না।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গগন পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওরে নিয়ে আয় এইবার—"

দিগন্ত অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া পাশের ঘর হইতে একটি নীল-শেড-দেওয়া সুদৃশ্য বাতি লইয়া প্রবেশ করিল।

"কোথা রাখব এটা"

"মাথার শিয়রের দিকে এই তেপায়াটার উপর। দাদুর ঘরে রাত্রে এই বাতিটাই জ্বলবে। শেডটা ভালো, সুদিং আলো হবে। এই লণ্ঠনগুলো সরিয়ে নিয়ে যা—"

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা আবার কোথা থেকে পেলি"

"কাটিহার থেকে আনালাম"

"তাই বুঝি সঙ্গে থেকে দু'ভায়ে মিলে ওইটে নিয়ে ফুস্‌ফুস্‌ করছিস"

দিগন্ত দাদার আদেশ অনুসারে আলোটি যথাস্থানে রাখিয়া লণ্ঠনগুলি লইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত ঘরটা একটা নীলাভ স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া উঠিল।

ঊষার দিকে চাহিয়া গগন প্রশ্ন করিল—"বেশ সুন্দর হয় নি?"

"চমৎকার"

"দাদুকে এবার ঘুমুতে দাও একটু। তুমি আবার যেন গল্প কেঁদো না"

"গল্প তো তোমরাই করছ। আমি তো এতক্ষণে এলাম ছেলে তিনটেকে খাইয়ে। ছেলে তো নয়, এক একটা ডাকাত"

"ঘুমিয়েছে ওরা?" সূর্য্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন।

"না। চক্ষে ঘুম নেই কারো। অথচ সমস্ত দিন হৈ হৈ করে' বেড়িয়েছে! কতক্ষণ আর চাপড়াব। বুড়ো হাতীদের কি আর চাপড়ে ঘুম-পাড়ানো যায়! ওদের বাপের কাছে দিয়ে চলে' এলুম তাই। ওঁরও ইচ্ছে ছিল সন্ধের সময় বাবার কাছে এসে একটু বসেন, কিন্তু যা হৈ হৈ হচ্ছে বসবেন কখন। আমারও ক্লান্ত লাগছে। মোটা মানুষ ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বাবার পায়ের কাছে এইখানটায় একটু গড়িয়ে নি। ওই ছোট বালিশটা আমাকে দে তো উর্ম্মিলা—"

উর্ম্মিলা সূর্য্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কোথাও উঠিয়া যায় নাই, কোন কথা বলে নাই। কেবল তাহার অঙ্গুলিগুলি সূর্য্যসুন্দরের কেশ-বিরল মস্তকে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল।

ঊষা মাথায় বালিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল। একটু পরে তাহার নাকও ডাকিতে লাগিল। সূর্য্যসুন্দর তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

গগন তখন চুপি চুপি দাদুর কানের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "দাদু, আলোটা ভালো লাগছে তো"

"ওয়াণ্ডারফুল"

"চম্পাকে ডাকব? সে এইখানে তোমার মাথার কাছে বসে আস্তে আস্তে গান শোনাক না একটা। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়—"

"বেশ, সে তো ভালই হবে। কিন্তু ওর কষ্ট হবে না তো, পোয়াতি মানুষ—"

"বাপের বাড়িতে পাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই অবস্থায়। ডেকে আনি?"

"আন তাহলে"

দিগন্ত পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। গগন সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দিগন্ত তোর বৌদিকে নিয়ে আয়। তার আগে ক্যাম্প-চেয়ারটা দাদুর মাথার দিকে পেতে দে। চম্পা ওইটেতে বসে' গান শোনাক দাদুকে—"

বাধ্য বালকের মতো দিগন্ত আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া দিল এবং তাহার পর চম্পাকে ডাকিয়া আনিল। চম্পা যেন গ্রীণ-রুমে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার পরিধানে জরির পাড়-বসানো নীল শাড়ি, খোঁপায় কুন্দ-ফুলের মালা। সে সলজ্জ মৃদু হাসিয়া গগনের দিকে চাহিল, তাহার পর মৃদুকণ্ঠে দিগন্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গানটা গাইব"

দিগন্ত বলিল, "দিন শেষে বসন্ত বা—"

গগন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দিগন্তর দিকে চাহিল। সে আশা করিয়াছিল দুপুরের কথা-মতো 'মম যৌবন নিকুঞ্জে' গানটাই গাওয়া হইবে। কিন্তু দিগন্ত একি ফরমাস করিল। কিন্তু সে জানে এ সব ব্যাপারে দিগন্তই বেশী সমঝদার, তাই সে আর প্রতিবাদ করিল না।

চম্পা ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

"দিন শেষে বসন্ত বা প্রাণে গেল ব'লে
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে।
তারি সুর নেব ধরে'
আমারি গানেতে ভরে
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে'।

গগন দিগন্ত দুই জনেই নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া গেল। সূর্য্যসুন্দর গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নিজের মাকে দেখিতে পাইলেন। মায়ের কোলে একটি শিশু, তিনিই যেন শিশু হইয়া মায়ের কোলে শুইয়া আছেন, মা যেন মৃদু কণ্ঠে গান গাহিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। মায়ের ছবি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। বাবা আসিলেন, তাঁহার হাতে এক-গোছা সবুজ দুর্ব্বা। বাবার হরিণটা আসিয়া দুর্ব্বাগুলি খাইতে লাগিল। বাবা চলিয়া গেলে আসিলেন মামা। তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার উপর সত্যই অন্যায় করেছিলাম আমি, আমায় মাপ কোরো। মামাও চলিয়া গেলেন, তাহার পর আসিল মন্মথ। হাসিয়া বলিল, কি রে তুইও টিকিট কেটেছিস দেখছি। কোন ভয় নেই। বেশ আছি আমরা এখানে। এখানেও গান গাই। শুনবি? তোর সেই হার্মোনিয়মটা আছে তো। হার্মো-নিয়মটা বাহির করিয়া আনিয়া, তেমনি করিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া সেই পুরাতন গানটা ধরিল—

উরমির পরে উরমি উঠিয়া
সবলে এ তনু দেয় ডুবাইয়া
ডুবে গিয়ে পুন কেন উঠি ভেসে
কেন নাহি যাই তলায়ে

তাহার পর হঠাৎ থামিয়া বলিল, "হার্মোনিয়মের বেলোটা খারাপ হয়ে গেছে, সারিয়ে নিস।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া সে-ও চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল নবুদা, তাহার পর রায় মশায়।...সর্ব্বশেষে আসিল 'বউ'—বিকর মা। মুখে প্রসন্ন হাসি।—মৃদুকণ্ঠে বলিলেন ছেলে, মেয়ে বউ, নাতি, নাতবৌ নিয়ে বেশ আরামে আছ দেখছি। যে জগত অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে, যে জগতের অধিবাসীরা আর ইহলোকে নাই সেই জগত তাঁহার ঘুমের মধ্যে মূর্ত্ত হইল। প্রায়ই হয়।

...তাহার পর হঠাৎ সব লুপ্ত হইয়া গেল আবার। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন—ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছে, চম্পা উঠিয়া গিয়াছে। ঊর্ম্মিলা শুধু বসিয়া আছে মাথার শিয়রে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কীর্ত্তনের গান—

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

"কারা হরি নাম করছে?"

"রামনিবাস বাবাজীর দল কীর্ত্তন করছে, সেই যে সন্ধের সময় এসেছিল"

"ও"

সূর্য্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন। ঊর্ম্মিলা আনত-মুখে সূর্য্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর যখন অনুভব করিল সূর্য্যসুন্দর সত্যই

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ; তখন সে-ও মাথার শিয়রের স্থানটিতে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্য্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। তিনি রামনিবাসের বাবা শ্রীনিবাসের কথা ভাবিতেছিলেন। লোকটা মদ খাইত, মাংসও খুব প্রিয় ছিল তাহার। প্রায়ই তাঁহার বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হইত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। কখনও শুধু হাতে ফেরে নাই। ঘুঘু হরিয়াল শরাল প্রভৃতি প্রায়ই মারিয়া আনিত। শুধু মারিয়া আনিত নয়, তাঁহার আস্তাবলটায় বসিয়া রাঁধিত। একা হাতেই সে পাখীর পালক ছাড়াইত, কুটিত, মশলা বাটিত। বামুনদিদি তাহাকে বাড়িতে আমোল দিতেন না। রান্না করিতে করিতে তাঁহার জন্য খানিকটা আলাদা করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে বাকিটাতে খুব ঝাল দিত। তাহার পর সেই ঝাল মাংসের চাট দিয়া মদ খাইত। রোজ মদ খাইত সে। বস্তুত ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সকালে উঠিয়া পাখীর খোঁজে বাহির হওয়া, পাখী খুঁজিয়া শিকার করা এবং সন্ধ্যায় সেই পাখীর মাংস সহযোগে মদ খাওয়া। যেদিন সে অন্য পাখী পাইত না, সেদিন চড়াই শালিক পর্য্যন্ত মারিত। ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত। এ বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তাহার, মাংস সে কোন রকমে রোজ জোগাড় করিবেই। মাংস তাহার প্রত্যহ চাই-ই, অথচ বাজারে প্রত্যহ মাংস পাওয়া যাইত না, এখনকার মতো তখন গ্রামে গ্রামে কশাইয়ের দোকান ছিল না, পূজার সময় ছাড়া পাঁঠা কাটা হইত না। আদিম বন্য মানবদের মতো তাই শ্রীনিবাসকে নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। মদ খাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল শ্রীনিবাস। যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সবই সে মদে নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে গ্রামের প্রান্তে দশ বিঘার যে আমবাগানটি আছে সেইটি বাঁধা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল সে। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া রীতিমত দলিল-পত্র করিয়া ধার করিয়াছিল। কিন্তু শোধ করিতে পারে নাই। কাহারও ধার সে শোধ করে নাই। অবশেষে একটা নষ্ট স্ত্রীলোকের আশ্রয় লইয়াছিল। সে নষ্ট ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীনিবাসের খুব হিতৈষিণী ছিল। সেই তাহাকে খাইতে পরিতে দিত এবং পাওনাদারদের তাড়ি হইতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিত। কোনও পাওনাদার শ্রীনিবাসের নাগাল পাইত না। সে নাকি শাখাপত্রবহুল বড় বড় গাছে উঠিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। স্ত্রীলোকটি একটি বালতির ভিতর এক বোতল মদ, কিছু মাংস এবং খানকয়েক রুটি লইয়া গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস গাছের উপর হইতে একটা দড়ি নামাইয়া দিত। স্ত্রীলোকটি বালতিতে দড়ি বাঁধিয়া পুনরায় সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস বালতি উপরে টানিয়া লইত। স্ত্রীলোকটিও তাহার পর গাছে উঠিয়া যাইত। সূর্য্যসুন্দর একবার স্বচক্ষে তাহাদের একটি গাছের উপরে দেখিয়াছিলেন। পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু যমকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শ্রীনিবাসের অবশেষে কঠিন পীড়া হইল। সিরোসিস্ অব লিভার এবং তদুপরি নিউমোনিয়া। ছিন্নবসনা রুক্ষকেশা শ্রীনিবাসের স্ত্রী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্য্যসুন্দরের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সূর্য্যসুন্দর শ্রীনিবাসের চিকিৎসা করিবার জন্য তাহার বাড়ি গেলেন। গিয়া দেখিলেন চিকিৎসা করিবার আর কিছু নাই, শেষ চিকিৎসক যম আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীনিবাস অসহায় দৃষ্টি তুলিয়া ক্যাল ক্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, দুই গাল বাহিয়া ধারা নামিল। শ্রীনিবাসের পুত্র রামনিবাস তখন চার বছরের শিশু। সে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, শ্রীনিবাস তাহার হাতটি টানিয়া সূর্য্যসুন্দরের হাতে দিয়া নির্নিমেষ উৎসুক দৃষ্টিতে সূর্য্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় সূর্য্যসুন্দর একটা নাটকীয় কাণ্ড করিয়াছিলেন। যে হ্যাণ্ডনোট ও দলিল লিখিয়া দিয়া শ্রীনিবাস একদা তাঁহার নিকট বাগান বাঁধা রাখিয়া আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল, সেই হ্যাণ্ডনোট ও দলিলটি তিনি বাড়ি হইতে আনাইয়া তাহার সম্মুখেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী হয়তো কিছু সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। রামনিবাস তাঁহার সে টাকা শোধ করে নাই। সেই বাগানটি অন্য লোককে বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছে। আখড়ায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি আছে। অনেক ভক্ত জুটিয়াছে। রামনিবাস এখন

বাবাজী, কেহ কেহ গুরুজিও বলে। ভক্তদের কৃপায় তাহার আর অন্নকষ্ট নাই।

কীর্তন আবার প্রবল হইয়া উঠিল—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

শুনিতে শুনিতে সূর্য্যসুন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘুমাইয়া আবার তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আবার যেন 'বউ' আসিয়াছে। বলিতেছে, "তুমি দিন-কতক পরে এসো। সবার সঙ্গে দেখা না করে' যেন এসো না। গগনের বউ ভারী সুন্দর হয়েছে, না?" মুচকি হাসিয়া বউ চলিয়া গেল। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সকলের সঙ্গে তো দেখা হয় নাই, সকলে তো এখনও পর্য্যন্ত আসিয়াও পৌঁছায় নাই। সকলে কি আসিবে? কতদিন পরে আসিবে? ততদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবার মতো শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি? দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন। ঘরে সেই নীল শেড দেওয়া আলোটা জ্বলিতেছে। তাঁহার বিছানার কাছে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? বউ নাকি!

"কে—"

মৃদু কণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমি চম্পা, আপনার জন্যে ওভাল্‌টিন এনেছি"

সূর্য্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না, দিতে পারিলেন না। একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসে তাঁহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গেল, তিনি কথা বলিতে পারিলেন না।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত

ব্যাকুল *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আসে কোন্ উদাস স্মৃতি যায় না সখা ভোলা যারে :
জাগে এক অনিদ্র ব্যথা ঘুম পাড়ানো যায় না তারে!

কবে সেই শ্যামলকে লো দেখেছিলাম নয়ন ভ'রে,
শুধু মন প্রাণ সঁপি'-তায় নিয়েছিলাম আপন ক'রে
সে-প্রণয় রঙিন কল্প কথার মতন তায় স্বপনে,
যেন সেই সব কাহিনী মন ভুলানো—ছায় অমনে!
যদি হায় ভাগ্য ঘুমায় জাগাতে তায় কেবা পারে!

আজো সেই যমুনা মাঠ নিকুঞ্জ বাট তেমনি তো ভায়!
তেম্‌নিই জলকে চলে সখীরা সব কলসী মাথায়!
শুধু আজ বল কোথা সেই নূপুর রণন মনোহরা?
কোথা হায় কথায় কথায় গোপালের সেই বায়না ধরা?
বাজে না কেন উছল বাঁশি লো বল্ সে—কংকারে?

আজো তায় তেমনি আকাশ, তেম্‌নি তো চাঁদ বাদল তারা,
আজো গায় তেম্‌নি কোকিল, নাচে ময়ূর আপন হারা,
আছে সব সেই-শুধু নেই সে ব'লে জীবন হ'ল ছাই,
বিরহের তাপে মীরা পাগলিনী আজ হ'ল তাই :
এ কেমন আগুন সখী জ্বললে যে আর নেভে নারে।

ডেকে আন ডাক দিয়ে তায় : "এসো বঁধু,
এসো গো আজ।
তোমার ঐ মোহন বাঁশি বাজাও আবার, হে হৃদয়রাজ!
তুমি না ঠাঁই দিলে পায় কোথায় পাব
ঠাঁই বলো আর?
তুমি নাথ মীরার যে সর্বস্ব, নেই আর
কেউ কোথা তার।
কেন বা বাসলে ভালো—করবে না সফল আমারে?"

---

* ইন্দিরা দেবীর সমাধিস্থ হিন্দি ভজনের অনুবাদ।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের রস-চিত্র কল্পনা

শ্রীকিশোরীরঞ্জন দাস

প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে কাব্যরস সম্বন্ধে বহু আলোচনা আছে। এ-বিষয়ে ইংরেজী-সাহিত্যও অগ্রণী। বাংলা-সাহিত্যে সংস্কৃত-ইংরেজীর রস-বিচার-ব্যাখ্যার অনুসরণ চলছে। অবশ্য কোন কোন স্থলে এর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে—বাংলা সাহিত্যিক ও কবিকুলের হাতে।

অভিনব গুপ্ত কাব্যরসের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন :—

> লক্ষ্যসমর্পণমানন্দময় সংসার সুন্দর বিভাবানুভাব সমুদিত-প্রাগ্ নিবিষ্ট—
> ইত্যাদি বাসনানুরাগসুকুমার—স্বসংবিদানন্দ চর্বণা ব্যাপার-রম্যরূপ
> রূপো রসঃ।

'প্রাগ্-নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব-বিভাব-অনুভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে সহৃদয়ের হৃদয়ে যে আনন্দময় আত্মসমানতা প্রাপ্ত হয়—তা-ই রস। কবির শব্দ-সংযোজনার দ্বারা লৌকিক ভাবগুলি সকল সহৃদয়-সংবাদী সুন্দর ও অনুপম বিভাব-অনুভাবে রূপান্তরিত হ'য়ে পাঠকচিত্তের স্থায়ি-ভাবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে।'

'সাহিত্যদর্পণে'র কবিরাজ বিশ্বনাথ এক-ই কথাই বলেছেন :

> বিভাবেনানুভাবেন
> ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
> রসতামেতি রত্যাদিঃ
> স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্।

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিভাব-অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে রূপান্তরিত হ'য়ে রসে পরিণত হয়।' এই বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী হচ্ছে কাব্যরচনা বা সৃষ্টি কৌশলের তিনটি ভাগ। এ-বিষয়ের আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ বহির্ভূত। সংস্কৃত আলংকারিকরা মানুষের মনের অন্তর্নিবিষ্ট এরূপ নয়টি স্থায়িভাব নির্দ্ধারণ করেছেন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম।

> রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
> জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়ীভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

এই নয়টি স্থায়িভাব বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীর সংস্পর্শে যথাক্রমে নয়টি রসে পরিণত হয়—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

> শৃঙ্গারহাস্যকরুণ রৌদ্রবীর ভয়ানকাঃ।
> বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥

মধুসূদনও অলংকারশাস্ত্রোক্ত নয়টি রসের শ্রেণীভাগ স্বীকার করেছেন, কিন্তু অলংকার শাস্ত্রে এই নয়টি রসের যে ভাবকল্পনা ও রূপবর্ণনা আছে তা তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কয়েকটি রসের যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তার মূলে তাঁর নিজস্ব কল্পনা ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন রসের সনেট-গুলির আলোচনায় এরকম চিত্রকল্পনার হৃদয়গ্রাহিতা এবং সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে। তিনি কোন রসসংজ্ঞা বা রসব্যাখ্যা এ কাব্যের কোথাও পরিবেশন করেননি, রসের মূল প্রকৃতিটি অবলম্বন ক'রে সেই রসের চিত্ররূপ এঁকেছেন তাঁর বিচিত্র কল্পনা ও অপূর্ব ভাষায় রেখায়। এর উপাদানগুলির কয়েকটা তিনি পুরাণাদিগত আখ্যানভাগ থেকে বা রামায়ণ-মহাভারত থেকে সংগ্রহ ক'রে তার-ই সাহায্যে ভাবময় ভঙ্গিকে রূপায়িত করেছেন শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তির দ্বারা, কবি করুণরস, বীররস, শৃঙ্গাররস ও রৌদ্ররস—এই প্রধান চারটি রসের বিচিত্র চিত্ররূপ এঁকে-ছেন এবং ঐ রসের ভাবাশ্রয়ে বিচিত্র চিত্রকল্পনা করেছেন। এরকম কল্পনা তাঁর নিজস্ব এবং বাংলা কাব্যে প্রথম।

মধুসূদনের এই রস-সম্বন্ধীয় সনেটগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে নানাজনের নানামত। কেউ বলেন, কবি নিজেই 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনা করতে গিয়ে বলেছেন—'গাইব মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত।' 'বীররস' সনেটের বর্ণনায় দেখি যে, 'গিরি-শিরে' ভীষণ-মূর্তি যোদ্ধ্-সমুচিত বীরিমদমত্ত এক বীরপুরুষ রামহস্তে ধৃত 'ভীমশরাসনে' শর সংযোজিত করে প্রচণ্ড সিংহনাদ করতে করতে এবং টংকারধ্বনি করে শরক্ষেপ করছে। তার—

> "ঘোরকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
> রতন-মণ্ডিত শির ঠেকিছে গগনে,
> বিজলী ঝলসা-রূপে উলসি জলদে।
> চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
> ঢালখান ; উরুদেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
> চৌদিকে বিবিধ অস্ত্র।"

কবি এই ভীষণাকৃতি ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত বীরপুরুষকে বীররসের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন—'বীররস এ বীরেন্দ্র রসকুলপাত।' বীররসের মূলভাব উৎসাহকে তিনি বিশেষভাবে যুদ্ধোদ্যমরূপে' গ্রহণ করেছেন। এই উৎসাহ সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে বিমলগভীর আনন্দানুভূতির সঞ্চার করতে নাও পারে। আর বিবিধ-অস্ত্র সজ্জিত 'ভৈরব আকৃতি শূরে' দেখে কবি নিজেই যেন কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েছেন—'প্রবিষ্ট ত্রাসে, কে এ মহাজন, কহ, গিরিমহামতি ?' তাছাড়া, বীররসে মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বীররসে কাব্যকে উত্তীর্ণ করতে পারেননি। সেখানে বীররসের যথার্থরূপ নিদর্শন থাকলেও মূলতঃ শেষ পর্যন্ত করুণ—রসাশ্রিত হ'য়ে উঠেছে।

'শৃঙ্গাররস,' 'সুভদ্রা' এবং 'উর্বশী' প্রভৃতি শৃঙ্গাররসাত্মক সনেট-গুলির মধ্যে কবি সুভদ্রা-অর্জুন প্রভৃতি নরনারীর যে কামনাময়ির রূপ অঙ্কন করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় রতিভাবাবলম্বিত কামকলার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় যে-সকল শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যরচিত হ'ত তার ধারানুসরণ করেছেন। 'শৃঙ্গাররস' নামক সনেট দুটির প্রথমটিতে দেখা যায় এক মনোরম কুসুমবনে উপবনে এক পুরুষ যৌবনবর্ধক পুষ্প-মালা ধারণ করে মস্তকে পুষ্পমুকুট পরিধান করে কুসুমাসনে উপবিষ্ট আছে। তার চারিপাশে সুন্দরী রমণীরা নানে কামনার দ্যুতি নিয়ে সকৌতুকে পরস্পর হাত ধরাধরি করে নৃত্য করছে। এই যুবাপুরুষের রাজ্যেদ্ভূত কামনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তরুণী সবল দগ্ধীভূত। এই অভিনব কাম-সম্ভোগচিত্র অঙ্কনা কবিকে ব্রজধামের গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রাসলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়টিতে নারী 'মদনের বরে' মেঘনাদবধ সমরকুশলী বীরযোদ্ধা, সে চন্দ্রচূড়রথী। অলক্ষিতে থেকে প্রেম-বাণবর্ষণে পুরুষহৃদয়কে আহত করে—কটাক্ষবাণে পুরুষ হৃদয় বিদ্ধ ক'রে এবং অতি সহজেই পুরুষকে পরাজিত করে। এতে জৈব প্রবৃত্তির অনিবার্য আবেগ সঞ্চারিত। আবেগের আতিশয্য কবির কল্পনাকে অতিশায়িত ক'রে তুলেছে। তিনি শৃঙ্গাররসকে কামের অবতাররূপে কল্পনা করেছেন—

"কামদেব অবতার রসকুলে আসি
শৃঙ্গার রসের নাম।"

প্রেম-কবিতা হিসাবে এগুলি রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে পারে—মেলাচকল চিত্তবৃত্তিকে কামনার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করতে পারে, কিন্তু সম্ভোগ শৃঙ্গারের এই কল্পনা-বিলাস চিত্তভূমিকে আবিল ক'রে তোলে, মঙ্গলকে পরিতুষ্ট করতে পারে না। পাঠক হৃদয়-খাতে এই আবিলতার প্রবাহ সর্বাত্মক নয় বয়ঃ কামপঙ্কিলতায় গতি রুদ্ধ হয়ে আসে। এরসের প্রাধান্য এক 'বীরাঙ্গনা' কাব্য ছাড়া তাঁর অন্য কোন কাব্যে তেমন পরিদৃষ্ট হয় না।

'রৌদ্ররসে'র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কতকগুলি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। রৌদ্ররসের প্রকৃতি গিরিগুহাবদ্ধ প্রলয়কারী মেঘের মত, ভীষণ গর্জনকারী ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায়। সেই ভীষণ গর্জনে বিরাট অটল-অচল পাহাড় ভূকম্পনে বনভূমি কম্পনের ন্যায়—যাত্যা-বিক্ষুব্ধ উদ্দাম-উত্তাল অতল সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত ঢেউএর তীব্র আন্দোলনের ন্যায় থরথর কম্পিত হচ্ছে। ভারতী দেবী কৃপা-পরবশ হ'য়ে এই ক্রোধবেগী নিষ্ঠুর কর্কশভাষী রৌদ্ররসকে সাগরের অতল-তলে রেখে রেখেছেন। এই রৌদ্ররসের ব্যবহারও সাহিত্যে খুব অল্প। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্যের কোন কোন স্থলে এবং 'বিরাঙ্গনা কাব্যের' কেকয়ী পত্রিকায় রৌদ্ররসের কিঞ্চিৎ ব্যবহার দেখা যায়; তাছাড়া আধুনিক কাব্যে এই রসের ব্যবহার নগণ্য। সে সম্বন্ধে কবি স্বয়ং তাঁর সনেটে বলেছেন—রৌদ্ররস—'বড়ই কর্কশভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্মতি, সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।' এই রসকে ভারতীদেবী সাগরের তলে রেখে রেখেছেন—অর্থাৎ এ-রসের ব্যবহার বিরল।

রৌদ্ররসের মূলভাব ক্রোধ। ভানুঃ (চিড়িয়া) সনেটে রৌদ্ররসের মার্থক বিবর্তন পাওয়া যায়:

"ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা পরে
ক্রোধান্নি তড়িত-রূপে; রক্ত-নয়নে
ক্রোধান্নি! মেঘের বুকে যেমতি নিঃসরে
ভৈরবনাদ বজ্রনাদে, ঘোর রোষভরে
কম্পার্ত ভূধর ভূমি, শেষে অম্বরে
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট যমনে;—"

'দুঃশাসন' সনেটটিতে প্রতিহিংসালোলুপ ভাবের চরিত্রের রূপায়ন দেখা যায়। করুণ-রস, বীর-রস প্রভৃতি রসের প্রকাশভঙ্গী শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু রৌদ্ররসের প্রকাশভঙ্গী বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। রৌদ্ররসের নিকৃষ্টতা প্রকাশিত হয়েছে ভাবের মৈস্ত ও কর্কশতা এবং বর্ণনার বিশৃঙ্খলার দ্বারা।

পর্যবেক্ষণে করুণ রস সম্বন্ধীয় সনেটগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে, এই স্তরের কবিতাগুলিতে একটি স্থায়ী আবেদন আছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'our sweetest songs are those that tell of our saddest thought,' এই হচ্ছে করুণ-রস। অনেকের মতে করুণ-রসই মূল রস। করুণ-রসের যে পরিবর্তন বিকশিত হয় তা অন্যকে আকর্ষিত করে আনে, তা সহজেই হৃদয়সংবাদী। "প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে রসের যে নয়টি বিভাগ আছে সেগুলির মধ্যে একমাত্র করুণ-রসই সর্বত্র, সহজে সর্বস্পর্শী অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী। করুণ-রসই আমাদের হৃদয় একেবারে পরিপ্লাবিত করে দিতে পারে। কবি মধুসূদনের অন্তরেও করুণ-রসের প্রতি পক্ষপাত ছিল; করুণ-রস-সৃষ্টিতেই তাঁর অধিকতর সাফল্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, 'মেঘনাদবধ' কাব্যেও তিনি যেখানে বীররস, শৃঙ্গাররস বা বীভৎসরস সৃষ্টি করেছেন, সেখানে উৎকর্ষের বা অভিনবত্বের পরিচয় মিলেও যেখানে তিনি করুণ-রসাত্মক ভাবপ্রকাশ করেছেন, সেখানে তাঁর রচনা অধিকতর মর্মস্পর্শী ও কবিত্বের দিক দিয়েও সার্থক হয়েছে। তিনি করুণ-রসকেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন।"

'করুণ-রস' সনেটের বর্ণনায় দেখি, অপূর্বসুন্দরী এক যুবতী নির্জন নদীতীরে নিঃসঙ্গে ক্রন্দনরতা। তার গণ্ডাবাহিত এক এক বিন্দু অশ্রু এক একটি মুক্তাফলের ন্যায় প্রতিভাত। আর কমনীয় সুন্দর আন্বিত বদনমণ্ডল বিপদাশঙ্কায় রাহুগ্রস্ত শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পাংশু ও ম্লান। তার অঙ্গস্পর্শে নদস্রোত কেবল যে পরিবর্তিত রূপধারণ করেছে তা নয়, তা থেকে মধু ও সুরভি ক্ষরিত হওয়ায় অনিকূল তরুপরি গুঞ্জরণ করছে। সব মিলিয়ে এক মায়াঘন পরিবেশ—

"সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
যামারে, মলিনমুখী, শরদের শশী,
রাহুর পরাসে যেন? সে বিরলে বসি,

মুখে তাঁরে সুরবালা ; সরযূর বারি,
গলে অশ্রুসিন্ধু, যেন দুকূলপ্লাবী !
সে নামের শ্রোতঃ পরশন করি,
ভাসে, ফুল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে চরি,
পুণ্যনামী সরযূর সুপুণ্য প্রমাণি।"

কবি তাকেই—'করুণা যামার নাম—রসমূলে যাঁরি' বলেছেন। করুণ-রসের এরূপ চিত্রাঙ্কনে, বিশেষ করে, নারীকে করুণার সঙ্গে অভিন্ন-রূপে কল্পনা ক'রে নিজস্ব কল্পনাশক্তির ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। রূপচিত্র-শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই অভিনব পরিকল্পনায়।

'করুণ-রস' সনেটে যে সুময়ী করুণা বামাকে নদীতীরে ক্রন্দনরতা অবস্থায় দেখা যায় সে-তো 'নদীপারে একাকিনী সে বিজনবনে' বসি রুদয়াদিনী শোকবিহ্বলা সীতাদেবী। 'করুণ-রসে'র চিত্র পরিকল্পনার মনোলোকে 'অভাগিনী সীতা'—চরিত্রের প্রতি কবি হৃদয়ের সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশিত। তাই করুণ-রসের পরিকল্পনা 'সীতা-বনবাসে' সনেট দুটিতে জীবন্তভাবে রূপায়িত। একটি কল্পনা, অপরটি বাস্তব রূপায়ণ। কারো মতে : 'দুঃখবেদনা—বিশ্বের এই চরিত্রের মধ্যে কাব্যের যে নিত্য প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে তাহার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে নাই।' এই উক্তি অনেকাংশেই সত্য ও যথার্থ। কবি এই করুণ চরিত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে 'সীতাদেবী' নামে একটি সনেট রচনা করেন। সেখানে অশোক-কাননে চেড়ীবেষ্টিতা সীতাদেবীর করুণাঘন মূর্তি অপূর্ব রস-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। কবি বলেছেন—

"দুখিত মনে
একাকিনী তুমি সতি, অশোক কাননে,
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায় বহে বৃথা
পয়াক্ষি, ও চক্ষু হ'তে অশ্রুধারা ঘনে।"

এই বর্ণনা পাঠান্তে কবির কথায় বলতে হয়—"অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, বৈদেহী।"

বীর-করুণ-শৃঙ্গার-রৌদ্র—এই চারটি রসের যে চিত্র-বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে করুণ-রসের বর্ণনা-ই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় এবং কবিমুখে বীররসের জয়গান করতে চাইলেও অন্তরে করুণ-রসের সমর্থক ছিলেন তা বোঝা যায়। আর কবির ব্যক্তি জীবনের ট্র্যাজেডীর সিঞ্চনে করুণ-রসাত্মক কবিতাগুলি তাই রসোত্তীর্ণ ও সার্থক। কবির কাব্যের Saddest thought-ই তো পাঠকের অন্তরে Sweetest song-এর সৃষ্টি করে। মধুসূদনের এই সনেটগুলি পাঠকচিত্তে সত্যই সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

প্রতীক্ষা

পুষ্প সান্যাল

সারা সকাল বসে আছি
তোমার তরে,
কখন তুমি আসবে প্রিয়
আমার ঘরে।
কখন তোমার আলোর আলো
ঘুচাবে মোর মনের কালো
কখন তোমার বাজবে বাঁশী
এ অন্তরে।

মেঘ জমেছে মনে মনে
উদাস হল দিন,
গভীর অবহেলায় প্রিয়
নীরব হল বীণ।
পুষ্পে আজি নেই সুরভি
প্রভাত যেন গায় পূরবী,
ধূসর ছায়া গুড়িয়ে আছে
আকাশ পরে॥

ভাবপ্রবাহ

উপানন্দ

যে কাজ করতে অপরে শঙ্কা বোধ করে, তা যদি সম্পন্ন করতে সহজ হয়, তা হলে সেটিকে ক্ষীণশক্তি বলে। ক্ষীণশক্তির দ্বারাও যে কাজ সম্পন্ন করা যায় না, তা সুসম্পন্ন করাকে প্রতিভা বলে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই নিজেকে উচ্চলোক বলে ঘোষিত করে, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে উচ্চলোকের গুণগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। একই ভুল বারে বারে করা উচিত নয়, —ভুলের রকম ফের ভালো। লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে হলে আত্মসংযম ও ধৈর্য্য ভিন্ন সম্ভবপর হয় না। চিত্তকে স্থির করলে ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। ভগবানকে ভক্তি করলে ভগবানের রূপ নিজের মধ্যে ফুটে ওঠে। তোমাদের জীবন প্রভাতের অন্যায় হয়েছে, এখন থেকে চেষ্টা করো প্রতিভাধর মানুষ হোতে।

ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ভিন্ন কৃষ্টি অর্জ্জন হয় না। কৃষ্টি ও সভ্যতা ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়, তা মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও সৌষম্য অনুশীলনের মধ্যে জীবনযাত্রার জটিল পথে যখন অগ্রসর হয়, তখনই প্রয়োজন হয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির। জগতে শিল্প বাণিজ্য যাদের মুঠোর মধ্যে, আজ তারাই সংস্কৃতিকে পরিচালনা করছে, সেইজন্যে আমরা সর্ব্বত্র সংস্কৃতির বিকৃতরূপ দেখতে পাই। সংস্কৃতিতে আজ সঙ্কটময় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। তোমরা ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রথম সন্ধান পাবে বেদে। আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা জাতির জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার জন্যে তোমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে জগৎ এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে এসেছে, এর কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সমাজশক্তির শুভতর অসামঞ্জস্য।

যে জাতি যে পরিমাণে আপনার অভাব আপনি পূরণ করতে সমর্থ, সে জাতি সেই পরিমাণে সভ্য। যে বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, সেই বিদ্যা অর্জ্জনই দরকার। সেই শিক্ষারই প্রয়োজন যা চরিত্রগঠনে সাহায্য করে, মানসিকশক্তিবিকাশের পথ প্রশস্ত করে, বুদ্ধির উৎকর্ষ আনে—যার আবলম্বনের পথ-রেখায় অধিকাংশ নিয়ম থাকবে ছোট বড়ো সকলকার দুর্গতের কাছে নিঃসঙ্কোচ অবারিত দাক্ষিণ্য ভোগ করতে হবে। এদিকে তোমরা প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করো। স্বাধীনদেশের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষালাভ না করলে স্বাধীনতা মৃতই হবে।

বিদ্যা কেবলমাত্র অর্থকরী হোলে ব্যক্তিগত মঙ্গল হোতে পারে বটে, কিন্তু তার দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয় না। ব্যক্তিগত মঙ্গল অবলম্বন করে করতে কোন জাতি বড় হয়নি। সমষ্টিভাবে কর্ম্ম না করলে কোন কর্ম্মই সংসাধিতহয় না। তোমরা বস্তুতন্ত্রবাদী জগতের প্রতি সচেতন হয়ে নিজেদের কর্ম্ম করে যাবে। যার চেতন যত বেশী কর্ম্মশক্তি থাকে, তার চেতন ততখানি অংশ জুড়ে আছেন ভগবান। সকলে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করবে, মিথ্যা আচরণ করবে না, মিথ্যা-কথনও ত্যাগ করবে, তাতে আত্মার বিশুদ্ধি রক্ষা হবে। আত্মার বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারলে, তোমাদের মধ্যে ভাগবৎশক্তি বেগবতী হবে, আর সেই শক্তি প্রয়োগ করে তোমরা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠবে—যেমন করে হয়েছিলেন ইতিহাসের পূর্ব্বপুরুষেরা। তোমরা ভুলো না ভারতের প্রধান সম্পদ—আধ্যাত্মিকতা।

জীবনে দুঃখ, বিপদ ও বাধাকে কেউ এড়াতে পারে না। এদের প্রয়োজনীয়তা ও আছে। দুঃখ বিপদ ও বাধা না এলে আমাদের চেতনা অধিকতর উদ্দীপ্ত হয় না, পরিমার্জ্জিত হয় না—এরাই-আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। জীবমাত্রেই জীবনসম্পন্ন। যতদিন জীবন নিত্য, ততদিন সমাজ ও নিত্য। জীবন যাপন করাই প্রতি সমাজের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের প্রাথমিক উপকরণগুলি যে সমাজ দিতে পারে না, সে সমাজ আত্মঘাতী—সে সমাজে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি সম্ভব নয়। মানুষ-সত্তার আদর্শকে পথ-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করাই তোমো আজকের দিনে সব চেয়ে বড় কাজ। এই কাজের ভার তোমাদেরই গ্রহণ করতে হবে। মানুষের চিন্তার মধ্যে যে অবিদ্যা প্রবেশ করেছে, তাকে

বিদূরিত করবার জন্যই তোমাদের এখানে আসতে হবে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে।

বীণা যখন থেকে থেকে পূর্ণ ঝঙ্কারিণীতে, তখন তার প্রত্যেকটী তারের স্বতন্ত্রতার নিদানে গড়ে ওঠে একটী সঙ্গীত, তবু তার মধ্যে স্বতন্ত্র থাকে প্রত্যেকটী আলাদা তার। এমনি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবে তোমরা অথচ সুরের ঐক্য যেন ছিন্ন হতে না যায়, একটি ঝঙ্কারই যেন ওঠে। কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠত্ব তার কর্ম্মের দ্বারা নির্ণীত হয় না, হয় তার কর্ম্ম-নৈপুণ্যের দ্বারা। সুখ ও দুঃখকে অবিচলিতভাবে আলিঙ্গন করবার মত স্বভাব যেন তোমাদের হয়, তা হোলে জীবনে বহু উন্নতি করতে পারবে।

ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলেছেন—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফল পাওয়া বা না পাওয়া কখনই তোমার আয়ত্তাধীন নয়, অতএব তুমি ফল কামনা করে কর্ম্ম করো না—আর কখনও কর্ম্মবিহীনও হয়ো না। কর্ম্ম বলে যে সময় বোধ হয়, তাকে যোগ বলে। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে তোমরা কর্ম্ম করবে। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—'সত্যংবদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ' সত্য বলবে, ধর্ম্ম আচরণ করবে, অধ্যয়নে ভুল করবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে বর্ত্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা···উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করিবার সামর্থ্যলাভ···আমাদের মধ্যে রয়েছে বহু সমস্যা, এর সমাধানের জন্যই তোমাদের উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়োজন।

সৎকর্ম্ম ও সৎশিক্ষা দ্বারা মানুষ এজগতে শ্রেয়লাভ করতে পারে। তোমরা শ্রেয়লাভ করবার জন্যে ছেলেবেলা থেকেই সচেষ্ট হও। এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে সত্য রয়েছে, তাকে মানুষ কালে কালে চিরকালই খুঁজেছে, সেই সত্যকে যে খুঁজে পেয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সে-ই হয়েছে আমাদের চিরবরণীয় আর চিরস্মরণীয়। আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের যত কিছু অনিষ্টের মূল,—আত্মকেন্দ্রিকতাকে যাঁরা তুচ্ছ করে পরার্থপরতার দিকে ছুটে বিশ্বকল্যাণ বোধকে আশ্রয় করেছেন তাঁরাই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহামানব হয়েছেন। আমরা তাঁদেরই বন্দনা করে থাকি। তোমরা যদি তাঁদের পথাঙ্ক অনুসরণ করে সত্যকে খুঁজে বের করে সত্যাশ্রয়ী হও, আর আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরহিত ব্রতে আত্মনিয়োগ কর, তাহোলে তোমরাও ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক একটি মহামানব হয়ে উঠবে—আর সারা বিশ্ব তোমাদের বন্দনা গান করবে।

বৈচিত্র্যই সৃষ্টির নিয়ম। বহু-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তাও তাই অস্বীকার করা যায় না। তোমরা ভেবে দেখবে, সৌন্দর্য্য বোধই মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, না আনন্দলাভই তার চেতনায় সৌন্দর্য্যবোধ এনেছে। অবশ্য যার দিয়ে পদার্থের গুণ বিচার করা চলে না। ভালোবাসাকে কারোনা সৃষ্টন। ভালোবাসা হোক সাগরের ঢেউয়ের মত—আর সেই ঢেউই যে প্রবহমান সাগরের দুই পারের দুই তটের সংযোগ। যা চিরদিনের সত্য, তাকে কখন সাময়িক স্বার্থের প্রভাবে ভুলে যেও না। আমাদের মধ্যে এসেছে নানারকম মানসিক আলস্য, এই আলস্য যেন তোমাদের মনকে স্পর্শ না করে। মানব সভ্যতার প্রভাত আলোকে তোমরা উদ্ভাসিত হও। আজ আমাদের অন্তর লোকের গগনক্ষেত্রে নেমে এসেছে ছিন্ন-নীরবতা, তা থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। আজকের রাত্রিই আমাদের একমাত্র সত্য নয়, কালুকের প্রভাতের কথাও ভাবতে হবে বৈকি!

মানব সভ্যতার মহানায়কদের জীবন আর বাণী তোমাদের হোক আলোচনার বস্তু—তোমরা তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁদের মতই হয়ে ওঠ। মানব সভ্যতার দুটি চির অনন্ত মশাল আর্ট ও বিজ্ঞান—এই মশাল দুটি ধরে তোমরা নিখিলের অন্তরাল্ল রহস্যের সন্ধান করো—কণ্টকহীন উপলহীন মহাবিস্তৃতির মসৃণ পথ করে তোলো তাদের জন্যে, যারা আজো জন্মগ্রহণ করেনি তোমাদের দেশে—সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজনের নূপকাষ্ঠে কোনদিন তোমরা অন্তরের চিরসত্যকে বলি দিও না—বলি দিও তাদের কৃত্রিম অন্তরের পথাচারকে, যারা তোমাদের দেশের আকাশবাতাসকে বিষিয়ে তুলছে, যারা মানব সভ্যতার চরম অনন্তস্বরূপ হয়ে দেশের অন্তরতম সত্যকে গভীরতম করে তুলতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না।

এজন্যে তোমরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে শক্তি সঞ্চয় করো—আর সংসাহসী হও। রাজনৈতিক কৌলিন্য মর্য্যাদা নিয়ে আজ যাঁরা নানা দেশের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন তালিকায় নিজেদের নাম বহু বিঘোষিত করছেন, তাঁদের বহু কথার সঙ্গে বহু কাজেরই মিল পাবে না, তাঁদের কথায় ভুলো না—নিজেরা খুঁজে দেখবে কোথায় সত্য আত্মগোপন করে রয়েছে—কোথায় ইতিহাসের উপেক্ষিত মানুষেরা নীরবে অশ্রুপাত করছে। তারা অনেক কিছু বলতে চেয়েছে, তাদের অনেক কিছু বলার অধিকার ছেলেছে তারা হারিয়ে। তাদের নিয়ে এসো তোমাদের পুরোভাগে—শোনো তাদের কাছ থেকে বিশ্বত কোন্ বস্তুর রৌদ্র আলো বৃষ্টিতে তারা বপন করেছিল বীজ—যার ফললে ভরে গেছে দেশ কিন্তু আজ শস্য সঞ্চয়ের দিনে তাদের কথা কেউ বলে না, কেননা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন তালিকা থেকে তাদের নাম মুছে গেছে। তোমরা তাদের খুঁজে বের করে এনে আবার আমাদের বিষাদ-গোধূলিতে জন্ম দাও আমাদেরই নবীন উষা—এইটুকুই হোক আমার বক্তব্য তোমাদের কাছে।

উপনিষদের ভূমিকা

চিত্রিতা দেবী

তোমাদের কাছে উপনিষদের কথা বলতে এসে আমার নিজেরি একটু দ্বিধা হচ্ছে। 'উপনিষদ' নামটা যে একটু ভয় দেখানো সন্দেহ নেই তাতে—কিন্তু ওর মধ্যে প্রবেশ করিলেই বুঝতে পারবে সকল ভয় দূর করার মূল মন্ত্র লেখা আছে এতে। কিন্তু আমি কেবল ভাবছি, কেমন করে বললে, সে বাণী তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। এতো ইতিহাস, ভূগোল অথবা অঙ্কের মত সাধারণ লৌকিক বিজ্ঞানের বিষয় নয়।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নিহিত আছে এই গ্রন্থগুলির মধ্যে। এ কাহিনী যে বলে, আর যে শোনে, উভয়কেই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করতে হয়। যেমন তেমন করে নিতান্ত সাধারণভাবে কেউ বলে গেল, আর তেমনি সাধারণ অর্দ্ধমনস্কভাবে কেউ শুনে গেল, সে যুগে একথা কেউ ভাবতে পারত না।

কিন্তু আমাদের হাতে এ ছাড়া আর উপায় কী আছে? সেই শান্ত স্নিগ্ধ তপোবনের ধীর মন্থর যুগ তো অনেকদিন চলে গেছে। আজকের যুগের লক্ষ্য হচ্ছে, অনেক লোকের জন্যে অনেক কথা কে কত তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে পারে। কিন্তু তাই বলে দুঃখ করবার কিছু নেই। মানুষের ইতিহাসে সে যুগের মতই এ যুগেরও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যুগের দাবী বর্ত্তমানের দাবী, মেটাতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন যুগকেও যেন একেবারে ভুলে না যাই। তাহলে তার এতদিনের অভিজ্ঞতার ফল ব্যর্থ হবে। সেই জন্যেই আজকের দিনে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল মনীষীদেরই এই আকাঙ্ক্ষা, যে, এ যুগের শিক্ষার পাশে জ্বলে উঠুক সে যুগের জ্ঞানের আলো?

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন 'উপ' এই কথাটাই 'উপনিষদ' এই শব্দের মধ্যে প্রধান। 'উপ' অর্থাৎ নিকটে। হাটের মাঝে গলাবাজি করে বলার বিষয় এ নয়। গুরুর নিকটে নিভৃতে বসে এই বিদ্যাকে গ্রহণ করতে হয় সমস্ত মানসশক্তি দিয়ে।

কেবল লেক্‌চার দিয়েই সে যুগের গুরু দায় খালাস হতেন না, অথবা ছাত্র কেবল হাজিরা দিয়ে, কর্ত্তব্য শেষ করতেন না। ছাত্রের দেহ-মনের সকল শিক্ষার ভার ছিল গুরুর উপরে। মন্ত্রতন্ত্রের সমস্ত শিক্ষা যাতে ছাত্রের মধ্যে সার্থক হয়, সে যাতে পূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সেদিকে গুরুর দৃষ্টি ছিল সর্বদা সজাগ। সেই জন্যেই সদ্‌গুরুর সন্ধানে মানুষ আজো এত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নিজের জীবনকে আদর্শরূপে শিষ্যের সামনে তুলে ধরে, আপন সাধনলব্ধ জ্ঞান, সে যুগের গুরু সঞ্চারিত করতেন শিষ্যের মধ্যে।

এখনকার দিনে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক যে রকম হয়ে উঠছে, তাতে এ ধরণের কথা হয়ত ভাবাও যায় না—কিন্তু সে যুগে, গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটী সত্য না হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত শিক্ষা পূর্ণ হোত না। তাই উপনিষদ পাঠের পূর্বে শান্তি-পাঠের মন্ত্রে গুরু-শিষ্যের সম্মিলিত প্রার্থনা দেখতে পাই ধ্বনিত হচ্ছে—ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু।

সহ বীর্য্যং করবাবহৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥

মন্ত্রটির বাংলারূপ এই রকম দাঁড়ায়—

"গুরু ও শিষ্য আমাদের দোঁহে এক সাথে রাখো প্রভু।
বিদ্যার ফল যেন ভোগ করি দুজনে।
অধীত বিদ্যা হোক তেজস্বী, আসুক চিত্তে বল।
বিদ্বেষভরে দুজনে দোঁহারে কখনো না যেন দেখি।"

গুরু ও শিষ্য পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হলে শিক্ষার সব আয়োজনই ব্যর্থ। শুধু কয়েকটা বিষয় জেনে নেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। তার যথার্থ উদ্দেশ্য শিক্ষিত হয়ে ওঠা, জ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া। তার জন্যে গুরু ও শিষ্য উভয়কেই সমান নিষ্ঠাসম্পন্ন হতে হবে। হতে হবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

'উপনিষদ' এই নামের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য আর একটু অন্য রকম করে করেছেন। শঙ্করাচার্য্যের নাম নিশ্চয় তোমাদের অজানা নয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে তাঁর অভ্যুদয় হয়, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তে। সমগ্র বেদান্ত সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও সেই ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে ভারতীয় বিখ্যাত দার্শনিক মত অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

তিনি বলেন 'উপনিষদ' এই নামের অর্থ 'সদ' কথাটার মধ্যেই নিহিত আছে। 'সদ' ধাতুর মানে খুলে

দেওয়া, আলগা করে দেওয়া। অজ্ঞানের আবরণ নিশ্চিহ্ন-রূপে খুলে দেয় বলে, এই গ্রন্থের নাম উপনিষদ্।

অজ্ঞানের আবরণ কথাটা একটু অস্পষ্ট ঠেকছে বোধ হয়। অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান। আমাদের ঢেকে রাখে। কি থেকে ঢেকে রাখে, ছায়া থেকে। অন্ধকার যেমন আমাদের ঢেকে রাখে আলো থেকে।

তাই পণ্ডিতেরা অজ্ঞানকে বার বার অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন, এ শুধু তমসা নয়, মিথ্যা মায়া। কারণ এ যে শুধু আমাদের দেখতেই বাধা দেয় তা নয়, অনেক সময় ভুল করে দেখায়—যেটা যা নয়, সেটাকে তাই বলে ধারণা করিয়ে দেয়।

যেমন ধর, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গরমের ছুটীতে হয়ত তুমি দার্জিলিঙে বেড়াতে গেলে। সেখানে কাজ তো খালি খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো। এমনি একদিন বিকেল বেলা খুব খানিকটা ঘুরে-টুরে, বাড়ীর কথা যখন মনে হোল, হয়ত তাকিয়ে দেখলে। পশ্চিম দিকের ঐ মস্ত পাহাড়টার আড়ালে, সূর্য্য কখন টুপ করে নেমে গেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার, কালো ছুরে তোমার চারিদিক ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। দুধারে পাইন গাছের সারি ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত তোমার একটু গা ছম্ ছম্ করছে। তাকে আমল না দিয়ে তুমি হয়ত হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে চলেছো। মেঘের কোণ থেকে তৃতীয়ার চাঁদ পাইন পাতা আর বাসের ডগার উপরে চিক্‌চিক্ করছে। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলে পথের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওটা কী শুয়ে রয়েছে। ওমা ও যে মস্ত কেউটে সাপ, ওকে ডিঙিয়ে যাবে কী করে। চমকে তুমি থমকে দাঁড়ালে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, পকেট থেকে টর্চ বার করে বোতাম টিপলে তুমি। আলো জ্বলল, তুমি আপন মনেই হেসে উঠলে, মিথ্যে ভয় পেয়েছিলে। সাপ নয়, ওটা তো একটা দড়ি। অন্ধকারের এমনি ক্ষমতা, দড়িকে সাপ বলে ভুল করায়। কখনো যদি উল্টো হয়,—দড়ি মনে করে সাপটাকেই মাড়িয়ে দাও। তাই তুমি হয়ত মনে মনে ঠিক করলে—রাতের বেলা সর্ব্বদা সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরোবে। তাহলে আর এমন ভ্রমে পড়তে হবে না।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, উপনিষদের বাণী অন্তরে উপলব্ধি করতে পারলেই মনের মধ্যে সেই টর্চটী জ্বলে ওঠে। তার আলোয় মানুষ নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করতে পারে। দুঃখ বিপদ যতই আসুক, পাপের পথ যতই লোভ দেখাক, ঠিক রাস্তা চিনে নিতে আর ভুল হয় না।

আগামী বারে তোমাদের উপনিষদ সম্বন্ধে আরও কিছু বলব। (ক্রমশঃ)

বৈশাখী

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

বিগত-বিভব আজ শুষ্করাজ
খুলি রাঙাচেলী বসন্ত-সাজ
বিবর্ণ অশোক-পলাশে ;
পুরাণো বছর নিলো বিদায়
ক্লান্ত চরণে বিবসন প্রায়
চুপিসাড়ে মধু মাসে।
পিকের কাকলি গেছে থামি
ধীরে যবনিকা আসে নামি
চৈত্র-রাত্রি শেষে ;
দু'টি দিগন্তে দু'টি বিভা
নিশি অবসানে আসে দিবা
নবীন সূর্য হেসে।
নব বরষের নব রাগে
চির নূতনের শোভা জাগে
দিকে দিকে রাশি রাশি ;
মৃদু গম্ভীর ধ্বনি তুলে
বৈশাখী উষা এলোচুলে
দুয়ারে দাঁড়ালো আসি।
বিগত দিনের ব্যথা ভুলি
বরণ করিয়া লহ তুলি
হৃদয় অর্ঘ্য দানে ;
নব বরষের নব প্রাতে
এসো আজি মিলি একসাথে
চির নূতনের অভিযানে।
গোধূলীতে মেলি রাঙা-আঁখি
রুদ্রাণীরূপে এ বৈশাখী
বাজাবে বিজয় ডমরু ;
সংহারী যত জীর্ণ-জরা
নূতন ছন্দে গড়িতে এ-ধরা
লীলা প্রমত্ত হবে সুরু।

কাজল-প্রদীপ

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

দুই তরুণ সখা যাবেন মৃগয়া করতে—কাঞ্চন-পুরীর যুবরাজ কাঞ্চনকুমার আর তাঁরই অন্তরঙ্গ প্রাণের দোসর সহচর যুব-সেনাপতি প্রদীপকুমার। একদিকে কাঞ্চনপুরীর রাজ-দম্পতির স্নেহের নিধি, আর একদিকে কাঞ্চনপুরীর রাজ-সেনাপতি ও তাঁর পত্নীর নয়নের তারা! রাজ-প্রাসাদে আর সৈন্যাধ্যক্ষ-গৃহে তাই সুখশান্তি নেই। তরুণ দুইটির দুঃসাহসিক মনের দুর্জয় পণ কি কিছুতে ভাঙবে না?

মহারাজা সমরেন্দ্রনাথ ও মহারাণী পদ্মাবতী দুজনেই সেদিন সন্ধ্যায় ম্লানমুখে বসেছিলেন রাজোদ্যানের সেকালী-তলের মর্মর-বেদীতে। অবিশ্রাম শিউলী ঝরছিলো মৃদু হাওয়ায়—আকাশ ভরে গিয়েছিল পুলকিত শারদ-জ্যোৎস্নার প্লাবনে।

"এ কী সমস্যার ওপর ঘুমন্তাত পড়লেন পদ্মা—!" মহারাণীর সমব্যথিত দৃষ্টি এসে মিশলো রাজার চোখে। অনতিদূরে পদ্মভরা পুষ্করিণীর শুভ্র মর্মর-সোপানে জলপ্রান্তে বসে আছেন রাজকন্যা চিত্রা তন্ময় হয়ে একা—যুক্তামালা-জড়ানো নিবিড়-কৃষ্ণ দীর্ঘ বেণী মর্মরের শুভ্রতার ওপর এঁকে-বেঁকে চলে পড়েছে। সখীরা কেহ সঙ্গে নেই। চিত্রা পিতামাতার আগমনও জানতে পারেন নি—কি এতো ভাবনায় কন্যা নিমগ্ন?

"প্রদীপের সঙ্গে চিত্রার বিবাহে মতাই কি একেবারে অসম্মত রাজা?" রাণীর কণ্ঠে ব্যাকুলতা ধ্বনিত হয়। "আমার বিশ্বাস তো অসম্ভব বলে না পদ্মা—রূপে বিদ্যায়, শৌর্যে বীর্যে এমন স্বামী পাওয়া তো চিত্রার ভাগ্য—কিন্তু মহারাণী···কুল-পুরোহিতের বিধান—"

"কি বিধান মহারাজ সে চিত্রার প্রাণ-রক্ষাকারীও তার পাণি-গ্রহণের অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে?"—এই সময়ে ফুল-বাগিচা উদ্যানপথ দিয়ে ধীর পদে যুবরাজ এসে দাঁড়ালেন মহারাজা ও মহিষীকে প্রণাম করে।

"পিতা-মাতা! আমি আপনাদের অনুমতি-প্রার্থনায় এসেছি—!" সংশয়শূন্য কণ্ঠে কাঞ্চন বললে। রাজা-রাণী ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন—কিসের অনুমতি-প্রার্থী হয়ে এমন সময়ে এলো কাঞ্চন? কি তাকে অদেয় আছে তাঁদের? পরম স্নেহে রাজপুত্রের চিবুক চুম্বন করে কাছে বসালেন পিতামাতা।" "চিত্রা-মা!" বলে কন্যাকে ডাকতে—যেমন পুষ্করিণী প্রান্ত শুভ্র—কখন রাজকুমারী চকিত হয়ে চলে গেছেন!

মহারাজা সমরেন্দ্রনাথ মহারাণী পদ্মাবতী নীরবে পুত্রের মুখপানে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন নীরবে—পলকে ভেসে উঠলো বাইশ বৎসর আগের ছবিগুলি মানস-পটে • = ০ কাঞ্চন চিত্রা আর প্রদীপ যখন এলো তাদের বাপ মায়ের কোলে—রাজা রাণী আর সেনাপতি হরকেতু আর তাঁর পত্নী সত্যবতীর মন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাঞ্চনপুরী-বাসীর মন ভরে গিয়েছিলো মরুভূমির মতো উষ্ণ তরল বিষাদে—লেশমাত্র সুখ শান্তির স্পর্শ সেখানে ছিলো না। এ সোনার রাজ্যে কিছুরই অভাব ছিলো না—কিন্তু অপুত্রক রাজা রাণী এবং অপুত্রক প্রধান সেনাপতির মনের অন্ধকারই ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা কাঞ্চনপুরীতে।

সমরেন্দ্রনাথ ও হরকেতু, পদ্মাবতী ও সত্যবতী পরস্পরে নিবিড় প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধের বৈষম্য সেখানেও ছিলো না তাতে। রাজা ও পরিজনের সুখ-সমৃদ্ধি সাধনে উভয়ে প্রকৃতই ছিলেন সহকর্মী। রাজ-দণ্ড ও শাসন-তরবারির উপরে ছিলেন মন্ত্রণা-গুরু কুল-পুরোহিত। চিত্র-সাধক এই সত্যদ্রষ্টা মহর্ষির করুণা-লাভ করেন মহারাজা সমরেন্দ্রনাথ অতি তরুণ বয়সে—পিতৃমাতৃহীন, রাজ্যভ্রষ্ট বিতাড়িত সমরেন্দ্রনাথ সেদিন উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ের দুর্গমতায়—একমাত্র সহচর ছিলেন হরকেতু। কিন্তু গুরুর কৃপায় সমরেন্দ্র-নাথের আজকের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সৌন্দর্য, ধন-পুণ্যে ও ঐশ্বর্যে সমা-রোহে ভরা আদর্শ রাজ্যের রচনা—সে হলো আর এক সুদীর্ঘ কাহিনী!

মহর্ষি বারোটি বৎসর সাধনা করেন এই অপুত্রকদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। সব তপতপ ব্যর্থ হয় হয়—এমন সময়ে কাজল ও প্রদীপ এলো মায়ের কোলে—একদিনে এলো শুভলগ্নে মহারাজা ও সেনাপতির ঘরে, শুভলগ্ন আনন্দ-রোলে মেতে উঠলো। রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর বুকে যেন অজস্র জলধারা আনন্দ-প্রলেপের মতো ঝরে পড়লো। খুশীর প্লাবনে টলমল করতে লাগলো সারা কাঞ্চনপুরী।

পাঁচ বৎসর পরে আনন্দের পূর্ণপাত্র উপহার দিয়ে মহারাণীর কোলে এলেন রাজকন্যা। কাজল চিত্রার খেলার সাথী প্রদীপও রাজপ্রাসাদেই বাড়তে লাগলেন।

জীবন আনন্দের লহরে-লহরে ক্রমেই রঙীন হয়ে উঠছিলো এমন সময় আবার কাঞ্চনপুরীতে নেমে এলো বিষাদের মেঘ। চিত্রার দ্বাদশ বৎসরের চন্দ্রদিনের উৎসব শেষে হঠাৎ রাজকুমারী সারাঙ্গ জ্বরে-যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। তারপর বহু দুঃখে জীবনের লক্ষণ ফিরে এলেও রাজকুমারীর সম্পূর্ণ চেতনা ফিরতে বহুদিন লেগেছিলো। চিত্রার কঠিন রোগে রাজা রাণী, কাজল, পুর-পরিজন ও প্রধান চিকিৎসক—নাগরি-কেরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেবল ক্লান্ত হয়নি যুব-সেনাপতি প্রদীপকুমার। চিত্রার খেলার সাথী সেদিন সখীর জীবন আগলে দাঁড়িয়েছিলো। মহাদাধক কুল-পুরোহিত এই দারুণ দুঃসময়ে কাঞ্চন-পুরীতে ছিলেন অনুপস্থিত—ভারতের সকল তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে-ছিলেন মহর্ষি।

চিত্রার জীবন-দীপ নিবু-নিবু হয়ে এসেছে—এমন সময় তার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন মৌন গম্ভীর মুখে। তাঁর ললাটে সঙ্কল্পের রেখা। তার-পর দীর্ঘ এক বৎসর ধরে প্রদীপ ব্রতধারী হয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহরে নাক-পুষ্করিণীতে ডুব দিয়ে একটি ফোটাপদ্ম শিরস্তাণ ভুলে দেবী-মন্দিরে দীপ

আনিয়ে পার্বতী-দুর্গের পাদদেশে বসবাস করতে চলাফেরা করতেন মহর্ষির নির্দেশে।

রাজকুমারী বড় হয়ে উঠলেন—তাঁর বরণ মালা মনে মনে প্রদীপের গলাই রচিত হয়ে গেলো। রাজা রাণী আভাসে জানতে পেরে মহা-সমারোহে আয়োজন শুরু করায় প্রথমে মহর্ষির অনুমতি-প্রার্থী হলেই—"দুষ্টহীন কোনও কুমারের কণ্ঠে রাজকন্যা মালা দিতে পারেন না—অসম্ভব!" বজ্রনির্ঘোষে জানালেন কুল-পুরোহিত।

তারপর আরও দুই বৎসর কেটে গেছে—দুঃখের আঁধারও যেন এই পরিবারে আর পুর-পরিজনের মনে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। কুলগুরুর সঙ্গেই তাঁর পুত্রের সঙ্গে চিত্রার বিবাহ-প্রস্তাব করে দূত পাঠান কাঞ্চন-পুরীতে—এমন সময় কাঞ্চন ও প্রদীপ দুই বন্ধুর অটল পণের কথা শোনা গেলো মুখরা ধাত্রীর—স্বয়ং মহর্ষিই নাকি তাদের উৎসাহ-দাতা। দুই তরুণ মেতে উঠেছে অজানার নেশায়—ওরা যে সেই যাদেরই এসে পৌঁছেছে—যে বয়সে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সব জানার নেশা জাগে—মন ঠেলা দেয় রহস্যের সন্ধানে।০ ০ ০ রাজা রাণী পুত্রের মুখপানে সজল-নয়নে চেয়ে থাকেন। তরুণ যুবরাজ কাঞ্চনকুমার—পাদপ্রান্তে উদ্যত দেহ—তরুণ-প্রদীপ শ্রী—সারা রাজ্যের আনন্দের উৎস।

"কিসের অনুমতি বৎস?" কম্পিত-কণ্ঠে রাণী শুধান।

"আমি আর প্রদীপ নীল পাহাড়ের বনে যাবো শিকার করতে—মাগো! আপনি ও পিতা অনুমতি দিন।"

"তুমি—?" রাজা যেন শুন্ধ হয়ে গেলেন—অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর মন।

"কাঞ্চন!" রাণী-মা কোমলস্বরে উচ্চারণ করলেন—

"তুমি জানো না কি অসম্ভব কথা বলছো তুমি আজ বৎস—" "হাঁ। কাঞ্চন, তার চেয়ে তুমি বরং যাও রক্ষিদের ন্যায়-উপত্যকায়—বিচিত্র সুন্দর সে বনভূমি নন্দনকাননের মতো—।" মহারাজা বলে ওঠেন। রাজা রাণী যে স্নেহের আধোও কাঞ্চনকে ঢেকে রাখেন—কি জানে, কোন ফাঁকে তাকে যাবার অনুমতি দেবেন অতি দুর্বল এতও বিভীষিকা-ভরা ঐ বনে? নীল পাহাড়ের বনে নাকি সত্যই এক মহা ভয়ঙ্কর, অজানা দানব বাস করে। মহাবীরের বুকও কেঁপে ওঠে ঐ অমর নামে। ছেলেমানুষ কাঞ্চন কি জানবে যে পৃথিবীতে আছে কতো ভয়-দুঃস্বপ্ন, আর মনুষ্য সমূহ হিংস্রতা! কাঞ্চন কিন্তু শোনে না—নীরবে দৃঢ় সংকল্পে-ভরা মুখে বুদ্ধ হাসে কথা-না-শোনা দুষ্টু ছেলের মতো! ও জানে সন্তান-স্নেহের দুর্বলতায় ভরা রাজা রাণীর হৃদয়—তেমনই সারা কাঞ্চন-পুরী। কিন্তু কাঞ্চনকে যে যেতেই হবে নীল পাহাড়ের অজানা বনে। ঐ রহস্যময় বন যে তাকে শৈশব হতে আহ্বান জানাচ্ছে প্রতিদিন। সে আর প্রদীপ ঐ বনকে জয় করার স্বপ্নে শৈশব-কৈশোরের কতো দিন বিভোর হয়ে কেটেছে।

কতো মিনতি, অনুনয় বিনয়—কিন্তু কারও কথা কাঞ্চন প্রদীপ শুনবে না। পুত্রের বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় পক্ষাঘাতী ও সন্ধ্যাবতীর চোখে জলের ধারা শুকায় না। পরিজনরা কতো বোঝায়—নীল পাহাড়ের বনের মহা-ভয়ঙ্কর দানবের কতো প্রবাদ উপকথা লোকে এসে বলে—কিন্তু কুমার অটল। অবশেষে মহারাজা বলেন—"তাহলে কাঞ্চন-পুরীবাসীকে এ কথা জানাতে হয়—কেন না কাঞ্চন তাদের মাথার মণি।"

.....পরদিন দলে দলে নগরবাসী ছুটে এলো দূর দূরান্তর হতে রাজার ডাকে। সভায় ধীরে ধীরে বললেন সমরেন্দ্রনাথ কথাটা—আবেগে গলা যেন রুদ্ধ হয়ে যেতে চায়।—নিমেষে সভাস্থল যেন শুন্ধ হয়ে গেলো। প্রজা-প্রধানরা সাদুনয় প্রতিবাদ জানালেন যুবরাজকে একবাক্যে—কিন্তু সবই নিষ্ফল হলো। অবশেষে বিষণ্ণ মনে অনুমতি দিয়েই ধরিতে সভা-স্থল পরিত্যাগ করলেন মহারাজা। বৃদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ রাজপুত্রকে ডেকে বললেন, "যুবরাজ, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর অন্ধের যষ্টি পুত্র প্রদীপ রইলো তোমার সহচর—প্রাণ দিয়েও সে রক্ষা করবে তোমায়।" তারপর প্রদীপকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বৎস! ক্ষত্রিয়ের জীবনে কর্তব্য ও ধর্মই সবচেয়ে বড়ো—আজ বিসর্জন দিয়েও তা পালন কোরো—" আবার পড়িয়ে-আসা অঙ্গ বুকে বৃদ্ধ রক্ষকেতু আশীর্ষ বর্শা ও তরোয়াল তুলে প্রদীপের হাতে দিলেন—"কতো অজের রাজ্য জয় কোরে মহারাজ সমরেন্দ্রনাথকে দিয়েছি এই বর্শা ও তরোয়াল—বিজয়-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ আছে এতে—আজ তুমি এদের নাও প্রদীপ।"

রাজকুমার যাবেন মৃগয়ায়—সারা রাজ্যে মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলো। কুলপুরোহিত বিজয়-তিলক শেষে কাঞ্চন প্রদীপের ললাটে জয়-তিলক এঁকে দিলেন—"কাঞ্চন-যুবরাজ! বিজয়-লক্ষ্মীলাভ কোরে এসো বৎস—বৎস প্রদীপ! বীর তুমি, রাজ-তিলক পরে এসো মনো-অভিলাষ পূর্ণ হোক।" হাসি ফুটে ওঠে মহাসাধকের মুখে।

কাঞ্চন হাতী রথ ও লোকলস্কর সব ফিরিয়ে দিলো। কাঞ্চন ও প্রদীপ দুই ঘোড়া সৈন্যরক্ষক ও গতিরাজে বসে হাওয়ায় মেঘে নিমেষে রাজা রাণী ও পুরবাসীর দৃষ্টি পথ মিলিয়ে গেলো ধনরাজ্যে। রাজকুমারের মন অনির্বচনীয় আনন্দে ঝলমল করছে।" বনের কাছাকাছির পাকে-চলা পথ শেষ হয়ে এবার শুরু হলো গহন অরণ্যানী। প্রদীপ একটু অন্যমনা। কাঞ্চন উৎসাহে চঞ্চল। দুজনে ঘোড়া হতে নেমে রাশ হাতে ধীরে এগিয়ে চলেছেন—পেছনে পেছনে সৈন্যরক্ষক ও গতিরাজ ঘুরের মৃদু শব্দ তুলে আসছে—তাদের পিঠে রয়েছে কুমারদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্ভার।

"দেখ প্রদীপ দেখ—কি সুন্দর পাখী!" কাঞ্চন আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। প্রদীপও বিস্মিত হলো এমন যুক্ত পাখীই নাচতে পারে এত অপরূপ ভঙ্গীতে! নিস্তব্ধ গহন বন—এখানে কথা কইলে প্রতিধ্বনি ওঠে। কাঞ্চন গান গেয়ে ওঠে আর প্রতিধ্বনিতে সুর ছড়ায় বনে। হঠাৎ কাঞ্চন থেমে বলে "প্রদীপ আমরা নীল পাহাড়ের কাছে এসেছি।" দাবধানে দুই বন্ধু এগোতে থাকেন ঘন লতা-পাতা ঠেলে করে। "কাঞ্চন—যুবরাজ!" প্রদীপ বললো, "আমরা ঘন বনে অনেকক্ষণ পৌঁছে গেছি—কোনও জন্তু জেন্তু দেখলাম—না এমনও, বড়ো আশ্চর্য লাগছে।" পাখী, হরিণ, প্রজাপতির পাশ কাটিয়ে

কাটিয়ে ওরা যেন শরীর রাতের বনে ঢুকতে লাগলো। সন্ধ্যা নামাতে দুজনে একটা বিরাট অশ্বত্থের তলকর গুঁড়ি মতো একটা অন্ধকার পাথরে গহ্বরে পথ জুড়ে রয়েছে দেখে ওরা স্থির করলে আর এগোবে না। সুমুখে এক স্রোতস্বিনীর ওপর ঘোড়া দুটিকে বেঁধে ওরা ঘন গুল্মে জড়ানো এক বন্য গাছের ডালের ওপর আশ্রয় নিলো—আজকের রাত্রিটা এইখানেই কাটাবে ওরা।

সন্ধ্যা হতেই নিশাচর পাখী আর নানারকম প্রাণীর ডাক সুরু হলো। অরণ্য তোলাকে সিক্তমিত করতে লাগলো বনস্থলী। কতো সুখে লালিত রাজার দুলাল আর কতো আদরের বাপ মায়ের ছেলে প্রদীপ এই অদ্ভুত উত্তেজনা ভরা নতুন পরিবেশে বিচিত্র সব ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। হঠাৎ দুজনারই ঘুম ভেঙে গেলো একটা কাতর মরণ-আর্তনাদে.....নীচে ঝুঁকে চেয়ে দেখতেই ওদের সারা শরীর যেন একটা অব্যক্ত আতঙ্কে অবশ হয়ে এলো—এক মহাভয়ঙ্কর অমানুষিক বিরাট দানব বজ্রপেষণে চেপে ধরেছে প্রদীপের ঘোড়া গতিরাজকে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলো-আঁধার বনের মাঝে সেই পাহাড়ের মতো অবয়ব ভালো বোঝা যায় না—কেবল রাক্ষুসে দুই শাণিত সাদা দাঁতের সারি আর দুটো নরমুণ্ড হিংস্রতা-ময় রক্ত চোখ ঝকঝক করছে। পলকে ঘানব এক ঝুঁড় ঝটকায় তুলে গতিরাজকে মুষ্টিতে চেপে মুহূর্তের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

ভোর হলে দুজনে গাছ হতে নেমে এলো। বৈরবকের পুঁটি শুদ্ধ নেই—ক্ষুরের চিহ্ন দক্ষিণের নিবিড় বনের ভিতরে মিলিয়ে গেছে। প্রদীপের বিষণ্ণ মুখ রাজপুত্রেরও মন দুঃখে ভরে তোলে। দুইজনে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেন। বৈরবক বেঁচে আছে বিস্ময়—নিঃশ্বাস ফেলে প্রদীপ বলে—"চলো, প্রথমে তারই সন্ধান করি।" নদীর ধার দিয়ে ওরা চললো—ক্ষুরের চিহ্ন এইদিক হতেই ছুটেছে।

ভোরের দিকে আকাশ ছিলো স্বচ্ছ। দিনের আলো ঝর্ণার মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো পৃথিবীতে—নদীর বুকে তারই খেলা চলছিলো—বনের গভীরে আলো কতোটুকুই বা দেখা যায়। মিষ্টি রোদ কড়া হয়ে ওঠবার আগেই ইশান-কোণে দেখা দিলো একটুকরো কালো মেঘ। দেখতে-দেখতে ছেয়ে গেলো সারা আকাশ.....তার রং হলো কালির মতো ঘন কালো, আর তারই মধ্য দিয়ে সুরু হলো বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানো ভয়োগাল খেলা। মেঘে মেঘে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়ে গেলো। অমাবস্যার দুপুর-রাতের মতো অন্ধকারে ভরে গেলো সব। দুজনে যেন দিশাহারা হয়ে গেলো—কথা কইলে শোনা যায় না এতো তুফান। এক বিরাট অশ্বত্থ গাছে ডালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখলে তারা। প্রতি মুহূর্তেই মনে হলো এবারে নিশ্চয়ই মাটিতে মিটকে পড়বে দুজনেই।

.....আসন্ন চৈতন্যের মধ্যে সারা রাত কেটে গেলো—ভোরের দিকে আবার পূর্বদিকে আলোর নিশানা দিয়ে তপনদেব উঁকি দিলেন। পাখীদের আনন্দ-কলিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো বন। নদীর ধারে ধারে আগে-পাশে রোদ যখন ছড়িয়ে গেলো, কাঞ্চন বললো—"প্রদীপ—আরও নিবিড় বনে যাই,—চলো তার আগে বৈরবককে খুঁজে বার করতে হবে। এই বনা দুটি আর তরোয়াল দুটি ছাড়া তো আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই গেছে ঘোড়া দুটির সঙ্গে।"...নদীর পাড় ধরে কাঞ্চন প্রদীপ এগিয়ে চলে। সারাদিন সারারাত বৃষ্টির ফলে ক্ষুরের চিহ্ন সব ধুয়ে মুছে গেছে। হতাশায় দুই বন্ধু স্তব্ধ।

(ক্রমশঃ)

তোমরা কি জানো

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় পর্যায়)

দিনের বেলায় আমরা আকাশের তারাগুলোকে দেখতে পাই না কেন—

অনেক দিন আগে, মানুষ যখন আকাশের ব্যাপার কিছুই জানতো না, তখন তাদের মধ্যে অনেকে মনে করত, দিনের বেলায় তারা বুঝি সত্যি সত্যি নিবে যায়। যিনি দেখে তখন যারা থাকত, তাদের ধারণা ছিল যে, তারাগুলো বুঝি ভগবানের লণ্ঠন। সন্ধ্যাবেলায় চারদিক যখন অন্ধকার হয়ে আসে, তখন তিনি ঐ লণ্ঠনগুলো একে একে জেলে দেন।

তারারা কিন্তু সত্যি সত্যি নিবেও যায় না, আর ভগবানের লণ্ঠনও নয় সেগুলো। তারা সারাদিন, সারারাত, সমস্তক্ষণ একভাবে থাকে। তবে আমরা দিনের বেলায় তাদের দেখতে পাই না কেন? তার কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর চারপাশে বাতাসের যে পুরু স্তর ঘেরে রেখেছে, দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে তারা টুকরো টুকরো করে চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়, যাতে কোথাও এতোটুকু অন্ধকার না থাকে। এইসময় আমাদের চোখ সূর্যের আলোর চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকে যে, সেই সুযোগে করে আমরা আর কিছু দেখতে পাই না। রাত্রিবেলায় সূর্যের এই আলো না থাকায় বাতাসের সেই স্তরের মধ্যে দিয়ে তারারা স্পষ্ট আমাদের চোখে পড়ে। যদি পৃথিবীর চারপাশে বাতাসের এই পুরুস্তরটা না থাকত, তাহলে শুধু রাত্রিবেলাতে কেন দিনের বেলাতেও, তারাদের আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতুম। সূর্য তখন কেবলমাত্র আলোর রেখায়-আঁকা বেশ বড় একটা কাগজের খোলার মতো হাজার হাজার তারায়-ভরা কালো আকাশের গায়ে বিরাজ করত।

সূর্যগ্রহণের সময়ে দিনের বেলাতেও আমরা তারাদের মধ্যে যেগুলো

সমতলের উপরে এবং যে গাছ সেইসমস্ত আকাশে অবস্থান করতে পেরেছে তাদের মাঝে। সমতলের মধ্যে যে সমতলের উপরে, মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও আকাশের দিকে তাকালে তাকে দেখতে পাবে। আর একথা ঠিক যে, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আকাশের অনেক উঁচুতে যাবার সমস্ত পথ ঠিক করে এরোপ্লেনে করে উঠে যেতে পারো, তাহ'লে তাহাদের যে কোন সময়েই দেখতে পাবে।

এমন কোন উদ্ভিদ আছে, যার ফল নেই, বীজ নেই, শিকড়ও নেই—

উদ্ভিদবিদ্যা যারা ভালো জানেন তারা জানেন যে, এই তিনটি ছোট ছোট ভাগের মধ্যে একটি ভাগের অধিকাংশ থ্যালোফাইট (thallophyte) নামের শ্রেণীর গাছগুলি খুব সাধারণ একরকমের উদ্ভিদ। এরা দেখতে একেবারেই বড় গাছের মতন নয়। এদের শরীর মাত্র কয়েকটি কোষ দিয়ে গড়া। এই থ্যালোফাইটের ফল নেই, ফুল নেই, বীজ নেই, শিকড়ও নেই।

গাছের গুঁড়িতে, পুরনো কাঠের বেড়ায়, আর বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালে এরা মনে হয়ে গজিয়ে থাকে। একেকটা একদিনেই বড়ো, কিন্তু এক পশলা বৃষ্টির পর এরা আরো বড় আর চওড়া হয়ে ওঠে—মুহূর্ত থেকে কোথায় যেন হঠাৎ কে যেন বড় হবার সাড়া দিয়েছে। ব্যাঙের ছাতা (mushroom) আর শিশুদের 'মস্' (moss) এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

মাথায় টাক পড়ে কেন—

মাথায় টাক পড়ার অনেকরকমের কারণ আছে। কারুর কারুর মাথার অসুখ আছে বলে সমস্ত চুল তাড়াতাড়ি ঝরে যায়, কেউ কেউ আবার মাথায় শক্ত টুপি ব্যবহার করেন বলে তাড়াতাড়ি তাঁদের চুল উঠে যায়। শক্ত টুপি মাথায় এমন এঁটে বসে থাকে যে, মস্তকত্বকের রক্ত চলাচল করতে পারে না, আর তাই চুল-গোড় উপযুক্ত খাদ্য না পেয়ে ঝরে পড়ে।

টাক পড়ার প্রধান কারণ হল উত্তরাধিকার। অর্থাৎ বাবার মাথাতে টাক থাকলে ছেলের মাথাতেও টাক পড়বে। কোন পরিবারে যদি বংশানুক্রমিক ভাবে এইটাক পড়াটা চালু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কষ্টকর। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মাথায় টাক বেশি দেখা যায়।

অন্য সব জীবজন্তুরা কি আমাদের মতন কথা বলতে পারে

আমরা যেরকম আমাদের মনের সমস্ত ভাব কথার মধ্যে দিয়ে পাঁচজনের কাছে বলি, অন্যান্য জীবজন্তুরা এবং তাদের ভাষার মত ভাষায় কথা বলতে পারে না। কিন্তু এটা মনে রেখো—কোন কোন জন্তু তাদের একেবারে বিভিন্ন ধরণের ভাষায় নিজেদের মধ্যে কোন কোন কথা বলে। কুকুররা যখন আমাদের কোন আসন্ন বিপদের কথা জানাতে চায়, আমাদের সঙ্গে খেলতে চায়, অথবা আমাদের উপর বিরক্ত হয়, তখনই তারা ডাকে। তোমরা শুনেছ, চড়ুই পাখীর বাচ্চারা খেতে না চাইলে তাদের মা কিরকম 'কিচমিচ' করে বকুনি দেয়, আর ছোট বাচ্চার চার দিকে খেলে 'ছাখো' 'ছাখো' করে ডেকে মাকে জানায় যে তার দিকে খেলছে। বাঁদরেরা নানারকমের শব্দ করে—তাদের প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা মানে।

অনেক পোকামাকড়েরা আশ্চর্য এবং সুন্দরভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। যেমন পিঁপড়ে আর বোমাছিরা। এদের আমরা 'সামাজিক পোকা' বলে থাকি, তার কারণ এরা মিলে মিশে বাস করে। এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না, যদি তাদের নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের কোন উপায় না থাকত। লম্বা লম্বা শুঁড় দিয়ে এরা পরস্পরকে স্পর্শ করে মনের বিভিন্ন ভাব জানায়।

শীতকালে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লে সেটা ধোঁয়ার মতো দেখায় কেন—

আমাদের শরীর আগুনের গনগনে একটা উনুনের মতো সর্বদাই উত্তাপের জন্ম দিচ্ছে, আবার শরীরের মধ্যে এমন সব আশ্চর্য ব্যবস্থা রয়েছে, যার দ্বারা শরীর নিজে হোতে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষের শরীরে এই উত্তাপের জন্ম, আর শরীরের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার মধ্যে তাপমাত্রার প্রভেদ ৯৮·৬ ডিগ্রী ফারেন হাইট।

ফুসফুসের ভেতরে জমানো জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়—এবং তাতে ঠাণ্ডা হাওয়ার কাজ খানিকটা হয়। বাইরে থেকে যে বাতাসটা ফুসফুসে এসে ঢুকছে তাতে ফুসফুসে যতোখানি জল ধরে, তার একশো ভাগের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ভাগ জল থাকে। যখন এই বাতাসটাই আবার নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যায়, তখন তা জলে একেবারে ভর্তি হয়ে থাকে। এইরকমভাবে শরীর থেকে প্রতিমুহূর্তে আমরা খানিকটা করে জল নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে হারাচ্ছি। শীতকালে নিঃশ্বাস ছাড়লে তা ধোঁয়ার মতো দেখায় তার কারণ হচ্ছে, তুমি নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে যে-গরম হাওয়া বাইরে ছেড়ে দিচ্ছ, তার ভেতরকার জল, বাইরের বাতাসের ঠাণ্ডার সংগে মিশে, ছোট ছোট জলকণা-ঘিরে-গড়া ছোটখাট একটা মেঘ হয়ে জমে ওঠে, আর সেইটেই তুমি ধোঁয়ার মতো দেখতে পাও।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ঝড়ের সংকেত ফটো : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর

পহলগামের প্রথম কটাক্ষ

পহলগাম বাজারের মধ্যে লীদারের ওপরে প্রকাণ্ড হোটেল-ওয়ালীর হোটেল। হোটেল বড়। কিন্তু কাশ্মীরের সব বড়োরই মাপ আমাদের মনের পারায় পড়ে ছোটো হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল শেষ অবধি ওয়লীর হোটেলে কেবল আমাদের মনের মেয়েদেরই স্থান হতে পারলো; বাকী সব তাঁবুতে।

লীদারের তীরে শতশত তাঁবু। যেন তাঁবুরই শহর। পহলগামে এসে এই তাঁবুতে থাকাই এক বিলাসিতা, শ্রীনগরে যেমন হাউস-বোটে থাকা। শ্রীনগরে নৌকা-বাড়ী, পাহালগামে তাঁবু-বাড়ী। কিন্তু তাঁবুই বা কতো তাঁবু। পহালগামে হতো তাঁবু নেই আমাদের মতো তাঁবু দরকার। কনট্রাক্টর দুয়া হিমসিম খেয়ে গেছে, তাঁবু যোগাড় করতে পারেনি। এখন তাই কাউন্সিল মিটিং।

কাউন্সিলে বাইরের লোক আছে দুয়া আর হোটেলের মালিক রতন। দুয়া বলছে, তাঁবু এনে দেবে শ্রীনগর থেকে; আজ আর কাল দুদিনের ব্যবস্থা নিয়ে গোলমাল। ভগবানদাসজীর মত যে দুদিনের জন্য আমরা কোনও রকমে গাদাগাদি করে কাটিয়ে দিই।

পতিরাম এতে নারাজ। পয়সা দেওয়া হচ্ছে ও হবে। কনট্রাক্ট দিয়েছে যখন—এক বয় কনট্রাক্ট পরিপাক করুক, নয়তো খেসারৎ দিক।

লালসিং বললে—"এখন তো ঠিকাদারকে ধরে ঠেঙালেও তাঁবু আসবে না; অর্ধেক রাত আসবে। বক্তৃতা না করে কাজ করা হোক।"

পতিরামের অনির্বচনীয় বচন। সে টেবিল চাপড়ে বলে ওঠে—"পহলগাম নিকে ভালুক, আধো দিক, বৈলে 'ঠেকা' থেকে ত্রিমানা দিক।"

লালসিং বলে—"বুদ্ধিটা যদি থাকবে তো গাঁয়ের পণ্ডিত কেন হবে ও।"

পতিরাম আরও চটে বললো,—"দুই দুণীর ডমিসাইলড্, লোল, বাংলার রেফুজীও নোস্—বাংলার রেফিউজি দুই। হেথেকে বাঙ্গালীরা হোর বুদ্ধি দেখে তাড়িয়ে দিয়েছে বাংলা থেকে। ত্রিমানা মানে টাকা। আর টাকা থাকলে সব হয়।"

ভগবানদাসজী বলেন: "কি বলতে চান তা পরিষ্কার করে বলুন, টাকা আছে। কি করবেন?"

লালসিং রতনের দিকে চেয়ে বললে, "কি মিষ্টার রতন, কিছু হতে পারে?"

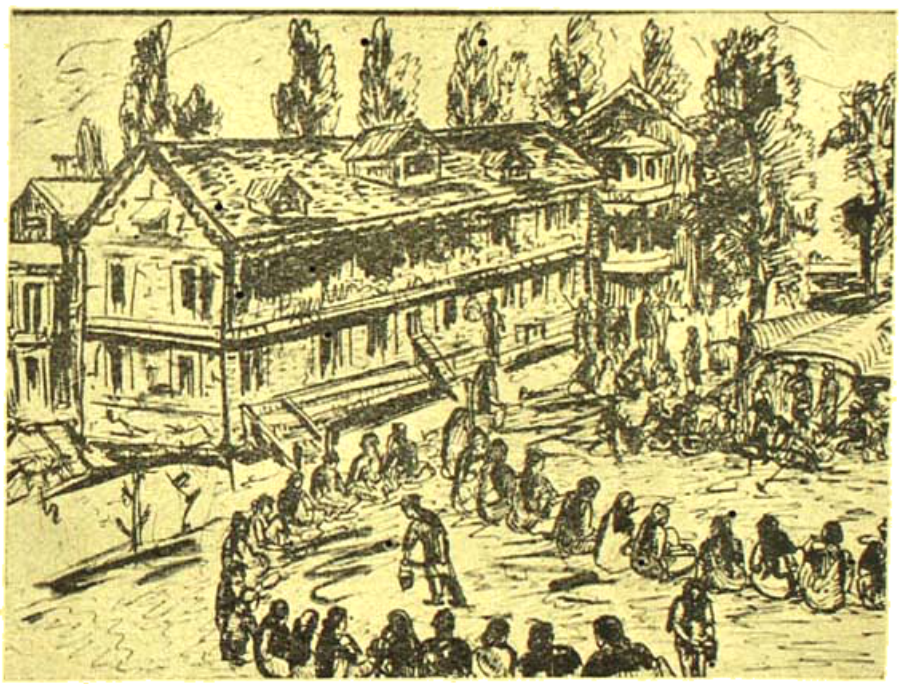

ওয়লীর হোটেলে যাত্রীরা সব আছে

মিঃ রতন বলেন—"টাকা খরচ করলে সবই হতে পারে। হোটেল তো আমার একটা নয়।"

পতিরাম আবার একটা বড় চিমটী কেটে বলে—"শোন শোন্ চুকন্দর শোন্। বাঙ্গালাদেশের কলঙ্ক দুই।"

ভগবানদাসজী বলেন—"কি বলেন মোহনলালজী—হোটেলে দুদিনের ব্যবস্থা করা যাক।"

"ফলে আর আমার কি বলার আছে। তবে উনি বলছেন রাজা হোটেলের কথা। পাহাড়গাঁয়ের সেরা হোটেল। মৌসিক সীট ভাড়া আট টাকা। একশো বাটজনের মৌসিক লাগবে ১২৮০৲। আটমিনে আমার বন হাজারের ওপর দেখে যাবে। এটা কি সম্ভব?"

পতিরাম চিৎকার করে বলে উঠলো—"সম্ভব নয়? আর আমাদের বাচ্চারা রাতে মিনে মাঠে পড়ে থাকে তা সম্ভব?"

ভগবানবাবুকী বল্লেন—"রাজা এখান থেকে কমপক্ষে তেড়ঘাইল। রাতে মিনে টিনসাহেবের খাবার জন্য যাতায়াতে কষ্ট হবে না?"

লালসিং বলে—"যা প্রস্তাব করা হয়েছে তার বিরুদ্ধ চিন্তা করার চেয়ে ভাল প্রস্তাব আনা হোক।"

পাহাড়গাঁয় মনকে ডুবিয়ে দেয়

আমি মিঃ রতনকে হাত ধরে টেনে বাইরে আনলাম। পরিষদ পরে পদম কিংবা সেরাম তখন সমস্ত ব্যাপারটা আড়াই হাজার টাকায় রফা হয়েছে।

কন্ট্রাক্টার বলে—"চারু হোমে আমার খরচ হোতো পাঁচশো।"

পতিরাম বল্লে—"লীডারে বাক্সা মেরে ফেলে রেখো আর যদি কথা বলেছো। কিন্তু বাঙ্গালী ছুটটা কোথায় থাকবে। ও যদি তেড়ঘাইল ঘুরে থাকে তো আমি এখানে থাকবোনা।"

লালসিং বললো—"একজন বেউ তো থাকবে রাজায়।"

ভগবানবাবুকী বললেন—"আমাদের বড় মনটাই এখানে রইলো। আমরা যেমন আছি থাকি। উনি মজায় যান।"

মিঃ রতন বললেন—"উনি না থাকলে রাজায় ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হবে। এখানে আমার অনেক পেট আছেন।"

পতিরামকে বলাম—"এখানে বেইক্ষণ থাকলো না ভাই। তোর খানাপানা না শুনে বেইক্ষণ কাটানোর আমার কোনও শক্তি নেই।"

যখন রাজায় সব মিলে পৌঁছেছি তখন বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে।

তেতলাটা পুরো আমাদের। বড় ঘরটায় একুশজন ছেলে। ছোট ঘরটায় আমরা ছয়জন। বেণু, অসিত, রণজীবন, গুপ্তা, বিহারীলাল আর আমি। ছেলেরা সব গোছগাছ আরম্ভ করে দিলো।

ওদের কিপ্রতা দেখবার জিনিষ। বাড়ীতে সকলে বাপ-মা-ঠাকুমা-দিদিমার নয়নের মণি। কখনও কুল গড়িয়ে খায়না। এখানে নিজের নিজের কাজ করার জন্যই খাস নয় শুধু, কার থেকে কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা। তাই মধ্যে কার কার ছোটো ছোটো গুপ্তাদী; নিজে না করে অপরকে খাটিয়ে নেবার কিকির। সেটা ধরা পড়ে যেতেই লেগে যায় গুটোপাটি হাসাহাসি। কেউ কুঁড়ে, কেউ চটপটে, কেউ আদুরে, কেউ বদমেজে; ছেলেদের এই অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়না বাইরে না এলে।

দলের কাজ এমনি করেই হয়। কে যে করে ঠিক নেই, কিন্তু দশজন একত্র হলেই করবার লোক একজন জুটেই যায়। ভগবান আছেনই বোঝা যাইছে। অ-কেজো-রা দুদলের। একদল নিরীহ, সোজাসুজি অ-কেজো; জানে অ-কেজো, মানে অ-কেজো। যে কাজ করে তাকে মেনে চলে। অন্যদল অ-কেজো; কিন্তু মারেমা। কেবল যে কাজ করে তার খুঁত ধরে বেড়াবে, তার একটা বিচ্যুতি, তার স্বার্থ অভিসন্ধির চুলচেরা হিসাব করবে; এটায় ওটায় ফোড়ন দেবে, টিপ্পনী কাটবে, প্যাঁচ কষবে। মাতব্বরী করবে কিন্তু কাজ করবেনা। এঁরা ভাবেন এঁরা চালাক, কেজো লোকটা বোকা। সমাজে এই বোকাদের কিন্তু সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায় এবং এই বোকারা জৈলে আমাদের জীবন সচল।

এমনি বোকা আমাদের গুরুমহাশয়। অধিকাংশ সকলের ফাইফরমাস খাটছে, নিজেদের মনটাকে আগলে রেখেছে। ফুলবাবু বনকুমার তো ওর আনার অধিম। দফাদারির ছেলে; বালতি ভরে জল নিয়ে

আনন্দে, ঘাড়ে করে বেডিং খুলছে। ধনেশ হাসে। ধনকুমার বেডিং আনছিল। ধনেশ পা-পিছলে পড়ে গেল। ধনকুমার বেডিংসহ ধরাশায়ী। বেডিংয়ের দড়িটা পটাস্ করে ছিঁড়ে গেল।

বেণু ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো। "দেখো দেখো জগজীবন দাদা—ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখ।"

সব ছেলে লজ্জায় এককোণে গিয়ে জড় হয়েছে।

বেণু নিজে দাঁড়িয়ে ছেলেদের জিনিষপত্র রাখিয়ে বিছানাপত্র করিয়ে নিয়ে শেষে বলে—"দুটোকে আমাদের ঘরে জায়গা দিতেই হবে।"

ছোটো ছোটো দুজাই মুরেশ আর দিলিপ। এক বিছানায় এক লেপে শোয়। বেণু নিজের কাছে ওদের বিছানা করে নিলো।

কিন্তু জানলা থেকে আমি নড়িনা।

রাজা হোটেলটা পহালগামের পশ্চিম সীমায় শেষ। এখনকার সীমায়, রেকাবের মধ্যোদরী, মধ্যে যাচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম, থেকে উত্তর পূর্বে। সীমায় দুভাগ হয়ে যাচ্ছে মাঝার নীচে, আবার গিয়ে মিশছে একটু পুবে গিয়ে। উত্তর পশ্চিম থেকে আর একটা পাহাড়ী নালা এসে মিশছে সীমায়ে। কাজেই রাজার এই জানালাটায় দাঁড়ালে সমস্ত পহালগাম, পূর্বের পাহাড়টা পর্যন্ত পশ্চিম থেকে পুবে ধরে যাওয়া সীমায়ের সমস্ত অবয়বটা চোখে পড়ে একখানা ডিম ধরণের রেকাবের মতো পহালগাম। রেকাবের কানাগুলো সারি সারি পাহাড়, ঘন পাইন বনে ঢাকা। গায় সবুজে যেন নিবিড় হয়ে আছে। আর সেই বনের মাথায় ওপর দিয়ে চাইলে বরফ ঢাকা পাহাড়। ভৈরব-গর্জন সীমায় চলেছে পহালগাম চিরে। তার বুকের ওপর দিয়ে ক্যাস্টিলীভার কাঠের সাঁকো সারি সারি একটা, দুটো, তিনটে পড়ে আছে। নদীর পাড়ের নরম ঘাসের বিস্তীর্ণ পুলিনে সারি সারি শত শত তাঁবু। তার শাদা শাদা পিঠ ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে ছেলে, মেয়ে, তরুণ, তরুণী, যুবক যুবতী নানা সাজে নানা পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই জানালা দিয়ে পহালগামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আর সেই পরিচয়ে পহালগামকে আমি ভালবেসে ফেললাম।

দিনের পর দিন আমি পহালগামকে দেখেছি। প্রভাতে দেখেছি, মধ্যাহ্নে দেখেছি, স্তিমিত অপরাহ্নে, ঘনায়মান সন্ধ্যায়, নিবিড় নিশীথে, প্রাগাজকার প্রভাতে বেশকটি পহালগামকে নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে, নানা বেশে, নানা ছলে। পহালগাম ইন্দ্রধনু নয়, পহালগাম কাশ্মীর নয়। কাশ্মীর—যে কাশ্মীর বাসিচালের টাইনেল পার হয়ে চোখে পড়ে—তার মধ্যে মন যেন হারিয়ে যায়। বিস্তীর্ণ আদিঅন্তহীন সুখসার পারাবার সে যেন, সে যেন এক রাজা যার মধ্যে বড় বড় নগর নগরী, নদী নালা লুকিয়ে তো আছেই, আছে শতশতাব্দী ব্যাপ্ত এক মানবমনের ইতিহাস। এখানে বিস্ময় জাগে, জাগে জিজ্ঞাসা। একে মন দিয়ে পাবার প্রশ্ন জাগেনা; চিত্ত দিয়ে জানার তৃষ্ণা জাগ্রত হয়। কিন্তু সে জগত থেকে বহু-বহুদূরে এই পহালগাম। একবারেই একই দৃষ্টিতে যেন এর সবখানি দেখা যায়, পাওয়া যায়, বোঝা যায়। যেন প্রথম প্রেম—যে পেলো সে সবখানি পেলো; যে পেলোনা সে হতভাগ্য।

রাজা হোটেল

এখানে ইতিহাস মহাকালের শ্যামল আসনের তলায় ঢাকা পড়ে আছে, নদীর বিবর্তনের চিহ্নটুকুও ঘুরে ফিরে যাচ্ছে সীমায়ের উন্মুক্ত স্রোত। এখানে সময় বাঁধা পর্বতের বলয়ে, সীমা উন্মুক্ত আকাশের যাতায়ন পথে। এখানকার পাইনের গানে দিনে শোনা যায়না, রাতের বুকে কাঁদে। পহালগাম যেন মনকে ডুবিয়ে দেয়। "মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী, নয়ন আমার কানায় ভরে ঝরেনা পুরি।"

পহালগামের সমতল আগাগোড়া কেবল ঘাসে ঢাকা। ঘন সন্নিবিষ্ট মাটী খেঁষা ঘাস। চলতে আরাম পাই। পথটা এঁটেল মাটিতে ঢাকা। চলে আরাম নেই। ঘোড়ায় করে চলা যায়। বাজারের মাঝ দিয়ে পথ। দুধারে দুসার দোকান। এক কার্লং লম্বা বাজার। তার মধ্যে পহালগাম শেষ। পাহাড়ীদের নোংরা বাড়ীর সার।

পহলগামের পাইন। পাহাড় দুধার

পহলগামের সাঁকো

কিন্তু এইসব নয়। ঘুরে ঘুরে পাইনের বিরিডগার মধ্যে ছেয়ে দেখবো লাফিক উঁচুতে আলো জলছে দেখতে পাওয়া যায়। ইলসবের মতো ঘোমবাতি জেলে বিজলিবাতি দেখতে হয়না। বাড়ী-গুলো সব সাহেবসুবোদের বা নিদেন রাই কাৎলাদের। আমাদের কেউ নয়। আমরা ভায়ক্লেশে এই বাজারের ঘর ভাড়া করেই থাকতে পারি। মাসখানেকের জন্য দিন হিসেবে ভাড়া পাওয়া যায়। হোটেল রেস্তরাঁ অনেকগুলি। বাইরে থেকে তবু যা, ভেতরে খাওয়া দেখলে খাওয়া মাথায় উঠবে। 'খানুক অন্তের ভাত'—চলেই যা নোংরা, দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কাশ্মীরে, সারা কাশ্মীরে এই এক বৈচিত্র্য দেখেছি, নোংরাকে এরা নোংরা মনে করেনা।

চা খাওয়া পর্ব সাঙ্গ হতে না হতে দেখি তুঙ্গভদ্রা আর গুটি-তিনেক মেয়ে মিলে একটা দল, অন্য দলে আছে বৈজন্তী আর চারটী শিক্ষয়িত্রী। কারুর দল নেই, ও একা। তুঙ্গভদ্রার দলে সকলেই ট্রাউজার আর কোট পরেছে। সিগারেট ধরিয়েছে। বৈজন্তীরা চুল ফাঁপিয়ে খোঁপায় একটা করে রুমাল বা টাই বেঁধেছে। পরণে শাড়ির ওপর দিয়ে লম্বা কোট চাপানো। ওরা গল্প করতে করতে এগিয়ে গেল ক্লাবের দিকে।

পহলগ্রাম ক্লাব বিরাট ক্লাব। একদলে সাহেবদের একচেটিয়া ছিল। এখন হুইমিং পুল হয়েছে। এখনও নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড়, পান-আহার চলে।

ফিরে আসছি। আটটা বাজে। আটটা বাজে। আটটা বাজে

চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

প্রোটোকটিন এরাস্মিক পারফিউমড কোকোনাট হেয়ার অয়েল ব্যবহার করলে আপনার চুল ঘন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এরাস্মিক একটি বিশুদ্ধ নারিকেল তেল যা চুল ভাল রাখে এবং চুলের গোড়া মাজিয়ে তোলে। আজকেই এক বোতল কিনে পরখ করুন—আপনার মনোমত গোলাপ বা চামেলির সুগন্ধযুক্ত তেল পাবেন।

এরাস্মিক

পারফিউম্‌ড কোকোনাট
হেয়ার অয়েল

এরাস্মিক লেবরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

ECH. 3·X62 BG

আপোষে আলোচনা করবে পরস্পরের স্বীকার বিষয়বস্তুর কেবল আভাস রাখবো দিয়ে।

"এ সব থাকতে অন্তরঙ্গে ভালো দুধের ফল যাওয়া আর খারাপের লক্ষণ" কবিতা বলে।

আপনি একা? জিজ্ঞাসা করে ফেলি।

আমি বলি "একাই হয়ে যাও তোমরাও। বেশী করে জানবে। It takes two to love; three is crowd! একা আমি আর যোগা পরস্পরকে নিয়ে। বাস্—life is paradise now!"

"Exactly—ঠিক বলেছেন। আমার অন্তরের কথা বলেছেন" কবিতা বলে। "কিন্তু আমার ভাল লাগে বুক খানিক আড়াল দিয়ে চাপা হয়ে তারপর দুয়ে যাই এই আনন্দে। কেবল একা ভাল লাগলো। কেউ অবশ্য প্রমোটের চাপা বেশে বেশে ছবি আঁকার নেশা আমারও আছে।"

ওরা আমায় ঘরে ফেলেছে। যাওয়া সরগরম। চাটের দোকানে চাই থাকতে পারছে না, চেরীর দোকানে চেরী। ফেরবার নেই ডিম, মাংস কটী।

মনে বৈকালীন ছোড় বহুলোক থাকনি। হার লোকসান।

আমরা ফেরে বললাম কোর্টেশরের দেওয়া সেই গান!! অত সাধের খাওয়া—কিন্তু কী কাণ্ড!! সমস্ত ভাত ছানার বালনা দিয়ে মেখেছি। সেই সুখে দেওয়া—মুখ খুঃ খুঃ, ঘিন, ঘিন! চরম নুন দেওয়া। মনে থাকবে কাশ্মীরীদের নুন খাবার রীতি।

ঘন ঘটা করে বৃষ্টি নামলো। সঙ্গে সঙ্গে হুহু করে বাতাস। বরফ পড়তে লাগলো চড়বড় করে। ভিতরে বসে আমরা কাঁপছি। টিনের ছাদের ওপর বৃষ্টি আর বরফের শব্দ, বাতাসের দীর্ঘ বিলাপ, নীচে হৈরব গর্জন। সমস্ত পৃথিবীর উপর তখন তাণ্ডবের বৃত্তা, ভয়ঙ্কর রূপে শিব, জটাজালের মধ্য হতে আগুনের ফুলকি।

আমি মনে মনে ডায়েরী লিখছি। সবাই ঘুমুচ্ছে। বেণু কেবল লেপ টেনে টেনে গায়ে দিচ্ছে আর কুঁকড়ে যাচ্ছে। বিহারীলালজী উঠে একটা সিগারেট ধরালেন।

আমি বাইরের দিকে জিয়ে জানলা খুলে নীচের দিকে চেয়ে রইলাম।

"স্মৃতি বেদনার মালা একেলা বহে যামিনী
যবিধন মুখরিত শ্রাবণ রাতি।"

(ক্রমশঃ)

ভালোবাসা

দিবেন্দু পালিত

ভালোবাসা, তুমি দিলে শুধু যন্ত্রণা—
নিষ্পাপ বুকে তীব্র জ্বালার বিষ;
ম'লে ম'রে যাই, এইটুকু সান্ত্বনা।
ভালোবাসা, তুমি দীপ্ত অহর্নিশ।

মনে পড়ে, কবে চেয়েছি তোমায় কাছে:
খুব কাছে, যেন হ'তে পারে শ্বাসরুদ্ধ;
নিঃশ্বাসে, নীল ওষ্ঠে গরল আছে—
তোমার স্মরণে হয়েছি মন্ত্রমুগ্ধ!

তুমি এলে, এই বাহুপাশ হলো সন্ধি—
আঁধারে লুটেছে আঁধার-আলোর অঙ্ক;
গুঁড়ো হয়ে যাই, সঙ্কোচে মনোবন্ধী।
কেঁপেছে পলুই, পাটাতন নিঃশঙ্ক!

তোমারই আঘাতে শিউরে হয়েছি বন্ধ্যা—
প্রাপ্ত শিখায় ঝিকিমিকি জ্বলে চিত্ত;
কখনো তৃপ্ত, কখনো বা হীনমন্য;
হঠাৎ প্লাবনে ভেসে গেছে বুক নিত্য!

তুমি কতো দিলে, ভালোবাসা, আমি পূর্ণ—
ছুটেছি আঁধারে দিক্‌হীন উদ্‌ভ্রান্ত;
ওষ্ঠ ক্ষরেছে, বক্ষ হয়েছে চূর্ণ;
হাঁপিয়ে বলেছি; নই এতটুকু শ্রান্ত!

দাবানলে জ্বলে সারা-মন-বনভূমি—
অঙ্গ জুড়িয়ে অগ্নিবলয় হাসে;
হঠাৎ কখন নেমে এলো মৌসুমী—
মুখ লুকিয়েছি অন্তিম উল্লাসে!

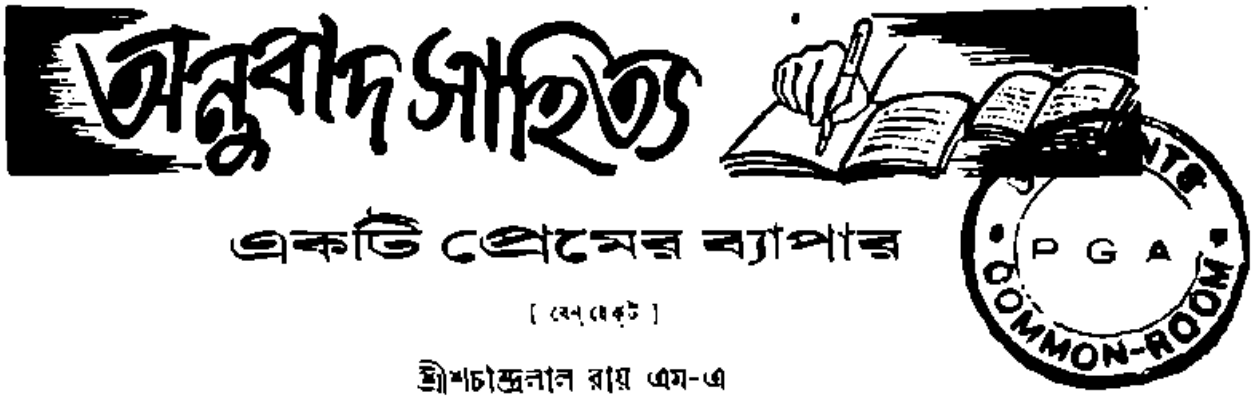

একটি প্রেমের ব্যাপার

[হেনরেকট]

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

অনেকদিন পূর্ব্বের এক রোদ ঝলমল প্রভাত।

সিকাগো ডেলিনিউজের নগর-সম্পাদক মিষ্টার গিলরথ তাঁর অফিস কক্ষে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সংবাদ-পত্রের প্রভাতি সংস্করণ থেকে কাটা একটুকরো কাগজ আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—ছাগেনব্যাক ওয়াগেল সার্কাস' পার্টি উইস্কন্‌সিনে এক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছে। সার্কাস পার্টির ট্রেনখানিতে রাত্রে আগুন লাগে। সেই আগুনে সার্কাসের অনেক লোক পুড়ে মরেছে আর জখম হয়েছে।

তিনি হেসে বল্লেন—আজ 'বিলিয়টে' আবার সার্কাস খুলছে। তুমি সেইখানে যাও। নিশ্চয়ই সেখানে গল্প লেখবার উপাদান তোমার চোখে পড়বে।

আমি ঠিক সময়েই 'বিলিয়টে' পৌঁছালাম। বিড়ম্বিত সার্কাস পার্টির শ্রেণীবদ্ধভাবে গমনের দৃশ্যটি আমার কাছে এক অতিসাহসিক অপচ মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল।

লাল আর সোনালি রং করা গাড়ীগুলিতে অনেক আসন শূন্য পড়ে আছে। ঘোড়া আছে—চালক নেই। কৌতুক চিত্র দেখানোর সরঞ্জাম আছে—কিন্তু ক্লাউনের অভাব। তা সত্বেও শোকদুঃখের যেন বাহ্যপ্রকাশ নাই। অনেকদিন আগের এক সূর্য্যকরোদ্ভাসিত দিবসে এই ছোট্ট সহরে দলটি এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছিল—যা দেখে মনে হয় তাদের সবই ঠিক আছে। কোনও বিপর্য্যয় তাদের ঘটেনি।

সার্কাস ব্যাণ্ডের বাজনা শুনে, দলটির জমকালো চলনভঙ্গি দেখে বিলিয়টের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভুলে গেল যে এই সার্কাসের অর্দ্ধেক খেলা দেখাবার লোক আর ইহজগতে নাই বা মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে।

আমি সার্কাসে প্রেস-এজেন্ট টমসনকে খুঁজে বের করলাম। তার হাত কাঁপছিল, তার চোখ অনিদ্রায় লাল হয়ে উঠেছিল। আমরা যখন সার্কাস দলের প্যারেড দেখছিলাম—হঠাৎ বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। তার ভাব দেখে মনে হলো সে যেন ভূত দেখেছে।

—এ যে, গাস্! সে বিবর্ণমুখে বললো—'কি আশ্চর্য্য!'

সিংহের খাঁচা নিয়ে যে গাড়ী যাচ্ছিল তার সামনের আসনে লালরংয়ের বেমানানো জ্যাকেট গায়ে, সবুজ রংয়ের ট্রাউজার পরা, পেটেণ্ট লেদারের জুতা পায়ে হাতে চাবুক নিয়ে যে লোকটি বসে ছিল তার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। সোনালি রংয়ের গাড়িটি ধীরে ধীরে চলছে—আর সেই লোকটি মাথা সোজা করে, সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বসে আছে। তার ভাব দেখে আমার মনে হলো যে তার চোখ খোলা থাকলেও সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।—

'আমি বুঝতে পারছিনা ওখানে ও কেন বসে আছে'—মিষ্টার টমসন বল্লেন—'সিংহের খেলা তো ও দেখায় না। হতভাগা লোকটা নিশ্চয়ই কাল রাত্তির থেকে পাগল হয়ে গিয়েছে।'

সার্কাস ময়দানে যাবার পথে মিষ্টার টমসন্ আমাকে ব্যাপারটি বল্লেন। সুইজারল্যাণ্ডবাসী গাস্ শ্রীমতী লোলার তরুণ স্বামী। লোলা বাঘ, সিংহ পোষ মানাতো, খেলা দেখাতো বাঘ সিংহ নিয়ে। গাস্ তার স্ত্রীকে, পৃথিবীর

সম্প্রদায়ের নারী বলে মনে করতো। প্রতিদিন খেলা দেখাবার সময় সে বড় খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো। খেলা দেখানোর সময় সে লোলার হাতে চাবুক, চেয়ার, পশুর খেলা দেখানোর সব সরঞ্জাম একে একে তুলে দিত। তখন তার কোমরের বেল্টে টোটা ভরা বন্দুক ঝুলতো।

লোলা তার স্বামীকে বলেছিল, যদি খেলা দেখানোর সময় পিঞ্জরের ভিতর কোনও গুরুতর রকমের ব্যাপার ঘটে তখনই যেন বন্দুক ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনের সময়ই ওটা করতে হবে—অন্য সময়ে নয়।

লোলা ও গাস্ ট্রেনের একখানি কামরায় ঘুমিয়ে ছিল—হঠাৎ ট্রেনখানিতে আগুন লাগে। ধাক্কা খেয়ে গাস্ অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হলে সে দেখতে পায়, সে জলন্ত ট্রেনের একধারে পড়ে আছে।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে গাস্ উঠে দাঁড়িয়ে অগ্নি উদ্গিরিত পরিবেশের মধ্যে উদ্ধার কার্যেরত লোকদের ভিড়ের দিকে ছুটে গেল। লোলাকে সে দেখতে পেল—চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। যখন সে অর্ধদগ্ধ গাড়ীর তল থেকে বেরিয়ে আসছিল—তখন একটি লৌহ-দণ্ড তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে। তার বুকের উপর একটা ভারী কাঠ পড়ে আছে। কিন্তু তখনও সে বেঁচে ছিল। সে মর্মন্তুদ চীৎকার করছিল যখন গাড়ীর জ্বলন্ত অংশগুলি সরাবার চেষ্টা করছিল উদ্ধার কার্যেরত লোকেরা। তাকে রক্ষা করার আর কোনও উপায়ই ছিলনা।

সহসা তার আর্তনাদ বন্ধ হলো। লোলা গাস্‌কে দেখতে পেয়েছে। গাস্ লোলার দেহের উপরের ধ্বংস স্তূপ সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যাকুলভাবে লোলার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

লোলা ফিস্ ফিস্ করে বল্লো—গাস্, এখন যে দরকার হয়েছে।

তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে গাস্ চেয়ে রইলো। একজন ডাক্তারের কথা কানে এল গাসের। না কোনও আশা নেই। এই ধ্বংসস্তূপ সরানোর আগেই ওর প্রাণ যাবে।

লোলা আবার ফিস্ ফিস্ করে বললো—এখন সত্যিই দরকার হয়েছে। কথা শোনো, গাস!

গাস বন্দুক বের করলো—যে বন্দুকের প্রয়োজন আর কোনওদিনই হয়নি। এক মুহূর্ত সে তার নির্ভীক লোলার মর্ম-বিদারক আর্তস্বর শুনলো। তারপর বন্দুক ছুড়লো। লোলা চিরকালের মত নিস্তব্ধ হলো।

সার্কাসে মহড়ানের দিকে আমরা যখন এগুচ্ছিলাম মিষ্টার টমসন এই গল্প আমাকে শোনালেন।

সাজঘরে গাস্‌কে দেখতে পেলাম। দুইজন লোক তাকে বোঝাবার জন্য চেষ্টা করছে। একজন বলছিল, খাঁচার মধ্যে লোলার জায়গা তুমি কিছুতেই নিতে পারবে না। বাঘ সিংহের খেলা দেখানোর অভ্যাস তোমার কোনও দিনই নাই গাস্। তোমাকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে।

—আমাকেই তার কাজ করতে হবে। অবিচলিত গাসের কণ্ঠস্বর। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে ঘুমিয়ে আছে—যদিও চোখ তার খোলা ছিল।

—'এতে কি ভাল হবে গাস্?' অন্য লোকটি প্রতিবাদ করলো—'ওখানে গিয়ে শুধু জখম হয়ে লাভ কি?'

—তার কাজ আমাকেই করতে হবে'—গাস্ পুনরুক্তি করলো।

অন্য কোনও ক্ষেত্রে গাস্‌কে দূরে সরিয়ে ফেলা হোতো। তার ভালোর জন্যই আটকিয়ে রাখতো। কিন্তু সার্কাস ব্যাপারটি আলাদা জগতের। তাছাড়া লাল জ্যাকেট পরা গাসের ফ্যাকাসে মুখ এবং স্থির চাহনিরও হয়তো একটা তীব্র এবং সঙ্গত যুক্তি ছিল।

অপরাহ্ণে খেলার সময় আমি বাঘ সিংহের পিঞ্জরের কাছে বসে দেখছিলাম তার মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে তারা প্রবেশ করলো। ব্যাণ্ডের বাজনা উদ্দামভাবে চলতে লাগলো। দর্শকরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। রিং-মাষ্টার আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। সার্কাসক্ষেত্রের গুণ গুণ আওয়াজের মধ্যে তার চড়া স্বর শোনা গেল। সে ঘোষণা করলো—হিংস্র জানোয়ারদের যে বেড়াল কুকুরদের মত পোষ মানিয়ে শিক্ষা দিত সেই পশুর খেলার পারদর্শিনী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী জগদ্‌বিখ্যাত লোলা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু তার স্বামী আজ সেই স্থান পূরণ করবে। সে সঙ্কল্প করেছে অরণ্যের হিংস্র পশুদের রাণী-

রূপে রোমাঞ্চকর তুলনাহীন যে অদ্ভুত খেলা তার স্ত্রী দেখাতো—আজ সেই খেলা সে দেখাবে।

লাল জ্যাকেট পরা, পেটেন্ট লেদারের জুতা পায়ে চাবুক হাতে গাস্ পিঞ্জরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। রোমাঞ্চিত দর্শকগণ এই খেলা যেমন করে হোক চলবেই এই ভেবে আনন্দধ্বনি করতে লাগ্‌লো। কিন্তু সার্কাস পার্টির লোক যারা এই ব্যাপার দেখছিল তাদের মুখ দিয়ে কোনও আনন্দ কোলাহল বের হলো না। তারা জানতো যে গাস্ মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করছে।

গাস্ যখন পিঞ্জরের ক্ষুদ্র দরজার বাইরে ক্ষণকাল দাঁড়িয়েছিল তখন তার মুখ দেখলাম। মুখখানি অপূর্ব্ব দীপ্তিমণ্ডিত। মনে হ'লো গাস্ যেন তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছে—যার মস্তকে অনুকম্পার গুলি বিদ্ধ করেছিল সে। মনে হলো—আমিও যেন লোলার ছায়ামূর্ত্তি গর্জ্জনকারী হিংস্রপশুদের পিঞ্জরের মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার মনের মধ্যে সহসা এই ভাব জেগে উঠ্‌লো—যেন গাস্ আমাকে বলছে যে, সে দেখতে পাবে লোলাকে ঐ হিংস্রপশুদের মধ্যে—যাদের সে ভালবাসতো এবং এইখানেই লোলার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

দরজা খুলে গেল! গাস্ পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করলো। নিঃশ্বাস রোধ করে আমি দেখতে লাগলাম। গাস্ চাবুক আস্ফালন করলো। লোলা বাঘ সিংহদের যে নামে ডাকতো সেই নাম ধরে ডাকতে লাগ্‌লো। তারা এই ভণ্ডর দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচিয়ে গোঁ গোঁ করে উঠলো এবং গর্জ্জন করতে করতে পিছু হটে গেল।

প্রথমটা মনে হলো যেন লোলার সেই প্রসিদ্ধ খেলাটি আগের মতই চলবে। পিপার চার ধারে ক্রুদ্ধপদক্ষেপে সিংহেরা প্রদক্ষিণ করলো। বাঘরা খাঁচার একপাশে তাদের পা রাখবার জায়গার দিকে সরে গেল।

সহসা লোলার অভিনয়ের ছন্দচ্যুতি হ'লো। তড়িৎ-বেগে একটি সিংহ গাসের ওপর লাফিয়ে পড়লো—তার-পর ঝাঁপিয়ে পড়লো দুইটি বাঘ। গাস্ মাটিতে পড়ে গেল। হিংস্র পশুর নখর দন্তে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগ্‌লো। লৌহদণ্ড নিয়ে সার্কাসের লোকেরা খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করলো। বন্দুক থেকে গুলি বর্ষিত হলো।

তাড়াতাড়ি গাস্‌কে হাসপাতালে পাঠানো হলো। ডাক্তারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম—গাস্ প্রাণে বাঁচবে, কিন্তু তার একটি পা ও একটি হাত কেটে ফেলতে হবে।

এই কাহিনীটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলাম এবং পরদিনই অফিসে ফিরে এলাম।

সম্পাদক মিষ্টার গিলরুথ আমাকে সহাস্যে বল্লেন—গল্পটা নেহাৎ মন্দ হয়নি—কিন্তু বেচারা এই ব্যাপারটা কেন্ করলো বলতো? নিশ্চয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আজকের এই গল্পের পাঠকগণ যা জানতে পারলেন মিষ্টার গিলরুথ্ তার সবটাই জানতেন না। ডেলি নিউজে যে গল্পটা ছাপা হয় তাতে গাস্ অলন্ত ট্রেনের নীচে আগের রাতে যা করেছিল তার বিবরণটা বাদ দিতে হয়েছিল আমাকে! গাস্ তার মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর যন্ত্রণা লাঘবের জন্য গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল—সে বিবরণ ইচ্ছে করেই আমি দিইনি—কারণ পুলিশের লোক এ সব ব্যাপারে সাংবাদিকদের মত ভাবপ্রবণতার ধার ধারেনা!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিষ্টার গিলরুথ বলেছিলেন—'গল্পটা ভালই—তবে একটা জায়গায় কেমন খট্‌কা লাগ্‌ছে! গল্পের কোনও একটা সূত্র বোধহয় তোমার দৃষ্টিতে পড়েনি। গল্পটা পড়তে পড়তেই আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।

—হ্যাঁ, এই বিরাট প্রেমের সমস্ত ঘটনাই উনত্রিশ বছর পরে প্রকাশ করলাম, মিষ্টার গিলরুথ। মহান প্রেমের এমন দৃষ্টান্ত আর আমার চোখে পড়েনি!

লেখক পরিচিতি:—নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক বেন্ হেক্ট ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত শিকাগো ডেলি-নিউজের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে Count Bragi. I Love actress প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। তিনি চলচ্চিত্রের জন্যও অনেক বই লিখেছেন।

সাময়িকী

অতুল দত্ত

ইরাকের বিদ্রোহ ও ফাটাফাটাবাণী আরবদের মধ্যে বিদ্বেষ, এবং তিব্বতে রাজনৈতিক গোলযোগ ও দালাই লামার ভারত আগমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান ঘটনা। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বতের হাঙ্গামা ভারতে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে; দালাই লামার ভারতে আশ্রয় গ্রহণে ভারত এই ব্যাপারের সহিত কতকটা জড়াইয়াও পড়িয়াছে।

তিব্বতে অশান্তি—

গত মার্চ মাসের প্রথম হইতে তিব্বত সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ হইতে আরম্ভ করে। উত্তর-প্রান্তবর্তী সহর হইতে নানাপ্রকার প্রচার চলিতে থাকে। তাহার পর, মার্চ মাসের শেষভাগে পিকিং হইতে জানান হয় যে, পূর্ব তিব্বতে খাম্পা-বিদ্রোহ তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; তিব্বতের সেনাবাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীর সহিত যোগ দেয়। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল, চার হাজার বিদ্রোহী সৈন্য মৃত হয়, নানা ধরণের চারি শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মর্টার, মেসিন্ গান, কামান ও মর্টার চীনা বাহিনীর হস্তগত হয়। চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতের স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির প্ররোচনায় বিদ্রোহীদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং দালাই লামাকে আটক করেন। পিকিং কর্তৃপক্ষ তিব্বতের এই গভর্ণমেণ্টকে বাতিল করেন এবং পঞ্চেন লামার নেতৃত্বে গঠিত নূতন প্রস্তুতি কমিটীর হাতে শাসনভার অর্পণ করেন। তিব্বত বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ-বিহীন রাজ্য। এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদের একান্ত অভাব। সুতরাং, চীনা কর্তৃপক্ষের কোন্ নীতির বিরুদ্ধে তিব্বতে এই বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহের পশ্চাতে তিব্বতী জনমতের সমর্থন কতখানি তাহা এখনও বোঝা যাইতেছে না। পিকিং কর্তৃপক্ষ বলেন—দালাই লামা বিদ্রোহের সুরুতেই একাধিকবার চীনা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পাল্লায় পড়িয়াছেন এবং বে-আইনী ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ করিতে প্রয়াসী। পরবর্তী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, দালাই লামা তাঁহার কয়েকজন সহযোগীর সহিত একত্রে ১৭ই মার্চ লাসা ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া ৩১শে মার্চ দালাই লামা, তাঁহার জননী, ভ্রাতা ও ভগিনী এবং আরও চল্লিশ সঙ্গী ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট দালাই লামা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন; ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সে অনুরোধ পূর্ব করিয়াছেন। ভ্রীনেহরু ঘোষণা করিয়াছেন যে, দালাই লামা ভারতে সম্মানিত অতিথিরূপে অবস্থান করিবেন।

তিব্বতের ব্যাপারে ভারতবাসীর আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ—তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী এবং সুপ্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যের সহিত ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইহা ছাড়া, ইংরাজের আমলে আমরা তিব্বতকে ভারতের প্রভাবাধীন এলাকা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি। চীনের সহিত তিব্বতের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেকেরই সম্যক জ্ঞান নাই। এই জন্য চীনের কম্যুনিষ্টরা অন্যায়ভাবে তিব্বত অধিকার করিয়াছে বলিয়া স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের প্রচারে তাহারা প্রভাবিত হয়। অতীতে তিব্বত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের জয়-পরাজয়ে শেষ পর্যন্ত তিব্বত চীনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চীন তিব্বতকে তাহার অবিচ্ছেদ্য রাজ্যাংশ বলিয়া এবং তিব্বতীদিগের চীনের পাঁচটি শত জাতির (nationality) একটি জাতি বলিয়া মনে করে। কম্যুনিষ্ট চীন হঠাৎ তিব্বতের উপর চীনের প্রভুত্ব দাবী করে নাই। অবশ্য, গত ১৯৪৯ সালে চীনে যেমন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমন পূর্বে কখনও হয় নাই। এই জন্য তিব্বতের সহিত চীনের সম্পর্ক পূর্বে শিথিল ছিল। কিন্তু চীন কখনও তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নাই। তিব্বতের সহিত চীনের সম্পর্কের শিথিলতার সুযোগেই এই রাজ্যে বৃটিশ ভারতের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০৪ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাপতি ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ইহার পর চীনের সহিত এক চুক্তি অনুসারে বৃটিশ ভারতের গভর্ণমেণ্ট গীয়াংসী, ইয়াটুং ও গার্টকে সৈন্য ও ট্রেড্ এজেণ্ট রাখিবার অধিকার লাভ করেন এবং লাসায় এক জন বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার পর ১৯১১ সালে চীনে যখন ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে জাতীয় বিপ্লব সংগঠিত হয়, তখন তিব্বত স্বাধীনতা ঘোষণা করে। চীনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করিয়া তিব্বতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ১৯১৪ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক কন্‌ভেনশন্ প্রবর্তন করেন। এই কন্‌ভেনশন্ অনুসারে তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য (Suzerainty) স্বীকৃত হয়—সর্বভৌমত্ব (Sovereignty) স্বীকৃত হয় না। ইহা ছাড়া, তিব্বত সামরিক ও বেসামরিক ব্যাপারে চীনা গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অবশ্য তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, চীন কখনও এই কন্‌ভেনশন অনুমোদন করে নাই।

আধিপত্য বা সুজারেন্‌ট বৃটিশের কূটনৈতিক মূর্খতাপ্রসূত এক আজব চিজ, যাহা চীন কখনও মানিয়া লয় নাই। "Britain was the first country to define China's position in Tibet as being that of Suzerain Power." (Oppenheim). "The recognition of Chinese suzerainty over Tibet .....principally served as a convenient device for establishing a buffer area between British and Russian spheres of interest." (Feer). আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে তিব্বতকে চীনের আইনগত প্রভুত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই "সুজারেনটীর" সৃষ্টি হয়। ইহার দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লাঠি না ভাঙ্গিয়া লাপ মারিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিব্বতের ব্যাপারে চীনকে সম্পূর্ণরূপে বরবাৎ করিয়া আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করা হইল না, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিব্বতীদিগকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কার "উপভোগ" করিতে দিয়া তাহাদের মাথার উপর বৃটিশের চাবুক উদ্যত রাখা হইল। রাজনীতির ভাষায় সভেরেন্‌ট ও সুজারেনটি শব্দ দুইটিতে যথেষ্ট পার্থক্য। Suzerainty is by no means sovereignty. It is a kind of international guardianship, since the vassal state is either absolutely or mainly represented internationally by the Suzerain state. (Oppenheim). তিব্বতের উপর চীন চিরদিন সভেরেন্‌ট দাবী করিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কৌশলে চীনকে এই অধিকারে বঞ্চিত করিয়া তাহার সুজারেন্‌ট মাত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসী হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত এই অবস্থাই চলে। ১৯৪৯ সালে চীনে যখন চিয়াং কাইশেকের শাসন শেষ হইয়া আসে, তখন তিব্বত পাশ্চাত্য শক্তির সহায়তায় চীনের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই সময় কুয়োমিন্টাং প্রতিনিধি লাসা হইতে বিতাড়িত হন। অন্য দিকে এক মার্কিণ সাংবাদিক (মিঃ লাওয়েল্‌ টমাস্‌) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এক পত্র লইয়া দালাই লামার নিকট উপস্থিত হন। ১৯৪৯ সালে অক্টোবর মাসে চীনে কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তিব্বতকে পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য সামরিক অভিযান আরম্ভ করিবার আয়োজন হয়।

ভারত তাহার পূর্বেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত নীতি অনুসারেই ভারত গভর্ণমেণ্ট তিব্বতের উপর চীনের শুধু সুজারেন্‌ট স্বীকার করেন। তাঁহারা তিব্বতের আন্তর শাসনাধিকার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া চীনের নিকট তিব্বতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার অনুরোধ জানান। ইহার পর চীন গভর্ণমেণ্ট তিব্বতকে আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে পিকিংএ একটি প্রতিনিধিমণ্ডল পাঠাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ১৯৫০ সালে লাসা হইতে এই প্রতিনিধিমণ্ডল প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁহারা নানা অজুহাতে নয় মাস দিল্লীতে অতিবাহিত করেন। ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবার পর বিরক্ত হইয়া চীন গভর্ণমেণ্ট পূর্ব তিব্বতে সৈন্য পাঠাইবার আদেশ দেন। তিব্বত গভর্ণমেণ্ট তখন সরাসরি জাতি-সঙ্ঘের নিকট আবেদন জানান। এই সময় ভারত গভর্ণমেণ্ট চীনের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তিব্বতের সহিত শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য চীন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পিকিং গভর্ণমেণ্ট এই অনুরোধের অপৌজন্যসূচক উত্তর দেন। ঐ লিপিতে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতকে হস্তক্ষেপে বিরত থাকিতে বলা হয় এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদ শক্তি কর্তৃক প্রভাবিত বলিয়া অভিযোগ করা হয়। চীনের ধারণা হইয়াছিল যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পূর্ববর্তী বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আচরণের অনুকরণে তিব্বতের উপর কর্তৃত্ব করিতে চাহিতেছেন—তাঁহাদের প্ররোচনাতেই তিব্বতী প্রতিনিধিবর্গ ভারতে নয় মাস বসিয়াছিলেন; আপোষ আলোচনার নামে সময় লইয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করা হইতেছিল। যাহা হউক, গত বল বৎসরে এই একবার মাত্র চীন ও ভারত গভর্ণমেণ্টের পারস্পরিক সম্বন্ধে তিক্ততা দেখা দিয়াছিল। তিব্বতের ব্যাপার লইয়া ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই তিক্ততা শেষ পর্যন্ত সুফলপ্রসূই হয়। এই চিঠির উত্তরে ভারত গভর্ণমেণ্ট কড়া ভাষা ব্যবহার করিলেও পিকিং গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি অনুসরণের ইচ্ছা তাঁহাদের আদৌ নাই—তাঁহারা তিব্বতে কোনও extra territorial rights চাহেন না। "Our rejoinder though couched in legally strong language, recognised Chinese sovereignty on Tibet.—(Panikkar) বৃটিশ আমলের নীতি বর্জিত হওয়াতেই পরবর্তীকালে চীন-ভারত সম্পর্ক মধুর হয় এবং ১৯৫৪ সালে তিব্বত সম্পর্কে চীন-ভারত চুক্তিতে "পঞ্চশীলনীতির" উদ্ভব হয়। এই চুক্তিতে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনধিকার স্বীকৃত হয়; অবশ্য ভারত তিব্বতের উপর চীনের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

ইরাকে বিদ্রোহ—

গত ২৪ মার্চ আঙ্কারায় আমেরিকার সহিত তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পর ১৩ই মার্চ কায়রো ও বাগদাদ হইতে এই মর্মে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, উত্তর ইরাকে কার্দেস্‌ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী সংবাদের মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্রোহ দমন হইয়াছে, বিদ্রোহী নেতা কর্ণেল শওয়াফ নিহত হইয়াছেন। পরে বাগদাদ হইতে সরকারী সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ৬ই মার্চ শান্তিবাদীরা দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইহার পরদিন নাসেরপন্থী বা-থিস্টরা এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বাধায়। সামরিক শাসক কর্ণেল শওয়াফ সাড়ে তিনশত

পার্টিবর্গকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। একজন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট ইরাকের ভাগ্যে তুর্কী করিয়া হওয়া কঠিন। এইদিনই তথাকথিত "সহল রেডিও" হইতে কাসেম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এবং বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, এই "সহল রেডিও" প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ার অবস্থিত—অত শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র ইরাকে নাই। যাহা হউক, ৯ই মার্চ সরকারী বিমান বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ করে এবং ওয়াহেদের লিডের নৈন্য তাহাকে ধরিয়া ফেলে। এই ঘটনার পরই ইরাকের গবর্ণমেণ্ট সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতাবাসের সামরিক কর্মচারীকে বিতাড়িত করেন এবং এদিকে প্রেসিডেণ্ট নাসের অত্যন্ত তীব্রভাবে ইরাকের কাসেম গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতে থাকেন। নাসেরের অভিযোগ—ইরাকের প্রধানমন্ত্রী কেবল কেবলমাত্র কম্যুনিষ্টদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন; তিনি আরব জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করিতেছেন। কম্যুনিষ্টদিগকে আক্রমণ করিয়া নাসের বলেন যে, তাহারা দেশদ্রোহী, তাহারা রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করিয়া অন্যান্য আরব দেশে অভিযান চালাইতে চাহিতেছে। কম্যুনিষ্ট নামের সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিও তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। ফলের নামে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য তিনি আরবদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন। মোট কথা, মিশর ইরাককে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ইরাকের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকেও আঘাত করিতেছেন। ইহা ছাড়া, এখন তিনি আমেরিকার কৃপাপ্রার্থী। সুতরাং কম্যুনিজম্ ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মতীব প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা প্রমাণের চেষ্টা তিনি গত কিছু কাল ধরিয়াই করিতেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে ইরাকে কম্যুনিষ্ট প্রভাব লইয়া সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে যখন খুব উত্তেজনা এবং সীরিয়াও মিশরে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী অভিযান, তখন সংবাদের "মিড-ইষ্ট মুখ্যান্" লিখিতেছেন, "Most of the scare stories have been put by the Ba'athists in Lebanon and Syria, who are anxious to discredit Kassem regime, and they have been skilfully exploited by President Nasser, who is currently flying a Pro-American Kite.

P.G.A COMMON-ROOM

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

ওথেলোর অভিনয় সকলকে এমন ভারি করে দিয়েছিল যে, রাতে ভালো করে ঘুমুতে পারলাম না। বিছানায় আশ্রয় না নিয়ে ফুল-বনে বসে রইলাম প্রায় তিন প্রহর রাত পর্যন্ত। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসায় ঘরে গিয়ে শয্যাশ্রয় নিলাম। দরজায় ঘন-ঘন করাঘাত ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। দরজা খুলতেই মিশা জিজ্ঞাসা করলে—অসুখ করেছে নাকি?

—না ত। আমি বললাম।

—ব্রেকফাষ্ট যে শেষ হতে চল্ল। খাড়ী তৈরি। টেকসটাইল মিলে এখুনি যেতে হবে।

—দশ মিনিটের মাঝেই দাড়ি কামিয়ে আর স্নানটা সেরে নিয়ে আমি গাড়ীতে গিয়ে বসছি।

—ব্রেকফাষ্ট খাবে কখন?

—মিলে গিয়েই খাব'খন।

—সেখানে যদি খাবার ব্যবস্থা না থাকে?

—নিশ্চিতই থাকবে।

মিলের রেসেপশন রুমে ঢুকতেই দেখলাম টেবিল ভরতি প্রচুর খাবার। যেমন হয়ে থাকে, তেমনই খাওয়া আর কাজের বিবরণ শোনা এক সঙ্গেই চলতে লাগল। সোবিয়েৎ রিপাবলিকগুলির মাঝে সবচেয়ে বেশি তুলো উৎপন্ন হয় এই উজবেকীস্থানে। তাই এখানকার এই মিলটি খুব বড় এবং রকমারি কাপড়ও (ধুতী-শাড়ী বাদ দিয়ে) উৎপাদন করে। সার্ট, কোট, ট্রাউজার, ব্লাউজ তৈরির নানা রকম কাপড় ও নানা ডিজাইনের ছাপা কাপড় এখানে তৈরি হয়। আমাদের সেই কথা জানিয়ে দিয়ে ডিরেক্টর সংখ্যা বর্ণনা করতে লাগলেন। উৎপাদন বৃদ্ধির পার্সেন্টেজ, মাথা-পিছু কাপড়ের পরিমাণ, শ্রমিকের সংখ্যা, শ্রমিক নর-নারীর অনুপাত, খালি সংখ্যা আর সংখ্যা। আমাদের ডেলিগেশনের অনেকে নোট-বুকে তা টুকে নিতে লাগলেন। সংখ্যাবৃত্তি শুরু হলেই আমি আনমনা হয়ে যাই। ও-সব আমার মাথায় ঢোকে না। আমি মিলও চালাবো না, কাপড়ের ব্যবসাও করব না, শুধু জানতে চাই ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজড হবার পর উজবেক জন-গণের আয়-বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, আর বেকার সমস্যারই বা কতটা সমাধান হয়েছে। এই কথা জানতে চেয়ে আমার সংখ্যাবৃত্তিকে উস্কে দিলাম। তা থেকে জানতে পারলাম বেকারের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে, শ্রমিক-পরিবারের জীবনের মানও উন্নত হচ্ছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রমিকরা তাদের এবং পৃথিবীর মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। আমাদের এই সব জানিয়ে দিয়ে মিল দেখাতে নিয়ে যাওয়া হোলো। সমগ্র মিলটা যেন একটা গার্ডেন-সিটি। যেখানে খালি জায়গা, সেইখানেই ফুলের কুঞ্জ, কেয়ারি। টাসকেন্টের মতো এমন ফুলের সমারোহ খুব বেশি যায়গায় দেখিনি। একদিন জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, শুধু পথের পাশে-পাশেই বছরে বিশলক্ষ ফুলগাছের চারা আবাদ করা হয়। অতবড় মিলটায় কোথাও কোন আবর্জনা দেখলাম না। কলের কারবার নেই বলে ধোঁয়াও কোথাও নেই, আর শ্রমিকদের হাতে-মুখে-পোষাকে কালিঝুলিও নেই। মিল-শেডগুলির মেঝে শুকনো, পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাসেরও অভাব নেই শেডের অভ্যন্তরে। শেডের পর শেড অতিক্রম করে তুলো-পেঁজা থেকে শুরু করে সুতো-তৈরি, কাপড়-বোনা, কোরা-কাপড় ধোয়া-শুকোনো-রঙকরানো, ছাপানো, সব কিছুই দেখে নিলাম। মেয়ে-পুরুষ সকলেই কাজ করছেন পরম উৎসাহভরে। সেদিন সবাই তাঁরা একটু অতিরিক্ত খুশী ছিলেন, কেন না তাঁরা একসঙ্গে ভারতের সকল রাজ্যের অনেক নর-নারী দেখতে পাবেন তাঁদের সুদীর্ঘ সারিগুলির ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, অথচ কর্মব্যস্ত নর-নারী মুহূর্তের তরে মুখ তুলে আমাদের দিকে একটিবার চেয়ে দেখছেন। তাঁদের অধরে হাসি, চোখে যেমন কৌতূহল, তেমনই প্রসন্নতা।

কাপড় ছাপাবার শেডে যখন ঢুকলাম, তখন ডিরেক্টর জানালেন সেই বিভাগের মেয়ে কর্মিরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানাবেন। মাথায় আমাদেরকে একগাছোয় জড়ো করলেন। মেয়ে কর্মিরা ফুলের বাক্স নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁদের বেশির ভাগই তরুণী, বয়স্কা কম। তাঁদের নেত্রীর বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না। তিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে যে ফুলের তোড়াটি আমার হাতে তুলে দিলেন, তার ওজন প্রায় দশ সের হবে বলে মনে হোলো। বেশিক্ষণ সেটি বইতে পারলাম না, নিতাই হাতে তা সমর্পণ করে বললাম—ভারত-উজবেকের প্রীতির মিলিত হয়েছে তোমরা, রুশীরা। তাই প্রীতিটুকু অন্তরে ভরে নিয়ে বোঝাটা চাপানোর ভোমার ওপর।

—বোঝা বলে যা বুঝি, তা আমরা ফেলে দিতে শিখেছি, বলে তোড়াটি সে নিল। তারপর অনেকক্ষণ সেটা তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে বেগিছি। কখন কোথায় সেটা একসময়ে সে হস্তান্তরিত করেছে, তা চোখে পড়েনি। জিজ্ঞাসাও কিছু করিনি তাকে।

নারী-শ্রমিকদের নেত্রীটি ফুলের তোড়াটি হাতে দেবার পর তাঁদের পক্ষ থেকে প্রস্তুত অভিনন্দন পড়তে লাগলেন। সেটি উজবেকী ভাষায় রচিত। তিনি জানালেন আমরা তাঁদের মিল দেখতে এসেছি বলে তাঁরা খুব খুশী হয়েছেন। এই মিলটি তাঁদের গর্ব্ব। কেননা এটি তাঁদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করে যেমন দারিদ্র্যের পেষণ থেকে তাঁদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে, তেমন শিক্ষালাভেরও সুযোগ করে দিয়েছে; সর্ব্বোপরি নারী-কর্মিদের এই মান-প্রত্যয়ের অধিকারী করেছে যে, কর্ম-শক্তিতে

তাঁরা পুরুষের চেয়ে হীনবল নন। তাছাড়া তাঁরা জানান যে, তাঁরা আশা করেন ভারতের যে নারীরা তাঁদের মতো কল-কারখানায় কাজ করেন, তাঁরাও নব শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। অবশেষে তাঁরা অনুরোধ জানান আমরা যেন ফিরে গিয়ে আমাদের নারী-প্রতিনিধিদেরকে তাঁদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

তাঁদের অভিনন্দনের জবাব আমাকেই দিতে হোলো। খুশী হয়েছি, তাঁদের কর্মকুশলতার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছি, হৃদয়বত্তার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি, এইসব বলেই বক্তব্য শেষ করলাম। আমাদের দেশের নারী শ্রমিকদের কথা বলাম না। ভালো করে কিছু জানি না বলেই যে বলাম না, তা নয়। যেটুকু জানি, তাও বলার না। তুলনাই হয় না যে! উজবেকী এই শ্রমিক-নারীদেরই দেখলাম না কেবল—উজবেকী মহিলা কবি, উজবেকী শিক্ষিকা, উজবেকী অভিনেত্রী প্রভৃতির সঙ্গে একাধিক স্থানে একাধিকবার মেলা-মেশা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, তাতে করে জেনেছি যে, ভারতকে ফলিয়ে তোলবার যে সাধনায় তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তা আমাদের শিক্ষিতা নেতৃস্থানীয়াদের অনেকে অনাবশ্যক মনে করে এড়িয়ে চলেছেন, শ্রমিক-নারীরা ত আজও শ্রমিক সমাজের নিম্নতর স্তরে পড়ে রয়েছেন। অথচ আমাদের নিখাঁতিজ্ঞান হয়েছে, আমরা এশিয়ার জাতিসমূহের মাঝে অগ্রগামী। আমরা মনেই রাখি না মাথা-পিছু আয়ের দিক দিয়ে আমরা এশিয়ার জাতিসমূহের অনেকের চেয়ে আজও নিম্নতর স্তরে পড়ে রয়েছি।

মিল থেকে বেরিয়ে একটি বিশেষ ধরণের চিকিৎসা-কেন্দ্রে গেলাম। মিলেরই একটা অঙ্গ সেটি। ক্লিনিকও নয়, হাসপাতালও নয়। ওর নাম যা বলা হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। শ্রমিকদের মাঝে এমন নর-নারী দেখা যায়, যাদের দেহে ব্যাধিজনিত কোন দুর্ব্বলতা এবং শ্রম করবার অনিচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কাজে উৎসাহের অভাব দেখা যায়। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রটি তাদেরই জন্য। তাদের ইনভ্যালিড হিসেবে ছুটি দেওয়া হয় না। সকলের মতো তাদেরও আটঘণ্টা মিলে কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজ শেষ করবার পর তাদের বাড়ী যেতে দেওয়া হয় না, এইখানে এনে রাখা হয়। এখানে তাদের ক্যালরি হিসেব করে খেতে দেওয়া হয়, মনের স্বাভাবিক আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করা হয়, চিকিৎসার সহায়ক সকল বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়। দৈনিক আট ঘণ্টা তারা মিলে কাজ করে, আর ষোলঘণ্টা এখানকার নিয়ম-কানুন মেনে তাদেরকে এইখানেই থাকতে হয় যতদিন না তাদের কর্মশৈথিল্য ঘুচে যায়, অথবা শৈথিল্যের প্রকৃত কারণটি ধরা পড়ে। যে ডাক্তারটি আমাদের এ-সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি বলেন অধিকাংশ বিশিষ্টকর্ম শ্রমিকই এখানকার বিধি-ব্যবস্থার দু-তিন সপ্তাহ থেকেই কর্মক্ষম হয়ে ওঠে, আর ধরাও পড়ে শৈথিল্যের প্রকৃত কারণটি কি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা ধরে নিয়েছেন মানসমাত্রেই এই টেক্‌সটাইল মিলে শ্রমিকের কাজ করতে উদ্দীপনা পাবেই।

—না, না, তা কিছুই নিশ্চিন্ত বলেই ত দেখতে চাই অসুখ-বিসুখ না থাকা সত্ত্বেও কাজে উৎসাহ নেই কেন? ওরা ত বলে না যে, এই বিশেষ কাজ ওদের ভালো লাগে না। সে-কথা মুখে ত সে-কাজ করতে ওরা উৎসাহ অনুভব করে, সেই কাজেই নিয়োগ করা যায়। কোন কাজেই উৎসাহ পাবে না, সেটা ত স্বাভাবিক নয়। তেমন লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি ভয়ের কথা।

এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি দেখবার পর একটি হাসপাতাল দেখতে গেলাম। ও-সব দেশে হাসপাতালে ঢুকতে গেলে বাইরের কাপড়-চোপড় এপরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। আমাদের সবাইকেই তাই পরিয়ে দেওয়া হোলো। বেশ পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি এই হাসপাতালটি। কয়েদের শয্যাগুলি ঘেঁসা-ঘেঁসি স্থাপিত, কিন্তু মেঝেতে বিছানো কোন বিছানা কোথাও দেখলাম না। আউট-ডোরেও সুখলা দেখলাম অনেক বেশি। আমাদের ডেলিগেশনে ডাক্তার ছিলেন চারজন। তাঁদের মাঝে একজন মহিলা, গুজরাটী, ডক্টর মিসেস বিদমে। তিনি প্রায়ই পর প্রশ্ন করে ওখানকার ডাক্তারদেরকে খাস নেবার আর অবসর দিলেন না। তাঁরা কিন্তু এতটুকু বিরক্ত হলেন না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় এসবের বেশ-বাড়া। যৌনব্যাধির প্রায় দেখা নেই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাষ্ট্র যে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে, তা ত কেবল মস্কো আর লেনিনগ্রাডেই আত্মসাৎ করে বসে নেই। তার সুফল পনেরোটি রিপাবলিকই সমানে ভোগ করছে। তাই উজবেকিস্তানেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, আধুনিক ওষুধ-পত্তর, যন্ত্রপাতি, কিছুরই অভাব নেই।

হাসপাতাল থেকে গেষ্ট-হাউসে ফেরবার পথে ছোট একটি সিটজিয়ামও দেখে নিলাম। লাঞ্চের পর অল্প একটু বিশ্রাম করেই শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। একটি বড় ঝিলকে কেন্দ্র করে একটি পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে ছেলেদের রেলগাড়ী রয়েছে। ছোট-ছোট রেলগাড়ী, ছোট ষ্টীম এঞ্জিন, ছোট ষ্টেশন। ছোটরাই ষ্টেশন মাষ্টার, টিকেট কলেক্টার, টিকেট চেকার, গার্ড, ড্রাইভার। যাত্রীরাও ছোট। বড়দের এই রেলওয়ের কোথাও ঠাঁই নেই। আমরা গেষ্ট হয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এবং তা রক্ষাও করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এই রেল-পথে কিছুটা ভ্রমণ করা যায় না? শুনলাম ট্রেণ সেদিনকার মতো যাত্রা শেষ করে ফিরেছে, ক্ষুদে-ক্ষুদে রেল-কর্ম্মিরা কাজ শেষ করে বাড়ী চলে গেছে। সেখতেও পেলাম ষ্টেশন-বাড়ীর একটি দরজা খোলা নেই।

মাষ্টার বল্লেন—ক্ষুদে-ট্রেণে বেড়াতে পারলে না বলে খুব দমিও হয়ে, ক্ষুণ্ণ হয়োনা কিন্তু। নৌ-বিহারের আয়োজন করা হয়েছে। ঝিলের বুকে খুব খানিকটা বেড়ানো যাবে।

বেলা তখন পড়ে এসেছে। উজবেকী তরুণ-তরুণীরা জোড়ে-জোড়ে ডিঙি ভাসিয়েছে ঝিলের বুকে, সাঁতারও কাটছে মনে মনে। আমরা বড়-বড় দুখানা মোটর-বোটে গিয়ে উঠলাম। বোট চলতেই ডিঙি গুলো আমাদের বোট দুখানির দুপাশ ঘেঁসে চলতে লাগল। তাদের আরোহী-আরোহিণীরা ভেসে-যাবার গান ধরল। যারা সাঁতার কাটছিল, তারাও সেই গান কণ্ঠে তুলে নিল; কণ্ঠে তুলে নিল তারা, গায়া

আপনার জন্যে চিত্রতারকার মত অপূর্ব লাবণ্য

মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। কি করে তিনি লাবণ্য এত মোলায়েম ও সুন্দর রাখেন?

"বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে", মালা সিনহা আপনাকে বলবেন। চিত্রতারকাদের ভিড় এই মোলায়েম ও সুরভি সৌন্দর্য সাবানটি সাহায্যে আপনারও থাকে যত্ন নিন। মনে রাখবেন, স্নানের সময় লাক্স সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS. 599-X52 BG

ঘুপচি-ঘুপচি জিনের গায়ে-গায়ে লাগা ভবন কটিছিল। ঘুপচির কুঠরি আর আড়ুষ্ট-কোণের আড়ালে বসে আত্মগোপন করে যারা কানে-কানে এতক্ষণ প্রাণের কথা কইছিল তারাও ওই গান কণ্ঠে নিয়ে জানিয়ে দিলে যে কোথায় কি ভাবে বসে রয়েছে। যারা গানে যোগ না দিয়ে দাঁড়িয়েই কাটছিল, তারা থেকে থেকে চেঁচিয়ে কী যেন বলছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তারা বলছে কাঁপিয়ে পড়, কাঁপিয়ে পড়, আমাদের সাথে গা ভাসিয়ে দাও।

ঘণ্টাখানেক পরে মাঝাম বল্লেন—আর নয়। এবার তাজমহলে যাবার সময় হয়েছে।

আমাদের বোটখানি তীরে ভিড়ল। জিল থেকে উঠে জনসমুদ্রে পড়লাম। মাঝাম আর কর্ণ-উদ্যোক্তা সাথীরা অতি কষ্টে পথ কেটে কেটে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চল্লেন। পার্কের ফটকের সামেই আমাদের বাসগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। বাসে উঠে জানালা দিয়ে আমরাও যত হাত নাড়ি, পার্কের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সিল্ক নীল ফ্রকপরিহিত তরুণ-তরুণীরাও ততই হাত নাড়ে। দু-পলুই চার ডিঙ্গিয়ালকে হাওয়ার তরঙ্গে ভাসিয়ে দুই পক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে। মোটর বাস ঘুরপথে বাড়িয়ে দেয়, ঘোড় ঘুরে পার্কটিকে অদৃশ্য করে দেয়।

মিনিট কুড়ি পরে রামধনুর সাত-রঙ-করাণো দুটি কোয়ারা আর তার পেছনে একটি মার্বেল প্রাসাদ নানা বর্ণের বিজলীর আলোয় উদ্ভাসিত হোলো। আর সেই উজ্জ্বল আলো ব্রোঞ্জের তৈরি দীর্ঘাবয়ব একটি বৃষভ মূর্ত্তিকে পারিপার্শ্বিক আড়ম্বরের এমনই উর্দ্ধে তুলে ধরেছে যে, পাশে রেখে মনে হয় মূর্ত্তিটি যেন আকাশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মূর্ত্তিটি উজবেকিস্তানের জাতীয় কবি আলিশির নাভোইয়ের প্রতিমূর্ত্তি। প্রসাদোপম ওই মার্বেল-প্রাসাদটি একটি অপেরা-ভবন, কবির স্মৃতি চিরন্তন রাখবার জন্য তৈরী করা হয়েছে। ওটিকেই আমাদের কাছে তাজমহল বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। আমাদের বাসগুলো নিয়ে প্রাসাদের প্রশস্ত সোপানের সামে দাঁড়ালো। সাদর অভ্যর্থনা সহকারে তোতলায় আমাদের তুলে নেওয়া হোলো। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই শুরু হয়ে গেলাম। সেত প্রস্তরের প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর, উজবেকী চিত্রের প্যালারি। খুব উচ্চাঙ্গের ছবি না দেখলেও বেশ ভাল ভালো অনেক ছবি দেখলাম। সেই হলের পর আর একটি হল উজবেকী রাপত্য বুকে করে রয়েছে। সব দেখা হলে তিন-তলায় যাওয়া হোলো। মধ্য-এশিয়ার শিল্প-নিদর্শন মেঝেলের মার্বেলে ফলিয়ে তোলা হয়েছে। একটি হল-ঘরে ঢুকেই আমি বল্লাম—এ যে ভারতবর্ষে ফিরে এলাম।

ফিউরেটার বল্লেন—পরখনে ঢুকলে বল।

—ওই লতা আর পাতা অমন করে আমাদের দেশেও আঁকা হয়।

—আমরা পাথরে খোদাই করিছি।

—আমরা কাঠে-পাথরে টুকে ওগুলি ৪ রূপায়িত করিছি, আবার পাশ-পার্কের যখন উপর দেওয়ালে আড়িয়ার চালের ওঁড়ো জলে গুলে ওর আল্পনাও দিয়ে থাকি। সারাটা পূর্ব-এশিয়াই যেন পরখনের মধুকর ছিল।

ফিউরেটার বল্লেন এই হলগুলিতে যে-সব শিল্প নিদর্শন রাখা হয়েছে, তার উদ্ভব এবং বিকাশ কোথায় কেমন করে হয়েছে, একদল শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে তা শিখিয়ে নিয়েছি। এরাই অপেরা-অভিনয় দেখতে যত দর্শক আসেন, তাঁদেরকে প্রথমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই হলগুলি দেখানো আর বোঝানো হয়। বিদেশ একটি ভেলকেই অপেরায় দর্শক করে আমরা রাখিনি ত। সকলকেই পালা করে আমরা অপেরা দেখাই। তাই সমাজের সকলেই অপেরা দেখতে এসে মধ্য-এশিয়ার কাক ও তার শিল্পেরও পরিচয় পেয়ে যায়। সেই পরিচয় দর্শকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। আর সেইটেই লাভির লাভ। জানবার আগ্রহ হবে, মানুষ এবার দাবী করবে হয় সমাজের কাছে, নয় নিজের কাছে।

অপেরা শুরু হবার সময় হতেই আমাদের প্রেক্ষাগারে নিয়ে যাওয়া হোলো। প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগারটি দর্শকে পরিপূর্ণ। আমরা প্রবেশ করতেই সকলে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও করতালি দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানালাম। আমরা আসন গ্রহণ করতে না করতেই যবনিকা উঠল, অভিনয় শুরু হোলো। অপেরাটির বিষয়-বস্তু আমাদের জানা—অর্থাৎ, লয়লা-মজনু। ওটি বাংলা মঞ্চেও একসময়ে খুব বেশি অভিনীত হোতো। তাকেও আমরা অপেরা বলতাম। কিন্তু ইউরোপীয় অপেরার সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। তা ছিল তখনকার বাংলা নাটকেরই অনুরূপ, খালি নাচ আর গান থাকত বেশি। ওদের অপেরায় সংলাপ থাকে না। নাচ, গান, অর্কেষ্ট্রা, আর দৃশ্যপট হচ্ছে ওদের অপেরায় প্রাণ। সব মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন কাব্য সৃষ্টি করে। বেশ ভালোই লাগল অভিনয়।

বিরতির সময় অভিনেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানাবার জন্য গ্রীণ-রুমের দিকে অগ্রসর হলাম। নায়িকার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই তিনি হেসে বল্লেন—আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

—আপনি বাংলা জানেন!

—কিছু-কিছু। বলে তিনি মুখে হাসলেন এবং হাত ধরে তাঁর নিজের বসবার আয়নাওয়ালা আসনখানিতে বসিয়ে দিলেন। আলাপ জমে উঠতে সময় লাগল না। অবশ্য আলাপের মোতাবী মিশার মাধ্যমেই চালাতে হোলো। জানলাম তিনিও ষ্ট্যালিন-প্রাইজ উইনার। তাঁকে, আর যিনি ওথেলো অভিনয় করেছিলেন তাঁকেও, এই টাসকেন্টে রাখা হয়েছে টাসকেন্টের অভিনয়ের মানোন্নয়ন করবার জন্য। এটা একটা খুব বড় কথা। দেশের সব গুণীদেরকে জড়ো করে সকল মহলগুলিকে দীন করে রাখতে সোভিয়েৎ রাষ্ট্র-পরিচালকরা রাজী নন। তাঁরা স্থির করেন যে কোন যায়গাকে কর্মকেন্দ্র করে নেবেন। থিয়েটারকে ন্যাশনালাইজড্ করাও হয়েছে সংস্কৃতিকে দেশ-ব্যাপী করে তোলবার জন্য। আর এই বিষয়ে অপেরাই হচ্ছে খুব বড় একটা মাধ্যম। বহু-ভাষা-ভাষিক দেশে অপেরাই হচ্ছে পর-সংযোগের শ্রেষ্ঠতম বাহন। কেননা অপেরায় সংলাপ থাকে না, নাটককে প্রকাশ করা হয় সুর-গীতের সহায়তায়। ভারতবর্ষেও একদিন তাই করা হোতো। প্রয়োজনের

পাঠিয়েই তা করা হয়েছিল, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের বোধগম্য নয় বলে। রাশিয়াতেও তাই। অবশ্য সোবিয়েতের পঞ্চান্নটি রিপাব্লিকে আজ সকলকেই কষ্ট শিখতে হয়। কিন্তু সকলেই কিছু কষ্টতে কাব্য নাটক লিখতে পারেন না। পাছে সম্ভব নয় বলেই তাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি; আঞ্চলিক ভাষাতেই তা লিখতে বলা হয়। শুধু বলাই হয় না, উৎসাহও দেওয়া হয়। আর সর্বজনীন ভাষাকে অপেরার সহায়তায় ব্যাপ্ত করা হয়।

ও-থেকে যাবার আগে শুনেছিলাম, অপেরা নাটকের সাহায্যে ওরা কমিউনিজম প্রচার করে। কিন্তু কথাটা আদৌ সত্য নয়। লয়লা-মজনুতে কমিউনিজম-এর কিছু নেই। প্রথমবার ও-থেকে গিয়ে প্রায় ডজনখানেক অপেরা দেখেছি। তিক্তর হুগোর বোত্তরদাম উপন্যাসও কয়েকটি অপেরায় রূপান্তরিত দেখেছি। খাঁটি রুশী বিষয় অবলম্বনে রচিত অপেরাও কম দেখিনি। একখানাতেও কমিউনিজম প্রচারণার গন্ধটুকুও পাইনি। মানুষের জীবন সুন্দর, নর-নারীর প্রেম বিশুদ্ধ হলে তা যে নরনারীকে মানুষ হিসেবে উন্নত করে, সুন্দর জীবন যাপন করবার এবং সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হবার কল্পনার অধিকার ধনী-দরিদ্র সকলেরই আছে, এমন সব প্রচারণা অবশ্যই থাকে, সততার মাধ্যমে নয়, শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে।

বিরতির সময় উত্তীর্ণ হবার মুখে আমরা প্রেক্ষাগৃহে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। অভিনেত্রীটি আমার হাতের প্রোগ্রামখানা টেনে নিয়ে তাঁর নাম স্বাক্ষর করে দিলেন, এবং যুক্তকরে আবেদন জানিয়ে রাখলেন, আবার যেন টাসকেন্টে আসি। রাত দশটার পর অভিনয় শেষ হোলো। লায়লা-মজনু অভিনয় যে অনবদ্য হয়েছে, এমন কথা আমার মনে হয়নি। অপেরার সুরে রস গ্রহণ করার আমার বাধা ওদের সঙ্গীতের সঙ্গে আমার পরিচয়ের অভাব।

সেবার টাসকেন্টে থাকবার শেষ দিনটি বড়ই কর্মব্যস্ত ছিলাম। সকালে কলেকটিভ ফার্ম দর্শন, দুপুরে ওখানকার দুজন শ্রেষ্ঠ কবির গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা, অপরাহ্নে পাবলিক রিসেপশন, তারপর জলসা, তারপর ব্যাঙ্কুয়েট, তারপর ডেলিগেশনের অর্ধাংশের মস্কো যাত্রা।

সেদিন ব্রেকফাস্ট খাবার পরই আমরা চলে গেলাম কলেকটিভ ফার্মে, টাসকেন্ট শহরের বাইরে। মোটারে যেতেই লাগল ঘণ্টা দুয়েক সময়। কলেকটিভ ফার্মের কর্মীরা অভ্যর্থনা করে নিয়ে রিসেপশন হলে বসালেন। ডিরেকটার কলেকটিভ ফার্মের বিবরণ শোনাতে শুরু করলেন। ফার্মের আয়তন, আয়-ব্যয়, উৎপন্ন শস্য প্রভৃতির পরিমাণ, কর্মীর সংখ্যা তিনি জানালেন। প্রায় চারশত পরিবার এই কর্মটিতে কাজ করেন। তাঁদের উৎপন্ন সব জিনিসই ফার্মের সম্পত্তি। কেবল তরি-তরকারি, শাক-সব্জী, উৎপাদনের জন্য প্রতি পরিবারকে কিছু-কিছু জমি পরিবারগতভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। ফার্মের উৎপন্ন সকল জিনিসই কিছুটা মুনাফা দিয়ে গবর্ণমেন্ট কিনে নেয়। সেই দাম থেকে কিছুটা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রেখে বাকিটা কাজ হিসেবে কর্মিদের মাঝে বণ্টন করা হয়। ফার্মের আয়তন এবং পরিচালনার ভারপ্রাপ্তদের আছে, স্কুল আছে, প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে, নাচ গান অভিনয়ের আসরও আছে। কৃষকদের ঘর-বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আধুনিক আসবাবে সজ্জিত। রেডিও দেখতে পেলাম অনেক বাড়ীতে।

এই ফার্মটির প্রধান ফসল হচ্ছে কাপাস। মাইলের পর মাইল কাপাসের ক্ষেত। গাছগুলি তখন কোমর অবধি বড় হয়েছে। অনেকগুলো উইডিং মেশিন তখন ক্ষেতের আগাছা নিড়াবার কাজ করছে। তাদের চাকাগুলো দুই সারি কাপাস গাছের মাঝখানকার জমির ওপর দিয়ে যেমন গড়িয়ে চলেছে, তেমন আগাছাগুলোও নির্মূল করে তুলে নিচ্ছে, অথচ কাপাস গাছের কোন ক্ষতি করছেনা। ডেলিগেশনের অনেকেই এক-একটা মেশিনে চেপে বসলেন ড্রাইভারের পাশে।

কাপাস ক্ষেত দেখবার পর গেলাম ফার্মের ডেয়ারীতে। সেখানে যাবার পথের দুধারে আঙুরের কেয়ারী। লতাগুলোয় থোকা-থোকা আঙুর ফলে রয়েছে; সাদা, লাল, বেগুনে এবং কালো, ডিম্বাকৃতি এবং গোল। ডেয়ারীর গরুগুলো হৃষ্ট-পুষ্ট আর পরিচ্ছন্ন এবং আকারে আমাদের দেশের বড় বড় ষাঁড়গুলোর চেয়েও বড়। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডে আর সুইডেনে ওর চেয়েও বড় গরু দেখেছি। আমরা যেতেই গরুর পরিচর্যা যাঁরা করছিলেন, তাঁরা পরমোৎসাহে দুধ দোয়া শুরু করে দিলেন, হাত দিয়েই। সাধারণত তা করা হয়না, যন্ত্র লাগিয়েই তা করা হয়। কিন্তু গরুগুলো এখন দোয়াবার সময় বলে বেড়াঝিল বলে তা করবার সুবিধে হোলনা। এখন দোয়া হচ্ছে শুধু আমাদের খাওয়াতে ওঁদের কার্মের গাইয়ের দুধ কত মিষ্টি। ডেলিগেটরা দুধ দিলে খুব তারিফ করলেন।

ডেয়ারীর পরই ক্লেশ দেখতে গেলাম। মায়েরা যখন কাজ করেন, শিশুরা তখন এইখানে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে। শিশুদের মাঝে যারা বড়, তারা খেলা করে, ছবির বই দেখে; যারা ছোট, তারা কটে-দোলনায় হাত-পা নেড়ে খেলা করে অথবা ঘুমিয়ে থাকে। এখানে ডাক্তার আছে, নার্স আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাও আছে। দিনান্তে কাজের শেষে ঘরে ফেরবার সময় মায়েরা শিশুদেরকে বুকে করে নিয়ে যান।

ক্লেশ থেকে বেরুতেই নাবাম আমাকে বল্লে—কার্মের আর কিছু তোমাকে দেখতে হবেনা। তোমাদের লেখকদের সংগ্রহ করে কবিদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাও। তোমাদের জন্যে দুইখানা গাড়ী অপেক্ষা করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—দোভাষী সঙ্গে যাবে কে?

—লিডা গেষ্ট-হাউসে তোমাদের বক্তৃতাগুলি অনুবাদ করছে। তাকে তুলে নিয়ে যেয়ো। সকালবেলায় আসবার সময় আমরা পাবলিক রিসেপশনে যে ভাষণ দেব, তাই লিখে নিয়ে এসেছিলাম ইংরেজিতে অনুবাদ করবার জন্য।

আমরা আটজনায় গেষ্ট হাউসে ফিরে এসে লিডাকে তুলে নিয়ে শহরের নানা পথ ঘুরে নির্জন এক অঞ্চলে পৌঁছলাম। এখানকার রাস্তাগুলি ফাঁকা এবং অমসৃণ, দু-পাশের বাড়ীগুলোও পুরাণো, জীর্ণ। অনেক ঘুরে ঘুরে একটি বাড়ীর সামনে আমাদের গাড়ী দুখানা থামল।

আমরা আসতেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনিই আমাদের ভোজ, কবি এস, গণিতের অধ্যাপক এবং আকাদেমিশিয়ান। আমরা তাঁর অনুসরণ করেই দেখতে পেলাম একটুকু খোলা বারান্দার ছোট একটি সাজিয়ানার নীচে লাল কার্পেট বিছানো রয়েছে। তার উপর কেরেছেটের খোলে-ভরা কয়েকটা তাকিয়া। আমাদের কিন্তু সেখানে বসানো হোল না। ও আসরটি সাজানো হয়েছে প্রতিবেশীদের যোগাযোগ জন্ত যে বাড়ীতে আর যেসব অতিথির আবির্ভাব হয়েছে।

আমাদের যে ঘরে বসানো হোলো, তাতে চেয়ার-টেবিল সোফা-কোচ রয়েছে। প্রাথমিক পরিচয় শেষ হতেই গৃহকর্তা বল্লেন—একটু চা খেয়ে নিলে কেমন হয়?

—তা মন্দ হয় না, আমি বল্লাম। কিন্তু প্রস্তাবটা শুনে পিত্তি আমার জ্বলে গেল। বেলা তখন বেড়টা; পেট চোঁ চোঁ করছে। ভেবেছিলাম লাঞ্চ এখানেই খাওয়া হবে। আর গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক মশাই বলতে চাইছেন—একটু চা পান করলে কেমন হয়!

প্রস্তাবটি করে তিনি আর আমাদের বসতে দিলেন না, একরকম পক্ষ-তাড়া করেই পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের সরলতায় চোখেই পড়ল না, প্রকাণ্ড টেবিল জুড়ি খাবার আর খাবার, আঙুর, আপেল, কলা, সারি-সারি দুয়ার যোজন। গৃহ-কর্ত্রী ঘরে খাওয়াবার ভার নিলেন, খাবার তুলে দিয়ে দিয়ে ডিসগুলি ভরতি করে দিলেন।

গৃহকর্তাকে আমরা বল্লাম—আমাদের সঙ্গে গণিতজ্ঞ কেউ নেই।

—না-ই বা থাকল, শিল্পী ত আছেন। আমি মধ্য-এশিয়ার স্থাপত্য এবং শিল্প-সাধনা অতীতে কেমন ছিল, তাই নিয়ে একখানা বই লিখেছি। উঠে গিয়ে সেল্‌ফ্ থেকে সেই বই একখানা টেনে নিয়ে এলেন।

চেয়ারে পুনরায় বসতে বসতে বল্লেন—আমার মেয়ে যদি এখানে এখন থাকত, আপনাদের ভালো করে সব বুঝিয়ে দিতে পারত। সে ইংরিজি বেশ ভালো বলতে পারে, আর এই বিষয়ে আমার কাছ থেকে সবই জেনে নিয়েছে। এখন সে মার্বেলীতে পড়ছে। তিনি বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। লিডার দিকে চেয়ে দেখি তার মুখ শুকিয়ে গেছে। অধ্যাপক যা যা বলবেন, সেটারাকে একা সব তর্জমা করে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

লিডা চুপি-চুপি আমাকে বল্লে—আমি নিজেই এ-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।

অধ্যাপক তাঁর কেতাব থেকে এক-একটা অংশ পড়েন আর কনুই দিয়ে লিডাকে এক-একটা গুঁতো যেন, লিডা কলের মতো অনুবাদ করে শুনিয়ে যেং—অধ্যাপক ছবি দেখাবার জন্ত বইখানা দুই হাতে উঁচু করে ধরে সকলের দৃষ্টি ছবির দিকে আকর্ষণ করেন।

গৃহ-কর্ত্রী ধমক দিয়ে বলেন—তুমি নিজেও খাবে না, আমার অতিথিদেরও খেতে দেবে না।

অধ্যাপক লজ্জিত হয়ে বইখানা রেখে কাঁটা দিয়ে একটা কিছু মুখে তুলে দিয়ে চিবুতে থাকেন, আবার কাঁটা রেখে দিয়ে বই তুলে নিয়ে বলেন—অনেকের ধারণা মধ্য এশিয়ার শিল্প সাধনা কিছুই নেই। এ অঞ্চলের লোকরা দুই চিরকালীন পক্ষ-ভেড়া তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, আর না হয় ঘোড়ার পর ঘোড় দৌড়নই করেছে। আমি তাও করেছে, আবার নানা সভ্যতার পতির সঙ্গে তাল রেখেও চলেছে। গ্রীক, হিন্দু, বৌদ্ধ, কেরেস্তানি এবং ইসলামিক সভ্যতার সঙ্গে যুগে-যুগে মধ্য-এশিয়া যে নিবিড় পরিচয় স্থাপন করেছিল, তার পরিচয় দূরে রয়েছে এই সব শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন। আমায় তিনি ছবি দেখাবার জন্ত বইখানা উঁচু করে ধরলেন। গৃহ-কর্ত্রী এবার আর ধমক দিলেন না। স্বামীর কথা টেনে বল্লেন—পরিচয় আরো রয়েছে সেই সব লোক, যে-সব লোক মধ্য-এশিয়ার বিজয়ীরা বস-বাস করেছে। কথাটা শেষ করেই তিনি আমায় বললেন—ভাববেন না, আমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গরব করছি। আমি সভ্যতার বিস্তার কি ভাবে হয়েছিল, তাই শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

খাওয়া আর আলোচনা ঘণ্টা দেড়েক ধরে চলবার পর আমি নিবেদন করলাম আমাদের আর একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে। অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে তাঁর গৃহিণীকে বল্লেন—তবে ত ওঁদেরকে আর বসিয়ে রাখা উচিত নয়। বিরিয়ানি পোলাউ আনতে বল।

আপত্তি জানালাম, সামান্তক্ষণ তা নিয়ে এসেছিলাম। তাই চুপ করেই রইলাম। এলো বিরিয়ানি আর শিক-কাবাব। কাজ-কাম উদরে তারও স্থান হোলো। গৃহ-কর্ত্রীর পাশে যে ডেলিগেটটি বসে ছিলেন, তিনি তা খাচ্ছিলেন না দেখে গৃহ-কর্ত্রী তাঁর বাম বাহু দিয়ে ডেলিগেটটির গলা জড়িয়ে নিয়ে চামচে করে তাঁর মুখে বিরিয়ানি ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন।

আমি বল্লাম—মাথায়, ছেলেটি বড়ই অবাধ্য।

—অবাধ্যকে বাধ্য করবার কায়দা আমার জানা আছে। দেখুন না, কেমন সুবোধের মতো খেয়ে যাচ্ছেন, এখন।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বল্লে—খাচ্ছে না, গো-গ্রাসে গিলছে।

পুরো দুই-ঘণ্টা পরে মুক্তি পেলাম। তাঁরা আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে বল্লেন—আবার যেন দর্শন পাই।

কুড়ি মিনিট পরেই কবির বাড়ীর সামে গিয়ে আমাদের গাড়ী থামল। কবির প্রতিনিধি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। যে-ঘরে আমাদের বসানো হবে, কবি তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকে হতবাক্ দাঁড়িয়ে রইলাম। আরো বড় টেবিল, আরো বেশি খাদ্য ও পানীয়! কবি সবাইকে বসালেন। চেয়ে দেখলাম ডেলিগেশনের সকলেরই চোখ সজল। কবি তাড়া দিলেন—হাত চালাও। আমি পাশেই বসেছিলাম। খোঁপা-ওড়া কাটলেটের একটা ডিস আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই খেয়ে নাও।

লিডাকে বল্লাম—বাঁচাও লিডা।

সে বল্লে—আমি কি করব। এক বেলায় দু' জায়গায় খাবার নিমন্ত্রণ নাও কেন?

—আমি আরাম আছি! হাতের ডিম টেবিলে রেখে কাটলেট থেকে যে ধোঁয়া উঠছে তাই দেখতে লাগলাম।

কবি অনুরোধ শুঁচো ছিলেন। আমি ছিপ্রহাতে একটা ছোট থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে ডিমে রেখে কবির হাতে তুলে দিলাম। কবি সেটা টেবিলে রেখে ইসারায় বুঝিয়ে দিলেন আমি কিন্তু মুখে না-দেওয়া পর্যন্ত তিনিও দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকবেন। অগত্যা এক টুকরো কেটে নিয়ে মুখে ফেলে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। এমন ভালো খাবারেও যে এত অরুচি হতে পারে, আগে কখনো তা বুঝিনি। বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখলাম—কেউ মাঝে মাঝে একটা করে আঙুর মুখে ফেলে দিচ্ছেন, কেউবা একটা কলা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন যেন পূর্বে কখনো কলা তাঁরা দেখেন নি। কবি তাড়ার পর তাড়া দিচ্ছেন, আর অন্তর থেকে ডিসের পর ডিস নতুন-নতুন খাবার আসছে। এক বর্ণ বাড়িয়ে বলছি না।

আর্তস্বরে লিডাকে বললাম—উপায় একটা কিছু ঠাওরাও, লিডা। তোমাদের এতদিন অতিথিক ঘাটিয়েছি বলে এমন করেই কি প্রতিশোধ নেবে?

—নইলে যেতে দিয়ে আমাদের কথা একেবারে ভুলে যাবে যে!

—করপুরার হাসকে আমরা দশ ঢেকেবেশি মর্যাদা দিই।

লিডা তখন বলে—শোন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। চট করে পোটা দুই-তিন গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে নাও। আর একটা গ্লাস কবির হাতে তুলে দিয়ে বল, তার স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে।*

তাই করলাম। আমরা দুজনাও দুটি গ্লাস মুখে লাগালাম কবিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। কবি পর পর দুই চুমুক শ্যাম্পেন পান করে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে ভুলে যান, আর তাঁর ছেলেকে ডেকে বলেন ওই কবিতাটি যে বইয়ে আছে, তাড়াতাড়ি সেই বইখানা নিয়ে আসতে। ছেলে বই আনতে যায়,আর কবি গ্লাস মুখে তুলে নেন। ছেলে বই এসে প্রম্পট করেন, আর কবি গ্লাসটা রেখে আবৃত্তি করেন, আর আমি শূন্য গ্লাসটা ভরতি করে দিই।

সহসা এক সময় কবি বলেন—আমি ত অনেক শোনালাম, এবার তোমাদের পালা।

আমি বললাম, অবশ্য। আমাদের দলে হায়দারাবাদের একটি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর হাফিজ মুখস্থ ছিল। তাঁকে কিছু আবৃত্তি করতে বললাম। তাঁর মুখে হাফিজ শুনে কবি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তিনিও হাফিজ আবৃত্তি করতে লাগলেন।

লিডা বলে—কেমন মাওয়াই বাজলে দিয়েছিলাম?

আমি জবাব দিলাম—শ্যাম্পেনের ওপর তোমার নিজেরও হাত লোভ ছিল।

হাত থেকে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সে বলে—অকৃতজ্ঞ।

কবি বলেন—কাব্যালোচনা আর খাওয়া ত একসঙ্গেই চলতে পারে।

আমি বললাম—অবশ্যই পারত, হাতে যদি সময় থাকত। পাঁচটায় পাবলিক রিসেপশন। এখন চারটে বাজে।

—তাই ত! রিসেপশনে সপরিবার অবশ্যই যে আসবেন।

—বিদায় নিতে বাধা পাচ্ছি, কিন্তু তবুও যে তাই নিতে হয়, কবি।

—কিন্তু তোমরা কেউ কিছু খেলেনা যে! আচ্ছা, রিসেপশন হবার পর আবার আসতে পার ত!

—পারতাম, যদি রিসেপশনের পর জলসা, আর জলসার পর ব্যাঙ্কোয়েট না থাকত।

—তাইত!

—ব্যাঙ্কোয়েটের পরই বলের অধিবেশন মস্কো রওনা হবেন, বাকি অর্ধেক কাল ভোরে।

কবি নীরব। আমি বললাম—তোমাদের একটি উজবেকী কবিতার বাংলা অনুবাদ শুনিয়ে আমরা তোমাকে খুশি করে দিতে চাই যে, দুবছরের ভেতর দুবারও তোমাদের কবিতা আমরা কণ্ঠে তুলে নি।

কবিতাটি আমাদের চিত্রশিল্পীদের মুখস্থ ছিল। তাঁকে অনুরোধ করতেই তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন। কবি খুব খুশি হলেন। নিজে নেমে এসে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিলেন। গেট-হাউসে ফিরতেই মাথায় হাত—তাসকেন্টের সবগুলো বাড়ীতেই ঘেরে এসে নাকি?

—না, সব বাড়ীর সব খাবার ওই দুই বাড়ী বলেই মেপে এলাম।

—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও রিসেপশনের জন্য।

সেবার ফিলাবলিক অব উজবেকিস্তানের অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। তাই অত সমারোহ। এবার মস্কোর পথে দেড়-বেলা বিশ্রামের ব্যবস্থা, অতিথি মস্কো শান্তি-কমিটির। অবশ্য আগেকার দেখা জায়গাগুলো আর একবার দেখা গেল; কিন্তু আন-অফিসিয়ালি। আগেকার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হোল না। তাঁরা হয়ত জানলেনও না আমরা আবার ওঁদেরই দুয়ার পার হয়ে চলে গেলাম। এই তিন বছরে অন্তত দেড়শত ডেলিগেশন তাসকেন্ট ঘুরে গেছেন। তাঁদের সকল সময়কে মনে রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যক্তি নয়, দেশই শুধু থাকে সবার স্মৃতিতে।

তাসকেন্টে নতুন ভারতীয় যাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম, তাঁদের মাঝে ছিলেন ডক্টর অনুপ সিং এম-পি। তিনি কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতির সময়ে ভারত-সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন। আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটির তিনি একজন প্রধান কর্মী। বেশ রিক্ত লোক, সদালাপী এবং সুবক্তা। কংগ্রেসের সদস্য তিনি।

ক্লায় মিলিত হলাম আর্থানায়ক-দম্পতির সঙ্গে। তাঁদের খ্যাতি অনেক দিন থেকেই শুনে আসছিলাম। আর্থানায়ক সিংহলী, ভারতবর্ষকে নিজের দেশ করে নিয়েছেন, সারা বিশ্বকেও বলা চলে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন আর ইউরোপ পরিক্রমা করেন। আপা দেবী তাঁরই সহধর্মিণী, বাঙালী মেয়ে। এই দম্পতির কর্ম হচ্ছে জন-সেবার মাধ্যমে সমাজোন্নয়ন। সবরমতী আশ্রমে ওঁরা কাজ শুরু করেন। এখন বিনোবাজীর সঙ্গে কাজ করছেন। এমন বিস্ময়কর নর-নারী জীবনে খুব কমই দেখেছি। মানবতার প্রতিষ্ঠার কথা ছাড়া সংসারের কোন কথাই তাঁরা ভাবেন না। হুঁকুটেও উঁচু অনুরোধ আর্থানায়কের সুগঠিত দেহ দেখলেই শিল্পীর গড়া একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি বলে মনে হয়।

আপনাকেই বড় বেশী ভোর দুটি দিয়ে মনগড়া গান মনের চলাচল প্রকাশ পায়।

হেমন্ত সন্ধ্যায় ভালকেতে পৌঁছলাম, তার পরের দিন ভোর রাতে হোটেল ছেড়ে আবার এরাবপোতে ফিরে গেলাম। ছোট ট্রেন মাঠে তিন ঘণ্টায় আমাদের মধ্যে নামিয়ে দিলে। আকাশ পথে ট্রেনে বসে সন্ধ্যাবেলাকার মধ্যের রূপ দেখলাম। কবি উইলিয়ম ব্লেকের 'ওয়ার্ল্ড অব ইনোসেন্স' পড়েছিলাম ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ান পকুলনি পাহাড়ে মাটির মধ্যের অনন্ত পাঁজরার চূড়াকে চীন-পাগোডা মনে করে মধ্যেকে মহাপ্রাচ্যের সমাধি বলেছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখলাম সেই অপরূপ অনন্তের চাঁদের চূড়া চাঁদিয়েও উঁচু হয়ে উঠেছে অনন্তের অতিকায় ঢেউ। মনে হোলো যোজনব্যাপী সার-পাইনের ঘন-সবুজ অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে এসে আমাদের ছোট-ট্রেন ফেলের অরণ্যে প্রবেশ করছে কি কেবল ঘরের প্রতি মায়ের আকর্ষণে? অথবা কি বিরাট সত্যের সন্ধান মাত্র?

ক্রমশঃ

যুগপ্রয়োজনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজি যুগ প্রয়োজনে তোমার পরশ মাগি অয়ি লহ লহ ওঙ্কারে, একপথ স্রোত মাঝে ভেসে আছে অমরত্ব নাম তব শুভ্র পরমলে। ধরণীর মহাভাব! পৃথিবীর পাড়ে আসে ফেনা। অন্তর্মীলিমার দিকে চেয়ে চেয়ে দু'জিতেছি আকাশ রেখার করুণায় সন্ধ্যা তারাটিকে। তুমি তো করেছ কৃপা জনে জনে ভাষা তব শোষ করি পশে হৃদয়ে, আসিয়াছ যুগে যুগে নব নব রূপে হয়ে ধরণীর সন্তান নিবসে। হরি-লীলা-রস সিঞ্চনের মন্ত্রাকারা লয়ে তুমি এসেছিলে আপনারে ভীরে প্রেম দিয়ে গেলে ভক্তি সিন্ধু শ্রীচৈতন্য এ ভারতে নিত্যানন্দ সাথে। চিরচির সৃষ্টি স্থিতি লয়, কালের অমৃত চক্রে, ঘুরিছে ইহিতে তব, ঘুরে গেছে ইতিহাস ছেড়ে কত যুগ যুগান্তর—ভৌগোলিক সীমা নব দেশে দেশে জনীনে অবনুপ্ত করি কত প্রভাতারা কত মহাভবপথ সে কথা ভুলিয়া যায়ে তোমার শক্তিরে করে উপহাস, তারা সে বিপথ চলিছে বিশ্ব মনে, তারা তো জানে না সত্রাস কামনা শেষে যাবে পুড়ে, পুঞ্জীভূত ধূম-মোহ যাবে উড়ে দুরন্ত দুরাশা হত দূরে বহুদূরে। দলনের দল যারা প্রহারে করিয়া খেলা স্বর্গলক্ষ্য রচিল সহসা বিজ্ঞানের বাহিনী লক্ষিয়া আজি, তারা তো জানে না কবে দুঃখের বহ্নি নামিবে তাদের মাঝে মানব দলন দিনে, সেইদিন আসিছে আবার, করুণার অবতংস তোমারে হেরিব আমি সেইদিনে মধ্য অবতার।

নাহি বল, নাহিক সম্বল, অম্বরে আনন্দ নাহি', চারিদিকে বিরুদ্ধলোক, অনন্ত আকাশে চলে বিজ্ঞানের মহাযাত্রা প্রজ্ঞানের করি অন্বীক্ষার আসর প্রলয়ে—মরণের মহারাত্রি ঘনাতে আসিছে, তবু ত্রাস নয় সৃষ্টি ছাড়া মতবাদ করিয়ে প্রচার সৃষ্টি মাঝে, অহংমন্য নিরন্তর তোমার শক্তিরে করি নিতে বিচলন—তারা আছে, তুমি নাই কহে সবা এই মতবাদ ভরে শুধু সত্যতার ঘুণে মনীষার হেরি ভুলকতা। ধরণ পুত্তার তুমি কাঙালের বেশ ধরি হেরি তব বিশ্ব পরিক্রমা হৃদয়-সোমুখী হোতে করুণা প্রাণের ধারা বয়ে তব করি সবে ক্ষমা।

জগতের ঘরেতে এসে রূপান্তীত করিতেছ লীলা, সে লীলার প্রতিচ্ছবি আমারে যেখানে কতবার! অনাহত সুরে সুরে অরূপায় সম ছবি তব নাম, কালের বৈরাগী আসে তোমারা যাত্রারে নিত্য মর্মমন্ত্রীতীরে পাবনী যাত্রায় তব সিনান করাতে মোরে সুরে সুরে চলে যায় ধীরে। সরযূ যমুনা গঙ্গা ত্রিবেণী সঙ্গম করে মিলে গেছে যাহিয়ানে মোর, অপূর্ব বিভূতি তব হে অসীম! সীমা মাঝে দেখায়েছ—ধরে আছি ভোর। দুদিনের রাত্রি ভরে অনাদিনী কাঁদিছে যেথায় বিচারের প্রহসনে, বিদেহায় বালকের উঠিছে রোদন ধ্বনি ধনুকের নিষ্ঠুর গর্জনে মৃতকুল মানব দেখা পাষাণে কুটিছে মাথা, বস্ত্রহীন বসি কঙ্কালে ভাগ্যেরে ধিক্কৃত করে, তুমিহীন দৃষ্টিহীন অর্থহীন ঘরে হাহাকারে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড সাথে দেখা করিতেছে নিত্য কোলাকুলি কৃত্রিম পণ্যের ভিতে গৃহদের ঘরে, মহাহীন মার্তণ্ড, ধর্ম তুলি অর্থ শোষণের তরে বর্ষর রীতিতে চলে, দেখা তুমি যুগ প্রয়োজনে মর্ত্যকারা ধরি এলো ত্রাণকর্তা রূপে আজি ধরিত্রীর দুর্যোগের ক্ষণে।

পরাধীন রাজপথে দলকেন্দ্রী পরস্তার লোভাতুরা আর পাশাচার ভয়ার্তের মতপুটে আনিতেছে সংহারণ। চিরাচার সমাজ সংসার ওঠে জ্বলে দিকে দিকে কুবেরের ধনলিপ্সা পশুশক্তি করেছে প্রধান, আদর্শের পরিবর্তে সভ্যতা পূজার পানে চলিতেছে, কেঁপে ওঠে প্রাণ বেগে আর দেশান্তরে অবসন্ন পরশক্তি প্রাণ ধারণের গ্লানি লয়ে, শুষ্কতোয় বেলাভূমে মৃতপ্রায় মানবতা—রাজনীতি অক্ষক্রীড়া হয়ে মরণন করিছে রচনা। বুভুক্ষের মানবের ঐশ্বর্যের ক্রীড়া-পুত্তলিক লক্ষ লক্ষ নরনারী। যুগতৃষ্ণা বিষাক্তের ডাকে আর বিভ্রান্ত পথিক! জাগত আত্মারে তুমি আমার জাগ্রত করো কল্যাণ করি অপগত, প্রেমধর্ম প্রচারিয়া এ ভারত একদিন বিশ্বরে করেছে অবনত।

পরমের দুর্জ্ঞেয়ে প্রেমের আকর তব হৃদয়ের রাজে গভীরায় তুমি কি ফিরে না সাড়া! মাঝি যুগ বিপর্যয়ে প্রাণধর্ম লভেছে বিদায়। নদীর পথে পথে অন্ধকার বাড়িয়েছে ঘোর রাখে করে মাধুকরী তুমি কি ফিরে না সাড়া! জীবনের অধীশ্বর! ভুবন ভুলানো রূপ ধরি। আকাশ-পিঞ্জর ছেড়ে, আপাহত শুভলোক, সভ্যতার অগ্নিকণাকরে, বহি ছেয়ে পৃথ্বী কাঁপে হিংসাত্মক ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাসে আর্ত পত্র ঝরে; শুষ্ক হয়ে যায় পত্র জীবন কুসুম। তব করুণার তরে তৃষ্ণা জাগে— ফেরে আছি প্রেমের ঠাকুর! কথা কও, কথা কও, দুঃখের বারিধি মাঝে বরাহত জীর্ণ তরী করে আর্তনাদ, হে কাণ্ডারী! কোথা তুমি! এস কাছে।

ওঙ্কারের নতটের সম্ভাবনা সম্মুখে সবার। কল্লোলিত সিন্ধুসম বিপুল বিক্ষোভ বেগ বিশ্ব মাঝে আলোড়িত, দিনগুলি যেন তিক্ততম। এ দুর্দিনে হে মহাজীবন! ধরণীর পূর্বদ্বারে এস প্রেম বন্যা লয়ে নবদ্বীপ ধামে, প্রতীক্ষায় অবধূত তরিয়াছে, বিরহের অশ্রু ঝরে— যাচে প্রভু! প্রণয়ের মৃদঙ্গের গুরু গুরু তালে তালে বাজায়ে পঞ্জনী আবাহন করি তব আবির্ভাব লয় তরে কীর্তনের সুরে কাল গণি।

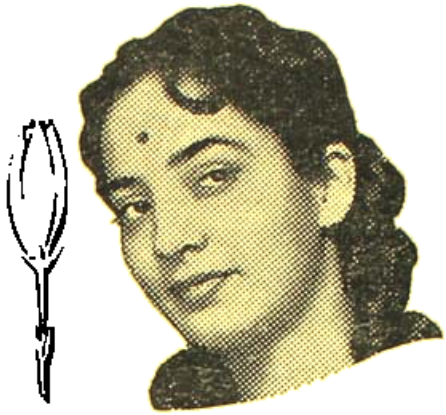

ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য **রেক্সোনা**

ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে!

এক মাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

BP. 152-X52 BG

তিব্বতে ও দালাই লামা—

গত ৩১শে মার্চ তিব্বতের ধর্ম-গুরু তথা শাসনকর্তা মহামান্য দালাই লামা ১৫ দিন পদব্রজে পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গল ও দুর্গমময় পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন—ইহাই বর্তমান যুগের একটি বড় ঘটনা। বহু দিন হইতে তিব্বতের এক দল লোক অন্যতম ধর্ম-নেতা পাঞ্চেন লামার নেতৃত্বে তিব্বতের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিল। তিব্বত দেশের চারিদিক প্রায় পাহাড়ে ঘেরা—বাহিরের জগতের সহিত সেজন্য তিব্বত-বাসীর সম্পর্ক কম। এ অবস্থায় বর্তমান সভ্যতা তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিব্বতের ঠিক উত্তরেই চীন-দেশ। চীনদেশে কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরাট ব্যবস্থা প্রচলিত। কম্যুনিষ্ট চীনও সেজন্য তিব্বতকে নিজ প্রভাবে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। গত এক বার বৎসর কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত তিব্বতীয়গণ তাঁহাদের দেশে দালাই লামার শাসনের উচ্ছেদ করিয়া কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত পাঞ্চেন লামার অধীনে নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছিল। সেজন্য উভয় দলে যুদ্ধ বিগ্রহ হইতেছিল এবং কম্যুনিষ্ট চীনের অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী তিব্বতে পাঞ্চেন লামার দলকে সাহায্য করিতেছিল। চীনের সাহায্যে ক্রমে পাঞ্চেন লামার দল প্রবল হইয়া উঠে ও তাহারা দালাই লামাকে হত্যা করিয়া তিব্বতে দালাই লামার শাসনের অবসানের জন্য নানা রূপ ষড়যন্ত্র করে। দালাই লামার গ্রীষ্মাবাসের উপর বোমা ও গুলী বর্ষণ করিয়া পাঞ্চেন লামার দল ঐ প্রাসাদ ধ্বংস করিয়াছে ও প্রাসাদস্থ বহু মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বহু প্রাচীন আসবাবপত্র নষ্ট করিয়াছে। এ অবস্থায় গত ১৭ই মার্চ দালাই লামা প্রায় ৯০ জন সঙ্গী লইয়া প্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন।

চীনা সংবাদদাতারা প্রকাশ করে যে গুলী বর্ষণের ফলে দালাই লামা নিহত হইয়াছেন। সেজন্য পৃথিবীর সর্বত্র বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা দালাই লামার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করে। যাহা হউক, দালাই লামা পদব্রজে ভারতাভিমুখে রওনা হন এবং তাঁহার ভারত প্রবেশের ৩।৪ দিন পূর্বে তাঁহার এক প্রতিনিধি ভারতে আসিয়া ভারতের প্রধান-মন্ত্রীকে খবর দেন যে দালাই লামা ভারত সরকারের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন।

শ্রীজহরলাল নেহরু দালাই লামার প্রতিনিধিকে জানাই-য়াছেন—ভারতের বৌদ্ধগণ দালাই লামাকে ধর্ম-গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, কাজেই তিনি ভারতে আসিলে তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হইবে ও আশ্রয় দান করা হইবে। ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি প্রদেশ (নেফা) পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ—গত ৩১শে মার্চ দালাই লামা ৮ জন সঙ্গীসহ তিব্বত সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের নেফা প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং আরও ৪ দিন পদব্রজে চলিয়া তোয়াং নামক এক মহকুমা সহরে আসিয়া পৌঁছেন। ভারতীয় সৈন্যদল ঐ কয়দিন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ৪ঠা এপ্রিল তাঁহারা তোয়াং সহরে পৌঁছিলে তাঁহাদের স্থানীয় শাসনকর্তা উপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন ও তোয়াংএর একটি বৌদ্ধ বিহারে তাঁহা-দের আশ্রয় দান করা হয়। ক্রমে দালাই লামার সঙ্গী বাকী ৮০ জনও আসিয়া তোয়াং বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে ২।১ দিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহাদের পদব্রজে আরও ৩।৪ দিন আসিতে হয়—তাহার পর জিপ গাড়ীতে করিয়া ৩।৪ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের নিকটস্থ রেল ষ্টেশনে আনয়ন করিতে হয়। শ্রীনেহরু এই সকল সংবাদ গত ৪ঠা এপ্রিল দিল্লীর লোক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন। দালাই লামা ভবিষ্যতে কোথায় থাকিবেন তাহা এখন ও জানা যায় নাই বা স্থির হয় নাই। বর্তমানে পাঞ্চেন লামার নেতৃত্বে তিব্বতে চীন-প্রভাবিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দালাই লামার দলের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতে চলিয়া আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। তাঁহা-দের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

তবে তিব্বতে কয়েক-দিন উভয় দলে যুদ্ধের ফলে বহু লোক নিহত হইয়াছে ও বহু সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে এখন ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। চীনের সহিত ভারতের মৈত্রী-ভাব আছে—তাহা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সময় হইতে প্রায় ২ হাজার বৎসরের প্রাচীন। শ্রীনেহরু চীনের সহিত সে বন্ধন ছিন্ন না করিয়া দালাই লামাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। যে কোন আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান মানব-ধর্ম—এখানে আশ্রয় প্রার্থী একজন মহা-সম্মানিত রাজকীয় ব্যক্তি এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বহু লোকের ধর্ম-গুরু। কাজেই তিনি যখন আশ্রয় প্রার্থী—তখন তাঁহাকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করিয়া শ্রীনেহরু মানব-ধর্মই পালন করিয়াছেন। গত ১২ই এপ্রিল দালাই লামা সদলে ভারতের মধ্যে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছেন। আমরা ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি। দালাই লামার ভারত-আগমন শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, ভারতের পক্ষে সৌভাগ্যের সূচনা করিবে বলিয়া আমরা মনে করি। একজন বিশিষ্ট ধর্ম-গুরুর ভারতবাসের ফলে ভারতের জনগণের মধ্যে ধর্ম-ভাব বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের সুপথে পরিচালিত করুক—আমরা সর্বান্তকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

কলিকাতার নূতন মেয়র—

গত ৮ই এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কংগ্রেস দলের প্রার্থী শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকিশোরীলাল চনচনিয়া যথাক্রমে ১ বৎসরের জন্য কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। বিদায়ী মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণা সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কর্পোরেশনের মোট ৮৬ জন সদস্যের মধ্যে ৪৯ জন মেয়রের পক্ষে ও ৪৭ জন ডেপুটী মেয়রের পক্ষে ভোট দান করেন। নূতন মেয়র বিজয়বাবুর বয়স ৫৫ বৎসর, তিনি গত ১৯ বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য আছেন, তাঁহার পিতামহ স্বর্গত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৪২ বৎসর কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। বিজয়বাবু বি-এল পাশ করিয়া গত ৩০ বৎসর আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। ডেপুটি মেয়র কিশোরীলাল বাবুর বয়স ৪৬ বৎসর; তিনি খ্যাতনামা অর্থ-নীতিবিদ্ ও ব্যবসায়ী। তিনি এক সময়ে ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আমরা উভয়কে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং আশা করি, তাঁহাদের সুপরিচালনায় কলিকাতা সহর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

কলিকাতায় নেতাজীর মূর্ত্তি—

সম্প্রতি স্থির হইয়াছে কলিকাতা সহরের দুইটি প্রকাশ্য স্থানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দুইটি পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি স্থাপন করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চৌরঙ্গী রোড ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোডের সংযোগ স্থলে মেট্রপলিটান হাউসের বিপরীত দিকে একটি ও কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে আর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামরিক পোষাক পরিহিত নেতাজীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন এবং কর্পোরেশন নিজ ব্যয়ে একটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি শ্যামবাজারে স্থাপন করিবেন। কলিকাতা সহরে নেতাজীর মূর্ত্তি না থাকা কলিকাতাবাসীদের পক্ষে কলঙ্কের কথা। তাঁহার জীবন ও অবদানের কথা সর্বদা বাঙ্গালীজাতির মনে জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এম-পি'কে বলপূর্বক বিতাড়ন—

গত ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে লোক সভার সদস্য শ্রীঅর্জুন সিং ভাদোরিয়াকে তাঁহার ঔদ্ধত্যের জন্য ডেপুটী সভাপতি সর্দার হুকুম সিং বলপূর্বক সভা হইতে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সোসালিষ্ট দলের সদস্য ও শাস্তি স্বরূপ তাঁকে একসপ্তাহের জন্য সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। লোকসভার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা এই প্রথম। তিনি ডেপুটী স্পীকারের কোন কথা না শুনিয়া শুধু সভায় গণ্ডগোল করিতেছিলেন। বল-প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে সভা হইতে বাহিরে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এ ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এরূপ ঘটনা দেশের পক্ষে সত্যই লজ্জার বিষয়।

মন্মথনাথ ঘোষ—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বহু মনীষীর জীবনী লেখক মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় গত ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার মধ্যরাত্রিতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর কর্মবীর ৺কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ

ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বেঙ্গলী ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অল্পবয়সে পড়িতে এম-এ পাশ করিয়া সরকারী হিসাব বিভাগে উচ্চপদে কাজ করিতেন। জীবনের প্রথম ভাগে হইতেই বাংলা সাহিত্য রচনায় তিনি ব্রতী হন এবং হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, কালীপ্রসন্ন, উমেশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনী রচনা করেন। তিনি ভারতবর্ষ পত্রের প্রথমাবধি লেখক ছিলেন এবং তাঁহার কয়েকখণ্ড লেখা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পুস্তক সংগ্রহ ছিল বিরাট এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি লেখা পড়াতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ-শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু লেখকের লেখার সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে বেদনা অনুভব করি ও তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী—

বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী গত ৬ঠা এপ্রিল শনিবার রাত্রিতে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা গড়িয়াহাটার 'ব্রহ্মবিহার' বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল। ১২৮৪ সালের ২৪শে আশ্বিন তাঁহার জন্ম হয়। বাড়ী ছিল বালসহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে। ১৭ বৎসর বয়সে কাব্যতীর্থ পাশ করিয়া তিনি কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৩৪১ সালে সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া তিনি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। সারা জীবন তিনি পাঠাগারে অধিক সময় ব্যয় করিতেন। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে তিনি পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া সে বিষয়ে গবেষণা করেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসিয়া যে কয়জন পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম; তপস্বীর মত তিনি সারা জীবন বিদ্যার্জন ও জ্ঞানচর্চা করিয়া গিয়াছেন।

মতিলাল রায়—

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায় গত ১০ই এপ্রিল সকালে ৭৭ বৎসর বয়সে প্রবর্তক আশ্রমে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত কয়েক বৎসর রোগভোগ করিতেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার সহধর্মিণী কয়েক বৎসর পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। ১২৮৯ সালের ২২শে পৌষ তিনি জন্মগ্রহণ করেন—৬ বৎসর বয়স হইতে তিনি এক শিবমূর্তি সর্বদা কণ্ঠে ধারণ করিতেন—১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু রামানন্দ ব্রহ্মচারীর নির্দেশে তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন। ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা হইতে পলাইয়া চন্দননগর যাইয়া তাঁহার গৃহে এক মাস অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। মতিবাবু প্রথম যৌবনে বিপ্লববাদের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন ও পরে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ মত প্রবর্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গঠনমূলক দেশসেবায় মন দেন। তিনি বহু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার মধ্যে দেশকর্মীদের কাজ দিতেন ও বহুলোককে পালন করিতেন। একদল ত্যাগী কর্মী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সারাজীবন তাঁহার আদর্শে কাজ করিতেছেন। তিনি প্রবর্তক মাসিক-পত্রের সম্পাদক ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার ভাগবত-জীবন ও আদর্শ নিষ্ঠা সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত।

ডাক্তার অমলকুমার রায়চৌধুরী—

কলিকাতা আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক অমলকুমার রায়চৌধুরী গত ৩০শে মার্চ সোমবার রাত্রিতে ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার গিরিডির বাস ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ বংশে ১৮৯২ সালে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে এম-বি পাশ করিয়া তিনি ১৯১৬ সালে হইতে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং ১৯৫৫ হইতে ২ বৎসর প্রিন্সিপালের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্তমান—তাঁহার পত্নী ১৯৩৪ সালে পরলোক গমন করেন। কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র শ্রীসৎকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চিকিৎসক হিসাবে তিনি সুনাম ও বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং পরে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের অভাব হইল।

নেতাজী রাশিয়ায় জীবিত—

গত ৫ঠা এপ্রিল বর্দ্ধমানে যাইয়া এক সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে নেতাজী জীবিত আছেন ও রাশিয়ায় আছেন। তিনি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া আসিবেন। সুরেশবাবু নেতাজী তদন্ত কমিটীর সদস্য ছিলেন এবং কমিটীর অপর ২জন সদস্যের সহিত একমত হইতে না পারিয়া পৃথক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্রজের মুখে ঘোষিত অনুজের সম্বন্ধে সংবাদ 'অসত্য' বলিয়া মনে করার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

সুন্দরবনে নূতন ৮টি থানা—

সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলে নূতন ৮টি থানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তন্মধ্যে গত ৩০শে মার্চ নিম্নলিখিত ৫টি স্থানে নূতন থানা (পুলিশ ষ্টেশন) খোলা হইয়াছে—হিঙ্গলগঞ্জ, পাথর প্রতিমা, গোসাবা, মাতলা ও বাসন্তী। পুলিশ-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ঐ সকল স্থানে যাইয়া থানা-গুলির কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

হুগলী নদীর ক্রমাবনতি—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা রয়াল একসচেঞ্জে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রীরে-ডি-কে ব্রাউন হুগলী নদীর ক্রমশঃ অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ফরক্কা বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন—এই বিষয়ে অতি দ্রুত কোন ব্যবস্থা করা না হইলে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সমগ্র ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের উপর উহার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হইতে পারে।—বিষয়টির গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কেন উপলব্ধি করেন না, বুঝা যায় না। এ বিষয়ে সত্বর কাজ আরম্ভ করা না হইলে পশ্চিমবঙ্গের বিরাট দক্ষিণাংশ আবার অরণ্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। কলিকাতা সহর বা সুন্দরবন এলাকার উন্নতি-পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে।

ভারতকে সাহায্য দান—

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমেরিকা, বৃটেন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান—৪টি দেশ সমবেত হইয়া অর্থ সাহায্য দান করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাঁচশালা ব্যবস্থার শেষ বৎসরে ৩০ কোটি ডলার ও তৎপূর্বে ৪০।৪৭ কোটি ডলার সাহায্য ভারত পাইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ভারতে যদি শতকরা ৩০ ভাগ মূলধন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমেরিকা বাকী অর্থ দিয়া ভারতে একটি নূতন ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবে। ভারত দ্রুত শিল্প ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই কার্যে বিদেশী অর্থসাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। শিল্পসমৃদ্ধ ভারতের পক্ষে এই ঋণ শোধ করা অসম্ভব হইবে না।

নেতাজী জন্মদিবসে ছুটি—

গত ২৬শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে প্রতিবৎসর নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ২৩শে জানুয়ারী ছুটি ঘোষণা করা হইবে। এতদিন যে কেন এই ছুটী ঘোষণা করা হয় নাই, তাহা জানি না। আমরা বিশ্বাস করি, নেতাজী জীবিত আছেন ও যথাসময়ে তিনি আবার ভারতে আগমন করিবেন।

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির জন্য পুরস্কার—

গত ১লা মার্চ নয়াদিল্লীস্থ ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, 'ভারতের ইতিহাস' সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির জন্য বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিরঞ্জন ঘোষাল ডি-লিট ৫ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জনপ্রিয় সাহিত্য প্রচারে উৎসাহ দানের পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ঐ পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালী ঐ পুরস্কার লাভ করায় বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গে গৃহ নির্মাণ—

দ্বিতীয় পাঁচশালা বন্দোবস্তের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কারখানার শ্রমিকদের জন্য ৫০ লক্ষ ৯১ হাজার ৬ শত টাকা ব্যয়ে ১০৩৬টী এক কক্ষ বিশিষ্ট ও ১৮৮টি দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসগৃহ নির্মাণ করা হইবে। ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় ভারত সরকার দান করিবেন ও বাকী অর্দ্ধেক ঋণ স্বরূপ ভারত সরকার হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ

করিবেন। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ১৩৯৬টী গৃহ নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে ও ২০৯০টী গৃহ নির্মিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ১৬২২টী গৃহ নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। চন্দননগর গোরহাটীতে ও টিটাগড়ের পাটুলিয়ায় নূতন গৃহগুলি নির্মিত হইবে। শিয়ালদহে বাসগৃহ সমস্যা কতদিনে সমাধান হইবে বলা যায় না। নূতন বাড়ীগুলি হইলে দরিদ্র শ্রমিক পরিবারগুলি যে উপকৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মেজর পি-বর্দ্ধন—

খ্যাতনামা সমাজ-সেবক নেতা মেজর পি-বর্দ্ধন গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলিকাতা বৌবাজারে প্রসিদ্ধ বর্দ্ধন বংশে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার পিতা কবি ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ১৯১৪ সালে এম-বি পাশ করিয়া তিনি পারস্য, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে ৮ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবন হইতে নিজেকে গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ ও পরহিতব্রতী বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

ইংরাজি ভাষা শিক্ষা—

একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী লোক স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের কথা বলিয়া থাকেন। অবশ্য ভারতবর্ষে ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতিতে সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া এখনই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে না। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে-এল-শ্রীমালিও ঐ কথাই বলিয়াছেন। সরকার সকল ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি কার্য্যকরী করিতে চাহেন না। যতদিন না আঞ্চলিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ রচিত ও প্রকাশিত হয়, ততদিন উচ্চ বিভাগে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরাজি ভাষা শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরাজীকে আরও কয়েক বৎসর আমরা বাদ দিয়া চলিতে পারি না। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে ক্রমে তাঁহারা নিজেরাই ইংরাজি ভাষাকে বাদ দিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বিদেশে 'পথের পাঁচালীর' সম্মান—

স্বর্গত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পথের পাঁচালী' পুস্তকের চলচ্চিত্র সম্প্রতি আমেরিকা নিউ-ইয়র্কের একটি চিত্রগৃহে ৪ মাস কাল ধরিয়া দেখান হইয়াছে। সত্যজিৎ রায় উহার পরিচালক। বাঙ্গালীর এই গৌরব সকলকে আনন্দ দান করে। উহা ফিলাডেলফিয়া সহরে বহু সপ্তাহ দেখান হইয়াছে। ক্রমে উহা ক্লিভল্যাণ্ড আটলান্টা, সেণ্ট লুইস, উইলমিংটন, সিন্সিনাটি, ওহায়ো, ওয়াসিংটন প্রভৃতি সহরে দেখানো হইয়াছে। মার্কিণ দর্শকগণ উহার শিল্পসমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী পরিচালকের এই অপূর্ব সৃষ্টি জগতের মানুষকে নূতন চিন্তার পথ দেখাইয়া নবজীবন দান করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীকটিক চট্টোপাধ্যায়—

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীকটিক চট্টোপাধ্যায় বিশুদ্ধ গণিতে গবেষণা করিয়া এ বৎসর

শ্রীকটিক চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সেতার-বাদক। তাঁহার গবেষণার বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত সুখ্যাতি করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর পাদপীঠে—

কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডে মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন সংবাদে গত পৌষমাসের ভারতবর্ষের সাময়িকীতে আমরা মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ ৪ লাইন লেখা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। উহা পাঠ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি-বন্ধু ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় উহার নিম্নলিখিত যে কাব্যানুবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—

"মৃত্যুর মর্ম্মের মাঝে অবিষ্ঠিত অক্ষয় জীবন,
অসত্যের অন্তরালে ধ্রুব সত্য রয় সুগোপন।
তমসার গর্ভ-গৃহে রহে গূঢ় ভর্গ জ্যোতিষ্মান,
প্রাণে সত্যে আলোকে ও প্রেমে আবির্ভূত ভগবান॥"

বেলগড়িয়া গ্রামে উৎসব—

বেলগড়িয়া ২৪পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম—তাহা ইছামতী নদীর অপর পারে অবস্থিত।

STUDENTS' P G A. COMMON-ROOM

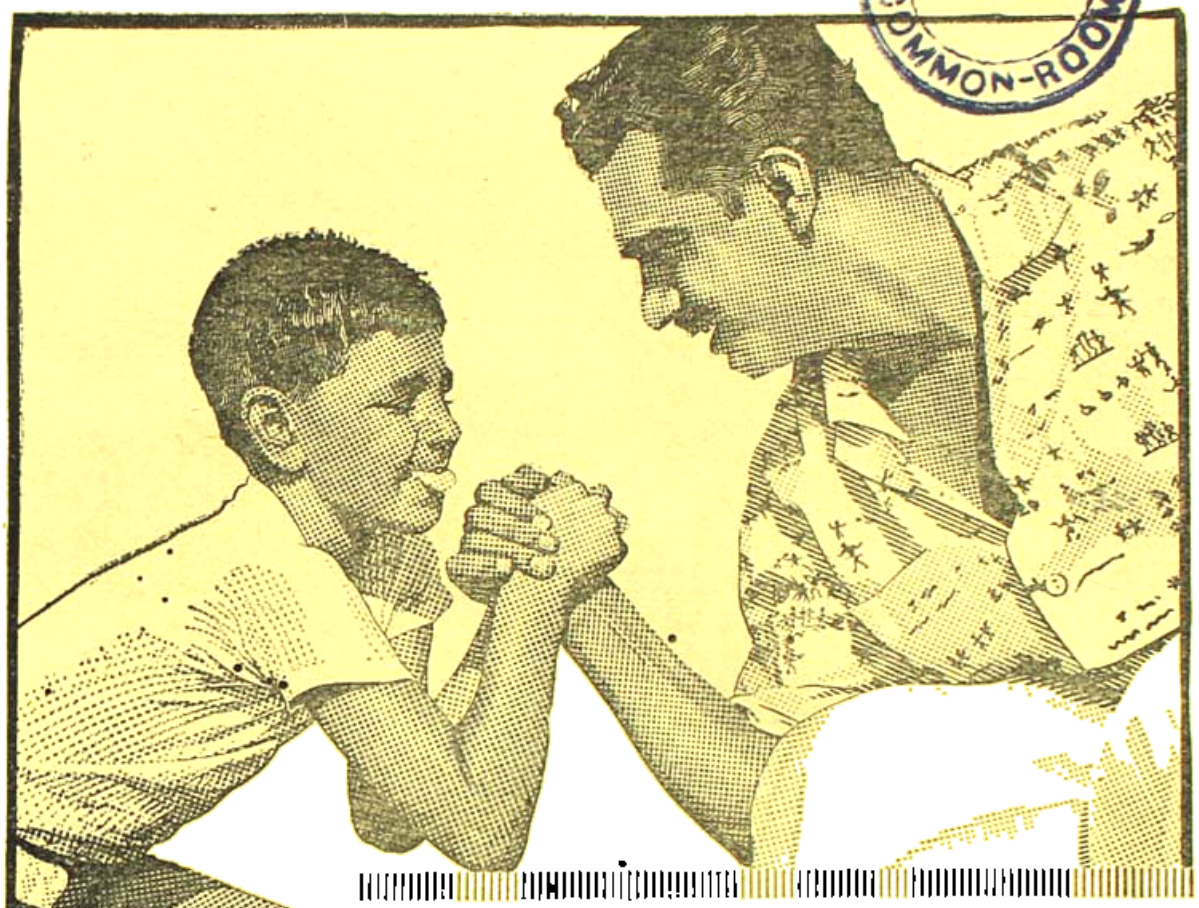

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

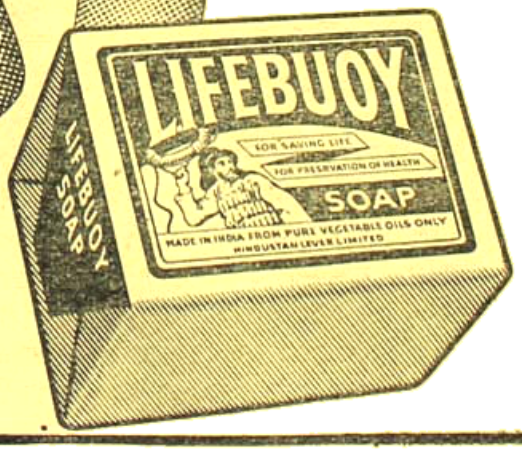

খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রচার।

L. 276-X52 BG

সম্প্রতি সেখানে স্থানীয় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য ডি-ফিল প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামে সম্প্রতি অধিবাসী স্বর্গত হরিচরণ বসু গ্রামের বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য বহু চেষ্টা ও অর্থদান করিয়া গিয়াছেন—উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসীরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হরিচরণবাবুর এক চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রতি বহু পণ্ডিত সভায় যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে তদুপলক্ষে যতীন্দ্রবিমল রচিত সংস্কৃত নাটক "মহাপ্রভু হরিদাসম্" অভিনীত হইয়াছিল। বহু পণ্ডিত সম্মিলনে ও ভক্ত সম্মিলনে শ্রীচৌধুরী ঘোষণা করিয়াছেন—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পূর্বগৌরবের প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, দেশবাসী তাহা করেন না। সংস্কৃত ভাষা যে চিরকাল সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা রূপে যোগসূত্রে একতা-

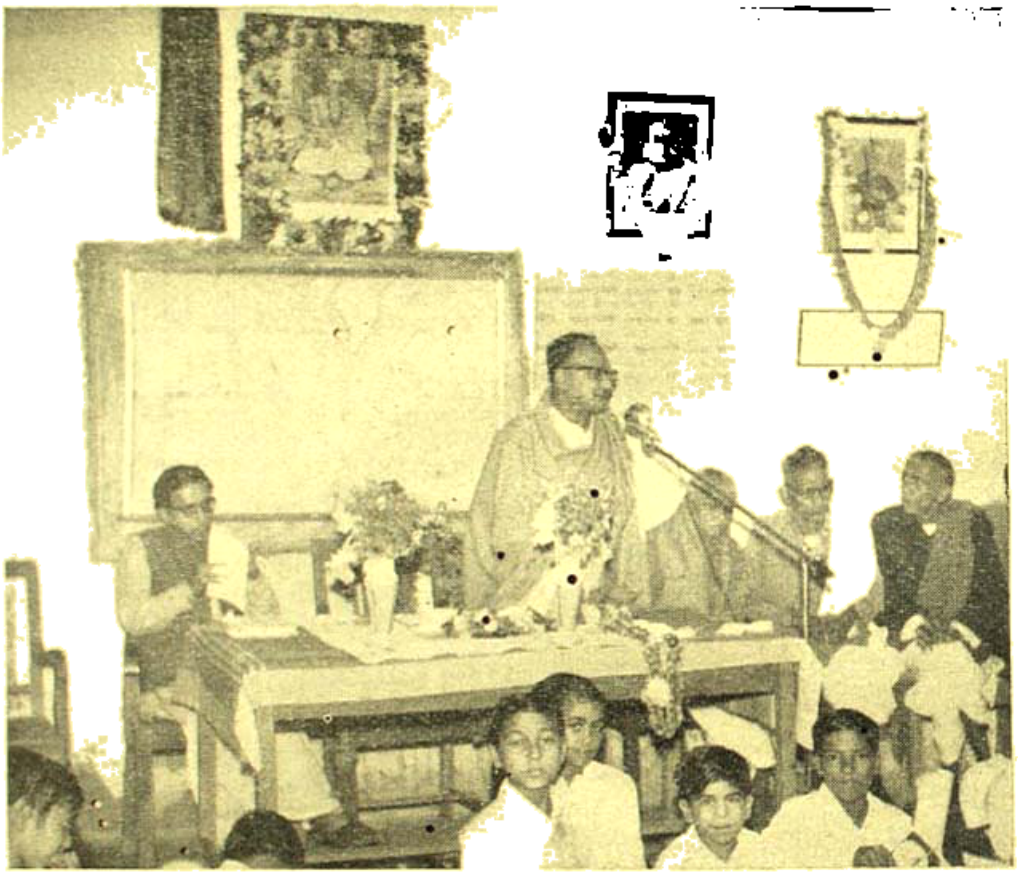

বেলমুড়িয়া গ্রামোৎসবে সম্মিলিত ব্যক্তিগণ

সম্বন্ধন প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রামের উৎসাহী কর্মীদিগের আগ্রহে ও চেষ্টায় গ্রামটিকে ক্রমশঃ শ্রীমণ্ডিত করার যে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে, সমাগত অতিথিরা তাহাতে সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

কাঁথি অঞ্চলে সংস্কৃত প্রচার—

খ্যাতনামা কোবিদ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁহার বিদুষী সহধর্মিণী ডক্টর রমা চৌধুরী মেদিনীপুর জেলায় সম্প্রতি ঘুরিয়া বহু চতুষ্পাঠী পরিদর্শন ও বহু পণ্ডিত সভায় যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে তদুপলক্ষে যতীন্দ্রবিমল রচিত সংস্কৃত নাটক "মহাপ্রভু হরিদাসম্" অভিনীত হইয়াছিল। বহু পণ্ডিত সম্মিলনে ও ভক্ত সম্মিলনে শ্রীচৌধুরী ঘোষণা করিয়াছেন—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পূর্বগৌরবের প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, দেশবাসী তাহা করেন না। সংস্কৃত ভাষা যে চিরকাল সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা রূপে যোগসূত্রে একতা-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, একথা আজ দেশবাসী ভুলিয়া গিয়াছে। সে কথা সর্বদা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর একান্ত কর্তব্য। শ্রীচৌধুরী ও তাঁহার সহধর্মিণী এ বিষয়ে যে একান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন, সে জন্য তাঁহারা শুধু সংস্কৃতানুরাগীদিগের নহে, দেশের সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের এ চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্লিটন একটা টেরি স্কালার উপহার দিয়েছে সুরেখা খাণ্ডেলওয়ালকে। লীলায়িত নৃত্যছন্দে ওর চরণের গতি যেন শিথিল না হয়। খাণ্ডেলওয়াল না বুঝলেও, সুরেখা বোঝে—কি চায় ক্লিটন। একদিন কথায় কথায় ক্লিটন বলেছিল, এল্‌কোহলে শরীরের ইলাস্টিসিটি কমিয়ে দেয়। মাসল্ যত হেল্‌থি হয়, স্কিন তত মসৃণ থাকে। গঠনের চার্ম তোমার কমবে না কোনদিন, যদি রোজ সকালে পনেরো থেকে বিশ মিনিট স্কালারে গা ঢেলে হাত-পা গুলো স্ট্রেচ করে নাও। কিন্নরী তুমি। অনবদ্য তোমার দেহসৌষ্ঠব।…আই মিন্, থাইজ এণ্ড বাটক্‌স্।…ক্লিটন ইতস্তত করেছিল।

খাণ্ডেলওয়াল হয়তো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চেয়েছিল সুরেখার মুখপানে। কিন্তু সুরেখা দৃক্‌পাত করেনি। বিস্ফারিত চোখ দুটো তুলে ধরেছিল ক্লিটনের মুখের ওপর! মুহূর্তে স্নায়ুগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। একটা অনাস্বাদিত শিহরণের স্রোত বয়ে গিয়েছিল ওর সারা দেহে।

উন্মত্ত জলস্রোতের ধারালো আঘাতে তটভূমিতে যখন ভাঙন ধরে, বাঁশের পিন দিয়ে আটকানো যায় না এলা মাটির পতনোন্মুখ ভিত্তি। স্রোতের আঘাতে নিঃশব্দে ছিন্ন হয়ে যায় বসুন্ধরার দৃঢ় বন্ধন। অতলের আকর্ষণে নুয়ে পড়ে তৃণশ্যামল তটভূমি। অলক্ষ্যে শিথিল হয়ে আসে রম্য-বীথিকার স্বপ্ন পরিবেশ। ভেঙে পড়ে। ব্লেসিয়ারের টানে বরফের সাতরঙা পাহাড় আলোর বাঁধন ছিঁড়ে উল্কার মত ছুটে যায় অন্ধকার গহ্বরের অজানা পথে।

রেখা!

খাণ্ডেলওয়াল।

তুমি—

কি বলতে গিয়ে খাণ্ডেলওয়াল থেমে যায়—ইতস্তত করে সুরেখার মুখ পানে এক নজর চেয়ে।

কি?

কিছু না।

কিছু না, নয়। কিছু—অনেক কিছু। বলো, থামলে কেন?

থামেনি। খাণ্ডেলওয়াল চেষ্টা করছিল কথাটাকে আন্দাজে-ইঙ্গিতে রূপ দিতে। সামনা-সামনি সহজ করে বলবার সাহস তার ছিল না।

সুরেখা জানে খাণ্ডেলওয়াল কি বলতে চায়। লিমন কুলপির ব্লাইসের মত এক চিলতে ঠাণ্ডা হাসি ঠোঁটের আগায় তুলে ধরে বলে: ক্লিটনের আসা-যাওয়া তোমার ভালো লাগে না। এই তো?

না—না, আমি তা বলিনি।

তবে?…সুরেখা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় খাণ্ডেলওয়ালের চোখে চোখ রেখে। চোখের দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে বদলে যায়, সূর্যের আলোর দিকে আস্তে-আস্তে ঘুরিয়ে ধরলে যেমন করে তেপল আতশী কাচের রঙ বদলায়—বিচিত্র হয়ে ওঠে বর্ণাঢ্য আকর্ষণ, তেমনি করে বদলে যায় সুরেখার চোখের দৃষ্টি। এ দৃষ্টিতে খাণ্ডেলওয়ালের মনের পাখার জিয়ালার আঠা জড়িয়ে যায়। মন ওর উড়তে গিয়ে হঠাৎ বন্দী বিহঙ্গের মত ছটফট করে। নির্ভিন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কি বলবে ভেবে পায় না।

সুরেখা মুখ টিপে হাসে।…টুইটেল ডি!…শবদেহকে যে মন আঁকড়ে ধরে থাকে, সে মন মায়ের। প্রিয়ার নয়।

ওর কথার তাৎপর্যটুকু খাণ্ডেলওয়াল ঠিক বোঝে না। না বুঝলেও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, সুরেখা জংলা পাখীকে পিস দেওয়ার মত ওর আদিম অনুভূতিকে

টিয়ান দিয়ে হাতে বসাতে চাইছে। মনটা ঘুরঘুর করে, কিন্তু মুখে ফুটে বলতে পারে না কিছু।

খাণ্ডেলওয়াল!

বলো।

ক্লিটন যেদিন ওই মালাটা এনে দিয়েছে, সেই দিন থেকে তুমি হয়েছ কেমন উন্মনা। ওদের দেশে যারা বরফের পিছল পথে ঘোড়দৌড় করে তুমি আর অতদূর ছিনিমিনি খেলে, মালায় তাদেরই জন্যে।…টাকা খরচ করেছে ক্লিটন, ফলভোগ করবে খাণ্ডেলওয়াল।

মনের আতঙ্ক কাটে না। সুরেখার কথায় কোন হেঁয়ালি নাই। তবুও খাণ্ডেলওয়াল কেমন বিমূঢ় হয়ে যায়। ক্ষণকাল মৌন দৃষ্টিতে সুরেখার মুখপানে চেয়ে থেকে বলে: রেখা। টাকা আমার ফুরিয়েছে। আজ আর পোষাবে নাই।

জানি।…মৌ ফুরিয়ে গেলে ফুলের পাপড়ি আপনি ঝরে পড়ে। বোঁটার বাঁধন আলগা হয়ে আসে। জোর করে এলনো পাপড়িকে আটকে রাখা যায় না।

ওদের কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ ক্লিটন এসে উপস্থিত হলো সিঁড়িতে দ্রুতপায়ের প্রতিধ্বনি তুলে।

সুরেখা এগিয়ে যায়। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে ক্লিটনকে: গুড ডে, মিস্টার ক্লিটন!

গুড ডে: ক্লিটন হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

খাণ্ডেলওয়াল ওঠে না। পাথরের মত বসে থাকে ওদের দিকে চেয়ে। মরা একটুকরো হাসি ফুটে ওঠে মুখে। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে সোফাটার দিকে হাত চিতিয়ে বলে: আইয়ে সার।…গুড মর্নিং!

মর্নিং!…ক্লিটন হাত-পা ছড়িয়ে বসে।

চলোন। জামা-কাপড় বদলে নাও। ডারমণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি। মিস্টার ক্লিটন নতুন গাড়ী কিনেছেন। আমাদের কম্পানি চান।

সুরেখা ফিরে দাঁড়ায় খাণ্ডেলওয়ালের দিকে। কণ্ঠস্বরে পর্য্যাপ্ত মমতা মাখিয়ে বলে: ওঠ, লক্ষ্মীটি, দেরী ক'রো না।…হি ইজ নাইস্! রিয়ালি নাইস্!

তোমরা যাও: খাণ্ডেলওয়াল ইতস্তত করে।…অনেক কাজ আমার।

আই'ম সরি: ক্লিটন ঘাড় নাড়ে।

অপেক্ষা না ক'রে খাণ্ডেলওয়াল উঠে যায় পাশের ঘরে।

সুরেখা আর দ্বিতীয় কথা বলে না। একবার তির্যক দৃষ্টিতে খাণ্ডেলওয়ালের মুখপানে চেয়ে পোষাকের ঘরে গিয়ে ঢোকে স্যুট বদলাতে।

একা বসে ক্লিটন চাবির চেনটা ঘুরিয়ে আঙুলে জড়ায় আর খোলে। কেমন একটা থমথমে নীরবতা যেন মুহূর্তে ওদের মাঝখানে ব্যবধানের কালো যবনিকা টেনে দিয়েছে।

ক্লিটনের কানে রিমঝিম করে সুরেখার মিষ্টি কথার তরঙ্গগুলো: হি ইজ নাইস্!…রিয়ালি নাইস্।…বটে, শি ইজ মোর নাইস্!…এ চার্মিং লেডি।

দীর্ঘক্ষণের জমাট-বাঁধা নীরবতা দু'পায়ে ঝন ঝন ক'রে ভেঙে দিয়ে সুরেখা চঞ্চলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মালাবারি সিল্কের ফিকে জাফরানি শাড়ির আঁচলটা পিঠের ওপর উড়িয়ে: এক্সকিউজ মি, মিস্টার ক্লিটন। অনেক-ক্ষণ বসিয়ে রেখেছি; না?

নো—নো: ক্লিটন চোখ ভরে চেয়ে থাকে সুরেখার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে।

হাল্কা সাক্সন রক্তের আওতায় সুরেখার নিটোল দেহটা যেন প্রদীপের শিখার মত দপদপ ক'রে জ্বলে। সুরেখা জানে কেমন করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পুরুষের মনে নেশা ধরাতে হয়। জানে, কেমন ক'রে হাতের কাছে থেকেও নাগালের বাইরে নিজেকে ধরে রাখতে হয়। তাই পুরুষের চোখে সুরেখা পুরানো হয় না।

স্পীড! ম্যাক্সিমাম স্পীড দেবে আজ মিস্টার ক্লিটন। বেঁচে থাকা মানেই স্পীড। তার চেয়েও বেশী স্পীডের ভিতর দিয়ে মরণকে আমি চাই। যে স্পীডে নিজেকে ধরে রাখা যাবে না। উল্কার বেগে ছুটে গিয়ে ছিটকে পড়বো এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে। একদল মানুষ হাহাকার করবে, আর একদল কাড়াকাড়ি করবে বিবস্ত্র দেহটা নিয়ে।

ক্লিটন হাসে। বাঙলা বলতে না পারলেও, সুরেখার কথার তাৎপর্য বুঝতে ওর অসুবিধা হয় না।…হাসির রাশ টেনে প্রশংসা মিশিয়ে বলে: এ ডিনামিক ফোর্স! এ্যান্ এমবডিমেণ্ট অব প্লেজার!

কথাগুলো খাণ্ডেলওয়ালের কানে যায়। কিন্তু কোন উত্তর সে দেয় না। নিজেকে যেন জোর করে বেঁধে রাখে হিসাবের খাতায়।

খাণ্ডেলওয়াল!

খাণ্ডেলওয়ালের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে সুরেখা বেরিয়ে যায় ক্লিটনের সঙ্গে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে বয়কে ডেকে বলে: বাবুকে সময়মত খাইয়ে দিও। ফিরতে আমার দেরী হবে।···হয়তো আজ না ফিরতেও পারি।

কথাগুলো কেটে কেটে বললেও সুরেখা যেন ইচ্ছা ক'রেই ছুঁড়ে দেয় খাণ্ডেলওয়ালের ঘরের দিকে।

তবুও নিস্তব্ধ। কোন শব্দ নাই, কোন প্রত্যুত্তর নাই।

ওরা বেরিয়ে গেল।

ক্লিটনের পেশিতে পেশিতে কেমন একটা উন্মাদনা। সুরেখার শিরা-উপশিরায় চঞ্চলতা। চঞ্চলতা ওর সহজাত স্ফূরণ। নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচতে ও জানে না। পারে না একটী মুহূর্তও গতিহীন হয়ে থাকতে।

ঝড় বয়ে যায় খাণ্ডেলওয়ালের জীবনে। ব্যবসায় মন্দা পড়েছে। চারিদিকে দেনা, পাওনাদারের ভিড়। ফাটকার খেসারৎ মিটাতে অনেক টাকার হুণ্ডি কেটেছে চোপরার কাছে।

সুরেখা সেই যে বেরিয়েছে ক্লিটনের সঙ্গে ডায়মণ্ড-হারবার ভ্রমণে, তারপর আর বাড়ী ফেরেনি।···তিন-চার-পাঁচ-ছয়···একে একে সাতটি দিন কেটে গেল। চোপরা মাঝে মাঝে ওদের খবর নিতে আসে। ওর প্লাস্টিক কারখানার নতুন পরিকল্পনা মাঝপথে বাধা পেয়েছে ক্লিটনের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে খাণ্ডেলওয়ালের মুখপানে চেয়ে চোপরা জিজ্ঞেস করে: পেয়েছ কিছু খবর?

না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে খাণ্ডেলওয়াল প্রসঙ্গটার মোড় ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে: লোহার বাজার বহুৎ মন্দা। কালসে—

খাণ্ডেলওয়ালের মনের অবস্থা যে চোপরা বোঝে না, তা নয়। তবুও কথাটাকে ফিরিয়ে এনে বলে: মানে দেও।···এক্সিডেণ্ট হয়নি তো?

নেহি: দ্বিধাহীন কণ্ঠে খাণ্ডেলওয়াল জবাব দেয়।

চোপরা অপেক্ষা করে না। বিদায় নিয়ে চিন্তিত মনে বেরিয়ে যায়।

বুধবার সকালে ব্যস্তসমস্তভাবে চোপরা এসে উপস্থিত হলো একখানা টেলিগ্রাম হাতে। কাশ্মীর থেকে ক্লিটন তার করেছে পনের দিনের ছুটি চেয়ে।

দেখিয়ে: চোপরা টেলিগ্রামখানা এগিয়ে ধরলো খাণ্ডেলওয়ালের দিকে। কিন্তু খাণ্ডেলওয়াল হাত বাড়ালে না। চোপরার মুখপানে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললে: প্রেজারট্রিপ।

তাই। তবে প্রেজারটা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকলে হয়।

চোপরা হাসে, কিন্তু খাণ্ডেলওয়ালের হাসি কেমন যেন শুকিয়ে ওঠে তাড়ার কাছাকাছি এসে। ভালো লাগে না। একতিলও আর ভালো লাগে না ওর। সুরেখা আজ চিতি সাপের মত দেহ জড়িয়েছে ওর গলায়। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ওর সারা অন্তর ছটফট করে সুরেখার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। কিন্তু সে মুক্তির পাশ সুরেখার হাতে। খাণ্ডেলওয়ালের হাতে নয়। সে নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে পারে সুরেখা নিজে। খাণ্ডেলওয়াল ইচ্ছা করলেও ছিঁড়ে ফেলতে পারে না তার বন্ধন। বোয়া কনস্ট্রিক্টার!

খাণ্ডেলওয়াল চেয়েছিল বিয়ের একটা দলিল রেজে-ষ্ট্রারি করতে। কিন্তু সুরেখা রাজী হয়নি। একই সোফায় পাশাপাশি ব'সে মাথাটা খাণ্ডেলওয়ালের কাঁধে হেলিয়ে দিয়ে বলেছিল: যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে ঠিকেদারি করতে আমি রাজী নই।

ঠিকেদারি! তার মানে?

টম্! এই সামান্য কথাটুকুও বোঝ না?

খাণ্ডেলওয়াল সত্যি বোঝেনি। খুকুর মত তীক্ষ্ণতা তার ছিল না। হয়তো ভাবতেও জানতো না সবকিছু, সুরেখার মত ধারালো বুদ্ধি নিয়ে।

আধফোটা পদ্মের মত ঠোঁটের পাপড়িদুটো মেলে ধরে সুরেখা বলেছিল: তিন আইনের বিয়ে মানে তো কনট্রাক্ট। আইনের ফাঁসে দেহকে হয়তো বেঁধে রাখা যায়। কিন্তু মনকে বাঁধা যায় না।

খাণ্ডেলওয়ালের মন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল। ওর

সবটুকু অস্তিত্ব যেন মুহূর্তে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সুরেখার বাসিতে।···বেক্-থা!

খাণ্ডেলওয়ালের আঙুলগুলো হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে সুরেখা নিষ্পলক চোখে চেয়েছিল খাণ্ডেলওয়ালের মুখপানে।

ওদের বিয়ে হয়েছিল হিন্দুমতে। খাণ্ডেলওয়াল না জানলেও, সুরেখা ভালো করেই জানতো যে, বাঁধন ছিঁড়বার সুযোগ খাণ্ডেলওয়ালের কমে গেল অনেক-খানি। কিন্তু সুরেখার কোনদিনই অসুবিধা হবে না ওকে দূরে সরিয়ে দিতে।

পুরানো কথাগুলো তোলপাড় করছিল খাণ্ডেলওয়ালের মনে।

অনেকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে চোপরা বললে: পনের-দিনের ছুটি। তোরা টেলিগ্রাম আসবে বোম্বাই থেকে। তারপর?

চোপরার কথায় উত্তাপ ছিল না। তবুও যেন মুহূর্তে চনচন করে উঠলো খাণ্ডেলওয়ালের মগজটা। ক্ষণকাল নীরব থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে: শেষ টেলিগ্রাম আসবে লণ্ডন না-হয় অষ্ট্রেলিয়া থেকে। নয়া একটা কিরিঙ্গি বাঁশ জমাবে আবার।

সমবেদনার এক টুকরো পাতুর হাসি খেলে গেল চোপরার মুখে। খাণ্ডেলওয়ালের পিঠে হাত রেখে ঘাড় নেড়ে বললে: কুছ পরওয়া নেই ভাইসাব।

চোপরা বসলো না। টেলিগ্রামখানা পকেটে ভরে নমস্কার জানালো খাণ্ডেলওয়ালকে।

হাত দুটো তুলে খাণ্ডেলওয়াল অভিবাদন করে উঠে দাঁড়ালো। অজস্র কথা এসে ভিড় করেছিল ওর মনে। কিন্তু বলা হলো না। কেমন একটা গুরুভার জড়তায় কণ্ঠস্বরটা যেন রুদ্ধ হয়ে গেল।

শনিবার বিকেলের ডাকে খাণ্ডেলওয়ালের হাতে এসে পৌঁছলো সুরেখার একখানা চিঠি। চিঠি সে আশা করেনি তা নয়। তবুও যেন আজ সে সইতে পারছিল না সুরেখার এই চিঠি। চিঠি নয়, এ হয়তো ডিনারের শেষে বাসি পাউরুটির একটা টুকরোর মত এক কণা করুণার দান সুরেখা ছুঁড়ে দিয়েছে পিছনের জানালা দিয়ে। খাণ্ডেল-ওয়ালকে সে করেছিল অনুগ্রহ। সেই অনুগ্রহের বোঝা আজ দুঃসহ হয়ে উঠেছে খাণ্ডেলওয়ালের কাছে।

অনেকবার নাড়াচাড়া ক'রে চিঠিখানা হাতে নিয়ে খাণ্ডেলওয়াল এসে দাঁড়ালো বাইরের বারান্দায়।

সূর্য তখন মহানগরীর সৌধকিরীট অতিক্রম ক'রে সীমান্ত রেখায় নেমেছে। প্রাসাদের গা ছাড়িয়ে দীর্ঘায়তন ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে পথে ও ফুটপাতে। কর্মশ্রান্ত মানুষগুলো পিঁপড়ের মত পিলপিল ক'রে বেরিয়ে আসে বিবর ছেড়ে।

খাণ্ডেলওয়াল চিঠিখানা খুলে ধরলো চোখের সামনে। ···হাঁ। চিঠি সুরেখাই লিখেছে। হাতের লেখার ছাঁদ কোথাও এতটুকু বদলায়নি। ঠিক তেমনি আছে আগা-গোড়া। বদলে গিয়েছে শুধু সুরেখা নিজে। তিল তিল করে সরে গিয়েছে তার নাগালের বাইরে।···নাগাল! নাগাল কি সে পেয়েছিল কোনদিন! সুরেখা হয়তো দুদিনের জন্যে করেছিল অনুগ্রহ। সে অনুগ্রহ পেয়ে খাণ্ডেলওয়াল হয়েছিল ধন্য। কৃতার্থ হয়েছিল ওর সারা অন্তর। কিন্তু আজ?

না-না-না।···বদলায়নি রেখা। বদলাতে সে পারে না। খাণ্ডেলওয়ালের জন্যেই তো সে ছেড়েছিল তার আত্মীয়-স্বজন সমাজ।···ক্লিটনকে হয়তো তার ভালো লাগে। ভালো লাগে চঞ্চলতা। তাই মাঝে মাঝে ক্লিটনকে যার দমকা বাতাসে হেলোনিয়াসের ফুলছড়ির মত। নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে না?

ক্লিটন! সেন্‌সিবল্ লোক হলে করতো না এই ছেলেমানুষি। কিংবা সুরেখার কোঁককে সে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সুরেখা ঝড়ের ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ক্লিটনকে গন্ধমাতাল পতঙ্গের মত। অপরাধ সুরেখার নয়। ক্লিটনেরও হয়তো ছিলনা কোনও দোষ।

রেখা লিখেছে। লিখেছে আনন্দের উচ্ছ্বাসে মনের কপাট খুলে। অস্বীকার তো সে করেনি খাণ্ডেলওয়ালকে!

লিখেছে: আমি জানি, জানি তুমি কষ্ট পেয়েছ অনেক। মনে তোমার ঝড় বয়ে গেছে আমায় নিয়ে। তবু এ-কথাও জানি যে, আমার ওপর রাগ করে থাকতে তুমি পারো না। আমি দূরে সরে এলে তোমার প্রতিটী মুহূর্ত শূন্যতায় ভরে ওঠে। বাইরের জগতে তোমার অটল

প্রতিষ্ঠা থাকলেও গৃহে তুমি একাকী অচল ; শিশুর মত অসহায়।

তুমি তো জানো। পথের নেশা যখন পেয়ে বসে, নিজেকে ধরে রাখতে আমি পারি না। দূর আমাকে হাতছানি দেয়। পিছনের টান শিথিল হয়ে আসে। মনে হয়, বাতাসে ছড়িয়ে দিই নিজের সবটুকু অস্তিত্বকে। ভেসে যেতে ইচ্ছা করে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি কোনদিন।

ডায়মণ্ডহারবারের পথ আমার চেনা। হাজার বারের আসা-যাওয়ায় পুরাণো হয়েছে তার প্রতিটি বাঁক, গাছ-পালা, মানুষ-জন, পশু-পাখী। তাই বাড়ী থেকে বেরিয়েই ক্লিটনকে বলেছিলাম গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে। আমারই ইচ্ছায় গাড়ী ডায়মণ্ডহারবার রোড না ধরে ধরেছিল এসে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড।···তারপর ! তারপর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে হাজির হয়েছি ভূস্বর্গ কাশ্মীরে।

মিস্টার ক্লিটন বিদেশী লোক। অদ্ভুত ভদ্রতাবোধ ! এতখানি পথ পাশাপাশি বসে এসেছি। কিন্তু একটী মুহূর্তের জন্যেও বিব্রত বোধ করিনি। নিতান্ত সংজ্ঞভাবে সঙ্গ দিয়েছেন বন্ধুর মত। ঢালু পথে নামবার সময় স্পীডের ওপর যে কয়েকবার গাড়ী ব্রেক করতে হয়েছে, মিস্টার ক্লিটনই বিব্রত হয়েছেন আমার অসাবধানতায়। মিষ্টি হেসে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সতর্কতার সঙ্গে।

অভিমান করে যেন নিজেকে অবহেলা ক'রো না। সুখদেওকে অনেকদিন বলেছি—শিখিয়েছি তুমি কি ভালোবাসো আর বাসো না।

এখানে এসে উঠেছি একটা হোটেলে। একই ঘরের দুপাশে দু-খানা স্প্রাং কট। সারাদিন ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের অপূর্ব রূপ আর প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ দেখে। ভুলে যাই বাইরের পৃথিবীটাকে। রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহর কাটে নানা কথায়। ক্লিটন বলে তার ছেলেবেলার কথা —ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের ইতিহাস। আর আমি বলি আমার স্কুলের কথা, কলেজ জীবনের কাহিনী। বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়ে কাটে সারাটি রাত।···গিয়ে শোনাবো তোমায় রাত্রি-দিনের গল্প।

চিঠিটা শেষ করা হলো না। চোখের সামনে অক্ষর-গুলো যেন কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে গায়ে গায়ে জড়িয়ে যায়। অসমাপ্ত চিঠিখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে খাণ্ডেলওয়াল শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

রাস্তার ওপারে সুদীর্ঘ গাছটার ডাল-পালায় নেমেছে সন্ধ্যার ছায়া। পথের আলো তখনো জ্বলেনি।

চায়ের পেয়ালা হাতে বয় এসে দাঁড়ালো খাণ্ডেল-ওয়ালের পাশে। সন্তোষের সঙ্গে ক্ষণকাল মুখপানে চেয়ে থেকে বললে : বাবুজি, চায় পানি।

নেহি : ক্ষিপ্রপদে খাণ্ডেলওয়াল সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কটকটা পার হয়ে নীচে এসে দাঁড়িয়েছে শিপ্রা—মিস্ শিপারিণ···পিছনে বালকদল। ক্রমশঃ

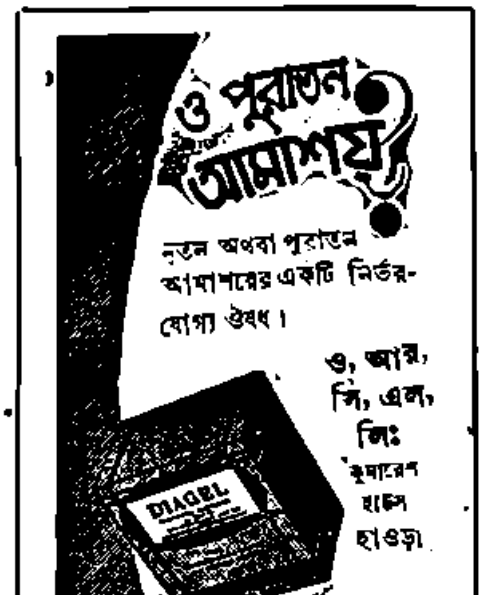

মাতৃ-বাৎসল্যের রূপায়ণে কবিশেখর

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর প্রবাহে কবিকুলের মধ্যে যিনি আজও বাংলার কাব্য-জাহ্নবে বনস্পতির ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়া আপনার স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিতেছেন, রবীন্দ্র প্রভাবিত হইয়াও যিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত, যাঁহার কবিতায় ক্লাসিকাল গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে পল্লীর সেফালির শুচিশুভ্র মাধুরী ও কমনীয়তা প্রকাশিত—তিনি হইতেছেন অনায়াস ছন্দ-মাধুর্য্যের অধিকারী কবিশেখর কালিদাস রায়। কবিশেখর একান্তভাবেই মাতৃ-বাৎসল্যের কবি।

বাংলাদেশ মাতৃ বাৎসল্যের দেশ। এদেশের সাহিত্যের একটি ধারা যশোদা, দেবকী ও শচীমাতার অন্তর হতে পুষ্ট হইয়া চিরধারা বন্যার ন্যায় উৎসারিত হইয়াছে। এই ধারাই মাতৃ-বাৎসল্যের ধারা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে এই প্রবাহই পুষ্টতর দান করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'মহিলা' কাব্যগ্রন্থে মাতৃগুণ রচনা করিয়াছিলেন। তারপর দেশমাতৃকার আবির্ভাবের পর রক্ত-মাংসের গর্ভধারিণী মানবী মাতার কথা কবিতায় আর বড় দেখা যায় না। দেশ-জননীর মহিমা কাব্য-সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভারতীয় সাহিত্যের কোন ধারাই বাদ পড়ে নাই—কাজেই অনেক রচনায় মাতৃ-মমতার কথা আছে—তবে প্রাধান্যলাভ করিবার অবসর পায় নাই।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল মল্লিকের রচনায় মাতৃ-বাৎসল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরে আর কোন কবি কবিতায় জননীকে তাঁহার প্রাপ্য-আসন দেন নাই। অবশ্য কবিশেখরকে বাদ দিয়াই এ কথা বলিতেছি। এ যুগের কবিগণ নিশ্চয়ই মাতৃভক্তি বর্জিত হন নাই—নিশ্চয়ই মাতৃপ্রেমে প্লাবিত। কিন্তু কই, বাৎসল্য-রসের কবিতা তো তাঁহাদের লেখনীতে প্রসব করে না!

এ যুগে একা কবিশেখর কালিদাস রায় জননীর মহিমা ও মাধুর্য্যকে কবিতায় একটি প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করিব—অন্য কাহারও জন্য না হউক বাংলার মায়ের জন্য।

কবিশেখর মাতৃ-জীবনের শুচিস্নাত শুচিতার কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

সন্তান যিনি যান, জননীর কালীঘাটে
পড়ক লুটায়;
পুত্র তাঁরা রয় যাক, কমলা যাঁহার নিজে
বিরাজেন তায়।

'মাতৃস্তব' নামক কবিতায় বলিয়াছেন—

সন্তা তোমা ছেলে যদি কেহ
হবে সে জননী ছাড়া কেহ নয়। মা'র পূণ্য স্নেহ
নিখিলের পরিধিরে করিতেছে তোমার চরণ
সন্তানে সোহাগ তার সে ত প্রভু তোমার স্মরণ।
একই নিয়ম, বিধি প্রকৃতির এ বিশ্বভুবনে,
সঞ্চারিছে শুভ-ধারা স্তনে তার; শুক্তি ধারা বনে।

* * * *

সন্ত্রাস যাহার নাই এ সংসারে সেই তোমা ভোলে।

কবিশেখর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'র ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন—

স্বর্গে যা' নাই তাও মিলিয়াছে। মায়ের স্নেহ
পেয়েছি দেখায় অগাধ, অবাধ, অপরিমেয়।
দেখা বৎসলা ধরণী শ্যামলা বক্ষ চিরি'
অন্ন বিলিছে রেখেছে যাঁহারে আঁচলে ঘিরি'।
প্রকৃতি মা দেখা ভরি' ফুলে ফল ফুলের ডালা,
কণ্টক-ব্যথা সহিয়া কণ্ঠে পরায় মালা।
দেখা নদী মাতা দহি কত্তার উপল-পীড়া
আমারি জীবন জুড়াতে সতত স্নিগ্ধ নীরা।
গগন-জননী ধরে ধরণী—প্রতি দিঠে
অবিরল দেখা মাতৃ-মমতা ঝরিছে নিশে।
মাতৃ-মহিমা-মণ্ডিতা দেখা সরস্বতী
জ্ঞান জীবনের পথে দিয়াছেন উর্ধ্বগতি।
স্বর্গে যে মোর মর্ত্যজননী দিয়াছে জিতে,
সেই কোন ছোট, স্বর্গের লোভ নেই এ চিতে।

এইরূপ মাতৃত্বের Pantheism তাঁহার বহু কবিতাতেই মিলে। রবীন্দ্রনাথের পর মাত্র বন্ধুবরের মাতৃ-মাধুর্য্য কবিশেখরের কবিতায় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 'ধরণীর প্রতি' কবিতার কিয়দংশ ইহার সাক্ষ্য হিসাবে তুলিয়া দিই—

লক্ষ লক্ষ যুগ ধরি রে জননি এই বক্ষে তোর
আমা-আত্মজ মোর।
বার বার ফিরে এসে ঝাড়িয়েছি তোর অঙ্কাগার
সেই আর-জন্মে জন্মে হলো কি-মা পর্বত পাহাড়?
বার বার শুষিয়াছি তোর স্তন্যধারা
সে শোষণ রচিলাকি শুষ্ক তাল বালুর সাহারা?

* * * *

আনন্দ দিয়েছি তোরে শিশু হবে। কত মা সবার
তাদের হাসে তা'ও মিথ্যা নয়।
তাইই স্মৃতি মা কি তোর মাঝে মাঝে মনে জেগে উঠে?
তোমাকিয়া কয় তুণ, তাই বুঝি ফুল হ'য়ে ফোটে?

* * * *

বহুদিন জমা দীর্ঘশ্বাস তোর মুক্তি পেয়ে
কাল বৈশাখীর রূপে আসে বুঝি ধেয়ে।
গেলাম বিদায় নিয়ে-যায় যায়। হায়, তারি লোকে
অবাধিত অশ্রু-ধারা ঝরেছে ও চোখে।
তোর চোখ-ঝরা সেই লবণাক্ত জল
মহাসিন্ধু হ'য়ে বুঝি তোদের ঘেরি' করে টলমল?

আর একটি কবিতায় জননী বহুন্ধরার মাতৃরূপ কী অপূর্বই না ফুটিয়াছে! মাতা বসুধা-কবিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—বৎস, ধূলোকলে আলো-করা কুসুমবন দেখেছ, তটিনী-বক্ষে পদ্ম ভরা লক্ষ তরণী দেখেছ, সোনার ধানে ভরা প্রান্তর দেখেছ, 'কলকাতায় অযুত আত্ম-কলহীদল দেখেছ—দূর বিসর্পে সিরিজীতে আমার এলায়িত কুন্তল দেখেছ; কিন্তু বহুযোজন জুড়ে যে মরুভূমি ধূ ধূ করছে, গিরিশিখরে যে চির হিমানীর ভার, তা' তো দেখনি; আফ্রিকার রবিকরদাহী বালুকা-সংকুল ধনভূমি দেখনি—

সেথনি অগ্নিসিরির কটাহ বিদীর্ণ আলাবনে
যেথা অবিরত পড়ছে গোয় 'লাভা' হ'য়ে দ্রুত গলে।
দেখেছ মায়ের-হাসিমুখ আর হাতের বাজনী-খানি,
শিয়রে গুরু, পেরের অন্ন শুনেছ সোহাগ-বাণী।
দেখনি মায়ের ক্লান্ত করুণ নয়ন দীপ্তি-হারা।
দেখনি মায়ের শুকানো বয়ন-লুকানো প্রপাত-ধারা।
ভরে ভাবনায় কত উদ্বেগে পরাণ তাহার জ্বলে,
রহিতেছে, তার আরাম-বিরাম দাবানলে সাতাঁরলে।
জানো বৎস কেবল তোমার হাসিমুখখানি দেখে
আনন্দময়ী লেজেছে জননী সকল বেদনা ঢেকে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমি বলিয়াছি—বাংলাদেশ মাতৃ-বাৎসল্যের দেশ। কবি-গুরুই অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'মেনকা' কবিতায়—

মা মেনকা হিমাদ্রিরাজ হিমালয়ের রাণী। কিন্তু মা হইয়া বড় দুঃখিনী। একমাত্র পুত্র বৈনাক ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে শিশু বয়সে অকাল মৃত্যু লইয়াছে। একমাত্র কন্যা উমা শ্মশানবাসী ভিখারী শিবের করে অর্পিত। বৎসরে মাত্র তিনটি দিনের জন্য উমা মাতৃ-গৃহ আলো করে। বিজয়ার পর নয় মাস অতীত হইলেই মা মেনকা আর অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারেন না—তাই বাংলার বর্ষা মাসে, তাই ৺ হৈমবতী নব-নবীতলিতে বন্যা আসে। মেনকার অশ্রুধারাই বাংলাদেশকে মাতৃ-বাৎসল্যে—তার স্রোতধারে পরিসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

ব্যথা তোমার ভিজালো সব মাতার দুখর বসুমুমে,
জননীরা চমকে দেখে বক্ষে ছেলে খাচার চুমে।
মাহুমি যার নেই মা কাছে
কেমনে আজ সেই মা বাঁচে?
অশনিঘাত—পাষাণ যে আজ হ'য়েছে তার চোখের ঘুম।
শিয়রে আজ সকল ভুলের মাতৃকেশর বসুধুমে।
পক্ষিমাতা বুকের পাখায় পাখকগুলি আগলে রাখে।
গর্ভাধানে বলাকা যায়, পাখী প্রসব-ব্যথার ডাকে।
নীল জননীর চিত্ত ফুটে
অমৃতে তার বিশ্ব উঠে
মক্ষীমাতা অনন্তাণ্ড বংশধারার অঙ্ক চাকে
আপনি রয়ে বঞ্চিত সে প্রাণের মধু সঞ্চি' রাখে।
অশ্রু তোমার বন্যা-বুকেও দিল অকাল-শুষ্ক এসে
সব যা হঠাৎ সব-মেয়েরে অঙ্কে টানে আপন মেয়ে
সুরভারা বিড়াল ছানায়
বুকে ফেলে আদর জানায়
পুজারিণী স্নেহের বলে সোপাসকে লয় বক্ষে টেনে
অশ্রু তোমার বসুন্ধ-বুকেও দিল স্নেহের বন্যা এনে।

কবি শেষে বলিয়াছেন—

গঙ্গাজলের ছোলো লোনা নয়ন-ঝরা তোমার স্নেহে।
এমন সেল মৃন্ময়ী মায়ের কথা।

কবি বাংলাদেশের পানে তাকাইয়া বলিয়াছেন—এ যে মায়ে-ভরা দেশ। মাতৃরূপে অম্বা, লক্ষ্মী, যষ্ঠী, সরস্বতী, চণ্ডী, ধরসা, ক্ষিতমা ইত্যাদি দেবীরা নারা দেশে পূজা পাইতেছেন—কে বলে মাতৃকাদিগের সংখ্যা বোলটি?

'মাতৃরূপে কেবা শুধে করে লেয়?'—পরিজন মহিলাদিগের বেশির ভাগ—মায় বৌমা পর্যন্ত সবই ত মা। কবির নিজের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

ওতদিন বড় মোর হয়নি ডানা
কাকীমার নীড়ে ছিনু কোকিল-ছানা।

শেষে কবি বলিয়াছেন—

যেন মা হারার শিশু আমাতে রাজে—
আমি যেন শত শত মায়ের মাঝে।
সব শেষে এক মায়ে কবির প্রণাম,
অন্তিমে যার কোলে চির-বিশ্রাম।

কবি বলিয়াছেন মায়ের মমতার শক্তি অলৌকিক। 'মরীচিকা' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন "পল্লীর জননীরা আপনাদের মমতাও আহুতি সংশ্লেষিত করিয়া বটতলের একটা পাথরে দেবতাকে জাগাইতে পারে।

"এ পাথরে কেন্দ্রীভূত শতেক মায়ের-বৎসলতা,
পাথরকে যে গলিয়ে ফেলে জননীদের শুশ্রূষা।
সভার প্রাণের আকিঞ্চনে দেখেছে যে হারিয়ে শুকে
মোদের চোখে পাষাণ বটে, মরীর মনি ওদের চোখে।

ভাত্রীকে কবি মাতৃ-রূপ দিয়াছেন "ভাতৃরূপী এসো" কবিতায়। ভাতৃ

তাহে-প্রকৃতির চারানো মেহে। হারিয়ে-যাওয়াকে ফেরার উদ্দেশে যা বলিতেছেন—

টৌপর-পানার পুকুর ভ'রেছে কোনখানে নেই ভাঙা
জলা বলে মনে হয় ডালগুলো, জলে মনে হয় ডাঙা।
ভুলে ভরা সব কোথায় ফেলিতে কোথায় চরণ পড়ে
এ হেন দুপুরে খোকা মাকো ঘুরে ভাইরাণী এলো ঘরে।
ঘন বাড়ন্ত আখের পাহারে আলিপথ গেছে ঢেকে
কাঁকড়া, শালুক, মাছ, বাঘে-ভরা বালী মেয়ে এঁকে-বেঁকে।
আজ পাইকেতে হাটা চুকে যায়, মন যে কেমন করে,
কাঁদিছে শালুকী, আদরিণী মেয়ে ভাইরাণী এলো ঘরে।

ওরদিনে কবি যাঁর গর্ভধারিণীকে স্মরণ করিবার পর পল্লী জননীকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

তুমি পল্লী জননীরে, যার দুঃখ-যাদু
জীবনী-পাখের রূপে দিলপক্ষি, দিল মীড় গাদু।
স্নেহের ছায়ায় রাখি পালালে যে মায়ের অসুখ
দ্বিগুণ লড়িয়া ব্যাধ অনায়িষ্ট—হৈহিক সুখ।

পল্লী পরিত্যাগ করিয়া নগরে শিক্ষিত হইয়া অনেকেই পল্লী-জননীকে ভুলিয়া যায়। কবি পল্লী জননীর এই ব্যথাকে একটি কবিতায় রূপায়িত করিয়াছেন—

নদী যা মামী হইলে ছেলে জননী হয় খুশী
পরম তার মনের কোনে খোপনে রাখে পুষি।
পথটি চেয়ে বসিয়া থাকে একলা নদী তীরে
যায় কি বাধা ঘরের ছেলে যদি না ঘরে ফিরে।
যেখানে থাক থাকুক সুখে জননী শুধু ঘাচে
অনেক জানা লভিয়া সে যে মানুষ করিয়াছে।
তবু যে হায় শুনিতে চায় না ব'লে ডাকটিরে
পুছে না বাধা ঘরের ছেলে যদি না ঘরে ফিরে।

বহু বৎসর পরে পল্লী জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া গিয়া কবি বলিয়াছেন—

ভাঙা বাঁশি জোড়া দিয়ে বীণা ফেলে তাই নিয়ে
ফিরিয়া এলাম
বহু অপরাধ ক্ষমা স্নেহ ভরে কর ক্ষমা
লও মা প্রণাম।

কবি শুধু জন্মভূমিতে নয়, জন্মমুখেও মাতৃত্বের আরোপ করিয়াছেন—ধূলমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

হে ধূল জননী বসুমতী
যেন জননীর মতোই মা তুমি ভবিষ্যতে অভিনন্দনীয়া।

এইবার গর্ভধারিণী মানবী মাতার কথা। এই স্নেহবিহ্বলা জননীকে কবি নানারূপেই দেখিয়াছেন।

কিশোরীর প্রথম সন্তানের জন্ম হইলে মাতৃহৃদয়ের বিস্ময়ের অবধি নেই। বেদনাহরণ হইতে বিমুক্ত চন্দ্রের মত অমের ঘরে শিশুর আবির্ভাব—ইহার চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু আর কি আছে। কবি সেই অনুভূত-পূর্ব বিস্ময়কে মাতৃ মুখে ভাষা দিয়াছেন—

মেয়ে এলি এমরাতে সুধা নিয়ে এলি সাথে
ধরে বুকে স্বর্গীয় রূপ,
মাঝ পথে দেহে মনে ছিলি কোথা সংগোপনে
এ দেহ যে বিস্ময়ের কূপ।
বিস্ফারিত দু'নয়ন বিস্ফারিত এ জীবন
পুলকিত এ স্পন্দিত হৃদয়,
ধন্য লভে সার্থকতা মূর্তি ধরি! এ কি কথা
অলৌকিক এ কি এ বিস্ময়।

সন্তানের রোগশয্যার পাশে ছল-ছল আঁখি করুণাময়ী স্নেহ-বিহ্বলা জননীর রূপ—

পুরি স্নেহমুগ্ধ তাঁর সচকিত নয়ন সজল,
উৎকণ্ঠা উদ্বেগে ত্রাসে ঘটাইছ স্নেহের কবল।

পুত্রাবগুণে পুত্রহারা জননীর রূপটি বড়ই করুণ—বড়ই মর্মস্পর্শী। করুণাময়ী বলিয়া জগন্মাতাকে এই শোকার্তা, পুত্রবিয়োগবিধুরা জননী আর সম্বোধন করিতে পারে না, প্রতিমার পানে সে শুধু অভিমান ভরে সজল চক্ষে চাহিয়া থাকে—

আজন্মধার পূজা বলিয়া যায় না বুঝা
বড় কষ্টে দীন আয়োজন,
জননী সংবরি' শোক এক হাতে মুছে চোখ,
আর হাতে ঘষিছে চন্দন।
আশিসিবা দিতে তা'র হাত কাঁপে বার বার
দীর্ঘশ্বাস নৈবেদ্যের 'পরে
চাহিতে প্রতিমা-পানে কাঁপে বুক অভিমানে
রুদ্ধ ক্ষোভে আঁখি জলে ভরে।

রাত্রি জাগিয়া ছেলে পরীক্ষার পড়া করিতেছে। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। সমস্ত বাড়ী—সমস্ত পাড়া নিদ্রিত। শুধু ছেলের মা জাগিয়া আছে। তাহার চোখে ঘুম আসিতেছে না। সন্তানের কষ্টে সে ছটফট করে আর ভাবে—পরীক্ষার পড়া এমনই কী জিনিস। আগে বাঁচুক তো, তবে পড়া। হায় সে নিজে কতকটা তার লইতে পারে না!

পড়িতে পড়িতে ছেলে একটুই ঘুম পেলে
পুঁথি বুকে ঘুমাইয়া পড়ে।
সন্তর্পণে মাতা গিয়া মশারিটি খাটাইয়া
দেয় ধীরে, যেন চুরি করে।

কবি বলিয়াছেন—চুরি করা ছাড়া আর কি? ছেলের ক্লান্তি হরণ-করিবারই ত এই সতর্কতা!

ভাদ্র মাসে দুঃখিনী জননী তাল-বড়া ও কাঁটালের বীচি ভাজিয়া ছেলেদের হাতে হাতে দিয়া প্রবাসিনী বিবাহিতা কন্যা উমার কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছে—'আহা উমা আমার কোলে বসে তাল বড়া খেতে ভালবাসত, সে আজ কতদূরে! ছেলেরা হাসিয়া উঠিল বলে—বড়-

লোকের ঘরে ঝিয়ে গিয়ে সে তোমার আর তালঘড়া নেতে চাইবে না।
৮. সে অনেক দামী দামী উপায়ের খাবার খাচ্ছে। তোমার কাঁটাল-বীচির তিপারিণী সে নয়।

অরুচি হ'লে যা পেয়ে তুমি গরীবের মেয়ে
জীবনেও পাওনি তা কভু,
পাঁচুমাচু মুখখানি তার সরে নাক বাণী
দুখিনী মা কয় শুধু 'তবু'—
বিজলী চমকে যেবে ঘোড়ো হাওয়া যায়-বেগে
পাল তুলে তরী যায় ভেসে
আনালার ফাঁকে চেয়ে তার সাথে যায় বেয়ে
মা'র মন কোন সুদেশে।

আর একটি মায়ের চিত্র—

নব-বিবাহিত পুত্র মা'র কাছে নবধূর মনে অবিরত নালিশ করে। নববধূ শাশুড়ীকে বলে—'সব মিথ্যে কথা মা।' বিধবা শাশুড়ী বধূকে কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ছেলের নালিশ শুনিতে থাকে। মা-জানে রসকলহের মাঝে স্নেহের চূড়ান্ত পরিচয়।

বধূরে টানিয়া কোলে বিধবা মা হাসে
উড়াইয়া দেয় নিমেষে এক দীর্ঘশ্বাসে।
ত্রিপঞ্চাশ আগেকার আপনার বধূকাল স্মরি
মধুরাম্লরসে ভরে চিত্ত উঠে ভরি।

সব চেয়ে করুণ, মর্মন্তুদ চিত্র পাওয়া যায় "মায়ের কাঁকন" কবিতায়। স্বর্গতা জননীর স্মৃতি চিহ্ন বলিয়া কাঁকন জোড়া কবি সযত্নে এতকাল রক্ষা করিয়াছিলেন—দারুণ অভাবের দিনেও তাহা বেচিতে পারেন নাই। কন্যাদায়ের সময় বেহাইয়ের হৃদয়হীন চাহিদায় কাঁকন ভাঙিয়া কন্যার গহনা গড়াইতে বাধ্য হইলেন। স্বর্ণকারের দোকানে বসিয়া কাঁকন গলাইয়া কতটা সোনা পাওয়া যায় দেখিতে হইল—

দ্বাপরের দীর্ঘশ্বাসে ভাঙা হোলো কাঠের আঙার
রক্তমেঘে চিরদিনই যেন তাহা বহ্নি-দেবতার।
পুড়িতে লাগিল স্বর্ণ—তার সাথে আমার পাঁজর,
তরল হইল স্বর্ণ, নয়নে করিল ঝরঝর
পাষাণ গলিয়া অশ্রু। ফিরিলাম গৃহে আপনার
যেন রে দ্বিতীয়বার জননীর করিয়া সৎকার।

মৃতবৎসা জননীর যেমন কবি 'গঙ্গার প্রতি' কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মৃতবৎসা মাতা গঙ্গাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছে—

একে একে সাতটি ছেলে,
দিলি জলের গর্ভে ফেলে
চিরদিনের মত গেলি একটিকে ও রেখে পতির কাছে,
তেমনি একটি বাছার রেখে
যেতে স্বামী কিম্বা থেকে
অভাগিনীর জীবন মিছে স্নেহটি যদি পতির কোলে থাকে।

যে অভাগিনী নারী মা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিল না, কবি তাহার আক্ষেপ মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আজকাল বন্ধ্যা নারীকেই সবচেয়ে ভাগ্যবতী মনে করা হয়। সন্তান একটা উপসর্গ। কবি যেকালে বন্ধ্যার খেদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেকালে নিঃসন্তান হওয়ার অপেক্ষা বড়দরের দুর্ভাগ্য আর ছিল না। আজকাল বন্ধ্যা নারীর স্বামী নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করে। জানি না বন্ধ্যা নারী আজকাল কি মনে করে! সে-কালের পার্থিব জীবনের পরিবেশে কল্পনায় নিজের চিত্তকে স্নেহবশ করিলে এ কবিতার রসবোধ সম্ভব হইবে। বন্ধ্যা নারী খেদ করিয়া বলিয়াছে—

আমার নারী-জীবন-চূড়ার যাওল নাক চড়া রে
শূন্য আমার মধুর সিংহাসন
বলো না হায় গৃহে আমার কিশুক বাছির ঝংকারে
বাল-গোপালের সাদর আমন্ত্রণ।
ধূলায় কাদায় গড়াগড়ি অনেক ঘরে যাহারা,
ছেলের আলায় হচ্ছে আলাতন।
যাদের ঘরে টাঁই মোটে নাই, ভাত জোটে না তাহাড়া
তাদের ঘরেই পাঠাও অগণন।
চায় না যারা তাদের ঘরেই পাঠাবে আর কত বা
একটি দিয়ে পুরাও আমার সাধ
একটি যা-হোক কালো, খাদা, টেরা, কটা অথবা
সেই হবে মোর মাণিক সোণার চাঁদ।

শরণী মা'র অঙ্কে ভূমিষ্ঠ হইয়া পল্লী জননীর স্নেহের অঞ্চল-ছায়ায় জননীর শুভ বুদ্ধে ও পিসীমা-কাকীমাদের স্নেহে মানুষ হইয়া যাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছেন, বাংলা ভাষা-জননী যে-কবির কণ্ঠে তীর্থ-বাস করেন—আজ বার্ধক্যে যিনি মাতৃকাগণের সেবা লাভ করিতেছেন, তিনি শেষ মাতা সুরধনীর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

পূর্বপুণ্যে তোমার পুলিনে জন্মেছি যবে বঙ্গদেশে,
আছে যা তরল পঙ্ক মুইয়া অঙ্কে তুলিয়া লইবে শেষে
তব সিকতায় মা'র মমতায় অমল শয়ন পাতিয়া রেখ,
তারক-ব্রহ্ম নাম দিও কানে জননী আমার শিয়রে থেক।
ইহ জীবনের শেষ সম্বল চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
তব তীরে নীরে কৃমিকীটও তরে যায় শুনে,
মোরে দিও তা দিও।

বাংলা সাহিত্যে দুইজন মাতৃসাধক।—বাৎসল্য রসের দিক হইতে কথা-সাহিত্যে চির-স্মরণীয় মরমী মরমী শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর কাব্যসাহিত্যে বঙ্গভারতীর স্নেহাভিষিক্ত বরপুত্র কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—এই দুই জীবন-শিল্পীর তুলনা নাই।

ভুতোদা বনাম আফিসের মেয়ে

বিমল আর বিমল হয়েছে। উৎফুল্ল হয়ে চুকলেন ঘরে।

ভুতোদা: ছাই ছাই কালে কালে কি হোল!

বিমল: আবার কি হোল?

ভুতোদা: জানিস আমাদের ছোটবেলায় বড়লোকের বাড়ীর যে মেয়েদের পাকা শুদ্ধ নদীতে ডুবিয়ে আনা হোত যাতে মুখ কেউ না দেখতে পায়। আর এখন ধুড়োধাড়ী মেয়েরা সব আপিসে কাজ করে বেড়াচ্ছে?

বিমল: তাতে আপনার হোল কি?

ভুতোদা: আমাদের বন্ধুপুরের কেলো এখানে এক সদাগরী আপিসে কাজ করে। কাল গিয়েছিলাম দেখা করতে।

চোকার মুখেই এক বয়স মেয়ে আধুনিকা পথ আটকালো। ইংরাজীতে চটাং চটাং করে কি বলল।

Ill. 407A-X6E BG

আমি বললাম "মা লক্ষ্মী আমাদের কেলোর সঙ্গে একটু দেখা করব।" অনেক বোঝানোর পরে বললে "ও, মিটার রে—আপনার স্লিপ পাঠান।" চেয়ারে ঠ্যাং তুলে একটু আরাম করে বসেছি বলে—"ঠিক করে বলুন। আপিসটা কি বাড়ীঘর পেয়েছেন?"

বিমল: ঠিকই তো বলেছে!

ভুতোদা: কাচকরা মেয়েদের আমি চোখে দেখতে পারিনা। ওদের বাড়ীঘরে মন থাকেনা। শুধু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো আর চটাং চটাং ইংরিজী বুলি।

বিমল আর বিনয়ের একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি হয়ে গেল। ভুতোদাকে আর একবার জব্দ করা যাবে।

বিনয়: ভুতোদা, আজ তো রবিবার। চলুননা আমার পিসে মশায়ের বাড়ী। গড়পারের ওদিকটা আপনার দেখা হয়ে যাবে আর আলাপ পরিচয়ও হবে।

ভুতোদা: তা যাব এখন।

বিকেলে গড়পারে বিনয়ের পিসের বাড়ীতে ভুতোদা বিমল আর বিনয়।

বিনয়: এই যে ভুতোদা, আমার পিসতুতো বোন মিলি। ও একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে।

ভুতোদা (অপ্রসন্ন): চাকরী করে? তা বেশ, তা বেশ

মিলি: কেন চাকরী করা আপনি পছন্দ করেননা?

ভুতোদা: (ভয়পেয়ে): না, না, কেন করবনা। তবে মা আমরা বুড়ো মানুষ। মেয়েদের ঘরের কাজকর্ম করাই পছন্দ করি।

মিলি: (মুখ টিপে হেসে) ও এই কথা!

বিমল: মিলি আমাদের খাওয়াবিনা?

মিলি: নিশ্চয়ই।

মিলি যত্নে মেজে পরিষ্কার করে সবাইকার আসন পেতে খাবার পরিবেশন করল। ভুতোদা অবাক হয়ে দেখছিলেন। হাবভাব দেখে তো ঘরের লক্ষ্মীই মনে হচ্ছে!

বিমল: (আড়চোখে তাকিয়ে) ভুতোদা, চাকরী করা মেয়ে। কাছে যাবেন না। কামড়ে দিতে পারে।

ভুতোদা: থাম্।

খেতে বসে

ভুতোদা: খাবার তো অনেক করেছো মা। মাছের কাল, মাংস, আলুপটলের ডালনা।

ঠাকুর রেঁধেছে নিশ্চয়ই।

মিলি: না, বাড়ীর রান্নাবান্না আমিই করি।

ভুতোদা: তা বেশ। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। এতো খেতে পারবনা। কিছুটা তুলে রাখো।

মিলি: খানই না আপনি। না খেতে পারলে পাতেই রেখে দেবেন।

ভুতোদা: বাঃ বাঃ খাসা স্বাদ হয়েছে তো। নাঃ পাড় আর কিছু খাওয়না। আর একটু ডালনা দাওতো। কি দিয়ে রেঁধেছ মা? তেল তো মনে হচ্ছেনা!

বিমল: কি দিয়ে আবার। 'ডালডা' দিয়ে।

ভুতোদা: (চটে)—আবার রসিকতা করছিস?

মিলি: না সত্যিই খাবার দাবার সব 'ডালডায়' করি।

ভুতোদা: আমি তো জানতাম ভাজাভুজি কিছুই 'ডালডায়' হয়!

মিলি: না সব রান্নাই 'ডালডায়' ভাল হয়।

বিনয়: শেষ শেষ ভুতোদা। শেষে চাকরী করা মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হোল।

ভুতোদা: আহা, আমাদের মিলিমা তো একজন। আরো যে হাজার হাজার মেয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে এমনটি—

মিলি: না ভুতোদা, মেয়েরা চাকরি করে জীবনযাত্রা স্বচ্ছল করার জন্যেই। বাড়ীর কাজেও তারা কোন অংশে খারাপ নয়।

বিমল: ভুতোদা, এবার কি সব চাকুরে মেয়ের বাড়ীতেই খেয়ে দেখবেন নাকি।

DL. 467B-X62 BO

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

মেয়েদের কথা

নারী শুধু গৃহিণীই নয়

সুপ্রিয়া ঠাকুর

মেয়েদের আজকাল শুধু অন্দরমহল নিয়ে থাকলেই চলে না। বাইরে তো যেতেই হয়, এমন কি প্রয়োজন বোধে অনেককে আবার চাকরী-বাকরী ইত্যাদি করে রোজগারের চেষ্টাও করতে হয়। অতএব ঘরের বাইরেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করা বিশেষ দরকার। আর তাই যদি করতে চান, তাহলে আগে আপনার বন্ধু এবং বান্ধবী মহলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। কারণ, তাঁদের সাহায্য এবং সহযোগিতাই যে আপনার বেশী করে দরকার। তাঁরাই তো আপনাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। নূতন নূতন সুযোগের সন্ধান এনে দেবেন। আপনার বন্ধুরা যদি আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হন তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে আপনার সুখ্যাতিও করবেন। এমনি ভাবেই আপনার পরিচিতের সংখ্যাও যেমনই বাড়বে তেমনই আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষেরও সংখ্যা বেড়ে যাবে। এইটুকু লাভ করতে পারলেই দেখবেন যে তার পরের ব্যাপারগুলো অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই আপনার হাতে মুঠোয় এসে যাচ্ছে।

এবার নীচের উপদেশগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে যান এবং এইগুলিকে অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা আপনার নিজের চরিত্রে স্থান করে দিন।

নিজের জ্ঞান জাহির করবেন না।

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্ প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "সারা জীবন ধরে এই জ্ঞানই অর্জন করলাম যে এত বড় বিশ্বের কিছুই জানতে পারলাম না।" কথাটা সক্রেটিসের বিনয়ের নয়। তাঁর অন্তরের কথা। বেশী নয়, যে কোন একটা বিষয়েও মানুষের পক্ষে পুরো-পুরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, অথচ আপনার আমার মত সাধারণ মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে সব সময় বেশী জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান মনে করে থাকি।

যাঁর কাছে নিজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞানের পরিচয় আপনি দিতে গেলেন, তিনি কিন্তু দেখলেন আপনার ভেতরের অহঙ্কারটাই এবং আপনার ওপর বিরূপ হয়ে গেলেন। কেন বলুন তো? আপনার নিজের কথা বলতে বলতেই যে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির অভিমানে আপনি ঘা দিয়ে বসে আছেন। অতএব জ্ঞান লাভ করে যান। কিন্তু কারও কাছে তার দর্শনীয়তাকে কখনও প্রকাশ করবেন না।

অযাচিত উপদেশ দেবেন না।

এই চলতি কথাটা বোধহয় নিশ্চয়ই জানেন: পয়সা দিও তবু আক্কেল দিও না। আক্কেল বলতে এখানে অযাচিত উপদেশের কথাই বলা হয়েছে। না হলে আপনার কোন বন্ধু বা আত্মীয় সমস্যার মধ্যে পড়ে আপনার কাছে উপদেশ চাইতে এলে, দেবেন না! নিশ্চয়ই দেবেন, কিন্তু যখন তখন "এটা করো না।" "ওটা ভাল নয়।" "এমন ভাবে চলো।" "দুনিয়াটাকে চেনা এত সোজা নয়" ইত্যাদি যা আমরা সাধারণত বলে থাকি, কখনও কাকেও এমনিভাবে বলে উপদেশ দিতে যাবেন না। আপনি তাঁদের ভালর জন্যেই বলছেন সত্যি, কিন্তু তাঁরা আপনাকে এড়িয়ে চলতে থাকবে। এমন কি আপনার অসাক্ষাতে অন্যের কাছে, "বড় জ্ঞান দেয়" বলে আপনাকে ঠাট্টাও করবে। তবে কি আপনার কোন বন্ধুকে ভুল বা অসৎপথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা পর্যন্ত করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন, এ সব ব্যাপারে কল্পিত দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলেই সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যায়,

অর্থাৎ তাঁকে এই ধরণের একটা গল্প বলতে হবে যে আপনার কোন বন্ধু ওই পথে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কি নাস্তানাবুদটাই যে হয়েছেন তা আপনি নিজে চোখে দেখেছেন। তাই আপনার এই বন্ধুটিকে ঐ পথে যেতে দেখে আপনি ভয় করছেন। মোট কথা আপনি যে তাকে উপদেশ দিচ্ছেন একথা যেন সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে। কারণ সমপর্যায়ের লোকের গুরুগিরি আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। মনে হয় ও খুব ঘুরন্ধার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওঁর চেয়ে আমিও কম বুঝি না।

তর্ক এড়িয়ে চলুন।

যখনই কোন বিষয়ে কারও সঙ্গে আপনার মতের মিল হল না দেখলেন, তখনই সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অন্য কথায় চলে আসার চেষ্টা করবেন, কারণ তর্ক করে পুরোপুরি জয়লাভ কখনও করা যায় না। হয় আপনি তর্কে হারবেন, না হয় আপনার বন্ধুটিকে হারাবেন। আপনার জোরাল যুক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ত আত্মসমর্পণ করলেন এবং পরাজয়ও স্বীকার করলেন। আপনি সবারই কাছ থেকে বাহবাও পেলেন। কিন্তু আপনার বন্ধুটি তো বিরূপ হয়ে গেলেনই, সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও আপনাকে এরপর থেকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। আপনার সঙ্গ তাঁদের কাছে আর মনোরম হবে না। তাঁদের এমনই একটা ধারণা হয়ে যাবে যে আপনি কথায় কথায় বড় তর্ক করেন। তার চেয়ে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকেই জয়ী হতে দিন। যদিও আপনি মনে-প্রাণে জানেন যে তাঁরই ভুল হচ্ছে—তবুও সেই ভুলটাকেই আপনি এই বলে মেনে নিন: "দেখ, আমারই হয়ত ভুলও হতে পারে। তার চেয়ে ব্যাপারটা ভালভাবে জেনে নেওয়া যাক চল", কিংবা তাঁকেই বলবেন যে বিষয়টা তিনিই যেন আর একবার জেনে নিয়ে আপনার এই ভুলটাকে সংশোধন করে দেন। দেখবেন, তাঁর প্রেস্টিজকে এমনি ভাবে মেনে নিলেন দেখে তিনি তো আপনার ওপর খুশী হবেনই, তারপর যখন আবার নিজের ভুলটা জানতে পারবেন, আপনার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে অনেক গুণ।

ভুল ধরলেন না।

ভুলে যাওয়া বা ভুল করা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই পড়ে। এমন মানুষ কি আছে যিনি বলতে পারেন যে জীবনে কখনও ভুল করেন নি। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মত কর্মিষ্ঠ লোকও নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে তাঁর সারাদিনের কাজের মধ্যে শতকরা ৭৫এর বেশী ভাগ কখনও তিনি নির্ভুল করে উঠতে পারেন নি।

"এই সামান্য ব্যাপারটুকুও জান না?"

"তোমার যে এটা ভুল, তা আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি।"

"তোমার থেকে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী।"

"আরও পড়াশোনা করা জানতে পারবে।"

সাধারণত এই ধরণের কথা বলেই আমরা অন্যের ভুল সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এমন সব কথা আপনি কখনও যেন আপনার কোন বন্ধু বা বান্ধবীকে ভুলেও বলবেন না। এতে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। অতএব আপনার প্রতি বিরূপ হয়ে যাবেন। সত্যি সত্যিই যদি তাঁদের কোন ভুল আপনি সংশোধন করিয়ে দিতে চান তাহলে তাঁকে মোটেই জানতে দেবেন না যে আপনার উদ্দেশ্যটা কি।

এই ধরণের কথাগুলো অনেক সময় খুব সুফল দেয়।

(ক) এটা করার সময় বুঝি খুব অন্যমনস্ক ছিলে? না হলে তোমার মত লোকের এমনটা হয় না।

(খ) আমার মনে হয় এমনিভাবে করলে হয়ত আরও ভাল হবে।

(গ) এটার সম্বন্ধে কেমন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছে না?

আর একটা জিনিষ খুব বেশী করে লক্ষ্য রাখবেন যে তিনি যেন আপনার কোন কথার সূত্র ধরে তর্ক করার সুযোগ না পান।

স্পষ্ট বক্তা হবেন না।

অনেককে এই কাজটি করে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেখা যায়, তাঁদের ধারণা এটা একটা বিশেষ বীরত্বের কাজ। "আমি অত কারও খাতির রাখিনা। সোজা কথা বলতে আমি একটুও ভয় পাই না।" এই সব

বলে বেশ গর্বও অনুভব করেন, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব নষ্ট করতে এবং বন্ধুস্থানীয়দের শত্রু করে তুলতে এর চেয়ে সহজ পথ আর নাই। অতএব যে কাজ করলে আপনি একে একে সকলের অপ্রিয় হয়ে উঠবেন, তেমন কাজে গর্ব করার তো কিছু নাই-ই—বরং আপনি অসামাজিক হয়ে উঠছেন বলে তাহা লজ্জার কথা। সত্যি কথা বলতে,যারা নিজের মতামত কৌশলে প্রকাশ করতে পারে না তারাই স্পষ্ট বক্তা হয়ে নাম কেনার চেষ্টা করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত নামের বদলে বদনামই কেনেন সবটুকু।

মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না।

বন্ধু-বান্ধবদের উপকার করতে পারেন, খুবই ভাল কথা। না পারলেও তেমন কিছু এসে যায় না, কিন্তু আপনি যা পারবেন না এমন কোন কাজ, করে দেবেন বলে তাঁদের আশা দেবেন না। এতে আপনার আশায় বসে থেকে তিনি হতে আর অন্যভাবে চেষ্টা করলেন না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। সাময়িক ভাবে আপনার উপর তাঁর শ্রদ্ধা হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার উপর তাঁর আর বিশ্বাস থাকবে না। আপনার অন্য বন্ধুদের কাছে আপনি বড় বাজে কথা বলেন, বলে তাঁদেরও বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারেন।

কথার খেলাপ করবেন না।

এ দোষটি অনেকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, খুব সতর্ক থাকবেন, কাজেও কোন কথা দেওয়ার আগে খুব ভাল করে ভেবে-চিন্তে তবে দেবেন। এতেও অন্যের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস চিরকালের জন্য হারাতে হয়।

টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবেন।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে টাকা-কড়ির লেন-দেন যত কম করতে পারেন তাই ভাল, করলেও সোজা-সুজি এবং খোলাখুলি ভাবে আপনার সুবিধা-অসুবিধা এবং সমস্যার কথাগুলি সময় থেকে বলে দেবেন।

বক্তার চেয়ে শ্রোতা হোন।

আপনার কৃতিত্ব বা আপনার দুঃখ সমস্যা তাঁদের কাছে না বলে প্রথমেই আগ্রহের সঙ্গে তাঁদেরগুলি শুনুন। কারণ, আপনার কিছু শোনার চেয়ে তিনি তাঁর নিজেরটি বলতেই বেশী উৎসুক। দেখবেন, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই আপনার কথাগুলিও জানতে চাইবেন। অনবরত আপনি নিজের কথাই বলাতে তাঁদের বিরক্তি আসতে পারে। ফলে আপনার সঙ্গ তাঁরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।

কারও হৃদয়-আবেগে বাধা দেবেন না।

বন্ধুদের প্রেম-প্রীতি বা স্নেহ-ভালবাসার ব্যাপারে, তা অসামাজিক বা অন্যায় হলেও সোজাসুজি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। এমন কি আপনার বিরুদ্ধ মতবাদ পর্যন্ত প্রকাশ করবেন না। কারণ, মানুষের এই হৃদয়-আবেগ কোন ন্যায়-অন্যায় বা যুক্তিতর্কের ধার মোটেই ধারে না। কেমন জানেন? ঠিক খরস্রোতা কোন নদীর একগুঁয়েমির মতই মানুষের এই হৃদয় আবেগ। মুখোমুখী একটা বাঁধ দিয়ে তার গতিকে প্রতিরোধ করতে গেলে, সে শতগুণ শক্তিশালী হয়ে তা ভেঙ্গে তছ্‌নছ করে দিয়ে চলে যাবে। এমনকি আশপাশের তীরের ক্ষতিসাধন করতেও ছাড়বে না। তার চেয়ে বাঁধ দেওয়ার আগেই যদি পাশ দিয়ে একটা খাল কেটে তার রাস্তা করে দেন' তবে তার গতিটাকে সহজেই ঘুরিয়ে দিতে পারবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার আসল কাজটাও অনেক সহজ হয়ে পড়বে। আপনার বন্ধুর বেলাতেও, যদি সত্যিই আপনি চান যে তাঁর কোন অন্যায় বা অসামাজিক হৃদয় আবেগে বাধা দেবেন, তবে তার আগে ঠিক অমনি একটি খাল কেটে দিন।

একজনের সামনে অন্যের সমালোচনা করবেন না।

অন্যের প্রশংসা বা নিন্দা দুটোই তাঁর মনে আপনার সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কারণ, মানুষের মন সব অবস্থায় অন্যের সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ কোনটাই সহ্য করতে পারে না, ভাল বললে হিংসে হয়। মন্দ বললে মনে করে যে আপনি হয়ত অন্যের কাছে তার নিন্দা করেন। আপনার স্বভাবটাই এমনি, তার চেয়ে ওটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

রাঙা আলুর পানতোয়া

উপকরণ—রাঙা আলু /১ সের, গোল আলু /।০, ঘি /॥০ সের, ক্ষোয়া ক্ষীর /৸ পোয়া এবং কিছু ময়দা।

প্রথমে আলু ও রাঙা আলুগুলি বেশ ভাল করে সিদ্ধ করে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দেবেন। আর উনানে ডেক্‌চিতে তিন পোয়া চিনি দিয়ে পানতোয়ার রস চাপিয়ে দিন। তারপর ময়দাগুলি নিয়ে তাতে ময়ান দিয়ে বেশ ভাল করে মিশিয়ে রাখুন, এতে কিন্তু জল দেবেন না যেন। তারপর সব আলুগুলি খোসা ছাড়িয়ে বেশ ভাল করে চট্‌কিয়ে নিন। তার সঙ্গে ময়ান দিয়ে মেখে রাখা ময়দাগুলি দিয়ে বেশ ভাল করে মাখুন। ময়দা পরিমাণ মত আন্দাজ করে নেবেন। মনে রাখবেন, আলু ও ময়দা যত ঠাসা হবে, পানতোয়া তত নরম হবে। তারপর ক্ষোয়াগুলি সামান্য জল দিয়ে মেখে নরম করে নিন। এমনি ক্ষীর হলে আর এই ভাবে মাখতে হয় না। সেইজন্য এমনি ক্ষীর হলে ভালই হয়। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি, গোল-আলুগুলি মিহিদানা আলু হলেই ভাল হয়। এইবার মাখা আলু অল্প করে হাতে নিয়ে পানতোয়ার খোল্ তৈরি করে ভেতরে ক্ষীরের পুর দিয়ে পানতোয়াগুলি আগে তৈরি করে নিন। তারপর উনানে ঘি চড়িয়ে পানতোয়াগুলি ভেজে নিন। ঠাণ্ডা হলে রসে ভিজিয়ে দিন। পানতোয়ার রস যেন খুব বেশি পাতলা না হয়। বেশ কিছুক্ষণ রসে ভিজানো থাকার পর পরিবেশন করবেন।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী

(চন্দননগর)

বাঁধন ভাঙার লাগি সাধনের খেলা

'বৈভব'

বিদায়ের লাগি এই
মিলনের মায়া—
শরতের আকাশেতে
শ্রাবণের ছায়া!

কত স্মৃতি বন্ধন
কত জনমে—
শত প্রীতি মায়া জাগে
শত করমে!

বাঁধন ভাঙার লাগি
বাঁধনের খেলা—
লীলার বিলাস লাগি
সাধনের খেলা।

ঢেউ-এর মতন উঠি
সাগরে মিলায়—
আকাশেরি পথে মেঘ
আপনা বিলায়।

ডাক্তার

শ্রীসতীরঞ্জন রায়

ঘড়িটায় তখন রাত দু'টো। বিস্মরাহত মহানাথ রোগিণীর পাশে বসে আছেন জ্ঞান সঞ্চারের আশায়। এক সময় মেয়েটির গলার দিকে তাকিয়ে মহানাথের মনে হলো, যথাসময়ে পুলিশ গিয়ে উপস্থিত হ'তে না পারলে হয়ত মেয়েটি প্রাণ আর ফিরে পেতো না। কঠিন দড়ির ফাঁস মেয়েটিকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে উঠেছিল। দুর্বৃত্তের কটুহাসির সুতীক্ষ্ণ ধ্বনি নিশেষারা করে দিয়েছিল মেয়েটিকে! তারপর একদিন কঠিন রজ্জু দিয়ে কণ্ঠরোধ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল তাকে।

কী সাংঘাতিক! হঠাৎ পাশের ঘরের ফোনটা ক্রীং ক্রীং করে উঠলো। চমক ভাঙলো মহানাথের।

কোন তুলে ধরে মহানাথ জানালো, না, এখনও মেয়েটির জ্ঞান ফেরেনি।

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানিয়ে দিলো, জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মহানাথ থমকে দাঁড়ালো। বিমূঢ় ও বিস্মৃতের ন্যায় আতাকে মহানাথ স্তব্ধ করে চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

কৃষ্ণবর্ণ স্যুট পরিহিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। চক্ষু দুটি ব্যতীত সমগ্র মুখখানি কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত। মহানাথের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অবাঞ্ছিত লোকটি দু'এক পা ক'রে অগ্রসর হ'য়ে ওরই সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

মহানাথের স্বর শিথিল হয়ে এসেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির সঙ্গোপনে কৃষ্ণবর্ণ বিভীষিকার দুরাগত পৈশাচিক মৃত্যু-বিষাণ কেঁপে কেঁপে বেজে উঠলো। বিস্ফারিত চক্ষু দুটি মেলে পুনরায় মহানাথ জিজ্ঞাসা করলো, কে?

অপরিচিত লোকটি সহসা ডাক্তারের বাম হাতটি চেপে ধরে চাপা গলায় বললে, ডাক্তার তোমাকে অনেক টাকা দেবো! সমাজে আমার যে প্রতিষ্ঠা আছে, তাকে রক্ষা কর।

ডাক্তার যেন উঠলো। উদ্‌ভ্রান্ত ঘন-কুটীল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে ডাক্তার নিজের অস্তিত্বকে যেন খুঁজে আর পাচ্ছিল না। আর একবার কিস্ কিস্ করে অপরিচিত লোকটি বললে, অনেক টাকা দেবো!—বলে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, এই প্যাকেটে ঘুমের ওষুধ রয়েছে, ঘুম পাড়িয়ে দাও।

হাত বাড়িয়ে মহানাথ ঔষধের প্যাকেট হাতে তুলে নিল। শঙ্কাহীন বিকট হাসির প্রতিচ্ছবি অপরিচিত লোকটির চোখের কোণায় কোণায়—তারায় তারায়। ঘুমের ঔষধ খাইয়ে অনেক টাকা পাওয়ার তাৎপর্য ডাক্তারের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। ভীত ত্রাস্ত ডাক্তার রোগিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মিনিট স্থির হ'য়ে রইলো। পুনরায় অপরিচিত লোকটি চেঁচিয়ে উঠলো, বল ডাক্তার, আমি তোমার অনুরোধ করছি। তুমি আমার এ উপকারটি কর। আমার কাছ থেকে এত উপকার পাবে, ডাক্তার, যা' তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

মহানাথ যেন নিজকে অনেকটা সহজ করে তুললো। সামলেও নিয়েছে সে অনেকটা। ভীত ডাক্তারের ব্লটিংএর মত সাদা মুখখানার রক্ত যেন আবার প্রবাহিত হ'তে লাগলো। ইঙ্গিতে অপরিচিত লোকটিকে বসতে বলে পাশের চেয়ারটায় আশ্রয় নিল নিজে। সহসা হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে লোকটি বলতে লাগলো, তুমি আমায় রক্ষা কর। তোমার হাতেই আমার মানমর্যাদা, সম্ভ্রম—সব কিছুই নির্ভর করছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠা আমার নষ্ট হ'য়ে যাবে।

অপলক নেত্রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ডাক্তার

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

–তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেণা

বিরাট সমস্যা! বিছানার চাদর, তোয়ালে আরও কত কি। শেষ পর্য্যন্ত মা ডাকলেন উমা আর রুমাকে ইস্ত্রী করায় সাহায্য করার জন্য। হাঁ, অনেক জামাকাপড়। কিন্তু কতটুকু সাবানই বা মা ব্যবহার করেছেন? মা সানলাইট সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচেন। এর অতিরিক্ত ফেণা বিনা আছাড়েই জামাকাপড় থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়। আপনার জামাকাপড় কাচার জন্যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন।

সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

S. 261-X53 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে প্রতৃতি।

বল্‌লো, আপনি সমাজের গণ্য ব্যক্তি। সমাজে আপনার প্রতিষ্ঠা রয়েছে। আপনার প্রতিষ্ঠার ইমারৎ দৃঢ় করবার জন্যই মেয়েটির জীবন নষ্ট করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মেয়েটি যে বেঁচে উঠবে, তা' বুঝি ধারণা করতে পারেন নি?

'তা' বুঝতে পারলে কি ডাক্তার তোমার কাছে আসি!'

লোকটার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে চিন্‌বার বৃথা চেষ্টা করে সে বল্‌লে, কিন্তু যার জ্ঞান ফিরে আসেনি, তাকে—

কথাটিকে শেষ করতে দিল না লোকটি। জোর টেনে জবাব দিল, তাকেই ত মেরে ফেলা সহজ। জ্ঞান ফেরবার আগেই আমি তাকে সরিয়ে দিতে চাই।

ডাক্তারের মনে হলো, সে যেন সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কারাবাসে আছে। বিভীষিকার ভীষণ আওয়াজ দৈ দৈ করছে, শবের বিকট উল্লাস যেন লোকটির মর্মমূল ভেদ করে এসে ডাক্তারের বক্ষে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে ডাক্তার বল্‌লো, সে কি ক'রে সম্ভব?

উত্তর শুনে অপরিচিত লোকটির মুখখানা যেন ক্রমে কঠিন হ'য়ে উঠতে লাগলো। চোখের মণি দু'টো শাণিত ফলার মত ঝল ঝল করছে। ভ্রূকুটি কুটীল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লোকটি হাতের প্যাকেটটি পকেটে পুরে বল্‌তে লাগলো, সম্ভব নয় কেন শুনি? জান, গুলি করে এখনই দুজনকে মেরে ফেল্‌তে পারি।

তারপর চক্‌চকে পিস্তলটি শক্ত হাতের মুঠিতে উঠে এলো পকেট থেকে। এমনি সময় পাশের ঘরের ফোনটিতে ক্রীং ক্রীং করে আহ্বান-আওয়াজ বেজে উঠলো। ডাক্তার ফিরে তাকালো যাবার জন্য, সেই মুহূর্ত্তে চাপা কঠিন সুরে ঘরখানা ভরে উঠলো—দাঁড়াও—বলে দ্বিরুক্তি না করে বাম হাতে ডাক্তারের ডানহাতখানা চেপে ধর্‌লো। লোকটি বল্‌লো, থানা থেকে খবর জান্‌তে চাইলে বল্‌বে—মেয়েটি মরে গিয়েছে।

'না, তা' হয় না। এক্ষুণি তা'হলে পুলিশ চলে আস্‌বে!'...

ডাক্তার ফোন তুলে ধর্‌লো। সেই থানা থেকেই খবর জানতে চেয়েছে। কথার ফাঁকে কোন কিছু জানাবার উপায় ছিল না। শুধু সে জানিয়ে দিল যে এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। ফোন নামিয়ে ডাক্তার কি ভেবে বল্‌লো, আমি আপনার কথা চিন্তা করছি।

সহসা বিহ্বল হ'য়ে লোকটি জবাব দিল, চিন্তা কর, ডাক্তার চিন্তা কর। আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দেবো। আমার মান বাঁচাও। কিন্তু ঘটনা জান্‌তে চেয়ো না। সহরের বিখ্যাত মানী ব্যক্তির মান-সম্ভ্রম যেতে বসেছে। রক্ষা কর। আমি কাল আবার রাত্রিতে আস্‌বো, দরজা বন্ধ করে রেখো না। দেখো কোন কিছুই যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। আমি কিন্তু তা হলে গুলি করতেও দ্বিধাবোধ করবো না। তবে ভাবনা নেই, আমি সঙ্গে করে টাকা নিয়ে আস্‌বো।

লোকটি আর বিলম্ব কর্‌লো না। মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ করে সামনের খোলা দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেল। বাত্যাহত বৃক্ষের মত ডাক্তার যেন বিপর্যস্ত। অপসৃয়মান গুহ্য দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনে ডাক্তার চিন্তা করতে লাগলো, পাঁচ হাজার!

ধীরে ধীরে ডাক্তার রোগিণীর হাত তুলে নাড়ী পরীক্ষা করে হাতটি আবার নামিয়ে রেখে পাশেই স্থির হয়ে বস্‌লো। এই তো অসাড় দেহ। এই দেহটাকে কেন্দ্র করেই পংকিলতার বিষাক্ত বাতাস ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। তবু পাঁচ হাজারের অনুরণন কান থেকে বুকের পাঁজর পর্যন্ত ঢিমে তালে হাতুড়ি পিটতে লাগলো। এই টাকা পাওয়া তো অসম্ভব নয়। মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত যে গিয়েছে, তাকে দুয়ারের বাইরে বসিয়ে না রেখে একেবারে ঘরে প্রবেশের প্রবেশপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই বা অপরাধ কোথায়? আজ তার অর্থের বড় প্রয়োজন। হাসপাতালের ঔষধ চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে তার চাকরী গ্যাছে। কালই তার শেষ দিন। বাড়ীতে তার চার ছেলে, দুই মেয়ে, আর তার চির-পীড়িতা স্ত্রী। এদিকে দেনার দায়ে বাড়ীও যেতে বসেছে। বিপুলায়তন সংসারের ব্যয় শুধু কি ডাক্তারি করে সম্ভব? সমস্ত কথা ভাবতে গিয়ে ডাক্তারের বুকের কোথায় যেন কাঁটা খচ খচ করে বিঁধতে থাকে। অব্যক্ত বেদনায় মুহূর্ত্ত মধ্যে

ডাক্তার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায়—পাঁচ হাজার টাকা তার চাই-ই।

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে এলোমেলো ঘুরতে লাগলো। কোথা থেকে যেন ডাক্তারি কর্তব্যবোধ সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের স্থির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলে। যার চাকরীর মেয়াদ শেষ, দেনার দায়ে বাড়ী যেতে বসেছে, পোষ্যগুলির প্রতিপালনও যার পক্ষে কঠিন, তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্তব্য কতক্ষণ আর পথরোধ করে দাঁড়াবে?

চিন্তায় ছেদ পড়লো। রোগিণী সহসা চেঁচিয়ে বললো, কে আছ, মেরে ফেললো। বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।

হতাশ্বাসে সে যেন আবার স্থির হয়ে গেল। বাঁচবার প্রবল আবেগে সে উঠে বসতে চায়, হাত তুলতে চায়, ঠোঁট দু'টোও ঈষৎ কেঁপে ওঠে। কিন্তু—

ডাক্তার ঝুঁকে পড়লো রোগিণীর দিকে! অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে বসে রইলো আর কিছু শোনার জন্য। কিন্তু শোনা গেল না, মনে হলো, আবার তার চেতনা শান্ত ও সমাহিত।

রাত কেটে গেল। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো। এর মধ্যে রোগিণীর সেই নিঃসাড় দেহে চেতনার কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার কিছু পরে ডাক্তারের এক বন্ধু এসে খবর দিয়ে গেল যে তদ্বির করা সত্ত্বেও তার চাকরী থাকবে কিনা সন্দেহ। অপরাধের গ্লানি কঠিন পাষাণের মত বুকের উপর চেপে বসে শ্বাসরোধ করে দিচ্ছিল। সমস্তই যদি তার যেতে থাকে শেষ পর্যন্ত, তবে সে নিশাচরের মৃত্যু-ফেনিল আহ্বানকে বরণ করে নেবে না কেন? দুনিয়ার সকল কর্তব্য তার সংসারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সংসারই যদি তার ব্যর্থ জীবনের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গের দোলায় ভেসে যেতে থাকে, তবে কিসের কর্তব্য—কার জন্য কর্তব্য।

অপরাধের খুলি কাঁধে নিয়ে যখন তাকে হাসপাতালের সদর দরজা পেরিয়ে যেতেই হলো, তখন আর একটা কলংক তার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে বাধা কোথায়?

ওপরে নিশা নেমে এলো হাসপাতালের ঘরে ঘরে। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের রাস্তায় রাস্তায় মাঝে মাঝে লোকের সাড়া পাওয়া যায়। দূরে অসংখ্য বৃক্ষের ছায়ার অন্তরালে পথের বিজলীবাতিগুলো যেন প্রেতিনীর মত দন্ত বিকাশ করে অট্টহাসি হাসছিল। হাসপাতালের আর একদিকের সমস্ত প্রাঙ্গণ যেন ডাকিনীর কৃষ্ণপক্ষে আচ্ছাদিত। মাঝে ট্রাম-লাইন পাতা পিচ-রাস্তার পাশে বিজলী বাতিগুলো যেন অস্পষ্ট আলোর শিখা ছড়িয়ে দিয়েছে। যানবাহন হীন নিষ্পন্দ রাস্তাটা যেন কালো চক্‌চকে সরীসৃপের মত নিদ্রা-মগ্ন। রাস্তার এপারে চেয়ারে বসে বিশীর্ণ শংকিত ডাক্তার। অন্তর তার থেকে থেকে কাঁপছে। সমস্ত আঁধার জমাট বেঁধেছে এসে যেন ঘরের ভেতরটায়, কোথাও যেন আলো নেই—সমস্ত অন্ধকার।

বিনা দ্বিধায় কৃষ্ণ-কাপড় জড়িত সেই অপরিচিত লোকটি ঘরে ঢুকে টাকার তোড়াগুলো পকেট থেকে বার করে সামনের টিপয়ের উপর রাখলো। লোকটি উজ্জ্বল চোখ দু'টো ঠিক্‌রে পড়তে লাগলো। ডাক্তারের মনে হলো, এতক্ষণ যে আঁধার সে অনুভব করছিল, সেই ঘরের দুর্ভেদ্য অন্ধকার লোকটির চোখের তীব্র জ্যোতিতে বুঝি আলোকিত হয়ে উঠলো। অপর পকেট থেকে একটা মোড়ক বার করে ডাক্তারের হাত দিয়ে বললো, আর দেরী নয়। জলের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দাও।

নির্বিবাদে ডাক্তার শক্ত কাচের গ্লাসে জলের সাথে ঔষধটি মিশিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। লোকটি ডাক্তারকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, দাঁড়ালে কেন? খাইয়ে দাও। কোথায় কখন কে এসে পড়বে।

ঔষধ মেশানো গ্লাসটি ডাক্তারের হাতে কঠিন হয়ে এঁটে গেল। কি এক দৃষ্টি যেন ডাক্তারের চোখে মুখে তপ্ত কম্‌তে লাগলো। মানবত্ববোধ যেন হঠাৎ ডাক্তারের কঠিন দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলতে লাগলো। ভুলে গেল ডাক্তার নিজের কথা, সংসারের কথা—ভুলে গেল লাভ-ক্ষতির হিসাব। কর্তব্য চিরকালই কর্তব্য। কঠিনস্বরে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো, ওখানে কত টাকা?

লোকটা চকিতে জবাব দিল, কেন? পাঁচ হাজার।

'না, ওতে হবে না। আরো পাঁচ হাজার চাই।'

'আরো পাঁচ হাজার? আগে বলনি কেন? তাই না হয় দিতাম কুকুর। বলে লোকটি পকেট থেকে সেই নিশাচরের কুটিল ভয়াল চক্‌চকে পিস্তলখানা বার করে

উঁচিয়ে ধরলো। টিপয়ের উপর থেকে কঠিন মুষ্টিতে টাকা-গুলো তুলে নিয়ে পকেটে পুরে রেখে রুখে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, বুজুর কোথাকার, লোভের তোমার শেষ নেই। নাও, এগিয়ে চল ঐ গ্লাস নিয়ে।

ডাক্তার একটু ভেবে তার মুখের দিকে তাকালো। চাপা কণ্ঠের বিকট আওয়াজ, যাও।

ডান হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে লোকটি স্থির হয়ে রইলো। ডাক্তার ধীরে ধীরে গ্লাসখানা নিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

'তাড়াতাড়ি কর।'

এক মিনিট। মুহূর্তে সমস্ত ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল। ডাক্তার বিষপূর্ণ গ্লাস কঠিন মুষ্টি থেকে সজোরে ছুঁড়ে মেরে দিল লোকটির চোখের দিকে। গ্লাসটি মুখে প্রতিহত হ'য়ে চূর্ণিত খণ্ড কয়েক চোখে বিঁধে গেল! ডান চোখের ধার ঘেঁসে কাচের খণ্ড সমূলে ঢুকে গিয়েছে। বাঁ-চোখের কিছুটা অংশও ক্ষত-বিক্ষত। মৃত্যু-বিষের সঙ্গে আততায়ীর অনাস্ত রক্তধারা নাকের উপর দিয়ে বুকের উপর এসে জমতে লাগ্‌লো।

লোকটি বিকট চীৎকার করে শুধু বলে উঠ্‌লো, শয়তান—

কাচের খণ্ডগুলি নীচে পড়ে ঝম্‌ঝম্ করে চৌচির হয়ে গেল। হাতের পিস্তলটি ছিট্‌কে পড়ে আওয়াজ হলো। সহসা ডাক্তার শব্দ করে হাঁটু চেপে ধরে কিছু দূরে গড়িয়ে পড়ে গেল। লোকটির চোখ দিয়ে তখনও দরদর ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিল। সমস্ত দেহটি তার কেঁপে কেঁপে মাটিতে পড়ে গেল।

রোগিণী তখনও নিঃসাড়ে পড়ে। এদিকে কোনও ক্রীং ক্রীং শব্দ করে চলেছে।

জিজ্ঞাসা

প্রভা দত্ত

চকিতে চলেছি আমি জিজ্ঞাসায় বলেছি উত্তর :
মনস্তত্ত্ব দীনতায় ভুগি আমি অন্ধকার প্রীতি,
রাত্রে দুঃস্বপ্নে জাগি লঘুবেগ চলেছে সত্বর
বক্ষের বিরহ নয়, বার্ত্তা তার অনন্ত সম্প্রীতি।
প্রশ্নের উত্তর নয়—মীমাংসা পূর্বে ও পশ্চিমে
খাঁড়ব দাহন শেষে সে তক্ষক লুকালো কোথায়
সেদিনের শেষ কোথা—দ্বন্দ্ব চলে সীমা ও অসীমে :
মহাশূন্যে কারাগার, বজ্রপাণি ক্ষেপণাস্ত্র ধায়।
মৃত্যুর জোনাকী জ্বলে—আলেয়াতো মনে হয় দূরে :
তবু তো জিজ্ঞাসা আজ, শক্তিশেল বুঝি লক্ষ্য ভেদে—
জীবন অরণ্যে শুধু, প্রতিধ্বনি জাগে অশ্বখুরে,
এমন শাপিল গতি, স্রোত বহে চলে কোন বেদে,
উত্তরে চলেছি আমি, জিজ্ঞাসায় বলেছি দক্ষিণ,
কল্পনা বিমূঢ় তবু, চিরকাল রবো যুক্তিহীন।

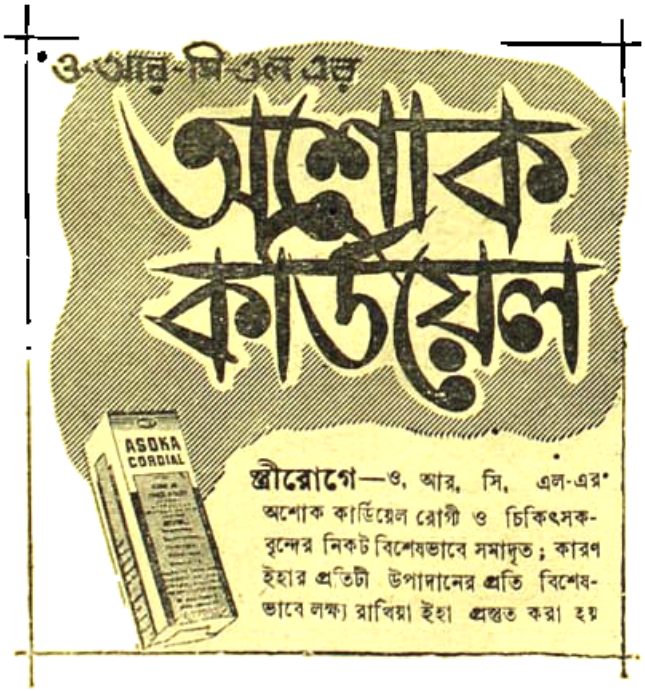

পাট ও পাঠ

শ্রী'শ'—

॥ শ্রেষ্ঠ চিত্র ॥

বাংলা চলচ্চিত্র যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, "সাগর সঙ্গমে" ও "জলসাঘর" চিত্র দুটি ১৯৫৮র শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, আবার তা প্রমাণ করল। দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "সাগর সঙ্গমে" চিত্রটিকে গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়ে এবং পুরস্কাররূপে চিত্রটির প্রযোজক পাবেন ২০০০০৲ টাকা ও পরিচালক পাবেন ৫০০০৲ টাকা। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "জলসাঘর" চিত্রটিকে গত বৎসরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে "সার্টিফিকেট অফ্ মেরিট" পুরস্কার দেওয়া হবে এবং এর প্রযোজক ১০০০০৲ টাকা ও পরিচালক ২৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাবেন।

বাংলা চিত্রের এই সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অভিনয়ের দক্ষতা ও পরিচালনার কৃতিত্ব ছাড়াও আরও একটি বিশেষ গুণে বাংলা চিত্র গুণান্বিত—এই গুণটি হচ্ছে সুলিখিত গল্প। গল্পই হচ্ছে ছবির প্রাণ। গল্প যদি চিত্তাকর্ষক হয় তাহলে সু-পরিচালনা ও সু-অভিনয়ের সমন্বয় ঘটালে সে ছবি দর্শক-মনোরঞ্জন করবেই। সুযোগ্য পরিচালক ও দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব অন্যান্য প্রদেশে না থাকলেও উপযুক্ত গল্পের বা প্লটের অভাব যে আছে তা বলা চলতে পারে। সে দিক দিয়ে বাংলা চিত্র যে সৌভাগ্যশালী তাতে সন্দেহ নেই, আর এই সৌভাগ্যের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র ঋণী ঐশ্বর্যশালী বাংলা কথা-সাহিত্যের কাছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে ও আধুনিক প্রতিভাশালী লেখক গোষ্ঠীর হাতে বাংলা কথা-সাহিত্য যে সম্পদে গরীয়ান হয়ে উঠেছে, তারই কিছু ভাগ নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। আর এই সমৃদ্ধি বাড়াতে হলেই শুধু নয়, বজায় রাখতে হলেও বাংলা চলচ্চিত্রকে আরও নিখুঁত হতে হবে সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্ববিভাগে—তবেই হয়ত দূর ভবিষ্যতে বাংলা চিত্র প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে, এই উপ-মহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে, বিশাল বিশ্বের চলচ্চিত্র বাজারে শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়ী আসন লাভ করে, বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের অনন্যসাধারণ সৃজনী শক্তির পরিচয় প্রদান করে, বাঙালী শিল্পীর শিল্প সাধনাকে সার্থক করে তুলবে।

• • • •

দেশে-বিদেশে ঃ

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরোদ বাদক আলি আকবর খাঁ বিলাতে তাঁর বাজনা শোনাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে শীঘ্রই লণ্ডন অভিমুখে রওনা হবেন। তিনি লণ্ডনের Royal Festival Hall ছাড়াও Bath শহরে এবং Oxford, Birmingham প্রভৃতি স্থানে তাঁর বাজনা শোনাবেন। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁনের এই ভ্রমণের আয়োজন করেছেন লণ্ডনের Asian Music Circle.

• • • •

বিশ্ব-বিখ্যাত ভারতীয় চিত্র "পথের পাঁচালী" নিউ-ইয়র্কের Fifth Avenue Cinema-য় ৩২ সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হয়ে ঐ সিনেমায় প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তিরিশ বৎসর আগে নির্ব্বাক যুগের বিখ্যাত জার্মান চিত্র "The Cabinet of Dr. Calligari" এই সিনেমায় ২২ সপ্তাহ ধরে চলে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল এতদিন পরে "পথের পাঁচালী" সেই রেকর্ড ভালভাবেই ভঙ্গ করে ভারতীয় চিত্রের গৌরব ঘোষণা করেছে।

• • • •

দূর প্রাচ্যের অনেক স্থানেই ভারতীয় চিত্র ভাল রকম ভাবে পরিবেশিত হলেও হংকং-এর বাজারে এর চাহিদা তেমন নেই। হংকং-এর চীনা ও ইউরোপীয় দর্শকরা ভারতীয় চিত্রের তেমন পক্ষপাতী নন। হংকং-এর একজন ভারতীয় চিত্র-পরিবেশক এর কারণরূপে মনে করেন যে ভারতীয় চিত্রের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য এখানকার দর্শকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় বলেই তারা ভারতীয় চিত্রের বিশেষ পক্ষপাতী নয়।

• • • •

ইন্দোনেশিয়ার Film Censorship Committeeর বিদেশী চিত্রের সেন্সর যে খুবই কড়া তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ছাব্বিশ জন পুরুষ ও সাতজন স্ত্রীলোক মিলে এই ফিল্ম সেন্সরশিপ্ কমিটি তৈরী হয়েছে, আর প্রায় প্রতিদিনই এই কমিটি বসে দেশী-বিদেশী চিত্রের ওপর কড়া সেন্সর আরোপ করবার জন্য। ইন্দোনেশিয় সমাজে চুম্বন প্রথার চলন নেই বলে এবং তাঁরা এ প্রথার বিরোধী বলে বিদেশী চিত্রের, বিশেষ করে হলিউডের ও ইউরোপীয় চিত্রে, স্ত্রী-পুরুষের চুম্বন দৃশ্যগুলি বাদ দিয়ে দেন। এমন কি সিনেমার পোষ্টারেতেও ঐ রকম কোনও দৃশ্য দেখাতে দেওয়া হয় না। নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও ধর্ম্মীয় মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব সেন্সর আরোপ করা হয়। গত বৎসর এই কমিটি ১৮৭টি চিত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর মধ্যে ছিল ১২৭টি মার্কিণ, ১১টি ব্রিটিশ, ৭টি ফৈনিক, ৬টি ফিলিপিনো, ৪টি মালয়ান, ৪টি ফ্রেঞ্চ, ৪টি জাপানী, ২টি ভারতীয়, ৩টি ইতালিয়ান ও ২টি পাকিস্তানী।

• • •

অবক্লাঅবক্ল ঃ

গত ১লা বৈশাখ পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, আকাডেমির (সঙ্গীত ভবন) নব ভবনের উদ্বোধন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে জানান যে ১৯৬৮ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক উৎসবে এই সঙ্গীত আকাডেমিকেই কেন্দ্র করে এবং এর সম্প্রসারণ করে, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। সে দিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত বিভাগের কার্য্যের উচ্চ নিদর্শন ও যোগ্য শিক্ষা পদ্ধতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। নাট্য-বিভাগে সর্ব্বাধিনায়করূপে আছেন শ্রীমহীন্দ্র চৌধুরী এবং নৃত্য বিভাগ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়কত্বে ও বিখ্যাত অধ্যাপকগণের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে।

• • • •

ব্রহ্মদেশের সমাজ ও জীবনের পটভূমিকায় লেখা শরৎচন্দ্রের "ছবি" নামক গল্প অবলম্বনে 'ইন্দো-বর্ম্মা ফিল্ম কর্পোরেশন'-এর নির্ম্মিত, গল্পের নামেরই চিত্রটি ব্রহ্মদেশে ও ষ্টুডিওতে শুটিং শেষ করে মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন বালা সিন্‌হা, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায় প্রভৃতি।

• • • •

'শ্রীমতী পিক্চার্স'-এর নূতন চিত্র "ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত"-র কাজ ভাগলপুরে আঞ্চলিক শুটিং এর মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য্য ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, আর শ্রীকান্তের ভূমিকায় সজল ঘোষ, ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় পার্থপ্রতীম চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ অভিনেতার সাক্ষাৎও এই চিত্রে পাওয়া যাবে।

• • • •

নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের জনপ্রিয় নাটক "ক্ষুধা"-কে 'এইচ্-এন্-সি প্রডাক্সন্স' চিত্রে রূপায়িত করছেন। চিত্রনাট্য রচনা নাট্যকার নিজেই করেছেন এবং পরিচালনা ভারও তিনিই গ্রহণ করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য ভূমিকায় থাকবেন ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, তরুণকুমার প্রভৃতি। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব সম্ভবত তাঁর বহু-প্রশংসিত 'সদা'-র ভূমিকায় দেখা যাবে।

• • • •

বিদেশী অবক্ল ঃ

হলিউডে অনুষ্ঠিত 31st. Annual Motion Picture Academy Award প্রদান অনুষ্ঠানে এবার দু'জন ব্রিটিশ তারকাকে 'Oscar' পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে,—এই দু'জন হচ্ছেন বিখ্যাত অভিনেতা David Niven ও অভিনেত্রী Wendy Hiller. এঁরা দু'জনেই Terence Rattigan-এর "Seperate Tables" চিত্রে অভিনয় করে বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা পার্শ্ব-অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করলেন।

৪৯ বৎসর বয়স্কা প্রখ্যাতা অভিনেত্রী Susan Hayward-এর বহু দিনের স্বপ্নও সার্থক হয়েছে এবার,—তিনি শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে Oscar পুরস্কার লাভ করেছেন "I Want to Live" চিত্রে অভিনয় করে। "The Big Country" চিত্রে অভিনয় করে ব্যালে গায়ক Burl Ives শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছেন।

চলচ্চিত্রের মধ্যে সঙ্গীত মুখর রঙ্গিন চিত্র "Gigi" শ্রেষ্ঠ চিত্রের পুরস্কার লাভ করা ছাড়াও নয়টি বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার লাভ করে প্রায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

• • • •

রুশ সম্রাজ্ঞী Catherine the Great-এর উত্তরাধিকারী তথাকথিত "পাগলা রাজা" ("Mad King") Czar Paul I-এর নাটকীয় জীবনী চিত্রে রূপায়িত হবে Yul Brynner ও Anatol Litvak-এর যুগ্ম প্রযোজনায়। Yul Brynner Czar Paul-এর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। চিত্রটি ১৯৫১ সালে মৃত রুশ লেখক Dimitry Merezhkovsky-র লেখা নাটকের অংশ অবলম্বনে নির্ম্মিত হবে।

• • • •

মাঃ ডি. ফার্নাণ্ডেজ প্রযোজিত ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'সোনার হরিণ' ছবির একটি প্রণয়-মধুর দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও জীবেন বসু

শিল্পীর কথা

'গানের ফুলে যে হার গাঁথি'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা। ময়মনসিং শহরের নামে একখানা সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীর মালিক মনোরঞ্জন ঘোষদস্তিদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধরণীরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার তখন ও অঞ্চলের একজন নামকরা শিকারী। রাইফেল ও রিভলবার নিয়েই তাঁর কাজ। বাড়ীতে ছিলনা সংগীতের কোনরূপ চর্চা। কিন্তু ধরণীবাবুর হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হোল, তিনি কিনে নিয়ে এলেন ভাল একটি হারমোনিয়াম। বাড়ীর সবাই অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, হারমোনিয়াম দিয়ে কি হবে? কে শিখবে গান? ধরণীবাবু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমার প্রথম সন্তান ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক, তাকে শেখাবো গান, আর এজন্যই আনি কিনেছি হারমোনিয়াম। তাঁর উত্তর শুনে হেসে উঠলেন সবাই। কিছুদিন পরে এক শুভ মুহূর্তে একটি কন্যাসন্তানের আবির্ভাব হোল। সবার আদর আর যত্নের ভেতর দিয়ে শিশুটি বেড়ে উঠতে লাগল দিন দিন। তার বয়স যখন মাত্র দু'বছর তখন সে খেলার সামগ্রী ভেবে হারমোনিয়ামের কাছে গিয়ে তার ছোট ও নরম আংগুল দিয়ে চেপে ধরতো রিডগুলো। সশব্দে বেজে উঠতো হারমোনিয়াম, আর শিশুটি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠতো মনের আনন্দে। খেলার নানাবিধ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও, পূর্বজন্মার্জিত সাধনা আর সংস্কারের ফলেই হারমোনিয়ামের আকর্ষণই সেই ছোট মেয়েটীর কাছে প্রবল হ'য়ে উঠেছিল শিশুকাল থেকে।

১৯০৩ সাল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ তখন বাঙলাদেশকে ক'রে তুলেছে চঞ্চল; বাঙলার আকাশ-বাতাস মুখর হ'য়ে উঠেছে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। দলে দলে বাঙালী হাসিমুখে কারাবরণ করছে। বঙ্গে তাদের দুর্জয় সাহস, দৃষ্টিতে তাদের অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা। দেশের বিভিন্ন স্থানে রোজই প্রায় অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে সভা, গড়ে উঠছে কত সমিতি। ময়মনসিং শহরেও এই আন্দোলনের ঢেউ তীব্র হ'য়ে ওঠে তখন। সেখানে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় সভা আর সম্বর্ধনা উৎসব। এই সব অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্যে সাদর আহ্বান আসে সেই মেয়েটীর কাছে। তখন তার বয়স মাত্র ছ' বছর। কিন্তু এরই মধ্যে শান্তিনিকেতনের শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কাছে সে শিখেছে কয়েকটী স্বদেশী গান। জনসভায় সেই ছোট্ট মেয়েটী যখন টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে 'নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা', 'সোনার বাঙলাদেশ', 'বন্দেমাতরম্', প্রভৃতি গান গাইত উদাত্তকণ্ঠে, তখন সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতো তার গান, বিস্মিত হ'ত বালিকার সংগীত-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে। সেদিনকার সেই ছোট্ট বালিকাটি আর কেউই নয়, ইনি হ'চ্ছেন বাঙলা তথা সারাভারতের সর্বজনপ্রিয় সংগীত-শিল্পী, সুরের নিষ্ঠাবতী পূজারিণী কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার।

তখনকার দিনে মেয়েদের মধ্যে সংগীত শিক্ষা আজ-কালের মত এত প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু তবুও বিজন কয়েকখানা মাত্র গান শিখে সভা সমিতিতে গাইলেও তাঁর সংগীত শিক্ষার পরিসমাপ্তি যে সেখানেই হ'তে পারে না—একথা তাঁর পিতৃদেব ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য ক'রেছিলেন সংগীতের প্রতি বিজনের গভীর অনুরাগ, মুগ্ধ হ'য়েছিলেন তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের অপূর্ব সুরঝংকারে, বিস্মিত হ'য়েছিলেন তাঁর সংগীত-প্রতিভায়।

ময়মনসিং শহরে তখন একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ছিলেন। নাম ছিল তাঁর ললিত মোহন সেন। সেন মহাশয়ের পেশা ছিল কবিরাজী, কিন্তু নেশা ছিল সংগীতে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি মার্গসংগীতের তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাধক।

কাকা অবনীরঞ্জন একদিন বিজনকে নিয়ে গেলেন ললিতবাবুর কাছে। সবিনয়ে তিনি পেশ করলেন তাঁর ভাইঝিকে গান শেখাবার প্রস্তাব। ললিতবাবু মৃদু হেসে বললেন যে তিনি কাউকে কখনো গান শেখান না। তা'

ভিন্ন, মেয়েদের গান শিখিয়েও কোন লাভ নেই। কারণ, সংগীত অত্যন্ত সাধনার বস্তু। মেয়েদের পক্ষে ধৈর্য ও একাগ্রতাসহকারে সে সাধনা করা সম্ভব নয়, সহজসাধ্যও নয়। উত্তর শুনে অবনীবাবু হ'লেন নিরুৎসাহ, বিজনের আশায় উৎফুল্ল মুখখানার উপর নেমে এল বিষাদের ছায়া। বালিকার ম্লান মুখখানা লক্ষ্য ক'রেই বুঝি আঘাত পেলেন সাধক। তিনি তখন আগ্রহভরে বললেন, একটা গান শোনা তো মা, দেখি তুই কি রকম গাইতে শিখেছিস! গান গাইলেন বিজন—অতি মধুর ও দরদীকণ্ঠে। মাত্র সাত-আট বৎসরের বালিকার গানের সুর-ঝংকার ও মূর্চ্ছনায় বিস্মিত হ'লেন সুর-সাধক। আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে তিনি বললেন, আমি তোকে গান শেখাবো। সংগীতে তোর রয়েছে একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, অসামান্য প্রতিভা।

এরপর থেকে ললিতবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্ন-সহকারে তাঁর শিষ্যাকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। উচ্চাংগ সংগীতের দুর্গম সাধনার পথে বিজনও এগিয়ে যেতে লাগলেন ক্রমে ক্রমে বিপুল উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে।

এদিকে স্কুলে ভর্তি হ'য়েও বিজন নিয়মিত পড়াশুনা করতে থাকেন। এ সময়ে তাঁর কাকারা শুধু যে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন তা নয়, ময়মনসিং শহরে তাঁদের বাড়ীর নীচতলাটায় জেলা কংগ্রেস অফিস স্থাপিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে উক্ত বাড়ীটি হ'য়ে ওঠে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটী কর্মকেন্দ্র। ঐ সময়ে শরৎ বসু, প্রফুল্ল ঘোষ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বহু দেশপূজ্য কর্মীর শুভাগমন হয়েছে এ বাড়ীতে। এর ফলে, আট-ন' বছরের বালিকা বিজনের মনও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, স্বাধীনতার সুর এই বালিকার মনকেও ক'রে তোলে চঞ্চল।

উক্ত শহরে 'গুপ্ত সমিতি' স্থাপন ক'রে একদল বিপ্লবী যুবক তাদের কাজ চালাতে থাকে সংগোপনে। হাতে তাদের মারণাস্ত্র, চোখে তাদের বিদ্রোহের আগুন। বাঙলার সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানদল অনেক সময় বালিকা বিজনকে দিয়ে অনেক কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নিয়েছিল তাঁর অজ্ঞাতসারে। ললিতবাবুর ভাই ধীরেন্দ্র মোহন সেন মহাশয়ের নিকট বিজন নানারূপ ব্যায়াম, ছোরা ও লাঠি খেলা ইত্যাদি শিখতে থাকেন।

নানা কাজের মধ্যেও বিজনের সংগীত সাধনা কিন্তু এতটুকুও হয় নি ব্যাহত। ললিতবাবু তাঁর এই শিষ্যাকে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রায় ৭০টী রাগের ধ্রুপদ, খেয়াল ভজন, তারানা, চতুরংগ প্রভৃতি শিক্ষা দেন।

একবার তাঁর গুরু ললিতবাবু ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে পড়েন কঠিন রোগে। অসহ্য যন্ত্রনায় তিনি অস্থির হ'য়ে পড়েন। তখন তিনি ডেকে পাঠান বিজনকে। বিজন

কুমারী বিজন ঘোষ দস্তীদার

এলে তিনি বলেন, পূর্বজন্মে তুই ছিলি আমার মা। মা কাছে না থাকলে সন্তানের কি কখনও খাওয়া হয়, না ঘুম আসে? আমার মনে হয়, তোর গান শুনলে রোগ-যন্ত্রনা আমার কমে যাবে। শিষ্যা তখন গান আরম্ভ করলেন। সে গানের সম্মোহনী শক্তি গুরুর রোগ-যন্ত্রনা দিল দূর করে, চোখে এনে দিল ঘুম।

খুব অল্প বয়স থেকেই বিজন রেডিওতে গান গাইতে সুরু করেন।

এগারো বছর বয়সে তাঁর একটী আধুনিক গান রেকর্ড করা হয়। ঐ গান খানার বহু রেকর্ডও বিক্রী হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁর খেয়াল, রাগপ্রধান, ভজন, গজল, কীর্তন, শ্যামা-সংগীত প্রভৃতি অনেকগুলো গানের রেকর্ড করা হয়। নজরুল ইসলামের রচিত শ্যামাসংগীতও তিনি নিজস্ব সুরে রেকর্ড করেন। এ ভাবে অল্পদিনের মধ্যে বিজনের নাম-যশ ও সম্মান বাঙলা দেশ পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে।

১৯৩৮ সালে বিজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩৯ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্যে সংগীত সিলেবাস অনুসারে খুব সহজ পদ্ধতিতে রেকর্ড করেন একটী সংগীত শিক্ষার সেট্।

১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস, মীরাট, এটোয়া, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হ'য়ে যোগদান করেন বিজন এবং প্রমাণ করেন সংগীত জগতে বাঙালী মেয়েদের অগ্রগতি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেখানেই তিনি গেয়েছেন গান সেখানেই লাভ ক'রেছেন বিপুল যশ ও সম্মান এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। এ ভিন্ন, বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হ'য়ে তিনি পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অসামান্য সংগীত-প্রতিভার।

১৯৪০ সালে নিখিল বংগ সংগীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় বিজনকে পরিচয় করিয়ে দেন সংগীত-সাধক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের সংগে। পণ্ডিতজী বিজনের কণ্ঠে তাঁরই নিজস্ব সুরে গাওয়া কবীরের একখানা ভজন গান শুনে এত মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে তিনি সানন্দে বিজনকে ছাত্রীরূপে গ্রহণ ক'রতে সম্মত হন। অতঃপর বিজন সুর-সাধক ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের কাছেই শিক্ষা ক'রছেন উচ্চাংগ সংগীতের সূক্ষ্ম ও জটিল কলা-কৌশল।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে প্রথম অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিজনই বাঙলার প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় তিনি বহুবার ভজন গান গেয়েছেন এবং মহাত্মাজীর স্নেহ-লাভে ধন্য হ'য়েছেন।

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ক'লকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে বিজন নিয়মিত ভাবে সংগীত শিক্ষা দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত সিলেবাস অনুযায়ী।

১৯৪৩ সালে সমগ্র বাঙলা দেশ যখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত, বাঙলার গরীব জনসাধারণ যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কোনরূপে বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, সে সময়ে বিজনের কোমল প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি ময়মনসিংহে গিয়ে 'চ্যারিটি শো' ক'রে বহু টাকা তুলে সাহায্য করেন দুঃস্থ জন-সাধারণকে।

১৯৪৪ সালে বিজন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ষ্টাফ আর্টিষ্ট রূপে নিযুক্ত হন। জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ধরণের গান তিনিই প্রথম জনপ্রিয় ক'রে তোলেন বেতার-মাধ্যমে। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর পনেরো দিন পর্যন্ত কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি 'রঘুপতি রাঘব রাজা-রাম' 'বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে', প্রভৃতি যে সব ভজন গান পরিবেশন করেছিলেন তা আজও অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে জনসাধারণের মনে। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ এর মার্চ পর্যন্ত তিনি উক্ত বেতার কেন্দ্রের ষ্টাফ আর্টিষ্টরূপে কাজ করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিজনের মত শিল্পীকেও বেতার প্রতিষ্ঠানের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে।

রামধুন সংগীত রেকর্ড হবার ফলে কলম্বিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে রয়্যালটী বাবদ বিজন যে ১৯৯৫৲ টাকা পেয়েছিলেন ঐ অর্থ তিনি দান করেন গান্ধী-স্মৃতি তহবিলে।

১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু হিন্দু অনন্যোপায় হ'য়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে যখন দলে দলে পশ্চিমবংগে চলে আসছিলেন তখন বিজনের বাবা, ছোট ভাই আর বোনেরাও চলে এলেন কলকাতায়। আর্থিক চাপে বিজন তখন দিশেহারা। গভীর চিন্তায় ভেঙে পড়ে তাঁর মন। আশ্চর্যের বিষয়, এমনি সময়ে একদিন ভগবানের আশীর্বাদলিপির মত তিনি পেলেন খড়ির পেছনে ছেঁড়া ঠোঙার একটুকরা কাগজ। সেই টুকরো

কাগজটুকু তিনি তুলে নিয়ে দেখলেন নিম্নোক্ত চারটী ছত্র লেখা রয়েছে :

God sent His singers upon earth
With songs of sadness and of mirth,
That they might touch the hearts of men
And bring them back to heaven again.
—Longfellow.

এই ছত্র চারটী পড়লেন বিজন। নিরাশার অন্ধকারে তিনি দেখতে পেলেন আশার আলো। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যত অভাব-অভিযোগই আসুক না কেন, তিনি অনলসভাবে সংগীত-সাধনায় থাকবেন মগ্ন।

১৯৫০ সালে সুরাট সংগীত নিকেতনের সমাবর্তণ উৎসবে বিজন আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে তিনি 'সংগীত বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত হন। বাঙলার বাইরে আর কোন বাঙালী মহিলা সংগীত-শিল্পী এ সম্মান লাভ করেন নি।

'ভারতবর্ষ', 'সংগীতবিজ্ঞান' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় অনেক গানের স্বরলিপি লিখেছেন বিজন। এ ভিন্ন ভজন মালা, মীরাবাঈ, (ভজনে মীরা জীবনী), সন্ত কবীর (ভজনে জীবনী ও বাণী) বইগুলির প্রত্যেকটী ভজন গানের স্বরলিপিসহ লিখেছেন তিনি।

১৯৫২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যকল্পে নিউ এম্পায়ার সিনেমা হলে এবং ঐ বৎসরেই মহাবোধি সোসাইটির সাহায্যার্থে রঙমহল থিয়েটার হলে বিজন তাঁর রচিত ও সুরসংযোজিত মীরাবাঈ নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করেন সাফল্যের সংগে।

১৯৫৪ সালের ৯ই জানুয়ারী রাজভবনে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে বিজনের রচিত ও পরিচালিত সন্তকবীর নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়। ঐ উপলক্ষে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-ভাণ্ডারে ২২৫০৲ তদানীন্তন দেবতুল্য রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীর হাতে অর্পণ করেন।

'গানের ফুলে যে হার গাঁথি', 'দখিন বাতায়ন রেখেছ খুলিয়া', 'জাগো ভারতরাণী', 'নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে' প্রভৃতি বহু গান বিজনের সুমিষ্ট কণ্ঠে রেকর্ড ও বেতারের মাধ্যমে পরিবেশিত হ'য়ে জনসাধারণকে দিয়েছে গভীর আনন্দ—পরম পরিতৃপ্তি।

বর্তমানে এই নিষ্ঠাবতী সংগীত সাধিকা বাগবাজার অঞ্চলে অবস্থিত কস্তুরীবাঈ সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। তিনি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ও বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সংগীত-পরীক্ষকের পদেও নিযুক্ত আছেন।

বিজনের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে অন্যায়, যেখানে অবিচার সেখানে তিনি প্রতিবাদ করেছেন দৃঢ়কণ্ঠে—নিজের স্বার্থ ও সুবিধার দিকে না তাকিয়ে। অন্যায় ও অবিচারের সংগে তিনি আপোস করতে শেখেন-নি কোনদিন। অসামান্য তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, অদ্ভুত তাঁর তেজস্বীতা। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন উচ্চাংগ সংগীত চিরকালই দেশবাসীর মনে উচ্চ শ্রদ্ধার আসন লাভ ক'রবে।

'বিজনের বয়স এখন ৩৭ বৎসর।' আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, অব্যাহত ভাবে চলুক তাঁর সংগীত-সাধনা। কামনা করি তাঁর শারীরিক সুস্থতা, সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন।

চলচ্চিত্র প্রসংগে

জীবনকৃষ্ণ দাশ

গল্পের সংগে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক মেলাতে গিয়ে, মনে পড়ে, জনৈক রসজ্ঞ ব্যক্তি এঁচড় আর এঁচড়ের ডালনার উপমা এনেছিলেন। ভেবে দেখলে কথাটা অনেকাংশেই সত্যি। এবং এ-উপমাকে উপাদেয় করা যত সহজ বলে মনে করা হয় আসলে তত নয়। এঁচড় এবং মশলার নিদিষ্ট আনুপাতিক যোগাযোগেই তা কুশলী রাঁধুনীর হাতে অমন হোতে পারে। এঁচড়ের গণ্ডগোলে কিংবা মশলায় বিশৃঙ্খলতায় ডালনা অখাদ্য হয়ে যায়। অবশ্য, রান্নার কসরতটাই শুধু জানেন—রাঁধতে পারেন না, এমন ব্যক্তিকে রাঁধুনী বলে স্বীকার করিনে।

উল্লিখিত এঁচড়ের ডালনা অর্থাৎ আধুনিক বাংলা ছবির খুঁত কোথায় তা ধরবার চেষ্টা করছি : এখন এদেশে ভাল গল্পের দুর্ভিক্ষ যাচ্ছে। আনাড়ী, মাথামুণ্ড-কাণ্ডজ্ঞানহীন গল্পের প্রাচুর্য দেখে আশান্বিত হবার কারণ নেই। ঐ সব ছাই পাশের সংগে সিনেমার মশলা মেশাতে

যাদের মানে হোল অর্থ ও সময়ের অপব্যয়। গল্প লিখবেন কে? না, যাঁর নতুন বক্তব্য আছে। জীবন ও সমাজকে যিনি নতুন করে দেখতে পেয়েছেন, নতুন বক্তব্য একমাত্র তাঁরই থাকে। সে জিনিষ না-থাকলে গল্প লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা। হোক না সিনেমার গল্প, সেও ত যাথীই একনিষ্ঠ আরাধনা। কিন্তু এখনকার ব্যাপার হোল উল্টো। কয়েকটি চমত্রিয়ে (?) ধরতাই "সিচুয়েশন" কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করানো সেলাই আদর্শ গল্প হয়ে যায়। এক্ষেত্রে গল্প কৃত্রিম হবে না তো হবে কি?

তারপর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসা পাবার লোভে সে-গল্প অবলম্বনে কাটা কাটা সংলাপ সহযোগে চিত্রনাট্য রচনা করা হয়। গল্প যখন কাগজের পাতায় থাকে তখন তার সমস্ত ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। পর্দায় রূপায়িত হতে গেলে আংশিক ও উপস্থাপনের দিক থেকে তারও রূপান্তর ঘটে। চিত্রনাট্যকেই তখনকার দায়িত্ব নিতে হয়। যাট্টাকার যথেষ্ট সতর্ক ও সংস্কৃতিবান না হ'লে গল্পের বক্তব্যের সঙ্গে চিত্রনাট্যের বস্তুবিন্যাস ও সংলাপ আদপাদ ছন্দিল কারাক হয়ে যায়। চিত্রনাট্য হয়ে পড়ে অবান্তর। আজকালকার প্রায় ছবিই অল্পবিস্তর অবাস্তবতার দোষে দুষ্ট।

হালফিলের বাংলা সিনেমায় যদি কিছুর উন্নতি হয়ে থাকে তবে সে হয়েছে ক্যামেরার। ক্যামেরাই হোল এখনকার ছবির "নায়ক"। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। ছবির সঙ্গে অভিনয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত নয় কি? ফোটোগ্রাফি যত ভালই হোক সে অনুপাতে যদি অভিনয়ের মান নেমে গিয়ে থাকে তবে তাকে সার্থক চিত্র আখ্যা দেওয়া অসংগত। ফোটোগ্রাফি এসেছে অভিনয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য। অভিনয় বাইল পিছিয়ে; তত মারামারি ফোটোগ্রাফি দিয়েই, এ কেমন কথা? শরীরের এক অংশকে বাদ দিয়ে যদি অপর অংশে বেশি রক্ত সঞ্চার হয় তাকে তো স্বাস্থ্যকর বলে না।

চলচ্চিত্রে সংগীত সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। তবে দেখতে হবে ভাবাবেগ একমাত্র গানছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ করা চলে না সেক্ষেত্রেই গান আসবে। গান সুপ্রযুক্ত হওয়া চাই। সুপ্রযুক্ত গান যেমন ছায়াছবির গতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে তেমনি খোস-পাঁচড়ার মত যেখানে সেখানে বেরিয়ে আসা গান ছবির গতিকে পদে পদে ব্যাহত করে। ভাল গান ক্রমশঃ দুর্লভ হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে নানা অসম্ভব, অশ্লীল, বিকৃত রুচির গান ও কমার্শিয়াল ভক্তিমূলক গান প্রাধান্য পাচ্ছে। এটা মনে রাখা উচিত যে গান চলচ্চিত্রের সহায়ক—তার উপাদান নয়। হিন্দি ছবিতে নাচ ও গানকে ছবির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলায় নাচটা এখনো তেমন আসেনি; হয়তো আসবে। নাচই হোক আর গানই হোক উপযুক্তক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হলে বিপদ ডেকে আনে।

চলচ্চিত্রের পরিচালক মহোদয়রা আমাদের সব চাইতে বেশি ক্যামেরা ফেলেন প্রেমের চিত্র পরিবেশন করে। অন্য সব জিনিষ একটু আধটু বুঝলেও, মনে হয় প্রেম বস্তুটা তাঁরা আদপেই বোঝেন না। তাঁরা ভেবেছেন পাত্রপাত্রীর মুখে কয়েকটা জানা পাকা কথা দিতে পারলেই প্রেমের চিত্র হয়ে গেল। বর্তমান জীবনে যেভাবে প্রেম বা লালসা-সর্বস্বতার পঙ্ক ঘনেছে তাতে সাহিত্য-পঙ্কজে তারই রূপায়ণে চলচ্চিত্রেও কি সে-পঙ্ক উঠে আসবে? তাহ'লে দুঃখ ঐক ছেড়ে দাঁড়াব কোথায়। প্রেমের যে আন্তরিকতা বা একটা অকৃত্রিম সত্য থাকে চলচ্চিত্র-পরিচালক বাহাদুরী দেখাবার জন্য সেটাকে পাল্টিয়ে যেন নির্বাসনে। প্রেমের চিত্র, বিশেষ করে রোমান্টিক পরিবেশ ওঁদের হাতে বারম্বার নষ্ট হতে দেখেছি। সামান্য ইঙ্গিতে, নীরবতায় যেখানে প্রেমের সহজ স্বর্গ রচনা করা যায়, পরিচালকের 'বাসবড়ি' ভাবের জন্য স্বর্গলোকের সমস্ত সম্ভাবনা ভেঙ্গে গিয়ে হয়ে ওঠে নরক গুলজার। বাংলা ছবির পরিচালকেরা দিন দিন এত বেরসিক হবেন, ভাবতেও দুঃখ লাগে।

অভিনেতাদের সম্পর্কেও কিছু না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অভিনয়ের সার্থকতা জন্ম নেয় অভিনেতার ব্যক্তিত্ব থেকে। সে জিনিষ সাধনা, নিষ্ঠা ও জীবন-বোধের গভীরতা থেকে আসে। কয়েকটি 'মারকরা' "মুভাবোধ", "ষ্টাণ্ট" আর নকল ভঙ্গি থেকে সে জিনিষ পাওয়া যায় না। শুধু বেয়াড়াপনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এমন কয়েকজন শিল্পীকে আমরা এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

পরিশেষে, কোন দেশের চলচ্চিত্রের মানোন্নতি নির্ভর করে সার্থক সমালোচনার ওপর। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কাগজ এদেশে যেহেতু কম নেই। কিন্তু তাতে আছে ভাল সমালোচনা ও পন্থা-নির্দেশনের অভাব। কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটি বিবরণ দিলে বা ওঁদের যেখানে সেখানে ঘরে উত্তেজক ভঙ্গিমায় ছবি তুলে দাড়ুকর তা' প্রচার করলেই সিনেমাপত্রিকার উদ্দেশ্য সাধিত হোল না। চলচ্চিত্রের শিল্প-সম্মত ব্যাখ্যা চাই, সৎ সমালোচনা চাই। দূরদর্শিতা, নিরপেক্ষতা, বিশ্লেষণতা ও সর্বোপরি রসবোধের যুগপৎ না থাকলে চলচ্চিত্র পত্রিকা পয়সা রোজগার ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারে না। বাংলাদেশে যে চলচ্চিত্রের সর্বাংগীন উন্নতি হচ্ছে না তার অন্যতম প্রধান কারণ এখানে উপযুক্ত সিনেমা পত্রিকা নেই। কথাটা অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়।

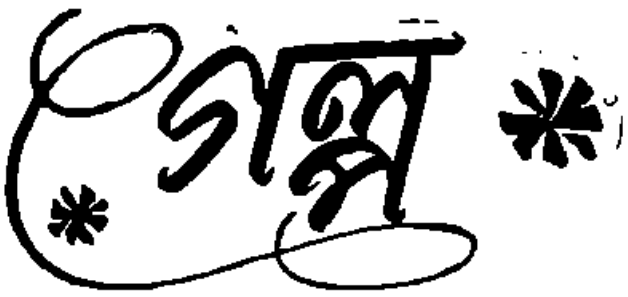

ফার্স্ট বয়

বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূবাবু বললেন, সত্যদেব অঙ্কে আমার হাতে ছিয়ানব্বই পেয়েছে। ইচ্ছে করে আমি ওর চার নম্বর কেটে নিয়েছি। তিরিশ বছর মাষ্টারী জীবনে এমন আর একটিও ছাত্র আমি দেখিনি।

বাংলার মাষ্টার মশাই দ্বিজপদ বাবু মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, সত্যদেব যা বাংলা জানে যে কোন বি-এ ক্লাসের ছেলেকে হারমানাতে পারে।

মোটা লেনসের ফাঁক দিয়ে তাকালেন হরিপ্রসন্নবাবু। তারপর মৃদু হেসে বললেন, ওছেলে আমার হাতে গড়া। আমি প্রথমদিনই বুঝেছি সত্যদেব একদিন বড়দরের কেউ হবে।

হলঘর ভর্তি ছেলে আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কারো মুখে রা-টি নেই। এবার স্কুলে চল্লিশটি ছেলে ম্যাট্রিক দিতে চলেছে। সকলে আজ ফর্ম ফিলাপ করে টাকা জমা দিতে এসেছি। বাকি কয়েকজন ছেলে মৌমাছির চাকের মতো ঝাঁক বেধে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছি। ওদের মুখ শুকনো। এবার ওরা কেউ টেষ্টে এলাউ হতে পারেনি। তবু শেষবারের মতো এসেছে অনুকম্পা ভিক্ষে করতে। ওরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাকি তিনটে মাস খেটেখুটে তৈরি হয়ে নেবে। কয়েকজন পকেটে করে টাকাও এনেছে। বলাতো যায় না—

হেড মাষ্টার মশাই বকুলতলায় এসে দাঁড়ালেন। ঘামে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে গায়ের কোট। মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে রোদে ঘুরে ঘুরে। ছেলেদের পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমরা ভেঙ্গে পড় না, মন দিয়ে পড়াশুনো করে যাও আসছে বছর নিশ্চয়ই পাশ করবে।

রতন এগিয়ে এল হেডমাষ্টার মশাইয়ের সামনে। পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

হেড মাষ্টারমশাই রতনকে বুকে টেনে নিলেন। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কেঁদোনা। তুমি এবার নিয়ে তিনবার ফেল করলে। গত বছর তোমায় আমরা 'এলাউ' করে দিলুম, অথচ তুমি ফিরে এলে। আর একবার চেষ্টা কর নিশ্চয়ই পাশ করে যাবে। জানত রবার্ট ব্রুসের গল্প—

রতন বাধা দেয় কথার মাঝখানে। বলে, এবার 'কম্পার্টমেণ্টালে' আছে স্যার। অঙ্কেই আমার ভয় বেশি। একটা মাস খেটে খুটে তৈরি হয়ে নেব স্যার।

হেড মাষ্টারমশাই হল ঘরে এসে ঢোকেন। আমরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কারো মুখে রা-টি নেই। এতক্ষণ সকলে বাইরের দিকে তাকিয়ে করুণ দৃশ্য দেখছিলুম।

হাতের ফর্ম আর টাকাগুলো গুণে নিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

তোমরা এবার পরীক্ষা দিতে চলেছ। হাতে আছে মাত্র তিনটে মাস। ঐকটা মাস মন দিয়ে পড়াশুনো করবে। জীবনে আনন্দ করবার যথেষ্ট সময় পাবে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের দেহ মন সুস্থ থাকুক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাকালেন হলঘরের একোণ থেকে অপর কোণে। সত্যদেবের দিকে চোখ পড়তেই তিনি ডাকলেন।

সত্যদেব দেওয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল, হেডমাষ্টার মশাইয়ের ডাকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

ওর দু'কাঁধে হাত রেখে একটা ঝাকুনি দিয়ে হেডমাষ্টার মশাই বললেন, সত্যদেব তুমি আমাদের ইস্কুলের আশা ভরসা। তোমার উপর মাষ্টার মশাইরা অনেক কিছু আশা করেন। তুমি ইস্কুলের মুখ উজ্জল কর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই।

সত্যদেব কথা বলল না। ধীরে ধীরে হেডমাষ্টার মশাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

তিন মাস পরের কথা।

ঐ কয়মাস আমরা পরীক্ষার জন্ত পরিশ্রম করেছি খুব। দিনগুলো যে কেমন করে কেটে গেছে বোঝা করেনি কেউ। কত রাত যে ভাল করে ঘুমুইনি তার নেই ঠিক। রাতে বিছানায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত সব পড়া মুখস্থ বলে গেছি, মা ঠেলে দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সব আবোল-তাবোল বকছিস।

আজ অনেকদিন পর পরীক্ষার হলের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতেই সকলে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলুম। সকলের মনই আজ অজানা ভয়ে দুরু দুরু করছে। ইংরিজী বাংলা, অঙ্ক সব কিছু একাকার হয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।

ঘণ্টা বাজতেই সকলে ভীরু পদক্ষেপে হলে গিয়ে বিকেল বেলায় হল থেকে ক্লান্ত অবসন্নের মত বেরিয়েছি। খিদেয় পেট টন টন করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি বাড়ির দিকে। পথে দেখা সত্যেনের সঙ্গে।

সত্যেন বললে, একটা খবর শুনেছিস ?

বললাম, কি খবর ?

সত্যদেব পরীক্ষা দেয়নি।

কেন ? বারবার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

তাত জানিনা। হেডমাষ্টার মশাই দ্বিজপদ বাবুকে বলেছিলেন তাই শুনলুম।

মনটা দমে গেল আমার। সত্যদেব পরীক্ষা দেয়নি একথাটায় যেন আমার মন সায় দিল না। সত্যদেব আমাদের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। ও আমাদের ইস্কুলের গৌরব। ওকে ঘিরে যে আমরা স্বপ্ন দেখি। শুধু আমরা কেন মাষ্টার মশাইরাও। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুম কি এমন ঘটনা ঘটল যার জন্তে সত্যদেব পরীক্ষা দিলনা। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ট্রামের রেলিংয়ের গায়ে। সত্যদেবের চেহারাটা ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে। রোগা লম্বা ছিপছিপে একমাথা কোঁকড়ানো চুল। সহজ শান্ত দৃষ্টি। খেলা-ধূলায় তেমন আগ্রহ ছিল না। টিফিনের সময় গল্পের বই নিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। আমরা হেড মাষ্টার মশায়কে বলে টিফিনের সময় ভলিবল খেলার ব্যবস্থা করেছিলুম। কতদিন সত্যদেবকে হাত ধরে টানা-টানি করেছি কিছুতেই সে খেলতে রাজি হয়নি। আমরা কত সময় ঠাট্টা করে কত কী বলেছি সত্যদেব হাসত রাগ করত না মোটে। সত্যদেবের চোখ দুটো এত উজ্জ্বল ছিল যে তাকালেই মনে হ'ত একদিন সে বড় হবেই। একটু পোষাক পরে আসত ক্লাসে। একটা প্যাণ্ট আর সার্ট। সার্টের কোথাও কোথাও ছেঁড়া। ওর মা হাতে সেলাই করে দিয়েছে। তা থেকেই বুঝতাম সত্যদেবের সংসারের অবস্থার কথা। অনেকটা পথ হেঁটে আসত সে ইস্কুলে। কত ঝড় বৃষ্টি বয়ে গেছে মাথার উপর দিয়ে সত্যদেব কিন্তু একদিনও ইস্কুল কামাই করেনি। মাষ্টার মশাইরা বলতেন, সত্যদেব ইস্কুলের আদর্শ ছবি। আজও যেন আমার জল জল করে চোখের সামনে ভাসছে।

শীতের সময়। আমি, সুধাংশু আর নীহার গিয়েছিলাম একদিন সত্যদেবের বাড়িতে। সত্যদেবের মাকে মা বললাম। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই বাধা দিলেন। আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে বললেন, ওকি করছ বাবা, তোমরা ঠাকুর। আমার পায়ে হাত দিতে নেই, ছিঃ! তারপর দেওয়ালে টাঙানো কৃষ্ণরাধিকার পটের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বিড় বিড় করে কি বললেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের পানে। ছোট্ট একখানি ঘর আর তার কোলে ছোট্ট একটুকু ফালি বারান্দা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের এককোণে ভাঁড়ার অপর কোণে একখানা চৌকি পাতা। চৌকির পাশে কাঠের ছোট একটা সেল্ফ। তাতে সত্যদেবের বইপত্তর সাজানো গোছানো রয়েছে। ঘরটা যেন ঝকঝক তকতক করছে।

কথাটা বড় করে আমার বুকে বাজলো। আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, আপনি সত্যদেবের মা, আমারও মা। আপনাকে প্রণাম করলে আমার পাপ হবে কেন ? যদি হয় হোক্।

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি।

খেতে বসে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এত রকম খাবার করেছেন কেন, এত কী খাওয়া যায়।

সত্যদেবের মা ম্লান হাসলেন। বললেন, কি আর এমন

বেশি করেছি বাবা। আগেকার দিনে জিনিস-পত্তর সস্তা-গণ্ডা ছিল, আর আজ? একটুকু দুধ তাও দিতে পারলুম না।

খাওয়া শেষ করে উঠতে যাচ্ছিলাম। সত্যদেবের মা বললেন, না বাবা উঠলে চলবেনা এই পায়েসটুকু খেয়ে নাও।

কী মিষ্টি তাঁর কথা। খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, শুয়ে পড় সব। রোদ পড়লে তবে বাড়ি যাবে। ফেরার সময় বললেন, আবার এস বাবা তোমরা। মায়ের একছেলে সত্যদেব, তাঁকে ঘিরে কত স্বপ্নের কথাই সেদিন দুপুরে আমাদের মাথার শিয়রে বসে বললেন। সেই সত্যদেব কেন পরীক্ষা দিলনা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম।

পরীক্ষার শেষদিন হল থেকে বেরিয়ে একটা দোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। মনে হল এতদিন পর জগদ্দল পাথর বুক থেকে নেমে গেল। সামনে কাকা মাঠটায় এসে আমি আর শিবু বসলুম। একটা ঘাসের শিস্ চিবুতে চিবুতে শিবুকে বললুম, একটা কাজ করবি?

শিবু বললো, কী?

বললুম, চল সত্যদেবের বাড়িতে ঘুরে আসি। ব্যাপারটা আসলে কি জানতে হবে।

শিবু চুপ করে বসে রইল।

বললুম, চল। জোরে হাঁটলে বড় জোর এক ঘণ্টা লাগবে। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

আমি আর শিবু সত্যদেবের বাড়ির সামনে এসে বেশ অবাক হয়ে গেলুম। দরোজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। পাশের বাড়ীর লোকের মুখে শুনলুম ওর মা অনেকদিন ধরেই হাঁপানিতে ভুগছিল, কদিন আগে মারা গেছে। দূর সম্পর্কের এক মামা এসে সত্যদেবকে শ্রীরামপুর না কোন্নগরে নিয়ে গেছে। আর কোন খবর কেউ জানে না। মনটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। আমরা দুজনায় পথে নামলাম। অন্ধকার নেমেছে। রাস্তাটা এবড়ো খেবড়ো। কতবার যে হোঁচট খেলুম তার নেই ঠিক। সারাটা পথ কেউ কারো সঙ্গে কথা বললুম না।

অনেকদিন কেটে গেছে। একদিন বিকেলবেলায় বাড়ির রোয়াকে বসে আছি। শিবু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। হাতে রেজাল্টের কাগজ।

বলল, এবার আমাদের ইস্কুলের রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছে। মাত্র তিনজন ফেল করেছে। তারপর সুর নরম করে বলল, ওরাও যদি পাশ করত বেশ হ'ত।

বললুম, চল হেডমাষ্টার মশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।

ইস্কুলে ঢুকে দেখলাম হেডমাষ্টার মশাই অফিস ঘরে বসে আপন মনে কাজ করে চলেছেন। সামনে তুপাকৃতি খাতার বাণ্ডিল।

আমরা পায়ে পায়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। হেডমাষ্টারমশাই আগেই আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। মুখ তুলে বললেন, কি খবর সব?

কথা বলবার আগেই আমরা দুজনায় তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তিনি আমাদের একে একে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, তোমরা মানুষ হও এই আশীর্বাদ করি।

তারপর সত্যদেবের কথা উঠতেই তাঁর মুখখানা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন, বড় আশা করেছিলুম সত্যদেব আমাদের ইস্কুলের নাম রাখবে। বড় হয়ে দেশের একজন হবে।

দেখলুম হেডমাষ্টারমশাইয়ের চোখের কোণে জল টলমল করছে।

এরপর আরো একটা বছর কেটে গেছে। কলেজ জীবন সুরু হবার আগেই বাবা সাহেবকে বলে আমায় অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আরো পাঁচজন কেরাণীর মতো দশটা-পাঁচটার অফিস করি। একদিন ট্রেনে ছাড়তে তখনও অনেক দেরি। হঠাৎ নজরে পড়ল ভিড়ের মধ্যে চেনা একটা মুখ। চোখাচোখি হতেই সে হাসলো। মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে এল, সত্যদেব না?

সত্যদেব ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাশে একটু জায়গা করে দিয়ে বললুম, বস, কি খবর, কোথায় চললি?

সত্যদেব হাসল। দেখলাম হাসিটা ঠিক আগের মতই আছে।

বলল, চলেছি শ্রীরামপুর। ওখানেই থাকি।

বললুম, আমরা পরীক্ষার পর গেছলাম তোর বাড়ি। পরীক্ষা দিলিনা কেন?

সত্যদেব বলল, পরীক্ষা দেব কি করে বল। মা যে ঐ সময় মারা গেলেন। আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বললুম, হেডমাষ্টারমশাই পরীক্ষার ফলে তোকে দেখতে না পেয়ে ভারি দুঃখ পেয়েছিলেন রে।

সত্যদেব বলল, আমার ত ইচ্ছে ছিল কিন্তু—

ইলেকট্রিক ট্রেন। হুহুশব্দে শ্রীরামপুর এসে গেল। সত্যদেব নেমে গেল।

আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম আরো হাজার ডেলিপ্যাসেনজারের মিছিলে আমাদের একদিনের মেধাবী বন্ধু সত্যদেব বেমালুম মিশে গেল।

এরপর বছর ছয়েক কেটে গেছে।

অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি। বুলা এসে টিব করে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

হেসে বললুম, কি ব্যাপার হঠাৎ প্রণাম যে?

বুলার মুখখানা হাসিতে চক্‌চক্ করছে। আন্দাজে বুঝলুম নিশ্চয়ই কোন সুখবর আছে।

হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, জান কাকু আমি ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছি।

আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে, না হলে ট্রেন পাব না। দ্রুতগতিতে পাতা ওলটাতে লাগলুম। হঠাৎ একটা ছবির উপর নজর আটকে গেল! খুব চেনা বলে মনে হ'ল। যদিও বয়সের ছাপ সে মুখে পড়েছে তবুও উজ্জ্বল চোখ দুটি কী ভোলবার? দেখলাম ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রথম তিনজনের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী এই ছেলেটি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। নিচে মন্তব্য লেখা—চেষ্টা এবং অধ্যবসায় থাকলে চাকরীর বাঁকেও পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া যায় তারই প্রমাণ তৃতীয় স্থান অধিকারী শ্রীসত্যদেব ঘোষ। কাগজখানির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। বহুদিনের পর হেডমাষ্টারমশাইয়ের মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। তিনি বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি সত্যদেব একদিন সত্যকার মানুষ হয়ে উঠবে।"

হেডমাষ্টারমশাই যদি আজ বেঁচে থাকতেন।

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে শ্রীল হরিদাস দাস বিসূচিকা রোগে হঠাৎ অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৩০৪ সালের ১৩ই ভাদ্র নোয়াখালি জেলার কেপ মহকুমার পূর্ব্বদিকে মধুগ্রামে এক সুবিখ্যাত পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়—তাহেই মৃত্যুকালে বয়স ১৯ বৎসর কয়েক দিন মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ ৺গোলকচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ও পিতা ৺গগনচন্দ্র তর্কতীর্থ ঐ অঞ্চলে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী। তাঁহার এক মাত্র ভ্রাতা মণীন্দ্রকুমার বাল্যকালেই সন্ন্যাসী হইয়া যান। হরেন্দ্রকুমার ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ১৯২৪ সালে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাশ করেন। দারিদ্র্য নিবন্ধন পাঠাবস্থায় তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইত। কিছুকাল শিক্ষকতা ও অধ্যাপকের কার্য করিয়া তিনি তাহা ছাড়িয়া দেন ও পরবর্ত্তী জীবনে দীর্ঘকাল (বোধ হয় ৩০ বৎসর কাল) নবদ্বীপে বাস করিয়া গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন তাহা হরিবোল কুটীর নামে খ্যাত ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি পুরী জগন্নাথ ও বৃন্দাবনে যাইয়া সাধুসঙ্গ করিতেন ও বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন।

যখন তিনি কলিকাতায় আসিতেন, তখন 'ভারতবর্ষ' কার্য্যালয়ে পদধূলি দান করিতেন ও প্রকাশিত গ্রন্থ এই দীনকে উপহার দিয়া যাইতেন। একবার মাত্র নবদ্বীপধামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও কিছুকাল গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কেন জানি না, কলিকাতায় থাকার সময় অবসর পাইলেই তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া গ্রন্থের সন্ধান করিতেন। তিনি ৮২ খানা গ্রন্থ প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে মাত্র ৪ খানা তাঁহার নিজের লেখা—(১) পরতত্ত্ব গৌর (২) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য (৩) গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ (৪) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ২ খণ্ড ও (৫) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—৪খণ্ড। শেষ গ্রন্থখানি তাঁহার জীবিতকালে ছাপা শেষ হয় নাই—পরে সরকারী অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতি দরিদ্রভাবে তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হইত। সকল দিন

পূর্ব আহার ত্রুটিত না। তৎসত্ত্বেও তিনি প্রত্যহ প্রায় ১৭ ঘণ্টা কাল লিখন পঠনে ব্যয় করিতেন। শেষ জীবনে কয় বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে মাসিক ৭৫ টাকা সাহিত্যিক-বৃত্তি দান করিয়াছিল। তিরোধানের অর্থে তাঁহাকে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তিনি এমনই অভিমানশূন্য ছিলেন যে জীবনে কোনদিন কাহারও নিকট নিজের কার্যের কথা বা বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করিতেন না। তিরোধানের সমস্ত অর্থ গ্রন্থ প্রকাশেই ব্যয় করিতেন। তাঁহার কোন ফটো পর্যন্ত তুলিতে দেন নাই। তাঁহার বহু গ্রন্থ এম-এ ক্লাসের পাঠ্য হইয়াছিল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তাঁহার গ্রন্থের সাহায্য লইয়া ছাত্রগণকে পাঠ্য বিষয় জানাইয়া দিয়া থাকেন। আচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরিদাস তাঁহার অন্যতম ছাত্র বলিয়া গৌরব অনুভব ও প্রকাশ করিতেন। যত্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে—সেজন্য বাবাজী মহাশয় সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি যখন যে গ্রন্থ হাতে পাইতেন, তাহার সম্পাদনা, টীকা প্রণয়ন প্রভৃতি করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। হাতের গ্রন্থের কাজ শেষ না হইলে অন্য গ্রন্থে হাত দিতেন না। তাঁহার আরও বহুগ্রন্থ প্রকাশের কথা তাঁহার মনে ছিল—কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার কৃপায় সেইরূপ নিষ্ঠাবান, সুপণ্ডিত, ভক্ত ও কর্মীর দ্বারাই তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিয়া সাধুনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা বিফল হয় নাই। তিনি অর্থ, যশ, মান কিছুর জন্যই লালায়িত ছিলেন না—এমন কি দেহের প্রাথমিক প্রয়োজন আহার ও বস্ত্রের কথা পর্যন্ত তিনি চিন্তা করিতেন না। শেষ জীবনে বন্ধুগণের চেষ্টায় সাহিত্যিক বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন এবং সে জন্য জাতীয় সরকারকে সর্বদা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুর অভাব ছিল না—কিন্তু কাহাকেও তিনি কোন প্রার্থনা জানাইতেন না। বলিতেন—সকল প্রার্থনা ঐ একই চরণে প্রত্যহ নিবেদন করি—তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এরূপ বিশ্বাসী মন কয়জন ভক্তের মধ্যে পাওয়া যায় জানি না। তাঁহার ৮ প্রাপ্তির এক বৎসর পরে তাঁহার কথা লিখিতে বসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যত কথাই মনে হইতেছে। তাঁহার পণ্ডিতবংশে জন্ম বিফল হয় নাই, তাঁহার বিদ্যার্জন শুধু তাঁহাকে জ্ঞানবান করে নাই, দেববাণীকে তাঁহার অংশভাগী করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাঁহার মধ্য দিয়া বর্তমান যুগে যেভাবে ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এ যুগে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিম্নে তাঁহার পুস্তকগুলির নাম প্রকাশ করিলাম। (১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা স্তব—২৷৹ (২) শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত—১৷৹ (৩) আশ্চর্যাবাস প্রবন্ধ—৸৹ (৪) গোপাল ভাপনী (টীকাবয়োপেতা) ৷৵৹ (৫) শ্রীকৃষ্ণাভিষেক—৷৵৹ (৬) শ্রীশ্রীমধুরা—মাহাত্ম্যং—৸৹ (৭) সামান্য বিরহাবলী লক্ষণম্—৷৵৹ (৮) শ্রীগোপাল বিরহাবলী—৷৹ (৯) শ্রীমাধব মহোৎসবং (মহাকাব্যং)—৩৲ (১০) শ্রীমাধবকৃষ্ণার্চন দীপিকা—৸৹ (১১) ধাতু সংগ্রহ—৵৹ (১২) শ্রীশ্রীযোগ-সারস্তব টীকা—১৷৹ (১৩) শ্রীভক্তিরসামৃত সেধ—১৲ (১৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চিক কৌমুদী—২৷৹ (১৫) শ্রীনিকুঞ্জকেলী বিরুদাবলী—৷৹ (১৬) শ্রীসুরত কথামৃত—৷৹ (১৭) শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা—৷৵৹ (১৮) শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি—৷৵ (১৯) সিদ্ধান্তদর্পণ—১, (২০) ঐক্যম্য কাব্যথিনী—৷৵৹ (২১) মুক্তাচরিতের পদ্যের অনুবাদ—১৲ (২২) শ্রীকৃষ্ণ বিরুদাবলী—১৲ (২৩) শ্লোকৌস্তুভ—৷৹ (২৪) শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী—৷৵৹ (২৫) দুর্লভসার—৷৹ (২৬) পরতত্ত্ব গৌর—৸৹ (২৭) কাব্যকৌস্তুভ—১৷৹ (২৮) শ্রীগোবিন্দ রতিমঞ্জরী—৷৹ (২৯) রসরোকীভাষ্য—১৷৹ (৩০) সাধন দীপিকা—১৷৹ (৩১) নবদ্বীপ চন্দ্রিকা—৷৹ (৩২) আর্যশতকম্ —৷৹ (৩৩) গৌরচরিত চিন্তামণি—১৲ (৩৪) গীতচন্দ্রোদয়—২৷৹ (৩৫) শ্রীকৃষ্ণভক্তি রত্নপ্রকাশ—১৷৹ (৩৬) সঙ্গীতসাধব—২৲ (৩৭) মুরারীগুপ্তের কড়চা—৵৹ (৩৮) ব্রহ্মসংহিতা—৷৹ (৩৯) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—৮৲ (৪০) ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—১২৲ (৪১) প্রেমোক্তি রসার্ণব—২৷৹ (৪২) শ্রীরামচন্দ্রোদয়—২৷৹ (৪৩) শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব—(৪৪) গোবিন্দলীলামৃত (মূল)—৩৲ (৪৫) গোবিন্দামৃত নাটক—১৷৹ (৪৬) রসকলিকা—১৷৹ (৪৭) ভাবনাসার সংগ্রহ—১০৲ (৪৯—৫১) পঞ্চচিত্রম্—৵৹ (৫২) বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা—৩৲ (৫৩) শ্রীপ্রবোধ ব্যাকরণম—১৷৹ (৫৪) শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা—৫৲ (৫৫) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ—৩৲ (৫৬) গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, প্রথম খণ্ড—৭৲ (৫৭) ঐ দ্বিতীয় খণ্ড—৫৲ (৫৮) শ্রীনামামৃত সমুদ্র—৬৷৹ (৫৯) বৈষ্ণবাভিধান—১৷৹ (৬০) উজ্জ্বলনীলমণি—১৩৲ (৬১) হরিভক্তিসুধোদয়—২৲ (৬২) প্রবুদ্ধ খাতেমকরী—৷৹ (৬৩) শ্রীবিশ্বনাথচার্য প্রবন্ধমালা—৷৹ (৬৪) গীত-গোবিন্দ (৬৫) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান। তাঁহার জীবদ্দশায় প্রাপ্তি-কালে অভিধানখানি যন্ত্রস্থ ছিল—পরে সরকারী অর্থসাহায্যে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশ শুধু অর্থাগমের উপায় বলিয়া বিবেচিত হয় না—গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার ধর্মকার্য বলিয়া লোক মনে করে। বিশেষ করিয়া যে সকল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ সচরাচর বিক্রীত হয় না—একহাজার ছাপিলে বিক্রয় হইতে ১০ বৎসর সময় লাগে—তাহার মুদ্রণ ত কেহই ব্যবসা বলিয়া মনে করেন না। গ্রন্থের হরিদাস দাস মহাশয় এই মহান্ ব্রতের ভার গ্রহণ করিয়া আপন কর্তব্য সম্পাদন ও জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন—তিনি দেশ-বাসীর শুধু নমস্য নহেন, তাঁহার কথা স্মরণীয় করার যোগ্য। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন বিস্তৃতি লাভ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। একশতকে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কার্যালয় হইতে বহু সংস্কৃত পুরাণাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া খুলনাতে বিক্রীত হইয়াছিল। বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি স্থানে এখনও সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশ নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রীযুতা রমা চৌধুরীর পরিচালনায় প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সম্প্রতি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। কাজেই শ্রদ্ধাভাজন হরিদাস দাসের অসমাপ্ত কার্যের ভার গ্রহণের লোকের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে বিদ্যোৎ-সাহী বন্ধুদের নিকট একটি প্রার্থনা জানাইব। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী এ বিষয়ে যে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গিয়াছেন, সে কথা যেন দেশ-বাসী বিস্মৃত না হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন তাঁহার স্মৃতিতে বৃত্তি বা অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করিয়া নীরব ও নিয়মিতমান কর্মীর প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেন।

গ্রহ জগৎ

দশম বা কর্ম্মভাব

উপাধ্যায়

(ভৃগু সংহিতা অবলম্বনে)

মেষ লগ্ন জাত ব্যক্তির ফলাফল

মেষ লগ্নজাত ব্যক্তির কর্ম্ম স্থান মকর। ভৃগুসংহিতা মতে এখানে রবি থাকলে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির অন্তরায় ঘটে। রাজ-অনুগ্রহলাভ সমাকৃষ্টাংশে হয় না। বিদ্যাবুদ্ধি উত্তম হয়, মাতৃভক্তি প্রকাশ পায়, ভূসম্পত্তির লাভ যোগও লক্ষ্য করা যায়। সন্তানদের সঙ্গে ভালো বনিবনাও হয় না। এখানে চন্দ্র থাকলে জাতকের মাতৃসম্পত্তিলাভ হয়, পিতৃস্থানে অনিষ্ট বৃদ্ধি ঘটে। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ, যশ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। লগ্নস বিচলনকারক হওয়াতে এখানে এই গ্রহের অবস্থিতি হেতু জাতকের শারীরিক শক্তি লাভ হয়, আর তার আত্মসম্মান বৃদ্ধি ও অহঙ্কার পরিলক্ষিত হয়। সুখ শান্তির দিকে লক্ষ্য থাকে না, জাতক পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে না, ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে। তার প্রকৃতি উদ্ধত হয়, নিজের ইচ্ছামত কাজ করে।

এখানে বুধের অবস্থিতি সম্পর্কে ভৃগু বলেছেন উৎসাহ ও পরিশ্রমের দ্বারা কর্ম্মোন্নতি ঘটে, পিতৃক্ষেত্রের শক্তি লাভ হয়, রাজসরকারে সম্মান প্রতিপত্তি হয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠার যোগ দেখা যায়। মাতামহ পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ হয়, কিন্তু মাতার সহিত বিরোধ ঘটে। বৃহস্পতি এখানে অবস্থান করলে পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়। ছোটো খাটো ব্যবসায়ে উন্নতি আর মাতৃপক্ষ থেকে সুখলাভ হয়, কোনরকম সম্মান বজায় থাকে। জাতক শান্তিপ্রিয়ও হয়। ভৃগু বলছেন শনিক্ষেত্রে দশমে শুক্র থাকা অত্যন্ত শুভ—উচ্চ স্তরের কর্ম্ম জীবন লাভ হয়। সমাজে আর রাজসরকারে পরম প্রতিপত্তি হয়। গৃহভূমি ও বন্ধুলাভ উত্তম হওয়াতে সুখের জীবন গড়ে ওঠে, স্ত্রী ও হয় মনের মত। জাতক সাংসারিক কাজে বেশ সুদক্ষ হয়। এখানে শনি থাকলে ভৃগুর মতে জাতক বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়, মাতার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, সমাজ সংসারে ও রাজকীয় বিভাগে বেশ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে, যশ জনকল্যাণকর কাজ তার দ্বারা ঘটে থাকে। দশমে রাহু থাকলে একাধিক স্থানে কর্ম্মলাভ, কর্ম্মে বাধাবিপত্তি ঘটে—সম্মান ও প্রতিষ্ঠার হানিও হয়। কেতু থাকলে কর্ম্মে বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

বৃষলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

বৃষলগ্ন জাত ব্যক্তির দশম বা কর্ম্মভাব তুঙ্গ। এখানে রবি থাকলে ভৃগু সংহিতা মতে পিতার সহিত শত্রু ভাব দেখা যায়। গৃহ ভূমি সম্পত্তি বিষয়ে জাতক সুখী হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে নানাপ্রকার অঘটন উপস্থিত হয়ে থাকে—উন্নতিতে বাধা উপস্থিত হওয়ায়, অবজ্ঞাপীড়া ভোগ করতে হয়—কর্ম্মোন্নতির জন্যে বহু প্রকার চেষ্টার সমুত্থান হয়ে কষ্টভোগ ঘটে, আলস্য দোষে অনেক সুযোগ সুবিধা অন্তর্হিত হয়। ভৃগুর মতে এখানে চন্দ্রের অবস্থান শুভপ্রদ, জাতা ভগিনীদের বলে বলী হওয়া যায়। সমাজে ও রাজসরকারে সম্মান প্রতিপত্তি হয়, মায়ের দিক থেকে সুখলাভ হয়, মানসিক সুখ আশা করা যায়। এখানে মঙ্গলের অবস্থিতি শুভজনক নয়, অন্ন-প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা, তাছাড়া বিদ্যায় বাধা, অশুভ পিতৃভাব, আর যৌনভাবের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। বুধের অবস্থিতি শুভপ্রদ, রাজা-সরকারেই সাহায্য পেয়ে বিশেষ উচ্চ শিক্ষালাভ, সন্তানদের উন্নতি, প্রচুর অর্থ, উত্তম গৃহ ও ভূসম্পত্তিলাভ হয়। মাতৃক্ষেত্র হ'তেও উন্নতি ঘটে। এখানে বৃহস্পতি থাকলে কর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে বৈষয়িক যোগাযোগ লাভ ও ক্ষতি দুইই ঘটে, অর্থোপার্জ্জনের জন্যে নানাপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করে—খুব পরিশ্রমের সঙ্গে কর্ম্ম করে জীবনের উন্নতি আনতে হয়। এখানে শুক্র থাকলে মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা ভাগ্য বৃদ্ধি করতে হয়, চাতুর্য্য বলে সমাজ ও রাজসরকারের কাছে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করে—আত্মীয়তা মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হয়। শনির অবস্থিতি হোলে পিতৃ প্রভাবে বিশেষরূপে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে—সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব্বক্ষেত্রে খুব সম্মান লাভ হয়—বড়দরের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, বাস্তব সুখশান্তির অভাব ঘটে। রাহু থাকলে পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে থাকে আর নিজের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কেতু থাকলে পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়, সকল কাজে বাধা, সম্মান হানি, আপাতত মনস্তাপ ও কর্ম্মবিপত্তি আসে।

মিথুনলগ্ন জাত ব্যক্তির ফলাফল

মিথুনলগ্নজাত ব্যক্তির দশম ভাব মীন। ভৃগু বলেন, এখানে রবি থাকলে উৎসাহ বলে অনেকটা কর্ম্মোন্নতি হয়ে থাকে, পিতৃ বলে বলীয়ান্

হয়, ভ্রাতার সহযোগিতা ঘটে, সম্মান সুখ সম্পত্তি হয়—বহু সৎকার্য্য জাতকের দ্বারা ঘটে—ভূসম্পত্তি উত্তম হয়ে থাকে। এখানে চন্দ্র থাকলে বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে প্রচুর অর্থলাভ, উচ্চস্তর নানা-প্রকার সুখসম্পত্তিভোগ আর অপরের উপর কর্তৃত্ব করবার সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে অবস্থিত মঙ্গল গ্রহ অপরিসীম শক্তি প্রদান করে—যার ফলে সামাজিক উন্নতি হয়, শত্রু জয়ী হওয়া যায়, লেখাপড়ার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় আর তার দ্বারা অবশেষে সাফল্য হয়ে থাকে। বুধ এখানে থাকলে কঠোর পরিশ্রম করে সৌভাগ্য অর্জন হয়—মাতৃ-ক্ষেত্র দুর্বল হয়। জাতকের মৈথিক সৌন্দর্য্যের অভাব হোতে পারে। বৃহস্পতি থাকলে উত্তম সম্মান ও মর্য্যাদালাভ, পার্থিবক্ষেত্রে সাফল্য। দশমভাবে মীনে শুক্র থাকলে বিদ্যালাভ হয়, সন্তানদের শক্তি হেতু চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয়। ব্যবসায়ী হোলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি। পিতৃ স্থান উত্তম। মানসিক শক্তিও জোরালো দেখা যায়। শনির অবস্থিতি দেখা গেলে বুঝতে হবে পিতার স্থানের কিছু ক্ষতি হয়েছে। জাতক দীর্ঘজীবী হয়। ব্যয়াধিক্য হয়। বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য সুনাম বৃদ্ধি। স্ত্রী-পুত্রের জন্য অশান্তি ও মানসিক কলহ। রাহু থাকলে ব্যবসায়ে ক্ষতি, পদমর্য্যাদা হানি ও মনস্তাপ। কেতু থাকলে জীবনের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় না।

কর্কটলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

কর্কটলগ্নজাত ব্যক্তির দশম ভাব মেষ। ভৃগু বলেন এখানে রবি থাকলে জমিজমাসংক্রান্ত ব্যাপারে জাতকের উন্নতি। ব্যবসায়ে অথবা কোনপ্রকার সম্ভ্রান্তপদপ্রাপ্তি থেকে প্রচুর অর্থলাভ—পিতৃস্থান সম্মান-জনক হয়,—মাতৃক্ষেত্র উত্তম হয় না, বৃহৎ পরিবার হয়। যশঃ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। রাজকীয় মর্য্যাদালাভ। চন্দ্র থাকলে পিতামাতার কাছ থেকে লাভ, উচ্চস্তরের বৃত্তিগ্রহণ, ভূ সম্পত্তি হয়—সংসারক্ষেত্রে অধি-পত্যবুদ্ধি আর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকে। মঙ্গল দশমে থাকলে রাজকীয় পদলাভ হয়, কর্তৃত্ব, বহু সম্মান, প্রতিপত্তি, পিতা ও সন্তান সম্মানিত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন হয়, খুব সম্মানের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে সমাজের উচ্চ স্তরে জাতক স্থান লাভ করে। বুধ এখানে থাকলে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হোলে অসাফল্য ঘটে, আর পিতাও ভ্রাতার স্থান দুর্ব্বল, আত্মসম্মান রক্ষা ও মর্য্যাদা লাভের জন্যে বহু ব্যয় হয়। বৃহস্পতি থাকলে জাতক অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও সৌভাগ্যবান হয়, পদোন্নতির উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে, আংশিকভাবে স্বার্থপর হয়ে থাকে। শুক্র থাকলে জাতক সুখী হয়, ভূসম্পত্তিলাভ, যানবাহনলাভ, সম্মান প্রতিপত্তি আর মাতৃ সুখ ঘটে। কর্মস্থানে যেসব শনি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি আনে, পিতৃক্ষেত্রে নানা অশান্তি ও অশুভ ঘটনা ঘটে—দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে কঠোর পরিশ্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবার বর্গের সঙ্গে অসদ্ভাব হেতু কষ্টভোগ, অতিরিক্ত ব্যয়। রাহু এখানে থাকলে পিতৃস্থান থেকে নানাপ্রকার কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়, ব্যবসায়ে ক্ষতি আর অসুবিধার জন্যে কর্ম্মে বিমুখতা আসতে পারে—ভাগ্যভাব দুর্ব্বল হয় আর ভাগ্যোন্নতির জন্যে নানা-প্রকার অপকৌশল প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। কেতু থাকলে পিতৃস্থানের দুর্ব্বলতা, পিতার সহিত মনোমালিন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি, সন্মানহানি ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি ফলভোগ হয়।

সিংহলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

সিংহলগ্নের দশম বা কর্ম্মভাব বৃষরাশি। এইভাবে রবি থাকলে সৌরবৃদ্ধি হয়—আর হয় সম্মানে যশ প্রতিষ্ঠা; সুখসমৃদ্ধতা সমাজভাবে লাভ করবার অদম্য চেষ্টা দেখা যায়, পিতার সঙ্গে বড় একটা যোগসূত্র থাকে না, সন্তান সম্প্রীতিরও অভাব ঘটে, মায়ের ওপর থাকে স্নেহের টান, জমি জমা সম্পত্তি গৃহ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য হয়। সমাজেও সেন পদার প্রতিপত্তি হয়। চন্দ্র থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হয়। গৃহসম্পত্তি আশানুরূপ হয় না, পিতামাতার ওপর তেমন টান থাকে না, অপরিমিত ব্যয় হয়, কর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। মঙ্গলের অবস্থান অবশ্য শুভপ্রদ, পার্থিব সুখসম্পদ আর সম্মান প্রতিপত্তিলাভ হয়—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে উত্তম বিদ্যালাভ, বিশেষ কর্ম্মোন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হেতু সুন্দর-ভাবে জীবন অতিবাহিত হয়। বুধ এখানে থাকলে অর্থানুকূল্যে ব্যব-সায়ে উন্নতি, রাজসম্মানলাভ, গৃহ ভূসম্পত্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা হয়। জাতক সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে ও প্রশংসাভাজন হয়। এখানে বৃহস্পতির অবস্থান ভালো নয়, পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হওয়ায় নানা অশান্তি ভোগ, সম্মান প্রতিপত্তি ও কর্ম্মোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়—তা' ছাড়া নিজের মানসিকতার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। শুক্র থাকলে শুভ হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ, রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে বহু সুযোগ সুবিধা পাবার যোগাযোগ হোতে থাকে। ভাগ্য লাভ হয়। ভ্রাতা তন্বী ও পিতার সঙ্গে জাতকের অনিবনাও হোতে পারে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পত্তি গৃহ প্রভৃতি হয়ে থাকে। শনি এখানে থাকলে বিশেষ কর্ম্মোন্নতি, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও গৃহসম্পত্তিলাভ, যানবাহনাদি যোগ। রাহু থাকলে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিতে পৌনঃপুনিক বাধা আসে, বহু কষ্ট ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সৌভাগ্য লাভ হয়। সকলের নিকট জাতক সুপরিচিত হয়। এখানে কেতুর অবস্থান হেতু কর্ম্মনাশ, তাছাড়া আশা-ভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি প্রভৃতি জীবনে ঘটতে পারে।

কন্যালগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

কন্যালগ্নের দশম বা কর্ম্মভাব মিথুন রাশি। এখানে রবি থাকলে কর্ম্ম বিষয়ক ফল আশানুরূপ হয় না। ব্যয়াধিক্য হেতু সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হ'তে থাকে। মাতৃভাব দুর্ব্বল হয়। ব্যবসায়ে বা চাকুরীতে উন্নতি করা কষ্টকর হয়ে থাকে। চন্দ্র থাকলে উত্তম কর্ম্মলাভ হয়, ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি আর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। যানবাহন সম্পত্তিভোগ। চব্বিশ বছর বয়স থেকেই উন্নতির সূচনা দেখা যায়। জাতক দীর্ঘজীবী হয়—সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিরূপে সমাদর লাভ করে। জীবনযাত্রার মান ও খুব উন্নত হয়। মঙ্গল এখানে থাকলে পিতৃ বৈরিতা, কর্ম্মোন্নতিতে

ব্যথা, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, দীর্ঘ জীবন, জ্ঞাতি বিরোধ প্রভৃতির সম্ভাবনা দেখা যায়। এখানে বুধ থাকলে বৈষয়িক সৌকর্য্য, বিশেষ সম্মান, রাজদ্বারে সদার প্রতিপত্তি, কর্ম্মোন্নতি ও উচ্চ পদের পদমর্য্যাদা লাভ, আত্মচিন্তা ও প্রেমানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। বৃহস্পতি থাকলে বড়ঘরের ব্যবসায়ী, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, সমাজ ও রাজ্যসরকারের ওপর কর্তৃত্ব প্রভৃতি ফল বলতে দেখা যায়। শুক্রের অবস্থিতি শুভ—কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাধিকার, সম্পত্তি ও ধনবত্তা ভোগ হয়, মাতৃ পিতৃকুলের ও উত্তম হয়। শনি থাকলে নিজের বুদ্ধি বলে জাতক উন্নতিশীল হয়। সম্মান প্রতিপত্তি, পুরস্কার, জনপ্রিয়তা, ব্যবসায়ে সাফল্য, রাজনৈতিক কার্য্যে সুদক্ষতা প্রভৃতি ঘটে। রাহু থাকলে ব্যবসায়ে মধ্যবা লাভ হয় কিন্তু আত্মস্বজনীন গোলযোগ হেতু অশান্তি ভোগ হয়, কেতু থাকলে অর্থ সঞ্চিত হয় না, পারিবারিক দুঃখ কষ্টভোগ ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ স্থান বা উন্নতি হয় না, —নানাভাবে অর্থক্ষয় হয়।

তুলালগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

তুলালগ্নজাত ব্যক্তির ধর্ম্ম বা কর্ম্মভাব কর্কট। রবি থাকলে সম্মানের সহিত আয়, বড়ঘরের ব্যবসায়ে সাফল্য, পিতৃ সম্পত্তিসুখ, মাতার সহিত অসদ্ভাব, ভূসম্পত্তি ও বাড়ী ভাড়া থেকে সুখের আয় এবং উত্তম জীবন যাপন হয়ে থাকে। চন্দ্র থাকলে উত্তম ব্যবসায়ী, রাজসরকারে প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধিবলে বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব, যশ, সম্মান ও প্রতিপত্তি হেতু অপ্রত্যাশিত লাভ ও অহঙ্কার ইত্যাদি হয়ে থাকে। এখানে মঙ্গল পারিশ্রমিক আনে, কর্ম্মোন্নতিতে বাধা ঘটে, পিতা ও স্ত্রীর কাছ থেকে সান্ত্বনা ভোগ, নিম্নশ্রেণীর পেশা বা চাকুরি হয়, অপরাজিত হলেও লজ্জাবোধ করেনা। বুধ থাকলে উত্তম ব্যবসায়ে সাফল্য, সৌভাগ্য বৃদ্ধি কর্ম্মোন্নতি, সম্মান লাভ হয়। বৃহস্পতি থাকলে মাতার ওপর টান থাকে না, পিতার দিকে টান হয়, মানসিক সুখ-শান্তির অভাব, ভ্রাতা-ভগ্নী পরিবেষ্টিত ও অর্থের পরিশ্রমী হয়। এখানে শুক্র রাজকীয় পদমর্য্যাদাদাতা, ব্যবসায়ে উন্নতিসূচক, অবশ্য অধ্যবসায় ও সৌভাগ্যবৃদ্ধিকারক। এখানে শনি অতিকষ্টে-বিদ্বান করে, নিজের সুখ-সুবিধা সৌভাগ্য ও কর্ম্মোন্নতির প্রলুব্ধ নিয়েই জাতক সময় অতিবাহিত করে, স্ত্রীকে দুর্ব্বাক্যের দ্বারা কষ্ট দেয়, সবার ওপর কর্তৃত্ব করে, উত্তম গৃহলাভ করে, অপরিমিত ব্যয়কুণ্ঠ হয়। রাহু থাকলে পিতৃস্থান দুর্ব্বল হয়, কর্ম্মোন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করতে হয়, মানসিক অসচ্ছলতা, শত্রুবৃদ্ধি ও সম্মানহানি, রাজদ্বারে দণ্ডভোগ ও সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদাহানি ঘটে। কেতু থাকলেও পিতৃকুলের অশুভ হয়, কর্ম্মহানি, ব্যবসায়ে ক্ষতি, বহুপ্রকার কষ্টভোগ, অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ, রাজসরকারের বিপক্ষতা ও মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।

বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্র সিংহ। এখানে রবির অবস্থান শুভপ্রদ। জাতক পদমর্য্যাদা সম্পন্ন হয়, আর শাসন বিভাগে উচ্চপদস্থ হয়ে বহুলোকের কর্তৃত্ব করে, পরিশ্রমী হয় আর কোন ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করেনা, সিংহভুল্য পরাক্রমী হয়—পিতাকে গ্রাহ্য করে না, মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে—সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে সমাবৃত হয়। এখানে চন্দ্রের অবস্থানও উত্তম। জাতক ধর্ম্মপ্রাণ হয়, অধ্যাত্মসাধনার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে, নিজের চেষ্টায় ভাগ্যোন্নতি করে, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়—রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মান পেয়ে উত্তম জীবন যাপন করে। এখানে মঙ্গল অত্যন্ত বলশালী, সুখের চেয়ারে, প্রখর বুদ্ধি, উত্তম বিদ্যা আর রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মান লাভ হয়—উন্নত আদর্শ ও বলিষ্ঠ মানসিক শক্তি দেখা যায়। এখানে বৃহস্পতি থাকলে জাতক বুদ্ধিজীবী হয়ে সমাজ ও রাজসরকার থেকে বহু টাকা উপার্জ্জন করে। তার বৃত্তি হয় অনুমোদন—পিতৃস্থান ও ব্যবসা থেকে ঐশ্বর্য্যশক্তি লাভ হয়। এখানে শুক্র বৃত্তি সম্পর্কে শুভ নয়, বিশেষ কর্ম্মোন্নতি হয়না, স্ত্রীর আচার ও আচরণ অসঙ্গত হয়, মাতৃসুখ সাধু হয়, উত্তম গৃহভোগ আর বিলাসিতায় অর্থব্যয় হয়। শনি থাকলে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে শেষে কর্ম্মোন্নতি হয়, আর গৃহসুখ সম্পত্তি লাভ হয়, সম্মান বজায় রাখবার জন্য যথেষ্ট, ব্যয় করতে হয়, অতিরিক্ত যাচ্ঞাহেতু মানসিক উদ্বেগ ঘটে। রাহু থাকলে পিতৃহানি বা পিতার সাংসারিক কষ্ট, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ, উন্নতির পথে প্রথম বাধা, পরে উন্নতিলাভ, কর্ম্মক্ষেত্রে নানা বাধা ও অসুবিধা ভোগ, বৃত্তি বা ব্যবসায়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কেতু থাকলে কর্ম্মক্ষতি, উন্নতিতে বাধা, বিনয়ে সাফল্য, মর্য্যাদাহানি, সমাজে লাঞ্ছনাভোগ প্রভৃতি ঘটে।

ধনুলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

ধনুলগ্নজাত ব্যক্তির ধর্ম্ম বা কর্ম্মভাব কন্যা। এখানে রবি অতীব সৌভাগ্যদাতা। সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা ও ভাগ্যোন্নতি হয়। রাজানুগ্রহ লাভ জন্য চিত্তের প্রসন্নতা। জাতক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হয়, নানাপ্রকার লাভ ঘটে। পদারপ্রতিপত্তিও অত্যন্ত হয়ে থাকে। চন্দ্র এখানে থাকলে পিতার দিক থেকে বাধা প্রাপ্তি হয়, সুচারুরূপে সৌভাগ্যোদয় হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রে অসম্মান ও লাঞ্ছনাভোগ হেতু চিত্তপীড়িত হয়। এই স্থানে মঙ্গল অবস্থান করলে জাতক শিক্ষিত ও জ্ঞানী হয়, প্রখর বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করে, সন্তানলাভ ভালো হয় না, পিতাকে কষ্ট দেয়, যাদৃশ ব্যয়কুণ্ঠ, সম্মান ও পদমর্য্যাদালোভে কৃপাপ্রার্থী হলেও তবু সম্মানলাভ করে, পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে—খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই কর্ম্মক্ষেত্রেলাভ হয়। ভাগ্যোন্নতি ও উপার্জ্জনের জন্যে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়। এখানে বুধ থাকলে বড় ব্যবসায়ী হওয়া যায়, পিতৃকুলে থেকে শক্তিলাভ ঘটে, সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্মান, অত্যন্ত সুন্দরী ও প্রতিপত্তিশালিনী স্ত্রী, বড়লোক শ্বশুর ইত্যাদি হয়—ভূসম্পত্তি তেমন হয় না। মাতৃস্থান দুর্ব্বল হয়, পার্থিব সুখ সম্পদ ঘটে। বৃহস্পতির অবস্থান ও এখানে শুভপ্রদ—পৈতৃকসম্পত্তি সম্পর্কে আশানুরূপ কিছু না হলেও নিজের চেষ্টায় বহুদূর পর্য্যন্ত উন্নতিলাভ করতে সক্ষম হয়—যৌবনান্তে ও উন্নতিযোগ। শুক্রের অবস্থান বিশেষ শুভপ্রদ নয়—পিতৃ স্থানের দুর্ব্বলতা সৃষ্টি

হয়। তাছাড়া, বৃত্তি বা ব্যবসায়ে অসাফল্য দেখা দেয়, সম্পত্তি সুখ থাকলেও সম্মানিত ব্যক্তি হয় না। রাজকীয় শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চ পদমর্যাদালাভ হয় যদি শনি এখানে থাকে, আয় আছে, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, সম্ভ্রান্ত স্ত্রী প্রভৃতি ও পরিলক্ষিত হয় এই গ্রহের অবস্থিতির জন্যে। কিন্তু মানুষ হিসাবে জাতক উদ্ধত হয়। রাহু এখানে অবস্থান করলে চাতুর্যের দ্বারা কর্মোন্নতি, সামাজিক মর্য্যাদা ব্যাহত হয়, বিদেশে সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্যে নানাপ্রকার অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে কেতু থাকলে কর্মক্ষেত্রে কেবল ক্ষতি হয়, চাকুরি ও এক জায়গায় থাকে না, ব্যবসাও নষ্ট হয়—নানাবিপত্তির পর শেষে সৌভাগ্যলাভ ঘটে।

মকরলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

মকরলগ্নের দশম বা কর্মভাব তুলা। এখানে রবি থাকলে পিতার দুঃখ দুর্দশা হয়, জাতকের আয়ু হ্রাস হোতে দেখা যায়; জীবিকা উপার্জনের জন্যে নানাপ্রকার কষ্টের সম্মুখীন হোতে হয়, সংসার চালাতে গিয়ে রোজই চিত্তের চঞ্চলতা ভোগ হয়, অর্থের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। এখানে চন্দ্রের অবস্থান শুভদায়ক, ফলে খুব উঁচুদরের লোক হয়, ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি ঘটে, রাজ সম্মান হয়; লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন আর স্ত্রীর আনুগত্যজনিত সুখলাভ হয়—মাতা-পিতার সহযোগিতা লাভ করা যায়। মঙ্গলের অবস্থান ও শুভ-উন্নত বিদ্যালাভ, কর্ম উন্নত হয়, স্বাস্থ্য সৌন্দর্যভোগ, মাতৃশক্তি অর্জন, অর্থের প্রাধান্য সমৃদ্ধি সুখ-শান্তিলাভ ঘটে। বক্তৃতা দেবার শক্তি ও বেশ দেখা যায়। বৃহস্পতি এখানে পিতৃস্থানের ক্ষতিকারক, কর্মহানি হয়, ভ্রাতৃবর্গের সহিত মনোমালিন্য, অর্থক্ষতি ও সৌভাগ্যোদয়ে বাধাবিপত্তি আসে। এখানে শুক্র থাকলে জাতক বিচারক হয়, খুব উঁচুদরের বিদ্যার্জন হয়, বেশ-বিদেশে সুনাম যানবাহনও ধনৈশ্বর্যভোগ প্রভৃতি করায়ত্ত হয়ে থাকে। এখানে শনি থাকলে জাতক অত্যন্ত ধনী হয়। তার বহু টাকা হয়, মাতৃ স্থান দুর্বল হয়। অর্থ-সঞ্চয়ই জাতকের বিশেষ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। বড়দরের ব্যবসায়ী হয়, স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকে না এরূপ চিত্তের বিক্ষোভ দেখা দেয়। রাহু থাকলে অর্থের জন্য উদ্বিগ্নতা, কর্মক্ষতি, পারিবারিক অশান্তি ও অর্থকৃচ্ছ্রতাভোগ। কেতু থাকলে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে বিরাজ করে ওঠে; পরিশ্রম করেও আশানুরূপ কর্মফলা হয় না, কর্মোন্নতি সহজে হয় না।

কুম্ভলগ্ন জাত ব্যক্তির ফলাফল

কুম্ভলগ্ন জাত ব্যক্তির দশম বা কর্মভাব বৃশ্চিক। এখানে রবি থাকলে মান প্রতিপত্তি, উত্তম কর্ম রাজসম্মান প্রভৃতি হয়, জাতক কোন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হোতে পারে, প্রতিপত্তিশালী স্ত্রী লাভ হয়, পার্থিব সুখ সম্পদ ও সৌভাগ্য লাভ হয়। মাতৃভাব ভালো হয় না। এখানে চন্দ্র থাকলে বহু কষ্টভোগ হয়, মান মর্য্যাদা নষ্ট হয়, অর্থের জন্যে চিন্তা-গ্রস্ত হোতে হয়। বহু বাধাবিপত্তির পর কিছু পরিমাণে সৌভাগ্য লাভ হয়। এখানে মঙ্গল থাকলে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, রাজ্য সম্মান, পুরস্কার প্রভৃতি ও পাওয়া যায়, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ হয়ে শাসন বিভাগে বড় চাকুরিলাভ হয় —প্রবল আইনজ্ঞ হয়। সহজেই দৈহিক ক্লান্তি আসে। বহু মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। সুখ থাকলে কর্মে বাধাবিপত্তি ও বিশৃঙ্খলতা ভোগ, মনস্তাপ ও আশাভঙ্গ। বৃহস্পতি থাকলে বড়দরের ব্যবসায়ী হয়, বহু অর্থলাভ হয়, আর নানাপ্রকার সুখ সুবিধা ও সুযোগ ভাগ্যোন্নতি ঘটে। শুক্র থাকলে জাতক খুব উচ্চপদ পায়—অঢেলনা টাকা-কড়ি বেশ হয়। শনি থাকলে স্ত্রীকে কেবল অপমানিত হোতে হয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্যে ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনা ভোগ হয়। এখানে রাহুর অবস্থান আশানুরূপ নয়। মন বিভ্রান্ত হয়, কার্যে বাধা, সম্মানে আঘাত প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়, কেতু এখানে থাকলে পিতৃক্ষেত্রে দারুণ ক্ষতি হয়—সম্মানহানি, নিম্নশ্রেণীর কর্ম, ব্যবসায়ে উন্নতি নেই। জাতক পরিশ্রমী হয়, দারিদ্র্য কষ্টভোগ।

মীনলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

মীনলগ্নজাত ব্যক্তির দশম বা কর্মভাব ধনু। এখানে রবি থাকলে কর্মী হয়, বিদ্যালে জাতক অধিপতিতা বিস্তার করে, পার্থিব সুখ লাভ হয়, অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়। চন্দ্র থাকলে অতীব উত্তম শিক্ষালাভ হয়, নানা প্রকারে সুযোগ সুবিধা পায়। অর্থ সঞ্চিত হয়, এখানে মঙ্গল থাকলে জাতকের বিদ্যায় ক্ষতি, বড়দরের ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে, বহু উপার্জন করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে জাতক রাখে। খুব সম্পত্তি যানবাহন সুখ হয়, বুধ থাকলে রাজকীয় সুখসুযোগ্য লাভ, আড়ম্বরপ্রিয় স্ত্রী, অঢেলনা ও খুব আর যানবাহন সুখ হয়। এখানে বৃহস্পতি থাকলে জাতক পিতাকে তার সমতুল্য ব্যক্তি বলে মনে করে। শত্রুদের ভয়ে পশ্চাৎপদ হয় না। এখানে শুক্র থাকলে ভ্রাতৃভাব ভালো হয় কিন্তু পিতৃসদ্ভাব হয় না। রাজ-দ্বারে সম্মানলাভ, জন সমাজে প্রাধান্য বিস্তৃতি ঘটে। শনি থাকলে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অশান্তি ভোগ, নানাপ্রকার কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতে হয়, ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, ভাগ্যের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়, সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে হয়। এখানে রাহু থাকলে পিতৃ-হানি, কর্মের জন্যে অশান্তি ভোগ, নানা অসুবিধা ও বিপত্তি, সকল কর্মে বিমূঢ়তা, এখানে কেতু থাকলেও সম্যক্‌ভাবে ভাগ্যোন্নতি হয় না, বহুকষ্টে আশাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

***

বৈশাখ মাসের ব্যক্তিগত রাশিফল

মেষ

অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষেই শনি ও বৃহস্পতির অশুভভাবজনিত কষ্টভোগ বেশী হবে। জাতকের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, হৃদ্রোগ প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক অশান্তি

চিত্তের উত্তেজক যোগ, কোন নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুর বিয়োগ। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা দরকার। জমিজমা, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি সম্পর্কে সন্তোষজনক পরিস্থিতি ঘটবে না। ভাড়া আদায়ের জন্য মামলা হোতে পারে, চাকুরির স্থান শুভ নয়, কর্মস্থানে বাধা, কর্মক্ষেত্রে পতনের আশঙ্কা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-জোগীদের পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ যাবে না, পুরুষের সহিত ব্যবহারে নিজেকে সংযত রাখা উচিত—কলহ, বিচ্ছেদ, মতভেদজনিত অশান্তি। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী হবেনা।

কুম্ভ

শুভাশুভফল। কৃত্তিকানক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে বহুল পরিমাণে শুভ, তৎপরে রোহিণী ও সর্বশেষে মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ হবে। মধ্যে মধ্যে শরীরে বায়ুপ্রকোপ, তাছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো। পারিবারিক অশান্তি। স্থানান্তরে অশুভ। আর্থিক অভাব অনটন হবে বাহ্যিকতা হেতু। মাসের প্রথমদিকে ভূম্যধিকারী বা বাড়ীওয়ালার পক্ষে অশুভ নয়, চাকুরিজীবীরাও কোন অশুভ ঘটনার সম্মুখীন হবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের অবস্থা গতানুগতিকভাবে চলবে। মাসের প্রথমদিকটা স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, শেষ দিকটায় অশুভ ঘটনা ঘটবে। প্রণয়ঘটিত যোগেও সন্তানাদির পীড়া। পরীক্ষার ফল ভালো। বিদ্যার্জন সন্তোষজনক।

মিথুন

আর্দ্রা ও পুনর্বসু নক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে কিছুটা ভালো, মৃগশিরা জাতকগণের অবস্থা আশানুরূপ হবেনা। স্বাস্থ্য ভালো যাবেনা। রক্তের রোগ, পিত্তপ্রকোপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি হোতে পারে। চলাফেরায় সতর্কতা আবশ্যক, দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। পরিবারবর্গের মধ্যে দুইজন বিশেষভাবে পীড়িত হোতে পারে। ঘরে বাইরে বিবাদজনিত অশান্তিভোগ। আর্থিক কষ্ট সেরূপ হবে না, বরং অর্থ ও দ্রব্যলাভ হবে, নব পরিকল্পনায় অর্থবৃদ্ধি, সন্তোষজনক আয়। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে স্বস্তিকর পরিস্থিতি দেখা যাবে। চাকুরীজীবীর পক্ষে অবস্থাটা ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্য লাভ, কিন্তু ঘরোয়া ব্যাপারে অশান্তির সম্ভাবনা আছে। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। লেখাপড়ায় অমনোযোগ।

কর্কট

পুনর্বসুনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুষ্যা এবং অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো। চক্ষুপীড়া এবং পিত্তপ্রকোপের সম্ভাবনা। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ধাতুতা কিলস এবং কলহের অবসান। সাময়িক বিচ্ছেদ পুনর্মিলনে পর্যবসিত হবে। আয়ব্যয় উত্তম, কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্য, ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ মাস,—মান মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ, প্রণয়ে সাফল্য। পরীক্ষার ফল শুভ,—লেখাপড়ার দিকে আগ্রহ।

সিংহ

পূর্বফল্গুনীনক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা মঘা ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের সময় ভালো। রক্তের চাপবৃদ্ধি, অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য শারীরিক কষ্ট, স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হবে। পারিবারিক অশান্তি বা কলহ বিবাদ থাকবে। সন্তানদের মধ্যে অসুখ হোতে পারে। নানা কারণে আর্থিক অবস্থা ভালো হবে না, আয়ের পথগুলি কিছু কিছু রুদ্ধ হোতে পারে—কতকগুলি প্রয়োজনীয় খরচের জন্য ঋণগ্রহণে টান ধরতে পারে। স্নেহুলেশনে ক্ষতির সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারীও বাড়ীওয়ালার পক্ষে সময়টি মোটামুটি যাবে। মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। চাকরীজীবির পক্ষে এ মাসটী ভালো নয়, কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন। উপরওয়ালার সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টী সাধারণভাবেই যাবে। লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফল মধ্যম।

কন্যা

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিদের পক্ষে তুলনায় কম দুর্ভোগ, হস্তা এবং চিত্রাজাতগণ পক্ষে এদের তুলনায় কিছু অস্বস্তিভোগ আছে। ইন্দ্রিয়-শক্তির অস্বাভাবিক উত্তেজনা পীড়া, চক্ষু পীড়া, জ্বর, রক্তের চাপ, আঘাত রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক অশান্তি। সামাজিক ক্ষেত্রে বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। স্নেহুলেশনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে এ মাসটী শুভ নয়। মামলা মোকর্দ্দমায় সম্ভাবনা। চাকুরীজীবীরাও প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর দিনযাপন করবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে কর্মের উত্থান পতন হেতু বিশৃঙ্খলতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসটী অতীব শুভ—সামাজিকতার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ,—প্রণয়ার্থীর সহিত মিলন, বিবাহাদি, গার্হস্থ্য জীবনে শান্তি। লেখাপড়ায় আশানুরূপ কৃতকার্য্য হোতে পারবে না, পরীক্ষায় অসাফল্য।

তুলা

বিশাখাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষেই বিশেষ শুভ—চিত্রা ও স্বাতিজাতগণের অনুরূপভাবে শুভ হবেনা। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। পারিবারিক শান্তি। আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ভাব ও ব্যবহার মধুর হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। নানা ভাবে অর্থাগম হবে। আয়বৃদ্ধি যোগ আছে। স্নেহুলেশনে সাফল্য লাভ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মধ্যম সময়। মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হোলে জটিল পরিস্থিতি ঘটবে। চাকরিজীবীর পক্ষে শুভ মাস,—কর্মক্ষেত্রে সুখ্যাতি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে উত্তম সময়—কর্মের প্রসারতা ও বিস্তৃতির জন্য আনন্দ উপভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ঘটিত যোগ, মাসের শেষের দিকে সাফল্য লাভ। সংসারে কিছু অশান্তি। লেখাপড়া উত্তম হবে, পরীক্ষায় সাফল্য।

বৃশ্চিকরাশি

অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ, বিশাখার পক্ষে তদনুপাতে অপেক্ষাকৃত শুভ। মিশ্রেরও পরিবার-বর্গের পীড়া। দুর্ঘটনায় বিপত্তি। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ। আর্থিক কষ্টভোগ, আয়ব্যয়ের জন্য চিত্তচাঞ্চল্য। গৃহবিচ্ছেদ জন্য স্থানান্তরে গমনের সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হোতে হবে। চাকুরিজীবীরা অসুবিধা ভোগ করবে—আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, পদবৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের অবস্থাও ভালো যাবে না, কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আসবে। লেখাপড়ার দিকে অবহেলা, পরীক্ষার ফল অশুভ।

ধনু

পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষেই অনেকটা শুভ। মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ যোগ আছে। স্বাস্থ্য মোটামুটিভাবে ভালো যাবে, কিন্তু রক্তপাতের আশঙ্কা থাকায় সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এ মাসে মানসিক শান্তির অভাব। কেন না নানা-রকম আশঙ্কা ও দুঃখভোগের সম্ভাবনা আছে। কোন নিকট আত্মীয়ের পীড়ার জন্য উদ্বেগ। অবশ্য এসব ঘটনা গুরুতর হবে না। আয়ের পথ রুদ্ধ হবেনা, ব্যয় বৃদ্ধি পাবে—তবে ব্যয় সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। মাসের প্রথম দিকে বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীরা নানা প্রকারে অসুবিধা ভোগ করবে, মামলা-মোকর্দ্দমারও সৃষ্টি হবে—কর্ম-স্থানে অশান্তি ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে সময় মধ্যম।

মকর

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের সময় প্রবণা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তি অপেক্ষা শুভ। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে কিন্তু সন্তানদের শরীর ভালো যাবে না, তাদের পীড়ার সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক অবস্থা খারাপ হবেনা, মধ্যে মধ্যে সামান্য ব্যাপারে কিছু কিছু বাধা আসতে পারে, তজ্জন্য মানসিক উদ্বেগ ঘটবে। আর্থিক অবস্থা সুন্দর হবে, লাভের যোগ আছে। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে শুভ, গৃহনির্ম্মাণ সংক্রান্তেরও সম্ভাবনা। চাকুরিজীবিদের পক্ষে শুভ, বেকার ব্যক্তির চাকুরি পাবার সম্ভাবনা, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ।

কুম্ভ

পূর্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তিগণের সময়ই বিশেষ ভালো যাবে। ধনিষ্ঠা ও শতভিষাজাতগণের সময় মধ্যম। শারীরিক দুর্ব্বলতা। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক অশান্তি মধ্যে মধ্যে সৃষ্টি হোলেও মৈমন্দিন জীবনযাত্রা সুখেই অতিবাহিত হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক স্বচ্ছলতা, কিন্তু অর্থও সঞ্চিত হোতে পারে। বাড়ীওয়ালাও ভূম্যধি-কারীদের অবস্থা ভালোই যাবে। চাকুরিজীবীরা কর্ম্মস্থানে প্রশংসা লাভ করবে, ভবিষ্যতে উন্নতির পথ রচনায় বর্ত্তমানে এই মাসটী সহায়ক হবে। উপরওয়ালার সহিত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীরা সাফল্য লাভ করবে, প্রচুর অর্থ বেশ জমবে। প্রেমের পক্ষে মাসটা জীবনের অশান্তি ভোগ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের সাফল্য লাভ।

মীন

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীর পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য খুব ভালো যাবে না, মধ্যে মধ্যে উদর-শূল, বুকের যন্ত্রণা, আমাশয় প্রভৃতি দেখা যাবে। যাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হৃদ্রোগ আছে, তাদের খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ক্ষতি। অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য উদ্বেগ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটি মোটেই ভালো নয়, নানাপ্রকার বৈরাকরমক পরিস্থিতির যোগ আছে। চাকুরি-জীবীর পক্ষে সুসময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে মাসটী মোটেই ভালো নয়।

ব্যক্তিগত ফলপ্রকাশ

মেষলগ্ন—

বিদ্যাভাব শুভ; শারীরিক অবস্থা শুভ। স্থান পরিবর্ত্তন। দাক্ষিণ্য লাভ। ধনপ্রাপ্তি লাভ ও চিত্তপ্রসাদ। বন্ধু বিচ্ছেদ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা বা বিপদ, ব্যয় বৃদ্ধি। কর্ম্মোন্নতি।

বৃষলগ্ন—

শারীরিক ভাব শুভ। অর্থব্যয়। বিদ্যাভাব মধ্যম। আশাভঙ্গ ও উদ্বেগ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে লাভ। সন্তান সম্ভাবনা। আয় বৃদ্ধি।

মিথুনলগ্ন—

অযাচিতভাবে কর্ম্মপ্রচেষ্টা। মানসিক কষ্ট। দুর্ঘটনার ভয়। পারিবারিক পীড়া ও তজ্জনিত উদ্বেগ ও অশান্তি। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। আয়াত-প্রাপ্তি।

কর্কটলগ্ন—

ভয়, অপবাদ ও দুশ্চিন্তা। লাভ। সন্তান লাভ। কর্ম্মে সাফল্য।

সিংহলগ্ন—

সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নানাপ্রকার লাভ, বিবাহ সম্ভাবনা।

কন্যালগ্ন—

ভয়। সন্তানাদির পীড়া, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। কলহ অর্থ-লাভ।

তুলা লগ্ন—

ভ্রমণ। উত্তম আয়। ব্যয়। ভাগ্য বৃদ্ধি।

বৃশ্চিকলগ্ন—

মানসিক উদ্বেগ, ন্যায়ভাবে অর্থাগমের সুযোগ হবে। নূতন পরিকল্পনার কাজে হস্তক্ষেপ করলে সিদ্ধিলাভ। স্থান ত্যাগ।

ধনু লগ্ন—

অগ্নি ভয়, শত্রু বৃদ্ধি, প্রবাস গমন বা ভ্রমণ, কার্যসিদ্ধি, গৃহ বিচ্ছেদ, শারীরিক অসুস্থতা।

মকরলগ্ন—

মন বৃদ্ধি, পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হওয়ার যোগ। শারীরিক অসুস্থতা। চিত্তের উত্তেজনা। মনস্তাপ। আশাভঙ্গ। স্থান ত্যাগ। বন্ধুযোগ। অর্থপ্রাপ্তি। সন্তান লাভ বা সন্তানের উন্নতি। দুঃখভোগ।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, দুঃখবৃদ্ধি, উপরওয়ালার নিকট সম্মান প্রাপ্তি, উৎসাহ, মধ্যে মধ্যে কর্মে বাধা, উদ্বেগ, অর্থলাভ, শত্রুনাশ, বন্ধুলাভ—স্ত্রীলোকের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা।

মীন লগ্ন—

অর্থ লাভে কিঞ্চিৎ বাধা, ব্যয় হেতু উদ্বেগ, মানসিক অসুস্থতা, অগ্নিভয়, জ্বর, আঘাতপ্রাপ্তি বা রক্তপাত, শত্রুবৃদ্ধি, স্ত্রীর পীড়া, ভ্রমণ, সন্তানের সহিত মনোমালিন্য, নানা প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা।

ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান লোহিতেই শাসন পদ্ধতি রুষিয়া থেকে তিরোহিত হবে। এই বৎসর সমস্ত বর্ষায় রাজনৈতিক আকাশও মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, এদেশের প্রকৃত শান্তি ও সৌভাগ্যোদয় হবে না। এখানে উত্তরোত্তর অশান্তি, বিদ্রোহ, রাজনৈতিক হত্যাবার্তা আর গণ-আন্দোলন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকেও চিন্তিত করে তুলবে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীতে হবে, সেগুলির অত্যন্ত সংস্ফোরণক্ষম ক্রমবর্দ্ধমান গতি ১৯৬৮ থেকে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ জগতের পর পৃথিবীর যে অবস্থা স্বপ্নে দেখেছিলেন আর মনে রূপায়িত করেছিলেন, তা ধারণে পরিণত হবে অর্থাৎ আবার মানুষ মাটি চষে ফসল ফলাতে যাবে যন্ত্রমানবের সমাধিক্ষেত্র দেখতে দেখতে। সেদিনের মানুষ বুঝতে পারবে হিংসাদ্বেষ কলুষকলঙ্কিত ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে পূর্বপুরুষেরা কি ভাবেই না মারণাস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে খণ্ড প্রলয় ঘটিয়ে গেল। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পরের মানুষেরা বিশ্বসৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন পৃথিবীর পত্তিবাচন করবে—সকল বিদ্বেষ, অর্থগৃধ্নুতা আর রাজনৈতিক ছলাকলা মানুষ ভুলে যাবে। ভালোবাসার দ্বারা সারা পৃথিবীর মানব সমাজ গড়ে তুলবে নতুন ঐক্যবদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

আমার মহাপ্রলয় ও খণ্ডপ্রলয়ের কথা যা আমরা ইতিপূর্বেই গ্রহ জগতে বলেছি, প্রতিধ্বনিত হয়েছে, উড়িষ্যার কটক থেকে। এখানকার মোহন্তদিদা বাজারে ভবিষ্যদ্বাণী কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে, এই সংবাদ পি, ই, এনের সুভেনিয়ারের (স্মারণিকা) মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। এই পত্রিকায় উক্ত ঠিকানা উল্লেখ করে শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন পৃথিবীর আগত প্রলয়ের সম্পর্কে। ভবিষ্যদ্বাণীর পশ্চাতে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রবচন, মহাপুরুষগণের বাণী, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধপুরুষগণের অভিমত। বর্তমানে গ্রন্থ-খানি উড়িষ্যা ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছে, শীঘ্রই ইংরাজী, হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদ হয়ে নানা দেশ প্রচারিত হবে। আমাদের হাতে এ গ্রন্থ এখনও আসে নি।

পি, ই, এনের রজতজয়ন্তীর স্মারক পত্রে (সুভেনিয়ার) শ্রীসত্য-নারায়ণ মিশ্র লিখেছেন—কলিযুগ শেষ হোতে প্রায় পঞ্চাশ বছর বাকী। সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে পনেরো বছর পূর্বে। এখন চলেছে কলির সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাসমাগমে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্কট দুর্যোগময় সময়। এর ভেতর দেখা দেবে আন্তর্জাতিক অশান্তি ও দুঃখ দুর্দশা, যুদ্ধবিগ্রহ, সৌরমণ্ডল ও ভৌগোলিকের পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রভৃতি। পরিণতি হবে শোচনীয় ও ভয়ঙ্কর। মহাসমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হবে অনেক ভূখণ্ড ;—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে অর্দ্ধসংখ্যক অধিবাসী।

আমরা গ্রহজগতে ইতিপূর্বে বলেছি ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটবে, এ সম্বন্ধে লেখক কিছু বলেন নি।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ব্যক্তিগত বর্ষফল

৮ই ফাল্গুন থেকে ৯ই চৈত্রের মধ্যে জাত ব্যক্তিগণের ভাগ্য মোটা-মুটিভাবেই চলবে বর্তমান ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। এঁদের শরীর ভালো যাবে না, এজন্যে শরীরের দিকে বিশেষ নজর নেওয়া দরকার। অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম এঁদের পক্ষে উচিত হবে না, দুরোগ্য বা হানির সম্ভাবনা আছে। যাঁরা সূর্য্যোদয়ের সময়ে জন্মেছেন, এবিষয়ে তাঁদের সতর্ক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সন্তানের কাছ থেকে আঘাত পেতে পারেন আর কাটকা ব্যাপারে লাভবান হোতে পারেন যাঁদের জন্ম দুপুর বেলায়। সূর্য্যাস্তের দিকে যাঁদের জন্ম, তাঁরা নানারকমই কষ্ট পাবেন গুপ্ত শত্রুদের কাছ থেকে। রাত্রি জাত ব্যক্তিরা বর্ষের প্রথম দিকে সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু লাভবান হবেন, গুরুস্থানীয়দের সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়ে জাত ব্যক্তিদের পক্ষে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সুখকর ভ্রমণ হবে। তাছাড়া বর্ষের প্রথম দিকে নূতন বন্ধুলাভ ঘটবে আর চৈত্রমাসে দাম্পত্য লাভ হবে ব্যবসা বাণিজ্যে। ফাল্গুনের শেষের দিকে জাত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতি, পদপ্রাপ্তি, আর্থিক অবস্থার উন্নতি যোগ আছে। চৈত্রমাসের প্রথম দিকে জাত ব্যক্তিদের প্রণয়ভঙ্গ ও নানাপ্রকার অশান্তির সম্ভাবনা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ধ্যানচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তান ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৪৬৯ (কানহাই ২১৭, মি লোবার্ড ১২)

পাকিস্তান : ২০৯ ও ১০৪ (রামাধীন ২১ রানে ৪, গিবস ১৪ রানে ৩ এবং এট্‌কিনসন্ ১৭ রানে ৩ উইকেট)

লাহোরে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্টইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ৩য় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৭৬ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তান ১ম ও ২য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয় এবং 'রাবার' লাভ করে।

বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ

পশ্চিম জার্মানীর ডর্টমুণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় জাপান ১৯৫৭ সালের মত পুরুষদের দলগত বিভাগে এবং মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে যথাক্রমে সোয়াথলিং কাপ এবং কোরবিলন কাপ জয়ী হয়েছে। বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের যোগদান খুবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান প্রথম যোগদান করে। যোগদানের প্রথম বছরেই জাপান মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় এবং ব্যক্তিগত বিভাগেও সাফল্যলাভ করে।

রাজনৈতিক কারণে জাপান ১৯৫৩ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৫৪ সাল থেকে জাপান বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় নিয়মিত যোগদান ক'রে অসামান্য প্রাধান্য বজায় রেখেছে। পুরুষদের দলগত বিভাগে জাপান এ পর্যন্ত ৬বার যোগদান ক'রে উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৫৪-৫৭ ও ৫৯ ; ১৯৫৮ সালে প্রতিযোগিতা হয়নি) দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপের পুরস্কার সোয়াথলিং কাপ জয়ী হয়েছে। মহিলাদের দলগত বিভাগে ৬বার যোগদান ক'রে জাপান ৬বার চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে (১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৭ ও ১৯৫৯)।

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগেও জাপান প্রাধান্য রক্ষা ক'রে চলেছে। জাপানের এই সাফল্য সুদীর্ঘকালের ইউরোপীয় প্রাধান্য খর্ব করেছে। জাপানই এশিয়া মহাদেশের সর্ব্ব প্রথম দেশ হিসাবে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়মালা লাভ করে ; আর জাপানই আজ একটানা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৯৫৯ সালের প্রতিযোগিতা

পুরুষবিভাগে ৩৭টি দেশ যোগদান করে। ৪টি বিভাগে এই ৩৭টি দেশকে ভাগ ক'রে খেলানো হয়। জাপানের খেলা পড়ে সি গ্রুপে। এই গ্রুপে ভারতবর্ষ থেকে ২য় স্থান পায়। চারটি গ্রুপ থেকে যথাক্রমে এই চারটি দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করে—হাঙ্গেরী (এ গ্রুপ), চীন (বি গ্রুপ), জাপান (সি গ্রুপ) এবং ভিয়েৎনাম (ডি গ্রুপ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই চারটি দেশ তাদের নিজের নিজের গ্রুপে অপরাজেয় থেকে শীর্ষস্থান লাভ করে এবং এই চারটি শীর্ষস্থানীয় দেশের মধ্যে তিনটি এসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত।

সেমি-ফাইনাল : জাপান ৫—৩ খেলায় ভিয়েৎনামকে পরাজিত করে। হাঙ্গেরী ৫-৩ খেলায় চীনকে পরাজিত করে।

ফাইনাল : জাপান ৩—১ খেলায় হাঙ্গেরীকে (ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান) পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগে ২৬টি দেশ ৩টি গ্রুপে ভাগ হয়ে যোগদান করে। জাপান সি গ্রুপ থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ভারতবর্ষ মহিলা বিভাগে যোগদান করেনি। মহিলা বিভাগের তিনটি গ্রুপ থেকেই এশিয়া মহাদেশের এই তিনটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়—চীন (এ গ্রুপ), দক্ষিণ কোরিয়া (বি গ্রুপ) এবং জাপান (সি গ্রুপ)।

ফাইনাল পুল : দক্ষিণ কোরিয়া ৩-০ খেলায় চীনকে পরাজিত করে। জাপান ৩—০ খেলায় চীনকে পরাজিত করে।

ফাইনাল : জাপান ৩—২ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম জাপান, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৩য় চীন।

১৯৫৯ সালের বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশ প্রাধান্য রেখেছে। দুটি দলগত প্রতিযোগিতায় জাপান জয়ী হয়। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় যে চারটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রেছিল তাদের মধ্যে হাঙ্গেরী ছাড়া বাকি তিনটি দেশই এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত।

মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় যে তিনটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় তারা সবই ছিল এশিয়া মহাদেশের।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিভাগ ছিল এবং এই পাঁচটি বিভাগেই জয়ী হয় এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দুটি দেশ—জাপান (চারটি বিভাগে) এবং চীন (একটি বিভাগে)।

আর একদিক থেকে এশিয়া মহাদেশের অটুট প্রাধান্য লক্ষণীয়। পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে মাত্র হাঙ্গেরী এবং চেকোস্লোভাকিয়া এই দুটি দেশ ছাড়া এশিয়া মহাদেশের বাইরের অন্য কোন দেশ পৌঁছতে পারে নি। হাঙ্গেরী পুরুষদের সিঙ্গলস এবং চেকোস্লোভাকিয়া পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে খেলে হেরেছিল। ব্যক্তিগত বিভাগে জাপানের প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাঁচটির মধ্যে জাপান চারটি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিল—মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস। এই চারটি ফাইনাল খেলার তিনটিতে—মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে কেবল জাপানী খেলোয়াড়রাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; অর্থাৎ জাপানী খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলোয়াড় এই তিনটির ফাইনালে উঠতে পারেনি। প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার সেমি-ফাইনালে হাঙ্গারীর এফ্ সিডো (১৯৫৩ সালের সিঙ্গলস বিজয়ী) জাপানের ইচিরো ওগিমুরাকে (জাপান) পরাজিত ক'রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। ওগিমুরা বিশ্ব টেবিল টেনিস খেলায় দু'বার সিঙ্গলসে জয়ী হন এবং এ বছরের প্রতিযোগিতায় ২নং বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে নির্ব্বাচিত হ'ন। ওগিমুরা অবশ্য এ বছরের প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগে বিশ্বখেতাব লাভ করেন—পুরুষদের এবং মিক্সড ডবলস খেলায়। জাপানী মহিলা এফ্ ইণ্ডো তিনটি বিভাগের (মহিলাদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডবলস এবং মিক্সড ডবলস) ফাইনালে খেলে কেবল মিক্সড ডবলস খেতাব লাভ করেন।

চীনের জাং কুয়ো তাং পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চীন দ্বিতীয় এশিয়া মহাদেশ অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে বিশ্ব খেতাব লাভ করলো। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় চীন প্রথম যোগদান ক'রে খেলায় যে পরিচয় দিয়েছে তাতে ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় চীনের সঙ্গে জাপানের সমানে সমানে লড়াই হবে মনে হচ্ছে।

এবছর পুরুষদের দলগত বিভাগের সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত চীন উঠেছিল। পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে ৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে চারজন ছিল চীনের। তাছাড়া মহিলাদের দলগত বিভাগের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে ৮জনের মধ্যে একজন চীনা মহিলা খেলেছিলেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে চারজন খেলোয়াড় বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় থ্যাকার্সি, ভোরা এবং দিভান প্রতিযোগিতার ১ম রাউণ্ডে বিদায় নেন। কে, নাগারাজ পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় ৪র্থরাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠে হাঙ্গারীয়ান খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হ'ন। মিক্সড ডবলস খেলায় দিভান এবং তাঁর জুটী চোং হিলী (কোরিয়া) ৪র্থ রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলেছিলেন।

সাহিত্য সংবাদ

চীন থেকে ভারত : রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য :

বইখানি মুদ্রণ নির্মাণের ২৪০০ বছরই স্বর্গে করে প্রকাশক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।

চীনদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক হিউয়েন সাঙ (৬০২-৬৬৪) নিজে ভারতে ১৪ বৎসর (৬৩০-৬৪৫) কাটিয়ে যত অমূল্য গ্রন্থপাঠ ও সংগ্রহ করেন এবং স্বদেশে ফিরে চীন ভাষায় তাদের অনুবাদ করেন—সেই ও তাঁর অধ্যায় অভিযানের অপূর্ব কাহিনী।

১৮১২ সালে Abel Remusat ফ্রান্সের প্রথম চীন ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তারপর Stanislas Julien, Edchavannes ও Paul Pelliot প্রমুখ বহু ফরাসী ও তথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এক শতাব্দী ধরে ভারত ও চীনের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে হিউয়েন সাঙ সে যুগের সাক্ষী হিসেবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন। অথচ তাঁর জীবনী ও যোগ-সাধনা এতকাল পরে ভালভাবে বোধহয় এই প্রথম বাঙলা ভাষায় রবীন্দ্রবাবু আমাদের উপহার দিলেন।

তিনি বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। হয় ত সেই জন্যেই মানচিত্রের সাহায্যে এমন সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ এই ভ্রমণ কাহিনী লিখতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া এ তো শুধু কাহিনী নয়—এ যে সাধকের তীর্থ যাত্রা। যে কথা প্রত্যেক সর্বদা মনে রেখে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লৌকিক ও অলৌকিক সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তৌগলিক তথ্য—পশ্চিম চীন থেকে খোটি মরভূমি ও উত্তুঙ্গ পামীর পার হয়ে পারস্যের সীমান্ত ছেড়ে হিন্দুকুশ পৌঁছান সেই ত যেন মহাকাব্যের এক বিরাট কাণ্ড—পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। কিন্তু সাধকপ্রবর সাঙ মহাপ্রস্থানের শেষ করে আরও ১১ বছর (৬৪৫-১৬০) একাগ্র সাধনায় চীন ভাষায় এক বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্য রেখে গেছেন। তাঁর সেই অমর-কীর্তি পুথি আজ নব্যচীন ও স্বাধীন ভারতের মানুষদের যেন আহ্বান করছে নতুন সংযোগি ও মৈত্রী সাধনার পথে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ভ্রমণের সময় মহাত্মা সাঙের মাতৃভূমি সো-ইয়াং পরিদর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর স্মৃতি জড়িত কত মঠ মন্দির মূর্তি ও প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। জাপানের বৌদ্ধ মঠও দেখেছি। ভারতের অমূল্য পুঁথির শ্রেষ্ঠতম কয়েকখানি তাঁর পিঠে বেঁধে পরিব্রাজক সাঙ প্রান্তি ক্লান্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন। এসব গল্প শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে শোনাই এবং তিনি তাঁর অমর তুলিকায় সাঙকে সার্থকরূপ দান করে গেছেন। গ্রন্থকারকে অধিকতর পরিশ্রম করার জন্য সাধুবাদ করি ; এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ করি অবিলম্বে আর একখানি গ্রন্থে তিনি চীনদেশের অন্য তীর্থযাত্রীদের কাহিনীগুলিও বাংলায় প্রকাশ করুন। হিউয়েন সাঙের প্রায় দেড়শ' বছর আগে ফা-হিয়েন গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে এসে তাঁর একটী মনোজ্ঞ বিবরণ লিখে গেছেন এবং প্রাচ্য পালযুগের প্রারম্ভে ই-চিঙ ভারতের তথা বাঙলার তাম্রলিপ্ত বিহারে অধ্যয়ন করে কি বিপুল পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র চর্চার কথা লিখে গেছেন—বাঙালীদের সেটা এখন নতুন ভাবে জানান দরকার। সেই সঙ্গে এটিও গ্রন্থকার দেখাতে পারেন যে ভগবান তথাগতের কল্যাণব্রতী বিশ্বজয় হিমালয় ও গোবি মরুর দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধ উপেক্ষা করে প্রায় দু হাজার বছর আগে—কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন, কুমারজীব ও গুণবর্মন, বোধিধর্ম ও বীর্যভদ্র—চীনে ও তিব্বতে ধর্মপ্রচার করে এসেছেন। তাঁরা ধর্মের সঙ্গে নিয়ে গেছেন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ ও সাহিত্য—যার সন্ধান এতদিন দিয়ে গেছেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ। কিন্তু এখন সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে এই ভারতের কৃতী সন্তানদের। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করবে আমি আশা করি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের "চীন থেকে ভারত"।

এই গ্রন্থখানি প্রবীণ সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "গল্প ভারতীতে" প্রকাশ করে তাঁর পত্রিকার নামটী সার্থক করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।

বইখানির বহুল প্রচার হোক—স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে—এই আমার প্রার্থনা।

প্রকাশক : কলিকাতা পুস্তকালয় (প্রাইভেট) লিঃ ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ডাঃ কালিদাস নাগ

মেঘডম্বর : প্রমথ চৌধুরী :

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো কি তিনশো বছর আগেকার বাংলা-দেশ আর বাঙালী সমাজ। যখন সপ্তগ্রামের বন্দরে এসে নোঙর করতো পৃথিবীর নানাদেশের বাণিজ্যতরী বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে, আবার ফিরে যেত বাংলার পণ্যের সঙ্গে পণ্য বিনিময় করে। যখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে বাংলার জলপথ তত শঙ্কিত আর

সেই সঙ্গে সামাজিক অনুশাসনে বাংলার সমাজ নিয়ন্ত্রিত। সেই সময়ের পটভূমিকায় এই 'মেঘডমরু' উপন্যাসখানি রচিত।

হরিহর দুপুরের একঘরে করা নীলাম্বরীর বিবাহরাত্রে প্রকাশ পেল যে, হরিহরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বৈষ্ণবী—যাঁকে গ্রামের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী দাতস্বরেরা গ্রামের ভদ্রে সহমৃতা করতে শ্মশানে নিয়ে যান। নিয়ে যান তাঁর দাঁতবার সমস্ত আকুতি অগ্রাহ্য করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে চিতাগ্নি অগ্নি সংযোগ করেও বৈষ্ণবীর দাহলীলা দেখার আনন্দে বঞ্চিত হতে হয় তাঁদের।—সেই বৈষ্ণবীর সেদিন মৃত্যু হয়নি। তিনি বেঁচে আছেন কিন্তু বর্তমানে তাঁর নাম বৈষ্ণবী নয়—রতনবুড়ী! সে দুঃখের ঘটনার ঘনঘটায় ছোট্ট বইখানি পাঠকের চিত্ত অধিকার করে থাকে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত কৌতূহলেরও শেষ হয় না। কাহিনীর প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন্ত। জ্যোতিভূষণ, শিরোমণি, রাধাকান্ত, পদ্মলোচন কবিরত্ন গোস্বামী, অষ্টিবুড়ী, শিবরাম, মহামায়া প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রই সজীব হয়ে ওঠে যেন মনের মধ্যে পড়তে পড়তে।

ঐতিহাসিক কাহিনী এ নয়। সম্পূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু যে সব মহামারী এতে চিত্রিত করা হয়েছে তাদের কেউই এখনকার সমাজের নয়। কিন্তু তাদের অন্তরে যে প্রেম, যে ভালোবাসা ফুটে উঠেছে, তা চিরকালের। সেই প্রেমকে আশ্রয় করে প্রশান্তবাবু নিপুণভাবে এ কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। এই উপন্যাসটীতে যে মুন্সীয়ানার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ছাপা বাঁধাই ভালো।

[প্রকাশক : বসাক প্রকালয়। ২১ সি, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—৯৲]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিতা-অঞ্জুষা : কবিরাজ ঐরাসবিহারী মল্লিক :

কবিতা-পুস্তক। কবির মনে তখন যে ভাবের উদয় হয়, তখন তিনি তাহা কবিতার আকারে প্রকাশ করেন। সমসাময়িক সকল মানুষ ও ঘটনা লইয়া এই সমস্ত কবিতা লিখিত। কবি চমৎকার কায়দায় ভালভাবে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে প্রশংসা সূচক পত্র গ্রন্থের অধিকাংশে পাওয়াই গেল।

[প্রকাশক : আর, মল্লিক। ৩৭, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২৷৹ ।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নীলকণ্ঠী"—৫৲

শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "অগ্নিযৌবন"—৫৲

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত "শরৎ-সাহিত্যে পতিতা" (২য় সং)—২৷৹

শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটক "কোটীপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎপর্ণা—রাজনটী—রূপকথা" (একত্রে নূতন সং)—৩৲

বিধেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩৩শ সং)—২৷৹ "মেবার-পতন" (১৪শ সং)—২৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "বুদ্ধদেব-চরিত" (৪র্থ সং)—২৲

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়গুপ্ত প্রণীত "পরিবার-পরিকল্পনা"—২৷৹

নীহারবিন্দু চৌধুরী প্রণীত "রাগ ও রাগ"—২৲

আরতি ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য "নব-কুশ"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৬

লেখ-সূচী

১। জগদীশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা (প্রবন্ধ) •
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী ৬৪১
২। কাগজের ফুল (কবিতা)
সুনীল বসু ৬৭৩
৩। মায়াবিনী (গল্প)
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬৭৪
৪। বিপিনচন্দ্র পালের—বুদ্ধিমানের কর্ম (প্রবন্ধ)
শ্রীবলাই দেবশর্মা • ৬৭৮
৫। শুভচেষ্টা (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৬৮০

চিত্র-সূচী

১। মঙ্গল পাহাড়ের চূড়ায়, ২। পলাশগ্রামের বাজার, ৩। ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত প্রার্থনা, ৪। ব্যায়াম, ৫। ব্রতচারী-নৃত্য, ৬। গল্পের আসর, ৭। অধ্যাপক মোহিত-কুমার ঘোষ, ৮। সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার পরিচালিত "যাত্রী" চিত্রের একটি দৃশ্যে সবিতা, নতুনদি ও বীণাকে দেখা যাচ্ছে, ৯। • শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখ-সূচী

৬। আগামী (কবিতা)—প্রশান্ত মৈত্র
৭। রবীন্দ্রনাথের বলাকায় গতিবেগ ও জীবন চেতনা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ৬৫৪
৮। 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ (প্রবন্ধ)
মণীন্দ্র চক্রবর্তী ... ৬৬১
৯। মনের দাবী (কবিতা)
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ৬৬২
১০। বিভূতিভূষণের কথাশিল্প (আলোচনা)
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৩
১১। ঘিঘি (গল্প)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ৬৬৯
১২। আজ (কবিতা)—হাসিরাশি দেবী ... ৬৭২
১৩। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)
শ্রীহৃষীকেশ আশ্রম ৬৭৩
১৪। কলহনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ... ৬৭৪

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র
বেণী সংহার
বিশেষ চিত্র
তরঙ্গভঙ্গ ও সাগর সঙ্গম

সগৌরবে চলিতেছে ঃ

সুন্দর বনের শ্বাপদসঙ্কুল
পট-ভূমিকায় রোমাঞ্চকর
প্রণয়মুখর কাহিনী.....

চিত্রাঞ্জলি পিকচার্স এর
বৈচিত্র্যময় ছবি

জল
জঙ্গল

শ্রেঃ মঞ্জুলা ব্যানার্জী, অসীমকুমার, সন্ধ্যা রায়, সুখেন, প্রেমাংশু, হরিধন, নবদ্বীপ ও সহর রায়।

পরিচালনা : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
সংগীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

শ্রী * প্রাচী * ইন্দিরা
ও সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে
—নর্মদা রিলীজ—

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অনামিকা

কবিতা গ্রন্থ। আধুনিক বাংলার কাব্য-গগনে যে কয়জন কবি বাংলার-হৃদয় রস নিয়ে চর্চা করেন—পরীক্ষা নিরীক্ষার কচকচি না করে মহাজন-পথে পদক্ষেপ করে চলেছেন—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। এ-বইটি পড়ে কাব্যরস পিপাসুরা তৃপ্তি পাবেন নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়। দাম—২·২৫ ন. প.

॥ রীডার্স কর্নার ॥ কলিকাতা-৬

— শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত —

নিশীথ রাতের
সূর্যোদয়ের পথে

দাম—২·৮০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

লেখ-সূচী

১৫। চক্ষু দান (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত ৬৮০

১৬। জেলখানার আত্মকাহিনী (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)
ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী ৬৮১

১৭। অমীমাংসা (কবিতা)
সাধনা মুখোপাধ্যায় ৬৮৩

১৮। আধুনিকা (অনুবাদ—গল্প)
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র ৬৮৪

১৯। বেলেঘাটা মুনিসাদি বিদ্যাপীঠ (আলোচনা)
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৬৯০

২০। বৃথা (কবিতা)—শ্রীশ্যামাদাস মণ্ডল ... ৬৯৩

২১। মযূর নৃত্য (সংগীত)—কথা ॥ শ্রীনিশিকান্ত
সুর-ও স্বরলিপি ॥
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬৯৪

লেখ-সূচী

২২। বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য (প্রবন্ধ)
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ৭০১

২৩। গ্রীষ্মের বাথা (কবিতা)
শ্রীকালিদাস রায় ৭০৪

২৪। জীবনের লক্ষ্য (কিশোর জগৎ)
উপানন্দ ৭০৫

২৫। উপনিষদের ভূমিকা (প্রবন্ধ—কিশোর জগৎ)
চিত্রিতা দেবী ... ৭০৬

২৬। সত্যি কি তুমি চাও (কবিতা—কিশোর জগৎ)
বৈভব ৭০৯

২৭। কাজল-প্রদীপ (গল্প—কিশোর জগৎ)
শ্রীআশাবরী দেবী ৭০৯

২৮। দ্বারকার দ্বারে (ভ্রমণ কাহিনী)
ঋণপ্রভা ভাদুড়ী

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী
অনুরূপা দেবীর
—অমর সাহিত্য-সাধনা—

মন্ত্রশক্তি ৪-৫০ গোষ্যপুত্র ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲
গরীবের মেয়ে ৪-৫০ হারানো খাতা ৩৲
পথের সাথী ৩৲ বাগ্‌দত্তা ৫৲ পূর্বাপর ৪৲

—সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে—
নূতন রূপসজ্জায় পুনর্মুদ্রিত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস
রামগড় ৪-৫০.

যে মহিয়সী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্র বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

লেখ-সূচী

২৯। বসন্ত (কবিতা)
বিভূলাল চট্টোপাধ্যায় ৭১৮
৩০। ছিন্নবাধা (উপন্যাস)
সমরেশ বসু
৩১। স্রষ্টার মন (প্রবন্ধ)
শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু ৭২৪
৩২। দুঃখ শুধু দুঃখ নয় (কবিতা)
গোবিন্দ গোস্বামী ৭২৭
৩৩। সাময়িকী ৭২৮
৩৪। শেষ পথের পাঁচালী (গল্প)
সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ৭৩৪
৩৫। মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর
* সোবিয়েতে—
শচীন সেনগুপ্ত ... ৭৩৯
৩৬। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর (আলোচনা)
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৭। আর কত দূরে (কবিতা)
শ্রীপ্রবীরকুমার বিশ্বাস
৩৮। লীলাভূমি (উপন্যাস)
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৭৪৮
৩৯। দূত (কবিতা)—রত্নেশ্বর হাজরা ৭৫২
৪০। পট ও পীঠ—শ্রী'শ'— ৭৫৩
৪১। 'এস মদনমোহনবেশে নন্দদুলাল'
কুমারেশ ভট্টাচার্য ... ৭৫৬
৪২। গ্রহ-জগৎ (জ্যোতিষ)—উপাধ্যায় ... ৭৬১
৪৩। খেলা-ধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ... ৭৬৫
৪৪। সাহিত্য সংবাদ ... ৭৭১

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

নিরুদ্দেশ

"জগৎ আগাইবে, হৃদয় পিছাইবে, প্রাচুর্য আসিবে মনের দৈন্য লইয়া, সম্পদ আসিবে ঔদ্ধত্য লইয়া, অকল্যাণ আসিবে কল্যাণের বেশে, আমরা চলিয়াছি—চলিব"—পৃথিবীর তেপান্তরে নিরুদ্দিষ্ট পথে—পিছনে জমিয়া উঠিয়াছে অশ্রুসায়র। • দাম—৪৲

দেহ ও দেহাতীত

কল্পনাদ্বারা মানব-মন যুগে যুগে তার জীবনে রচনা ক'রেছে স্বপ্নের মায়াজাল। তাই তার পাওয়ার মাঝে আছে না-পাওয়ার বেদনা—না-পাওয়ার মাঝে আছে পাওয়ার আনন্দ। দেহ ও দেহাতীত-জীবনে ইহাই মানবের চিরন্তন জীবনেতিহাস। দুইটি নর-নারীর জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার সুখ আলেখ্য।

দাম—।৶

পেতাঙ্গ

যুগে যুগে রক্তাক্ত বিপ্লবই পৃথিবীকে দিয়াছে অগ্রগতি। মহামানবগণের প্রেমের বাণী—ত্যাগের বাণী—মানুষের বধির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। আসুরিক শক্তির দম্ভে মানুষ আপনার মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে পৃথিবীর দ্বারে।

১ম পর্ব—২-৫০ ২য় পর্ব—২৫০

কারটুন

তিনটি বোহিমিয়ান শিল্পীর বিচিত্র জীবন-কথা—হাসি ও অশ্রুর সমন্বয়ে অপরূপ। দাম—২-৫০

বিশ্ব মানব

যুগান্তর বলেন: তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই বৃহৎ উপন্যাসখানি বঙ্গ-সাহিত্যের এক নূতন সৃষ্টি। দাম—৪৲

শ্রেষ্ঠ গল্প

(অ-নির্বাচিত)

দাম—চার টাকা

পৃথ্বীশবাবুর দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও গভীর—জীবনের মর্মমূল হইতে সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করাই উহার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ আর দুঃখের তুচ্ছ ইতিকথাও তাঁহার অপূর্ব লেখনী স্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠে। জীবনের নশ্বর পটভূমিকায় অঙ্কিত ক্ষুদ্র মানুষের অতিক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার সিসিফাসীয় অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। একুশটি গল্পের সুবৃহৎ সংকলন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

নীলকণ্ঠ
অদ্য ও প্রত্যহ
॥৫·০০॥

সমরেশ বসু
শ্রীমতী কাফে
॥৬·০০॥

বিক্রমাদিত্য
যুদ্ধের ইয়োরোপ
॥৪·০০॥

প্রফুল্ল রায়
সিন্ধু পারের পাখি
॥৯·০০॥

নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত
ডাক বাংলো
॥২·২৫॥

আনন্দকিশোর মুন্সী
তেলকি থেকে তেযজ
॥৬·০০॥

* স্মৃতিকথা, জীবনী, আত্মজীবনী *

বন্যা ক্যাম্প : অমলেন্দু দাসগুপ্ত : ॥৩·৫০॥ **আমার কালের কথা** তারাশঙ্কর বন্দ্যো: ॥৩·৫০॥ **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ** : বিনয় ঘোষ : (১ম খ) : ৩·০০, (২য় খ) : ৭·০০, (৩য় খ) : বসুন্ধর, **ইংলণ্ডের ডায়েরী** : শিবনাথ শাস্ত্রী ॥৪·০০॥ **আরাকান জঙ্গলে** শান্তিরাম রায় ॥ ২·০০ ॥ **হারানো অতীত** : সরলাবালা সরকার ॥৩·০০॥

* উপন্যাস *

জল জঙ্গল : মনোজ বসু : ৫·০০॥ **আরোগ্য নিকেতন** : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ৬·৫০॥ **ডোমরাই ভরসা** : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : ৪·৫০॥ **শিলালিপি** : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ৫·০০॥ **কুশাঙ্গু** : সরোজকুমার রায়চৌধুরী ৫·০০॥ **তামসী** : জরাসন্ধ : ৫·০০॥ **সুখ দুঃখের ঢেউ** : নরেন্দ্র; নারায়ণ চিত্র : ৪·০০॥ **প্রদক্ষিণ** : সুধীরজন মুখোপাধ্যায় : ৬·০০॥ **ঠিকানা বদল** : অমরেন্দ্র ঘোষ : ৫·০০॥ **মুক্তাভস্ম** : প্রাণতোষ ঘটক : ৫·০০॥ **চলাচল** : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : ৬·০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা—১২

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

— ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি বই —

কপালকুণ্ডলা

মূলগ্রন্থ, ১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী কপালকুণ্ডলা পরিচিতি, ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দটীকা ও টিপ্পনী এবং **বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ** সুদৃশ্য প্রামাণ্য সংস্করণ।

দাম—২-৫০

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনাসহ নূতন সংস্করণ। উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। দাম—এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দিলীপকুমারের

অনামী—(২য় সংস্করণ) পূজার আগেই বাহির হইয়াছে। ইহাতে আছে :—

মণি-মঞ্জুষা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন ও হিন্দী কবিতা থেকে অনুবাদ।

কবিতাকুঞ্জ—দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন—বহু নূতন কবিতা।

গীতিগুঞ্জন—দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গানের সংকলন—বহু নূতন গান।

মীরার ভজন—ইন্দিরা দেবীর সুধাঞ্জলির প্রায় ১০০ কবিতার অনুবাদ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের প্রাক্‌কথন সহ।

পত্রাবলী—(বাংলায়)—রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের, সুভাষচন্দ্রের, মোহিতলালের, শ্রীগোপীনাথের ইত্যাদি।

পত্রাবলী—(ইংরাজীতে)—শ্রীঅরবিন্দের, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের, সার পল ডিউকসের, জর্জ রাসেলের ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রাক্‌কথন সহ। মূল্য—৬·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কল্পিত জীবনীয় রসায়ন। ইহা মৃতকল্পকে জীবন, ব্যাধিতকে স্বাস্থ্য, দুর্ব্বলকে বলদান করে এবং ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনাভরা মনমরা হতাশ জীবনে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দের ধারা উৎসারিত করে। ইহা সেবনে পাচকাগ্নি ও জীর্ণ শক্তি বাড়ে, যকৃৎ স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করে, অম্ল ও অরুচি দূর হয়, দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগান্তে এবং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে ইহা মন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। কঠিন রোগে ক্ষীণনাড়ী মুমূর্ষুর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া নিস্পন্দ হওয়ার উপক্রমে ইহা নূতন জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক নাড়ীর গতি আনিয়া দেয়।

পাইন্ট—৪৲ টাকা, কোয়ার্ট—৭৷৷০ টাকা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয় ডাকা লিঃ।

হেড অফিস: ৫২।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রাঞ্চ—ভারত ও পাকিস্থানে সর্ব্বত্র।

মালিকগণ—অধ্যক্ষ মথুরমোহন, লালমোহন ও শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখার্জ্জী চক্রবর্ত্তী

শিল্পী : শ্রীঅতুলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেণী সংহার

ভারত ব্রিটিশ এম্বাসি

উপন্যাসের মত জীবন

শরৎচন্দ্রিকা । নন্দদুলাল চক্রবর্তী

আত্মজীবনের তথ্য রহস্যে আবৃত রেখেছেন শরৎচন্দ্র। বলেছেন—'আমার যা-কিছু বলবার তার সবই আছে আমার বইয়ে। এত বেশি আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা আর কারো লেখায় পাবে না। আমার বই থেকে যদি কেউ আমার জীবনের সব কথা উদ্ধার করতে না-পারে, সে আমার জীবনের কথা লিখতে পারবে না।' শরৎচন্দ্রের এই নির্দেশ সযত্নে পালন করেছেন লেখক নন্দদুলাল চক্রবর্তী। দীর্ঘ দিনের সন্ধানে বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, গবেষণা করেছেন, তারপর রসান দিয়ে পরিবেশন করেছেন 'শরৎচন্দ্রিকা'। দাম ৪·৫০

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন । রবি রায়

বাংলাভাষায় মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে এ ধরণের বই এই প্রথম। সব চেয়ে বড় গুণ এর আলোচনা-পদ্ধতি। মার্ক্সীয় দর্শন যে একদিনে রচিত হয়নি, তার পিছনে আছে পাশ্চাত্য দর্শনের আড়াই হাজার বছরের পটভূমি, তা দেখাবার জন্যে পাশ্চাত্যের প্রথম দার্শনিক থেল্‌স থেকে হেগেল্‌ পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকের ধারাবাহিক পরিচয় গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে মার্ক্সীয় দর্শনের মর্ম গ্রহণ যেমন সহজ হবে তেমনি দর্শনে উৎসাহী ছাত্রদের বিশেষ কাজে আসবে। দাম ৫৲

কৈলাস-মানসের পথে । ডক্টর অতুলচন্দ্র লাহিড়ী

কৈলাস মানস-সরোবর—এই মহাতীর্থের ডাকে মন সাড়া দেয়নি এমন ভারতীয় বিরল। কিন্তু তাহলেও এই তীর্থ দর্শনের সংকল্প অনেকেরই মনে শুধু সে কল্পনাতেই থেকে যায়। তার একটি প্রধান কারণ—এই পথপরিক্রমার উপযুক্ত তথ্যবিবরণীর অভাব। ডক্টর অতুলচন্দ্র লাহিড়ীর গ্রন্থ সেই অভাব দূর করবে। সাধারণ গৃহস্থের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা—সহজ, সুরল, অনাড়ম্বর এই ভ্রমণকাহিনীতে উন্মুখ যাত্রী পাবেন এমন অনেক তথ্য যাতে এই অজানা পথ তাঁর কাছে অনেকটা জানা হয়ে যাবে, অভিজ্ঞ পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হতে পারবেন। ২৪খানা আলোক-চিত্র। সিগনেট বুকশপ পরিবেশিত। দাম ৩৷৹

নতুন সংস্করণ

আবোলতাবোল । সুকুমার রায়

বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নম্বরের বই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তালিকা করা যায়, সে তালিকা যেখানেই শেষ হোক, এর প্রথম স্থান অবধারিত। যুগে-যুগে যত ছেলেমেয়ে আসবে এ-দেশে, প্রত্যেককে তার আনন্দের অভিজ্ঞতা নিতে হবে এ-বই থেকে। এ শুধু একটা বই নয়, এ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। দাম ২·২৫, ২·৭৫

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
বালিগঞ্জে : ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

সিগনেট বুকশপ

নূতন দ্বিতীয় সংস্করণ
—ঃ প্রকাশিত হইল ঃ—

ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত

শরৎ-সাহিত্যে পতিতা

সমাজের দৃষ্টি যে দিকটায় পরাঙ্মুখ—শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির সেইটাই অভিমুখ। তাই সংবেদনশীল চিত্ত লইয়া শরৎচন্দ্র তথাকথিত পতিতাদের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সমালোচকের মতে—শরৎচন্দ্রের মনের অবচেতন স্তরে একটি শাশ্বত নারী ছিল। জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় সেই নারীটি বিভিন্ন রূপে শরৎ-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শরৎবাবুর চিত্রিত প্রত্যেকটি চরিত্রহীনার চরিত্রে এমন একটি শোভন দিক আছে যে তাহাদিগকে সাধারণ পতিতা নারীর পর্য্যায়ে ফেলিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। অবাঞ্ছিত আবেষ্টনীর মধ্যেও শরৎবাবুর সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি নারীরই এমন একটা দেহাতিরিক্ত আবেদন আছে, যাহা চিন্তাশীল পাঠকের সহজ সহানুভূতি আকর্ষণ করে। দাম—২৲০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

২৯শে মে থেকে

আর·ডি·বনশল
এ্যাণ্ডিত

ছবি
অরুন্ধতী
সাবিত্রী
বসন্ত
পাহাড়ী
অতিরিক্ত
আশাপূর্ণা দেবীর

শশীবাবুর সংসার

পরিচালনা
সুধীর মুখার্জি
সুর
অনিল বাগচী

রাধা · লোটাস · পূর্ণতে

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

জগদীশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ শাশ্বত ও সনাতন—বৈজ্ঞানিকের সম্পর্ক এই পরিদৃশ্যমান, স্থূল, জড় জগতের সঙ্গে; কিন্তু ধার্মিকের জগৎ ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞাত জগৎ, যার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের কোনোরূপ আদান-প্রদানই নেই। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাঁরা "বিজ্ঞানী" অর্থাৎ "বিজ্ঞান" বা বিশেষ-জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁরা এই কৃত্রিম সীমারেখা স্বীকার করেন না। তাঁদেরই একজন ছিলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, যাঁর শুভ জন্মশতবার্ষিকী বর্তমানে দেশবিদেশে সর্বত্রই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত হয়ে আছেন, জড়জগতেও তাঁরই বিকাশ—অজড়-প্রাণি-জগতেও তাঁরই বিকাশ। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও সেই একই মহাশক্তির মহাপ্রকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল পূর্ণতর মহিমায়। বহুদিন পূর্বে বিরচিত (১৮৯৭) একটী সুন্দর প্রবন্ধে আচার্যদেব বলছেন :—

"শক্তিও অবিনশ্বর। এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান্ নদীস্রোত যেমন উপলখণ্ডকে বারম্বার ভাঙিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তিস্রোতও সেইরূপ ক্ষুদ্রজগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে।"

এই মহাশক্তি কিন্তু কেবল জড়শক্তি নয়, জীব-শক্তিও সমভাবে। জীবে এই শক্তি রূপধারণ করেছেন অজর, অমর প্রাণশক্তি রূপে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে, অথচ দার্শনিকের পরিপূর্ণ উপলব্ধি-লব্ধ বিশ্বাসে, আচার্যদেব পুনরায় আমাদের সেই বেদোপনিষদের শাশ্বত সত্যই প্রচার করে' বলেছেন—

"সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটী অংশ আছে। একটি অজর, অমর, তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।"

এই জীবন অনন্ত, অসীম, তার ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই, শেষ নেই, আরম্ভ নেই! বাহিরের রূপের আরম্ভ আছে, পরিবর্তন আছে, ভয় আছে, মরণ আছে। কিন্তু সর্বব্যাপী মহাশক্তির বিকাশ আন্তর সত্তার, প্রকৃত স্বরূপের, অন্তর্নিহিত আত্মার আরম্ভ নেই, শেষ নেই, পরিবর্তন নেই, জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, ভয় নেই, মরণ নেই। অনুপম ভাবে আচার্যদেব বলছেন—

"জগতের শেষও নেই, আরম্ভও নেই। কোনো বস্তুরই বিনাশ নেই।"

"আজ যে পুষ্প কলিকাটী অকারণে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের বীজাণুতেও বংশপরম্পরাগত অনন্তজীবন প্রসারিত। সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।"

অনন্তের বুকে লালিত এই জীবের চরমোৎকর্ষ মানব। যে মহাশক্তি জড়ে প্রকৃতি রূপে, জীবে প্রাণ রূপে প্রকাশমান, তিনিই মানবে প্রজ্ঞারূপে, আনন্দ রূপে, আত্মা রূপে পূর্ণ-বিকশিত।

"অসংখ্য বৎসর ব্যাপী, বিভিন্ন শক্তি গঠিত, অনন্ত সংগ্রামে জয়ী, জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব।"

মানব ক্ষুদ্র হয়েও বৃহৎ, জ্ঞানবলে অসীম-লাভের প্রয়াসী।

"আজ সেই কীটাণুর বংশধর দুর্বল জীব স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বলধারণ করিতে চাহে। অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিম্বা এই ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোনটা অধিক বিস্ময়কর? পূর্বে বলিয়াছি এ জগতের আরম্ভ নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নেই, বৃহৎও নেই।"

সত্যই, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দেহের উৎপত্তির কারণ বা আকারে নয়না, হয় আত্মার শক্তিতে, আত্মার উৎকর্ষে। সেইজন্যই, সাধারণ মানবেই সেই মহাশক্তির শেষ নয়, শেষ প্রকৃত মানবে, মহামানবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন জীবন্মুক্ত। পরম বিশ্বাসভরে আচার্যদেব বলছেন:—

"জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! এ' কথা সর্বসাধারণের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্দ্ধাভিমুখেই সৃষ্টির গতি; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র মানবজীবনের এই অনন্ত উন্নতি সম্ভাবনাতেই ছিলেন আজন্ম বিশ্বাসী। এরূপ আশাবাদই হল ধর্মের প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরের বরপুত্র জগদীশচন্দ্রও জড় থেকে জীবে, জীব থেকে মানবে, মানব থেকে মহামানবে সেই একই পরমেশ্বরের, সেই একই মহাশক্তি, মহাপ্রাণ, মহাজ্ঞান, মহাসৌন্দর্য ও মহানন্দের ক্রমবিকাশ দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন। সমগ্র জগৎই ছিল তাঁর কাছে শ্রীভগবানের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাঁরই স্বরূপ প্রকাশের উপায়। সেইজন্যই, ধর্মপ্রাণ আচার্য জগদীশ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিশ্রুত গবেষণাগারকে "মন্দির" আখ্যা দিয়ে "দেবচরণে নিবেদন" করে বলেছিলেন—

"বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল,

তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির,কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।"

কিন্তু আচার্যদেবের পূত জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রণিধানীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তাঁর এই ধর্মকে, এই গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদে পদে, প্রতি পলে পলে মূর্ত করে তুলেছিলেন এক অপরূপ মহিমায়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডস্থ এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পার্শ্ববর্তী বাসভবনে বহুদিন বাস করেছি। আমাদের পিতামহী স্বর্ণপ্রভা ছিলেন জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং তাঁর বিবাহ হয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দেশ-সেবক আনন্দ-মোহন বসুর সঙ্গে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান ডিরেক্টর ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসুর মাতা সুবর্ণপ্রভা ছিলেন আচার্যদেবের দ্বিতীয়া কন্যা এবং তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় আনন্দমোহনের ভ্রাতা মোহিনীমোহনের। আনন্দমোহনের ঋষিতুল্য চরিত্র, গভীর ধর্মানুরাগ ও স্থির ঈশ্বরবিশ্বাস জগদীশচন্দ্রকেও সুগভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আনন্দমোহনকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রাণসহচর জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের অতি নিকট সংস্পর্শে এসে, যে আধ্যাত্মিক দ্যুতি আমরা দেখে ধন্য হয়েছি, তা' সত্যই অপূর্ব। শিশুকালে, তিনি কত মধুর গল্পচ্ছলে আমাদের ধর্ম ও নীতির মূলতত্ত্বগুলি বুঝিয়ে বলতেন। বড় হয়েও সর্বদা দেখেছি—কি সুন্দর-ভাবে তাঁর প্রতি কথায়, প্রতি সাধারণ কাজেও তাঁর এই আধ্যাত্মিক মনোভাব সু-পরিস্ফুট হয়ে উঠত। প্রথম দর্শন পড়ে আমরা যখন বিশ্বপিতার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্কে রত হতাম, তখন তাঁর অটল ঈশ্বর-বিশ্বাসের তুঙ্গ শিলাতটে ব্যাহত হয়ে সেই তর্কস্রোত মুহূর্তেই থেমে যেত। একটী কথা তিনি প্রায়ই বলতেন এবং সত্যই নিজের জীবনের মূলমন্ত্ররূপেও গ্রহণ করেছিলেন—"বিশ্বাস রাখ, সন্দেহ করো না, বিশ্বাসের প্রমাণ আপনিই পাবে।" ঋষিশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্রের এই বিশ্বাসের মন্ত্র, এই আশার বাণী, এই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা আমরা জীবন-প্রারম্ভেই লাভ করে পরমধন্য হয়েছিলাম এবং তা'ই আজও হয়ে রয়েছে আমাদের অমূল্য জীবন-পাথেয়।

আচার্যদেবের সেই অনুপম বিশ্বাস-মন্ত্রই যেন আজ বর্তমান সার্বজনীন অবিশ্বাসের, অশান্তির যুগকেও উদ্বুদ্ধ করে :—

"কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাস বলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটী ঘটনার দ্বারা হয়না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।"

কাগজের ফুল

সুনীল বসু

কাগজের ফুল, ক্ষণস্থায়ী আয়ুর বিরোধী
কী সুন্দর স্থির হয়ে আছো তুমি কাঁচের শোকেসে!
জল বিনা সজীবতা অঙ্গে ফোটে দৃষ্টিতে অক্লেশে,
হাস্যকর ভাব শুনি মৃত্তিকার ফুল হতে যদি।
আমাদের নাগরিক পেশাদারী মানুষী জীবন
তোমারি মতন জানি, প্রকৃতির ধারি না'ক ধার।
মুখের মুখোস এঁটে ভাবি কত নৌখিন এখন—
কল্পনায় এঁকে ফেলি নদী মাঠ কুহেলি পাহাড়।
মৃত্তিকার আলিঙ্গনে বীতস্পৃহা অশেষ তোমার
সুস্থ থাকো চক্ষু মেলে নম্র কাটা
ফ্লাওয়ার ভেসে।
আমরাও পাড়াগাঁকে চক্ষে দেখি অশেষ ক্ষমার,
দিবা থাকি ভাড়া দিয়ে, বাসা কিংবা
হোটেলে, কি মেসে।
এতো নিপুন সাদৃশ্য, মধ্যবিত্ত সত্তা এ-জীবনে
তবু আয়ু দীর্ঘস্থায়ী বিরাজিত ক্ষুদ্র কক্ষ-কোণে॥

মায়াবিনী

সুভাষ সমাজদার

শহরের একেবারে দক্ষিণদিকে শ্মশানের রাস্তা। লোকে ঐ পথটাকে বলে মহানির্বাণ রোড।

একদিন রাতে মহানির্বাণ রোডে একজনের পদশব্দ জেগে উঠল। রাস্তার দু'পাশে শালগাছের ঘন বিস্তার চারিদিকে কালো থকথকে অন্ধকার ছড়িয়েছে! দূরে তমসাস্তীর্ণ আকাই নদীর ভোঁতা ছুরির মত রেখাটার দিকে তাকিয়ে একটা বিস্বাদ বিবর্ণ অনুভূতিতে ছেয়ে গেল তার মন। দেশ ভাগ হয়ে এখানে আসার পর থেকেই মাথার ওপরে উদ্যত খড়্গের মত সর্বনাশের আশঙ্কা নিয়ে তার দিন কাটছে। এইভাবে লোক ঠকিয়ে ঠকিয়ে আর কতদিন সংসার চলবে? যে কোন মুহূর্তে চরম বিপদও তো হয়ে যেতে পারে! তার বুকে ভয়ের দুরুদুরু! তবুও—

তবুও অদ্ভুত একটা দৃঢ়তার প্রলেপ লাগল তার মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে। সে মাথা উঁচু করে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

শন শন করা একটা দমকা হাওয়ার আর্তনাদ আছড়ে পড়ল শালগাছের ডালে ডালে। তীব্র একটা সন্দেহের বিষ বাষ্পের জীবাণুর মত তাকে ঘুরে ঘুরে খেয়ে ফেলতে লাগল। মাধব এতদিন তার কাছে রয়েছে কেন? চারিদিকে ঝিঁঝিঁর নূপুর বাজছে। ঘন কালো অন্ধকারের ভেতরে নিশিরাতের গা ছমছম করা নিথর স্তব্ধতার বুকে মৃদু পদশব্দ তুলে সেই ছায়াশরীর চলতে লাগল। তাকে যে যেতেই হবে সেখানে—

সেখানে শ্মশানের উত্তরপূব কোণে বাঁশঝোপের নীচে ছোট কুঁড়েঘরের ভেতরে ভৈরবী বসে রয়েছে। তার নিকষকালো পাথরে গড়া দেহের রেখায় রেখায় সমুজ্জ্বল যৌবনশ্রী। শিথিল দুটো রক্ত চোখের তারায় তারায় কেমন একটা অদ্ভুত ঝলমলে দৃষ্টি। তার জটধরা রুক্ষ চুলের গোছা, আর দুচোখের ধারালো দৃষ্টির বিচিত্র সম্মোহনে সকলেরই বিবেক বুদ্ধি কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় ছেয়ে যায়। হয়তো—

হয়তো মাধবেরও তাই হয়েছে। তাই ভৈরবীর সঙ্গে একদিন আলাপ করতে এসে, সেই থেকে এখানেই রয়ে গেছে কেন? কেন যাই যাই করেও মাধব যেতে পারে নি? শহরের লোক বলে, ভৈরবী মাধবকে বশীকরণ করে তার নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। অমন ভরা যৌবনের মেয়েমানুষ, শ্মশানে একা একা থাকে, তার পক্ষে যে কোন কাজ সম্ভব! শুধু তাই নয়। কুঁড়েঘরের এককোণে মাটির তৈরী মা ব্রহ্মময়ীর ভয়াল মূর্তি। তাঁর হাঁস-মুরগী আর কবুতরের ছিন্ন মুণ্ডু দুলছে। ভৈরবীর ধ্যানের আসনের চারিদিকে ইতস্তত ছড়ানো মড়ার মাথার খুলি আর এককোণে মাটিতে পোতা সিঁদুর-মাখা ত্রিশূল—সব মিলিয়ে শহরের লোকের মনে একটা ভয়ের শিহরণ ছড়িয়ে দিয়েছে তান্ত্রিক এই সন্ন্যাসিনী।

গভীর রাতে আকাশে কালো মেঘ জমল থরে থরে। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে সুরু হলো। আশ্রমের সেই ঘরে ভৈরবীর ধ্যানস্থ মূর্তির সম্মুখে মুগ্ধ ভক্তের মত বসে রয়েছে মাধব।

—মাধব!

চোখ খুলল ব্রহ্মচারিণী। তার বিশাল দুটো অপলক চোখের তারায় তারায় বিচিত্র একটা হাসির আলো ঝলসে উঠল।

—আজ বলে যেবে—পুরানো কংগ্রেস ভবনের পিছনে বুড়া কালীতলার ঠিক কোথায় গুপ্তধন রয়েছে তা আজ বলবে?

তীব্র আগ্রহে তার কাছে ঘন হয়ে বসে মাধব।

আকাশের কোন অলক্ষ্য প্রান্ত থেকে গুম গুম করে ডেকে উঠল মেঘ। ঝড়ো বাতাসে ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন। বাইরের ঐ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ রাত্রিটার দিকে তাকিয়ে হেসে মধু ঝরা গলায় ভৈরবী বলল—মাধব তুই সাধু সন্ন্যাসী বিশ্বাস করিস ?

—হ্যাঁ করি। না করলে, তোমার কাছে এতদিন কিসের আশায় রয়েছি। আর অবিশ্বাস করলে তুমি তা বুঝতেই পারতে।

—তোকে তো কতদিন আমি বলেছি, ধর্মের টানে আমি এই পথে আসিনি। আমি সন্ন্যাসিনী নই মাধব !

ভৈরবীর কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনালো।

—তুমি তাহলে বারো বছর ধরে শ্মশানে শ্মশানে তোমার স্বামীকে খুঁজছো ! বেশ তা বুঝতে পারছো, আর তুমি তাকে পাবে না।

পাবে না ! মাধবের কথাটা যেন তীব্র তীক্ষ্ণ তীরের মত ভৈরবীর বুকে বিঁধে গেল। ঘন বর্ষার মেঘের মত কি যেন টলমল করে উঠল তার দুচোখ। বাইরে অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। সম্মুখের বটগাছটার ঝাঁছড়ে ঝড়ো হাওয়ার ঝলক। তার সম্মুখে যেন একটা বিয়োগান্ত কাহিনীর পাণ্ডুলিপি পড়ছিল—একটা দমকা বাতাসে তার অনেকগুলো পাতা সামনের দিকে ফরফর করে উড়ে গেল। চলে গেল একেবারে প্রথম অধ্যায়ে—যখন তার জীবনে ছিল নিরুদ্বেগ গৃহীজীবন। ছিল স্বামী নামে একটি প্রেমিক পুরুষ, যার বুকে আত্মসমর্পণে আনন্দ ঘনাত, আর তার আদরে ভালবাসায় অনেকগুলো সোনা মোড়া দিন নীল আকাশে শাদা মেঘের মতই উড়ে গিয়েছিল—

হ্যাঁ। একদিন সেও বিয়ের বেশে সেজেছিল। শুভদৃষ্টির সময় সলজ্জ চোখে যার হাসিমাখা চোখদুটো দেখেছিল, সে তাকে ভালও বেসেছিল খুব। কত নিরালা রাতে গাঢ় গলায় সে বলেছিল—তোমাকে একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারি না।

হ্যাঁ। সেই মানুষই আজ তাকে ছেড়ে বারো বছর ধরে কোন শ্মশানে; কোন তীর্থে যে ঘুরছে ! কে জানে বেঁচে আছে কি না !

পুনর্ভবার তীরে গঙ্গারামপুরের তাদের নিস্তব্ধ বাড়ীতে অনাগত একটি অতিথির আগমন সম্ভাবনায় আনন্দের সাড়া পড়ল। তাদের প্রথম সন্তান এল। কিশুককে নিবিড় আবেগে বুকে চেপে ধরে গৌরদাস কি আদরই না করতো ! কিশুককে ঘিরে তার চোখ দুটো সোনার স্বপ্নে অবাধ হয়ে উঠতো। বলতো—দেখ—দেখ বেলা, কিশু আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাসছে। কী দুষ্টুই হয়েছে ! রান্না ফেলে তাকে কিশুর হাসি দেখতে ছুটে আসতে হতো।

—বুঝলে বেলা, ওকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াবো। এখন কলকব্জার ঘুম—আরও হাজারো কথার আবেগে গৌরদাসের মুখখানা উত্তেজনায় ঝলমল করতো। হয়তো কিশুকে খাওয়াতে একটু দেরী হয়েছে। সে কাঁদছে। অমনি গৌরদাসের কপালে বিরক্তির মেঘ ঘনিয়ে আসতো। বলতো—ঘরের কাজই তোমার কাছে বড় হলো ? তুমি ছেলেটাকে মোটেই যত্ন করো না ! অসুযোগে ভারী হয়ে উঠতো তার গলার স্বর।

কিন্তু, কিন্তু, আর কিন্তু ! কিন্তু যেন তার সমস্ত চেতনাকে সুগন্ধী ফুলের মদির সৌরভের মত জড়িয়ে ছিল। একেক দিন সে বিরক্ত হয়ে বলতো—ছেলে যেন আর কারো হয় না। তুমি দিনরাত ওকে নিয়ে থাকো কেন ? একটু বাইরে ঘুরে এলেও তো পারো !

—ওর ঠিকুজী তৈরী করেছেন যে জ্যোতিষী, জানো, তিনি কি বলেছেন ?

—কি ?

—রাজসম্মানের যোগ রয়েছে। ওরই যশসৌরভ দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে।

কোন কথা বলতো না সে। কিন্তু তার মনের নেপথ্যে অশুভ একটা ইঙ্গিত বিষধর সাপের উদ্যত ফণার মত ছোবল দিয়ে উঠতো হয়তো কিশু বাঁচবে না।

তিন দিনের জ্বরে কিশু মারা গেল। এতটুকু কাঁদলে না গৌরদাস। কিন্তু তার নিষ্পলক শূন্যদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। রাত্রে ভাল করে ঘুমায় না গৌরদাস। নিশি রাতে উঠোনে একটা প্রেতের মত পায়চারী করে বেড়ায়। একদিন গৌরদাস বলল, শোন, তুমি দীক্ষা নেবে ?

—দীক্ষা! সে নিয়ে কি হবে?

—আমার সাধনায় সহায়তা করবে। তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নেব বুঝলে। শ্রীযুক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজ হয়—গৌরদাসের উত্তেজিত চোখদুটো সহসা কঠিন হয়ে ওঠে। তবুও সে তার হাতদুটো ধরে ব্যাকুল করুণ গলায় বলেছিল—শোন, তুমি এ পথ ছেড়ে দাও। ছেলে মরে গিয়েছে তাতে কি? কোলে আবার ছেলে আসবে।

পাথরে একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল গৌরদাস।

সেদিনও রাত্রে এমনি গভীর শোকের মত আকাশ ভেঙে নেমেছিল শ্রাবণের বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টির ঝরঝর শব্দে, ঝড়ো হাওয়ার রুদ্ধ গর্জনে সমস্ত পৃথিবী যেন লুপ্ত হয়ে যাবে। শেষরাতে তার মনে হলো—তার পায়ের ওপর যেন কোটা কোটা জল ঝরছে! তাহলে ঘরের খড়ের চাল ফুটো হয়ে জল পড়ছে! চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল সে। ঘরের চারিদিকে কালো-ঢালা নীরন্ধ্র অন্ধকারে সে ঘুমঘোর চোখদুটোর দৃষ্টিকে মালিয়ে নিয়ে দেখল গৌরদাসের বিছানাটা খালি। শুধু সাদা ধবধবে বিছানাটা অন্ধকারে যেন দাঁত মেলে হাসছে! ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। কানের কাছে হাহাকার করে উঠল গৌরদাসের কথাটা—দীক্ষা নেবে? তান্ত্রিকমতে দীক্ষা নেব বুঝলে··· তারপরে—

তারপরে একে একে বারোটা বছর কেটেছে। কত জেলার কত শ্মশানে তীব্র আশার বুক বেঁধে সে ঘুরছে এই ভৈরবীর বেশে। দুঃস্থ, নারিদ্র্যজীর্ণ, অদৃষ্টবাদী হাজারো মেয়েপুরুষের শ্রদ্ধার উপহার—শত শত টাকা তার দুহাতের অঞ্জলির ভেতরে ঝিঁচোর মিশ্র আশীর্বাদের মত ঝরে পড়েছে। কিন্তু—

কিন্তু সন্ন্যাস যে তার মনের কোথাও বাসা বাঁধে নি! বরং এই জীবনময় সংসারে সুখ দুঃখের বোঝা কাঁধে নিয়ে হেসে খেলে বেঁচে থাকার সাধ আজও তার রক্তের ভেতরে কেঁদে কেঁদে ওঠে। এই নির্জন শ্মশানে যখন রাত্রে নামে, তখন নিস্তব্ধ একক ঘরে বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে সহস্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তার বুকের ভেতরটা বিদীর্ণ হয়ে যায়। কবে—কবে তার দেখা পাবে! কিন্তু আবার কোলে আসবে; আবার নতুন করে সংসার পাতবে!

—কি এত ভাবছো!

একটু হেসে বলল মাধব।

চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল ভৈরবী। যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে প্রলাপের মত বিড় বিড় করে বলল—তাকে পাবো না—তুই বলেছিল—তাকে পাবো না?

—হ্যাঁ আমার তাই মনে হয়।

—বারো বছর হয়ে গেল—চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে কুটিল হেসে মাধব বলল।

বাইরে অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে! দূরে তালগাছের উদ্যত মাথাগুলোর ওপরে উদ্যত খড়্গের আভাস দিয়ে তীক্ষ্ণ সাদা আলোর বিদ্যুৎ ছুঁয়ে গেল খানিকটা। কড়—কড়—কড়াৎ করে দূরে কোথায় বাজ পড়ল।

—এ কী! তুমি কাঁদছো?

কোমল গলায় মাধব বলল। ঘরের ছায়াকাঁপা প্রদীপের আলোয় একটা নিষ্প্রাণ শিলীভূত মূর্তির মত বসে রয়েছে ভৈরবী। তার গাল বেয়ে অশ্রুর নির্ঝর ঝরছে। দুটো কান্না-ভরা চোখের অপলক দৃষ্টি বাইরের দুর্যোগভরা কালো রাত্রির দিকে স্থির নিবদ্ধ।

মাধব তার পেশীবহুল হাতটা ভৈরবীর পিঠে রেখে নরম গলায় বলল—তুমি তো আর কাউকে বিয়ে করতে পারো। এখনও তোমার বয়স রয়েছে—তার কথার সুরে যেন অদৃশ্য সেতারের মধুর রাগিণী বাজতে লাগল।

বাইরে একটানা হু হু হাওয়ার আর্তনাদ, সেই বৃষ্টি-ঝরা রাত্রি আর শ্মশানের সেই নিরালা ঘরে ভৈরবীর স্বাস্থ্য পুষ্ট কালো ঝকঝকে তনুদেহ, সহসা মিলিয়ে বিচিত্র একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মাধবের চেতনা। ব্রহ্মচারিণীর পিঠের ওপরে হাতটাকে পরম আবেশে বুলিয়ে দিতে লাগল।

—মাধব এ কী করছিস?

ভৈরবীর মনে হ'ল একটা বিষাক্ত মাকড়সা যেন তার পিঠের ওপরে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। কিন্তু—

কিন্তু মাধবের চোখে তখন আদিম রক্ত তরঙ্গের ভাষা উগ্র ক্ষুধায় জ্বলে উঠেছে। তার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে—

—মাধব!

মাধবের সবল হাতের উগ্রত নিষ্পেষণে ভৈরবীর গলার স্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল। আর—

আর পরমুহূর্তেই গনঘোর গর্জিত ছাওয়ার উচ্ছ্বাসে-ভরা সেই বর্ষামুখর রাত্রিটা যেন বিপুল একটা অনুভবের সুখে আবিষ্ট হয়ে গেল।

বৃষ্টিটা একটু ধরে এল। রেখা জাগল। শেষরাতের ভোরের আকাশে রেখা জাগল। ভৈরবী বলল—আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবি না তো তুই?

কেমন করুণ শোনালো তার গলা। বলল—দেখ—একা একা অনেকদিন ধরে তো থাকলাম, এক মুহূর্তও ভাল লাগে না। সব সময় মনে হয় কোন বিপদ বুঝি আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারছে—

—হ্যাঁ। একা জীবন কাটানো মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়।

—আমার কাছে যা রয়েছে, তাতে তিন চারটা মাস স্বচ্ছন্দে দুজনের চলে যাবে। চল কালই আমরা অন্য কোথাও চলে যাই—

—গিয়ে কি হবে, তুমি তোমার ঐ ভৈরবীর পেশা, এই বেশভূষা ছেড়ে দেবে?

—ছিলই না কোনদিন তো ছাড়বো কি?

একটু থেমে বলল—আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকবো। তোকে একটা দোকান টোকান কিছু করে দেব। তাতে দুজনের বেশ চলে যাবে—কি বলিস?

স্বপ্ন নেমে আসে ভৈরবীর দুচোখে।—ধক—ধক—কি—বাইরে ঝাঁপের দরজায় কার ব্যাকুল দ্রুত হাতের করাঘাত বেজে উঠল। মাধবের মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ভৈরবী বলল—এই শেষ রাতে আবার কোন ভক্ত এল।

—হয়তো ভক্ত নয়—আমার মনে হচ্ছে, সে এসেছে, অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে বলল মাধব।

—ধক-ধক-ধক—

কি আবার শব্দ বেড়ে উঠল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো ভৈরবী। কিন্তু বিস্ময়ের চমকে তার চোখ দুটো ছটফট করে উঠল। এই শেষ রাতে কোন বাড়ীর বৌ ঘর ছেড়ে কিসের আশায় শ্মশানে এসেছে।

—তোমার ঘরে আমার স্বামী আছে। তাকে ফিরিয়ে দাও দয়া করে—তোমার পায়ে পড়ি—তার জলভরা দুটো চোখ ম্লান নক্ষত্রের মত জ্বলে উঠল!

—না, আমার ঘরে কেউ নেই—তুমি মিথ্যা শুনেছো, সব ভুল।

—না, মিথ্যা নয়, তুমি তাকে বশীকরণ করে তোমার কাছে রেখেছো। ভাল করে বলছি, ফিরিয়ে দাও, তা না হলে কিন্তু পুলিসকে বলবো—বৌটির চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল। চোখের কান্নাটান্না কোথায় উড়ে গেছে।

—না, পুলিসকে ডেকো না, আর্তগলায় ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল মাধব—ও আমার যে ক্ষতি করেছে তার শাস্তি ওকে আমরা দুইজনেই দিতে পারবো। জানো লেখা—কী ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ ও—বুড়াকালীতলায় গুপ্তধন আছে কি না জানতে এসে, কী বিপদেই না পড়েছি, একটা তীরবিদ্ধ জন্তুর মত আর্তনাদ করতে করতে বেরিয়ে এল মাধব। লেখার হাতদুটো ধরে প্রবল ঝাঁকুনী দিয়ে বলল—আমাকে নিয়ে চল। বাঁচাও ঐ ডাইনীর হাত থেকে—

ভৈরবী যেন পাথর হয়ে গেছে। নিষ্পলক, শূন্য চোখে মাধবের দিকে তাকিয়ে রইল। আর লেখার ঠোঁটের কোণায় কোণায় হিংস্র একটা হাসির রেখা ছোরার ধারের মত ঝরে গেল। বলল, শোন ওকে যে টাকা পয়সা দিয়েছে, সব ফিরিয়ে নাও—

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।

বলল মাধব। ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকে ভৈরবীর প্রাণের ধুকধুকির মত বেতের বারকোষটা ঘরের চালের বাতা থেকে টেনে নামালো। ক্ষিপ্র হাতে জীর্ণ কাঁথা আর গেরুয়া কাপড়ের স্তূপ সরাতেই ঐরের ম্লান অন্ধকারে ঝকমক করে উঠল কাঁচা পয়সা আর নোট।

—তুমি ওগুলো ছাও নি। কেন তুমি নিচ্ছ? চীৎকার করে ঝাঁকিয়ে পড়ল ভৈরবী।

—চুপ কর—তীব্র আক্রোশে জ্বলে উঠল মাধব। বল—যদি বাঁচতে চাও,তাহলে চুপ করে থাকো। তুমি আমার যে সর্বনাশ করেছো তাতে তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত—

—ঐ হার আর বালাদুটোও তো আমার—বাক্স থেকে তুমি চুরি করে নিয়ে এসেছিলে—বেতের ঝুড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল লেখা।

—না, বালাদুটো আর হার তোমাদের নয়। ওটা

আমার বিয়ের সময়কার। আমার শ্বশুরমশায় দিয়েছিলেন—

কান্নাভরা গলায় চীৎকার করে উঠল ভৈরবী। দুহাত দিয়ে সজোরে আঁকড়ে ধরল বাক্সটাকে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—তোমাদের পায়ে পড়ি—গহনাগুলো আমার শেষ সম্বল। ওগুলো নিও না। তুমি যতদিন ছিলে আমাকে একটা আধলা ছোঁয়াও নি।

—তুমি বললেই শুনবো, খিঁচিয়ে উঠল লেখা—ধান বিক্রী করা টাকাও নিয়ে এসে তোমার পায়ে ঢেলে দেয় নি? তুমি জানো, আমার ছোট ছোট ছেলেদুটো দুদিন দুড়ি খেয়ে রয়েছে! তিনদিন থেকে হাঁড়ি চড়ছে না—

—তুমি বিশ্বাস কর, তোমার স্বামী আমাকে একটা পয়সা দেয় নি। আমি মেয়েমানুষ। একা থাকি। এমন করে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করো না—লেখার পায়ে লুটিয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল ভৈরবী। টাকা গহনার পকেট সোকাই করে মাধব বলল, যা যা নিয়ে এসেছিলাম, ওর মোহে পড়ে, সবই কেড়ে নিয়ে নিয়েছি—চল—চল ঈশ্বর—ওরা মায়াবিনী—ওরা সব পারে—

এক ঝটকায় ভৈরবীকে চৌকাঠ থেকে সরিয়ে তারা দুইজনে বাইরের পাতলা অন্ধকারে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর—

আর খাদিমপুরের শ্মশানের নিথর স্তব্ধতাকে শিউরে দিয়ে দুর্ভাগিনী এক নারীর একটানা করুণ কান্নার শব্দ ভোরের শন শন করা মলয় হাওয়ার বহুদূরে মিলিয়ে গেল। তার মনে হল, চারবছর আগে পতিরামের শ্মশানেও মাধবের মতই আরেকজন, যাকে অবলম্বন করে সংসারে সুখ দুঃখে জড়িয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মত বাঁচতে চেয়েছিল—সেও তাকে নির্মমভাবে ঠকিয়ে চলে গিয়েছিল; কিন্তু মাধবের মত চক্রান্ত করে সর্বস্ব লুটে পুটে নিয়ে এমন সর্বস্বান্ত তাকে আর কেউ করে নি!

বিগতদিনের দুঃস্মৃতির কথা মনে হতেই অসহ্য যন্ত্রণায় কপালটা চীপে ধরে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল সে।

তার চাপা কান্নার শব্দের সঙ্গে মিশে আত্রাইয়ের জলকল্লোলটা একটানা মৃদু বিলাপের মত শোনা যেতে লাগল। আর ভোরের আবছায়া আলোর নীচে বাসনা কামনার জটিল পৃথিবীটা স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল।

বিপিনচন্দ্র পালের—বুদ্ধিমানের কর্ম

শ্রীবলাই দেবশর্মা

বিপিনচন্দ্র পালের মর্ম্মবাণী বলা যায়—জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতি—তাহা জ্যোতিরও জ্যোতিঃ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তিনি যে সকল-প্রবন্ধ নিজে লিখিয়াছিলেন, তাহা যেমন বিস্তৃত, তেমনই প্রকাশ-ভঙ্গিমায় ভাষার অর্থাৎ উহা স্বরূপের মহিমায় মহিমান্বিত, আবার-রূপের গরবেও গরবিত। তাঁহার রচনাবলী বঙ্গ-সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। ভারতীয়তার সাম-মন্ত্রের উদ্গাতারূপে, ওজস্বী বাগ্মীরূপে, বাংলার নব জাগরণ যুগের রাজনীতিতে-চরমপন্থী দেশসেবকরূপে এবং 'স্বদেশতত্ত্ব' ও "নিউ ইণ্ডিয়ার" নির্ভীক সম্পাদকরূপে তাঁহার যে পরিচয়, তদ্ব্যতীত তাঁহার একটি মহিমান্বিত সাহিত্যিক সত্তাও বিদ্যমান।

বর্ত্তমানে বিপিনচন্দ্রের কিছু কিছু রচনা পুনর্মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তাঁহার প্রতিভার কথা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইল। কিন্তু মুখরসাহী মননশীলতার সহিত ভাবিষ্ণুধর্মী সাহিত্য রচনার তিনি যে অধিতীয় এবিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। বঙ্কিমোত্তর যুগে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিপিনচন্দ্র পাল বাংলার মনস্বিতার দিব্য মূর্ত্তি।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে আসিয়াছে একটা জড়তা—যাহাকে বলা যায়—লৌল্য, চিন্তালেশশূন্য একটা প্রগল্‌ভতা, আর পল্লবগ্রাহিতা। যে মননশীলতা রহিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্যের প্রতিধ্বনি, উহা অনুকরণে অপটু, উহা আত্মসত্তা বিবর্জ্জিত। বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তির বর্ত্তমান এই অবস্থাকে বলা যায় বুদ্ধি দৈন্য—intellectual bancrupcy.

গীতা-গীতিতে বুদ্ধির মাহাত্ম্য অত্যধিক। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধির একটা আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। উহার প্রতিধানের জন্য বুদ্ধি-যোগ আশ্রয় লইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। গীতায় আরও বলা হইয়াছে—বুদ্ধি ভেদে, বুদ্ধি বৈপরীত্য আনিয়া দেয়—মহতি বিনষ্টি—বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। এই

কারণেই বিশ্বশক্তি জগন্মাতাকে বুদ্ধিরূপিণী বলিয়া স্তুতিবন্দিত করা হইয়াছে—যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ।

ব্যক্তি-মানবের, জাতি-সমাজ বুদ্ধি-বৈভব ও বুদ্ধি-বৈকল্য তাহার অধঃপাতেরই পূর্ব সূচনা। যে গায়ত্রী মন্ত্র বেদ-বিজ্ঞানের সারভূত, তাহাতে ধীশক্তির জন্যই আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বাংলার দুইটি বিরাট মানব—স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ বুদ্ধির ত্রিগ্রন্থিকেই মানব জাতির অধঃপাতের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপের মনীষিগণও পাশ্চাত্য বেদসমূহের ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল ম্যাক্রোপ্‌সি অবলোকন করিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বুদ্ধিপ্রভার দীপ্তিতে বিপিনচন্দ্রের চিন্তা একবার ভাবের প্রভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। উহা একটা ইতিহাস। বাংলার মনস্বিতার অধ্যায়ও বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাঙ্গালীর চিন্তনে ও মননে যে একটা উন্মার্গ ও বিপ্লব ভাব আসিতেছিল, বিপিনচন্দ্রের তদানীন্তন দিনের একটি রচনা তাহার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ইচ্ছার নামে যে একটা উন্মার্গগামিতা ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহার গতিবেগ প্রতিহত করিতে বিপিনবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই ইতিবৃত্তই করিতেছি। I think, you think, they think, ইহাই শেষ কথা নহে, ইহার সাধনক্রম আছে, বিপিনবাবু তাঁহার একটি বক্তৃতায় উহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতা পরে প্রবন্ধাকারে "নারায়ণ" পত্রে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাটির নাম "বুদ্ধিমানের কর্ম"।

য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণান্তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" শীর্ষক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। ঐ রচনাটি তরুণ সমাজের পক্ষে এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, বিশ্বকবিকে উহা কয়েকবারই পাঠ করিতে হইয়াছিল। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রবন্ধ শুনিবার দক্ষিণা ছিল দশটাকা।

সেদিন তখন সবুজপত্রের যুগ। তখন সবুজ অবুঝ হইয়া উঠিয়াছে। আব-ময়াদের সঞ্জীবিত করিবার পরিবর্তে তাহাদিগকে ঘা মারিয়া বাঁচাইবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজ-শাসনতন্ত্রকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া ক্রীতদাসের মত মনোবৃত্তি পরায়ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই মুক্তপ্রাণ কিনা তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু যাহারা শাস্ত্রশাসন, সমাজশাসন, পিতৃপৈতামহিক ধর্ম-বিধানকে অস্বীকার করিয়া চলিতেছে, তাহারাই মুক্তপ্রাণ—আখ্যায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পতাকা উড্ডীন করিয়া অভিজাত গৃহের অন্তঃপুরিকা বাহির বিশ্বে স্বাধীনতা আস্বাদন করিতে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীচরণেষু পাঠ লেখার জ্যেঠা মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখিয়াছেন—আমা অপেক্ষা আমার পাই কি তোমার কাছে বড় হইল? ঐ সময় জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনও প্রাক্তন ছাত্র আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া "সবুজপত্রে" এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সতীত্ব একটা মানসিক দুর্বলতা।

য়ুরোপের এবংবিধ মহা-দুরুক্তের শেষ হইয়াছে। বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, "ডন সোসাইটির"—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অশ্বিনী-কুমারের "ব্রতিযোগের" প্রভায় বিলীন হইয়া আসিতেছে, পণ্ডিতপ্রবর রাজচৌধুরী জাতীয় কর্মীদিগের পরিবারের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা ও জাতি-সংগঠনের তপস্যা তাঁহার মৃত্যুতে শঙ্কীভূত, বেদ-বট বৃথাস কুপমণ্ডুক স্বামীকে পত্রাঘাতে বিধ্বস্ত করিতেছেন,—সোনার বাংলায় প্রতি ঘনবিবিড় ভালবাসা বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত, দলনামরিক দিনের বন্ধুত্বনের এই মহাপর্ব অবহায় ইতিহাস চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত "নারায়ণ" ও "সবুজ পত্রের" পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" শুকবাদের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হইলেও পরোক্ষে উহা সংরক্ষণপন্থী হিন্দু সমাজের প্রতি সুস্থ নিক্ষেপ। হিন্দু সমাজের সত্তানুপ্রতিষ্ঠিকতাকে উপহাস করিয়া উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন—"চীৎপুর চিৎ হইয়াই রহিল।" তখনকার দিনের তরুণ সম্প্রদায় সমাজের বিধিনিষেধ, শাসন-অনুশাসন হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণা ও নির্দেশ পাইয়া যেমন অতি উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তেমনই প্রাচীনপন্থীদিগের মধ্যেও বিশেষ বেদনা বোধ হইয়াছিল। সেই বেদনাবোধের অভিব্যক্তিই—"বুদ্ধিমানের কর্ম"।

প্রাচীনপন্থী বলিয়া যাঁহাদিগকে অভিহিত করিলাম, তাঁহাদিগের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। তাহা না করিলে তাঁহারা কি শ্রেণীর প্রাচীনতার অনুগামী তাহা বুঝা যাইবে না। ইঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ নহেন, পরন্তু ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার প্রফুল্ল কমল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি এই দলের অগ্রণী ছিলেন।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম প্রবন্ধে গুরু, পুরোহিত, পার্শ্ব সিদ্ধান্ত, আপ্ত-বাক্য, আচার, অনুষ্ঠান, যেনাস্য পিতরো যাতাঃ—যেন যাতাঃ পিতামহাঃ প্রভৃতির অনুশাসন আনুগত্যকে ছিন্ন করিয়া স্বাধীন চিন্তার আত্ম-প্রত্যয়ের পথানুবর্তী হইতে বলা হইয়াছিল। এই মনোগত অভিমতটি জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের স্বাধীন চিন্তা হইতে আর একটু অগ্রবর্তী। ইহা দার্শনিক নৈরাজ্য—philosophic anarcy.

বুদ্ধিমানের কর্মে বিপিনবাবু বলিলেন—না জানাই মানবত্বের পরমধর্ম হইতে পারে, কিন্তু এই অধীকৃতিটা যেমন তেমন করিয়া কেবলমাত্র ঔদ্ধত্যের সহজ আবেগ বেরবার হয় না। উহাতে যাহা হয়, তাহা একান্তই স্বেচ্ছাচার, উহা মানসিক অধঃপাতেরই পরিচায়ক। উহা আধ্যাত্মিক স্বরাজ্য নহে, পরন্তু মানসিক অরাজকতা। এই অরাজকতা ব্যক্তি-মানব ও সমষ্টি-মানবের পক্ষে অতি ভয়ানক বস্তু, আত্মহত্যারই রূপান্তর। বিধি-বিধানকে অমান্য করিতে করিতে ক্রমশঃ মানুষ তাহার স্বকীয় কল্যাণে কর্মকেও অমান্য করিয়া চলে। উপনিষদে ইহাকে বলা হইয়াছে—মহতি বিনষ্টিঃ।

বিপিনচন্দ্র তাঁহার বক্তব্য প্রতিপাদন করিতে চাহিলেন—এই না মানাটা—এই স্বাধীনতাটা চরম বুদ্ধিহীনতা। পরিপূর্ণ না মানা

যারা, তাহা কোনও বিশেষ মত বা ভাবে সীমাবদ্ধ নহে, মানিব না যখন, তখন কিছুই মানিব না। গীতাও মানিব না, বাইবেলও নহে; গুরুপুরোহিতও নহে, আচার্য্য প্রয়োজনও নহে, টীকাও নহে, মন্দিরও নহে, চার্চ্চও নহে, যে আত্মজ্ঞতাকে চরম ও পরম বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাকেও নহে। এই অস্বীকৃতির একটা ক্রম আছে। না মানিতে মানিতে বেদ, বেদী, চিহ্ন, বুদ্ধি, মন, এমন কি আত্মসত্তা পর্য্যন্ত সবই অস্বীকারের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। বিপিনবাবু ইহাকেই বলিয়াছেন—নিরঞ্জনিক এ্যানার্কি। উপনিষদের ইহাই নেতিতত্ত্ব।

ঐ নেতিতত্ত্বের পরিচয় প্রসঙ্গে ঔপনিষদিক ঋষি বলিতেছেন :—তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্ক অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্।

প্রকৃত মার্শনিক বৈরাগ্য ইহাই। বিপিনচন্দ্র তাঁহার বুদ্ধিমানের ভয় নিবন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কিছু না মানিতে হইলে প্রথমে অনেক বিধি নিষেধ মান্য করিতে হয়। একটা মিথ্যাপ্রপঞ্চ জীবনের অধীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। তবে, বৈরাগ্যসিদ্ধি লাভ করা যায়। আর উহাই সমাধি। শ্রুতি যাহাকে বলিয়াছেন—অমৃতিঃ। তাহাও একটা জীবনের উপলব্ধি হয় না, উহা বহু জন্মজন্মান্তর নিতিক্ষা সম্পন্ন হইয়া সাধনা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেই বলিয়াছেন—বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। হটকারিতা, আবাদুতা, সেন্টিমেন্টালিজম্, বৈষম্য আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা, এই সকল না থাকা—আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যসিদ্ধির অনুকূল নহে, বরং বিশেষ প্রতিকূল। ইহা দুষ্কর উপলব্ধি! শ্রুতির ভাষায় ইহা ক্ষুরধারা নিশিত পথ। ইহা কখনই উন্মার্গগামিতার দ্বারা লভ্য নহে। অনবরত কর্ম্ম অনুষ্ঠানেই যাহাদের সিদ্ধি সম্ভব হইয়া থাকে।

ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অযোঘ যুক্তির দ্বারা বিপিনচন্দ্র পরিশেষে বলিয়াছেন—জগতের যাবতীয় সাধুসন্ত, ভক্ত যোগী একটা বৈরাগ্যপথের অনুসরণ করিয়াই বিভিন্নিবেধের অতীত হইয়াছেন। গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে—সম লোষ্টাশ্ম কাঞ্চন, তুল্য নিন্দাস্তুতি, মিত্র ও অরিতে সমভাব। কামকাঞ্চনঃ—যারা হয়, তারা মহতি বিনষ্টি।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য? না, বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম সাধনাই শ্রেয়, সে মীমাংসা করিতেছি না, বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় একটি বিশেষ বিভাবের কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম।

শুভচেষ্টা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

তুমি যদি দিলে দেখা কেহ কী দেখিতে পায়
তুমি না ডাকিলে কাছে কাহারে কী চিত্ত ধায়—

সত্য কথা। কিন্তু দেখবে কে? যাইবে চিত্ত কেমন ক'রে—নিজের চেষ্টায় চোখকে খুলে না রাখলে, চিত্তকে তাহার না করলে। দিবা-রাত্রি জোনাকীর পিছনে ছুটিয়ে কিম্বা আলেয়ার অধিক আভিকে দিবা রশ্মি ভেবে তার পিছনে ছুটিয়ে আর্থির সাধ থাকলে জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি দর্শনের। দেখব বলে মন স্থির করলে তবে দেখার সৌভাগ্য ঘটে। কারণ, তিনি তো বিরাজেন সর্ব্বঘটে বৈকুণ্ঠ হ'তে হিরণ্য-কশিপুর কটিক স্তম্ভে। তিনি ছুটে আসেন সেখানে যেখায় ভক্ত ব্যাকুল হয় তাঁকে দেখবার জন্য। তিনি যদি বলছিলেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

বৈকুণ্ঠে থাকতে পারি না, পারিনা তিষ্ঠিতে যোগিদের হৃদয়ে। যেথায় আমার ভক্ত গায় আমি থাকি সেথায়।

চাই চেষ্টা—একান্ত ভক্তি। শত বাধা আসবে, তুফান উঠবে, ঝড়ের জোরে ঢেউয়ের থলে চাই তাদের প্রতিরোধ। নিশ্চিন্ত তমসাকুলের সাফল্য নাই কোনো পথে। মোক্ষ-সাধনার সাত্ত্বিক পথে চাই রাজসিক উদ্যম। নিজের পথ চিনতে হবে নিজেকে—চলতে হবে সে পথে যাবতীয় উপেক্ষা ক'রে তবে জয় হ'বে সফল। তাই উপনিষদে শুনি অমৃতস্যের নির্দ্দেশ—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

বলহীনের লভ্য নয় এ আত্মা। বল—অন্তর প্রাণের বল।

শ্রীকৃষ্ণ যোগ শিক্ষা দেবার পূর্ব্বে যোগালেন যে আত্মা প্রতি জীবে অবস্থিত। কিন্তু সে অজ্ঞান গ্লানিতে বিবর। সেই ঢেউয়ে আত্মাকে টেনে তোলাই মোক্ষ সাধনা। তাকে তুলতে হবে উর্দ্ধে। তাকে অবদমন করলেও হবে না। অধোগামী করলে অনুভূতি হবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু। সাংসারিক অবিবেকীবুদ্ধি হ'তে পারে না আত্মার বন্ধু। যতই থাকনা তার সাথে আপাত মনোরম প্রীতির লক্ষণ। আর আত্মাই আত্মার শত্রু। পরের দুষ্কৃতকে নিজে গ্রাহ্য না করলে তো দুষ্কৃতি অশ্বিত্ব সাধতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে—

জীবাত্মার কর্ত্তব্য আপনিই আপনাকে উদ্ধার করা। আত্মাকে কখনও

অবসন্ন হ'তে দিওনা। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু। আবার আত্মাই রিপু আত্মার।১

কিন্তু আত্মাকে বন্ধুরূপে পেতে গেলে আবশ্যক আপনাকে জয় করা। মানুষ হীন হয় আপিসের। আমার দাঁত অসি যুদ্ধে জয় হয়েছে, আমার পুষ্টি তো বহুদিন পাষাণের মত প্রাণ পেয়েছে, আমার বুদ্ধি প্রবল হয়েছে—এই আত্ম-ভাব আত্মার শত্রু। কারণ আত্মা পরমাত্মার বিকাশ জীবে। ইন্দ্রিয়-লভ্য জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যে কৃত-কর্ম, জীবকে করে সঙ্কুচিত। কিন্তু আত্মা অমর, অজর অক্ষয়। ইন্দ্রিয় ভোগ্য বাহ্যপর ভাব আত্মোদ্বিত করে রাখে জগতকে। তাই যে জিতেন্দ্রিয়, সে নিজে নিজের বন্ধু। তার দ্বারা আত্মার উন্মোচন সম্ভব। যে আত্মা আপনাকে জয় করেছে সেই আত্মাই আপনার বন্ধু। আর যে আত্মা, আত্মাকে জয় করতে অসমর্থ সেই আত্মাই আত্মার শত্রু।২

আত্মোপলব্ধি ধর্ম। আত্মার উপলব্ধিতে প্রকৃষ্ট পথে চলাই ধর্ম-সাধনা। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য আত্মানুভূতিতে আত্ম তৃপ্তি। সে আত্ম-তৃপ্তি জগৎ জোড়া সবার মাঝে আপনাকে উপলব্ধি করার তৃপ্তি—আর সবার মাঝে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করার সাফল্য। এ কার্য্য নিজের উদ্যমেই সম্ভব। পরে পারে না আমাকে উদ্ধার করতে—আমি যদি নিষ্পৃহ হয়ে, অন্ধ সম হয়ে অন্ধে থাকি। গুরু পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, সে পথে চলতে হবে আপনাকে। সদ্‌গুরু অবশ্যম্ভাবীরূপে সকল বোঝবার যন্ত্র দিতে পারেন। কিন্তু যন্ত্র প্রয়োগ হবে সাধককে।

এই শিক্ষা গীতার সর্ব্বত্র। কর্ম চাই সব পথে। নৈষ্কর্ম্য আর্য্য ধর্ম পার্থ—জাড়তার ফলে নিষ্ক্রিয় হ'লে কোনো কাজ হয় না। এই উপদেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনকে কর্তব্য-পথ নির্দেশ করেছিলেন। তিনি স্থিত-প্রজ্ঞের কথা বলেছেন, তার লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য সে সাধনার ফল অলসের লভ্য নয়। তিনি বলেছেন—নিরাহার ব্যক্তির পক্ষেও বিষয়ের বর্জন হয়। কিন্তু সে সব বিষয়ের বাসনা সেষ হয় না। অভিলাষ যায় না অনুরাগ নিবৃত্ত হলেও। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা স্থিত-প্রজ্ঞের সকল বাসনার অন্ত হয়।৩

সুতরাং চাই সাধনা নিজের প্রয়াস। স্থিত-প্রজ্ঞ শান্তি লাভ করে। কিন্তু সে শান্তি মাত্র লাভ করা সম্ভব নিজের চেষ্টায় সকল কামনা ত্যাগে। সাধককে নিস্পৃহ, নির্মম, নিরহঙ্কার হ'তে হয়। স্পৃহা, মমতা, অহঙ্কার পরিবর্জ্জন করবার জন্য চেষ্টা করতে হয় অবশ্য। সুতরাং শান্তি লাভ বহু চেষ্টা সাপেক্ষ। প্রয়াস বিনা লাভ করা যায় না।

প্রবৃত্তিমার্গও যেমন কর্ম সাপেক্ষ নিবৃত্তি মার্গও তেমনি কর্ম সাপেক্ষ। চেষ্টায় মানসিক ও শারীরিক কর্মে আনা যায় নিবৃত্তি। তাই সন্ন্যাসী উপনিষদ বলে বলবার প্রয়োজনকে বর্জন করবার জন্য তরুতলে শয়ন ক'রে মৃদুফেননিভ শয্যায় বিলাস বর্জনের উপদেশ। অর্জুন স্বয়ং সন্দেহে পড়েছিলেন জ্ঞানের প্রশংসা শুনে। সত্যই তো যদি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান হয় শ্রেষ্ঠ—কেন তবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধরূপ ভীষণ কর্মে প্রবৃত্ত করছেন।

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—কর্ম না করলে তো কর্ম ত্যাগ করা যায় না। কর্মকে সন্ন্যাসরূপে টেনে নিতে গেলে, চাই কর্মের বিন্যাস—নিষ্কাম কর্ম—তারপর মনকে শাসন করে মনের প্রবৃত্তি নিরোধ। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা সংযত ক'রে অনাসক্ত হ'য়ে মাত্র কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ করে সেই ব্যক্তিই বিশিষ্ট।১

সুতরাং মনের পক্ষে ইহকাল বা পরকাল কোনোকাল সুখকর নয়। চেষ্টা, প্রয়াস, সাধনা এবং মূলে ব্যাকুলতা আবশ্যক।

তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন—"খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাকে দেখা যায়। স্ত্রী-পুত্রের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে। টাকার জন্য লোকে বেঁধে আসিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? তাঁকে যত ডাকতে হয়।" আরও—"তিন টান হলে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর—আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও এক সঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।"

গীতার বহু আশাপ্রদ শ্লোক—

মৎকর্মকৃৎমৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

যে—পাণ্ডব যে ব্যক্তি আমার কর্ম করে, মৎপরায়ণ ও আমার ভক্ত, যে আসক্তিবিহীন, সর্বভূতের অবিরোধী সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য শ্লোক যেমন আশাপ্রদ তেমনি কঠিন কর্তব্য-পথের প্রদর্শক। নিজের চেষ্টায় প্রতি নিমেষে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করলে—সকল কাজের মাঝে খেয়ে যেওয়া যায়না কোন কাজটি ভগবানের কাজ। এইরূপ কল্যাণকর কর্মকে বাছিয়ার সময় মনের মাঝে সদা জাগিয়ে রাখতে হবে যে তিনিই পরম, তিনিই স্বামী। আমার কল্পিত বা কৃত কর্ম তাঁর অভিপ্রেত কিনা একথা বিচার করতে হবে। অবশ্য আসক্তি আপনি ছেড়ে যাবে কর্ম হ'তে যখন বোধ হবে নিশ্চয় যে—তোমার কর্ম তুমি কর না, লোকে বলে করি আমি। তারপর নির্বৈর হওয়া সকল ভূতের প্রতি—আততায়ীকে ক্ষমা করা, দোষীকে অপরাধী না করা—ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু যীশু, প্রভু বুদ্ধ, মহাপ্রভু প্রভৃতি এ দোষ হ'তে মুক্ত করতে মানুষকে কত না উপদেশ দিয়েছেন। আমরিক শক্তির মহাভেদ আহরণ করবার জ্ঞান অর্জন করেছে নর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগতের হিতের কাজে তাকে না লাগাবার জ্ঞানও মুখর প্রচারে রত

---

১ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। গীতা ৬।৫

২ বন্ধুরাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। ৬।৬

৩ বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ,
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে। ২।৫৯।

১ গীতা ৩।৯

মানুষের মনকে অধিকার করে রয়েছে। এরা বহু জ্ঞানীও যে হ'তে পারে না নিশ্চয়ই।

তাই মনে হয় কবিতার ভাষা খুব মিষ্টি, খুব কথা সরল ও আশাপ্রদ—আমাকে পাবে—কিন্তু আধ্যাত্ম-জীবনের সাধনা ক্ষেত্রে পরামর্শ কতখানি লাগির ঠেলিয়ে দেয় শুরু কর্মীর সঙ্গে—তা ভেবে ভাত হ'তে হয়। প্রতিদিন ধ্যানে ধ্যানে অভ্যাস করলে নিশ্চয়ই জীব সাধু হ'তে পারে। আজ আর মুহূর্তে মুহূর্তে প্রমাদ। এর মাঝেও দেখি সেই শিক্ষা ও সাধনার ত্রিধারা। শুক্তিতত্ত্বে তাঁকে জানতে হবে পরম ধনে, জানে বুঝতে হবে কোন কর্ম তাঁর অভিলষিত এবং দেহ ও মনের শক্তির দ্বারা সে কর্ম সাধন করতে হবে—এই কথা আমায় বলেছেন ভগবান গীতার শেষে। বলেছেন মনঃসমর্পিত হও, আমার ভক্ত হও, আমার যজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করছি—আমাকে পাবে এমন ভাবে জীবন যাপন করলে।

তারপর চরম উপদেশ—

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

সকল ধর্ম-কর্ম ত্যাগ কর, কর্মে যাঁরা পড়বে না, সে অবস্থায় পৌঁছতে পারলে তখন হাতে কাজ থাকবে আমার শরণ। তখন আর পাপের কথা বিচারের আবশ্যক হবে না। আমার শরণ নিয়ে, আমার কর্ম মেনে নিয়ে জীবন যাপন করলে পাপের হাত থেকে ত্রাণ করবেন তিনি যাঁর শরণ হয়ে জীবনের ধারা—মনে, প্রাণে শয়নে-স্বপনে জাগরণে। তাঁকে ডাকাই মনে হয় হয়ে তখন আঁধার যাবে কেটে। চেষ্টায় সাফল্য লাভ হবে।

ডাকি তবে নাম শুদ্ধ কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরল বলে
হৃদি মেলে আসে মনে।

শত বাক্যের উপরেও—

সহসা একলা আপনা হইতে
শুনি যিনে তুমি তোমারি অমৃতে
এই ভরসায় করি পরতলে
শূন্য হৃদয় খানি,
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগেনা যখন প্রাণ।

মানুষের শুভ চেষ্টাকে প্রণোদিত করতে পারে শুদ্ধ ভক্তি। তাই ভক্তি শান্তিরস চেষ্টার পিছনে যে ভক্তি অমৃত—

সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর,—সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে ভগবান।

এই শুভ চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র-গভীর অথচ মধুর কথা মানতে হবে—

নায়ানিং অবসাদয়েৎ।

কিন্তু এই শুভ চেষ্টা যাতে বিফলতায় অবসান হবে, যদি জ্ঞানের মাঝে অজ্ঞতা বা শ্রদ্ধার অভাব থাকে। যাকে সত্য বলে মানতে হবে তাকে মন স্থির করে বুঝতে হবে সত্য। নিজের চেষ্টা চাই জীবনের ইহকালের বা পরকালের শান্তির আবাহনে। কিন্তু পথ অনুসরণ করে যদি কোনো মানুষ মনে সংশয় নিয়ে আসে-তার সাধনা সুদূর পরাহত।

জ্ঞান লাভ হয় গুরু হ'তে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ জ্ঞানীর শিক্ষা সাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বলেছেন—তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর উপদেশ হ'তে লাভ হয় জ্ঞান। সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় প্রণাম, পরিপ্রশ্ন এবং সেবায়।১

এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ওঠে। প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান লাভ হ'তে পারে সেবায়। আমাদের পুণ্যভূমিতে বহু মহাপুরুষ শিক্ষার বীজ রেখে গেছেন। কিন্তু সে বীজ যিনি শিষ্যের মনে বপন করবেন, তিনি যদি স্বয়ং প্রকৃত জ্ঞানী না হ'ন—শিষ্যের অবস্থা হয় সঙ্গীন। এ ক্ষেত্রে যাহির উত্তর পক্ষের।

যদি কেহ স্থির করে কোন মহাপুরুষের শিক্ষা হিতকর তার পক্ষে, তখন শ্রদ্ধা আবশ্যক। শ্রদ্ধা ভগবানে। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে লাভ করতে হয় জ্ঞান। হ'তে হয় তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়। কিন্তু পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান হয়না পথ-প্রদর্শক। এ ক্ষেত্রে শুভ চেষ্টা অনুকূল হয় যদি নিঃসন্দেহ হয় সাধক। সংশয়ের স্থান নাই শিক্ষা ক্ষেত্রে বা সাধনার পথে। যদি গুরু রূপে কাকেও মানতে হয় তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা আবশ্যক। সে পথ শাস্ত্র বা গুরু দেখিয়ে দেবেন সে পথ নিজের বিবেক এবং কর্তব্যবুদ্ধির প্রভাবে নিঃসংশয় সত্য পথরূপে না মানলে উপায় কী সেটা পৌঁছবার। ভুল-ভ্রান্তি সম্ভব। তার সংশোধন অনিবার্য হয় জ্ঞানে। অজ্ঞান যেমন নূতন নূতন প্রহেলিকার সৃষ্টি করে প্রকৃত জ্ঞানও তেমনি আবিষ্কার করে সত্য—অনন্ত পথের।

গীতার নির্দেশ এ বিষয়ে পাই। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—শ্রদ্ধাবান, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং সংযত যার ইন্দ্রিয়, সে লাভ করে জ্ঞান এবং অধিকারী হয় পরম শান্তির।২

তারপর বলেন—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়-চিত্ত যারা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখ নাই।৩

শুভ কর্মপথে কর নয়ন দান
যত দুর্বল সংশয় হক অবসান—

গেয়েছিলেন কবি।

---

১ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। গীতা ৪।৩৪

২ শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। ৪।৩৯

৩ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। ৪।৪০

মোট কথা মানুষকে নিজের উন্নতি করতে হবে ইহ জগতে এবং পর জগতে নিজের চেষ্টায়। ঋষি বলেছিলেন—

পরাঞ্চখোলী পরমস্বভাবাৎ
যদীষতি তমরবন্
স্বয়ংভূঃ সোহস্ত বিদ্রাৎ।

এ সংসারীর কথা। পরলোক পরের চেষ্টায় মোটেই নয় লভ্য। পথ নির্বাচনে সহায়তা করে সত্য জ্ঞান, যদি তার পটভূমিতে থাকে ভক্তি। সেই জ্ঞানকে নির্দিষ্ট পথে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা করতে হবে আত্মপ্রসার—পরকে ঈশ্বরের অংশ ভেবে আপনার করতে হবে—তবে মুক্তি। বহু কথা স্পষ্ট লিখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি, জ্ঞান, কর্মের। নিঃসংশয়ে তাদের মানতে হবে—শুভ চেষ্টা করতে হবে আপনাকে। তাহ'লে শান্তিময় আনন্দলোকের পাওয়া যাবে সন্ধান। আমি থাকব নিশ্চেষ্ট—পরে আমার জন্য পরলোকে যাবার ছাড়পত্র এনে দেবে—এ যাদুর বুদ্ধি কল্যাণকর নয়।

যজ্ঞ-গম্ভীর মন্ত্রে উপনিষদ বলেছে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া-দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি
উঠিত হও, জাগ্রত হও এবং আত্মজ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞানের পথকে দুরতিক্রমণীয় শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলেন।

এই সুরেই বুদ্ধবাণী শুনি ধর্মপদে।

উত্তিট্ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

ওঠ, আলস্যে প্রমত্ত নিওনা, সুচরিত ধর্মের সেবা কর। ধর্মচারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ লাভ করে।

ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আলোকের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে যেন। তাই ঋষি গেয়েছিলেন—

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে যাও।
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধূলায় ঢাকা ঘুইয়ে যাও।
যে জন আমার মাঝে ছড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে যাও।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কড়া ভাষায় বলেছেন—শাস্ত্রবিশ্বাসকে পরম পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যে ভাগে বৈষ বৈষ করে, ওটা দুর্বলতার চিহ্ন, মহা কাপুরুষতার পরিণামে।

সত্যই সাধনা—শুভ চেষ্টা—না হলে ঈশ্বর লাভ হয়না। মাত্র শাস্ত্র-পাঠে কিছু হয়না। মনে পড়ে ঠাকুর পরমহংস দেবের চোখ ফোটানো উপমা।

"পাঁজিতে যত আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয়না। তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্ম কথা লেখা থাকে, শুধু পড়লে ধর্ম হয়না, সাধন চাই।"

জ্ঞানমার্গের বড় উপদেষ্টক শঙ্করাচার্য বলেছেন—গোবিন্দকে প্রাণ দিয়ে ভজতে হবে, মাত্র লোক উচ্চারণে, ব্রত পরিপালনে, স্নানে বা গঙ্গাসাগর তীর্থে মুক্তি পত হতে।

কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং
ব্রতপরিপালনমথবা দানম্
জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন
মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।

নিজের চেতনার মাঝে তীর্থ ভ্রমণ, ব্রত পালন বা দানে না উপলব্ধি করলে মুক্তি ফলপ্রসূ হয়না। পরিশ্রম আবশ্যক সন্ধানে এই তাঁর মত। তবে গোবিন্দ ভজনা কল্যাণকর হবে। যান স্পষ্ট করে ধারণা, বুদ্ধি প্রাণবন্ত করে ইহলোকরায়, জেনে জানিয়ে যের সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপ।

আগামী

প্রশান্ত মৈত্র

আসন্ন স্বপ্নটাও যদি ক্লান্ত রাত্রির শীতরে ভেঙে যায়
জানালায় বহে যাওয়া ঝরঝরে হাওয়ার ডানায়
বিষাক্ত চেতন জাগে জাগে।
পাখীদের ক্লান্তি ভাঙে, রাত্রির উন্মুক্ত শুদ্ধতা,
এ'রাতের পাখায় যেন গভীর সময় একতা—
ব্যোমে স্বপ্ন জালে।

মাঝের রাত্রির তারা মিটমিটে আকাশে প্রদীপ নিভন্ত,
তার পানে চেয়ে যদি পথের কথাও ভোলা যায়,
কেন তবে বার্ধক্যের বীণাটার মন্দ্র তারে গভীর
নিতান্ত ?
সবচেয়ে কাছে থেকে আজ যদি ফের এই পথে,
আমাকে পাবেই তুমি মুখোমুখি স্বপ্নের রাতে ॥

রবীন্দ্রনাথের বলাকায় গতিবেগ ও জীবন চেতনা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' প্রধানতঃ গতিবাদের কাব্য—এই গতির যে-বেগ আছে, সে-বেগ যৌবনের জয়-সংগীতের সুরে যেমন প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তেমনি তাই পেয়েছে মানবাত্মার অবিরাম যাত্রায়। এই যাত্রার গতি-পথের উত্থান-পতনের সঙ্গে জীবনের পরাজয়ের এক প্রেমানুভূতি জেগেছে এবং সেই জন্যই মনে হয় সমুদ্ভূত এক জীবন-চেতনার সঙ্গে এই যাত্রা সার্থকতার পরিণামধর্মী।

গতিতত্ত্বের মূলে আছে যৌবনের প্রাণ-চাঞ্চল্য। তাই কবির অনুভবেও 'বলাকা'র মূলে যৌবনেরই উদ্বোধন ঘটেছে সর্বপ্রথম। যৌবনের বেগেই গতির বেগ। আধ্যাত্মিকতার যে-মানসিক ধর্ম কবি যৌবনের সেবাগ্রন্থে প্রথম গ্রহণ করেছিলেন—'খেয়া,' 'নৈবেদ্য' থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্জলি-শ্রেণী পর্যন্ত সে-নিস্পৃহ ধর্মীয় রসে অন্তরকে পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন, সেই রসের গতিধারাকে অন্তরের তলদেশ থেকে একটু সরিয়ে দিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় দাঁড়িয়ে কবি অন্তরাত্মাকে অভিষিক্ত করলেন যৌবন ধর্মকে। নিত্য নূতন পথে অভিসার যাত্রাই রবীন্দ্র-কবিমানসের বৈশিষ্ট্য। ইউরোপ প্রবাসে যেয়ে সেই যৌবনের প্রাণ-ধর্মের চঞ্চলতাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন। অনুভব করলেন যৌবনের সজীবতাকে। রবীন্দ্রনাথের মানস-বলাকা সেই নূতন সজীবতার আবেগ নিয়ে যে-পথে যাত্রা করলো, সে-পথ নবতম এক গতিলোকের পথ। সে পথে যৌবনই সব চেয়ে বড় বিধাতা।

এই গতিময় যৌবনের মধ্যে আছে এক বিপুল সৃষ্টি ধর্ম। এই সৃষ্টি-ধর্মই যেন কবির প্রাণধর্মকে উজ্জীবিত ক'রে তুলেছে। এই প্রাণধর্মের প্রবর্তনায় কবি চাইলেন পৃথিবীর দিকে, যেখানে বস্তুপুঞ্জকিত আবর্জনা পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কবি এটাও খুব ভালো ক'রে উপলব্ধি করেছেন যে প্রাণের ধর্মই হচ্ছে সমস্ত পুরাতন অর্থহীন বস্তুকে কাটিয়ে অজানার পথে যাত্রা করা। এই জন্যই যাঁদের প্রাণশক্তি অংকুরের রূপ ধরে তার আবরণটিকে সরিয়ে ফেলে আলোকের পথে এক অজানা বিস্ময়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। শাস্ত্রের গতানুগতিক বন্ধন-জড়তা যৌবনের জন্য নয়। যৌবন চায় সমস্ত কিছু ভেঙে দিয়ে সত্যকে প্রতি-পদে গ্রহণ করতে। কিন্তু এই সত্যোপলব্ধির পথে পদে পদে যেমন বেদনা আছে, তেমনি দুর্বিষহ আঘাতও আছে। তা' হলেও প্রবীণত্বের অন্ধকারে বন্ধনহা যাঁরা সে কিছুতেই থাকতে চায় না।

কিংবা যা' চিরকালীন ধর্ম, তা' কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে যৌবনের মধ্যে। জরার জড়তার দুর্বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে যৌবন উড়াতে চায় জীবনের জয় পতাকা; এই জন্যই যৌবন দুরন্ত এবং প্রাণলীলায় জীবন্ত! কবির তাই আকাঙ্ক্ষা, আশা তোলানাথের মত যৌবন-ভাঙা মৃত্যুর তালে তালে ঝড়ের মাতাল বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে যৌবন চলুক তার জয়-যাত্রায়! বন্ধনের পূজারীরা পড়ুক কেঁদে, পুঁথির পাতাকে যা যেন বলি দিতে আসে, সেই বিপদকেও বরণ ক'রে নিতে হবে। বিপদ বরণের মধ্য দিয়েই তো যৌবনের আরম্ভ।

চিরযুবা যে, সেই চিরজীবী। কবি তাই বলেন—

চিরযুগ, তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ-জরা বাজিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে যেথায় দিবি। [১নং]

বসন্তের চির-নবীনতার মালা প'রে, বজ্র-বিদ্যুতের ধ্বজ পতাকা উড়িয়ে দিয়ে যৌবন চিরদিনকার অধর।

এই যৌবন-বেগের মধ্য দিয়েই যেথা ঘিরেছে এক গভীর জীবন-চেতনা। কবির এই জীবন-চেতনার একটি দিক বিশ্বগত, আর একটি দিক ব্যক্তিগত। বিশ্বগত জীবন-চেতনা বিশ্বসমিবত্ত্বাবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করছে কবি-চিত্তকে, যেখানে তিনি বিশ্বপৃথিবীর এক যুগসন্ধির সংকটক্ষণে উদ্বেগাতুর হয়ে উঠেছেন। তিনি শুনতে পাচ্ছেন—রক্ত-মেঘের খিলিকের ভেতর দিয়ে, গহন পারের বজ্রধ্বনির মধ্য দিয়ে, কোন্ পাগলের অট্টহাসির পথ ধরে মরণ আসছে যেন জেগে উঠেছে। রবীন্দ্র-নাথের কাছে জীবন এখন—'মাতলো মরণ বিহারে।' সে-গতিকে নিয়ে তিনি যুগ-সংকটের এক জটিলদণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেই সংকট-ক্ষণের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকেই কোন আগু-পিছু না ভেবে বরণ ক'রে নিতে হবে। কোন্ যেন এক নিরুদ্দেশের থেকে ডাক এসেছে, কিন্তু এই ডাকের পিছনে আছে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব, রক্তের এক বিপুল উচ্ছ্বাস। ঝড়ের আকস্মিক আঘাতে সমস্ত কিছুর যেন ভিত্তি নড়ে উঠেছে, পরম নিশ্চয়ের প্রদীপ নিভেছে নিজে, পথই একমাত্র আপন হ'য়ে উঠেছে। তাই কবির ডাক—

কিসের তরে চিত্ত বিকল,
আসুক না তোর দ্বারে শিকল,
বাহির দ্বারে ছোট না সকল
দুঃখ-সুখের খেয়ে গো। [২নং]

এই দুঃখ-সুখের খেয়ার পারে পৌঁছতে যদি সর্বনাশের ডাক আসেই, তবে অন্তরের সমস্ত স্নিগ্ধতাকে দূর ক'রে দিয়ে, দ্বারের শিকল ভেঙে দিয়ে যেতে হ'বে আসতে হবে বাইরের দিকে। নবযুগের রক্তবর্ণ অরুণোদয়ের পূর্বাকাশে যেন দেখা যাচ্ছে। এই শুভ অরুণোদয়ের রক্ত আশীষকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হ'বে, সর্বনাশের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেলে কিছুতেই চলবে না। বহুযুগের আবর্জনাময় পুরাতন ঘরকে ত্যাগ ক'রে যেতে হ'বে জীবনের বৃহত্তর পূর্ণতা লাভের জন্য, আর পা বাড়াতে

হ'বে বহু সম্ভাবনায় কলোল্লাসে ভরা নূতন যুগের উদ্বোধন। এমনি করেই যুগযুগ মানব-জীবনের যৌবনের গানে কবির হৃদয় যেমন পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, তেমনি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বিপুলতর জীবন-চেতনায়। যৌবনের বাণী কখনো শুধু পাওয়ার পুঁথির বাঁধনে বাঁধা থাকেনা'—তার বাণী ভেঙে ওঠে প্রলয় মেঘে ঝড়ের ঝংকারে, ঢেউয়ের উপরে যাত্রিকে চলে দিয়ার ডাক। জীবন বিপাশার প্রার্থনাকে বুকে নিয়ে কবি তাই যৌবনকে ডেকে বলেন—

জীর্ণতারই বক্ষ দু'ফাঁক করে
অমর পুষ্প তব—
আলোক পরশে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব। [৪৪নং]

জীবনে এগিয়ে যাওয়ার যে সার্থকতা, সেই তো যৌবনের অমর পুষ্প। তারই মধ্যে আছে জীবনের অমৃত সন্ধান। তাই যৌবনের মধ্য দিয়ে কবি রুদ্রকে এবং রুদ্রের প্রসাদকে লাভ করেছেন।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত-সর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। [৪৪নং]

যৌবন যাত্রার সঙ্গে বিশ্বের অন্তর্চারী একটি এক শক্তির গূঢ় চারণাকে যেমন তিনি অনুভব করেছেন, তেমনি তাঁর রুদ্ররূপের অনন্ত বিস্তৃতি থেকে অনবরত যে প্রসাদকণা ঝ'রে পড়ছে, তাকেও মাথা পেতে নিচ্ছেন তিনি। রুদ্রের ভয়ংকর প্রসাদের মধ্যেও যে শান্তির অমৃত আস্বাদ, এ-কথা তিনি ভুলবেন কি করে? তাই জীবননদীর এক কূল ভেঙে দিয়ে, অপর কূলের আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে হ'বে আমাদের। এই পুরাতন গল্পকে ভেঙে দেওয়ার যে ব্যক্তিগত বেদনা, সেই বেদনার মধ্য দিয়েই বিধাতাপুরুষ একটি বিশ্বজনীন সত্যের অভিব্যক্তি দান করেন এবং এই সত্যকে অভিব্যক্ত করার জন্যই এক রুদ্র আহ্বানে তিনি নবীনদের অন্তরাত্মাকেও জাগ্রত ক'রে তোলেন। এই ডাক যখন নবীনেরা শুনতে পায়, তখন তাদের জীবনকে গতির বাঁধা-ধরা প্রাচীরের মধ্য থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে অমৃতের প্রসাদপুষ্ট জীবনকে লাভ করার জন্যে পাগল হ'য়ে ওঠে, আর বাঁধন ছেঁড়ার সংগীত জাগিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে কেবল বলতে থাকে—

মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতসম আনব হ'রে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে
মরণ-সাধন সাধবে। [৩৮নং]

জীবনের অর্থই হচ্ছে বিপুল শক্তি অর্জন ক'রে অগ্রসর হওয়া। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলতে হয়, 'জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে গিয়ে জীবনকেই হারানোর মতো দুর্গতি আর কিছু আছে?' সে-জীবন অমড় হ'য়ে পড়ে থাকবে, সৃষ্টির মূলে জীবন-স্রোতের যে-প্রবাহধারা ব'য়ে চলেছে, তার কোলো খবরই রাখবে না সেই তো জীবনকে হারানো। সে-স্পর্শ রোমাঞ্চ তানে ঝংকৃত হ'য়ে উঠবে 'দীপ্ত প্রাণের স্পর্শ।' এটাও কবি সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, আলস্য বা কর্মবিরতির জড়তা যখনই জীবনকে এসে জড়িয়ে ধরবে, তখনই বিধাতাপুরুষের অভ্রংলিহ দৃষ্টি পড়বে ধূলায়; তাঁর কাছে আরাম চাইতে গিয়ে লজ্জিত হ'তে হবে সব চেয়ে বেশি। তখনই জীবনে আসবে নিষ্ঠুর নূতন প্রচণ্ডতর আঘাত; কিন্তু সেই আঘাতকে সহ্য ক'রেও তাঁরই বেদনা বুকের পরশে মরণ ক'রে নিয়ে জয়ধ্বনি বাজাতে হবে। তবেই আসবে জীবনে সার্থকতা, সংঘাতময়তার মধ্য দিয়েই জীবনের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কারণ চলার বেগে নিত্যের আঘাত লেগে লেগে সব কিছু ঠেকে-যেওয়া আবরণ যেমন ছিন্ন হ'য়ে যায়, তেমনি 'বেদনার বিচিত্র লক্ষ্য'ও জয় হ'তে থাকে ক্রমে ক্রমে। আর সেই চলার অবগাহন স্নানে কবির জীবনও যেন পুণ্যময় হ'য়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, কবি উপলব্ধি করতে পারেন—

চলার অমৃত পরশে
নবীন যৌবন
বিকশিল ওঠে প্রতিক্ষণ। [১৮নং]

প্রতিক্ষণে বিকশিত হ'য়ে ওঠা নবীন যৌবনের অমৃত আস্বাদে কবির মন একটু ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছে—'যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।' তাই কবির হাতে যৌবনকে পরাবার জন্যে বরণের ডালা। 'বার্ধক্যের শুভ্র পাকার আয়োজন' কবির আন্তরিক যৌবনধর্মকে আর ঢেকে রাখতে পারছে না। তাই বাইরের পাতাঝরা পউষের বনভূমি কবির অন্তরের বিগত-যৌবন জীবনকে মনে করিয়ে দিলেও, সেই বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবন কবির কাছে উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের সাথে যেন এক সংগীতময় ইংগিতভরা লিপি পাঠিয়েছে। সে-লিপিতে—

লেখিছে সে—
আজি আমি অনন্তের মেলে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার। [১৩নং]

শুধু তাই নয়, এই যৌবন 'বয়সের জীর্ণ-পথ শেষে মরণের সিংহদ্বার' পার হয়ে আসতে কবিকে আহ্বান জানিয়েছে। তাই এই যৌবন পৃথিবীর সীমারেখাকে পিছনে রেখে কবির সাথে এক'তারলোকে নিত্যের আসনটি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। জরা যে জীবনের উপর মিথ্যা আবরণ মাত্র, সেই কথাটা বলতেই যেন যৌবন কবির জীবন-ভূমিকায় এসে একটি আবর্ণায়িত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণের একটি প্রোজ্জ্বল রূপ ব্যক্তিগত জীবনের চেতনালোকে যৌবনের মাধুর্যময়তায় নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে এখানে। যৌবন-চেতনায় মাতোয়ারা বসন্ত কবির প্রাণপদ্মের উপর তার দলগুলি মেলে ধরেছে, সেই চেতনাকে ঘিরে 'অলক্ষ্যের হৃদয় আঁচলে' ঢাকা বহু তপস্যার ফলে ফুটে-ওঠা মাধবীর আনন্দরাজিকে কবি প্রত্যক্ষ করছেন। এই ছবিই কবির জীবনকে যেমন আনন্দময়ের

করেছে, তেমনি করেছে যৌবন দুবর। দারাটি জীবন ধ্রিয়ে তাই কবি এই জগতকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছেন, ভালোবেসেছেন এই জগতের আলোককে—এবং জীবনকেও তাই ভালোবাসেন গভীরভাবে। তাঁর কাছে জগতকে একান্ত ক'রে চাওয়া ও ছেড়ে যাওয়া দুইই সমান সত্য। এই সত্যের অনুসন্ধানে জীবনের গূঢ়তম জিজ্ঞাসাকেও জাগিয়ে তুলেছেন কবি।

এই জীবন জিজ্ঞাসায় কবিচিত্তে যে-বিষয়ক-চেতনা জেগেছে, তার মধ্যেই ধরা পড়েছে আত্মার গতি এবং সৃষ্টির গতি। আত্মার গতির মধ্যে এক কল্যাণপন্থা আছে এবং নিত্যকালের নাবিক সেই পন্থাকেও করেন পুরস্কৃত। এই আত্মিক উপলব্ধির পূর্ণতার রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'পাড়ি' (৫নং) কবিতায়। তখন প্রবহ বিশ্বমুক্তির উল্লোৎসব। ধরণের উদ্যমনায় বিশ্বধারীর ঈষাকুটিল ভ্রূভঙ্গীর মধ্যে কবি-মানসের স্বপ্ন ইতিহাসের কোপদৃষ্টিতে এক নূতন গতিসঞ্চারের বাণী জেগে উঠেছে,—জেগে উঠেছে গতিলোকের প্রাণপক্ষকে নিয়ে এক বিপুল জীবন-চেতনা। মানব জীবনের গতির সঙ্গে বিশ্বদেবতার গতিও যেন মিশে গিয়েছে, তাঁরও তিনিও নিশ্চল থাকতে পারেন না। কবি যেন তাঁর শান্ত সমাহিত অন্তর্লোকে নিঃসংশয়ভাবে বুঝতে পারলেন, এই প্রলয়ঝঞ্ঝার শঙ্কিত দিনে নিত্যকালের কর্ণধার যেন তাঁর লোকোত্তর 'পাল তুলে' দিয়ে এই দুর্দিনের উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু যতই প্রাণে প্রত্যয় জাগে, এই শঙ্কিত রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে তিনি এমন কি সম্বল নিয়ে আসছেন এবং সেই আগমন এই প্রলয়-রাত্রির ঘনান্ধকারে কেন? যখন 'কালোরাতের কালিমালা জড়ায় নিবিড় নিশে' মুছিত হ'য়ে রয়েছে আকাশ, তখন কোন্ ঘাটে এসে তাঁর তরীটি লাগবে, তা' কেউ জানে না, এবং এইজন্যই মনে করা আশঙ্কা ও বেদনা! হাতে তাঁর একটি রজনীগন্ধা ফুলের গুচ্ছ,—সেই রজনীগন্ধার মালা নূতন আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তিনি যে কার গলায় পরিয়ে দেবেন, সে তো কেউ জানে না! যারা শক্তিমান বা ধনবান, যারা শাসন করেন রাজশক্তিকে, নিত্যকালের নাবিকের হাত দিয়ে তারা তো এই উপহার পাবে না। দুঃখের কালরাত্রির ভয়ংকর দৃষ্টিতে যারা নিরুদ্ধ ঔদাস্য তপস্যা নিয়ে নীরবে 'আত্মস্থ' হ'য়ে আছেন, তাঁরাই পাবেন, এই শান্তিসৌন্দর্যের পাথেয় পুরস্কার। তাঁর আগমনের দৃষ্টিতে কোনো তূরীভেরী বাজবে না, কিন্তু আঁধার যাবে কেটে, আলোকে ভ'রে উঠবে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণ, তাঁর পুলকস্পর্শে জীবনের সমস্ত রিক্ত সার্থকতায় উঠবে ভ'রে। তখন—

নীরবে তার চিরদিনের পুঁজিবে সন্ধের,
কূলে আসবে নেমে। [৫নং]

এই যে বিশ্বকল্যাণের জন্য আত্মার নীরব তপস্যা, এই তপস্যাই অন্তরিক্ষ দিয়ে পরিপূর্ণতার পিয়াসী মানবাত্মাকে মৃত্যুর মধ্য থেকে অমৃতকে খুঁজে আনতে ভূমে ভূমে প্রবুদ্ধ করেছে। অমৃতলোকের যাত্রাপথে আত্মার সাথে যেন সঞ্চার করেছে এই তপস্যার মঙ্গলবুদ্ধি আর বিশ্বকল্যাণের মন্ত্রধ্বনি। নিখিল বিশ্বের প্রাঙ্গণে যখন দুঃখের কলরোল রক্তকল্লোলের সঙ্গে জেগে উঠেছে, তখন শুধু এই কথাই মনে হয় যে, পুরাতন সঞ্চয় নিয়ে বেশিদিন আর বেঁচেথেকো চলবেনা। যখন 'মুক্তিও বিদ্রোহকরা মরণে মরণে আলিঙ্গন' তখন কবি-আত্মার জেগে উঠেছে নূতন মন্ত্র,—'দুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর, পালে, দিতে হ'বে পাড়ি।' মানব-ইতিহাসের যিনি কর্ণধার—কবি যেন তাঁর ডাক শুনতে পেয়েছেন। তাই 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'-পানে চেয়ে কবি এক শান্তির সত্যকে দেখতে চান। যুদ্ধের মৃত্যুস্নায় অগ্নিসাগর পার হ'য়ে নূতন যুগের দ্বারে পৌঁছতে হবে। অজানা সমুদ্রতীর এবং অজানা এক দেশ,—অথচ সেই দেশের পথনেই যেতে হ'বে সব জীবনের অভিসারে। উত্তর দুর্দিন যদি আমার উপরে বিয়াট এক বিভীষিকা নিয়ে বিরাজ করে, তবুও চিত্তে জাগিয়ে রাখতে হ'বে অন্তহীন আশা, পথে চলার জন্য রাখতে হ'বে অন্তরের সত্য এবং মঙ্গলের পিপাসা! এই দুর্দিনের গুরুভার বুকে বহন ক'রে কাকেও নিন্দা করা চলে না। দুর্দিন যে আসে সে একজনের পাপে নয়, বহুজনের পাপে। তাই দুর্দিনের এই কালোরাত্রায় ঘেরা জীবনযাত্রার জটিল গ্রন্থিকে আমাদের তো উন্মোচন করতেই হ'বে। 'নূতন সৃষ্টির উপকূলে' নূতন বিজয়ধ্বজা তুলতে হ'বে। কিন্তু তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে আমাদের সকলকে বলতে হ'বে—

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব যেথ,
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক। [৩৭নং]

আত্মিক প্রতিষ্ঠার সত্যচিন্তায় বলীয়ান হ'য়েই প্রাণ বিসর্জন করা চলে। এই বিসর্জনের মধ্যে কোন ভয় নেই। কেন না, শান্তি ও মঙ্গলই চিরন্তন সত্য; অশান্তির ঘূর্ণি যে-প্রলয়-অন্ধোলকে জাগিয়ে তোলে, তার বিরুদ্ধে এ যেন আত্মারই প্রত্যাবর্তন! কারণ আত্মা তার গতিপথে এগিয়ে চলার বেলায় এটুকু জেনে নিয়েছে, সত্যের সম্মুখে হীনতা, মীচতা, পাপ সর্বদাই নিজের কুণ্ঠিত লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রাখতে চায়। তাই এই সত্যকে পাথেয় করেই মৃত্যুর অন্তরে আমাদের প্রবেশাধিকার নিতে হ'বে আর খুঁজে নিতে হ'বে আত্মাকে। ঠিক এইজন্যই সংগ্রামের রক্তাক্ত অনিবার্যতা স্বীকার ক'রেও সত্যকে লাভ করবার জন্য 'প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো' সহস্র বীর আত্মোৎসর্গ করার জন্য ছুটে চলেছে। যদি এই আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে নূতন স্বর্গ লাভ করা যায়, তবে সে বিশ্ববিধাতা এই আত্মত্যাগীদের কাছে বন্দী হ'য়ে থাকবেন! আত্মিক শক্তির গতিতে তারা যে মৃত্যুকে লঙ্ঘন ক'রে নূতন জীবনের জয়ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে! মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেই তো মর্ত্যের সীমাকে পার হ'য়ে যাওয়া যায়। মৃত্যু ও দুঃখজয়ের মধ্য দিয়েই মানবাত্মা ভূষিত হ'য়ে ওঠে দেবত্বের অমর সৌন্দর্যে। মানবাত্মা তাই যাত্রা করেছে যুগ থেকে যুগান্তরে,—অনুপ্রেরণার অতো প্রিয়জনের অন্তরের মধ্যে যান ক'রেও। স্থিরতাই তো সব কিছু নয়। সুদূর আকাশপীড়ের যে-নীহারিকা লোক, সেই লোকের অবগুণ্ঠিত রহস্যতল তো স্থিরতার মধ্যে থেকেও

আলোক-বর্তিকা জ্বালিয়ে নিয়ে অন্ধকারের পথেই যাত্রা হ'তে চলেছে। তাই ছবির দিকে তাকিয়ে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—

চির চঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হ'য়ে রও ? (৯নং)

ছবির রেখাবন্ধনটি হলো। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে কোন আবেদনই জানায় না ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্পর্শশক্তির মধ্যে যা' পাই, তাই কি সব সত্য ? সত্য যা, তা' অন্তরের উপলব্ধির গোচরে এলেই ধরা দেয় এবং উপলব্ধ সত্যের মধ্যেই তো সৌন্দর্য, আনন্দ এবং রস আছে। সত্যকে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও আমরা অনুভব করতে পারি, তাতে আমরা সৌন্দর্যকে দিতে পারি সম্মান, দিতে পারি অন্তরের মাধুরী-মেশানো স্বীকৃতি। সেইজন্যই মানব-হৃদয় রেখাবন্ধনে শিল্পায়িত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে এমনি ক'রে কতই না প্রশ্ন করে। প্রশ্নগুলি বলা যেতে পারে, প্রতিকৃতিটি কবির পরলোকগতা পত্নীর। এলাহাবাদে এক আত্মীয়ের গৃহে লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটিকে দেখে যে-আবেগ-বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে সত্যোপলব্ধি ঘটেছিল কবির মনে, তারই প্রকাশ এই কবিতায়। স'রে পড়া ফুলের পাপড়িকে ঘেরে মর্মভেদের শাশ্বত বস্তুর অনুভব এখানে ধ্বনিত ছন্দের মধ্য দিয়ে ভাষাময় হ'য়ে উঠেছে।

শুধু কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্যে-শ্রোতব্যে-দর্শনে, সেই দর্শনের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। এই যে ধূলি আর এই যে ফুল, 'বসন্তের মিলন-উষায়' ধরিত্রীর অঙ্গে নূতন পরিবেশ এঁকে দেয়, বিশ্বের চরণতলে যে-তৃণ লীন হ'য়ে মিশেছে, তারাও চঞ্চল এবং এই চাঞ্চল্যের পথ ধ'রেই তাদের যাত্রাকালীন অভিব্যক্তির স্ফুরণ ঘটে। তাই তারা যেমন জীবন্ত, তেমনি সত্য। তেমনি নিশ্চয়তার অন্তঃপুরে বাঁধা প্রিয়জনের প্রতিকৃতিও নিশ্চয় সত্য। তাই কি একমাত্র সত্য ? সেই প্রতিকৃতির জীবিতকালের আত্মা কি কোনরূপে আনন্দস্পন্দন জাগিয়ে তোলে না প্রিয়জনের অন্তরের গোপন কোণে ? এই প্রতিকৃতির যে-মানুষ, একদিন সে সকলের সঙ্গে পথে পথে চলতো, বিশ্বের লীলাচ্ছন্দে তার প্রাণের ছন্দ লীলায়িত হ'য়ে উঠতো। মিথিলের পটভূমিকায় ছন্দের তুলিকা ব'য়ে রসের মূর্তি এঁকে দিত, এবং সেই যেন ছিল এই বিশ্বের সুগভীর আনন্দবার্তার মূর্তিমতী বাণী। ধরিত্রীর তৃণ হ'তে আরম্ভ ক'রে শশী রবি পর্যন্ত যার যার গতি-চাঞ্চল্যের মাঝে প্রাণসত্তার পরিচয় দিয়ে চলেছে। কবিও আপনার সুরে সুর মেলে চলেছেন ; কিন্তু প্রাণহীন এক শুষ্ক আলেখ্য লেখার সকলের আড়ালে ছবি নিস্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে—'তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি !' ছবির দিক দিয়ে যে-নিস্তব্ধতা, তা' জেনেই মনে হয়,—ছবি নিশ্চয়ই কেবলমাত্র 'ছবি' নয়। স্থির রেখার বন্ধনে 'গতিহীন ক্রন্দনে'র ঢেউ তুলে দিয়ে 'চির নিস্তব্ধের' মাঝে নিজের আসনটি পেতে রাখবে এতো হ'তে পারে না। কেননা, সে তো একদিন অন্তরের গভীরতা দিয়ে চিত্তস্পন্দনের নিঃসংখ্য প্রকাশের দ্বারা জীবনের পথে, প্রতি পদক্ষেপের সচকিত ধ্বনির দ্বারা তার জীবনকালের প্রাণ-তরঙ্গকে প্রকাশ করতো এবং চিৎশক্তির এক সুগভীর আনন্দকে করতো রূপায়িত। অরূপ এবং চিরন্তন আনন্দের ভিতর দিয়েই তো বিচিত্র রূপে জীবনের প্রকাশ ঘটে ? এই ছবির মধ্যে যে-রূপ আছে, সেই রূপেও তো আনন্দের সমুজ্জ্বল প্রকাশ। কারণ আনন্দ শাশ্বত, আনন্দ অমৃত ! 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।' তাই যদি হয়, তবে এই ছবির ভিতর শিল্পীর তুলিকাপাতে তার যে-প্রকাশ, সে তো আনন্দেরই প্রকাশ ! আনন্দের এই রূপগ্রহণ তো মিথ্যা হ'তে পারে না ! আনন্দের মাঝেই সে প্রেরণা-রূপিণী হ'য়ে জেগে থাকে অন্তরে ! যাকে অন্তরের নিভৃতে গভীরভাবে ভালোবাসা যায়, তারই প্রেরণার স্পর্শসুখকে এই ধরণী যেন হ'য়ে ওঠে মধুময়ী। প্রকৃতির রূপসত্তা তার প্রাণ-সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে সৃষ্টির আনন্দবাণীকে মানবীজনের মর্মর ধ্বনিতে মুখর ক'রে তোলে !

চল-ধর্মী বিশ্বের রূপবাসনা এক বিপুল সুন্দর পরিণতিকে কামনা ক'রে যাত্রা করেছে অনাদির উদ্দেশে,—যার শিল্প, শিল্পীর তুলিকা হ'তে তার সমগ্র সৌন্দর্যের পূর্ণতার সুষমা নিয়ে বিশ্বের রূপবাসনাকে চাইছে রূপায়িত করতে। আমরা পথ চলার বেলায় চোখে-মেখা ফুলগুলিকে ভুলে যাই। তাই একটি ফুলের পূর্ণতাকে ঘুরে ঘুরে ঘরে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছে, আর একটি বিস্মৃতির মর্মে বসে রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে ! বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের এক্যমাত্র সুর হ'লো চলা। এই চলার সুরে মেতে আনন্দে পথ চলবার বেলায় অনেক কিছুর দিকেই আমরা ফিরে তাকাই না। কিন্তু তাই ব'লে তারা মিথ্যে হ'য়ে যায় না। সেইজন্যই হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনটি নয়নের সম্মুখে না থেকে মনের মাঝে ঠাঁই ক'রে নিয়েছে। এইজন্যই সে আজ কবির অন্তরে কবি। হারিয়ে-যাওয়া অন্ধকারে যে-জীবন মিলেছে মিলন হ'য়ে, সে আজ শিল্পের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে 'আর্টকে' যেমন সার্থক করেছে, কবির আলোকে কবিজীবনকেও সত্য ও প্রত্যয়ের পথে প্রেরণারূপিণী হ'য়ে পরিচালিত করছে। এক মানবীর আত্মা এখানে প্রেরণারূপিণী ! 'বলাকার' ছন্দ নিশ্চলতার মাঝখানে থেকে চলার শক্তিকে প্রকাশ করার ছন্দ-আলেখ্য। তাইতো চলার পথে যেমন জীবনকে পরিচালিত করার বাসনা আছে 'বলাকায়', তেমনি অতীতের অনুভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারাকেও স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস আছে। কবি-জীবনের অতীতি-অনুভূতির সত্তা-চেতনার ধারা এসে মিশেছে 'বলাকায়', এই 'ছবি' কবিতায়।

আর 'বলাকায়' 'শাজাহান' কবিতার দিকে যখন তাকাই তখন দেখি, সম্রাট শাজাহান জানতেন 'জীবন যৌবন ধন মান' কালস্রোতে ভেসে যায় ; এবং জানতেন বলেই তাঁর মাথা পত্নীর মৃত্যুবাসরে প্রতিদিন আকাশকে সকরুণ ক'রে তুলুক, এই তাঁর মনে সাধ ছিল। তিনি জানতেন, 'শীত্র মুক্তা মাণিকের ঘটা' বিশ্বস্রোতের ফেনা-সম বর্ণবিলাসের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর শোকের একবিন্দু অশ্রু কালের কপালে চির উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে এও তাঁর অন্তরের সাধ। কিন্তু এই সাধাতেই সব শেষ নয়। মানব-হৃদয় কালের স্রোতে কোথায় যেন ভেসে চলেছে। তার কোনদিকে চাইবার যেন অবকাশ নেই। ভুবনের ঘাটে ঘাটে, জীবনের পরস্রোতে ভেসে ভেসে সমস্ত বোঝাই পূর্ণ ক'রে দিতে হয়। হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয়কে পথপ্রান্তে বিশ্বের ফেলে যেতে হয়।

তাই সমস্ত চরাচরের চৌদ্দ-আনাই দৃষ্টি দিয়ে মহাকালকে দৌড়-ঝাঁপুনিতে ভুলিয়ে রাখবার মানসে রাখতে চেয়েছিলেন। তার মতোর আশা-পড়াকে, জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়াকে তুচ্ছ ক'রে তাঁর সেই চিরবিরহের বাণী যেন বেজে উঠ্‌ছে—

তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই প্রিয়ে। [৯৯নং]

কিন্তু মানবাত্মাকে বিশ্বসৃষ্টির পথ দিয়ে বের হ'য়ে যেতেই হয়; সৃষ্টির পিঞ্জর থাকে তার খুলে দিতেই হয়। 'অবসাদ আবরণ দিয়ে' ঢাকা সমাধিকক্ষের তাই চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে থাকে। কারণ সমাধিকেই আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারে, জীবনকে কখনো বেঁধে রাখতে পারে না। কেননা, প্রাণের প্রতি ছিন্ন ক'রে সে ছুটে যায় নিত্য নূতন পূর্ণতাকে। তার নিয়ত লোকে লোকে, তাই সে বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।' তাই মহাকালরূপী কোন মানবাত্মাকে কোন মহারাজাই বেঁধে রাখতে পারেনি। মনুষ্যবসতি পৃথিবীতে জীবনের উৎসব থাকতে পারে, কিন্তু সেই জীবনের ভোগে এই ধরণীকে ভূৎপাত্রের মতো সেই আত্ম নিঃসঙ্কোচে ফেলে চলে যায়; কেননা, তার কীর্তির ভোগেও সে নয়। তার চিহ্ন প'ড়ে থাকে, কিন্তু সে কোথাও বাঁধা পড়ে না। যে-প্রেম সমুখ পানে চলবার পাথেয় জোগায় না,—আর যে-প্রেম চলার পথের মাঝখানে নিজ হৃদয়ের সন্ধান জানায়, তাকে পথের ধুলাতেই ফেলে দিয়ে অজানা পথের অগ্রগতিকেই স্বীকৃতি দেয়। সেই অজানার পথে চলার কালেই জীবনের বাণিজ্য হ'তে যে-প্রেমের বীজটি খসে পড়ে সেই শুধু কেবল অজানার পথযাত্রী পথিককে সুরভি ক'রে তোলে,—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজা তারে ছেড়ে দিল পথ,
রহিল না সমুদ্র পর্বত—[৭৮নং]

সৃষ্টিমাত্রে বিজড়িত থাকে সেই প্রেমের বীজটি; কিন্তু মানবাত্মারূপী পথিকের সে ধারা 'প্রবাহের সিংহদ্বার পানে,—কারণ সে অমৃত।

শিল্পের দ্বারা প্রেমকামনার এক পূর্ণতর দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানবাত্মার আছে, কিন্তু যেহেতু সে নিজে রূপ অরূপান্তরের গতিপথে পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী, ঠিক সেইজন্যই শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর জীবনে এক বিরাট অপূর্ণতাও আছে। জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে আর্টের 'পূর্ণতার মাঝখানে কিছুতেই তুলাদিত করা চলে না। মানবাত্মারূপী শাজাহান তাই বহুতর পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষার গতিতে চির অজানার যাত্রী। এইখানেই রবীন্দ্র জীবন-দর্শনে আত্মার গতির অনিবার্যতা। সেখানে যেন কবির এই কথাই বারংবার ধ্বনিত হয়—

চলতে যাবের ধ'রে চিরকালই
যাইকো তাদের তার। [৪৬নং]

'কবির মধ্যে কবি তাঁর প্রিয়ার ভালোবাসার অতীত চেতনাকে পরিস্ফুট ক'রে নিজের জীবনের অন্তরতম প্রেরণাকে খুঁজতে চেয়েছেন, আর 'শাজাহান' কবিতায় মানবাত্মার চিরন্তন যাত্রাকে প্রত্যক্ষ ক'রে জীবনের পূর্ণতাকে শিল্পগত পূর্ণতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এইখানেই আমার গতির জ্ঞেয়।

এর পরে কবির উপলব্ধির মধ্যে রূপ ধ'রে এসে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টির গতি। সমস্ত সৃষ্টিই যেন এক বিরাট গতির অনুপ্রেরণায় এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে। কোন্ যেন এক বিরাটের অভিসার-পথে যাত্রা করেছে আমাদের এই প্রত্যক্ষীভূত বস্তুবিশ্ব এবং আকাশব্যাপী নিরন্ধ্র অন্ধকারের পটভূমিকায় গ্রামোফোন্ নিখিল চরাচরের অযুত গতিরূপ প্রত্যক্ষ করবেন কবি। এই গতিরূপের বিরাট প্রবাহই বিশ্বনদী। অন্ধকারই যেন গতিময় সৃষ্টিধারার বেগ-প্রবাহ, আর আকাশলোকে অগণিত নক্ষত্রের যে-পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশমান, তা' যেন সেই বিপুল বেগ থেকে জেগে ওঠা সৃষ্টিধারার উপরিস্থিত ফেনপুঞ্জ। এই যে বিরাট বিশ্বপ্রবাহ তার স্পন্দনে নিখিল সৃষ্টি, রূপ কায়াহীন বেগে।

এই বিশ্বনদী তার চলার প্রবাহধারায় কখনো বৈরবী প্রগল্‌ভিনী, কখনো বা বৈরাগিনী; আর তার চলার রাগিণীতে বিলম্বিত যাত্রার পদ্মহীন সুর। বিশ্বপৃথিবী অন্ধকারের আবরণে তন্দ্রাভিভূত, তখনও সে ঘরে চলেছে 'পথের আনন্দ বেগে'; তার অন্তরের যত কিছু পাথেয় চতুর্দিকে বিলিয়ে দিয়ে এক উদ্দাম গতিবেগের সঙ্গে চলার পথকেই বরণ ক'রে নিয়েছে। ওই উদ্দাম গতিবেগ আছে ব'লেই তার সমস্ত কিছু দুই হাতে ফেলে দিয়ে যায়; সঞ্চয়ও করে না, কুড়িয়েও কিছু নেয় না।

পূর্ণতার মধ্যেও একটা নিঃস্বতার ভাব আছে, কিন্তু নিঃস্বতার মাঝে একটি পবিত্রতার স্পর্শ আছে। যে-মুহূর্তে পূর্ণতা আসে, সেই মুহূর্তের শুভ লগ্নটিতে মনে হয় যেন কিছুই নেই এবং সেই জন্যই পবিত্রতার এক স্নিগ্ধ আবেশ তার সমস্ত যাত্রাপথকে ভ'রে তোলে। তাই 'অলক্ষিত চরণের অকারণ আবরণ চলা'র রহস্যময়ী গতিতে চঞ্চলা অপরূপী-রূপিণী বিশ্বসঞ্চারিণী কবি-হৃদয়ে চিরচঞ্চলের পদধ্বনিকে জাগিয়ে তুলেছে, কবির নাড়ীর ছন্দে জেগে উঠেছে তাই সমুদ্রের ঢেউ, অন্তরের কোণে বাতাসে জেগে-ওঠা আরণ্য-ব্যাকুলতার স্পন্দন-ধ্বনি। কবি উপলব্ধি করেছেন সৃষ্টির গতিকে ধারারূপিণী বিশ্বনদীর পানে চেয়ে। বিশ্বনদীর যে গতিপ্রবাহের বেগে আকাশ নির্মল নীলাঞ্জিত সন্ধ্যায় সুন্দর ও পবিত্র, সেই গতিবেগের অনাদিকালের উৎসবের থেকে যুগে যুগে নির্ঝরের অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো রূপ হ'তে রূপে, প্রাণ হ'তে প্রাণে ঝলিত হ'য়ে কোথায় কোন্ পরিপূর্ণ সার্থকতায় জীবনকে অভিসিক্ত ক'রে দিতে, জীবনের সমস্ত সঞ্চয়কে বিলিয়ে দিতে কবি-আত্মা ছুটে চলেছে। এখানে সৃষ্টির গতি ও আত্মার গতি যেন এক হ'য়ে মিশে গিয়েছে।

তীরের সঞ্চয়কে কবি তাই পিছনে ফেলে যেতে চান, কারণ সঞ্চয়ের মধ্যেই জমে' ওঠে মর্মলোকের শত সহস্র আবর্জনা। বিশ্বপ্রবাহ ধারায় বিশ্বের অন্তরাত্মার যে-প্রকাশ ঘটছে তাই হচ্ছে গতির সত্য। এই গতির সত্যটিতেই কবিজীবনেরও পরম প্রতিষ্ঠা। জন্ম-জন্মান্তরের বিরহবহ্নির ধারাপ্রবাহে এ-জন্মের কোলাহলকেও পিছনে ফেলে ও-কূলের পানে ভেসে চলেছে। গতির সত্য যে-আনন্দরূপের রূপায়ণ, তাই জীবনেরও অমৃতরূপ। কবির এই গতি-ভাবনা জীবন-চেতনায় মর্মমূলে অমৃতরূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যে-বন্ধনবাতের

আবর্তলীলার মাঝখানে দিয়ে জীবনের অগ্রগতি, সেই জীবনই এখানে গতির ছন্দকে অন্তরে নিয়ে বিশ্বচেতনার পূর্ণতম প্রকাশকে শান্তরূপে গ্রহণ করছে। অন্তর জীবন-ধারার শুচিস্নাত মানবাত্মার কল্যাণরূপ যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি পরমপুরুষেরও উপলব্ধি ঘটে। চঞ্চলের জন্য কবির সমস্ত অনুভবের মধ্যে এক গভীর ব্যাকুলতা সংগীতের মতো ছড়িয়ে আছে; কারণ সৃষ্টির গতিচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রকাশ ঘটে।

সৃষ্টির মধ্যে এই যে গতির দিক, তা' আমাদের চতুর্দিকের আপাত অচল বৃক্ষ এবং বীজের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে। জড়প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে রয়েছে এই সৃষ্টির গতি। চির-চঞ্চলের প্রাণলক্ষ্য যৌবন-বসন্তের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে এক আবর্ত সৃষ্টি করে রাখে। সেই চির চাঞ্চল্যের মর্মধ্বনিটিই যেমন চকিত ক'রে তোলে 'অন্ধকারের সিরিতট তলে' সারি সারি দেবদারুতরুকে, তেমনি 'পথের বিদ্যুৎছটা'র সন্ধ্যার গগনকে। মনে হয়, ঝরনা যেমিয়া গান ক'রে আনন্দের অট্টহাসি তুলে' হংস-বলাকার দল 'বিস্ময়ের আগরণ ওরঙ্গিয়া চলিল আকাশে'। তপস্তা-মগ্ন পৃথিবীর 'ধ্যান-গভীরতাকে যেন ভেঙে দিল দেবলোকবাসিনী অপ্সরা-গণের নূপুর-ঝংকার। উড়ে যাওয়া পাখীর পাখার ঝাপ্টায় জেগে উঠলো—

পুলকিত নিকুঞ্জের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ। [১৭ নং]

পথিকের হৃৎপদ্মদলকা ধরিত্রীর যেন সমস্ত শুষ্কতার আবরণ খুলে' দিল, এবং আবার উন্মোচনের মুক্তপথ দিয়ে 'লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা' অংকুরের পাখা মেলে দিয়ে প্রাণের এক অনন্তরাজ্যে নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। শুধু তাই নয়, অচলায়তনের নিশ্চল শুরুরাজিও উন্মুক্ত ডানায় 'অচলা হইতে অচলায়' পাড়ি জমাতে চায়। চিরহরিৎ অচল বন্ধনে যে-নক্ষত্র বাঁধা রয়েছে তাদের অন্তরে জেগে রয়েছে এক গতির আলো, এবং সেই আলোকে অন্ধকারও চকিত হ'য়ে উঠছে।

মানব-হৃদয়ের নিভৃততম যে-বাণী, তা' কোন্ অতীত যুগের বিস্মৃতির অতল থেকে বের হ'য়ে অলক্ষিতে যুগ থেকে যুগান্তরের পথে চলছে; কারণ এই নিখিল বিশ্বে নিশ্চল বলে' কিছু নেই। 'বলাকা'র পাখার মতো মানব-হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আলো অন্ধকারের রহস্যঘন পথ দিয়ে যাত্রা করেছে—এর শেষ কোথায় কে জানে। গতির মধ্যে বিষয়ত্যের এক অনির্বচনীয়তা আছে বলেই নিখিলের পাখায় চিরন্তন ছন্দস্পন্দিত—

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। [৩৯নং]

কিন্তু এ তো সৃষ্টির গতিতত্ত্বের একদিক। জীবনে প্রেমেরও তো একটি দিক আছে। যে-প্রেমের বেগে জীবনের গতিপথ আরও সুন্দর হ'য়ে ওঠে, অন্তর ভ'রে ওঠে পরমতম উপলব্ধিতে, সেই কবি-অন্তরের প্রেমের বেগও সঞ্চারিত হয়েছে এই 'বলাকা' কাব্যে।

'বলাকা' কাব্যে মানব-ইতিহাসের তরীটিকে যেমন নবযুগের আবর্তটে বাঁধবার ইচ্ছে আছে, তেমনি নিত্য জীবনতরীটিকেও বন্ধন-সীমার অতীত তীরে যুক্ত উষার বিশ্বত অধীরের ঘাটে নিয়ে অকূলের পানে ভাসিয়ে দেওয়ার বাসনা জাগে। এই বাসনার মূল থেকেই 'বলাকার' যুগে বিশ্বচেতনার সঙ্গে কবি-হৃদয়ের নূতনভাবে পরিচয় ঘটে। এই-খানেই গড়ে উঠেছে 'বলাকার' গতিলোকের সঙ্গে কবি হৃদয়ের এক নূতন ভাবলোক। অসীমের প্রতি চিত্তের যে পিপাসাতরা ভাবচেতনা, আর গতির যে দোলাচাঞ্চল্য, তাই গতির সঙ্গে ভাবমাধুর্যের সংযোগ করেছে। এই ভাবলোকেই কবির প্রেমের বেগ।

এই ভাবলোকের মধ্য থেকেই কবি যৌবন-চেতনার মনোভাবনা নিয়ে নারীর দু'টি রূপকে আবার ধ্যান করেছেন। 'বলাকার' যুগে এই নারীরূপের কল্পনায় গতির আকর্ষণ যে না আছে তা নয়,—কারণ গতি-শীলতার মাঝেই তাঁকে অসীমের অভিমুখী করেছে। এই গতিশীলতা ও জীবন চাঞ্চল্যের মধ্যেই তিনি অপরূপ যৌবনরূপিণী উর্বশীর গতির চঞ্চলতাকে প্রাণস্পন্দনে জাগিয়ে তোলে, আর কল্যাণী লক্ষ্মী তার নির্মল স্নিগ্ধ কামনার এবং শান্তির পূর্ণতার মধ্যেও যে-আনন্দ, তাই জাগিয়ে দেয়। একজনের মধ্যে চঞ্চলতার আবেগ, আর একজনের মধ্যে পরি-পূর্ণতার 'লাবণ্যের স্নিগ্ধ শান্ত সুধা।' নারীর একজন যৌবনকে জাগিয়ে দেয়, উতলা ক'রে তোলে অজানার আকর্ষণে, আর একটি রূপ জীবন-মৃত্যুর পবিত্র সংগমতীর্থে 'অনন্তের পূজার মন্দিরে স্নিগ্ধ শান্ত এক ভাব-জীবনে প্রবেশাধিকারও দেয়। সেইদিকেই কবিমনকে টেনে নেয়, কারণ সেখানে আছে শান্তির পূর্ণতা। নূতনভাবে কবিহৃদয়কে আকুল ক'রে তোলে।

আবার এই ভাবলোকের মধ্যে কবির জীবনচেতনা মৃত্যুকেও পরম বরণীয় ক'রে তুলেছে। মৃত্যুর ভূমিকাও জীবনের অমরত্বের গতিশীল-তার মধ্যে তুচ্ছ নয়, বরং বিশেষ একটি গুরুর আরোপ করেছে এখানে। ভ্রমণশীল বিশ্বভুবনের অদৃশ্য এক বিরাট প্রবাহধারাকে উদ্দেশ ক'রে কবি বলেন—

তুলিতেছ শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকশিছে নিখিল গগন। [৬নং]

কবি বিশ্বাস করেন, মরণের শুচিস্নান না হ'লে বিশ্বজীবন পূর্ণ পূর্ণতায় পরিপূর্ণতার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে না। আবার এই মরণের সিংহদ্বার পার হয়েই চিরযৌবনকান্ত যৌবনকেও অনুভব করা যায়। কবির কাছে যৌবনের বার্তাবহ বসন্ত তাই বারংবার এসে বলে যায়—

মরণের সিংহদ্বার
হ'য়ে এলো পার;
ফেলে এলো রাত্রি পুষ্পহার। [১৩নং]

শুধু তাই নয়, এই মরণের হাত ধরেই জীবনের এপারে ওপারে এই চিরন্তন যৌবনের সঙ্গে বারংবার দেখা হবে। জীবন চেতনার অঙ্গনে যৌবনের এই হচ্ছে নির্দেশ।

'বলাকা'র এই ভাব সৃষ্টির পথাগ্রে জীবন-চেতনার সঙ্গে কবির

অরূপের ধ্যান ভাবনার ভেতর দিয়ে হয়েছে। কারণ, অরূপের অনুভবনা নিয়ে উপনিষদ যেমনি করে যাত্রা করেছিলেন—সেই রূপক কবির কাছে অজানা। এই জন্যই 'বলাকা' যুগের জীবন চেতনার সঙ্গে একটি ইতিহাসের অনুরণন জড়িয়ে আছে। এই জীবন চেতনার বস্তুময় পৃথিবীর ভোগাকাঙ্ক্ষার কোন রেশই যেন নেই। 'চিত্রা'র যুগে মাঝে মাঝে ভোগময়ী বসু পৃথিবীর জন্য কবিমানসে কামনা জেগেছে, বস্তু-বিরোধক সৌন্দর্যবর্গ থেকে বিদায় চেয়েছেন কবি—কিন্তু 'বলাকা'র যুগে কবি-মানসে সেই দ্বন্দ্বময়তা নেই। চিরন্তন সত্যের এক অনির্বাচ্যতার ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে শুভ্র-সুন্দরতার জীবন চেতনায় কবি আপ্লুত হয়ে উঠেছেন।

সৃষ্টির গতিময়তাকে উপলব্ধি করতে যেয়ে বিষস্রষ্টার দিকে কবি দৃষ্টি না ফিরিয়ে পারেন নি। জগতের মধ্যে থেকে কবি যে-সত্যকে অনুভব করেছেন, যে-সত্যের উপলব্ধি থেকে জগতের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা জেগেছে কবির মনে, সেই জগৎস্রষ্টা বিশ্বদেবতার প্রতিও হৃদয়-সত্তাকে কবি তুলে ধরেছেন। বিশ্বদেবতার সমস্ত কিছুর পূর্ণতার মধ্যেও কবির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কবিকে না হলে তাঁর পূর্ণতার অনুভব সম্পূর্ণ হয়ে না। যেহেতু তিনি নিত্যপূর্ণ, ঠিক সেই জন্য তাঁর নিজের কোন আনন্দবোধ নেই; আনন্দের অনুভবাদ গ্রহণ করতে হয় কবির হৃদয়-পাত্রটি একবার রসে পূর্ণ করে দিয়ে, আবার তা' গ্রহণ করে। এই দেওয়া আর নেওয়ার মধ্য দিয়েই কবির অন্তরের সঙ্গে বিশ্ব-দেবতার চিরমিলনের বন্ধন।

মানুষেরই এই সমগ্র সুখ-দুঃখে, আশা-কামনার অপূর্ণতার মধ্য দিয়েই বিশ্বদেবতা নিজের সৃষ্টিকে অনুভব করেন, উপলব্ধি করেন নিজের পূর্ণতার ঐশ্বর্যকে। মানুষের সঙ্গে বিশ্বদেবতার এই যে অন্তরতর সম্পর্ক, এই সম্পর্কের কথা চিন্তা করেই কবির মনে জেগে উঠেছে বিশ্বদেবতার প্রতি অফুরন্ত প্রেম এবং এই প্রেমের বেগ নিয়েই কবি সেই দিকে ছুটেছেন, যেখানে আছে অন্তরের বিকাশ। এই বিকাশের মধ্যে আছে আনন্দ। কবির অন্তর-বিকাশের প্রতীক্ষায় সেই আনন্দময় পরম দেবতা হয়ে থাকেন, আর সেই বিকাশ যখন প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁর আনন্দ কামনার বিকশিত পুষ্পস্তবকের হাসি-মাধুর্যে ধরা দেয়। এই উপলব্ধিতে কবি তখন পরি তৃপ্তির সঙ্গে বলেন—

জীবন হ'তে জীবনে মোর পদ্মটি যে মোহটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সুখগুলো ছিঁড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে মেলায় কুলে কুলে
কৌতূহলের ভরে। [৩৩]

বিশ্বদেবতার মানসসরোবরেই কবির জীবন-পদ্মটি দলগুলি তার খুলে দেয়। একজনের মানসসরোবরে আর একজনের জীবনপদ্মের বিকাশ-সাধনা; এই সাধনার মধ্যেও একটি গতি আছে। জীবন থেকে জীবনের পথ-পরিক্রমায় প্রাণপদ্মের দলগুলি খুলে খুলে এই সাধনা।

প্রেমের বিশ্বচেতনার জন্য অন্তরতরের ব্যাকুলতা রূপময় হয়ে ওঠে, প্রেমের হৃদয় সম্পূর্ণতার পরিণতি লাভ করে; কারণ সেই বিশ্বদেবতা হৃদয়রূপ। জগৎ সাগরে ডুব না দিলে জীবনের গতিসত্যের রহস্যও ধরা পড়ে না। এই জন্যও 'বলাকা'র গতিবাদের মধ্যেও কবির মনে রস-স্বরূপের আনন্দধ্যান জেগে উঠেছে। হৃদয়ের গতিময়তার সৌন্দর্যের রূপপদ্ম মেলা দিয়েছে। এইখানেই কবির ধার্মনিক বার্গসোঁর গতি-তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের পার্থক্য। বার্গসোঁর গতিতত্ত্বে কেবল উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন চলার জয়গান, আর রবীন্দ্রনাথের গতি-তত্ত্বে অধ্যাত্মদৃষ্টির দিব্য বিশ্বাস। গতিতত্ত্ব দু'জনেরই, Elan vital এর অন্তর্নিহিত শক্তিকে দু'জনেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু একজন সৃষ্টির মূলে দেখেছেন শুধু নিরবচ্ছিন্ন গতিধারার প্রচণ্ডতাকে, আর একজন পরম সুন্দরের অলক্ষ্যকুলে শান্ত মধুর পরিণামকে, জীবনের মুক্তি সন্ধানের সঙ্গে অন্তরের মিলন-মাধুর্যকে। একজন অজানার বেগে 'ধূসর মিটি'র সন্ধান পান নি, আর একজন পেয়েছেন আর গভীর উপলব্ধিতে পেয়ে উঠেছেন—

তারে ঘিরে হলো না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই মিতা তারে সাধা—
এমনি ক'রেই আশা-আওয়ার তোরে
পেয়েছি আমি বোনা। [৩৩নং]

এ-প্রেম চির যাত্রার পথের প্রেম। কিন্তু এ-প্রেমে যে-চেতনা, তাতে কেবল এই বাণী—

ধূসর মিটি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার বেশে। [৩৩নং]

বার্গসোঁর কাছে যেখানে বিশ্বসত্য কেবল 'unceasing life, action, freedom' এবং 'there are no things, there are only actions'—সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাছে—

সেখানে আমি শোনাব তারে কাছে
নূতন আলোর ভাষা,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার সুখে দুখে। [৩৩নং]

চিরন্তন গতিধারার সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে দিয়ে 'নূতন আলোর তীরে' পৌঁছে কবি শুধুই পরিতৃপ্তিই লাভ করবেন না, সেই পরমতম সত্তা যে তাঁর চিরদিনকার সঙ্গী, এই আত্মোপলব্ধিটুকুও জানাতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন না। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের প্রজ্ঞা ও আত্মানুভূতি রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের মধ্যেও এমনি করে মিশে গেছে। বিশ্বব্যাপী আনন্দ-চৈতন্যকে জীবনের চলার গতি সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে না দেখলে অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথের মন শান্তি পায়নি এবং ঐক্যধর্মী ভারতীয় মনের সাধক-মন জীবনের ঘূর্ণিবায় গতি সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েও পরমতম প্রেমের প্রকাশ-মহিমার রূপদেহটিকে হৃদয়লাবণ্যে গড়ে তুলেছে। আনন্দের অমৃত-চিন্তা জীবনের পরিণামহীন গতিতত্ত্বকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে পারে নি। চাকলোর মাঝে এসেছে উপনিষদের রসবোধ। 'বলাকা'-কাব্যে সৃষ্টির মূলে গতিসত্যকে স্বীকৃতি দিয়েও রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন শান্ত-সুন্দর রস-স্বরূপকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' তাই গতিতত্ত্বময় জীবন-চেতনার আনন্দ-পরিণামের বার্তাবাহী।

'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

প্রেরণা থেকেই সৃষ্টি। মানব জীবনের এই সর্বাত্মক মনোভাবটি না থাকলে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা যায় না। শরৎচন্দ্রের জীবনে এমনি একটা অনুপ্রেরণা ছিল বলেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম-প্রস্তুতি একটা সাধারণ রূপ নিতে পেরেছিল। অপরিণত বয়সে তাঁর 'কাশীনাথ' সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম যৌবনের সৃষ্টি হয়েছিল—'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল গ্রাম,' 'বড়দিদি', ভদ্রনাথ, হরিচরণ, দেবদাস, ও বালস্মৃতি। শুভদা নামে একখানি উপন্যাস অসমাপ্তই ছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে সেটা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ৭ই জুন ১৯৩৮ সাল।

শরৎচন্দ্রের বড়দিদিই সাহিত্যের হাটে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতীর পাতায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। 'এ লেখা রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না' বলে বাংলার পাঠক সমাজ তা মেনে নিয়েছিল। তার কারণ ছিল, শরৎচন্দ্রের নাম ঘোষণা করেও সংখ্যায় কথা হয়নি বলে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছেও এ সংবাদ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত!

শরৎচন্দ্র নিজেকে বড় দুর্বল বলে মনে করতেন, যার ফলে তাঁর জীবনে একটা লক্ষণ দেখা দিয়েছিল—অধ্যয়নানুরাগী হয়ে থাকা। তাই বর্মায়-প্রবাস জীবনে লেখার চাইতে বই পড়ার নেশাটাই ছিল শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বেশী।

অথচ তাঁর এই সাধনার মধ্যে একটি মাত্র উপন্যাসের কথা আমরা জানতে পারি। সেটা হলো 'চরিত্রহীন।' চরিত্রহীনের কথা রেঙ্গুনের বন্ধুবান্ধবও প্রথমে জানতে পারেন নি। কিন্তু একজন যিনি জেনেছিলেন তিনিই হলেন শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন জীবনের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু—যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। এঁর লিখিত 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। সেটা পড়লে আমরা শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন জীবনের অনেক ঘটনার কথা জানতে পারি। তিনি যেমন শরৎচন্দ্রকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন, তেমনি মনে প্রাণে জেনেছিলেন শরৎচন্দ্র একজন উচ্চস্তরের লেখক। অথচ শরৎচন্দ্র নিজেকে তা মনে করতেন না। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। কথায় কথায় একদিন যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে শরৎচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"সরকার, আমাকে পিটিয়ে সাহিত্যিক করতে চাও, না? তাই বুঝি তোমাদের এত সহানুভূতি আর উৎসাহ! দুঃখ রয় সরকার, আমার দ্বারা তোমরা আর কিছুই হবে না।"

এ কথার অর্থ আছে, তাৎপর্যও আছে। কারণ শরৎ-জীবনে নানা সংঘাত ঘটেছিল। যার ফলে তাঁর মনোবল ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়েছিল। ১৯১২ সনে রেঙ্গুনে সুরেন্দ্রনাথই তাঁর সাহিত্য জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। 'চরিত্রহীনের' পাণ্ডুলিপি ও 'আমীর ইতিহাস' [illegible] পাতার উপন্যাস দুটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে আবার সাহিত্য চর্চা শুরু করবেন এমন ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি নিজেই একথা বলেছেন—"আমি তখন বিহারে···প্রায় বছর দশেক পূর্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।"

শরৎচন্দ্রের সত্যিকারের সাহিত্য জীবন শুরু হয় ১৯১৩ সালে। অর্থাৎ 'যমুনার' পাতায়—'বিন্দুর ছেলে' 'নাম নির্দ্দেশ', 'রামের সুমতি', প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার পাঠক-মনে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল ১৯১২ সনে তাঁর কোলকাতায় আকস্মিক আগমনের ফলে। এই সময় প্রমথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল পরিকল্পিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চলে যান। কিন্তু যেদিন প্রমথনাথ শরৎচন্দ্রকে পৃথকভাবে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন তাঁরা সত্বর 'ভারতবর্ষ' নামে একখানি পত্রিকা বের করবেন, সেদিন শরৎচন্দ্র আনন্দে অধীর হয়ে পত্রখানি বন্ধুবর যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে দেখিয়ে বলেছিলেন—"ওহে সরকার, মস্ত এক সুখবর। আজ প্রমথর চিঠি পেলাম। সে লিখেছে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স) 'ভারতবর্ষ' নামে একটা কাগজ বের করবেন। বিলাতের 'ষ্ট্রাণ্ড' 'ম্যাগাজিন বা 'উইণ্ডসর' ম্যাগাজিন-এর মতোই বলা চলে।

তাছাড়া সবকলেবরে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র যেমন আনন্দ পেয়েছিলেন তেমনি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিকৃতিসহ প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' তাঁর হস্তগত হলে দুঃখ করে যোগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"সরকার, পত্রিকাটি বোধহয় সফল হবে না। কিন্তু আসল মালিকই চলে গেল যে!"

এই 'ভারতবর্ষে' অনেক চিন্তা করেই শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনের' কিয়দংশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হননি। কারণ শরৎচন্দ্র নিজেকে তখনও পাকা লেখক বলে মনে করতেন না। সে হিসাবে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখার জন্য তাগাদা শুরু করায় ফলে শরৎচন্দ্র তাঁকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেটা পড়লেই 'লেখা' সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটি কী ছিল বোঝা যায়। তা এইরূপ—

প্রমথ,

একটা অহঙ্কার করবো মাপ করবে? যদি করতো বলি। আমার চেয়ে ভাল Novel কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জানে সত্য বলে জন্ম হবে, সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্বে

নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপর রইলো। এ বিষয়ে আমি অনড়া আস্থির চাই না ; আমি দড়া চাই।

ইতি—তোমার শরৎ। ৮ই এপ্রিল—১৯১৩।

শরৎচন্দ্রের এই পত্রাঘাতে প্রমথনাথ বিচলিত হননি। পত্র আর টেলিগ্রাম করে শরৎচন্দ্রের কাছে অন্ত কিছু পাবার আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ সৃষ্টি হয়েছিল—'বিরাজ বৌ'। এই 'বিরাজ বৌ' পড়ে বন্ধুদের অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই সাহসের জোরেই 'ভারতবর্ষে' 'বিরাজ বৌ' পাঠাবার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু বইয়ের নামকরণ তখন করা হয়নি। 'ভারতবর্ষে' বইয়ের প্রথম কিস্তি পাঠাবার সময় শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে লিখেছিলেন—"আচ্ছা, কী নাম দেওয়া যায় বলতো সরকার?"

—"কেন? বিরাজ বৌদিদি।"

—"বেশ নাম। তার চেয়ে 'বিরাজ বৌ' নাম দেওয়াই ভাল। আখো সরকার মোহিনী চরিত্র যেমন ইম্‌পর্টান্ট নয়।"

—"এই যেমন ধরুন না শরৎ বা, যোগেন চাটুজ্যে 'কবে বৌ', নিখিলেশ পাত্রীর 'মেজবৌ' আর তৃতীয়টি হচ্ছে শরৎ চাটুজ্যের 'বিরাজ বৌ'।"

—"ঐ তো তোমাদের কেমন একটা রোগ! ওদের 'কবে বৌ', মেজবৌ', যতগুলি থাক আমার কিছু লোকসান নেই।"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই 'বিরাজ বৌ' গল্প বলেই 'ভারতবর্ষে' পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—"ওকি শরৎ দা, উপন্যাসকে গল্প বলে ছেড়ে দিচ্ছেন? প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি গল্প পাঠাতে লিখেছিলেন?"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই কথায় 'বিরাজ বৌ', গল্প নয়, উপন্যাস-বলেই 'ভারতবর্ষে' পাঠিয়েছিলেন এবং রচনা শৈলীর একটা নূতন দিক নিয়েই 'ভারতবর্ষে' তা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বেঙ্গুন ছাড়ার পর শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুন যাবার পথে শিবপুর যান' যাইলেন স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন থেকেই 'ভারতবর্ষে' তাঁর লেখার পথ প্রশস্ত হয়। অবশ্য 'যমুনায়' তাঁর অনেকগুলো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে সে পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি আর, তার কারো-মনো ভাব থেকে। অবশ্য ১৯১৭ সালে যমুনায় চরিত্রহীনের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের লেখার ভয়ানক ভক্ত ছিলেন। তার বাবাদুর জলধর সেন মহাশয় 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক হয়েছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিয়ে আসতে পারতেন এ কথা বললে ভুল হবে না। কারণ শরৎচন্দ্র জলধর সেন মহাশয়কে শ্রদ্ধেয়ের মতোই স্নেহ করতেন। ১৯০৩ সালে 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় তিনি 'মন্দির' গল্পটি পড়ে (যাদুর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত) যে মন্তব্য করেছিলেন—"এই লেখকটি যদি চর্চ্চা করেন, তা হলে ভবিষ্যতে যশস্বী হবেন"—এই আশীর্বাদীর জন্যেই শরৎচন্দ্র জলধর' সেন মহাশয়কে আপনজন মনে করতেন। তা ছাড়া তাঁদের মধ্যে লেখক সম্পর্কও ছিল।

যাদে শিবপুরে জলধর সেন মহাশয়ের যাতায়াত ছিল ঠিক একই সূত্রে। নানা পত্র-পত্রিকার তাগাদা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রকে তিনি 'ভারতবর্ষে' লেখা চাইবার জন্য প্রায়ই গিয়ে বলতেন—"শরৎ, এখন কি লিখছ ভাই? এবার নূতন কিছু একটা দিচ্ছ তো?" তাঁর এমন কথা শুনে শরৎচন্দ্র অনুপ্রাণিত হতেন কিনা বলতে পারি না। তবে 'জলধর দাদার' আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করতেন বলেই 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের একটির পর একটি লেখা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মনের দাবী

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কাজে কাজে ভুলে যাই আমাদের আসল কি কাজ?
ভুলে যাই আমাদের সমাহিত হৃদয় সমাজ
ছোট বড় কতই না গুরুভার ব'য়ে নিয়ে চলে
কিছু যেন বাকি প'ড়ে ঠিক থাকে তারি তলে তলে।

আমরা করছি সাজ রঙিন কল্পনা নিয়ে চোখে,
রঙের বাহার মন কেড়ে ফেলে দেয় যত লোকে,
একটি গহনে কোন স্পর্শবতী নরম শরীর
যদি ছুঁয়ে দিয়ে যায়;—হোক না সে ছোঁয়ায় নিবিড়।

হৃদয়ের দাবী আছে সর্বাগ্রেই; এ কথাটি বুঝে
কাজে কাজে ভুলে থাকা চলে না তো
চোখ দু'টো বুজে।
হঠাৎ মহৎ কিছু ভেবে নিয়ে এ কথা বলার
বৃহৎ অরির ছুটা ছড়িয়েই দিন যে আমার।

হৃদয়ের গুহাশ্রিত খাঁচে খাঁচে রকমারি কাজে
আমাদের সেখানে-যে মনেরই দাবীই শুধু সাজে।

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এমনি করিয়া 'ডাকপাড়ী' গল্পে প্রথম প্রভাত সূর্যালোকে মাথার হিজ-জীবনের ছুরাশা কাটিয়া গেল। এই আখ্যানের বাণী শুনাইয়া বিভূতি-ভূষণ যে প্রত্যক্ষভাবে কোন পথনির্দেশ করিলেন তাহা নহে ; কিন্তু হতাশার অন্ধকারে তিনি ভৈরবীর বেশ আনিলেন। অন্তরের সন্ধান মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে প্রবিপুল সম্ভাবনা, গড্ডলার বৈরু যে তাহাকে ত্রাণ করে, তাহাই তাহার ট্র্যাজেডি। বিভূতিভূষণ সহজ কথায় জীবনের সন্ধান পাইয়াছেন। আঘাত-সংঘাতে যে ক্রম বিপর্যস্ত, এই আশ্বাস বাণীটুকুর মূল্য তাহার কাছে অনেক। রাধা যেমন শ্যামকে বাঁশিতে যেন আর তাহার পরিচয় বাক্যহীন মেলিয়া মনে বল পাইল, ভাঙিয়া ফেলিল 'দুঃখ-অবসাদের সমস্ত জড়তা, সেইরূপ সকলের জন্যই অজস্র সুযোগ পথে-ঘাটে ছড়াইয়া আছে। অভিযাত্রী আধিক লেখকের কাছে ইহাই তো মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব। প্রকৃতির রূপ-মাধুর্যের মধ্যে, নরনারীর পবিত্রতার মধ্যে, শিশুর সরল সৌন্দর্যের মধ্যে এই কল্যাণী প্রতিশ্রুতিই ঘনায়িত করে।[৫৩] বিভূতিভূষণের এইরূপ আখ্যানধর্মী মনোভাবের পরিচয় আরও স্পষ্ট হইবে আমরা যদি তাঁহার 'অক্ষয় ও মৃত্যু' গ্রন্থের 'অবতার' গল্পটি দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করি।[৫৪] গল্পটি মনোজ্ঞ, হৃদয়ের ভাব-বিন্যাসের উপর রচিত। ইহাতে আছে :—মন ভাল ছিলনা বলিয়া গল্পের বক্তা ছেলেপাড়া লেনের পুরানো বাসের আড্ডায় গেলেন এবং সেখানেও ভাল না লাগায় কিছুক্ষণ পরেই বাহির হইয়া পড়িলেন পথে। পথ অপরিচ্ছন্ন, নিতান্ত নগ্ন পল্লি, পাশেই মিউনিসিপালিটির একটি ময়লার ভাগাড়। হাত পাঁচেক লম্বা আর ওই রকম চওড়া একটা খোলার ঘরে স্বামী স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তানের সংসার। ছোট ছোট ছেলেকে কোলে লইয়া ঘাঁটিতেছে, যাহিরা-জীর্ণ শরীর, বয়স ত্রিশ যায় না, ত্রিশও হইতে পারে চল্লিশও হইতে পারে। ময়লা আলনায় ময়লা কাপড় আধা ঝুলিতেছে। মনটা আরও দমিয়া গেল। কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কোথাও আশ্বাস নাই! রাস্তায় মোড়ে বইয়ের দোকান, কিন্তু সেখানেও যাহে বইয়ের স্তূপ। বর্ষণলার গীর্জার সামনে এক বেহিসাব মাতালকে টানিয়া করিয়া কোথায় লইয়া গেল। আনন্দ-সন্ধানের রাস্তা কি বিকৃত পথ! অবসন্ন মনে বক্তা ঢুকিলেন পড়ের মাঠে, কার্জন পার্কে। সন্ধ্যা হয় হয়। হঠাৎ কার্জন পার্কে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কাঁকড়া সোনালী চুল ছোট একটি ছেলের উপর। ছেলেটির সঙ্গে যে চাকর আসিয়াছিল সে তখন পার্শ্ববর্তিনী এক আয়ার সহিত গল্পে মশগুল। ছেলেটি মনের আনন্দে চাকরের মাথায় টুপি পরাইতেছে। গল্পে এইখানে আছে :—"আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলুম। নরম নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশ—ভঙ্গির কি লঘীয়তা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব সৌন্দর্য।...আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব, অনুভূতাশ্রিত সৌন্দর্যের সামনে পড়ে গিয়েছি যেন।

...খোকার মনের অর্থহীন আনন্দ অলক্ষিতে কখন আমার মনে সংক্রামিত হয়েছে দেখলুম। খোলার ঘরের সেই মেয়েটিকে আর ঘিনঘিনে মনে হ'ল না।"

কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের এই আখ্যানগুলি শুধু মানবতামূলক করুণারসাপ্লুত নয়। অসহায় বিপন্নকে তিনি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন সত্য, তাহার সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন আশার আলো, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা নিষ্ক্রিয় পরগাছা, তাঁহার সহানুভূতি তাহাদের জন্য নহে। অপরাজিত জীবন-মহিমার স্মারক-সংগ্রামী চরিত্র ফুটাইবার দিকেই তাঁহার প্রবণতা। তাঁহার মানসপুত্র অপরাজিতের অপু সংগ্রাম করিয়াছে, দৃষ্টিপ্রদীপের জিতু সংগ্রাম করিয়াছে, বিপিনের সংসারের বিপিন, অনুবর্তনের মাষ্টার মহাশয়েরা, আদর্শ হিন্দু হোটেলের হালারি—ইহাদের প্রত্যেকেই কঠোর জীবন-সংগ্রাম করিয়াছে। তাহারা কেহ জিতিয়াছে, কেহ হারিয়াছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ হারজিত নিরপেক্ষভাবে সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের জীবনযুদ্ধ। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মানুষকে খণ্ডিতভাবে না দেখিয়া তাহার সমগ্র রূপ ফুটাইবার যে চেষ্টা বিভূতিভূষণ

---

৫৩. God with us is not a distant God, he belongs to our homes as well as to our temples. We feel his nearness to us in all the human relationship of love and affection, and in our festivities He is the chief guest whom we honour. In seasons of flowers and fruits, in the coming of the rain, in the fulness of the autumn, we see the hem of his mantle and hear his footsteps. We worship him in all the true objects of our worship and love him wherever our love is true. In the woman who is good we feel Him, in the man who is true we know Him, in our children He is born again and again, the Eternal child.—Rabindranath—Personality (1948) P. 27-28.

৫৪। এই গল্পের বক্তা লেখকের মনোভাব পরিস্ফুটের সুবিধার্থেই 'আমি' রূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন।

করিয়াছেন, কথা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রেও শরৎ চরিত্রের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস সে চেষ্টার পরিপূরক। বলা বাহুল্য, এইভাবে মানুষ মর্যাদা পাইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিবার দায় থাকে, কারণ ইহাতে সঙ্কীর্ণতার আবেষ্টন থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণের মানবতাবোধী রচনাবলীতে এই মনোভাবই অধিক লক্ষ্য করা যায়, 'ইছামতী'র ভবানী, বা 'কেদার রাজা'র কেদারের মত প্রধান চরিত্র তিনি কমই সৃষ্টি করিয়াছেন।[৩৫] বিভূতিভূষণের এই বিশিষ্ট সহানুভূতির সার্থক পরিচয় মিলিবে 'আরণ্যক' হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তিগুলিতে।

> আরণ্যকের প্রথম দিকে লবটুলিয়ার কাছারী বাড়ী পরিদর্শনে গিয়াছে জমিদারীর ম্যানেজার সত্যচরণ। সত্যচরণ তরুণ যুবাপুরুষ, যুবতী স্ত্রী সে দেখিয়াছে, কিন্তু বিহারের জঙ্গল-মহালে গিয়া হতভাগ্যদের দারিদ্র্যের ভয়াবহতা দেখে নাই। কাছারিতে তাহার আসিবার সংবাদে মাসখানেক পরে তাই যাইবার আশায় বহু দূর-দূরান্তর হইতে অনেকগুলি দরিদ্র প্রজা আসিয়া জুটিল। ইহাদের কর্মহীন ভিক্ষাবৃত্তিকে বিদ্রূপ করা সহজ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে লেখক বিভূতিভূষণ তাহা করিলেন না। তিনি সহানুভূতির সহিত তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃপণা প্রকৃতির দুর্ভাগ্য এই সন্তানদের সম্পর্কে সত্যচরণের জবানীতে লিখিয়াছেন :—"কেন জানি না, ইহাদের ঠাঁই ও ভাত জোটে নাকি। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের লাঞ্ছনা, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের বুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার অরণ্যভূমি ও হিমঝরা রুক্ষ আকাশ বিলাসিতার কোনও পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদের সত্যকার সুস্থ মানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা তীরবাসরৌলা ও পর্বতী হইতে না' খাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সহজে তাহারা হিসাব করিল।"

সুন্দরের সহিত সত্যের ঐক্য-উপলব্ধি আর্টের লক্ষণ। যাহা প্রচলিত অর্থে সুন্দর, তাহাই সত্য বা মহৎ নয়—একথা জানিয়াও শিল্পী যখন সুন্দরকে ফুটাইয়া তোলেন তখন স্বভাবতই তাহার সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকেন। শিল্পীর সৌন্দর্যপ্রীতিই এই রূপকলার মূল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ হিসাবে বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য হইল, চরিত্র সৃষ্টে তো নয়, চেহারার দিক হইতেও কুৎসিত—রূপায়ণে তাঁহার বড় একটা আগ্রহ ছিল না। শরৎচন্দ্র বিহারের পরিপার্শ্বিতে বা আসবার রূপায়ণে ট্র্যাজেডি ফুটাইবার যে সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, পল্লী-ভাবাশ্রয়ী শিল্পী বিভূতিভূষণের পক্ষে তাহা একরূপ অসাধ্য ছিল। অবশ্য বিভূতিভূষণের এই সৌন্দর্য-প্রীতির ফল যে সর্বক্ষেত্রে বিরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বিধুবাউরি' গ্রন্থে 'প্রবাসিনী মানীমা' গল্পে দীর্ঘদিন প্রবাসিনী মানীমাকে পাইয়া সুন্দরী কল্পনা করিয়া শেষ পর্যন্ত বার্ধক্য-জীর্ণা শ্রীহীনা বৃদ্ধাকে দেখিবার ব্যবস্থা পাঠককে যতটা মহানুভূতি-শীল করিয়া তোলে, তাহার বিপরীতে বেদেনির ফুলঝাড়ী গ্রন্থের 'কুলাঙ্গার রঙ,' গল্পে যেখানে গল্পের নায়ক প্রফুল্ল অতীতদিনের মানসী কল্পার দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তায় জীর্ণ চেহারা দেখিয়া হতাশ মনে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেখানে পাঠক অবশ্যই সেরূপ বক্তিগত করে না।[৩৬] পথের পাঁচালী-অপরাজিতে দুঃখ-দারিদ্র্য জানাইয়া দিয়া এই সৌন্দর্যের হিল্লোল বহিয়াছে। সেখানে প্রকৃতি রূপময়ী, মানুষের রূপও কম নয়। বয়সী বালাইয়ের লোলচর্ম ইন্দির ঠাকরুণের সৌবনের তথা রূপের উল্লেখে লেখক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, তরুণ দুর্গার লাবণ্যময় জামাই চন্দ্র মজুমদারের জন্য প্রৌঢ় বিপত্নীক চন্দ্র মজুমদারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্দিরঠাকরুণ বিহ্বল হইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, অপরাজিতার মত রূপসী রামচাঁদ চক্রবর্তির অন্নপূর্ণা মাতৃস্বসা ও মামাবাড়ীর করুণাময়ী মেজবৌ চকিতে দেখা দিয়া গিয়াছেন, সর্বজয়া, অপু, দুর্গা, রানু, অমলা, মেজবৌরাণী, লীলা, অপর্ণার মা, অপর্ণা—অনেকেই সেখানে সুন্দর। বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উপেক্ষিতার' যে গ্রাম্য বধূটির কথা বলা হইয়াছে, তিনিও রূপে গুণে অনুপমা। বলিতে গেলে এই বধূটিই বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের নারী চরিত্রের আদর্শ স্বরূপা। সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াই যে গল্পের তরুণ নায়ক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছে সে কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই পরিচয় বা তৎপরবর্তী ঘনিষ্ঠতায় বিভূতিভূষণের নির্মল শুভ্রতা রক্ষা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার সৌন্দর্যপ্রীতি ও কল্যাণ দৃষ্টির পরিচায়ক। সত্যকার সৌন্দর্য যে শুধু চিত্ত-পরিচায়ী, তাহা দৈহিক কামনা-বাসনা নিরপেক্ষ, কল্লোলযুগীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ইহাই যে সত্য এমন কথা বহু মনীষী বলিয়াছেন।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে সেই বিশৃঙ্খলার সময় এই মনোধর্মী স্নিগ্ধ সৌন্দর্য

---

[৩৫] এই দুইটি চরিত্র সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দিক হইতে কিছুটা কৈফিয়ৎ আছে। ভবানী উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ এবং কুলীন ব্রাহ্মণ। তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁহার এইরূপ জীবন হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া তাঁহাকে যখন গ্রন্থে আনা হইয়াছে, তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৫০ বৎসর, পূর্বজীবন তাঁহার অজ্ঞাত, অন্ততঃ বৈচিত্র্যময় এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ।

কেদার রাজার কেদার সম্পর্কে বলা যায়, কেদার এক বিগত বৈভব জমিদারবংশের বংশধর। অতীত গৌরব প্রথার পরাজয়-জীবিতের তিনি বন্ধু। তবু কন্যা সরৎ যখন কলিকাতায় হারাইয়া গেল, তাহার পর কেদার ডিনমাসের ব্যবসায়ের পুঁজিতে হাড়কাটা পাড়ুনির কাজ লইয়াছেন।

[৩৬] তবে বিভূতিভূষণের ভক্ত পাঠক এ অবস্থায় আলোচ্য প্রত্যাবর্তনের অর্থে একথাও ধরিয়া লইতে পারে যে, দুঃখ-দারিদ্র্য কথার মনে যে ফাটল ধরিয়াছিল, প্রফুল্লের দারিদ্র্য তাহা বাড়িয়া যাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই লেখক বিধবা কথাকে পাঁচাইতে এইভাবে কথাকে বাড়ী হইতে প্রফুল্লকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

[৩৭] 'প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি সাধারণ অনুভূতি হইতে পৃথক সৌন্দর্যপিপাসা যে বস্তুর, আধুনিক Aesthetics—শাস্ত্রের ইহাই

অঙ্কনের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। বিভূতিভূষণের বিচিত্র রোমান্টিক ভাবাবেগ সমকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের মতো জীবনবেদ রচনায় আধুনিকতা চিহ্নিত করিয়া পুরাতন ও নূতন কালের মধ্যে সেতুবন্ধন করিল। ফলে মহাযুদ্ধের পাঁজলাতে যে সময় বাংলা-সাহিত্যের কণ্ঠরোধ প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, বিপ্লবাত্মক মানসিক ভারসাম্য ও সৌন্দর্যমুগ্ধ কল্যাণধর্মী ভাবদৃষ্টি লইয়া বিভূতিভূষণ সেই সময় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাস্তববোধের ক্ষেত্রে তাঁহাকে কেহ প্রাজ্ঞ বলিবে না, কিন্তু অনুভূতির রাজ্যে তিনি সম্রাট।[৩৪৮]

আগেই বলা হইয়াছে, বিভূতিভূষণ ধার্মিক লেখক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম পবিত্রতাবাচক তো বটেই, তাহাড়া বিশ্বপ্রকৃতির মূলে পরমাত্মার অস্তিত্ব তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মের আচার-বিচারগত রূপে অথবা পুথি-প্রক্রিয়াগত সাধনায় তাঁহার মোহ ছিল না। সত্য, শিব ও সুন্দরের উৎসস্বরূপ ভগবান, ইহাদের সাক্ষাৎ ও স্বীকৃতিই ভগবানের পূজা,—ইহাই বিভূতিভূষণের ধর্মভাব। শাস্ত্রভাবাশ্রিত সহজ সত্যের পথিক বিভূতিভূষণ সহজ বিশ্বাসের আলোতে ভগবানকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই যাহা প্রশান্ত, সুন্দর ও কল্যাণকর, যাহাতে ক্লেদস্পর্শ নাই, তাহাই তাঁহার কাছে ভগবানের স্তোত্রক। ইহার বিপরীতে প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির অন্তঃসারশূন্যতা যখনই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তখনই তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র বাবুনের মেয়ের গোলক চাটুজ্যে ধর্মের মুখোশ যেভাবে ক্লেদাক্তক

সেড়োর কথা। বাস্তব প্রয়োজনের মতই, বাস্তব শুভবুদ্ধির সঙ্গে ঘাঁটি সৌন্দর্যপ্রীতির সম্পর্ক নাই। সৌন্দর্যবোধ মানব-মনের এমন একটা বৃত্তি যে, তাহার পূর্ণ স্ফূর্তির কালে intellect বা Emotion, এদুয়ের কোনটাই ক্রিয়াশীল থাকে না ;

—মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১ম সংস্করণ), পৃঃ-৫৮।

৩৪৮ বিভূতিভূষণের বিবরণিপি হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তি কয়টিতে পরিষ্কার হইবে :—"এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সজনেগাছটা আর গাছটা বড়ে ভেঙে গিয়েছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সজনেগাছটা ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো ছিল নানা দিক থেকে। ওরই তলায় সেই মরণা কাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আমার কত মধুর সম্বন্ধ।

সজনেগাছটার সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে আসবে এবার বাজারে কাঠ। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম। গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সজনেগাছটা যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনিনি।

পথের পাঁচালীতে সজনেগাছটার কথা লিখেছি। লোকে হয়তো মনে রাখবে ওকে কিছুদিন।"

—উর্মি মুখর (১ম সংস্করণ), পৃঃ—১

বর্ণনায় পুলিয়া দিয়াছেন, সেরূপ তির্যক প্রকাশ-ভঙ্গি বিভূতিভূষণের ছিল না, কিন্তু হীনতা চোখে পড়িলে অনেক সময় প্রবন্ধের মত সরল স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। একদা খলিতচরিত্রা গিরিবালার (আচার্য কৃপালনী কলোনী গ্রন্থের গিরিবালা গল্প) জন্য যখন পরিতাপিত হইয়াছে, ধর্মপ্রাণতার জন্য তাহাকে বিভূতিভূষণ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টিপ্রদীপে নগ্নাঙ্গ গৃহস্থ পরিবার কিভূর জ্যাঠামশাইয়ের ধর্মোন্মাদনার ফলে যে কুৎসিত বীভৎসতা রহিয়াছে, তাহা তিনি কিভূর জবানীতে বর্ণনা করিয়াছেন বিরুদ্ধভাবে।[৩৪৯] কুশল পাহাড়ী গ্রন্থের 'কুশল পাহাড়ী' গল্পের বনবাসী সাধু ও তাঁহার আবাদ-ভূমির রমণীয় আবেগোজ্জ্বল বর্ণনার বিপরীতে কলিকাতায় ধনীগৃহের বিলাসিতার ঔজ্জ্বল্য আর কৃত্রিম কথাবার্তা তাঁহার প্রকৃতি প্রেমিক ধার্মিক মনটিকে চমৎকার ফুটাইয়াছে। 'জ্যোতিরিঙ্গণ' গ্রন্থের 'অনুশোচনা' গল্পে শীর্ণকায় আচারনিষ্ঠ পুরোহিত বালামাল গুপ্তের চিত্রচাকল্য সরল চাষীভদ্রের পাশাপাশি তুলিয়া ধরিয়া তাঁহার হীনতা উদ্ঘাটিত করিতে বিভূতিভূষণ সঙ্কোচবোধ করেন নাই। 'দৃষ্টিপ্রদীপে' কিভূ যেখানে মনিবদের যেসব অযৌক্তিক বর্ণনা করিতেছে সেখানেও বিভূতিভূষণ নির্মম। কলিকাতায় যাহাদের বিলাসী জীবন কাটে তাহারা সেখানকার পীঠস্থানের মোহান্ত।[৩৫০] সরল ধর্মবিশ্বাসী গ্রামা নরনারী কষ্টার্জিত টাকা পয়সা প্রণামী যেন, সেই প্রণামীতেই চলে তাহাদের সহরের বিলাস-ব্যসন। গরীব চাষী নিমচাঁদ তাহার ছেলের অসুখের জন্য স্ত্রীকে পোঁসাইয়ের কাছে ধর্না দিতে লইয়া আসিয়াছিল। বাবুদের রূপোর থালার উপর বাড়তি প্রণামী হিসাবে তাহারা তিনটি টাকা রাখিল, এ-ছাড়া প্রণামী ও পূজা দিল যথারীতি। এই মেলাতেই নিমচাঁদের কলেরা হইল, অকস্মাৎ নিভিয়া গেল তাহার জীবনদীপ। একটি সুখের সংসার ভাঙিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতায় বাবুদের বাড়ী বিবাহ। জামাইকে সাঁইন গাড়ী যৌতুক দেওয়া হইল, অন্য আয়োজন তো হইলই। এই সময় কিভূর জবানীতে বিভূতিভূষণেরই বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে :—"ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি চাকরের দলা দারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড় মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমঝরা অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুর ডালের কাঁপে শীত আটকাচ্ছে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেই যার করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর

৩৪৯...গ্রন্থের ভক্তির উৎসের মূল গ্রন্থের বিষয় বুদ্ধি ও সাংসারিক উন্নতি। ভগবান এঁদের উন্নতি করেছেন, ফল বাড়াচ্ছেন, মান খাতির বাড়াচ্ছেন—এঁরাও ভগবানকে খুব তোয়াজ করছেন, খুশী রাখবার চেষ্টা করছেন—ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে।...গ্রন্থের সত্যনারায়ণ পূজো মঙ্গলতা বৃদ্ধি করার জন্যে, লক্ষ্মী পূজো ধনধান্য বৃদ্ধি করবার জন্যে, গৃহ-দেবতার পূজো, সোনাপীর জীউর পূজো—সবারই মূলে—হে ঠাকুর, মনে সুখে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তাহ'লে তোমাকেও খুশী রাখবো।"

(দৃষ্টিপ্রদীপ—প্রথম পরিচ্ছেদ)

মধ্যে আছে। ধর্মের নামে এরা করেছে ঘোর অধর্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বইগুলার খোঁপাই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড় মানুষ ক'রে দিয়েছে, লক্ষ গরীব লোককে ঘেরে—জায়গাগুলির গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় করে রেখেছিল, মাথে, সীতাকে ও কুকুরের মাংসে করেছিল ওদের ভীতখানা।

সত্যিকার ধর্ম কোথায় আছে? কি ভাবে মোহ, অনাচার ও মিথ্যার কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্যরূপ দেখিয়ে, কেমন থেকে এরা সমস্ত ধর্মকে ভুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্মের আসনে বসিয়েছে।"

কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন—বিভূতি বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাহচর্যে আসিয়াছিল বলিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আপেক্ষিক শ্রদ্ধাবান কিন্তু এক্ষেত্রে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছে। কথাটা যে সত্য নয় এবং কিভূর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিভূতিভূষণেরই বাণী, তাহা বিভূতিভূষণের ইচ্ছামতী হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তিগুলিতে বুঝা যাইবে। উদ্ধৃতিটি দেওয়ান রাজারাম রায় সম্পর্কে। সাহেবদের স্বার্থে রাজারাম সব কুকার্যই করেন। পদোন্নতি করিয়াছেন তিনি অনেক। রাজারামের পূজার্চনার ঘটা বিশ্লেষণ করিয়া বিভূতিভূষণ বলিতেছেন,—"রাজারাম···অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করলেন। ঘণ্টা খানেক প্রায়। অনেক কিছু সুর স্তোত্র পড়লেন।

এত বেলা হওয়ার কারণ এই, সন্ধ্যা গায়ত্রী শেষ করে রাজারাম বিবিধ দেবতার স্তব পাঠ করতে থাকেন। দেবদেবীদের মধ্যে প্রতিদিন দুই তিন জন তিনি নূতন করেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, রক্ষাকালী, সিদ্ধেশ্বরী ও মনসাকে। এদের কাউকে চটাতে চান না। মন খুঁত খুঁত করে। এঁদের স্তোত্রে তিনি ক'রে থাকেন। আবার পাছে কোন দেবী শুনতে না পান এজন্যে তিনি স্পষ্টভাবে টেনে টেনে সুর উচ্চারণ করে থাকেন।"

বিভূতিভূষণের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করিলে তাঁহার উদারতা ও আধুনিকতায় মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি অন্ধধর্মবাদী লেখক, আদর্শের সহিত ধর্মের কিছুটা ত্রাস আছে বলিয়াই মনে হয়। মনকে যাহা পরম-মূল্যে দীক্ষাদীক্ষা করিয়া তোলে, এমনি এক ধর্মবোধে তিনি উদ্দীপিত ছিলেন। প্রচলিত ধর্মবাদের কোন গোঁড়ামি তাঁহার ছিল না। নবাগত গ্রন্থের 'স্বয়ম্বরসভায়' গল্পে প্রেমের পূজা সার্থক করিতে গ্রীক হেলিওডোরস হিন্দুদেবতা বাসুদেবের ধনু ভেঙে, 'কৃপণ পাহাড়ীর' অন্তর্দৃষ্টি গল্পে নিঃস্বার্থ সর্বজনপূজ্য ব্রাহ্মণ দীনবন্ধুর অন্তর্দৃষ্টির দমন গঙ্গা তীরের দমস্ত ব্যবস্থা তিনিবিধি কালেক্টরি বন্ধিক দিয়ে ইাড়াইয়া থাকিয়া সুসম্পন্ন করে, আচার্য কৃপালনী কলোনী, গ্রন্থের 'নীলগঞ্জের কালমান সাহেব' গল্পে কালমান সাহেব খৃষ্টান হইয়াও বেদের শ্রদ্ধানুষ্ঠানে ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণভোজন করায়, ইছামতীর দীনবন্ধু সিপটন সাহেব কুঠীতে আড়ম্বরে দুর্গোৎসব করে। লেখকের ধরণী মনের স্পর্শে সব অনুষ্ঠানই সার্থক হইয়াছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে তরুণী অপর্ণা নিজের খুশিতে এবং একক প্রেরণায় সন্ধ্যাপূজা করে। লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়েটির মানস-রূপের সহিত এই সন্ধ্যাপূজার সামঞ্জস্যটাই বড় কথা। আনুষ্ঠানিক দিক নয়, ইহার সাধনার যে সৌন্দর্য ও পবিত্রতার কথা মনে আসে তাহাই সবার উপরে।' ইছামতীতে হিন্দু এবং খ্রীষ্টের মেয়েরা ইছামতীর তীরে 'হেরের পাদুনি' করিতে যায়। সেখানে দেবতা কোথায় আছেন বুঝা যায় না, মুক্ত বিহঙ্গের মত আনন্দ মুখরিত প্রাণ মেয়ে-মজলিসের উচ্ছল সুরঝঙ্কারই সে অনুষ্ঠানের মুখ্যরূপ।

আমার প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে সত্যের সহিত এক হইয়াছে, সেখানে বিভূতিভূষণ তাহা সানন্দে বরণ করিয়াছেন। কুশলপাহাড়ী গ্রন্থের 'সত্য বল,' গল্পে 'হরিবোলে ফল' বলিয়া শুধু সন্ন্যাসী শিষ্যকেই বাঁচাইলেন না, ডাকাত সতীশ বাগ্দীকেও উদ্ধার করিয়া বাঁচাইয়া দিলেন। অপরাজিতে দেবভক্তিপরায়ণা আত্মবিশ্বাসী নিরহিমি বরাবর দেবীর শ্রদ্ধা পাইয়াছে। 'কুশলপাহাড়ীর' 'অতিমানী' গল্পে প্রেমাস্পদকে ভালবাসা রাখিবি যখন দুনিয়ার কৃষ্ণমন্দিরে দেবতার চরণে আজ্ঞা লইয়াছে, বিভূতিভূষণ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন নাই। 'মৌরীফুল' গ্রন্থের 'জলসত্র' গল্পে আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাধব শিরোমণি কলু তারাচাঁদ বিশ্বাসের জলসত্রে জল খাইয়া বিভূষায় কলুষিত হন নাই, 'অসাধারণ' গ্রন্থের 'পিপিমের নীচে' গল্পে বুদো সাধু পাগলা ঠাকুরকে তাচ্ছিল্য করিয়া আচারনিষ্ঠ পিসিমাই ঠেট হইয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণের ভগবদ্বিশ্বাসও প্রকৃতিপ্রেমেরই পরিপূরক দিক। অবাধ উদার প্রকৃতিকে সত্যরূপে ভালবাসিয়া তাঁহার দৃষ্টি যে প্রত্যয়িত হইয়াছে, তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আত্মস্বার্থ-নিরপেক্ষ বিশ্বমানবপ্রেমে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাই 'বড় আমি'র সহিত মিল। এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে আত্মোপলব্ধি চরাচরব্যাপ্ত শক্তির সহিত একাত্মতা আনিয়া দেয়। ইতিপূর্বে দেখানো হইয়াছে, সংস্কার-আচার উপকরণ-সর্বস্ব নিষ্ঠা নয়, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি সহজ নির্মল প্রাণধর্মের আরতিতে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন।[৩৫০] অলৌকিকত্বের প্রতি আন্তরিক অভাব সত্ত্বেও ধর্মগত সংস্কার হইতে বিভূতিভূষণ যে মুক্ত ছিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা। সত্যসুন্দরের প্রতীকরূপে মঙ্গলময় ভগবানের অস্তিত্ব

---

৩৫০ বিভূতিভূষণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন সুন্দরের আলোকে, জাগতিক অসুন্দরের অস্তিত্বের নিরিখে ভক্তির মত ঈশ্বর-বিচারের জটিলতায় তিনি প্রবেশ করেন নাই। মহাভক্তির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' উপন্যাসে বৃদ্ধ কারামাজোভের অন্যতম পুত্র আইভান খ্রীষ্টকে প্রভুর প্রিয় কুকুরের গায়ে একটি ঢিল ছোঁড়ার অপরাধে ধনী প্রভুর আদেশে মায়ের চোখের উপর বাদকে শিকারী কুকুরের দ্বারা টুকরো করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার ভয়াবহ কাহিনী শুনাইয়া প্রশ্ন করিয়াছে, ভগবান যদি থাকেন এই দুষ্কৃতি বন্ধ হয় না কেন? এইভাবে সৎ নিরীহ লোকের দুঃখে পাওয়া যদি অনিবার্য হয়, তাহা হইলে আইভানের মতে হয় ঈশ্বর পাপিষ্ঠ, আর না হয় অস্তিত্ব নাই (God either is evil or does not exist)। বিভূতিভূষণে মানবতাবোধের গভীর পরিচয় থাকিলেও তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস এরূপ প্রশ্ন-কণ্টকিত নয়।

অনুভব করিবার আকুতি তিনি বেপরোয়াভাবে অথচ পুরাপুরিভাবে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাহার ধর্মবোধ মানুষের মহৎ উদ্বোধনের অনুপূরক;—এই হিসাবে বিভূতিভূষণ নিঃসন্দেহে আধুনিক লেখক।

ধর্ম বা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রেও তেমনি বিভূতিভূষণ সত্য এবং পবিত্রতাবোধ সম্মুখে রাখিয়াই যেন সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য এজন্য তাঁহার সৃষ্টির দায়দীনতা বা স্মৃতি সঙ্কুচিত হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সম্ভবত বিভূতিভূষণের আবেগ-প্রধান মনোধর্মের জন্য এরূপ ঘটে নাই। সাধারণ বিষয়বস্তু বা পটভূমিকার জন্যও এই নির্বন্ধতার আবেদন রচনার গতি-পরিণতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' গ্রন্থের হাজারি ঠাকুর বা 'বেণীসির ফুলবাড়ী' গ্রন্থের 'শান্তিরাম' গল্পের শান্তিরামের মত কেহ কেহ সততার জন্য পুরস্কৃতও হইয়াছে। তবে এইরূপ পুরস্কারের প্রশ্ন এক্ষেত্রে গৌণ, পুরস্কার মিলিয়াছে কর্মক্ষেত্রেই, আসলে নির্বন্ধতার রূপায়ণেই লেখকের প্রধান সীমায়িত এবং তাহাতে যেটুকু আবেদন সৃষ্টি হয়, তাহাই রচনার ফলশ্রুতি। 'যাত্রাবদল' গ্রন্থের 'সার্থকতা' গল্পে মনী অনেকদিন পরে গ্রামে আসিয়া কিছু ভাল কাজ করিয়া গেল। একদিন নিজে সে গরীব ছিল, গরীবের দুঃখে সান্ত্বনার সুর করিয়া সে পাইল আনন্দ, বিভূতিভূষণের বক্তব্যও এইখানেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এ গল্প পাঠক-মনে যেটুকু আলো ফেলিবে, তাহাতেই যেন লেখক বিভূতিভূষণ কৃতার্থ। 'বেণীসির ফুলবাড়ী' গ্রন্থের ফিরিওয়ালা, 'অসাধারণ' গ্রন্থের 'অসাধারণ' গল্পের হাড়ি দাই অথবা 'জলো বাঙাল' গল্পের জলো চাকর সততার জন্য পায় নাই কিছুই, কিন্তু সততার গৌরব তাহাদের উজ্জ্বল করিয়াছে। 'কুশল-পাহাড়ী' গ্রন্থের 'শিকারী' গল্পে জংলি মেহাতী বালক মাগ্‌নিরায় বিজয় জীবনের বিনিময়ে পাগলা হাতীকে মারিয়া পিতাকে একশত টাকা পুরস্কার পাওয়াইয়া দিল, তাহার মৃত্যুবরণ অনবদ্যনী পাঠকদেরও অশ্রু-সজল করিয়া তোলে। 'আরণ্যকের' মহাজন খাওতাল সাহু সততার জন্য পুরস্কারের পরিবর্তে লোকসান দেয় কিন্তু এই সততাই তাহাকে বড় করিয়াছে। বিভূতিভূষণের এই নির্মাল্যশক্তি সমকালীন বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে আশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য ধনীর সাহিত্য নয়, দরিদ্রের, বড় জোর, মধ্যবিত্তের সাহিত্য। মানবতাবাদী বিভূতিভূষণ ধনীদের সম্পর্কে সহানুভূতিহীন, না হইলেও তাঁহার সাহিত্যে বিত্তবান যাহারা আসিয়াছে, প্রধানত তাহারা দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত চরিত্র ফুটাইবার জন্য অথবা পরিবেশ উজ্জ্বল করিবার জন্যই আসিয়াছে, তাহারা নিজেরা প্রধান চরিত্র নয়। পথের পাঁচালী—অপরাজিতে সর্বজয়ার মনিবদের বাড়ী, দৃষ্টি-প্রদীপে-জিতুর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ী অথবা তাহার কলিকাতার মনিব-বাড়ী, আদর্শ হিন্দু হোটেলে হরিচরণবাবু বা গোপালনগরের কুণ্ডুরা, দুই বাড়ীতে লালবেহারীবাবু, আরণ্যকে সত্যচরণের মনিব অবিনাশ,—ইহাদের কেহই রচনার প্রাণ নয়। কাজেই মূলত দরিদ্র-মধ্যবিত্তের রূপায়নের ফলে স্বাভাবিক দুঃখ-রিক্ততার, বাস্তবচিত্র অধিকতর প্রকাশিত হওয়ায় বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে সুখ বস্তুটি দুর্লভ। এই সুখ বলিতে বস্তুতান্ত্রিক লাভ বা প্রাপ্তিই বুঝাইতেছে। কিন্তু সুখ দুর্লভ হইলেও বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আনন্দের অভাব নাই। তিনি নিজে মনোধর্মী, আপাতিক লাভালাভ-নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতি-সৌন্দর্যে বা মানুষের কমনীয় হৃদয়বৃত্তির স্পর্শে তিনি মুগ্ধ ও বিগলিত, তাঁহার সৃষ্টিতে আনন্দের সন্ধান সহজেই মিলে। সবচেয়ে বড় কথা অনেকক্ষেত্রেই এই আনন্দ আসিয়াছে অতি তুচ্ছ সূত্র হইতে (চাকরাড়ী গল্পে বাঙ্গিলিং মেল দেখিয়া রাখার নামক-পরিবর্তনের কথা আগেই বলা হইয়াছে)। পাড়াগাঁয়ে বর্ষার দিনে হঠাৎ কই মাছের ঝাঁক ডাঙায় উঠিয়া আসে, সহরের ছেলে তুলসী তাই দেখিয়া আনন্দে উচ্ছল হয়, ইহাই হইল 'তুলসীপাহাড়ী' গ্রন্থের 'আবির্ভাব' গল্পের কাহিনী। সুখের জন্য নয়, আনন্দের জন্যই অপরাজিতের অপু তাহার একমাত্র পুত্র শিশু কাজলকে গ্রামে পরের কাছে রাখিয়া নিজে অজানা সুদূরের পথে হয়। এই আনন্দ হারাইয়াই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত জীবনেও আরণ্যকের সত্যচরণ অনাস্থা অভাব-সমাকীর্ণ আরণ্যক-জীবনের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। 'মরাগাঙ' গ্রন্থে 'ভ্রমরডাঙার কাশীবাস' গল্পে ভ্রমরী যে তীর্থ ছাড়িয়া বৃদ্ধবয়সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, সেও সুখের জন্য নয়, আনন্দের জন্য।

বিভূতিভূষণ গ্রামীণ শিল্পী, সহরের জটিল চিত্র বা সহরের মানুষের জটিল রূপ তিনি বহুলাংশে এড়াইয়া গিয়াছেন।[৩৫১] গ্রামের সরল সামাজিক মানুষের সরল জীবনযাত্রার আলেখ্য তাঁহার সহানুভূতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক 'পথের পাঁচালীতে' অপু-দুর্গার বাল্যজীবনের যে দীর্ঘ কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে উপন্যাসে লেখা যায়, ইহাই বাংলা-সাহিত্যে অভাবিত ছিল।[৩৫২] 'মেঘমল্লার'

---

৩৫১ বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনা গ্রামীণ পটভূমিকায় লেখা; সহরের কথা যেখানে বলা হইয়াছে, সেখানে অনেকক্ষেত্রেই গ্রামাজীবনের সারল্য বা সৌন্দর্যের বৈপরীত্য সৃষ্টির চেষ্টা আছে। বাস্তবিক জীবনের তাগিদে 'অপরাজিতে'র বা আদর্শ হিন্দু হোটেলের মত কোথাও সহর জীবন বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সহরজীবনের জটিলতার উপর জোর পড়ে নাই। 'অনুবর্তন' বইখানি বিভূতিভূষণের বিচিত্র রচনা, ইহাতে প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণের পরিচয় সামান্য, এ উপন্যাসের পটভূমিকা প্রধানতঃ কলিকাতা। কিন্তু এখানে একজন শিক্ষকের জীবনসংগ্রামের সাধারণ কাহিনীর সহজ গতিতে বহুবিচিত্র কলিকাতার নগর-জীবনের সন্ধান কমই পাওয়া যায়।

৩৫২ 'পথের পাঁচালীর রূপায়ণকর্মা এক একদিন সন্ধ্যা বৈঠকে পড়া হ'ত। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা অনেকে থাকতেন, তাঁরা আনন্দিত হতেন। যেদিন অপুর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ ক'রে রেলযাত্রার অংশটি পড়া হয়, সেদিনকার অনুপম বিষয় বিশেষ করে আমাদের মনে আছে। কবি মোহিতলাল মজুমদার বললেন, কি কাণ্ড করেছে রেলগাইন, আর ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল নিয়ে।

—গোপাল হালদার—পথের পাঁচালী—পরিবারের চিঠি,

অগ্রহায়ণ—১৩৬৭

গ্রন্থের 'পুইমাচা' থেকে কেন্দ্রি তুলোই প্রতিক্রম, মনোহারিত দাতের পুঁই-চাটির স্বাদগন্ধটিতে আপন কৈশোর লাবণ্য সাজাইয়া দিয়া এই যে মেয়েটি জগৎ হইয়া বিদায় লইয়াছে, তাহার কাহিনী সংবেদনশীল বিভূতি-ভূষণের হাতে অদ্ভুত ছুঁইয়াছে। বিভূতিভূষণের 'কণভঙ্গুর' গ্রন্থে 'হাট' নামে একটি গল্প আছে। এই গল্পে ছুড়োন মণ্ডল হাটে চড়া দরে পটল বেচে, যাতায়াত, হাটে বসবার জায়গা, এই ধরণের সুখ দুঃখের ছোটো সাধারণ কথা বলে অন্যান্য হাটুরেদের সঙ্গে, তারপর সন্ধ্যায় হাট ভাঙিলে বাড়ী ফিরিয়া যায় ;—ইহাই কাহিনী। কিন্তু ঘনভূত কাহিনী না থাকা সত্ত্বেও এই সাধারণ গল্পটি হইতে পাঠক বিভূতিভূষণের সহজধর্মী মানব-লোকের পরিচয় পায়।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ তাঁহার আধুনিকতার বিরুদ্ধে সমালোচনার সর্বপ্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। মৃত প্রেত পরলোকে তিনি বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাসীনভাবে লেখার আগে রচনায় সন্নিবিষ্ট করেন, তাহাকে আধুনিক সাহিত্যিক বলা যায় কি করিয়া! অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' গ্রন্থের 'বিভূতিভূষণের শিল্পীসত্তা' প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত সহানুভূতির সহিত বিভূতিভূষণকে বুঝাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন৫০৪ সত্য, কিন্তু তিনিও বিভূতিভূষণের এই অলৌকিকত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্বের যথার্থ মূল্যায়ণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি লিখিয়াছেন :—

"তিনি (বিভূতিভূষণ) অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস করিয়াছেন—তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পগুলি এই বিশ্বাসসিদ্ধ ; 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তাঁর কাছে সহজ স্বাভাবিক—যেখানে লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির তল। প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তরঙ্গতাও তাহাতে এসেছে—প্রকৃতির প্রতি এই অনুরাগ এবং অর্ধস্ফুট ইঙ্গিতের প্রতি একটি বিচ্ছু আকর্ষণ বিভূতিভূষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এগুলি বুদ্ধিনিষ্ঠ বর্তমানের শক্তিহীন বাস্তবতা এবং নিষ্ঠুরতার হাত থেকে আমাদের মনের পক্ষে এদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। মানুষ যে মুহূর্তেই বাস্তবাতীত কোন নির্ভরযোগ্য শক্তির আশ্রয় পায় সেই মুহূর্তেই নিজের ভার সে তার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়। তখন তার ভূমিকায় আর প্রশ্নকর্তা থাকে না, থাকে একটি কৌতূহলী মন—যে স্থির বিশ্বাসে সব কিছু দেখতে চায়, দুর্বোধ সন্ধান বুদ্ধির আলোকে বিচার করতে চায় না।৫০৫

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, যে লেখক বাস্তবকে এড়াইয়া যাইতে চান, বাস্তবাতীত নির্ভরযোগ্য কোন শক্তির সন্ধান মিলিলে তাঁহাকে তিনি আশ্রয় করেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ তো 'পলাতক' বাস্তবতার নিকট হইতে পলাতক হইতে চাহেন নাই। তিনি আসলে বাস্তব লেখক, তাঁহার এই বাস্তবতা ধরিয়া লইয়া তাঁহার অলৌকিকত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্ব বিচার করিতে পারিলে তবেই তাঁহার প্রতি সুবিচার হইবে। প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হইলেও অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ যুক্তিযুক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :—"বাস্তবনিষ্ঠ হইয়াও স্বভাবসিদ্ধ রসের অনুভূতির গুণে তিনি নিতান্ত পরিচিত জীবনগুলিকে তাঁহার রচিত কাহিনীতে অনাস্বাদিত রসের আধার করিয়া তুলিয়াছেন।৫০৬ বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বড় পরিচয় হইতেছে প্রকৃতি-প্রীতি ও মানবপ্রীতি। প্রকৃতি প্রীতির সত্যতায় অতীতচারিতা, রাজ-মহত্ত্ব এবং ঈশ্বরানুভূতি প্রশ্ন পায় একথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মানবতাবাদের দিক হইতে দেখিলেও তাঁহার অতিপ্রাকৃতত্বের বাস্তব ব্যাখ্যা মিলে। সাধারণ কথাসাহিত্যিকের মতই বিভূতিভূষণ জগৎ ও জীবনের রূপায়ণ করিয়াছেন, তবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তিনি অতিপ্রকৃত পটভূমিকা সৃষ্টির দ্বারা হয় 'পরিবেশ বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর না হয় বক্তব্য স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আশ্রয় গ্রহণের প্রশ্ন নয়, তাঁহার অন্তিবাদী মনোধর্মের সহিত অতিপ্রাকৃত প্রত্যয়ের সামঞ্জস্য আছে। তবে স্থির বিশ্বাস করিলেও তাঁহার রচনা-বলী ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে একথা স্পষ্ট হইবে যে, এই বিশ্বাসকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। বরং পাছে পাঠক মনে এ সম্পর্কে কোন দুর্বলতা দেখা দেয় তজ্জন্য তিনি অতিপ্রাকৃতত্ব বর্ণনার পর এই বর্ণনার যৌক্তিকতার বিধা জন্মাইবার উপ-যোগী মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাই 'জন্ম ও মৃত্যু' গ্রন্থের 'তারানাথ তান্ত্রিকে'র গল্পের শেষে শ্রোতা গল্পের বক্তার প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—আমি দেখিলাম তারানাথের ধকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষাও গুরুতর কাজ আছে। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো উত্তর দিব না।" বিভূতিভূষণের 'ছলছল' গ্রন্থের বিরজা হোম ও তাহার ব্যাখ্যা এই ধরণের আর একটি অলৌকিক পটভূমিকার গল্প। এই গল্পের শেষেও বক্তা ভৈরব চক্রবর্তী বলিয়াছেন :—"এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনাদের কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।"

ক্রমশঃ

৫০৪ অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—১১

৫০৫ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ—বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—৪৪৭

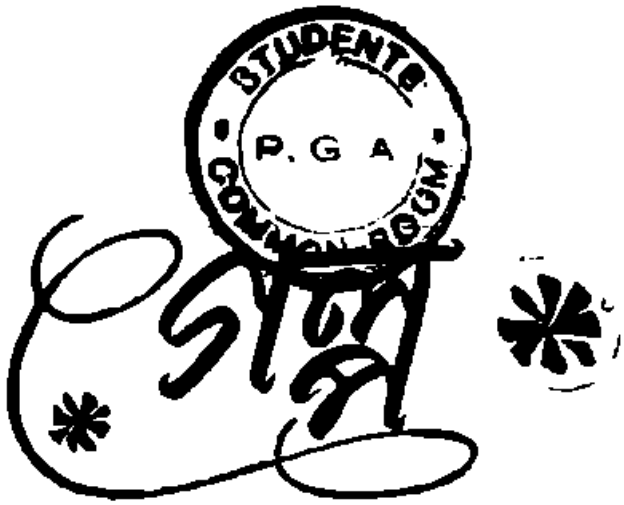

দিদি

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

বেশ হৈ-চৈ করে কাটে ওদের সময়। চোর ডাকাত নয় তো, রাজনৈতিক বন্দী। মান আছে। দুপুরে কেউ ঘুমায়, কেউ বই পড়ে। কেউ গলা সাধার পালা জেলের দেয়ালের কানে রেখেই বের হ'তে চায় গায়ক হ'য়ে। বিকেলে যখন রোদ পড়ে—মাঠে গিয়ে ওরা খেলে, কেউ খেলা দেখে।

নীরেন এদের দলে নয়। সে একা। সে সকলের কাছে এক রহস্য!

বাজে জেলের ঘণ্টা—বন্দীদের আয়ু! নীরেন শোনে। ঐ ঘণ্টা মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

না—ছেদ পড়ে ভাবনায়। মনে মনে থেকে যায় নীরেন। পাঁচ বছর কেটে গেল! যৌবনের ঐ মূল্যবান দিনগুলোতে সোনার ফসল ফলাতে পারত সে—তা' সব বৃথা গেল। দিন, মাস, বছর সব পচে পচে ক্ষয়পাকার হয়ে রইল এই জেলে!

রক্তে গতি আসে নীরেনের। মুক্তির সংকেত নয় ঐ ঘণ্টা; তা'র জীবনের বেলা যায় ধ্বনি! উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে নীরেন, চোখে আগুন! গরাদে মাথা কোটে বার বার।

অফিসার আসে। জিজ্ঞেস্ করে, কি চাই আপনার নীরেনবাবু?

ধন্যবাদ! কিছু দরকার নেই আমার।

বন্দীদের বিচিত্র বায়না শুনতে শুনতে অফিসারের কান ঝালাপালা। অতিষ্ঠ সে। নীরেনের কাছে এলে সে একটু নিঃশ্বাস ছাড়ে। পরক্ষণেই নীরেনের চাহিদা না থাকায় আরেকদিক থেকে ভাবনা হয় তার। অফিসারের পুলিশী মন চলতে থাকে বাঁকা পথে। গভীর মনে আরেকটা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে না তো নীরেন!

লাল দাঁত বের করা জেলের দালান। সেলের মাথার ওপরে একটা জানলা। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ঐ একটু পথ। এক ফালি নীলাকাশ তারই পথে এসেছে নীরেনের সেলে!

পাশের সেল থেকে এলো অজয়, মুকুল আর অরবিন্দ। বিনা কাজের কাজে। এসেই থম্‌কে দাঁড়াল ওরা। চোখের সাম্‌নে নিত্যদিনের সেই একই দৃশ্য। উদাস নীরেন। নিজেকে ছেড়ে দিয়ে একমনে বসে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

বিরক্ত হ'ল মুকুল, দূর দূর। পুলিশ নিশ্চয়ই ভুল রিপোর্ট পেয়ে ওকে ধরে এনেছে।

কেন যে সরকার ওর জন্য খরচ করছে। বলল অজয়। বলতে বলতে ফিরে যায় সব।

কোন কোনদিন আবার নীরেনের জন্য অলক্ষ্যে করুণা জেগেছে ওদের, খেলাধুলো নেই, মিশছে না কারোর সঙ্গে, কথা বলে না মোটে—পাগল হ'য়ে যাবে নাকি?

বন্ধুরা তাই জোর করেই অনেক সময় হৈ-চৈ করতে চেষ্টা করেছে, যে-লগ্নে নীরেনের মন ছুঁয়ে আছে সেখান থেকে মনটাকে একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে অন্যমনস্ক করাতে। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি কিছু। কোনদিন নীরেন হেসেছে একটু ম্লান হাসি, কোনদিন-বা মুচকি হাসি একটু।

কিন্তু নাছোড়বান্দা অরবিন্দ। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তার বাজী। তাই মৌনীকে নিয়ে তার মুখরতা। নীরেনকে একলা পেতে এসেছে সময়-অসময়ে। বলেছে, তুই ভাই কি? আগুনে লোহা গলে যায় আর আমাদের সান্নিধ্যে তোর মুখ দিয়ে একটা কথা বের হ'ল না। হয়েছিস্ না হয় বিপ্লবী। তাই বলে কি মনের কথা থাকতে নেই।

মনের কথা···

এই মানে···একটু দখিনা বাতাস···একটু ফুল···একটু ইয়ে···

আমি অলি নই।

এ্যা···তা' হ'লে কথা জানিস্। বলে ফেল্ সোনার চাঁদ। তা' ছাড়া এতো ওপেন্ সিক্রেট্!

কিছু বলার নেই আমার।

তুই কি আমাদেরও আই-বি-র লোক মনে করছিস্ নাকি? সবটাতেই নিগেটিভ!

বিপ্লবীদের আগুন নিয়ে কারবার···

অনেক রকম আগুন! আমি বলছি···ঐ যে, সে-ই আগুন নিয়ে খেলা।

তুমি সে-আগুনের সংস্পর্শে এসেছ?

এসেছি—তীব্রভাবে এসেছি। কিন্তু আমার কি দোষ? প্রকৃতির খেলায় আমরা পুতুল। সত্যি! সব সময় হৈ-চৈ করে ভুলে থাকতেই তো চেষ্টা করি, তবুও পারা যায় না। দু' এক সময় যখন বীণার কথা মনে পড়ে তখন ইচ্ছে হয়···

পালিয়ে যেওনা যেন অরবিন্দ।

পালিয়ে যাবো কেন! ভালোবাসা জীবনের লক্ষণ। শুধু ইচ্ছে হয়, ওর কথা একটু আলোচনা করি। কিন্তু সকলের কাছে সব কথা বলা চলে না; মনের মতো লোক চাই—Only to the lovers ear alone.

আমাকে বুঝি তোমার মনের মতো লোক মনে করেছ?

হাঁ।

কারণ?

চুপ করে বসে থাকিস্, উদাসভাবে তাকিয়ে থাকিস্ আকাশের দিকে; চোখের তারায় কা'কে যেন দেখবার একটা আকুল আকুতি, এক কথায় আধুনিক প্রেমিকদের সব ক'টী লক্ষণই···

হেসে উঠল নীরেন, খুবই ভুল করেছ অরবিন্দ! বিপ্লবী একমাত্র ভালোবাসবে তার মাকে—দেশ-মাতাকে।

আমরাও তা' ভালোবাসি, কিন্তু সে তো বাইরে গিয়ে। জেল হ'ল আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাব। নিষ্ঠুর দিনগুলোকে কাটানোর জন্যই তো ব্যক্তিগত মন নিয়ে টানাটানি। কাজেই ঐ অফিসিয়ালটী বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত কিছু থাকবে না?

থাকা উচিত নয়।

'উচিত নয়' কথাটী আবার নিজের মনেই ভাবল নীরেন। মনের মধ্যে কেমন যেন টন্‌টন্ করে উঠল তার। ফিরে তাকাল পেছনের দিকে। ধীরে ধীরে খুলল স্মৃতির দুয়ার। গিয়ে দাঁড়াল উষার সামনে। মনের কানেও যেন ভেসে এলো তার কথা: মা কাঁদছে—এগিয়ে যা বীরের মতো।

আরেকদিনের কথা মনে হ'ল নীরেনের। উষা তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কানে কানে বলেছিল সে-কথাটী।

ভাবতে ভাবতে এসে পৌঁছাল চরম ঘটনায়। উষার বরও একজন বিপ্লবী। বম্ কেসে অনেক বছর জেল হয়েছিল তার। যেদিন 'রায়' বের হ'ল, সেদিন মীরেন ম্লান মুখে উষার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই উষা বলেছিল, পরাধীন ভারতই একটী জেল; আমরাও তো জেলে নীরেন। এ-জেল থেকে মুক্তির কথাই চিন্তা কর।

অবাক হয়েছিল নীরেন। অগ্নিময়ীর কথা শুনে দুঃখেও আনন্দ পেয়েছিল অনেক। অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল উষার দিকে। তার চোখে এখন জল নয়—আগুন। তারই একটু স্ফুলিঙ্গ যেন ছিটকে এসে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল নীরেনের মনে।

সে-আগুনেই নীরেনের শিক্ষা; সে-মন্ত্রেই নীরেনের দীক্ষা!

ওদিকে সংবাদের প্রতীক্ষায় যারা ছিল, তা'রা সব ঘিরে ধরেছে অরবিন্দকে—কিরে বিন্দে! মুনির মৌনব্রত ভাঙাতে পেরেছিস্?

না।

টাকা ফেল তবে। গভীর জলের মাছ! বলল মুকুল।

বীণা বলে এক কাল্পনিক মেয়েকে কল্পনা রংয়ে উজ্জ্বল করে তুললাম, তবুও নীরব। দেখা যাক্। টোপ বদলাতে হবে। হয়তো ওর টন্‌টনে বাথার জায়গায় ছোঁয়া দিতে পারিনি। কিন্তু সেদিন সেই ছোঁয়াটী লেগে যাবে সেদিন দেখবি জোর করে শোনাবে আমাদের।

দিন যেতে লাগল—কিন্তু কিছু শোনাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। নীরেন তেম্‌নি নির্বিকার; সে একা।

জেলের অফিসার জানে, নীরেনের কোন চাহিদা নেই। তবুও তার কর্তব্য সে করে। জিজ্ঞেস করেই যায় নীরেনকে। সেদিনও নীরেন মাথা নেড়ে না জানাতেই অফিসার বল্‌ল, আজ পর্যন্ত একটা জিনিষও কিন্তু আপনি চাইলেন না।

প্রয়োজন হয় না আমার।

অন্তত একটা দিন একটা কিছু···

দিন তবে···বলেই থামল নীরেন। চলে গেল ফেলে আসা দিনে: ছোটকালে বাবা যাকে হারিয়েছে। উষার কাছে মানুষ। দুনিয়ায় উষা ছাড়া আপন বলতে তার আর কেউ নেই। সে-ও দুর্ভাগা। স্বামী তার জেলে। উষা জেলে না হ'লেও একা! এক বাড়ীতে একা—দ্বীপবাসিনী!!

উৎসাহিত হ'য়ে উঠল অফিসার—কি! কি চাই আপনার বলুন তো?

রং তুলি আর ক্যানভাস্।

আপনি বুঝি ছবি আঁকতে পারেন? হেসে উঠল অফিসার।

না।

তবে?

একবার চেষ্টা করে দেখতাম।

নীরেনের চাহিদা যখন ছিল না তখন অবাক হ'য়েছিল অফিসার। চাহিদা শুনেও বিস্মিত হ'ল সে। দিনে দিনে এমন আরো কতো শুনবে। চোর ডাকাত, খুনী, বদ্‌মাস, দেশপ্রেমিক, দেশনেতা সবই তো এখানে; গোটা দেশের সূচীপত্র জেল। চাহিদাও রকমারী। এই বৈচিত্র্যের মাঝে নীরেনও এক বিচিত্র চিত্র! দীর্ঘ নীরবতার পর কথা বলতে চাইছে তুলির মুখে। নীরবতা থেকে গভীর নীরবতায়।

বাতাসের কান আছে। স্বাভাবিক এবং সাধারণ চাহিদা কোন আলোচনার বিষয় নয়। নীরেনের অসাধারণ চাহিদা বলেই 'মুখ-রোচক' হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল অনেকের কানে কানে।

শুনে মুকুল, অরবিন্দ এবং অজয় উল্লসিত হয়ে উঠল। বল্‌ল অরবিন্দ, এতোদিন পরে তবে ঢেউ উঠল।

কি ক'রে বুঝলি?

প্রেম সায়কোলজী!

অর্থাৎ?

নীরেন নিশ্চয়ই তার প্রেয়সীকে আঁকবে।—অনেকদিন দেখ্‌ছে না! এবার রং তুলি দিয়ে কাছে টেনে আনবে।

তা' হ'লে রাতারাতি শিল্পী হ'য়ে যাচ্ছে?

হোপ্‌লেস্—রাতারাতি কেন। ঐ যে চুপ্‌ করে বসে থাকে—সেটা তো বাইরে! ভেতরে ভেতরে মনের কলালয়ে তুলির টান চলেছে সমানে। এখন হবে শুধু ফিনিসিং।

সত্যি সত্যি নীরেন তখন রং আর তুলি নিয়েই বসেছিল। ইজেল; ছবি আঁকবে সে। হঠাৎ একটু শিহরণ। গাছে পাতা কেঁপে উঠল। পরাদের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস এলো ঘরে। মিষ্টি ছোঁয়া।

চম্‌কে উঠল নীরেন। এই বাতাস! কতোদূর থেকে এসেছে। ছুঁয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। তাই কি এতো মিষ্টি?

মনের কূলে কূলে অনুভূতি। অলক্ষ্যে মাথা উঁচু করে নীরেন। চোখ দুটাকে ছেড়ে দেয় জানলার অন্তর ছিঁড়ে তাকায় দূরে, সেই দূরে!

অরবিন্দ-প্রভৃতি দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকা দেখ্‌ছিল। ছবির আউট-লাইন দেখেই সুরু করেছিল হাসতে। পরে যখন ফুটে উঠল শাড়ীর পাড় আর চুলের খোঁপা তখন ওদের সন্দেহের হাসি বাস্তবে! অরবিন্দ চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল, শিথিল কবরী দেখা যাচ্ছে রে অজা! এবার অলকে কবরী!

ওর পেটে পেটে এতো ছিল, বল্‌ল অজয়। দেখতে একেবারে গোবেচারী, ভিজে বেড়াল!

কিন্তু সিঁকে ছেঁড়ার যম, বলেই অরবিন্দ গা' চালাল গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে, "কবে ফুটেছিল ফুল গন্ধ ব্যাকুল পবনে"।

একখানা ছবি। প্রথম আঁকা তবুও ভারী সুন্দর। স্রষ্টা বারে বারে দেখছিল নিজের সৃষ্টিকে। একবার কাছে বসে', একবার একটু দূরে গিয়ে।

পেছন থেকে অরবিন্দ গিয়ে তুলল ঠাট্টার সুর। ভাই

নীরেন। রাখে আর চুলিতে রাঙিয়ে তুললেই চলবেনা, এবার তোর মুখের কথায় ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। কা'র ছবি তাই?

মন থেকে এঁকেছি।

শুধু কি তাই! মনের গহন গভীর থেকেও নিশ্চয়ই।

শান্ত চোখ দুটি নীরেন তুলে ধরল অরবিন্দের দিকে। ধীরে ধীরে বলল, আমাকে এখন একটু একা একা থাকতে দাও অরবিন্দ—প্লিজ!

অপেক্ষায় ছিল মুকুল ওরা। অরবিন্দ গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই মুকুল জিজ্ঞেস্ করল, কি বারতা-রে বিন্দে দূতী?

হাস্ত ঘুঘু! ওকে ডাকাডাকিই করতে হবে। তখন বলবেই···

বলবেই···গণৎকার এসেছিস যে।

ইচ্ছে করে কেউ পাগল হ'তে চায় না জানিস্। অনুভূতির বোকাকে ছবিতে রূপ দিয়ে মন হাল্কা ক'রেছে। এবার বুক হালকা করতেই হবে।

আবার তোর সেই হবে—সবই ভবিতব্য।

ভবিতব্যের কোলে সব লুকিয়ে থাকে; সময় না হ'লে জল পাকে না—দেখ্‌বি।

কিন্তু এই ভবিতব্য বেশী দূরে ছিল না। কয়েকদিন পরেই দেখা মিল সে-দিনটা।

সেদিন বিকেল চারটা হবে। নীরেনের সাগে ইন্টার-ভিউ দিতে তার ঘরের দিকে এগোচ্ছিল একটা মেয়ে। বারেন্দা দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল। অরবিন্দ ওরা তা'কে দেখল। প্রথম দেখাতেই মিলিয়ে নিল প্রাথমিকটা। তারপর আরো দেখে' আরো। একেবারে মিলে যাচ্ছে—উঁচু নাক, টানা ভুরু, ছবির মতোই খোপা বাঁধা।

চাপা হাসি খেলতে লাগল ওদের সকলের চোখে। বলেই ফেলল অরবিন্দ, এতোদিন পরে একেবারে হাটে হাড়ি ভেঙে গেল অন্না! হ'ল তো···

চুপ কর অরবিন্দ শুনবে, ধমক দিল অভয়।

কিন্তু ঔৎসুক্য সকলেরই ষোল আনা। ধীরে ধীরে বারেন্দা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। হঠাৎ অরবিন্দ বলল, বেরসিকগুলো! তাড়াতাড়ি চল্। জেলখানা নন্দন-কানন হ'য়ে উঠবে যে! অনেকদিন বিরহ ব্যথা সইবার পর···প্রথম দেখার সেই তরতর আঁখি কাঁপা, নীরব নয়নের চুমুকে চুমুকে দুঁহু দোঁহার রূপসুধা পান যদি না দেখতে পেলি তবে আর কি দেখবি?

বৈদ্যুতিক হ'য়ে উঠল সকলে। মেয়েটা তখন নীরেনের ঘর ছোঁয় ছোঁয়।

সময় হ'য়েছে বলে নীরেন ও হ'য়েছিল চঞ্চল। তা'র সারা চোখে উপ্‌চে পড়ছে তৃষ্ণা! কতোদিন পরে দেখা হবে। কিন্তু আসছে না কেন? চারটা তো বাজে! ঘড়ির দিকে আরেকবার তাকিয়ে দোর গোড়ায় এগোল সে।

ঠিক তখনই দুই প্রতীক্ষার প্রত্যক্ষ মিলন! প্রত্যাশার সফল ছবি! চোখের পলকে মেয়েটার দু'বাহুর আকর্ষণে নীরেন কাঁপিয়ে পড়ল তা'র বুকে। সঙ্গে সঙ্গে নীরেনের সম্বোধন 'দিদি' ডাকের ধ্বনিতেও সচকিত হ'য়ে উঠল সেল, বারেন্দা—গোটা জেল!

অরবিন্দ—ওরা তখন অবাক!

আজ

হাসিরাশি দেবী

হায়রে মন, অবোধ মন,—বুঝেও বুঝি না যে
তোর সাথে তো মুখোমুখি'র এমন চেনা শোনা,
ফিরিস্ কেন কুড়িয়ে তবু লাগেনা বেটা' কাজে,
বাতিল দেওয়া যা কিছু হেলা-ফেলার আবর্জনা!

এমনি ক'রে অর্থহীন ভাবনা ভেবে ভেবে
শুধুই যদি দিন্ কাটাবি, রইবি যদি ব'সে,
দেওয়া নেওয়ার ওজোনটুকু কুনকে মেপে মেপে
খাতার পাতা ভরাবি রোজ অঙ্ক ক'ষে ক'ষে!

মরচে ধরে বুকের মাঝে শিথের তলোয়ার,
চোখের কোণে জল আসে যে ঘুমের রসে ভরা,
ফুলবাগানে চৈতিদিনে হাওয়ার হাহাকার,—
রঙিণ ঘুলো মুঠোয় তুলে সিঁথের কেন পরা।

হায়রে মন, অবোধ মন, ঘরের কোণে কোণে
এ-কী-আঁধার জমালি' তুই আলতে গিয়ে আলো,
চেনা-জানার মাঝখানে যে কাপসা মায়া বোনে
নতুন চোখে দেখছি সে আজ ধোঁয়ার রঙে কালো॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রসঙ্গে

১০৮ শ্রীহৃষীকেশ আশ্রম (তারকেশ্বর)

আজ হইতে ৪৭৩ বর্ষ পূর্বে বাংলার ভাগ্যাকাশে এক সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—যাহার স্নিগ্ধ কিরণ বিচ্ছুরণে তদানীন্তন ভারতবর্ষ এক নব প্রেরণা পাইয়াছিল।

নবদ্বীপের শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভু আবির্ভূত হন শুভ ফাগুন-পূর্ণিমার পুণ্য মুহূর্তে। প্রেমাবতার তাঁর সরল জীবনটীকে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া নিখিল প্রাণীকে উদ্বুদ্ধ করেন ভগবদ্‌মুখতার প্রতি।

ভারতবর্ষের ধর্মজীবন তখন মহান্ বিপর্যয়ের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যখন সাম্রাজ্যের অত্যাচার মানুষকে দিশেহারা করিয়া ফেলিয়াছিল সেই সঙ্কটজনক সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গ এদেশে আসিয়াছিলেন—পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন—আনন্দকামী মানুষকে প্রভূত আনন্দের প্রস্রবণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কাটে নবদ্বীপধামের গঙ্গাতটে আমল বাংলার মাটীতে। শেষজীবন নীলাচলে মহোদধির তীরে প্রভু জগন্নাথের পাবন-অধিষ্ঠানে। মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। সন্ন্যাসের জন্য তাঁহাকে করুণারসের প্রতিভূ মাতা শচীদেবীর স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিতে হইয়াছিল এবং মহীয়সী সতীসাধ্বী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রেমপাশ তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। জীবনের সব হইতে প্রিয়তমকে পাইতে হইলে অন্য সবকে ত্যাগ করিতে হইবে। প্রিয়তম শ্রীভগবানের মধুর সান্নিধ্য যদি সত্যই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজনের স্নেহবন্ধনকে ছিন্ন না করিলে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। মাতৃরূপে স্ত্রীজাতির স্থান আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত বলা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে ইহাও স্বিকৃত যে স্ত্রী-সান্নিধ্য শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির মূলতঃ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই হরিদাসকে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন :—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্যপারং পরং
জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত-
বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

অর্থাৎ যিনি ভবসাগরের পরপারে যাইতে চাহেন তাঁকে প্রথমেই 'নিষ্কিঞ্চন' হইতে হইবে অর্থাৎ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে মোক্ষের পথে চলিবার অধিকার নাই। বৈরাগ্যের সহিত থাকিবে ভগবদ্‌মুখতা—ভগবৎপরতা। ভগবদ্‌মুখতা এত প্রবল হইবে যাহার নিকট বিষয়, বিষয়ী ও স্ত্রীজাতির অবকাশ থাকিবে না। বস্তুতঃ মোক্ষের পথে ভগবানের চরণারবিন্দে নিজেকে সমর্পণ করিবার পথে বিষয় প্রভৃতি বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন :—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গীনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বাদূরতস্ত্যক্তবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই দাঁড়ায়—অতন্দ্রিত অর্থাৎ নিরলসভাবে বস্তুতঃ অনন্যভাবে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে হইলে তাঁকে অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করিতে হইলে রমণীসঙ্গ হইতে বহুদূরে নিজেকে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রের এই আদেশ—শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্যকে শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে দেখাইয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাই আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আপাততঃ হরিদাসের লঘুতম অপরাধে দণ্ড হইয়াছিল পরিত্যাগ। ভারতের অতীত যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় ইহা অনুভূত হইবে। যখনই ধর্ম্মের উপর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আসিয়াছে, ধর্ম্মপরায়ণরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই একটা ঘটনা হইয়াছে—যদ্দ্বারা পুনরায় ধর্ম্ম আবার স্থির হইয়াছে, ধর্ম্মাচরণপরায়ণরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। এমনই এক বরণীয় ও স্মরণীয় ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তখনকার কলুষিত আবহাওয়ায় যে পাপ-পঙ্কিল অবস্থা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সর্ব্বাংশে না হইলেও অনেকাংশে পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছিল

শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়। তাঁর প্রভাবে সারা ভারতবর্ষ সেদিন পুনরায় অন্ধকারময় বিভীতির আশঙ্কা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জগৎ—অর্থাৎ পঞ্চমদল জগতে যাহা কিছু আসে তাহা একদিন চলিয়া যায়। জগতের সেই চিরন্তন নিয়মের স্বীকৃতিতে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর লীলা সম্বরণ করেন। অপ্রকট হন তিনি। কিন্তু জগতের মাঝে যে আদর্শ তিনি রাখিয়া যান, যে প্রেম-সরস সাধনার পথ নির্দেশ করিয়া যান, যে উদাত্ত বাণী বলিয়া যান—আজও তাঁহার আদর্শ গ্রহণেচ্ছু সাধন-পথের পথিক জিজ্ঞাসুর নিকট তাহা চির অম্লান রহিয়াছে—থাকিবে। শ্রীচৈতন্যদেবকে বর্ত্তমান সঙ্কীর্ত্তনের জনক বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। হরিকীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"চেতো-দর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।"

কীর্ত্তনের ফলপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু প্রথমেই বলিয়াছেন—'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্' চিত্তের মালিন্য কাটিয়া যায় নামামৃতরসের প্রভাবে। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ত্তন কেবল প্রচলিত অর্থে খোল করতাল-সহ গান করাকেই বুঝাইবে তাহা হইতে পারে না। কীর্ত্তন শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরিলে জপ প্রভৃতিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যোগদর্শনে 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' এই সূত্রের পর বলা হইয়াছে—"ততঃ প্রত্যক্ চৈতন্যাধিগমঃ অন্তরায়াভাবশ্চ" নিরন্তর অভিনব মন্ত্রের শাস্ত্রানুমোদিত এবং শাস্ত্র ও গুরু নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে জপ করিলে মনের ময়লা কাটিয়া যায়।' আর মন শুদ্ধ না হইলে শ্রীভগবানকে অশুদ্ধ বিষয়ানুভূতি-পূতিগন্ধময় মন দ্বারা মনন করা সম্ভবপর নহে। মন-মুকুরে যে জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা স্তূপ রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া মনকে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে এই জপ কীর্ত্তন উৎকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মহিমা স্বয়ং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উদ্ঘোষিত হইয়াছে সেই কীর্ত্তন করিতে হইলে সেইরূপ অধিকারীও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দরকার।

তাই মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন :—

"—তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মহাপ্রভুর পবিত্র স্মৃতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিলে বলিতে হয়—মহাপ্রভুর আদর্শকে নিজের জীবনে রূপ দিয়াছেন বলিয়া যাঁরা বলিয়া থাকেন আমরা—বস্তুতঃ জাতি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা কতকটা শিথিলভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়—বেদ বা শাস্ত্রকে বাদ দিয়া ভগবদুপাসনা হইতে পারে না। তাই গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান নিখিল বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন :

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং।

প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসানুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটী প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে :—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক'

—অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য মানা না মানার উপর আস্তিকতা বা নাস্তিকতা বিচার করা হইবে। বেদও তদনুসারী ঋষিপ্রোক্ত অনুশাসন বাক্যরাজিই শাস্ত্র এবং শাস্ত্রানুসারী আচার অনুষ্ঠান, ধ্যান ধারণা, ভক্তিপ্রেমকেই ধর্ম্ম বা কর্ম্ম অথবা উপাসনা বলিয়া গণ্য করা যাইবে। বেদ-বিরোধী যে কোন আচরণ অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্ম অধর্ম্মস্তদ্ বিপর্য্যয়"।

এই নীতি অনুসারে যাঁরা বেদ-বিরোধী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইবেন তাঁহারা অধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং ধর্ম্মজগতের তাঁহারা অতি বড় শত্রুরূপে গণ্য হইবেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ বোধ করি নাই। শাস্ত্রে আছে—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

শ্রুতিঃ স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী অমদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

আর মনে রাখিতে হইবে যে শাস্ত্র 'নাম' করিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন সেই শাস্ত্রই, সেই ঋষিই বলিয়াছেন :—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে সম্যক্ নান্যত্তোষকারণম্।

শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও মর্ম্মানুসারে বলিতে হইবে বর্ণাশ্রমীর পক্ষে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিয়া যদি কেবলমাত্র 'কামকারতঃ' আচরণ করা যায় তাহা হইলে রাগমার্গে বিচরণ করিলেও তাঁর নিকট নরকের দ্বাররক্ষীরাই স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া থাকে।

কবি সম্মেলন

"……উঠে যাও, আরও উঠে যাও ; পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই ; চূড়া ছুতে চূড়ান্তরে ! নীচে বসে থাকা, নীচে পড়ে থাকা, নীচে পচে থাকা, মরে থাকা, ও কিছু নয়। উঠে যাও, আরও উঠে যাও। উঠে যাও সর্পিল পথের বাধা ছিন্ন করে ; পিচ্ছিল গতির বিদ্বেষ স্থির করে ; ক্লিষ্ট নিঃশ্বাস আহরণের দুর্ধর্ষতাকে স্থির করে। ওঠো, আরও ওঠো। যেখানে ঐ পাইনের বনে দোল লেগেছে ; যেখানে ঐ শাখে শাখে স্ত্রী 'কোণ' গুলি পুংকেশরের সমাগম প্রতীক্ষায় চঞ্চল ; যেখানে ঐ কুমারী ভূমির অঙ্গবাস সন্ধ্যা স্বয়াপাতার বেদনালালিমায় শোভান্বিত। ঐখানে ঐ যে একখানি সূর্য্যালোকে স্নান করছে নবোদ্গত পাইন চারাটী ওর কাছে গিয়ে গান গাও, মাটীর গান, আলোর গান, শিকড়ের গান, ঝাঁঝল জলতেষ্ট গান। গান গাও, কবি আঁকো, তুষার-কিরীটী ঐ নীলচেঁড়া শিখরগুলির গেকে চোখ রাখো। চোখ রাখো নীচের ঐ ঘনীভূত গর্জন-ভৈরব লীদারের নীলে-শাদায় আঁকা আল্প-রাপাটায় পানে। উঠে যাও, উঠে যাও।"

একুশে সকালে ডায়েরীতে এই গান লিখেছি মন্ডল থেকে ফিরে এসে।

বলেছি একটা ঘরে আমরা সাতজন। দুটী ছোটো ছেলে অতিরিক্ত, জলের কল নীচের তলায়। ছোট একটা নামমাত্র বাথরুম ঘরের সঙ্গে। বড় জোর দুজন প্রাণীর প্রয়োজন মেটায়। চাকর এক বালতি গরম একবালতি ঠাণ্ডা জল দিয়ে যায়। এরপর প্রতি বালতি চার আনা। স্নানেই স্নান ছোলো সমস্যা।

আমি বলি অজিতকে—ভাবছো কেন ? পহাল গ্রামে কি মন্দির নেই ? আছেই। মন্দির থাকলেই স্নানের ব্যবস্থা আছে।

অজিত বলেছিল লীদারে স্নান করতে। কিন্তু ক্যাম্পে কাশ্মীর সরকার ইস্তাহার দিয়ে গিয়েছিলো লীদারের জলে স্নান যেন না করি, পান তো নয়ই। জলটা নানা রোগের আকর।"

সকালটায় নীচে গিয়ে দেখি মাঠে বাসমালা কলটাকে ঘিরে ছেলের দল মিথ্যে এক স্নানের আড্ডা তৈরী করেছে। মুনিসিপ্যাল স্কুলের সত্তেরোজন ছেলে, আরবী স্কুলের একুশ জন ছেলে, দয়ানন্দ স্কুলের কুড়ি জন ছেলে—সকলেই এখানে। আরবী স্কুল স্নান পেয়েছে খানিক আবুতে খানিক হোটেলের ঘোড়া রাখা আস্তাবলে। এসব বহুকাল ঘোড়া তাতে থাকে না অবশ্যই।

এই কলতলায় মহীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। দিল্লীতে দুবেলা ছিল। বক্সীসাহেবের বাড়ী আলাপ হয়েছিল। এখানে এসে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন "সবার ভাগ্যে সব কিছু, আমার ভাগ্যে ঘোড়া-শালা ; সবার ভাগ্যে সব কিছু হোসেনের ভাগ্যে খচ্চর।"

মৌলবী সাহেবকে নিয়ে অনেক গান-গল্প জমলো কলতলায়। হুকুম আর খলেশ জল তুলে বেসুর স্নানের ব্যবস্থা করে দিলো। বাসনমাজার একটা হিড়িক পড়লো। হুকুম জোর করে তোরো জামা কাপড়ের ডাঁই সংগ্রহ করে দুই টিন ভর্তি করেছাটের মাঝে সাথের উনুন করে ফোটাচ্ছে সাবান জলে। ধকধকে রোদ। তাতে গালি গায়ে ওরা নানা কাজে ব্যস্ত। আমাদের স্নান হয়ে গেল। হুকুম আমার প্যান্ট কাপড় নিয়ে সাবান মেখেই। বেশু শেষ অবধি নিলো তো না-ই ; ও আর অজিত মিলে গেল হুকুমকে সাহায্য করতে।

স্নান সেরে পুলিপার হয়ে বেড়াতে চলেছি ওপারের পাহাড়ে। নদীর ওপারে পাইন ভরা একটা পর্বত শিখর। শিখর যেন একটা উদ্ধত আহ্বান, যেন দুরন্ত স্পর্দ্ধা জানাচ্ছে। যেখানেই আমি যেন ঝেঁপে উঠি। উঠতে হবে।

সুতরাং আজ সকালে ঐ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ। সেই পাইন-ঢাকা পাহাড়। পাইন-ঢাকা পাহাড়ের গায়ের মতো বিপজ্জনক চড়াই বড় কম পাওয়া যায়। পাইনের পাতা তেলালো ছুঁচের মত বিছিয়ে থাকে গাদা গাদা। পা হড়কাবেই, অনিবার্য্য।

তবু উঠতে হবে। নদীর দেহ এখন ক্ষীণ। আসল দেহ বিপ্লবের রেখা পার হবার পর প্রথম চড়াই কেবল এঁটেল মাটি। এতো পিছল যে চলা দুষ্কর। এ মাটি শেষ করে একটি পথ, অনেকটা উঁচুতে। পথের পরেই সোজা খাড়া পাহাড় আরম্ভ হয়েছে।

কিন্তু পথের ওপর এক মন্দির।

আমি মন্দির দেখেই চিৎকার করে উঠলাম "মঙ্গল, মঙ্গল্।"

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের বাড়ীর মেয়েরা। খর্বকায়া, ঘনশ্যাম বর্ণ। আপাদ-গোড়া অনেখোলা ঢাকা দেহ। মাথায় তিনকোনাকার ধাঁধা কাপড়ের টুকরোর তৃতীয় কোনটা ঝুলছে পিঠে—আর তার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা কাপড়ের কালির উপায় ঝুলকো চুলছে প্রায় পোড়ালীর কাছাকাছি। আলখাল্লা পরে আছে বলে পায়ে লাগছে না।

হাতে পূজার সামগ্রী নিয়ে বেরুচ্ছে। পরণে গহনাগুলি কাশ্মীরী প্রথার ওজনে আর সাথকে গুরুভার।

মঙ্গল আছে পাহালগামের কাছে কোথাও জানান। এই মঙ্গলকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলাম পহালগামে ও মন্দির আছে এবং স্নানের

যাওয়া করে যেতে পারবে। নীচেরের বাস থাকে সুরক্ষাকারী বেষ্ট হাউস্। দক্ষিণে নদীর চঁচু থাই ছেড়ে পাহাড়ের নীচে যমনক বা অমরেশ্বর শিব মন্দির। যখন পরাক্রান্ত মহারাজে কাশ্মীরের রাজা তখনিতে অমরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরের তলা দিয়ে বর্ণা বইছে। তার ওপর ছোটো মন্দির।

ভিতরে গিয়ে দেখি ছোটো শিব মন্দির। মন্দিরের ঠিক তলায় বর্ণা। সেই বর্ণার জল দিকে দিকে বইয়ে দিয়েছে মন্দিরের সেবাইতেরা। একধারে পড়ছে একটা ঝুড়ো। স্নান করা যায় পরম আরামে দাঁড়িয়ে

মঙ্গল পাহাড়ের চূড়ায়

দাঁড়িয়ে। পুরুষেরা স্নান করছে। তার মধ্যে মেয়েরা। বাইরে ছোটো প্রোহবিনীর ধারা বইছে এদিক ওদিক দোকান। কেউ কাপড় কাচছে, কেউ মুখ ধুচ্ছে, কেউ বাসন মাজছে। অমরেশ্বরের মন্দিরের ঐতিহ্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে।

আমরা উঠেছিলাম সেদিন সেই গিরিশৃঙ্গে। অনেক বাধা অনেক বিপত্তির পর গিরিশৃঙ্গে ওঠা। কিন্তু ওঠার পর কী আনন্দ। দেখিকে তোলা ওদের পর ছবি। কেমন ভোয়ালো কাপড়ের কই যে ছবি দেখো। পাইনের চালে সকলকে বসিয়ে একটা ছবি নিলাম। এ ক্ষণে সকলই না এসেছে, এ ক্ষণের এমন পাত্রি সকলই না তোল করেছে।

মনের স্বভাব এই রকম মতো। সমস্ত প্রস্তাবের সমতল শেষ করে সে চায় তোখাও একা একা কোনও উচ্চতায় উঠে যেতে, যেখান থেকে প্রতিটি প্রস্তাবকে অবলোকন করা যাবে তুচ্ছ বহু মধ্যে বিস্তৃতির সমস্ত একটি সুষমা। সমস্ত জীবনের সমতলকে এমনি এক দৃষ্টিতে দেখা যায়—মনের এই উচ্চতা পাবার তৃষ্ণাই মানুষের একাকীত্বের তৃষ্ণা। সঙ্গ ও সমাজে থেকেও একটা সমাজ-সঙ্গ-অপেক্ষার বৈরাগ্যের তৃষ্ণা। এখানে পর্বত শিখরের সঙ্গে আমার মনের আমী মিল।

এই পাহাড় জয় করার পরেই ফিরে গিয়ে ডায়েরীতে লিখি এ কয়েকটি পংক্তি। ফিরতে দেরী হয়েছে। দুপুরের খাওয়া প্রায় সব শেষ। মিসেস শর্মা ফিরে আসে রান্নার ভার নিয়েছিলেন ওঁর বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষয়িত্রী আর বারোজন মেয়েকে নিয়ে।

কান্নার আজ ভারী আনন্দ। মিসেস শর্মা ওকে সম্মান করেছে, মর্য্যাদা দিয়েছে। রান্নাঘরে ও বাসতি ভরে উঁচু খাবার দিয়েছে। মেয়েরা তাই নিয়ে পরিবেশন করে আসছে।

একটা কোণে বসে ওদের খাওয়া দেখছি। একটি মেয়ে একখানা চেয়ার আর টেবিল এনে বলে—"বাইরে বসবেন না। উঠে বসুন।"

অ্যা ক মা হি—সে কি! আমার জন্য এই কষ্ট করেছো তুমি? কেন?

মেয়েটি সেদিকে চেয়ে কিক্ কিক্ করে হাসছে সেদিকে চেয়ে দেখি মিসেস শর্মা। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের চারিধারে এসে দাঁড়ালো জগজীবন, অদিত, বেণু, গুপ্তাজী, বিহারীলাল।

"খানা-খানি—কুপন? এসব কৈ?"

মিসেস শর্মার হাতে খালতি। মেয়েরা ভিস আর চামচ দিয়ে গেল। "তখন থেকে খুঁজছি। কি কষ্ট করে আজ রান্না করিয়েছি কি বলবো। এক মিনিট রান্নাঘরের বাইরে যাইনি। আমার লজ্জা পাবার ভিস আপনারই জন্যে। এখন এলেম। সব ফুরিয়ে গেছে। বেলা তিনটে বেজে গেছে, চায়ের চা। আর থাকে কখনও?"

গাত্রুরা দিই, "কিছু হবনি ওতে।" কিন্তু মানে না।

"কষ্ট করে করলাম। তৃপ্তি করে খাওয়াতে পারলাম না।"

কিন্তু সেদিন সত্যিই তৃপ্তি করে খেয়েছিলাম। "সেলাম ভাল, আর একটু দই। কিন্তু পাত্র আর তৃপ্তি যেন রূপ আর অরূপের সবক।

এখন থেকে ক্যাম্পে এই ব্যবস্থাই রইলো। মেয়েরাই সাজ পরিবেশনই করে না শুধু, রন্ধনশালায় বাড়িয়ে থেকে তাঁ'যায়ও। এক একদিন এক এক মেয়ে-স্কুলের ভার।

বিহারীলাল আমায় বলে "চলুন মজিদের ঘরে আজ মুশায়রা আছে, চলুন।" প্রায় টেনে হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে আমায় নিয়েও বসালো মজিদের ঘরে।

বর্তমান কাশ্মীরী ভাষার কবিতার আলোচনা চলছিল। বর্তমান কাশ্মীর, নব-কাশ্মীরের বড় বড় কবিদের রচনিকথা ; প্রেম নয়, কাব্য নয় ; —দেশ, জনতা, মাটীর প্রেরণা, জীবনের সংঘাত। বিংশশতাব্দীর বড় বড় দুটো প্রভাব সেমেটিক আর এরিয়ান। সেমেটিকরা যেমন বস্তুবাদী, যথার্থবাদী, জীবনবাদী, এরিয়ানরা তেমনি ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী, জীবনোত্তর বাণীর প্রত্যাশী। এই সেমেটিক দর্শন প্রভাবিত করেছে কাশ্মীরকে। তাই কাশ্মীরের মাটীর গুণ সে সমাজতন্ত্রের মূল কথা সহজে গ্রহণ করতে পারে, সাম্রাজ্যবাদের খোলস অকাতরে ছেড়ে চড় চড় করে টেনে খুলতে পারে।

আজ কাশ্মীরের বড় কবি জিন্দা কাউল, মহমুদ, আজাদ। আজাদের গান আজ কাশ্মীরের ঘরে ঘরে। জিন্দা কাউলের একখানা গান লিখে এনেছিলেম।—

কাঁদবেই মানুষ কাঁদবে
দিলে ফেলবে না সে তার অশ্রুজল
কিন্তু তবু বল কিবা তাতে বল ?
ফল কি তাহার যদি আঁখি হতে রক্ত ঝরে
ফল কি তাহার পাথরে মাথা সে কুটিয়া মরে
সে জানে তাহার অপেক্ষা নেই কারো
তবে কেন তাড়া জাগাইতে সাড়া
জনের করুণা ঘোরে
তবে কেন তীব্র দুর্নীরীক্ষ্য দক্ষ্য করিয়া বৃথা
কেন বাধাতা ? কেন অসহায় ভৈষ্য ?

এ কাব্যে জিন্দা কাউল বেদনাকে স্বীকার করেছে ; মানুষের আর্তনাদকে অবশ্যম্ভাবী মনে করেছে মহাকালের অট্টহাস্যের মতো। কিন্তু আরও গভীর বেদনার কথা বলা হয়েছে অন্য এক কাব্য খণ্ডে।

মরছে মানুষ মরছে
পলে পলে আর তিলে তিলে মানুষ মরছে, মরছে।
মরছে ক্ষুধায়, মরছে শীতে, মরছে নিরন্ন তৃষ্ণায়
চিৎকারের ওপর ঘবনিকা টেনে।
রোগে বিপন্ন, শ্রমে অবসন্ন সে মরছে।
ভয় তার, অভাব তার, শোক দুর্ভাগ্য তার। সে মরছে,
কিন্তু দুঃখ পায় অকাতর
আশা পত্র ফলায় করে লোকাতুর
মন ওঠে দুলে ;
পায় না সে শান্তি কোনো ত্রিহিকে
কি যেন তাকে হাতছানি দেয়, ডাকে, ভোলায়,
সে জানেনা সুন্দর শিব আছে কি নেই কোথাও
দেখেনি সে, পায়নি।
তবু তার আশা তার হারানো জিনিষ মতো।
সে পাবে একদিন পাবে,—
মাতাল যেমন ঘরে পায় হারানো পোষাক ঘরের মাঝ !

অভাব-বাসনার মাঝে একী সুসংগতি না জীবন ! জিন্দা কাউল এখন বৃদ্ধ। লোকে জানে 'মাষ্টারজী' নামে। রবীন্দ্রনাথ যখন কাশ্মীরে যান তখন জিন্দা কাউল তাঁকে কবিতা শোনায়। বিশ্বকবি তাঁকে কবিতা শোনান। বিশ্বকবি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। খুব সামান্য ঘরে জন্ম নিয়ে বহু কষ্টে শুধু বি-এ পাশই করেন না, অনেকগুলো ভাষা শিখে ফেলেন। এঁর গুরুও কবি ছিলেন। একটা কবিতার শেষ চরণ লিখতে গিয়ে তিনি পড়েন সমস্যায়। তখন জিন্দা কাউল কিশোর। তিনি একটি চরণ রচনা করে দেন। গুরু মহাখুশী। গুরুর আশীর্বাদ আর রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ পেলে এমন কাব্য রচনা করা যায়না।—

আমারে পরিহরি কেন গো যাও সখি
কেন গো রাখনি তা যে কথা ছিলে দিয়ে
তোমারি গান গেয়ে, তোমারি পথ চেয়ে
তোমারি ভালবাসা চেয়েছি অহরহ
আসিবে বলে তুমি জাগায়ে মনভূমি
কি কথা কহিব গো, কহিতে যাবে বাধা
বিরহ তাপে মম শুকালো প্রিয়তম—
এদেহ ; শুকালোনা তবু তো ভালবাসা।

বেশ পাওয়া যায় এ গানে হারায়ে হৃদয়, রবীন্দ্রনাথের সন্ধান।

পহলগামের মাঠের পারে তাঁবুর ঘরের মধ্যে দশ বারোটি মুসলমান বৃদ্ধক। সঙ্গে ঐ বৃদ্ধ মজিদসাহেব। কাশ্মীরী গানের বন্যা ছুটেছে, কাশ্মীরী কবিতার ঢেউ। নীলাভের পথ আসছে ভেসে যেন সাগরের গর্জন, বাতাস বইছে পাহাড়ের বনের মর্মর দিয়ে পথ করে। আকাশে মেঘ। ঝির ঝির করে পড়ছে জল।

আজাদের কাব্য শুরু হোলো। আজ কাশ্মীর আজাদের নামে বিহ্বল।

তুমি বলেছো যা আজাদের কানে কানে
সে বাণী কিশোর সারা কাশ্মীর ঘাসে
কেন ছেলেমী এ ধর্ম ধর্ম ঘরে
কুলকুল ঝীনের কেন আলোচনা বাজে ?
হিন্দু মুসলমান
প্রদীপ শিখায় আলোর বন্যা
সবার একসমান
সম্মুখে বিশাল একের মহিমা

কে আপন কেবা পর
হিন্দুই বা কে মুস্লিম বা কে
কে চাহে কাহার ঘর
আমার ধর্ম নেই
তাই যদি তাই না চাস তাহোলে
ধর্মেতে কাজ নেই
কাজ নেই আলো কাজ নেই শিখা
দিলনা যে মোরে আলো
সবারে আপন করিতে দিল না
বাসিতে দিলনা ভালো।

প্রবীণ এ কালের কবি। এ কালের ধ্বনি পেলায় তাঁর কাব্যে। সুর করে গায় এরা গান।

"হোপিয়ার তুই খুন-পিয়াসা লড়াই বাজ!
কিসের রে তোর বেমাক আজ?
কাপেঞ্জ যাদুর যোমার তোপ,
যুদ্ধ-বিমান গুপ্ত কোপ:—
সোনা-রূপা আর ডলার পাইত,
বেমাক তাহেই রে ব্রাড হাইত।
দেখসি কি তুই, দেখিস কি তুই প্রমিক চাষীর আত্মপণ?
দেখ্‌রে দেখ্‌না, দেখ্ এখন!
ভূমিকম্পে বিশ্বে এলো রে এলো এ প্রবর্তন।"

নারীদেরই জন্ম কবিতা:—

বাহিরের ডাক এসেছে রে শোন
যায় হতে হবে আজ
আজই-আজই-আজ।
পড়লো নতুন পথ;
ডাকলো দোলা, তুচ্ছ সে বাধা।
জগন্নাথের রথ
ঠাকিয়ে দিয়েছে; শঙ্কার চোখে বিশ্বিয়ে রেখে চোখ
ডাকাতের দল কেঁপিয়ে তুলোবো; রুখবে কেমোর যোর?
হুকার ঘাড়, যাও হুকার
গর্জন করি দিনও রাত,
হাতেতে আমার কাঁপে হাতুড়ি, আর কলমের কালি,
কণ্ঠে শপথ, লাল-অক্ষরে খালি,
ঘুরে ঘুরে ফিরে এখানে-ওখানে
ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তার সন্ধানে
সর্বত্যাগী কে সে শয়তান; ভাঙবো তাদের ভুল
কাস্তে-হাতুড়ি-কলম-অস্ত্র হবে তারা নির্মূল।

কিন্তু আশ্চর্য লাগলো বর্তমান কাশ্মীরের অন্যতম সাহসিক মন্ত্রী মীর্জা গুলাম হেসেন বাগ্‌ পড়ে। 'অরিয়ন্ট' ডাকযোগে না কাশিক মাসে ইনি লেখেন। উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি উত্তরাখণ্ডের ভাষায় কবি নাম গ্রহণ করা একটা কায়দা। অরিয়েন্ট কাব্য সমাজবাদ, সংগ্রামিক-সমাজবাদে সাম্প্রতিক বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখে। প্রশ্ন আসে। সমাধান নেই। না থাক্, এ প্রশ্নই সমাধানের একটা সিঁড়ি। কাশ্মীরী শাল-কারিগরদের ওপর প্রসিদ্ধ কবিতাটির পরিচয় আগে দিয়েছি। কবিতাটা এখানেই শুনি। আরও দুটি ছোট গজল শুনি তাঁরই লেখা:—

'শুনেছি হানি কেটে মুষ্টি দিতে পারে কতো সে শয়তের ভণ্ড
পারি কি পারি আমি তাদের কাছে যেতে?
আমি যে বসে বসে ঘুমি।
অন্ধ পাপের মতো বিশ্বিয়ে আছ দুই মুঠী ভরি।'
'মৌলভ তব ভাগ করে দিতে কেন এ গণ্ডগোল?
যদি দিতে সব সমান ঘর্ম্মা মেপে
আকাশে দেবতা থাকতেন সুখে
ধরায় মানুষ সুখ পেতো বুকে
পাতালের মতো শয়তান তারা
ঘরে যেতো কেঁপে কেঁপে।

গজলের গান অন্য গান অন্য সুরে—

বুলবুল চায় তার গোলাপে
যৌবনি চায় নায়গিনে হাসু
কাশ্মীর চায় কাশ্মীরীভাই
কাশ্মীরী কাশ্মীরে শুধু চায়।

* * *

আমাদের দেশ কানন ভরা এ মর্ম
আমাদের দেশ সকল ধরার মর্ম
ভালবাসো এরে ভালবাসো আরো বাসো
এরে বুকে ধরে স্বাধীন চিত্ত হাসো।

গজলের বলেছে—

হিন্দু চালাবে বৈঠা,
মুস্লিম ধরে হাল
এখানে আবার ভেদাভেদ কোথা
তীরে তীরে আর কোলাহল কোথা
একতার গতি এক মন জানি
সাথি ভুলে ধর পাল
হিন্দু নিয়েছে বৈঠার ভার
মুস্লিম ধরে হাল।

এসব গানের সুরে ছন্দে কাশ্মীর আজ মাতোয়ারা। কাশ্মীরে আজতো পতাকা উড়বে না অক্ষমেধের—এ কথা কাশ্মীরের চিন্তকে কখনও কোনও দিন ব্যাকুল করেনি। কোটারাণীর সময়ে করেনি, হায়দার সময়ে করেনি। আজের মকবুল শেরওয়ানীর সময়েও করেনি এখনও করে না। কাশ্মীরের অন্তর্লোকের কথা কাশ্মীরে কাশ্মীরী থাকবে কি থাকবে না। হিন্দুও কাশ্মীরী, মুসলমানও কাশ্মীরী এই মাটিই কাশ্মীরের সম্বল। জিন্নাকে এই মাটি শোনাবোর অপরাধেই বারামুলার শেখ-

ওদানীকে মারা হয়। জনমত বা গণভোট তো রাজনৈতিক একটা ধাপ্পাবাজির নাম। কিন্তু তারও ওপর যে চিরন্তন সত্য সে কাশ্মীরীর দৃঢ়বিশ্বাস আপন ঐক্যে, আপনার দেশের মহত্তায়।

মজিদ সাহেব নিজে কাশ্মীরী জানতেন, তাই আবেগটা বুঝেছিলেন খুব। কাশ্মীরে প্রথম কাব্য রচনা হয় হাজার বছরের সময়ে। এর আগে প্রাকৃত ভাষার অর্থাৎ দেশের খাঁটির ভাষায় সাহিত্য রচনার আদর ছিল না। তখন ছিল সংস্কৃতের প্রচার। আর্য সংস্কৃতির এই একটা ঝাপট একদিকে খুব জোর করেছিল। দেবভাষা বলে সংস্কৃতকে এরা উচ্চে স্থান দিলো তো এমন দিলো যে—অন্য ভাষাকে মাথা তুলতে দিলোনা। আজ আবশ্যিকভাবে হিন্দী শিক্ষার বিপক্ষে আমরা যা যা বলছি একদিকে কাশ্মীরী বা মাদ্রাজী-রা যে সংস্কৃতের বিপক্ষে সে কথা বলেনি এ কথা বলি কি করে। কিন্তু তখন আর্যরা কৃতসঙ্কল্প হয়ে প্রাণে মনে জয় সুনিশ্চয় করায়। কাজেই লোকসাহিত্যকে, অন্ত্যজ, নগণ্য করে রেখে একটা গোত্রাশ্রয়ী বিশেষ সাহিত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ফল যা হয় দেশের কথা।

তবু মরে না। বটের চারার মতো অক্ষয় প্রাণ দেশের ভাষার। নিখাদ রক্ত মরুভূমি ফুলের বাহারকে ঘর্ষিত করে মহাকালের সাক্ষ্য এই বটবৃক্ষ একদিন সব গ্রাস করে। কোনও বিবর্তনবাদের ফলে সংস্কৃত হয়েছে পালি, প্রাকৃত পরে দেশীয় ভাষা—এ কথায় যথার্থ্য ও সঙ্গতি মানতে নারাজ। মনে হয় কে যেন কবে জুলুম দিয়ে এই দেব ভাষা মানবদের ওপর চাপিয়ে দেয় আবশ্যিকভাবে। সারা মারেনি তাদের অন্ত্যজ, অন্ত্যবাসী করে রেখেছে, অনধিকারী করে রেখেছে স্ত্রী, শূদ্র এবং প্রথম তিনটী দ্বিজবর্ণের অন্ত্যজ বর্ণের মধ্যে। এতে যে বিশেষ একটা গোষ্ঠীর সুবিধা হোলো তার সাহায্যে কোটি কোটি নিগৃহীতকে উৎপীড়ন করা চলতে লাগলো যুগের পর যুগ যাতে তারা মনে প্রাণে সিদ্ধান্ত করে নিলে যে তারা হীনের হীন, সভ্যতার মাপ কাঠিতে অত্যন্ত খাটো। এই ধরণের সাংস্কৃতিক অত্যাচার মানুষের মূল্যকে যে কতো ছোট করে দিতে পারে তার কথঞ্চিৎ বিকাশ তো আমরাই আমাদের সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করেছি ইংরাজীর মাধ্যমে। কিছুদিন আগেও গ্রামে গ্রামে ইংরেজী জানাকে পাণ্ডিত্য মনে করা হোতো। ইংরাজী বক্তাকে দেবলোকের প্রতিনিধি মনে করা হোতো, ইংরাজী জ্ঞানে অপারদর্শী দেশী পণ্ডিতের পক্ষে ভিক্ষার ঝিড়ম্বনাকে আমরা সহজ চক্ষে দেখেছি। আমার কথা বিষয়টা এখন শেষ হয়ে এসেছে। যারা আপত্তি করতে আসবেন, তারা অন্ধ ও অদৃষ্টি। ইংরাজী একদা প্রাণ দিয়ে শিখেছে বলে, ইংরাজী ভাষার মাধুর্য রস জীবনে উপলব্ধি করেছে বলে তারা এখনও আপত্তি জানায়। কিন্তু সত্য যা তা বটের চারার মতো আত্মপ্রকাশ করবেই।

মজিদ সাহেবের সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগলো। "সামান্য ইংরেজী জানা যখন না শিখলাম তখন কেউ পাত্তা দিলো না। জীবনে দু'টা ভাষা শিখেও দুখানা বই সংগ্রহ করতে পারতাম না। প্রথম স্ত্রী মারা গেলেন গর্ভাবস্থায় এনিমিয়া রোগে। সুরলায় পেতে দিতে পারিনি তাই ঘরে গেল। আর বিয়ে করিনি; করতাম ও না। কিন্তু যুবক-বেলা গেল। আমি পই পই করে পাড়া প্রতিবেশীদের দিয়ে অবধি

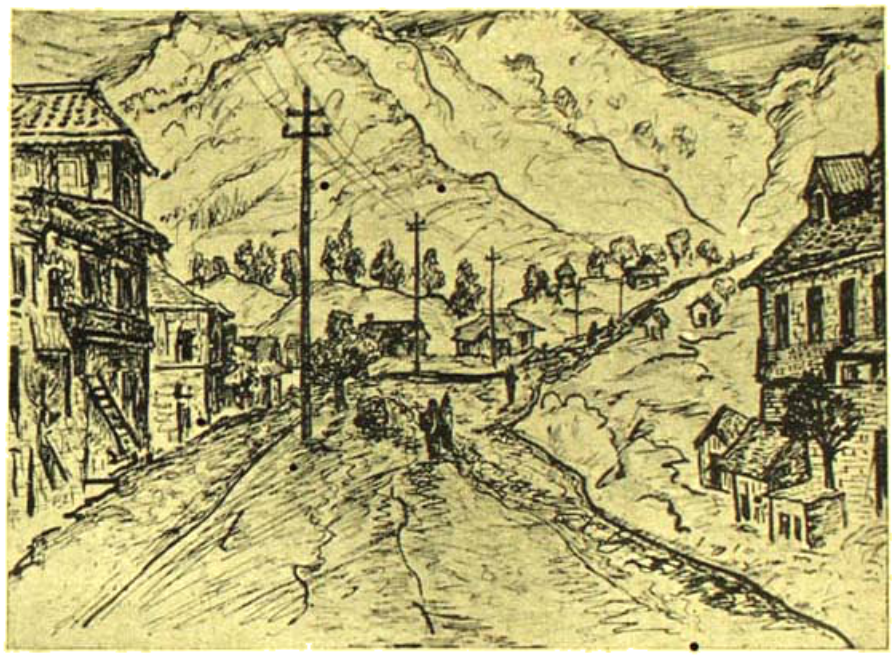

পহলগামের বাজার

বললাম আমার দারিদ্র্যের কথা। কিন্তু জনাব হামিদাবেগম আমার জন্য দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো। তার বাপ ছিল বড় উকীল। আমায় এসে জোর করে ধরলে। আমি তখন ঠিক করেছি ইংরিজী না জেনে, রোজগার না করে সংসার করবো না। জনাব আমার ইংরিজী শেখা হামিদা বেগমের কাছে। বন্ধুরের সুপারিশে এই চাকরি। হিব্রু, ফার্সী, আরবী, উর্দু, ইথিওপিয়ান, পোস্ত, তুর্কী এই সব ভাষাগুলোর ঘরবাসে আমার করার পরেও ইংরিজী না শিখে বন্ধনার জলে হাত দেবার হুকুম পেলাম না জীবনে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

ছেলেরা মেয়েরা সব বেড়াতে বেরিয়েছে দেখেশুনে। কেউ যাচ্ছে পাহাড়ে, কেউ নদীর পাড়ে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ পায়ে হেঁটে।

একের সঙ্গে অন্যের কোনও রকমের যোগ ছিল না। দেখলে মন ভরে যায়।

আমি আশিস বাবুর কথামতো নেমে একা একা নেমে চলেছি নীলাম্বরের বাড়ির দিকে। ঠাকুর পর ঠাকুর। কত পরিবার কত পরিবেশে নবরাত্রির সাজ নিচ্ছে। লোভা আর মীনাক্ষীকে এখানে দেখতে পেলাম। মীনাক্ষী নমস্কার করলো। লোভা করলো না।

স্রোতের শিয়রে নতুন দুইটীং পুল তৈরী হচ্ছে। তার পাশে একটা বড় পাইন একেবারে নদীর ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছে। সেই পাইনের তলায় কাঠের রেলিং ঘেরা বিবি বসার জায়গা। বেঞ্চি পাতা আছে। একটু গাঢ় ছায়া নিবিড় নিরালা জায়গা। লোভ হয় একটু বসি।

কিন্তু বসবো কি। বেশ ঘুরলাম বেড়ে নেই। প্রকৃতির সেই ঘুম-ভরা। স্নানের আর্দ্রতাটা ঠোঁটে করে ছুটো গেলাস কিনে নেলো। পানি গেলাস ছুটো ফিরিয়ে দিয়ে গেলো। ভদ্রলোকটী ভারতীয় নয়। ঘুমভরার জীবন কী দুঃসহ ভাবতে লাগলাম।

ত্রিশ্রোতনে থেকে এক ধরণের চাপা ঘেওয়া প্রবৃত্তি জাগে। উচ্ছ্বল-তায় ছুটে যায় মনে। একটা ধারা চলে পরিপূর্ণ বাস্তবের বেগ ধারণ করার ঘোগ্য—পরিসরের অভাব হলে, বন্যার মতো ; ঘুমভরা ভেঙে ; অন্যটা চলে অবাস্তবের জীবন বহন করার কল্পে, বাইরের বেগ সংগ্রহ করে, সেগুলোকে অবীকার করার চেষ্টায়। দ্বিতীয়টা বেশী ক্ষতিকর। মন যখন জীবনের আস্বাদ পায়না, ক্ষুধা যখন প্রবল নয় ; তখনও বেঁচে থাকার মানেকে বাস্তব বহন করে কি করে ? কাজেই এধার ওধার থেকে নানা উপায়ে জীবনের মানেকে বাড়িয়ে তুলতে চায়। অক্ষীর রোগীর পক্ষে লম্বা বা অন্ধের কৃষ্ণার মতো তারা অপাঙ্গকে বন্ধু মনে করে।

পরলোকে আমি যেন একটা বন্ধ সমাজে এসে পড়েছি। আমার চোখ কিছুতেই আমি প্রকৃতির দিকে মেলে ধরতে পারছি না। কেবল দেখছি মানুষ। ভাল লাগছে না।

আরও ঘুরলাম। বৃষ্টি নামলো। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে দেখি ওরা আমার আশায় অপেক্ষা করে আছে। এ বেলাও খাওয়া ভালোই হোলো।

অনেক রাতে শুয়ে শুয়ে কথা হতে লাগলো রবির সাহেবের। লোকটা এতো গুণী অথচ এতো নিরীহ।

কে যেন দেতার বাজাচ্ছে, তারি মিষ্টি, সকরুণ রেশ। তারপরে মালকোষ। কে বাজাচ্ছে। হোটেলে কে হবে হয়তো।

(ক্রমশঃ)

চক্ষু-দান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কুয়াশা-কুহকে ধরণী ধূসর হোলো ;
শীতের শিশিরে শিহরে খেজুর-পাতা ,
ঘোর সন্ধ্যায় তুতুড়ে দেখায় বুঝি
খেজুর গাছের বাঁকড়-মাকড় মাথা।

(২)

আঁধারে আঁধারে ছায়ার ছায়ার মত
এমন সময়ে সহসা আসিয়া চাষী
খেজুর-গাছের বদনাবরণ তুলে
চক্ষু ফুটায়ে ছায়ায় মিলালো হাসি'

(৩)

গলায় বাঁধিল মাটির কলসী দড়ি,—
কাঁস তো তাহার ছড়ানো যায় না মোটে ,
চক্ষু কাটিয়া নির্বাস ফোঁটা ফোঁটা
রাত-ভোর ক'রে কলসী ভরিয়া ওঠে।

(৪)

শিশির করিছে—আড় পড়িয়াছে খুবই ;
হঠাৎ কেবল ঝলক মারিছে হাওয়া ;
বক্ষের মধু চক্ষু ছাপায়ে ঝরে,—
চাষারই কেবল যায় নাকো দেখা পাওয়া।

(৫)

চক্ষু ফুটালো রুক্ষ—রসিক চাষা
শাস্তি কি তা'র হবে না রাতেও ভঙ্গ ?
ভাণ্ড ভরিয়া ধরিয়া বক্ষ-মধু
চক্ষু হ'য়ে কি কাঁদিবে গাছেরই অঙ্গ ?

(৬)

রসের রসিক আসিবে নিশির শেষে,
মাথায় তুলিয়া ল'বে সে রসের ভাণ্ড ;
সে রস রসিয়ে হয়তো করিবে গুড়—
হয়তো বা তাড়ি ,—হায় রে অবাক্ কাণ্ড !

(৭)

যেমন বিটপী—তেমনই তাহার চাষা ;
চোখ-ফুটানোর নেশায় এমনই টান
রসের চক্ষু যে কভু ফুটাবে বা'র
কিরে সে করিবে তা'রেও চক্ষু-দান।

P. G A
COMMON-ROOM

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শাহজাদা আকবরের নিকট বাদশাহ আলমগীরের পত্র :

আমার প্রাণাধিক পুত্র মহম্মদ আকবর,

আমার অন্তরের নিকটতম, আমার নয়নের মণি, আমার অকপট অনুকম্পা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমাকে জানাচ্ছি, আল্লাহ সাক্ষী, আল্লাহ জানেন যে তোমাকে আমি আমার সকল পুত্রের চেয়ে বেশী ভালবাসতাম এবং তুমি আমার সবার চেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলে। কিন্তু রাজপুতদের ছল চাতুরী তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই রাজপুত জাতি মনুষ্যরূপী শয়তান। এই রাজপুতগণ তোমাকে ধর্মের বিধি থেকে বঞ্চিত করেছে। তুমি তাদের প্ররোচনায় দুর্ভাগ্যেরই অজানা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার পোচনীয় উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং দুর্ভাগ্যের সংবাদে আমার হৃদয় শোক এবং দুঃখের অতল তলে নিমগ্ন হয়েছে। উঃ! জীবন আমার বিষময় হয়ে উঠেছে। এর বেশী আমি আর কি বলতে পারি? ধিক! সহস্র ধিক! তুমি মুঘলবংশের মর্যাদা এবং শাহজাদার আভিজাত্য দূরে নিক্ষেপ করেছ। তুমি যে শাহানশাহ আলমগীরের পুত্র সেকথা ভুলে গিয়েছ। তুমি যৌবনের উচ্ছলতায় তোমার সারল্য বিস্মৃত হয়েছ। তোমার পত্নী এবং সন্তান-গণের প্রতি কর্তব্য ভুলে গেছ। তুমি পশু অপরাধী, পশুবৎ, দুষ্ট—রাজপুতদের আশ্রয়ে তুমি একটি ক্রীড়নকের মত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছ। এখনই তোমার উত্থান, পর মুহূর্তেই তোমার পতন; তারপর তোমার পলায়ন। উঃ! তৈমুর বংশের সন্তানের কি দুর্ভোগ।

বিশ্বপিতা, এই জগতের সমস্ত পিতার অন্তরে পুত্রস্নেহের বীজ বপন করেছেন। তোমার শত গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও আমি ইচ্ছা করি না যে তোমার কৃত পাপের জন্য যেন তোমার প্রতি যথেষ্ট শাস্তি বিধান করা হয়।

পুত্র পিতার প্রতি ভস্ম নিক্ষেপ করেছে কিন্তু মাতা পিতা সেই ভস্ম দ্বারা চোখের অঞ্জন রচনা করেছেন।

যে আমার প্রাণাধিক! অতীতে যা ঘটেছে তা বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাক। যদি তুমি ভাগ্যবান হও, তবে তোমার কৃতকর্মের জন্য তুমি অনুতাপ করবে। যে কোন স্থানে ইচ্ছা করলে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পার। তোমার সমস্ত ভুল, সমস্ত অপরাধ আমি এক মুহূর্তে মার্জনা করব। তোমাকে আমি এমন অনুগ্রহ, এমন পুরস্কার দেব, যা তুমি কল্পনা করনি। তোমার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত উদ্বেগ, নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য পুত্রের প্রতি পিতার অনুগ্রহ সাক্ষাতের অপেক্ষা রাখে না। তবুও বলব যে তোমার অপ-মানের পাত্র বিধাতাই বিধানে পূর্ণ করেছে। তুমি একবার আমার সম্মুখে এস এবং তোমার সমস্ত অপমানের লজ্জা দূরীভূত কর। রাজপুত দুরভিসন্ধি যথেচ্ছভাবে সিং রায়া সিংকোকে সাহায্য করেছিল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কি ফল হয়েছিল জান? পরাজয় আর অপমান। তোমার ভাগ্যলিপি নিশ্চয়ই তুমি জান। আল্লাহ্, তোমার সহায় হউন। আল্লাহ্, তোমাকে সুপথে চালিত করুন।

মহম্মদ আকবরের প্রত্যুত্তর

শাহানশাহের জীবনতম পুত্র, শাহজাদা মহম্মদ আকবর, যথাবিহিত সম্মান, শ্রদ্ধা, নতি এবং অভিবাদন অন্তে নিবেদন করছে;—মানের প্রতি অনুগ্রহ করে সম্রাটের লিপি জীবনতম পুত্রের নিকট এসেছে—অতি শুভ মুহূর্তে এবং অতি শুভক্ষণে। সম্রাটের পবিত্র লিপিখানি আমার শিরে ধারণ করলাম। পত্রের অপূর্ব স্নেহ মাখা আমার নয়নে আলোক সম্পাত করেছে এবং কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরগুলি আমার নয়নে অঞ্জন হয়ে উঠেছে। পত্রে বর্ণিত সংবাদগুলি আমার অন্তর এবং নয়নকে দীপ্তি দিয়েছে। আমি জাহাপনার সম্মুখে পত্রের উপদেশ ও অনুগ্রহগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি। সত্য জগতের সমস্ত বিষয়ের মূল এবং স্রষ্টার অনুসরণ করে।

সম্রাট লিখেছেন—"আমি আমার এই পুত্রকে অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসি; কিন্তু সেই পুত্র দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অতুল সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং নিজের স্বার্থ আবর্তে নিজেকে নিক্ষেপ করেছে। আলহম্দ হে দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের বিধাতা, তোমাকে অভিনন্দন করি। পিতার তৃপ্তি সম্পাদন এবং পিতার সেবায় পুত্রের আত্মনিবেদন যেমন কর্তব্য, পিতারও তেমন কর্তব্য যে সমস্ত পুত্রদের সমদৃষ্টিতে প্রতিপালন করবেন? তাদের নৈতিক ও জাগতিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন এবং তাদের ন্যায্য অধিকার দান করবেন। আল্লাহ্‌র জয় হউক।" আমি আজ পর্যন্ত পুত্রের কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করি নাই বা পরাঙ্মুখ হই নাই। আমার প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ এবং পুরস্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে! সম্রাটের অনুগ্রহের সহস্রভাগের একভাগ কি বলা সম্ভব? কনিষ্ঠ পুত্রের নিরাপত্তা এবং ভয় সর্বকালে, সর্ববেশে এবং সর্বস্থানে পিতার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সম্রাট পৃথিবীর এই চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। কনিষ্ঠ পুত্রদের তুচ্ছ করে জ্যেষ্ঠপুত্রকে শাহ উপাধি দান করে সম্মানিত করেছেন। নিজের উত্তরাধিকারী স্থির করেছেন। কোন ন্যায় এবং নীতির বিচারে সম্রাটের এই কার্য সমর্থন যোগ্য? সমস্ত পুত্রেরই পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার। পবিত্র কোরাণ ও ধর্মের কোন

বিধি অনুসারে এক পুত্রকে সম্রাজ্ঞি করে অন্য পুত্রদের অবদমিত করেছেন। অথচ দুনিয়ার মালিকের বিধানকে প্রশ্ন করবার অধিকার মানুষের নাই। হিন্দুস্থানের মালিক দুনিয়ার মালিকের পথ অনুসরণ করার স্পর্দ্ধা করেন। আপনি দুনিয়ার লোকের পথপ্রদর্শক—দুনিয়া আপনার পথ অনুসরণ করে। আপনার পথ যে অনুসরণ করে তার কি কখনও অমঙ্গল হতে পারে! সেই লোক কি কখনও দুর্ভাগ্য হয়? এ বীন পুত্র তো তার পিতার পথ অনুসরণ করছে।

যে অমর জগতের ঋষি, মানুষ দুঃখ কষ্ট নিজের কর্মের জন্যই ভোগ করে। আমাদের পূর্ব্বগামী সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ইচ্ছা করেই পোলযোগ সৃষ্টি করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অভীষ্ট লাভ করেছিলেন। ইতিহাস কি প্রমাণ করে না যে আলেকজাণ্ডার অন্যাচারের দ্বারা নিজেই জীবনে অমৃতের স্বাদ লাভ করেছিলেন। কণ্টক বাদ দিয়ে গোলাপ হয় না। গুপ্তঘাতকের বিষয়ে সর্প বাস করে এবং গুপ্তঘাতককে রক্ষা করে।

পরিশ্রমের পরিশেষে আসে শান্তি, তৃপ্তি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আল্লাহর অনুগ্রহে আমার অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ হবে। আমার সমস্ত উদ্বেগ আশঙ্কা পরিশ্রম আনন্দে, উৎসবে পরিণত হবে।

জাঁহাপনা লিখেছেন—"যশোবন্ত সিংহ রাজপুত কুলমণি ছিলেন। তিনি দারা শিকোকে কি সাহায্য করেছিলেন তাহা জানো অবিদিত নয়। সুতরাং এই বিশ্বাসঘাতক জাতিকে বিশ্বাস করা চলে না। জাহাপনা যথার্থ কথাই বলেছেন। দারা শিকো রাজপুত জাতিকে ঘৃণা করতেন। তাঁকে সে ঘৃণার ফল ভোগ করতে হয়েছিল। যদি প্রথম থেকেই দারা শিকো রাজপুতদের সহযোগে কাজ করতেন তবে তাঁর এই বিপর্য্যয় হত না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আকবর রাজপুত জাতির সঙ্গে মৈত্রী ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন—তাদের সহায়তায় হিন্দুস্থান জয় করেছিলেন। বহুবার খান এই রাজপুতদের সাহায্য নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বন্দী করেছিলেন। শঠ ও প্রবঞ্চকদের যোগ্যরূপ শাস্তি দিয়েছিলেন। জাঁহাপনার নিশ্চয় মনে পড়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের কাহিনী। সেদিন চিনপত যার রাজপুত যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়েছিল, সে কাহিনী সর্ব্বজন বিদিত। সে এক অভূতপূর্ব্ব কাহিনী। নিশ্চয়ই জাঁহাপনা বিস্মৃত হন নি যে শাহজাদা সুজার সঙ্গে যুদ্ধের সময় যশোবন্ত সিংহ অমার্জ্জনীয় অযোগ্যতা দেখিয়েছিলেন। জাঁহাপনাকে অপমানও করেছিলেন। জাঁহাপনা তো সম্পূর্ণ সজ্ঞানে মৃত শরীরে সেই যশোবন্ত সিংহকে শোকযাত্রা দ্বারা তুলিয়েছিলেন, দারা শিকো থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন! এই যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনাকে জয়যুক্ত করেছিলেন। এই রাজপুত জাতি অকৃতজ্ঞ নয়, বিশ্বাসীনভাবে রাজপুতজাতি তাদের প্রভু পুত্রের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তারা জাঁহাপনার বীরপুত্র আউরঙ্গজেবের বন্দী এবং সম্রাট উজীরদের বিদ্রোহ করেছে—অবশ্য এটা সংগ্রামের পূর্ব্বভাষ মাত্র।

এরূপ হবে না কেন? জাঁহাপনার সামনে মন্ত্রীগণ কর্মতাহীন, আমীরগণ অবিশ্বাস্য, সৈন্যগণ অসন্তোষে ভোগে। লিপিকারগণ কর্ম্মহীন, বণিকগণ উপার্জ্জন বিলম্বিত, কৃষকদল পরমলিত—সুতরাং সর্ব্বত্রই অসন্তোষ। দাক্ষিণাত্যের অবস্থাও সেইরূপ। বিস্তীর্ণ সেই ভূখণ্ড, ভূস্বর্গ—বর্ত্তমানে জনহীন মরুভূমিতে পরিণত। বুরহানপুর ধরিত্রীর ললাটে কপালে তিলকের মতন সুন্দর সুচিহ্নিত অংশ শুধু। আহানারার পরিত্রাণ সত্ত্বে সংগ্রিষ্ট আওরঙ্গাবাদ (আওরঙ্গজেবের নগর) পাত্রদের মত স্পর্শ কাতর ও পরিবর্ত্তনশীল হয়ে উঠেছে—সক্কর আঘাতে সেই পক্ষিল নগর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হিন্দুজাতি আজ দুইটি বিষয়ের সম্মুখীন—তারা জিজিয়া কর দিতে বাধ্য হয়েছে; সক্কর আঘাতে তাদের বেশ বিধ্বস্ত। একটা জাতির উপর এত দুঃখ দুর্দ্দশা চারদিক থেকে মাথার উপর ঝিরে পড়ার মতন করে গেছে যে তারা আর সম্রাটের মঙ্গল কামনা করতে পারছে না। অভিজাত প্রাচীন পরিবারগুলি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। জাঁহাপনার পরামর্শদাতা হয়েছে বাহ্যিক ব্যবসায়ী হীনচরিত্র; তারাই রাজকার্য্য পরিচালনা করে; তাদের হাতে জপমালা, মুখে কোরাণের বুলি; পকেটে শঠতার জাল। জাঁহাপনা ত এইসব ধর্ম্ম বিদ্বেষীদের বিশ্বাস করেন; তারাই সম্রাটের নিকট থেকে দূরত্ব। আপনার গুপ্তচরগণ কি জনগণের মধ্যে প্রচলিত গান শোনেন নি?

রাজ্যের কর্ম্মচারী লোকের আকর্ষণে বণিক বৃত্তি অবলম্বন করেছে। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ মর্য্যাদা বিনিময়ে বিক্রীত হচ্ছে; আরও অনেক উপায়ে গুপ্তধন ক্রয় করা যায়; সেটা উল্লেখ নাই করলাম। যে ভাণ্ডার পূর্ণপ্রায়, সে ভাণ্ডার অকাতরে লুণ্ঠিত হচ্ছে। এই বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি আজ দুর্বল। সেদিন খুব দূরবর্ত্তী নয়—এ সৌধ ভূমিসাৎ হয়ে পড়বে।

আমি সাম্রাজ্যের এই রূপ কল্পনার চোখে দেখছি—সম্রাটের মনোবৃত্তি সংশোধনের কোন উপায় এবং সম্ভাবনাও নেই। আমার ধমনীতে আমাদের পুণ্যশ্লোক শাহানশাহ আকবরের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে—সেই হিন্দুস্থানের উর্ব্বর ভূমি থেকে কতকগুলি স্থান উচ্ছেদ করতে আমাকে প্ররোচিত করছে। আমার হিন্দুস্থান জ্ঞান পরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক—অত্যাচার ও নীচতা দূরীভূত হউক। হিন্দুস্থানের প্রজা পুনরায় সহজ ও শান্তজীবনযাপন করুক। দ্বিতীয় আকবরের নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আমার অনুরোধে যদি জাঁহাপনা তাঁর কার্য্যভার সুযোগ্য পুত্রদের হস্তে ন্যস্ত করে পবিত্র মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন—এমন অভিপ্রায় তো সম্রাট বহুবার ব্যক্ত করেছেন—তবে বিশ্বজগৎ সম্রাটের গুণকীর্ত্তন করবে।

আজ পর্য্যন্ত জাঁহাপনা একমাত্র পার্থিব দ্রব্যের লোভে জীবন অতিবাহিত করেছেন—আপনি তো জানেন যে পার্থিব জগৎ স্বপ্নের চেয়েও অলীক, ছায়ার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী। আজকে সময় এসেছে যখন জাঁহাপনা পরলোকের পাথেয় সঞ্চয় করবেন। দুষ্কর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবেন। এই ক্ষণস্থায়ী জগতের স্বার্থে আপনি পরমপূজ্য পিতা ও

মহান মহোদয়ের প্রতি কি ব্যবহার করেছেন—আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হয়েছেন যে আপনি অশীতি পর বৃদ্ধ—মৃত্যু আপনার জীবনের সীমান্তে অপেক্ষা করছে।

সম্রাট তাঁর পত্রে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন—তা পড়ে আমি লজ্জিত হয়েছি। আপনি পিতার প্রতি যে আচরণ করেছেন, আপনার পুত্রের নিকট তার বেশী আর কি প্রত্যাশা করেন। সকল পিতাই আশা করেন পুত্র পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে সন্তুষ্ট হবেন—এটাই স্বাভাবিক।

জাঁহাপনা আমাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হতে উপদেশ দিয়েছেন। স্বীকার করি পিতার সম্মুখে পুত্রের উপস্থিতি মানুষের জীবনে একটা আশীর্বাদ। কিন্তু জাঁহাপনার জীবন প্রতিহিংসার কথা স্মরণ করে আমি সাহস পাচ্ছি না ; কারণ জাঁহাপনা পিতা ও ভ্রাতাদের প্রতি যে অমানুষিক অবিচার করেছেন তার স্মৃতি এখনও মলিন হয়ে যায়নি। আপনার কি ভীষণ প্রতিহিংসা ! আমি প্রস্তাব করছি যে জাঁহাপনা যদি অল্পসংখ্যক রক্ষী নিয়ে আজমীরে যাত্রা করেন তবে আমি নির্ভয় হতে পারি। জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। তারপর আহাপনার সমস্ত আদেশ আমি পালন করব।.....

কি দুর্ভাগ্য, পুত্রের আমার ধৃষ্টি হ্রণে হয়েছে। আমার পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। এই শ্রদ্ধাই তো পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মূল বস্তু। আজ আমার সেই পুত্র কর্মে ক্রূর, মনোবৃত্তিতে অসৎ, মসনদ-সিংহাসনের রাজমুকুটের লোভে পিতার বিরুদ্ধে তরবারি আস্ফালন করছে। বলত, ভারতের সম্রাটদের ইতিহাসে কোন্ পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। মহম্মদ আকবর, তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ করেছ। তোমার যদি সত্যই অন্ত পাঠানপিতা প্রমাণ করার অভিলাষ হয়ে থাকে, যদি তুমি রাজ্য অধিকার করতে চাও তবে এর চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে? তুমি বিপুল সৈন্যবাহিনী ও অনুচর নিয়ে পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান কর। পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস তোমার পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন—তাঁহাকে তোমার শক্তি প্রতিহত করেছেন। তোমার কর্তব্য শাহ আব্বাসের রাজ্য জয় করা—এই তো হল প্রকৃত পুত্রের কর্তব্য। কিন্তু তুমি তো সিংহাসনের লোভে পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছ। যুদ্ধে জয়ের কর্তা বিশ্ব বিধাতা স্বয়ং, রাজ্যাধিকার বিধাতার পবিত্র দান। ইহার চেয়ে মূল্যবান আর কি বস্তু হতে পারে? হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি পরাজয় এবং নতি স্বীকার করে তোমার শ্রেষ্ঠত্বকে নবরূপ দান কর। তুমি নক্ষত্রের মত কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হও। তুমি সম্রাটের সিংহাসনের সম্মুখে নিজেকে অবনমিত কর। তোমার উপর নিশ্চয়ই আমার অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। মনে রেখো আমার এই ইচ্ছা সত্যই প্রতিপালিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমার আদেশ প্রতিপালন করতে কখনও বিলম্ব করো না।

ক্রমশঃ

অগ্নীমাংসা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

প্রত্যহ সকালে, সুরু হয় ক্লান্ত আরোহন
একঘেয়ে অনুবৃত্তি, রন্ধ্রে ভিজিয়ে নিয়ে মন,
দিনের বিষণ্ণ সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে,
পৌঁছলো রাতের শিবিরে।
মধ্যমা বিকেলে মেঘের মৌটায়া নাচে,
ঝিরঝিরে বন-ঝাউ গাছে,
পাতাদের শীর্ষ-চূড়োয়,
ভরে যায় আবীর গুঁড়োয়।
তবু সে প্রলেপটুকু ক্ষীণ সান্ত্বনা ম্লান বুকে,
রাতের বাহুড় আছে ডানা তার
মেলে সম্মুখে।
চাঁদের উদ্যত হাতে প্রশ্নের একটি ধনুক,
আঁধারের বিষমাখা তূণে তার বহ্নি শিলামুখ।
কালকে কি হবে আর আজকে কি হল,
তারার আঙুরগুচ্ছে জিজ্ঞাসারা জলে থোলো থোলো।
দৈনিকের সরণীতে যে মনটি নিরন্তর ওঠে,
থামবে একটি ধাপে, আকাশের নীলবর্ণ ঠোঁটে
যেখানে দেয়না তুলি আলোকের পেয়ালা রঙীন
প্রত্যুষ, আলোছায়া আলপনা আঁকেনা
যেখানে রাতদিন ;
সেখানে মীমাংসা বুঝি গ্লানিহীন শান্তির প্রসাদে,
গীতা বলে ঠিক্ ঠিক্ বিজ্ঞানের মত নেতিবাদে।

আধুনিকা

(রচনা : অন্তন শেখভ্)

অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

অলগা আইভানোভার আজ বিয়ে।

পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীরা সকলেই এসেছে ওর বিয়েতে।

স্বামীকে দেখিয়ে বান্ধবীদের চুপি চুপি বলে, "দেখ্, দেখ্, চেয়ে দেখ্, কী সুন্দর দেখাচ্ছে!"

স্বামীর চেহারার মধ্যে দেখবার মতো কিছুই ছিলো না। তবুও ও-কথা ব'লে অলগা বোঝাতে চায় কেন ও একটা সাধারণ লোককে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

অলগার স্বামী ওসিপ ডিমভ্ নামেই কাউন্সিলার, আসলে সে একজন ডাক্তার। দু'টো হাসপাতালে ওকে দেখাশোনা করতে হয়, একটাতে এখন অস্থায়ীভাবে কাজ করছে। সকাল ন'টা থেকে দু'পুর পর্যন্ত তার ওয়ার্ড এবং বাইরে যে সব রুগী আসে তাদের দেখাশোনা করে। বিকেলে অন্য হাসপাতালে যায়, সেখানে মরা চেরাই করে। সারা বছরের আয় খুবই অল্প প্রায় পাঁচশো রুবল। এইটুকু বললেই লোকটার সম্বন্ধে সবই বলা হয়, বেশী কিছু বলার বাকি থাকে না। এদিকে অলগাও তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা ডিমভের মতো সাধারণ লোক নয়, প্রত্যেকেরই একটা না একটা বিষয়ে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে; একেবারেই অখ্যাত কেউ নয়। পুরোপুরি নাম করতে না পারলেও কিছুটা নাম করতে আরম্ভ করেছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরো নাম করতে পারবে। ওদের মধ্যে একজন অভিনেতা এরই মধ্যে অভিনয়ে বেশ কিছুটা নাম করেছে। সুন্দর, সুপুরুষ চালাক-চতুর লোকটা আবৃত্তি করতেও জানে। কী ভাবে বক্তৃতা দিতে হয় অলগাকে তাই শেখায়। আমুদে, মোটা লোকটা একজন গায়ক। সে প্রায়ই দুঃখ করে বলে যে, অলগা নিজেকে নষ্ট করছে। অলগা যদি কুঁড়ে না হতো, অলগা যদি একটু মন দিয়ে খাটতো, তাহলে ও একদিন না একদিন নামকরা গায়িকা হতে পারতো। এ-ছাড়া কয়েকজন শিল্পীও ছিলো ওদের দলে। তাদের মধ্যে রিয়াবভ্স্কী-নামকরা। পঁচিশ বছরের অপরূপ সুন্দর যুবক রিয়াবভ্স্কীর ছবি নিয়ে প্রদর্শনীতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে—শেষ ছবিটায় সে পাঁচশো রুবল পুরস্কার পেয়েছে। অলগার ছবিগুলোতে টান দিতে দিতে ও বলে—আমার মনে হয় ছবি আঁকায় অলগা নতুন কিছু দিতে পারবে। অপর লোকটা বেহালা বাজায়, ওর বেহালার সুরে যেন কান্না ঝরে পড়ে। ও স্পষ্টই বলে—যে-সব মহিলাদের ও জানে তাদের মধ্যে একমাত্র অলগাই তার সমকক্ষ। অপর যুবকটি লেখক, ছোট ছোট উপন্যাস গল্প ও নাটক লিখে ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা নাম কিনেছে। বাকি রইলো কে? ওহো, ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিভিচের কথা বলাই হয়নি। ভদ্রলোক জমিদার, প্রচ্ছদপট শিল্পী। দেশীয় কৃষ্টি ও পৌরাণিক মহাকাব্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক টান। রোগে না পড়লে এই সব শিল্পী, উদারনৈতিক ভাগ্যবান ধনী ভদ্রলোকদের ডাক্তারের কথাই মনে পড়ে না। ডিমভ্কে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, ওকে সাধারণ লোক মনে করে, যেমন মনে করে সিডোরভ্ আর টায়াসভ্কে। বেনিয়ানের মতো একগাল দাড়ি ও বেমানান কোট গায়ে ডিমভের প্রয়োজনই ওরা বোধ করে না। অবশ্য ডিমভ্ যদি লেখক হতে পারতো কিংবা হতে

পারতো কোন শিল্পী তাহ'লে সকলে বলতো "ঠিক জোলার মতো দেখতে ওকে।"

অভিনেতা অলগাকে বলে "এই বিয়ের সাজে তোমাকে ঠিক সাদা ফুলে ঢাকা লাল গাছ মনে হ'চ্ছে।"

ওর হাতটা ধরে অলগা বলে "না···না শোন। ঘটনাটা কী ভাবে ঘটলো তাই বলছি। বাবা আর ডিমভ দু'জনে এক হাসপাতালেই দেখাশোনা করতো। বাবা অসুখে পড়লে ও নিঃস্বার্থভাবে দিনরাত বাবার সেবা করে। রিয়াবভস্কী, তুমিও শোন, ওহে তোমরাও সকলে শোন। ও কী হচ্ছে? আরো কাছে এগিয়ে এসো। রাতে আমার ঘুম হ'তো না, বাবার পাশে ঠায় বসে থাকতাম। হঠাৎ একদিন মনে হলো ডিমভ্ যেন আমার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে, আমি যেন ওর হৃদয় জয় করতে পেরেছি। কী অদ্ভুত ভাগ্যের খেলা, তাই না? বাবা মারা গেলেন। মধ্যে মধ্যে ও আমার কাছে আসতো, কখনো কখনো বাইরেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ চলতো। একদিন ও আমাকে সবকথা খুলে বললে। সারারাত কাঁদলাম, বুঝতে পারলাম আমিও ওর প্রেমে পাগল, আমিও ওকে ভালোবাসি। আজ আমার বিয়ে হলো। পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে, মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের দিকে মুখ ঘোরালে ওকে ভালো করে লক্ষ্য করো। ডিমভ্, তোমারই কথা হ'চ্ছে। এখানে সরে এসো, ওর হাতে হাত মেলাও···। থাক্···থাক্ ···হয়েছে, আজ থেকে তোমরা দুজনে বন্ধু হলে, কেমন?"

মুচকি হেসে ডিমভ্ রিয়াবভস্কীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে "খুব খুশী হলাম। রিয়াবভস্কী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পড়তেন, বোধকরি তিনি আপনার কোন আত্মীয় নন।"

(২)

অলগার বয়স বাইশ, ডিমভের একত্রিশ। বিয়ের পর থেকে ওদের দিনগুলো সুখে কাটে। বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে ফ্রেমে বাঁধানো ও ফ্রেম ছাড়া খোলা ছবিগুলো বসবার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়। বড় পিয়ানো ও আসবাব পত্রগুলোর চারপাশে ছোট ছোট চীনা ছাতা, রঙিন টুকরো কাপড় এবং ফটোগুলো সাজিয়ে রাখে। রান্নাঘরের দেয়ালে টাঙায় সপ্তাদরের আঁকা ছবি ও ছুতো। ঘরের কোণে জড়ো করে রাখে বিন্ ও কাস্তেগুলো। "সিলিং" ও দেয়ালে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকে, ঘরটাকে করে তোলে একটা গুহা বিশেষ। বিছানার ওপর ঝোলানো "ভেনিটিরান্" আলো, দরজার সামনে দাঁড় করানো মূর্তির হাতে টাঙি। যে-ই দেখে সে-ই বলে "খাসা ছোট্ট একটা নীড় রচনা করেছে ওরা।"

রোজ এগারোটার সময় অলগা ঘুম থেকে ওঠে, কিছু পরেই পিয়ানো বাজাতে বসে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছবি আঁকে। বারোটার কিছু পরে মেয়ে দর্জির কাছে যায়। স্বামী-স্ত্রীর আয় খুবই অল্প, কেবল মাত্র দরকারী জিনিষটুকু কেনা চলে। অলগার নতুন পোষাক দরকার হলে, দর্জি ও অলগাকে নানারকমের ফন্দি-ফিকির করতে হয়। আর সেই জন্যে বারবার অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পুরনো রঙীন ফ্রকটাই নানা রংয়ের টুকরো জরি ও ফিতে দিয়ে সেলাই করে দেয়,ফলে সেটা জামা না হয়ে কিম্ভূতকিমাকার একটা বস্তু বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে যায় এক অভিনেত্রী বান্ধবীর কাছে, প্রথম রজনীর কিংবা কোন "চ্যারিটি" শোয়ের টিকিট জোগাড়ের চেষ্টা করে। ওখানকার কাজ সেরে হয় ষ্টুডিওতে আসে, নয়তো কোন সিনেমা হলে ঢোকে। পরে কোন এক নামজাতা বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে আসে। সকলেই অলগাকে পছন্দ করে ওর সুখ্যাতি করে। সকলেই বলে—অলগা ভালো, অলগা সুন্দরী, অলগা অসাধারণ···নামকরা যারা, তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, ও যদি নিজেকে এ-ভাবে নষ্ট না করে তাহ'লে এক সময়ে ও বেশ নাম করতে পারবে। অলগা গান করে, পিয়ানো বাজায়, ছবি আঁকে, মাটির মূর্তি গড়ে, সখের দলে অভিনয় করে। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে এ-সব করে না, যথাসাধ্য চেষ্টা করে ভালোভাবে করতে। যা-কিছু সে করুক না কেন—আলো জ্বালা, বেশভূষা করা কিংবা কারোর গলায় টাই পরিয়ে দেওয়া—সব কিছুই সে নিখুঁৎভাবে করবার চেষ্টা করে। নামকরা বন্ধুদের এবং পরিচিত লোকদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার মধ্যে তার যে-রকম দক্ষতা ফুটে বেরোয় অন্য কিছুতেই তেমন ফোটে না। কোন লোকের মধ্যে নতুন কিছু

দেখলেই অলগা তার সঙ্গে পরিচয় ক'রে বন্ধুত্ব পাতায়, ওর বাড়ীতে খাবার জন্যে অনুরোধ করে। যেদিন কোন নতুন লোকের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়, সেদিনটা ওর কাছে সত্যিই মধুর বলে মনে হয়। নামকরা লোকদের ও শ্রদ্ধা করে, গর্ব করে, রাতে তাদের স্বপ্ন দেখে। তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে ও সদাই ব্যগ্র, আর সে ব্যগ্রতা কিছুতেই ও মন থেকে দূর করতে পারে না। পুরনো বন্ধুদের ভুলে যায়, নতুন বন্ধুদের নিয়ে উঠে পড়ে লাগে। কিছুদিন পর তাদেরও ভালো লাগে না, তাদের সঙ্গ বিরক্তিকর মনে হয়। নতুন বন্ধুদের জন্যে সে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখা পেলে অন্যদের খোঁজ করে। কেন? অলগা এরকম করে কেন?

চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে সে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বেরতে বলে। স্বামীর সহজ সরল রসিকতায় আনন্দে আটখানা হয়ে অলগা মাঝে মাঝে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, হাত দু'টো দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে চুমু খায়।

স্বামীকে বলে "দেখো, তুমি সবই জান, সবই বোঝ, ঈশ্বর মন তোমার। কিন্তু বড় বড় তোমার দোষ যে, আর্টের দিকে তোমার কোন উৎসাহ দেখি না। ছবি এঁকা বা গান বাজনা নিয়ে তুমি তো মোটেই মাথা ঘামাও না, কেন বলো তো?"

"ও-সব আমি বুঝি না। জীবন ভোর শুধু বিজ্ঞান ও ওষুধপত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করলাম। ওদিকে মন দেবার ফুরসোত হলো কই?"

"আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ না দেওয়াটা খুব খারাপ দেখায়।"

"কেন? তোমার বন্ধুরা তো বিজ্ঞান বা ওষুধপত্রের বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করে না। কই, তুমি তো তাদের দোষ ধরো না? যে যার নিজেরটাই নিয়ে আছে। ছবি বা সিনেমার বিষয় আমি কিছু জানি না বা বুঝি না। দেখো, একদল চালাক লোক জীবন-ভোর শুধু ঐ সব নিয়ে মেতে থাকে আর একদল ঐগুলোর পেছনে অজস্র টাকা খরচ করে—দুই দলেরই প্রয়োজন। আমি ও-সব বুঝতে পারি না, তাই বলে এই মানে করো না যে, আমি ও-গুলো অবজ্ঞা করি।"

"কই, তোমার হাতটা দেখি!"

খাওয়া-দাওয়া সেরে অলগা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়। পরে থিয়েটার বা অর্কেস্ট্রা পার্টিতে যায়। কোনদিনই রাত দুপুরের আগে ফেরে না। রোজই এক-ভাবে চলে।

বুধবার ও কোথাও বেরোয় না। কেন না ঐ দিন সন্ধ্যের সময় সকলে ওর বাড়ীতে আসে, ওদের নিয়ে চলে আর্টের আলোচনা। নামকরা অভিনেতা বন্ধুটি আবৃত্তি করে, গাইয়ে গান গায়, কেউ কেউ বা অলগার "এ্যালবামে" ছবি এঁকে দেয়, বীণা-বাদক বীণা বাজায়। অলগা নাচে, গান করে, ওদের আনন্দ দান করে। আবৃত্তি, অভিনয় ও গানের মধ্যে বিরামের সময়টুকু চলে সাহিত্য, অভিনয় ও শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা। বান্ধবীদের কাউকে দেখা যায় না। কেন না অভিনেত্রী ও ঐ মেয়ে-মহলি ছাড়া অলগা মেয়েদের হেয় জ্ঞান করে। প্রত্যেক বুধবারে কেউ না কেউ নতুন অতিথি আসে। ওদের এই আসরে ডিমভকে দেখা যায় না, কেউ ওর জন্যে ভাবেও না। ঠিক সাড়ে এগারোটার পর রান্নাঘরের দরজা খুলে যায়, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত দু'টো ঘসতে ঘসতে সহজ সরলভাবে হেসে ডিমভ্ বলে খাবার দিয়েছে, আপনারা আসুন।"

সকলে সারি হয়ে দাঁড়ায়, পরে খাবার ঘরে চলে আসে। টেবিলের ওপর ডিসে করে সাজানো বিস্কুক, একতাল মাংস, পানীর ও নানারকম শাক্-সব্জী আর মদ ঢালবার দু'টো গ্লাস—একই রকমের খাবার চলে আসছে চিরকাল ধরে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে অলগা, বলে "তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! কপালটার দিকে চেয়ে দেখো তোমার, ঠিক যেন "বেঙ্গল টাইগার।"

খেতে খেতে ওরা ডিমভের দিকে চেয়ে দেখে "না, সত্যিই লোকটা ভালো।" ঐ পর্যন্ত, পরক্ষণেই ওরা ওর কথা ভুলে যায়, আবার অভিনয় ও গানের আলোচনা আরম্ভ হয়।

বিয়ের পর প্রথম দু'সপ্তাহ ওদের বেশ সুখে কাটে। তৃতীয় সপ্তাহ কিন্তু ভালো ভাবে কাটে না। চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে ডিমভ্কে হাসপাতালের বিছানায় দু'দিন

শুয়ে থাকতে হয়। সুন্দর কালো চুল কেটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। অলগা স্বামীর পাশে বিছানায় বসে কাঁদে। একটু ভালো হলে মাথায় একটা সাদা রুমাল বেঁধে দেয়, স্বামীকে ঘাবারের মতো সাজায়। ওরা দু'জনেই এতে আমোদ উপভোগ করে। তিনদিন পর ডিমভ্ সম্পূর্ণ সেরে ওঠে এবং হাসপাতালে যাওয়া আরম্ভ করে। আবার নতুন করে বিপদ দেখা দেয়।

একদিন খাবার সময় ডিমভ্ বলে "আমার সময়টা এখন ভালো যাচ্ছে না। আজ চারটে মরা কেটেছি, বাড়ী এসে দেখি দু'টো আঙুল কেটে গেছে।

অলগা ভয়ে শিউরে ওঠে। ডিমভ্ হেসে বলে" ও কিছু না, মরা কাটতে গিয়ে ও-রকম কতবার কেটেছে।

কখন ডাক্তারের রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে এই চিন্তায় অলগা ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ভালোয় ভালোয় যাতে বিপদ কেটে যায় তার জন্যে রোজ রাত্রিতে প্রার্থনা করে। দিন কয়েক কেটে গেল, ডাক্তারের কোন ক্ষতি হ'লো না। ফিরে এলো সুখ ও স্বস্তিতে ভরা দিনগুলো। বর্তমান দিনগুলো হয়ে উঠলো আনন্দ ভরপুর। শীঘ্রই আসবে বসন্ত আনন্দের ডালি সাজিয়ে, তাদের জীবন বয়ে যাবে চিরসুখের মধ্যে দিয়ে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসের জন্যে রয়েছে গাঁয়ের ছোট্ট বাড়ী, শহর থেকে অনেক দূরে। সেখানে চলবে পায়ে হেঁটে বেড়ানো, চলবে ছবি আঁকা, লেকে মাছ ধরা, আর চলবে নাইটিঙ্গিলের মিষ্টি গান শোনা। জুলাই থেকে শরৎ পর্যন্ত চলবে শিল্পীদের জলসা অভিযান। অলগা শিল্পীগোষ্ঠীর একজন স্থায়ী সদস্যা, তাই ঐ অভিযানে সে অংশ গ্রহণ করবে। এরই মধ্যে অলগা একজোড়া ভ্রমণের পোষাক তৈরী করিয়েছে, ভ্রমণের জন্যে সে কিনেছে রং, তুলি ও ব্রাশ, ক্যানভাস ও নতুন একটা রঙদানি। বিয়াবস্তকী প্রায়ই অলগার কাছে আসে, দেখে যায় অলগার কী রকম ছবি আঁকা চলছে। অলগা আঁকা ছবিগুলো দেখালে ও হাত দুটো পকেটে পুরে একটু ঠোঁট চেপে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে বলে, বাঃ! বাঃ! মেঘগুলো যেন গর্জন করছে, সন্ধ্যেবেলার আলোটা ভালো ফোটেনি……সামনের জমিটা জগাখিচুড়ি হয়েছে, ছবিটার মধ্যে এমন একটা জিনিষের অভাব…আমি যা বলতে চাইছি বুঝতে পারছো?……ছবিটা ভালো ভাবে ফুটে ওঠে নি। কুড়ে ঘরটা মড়ার মতো হয়ে উঠেছে…ঐ কোনটা আরো কালো হওয়া দরকার। সব মিলিয়ে মন্দ হয়নি ছবিটা—আমি খুশী হয়েছি। সত্যি বলছি আমি খুশী হয়েছি।"

(৩)

একদিন সোমবার বিকেলে ডিমভ্ কিছু ফল ও মিষ্টি কিনে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়ে। পনেরো দিন হলো ও স্ত্রীকে দেখতে পাইনি, তাই তাকে দেখতে যাচ্ছে। রেলগাড়ীর কামরায় বসে ওর ভীষণ খিদে পায়। জঙ্গলের মধ্যে স্ত্রীর ছোট্ট বাড়ীটা খুঁজে বেড়াবার সময় খিদে আরো বেড়ে ওঠে। কল্পনা করে যেন ও স্ত্রীর পাশে বসে একসঙ্গে খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। খুশী মনে ও হাতের মোড়াটার দিকে তাকায়—ওর মধ্যে আছে নোনতা খাবার, ক্ষীর ও মাছ।

সূর্য তখন ডুবুডুবু এমন সময় ডিমভ্ স্ত্রীর ছোট্ট বাড়ীটা দেখতে পায়। বুড়ো চাকর জানায় অলগা বাড়ী নেই, এখুনি ফিরবে। সাদাসিদে ছোট্ট বাড়ী, খুব বেশী উঁচু নয়। দেয়ালের ওপর টুকরো চিঠির কাগজ মারা, গর্ত ভর্তি এবড়ো-খেবড়ো মেঝে, বাড়ীর মধ্যে মাত্র তিনটে ঘর। একটার মধ্যে বিছানা পাতা, পরেরটায় ক্যানভাস, আঁকবার তুলি, মরদা কাগজ, চেয়ারে ও জানলার ওপর পুরুষদের কোট ও টুপী। তৃতীয়টার মধ্যে তিনজন অচেনা লোক বসে আছে, ওদের মধ্যে দু'জনের গায়ের রঙ কালো মুখে একগাল দাড়ি। অপরজনের দাড়ি কামানো, দোহারা শরীর, খুব সম্ভব একজন অভিনেতা। টেবিলের ওপর কেটলিতে জল ফুটছে।

ডিমভের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় অভিনেতা জিজ্ঞেস করে "কাকে চান? অলগা আইভানোভ্নাকে? ওরই সঙ্গে দেখা করতে চান?

ডিমভ্ অপেক্ষা করে। একজন দাড়িওয়ালা লোক ঘুম ঘুম চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দেখে, কাপে চা ঢেলে ওকে জিজ্ঞেস করে "এক কাপ হবে নাকি?"

খিদে ও ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ডিমভ্ চা খায় না। কিছু পরেই পায়ের ও হাসির শব্দ শোনা যায়। দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে অলগা ঘরে ঢোকে, ওর মাথায় টুপী,

হাতে একটা বাক্স। পেছনে লোকে রিয়াবড্‌কী, হাতে বড় ছাতা ও মোড়া টুল একটা।

আনন্দে আটখানা হয়ে অলগা চিৎকার করে ওঠে, "ডিমভ! ডিমভ্, তুমি! ডিমভের বুকের ওপর মাথা ও হাত দু'টো রেখে অলগা থেমে থেমে বলে "ডিমভ্··· আমার ডিমভ্, এতোদিন কেন আসনি? কেন?···কেন আসোনি এতোদিন?"

কী করে আসি বলো? আমি সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে যখন আসার অবসর মেলে, ওদিকে তখন আসবার গাড়ী জোটে না।"

তোমাকে দেখে কী-যে আনন্দ হচ্ছে, কেমন করে বলি সে কথা। রাতের পর রাত তোমার স্বপ্ন দেখেছি, মনে মনে ভেবেছি হয়তো তোমার কোন অসুখ করেছে। আমি যে তোমাকে কতো ভালোবাসি। ভাগ্যিস্ তুমি এসে পড়েছো, তা না হলে যে কী হতো ভাবতেই পারছি না। তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে, এ বিপদের হাত থেকে তুমিই পারবে আমাকে বাঁচাতে।" ডিমভের টাইটা বাঁধতে বাঁধতে হেসে বলে, কাল এখানে একটা বিয়ে আছে। ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ অপারেটারের বিয়ে। ছেলেটা দেখতে শুনতে ভালো, চাদাক-চতুরও বটে। আমরা সকলেই তাকে পছন্দ করি, তাকে কথা দিয়েছি তার বিয়েতে আমরা সকলেই যাব। সে গরীব, সে সঙ্গীহীন, সে লাজুক। তার বিয়েতে না-যাওয়াটা খুব খারাপ দেখাবে। গির্জার প্রার্থনা শেষ হলে ওদের বিয়ে হবে। আমরা গির্জা থেকে সোজা কনের বাড়ীতে যাব·····। সেখানে আছে লতা-বীথিকা, পাখীর কাকলি, ঘাসের ওপর রোদের ঝিলিমিলি আর থাকবো আমরা রং-বেরংয়ের পোষাক পরে প্রকৃতির আঁচল কোল জুড়ে। মুখ শুকনো করে অলগা বলে কিন্তু কী পরে আমি গির্জায় যাব। জামা নেই, দস্তানা নেই, ফুল নেই—আমার কিছুই নেই যে ডিমভ্···। তুমি আমাকে বাঁচাও এ বিপদ থেকে। আমাকে রক্ষা করো। কপাল ভালো যে তুমি এসে পড়েছো, এ যাত্রা তুমি আমাকে বাঁচাও। এই নাও চাবিটা নাও, শীগগির বাড়ী চলে যাও। আমার বেগুনি রংয়ের জামাটা নিও, ওটা সামনেই ঝুলছে দেখতে পাবে···। যে ঘরে আমরা গান-বাজনা করি, সেই ঘরের মেঝেতে দুটো পিচবোর্ডের বাক্স দেখতে পাবে। ওপরের বাক্সটা খুললে টুকরো টুকরো জরি ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না, তারই তলায় ফুলের তোড়া আছে। সবগুলোই নিয়ে এসো, দেখো নষ্ট করো না যেন। ওরই থেকে পছন্দ মতো নেবো। আর আসবার সময় আমার জন্যে একজোড়া দস্তানা কিনে এনো, ভুলো না যেন।

"ঠিক আছে, কাল গিয়েই ওগুলো পাঠিয়ে দেবো।"

ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে অলগা বলে, "কাল! কাল হয়তো তুমি ঠিক সময়ে গাড়ী ধরতে পারবে না। সকাল ন'টায় প্রথম গাড়ী ছাড়ে, এখানে এসারোটায় ফেরে। না, না, লক্ষ্মীটি, আজই চলে যাও। কাল যদি নিজে না আসতে পার লোক দিয়ে জিনিষগুলো পাঠিয়ে দিও। নাও ওঠো, দেরী হয়ে যাচ্ছে। এখুনি গাড়ী ছাড়বে।"

"আচ্ছা, যাচ্ছি।"

অলগার চোখ জলে ভরে ওঠে। ও বলে "তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না। কী করি বলো, এখন বুঝতে পারছি অপারেটারকে কথা দিয়ে কী বোকামিটাই না করেছি।"

এক গ্লাস চা গোগ্রাসে গিলে, বিস্কুটটা তুলে নিয়ে ডিমভ্ হেসে ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ায়। কালো লোক দু'টো ও অভিনেতা বাকি খাবারগুলো শেষ করে।

(৩)

জুলাই মাসের নিঝুম চাঁদনী রাত। ভল্‌গার ওপর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অলগা, একবার জলের দিকে আর একবার সুন্দর নদী তীরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, পাশে দাঁড়িয়ে বলে চলে—জলের ওপর ঐ যে কালো ছায়া, ওটা সত্যি ছায়া নয়—ওটা স্বপ্ন। সব কিছুই ভুলে যাওয়া ভালো, মরে গিয়ে মানুষের স্মৃতিতে জেগে থাকা ভালো। চার পাশে এই ফুরেলিকা ভরা চকচকে জল, ঐ অসীম আকাশ, শোকাকুল বিষণ্ণ এই নদীতীর, সব কিছুই আমাদের অন্তঃসার শূন্য জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় এমন কিছু—যা মহৎ যা অনন্ত, যা বরণীয়। অতীত নগণ্য অনুরাগ বিহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এমন কী এই সুন্দর চাঁদনী রাত, যা আর কখনো ফিরে আসবে না, এখুনি শেষ হবে—অনন্তের মাঝে হবে বিলীন। কেন? তবে কেন এই জীবন?

অলগা কখনো ওর কথা শোনে; কখনো-বা ও মগ্ন হয়ে পড়ে রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে। অলগা মনে মনে ভাবে—আমি অমর আমি কখনো মরবো না। যে-জিনিষ সে আগে কখনো দেখেনি—জলের ওপর আলোর সেই ঝিলিমিলি, ঐ আকাশ, এই নদীতীর, কালো ছায়া আর অপার আনন্দ ওর মন ভরিয়ে তোলে, প্রাণে জাগায় আশা। ওর মনে হয় একদিন সে নাম-করা শিল্পী হতে পারবে। সুদূর জ্যোৎস্নালোকের পরপারে, অনন্ত অসীম শূন্য ছাড়িয়ে যে জগৎ সেখানে আছে তার সফলতা, তার যশ, আর তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা···। দূরের পানে তাকিয়ে দেখে, মনে হয় যেন ভীড় লেগেছে ওখানে,আলো হয়ে উঠেছে জায়গাটা, গান-বাজনায় আর আনন্দে মেতে উঠেছে সকলে। গায়ে ওর সাদা পোষাক, চারিদিক থেকে যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে ওর ওপর। গরাদের ওপর হেলান দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে লোকটা, অলগার মনে হয় সত্যিই ও মহৎ, সত্যিই ও প্রতিভাবান। আজ পর্যন্ত ও যা করেছে সবই অদ্ভুত, সবই নতুন, সবই অসাধারণ। ভবিষ্যতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন ওর ঐ অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হবে, তখন ও যা করবে সবই হবে সুন্দর, সবই হবে মহৎ। সব কিছুই প্রকাশ পাবে ওর চোখে-মুখে, ওর চাল চলনে ওর কথা বলার ধরণে, আর ওর দৃষ্টি ভঙ্গিতে। দিনের অবসানে প্রকৃতির বুকে ফুটে ওঠে যে আরক্তিম বর্ণচ্ছটা—ওর তুলিতে তা মূর্ত হয়ে ওঠে অনবদ্য ব্যঞ্জনায়। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আর রাতের ছায়া—কুহেলিকা সজীব হয়ে ওঠে ওর তুলির আঁচড়ে। এক কথায় সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে অনায়াসেই ও সঞ্চার করে মোহিনী-মায়া—যার ফলে ওর ছবি দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। স্বাধীন জীবন ওর, ঠিক যেন মুক্ত বিহঙ্গ।

অলগা কাঁপতে কাঁপতে বলে—"শীত করছে।"

ওর গায়ে নিজের কোটটা জড়িয়ে দিয়ে রিয়াবভস্কী উত্তর করে—"তোমার মোহে মুগ্ধ আমি। কিসে আজ তোমায় এতো মনোহর করে তুলেছে?"

ও একদৃষ্টে অলগার দিকে তাকিয়ে আছে, ভয়াল সে চাহনি। ওর দিকে তাকাতে পারে না অলগা। কানের কাছে মুখ রেখে ও অলগাকে বলে—"আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছি। অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে ও বলে চলে আমি সব কিছু ছেড়ে দেবো, একটিবার মাত্র বলো ···আমাকে ভালোবাস···ভালোবাস আমাকে···"

চোখ বন্ধ করে অলগা বলে—"ও-ভাবে বলো না, বিশ্রী শোনায়। ডিমভের কী হবে?"

"ডিমভের এতে কী আসে যায়? ওর কথাই বা উঠছে কেন? ওর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? ওর কথা আজ নয়—আজ শুধু অলগা, শুধু আকাশের ঐ চাঁদ, প্রকৃতির এই সৌন্দর্য, আমার প্রেম, শুধু তুমি আর আমি···আজ শুধু আনন্দ। আজ কিছু মানবো না, পিছনের দিকে তাকাবো না···আমি চাই ক্ষণিক একটি মুহূর্ত।"

অলগার বুকের ভেতরটা জোরে জোরে কাঁপতে আরম্ভ করে, স্বামীর কথা মনে করবার চেষ্টা করে। অতীতের সব ঘটনা—তার বিয়ের কথা, ডিমভের কথা, আজ অস্পষ্ট মনে হয়, মনে হয় অনেক দূরে সরে গেছে তারা। সত্যিই তো ডিমভের কথা আজ কেন? ওর জন্যে সে কী করতে পারে? সত্যিই ডিমভ্ বলে কেউ ছিলো, না সবই স্বপ্ন?

হাত দু'টো দিয়ে মুখ ঢেকে ও আপন মনেই বলে চলে —"যতটুকু আনন্দও দিয়েছে ডিমভ্‌কে, একজন সাধারণ পুরুষের পক্ষে ততটুকুই যথেষ্ট। যা ইচ্ছে হয় তারা করুক, দিক তারা আমার অভিশাপ। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে দেখাবো আমি ওদের কত ঘৃণা করি···একবার অন্ততঃ চেষ্টা করতে দোষ কী? হায় ভগবান কী ভয়ানক অথচ কী সুন্দর!

রিয়াবভস্কী ওকে জড়িয়ে ধরল, অলগা দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। রিয়াবভস্কী বলে—"কী সুন্দর রাত! তুমি কী আমায় ভালোবাস না?"

"হাঁ, কী সুন্দর রাত।" ওর দিকে তাকিয়ে দেখে ওর চোখে জলের ধারা। আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরে অলগা।

ডেকের অপর দিক থেকে কে যেন বলে ওঠে—এক মিনিটের মধ্যে আমরা "কিনেস্‌মায়" পৌছবো। খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা জোরে জোরে পা ফেলে ওদের পাশ দিয়ে চলে যায়।

হাসতে গিয়ে অলগা কেঁদে ফেলে, যেন হরিষে-বিষাদ। বলে "আমাদের জন্যে খাবার আনাও।"

উত্তেজনায় রিয়াবভস্কী ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে। মাথাটা গরাদের ওপর রেখে অলগার দিকে তাকিয়ে বলে "আমি শ্রান্ত, আমি ক্লান্ত, আমি অবসন্ন।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বেলেঘাটা বুনিয়াদি বিদ্যাপীঠ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্যে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এদিকে জনসাধারণের যেমন দৃষ্টি আছে তেমনি সরকারের লোকহিতকর এই অনুষ্ঠানের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাই। ছেলেদের ও মেয়েদের কি ভাবে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায় সেদিকেও লক্ষ্য পড়িয়াছে। ছেলেদের বিশেষতঃ এক হিসাবে শিশুদের যেমন যথন অনুযায়ী শিক্ষার আবশ্যক, তেমনি বালিকাদের যথন উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তাও দিন দিনই আমরা সকলে অনুভব করি। প্রথম কথা—বালক ও বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থাটা আলাদা রকমের হওয়া চাই। ছেলেমেয়েদের মনের অবস্থা, প্রতিবিধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে আমরা দেখিয়াছি—সে বেশীদিনের কথা নয়,ইংরেজ আমলেই শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ তাহারা ছিলেন পরাধীন।

ছাত্রছাত্রীদের সমবেত প্রার্থনা

তাহাদের আদর্শ ছিল ভিন্নরূপ। মানুষরূপে জাতিকে গড়িয়া তুলিবার মত মনের ভাব তাঁহাদের অনেকেরই ছিল না। তাঁহারা চাহিতেন একটা অধীন জাতি গড়িয়া তুলিতে—সেজন্যে শিক্ষার আদর্শও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সে সময়ে ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিলেও যাঁহারা এদেশে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নাম উল্লেখ করিতে হয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে—যাহারা দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কত বিরাট ছিল সে আমাদের জাতীয় জীবনে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা দু এক কথায় বলা চলে না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাঁহার দান ছিল অসাধারণ। আমরা ছেলেবেলা তাঁহার লেখা বর্ণপরিচয় হইতে বর্ণমালা শিখিয়াছি। বোধোদয় হইতে নূতন নূতন বিষয় জানিয়াছি এবং সত্য কথা বলিতে কি—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে তিনি যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন একথা আমাদের সকলকেই মানিতে হইবে। আমাদের এখানে সেকথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। বিদেশীর মধ্যে খৃষ্টান ধর্মযাজক কেরী, মার্শম্যান, ডেভিড হেয়ারের নাম আমরা ভুলিতে পারি না। শিক্ষার ক্ষেত্রে—এক কথায় কেরী সাহেব বাংলা সাহিত্যের একজন বড় স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। তাঁহার লেখা শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা বড় কম নয় তাহা সকলেই জানেন। একথায় যদি শতবর্ষ পূর্বের বাংলা সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে হয়, তবে আমরা কখনও ডেভিড হেয়ারের নাম ভুলিতে পারিব না। হেয়ার সাহেব ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঘটনাও যেন ১৭৭৫ সালে ডেভিড হেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঘড়ির ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন। সে সময়ে এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায়ে কোন প্রতিযোগিতা ছিল না, কাজেই সহজে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি বেশ সুন্দর গল্প আছে। রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ীতে হেয়ার সাহেব মাঝে মাঝে যাইতে ভাল বাসিতেন। তিনি বাঙ্গালীদের বড় ভালবাসিতেন। বন্ধুভাবে লোকের বাড়ী যাইতেন, সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্য আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার ছিল বড়ই দুরবস্থা—বাংলা সাহিত্যের ত কথাই নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মনসামঙ্গল, ধর্ম-জ্ঞান, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী—এইরূপ কয়েকখানি প্রচলিত পুস্তক মাত্র ছিল। বালকবালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক কিছুই ছিল না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা পাইত। এই হেয়ার সাহেবের দ্বারা কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময়ে কি ভাবে ক্রমে ক্রমে চারিদিকে ইংরেজী ও বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে জাতীয় উন্নতিধারায় এক নূতন ভাব এবং নবশক্তির অভ্যুদয় এবং জাতীয় জীবনের উন্নতিধারায় সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেকালের কথা লিখিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, "সংস্কারের বিভিন্ন উপায়ে এই সকল ভাব জাতীয় হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, প্রথম রাজনীতি প্রকৃতির আন্দোলনাদির দ্বারা, দ্বিতীয় সংবাদপত্রাদির দ্বারা, তৃতীয় জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা। এইজন্য সর্বদেশেই এই তিনটীর প্রতি বিদেশীয় রাজাধিপের তীব্র দৃষ্টি থাকে। তিনটীকেই তাহারা শাসনে রাখিবার চেষ্টা করেন। তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে; তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়াই জানা উচিত। আমরাও দেখিতেছি, আমাদের রাজ-পুরুষগণ এই তিনটীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেছেন।

এমন কি শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী হইতে জাতির উদ্দীপনার অনুকূল যাহা কিছু সমুদয় যত্নপূর্বক বর্জন করিতেছেন। জাতীয় ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্বের দৃষ্টি তাঁহাদিগকে শিশুদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। সুতরাং গবর্মেণ্ট তাহা রাখিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই, দেশের লোকের এ বিষয়ে মনোযোগ না থাকাতে শিশুশিক্ষার যথেষ্ট দুর্গতি হইতেছে, যাহাতে মানুষ মানুষ হইতে পারে সে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না, অনেক স্থলে লেখার নামে অলভ্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

যাক সে কথা; শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছাড়িয়া দিলেও সাহিত্যের সুদূর-প্রসারিত ক্ষেত্র পড়িয়া থাকে, যাহাতে স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতির উন্নতির আলাপপ্রসঙ্গের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য স্বজাতিপ্রেমিকদিগের হস্তে একটা মহা অস্ত্রস্বরূপ। প্রাচীনকালের ঋষিগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে ইন্দ্র—বণিকের অর্থপোত যেমন ধন বহন করিয়া আনে, তেমনি তুমি আমাদের জন্য ধন বহন কর।" সাহিত্য কি বণিকের অর্থপোতের ন্যায় নয়? ইহাতে করিয়া কি আমরা স্বদেশ ও বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যের খনি হইতে, বিদেশীয় চিন্তার সাগর হইতে, মণি মুক্তা বহন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাদৈন্য মোচন করিতে পারি না? এ প্রশ্নের উত্তর এখন আমরা দিতে পারি।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের চলিয়াছে শিক্ষা, সংস্কৃতিও স্বাধীনতা লাভের নূতন যুগ। এই এগারো বৎসরের মধ্যে নানাভাবে আমরা অগ্রসর হইতেছি এবিষয় কাহারও অজ্ঞাত নয়। নূতন নূতন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতি চলিয়াছে প্রগতির পথে। আমাদের ভারতের গণতন্ত্রের পরিচালকগণ সকলেই বুঝিয়াছেন—প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ছোটবড় সকলকেই শিক্ষিত করিয়া তোলা একান্ত দরকার। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি এইদিকে দরকার অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বর্তমান সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। আমি এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি শিক্ষার সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার দিতে কিছুদিন পূর্বে মাদাম মণ্টেসরী এদেশে আসিয়াছিলেন। এই মণ্টেসরীর নাম আজকাল পৃথিবীর সভ্যদেশের সকলেই জানেন। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই—বাড়ীতে ও বাহিরে যে সব ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে না, তাহারা অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক পাড়ায়ই কি শহরে কি পাড়াগাঁয়ে এমন ছেলে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা বাড়ী ঘরের কোন খবর রাখে না। যাহাদের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, বাপ মা অর্থের অভাবে স্কুলে পাঠাতে পারেন না সেইজন্য তাহারা রাত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়, গল্প করে, মারামারি করে, নির্বীহ কুকুর বিড়ালকেও প্রহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না—ফলে ইহারা বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শত্রু হইয়া পড়ে। চুরি করিতে শিখে, পকেট কাটিয়া হয় খুন, হয় অগ্নিদগ্ধ।

আমি এমনও দেখিয়াছি যে অনেক সময় গুরুমহাশয়ের ভয়ে ছেলে-মেয়েরা পাঠশালায় বা স্কুলে যাইতে রাজি হয় না। আমাদের পাড়ার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে—পাঠশালায় বা স্কুলে যাইব বলিয়া ছেলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়—সারাদিন পথে ঘাটে খেলিয়া বেড়ায়—সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে বাড়ী যায়। এরূপ অবস্থায় কি ভাবে এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের এমন ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়—যাহাতে তাহারা আনন্দের সহিত লেখাপড়া শিখে—পড়িবার জন্য স্কুলে যায় এবং সেখানে শিক্ষা শিক্ষকেরা যাহা শেখান এবং ছেলেমেয়েরা নিজেদের চেষ্টায় যাহা শিখে তাহা বেশ আনন্দের সহিত শিখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে।

এইরূপ একটি আনন্দময় পরিবেশের চেষ্টা করিয়া ইটালি দেশের ডাক্তার মণ্টেসরী নামে একজন বিদুষী মহিলা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মণ্টেসরী চিকিৎসা বিদ্যায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বভাবও কার্যকর্ম বিশেষভাবে পর্য-বেক্ষণ করিলেন। পরেকালে স্থির করিলেন যে ছেলেমেয়েরা যাহাতে বেশ আনন্দে লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহার জন্য একটি আদর্শ বিদ্যালয়

ব্যায়াম

স্থাপন করিতে হইবে। যেমন কথা তেমনি আরম্ভ হইল কাজ। তিনি ইটালির রাজধানী রোম শহরে তাঁহার আদর্শের কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিদ্যালয়গুলি হইল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। ছেলেমেয়েরা সেই বিদ্যালয়ে আসিয়া নিজেদের ইচ্ছা মত বেড়িয়ে বেড়ায়, বিদ্যালয়ের বাগানে মাঠে খেলিয়া বেড়ায়, ঘুরিয়া বেড়ায় মনের আনন্দে—যেমনি খেলে তেমনি লেখাপড়াও করে। আমাদের দেশে এক সময় পাঠশালায় ছেলেরা পড়িতে যাইবার সময় একখানা ছোট মাদুর নেয়—যেমন মাঠে গেল দুই তিনেটগুলি, তারপর মাদুর বিছাইয়া বসে—তেমনি মণ্টেসরী বিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যেক ছাত্র এবং ছাত্রীর এক একখানি ছোট কার্পেটের আসন থাকে। সেই কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের কাজ করে। তাহাদের হাতে অক্ষরের টিকিট দেওয়া হয়—তারপর সেই অক্ষর সাজাইয়া তাহারা একটি বাক্য রচনা করে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ের ঘরে তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ছোট ছোট টেবিল দেওয়া

হয়, আর সেই টেবিলের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একখানি চেয়ার পায়। যাহারা ছোট তাহাদের জন্য ছোট ছোট টেবিল চেয়ার থাকে। মণ্টেসরী তাহার বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের কাজগুলি নিজেদের দিয়া করাইয়া ফেলেন। এই ভাবে ছেলেমেয়েরা সকল রকমের কাজ করিতে শিখে এবং তাহাদের চলাফেরা কথাবার্ত্তা সুন্দর হয়। কোন জিনিষ শিখিবার সময় শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে আসিয়া বসেন। তাহাদের নাম ধরিয়া বেশ স্পষ্ট করিয়া ডাকেন এবং সেইদিন যাহা শিখাইবার শিখাইয়া যেন, তাহারাও আনন্দের সহিত প্রফুল্লমনে শিখিয়া থাকে। বিদ্যালয়গুলিতে নানারকমের খেলনা থাকে, অক্ষর তৈরী করিবার সরঞ্জাম থাকে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য নানারকম জিনিষ থাকে। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী যখন এই জিনিষগুলি পায়, তখন তাহারা সেই জিনিষগুলি তাহাদের নিজেদের বলিয়া মনে করে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্র বা প্রত্যেক অক্ষর লেখা শিখে শিখিতে করিতে তাহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস বাড়িয়া যায় এবং

ব্রতচারী নৃত্য

তাহাদের কাজের মধ্যে এক সুন্দর শৃঙ্খলা আসে। আমাদের দেশে যেমন বস্তি আছে—তেমনি রোম শহরে ও অনেক পল্লী আছে যেখানে অনেক গরীব বাস করে। সেই পল্লীর নাম ঘেটো। শ্রীযুক্তা গ্যালী নামে একটী মহিলা সেখানকার গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁর এমনি আগ্রহ ছিল যে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া তিনি যে কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তিনি সেই সব টাকা দিয়া পল্লীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন। যাহাদের কেহ ডাকে না, যাহাদের বস্তীর ছেলেমেয়ে বলিয়া উপেক্ষা করে সেই সব ছেলেমেয়েদের মাঠে ঘাটে ডাকিয়া আদর করিয়া তিনি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; তখন তাহারা দেখিল এক অপূর্ব্ব রাজ্যে আসিয়াছি। এখানে তাহারা মনের আনন্দে খেলা করে, গান গায়, দৌড়াদৌড়ি করে, হাত পা সঞ্চালন করিতে পারে তাহাদের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই। ইহারা একটা নূতন রাজ্যে আসিয়া নূতন মানুষ হইয়া গেল।

মাইমনা গ্যালী ভাল করিয়া তাহাদের স্নান করিতে শিখাইলেন, পোষাকপরিচ্ছদ যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখিতে শিখাইলেন। সব-দিকেই তাহাদিগকে সুন্দর করিবার জন্য করিলেন অক্লান্তভাবে চেষ্টা এবং যত্ন। ডাক্তার মণ্টেসরী যখন এই বিদ্যালয়ের কথা শুনিলেন তখন তিনি নিজে আসিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

একবার তখনীন্তন ইটালির মহারাণী মার্গারেটা একটি মণ্টেসরী বিদ্যালয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। একটি মেয়ে তখন তাহার অক্ষরের বাক্স হইতে অক্ষরগুলি বাহির করিয়া সাজাইতেছিল। মহারাণী তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, মেয়েটি কিন্তু তাহার কাজ একমনে করিয়া যাইতেছিল। সেখানে একজন শিক্ষক দাঁড়াইয়া-ছিলেন—তিনি মেয়েটিকে বলিলেন—রোজা, মহারাণী এসেছেন—একবার তুমি দেখ। মেয়েটি উত্তর করিল—হাঁ আমি মহারাণী এসেছেন, কিন্তু মহারাণী জানেন—আজকে পড়াশুনার আগে বানান শিখবার জন্য অক্ষরগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে।

ডাক্তার মণ্টেসরী এইভাবে ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে ভাল জিনিষ—যেমন ভাল ছবি, ভাল খেলনা ও পশুপাখীর চিত্র রাখিয়া তাহাদের সব জানিবার কৌতূহল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন।

মণ্টেসরীর এই শিক্ষার আদর্শ এখন ইউরোপের ও আমেরিকার সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতেছে। সুইজারল্যাণ্ড ইউরোপের একটি সাধারণ-তন্ত্রী দেশ। সেখানকার প্রত্যেকটি অঞ্চলে মণ্টেসরীর আদর্শ অনুসৃত হইতেছে। আমাদের ভারতবর্ষেও মণ্টেসরীর শিক্ষাপ্রণালী বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শে চলিতেছে।

সেদিন আমি ছেলেবাটা অঞ্চলের বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম সেদিন ছিল বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা দিবস; পরিবেশটি মনোরম। রাস্তার একদিকে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বড় বড় সারি সারি অট্টালিকা—পূর্ব্বদিক উন্মুক্ত। দেখিতে বেশ লাগে। অনেকদিন পরে এ অঞ্চলে আসিয়াছি বলিয়া সবই নূতন লাগিল। চওড়া প্রশস্ত পথ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কাজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শুনিলাম পূর্ব্বে এই বিদ্যাপীঠ একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল; সম্প্রতি নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের উদ্যোগে উক্ত সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে বিদ্যাপীঠ একটি সুন্দর নিজস্ব বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি বাড়ীটিকে মিউজিয়ম করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য—ছেলেবাটা অঞ্চলের বস্তীর ছেলেমেয়েদের এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বালকবালিকাদের শিক্ষা দিবার জন্য, তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। দিন দিনই ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষিকারা সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষিত। এখানে নৃত্য, সঙ্গীত, সূচীবয়ন, কুটীর শিল্প এবং অন্যান্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলিতে অনুরোধ করা হইল। আমি গল্প বলিলাম, তাহারা হাসিতে হাসিতে গল্প শুনিল। তাহাদের মুখে ফুটিয়াছিল আনন্দের হাসি। তাহাদের সমবেত প্রার্থনা শুনিলাম, ব্রতচারী নৃত্য দেখিলাম, তাহার

দেখিলাম তাহাদের আঁকা ছবি, গড়া পুতুল, তৈরী রুমাল, জামা, কাপড়ের বিচিত্রবর্ণের ফুল। সুন্দরভাবে সাজানো আসনে দৃষ্টি করিয়াছে নিজেরা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। প্রত্যেক দিকেই দেখিলাম আনন্দ ও উৎসাহ—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সকলের জন্যেই দেখিলাম নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে।

শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। তাঁহারা বালক-বালিকাদের জননী প্রাণ লইয়া ভালবাসেন, স্নেহ করেন এবং শিক্ষা দিতেছেন—তাঁহাদের সকলের মুখেই দেখিলাম প্রসন্ন সুন্দর হাসি। আলাপ হইল এখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বিভাদেবীর সঙ্গে, পরিচয় হইল। তিনি যত্ন করিয়া আমাকে প্রত্যেকটি বিভাগ দেখাইলেন এবং কিভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা চলিতেছে তাহাও দেখাইলেন। এই বিদ্যাপীঠের পরিচালিকাগণীর মধ্যে যাঁরা আছেন তাদের কাহারো কাহারো সঙ্গে আলাপ হইল—শ্রীমতী সাম্বনা সেন, শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী প্রভৃতির সহিত। সকলেরই এই বিদ্যাপীঠের প্রতি দেখিলাম অসীম অনুরাগ। শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা, শ্রীমতী মায়া গুপ্তা প্রভৃতিরও অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্ন রহিয়াছে এই বিদ্যাপীঠের প্রতি।

আমার মনে পড়িল যোগবাশিষ্ট রামায়ণের একটি কথা—

কর্ম না করিলে পৃথিবী শস্যশূন্য, সূর্য্য আলোকশূন্য, অগ্নি তেজশূন্য, গ্রহগণ জ্যোতিঃশূন্য, বায়ু স্পন্দন ও জীবনী শূন্য এবং ব্রহ্মাণ্ড ভুবন অস্তিত্ব শূন্য হইত। তুমি, আমি, সে—কেহই থাকিতাম না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি শূন্য হইত। মেঘ আর জল দিত না, পর্ব্বত আর পৃথিবী ধারণ করিত না, নদী আর প্রবাহিত হইত না, সাগর আর সম্মিলনের আধার হইত না। পৃথিবী আর বহন করিত না। ফলতঃ সবই লোপ পাইত। অতএব কর্মই জীবন ও অকর্মই মৃত্যু ভাবিয়া সর্ব্বদায় কর্ম সাধনে তৎপর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।"

গল্পের আসর

" বিদ্যাপীঠের" পরিচালকবর্গণী এবং শিক্ষা কর্ম্মে যাহারা ব্রতী আছেন, তাঁহাদের নিকট এই সংবাদটি উদ্ধৃত করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। আমি আশা করি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এইরূপ শিশু ও বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যাভবন গড়িয়া উঠিবে।

বৃথা

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল

পুতুল খেলার দিনগুলোকে
ফিরিয়ে আনা যায় না—
রাজা রাণী হারিয়ে গেছে
কোন সে মনের অন্ধকারে
খোকা খুকুর বিয়ে খেলা
কেহ বা আজি খোঁজে তারে
আকাশ ভরা বাদল যে আজ
মনের আকাশ ছায় না—
পুতুল খেলার দিনগুলোকে
ফিরিয়ে আনা যায় না।

অচিন দেশের রাজকন্যা
সোনার কাঠি নিয়ে
ঘুমিয়ে ছিল হয়ত সেদিন
আপন সঙ্গোপনে
খুঁজতে গেলে আর পাবে না—
হারিয়ে গেছে মনে
রাজ পুত্তুর আসবে না আজ
হবে না কো বিয়ে
অচিন দেশের রাজকন্যা
সোনার কাঠি নিয়ে।

খুঁজে ফেরা বৃথা সে আজ
রোদ ছোঁয়া এই দেশে
হারিয়ে যেটা গেছে সে থাক্
সত্য হয়ে উঠবে শুধু
পাঁচ বছরের এইটুকু দাম
বিশ বছরে এসে
খুঁজে ফেরা বৃথা সে আজ
রোদ ছোঁয়া এই দেশে।

ময়ূর-নৃত্য

"ময়ূর-নৃত্য" নৃত্য-সঙ্গীতময় নৃত্য নাটিকা, তিনটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রতি অঙ্কের ভাবানুযায়ী মঞ্চ দিগন্ত-পটের পট, মঞ্চবৃক্ষ ও ময়ূর নৃত্যশিল্পীর সাজ-সজ্জা পরিবর্তিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে বিদূষকের প্রস্থান হবে যবনিকা পাত; ঐ সময়ের অন্তরালে শোনা যাবে ময়ূর-নৃত্যশিল্পীর নূপুর-ধ্বনির মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ। তৃতীয় অঙ্কের শেষে হবে যবনিকা-পতন।

প্রথম অঙ্ক

নাচেরে! ময়ূর নাচে, ময়ূর নাচে!
নাচে,
নাচে,
ময়ূর নাচে!
বীর্যাবিভায়
দীপ্ত ময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে।
নাচে সে নৃত্যাহরণ-বহ্নিচরণ মর্ত্তে রাখি'
যুগান্তের ঐ সময় সাঁঝে
ভীষণ মধুর ভঙ্গে নাচে
কালভুজঙ্গ সুবন পাখি:
মোর স্থরের রক্তধারা
দিগ্বিজয়ের নর্তনে তার
আত্মহারা!
তনি তার কণ্ঠরবে, চিরন্তনীর
জয়ধ্বনির
শঙ্খ বাজে:
আমার জীবন
শঙ্খে বাজে।
বিজয়ার বীর্যাবিভায়
দীপ্ত ময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে॥

কথা—শ্রীনিশিকান্ত সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ পা সা না | সা রা সা | রা গা রা | গা মা ধপা |
না চে রে না চে রে ম যূর্ না চে ম যূর্

| মা -া গা | রা পা ধমা | গা রসা সা | সা সা -া |
না ০ চে না চে না চে ম যূর্ না চে ০

I সা সা ন্া | সা রা সা I রা -া া | রা গা রা I
বি জ য়ার্ বীর্ য বি ভা • য়্ লীপ্ ত ম

I গা -া -া | গা মধা ধা I পা পা পাঃ | মগ রগা মা -া I
যু • য়্ নৃ ত• বি লায়্ আ মার্ মা •• ঝে •

I রা পা পমা | গা রসা সা I সা -া সা | -া -া -া II
না চে না চে ম যুর্ না • চে • • •

II গা সা রা | গা পা ক্ষা I পা -া -মগা | গা মপা পমা I
না চে সে নৃ ত্যা হ র • •ণ্ বণ্ ঝি• চ

I গা -া -া | গা মধা পা I ধা -া -া | ধধা ধা ধা I
র • ন্ ময় তে• রা খি • • বু গান্ তের্

I ধা ধা পা | নধা র্সা -া I -া -া -া | ধধা ধা ধা I
ত্রি • স ময় র্সা ঝে • • • • ভী বণ্ ম

I ধা ধা পা | নধা র্সা -া I -া -া -া | ধা -র্রা র্সর্সা I
ঘুর্ ত ঙ্গে না চে • • • • কা ন্ ছু

I ধা পা গা | গরা -গা রসা I সা -া -া | ধধা ধা পা I
ভঙ্ গ মু দ• ন্ পা খি • • মোর্ ভ দ

I ধর্সা -নর্সা -া | ধা ণধা পক্ষা I ধপা -া -া | সা -রা -রা I
নে• • • য় রক্ ত• ধা• রা • • দিগ্ বি জ

I রা -া -া | রা রা রা I রা -া -গা | রা গপা পমা I
য়ে • য় নয় ত নে ভা • য় আ স্ত• হা

I গা -া -া | গা সা রা I গা পা ক্ষা | পা -া -া I
রা • • ত নি তায় কণ্ ঠ র যে •• •

I গা পা ধা | ধা -া -া I ধধা ধা ধা | ধা ধা পা I
চি রন্ ত নী • য় জ য় ধ্ব নিয় শঙ্ খ

I নধা -র্সা র্সা | -া -া -া I ধা র্রা র্সা | ধা পা গা I
বা • জে • • • আ মার্ ভী বন্ শঙ্ খে

I রসরা রা -সা | -া -া -া I
বা• জে • • • •

" বিজয়ার বীর্য্যবিভায়.....মাঝে, নাচে নাচে ময়ূর নাচে" II

|| সা সরা না | সা রা সা | রা -া -সনা | সা গা রা |
তু ৎ নেহ্ গ হন্ ত্ব মে ০ ০র্ অন্ ধ কা

| গা গা রা | গা পা ক্ষা | পা পা পা | গা মপা ক্ষা |
রে তা রি ক পেহ্ আ লো আ মার্ ঘুম্ ভা০ ঙা

| পা -া -া | পা ধা মা | মা পধপা মা | গা -া -া |
লো ০ ০ না চা লো লে আ০০ মা রে ০ ০

| -া -া -া | পা গা পা | ধা র্সা না | সা -া -া |
০ ০ ০ ভা ব ভেহ্ দিগ্ বা লি কা ০ ন্

| পা ধা র্সা | র্সা -া -া | র্গা গা গা | রা সা সা |
লি গম্ ধ রী ০ হ্ দী পা লি কার্ পাই যে

| না -র্রা র্রা | -র্সা -া -া | পা পা পা | পা ধা ধা- |
তা ০ রে ০ ০ ০ অ সী মার্ সেই লি ০ খী

| ধনা- ন্ধা পা | পা না ন্ধা | ধা পা ক্ষা | গক্ষা ক্ষা- পা |
ও০ ০ ই ভ গৎ নি মার্ নি ত্রা হা০ নে ০

| -া -া -া | গা ধা ধা | ণপা -া -া | গা রগা রা |
০ ০ ০ ম হা নি শা ০ ন্ ল ক্ষ০ তা

| সা -া -া | সা ধা ধা | ধা ধা পা | ন্ধর্সা র্সা -া |
রা ০ হ্ লে ঘম্ তো লে আ মার্ পা০ নে ০

| -া -া -া | সা রগা রা | গা রা সা | রগা গা -া |
০ ০ ০ ০ শ্রী বার্ সো দা নি নীহ্ ক্ষ০ ণী ০

| -া -া -া | গা পা ক্ষা | পা -া -া | পা ধা ধা |
০ ০ ০ হন্ ত্রা হা রা ০ ০ ছুই চো খে

| ধা ধা পা | ন্ধর্সা র্সা -া | -া -া -া | পা গা পা |
বৈ ছুন্ ব ম০ নি ০ ০ ০ ০ মু খে তার্

| ধা র্সা না | র্সা -া -া | পা ধা র্সা | র্সা -া -া |
চন্ ত্র ক লা ০ ০ চু ড়ায় নি খা ০ ০ ০

| র্গা গা গা | র্রা র্সা র্সা | র্সনর্রা র্রা -র্সা | -া -া -া |
সু নী ল্ প্র ভাত্ ব ক্ষ সা০০ জে ০ ০ ০ ০

| র্রা র্রা র্সা | ধা পা গা | রসরা রা- সা | -া -া -া |
আ মা ম্ ঐ বন্ ব ক্ষে সা০০ জে ০ ০ ০ ০

"বিজয়ার বীর্যাবিভায়.....মাঝে, নাচে নাচে ময়ূর নাচে" ||

তালফের—ঝাঁপতাল

| প্া সা | সা -া সা | সা -া | সা সা -রা | না সা | রা রা রা | রা -া | রা জ্ঞা জ্ঞা |
মা টি তে ০ ম হা ০ দে বী ম্ উ দ য় ক্ষ শে তা য় মা ন বী

| জ্ঞা মা | রা রা সা | সা মা | মা -া মা | মা পা | পা -া পা | পণা -মা | পা পা -া |
লী লা র ম্ নে ম হা দে ব্ ঐ অ ং প ক্ ং প্ ম যু ং র্ হ য়ে ০

| মা -া | ধা -া ধা | ধা -া | ধা -া ধা | ধা -পা | ধা ণা -া | -া -া | -া -া -া |
না ০ চে ০ আ মা ০ র ০ মা ন ০ ব তা ০ ০ ০ ০ ০ ম্

| মা -া | পা -া পা | পা -া | পা -া পা | ধা -পা | ধা র্সা -া | -া -া | -া -া -া |
না ০ চে ০ আ মা ০ র ০ ত ছ ০ ল তা ০ ০ ০ ০ ০ ম্

| পা -া | র্রা -া র্রা | র্রা -া | র্রা -া র্রা | র্রা -র্সা | র্রা র্জ্ঞা -া | -া -া | -া -া -া |
না ০ চে ০ আ মা ০ র ০ প্রা ণে ০ ম নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

ত্রিতালে

| সা -া | মা -া মা | মা -া | মা -া মা | মা পা | পা পা পা | পা ধা | পা ধা ধা |
না ০০ চে ০ ঐ থৈ ০ থৈ ০ থৈ থি মা থি মা থ ম ল ০ থ ম ল

| ধা পা | পা -া পা | পা -া | পা পা -া | পা -ধা | র্সা -া র্সা | র্সা র্সা | র্সা -া র্সা |
ঘুং গ ল ০ ডা না ম্ ধো লা ম্ না ০ চা ম্ প্র ০ ল ম ব ০ ম্

| র্রা র্রা | র্গর্গা -র্রা গা | র্মা -া | -া -া -া ||
স্ব জ ন০ ০ ক ম ০ ০ ০ ল্

উল্লিখিত স্বরলিপি যে সুরে গীত হইবে সেই সুরের মধ্যম অর্থাৎ "মা"কে সুর করিয়া নিম্নলিখিত স্বরলিপি গীত হইবে।

তালফেরতা—তেওরা

II ধা -র্সা ধা | র্সা -া | ধা -া I মা- পধপা মা | রা -া | সা -া I
ঐ ০ না | চ ০ নে য় | ছু ০০ন্ দে | মা ০ তা ল্

I(ধ্া সা সা | সা -া | সা -া I (সা -রা রা | রা -া | সা -রা)) I
মা ন ব | লো ০ কে য় | স ঙ্ গো | না ০ চে ০

I রা -া মা | পা -ধা | ধা -া I ধা -া ধা | পা -ধা | মা -পা I
স ঙ্ গে | না ০ চে ০ | স্ব র্ গ | পা ০ তা ল্

I ধা -র্সা ধা | র্সা -া | ধা -া I মা -পধপা মা | রা -া | সা -া I
ঐ ০ না | চ ০ নে য় | ছু ০০ন দে | মা ০ তা ল্

I ণ্া সা -া | সা -া | সা -া I রা রপা- পমা | রা -া | সা- -রা I
ন ট ০ | রা ০ জ্ ০ | বি হ০ ঙ্ | গ ০ মে ০

I ণ্া সা -া | সা -া | সা -া I সা ধা ধা | ধা -া ধা -া I
ন টে ০ | শ্ব ০ রী য় | নি খি ল | না ০ টে য়্

I পা -ধা ধা | ধপা -পা | মা -া II পা ধা মা | পা -র্সা | ধা ধা I
র ঙ্ গ | রা০ ০ জে ০ | আ মা র | জী ০ ব ন

I ধা -া পমা | পা -পমা | মা -া)I ণ্া সা -া | সা -া | -া -া I
র ঙ্ গে০ | রা ০ জে ০ | বি জ ০ | রা ০ ০ য়্

I সা -ধা ধা | ধা -া | ধা -া I পা -ধা ধা | ধপা -পা | মা -া I
বি য় ন | বি ০ ভা ষ্ | দী প্ ত | ম০ ০ য়ু য়্

II পা -ধ্ মা ' | পা -া | পর্সা -ধা I ধা ধা পমা | পা -পমা | মা -া) I
নৃ ০ ত্য | বি ০ লা০ য়্ | আ মা র০ | মা ০ কে ০

I ণ্া সা -া | সা -া | -া -রজ্ঞরা I ণ্া সা -া | সা -া | -া -রজ্ঞরা I
না চে ০ | রে ০ ০ ০০০ | না চে ০ | রে ০ ০ ০০০

I ণ্া সা -া | সা -া | -া -া I সা ধা -া | ধা -া | ধা -া I
না চে ০ | রে ০ ০ ০ | ম য়ু য়্ | না ০ | চে ০

I' পা ধা -া | ধপা -পা | মা -া I পা ধা -মা | পা -া | পর্সা -ধা I
ম য়ূ র্ | না০ ০ চে ০ | না চে ০ | না ০ | চে০ ০

ধা ধা -পমা	পা পমা	মা -া	পা ধা -মা	পা -া	পর্সা -ধা
ম ধু ০ ম্	না ০ চে	না চে ০	না ০	চে০ ০	

ধা ধা -পমা	পা পমা	মা -া	গা সা -া	সা -া	-া -রজ্ঞরা
ম ধু ০ ম্	না ০	চে ০	না চে ০	রে ০	০ ০০০

গা সা -া	সা -া	-া -রজ্ঞরা	গা সা -া	সা -া	-া -রজ্ঞরা
না চে ০	রে ০	০ ০০০	না চে ০	রে ০	০ ০০০

গা সা -া	সা -া	-া -া ‖ ‖
না চে ০	রে ০	০ ০

দ্বিতীয় অঙ্ক

ভুবনের গহন ঘুমের অন্ধকারে
তারি রূপের আলো
আমার ঘুম ভাঙালো,
নাচালো সে আমারে ;
ভারতের দিগ্বালিকার
দিগম্বরীর দীপালিকায়
পাই যে তারে।
অসীমার সেই শিখী ঐ জগৎ-নিশার নিদ্রাহানে,
মহানিশার লক্ষ তারায়
পেখম তোলে আমার গানে !
গ্রীবায় সৌদামিনীর কণ্ঠী,
তাহারা দুই চোখে বৈদূর্যমণি ;
মুখে তার চন্দ্রকলা, চূড়ায় শিখা,
নীলাভ প্রভায় বক্ষ সাজে :
আমার জীবন বক্ষে সাজে।
বিহ্বলার বীর্য্যবিভায় দীপ্ত ময়ূর নৃত্যবিলায়
আমার মাঝে ॥

তৃতীয় অঙ্ক

মাটিতে মহাদেবীর উদয়-ক্ষণে
তার মানবী লীলার সনে
মহাদেব ঐ অপরূপ ময়ূর হয়ে
নাচে আমার মানবতায়,
নাচে আমার তনুলতায়,
নাচে আমার প্রাণে মনে।
নাচে ঐ থৈ-থৈ-থৈ থিয়া-থিয়া থমল-থমল !
দুলে ডানার দোলায়
নাচায় প্রলয় বহ্নি সুজন কমল !
ঐ নাচনের ছন্দে মাতাল
মানবলোকের সঙ্গে নাচে স্বর্গ পাতাল ;
নটরাজ বিশ্বমে নটেশ্বরীর নিখিল-নাটের রঙ্গরাজে :
আমার জীবন তুঙ্গে রাজে।
বিজয়ার বীর্য-বিভায় দীপ্ত ময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে ॥

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ঈশ্বর

ব্রহ্মসূত্রের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২), এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর লিখিয়াছেন "অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য, অনেক-কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্তস্য, প্রতিনিয়ত-দেশ-কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া-ফলাশ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্য-রচনা-রূপস্য জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি, তৎ ব্রহ্ম। অর্থাৎ নামরূপে ব্যাকৃত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তার সহিত সংযুক্ত, ব্যবস্থিত দেশ-কাল, নিমিত্ত, ক্রিয়া ও ফলের আশ্রয় অচিন্ত্য-রচনা-কৌশল এই যে জগৎ, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয়, তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু এখানে ব্রহ্মের যে লক্ষণের বর্ণনা শঙ্কর করিয়াছেন (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় কর্ত্তৃত্ব) তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে, তটস্থ লক্ষণ।

কিন্তু জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই; জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত ও মায়িক। যাহার পারমার্থিক সত্তা নাই, তাহার স্রষ্টৃত্ব, পালনকর্ত্তৃত্ব ও সংহর্ত্তৃত্ব ও মায়িক—এই মীমাংসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জগতের অস্তিত্ব যেমন ব্যাবহারিক, ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতিও তেমনি ব্যাবহারিক ব্রহ্ম—নির্গুণ ও একমাত্র পারমার্থিক সত্য।

জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। জগৎকে আমরা সজ্ঞানে কল্পনা করি না, ঋজিকরের মায়া যেমন, তেমন তাহা আমাদের চেষ্টা ব্যতীত অকল্পনা হইতেই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়। কিন্তু ঋজিকর প্রত্যক্ষ জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টিগোচর নহেন। আমরা জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের ব্যাখ্যার জন্য ব্রহ্মের কল্পনা করি, অথবা শ্রুতিতে তাঁহার কথা আছে বলিয়া, আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তাঁহার উপাসনা করি।

ব্রহ্মের দুইরূপ—নির্গুণ ও স-গুণ, নিরুপাধি ও সোপাধিক, নির্বিশেষ ও সবিশেষ ব্রহ্ম। সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তং এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য "মায়া" ও "অবিদ্যার" কল্পনা। এই জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি নহে, মায়া-উপহিত (মায়া-উপাধিযুক্ত) ব্রহ্মের সৃষ্টি। মায়া উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। মায়া ঈশ্বরের উপাধি। এই মায়া বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতি। ত্রিগুণা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব যখন প্রধান হয়, তখন তাহা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা। আর অবিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা—ইহা কেহ কেহ (তত্ত্ববিবেককার) বলিয়াছেন। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। ব্রহ্ম যখন অবিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হন, তখন তিনি জীব। মায়াই প্রকৃতি। কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ—ইহাই অদ্বৈতবাদ। মায়া যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মের উপাধি হয়, তাহা হইলে দ্বৈত স্বীকৃত হইয়া পড়ে। তাই মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয় নাই। মায়াকে অনির্ব্বাচনীয় বলা হইয়াছে। একদিক হইতে মায়ার অস্তিত্ব আছে, অন্য দিক হইতে নাই। সৎ অথবা অসৎ ইহাকে কিছুই বলা যায় না।

এবংবিধ মায়াগত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই ঈশ্বর। আর অবিদ্যা-গত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব। মায়ার আবরণশক্তি ফলে ব্রহ্ম-চৈতন্য আবৃত হন, তাহাকে দেখা যায় না; বিক্ষেপ শক্তির ফলে জীব ও জড় জগতের আবির্ভাব হয়। মায়ার আবরণ শক্তির আধিক্য হইলে তাহাকেই অবিদ্যা বলে, তাহাতেই পতিত ব্রহ্ম-চৈতন্য জীব। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবের উপাধি, ঈশ্বরের নহে! জীব আপনাকে অজ্ঞ বলিয়া জানে। ঈশ্বরের সঙ্গে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মায়াধীশ। ব্রহ্ম অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহার উপাসনার জন্য ঈশ্বর যে কেবল কল্পিত, তাহা নহে। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে, কেন মায়াকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না—তাহা অনির্ব্বচনীয়! সেইজন্য স্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বর-

রূপে প্রতিভাত হন, তাহা অচিন্ত্য হইলেও ঈশ্বরকে অসৎ বলা যায় না।

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে চিৎ-প্রতিবিম্ব। যাঁহার প্রতিবিম্ব তিনি বিম্ব। মায়া ও অবিদ্যার (বা অন্তঃকরণ) যাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই বিম্ব ব্রহ্ম। তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য, কোনওরূপ উপাধি দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন।

চৈতন্য চতুর্বিধ বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন। জীব, কূটস্থ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে একই, তাহাতে ভেদ নাই। এই সকল ভেদ ঔপাধিক বা ব্যবহারিক। একই আকাশ যেমন উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ ও মহাকাশ নামে পরিগণিত হয়, তেমনিই একই চৈতন্য উপাধি ভেদে চতুর্বিধ প্রতীত হয়। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মে কল্পিত। জীবের স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরও চৈতন্যেই কল্পিত। চৈতন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠান। চৈতন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠান বলিয়া, চৈতন্য উক্ত শরীরদ্বয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন। এই শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম কূটস্থ। ইহা নির্বিকার, এই জন্য কূটস্থ। সূক্ষ্ম শরীর কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত বলিয়া তাহার অন্তর্গত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণও কূটস্থে কল্পিত। এই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব—চিদাভাস। চিদাভাস সংসারী, কিন্তু কূটস্থ চৈতন্য নির্বিকার। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে মায়া আশ্রিত। ব্রহ্মাশ্রিত মায়ায় জগৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। জগতের অন্তর্গত যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধিও সূক্ষ্মরূপে মায়ায় অবস্থিত। এই মায়ায় অবস্থিত সূক্ষ্ম-বুদ্ধিকে বুদ্ধিবাসনা বা ধী-বাসনা বলে। এই মায়ায় অবস্থিত সকল প্রাণীর বুদ্ধি বাসনাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। বুদ্ধির বিষয় হইতেছে যাবতীয় বস্তু। সকল প্রাণীর সমস্ত বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি-বাসনা (যাহা মায়ায় অবস্থিত) ঈশ্বরের উপাধি। এইজন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সুতরাং সর্বকর্তা।

ঘটের মধ্যে জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ দ্বারা ঘটাকাশ যেরূপ তিরোহিত হয়, কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত জীবদ্বারা কূটস্থ সেইরূপ তিরোহিত হয়—প্রতিভাত হয় না। জীব ও তাহার অধিষ্ঠান কূটস্থের অবিবেককে মূল অবিদ্যা বলে।

বেদান্ত মতে আত্মা সর্বব্যাপী। সুতরাং জগতে অচেতন কিছুই নাই। আত্মচৈতন্যহীন স্থান বা পদার্থ জগতে নাই। অথচ জাগতিক বস্তুদিগকে চেতন ও অচেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। চৈতন্য সর্ব-বস্তুতে থাকিলেও যাহাতে বুদ্ধিগত চিদাভাস আছে তাহাকে চেতন ও যাহাতে তাহা নাই, তাহাকে অচেতন বলা হয়। প্রাণীদিগের চিদাভাস আছে বলিয়া তাহারা চেতন, জড়-পদার্থে নাই বলিয়া তাহা অচেতন।

অন্তঃকরণাদি মায়ার কার্য্য। মায়া ও তাহার কার্য্যাদি পরমাত্মা বা ব্রহ্মের উপাধি। সর্ব্ব উপাধি বর্জিত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য। মায়া উপাধিযুক্ত পরমাত্মা ঈশ্বর। যাবতীয় সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি রূপ উপাধি-বিশিষ্ট পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত এবং যাবতীয় স্থূল শরীরসমষ্টিরূপ উপাধিযুক্ত পরমাত্মা বিরাট বা বিরাট পুরুষ।

চিৎ বা চৈতন্য ত্রিবিধ—জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। কূটস্থ চৈতন্য জীবের অন্তর্ভূত।

লিঙ্গদেহ অধ্যস্ত হয় কূটস্থ চৈতন্যে। লিঙ্গদেহে বর্ত্তমান অন্তঃকরণে চিদাভাস বা চিৎ প্রতিবিম্ব পতিত হয়। কূটস্থ চৈতন্য, লিঙ্গদেহ ও চিদাভাস মিলিত হইয়া জীব।

"বিবরণ"-গ্রন্থ অনুসারে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই প্রতি-বিম্ব নহেন। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্ব। অজ্ঞানগত চিৎ প্রতিবিম্ব জীব। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই প্রতিবিম্ব হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাহারও মতে অজ্ঞানগত চিৎ প্রতিবিম্ব ঈশ্বর। অন্তঃকরণগত চিৎ প্রতিবিম্ব জীব। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মায়াতে (বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে) প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি বা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম জীব।

কোনও কোনও প্রাচীন আচার্য্যের মতে প্রতিবিম্ব ও বিম্বের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। বিম্ব যেরূপ সত্য, প্রতিবিম্বও তেমনি। প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে। প্রতিবিম্ব সত্য বলিয়া মুক্তিতেও জীবের অস্তিত্বের নাশ হয় না। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অভিন্নত্ব প্রমাণের জন্য বলা যাইতে পারে, বিম্ব কখনও চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাতে পতিত আলোক প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুতে পতিত হইলে বিম্ব

* ষোড়শিণের লেকচার : শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, চতুর্থ পর্ব্ব—১৭ পৃষ্ঠা।

দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবিম্বের বেলাতেও সেই বিম্ব হইতে প্রতিফলিত আলোক রশ্মিই স্বচ্ছ পদার্থকর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া যখন চক্ষুতে পতিত হয়, তখন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। একই আলোক-রশ্মি বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের দৃষ্টিজ্ঞানের কারণ। যাহারা প্রতিবিম্বকে সত্য বলেন, তাহারা বলেন—প্রতিবিম্ব মিথ্যা হইলে জীব মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, মুক্তি মিথ্যা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন ইহাই তো বেদান্ত সিদ্ধান্ত। গৌড়পাদ বলেন—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্নবন্ধো ন চ সাধকঃ
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।

নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই, মুক্তিও নাই। ইহাই পরমার্থতা। কিন্তু প্রতিবিম্বের সত্যত্ববাদিগণ বলেন—প্রতিবিম্ব যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হয় না। যদি ব্রহ্ম সত্যও হয় জীব মিথ্যা, তাহা হইলে উভয়ে অভিন্ন হইবে কিরূপে। সত্য ও মিথ্যা কখনও অভিন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন—চিতের প্রতিবিম্বই হইতে পারে না। প্রতিবিম্ব হয় দ্রব্যের। যাহার ক্রিয়া ও গুণ আছে এবং যাহা সমবায়ী কারণ, তাহা দ্রব্য, ইহাই কণাদের মত। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, তিনি সমবায়ী কারণও হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা হয়—দ্রব্য না হইলেও প্রতিবিম্ব হইতে পারে, যেমন প্রতিধ্বনি। শব্দ দ্রব্য নহে, কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনিই তাহার প্রতিবিম্ব। সে যাহা হউক বৈশেষিক দর্শনে আত্মা দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত এবং ব্রহ্ম পরমাত্মা।

শঙ্কর বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—অবিকৃত ব্রহ্ম স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হন। ঈশ্বরের সহিত সমস্ত প্রপঞ্চ জীব দ্বারাই কল্পিত হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত উপরে বর্ণিত হইল। জগৎ স্রষ্টৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থ অর্থাৎ আগন্তুক লক্ষণ। জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মের স্বরূপের হানি হয় না। জগৎ-সম্বন্ধ-বর্জিত ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু সৃষ্টি-প্রবাহ যখন অনাদি, তখন জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও অনাদি। সুতরাং অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম জগৎ স্রষ্টা। কিন্তু সৃষ্টি-প্রবাহ ও ব্রহ্মের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব মায়া-কল্পিত। মায়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টারূপে প্রতিভাত হন। জগতের মধ্যে জীব ও প্রপঞ্চ উভয়ই বর্ত্তমান। জ্ঞান কেবল—জীবের নিকটই হইতে পারে। জীবের উক্ত জ্ঞান হয় জীবের নিকট। জীবের নিজের অস্তিত্বের জ্ঞানও হয় জীবেরই নিকট। জীব ও জড়ের জ্ঞান ব্রহ্মের নিকট হয় না। ঈশ্বরের নিকট হইতে পারে। কিন্তু শঙ্কর বলেন—ঈশ্বর ও জড় জগৎ জীবেরই কল্পিত অর্থাৎ উভয়ই জীবকর্ত্তৃক ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়।

ব্রহ্ম, জীব, ঈশ্বর ও জগৎ

"জগৎ যোনিরযোনিস্ত্বং, জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং, জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥
আত্মানং আত্মনাবেৎসি, সৃজস্যাত্মানমাত্মনা।
আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ, আত্মন্যেব প্রলীয়সে॥"
(কুমার-সম্ভব)।

ঈশ্বর জগতের কারণ; কিন্তু তাঁহার কারণ নাই। তিনি জগতের সংহার করেন, কিন্তু তিনি নিত্যও অবিনশ্বর। তিনি জগতের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি নাই। তিনি জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বর নাই। তিনি আপনি আপনাকে জানেন, আপনি আপনাকে সৃষ্টি করেন (জগৎরূপে), আপনি আপনাতে তুষ্ট হন এবং আপনাতে বিলীন হন। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা যিনি, তিনি ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। বড়জোর তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপ ও অনন্ত। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের অতীত। মায়াতে তাঁহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু দ্রষ্টা না থাকলে প্রতিবিম্ব হয় না। এই প্রতিবিম্ব দর্শন করে জীব, ব্রহ্ম করেন না। মায়ার মধ্যে জীব ব্রহ্মের যে রূপ দর্শন করে, তাহাই ঈশ্বর।

কিন্তু জীব কি? অবিদ্যা বা অজ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব। এই প্রতিবিম্ব অচেতন নহে, চৈতন্য। প্রকৃতপক্ষে এই তথাকথিত প্রতিবিম্ব ব্রহ্মই। অবিদ্যারূপ এক অচিন্ত্য পদার্থ কর্ত্তৃক অনন্ত জ্ঞানময় ব্রহ্ম নিজে অবিকৃত থাকিয়াও বহুসংখ্যক সসীম জীবে পরিণত হন। ব্রহ্ম অধিকারী, সুতরাং তিনি জীবে পরিণত হন বলা যায়

না। জীবের উদ্ভব হয় বলিতে পারা যায়। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ কেবল জ্ঞানের পরিমাণের ভেদ। জীব সসীম বলিয়া তাহার সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মের জ্ঞান পূর্ণ। যখন অবিদ্যা অপগত যায়, তখন জীবের জ্ঞান প্রসারিত হয়, তখন তাহার জ্ঞান ও ব্রহ্মের জ্ঞানের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না, জীব তখন ব্রহ্ম হয়।

ব্রহ্মকে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা ব্রহ্ম নির্গুণ কিন্তু 'সৎ' ও চিৎ ও আনন্দ শব্দত্রয় গুণ বাচক। বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে সাংখ্যের গুণকে দ্রব্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। জীবকে গুণের (দড়ির) দ্বারা বন্ধনকরে বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ। ব্রহ্মকে যখন নির্গুণ বলা হয়, তখন তাহার অর্থ ইহা নহে, যে তাঁহাতে কোনও গুণই নাই। তাহার অর্থ ব্রহ্ম সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণ বর্জ্জিত। জাগতিক সমস্ত বস্তুই সত্ত্বঃ রজ ও তমো গুণাত্মক। ব্রহ্ম তাহা নহেন, এই অর্থেই ব্রহ্ম নির্গুণ। আমাদের পরিচিত কোনও গুণই তাহাতে নাই। তিনি ত্রিগুণাতীত—ত্রিগুণ জগতের অতীত (Transendent).

এক ব্রহ্ম কিরূপে অসংখ্য জীবরূপে প্রতীত হন, তাহা দুর্বোধ্য। এই প্রতীতি কাহার? ব্রহ্ম ব্যতীত তো দ্বিতীয় বস্তু নাই। সুতরাং এই প্রতীতি ব্রহ্মেরই বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বিশুদ্ধ চিৎ, তাঁহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদ নাই, তাহার পরিণামও নাই। সুতরাং তিনি যে আপনাকে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপ অনুভব করেন, ইহা বলা যায় না। মায়াবশতঃই ব্রহ্ম জীবরূপে অনুভূত হন। কিন্তু মায়াবশতঃ যে সকল জীব উদ্ভূত হয় এই অনুভূতি তাহাদেরই। এই অনুভূতি ও জীবের উদ্ভব একই। কেননা জীব না থাকিলে যেমন এই অনুভূতি হইত না, তেমনি এই অনুভূতিতেই জীবের উৎপত্তি। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই, যে এক অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম মায়াতে অসংখ্য কেন্দ্র—অসংখ্য জীবরূপে প্রতীত হন, যেমন একই চন্দ্র জলাশয়ের বিভিন্নস্থানে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে দৃষ্ট হয়। এবং এই প্রতীতি সেই সকল জীবেরই। মায়াতে যে সকল প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহারা চিতের প্রতিবিম্ব বলিয়া চিতের ধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহারা আপনাদিগকে (সান্ত বলিয়া) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব করে। জড়ের প্রতিবিম্বের সহিত চিতের প্রতিবিম্বের পার্থক্য এইখানে। নির্গুণ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম কেবল প্রতিবিম্বিত হন না, প্রতিবিম্বের মধ্যে জ্ঞাতারূপে আবির্ভূত হন। কিরূপে হন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ব্রহ্ম কেবল ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপেই প্রতিবিম্বিত হন না, তিনি সমগ্র মায়া উপাধির মধ্যে ঈশ্বররূপেও প্রতিবিম্বিত। মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বগুণের ন্যূনাধিক্য মাত্র। জীবের সত্ত্ব প্রধান বুদ্ধিতে ব্রহ্ম ঈশ্বররূপ প্রতীত হন।

জড়জগৎ জীবকর্তৃক ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়। ইহার কারণ অবিদ্যা ও অজ্ঞান। এই অবিদ্যাবশতঃই জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতীত হয় এবং ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হন।

বিশুদ্ধ চৈতন্য

বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বয়ং-প্রকাশ। ইহা কখনও জ্ঞান ক্রিয়ার বিষয় হয় না। জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ইহা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়ায় বর্ত্তমান। জ্ঞানের বিষয় না হইয়া সমস্ত জ্ঞান ক্রিয়ায় বর্ত্তমান থাকিবার যোগ্যতাই স্বয়ং-প্রকাশতা। যখন কোনও বস্তুতে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন সেই বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব তাহার এক গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জ্ঞেয়ত্ব সেই বস্তুর মধ্যে অবস্থিত হইতে পারে অথবা নাও পারে। ইহা সময় বিশেষে বস্তুর মধ্যে অবস্থিত, অন্যসময়ে অবস্থিত না হইতেও পারে। এই জ্ঞেয়ত্ব নির্ভর করে জ্ঞেয়ত্ব উৎপাদনক্ষম অন্য বস্তুর উপরে। কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্য তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। পরন্তু তাহা অন্য সকল বস্তুকে প্রকাশ করে। এক সংবিদকে প্রকাশিত করিবার জন্য যদি অন্য সংবিদের প্রয়োজন হইত—তাহা হইলে দ্বিতীয় সংবিদের প্রকাশের জন্য অন্য সংবিদের প্রয়োজন হইত। তাহাতে অনবস্থার উদ্ভব হইত। কোনও বিষয়কে জানাইবার সময় যদি সংবিদ আপনাকে প্রকাশিত না করিত, তাহা হইলে কোনও বস্তুকে দেখিবার অথবা জানিবার পরেও, জ্ঞাতা তাহা দেখিয়াছে অথবা জানিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হইতে পারিত। এই স্বয়ং প্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য বা সংবিদই আত্মা। আত্মা কোনও জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও সর্ব্ব অনুভূতির মধ্যে

প্রকাশিত। সকল জ্ঞানে আত্মা প্রকাশিত বলিয়া কেহই তাহার আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হয় না। আত্মা সকল বস্তুর প্রকাশক, কিন্তু নিজে কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না। যাহা আত্মানুভূতি রূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অহংকার—আত্মা নহে।

জীব ও ঈশ্বর বিশুদ্ধ চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে পতিত প্রতিবিম্ব। বিশুদ্ধ চৈতন্য বিম্ব। জীব ও ঈশ্বর প্রতিবিম্ব। চৈতন্য বিশুদ্ধ কোনও উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। তাহার মধ্যে চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু নাই। তাহার মধ্যে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ নাই।

গ্রীষ্মের ব্যথা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

রুদ্রদেব, রৌদ্রে তব প্রাণ বাঁচে না যে
জানোনা-ত লাহজ্বালা শিরে তব হিমগঙ্গা রাজে।
তোমার তো হাঁস নেই, নেইক খেয়াল-ও,
তোমার জটার বনে মা-গঙ্গা কি শুকালো লুকালো?
কালবৈশাখীর ঝড়ে তোমার তাণ্ডব হোক সুরু।
জটার বাঁধন তায় ঢিলা হোক ওগো নটগুরু।
ঝরিয়া পড়ুক তায় ফাঁক পেয়ে কিছু রুদ্ধ জল,
নহীতল হউক শীতল।

(২)

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন দুপুরে হাঁকছে ফেরিওলা
'হিমসাগর আম—চাই বাবুজী', শুকনো তাহার গলা।
নামিয়ে ভারা বল্লে বুড়ো—'গোটা পঁচিশ আম,
আছে বাকি নাও বাবুজী যা খুশি দাও দাম।'
গামছা পেতে পড়ল শুয়ে চাইল আমার জল।
নিরিখেতে কিনে নিলাম তাহার ক'টা ফল।
হিমসাগরও মাথাতে যার তার এ কাতরতা!
খালি মাথায় খাটছে যারা ভাবছি তাদের কথা।

(৩)

দুধারভরা শ্যামল মাটি পথ হয়েছে আজ
কমলা রাঙে ময়লা দেহ বদলে নেছে সাজ।
জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলায় তপ্ত বন খাদে
দুটি ধারের বাড়ীগুলোয় তার অভিযোগ আসে।
আমরা দুয়ার জানলা রুধি চাইনা পথের পানে
কাদের কাছে নালিশ করে হায় রে সে কি জানে?
তার এ দশা কার গরজে হায় কি সে তা ভাবে?
তপ্ত হাওয়ার জ্বালায় যেবা সে কী দরদ পাবে?

(৪)

জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুর বেলা সাইকেলী রিক্‌শোতে
চলেছিলাম বর্ধমানে রেল ইষ্টেশন হতে।
ঘেরাটোপের মধ্যে ব'সে থাকি,
সাম্‌নে পাশে চেয়ে চেয়ে কল্‌সে পড়ে আঁখি।
দুপুর রোদে পথে কোথাও নেইক কোন ছায়া।
রিক্সাওলার পানে চেয়ে হলো বড়ই মায়া।
তায় শুধালাম—হাটে কেন ঢাকিস্ না তোর মাথা?
দাওিতে তো বাঁধতে পারিস একটা ছোট ছাতা!
জবাব দিল—"দুপুর বেলায় বাবু,—
দু-এক আনা ভাড়া বাড়াই হই না তাতেই কাবু।
পেটে খেলে পিঠে কেন, মাপায়ও সব সয়।
সুয্যিমামা মামার বটে, মামার কী বা ভয়?"

(৫)

দুপুর রোদে বেরুত না মেয়েরা এই দেশে,
এখন তারা বেরিয়ে পড়ে সেজে নানান বেশে।
তাদের মাথায় খোঁপা থাকে চুলও ঘন আছে,
যতই রাগুক সুয্যিঠাকুর জব্দ তাদের কাছে।
মোদের মাথায় চুলের অভাব, অনেক মাথায় টাক।
দুপুর রোদে যাতায়াতে মোদেরি বিপাক।
ছাতা নিলেও ছাতার তাতে মাথা মোদের ঘামে,
টাকের পিছল ঢালু পথে ঘাম্‌টী ধারা নামে।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভরতভত্ত

ফটো : বিমলকৃষ্ণ [illegible]

Hello Iggy, Hello

জীবনের লক্ষ্য

উপানন্দ

চরিত্রের প্রধান অস্ত্রই আত্মবিশ্বাস। চরিত্রবলের অভাবে কেবল যে নিজের অনিষ্ট হয়, তা নয়—সমগ্র জাতিও দুর্বল হয়ে শত্রুদের মুখে পতিত হয়। নিজের স্বার্থের জন্য অপরকে প্রতারণা করা অনুচিত। পরকে নিজের মত দেখবার অনুরোধ করলে ক্রমে মনুষ্যত্ব বোধ হয়। তখন স্বার্থপরতা আর অন্তরে থাকে না। সমাজের সঙ্গে আর সমস্ত অঙ্গের সঙ্গে যেমন আমাদের দৈহিক সম্বন্ধ, সমাজের সঙ্গে আমাদের তেমনি সম্বন্ধ। সমাজ দেহের আমরাও এক একটা অংশ, আমাদের চরিত্র দুর্বল হোলে, সমাজের ও জীবনীশক্তি হ্রাস পাবে। সমাজকে বলিষ্ঠ রাখা দরকার।

দেশের ও দশের ভালোমন্দ নিয়েই মানুষ বাঁচে। জোমাদেরই পাশের লোকদের স্বাস্থ্য, অজ্ঞতা, সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তোমাদের দেখতে হবে, নতুবা তোমরা সুখী হোতে পারো না। তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্যে যখন তোমরা অধিকতর পরমুখাপেক্ষী, তখন দেশের স্বাধীনতার দিকেও তোমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। কথাটাকে আপনার মত করে নেবার মানেই বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণেই পাওয়া যায় পরম আনন্দ, অপরিসীম সন্তোষ, আর অপূর্ব পরিতৃপ্তি। পরার্থপরতা বোধ না থাকলে আত্মোন্নতি হয় না।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা না একটা লক্ষ্য থাকে। যার জীবনের কোন লক্ষ্য নেই, সে সংসারে কিছুই করতে পারে না। ছেলেবেলায় জ্ঞানের অভাব থাকে, তাই আদর্শেরও স্থিরতা থাকেনা। বিদ্যাশিক্ষার সাথেসাথে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হোতে থাকে, আর বিচারবুদ্ধি জাগবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শের সম্বন্ধে চেতনা জাগে, তখন নিজের জীবনের শুভ পথে চলবার দিকে মানুষের লক্ষ্য হয়। চরিত্রবলের অভাবে অনেকে ভ্রান্ত পথে চলে। চরিত্রবল যেমন প্রয়োজনীয়, বরং আরও বেশী তেমনই আবশ্যক, নতুবা মানুষ হয়ে জীবনে যে দুরবস্থা ভোগ করার সম্ভাবনা থাকে। নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কিভাবে দেশের সাতটি আদর্শ রক্ষা করা যায়—আর সমাজের সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্যে বড়রা ও ছোটরা সকল করা যায়, সেজন্যে অনেক চরিত্রবল প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ব্যক্তি ও বলে বলবান, সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। তাতে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার অভাবেই দরিদ্রতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানুষের অন্তরে দৃঢ়ির স্তরের মত বিস্তৃত হয়, ক্রমে ক্রমে এই সব বিষাক্ত আবহাওয়ায় পরিবেশিত হয়ে মানসিক শক্তিকে নষ্ট করে, সমাজ-জীবন পরিণতি ঘটে। আজ শিক্ষার অভাবে আর চরিত্রবলের অভাবে বহু মানুষই জীবনকে ব্যর্থতায় করে পথে পথে আর্তনাদ করে বেড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ হয়তো অনুরে মহাদয়া বলে স্বীকার করে নিয়ে তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা সময় থাকে যাবে, কিন্তু যারা তাকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করতে পারলো না, তারা মানবসমাজের কোন মহত্তর বিকাশের সম্ভাবনাকেও উপলব্ধি করতে পারলো না—অসফলতা নিয়েই ঘটলো তাদের অপমৃত্যু। আগামী পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে তার নতুন মানবতার জন্যে—এই মানবতার বীজ বপন করে যাচ্ছে তোমাদের মৈত্রিক চরিত্রবলে ও মহৎ আদর্শে মানুষের সভ্যতার ক্ষেত্র প্রচুর সোনার ফসলে পরিপূর্ণ হয়। একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা দেখতে পাবে, আজকের দিনে মানুষের চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করেছে অধিনতা, তাকে দূর করা আজ প্রয়োজন। এজন্যে তোমাদের অগ্রগতি আবশ্যক—আপনি আচরি ধর্ম পরের শিখাও—সভ্যতা বিরোধী, মানব কল্যাণ বিরোধী যত কাজ দেশের সর্বত্র নিষিদ্ধ করেছে তাদের প্রয়োজন—এর প্রতিকারের জন্যে আমরা চলবো প্রস্তুত মনুষ্যত্ব। মানব সভ্যতার মহানায়কদের জীবন আর বাণীর সঙ্গতির মধ্যে যে সাহিত্য রচনা করে, সে সাহিত্য থেকে তোমাদের আলোকময় পথ, যাতে করে তোমরা পড়ে তুলতে পারো নিজেদের জীবন সমাজিকল্যাণের আদর্শে। সভ্যতাদী

হয়ে মানুষ নয় তার প্রমাণের [illegible] হয়ে,—তোমাদের অন্তরলোকের গভীর থেকে যেন না মেনে আসে ছিধা-দ্বিধাহীন। ভিক্টর বিশুদ্ধতাই এনে দেয় মানবমনের অপরাজেয় বেতবিদ্যা, এই বেত-বিদ্যাই সাহায্য প্রকাশের পথ উন্মোচন করে আমাদের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন সুর ধ্বনিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। যেখানে যেখেছেন অন্যায়, সেখানেই তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন নিজের ধর্মপ্রকার থাকে বিসর্জন দিয়ে। রাশিয়ার জারের ভুতিকে সাহায্য করবার জন্যে যখন তিনি বিশ্বমানবতার আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরে বেদ-বাণীকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁকে ভর্ৎসিত, আহত অন্তরে তখনকার বিদ্রূপের মাথা পেতে নিতে হয়েছে। ভিক্টর বিশুদ্ধতাই রবিশুকে সত্যদ্রষ্টা করেছিল, তাই তিনি বিশ্বকবি হোতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টার মতোই মানবতার উদ্গাতা।

আজ রাশিয়াকে চলতে হচ্ছে রাজনৈতিক বাধিতা, তাই আমরা এসে হাজির হয়েছি তাদের সম্মুখে—কেমন করে আমরা সমাজ, জীবন, ধর্ম, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবো সে সম্বন্ধে আজ তাদের যথেষ্ট অবকাশ এসেছে। এমন দিনে নিরাকৃত অভিযোগ মনটাই একমাত্র ত্রাণ নয় সঙ্গে তোমাদের চরিত্রবল, মনুষ্যত্বের কাঠামো, উচ্চ শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য, সংস্কারের আর অনাচার—তোমাদের মধ্যে আছে মানবিকতার বিপুল সম্ভাবনার ঐশ্বর্য—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তোমরা উদাসীন হয়ে পড়লে, এ জাতির লোকসান দুদু হবেই। জাতির ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা আর রক্ষা করাই তোমাদের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে হোলে কিশোর অবস্থাতেই নিজেদের চরিত্র গঠনে অবহিত হও—যাতে দেশের অধিকাংশ দুঃখ ও অসমাজের মানুষকে নব-জীবন দান করতে পারো সত্য সাধনার বলে—শুধু বিসর্জন করে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অর্থোপার্জন করাই যেন তোমাদের একমাত্র কর্ম না হয়, জন্মভূমির ঋণ শোধ করবার যে বিরাট দায়িত্ব তরুণদের তোমরা নিয়ে এসেছ, সে দায়িত্ব পালন করতে কোনদিন কার্পণ্য করো না—এইটুকুই আমাদের বিনতি। ভিক্টর হুগো ফ্রান্সের জন্যে যা আশা করেছিলেন—তাই তোমাদের কাছে করতে হবে। বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—'বিধাতার যেন দুঃখ নাই আমার তোরা মানুষ হ'। তোমরা মানুষ হোলে, সমস্ত জাতিও বড় হবে—একথা ভুলে যেও।

উপনিষদের ভূমিকা

চিত্রিতা দেবী

গত বারে তোমাদের উপনিষদ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছি, এবারে আরও কিছু বলছি—শোন। উপনিষদ মানুষের অজ্ঞানের আবরণ, অন্ধকারের জাল ছিন্ন করে, তার অন্তরে জ্যোতি উৎসের পথ খুলে দেয়। সেই আলোয় মানুষ বিশ্বের সত্যস্বরূপকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে, এতদিন সে শুধু অপরকে নয়—নিজেকেও চিনতে পারেনি। মানুষ সাধারণত নিজের ইচ্ছে, নিজের ভাবনার রংটাই বিশ্বের উপরে মাখিয়ে থাকে—যার যেমন শক্তি, সে তেমনি ভাবেই এই সৃষ্টিকে দেখে থাকে। 'জণ্ডিস' রোগের নাম নিশ্চয় শুনেছো, এই রোগে সব কিছুই হলদে দেখায়। সেই রকম তোমার চোখে যতটুকু দেখ, তুমি হয়ত ভাবো—সত্য বুঝি ততটুকুই। আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তুমি হয়ত এক এক সময় ভাবো, তোমার পুঁথই দুঃখ। তুমি যা চাও তার কিছুই পাওনা—তোমার চেয়ে কত সুখী তোমারই ক্লাসের ওই রঞ্জিত,—মুখের কথা খসতে না খসতে যার সমস্ত অভাবপূর্ণ হয়। এই তো সেদিন, না চাইতে ওর বাবা ওকে Parker 51 কিনে দিয়েছেন, আর তোমার ভাগ্যে জুটেছে একটা দু'টাকা দামের কলম, যা থেকে বেশীর ভাগসময়েই কালি 'লিক্' করে, আর অপরিচ্ছন্নতার জন্যে মাস্টারমহাশয়ের কাছে বকুনি খেতে হয় তোমাকেই।

আবার রঞ্জিত হয়ত ভাবে, ওর তুলনায় তুমি কত সুখী। কেমন নির্ভাবনায় পকেটে করে কাল ঝাল ছোলা ভাজা নিয়ে ঘুরে বেড়াও। যখন ইচ্ছে টুক্ টুক্ করে মুখে ফেল। পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় হয়ে ভালো ভালো প্রাইজ নিয়ে বাড়ী যাও। তোমার মা, বাবা, ভাই-বোনেরা তখন তোমাকে ঘিরে কেমন আনন্দ করেন।

কিন্তু উপনিষদের ঋষি বলেছেন, তোমাদের মনের মধ্যে আলোটী জ্বললেই দেখতে পাবে, যে তোমরা দুজনেই মিথ্যে করে দেখছিলে। অজ্ঞানের মায়ায় তোমরা ভ্রান্ত হয়েছিলে—ভুল বুঝেছিলে। জানতে না, তাই দুঃখ

পাচ্ছিলে। সেই আলো অমনি দেখতে পাবে, দুঃখ কিছু নয়—তোমাদের দুজনের মধ্যে সেই একই ভগবানের আনন্দ, যিনি—"সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" অর্থাৎ যিনি সদা সকলের হৃদয়কেন্দ্রে আছেন সন্নিবিষ্ট। যিনি কারো বিশেষ সম্পত্তি নন, অথচ সকলেরই একান্ত আপনার ধন। সকলের মধ্যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দেখতে পেলে নিজের সুখ-দুঃখকে আর জগৎজোড়া মনে হবে না। তখন অন্যকেও যেন অনেকটা নিজের মত করেই ভাবতে পারবে। পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া সহজ হবে।

উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্তে অথবা শেষে গ্রথিত আছে বলেই এই নাম। কিন্তু বেদান্তের কথা বলতে গেলে, আগে বোধহয় একটু বেদের কথা বলে নেওয়া উচিত। ভূমিকা বাদ দিয়ে উপাখ্যান সুরু হতে পারে কি? সিঁড়ি বাদ দিয়ে দোতালা?

কবে কোথায় বেদ* রচনার সূত্রপাত হয়েছিল এবং কবেই বা তা সমাপ্ত হয়েছিলো তার সন তারিখ এখনো তেমন করে কিছুই ঠিক করতে পারেন নি পণ্ডিতেরা। তবে এটুকু তাঁরা স্থির করেছেন, যে আর্যভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে, হিমালয়ের তুষারস্নাত অরণ্যাবৃত্ত ক্ষীণ পথ-রেখা ধরে নীলচক্ষু আর্যেরা যখন ভারতে প্রবেশ করেন, অনেকে বলেন, তখনই তাঁদের কণ্ঠে ছিল বেদমন্ত্র।

অবশ্য এ নিয়ে আলোচনার সময় নেই আজকে। আমি এখন শুধু বেদের বর্তমান রূপ নিয়ে দুয়েকটী কথা বলব। কথিত আছে মহাভারতকার ব্যাসদেব 'বেদ' সম্পাদনা করে চার ভাগে বিভক্ত 'বেদে'র এই নূতন রূপ প্রবর্তন করেন। তার আগে কতকাল ধরে যে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে কে তার হিসাব রাখে।

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ—অর্থাৎ বেদ চারটি—ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব। এই চার বেদের আবার চার ভাগ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্। প্রথমে মন্ত্র ভাগ অথবা সংহিতা। এতে আছে মন্ত্র অথবা শ্লোক। ছন্দে গাঁথা স্তব, দেবতার উদ্দেশে। কারা এই দেবতা? কোথায় তাদের বাস? তাদের বাস দ্যুলোকে। দ্যুঃ এবং দিব্, অর্থাৎ দীপ্তি। দিব্যরূপ তাঁরা দেবতা, জ্যোতিষ্মরূপ।

"ঘনঘটায় ঘটা বনায় আঁধার আকাশ মাঝে"—সেই মেঘ ঢাকা কালো আকাশ হঠাৎ চিড় খেয়ে ফেটে গেল তীব্র বিদ্যুতে। পৃথিবীতে ছাই হয়ে পুড়ে গেল গাছ। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন আর্যঋষি, বললেন—ইন্দ্রদেব হানলেন বজ্রের অভিশাপ মর্ত্য পৃথিবীতে।

সূর্য, চন্দ্র, জল, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি প্রকৃতির দিব্য-শক্তির বিচিত্র রূপের দিকে শ্রদ্ধা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতেন সে যুগের ঋষি-কবিরা, আর তাঁদের মুক্ত কণ্ঠ থেকে উচ্ছ্বসিত হোত স্তব অথবা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলিই সঙ্কলিত হয়েছে বেদের প্রথম ভাগ 'সংহিতা'য়।

এই সব মন্ত্রপাঠ করে তাঁরা দেবতাদের উদ্দেশে এক রকম পূজা করতেন—তার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞে তাঁরা অর্ঘ্য দিতেন দেবতাকে, যা তাঁদের প্রিয়—ক্ষেতের শস্য, বনের ফল, হবি এবং সোমরস। তাঁদের এই অর্ঘ্য দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যেত অগ্নি। 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলে তাঁরা অর্ঘ্য ঢেলে দিতেন হোমকুণ্ডের আগুনে। অগ্নি লেলিহান হোত, আর ধূম উঠত উর্ধ্বদিকে। তাঁরা মনে করতেন, তাঁদের উপহার পৌঁছে গেল ঊর্ধ্বে দেবলোকে। যজ্ঞকালে ঐ বেদমন্ত্র তাঁরা কখনো পাঠ করতেন, কখনো গান করতেন নানাভাবে।

নানা যজ্ঞে নানা বিধি নিয়ম। এর প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি নিয়ম ছিল তাঁদের কাছে অবশ্য পালনীয়। এই সব যজ্ঞবিধি লেখা আছে বেদের 'ব্রাহ্মণ' ভাগে।

তোমরা জান, বেদের চার ভাগের মতন মানব জীবনকেও চার ভাগে ভাগ করেছিলেন সে যুগের ঋষিরা, চতুরাশ্রম—প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম। আট বছর বয়স থেকে প্রায় চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করতে হোত। এই সময়টা ছিল তাঁদের শিক্ষার যুগ। এই বয়সে, কখনো তাঁরা আরাম বিলাস অথবা আলস্যে দিন যাপন করবার অনুমতি পেতেন না। গুরুগৃহে অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায়ের কঠোর অনুশীলনে দিন কাটত।

পাঠ শেষ হলে গুরুর কাছ থেকে যাকে বলে সার্টি-ফিকেট পেতেন তাঁরা। তখন তাঁদের বলা হোত স্নাতক ব্রাহ্মণ। স্নাতক হয়ে গুরু দক্ষিণা দিয়ে ঘরে ফিরে এসে বিবাহ করে সংসারী হতেন। সেই গৃহীরা প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে সংসার ভোগ করতেন। ভোগের মধ্যেও অবশ্য

অনেকখানি ত্যাগের চর্চা হোত, ঐ যজ্ঞের দ্বারাই। যজ্ঞে বহু দান করতে হোত, বহু ব্রত নিয়ম পালন করতে হোত। এমনি করে ভোগকে তাঁরা সবসময়ই ত্যাগের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে ভালোবাসতেন। শুধু মাত্র ভোগকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতেন না। এই বিষয়েই উপদেশ আছে উপনিষদে—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, তাই তুমি ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর, শুধু ভোগের দ্বারা নয়। পাঁচজনকে দিয়ে-থুয়ে সুখ পাও তুমি—পাঁচজনকে খাইয়ে তৃপ্তি। শুধু নিজে খেয়ে দেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে পেট ফাটিও না। জীবনের এই সংসারী অংশটাকে সে যুগে 'বেদে'র 'ব্রাহ্মণ' ভাগ সর্বদা পরিচালিত করত।

সংসারের শেষে, ৫০।৭৫ বছর বয়সে, পৌত্রমুখ দর্শন করে, পুত্রকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে গৃহী তাঁর সমস্ত ধন-দৌলত পরিত্যাগ করে কখনো সস্ত্রীক, কখনো বা একাকী বনে চলে যেতেন—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি,
তাজিতে মুকুট দণ্ড, সিংহাসন ভূমি।
ধরিতে চরিত্র বেশ।"

বনে গিয়ে কুটীর রচনা করে, অধ্যয়ন, তপস্যা ও শাস্ত্রালোচনায় দিন কাটাতেন তাঁরা। কিন্তু তখনো অনেক সময়েই তাঁদের বন্ধ করার বাসনা থাকত। চির-দিন যাকে ধর্ম কাম্য বলে জেনে এসেছেন, বনে এসেই তা থেকে বিরত হতে মন সায় দিত না। কিন্তু তপোবনে কোথায় পাবেন তাঁরা যজ্ঞের অত সহস্র রকম উপকরণ। ধন-জন সবই তো তাঁরা ফেলে এসেছেন। তাই তাঁরা ধ্যানে বসে মনে মনেই করতেন যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞের এই মানস আয়োজন অথবা ধ্যানের কথা লেখা আছে বেদের আরণ্যক ভাগে।

'বেদে'র মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিণতির আভাস আছে। প্রথমে মন্ত্রের উচ্ছ্বাস, পরে কর্মের বন্ধন, তার-পরে ত্যাগের দ্বারা ধ্যানের যোগ এবং সর্বশেষে উপনিষদ্।

আরণ্যক ধ্যান তপস্যার দ্বারা তপোবনের ঋষি যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন আপন চিত্তে, তারই কথা বলেছেন তাঁরা উপনিষদে।

উপনিষদ্‌গুলির কিছু গদ্যে, কিছু বা মন্ত্রের মত ছোট ছোট শ্লোকে গাঁথা। এই শ্লোক বা গদ্য বচনগুলির মধ্যে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বালোচনা রয়েছে। তত্ত্বালোচনা বটে, কিন্তু ছন্দে, ভাবে ও মাধুর্যে, এই বচন-গুলি কোন কবিতার চেয়ে কম সরস নয়। এ শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যা নয়। এ তাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শন, এ তাঁদের উপলব্ধি। —তাই বেদকার ঋষি কবিদের এক নাম মন্ত্র-দ্রষ্টা। মন্ত্র-গুলি তাঁরা ভেবে ভেবে বানিয়ে বানিয়ে লিখতেন না। সেগুলি যেন তাঁদের মনের আয়নায় ছবির মত ফুটে উঠত, প্রত্যক্ষ করতেন তাঁরা রূপ।

কখনো চিত্তে আকুল হয়ে উঠেছে প্রশ্ন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলে উঠেছেন—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং
মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ?"

কার ইচ্ছায় এই মন সর্বদা সচল হয়ে রয়েছে—কে এই প্রাণকে প্রথম পাঠাল। 'কার এষণায় এ মন সচল, কার প্রেষণায়—প্রাণ চঞ্চল—চোখ দেখে কার জন্যে?

কখনো হৃদয়ে ভাবের হয়ে উঠেছে সমাধান, বুঝতে পেরেছেন তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—তিনি অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান—

অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হোতে মহীয়ান,
গোপন গুহায় নিহিত রয়েছে জীবের আত্মপ্রাণ।

সেই আত্মাই তিনি, যাঁকে আমরা ভগবান বলে জানি। সেই আত্মাই প্রতি জীবের মধ্যে পরমানন্দরূপে বিরাজ করছেন। জীবের হৃদয়ে সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার আসন যদি না থাকত, তাহলে কেমন করে মানুষ শত দুঃখের মধ্যে থেকেও আবার হেসে-খেলে নিজের প্রাণকে উদ্ধার করত? উপনিষদ্ বলেছেন—জীবের অন্তরস্থিত এই আনন্দকে জ্ঞানের মধ্যে উপলব্ধি করাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য।

আজ উপনিষদের কথা বলতে এসে শুধু তার একটু-খানি ভূমিকামাত্র করা গেল। কারণ এত অল্পে এই মহৎ গ্রন্থের কতটুকুই বা প্রকাশ করা যায়।

আজ শুধু এইটুকু জেনেই শেষ করি, যে উপনিষদ্

বলেছেন, সকল মানুষের অন্তরে লুকানো আছে ঈশ্বরের আনন্দ অমৃতরূপ। এমন কি পরম দুঃখও তাঁর প্রসাদ থেকে বিচ্যুত নয়। দুঃখকে দুঃখ মনে করি বলেই সে বিকট মুখভঙ্গী করে আমাদের ভয় দেখায়।

সুখ, দুঃখ এই উভয়কে মিলিয়ে এবং তাদের অতিক্রম করেও বিরাজ করছেন আনন্দস্বরূপ। তাঁকেই জানতে হবে সমগ্র জীবনের কর্মে এবং জ্ঞানে।

ওঁবিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।

সত্যি কি তুমি চাও ?

'বৈভব'

সত্যি কি তুমি চাও পৃথিবী আরও ভালো হোক্ ?
শোন বলি কি করতে হবে !
তোমার নিজের কর্মগুলির ওপর দৃষ্টি রাখো
সেগুলি যেন সর্বদা সত্য ও সরল হয়।
স্বার্থ প্রেরণা মন থেকে মুছে ফেল।
চিন্তা তোমার হোক স্বচ্ছ ও উন্নত।
তুমি যেখানে আছ সেখানে একটি
ছোট্ট স্বর্গ রচনা তুমি করতে পারো।

• •

সত্যি তুমি চাও মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ুক ?
ভাল, তুমিই তার আরম্ভ করনা !
তোমার মনের ছেঁড়া খাতাতেই
জ্ঞান সঞ্চয় শুরু করে দাও না।
একটি পাতাও বাজে কথায় নষ্ট কোরো না।
তুমি যদি মানুষকে জ্ঞান দিতে চাও
তার আগে তোমাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে।
তুমি কি সত্যি চাও মানুষ সুখী হোক ?
তা হ'লে প্রতিদিন মনে রেখো—
চলার পথে তোমাকেই ছড়াতে হবে
দয়া ও প্রীতির বীজ !
প্রায়ই দেখা যায় যত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য
নির্ভর করে একজনের বদান্যতার ওপর—
অজ্ঞাত কোন একটি হাত চারাগাছ লাগিয়ে যায়
কত দিন ধরে কত লোক তার ফল খায়
কত দিন ধরে কত যাত্রী তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে।

কাজল-প্রদীপ

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সঘন বনের মধ্যে দিনের পর দিন কাটতে থাকে। ভোর ওরা উষ্ণ-অন্ত দেখে পুবের—পুবে পশ্চিমে। তমসা ঢাকা রাতের পর যখন সুপ্রভাত রাঙা হ'য়ে ওঠে—বনের ঘাসে কতো পোকাই না ওরা দেখে। স্বাস্থ্যবান সবল বনে ঘোরা আর রাতে কোনও বিরাট বনস্পতিতে আশ্রয়—এইভাবে থাকেন দুই কুমার। মাঝে মাঝে বীরত্বের পরীক্ষাও হয় হিংস্র জন্তুর আক্রমণে। কতোদিন কেটে গেলো—না পাওয়া গেলো বৈরভকের সন্ধান—না পাওয়া গেলো কোনোদিন একটু লোকালয়ের সূত্র। মানুষের আস্তানার দিকে কাজল প্রদীপ আর যান নি—রাতের গভীরে অনেক সময় তার বিরাট শরীরের পেছনে মড় মড় করে বনতল দলিত করে যাবার শব্দ পাওয়া যেতো—কখনো বা তার গর্জন ভেসে আসতো দূর হ'তে।

সেদিন ভোরে ওরা সঘন বনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে এগোতে শুরু করলো। চলতে চলতে এক সময় প্রদীপ থমকে দাঁড়ালো—"যুবরাজ—কাজল ! আপো ওই দিকে যেন বন ফাঁকা হয়ে এসেছে আর নিবিড় বনের ঝালরী হঠাৎ ফাঁক হয়ে কেমন উজ্জ্বল নীল আকাশ দেখা যায়—আপো !" "হাঁ প্রদীপ ! একটা সূর্যরশ্মি রেখাও মাঝখানে লক্ষ্য কোরে আপো—বোধহয় পাহাড়-শ্রেণী।"

কাল সেই বন নিয়ে দুই বন্ধু আবার এগোতে থাকেন। রাতে আবার আশ্রয় অজানা বনস্পতির বেষ্টনীতে। ভোরে প্রদীপ গেলো ফলের সন্ধানে—কাজল পাখী-শিকার করেছে—একটু বন ঝোপের আড়ালে আগুন জ্বালিয়েছে। একটু পরেই প্রদীপ ছুটে এলো ফিরে—তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কাজল অবাক হয়ে চেয়ে রেখে প্রদীপের কাঁধে অপূর্ব সুন্দর একটি টিয়াপাখী—নতুন আধপাতার যে রং থাকে—তারই মতন তার গায়ের। পলাশ লাল কালো টিয়া।

"কথা কইছে ! কাজল এ কথা কইছে ! আর আপো পাখেতে এর দোসর শিকল চড়ানো—"

"পারলো না—পারলো না ! ওরা—কেউ পারলো না !" প্রদীপের কথার বাধা দিয়ে টিয়ার তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠ বনভূমি সচকিত করে তোলে।

"তাহলে কাছেই লোকালয় আছে প্রদীপ—" কাজল দাঁড়িয়ে উঠে

বলে—"কিন্তু এ উটে চড়ে কি প্রবীণ? তোর কষ্ট কি পারলো না কেউ?"

দুজনে আবার এগোতে শুরু করেন সন্তর্পণে। কোথাও বনের শেষ পাওয়া যায় না। রাতে দুজনে উঠে নিয়ে গাছে আশ্রয় নেন। "ঠিক হচ্ছে!" এক সময় চিন্তামগ্ন কাজল বলে ওঠে।

"কি ঠিক হলো কুমার?" প্রবীণ চকিত হয়ে ওঠে।

"কাল আমরা নদীর বুকে পাড়ি জমাবো।"

কয়েকটি শুকনো ডাল লতা দিয়ে বেঁধে দুই বন্ধু অজানা নদীর ঢেউ বেয়ে চললো। সঙ্গে রইলো নতুন সাথী উটা।

ক্রমাগত পাশে চলেও যে দূরের পাহাড়কে ওরা কাছে আনতে পারেনি—এবার কখন যে তারই কাছ ঘেঁষে ওরা চলেছে জানতেও সময় ফুরিয়ে এলো—কোথায় ঝিকিমিকি নদীর বুক উচু-নীচু নীলাভ দূরন্ত পাহাড়ের গায়ে যেমন মুখ দেখছে—দুই বন্ধু দেখেন অবাক হয়ে। হঠাৎ ওদের চমক ভাঙলো তীব্রভাবে ভেলা থামিয়ে নেওয়াতে।

"কুমার, কুমার! আমাদের এখুনি ভেলা ছেড়ে দিতে হবে, নইলে নদী উৎস-মুখে আমাদের সাথে আমরা ভেলা শুদ্ধ তলিয়ে যাবো।" উটা গভীর জলেও তীর দূর দূর নয়। কাজল প্রবীণ দুইজনে বহু কষ্টে সাঁতরে তুলে এনে ওঠে। অবসন্ন শ্রান্ত দেহে নিরু বদনে দুই বন্ধু ধীরে ধীরে বন হাতে পায়ে-চলা পাহাড়ে পথে চলতে শুরু করেন। প্রবীণের কাঁধে কুমার সঙ্গীটী উটা বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে—"পারলো না, কেউ পারলো না—বন্ধু, বন্ধু!"

গিরিপথ দিয়ে চলতে চলতে দুই বন্ধু লক্ষ্য করেন পাহাড়ের সে পায়ে-চলা-পথ যতো অস্পষ্ট—ঝোপে-ঝাড়ে যেন মুছে গিয়েছে যেন। যেন বহুদিন আগে বহু লোক, বহু অযাত্রীরা এই পথে এসেছিলো না ফিরে ফিরে। পাহাড়ে-পথের শেষে সমতল-ভূমিতে দুই বন্ধু যখন এসে পৌঁছালেন—তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। তারার পরিষ্কার আলোয় দূরে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রান্তর কোন কিছু চোখে ধরা যায় না। আরও দূরে দেখা যায়—কোন অতিদূর তারার মানুষের ঘরে ঘরে জ্বালা অনেক আলো।

সমতল-ভূমিতে দুই বন্ধু নগ্ন-দেহে পায়ে হেঁটে সম্মুখেই যে কুটীর দেখেন তারই দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ান। একটি কিশোর বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি বলে "ওগো তোমরা কে?"

"পুরে-বেড়ানো ছেলে আমরা।" আত্মপরিচয়-গোপন করে দুই বন্ধু বলেন। দীর্ঘ বনবাসে ক্লেশে ও বেশে কোনো চিহ্নই নেই পরিচয়ের। শুধু দীর্ঘ যুদ্ধের ক্লেশ পথিকের প্রাণে চেষ্টে পথচারীরা জানে।

"ভাই সব! মহর্ষির দুই বরপুত্র কি আজ এলেন এই অভাগা দেশকে ত্রাণ কোরতে?" কেউ বলে। "যেন অমে-ঢাকা আগুন দুই নবীন পথিক!" আর একজন বলে।

"দুশন যুদ্ধের মতো এমন দুই ছেলে ছেড়ে এরের মা কোন্ প্রাণে আছে গো!" এক বৃদ্ধা বলে ওঠে। কিশোর ছেলেটি ওদের হাত ধরে ছোট কুটীরের ভিতরে এনে বসায়। তার বৃদ্ধা মা বাতাস করতে থাকেন দুই ক্লান্ত পথিককে। ফল মূল, পানীয়, অন্নব্যঞ্জন ও শয্যা দিয়ে মধুরতম আন্তরিক যত্নে কিশোর ও তার মা দীর্ঘ দিনের সকল ক্লান্তি মুছে নেয় দুই বন্ধুর। কিশোরটির নাম যাদব। দুই বন্ধুকে যাদব নেয় আর নানা কাহিনী শোনাতে থাকে সে। এ সোনার রাজ্যের নামও সোনাপুরী। প্রকৃতি দেবী তাঁর দান দু'হাত উপুড়ে দিয়েছেন এ রাজ্যে—অজস্র অনটন—দুঃখ শোক কেউ জানতো না এই অপূর্ব পুরীতে। সোনার পুরীর চারিদিকে তরীর আঁচলের মতো প্রবহমা নদী—আর নীল পাহাড় ঘেরেছে এর মাথার মুকুট।.....তারপর। সুখ শান্তির দিন কবে শেষ হয়েছে—যাদব তখন ছোট। নীল পাহাড়ের গহ্বর-বাসী এক প্রচণ্ড দানব দেবতার অভিশাপের মতো সোনাপুরীর প্রান্তে এসে দেয় হানা বছরে বছরে—যার কতো প্রাণ আর শস্য-সামগ্রী। এ অত্যাচার বারে-বারেই চলতে থাকে। তাই....." বলে যাদব থামে, তারপর বলে "তাই এ দেশের দেবতার মতো রাজা চন্দ্রচূড় বিপুল সেনা-বাহিনী নিয়ে ঐ নীল পাহাড়ের অজানা বনে দানবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে, বহু বার। কিন্তু বনে ঢোকবার মুখে প্রথম সন্ধ্যাতেই কিন্তু, প্রলয়ের মূর্তি গরিলা-দানব মহারাজাকে আক্রমণ করে বন্ধু-শিবিরে নিহত করে। আর সেই বিরাট বাহিনীরও ধ্বংসলীলা তার হাতে শোচনীয় পরিণতি। যে শুটিকতক অবশিষ্ট পালিয়ে এসেছিলো তাদের মুখে সেই ভয়ঙ্কর গরিলার সেদিনের তাণ্ডব নৃত্যের কথা এখনও শোনা যায়। গরিলা-দানবের প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা এখনও তৃপ্ত হয়নি—মাঝে মাঝে ঐ নীল পাহাড়ের ওপর হতে তার হিংস্র গর্জন শোনা যায়—হয় তো আবার কোনদিন এসে হানা দেবে সোনার পুরীতে। বয়োবৃদ্ধা অশীতে প্রবীণ, তবু তিনিই পরিচালনা করছেন রাজ্যভার আর ঘোষণা করে দিয়েছেন—যে বীর মানবের বেশের শত্রু তাঁর স্বামীহন্তা এই দানবকে, তিনিই পাবেন রাজকন্যা রত্নাবলীকে, আর সোনার-পুরীর রাজমুকুট!"

"রত্না, রত্না! কেউ পারলো না রত্নাকে!" রত্নাবলীর নাম শুনে দুষ্টিষ্ট উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে উটা। "একি! এ যে রাণীমার উটা—আমি আগে বুঝতে পারিনি তো! একে কোথায় পেলে ভাই?"

"ওকে আমরা নীল পাহাড়ের বন হতে পেয়েছি যাদব।"

"সত্যি বলো ভাই—তাহলে কি মহর্ষিই তোমাদের পাঠিয়েছেন? তিনি বলেছিলেন—দুটি কুমার আসবেন নীল পাহাড়ের বন পার হয়ে আমাদের ত্রাণ করতে!" বিস্ময়ে আশায় যাদবের চোখে আবার জল এসে পড়ে। রাণীমার ঘোষণা দিয়ে বেশে বেশে পাঠিয়েছিলো পত্র দিয়ে। কতো বীর, রাজা, রাজপুত্র এসে প্রাণ হারালেন গরিলার বজ্র নিষ্পেষণে। এক এক করে এক একটী বীরের মৃত্যু সংবাদ আসে আর মহারাণী বলে ওঠেন "পারলো না কেউ পারলো না—রত্না, রত্না।" সঙ্গে সঙ্গে চলে পড়েন জ্ঞান হারিয়ে। সেই কথাই তাঁর সাথী এই উটা বলছে—একে কাল সন্ধ্যায় নিয়ে যেতে ভাই—কুতো খুশী হবেন।" দুই বন্ধু বিচিত্র ভাবনায় আর উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে শোনেন যাদবের কথা। একসময় প্রবীণ ধীরে বলেন—"মহর্ষির কথা বলো যাদব।"

"তিনি এক মহা তপস্বী—সারা ভারত তীর্থ পর্যটন কোরে বেড়াতে বেড়াতে কৃপা কোরে আমাদের এই আতঙ্ক-ভবন সোনারপুরীতে এসে আমায় বাণী দিয়ে গেছেন যে—দুই বীর আসবেন তোমাদের রক্ষা কোরতে। সেও তো আমার আশায় আশায় দুই বৎসর কেটে গেলো—বলো না ভাই—তোমরাই কি সেই ?'

দুই বন্ধুর মনে সে রাতে কতো যে চিন্তার তুফান ওঠে কে তা জানে। কাঞ্চনপুরীর মহারাণীর কুলগুরু এই রামধ-ভ্রান্তিত পুরীতে এসে কি তাদেরই আশ্রয়দাতা মানিয়ে গেছেন? এই দুস্তর বনসমুদ্রের কথা তারা তো স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করেনি—যা হবে এই অজানাকে জয় করার নেশা তাদের শুরুর আশ্বাসেই রঙীন হয়ে উঠেছিলো। মাত্র দশবারো দুইজনের অবস্থা জলপুরের মতো—ক্লান্তে শীর্ণ। কতোদিন কাঞ্চনপুরী ছাড়া তারা—কি দুঃখের আঁধারেই ফেলে এসেছেন দুই কুমার কাঞ্চনপুরীকে।

রাত শেষ হয়ে আসে। ভাবতে ভাবতে কামল কখন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—সহসা ঘুম ভাঙে প্রদীপের করস্পর্শে!

"বন্ধু, সখা, যুবরাজ!" ভাঙা গলায় প্রদীপ বলে—আমায় তুমি এক্ষুণি যেতে দাও মহারাণীর সভায়। আমার হাতে পিতার দেওয়া অমোঘ অস্ত্র—আমি একা যাবো সেই দানবের সন্ধানে নীল পাহাড়ের গহ্বর-মুখে। যদি তাকে হত কোরতে পারি—তোমার উপহার দেবো কামল সেই দানবের হত্যা-কলঙ্কিত হাত দুটো। তুমি রাজকন্যা ও রাজ্য পাবে। আর……যদি আমি যদি তার বজ্র-নিষ্পেষণে…… তাহলে—তুমি তো জানো একটি আঘাতেই জীবমুক্তি লাভ হবে……।"

প্রদীপের দুই হাত রাজপুত্র চেপে ধরেন—"না বন্ধু! তোমার দেওয়া রত্নাবলী আমি নেবো না—সে তোমাকেই নিতে হবে জেনো! তাহলে তো সোনার-পুরীও হবে তোমার। রত্না ও রাজমুকুট যদি পাও—তাহলে তো চিত্রাও হবে তোমারই!" কামলের কণ্ঠ শেষকালে একটু কেঁপে যায় আর প্রদীপের মনে ওঠে ঝড়। বীর্যবন্ত ক্ষত্রিয় তরুণ—তার হাতে শাণিত অস্ত্রের অস্ত্র—দানব মারতে পারবে না? রত্না তো উপলক্ষ্য। সোনারপুরী ও রত্না! রাজমুকুট পেলেই চিত্রার গাঁথা বরণ-মালা দুলবে প্রদীপের গলে। বৈশব-বৈশোরের সহচরীকে সে যে একটি বৎসর ধরে বিনায়ু রাত্রি স্নান শেষে দেবীর চরণে ফোটাপদ্ম অর্পণ কোরে ব্রত সমাপন কোরেছিলো জীবনে ফিরে পাবার জন্যে!

আর কোনো কথা হয় না। পরদিন কামল ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় মহারাণী সুবেণীর রাজসভায়। রাণীমার মহিমান্বিত রূপে যেমন মিলে মিশে পাশুর হয়েছে দেহের লাবণ্য। কুমারদের দুই হাত ধরে স্বাগত জানালেন। বীরদের ঘোড়া হারানো ঠিকানা পেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো তাঁর—"আমার কথা বলার সাথী একে যে আবার ফিরে পাবো—তা' স্বপ্নেও ভাবিনি!" "পারলো না, পারলো না—রত্না কেউ পারলো না—" হঠাৎ উঠা তীব্র মধুর স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। "ঠাঁ।" হাত তেসে মহারাণী বলেন "আজও আমার স্বামী-হন্তা সোনারপুরীর আতঙ্ক পরিত্রাণ-দানবকে কেউ মারতে পারেনি। রত্না-মাকে আর এই আমার মহারাজার রাজমুকুটটিকে জয় সেই বীর পুরুষ কোরে এনে দেবেন আমার হাত হতে!" সুবেণীর দুই চোখ হতে অঝর ঝরে।

দুই বন্ধু মহালয়ারের আশ্রয় পেলেন রাজপ্রাসাদে। বীরদের মনে পড়লো দুই কুমার। যুবরাজ একসময় বলেন "প্রদীপ আমি যাবো!" "আমিও!" প্রদীপ বলে ওঠে। দুই বন্ধু মেতে ওঠেন রাজমহাকে লাভ করবার সংকল্পে।

প্রভাতে মহারাণীর মহলারে অরেজি পেশ করলেন দুইবন্ধু। ঝলমল করে উঠলো রাণীমার চোখ দুটি—"যেদিন বুঝেছিলেম তোমারই সেই হঠাৎ আসা মহাতপস্বীর দুই বরপুত্র তোমাদের আমার জন্যে প্রতিদিন প্রতি প্রহরে দেবী বিশালাক্ষীর চরণে প্রার্থনা জানিয়েছি—কুমারেরা! কিন্তু আমার যে মন মানছে না বৎস—কোন মায়ের এমন ধনকে আমি পাঠাবো সেই মহাভয়ঙ্করের মুখে?" "দেবি! আপনি ভয় পাবেন না—আমরা ফিরে আসবো!" দুই বন্ধু স্থিরমুখে বলে।

* * * * মহারাণীর দেওয়া সকল অস্ত্রশস্ত্র, রাহীযোড়া, লোকজন, সব ফিরিয়ে দিয়ে নীল পাহাড়ের বাঁকে কুমার দুইজন ঘোড়ার পিঠে মিলিয়ে গেলেন। রাখালিয়া বালক ছিলো রাজপুত্রের ঘোড়ার পিঠে—তারই হাতে দুটি ঘোড়াই রাখ দিয়ে দুই বন্ধু বনপ্রান্তে নেমে পড়লেন। বালকের কাছে বিদায় নিয়ে দুইকুমার নদীতীরের বন বন-শ্রেণী ধরে চলে গেলেন। বালক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে এলো কুটিরে।

নদীর উৎসের কাছে এসে যুবরাজ থামলেন—অটলস্বরে বলেন প্রদীপকে—"আজ আমাদের তাদা পরীক্ষা প্রদীপ! তোমার আমার দুজনারই মনে সংশয়ের ঝড় উঠেছে। আমাদের মনের জোর এই যে আলগা হয়ে এসেছে—জানি না আর এর গ্রন্থি বাঁধা যাবে কি না! এই নদী-উৎস হতে আমরা আলাদা আলাদা পথে যাবো।"

……দীর্ঘ দিন আর রাত্রি, ক্লান্ত নিঃসঙ্গ যুবরাজ নীল পাহাড়ের বনে অবসন্ন দেহ টেনে দানবের সন্ধানে ঘুরছেন। প্রথম প্রথম ঝড়ো এলা লাগতো রাজপুত্রের—নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতেন। ……ঘোর অন্ধকার রাতে পাহাড়ের গহ্বরের শিয়রে ডানবাঘের দেওয়ালের পাথরের খাঁজের আড়ালে লুকিয়ে রাজপুত্র অতন্দ্র-চোখের সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকেন—যদি শত্রুর দেখা পান—যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হয়!

…ক্রমে গভীর রাত নিথর নিশ্চুপ হয়ে ঘনিয়ে আসে—কখন ক্লান্ত চোখের পাতায় তন্দ্রার পরশ লেগেছিলো রাজপুত্র জানেন না—হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুমের ঘোঁয়াটুকু চকিতে ছুটে গেলো! কৈ কিছু তো না—তেমনি নিথর বন আরণ্যে থমথম করছে! কিন্তু সম্বিৎ ফিরে আসতেই যুবরাজ স্পষ্ট অনুভব করেন মনের অন্তিম

কোন হতে একটা কমার অন্ধকারের বিশাল পক্ষরাজ ঝাঁপ হয়ে এলো হারপথেই সে সমস্ত গলটা ভাঙতে ভাঙতে পুরুষের দিকে দ্রুত এগিয়ে এলো। দুটো ভয়াল মধুর চোখ আর দুই সারি হিংস্র দাঁত ঝক-ঝক করে জ্বলছে! পরিমার লোমশ গায়ের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। পলকে কর্তব্য স্থির করে রাজপুত্র অদ্ভুত কুশলী হাতে বিপুল শক্তিতে বর্শা হানলেন……একটা আকাশ-ভাঙা গর্জনে ভূলে আনোয়ারটা লম্ফ দিতে দুই করাল-নখর ভরা বিশাল হাত বাড়িয়ে লাফিয়ে পড়লো—ঠিক রাজপুত্র পেছু হটতে থাকেন এমন সময়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন দানবের পর্বতাকার দেহটা যেন হঠাৎ অসাড় হয়ে লুটিয়ে পড়লো। বিদ্যুৎ দুবরাজ পক্ষের-তালে নামতে যেতেই দুজনের ওপাশ হতে কার আবছায়া মূর্তি এগিয়ে এলো।

—"প্রদীপ!"

—"কাঞ্চন-যুবরাজ!" দুজনেই বিস্ময়ে অভিভূত…পরিমার বুকে পাশাপাশি দুই বর্শা গাঁথা—দুজনকিতে ওরা আজ রাক্ষসটা দানবের প্রাণ নিয়েছে।

বন্ধুদ্বয়ের হাত দুজনের হাতে রেখে বিদায় ভাবনায় দুই সখা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকেন।

……অবচেতনার দুটি প্রদীপ অহরহ অন্তর নিষ্টিড়িত করতে লাগলো—রত্নাবলী! রাজমুকুট—চিত্রা! কার হবে পুরস্কার—বিজয়-তিলক?

সারা সোনারপুরী জেগে পড়েছে—আজ সবার মুখেই একই কথা—কার হবে পুরস্কার? দুই বীর যুগল হাতে নিধন করেছেন সোনার-পুরীর শত্রুকে। কার হবে রত্নাবলী…রাজমুকুট?

বিরাট মানব-স্রোত সভাপ্রাঙ্গণের একপাশে নীত হয়েছে।—হর্ষে-বিষাদে আজ ভেঙে পড়েছেন মহারাণী। পরম সমাদরে দুই হাতে দুই বীরের হাত ধরে মহারাণী বলেন, "দেবতার বরপুত্র তোমরা বৎস! নিলিপ্ত-শক্তিতে তোমরা আজ উদ্ধার করলে অভাগা পুরীকে। দুই বীরকেই আজ পুরস্কার দানে বরণ করে নেবে সোনারপুরী—তোমরা আমার তিলমাত্র বিধা দেবেনা।…কিন্তু…" মহারাণী থামেন—বিশাল নিস্তব্ধতা রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে—কই না নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাবে সেখানে!

"কিন্তু—না কিন্তু নয়। আজ হতে সাতদিন পরে হবে সকল সমাধান! পুরবাসী! রাজকন্যার শুভ বিবাহ আর নবীন রাজার অভিষেকের আয়োজন করুন!" দ্বিধাহীন ঘোষণা করে দিয়ে মহারাণী সভাভঙ্গ করেন।

সেই সাতটি দিন কি দুঃসহ ব্যবধানই এঁকে দেয় দুই তরুণের মধ্যে। রত্নাবলী ও সোনারপুরী! বাঘনের মুখে রাজপুত্র নিশিদিন শোনেন রাজকুমারীর কথা। ত্রিভুবনে ওঁর তুলনা হয় না। সোনার মধ্যে যে বর্ণ-বিলাসে তারই আছে এই সোনারপুরীর সোনার বরণ রাজ-কুমারীর দেহে! বিদ্যুতের বুকের দীপ্তিটুকু যেন স্পর্শ করা হয়েছে ওঁর লাবণ্য-বৃদ্ধিতে আর কালবৈশাখীর মেঘকেও হার মানায় রত্নাবলীর কেশ। প্রদীপ বেদনা-মলিন মুখে একা বসে ভাবেন—রাজমুকুট আর চিত্রা!

নীল পাহাড়ের গায়ে গায়ে। এলো অবশেষে সেই মহাক্ষণ! রাজ-কন্যা রত্নাবলীর পরিণয় আজ এই বসন্ত-পূর্ণিমা-রজনীতে আর কার হৃদয়ের মদন-দুন্দুভি হবে নবীন রাজার রাজ্যাভিষেক! বহুদিন পর সারা নগরী উৎসব-সজ্জায় মেতে ওঠে মাতামাতি করে। পথে পথে চন্দন-ছড়া পারদৃষ্টি হচ্ছে! মঙ্গল-ধ্বনিতে আকাশ ভরা!

সন্ধ্যায় দুই বীর আসেন রাজকুমারীর বিবাহ-সভাতে। সুসজ্জিত বিরাট সভামণ্ডপে দিকে দিকে মণিময় দীপ জ্বলে। সোনার পাদ-পীঠের ওপর স্বর্ণের মৃগ সিংহাসনটি ঝলমল করে হীরা পান্নার দীপ্তিতে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন—শুভলগ্ন উপস্থিত। ধীরপদে মহারাণী এগিয়ে আসেন—ইঙ্গিত মাত্রে পলকে সরে যায় সিংহাসনের ডানপাশে হাতির দাঁতের জালির আবরণ—নিমেষে সভা যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেলো! দুইটি অপরূপ তরুণ মূর্তি দাঁড়িয়ে-রয়েছে একই ভঙ্গী, একই বর্ণ, একই মুখ—একটিল ভেদ নেই!

"রত্নাবলীকে পাবেন দুজন বীরের একজন! স্বর্ণময়ী মাকে যিনি লাভ করবেন তিনি হবেন কাল এ রাজ্যের রাজসিংহাসনে অভি-ষিক্ত আর রত্নাবলীকে যিনি লাভ করবেন তিনি আর কিছুই পাবেন না?" মহারাণীর শান্ত কণ্ঠস্বরে সভা আবার স্তম্ভিত হয়ে যায়।

মহারাণীর ইঙ্গিতে দুইজন প্রাচীন নাগরিক দুই কুমারের চোখ বেঁধে দেন নিশ্ছিদ্র বস্ত্রখণ্ড দিয়ে। সোনা দিঁড়ী দিয়ে কুমারেরা প্রতিমার পানে যান সোনার পাদপীঠ দিয়ে। রাজপুত্র আনন্দোজ্জ্বল মুখে তাঁর চোখের ঢাকা খুলে ফেলেন—তাঁর হাত দুটীর মধ্যে ধরা পড়েছে অতি সুন্দর কোমল একখানি হাত জীবনের শপথে তাপময়। আর প্রদীপ অপূর্ব আনন্দ-বিস্ময়ে দেখেন তিনি পাণিগ্রহণ করেছেন দুর্নি-রীক্ষ্য স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে চোখে তার নীলকান্ত-মণি, মুখে প্রবালের রক্তরাগ আর পদ্মরাগ-মণিতে গড়া অপরূপ ঠোঁট দুটি—সবই রত্না-বলীর উপমা! অভিভূত বীর প্রণাম করেন যুক্তকরে সেই দেবী মূর্তিকে!

সোনারপুরীর রাজমুকুট সিংহাসনে অভিষিক্ত প্রদীপকুমারের চন্দন-পত্র ললাটে পুরহিত মহারাণী পরিয়ে দেন! রত্নাবলী ও যুবরাজ সহর্ষে সানন্দে রাজ-তিলক এঁকে দেন সলজ্জ প্রদীপের কপালে। রাণী-মা সোনারপুরীর রাজার সঙ্গে কাঞ্চনপুরীর রাজকুমারীর বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠিয়েছেন।

আনন্দে অধীর সারা কাঞ্চনপুরী নীল পাহাড়ের বন ভেঙে বিরাট রাজপথ তৈরী করছে গানের তালে। সোনারপুরীর আতহারী উৎসবের ঢেউ-টাচ কাঞ্চনপুরীতেও এসে লেগেছে।

ফুলবৃষ্টিতে আকীর্ণ রাজপথ দিয়ে যুবরাজ কাঞ্চনপুরীতে এসেন বধূ নিয়ে। মহারাণী সুরেখী বরবেশী প্রদীপকুমারের ঘোড়ার সঙ্গে আসেন শিবিকায়। সুগন্ধ রাজার দীপের আলোয় কাঞ্চনপ্রদীপের বিস্ময়ে প্রণামে সমুদ্যত ললাটে আশিস-মুদ্রা দিয়ে, কুলপুরোহিত স্মিত-মুখে বলেন—"আজ আমার সকল অনুষ্ঠান সফল হলো।"

দ্বারকার দ্বারে

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

আরব সাগর উপকূলে পশ্চিম ভারতের শেষ সীমারেখার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। প্রত্যহ ভোর বেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্র বহন করে নিয়ে আসে নানা সংবাদ। তার মধ্যে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের আশঙ্কার খবরটাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর। রেলপথ, ব্যোমপথ, জলপথ, সব দিয়ে মানুষ আজ যুদ্ধ করছে। মনে হয় কোলকাতার বাইরে গেলে কিছুদিনের জন্য মন একটু মুক্তির আনন্দ পাবে। কিন্তু তাও কি উপায় আছে? রাজস্থান, গুজরাট, সৌরাষ্ট্রের পথে সঙ্গী মানুষদের মনেও সেই অশান্তি। গুজরাতীরা চাইছে মহাগুজরাট প্রতিষ্ঠা করতে, মারাঠীরা চাইছে বৃহত্তর মহারাষ্ট্র; কিন্তু কারো আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত না করে ১লা মে বম্বের প্রতিষ্ঠা হবে (এখন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে) দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য। কাজেই গুজরাট আর মহারাষ্ট্রের মানুষের মনে ঘোর অশান্তি। সর্বত্র অশান্তি। দ্বারকায় এসে জগৎ-মন্দিরে রণছোড়জীর বিগ্রহের পানে চেয়ে মনে পড়ে গেল সেই মহাভারতের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কথা। সেই যুদ্ধ সর্বকালে সর্বদেশে সৃষ্টির পশ্চাতে ছুটে বেড়াচ্ছে। এর থেকে মানুষের আর মুক্তি নেই।

রাজকোট থেকে দ্বারকাধাম ১১০ মাইল তিন ঘণ্টার পথ আমরা অতিক্রম করলাম ১০ ঘণ্টায়। সৌরাষ্ট্র এতবড় দেশ হলেও তার রেল-পথ বড় দুর্বল। সেই দিল্লীর পর থেকে সুরু হয়েছে মিটার গেজ লাইন। তার গতি ও বিরতির মধ্যে কোনও নিয়মানুবর্তিতা নেই। যখন খুশী চলে, যতক্ষণ খুশী থামে। আর গতিবেগও অত্যন্ত মন্থর। সৌরাষ্ট্রের রেলপথে এই ব্যাপার চরমে পৌঁছেছে। মানুষের মূল্যবান সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রেল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। সৌরাষ্ট্র দেশটির তিনদিক আরব সাগরে বেষ্টিত। তাই এর নাম কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপ। মরুদেশের তরা দেশ হলেও এর মাটিতে সবুজের চিহ্ন খুব কমই চোখে পড়ে। পথের দুধারে শুধু চীনাবাদামের ক্ষেত, আর কাঁটাবন। এরই আড়ালে কোথাও দলবেঁধে কোথাও একেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাগী সুন্দর সুন্দর ময়ূর আর ময়ূরী। চিকার মত প্রকাণ্ড একটী ডুবোর পরে গোমতী নদীর খাদের উপর দিয়ে আমরা চলেছি। এমন সময় ছন্দা, পাশড়ী সোল্লাসে ঘোষণা করল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সত্যি নীল, আকাশের প্রান্তে তখন দেখা যাচ্ছে আরব সাগরের অসীম সুনীল বিস্তৃতি। ভাদুড়ী বললেন—ওটা সমুদ্রের খাত, আসল সমুদ্র নয়। কিন্তু ছেলেরা ওঁকে বোঝালেই ওটা আসল সমুদ্র, খাত নয়। যোজন খানেক দূর হলেও সাগর পার্শ্বে বালুময় স্থলভূমি দিয়ে আমরা বেলা প্রায় তিনটের সময় দ্বারকা ধামে এসে পৌঁছালুম। ভোতাদ্রি মঠে আমাদের আস্তানা ঠিক ছিল।

সুন্দর সিমেন্ট বাঁধানো পরিচ্ছন্ন পথ। ষ্টেশন থেকে একেবারে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির পর্যন্ত চলে গেছে। পথিপার্শ্বে গাছপালা বিশেষ না থাকলেও দ্বারকাকে সমৃদ্ধ দিয়েছে অখণ্ড স্নিগ্ধতা, আর নিবিড় প্রশান্তি। আবহাওয়ায় এখানে উষ্ণতার মোটেই নেই। সবচেয়ে মজা এখানে। কাছাকাছি দুটী কূপ, তার একটীর জল লোনা, অপরটীর মিঠে। একই মাটী, অথচ জলের কি তারতম্য।

ষ্টেশন আর জগৎ-মন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে ভোতাদ্রি মঠ। অন্যান্য হোটেল, আশ্রম, ধর্মশালা প্রভৃতি হয় ষ্টেশনের কাছে, নাহয় মন্দিরের কাছে অবস্থিত। তাই এই মঠের চতুর্দিকে বিশেষ লোকালয় না থাকায় ছিল তপোবনসুলভ মুক্ত প্রান্তরের পক্ষীহীন বিমুক্ত। মঠের স্বামীজি মহারাজ তখন দুর্গাপুরার জন্য জামনগরে ছিলেন। ষ্টেশনে ভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন যে দু একদিনের মধ্যে তিনি দ্বারকায় আসছেন। আমরা মঠে পৌঁছাতে রামবাবু আমাদের যথেষ্ট অভ্যর্থিত করলেন। এখানে যাত্রীরা ভিন্ন সকলেই সন্ন্যাসী। পরিবেশটী

ছোট দ্বারকার মন্দির

বড় ভালো লাগল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমান্তে একটী পরিচ্ছন্ন আস্তানা পেয়ে প্রাণ মন কথা কয়ে উঠল—"দেশে যেন্থে মোর ঘর আছে"।

আমাদের ইচ্ছা ছিল স্নানাহার করে সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাওয়ার—কিন্তু মঠে সেদিন যাত্রীর অত্যধিক ভীড়ের জন্য কুয়োতলা খালি হতে অনেক দেরী হওয়াতে মন্দিরে যেতে আমাদের রাত্রি হয়ে গেল। সেদিন ছিল শারদ শুক্লা একাদশী। শিউলী ফুলী জ্যোৎস্নায় পথ প্রান্তর যেন কথা কইছে। অজানা পথ, অচেনা মানুষ, আমরা চলেছি। পথে লোক নেই বললেই হয়।—দূরে দেখা যাচ্ছে দ্বারকার বিখ্যাত সিমেন্ট ফ্যাক্টরী। ইন্দ্রপুরীর মত ঝলমল করছে তার বৈদ্যুতিক আলোক মালা। তার চলন্ত যন্ত্রের গর্জনে রাত্রির দ্বারকাপুরী প্রাণময় হয়ে উঠেছে। প্রশস্ত পথ, একটী গেছে ওখারোডের দিকে, অপরটী মন্দিরে। দোকান বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরে একসময় আমরা এসে

পৌরাণিক দ্বারকানাথের উদ্ভবে মন্দিরের প্রধান দেবতাটীর নাম দ্বারকানাথ; আর গোমতীর প্রবেশদ্বারের নাম মোক্ষ দ্বার। দ্বারকাধামে সাতটী, শিব পাঁচটী, নারায়ণের ও লক্ষ্মীর মন্দির আছে। সেই সকল মন্দিরের চত্বরে দোকান বসিয়ে বিক্রী হচ্ছে তুলসীমূল আর তুলসী পাতার মালা। মন্দির তখন লোকারণ্য। সবেমাত্র সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। অতিকষ্টে সেই জনসমুদ্র অবগাহন করে গর্ভ-গৃহের সামনে উপস্থিত হয়ে আমরা দেখলুম সম্রাট বেশে শ্রীকৃষ্ণকে। মহামূল্যবান বেশভূষা ও রত্নভূষণের মাঝেও স্পষ্ট প্রতীয়মান করলুম নবঘন-শ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডল ও দুটী চরণ দুটী। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করে-ছিলেন, তাই এখানে তিনি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে হাসে দণ্ডায়মান—পীতবসনা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ নন। এখানে তিনি রাজবেশধারী রণছোড়জী দ্বারকা-নাথ। আমার সামান্য তুলসীর মালাটী তাঁর কণ্ঠে দুলতে দেখে দ্বারী আনন্দ বোধ। বন্ধনা শেষে গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। আবার চল্লিশটি পরে খোলা হবে। ক্রমশঃ ভীড় কমে আসতে লাগল। আমরা এবার চত্বরে বসে রইলুম আবার মন্দির দ্বার মুক্ত হওয়ার আশায়। কারুকার্য খচিত সুন্দর রত্নত অর্থনটীর পানে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হোল, চিতোরের রাজলক্ষ্মী কৃষ্ণ-প্রেমিকা মীরাবাঈ-এর কথা। আরাধ্যের শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বামী সংসার সিংহাসন ফেলে পথে বেরিয়েছিলেন মীরা। আমার গিরিধারী তুমি কোথায়?" খুঁজতে খুঁজতে তিনি এলেন বৃন্দাবন ধামে, রূপ গোস্বামীর আশ্রম প্রাঙ্গণে। দীক্ষা নেবেন মীরা। গোস্বামীঠাকুর বললেন, তিনি কোনও স্ত্রীলোকের মুখ-দর্শন করেন না, তার দীক্ষা ত দূরের কথা। মীরা তাঁর অভিমত মেনে নিতে রাজী নন। ফলে উভয়ে নিমজ্জিত হলেন তুমুল তর্কসমুদ্রে। অবশেষে ভক্তির কাছে যুক্তি পরাজিত মেনে। রূপগোস্বামী মীরাকে দীক্ষা দিলেন। নাম হল মীরা উন্মাদিনী। কিন্তু তাতেও তাঁকে পাওয়া যায় না। তখন মীরা আবেশ পেলেন—"দ্বারকায় গেলে আমায় পাবে" দ্বারকা কতদূর? অবশেষে একদিন মীরা এলেন দ্বারকা। অগণিত যাত্রীর সঙ্গে তিনিও চলেছেন মন্দিরে। রণছোড়জী যে তাঁকে ডেকেছেন?। এমন সময় ঘটে গেল এক অলৌকিক কাণ্ড।" মীরা এসে যেই দাঁড়িয়েছেন কৃষ্ণবিগ্রহের সামনে, অমনি তাঁকে নিয়ে আপনা থেকে গর্ভগৃহের দ্বার অদর্শনস্থ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার যখন অর্গলমুক্ত হোল, তখন দেখা গেল পূজা বেদীকায় শুধু পড়ে রয়েছে মীরার পরিধেয় বস্ত্রখানি; মীরা তাঁর গিরিধারীলালের সঙ্গে, লীন হয়ে গেছেন। এই সেই দ্বারকাভূমি, এই সেই মীরার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। সহস্র প্রবাহ বয়ে চলেছে অবশ্য ধারায়। মানুষের মধ্যে দিয়ে ভগবান কথা বলে নিত্য নতুন নতুন রূপে। কিন্তু মানুষের প্রেম চির-শাশ্বত, কোনও যুগে কোনও কালে তার মৃত্যু নেই।

গোমতী নদী যেখানে গিয়ে আরব সাগরে মিশেছে ঠিক তারই খানে সৌন্দর্যে দ্বারকানাথের জগৎ-মন্দির। মথুরা থেকে চলে এসে শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাজত্ব করেছিলেন। অতঃপর তাঁর পৌত্র বজ্রনাভ এইখানে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের অতীত ইতিহাস মানুষের সংসারযুদ্ধিকতার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে অবশ্য ধারায়। দ্বারকানাথ নামের উৎপত্তি হোল যার—অর্থাৎ দুয়ার, নাথ—প্রভু; দ্বার—কা—নাথ। অর্থাৎ ভগবানের রাজ্যের দুয়ার একী—মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের শিল্প ও ভাস্কর্য অত্যন্ত সুন্দর, সুন্দর ও ভাবময়। সেটের সাতটী তলা আছে এবং দুইটি চূড়ার ঈশানকোণে একটি উজ্জ্বল পতাকা উড্ডীয়মান। গর্ভদ্বারের মুখে একটি গণেশের মন্দির আছে। অনেকে মনে করেন এই মন্দির শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের একাংশে আর একটী মন্দিরে শঙ্করাচার্য ও তাঁর গুরুদেবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎকালীন বৌদ্ধ ভারতে ব্রাহ্মণ ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শঙ্করাচার্য ভারতের চতুর্দিকে যে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারমধ্যে পশ্চিম প্রান্তের মঠ গোবর্দ্ধন ছিল এইখানে। উত্তর ভারতের বদরীনাথের পথে যোশী মঠ; দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরমে শৃঙ্গারি মঠ, পূর্ব ভারতের পুরী জগন্নাথ ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম মঠ, আর পশ্চিম ভারতের দ্বারকা ধামে এই গোবর্দ্ধন মঠ শঙ্করাচার্যের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

রুক্মিণী আর ভদ্রকালী মন্দিরে যাওয়ার জন্য আমরা বেলা থাকতে বেরিয়ে পড়লুম। ওখানেতে সমুদ্র খাতের ধারে রুক্মিণী মন্দির। দুর্বাসাপাড়ি কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়ে রুক্মিণীকে কিছুদিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরহযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। মন্দিরটি বেশ সুন্দর। ভিতরে রত্ন চতুঃ বিশিষ্ট রুক্মিণী মাতার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দুই আনা করে পয়সা দক্ষিণা দিয়ে রুক্মিণীর সীমন্তে সিঁদুর বিলুম—ভদ্রা পাণ্ডারী ও জামি। এখানে একটি চমৎকার মিঠে জলের কূপ আছে। মন্দিরের নিভৃত অলিন্দে কিছুক্ষণ সুখ বেড়িয়ে আমরা রওনা হলুম, ভদ্র-কালীর মন্দিরের পথে। ভদ্রকালী বা অম্বিকা মাতার মন্দির জগৎ-মন্দির থেকে আরও কিছুদূরে। এই মন্দিরে অনেক সাধু সন্ন্যাসী রয়েছেন। পূজা আরাধনা স্তোত্রপাঠ করছেন। এখানে অম্বিকা মায়ের ও ভদ্রকালীর মন্দির আছে। ভদ্রকালীর মন্দিরে, আমাদের কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর একটি ছবি রয়েছে। এখানে দেবীর শ্রীঅঙ্গ, অমির পোশাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত। মন্দির চত্বরে বসে আছি আমরা। নানা বয়সের মানুষের বহুমান স্রোতের মধ্যে দিয়ে দেখছি সৌখীন কাঠিয়াওয়াড়-বাসীদের সুস্থ সৌন্দর্য প্রিয়তা। এদের মেয়েরা সৃষ্টি শিল্পের কাজে যেন পারদর্শিনী। মাথার জলের কলস অবধি সামান্য ঘড়ের বিচিত্র পর্যন্ত সুন্দর সূচিশিল্পের কাজ করা। রুদ্রা পাণ্ডারী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, বাচ্চা মেয়েদের রেশমী ঘাগরার কারুকার্য দেখে। এদের গ্রামা পুরুষেরা কর্ণে কণ্ঠে অলঙ্কার পরে। আর এদের পোষাকও বেশ বিচিত্র ও বর্ণময়। মেয়েদের চোখের সুর্মা ও করধৃত মোলানী ওড়নির মেয় এদের বাহিরের কথা। গোমতী নদীর ওপারে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির। এখানে একদা পঞ্চপাণ্ডব এসেছিলেন। তাই এই ঘাটের নাম পাণ্ডব ঘাট। চারিদিকে অথৈ সমুদ্রের বালুবেলার মধ্যে পাঁচটি মিষ্টি জলের কূপ আছে। কূপগুলি বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলেও তারমধ্যে নির্মল জল টল টল করছে। এই কূপ নাকি পঞ্চ পাণ্ডব প্রতিষ্ঠা করে-

STUDENTS' COMMON-ROOM P. G. A.

ব্যবহার করুন

হিমালয় বোকে

ট্যালকাম পাউডার

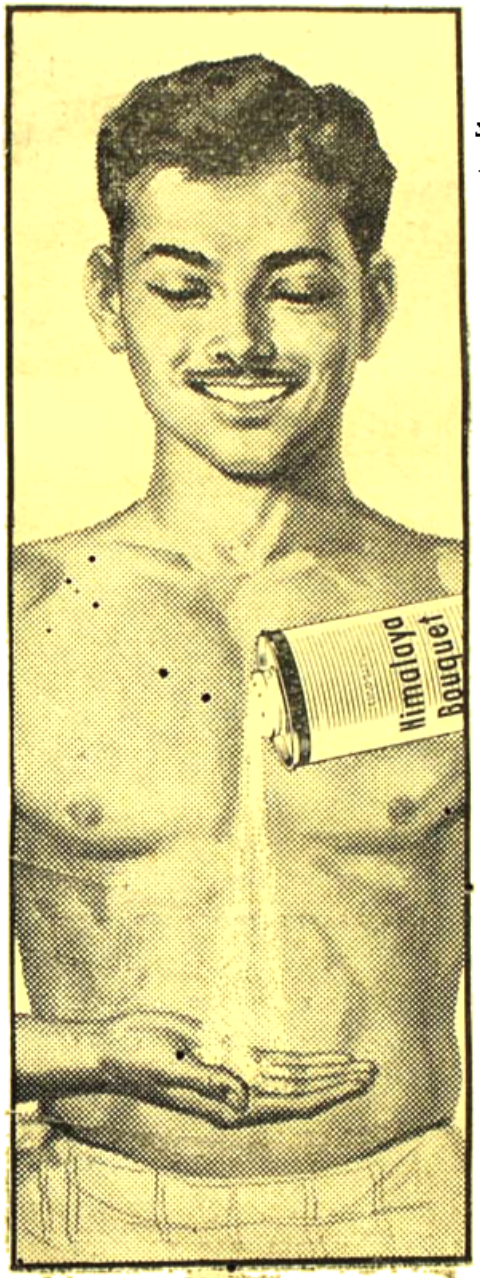

সারাদিন

সতেজ

থাকার জন্যে

• এত সুগন্ধ
• এত কম খরচ
• সারা পরিবারের
পক্ষেই আদর্শ

এসোসিয়েটেড সহযোগে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

IIBT 19-X52 BG

ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে কিছুক্ষণ বসে পূজারীর কথকতা শুনে এলাম ফিরে এসে সেই ডোঙ্গা-নৌকায়। নৌকার মাঝি আমার অনেক-গুলো খুব সুন্দর ছবি তুলে দিল। তার প্রীতির দান চিরদিন মনে থাকবে।

সন্ধ্যা হয়নি তখনও। আমরা এসে দাঁড়ালুম সমুদ্রের ধারে। এখানে গোমতী নদী এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। গোমতীর হিরোলিত গৈরিক জলধারা, সমুদ্রের তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ নীল জলের সঙ্গে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে যেন বোঝা যাচ্ছে। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ওই রকম ঘূর্ণপাক খাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে চেয়ে। জীবনের সঙ্গে মহাজীবনের চলেছে তুমুল সংঘর্ষ অনন্ত কাল ধরে। এর শেষ কোথায়, সাগর কি জানে? এখানকার প্রকৃতি বেলা-ভূমি নানা জাতের ঝিনুকে আচ্ছন্ন। বালু আর ঝিনুক মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। তার মধ্যে প্রবালের মত একরকম বিচিত্র বর্ণের পাথর এখানে পাওয়া যায়। বর্ণ-গঠনে সেগুলি এত মনোরম যে কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবো—তা ঠিক করা শক্ত হয়ে ওঠে। সাগর সেঁচা এই অমূল্য রত্নগুলি কি বস্তু, তার যথার্থতা নির্দ্ধারণ করতে সকলে অক্ষম। কেহ বলে, "এগুলি খেত প্রবাল,"—পাণ্ডারী বলে, "শুকনো সমুদ্রের ফেনা"—ভাদুড়ী বলেন, "কোনও সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল"—যাই হোক সমুদ্র যখন স্থল ভূমিকে উপহার দিয়েছে, তখন সে বস্তু মহার্ঘ।

পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্য্যাস্ত হচ্ছে। রক্তিম প্রবাল আলোর নীল সাগরকে অপরূপ করেছে।—সেই অপরূপ সমুদ্রের বুকে, তিল, তিল করে ডুবে যাচ্ছে একটী প্রকাণ্ড রক্ত শতদল। সঙ্গে সঙ্গে আমি-গুলি চেয়ে দেখে এল সৈকত স্থান পায় অন্ধকার। ওদিকে সমুদ্রে তখন জোয়ার আসছে। উত্তাল তরঙ্গগুলি তীরে এসে গভীরভাবে আছড়ে পড়ছে।

তার বজ্রকঠোর দীর্ঘক চূড়া ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে।—তবুও উদ্যম বেগে ক্রমশঃ সে তীরের উপর দিকে এগিয়ে আসছে। যাত্রীরা ধীরে ধীরে সব চলে যাচ্ছে। সাগর সৈকত প্রায় জনশূন্য। আমরা বসে বসে দেখছি সাগরের এই সাধনাতীত লীলা। প্রচণ্ড গর্জ্জনে ঢেউ-গুলি যেন কানে কানে বলছে—"তোমরা যেওনা, আর একটু থাকো।"

ওদিকে অদূরে গোমতী নদীর তীর নিবাসীদের মাথায় শুরু জ্যোৎস্না-রজনীর চাঁদ উঠেছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় সৈকতের বালুকণাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঠিক মনে হচ্ছিল কার যেন গোপন জল।

সেই পথে বেঁটে চলেছি আমরা মুক্ত পথের মুষ্টিমেয় পথিক।

দিল্লী সিমলাতে যেমন কালী বাড়ী, দ্বারকাতে সেইরকম তোতাদ্রি মঠ বিশেষ বাঙ্গালীদের একটী বিশিষ্ট আশ্রয়স্থল। এখানকার সন্ন্যাসীরা রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের বস্ত্র আতিথেয়তা সত্যিই প্রশংসনীয়। স্বামীজী বাঙ্গালী হলেও তাঁকে দেখে মনে হবে দক্ষিণ ভারতীয়। তাঁর শিষ্য দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। মঠের মধ্যে একটী বিষ্ণু-মন্দির আছে। সেখানে বিষ্ণুর সঙ্গে, লক্ষ্মী, রাধা, রুক্মিণী ও সত্যভামার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভোগ আরতির সময় মন্দিরের প্রতিটি পাষাণ কলস মনে হোত যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে। দৃঢ় প্রদীপের কম্পমান উজ্জ্বল শিখায় থর থর করে কাঁপতো প্রত্যেকটী মানুষের প্রাণের প্রার্থনা।

মঠের ভবন-সংলগ্ন প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটী নানা প্রকার তরুরাজিতে বেশ স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন। একটী বিল্বতরুর ছায়ায় দুটী পাষাণ বেদী আছে। বিশ্রামের জন্য। এই স্থানটী অদ্ভুত শান্তিময়। এখানে বসে স্বামীজি করতাল সহযোগে হরিনাম গান করেন। সময় পেলেই আমরা এখানে এসে বসতুম। দৃষ্ট চক্ষুতে দেখলে এমন কিছুই নয়। শুধু প্রকাণ্ড কয়েকটী বিল্বগাছ সতেজ সবুজ শাখা পত্রে পরস্পরে একত্রিত হয়ে—আকাশকে প্রায় আবৃত করে রেখেছে। তারই নীচে লাল প্রস্তরে বাঁধানো দুটী আসন। অদূরে আর একটী প্রকাণ্ড কাঠাসন। সেটী স্বামীজির ধর্ম্মগত গুরুদেবের। নীচে পশ্চিম ভারতের রুক্ষ মাটীর পথ। স্থানের কোনও বিশেষত্ব নেই। তথাপি কুতূহলীতে প্রবেশ করলেই মনে হবে অন্য পৃথিবীতে এসেছি। বিশালত্বের মরুভূমিতে ও ঠিক এই ধরণের মনোরমতা ছড়িয়ে আছে।

তখন যাবার দিন শেষ রাত্রে জলের জন্য কূপের কাছে যাবার সময় আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই বেদীতে কে যেন বসে রয়েছে। আমি স্তম্ভিত-ভাবে চমকে দাঁড়িয়ে ভাবলুম এত রাত্রে কে এখানে? যাই ভাদুড়ীকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে আসি। কিন্তু সেখান থেকে কূয়ো যতটা পথ আমাদের ঘর বোধহয় তার চেয়ে একটু দূরে ছিল। আর সময় হাতে বেশী ছিল না বলে আমি ভগবানের নাম করে মাটীর দিকে চেয়ে সে পথ পার হয়ে গেলুম। ফেরার সময় দূর থেকে অনুমান চন্দ্রালোকে দেখলুম সেখানে কেউ নেই।

একথা আমি তখন কাউকে বলিনি। ওই স্থানটী ভাদুড়ীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোলকাতায় ফেরার দিন ভোর বেলা আমরা বিল্বকুঞ্জে বসেছিলুম। দূরে ঘাটকের বাঁশীর সুযোগ হচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে মধুর নহুরীর নীরস আলাপন। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সামনে ভজনে মগ্ন। ভাদুড়ী বললেন, "তাঁকে স্বামিজী ডুকেছেন,—এই বিল্বকুঞ্জে রাত্রির খুব নির্জ্জন প্রহরে অপরীরী মহাত্মারা এসে অবস্থান করেন। কথাটী শুনে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। পরন্তু রাত্রে, তবে কি আমি কোনও মহাপুরুষকে দেখেছি? এই আশ্রমে একজন মৌনী সন্ন্যাসী আছেন। বিষ্ণু মন্দিরের পূজার কাজ তিনি সমস্ত করেন। আমাকেও একদিন তিনি গৃহস্থালির কাজে খুব সাহায্য করেছেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত হয় তিনি ভাগবত পাঠ করেন, নয়, বেহালা বাজান। বয়সে তরুণ হলেও এমন একনিষ্ঠ সাধক আমি খুব কম দেখেছি।

ভোর চারটে। ভাদুড়ী আমাদের ঘুম থেকে ডাকলেন। উঠে বসে দেখলুম চারিদিকে গভীর অন্ধকার। শুক্লা ষষ্ঠীর চাঁদ অস্তোন্মুখ। আশ্রমের গেটে একটী ইলেকট্রিক আলো সারারাত্রি জ্বলে। দ্বারকার রাজপথেও আলোর কোনও বালাই নেই। (সৌরাষ্ট্রে ভোর হয় সাতটায়, আর সন্ধ্যা হয় সাতটায়) এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কূয়োর পাড়ে গিয়ে আমাদের হাত মুখ ধুয়ে তখার পানীয় জল তৈরী হতে হবে। মনে অবশ্য উৎসাহ, দুরাগত পাড়ি দেবার। কাজেই জল ভাবনা সেখানে

কিছুই থাকে না। ভাদুড়ী খুব ঘুরে ফিরে এলো, আমি গেলুম। আমি ফিরে এলে হন্দা পাণ্ডাকে নিয়ে উনি গেলেন। আমাদের সবগুলি খোয়ানো ছিল, তাতেই পথে বেরোতে বেশী দেরী হোল না।

মন্দিরের কাছে একটী জায়গার নাম তিনমতি চৌরাস্তা। সেখানে বাস থামাত। সেই রাত্রির ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘুমন্ত দ্বারকাপুরীর মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। জনহীন নিঝুম চৌরাস্তা। চারিদিকে চারিটি পথ, আর মাঝখানে প্রকাণ্ড এক গাছে তিনটী বাতি জ্বলছে। বাস ড্রাইভার আমাদের আসতে বলেছিল সাড়ে পাঁচটায় সময়। এখনো বাকি বার ঘণ্টা। আমরা এসে ভূতের মত দাঁড়িয়েছি, কেউ কোথাও নেই। এমন সময় একটি চা এবং একটী পানের দোকানের দ্বার মুক্ত হোল। পান-আলার সঙ্গে ভাদুড়ীর বন্ধুত্ব হতে আমরা রাজপথে বসার জন্য একটি বড় কাঠাসন পেলুম। কিছুক্ষণ পরে এক গুজরাটী বালক চায়ের দোকানের চা নিয়ে এল। জলে জলে কাঁপিয়াওয়াড়ি-চা খাচ্ছি আর আকাশে আলো আঁধারির খেলা দেখছি, এমন সময় বাস এল। সঙ্গে সঙ্গে এক দুই তিন করে বহু যাত্রী। সকলেই স্থানীয়। চলেছে ওখা বন্দরে নানা কাজে। স্থান সংগ্রহ নিয়ে সে তুমুল হট্টগোল। তবে একটা নিয়ম আছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী যাত্রী বাসে উঠতে পারবে না। এখান থেকে আর একটি বাস গোপীতলাও হয়ে ওখা বন্দরে যায়। গোপীতলাওর আর এক নাম মালাসুর কুণ্ড। দ্বারকা থেকে তেরো মাইল ঘুরে একটি সরোবর আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নির্দেশে গোপিনীদের মোক্ষ প্রদান করেছিলেন। দ্বারকা থেকে ওখা প্রায় ২০ মাইল পথ। ওখা রোড ধরে আমাদের বাস ছুটে চলেছে। ক্রমশঃ সিমেন্ট বাঁধানো পথ শেষ হয়ে সুরু হোল সুরকী ঢালা পথ। দুপথের দূর প্রান্তর শেষ হয়ে ঝিলমিল করতে লাগল সমুদ্রের খাঁড়ি। প্রকৃতির সে এক বিচিত্ররূপ। আকাশ মাটি সবত্র জলময়। জলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে বহু বিচিত্র বর্ণের বলাকা পাতি। এক সময়ে দূরে দেখা গেল আরব সাগরের নীলজল রাশি, ধীরে ধীরে সাগর এগিয়ে এল। আমরা চলেছি তার তীরভূমি দিয়ে। অল্পক্ষণে ওখা বন্দরে এসে বাস থামল। বেদিকে তাকাও শুধু উত্তাল তরঙ্গ-মুখর নীল জল। অদূরে ওখা রেল station। হন্দা পাণ্ডা আমাদের বোঝাচ্ছে ভারতবর্ষের মানচিত্রের যেখানটা আঁকতে গুদের কষ্ট হয় আমরা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছি। ওখা বেশ জনবহুল স্থান এবং বেশ বড় বন্দর। করাচী, বম্বে, আফ্রিকা প্রভৃতি যেসব বিদেশ থেকে আমাদের বোম্বাই মাল আমদানি রপ্তানি হয়। কয়েকদিন আগে একটি খেজুরের জাহাজ এসেছে। এখানে একটি বেশ বড় হাসপাতাল আছে। টাটা ও বার্মাসেল কোম্পানীর প্রকাণ্ড গুদাম আছে। দূরে সাগর বক্ষে দেখা যাচ্ছে একটি দ্বীপ। ওই হোল বেট দ্বারকা। এর অপর নাম বীরশঙ্খধর। ছোট জাহাজের মত প্রকাণ্ড নৌকা ঘাটে বাঁধা রয়েছে। সঙ্কীর্ণ ঢালু পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে নৌকায় চড়তে হবে। এখানে যাত্রীদের মধ্যে হৈ হৈ নেই। সকলেই সন্তর্পণে নৌকায় উঠে স্থির হয়ে বসল। ভয়ে কি ভক্তিতে ঠিক বোঝা যায় না।

অকূল সমুদ্রে পাল তুলে দিয়ে নৌকা চলেছে। আমাদের চারিধারে তরঙ্গ পুঞ্জ—জলীয় জলরাশি টলমল করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি নৌকা কাত হয়ে গেল। এমন সময় পাণ্ডাজী দেখল, জলের মধ্যে একটা কালো মাথা। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাত্রীরাও চিৎকার করে উঠল আনোয়ার, আনোয়ার। সকলে সবিস্ময়ে দেখল, প্রচণ্ড শব্দে জলে প্রকাণ্ড আবর্ত সৃষ্টি করে কালো মাথা আনোয়ার জলের তলে তলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে নৌকা এসে ভিড়ল ছোট দ্বারকা দ্বীপের কূলে। যথারীতি ট্যাক্স দিয়ে আমরা দ্বীপের মাটী স্পর্শ করলুম।

বীরশঙ্খধর, চলতি নাম বেটদ্বারকা অত্যন্ত পুরানো নগর। স্থানীয় মানুষদের জীবন যাত্রার বিগত পরাধীন ইতিহাস লেখা রয়েছে। অলিগলি বন্ধুর পথ দামোদর অন্বেষণ করেই মন্দির দেখা গেল। দাবেকী

দ্বারকানাথের প্রথম মন্দির ফটো : মধুসূদন ভাদুড়ী

প্রকাণ্ড সিংহদ্বার পেরিয়ে আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। তখন সবেমাত্র আরতি সুরু হয়েছে। এখানেও দেখলুম রাজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে। কমনীয় দুটী চক্ষে অপার্থিব আলো। ঠাকুরের পূজা-বেদীতে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে। তার মিগ্ধ আলোকে, ধূপ ধুনা ও পুষ্পের সুগন্ধে স্থানটি আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শে দেবকী, বাসুদেব, অম্বিকাদেবী, ইত্যাদি আরও দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ওরপাশে আর একটি মন্তবড় মন্দির। তাতে শ্রীকৃষ্ণের চার রাণী, রুক্মিণী, সত্যভামা, রাধা ও জাম্বুবতীর সুন্দর দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বহুকালের প্রাচীন মন্দির। তখন প্রাকারের ইষ্টক পঞ্জরে, আর অশ্বত্থ পাদপের কাণ্ডে, ফুলে ও ঘাস জটাজুটে, তাঁরই ঝঙ্কার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি প্রকাণ্ড দালানে বহু জন সমাগম। ভজকথা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি বেদীতে বসে আছেন একজন রমণীয় কান্তি

মধু। বেশের কাছে তাঁর বয়স লোপাট ও পরমায়ুটি থাকলেও, মুখখানি অপরূপ আবেগে টলটল করলেও, চোখেমুখে কোথায় যেন একটি গৌরব ছায়া ফেলে। আমাদের অবশ্য বুঝতে দেরি হয় না মহারাজের বয়সে, তিনি এখানকারই মন্দিরের প্রধান পূজারী। উনি মধু বেশে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। তাই বেশে নারী বেশ ধারণ করেন। আসলে তিনি পুরুষ। বেশে মনে হোল তিনি প্রকৃতই সমস্ত দেহ মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের কুলদেবতা উরলের মন্দিরটি ভারী সুন্দর ও সুসজ্জিত। তার মন্দির মধ্যে বেশ উঁচুমাটির ওপরেও আর একটি দালান রয়েছে। পাঁচ হাজার বছর আগে এইখানে একদিন কুরুক্ষেত্র সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাই অনেক স্থানীয় ব্যক্তি বলেন ভেট ঘাটকা নাম হয়েছে এইজন্য। ভেট অর্থে সাক্ষাৎ। ভেট ঘাটকা। অর্থাৎ ঘাটকালাদের সঙ্গে এইখানে সখা কুলাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ডানদিকে আছে, দ্বারকের আকর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে রথখানির সাহায্য এই দ্বীপে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সর্বদুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার হেতু সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কোনও প্রশ্ন করিয়া তত্ত্ব জানিতে চাহেন নাই বলে মনে হয় না। আমার মনে হোল সমস্ত ব্যাপারের বিশ্লেষণের ভার যেন তাঁরই ওপর, যাকে, সেই প্রথম এই ঘেঁটে ঘায়েরাও ছিল শ্রীকৃষ্ণ, তারপর, বারম্বারপুত। ভেট ঘাটকা দ্বীপটি আয়তনে ২৪ বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা প্রায় ৩০০ হাজারের। সকলেই গুজরাটী। একটি গুজরাটী বিদ্যালয় রয়েছে। সেখানে মেয়ে খুব কমই পড়ে। আমার সাথে ভারতীক থেকে এই দ্বীপটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাই এর বাড়ীঘরে মন্দিরের বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না। মন্দিরের সামনে শুধু প্রকাণ্ড একটি নিমগাছ আছে। এখানের তুলসীগাছগুলি বেশ বড়। নতুন পাখা গজানে সমাচ্ছন্ন শিউলী গাছের মত মনে হয়। এখানকার মন্দির কেউ স্নান করল না। অদূরে একটি সরোবর আছে, সমস্ত যাত্রীরা সেখানে স্নান করছে। সরোবর নামে একটি ছেলের বোটের বাড়ীতে তার সময় আপ্যায়িত আহার গ্রহণ করে মন্দিরে রাজ-ভোগের পূর্ব দর্শন করে আমরা ফিরে এলুম ঘাটে। সেখানে নৌকা বাঁধা রয়েছে। যাত্রীরা সকলে এসেই নৌকর খুলবে। মাঝিরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। পশ্চিম ভারতের শেষ সীমারেখার তটপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের চতুর্দিকে উত্তাল আরব সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে আকুলি বিকুলি করছে। মাথার উপরে অনন্ত আকাশে অসীম ঔদার্য। নিকটে কোনও জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। এই ঘাটের অদূরে একটী নতুন ছোট বৈতরী হচ্ছে; সেখানে মেহনতী মানুষরা কাজ করছে, গল্প করছে। কিন্তু সাগর গর্জনের জন্য তার কিছুই শোনা যাচ্ছে না এখানে। আমরা শুধু শুনছি বালুতে বিন্দুকে প্রতিহত হয়ে সাগর তরঙ্গের নিয়ত মর্মকথা। এরই মধ্যে অস্পষ্ট উচ্চারিত হচ্ছে মহাস্নানের শাশ্বত জীবন বাণী। গীতায় অন্তর্নিহিত সত্যটুকু এইখানেই সার্থকরূপে মূর্তায়িত। সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে উপলব্ধি করলুম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যাহ্ন সূর্য পর্যন্ত কিরণ সম্পাতে বন্দনা করছে অনন্ত কালের ভীমনাগার্য এই মহাসমুদ্রকে।

বসন্ত

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবনের অপরাহ্নে আসিলে আবার,
হে বসন্ত, হাতে লয়ে পুষ্পের সম্ভার
পলাশে শিমুলে রাঙা কাননে কাননে।
আমার স্বাগত লহো। কবে সে যৌবনে
এমনি আসিতে তুমি! বাতাসীর ফুল
সেদিনও সৌগন্ধ্যে চিত্ত করিত আকুল!
আসন্নক বিরহের আসি কোথা ছোঁয়া,
এমনই নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীতের স্রোতে
উদ্‌ভ্রান্ত করিত হিয়া! গেছে সে যৌবন!
তার সাথে যায়নি কি সেদিনের মন?
তবু আজও, হে বসন্ত, অনুভব করি
মর্মের গভীরে তুমি বাজাও বাঁশরী।
দুদিন পৃথিবীতে জীবন আমার—
পর্বে পর্বে গেঁথে যাবো তব কণ্ঠহার!

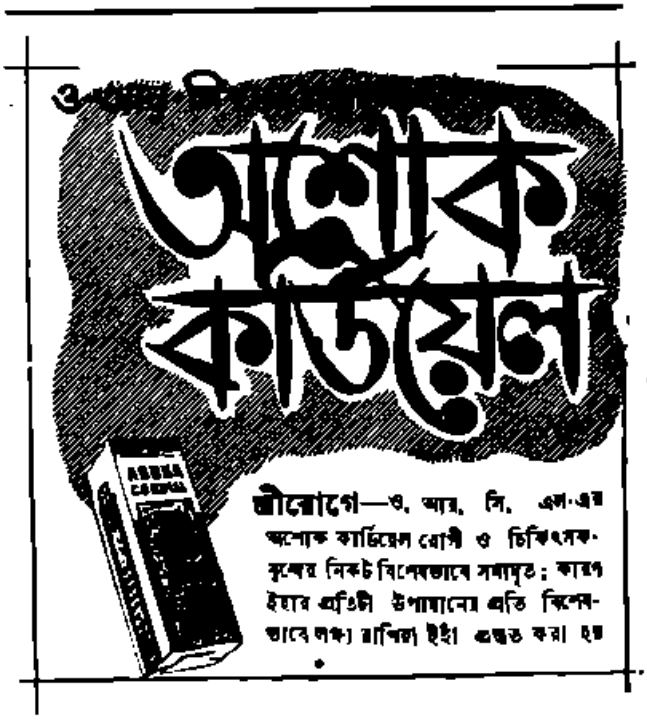

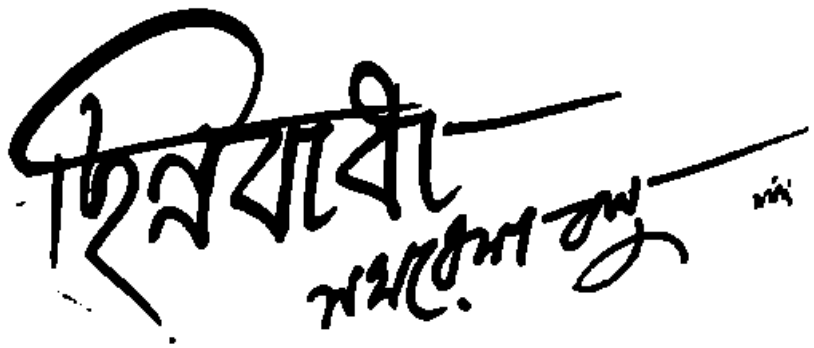

(পূর্বানুবৃত্তি)

অবশ্য লোচনের প্রতি প্রশ্ন তুলে ধরার আগে একটু ভনিতা ক'রে নিল অভয়। ঘোষ মশায়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে তার ধৃষ্টতা, তা' সে জানে। তিনি যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন। অর্বাচীনের প্রলাপে যেন বিরক্ত না হন। ছেলের কপচানিতে বাপ ভগবানের মত হাসেন।

লোচন ঘোষ হেসে বললে, 'গাইতে এসে শেষে পরের ছেলের বাপ হ'তে হবে?' সবাইকে শুনিয়ে বলা নয়। তা' হলে হাসির রোল প'ড়ে যেত। কোন্ একজন চেঁচিয়ে বলল, কপচানিটা শুরু হোক, তা' পরে বোঝা যাবে ছেলে এখনো কপচায়, না, বচন দেয়।

অভয় ধুয়া ধরল,

একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে
আপনার অঙ্গ
মহাকালের ক্ষত রঙ্গ
ও ভাই, হায় দিন চলে যায়
কান পেতে কালের কথা শোন আপন বুকে।

ধূমাবতী আর দিতি অদিতির কথা, শুধুই কথা। পুরাণের কথা। কিন্তু সেকাল তো আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কাল নিরবধি। নিয়তি মহাকালেরই চোখের মণি। সে বিধান ঠেকানো যায় না। সে সুন্দর, অপরূপ। কিন্তু পাষাণ কঠিন। ধনুর্ধরির মান রাখতে, শমনের হাত-ধরা প্রাণীও একবার বুঝি থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আর কাল? তার বুকে মাথা খুঁড়লেও সে এক পলক দাঁড়াবে না। তাই, সেই জন্যেই বলেছি, আপনার অঙ্গ, মহাকালের ক্ষত রঙ্গ। একবার আপনারা চেয়ে দেখেন নিজেদের দিকে।

আজ যে-নয়নের বানে পীরিতের আগুন ঝরে
কাল সে নয়নে কেন ছানি পড়ে গো।
যে-চাঁদ মুখে আজ রূপের হাট
কালে তা' করলে লোপাট
কাহারো কপালে কালো রেখা পড়ে গো।
মুকুতারো ঝিকিমিকি মুকুতারো দাঁতে
হায় সে মুকুতা হাসি কে হরণ করে গো।
একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে।

নিঃশব্দ আসর। অভয় গলা সপ্তমে চড়িয়ে টেনে টেনে গাইছে। ঢোলক কাঁসী বাজছে আস্তে আস্তে। রাজু-বালা কিছুতেই চোখের জল চাপতে পারল না। অনেকেরই বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প উঠেছে জমে। লোচনের বুকটাও যেন টনটনিয়ে উঠছে। ছোকরা কাকে বলছে এসব কথা!

লোচন ঘোষকে নাকি? কই, সেই বিদ্বেষের ছায়া তো নেই অভয়ের মুখে। কিন্তু, শুধু কবিয়াল হিসেবে নয়, সব মিলিয়ে লোচনের প্রৌঢ় বুকে হঠাৎ একটা ফিক্ ব্যথার কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে। সাধুবাদ দিতে গিয়ে টের পেল লোচন, তার গলার স্বর যেন ভাঙা। হেসে হেসে ঢলে ঢলে, অভয় যেন নির্মম কালেরই মত কথায় সুর দিয়ে চলেছে। লোচনের মনে হল, এই শ্রোতার আসরে নয়, অভয়ের আসরে তার পরাজয়ের পালা যেন শুরু হ'য়ে গিয়েছে অনেকদিন। তার বড় সাধ হল একবার চির-প্রতিদ্বন্দ্বিনী রাজুবালার দিকে ফিরে তাকাবার। সাহস হ'ল না। কিন্তু রাজুবালা তাকিয়েছিল তার দিকেই। মনে মনে বলছিল, সত্যিই তো। এত আলো, কই, ঘোষকে তো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নে।

শৈলবালারও দু' চোখ ভেসে গিয়েছে। সে ফিস্-ফিস্ ক'রে বলছে, ঠিক বলেছ বাবা। যথার্থ কথা বলেছ।

সুবালার চোখে জল নেই। তার চাঁদমুখে এখনো রূপের ছটা। চোখে অনেক আগুন। তবু সারা মুখে তার শুধু বিষণ্ণ। সে মুখের দিকে তাকিয়ে গিরিবালার চোখ ঘুমে ঢলে আসছে।

নিমির মন খারাপ। সংসারে বুঝি আর কথা নেই? কত কালের বুড়ো মানুষটি তুমি যে, কেবল তব কথা চালিয়েছ? মানুষ একটু হাসতে চলতে এসেছে। তা' নয়, যত বাজে বাজে কথা ব'লে মানুষের মন খারাপ ক'রে দেওয়া কেন? মন খারাপ তো আছেই! গান শুনে মন খারাপ করার চেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকা ভাল।

কিন্তু পাড়ার মেয়েরা তাকে চলে যেতে দিল না।

মহাজন শরৎদাস কখন শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ভবানী চৌধুরীকে রাস্তা থেকে ধরে এনে বসিয়েছে। তিনি ভাল ক'রে গুছিয়ে বসে বললেন, ছেলেটি ভাল গায় তো হে। থাকে কোথায়? মালী-পাড়ায়? শৈলবালার জামাই? কে শৈলবালা? যাকগে, চিনি নে।

কিন্তু এ চালাক কবিয়ালের রীতি নয়। প্রথমেই কাঁদানো ভাল নয়। দীর্ঘশ্বাস তোলানো উচিত নয়। আসর জুড়িয়ে যাবার ভয় আছে। একবার হাই উঠতে আরম্ভ করলে, সকলেরই হাই উঠতে থাকবে।

তবে এখনো সে অবস্থা নয়। চারদিক থেকে সবাই সাধুবাদ দিয়ে উঠল। অভয় আবার গলার স্বর চড়িয়ে গানে গানেই বলল, তাই এস, আজকের কথাই বলি। আজকের মানুষের খানি এক কথা শুনতে পাই।

জীবনের জ্বালা নাহি যায়
জীবনের ভাব বোঝা দায়।

কিন্তু কেন? না,

অ ভাই, অনাদায়ে ভাবের তবিল খালি থেকে যায়।
ভাব দিয়ে ভাব ক'রে আদায়
জীবনের রস বোঝা যায়।

ভবানীবাবু তাঁর মোটা লেন্সের চশমায় অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, বাঃ।

অভয় গেয়েই চলল, জীবনের ভাব বুঝতে গেলে, বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এ জীবনের কথা। প্রশ্ন নয়, যোগ মশায়ের কাছে শিখতে চাই, সংসারে সব চেয়ে কী দামী? সব চেয়ে সস্তা কী। খাঁটি মানুষ বলে কাকে? শরত দাশ মশায় রয়েছেন, ক্ষমা করবেন অভয়কে। কাকে বলে মহাজন? আর জগতে সবাই ভোগ করতে এসেছেন। একশ জনের একজন ভোগ করেন সুখ, নিরানব্বই জনে দুঃখ। কেন?

মা'য়ের জাতি ব'লে ডাকলি যারে
আবার রাতে গিয়ে পরশ দিয়ে কিনলি তারে।

কেন? প্রশ্ন নয়। শিখতে চায় অভয় লোচন ঘোষের কাছে। তার পোড়া মনে জেগেছে এসব কথা। তার মন হদিস খুঁজে মরছে। কী সেই বস্তু, যা দিয়ে জয় হবে এই সংসার।

আসরে গুলতানি শুরু হয়ে গিয়েছে। এসব কথা কবি গানের অঙ্গ হওয়া উচিত কিনা, তাই নিয়ে তর্ক লেগে গিয়েছে কারুর কারুর মধ্যে। কারুর কারুর মুখে একটু অস্বস্তির ভাব উঠেছে ফুটে। কিন্তু লোচনের জবাব শোনার কৌতূহল আসর ত্যাগ করতে দিচ্ছে না। অভয়ের কথার মধ্যে কিছু নতুনত্ব আছে! এসব কথা বড় একটা ওঠে না। আর তর্কেতে কিছুই যায় আসে না। কারণ কবি গানের বিষয়বস্তুতে মহাজনেরা কোনো রীতিকরণ করে যান নি। নতুন নতুন কথা ব'লে সবাই কবি গানের ক্ষেত্র বড় করেছেন। পৌরসভার ভোটের সময়, এই লোচন ঘোষ ভোটের কথা গেয়েছে। এখানে আগে কেউ গায় নি।

লোচন ঘোষের মুখে আর সেই সহজ হাসিটি নেই। সেই অপরাজেয় হাসি। যে-হাসি দেখলে প্রতিপক্ষের বুক কাঁপে। তবু সে স্বভাবসুলভ হাসিটি বজায় রাখতে চেষ্টা ক'রে প্রথমে সাধুবাদ দিল অভয়কে। যদিও সেই সাধুবাদের মধ্যে কিছু স্নেহের ছোঁয়া আছে। কিন্তু তাতে তেমন ধার নেই। লোকে হাসল না প্রাণ খুলে। কথার জবাব দিতে গিয়ে আগেই সে জানিয়ে নিলে, অভয়ের কথার জবাব নানা রকম হয়। বিচারের ভার শ্রোতাদের ওপর।

শ্রোতাদের ওপর ভার দিয়ে লোচন সুবিধে করল না।

জবাব দিতে গিয়ে ধর্মের কথা টেনে আনল সে। কিন্তু আসরে কোনো উল্লাস উঠল না। উল্টে তাকে পুরাণেরই আশ্রয় নিতে হ'ল।

তা' ছাড়া, অভয়ের পরে লোচনের গলার স্বর যেন চাপা প'ড়ে গিয়েছে অনেকখানি। লোচনের স্বর মিষ্টি, কিন্তু তার ধার নেই, তেজ নেই। তেমন জোরালো নয়। তার স্বরে হারমোনিয়মের সুরের আবেশ আছে। অভয়ের গলায় আছে টান-টান-চামড়া ঢোলকের কড়া চাঁটির তীব্রতা।

লোচন ঘোষের উদ্দেশে কে যেন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—ঘোষের গায়ে একখানি নামাবলী চাপিয়ে দিলে হ'ত। নাম গান জমত ভাল।

ঘোষের ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গেল। আসর নেতিয়ে গিয়েছে একেবারে। অভয়ের গানেও আসর খুব উত্তেজিত, চঞ্চল, কিন্তু জোলানি ছিল একটি। ঘোষের অপেক্ষায় ছিল সবাই। কিন্তু উল্টো বুঝে লোচন নিছক ধর্মের কথা ব'লে জবাব দিল। আসর গেল জুড়িয়ে। ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য কথা বলে, রঙ-রসিকতা ক'রে গরম করার চেষ্টা করল। লোকে মানল না। লোচনঘোষের নিজের এলাকায় এই প্রথম পরাজয়।

অভয়ের নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। লোক-চরিত্রের শিক্ষা পায় মানুষ এমনি ক'রে। ভাল লাগলে লোকে মাথায় করে। মন্দ লাগলে ঝেড়ে ফেলে দেয়। এইটি নিয়ম সংসারের। আর এই নিয়মের অধীনে মানুষ নিষ্ঠুর।

ঘোষ বসে পড়ল। রাঙ্গুবালার মনে হ'ল আসরটা যেন চারদিক বন্ধ ঘোরাটোপ। বাতাস নেই, আলো নেই। অন্ধকার আর জমবন্ধ গুমোনি। দেহপোজীবী বুড়ি রাঙ্গুবালার প্রাণে জীবনের কিছু ছিঁটেফোঁটা অনুভূতি ছিল। পয়সা দিয়ে কোনোদিন ঘোষের সঙ্গে কেনা-বেচার সম্পর্ক ছিল না। যৌবনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটি খেলার সম্পর্ক ছিল। ঘোষকে সে চিরদিন নিজের চেয়ে বড় মনে করত। কিন্তু তা প্রেম নয়। লোকে মনে করত পীরিত। বয়সে একটু পাথনাই সবাই দেয়। তবু লোচন পুরোপুরি গৃহস্থ। সম্পন্ন করেছে নিজেকে পেটেখুটে।

আজকেও যে রাঙ্গুবালার বুক টাটায়, তা মেয়ে-পুরুষের প্রেম বলতে সহজে যা বোঝায়, তা' নয়। বন্ধুর জন্য, অনেক বড়, অনেক প্রকার ভালবাসার বন্ধুর জন্য রাঙ্গুবালার বুকে বড় কষ্ট। এত লোকের মধ্যে একলা তারই কষ্ট! শুধু তারই মনটি ব্যাকুল হ'য়ে উঠল, আহা! ঘোষকে কেউ একটু পাখার বাতাস করে না কেন? আজকে আর কেউ তার পাশে বসবার জন্য ছটফট করে না? ঘোষ যেন একঘরের মত একলা বসে আছে।

ভবানীবাবু বলছিলেন তখন শরৎ দাশকে—লোচনের বয়স হয়েছে, আর পারে না আজকাল।

লোচনের সারা মুখের রেখাগুলি যেন কিলবিলিয়ে উঠল।

ক্রমশঃ

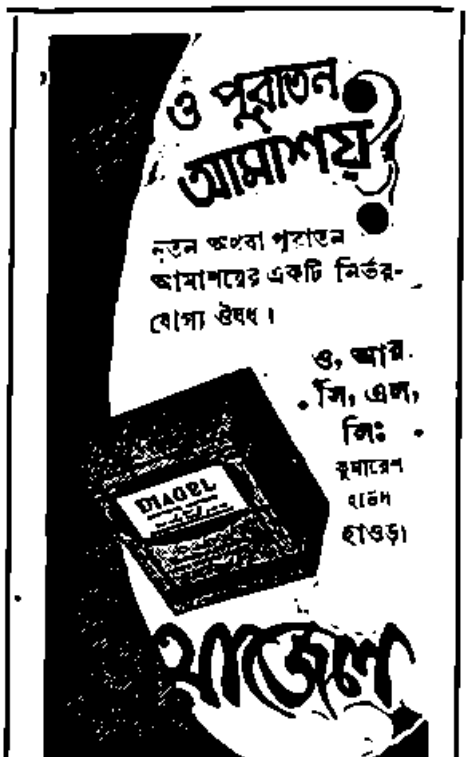

ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দেখে ভুতোদা পট্ পট্ করে বাগানের যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

"তিনমাস ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এসব গাছে।

বিমল চমকে উঠে এল—

"আহা হা করছেন কি ভুতোদা!"

ভুতোদা : "করব না তো কি?"

বিনয় : বোঝ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে?

ভুতোদা : তার মানে?

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার দেবেন দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকষ কম কিনা।

ভুতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে) : হুঁঃ! যতসব কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিমল : সে কি ভুতোদা? গাছ যে মানুষেরই মত, সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মানুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি।

EL PLANSIBO

ভুতোদা : যাঃ যাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে ?

ভুতোদা : তাই বলেই কি আমায় মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই ! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্যগুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিশারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিশালী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে ?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র সীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল: এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভুতোদা : কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে খেলধুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

স্রষ্টার মন

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু এম-এ

আপ্রমিক ফলমূলাহারী সন্ন্যাসী হলেন সাহিত্যিক। রচিত হল অমূল্য সাহিত্য। কিন্তু কেন?...কিসের আশায় ব্রহ্মচারী বিমল লেখনী; কোন বাসনায় বা কোন প্রেরণায় তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

তা'হলে কি কল্পনার উত্তেজনায় সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি। সাহিত্যিক ও শিল্পীর উৎস কল্পনা, মানি। মায়ের কোলে শিশু বলে, "মা গল্প বল," আজো মায়ের গল্প বলা শেষ হয়নি। কল্পনার উপর নির্ভর করে যুগযুগান্ত ধরে মা গল্প বলে চলেছেন—শিশু তন্ময় হয়ে শুনছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ধারা ও সুর বদলেছে সত্যি। কিন্তু এখনও তার পূর্ণচ্ছেদ আসেনি। সাবলীল পাখনার উপর ভর করে মার কল্পনা উড়ে চলেছে অতীত থেকে বর্তমানে—প্রকাশ করছে বিচিত্র যুগের বিচিত্র জীবন ধারা, চিন্তাপ্রবাহ ও বৈশিষ্ট্য। অন্যাবিষ্ট শিশু অতীতকে জানতে পারছে। তারো নতুন সম্ভাবনা-পূর্ণ যাত্রার দিকে সত্যের বলিষ্ঠ ভাবধারার প্রবাহ—সমস্ত উন্নত প্রবৃত্তি ও আদর্শবাদকে জাগরিত করে।

তবে কি এই সাহিত্য?

না, এ সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র। শব্দ চয়ন ও ভাষা বিন্যাসের দ্বারা কল্পনাকে অনবদ্যভাবে রূপে রসে শোভিত করে সকলের সামনে উপস্থিত করার নাম সাহিত্য। যিনি এটা করেন, ভাষা ও শব্দের সাহায্যে যাঁর অন্তর্নিহিত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, লিখনে সুখ অনুভূত হয়—তিনি সাহিত্যিক।

কিসের লোভে বা মোহে যারা শিক্ষানীক্ষায় সন্ধীয়ান হয়েও দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংস্থান করতে পারে না, পরিবার পরিজন যুদ্ধ যাদের দুঃস্বপ্নের মত—ভবিষ্যৎ যাঁদের তমসাচ্ছন্ন—সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য জ্যোতি তাদের জীবন উদ্ভাসিত করবে কিনা জানে না—তবু সাহিত্যিক বাণীর চরণ খুঁজে পড়ে থাকে কেন? কিসের আশায়?

তবে কি যশের লোভে?

কেবল যশের লোভে বা মোহে বললে ঠিক উত্তর হবে না। কারণ যশাভিলাষ নেই এমন মানুষ তা' দেখা যায় না। যদি বলি সম্পদের আশায়—তা'হলেও ঠিক হবে না, যদি বলি অমরত্বের জন্য—না, সে জবাবও ঠিক নয়। এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হচ্ছে, একজন সাহিত্যিক অকস্মাৎ অস্ত্রপ্রচারক, একজন ক্রীড়ক আরেকজন সৈনিক, একজন অভিনেতা অকস্মাৎ বিচারক কেন হয়? একই সমাজে বাস করে কেন মানুষ এমন বিচিত্র জীবনযাত্রা বেছে নেয়?

তবে কি এদের উদ্দেশ্য পৃথক?

তাও নয়, অহিংসা ও হিংসার দুই ভিন্ন পথের পথিক হলেও দু'দলের উদ্দেশ্যই সমাজ কল্যাণ করা। একই সহজাত প্রবৃত্তি (innate) বশাভিলাষ থাকা সত্ত্বেও দু'দলে বিভক্ত হওয়ার মূলে রয়েছে এক আকস্মিক সংঘর্ষ (Accident)। এ সংঘর্ষ বাহিরে প্রকাশ্য নয়, মানবের মনোজগতে সংঘটিত। জীবনের অগ্রগতির পথে এই সংঘাতকে এড়িয়ে যাওয়া কোন রকমেই সম্ভব নয়, পরস্পরের ঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য মনোজগতে পরস্পরের ঘর্ষণ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে ব্যক্তিগত বাস্তবের (individuality) উপর। আবার ব্যক্তিগত বাস্তবকে প্রভাবান্বিত করে মানবের বুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা এবং বংশগতি ও সামাজিক অবস্থা।

অনেকের ধারণা ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ বংশগতি। এই কারণে বংশগতিবাদীরা মনে করেন যে মানব জীবন গঠনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি। শিক্ষার দ্বারা শিশুর গঠন কতদূর সম্ভব, তা নির্ণয় করে ঐ শক্তিগুলি। তাঁদের মতে, সকল শিক্ষালাভেরই একটা সীমা বা ক্ষমতা আছে। সেই সীমা বা ক্ষমতা নির্ভর করে শিশুর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ শক্তির উপর। ঐ শক্তি মৌলিক বৃত্তির মধ্যে আপনি বিকশিত হয়। তাই শিক্ষা কিছু নয়—আসলে ওটা এক রকমের রঙীন প্রলেপ—বাইরেটাকেই খানি চক্‌চকে করে তোলে, ভিতরের কাঠামোকে বদলাবার তার কোন ক্ষমতা নেই।

অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকবাদীরা বিশ্বাস করেন যে শিশুর মন একটি নরম বস্তু বিশেষ। পারিপার্শ্বিকই তাকে ইচ্ছামুযায়ী গড়ে তোলে। "যদি বংশানুক্রমে সেই আদিম মানুষ তার সেই আদিম গুণগুলিই আমাদের মধ্যে দিয়ে যেত, তা'হলে নিশ্চয়ই আমরা মানুষ হিসাবে এত বড় সভ্যতার অধিকারী হতে পারতাম না—গড়ে তুলতে পারতাম না কিছুতেই আজকের দিনের এই সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প ও সমাজকে। এ কেবল সম্ভব হয়েছে মানুষের জ্ঞান, চিন্তা, শিক্ষা, অভ্যাস, অভিজ্ঞতার ফলে। মানুষের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই।"

আমাদের মতে মানবজীবনের পূর্বতালাক সৈশবাবধি বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান ও যোগাযোগের ফলে। এই দুই গুণনীয়কের (factor) সংমিশ্রণের জন্যই ব্যক্তিগত পার্থক্যের সৃষ্টি। তাই অনেক সময় দেখতে পাই হিংসায় ঘরে অহিংসার সৃষ্টি কিম্বা অহিংসার ঘরে হিংসার উদ্ভব। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন কোন না কোন উদ্দীপকের (Stimulus) প্রেরণা। যে উদ্দীপক আপতন (accident) ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ এক আপতনের ফলেই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ। তাঁর সাহিত্যিক উদ্দীপক হোল এক গ্রাম্য বালকের উপরোধ।

পূর্বোক্ত সংঘর্ষ একক নয়—প্রয়োজন দু'এর। মনোজগতেও

এর ব্যক্তিক্রম নেই। তাই মনোজগতে সংঘাতের সৃষ্টি নির্জ্ঞানের ও সংজ্ঞানের ইচ্ছার দ্বন্দ্বে। ইচ্ছাই মূলতঃ কর্মপ্রেরণা আনে অর্থাৎ আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। ইচ্ছানষ্টি হতেই প্রক্ষোভের (emotion) উৎপত্তি। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভ আমাদের ইচ্ছাকে অবদমিত করে এবং নির্জ্ঞানস্থিত হিংসা, দ্বেষ, ভালবাসা, প্রভৃতি প্রক্ষোভ অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রভাবিত করে।

শৈশব অবস্থা হতেই কতকগুলি, কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ইচ্ছানকল বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হয়ে প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু সমাজ অসামাজিক ইচ্ছা সহ্য করে না। এই কারণে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক শাসনে মনে ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্য, কর্তব্য, অকর্তব্য, বিবেকবুদ্ধি জন্মায়। তখন বাধা বিবেকের অপেক্ষা না রেখেই অসামাজিক ইচ্ছা মনের গোচরে না থাকে তার চেষ্টা করি—অসামাজিক ইচ্ছাকে নির্বাসন দেই। অসামাজিক ইচ্ছাকে নির্জ্ঞান মনে নির্বাসনের নাম অবদমন। সমাজানুমোদিত পথে অবদমিত ইচ্ছা যখন রোগের সৃষ্টি না করে প্রতীকের সহায়ে সৌষ্ঠবরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে উদ্গতি (Sublimation) হয়েছে বলা হয়।

এই উদ্গতি শিল্প, কলা, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আনে। অর্থাৎ রুদ্ধ ইচ্ছা সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে প্রকাশ করার ইচ্ছা। শিল্পী, চিত্রকর, বা সাহিত্যিক যখন কোন বস্তু বা প্রাণী সম্বন্ধে আমাদের মনে অযথা ভয় প্রীতি, ঘৃণা বা অপর কোন প্রক্ষোভের উৎপত্তির চেষ্টা করেন, তখন বুঝতে হবে তার পশ্চাতে প্রতীকের সঙ্গে কোন না কোন অবদমিত ইচ্ছা জড়িত।

চিত্রে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে যে রচয়িতার অবদমিত ইচ্ছা বা প্রক্ষোভ সবসময়ে জড়িত তা নয়। সময় সময় প্রেরয়িতার সংজ্ঞানান্বিত ইচ্ছা বা প্রক্ষোভ চিত্রে, ভাস্কর্যে বা সাহিত্যে প্রকাশিত হয় রূপকের সাহায্যে। এর প্রমাণ আমরা প্রেরয়িতার স্বীকার উক্তিতে। শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন, "তারপর আছে ভুল বোঝা। স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ত্রুটির চেয়ে ভুল বোঝাটাই সকলের আসি তাদেরও উপর বর্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাকেই আমি বেশীর ভাগ করি। আমার বেশীর ভাগ বইয়েই তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ এটা।"—এখানে বলা প্রয়োজন যে রূপকের অর্থ আমাদের অজানা নয়। তাই স্নেহত্বের গাম যখন আত্মাকে পাখি বা স্নেহকে পিঞ্জর রূপে বর্ণনা করে, তখন হয় রূপক। অন্তর্নিহিত প্রতীকের অর্থ নির্ণয় করা সোজা কাজ নয়। প্রতীকের বিশেষত্বই এই, যে তার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করলেও মন তা মানতে চায় না।

সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব হতেই কল্পনার সৃষ্টি। কল্পনা বলতে বোঝায় যে মূল সামগ্রী বা বিষয়ের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রূপের (Perception) পুনরুৎপাদন করা। কল্পনাই চিত্র, ভাবনা বা সাহিত্য সৃষ্টির মূল কথা। কল্পনা রচয়িতার মনের উপর জোর বেড়ায় না, তাদের বিশাল মনের গভীরতম প্রদেশ—নির্জ্ঞান মনে। 'যেখানেই মন সৃষ্টির আনন্দে বিভোর—কাব্যে, গল্পে, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সেখানেই এই নির্জ্ঞান মন সাড়া করে আপনাকে, বিষয় নির্বাচনের চিত্তর দিয়ে, ভাষায়, ভঙ্গিমায়, রূপের সমাবেশে স্বাপত্যের কৌশলে।' স্রষ্টার কল্পনায় রচয়িতার নির্জ্ঞান মনের কোন অবদমিত, চিন্তাধারা বা ইচ্ছা প্রভাব বিস্তার করছে জানতে হলে প্রয়োজন—রচনার বিষয়, ভাষা, ছন্দ প্রণালী প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা। নির্জ্ঞান মন অবদমিত ইচ্ছার ভাণ্ডার। কল্পনা দৈনন্দিন ঘটনার অবদমিত ইচ্ছানুযায়ী বিকার মাত্র।

কল্পনার সঙ্গে মনশ্চিত্রের (fantacy) প্রয়োজন শিল্পকলা ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। কল্পনার আকাশ কুসুম রচনাই মনশ্চিত্রের কর্ম। শিশুর বেশীরভাগ মনশ্চিত্রের নায়ক আমি যখন বড় হব। বাস্তবের মধ্যেও ঐ মনোভাব বয়স পরিমাণ দেখা যায়। কবি লিখেছেন,—

এখনো তো বড় হই নি আমি,
ছোট আছি ছেলেমানুষ বলে।
আমার চেয়ে অনেক বড় যারা
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।
যারা তখন পড়তে যদি না চায়
পাখির ছানা পেলে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এমনি বকে যেন
যেমন, "তুমি চুপটি করে পড়ো।"
যেমন, "তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে"—
যখন হব বাবার মতো বড়ো
তখন নিয়ে যাবার পাঠশালা
ভালো ভালো পুরস্কার পাবার জন্য।

সামাজিক অনুভূতির সঙ্গে ক্ষমতা-লিপ্সার সংমিশ্রণ, মনশ্চিত্র সৃষ্টির আরেকটি কারণ। এই কারণেই দুর্ধর্ষ অনুশী শিশুদের ভিতর মনশ্চিত্রের বাহুল্য দেখা যায়।

মনশ্চিত্র গঠনের মূল কারণ কিন্তু প্রত্যাগতি (Regression) অজ্ঞাত মন থেকে আবেগীভূত ইচ্ছা সংজ্ঞান মনে যখন প্রকাশ লাভের চেষ্টা করে, তখন এই মানসিক ক্রিয়াকে আমরা গতি (Progress) আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু বাধাবিবৃদ্ধির সময় এর উল্টো ব্যাপার হলে অর্থাৎ সংজ্ঞানের চিন্তা যদি কোন কারণ বশতঃ নির্জ্ঞানের দিকে ধাওয়া করে তবে তাকে প্রত্যাগতি বলা হয়।

কাম যখন সামাজ্য কিছু নিয়ে গিয়ে স্থির, যখন বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মনোভাব প্রকাশ করে, তখনই মনশ্চিত্রের সৃষ্টি। প্রত্যাগতি যখন সর্বপ্রথম পর স্বতঃভাবে শেষ হয় তখন মানসিক রোগের উদ্ভব।

শৈশব অভিজ্ঞতার রোমন্থনে আপনাদের পরিপূর্ণ তাৎপর্যবিহীন প্রতিমূর্তি। প্রত্যেকটি কল্পনার ভাবনা-বিশিষ্ট হয়ে ঐ প্রাক্তন রোমন্থনকে ত্বরান্বিত করে। এই কারণে শিল্পকলায়, সাহিত্যে ছন্দচিত্রায় বিস্তৃত ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশিত করে। ফ্রয়েড শৈশবের সুখলীলার অবগাহনের জন্য ব্যাকুল হন। কবিগুরু তাই বলেছেন—

'ছেলেদের মনে কিছুকাল সম্পূর্ণ আইডিয়া পড়লে তবেই মানুষ সৃষ্টি করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই কাঁচাটা দরকার। প্রতীপের ছেলের মনে আইডিয়া পড়ে নেবার আমি চেষ্টা করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনার সেই শিশু সীমার তন্ত্রে সাঁতার কাটুক, সবটাকে ছিন্ন করবার জন্যে, বিদীর্ণ করবার জন্যে, ধ্বস্ত করবার জন্যে।'

কল্পনা, মনস্তত্ত্বের প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে গুটেরাও (complex) মনের ঘাতে চুপি চুপি এসে বাসা বাঁধে। গুটেরা হলো মন-সৃষ্টির অন্যতম গুণনীয়ক (factor) রূপে বিবেচিত।

গুটেরা হচ্ছে সেই অবদমিত ইচ্ছা, যে ইচ্ছা অজ্ঞাত থেকে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের জীবনে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাত, সাড়া ও স্ফূর্তি, বেদনা ও যাতনা, সাধ ও সার্থকতার রূপ বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিক স্তরে দেখতে গেলে অর্থাৎ একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের জীবনে ঘটনার দিক থাকতে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা যায়। বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর (কামশক্তি) প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে। অনেকটা জলস্রোতের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। অস্থিতি, অনাগ্রহ, ও গতির বাধা তার সহজ সাবলীলকে কুটিল পথে পরিচালিত করে। এই ভাবে ব্যাহত লিবিডো মানুষের চরিত্রে দু'রকম ফল সৃষ্টি করে—১। গুটেরা (complex) ২। অপচার (perversion)।

গুটেরা একটি ভাবনাবিকার মাত্র এবং অপচার হলো আচরণের বিকার। আচরণের ক্ষেত্রে দিয়ে চরিতার্থতা লাভের অভাবেই লিবিডো গুটেরা সৃষ্টি করে। অন্য দিকে, লিবিডো অপচার বা কদাচারের (যেটা অস্বাভাবিক) ভেতর চরিতার্থতা লাভ করে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অপচার যেখানে থাকে গুটেরার অস্তিত্ব সেখানে নেই। লিবিডো যেন নিজের ভাঙচুরে অপচারের আশ্রয় নিতে পারে না বলেই নিতান্ত অভিমানের বসে অবদমিত হয়ে থাকে—গুটেরা সৃষ্টি করে।"

হিংসা, যৌন প্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত হলেও অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক ইচ্ছা সজ্ঞানে সহ্য করে না তাই মনের প্রহরী নির্বাসনে দেয় একে অস্বাভাবিক—ইচ্ছা অবদমিত হয়। আচরণের বিভিন্নতায় যখন ঐ অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে না তখনই গুটেরা বা ভাবনা-বিকার ; কিন্তু নির্জনে চুপ করে থাকে না ; কল্পনা ও মনস্তত্ত্বের সহায়তায়শিল্পকলায় ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়ে চরিতার্থ লাভ করে।

হিংসা যখন অবদমিত না হয়ে সজ্ঞানে বাস করে তখন মানুষ পুরী হয়। কিন্তু এই অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি অবদমিত হওয়ার পর, যখন উদাত্তির প্রেরণায় সমাজ কল্যাণকর রূপে প্রকাশিত হয়ে অনেকটা অসংকুচিত (Raw) অবস্থায়, তখন মানব সৈনিক, অগ্রগতাগত, আইন-রক্ষক প্রভৃতি হয়। আমার এই অবদমিত ইচ্ছা যখন অধিক পরিমাণে সংকুচিত (Refine) হয়ে, কল্পনা ও মনস্তত্ত্বের সহায়তায় প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষ শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়। চিত্রে বা ভাস্কর্যে শিল্পীর অবদমিত হিংসাপ্রবৃত্তির প্রকাশ সামান্য অনুসন্ধান করলেই আমরা দেখতে পাই। অন্যদিকে সাহিত্যিকের হিংসাপ্রবৃত্তি প্রকাশ তার কাব্যে, নাটকে ও ডিটেকটিভ উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে। বিদ্রোহী কবি লিখেছেন—

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।
আমি মানিনাকো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, ভীম পাড়ি দিই ভীম ভাসাই তরণী,
ভাসাই তরণী।
আমি ঝঞ্ঝা, আমি নৈরাকেতে ঘন্টস্তম্ভের বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী সুত-বিশ্ব-বিধাত্রীর।

হিংসার ন্যায় যৌন-প্রবৃত্তিও অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত, তাই অবদমিত হয় আমাদের অজ্ঞাতে। যৌন-প্রবৃত্তি যখন অবদমিত না হয়ে সজ্ঞানে বাস করে তখন লোকে পশুচিত ব্যবহার করে। এটা সর্বজনবিদিত যে যৌন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতাবান। এই বলবতী প্রবৃত্তি অবদমিত হওয়ার পর উদাত্তির প্রেরণায় সংকুচিত অবস্থায় প্রকাশ পায় যন্ত্র-চিত্রে, ভাস্কর্যে ও সাহিত্যে।

সাহিত্যে প্রকাশ নরনারীর 'প্রেম সম্ভারে'। ফ্রয়েডের কথায় হল "সকল প্রণয় কলার প্রধান লক্ষ্য হল তার তৃপ্তি। সব ভালবাসার সার কথা এই কামের বাসনায় চরিতার্থ।" মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে যৌনভাবে প্রকাশের জন্য প্রেমের পূর্বে যেন, যাদু, শিল্প, ভাদু, প্রভৃতি শব্দ সংযোজন। অথবা শিল্পানুরাগ, আত্মপ্রেরণা, বাৎসল্য, পীড়িতের সেবাশুশ্রূষাদি রূপে প্রকাশ।

ভালবাসার অভিব্যক্তি চুম্বনে। অনন্ত পুলকে চুম্বন কখন প্রকাশে, কখন গোপনে—কখন অন্তরে, কখন বা বাহিরে।

চুম্বন স্পর্শ রসের প্রকাশভঙ্গি। আবার স্পর্শের রসের নামান্তর প্রেম। প্রেম দু'ভাগে বিভক্ত—"বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিরহের পূর্বরাগকে বলে বিপ্রলম্ভ, আর মিলনের পরবর্তী ভাব সম্ভোগ।" প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় বিরহে। গোস্বামী কবি বলেছেন—

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতিগাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়।

প্রেমবৃষ্টি ক্রমে নাম স্নেহধান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।

এই মহাভাবই বিরহ!

শিল্পী ও সাহিত্যিকের রচনা যখন অপর লৌকিকের প্রতি প্রেম নিবেদন করে তখন রচয়িতার অজ্ঞাতে ইহার আশা-বাসনা চরিতার্থ হয়। অন্তরালে সাহিত্যিক ও শিল্পী যখন নিজেকে অপর লৌকিকের সঙ্গলোভে মনে করে সাহিত্য ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি করেন তখন নির্জ্ঞানস্থিত সমকামিতা তৃপ্ত হয়। যেমন কোন এক বিখ্যাত পুরুষ কবি নিজেকে নারীরূপে কল্পনা করে লিখেছেন—

In vain, I entreated him not to be so rude. He sealed my lips with kisses and his game persued. Declaring, if that man might not do so thy boast, The world, in a short time, would ceased to exist.

সাহিত্য ক্ষেত্রে, কবি, ঔপন্যাসিক ও আনুষাঙ্গিকের ভিতর পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। 'নিজের কল্পনা সুশোভিত করে অবদমিত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করেন যিনি, তিনি ঔপন্যাসিক বা গল্প লেখক। যাঁর অবদমিত ইচ্ছা অন্যের রচনার সহায়তায় পরিতৃপ্ত হয়, এবং ঐ রচনা যিনি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদিত করেন,' তিনি অনুবাদক। আবার কল্পনাকে ছন্দে ও তালের সঙ্গে সঙ্গে যিনি আলোড়িত করে অবদমিত পরিতৃপ্তার্থে, প্রকাশ করেন তিনি কবি। কবির রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কবির সমস্ত কল্পনাই তার জীবনের ব্যর্থ আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার সঙ্গে সংযুক্ত। কিশোর কবি লিখেছেন—

আঁধিয়ারে বৈসে কত সঙ্গতে
চাইলা চাইলা আমি অঙ্গতে।

ব্যর্থতার চরম প্রকাশ।

সাহিত্যিক ও শিল্পী মনের পার্থক্য প্রকাশ করিতে। লিখনে যাঁর কায়দুস্ত অনুভূত হয় তিনি সাহিত্যিক; অঙ্কনরেখায় যাঁর কল্পনা রঙ ও তাহার সাহায্যে প্রকাশ করা সত্ত্বেও অবদমিত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয় না, যেমনটি রেখা বা রূপায়নের সাহায্যে সম্ভব; যাঁর রেখা সংযোগে ও রূপায়নে কায়দুস্তানুভূতি হয় তিনি শিল্পী।

আরেকটা বিশেষ পার্থক্য সাহিত্যিক ও শিল্পীর—সাহিত্যিক অপেক্ষা শিল্পী একটু বেশী পরিমাণে বর্ণন জাতিরূপ (visual Type)। সাহিত্যিকের ন্যায় যা-ই শোনা তাই দেখা নয়। তাই অবদমিত ইচ্ছায় তৃপ্তির জন্য কল্পনায় একটা রূপ দিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরতে হয় শিল্পীকে।

পরিশেষে বলব যে সাহিত্য বা শিল্পকলা সেখানেই সার্থক যেখানে স্রষ্টার অবদমিত ইচ্ছা ও প্রকোপ সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যের মনে প্রক্ষেপিত হয়। স্রষ্টার অবদমিত বাসনা দর্শক বা পাঠকের মনকে প্রভাবিত করে রক্তের ন্যায় তাঁদের মনেও যখন প্রকোপ ও ইচ্ছাকে উদ্দীপিত ও নিমীলিত করতে সক্ষম তখনই সার্থক সৃষ্টি—শিল্পী বা সাহিত্যিকও সার্থক।

উপসংহারে বলব যে কেবলমাত্র আবেগ, বা প্রেরণা বা উপলব্ধি প্রভৃতির একটি গুণীজনের প্রভাবেই সাহিত্যিক বা শিল্পী হয় না। যখনসকল গুণীজনের কিছু না কিছু একত্রিত হয়ে যাঁকে পরিচালিত করে, তখন তিনিই সাহিত্যিক বা শিল্পী হন।

দুঃখ শুধু দুঃখ নয়

গোবিন্দ গোস্বামী

দুদুহের মৌনক্ষণে শান্তি যদি না-ই পেয়ে থাকো
রাখিওনা অভিযোগ দুঃস্থ দুপুরে
নিবিড় নিরাসা ভরা রাত্রিতেই রাখো
না পাওয়ার ব্যথা যতো মনের মুকুরে।

স্মৃতিকের স্বচ্ছ স্মৃতি যুগ যুগ ধরে
পান পাত্রে ভরে নেয় প্রণয় পিপাসা
কাচের কাকলী ঘেরা সুখের সফরে
ক্ষুদ্র মূল্যে কেনে তারা জীবন-জিজ্ঞাসা।

অপরাহ্ণে এই সুখে পৃথিবী প্রিয়রে
পারো যতো দেখে নাও রাত্রি শৈব
নক্ষত্র মেলায়
পূবের পুরবী জাগে সোনার সেতারে
নদীর নিরীহ গানে বেদনা মেলায়।

দুঃখ শুধু দুঃখ নয়, ব্যথা নয় বেদনার গান
সাগর মথন করে পেয়েছিলে শুধুই কী
অমৃত সন্ধান?

মন্ত্রীদের দ্বারা গণসংযোগ—

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ গণসংযোগের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গত ১লা মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার ভার লইয়াছেন—তাঁহার কার্যে শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ও কয়েকজন মন্ত্রী সাহায্য করিবেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীভূপতি মজুমদার ও জনাব জিয়াউল হক হুগলীজেলার ভারলইবেন। প্রফুল্লবাবু নদীয়া ও হাওড়ার ভার পাইবেন। নদীয়ার উপমন্ত্রী শ্রীঅম্বরিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাওড়ার শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। ২৪পরগণার ভার লইয়াছেন, ডাক্তার জীবন-আমেদ, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ও শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, জনাব কাসেম আলি মির্জা ও শ্রীনিশাপতি মাঝি জনসংযোগ করিবেন। বর্ধমানের ভার জনাব আবদাস সাত্তার একাই গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅন্নদাবন্ধু রায়, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপঞ্চননারায়ণ সিংহদেব বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ভার পাইয়াছেন। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও উপমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র মহান্তি মেদিনীপুর জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথ রায়গুপ্ত, জলপাইগুড়ী, দার্জিলিং ও কুচবিহার লইয়া গঠিত এলাকায় জনসংযোগ করিবেন। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্মন পশ্চিম দিনাজপুর এবং শ্রীসৌরীন মিশ্র মালদহের ভার পাইয়াছেন। এই সকল মন্ত্রী ছাড়াও জনসাধারণকে গণসংযোগ করিতে বলা হইয়াছে। এই তালিকা অনুসারে মন্ত্রীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে খবর লইয়া তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলে জনগণ উপকৃত হইবে।

আচার্য্য চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত—

আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ১২ই বৈশাখ রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ভাষা সঙ্কট নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে ৩ ভাষার স্থলে তিন ভাষা শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট হইবে। মাতৃভাষা বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষাই ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট। বাঙ্গালীদিগকে যেভাবে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে তাহাদের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইয়া থাকে। হিন্দী ভাষার বানান ও বাংলা ভাষার বানান ঠিক বিপরীত—তাহার ফলে ছাত্ররা বানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজি না শিখিলে জগতের সভ্য সমাজের সহিত মেশা যায় না বা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে সম্বাদ সংগ্রহ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিলে ভারতের সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা যায় না—এ অবস্থায় যাহাতে অহিন্দী রাজ্যসমূহে জোর করিয়া হিন্দী শিখাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়, আচার্য্য চট্টোপাধ্যায়ের সে জন্য সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

হিন্দীর বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ—

ডাঃ সি-রাজাগোপালাচারী, শ্রীমির্জা ইসমাইল, শ্রীএম-কে-আত্তাকর, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ডি, ডি, কার্বে, মাষ্টার তারা সিং, শ্রীমুকুরাম আনন্দ, শ্রীও-সি-গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতবাসীরা দিল্লীর লোকসভার অধ্যক্ষ ও রাজ্যসভার সভাপতির নিকট এক আবেদনে জানাইয়াছেন—ভারতের একটি অংশের জনগণের উপর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দীভাষা চাপাইয়া দেওয়া হইলে দেশে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে—সেজন্য ভারতের সরকারী ভাষারূপে ইংরাজী বহাল রাখার দাবী মঞ্জুর করা হউক। ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইংরাজির স্থলে হিন্দী প্রবর্তিত হইলে দেশের জনগণের ঐক্য বিনষ্ট হইবে এবং তাহাদের মানসিক যোগ ছিন্ন হইবে। এই আবেদনে দেশের বহু মনীষী স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই

চিন্তাশীল পণ্ডিত এবং দেশের কল্যাণকামী বলিয়া পরিচিত। আমাদের বিশ্বাস, এ আবেদন নিষ্ফল হইবে না।

সরকারী ভাষা সম্পর্কিত রিপোর্ট—

গত ২২শে এপ্রিল দিল্লীতে লোকসভায় ও রাজ্যসভায় সরকারী ভাষা কি হইবে, সে সম্বন্ধে সংসদীয় কমিটীর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সকল রাজ্যে রাজ্যের নিজ নিজ ভাষা সরকারী ভাষারূপে চলিবে এবং কেন্দ্রে ১৯৬৫ সালের পর হইতে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষারূপে গণ্য করা হইবে। অবশ্য যতদিন যেভাবে প্রয়োজন, ততদিন সেভাবে ইংরাজি ভাষার প্রচলন থাকিবে। প্রতি রাজ্যে সে রাজ্যের প্রাদেশিক ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে চালানো সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করেন নাই—কিন্তু হিন্দী ভাষা বলিয়া কোন একটী ভাষা নাই। যাহাকে হিন্দী ভাষা বলা হয়, তাহা নানা প্রকৃতির—তাহার সাহিত্য সম্পদ বা শব্দ-সম্পদও অপ্রচুর—এ অবস্থায় হিন্দী ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা করা হইলে ভারতের কতকগুলি লোককে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে ও কতকগুলি লোক বিষম অসুবিধা ভোগ করিবে। সেজন্য এই বিবরণ প্রকাশের পর ভারতের বহু স্থানের সুধী পণ্ডিতগণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পলতায় কারখানা স্থাপন—

বারাকপুরের নিকট পলতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের যে জলকল আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু পলিমাটি জমা হয়—এতদিন ঐ পলিমাটীর সুব্যবহারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীএ-কে-চন্দের চেষ্টায় তথায় একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ পলিমাটি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত ৩রা মে রবিবার শ্রীচন্দ এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আলোচনা কালে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু উচ্চপদস্থ কর্মী তথায় উপস্থিত ছিলেন। যে সকল জিনিষ নষ্ট হইত, সে সকল জিনিষ কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা না করিলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যাইবে না। আমরা এই পরিকল্পনাকে সত্বর কার্যে পরিণত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব—দেশের বেকার সমস্যা সমাধান ও সম্পদ বৃদ্ধির ইহা সহায়ক হইবে।

অধ্যাপকগণের বেতন বৃদ্ধি—

কলিকাতা কলেজসমূহের অধ্যাপকগণের বেতন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা দিয়াছেন। কতকগুলি কলেজকে এই সর্তে ঐ বর্দ্ধিত বেতনের টাকা দেওয়া হইয়াছে যে—ঐ সকল কলেজে আগামী ৫ বৎসরে পর্যায়ক্রমে ছাত্র সংখ্যা কমাইয়া ১৫০০ করিতে হইবে। বর্দ্ধিত বেতন প্রাপ্ত অধ্যাপকগণ সপ্তাহে ৩ ঘণ্টার বেশী প্রাইভেট টুইশান করিতে পাইবেন না। বেতন বৃদ্ধির ফলে শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতি হইলে এবং ছাত্ররা নূতন ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হইলে এই অর্থদান সার্থক হইবে। অধিক বেতনপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ অতঃপর অধিকতর উৎসাহ ও মনোযোগের সহিত অবশ্যই অধ্যাপনা করিবেন।

সরকারী ও বেসরকারী শিল্প—

গত ২৬শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষদের পঞ্চবার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলেন—সরকারী শিল্পে নানারূপ ভুল ত্রুটি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বেসরকারী শিল্প অপেক্ষা সরকারী শিল্প বহু গুণে ভাল। ভারতে সরকারী শিল্প আজ বেসরকারী শিল্প অপেক্ষা ব্যয়-সঙ্কোচ, কর্মদক্ষতা এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া বহুগুণে শ্রেয়। শ্রীনেহরু প্রশাসনিক পরিষদের সভাপতি। তিনি বার বার বলেন—আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইল সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠন। সরকারী অফিস সমূহের সম্মুখে এই মূল উদ্দেশ্যের কথা লিখিত থাকা উচিত।

কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণ—

কলিকাতা কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ২৬শে এপ্রিল রবিবার কলিকাতা মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল মাঠে নূতন মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেপুটী মেয়র শ্রীকিশোরীলাল ঘনঢনিয়াকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। তথায় মেয়র বলেন—কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণ ব্যতীত সহরের সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। কলিকাতা আয়তনে ক্ষুদ্র ও ঘনবসতিপূর্ণ। পৃথিবীর সকল বড় বড় সহর অপেক্ষা কলিকাতার ঘনবসতি অধিক—কলিকাতার গৃহ নির্মাণের

পূর্বে কোন স্থান ছিল না। প্রতিদিন মফঃস্বল হইতে ১০।১২ লক্ষ লোক কলিকাতায় আসিয়া থাকে। দেশ বিভাগের ফলে সহরের লোকসংখ্যা ৭৮ লক্ষ বাড়িয়াছে। সহরের আয়তন বাড়াইয়া বস্তীবাসীদিগকে ফাঁকা স্থানে লইয়া যাইতে না পারিলে সহরের সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। তিনি এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।

চীনের নূতন রাষ্ট্রপতি—

গত ২৭শে এপ্রিল পিকিংয়ে চীনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশনে বিখ্যাত মার্কসীয় তত্ত্ববিশারদ লিউ-লাউ-চি মহাশয় মাং সেতুংয়ের স্থানে চীনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনের পরই তিনি চৌ-এন-লাইকে আরও এক বৎসরের জন্য প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিয়াছেন।

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

সমগ্র বঙ্গের সেচবিভাগের চিফ এঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ বান্দ্যোপাধ্যায় গত ৩০শে এপ্রিল ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সেকালে তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

কালীপদ ঘোষ—

খ্যাতনামা সাংবাদিক কালীপদ ঘোষ ৮৩ বৎসর বয়সে গত ২৭শে এপ্রিল তাঁহার হুগলী শ্রীরামপুরের বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৫০ বৎসর কাল তিনি কলিকাতায় সাংবাদিকের কাজ করিতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে কাজ করিতে দেখা গিয়াছিল। সংবাদ সংগ্রহ কার্যে তিনি কখনও অসৎ উপায় অবলম্বন করেন নাই।

মোকামায় নূতন পুল—

গত ১লা মে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু মোকামায় গঙ্গার উপর নির্মিত ৬ হাজার ফিট লম্বা পুলের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্রে এই পুল লইয়া গঙ্গার উপর ৯টি পুল হইল। (১) কাশীর নিকট মালিয়া পুল (২) এলাহাবাদের নিকট ইজত পুল (৩) কানপুরে গঙ্গার পুল (৪) ফাকামাটিতে কার্জন পুল (৫) রাজঘাট নাজোরায় গঙ্গাপুল (৬) গড়মুক্তেশ্বর গঙ্গাপুল (৭) বালাওয়ালি গঙ্গা-পুল (৮) কাহিয়া গঙ্গাপুল ও (৯) মোকামায় রাজেন্দ্র পুল। নূতন পুল হওয়ায় উত্তর বিহারের সহিত দক্ষিণ বিহারের যোগাযোগের ব্যবস্থা হইল।

কোশী বাঁধের ভিত্তি স্থাপন—

গত ৩০শে এপ্রিল নেপাল রাজ্যের ভীমনগরে নেপালের রাজা মহেন্দ্র কোশী বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন—১৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ বাঁধ নির্মিত হইবে। ২ লক্ষ নেপালী ও ভারতীয় উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। চাতরা নামক যে স্থানে কোশীনদী সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে হনুমান-নগর নামক নেপালী সহরের নিকট বাঁধ নির্মিত হইবে। ঐ স্থানে নদী ৪ মাইল চওড়া। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহর-লাল নেহরু ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহা ছাড়া বিহারের রাজ্যপাল ডাক্তার জাকীর হোসেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম, কেন্দ্রীয় ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ, বিহারের সেচমন্ত্রী শ্রীনীলনারায়ণ সিংহও ঐ উৎসবে যোগদান করেন। বাঁধ, খাল প্রভৃতি সব সম্পূর্ণ করিতে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ঐ স্থানে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ নেপালে সরবরাহ করা হইবে। বহু জমী ঐ কার্যের ফলে সুজলা সুফলা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা—

গত ২২শে এপ্রিল বারাকপুরে বারাকপুর ও কল্যাণী কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটীর সভায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদাস সাত্তার জানাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বেকার লোকের সংখ্যা ১২ লক্ষেরও অধিক। তাহাদের মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বেকার শিক্ষিত। বহু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন সত্ত্বেও বেকার সমস্যার সমাধান হইতেছে না। লোক আর কেহ গ্রামে বাস করিতে চায় না—সকলে সহরে চলিয়া আসিতে চায়—তাহাই বেকার সমস্যার প্রধান কারণ। সে কারণে কৃষির উপযুক্ত উন্নতি হয় না ও খাদ্য সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলে। বেকার লোকদিগকে কৃষিমুখী করিয়া গ্রামে বাস করাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে দেশের

এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা দূর হইবে না। ঢেঁকী ও হাতে-চালানো তাঁত প্রবর্তন দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের কথা শুনা গিয়াছিল—সে বিষয়েও উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। কে ইহা করিবে, কেহই বলিতে পারেন না।

পল্লী পরিচর্যা কেন্দ্র—

গত ২৫শে এপ্রিল ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীসুবিমল-প্রসাদ জৈন শান্তিনিকেতনে পূর্বভারতের কৃষিগত অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য নূতন ভবন "পল্লী পরিচর্যা কেন্দ্রে"র উদ্বোধন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র চৌধুরী ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ প্রদত্ত একলক্ষ টাকা দানে ঐ কেন্দ্রের গৃহ নির্মিত হইয়াছে। কৃষি উন্নয়নের জন্য পল্লী সমস্যার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ঐ গবেষণা কেন্দ্র পল্লীর কৃষি সমস্যা সমাধানের কারণ নির্ণয় করিয়া সে বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। জনগণকে কিভাবে গ্রাম-মুখী ও কৃষি-মুখী করা যায়, আজ দেশের তাহাই প্রধান সমস্যা।

পশ্চিমবঙ্গে লৌহ সরবরাহ—

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ সালের এপ্রিল হইতে জুন এই তিনমাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৯৯৫২ টন লৌহা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিল—১৯৫৯ সালের এপ্রিল হইতে জুন তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গ ২০৬৪০ টন অর্থাৎ পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ১১ হাজার টন বেশী লৌহা পাইবে। তাহা (১) গৃহনির্মাণ (২) সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (৩) কারখানার ব্যবহার—তিনটি কাজেই ব্যবহৃত হইবে। গত কয় বৎসর যাবৎ সিমেন্ট সহজে পাওয়া গেলেও লৌহা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় বহু লোক নূতন গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন নাই। লৌহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে বহু নূতন গৃহ নির্মিত হইয়া গৃহ সমস্যার সমাধান হইবে।

পরলোকে অধ্যাপক

মোহিতকুমার ঘোষ

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক মোহিত-কুমার ঘোষ মহাশয় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার নিউ আলিপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল, মাত্র আড়াই বৎসর পূর্বে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী ও তিন পুত্র বর্তমান। মোহিতকুমার ছাত্রজীবনে বিশেষ কৃতী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। এম-এ পাস করিবার পর তিন বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির লেকচারার ছিলেন। ১৯২০ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বিলাত গমন করেন এবং লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স হইতে

অধ্যাপক মোহিতকুমার ঘোষ

বি-কম্ ডিগ্রী লাভ করেন। স্বদেশে ফিরিয়া ঐ বৎসরই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন এবং কিছুকালের মধ্যেই ঐ বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এদেশে বাণিজ্য বিষয়ক চর্চার তিনি একজন পথিকৃৎ ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে যে সকল বাঙালী বাংলার বাহিরে থাকিয়া বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন মোহিতকুমার ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মধ্যে

তিন বৎসর, তিনি কলিকাতায় Govt. Commercial Institute এর অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসর অন্তর ৪ বার তিনি অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক ফ্যাকাল্টির ডীন নির্ব্বাচিত হন। অধ্যাপক ঘোষ কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সরল, অমায়িক ও অনাড়ম্বর মানুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একটি সুসন্তান হারাইল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কবি রসরাজ সংবর্দ্ধনা—

কলিকাতার সুবিখ্যাত মল্লিক বংশের সুসন্তান রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক মহাশয়কে সম্প্রতি পুরীতে তত্রত্য বাঙালী উড়িয়া ও মাদ্রাজী সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক এক বিশেষ সভায় সংবর্দ্ধিত করা হয় এবং কবিসূর্য্য মানপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য্য শ্রীনিবেদিতা নিজে। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় কবি রসরাজের কাব্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে—আজ আমাদের সামাজিক জীবনের চারিদিকে নানা ক্লেদ নানা গ্লানি সমাহিত হইয়াছে। মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা প্রতি পদে ব্যাহত হইতেছে। কবি রসরাজ সরলী মন লইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার ব্যঙ্গ-কাব্যের মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেকটি ত্রুটি দেখাইয়াছেন এবং তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। কবির সমাজ চেতনা ও মানব-মনস্ত অনস্বীকার্য্য। সভায় বহু জ্ঞানী গুণী ও মহিলা সমবেত হইয়া কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের তীর্থ দর্শন—

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গত ৩রা মে রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর ও শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর জন্মভূমি জয়রামবাটী গ্রাম দুইটি দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস নেতা শ্রীসকুলা ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গ্রাম দুইটি পূর্ব্বে প্রায় দুর্গম ছিল—বর্ত্তমানে নূতন পথ নির্ম্মিত হওয়ায় মোটরে তথায় যাওয়া যায়। উভয় স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীদের চেষ্টায় মন্দির ও গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিতে হইলে ঐ সকল স্থানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়া স্থান-গুলিতে যাহাতে অধিক সংখ্যায় লোক বসবাস করে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শ্রীদেশাই ঐ স্থানগুলি পরিদর্শন করার ফলে ঐ অঞ্চলগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। নানাভাবে মানুষকে গ্রামের মধ্যে লইয়া যাইতে না পারিলে, দেশও সমৃদ্ধ হইবে না—সহরের লোকসংখ্যাও কমানো যাইবে না।

নলিনীনাথ মৈত্র—

খ্যাতনামা দেশসেবক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহ-কর্ম্মী নলিনীনাথ মৈত্র গত ২রা মে ৮১ বৎসর বয়সে কলি-কাতা সুখলাল কার্ণানী হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ টাঙ্গাইলের লোক ছিলেন ও ১৯২১ সালে ওকালতী ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি কিছুকাল ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজির আশ্রমেও বাস করিয়াছিলেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন।

নিমতিতা-ধুলিয়ান নূতন রেল—

সদার ঘাটনে ধুলিয়ানের নিকট আজিমগঞ্জ বার-রোয়ারা রেলের একাংশ নষ্ট হওয়ায় রেল কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই নিমতিতা হইতে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত সাড়ে ৫ মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ করিবেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপি-সি মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ খবর দিয়া গিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী বারাসত বসিরহাট রেল নির্ম্মাণ যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে বরবার হইতে অনুরোধ জানাইলে তিনি ঐ বিষয়েও সত্বর ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। রেলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক জমীদখল কার্য্য শেষ হইয়াছে। বারাসত বসিরহাট রেল নির্ম্মিত না হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখকষ্ট দূর করার অন্য উপায় নাই।

স্বদেশব্রত—

১৩১৪ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশব্রত লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মদিনের সংখ্যায় ভূদানযজ্ঞ

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

–সানলাইটের অতিরিক্ত ফেণাই এর কারণ

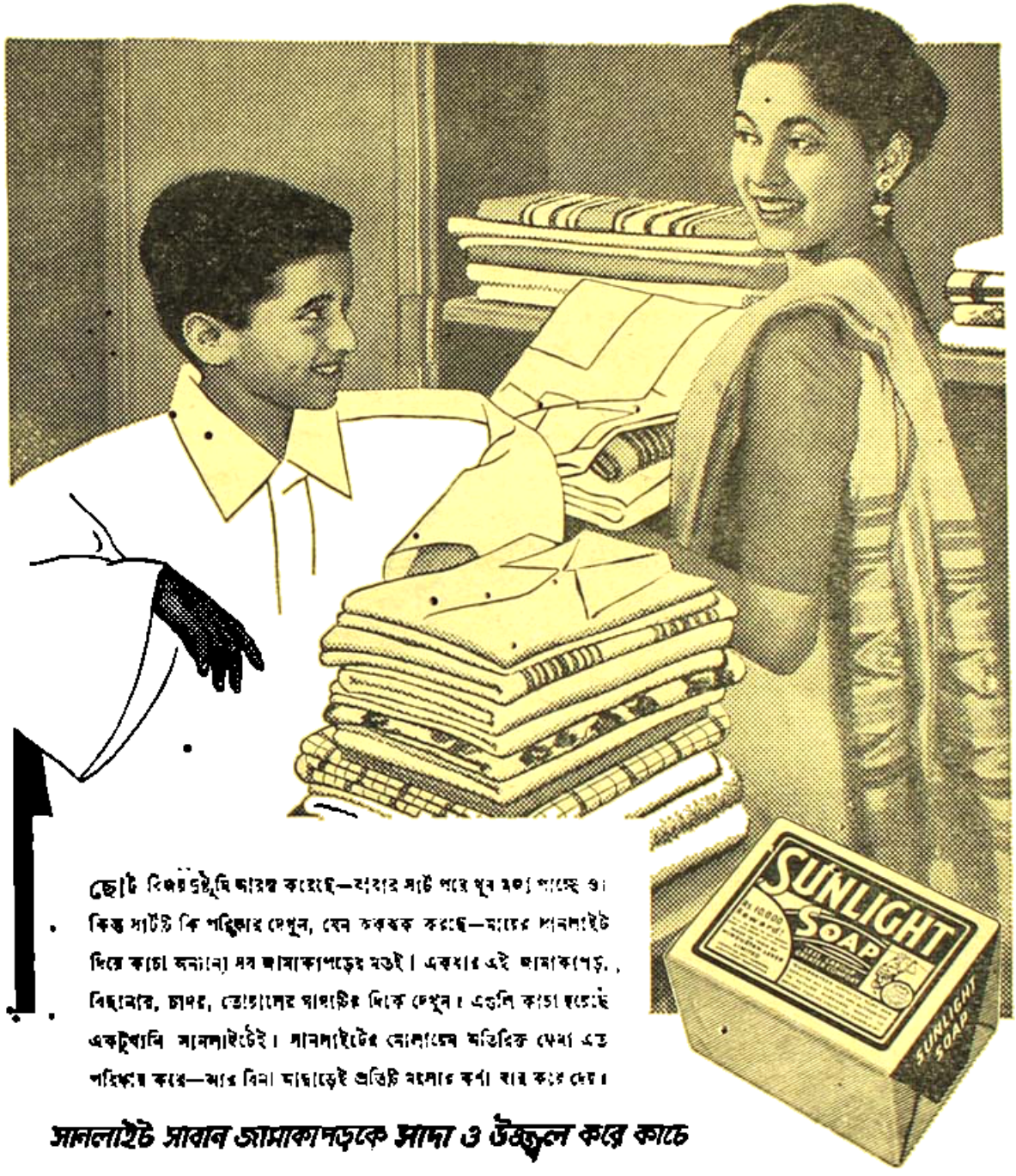

ছোট বিজ্ঞাপনটুকুই আরম্ভ করেছে—যাহার সার্ট পরে খুব মজা পাচ্ছে ও। কিন্তু সার্টটি কি পরিষ্কার দেখুন, যেন ঝকঝক করছে—মায়ের সানলাইট দিয়ে কাচা অন্যান্য সব জামাকাপড়ের মতই। এবারে এই জামাকাপড়, বিছানার চাদর, তোয়ালের গাদাটির দিকে দেখুন। এগুলি কাচা হয়েছে একটুখানি সানলাইটেই। সানলাইটের ফেণায়িত অতিরিক্ত ফেণা এত পরিষ্কার করে—আর বিনা আয়াসেই প্রতিটি ময়লার কণা বার করে দেয়।

সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

S. 260-X52 BQ

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে এর পক্ষে।

সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহা সর্বকালের উপযোগী—আমরা সেজন্য নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম—"আর কিছু না পারো, খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার যাহাত্মা আছে, সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান যাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে—সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার ধর্মপথ প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোন দলেই তোমার নাম না লাগুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ, প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামাজ্ঞ বলিয়া ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয়, উপহাস করে, তবে তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে॥"

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা কবি, লেখক ও সাংবাদিক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ১১ই মে সোমবার সকালে ৬৭ বৎসর বয়সে হঠাৎ তাঁহার কলিকাতা বাণিজ্যতলার বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। পূর্বদিন সকালে তিনি এক সভায় বক্তৃতা করেন ও বিকালে এক সভায় ভাষণ দিবার সময় অজ্ঞান হইয়া যান। ১৮৯২ সালে নদীয়া জেলায় তাঁহার জন্ম, কাটোয়াতে ও বর্দ্ধমানে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ডাক বিভাগে কাজ করিতেন ও ১৯৩৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীপালি সাপ্তাহিক ও মহিলা মাসিকের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও অবসর গ্রহণের পর প্রায় ৪০খানি বই লিখিয়াছিলেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ সকল বিষয়েই তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার মত বহু বৎসল, সদালাপী লোকের সংখ্যা কম।

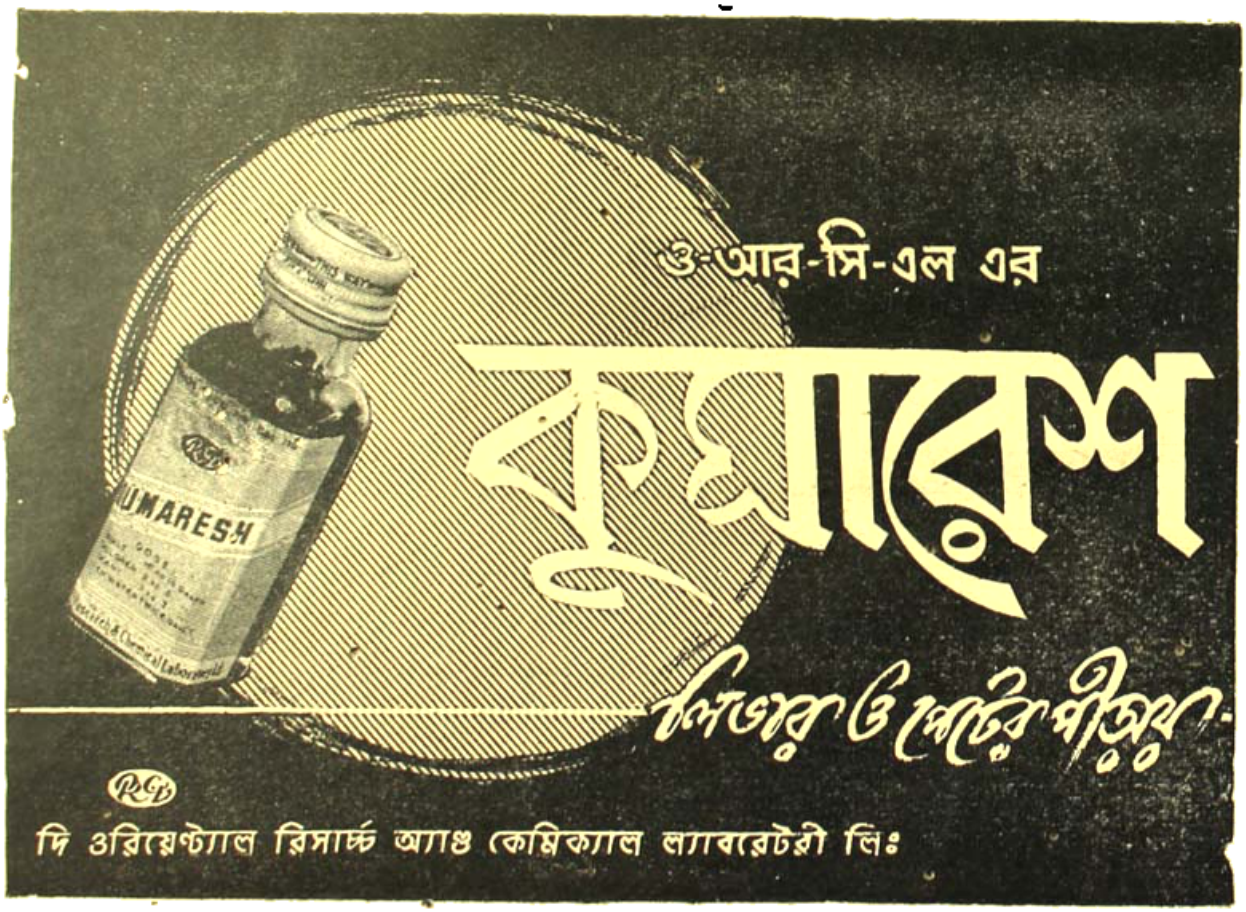

শেষপথের পাঁচালি

সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

সরকারী অফিসে কেরাণীর চাকরী পেয়ে গেলাম। সবাই বলে ভাগ্যটা ভাল। গবরমেণ্টের কাজ করা মানেই তো লিফটে ওঠা, দেখতে দেখতে দোতালা, তিনতালা এবং আরও উঁচুতে নিয়ে যাবে। ঢুকে দেখি, সহ-কর্মীরা সেই একতালায়ই পচ্চেন দশ পোনেরো বছর। মন দমলেও হাল ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। উৎসাহ নিয়ে চেয়ারে বসি। পদোন্নতি আনতেই হবে জীবনে।

বিরাট অফিসের পেনসন বিভাগে কাজ। বেশ কয়েকজন কেরাণী এখানে। কর্তব্য, অবসরপ্রাপ্তদের পেনসন দেওয়া। বড়বাবু বসেছেন ঘরের এক কোণে। অফিসাররা বসেন দূরে, ছোটো ছোটো ঘরে।

"এই বুড়োবাবু, ওধারে যাবেন না।" হুঙ্কার দিল কনষ্টেবল। ওখানে কাঁচা টাকা থাকে। পাহারা দিচ্ছে তাই দুজন সেপাই। চেয়ে দেখি, অতি বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক কেশিয়ারের ঘরের দিকে হাঁটছিলেন। ছফিট লম্বা তেজী নওজোয়ান কনষ্টেবল বাক্যাহত করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বৃদ্ধ যে এককালে লম্বা ছিলেন বোঝা যায়। তবে বয়সের ভারে এখন নুয়ে গেছেন অনেক। চুল সব সাদা, বড় বড়, আঁচড়ানো হয় না বলে সাধুদের মত জট বেঁধেছে। দাঁত একটাও নেই। চোখে পুরু চশমা। পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে—আর কাঁপছে মাথাটা ঘাড়ের ওপর। একটু হাওয়া লাগলেই যেন পড়ে যাবেন।

মাথায় কুঁচকে-যাওয়া দোমড়ানো অতি পুরোনো টুপি, গায়ে ইস্তিরি-বিহীন খাকি হাপ-প্যাণ্ট আর নোংরা সার্ট। হাতে ছড়ি। পায়ে মোজা নেই, আছে কাবলী-স্যু।

এরকম অসহায় লোককে ওরকমভাবে ধমকানো উচিত হয়নি কনষ্টেবলের। মনের কথাটা উপ-বড়বাবু কেষ্ট-বাবুকে বললাম। শুনে হেসে আকুল, বললেন, "বুড়ো দেখে অত উতলা হয়ো না ভায়া। পেনসন অফিসে কাজ করতে এসেছ। বুড়ো দেখে ভুল পাবেনা।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ, ভায়া। আমারা দিয়েছ কি মরেছ। বুড়োদের সঙ্গে বাড়ীতে কেউ কথা বলে? একবার কথা বলে দেখ, বক-বকানীর জ্বালায় অস্থির হবে। তার ওপর, ঘামা কাপড়ের আর গা-র গন্ধ তো আছেই।

"গন্ধ কেন?"

"কতদিন স্নান করে? অসুখ হবে না? স্নান করলেও তো কাক-স্নান। আর জামাকাপড়? ওদিকে একটু ছাঁস থাকলে আমরা একটু শান্তি পেতাম।"

হেসেই চলেছেন কেষ্টবাবু। যোগ দিতে পারি না। চোখে ভাসে বড়দার শিশুটি। নিজের খাবার পরবার ক্ষমতা নেই। মানুষের সেই শৈশবাবস্থাই তো আবার ফিরে আসে বার্দ্ধক্যে। তাকে নিয়ে হাসবার কি আছে। কেষ্টবাবু কখনও বুড়ো হবেন না?

এগিয়ে গেলাম। প্রশ্ন করি, ব্যাপার কি। কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট কোমলতা টেনে আনি।

"বলতে পার বাবা, এই বিভাগের বড়সাহেব কোথায় বসেন? দেখা করতে চাই।" বড়সাহেবের চাপরাশী বসেছিল টুলে, বাড়ী উৎকল, বটুয়া খুলে পানের ওপর চুণ দিচ্ছিল। বলি, "ইনির নাম লিখে বড়সাহেবকে দাও।" চাপরাশী শুনেও শুনল না। কর্তার আরদালী সে। আমার মত কেরাণীর কথা শুনবে কেন। বৃদ্ধ তখন পকেট থেকে লম্বা কাগজ টেনে আনেন, লেখার ভঙ্গি, দরখাস্ত হবে হয়তো। চাপরাশীকে অনুরোধ করলেন, সাহেবের হাতে দিতে। চাপরাশি গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, "সাহেবের হুকুম আছে, দেখা হবে না।"

পৃথিবী কেঁপে ওঠে। পাইপ টানতে টানতে, দুহাত

ট্রাউজারের দুই পকেটে ঢুকিয়ে, ভারে ভারে পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন খোদ বড়সাহেব। কোথায় নাকি যাবেন। আমরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বৃদ্ধ কিন্তু এগিয়ে গেলেন, বললেন, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম এই দরখাস্তটি নিয়ে।"

বড়সাহেব বয়সে ইনির আধেক। গতিতে বাধা এসেছে দেখে চোখ মুখ কুঁচকিয়ে দাঁড়ালেন। এর মাঝেই ভদ্রলোক তাঁর কাগজ কর্ত্তার হাতে দিয়েছেন গুঁজে। চোখ বুলিয়ে নিলেন একটু, তারপর দিলেন ছুঁড়ে মাটিতে। বললেন, "এসব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমার সময় নষ্ট করছেন কেন? কেরাণীবাবুদের কাছে যান।"

কেষ্টবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম তাঁকে। এতবছর কানীবাস করছিলেন। আর ভাল লাগছে না, তাই ফিরে এসেছেন। এখন আমাদের এই অফিস থেকে যাতে পেনসনটা পান, সেই ব্যবস্থাই করতে তাঁর আগমন। মুখ না তুলে কেষ্টবাবু উত্তর দিলেন, "আপনার দরখাস্ত রাখলুম। দিনচোদ্দ পরে খবর নেবেন।" দরখাস্তটা পড়ে কাগজের গাদায় ছুঁড়ে কেষ্টবাবু কাজে মন দিলেন। হঠাৎ কেন জানি না কৌতূহল হল। দরখাস্তটা টেনে পড়ি, পড়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকি। ইনি পুলিশের সুপারিনটেনডেণ্টের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। নামের আগে পেছনে অনেক উপাধি। এই লোককে একটু আগে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল এক কনষ্টেবল? যে টাকাটা ইনি প্রতিমাসে পেনসন পাচ্ছেন, সেই টাকাটা ধরে তুলতে যে আমাদের মত লোকের লাগবে বছরের কাছাকাছি।

আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশসাহেব বলেন, "কনষ্টেবলের ব্যবহারে তুমি দুঃখিত হয়ো না। রক্তের গরমে অনেকে অনেক রকম কুকাজ করে। তারপর রক্তের আগুন যখন যায় নিভে, তখন জন্ম নেয় নতুন এক আগুন। অনুতাপের আগুন। সেই আগুনে আমি আজও জ্বলছি। সেই জ্বলনে যে কি জ্বালা, তোমাকে কি করে বোঝাবো বাবা। আগে যদি জানতুম, তবে অনুতাপ করবার কারণ জীবনে আনতুম না।"

পুলিশ সাহেবকে এগিয়ে দিলাম গাড়ীবারান্দা পর্য্যন্ত। আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, "এরকম অসহায় কিন্তু আগে ছিলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্বারোহণে জিলার এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত চষে ফেলেছি। কতবার আদেশ দিয়েছি, কাজার, সঙ্গে সঙ্গে কনষ্টেবলদের রাইফেলগুলো গর্জ্জে উঠেছে। চার্জ্জ-এর হুকুমও দিয়েছি অনেকবার। চোখের সামনে এখনও ভাসে, বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে সেপাইরা ধেয়ে চলেছে। আর আজ? পদ কত ক্ষণস্থায়ী। সেই পদের গর্ব্ব মানুষ করে। ছিঃ ছিঃ। দেহের কি পরিণতি। সেই দেহ নিয়ে মানুষের আবার তেজ। ছিঃ ছিঃ। আচ্ছা, বাবা, আজ তবে আসি।"

মাসের প্রথম দিকে আমাদের কাজ বেশী। দলে দলে বুড়ো নিজের নিজের দিনে এখানে পাশের ছোট ঘরে বেঞ্চির উপর বসে থাকেন। নাম ডাকলে ছুটে আসেন, কাঁপতে কাঁপতে। কেউ নেন টাকা, কেউ বা চেক।

"রবিদাস পাল, রবিদাস পাল।" কোন উত্তর এল না। শুনলাম, প্রতিমাসেই নাকি দুচারজনের নাম ডেকেও কোন উত্তর পাওয়া যায় না। হেসে কেষ্টবাবু বলেন, "পটল তবে রবিদাস এতদিনে তুলল। কুড়ি বছর পেন্সন নিচ্ছে লোকটা। গবরমেণ্টকে ফতুর করবে।" আমি একটা বিপরীত কেস জানতুম। বলি, "কেন তা হবে। অটলবাবু যে মাত্র একবার একটি মাসের পেন্সন নিয়েছিলেন।"

অন্য নাম ডাকা হল। তারপর আরও নাম। এমন সময় টাল সামলাতে সামলাতে এসে হাজির রবিদাস পাল। ধমকে উঠলেন কেষ্টবাবু। মাথা চুলকিয়ে, একবার কেশে আর একবার চোখমুখ কাঁচুমাচু করে রবিদাসবাবু বলেন, "জানোই তো বাবা, ডায়েবেটিসের রোগী। তাই তো ঘনঘন ছুটতে হয় বাথরুমে।" আর একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কেষ্টবাবু বলেন, "আপনার পালা চলে গেছে। সবুর হয়ে থাক, তখন ডাকব।"

"কিন্তু, বাবা, ডাক্তারের কাছে যাব।"

"তাই চলে যান। আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। বুঝলেন?

রবিদাসবাবু মুখ মলিন করে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এসে নিজের সীটে বসলেন।

মুচকি হেসে আপন মনে কেষ্টবাবু বলেন, "ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেটের মেজাজ এখনও ছাড়তে পারেনি বুঝে।"

"উনি ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন নাকি ?"

"হাঁ। তার ওপর রায় বাহাদুর, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"উনি কোন মেজাজ দেখিয়েছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"অন্ধ হয়ে বসে থাকলে দেখবে কি করে ?"

এককালে অগুন্তি দর্শনার্থীদের তিনি উপদেশ দিতেন, তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট না করতে। আজ তিনি সেই শুনলেন—কেরাণীর কাছে।

পেন্সনের কাজ চলেছে সমান ভাবে। একের পর একজন আসছেন। চারশ টাকার বন্দোবস্ত না করে কেউই যাচ্ছেন না। আমার এইদিকটায় কেবল উচ্চ-পদস্থদের নিয়েই কারবার।

দেবীপ্রসাদ রায় এসে থেমে গেলেন কেষ্টবাবুর কাছে।

"আপনি দেবীপ্রসাদ রায় ?" কি কঠিন কঠোর গলার স্বর।

"হাঁ।" বিনয়ী না হয়েই উত্তর দিলেন রায়।

"প্রমাণ।"

"প্রমাণ ?"

"হাঁ, প্রমাণ।"

"আমি মিথ্যা কথা বলছি ?

"বলতে পারেন।"

"আমাকে এরকম বলছেন। দেখে নেব।"

"জজিয়তি মেজাজ এখনও যায়নি দেখছি। মনে রাখবেন, এটা আপনার আদালত নয়। অন্য নাম ডাক হে।"

অন্য নাম ডাকা হল। ওধারে শুনতে পেলাম অন্যান্য পেনসন-প্রয়ালারা রায়কে বোঝাচ্ছেন।

"বুঝেছেন, মশয়, আমরা এখন অগুণানী সূর্য। গোল-মাল করলে টাকা পেতে দেরী হবে। ওতে একমাত্র আপনারই অসুবিধে।"

রায় শান্ত হলেন। হাতে কাজ ছিল না। বসলাম তাঁর পাশে। বলতে আরম্ভ করলেন নিজের কথা। সবে মাত্র তিনি বিচারকের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। পাঁচ পাঁচটা লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেখা হয়েছিল তাঁর এই ডানহাত দিয়েই। তাঁর এই ডানহাতই প্রায় একশজনকে পাঠিয়েছিল যাঁড় থেকে বিশবছরের সশ্রম কারাবাসে। কত গণ্যমান্য লোককে ধরে এনে জরিমানা করেছেন আদালত অবমাননার অপরাধে। সেই লোককে কিনা মিথ্যাবাদী বলে দিল এক কেরাণী।

অবসর নেবার পরদিনই তিনি অসুস্থ হলেন। তাড়া-তাড়ি চলতে ফিরতে পারলেও দেখলেন, ডান হাত কিছুটা অবশ হয়ে গেছে। কলমকে তাই অন্য ভাবে ধরতে হয়। হাতের লেখাটা বদলালো বেশ, ঐ সঙ্গে সইটাও। তাঁর কাগজ-পত্রে যে সই আছে, ওর সঙ্গে মিললোনা তাঁর আজের সই। গোলমালটা তাই নিয়ে।

বড়বাবুর ডাকে কাজে বসতে হল। রায় সাহেব আর খানিকক্ষণ বসে চলে গেলেন।

বড়বাবুর সামনে ধূমপান চলে না। বাইরে এসে গাড়ী বারান্দার সামনে সিগরেট ধরিয়ে বসেছি। এমন সময় হেলতে দুলতে রায়বাহাদুর রবিদাস পাল এলেন। দুটো সিঁড়ি ডাঙতেই পা একটু ফসকে গেল। তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ধরে ফেলি।

"বাবা, বাবা, বাবা।" সাবেকী আমলের মোটর গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এল এক আধুনিকা। ছোটো-খাটো স্বাস্থ্যভরা গঠন। সোনার মত রং। নিখুঁত একটি মুখ। ক্ষীণ-কটি ছাড়িয়ে নেমে গেছে লম্বা দুটো বেণী।

"না, না, আমার কিছুই হয়নি।"

গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম দুজনকে।

"বড্ড ভয় করছে। সঙ্গে এলে ভাল হয়। ভয়ঙ্কর একটা অনুরোধ করছি না তো ? বাবাকে আপনি না ধরলে যে কি উপায় হত।"

"যখন তখন অফিস ছাড়তে পারেনা কেরাণী। ঠিকানাটা দিন, ছুটির পর খোঁজ নেব।"

"আপনি তো বেশ স্পষ্টবাদী। এ রকম ছেলেই দেখে আমি অভ্যস্ত—যারা যা নয় তাই জাহির করতে ব্যস্ত। যেমন, যে শিকারের কিছু জানে না, সে আমাকে জানায়, সে বড় শিকারী। যে একাউনটেন্ট সে পরিচয় দেয়, ডেপুটি একাউনটেন্ট জেনারেল। আর আপনি জানিয়ে দিলেন আপনি কেরাণী। জানেন, এর কি প্রতিক্রিয়া হয়ে আমার মনে ?"

"বিরাগ। কিন্তু উপায় কই? না আছে চাল, না আছে তরোয়াল। কেমন করে বলি, মস্ত বীর আমি।"

ছুটির পর দাঁড়ালাম রায়বাহাদুরের বাড়ীর সামনে। দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল মালতী। বিরাট বাড়ী। কিন্তু অবস্থা বড় মলিন। কুড়ি বছর আগে মালতীর মা চলে যাবার পর বাড়ী আর মেরামৎ হয়নি। ছেলেরা কাজ-কর্মে বিদেশে, মেয়েরা স্বামীর ঘরে। একা মালতী সামলায় সব দিক। মার ভাঙা তুলসী তলায় সে জ্বালিয়ে যাচ্ছে প্রদীপ। কিন্তু মালতীর পর?

চা খাচ্ছিলাম, কথা বলে চলেছে মালতী। বেড়িয়ে ফিরলেন রায়বাহাদুর। বলেন, "একদিন ছিল যখন লোকের জ্বালায় অস্থির হয়েছি। এখন কেউই আসে না আমার খোঁজ নিতে। ধন্যবাদ তোমাকে। আবার এসো।"

কয়েক দিন যাতায়াতের পর রায়বাহাদুর অনুরোধ করলেন মালতীকে গ্রহণ করতে। এ যেন চাঁদ হাতে পাওয়া। কিন্তু রাখব কোথায়? খাওয়াব কি? ব্যাপার বুঝে তিনি জানিয়ে দিলেন, থাকা খাওয়া এই বাড়ীতেই। কিন্তু আমি যে সামান্য কর্মচারী। তিনি বললেন, "ভয় পাচ্ছ কেন, বিছানার পরীক্ষা পাশ করে ওপরে ওঠতে পারবে না? না পারলেও ক্ষতি নেই। আমার সবই তো রইলো মেয়ে-জামাইএর জন্য।"

দু-দিন সময় নিয়ে ভাবলাম, শুধু ভাবলাম। শেষে ঠিক করি, প্রস্তাব গ্রহণ করবই। এ যে রাজকন্যা আর আধেক রাজত্ব পাওয়া। পরে আমি ছোট। কিন্তু চেষ্টা করলে ওপরে উঠতে পারব না? ছুটে চলি। হেসে দরজা খোলে মালতী। চোখে-মুখে লজ্জা। বোধ হয় শুনেছে সব। মাথা নীচু করে বলে, "বাবা ঠাকুর ঘরে, ওপরে। আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। চা আনছি আমি।" এই মেয়েটি আমার স্ত্রী হবে। এই বাড়ীর মালিক আমি হব। চেষ্টা করে পদোন্নতি আনব। কি আনন্দ, কি মজা। লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠি।

তিনতালায় একটি ঘর। এই ঘরটাই ঠাকুর ঘর। দরজা খোলা। স্তব্ধ হয়ে গেলাম ভেতরের দৃশ্য দেখে। চোখ বন্ধ রায়বাহাদুরের, জল পড়ছে দু-গাল বেয়ে। আপন মনে আবৃত্তি করছেন:

"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তম, বিত্তম তেন বিনোদয় চিত্তম॥
কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজন যৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।"

মাথা ঘুরছে। আমি কোথায়? ঐ যে, ঐ যে, এক যুবক। বেয়ে চলেছে। কে এই তরুণ? পেছনে পড়ে আছে স্ত্রী যশোদা আর মেয়ে। চিনতে পেরেছি। মায়া একে আটকাতে পারেনি। এর নাম বর্দ্ধমান মহাবীর তৈন। ঐ যে আর একজন, পাহাড় থেকে নামছে। একেও জানি। স্ত্রী যশোধরা আর পুত্র রাহুল ধরে রাখতে পারেনি এই তরুণকেও। এ যে আমাদের সিদ্ধার্থ। আবার কে যায়? শিবের মত সুন্দর। চিনেছি, চিনেছি, এ যে শঙ্করাচার্য্য। মার মায়া ধরে রাখতে পারল না এই কিশোরকে। দু-হাত তুলে হরিনাম করতে করতে ওধার দিয়ে কে আসছে? বাঙলা একে ভালোভাবে জানে। এ যে নদীয়ার নিমাই, চলেছে নীলাচলে। মাতা শচীদেবী আর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুতেই একে সংসারী করতে পারেনি।

ভারতের আকাশে বাতাসে লুকানো রয়েছে উদাসীনের বীজ। আমি না এসে পারলাম না এর অধীনে। দেহের এবং পদের কি পরিণতি তার প্রতিমূর্ত্তি তো রয়েছে সামনে। তবে কেন এর মধ্যে যাব? কে মালতী? চিনিনা। পদোন্নতি? চাই না। পালিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াই। তারপর ছুটি। দু-হাত বাড়িয়ে মায়া ধরতে আসছে। সামনে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। তাই ধরে দৌড়াই। তারপর? তারপর কেটে গেছে পঁচিশ বছরের এক যুগ। মঠে মন্দিরে তীর্থে আর গুহায় চলে চলে আজ এসেছে জীবনের শেষ দিন। কিন্তু মালতীর কথা ভুলতে পারছি কই। তাকে সব কথা না জানিয়ে গেলে ওধারেও শান্তি পাব না। কিন্তু এখন কি করে জানাই? ডাক্তার সাহেব, মালতীকে জানাবেন?

সন্ন্যাসীর কথা বন্ধ হল। ডাক্তার সাহেব মেজর সেন কলম আর লেখাটা পকেটে রেখে হাসপাতালের বাইরে এলেন।

শত শত তীর্থযাত্রী চলেছে দুঃখ কষ্টেরা অমরনাথের পথে, দর্শনের আশায়। সঙ্গে যাচ্ছে মেজর সেনের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান সামরিক হাসপাতাল। এক সন্ন্যাসী যাত্রী অসুস্থ হয়ে নিয়েছিলো আশ্রয় এই হাসপাতালে। তিনি আর উঠতে পারেননি। শেষ সময়ে তাঁর অনুরোধে মেজর সেন তাঁর শেষ জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন।

"কে?" দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। একটু পরেই খোলে। দেখা গেল এক মহিলাকে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা। হাতে দুগাছি চুড়ী, গলায় সরু হার জামাইবাবু যে, হঠাৎ? সব খবর ভাল? এলেন কবে?

"ট্রেন থেকে সোজা আসছি! অনেক দিন তোমাকে প্রশ্ন করেও উত্তর পাই নি, কেন তুমি অবিবাহিতা আর কেন তুমি বাড়ী থেকে কোথাও যাও না। যার প্রতীক্ষায় ছিলে, তার শেষ জবানবন্দী এই যে। নাও, মালতী।"

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

আগের বার মস্কো থেকে আসবার পর মডার্ন রিভিউ কাগজে যে বিবরণী লিখেছিলাম, তাতে মস্কোকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তা করিনি। সত্যিই মস্কোর দিকে নিষ্পৃহে কিছুকাল চেয়ে মনে থাকলে মস্কোর অমনই একটা রূপ মনের পটে ফুটে ওঠে। অনেক রুশী লেখকও মস্কোকে ওই রূপেই কল্পনা করেছেন। লেনিনগ্রাদ মস্কো থেকে অনেক বেশি সুন্দর। রুশ বিপ্লব শুরু হয় লেনিনগ্রাদে, সার্থকও হয় সেইখানে। জারদের উইন্টার-প্যালেস সেখানে, স্মলনী সেখানে, অরোরা জাহাজও রয়েছে সেখানকার নেভার বুকে। ওই উইন্টার-প্যালেসে কেরেনস্কির প্রভিসনাল গবর্নমেণ্ট যখন বিপ্লবকে কি করে ব্যর্থ করা যায়, তাই নিয়ে সভায় গবেষণা করছিলেন, তখনই অরোরা জাহাজ থেকে বন্দিত গোলা এসে পড়েছিল তাঁদের মন্ত্রণাকক্ষের ঠিক ছুটো করে। ওই উইন্টার-প্যালেসেই ঢুকে পড়েছিল বিপ্লবী জনতা প্রাসাদ-সংলগ্ন খোয়ার থেকে। স্মলনীর যে প্রাসাদোপম স্কুল-বাড়ীতে অভিজাতদের মেয়েরা পড়াশুনো করত, ব্রু-ব্লাডের উৎস হয়ে উঠেছিল যা, তারই একটি অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র কক্ষে বসে লেনিন তখন বিপ্লব পরিচালনা করছিলেন। প্রথমে জারের অপসারণ, তারপর কেরেনস্কির পলায়ন, রুশ বিপ্লবকে সফল করে তুলে প্রথমেই লেনিনগ্রাদে যেমন, তেমন লেনিনগ্রাদের ওই স্মলনেতির ক্ষুদ্র কক্ষ থেকেই প্রচারিত হয় লেনিনের ঐতিহাসিক শান্তি ডিক্রী, আর কৃষকদের "ভূমাধিকার" দেওয়া ল্যাণ্ড-ডিক্রী। কিন্তু তবুও লেনিনগ্রাদের প্রাকৃতিক, নাগরিক, বৈপ্লবিক এ বিস্ময়কর সম্পদপূর্ণ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও লেনিনগ্রাদ মস্কোর মতো অন্তরের গভীরতম আবেগকে আলোড়িত করে না; অন্তত আমার মনকে করেনি। কেন করেনি, তা নিজেও বুঝতে পারি না। ভাবি, হয়ত চেকভের 'থ্রি সিস্টার্স' আর তলস্তয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস'-এর প্রভাব। আমার ভাবি, আলেক্সি তলস্তয়ের 'অর্ডিন' ত লেনিনগ্রাদকে অবলম্বন করেই শুরু হয়। ওই বই পড়েই ত রুশ বিপ্লবের এমন চিত্র পেয়েছি, যাতে করে আমার মনে হয়েছে লেনিন স্তালিন যদি চাইতেনও, তাহলেও রুশ বিপ্লবকে মুদ্রিত রাখতে পারতেন না। ও-কথা ট্রট্স্কির 'হাস্টরি অব রেভলিউশন' পড়েও বুঝিনি। অবশ্য কাউণ্ট তলস্তয় তাঁর 'ওয়ার এণ্ড পীস' উপন্যাসে তখনকার সুযোগ থেকে রুশের মুক্তির অনিবার্যতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বোনাপার্টিয়ান মস্কোতে উপস্থিত হবার পর। মস্কো যেন বাংলার নবদ্বীপ, আর লেনিনগ্রাদ যেন কোলকাতা।

কিন্তু মস্কো লেনিনগ্রাদের কথা বিশদভাবে পরে বলব। উত্তরে চলেছি এবার। আগে সেই পথের কথাই বলে নি। এবার যাবার পথে আমাদের স্থান দেওয়া হয়েছিল মস্কোভা হোটেলে। সেখান থেকে ইয়োরোপীয়ান। মস্কোভা হোটেল অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল। এখানে গরম ভাত গরম দি দিয়ে বেশে খাবার সুযোগ পেলাম। পরে যাঁরা যাবেন তাঁরা হয়ত শাক-শুকতো-বড়িভাজাও পাবেন। তত দিনে মস্কো-কাযা ওদের ভালো করে পড়া হয়ে যাবে।

মস্কো পাস্থি নিবাস হোটেলেই আমাদের একটি বিশেষ ভোজ দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। খেতে হলে বক্তৃতাও করতে হবে, গাইতে হবে, বাজাতে হবে, পারলে নাচতেও হবে! বক্তা এবার আমাদের দলে অনেক ছিলেন। আর সীতারের কর্তব্য পালনের দায়ও এবার আমার ছিল না। কাজেই এবার আমাকে 'মাইর ফেলারেল অব এণ্টারটেইনমেণ্টস'-এর কাজ করতে হয়। এ-ছাড়া এবার দাবার টেবিলে পাশেই পেলাম মাদাম কৃপালোভাকে আর মিষ্টার ফেলিক্সভ্‌কে—দুজনাই আগের বার বন্ধুত্ব দিয়ে আমাকে বন্ধ করেছিলেন। মাদামের কথা ট্রাস্টফেট প্রসঙ্গে আগেই লিখেছি।

মাদাম কৃপালোভা সেভিয়েট শান্তি কমিটির একজন মেম্বার। তিনি যেমন স্নেহময়ী, তেমন শক্তিমতী। গতবার দুই সপ্তাহকাল আমরা তাঁকে জ্বালিয়ে খেয়েছি। কখনো তাঁকে ক্লান্ত বা বিরক্ত দেখিনি। তাঁর সম্বন্ধে আমি লিখেছিলাম যে, বিপ্লবোত্তর রুশ-নারীর তিনি একটি ক্লেমিং ইলাস্ট্রেশন, জলন্ত দৃষ্টান্ত! সত্যিই সংগঠনের অসাধারণ শক্তি তাঁর।

মিঃ ফেলিক্সভ গতবার আমাদের হিন্দী-বোতাষীর কাজ করেছিলেন। তিনি ইংরেজীও ভালো জানেন। এখন মারাঠীও শিখেছেন। এখন তিনি মস্কো ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটে হিন্দী ভাষার ডিরেক্টর হয়েছেন। হিন্দী-রুশী পঙ্কজোষও তিনি একখানি তৈরি করেছেন।

মাদামকে কাছে পেয়ে গতবারে যাঁরা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সাহায্য করতেন, তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। লিডা কোথায়? আন্দ্রে, মিশা, আরিয়েডা, তাঁরা? সকলের কথা তিনিও বলতে পারলেন না। নানা যায়গায় নানা কাজে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন। ইণ্টারপ্রিণ্টারদের বেশির ভাগই শিক্ষক-শিক্ষিকা। সকলেই কিছু সারা জীবন থাকেন না, প্রয়োজন মতো অন্য কাজেও কাউকে কাউকে সরিয়ে নেওয়া হয়। লিডা মস্কো রেডিওতে কাজ করছে, আন্দ্রেও তাই। অপর কারুর বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না।

সকলের খবর নিয়ে মাদামকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার খবর বল এবার।

—তোমাদের আসবার পথ চেয়ে বসে থেকে থেকে বুড়িয়ে যাচ্ছি।

—আমি কিন্তু তোমাদের পরশ নিয়ে-নিয়ে যৌবন ফিরে পাচ্ছি।

—তোমাকে দেখে তোমার কথা অবিশ্বাস করতে পারছি না।

ডেলিগেট বলেন—আপনি এত জোরে কথা বলবেন না।

আমরা বক্তৃতা শুনতে এসেছি, আর ওঁদের চলছে বক্তৃতা। আমরা বক্তৃতা শুনতে আসি না। তবে সকলের সঙ্গে মিলে তালি বাজিয়ে যাচ্ছিলাম।

ফিকোনোভ উঠে দাঁড়ালেন—কবি ফিকোনোভ, লোকটাকে শান্তি একটা দেওয়া দরকার। অত্যন্ত ভদ্রশ্রেণীর কবি। তাঁর কবিতার বই সোবিয়েতে সবচেয়ে বেশি বিক্রী। তিনি বেশি কিছু বলেন না, শুধু আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

আমাদের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের কংগ্রেসী-সদস্য গোবিন্দ রেড্ডী কৃতজ্ঞতা জানালেন। তেওয়ারি চমনলাল আর ডাক্তার অনুপ সিংহও বলেন। তাঁরাও কংগ্রেসী হলেও পার্লামেন্টেরিয়ান।

ভারতীয় শান্তি কমিটির সেক্রেটারী পরমেশ্বরন এসে বলল—আমাকে একটিবার আপনাদের সাহায্য করতে হবে।

একটা ফোরেড ঈগলের ছানা চিঁচিঁ চিঁচিঁ আওয়াজ করতে চাইলাম—কেন?

—ভারতীয় শান্তি সংসদের পক্ষ থেকে কিছু বলতে হবে না?

আমি বললাম—পারব না। ছুঃ, নেই। তিন বছর পরে মাতৃভূমিকে কাছে পেয়েছি, তাই। একটু পর গুরুর করতে চাই এই ছিপের ঝিরঝিরিতে।

নরেশ বলেন—এইখানে দাঁড়িয়েই বল, আমি তর্জমা করব।

—থাক্ নরেশ, বক্তৃতা থাক্। ওঁরা যা বলেন, তারই ত প্রতিধ্বনি তুলতে হবে। তাতে ওরে বিশ্ব-শান্তি খুব বেশি এগুবে বলে মনে হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—এতক্ষণ আমরা ভিয়েতনামকে পরিত্রাণ করিছি সুখাদ্যের থাল দিয়ে আর সুভাষণ ভাষণ দিয়ে। এবার আমাদের প্রতিবাদে শাণ দিতে হবে। নইলে সে বেরুবে বিদ্রোহ করবে। আর তাহলে আমাদের স্টকহোমে যাওয়াই ব্যর্থ হবে, শত শত বক্তৃতা মাঠে মারা যাবে। আমি তাই প্রস্তাব করি ভারতীয় ডেলিগেশনের যাঁরা শিল্পী আছেন, তাঁরা অনুপম সৃষ্টি-আভিজাত্যের প্রতিদান স্বরূপ কিছু সঙ্গীত পরিবেশন করুন। ইলাসভিতে ভোজপুর ঘুরিত হোলো।

আমার উঁচুতে অজিত বসু আর শোভা চক্রবর্তী। অজিতকে আগেই বলে রেখেছিলাম তার ঘর থেকে গীটারটা আনিয়ে রাখতে। সে সচিত্রকারের নিজী মানুষ, হাত ঘুরে বসেই থাকত। তার গীটার নিয়ে সে লোহার টেবিলের তাকে দিয়ে ঝঙ্কার শুরু করে দিলে।

শোভা চক্রবর্তী ঘুরে বসে থাকছিল। মুখ তুলতেই দেখতে পেল আমি তার দিকে চেয়ে আছি। সে সেইখান থেকেই গোপালাপোর সুর চড়ালে আমাকে কিন্তু গাইতে বলবেন না, শচীন দা।

আমি বললাম—অজিত খোললেই তুমি উঠবে।

—না, না, আমি নার্ভাস হয়ে পড়ছি।

—অজিত সহজে বসবে না। হয়ত বন্ধুকে ওকে বসিয়ে দিতে হবে। তুমি তৈরি হবার প্রচুর সময় পাবে, শোভা।

—মাপ করবেন। আমি কিন্তু টেবিল থেকে উঠে পালিয়ে যাব।

এ মেয়েকে নিয়ে কী করা যায়! নিজেকে এমন করে প্রচার করতে ও চায় কেন?

আমার রাগটা পড়ল আমাদের জেনারেল-সেক্রেটারী রমেশচন্দ্রের ওপর। বললাম, ভাই একটা ডেলিগেশন এসেছে তুমি!

তিনি তাঁর স্বাভাবিক হাসি হেসে কোমল-কণ্ঠে বললেন—কেন, অপরাধটা হলো কোথায়?

—ডেলিগেশনে এমন একটি তরুণ আসবি যে শোভা চক্রবর্তীর মত সুন্দর গান তুলে দিতে পারে!

রমেশ বললেন—শোভাকে তুমিই রেকমেণ্ড করেছিলে। ওর স্বামীকে আমাও যে দরকার, তা ভাবনি কেন?

সত্যিই তা ভাবিনি। অজিত অবশেষে বাজনা শেষ করল। ভালোই বাজালে সে। সকলেই তালি বাজিয়ে তাকে সম্মান দিলে।

—গান, এবার একটা গান হোক্। হল থেকে বাণী উঠল। শোভার দিকে চেয়ে দেখি সে অন্য দিকে চেয়ে বসে আছে। মেয়েটা কি একগুঁয়ে। সকলে কত খুসি হোতো ও গাইলে। হঠাৎ ডাক্তার অনুপ সিংহ উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন। উনি যে গান গাইতে জানেন, তা আমার জানা ছিল না। বেশ গাইলেন উনি। বক্তৃতা হোলো, বাজনা হোলো, গানও হোলো যথন, তখন আর কিছু করবার রইলনা বলে খাওয়াও শেষ করতে হোলো।

পরের দিন ফিরতে আমরা রীয়ার যাব ঠিক হোলো। রমেশচন্দ্র কল্ দিলেন সকালে মিটিং হোসবে ভারতীয় ডেলিগেশনের।

—মিটিং ত ইকনোমিকে। আমি বললাম।

—সেখানে কি করব তাও ত ঠিক করতে হবে। তা ছাড়া সকলকে পরিচিতও হতে হবে ত।

সকালে মিটিং বোসল, পরিচয় হয়ে গেল; কে কোথা থেকে এসেছেন, কার কি এলেম। সেই মিটিংয়ে একটি কমিটি গড়া হোলো। সেই কমিটিই স্থির করবেন ভারতীয় ডেলিগেশনের কে কোন্ কমিশনে যোগ দেবেন, কোন কমিশনের দায়িত্ব কে নেবেন। পোলিটিকাল কমিশন, ইকনমিক কমিশন, কালচুরাল কমিশন, সাটেমিক এথার্মি কমিশন প্রভৃতি। পোলিটিকাল কমিশনের দায়িত্ব পড়ল উষার অনুপ সিংহের ওপর, ইকনমিক কমিশনের দায়িত্ব পড়ল কেরলার আইন-সচিব ত্রিভুবনের ওপর, কালচুরাল কমিশনের দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর, সাটেমিক এথার্মি কমিশন ইকনোমিকে পৌঁছে হবে ঠিক হোলো।

মিটিং শেষ হোলো লাঞ্চের সময়। লাঞ্চের টেবিলেই জানা গেল ডেলিগেশনে যাঁরা সাংবাদিক আছেন, তাঁরা আরো দু'দিন মস্কো থেকে যাবেন। মুরলেভের সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ দেবেন।

গোপাল হালদার জিজ্ঞাসা করলেন—থেকে যাবেন নাকি, দাদা?

—আমি যে সাংবাদিক, সে-কথা আজকার কোলকাতার ছেলে-মেয়েরাই জানে না। বাটুকে হয়েছে সবই যে হারিয়েছি! আপনি বরং থেকে যান। পরিচয়-সম্পাদকের ব্যবস্থা ওরা দেবে।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...

রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে

সত্যকারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনার মধ্যে ক্যাডিল—অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার ত্বককে সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার ফেনায় মুখ ধোবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে···রেক্সোনা

রেক্সোনা সোপ লিঃ, সাউথ হ্যাম ব্রিজ রোড, লণ্ডন, এস, ই, ১

BP. 153-N32 BG

সোপাল বললেন—না, না, আমিও খাবো না। ও চলুক এক সঙ্গেই যাই।

কোলকাতায় এই সোপাল হালদারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার তেমন সুযোগ হয়নি। মাঝে-মাঝে নানা ধরণের ফিউচার্স বা বেচা হোতো। আমি ওঁর অনেক বই পড়িছি। কিন্তু উনি আমার কোন নাটকের অভিনয় দেখেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু এবারকার পঞ্চরে ওঁর চিত্তের মাধুর্য আর উদার দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। সর্ব বিষয়েই ওঁর এমন একটা সংযম আছে এবং এমন একটা সমন্বয়বোধ হয়েছে, যা শ্রদ্ধা টেনে নেয়। আগের বার বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর আমি যেমন প্রায়ই হোটেলে আর রেস্তরাঁতে আসরের হতাম,এক সঙ্গেই বেড়াতাম, এবার সেই রকম সোপাল হালদার আর আমি প্রায়ই অতিথি থাকতাম। সোপাল-অনুরাগিণী সোপিআরা ঘটে যেতেন।

পাকের সময়েই জানিয়ে দেওয়া হোলে যে, প্রত্যেকেই যেন একঘণ্টার মধ্যেই নিজের নিজের সুটকেস প্যাক করে ঘরের বাইরে রেখে যেন, এবং সাড়ে চারটার সময় যেন হোটেলের বরফার অপেক্ষমান বাসে আসন গ্রহণ করেন।

নিজের পাঁচটার সময় আমরা মস্কো, পরদের রীগা ট্রেনযোগে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মস্কোয়ের অনেকগুলি ট্রেনের টাইমিনাসের নামে নাম রক্ষা হয়েছে। ট্রেনের গাড়ী তৈরিই ছিল। দুই আরোহীর কুপে, আর চার আরোহীর জায়গায় এই কোরিডোর গাড়ীগুলো গঠিত। কথা ছিল, ট্রেনিংগ্রেসে যারা স্ত্রী নিয়ে আছেন, তাঁরা কুপেতে স্থান পাবেন। চারজনের জন্যেই চারটি কুপে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মস্কোতে উপরের ছেলে এসে জুটলেন বলে তাঁরা চার-আরোহীর একটি কামরা নিলেন, আর তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কুপেটি বদল করে নোসলাম, আমি আর সোপাল হালদার। তাতে অসুবিধা হলেও কেউ আপত্তি করলেন না।

রাত আটটার মধ্যেই 'সাপার' শেষ হবার পর সবাই যখন নিজ-নিজ কামরায় এসে বোসলেন, তখন আমি রোঁদে বেরুলাম। কামরার কামরায় গিয়ে বললাম—বাইরে অপূর্ব জ্যোৎস্না। এমন সন্ধ্যায় ঘুমোনো অপরাধ। তাই কোরিডোরে বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। যাদের ইচ্ছে হবে, তাঁরা তাতে যোগদান করুন।

একে একে অনেকেই বেরিয়ে এলেন। শোভা চক্রবর্তী, টমি সেনগুপ্ত, রমেনচন্দ্র, ছিত্তি বিশ্বাস, মাদ্রাজের ছিন্দ ডিরেক্টর জানকীরাম, পিকিং বিশ্ব বিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক পি. এসাদ, রাজেশ্বর সহায়, তাঁর স্ত্রী বিমলা সহায়, পিকিং বিশ্ব বিদ্যালয়ের উর্দুর অধ্যাপক হেদায়ত আহম্মদ। শেষের চারজন জার্নি সাইবেরিয়ান রেলে পিকিং থেকে সাত দিনে মস্কোতে এসেছিলেন। চারজনই তারুণ্যে ভরপুর, উৎসাহে প্রদীপ্ত।

শোভা এসেই বললে—এখন যদি গান গাইতে বলবেন, অচীনদা, তবে গাইতে পারি।

—কোন রাজকুমার সোনার কাঠি বুলিয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, শোভা?

—তেমন কেউ যদি করতো ত দুঃখ ছিল না। উমার গল্পটা আর সইতে পারলাম না।

—পারিনী-বনবিহারীরা আজও তবে অসাধ্য সাধনে মুহ্যমান হচ্ছেন? শোভা, উমা, মেহমতীদের সাতুবধূ। উমা বজ্রভাষিনী। কিন্তু অশোভন কিছু সইতে পারে না। কেবল তখনই সে মুখরা হয়ে ওঠে। সে শোভাকে বলত—গান গাইবিনে ত এলি কেন?

শোভাও কম যায় না। সে বলত—জলসায় ত যাচ্ছি না, যাচ্ছি শান্তি-সংস্রবে।

কিন্তু শোভা গান গাইল। একটি নয়, দুটি নয়, গানের পর গান, অনর্গল গান, ঝরঝরে গান।

রীগ-এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে কাক জোছনায় মোহে মত্ত হয়ে, চড়াই উৎরাই অগ্রাহ্য করে। দুপাশের পাইন বন ব্রস্ত হয়ে তার পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে, মাঠগুলো অসহায়ের মত শুন্য হয়ে পড়ে রয়েছে, নদী-নালাগুলো এঞ্জিনের দ্রুততর গতি দেখে আরও উছলে উঠ্‌ছে, কৃষক কুটীরের আলোগুলো কৌতূহলে চেয়ে দেখ্‌ছে। রীগা এক্সপ্রেস সব কিছু উপেক্ষা করে ঘন ঘন বাঁশি বাজিয়ে ছুটে চলেছে। তারই কোরিডোরে দাঁড়িয়ে আমরা পনেরো কুড়িজন ভারতীয় নর-নারী গান গাইছি, আর জানালা দিয়ে চোখ ভরে দেখছি মৃদু জ্যোৎস্নালোকে অর্দ্ধোদ্ভাসিত স্বপনপুরীর নানা অস্পষ্ট রূপ। রাজনীতির কথা, জড়বিজ্ঞানের কথা, বাস্তবধর্মী জীবনের কথা একটিও মুহূর্তের তরে মনে পড়ল না। কোথায় যাচ্ছি যে, তাও ভুলে গেলাম। যেন চিরকাল এমনই চলে এসেছি, এমনই চলব চিরকাল। সে এক বিস্ময়কর অনুভূতি!

গান একা শোভাই গাইলনা। অধ্যাপক প্রসাদ হিন্দী গান গাইলেন, অধ্যাপক হুসেনও আহম্মদ গাইলেন উর্দু গান, আর সমর দস্তিদার গোলালেন একখানা চীনা গান। তারপর শুরু হোলো কোরাস্। 'মন যাকে খুঁজে ফেরা' থেকে শুরু করে যত খেয়ালী সুরের গান জানা ছিল, একে একে সব গাওয়া হোলো। রাত নটা থেকে সকাল দুটো পর্যন্ত রীগা এক্সপ্রেসের কোরিডোরে দাঁড়িয়ে কেন যে সেদিন বিভিন্ন বয়েসের, বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ওই পঁচিশটি ভারতীয় নর-নারী অমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, আজ কিন্তু তাঁদের কেউ সে-কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু সেদিন তাঁদের পক্ষে তা অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল। আর তাই হয়েছিল বলেই শোভা-নির্ঝরিণীর আকস্মিক অবতরণ হয়েছিল —মনবিনীর গহনায় নয়।

রাত সওয়া দু'টায় আমি বললাম—ওগো, সুযোধ ছেলে-মেয়েরা, রাতের যৌবন উত্তীর্ণ। যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়। জলসা শেষ।

ঘুমাবার কথাটা শুনে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম সকাল সাতটা। ধীরে ধীরে দরজাটা একটু ফাঁক করে শোকলা মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করে ফ্রেঞ্চ-টুথব্রাশ কিভাবে করল—চায়?

তাড়াতাড়ি উঠে বললাম—পাসিভা, পাসিভা।

ওপরের বাঙ্ক থেকে গোপাল ভরন কণ্ঠে বললেন—সত্যিই কি চা পাওয়া যাবে ?

—পাওয়া যাবে মানে ? ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ওপরের বাঙ্ক থেকে নামবার বেঁটে সিঁড়িটা এগিয়ে দিলাম। কাঠ সেড়ানীর মত ঝিপ্রগতিতে গোপাল নেমে পড়লেন।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে গোপাল বললেন—ব্যবস্থাটা ভালো, বসুন।

—হবে না, আপনার রাষ্ট্র ত !

—তারপর যদি আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

গোপাল কমিউনিষ্ট হলে রাশিয়া সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে হলে আমি বলতাম—আপনার রাষ্ট্র। গোপালও বলতেন—প্রতিবার কথা বলবার সময় সাবধানে মেপে কিন্তু। চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে একে একে অনেকে এসে কামরায় ঢুকলেন।

হুন্ হুন্ করে চিত্ত বিশ্বাস এগিয়ে এসে বন্ধুকে ধিকার দিলেন—একি ! এখনো আপনাদের চা খাওয়া শেষ হয়নি।

—এক পেয়ালা সাবাড়। আর এক পেয়ালার আশায় রয়েছি। গোপাল করুণ কণ্ঠে বললেন।

—ব্রেকফাষ্ট টেবিলে আবার পাবেন ত। আটটায় ব্রেকফাষ্ট। সাড়ে নয়টায় আমরা রীগায় পৌঁছুব।

পৌঁছুলামও তাই। লাতভিয়া রিপাবলিক সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের সব চেয়ে পশ্চিম অঞ্চল। বলটিক সাগরের তীরে অবস্থিত রীগা তার প্রধান শহরও ; প্রাচীন শহরও বটে। ট্রেনে জনারণ্য ভীড়। এর আগে কোন ভারতীয় ডেলিগেশন রীগায় আসেনি। পুষ্পবৃষ্টি শুরু হোলো। আমাদের মেয়েরাই হলো তাদের বিস্ময়। শাড়ী তারা আগে কখনো দেখেনি। ফুলের তোড়ার পর তোড়া তাদের উদ্দেশে অর্পিত হলো। রাণী রায়চৌধুরীকে, মনে হোলো, তার কিড্‌নাপ করতে চায়। সাংবাদী ডেলিগেটরা ধুপকাঠি বিতরণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ও-বস্তু কি, তা তারা জানে না। একটা ছেলে সেই ধোঁয়ায় দেওয়া হোলো, অগ্নি শত শত হাত উঁচু হোলো। সকলেই একটি করে কাঠি চায়। মেয়েরা রেহাই পেয়ে বাসে উঠে পড়ল।

কথা ছিল ডেলিগেশনের অর্ধাংশ সেদিন রীগায় থেকে যাবেন, ইক্‌হোল্‌মে সকলের হোটেল-একোমোডেশন সুনিশ্চিত হয়নি বলে।

গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন—থেকে যাবেন নাকি, দাদা।

—ঊরুতে হাওয়ার মন কেড়ে চলেছে, থামতে ইচ্ছে-করছেনা।

গোপাল বললেন—আমরাও তাই।

যাঁরা সেদিন রীগায় থাকবেন, তাঁরা দু'খানি বাসে হোটেলে চলে গেলেন। আর দুখানি বাস আমাদের ঘুরে নিয়ে চল তাড়াতাড়ি শহরের যতটা দেখানো যায়, তাই দেখিয়ে দিতে। সুন্দর শহর রীগা। মধ্যযুগের স্থাপত্যের পাশে পাশে আধুনিক বাড়ী। শহর দেখতে দেখতে ইতিহাসের ঘটনাগুলো ভিড় করে স্মৃতিকে তোলপাড় করে দিল। বুদ্ধ আর বুদ্ধ। এই শহরের পৌরাণিক আশা বিদর্ণাই। অনশন আর প্রাচুর্য, যুদ্ধ আর নবজীবন, বৈরাচ আর সব-সংগঠনের সঙ্ঘর্ষ পালাক্রমে এই শহরের মানুষদের অভিভূতও করেছে, উদ্বুদ্ধও করেছে। তবুও যখনই অবসর পেয়েছে, এর মানুষগুলি হেসেছে, গেয়েছে, মেতেছে, নাইটের তলোয়ার দিয়েছে, বাসনা বাঁধিয়ো, কৃষিকাজে মন দিয়েছে, শিল্প সৃষ্টি করেছে, মোহিনী প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা প্রাণভরে উপভোগ করেছে।

দফ্‌তা নদের তীরে আমাদের বাস গিয়ে থামল। আমরাও নেমে পড়লাম। দফ্‌তা নদ শহরটিকে দুভাগে ভাগ করেছে। একদিকে প্রাচীন, আর একদিক নবীন রীগা। আমরা এসেছি প্রাচীন অংশে। দুটি সেতু দেখলাম। একটি কাঠের আর একটি লোহার। শেষেরটি রেল-পথ। কাঠের সেতুটি সমগ্রীদের যাওয়া-আসার জন্য অতীতে তৈরী হয়েছিল। এখনো শক্ত আছে। তার শিল্পের সুন্দর নিদর্শন এই সেতুটি।

অনেকগুলি চর্চের চূড়া দেখা গেল। একটি চার্চে দেখবার আমন্ত্রণ পেলাম। রবিবার। উপাসনা তখন শুরু হয়ে গেছে। চার্চের গায়েকার প্রবেশ অঙ্গনে পৌঁছে আমরা নেমে পড়লাম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে চার্চের প্রবেশ পথ পেলাম। ধর্মালোকিত চার্চে তখন প্রার্থনা চলছে। উঁচু মঞ্চপীঠে দাঁড়িয়ে পুরোহিত বাইবেল থেকে আবৃত্তি করছেন, মাঝে মাঝে গান হচ্ছে। একটি আসনও খালি নেই। অনেকক্ষণ আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আমার বেশ ভালো লাগল। কেরালার যখন গিয়েছিলাম, তখনো একদিন আমি চার্চে গিয়েছিলাম, মস্কোতেও। আমার ভিতরের সাধি মানুষটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে আমাকে খাড়া দেয়, না ধিক্কার দেয়, আজও তা বুঝতে পারলাম না।

চার্চ থেকে বেরুতেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হোলো একটি ওপন-এয়ার থিয়েটারে। মঞ্চটি প্রকাণ্ড, হাজার পনেক শিল্পী এক সময়ে তার ওপর অভিনয় করতে পারে। তার সামনে হাজার দশেক দর্শক বসতে পারে, দাঁড়ি বাঁধি এত বেঞ্চি রয়েছে। মঞ্চের পেছন দিকে ত্রিতল একটা বাড়ি। তাতে যেমন সাজঘর আছে, তেমন একটি মিউজিয়ামও আছে। সে মিউজিয়ামে লাতভিয়ার আধুনিক ইমব্রাষ্ট্রির দামী জিনিষ-পত্তর।

এই থিয়েটারে এসে শুনলাম রাত্রে একটি উৎসব আছে। সোবিয়েতের নানা রাষ্ট্র থেকে নাচিয়ে-গাইয়েরা সমবেত হবেন এবং নাচ গান করবেন। আকর্ষণ হোলো। গোপালস্থলেন—থেকে গেলেই ভালো হোতো। কিন্তু তখন আর কিছু করবারও ছিল না ?

রীগার মতো ছোট শহরে দুটো থিয়েটার আর অপেরা হাউস আছে ; লোক সংখ্যা লাখও নয়। মিউজিয়ামও আছে তিন চারটি।

শহর থেকে সাতের সময় এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম এবং সেই-খানেই ডাক বাংলোয় বিশ্রাম করলাম। রীগা এয়ারপোর্টটি চমৎকার।

বেলা চারটায় সময় স্যুয়েশ হোলো—প্রাগ টু দি এয়ারফ্রাঙ্কুট।

বলটিক সাগর অতিক্রম করে প্লেন চলল সুইডেনের দিকে। প্লেনে বসে একটি আপেল কামড়াতে কামড়াতে সাগরের দিকে চেয়ে নীলিমার সন্ধান পেলাম না। মনে হোলো ঢেউ তোলা বিপুল বিস্তৃত একখানা কাঁচের শীটের ওপর দিয়ে আমরা যেন উড়ে চলেছি।

দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টকহোলম চোখে পড়ল। বহুদূর দৃষ্টি যায় বন-বনানীর ফাঁকে-ফাঁকে লাল টালির ছাদ। তার যেন আর শেষ নেই। কতগুলি পাহাড়ী-দ্বীপের সমষ্টি হচ্ছে ষ্টকহোলম শহর। ক্রমশঃ

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম জীবনে আমরা রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে দেখিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় তাঁহাকে দেখিয়াছি—রিপণ কলেজে দেখিয়াছি—একবার তাঁহার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটস্থ বাসগৃহে ও থাকিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের যৌবনও ছাত্রজীবনের সুখে নানা ক্ষেত্রে নানা সুধীর আবির্ভাবে যেরূপ ধন্য হইয়াছিল—আমরাও সময় এবং সুযোগ পাইলে সে সকল মনীষীর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতাম। বিএ ক্লাসের ছাত্রদলে পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ছাপরাহাটার মহাশয়ের গৃহে বাস করার সময় প্রায়ই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে যাইতাম। অধ্যাপক রামকীনাথ ভট্টাচার্য্যের অধ্যাপনা শুনিবার জন্য রিপণ কলেজে যাইতাম—তাহাতেই রামেন্দ্রবাবুকে বহু সময়ে দেখিতে পাইয়াছি। অতি সাধারণ পোষাক পরা, খাঁটি বাঙ্গালী রামেন্দ্রসুন্দর ধুতি পরিয়া, কলেজের অধ্যক্ষের কাজ করিতে আসিতেন। অবশ্য তাহাতে নূতনত্ব কিছু ছিল না—সে বৈশিষ্ট্য অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারত্বকালে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রক্ষা করিতেন। তখনও অসহযোগ আন্দোলনের যুগ আসে নাই—তাহাতেই সাহেবী পোষাক পরার রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই।

ত্রিবেদী মহাশয় দেহত্যাগ (১৩২৬ সালের ২৩শে শ্রাবণ) করিবার কথাও বেশ মনে আছে। সে সময়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ণধার, সাহিত্যিকগণের সহৃদয় বন্ধু, অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধাভাজন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি যখন রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে লেখা সংগ্রহ করিবার জন্য রামেন্দ্র-ভক্ত ও রামেন্দ্র-বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন, তখনও প্রায় নানাস্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। তিনি ও কয় জনে লেখা সংগ্রহ করেন নাই—কর্ম্মব্যস্ত বন্ধুগণের গৃহে বার বার যাইয়া তাগাদা দিয়া তাঁহাকে লেখা সংগ্রহ করিতে হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত বহু লোকের লেখা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বিপিনবিহারী গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচন্দ্র বাগচী, গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতির লেখা সংগ্রহ করার কাজ সহজসাধ্য ছিল না। তাহা ছাড়া স্বর্ণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ দাস প্রভৃতির মত লোকের অর্থসাহায্য না পাইলে লেখাগুলি ছাপার ব্যবস্থা হইত না। নলিনীবাবু সভাই অদ্ভুতকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। নানাস্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী রামেন্দ্রজীবনী লিখিয়াছেন এবং ত্রিবেদী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর নিকট অনুমতি লইয়া ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত 'সাহিত্য সম্মিলন' নামক ১৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এই গ্রন্থের শেষে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে এই কাজ না করিলে ৪০ বৎসর পরে আজ আমরা রামেন্দ্রবাবুর কথা এভাবে জানিতে পারিতাম না। নলিনীবাবু ১৩২১ সালে 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' নামক যে গ্রন্থপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ৩৮ বৎসর পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সাংবাদিক শ্রীমান নারায়ণচন্দ্র পণ্ডিত তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া দেশবাসী সকলের, বিশেষ করিয়া রামেন্দ্র-ভক্তগণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে ১৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে বিভিন্ন লেখকের লেখা ১৩১ পৃষ্ঠা। বইখানির দাম ৪ টাকা, কলিকাতা—৮, ৩২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ডি-এম-লাইব্রেরী তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

সেকালে লেখা বিভিন্ন মনীষীর উক্তি নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের পরিচয় স্বরূপ প্রদান করিলাম। আর রামেন্দ্রবাবুর কথা তাঁহার বন্ধু ও ভক্তগণের কথায় অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সেগুলি পাঠ করিয়া একটি মহৎ জীবনের আদর্শ লক্ষ্য করা যাইতেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন—"রামেন্দ্র যেখানিকের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—একটি সাহিত্য-পরিষদ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য পরিষদের মন্দির।"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন—"রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য, চরিত্রের শুচিতা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা, ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। তাঁহার প্রজ্ঞা বুদ্ধির তুলনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রতিভার সহিত পূত চরিত্রের, কর্ম্মিষ্ঠার সহিত অমায়িক আত্মভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। এইরূপ চরিত্রই স্বদেশে সর্ব্বকালে পূজিত হইয়া আসিয়াছে। ইহাই আমাদের সর্ব্বকালের আদর্শ। আমাদের জাতীয় চরিত্র এইরূপ আদর্শেই গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"আমরা দীর্ঘকাল, প্রায় ২০ বৎসর, রামেন্দ্রবাবুর বন্ধুত্ব সম্ভোগের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরিষদের সম্পর্কে একযোগে কাজ করিয়াছি, কোনদিন রামেন্দ্রবাবুর উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ পাই নাই। মতান্তরের অবসর ঘটে

আপনার জন্যে চিত্রতারকার মত অপূর্ব লাবণ্য

মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। কি করে তিনি লাবণ্য এত মোলায়েম ও কমনীয় রাখেন? "বিশুদ্ধ, কুল লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে", মালা সিনহা আপনাকে বলবেন। চিত্রতারকাদের প্রিয় এই মোলায়েম ও সুগন্ধ সৌন্দর্য সাবানটির সাহায্যে আপনারও ত্বকের যত্ন নিন। মনে রাখবেন, প্রথমের সঙ্গে লাক্স সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

নাই ; কেন না, রামেন্দ্রসুন্দর কখন অন্যায় মত গোপন করেন নাই। পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের যে সম্বন্ধ, তাহার স্বরূপ যাঁহারা দেখেন নাই, তাহা তাঁহারা বুঝতে পারিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থাপনাবধি তাহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই। কেন না, রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।"

পণ্ডিতপ্রবর জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য রামেন্দ্রবাবুর সহিত একই বৎসরে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন এবং রিপণ কলেজে রামেন্দ্রবাবুর সহকর্মী অধ্যাপক ছিলেন—পরে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই যোগ্য লেখা। আমরা তাঁহার অধ্যাপনা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম—রাইচরণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলেজে রাইচরণের মতই তিনি ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া দিতেন—মাতৃভাষার বক্তৃতা দ্বারা নহে, কলেজ ক্লাসে অধ্যাপনার মধ্য দিয়া সুকৌশলে তাঁহার প্রচার কার্য্য চলিত। জানকীনাথ রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"স্বদেশ প্রীতিই আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি ছিল। তিনি দেশসেবায় মেজাজাত সৈনিক ছিলেন, লেখনী ছিল তাঁহার নির্ব্বাচিত শস্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবে গৌরববোধ করিতে ও বর্ত্তমান অবনতিতে বেদনা পাইতে, তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখি নাই। অতীত ও বর্ত্তমানের এই দ্বন্দ্বমিলনেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য চেষ্টার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে একদিকে ছিল ঋষি-সন্তানসুলভ প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা, অপর দিকে ছিল, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের মর্ম্ম কোলাহল, তুমুল বিলাপের সজীব অনুভূতি। এই দ্বারই প্রেমের দ্বারাই তাঁহার জীবন চরিত ও কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে একজন মহাপণ্ডিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক বা মহারথী সাহিত্যসেবক হারাইয়াছি, তাহা নহে ; আমরা জাতীয় আদর্শের ভাবোদ্দীপ্ত প্রচারকও হারাইয়াছি। ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ভারতের নবজাগরণের আনন্দকারী জাগা-নিদ্রোত্থিতের মধ্যে তাঁহার যথাযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিবেন।"

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও পণ্ডিত, স্বর্গত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের সাধনা তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতির ভাণ্ড ! ইউরোপের আধুনিক সাহেবে কি সব পদার্থ তত্ত্বের কি সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই সমাচার তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিতে প্রথম যৌবনে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই কার্য্যটি করিতে যাইয়া রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গলার গদ্যের ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। (২) তিনি ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে আমাদের ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদি কষিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষকে তুলনার সমালোচনায় তুলিত করিয়া উভয়ের যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই যাচাই চেষ্টাও রামেন্দ্রের পক্ষে অপূর্ব্ব। তিনি ইহাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় অনুপাতাবে দিয়াছিলেন। কিন্তু এই তুলনায় সমালোচনা করিতে যাইয়া রামেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সিদ্ধান্তের পুঁজি তাঁহার বড় কম। তিনি অমনি বেদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রেরও আলোচনা আরম্ভ করিলেন ও বেদের তত্ত্বের পরিচয়ও বেশ লইয়াছিলেন। (৩) তৃতীয় পর্য্যায়ে রামেন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে তিনি যে কয়খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বাঙ্গলার বিদ্বজ্জন সমাজকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইউরোপের বিদ্যার মাপ কাঠিতে ভারতের বিদ্যা মাপিলে মোট ঠ হইবেই না, উপরন্তু ভারতে এমন অনেক জিনিষ আছে, অনেক ভাব আছে, যাহা ইউরোপের মাপ কাঠির বাহিরে ; ইউরোপ এখনও সে ভাব-জগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বেদ সম্বন্ধে তাঁহার যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছিল, তাহা এই ভাবেই জয়পুর এবং তেমন বৈদিক বিদ্যার পরিচয় দিয়া বৈদিক সন্দর্ভ ভারতবর্ষের আর কেহ লিখিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

১২৭১ সালের ৭ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক উৎসব করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নব সংস্করণ প্রকাশ করিলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদের কথা লোক জানিতে পারিবে। তাঁহার কোন স্মৃতিসভারও অনুষ্ঠান হয় না। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যুর পর ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষগণের সেদিনটি পালন করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে সকলে যাহাতে স্মরণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

আজ সকলকে তাঁহার সাহিত্য সাধনার কথা জানানো একান্ত প্রয়োজন। তৎকালীন রিপণ কলেজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার সেবা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ ও ধন্য হইয়াছে। সে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া আছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন—তাহাও সত্যই অতুলা ! ২৪ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ পড়ার সময় তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে সাধনা, জন্মভূমি, দাসী, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, আর্য্যাবর্ত, মুকুল, উপাসনা, মানসী, ভারতী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৩০৬ হইতে ১৩১০ এবং ১৩১৪-২৫ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া তিনি 'প্রকৃতি' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৩০৭ সালে তাঁহার পুত্তলীক কুলকীর্ত্তি পত্রিকা নামে কতেসিং জমীদারীর ইতিহাস প্রকাশিত হয়। ১৩১৩ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ১৩১৭ সালে মায়াপুরী ও ১৩১৮ সালে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ সাহিত্য পরিষদ হইতেই প্রকাশিত হয়। ১৩২০ সালে চরিত কথা ও কর্মকথা, ১৩২১ সালে বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৩২২ সালে শব্দকথা এবং ১৩২৩ সালে বঙ্গকথা ও বিচিত্র জগৎ—২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালে ভারতবর্ষে তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত

হইয়াছিল, সেগুলি ঐ সময়ে বিচিত্র রূপং নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ভূগোল ও বিজ্ঞান পাঠ নামের বদলে নূতন পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য সাধনাই তাঁহাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে।

সাহিত্যকে তিনি কি দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতেন, তাঁহার নিম্ন লিখিত লেখা হইতে তাহা বুঝা যায়—"বাংলা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কিন্তু বাংলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে, এমন কি সেই সাহিত্য বাঙ্গালার পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। • • • বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাংলার ঘাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই।"

সর্বশেষে রামেন্দ্রবাবুর প্রাণের কামনা ও ভবিষ্যবাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সাহিত্য পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্য সেবকগণের সম্মিলনের কেন্দ্রস্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষীগণ এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া নব নব তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং বেশবাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীতকালের মহাপুরুষগণের স্মরণ নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসী মাত্রের তীর্থস্বরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষদ প্রথম তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য বর্তমানকালে বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু, এই পতিত জাতির যদি উদ্ধারসাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, এ কথা ধ্রুব সত্য।"

পরাধীন বাঙ্গালী জাতি আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাধনা প্রভৃতি সকল প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে! এই স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের ও সাহিত্যের দান অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। রামেন্দ্রসুন্দর সেই সংগ্রামীদের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণী হইতে আরম্ভ করিয়া কত কবিতা, কত গান, কত প্রবন্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদিগকে প্রেরণা দান করিয়াছে, তাহার সংখ্যাও নাই, হিসাবও নাই।

রামেন্দ্রবাবুর শেষ কামনা ও ভবিষ্যবাণী স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যেন সৌরবের অধিকার অর্জনে অগ্রসর হয়, আমরা রামেন্দ্রবাবুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করিবার সময় সেই প্রার্থনাই জানাইতেছি।

আর কত দূরে

শ্রীপ্রবীরকুমার বিশ্বাস

কতদূর—আর কতদূরে—
তোমার গানের সভা মুখর নূপুরে ?
বাজে রিনিঝিনি।
সপ্ত সুরে তোলে তান তব বীণাখানি।
কাননে বসন্ত ঋতু ফাগুনার ফুলের পরাগ
আবীরের গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে আনে অনুরাগ
পূর্ণিমার স্বপন মেদুরা—
তোমার হৃদয় দেশে এনে দেয় যৌবনের মেলা।
ইন্দ্রনীল আকাশের সোনালী রেখায়
তোমার ফাগুন চিঠি দিকে দিকে অকাতরে
ছড়ায় বিলায়।
হৃদয়ের অন্তরের কাছে—
সমস্ত বিশ্বের প্রাণ টেনে নেয় সংগীতের মাঝে।
সে অগাধ প্রেমের সম্ভার
সে পেয়েছে কণামাত্র দানে—
তোমার করুণা দানে—
তৃষ্ণা তার নির্বাপিত, ছোটেনা সে মরীচিকা পানে।
কতদিন বিভাবরী জাগর হৃদয় মোর কাণ পেতে রাখে,
বুক পেতে থাকে
তোমার চরণখানি অসাবধানে যদি কভু পড়ে,
দুপায়ে নূপুর তব রুনু ঝুনু রুনুঝুনু সুরে
বেজে ওঠে চকিতে চমকে—
গমকে চমকে।
চলা গতি থেমে যায়, মিঠে হ'য়ে আসে আঁখি দিঠি
তারপর তোমার সভায় যাবার ফাগুনের
সেই রাঙা চিঠি!
হাতে দিয়ে বলে শুধু, একটিবার হে দেবী আমার
এসো তুমি ফাগুনের গানের সভায়—
সেখানে সমস্ত বিশ্ব বাঁধা হ'য়ে আছে এক সুরে
অরূপ ললিত ছন্দ হৃদয়ের প্রেম অন্তঃপুরে।

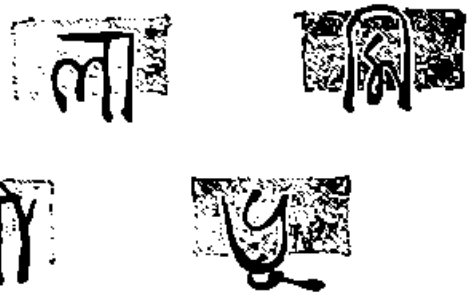

গিরীন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ফেরিওলার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে নিবারণ। প্রয়োজনের তাগিদে যতখানি সে এগিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী তাগাদা তাকে দিয়েছিল অতসী···পুরুষ মানুষ, কুণে বেড়ালের মতন ঘরে বসে থাকলে অভাব কোনদিন মিটবে না। কাঙালের দুঃখ কাঁদলে ঘোচে না। মেহনৎ করতে হয়।···আমাকে না-হয় ভগবান বেবন্দে ফেলেছে।···মেয়ে-মানুষ। তার ওপর গতর ছুরং পুইয়ে বসে আছি। ভিক্ মাগতে মন চায় না। বেটে খাবার গতরও নাই। কিন্তু তুমি ?···আপনি ?

নিবারণ উত্তর দেয়নি। কিন্তু ভেবেছে। অনেকবার ভেবেছে অতসীর কথাগুলো। তবুও ঠিক ভেবে উঠতে পারেনি কি সে করবে।

অতসী বেশী কথা কোনদিন বলে না। অল্পভাষী স্বভাব তার। কিন্তু নিবারণকে তাতিয়ে তুলবার জন্যে বারবার সে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে : ধুলো বিক্রি করে একদিন চলে। চিরকাল চলে না।

নিবারণ চমকে উঠেছে : কি বললে ?···ধুলো !

হ্যাঁ, ধুলো। পথের ধুলো কুড়িয়ে লক্ষ বাবুদের পদধূলি আর বিশ্বাবনের রজ বইলে গঙ্গাস্নানের ভিড়ে যাত্রী ঠকিয়ে-ছিলেন। একদিন চলেছে। রোজ রোজ সে চালাকি চলবে না।

কাণ পেতে নিবারণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে, ভাবতে পারেনি—কেমন করে অতসী টের পেয়েছে ওর কারবারের গোপন কথা।

অতসী থামেনি। আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছে : জোচ্চুরি ক'রে নেশা-ভাঙ করা যায়, পেটের ভাত হয় না।

নিবারণ উত্তর দেবার আগেই অতসী পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

উঠানের ওপাশে পদ্ম চৌকাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের সামনে। ওপরের কাটা-ঠোঁটের কোণটা নীচের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে, আড়চোখে তাকিয়ে ছিল নিবারণের ঘরের দিকে।

গলির পথে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ কি ভেবে অতসী আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পদ্মর সামনে :

পদ্মদিদি !

কি ?

পদ্ম হেসে ফেলেছিল অতসীর মুখপানে তাকিয়ে : নিবারণকে মানুষ না ক'রে ছাড়বি না দেখছি।

মানুষ সে ছিল পদ্মদিদি। কিন্তু নন্দা তাকে অধঃপাতের পথে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। দু-দিন পরে হয় পকেটমার হবে, না-হয়—

পাঁচসিকের একটা একতারা কিনে ভিক্ষেয় বেরোবে সেকথা প'রে। তোর পাল্লায় যখন পড়েছে, সহজে রেহাই পাবে না।

তাই।···কোঁকের মাথায় কি বলতে গিয়ে, অতসী নিজেকে সামলে নিয়েছে। পদ্মর ইঙ্গিতটুকু বুঝতে ওর দেরী হয়নি। তবুও কড়া জবাব দিয়ে পদ্মকে ও আর অসন্তুষ্ট করতে চায়নি।···দীনুকে যে পদ্ম সইতে পারতো না, তা নয়। সইতে পারতো না অতসীর কাছে তার থাকা। অতসী একটা দিনের জন্যেও চায়নি দীনুকে ভিকিরী করতে। কিন্তু উপায় ছিল না। আপনভোলা মানুষ। দিনের পর দিন না খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কলের জল খেয়ে, মোটা মোটা উপোসে দিন কাটিয়ে পড়ে থেকেছে ফুটপাতে, না-হয় কোম্পানী বাগানে। তবুও কারো কাছে হাত পাতেনি কোনদিন।···অতসী জানতো যে, দীনু না খেয়ে মরলেও ভিকিরীর মতন চেয়ে খাবে না কারো কাছে। দীনুকে যেদিন প্রথম সে পেয়েছিল,

সেদিনের কথা আজও অতসীর মনে ঝলমল করে। জোর ক'রে হাতে খাবারগুলো গুঁজে দিয়ে, রাস্তার কল থেকে এক বাটি জল এনে ধরেছিল তার সামনে।…ক'দিন উপোসী ছিল, ভগবান জানে! নইলে খাবারগুলো হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দিত পাঁশকুড়ে।…যা হবার নয়, তা হয় না। যা থাকবার নয়, তা থাকে না। কতবার অতসী ঘরে এনেছে সারা সহর খুঁজে। শান-বাঁধানো পথে কপালে চোট লেগে রক্ত ঝরে পড়েছে কাপশোপা বয়ে। তবুও বাড়ী ফিরবার নাম করেনি। হয়তো ফিরতোও না। আঁচলে রক্ত মুছিয়ে অতসী হাত ধরে ফিরিয়ে এনেছিল বাড়ীতে। নেকড়া পুড়িয়ে পলতারা করে দিয়েছিল। কিন্তু কিসের কি! পালাবার তালেই সে ছিল। শেষে এমন সময় ছিটকে পালিয়ে গেল যখন অতসীর উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না।

কিলো! থমকে গেলি কেনে?…কি ভাবছিস অমন ক'রে?

কিছু না: অতসী ইতস্তত করেছিল।

তেরচা হাসির রেশ টেনে পদ্ম বলেছিল: দায়ের কাছে মন গোপন করিস না। মুখ দেখে পদ্ম পেটের ভাত ওগতে পারে।

তা জানি। ইচ্ছে করলে তুমি সবই পারো পদ্মদিদি।…বলছিলাম কি, নিবারণের একটা হিল্লে করে দাও। ভদ্দরলোকের ছেলে। ভুল পথে পা বাড়িয়ে জাঁতিকলে এসে পড়েছে। হাতে এখনো যে দু'চার পয়সা আছে, তাই দিয়ে যদি পেলাস্টিকের খেলনা কিনে এনে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করে, কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে দিন কাটবে। নইলে—

নইলে তুই খাওয়াবি ভিক্ষে ক'রে। একটা মানুষ তো তোরও চাই!

না-না। আমার চাই না কিছু। সত্যি বলছি পদ্মদিদি। ঠাট্টা ক'রো না তুমি। নিবারণবাবুর একটা হিল্লে হলে আমি আমার পথ দেখে নিতে পারবো। মটর গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে যে ক'দিন অচল হয়ে পড়েছিলাম, অনেক করেছে নিবারণবাবু। তার দেনা শুধতে পারবো না কোনদিন।…খোকা ছুটি দিয়ে গিয়েছে। এখন আমার ঝাড়া হাত-পা।

পদ্ম খোঁটা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ অতসীর চোখে জল দেখে মনটা ভিজে উঠলো। হাত ধরে বললে: আয়, বসবি আয়।…ফেরিয়ালাকে বলবো, সে দোকান চিনিয়ে দেবে।

পদ্মর পিছু পিছু অতসী তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এতদিন ওরা পাশাপাশি বাস করেছে, কিন্তু অতসী কোনদিন ঢোকেনি পদ্মর ঘরে। পদ্মকে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতো। পদ্ম ছিল মাণিক পেয়াদার আখড়ার রাঁধুনি। দিনে রান্নার কাজ করতো। আখড়ার কানা-খোঁড়া ভিকিরীদের জন্যে শাকসিদ্ধ, খুদের জাও, আর লপসি রেঁধে রেখে সারাদিন এঘর-ওঘরে টহল দিয়ে বেড়াতো। রাতের আঁধারে ঘরের কোণে পিদিম জেলে রেখে মাণিক পেয়াদার চোখে ঘুমো দিতো। আঁচল উড়িয়ে বেড়াতো বস্তির অন্ধকার আনাচে-কানাচে। অতসীকে কম হেনস্তা করেনি। দীনু যেদিন থেকে বস্তিতে এসেছিল, পদ্ম যেন ক্ষেপে উঠেছিল। থেকে থেকে চিলের মতন ছোঁ মারতো দীনুকে ছিনিয়ে নেবে বলে। অন্য বেটা ছেলে হলে ওর হাত থেকে রেহাই পেত না।

তুই বুঝি ভিক মাগা ছেড়ে দিবি?

হাঁ: অতসী নিস্পৃহভাবে উত্তর দেয়।

একটু থেমে পদ্ম নীচু গলায় বলে: তাই ভালো। কি লাভ দু'মুঠো চাল আর দুগণ্ডা পয়সার তরে লোকের দুয়োরে হাত পেতে! তুই ছুঁড়ি যে বোকা। নইলে তোর আবার ভাতের অভাব হয়। যাক গে, লোকটা যদি খেলনা বেচে দু'চার পয়সা ঘরে আনে, দুজন লোকের খাওয়া-পরা বেশ চলে যাবে।

হাঁ।

উত্তরটা সংক্ষিপ্ত ক'রে অতসী প্রসঙ্গটা শেষ করতে চায়। কিন্তু পদ্ম থামে না। নানা কথার ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে নিবারণের সঙ্গে অতসীর অচ্ছেদ্য সম্পর্কটুকু প্রতিপন্ন করবার জন্যে যেন ঘরিয়া হয়ে ওঠে। সন্তুষ্ট না হলেও অতসী অসন্তুষ্ট হয় না। গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কোন রকমে পদ্মর সাহচর্যটুকু নিবারণের জন্যে ভিক মেগে নেয়। পদ্ম আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠে।

নতুন কারবার সুরু করেছে নিবারণ। প্লাষ্টিকের খেলনা,

কুমকুমি ঢিপ আর রঙমারি পুতুল কিনে এনে এক-একদিন এক-এক রাস্তার ফুটপাতে দোকান সাজিয়ে বসে। উদ্‌ভ্রান্ত অবিশ্রান্ত চলাচলে নানাশ্রেণীর লোকের কেউ কেনে, কেউ বা দর যাচাই ক'রে এটা ওটা নেড়েচেড়ে আবার নামিয়ে রেখে যায়। সারাদিনে যা বিক্রী হয় তাতে নিবারণের মন ভরে না। তবুও টাকা-পাঁচসিকে মুনাফা নিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে। যেদিন হাল্লায় ধরে, সিকি-দু'আনিটা গুঁজে দিয়ে আসতে হয় ভোজপুরী হাল্লা সৈত্যের বাঁ হাতে। মনটা দুঃখে যায়। দিনান্তের অবসাদ যেন অনেকখানি দ্রুত করে ওর ঘরমুখো পায়ের গতি।

অতসী!

কোন সাড়া আসে না অতসীর ঘর থেকে। কেরোসিনের কুপিটা নিবিয়ে অতসী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে মাদুরখানা বিছিয়ে।

বেসাতির কোলাটা নামিয়ে রেখে নিবারণ একবার কাণ পাতে অতসীর রুদ্ধ দ্বারে।···কোন সাড়া শব্দ নাই।

কানিস্তারার দরজাটায় আস্তে আস্তে আঙুলের টোকা দিয়ে নিবারণ ডাকে: অতসী!

অতসী সাড়া দেয়। কিন্তু ওঠে না। হয়তো চোখ না খুলেই উত্তর দেয়: ঘরের কোণে পান্তা-ভাত আছে মালসায়। তরকারি আজ ছিল না কিছু।··· দু'চার পয়সার তেলেভাজা কিনে এনে খেয়ে নেবেন।

তুমি?

আমি আজ আর খাবো না কিছু।

খাবে না?

না। শরীরটা ভালো নাই। সারাদিন রোদে ঘুরে মাথাটায় যেন হাতুড়ি পিটছে। নিবারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কি বলবে সে! তবে এটুকু অনুমান করতে দেরী হয় না যে, ভাতের চাল অতসীই ভিক্ষ মেগে এনেছে সারাদিন রোদ্রে ঘুরে। একদিন নয়, দিনের পর দিন তা-ই করে অতসী। নিবারণকে চাল কিনতে দেয় না। হাতে পয়সা দিতে গেলে বলে: পয়সা এখন খরচ করবেন না। হাতে কিছু জমলে কারবারটা বড় হবে। ভদ্দরলোকের ছেলে, ভিকিরীদের আস্তানায় এসে শেষটায় আপনিও ভিকিরী হবেন। সেটা কি ভালো?

অতসীর কথার ওপর জোর করে কোন-কথা বলতে পারে না নিবারণ। ক্ষণকাল নীরব থেকে অনুনয়ের সুরে বলে: দিনের পর দিন না খেয়ে আর আধ-পেটা খেয়ে ক'দিন বাঁচবে অতসী?

অতসী হাসে। নিবারণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: আমার কথা ভাববেন না। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি, অত সহজে মরবো না। মরলে অনেক আগেই মরতাম। দিনের পর দিন না খেয়ে যখন মা-ভাই শুকিয়ে মরলো, রোগা বাপ অন্ধ হয়ে গেল, তখন তো কই মরিনি!···মরবার সুযোগ ভগবান দিয়েছিল যখন গাড়ী চাপা পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি দিলেন না মরতে।···ওষুধ-বিসুখ আর দুবেলা খেয়ে দুদিনে চকচকে কপালটা আবার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অমন ক'রে মরে কি লাভ হতো শুনি?

লাভ!···বেঁচে কি আমার খুব বেশী লাভ হয়েছে!··· থাকগে সে কথা। আপনি বেঁচে উঠুন নিবারণবাবু। এই নরককুণ্ডে পড়ে আপনি যেন আর ডুবে যাবেন না।

নিবারণের সাড়া পেয়ে পদ্ম গায়ে-পড়া হয়ে এগিয়ে আসে: কি গো! আঁধারে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছো কেনে? কুপিটা জেলে দেবো?

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই পদ্ম দরজা খুলে নিবারণের ঘরে ঢোকে। হাতড়ে কুলঙ্গী থেকে কুপিটা নামিয়ে নিয়ে পুঁটি গহলানির ঘরের দিকে এগিয়ে যায় জেলে আনবে বলে।

পদ্ম আজও তেমনি টুক্‌ কাটে। টিটকারি দিতে ছাড়ে না। কিন্তু অতসী কোন জবাব দেয় না। সন্তর্পণে বাঁশের সাঁকো বয়ে খাল পার হওয়ার মত পা টিপে টিপে পদ্মর পাশ কাটিয়ে চলে। পাছে, পদ্ম বিগড়ে গেলে নিবারণের ক্ষতি হয়। পদ্মই তো দিয়েছে নিবারণকে নতুন কারবারের সুযোগ-সুবিধে ক'রে।

তিক-মাগা অতসীর আর ভালো লাগছিল না। কোন রকমেই যেন সে আর পারছিল না এই কদর্য

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? মলো ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, মলার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই মলোয় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই মলোজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং মলো জনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এই আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

L. 373-X51 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই বর্তৃক প্রস্তুত।

জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে যেন মাঝে মাঝে ওর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।···কি লাভ! কি লাভ এমনি ক'রে জ্যান্ত মরার মত বেঁচে থেকে! বেঁচে থেকে! ওই তো দলে দলে আরও কত মানুষ বেঁচে আছে। ওরা পায়ে হেঁটে চলে! পিরদাঁড়ার হাড় ওদের কনকন করে না ভলো বাতাস লেগে। চলে—ওরা চলে পায়ের পর পা ফেলে, হাসির ফিনকি ছড়িয়ে। পথের দুপাশে ছড়িয়ে পড়ে ওদের হাসি গল্প গান। মরতে ওরা আসেনি। তাই মরণের পথ তাকিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকে না।···ও মরা মেয়ে মানুষ, তাই শীতুকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল বস্তির এই অন্ধকার ঘরে। ভূতের পুরীতে জ্যান্ত মানুষ এলে যেমন ক'রে ভূতগুলো তাকে আঁকড়ে ধরে, তেমনি করে অতসী চেয়েছিল শীতুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে। কিন্তু, কেন থাকবে সে? আজও দিন তো তার ফুরিয়ে যায়নি। আবার বাঁচবে। আবার বাঁচবে শীতু, যেমন করে ধীরে ধীরে বেঁচে উঠছে নিবারণবাবু।

রাতের গভীরতা ঘন থেকে ঘনতর হয়ে ওঠে। বাইরের জগতে কখন কোলাহল থেমে গিয়েছে। কিন্তু অতসীর চোখে ঘুম নামে না! ভাবতে ভাবতে মগজের ভিতর কেমন একটা আগুনের শিখা যেন শীষিয়ে ওঠে। মনে হয় বুকের ভিতর খানিকটা রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটছে!

বিছানায় পড়ে থাকতে পারে না। উঠে বসে। যন্ত্রচালিতের মত বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। সারা বস্তি নিঝুম। অন্ধ কুঠে দুলো ভিকিরীগুলোও আর কাৎরায় না যন্ত্রণায়। ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে সব।

নিবারণ ঘুমিয়েছে। ওঘরে ঘুমিয়েছে পদ্ম আর ফেরিয়ালা। পুঁটি গয়লানি ঘুমিয়েছে বাবাজীর দাত-তালি-খেওয়া ছেঁড়া কাঁথাখানার একপাশে। কোথাও কোন সাড়া নাই।

আস্তে দরজাটা ঠেলে অতসী নিবারণের ঘরে ঢুকে একবার দাঁড়ায়।···স্পষ্ট শোনা যায় নিবারণের নিঃশ্বাসের শব্দ। সারা দিনের শ্রান্তি নেমেছে ওর চোখে।

নিশ্চল প্রেতমূর্তির মত অতসী ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থাকে নিবারণের বিছানার পাশে। তারপর পা টিপেটিপে আবার বেরিয়ে আসে। দরজাটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে পদ্মর ঘরখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সবাই ঘুমিয়েছে! কেউ হুঁস জেগে নাই সারা বস্তিতে।

চালাকিতে নেমে অতসী আর একবার থমকে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গলির দিকে। কোথায় যাবে, তা সে নিজেও জানে না। তবু বেরিয়ে পড়ে। আর দাঁড়ায় না। গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে নামে। একটিবারও পিছন ফিরে চায় নাবস্তিটার দিকে।

ক্রমশঃ

দূত

রবেশ্বর হাজরা

স্বর্ণ-রোদে-স্নান-করা পাখি
উড়ে গেল মহাশূন্যতায়—
আকাশ শুধায়:
'কে তুমি হে প্রাণ?
কেন এলে?'
বিহগ উত্তর করে:
'আমি দূত, মহাজীবনের
বার্তা দিতে এলাম
তোমায়।
তোমার দুয়ার খুলে দাও
মাটির আশিস্ লই শিরে।'

আকাশ বিস্মিত হয়।
আবার শুধালে:
'কার তালে
পৃথিবীর ছোঁয়া দিয়ে যাবে?'
উত্তর এবার:
'যুগান্তের অলক্ষ্য-তোমার।'

পাটি ও পীঠ

শ্রী'খ'—

॥ চলচ্চিত্রের চাহিদা ॥

ভারতীয় চিত্রের চাহিদা এদেশেই শুধু নয়, বিদেশেও যে বেড়ে চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদেশের বাজারে ভারতীয় চিত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও উপার্জন থেকে। ১৯৫৭ সালের চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ভারত প্রস্তুত করেছে ২৯৫টি, আর জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে করেছে ৪৭৩ ও ৩৭৮টি। এদের পরে আছে ইতালি (২১৭) ও ফ্রান্স (১৪২)।

তবে, বিদেশের বাজারে চাহিদা ও উপার্জনের দিক থেকে ভারতীয় চিত্র মার্কিণ ও ব্রিটিশ চিত্রের তুলনায় এখনও অনেক পেছিয়ে আছে। কারণ, ভারতীয় চিত্র শুধু সেইসব দেশেই চলে যেখানে ভারতবাসীরা বহু সংখ্যায় গিয়ে বসবাস করছে ও যে সব দেশের আচার-ব্যবহার অনেকটা ভারতীয়দের মতন। তাই শুধু মধ্য-প্রাচ্য ও সুদূর-

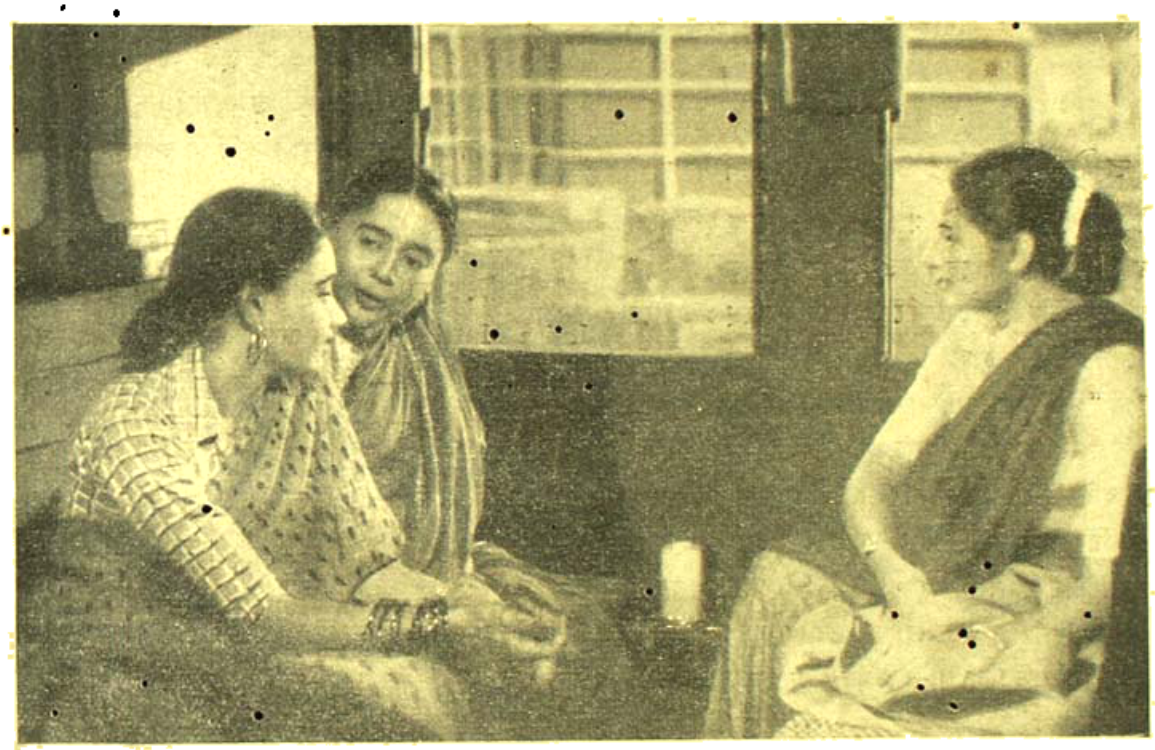

দক্ষিণারঞ্জন বসুমজুমদার পরিচালিত "যাত্রী" চিত্রের একটি দৃশ্যে মঞ্জিতা, নবদ্বীপ ও বীণাকে দেখা যাচ্ছে।

১৯৫৬ ও ৫৭ সালে বিদেশে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শন করে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদেশীয় হিন্দী চিত্রগুলির প্রায় শতকরা পনের ভাগ আয় বিদেশের বাজার থেকেই হয়, আর চলচ্চিত্র রপ্তানিতে ভারতের স্থান বোধ হয় বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। তাছাড়া প্রাচ্যের দেশগুলিতেই ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশগুলিতে ভারতীয় চিত্রের চাহিদা নেই বললেই চলে। যদিও "পথের পাঁচালী" প্রমুখ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার-প্রাপ্ত ভারতীয় চিত্র অধুনা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সুনাম

অর্জন করেছে. কিন্তু কমার্সিয়ালভাবে প্রদর্শিত হয়ে বিদেশী অর্থ উপার্জনে বিশেষ সফল হতে পারেনি। অবশ্য "পথের পাঁচালী" নিউ-ইয়র্কে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনেক সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হয়ে ভারতীয় চিত্রনির্মাতাদের উৎসাহিত করেছে। আরও আশার কথা যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, চিত্র-প্রযোজকগণ ও পরিবেশকদের নিয়ে একটি Film Export Advisory Committee গড়ে উঠেছে। এই কমিটি ভারতীয় চিত্রের রপ্তানি যাতে আরও বৃদ্ধি পায় তার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করছেন।

ভারতীয় চিত্র বহুল পরিমাণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হতে আরম্ভ করলে ভারতীয় চিত্রের আয়ই যে শুধু বাড়বে তাই নয়—ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য, সভ্যতা প্রভৃতিরও প্রচার ও প্রসার হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের বৃদ্ধি ঘটবে।

• • •

॥ রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্ররূপ ॥

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসকে ইতিপূর্বে চিত্রে রূপদান করা হয়েছে। এর মধ্যে "কাবুলীওয়ালা" চিত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনেও সক্ষম হয়েছে। এবারে রবীন্দ্রনাথের আরও চারটি বিখ্যাত গল্প, "ঘরে বাইরে", "গোরা", "ক্ষুধিত পাষাণ" ও "ডাকঘর"-কে চিত্রে রূপায়িত করবার আয়োজন চলছে।

'ঘরে বাইরে'-র পরিচালনা ভার নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। নায়িকা বিমলার চরিত্রে অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন, আর প্রধান পুরুষ চরিত্র দু'টিতে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'-র চিত্ররূপ দেবেন 'চিত্রাঞ্জলি পিকচার্স'। সম্ভবত সুচিত্রা সেন সুচরিতার ভূমিকায় নামবেন, আর উত্তমকুমার থাকবেন নায়কের ভূমিকায়।

পরিচালক তপন সিংহর নবতম প্রচেষ্টা হবে অবিস্মরণীয় গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে চিত্রে রূপদান। তিনি এখন সেই কাজেই ব্যস্ত আছেন।

আর, 'ডাকঘর'-এর পরিচালনা ও প্রযোজনা করবেন সুকুমার দত্ত। 'গ্রীন্ এণ্ড গোল্ড প্রোডাকসন্স' চিত্রটি নির্মাণ করবেন।

• • • •

অন্বেষা-অন্বয় ঃ

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর "ক্ষণিকের অতিথি" চিত্রটির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। চিত্রটিতে রাধামোহন ভট্টাচার্যকে অনেকদিন পরে এক চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে। নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন নির্মলকুমার ও রুমা দেবী।

• • •

জে, এন্, পিকচার্সের "উত্তরমেঘ" চিত্রটি জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমল মিত্র প্রভৃতি এতে অভিনয় করছেন।

• • •

"হাসপাতাল"-এর চিত্রগ্রহণ সুনীল মজুমদারের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। অশোককুমার ও সুচিত্রা সেন প্রধান চরিত্রদ্বয়ে অভিনয় করছেন।

• • •

নরেন্দ্র নাথ মিত্রের গল্প অবলম্বনে রচিত "আকাশের রং" চিত্রটিতে নায়িকার ভূমিকায় ইতালীয় চিত্র-তারকা Lilisa Mattiolitকে দেখা যাবে একটি ইতালিয় ভ্রমণকারিণীর ভূমিকায়—যে একটি বাঙালী তরুণের প্রেমে পড়েছিল। অন্যান্য ভূমিকায় অসিতবরণ, শোভা সেন প্রভৃতি আছেন।

• • • •

"কামরূপ চিত্র"-র প্রথম অবদান চিত্র "শকুন্তলা"-র পরিচালনা করবেন ভূপেন হাজারিকা। সঙ্গীত পরিচালনার ভারও তিনি গ্রহণ করেছেন।

• • •

প্রযোজক-পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের "হাত বাড়ালে বন্ধু"-র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করে দিয়েছেন। উত্তমকুমার, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি ভূমিকালিপিতে আছেন।

• • •

পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় "রায় বাহাদুর" চিত্রের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলছেন। প্রধান ভূমিকায়য়ে আছেন কিশোরকুমার ও মালা সিন্‌হা।

• • •

'অমর বাণী চিত্র'-র প্রথম ছবি "ভূল"-এর কাজ শেষ হয়ে এসেছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তপতী ঘোষ প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছেন।

• • •

বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য-তীর্থ'র প্রযোজনায় ও পরিবেশনায় বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কৌতুক-নাট্য "উটরোগ" মহাজাতি সদনে অভিনীত হয়। অভিনয়ে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, মন্মথ রায়, স্বপন বুড়ো, মৌমাছি, মনোজ বসু, বারি দেবী, হিরণ্ময়ী বসু, প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। সংগীত পরিবেশনে ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক।

• • •

দেশে-বিদেশে ঃ

আগামী ২৬শে জুন যে নবম পশ্চিম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হবে তাতে এখন পর্য্যন্ত ৩৬টি দেশ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকারও অনেক দেশ আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, জাপান, ইউনাইটেড্ আরব রিপাব্লিক, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ ভিয়েটনাম্, তুরস্ক, টিউনিসিয়া প্রভৃতি। গত বৎসর ভারত তার "দো আঁখে বার হাত" চিত্রের মারফৎ এই উৎসবে দু'টি পুরস্কার লাভ করেছিল। এবারও ভারত একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ও কয়েকটি ছোট চিত্র পাঠাবে।

• • • •

আগামী বৎসরের 'এশিয়ান্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল্'-এ ভারত প্রতিযোগী হিসাবে যোগদান করবে বলে জানা গেছে। এর আগেও ভারত এই উৎসবে যোগ দিয়েছে কিন্তু প্রতিযোগী রূপে নয়, অতিথিরূপে—কোনও পুরস্কার গ্রহণে অধিকারী রূপে নয়। এই বৎসরের উৎসব Knala Lumpur-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আগামী বৎসর টোকিওতে হবে।

• • • •

ভারতের কয়েকজন প্রগতিশীল চিত্র-নির্ম্মাতা ভারতের বাইরের দেশে আঞ্চলিক চিত্র-গ্রহণ করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টি এখন সিঙ্গাপুরের ওপর পড়েছে। সিঙ্গাপুরের দৃশ্যাবলী ও পটভূমিকা ভারতীয় ও অ-ভারতীয় দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হবে বলে তাঁরা মনে করেন। চিত্র-নির্ম্মাতা শ্রীআকার তাঁর আগামী চিত্র "কালা সোনা"-র চিত্র-গ্রহণ সিঙ্গাপুর শহরেই করবেন বলে জানা গেছে। চিত্রটিতে সুনীল দত্ত প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন এবং তাঁর বিপরীতে কোনও মালয় মেয়েরা অভিনেত্রীর অভিনয় করবার সম্ভাবনা আছে।

• • • •

বিদেশী প্রসঙ্গ ঃ

বিশ্বের চলচ্চিত্র অনুরাগীরা জেনে সুখী হয়েছেন যে চার্লি চ্যাপ্লিন্ আবার তাঁর সেই বহু পরিচিত বাউলার টুপি পরিহিত, ছড়ি হাতে ছোট্ট মানুষটির সাজে একটি রঙ্গিণ চিত্রে অবতীর্ণ হবেন। ১৯৩৬ সালে "Modern Times" চিত্রটির সময় চার্লি ঐ 'Little Man'-কে বিদায় দিয়ে তাঁর স্বরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। তার পর থেকে তাঁর অন্য চিত্রগুলিতেও তিনি স্বাভাবিক রূপেই অভিনয় করে আসছেন। সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করে চার্লি চ্যাপ্লিন্ জানিয়েছেন যে ঐ "Little Man"কে অপসারিত করে তিনি ভুল করেছেন, কারণ এই অত্যাধুনিক এ্যাটম্ যুগেও ঐ ছোট্ট মানুষটির দরকার আছে। তাই, তাঁর জন্ম দিনের উপহাররূপে বিশ্ববাসীকে ঐ ছোট্ট মানুষটির অভিনয় সংবলিত এই চিত্রটি উপহার দেবেন।

• • • •

Metro-Goldwyn-Mayer-এর বহু কোটি ডলার ব্যয়ে নির্ম্মিত "Ben Hur" চিত্রটিই M-G-M-এর সর্ব্ব-বৃহৎ চিত্র বলেই স্টুডিও কর্ত্তারা মনে করেন। Ben Hur-এর বিখ্যাত chariot race ও সমুদ্র-যুদ্ধের দৃশ্যগুলি অতুলনীয় হয়েছে বলে তাঁদের ধারণা। চিত্রটিতে যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকারা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd, Haya Harareet, Martha Scott, Hugh Griffith প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চিত্রটি এখনও সম্পাদনার স্তরে রয়েছে এবং এই বৎসরের শেষের দিকে নিউ-ইয়র্কে মুক্তি লাভ করবে।

• • •

'সংগীত সংঘে'র বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করতে গোপেশ্বরবাবু আসেন কোলকাতায়, সাথে আসেন সত্যকিংকর। উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বহু সংগীতজ্ঞ, জমিদার, রাজা-মহারাজা। মেজকাকার নির্দেশে সত্যকিংকর ধ্রুপদ গান করেন উক্ত অনুষ্ঠানে। সংগীতে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের অপূর্ব কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন, গান শুনে মনে হচ্ছে যেন বহুদূর আবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর মহারাজার অনুরোধে রাজকুমারকে সংগীত শিক্ষা দেবার জন্যে বালক সত্যকিংকর একাদিক্রমে ছয়মাস পর্যন্ত লালডাঙা রোডস্থ নাটোরের রাজবাটীতে অবস্থান করেন।

সত্যকিংকরের পিতামহ ভারতের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ ক'রে কথকতা, ভাগবত পাঠ ইত্যাদির দ্বারা যা কিছু আয় ক'রতেন তা দিয়ে কোনপ্রকারে নির্বাহ হোত সংসার-যাত্রা। নাটোরের রাজবাটী থেকে এসে পিতৃর সংগে বালক সত্যকিংকর ভারত ভ্রমণে বের হন—উভয়ের চেষ্টায় কিছু অর্থ উপার্জন ক'রতে। সে সময়ে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জলসায় ভারত-শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী শম্ভু-প্রসাদ মিশ্র বালকের সংগে পাখোয়াজ সংগত করেন। বালকের ধ্রুপদ ও ধামারের দুরূহ ছন্দ, অতীত, অনাঘাত ইত্যাদি লয়ের ক্রিয়া ও সুরের কলাকৌশল লক্ষ্য করে শ্রোতৃবৃন্দ হ'য়েছিলেন বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ।

১৯১৬ সালে লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন, একজন অতি সুদক্ষ প্রবীণ গায়ক ও বাদকের জন্যে। কিছুদিন পরেই গোপেশ্বরবাবুর আদেশে দ্বাদশবর্ষীয় বালক সত্যকিংকর উপস্থিত হলেন মহারাজার দরবারে গায়ক ও বক্সী হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দিতে। মহারাজা তো অবাক্! বালকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে অত্যন্ত কৌতূহল-বশতঃ তিনি শুনতে চাইলেন তাঁর গান ও সেতার বাজনা। সত্যকিংকরের গান ও বাজনা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, চোখ বুজে শুনলে মনে হয় যেন কোন প্রবীণ শিল্পীর কাছে বসে আছি, চোখ চাইলেই দেখি নিতান্ত বালক। তারপর সত্যকিংকর সেখানে নিযুক্ত হলেন প্রধান গায়কের সম্মানিত পদে। লালগোলায় থাকবার সময় মহারাজার খেয়ালে এবং নিজের প্রবল ঝোঁকে সত্যকিংকর এস্রাজ, তবলা, পাখোয়াজ, বাঁশী, ব্যাঞ্জো, জলতরংগ, স্বরতরংগ, সুরবাহার প্রভৃতি সমস্ত বাজনা নিজ প্রতিভায় আয়ত্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এগুলোকে ভালভাবে রক্ষা করবার জন্যে তিনি শিক্ষা করেননি। তবে শিক্ষার পক্ষে তাঁর যুক্তি হোল, 'না শেখা থাকবে কেন?' এ যেন শিল্পীর অপূর্ব প্রতিভার বিজয়নিশান উড়িয়ে দুর্গের পর দুর্গ জয় করবার মহা আনন্দ—পরম তৃপ্তি। লালগোলায় চার-পাঁচ বছর থাকবার পর সত্যকিংকর পুরুলিয়ার রাজার প্রধান গায়করূপে নিযুক্ত হন।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে সত্যকিংকরবাবু বেনারসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে ধ্রুপদ গান গেয়ে ও সেতার বাজিয়ে সভাস্থ সকলকে করেন মুগ্ধ এবং লাভ করেন ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি গুণীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন কোলকাতায় তাঁর সংবর্ধনা উৎসবে তাঁরই ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় সংগীতের ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীর রাগ-রূপ প্রদর্শন এবং ছয়রাগ শোনাবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থায় ভারতের ছয়জন শ্রেষ্ঠশিল্পী নির্বাচনে পশ্চিম ভারতের তিন জন ও বাঙলার তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাঙালী শিল্পী তিনজনের মধ্যে দুজন হলেন বিখ্যাত গুণী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন একুশবৎসর বয়স্ক যুবক সত্যকিংকর। এঁর উপর ভার পড়েছিল 'মেঘরাগ' শোনাবার। তাঁর সংগীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তখন থেকে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর সত্যকিংকরকে সভাগায়ক পদে নিযুক্ত করেন। এই রাজ-দরবারে থাকাকালীন হায়দ্রাবাদের নিজাম, গোয়ালিয়রের মহারাজা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর গান-বাজনা শোনাবার সুযোগ পেয়ে তিনি বাঙলা ও বাঙালীর গৌরবই বৃদ্ধি করেছিলেন। সত্যকিংকর বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত সংগীত সম্মেলনে বহুবার যোগদান ক'রে প্রমাণ করেছিলেন সংগীতজগতে বাঙলার অগ্রগতি। প্রায় ৪০বৎসর পূর্বে বাঙালী গায়কদের ধ্রুপদেই ছিল অসাধারণ দক্ষতা; খেয়াল সংগীতে পশ্চিমী-

দের তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন। বাঙালীদের এই পরাজয় কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না সত্যকিংকর। অপূর্ব প্রতিভার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর দেখা গেল বাঙলাদেশেও খেয়ালী আছেন—এদেশে খেয়ালের নবযুগ প্রবর্তন করেন সত্যকিংকর।

একুশ বৎসর বয়সে কোলকাতায় অবস্থিত তদানীন্তন সংগীতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় 'সংগীত সম্মেলনী'তে শিক্ষকতার পদ লাভ করেন তিনি। তাঁর সংগীত শিক্ষাদানের অপূর্ব পদ্ধতি অল্পদিনের মধ্যেই এখানকার বিশিষ্ট মহলে তাঁকে জনপ্রিয় ক'রে তোলে। গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, লেডমার্গারেট, ইউনাইটেড মিশনারী হাইস্কুল প্রভৃতি স্কুলের কর্তৃপক্ষ সত্যকিংকরকে সাগ্রহে সংগীত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। আজ প্রায় ১৮ বছর যাবৎ তিনি ডায়াসেসন স্কুলেরও প্রধান সংগীত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। নিজ প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত শিক্ষাশ্রমে' আজ প্রায় ৩০ বৎসর ধরে তিনি গড়ে তুলেছেন বহু শ্রেষ্ঠ সংগীত-শিল্পী। দেশবিখ্যাত পরলোকগত গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী সত্যকিংকরের প্রেরণায়, উৎসাহে ও শিক্ষায় সংগীতজগতে প্রথম প্রবেশ করেন। সংগীত শিক্ষাদানকালে তিনি ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দেন, সংগীতজ্ঞদের আদর্শ হবে আত্মোন্নতি, ভগবদ্ভক্তি। গানবাজনার ভেতর দিয়ে এই ভাবটাই উপলব্ধি করতে হবে যে, গানবাজনা যেন ভগবানকেই শোনান হচ্ছে। তবেই হবে সংগীত শিক্ষা ও সাধনার সার্থকতা।

কোলকাতায় বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম কয়েকদিন উক্ত কেন্দ্রের ডিরেক্টার সাহেবের আগ্রহে ও স্বর্গীয় মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় একমাত্র সত্যকিংকরই প্রত্যহ কয়েকবার করে নানাবিধ যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের দ্বারা ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীত পরিবেশন করেছিলেন এবং সেই সময় থেকে তিনি বেতার কেন্দ্রের প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর মর্যাদা লাভ করে আসছেন।

দশবছর বয়স থেকেই তিনি বাঙলায় গান রচনার চেষ্টা করতে থাকেন এবং সংগীতগুরু গোপেশ্বরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন।

তাঁর এক সংগীতের ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য মশাই বললেন, তাঁকে কোন একটা রাগের নূতন ধরণের খেয়াল গান শেখবার বাসনা জানালে তিনি সংগে সংগে বেশ সুন্দর বাংলা গান রচনা ও স্বরলিপি করে শিখিয়ে দেন। গান রচনায় ও সংগে সংগে স্বরলিপি লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রয়োজনের তাগিদে বহুক্ষেত্রে হঠাৎ সময়োপযোগী বহু বাউল ও হিন্দীগান তাঁকে রচনা করতে হয়েছে। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত 'সংগীত জ্ঞান প্রবেশ', 'সংগীতমুকুর', 'সংগীত ও কাহিনী', গ্রন্থগুলো সংগীত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে জনসমাজে সমাদৃত হয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. বিউজ ও বি. বিউজের পরীক্ষকও নিযুক্ত আছেন সত্যকিংকর।

১৯৫০ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত তানসেন সংগীত সম্মেলনে লোকবরেণ্য সংগীত নায়ক বর্ষীয়ান সাধক আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যোগদান ক'রেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে সত্যকিংকরবাবু ধ্রুপদ গান শেষ করে যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন খাঁ সাহেব নিজের আসন থেকে উঠে এসে সত্যকিংকরকে আবেগভরে আলিংগণ করেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। পুত্র আলিআকবর খাঁ কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করছিলেন বৃদ্ধপিতার আকস্মিক ভাবাবেগ। তখন আলাউদ্দিন খাঁ সত্যকিংকরকে দেখিয়ে পুত্রকে বললেন, 'বর্তমান দিনে এঁরাই আচার্যস্থানীয়—এঁকে নমস্কার কর।' কোলকাতায় যখনই আসবে এঁদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করবে।' আমাতা রবিশংকর সাগ্রহে বললেন, 'খুবই আশা করেছিলাম কনফারেন্সে তাঁর সেতার বাজনাও শুনতে পাব।'

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটী দেশবাসীর পক্ষ হ'তে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যকিংকরবাবুকে প্রদান করেন এক সুদীর্ঘ মানপত্র এবং সম্মানিত করেন 'সংগীত-সুধাকর' ও 'সংগীত-জ্ঞান-জলধি' উপাধি প্রদানের দ্বারা।

১৯৫৯ সালের ১০ই জানুয়ারী ভট্টপল্লীর পণ্ডিত সমাজ নৈহাটী সংগীত সমাজের মাধ্যমে মহাসমারোহে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবীণ সংগীত সাধক সত্যকিংকরকে প্রদান করেন মানপত্র ও 'সংগীতশাস্ত্রী' উপাধি।

সত্যকিংকরবাবুর পাঁচটি পুত্রই লেখাপড়ার সংগে সংগে সংগীত সাধনাও করছেন নিয়মিত। এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ কণ্ঠ সংগীতে লাভ করেছেন বিশেষ পারদর্শিতা এবং গভর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত 'মিউজিক একাডেমীর' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। খেয়াল সংগীতে অমিয়বাবুর গায়কী ও তানের বিস্তার অভিনব।

সত্যকিংকর বহু সংগীত আসরে স্বরচিত যে সব বাঙলা খেয়াল গান করেন তার মধ্যে ভরভয়ন্তী রাগের 'নয়নে এসেছ তুমি মোর ওগো স্বামী', মালকোশ রাগের 'এস মদনমোহন বেশে নন্দদুলাল' কানাড়া রাগের 'ঝুলনে ঝুলিছে শ্যাম রায়', এবং ইমনের 'শূন্য গৃহে আজি তার পদধ্বনি বাজে' প্রভৃতি গানগুলি বিশেষ ভাবে স্থান পায়।

সংগীতজ্ঞদের সাধনা রক্ষাকল্পে তিনি বলেন, বর্তমানে যে সমস্ত উচ্চস্তরের গায়ক-বাদক আছেন তাঁদের প্রত্যেকের কয়েকটী ক'রে গান ও বাজনার টেপ রেকর্ডিং বা অন্য কোন স্থায়ী রেকর্ড করে রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের। তাহলে শিল্পীদের সাধনা হবে রক্ষিত, ভবিষ্যতেরও হবে কল্যাণ। আজ তানসেন, বহুভট্ট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গায়কদের শুধু বিরাট নামটাই আমাদের কাছে হয়ে আছে সম্বল।

সংগীত-সাধনার কথায় শিল্পী বলেন, "সংসার জীবনে সংগীতে শিল্প সাধনার প্রতিষ্ঠা বড় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে অন্তর্জগতে সংগীতের অধ্যাত্ম সাধনা ও তপস্যা যদি না থাকে তাহলে সবই বৃথা হয়ে যায় বলে মনে হয়। একদিন গান গাইতে গাইতে এই অবস্থার কথা চিন্তা করে আকুল ভাবে কেঁদে ফেললাম।" সেই মুহূর্তে কণ্ঠে আমার বেদনার মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে এল ঐক গানের প্রার্থনা বাণী।

আসিতেছি গেয়ে যে কয়টি রাগ-রাগিণী
বৃথা গাওয়া হ'ল মম যে তোমাতে রাখিনি।"

কোন্ কোন্ রাগ গাইতে তাঁর ভাল লাগে জিজ্ঞেস করায় তদুত্তরে তিনি বলেন, ঠিক বুঝতে পারি না। যে রাগটা যখন গাই তখন মনে হয় সেই রাগটাকেই সারাজীবন ধরে সাধনা করে যাই। প্রধান রাগগুলোর শক্তি, সামর্থ্য ও মহিমা এমন যে, তাদের একটিকেই যদি সারাজীবন ধরে ধ্যান, চিন্তা ও সাধনা করা হয় তাহলেও শেষ হবে না তার অনন্তবিস্তারি রূপের।

সত্যকিংকরের কণ্ঠে আলাপ, ধ্রুপদ ও খেয়াল এবং সেতার যন্ত্রে যে গায়কী ও বন্দেশ দেখতে পাওয়া যায়, তা কেবল পুরাণো ঘরোয়ানা থেকেই আসে—দৃঢ়তা লয়দারী এবং অপূর্ব অলংকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচিত্র তানের সমাবেশ। এ যেন রাগের সৌন্দর্যময়ী মূর্তি রচনা করে তার মস্তকে নানা কারুকার্যখচিত স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেওয়া। তাঁর খেয়াল গানে ও সেতারে তানের অপূর্ব সমাবেশ দেখে বোদ্ধা শ্রোতার কেবলই মনে হবে ভারতের সকল স্থানের বৈশিষ্টপূর্ণ তানের যেন এক বিচিত্র প্রদর্শনী।

সত্যকিংকর সংগীতকে যে কি ভাবে ভালবাসেন, সুর-ব্রহ্মের স্থান যে তাঁর কাছে কত উচ্চে তা তাঁর জীবনে সংঘটিত বহু ঘটনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। বহু দিন পূর্বে একদা ভারতের কোন এক স্বাধীন মহারাজার সভায় আহূত হয়ে গান গাইতে গিয়েছিলেন তিনি। রাজ দরবারে বসল গানের আসর। শিল্পী দেখলেন, মহারাজার, তাঁর পারিষদবর্গের এবং বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের বসবার স্থান হয়েছে উচ্চে এবং সে তুলনায় গানের আসর সজ্জিত হয়েছে নিম্ন স্থানে। প্রতিবাদ করলেন সত্যকিংকর এ ব্যবস্থার। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, এ আসরে আমি গান গাইব না। সুরব্রহ্মের এমন অসম্মাননা হয় যেখানে, সেখানে আমার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে মহারাজা এরূপ উক্তি অন্য কোন শিল্পীর মুখেই শোনেন নি কোন দিন। বলা বাহুল্য, শিল্পীর ইচ্ছানুযায়ী গানের আসর উচ্চ স্থানেই পুনরায় সজ্জিত হল।

বর্তমানে সত্যকিংকরবাবুর বয়স প্রায় ৬০ বছর। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি তাঁর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং পারিবারিক শান্তি। আশা করি, তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরে সুরব্রহ্মের পূজা করবেন এবং সংগে সংগে আত্মবিস্মৃত বাঙালী শিল্পীদের দেবেন সত্যিকারের পথের নির্দেশ—তাঁর শত শত ছাত্র-ছাত্রী দিতে শিখবে সংগীতের যথার্থ মর্যাদা।

গ্রহ জগৎ

আগামী ১৯৬২ সাল

উপাধ্যায়

মকররাশিতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আটটী গ্রহের একত্র সমাবেশ হবে। বিশ্বের আটশো বছরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে এরূপ গ্রহসমবেশের ঘটনা পাওয়া যায় না। এক রাশি থেকে চারটী পাঁচটী গ্রহের একত্র অবস্থানে হয়েই থাকে কিন্তু এই আট গ্রহের সন্নিবেশন অষ্টযজ্ঞের সংযোগ বলা চলে, তাতে সমগ্র পৃথিবীর ওপর দিয়ে খণ্ডপ্রলয়ের দুর্যোগই আসবে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠবে বলেই অনুমান করা যায়।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের এই ফেব্রুয়ারীতে এই গ্রহগুলি মকরে সন্নিবেশিত হবে, এদের স্থিতিকাল হবে ঐ রাশিস্থ প্রায় তিন দিন, উক্ত তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে,—পূর্ণগ্রাস। চার মিনিট ব্যাপী সূর্যমণ্ডল থাকবে তমসাচ্ছন্ন। এই গ্রহণ ভারতে অদৃশ্য হলেও নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। মহাজ্যোতিষির মতানুসারে, শ্রবণা অথবা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গ্রহণ হোলে গ্রহণজনিত অশুভ ফলের স্থিতি হয় সাত আট মাস। ৩১শে জুলাই ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে অমাবস্যাকার বিশিষ্ট সূর্যগ্রহণ হবে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীতেও অনুরূপ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই গ্রহণগুলির গভীর তাৎপর্য আছে। গ্রহণের পর প্রবল ও দুরু রাশিস্থিত শনির ক্ষেত্রে অবস্থিত দেশগুলিতে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হবে।" বহু লোককে অনিচ্ছাসত্ত্বেই দুর্যোগ সঙ্কটের মধ্যে এসে প্রাণ সংশয় অবস্থায় রাখা হবে। ভারতের উত্তরও পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলগুলির অবস্থা শোচনীয় হোতে পারে। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ব্যাপক ভাবে বিশৃঙ্খলতার চরম অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে—গ্রীস, ইরাণ, আফগানিস্তান, বুলগেরিয়া, যিথুনিয়া প্রভৃতি দেশগুলির অনুরূপ লোকাবহ পরিস্থিতির আশঙ্কা করা যায়। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ পাঞ্জাব এবং বাংলার যে সব অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সেগুলির বিপন্নতা সতীব্রভাবে অনুভূত হয়। মিসর, গ্রীস এবং তুরস্ক থেকে সুরু করে ভারতবর্ষের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত গ্রহণের প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাবে অমঙ্গলের ব্যাপ্তি ঘটবে—উত্তেজনা, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার মাঝারে দারুণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও রক্তে এতদঞ্চল অবলুপ্তাবী হয়ে উঠবে। ঝড় ও ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি চলবে। তীব্রে বহু আকস্মিক দুর্ঘটনার সঙ্গে দারুণ জলপ্লাবন হবে। সমগ্র চীন জাতি ও চীনের সাম্প্রতিক সামন্ততন্ত্রের পথে ঐ বৎসরে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থা আসবে। অষ্ট্রেলিয়াতেও জলপ্লাবন হবে, তবে চীনের মত তার মারাত্মক অবস্থা হবে না। আমেরিকার বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। সিনেট বিধান ও সমাজের তথাকথিত ওলোটপালট হয়ে যাবে। ফলিয়ার বর্তমান শাসন পদ্ধতির অবসান হবে—আর সাংঘাতিক রকমের অশুভ ঘটনা ঐ বৎসরে দেখা যাবে যা রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ বলেই পরিগণিত হবে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী মিষ্টার ফাঁরে বলেছেন—

I must summarise the brief review as (a) Great Scientific advances (b) Great Sociological Changes and (c) Possibility of floods and similar catastrophes on a vast scale.' তিনি তাঁর গণনায় দ্বারা বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখতে পান। যা আমাদের গণনার সঙ্গত হচ্ছে। আমরা দেখছি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে সুরু হবে খণ্ড ভাবে ছোটখাটো যুদ্ধ। যুদ্ধের আটাশালার অন্তর্ভুক্ত হবে উত্তর আফ্রিকার অংশগুলি—যেমন মিশর, ইউরোপের অংশগুলি—যেমন বাল্কেরিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক, আর আমাদের ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলগুলি সহযে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া। সর্বত্রই খণ্ডীযুদ্ধগুলির সুরুবস্থা আশঙ্কা করা যায়। আর ১৯৬২ সাল থেকে নৈরাজ্যগুলী, বিপ্লবেচ্ছুর দাঙ্গা, রাজনৈতিক কূটনীতিজ্ঞ, শাসন তন্ত্র এবং মন্ত্রীমণ্ডলী অত্যন্ত দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করবে। আমেরিকা ও রুশিয়ার ভাগ্যাকাশে ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে কোনরূপ দুর্গতিগ্রস্ত আবহাওয়া দেখা যাবে।' মূলযুদ্ধ সুরু হবে দক্ষিণ ইউরোপ ও আফ্রিকায়। ১৯৬২ সালের প্রথমে আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদীরা বিপক্ষের সম্মুখীন হবে। পাশ্চাত্য জাতির সমাধিক্ষেত্র রচনার কাজ সুরু হবে ১৯৬২ সাল থেকে। পৃথিবীর কোন জাতি এমুদ্দিনে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বহাল তবিয়তে থাকতে পারবে না। খাদ্যদ্রব্য সরিয়ে রেখে যে পথাগার সুরু হয়েছে, তার প্রতিশোধ নেবে সেদিন ধরিত্রী অষ্টগ্রহ সম্মেলনে। বাঙলার হবে শোচনীয় দুর্গতি। বৃশ্চিক রাশিতে শনির প্রবেশের সময় থেকে যে সব দেশে সাময়িক বৈরতন্ত্র শাসন সার্বভৌম শক্তি প্রদর্শন করছে সে শাসনের

আন্তরিক বিপত্তি ও ধর্মবিষয়ক পতন হবে ১৯৩১ সালে। মানুষ নতুন করে চিন্তা করতে থাকবে তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে। ফলে নতুন দর্শন বা মতবাদ সৃষ্টি হবে। ১৯৬৬ সালে নূতন মধ্যেবসাহী মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠবে। ১৯৬২ সালে জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু ও ইন্দুরাশির সপ্তমে আটটী গ্রহের সমাবেশ পরীর উদ্বেগের বিষয়। চার পাঁচ বছর ধরে ভারতের উপর দিয়ে নানা দুর্যোগ বয়ে যাবে ;—ভারতের লোকেরা বিপথে চলবে ;—সমাজবাদী ধনতান্ত্রিকদের অসহযোগিতা চলবে। সমাজ ও দেশ জাতিগঠনী নীতি অনুসরণ করবে, পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ নিষ্ক্রিয়ভাবে চলবে। সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত হবে, বাংলার অবস্থা হবে শোচনীয়।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়টা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এমন ভাবে রাখবে যোগাযোগ। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও বাঙলা। অযুগ্ম হবে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ও উদ্বেগজনক। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল রাজ্যগুলি মিশর, জার্মানী ও রুমিয়ার দুঃসময় দেখা যাবে উপরোক্ত সময়ের মধ্যে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা জটিল হবে। বর্তমান বর্ষে রাজনৈতিকক্ষেত্রে, শাসন বিভাগে ও ব্যবসায়ী মহলে যুক্ত ও ঈর্ষান্বিত লোকের সঙ্গে উত্তেজনা ও প্রাণহানি বিস্তৃতির সম্ভাবনা আছে। পশ্চিম বাংলায় জীবন যাত্র সঙ্কট ঘটবে। বহুস্থানেই খোলা যাবে বুভুক্ষুর প্রকট রূপ।

মোটের উপর আগামী ১৯৭২ সালে পৃথিবীতে বহুলোকের মৃত্যু ঘটবে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা উঠবে, নতুন গ্রহের মত দুর্যোগ দেখা যাবে, আর অর্থনৈতিক সঙ্কটাবস্থের বিশেষ দুর্গতি হবে,—সামাজিক বিপ্লব ও তৃতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর বহুস্থানেই আশঙ্কা করা যায়। তৃতীয় মহাযুদ্ধ মধ্য এশিয়াকে কেন্দ্র করেই ১৯৭২ সালে সুরু হবার যোগ দেখা যায়।

* * *

জ্যৈষ্ঠ-মাসের ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফলাফল

মেষ

অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অশুভ সংযোগ ফল হবে। ভরণী-নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা সময়টায় বেশী কষ্ট পাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, উদরঘটিত পীড়া, বুকের বেদনা প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা, কলহ, প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং বন্ধুদের দুর্ব্যবহার ও বহুবিধ অন্যপ্রকার উদ্বেগ ও আশঙ্কার সম্ভাবনা দেখা যেতে। অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হবেনা। কেননা নানাভাবে আয়ের যোগাযোগ আছে। যাতায়াত ঘটবে। স্ত্রীলোকের প্রয়োচনাতেই যাত্রাবিঘ্ন সম্ভব। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী মোটের উপর ভালো। চাকুরিজীবীদের পক্ষে সতর্ক হওয়া উচিত, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট আসবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো বলা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষের অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য লাভ ও সামাজিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ঘটনার উদয় ঘটবে। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না।

বৃষ

কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে শুভ হবে, চারপদ রোহিণীজাতদের, কিন্তু মৃগশিরা নক্ষত্রাশ্রিতগণ এখানে কোন শুভ সংযোগ পাবেনা। পিত্তপ্রকোপ, বায়ু পীড়া, রক্তের চাপবৃদ্ধি আশঙ্কা করা যায়। পারিবারিক জীবন অশান্তি ভোগ করবে। ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনার ভয় আছে। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য কষ্ট ভোগ, যকৃতের জন্য হবে কষ্ট। অর্থোপার্জনে বাধাও ঘটতে পারে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীরা নানা যোগাযোগের মধ্যে পড়বে, আয় কর আইনের চাপে অনেকে কষ্ট ভোগ করবে। চাকুরির ক্ষেত্রে উপরওয়ালার সহিত বিরোধ ও সহকর্মীদের দুর্ব্যবহার আশঙ্কা করা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভাল বলা যায় না, প্রণয় ভঙ্গের সম্ভাবনা ও গৃহবিবাদ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী অশুভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ের পক্ষে মাসটী মন্দ নয়।

মিথুন

পুনর্বসু নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে আশানুরূপ শুভ হবে না। মৃগশিরা ও আর্দ্রা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির শুভ ফল দেখা যায়। বাতাধিক্য, রক্তদোষ, পিত্তপ্রকোপ, তাপজনিত কষ্ট, বায়ুদৌর্বল্য ইত্যাদি সূচিত হয়। অগ্নি ঔষধ বা টীকা অন্যথায় জনিত বিপত্তির ভয়। ঘরে বাইরে অশান্তি ও মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হবে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে বহু প্রকার ঝঞ্ঝাট, মামলা মোকর্দ্দমা ও নানা অশান্তি ঘটবে। চাকুরী জীবীর পক্ষে মাসের শেষভাগ খারাপ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ,—সামাজিক ও পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও প্রতিষ্ঠা, প্রণয় লাভ, উৎসাহ বৃদ্ধি ও ধনাগম সুযোগ লাভ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

কর্কট

মাসটী শুভ। পুনর্বসুনক্ষত্রাশ্রিতব্যক্তি অপেক্ষা পুষ্যা ও অশ্লেষা নক্ষত্রাশ্রিতগণ বেশী শুভ ফল লাভ করবে। বাত্য ভালোই যাবে, তবে চক্ষুপীড়া, পিত্তপ্রকোপ, রক্তচাপবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্র শুভ ও শান্তিপ্রদ হবে। কূটে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ আছে। বিলাসব্যসনের জন্যাদি ব্যয়ের সম্ভাবনা। নানাভাবে অর্থাগম দেখা যায়, লেখনীদ্বারে সাফল্য। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে শুভ, নতুন কারবারে লোকসান যেতে পারে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে বিশেষ শুভ, পদোন্নতি যোগ আছে। সর্বপ্রকারে স্ত্রীলোকেরা সুযোগ সুবিধা পাবে—প্রণয়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি, অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য যোগ, পারিবারিক স্বচ্ছলতা, পুরুষের

আনুকূল্য লাভ. ভ্রমণ—সমাজে মেলার সুযোগ ও প্রতিষ্ঠালাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের শুভ সময়।

সিংহ

মঘা ও উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণ বহু অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করবে। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না, মধ্যে মধ্যে রক্ত খারাপ হয়ে পড়বে। ভ্রমণ কষ্ট, পিত্ত প্রকোপ, চক্ষুপীড়া, পরিবার বর্গের মধ্যে কলহ ও স্বজন বিয়োগ সম্ভব। কোন স্বজন বিয়োগ হেতু শোক। আর্থিক অবস্থা শুভ হবে। মামলা মোকর্দ্দমায় অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মধ্যম সময়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। মাসের প্রথম দিকে স্ত্রীলোকেরা মনোপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সুখশান্তি পাবে, শেষের দিকে সময়টী ভালো যাবে না—আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি ঘটবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম সময়।

কন্যা

মাসটী উত্তম নয়। কর্মে চেষ্টা ও বিপুলতা শত্রুবৃদ্ধি, ভ্রমণে কষ্ট, অপ্রত্যাশিত ভাবে দুঃখজনক পরিবর্তন ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতার যোগ আছে। চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ কষ্টপ্রদ হবে, উত্তর ফল্গুনী ও হস্তা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে যথাকিঞ্চিৎ ভালো। এমাসে শরীর ভালো যাবে না যদিও গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা নেই। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যে কষ্ট ভোগ, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, দুর্বলতা ও জীবনীশক্তির হ্রাস হবে। পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা কম কিন্তু স্বজন বিয়োগ বা অন্যান্য বন্ধুর মৃত্যু। আর্থিক অবস্থা ভালো বলা যায় না, কোন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটবেনা। কোন প্রকার নূতন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ আছে। লগ্নীকারবারে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারী পক্ষে শুভাশুভ সময়। চাকুরীজীবীর পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টী শুভ—পুরুষের সহিত মেলামেশায় সুখপ্রদ ঘটনা ঘেটে যায়। এমাসে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে।

তুলা

চিন্তা ও নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে কষ্ট ভোগ কম হবে। বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা নানা অসুবিধা ও অশুভ ঘটনার মধ্যবর্তী হবে। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে, কিন্তু কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্তি ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা যায়। মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যোগ আছে, পারিবারিক শান্তি দেখা যায়। আর্থিক অবস্থা শুভ, আয় বৃদ্ধি যোগ আছে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না। চাকুরীজীবীদের পক্ষে শুভ সময়, পদোন্নতি ও সুযোগ হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ মিশ্রিত মাস। অবৈধ প্রণয়ে সিদ্ধি, প্রণয় ভঙ্গ যোগ। আয় বৃদ্ধি ও পারিবারিক সুখলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক

বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভ। বহুকার্যে নানা বাধা যোগ, যার বৃদ্ধি প্রকৃতি ঘটবে। শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্ঘটনাদির জন্য কষ্ট ভোগ। জ্বর, অজীর্ণ রোগ, উদর পীড়া, সামান্য আঘাত, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি সম্ভব। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মধ্যম সময়,—মামলা মোকর্দ্দমা পরিহার করা কর্তব্য। চাকুরিজীবীদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ নয়,—কোন প্রকার রোমান্টিকতা, প্রণয়ের ক্ষেত্রে পূর্বরাগ বা অবৈধ প্রণয় বিপত্তির কারণ হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম সময়।

ধনু

মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষেই ভালো সময়, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণ কিছু অসুবিধা ও অশান্তি ভোগ করবে। শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভালো যাবে না। উদর পীড়ার আশঙ্কা—স্ত্রী ও সন্তানাদির অসুখ হতে পারে। পারিবারিক কলহ ও গোলযোগ—ঘরে বাইরে কোন আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে না। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মধ্যম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীরা আশানুরূপ শুভ ফল পাবে।

মকর

শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণ অপেক্ষা শ্রবণা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভ। আয় ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তি। স্ত্রীর পীড়া। চক্ষু ও উদর পীড়া। আর্থিক স্বচ্ছলতার যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীরা নানা প্রকার সুযোগসুবিধালাভ করবে। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায়। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করবে। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ

পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অশুভ। ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অনেকটা শুভ। শারীরিক সুস্থতা যোগ আছে যদিও উদরের গোলযোগ, মাথাধরা ইত্যাদি ঘটবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। পাওনা টাকা বা অন্যান্য অর্থপ্রাপ্তি। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালারা নানা জটিল সমস্যার মধ্যে এসে পড়বে। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী

ও কৃষি-জীবীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীদেরও শুভসময় দেখা যায়।

মীন

রেবতী ও উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রান্বিতগণের পক্ষে শুভ সময়। পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রান্বিতগণের পক্ষে শুভফলের হ্রাস হবে। শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো যাবে না। গৃহবিবাদ, বিচ্ছেদ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা মন্দ নয় কিন্তু প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে অত্যন্তশুভ সময়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উত্তম সময়, বেতার বাড়ির কর্মলাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সময়—কর্ম্মে প্রসার বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

* * *

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

স্ত্রীলোকের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে মতভেদ। বন্ধুভাব শুভ। লাভ। বিদ্যা বা সন্তান ভাবের ফল ভালো নয়। কর্ম্মস্থানে বাধা বিঘ্ন। ভাগ্যোন্নতির যোগ আছে কিন্তু শনির অবস্থান হেতু ভাগ্যোদয়ের বাধা বিপত্তি। পত্নীর স্বাস্থ্য মন্দ নয়।

বৃষলগ্ন—

রেবতীসংযুক্ত পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া ভোগ করলেও এ মাসে অশুভ ফলের হ্রাস হবে। বন্ধুভাব মধ্যবিধ। বিদ্যা বা সন্তান ভাবের ফল ভালো নয়। সন্তানের স্বাস্থ্যহানিও বিদ্যালাভে বিঘ্নের আশঙ্কা আছে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কর্ম্মস্থলে ক্ষতিও ভাগ্য বিপর্য্যয় যোগ, কর্ম্মস্থলে ক্ষতির আশঙ্কা কম। ধর্ম্মে বাধা। পিতার শরীর অশুভ। স্বাধীন ব্যবসা অপেক্ষা চাকুরীস্থলের ফল শুভ। সন্তানাদির বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ।

মিথুনলগ্ন—

রেবতীসংযুক্ত পীড়া, দাঁতের পীড়া, মাতৃপীড়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত মনোমালিন্য, কলহ। ধনাগম। বিদ্যাস্থান ও সন্তানস্থানের ফল শুভ। ভাগ্যোন্নতি, কর্ম্মোন্নতির অন্তরায়। পত্নীর অসুস্থতা—পত্নীর স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, পাকাশয়ের দোষ, পিতার স্বাস্থ্য ভালো। সন্তানের বিবাহ যোগ।

কর্কটলগ্ন—

শারীরিক পীড়ার সম্ভাবনা নাই। ধনাগম। বিদ্যাস্থান ও সন্তানস্থান শুভ। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের আলোচনা। পিতামাতার শারীরিক দুর্ব্বলতা। কর্ম্মোন্নতি ও ভাগ্যোন্নতির অন্তরায়। শুভকার্য্যে ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তোষের ফল শুভ নয়। তীর্থভ্রমণ।

সিংহলগ্ন—

মধ্যে মধ্যে দেহপীড়া, বাত ও পিত্ত জনিত কষ্ট ভোগ। আর্থিকোন্নতি আছে কিন্তু ব্যয় বাহুল্য। বিদ্যাস্থানে বিঘ্ন ও সন্তানের দেহপীড়া। পিতামাতার স্বাস্থ্যোন্নতি। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। চাকুরি লাভ ও পদোন্নতি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্বাস্থ্য ভালো।

কন্যালগ্ন—

রেবতীসংযুক্ত পীড়া, রক্তঘটিত পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া। ধনাগম। সহোদর ভাব শুভ। কপট বন্ধু লাভ। বিদ্যাস্থানে বাধা। ভাগ্যোন্নতি কর্ম্মলাভ বা পদোন্নতি।

তুলা লগ্ন—

দেহভাব শুভ। ধনাগম। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ। সম্বন্ধলাভ। স্বাস্থ্যহানি। সন্তান ভাব শুভ। পিতার স্বাস্থ্যহানি। তীর্থভ্রমণ-ভাগ্যোন্নতি।

বৃশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। ধনাগমে অন্তরায়। ব্যয় বাহুল্য। আশা ভঙ্গ। মনস্তাপ। সন্তানের পড়াশুনার বাধা বিঘ্ন। বিবাহ জনিত সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্য প্রণয় লাভ। কন্যা সন্তানের বিবাহ বা বিবাহের কথাবার্ত্তা।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো নয়। রক্তস্বাভাবি পীড়া, উদর সংক্রান্ত পীড়া, যকৃত দোষ। অর্থাগম। ব্যয় বাহুল্য। কপটবন্ধুর দ্বারা প্রতারণা। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা, কর্ম্মস্থলে বিশৃঙ্খলতা, বিবাহ সম্ভাবনা। বিবাহে সৌভাগ্যোদয়।

মকরলগ্ন—

শারীরিক ফল অশুভ। ব্যয়াধিক্য। বিদ্যোন্নতিযোগ; সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তম ফল লাভ। সন্তানাদির বিবাহ আলোচনা। স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। কর্ম্মস্থলে উন্নতির আশা কম। মাতার স্বাস্থ্য ভালো।

কুম্ভলগ্ন—

মনস্তাপ, পাকাশয়ের দোষ, রক্তপাত বা রক্তবৃদ্ধি। অর্থভাব, ব্যয়বৃদ্ধি জনিত কষ্ট। পত্নীর পীড়া, সম্বন্ধলাভ। সন্তানভাব অশুভ। মাতাপিতার শরীর ভালো যাবে।

মীন লগ্ন—

পাকাশয়ের দোষ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্বাস্থ্য হানি। ব্যয়াধিক্য, মানসিক চাঞ্চল্য, মনস্তাপ, আশা ভঙ্গ, কলহ। বন্ধু বান্ধবের সহিত মতানৈক্য। স্বাস্থ্য প্রণয়, কর্ম্মস্থলে ক্ষতি, শিল্প সাহিত্য চর্চ্চায় খ্যাতি, শুভকার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

হকি লীগ ঃ

১৯৫৯ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৮টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ২য় স্থান পেয়েছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (৩০ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্থান কাষ্টমস (২৭ পয়েন্ট) এবং গত চার বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব (২১ পয়েন্ট)।

ডেভিস কাপ ঃ

টোকিওতে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ফিলিপাইনের সঙ্গে খেলবার অধিকার লাভ করে।

ফিলিপাইন ৪—০ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

ক'লকাতায় সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় ফিলিপাইনকে পরাজিত করে। এরপর ভারতবর্ষের খেলা পড়বে আমেরিকা বনাম ইউরোপের ইণ্টার-জোনাল বিজয়ীদলের সঙ্গে।

প্রথমদিন রামনাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হ'লে ভারতবর্ষ ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। ২য়দিন নরেশকুমার এবং রামনাথন কৃষ্ণান জুটি হয়ে ডবলসে জয়ী হ'লে ভারতবর্ষ ৩—০ খেলায় অগ্রগামী থেকে পূর্ব্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ৩য়দিনের খেলায় ভারতবর্ষ আরও একটি সিঙ্গলসে জয়ী হয়। অপরদিকে ফিলিপাইনের এশ্লন ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ধরে খেলে শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করায় ফিলিপাইনের পক্ষে এই সিরিজে মাত্র একটি খেলায় জয়লাভ হয়।

গোল্ডকাপ হকি ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিস ৩—২ গোলে সেণ্ট্রাল রেলদলকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি দু'বছর গোল্ডকাপ জয়ী হয়েছে। প্রথমদিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্যভাবে ড্র যায়।

পাঞ্জাব পুলিস এবং সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এনিয়ে উপর্য্যুপরি তিনবছর ফাইনাল খেললো। ১৯৫৭ সালের ফাইনালে রেলদল এবং ১৯৫৮ সালের ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিস কাপ বিজয়ী হয়।

এফ এ কাপ ফাইনাল ঃ

ইংলণ্ডের বিখ্যাত উইম্বলি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৫৯ সালের এফ এ কাপ (ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েসন কাপ) ফাইনালে নটিংহাম ফরেষ্ট দল ২—১ গোলে লুটন টাউন দলকে পরাজিত ক'রে এফ এ কাপ জয়ী হয়। নটিংহাম দলের জয়লাভ খুবই কৃতিত্বপূর্ণ; ৯০ মিনিট খেলার মধ্যে তারা ৭৫ মিনিট সময় দশজন খেলোয়াড় নিয়ে খেলেছিল।

বাইটন কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৫৯ সালের বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার

ফাইনালে গতবছরের রানার্স-আপ কোর্স অব ইঞ্জিনিয়ার্স (কিকি) ২-১ গোলে দিল্লীর আর্মি একাদশকে পরাজিত করে বাইটন কাপ জয়ী হয়। ফাইনালে এই দুই সামরিক দলের খেলার ফলাফল নিয়ে ক্রীড়ামহলে রীতিমত গবেষণা চলেছিল। সেমি-ফাইনালে কোর্স অব ইঞ্জিনিয়ার্স দল ২-০ গোলে কাস্টমস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে দিল্লীর আর্মি একাদশ দল ১-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে।

বেঙ্গুরে প্রথম বিভাগের চকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দল ১—৩ গোলে দিল্লীর সামরিক একাদশ দলের কাছে কোয়ার্টার-ফাইনালে পরাজিত হয়। অপরদিকে গত বছরের বাইটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ০—৩ গোলে কোর্স অব ইঞ্জিনিয়ার্স (কিকি) দলের কাছে কোয়ার্টার-ফাইনালে হেরে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত বছর মোহনবাগান প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১—০ ২-০ গোলে কোর্স অব ইঞ্জিনিয়ার্স দলকে পরাজিত করেছিল।

ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকা ঃ

আমেরিকার পাঁচজন এ্যাথলেট ভারতসফরে এসে দিল্লী, মাদ্রাজ এবং ক'লকাতায় ভারতীয় এ্যাথলেটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দিল্লী এবং মাদ্রাজে ভারতীয় এ্যাথলেটরা একেবারে মোহার হেরে যায়। দু'জায়গাতেই প্রতি সাতটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতীয় দল মাত্র একটি ক'রে অনুষ্ঠানে জয়ী হয়। কিন্তু ক'লকাতার উভয় দলের সঙ্গে রীতিমত-লড়াই হয় যদিও শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ৬-৩ ব্যবধানে জয়ী হয়।

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

সতেরজন খেলোয়াড় পুষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফরে গেছে। দলের অধিনায়ক হয়েছেন, ডি কে গাইকোয়াড় (বরোদা), সহ-অধিনায়ক পঙ্কজ রায় (বাংলা) এবং দলের ম্যানেজার বরোদার মহারাজা। গত ২২শে এপ্রিল থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দল সরকারী সফর তালিকা অনুযায়ী খেলা সুরু করেছে। ভারতীয় দল পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ খেলবে। টেষ্ট ম্যাচ খেলার তারিখ নির্দ্ধারিত হয়েছে—১ম টেষ্ট (ট্রেণ্ট ব্রিজ) ৪ঠা জুন ; ২য় টেষ্ট (লর্ডস) ১৮ই জুন ; ৩য় টেষ্ট (লিডস), ২রা জুলাই ৪র্থ টেষ্ট (ওল্ড ট্রাফোর্ড) ২৩শে জুলাই এবং ৫ম টেষ্ট (ওভাল) ২০শে আগষ্ট।

ইংলিশ টেবল টেনিস ঃ

ইংলিশ ওপন টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপস প্রতিযোগিতায় জাপানী খেলোয়াড়রা পাঁচটি বিভাগেরই ফাইনালে জয়লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের ইতিহাসে জাপান ছাড়া আর কোন দেশ প্রতিযোগিতার পাঁচটি বিভাগেই জয় লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

জাতীয় হকি ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ১৯৫৯ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলদল ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিনবছর রানার্স জয়ী হয়েছে। রেলদল ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের ফাইনালে বোম্বাইকে পরাজিত করে। সার্ভিসেস দল ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে কাপ জয়ী হয়। খেলা শেষ হবার তিন মিনিট আগে রেলদলের ইনসাইড লেফ্‌ট অনিল দাস জয়সূচক গোলটি দেন। পাঞ্জাবকে ৩—১ গোলে হারিয়ে বাংলা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করে। সেমি-ফাইনালে বাংলাদল রেলদলের কাছে এবং পাঞ্জাব দল সার্ভিসেস দলের কাছে হার স্বীকার করে।

সাহিত্য সংবাদ

স্বপনবুড়োর নব কথামালা—শ্রীঅখিল নিয়োগী

বত্রিশটী প্রাণীজগতের ঘর সংসারের কথা শুনিয়েছেন ছেলেমেয়েদের প্রিয় প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) ফড়িং, টিকটিকি, তারপোকা, পিঁপড়ে, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, মাকড়শা, মৌমাছি, ঘুঘু, বাস্তুসাপ, ছাগল, বাঘের বাচ্চা, হাতী, কুমীর, কাকাতুয়া, কাক, কাঁকড়া প্রভৃতি হয়েছে গ্রন্থকারের কথামালার নায়ক নায়িকা। এরা গড়া কেউটেকে, গান গেয়েছে, নানারকম খুনসুড়িও করেছে। মন্ত্রী পাঁচোর পাঁচালী যে সকলেরা সুখকরী, পোনামাছ কেমন করে রাজ-জলাব আংটী ফিরিয়ে দিয়ে আদর খেতে গিয়ে প্রাণ হারালো, কুমীরের সঙ্গে টুনটুনির কাল ভালোবাসার শেষ পরিণতি কোথায়, ব্যাঙের দলের সঙ্গে ব্যাঙাচির কলহ, বাঘের বাচ্চাকে ছাগলের স্তন্যদান, কোকিল বউ আর কাক বউর কথা কাটাকাটি, আরশুলী মেয়ের রাজা ঘুম-সর্দার কর্তৃক বিচারি প্রভৃতি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। প্রত্যেকটী গল্পই রচিত হয়েছে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তাধারার অতি-রাত্রিকে—আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁর প্রতিভা কোথাও ম্লান হয়নি। এ ধরণের মজাদার ছেলে-মেয়েদের মন ভুলানো কথামালা আমাদের শিশু-সাহিত্যে বিরল। আমরা পড়ে খুব খুশী হয়েছি, ছেলে-মেয়েরাও খুশী হবে, বইখানি পড়ে এ ধারণাও হয়েছে। গ্রন্থখানি উপহারোপযোগী, গ্রন্থপট বর্ণাঢ্য, ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উত্তম।

[প্রকাশক—ইষ্ট, এন, ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২, মূল্য ছেড়টাকা মাত্র।]

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত এই কয়টি কবিতার বই কাব্যামোদীদের নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আকৃষ্ট করেছে। প্রবীণ কবি শ্রীকালীকিংকর সেন-গুপ্তের 'মন্দিরের চাবি' তমুদ্রিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত ও বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯৩১ সালে গ্রন্থখানি সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার ঐ নিষেধ আদেশ প্রত্যাহৃত করেন। বাঙলার পাঠক-পাঠিকা আজ 'মন্দিরের চাবি' পাঠের অধিকারী। স্বাধীনতাকামী বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করতে এ কাব্যগ্রন্থ যে সাফল্য লাভ করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্বাধীনতালাভ করলেও আমাদের স্বাধীনতা বোধ তত্টা জাগেনি। তাই দেশপ্রাণ কবির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের জাগরণী গান আবার সহস্র কণ্ঠে উদ্গীত করায় প্রয়োজনীয়তা আছে। এ কাব্য গ্রন্থের প্রচার হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

[প্রকাশক—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড ৪৩ বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২, মূল্য—দুই টাকা।]

নীরঞ্জনা—কানাই সামন্ত।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকার করে কাব্য রচনার একটা বাহাদুরি কেউ কেউ রাখী করেছেন। কিন্তু সে বাহাদুরি মিথ্যা অহংকার মাত্র। সে মিথ্যা অহংকারে বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ এমন কবিতা রচনা ক'রছেন যার অর্থ আমরা সহজে বুঝতে পারি না—এমন কি একেবারেই পারি না। রবীন্দ্র প্রভাবকে সহজ ভাবে স্বীকার করে শুধু নয়—রবীন্দ্রনাথের পথে চলে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, কবি কানাই সামন্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত 'নীরঞ্জনা' কাব্য-গ্রন্থই এর যথেষ্ট প্রমাণ।

[প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য—চার টাকা।]

ফুল পিঁড়ি—শচীন দত্ত।

কবি শচীন দত্তের "ফুলপিঁড়ি" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইখানার যথেষ্ট সমাদর হয়েছে পাঠক মহলে—প্রশংসার গুঞ্জরণ শোনা গিয়েছে সমালোচকদের কণ্ঠে। আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁরা শুধু কাব্য রচনা করেই তুষ্ট নন, যাঁরা অন্তরের নিবিড় অনুভূতিকে প্রকাশের বেদনায় কাতর, যাঁদের কথায় গানে-সুরে সে-বেদনার অনুরণন শুনি—তাঁদের দলের শক্তিমান্ কবি শচীনবাবু। প্রমাণ মিলি চায়—

আবার আমাকে দিলে এই বীজ
সবুজের সুর?
কেন দিলে সখা নূপুর!
আমি তো চাইনি তার ঝলোমালা, চাইনি কথকলি—
কেবল চেয়েছি এক ফত-বিক্ষত হৃদয়ের ঘরা পাতা—দূর
মরুদের ছেঁড়া চিঠি কোনো।

[প্রকাশক—কবিতা প্রকাশ সংস্থা, ১৮।১ শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৬ মূল্য—দুই টাকা।]

সামুদ্রিক—অজিত ঘোষ।

আর একটি কাব্য গ্রন্থ কবি অজিত ঘোষের 'সামুদ্রিক' প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয়, ইহা কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এরি মধ্যে কবি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কবির মত যদি আমাদের দেশের সব ছেলে আর সব মেয়েরা বলতে পারত—

ভারতবর্ষ, আমি যে তোমারি ছেলে,
তোমার সাধনা রক্তে মিলেছে খেলে।

খোকন ভাই ঘুমুবে আমার সনে
মধুছন্দ বিকাবোনা প্রয়োজনে।

[প্রকাশক—ইপূর্ণচন্দ্র সরকার, ২৪, পটুয়াটুলি রোড। কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।]

মালিকা—মালিনী বসু।

'মালিকার' রচয়িত্রী মালিনী বসু মাত্র বার বছরের মেয়ে। অথচ হয়েছি তাঁর বয়স দেখে। যেমন কবিত্বশক্তি, এমন ভাষা আর ভাব কোনও বার বছরের কবির থাকতে পারে, তা ভাবতে পারি। শুধুমাত্র একটিবার চারটি লাইন—

"কল্পনার ঘন বাহি। নিবিড় তিমিরে,
আশা দীপ জ্বালি' ধীরে ধীরে
কর্ত্তব্যের পথ চেয়ে নিরন্ত আঁধারে,
জীবন চলেছে অভিসারে।"

শ্রীমতী মালিনী বসুর কাব্য-সাধনার বিষয়ে পরিচয় জানতে পারলে তাঁর বিষয় আলোচনা করা যেত। আজ শুধু তাঁর কবি-জীবন সুখের কুসুমের মত প্রস্ফুটিত হোক, সার্থক হোক এ শুভ কামনা জানাচ্ছি।

[প্রকাশক—E অমিলচন্দ্র বসু, নেং নাতলক লেন, বালীগঞ্জ কলিকাতা-১৯। মূল্য—এক টাকা আট আনা।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্বক ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি. পি.তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক লাগিবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস"

N 82811—শিল্পী বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—'সুখ তরা চাঁদ' ও 'টুইটাং টুং টাং দুচির তালে'।

N 82812—জনপ্রিয় শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'চৈতীহুয়ের হাওয়াতে' ও 'কে যাবে কে যাবে'—দুখানা আধুনিক গান আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

N 82813—'তুমি সুন্দর তাই ভোর থাকি' ও 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো' গান দুখানা সর্বজনপ্রিয় শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুরের পরশে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

N 82814—শিল্পী ইমা দেবীর মধুর কণ্ঠে 'গান করে এসো তুমি' ও 'সোনালী চন্দ্র কলা' দুখানা আধুনিক গান অপূর্ব হয়েছে।

কলম্বিয়া

GE 24923—'কত রাত্রির দুল ভাঙাতে' ও 'আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না' গান দুখানা সর্বজনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুরলালিত্যে ও ভাব-ব্যঞ্জনায় অনুপম হয়েছে।

GE 24924—শিল্পী নির্মলা মিশ্রের মধুরকণ্ঠে 'আকাশ মেঘ মে' ও 'পিল পিলাটন পিলেবোটন' গান দুখানা আমাদের ভালই লেগেছে।

GE 24925—'আকাশে আজ রঙের খেলা' ও 'নাচ মধুরী নাচরে' দুখানা আধুনিক গান জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীমতী আশা ভোঁসলের মধুরকণ্ঠে চমৎকার পরিবেশিত হয়েছে।

GE 24926—তুষিতা মিত্রের গাওয়া দুখানা গান 'সাদা মেঘ ভেসে যায়' ও যদিও ক্লান্ত 'নয়নে সুর'—সত্যিই অপূর্ব হয়েছে।

GE 24927, 24928—দুখানা রেকর্ডে পংকজ কুমার মল্লিকের পরিচালনায় পল্লিবরেণ্য লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের গাওয়া চারখানা সুন্দর লোকগীতি।

GE 24929—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের বিজয়ী সুরে গাওয়া দুখানা আধুনিক গান—'ঐ চাঁদ যদি ডুবে যায়', ও 'ঐ দেবদারুবন।'

GE 24930—নবাগতা কুমারী মল্লিকা ঘোষের মধুর কণ্ঠের দুখানা আধুনিক গান—'ঐ তো আকাশ, এই তো মাটী,' ও 'ফুলজনে ভীড় জমালো।'

GE 24931—অমল মুখোপাধ্যায়ের দুখানা আধুনিক গান 'যান জানে যান জানে' ও 'যোগেশ আসে, যোগেশ যায়।'

GE 24932—'আকাশ অনেক দূর' ও 'কত চন্দ্র তারা'—অনবদ্য দুটি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন কুমারী আরতি মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অন্ধকারের পিপাসা (কবিতা)—সুনীল বসু ... ৬
অষ্টাপদী (কবিতা)—কালিদাস রায় ৭৭
অচেনা মুখ (গল্প—কিশোর জগৎ)—প্রশান্ত মিত্র ১৮১
অমীমাংসা (কবিতা)—সাধনা মুখোপাধ্যায় ৬৮৩
অলৌকিক (কবিকা)—তারিণীপ্রসাদ রায় ১৮১
অভিজ্ঞতার কথা (কিশোর জগৎ)—উপমন্যু ৩২১
অতিথি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৪১৩
অনুসৃত অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধ)—
শ্রিয়তোষ মৈত্রেয় ৪২৮
অভিজ্ঞান (কবিতা)—মণি পাল ৪৩৬
আঞ্চলিক লোক সংগীত (প্রবন্ধ)—
শ্রীঅমদেব রায় ... ৭১
আজ (কবিতা)—হাসিরাশি দেবী ... ৪৭২
আগামী (কবিতা)—প্রশান্ত মৈত্র ... ৫২০
আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)—শ্রীসতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৭৪৫
আয় অতো ঘুরে (কবিতা)—শ্রীপ্রবীরকুমার বিশ্বাস ৭৪৭
আদালত অবমাননার দায়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—
শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ১০০
আধুনিকা (অনুবাদ গল্প)—কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র ৬৮৪
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র ১০৮
আমাদের খুন ও আজকের যুগ (প্রবন্ধ)—
শ্রীঅবনীনাথ রায় ১৫৩
আকাশ পথে (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমান ভট্টাচার্য ১৪৫
আজ আমি চিনেছি আমায় (কবিতা)—
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত ২৩২
আজকে প্রাতে (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
রমেন মজুমদার ৩৩১
আধুনিক নারীজীবন ও তার সমস্যা (মেয়েদের কথা)—
শ্রীমতী অনুরাধালা দেবী ৪৭৮
আসন (কবিতা)—শ্রীচিত্রা শর্মা ৪৪২
আশা (কবিতা)—শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত ৪৩২
আগুন নেভানোর যন্ত্র (কিশোর জগৎ)—
শ্রীসত্যগোপাল পাল
আদিকবি কৃত্তিবাস (কবিতা)—
শ্রীসচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়
উপমা (কবিতা)—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
উৎসবের পরে (কিশোর জগৎ)—
শ্রীআশাবরী দেবী
উদয় অস্ত (উপন্যাস)—বনফুল
৮৩, ২১১, ৩০২, ৪৪৩, ৫৫৪
উপনিষদের ভূমিকা (প্রবন্ধ—কিশোর জগৎ)—
চিত্রিতা দেবী
এ ডেথ রেজার (অনুবাদ গল্প)—
শ্রীতরুণ বাগচী
এখানে রাত্রি আসে (কবিতা)—
শৈলেন্দ্রনাথ রায় ৩৫৮
একটি প্রেমের ব্যাপার (অনুবাদ গল্প)—
শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় ... ৫৭৫
এসো মদনমোহন বেশে নন্দদুলাল (আগমনী)—কুমারেশ
ভট্টাচার্য ... ৭৪৬
ঐতিহাসিক (কবিতা)—গৌরীশঙ্কর দে ৪৪
ও মনিয়া সোনা (কবিতা)—সতীন্দ্রনাথ লাহা ৭৮৪
কবি পরিণতি (প্রবন্ধ)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ১
কবি চিত্তরঞ্জন দাশ (প্রবন্ধ)—তপোবিজয় ঘোষ ২৪৭
কবি শশাঙ্কমোহন সেন (আলোচনা)
হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত
কলহংসের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)—
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ২৮, ১৩৮, ৩১৫, ৪১৭, ৫৬৯, ৬৭৪

কবির তীর্থ—মদনা (প্রবন্ধ)—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৪৩
কমলবাস (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩
কণ্ঠ-সংগীত (গান ও স্বরলিপি)—মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য ও কল্যাণী দেবী ১৯৩
কাজল-প্রদীপ (গল্প—কিশোর জগৎ)—আশাবরী দেবী ৫৬৫, ৭০৯
কাশফুলের ফুল (কবিতা)—সুনীল বসু ৬৪৩
কিভাবে স্মৃতিশক্তি লাভ করা যায় (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ১৮৪
কী চাই (প্রবন্ধ)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত ৩১
কী খেলে গীতা পাঠে (প্রবন্ধ)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত ৪০৫
কবি মুক্তারামের শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী ৪০৭
কাজ হয় (গল্প)—অমলেন্দু মিত্র ৩৭
কোথা বারিকাকে (কবিতা)—দিব্যেন্দু পালিত ২৪৭
ক্রিস্টোফারসন (অনুবাদ কবিতা)—রণজকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭৬
খেলা ধূলা—শ্রীক্ষেত্রমোহন রায় ১২৬, ২৪৩, ৩৮২, ৪১৩, ৬০৭, ৭৪৫
খড়কড়া পাজুলীর গল্প (কিশোর জগৎ)—বীর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮
খাদের ফুলে যে হয় পাখি—কুমারেশ ভট্টাচার্য ৬৯০
গোধূলীর রঙ (গল্প)—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ৩৯৪
গ্রহ জগৎ (জ্যোতিষ) উপাধ্যায়— ৮৯, ১৪৮, ৩৭৪, ৫১৩, ৬৩৭, ৭৬১
গ্রামের মাথা (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ৭০৪
ঘুড়ি নেই (কবিতা)—বীরেন্দ্র ৫৭০
চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদনের রসচিত্র কল্পনা (প্রবন্ধ)—শ্রীকিশোরীরঞ্জন দাস ৫৪৮
চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে—জীবনকৃষ্ণদাস ৩৬২০
চন্দ্রযান (কবিতা)—শ্রীসুধীন্দ্র গুপ্ত ৬৮০
চিত্রাপন ভারত (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ৪৪৯
চেলিনীর জীবন কথা (প্রবন্ধ)—সুনীলকুমার নাগ ৫৫৭
চৈত্রে আহ্বানে (কবিতা—কিশোর জগৎ)—শ্রীসুধীরকুমার রায় ৪৪৪
চির বিচ্ছেদের পত্র (কবিতা)—শ্রীগোপেশচন্দ্র বসু ১০৭
চৌপদী (কবিতা)—বেতাল ভট্ট ৫১৭
চৌপদী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৩১৪
ছিন্নবাধা (উপন্যাস)—নরেন্দ্রদেব বসু ২২০, ৩৫৯, ৪৮৪, ৭১৮
ছবির ঘোড়া (জাপানী উপকথা)—গোপাল দাস ৩৩১
ছেলেরা চুরি করে কেন (ছেলেদের কথা)—সুস্মিতা ঠাকুর ২১৪
জবতা সাধারণ (প্রবন্ধ)—শঙ্কর গুপ্ত ১৪
জগদীশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা (প্রবন্ধ)—ডক্টর রমা চৌধুরী ৬৪১
জাতীয় পথ সফর পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)—আশা গঙ্গোপাধ্যায়
জেমস্টাউনের আত্মকাহিনী (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)—ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী ৪৭, ২১৭, ৩০৭, ৪৮১
জিজ্ঞাসা (কবিতা)—প্রভা বসু ৬১৩
জাতকের গল্প (কিশোর জগৎ)—রমীন দেব ৪০
জীবন সন্ধ্যায় তুমি (অনুবাদ কবিতা)—শ্রীপঞ্চানন বসু ৫৬
জীবনে বৈচিত্র্য চাই (কবিতা)—পুলক আঢ্য ৬
জীবনের লক্ষ্য (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ৭০৫
টেরাকোটা শিল্প ও বাঙালী (প্রবন্ধ)—শ্রীদুর্গাচরণ সরকার ৫২৩
টমাটোর আচার (রান্নাঘর)—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী ৪৮৩
ডাক্তার (গল্প)—সতীরঞ্জন রায় ৬১২
তাঁরই ঘুঙুর তুমি নদী মন্দিরে—কুমারেশ ভট্টাচার্য ৫০৫
তুইরেপোর মেলা (গল্প)—প্রণবেশ চৌধুরী ১০১
তোমরা কি লক্ষ্য করেছ ? (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ৪৭
তিন (গল্প)—সংকর্ষণ রায় ২৬১
তোমরা কী জানো (কিশোর জগৎ)—সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫৩, ৬৬১
দিদি (গল্প)—শ্রীসুধীরঞ্জন গুহ ৬৬১
দুঃখ শুধু দুঃখ নয় (কবিতা)—গোবিন্দ গোস্বামী ৭১৭
দূত (কবিতা)—রত্নেশ্বর হাজরা ৭১৮
দেওয়ান মধুসূদন মিত্র (প্রবন্ধ)—শ্রীহারাধন দত্ত
দেশবিদেশে ভারতীয় নৃত্য (প্রবন্ধ)—বর্ণকমল ভট্টাচার্য ৩৪৫
দেবভূমি—রবীন্দ্রনাথ (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীউমামোহন চক্রবর্তী ৫৬১
দারুকার দারে (ভ্রমণ কাহিনী)—কণপ্রভা ভাদুড়ী ৭১৩
দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান (প্রবন্ধ)—নরেশের রায় ৫১৩
দিশারী (কবিতা)—বেতাল ভট্ট ২৭৫
ধর্মে অভয় ও অহিংসা (প্রবন্ধ)—শ্রীবলাই দেবশর্মা ১৯৭
ধান্য (গল্প)—অমিয় চৌধুরী ২০৬
নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী ২৫৭, ৬৬০
নতুন ধানের (গল্প)—রবীন্দ্রকমল কর্ম ৫১৮
নাম ও প্রেম (অনুবাদ কবিতা)—শ্রীগোপেশচন্দ্র বসু ৫৩

আমী শুধু গৃহিণী নয় (মেয়েদের কথা)—
হরিদাসী ঠাকুর ৬০৮
নীলাচলে মহাপ্রভু (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ১০২
নূতন দিক দর্শনে আচার্য শ্রীযোগীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
রাধিকা রায়চৌধুরী ৭৮
ন্যূনতম বেতন সম্বন্ধীয় আইন (আলোচনা)—
শ্রীনির্মলচন্দ্র গুপ্ত ৩১৩
নৃত্যময় ভারত (প্রবন্ধ)—অর্কমল ভট্টাচার্য ৯৭
পতিব্রতিনী সতী (কিশোর জগৎ)
শ্রীআর্যকুমার পালিত ... ৬৯
পট ও পীট—"ঐ"— ১৮২, ২৪২, ৩১৯, ৪৪১, ৬১৭, ৭৪০
পাখী ও কবি (কবিতা—কিশোর জগৎ)—বৈষ্ণব ৪৯
পাখী (কবিতা)—রাজেশ্বর হালদার ২৭১
পূজারিণী (কবিতা)—শ্রীলাবণ্য পালিত ১৮৭
পুরাণে বিনোদস্মৃতি (কিশোর জগৎ)—শ্রীহরিপদ গুহ ৩১৩
পি. ই. এন. ক্লাবের রজত জয়ন্তী উৎসব ও লেখক সম্মেলন
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৩৬৪
পারমাণবিক শক্তি ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)
সমর দত্ত ৪০৭
পরশুরামের কৃষ্ণমন্ত্রন (প্রবন্ধ) শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৪১৪
পিতৃস্ব (কবিতা)—অম্বেজালি বিয়া ৫৪৩
প্রবাসী বাঙালী ভূপেন্দ্রনাথ (আলোচনা)—কুমার ভট ... ৪৭৩
প্রণয়ী (কবিতা)—শ্রীবিমল রায় ... ৪৪৩
প্রতীক্ষা (কবিতা)—পুষ্প সান্যাল ... ৫৮০
প্রেম (অনুবাদ কবিতা)—শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায় ... ৪২৯
পুরস্কৃত চরিত্রম্ (গল্প)—মেধাচার্য ৪৩১
পুণ্যভূমি তারকেশ্বর (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৯০
প্রেমাঞ্জা হিমালয় (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ... ২৮০
ফ্রন্টার্ট বয় (গল্প)—বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৫
বাহি যৌবন (কবিতা)—শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ ৪১৩
বসন্ত (কবিতা)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৭১৮
বাংলা সাহিত্যে অমেয় প্রীতি (আলোচনা)
শ্রীনারায়ণচন্দ্র পণ্ডিত ২৮৮
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪১, ১৪২, ২৭৯, ৩৯৮,
বাড়ির কর্তা (অনুবাদ গল্প)—শ্রীকল্যাণকুমার ভট্টাচার্য ... ৪২৭
বিজ্ঞান—পাঠাগার ও পুস্তক (প্রবন্ধ)
শ্রীমমিতা সেনগুপ্তা
বিভূতিভূষণের কথাশিল্প (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৩, ৩৩১, ৪৪৮, ৬৬৩
বিবাহ (কবিতা)—শ্রী মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৩০৬
বিদায়করণী (গল্প)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩১৯
বিচিত্র লীলা (কবিতা)—শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য ... ৪৮৩
বিদ্যুৎ (কবিতা)—কৃতী সোম ... ৪৭৪
বিপিনচন্দ্র পালের—পুঁথিখানের কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীকমলাই মেবমর্মা ৬৭৮
মেঘাল্প বর্ণন—পত্তর-ভাত (প্রবন্ধ)
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ৬১, ১৯৪, ৪৫৭, ৫৪২, ৭০০
মীরন ভাঙার লাগি সাধনের খেলা (কবিতা)—বৈষ্ণব ... ৪১১
ব্যাকুল (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৫৪৭
বৃথা (কবিতা)—শ্রীশ্যামাদাস গুপ্ত ... ৬৮৩
ষোলআটা পুনিয়াদি বিদ্যাপীঠ (আলোচনা)—শ্রীযোগেশ্বরনাথ গুপ্ত ৬৯০
বৈশাখী (কবিতা—কিশোর জগৎ)—শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী ... ৫৬৪
বৈজ্ঞানিকী—শ্রীঅতুল বসু ১৮৭, ২৭০, ৪৮৮, ৫৭৮,
বিফল জনম বিফল জীবন (জীবনী)—কুমারেশ ভট্টাচার্য ৪৯৪
ভগ্ন পুতুল (উপন্যাস)—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৩, ১৭২, ১০৪,
ভয় দেখানোর গল্প (গল্প—কিশোর জগৎ) আলোক মুখোপাধ্যায় ১৯২
ভারত (কবিতা)—শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৫১২
ভুল (গল্প)—শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ ১৭
ভাল্লুকের কবলে (শিকার কাহিনী)—শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৪৪৯
ভাব প্রবাহ (কিশোর জগৎ)—টপাবল ... ৫৬১
ভারতবর্ষে পরশুরামের আত্মপ্রকাশ (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্র চক্রবর্তী ৬১১
ভালোবাসা (কবিতা)—বিধোন্দু পালিত ... ২৭৭
মন্ত্রে পড়ে (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ১০৬
মধুর বৃত্তা (সংগীত)—কথা : শ্রীনিশিকান্ত ; সুর ও স্বরলিপি :
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬৯৭
মনের মানী (কবিতা)—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ... ৬৭২
মলয়কুমার (কবিতা—কিশোর জগৎ)—পান্থজীবন দাশ ... ৩৫৬
মরীচিকা সাধনা (প্রবন্ধ)—ডক্টর শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য ... ২৯৪
মধুমাসে তুমি এসেছ মাধবী ঘুম ঘুমুম চোখে (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৫৭৩
মানবতার সাগর-সঙ্গমে দুইচেনে আর সোভিয়েতে (ভ্রমণকাহিনী)
শচীন সেনগুপ্ত ২৯, ১৮০, ৩২৪, ৪৮১, ৭৬৯
বাঘ (কবিতা—কিশোর জগৎ)—শ্রীসুধীরকুমার রায় ... ১৯১
মায়াবিনী (গল্প)—সুভাষ সমাজদার ... ৬৪৪
মা (গল্প)—শ্রীবেণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ২০৩
মানবতার পূজারী লক্ষ্মণ (প্রবন্ধ)—শ্রীবসুশ্রী চট্টোপাধ্যায় ... ৩০৫
রামকবির কাব্যকলা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য
মাতৃবাৎসল্যের রূপায়ণে কবিশেখর (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
যুগ প্রবর্তনে শ্রীমদ মহাপ্রভু (প্রবন্ধ)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রকাব্যে সসীম ও অসীম (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক আশুতোষ সান্যাল ৫২১
রবীন্দ্রকাব্যে যৌবন মহিমা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক আশুতোষ সান্যাল ২৮১
রবীন্দ্রনাথের কলাকার পরিবেশ ও জীবন চেতনা (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক গোপেশচন্দ্র দত্ত ৬১৫
রজনীর তীরে মন তরীর বেদন (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২১৯
রাঙা আলুর পায়েস (রান্নাঘর)—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী ৩১১
রান্নাঘর—আন্নারাণী দেবী ২২৭
রান্নাঘর—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী ১০৫
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনের এক অধ্যায় (প্রবন্ধ)
শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ৪০২
লীলাভূমি (উপন্যাস)—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১১১, ২০৪, ৭৩৩, ৫১৭, ৭৪৮
শক্তিসাধন বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—শ্রীমৃত্যুগোপাল মুখোপাধ্যায় ... ২৭২
শিক্ষার্থীর বিদ্যুৎলা (প্রবন্ধ)—ভারতী ১৩
শিশুরঞ্জন (প্রবন্ধ—মেয়েদের কথা)—সুপ্রিয়া ঠাকুর ... ১০৪
শুভবৃষ্টি (গল্প)—মহীন্দ্র ভৌমিক ৭
শুভচেষ্টা (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ৩৫০
শেষ রক্ষা (নাটিকা)—শ্রীগোপী ভট্টাচার্য ১৪৯
শেষ পথের পাঁচালী (গল্প)—সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ৭০৫
শ্মশানের স্বরূপ (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ১১৮
শ্রাদ্ধ বাড়ী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ২২৭
শ্রীঅরবিন্দের প্রেমধর্ম (প্রবন্ধ)
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪২৭
শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চতুর্বিধ শিক্ষা (প্রবন্ধ)
শ্রীচারুপদ ভট্টাচার্য ... ৪২৩
শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)—শ্রীহরীকেশ আশ্রম ৫৭৩
শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী (প্রবন্ধ)
শ্রীহরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৫৮
সংসার (কবিতা)—নিস্টির মিত্র ৮৯
সংগীত (কথা, সুর ও স্বরলিপি)
শ্রীসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৩৩
সর্বোদয় গ্রাম অধ্যাপক শিবির (প্রবন্ধ)
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫৪
সত্যনারায়ণ কাপেন্ট্রেটর (আলোচনা)
শ্রীসরোজকুমার বসু ২১
সাময়িকী— ১১৫, ২৩৮, ৩৫৪, ৫০০, ৫৯০, ৭২৮
সাহিত্য সংবাদ— ১২৮, ২৫৫, ৩৮৪, ৪১২, ৩৩৯, ৭৬৭
সে মেয়েটি (কবিতা)—শ্রীসমুখ দাশগুপ্ত ... ২৭
সংস্কৃত ভাষায় স্তুতি (কবিতা)—ডক্টর শ্রীবীরেন্দ্রবিমল চৌধুরী ৪৮৭
সোনার তরীর আধ্যাত্মিকতা (প্রবন্ধ)
শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
সহানুভূতি (গল্প)—তোলানাথ মুখোপাধ্যায়
সপ্তম সুর (অনুবাদ—গল্প)—শ্রীকানু রায়
সতী কি তুমি চাও (কবিতা—কিশোর জগৎ)—বৈতব
সাহিত্যে ধীমাংসার আনন্দবর্ধন (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য
সাধন সংগীত—কথা ও শ্রীনিশিকান্ত
সুর ও স্বরলিপি ও শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১০
সান্ত্বনা (গল্প)—সুরেন ঘোষ ... ৪০৯
সাবিত্রী (কবিতা)—বন্ধুবসু ... ৪৩০
প্রষ্টার মন (প্রবন্ধ)—শ্রীগোরাচাঁদ বসু ... ৭২৪
স্বরাজের পথে অগ্রি দেশ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ... ২৮৪
স্টাইল (গল্প—কিশোর জগৎ)
নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার
সংগীত ও কথা ও গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সুর ও স্বরলিপি ও পঙ্কজকুমার মল্লিক
স্নেহমন্ত্র ভোর (কবিতা—কিশোর জগৎ)
শ্রীসমুখ দাশগুপ্ত
হোটেল বিক্রয়ার্থ (কবিতা)—সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ ১৩৬৪—বহুবর্ণ চিত্র—'মিলন' বিশেষ চিত্র—'একলা চল রে' ও 'নির্নিমেষান মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি' এবং এক বর্ণ চিত্র ৮ খানি
মাঘ —'ভজন' বিশেষ চিত্র—'ঘরা পাতা ও 'শিল্প কেশা' এবং এক বর্ণ চিত্র ১০ খানি
ফাল্গুন —'কাশ্মীর লেক' বিশেষ চিত্র—'দেখছ কি !' ও 'বিগত বৈভব' এবং একবর্ণ চিত্র ৯খানি
চৈত্র —'বসন্ত বাহার' বিশেষ চিত্র—'আকাশ পুটে' ও 'জল জঙ্গল' এবং একবর্ণ চিত্র ১৩ খানি
বৈশাখ ১৩৬৫ —'দিনের শেষে' বিশেষ চিত্র—'ঝড়ের সংকেত' ও 'ঝড়ো হাওয়া' এবং একবর্ণ চিত্র ৯ খানি
জ্যৈষ্ঠ —'দেবী সংহার' বিশেষ চিত্র—'তরঙ্গভঙ্গ ও 'সাগর সন্ধান' এবং একবর্ণ চিত্র—৯খানি।